ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষ, প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

মাসানুক্রমিক চিত্রসূচী

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ২৫শে অগ্রহায়ণের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১২৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৬৲ টাকা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্ণে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি, পি, খরচ পৃথক লাগিবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নূতন গ্রাহক' কথাটি উল্লেখ করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

শিল্পী : ত্রিভঙ্গ রায়　　হরপার্ব্বতী　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আষাঢ়—১৩৬৮

প্রথম খণ্ড | ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

পরমা সংস্কৃতি*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আমাকে আপনারা এ প্রীতির উৎসবে ডেকেছেন শেষ দিনে শান্তি পাঠ করতে—এ আমার মহৎ সম্মান, এইটুকু বললেই প্রীতির ঋণ শোধ হয় না। কেন বলি।

মহাভারতে উদ্যোগ পর্বে আছে কৃষ্ণ তাঁর কুটিরে পদার্পণ করলে বিদুর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিলেন :

যা মে প্রীতিঃ পুষ্করাক্ষ! ত্বদ্দর্শন সমুদ্ভবা।
সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যম্ অন্তরাত্মাসি দেহিনাম্॥

দর্শনে তব কমললোচন! যে-প্রীতি হৃদয়ে ওঠে উছলি—
কী আর বলিব? ওগো নিখিলের অন্তর্যামী, জানো সকলি।

এর নিহিতার্থ এই যে, প্রীতির প্রাণের কথাটি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শুধু অন্তর-লোকেই তার যাওয়া-আসা। সামাজিক প্রীতি আন্তরিক প্রীতির ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য।

এ-যুগের সংস্কৃতি সভায় আধুনিক ভারতে প্রথমেই ভগবানের গৌরচন্দ্রিকা গাওয়া হয়ত অসমীচীন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাবিত্রীতে লিখেছেন ভগবান্ অশ্বপতিকে বলছেন : "Speak not my secret name to hostile time" —অর্থাৎ, "এ-যুগে আমার নাম গোপন রেখো, কারণ লোকে এখন নাস্তিক।" আমার ভরসা শুধু এই যে আমি

* বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের শেষদিনের (৫ এপ্রিল, ১৯৬১) অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ।

আপনাদের প্রীতির দ্বারে অতিথি, তাই জানি—আমার অপরাধ আপনারা ক্ষমা করবেন—আরো এই জন্যে যে, এ যুগে নাস্তিকতার বাড়-বাড়ন্তেও মনস্তাত্ত্বিকরা মানেন অন্তত গীতার একটি কথা যে: স্বভাবস্তু প্রবর্ততে—অর্থাৎ স্বভাব যায় না ম'লে। তবে আমার একটি সাফাই আছে মোক্ষম—যে-সাফাইটি আমার কন্যাশিষ্যা ইন্দিরা দেবী প্রায়ই পেশ করেন—কোনো অতিথি আমাদের মন্দিরে এলে বলেন: "আমাদের কাছে যখন এসেছেন কিছু শুনতে, তখন আমরা যা জানি তারি কথা ছাড়া আর কীই বা বলব বলুন? ফলের দোকানে এসে পাটের খবর চাইলে চলবে কেন?" তাই এইটুকু ভূমিকা করেই আমি সংস্কৃতি বলতে এ-চৌষট্টি বৎসরে যা অন্তরে উপলব্ধি করেছি তারি কথা বলব—এ-সম্বন্ধে চলতি সব মামুলি বুলিকে পাশ কাটিয়ে।

সংস্কৃতি শব্দটির বৈদিক অর্থ মন্ত্রাদি শোধন: কিনা, শুদ্ধিদান—মন্ত্রশক্তির সাহায্যে। সংস্কার বলতে বোঝায় যে-রিফর্ম তারি সগোত্র—কেবল আধ্যাত্মিক আমেজ আছে, এই যা। সাহেবি "কালচার" শব্দটির প্রতিরূপ হিসেবেই বাংলায় এ-শব্দটির প্রবর্তন করেন প্রথম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। আমাদের বাংলা ভাষাকে তিনি ঢেলে সাজিয়েছেন তাঁর অসামান্য প্রতিভায়, তাই তাঁর কথা না শুনবে কে? সংস্কৃতির পূর্বসূরী ছিল কৃষ্টি—যার আভিধানিক অর্থ কর্ষণ বা ফসল ফলানো। এ-শব্দটি ছিল কবির কর্ণশূল। তিনি ১৯৩২ সালে ৺শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "কালচার শব্দের একটা নতুন বাংলা কথা হঠাৎ দেখা দিয়েছে—চোখে পড়েছে কি? কৃষ্টি। ইংরেজি শব্দটার আভিধানিক অর্থের বাধ্য অনুগত হ'য়ে ঐ কুশ্রী শব্দটাকে কি সহ্য করতেই হবে? এঁটেল পোকা পশুর গায়ে যেমন কামড়ে ধরে, ভাষার গায়ে ওটাও তেমনি কামড়ে ধরেছে। মাতৃভাষার প্রতি দয়া করবে না তোমরা? অন্য প্রদেশে ভদ্রতাবোধ আছে। এই অর্থে সেখানে ব্যবহার 'সংস্কৃতি।'

ভাগবতের গোড়াতেই একটি শ্লোক আছে, তার শেষার্ধে আছে: "পিবত ভাগবতং রসম্ আলয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ"—অর্থাৎ

ভাগবত রস অন্তিম দিন অবধি করুন তাঁরা
পান আনন্দে—রসিক এবং ভাবুক ধরায় যাঁরা।

কিন্তু রসিক তথা ভাবুক মিশিয়ে রসিকভাবুক শব্দটি সমাসসিদ্ধ হ'লেও সংস্কৃতিবান্ শব্দটির মতন একটি মূল শব্দ বলা চলে না ব'লে সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিবান্ শব্দ দুটি কালচার ও কালচার্ড শব্দদ্বয়ের প্রতিরূপ ব'লে গণ্য হওয়া বেশি বাঞ্ছনীয়—একথা মানতেই হবে।

ব্যস্। এবার কালচার শব্দটির নিহিতার্থ নিয়ে একটু আলোচনা ক'রে নারায়ণং নমস্কৃত্য পাঠ সুরু করব।

বিশ্ববিশ্রুত জর্মন ভাবুক অসওয়াল্ড্ স্পেংলার তাঁর বিখ্যাত Untergang des Abendlandes (Decline of the West) গ্রন্থে কালচার শব্দটির সংজ্ঞানির্ণয় করতে অনেক কিছুই বলেছেন। তার সার মর্ম এই যে, মানুষের নিয়তি (Shicksal = destiny) তাকে যে ঊর্ধ্বপথে টেনে তুলতে চায় সে টানটি যখন নিঃশেষ হয়—অর্থাৎ মানুষের ঊর্ধ্ববিকাশ যখন থেমে যায়—তখন কালচারের অন্তঃশক্তির ঘনিয়ে আসে মরণ দশা, বেঁচে ব'র্তে থাকে শুধু তার বাইরের কাঠামোটি, ওরফে "সভ্যতা" (Civilization। তাই—বলছেন সাহেব—স্তিমিতায়মান (decadent) প্রতীচ্যে মানুষ আজ কালচারে দেউলে হ'য়ে শুধু শুষ্ক সভ্যতাকে নিয়ে ঘর করছে। একথা সত্য হোক বা না হোক, সাহেবের এই বিলাপের মূলে আছে একটি মহৎ স্বীকার যে, মানুষের মনুষ্যত্বের প্রধান সহায় তার স্বপ্ন দুরাশা ঊর্ধ্বচারণের অভীপ্সা, তাই তার নিয়তির ঊর্ধ্ববিকাশ থেমে যাওয়া আত্মহত্যারই সামিল।

এখন একটু বুঝতে চেষ্টা করি নিয়তির ঊর্ধ্ববিকাশ বলতে কী বোঝায়।

একথা বোধ হয় কোনো সংস্কৃতিবান্ মানুষই অস্বীকার করবেন না যে প্রতি মানুষের হৃদয় হ'তে এসেছে এক একটি কুরুক্ষেত্র—যে-চিরন্তন আখড়ায় দুটি বিরোধী শক্তিসংঘ চায় তাকে বশে আনতে। একটি চায় তাকে রসাতলে নামাতে, যার নাম আসুরিক মনোবৃত্তি—নিষ্ঠুরতা, দণ্ড, শক্তিমদ ও স্বার্থ যার উপজীব্য; অন্যটি চায় তাকে স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ করতে—দয়া, দীনতা, নিরভিমানিতা ও প্রেম যার মূল প্রেরণা। কিছুদিন আগে রাসেল তাঁর Impact of Science on Society তে বলেছেন (৯১, ৯২ পৃ:): "মানুষ আজ ধ্বংসের কিনারায় এসেছে, সর্বনাশকে ঠেকাতে হ'লে তাকে বর্জন করতে হবে

নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা, লোভ, প্রতিযোগিতা……অর্থাৎ যাকে ফ্রয়েড-পন্থীরা নাম দিয়েছে আত্মঘাতী বাসনা—death wish। আসলে সমস্যাটির সমাধান হ'তে পারে একটি অত্যন্ত সহজ ও মামুলি উপায়ে—উপায়টি এতই সরল যে আমি উল্লেখ করতে কুণ্ঠা বোধ করছি—পাছে বিজ্ঞ সিনিকেরা আমাকে হেসে উড়িয়ে দেন। সমাধানটি হ'ল—আমার দুঃসাহস ক্ষমণীয়—প্রেম, খৃষ্টধর্মীয় প্রেম (Christian Love) বা করুণা। যদি তুমি হৃদয়ে এই প্রেম অনুভব করো…তাহ'লে মানুষের দারুণ আধিব্যাধির নিরসন কিছু না কিছু তুমি করতে পারবেই পারবে।"

কেবল এখানে গোড়ায় গলদ এই যে, শুধু বুদ্ধিবাদী সংস্কৃতির প্রসাদে এই খৃষ্টধর্মীয় প্রেম হৃদয়ে অনুভব করা যায় না—খৃষ্টকে বাদ দিয়ে—করুণাকে আবাহন ক'রে স্থায়ী করা যায় না করুণাময়কে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে। কিন্তু হ'লে হবে কি, পাশ্চাত্য দেশে আজকের বিজ্ঞান ও বস্তুতন্ত্রে দীক্ষিত সংস্কৃতিবান্ মানুষ খৃষ্ট ও তাঁর করুণাময় পরম-পিতাকে বরখাস্ত ক'রে বেদীতে চড়িয়েছে জাতীয়তা ও ঐহিকতাকে। ফলে হয়েছে শুধু যে প্রেম ও অনুকম্পার ভরাডুবি তাই নয়, হয়েছে আমাদের ঊর্ধ্বমুখী হৃদয়বৃত্তিগুলির মূলোচ্ছেদ। শিকড় কেটে গাছকে বাঁচানো যেমন অসম্ভব, বস্তুবাদী বুদ্ধিকে বেদীতে বসিয়ে প্রেম প্রীতি করুণা তিতিক্ষাকে আমল দেওয়া ঠিক তেমনি অসম্ভব। এই জন্যেই মানুষ আজ "আত্মঘাতী বাসনা"-কে বরণ করেছে নাস্তিক আসুরিকতার প্ররোচনায়—আণবিক দৈত্যের হাত ধ'রে এসে পৌঁচেছে ধ্বংসের কিনারায় সর্বলুপ্তির অতল গহ্বরে ঝাঁপ দিতে। মনে প'ড়ে যায় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গানের অস্থায়ী কোরাসে গেয়:

জীবনটা তো দেখা গেল, শুধুই কেবল কোলাহল,
এখন যদি সাহস থাকে মরণটাকে দেখবি চল্।

এরই নাম দিয়েছেন রাসেল মরণমুখী বাসনা বা বুদ্ধি।

এই আত্মঘাতী প্রবৃত্তির একটি মাত্র প্রতিষেধক আছে—শ্রদ্ধা। গীতায় তাই ঠাকুর পই পই ক'রে মানা করেছেন সংশয় ও দেবদ্রোহিতাকে আমল না দিতে, বলেছেন শুধু শ্রদ্ধাবানই জ্ঞানকে পায়—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। স্বামী বিবেকানন্দের একটি চমৎকার চিঠি মনে পড়ে এ সম্পর্কে, তিনি লিখেছিলেন: "আমি গৃহস্থও বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না, যথার্থ সাধুতা, উদারতা ও মহত্ত্ব যেখানে, সেখানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হোক।

উদ্ধৃতিটি ঠিক সময়েই হাজিরি দিয়েছে। কারণ যথার্থ সংস্কৃতিকে আমি এই শ্রদ্ধার সমার্থক মনে করি—এই আত্মিক ইষ্টার্থে (Values) শ্রদ্ধা বুঝি—সাধুতা, উদারতা ও মহত্ত্বের বিকাশ। ইতিহাসের প্রতি পাতায়ই কি দেখতে পাই না মানুষের এই চিরন্তন অভিজ্ঞতার এজাহার যে, যেখানেই মানুষ নিজের ক্ষুদ্র আত্মাভিমান, অসাধুতা ও নিম্নমুখী স্বার্থ বৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়েছে, সেখানেই তার ঊর্ধ্বপ্রগতি ব্যাহত হ'য়ে সর্বনাশী অশুভ-বুদ্ধি তাকে পেয়ে বসেছে? কেবল মুস্কিল এই যে ব্যক্তির সম্বন্ধে এ-সত্যটি স্বতঃসিদ্ধের মতন মনে হ'লেও জাতীয় অধঃপতন এত স্পষ্ট ও অপ্রতিবাদ্য হ'য়ে চোখে পড়ে না। তাই মানুষ জাতীয়তার অভিমানে অন্ধ হ'য়ে দেখেও দেখতে পায় না যে জাতি ব্যক্তির সমষ্টি ব'লে উভয়ে একই পথে চলে আত্মঘাতের মহাপ্রয়াণে—সংস্কৃতি খুইয়ে শুধু বাহ্য সভ্যতার সস্তা চেকনাইকেই বরণ করে একই শোকাবহ ভ্রান্তিবিলাসে।

ভাগ্যক্রমে পুণ্যভূমি ভারতে আমরা চিরদিন মহৎ ও উদার সাধুসন্তদের কাছেই পরমা সংস্কৃতির দীক্ষা পেয়ে এসেছি, শুনে এসেছি যে ভাগবত প্রসাদের ছিটে ফোঁটা পেলেও আর ঠিকে ভুল হয় না, অজ্ঞানতিমিরান্ধ নয়ন পায় আলোর দিশা, বুভুক্ষু প্রাণ—পথের পাথেয়।

যত দুর্গতিই হই না কেন, আমরা আজো যে বেঁচে আছি তার কারণ—ধর্মে বিশ্বাস এখনো আমাদের ভারতীয় গণমনে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে। কেবল শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি—শুভবিশ্বাস ও শুভবুদ্ধির পরিপন্থী বহু। এদের মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক শত্রু হ'ল আপাত-মনোহর বস্তু-তান্ত্রিকতার ভোগবাদী বুদ্ধি—যার অন্ত্যেষ্টি দর্পমূঢ় রণসজ্জার আত্মঘাতে। তাই আমাদের আজ আরো সশ্রদ্ধ নিষ্ঠায় বরণ করা চাই মহাজনে শ্রদ্ধা, যেহেতু "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" যুধিষ্ঠিরের এ-মহাবাণী শুধু তাঁর ব্যক্তিগত রুচির কাব্যরূপ নয়—মানব মনের একটি শাশ্বত উপলব্ধির এজাহার: যে, "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"—যে যা মনে প্রাণে

বিশ্বাস করে সে শেষে তা-ই হ'য়ে দাঁড়ায়। গত দেড়শো বৎসরে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক উর্ধ্ববিকাশ কী ভাবে আমাদের সহায় হ'য়ে এসেছে তার ইতিহাস একটু পর্যালোচনা করলেই আমরা দেখতে পাব গীতার কথা কত সত্য। সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা কাব্য নাটক গান ভাস্কর্য দেশাত্মবোধ—সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ এ তিন মহামানবের তপস্যালব্ধ অধ্যাত্ম-প্রেরণা—সব জড়িয়ে একটি মহান্ জাতীয় রেনেসাঁস—নবজন্ম—আমাদের গৌরবের বস্তু হ'য়ে এসেছে। শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত Renaissance in India-য় পরিচয় পাওয়া যায়—অধ্যাত্মলোকের আলো সমাজে কী ভাবে সক্রিয় হয়। এ বইটি লেখা হয়েছিল পঞ্চাশ বৎসর আগে, কিন্তু আজও এর ছত্রে ছত্রে ভারতীয় মনের অধ্যাত্মসমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর তেমনই অম্লান, অক্ষুণ্ণ আছে।

পক্ষান্তরে যেখানে এ-অধ্যাত্ম প্রেরণা নেই, সেখানে মানুষের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগ কীভাবে জোয়ারের জলের মতনই ফেঁপে ওঠে—আজকের য়ুরোপের চিন্তানেতাদের লেখা পড়লেই প্রতীয়মান হবে—আমরা দেখতে পাব মানুষের সংস্কৃতি-সংকট নিয়ে ওদেশের ভাবুকবৃন্দ কতখানি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছেন। যথা, পয়লা নম্বর: বাহ্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতা যদি যথার্থ সংস্কৃতি হ'ত তাহ'লে হিটলারী জর্মন প্রভুজাতির (Herrenvolk) সামরিক হুঙ্কারই হ'ত এ-যুগের সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দোসরা: ধন-বৃদ্ধি ও বিলাসসজ্জা যদি হ'ত আসল সংস্কৃতির ভিৎ তাহলে আমেরিকার মানুষ এত অশান্ত চঞ্চল হয়ে শুধু উত্তেজনার মায়ায় জাতীয় অসুখকে ভুলতে চাইত না। তেসরা: শক্তিমত্তাই যদি সংস্কৃতির অভিজ্ঞান হ'ত তাহ'লে ইংলণ্ড বা জাপানের আজ এ-দেউলে অবস্থা হ'ত না। সবশেষে, শুধু বুদ্ধির চাষেই পরম সংস্কৃতির ফসল ফলে—একথা যদি সত্য হ'ত তাহ'লে বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও আজ মূঢ়মতি রাজনীতিকের তাঁবেদার হ'য়ে তাঁদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রতিভাকে সর্ব ধ্বংসের কুরুক্ষেত্রে সারথি বাহাল করতেন না।

এ-সব ক্ষেত্রে যথার্থ সংস্কৃতির কমবেশি অধো-গতি হওয়ার কারণ স্পেংলার ঠিকই নির্দেশ করেছেন: যে সভ্যভব্য জীবনরীতি, ধনশালিতা, শক্তিমদ, বুদ্ধিবাদ—এরা নয় সংস্কৃতির অভিজ্ঞান। পরম সংস্কৃতি বলব সেই প্রেরণাকেই—যা আমাদের নিয়তিকে সার্থক করে উর্ধ্বাভি-সারে, ইন্দ্রিয়ভোগের সোণার হরিণের পিছনে মিথ্যে ধাওয়া করায় না। তাই ভারতের কবি মনীষী সাধুসন্ত মুনি-ঋষি সবাই একবাক্যে ব'লে এসেছেন আবহমান-কাল যে, সেই সংস্কৃতিই হ'ল পরমা সংস্কৃতি—যাকে বলা যায় আত্মার উপনয়ন, অর্থাৎ যে আমাদের কানে আত্ম-বোধের দ্বিজমন্ত্র দিয়ে বলে: "জিতং জগৎ কেন? মনো হি যেন"—অর্থাৎ যে আত্মজয়ী সেই জগজ্জয়ী, যে-ধনজন সুখ মানে মানুষ অমৃত না, হয় কী হবে তাকে নিয়ে—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?" এই যে আশ্চর্য, অনাড়ম্বর প্রশ্নটি করেছিলেন ভারতের এক মহীয়সী—চারহাজার বৎসর আগে—আজও সে প্রশ্ন প্রতি অমৃতার্থীর হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে ওঠে ঠিক তেমনি ব্যাকুল অনুরাগে—মনে করিয়ে দেয় সেই ঋগ্বেদের ঋষিদের পরমা সংস্কৃতির ঘোষণা—যার প্রসাদে "মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ" তাঁরা মানুষ হয়ে জন্মেও অমৃতের অধি-কারী হয়েছিলেন।

এ-ধরণের সেকেলে কথা শুনে অনেকে হয়ত অপ্রসন্ন হ'য়ে বলবেন: "এ কী ধান ভানতে শিবের গীত?" বললে খুব ভুল বলবেন না—তাঁদের নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার ক'রে। কিন্তু পক্ষান্তরে আমাদের মতন মানুষেরও একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে। আমরা বলতে আমি বুঝেছি সেই শ্রেণীর তীর্থযাত্রীর কথা—যাঁরা শুধু যে ধর্মকে বিশ্বাস ক'রে পথের পাথেয় পেয়েছেন তাই নয়, যাঁরা ভগবৎ প্রসাদের দিব্যাঞ্জনে জগৎকে দেখতে শিখেছেন সম্পূর্ণ অন্য চোখে, কাজেই আর মনে করতে পারেন না যে আত্মার সংস্কৃতি বলতে বোঝায় তথাকথিত সভ্যতার ক্ষণিক চাক-চিক্য—আজ আছে—কাল নেই বিলাসমোহ, অলীক সুখ ও সর্বোপরি, দুরন্ত উত্তেজনা। এ-শ্রেণীর জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি-ভঙ্গির স্বরূপ একদা রমণ মহর্ষি আমাকে বড় সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম: "মানুষ সুখ ছেড়ে কৃচ্ছ্রতে, ভোগ ছেড়ে ত্যাগকে বরণ করবে কী দুঃখে? সুখে ভোগে যে আমাদের জন্মস্বত্ব!" তিনি হেসে বলেছিলেন: "একশোবার। কেবল সুখ

বলো তুমি কাকে ?" আমি বলেছিলাম : "যার দানে মন ভ'রে ওঠে।" তিনি সায় দিয়ে বলেছিলেন : "চমৎকার। কেবল বলো তো বাবা, ভোগবাদী সুখান্বেষীদের চেহারা দেখে মনে হয় কি তাঁরা পেয়েছেন এই মন ভরানো সুখ ? না বাবা, সে-বস্তু মেলে না বাইরে—মেলে কেবল অন্তরে। নিরন্নের দোরে ঘা দিলে তো ভিক্ষান্ন মিলবে না। পরম সুখ মিলতে পারে কেবল এক দাতার কাছে—আমাদের অন্তর। অন্য ভাষায়, সুখ মেলে না বহির্মুখী অন্বেষণে—যেখানে সুখের অন্ন নেই সেখানে হাত পেতে কান্নাকাটি করলে। সুখ পেতে হ'লে সব আগে ডুবতে হবে নিজের মধ্যে। জানতে হবে—'আমি' কে ? এছাড়া আর পথ নেই।"

জগতের দিকে চাইলে জ্ঞানীরাজ রমণ মহর্ষির একথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য এ বিষয়ে সংশয় থাকে কি ? দেখতে পাই না কি যে, যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ সুখী হ'তে যেয়েই বাইরের অবান্তর এ-ও-তা সিদ্ধির কাছে হাত পেতে ব্যর্থ হয়েছে ? কেবল দুঃখ এই যে, সে তবু আজ ফের ভুলতে ব'সেছে যে আমাদের অন্তরে যে দেবতা প্রচ্ছন্ন রয়েছেন তাঁকে পেলে তবেই নিঃস্ব হ'য়ে ওঠে বিশ্বরাজ, মনের কালো হয়ে ওঠে আলোর আলো। রবীন্দ্রনাথ একথা জানতেন ও মানতেন ব'লেই তাঁর বহু কবিতায়ই এই অন্তর্মুখিতার জয়গান গেয়েছেন, স্থানাভাবে তাঁর "নৈবেদ্য" থেকে শুধু একটি কবিতার শেষ চারটি চরণ উদ্ধৃত করি :

"তোমারি মিলন শয্যা হে মোর রাজন্ !
ক্ষুদ্র এ-আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্র কান্ত ! ওগো বিশ্বভূপ !
দেহে মনে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ !"

এই যে ঈশ্বরবাদ এর দুটি রূপ : যখন অন্তরে তাঁর প্রসাদ পাই তখন নিজের দেবত্ব উপলব্ধি করি এঁরই স্পর্শের প্রসাদে। তারপরই দেখতে পাই অন্তরে যিনি অদ্বৈত হ'য়ে আসেন বাইরে তিনিই বহুবিচিত্র হ'য়ে হাসেন।

এই উপলব্ধির পথে আমাদের অন্তরকে রওনা ক'রে দেয় যে-সংস্কৃতি তারই নাম পরমা সংস্কৃতি—সংস্কৃতির সংস্কৃতি। ওরফে ধর্মজীবন বা অধ্যাত্মজীবন। তাই এ সংস্কৃতিকে পেতে হ'লে তাকে খুঁজতে হবে ধর্মেরি মণি-কোঠায়—শক্তির সাম্রাজ্যে নয়, ধনের ধুমধামে নয়, এমন কি বুদ্ধির বিশ্ববিদ্যালয়েও নয়।

আমাদের বাংলার নব্য সংস্কৃতির যাঁরা পুরোধা ছিলেন তাঁদের অগ্রদূত ছিলেন পূজ্যপাদ রামমোহন রায়। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষকে খুঁজে পেয়েছিলেন উপনিষদে, তাই উপনিষদের অনুবাদে ব্রতী হন হিন্দু-ধর্মের নানা অবান্তর আবর্জনা সংস্কার করতে যেয়ে। অতঃপর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ কতিপয় ধর্মনেতা এক নব সমাজের পত্তন করেন : ব্রাহ্মসমাজ। ওদিকে হিন্দুসমাজের অঙ্গন সাফ ও মেরামৎ করতে যেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও আমাদের এই ধর্মভিত্তি সংস্কৃতির অন্যতম পথিকৃৎ হ'য়ে দাঁড়ান, তাঁর অসামান্য মনীষাকে নিয়োগ করেন কৃষ্ণচরিত্রের মহিমা প্রচার করতে। তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথও আমাদের নানা সুরে নব সংস্কৃতির পালা গান শুনিয়েছিলেন মূলত এই অন্তর্মুখী চেতনারই আনন্দ প্রেরণায়—শুধু তাঁর অজস্র কবিতায় ও গানেই নয়, প্রবন্ধে, ভাষণে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে। তিনি ছিলেন ভাবুকতার প্রতিমূর্তি—তাই প্রতি নব পথেই ফেলেছিলেন তাঁর আশ্চর্য আত্মার আন্তর স্বর্ণপ্রভা। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর নাম ছিল না, ছিল উপাধি। নৈলে কি শেষ জীবনেও তাঁর মনের অপরাজেয় অভয় ফুটে উঠতে পারত যখন তিনি মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলেন, বলেছিলেন মৃত্যুকে তাঁর "মৃত্যুঞ্জয়" কবিতায়

"ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল লাজ।…
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো, এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চ'লে।" (পরিশেষ)

অভয়ের কোলে এই যে গভীর আশ্রয়, এরি তো দিশারি অন্তরাত্মার পরম আশ্বাস যে পদে পদে মানুষের মধ্যেই দেখতে পায় তার দেবত্বের অক্ষয় সম্পদ। তাই কবি মানুষ আর দেবতাকে একই ঐক্য সূত্রে বেঁধে গেয়েছিলেন :

"এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর।"

শুধু কি তাই ?

"ভিক্ষু বেশে দ্বারে তার "দাও" বলি' দাঁড়ালে দেবতা
মানুষ সহসা পায় আপনার ঐশ্বর্য বারতা।"

পরমা সংস্কৃতির একটি মস্ত দান হতেই হবে আপনার অন্তরের এই গোপন ঐশ্বর্যের সন্ধান পাওয়া। যেখানেই মানুষ দুঃখ বেদনা বিপদ আপদের সামনে অকুতোভয়ে বলতে পেরেছে :

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না করি যেন ভয়
দুঃখ তাপে-ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়,
কিম্বা স্বামী বিবেকানন্দের জীমূত মন্দ্রে :
হে প্রেমিক, স্বার্থ—মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে করো বিসর্জন,
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান—

তখনই সে পেয়েছে এই অন্তরের অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্যেই পরম পাথেয়, শুনেছে এই প্রেমসিন্ধুরই আনন্দ কল্লোল।

একথা আমার কাছে অজানা নেই যে আজকের দিনে এ-শ্রেণীর আধ্যাত্মিক পাথেয়—অভয় প্রেম বা পরার্থনিষ্ঠা—সাধারণতঃ সংস্কৃতির উপজীব্য ব'লে গণ্য হয় না। সাধারণতঃ সংস্কৃতিবান্ ওরফে "কালচার্ড" মানুষ বলতে আমরা বুঝি শুধু তাঁদেরই—যাঁরা প্রধানতঃ উচ্চশিক্ষিত, বাক্‌পটু ও বিশ্বতথ্যজ্ঞ—এককথায় বুদ্ধিজীবী—ইনটেলেক্‌চুয়াল। কিন্তু আমার মনে হয় এ-শ্রেণীর বহির্ভূষণ বা বাহ্য চাকচিক্যকে সংস্কৃতি নাম না দিয়ে সদ্‌গুণ—accomplishments—নাম দেওয়াই বেশি সঙ্গত। কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলি।

বঙ্কিমচন্দ্র যে আমাদের দেশে সংস্কৃতিবান মহাজনদের মধ্যে একজন অগ্রণী ভাবুক ছিলেন, একথা বোধহয় এ-প্রবর্ধমান অশ্রদ্ধার যুগেও সবাই স্বীকার করবেন। তিনি তাঁর "ধর্মতত্ত্ব" গ্রন্থে সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছিলেন বিশদ ক'রেই। তাঁর মোট কথাটি ছিল এই যে, শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী এই চতুর্বিধ বৃত্তির সুষমিত (harmonious) অনুশীলনেই মানুষ যথার্থ সংস্কৃতিবান্ হয়ে পূর্ণ মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে। কিন্তু পিঠ পিঠ লিখেছিলেন তিনি যে, চরিত্রের সম্পূর্ণতা সংসাধিত হয় কেবল ভক্তিতে—কেন না "এক, ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখনো উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না; দুই, নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না।" (ধর্মতত্ত্ব—দশম অধ্যায়)

কিন্তু শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই নন, প্রবন্ধের অযথা বপু বৃদ্ধির ভয় না থাকলে বাংলার আরো কতিপয় বরেণ্য মনীষীর বাণী উদ্ধৃত ক'রে দেখাতে পারতাম যে তাঁরা সবাই অন্তর্লোকের অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যকেই সংস্কৃতি নাম দিতেন। এখানে কেবল নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মান্দালয়ের জেল-থেকে-লেখা একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত হব। তিনি লিখেছিলেন :

"বাহ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ও ধ্যান ধারণার প্রয়োজন।...নিয়মিত সাধনা করিলে সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন ও রিপুর ধ্বংস হইয়া থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য দুইটি : এক—রিপুর ধ্বংস, প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা; দুই—ভালোবাসা, ভক্তি, ত্যাগবুদ্ধি প্রভৃতি গুণের বিকাশ করা।...ভক্তি প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হয়। মানুষের মনে যখনই কোনো ব্যক্তি বা আদর্শের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি বাড়ে তখন ঠিক সেই অনুপাতে স্বার্থপরতা কমিয়া যায়।...ভালোবাসিতে বাসিতে মন ক্রমশ সকল সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে।" (তরুণের স্বপ্ন)

আজকের দিনে আমরা আমাদের সংস্কৃতির এই ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য ছেড়ে বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতার বহির্মুখী ভাবধারায় দীক্ষিত হ'য়ে সিদ্ধি খুঁজছি বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিকতার ঐহিক মায়ালোকে। তাই আমরা বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বাংলার বরেণ্যতম মহাজনদের জীবন সাধনার ধারাধরণ পর্যালোচনা না ক'রে শুধু তাঁদের নামগুণগানে একটু উজিয়ে উঠেই মনে করি তাঁদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখানো হ'ল। কিন্তু একটু তলিয়ে ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেই দেখতে পাব যে বাংলার সত্যিকার মহাপ্রাণ যাঁরা—তাঁরা যে জীবন-সাধনায় সর্ববরেণ্য হয়েছেন সে ঠিক মনঃশীলবুদ্ধির জৌলুষ বাড়িয়ে ইনটেলেকচুয়াল বা মনস্বী হ'য়ে ওঠবার সাধনা নয়। তাঁরা সবাই চেয়ে ছিলেন চলতি সংস্কৃতির মানস আদর্শকে অন্তরাত্মার দিব্যদীপ্তিতে রূপান্তরিত ক'রে পৌঁছতে সেই পরমা সংস্কৃতিতে—যার আলোর জোগান দেয় বহির্মুখী বিদ্যাবুদ্ধির অস্থির শিখা নয়—অন্তর্জ্যোতির

সেই অচঞ্চল প্রভা। এ-প্রভা নিয়তির জলঝড়ে নিভে যায় না, প্রত্যুত আমাদের নিম্নমুখী প্রবৃত্তির পৃথ্বীটানকে কাটিয়ে ঊর্ধ্বাভিসারের দুঃসাহসকে সতেজ ক'রে, জীবনের হাজারো কাঁটাবনে আলো দেবার। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির আর একটি প্রতিভাধর বরপুত্র—তিনিও এই কথাই বলেছেন তাঁর নানা নাটকে কাব্যে ও গানে—বিশেষ ক'রে একটি অপরূপ ওজস্বী গানে—যে-গানটি নেতাজি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত ভালোবাসতেন। গানটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক মেবার-পতনের শেষ গান তথা বাণী :

কিসের শোক করিস ভাই?—আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ, দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ।

মানুষ হ'তে হ'লে কোন্ সাধনা অবলম্বন করতে হবে কবি তারও নির্দেশ দিয়েছেন :

বিশ্বময় দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোখ,
পুণ্যসেনা নিজের কর্, পাপের সেনা শত্রু হোক।

এর ডাকনাম নৈতিকতা হ'লেও আসল নাম বিশ্বাত্মবোধ যে বলে :

ভুলিয়া যারে আত্মপর, পরকে টেনে আপন কর,
বিশ্ব তোর নিজেরি ঘর—আবার তোরা মানুষ হ।
ধর্ম যেথা সেদিকে থাক্, ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ,
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক—আবার তোরা মানুষ হ।

আপনাদের ধৈর্যের পরে অনেক অত্যাচার করেছি, এবার শান্তিপাঠের সময় এল। শুধু আর দু একটি কথা বলার আছে। কেবল তার আগে যদি একটু ব্যক্তিগত কথা বলি তবে আশা করি আপনারা কিছু মনে করবেন না। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা কেন করতে যাচ্ছি একটু শুনলেই বুঝবেন।

আমি বলতে চাই—একটু জোর দিয়েই যে আমি আশৈশব পিতৃদেবের দীপ্ত মনীষা তথা ব্যক্তিরূপের প্রসাদে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সংস্পর্শে একটি সমৃদ্ধ বুদ্ধিবাদী সংস্কৃতির আবহে মানুষ হয়েছিলাম। তারপর যৌবনে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রাসেল, রোলাঁ, দু হামেল প্রমুখ এদেশের তথা ওদেশের বহু সংস্কৃতিবান্ মহাজনের সঙ্গ ও স্নেহলাভ ক'রে চলার পথে অনেক কিছু পাথেয় সংগ্রহ ক'রে এসেছি। কিন্তু এঁরা সবাই আমার কাছে পরম শ্রদ্ধার্হ হ'লেও আমি যে-দুটি মহাপুরুষের ছোঁয়াচে আমার অন্তর্জীবনের লক্ষ্য-নির্ণয়ে সব চেয়ে বেশি প্রভাবিত হ'য়েছি এবং যাঁদের পথনির্দেশে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিকেই পরমা সংস্কৃতি ব'লে চিনেছি তাঁদের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত আমার কাছে গীতা ভাগবতের চেয়ে কম প্রিয় নয়। তাতে শৈশবেই পড়ি—ভগবান্ লাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। তারপরে নানা ঘাটের জল খেয়ে সময়ে সময়ে হাঁপিয়ে উঠলেও পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে ভুলেও কখনো মনে সংশয় আসে নি এবং তাইতেই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা আমি আমার স্মৃতিচারণে লিখেছি বিশদ ক'রেই—ও ভাবে সাধ্যমত গুছিয়ে বলবার প্রয়াস পেরেছি—কীভাবে তিনি সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমার ধারণায় মধ্যে বিপ্লব ঘটিয়ে ভগবদ্‌ভাবে ভাবিত হ'তে পারাকেই পরমা সংস্কৃতি ব'লে চিনিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁর "জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া" কী ভাবে তিনি আমার "অজ্ঞানতিমিরান্ধ চক্ষু উন্মীলিত" করেছিলেন। তারপরে উত্তর যৌবনে শ্রীঅরবিন্দ আমার এই শৈশবলব্ধ আবছা দিশাকে প্রদীপ্ত ক'রে আমার সামনে ধ'রে দেখিয়ে দেন—কেন বুদ্ধিবাদী সংস্কৃতি আত্মবোধী সংস্কৃতির মধ্যে নবজন্ম না নিলে মানুষ কৃতকৃত্য বা আপ্তকাম হয় না, হ'তে পারে না। সনৎকুমারের কাছে নারদ এসে বলেছিলেন এই দুই জাতের সংস্কৃতির কথা। বলেছিলেন বহুপাঠী ও বহুজ্ঞ হ'য়ে তিনি হ'য়ে উঠেছিলেন "মন্ত্রবিৎ" কিন্তু "আত্মবিৎ" হ'তে পারেন নি। সনৎকুমার নারদকে দেখিয়ে দেন "আত্মবিৎ" হতে হ'লে কোন্ পথ ধরতে হয়—অল্পকে ছেড়ে অনল্প বরণ। বলেন শেষে: "ভূমৈব সুখম্—নাল্পে সুখমস্তি।" এক ভগবদ্‌উপলব্ধি হ'লে তবেই মানুষ পরম সুখী হয়—সীমার অল্প সম্পদে মন ভরে না—যদি সীমার মধ্যে অসীমার মহান্ সুরটি না শুনতে শিখি। শ্রীঅরবিন্দের চরণচ্ছায়ায় পঁচিশ বৎসর ধ'রে হাতে কলমে শিখি এই সুরটি শুনবার সাধনপদ্ধতি—টেক্‌নিক্। আমার জীবনের এই দুই পরমদিশারির নাম করছি আত্মজীবনী পেশ করতে নয়—শুধু জোর দিয়ে বলতে যে পরমা সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায় আমি জেনেছি, চিনেছি ও মনে প্রাণে মেনে

নিয়েছি বাংলার এই দুই পরম ভাগবতের প্রসাদে। আমার কৈশোরে ও যৌবনে আমার মনে একটি গভীর খেদ ছিল যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেখা আমি পাই নি। তারপরে শ্রীঅরবিন্দকে দেখে শুধু যে আমার খেদ মেটে তাই নয়, তাঁর দীপ্ত প্রতিভার, দিব্য জ্ঞানের ও মহিমময় কাব্যের ছোঁওয়ায় আমার বিশ্বাস ক্রমশ প্রত্যয়ে পরিণতি নিয়েছে; তাঁকে যতই ভালোবেসেছি ততই খ'সে পড়েছে আমার চোখের ঠুলি—আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠেছে আনন্দঝংকারে তাঁর "Who" কবিতার:

All music is only the sound of His laughter,
All beauty the smile of His passionate bliss,
Our lives are His heart-beats, our
rapture the bridal
Of Radha and Krishna, our love is their kiss.

বাজে যেথায় যত গান—ধ্বনি তার উছল সুহাস্যের,
সকল মাধুরী—তার আনন্দেরি স্মিত সম্ভাষণ,
মানব-জীবন—বুকের স্পন্দন তার, পুলক আমাদের—
মিলন রাধাশ্যামের, প্রেম আমাদের তাদেরি চুম্বন।

এই বিশ্বমাঝে বিশ্বরাজের স্পর্শ পাওয়াকেই নাম দেওয়া যায় পরমা সংস্কৃতি, সংস্কৃতির শেষ লক্ষ্য—শুধু বাংলার সংস্কৃতি নয়, এমন কি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সংস্কৃতিও নয়, এর নাম সর্বকালীন তথা সর্বজনীন সংস্কৃতির মুকুটমণি—পরমতম বিকাশ। আর এ-বিকাশ যে-অনুপাতে অঙ্গীকৃত হয় ঠিক সেই অনুপাতেই আমাদের অন্তরে নামে প্রেম, চোখে আলো, প্রাণে বল, চিত্তে প্রজ্ঞা। তখন আর ভাবনা থাকে না—মন গান গেয়ে ওঠে (অতুলপ্রসাদের বাউল): "তোমার ভাবনা ভাবলে আমার ভাবনা রবে না, আর আমার ভাবনা রবে না।" কারণ তখন যে আমি সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করব সেই প্রেমাস্পদকে—যার প্রেমের আগুনে সংশয়ের আঁধার কেটে যায়, প্রাণে জাগে পরম নৈশ্চিত্য—শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্য সাবিত্রীর ভাষায়—

Love must soar beyond the very heavens
And find its secret sense ineffable:

স্বর্গ করি' অতিক্রম লভিবে লভিবে প্রেম তার
অন্তর্গূঢ় পরমার্থ—ভাষা যার দিশাও না পায়।

এ-প্রেম স্বভাবে আত্মসুখা নয়—সর্বগ্রাহী, তাই তো মহিমময়ী সাবিত্রী অন্তরে অনুভব করেছিলেন:

In me the spirit of immortal love
Stretches its arms out to embrace mankind.

অর্থাৎ

আমার অন্তরে মৃত্যুহীন প্রেম করে প্রসারিত
বাহু তার—করিতে বিশ্বের প্রতি জীবে আলিঙ্গন।

কেন না

Love is the bright link twixt earth and heaven
Love is the far Transcendent's angel here...

প্রেম বাঁধে তার দীপ্র যোগসূত্রে স্বর্গে মর্ত্য সাথে,
সুদূর অপার ভুবনাধিকার প্রেমই দিব্য দূত...

যে-দূত যুগে যুগে ঘোষণা ক'রে এসেছে:

Imperfect is the joy not shared by all
সে-আনন্দ অসম্পূর্ণ—ভোগ্য যাহা নয় সকলের।

এ-উদ্ধৃতিগুলির ভাষ্য শুধু এই যে মানবিক তথা মানসিক সংস্কৃতির প্রয়োজন আছে—কেবল সোপান হিসেবে। অর্থাৎ শিল্প কাব্য বিজ্ঞান দর্শন মানবাত্মার ঊর্ধ্ব অভিসারে উপায় ব'লেই বরেণ্য, লক্ষ্য ব'লে নয়। লক্ষ্য হ'ল প্রীতি ভক্তি প্রেম—যারা গীতার ভাষায় "সর্বভূতহিতে রতাঃ।" তাই মানবিক সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ কমবেশি তৃপ্তি পেলে তার মধ্যে দূষণীয় কিছু না থাকলেও তাকেই চিরাশ্রয় ব'লে বরণ করলে তার মহতী বিনষ্টি, কারণ

Now we strain to reach an unknown goal.
The life that wins its aims asks greater aims,
There is no end of seeking and of birth,
There is no end of dying and return;
The life that fails and dies must live again,
Till it has found itself it cannot cease.

আমরা দুরভিসারে চলি এক অজানা লক্ষ্যের।
এক লক্ষ্য হ'তে প্রাণ ধায় ঊর্ধ্বতর লক্ষ্যমুখে,
নাই শেষ জিজ্ঞাসার, সন্ধানের, জন্মান্তরের,
মরণের পরে পুনরাবর্তন—নিরন্ত এ-বিধি,

মানে যে-জীবন হার, নিতে হবে নবজন্ম তাকে,
যতদিন আপনাকে না চিনে সে—মুক্তি নাই তার।

যুগে যুগে এই ঊর্ধ্বাভিসারকে বরণ ক'রে এসেছে প্রতি দেশেরই শ্রেষ্ঠ মহাজন বটে, কিন্তু (রামপ্রসাদের ভাষায়) "মানবজমি"তে এই পরমা সংস্কৃতি "কৃষি কাজে সোনা ফলেছে" সব চেয়ে বেশি আমাদের ভারতবর্ষেই বটে—যে-জন্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষিকবি শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই এ-দেশকে "পুণ্যভূমি" নাম দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ভারতের প্রাণশক্তির উৎস ধর্ম যার শেষ লক্ষ্য, অন্তিম পরিণতি—সর্বাত্মবাদ অর্থাৎ ভগবানকে দেখা এ-বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে। আমাদের দেশের মরমিয়ারা—বাউল, ফকির, সাধু, সন্ত, বৈরাগী, উদাসী—সবাই গেয়ে এসেছেন এই কীর্তনেরই পালাগান, এ-মহা উপলব্ধি যারই অন্তর আলো ক'রে আসে সে-ই দেখে সেই একই সনাতন সত্যের পুনর্নব আবির্ভাব—যা ইন্দিরা দেখেছিল ভাব-সমাধিতে আর সঙ্গে সঙ্গে শুনেছিল স্বকর্ণে (৯ আগস্ট, ১৯৫৪):

ময় জিত দেখূঁ—তূ হী তূ হৈ, জিত দেখূঁ কনহাঈ—তূ!
তূ বৈরী ভী হয়, সখা ভি তূ, নিন্দক তূ সহাঈ তূ!
মুসকন অধরপে ভা তূ হয়, হয় হৃদয়কি পীর ভি তূ!
তূ মিলনানন্দ হয় সুধাভরা, বিরহাকা তীর ভি তূ!…
তূ মীরাকা চির-প্রীতম হয়, প্রেমী সৌদাঈ তূ!
ময় জিত দেখূঁ—তূ হী তূ হৈ, জিত দেখূঁ কনহাঈ—তূ॥

আমি যেথাই তাকাই—দেখি শুধু তুমি সবই
শ্যামরায়, তুমি!
তুমি বৈরী, বন্ধু, নিন্দক, বাধা, পরম সহায় তুমি!
বঁধু, তুমি অধরের আলোহাসি, প্রাণে যাতনা গভীরও তুমি!
তুমি অমৃতমিলনানন্দ, বিরহবেদনার তীরও তুমি!
তুমি চিরবল্লভ মীরার, প্রেমের পাগল ধরায় তুমি!
আমি যেথাই তাকাই—দেখি শুধু তুমি, সবই
শ্যামরায়, তুমি

তিমিরা

প্রবোধ সিংহ

তখন গোধূলি; রামধনু রোদ ঘিরে
মদালসা ওই তারাদের ঘুম ভাঙে,
গণিকা রাতের অনুভূতি এল ফিরে।
ফাগুনের সাজ যুবতী বুকের গাঙে।

দেহের ব-দ্বীপে চোরা মাদকতা লাগে;
আঁধারের মাঝে বিলীন হয়েছে সাজ—
অনামী দ্বীপের রাজকন্যারা জাগে,
রাত শেষ হ'ল—কোথায় পক্ষীরাজ?

মনের গোপনে পুরাতন মোনালিসা,
আধেক রাতের ছেঁড়া পূর্ণিমা যেন।
উন্মাদ হিয়া কোথায় হারাল দিশা?
তন্দ্রা তাদের নির্লজ্জ এত কেন?

পুরানো গন্ধ জড়িয়ে রাত্রি আসে;
আসি নামে কোন অনাহূত এক যাত্রী।
ক্লান্ত ভাবনা পলায়ন করে ত্রাসে—
হাসে মোনালিসা-অহল্যা-ঘন রাত্রি।

আর্য ও অনার্য

সুভাষ সমাজদার

ডিষ্ট্রিক্ট কণ্ট্রোলার সুনীল লাহিড়ী, আর ডেপুটি মনোরঞ্জন সেন, আর রিলিফ অফিসার সত্যেন ব্যানার্জী তাদের 'টুর' শেষ করে গঙ্গারামপুর ডাক-বাংলোয় এসে উঠল।

বাংলোর চারিদিকে বিকেলের কোমল বিষণ্ণ ছায়া নেমেছে। সামনে বরিন্দের দিগ্ বিস্তীর্ণ প্রান্তর গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে। দূরে কাজলকালো দিগন্তের দিকে তাকিয়ে সুনীল বলল—একটু চা হলে ভাল হতো না?

—ঠিক বলেছো! বলল মনোরঞ্জন। হাঁক দিয়ে ডাকল বাংলোর চৌকিদারকে—মতি—

মতি এল। জাতে রাজবংশী। কটা কটা চুল। লালচে রঙ। গোল ধরণের ভারী মুখ। আর ছোট ছোট দুটো চোখে সরল দৃষ্টি।

—মতি আমাদের চা খাওয়াতে পারো?

—হ্যাঁ বাবু।

মতি রান্নাঘরে গেল। একটু পরেই তিন কাপ চা করে নিয়ে এল। চায়ে এক চুমুক দিয়েই মুখ কুঞ্চিত করে বলল, সুনীল—ছিঃ ছিঃ এটা কি হয়েছে? চিরতার জলের চেয়েও বেশী তেতো—

—উত্তরবঙ্গের বাঁহে তো! যাকে বলে হুহু। হয়তো চা কোনদিন দেখেই নি।

সত্যেনের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, সত্যেন এদেশের ছেলে। তার সামনে তার দেশের নিন্দা করাটা ঠিক হয়নি।

—সত্যেন, তুমি রাগ করলে ভাই?

কোন কথা বলল না সত্যেন। সে দূরে আসন্ন রাত্রির অন্ধকারে মলিন বিপুলব্যাপ্ত প্রান্তরের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে স্তব্ধ একটা মূর্তির মত বসে রইল।

—মাফ করো ভাই, আবার ব্যাকুল হয়ে বলল মনোরঞ্জন।

—এই বাহে আর হুহুর দেশের সম্বন্ধে যদি বিন্দুমাত্র জ্ঞান তোমার থাকতো, তাহলে এমন কথা তুমি কখনো বলতে পারতে না। এ জেলার সব জায়গায় তোমাদের ঘুরতে হয়। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো, বরিন্দের যে কোন গ্রামের অশ্বত্থ পাকুড় গাছের নীচে নীচে সিঁদুর মাখানো থান। ঐ দেবতার থান দেখেই তোমার বুঝতে পারা উচিত, এখানকার লোকের বিশেষ করে ঐ মতি বর্মনের স্বজাতি রাজবংশীদের ধর্মের ওপরে নিষ্ঠা কত প্রবল।

—হ্যাঁ তাই তো দেখি,যেখানে সেখানে ডাকাত-কালী, আর মশান-কালীর ছড়াছড়ি!

—তোমরা তাই দেখেই ধরে নাও এদেশের রাজবংশীরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অজ্ঞতা আর গোঁড়ামী ওদের মজ্জায়-মজ্জায়—তাই না?

—হ্যাঁ তাই তো, তা ছাড়া আবার কি?

—আজ ওরা সমাজের সব চাইতে নীচের তলায় পড়ে আছে বলেই ধর্মের ওপরে ওদের আস্থাটা অত বেশী। দারিদ্র্যগ্রস্ত বলেই দেবতায় ওদের ভক্তি এত প্রবল। কিন্তু জানো—শত শত বছর আগে এদেশের মাটিতেই প্রথম গণ-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। মহারাজ চক্রবর্ত্তী ধর্মপাল দেবপালের বংশের মূর্তিমান কুল-কলঙ্ক রাজা দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে শ্রেণীবর্ণনির্বিশেষে এদেশের সমস্ত শোষিত মানুষ বিদ্রোহের নেতা দিব্যোকের যুদ্ধ আহ্বান এই রাজবংশীদের রক্তে রক্তে স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাড়া জাগিয়ে ছিল। সেকালের রাজবংশীদের ভেতরে অনেক বীরমল্ল, সহস্রমল্ল তাদের রায়বাঁশ নিয়ে বল্লম নিয়ে সেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে

পড়েছিল। সেদিন ঐ মতি বর্মনের জাত-ভাই রাজবংশীরা আজকের মত গলায় তুলসীকাঠির মালা পরে সব কিছু কৃষ্ণের ইচ্ছায় স'পে দিয়ে বসে থাকতো না—

—এত বড় একটা বীর্য্যবান জাতির বংশধরদের এই পরিণতি কেমন করে হলো ?

—কেমন করে হলো ? দপ করে জ্বলে উঠল সত্যেনের চোখ দুটো। সত্যেনের উত্তেজিত মূর্তির দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল সুনীলের মুখে। আর মনোরঞ্জন মাথা নীচু করে মাটিতে নখ খুঁটতে লাগল। সত্যেন বলল, আমাদের ইতিহাসে দেখবে, যুগে যুগে ধনে-জনে শক্তিশালী বর্ণশ্রেষ্ঠরা নীচু বর্ণের ব্রাত্য, অন্ত্যজ জাতির মানুষদের ঘৃণা করেছে, অবহেলা করেছে। শুধু তাই নয়। ছলে বলে তাদের দাবিয়ে রেখেছে। দেখ না মহেঞ্জোদারো আর হরাপ্পার মত অত শক্তিশালী সভ্যতা ছিল যাদের, তাদের গায়েও 'অনার্য কি দ্রাবিড়' এই ছাপ লাগিয়ে ছোট করেছে আর্য্যরা। ইতিহাস থেকে আরও অনেক উদাহরণ অবশ্য দেওয়া যেতে পারে।

—না। তুমি রাজবংশীদের কথা বলো।

—রাজবংশীরা বরাবরই ছিল যোদ্ধার জাত। ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকে বারো ভুইঞার আমল পর্যন্তও এরা ছিল সৈনিক। ভুইঞা রাজাদের প্রতাপ যখন দুর্বল হয়ে এল, ইংরাজ শক্তির বনিয়াদ ধীরে ধীরে দৃঢ় হলো, তখুনি বাধ্য হয়েই যুদ্ধ-ব্যবসা ছেড়ে দিতে হলো রাজবংশীদের। তারা কেউ গৃহস্থ জীবন যাপন করতে লাগল, আবার কেউ কেউ তাদের যুগ-প্রবাহিত রক্তধারায় যুদ্ধের উন্মাদনা আর সৈনিকের রোমাঞ্চকর অশান্ত জীবনের অনুভূতিকে ভুলতে না পেরে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করল—

—সত্যেনের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ গভীর হয়ে এল। দূরে ফাঁকা মাঠ ঘনায়মান কৃষ্ণারাত্রির দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে একটা গল্প বলি, শোন—

ইংরাজরা বাঙলা দেশের দেওয়ানী পাওয়ার পরে দিনাজপুরের মহারাজা বৈদ্যনাথের শক্তি আর স্বাধীনতা অনেক খর্ব হয়ে গিয়েছিল। এককালের প্রবল পরাক্রমশালী মহারাজা প্রাণনাথের বংশধর বৈদ্যনাথ হলো ইংরেজের দাসানুদাস।

এই সময় দিনাজপুরের মহারাজেরই এক রাজবংশীয় প্রজা অনুধ্বজ বর্মনের মনে স্বাধীন একটা রাজ্যের স্বপ্ন জেগেছিল। এই গঙ্গারামপুরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে করদহ, তপন আর সনকৈরী—এই তিনটি পরগণার সকলের খাজনা আদায় সে করতো এক রকম জোর করেই! বলতো দিনাজপুরের রাজা তো ইংরেজের হাতের পুতুল। ওটা একটা মানুষই নয়। তোমরা খাজনা দেবে আমাকে। এই তিনটি পরগণায় তোমাদের জন্য পুকুর গড়ে দেব, রাস্তা তৈরী করাবো। তোমাদের সুখ দুঃখের ভার আমার ওপর। করদহ তপনের সব লোকই সানন্দে অনুধ্বজকে কর দিত। কিন্তু শুধু কর আদায়ের টাকা দিয়ে তো আর এত বড় পরগণা চালানো যায় না। রাস্তা ঘাট, মন্দির, পুকুর তৈরী করতে যে অনেক টাকার প্রয়োজন। তাই অনুধ্বজ দলবল নিয়ে তার এলাকার বাইরের জমিদার জোৎদারদের বাড়ীতে ডাকাতি করতো। লুঠতরাজ করে যে টাকা পয়সা পেত তার প্রত্যেকটি পাই পর্য্যন্ত তার প্রজাদের কল্যাণের জন্যই ব্যয় করতো। দিনে দিনে অপ্রতিহত গতিতে অনুধ্বজের শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল।

দিনাজপুরের মহারাজা বৈদ্যনাথের কানে সব খবর আসে। তিনি তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বলতেন, ব্যাটা ছোট জাতের লোকটার বড় বাড় বেড়েছে! একদিন শায়েস্তা করতে হবে—

সত্যিই তো মণিমুক্তা-বিখচিত সিংহাসনে বসে কোথাকার কোন একটা অস্পৃশ্য রাজবংশী ডাকাতকে আমল দেওয়া রাজার শোভা পায় না। কিন্তু একদিন অনুধ্বজ মহারাজার কোষাধ্যক্ষের পাল্কী লুঠ করলো; কোষাধ্যক্ষ হরেকৃষ্ণ প্রায় আশী হাজার টাকা নিয়ে দিনাজপুরের সদরে জমা দিতে যাচ্ছিল। শুধু আশী হাজার টাকা লুঠ নয়, হরেকৃষ্ণকে খুনও করেছিল অনুধ্বজ। এবার মহারাজা নিরুদ্ধ আক্রোশে জ্বলে উঠল, একটা রাজবংশীর এতদূর স্পর্ধা! লাঠিয়ালদের সর্দারকে হুকুম করল, অনুধ্বজকে বেঁধে নিয়ে আসতে।

কিন্তু কাজটা যত সহজ ভেবেছিল মহারাজা তত সহজ নয়।

দিনাজপুর থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত যে নবাবী সড়ক বর্ত[illegible]ন ঘন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন, তারই পাশে ছিল অনুধ্বজের

কেল্লা। নিশি রাতে মহারাজার পাইক বরকন্দাজরা কেল্লা ঘেরাও করল। দরজা ভেঙ্গে ঢুকে দেখল, একটা জনপ্রাণী নেই! রাজবংশী পাড়ায় এসে তারা অনুধ্বজের খোঁজ করল। রাজবংশীরা অনুধ্বজের উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, আমরাও তোমাদের মত তাঁর কথা শুনেছি। তাঁকে দেখা কঠিন। শোনা যায়, মাঝরাতে না কি কেল্লায় আসে। সারা দিনমানে কোথায় থাকে কেউ জানে না। মহারাজার লোকরা কিছুক্ষণ বোকা বোকা চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল। যেই তারা চলে গেল, অমনি হো হো করে হেসে উঠল এই শান্ত শিষ্ট নিরীহ রাজবংশীরা। এরা প্রত্যেকে অনুধ্বজের দলের লোক। প্রয়োজন হলেই কাঁধের লাঙ্গল ফেলে দিয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে তীর ছুড়তে পারে; চলে যেতে পারে রণপা চড়ে মাইলের পর মাইল। অনুধ্বজের দলের ঐ ছিল বৈশিষ্ট্য।

রাজার সঙ্গে অনুধ্বজের সংঘর্ষ যখন চরমে উঠেছে, এমন সময় বৈদ্যনাথের কাছে এক ব্রাহ্মণ এল। বলল, গঙ্গারামপুরের দক্ষিণে মল্লীনাহার গ্রামে আমি কিছু জমি পত্তন নিতে চাই—

—আপনার নিবাস? মহারাজ জিজ্ঞাসা করল।

—বর্দ্ধমান জেলায়।

—দেশ ত্যাগের কারণ?

—জ্ঞাতিদের সঙ্গে বিরোধ করে চলে এসেছি। এদেশে এলাম তার কারণ এই বরেন্দ্র ভূমিতেই একদিন হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছিল। সুপ্রাচীন দেশ। আর মল্লীনাহার গ্রামে আমি বাস করতে চাইচি এই জন্যে যে সেখানে আছে পুনর্ভবা নদী। আমার অবগাহন, স্নান, সূর্য্যপ্রণাম—

—আপনি ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ।

—সে কী! এতক্ষণ বলেন নি কেন? তাড়াতাড়ি উঠে এসে মহারাজা বৈদ্যনাথ প্রণাম করল যুবককে। বলল, আপনি বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আমার রাজ্যে থাকবেন, খুবই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু মল্লীনাহারে না থাকলে হয় না?

—কেন?

—অনুধ্বজ নামে এক ব্যাটা ছোট লোক—যার কাজই হচ্ছে ডাকাতি করা, রাহাজানি করা, তার ডেরা ঐ গ্রামের খুব কাছে।

—তাতে কি হয়েছে? ব্রাহ্মণ যুবকের প্রদীপ্ত দুটো চোখে হাসি ঝিকমিক করে উঠল। বলল, আপনি দমন করতে পারছেন না বুঝি?

লজ্জায় মাটিতে মাথা নামালো মহারাজা। আগন্তুক যুবক বলল—আমি তিন মাসের ভেতরে অনুধ্বজকে বেঁধে আপনার সামনে হাজির করাবো। একটা ছোট জাত রাজবংশীর মাথায় আর কত বুদ্ধি থাকতে পারে মহারাজ?

এই যুবকের নাম ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মল্লীনাহারে মাটির দোতালা কোঠাবাড়ী তৈরী করল সে। অবশ্য মহারাজের লোকজন, টাকাপয়সার সাহায্যেই সে বাড়ীটা তাড়াতাড়ি করতে পেরেছিল।

এ অঞ্চলের লোক ব্রাহ্মণকে দেবতার মত ভক্তি আজও করে, তখন আরো বেশী করতো। কিন্তু ব্রাহ্মণদের ছুঁয়ে প্রণাম করার কোন অধিকার তাদের ছিল না। দূর থেকে প্রণাম করতে হতো। আর রাজবংশীয় এবং অন্যান্য অন্ত্যজ জাতদের ছায়া গায়ে পড়লেও ব্রাহ্মণরা স্নান করে শুদ্ধ হতেন। কিন্তু সেই যুগে তরুণ ব্রাহ্মণ ভবশঙ্করের ব্যবহার দেখে রাজবংশীরা বিস্মিত হলো। মুগ্ধ হলো। প্রথমে বাড়ী তৈরী করেই গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে নারায়ণ পূজোর নিমন্ত্রণ করল গ্রামের সবাইকে। সম্ভব মত পাতা পেড়ে যাকে বলে ভূরি-ভোজন! রাজবংশী কোঁচ উঁরাও সকলের বাড়ীর মেয়ে-বৌরা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ পেল। পেটপুরে খেয়ে আরও কিছু বেঁধে নিয়ে আনন্দে ডগোমগো হয়ে তারা বাড়ী চলে গেল। এ অঞ্চলের সমস্ত গ্রামের আকাশে বাতাসে ভবশঙ্করের প্রশংসার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো!

দিন কাটে। মাস যায়। ভবশঙ্কর ভুলতে পারে না মহারাজের কাছে তার প্রতিজ্ঞার কথা। তার রক্তে ভেতরে যেন চিন চিন করে জ্বালা ধরে যায়। একবার নয়। তিন তিন বার ভবশঙ্কর লোক পাঠিয়েছে অনুধ্বজের কাছে। প্রত্যেক বারই লোক ফিরে এসে বলেছে, অনুধ্বজ কখন তার কেল্লায় আসে, আর কোথায় যায়—কি করে—তা কেউ বলতে পারে না ঠাকুর মশায়। কিন্তু মজা এই যে

ভবশঙ্করের লোক যতবার ফিরে এসেছে, ততবারই গভীর রাতের অন্ধকারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রণপা চড়ে অনুধ্বজের দূত এসে চিঠি দিয়ে গেছে।

চিঠির ভাষায় তরুণ ব্রাহ্মণ ভবশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব নেই। অনেক কোটি প্রণাম জানিয়ে অনুধ্বজ লিখতো, আমি জানতে পেরেছি, আপনি ইংরেজের সাক্ষী-গোপাল ঐ অকর্মণ্য রাজার অনুগ্রহপুষ্ট! করদহ, তপন, সনকৈর—এই তিন পরগণা নিয়ে আমার যে এলাকা, আপনি তার সীমানার বাইরে আছেন, থাকুন। আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আমার কাছে দেবতার তুল্য। আপনার কোন ক্ষতি করবো না, আপনিও আমার কোন অনিষ্ট করার ইচ্ছা পোষণ করবেন না—

ইতি আপনার সেবক
—অনুধ্বজ বর্মন।

পরে আরেকটা চিঠিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ভবশঙ্করকে। বলেছিল, আমার কোন পরগণার ভেতরে একজনও ব্রাহ্মণ নেই! আপনি আমার এলাকায় এসে বাস করুন। আপনাকে দেবতার মত মহিমা দিয়ে মাথায় করে রাখবো। আমি এখানে প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চায়েৎ করেছি। আমার প্রজারা নিজেদের ন্যায় অন্যায়ের বিচার নিজেরাই করে। প্রত্যেকটি গ্রামে খাঁটি স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করেছি! আপনি এখানে বাস করতে না চাইলেও অনুগ্রহ করে একবার এসে আমার ছোট্ট রাজ্যটা দেখে যান—

কিন্তু অনুধ্বজের সাদর আহ্বানকে উপেক্ষা করেছিল ভবশঙ্কর। সে অনুধ্বজকে বিশ্বাস করতে পারেনি! বিশ্বাস কেমন করে করবে, দ্বন্দ্ব যে ছিল তার নিজের মনের ভেতরেই। তবুও আশ্চর্য, ভবশঙ্কর মনে মনে আশা করতো, সে বর্ণশ্রেষ্ঠ বলেই একদিন অনুধ্বজ স্বেচ্ছায় আসবে তাকে প্রণাম করতে!

ওদিকের মহারাজার শাসনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন নগরে গ্রামে অনুধ্বজের লুঠতরাজ অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল। রাজার লাঠিয়াল, পাইক-বরকন্দাজরা নাজেহাল হয়ে গেল। মহারাজা বৈদ্যনাথের মনটা যন্ত্রণায় জ্বলে ওঠে। অস্থির পায়ে পায়চারী করে রাজপ্রাসাদের অলিন্দে। অনুচরদের ডেকে বলেন, সেই ব্রাহ্মণ যুবককে ডেকে নিয়ে এস—

ভবশঙ্কর এল। আবার দৃঢ় গলায় বলল, ধৈর্য ধরুন মহারাজ! আমি যা বলেছি তা করবো।

—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার আমন্ত্রণও অগ্রাহ্য করেছে অনুধ্বজ!

—হ্যাঁ। সোজা পথে কাজ হবে না। একটু বাঁকা রাস্তা ধরতে হবে।

—যা হোক একটা উপায় করুন ঠাকুর! গোটা মল্লিনাহার গ্রামটাই আপনার নামে লিখে দেব।

—দেখি কি করতে পারি!

মাথায় গুরুভার চিন্তার বোঝা নিয়ে ভবশঙ্কর বাড়ী এল। হঠাৎ তার মনে হল, অনুধ্বজ কি দেবতা মানে? ভগবানের সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে ওর? যদি কোন পূজা উপলক্ষে বাড়ীতে অষ্টপ্রহর কীর্তন কি ষোল নাম, বত্রিশ অক্ষরের নামযজ্ঞ ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে ওকে নিজে গিয়ে আমন্ত্রণ করে! তাহলেও কি অনুধ্বজ আসবে না? কিন্তু লোকটার দেখাই যে পাওয়া যায়না!

মল্লীনাহারের রাজবংশীদের মুখে শুনতে পেল, ভবশঙ্কর তপনে একটা বিশাল দীঘি খুঁড়ে দিয়েছে অনুধ্বজ। সেই দীঘির জল জনসাধারণ ব্যবহার করার আগে একটা উৎসব হবে। সেই উপলক্ষে প্রজাদের মঙ্গল কামনা করে দীঘির উঁচু পাড়ে যাগযজ্ঞ ও পূজার আয়োজন করেছে অনুধ্বজ। আরও শুনল, তার এলাকায় কোন ব্রাহ্মণ নেই বলেই মালদহ থেকে দশজন ব্রাহ্মণ এনে খাওয়াবে অনুধ্বজ। দক্ষিণাও দেবে।

তোমরা হয়তো ভাবছো, ব্রাহ্মণদের ওপরেও এদেশের ব্রাত্য মানুষদের এত ভক্তি কেন? সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে মাত্র পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিয়ে এসেছিলেন এই দেশে বহুকাল আগে। এই পাঁচজনই শিক্ষাদীক্ষায় ও মনীষায় সত্যিকারের ব্রাহ্মণ ছিলেন। এদেশের নীচুবর্ণের মানুষরা তাঁদের গুরু বলে মেনে নিয়েছিল। তাঁরা যাগযজ্ঞ বেদপাঠমণ্ডিত উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন-ধারার প্রভাব এদেশের মানুষের মনে সঞ্চারিত করে দিয়েছিল। কালে কালে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বেড়েছে। সেই প্রথম পাঁচজন ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে

এদেশের লোক—সেই ভক্তি অনুধ্বজের কালের ব্রাহ্মণরাও পেত। যাক—

বৈশাখী পূর্ণিমায় উৎসবের দিন স্থির হয়েছে। ভবশঙ্কর ভাবল—অনাহূত হয়েই যদি সে অনুধ্বজের এই সমারোহ-ভরা উৎসবে যোগদান করে তাহলে কি অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের মত তাকে সমাদর করবেনা? আবার পর-মুহূর্ত্তেই তীব্র একটা আশঙ্কায় ভেঙ্গে পড়েছে তার বুক। যদি অনুধ্বজ তার কোন ক্ষতি করে!

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মাথার ওপরে উদ্যত খড়্গের মত বিপদের আশঙ্কা নিয়েই ভবশঙ্কর তপনে রওনা হয়েছিল। ভেবে দেখ, শুধু মাত্র দেহে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের রক্ত বইছে, অতএব অনুধ্বজ কোন অনিষ্ট নাও করতে পারে—এই ক্ষীণ বিশ্বাসটুকু সম্বল করে নিশ্চিত বিপদের মুখে এগিয়ে গিয়েছিল ভবশঙ্কর!

ভবশঙ্কর যখন তপনে সেই দীঘির পাড়ে এসে দাঁড়াল, তখন সূর্য্য পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়েছে। পূজো আর কীর্ত্তন শেষ হয়ে গেছে। বিশাল জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। রাজবংশীদের ভেতরে যারা ভবশঙ্করকে চিনতো, তারা কলরব করে উঠল, আরে মল্লীনাহারের ঠাকুর এসেছে। মালদহ থেকে আগত ব্রাহ্মণরা আহার করছিল—তারাও মুখ ঘুরিয়ে দেখল, সত্যিই এক তরুণ ব্রাহ্মণ যুবক দীঘির উত্তর পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পথ হাঁটার পরিশ্রমের ক্লান্তিতে,আর কি একটা উদ্বেগে তার সুন্দর মুখখানা কেমন কালো হয়ে গেছে।

ভবশঙ্কর বিস্মিত হয়ে দেখল, আহাররত ব্রাহ্মণদের সম্মুখে ভক্তিবিনম্র ভঙ্গীতে বসে রয়েছে এক রাজবংশী। শীর্ণ দেহ, খর্বকায় যুবক। কিন্তু দেহের কোথাও যৌবনের দীপ্তি নেই। ধক করে উঠল ভবশঙ্করের বুকটা, যে দিনাজপুর মহারাজার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, যার মনে স্বাধীন একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠার অতবড় স্বপ্ন, সেই অনুধ্বজের এই চেহারা! সত্যি সত্যি সেই খর্বাকৃতি রাজ-বংশীই ভবশঙ্করের কাছে এল। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। হাত দুটো জোড় করে বলল, কী আশ্চর্য, আপনি আসবেন, ভাবতেই পারি নি! ভেবেছিলাম, নিমন্ত্রণ করলেও আপনি আসবেন না!

সাদর ও আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়ে ভবশঙ্কর আশ্বস্ত হলো। যাক কোন বিপদের ভয় নেই তাহলে। একমুখ হেসে বলল ভবশঙ্কর—নেমন্তন্ন করলেও আসবো না, কেন ভেবেছিলে?

—আমি রাজার বিরোধী পক্ষ।

সাদা ঝকঝকে পৈতেটা গায়ের চাদরের নীচ থেকে বের করল ভবশঙ্কর। পৈতে আঙ্গুলে জড়িয়ে ব্যাকুল গলায় বলল, এখন মহারাজা বৈদ্যনাথের সঙ্গে আর কোন যোগ নেই অনুধ্বজ। তুমি বিশ্বাস করো—

—সে কী! পৈতে ছুঁয়ে একথা বলছেন ঠাকুর?

—হাঁ,সত্যি বলেই পৈতে ছুঁয়ে বলতে পারছি অনুধ্বজ।

—কিন্তু আপনি মহারাজার টাকায় বাড়ী করেছেন। তার রাজ্যে থাকেন।

—থাকি। কিন্তু মনে বড় যাতনা নিয়ে বাস করছি।

—কেন?

—তোমার মত মহারাজা বৈদ্যনাথের মনে কোন ধর্ম-বিশ্বাস নেই; ভক্তি নেই ব্রাহ্মণের ওপরেও। প্রজারাও সবাই রাজার মতই বিলাস-ব্যসনের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে। যে দেশে ধর্ম নেই, সে দেশে কোন ব্রাহ্মণ থাকতে পারে অনুধ্বজ?

ভবশঙ্করের কথা শুনে অনুধ্বজের চোখদুটো জ্বলে উঠল। ভবশঙ্করের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধায় ভরে গেল তার মন। বলল, আপনাকে তো বলেছিলাম আমার এলাকায় এসে থাকতে—

—হাঁ তাই অসবো অনুধ্বজ।

সামনে বসে থেকে যত্ন করে খাওয়ালো ভবশঙ্করকে। নিমন্ত্রিত বিদেশী ব্রাহ্মণদের মোটা দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করল অনুধ্বজ। ভবশঙ্করকেও একশো টাকার তোড়া দিল। কিন্তু ভবশঙ্কর তোড়া ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আমি টাকার দক্ষিণা চাই না অনুধ্বজ।

—বলুন কি দক্ষিণা চান ঠাকুর?

—যা চাইবো দিতে পারবে?

—নিশ্চয়ই। আপনি ব্রাহ্মণ। আমার অতিথি। যা চাইবেন, তা সম্ভব হলে দিতেই হবে।

—বেশ, শোন, আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, আমার বাড়ীতে কুলবিগ্রহ রাধামাধবের পুজো হবে। তুমি তোমার অনুচর-দের নিয়ে চলো আমার প্রসাদ নেবে।

—যেতে পারি। কিন্তু কোন বিপদ হবে না তো?

—কী! আমি ব্রাহ্মণ হয়ে তোমার কাছে মিথ্যা বলছি অনুধ্বজ! ভবশঙ্করের চোখে বেদনার ছায়া নেমেছিল। আবার পৈতে ছুঁয়ে গাঢ় গলায় বলেছিল ভবশঙ্কর—তুমি নিরাপদে ও অক্ষত দেহে ফিরে আসবে অনুধ্বজ।

—এই দক্ষিণা চান?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তো যেতেই হবে।

রাত্রির ছায়া নামল সেই দীঘির চারিদিকে আদিগন্ত প্রসার প্রান্তরে। পূর্ণিমা-চাঁদের রূপালী আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। অনুধ্বজ প্রায় একশো বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে মল্লীনাহারে রওনা হলো।

দূর থেকেই দেখা গেল ভবশঙ্করের দোতালা কোঠাবাড়ী আলোয় ঝলমল করছে। ভবশঙ্কর আশা করেছিল, সে নিজে গেলে অনুধ্বজকে আনতে পারবে। তাই বাড়ীতে লোক খাওয়ানোর এবং অন্যান্য সব ব্যবস্থাই করা ছিল। যাওয়া মাত্র অনুধ্বজের সঙ্গের লোকদের খেতে বসিয়ে দিল ভবশঙ্কর। ওদিকে বাইরের বারান্দায় হরিনাম গানের শব্দ, আর ভেতরে আহার-রত অনুধ্বজের রাজবংশী অনুচরদের উল্লসিত কলরোল মিশে প্রচণ্ড একটা শব্দের তরঙ্গ আছড়ে পড়ল চারিদিকের নিস্তব্ধ প্রান্তরের বুকে।

—তুমি আমার সঙ্গে এস অনুধ্বজ। শান্ত, স্নিগ্ধ গলায় ডাকল ভবশঙ্কর।

ভবশঙ্করের কুলবিগ্রহ রাধামাধবের মূর্ত্তির সামনে এসে দাঁড়াল অনুধ্বজ।

প্রণাম করো—গম্ভীর স্বরে বলল ভবশঙ্কর।

মন্দিরের ভেতরে নিস্তব্ধতা থম থম করছে। যেই মঞ্চিতে মাথা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল অনুধ্বজ, অমনি মন্দিরের শালকাঠের ভারী দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আর্ত্ত-গলায় চেঁচিয়ে উঠল অনুধ্বজ—আপনি ব্রাহ্মণ, পৈতে ছুঁয়ে—দরজার ওপারে শ্বাসরোধী অন্ধকার থেকে তার গলা আর শোনা গেল না। শুধু ভবশঙ্করের হিংস্র, হাসির শব্দে সারা বাড়ীটা কেঁপে উঠল। মুহূর্তে যেন চারিদিকে মহা-প্রলয় নেমে এল। হুঙ্কার দিয়ে এল দিনাজপুর মহারাজার অজস্র সৈন্যরা। ভবশঙ্কর তপনে যাওয়ার আগেই তার বাড়ীর পেছনে তাদের লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল।

অনুধ্বজের অনুচরেরা—যারা প্রত্যেকে সুনিপুণ যোদ্ধা—তারাও অসহায়ভাবে বন্দী হলো। শুধু তাই নয়, মহারাজা বৈদ্যনাথ ইংরাজদের কাছে থেকেও সৈন্য ও আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্য নিয়েছিল সেদিন। অনুধ্বজ শাসিত তপন করদহ পরগণার প্রত্যেকটি রাজবংশীদের বাড়ীতে তারা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। নারী শিশু-বৃদ্ধরা পুনর্ভবা, টাঙন নদী পার হয়ে—প্রাণভয়ে পালিয়ে ছিল। আর শত শত রাজবংশী যোদ্ধা বল্লম আর তীরধনুক নিয়ে গোরা সৈন্যদের বন্দুকের গুলীর সামনে ধুলোরমত মাটিতে মিশে গিয়েছিল। পুনর্ভবা নদীর কাজল-কালো জলে রক্তের বন্যা নেমেছিল!

এমনি করেই বরিন্দের আরণ্য মৃত্তিকার আদিমতম সন্তান রাজবংশীদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল। সেই থেকেই যুগ যুগ ধরে এই সামরিক জাতটা একেবারে শান্ত ও নিরীহ হয়ে গিয়েছিল। তারপরে কালে কালে দারিদ্র্য আর কঠোর জীবনসংগ্রাম ওদের আরও নির্জীব করে দিয়েছে।

দেখ, এখানে একটা খটকা তোমাদের লাগতে পারে। তোমরা ভাবতে পারো, মহারাজা বহু আগেই ইংরাজদের সাহায্য নিয়ে রাজবংশীদের ওপরে নৃশংস অত্যাচার করে তো তাদের দমন করতে পারতো। ভবশঙ্করের প্রয়োজন কী? কিন্তু তোমাদের আগেই বলেছি অনুধ্বজকে সশরীরে গ্রেপ্তার করাই যে অসম্ভব ছিল। ভবশঙ্কর ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল বলেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। আর অনুধ্বজকে ছেড়ে শত শত রাজবংশীকে হত্যা করলেও মহারাজা বিপদমুক্ত হতেন না।

ভারতের ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী নতুন নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের দীপ্তি ছড়িয়ে নিম্নবর্ণের মানুষের সহজ সরল ও ভক্তিপ্রবণ মনের সুযোগ নিয়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করার এই প্রচেষ্টা সুদূর অতীতের সেই আর্য-অনার্যের সংঘাতের কাল থেকেই চলে আসছে।

শুধু আলকপ্প গানে নয়, পল্লী বাউলের সঙ্গীতে, বরিন্দের গ্রামে গ্রামে কৃষকবধূদের কণ্ঠেও অনুধ্বজের করুণ মর্মান্তিক পরিণতির বেদনাভিষিক্ত স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য মুখর হয়ে উঠে।

অনুধ্বজের তৈরী তপনের সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ দীঘি আজও জলের ঐশ্বর্য্যে টলমল করছে, তোমরা ইচ্ছে করলে দেখে আসতে পারো। সত্যেন থামল।

মতির তৈরী সেই তেতো চায়ের কাপটা টেবিল থেকে নামিয়ে রাখতে রাখতে আবার বলল, আজ এই বাংলোর চৌকিদার মতি বর্মনের দুটো ঘোলাটে চোখে, হাড়জিরজিরে চেহারায় তোমরা তার অতীত পুরুষদের সেই বীর্য-বত্তার কোন আভাসই পাবে না—

সুনীল আর মনোরঞ্জন বাংলোর অন্ধকার বারান্দার এককোণে ঘাড় গুঁজে বসে থাকা মতির দিকে বিস্মিত চোখে তাকাল।

গঙ্গারামপুর ডাকবাংলোর চারিদিকে তখন রাত্রি নেমেছে ঘন হয়ে।

স্বদেশ-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৭ই আগস্ট টাউনহলে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে যে বিরাট জনসভা হয়, সেখানে "অবস্থা ও ব্যবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী প্রচার ও ইংরাজ শাসকদের সঙ্গে অসহযোগ অবলম্বনের দ্বারা এই অন্যায় প্রতিরোধের উপদেশ দিয়েছিলেন। এ আন্দোলনে তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় একজন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বদেশীযুগের পূর্ব হতেই এই আন্দোলনের ভাব-বিকীরণ কেন্দ্র স্বরূপ ; তিনি যে এর মধ্যে সক্রীয়-ভাবে এসে যোগ দেবেন এটা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। পূর্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আত্মশক্তির সাধক। এই সময় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'আত্মশক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি কখনো কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রাধীন ভিক্ষা-নীতির সমর্থক হ'তে পারেননি। তিনি ছিলেন বঙ্কিম-বিবেকানন্দের বীর-ভাবধারার উত্তরাধিকারী। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কবি ও সাহিত্যিকেরাও সকলেই ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যাঁরা মনে করতেন—

জপতপ আর যোগ আরাধনা
পূজা হোম যাগ, প্রতিমা অর্চনা
এ সকলে এবে কিছুই হবে না
তূণীর কৃপাণে কররে পূজা !

রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা এগিয়ে এসে জোর গলায় বললেন—ভিক্ষা ছাড়তে হবে। 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।' আবেদন—নিবেদনে কিছু হবে না। জাতীয় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। আত্মনির্ভরশীল হতে হবে ! রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে অর্থ-নৈতিক সংগ্রামও চালাতে হবে। বিদেশী শিল্প সম্পূর্ণ বর্জন ও স্বদেশী শিল্পের প্রচলন করা চাই। মুনাফায় হাত না পড়লে এই বিদেশী বণিকদলের চৈতন্য হবে না। বঙ্গ-বিচ্ছেদ যদি বাতিল ক'রতে হয় তবে চালাতে হবে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে যথাসম্ভব অসহযোগ। বিলিতী সব কিছু এমন কি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বর্জন করতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে জাতীয় বিদ্যালয়, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দেশীয় বস্ত্রাদির কলকারখানা। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধের দ্বারা আমাদের প্রতিবাদকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। এসব ব্যাপারে কবির সঙ্গে একমত হয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্বর্গীয় ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, ডন সোসাইটির অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনয় কুমার সরকার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি বাংলার বামপন্থী নেতারা। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই সেদিন বাংলার জাতীয়-সঙ্গীত রূপে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানটি কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল। এই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শেষ পর্যন্ত জাতীয়-মন্ত্র হয়ে উঠে ইংরেজদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। স্বদেশী আন্দোলনটা বঙ্গ-বিচ্ছেদকে অবলম্বন করেই শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু, এ ক্রমশঃ রূপ নিল পরাধীন জাতির 'স্বাধীনতা' লাভের যুদ্ধ আন্দোলনের। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ তখনও স্বাধীনতার স্বপ্ন পর্যন্ত দেখেন নি।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথের অশান্ত লেখনী-নিঃসৃত অসংখ্য দেশ-প্রেমাত্মক সঙ্গীতও এই আন্দোলনে একটা প্রচণ্ড গতিবেগ ও প্রাণের উদ্দীপনা সঞ্চার করে একে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল—বোমারযুগের রক্তাক্ত কারা-প্রাঙ্গণে—শহীদদের শোণিতসিক্ত বধ্যভূমি পর্য্যন্ত। ফাঁসীর আসামী উল্লাসকর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শুনে বিচারালয়ের মধ্যে সেদিন গেয়ে উঠেছে।

"সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে।"

পুলিশের অত্যাচারে নির্য্যাতীত, লাঠির আঘাতে ভূলুণ্ঠিত তরুণের দল হাস্য মুখে গেয়েছে—

"ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা।

তোমাতে বিশ্বময়ীর,—
তোমাতে বিশ্ব মায়ের
আঁচল পাতা।"

স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্যে দেশভক্ত কবি উৎফুল্ল হয়ে উঠে গেয়েছিলেন—

"জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খবাজে!
* * * *
মার আহ্বান-বাণী রটাও ভুবন মাঝে।"

ইং ১৯০৫ সালের ১৫ই অক্টোবর বা ৩০শে আশ্বিন তারিখে রবীন্দ্রনাথ সারা বাংলাদেশে হরতাল, অরন্ধন, গঙ্গা-স্নান ও রাখীবন্ধন ঘোষণা করেন। এই রাখীবন্ধনের মন্ত্রস্বরূপ তিনি যে প্রাণস্পর্শী গানটি রচনা করেন, আজও তা' আমাদের কানে বাজচে!—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক—
হে ভগবান!
* * *
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক—
হে ভগবান!"

ইং ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ যে পর্যন্ত না বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়ে উভয়বঙ্গ পুনরায় এক হয়েছিল, স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল-তরঙ্গ কিছুমাত্র রোধ হয়নি। কত জেল, কত দ্বীপান্তর, কত ফাঁসী হয়ে গেল তার মধ্যে। এই আন্দোলনের ঘনঘটার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেন জ্যোতির্ময় আদিত্যের মতোই উদিত হয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিপূর্ণ প্রকাশ যেন এই স্বদেশীযুগেই সকল ঐশ্বর্য নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। কিশোর বয়স থেকেই যে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন সেই মন্ত্র সাধনার পূর্ণ সিদ্ধি যেন এই সময়েই তিনি তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতিকে নিঃশেষে দান করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। নিঃশঙ্কচিত্তে যতকিছু দুঃসাহসের কাজ তিনি যেন বেপরোয়াভাবে করে গিয়েছিলেন। এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু ইতস্ততঃ ভাব ছিল না তাঁর মধ্যে। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা সবাই সেদিন বিদেশী শাসকদের চোখ রাঙিয়ে বলেছিলুম—

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান?
তুমি কি এমনি শক্তিমান?"

সেদিন উদাত্ত কণ্ঠে কবি আমাদের ডেকে বলেছিলেন—

কে জাগিবে আজ? কে করিবে কাজ?
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ?
কাতরে কাঁদিবে—মার পায়ে দিবে—
সকল প্রাণের কামনা!"

স্বদেশী আন্দোলন সেদিন বাংলাদেশ জুড়ে চলেছিল পরিপূর্ণ-বেগে। কবি পরিতৃপ্ত আনন্দে গাইলেন—

"এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
জয়মা বলে ভাসা তরী।"

মাঝে মাঝে কর্মীদের মধ্যে ভয় বা অবসন্নতা এসেছে দেখলে কবি উৎসাহ দিয়ে গেয়েছেন—

আপনি অবশ হ'লে, তবে, বল দিবি তুই কারে?
নেই যেরে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে!
অভয় চরণ শরণ ক'রে— বাহির হয়ে যা রে।"

ভীরুদের মন থেকে ভয় দূর করবার জন্য তিনি নির্ভয় কণ্ঠে বলেছেন—

"আমি ভয় করবনা, ভয় করবনা
দুবেলা মরার আগে
মরবো না ভাই মরবোনা।"

তিনি আমাদের সাহস দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বলেছেন—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা' চলরে।
* * *
যদি কেউ কথা না কয়—
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরেয়ে, সবাই করে ভয়,
তবে পরাণ খুলে—
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা
একলা বলরে!
* * *

যদি আলো না ধ'রে—
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে,
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে—
একলা জ্বলরে !"

এই গানেরই প্রতিধ্বনি শুনেছি আমরা কবির কণ্ঠে—

"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না !
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়ত'রে ফল ফলবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চলবেনা !
আসবে পথে আঁধার নেমে
তাই বলে কি রইবি থেমে ?
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি
হয়ত বাতি জ্বলবে না—
তা'বলে ভাবনা করা চলবে না !

কবি তাঁর কর্তব্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাই তিনি বলচেন—

"যে তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়বনা !
আমি, তোমার চরণ করব শরণ
আর কারো ধার ধারব না !

এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের আরও অসংখ্য স্বদেশী সঙ্গীত আছে। যেমন "নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।" "ছিছি, চোখের জলে ভেজাস্‌নে আর মাটি !" "আমায় বোলনা বোলনা গাহিতে, বোলনা !" "যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যানা !" "মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?" "বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি !" ইত্যাদি। এ গুলির সংখ্যা প্রায় শতাধিক হবে। কিন্তু 'গীত বিতান' গ্রন্থে কবির যে সকল স্বদেশী সঙ্গীত স্থান পেয়েছে তার সংখ্যা পঞ্চাশেরও কম। এই সঙ্গীতের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার বহু পূর্বেই স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন। পরবর্তী গানগুলি অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেই অর্থাৎ ইং ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে লেখা। এইসব গান দেশবাসীর অন্তরে একটা-প্রবল দেশাত্মবোধ জাগ্রত ক'রে তোলার দিক দিয়ে যে অসমান্য কাজ করেছে একথা সগৌরবে স্বীকার করতে হবে।

ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'দেশীয়রাজ্য' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন, তাতে ভারতের সমস্ত সামন্ত নৃপতিদের তিনি স্বদেশের শিল্পবাণিজ্য রক্ষা করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন ! অনুরোধ করেছিলেন—স্বদেশজাত দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু যেন তাঁরা ব্যবহার না করেন। তাঁদের রাজ্য থেকে সব কিছু বিলিতী বিলাস ও প্রসাধন নির্ব্বাসিত হোক। দেশের টাকা বিদেশে বেরিয়ে না গিয়ে দেশেই থাকবে এবং তার ফলে দেশের দারিদ্র্য দূর হবে। কবি তাঁর 'রাজা-প্রজা' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কি ভাবে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য ভারতের ধনসম্পদ প্রতিদিন অবাধে লুণ্ঠিত হচ্ছে। ভারতের নিজস্ব শিল্প-বাণিজ্য কিভাবে ধীরে ধীরে লয় পাচ্ছে।

এই সময় এদেশে ইংরাজ-প্রবর্তিত বিদেশী চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। ভারতীয় চিত্রকলা প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। প্রাচ্য রম্যকলার পুনরুদ্ধারের জন্য কবি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। শিল্পীচূড়ামণি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের বলেছেন যে আজ যে ভারতবর্ষের চারিদিকে ও ভারতের বাইরে 'ওরিয়েণ্ট্যাল' আর্ট বা ভারতীয় চিত্রকলার এমন প্রচুর সমাদর হচ্ছে, এর জন্য দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের কাছেই আমরা অশেষ ঋণী। কারণ, তিনিই বার বার বলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলিকাকে য়ুরোপের পথ থেকে সরিয়ে ভারতাভিমুখী করে দিয়েছিলেন।

স্বদেশী-আন্দোলনের প্রায় মাঝামাঝি শ্রীঅরবিন্দ এসে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এঁর কাছেও কথার চেয়ে কাজেরই দাম ছিল বেশি। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন তখন সুস্পষ্ট মোড় নিয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে এবং কংগ্রেসের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা এবং পূর্ণ স্বায়ত্ব-শাসন বা 'স্বরাজ' নিয়ে 'নরম পন্থী' ও 'চরম পন্থী' দুটি পৃথক দল গড়ে উঠেছে। ১৯০৬ সালে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনেই কংগ্রেস সর্বপ্রথম সারা ভারতবর্ষের জন্য 'স্বরাজ' চাই বলে দাবী করেন।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় তাঁর সেই পূর্বপরিকল্পিত 'স্বদেশী

সমাজে'র পরিকল্পনাকে জাতিগঠনের কাজে রূপায়িত ক'রে তোলবার চেষ্টা করেন। শক্তিশালী বিদেশী শাসকদের আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় হয়ত সহজে বিদায় করতে পারবনা। নাই বা পারলাম। ওরা আছে থাক। ওদের সঙ্গে কোনও রকম সংঘর্ষ সৃষ্টি না ক'রে আমাদের দেশ যদি আত্মনির্ভরশীল হতে পারে সেই চেষ্টাই করা হোক। আমরা নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে আমাদের নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তুলবো। ওদের আদালতে ঢুকবনা। সালিসী প্রথা মেনে নিয়ে নিজেদের মধ্যে সকল বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে নেব। শান্তিরক্ষার জন্য ওদের পুলিশ পাহারার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব না। নিজেদের মধ্যেই শান্তিরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হবে। ওদের স্কুলে, ওদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছেলেদের শিক্ষা নিতে যেতে দেবনা। আমরা নিজেরাই জাতীয় পাঠশালা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলবো। ইংরেজ সরকারের পাশাপাশি চলবে আমাদের সেই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা, যার প্রধান কাজ হবে—দেশ ও জাতির উন্নতিমূলক সর্বপ্রথম সংগঠন সৃষ্টি করা।

এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন' নিয়ে সর্বাগ্রে কাজ শুরু করার প্রয়োজন হয়ে পড়লো বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগের এক সার্কুলার জারি হওয়াতে। এ সেই বিখ্যাত 'কার্লাইল সার্কুলার'—যাতে প্রত্যেক ছাত্রকে চোখরাঙিয়ে বলা হয়েছিল যে স্বদেশী সভা সমিতিতে যে ছাত্র যোগ দেবে এবং যে ছাত্র 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি মুখদিয়ে উচ্চারণ করবে, তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চিরকালের জন্য বিতাড়িত করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুরাগীরা এই চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করেছিলেন। কবি স্বয়ং বিদেশী সরকারের এই স্বেচ্ছা-চারিতার বিরুদ্ধে কলিকাতার একাধিক সভায় কঠিন ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে অকাট্য যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ফলে ছাত্রছাত্রীরা কার্লাইল সার্কুলার সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে স্বদেশী সভায় যোগ দিতে এবং তার স্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে শুরু করে দিলে। পুলিশের রেগুলেশান পাঠি তাদের শির ও শরীর আহত করতে ছাড়লে না। বহু ছাত্র সরকারী বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িতও হয়েছিল। কিন্তু, বাংলায় যুবশক্তি বিদেশী সরকারের সে অন্যায় উৎপাড়নের কাছে মাথা নত করেনি। তারা 'এ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটি' খুলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রচারের কাজে লেগে গেল।

রবীন্দ্রনাথ লেগে গেলেন 'জাতীয়-শিক্ষা আন্দোলন'কে রূপ দিতে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ দেশের ছেলে মেয়েদের যে বিদেশী শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়েছিল, তারই বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহস্বরূপ তিনি এদেশের ছেলে মেয়েদের সম্পূর্ণ জাতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের পরি-কল্পনা প্রচার করেছিলেন। যে শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে আমাদের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগ নেই, আমাদের আদর্শ ও নীতির সম্পর্ক নেই, যা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী সরকারের করায়ত্ত—সে শিক্ষা কখনো জাতির মনুষ্যত্ব ও বীর্য বিকশিত করে তুলতে পারে না। অতএব দেশ-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ চাইলেন এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে—যা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদেরই আয়ত্তাধীন। আমাদের দেশের জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই এখানে শিক্ষানীতি প্রবর্তিত করতে হবে। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ বললেন—আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা চাই।

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত এই জাতীয়শিক্ষা পরিষদের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিল, এগিয়ে এলেন অকৃপণ হস্তে তাঁদের অর্থকোষ উন্মুক্ত ক'রে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী, সার তারকনাথ পালিত এবং ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। অধ্যাপনার ভার নিলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মনীষী হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতি। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এর প্রধান অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মহা উৎসাহে এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যে আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন। এর পাঠ্য তালিকা নির্বাচন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা প্রভৃতি নানা কঠিন বিষয়েই তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। কিন্তু, পরিচালকেরা যখন ক্রমেই

জাতীয় আদর্শ বিচ্যুত হয়ে এখানে পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রণালীর অনুসরণ শুরু করলেন, রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন তাঁর বোলপুর ব্রহ্মচর্য আশ্রমে। এই বিদ্যালয়টিকেই তিনি আপন আদর্শ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলবার গুরুভার একা আপন স্কন্ধে তুলে নিলেন। কারণ, প্রাচীন ও নবীনদলের মধ্যে আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে সুস্পষ্ট মত ভেদ দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বহু চেষ্টা করেছিলেন এই দুই দলকে মিলিয়ে একযোগে দেশের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত করতে। কিন্তু এক হওয়া তো দূরের কথা, বিভেদ ক্রমেই বেড়ে চললো। রবীন্দ্রনাথ দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন উপলক্ষে নিজেদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব কোলাহল একেবারেই পছন্দ করতেন না। এখানে কাজের চেয়ে কথা বেশি হচ্ছে দেখে তিনি ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে বাধ্য হলেন। অবশ্য এঁদের সঙ্গে সংশ্রব একেবারে বিচ্ছিন্ন করেন নি। "ব্যাধি ও প্রতিকার" শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে দেশের উত্তপ্ত তরুণ সম্প্রদায়কে ডেকে কবি তাদের উত্তেজনাকে সংযত করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, স্থির হয়ে শান্ত হয়ে দেশ গঠনের কাজে মন দিতে। বৃথা অত্যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা স্বীয় চরিত্রকে দুর্বল করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি যুবকদের নিজ নিজ পল্লীতে গিয়ে ঘৃণিত অবহেলিত নিরক্ষর গ্রামবাসীদের জ্ঞান দিতে, আনন্দ দিতে, আলো দিতে এবং সেবা ও প্রীতি দিয়ে তাদের আপন করে নিতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, তারাও মানুষ, তাদেরও বাঁচার অধিকার আছে একথা তাদের গিয়ে বুঝিয়ে দাও। ১৯০৭ সালেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ স্বদেশপ্রেমাত্মক কাহিনী "গোরা" ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'তে শুরু হয়। এই কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের সাহায্যে তিনি তাঁর দেশসেবার গঠনমূলক আদর্শই প্রচার করেছিলেন।

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে এই নরম-পন্থী ও গরম-পন্থীর বিবাদ প্রকাশ্য সভায় অত্যন্ত কুশ্রীভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এতে অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হন। এই বৎসরই রাজদ্রোহের অপরাধে শ্রীঅরবিন্দকে ইংরেজ সরকার বন্দী করায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে তাঁর সেই বহুজনপ্রশংসিত কবিতাটি প্রকাশ করে দেশভক্তের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছিলেন।

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ, কোনো ক্ষুদ্র দান,
চাই নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা, ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি।...জয়, তব জয়!"

ইং ১৯০৮ সালে পাবনায় যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনে সভাপতিরূপে নির্বাচিত হ'য়ে যোগ দিয়েছিলেন। দুটি পৃথক শিবিরে বিভক্ত দেশের মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী দুই রাজনীতিক দলকে দেশের কল্যাণের জন্য একত্র করবার মহৎ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ'য়েই রবীন্দ্রনাথ এই সভাপতি পদ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথই সর্ব প্রথম তাঁর সভাপতির অভিভাষণ বাংলাভাষায় দিয়ে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে বাংলাভাষাকে প্রথম সামাজিক মর্য্যাদা দিলেন। এই অভিভাষণে তিনি তাঁর কিছুদিন পূর্বের লেখা 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে যে কথা বলতে চেয়েছিলেন সেই উপদেশই দেশের তরুণ যুবকদের উদ্দেশে একটু বিস্তৃত ভাবেই বলেছিলেন। বৃথা হৈ চৈ না করে, ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার না ব'নে তিনি সকলকে দেশের কল্যাণকর গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে অনুরোধ করেন। সকলেই স্ব স্ব প্রধান না হয়ে একজন নায়ককেই মেনে চলতে বলেন। কার্যসিদ্ধি তাতেই হবে।

এই অধিবেশনেই প্রথম দেখাযায় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা। তিনি এখন থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের কল-কোলাহল থেকে দূরে সরে এসে নিঃশব্দে দেশের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগের দ্বারা স্বদেশের সেবা করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। দেশ ও জাতিগঠনমূলক বিবিধ কাজ নিয়ে তিনি সুদীর্ঘ কাল নিজেকে শান্তিনিকেতনে আবদ্ধ রেখেছিলেন। মজঃফরপুরে প্রথম 'বোমা' দুর্ঘটনার পর রবীন্দ্রনাথ 'পথ ও পাথেয়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে, ছেলেদের প্রাণদানের সাহস ও বীর্যবত্তার প্রশংসা করে এ কথাও বলেছিলেন যে—এ পথ

হিংসার পথ, এপথে সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। একে স্বাধীনতালাভের জন্য পুণ্য সংগ্রাম বলা চলেনা। এ জিঘাংসা-প্রণোদিত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। এ পথে যদি কখন সাফল্য আসেও, তবে তা দেশবাসীর পক্ষে কল্যাণকর হবে না।

ইং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বাইরে থেকে একটা অসদ্ভাব সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে দেখে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হ'য়ে উঠেছিলেন। একে প্রশ্রয় দিলে বাংলার ভবিষ্যৎ যে একদিন শোচনীয় হয়ে উঠবে, দেশ-প্রেমিক কবির অন্তর্দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিল। তিনি 'সদুপায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে দেশবাসীকে এই সর্বনাশ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্ভাবনা যে অসম্ভব নয় এ ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। কবির মনে এই সময় থেকেই একটা মহামানবতার আবেদন এসে পৌঁছেচে এবং তাঁর চোখে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রেমাঞ্জন লেগেছে—এর আভাসও পাওয়া যায়।

ইং ১৯০৯ সালে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনা করে রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রের সাহায্যে 'অসহযোগ' ও 'সত্যাগ্রহ' সাধনার অপরাজেয় শক্তি দেশবাসীর দৃষ্টি পথে মেলে ধরেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর কল্পনাতেও সেদিন 'সত্যাগ্রহ' বা 'অসহযোগের' স্বপ্ন ছিলনা। অহিংস প্রতিরোধের পূর্বাভাষ বাংলাদেশ পেয়েছিল কবির কাছেই প্রথম, এই ধনঞ্জয় বৈরাগীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ভিতর দিয়ে। এরই অব্যবহিত পরে মহাত্মাগান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় 'প্যাসিভ রেজিষ্টান্স' বা 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'-অবলম্বনে 'সত্যাগ্রহ' শুরু করেন।

রবীন্দ্রনাথের 'তপোবন' পড়লে দেখতে পাই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, তার আদর্শ ও নীতি, তার ধর্ম ও ঐতিহ্যে একান্তভাবে বিশ্বাসী কবির আশ্রম-জীবনের উপর কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অটুট বিশ্বাস ছিল। তা' সত্ত্বেও ভারতবাসীদের মধ্যে যে সব আচারগত কুসংস্কার ও ধর্মের ভণ্ডামি এসে ঢুকেছিল তাকে তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি তিনি। গদ্যে ও পদ্যে বহুবার তিনি আমাদের এই জাতীয় দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আমাদের হিন্দুধর্মের মহত্ব কোথায়। বহু প্রবন্ধ লিখে তিনি তা' দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কথায় বলে 'স্বভাব যায়না ম'লে।' আমাদের ও হয়েছিল তাই। "শেষে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' নাটক রচনা করে আমাদের লজ্জা দিয়ে আর একবার সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন। 'চরিত্রপূজা' গ্রন্থে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ভারতীয় মহাপুরুষদের আদর্শ জীবন রচনা করে চরিত্র গঠনের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে এক নূতন জাতীয় সঙ্গীত উপহার দিলেন "জনগণমনঅধিনায়ক, জয় হে, জয় জয় ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।"

ইং ১৯১০ সালকে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম সাধনার নিকেতনী'যুগ বলা যেতে পারে। এই সময় বেদ উপনিষদ প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব এবং ভারতীয় দর্শন পুরাণ ও ইতিহাস নিয়ে তিনি গভীর গবেষণা ও আলোচনা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বখ্যাত 'গীতাঞ্জলি' এই বৎসরই প্রকাশিত হয়েছিল। এরই দু'বছর পরে 'গীতাঞ্জলি'র জন্য কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—এই প্রাচীন ভূখণ্ডে সুদীর্ঘকাল ধরে কত বিচিত্র জাতি আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সকলের সমন্বয়ে ভারতবর্ষকে আজ এক দুর্লভ গৌরব অর্জন করতে হবে—সে হ'ল তার—'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' (unity in diversity)—সে হ'ল বিভেদের মধ্যে সাম্য। এই ঐক্য ও সাম্যের দ্বারা নিখিল মানবের মুক্তিকল্পে তার কল্যাণের পথ প্রশস্ত করতে হবে। মানুষে মানুষে, জাতি বর্ণ ও ধর্মের ভেদাত্মক বিরোধ নিয়ে যাতে তারা পরস্পরকে দূরে ঠেলে দিয়ে পৃথক হয়ে না থাকে, কবি পৃথিবীর মানুষদের এখন থেকে এই কথাই শোনাতে শুরু করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ এই যুদ্ধের নামে মানুষের উন্মত্ত হিংসাকে পাশবিক তামসিকতা বলে নিন্দা করেছিলেন। অহিংসাই যে মানবতার সর্বোচ্চ আদর্শ, একথা তিনি তাঁর 'মা মা হিংসি' প্রবন্ধে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে

মার্চ মাসে গান্ধিজী আর একবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসেন। প্রথমবার এসে কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তখন য়ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এই প্রথম কবির সঙ্গে গান্ধিজীর মুখোমুখী সাক্ষাৎ হল। রবীন্দ্রনাথের নিকট অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গান্ধিজীও কবিকে 'গুরুদেব' ব'লে সম্বোধন শুরু করেন। ভারতাত্মা গান্ধিজীকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম 'মহাত্মা' বলে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন—এ খবর হয়ত' অনেকেরই জানা নেই। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কবি চঞ্চল হয়ে উঠে বাঁকুড়ার নিরন্নদের সাহায্যকল্পে চাঁদা সংগ্রহের জন্য 'ফাল্গুনী' নাটক রচনা করে অভিনয় করেন। এ নাটকখানি 'সবুজপত্রে' প্রথম প্রকাশিত হয়। দরিদ্র দেশবাসীর প্রতি কবির এই আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসার পরিচয় আমরা বারবার তার নানা রচনায় ও কর্মের মধ্যে পেয়েছি।

ইং ১৯১৫ সালে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা কি ভাবে কোন পথে এল তা দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। এ বইখানিকে আমরা কবির স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাওয়ার একটি কৈফিয়ৎ হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি।

কবি ভারতবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে এতই সজাগ ছিলেন যে ইংরেজ উপনিবেশগুলিতে ভারতবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন হচ্ছে শুনে তিনি ব্যাকুল হয়ে তাঁর ভক্তশিষ্য এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সনকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যাণ্ডে পাঠিয়েছিলেন সেই সব হতভাগ্য ভারতীয় শ্রমিকদের সঠিক অবস্থা কি সবিশেষ জেনে আসবার জন্য। এই বছরই তিনি আর একবার 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে মাতৃভাষার সাহায্যে দেশের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবার দাবী পেশ করেন। দেশের ছাত্র-সমাজকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহের চক্ষে দেখতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের 'সুভাষচন্দ্র বসু' প্রমুখ দুঃসাহসী ছাত্রেরা অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে ক্লাশে পড়াবার সময় ভারতবাসীর নিন্দা করার অপরাধে যে প্রহার করেছিলেন, সে জন্য ছাত্রদের উপর ইংরেজ সরকারের প্রচণ্ড শাসনদণ্ড উদ্যত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই নিষ্ঠুর ছাত্র দলনের প্রতিবাদে 'ছাত্র-শাসন' নামে একটি স্মরণীয় প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধে কবি স্পষ্ট ভাষায় বিদেশী শাসন-কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এইসব অন্যায় আচরণের জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর বিরূপ মনোভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইং ১৯১৬ সালে কবি দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া, চীন, জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরে এসে দেখেন ঘোরতর অশান্তি ও অরাজকতা চলেছে। রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃস্থানীয়দের ধরে ধরে বিনা—বিচারে আটক ও বন্দী করে রাখা হ'চ্ছে। তিনি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাব্র প্রতিবাদ জানিয়ে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' শীর্ষক একটি বলিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। দেশের প্রতি ও দেশবাসীর প্রতি এতটুক অন্যায় কবি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভগবান কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না। তাই ঈশ্বরকে ডেকে বলেছেন—

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর সনির্বন্ধ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ আবার একটি ভারতের বন্দনা গীতি রচনা করেন—

"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি;
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কৈ?"

অ্যালফ্রেড থিয়েটারে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি কবি যেদিন পাঠ করেন সেদিনই প্রথম এই গানটি সর্বসাধারণের কাছে পরিবেশন করা হয়।

ইং ১৯১৭ সালে কলিকাতায় আবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। 'হোমরুল' পরিকল্পনার জন্য শ্রীমতী এ্যানি বেশান্তকে সভানেত্রী করা নিয়ে প্রবীণ ও নবীনদলের মধ্যে বিরোধ বাধে। বিশ্বপ্রেমিক উদারহৃদয় রবীন্দ্রনাথ এই আইরিশ মহিলার ভারতের প্রতি অপরিমেয় প্রেমের পরিচয় পেয়ে কৃতজ্ঞহৃদয়ে এ্যানি বেশান্তকেই প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য সমর্থন করেছিলেন। কবির দাবীই সেদিন জয়ী হয়েছিল। ইংরেজ সরকার এইবার রবীন্দ্রনাথের দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা, তাঁর

স্বদেশ প্রেম, তাঁর নির্ভীক সত্য-ভাষণ ইংরেজের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিযোগ নিয়ে এল' যে, তারা সংবাদ পেয়েছে, কবি নাকি স্যানফ্রান্সিস্কোর বিদ্রোহী ভারতবাসীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং নানাভাবে তাদের সাহায্য করছেন। মিত্রপক্ষের শত্রু জার্মানীর কাছে তিনি নাকি অর্থ-সাহায্য নিয়ে আমেরিকা ভ্রমণ করেন! ভারতে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে তিনি নাকি সর্বত্র এমন সব বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, যাতে ন্যায়সঙ্গত বিধি-বিধানানুযায়ী ভারতে প্রতিষ্ঠিত এই ব্রিটীশ সাম্রাজ্য সকলের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়!

রবীন্দ্রনাথ এ পত্রের কোনও উত্তর দেন নি। তিনি একেবারে সোজা তদানীন্তন মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে এই সব মিথ্যা সংবাদের কৈফিয়ৎ দেবার জন্য তলব করেন। ইংরেজ বেগতিক দেখে এ ব্যাপার এইখানেই ধামা চাপা দেয়।

শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী' নামে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এই সময় কবিকে যেন অস্থির করে তুলেছিল। তিনি এ সম্বন্ধে শান্তিনিকেতনের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে এর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা সুরু করেন।

[আগামী মাসে সমাপ্য]

কোন পথে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

স্বাধীনতা লভি' উল্লাস করি—মরি যে তবু আতঙ্কে,—
শৃঙ্খল গেল—এতো শৃঙ্খলা কেন গেল তার সঙ্গে?
এতই হীনতা—এত শিথিলতা,
এত লোভ, এত মদমত্ততা,
কোথা থেকে এলো—এত বিষব্রণ সাধু সমাজের অঙ্গে?

২

প্রগতির সাথে এতো দুর্গতি—এতো দুর্নীতি কোথা আর?
প্রবঞ্চক আর ঠক-প্রতারক দেশকে করিল ছারেখার।
কল্পিত নিতি নূতন অভাব,
কৃত্রিমতায় সত্যের ছাপ,
ম্লান করে দিল শুভ্র শুচিতা—ব্যভিচার নানা রঙ্গে।

৩

স্নেহ দয়া মায়া ভক্তি ও প্রেম—নির্ঝর মহাপ্রাণতার—
লুকায়ে যেতেছে, শুকায়ে যেতেছে—ফিরাবে তাদিকে কিসে আর?
বিশ্বপ্রেমের বন্যা যে এসে।
গৃহ ঘর বাড়ী ভাসাইল শেষে,
শিষ্টতা আর বিশিষ্টতাও ভেসে গেল সে তরঙ্গে।

৪

জাতি যে নিষ্ঠা তপস্যা হারা—নাহি সম্ভ্রম সংযম—
মনুষ্যত্বে বড় যদি হবে, কোথা প্রাণপণ উদ্যম?
স্নিগ্ধ মমতাময়ী ভূমি আজ,
পরিছে নাগরী বিলাসিনী সাজ।
সহিতেছি নিতি হিয়া দগদগি বুকভরা আশা ভঙ্গে।

৫

ধর্ম্ম ও সৎকর্ম্ম ক্রমেই হইয়া উঠিছে পণ্য—
জাতীয়তা আজ নিলামে উঠিছে—স্বার্থ অগ্রগণ্য।
সর্ব-শক্তি-উৎসে সার্থে।
জাতি সংযোগ বসেছে হারাতে।
তাহাদিকে তুমি কি জীবন দিবে পতিতপাবনী গঙ্গে?

৬

কোথা গান্ধীর সেই তপোবল?—তাঁহার সিদ্ধ মন্ত্র?
সকল তাঁহার পরিকল্পনা করিবে কি শুধু যন্ত্র?
তাঁর আদর্শ হতে কত নীচে—
নামিতেছি দিন—চাহি নাক পিছে,—
কোন পথে আজ চলিয়াছি মোরা তাঁর উপদেশ লঙ্ঘ্যে?

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
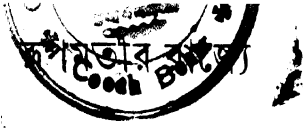
অট্টালিকাটির ছাদ হ'তে দূরে দেখা যাচ্ছে নর্ম্মদাকে।

পার্ব্বত্য অঞ্চলে হাওয়ায় দুপুরের খর রৌদ্রেও মনে হচ্ছে, পাতলা নীলাভ কুয়াশায় আচ্ছন্ন। চিকমিক করে বহে যাচ্ছে স্রোতস্বিনী নর্ম্মদা।

সূর্য্য কিছুক্ষণ হ'ল মাঝ আকাশ ছাড়িয়ে গেছেন। কয়েকঘণ্টা পরেই দূর পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়বেন। নামবে অন্ধকার, নামবে রাত্রি।

সেদিনও রাত্রি নেমেছিল, নর্ম্মদার তীরে, এইখানে, ওই প্রান্তরে।... সূচীভেদ্য অন্ধকার।......

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভেসে এল সেই সঙ্গীত ধ্বনি, সেই কিন্নরী-কণ্ঠের সুর। সুর তো নয়, সুরা!

তারই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে সুলতান বাজবাহাদুর, রাজ্যেশ্বর বাজ-বাহাদুর, সেই অন্ধকারে জনহীন প্রান্তরে, নিঃসঙ্গ ছুটতে লাগলেন। লক্ষ্য, গন্তব্য, সেই সুরের উদ্ভব-কেন্দ্র। যে সুর, যে সঙ্গীত, ক'দিন ধরে তাঁ'কে টানছে—তাঁকে উন্মাদ করে তুলেছে। যা তাঁর মনে গায়িকার প্রতি এক অনির্ব্বচনীয় অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। যা' শাসক বাজ-বাহাদুরের ভিতর থেকে বা'র করে এনেছে একটি দুর্ব্বল, সাধারণ মানুষ বাজবাহাদুরকে। হারিয়ে গেছেন রাজ্যেশ্বর বাজবাহাদুর। তাই ছুটছেন তিনি কোন অদৃশ্য হস্তের নির্দ্দেশে, কোন অজ্ঞাত তৃষ্ণায়—শুধু ধ্বনি-মাত্র সম্বল করে।

জোরালো. বাতাস বইছে। তাই সুরের দিক বার বার হারিয়ে যাচ্ছে। কখনো তা' ডাইনে, আবার কখনো বাঁয়ে মনে হচ্ছে। বাজ-বাহাদুর দিশাহারা হয়ে ছুটছেন।

অবশেষে, নর্ম্মদার তীরে, একজায়গায় দেখলেন, একখানা ওড়না হাওয়ায় উড়ছে। দেখতে পেলেন, এক অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তি। ঘন অন্ধকারেও তার শুভ্র বাহু দুটি দেখা যাচ্ছে। ছুটে গিয়ে তা'র সামনে দাঁড়ালেন। রমণী ভয় পেয়ে দু'পা পেছিয়ে গেল। কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল—"কে?"

সুলতান উত্তর দিলেন—"ভয় পেওনা। আমি বাজবাহাদুর, মাল-ওয়ার সুলতান।"

রমণী আশ্বস্ত হয়ে বলল—"ও!"

বাজবাহাদুর প্রশ্ন করলেন—"তুমি কে মনে করেছিলে?"

রমণী—"চোর, দস্যু।"

বাজবাহাদুর (হাসিয়া)--"এখন বুঝলে তো তা' নয়।"

রমণী—"তা'র চেয়ে কমও নয়। আপনি কেন আমার সঙ্গীতে বাধা হলেন?"

বাজবাহাদুর আহতকণ্ঠে বললেন—"বাধা! না, বাধা হ'তে আমি আসিনি। আমি শুধু তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম। তোমার সুরের জালে আবদ্ধ হয়ে ক'দিন ধরে আমি যন্ত্রণা পাচ্ছি। আজ তাই তুমি কে,—তুমি কি সত্যই মানবী না কোনও হুরী, না কি কোনও ঐশ্বরিক ছলনা, তাই দেখবার জন্য ছুটে এসেছি।"

রমণী উত্তর দিল—"আপনি মালওয়ার সুলতান হোন আর যেই হোন, আমার সঙ্গীতের ছেদ ঘটিয়ে অন্যায় করেছেন। আপনি যান। আর কখনও আসবেন না।"

বাজবাহাদুর বেদনাহতকণ্ঠে বললেন—'বেশ, আমি যাচ্ছি। আর কখনও তোমার সামনে আসবনা। শুধু একটি অনুরোধ, তুমি আমায় মনে রেখো। আমি বাজবাহাদুর।"

এরপর উভয়েই স্ব স্ব গৃহমুখী হ'লেন।

অথচ পরদিনই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনায়মান হ'তে না হতেই বাজবাহাদুর ছুটে গেলেন নর্ম্মদার তীরে। শুনতে লাগলেন সেই কণ্ঠস্বর,—মাতা নর্ম্মদার উদ্দেশে সেই সঙ্গীতাঞ্জলি। তবে, গায়িকার স্বর যেন মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। কোথায় যেন একটি তন্ত্রী নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।

যতদিন যেতে লাগল, ততই গায়িকার সঙ্গীত বেদনার রসে ভরে উঠতে লাগল। সুর বিস্রস্ত হ'তে লাগল। শেষে, বাজবাহাদুর প্রতিজ্ঞা-চ্যুত হয়ে আবার একদিন গায়িকার নিকট উপস্থিত হ'লেন। মৃদুস্বরে বললেন—"আমি রোজই এখানে আসি কিন্তু তোমায় কথা দিয়েছি বলে তোমার সম্মুখে আসতে পারিনা। দূরে, ওই গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে, তোমার কণ্ঠস্বরে বুক ভরে নিতে চেষ্টা করি। যতক্ষণ তুমি গাও, আমি পান করি। তবু তৃষ্ণা মেটেনা যে!" রমণী কোনও উত্তর দিলনা। বাজবাহাদুরের চোখের উপর কাতর দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক বসে রইল। তারপর হঠাৎ কেঁদে উঠল—"আপনি কেন আমার এ ক্ষতি করলেন! আমি তো নর্ম্মদার উদ্দেশে, ভগবানের উদ্দেশে গাইতাম।"

চমকে উঠলেন সুলতান। মুহূর্ত্তের জন্য নীরব থেকে বললেন—"স্রষ্টাকে তুমি যে সঙ্গীত সুধা নিবেদন করতিসে তার মাঝায়, তার স্পর্শে, তাঁরই একটা সৃষ্টি—একটা মানুষ বাঁধা পড়েছে। একি অস্বাভাবিক? এ কি অন্যায়? তবু, যদি তোমার কোনও ক্ষতি করে থাকি তো সেই ক্ষতিপূরণ করার জন্য মালওয়ার অধিপতি, আমি, তোমার সকল ভার গ্রহণের আরজি পেশ করছি। দেবে আমায় তোমার ওই সুন্দর হাত দু'খানি? তোমার সেবায়"—

রমণী বাধা দিল, "ছিঃ, আপনি রাজ্যেশ্বর। আমি অতি সামান্যা।"

রাজবাহাদুর—"না না। আমি তোমার কাছে রাজ্যেশ্বর নই, বাজবাহাদুরও নই। আমি এক সাধারণ মানুষ। তোমার হৃদয় সান্নিধ্যের তৃষ্ণায় কাতর।"

রমণী—"কিন্তু সুলতান আপনি কি জানেন আমি কে? কোথায় আমার জন্ম? কোথায় আমার বাস?..."

রাজবাহাদুর—"জানবার প্রয়োজন আছে কি?"

রমণী—"হাঁ।"

রাজবাহাদুর—"বেশ, বল।"

রমণী দূরের এক বসতির দিকে দেখিয়ে বলল—"আমি ওইখানে থাকি।"

রাজ ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হয়ে বললেন—"ওখানে তো"—

রমণী হেসে বলল—"হাঁ। সমাজ যাদের স্বীকৃতি দেয়নি তাদেরই বাস।"

রাজবাহাদুর বললেন—"তা হোক। আমি তোমাকেই চাই, তোমার উৎপত্তির ইতিহাসকে নয়।"

রাজবাহাদুর রমণীর বাহু স্পর্শ করলেন। রমণীর চোখ হতে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। বলল—"তোমার মনের এতটা জায়গা আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছো সুলতান!"

রাজবাহাদুর তৃপ্তির হাসিতে উৎফুল্ল হ'লেন।

রমণী প্রশ্ন করল—"আমার নামটাও জানতে চাওনা?"

রাজবাহাদুর—"না। তোমার নাম যে আমিই রাখব। তোমার নাম রাখলাম রূপমতী। তোমার অন্তরে বাইরে এত রূপ! তাই তোমার নাম রাখলাম রূপমতী।"

* * * *

সেই রূপমতীর উপকথার রাজ্য, মাণ্ডু।

ইন্দোর থেকে ষাট মাইল।

হারিয়ে গেছে সেই জনপদ। 'সুকৃত সাগর'-এর গ্রন্থকার রত্ন-মন্দাকিনীর হিসাব অনুযায়ী যা'র লোকসংখ্যা ছিল সাত লক্ষ। মুসলিম রাজত্ব পত্তনের পূর্ব্বে, পারমার রাজগণের আমলে, এর নাম ছিল মণ্ডপদুর্গ, মণ্ডপাচল, মণ্ডপগিরি, মণ্ডপাদ্রি বা মণ্ডপশৈল।

বর্ত্তমান রাজস্থানের কোল ঘেঁষে, পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ড, পশ্চিমে গুজরাট, উত্তরে চম্বল আর দক্ষিণে নর্ম্মদার সীমারেখায় পরিবৃত রাজ্য ছিল মালওয়া (মালব)। আর তা'রই রাজধানী ছিল মাণ্ডু।......

আষাঢ় মাসের শেষ ভাগ।

ক'দিন আগে সামান্য বৃষ্টি হয়ে গেছে। আধ শুকনো ঘাস, গাছের পাতা, বৃষ্টির জল লেগে সবুজ রং ধরেছে। পরমপুরুষ তাঁর প্রকৃতি-প্রিয়াকে সাজিয়েছেন সবুজ সজ্জায়। বিন্ধ্য পর্ব্বতের এই উপত্যকাটির মত এত সবুজ উত্তর-পশ্চিম ভারতে বড় একটা দেখা যায়না।

আধুনিক জীবনযাত্রায় অজ্ঞ মানুষগুলোও সবুজ,—তাজা মনের মানুষ। পুরুষরা ছোট ধুতি আর বেশীরভাগই মোটা সাদা কাপড়ের মেরজাই পরেছে। মাথায় পরণের ধুতির চেয়েও লম্বা কাপড়ের মস্ত পাগড়ি। হাতে লাঠি। পায়ে নাগরা। মেয়েরা বেশীরভাগই টকটকে লাল আর জাফরানিতে সেজে, খর সূর্য্যের আলোকে যেন প্রখর করে তুলেছে। পরেছে ঘাঘরা, চোলী আর অঙ্গবাস উত্তরীয়। স্বর্ণেতর ধাতুর অলঙ্কারও যথেষ্ট আছে। সবাই ঈষৎ অবগুণ্ঠিতা। মানিয়েছে চমৎকার! কারণ, সেই ঈষৎ অবগুণ্ঠনের নীচে দেখা যাচ্ছে ব্রীড়া-লাঞ্ছিতা মুখ। ঘোমটা ওদের শুধু একটা পোশাকী ব্যাপার বা প্রথাই নয়, ওতে আছে সরম লাগার ইঙ্গিত।

গ্রাম থেকে পাঁচ-ছ'টা দল এসেছে। তাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে এক প্রৌঢ় সহযাত্রী প্রশ্ন করলেন—"তোমরা কোথা থেকে এসেছো?"

জল মহলের ভগ্নাবশেষ।

দূরে দেখা যাচ্ছে জাহাজ মহল

হোশাং শাহের সমাধি

সে একটা গ্রামের নাম বলল। সহযাত্রীটি আবার প্রশ্ন করলেন—"তোমার মরদ ?"

মেয়েটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাল একটা পিতলের ঘটিতে জল সংগ্রহ করে নিয়ে আসছে, বছর ত্রিশ বত্রিশের এক যুবা। মেয়েটির ঈষৎ অবগুণ্ঠিত কপাল ও মুখে উত্তরীয়ের লালেরই আভা ফুটে উঠল! সে মুখ নীচু করল। মনে হ'ল এদের জন্যই তো অবগুণ্ঠন। অবগুণ্ঠন এদের আবরণ নয়,—সার্থক আভরণ, অলঙ্কার।

একটা গাছতলায় বসে ওরা জলযোগ করল। শুকনো মিঠাই আর 'চুড়া-পোয়'—চিঁড়ের তৈরী সুস্বাদু খাবার। তারপর আমাদেরই সঙ্গে বেরোল মাণ্ডুর অতীত গৌরবের সাক্ষীদের দেখতে।

* * * *

ধ্বংসাবশেষগুলো ছাড়িয়ে আছে তিন চার মাইল জুড়ে। পারমার, ঘোরী, খিলজী বংশের স্মৃতি বুকে নিয়ে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মত, যেন নিঃশব্দে চেঁচাচ্ছে—'আমাদেরও যৌবন ছিল'। বিশিষ্ট ক'টি দেখতেই প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গেল।

পাহাড়ের একটা খাদের ঢালু গায়ে অপূর্ব্ব এক ছায়াশীতল বিশ্রামাগার আছে। নাম তা'র নীলকণ্ঠ। যদিও শা' বুদাম খাঁ নামে আকবরের এক প্রতিনিধি শাসক এটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন তবুও এর নীলকণ্ঠ নামই চলে আসছে। কারণ, এখানে আগে শিবের ঠাঁই ছিল।

দু'পাশে দু'টি বিরাট জলাশয়—কপুর (কর্পূর) তালাও ও মুঞ্জ তালাও-এর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজ মহল, সুলতানদের বাসগৃহ। মালওয়ার হিন্দু শাসককুলের অন্যতম ছিলেন পারমার বংশীয় রাজা মুঞ্জদেও। তাঁরই নাম অনুসারে 'মুঞ্জতালাও।'

জাহাজ মহলের পশ্চিমে একটি সুবৃহৎ কূপের নাম চম্পা। জল ছিল অনেক নীচুতে। সুড়ঙ্গ পথের মত মাটির নীচে পর্য্যন্ত সোপান শ্রেণী দিয়ে এর ভিতরে, জলের সমতল পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। জলের সমতলে একটি বাঁধান চত্বর আছে। গ্রীষ্মের দিনে হেরেমের সুন্দরীরা এখানে বিশ্রাম করতেন।

জাহাজ মহলের পিছনে ও মণ্ডুতে তালাও-এর পশ্চিমে এক সুরম্য প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রাসাদটির নাম ছিল জল-মহল।

রাজকীয় আবাসস্থলের একপ্রান্তে একটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। তা'র নাম মেদিনী রায়ের মহল। মেদিনী রায়, দ্বিতীয় মাহমুদ খিলজীর উজির ছিলেন।

সুলতান হোশাং শা' মালওয়ার রাজধানী 'ধার' হ'তে মাণ্ডুতে স্থানান্তরিত করেন। হোশাংশাহের সমাধি সৌধটি অবিকৃত আছে। সুলতান নিজেই তাঁর সমাধিটির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়েছিলেন। তবে, এটি শেষ করেন প্রথম মাহমুদ খিলজী। হোশাং শা' তাঁর পিতা দিলওয়ার খাঁ ঘোরীকে (বা শিহাবুদ্দিন ঘোরীকে) বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। হোশাংশার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহম্মদঘোরী মাত্র একবৎসর রাজত্ব করেন ও স্বীয় শ্যালক মাহমুদ খিলজী (১ম) কর্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হ'ন। ঘোরী বংশের রাজত্বও শেষ হয়।

প্রথম মাহমুদ খিলজী হোশাং শাহের আরও একটি অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন। তা' হ'ল জম্-ই-মসজিদের নির্ম্মাণ কার্য্য। অপূর্ব্ব-গঠন এই মসজিদটিতে একটি কালরঙের প্রাচীর আছে, যা, কোনও অস্ত্রের দ্বারাই বিদ্ধ করা যায় না। মাহমুদ খিলজী (১ম) মালওয়ার সুলতানগণের মধ্যে সবচেয়ে সুখ্যাত। দু'একজন তাঁকে গোঁড়া মুসলমান রূপে বর্ণনা করলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকই তাঁর প্রশংসা করে গেছেন। তবকত্-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, তিনি মাণ্ডুতে এক মানসিক চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। মধ্যযুগে এরূপ হাসপাতাল বোধ হয় ওই প্রথম।

জম্ ই-মসজিদ বা জমা মসজিদের সামনে আশরফি মহল। মালওয়ার সুলতানগণের কবরস্থান।

আমরা পৌঁছলাম বাজবাহাদুরের প্রাসাদে। এটি বাজবাহাদুরের প্রাসাদ

আশরফি মহল
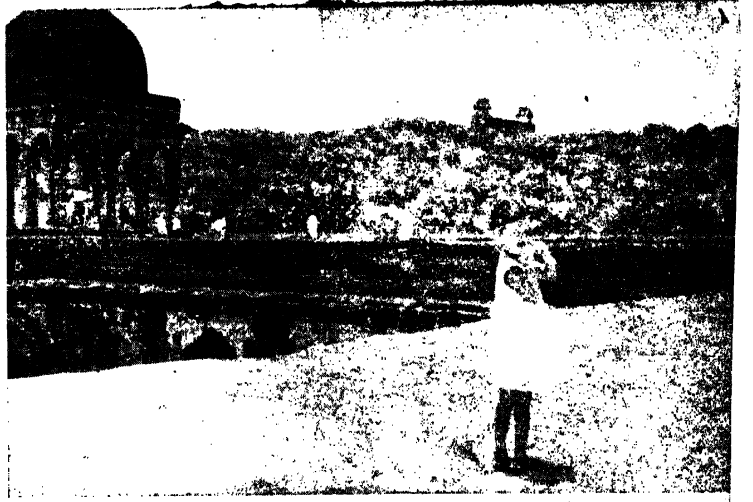
বাজবাহাদুরের প্রাসাদ।
দূরে দেখা যাচ্ছে রূপমতীর মহল

বলেই অভিহিত, কিন্তু এটি সুলতান নাসিরুদ্দিন খিলজী কর্তৃক নির্ম্মিত হয়েছিল। নাসিরুদ্দিন নামটি মালওয়ারবা মাণ্ডুর ইতিহাসে একটি কুখ্যাতি স্বরূপ। পিতা ঘিয়াসুদ্দিনকে হত্যা করে নাসিরুদ্দিন সিংহাসন লাভ করেন। ঘিয়াসুদ্দিন খিলজী ছিলেন শিল্প—কলা—নৃত্য সঙ্গীতাদির পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী। আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতে তাঁর জুড়ি ছিলনা। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীয় অনুশাসনাদির প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সরল স্বভাবের মানুষ ঘিয়াসুদ্দিনকে বহুজনে বহু প্রকারে, প্রতারণা করতো। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হ'তেন না। গল্প আছে, একদিন একজন লোক একটি গাধার খুর এনে বলে যে, এটি যীশুখৃষ্টের গাধাটির খুর। ঘিয়াসুদ্দিন তখনি পঞ্চাশ হাজার টঙ্কা (টাকা?) দিয়ে খুরটি কিনতে আদেশ দিলেন। পরে অনুরূপভাবে আরও তিনজন আরও তিনটি খুর আনে ও প্রত্যেকটি খুরই সুলতান পঞ্চাশ হাজার টঙ্কা হিসাবে কিনে ফেলেন। কিছুদিন পরে আর একজন লোক অনুরূপ একটি গাধার খুর নিয়ে এলে ঘিয়াসুদ্দিন তাও কিনতে উদ্যত হ'লেন। একটি কর্ম্মচারী তখন তাঁকে বলে যে, যীশুর গাধার তো চারটিই পা ছিল, অতএব, এ লোকটা পঞ্চম খুর পায় কিরূপে? সুলতান উত্তর দিলেন—'ওতে কিছু এসে যায় না। এই লোকটি নিশ্চয় সত্য বলছে। আগের চারজনের মধ্যেই হয়তো কেউ ভুল করে গেছে। একে পঞ্চাশ হাজার টঙ্কা দাও।' জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথায় বর্ণিত আছে যে, নাসিরুদ্দিন ঘিয়াসুদ্দিনকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করলে দুবার তিনি 'জহর মোহরা' বা বিষনাশক পাথরের দ্বারা সে বিষ নষ্ট করে রক্ষা পান। নাসিরুদ্দিনের তৃতীয় প্রচেষ্টা ঘিয়াসুদ্দিন পূর্ব্বাহ্নেই জানতে পারেন ও স্রষ্টার উদ্দেশে বলেন—'প্রভু, আমার আশী বছরের জীবনে তুমি যথেষ্ট দিয়েছো। এত সুখ, এত ভোগ অনেকেরই ভাগ্যে হয় না। তাই আমার মৃত্যুকে আমি নিয়মিত বলে মেনে নিচ্ছি। তুমিও সেই হিসাবে নাসিরকে আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী কোরোনা, তাকে শাস্তি দিওনা।' এই বলে বিষমিশ্রিত পানীয় গ্রহণ করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর পিতৃহন্তা নাসিরুদ্দিনের সমাধি দেখতে গিয়ে সমাধিতে লাথি মারেন ও পরিচারকদেরও লাথি মারতে বলেন। তাতে খুশী না হয়ে সমাধিটি ভেঙ্গে দেহাবশিষ্টগুলি নর্ম্মদার জলে নিক্ষেপ করতে আদেশ দেন।

* * * *

মাণ্ডুর সবচেয়ে উঁচু জায়গাটিতে রূপমতীর মহল। ছাদের উপর যে মণ্ডপটিতে বসে রূপমতী খেয়ালী চঞ্চলা নর্ম্মদাকে গান শোনাত সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম সেই রাতের কথা। যে রাতে বাজবাহাদুর আর রূপমতীর প্রথম সাক্ষাৎ হয় দূরে, নর্ম্মদার তীরে।

এক মালবী সহযাত্রীর ডাকে চমক ভাঙ্গল—"কি এত দেখছেন?"

বললাম—"নর্ম্মদাকে।"

হেসে বললেন, "তা বাবু, কলকাতায় বুঝি নদী নেই?"

বললাম "আছে। তবে অন্যরকম।"

তিনি হেসে বললেন, "না, বাবুজীর কথাই যেন কি রকম। নদীর আবার অন্যরকম কি! নদী নদীই। তা কলকাতায় হোক, আর মাণ্ডুতেই হোক।"

উত্তর দিলাম না। কারণ, তফাৎটা ওঁকে আমি বোঝাতে পারবনা।

সহযাত্রী বললেন "চলুন গাড়ী ছেড়ে দেবে।" চললাম। পথে পড়ল Echo Point বা প্রতিধ্বনি কেন্দ্র। আমরা থামলাম।

পথের ধারে একখানা বড় পাথর দিয়ে চিহ্নিত করা জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে কথা বললে, সঙ্গে সঙ্গে, আধ ফার্লং দূরে অবস্থিত গম্বুজযুক্ত ঘরটির ভিতর থেকে তার সুউচ্চ প্রতিধ্বনি বিক্ষিপ্ত হয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত শোনা যায়। পূর্ব্বকালে নাকি অদূরস্থিত জঙ্গলে ধাত্রী থাকতেন। তাই ধাই-মাকে ডাকবার জন্য ওই কৌশল।

প্রতিধ্বনি কেন্দ্রের কাছে, পথের ধারে, একটা গাছতলায় বসে আছে দশ বারটা ছেলে। চেহারা অনেকটা বীরভূম আর সিংভূমের সীমান্তবাসীদের মত। কয়েকজনের হাতে পাচনবাড়ি। গরুগুলো দূরে চরছে।

প্রতিধ্বনি কেন্দ্র

দুজনের হাতে তীরধনুক। বাকী সকলের হাতে পদ্মফুল। যদি যাত্রীরা কেনে তাই এনেছে। ওরা 'ভীল'। সবারই খালি গা'। যা'দের জামা আছে তা'রাও তা খুলে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছে। একটা ছেলে তা'র জামাটা খুলে তাই দিয়ে একটা হাত ঢেকে রেখেছে। মুখটা তা'র বড়ই যন্ত্রণা কাতর। প্রশ্ন করতে জানালো, গাছ থেকে পড়ে হাত ভেঙ্গে গেছে। সঙ্গে ছিলেন ইন্দোরের এক ডাক্তার। তিনি জোর করে জামাটা সরাতেই দেখা গেল হাতটা ভয়ানক ফোলা আর তা'র ওপর ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলোয় ঘা ধরেছে। মাটির মত কি একটা জিনিসের প্রলেপ লাগিয়েছে।

ডাক্তার সাহেব বললেন—"ইস্! কি অবস্থা দেখছেন!"

ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হাসপাতালে গিয়েছিলি?"

সে বলল—"না। আমার দিদিমা বারণ করেছে। ওখানে যেতে নেই। আমাদের গাঁয়ের একজন গিয়েছিল। ফিরে আসেনি।"

ডাক্তার বললেন—"শুনলেন তো কথা। কাছেই (২২ মাইল দূরে) জেলা হাসপাতাল। এরা এমনি করে মরবে তবু যাবেনা।"

মনে হ'ল এদের বোধহয় witch doctor বা রোজা আছে। তা'কে এরা নিশ্চয় খুব বিশ্বাস করে। তার ঐশী শক্তির কথা এরা জানে। সে খানিকটা মাটি গুলে খেতে দিলে তাই খেয়েই হয়তো এরা নীরোগ হয়। এরা পাথুরে মাটির মানুষ, আর বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুটোই ওদের ওই বিন্ধ্যগিরির মতই মজবুত। জাগ্রত হোক বা অন্ধ হোক, অটল বিশ্বাস এদের সম্পদ। ওতেই ওরা ভাল হয়ে যায়,—ওরা বাঁচে।

ডাক্তারকে বললাম—"জড়ি-বটি, ধুলোপড়া, চলছে বোধহয়। ভাল হয়ে যাবে।"

আমাদের সঙ্গে মেডিক্যালের একটি ছাত্রও ছিলেন। তিনি গর্জে উঠলেন—"Medical Science ও কথা বিশ্বাস করেনা।"

আমার বন্ধুটি হয়তো জানেন না, ভারতবর্ষ ওকথা বিশ্বাস করে। কারণ, মনের নিরাময়কারী শক্তির কথা এদেশে অতি প্রাচীনকাল হ'তেই জানা আছে। মন নামক ইন্দ্রিয়টি সকল ইন্দ্রিয়ের উপরই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। ওই witch doctor আর রোগী যখন একাত্মা হয়ে, খানিকটা ধুলোকেই আরোগ্যকারী জ্ঞানে প্রয়োগ ও গ্রহণ করে তখন তা'দের যৌথ ও একীভূত মনের শক্তিতে রোগ নিরাময় অসম্ভব নয়। ধুলোটা উপলক্ষ মাত্র।

একটা ছেলেকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমরা পড় না?"

সে বুঝতে পারল না। একজন সঙ্গী স্থানীয় ভাষায় আমার প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিতেই, ছেলেগুলো মুচকে মুচকে হাসতে লাগলো। আর সঙ্গী ভদ্রলোককে যা' বলল, তা'র অর্থ হ'ল, ওরা পড়বার জন্য স্কুলে গিয়েছিল। তবে, এখন আর যায় না। মাষ্টার মেরেছিল, তাই ছেড়ে দিয়েছে।

বাস্-এর ড্রাইভার হর্ণ বাজিয়ে যাওয়ার নোটিশ দিল। আমরা ফিরবার পথ ধরলাম।

* * * *

একটা কথা বলা হয়নি।

বাজবাহাদুর রূপমতীকে বলেছিলেন—'তোমার অন্তরে বাইরে এত রূপ! তাই তোমার নাম রাখলাম রূপমতী।' রূপমতী তা'র অন্তরের রূপ প্রকাশ করেছিল।

আকবর বাদশাহের সেনাপতি মাণ্ডু অধিকার করলে, বাজবাহাদুরের রূপমতী বিষপানে আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছিল।

মধ্যপ্রদেশে রূপমতী ও বাজবাহাদুরের উপাখ্যানের জন্যই মাণ্ডুর প্রসিদ্ধি। সেজন্যই রচনাটির এরূপ নামকরণ;

ঐতিহাসিক তথ্যাদির জন্য নিম্নোক্ত বইগুলির উপর নির্ভর করতে হয়েছে:

১। Oxford History of India—V. Smith

২। Cambridge History of India—Haig

৩। Mandu—G. Sugandhi

দ্বিজেন্দ্র কাব্যে অতীন্দ্রিয়বাদ

শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি,

দ্বিজেন্দ্রলালের লিরিকের প্রেমের মূর্চ্ছনায়, দেশ-প্রেমের উদাত্ত ভাব-প্রবাহে ও হাস্যরসিকদের আলোকোজ্জ্বল দীপ্তিতে দ্বিজেন্দ্রলালের ভক্তিবাদমূলক কবিতাগুলি চাপা পড়িয়াছে। কবিতাগুলি সংখ্যায় অল্প হইলেও কবি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি বিশেষ প্রবণতা এই কবিতাগুলিতে ধরা পড়িয়াছে। সত্য বটে, জগতের দুর্নীতি, অকল্যাণ ও অসৌন্দর্য্য কবিকে ব্যথাতুর করিয়াছে, ভগবানের অস্তিত্বে সন্দিগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু ইহা তাঁহার স্থায়ীভাব নহে। সাময়িক বিক্ষোভের মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই ভক্তিবাদী ঈশ্বর-বিশ্বাসী দ্বিজেন্দ্রলালকে।

বিধবার দুঃখে কাতর, স্নেহবিগলিত ধারায় অভিভূত কবি বিধবার হাহাকারে ঈশ্বরের নিশ্চেষ্টতা স্মরণ করিয়া উপহাস করিয়াছেন:—

হায়রে মানুষ! বিধির কৃত্য
চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি নিত্য;
তবু আমরা চক্ষু বুজে থাকি!
খোসামোদের মন্দির খুলে
মিথ্যার কৃষ্ণ-নিশান তুলে,
উচ্চৈঃস্বরে "দয়াল"! বলে ডাকি!

বিপত্নীক কবি গভীর দুঃখে ঈশ্বরকে কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই:—

"জানি নাও কখনো কি তাহার সঙ্গে-দেখা
হবে কোনোদিন;
যত খানি দেখা যাচ্ছে,—ধূ ধূ করে শুধু
অসীম বারি নিধি;
—ওহো—কি মনুষ্য জন্মই তোমার বিশ্বে তৈয়ের
করেছিলে বিধি!"

বিক্ষুব্ধ দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরে ধ্যানমগ্ন ছিল এক প্রেমিক ভক্ত। ভগবানের প্রতি কত না প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, মান-অভিমানে অভিষিক্ত ছিল তাঁহার অন্তর। ভগবানের বিভিন্ন সাকার মূর্ত্তির অন্তরালে তাঁহার চিন্ময় মূর্ত্তি কবি ধ্যানলোকে উপলব্ধি করিয়াছেন।

বাংলা শক্তি-সাধনার পীঠস্থান। বাঙ্গালী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাৎসল্য রসে বিভোর হইয়া কত না মান-অভিমান করিয়াছেন! তাঁহার এই মান-অভিমানের সুরটি পাঠকচিত্তে ভক্তিরস সঞ্চার করিয়াছে। শ্যামামায়ের প্রতি অভিমানে কবি যেন চিরন্তর সন্তানের অভিমানটি রূপায়িত করিয়াছেন। আদুরে ছেলের মত কবি বায়না ধরিয়াছেন:—

"আর কেন মা ডাক্‌ছ আমায়, এই যে এইছি তোমার কাছে,
আমায় নাও মা কোলে, দাও মা চুমা, এখন তোমার যত আছে
সাঙ্গ হ'ল ধুলা-খেলা, হয়ে এলো সন্ধ্যা-বেলা
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা এখন তোমায় হারাই পাছে।
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—মা তোর ঐ বুকের মাঝে।
এবার যদি পেইছি শ্যামা, আর তো তোমায় ছাড়ব না মা
ওমা ঘরের ছেলে পরের কাছে মায়ে ছেড়ে সেকি বাঁচে।"

মায়ের যে মধুর রূপটি কবি অনুভব করিয়াছেন তাহাতে সর্ববিধ ভীষণতা পরিত্যাগ করিয়া মা যেন মধু হইতে মধুরতর হইয়াছেন, মায়ের মধুর বরাভয় হাসি এক নিবিড় স্নেহস্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন; চিন্ময়ী বিশ্বজননী আজ যেন সন্তানের একান্ত আপনার হইয়া 'ঘরের মায়ে'র মত সন্তানের টানে নামিয়া আসিয়াছেন:—

"এবার তোরে-চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি।

* * *

(শেষে) ছেলের কান্না শুনে অমনি (ও তোর) কেঁদে উঠ্‌ল
মায়ের নাড়ী।
হাতে ধরে নিলি মোরে (আমি) ভাবনা ভীতি গেলাম ভুলে
চোখের বারি মুছিয়ে দিয়ে (তখন) নিলি আমায় কোলে তুলে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক শাক্ত-তন্ত্রের আচার্য্য-সাধক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আগমবাগীশ তাঁহার "বৃহৎতন্ত্রসারে" শ্যামামায়ের "শবারূঢ়াং মহাভীমাংঘোরদ্রংষ্ট্রাং" করাল সংহার কালীরূপের সহিত "হাস্যযুক্তাং" "বরাভয়াং" রূপ ধ্যাননেত্রে উপলব্ধি করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে বাংলার বৈষ্ণবধর্মের মধুর ভাবের প্রভাবে মায়ের কঠোর রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া কোমল মধুর রূপটি প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। মায়ের আদুরে ছেলে মায়ের চরণ ধরিয়া আবদার ধরিয়াছেন:—

"চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে একবার চেয়ে দেখিস্ না মা"
মত্ত আছিস আপন খেলায় আপন ভাবে বিভোর বামা
একি খেলা খেলিস্ ঘুরে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধরে ডাকে মা মা।
হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা,
মুখে হা হা অট্টহাসি, অঙ্গবেয়ে রক্ত ধারা।

তারা, ক্ষেমঙ্করী, ক্ষেমা, অভয়ে, অভয় দেমা,
কোলে তুলে নেমা শ্যামা, কোলে তুলে নেমা শ্যামা।
আয়মা এখন তারারূপে, স্মিত মুখে শুভ্র বাসে,
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে;
এতদিন ত কালী, শ্যামা,—তোরই পূজা করেছি মা,
পূজা আমার সাঙ্গ হ'ল, এখন মাতোর অসি নামা।"

বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি কবির অনুরাগ ছিল স্বভাবসিদ্ধ। কবির মাতা ছিলেন মহাপ্রভু অদ্বৈতবংশ সম্ভূত। কবি নবদ্বীপের পুণ্য রজঃ গায়ে মাখিয়া নদীয়েন্দু গোরাচাঁদকে স্মরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্যপদাঙ্কিত নবদ্বীপধাম কবির চক্ষে শুধু জড় সত্তা নহেন। কবি শ্রীধাম নবদ্বীপ স্পর্শ করিয়া এক আত্মিক স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন :—

"গঙ্গা জলাঙ্গী সঙ্গমে নবদ্বীপপুর
এইখানে গৌরাঙ্গের গম্ভীর মধুর,
উঠেছিল সঙ্কীর্ত্তন;

* * *

নব যৌবনের মত কোথা হতে নেমে;
অমনি উঠিল নৃত্য—মহানৃত্য প্রেমে;
আর সেই সঙ্কীর্ত্তন—মধুর মৃদঙ্গে
সুমধুর হরিনাম, ছাইল এবঙ্গে।"

* * *

প্রিয়া, শিরে লও তুলি,
প্রেমে সুপবিত্র আজো তার স্বর্ণ-ধূলি;
হোক সে পঙ্কিল আজি, বিলুপ্ত বিভব,
বিহীন সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রতিভা গৌরব,
তবু চিরপুণ্যময় তাহা, স্বর্গসম—
অবনত কর শির—প্রেয়সি, প্রণাম।

বাংলার গোরাচাঁদের লীলাময় ভাগবৎ জীবন কবি-চিত্তকে বিমোহিত করিয়াছে, বিমুগ্ধ করিয়াছে, ভাব উদ্বেলিত কবি যেন দিব্যচক্ষে নবদ্বীপ-চন্দ্রকে দেখিতেছেন। তাঁহার কি রূপের ছটা—ঢলঢল রূপ লাবণ্যের ছটা যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে :—

"ওকে, গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়
পথে পথে ঐ নদীয়ায়!
ওকে, নেচে নেচে চলে, মুখে হরি' বলে
ঢলে ঢলে পাগলেরই প্রায়।
ওকে, যায় নেচে নেচে আপনায় বেচে
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ওকে, দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে
দেখে যারে তোরা দেখে যা।

* * *

বলে, ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চলে যাই।
নৈলে প্রভু, তোমার প্রেমে গলে যাই!
এযে, নূতন মধুর প্রণয়েরই পর
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই?
(ঐ যে) নরনারী সব পিছে ধায়,
(ওই) জয়ধ্বনি ওঠে নীলিমায়,
(তোরা) আয় সবে চ'লে, মুখে হরি ব'লে
(তোদের) ছেঁড়া পুঁথি ফেলে চ'লে আয়!"

যমুনা-পুলিনে রসিক-শেখর রসরাজ চিরকিশোরের মধুর লীলার সুরও কবির মরমে পশিয়াছে। সহৃদয় রসিক-কবি রসিক-শেখরের অলৌকিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ :—

"গিরি-গোবর্দ্ধন—গোকুল-চারী,
যমুনা তীরে—নিকুঞ্জ-বিহারী,
শ্যাম, সুঠাম, কিশোর, ত্রিভঙ্গিম
চিত্ত-বিনোদন-কারী।
পীতাম্বর, বনপুষ্পবিভূষণ
চন্দন-চর্চ্চিত, মুরলী-ধারী
যিনি রবসে মোহিত বৃন্দাবন
উছলিত যমুনা-বারি।
নূপুর-শিঞ্জিত, নৃত্য-বিমোহন,
কপট-চপল চতুরালী,
প্রেম-নিমীলিত, নয়ন—বিলোল
কদম্ব-তলে বনমালী।"

গঙ্গার আধ্যাত্মিক মহিমা কবির হিন্দু সংস্কারে নাড়া দিয়াছে :—

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে।
শ্যামবিটপি ঘন তট বিপ্লাবিনি, ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে।

* * * *

বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে,
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কল কল্লোলিনী গঙ্গে!

কবি উদাত্ত ছন্দে শশাঙ্কশেখরের বন্দনা করিয়াছেন :

ভূতনাথ তব ভীম বিভোলা, বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী।
ভূজঙ্গ-ভৈরব বিষাণ ভীষণ প্রশান্ত শঙ্কর শ্মশানচারী।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির উর্দ্ধে ছিলেন, এজন্য শ্যামা-সঙ্গীত, শ্যাম সঙ্গীত ও শিব কীর্ত্তন লিখিতে কোন দ্বিধা করেন নাই। তিনি বাংলায় ধর্ম-চেতনা যে শ্যাম ও শ্যামাকে—শক্তি ও বৈষ্ণব-সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশলাভ করেছে তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন

গান

এস এস তুমি ভরে দাও হিয়া গোপনে,
বুলাও মায়ার তুলিকা আমার নয়নে।
তুমি যে আমার জীবনের সুর
কাছে থেকে তুমি তবুও সুদূর
তোমার পরশে ফুল ফোটে মোর কাননে॥

জাগাও জাগাও মধু মিলনের সুরভি
প্রথম দিনের চোখ মেলে দেখা সে ছবি।
আকাশে তারার জ্বলুক দীপালি
ঝরিয়া পড়ুক মনের শেফালি
তুমি আর আমি বুনে চলি নব স্বপনে॥

কথা ঃ গোপাল ভৌমিক

সুর ও স্বরলিপি ঃ বুদ্ধদেব রায়

এসো এসো তুমি ভরে দাও হিয়া

II ধা ধা ধা | ধা ণা ধা | পা ধা পা | -া মা মা I
এ স এ স তু মি ভ রে দা ও হি য়া

পা মা গা | -া -া -া | সা গা‿পা | পা ধপা -া I
গো প নে ০ ০ ০ বু লা ও মা য়া র

গা পা পধণা | পা ধা পা | গা পা মা | -া -া -া II
তু লি য়া আ মা র ন য় নে ০ ০ ০

II পা না রা | র্গা র্রা -া | না র্রর্গর্মা র্রা | র্গা র্সা -া I
তু মি যে আ মা র জী ব নে র সু র

না র্সা র্সা | র্রা র্সা -া | না র্সা নধা | না ধা -া I
কা ছে থে কে তু মি ত বু ও সু দু র

ক্ষা ক্ষা পা | পা ধা পা | ক্ষা পা ধা | পা মা -া I
তো মা র প র শে ফু ল ফো টে মো র

পা মা গা | -া -া -া II
কা ন নে ০ ০ ০

II গা মা রা | ণা ধা সা | সা মা ধা | পা গা পা I
জা গা ও জা গা ও ম ধু মি ল নে র

ণা ণা ধা | -া -া -া | পা র্সা র্সা | না র্সা -া I
সু র ভি ০ ০ ০ প্র থ ম দি নে র

পা র্রা র্রা | ণা ধা পা | ধা পা মা | -া -া -া II
চো খ মে লে দে খা সে ছ বি ০ ০ ০

II পা না র্রা | গা র্রা -া | না র্রর্গার্মা র্রা | র্গা র্সা -া I
আ কা শে তা রা র জ্ব লু ক দী পা লি

না র্সা র্সা | র্রা র্সা -া | না র্সা ণধা | না ধা -া I
ঝ রি য়া প ড়ু ক ম নে র সে ফা লি

ক্ষা ক্ষা পা | পা ধা পা | ক্ষা পা ধা | পা মা মা I
তু মি আ র আ মি বু নে চ লি ন ব

মা পা গা | -া -া -া II
স্ব প নে ০ ০ ০

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তিন

শোনাতে বসেছি একটি রাতের কাহিনী। অসহায়া ক নিশীথিনীকে বেহদ্দ বেহায়ার মত বেআবরু করবার ষ্টা করব। বহুকাল আগে সে বেচারী পালিয়ে গেছে আমার মুঠো ফসকে, ধরে তাকে রাখতে পারিনি। পারিনি লে আজ চুটিয়ে প্রতিশোধ নোব। চিরে চিরে দেখাব —কি ছিল তার চিত্তে, কিভাবে সে আমায় ঠকিয়ে গেছে।

পারব ত'। খাঁটি ব্যাপারটাকে নির্জলা খাঁটি করে রে রাখতে পারব কি কালির আঁচড় কেটে সাদা কাগজের কে! বলতে যা চাচ্ছি, তা' হয়ত বলার মত বেওরাই । এ বেওরা শুনিয়ে লাভ হবে আমার কতটুকু! নেই বা কার কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে! সেই বিশ্বাস-তিনী বিভাবরীর বুকে শ্বাসপ্রশ্বাস বয়েছিল কি না, ইলেও সেই শ্বাসপ্রশ্বাসের তালমান যথাযথ ছিল কিনা, কান জাতের কি রহস্য লুকিয়েছিল তার ধমনীর স্রোতে, সমস্ত জেনে কার কতটুকু তত্ত্বজ্ঞানলাভ হবে! কিছুই , সবই সবায়ের জানা ব্যাপার। জানা ব্যাপার ছাপার ক্ষরে চোখের সামনে ফুটে উঠলে কারও কোনও চুর্বর্গ সিদ্ধি হয় না।

না হোক, শিকেয় তোলা থাক লাভ-লোকসানের সেব, শুধু বোঝাপড়া হোক একটা। সেই রাত্রিকে রে রাখতে পারিনি, অনেক কাল আগে সে ফাঁকি য়ে পালিয়ে গেছে। এতকাল পরে তাকে সামনে পেয়েছি, খোমুখি মোকাবিলা করার এত বড় সুযোগটা ফস্‌কে যেতে দেওয়া ঠিক হবেনা। সেই রাত্রি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, মুখ টিপে হাসছে, কি যেন কি একটা অবরুদ্ধ উত্তেজনায় ওর বুকটা ঘনঘন ওঠানামা করছে। ওর চক্ষু দু'টিতে দুষ্টুমি বুদ্ধি চকচক করছে। কিভাবে ভাঁওতা দিয়ে ভড়কে দিয়েছিল আমাকে, তাই যেন বলতে চায় ও। কি বেহায়া! ভড়কে গিয়েছিলাম আমি! একটুও নয়, এতটুকুও নয়। ভাঁওতাটাকে সার্থক করে তোলার আশায় নিজের সঙ্গে নিজে ভাঁড়ামি করেছিলাম। পরিপাটি করে সেই ভাঁড়ামির পরিচয়টা পেশ করতে চাই। যদি পারি, এই পেশ করতে বসে যদি আর একবার নিজের সঙ্গে নিজে ভাঁড়ামি করার লোভ সম্বরণ করতে পারি, তা'হলে আর কিছু হোক বা না হোক, উদ্ধারণ-পুরের শ্মশানে মড়াদের বিছানায় চেপে বসে থাকাটা যে বিলকুল বিড়ম্বনা হয়নি, এটুকু অন্ততঃ প্রমাণ হোয়ে যাবে।

প্রমাণ প্রয়োগ করতে হলে আগে এসে পড়ে সেই বর্ষার কথা। ঝিমঝিমে বৃষ্টিতে উদ্ধারণপুরের শ্মশান ভস্ম ভিজলেও মড়াদের তোশক কাঁথা কখনও ভিজতে পায়নি, মড়া জড়িয়ে আনা চাটাই-মাদুর দিয়ে আচ্ছা করে আচ্ছাদন বানিয়ে দিয়েছিল রামহরেরা। বাবা বম্ভি-নাথের কৃপায় আশ্রয় যা জুটল তার আচ্ছাদন ছিল ঝাঁজরা। খানিক রাতে আকাশের জল অঝোর ঝরায় ঘরের ভেতর ঝরতে লাগল। নতুন কেনা সতরঞ্চি-বিছানা বিছিয়ে রাখা গেল না, মুড়ে টুড়ে ঠিকঠাক করে বেঁধে ফেললাম। বেঁধেই বা রাখব কোথায়; চৌকিতে জল,

মেঝেয় জল, সারা ঘরে স্রোত বইছে। অগত্যা বিছানাটিকে শিকেয় ঝোলাতে হোল। বিশাল-বপু কড়ির গায়ে লোহার আংটা লাগানো ছিল, সেই আংটায় ঝুলছিল লোহার শিক। বাড়ী যাঁরা বানিয়েছিলেন, তাঁরা পাকা বন্দোবস্তই করেছিলেন। এক শিকের মুখে বিছানা বাঁধা দড়ি গলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

গান শুনিয়ে তারকনাথ চলে গেছে, মীঠুরাম এক সোরাই জল এনে এক কোণে বসিয়ে দিয়ে গেছে। তার-পর থেকে আর কারও কোনও পাত্তাই নেই। রাত বাড়ছে, বৃষ্টি বাড়ছে, ঘরের ভেতর জলপড়া ক্রমেই ঘন হোয়ে উঠছে। ঘর ছেড়ে বাইরের দাওয়ায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছি। পায়চারি করছি আর পাঁয়তাড়া কষছি মনের সঙ্গে। কে যেন মনের মধ্যে বসে বলছে, নাও—যা পেয়েছ তা এখন মনের সুখে ভোগ-দখল কর। খামকা আর কেন নিজেকে নিজে ঠকাচ্ছ।

ভোগ-দখল করার পানে নজর দিতে গেলেই একটা ভ্রূকুটি ফুটে উঠছে নজরের সামনে। ভোগ দখলের চেহারাটা খোলা দরজার ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যে স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে নজর ফিরিয়ে নিয়ে আবার মাথা হেঁট করে পায়চারি। অতবড় নির্লজ্জ কাণ্ডটার পানে প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে থাকা যায় কখনও! শ্লীল-অশ্লীলের কথাটা থাক, রুচি-অরুচি বলেও ত' দুটো বস্তু আছে।

আগমবাগীশকে স্মরণ হোল। আগমবাগীশ একবার শ্লীল কি তা' বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন—শ্লীলতা এখন এই জাতটার মজ্জায়-মজ্জায় সেঁধিয়ে গেছে। এই জাতের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে—মা ষষ্ঠীর কৃপায় আর পাঁচু-ঠাকুরের দোর-ধরার ফলে। চোখের সামনে যাদের জন্মাতে দেখছ আর মরতে দেখছ, সব ঐ মা-ষষ্ঠী আর পাঁচু-ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট-জীব। সব ছিবড়ে, এরা বেঁচেও নেই মরেও নেই। আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাত, ঝড়ের আগে উড়ে যায়। তাবিজ-কবচের কসরতে টিকে আছে কোনও রকমে, শ্লীলতা-অশ্লীলতার তাবিজ-কবচ। হবেই, হোতেই হবে যে। মানুষ ত' ইচ্ছে করে এদের জন্মদান করেনি, একটা দুর্ঘটনার ফলে জন্মে পড়েছে। দুর্ঘটনার দরুণ জন্মেছে বলে আর একটা দুর্ঘটনায় মরবে। জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে বেঁচে থাকার মেয়াদটুকুই এদের কাছে অশ্লীল। তাই এরা জন্ম-মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকতে চায়।

আগমবাগীশ যা বোঝাতে চেয়েছিলেন, শ্মশানে বসে সে তথ্যের বিন্দুবিসর্গ মগজে সেঁধোয়নি। রুচি-অরুচির বালাই ছিল না উদ্ধারণপুরের ঘাটে, শেয়ালে শকুনে রুচি-অরুচি ছিঁড়ে খেয়ে মহোল্লাসে জয়ধ্বনি দিত। কে কার পরোয়া করে!

পরোয়ানা পেয়ে যাবার পরে কিন্তু পরোয়া করার প্রশ্নটা সামনে এসে দাঁড়াল। চোখ রাঙিয়ে ভ্রূকুটি করে বলতে চাচ্ছে—খবরদার, নিজের পানে তাকাও একটি-বার। শুধু নিতেই ত' যাচ্ছ না, দেবেও ত' কিছু। কি দেবে! যা আছে তোমার, ঢাকা-ঢুকি দেওয়া আছে। বেশ আছে। ও পদার্থ কারও সামনে খুলে মেলে ধরতে যেও না। ছিঃ—

থমকে দাঁড়াতে হোল। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে নিজের ছাল-ছাড়ানো ছুরতখানা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। ওয়াক্-থুঃ। উৎকট নেশা করলেও এই পদার্থের আবরণ উন্মোচন করা যায় না।

মলে পরে তাও সম্ভব হয়।

হ্যাঁ—তাই হয়। উদ্ধারণপুরের ঘাটে বসে দিনের পর দিন দেখেছি, মরা কথাটার সাদা অর্থ হোল আবরু-বিহীন অবস্থায় পৌছন। নেশা-করা ঘুমিয়ে-পড়া আর মরে-যাওয়া এক কথা। নেশা করে বেহুঁশ হোলে কোথায় থাকে কাপড়-চোপড়, কোথায় থাকে কি! মুখ দিয়ে যা বেরয়, তারও কোনও হিসেব নিকেশ নেই। ঘুমিয়ে পড়লেও তাই। ঘরে ঢুকে দরজার আগড় আটকে না ঘুমলে জেগে ওঠবার পরে মন মেজাজ খিচড়ে ওঠে। কে বলতে পারে, ঘুমের ঘোরে নিজের ওপর পাহারা দিতে পারিনি যখন তখন কি অবস্থায় সবাই আমায় দেখেছে। মরার পরে আর কোনও কথাই থাকে না। মরে গেলে শরীরটাকে নিয়ে সবাই যদৃচ্ছা নাওয়ায় ধোওয়ায়। যত্ন-আত্তি করে। শুনেছি এবং দেখেছিও, খুব নাম-করা মানুষ মারা গেলে ভক্তরা তাঁর চুল দাড়ি ছিঁড়ে নিয়ে চলে যায়। ভক্তি করে ঘরে রেখে নিত্যি নিত্যি ভক্তি দেখাবে।

তা'হলে নেশা না করে, ঘুমিয়ে না পড়ে বা মরে না গিয়ে কি করে নিজেকে নিজে বেআবরু করা যায়!

ভোগ দখল করার বাসনা ফাঁকা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মাথা কুটে মরতে লাগল। আবার পায়চারি শুরু করে দিলাম। বে-আবরু হবার হিম্মত কতখানি আছে, সেটা ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারলাম না।

বাড়ীর ভেতর বসে বিপিনবিহারীবাবুর পরিবারটি কি করছেন, তাও ঠাওর করে উঠতে পারলাম না। বাড়ীর ভেতরেই কাটাবে নাকি সারারাত! পাঁচ পাঁচটি সন্তান হতভাগীর কোলে এসেছে আর গেছে, অমন শোকাতাপা মানুষ জুড়বার মত ঠাঁই পেলে সবই ভুলে যেতে পারে। রাত ভোর বাড়ীর ভেতর বসে বুকের জ্বালা জুড়বে কি না, কে বলতে পারে!

খুশী মনে আমিও জুড়িয়ে কাটাতে পারি রাতটা। অঝোরে জল পড়ছে ঘরে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, উঠোনের পেয়ারা আর পেঁপে গাছগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভিজছে। ঝড়-বাতাস একদম থেমে গেছে। থমথমে অন্ধকারে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, খুশি মনে আমিও রাতটা জুড়িয়ে কাটাতে পারি ঐ ভিজে ঘরের এক কোণে শুয়ে। জ্বালাটা আমারও জুড়তে পারে। এমন বর্ষার রাতে এমন নিরিবিলি ঘরে আশ্রয় পাওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়।

মুখ ফিরিয়ে আর একবার তাকালাম ঘরের মধ্যে। তারপর আবার পাক খেতে লাগলাম সেই ছোট্ট বারন্দায়। খানিক পরে আবার হাওয়া উঠল। ভিজতে লাগল ভদ্রলোকের ছেলের সাজ-পোশাক। বেশ শীত করতে লাগল যেন, দস্তুরমত কাঁপতে লাগল বুকের ভেতরটা। ঠাণ্ডায় না ভয়ে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

হাঁ—ভয়েই। স্পষ্ট যেন বোঝা যাচ্ছে মতলবটা। শুধু শুধু নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ভেবেছে, এ মানুষটাকে নিয়ে যা খুশি করা যায়। মনে করেছে, সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে মস্ত বড় একটা অনুকম্পা প্রদর্শন করা হচ্ছে। পড়ে ছিল শ্মশানে, উদ্ধার করে নিয়ে এল, তারপর আবার স্বামী বলে পরিচয়টাও দিচ্ছে। আর কি চাই! আর চাইবারই বা আছে কি, পাওয়ারই বা বাকী কতটুকু? আরও কিছু দাবি করার মত স্পর্দ্ধাই বা হোতে যাবে কেন লোকটার? বামন হোয়ে চাঁদের পানে হাত বাড়াবার সখ চাপবে কেন?

বাবাজী চরণদাসও বিস্তর দিন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে ওর, বিস্তর সাজানো সম্পর্ক নির্বিঘ্নে বয়ে গেছে ঘাড়ে করে। কিন্তু বামন হোয়ে চাঁদের পানে হাত বাড়াবার স্পর্দ্ধা কখনও সে দেখায়নি।

চরণদাস বাবাজীর বে-আবরু স্বরূপটা চোখের সামনে ভেসে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে পা দু'খানা আড়ষ্ট হোয়ে থেমে পড়ল। দু' হাত মুঠো করে অহেতুক আক্রোশে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগলাম। দেখিয়ে দিতে পারি, একটি বার এই ভিজে রাতে ঐ ঘরের মধ্যে একলা পেলে—দেখিয়ে দিতে পারি, দুনিয়া সুদ্ধ সবাই বাবাজী চরণদাস নয়।

পালিয়ে গিয়ে এড়িয়ে যাবে আমাকে!

আচ্ছা!

নিঃশ্বাসের ঐ সঙ্গে 'আচ্ছা' কথাটি আলটপকা বেরিয়ে পড়ল। খট্ করে কানে লাগল কথাটা। চমকে উঠে আবার পা চালালাম। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে চাপা-গলায় কে বলে উঠল—উঃ, পুড়ে মলুম যে। ধর না এই বাটিটা—

ঝটকা মেরে ফিরে হাত বাড়িয়ে ধরলাম বাটিটা। গরম বটে, একেবারে আগুনের মত গরম। তাড়াতাড়ি বাটি নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়তে হোল। তৎক্ষণাৎ হাত থেকে না নামালে উপায় আছে। উদ্ধারণপুরের শ্মশানে পোড়-খাওয়া হাত দু'খানাতেও সহ্য হয় না এমন গরম হোয়ে উঠেছে বাটিটা, বাটি ভরতি দুধ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ছোট একখানা গামলা বোঝাই পেট-ফোলা পুরি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন পরিবার। গামলা নামাবার আগেই ঘরের দশা দেখে দাঁত বার করে ফেললেন।

ও মা! একি! ঘরে যে স্রোত বইছে!

আত্মরক্ষার্থে মানুষে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করেছে, তার ভূরি ভূরি নজির আছে ইতিহাসে। ছোট বেলাতেই ছেলে-মেয়েরা রাজপুতানী পদ্মিনীর নামটা মুখস্থ ক'রে ফেলে। কিন্তু কেউ কি কখনও শুনেছে যে আত্মরক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হোল অকপটে আত্মদান করা! নিঃ-সঙ্কোচে নিঃশঙ্কচিত্তে একজন যদি আর একজনকে বিশ্বাস

করতে পারে, ত'হলে কিছুতেই কোনও অঘটন ঘটা সেখানে সম্ভব হয় না।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেল। দেওঘর বল্ডিনাথে ঘি বস্তুটা মেলে। সে ঘিয়ে ঘিয়ের গন্ধ পাওয়া যায়। গরম পুরি থেকে সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। গরম পুরি চিনি সহযোগে, তারপর গরম দুধ। আর কি চাই! পরিবার স্বহস্তে বানিয়ে এনেছেন। বললেন—অনেক প্যাঁচ কষে তবে এ সব জোগাড় করেছি ঠাকুর—তোমার জন্যে। রাতটা হরিমটর চিবিয়েই কাটাতে হোত আমি শম্ম। সঙ্গে না থাকলে। এই সহস্র ফুটো ঘরখানা দিয়েই এঁরা তুষ্টু হোয়ে পড়েছিলেন। আরও যে কিছু দিতে হবে, সেটা মোটে ভাবতেই পারেননি।

এক হাত তফাতে সামনে বসে আছে পা মুড়ে। মাঝ-খানে আলোটা জ্বলছে। চাপা উত্তেজনায় ভুরু দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘোমটা খসে পড়ছে পেছন দিকে। কয়েকটা অবাধ্য চুল নেমে এসেছে বাঁ গালের ওপর। পুরি চিবতে চিবতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখছি। এত কাছ থেকে এ রকম ভাবে খুঁটিয়ে ওকে দেখবার সুযোগ এর আগে কখনও মেলেনি। চোখ নাক মুখ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মুখর হোয়ে উঠেছে যেন। সর্বাঙ্গ দিয়ে কথা বলছে ফিসফিসিয়ে। দুষ্টু বজ্জাত একটা অকালপক্ক কন্তে। কি ভাবে কত সহজে এ বাড়ীর গিন্নীটিকে ঠকিয়ে তাঁর পেটের ভেতর থেকে আদি অন্ত বিলকুল বেওরা বার করে এনেছে, তাই বাতলাতে পারলে যেন বর্তে যায়। কত বড় বাহাদুরি কাণ্ডটা করে ফেলেছে, সেটার সম্যক পরিচয় পাওয়া আমার চাই-ই চাই। না শুনিয়ে কিছুতে ছাড়বে না।

একবার সাবধান করতে গেলাম—উঁহুঁ, এখন থাক না এ সব কথা। হয়ত আবার কোনও থান থেকে আড়ি পাতবে।

হুঁ—পাতবে! সে পথ একদম বন্ধ করে এসেছি। ভুতের ভয়ে এ রাতে আর এদিক মাড়াবে না।

বলেই হাসি চাপবার জন্যে মুখের মধ্যে আঁচল গুঁজে দিলে।

গলা দিয়ে আর এক গরাসও নামতে চাইল না। ঐ দুষ্ট মি ঐ হাসি ঐ অতি-অকৃত্রিম নিঃসঙ্কোচ ভাবটা আমার শরীরের সবকটা শিরা-উপশিরার ভেতর আগুন জ্বালিয়ে ছাড়ল। সেই আগুনের আঁচ ঝলকে ঝলকে বেরতে লাগল চোখ কান নাক দিয়ে। ঢোক ঢোক করে খানিক জল গিলে উঠে পড়লাম।

খেতে বসল। খাবে না হাসবে, হাসির চোটে বিষম খেয়ে যাচ্ছে তাই কাণ্ড বাধিয়ে বসল। চাপা গলায় ধমক লাগালাম—হচ্ছে কি ছেলেমানুষী—! আগে খেয়ে নাও, তারপর যত পার হেস।

কে কার কথা শোনে। শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ল আরও দু' এক গরাস গিলে। তারপর শোবার ব্যবস্থা। এই সময়টার জন্যে ভেতরে যথেষ্ট পরিমাণে আড়ষ্ট হোয়ে উঠেছিলাম। সমস্যাটা কেমনভাবে সামনে এসে দাঁড়াবে, আন্দাজ করতে গিয়ে দম আটকে আসছিল। কোথায় কি! একটা কুলকুচো করে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকেই বলে উঠল—তারপর? এখন ঐ চৌকিকে নিয়ে যাওয়া যাবে কোথায়?

চৌকির একটা কোণ শুকনো ছিল তখনও। সেখানটায় পা ঝুলিয়ে বসে চোখ বুজে বিড়ি টানছিলাম। বললাম—একেবারে ঐ উঠোনে পেঁপে গাছের তলায়। ঐ খানেই শুধু জল পড়ছে না।

ঘরের চতুর্দিকে একবার নজর ফেলে বলে উঠল—ইস্! কত ঠাকুরের দরজায় মাথা খুঁড়ে বলে ঘর জুটেছে এক রাত্তিরের তরে এখন আবার ঐ পেঁপে গাছ তলায় শোবার সখ। নাও নাও, ওঠ দিকিনি। রাত যে ওধারে পুয়িয়ে এল। বার করে ফেল ঘর থেকে ঐ টেবিল চেয়ার। ঐ খানটায় জল পড়ছে না। চল, এই চৌকিকে নিয়ে গিয়ে ওখানে শুয়ে পড়ি।

বগলে নিয়ে বয়ে বেড়ান যায় এমন মাপের শয্যা। পাশাপাশি শুলে দু'জনকেই পাশ ফিরে শুতে হয়। চৌকি-খানা অবশ্য দু'জন শোবার উপযুক্ত, শয্যা চৌকির সবটুকু ঢাকতে পারল না। শিকে থেকে নামিয়ে চটপট শয্যা পেতে ফেললে! তারপর এক লাফে উঠে পড়ল চৌকির ওপর। একটি মাত্র পাতলা মাথার বালিশ, তার অর্দ্ধেক-টুকুতে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। শুয়েই ডাক দিল—আলোটা কমিয়ে দিয়ে এস। দরজাটা বরং খোলা থাক, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস আসছে।

ঠাণ্ডা বাতাসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলাম। ব্যাপার কি! সত্যিকারের পাঁচ ছেলের মা বিয়ে-করা পরিবার নাকি! অন্য কিছু না থাক, লজ্জা শরম বলেও ত' ছুটো কথা আছে।

ছু' মুহূর্ত্ত রইল গুটিশুটি মেরে শুয়ে। তারপর উঠে বসল ধড়মড়িয়ে। চাপা গলায় সুর করে বললে—বলি ও বিপিনবিহারীবাবু—সারা রাত ঐ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি? আসুন, শুয়ে পড়ুন। ধর্ম্মপত্নীর পাশে শুলে আপনার ধর্ম্ম নষ্ট হবে না।

এবার আর না হেসে পারলাম না। হেসে উঠতেই সমস্ত ব্যাপারটা ভয়ানক হালকা হোয়ে গেল। আলো কমিয়ে চৌকির ধারে উঠে বসলাম। বললাম—দেখ সই, সব সময় ফাজলামি করা ভাল নয়। এইটুকু বিছানায় ঘেঁষা ঘেঁষি করে শুয়ে রাত কাটাবার বিপদ আছে। অতটা নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নয়।

তা'হলে কি ঠিক?

ধক্ করে একটা আলো জলে উঠল যেন চক্ষু ছুটিতে। ছু'হাত তুলে দিলে আমার দুই কাঁধের ওপর। অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার চোখ ছু'টির পানে তাকিয়ে বলে উঠল—বলনা, শিখিয়ে দাও না গো, তা'হলে ঠিক কাজটা কি হবে। তোমাকে ছোট ভাবব, তোমাকেও ভাবব আর পাঁচ জনের মত, তুমিও হ্যাংলাপনা করবে আমার এই হাড় মাংসের বোঝাটার জন্যে, এটা বিশ্বাস করবার পরেও আমায় বেঁচে থাকতে হবে? কি নিয়ে বেঁচে থাকব তখন, শিখিয়ে দাও।

দম ফেলবার সামর্থ্য ছিল না। কোনও রকমে বললাম—কিন্তু সই, আমারও যে রক্ত মাংসের দেহ—

ছু' হাতে জড়িয়ে ধরলে গলাটা, মাথাটা গুঁজে দিলে আমার থুতনির নিচে। বুকের ওপর মুখ চেপে বলতে লাগল—তাই ত' আরও বেশী নিশ্চিন্ত হোয়ে আছি গোঁসাই। তোমার এই রক্ত-মাংসের শরীরে—এই দেখ কান চেপে শুনছি—দস্তুরমত শুনতে পাচ্ছি টিক্‌টিক্—শব্দ। আসল তুমি ঐ টিক্‌টিক্ শব্দ করছ। দস্তুরমত জেগে আছ যখন, তখন তোমার এই রক্ত-মাংসের শরীর আমার এই রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে কিছু করতে পারবে না। নাও, তুমিও শোন আমার বুকে কান চেপে। আসল আমি ঠিক জেগে আছি। এই দেখ ঠিক টিক্‌টিক্ করছে আমার বুকের ভেতর। হুবহু তোমার মত টিক্‌টিক্ করছে। শোন না, শোন আমার বুকে কান চেপে।

বলতে বলতে মাথা তুলে বসে আমার মুখটা টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরলে। শুনতে লাগলাম, নিরিবিলিতে কান পেতে শুনতে লাগলাম। উন্মত্তা রজনী ঘরের বাইরে অন্ধকার উঠোনে পেঁপে পেয়ারার জঙ্গলে বসে ঝিমঝিমে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল। ভিজুক, ভিজতে দাও। ভিজে মরুক রাত্রি, দুনিয়াখানা জলে জলে ধুয়ে মুছে সাফ্ হোয়ে যাক্। কিছুতেই কিছু যায় আসে না। শুধু এই ক্ষণটুকু যেন চিরস্থায়ী হয়। বেঁচে থাকার রাত, সজ্ঞানে ছ'জনে ছ'জনকে আঁকড়ে ধরে জেগে থাকার রাত, এ রাত পোহালে সর্ব্বস্ব খোয়ানো হবে যে। নেশা না করে, ঘুমিয়ে না পড়ে বা মরে না গিয়ে বে-আবরু হওয়া যায় কখনও! একটা রক্ত-মাংসের দেহ আর একটা রক্ত-মাংসের দেহকে আঁকড়ে ধরে আছে। কোনও ভয় নেই। ছুটো দেহের অন্তরে যে যন্ত্র ছুটো টিক্‌টিক্ করছে সেই যন্ত্র ছুটোর সুর তাল লয় বিলকুল এক রকমের। কান পেতে শুনলে শোনা যায়। শুনতে শুনতে ঘুমিয়েও পড়া যায়। দেহের ঘুম নয়, মনেরও ঘুম নয়। সে হোল অন্য জাতের ঘুম। সে ঘুমে স্বপ্ন দেখা নেই। সে হোল সুরের ঘুম। সে ঘুমে কোনও যন্ত্রই কিছুতে বেসুরো বাজে না। তাই সে ঘুমের তাল কেটে যায় না কখনও।

[ক্রমশঃ
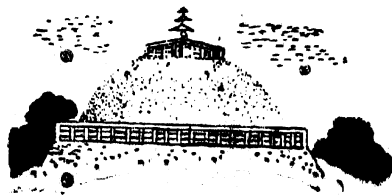
মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে

অসিতকুমার হালদার

নরোত্তম, হে কবি-সত্তম!
আজি তব জন্ম শতবার্ষিক বাসরে
হেরিছ কি বসি তুমি কৌতুহল ভ'রে
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হেন রহি সুরপুরে
দেবেন্দ্রের গৃহে?
এবে সর্ব মানবের মনে বিকশিছে তব প্রীতি
স্নেহ শতদল, তোমারে স্মরিয়া
ধূপ গন্ধে সুবাসিত, জ্বালি দীপ প্রতি ঘরে ঘরে
নত শিরে তোমারেই নমস্কার করে।

তুমি হেথা নাই,
জ্ঞানের দীপিকা তব
গেছ জ্বালি অনির্বাণ সমুজ্জ্বল ভাস্বর লিপিকা
বিশ্বের কল্যাণ তরে।
বিশ্ব-জ্ঞান-জয়ী তুমি;
তোমারি প্রভাব মানবের মর্মে মর্মে
দূরীভূত করে অন্ধকার
শান্তি পায়, যায় ভুলে শত অহংকার!

নব নব বাণী-দ্যুতি কিরণ সম্পাতে
সত্য ধর্ম, মানবতা-মর্মের বারতা
অনন্তের অন্তরের দ্বার
প্রজ্ঞালব্ধ—কুঞ্জিকাতে করিয়াছ উদ্‌ঘাটিত।
বার বার দেখায়েছ গানে, কাব্যে,
রচনা মাধুর্যে, বেদ-বেদান্তের মাঝে
সত্য, শিব, সুন্দরের প্রেম হর্ষ-ধার।
হেন অনুভূতি তুমি করিয়া জাগ্রত
বিশ্ব মানবের তরে বিশ্বের ভারতী
করিতে প্রচার জন্মেছিলে শতবর্ষ আগে
মহাকবি ক্ষণজন্মা, পঁচিশে বৈশাখে।
তারি তরে সবে আজি করযোড়ে করিছে বন্দন
তব জন্ম শতবার্ষিকীতে।

ভুলি নাই মোরা
তোমারি দোসর এক বহু যুগ হ'ল গত
যে ভারতী এ ভারতে সত্যরূপ সমবেদনায়
করেছে প্রচার
ছন্দে ছন্দে নবরত্ন সভাগৃহে রাজেন্দ্র সদনে;
মহামানবের নিবিড় বিরহ ব্যথা করিয়া সম্ভূত
উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে গেয়েছিল
কোন্ এক প্রাবৃট সন্ধ্যায়
'মেঘদূতে' মন্দাক্রান্তা কান্তা শোকাভাস;
তেমনি ত তুমি জগতের মাঝে
সত্য সন্ধানের ব্যথা সৌন্দর্য সম্ভার
নব ভাবে, নব ছন্দে করেছ প্রকাশ।
কাব্যের রচনা লীলা 'গীতালি,' 'নৈবেদ্য'
'গীতাঞ্জলি' 'বলাকায়'
বহু নাট্য গীতিকায় বাণীর ঐশ্বর্য
নানা ভাবে, নানা রসে দিতে আলো
হে কবি রবীন্দ্র! ধরণী আদিত্য তুমি
আসিলে ধরায় শতবর্ষ পূর্বে এক দিন।
মানি তব মৃত্যুহীন জনমের কথা
উৎসাহের ভরে
নরনারী আসি আজি বার বার নমস্কার করে।

হেরি আজি অন্তর্দিকে
প্রাচ্য আর প্রতীচির মূলে
বিজ্ঞানেতে বৈজ্ঞানিক মনশ্ছন্দ করিছে সন্ধান
মিলাবারে এক করি বিচিত্র মানব চিত্ত
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি
কূট দার্শনিক বিসম্বাদ ভরিছে ধরণী
দূর হতে-দূরে সবে যায় সরে' সরে'!
মানুষের অন্তর বিকাশ
কি উপায়ে হতে পারে
সাম্য তরে প্রতি মানবের মনন-সংস্কার
পারেনা ধরিতে রীতি তার
বেড়ে যায় শব্দ কোষ, গ্রন্থ, গ্রন্থাগার।

তুমি দেখি একমাত্র সত্যবাণী, সত্যজ্ঞানে
হয়ে জাগরিত সত্যের সন্ধানে সুদীর্ঘ জীবন
বেদ-বেদান্তের তত্ত্ব-যা ছিল গোপন
জনতার কাছে

ছন্দে গাথা মধুমাখা গীতির সম্বাদে
ধরে দিলে পূর্ণকরি প্রতি জনে জনে।
আজি তাই বিস্ময়ে চাহিয়া সবে দেখে বার বার
তুমি নাই, তব বাণী জ্যোতিষ্ক আকারে
উজ্জ্বলি দিতেছে দীপ্তি !
ভাবি কথা তার, মহামানবের মন শ্রদ্ধায় বিনত
তব শতজন্মবার্ষিকীতে—
আসিয়াছে উৎসব বাসরে প্রণত হইয়া
তোমারেই অন্তরের দিতে উপহার।

বস্তু তৃষ্ণা, অহংকার, মোহের পিপাসা
যত কিছু তুচ্ছ ক্ষুদ্র দীনতা বিবাদ
তুমি রবি কিরণের জালে করি দিলে দূর
নৃত্য ছন্দে। গীতি-নাট্যে বাজিল বিধুর
সম্বেদনা সান্ত্বনা মধুর।

অন্তর্দৃষ্টি দানি তুমি হেরিয়াছ দেবতার তৃতীয় নয়নে
সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে
অধঃ উর্দ্ধে দেখেছ বিস্তৃত
বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে সেই অমৃত স্বরূপে।
নিজের মাঝারে হেরিয়াছ তুমি সর্বভূতবর্গেরে সবাই ;
সর্বভূতে নিজেরে দেখেছ বিদ্যমান
ঘৃণা দ্বেষ তাই পায়নি নির্দেশ
প্রবেশিতে চিত্তে তব।
আজি জন্মশতবার্ষিকীতে তারি কথা ভাবি
আসে নরনারীকুল হইয়া আকুল,
করিতে প্রণাম।
প্রতিভার উচ্চৈঃশ্রবা তব মানে নাই কোনো বাধা
শিক্ষাগুরু চালকের নির্মম শাসন
বহুদিকে বহুপথে করিয়া ভ্রমণ
করিল নির্মাণ পথ
পথ-চিহ্ন পূর্বে যেথা নাই।
বহু মাঝে একই আছে দ্বিতীয় যে নাই
বিচিত্র-রচনা তাই করিল ঘোষণা
কাব্যের বিপুল যজ্ঞে
বিধাতা সৃজিত রূপ করনি বিকৃত
ছন্দের তুলিকাপাতে তুলেছ ফুটায়ে
সুন্দরের পরম স্বরূপ।

আনন্দ অমৃত রূপে প্রকাশিত তাঁরে
ঋদ্ধি প্রজ্ঞা ভ'রে দেখি
চিন্ময়, অব্যয় নির্গুণ আত্মারে
সবাকার হিত তার রূপ কল্পনায়
আঁকিলে সকল ছবি কাব্য-ছন্দে-
কল্যাণ-কল্পনা।
বাণী তব তাই অসত্য হইতে সবে
সত্যে লয়ে যায়, তম হ'তে জ্যোতির্মার্গে
মৃত্যু হ'তে অমৃত সদনে।

তুচ্ছ যাহা, আলো ছায়া
ঝরাপাতা, ঋতুর বর্তন
দুঃখীর ক্রন্দন, ভ্রমর গুঞ্জন
খেয়া বেয়ে তরী ভেসে যায়,
হাটে মাঠে, পথিকের সুখে দুখে
কবির মানস চক্ষু রসাবেশে ধায়
হেরিতে তাহার মাঝে সম্বেদনা সকলের
—সবারে জানায়।

দুঃখে দুঃখী, প্রেমে প্রীতি প্রতি মানবের তরে
জাতি কর্ম নির্বিশেষে দিয়ে যায় কবি যাহা শাশ্বত বাণীতে
শত শত যুগ ধরি আদিত্য কিরণ হেন
অমৃত লোকের পথে, মরণেও পাইয়া জনম
দীপ্ত জ্যোতি কভু না হারায়।

মহাকবি তুমি, আজি শতবর্ষ কমলের দল
বিকশিত না হইতে গেলে চলি করি ত্যাগ
যে বাণীরে হেথা
তারি মাঝে গেলে রাখি মৃত্যুহীন জীবন বারতা
আজি তাই তব গানে সমবেত কণ্ঠ মিলাইয়া
সকলের সাথে গাহি গান।
তব শত জন্মবার্ষিকীতে করিতে প্রণাম।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম, এ

(পূর্ব প্রকাশিত পর)

পরদিন সকালে অশ্বারোহণে আলুন গ্রামে পৌঁছাই। সেখানে আহারাদি শেষ করে 'বাসাত খানে' চলে যাই। দুপুরের নমাজের পর আমাদের সুরাপানের বৈঠক বসে।

পরদিন ভোরে আবার আমাদের যাত্রা সুরু হলো। খান বৈদের সমাধি দেখে এবং সমাধিস্থল প্রদক্ষিণ করে 'চিনেতে' একটা ভেলায় চড়ি। পেন্‌জির নদীর সঙ্গমস্থলে যেখানে পাহাড় জলের সঙ্গে মিশেছে, আমাদের ভেলাটা জলের ভিতরের একটা পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খায়। ধাক্কা লাগার সময় ভেলাটা এমন ভীষণ ভাবে কেঁপে ওঠে যে কয়েকজন লোক ঐ ঝাঁকুনি সামলাতে না পেরে নদীর মধ্যে উল্‌টিয়ে পড়ে। তাদের অতিকষ্টে আবার তুলে নেওয়া হয়। একটা চামচে সমেত চীনে মাটির পেয়ালা ও একজোড়া করতালও জলে পড়ে যায়। সেখান থেকে সরে গিয়ে আমাদের ভেলা যেই পাহাড়ের উল্‌টো দিকে গিয়েছে তখন নদীর জলের ভিতর একটা কিছুর সঙ্গে আবার ধাক্কা লাগে। জানিনা ওটা জলের মধ্যে ডুবে থাকা কোনও গাছের ডাল কিম্বা জলের গতিরোধের জন্য জলের মধ্যে পোঁতা খুঁটি কি না। ধাক্কা লেগে সা হোসেন উল্‌টিয়ে জলে পড়ে আর জলে পড়ার সময় মির্জ্জাকে ধরে ছিল বলে সেও জলে পড়ে যায়। তার হাতে ফুটি কাটার জন্য একটা ছুরি দিল। যখন জলে পড়তে যাচ্ছে তখন ভেলায় বিছানো মাদুরে ছুরিটা গেঁথে রাখে। ভেলাটাকে ধরতে না পেরে তার গায়ের দামী পোষাক নিয়েই সে সাঁতরাতে থাকে।

ভেলা থেকে নেমে সে রাত্রিটা আমরা মাঝিদের বাড়ীতেই কাটাই। যে পেয়ালাটা জলে পড়ে যায় সেই রকম একটা সাতরঙা পেয়ালা দরবেশ মহম্মদ আমাকে উপহার দেয়।

২৫ শে সোমবার আমি সারচিচ সম্মানের দ্যোতক একটি পোষাক এবং সাজ সমেত একটা ঘোড়া দরবেশ মহম্মদকে প্রদান করি ও তাকে 'বেগ' পদবীতে ভূষিত করি। চার পাঁচ মাস আমি মাথার চুল কাটিনি। ২৭ শে তারিখ বুধবার আমি চুল কাটি। এই দিনে আমাদের সুরাপান উৎসব হয়।

ইউসেফজাইদের সায়েস্তা করার জন্য আমি অভিযান শুরু করি। যখন আমি ঘোড়ায় চড়তে যাই তখন আমার অশ্বরক্ষী বাবাজান প্রচলিত নিয়মবিরুদ্ধভাবে ঘোড়া আমার সামনে আনায় আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তার মুখে ঘুঁষি মারি এবং তাতে আমার বুড়ো আঙুলের হাড় নড়ে যায়। প্রথমে আমি এর গুরুত্ব বুঝতে পারিনি, কিন্তু যখন যাত্রার শেষে ঘোড়া থেকে নামি তখন আঙুলের ব্যথা অসহ্য হয়ে ওঠে। অনেকদিন আমি এই ব্যথায় ভুগি। সে সময় একটা চিঠিও লিখতে পারিনি। যাহোক কিছুদিন পর ব্যথাটা সেরে যায়।

আমরা কিরুকে গিয়ে থামি। আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে একটা নৌকায় উঠি। এই জায়গাতেই নয়া চাঁদের উৎসব পালন করি। সুর উপত্যকা থেকে কতকগুলো পশুর পিঠে মদের পাত্র বোঝাই করে নিয়ে আসে। সন্ধ্যার নমাজের পর সুরাপান বৈঠক বসে। দরবেশ মহম্মদ কোনও সময়েই সুরাপান করেনি। শৈশবকাল থেকে এ পর্য্যন্ত আমি এই নিয়মই পালন করে এসেছি যে—কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদ খাওয়ার জন্য জোর-জবরদস্তি করবো না। দরবেশ মহম্মদ বরাবরই আমাদের দলে থাকে। কিন্তু তাকে কখনও মদ খেতে বলিনি। মহম্মদ আলি কিন্তু তাকে এভাবে চলতে দিতে ইচ্ছুক নয়। সেদিন তাকে নানাভাবে অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি করে তাকে কিন্তু সুরাপান করায়।

ইদের দিন সোমবার সকালে আবার আমরা মার্চ সুরু করি। পথের মধ্যে আমি ভাং খাই। যখন ভাং খাই তখন আমার কাছে আপেলের মত একটা ফল আনা হয়। দরবেশ মহম্মদ এমন ফল কখনও দেখেনি। আমি তাকে বলি যে এটা হচ্ছে হিন্দুস্থানি ফুটি। সেটাকে কেটে এক টুকরো তাকে দিই। সে তাড়াতাড়ি সেটা মুখে ফেলে আগ্রহভরে চিবুতে থাকে। সারাদিন তার মুখের তিক্তাস্বাদ যায় নি। কিছু মাংস তৈরী হয়ে গিয়েছে এবং খাওয়ার জন্যও পরিবেশন করা হয়েছে এমন সময় লেঙ্গার খাঁ কিছু ভাং উপঢৌকন স্বরূপ নিয়ে উপস্থিত হলো এবং আমার কাজে সে নিজেকে উৎসর্গ করবে জানালো। বিকেলের নমাজের পর আমি কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিয়ে একটা ভেলায় উঠে স্রোতের টানে ভেসে যাই।

পরদিন সকালে আমরা অগ্রসর হয়ে খাইবার-পাসের নীচে গিয়ে থামি। সেই দিনই সুলতান বেজিদ সেখানে পৌঁছিয়ে এই সংবাদ দেয় যে আফ্রিদি আফগানরা তাদের পরিবারবর্গ এবং জিনিষপত্র নিয়ে 'বারে'তে বসবাস করছে। সেখানে তারা প্রচুর পরিমাণে ধানের আবাদ করেছে, মাঠ থেকে তখনও তারা ধান কেটে নিয়ে যায় নি। আমি তখন ইউসেফজাই আফগানদের দেশ লুণ্ঠন করবো স্থির করেছি, সুতরাং অন্য ব্যাপারে মাথা গলানোর মত সময় ছিল না। দুপুরের নমাজের সময় সুরাপানের বৈঠক বসে। এই বৈঠকের সময় আমি খাজা কিলানকে এই সব দেশে আমাদের অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে একখানা চিঠি লিখি। চিঠিটার এক পাশে এই কবিতাটি লিখে দিই।

'ওগো, মলয় পবন !
চকিত-নয়না হরিণ শিশুটিরে
বোলো দয়া করে,
অভিশাপ দিয়েছ তুমি মোরে,
যার ফলে মরু ও পাহাড়ে
আমি মরি ঘুরে

সেখান থেকে ভোরে রওনা হয়ে খাইবার গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে আলি মসজিদে গিয়ে থামি। দুপুরের নমাজের সময় মালপত্র পরে আসবে এই ব্যবস্থা করে আমরা এগিয়ে যাই এবং রাতের দ্বিতীয় প্রহরে কাবুলের নদীর তীরে পৌঁছাই। সেখানে অল্প সময় নিদ্রা যাই। ভোর হতেই নদীতে হেঁটে পার হওয়ার মত জায়গা খুঁজে নিয়ে পার হয়ে যাই। আমার অগ্রগামী সেনাদের মারফৎ সংবাদ পাই যে আফগানরা আমাদের আসার খবর পেয়েই পালিয়েছে। যাহোক রাস্তা ধরে চলতে চলতে আবার সেওয়াদের নদী পার হয়ে আফগানদের শস্যক্ষেত্রের মধ্যে উপস্থিত হই। যে পরিমাণ শস্য পাব বলে আমাদের বিশ্বাস জন্মানো হয়েছিল—তার অর্দ্ধেকও দেখলাম না। অর্দ্ধেক কেন চার ভাগের এক ভাগও নয়। সুতরাং হাস্‌নাঘরকে শস্যভাণ্ডার রূপে সুরক্ষিত করার যে পরিকল্পনা ছিল সেটা ত্যাগ করতে হলো। যে সব প্রধানরা এই অভিযানের জন্য আমাদের প্ররোচিত করেছিল তারা লজ্জিত হলো। বিকেলের নমাজের কাছাকাছি সময় কাবুলের দিকের নদীটা পার হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি।

পরদিন ভোরে বেগদের উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ জারি করি। তারা এলে পরামর্শ সভায় যোগ দিতে তাদের আহ্বান করা হয়। পরামর্শের পর স্থির হয় যে আফ্রিদি আফগানদের দেশটা লুণ্ঠন করতে হবে, আর পেশোয়ার দুর্গকে এমন ভাবে সজ্জিত করতে হবে যাতে লুঠের মালপত্র ও শস্য সেখানে সুরক্ষিত করে রাখা যেতে পারে। সেখানে একদল সৈন্য রাখারও সিদ্ধান্ত করা হয়।

এই সব ব্যাপারের সুরাহার পর আমরা যাত্রা সুরু করে 'বিশ্বাস-উদ্যানে গিয়ে পৌঁছাই। এই ঋতুতে বাগানটি ফলে ফুলে শোভা পাচ্ছিল।' গাছে লাল রঙের ডালিম ঝুলছিল। কমলা লেবুর গাছে সবুজ রং নিয়ে যেন আনন্দে হাসছে। অসংখ্য কমলালেবুতে গাছগুলো ভারাক্রান্ত। ভাল জাতের কমলালেবু তখনও পাকেনি। এখানকার ডালিমগুলো বেশ ভাল বটে কিন্তু আমাদের দেশের মত অত সুন্দর নয়। এবার এই বাগান দেখে যে রকম আনন্দ পেয়েছি এমনটি কিন্তু আগে হয়নি। যে তিন চার দিন আমরা এই বাগানে ছিলাম আমাদের শিবিরের সকলেই প্রচুর পরিমাণে ডালিম খেয়েছে।

উদ্যান থেকে বেরিয়ে এলাম। এখানে আমরা দিনের প্রথম প্রহর পর্যন্ত ছিলাম। নানা লোককে কমলালেবু বিতরণ করি। সা হাসানকে দুটো গাছের কমলা দিই। বেগদের কাউকে একটা গাছের, কাউকে দুটো গাছের কমলালেবু দেওয়া হয়। শীতকালে লেমখানের ভিতর দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকায় জলাশয়ের ধারের প্রায় কুড়িটা কমলালেবু গাছের ফল আমার ব্যবহারের জন্য রাখার ব্যবস্থা করি। এই দিনই আমরা গেন্দেমেকে পৌঁছে যাই।

পরদিন সকালে আমরা জগদালিকে গিয়ে উপস্থিত হই। সন্ধ্যার নমাজের সময় আমাদের সুরাপান বৈঠক বসে। আমার অনেক সভাসদ এই সময় উপস্থিত ছিল। উৎসবের শেষে গেদাই খুবই বাচাল এবং ব্যবহারে বিরক্তিজনক হয়ে উঠেছিল। সে মাতাল হয়ে যে বালিশে হেলান দিয়ে আমি বিশ্রাম করি সেই বালিশে শুয়ে পড়তেই তাঘাই তাকে সেখান থেকে বের করে দেয়।

ভোর হওয়ার আগেই সেখান থেকে রওনা হয়ে বারিক নদীর ধারের গ্রামগুলি পর্য্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করি। অনেক তুরাক গাছ সুন্দর ফলে শোভা পাচ্ছিল। আমরা এই জায়গায় থামি। 'ইউন্‌কেরান' নামে একটা খাবার দিয়ে মধ্যাহ্নের আহার শেষ করে এখানকার শস্যসম্পদের প্রাচুর্য্যকে সম্মানিত করার জন্য সুরাপান চলতে থাকে। আসবার সময় রাস্তায় একটা ভেড়া পাওয়া গিয়েছিল। আমার লোকেরা সেই ভেড়া জবাই করে তার কিছুটা মাংস ছাড়িয়ে নিয়ে রান্না করে। ওক গাছের ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে উৎসব পালন করা হয়।

সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢলে না পড়া পর্য্যন্ত আমরা এইখানে সুরাপান চালিয়ে যাই, তারপর আবার যাত্রা সুরু করি। যারা এই সুরাপানের দলে ছিল তারা সবাই সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে পড়েছিল। সৈয়দ কাশিম এমন মাতাল হয় যে তার দুইজন ভৃত্য তাকে ঘোড়ার উপর বসিয়ে অতিকষ্টে শিবিরে আনতে পেরেছিল। দোস্ত মহম্মদের নেশাও এমন জোর হয়েছিল যে আমিন এবং আর যারা তার সঙ্গে ছিল, নানা কসরৎ করেও তাকে ঘোড়ায় ওঠাতে পারেনি। তার মাথায় অনেক জল ঢালা হলো, কিন্তু কোনও ফল হলো না। এই সময়ে একদল আফগানকে অদূরে দেখা গেল। ঘোর মাতাল অবস্থায় আমিন গম্ভীরভাবে এই মত প্রকাশ করলো যে তাকে এই অবস্থাতেই এখানে ফেলে রাখা ভাল—যাতে সে শত্রুর হাতে পড়তে পারে। তার মাথাটা শত্রুরা কেটে নিয়ে গেলেই খুব ভাল হবে। যা হোক, আর একবার চেষ্টা করে তারা কোনও রকমে ঘোড়ার পিঠে ছুঁড়ে ফেলে ঘোড়া চালিয়ে তাকে দূরে নিয়ে আসে।

মাঝরাতে আমরা কাবুলে পৌঁছে গেলাম। আমি একা এগিয়ে গিয়ে কাবিল বেগের সমাধির নিকট এসে প্রথম একপেয়ালা সুরাপান করি। দলের লোকজন একে একে সেখানে এসে হাজির হয়। সূর্য্যের তাপ বেড়ে উঠলে আমরা বেগুনি-বাগানে বিশ্রামের জন্য যাই। সেখানে একটা জলাশয়ের ধারে মদের পেয়ালা নিয়ে বসে যাই। দুপুরে আমরা একটু ঘুমিয়ে নিই। দুপুরের নমাজের পর আবার আমরা সুরাপান করতে বসি। বৈকালের উৎসবে আমি টেংরিকুলি বেগ ও মেন্দিরের হাতে সুরার পেয়ালা তুলে দিই—যা আগে আমি কখনও করিনি। রাতের নমাজের সময় আমি স্নানশালায় পৌঁছিয়ে সেখানেই রাতটা কাটিয়ে দিই।

রবিবারে ফটকের উপরের ছোট্টো ছবিঘরে এক বৈঠক বসে।

ঘরটা খুব ছোট হলেও আমাদের দলে লোক ছিল ষোলো জন। শস্যের ফলন কেমন হয়েছে আমি দেখতে যাই। এই দিন আমি ভাং খাই। সে রাতে খুব বৃষ্টি হয়। অধিকাংশ বেগ এবং সভাসদরা যারা আমার সঙ্গে ছিল আমার তাঁবুতেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। তাঁবুটা খাটানো হয়েছিল বাগানের মাঝখানে।

পরদিন সকালে সেই তাঁবুতে সুরাপান বৈঠক বসে। রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের মদ খাওয়া চলে। পরদিন ভোরেও এক পেয়ালা সুরাপান করে মাতাল হওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ি। দুপুরের নমাজের সময় ইস্তালিফ ত্যাগ করে রাস্তাতেই ভাং খাই। এদিকে ফসলের অবস্থা খুব ভাল ছিল। শস্যক্ষেত্রের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে আমার সঙ্গীদের কয়েক-জন—যারা মদ খেতে খুবই পটু তারা—আর একটা সুরাপান বৈঠকের আয়োজন করার মতলব করছিল। আমি যদিও ভাং খেয়েছিলাম, শস্যের অসাধারণ প্রাচুর্য্য দেখে যে সব গাছে পর্য্যাপ্ত ফল ধরেছিল সেই সব গাছের নীচে বসে মদ খাওয়া সুরু করি। সে জায়গাতেই রাত্রের নমাজের সময় পর্য্যন্ত এই বৈঠক চলতে থাকে। খালিফা সেইখানে পৌঁছে যেতেই তাকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাই। আবদাল্লা খুব মাতাল হয়ে পড়ায় এমন একটা মন্তব্য করলো যেটা খালিফাকে আঘাত করে। মোল্লা মহম্মদ সেখানে উপস্থিত আছে সে কথা বিস্মৃত হয়ে সে এই কবিতাটি আবৃত্তি করে।

'পরীক্ষা তুমি যাকেই করো,
ছোক সে ছোট হোক সে বড়,
দেখবে তুমি নিজের চোখেই,
একই ক্ষতে ভুগছে সবাই।'

মোল্লা মহম্মদ মদ খায় না। কবিতাটি লঘুভাবে আবৃত্তি করার জন্য সে আবদাল্লাকে ভৎর্সনা করলো। আবদাল্লা তার বিচার শক্তি ফিরে পাওয়ার পর খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। সে তারপর থেকে সারা সন্ধ্যাটা খুব মোলায়েম ও মিষ্টভাষায় কথাবার্ত্তা বলতে লাগলো।

১৬ই বৃহস্পতিবারে আমি বেগুনি-বাগানে ভাং খাই। আমার কয়েকজন বন্ধুস্থানীয় সহচরকে সঙ্গে নিয়ে একটা নৌকায় চড়ি। হুমায়ুন কামরাণও আমাদের সঙ্গে ছিল। হুমায়ুন খুব সুন্দর নিশানা করে একটা পাণকৌড়ি শিকার করে।

প্রায় দুপুরবেলায় আবার আমরা ঘোড়ায় চড়ি। সহিস ও ভৃত্যদের বিদায় করে দিয়ে একটা গুপ্ত জলপথের ধারে পৌঁছে যাই। তারপর আমরা ভাটিখানার পেছন দিক দিয়ে রাতের প্রথম প্রহরের শেষের দিকে তারদি বেগের জলনালার কাছে পৌঁছে যাই। তারদি বেগ আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমি খুব ভালভাবেই জানতাম যে তারদি বেগের চিন্তাহীন শপথের কথা এবং এও জানতাম যে সুরাপাত্র হাতে নিতে সে অপছন্দ করবে না। আমার সঙ্গে যে টাকা ছিল তা তার হাতে তুলে দিয়ে বল্লাম যে কয়েকজন ফূর্ত্তিবাজ সহচরের সঙ্গে আমি আমোদ করতে চাই। সে যেন মদ এবং আনুসঙ্গিক জিনিষপত্র কিনে নিয়ে আসে।

মদ আনতে তারদি বেগ বেরিয়ে গেল। তারদি বেগের একজন ক্রীতদাসকে আমার ঘোড়াটাকে মাঠে ঘাস খাওয়াতে পাঠালাম। আমি জলাশয়ের পেছনে একটা উঁচু মাটির ঢিবির উপর বসে পড়ি। রাতের প্রথম প্রহরে প্রায় নয়টায় তারদি বেগ এক কলসী মদ নিয়ে এলো। আমরা সুরাপাত্র নিয়ে বসে গেলাম। তারদি বেগ যখন মদ নিয়ে আসছিল তখন মহম্মদ কাশিম ও সাজাদা তার উদ্দেশ্য আন্দাজে বুঝে নিয়ে তার পিছু পিছু ধাওয়া করে। তারা কিন্তু বুঝতে পারেনি যে আমার আদেশেই সে মদ আনছে। আমাদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানাই। তারদি বেগ আমাকে জানায় যে হুলহুল আমাদের সঙ্গে মদ খেতে চায়। আমি বল্লাম—'স্ত্রীলোককে মদ খেতে আমি কখনও দেখিনি। বেশ, তাকে আমাদের দলে যোগ দিতে বল।' সে সাহি নামে একজন সাধু লোককেও ডেকে আনে। সে লোকটা বাঁশী বাজায়।

আমরা জলাশয়ের পেছনের উঁচু জমির ওপর বসে সান্ধ্য নমাজের সময় পর্য্যন্ত মদ্যপান করতে থাকি। তারপর আমরা তারদি বেগের বাড়ীতে এসে মোমবাতির আলোয় রাতের নমাজের সময় পর্য্যন্ত সুরা-পান চালিয়ে যাই। আমাদের এই উৎসবটা খুবই আমোদজনক ও নির্দ্দোষ হয়েছিল।

আমি শুয়ে পড়লাম। আমার অন্যান্য সঙ্গীরা রাতের শেষ যাম ঘোষণা করে দামামা না বাজা পর্য্যন্ত সুরাপান চালিয়েছিল! হুলহুল মত্ত অবস্থায় আমার কাছে এসে নানা উৎপাত সুরু করে দেয়। আমি যেন খুব মাতাল হয়ে পড়েছি এই ভান করে শয্যায় শুয়ে পড়ি। এই ছলনার আশ্রয়ে সে রাতে তার হাত থেকে উদ্ধার পাই।

আমি একাই বেরিয়ে পড়বো এই ইচ্ছা করে ওদের কাউকে না জানিয়ে ঘোড়ায় চড়ার আয়োজন করি। কিন্তু ওরা আমার মতলব ঠিক পাওয়ায় আমি কৃতকার্য্য হতে পারিনি। ভোরের দামামা বেজে উঠলে আমি ঘোড়ায় উঠি। তারদি বেগ ও সাজাদাকে আমার সঙ্গী হতে বললে তারাও ঘোড়ায় উঠে পড়ে। প্রভাতী নমাজের সময় আমরা ইস্তালিফে পৌঁছে যাই। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি ভাং খাই। তারপর শস্যের অবস্থা দেখার জন্য আমরা ঘুরে বেড়াতে থাকি। সূর্য্যোদয়ের সময় আমরা ইস্তালিফের উদ্যানে গিয়ে থামি। সেখানে আঙুর খাই। তারপর আতামিরের বাড়ীতে গিয়ে ঘুমাই।

আমরা যখন নিদ্রায় মগ্ন, তখন আতামির আমাদের অভ্যর্থনার জোগাড় করে এক কলসী মদ ঠিক করে রাখে। মদটি খুবই উপাদেয় ছিল। কয়েক পেয়ালা পান করে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠি। দুপুরের নমাজের সময় একটা সুন্দর উদ্যানে গিয়ে থামি। সেখানে আমাদের আমোদ বৈঠক বসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমিন আমাদের সঙ্গে যোগ-দান করে। রাতের নমাজের সময় পর্য্যন্ত আমরা সুরাপান চালিয়ে যাই।

পরদিন প্রাতর্ভোজনের পর ইন্ডার গাছের নীচে রাজ-উদ্যানের চারি-

দিকে ঘুরে বেড়াই। একটা আপেল গাছে অনেকগুলো ফল ধরেছে। কতকগুলো শাখায় পাঁচ ছয়টা পাতা বিচ্ছিন্নভাবে তখনও রয়েছে। এমন সুন্দর যে কোনও চিত্রকরের অশেষ নৈপুণ্য থাকলেও এই চিত্রটি ঠিকভাবে তুলি দিয়ে আঁকার চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

দুর্গে পৌঁছে সুরাপান উৎসবের আয়োজন করি। এই বৈঠকের নিয়ম ছিল যে কেউ মদ খেয়ে মাতাল হলেই তাকে সে স্থান ত্যাগ করতে হবে—আর তার জায়গায় আর একজনকে নিমন্ত্রণ করে আনা হবে।

১৫১৯ সালের আরও ঘটনাবলী

কুলবের নীচের পাহাড়ে আমরা অনেকগুলো হরিণ শিকার করি। আমার আঙ্গুলে ব্যথা হওয়ার পর থেকে আমি এ পর্য্যন্ত তীর ছুঁড়িনি। এই দিন তীর ছুঁড়ে একটা হরিণের কাঁধের হাড় বিদ্ধ করি। শরটি আধাআধি বিঁধে যায়। বিকেলের নমাজের সময় একটা ভেলায় চড়ি। সেখানেও সুরাপান চলে। সন্ধ্যের নমাজের পর ভেলা থেকে নেমে তাঁবুতে গিয়ে মদ নিয়ে বসে যাই।

পরদিন ভোরে আবার ভেলায় উঠে ভাং খাই।—

শুক্রবারে পুনরায় কিছুদূর অগ্রসর হতেই অনেকগুলো তিতির পাখী চোখে পড়লো। রাতেও সুরাপান চললো।

একটা ভেলায় চড়ে কমলালেবুর বাগানের কাছে এসে ডাঙ্গায় নামি। কমলালেবুগুলো প্রায় পীত রং ধারণ করতে চলেছে। আর সবুজরঙা গাছগুলোও চমৎকার দেখাচ্ছে। এই কমলালেবুর বাগানে আমরা পাঁচ ছয়দিন অবস্থান করি।

স্থির করেছি যে চল্লিশ বছর বয়সেই আমি মদ খাওয়া একেবারে ছেড়ে দেব।—আমার চল্লিশ বছর বয়স পূরণ হতে এক বছরের কম বাকি। তাই এ সময়টা আমি খুব বেশী মদ খেতে থাকি। মোল্লা ইয়ারেক একটা সুর বাজালো—যে সুর ও তাল তার নিজের তৈরী। সুরটা খুবই সুন্দর। আমি এসব বিষয়ে কোনও মনোযোগ দিইনি। আমার খেয়াল হলো যে আমাকেও কিছু একটা রচনা করতে হবে। এই ঘটনায় আমার মনে 'চারঘার' তালে একটা গীত রচনা করার কথা জেগে উঠ্‌লো। সে কথা পরে সময়মত উল্লেখ করা যাবে।

সেদিন সুরার প্রথম পেয়ালা হাতে নিয়ে আমোদ করে বল্লাম—যে কেউ 'তাজিক' সঙ্গীত গাইতে পারবে—তাকেই একটা বড় পাত্রপূর্ণ সুরাপান করতে দেওয়া হবে। এর ফলে অনেকেই বড় পাত্রপূর্ণ সুরা পান করতে পায়।

সকাল নয়টার সময় আমাদের বৈঠকে যোগদানকারী যে কয়জন তাল গাছের নীচে বসেছিল তারা প্রস্তাব করলো যে যারা তুর্কি গান গাইতে পারবে তাদেরও বড় পাত্র ভর্ত্তি সুরা দেওয়া হবে। কেউ কেউ তুর্কি সঙ্গীত গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরা দাবী করলো এবং তারা তা পেল। সূর্য্য যখন মাথার উপরে তখন আমরা কমলালেবুর গাছের দিকে গেলাম এবং খালের ধারে বসে মদ খেলাম।

পরদিন সকালে অনেক অপরাধে অপরাধী খামজে খানকে—যে অনেক নির্দ্দোষ লোক হত্যা করে রক্তের স্রোত বইয়েছে, মৃত্যুদণ্ড দিলাম। এই দণ্ড কার্য্যে পরিণত করার জন্য অত্যাচারিতদের হাতেই তাকে সমর্পণ করলাম—যাতে তারা বিধিমত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে।

কোরাণের কিছু অংশ পাঠ করার পর আমি কাবুলে ফিরে আসি। এখানে এসে ঘোড়াদের দানা খাইয়ে এবং নিজেরাও তাড়তাড়ি খাওয়া শেষ করে আমরা আবার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলাম।

[আত্মচরিতে আবার বিরতি। ১৫২০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৫২৫ সালের নভেম্বর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভারতে দ্বিতীয় অভিযানের শেষ থেকে পঞ্চম অভিযান আরম্ভ পর্য্যন্ত ঘটনাগুলির কথা আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় না। ভারতের বিরুদ্ধে বাবরের তৃতীয় অভিযান ১৫২০ সালে সুরু হয়।

যে সব আফগানরা বাবরের সঙ্গে যোগ দেয় এবং যারা পরে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের মধ্যে অনেককে বাবর হত্যা করেন। কৃষক-সমাজ তাতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে—কারণ এই সব আফগানরা তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল। বাবর শিয়ালকোট পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এখানকার অধিবাসীরা আত্মসমর্পণ করে তাদের সম্পত্তি রক্ষা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু সৈয়দপুরের আধিবাসীরা প্রতিরোধ করায় তাদের তরবারির মুখে প্রাণ দিতে হয়।

এই সময় বাবর সংবাদ পান যে কান্দাহারের দিক থেকে তাঁর রাজ্য আক্রান্ত হয়েছে। এই ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে বিদেশী রাজ্য জয় করার চেষ্টার আগে নিজের রাজ্য সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। তিনি তখন বাদাক-সান প্রদেশের শাসন ভার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনের হাতে সমর্পণ করেন। তার পর তাঁর ভারত আক্রমণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করার শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়।

দিল্লীর সাম্রাজ্য তখন এমন ছিলনা যেমন পরে বাবরের পৌত্র আকবরের সময় হয়েছিল। কিছুকাল পূর্ব্ব থেকেই ভারতের অনেকস্থান আফগান আক্রমণকারীদের হাতে গিয়ে পড়েছিল। সম্রাট ইব্রাহিমের রাজ্য-শাসন পদ্ধতি খুবই অসন্তোষজনক ছিল। তিনি আফগান আমিরদের আনু-গত্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তারা অনেকেই গঙ্গার অপর পারে চলে যায় এবং বেদাউন থেকে বেহার পর্য্যন্ত সব প্রদেশ বিদ্রোহীদের কবলিত হয়। বঙ্গদেশে তখনও স্বাধীন নরপতি ছিল, মালোয়া ও গুজরাটেও তাই। হিন্দু রাজপুত রাজারা রাণা সঙ্গকে দলের প্রধান ঠিক করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। পাঞ্জাব তখন দৌলত খাঁয়ের অধীন ছিল। তার দুই পুত্র গাজি খাঁ ও দিলওয়ার খাঁ নিজেরাও আফগান হওয়ায় ভারত সাম্রাজ্যের অন্য অংশের আফগান আমিরদের অদৃষ্ট দেখে সম্রাট ইব্রাহিমের আয়ত্তের বাহিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল। তারা বাবরের নিকট দূত পাঠিয়ে তাদের আনুগত্য জানায় এবং তাদের উদ্ধারের জন্য ভারত আক্রমণের প্ররোচনা দেয়। বাবরের মন নেচে ওঠে, কারণ তাঁর অন্তরের অভিলাষ পূরণের সুযোগ এই আহ্বান এনে দিল। বাবর চতুর্থবার হিন্দুস্থানে প্রবেশ করলেন। যে সব আফগানরা তখনও সম্রাট ইব্রাহিমের স্বার্থ

দেখছিল তারা লাহোরে বাবরের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করলো। তারা পরাজিত হয়। বাবরের সৈন্য লাহোর সহর ও বাজার ভস্মীভূত করে ফেলে।

এই যুদ্ধের ফলে দৌলত খাঁর ক্ষমতা খুব বেড়ে যায়। কারণ সেই বাবরকে ভারতে আহ্বান করে আনে। সে তার দুই পুত্র গাজি খাঁ ও দিলওয়ার খাঁ সহ তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়।

যাহোক বাবরকে দিয়ে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সে মতলব আঁটতে থাকে—কি করে বাবরের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সে শঠতা করে বাবরকে জানায় যে একদল সৈন্য তাঁর অগ্রগতি রোধ করার জন্য অপেক্ষা করছে, সুতরাং তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেবার জন্য বাবর যদি একদল সৈন্য আগেভাগে পাঠিয়ে দেন তাহলে খুব ভাল হয়। দৌলত খাঁর উপদেশ মত কাজ করার জন্য বাবর প্রস্তুত হচ্ছিলেন—কিন্তু দিলওয়ার খাঁ তাঁকে গোপনে জানিয়ে দেয় যে তার বাবার উপদেশটা বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্ত মাত্র। বাবর কথাটা বিশ্বাস করেই হোক অথবা বিশ্বাস করার ভান করেই হোক দৌলত খাঁ ও গাজি খাঁকে বন্দী করেন। পরে অবশ্য তারা মুক্তি পেয়ে বাবরের কাছ থেকে পালিয়ে যায়। তাদের সম্পত্তি তখন দিলওয়ার খাঁর হস্তগত হয়। এই সব ব্যাপারের পর বাবর আর দিল্লীর দিকে এগিয়ে অভিযান চালিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে করলেন না। তিনি লাহোরে চলে এলেন। তারপর শতদ্রু নদী পার হয়ে কাবুলে প্রত্যাবর্তন করলেন। সে যাই হোক, সিন্ধু নদের অপর দিকেও স্থায়ী ঘাঁটি করতে তিনি সক্ষম হলেন। এইবারকার অভিযানে সম্রাট ইব্রাহিমের ভাই সুলতান আলাউদ্দিন তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। খুব সম্ভবতঃ বাবর তাঁর মনে এই আশার সঞ্চার করতে পেরেছিলেন যে তাকেই তিনি হিন্দুস্থানের সম্রাট করে দেবেন।

বাবর সিন্ধুনদের ওপারে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৌলত খাঁ ও গাজি খাঁ তাদের পার্ব্বত্য গুপ্তস্থান থেকে নেমে এসে দিলওয়ার খাঁকে বন্দী করে। তারপর দ্রুত অগ্রসর হয়ে আলাউদ্দিনকে যুদ্ধে পরাজিত করে। আলাউদ্দিন কাবুলে পলায়ন করে।

দৌলত খাঁ শীগগিরই জানতে পারে যে আলাউদ্দিন কাবুলে উপস্থিত হলে বাবর তাকে সমাদরে গ্রহণ করেছেন। বাবর বাল্খের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে সেই দিকে যাওয়ার জন্য আলাউদ্দিনকে হিন্দুস্থানে পাঠালেন। তাঁর সেনাপতিদের এই নির্দ্দেশ দিলেন যে তারা আলাউদ্দিনের সঙ্গে দিল্লী অভিযানে যেন সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করে যাতে সে দিল্লীর মসনদে বসতে পারে। চতুর দৌলত খাঁ এই সংবাদ শুনে তৎক্ষণাৎ আলাউদ্দিনকে চিঠি লিখে তার কৃতকার্য্যতার জন্য সম্বর্দ্ধনা জানায় এবং সে নিজেও তাকে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

এই দুইজনের মধ্যে এক সন্ধি হয়—যার ফলে গোটা পাঞ্জাব দৌলত খাঁর ভাগে পড়ে অর্থাৎ যে প্রদেশটা এতদিন বাবরের অধীন ছিল। বাবর এই কথা শুনে স্থির করলেন যে এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করায় আলাউদ্দিনকে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন তার আর কোনও মূল্য রইলো না। দৌলত খাঁর সঙ্গে আলাউদ্দিনের ঐ ভাবে সন্ধি হওয়ায় তাঁর সঙ্গে সমস্ত চুক্তি নাকচ হয়ে গিয়েছে।

আলাউদ্দিনের সৈন্যরা যখন দিল্লীতে উপস্থিত হয় তখন তা অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা ছিল—চল্লিশ হাজার।

দিল্লী অবরোধ, আলাউদ্দিনের পরাজয় এবং পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি বাবর নিজেই আত্মচরিতে বিবৃত করেছেন। আত্মচরিত পুনরায় সুরু হয়েছে পঞ্চম ও শেষবার হিন্দুস্থান আক্রমণের বিবরণ দিয়ে।]

[ক্রমশঃ

করুণা কোরো না

'গোরা'

করুণা কোরো না যদি হই অভিযুক্ত
করুণার আড়ে থাকে ক্রূর অভিসন্ধি ;
ঘৃণা আর অবহেলাতেই রেখো মুক্ত—
অনুকম্পায় আমারে
কোরো না বন্দী।

উপেক্ষা আমি মাথা পেতে নেবো প্রেয়সী—
ভ্রূকুটির শরাঘাতে হব আমি ধন্য—
অভিমানে কভু ব্যথার অশ্রু বরষি
বেঁধো না আমায় ; উদ্দাম আমি বন্য।

লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে ফিরে তবু আসবো—
পতঙ্গ-সম প্রদীপ শিখায় জ্বলতে,
আহুতি হ'য়েও তোমারেই ভালবাসবো—
শুধু—অশ্রু-পিছল পথে
পারবো না আমি চলতে।

বহুবাজার শিশুহত্যা মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমি ও আমার সহকারী এতক্ষণ আমাদের নিঃশ্বাস পর্যন্ত রুদ্ধ করে আসামীর কাহিনী শুনছিলাম। বাহিরের রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ, উপরে ঘূর্ণায়মান পাখার শব্দ ও পাখার হাওয়াতে দুলে-উঠা টেবিলের উপরকার কাগজ-পত্রের পতপত শব্দের এতটুকুও আমাদের এতক্ষণ কর্ণ-গোচর হয় নি। কিন্তু আসামী তার বক্তব্যের শেষটুকু শেষ করা মাত্র ঐ শব্দগুলো যেন আরও জোরালো হয়ে একই সঙ্গে আমাদের কানের পর্দায় আঘাত করতে শুরু করে দিলে। ডায়েরির পাতাগুলো সামনে টেবিলের উপরে খোলাই পড়েছিল। হেঁট হয়ে আমি দেখলাম যে সত্য-সত্যই আমি তার বিবৃতির প্রতিটি বাক্য যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে পেরেছি। কিন্তু কখন যে তা আমি করলাম তা আমি চেষ্টা করেও স্মৃতি পথে আনতে পারলাম না। আমি সম্বিৎ ফিরে পাওয়া মাত্র ব্যস্ত হয়ে চেয়ে দেখলাম, না, আসামী পালায় নি। সে ঘরের মধ্যেই লোহার চেয়ারটার উপর তখনও বসে আছে। এদিকে আমার সহকারী অফিসারটিও তাঁর স্বাভাবিক সত্তা ফিরে পাওয়া মাত্র ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'স্যার, আর দেরী না করে এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক্‌। ও যদি এখুনি বারাকপুরে গিয়ে ঐ জায়গাটা না দেখিয়ে দেয় তো ওকেও আমরা ওমনি করে খুন করবো, এখুনি সেখানে না গেলে লাস অন্য কোথায় পাচার হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ঐ রিক্সাওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা, দুধ-বিক্রেতাদের, শ্যামনগরের কুলিটাকে ও কাঁচড়াপাড়ার দোকানীটাকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

আমার সহকারী অফিসার এখনও বুঝতে পারেন নি যে আসামী এক প্রকারের পাগল অপরাধী মাত্র। অন্য বিষয়ে সে স্বাভাবিক হলেও এই একটি বিষয়ে সে অতি মাত্রায় পাগলই। তাই যে রীতিতে একজন সহজ মানুষ নীরোগ অপরাধীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সেই রীতিতে একজন অপরাধ-রোগীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিরর্থক। এতে বিপরীত ফল ফলে মামলার কিনারা সুদূর-পরাহত করে দেবে। কিন্তু এই বিষয়ে সহকারীকে এখুনি বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। এদিকে ভুলপথে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে আসামী আবার আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। এই জন্য সহকারী অফিসারের উপর কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে আমি বলে উঠলাম, 'কি সব তুমি ভাই বাজে বোকছো! ঐ আসামী মিথ্যে বলবার জন্য এখানে আসেনি। ও নিজের ইচ্ছায় যা বলেছে তা নিজেই ও প্রমাণ করবে। তুমি জানো কতো কষ্ট পেয়ে সে এরকম একটা কায করেছে। তুমি ফরিয়াদীকে (ডাঃ প্যাটেল) এখানে ডাকিয়ে পাঠিয়ে এখুনি একটা ট্যাক্সি ডাকাও। আসামী এখুনি আমাদের বারাকপুরের মাঠে নিয়ে গিয়ে প্রমাণ করে দেবে যে, সে এতক্ষণ এতটুকুও মিথ্যে কথা বলে নি।'

এক নিশ্বাসে কথা কয়টা বলে আসামীর অলক্ষ্যে আমি সহকারীকে চোখের ইশারা করলাম। বণিকরা যেমন অপরের অলক্ষ্যে ইশারায় কিংবা অপরের দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে, আমিও এই সময় সহকারীদের পরস্পরকে পরস্পরের মনের ইচ্ছা বুঝাবার জন্যে কয়েকটি সাঙ্কেতিক শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে তুলেছিলাম। এইরূপ বহু দুর্বোধ্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমক্ষে তাদের অগোচরে আমরা বহু সময় নিজেদের মধ্যে ভাবের ও ভাষার আদান প্রদান করতে পেরেছি। আমার এইরূপ মৃদু ভর্ৎসনায় সহকারী ক্ষুব্ধ না হয়ে বরং খুশি হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বার হয়ে গেলে আমি আসামীকে এই খুন সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করে নিলাম। এই সময় আসামী আমার প্রশ্নের যথাযথই উত্তর দিয়েছিল। এই সব

কিংবা তাকে মাত্র আহত করে তার রক্তমাখা জামা কয়টি খুনের প্রমাণ স্বরূপ সেখানে রাখা হয়েছে। সম্ভবত আসামী এই সব ব্যবস্থা করে আহত শিশুটিকে অন্যত্র রেখে থানায় এসেছে। ঐ শিশুর মাতা-পিতাকে হয়রানি বা ব্ল্যাকমেইল করবার উদ্দেশ্যে কি সে এই সব করলো? কিন্তু তাই যদি হয় তা'হলে সে থানায় এসে এই সম্বন্ধে স্বীকারোক্তিই বা কেন করবে? প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদটি আমি ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত রক্তরঞ্জিত বস্ত্রাদি ও আসামীর হাবভাব ও আচরণ প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না।

এইরূপ অপরাধ-শাস্ত্রসম্মতভাবে পর্যালোচনার পর আমার একবার মনে হল হয়তো আমি এই অপরাধীর ভুল শ্রেণী-বিভাগ করেছি। হয়তো সে আদপেই একজন অপরাধ-রোগী নয়। বরং সে একজন নারোগ অপরাধী ও জ্ঞান-পাপী। কিন্তু ইতিপূর্বে আমি তার চোখের রঙ ও চক্ষুর ঘূর্ণন ও উহার পত্রের উঠানামা ও তার হাবভাব, কথাবার্তা ও পূর্বাপর আচরণ ধীরভাবে লক্ষ্য করেছিলাম, এইজন্য তাকে এক প্রকার অধীরমনা মানসিক রোগী বলেই আমার মন মেনে নিয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমার সহকারী এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা এতক্ষণ ঐ সকল রক্তরঞ্জিত প্রামাণ্য দ্রব্যগুলি নাড়াচাড়া করা সত্ত্বেও এতগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় তাদের চক্ষু এড়িয়ে গেল। আমার সহকারী এই পুলিশ বিভাগে নূতন প্রবেশ করেছিলেন। তাই ঘটনাস্থলে অতগুলি রক্তরঞ্জিত জামা ফ্রক পেয়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। এই উত্তেজনা সব সময়েই মনে বুদ্ধিভ্রংশতা ও চিত্তবিভ্রম আনয়ন করে। এইজন্য বড় বড় মামলার তদন্তে নিয়ম আছে যে, একজন অফিসার হাতে কলমে তদন্তকার্য করবে এবং অপর একজন অফিসার এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থেকে ধীর ভাবে লক্ষ্য করবে তদন্তকারী অফিসার কি কি করেছে ও তদন্ত সম্পর্কে কি কি-ই বা সে করতে ভুলে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে সহকারী নিজেই তদন্তে হাত দেওয়ায় উত্তেজনার কারণে খোকার জামার বোতাম কয়টির এবংবিধ অবস্থান পরিলক্ষ্য করতে পারেন নি।

'স্যার! এই দেখুন ফ্রেশ ব্লড,' একটু উত্তেজিত ভাবে সহকারী অফিসার বলে উঠলেন, 'এখন তল্লাসী কাগজে এর ধূপি মার্কাগুলি সনাক্ত করানো না হলে শুধু ফরিয়াদীকৃত সনাক্তকরণ আদালতকে বিশ্বাস করানোর জন্য যথেষ্ট হবে না। তবে আসামীর বিবৃতি অনুসারে যখন এই সকল প্রামাণ্য দ্রব্য [exhibits] আমরা উদ্ধার করেছি, তখন এগুলি আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণরূপে ভালোভাবেই ব্যবহার করা চলবে। এ'ছাড়া, স্যার, এইখান হতে রক্তমাখা মাটির কয়েকটা চাপড়া তুলে নিয়ে সাক্ষীদের সামনে তল্লাসীপত্রে তা নথীভুক্ত করে নিতে হবে। তবে এই নিহত শিশুর লাসটা পাওয়া গেল না, এই যা—'

সহকারী অফিসার বাঁধাধরাভাবে তদন্ত সম্পর্কে যা করণীয় তাই মাত্র বলছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁকে যথাযথরূপে উপদেশ দিতে দিতে আমি ভাবছিলাম একটি অন্য কথা। আমি টর্চের আলোক ঘুরিয়ে ঐ বৃক্ষের গুঁড়ির বিভিন্ন স্থানে নিক্ষেপ করে দেখলাম যে সেখানে কোথাও রক্তের লেশমাত্রও নেই। অথচ এই বৃক্ষের নিম্নে ঐ হতভাগ্য শিশুটিকে নিহত করা হলে কর্তিত ধমনী হতে ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠে ঐ বৃক্ষ কাণ্ডটির উপরাংশে বহুদূর পর্যন্ত রক্তরঞ্জিত করে দেবার কথা। হুঁ, তা হলে? তাহলে কি এইখানে শিশুটিকে হত্যা করা হয় নি? কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে বৃক্ষের তলে চাপে চাপে রক্ত পড়ে থাকবে কি করে? অন্যত্র হত্যা করে লাস বৃক্ষের তলে ফেলে দিলে চুইয়ে চুইয়ে কিছু রক্ত মাটিতে পড়তে পারে বটে। কিন্তু তাহলেও এতো রক্ত সেখানে পড়বার কথা তো নয়। এ'ছাড়া অন্যত্র হত্যা করে ঐ শিশুর দেহটি রক্তাক্ত অবস্থায় এখানে আনাও তো আসামীর পক্ষে এক কঠিন কার্য। এদিকে আসামীর থানায় এসে আত্মসমর্পণ করার সময় তার দেহের ও পরিচ্ছদের কোথাও লেশমাত্র রক্তের চিহ্ন দেখা যায় নি। এমন সুষ্ঠুভাবে দেহ পরিষ্কার করে নতুন বস্ত্রাদি পরিধান করার অত সময় ও সুবিধাজনক স্থান এতটুকু সময়ের মধ্যে সে পেলো কোথায়? আসামী রাত্র আট ঘটিকার মধ্যে থানায় এসে স্বীকারোক্তি করেছে। বারাকপুর হতে শহরে আসতেও তার বেশ কিছু সময় লেগেছে। অন্যদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারেই মাত্র তার পক্ষে ঐ মাঠে শিশুটিকে হত্যা করা সম্ভব হতে পারে। এই সকল কার্যকারণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এতো বেশী থাকতে তো কোনও ক্রমেই পারে না।

এই খুন সম্পর্কে আসামীকে আমাদের বহু কথা এই ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসা করবার ছিল, কিন্তু এই অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন হত্যাস্থল এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদের [interrogation] পক্ষে অনুকূল ছিল না। এই জন্য ত্বরিত-গতিতে অকুস্থল হতে সংগৃহীত প্রামাণ্য দ্রব্যগুলি তল্লাসীপত্রে নথাভুক্ত ও সেইগুলি বৈজ্ঞানিক পন্থায় সংরক্ষিত [packed] করে ঐ সকল দ্রব্যাদি সহ সকলে মিলে পুনরায় আমরা বারাকপুর ট্রাঙ্করোডে এসে সেখানে অপেক্ষামান—ট্যাক্সিটাতে উঠে বসলাম। এর পর কলকাতায় ফিরে এসে আমরা ঐ নিহত শিশুর হতভাগ্য পিতাকে কোনওরূপে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিলাম। তার পরে আমরা সেদিকে আর ফিরে না তাকিয়ে সোজা বিশ্রামের জন্য থানায় চলে এলাম। থানার ঘড়িটাতে ততক্ষণে ভোর পাঁচটা বাজতে চলেছে। অগত্যা তাড়াতাড়ি আসামীকে লক্‌আপে পুরে দিয়ে এবং প্রামাণ্য দ্রব্যের প্যাকেটগুলি মালখানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের জিম্মা করে দিয়ে আমি সহকারীকে সঙ্গে করে একটুক্ষণ ঘুমাবার ব্যর্থ চেষ্টা করবার জন্য থানাবাড়ীর দ্বিতলে উপরের স্ব স্ব কোয়ার্টারে উঠে এলাম।

পরদিন প্রত্যুষে সাতটার সময় চোখ রগড়াতে রগড়াতে থানায় নেমে এসে দেখলাম আগে ভাগেই ঐ নিহত শিশুর পিতা কখন থানার অফিস ঘরে এসে বসে রয়েছেন। বেশ বুঝা গেলো যে নিজের বাড়ীতে বসে এতটুকুও সময় কাটানো তাঁর পক্ষে আজ সাধ্যাতীত,—অচিন্ত্যনীয় ও অসম্ভবও বটে। আমাকে দেখা মাত্র তিনি পূর্বদিনের মতই ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আমি এইদিন বিছানায় শুয়ে শুয়েও এই হত্যা মামলা সম্বন্ধে সারাক্ষণ ভেবেছিলাম। আমি এইবার ডাক্তার প্যাটেলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে উঠলাম, 'দেখুন! এই ব্যাপারে আমি যতই ভাবছি ততই আমার মনে ধারণা হচ্ছে যে খুব সম্ভব আপনার খোকা এখনও বেঁচে আছে। এখানে ওখানে ঐ সব রক্তের বাহার দেখে আমি কিন্তু আদপেই ভড়কাই নি। আপনি এখানে এই সময় এসে গিয়ে ভালোই করেছেন। এখন আপনাকে আমি আরও কয়েকটি প্রশ্ন করবো। এই প্রশ্নগুলি অপ্রিয় হলেও এইগুলির যথাযথ উত্তর আপনাকে দিতে হবে। আপনার খোকনকে ফিরে পেতে হলে এই ব্যাপারে কোনও সত্য গোপন করলে কিন্তু চলবে না।' এর পর ডাঃ প্যাটেলকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম এবং তিনি যথাসাধ্য সেগুলির উত্তর প্রদান করেছিলেন। এই প্রশ্নোত্তরগুলি উল্লেখযোগ্য বিধায় নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—সত্য করে বলুন ডাক্তারবাবু, আগে থেকে এই আসামীর সঙ্গে আপনার স্ত্রীর আলাপ ছিল কি না? এ'ছাড়া আপনার বাড়ীতে থাকাকালীন এই আসামীর মধ্যে কখনও কোনও বিসদৃশ ব্যবহার আপনি দেখেছিলেন কি'না—তা'ও আপনাকে মনে করে করে বলতে হবে।

উঃ—কেন? কেন বলুনতো! এ কথা আপনি আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন? আপনি যা ভেবেছেন তা কিন্তু আদপেই সত্য নয়। আমার নিষ্পাপ বালিকা-বধূকে আপনি এখনও দেখেন নি। তাই আপনি এই সব সন্দেহের কথা বলতে পারছেন। তবে হাঁ, একদিন আমরা সকলেই আসামীর আচরণের মধ্যে এক অত্যদ্ভুত ও বিসদৃশ ভাব পরিলক্ষ্য করেছিলাম। একদিন আমার স্ত্রী দূর হতে লক্ষ্য করেন যে ঐ আসামী চুপে চুপে তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর তোরঙ্গটির ডালা খুলে তার ভিতর অতি-সন্তর্পণে কয়েকটি জার্মান সিলভারের কাপ ও ডিস রেখে দিচ্ছে। এর পর ঐ আসামী চুপে চুপে ঘর হতে বার হয়ে গেলে আমার স্ত্রী ঐগুলি পরীক্ষা করে দেখে যে, ওগুলোর প্রত্যেকটির গায়ে ইংরাজীতে 'মিসেস্ প্যাটেল' এই শব্দ দুইটি খোদাই করা রয়েছে। এই বিষয় আমার স্ত্রী আমাকে জানালে আমরা তাকে এই সম্বন্ধে অনুযোগ ও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম, কিন্তু সে তার এই বিসদৃশ ব্যবহারের ব্যাপারে কোনও সদুত্তর দিতে পারে নি। তবে এজন্য আমরা কেউ তাকে ভর্ৎসনা বা অপমান করি নি। উপরন্তু সে আমার স্ত্রীকে সকল সময়েই দিদি-ভাই বলে সম্বোধন করে এসেছে। তার প্রতি ওর কোনও বিসদৃশ অনুরাগ এ পর্যন্ত কেহ দেখে নি। এইরূপ কিছু ঘটলে আমার স্ত্রী নিজেই এর প্রতিকার করতো এবং আমিও তার কু-অভিপ্রায়ের বিষয় তৎক্ষণাৎ জানতে পারতাম।

প্রঃ—আচ্ছা! এখন বলুন তো আপনার স্ত্রীর পিতা কি করতেন? তাঁরা কি সাহেবী কায়দায় ঘর-সংসার

করতেন ? আপনার স্ত্রী কি কখনও কোনও ছোট শহরের স্কুলে পড়াশুনা করতেন ? এ ছাড়া আপনার স্ত্রী একবছর আগে কি একাকী বা কাউর সঙ্গে ট্রেনযোগে কোলকাতায় এসেছিলেন ? তারপর এই আসামীকে আপনার কম্পাউণ্ডাররূপে নিয়োগ করতে আপনার স্ত্রী কি কখনও আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন ?

উঃ—এসব কি বলছেন আপনি ? আমার শ্বশুরমশাই চিরকাল তাঁর পল্লী-গৃহে গোঁড়া-হিন্দুর মতন জীবন কাটিয়েছেন। এ'ছাড়া আমার স্ত্রীর পড়াশুনো পল্লীগ্রামের পাঠশালে তার শিশুকালেই শেষ হয়েছে। এর পর যেটুকু পড়াশুনা তা সে নিজেদের বাড়ীতেই করেছে। এরা কোনও ছোট বা বড়ো শহরে বাস করে নি। এদিকে আজ হতে তিন বছর পূর্বে আমার স্ত্রীকে তাদের দেশ থেকে আমিই সঙ্গে করে কলকাতায় আনি। আসামীকে আমি নিয়োগ করার পর আমার স্ত্রী তাকে সর্বপ্রথম দেখে। আসামীর পক্ষে আমার স্ত্রীর উমেদারী করার প্রশ্ন আদপেই উঠে না।

প্রঃ—আচ্ছা আর একটি প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো। এই সম্বন্ধে আপনি আপনার বাড়ীর লোক-জনদেরও একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখবেন। এই আসামীর সঙ্গে অন্য কোন কোন্ যুবক মেলামেশা করতো ? এর বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের মধ্যে কাউকে আপনি জানেন কি ?

উঃ—আমি প্রায়ই আসামীকে অবসর সময়ে অন্যমনস্ক-ভাবে বসে থাকতে দেখেছি। প্রায়শ সময়েই তাকে অত্যন্তরূপ বিমর্ষ দেখা যেত। তবে বাড়ীতে কোনও উত্তেজনার কারণ ঘটলে কিংবা নিজে সে কোনও কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠলে তাকে [এই উত্তেজনা সত্বেও] বেশ প্রফুল্ল দেখা গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে সে তার সমবয়সী পাড়ার কয়েকটি যুবকের সঙ্গে বহুক্ষণ যাবৎ বাইরে কালাপহরণ করেছে। ঐ সকল যুবকদের চরিত্র সম্বন্ধে আমি পাড়ার লোকদের নিন্দা করতে শুনেছি। তবে এ কথাও ঠিক যে—শুনা-কথা আমি আদপেই বিশ্বাস করি না। এর কারণ আমি নিজের সম্বন্ধেই যা শুনি তার শতাংশের একাংশ সত্য হলেও তা এক ভয়াবহ ব্যাপার। অথচ আমি ভালো করেই জানি যে তার মধ্যে লেশ মাত্রও সত্য নেই। এই অবস্থায় অপরের সম্বন্ধে শুনা-কথায় আমি বিশ্বাস করি কি করে ? তবে আসামীর মধ্যে কোনও বেচাল বা বেভাব আমরা কেউই কোনও দিনই লক্ষ্য করি নি।

এইবার আমাদের বিবেচ্য বিষয় হলো যে ডাঃ প্যাটেল আমাদের নিকট সত্য কথা বললেন কি না ? এই বিষয়ে ডাঃ প্যাটেলকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ আমাদের ছিল না। নিজপুত্র সম্বন্ধে শোকাতুর হয়ে উঠলেও তিনি আসামীর সম্বন্ধে একটুকুও প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠেন নি। এর পর বরং আমি এই আসামীর বিবৃতিরই অধিকাংশ অবিশ্বাস করেছিলাম। যার বিবৃতির একাংশ মিথ্যা, তার ঐ বিবৃতির অপরাংশও মিথ্যেই হয়। তবে জোর করে কোনও কিছুতে স্থির সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে না। তবুও আমার মনে হলো যে তাহলে ঐ খুনেটা বানিয়ে বানিয়ে এতগুলো মিথ্যা কথা বলতে পারলো ? ঠিক এই সময় আমার সহকারী অফিসারটিও চোখ রগড়াতে রগড়াতে থানার অফিস ঘরে নেমে এলেন।

'বড্ড মনটা খারাপ লাগছে, স্যার। ঘুমতে পারলাম না,' ক্ষুন্ন মনে সহকারী অফিসারটি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন, 'বারাকপুরের ঐ মাঠে ছোট বড়ো অনেক পুকুর আছে। ঐ সব পুকুরেও আসামী লাসটা ফেলে দিতে পারে। মাঠের নিকটে তো আবার গঙ্গাও আছে। যাই হোক ঐ পুকুরগুলোতে জাল ফেলে লাস উঠাবার চেষ্টা করতে হবে। এই সব তদন্তের প্রতিটি সম্ভাব্য বিষয়েই একবার বেয়ে-চেয়ে দেখা দরকার। একবার বারাকপুরের স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে এই সম্বন্ধে অনুরোধ জানানো দরকার। ওঃা জাল-টাল যোগাড় করে জেলেদের সাহায্যে তা ঐ পুকুরগুলোর জলে ফেলে দেখুক।'

'তা সে কথা তুমি ঠিকই বলেছো। আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম', খুশি হয়ে আমি উত্তর করলাম, 'তাহলে তুমি এই রক্তমাখা জামা ও ওখানকার মাটির চাপড়াগুলো কানুন-মত নিশানা দিয়ে প্যাক করে ওগুলো তোমার এই খুন সম্পর্কীয় রিপোর্টের সঙ্গে সরকারী রক্ত-পরীক্ষকের কাছে একজন বিশ্বাসী জমাদারের হেপাজতীতে পাঠিয়ে দাও। ঐ রক্তের পরীক্ষা ও ঐ রক্তের গ্রুপিং এখুনি হওয়া দরকার। ওগুলো পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে নিজেই না হয় বারাকপুরে রওনা হয়ে যাও। এই বিষয়ে ওখানকার স্থানীয় পুলিশকে আমাদেরও একটু সাহায্য করা উচিত হবে। আমি এদিকে ফরিয়াদীর সঙ্গে তাদের বাড়ী গিয়ে এই আসামী সম্বন্ধে আরও একটু খোঁজ-খবর করে আসি।'

[ক্রমশঃ

অহমিকা ও আত্মমর্যাদা

শ্রীহরিচন্দন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি

জনৈক বন্ধু প্রশ্ন করিলেন—অহমিকা এবং আত্মমর্যাদাজ্ঞানের সীমারেখা কোথায়? প্রশ্নটি আলোচনাসাপেক্ষ। বলিলাম—ব্যক্তি মাত্রেরই আত্মমর্যাদাজ্ঞান থাকা দরকার। সেইটিই ব্যক্তিতা (Personality) বা ব্যক্তিত্ব (Individuality)। কিন্তু আত্মমর্যাদাজ্ঞানের প্রাবল্য যখন বিলাসের স্তরে উপনীত হয়—সেই অবস্থাই অহমিকা।

আত্মমর্যাদাজ্ঞান মনের উৎকর্ষ আনয়ন করে। আত্মা ও ভগবান যদি এক হয়, তাহা হইলে সেই আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকাই আধ্যাত্ম-সাধনার একটি স্তরবিশেষ। অপরপক্ষে অহমিকা মনের অপকর্ষ-সাধনে অগ্রদূত। ইহা মদ ও মাৎসর্যের পরিপোষক। অহঙ্কারী ব্যক্তি অপরের ছিদ্রান্বেষণ করিতে গিয়া নিজেকে দুর্বল প্রতিপন্ন করেন।

কোন প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন—'অপরের প্রতি প্রেমের বিস্তার মাৎসর্যের পরম ঔষধ'। সবই মানিলাম। কিন্তু পূর্বে যাঁহার নিকট অপমানিত হইয়াছি, তিনি নিমন্ত্রণ করিলে আমার কর্তব্য কি হইবে? যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা করি, তাহা হইলে আত্মমর্যাদা হারাইবার ভয় আছে। আবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলে অহমিকা প্রকাশ পাইতে পারে। এক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হইবে কিরূপে?

অপমান করিবার পরও যিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যখনই তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিলেন সেই মুহূর্তেই গৃহকর্তার পরাজয় ঘটিল এবং আগন্তুক ব্যক্তির মহত্ত্ব প্রতিপাদিত হইল। এক্ষেত্রে আত্মমর্যাদাহানির কোন প্রশ্নই রহিল না। অপমান, অশান্তি, অহমিকা সবই মানসিক বিকার মাত্র। যে-কোন কাজের পূর্বেই মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম সবই মনে। তাই মনের অপর নাম বিবেক। নিছক দৈবদুর্বিপাক ব্যতীত মানুষ মুহূর্তেই খুন করিতে পারে না। বহুদিন ধরিয়া মনের মধ্যে কুভাব পোষণ করিলে পর একদিন মানুষ কুকার্য করিয়া বসে। সেইরূপ আমি যদি মনে মনে চিন্তা করি, যেহেতু অমুক ব্যক্তি আমাকে ইতঃপূর্বে অপমান করিয়াছে, অতএব অমুকের বাড়ীতে আহার করিলে লোকে কি বলিবে? লোকে বাস্তবক্ষেত্রে হয়ত কিছু বলিবে না; কিন্তু আমার মনই পূর্ব হইতেই আমাকে দুর্বল করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বিরত থাকিলেই সেই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইল এবং ফলে মানসিক অপকর্ষ সাধিত হইল।

পদ এবং বংশমর্যাদার আভিজাত্যও অহমিকার পরিপোষক। অফিসের বড়বাবু ভাবিতেছেন—ছোটবাবুর বাড়ীতে যাইব কিরূপে? জমিদার গরীব-প্রজার উৎসবে যোগদান করেন না সম্মানহানির আশংকায়। এরূপ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ অজুহাতের দোহাই দিয়া উপহার-সামগ্রী পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কাদা না মাখিয়াই মাছ ধরা হইল মনে করিয়া উপহার-প্রেরক আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এবম্প্রকার আত্মপ্রসাদই অহমিকার রূপান্তর।

অবশ্য অজুহাতের মাধ্যমে অব্যাহতিলাভ অনেকক্ষেত্রে প্রশংসার্হও হয়। আমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি মনে করেন যে উৎসব-প্রাংগণে তাঁহার উপস্থিতিতে কোন বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইবে, অথবা তাঁহার উপস্থিতি অপরের পক্ষে কোনপ্রকার অসুবিধার কারণ হইবে, একমাত্র সেরূপক্ষেত্রে উপহারসামগ্রী পাঠাইয়া নিরস্ত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ এরূপস্থলে মানসিক অপকর্ষতার কোন আশঙ্কাই নাই।

অর্থাৎ মন যেখানে যুক্তিদ্বারা পরিচালিত হয় সেখানে বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত থাকে বলিয়া আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রে অহমিকা ছদ্মবেশেও প্রবেশলাভ করিতে পারে না।

অহমিকা মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। অহংভাবসম্পন্ন ব্যক্তি মদগর্বী হইয়া সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই তুচ্ছজ্ঞান করেন। নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে তিনি অতিরিক্ত হুশিয়ার এবং অপরকে পদদলিত করিয়াই তাঁহার তৃপ্তি। অতএব প্রত্যেক জীবের বা বস্তুর মধ্যেই যে ভগবান প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাহা অহংকারী ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন। ফলে, প্রথমতঃ এই সব ব্যক্তিদের মনের আধ্যাত্মিক অপকর্ষ সাধিত হয়, দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং আত্মমর্যাদাকে সুরক্ষিত রাখিবার অভিপ্রায়ে নিজেকে সদা স্বতন্ত্র রাখিতে গিয়া এই শ্রেণীর ব্যক্তিনিচয় সমাজের বিভীষিকাতে পরিণত হইয়া থাকেন।

এক অত্যাচারী জমিদারের পুত্র গুরুদেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণকালে প্রশ্ন করিলেন—যে রক্ত আমার ধমনীতে প্রবহমান তাহার কুপ্রভাব হইতে অব্যাহতিলাভ করিব কিরূপে? গুরুদেব উত্তর দিলেন—আত্মসংযমের সাহায্যে।

আত্মসংযম কি? মনের সংহতিই সংযম। মনকে আত্মার অভিমুখী করিতে হইবে। তবে আত্মাকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা জন্মাইবে।

ত্যাগ বা উদারতার সাধনাই অধ্যাত্মসাধনার মূলকথা। ভগবানের রাজ্যে সর্বত্র সাম্য বিরাজমান। সেখানে উচ্চনীচ, ক্ষুদ্র-বৃহতের ভেদাভেদ নাই। ভেদনীতি মানুষের সৃষ্ট। সমাজের কূটনীতির প্রয়োজনে

ইহার আবির্ভাব। সর্বজীবে সমান দয়াই মনুষ্যত্বলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কারণ 'জীবসেবাই ঈশ্বর সেবা'—এই মন্ত্রের অনুশীলনের সাহায্যেই মানুষ সোঽহং' ভাবের অধিকারী হয়।

আত্মার যেখানে অবমাননা হয় সেখানে নিঃসন্দেহে আত্মমর্যাদারও হানি হয়। এই জন্যেই অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে—উচ্চকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিবাদ যেন প্রতিশোধের রূপ-গ্রহণ না করে সে-বিষয়ে সতর্কদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। মনুষ্যত্বের ন্যায্য অধিকার হইতে কেহ যদি আমাকে বঞ্চিত রাখিতে চাহে তাহা হইলে অবশ্যই আমার আত্মমর্যাদার হানি ঘটিল এবং সেক্ষেত্রে উহার প্রতিকারের জন্য আমাকে সচেষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে অব্রাহ্মণের বাড়ীতে পদার্পণ করিলেই আমাকে আত্মমর্যাদা হারাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

আত্মমর্যাদা কায়েম রাখিবার জন্য আত্মোপলব্ধির (Self-realisation) প্রয়োজন। সর্বাগ্রে নিজেকে অর্থাৎ নিজের মনকে সম্যকরূপে বুঝিতে হইবে। তন্নিমিত্ত ব্যক্তিকে নিজের শক্তি, সামর্থ এবং ওজন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে পালোয়ানের পুত্র ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও যদি পিতার পদাংক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া কংকালসার বাহুতে তাল ঠুকিতে থাকে এবং নগ্নদেহে ধুলা মাখিয়া মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহা হইলে হাস্যাস্পদ না হইয়া তাহার অন্য উপায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিমাত্রেরই নিজের জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া আবশ্যক। আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর জানিতে ইচ্ছা করা যে ধৃষ্টতারই নামান্তর তাহা সর্বজন-স্বীকৃত মহাজন-বাণী। বাস্তবিকপক্ষে আমি যাহা জানিবার জন্য উৎসুক তাহা আমার ব্যক্তিগত জীবন তথা পরিবেশের সহিত কতখানি সংশ্লিষ্ট বা আদৌ সম্পর্কিত কি না তাহা পূর্বাহ্ণেই বিচার করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ আত্মমর্যাদার অনুশীলনকারী ব্যক্তিকে স্বীয় লক্ষ্যনির্ণয়ে অবহিত হইতে হইবে। ইহার জন্য মন হইতে সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য দূরীভূত করিয়া একাগ্রতা এবং একনিষ্ঠতার অনুশীলনে যত্নবান হইতে হইবে। আমরা জানি—"Jack of all trades and master of none"। লক্ষ্য বহুবিধ হইলে কোন বিষয়েই প্রতিষ্ঠালাভ করা যায় না বলিয়া উহা আত্মমর্যাদার হানিকারক।

চতুর্থতঃ আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করিতে হইলে সততা ও ন্যায়ের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। সৎ ও ন্যায়পথচারী ব্যক্তির গুণে সকলেই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন বলিয়াই এবংবিধ গুণাবলী মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক।

অপরপক্ষে দয়া, সহানুভূতি, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি কোমল বৃত্তিনিচয় অহমিকার পরিপন্থী। অহমিকাকে আত্মমর্যাদার পর্যায়ে রূপান্তরিত করিতে হইলে উল্লিখিত বৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষ-সাধনে ব্রতী হইতে হইবে।

বস্তুতঃ ত্যাগ ও উদারতার শিখায় মংগল ও কল্যাণ-সাধনের দীপ প্রজ্জ্বলিত করিতে সমর্থ হইলেই অনায়াসে এবং নিজের অজ্ঞাতসারে অহমিকার বিলোপ সাধন ঘটিবে এবং প্রকৃত আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বহুপরিমাণে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষও সাধিত হইবে।

কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

কুসুমবিহারী চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম এত বৃহৎ, তার পরিধি এত বিস্তৃত, যার গভীরতা একমাত্র সমুদ্রের সঙ্গেই তুলনীয়, যা সমগ্রতায় একমাত্র হিমালয়ের মতো চিরবিস্ময়-বিমুগ্ধকর। কারো পক্ষে এক জীবনে তা পড়ে রসাস্বাদন করা সম্ভব কিনা জানিনা, সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলী শুধু আয়তনে নয়, অর্থবহতায়ও এত বিরাট যে তার গহনে প্রবেশ করিতে হইলে সাধারণ পাঠকমনের চাই সেজন্য প্রস্তুতি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বতোভাবে কবি—আবার সে সঙ্গে এমন কী আছে যা তিনি নন। নাট্যরচনায়, গীতরচনায়, প্রবন্ধ রচনায়, সমালোচনা সাহিত্য, ভ্রমণ সাহিত্য, পত্র-সাহিত্য রচনায়—সর্ববিষয়ে সাহিত্যের সকল কারুশিল্পে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এমন কী গল্প লেখক ও ঔপন্যাসিক হিসাবেও তিনি ন্যূন নহেন। সাহিত্যের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে তাঁর স্বচ্ছন্দ-পদচারণা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার মধ্যে আমরা দুটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সমন্বয় দেখিতে পাই। তা' হলো তিনি এত বড় কবি হয়েও উপন্যাস, গল্প লিখেছেন। কবিতা ও উপন্যাস রূপের দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, তা লিখতে দুটি ভিন্ন জাতের মনেরও প্রয়োজন। কবির মন অন্তর্মুখী, আর ঔপন্যাসিকের মন বহির্মুখী। উপন্যাসের উপজীব্য এমন কিছু—যা' আমাদের অন্তরের বাইরে, মনোজীবন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাব্যের উৎস কবি-মানসের একক কেন্দ্রে।

কবি বাহির-বিশ্বকে সংহত করেন আপন অন্তরে। ঔপন্যাসিক বাহির-বিশ্বে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে বহু উৎস হইতে রূপ ও রস সংগ্রহ করেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বতোমুখী হইলেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে তিনি স্বভাবতঃই কবি ছিলেন। তাঁর কাব্য, কাব্য-ধর্মী নাট্য—বিশ্বসাহিত্যের আসনে সমাসীন হইলেও তাঁর কথাসাহিত্য সে স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। এর কারণ স্বাভাবিক। তাই তাঁর কাব্য আর কথা সাহিত্যকে একই আদর্শের নিরিখে বিচার করা চলে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ-রূপে মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই। মাইকেলের অমিত্রাক্ষরছন্দ, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক সে যুগে বাংলা সাহিত্যে এনেছিল এক মহাবিপ্লব। সে যুগসন্ধিক্ষণে বাঙলা সাহিত্যাকাশে আবির্ভাব হলো আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের। তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সবেমাত্র অরুণোদয়। উপন্যাস সদ্যোজাত ছোট গল্পের তখনও জন্মলাভ হয়নি। এই সময়টাতে রবীন্দ্রনাথের লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন নূতন ছবি, নূতন নূতন রূপ, নূতন নূতন রীতি, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে লাগলেন। এভাবে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এক-জীবনে বাংলা গদ্যকে তিনি দিলেন পরিণত রূপ। বাংলা গদ্য সাহিত্যের এ রূপান্তর হঠাৎ হয়নি, ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে তার রূপ বদল হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যে আমদানী করলেন—এক সম্পূর্ণ নূতন গদ্যরীতি, যা' সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব রীতি—যা' চলতি ভাষা নামে আধুনিক বাঙলা গদ্য সাহিত্যে পরিচিত, 'ঘরে বাইরে' লিখলেন তিনি এই চলতি ভাষায়। 'ঘরে বাইরে' থেকে 'ছেলেবেলা' পর্যন্ত চালালেন এই গদ্য সাধনা।

আধুনিক বাঙলা চলতি গদ্যের প্রথম পরিমার্জিত রূপায়ণ আমরা দেখিতে পাই তাঁর 'পত্রসাহিত্যে'। আঠারো বৎসর বয়সে লেখা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে আমরা দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় সেই স্বকীয় বিশিষ্ট রূপটি।

বাংলা কথাসাহিত্যকে বঙ্কিম যেখানে এনে দাঁড় করাইয়াছিলেন, তারপর থেকে পদযাত্রা সুরু হয় রবীন্দ্রনাথের। একসময়ে চন্দননগরে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ অনেক গদ্যরচনা লেখেন। পরে সেগুলি 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিশ বৎসর বয়সে লিখিলেন 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১২৮৮—১২৮৯)। এটিই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস। সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। তখন বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস লেখার সবেমাত্র শৈশব চলিতেছে—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস লেখা হয় মাত্র পনের বৎসর পূর্ব্বে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের লেখা উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'তে বঙ্কিমের প্রভাব থাকিলেও, বঙ্কিমী ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা থেকে রবীন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে সংক্রমণ করলেন আধুনিক সামাজিক উপন্যাসের ধারায়। বঙ্কিম তাঁর বহু উপন্যাসের উপাদান নিয়েছেন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বাইরে থেকে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপাদান নিলেন আমাদের সামাজিক ও লৌকিক জীবন থেকে। বঙ্কিমের উপন্যাসে রাজা রাজড়াদের নিয়ে কারবারের প্রাধান্য—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কারবার সাধারণ মানুষ নিয়ে; যারা খেটে খায়, চাষ করে, কলম পিষে, আপিসে চাকুরী করে—সাধারণ মানুষের চিরন্তন মূর্তিকে তিনি রূপেরসে অপরূপ করে মূর্ত করেছেন তাঁর গল্প, উপন্যাসে। বঙ্কিমের উপন্যাসে ভালবাসার বাড়াবাড়ি অনেক সময়ে পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই বাড়াবাড়ির উপর তাঁর পূর্ণ সমর্থন দেখিতে পাই। সেখানে তিনি দেখাইয়াছেন প্রেমেরই মহনীয় রূপ।

'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'র মধ্যে যে ভাবধারার উন্মেষ দেখা গিয়াছিল, তা' পরিণত রূপ পেল 'চোখের বালিতে'। 'চোখের বালি'—বাঙলা সাহিত্যে তাঁর আর এক স্মরণীয় অবদান। এই বইয়ের চরিত্রগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক মনস্তত্ত্বের সমাবেশের মধ্যে রবীন্দ্র-নাথ প্রচার করিয়াছেন প্রেমেরই শাশ্বত মহিমা. বাংলা ভাষায় এটিই মনস্তত্ত্ব ঘটিত সর্বপ্রথম উপন্যাস।

রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের প্রধান কথা হলো গতি। তিনি চিরদিনই অগ্রগতির ও উন্নতির উপাসক। গতির মহত্ব ও সৌন্দর্য ঘোষিত তাঁর কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারায়ও দেখা যায় এই গতিরই মহত্ত্ব—একটা বিবর্তন ধারা। প্রথম পর্যায়ের লেখা 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'র ঐতিহাসিক ধারা থেকে লেখক সঞ্চরণ করলেন দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাস 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবিতে'—গভীর মনস্তত্ত্বমূলক আধুনিক সামাজিক উপন্যাসের ধারায়। তৃতীয় পর্যায়ে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সমাজ ও নীতির আদর্শকে রূপ দিলেন তাঁর উপন্যাসে। লেখা হলো 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', আর 'যোগাযোগ'। দেশের বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার সাহিত্যিক রূপায়ণ হল 'গোরায়'। 'আনন্দমঠের' প্রতি-পাদ্য জাতীয়তার সঙ্গে 'গোরা" সংযোজন করলো গণতন্ত্র, মানবীয় সমানাধিকার। জাতীয় চিন্তাধারায় 'গোরা' আনলো—গণতন্ত্র ও মানবীয় সমানাধিকারের নতুন আলোক।

চতুর্থ পর্যায়ে আর একবার পথ বদল করে তিনি লিখলেন—'শেষের কবিতা', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ' ও 'চার অধ্যায়'। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের আধারে অনুপম কাব্য-সৃষ্টি। 'শেষের কবিতার' কৃত্রিম জগৎ কবি-ঔপন্যাসিকের মানসলোকের অশরীরী প্রেমের জগৎ। 'যোগাযোগের' ট্রাজিক ঘটনাবলীর দুঃখ থেকে মনকে মুক্তি দেবার প্রয়াস 'শেষের কবিতায়'। উত্তরজীবনে রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যকে শুধু গল্পের বাহন করেননি, চেয়েছিলেন উপন্যাসকে কাব্যের সধর্মী করে তুলতে।

জমিদারির কাজে এসে পল্লীগ্রামের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অনেক অভিজ্ঞতা হলো রবীন্দ্রনাথের। সাধারণ মানুষ, গ্রামের মানুষকে দেখবার সুযোগ পেলেন তিনি। তাদেরই কথা লিখেছেন 'গল্পগুচ্ছে', তাদেরই ছবি আঁকলেন 'চৈতালি'র কবিতায়। এ সময়ে 'হিতবাদী'

ফটো : বিমল সরকার

'মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে'—

ফটো :
রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডা

'বাদল ধারা হ'ল সারা'—

নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বের হয়। রবীন্দ্রনাথ হলেন তার সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক। এই নূতন পত্রিকার প্রেরণায় কবির লেখনীতে এলো বান। বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম ছোট গল্পের সূত্রপাত হল। ঐতিহাসিকভাবে না হোক, সাহিত্যিকভাবে বাংলাদেশে আধুনিক ছোটগল্পের জন্মদাতা রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অধিকাংশ পূর্বজীবনের রচনা, যখন উপন্যাসে তিনি ছিলেন বঙ্কিমী টেকনিকের অধীন। কিন্তু ছোটগল্পের বেলায় তিনি বেছে নিলেন সম্পূর্ণ ভিন্নপথ। সেখানে তিনি 'বঙ্কিমে'র পথে না চলে আঁকলেন লৌকিক জীবনের ছবি—দুঃখে পীড়িত, অভাবক্লিষ্ট বাংলার পল্লীবাসীদের কথা। একমাত্র 'মহামায়া' গল্প ছাড়া বোধহয় আর কোথাও তাঁর বঙ্কিমের অনুগামিতা দেখা যায় না, কবিতার পরেই রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি ছোটগল্প ও নাট্য কবিতায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের সমৃদ্ধতম যুগ 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা'র যুগেরই আর এক বিস্ময়কর প্রকাশ এই ছোটগল্প। কাব্যের অনাবিল ভাবসৌন্দর্যের মধ্যে কবির ভাব-সাধনায় জীবনের সুস্পষ্টতর জাগিল। এ জীবনমুখিতার পথ বাহিয়া আসিল ছোটগল্পের ধারা। কী বিষয়বস্তুর স্বকীয়তায়, কী রচনা-শৈলীর নৈপুণ্যে ও শিল্পসৌকর্যের স্বচ্ছন্দতায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে বিশ্বসাহিত্যেরও বিস্ময়কর অবদান বলিলে অত্যুক্তি হয়না।

রবীন্দ্রকাব্যের জীবন-দেবতা

অমিতাভ চক্রবর্তী রায়চৌধুরী

রবীন্দ্র-কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে তাহার জীবন-দেবতা শ্রেণীর কবিতা। রবীন্দ্র-কাব্যের এই জীবন-দেবতাকে জানিতে হইলে রবীন্দ্র সত্তাকে জানিতে হইবে। কবি এই রূপ-রস-গন্ধে ভরা প্রকৃতির বাইরে এক ইন্দ্রিয়াতীত অতীন্দ্রিয় সত্তার পরিচয় জানিবার জন্য ব্যাকুল। এই সত্তা সৌন্দর্য্যাতীত, জ্ঞানাতীত, ভাষাতীত, ভাবাতীত এক অকল্পনীয় পুরুষ। অথচ ইহাই হইতেছে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল জ্ঞান, সকল ভাষা, সকল ভাব ও কল্পনার মূল।

কবি মানুষ; পঞ্চেন্দ্রিয় কর্তৃক তাঁহার সত্তা নির্মিত। ইন্দ্রিয়াতীত কোন বস্তুকে লাভ করিতে সে অসমর্থ। তাই ইন্দ্রিয়াতীত সেই বস্তুকে লাভ করিবার জন্যই তিনি তাঁহার কতিপয় কাব্যের মধ্যে জীবন-দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। এই জীবন-দেবতা তাঁহার নিজস্ব সত্তার সহিত বিশ্বকে একীভূত করিয়া দিয়াছে। ইহাই তাঁহার সকল কবিতা ও ভাবের উৎস। জীবন-দেবতার স্বরূপ কবি প্রবাসীর ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'মানব সত্য' নামক প্রবন্ধে সংক্ষেপে অথচ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। "আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক্ আছে। এক যাকে বলে আমি আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে আছে যা কিছু, যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধন-জন-মান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু পরমপুরুষ আছেন সেই সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে—নাটকের স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারিনে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখে-দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখিনে। কোনো এক সময়ে সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে জীবন-দেবতা শ্রেণীর কাব্যে।

'ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?'

আমি যে পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমিন্, সেই পরিমাণে আপন করেছি তাঁকে, ঐক্য হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলেম, তুমি কি খুসি হ'চ্ছ আমার মধ্যে তোমার জীবনের প্রকাশ দেখে। বিশ্ব দেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে গ্রহ-চন্দ্র-তারায়। জীবন

দেবতা বিশেষ ভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে যাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ।"

এই জীবন দেবতাকে এক একজন এক এক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সক্রেটিস ইঁহাকে বলিয়াছেন Daemon, প্লেটো বলিয়াছেন, আইডিয়া, খ্রীশ্চানদের কোয়েকার সম্প্রদায় বলিয়াছেন, অন্তরের আলোক; দার্শনিক ফেক্‌নার ইঁহাকে বলিয়াছেন, ব্যক্তি চৈতন্যাতীত মহাচৈতন্য, যাহা জীবনের পরিচালনীশক্তি। ইঁহাকেই H. G. Wells "The living reality in our lives, The Driver of machineman" এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই অবস্থাকে 'Serene and Blessed Mood" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

জীবন-দেবতা হইতেছে 'ব্যক্তিচৈতন্যের অধিপতি।' অনাদি অনন্তকালের মধ্যে ব্যক্তিচৈতন্য একটি বুদ্‌বুদ্‌। এই ব্যক্তিচৈতন্য বা ব্যক্তিকে পরিচালনা করে তার অধিপতি বা জীবন দেবতা। তিনি পূর্ণ জীবনের অখণ্ড আনন্দানুভূতির মধ্যে বিরাজমান।' কবি করেন সৃষ্টি। তাঁর এই সৃজন-শক্তি প্রেরণা লাভ করে একটা শক্তি হইতে! এই শক্তির বলেই সে অনুভব করে সকলের সহিত স্বকীয় আত্মার ঐক্য। এই শক্তিই হইতেছে কবির অন্তর্যামী বা জীবন-দেবতা।

কবির জীবন দেবতা সম্পর্কে Thomsonএর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। "The poet's inspiration comes to him from Divinity itself. God wreaths into him the Wreath of life and entire world of beauty at once unrolls itself before his imaginative version. The life of every day experience is his, not however the visionary hours of poetic ecstasy."—Francis Thomson.

আবার এই জীবন-দেবতাকেই কবি কৃত্তিবাস ওঝা সরস্বতী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—

"সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥

কবি রচিত জীবন-দেবতা শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে চিত্রা কাব্যের অন্তর্যামী, জীবন দেবতা, সাধনা সিন্ধুপারে, আত্মোৎসর্গ, শেষ উপহার ও সোনার তরী কাব্যের সোনার তরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা, মানসসুন্দরী প্রভৃতি প্রধান। এই সকল কবিতার মধ্যে কবি তাঁহার জীবন-দেবতাকে কখনও রমণীরূপে এবং কখনও পুরুষরূপে কল্পনা করিয়াছেন। জীবন দেবতা একটা শক্তি। এই শক্তির কোন লিঙ্গ নাই। তবুও রমণীরূপে ইঁহাকে কল্পনা করিবার সার্থকতা আছে। হিন্দুরা সকল শক্তির উৎসরূপে আদ্যাশক্তিকে কল্পনা করিয়াছে। এই আদ্যাশক্তি বা কালিকাশক্তি হইতে সকল শক্তি জন্মলাভ করিয়াছে। এই আদ্যাশক্তি স্ত্রীরূপা। কিন্তু জগতের সকল অসুয়া ও অনিষ্টকে বধ করিবার জন্য এই স্ত্রীশক্তি পুরুষ শক্তির নিকট হইতে আরও শক্তিলাভ করিয়াছিল। সুতরাং পুরুষশক্তিকেও অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। মানুষের সকল কাজ-কর্মের প্রেরণাদাতা হিসাবে কবির এই জীবন-দেবতা বা অন্তর্নিহিত শক্তির পরিকল্পনা আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রসূত। কবির এই জীবন দেবতা শ্রেণীর কবিতাগুলিতে ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার মূল কথা ধ্বনিত হইয়াছে। বহু হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতীয় ঋষিরা ব্যক্তি সত্তার উপরে যে একটি পৃথক সত্তার কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাই কবির এই শ্রেণীর কাব্যগুলিতে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।
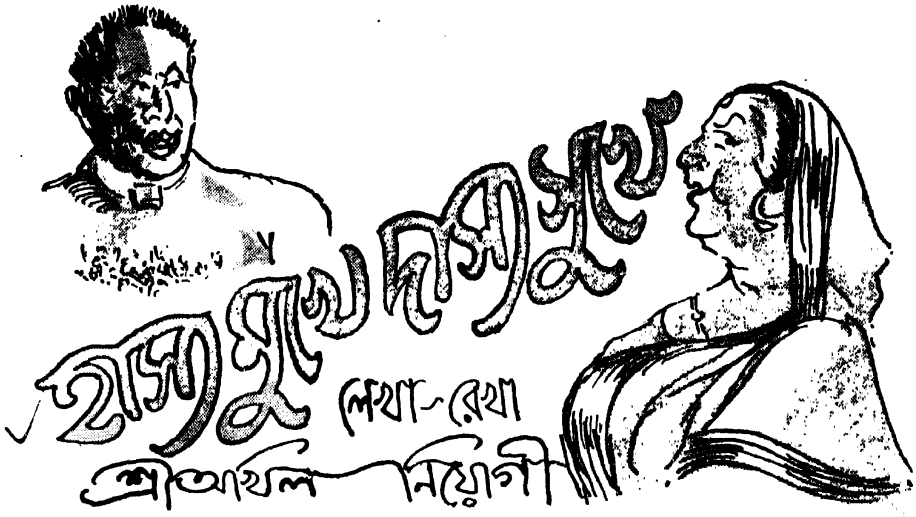
সি, আই, টি, বিল্ডিংস্-এর গৃহিণীরা সব খোপের পায়রা। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বাস, কিন্তু কারো সঙ্গে কারো বিশেষ হৃদ্যতা নেই!

কিন্তু মানুষের জীবনে অকস্মাৎ এমন এক একটি বেদনা পুঞ্জীভূত হয়, যে সমবেদনার ছায়াতলে সবাই গলা জড়াজড়ি করে কাঁদতে বসে! একের সঙ্গে অপরের চোখের জল মিশে যায়। ব্যথা যেখানে সবাইকার সমান, সমবেদনা সেখানে স্বতঃ-উৎসারিত।

ইদানিং একটি তীব্র বেদনা গৃহিণীকুলকে কাছাকাছি টেনে এনেছে।

কারো ফ্ল্যাটে ঝি-চাকর টিঁকছে না। দাস-দাসীহীন সংসার পাল-ছেঁড়া হাল-ভাঙা নৌকোর মতো।

এটা আমাদের কথা নয়। গৃহিণীদেরই সুচিন্তিত মন্তব্য।

আজ বাড়ীর কর্ত্তারা যখন অফিস-আদালতে কলেজ-কাছারিতে বেরিয়ে গেছে—তখন বিভিন্ন ফ্ল্যাটের গৃহিণী-দের গোপন বৈঠক বসেছে।

সত্যিই ত' বাড়ীতে ঝি চাকর না থাক্‌লে সবই এক সঙ্গে অচল। উত্তাল সমুদ্রে জাহাজ চল্‌তে চল্‌তে যদি সাগরের তলাকার গোপন চড়ায় আটকে যায় তা হলে ক্যাপ্টেনের যে অবস্থা, আজ সি, আই, টি, বিল্ডিংস-এর গৃহিণীদেরও সেই আশঙ্কাজনক অবস্থিতি!

চৌধুরী গৃহিণী ইতিমধ্যেই এ অঞ্চলে গতরের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সুতরাং সভানেত্রীর পদে তাঁকেই বরণ করা হল।

তিনি সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করতে একটি শান্তি-নিকেতনী মোড়ায় উপবেশন করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রী সেই সৌখান মোড়াটির অকাল পঞ্চত্ব প্রাপ্তি সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি একটি শীতলপাটি বিছিয়ে দিলেন। সভানেত্রী তাতেই দেহ এলিয়ে দিয়ে করুণ-কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত দিয়ে আমাদের গৃহিণী-সংসদের শুভ-উদ্বোধন হবে। সভ্যাদের মধ্যে কেউ এমন একটি বিষাদ-সঙ্গীত গাইবেন, যার ভেতর দিয়ে গৃহিণীকুলের দুঃখ বেদনা মূর্ত্ত হয়ে ওঠে!

এ বিষয়ে দরজা দত্তের দাবী সবাইকে দাবিয়ে দিল। কারণ দরজা সম্প্রতি সঙ্গীত-নাটক-আকাদামী থেকে শিক্ষা লাভ করে প্রত্যেকটি রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের প্যাণ্ডেলে গান গেয়ে লোক জড় করে ফেল্‌ছে।

কিন্তু আজকের এই অধিবেশন রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের উদ্দেশ্যে আহূত হয়নি। গৃহিণীকুলের দুঃখ-বেদনার আশু মীমাংসার জন্যেই এই গোপন সংসদের গোড়াপত্তন। সুতরাং সভার পরিচালনার ব্যাপারে প্রত্যেকটি কার্য্যে মৌলিকতা থাকা একান্তভাবে আবশ্যক।

নব-রচিত গান দিয়েই সভার কার্য্য সুরু হবে—সভা-নেত্রীর এই সুচিন্তিত অভিমত।

দরজা দত্ত

দরজা দত্ত হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে মুখ ব্যাদান করে গাইতে সুরু করে দিলেন—গানটি। তার আগে ভনিতা করে বল্লেন, আজই আমি এই বিশেষ সঙ্গীতটি রচনা করেছি—!

মনোহারী মোদক তবলায় সঙ্গত করতে লাগলেন। এক মুহূর্ত্তে ঘরের পরিবেশ বদলে গেল, সবাই কান পেতে গানটি শুন্‌তে লাগ্‌লো—

গান

যদি কলের মুখেতে জল নাহি থাকে, ফ্ল্যাটে নাহি থাকে ঝি

গৃহিণীরা সব গতর খাটালে পরাণ বাঁচিবে কি ?

কি করে পরিবে নাইলন সাড়ী ?

সিনেমা দেখিবে ছুটি তাড়াতাড়ি

সেজে গুঁজে সবে বৌ-ভাতে যেতে সময় মিলিবে কি ?

গিন্নির খেটে হাড় কালি হল, কর্ত্তা দেখে না ছিঃ !

গৃহিণীরা সব জেগেছে এবার,—আপনি বিছাবে জাল—

রান্না ঘরের হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে হল কি সবার হাল।

এবার সবাই ছড়ায়ে চরণ

পড়িবে নভেল নতুন ধরণ

পান-দোক্তার আমেজ বিহনে জীবন-ধারণ কি ?

যেথা হতে হোক জোটাবো চাকর, আনিব খাটিয়ে ঝি।

নহে পরাণ বাঁচিবে কি ?

ঘর শুদ্ধ সবাই গান শুনে খুশী।

করতালি ধ্বনিতে গায়িকাকে সকলে অভিনন্দন জানালো।

সভানেত্রী বল্লেন, ছন্দে আর সুরে গায়িকা আমাদের মনের কথা খুলে বলেছেন। এই গানটি উদ্বোধন-সঙ্গীত হিসেবে একেবারে অনবদ্য।

খ্যাংরা কাঠির মতো দেখতে শাল্মলী তরফদার দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন, মাননীয়া সভানেত্রী, এইবার আমাদের কাজের কথা সুরু হোক। যে কোনো ফ্ল্যাটে ঝি-চাকরের প্রয়োজন হলে এই গৃহিণী-সংসদে আবেদন করতে হবে। গৃহিণী-সংসদ ইণ্টারভিউ নিয়ে যথাযোগ্য ঝি-চাকর নির্ব্বাচন করবে, তারপর আবেদনকারীকে ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দেবে।

ফটকা খাশনবীশ একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তিনি নিজের মাথার ওপর হাতখানি তুলে উদাত্ত কণ্ঠে বল্লেন, কিন্তু তার আগে এই গৃহিণী-সংসদ ঝি চাকরের মাইনের একটি চার্ট তৈরী করবে। কোন ফ্ল্যাটে কত লোক বাস করে তারই ওপর নির্ভর করে এই মাইনের তালিকা তৈরী করতে হবে। গৃহিণী-সংসদ ঝি-চাকরের যে মাইনে ধার্য্য করে দেবে প্রত্যেক ফ্ল্যাটকে তাই অবনতমস্তকে মেনে নিতে হবে। কয়েকটি সভ্যা সোল্লাসধ্বনি তুললেন, সাধু সাধু—সভানেত্রী সংশোধন করে দিলেন, মাননীয়া সভ্যাগণ, আপনারা ব্যাকরণ ভুল করবেন না। আনন্দধ্বনি জানাতে হলে সমস্বরে চীৎকার করবেন—সাধ্বী সাধ্বী—

সভ্যারা সভানেত্রীকে সমর্থন করলেন। এই সময়ে পটলী বটব্যাল দাঁড়িয়ে উঠে টিপ্পনী কাটলেন—ইতি-পূর্ব্বে দেখা গেছে এক ফ্ল্যাটের গিন্নি অপর ফ্ল্যাটের ঝি-চাকরকে ফুসলে নিয়ে যায়। ভবিষ্যতে এই জাতীয় ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্যে গৃহিণী-সংসদ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

কাসুন্দী নন্দী তার ক্যান্‌কেনে গলায় তীব্র প্রতিবাদ করে বল্লেন, এই ফুসলানো কথাটায় আমি আপত্তি উত্থাপন করছি—

পটলী বটব্যালও ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। তিনি আবার উঠে বল্লেন, এ সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। গত বছর আমি একটি ছোক্‌রা চাকর পেয়েছিলাম। ছেলেটি খুবই কাজের। কিন্তু এই কাসুন্দী নন্দী তাকে চার বেলা খাওয়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে আমার ফ্ল্যাট থেকে ফুসলে নিয়ে গেলেন। অবশ্য ও ফ্ল্যাটেও ছোক্‌রাটি বেশী দিন মন দিয়ে কাজ করেনি। দেশে যাবার নাম করে পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমার বল্‌বার কথা হচ্ছে এই যে, এই দুর্নীতি প্রথমেই দমন করতে হবে।

সারা ঘরে কানাকানি আর ফিস্‌ফিসানি সুরু হয়ে গেল। ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক ফ্ল্যাট থেকেই কেউ-না-কেউ ঝি-চাকরকে মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। সেদিক দিয়ে বিচার করে দেখ্‌তে গেলে পটলী বটব্যালের অভিযোগ মিথ্যা নয়। কিন্তু ঠগ বাছতে গেলে গাঁ একেবারে উজাড় হয়ে যাবে। তাই এই চাঞ্চল্যকে দূর করবার জন্যে স্বয়ং সভানেত্রী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি একটি খুন্তি কুড়িয়ে নিয়ে বল্লেন, সভ্যাগণ, আপনারা শান্ত হোন। অতীতে কি ঘটনা ঘটেছে সে কথা আলোচনা করে আপনারা সভার শান্তি ভঙ্গ করবেন না। ভবিষ্যতে যাতে ভুল বোঝাবোঝির অবকাশ না ঘটে, সে বিষয়ে আমরা সবাই সচেষ্ট থাকবো।

সভানেত্রীর কথায় সবাই শান্ত হল। মালাই মোদক কি কথা বলবার জন্যে যেন সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি এইবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাঙা কাঁসার থালার মতো শব্দ করে বল্লেন, মাননীয়া সভানেত্রী মহোদয়া, আমার একটা প্রস্তাব আছে। আপনারা যদি সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনেন, তবে আমি আমার বক্তব্য সভায় পেশ করতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ধ্বনি উঠ্‌ল—বলুন—বলুন—।

মালাই মোদক এই বিল্ডিং অঞ্চলে সর্ব্বজনপরিচিতা। তিনি 'শ্যামা' নৃত্য-নাট্যে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়ে

মালাই মোদক

যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তাই ইদানিং তিনি কথা বল্‌বার সময় নৃত্যের ভঙ্গীতে সব কিছু ব্যক্ত করে থাকেন। তাই মালাই মোদকের বক্তব্যের মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্প-কলার চমক্ দেখা যাবে এইটেই সকলে আশা করে।

মালাই মোদক নৃত্যের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে সুরু করলেন, সভ্যাগণ, আপনারা অবহিত হোন—আমি লক্ষ্য করেছি,—কোনো কোনো ঝি-চাকর বেড়াল ডিঙ্‌তে পারেনা এমন পাহাড় প্রমাণ ভাত গাণ্ডে পিণ্ডে গিল্‌তে থাকে। এই দৃশ্য অশ্লীল—একেবারে সূক্ষ্ম শিল্প-কলা বিরোধী। আমি গৃহিণী-সংসদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। এই সম্পর্কে আলোচনা করে ঝি-চাকরের খাদ্য বরাদ্দ করে দেবার জন্যে একটি সাব কমিটি গঠন করা বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করতে সবিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

গৃহিণীগণ এই সংবাদ শ্রবণে বিশেষ পুলকিত হয়েছেন বলে মনে হল। সভানেত্রীও একটু নড়ে চড়ে বসে মন্তব্য করলেন, মালাই মোদকের এই প্রস্তাব অতি যুক্তিযুক্ত। কেননা, আমি নিজে হিসেব করে দেখেছি যে, সমগ্র পরিবার একবেলায় যে ভাত খায়, এক একটি ঝি-চাকর একাই অবলীলা ক্রমে সেই পরিমাণ তণ্ডুল নিঃশেষ করে ফেলে! গৃহিণীরা যদি এ বিষয়ে এখন থেকেই সচেতন না হন, তবে তাদের লক্ষীর ভাণ্ডার শূন্য হতে বেশী দেরী লাগ্‌বেনা।

আন্নাকালী আঁশ হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন, এ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে।

সভ্যাগণ অবাক হয়ে আন্নাকালীর মুখের দিকে তাকালো।

আন্নাকালী আঁশ কিন্তু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বজ্র নির্ঘোষে তিনি ব্যক্ত করলেন, সভ্যাগণ, আপনারা শ্রবণ করুন। কোনো কোনো ঝি-চাকরের যদি বেশী খোরাক হয়, কিন্তু তার কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কাজ পাওয়া যায় তবে আপত্তি করবার কি কারণ থাকতে পারে? আমার কথাই ধরুন না কেন? আমরা স্বামী-স্ত্রী চাকরী করি। ছেলে মেয়েদের ঘরে আগ্‌লে রাখে ঝি। তার খোরাক যদি একটু বেশী হয়—তাতে আমাদের আপত্তি করবার কি থাক্‌তে পারে? বরং বেশী খাইয়ে তাকে যদি আমার ঘরে আট্‌কে রাখ্‌তে পারি—সেইটেই আমাদের সংসারের পক্ষে সুবিধে। স্বামী-স্ত্রী মিলে আমরা যা রোজগার করি তাতে আমরা অমন চারটে চাকর পুষতে পারি।

আন্নাকালীর কথায় আবার সভাগৃহে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি উত্থিত হল। সবাইকার সংসারত' এক রকম নয়। কাজেই উপস্থিত গৃহিণীরা এই দম্ভোক্তিতে বিশেষ খুশী হয়েছেন বলে মনে হল না!

সজনে বাগ্‌চী ফোঁস করে উঠ্‌লেন। বল্লেন, আমার সংসারে এ সব আদিখ্যেতা আদৌ চলবে না। আমি একটি ছেলেকে খুব ছোট বয়েস থেকে মানুষ করেছি। সে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ পর্য্যন্ত সব কিছু এক হাতে করে। অথচ তার খোরাক এমন কিছু বেশী নয়, ঠিক আমাদেরই মতো।

গঞ্জনা গাঙ্গুলী এতক্ষণ চুপ করে সব শুন্‌ছিলেন। এইবার মুখ বাঁকিয়ে মন্তব্য করলেন, পয়সা দিয়ে ঝি চাকর

গঞ্জনা গাঙ্গুলী

রাখ্‌বো খাটিয়ে নেবার জন্যে। আমি ভাই পষ্ট কথার মানুষ। আমার আবার একটু ছুঁচি-বাই আছে। এক ঘড়ার যায়গায় যদি সাত ঘড়া জল দরকার হয় তা' তুলে দিতে হবে বৈ কি! কর্ত্তা বলেন, জল ঢেলে ঢেলেই নাকি আমার পায়ে হাঁজা হয়েছে। তা হোক না হাঁজা…হেগো কাপড়ে তাই বলে পুজো আর্চ্চা করতে হবে নাকি?

সভার পরিবেশ যেন একটু থম্‌থমে হয়ে এলো। মনে হল ঈশান কোণে ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু সভানেত্রী শক্ত হাতে হাল ধরেছেন। তিনি কিছুতেই নৌকোকে বামচাল হতে দেবেন না। তাই গুরু গম্ভীর গলায় তিনি সকলের কাছে আবেদন জানালেন, ভগ্নিগণ, নিজেদের মধ্যে মন কষাকষি করে লাভ নেই। আমরা যদি আজ সঙ্ঘবদ্ধ হতে না পারি,—তা হলে আমাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ভৃত্যতন্ত্রেরই জয় ঘোষিত হবে। অতীতে কি ঘটেছে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝা-বোঝির অবসান হোক্‌। এখন থেকে গৃহিণী-সংসদ সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করুক। তা হলেই আমরা প্রাণে বাঁচবো। আপনাদের কার-কার ঝি-চাকরের প্রয়োজন আছে এই গৃহিণী-সংসদের কাছে আবেদন করুন। আমরাই লোক

নির্ব্বাচন করে সব কিছু ব্যবস্থা করে দেবো। কর্ম্মপ্রার্থী ঝি-চাকরদের ফটো সহ আবেদন করতে হবে। দুই কপি ফটো চাওয়া হবে। একটি থাকবে বাড়ীর গৃহিণীর হাতে, আর একটি জমা দেয়া হবে স্থানীয় থানায়। কোনো ঝি চাকর যদি চুরি করে পালায় তবে এই ফটোর সাহায্যে অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। এ ব্যাপারে গৃহিণী-সংসদ বিশেষ সচেতন থাকবে।

উপস্থিত সভ্যাগণ সভানেত্রীর কথা মেনে নিলেন।

সেদিনের মতো সভা সেইখানেই ভঙ্গ হল।

এই ঘটনার দিন চারেক পরের কথা।

ইতিমধ্যে দুটি ফ্ল্যাট থেকে সভানেত্রীর কাছে আবেদন-পত্র এসেছে। একটি ফ্ল্যাটের চাই ঝি, অপর ফ্ল্যাটের চাই কর্ম্মী-চাকর। যথারীতি গৃহিণী-সংসদ থেকে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আবেদনও এসেছে অনেক।

আজ দুপুরে ইণ্টারভিউ গ্রহণ করা হবে। সেই জন্যে সভানেত্রী দুপুর বেলা বিশেষ বৈঠক আহ্বান করেছেন। ইতি মধ্যেই তিনি সব ফ্ল্যাটে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঝি-চাকর নিয়োগ ব্যাপারে গৃহিণী-সংসদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। এ সম্পর্কে বাড়ীর কর্ত্তাদের কোনো হাত থাকবে না। গৃহকর্ত্তারা নতমস্তকে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। কেননা তাঁরা প্রত্যহ বাজার করা ও অফিসের ফাইল নিয়ে এত বিব্রত যে এ দিকে দৃষ্টি দেবার সময় তাঁদের আদৌ নেই।

সভানেত্রার আহ্বানে প্রথমে এলো এক বিরাট ব্যাটাছেলে। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। যাকে বলে একেবারে দশাসই চেহারা। মাথায় খোঁচা খোঁচা কদম-ছাট চুল। তাকে দেখেই সভ্যাগণ একেবারেই মূর্চ্ছা যায় আর কি! কেউ কেউ সভানেত্রীর কাছে পানীয় জলের জন্যে আবেদন জানালেন।

সভানেত্রী চৌধুরী গৃহিণী সবাইকে শান্ত হতে বলে সান্ত্বনা বাণী দিলেন, আমি এক্ষুণি ওর ইণ্টারভিউ সুরু করবো। আপনারা সবাই স্থির হয়ে বসুন—সভানেত্রীর নির্দ্দেশে সভা-গৃহ শান্ত হল।

চৌধুরী-গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন, ওরে, তোর নাম কি?

—আজ্ঞে উচ্চিংড়ে—

—এই বিরাট চেহারা আর ওই তোর নাম?

—কি করবো গিন্নিমা, ঠাকুমার সখের দেয়া নাম ত' আর ফেলে দিতে পারি না।

একজন সভ্যা আপত্তি জানিয়ে বল্লেন, গিন্নিমা কি? সভানেত্রী বল্‌তে পারো না?

উচ্চিংড়ে উত্তর দিলে, আজ্ঞে অত শক্ত নাম বল্‌তে পারবো না, দাঁত ভেঙে যাবে!

সভানেত্রা শুধোলেন, এখানে তোর কে আছে? কে তোকে চাকরী করতে পাঠিয়েছে—

উচ্চিংড়ে বিনয়ের অবতার হয়ে দুই হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে জবাব দিলে, আজ্ঞে আমাদের একটি সমিতি আছে সেইখান থেকে আমায় পাঠিয়ে দিলে কাজ করতে।

উচ্চিংড়ের মুখে এই কথা শুনে সভানেত্রীর চোখদুটি বড় বড় হয়ে উঠ্‌ল। চৌধুরী-গৃহিণী সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, সমিতি? তোদের আবার কি সমিতি শুনি?

উচ্চিংড়ে উত্তর দিলে, আজ্ঞে অনুচর সমিতি। আমরা সবাই তার সভ্য। আমার যে কথাগুলি জান্‌বার আছে একে একে জিজ্ঞেস করছি। আপনি গিন্নিমা তার জবাব দিন। সেই জবাব শুনে তবে আমি ঠিক করবো—এখানে কাজ নেবো কি নেবো না—!

চাকরের মুখে এই চাঁচা-ছোলা কথা শুনে সভাস্থ সভ্যা-বৃন্দ চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লেন। দু' একজনের মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হল।

তখন আন্ পাখা—আন্ জল—চারিদিক থেকে চীৎকার উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

স্বয়ং সভানেত্রীর সারা গা বেয়ে কুল্‌কুল্ করে ঘাম বইতে সুরু হল! কোথায় তিনি বড় মুখ করে ইণ্টারভিউ নিতে এসেছেন,—আর এই চাকরটাই কিনা তাঁকে জেরা করবে?

হায়—হায়—মান-সম্মান তা হলে আর রইল না! এরই মধ্যে রাতারাতি ওরা 'অনুচর সমিতি' গড়ে বসে আছে? 'গৃহিণী-সংসদ' কি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে?

চৌধুরী-গিন্নির গতরও নেহাৎ কম নয়। তাই মনের দৌর্ব্বল্য তিনি বাইরে বিন্দুমাত্র প্রকাশ করলেন না। শুধু

গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস্ করলেন, আচ্ছা, কি তোর জিজ্ঞেস্ করবার আছে—তাড়াতাড়ি বল। আমার আবার অনেক কাজ আছে—

উচ্চিংড়ে একেবারে বিনয়ের অবতার।

বল্লে, আজ্ঞে আপনাদের কাজ থাকবে বৈ কি! সেই সেই কাজের সুরাহা করবার জন্যেই ত আমাদের আসা। হাসি মুখে গায়ে-গতরে খেটে যাবো, মুখে কথাটি কইব না। তবে আমাদের দাবী গুলি মেনে নিতে হবে গিন্নিমা!

—দাবী?

গোটা সভার সভ্যাবৃন্দ যেন একেবারে ঝিমিয়ে পড়ল! উচ্চিংড়ে বিগলিত হয়ে উত্তর দিলে, আজ্ঞে গোটাকয়েক দাবী অমাদের আছে বৈ কি! এই যেমন ধরুন,—যে বাড়ীতে চাকরী তার লোক কত সেটা আগেই জেনে নিতে হবে। ব্যাটা ছেলে কত, মেয়ে ছেলে কত, ইস্কুলে পড়া ছেলে-মেয়েরা কত—সব জেনে নিতে হবে।

—তারপর?

—রান্না করতে হবে কি বাসন মাজ্‌তে হবে? যদি দুটোই এক সঙ্গে করতে হয় তবে ডবল রেট!

—হুঁ!

তারপর জান্‌তে হবে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পৌঁছে দিতে হবে কিনা? তা হলে শতকরা ৫ টাকা মাইনে বেড়ে যাবে।

সভানেত্রীর মুখ ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগ্‌লো। তবু তিনি বুকের রাগ মুখে প্রকাশ করলেন না শুধু জিজ্ঞেস করলেন, আর তোদের কি কি বায়না আছে শুনি?

উচ্চিংড়ে দন্ত বিকশিত করে উত্তর দিলে, আজ্ঞে বায়না নয়। দিন-রাতি গায়ে-গতরে খাটবো। কথা-বার্ত্তা পাকাপাকি হওয়াই ভালো।

—তাতো ভালই!

সভয়ে উত্তর দিলেন সভানেত্রী।

আচ্ছা, আর কি কি জানবার আছে বল্!

উচ্চিংড়ে বিনয়ে নত হয়ে কইলে, আজ্ঞে গিন্নিমা, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?

—নির্ভয়েই বলো।

যদি বাজার করতে দেন ত' ভালই। নইলে বাড়ীর কর্ত্তা যদি বাজার করাটা নিজের হাতে রাখেন তা হলে শত করা ত্রিশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে।

সভাস্থ সভ্যারা শিউরে উঠ্‌লেন।

সভানেত্রী তাঁদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, আপনারা কেউ শঙ্কিত হবেন না। মীমাংসা একটা হয়েই। কিন্তু সভানেত্রীর মুখের কথায় সভ্যাবৃন্দ বিশেষ আশ্বস্ত হতে পারলেন না!

তখন সভানেত্রী মুখ গোমড়া করে আবার উচ্চিংড়ের মুখের দিকে তাকালেন।

—আচ্ছা, আর কি কি তোর জান্‌বার আছে?

—আজ্ঞে রাত্তিরের কাজ-কর্ম্ম সেরে ছাদে শুতে যাবার অনুমতি দিতে হবে। পরদিন সকাল সাতটার আগে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙানো চল্‌বে না।

—হুঁ! বুঝলাম।

উচ্চিংড়ে নির্ব্বিকার চিত্তে বলে যেতে লাগ্‌লো।

—যদি সবাইকার জুতোয় কালী দিতে হয়, তা হলে আমাদেরও একদিন করে জুতোর কালী দিয়ে নেবার অধিকার থাক্‌বে। এ ছাড়া হপ্তায় একদিন করে সিনেমা দেখার পয়সা দিতে হবে, আর হপ্তায় দু'দিন করে দাড়ি কামাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

—আর কি কি চাই শুনি?

—আজ্ঞে বছরে ছয়খানা নতুন ধুতি আর দুইখানা করে গামছা—এতো দিতেই হবে। ত্রৈলঙ্গস্বামী হয়ে ত আর ভদ্র বাড়ীতে কাজ করা চলে না! সভা গৃহে হঠাৎ খুক্—খুক্ হাসি শোনা গেল!

সভানেত্রী এতক্ষণ মাদুরে বসেছিলেন। এইবার একেবারে দেহ এলিয়ে দিলেন। তবু ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস্ করলেন, বাবা উচ্চিংড়ে, তোমার দাবীর ফর্দ্দ কি এখনো শেষ হয় নি?

মাথা নত করে উচ্চিংড়ে সবিনয়ে উত্তর দিলে, আর সামান্যই বাকি আছে গিন্নিমা। বছরে একমাস করে ছুটি দিতে হবে। সারা দুপুর তাস খেলার জন্যে কোনো ফ্ল্যাটে আটকা থাক্‌বো না। আর এই ধরুন—পান বিড়ির জন্যে মাসে মাসে কিছু ধরে দিতে হবে—। তা ছাড়া হাসি মুখেই সব কাজ করে যাবো—

উচ্চিংড়ের বিবৃতি যখন শেষ হল—তখন দেখা গেল স্বয়ং সভানেত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন! মাদুরের ওপর চুলের রাশি এলিয়ে পড়েছে। চোখ দুটি কপালের ওপর গিয়ে উঠেছে।

এই কাণ্ড দেখে সভ্যারা আর্ত্তনাদ করে উঠলেন।

উচ্চিংড়ে দুই হাত এক সঙ্গে করে বিনীত কণ্ঠে কইলে, আপনারা বিন্দুমাত্র চিন্তিত হবেন না। আমাদের অনুচর সমিতির ঘরোয়া ডাক্তার আছে। আমি এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আসছি। গিন্নিমার জ্ঞান ফিরতে এতটুকু দেরী হবে না!

প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীপ্রমোদনাথ সেন

দুটি অভিন্ন-হৃদয় সাহিত্যিক বন্ধু প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উভয়েই আজ পরপারে।

১৯১৬ সালে (৪৫ বৎসর পূর্ব্বে) প্রিয়নাথ সেন পরলোকগমন করেন। ১৯৪১ সালে, প্রিয়নাথ সেনের মৃত্যুর ২৫ বৎসর পরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেহরক্ষা করেন।

মনস্বী লেখক ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"৮নং মথুর সেনের গার্ডেন লেনে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি তীর্থ ছিল। এককালে রবীন্দ্রনাথ সে তীর্থের নিত্যযাত্রী ছিলেন। স্বনামধন্য মথুরচন্দ্র সেন মহাশয়ের বংশে একজন সাহিত্য-সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি প্রিয়নাথ সেন।

প্রিয়বাবু অসামান্য মনীষার অধিকারী ছিলেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পার্শী, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় ও সাহিত্যে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি রসজ্ঞ, ভাবুক ও সাহিত্যরসিক সমালোচক ছিলেন। সাহিত্যের সকল বিভাগে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তিনি যে স্বল্প রচনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার "কবি, ভাবুক, সন্দর্ভকার ও সমালোচক এই রূপ চতুষ্টয় দেদীপ্যমান হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা ও ইংরাজী রচনায় তিনি সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রচনারীতি বিশুদ্ধ পুষ্পিত ও প্রাঞ্জল ছিল। সে রীতি নব্য লেখকগণের আদর্শ হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য উপকৃত হইতে পারে।

৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন, ৺অক্ষয়কুমারবড়াল, ৺প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৺প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ৺দীনেশচন্দ্র সেন, ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৺যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতি প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিকগণও সে তীর্থের যাত্রী ছিলেন! প্রিয়নাথ সেনের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় রবীন্দ্রনাথের যৌবনের প্রারম্ভেই এবং বিশ্বসাহিত্যের রস-ভাণ্ডারে প্রবেশ পথে সে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব অচিরেই সৌহার্দ্যে পরিণত হইয়াছিল। বন্ধুত্বের সূচনায় "প্রিয়বাবু" সম্ভাষণে প্রিয়নাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের মাত্র কয়েকখানি পত্র আজও রক্ষা পাইয়াছে। ১৮৮৩

রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে "গোড়ায় গলদ" পড়িয়া শুনাইতেছেন

সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিবাহে প্রিয়নাথ সেনকে যে রসমধুর হৃদয়গ্রাহী নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়াছিলেন উহা এবং আরো ২১১ খানি পত্র উদ্ধৃত হইল :—

"প্রিয়বাবু,

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার "পরম আত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং জোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকেও আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন"। ইতি

ইতি অনুগত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"প্রিয়বাবু,

আমার নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠা হয়েছে ; আজ নানা কারণে আপনার দর্শন প্রার্থনীয়—নিরাশ করিবেন না।

প্রিয়বাবু

আজ বিকালে আপনি একবার এদিকে আসবেন ? নগেনবাবু আজ এখানে আসবেন। আজ আপনার যদি কোন বাধা না থাকে তবে আমাদের এখেনে সন্ধেবেলায় আহারের নিমন্ত্রণ রহিল। শুভ উত্তরের অপেক্ষায় রইলুম।"

ক্রমশঃ "ভাই প্রিয়বাবু"—"ভাই" এবং "আপনির" বদলে "তুমি" সম্ভাষণে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য পত্রের অনেকগুলি সংরক্ষিত হইয়াছে। দুই বন্ধুর মধ্যে এই পরম রমণীয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও মধুর সহোদয়-প্রীতি প্রিয়নাথের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

অন্তরঙ্গ অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের। শুধু বন্ধুই বা বলি কেন ? তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক অধ্যবসায়কে নিত্যই অভিনন্দিত করিবার জন্য ছিলেন তাঁর নিত্যপথের সাথী, উপদেষ্টা "সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক" শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সমালোচক ও দার্শনিক কবিবর প্রিয়নাথ সেন।

প্রিয়নাথ শুধু রবীন্দ্রনাথেরই অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন না। ঠাকুর পরিবারের প্রায় সকলেরই সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং আন্তরিক হৃদ্যতা জন্মে। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেরই তিনি বন্ধু ও শুভার্থী ছিলেন এবং সকলেই প্রিয়নাথের সাহিত্য সাহচর্য্য লাভ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতে পারিয়াছিলেন। সাহিত্য-বান্ধবতায় প্রিয়নাথের অসাধারণ সরলতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। এই প্রসঙ্গে প্রিয়নাথকে লিখিত ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কতিপয় পত্রের মধ্যে দুইখানি উদ্ধৃত হইল :

ওঁ

প্রিয়বন্ধু,

আমার "স্বপ্নপ্রয়াণ" খানি সমালোচনার অভাবে বেঘোরে পড়ে অকুলপাথারে হাবুডুবু খাইতেছে। এ বিপদে তোমা ভিন্ন তাহার গতি নাই। আমাকে যদি একবার অত্রভবনে চিরাভিলষিত দর্শনদান কর তবে পরম সুখী হইব।"

সাহিত্যরসের রসিক তোমার সৌহার্দ্দ্যে বাঁধা
প্রিয়সুহৃদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অভিন্নহৃদয়েষু alias old বড়দাদা

ওঁ

প্রিয়বন্ধু

তুমি স্বপ্নপ্রয়াণের সমালোচনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহা আমার পরম সৌভাগ্য এবং আনন্দের বিষয়। বঙ্গের সাহিত্য-মধুপেরা drone-এর জাতি—তাহারা রসও বোঝেনা, আর ভাল জিনিষের মর্য্যাদাও বোঝে না। তোমার এবং আমার সাধের স্বপ্নপ্রয়াণটি তাই এই দীর্ঘকাল ধরিয়া বাজে দপ্তরের (waste basket) আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে মরণাপন্নভাবে পড়িয়া রহিয়াছে—কেহ তাহাকে পোছে না। কোন কবি গর্ভবাস কালে বিধাতা পুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল—

"ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর—তানি সহে চতুরানন
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥"

ইহার একটি অনুবাদ

শত তাপ বিতর সহিব তাহা হে চতুরানন।
লিখোনা লিখোনা শিরে অরসিকে রস নিবেদন।

ব্রহ্মার আশ্বাস বাণী

হইবে তোমার বন্ধু সুরসিক প্রিয়।
কবিত্ব রসের ডালি তারে সঁপি দিও॥

প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ সেন
অভিন্ন হৃদয়েষু সতৃষ্ণ চাং দ্বিঃ

রবীন্দ্রনাথের জীবনী বা জীবনের অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং—তাঁর জীবন স্মৃতিতে, নানা পুস্তকে ও পত্রাদিতে। তাঁর মৃত্যুর পর অনেক প্রতিভাবান লেখক, সাহিত্যিক, সমালোচক ও কবি (দেশী ও বিদেশী) বিশ্বকবির প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছেন, লিখিতেছেন এবং লিখিতে থাকিবেন এবং তাঁর মৃত্যু তাঁকে দেশবিদেশে 'ছড়াইয়া' অমর করিয়াছে।

আজ ৪৪ বৎসরের মধ্যে প্রিয়নাথ সেনের জীবন, প্রতিভা এবং তাঁর রচনাবলীর পরিচয় দেশবাসীরা বিশেষ পায় নাই এবং তাঁর স্মৃতি হয়ত বিস্মৃতির সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। এখনকার তরুণ লেখকরা হয়ত তাঁকে জানেনও না। প্রিয়নাথের জীবনের কথা এবং তিনি যে কত বড় বিদ্বান—কত বড় সাহিত্যিক, কতবড় লেখক, বোদ্ধা ও সমালোচক ছিলেন তাহা তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু রবীন্দ্রনাথই তাঁর অমর লেখনীতে লিখিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথের একপত্রে প্রিয়নাথকে লিখিতেছেন :—

* * * "জানিনে আমাকে তুমি কি রকম মনে কর—কিন্তু আমি তোমার কথা বেশ বুঝতে পারি—তোমাকে অত্যন্ত প্রতিবেশী বলে বোধ হয়—দুজনের এক ভাষা। আমার মনে হয় আমি ছাড়া তোমার অনেক কথা আর কেউ ঠিক অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারে না। তর্ক সকলের সঙ্গেই করা যায়, কিন্তু সকলের সঙ্গে কল্পনা করা যায় না। তাই সংসারের মধ্যে সকলে কল্পনার উপরে অবিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়—কল্পনাকে কেবল নিতান্ত আমারই খেয়াল বলে মনে হয়—তারপর তোমার সঙ্গে যখন কল্পনার মিল হয় তখন তাকে আবার সত্য বলে বিশ্বাস হয়—তার পক্ষে একটা প্রমাণ পাওয়া যায়।"

"তোমার সেই রাস্তার ধারের ঘরের Positionটি কিছু Poetical নয়, কিন্তু অনেক সময়ে সেই ঘরে গিয়ে আমার মনে হয়েছে আমি যেন বাগানে গিয়েছি। তোমার ওখেনে সমুদ্র-পারের মাঠ থেকে বন-ফুল দোলান বাতাস বয়—আমার মনে হয় যেন তোমার-ও ঘরের সঙ্গে কলকাতার Municipalityর কোন সংস্রব নেই। আমি যেন কলকাতা থেকে তোমার ওখেনে যাই, তোমার ওখেন থেকে কোলকাতায় ফিরি। তোমার ওখেনে খানিকক্ষণ থাকলে আমার একরকম বিষাদ জন্মায়। আমার মনে হয়, আমি একটা কিছু করতে পারি—কিন্তু করতে পারচিনে। আমি যা কিছু লিখেছি, যা কিছু গেয়েছি, সেগুলো আগাগোড়া অসম্পূর্ণ। বসন্তের বাতাস লেগে আমার সহসা যেন চৈতন্য হয় যে, আমার গান বন্ধ হয়ে গেছে।" "তোমার কাছে গেলে আমার মনে হয় এখেনে জারিজুরি খাটবে না, তুমি জহর চেন—আমার নিজেকে নিজের অনুপযুক্ত বলে বোধহয়। এ চিঠিতে যা লিখলুম তা' তোমার একটু বেশী বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে—কিন্তু তা' ঠিক নয়। তোমার কাছে আমি চুপ করে থাকি—চিঠিতে আমি খুলে লিখলুম—এ চিঠি লেখার উদ্দেশ্যই তাই।"

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশবিদেশে এক মহা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অমর কবি রবীন্দ্রনাথকে নিকটে, অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবার জন্য, তাঁর সম্বর্দ্ধনার জন্য, তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বর্ষকালব্যাপী ঘরে বাহিরে তাঁর পূজার বিপুল আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু সেই মহোৎসবে রবীন্দ্রনাথের একাধারে বন্ধু দার্শনিক ও পথের সাথী (friend philosopher and guide) প্রিয়নাথ সেনকে ভুলিয়া থাকিলে বা বাদ দিলে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব প্রাণহীন অঙ্গহীন হইবে। যুবক রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের সঙ্গ সর্ব্বত্র, যখন যেখানেই থাকিতেন, নিত্য অধীরভাবে কামনা করিতেন এবং প্রিয়নাথের সঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে যে কি মহাপ্রেরণা দিত—কিভাবে প্রোৎসাহিত করিত তাহা প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত কবিগুরুর অসংখ্য লিপির প্রত্যেকটিতে সুপরিস্ফুট। প্রিয়নাথের সহিত রবীন্দ্রনাথের এক পরম সুমধুর আত্মিক যোগ ছিল। নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধনায় প্রিয়নাথ লেখা ও লেখক সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্র সাহিত্য শাখায় যে প্রদীপ জ্বালিয়া ছিলেন তাহার দীপ্ত সুষমায় রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লিখিতেছেন :—

"সাহিত্যে কবিতায় ও আগেপ্যে আমি চিত্র বিচিত্রিত হয়ে উঠেছি—তাতে তোমারই প্রণয় চেষ্টা প্রস্ফুটিত হয়েছে আমি সে সম্বন্ধে নীরব।"

"দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার ও সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে" প্রিয়নাথ সেনের অবাধগতি এবং বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে সেই মনীষার প্রতিভা ও অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয়, তাঁর রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথের পত্রাদি এবং অন্যান্য মনীষীদের প্রিয়নাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হইতে পাওয়া যায়। তাঁর পাণ্ডিত্যের ও জ্ঞানের অনুপাতে প্রিয়নাথ সেন খুব বেশী লিখিতেন না এবং এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা প্রায়ই অনুযোগ করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে তাড়না—"পরের অনুরোধে লক্ষ্মীর দলিলপত্র ফসাফস লেখ, আর সরস্বতীর মৌরসী দলিল কেন না লিখিবে? পত্রপ্রাপ্তি মাত্র "show cause why"? "তুমি বড্ড ফাঁকি দিচ্চ। ফোড়া হলে পা চলেনা কিন্তু কলম চলবার বাধা হয় না। আমি নিজে লেখা-ব্যবসায়ী, অতএব আমার কাছে বাজে ওজর কোরো না—এই মুহূর্ত্তেই বসে যাও"। যশোলিপ্সায় প্রিয়নাথের মজ্জাগত ঔদাসীন্য ছিল—তিনি নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। দেশবিদেশের গৌরব রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান সহায়, পথপ্রদর্শক ও কর্ণধার প্রিয়নাথ সেনের বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় আসন। রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে কবিগুরু ও প্রিয়নাথের একত্রে চিত্রটির (রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে "গোড়ায়গলদ" পড়িয়া শুনাইবার সময় এই যুগল কবির যে ফটো তোলা হইয়াছিল) একটি প্রস্তর বা ধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তি কলিকাতার কোন সুপ্রসিদ্ধ সুপ্রকাশিত স্থানে স্থাপন করা অতীব বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ রচনাই প্রিয়নাথকে না শুনাইয়া প্রকাশ করিতেন না। "চিত্রাঙ্গদা", "গোড়ায় গলদ" প্রভৃতির পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া প্রিয়নাথকে শুনাইবার ২।১ খানি নিমন্ত্রণ পত্র আজিও পাওয়া যায়। গোড়ায় গলদ পাঠকালে এই যুগল কবির একত্রে একখানি চিত্র তোলা হয়, চিত্রখানি "গোড়ায়গলদ" পুস্তকের প্রথমেই বিরাজিত। প্রিয়নাথকে "গোড়ায় গলদ" উৎসর্গকরা হয়।

প্রবীণ সাহিত্য সেবক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রিয়নাথ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—It was in deference to his unfavourable opinion that Rabindra Nath Tagore withdrew one of his early works from Circulation and it has never been reprinted" সম্ভবতঃ বইখানি "ভগ্ন-হৃদয়"। কারণ রবীন্দ্রনাথ জীবন স্মৃতিতে লিখিয়াছেন—"ভগ্নহৃদয়" পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে একপত্রে লিখিতেছেন "চৈত্রের কুমার সভা (চিরকুমার সভা) সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ সেটা ঠিক। তোমার পরামর্শ মতে ভবিষ্যতে ওটা পরিবর্ত্তন করে দেবার চেষ্টা করব। বৈশাখের কুমার সভার উপসংহারটা পড়ে কিরকম লাগে জানবার খুব কৌতূহল আছে। যথেষ্ট আশঙ্কাও আছে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"এই সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার দ্বারা আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম, যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্য রচনার বিকাশ চেষ্টায় প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্ব্বে "ভগ্নহৃদয়" পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসঙ্গীতে তাঁর মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্ব্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন। তাহার ভাললাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নয়। একদিকে বিশ্ব সাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভ কালেই যে কত উপকার করিয়াছে বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার ফলে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত বলা শক্ত"।

প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথের নিকট যে কি অমূল্য সম্পদ ছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের পত্রাদিসমূহে উচ্ছসিত আবেগে ব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে কবিতায় এক পত্র লেখেন। সে কবিতাটি পরে "কড়িও কোমল" কাব্যে 'পত্র' নাম দিয়া প্রকাশিত হয়। বন্ধুত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সেই অভিনব সুমধুর পত্র কবিতাটির এবং আরো কয়েকখানি পত্রাদির অংশ উদ্ধৃত হইল :—

১। পত্র

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন
স্থলচর সমীপেষু

ভাই,

জলে বাসা বেঁধে ছিলেম, ডাঙ্গায় বড় কিচি মিচি।
সবাইগলা জাহির করে, চেঁচায় কেবল মিছি মিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়—
ভদ্র লোকের গায়ে পড়ে, কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।
এখানে যে বাস করা দায় ভনভনানির বাজারে,
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে উঠি যখন হাঁপিয়ে,
কোথায় পালাই, কোথায় পালাই জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।
গঙ্গাপ্রাপ্তির আশা করে, গঙ্গা যাত্রা করে ছিলেম।
তোমাদের না বলে কয়ে আস্তে আস্তে সরেছিলেম।
* * * * *
* * * * *
টীকা করেন ব্যাখ্যা করেন জেঁকে উঠে ব্যক্তিমে,
কে দেখে তাঁর হাত পা নাড়া চক্ষু দুটোর বক্তিমে।
চন্দ্র সূর্য্য জ্বলছে মিছে আকাশ খানার চালাতে—
তিনি বলেন "আমিই আছি জ্বলতে এবং জ্বালাতে"।
* * * * *
* * * * *
আগা গোড়াই মিথ্যে কথা মিথ্যেবাদীর কোলাহল
জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল।
বাক্য বন্যা ফেনিয়ে আসে ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে,
কোন ক্রমে রক্ষে পেলেম মা গঙ্গারি ক্রোড়ে।
* * * *
* * * *
এই শান্তি সলিলেতে দিয়েছিলেম ডুব
হট্টগোলটা ভুলে ছিলেম সুখে ছিলেম খুব।
জানত ভাই আমি হচ্ছি জলচরের জাত,
আপন মনে সাঁৎরে বেড়াই ভাসি যে দিনরাত।
রোদ পোহাতে ডাঙ্গায় উঠি হাওয়াটি খাই চোখ বুজে,
ভয়ে ভয়ে কাছে এগোই তেমন তেমন লোক বুঝে।
গতিক মন্দ দেখলে আবার ডুবি অগাধ জলে
এমনি করে দিনটা কাটাই লুকোচুরির ছলে।
তুমি কেন ছিপ ফেলেছ শুকনো ডাঙ্গায় ব'সে?
বু'কের কাছে বিদ্ধ করে টান মেরেছ ক'সে।
আমি তোমায় জলে টানি তুমি ডাঙ্গায় টান',
অটল হয়ে বসে আছ হার তো নাহি মানো
* * * *
* * * *
আর কেন ভাই ঘরে চলো ছিপ গুটিয়ে নাও,
রবীন্দ্রনাথ পড়ল ধরা ঢাক পিটিয়ে দাও।

"অচলাটল নির্ব্বাধরেষু" সম্ভাষণে প্রিয়নাথকে রবীন্দ্রনাথ এক পত্র লেখেন এবং তাঁহার আর এক পত্রে (২রা বৈশাখ-সাল নাই) "অটল হয়ে বসে আছ হার তো নাহি মানো" এই চরণটির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন :—

১। "কলিকাতা ৬ই এপ্রিল (১৮৯৩) * * * এই হতভাগা জনশূন্য দেশে মনটা যেন নিশি দিন উপবাসী হ'য়ে আছে—কেবল ভিতর থেকে আপনাকে আপনি আহার করচে। কেবা জীবনধারণ করে, কেবা ভাবে, কেবা কথা কয়—কেই বা উৎসাহ দেয়—কেই বা তোমার কথা শোনে, কেই বা তোমার ভাব বোঝে—কেইবা অন্তরের মধ্যে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। কেউ বা আমোদ করচে, কেউ বা আলস্য করচে, কেউ বা অপিসে যাচ্ছে, মানুষের মন বলে যে একটি প্রাণী আছে সেটা যে শুকিয়ে আধমরা হয়ে যাচ্ছে তার জন্য কারো কানাকড়ির মাথা ব্যথ

নেই। আমি আজ সকালে প্রিয়বাবুর ওখেনে গিয়েছিলুল; অনেকটা যেন তাহার পান করে আসা গেল"।

২। "কলিকাতা ২রা আগষ্ট (১৮৯৪) প্রিয়বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয় যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানব ইতিহাসের একটা মস্ত জিনিষ বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই; তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেক খানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি। তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়—তখন আমি কল্পনায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব্ব ছবি দেখতে পাই—দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোক দুঃখের মধ্যস্থলে একটা অনন্ত নির্জন নিস্তব্ধ জায়গা আছে সেখানে আমি নিমগ্ন ভাবে বসে সমস্ত বিস্মৃত হ'য়ে আপনার সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত আছি, সুখে আছি।

প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে "কবি ও মধুকর", "রবীন্দ্রনাথ" এবং "বসন্ত অন্তে" তিনটি কবিতা লিখিয়া ছিলেন এবং "বসন্ত অন্তে" কবিতাটির প্রথম পংক্তিটি লইয়া রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের উদ্দেশ্যে "প্রত্যুপহার" নাম দিয়া এক কবিতা লেখেন। কবিতা চারিটি এখানে উদ্ধৃত হইল।

কবি ও মধুকর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোদর প্রতিমেষু,

ভিখারী বৈরাগী সম খঞ্জনী বাজায়ে,
স্বভাব-দরিদ্র মক্ষি বন-লক্ষ্মী-দ্বারে,
উষার উদয় হ'তে সন্ধ্যার বিদায়ে
ফুলে ফুলে ভিক্ষা মাগি যে মধু আহরে
প্রসন্ন হ'লেও তাহে দেবতার মন,—
দেব অর্ঘ্য সে কি তবু তেমন মধুর,
সৌন্দর্য্যের মহাপীঠ বাণীর আসন
কবি হৃদি শতদল যাহে ভরপুর!
মধুর সমস্ত বিশ্ব কবির হৃদয়
জাত মধুর মিশ্রণে; প্রতিভা কবির
নিত্য যাত্রী সেই পথে, আনন্দ কবির
চির জ্যোৎস্নান্বিত যেথা সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীর
সে সৌন্দর্য্যে প্রেমাকুল উদার বচনে
মধুময় কর কবি মানব জীবনে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

রবীন্দ্রনাথ

তোমায় সঙ্গীত-রবে স্পন্দিত হৃদয়—
ললিত রাগিণী কভু বীণার কাঁদন,
কভু বা মুরজ-মন্দ্র—গম্ভীর বেদন
নর-হৃদয়ের! হেথা বসন্ত-সরস
বাণী—বন অরণ্যের শ্যামল হরষ;
নিদাঘ-রুদ্রের সেথা রাঙিম নয়ন;
বরষা-উৎসবে পুন সঘন শ্রাবণ—
ছন্দে ছন্দে বরষের বিচিত্র পরশ।

কালের অসীম নিশি আজি আলোকিত,
—চন্দ্রে—সূর্য্যে নয়—তারা উঠে—অস্ত যায়—
প্রতিভার চিরোজ্জ্বল অমর-প্রভায়
সমুজ্জ্বল চারি যুগ নয়নে উদিত!
'কল্পনা'—'কাহিনী'—'কথা'—'কণিকা' হীরার
চারিদিকে চারি রবি চতুষ্ক শোভার।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

বসন্ত অন্তে

কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রিয়বরেষু

অচির বসন্ত হায়, এল—গেল চলে—
নিবে গেল কোকিলের দীপক-পঞ্চম,
ভঙ্গুর কুসুম-শোভা ভেঙ্গে পড়ে ঢলে,
প্রভঞ্জনে পরিণত—উৎপাতে বিষম—
অলস—পরশ-মধু মলয়ার বায়!
যায় যদি যাক্ চলে ক্ষণিকের স্নেহ।
অনুরাগ ফুলবীথি কোথা তাহা হায়।
এ যে শুধু ছলনার মরীচিকা গেহ।
যে মদিরা পান তরে প্রাণ তৃষাতুর
কোথা তাহা?—কোথা অলস যৌবন-তব
শোভনা প্রতিভা কবি? বিশাল চিকুর
আবরে প্রকাশে যার তনুর বিভব—
নগ্ন দেহ—কম্প্র বক্ষ—মদির নয়ন—
ঢালুক অশেষ নেশা—পুলক-দহন।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

"প্রত্যুপহার"

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের করকমলে উপহৃত

অচির বসন্ত হায় এল, গেল' চলে',—
এবার কিছু কি কবি করেছ সঞ্চয়?
ভরেছ কি কল্পনার কনক-অঞ্চলে
চঞ্চল-পবন-ক্লিষ্ট শ্যাম কিশলয়,
ক্লান্ত করবীর গুচ্ছ? তপ্ত রৌদ্র হ'তে
নিয়েছ কি গলাইয়া যৌবনের সুরা

ঢেলেছ কি উচ্ছ্বলিত তব ছন্দঃস্রোতে,
রেখেছ কি করি তারে অনন্ত মধুরা !
এ বসন্তে প্রিয়া তব পুর্ণিমা-নিশীথে
নব মল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে,
তোমার আকাঙ্ক্ষা-দীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে,
সেকি রাখ নাই গেঁথে অক্ষয় সঙ্গীতে ?
সে কি গেছে পুষ্পচ্যুত সৌরভের দেশে ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বসন্ত অন্তে" ও "প্রত্যুপহার" দুইটি কবিতাই "প্রদীপ" পত্রে (১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) পাশাপাশি মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ মুদ্রিত কবিতাটির কতক কতক বদল করিয়া সংশোধিত কবিতাটি এক পত্র লিখিয়া পাঠান। রবীন্দ্রনাথের পথের পত্র খানি ও পরিশোধিত কবিতাটি মুদ্রিত হইল।

"ভাই—

তাইত ! অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমার কোন অভিমান কোনকালে নেই, কিন্তু চোদ্দটা লাইনের মধ্যে যেটুকু গণিত শাস্ত্র আছে, তাতেও যে আমার স্খলন হবে এ আমি কল্পনা করিনি। সনেটটিতে অজ্ঞাতসারে একটি লাইন ফাঁকি দিয়েছিলেন। সেটুকু অঙ্ক এইমাত্র পরিশোধন করতে বসে আগাগোড়া কতক কতক বদলে গেল। আর কিছু না, একটা লাইন লিখে শেষকালে লেখবার নেশা জেগে উঠল—খুন চড়ে যাওয়ার মত একেবারে কলম হাতে ভীষণ বেগে ran amuck। যদি ভাল লাগেত এই পাঠান্তর রেখো, নইলে নূতন লাইন টুকু যোগ করে পুরাণ পাঠ চালিয়ে দিতে পার। যথাভিরুচি। ক্ষণিকার জন্য তাড়া লাগিয়ে হয়রাণ হলুম—নেপথ্য বিধানেই বসন্তের রাত্রি কেটে গেল—আমার নটী, যখন রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করবেন, তখন বাদলের দৌরাত্ম্যে তার বাসন্তী রঙের অতি ফুরফুরে উত্তরীটির বাহার থাকে কিনা থাকে। দক্ষিণে বাতাসের মধ্যে একে না বের করতে পারলে অন্যায় হবে। ইতি ২৯শে বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

প্রত্যুপহার

অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে
এবার কিছু কি কবি করিলে সঞ্চয় ?
পরালে কি কল্পনারে কোমল কৌশলে
বাসন্তী সোনার বর্ণ নবীন বলয়,
রচিয়া নিপুণ ছন্দে চম্পকের দলে.
লুঠিয়া ফাল্গুন রাতে নিকুঞ্জ নিলয় ?
আঁকিলে অলক্ত রাগ পাদ পদ্মতলে
তুলি লয়ে কিংশুকের রক্ত কিশলয় ?
এবসন্তে প্রিয়তর পুর্ণিমা নিশীথে

*　*　*　*
*　*　*　*

*　*　*　*
*　*　*　*

সে কি গেছে চ্যুতপুষ্প—সৌরভের দেশে ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুখে দুঃখে প্রিয়নাথের সান্নিধ্য ও সহায়তা লাভের জন্য রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত আবেগে লিখিতেছেন :—

১। "ভাই ঘরে আছ ? কখন, কোথায় কি উপায় সাক্ষাৎ হবে। মঙ্গলবার।"

২। "ভ্রাতঃ,

দোকানে গময়িষ্যামি থ্যাকারস্ত স্পিঙ্কস্য
কথনং যাইতে হৈবে টাইম অবধারয়।

৩। "ভাই,

তোমার স্বপ্নলোক এবং কর্ম্মচক্র থেকে শীঘ্র নেমে এস। কালত রবিবার আছে, কাল কখন আসবে লিখে পাঠিয়ো। তুমি যদি না নড়তে পার মহম্মদকে লড়তে হবে—কিন্তু মহম্মদও নড়েছেন ওদিকে পর্ব্বতও সরেচেন এমন ঘটনা ইচ্ছা করিনে। তুমি আসবে কি আমি যাব ঠিক করে বল এবং কখন" ?

৪। "ভাই,

জ্বরে পড়ে আছি। অবকাশ হলে এসো"

৫। "ভাই,

সেই ঔষধটায় উপকার হয়েছে। বটব্যালের কাছ থেকে আর একটা বড় শিশিতে সেই ঔষধ তৈয়ারি করে আমাকে পাঠিয়ো"।

৬। "ভাই,

***তারপর ২৬।২৭ শে নাগাদ কলকাতা অঞ্চলে দুই এক দিনের জন্য পদার্পণ করবার সঙ্কল্প আছে, তুমি সেই সময়ে সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে থেকো—আমি তোমাকে অকস্মাৎ অপহরণ করে রেলগাড়িতে চাপিয়ে এই পদ্মাতীরে এনে ফেলব, কোন প্রকার বিলাপ পরিতাপ ওজর আপত্তিতে কর্ণপাত করব না। তোমার যদি আর কোন সহায় তুমি নিয়ে এস, সেই সান্ত্বনা এবং আশ্রয়টুকু থেকে তোমাকে আমি বঞ্চিত করতে চাইনি।

শিলাইদহ। কুমারখালি।

৭। অচলাটল নির্ব্বাষরেষু,

কোন সময় চুপ করিয়া থাকিতে হয় সে বিদ্যাটা তুমি বেশ জান। আমি এখানে একাগ্রমনে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছি—তোমার মস্ত খবরটা একবার কেবল ঠোকর মারিয়া গেল—হে অতলস্পর্শ সম্বাদ অম্বুনিধি এই তীরবাসীকে আর বিড়ম্বিত করিয়োনা।

গাজিপুর ২ বৈশাখ

৮। ভাই,

নববর্ষের কোলাকুলি গ্রহণ কোরো। বর্ষারম্ভে বিদেশের বন্ধুকে স্মরণ কোরো। যদি কোন সুযোগে এদিকে আসতে পার তাহলে দিন-

কতক সম্মিলনরস সম্ভোগ করা যায়। কিন্তু তোমাকে মথুর সেনের কূপ্রপথ থেকে নড়ান কোন শক্তির দ্বারা সাধিত হতে পারে তাত জানিনে। সুদূরস্থ সখ্য শক্তির দ্বারা ত নয়ই—নিতান্ত বাহুবলের দ্বারা হতে পারে। সংসারে বোধ করি যৌগিক অথবা চুম্বকাকর্ষণের অপেক্ষামাধ্যাকর্ষণ বা কৌশিকাকর্ষণের বল বেশী। কিন্তু তুমি শেষোক্ত দুই আকর্ষণের বাহিরে চমৎকার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ। অতএব ডাকযোগে কেবল ডাক দিয়ে অপেক্ষা করে রইলুম—দেখি কোন ফল হয় কিনা।

৯। ভাই,

আপাততঃ পুলি পিনাং হইতে যদি রক্ষা পাইয়া থাক, তবে কবে এখেনে আসতে পারবে একটা নিশ্চিত খবর দিয়ো। ইতিপূর্ব্বে তোমার প্রত্যাশায় তিনবার অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার পরে কথামালায় The wolf গল্পের বিভ্রাট ঘটিলে নিজের কর্ম্মফল ছাড়া আর কাহাকেও দোষ দিতে পারিবে না।

১০। ভাই,

আমি এই পুণ্যতোয়া পদ্মার দিকে মুখ করে ডাকযোগে তোমার গা ছুঁয়ে সপথ করে বলতে পারি যে তুমি যদি এস—আমি খুলনায় যাইনে। কিন্তু এই হপ্তার মধ্যে তুমি যদি না এস তাহলে আমি না যাইত আমার নাম নেই—অতএব তোমার ভৃত্যটিকে হাঁক দাও, পোর্টম্যান্টো বোঝাই কর অশ্রুমুখী গৃহিনীর কাছে বিদায় লও এবং কোন প্রকার কৌশলে ট্রেন মিস করবার চেষ্টা কোরনা। এই আমার ultimatum এর পরই লড়াই সুরু হবে। শেষকালে হয়ত একদিন লাঞ্ছিত পরাজিত বন্দীভাবে নতশিরে এখেনে এসে ধরা দিতেই হবে।

১১। ভাই,

তবে বৃহস্পতিবার দর্শন পাবার আশা আছে। কিন্তু অনেক ঠেকে ঠেকে আজকাল আমি মনকে এমনি সায়েস্তা করে নিয়েছি যে আশার কারণ থাকলেও তাকে আমি আশা করতে দিইনে—যদি বৃহস্পতিবার মধ্যে তুমি না এস, তাহলে আমি প্রাজ্ঞজনোচিত সুগম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলব—সংসারের এই রকমই নিয়ম যা—অভিলষিত তা সকল সময়ে সুলভ নয় বলে দ্বিগুণ অভিলষিত—যা অত্যন্ত সম্ভবপর তারও স্থির নিশ্চয়তা না থাকাতে সংসার চিরদিন বিচিত্র হয়ে আছে এবং অধিকাংশ জিনিস আমাদের প্ল্যান অনুসারে ঘটে না বলেই যা ঘটে—তা আমাদের চিত্তের ঔৎসুক্যকে অহরহ জাগ্রত করে রেখেছে। কিন্তু তাই বলে তোমার না আসবার কোন ওজর আমি সহজে গ্রাহ্য করব না তাও বলে রাখছি।

১২। ভাই,

তুমি ত কাল বৃহস্পতিবার শিলাইদহে এলে না—আমি অত্যন্ত চটে মোটে করে একেবারে কুষ্টিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির। তোমার নামে নালিশ দায়ের করতে নয়—তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কুষ্টিয়ার একটা হাইস্কুল হয়েছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করতে তাঁর সঙ্গে এবং মুক্তারবাবুর সঙ্গে মোলাকাৎ করা আবশ্যক হ'য়েছিল। এর থেকেই বুঝতে পারবে—আমি কত বড় পাব্লিক স্পিরিটেড্ লোক—রায় বাহাদুর হবার যোগ্য। কেবল ক্ষণিকা লিপি বলে তোমরা আমাকে অবজ্ঞা কর, কিন্তু সেদিন কুষ্টিয়ার ছাত্রবৃন্দ আমাকে অভিনন্দন পত্র দেবে সেদিন আমার মর্য্যাদা বুঝতে পারবে। তাতে আমার জগদ্বিখ্যাত দয়াদাক্ষিণ্য, শৌর্য্যবীর্য বদান্যতার উল্লেখ থাকবে—ধনমানরূপগুণ কুলশীল কোনটাই বাদ যাবে না। তখন মোলিয়রের যশস্বী জুঁদ্যার মহাবাক্য স্মরণ বলবে প্রায় ৪০বৎসর লোকটাকে দেখে আসচি, কিন্তু জানতুম না—ইনি এত বড় ইনি।

১৩। "ভাই,

তুমি যখন আসবে "আলোছায়া" খানি সঙ্গে করে এনো।

আসতে পারবে ত? আমি বোটে যাওয়ার কল্পনাটা পরিত্যাগ করলুম; কিন্তু তোমার আগমন প্রত্যাশায় দেবেন্দ্র সেনকে পুনর্নিমন্ত্রণ স্থগিত রেখেছি—কারণ তোমাকে আমি তার সঙ্গে একত্রে চাইনে—আতিথ্যের কর্তব্য পালনের হাঙ্গামার ভিতরে বেশ নিভৃতভাবে গুছিয়ে বসতে পারব না—অন্য লোক থাকলে তুমি এখেনে এসে গৃহের স্বাদ পাবে না—তোমাকে অতিথিশালায় স্থান না দিয়ে গৃহে রাখতে ইচ্ছা করি।

১৪ "ভাই,

তুমিত আধিব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে গলির ধারে পড়ে আছ! এ সময়ে তুমি কোন প্রলোভনের আকর্ষণে শিলাইদহের অভিমুখে দৌড়বে বলে বোধ হচ্চে না। বাঁশি বাজলে গোপাঙ্গনারা ছুটোছুটি করে যমুনাতটে উপস্থিত হতো বটে কিন্তু তোমার মত তাদের কারো পায়ে ফোড়া হইনি—বৃন্দাবনে দশপ্রকারের দশা এবং স্বেদপুলকবেপথুস্তম্ভমূর্চ্ছা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ ছিল কিন্তু কারো পায়ে ফোড়া হতনা এবং একা কৃষ্ণ সকল ঘটকালির পথ রোধ করে ত্রিভঙ্গমূরতি ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

১৫। "ভাই,

আজ শনিবার। তুমি যদি সোমবার নিশ্চয়ই এসো তাহলে আশা-করি আগামীকাল খবর পাবই। কারণ তোমাকে কুষ্টিয়ায় ভোজন করিয়ে সেখান থেকে আনতে চাই। শুক্লপক্ষ অবসান হবার পূর্ব্বেই শিলাইদহে তোমার অভ্যুদয় হবে এই রকম আশাকরা যায়।"

রবীন্দ্রনাথের আকুল আহ্বানে সোদরপ্রতিম বন্ধু প্রিয়নাথ বিচলিত হইয়া শিলাইদহে ছুটিয়াছিলেন।

১৬। ভাই,

ক্ষুব্ধ আত্মীয়দের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে সাহিত্যের কোন গল্পে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিৎ আক্রমণ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকেত করিবে।

১৭। ভাই,

"রাস্কিন" শেষ করে ফেল। এবং আমার ক্ষুদ্র ক্ষণিকাটিকেও ভুল না। লেখা সম্বন্ধে নদীর উপমা খাটে না—যদি খাটত তাহলে আমার সেই বিনোদিনীর সুদীর্ঘ কাহিনীটি এতদিনে খাতার মধ্যে শেষ হয়ে থাকত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে না লিখলে লেখা অগ্রসর হয়না—অতএব লিখে ফেল।

১৮। ভাই,

তুমি ক্ষণিকা সমালোচনা করচ শুনে আমি সুখী হলুম, সে কথা গোপন করতে চাইনা। তার একটু বিশেষ কারণ আছে; ওর ভাষা ছন্দ প্রভৃতি এতটা অধিক নূতন হয়েছে যে, যারা স্বাধীন রসগ্রাহী লোক নয়, তারা কিছুতেই ভেবে পাচ্চে না এটা তাদের ভাললাগা উচিত কি না—সুতরাং পনেরো আনা পাঠক ইতস্তত: করবে—আর যদি অধিককাল তাদের এই দ্বিধার মধ্যে ফেলে রাখা যায় তাহলে তারা চোটে মোটে গাল দিতে আরম্ভ করবে। একটা সমালোচনা পেলে তারা আশ্রয় পেয়ে বাঁচবে।

১৯। ভাই,

তোমার বই দুটির সঙ্গে সাধুবাদ প্রেরণ করছি। W. Harland এই বইখানিতে যৌবন বসন্ত টগবগ করছে—W. Spencer এর গ্রন্থে বার্দ্ধক্য পরিপক্ক—পরিণত। দুটোই যে আমি এক সঙ্গে পড়তে পারলুম তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে আমি এমন একটি বয়সে এসে পৌচেছি যার এক সীমানায় যৌবনের রেখা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং আর এক সীমানায় বার্দ্ধক্য ক্রমশ: শুভ্র রেখায় ফুটতর হয়ে উঠচে।

দীনেশবাবু এসেছিলেন তাঁরই হাতে বইদুটি দিলুম।

আমি সন্তোষের ওখেনে নিমন্ত্রিত বটে—কিন্তু যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

যাবার ইচ্ছা ছিল, কেবল নিমন্ত্রণের প্রলোভনে নয়—তোমার কাছ থেকে পাঠ্য বই দুই একখানা উদ্ধার করে আনবার জন্যে। যাহোক বিলম্বে বা অবিলম্বে কোন না কোন কর্ম্মদায়ে কলকাতায় যেতেই হবে তখন দস্যু বৃত্তি অবলম্বন করবার অবসর হবে।"

২০।

"যদি বন্ধন থেকে খালাস পেয়ে বুধবারে আসতে পায় তাহলে আর দ্বিধা মাত্র কোরো না।

পণ্ডিতমহাশয় তোমার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত আপ্যায়িত হয়েছেন—তিনি তোমার গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরলতা, চরিত্রমাধুরী, সদাশয়তা, রসজ্ঞতা ইত্যাদি অনেক প্রকার গুণের মিশ্রণ দেখে তোমার সঙ্গ সুখের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছেন।

কাল প্রমথবাবুর একখানি পত্র পাওয়া গেল। তিনি তোমার সঙ্গে শীঘ্র সাক্ষাৎ করতে যাবেন লিখেছেন।

তোমার নিজের নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা ও কাজের ভিড়ের মধ্যেও তুমি বিচিত্র লোককে কেমন করে আকর্ষণ করে আনতে পার আমি ত বুঝতে পারিনে। চিত্তকে নীরস করে শুষে ফেলবার পক্ষে বৈষয়িক বঞ্ঝাটের মত এমন জিনিস আর কিছু নেই।

বেলা অনেক হ'ল। এখন নাইতে খেতে যাওয়া যাক্—নইলে নির্দ্দোষ নিরপরাধী তুমি সুদ্ধ গৃহিণার বিদ্বেষের ভাগী হবে। তুমি এতক্ষণে অপিসের বর্মচর্ম পরে আদালতের রণাঙ্গনে।

২১।

"অতুল চন্দ্র (ছদ্মনাম বীরেশ্বর গোস্বামী) তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুসি হয়ে আমাকে পত্র লিখেছেন—যেন তুমি কাউকে খুসী করলে তার কৃতজ্ঞতার অংশে আমার ও দাবী আছে।

আকের গুড় তোমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—মূল্য এখন ফস করে নিচ্চিনে—যতটা সাধ্য তোমাকে ঋণী করে রাখা যাক—মিষ্টির ঋণ, সুবিধা পেলে, কোন এক সময়ে মধুরেণ শোধ করে নেওয়া যাবে।

২২। ভাই,

বলুর মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। বিশেষত: আমার স্ত্রী শিলাইদহে অত্যন্ত শোক অনুভব করিতেছেন, বলুর প্রতি তাঁহার একান্ত স্নেহ ছিল। ওদিকে বেলার অসুখের খবর পাইয়াছি।

এখন বিষয়জালের কর্ম্ম ফাঁসটি আমার কণ্ঠ হইতে সত্বর নামিলে আমি একবার সহর হইতে উর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইতে চাই। এ সম্বন্ধে একবার দেখা করিবে? যদি না পার ত, পত্রে ভাল মন্দ যাহা হয় লিখিয়া পাঠাইয়ো—সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি।

২৩। ভাই,

ভারতী-সম্পাদক তাগিদ করিতেছেন। দুই একদিনের মধ্যেই চাই। তুমি কি সংক্ষেপে গুটিকতক ছত্রে বলুর সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে ও বন্ধুভাবে শোক প্রকাশ করিয়া সত্বর লিখিয়া পাঠাতে পার? আজ বলেন্দ্রের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল।

[আগামী বারে সমাপ্য
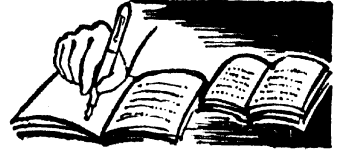
একটি যাত্রার কাহিনী

লেখিকাঃ এডিথ্ হোয়ার্টন (আমেরিকা)

অনুবাদক—শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায়

পর্দা ঘেরা ছোট্ট খুপরিতে সে শুয়ে আছে। মাথার ওপর তার নিজেরই কালো ছায়া, আর পায়ের তলায় চলন্ত চাকার অবিরাম গর্জন। কিছুতেই ঘুম আসছে না। চিন্তা—একটার পর একটা চিন্তা এসে তন্দ্রাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কিছুতেই কাছে আসতে দিচ্ছে না। রাতের অন্ধকার বুক চিরে ট্রেন ছুটে চলেছে। কামরার ভেতর অন্যান্য যাত্রীরা নিজের নিজের পর্দা ঘেরা খুপরিতে সুখ-নিদ্রায় মগ্ন। মাঝে মাঝে এক একটা ভারী নিশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া যায়। বাইরে মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের স্রোতে হঠাৎ ভেসে উঠছে একটা মিটমিটে আলো-ঘেরা ছোট্ট দ্বীপ—ঘুমন্ত কোনও গ্রাম। সবাই ঘুমুচ্ছে—ঘুম নেই শুধু তার চোখে। না চাইলেও পর্দার ফাঁক দিয়ে চোখ গিয়ে পড়ছে পাশের খুপরির পর্দায়। সেখানে তার স্বামী শুয়ে আছেন। দুই খুপরির মাঝখানে ব্যবধান অতি সামান্য, এক হাত চওড়া একটা চলার পথ মাত্র।

তবু ভাবনা যাচ্ছে না, ভয় হচ্ছে স্বামী যদি ডাকেন, যদি তাঁর তাকে প্রয়োজন হয়। তা'হলে শুনতে পাওয়া যাবে তো! অসুখে ভুগতে ভুগতে গত কয়েক মাস বেচারির কণ্ঠস্বর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে মেজাজও হয়েছে মারাত্মক রকম খিট্‌খিটে। একবার ডেকে সাড়া না পেলেই খেপে যান। এই বিরক্তি, এই আকস্মিক ধৈর্যচ্যুতিকে কেন্দ্র ক'রেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিস্তৃত হয়েছে অপরিচয়ের ব্যবধান। প্রথমটা ধরা যেতোনা। এখন কিন্তু দূরত্বটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার। দু'জনের মাঝে যেন ঝুলছে একটা অদৃশ্য কাঁচের আড়াল। আড়ালের দুধারে দুজনে দাঁড়িয়ে আছে, পরস্পরের মুখোমুখি, প্রায় বুকের কাছে; কিন্তু তবু কেউ কারুকে ছুঁতে পারছে না। বলতে পারছে না অপরকে নিজের অন্তরের কথা। ইদানীং স্বামীর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথায়, স্তিমিত চোখের চাউনিতে চমকে ওঠে এই অপরিচয়ের ইঙ্গিত। হয়তো এই সব কিছুর জন্য সেই দায়ী। তার মত এমন অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে রুগীর সেবায় সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশও হয়তো অন্যায়। সেও যে সংযত হবার সাধ্যমত চেষ্টা করেনি তা নয়, কিন্তু পারেনি। কেমন যেন মনে হয়েছে স্বামীর এই খিট্‌খিটে মেজাজ, এই একের পর এক অহেতুক আবদার—সবই রোগের ফল নয়। এই সবের মধ্যে যেন কোথায় গোপন গভীরে লুকিয়ে আছে তাঁর স্ত্রীকে বিব্রত ক'রে খুশী হবার উল্লাস। অথবা হয়তো এই সবকিছুর জন্য ঘটনার আকস্মিকতাই দায়ী। অন্তত সে নিজে এই অতর্কিত পরিবর্তনের জন্য, নূতন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এক বছর আগেও দু'জনের মনের বীণা একই সুরে বাঁধা ছিল, একই রঙে আঁকা ছিল দু'জনের আশার আকাশ। কিন্তু আজ সুর কেটে গেছে, রঙ মুছে গেছে। দেহে তার উচ্ছল যৌবন, মনে অদম্য আকাঙ্ক্ষা। তাই তার মনে হয় সে আকাশ বুঝি হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। কিন্তু রুগ্ন ভগ্নস্বাস্থ্য স্বামীর চোখে নিভে গেছে জীবনের সব আলো। তার স্বপ্নের সীমানা থেকে তিনি অনেক পিছিয়ে পড়েছেন; হয়তো হারিয়ে গেছেন।

বিয়ের আগের কর্মক্লান্ত যান্ত্রিক জীবন মনে পড়ে।

দিনের পর দিন স্কুলে একদল মেয়েকে শিক্ষার পাঠ দেওয়া। ক্লাসঘরের বোবা সাদা দেয়ালের মত নিষ্প্রাণ নিরালম্ব জীবন। তারপর এল মনের মানুষ। উচ্ছল জীবনের তরঙ্গ বাঁধ ভেঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়ে আবার ধীরে ধীরে সীমায়িত হল একটি নিটোল নিস্তরঙ্গ জীবনের গণ্ডীতে। বিয়ের পর সুরু হ'ল জীবনের অনেক হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন সার্থক করার পালা। কিন্তু সার্থক আর হ'ল না। বিধাতা হানলেন বজ্র। এক আঘাতে সব আশা নিঃশেষ হয়ে গেল। জীবনই তার প্রতি বিরূপ, আশার আকাশে পাখা মেলা তার ভাগ্যে লেখা নেই।

প্রথমে মনে হয়েছিল ছয় সপ্তাহ বায়ুপরিবর্তনের পরই বুঝি স্বামী সুস্থ হয়ে উঠবেন। অন্তত ডাক্তাররা সেই রকমই বলেছিলেন। বায়ুপরিবর্তন হ'ল, কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'লনা। এবার সারা শীতকালটা কোনও শুকনো জায়গায় কাটানোর হুকুম হল। বাধ্য হ'য়ে সখের সাজানো বাড়ী ছেড়ে, বিয়ের নতুন সব আসবাব আর অসংখ্য উপহার বস্তা বেঁধে গুদামজাত ক'রে, তাদের যেতে হ'ল কোলারেডো। জায়গাটা তার মোটেই মনে ধরেনি। একটাও চেনা মুখ নেই, একজনও নেই এসে খোঁজ নেবার। দাম্পত্য জীবন দেখে খুসী হবার লোক না থাক্, তার সৌভাগ্যে, তার বসন আর ভূষণের সম্পদে ঈর্ষান্বিত হবার কেউ থাকলেও সে সুখী হ'ত। ছিলেন শুধু স্বামী, কিন্তু তাঁর রোগও উত্তরোত্তর বেড়েই চ'লল। চারিদিকে তার মাকড়সার জালের মত অসংখ্য সমস্যার জাল—এত সূক্ষ্ম যে শুধু বুদ্ধি দিয়ে তা ছিন্ন করা যায় না। স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় অন্তর তার তখনও ভরপুর। কিন্তু স্বামীই কেমন যেন দিনের পর দিন বদলে যেতে লাগলেন। সে বদল মুখে বলা যায় না, কিন্তু মনে ঠিক নাড়া দেয়। কোথায় সরে দাঁড়াল সেই সুঠাম, সুন্দর, সৌম্য পুরুষ—যাকে সে স্বামীত্বে বরণ করেছিল! কোথায় হারিয়ে গেল সেই বিস্তৃত বলিষ্ঠ বক্ষ, যেখানে জীবনে সব ঝড়-ঝাপটায় ছিল তার নিরাপদ আশ্রয়। ভাগ্যের নিষ্ঠুর এক নির্দেশে সেই অবশেষে হয়ে দাঁড়াল—রুগ্ন সদা-সশঙ্ক এক পুরুষের একমাত্র নির্ভরস্থল। ঠিক সময়ে তার হাত থেকে ওষুধ বা পথ্য না পেলেই বিপদ উঠবে ঘনিয়ে। রুগীর ঘরের ধরাবাঁধা নিয়মের গণ্ডীতে ঘুরতে ঘুরতে সে দিশেহারা হ'য়ে পড়ল। ক্রমশঃ তার দেহে নামল অসীম অবসাদ, মনে ফিরে এল ফেলে-আসা সেই ক্লাসঘরের ক্লান্তি।

এই অবসাদ আর ক্লান্তির কালো মেঘ ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে অবশ্য উছলে পড়েছে স্নেহ আর সহানুভূতির নরম আলো। ক্ষয়মাণ মানুষটির পাশে ব'সে তাঁর সজল স্তিমিত চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বুক উথলে উঠেছে আবেগের বন্যায়, ক্ষণিকের জন্য কাছে ফিরে এসেছে তার মনের মানুষ। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যই। ভোরের শিশিরের মত ঝ'রে পড়ে গেছে সেই স্বর্ণাভ মুহূর্ত। ভয়, কেমন একটা অজানা ভয় অধিকার ক'রে বসেছে তার সারা সত্তা। সেই পাংশু, ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে তার মনে হয়েছে—এ মানুষকে সে চেনে না। দুর্বল ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর শুনে, শুকনো ফাটা-ফাটা ঠোঁটের কোণে বিকৃত হাসির রেখা দেখে অজানতে ভয়ে শিউরে উঠেছে তার অন্তর। ঘামে ভেজা তৈলাক্ত গায়ে হাত দিতে তার ভাল লাগেনি। অদ্ভুত কোনও প্রাণীকে দেখার যে বিস্ময়, সেই বিস্ময় সেই কৌতূহল ফুটে উঠেছে তার দৃষ্টিতে। নিজের এই পরিবর্তনে নিজেই সে চমকে উঠেছে। চমকে উঠেছে চিন্তার আঘাতে—যে এই লোককেই তো একদিন সে ভালোবেসেছিল! হয়তো নিজের এই গোপন বেদনা স্বামীকে খুলে বলতে পারলে সে তৃপ্তি পেত। তা বলা হয়নি। বরঞ্চ সে তার মনকে বুঝিয়েছে যে বিদেশে দু'জনের এই নিঃসঙ্গ জীবনই মানসিক যন্ত্রণার জন্য দায়ী। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ফিরে যেতে পারলেই আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে। ফিরে যাবার সুযোগ আসতেও দেরী হ'ল না। ডাক্তাররা অবশেষে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। সংবাদটা পেয়ে সে কি খুসীই না হ'ল। অবশ্য এই অনুমতির অন্তর্নিহিত কারণ তাদের দু'জনেরই অজানা ছিল না। ফিরে যাওয়ার অর্থ রুগীর আরোগ্যের আর আশা নেই। তবু দু'জনেই হঠাৎ কেমন উৎসাহিত হয়ে উঠল, আশার আলো জেলে মৃত্যুর অন্ধকারকে চাইল দূরে সরিয়ে দিতে। যাত্রার আয়োজনে তার সে কি উৎসাহ উদ্দীপনা!

অবশেষে যাত্রার দিন সত্যিই এল। তার কেমন একটা ভয় ছিল, শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়তো হবে না। হয়

স্বামীর অসুখ হঠাৎ বেড়ে যাবে, আর নয় তো ডাক্তারেরা শেষ মুহূর্তে নিয়ে আসবেন তাঁদের চিরপরিচিত বারণের বাধা। কিন্তু কিছুই হল না, এই একবার ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন হ'ল। ট্রেনের কামরায় কম্বলে হাঁটু ঢেকে, পিঠে বালিস দিয়ে স্বামী বসলেন। ট্রেন ছাড়ল। দু'-চারজন প্রতিবেশী বিদায় জানাতে স্টেশনে এসেছিল। এতদিন সে এদের আমলই দেয়নি। সেই মুহূর্তে কিন্তু তাদের লক্ষ্য ক'রে রুমাল নাড়তে তার ভালই লাগল।

ভালভাবে একটা দিনও পার হ'ল। স্বামী বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন, সেও প্রাণ ভ'রে উপভোগ করেছে বাইরের মনোরম দৃশ্য, আর ভেতরের সব মজার ঘটনা। দ্বিতীয় দিনে স্বামী ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল তাঁর বিরক্তি। একটু দূরের বেঞ্চিতে ব'সে একটা ছোট্ট ছেলে চকোলেট চুষতে চুষতে এক দৃষ্টে চেয়েছিল তাঁর দিকে। শিশুর অকারণ কৌতূহলী চাউনি, কিন্তু এতেই বিরক্তির সূত্রপাত। ছেলেটাও চোখ ফেরাবে না, স্বামীর অস্বস্তির শেষ নেই। সে বাধ্য হ'য়েই ছেলের মাকে স্বামীর অসুস্থতার কথা জানিয়ে অনুরোধ করলে—ছেলেকে অন্যধারে সরিয়ে নিতে। মা বেশ বিরক্ত হ'লেন, শিশুর পক্ষ নিয়ে অন্যান্য যাত্রীরাও ব্যঙ্গ ক'রতে ছাড়লে না।

রাতে স্বামীর ঘুম হ'ল না। তৃতীয় দিন সকালে দেখা গেল—জ্বরে তাঁর গা পুড়ে যাচ্ছে। অবস্থা যে ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে এটুকু বুঝতে তার দেরী হ'ল না। যাত্রার দু'একটা ছোটখাট অসুবিধা ছাড়া দিনটা একরকম কেটে গেল। ট্রেনের ঝাঁকানিতে স্বামী যেন আরও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন। ক্লান্তির কালিমা মাখানো সেই মুখ দেখতে দেখতে ভয়ে-ভাবনায়, ব্যথায়-সহানুভূতিতে সে নিজেই কেমন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল। অন্যান্য যাত্রীরাও স্বামীর এই আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। সে পুতুলের মত একবার স্বামীকে দেখছে, আবার ঘাড় ফিরিয়ে চেষ্টা করছে যাত্রীদের চোখের ভাষা পড়বার। ছোট্ট ছেলেটা ঠিক তেমনি একটানা চেয়ে আছে। চকোলেট, ছবির বই, কিছুতেই তাকে প্রলুব্ধ করা যায়নি। পোর্টারটা পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সাহায্য করতে চাইলে। সজ্জন কোনও যাত্রীর বোধ হয় হঠাৎ মনে হয়েছে কিছু একটা করা দরকার। তাই এই পোর্টারের আবির্ভাব। একটু দূরে মাথায় চ্যাপ্টা টুপি এক ভদ্র-লোককে বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে, সম্ভবত তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্যের ওপর এই ধরণের দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া ভেবে।

গোধূলির আলো মিলিয়ে সন্ধ্যা এল। বিষাদের ভার ঝেড়ে ফেলে সে উঠে এসে স্বামীর পাশে বসল। তিনি ধীরে ধীরে শীর্ণ হাতখানি রাখলেন তার হাতের ওপর। স্পর্শের মধ্য দিয়ে হঠাৎ সারা দেহে ছড়িয়ে গেল এক বিদ্যুৎ-শিহরণ। মনে হ'ল অনেক, অনেক দূর থেকে তাকে স্বামী ডাকছেন। অপ্রতিভ হয়ে মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ল স্বামীর ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসির রেখা। হাসির সেই রেখা দীর্ঘ হ'য়ে তীব্র বেগে তীক্ষ্ণ ফলকের মত এসে যেন বিদ্ধ হল তার হৃৎপিণ্ডে। যন্ত্রণার একটা শীতল স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে ছড়িয়ে পড়ল তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

"তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?" নিজেকে সামলে নিয়ে সে শুধাল।

"না, এমন কিছু নয়।"

"আমরা তো বাড়ীর কাছে এসে গেছি।"

"হ্যাঁ, খুব কাছে।"

"আগামী কাল এই সময়ে……"

স্বামী চোখ বুজলেন। দুজনের মাঝে আবার নেমে এল অখণ্ড নীরবতা। একটু পরেই স্বামীকে বিছানায় শুইয়ে সে নিজের জায়গায় ফিরে এল। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিউইয়র্কে পৌঁছান যাবে ভেবে খুসী হবার চেষ্টা করলে। ষ্টেশনে গাড়ী থামলেই ভিড়ের মধ্যে ভেসে উঠবে একাধিক পরিচিত মুখ। আত্মীয়-পরিজন সব খুঁজতে খুঁজতে এসে দাঁড়াবে কামরার সামনে। তবে কেউ যেন না আবার স্বামীর দিকে চেয়েই উল্লাসে উপচে ব'লে বসে—শরীর বেশ ভাল হয়েছে, শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে যাবেন। দীর্ঘকাল রুগীর পাশে ব'সে থাকার ফলে এইসব মৌখিক সমবেদনার নিষ্ঠুর দিক সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ মনে হ'ল স্বামী বোধহয় তাকে ডাকছেন। নিজের খুপরির পর্দা সরিয়ে কান পেতে শুনলে। অপর প্রান্ত থেকে এক যাত্রীর ভারী নিশ্বাসের আওয়াজ শুধু

ভেসে এল। কেমন একটা তরল আওয়াজ, যেন তৈলাক্ত কিছুর মধ্য দিয়ে ব'য়ে আসছে। এবার ভয়ে ঘুমোবার চেষ্টায় চোখ বুজুলো।......স্বামীর খুপরিতে নড়াচড়ার শব্দ না? চমকে উঠে তার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল......এই নিস্তব্ধতার ভার যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। স্বামী ডাকলে যদি সে শুনতে না পায়· হয়তো এতক্ষণ তিনি ডেকে ডেকে ক্লান্ত হ'য়ে চুপ করেছেন......একটার পর একটা আশঙ্কায় সে অভিভূত হয়ে পড়ছে কেন? এ সবই হয়তো ক্লান্ত মনের উপর উত্তেজিত মস্তিষ্কের প্রভাব, সব-কিছু সম্ভাবনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার প্রয়াস...... নিশ্চিন্ত হবার আশায় আবার মাথা বার ক'রে কান পেতে শুনলে। কিন্তু একাধিক যাত্রীর নিশ্বাসের মাঝে স্বামীর নিশ্বাস আলাদা করা অসম্ভব। একবার উঠে গিয়ে দেখার প্রবল ইচ্ছা হ'ল। পরক্ষণেই নিজের চঞ্চলতায় নিজেই লজ্জিত হ'ল। কাছে গেলে রুগীর ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা। চোখে পড়ল ট্রেনের গতির সঙ্গে তাল রেখে স্বামীর খুপরির পর্দাটা মন্থর ছন্দে দুলছে। দেখে—কেন কে জানে নিজের বুকের দুলুনি থেমে এল। একটা পরম প্রশান্তির ভাব ছড়িয়ে পড়ল দেহে আর মনে। পাশ ফিরে শুতেই তন্দ্রা এসে হরণ করল তার সব অস্বস্তি আর অশান্তি।

ভোর না হ'তেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। মুক্ত মাঠের মাঝ দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। ধূসর দিগন্তে ছোট ছোট পাহাড়ের অভাব। ঘসা-পয়সার-রঙ বোবা আকাশটাতে সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের বিস্ময় মাখা। জানলা তুলে দিতেই মুখে এসে লাগল শীতল বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শ। ঘড়িতে সাতটা বেজেছে। এখনই আর সব যাত্রীরা জাগবে। সুরু হবে পর্দা গুটিয়ে শয্যার আয়োজন সরিয়ে নেবার পালা। মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় বদলে প্রস্তুত হবার জন্য সে তৎপর হ'ল। প্রভাত-প্রসাধন সাঙ্গ হবার পর নিজেকে বেশ হাল্কা মনে হ'ল। শুকনো তোয়ালে দিয়ে মোছা কপোলে একটা বেশ আবেগ-মধুর জ্বালা, কপালের ওপর লুটিয়ে পড়া দু'এক টুকরো ভিজে চুলে কেমন আদরের আস্বাদ। অনেকদিন পর সকালে উঠেই মনে হচ্ছে কি সুন্দর দিন! আর দশ ঘণ্টা পরেই পৌঁছে যাবে বাড়ীর দরজায়।

স্বামীর খুপরির দরজায় এসে দাঁড়াল। এই তাঁর এক গ্লাস দুধ পানের সময়। বেঞ্চির ধারে জানালাগুলো ফেলা, তাই পর্দায় ঘেরা খুপরিটায় আবছা অন্ধকার। স্বামী জানালার দিকে পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছেন, মুখটা দেখা যাচ্ছে না। সে ঝুঁকে প'ড়ে একটা জানলা খুলে দিলে। হাতটা সরিয়ে আনবার সময় স্বামীর হাতে ঠেকল। স্বামীর হাতটা হিম-শীতল......

সে ঝুঁকে প'ড়ে নাম ধরে ডাকলে। কোনও সাড়া নেই। কাঁধের ওপর ঝাঁকানি দিয়ে আরও জোরে ডেকে উঠল। দেহ পাথরের মত নীরব নিথর। ব্যগ্র হ'য়ে স্বামীর হাতটা মুঠোয় ধরতে গেল। শবের মত কঠিন শীতল হাত। শবের হাত!......মনে হ'ল নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এখুনি সে লুটিয়ে পড়বে। মুখ, স্বামীর মুখটা দেখা দরকার। কম্পিত হাত বাড়িয়ে মাথাটা সোজা করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ঢলে পড়ল মাথাটা। মুখের রঙ পাংশু, কিন্তু ভাব পরম প্রশান্ত। পাথরের মত চোখ দুটো তার প্রতি নিষ্পলক-নিবদ্ধ।

সেই চোখের দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ নির্বাক সে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ মস্তিষ্ক থেকে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল একটা তীব্র শিহরণ, সারা শরীরে জাগল ভয়ের কম্পন। পরক্ষণেই এক প্রবল বিপরীত শক্তির বজ্রস্পর্শে সে সংযত হ'ল, শীতল জলের স্পর্শে যেমন জেগে ওঠে বিকারের রুগী। ভয়েই ভয়ের শেষ; মৃত্যুর চেয়ে প্রবল হ'ল মানুষের ভয়! মৃত্যুর কথা রাষ্ট্র হ'লেই পরের ষ্টেশনে তাকে নেমে যেতে হবে। তারপর?

সিনেমার ছবির মত চোখের সামনে দিয়ে চ'লে গেল দৃশ্যের পর দৃশ্য। অনেকদিন আগে দেখা একটা ঘটনা। ট্রেনে তাদের কামরার যাত্রী এক নবীন দম্পতি নেমে দাঁড়িয়ে আছে পথের মাঝে অপরিচিত ছোট্ট রেল ষ্টেশনে। মায়ের কোলে শিশুপুত্র। শিশুটি ট্রেনেই মারা গেছে। ট্রেন ছেড়ে চ'লে গেল! চোখের সামনে তার ভাসছে—চলন্ত ট্রেনকে অনুসরণ করা মায়ের সেই ক্লান্ত করুণ দু'টি চোখ—ট্রেন যাচ্ছে না যেন মৃত্যুর মুখে ফেলে অপসারিত হচ্ছে তাদের একমাত্র আশ্রয়। এই মুহূর্তে সামান্য অসতর্ক হ'লে অচিরে একই দুর্দশা তাকে বরণ করতে হবে। পথের মাঝে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ষ্টেশনে

নির্বান্ধব তাকে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে নেমে দাঁড়াতে হবে। অসম্ভব! এই দুর্দৈব থেকে বাঁচবার জন্য যে কোনও কষ্ট সে করতে প্রস্তুত।

হঠাৎ ট্রেনের গতি যেন মন্থর মনে হ'ল। ওই, ওই তা'হলে আসছে! সামনে এগিয়ে আসছে একটা ষ্টেশন। চকিতে সেই নির্জন গ্রাম্য ষ্টেশনে মৃতসন্তান কোলে নিঃসহায় মায়ের ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে টেনে সে নামিয়ে দিল সদ্য-তোলা জানালার আবরণ। মৃত স্বামীর মুখ যেন কেউ দেখতে না পায়।

কিন্তু নিজেও আর সে সেই চকচকে চোখ দুটোর দিকে চাইতে পারছে না। পা দু'খানা তার থরথর ক'রে কাঁপছে। বাধ্য হয়ে ব'সে পড়ল বেঞ্চির ধারে, মৃতদেহের পাশে। যাত্রীদের দৃষ্টিতে আড়াল দেবার জন্য পর্দা-গুলো ভাল করে টেনে দিলে। সমাধিমন্দিরের আলো-আঁধারিতে জীবন ও মৃত্যু যেন মুখোমুখি হ'ল। এই শ্মশান-শূন্যতার মাঝেই তার ভেবে নেবার সামান্য সুযোগ। স্বামীর মৃত্যু যে কোনও প্রকারে গোপন করতে হবে। কিন্তু কি ক'রে? মাথার মধ্যে চিন্তাগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই একটার পর একটা সাজিয়ে পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না। তবে কি সে এইখানে এইভাবে পর্দা দু'টো মুঠো ক'রে ধরে ব'সে থাকবে? তারপর·········

বাইরে অন্যান্য যাত্রীদের নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। পোর্টারটা এসে গেছে। এইবার পর্দা গুড়িয়ে শয্যার সরঞ্জাম সরানো সুরু হবে। সব শক্তি সংহত ক'রে সে উঠে দাঁড়াল, এল খুপরির বাইরে। পর্দাটাকে ভাল ক'রে টেনে দিয়ে ফিরবে, চোখে পড়ল ট্রেনের দোলানিতে দুটো পর্দার মাঝে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। চট্ ক'রে নিজের পোষাক থেকে একটা পিন খুলে নিয়ে জোড়টা এঁটে ফাঁকটা ঢেকে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ নিশ্চিন্ত মনে হল। তাকাতেই চোখে পড়ল পোর্টারটা। হয়তো সে এতক্ষণ তাকেই দেখছিল, এইবার বললে "ওঁর ঘুম কি এখনও ভাঙ্গেনি?"

"না," বলতে গিয়ে গলাটা কেমন কেঁপে গেল।

"সাতটার সময় আপনি ওঁর দুধ আনতে বলেছিলেন। দুধ তৈরী আছে, যখন দরকার হয় বলবেন।"

সাবধানে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সে নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ল।

সাড়ে আটটায় বাফেলো ষ্টেশন এসে গেল। ততক্ষণে শয্যার সরঞ্জাম সরানো শেষ হয়েছে। যাত্রীরাও সেজে-গুজে যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় সারাদিনটা ব'সে কাটানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছে। বালিস চাদর ইত্যাদি কাঁধে নিয়ে যাতায়াতের সময় পোর্টারটা বার বার তার দিকে চেয়ে দেখেছে। অবশেষে সে বাধ্য হয়ে বললে "ওঁর ঘুম কি এখনও ভাঙ্গেনি? আপনি তো জানেন, বেলা বাড়বার আগেই সব শয্যা আমায় সরিয়ে ফেলতে হবে।"

ভয়ের সেই শীতল কম্পন আবার সারা দেহ আচ্ছন্ন ক'রে ছড়িয়ে পড়ছে। ট্রেনটাও ষ্টেশনের প্লাটফর্মে সবে ঢুকছে।

"না, এখন নয়" গলাটা শুকিয়ে গেছে, কথা জড়িয়ে আসছে "মানে, দুধ দেবার আগে নয়! দুধটা বরঞ্চ এইবার এনে দাও।"

"আচ্ছা, দয়া ক'রে একটু তাড়াতাড়ি ক'রে নিন।"

ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পোর্টার দুধ নিয়ে এসে দাঁড়াল। হাতে নিয়ে হতচৈতন্য সে ব'সে রইল। চিন্তার শক্তি পর্য্যন্ত সে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু নির্বাক বসে থাকারও সুযোগ নেই। সামনেই পোর্টারটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে। "আমি কি দুধটা ওঁকে দিয়ে আসবো" পোর্টারটা শেষে ব'লেই ফেললে।

'না, না' সে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল। তারপর সামলে নিয়ে বলল "ওঁর, ওঁর হয়তো ঘুম এখনও ভাঙ্গেনি।"

বাধ্য হয়ে পোর্টারটা চলে গেল। সে উঠে এসে পিনটা খুলে, পর্দাটা সন্তর্পণে সামান্য সরিয়ে খুপরির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। আলো-আঁধারিতে মনে হ'ল মমির মুখে যেন জলছে দুটো চকচকে পাথরের চোখ। চোখ দুটো থেকে কি আলো ঠিকরে পড়ছে? তাড়াতাড়ি সে ডান হাত বাড়িয়ে চোখের পাতা দুটো টেনে দিলে। বাঁ হাতে ধরা দুধের কাপ—দুধ নিয়ে সে এখন কি করবে? ওপাশের জানালার আবরণ একবার তুলে দুধটা বাইরে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু তাতে অনেকখানি ঝুঁকে পড়তে হবে, মুখটা

প্রায় সেই মমির মুখে ঠেকবে। তার চেয়ে—চট্ ক'রে সে সবটা দুধ নিজের গলায় ঢেলে দিলে।

খালি কাপ হাতে নিজের বেঞ্চে ব'সতে না বসতেই পোর্টারটা ফিরে এল। "এইবার ওঁর বিছানাটা কি সরিয়ে নিতে পারি?" কাপটা হাতে নিয়েই প্রশ্ন।

উত্তরে সে অনুনয়ে ভেঙ্গে পড়ল—"ওঁর অসুখ খুব বেড়েছে। বিছানাটা কি রাখা যায় না? ডাক্তাররা বলেছেন—শুয়ে থাকলেই উনি সুস্থ হ'য়ে উঠবেন।"

পোর্টারটা বেশ বিব্রত হ'য়ে খানিক মাথা চুলকে, কি ভেবে বললে—"আচ্ছা, অসুখ যখন খুবই বেড়েছে…"

খালি কাপটা নিয়ে ফিরে যেতে যেতে দু'চারজন কৌতূহলী যাত্রীকে কৈফিয়ত না দিয়ে উপায় নেই। পর্দার আড়ালে যাত্রীটির অসুস্থতার কথা জানিয়ে সে অদৃশ্য হ'ল।

জোড়া জোড়া চোখের দৃষ্টি ফিরে এসে পড়ল তার উপর। সহানুভূতি জানাবার অদম্য আবেগে একটি বয়স্কা মহিলা সটান এসে ব'সে পড়লেন তার পাশে। সুরু করলেন "স্বামীর অসুখ কি খুবই বেড়েছে? আহা! তা বাপু, অসুখ আর কোন সংসারে নেই বল? রুগীর সেবা ক'রেই তো সারাটা জীবন কাটল। চল দিকিনি—দেখি একবার তোমার স্বামীকে।"

"দেখুন,ওঁকে এখন বিরক্ত করা বোধহয় ঠিক হবেনা।"

মহিলা এই মন্তব্যে বিশেষ খুসী না হ'য়ে আবার সুরু করলেন "অবশ্য তোমার স্বামীর ব্যাপার তুমিই ভাল জান। কিন্তু রুগীর সেবা তোমার বেশ রপ্ত ব'লে তো মনে হয় না। তোমার আপত্তি না থাকলে আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি। তা, এই রকম বাড়াবাড়ি এর আগেও হয়েছে না কি?"

"হ্যাঁ।"

"কমলো কি ক'রে?"

"বেশ খানিকক্ষণ একটানা ঘুমিয়ে।"

ঠোঁট উলটে মহিলা বললেন—"উহু, বেশী ঘুম মোটেই ভাল নয়। আর ওষুধ দিতে না?"

"হ্যাঁ।"

"তাই তো বলি, ওষুধ দেবার সময় ঘুম ভাঙাতে নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ।"

"তা, ওষুধ আবার কখন দিতে হবে?"

"দু'—মানে দুঘণ্টা পরে।"

মহিলা হতাশ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিলেন—"আমি হ'লে এমন অবস্থায় আরও তাড়াতাড়ি ওষুধ দিতাম।"

এইখানেই শেষ নয়। সহানুভূতি সস্তা ব'লেই তার বুঝি শেষ নেই। প্রত্যেক যাত্রী যেতে যেতে তার দিকে চাইছে, চাইছে সেই পর্দাফেলা খুপরির পানে। একজন তো দুই পর্দার ফাঁক দিয়ে ভিতরটা দেখার লোভে দাঁড়িয়েই পড়লেন। এধারে ওধারে আলাপ চলেছে, কথার টুকরো ভেসে আসছে "আহা" "অসুখ বাড়াবাড়ি" ইত্যাদি। টিকিট-চেকার আসতে আবার সারা দেহে নামল ভয়ের কম্পন। কোণে জড়সড় হ'য়ে ব'সে বাইরের চলমান দৃশ্যের পটে চোখ আটকে ট্রেনের কামরাকে ভুলে যাবার চেষ্টায় সে ব্যস্ত হ'ল।

কিন্তু ষ্টেশনে গাড়ী থামলেই সুরু হয় যাত্রী ওঠা-নামা। নতুন যাত্রী উঠলেই দেখতে হয় কারণ কামরায় ব'সেই প্রত্যেকের প্রথম কাজ হচ্ছে সেই পর্দা-ঢাকা খুপরির প্রতি বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ। দেখতে দেখতে তার এমন হয়েছে যে চোখ বুজে কিছু ভাবতে গেলেই ভেসে ওঠে মানুষের মুখের মিছিল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে এল এক নূতন উপদ্রব। সামনের বেঞ্চিতে এসে বসলেন এক মোটাসোটা বয়স্ক ভদ্রলোক। ট্রেনের দোলানিতে তাঁর ভুঁড়িটা দুলছে, আর ঠোঁটের কোণে লেগে আছে কেমন একটা রহস্যময় হাসি। ভদ্রলোকের পরণে কালো ঢিলেঢালা পোষাক, গলার টাইটা পুরণো আর ময়লা। তিনিই প্রথম কথা পাড়লেন "অসুখটা কি সকাল থেকেই বাড়লো?"

"হ্যাঁ।"

"আহা, হা! কি বিপদ দেখ- দিকিনি!" সেই রহস্যময় হাসিটা একটু বিস্তৃত হ'ল,ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল দুটো সোনা বাঁধানো দাঁত "তবে কি জান, অসুখ ব'লে সত্যিই কিছু নেই। আর শুধু অসুখ কেন, মৃত্যুটাই তো একটা মায়ার খেলা মাত্র। ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাস রাখ, তা'হলেই দেখবে অসুখ বা মৃত্যু সব মিথ্যে। তোমার স্বামী যদি এ উপদেশগুলো পড়েন" ব'লেই সামনে একটি পুস্তিকা এগিয়ে ধরলেন।

সময় এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বড় ধীরগতিতে। আবার সেই বাইরে চোখ মেলে ব'সে থাকা। কামরার গুঞ্জন মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছে। সেই সেবাপরায়ণা মহিলা কার সঙ্গে তর্ক জুড়েছেন—একই সঙ্গে একাধিক—না একটার পর একটা ওষুধ খাওয়ালে তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যায়। ভোরের কুয়াসা ভেদ করে যেন ভেসে আসছে দূরাগত ঘণ্টার ধ্বনি। এরই মধ্যে পোর্টারটা বারকতক এসে প্রশ্ন করেছে। কি উত্তর দিয়েছে তা সে নিজেই জানেনা। তবে মনোমত উত্তর নিশ্চয়ই দিয়েছে, কারণ প্রতিবারই সে ফিরে চ'লে গেছে। দুঘণ্টা অন্তর মহিলাটি ওষুধ দেবার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। কত পুরাতন যাত্রী নেমে গেছে, কত নূতন যাত্রী এসেছে।

মস্তিষ্কের মধ্যে সমুদ্রের আলোড়ন উঠেছে, চিন্তার ঢেউ ক্রমান্বয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। একটা কিছু বিষয় নিয়ে একটু ভাবতে পারলে হয়তো নিজেকে সামলানোর সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু এ যেন হঠাৎ সে পা ফসকে খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে, হাতের কাছে গাছ, পাথর যা পাচ্ছে ধ'রে বাঁচতে চাইছে কিন্তু পারছে না; একটার পর একটা আশ্রয় হাত ফসকে যাচ্ছে। এইভাবে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে হাতড়াতে হাতড়াতে মন উড়ে চ'লে গেল নিউইয়র্ক ষ্টেশনে। ট্রেন ঠিকসময়ে নিউইয়র্ক ষ্টেশনে পৌছবে। কিন্তু তারপর? কঠিন হিমশীতল মৃতদেহ দেখে সকলে কি বুঝবেনা যে তার স্বামী সকালেই মারা গেছেন? তখন কি চোখে সকলে চাইবে তার দিকে, কি ভাববে তার সম্বন্ধে?

চিন্তাটা এইবার দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে:—"সেই মুহূর্তে আমি যদি বিস্মিত না হই, তা'হলে সকলের মনেই সন্দেহ উঁকি দেবে। প্রশ্নের পর প্রশ্নের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষিপ্ত হবে আমাকে লক্ষ্য ক'রে। অকপটে যদি সব ঘটনাটা বলি—কেউ কি বিশ্বাস করবে? কেউ না, আমার নিকটতম আত্মীয়রাও বিশ্বাস করবে না! উঃ! কেমন ক'রে আমি শত শাণিত সন্দেহজর্জর দৃষ্টির সামনে দাঁড়াব?" চিন্তা চকিতের মধ্যে পৌছে গেল সিদ্ধান্তে:—"আমাকে সম্পূর্ণ না জানার ভান করতে হবে। সকলে এগিয়ে যাবে পর্দাঘেরা খুপরির দিকে, আমিও যাব তাদের সঙ্গে সঙ্গে। একজন পর্দাটা তুলে ধরবে—আর, আর তখনই আমার কণ্ঠ চিরে ফেটে পড়বে এক তীক্ষ্ণ চীৎকার ······কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অভিনয়ে সাফল্যলাভ সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারল না।

মস্তিষ্কের তটে চিন্তার ঢেউ ভেঙ্গে পড়ারও শেষ হ'ল না। যতই সে চেষ্টা করে একটা বিষয়ে মনস্থির করবার, অন্যটা তার জরুরী দাবী জানিয়ে জড়িয়ে ধরে, যেমন জড়িয়ে ধরত গ্রীষ্মের ক্লান্ত বিকালে ক্রীড়ারত তার স্কুলের পড়ুয়ারা। এই মানসিক অবস্থায় অবাস্তব এক অভিনয় তো দূরের কথা, কোনও সামান্য কাজও তাকে দিয়ে সম্ভব হবে না। সে পারবে না। অসতর্ক মুহূর্তে তার কথা, তার কাজই তার মুখোস খুলে দেবে।

মন যাই বলুক, মুখে কিন্তু সে ক্রমান্বয়ে ব'লে চলেছে "আমাকে সম্পূর্ণ না জানার ভান করতে হবে, করতেই হবে।" মন্ত্রজপের মত কতক্ষণ যে এই কথাগুলো সে বলেছে, তা সে নিজেই জানেনা। এক সময়ে হঠাৎ নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই চমকে উঠল "আমার মনে নেই, কিছু আমার মনে নেই।"

চকিত হ'য়ে কামরার এধার থেকে ওধার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল—আর কেউ শোনেনি তো! দেখে আশ্বস্ত হ'ল যে সময়ের যাদুতে সে সকলের মনোযোগের বাইরে চ'লে গেছে।

কিন্তু স্বামীর পর্দাফেলা খুপরিটা নিজের মনোযোগের বাইরে সরানো গেলনা। চোখটা যেন পর্দার গায়ে আটকে গেল। এতক্ষণ পর্দায় আঁকা বিচিত্র সব রেখা আর বৃত্তের সমন্বয় সে লক্ষ্য করেনি। ভারী পুরু পর্দার গায়ে রঙীণ রেখাগুলো যেন ফুটে রয়েছে। রেখাটা কোথায় আরম্ভ—আর কোথায় শেষ কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। হঠাৎ মনে হ'ল পুরু পর্দাটা কাঁচের মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে, আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে স্বামীর পাংশু মুখ—মৃতের মুখ। সেই পাথরের মত চক্চকে চোখে আটকে গেল তার দৃষ্টি। সরাতে গেল পারল না। মনে হ'ল মাথাটা যেন পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছে। প্রচণ্ড চেষ্টায় যখন সফল হল তখন সারা দেহ তার ঘামে ভিজে উঠেছে। তবুও যায় না। মুখটা তাকে অনুসরণ ক'রে উঠে এসেছে। এবার শূন্যে, তার আর সামনের যাত্রীর মাঝখানে শূন্যে দুলছে। উন্মাদের মত সে হাতের ধাক্কায় সরিয়ে দিতে চাইলে মুখটা। প্রসারিত হাতে যেন

স্পর্শ পেল মুখের মসৃণ চামড়ার। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সে দাঁড়িয়ে উঠে গলার কাছে ঠেলে আসা আর্তনাদকে প্রাণপণে দমন করল। সামনের যাত্রী অবাক হ'য়ে চেয়ে আছে। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে ওঠার প্রয়োজন প্রমাণ করতে টেনে নিতে হ'ল সামনে ঝোলানো ছোট্ট ব্যাগটা। ব্যাগটা খুলতেই চোখে পড়ল স্বামীর ফ্লাস্ক। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে আবার ব'সে পড়ল। চোখটা বুজে থেকে যদি মুক্তি পাওয়া যায় ওই দোদুল্যমান মুখের দৃশ্য থেকে। মুখোসের মত মুখটা পাথরের মত চোখের তারায় আলো ঠিকরে ঠিক দুলতে লাগল।

কতক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল মনে নেই। সম্বিত ফিরতে দেখল তখনও বেশ বেলা আছে। যাত্রীরা কেউ ব'সে ঢুলছে, কেউ অন্যের সঙ্গে আলাপরত।

বেশ খিদে পেয়েছে। মনে পড়ল যে সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। খাবার স্পৃহাও নেই, খেলে হয়তো বমি হ'য়ে যাবে। তবু শরীর কোনও যুক্তি মানবে না, জঠরের ইন্ধন জোগাতেই হবে। নিজের ব্যাগে বিস্কুট ছিল। তারই একটা মুখে ফেলে দিল। শুকনো বিস্কুট জিভে আটার মত জড়িয়ে গেল, গলা শুকিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি স্বামীর ফ্লাস্কটা ব্যাগ থেকে টেনে নিয়ে তেষ্টা মেটাতে গেল। পানীয় গলায় ঢালতেই মনে হ'ল একটা জ্বলন্ত অঙ্গার যেন বুক বেয়ে নেমে যাচ্ছে। স্বামীর ফ্লাস্কে ছিল তীব্র সুরা। এই সুরাটুকু পান ক'রে কিন্তু তার উপকার হ'ল। ক্লান্তি চ'লে গিয়ে দেহে মনে এল একটা নরম উষ্ণতা। চিন্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ঘনিয়ে এল হাল্কা আবেশ। চোখ বুজে এই আবছা আনন্দ উপভোগ করতে করতে এক সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখল। এই ছুটন্ত ট্রেনের মত জীবনের আকর্ষণে সেও যেন অন্ধের মত এগিয়ে চলেছিল ভবিষ্যতের ভয়াবহ অন্ধকারের মুখে। হঠাৎ গতি শুদ্ধ হ'ল, নেমে এল নিরন্ধ্র অন্ধকার, নিশ্ছিদ্র শুদ্ধতা। স্বামীর পাশে সেও শুয়ে আছে—মৃত, পাংশু-মুখ, শুদ্ধ-দৃষ্টি। কি অপরিসীম শান্তি! দূরাগত মৃদু পদধ্বনি শোনা যায়, দু'জনের মৃতদেহ নিয়ে যাবার জন্য কারা যেন এগিয়ে আসছে। তীব্র একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়ল তার সারা দেহে, যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠল সব পেশীতন্তু। তারপরই অতল অন্ধকার—মৃত্যুর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বুক চিরে ঝড়ের বুকে ঝরা পাতার মত, তার আর স্বামীর মৃতদেহ পাশাপাশি ভেসে যেতে যেতে মিশে গেল অসংখ্য মৃতদেহের ভিড়ে।......

ভয়ে চীৎকার করতে যাবে, ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে দেখে—বেলা শেষ হয়ে নেমেছে ধূসর সন্ধ্যা। আলো ঝলমল কামরায় যাত্রীরা জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। একটা শীর্ণ আইভিলতার ছোট্ট টব হাতে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন সেবাপরায়ণা মহিলাটি। দার্শনিক পাদ্রী তাঁর সার্টের হাতা গুটোচ্ছেন। লম্বা ঝাড়ু হাতে পোর্টারটা এসে দাঁড়াল। টুপি মাথায় একজন কর্মচারী হাত বাড়াল স্বামীর টিকিটটা দেখবার জন্য। সুরু হ'ল টিকিট আর লাগেজ পরীক্ষার পালা।

দু'পাশে দেয়ালের সুড়ঙ্গ ভেদ ক'রে ট্রেন এগিয়ে চলেছে। একটু পরেই হবে যাত্রার সমাপ্তি, ষ্টেশনের ভিড়ে দেখা যাবে আত্মীয়-পরিজনের পরিচিত মুখ। বুকটা এখন বেশ হাল্কা মনে হচ্ছে। আর ভয় করবার কিছু নেই......

"এইবার ওঁকে বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যাক্" পাশে পোর্টারটার গলা শোনা গেল।

পোর্টারটা এরই মধ্যে স্বামীর টুপিটা তুলে নিয়ে তার লাঠির ডগায় ঘোরাতে ঘোরাতে কি যেন ভাবছে।

টুপিটার দিকে এক চমক দেখে সে কিছু বলতে গেল। হঠাৎ মনে হ'ল কামরার সব আলো নিভে গেছে, আলকাতরার মত কালো অন্ধকারের স্রোত পাক্ খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। সে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল কোনও একটা অবলম্বনের আশায়। মুখ থুবড়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল তার দেহ, পড়বার আগে মাথাটা ঠুকে গেল স্বামীর বেঞ্চের কানায়।

জীবন যাত্রা প্রণালী

উপানন্দ

আলস্য এত ধীরে ধীরে পরিভ্রমণ করে যে, সহজেই দারিদ্র্য এসে তার নাগাল পায়। অলস ও আড্ডাবাজ ছেলেমেয়েরা কোন দিনই লেখাপড়ায় ভালো হয় না, স্থান পায়না বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর। আজকের দিনে শুধু শিক্ষা নয়, উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন আছে, নতুবা পিছু হটতে হটতে শেষে দিশেহারা হবে। তোমাদের মধ্যে চিন্তাশক্তির ও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির উন্মেষ হওয়া দরকার। চিন্তার উর্ব্বরতা উত্তম জীবন-শস্য উৎপাদন করে।

পঠিত বিষয় নিয়ে সময়ে সময়ে প্রবন্ধ লিখ্‌বে। বিষয়বস্তু যত কঠিন হবে, ততই বেশী মনোযোগ দিয়ে বুঝ্‌বার চেষ্টা করবে, না বুঝে মুখস্থ করবেনা। পঠিত অধ্যায়গুলি বারেবারে পুনরালোচনা করবে। কৌশল না জানা থাকলে কোন কাজেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কৌশল জানা থাকলে উত্তম ভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মোটেই কঠিন নয়, এজন্যে প্রথমেই দরকার দৃঢ়সঙ্কল্প, আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি। তারপর দরকার ভালোভাবে সিলেবাস বা পাঠ্যতালিকা পড়ে নেওয়া। সংগ্রহ করে নেবে পূর্ব্বের প্রশ্ন পত্রগুলি।

এই সব প্রশ্নপত্র থেকে ধারণা করে নিতে পারবে কিরূপ ধরণের একই প্রশ্ন নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষার জন্যে দেওয়া হয়। প্রশ্নের ধরণ জানা থাকলে, উত্তর দিতে কষ্ট হবে না। উত্তম ভাবে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও প্রশ্ন বুঝবার ক্ষমতার অভাবে অনেক ছেলে-মেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোতে পারে না। প্রশ্নের ভাষা বোধগম্য হওয়া আবশ্যক। সিলেবাসে নির্দ্দিষ্ট পঠিতব্য বিষয়গুলি বারম্বার পড়ে আর আয়ত্তাধীনে এনে প্রশ্নোত্তর দেওয়া অনুশীলন করবে।

দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে অধ্যবসায়ী হয়ে পড়াশুনা সুরু করলে অতিসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ে নিশ্চয়ই ভালোভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোতে পারে। জান্‌বার আগ্রহ নিয়ে যে মানুষ সাময়িক ভাবে প্রশ্ন করে, সে প্রশ্নকে নির্ব্বোধ বলে প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু যে মানুষ জান্‌বার আগ্রহ নিয়ে কোন প্রশ্নই করেনা সে মানুষ থাকে চিরদিন নির্ব্বোধ। যারা পরীক্ষা-ভীতি-বিহ্বল হয়ে কেবল না বুঝে মুখস্থ করে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অপ্রত্যাশিতভাবে পরীক্ষোত্তীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে জ্ঞানার্জ্জনের অভাব হেতু, পদে পদে দুঃখ পেতে হয়। ভালোভাবে বরাবর উত্তমরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশের কৃতীসন্তান হোতে হোলে, তোমাদের পক্ষে উচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য, দৃঢ়সঙ্কল্প ও একনিষ্ঠ অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও ভবিষ্যৎ চিন্তা বা পরিণামদর্শিতা উত্তম মনঃসংযোগ ও মনস্তাত্ত্বিকজ্ঞান, সর্ব্বপ্রকার সঙ্গতি সামঞ্জস্য রক্ষা, উদ্দেশ্য বোধ, উত্তম ব্যবস্থাপদ্ধতি, সময়ের সদ্ব্যবহার, বিষয় বস্তুগুলির বারবার পুনরাবৃত্তির দ্বারা স্মরণ ও মননের অভ্যাস, সাহস ও আত্মবিশ্বাস, জান্‌বার উৎসাহ ও ঔৎসুক্য, পাঠে তন্ময়তা ও নিয়মিত অনুশীলন আবশ্যক। তোমরা জেনো বড় গাছ কুঠার দিয়ে এক কোপে কাটা যায় না, লেখা পড়াও তুড়ি মেরে হয়না। এজগতে দুর্গম পথের মধ্যদিয়ে যাত্রা করে দুর্লভকে পেতে হয়।

যে বিষয়ে চিন্তা করা যায়, মনই তাকে রূপায়িত করে। মানসিক শক্তি অর্জ্জন করলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। যে শিক্ষায় ভগবৎভক্তি নেই, সে শিক্ষায় সফলতা বশ্যতা আনা অসম্ভব। জাতীয়তায় বড় হোতে চাইলে সততা ও সুশৃঙ্খলতা অভ্যাস একান্ত আবশ্যক। অধ্যবসায়, মনঃ-সংযোগ, অধ্যয়ন, শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা ও দৃঢ়তা ভিন্ন জীবনে উন্নতি করা যায় না। আদর্শচরিত্র ভিন্ন বর্ব্বরতা ধ্বংস করা যায় না। অহং ও স্বার্থজ্ঞানে মনুষ্যত্ব লোপ পায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব লাভ। বল্গা-হীন বন্য পশুর মত যারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে প্রচণ্ড লোভ আর শক্তির আধিপত্যের প্রতিযোগিতা—এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তোমাদের এসে দাঁড়িয়ে মানব সভ্যতার সম্পূর্ণ এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করতে হবে বিপুল জ্ঞান-বিপ্লবের মাধ্যমে।

যে সত্য নতুন হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সেই সত্যকে যখন পুরাতন রূপে পাওয়া যায় তখন মোটেই বিস্ময়ের উদ্রেক করেনা। স্বার্থের ধূলি-জালে সত্য দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন না হয়। উত্তেজনার আধিক্যে শ্রদ্ধেয়কে কখন অসম্মান করবে না। যা শক্তি, অনেক সময়েই তা অশক্তির কারণ হয়ে ওঠে। তোমরা যথার্থ মানুষ হোলেই সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে কিন্তু মনুষ্যত্ব লাভের পথ সোজা নয়, এর জন্যে নীরব সাধনা ও একাত্মানুভূতি প্রয়োজন। জ্ঞানের পথ না ধরলে কোন শক্তি অর্জ্জন করা যায় না। স্থির বুদ্ধিও সংযম আবশ্যক। উত্তেজনা বশে কিছু করা উচিত নয়। তোমাদের সম্মুখে রয়েছে বিরাট কর্ত্তব্য ভার, জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সেই সব কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করতে হবে, এজন্যে এখন থেকেই জ্ঞানার্জ্জনের দিকে মনোনিবেশ কর যাতে আত্মোন্নতি হয়, শক্তি লাভ হয়।

জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দূর করা আবশ্যক, সভ্যতাকে সংশোধিত ও সঞ্জীবিত করা প্রয়োজন, নতুবা এ স্বাধীনতা লাভ মূল্যহীন। সংসারের আবর্তে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যারা ঘুর পাক খায় তারা মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করতে পারে না, দেশেরও উন্নতি করতে পারে না। শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় না হোলে উন্নতির স্তম্ভ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। বাংলার সভ্যতা সংস্কৃতি, শৌর্য্যবীর্য্য ও শিল্পনীতি তোমাদের একাগ্র সাধনার মাধ্যমে অত্যুন্নত হয়ে উঠুক। শক্তি, সাহসও নিয়মানুবর্ত্তিতা আয়ত্ত করে তোমরা চেষ্টা করবে সাময়িক প্রতিভাকে বিকীর্ণ করতে—ভীরুতার প্রশ্রয় দিলে স্বদেশের পতন অবশ্যম্ভাবী।

শূন্যগর্ভ অহঙ্কারের কোন মূল্য নেই। বৃষ্টিবিন্দুর মত ক্ষুদ্র কেউই নয় কিন্তু সংহত হোলে তাদের মত বলবান ও কেউ নেই। অতএব ঐক্য বদ্ধ বৃষ্টি বিন্দুর মত শক্তি অর্জ্জন করে দেশরক্ষার জন্যে দৃষ্টিপাত করো। যে সমাজে ঐক্য নেই, সে সমাজে শত নির্য্যাতন, শত লাঞ্ছনা ভোগ প্রত্যক্ষকরা যায়। একতার বলে অসাধ্যসাধন করা যায়। একতা-বদ্ধ হয়ে আমেরিকার অধিবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করেছিল একতাবদ্ধ ফরাসী জাতি বিপ্লব আনয়ন করে স্বেচ্ছাচারী ফরাসী সম্রাটের শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। ঐক্যবদ্ধ সমাজের ওপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে যে একা, তার মত অসহায় কেউ নেই। ঐক্যই বল। কাউকে হস্তগত করতে হোলে শুধু যুক্তি দেখালে চলবে না, তার আগে তার স্বার্থ দেখাতে পারলে তখন সে মনোযোগী হবে; দলে ভিড়বে। মানুষ যুক্তি দেখতে চায় না, সে যুক্তিতে তার স্বার্থ কতটুকু, সেইটাই দেখে আগে।

অপরের প্রতি প্রেমের বিস্তার মাৎসর্য্যের পরম ঔষধ। প্রেমই মাৎসর্য্য দমনের উপায়। আমাদের অভীষ্টলাভের পথ অতি দীর্ঘ, বহুকাল যত্ন ও চেষ্টা করে তবে সেই প্রার্থিত বস্তু লাভ করা যায়। শ্রেয় আর প্রেয় লাভ করতে হোলে কণ্টকাকীর্ণ জীবনপথে হাসি মুখে বীরের মত অগ্রসর হোতে হবে। স্বার্থান্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে সমাজের স্থিতি, শৃঙ্খলা ও উন্নতিবিধানের দিকে তোমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। প্রভুত্বপ্রিয়তার ফল ঝগড়া বিবাদ ও রক্তারক্তি। কর্ত্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দ্বন্দ্বসংঘর্ষ যুদ্ধবিগ্রহের মূলে আছে মানুষের প্রভুত্বপ্রিয়তা। যাদের মধ্যে প্রভুত্বপ্রিয়তা খুব বেশী, তারা মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে না, তারা দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

নিজের প্রতি ভালোবাসা ও নিজের সম্ভ্রম অব্যাহত রাখার চেষ্টার নাম আত্মাদর। প্রকৃত আত্মাদর সম্পন্ন ব্যক্তি আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্যে সর্ব্বদা যত্নশীল। এইসব ব্যক্তি কখন চরিত্র নষ্ট করে না। ইতিহাস যেমন মানবজাতির কাহিনী, জীবনচরিত তেমি মনুষ্যবিশেষের কাহিনী। জীবনচরিত পাঠ করলে তোমরা অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারবে। মহাত্মা ব্যক্তির জীবনের বৈচিত্র্যময় কাহিনীর মূলে আছে এক বলিষ্ঠ নীতিবোধ। এদিকে তোমরা দৃষ্টি আবৃত না করলে দেখতে পাবে মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠে মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটে।

রাত্রি আসে, সূর্য্যের সঙ্গীত শেষ হয় না। শীত আসে, পুষ্পের সঙ্গীত শেষ হয় না। চেতনা আসে, অজানার সঙ্গীত শেষ হয় না। মৃত্যু আসে, জীবনের সঙ্গীত শেষ হয় না। জন্মমৃত্যুর মাঝখানে আলো ছায়া। তৃণ থেকে মানুষটি পর্য্যন্ত নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে। এই প্রকাশের পথে যে নিরন্তর বেদনা, দুঃখ কষ্ট, এটা গ্রহণ করেই তো শ্রী। এই সাধনাতেই তো আনন্দ। দুঃখ দৈন্যকে মহাশক্তিরূপে অর্চনা করে বরা ভয় লাভ করতে হয়।

যারা আহত হবার জন্যে সৃষ্ট হয়েছে, তাদের আঘাত করো। যারা সুরলোকের শ্রী পেয়েছে তাদের বন্দনা করো। অর্চনা পাও, অনর্থ ঘটিও না। দেশ ও ধর্ম্ম যেখানে এক হয়ে গেছে, সেখানেই দেশাত্ম-বোধ। দেশাত্মবোধ যার মধ্যে নেই, সে দেশের কোন মঙ্গল করতে পারে না। আমাদের বেশীর ভাগ লোক স্বার্থপরায়ণ, খুব কম লোকই দেশকে ভালবাসে। আমাদের পূর্ব্বাচল থেকে কত মহিমাই না অস্ত গেল! তোমরা সাধনার দ্বারা সেই সব মহিমার আবির্ভাবকে ফিরিয়ে আনো। তোমাদের প্রত্যেক কথা ও কার্য্যের ভেতর ফুটে উঠুক নির্ভীকতা স্বজাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম। যে পথ ভ্রান্ত, সে পথে ভুলেও পদচারণ কোরোনা এইটুকুই আমাদের অনুরোধ।

প্রতিদান

ছায়া বলে, তরু ক্ষত বিক্ষত
কেন বল তব অঙ্গ ?
তরু বলে, আমি ক্লান্ত পথিকে
দিয়েছিনু মোর সঙ্গ।

—সাধন চৌধুরী

ষাঁড়ের লড়াই দেখ্‌তে গিয়ে

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার

গঙ্গাগবিন পাঁড়ে
ভাগ্নেকে তার সঙ্গে নিয়ে
ষাঁড়ের লড়াই দেখতে এলো
কল্‌কাতাতে—ফুটপাতেরি ধারে।
মস্ত দু'টো ষাঁড়
শিং নেড়ে সব গুঁতোগুঁতি
দু'দিক থেকে ঠোকাঠুকি
চলছে তখন ভীষণ দারি
লড়াই জোরদার।
পাড়াগাঁয়ের ষাঁড়—
দেখেই শুধু আসছে বারোমাস।
পালোয়ানী ভাগলপুরী ষাঁড়
দেখেনিত কোন দিনই
দেখেই দু'টো ভীষণ আকার
মনে তাদের বাড়ল উল্লাস।
ঠোকাঠুকি, দুরপাল্লা লড়াই দেখে
গঙ্গাগবিন কাঁপে
বুক কাঁপে তার দুরু-দুরু
ষাঁড়ের লড়াই দাপে।
গঙ্গা ফড়িং হাততালি দেয়
বারণ করে মামা
বলে—ফড়িং হাততালি তোর
থামা, ওরে থামা।
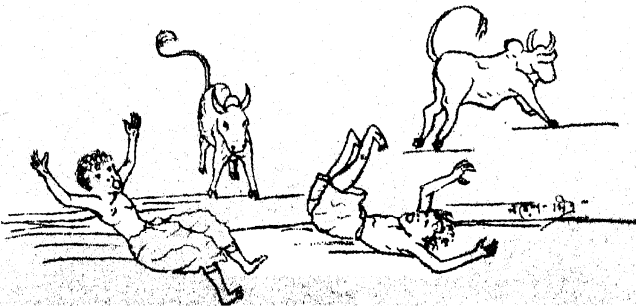
পাড়াগেঁয়ে ভূত
কে কার কথা শুনে তখন
থামাবে কোথা? বাড়িয়ে চলে
ক্রমশঃ চারগুণ।
আর কোথা যায়!
ষাঁড় দু'টো ধায়
তাদের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে
শিং জোড়া সব বাগিয়ে তুলে নিয়ে।
গঙ্গাগবিন সম্বন্ধে মামা
আগে ভাগে সটান পড়ে কেটে।
তবু কী তার রেহাই আছে
উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে গিয়ে
হোঁচট খেয়ে পড়ল দূরে
রক্ত পড়ে কপাল তাহার ফেটে।
ব্যাপার দেখে গঙ্গা ফড়িং
হক চকিয়ে যায়।
বিরাট ষাঁড়ের বিরাট গুঁতোয়
ছিট্‌কে পড়ে এ ফুট হতে
ওফুট গিয়ে ভীষণ ব্যথা পায়!
ভাগ্য তাহার জোর
শিংয়ের গুঁতোয় যায়নিক
পেট ফেঁসে!
পথের পথিক দু'জনে ধরে
দিয়ে এলো হাসপাতালে শেষে।
হাসপাতালে জীবন পেয়ে ফিরে
অনেক কষ্ট করে
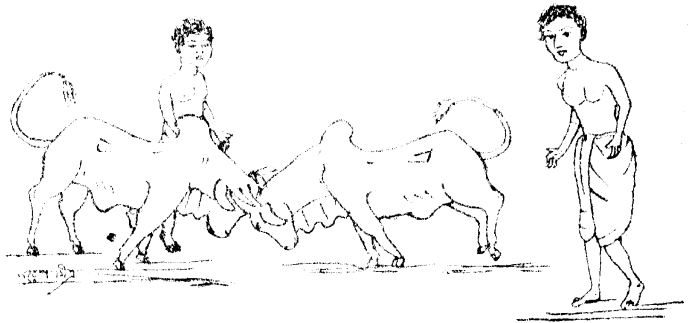
মামা ভাগ্নে ষাঁড় দেখলেই আজ
আগে ভাগে পালায় তারা
দু'একশো গজ সরে।
মনে মনে বলে আবার
ষাঁড়ের লড়াই খুব হয়েছে দেখা!
ষাঁড়ের লড়াই দেখতে গিয়ে—
খুব হয়েছে শেখা!

নাথানিয়েল হথর্ণ রচিত

হার্কুলিসের দ্বাদশ অভিযান

(সার-মর্ম)

সৌম্য গুপ্ত

প্রাচীন যুগের গ্রীক্-পুরাণের অদ্বিতীয় বীর ছিলেন হার্কুলিস্…স্বর্গ-রাজ্যের অধিপতি দেবরাজ জুপিটারের পুত্র। জুপিটারের স্ত্রী রাণী জুনোর আরো অনেক ছেলে-মেয়ে…কিন্তু তাদের দিকে না চেয়ে, দেবরাজ জুপিটার প্রাণের অধিক ভালোবাসতেন হার্কুলিস্‌কে। এজন্য হার্কুলিসের জন্মাবধি পুত্রের উপর মাতা জুনোর বিদ্বেষ ছিল খুব প্রবল।

হার্কুলিস্ যখন মাত্র আট মাসের শিশু, তখন তাঁর প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে শিশুর শয্যায় যে প্রকাণ্ড দুটি বিষধর সাপ রেখে দেওয়া হয়েছিল, হার্কুলিস্ ঐ বয়সেই ভীষণ সেই অজগর সাপ দুটির গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন।

হার্কুলিস্ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতা জুনো তাঁকে মেরে ফেলবার নানা চেষ্টা করেছিলেন…জুনো তাঁকে একদা এমনই দুরারোগ্য ব্যাধিভারে পীড়িত করেন যে, সে-ব্যাধির প্রকোপে হার্কুলিস্ কিছুকাল পাগল হয়ে গিয়েছিলেন… এবং এই পাগল থাকার সময় তিনি নানা অপ্রিয় কাজ করে স্বর্গের দেবতাদের অসন্তোষ ভাজন হয়ে ওঠেন।

তবে উন্মাদ-রোগ সারবামাত্র অভিশপ্ত হার্কুলিস্ বুঝলেন—কি কি অন্যায় করেছিলেন…সে জন্য তাঁর ক্ষোভ এবং অনুশোচনা হলো প্রচুর…অনুতাপে আক্ষেপ করে তিনি শুধু বলতে লাগলেন, কি আমি করবো? কি করলে আমার এ সব অপরাধের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবো… দেবতারা আবার প্রসন্ন হবেন?

তখন দৈববাণী শুনলেন—দীর্ঘ বারো বছর কাল তুমি রাজা ইউরিস্‌থিয়াসের সর্ব্ব আদেশ পালন করবে…তাঁর জন্য তোমাকে বারোটি অসাধ্য সাধন করতে হবে…তা যদি করতে পারো, তাহলে নরক সম্বন্ধে তুমি বহু সন্ধান পাবে এবং পরে স্বর্গে দেব-সমাজে দেবতা বলে পরিগণিত হবে!

এ বাণী শোনবামাত্র হার্কুলিস্ চললেন রাজা ইউরিস্‌থিয়াসের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন,—রাজা যে আদেশ করবেন, হার্কুলিস তা পালন করবে।

রাজা ইউরিস্‌থিয়াস্ খুব চতুর…তিনি হার্কুলিস্‌কে সাদরে অভ্যর্থনা করে মিষ্ট কথায় তাঁকে তুষ্ট করলেন, তবে মনে-মনে ফন্দী আঁটলেন হার্কুলিস্‌কে এমন কঠিন সব কাজের ফরমাশ করবেন যে সে সব কাজ করতে গিয়ে অভিশপ্ত দেব-রাজপুত্র হয় প্রাণ হারাবেন, নয় তো কর্ম্মে অসাফল্যের দরুণ হাস্যাস্পদ হবেন। ইউরিস্‌থিয়াস্ স্থির করলেন—রোজ বারোটি কাজ ফরমাশ করবেন। হার্কুলিসের প্রথম কাজের ফরমাশ—নেমিয়া অঞ্চলে একটা দুরন্ত সিংহ দারুণ অত্যাচার করছে…সেই অশান্ত উপদ্রবকারী সিংহকে বধ করতে হবে। রাজার বিপুল বাহিনী বেপরোয়া এই সিংহকে কোনমতেই কায়দা করতে পারেনি…সিংহের মুখে প্রাণ দিয়েছে! সে সিংহের এমন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যে তার ভয়ে ও-অঞ্চলে দিনে-রাতে কোনো মানুষ বাড়ী ছেড়ে বেরোয় না!

সিংহ কোথায় থাকে খবর জেনে হার্কুলিস্ তখনি যাত্রা করলেন। দুর্গম নিরালা গিরি-কন্দর…তীর-ধনু নিয়ে হার্কুলিস্ সেখানে পদার্পন করবামাত্র দুরন্ত সিংহ সতেজে কেশর ফুলিয়ে প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়লো…বিপুল-বিক্রমে সে হার্কুলিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে…কিন্তু সে ঝাঁপ আর দেওয়া হলো না—তার আগেই হার্কুলিসের তীরের অব্যর্থ

আঘাতে বিরাট সিংহ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে···হার্কুলিস্ ছুটে গিয়ে এক হাতে তার গলা চেপে ধরে তাকে প্রচণ্ড কয়েকটা মুষ্ট্যাঘাত করলেন···সে আঘাতে দুরন্ত সিংহ আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলো না—বীর হার্কুলিসের হাতেই সে প্রাণ হারালো! তখন প্রাণহীন বিরাট সিংহটাকে পিঠে তুলে হার্কুলিস ফিরলেন রাজা ইউরিস্থিয়াসের রাজ-প্রাসাদে।

সভায় এসে রাজার পায়ের কাছে প্রাণহীন বিরাট সিংহের দেহটা ফেলে দিলেন হার্কুলিস্। হার্কুলিসের এমন বিক্রম দেখে রাজা ইউরিস্থিয়াস্ শুধু অবাক হলেন না—তাঁর ভয় হলো! তাইতো, এমন বীর···একে তো সহরে থাকতে দেওয়া উচিত হবে না! কিন্তু, সে কথা বলেন কি করে! কাজেই ইউরিস্থিয়াস্ হার্কুলিস্কে বললেন—বেশ, এখন আর একটি কাজ করতে হবে! সাত-মাথা ভয়ঙ্কর এক অজগর সাপ আছে—তার নাম হাইড্রা·····তাকে বধ করতে হবে।

রাজার আদেশে হার্কুলিস্ তখনি বেরুলেন অজগর হাইড্রাকে মারতে। ইউরিস্থিয়াসও এই ফাঁকে আগাগোড়া পিতলের দুর্ভেদ্য এক প্রাসাদ তৈরী করিয়ে, সেই প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন।

ওদিকে সাত-মাথা অজগর হাইড্রাকে বধ করতে গিয়ে হার্কুলিস্ দেখেন যে সেই ভয়ঙ্কর জীবটিকে কাবু করা সহজ ব্যাপার নয়! হার্কুলিস্ ধারালো তলোয়ারের আঘাত হেনে হাইড্রার একটি মাথা কাটেন—সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দুটি মাথা গজিয়ে ওঠে! হার্কুলিস তখন নিরুপায় হয়ে বুদ্ধি ঠাওরালেন···বড় বড় লৌহদণ্ড জলন্ত আগুনে তপ্ত করলেন এবং অজগর হাইড্রার একটি করে মাথা যেমন কাটেন সঙ্গে সঙ্গে সেটির মূলে চেপে ধরেন ঐ অগ্নিতপ্ত লোহার দণ্ড·····তখন সেই কাটা-মাথায় আর নতুন করে মাথা গজায় না······এমনি করেই শেষ পর্যান্ত হার্কুলিসের হাতে হলো ভয়াল-অজগর হাইড্রার মৃত্যু!

হাইড্রাকে বধ করে হার্কুলিস্ ফিরে এলেন রাজা ইউরিস্থিয়াসের রাজধানীতে······প্রজার দল বিজয়ী বীর হার্কুলিস্কে জানালো অভিনন্দন। হার্কুলিসের এই অমিত-বিক্রমের পরিচয় পেয়ে রাজা ইউরিস্থিয়াস্ কিন্তু আরো শঙ্কান্বিত হয়ে উঠলেন।

তৃতীয় দফায় হার্কুলিসের উপর ইউরিস্থিয়াসের হুকুম হলো—রাজ্যের দূর-প্রান্তে অদ্ভুত একটি হরিণ আছে—বাতাসের চেয়ে দ্রুত তার গতি······সে হরিণের মাথায় আছে একজোড়া সোনার শিং, আর পা দু'জোড়া পিতলের—সেই হরিণকে ধরে আনতে হবে!

পিতলের পা আর সোনার শিং-ওয়ালা বিচিত্র-সেই হরিণ ভারী চঞ্চল···বনে-পর্ব্বতে বিচরণ করে বেড়ায়···তার নাগাল পাওয়া দায়! তীর-ধনু প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে হার্কুলিস্ অদ্ভুত সেই হরিণের সন্ধানে এক বছর দুর্গম বনে-পর্ব্বতে ঘুরে বেড়ালেন·····অবশেষে একদিন এক নদীর ধারে তাকে দেখে তিনি সেই সোনার শিং-ওয়ালা হরিণকে তাগ্ করে তীর ছুড়লেন······সে তীর লাগলো হরিণের একটা পায়ে···হরিণ জখম হলো, কিন্তু মরলো না। হার্কুলিস্ তাকে ধরে ফেলবার আগেই, সে হরিণ খোঁড়া-পা সত্ত্বেও বাতাসের বেগে ছুটে পালালো—কিছুতেই হার্কুলিসের অব্যর্থ তীরের লক্ষ্যের মধ্যে এলো না। নিরুপায় হয়ে হার্কুলিস্ শেষে বুদ্ধি খাটিয়ে ফাঁদ পাতলেন···সেই ফাঁদে হরিণ ধরা পড়লো! এমনিভাবে হার্কুলিস্ করলেন অসাধ্য সাধন।

তারপর চারের দফায় রাজা ইউরিস্থিয়াস্ হার্কুলিস্কে দুরন্ত একটি বন্য বরাহ শিকারের ফরমাশ করলেন···সে বরাহের দৌরাত্ম্যে প্রজাদের ধনপ্রাণ বিপর্য্যস্ত রাজার আদেশে সেই দুরন্ত বন্য বরাহকে তাড়া করে চললেন হার্কুলিস্। তাড়া খেয়ে পালাবার সময় শেষে বরফে-ঢাকা একটা গর্ত্তে পড়লো সেই বরাহটা···হার্কুলিস্ তখন ছুটে গিয়ে শক্ত কাছি দিয়ে তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললেন···বেঁধে জীবন্ত বন্যবরাহকে পিঠে তুলে তিনি ফিরে এলেন রাজা ইউরিস্থিয়াসের রাজ-সভায়! বরাহ দেখে রাজা যেমন বিস্মিত, তেমনি আতঙ্কিত হলেন বীর হার্কুলিসের শৌর্য্যে!

পাঁচের ফরমাশ—রাজা এজিয়াসের বিরাট গোশালায় রয়েছে তিনশো দুরন্ত বলদ···ইদানীং কয়েক বছর সে-গোশালা সাফ করা হয়নি, কারণ—বলদগুলো

কাকেও সেখানে ঢুকতে দেয় না···শিং উঁচিয়ে তাড়া করে, গুঁতোতে আসে—সেজন্য গোশালায় জঞ্জাল জমে আছে পাহাড়-প্রমাণ···হার্কুলিসের উপর আদেশ হলো রাজা এজিয়াসের গোশালা সাফ করে দিতে হবে।

আদেশমতো হার্কুলিস বেরুলেন রাজা এজিয়াসের গোশালার উদ্দেশ্যে। সেখানে হাজির হয়ে হার্কুলিস দেখেন—দীর্ঘকাল ধরে জঞ্জালের স্তূপ জমে থাকার দরুণ গোশালাতে সেঁধুনো অসম্ভব! হার্কুলিস তখন কৌশল করে সুদীর্ঘ ক'মাস ধরে গোশালার চারিদিকে গভীর নালা কাটলেন···তারপর সুকৌশলে গোশালার পাশেই যে খরস্রোতা নদী—সে নদীর স্রোত ফিরিয়ে এই নালা-পথে প্রবাহিত করালেন। নদীর ধারা-প্রবাহে নালা-পথে খরস্রোত বইলো এবং অবিলম্বেই নালার জল ছাপিয়ে স্রোতের বেগ প্রবেশ করলো পাহাড়-প্রমাণ জঞ্জাল-জমা গোশালার মধ্যে···তার ফলে, নালার জলের সেই খরস্রোতে গোশালায় স্তূপীকৃত যত জঞ্জাল নিমেষে হলো নিষ্কাশিত।

(আগামী বারে সমাপ্য)

চিত্রগুপ্ত

অন্যান্যবারের মতো এবারেও তোমাদের বিচিত্র-অভিনব একটি মজার খেলার কথা বলছি। নতুন এই খেলাটির নাম—"**কলার কেরামতি।**" ঠিকমতো কায়দা-কানুন রপ্ত করে নিয়ে, আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের সামনে বিচিত্র-মজার এ খেলাটি দেখিয়ে তোমরা তাঁদের শুধু আনন্দদান নয়, রীতিমত তাক্ লাগিয়েও দিতে পারবে অনায়াসে।

এ খেলার কায়দা-কানুনের কথা বলবার আগে, গোড়াতেই জানিয়ে রাখি—যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, সেগুলির মোটামুটি ফর্দ্দ। অর্থাৎ, এ খেলা দেখানোর জন্য চাই—বড় 'ফাঁদল' বা মুখওয়ালা লম্বা একটি কাঁচের বোতল, খানিকটা 'মেথিলেটেড্ স্পিরিট' (Methylated Spirit) এবং খোসাসমেত পুরুষ্টু একটি গলগলে পাকা কলা! এ সব উপকরণ সংগ্রহ করা এমন কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়—প্রত্যেকের বাড়ীতে সহজেই মিলবে।

এবারে বলি—"কলার কেরামতি" খেলা দেখানোর কায়দা-কানুনের কথা।
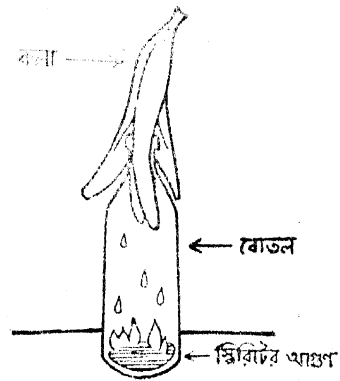
পাশের ছবিতে যেমন দেখতে পাচ্ছো, তেমনিভাবে কাঁচের বোতলটিকে সমতল টেবিল কিম্বা মেঝের উপর বসিয়ে রাখো। কাঁচের বোতলটি সংগ্রহ করবার সময় বেছে নিতে হবে যে বোতলের মুখ বা ফাঁদল এমন হয় যেন আস্ত কলাটি তার মধ্য দিয়ে বোতলের ভিতর প্রবেশ করতে পারে।

বোতলটি সমতল টেবিল বা মেঝের উপর বসিয়ে রাখার পর, পাকা কলাটির নিম্নপ্রান্তের খোসা একটুখানি ছাড়িয়ে নাও। তারপর ঐ কাঁচের বোতলের মধ্যে চায়ের চামচের এক চামচ পরিমাণ 'মেথিলেটেড্ স্পিরিট' ঢেলে তার উপর জ্বলন্ত দেশলাইয়ের একটি কাঠি বা জ্বলন্ত এক-টুকরো কাগজ ফেলে দাও···বোতলের ভিতরের স্পিরিট দপ্ করে জ্বলে উঠবে—সঙ্গে সঙ্গে ঐ নিম্নপ্রান্তের খোসা-ছাড়ানো পাকা কলাটিকে, এঁটে বসিয়ে দাও বোতলের মুখে—অর্থাৎ শুধু কলার ভিতরের শাঁসালো-অংশটুকু এঁটে

থাকবে বোতলের ফাঁদলে এবং বাইরের খোসা-আবরণ ঝুলবে বোতলের বাইরে—উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে! জ্বলন্ত স্পিরিট-ভর্ত্তি বোতলের মুখে এমনিভাবে এঁটে পাকা কলাটিকে বসিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে দুম্ করে শব্দ শুনতে পাবে—তার কারণ, ঐ জ্বলন্ত স্পিরিটে বোতলের ভিতরকার অক্সিজেন (Oxygen) বা অম্লজান বাষ্পটুকু নেবে শুষে···ফলে, বোতলের ভিতরের বাতাসের যে চাপ তার চেয়ে বোতলের বাইরের বাতাসের চাপ হবে অল্প এবং ঈষৎ-ছাড়ানো কলার খোসা আপনা থেকেই শাঁসালো-অংশ থেকে খসে ক্রমশঃ সমগ্রভাবে বোতলের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে। এমন হওয়ার কারণ, বাতাসের চাপে কলাটি ধাক্কা পেয়ে ক্রমশঃ বোতলের ভিতর দিকে নেমে যাবে এবং সেইজন্যই কলার শাঁসালো-অংশ বাইরের খোসা থেকে খসে-খসে পড়বে।

পাকা কলা ছাড়া, এমনি কায়দায় খোসা-না-ছাড়ানো সিদ্ধ ডিমের সাহায্যেও এ-ধরণের কেরামতির খেলা দেখানো যায়—এমন কি 'অ-সিদ্ধ' (Unboiled) ডিম ব্যবহার করেও! তবে 'অ-সিদ্ধ' ডিম নিয়ে এ খেলা দেখাতে হলে, সে-ডিমটিকে পূর্ব্বাহ্নেই বেশ খানিকক্ষণ ভালো 'ভিনিগারে' (Vinegar) ডুবিয়ে জীর্ণ করে রাখা চাই।

এই হলো এ খেলাটির মোটামুটি কায়দা···এবারে তোমরা নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে ছাখো, বিচিত্র-অভিনব বিজ্ঞানের এই মজার খেলাটি কত তাড়াতাড়ি এবং নিখুঁতভাবে রপ্ত করতে পারো!

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। কাটকুটের হেঁয়ালি ঃ

আমার কাছে তিনখানা খুব ভালো-কাঠের তক্তা আছে—তিনখানিই চৌকোণা, তবে ভিন্ন-ভিন্ন মাপের—একখানির মাপ ১২" ইঞ্চি×১২" ইঞ্চি; দ্বিতীয়খানির
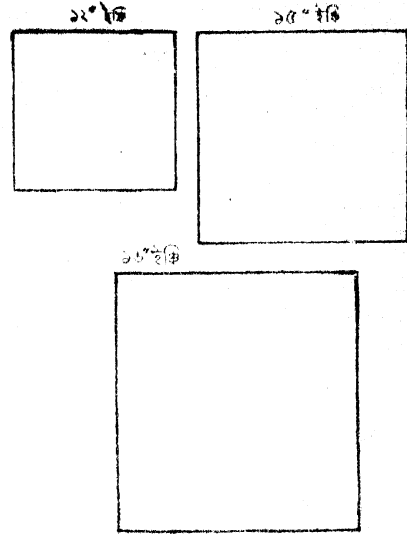
মাপ ১৫" ইঞ্চি×১৫" ইঞ্চি; তৃতীয়খানির মাপ ১৬" ইঞ্চি×১৬" ইঞ্চি। এই তিনখানা কাঠ বুদ্ধি খাটিয়ে কায়দামতো কাটকুট করে জুড়ে সাজিয়ে আমি একটা টেবিলের মাথা বা 'Top' তৈরী করতে চাই—টেবিলের মাথা বা 'Top'-এর মাপ হবে ২৫" ইঞ্চি×২৫" ইঞ্চি। এই তিনখানি কাঠ যত কম টুকরো করা যায়, সেদিকে নজর রেখে আমি মাত্র ছয়টি টুকরোতে এ কাজ করতে পারবো—হিসাব পাচ্ছি। এখন, তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে এঁকে দেখিয়ে দাও দিকিন, কিভাবে এই ছয় টুকরো কাঠ কাটকুট করে জুড়ে সাজালে ২৫" ইঞ্চি×২৫" ইঞ্চি মাপের টেবিলের মাথা বা 'Top' তৈরী হবে! যদি সঠিক জবাব দিতে পারো, তাহলে বুঝবো—বুদ্ধির জোর আছে রীতিমত!

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

তিন অক্ষরে নাম—বাড়ী থেকে নড়ে না। প্রথম দুই অক্ষরে কিছুই অজানা থাকে না। মাঝের অক্ষর কখনই 'হ্যাঁ' বলে না এবং মাঝের অক্ষর বাদ দিলে তাতে জল ভরে রাখি। প্রথম অক্ষর বাদ দিলে জল যাতায়াতের পথ বোঝায়। বলতে পারো এ ধাঁধার উত্তর?

কুণাল মিত্র (কলিকাতা)

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'
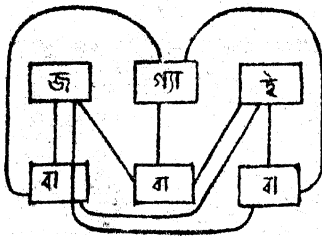
উত্তর :

পাশের ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবে—কিভাবে 'জল,' 'গ্যাস' আর 'ইলেকট্রিক' সরবরাহের কারখানাগুলি থেকে এই তিনটি জিনিষ বিভিন্ন 'পাইপ' বা 'নল' সংযোগে সহরের তিনটি বাড়ীতে জোগান দেওয়া যাবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

১। সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর)
২। বাপি, বুতাম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)
৩। প্রণীতা ও যশোজিৎ মুখোপাধ্যায় (ঢাকুরিয়া)
৪। শুভা, সোমা, অরিন্দম ও কল্পনা বড়ুয়া (কলিকাতা)
৫। পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু মুখোপাধ্যায় (মোগলসরাই)
৬। তিলোত্তমা, তাপসী ও টুটুল গুপ্ত (চাঁইবাসা)
৭। মুরারি পালচৌধুরী, সঞ্জয় বিশ্বাস, অমিয় রায় (ভিলাই)
৮। অনিন্দিতা, অবনীন্দ্র, অনসূয়া ও অবনীশ সেন (রাঁচী)
৯। কুলু ও রিন্‌টিন্ মিত্র (কলিকাতা)
১০। গৌতম, বুবুল, ফুল বসু (নাসিক)
১১। ফুলরেণু, গোপা, মন্দিরা, মোহন সান্যাল (দিল্লী)
১২। সচ্চিদানন্দ, সুনন্দা, জগদানন্দ, সুচন্দ্রা সেন (কাটিহার
১৩। শ্যামসুন্দর ধর
১৪। বাবলু, শ্যামা ও মান্ত্রিক হাজরা (পাটনা)

রেল চলে

শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত

রেল চলে—
ঝিক্‌ঝিক্ ঝক্‌ঝক্
যাত্রীর বক্ বক্
শত আশা-নিরাশায়
পায়েতে দলে।

ছেলে কাঁদে নাকি সুরে
মা তারে বুকে পুরে
মিঠি মিঠি গান গায়
কথার ছলে।

কত নদী-খাল-বিল—
শত পাখী গাঙ্-চিল
ডেকে ডেকে উড়ে যায়
ডানাটি মেলে।

মাঠে-ঘাটে প্রান্তরে
মানুষের অন্তরে
সুদূরের স্বপনের
ছায়াটি ফেলে।

কত বর কত বধূ
খুদিরাম ভিখু মধু
গাড়ি চড়ে মিলনের
নেশায় টলে।

বনে আর পাহাড়ে
ডাকে যেন কাহারে
নয়ন ভুলান ওই
ফুলে ও ফলে।

যুগে যুগে দেশে দেশে
ঝিক্‌ঝিক্ হেসে হেসে
দিনে রাতে রেল চলে
জলে ও স্থলে।

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্মা বিচিত্রিত

বেন্‌থাল্‌ : এরা হলো বিচিত্র এক ধরণের মাছ — সাগরজলের বাসিন্দা। এরা বসবাস করে সমুদ্রের অতল তলে — যেখানে গাঢ় আঁধারে আর কনকনে ঠাণ্ডা জলে আর কোনো মাছ বা সামুদ্রিক জীব সচরাচর বাস করতে পারে না — অর্থাৎ প্রায় হাজার 'ফ্যাদম্‌' (ছয় হাজার ফুট) নীচে সাগরের অতল গর্ভে। এ সব মাছ খুবই দুষ্প্রাপ্য।
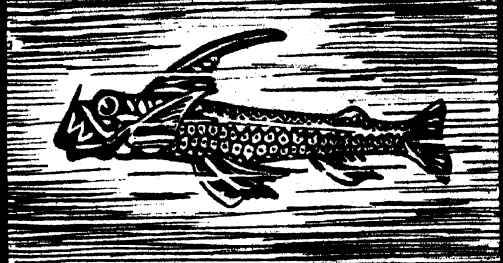
আভোসেট : এরা বিচিত্র এক ধরণের পাখী ... জলাশয়ের ধারে মাঠে-জঙ্গলে বাস করে। ইউরোপের বাসিন্দা। এরা হলো 'গ্যল্‌-পাখীর জাতভাই। জলের ধারে কাদামাটি আর পাঁকালো জমিতে বিচরণ করে মুখের ঐ বিরাট লম্বা বাঁকানো ঠোঁটের সাহায্যে পোকা মাকড় প্রভৃতি খুঁটে খেয়ে জীবনধারণ করে। এদের ঠোঁটের গড়নটি বক্র — সোজা নয়। তবে ইদানীং এ সব পাখী দুষ্প্রাপ্য হয়ে আসছে।

গৃহী-কীট : এরা বিচিত্র এক ধরণের সামুদ্রিক কীট... নলের মতো খোলশের আবরণে ঢাকা দেহ, শুঁয়া হলো ফুলের কেশরের মতো। সারা জীবন ধরে এরা দেহের চারদিকে এই নলের মতো খোলশ রচনা করে আপাদমোড়া শরীর ঢেকে রাখে, শুধু শুঁয়ার মতো একরাশ বাহুওয়ালা মাথাটি বাইরে বার করে রাখে। এই শুঁয়া-বাহু দিয়ে এরা ছোটখাটো সামুদ্রিক পোকা শিকার করে খায়। ফুলের মতো নানা বর্ণে রঙীন হয়।

মেঘ-মল্লার

অরূপ ভট্টাচার্য্য

আমি আষাঢ়ের খরতরা মেঘ বরিষণ-চঞ্চল
আমার উষ্ণা উরসে উথলে সপ্ত-সিন্ধু-জল
আমি অনিকেতা চির-যাযাবর
ছুটে পার হই মরু প্রান্তর
গিরি কান্তার গগন-চুম্বী সুদূর বিন্ধ্যাচল
আমি আষাঢ়ের খরতরা মেঘ বরিষণ-চঞ্চল ॥

আমি ধরণীর তরুণী কুমারী চির-যৌবনা নারী
উষার অঙ্গে শিশির বিন্দু আমি যাই সঞ্চারি'
সারথী আমার মলয় মরুৎ
আমি চমকাই খর-বিদ্যুৎ
আমার বক্ষে নাচে মহাকাল নাচে ঐ ত্রিপুরারী
আমি ধরণীর তরুণী কুমারী চির-যৌবনা নারী ॥

আমি আপনার মনে নীহারিকা তলে বিহার করি যে ব্যোম
কালো অঞ্চলে আবৃত করি গ্রহ সূর্য্য ও সোম
কখনো ধবলা ধুমল-ধূসরা
মরুভূর মত কভু বা উষরা
আমার অভাবে মর্ত্ত্যের লোক জ্বালে হবনী ও হোম
আমি আপনার মনে নীহারিকা তলে বিহার করি যে ব্যোম ॥

আমি যে নভগা বলাহক-নটী গাহি নট-মল্লার
নগ-নর্ত্তকী, নূপুরে আমার নদনুর ঝঙ্কার
কভু রিম্ ঝিম্ কভু ঝম্ ঝম্
গুরু গম্ভীর শত রঙ্গম্
সে যতি-ছন্দে নাচে আনন্দে তটিনী ও পারাবার
আমি যে নভগা বলাহক-নটী গাহি নট-মল্লার ॥

আমি অম্বুদা জন্ম আমার অগ্নির ঔরসে
তপন-তপ্ত এ তনু, পুষ্টা তবু মৃত্তিকা-রসে
আমার তুহিন্ তুষারের গুণে
প্রস্ফুট করি সুপ্ত প্রসূনে
আমারই মন্ত্রে কেকী-দম্পতি নাচে শৃঙ্গার-বশে
আমি অম্বুদা জন্ম আমার অগ্নির ঔরসে ॥

আমি প্রলয়-রূপিণী ঝঞ্ঝা-বাত্যা কুহেলী কুজ্‌ঝটিকা
গগনাঙ্গনে আমি এলোকেশী কৃষ্ণ-কুন্তলিকা
আমার আষাঢ়-আসার-ধারায়
সৃষ্টি স্থিতি মুছে যেতে চায়
নর ও চিতের চিত্তে জাগাই প্লাবনের বিভীষিকা
আমি, প্রলয়-রূপিণী ঝঞ্ঝা-বাত্যা কুহেলী কুজ্‌ঝটিকা।

আমি সুন্দরী বরষা রূপসী প্রাবৃট্-প্রাবৃষা
মোর নবোদকে নভোঃস্থুপ মিটায় কণ্ঠ-তৃষা
রস-রাসময়ী বীজস্থ বসুধা
সঞ্চিত করি মোর পয়োসুধা
স্তন-যুগে তার, জিয়াইয়া তোলে বীজনেষ্ঠু-ঈশা
আমি সুন্দরী বরষা রূপসী প্রাবৃট্-প্রাবৃষা ॥

আমার নীহার-নির্ঝর-বুকে কৃশানু-কিরণ-রাশি
অমৃত-স্বর্ণ-শরবৎ যেন বিচ্ছুরে যবে আসি'
মরকত মণি নিযুত বিথচি'
নভোনীলিমায় রামধনু রচি'
আপন লাস্যে আদিগন্ত উঠি আমি উদ্ভাসি'
ঊর্দ্ধে চাহিয়া উদধিমেখলা হাসে বিচিত্র হাসি ॥

আমি অমৃতা অমেয়া অমোঘা নাহি লয় নাহি ক্ষয়
বৈশ্বানরের বরে অমর্ত্ত্য মর্ত্ত্যের বিস্ময়
দ্যুপতির তাপে ত্যজিয়া দ্যুলোক
খুলি' আপনার নীর-নির্মোক
মাতৃ অঙ্কে লভি বার বার স্নেহাতপ আশ্রয়
আমি অমৃতা অমেয়া অমোঘা নাহি লয় নাহি ক্ষয় ॥

বর্ষারম্ভ—

শ্রীভগবানের কৃপায় ভারতবর্ষের বয়স ৪৮ বৎসর পূর্ণ হইয়া ৪৯ বৎসর আরম্ভ হইল। এই উপলক্ষে আমরা ভারতবর্ষের পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক প্রভৃতি সকলকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করি। যাঁহাদের প্রেরণা ও উৎসাহদানে ভারতবর্ষ এত দিন ধরিয়া তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে আজ তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কথা আমরা সর্বদা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি এবং প্রার্থনা করি, তাঁহাদের আশীর্বাদ যেন সর্বদা আমাদের সুপথে পরিচালিত করে। যে আদর্শবাদের কথা স্মরণ করিয়া 'ভারতবর্ষ' যাত্রাপথ আরম্ভ করিয়াছিল, সেই আদর্শবাদ যেন আমাদের সকল কার্য্যকে সুসম্পন্ন করিতে বুদ্ধি ও শক্তিদান করে—সকলের নিকট বর্ষারম্ভে আমরা সেই প্রার্থনাই জানাই।

কাছাড়ে হত্যাকাণ্ড—

আসামে ভাষা সমস্যা লইয়া সম্প্রতি কাছাড় জেলার বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীদের উপর আসাম সরকার যে নির্মম অত্যাচার অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহাতে শুধু আসামে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও দারুণ বিক্ষোভ দেখা গিয়াছে। ঐ দাঙ্গায় ১১ জন নিরপরাধ বঙ্গভাষাভাষীকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইয়াছে। আসামের তিন জিলায় বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক—সে স্থানের লোক বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে রাখিতে চাহে—কিন্তু আসামের বর্তমান মন্ত্রিসভা আসমীয়া ভাষাকে তাহাদের উপর চাপাইবার প্রস্তাব করিয়াছে। ফলে যে প্রতিবাদ-সত্যাগ্রহ হয়, তাহা দমন করিবার জন্য পুলিস গুলীবর্ষণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া কত প্রকারে বঙ্গভাষাভাষীদের উপর অত্যাচার করা হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাতে মানুষ আরও বিক্ষুব্ধ। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু প্রাদেশিকতার দোহাই দিয়া আসাম সরকারের এই অমানুষিক কার্য্য সমর্থন করিয়া তাঁহার অক্ষমতা ও শক্তিহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পক্ষে এই কার্য্য কিরূপ নিন্দার্হ, তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

পশ্চিমবঙ্গে হরতাল—

আসামে বঙ্গভাষাভাষী অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং তথায় যে ১১ জন লোক নিহত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য গত ২৪শে মে বুধবার পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হরতাল পালন করা হইয়াছিল। ঐ হরতাল শান্তিপূর্ণ ছিল এবং অপরাহ্ণে নিহত ব্যক্তিদের চিতাভস্ম লইয়া কলিকাতা সহরে এক বিরাট শোকযাত্রা বাহির হইয়াছিল—শেষে কেওড়াতলা শ্মশানে যাইয়া চিতাভস্ম গঙ্গাজলে সমর্পণ করা হয়। এই ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্যের বঙ্গভাষাভাষীদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গবাসীদের সহানুভূতি ও সমবেদনা মূর্ত হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ভাষা-সমস্যা লইয়া কোথাও জনগণের পক্ষ সমর্থন করেন নাই—ফলে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে—আসামে যদি বাংলাভাষাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করা না হয়, তাহা হইলে আসাম রাজ্য কয়ভাগে বিভক্ত হইবে কে জানে? নাগারা স্বতন্ত্র রাজ্য করিয়াছে—অন্যান্য পার্বত্য জাতিরাও পৃথক রাজ্য গঠন দাবী করিয়াছে—এ সময়ে বঙ্গভাষাভাষীরা স্বতন্ত্র রাজ্য দাবী করিলে তাহাদের কি অন্যায় হইবে?

দুর্গাপুরে এ-আই-সি-সি—

আসামে ভাষা সমস্যা লইয়া অনাচারের পরই পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর সহরে গত ২৮শে ও ২৯শে মে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভা হইয়া গেল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তথায় আসামের অনাচারের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

দুর্গাপুরে কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে ছোরা মারার চেষ্টা হইয়াছে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর যাত্রাপথে কৃষ্ণ পতাকা দেখানো হইয়াছে, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের গাড়ী লক্ষ্য করিয়া ইট ছোঁড়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় শ্রীবিজয় সিং নাহার প্রমুথ পশ্চিমবঙ্গের সদস্যগণ যে তীব্র ভাষায় শ্রীনেহরুর কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন, সেরূপ ভাষা নাকি শ্রীনেহরুকে পূর্বে কখনও শুনিতে হয় নাই। এমন কি, মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ও আসাম সমস্যা লইয়া কঠোর ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্যের সমালোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল প্রতিবাদই শেষ পর্য্যন্ত নিষ্ফল হইয়াছে। ইহার প্রতীকারের উপায় কি? পশ্চিমবঙ্গে আজ দারুণ দুরবস্থা—অবাঙ্গালীর চাপে পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙ্গালী আজ সকল দিক দিয়া বিপন্ন—কে এ অবস্থায় বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবে? আজ দেশবাসী ডাক্তার বিধানচন্দ্রের নিকট বলিষ্ঠতর নেতৃত্ব দাবী করিতেছে।

বলিষ্ঠতর নেতৃত্ব—

ভারতের সর্ববাদীসম্মত নেতা, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে আজ আর ভারতবাসী সন্তুষ্ট থাকিতে চায় না। চীনারা আসিয়া ভারতের উত্তরাংশে হিমালয় প্রদেশে এক বিরাট ভূখণ্ড দখল করিয়া বসিয়া আছে। পাকিস্তান-সরকার এখনও প্রায়ই পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে প্রবেশ করিয়া জোর করিয়া জমি দখল করিতেছে ও জিনিষপত্র লুঠ করিয়া লইয়া যাইতেছে। কাশ্মীর সমস্যা লইয়া কোন মীমাংসা হয় নাই, পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ কাশ্মীর কাড়িয়া লওয়ার ভয় দেখাইতেছে। এ অবস্থায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। পাকিস্তানের কাছে ভারত বহু টাকা পায়, সে টাকা আদায়ের জন্য এ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কোন চেষ্টাই হয় নাই। উপরন্তু পাকিস্তানের নূতন নূতন দাবী মিটাইবার জন্য ভারত সরকার সর্বদা উৎসুক। শ্রীজহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই করিতেছেন না। নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি রাজ্য লইয়া আজ সমস্যা উপস্থিত—যে কোন সময়ে ঐ সকল দেশ চীনা-কম্যুনিষ্ট রাজ্যের অধীন হইতে পারে। আসামও আজ সমস্যার দেশে পরিণত—কেন্দ্রীয় সরকার সে সমস্যা সমাধানে সমর্থ হইতেছেন না। এ অবস্থায় দেশবাসী শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছে না। যে কারণেই হউক, শ্রীনেহরুর নেতৃত্ব আজ দুর্বল—যে শক্তি ও সাহসের সহিত স্বর্গত সর্দার বল্লভভাই পেটেলের নেতৃত্ব কাজ করিয়াছিল, আজ ভারতবাসী বিশেষ ভাবে তাহার অভাব অনুভব করিতেছে। স্বর্গত গোবিন্দবল্লভ পন্থও আজ নাই—তাঁহার স্থানে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর নেতৃত্ব কি ভারতকে তাহার বর্তমান বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে? কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেননের বহুবিধ দুর্বলতা ক্রমে প্রকাশিত হওয়ায়, ভারতের জন-সাধারণ তাঁহার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। এ অবস্থায় শ্রীজহরলাল নেহরুর কর্তব্য কি—তাহা সকলের চিন্তার বিষয়। জহরলালের নেতৃত্বও আজ দুর্বল—কে তাঁহার মধ্যে শক্তিদান করিবে? ভারত আজ সর্বত্র বলিষ্ঠতর নেতৃত্বের জন্য উৎসুক—সে বলিষ্ঠতর নেতৃত্ব কোথায় পাওয়া যাইবে?

নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ কারখানা—

রাঁচীর নিকট হাতিয়ায় জেকোশ্লোভাকিয়া রাজ্যের অর্থ সাহায্যে একটি বড় নূতন যন্ত্র-নির্মাণ করখানা স্থাপিত হইবে। ঐ কারখানায় বৎসরে ১০ হাজার টন ভারী যন্ত্র প্রস্তুত হইবে—তাহার দাম হইবে বৎসরের ৮ কোটি টাকা। হাতিয়ার নিকট পূর্বে ২টি বড় কারখানা নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে—(১) হেভি মেশিন বিল্ডিং প্ল্যাণ্ট (২) ফাউণ্ডি ফোর্জ প্ল্যাণ্ট। প্রথম কারখানাটি সোভিয়েট অর্থ সাহায্যে নির্মিত হইবে—তাহার পাশে ১৮০ বিঘা জমির উপর নূতন কারখানা হইবে—তথায় ২ হাজার কর্মীর কর্মসংস্থান হইবে।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

যে সময়ে দেশের সর্বত্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিক উৎসব সম্পাদিত হইতেছে, সেই সময়ে গত ৩রা জুন শনিবার সকালে কবিগুরুর একমাত্র জীবিত পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার ডেরাডুন রাজপুরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার বিধবা পত্নী শ্রীমতী প্রতিমা দেবী বিদ্যমান। কবিগুরুর অপর পুত্র শমীন্দ্রনাথ বাল্যবয়সেই দেহত্যাগ

করেন। রথীন্দ্রনাথ বাল্যে আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া আজীবন পিতার সহিত শান্তিনিকেতন পরিচালনায় সহকর্মী ছিলেন। তিনি কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন ও কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তিনি বিশ্বভারতী সোসাইটীর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং কিছুকাল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থের লেখক ছিলেন এবং ইদানীং পিতার কথা লিখিতেছিলেন। তাঁহার ভগিনীদের মধ্যে শ্রীমতী মীরা দেবী জীবিত আছেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা—

ভাষা কমিটীর নির্দ্দেশ মত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ স্থির করিয়াছিলেন যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ৪টি ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে—(১) মাতৃভাষা (২) ইংরাজি (৩) হিন্দী (৪) সংস্কৃত। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা বোর্ড স্থির করিয়াছেন—৪টি ভাষা শিক্ষা করা কষ্টকর, কাজেই ৩টি ভাষা শিখিলেই চলিবে। (১) মাতৃভাষা (২) ইংরাজি (৩) যে কোন ভাষা। ফল কি হইবে? হিন্দী সর্বভারতীয় ভাষা—তাহা শিখিতেই হইবে। তবে কি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা বাদ দেওয়াই মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের উদ্দেশ্য? যে কোন ভারতবাসীর পক্ষে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা না করিলে তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইয়া যায়—ইহা প্রত্যেক ভারতীয়ের চিন্তা করা প্রয়োজন।

ভারতকে ঋণ দান—

গত ২রা জুন আমেরিকার ওয়াসিংটনে ৬টি রাজ্যের প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া স্থির করিয়াছেন ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যের জন্য তাঁহারা মিলিতভাবে ভারতকে ১ হাজার কোটি টাকা অর্থ-নীতিক সাহায্যদান করিবেন—দেশগুলি হইল (১) কানাডা (২) পশ্চিম জার্মানী (৩) জাপান (৪) বৃটেন (৫) মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র ও (৬) ফ্রান্স। ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক ও ইণ্টার ন্যাশনাল ডেভালপমেণ্ট এসোসিয়েসন এ বিষয়ে সম্মতি দিয়াছেন। অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন দেশের প্রতিনিধিরা ঐ আলোচনার সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই অর্থ-সাহায্য পাইলে ভারতে বহু নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মার্কিন সভাপতির শুভচেষ্টা—

আমেরিকার নব-নির্বাচিত সভাপতি মিঃ কেনেডি সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উৎসুক হইয়া গত ১লা জুন প্যারিসে যাইয়া ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি দ্য গলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহার পর জেনেভায় তাঁহার সহিত সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভেরও সাক্ষাৎ হইয়াছে। বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীর সহিত মিঃ কেনেডি পূর্বেই বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ কেনেডি ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিতও মিলিত হইতে চান। ইহার ফলে পৃথিবী হইতে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভাবনা দুরীভূত হইলেই সুখের কথা। আমরা মিঃ কেনেডির এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

পরলোকে ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী—

প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী এম-এ, এম-এস-সি, ডি-ফিল্, পি-আর-এস্ কলকাতায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া-

ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী

ছেন। বিহারের বক্তিয়ারপুরের ডাঃ মাখনলাল চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ডক্টর চৌধুরী ১৯৩৯ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সসম্মানে পদার্থ বিদ্যায় এম-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজী ও দর্শন শাস্ত্রে এম-এ ডিগ্রী লাভ করিয়া ডি-ফিল্ ও পি-আর-এস হন। শিলং কলেজে ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর ডাঃ চৌধুরী শান্তিনিকেতন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যায় ও দর্শন শাস্ত্রে রীডার পদে নিযুক্ত

হন। ১৯৫৩ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ সালে আমেরিকার দুইটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া এক বছর আমেরিকায় থাকেন এবং এথেন্স নগরীতে আন্তর্জাতিক এসথেটিকস্ সম্মিলনে সহ-সভাপতির কার্য্য করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বহু দেশী ও বিদেশী পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিদেশী ভাষায় লিখিত তাঁর সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক সুধী-সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। "ভারতবর্ষ" পত্রিকারও তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং তাঁর বহু প্রবন্ধ, গল্প প্রকাশিত হইয়াছে।

সদালাপী, সুদর্শন প্রবাসজীবন একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্চ্চ বলিতেছেন—"Pravas-Jiban was a philosopher of great ability. He developed a system of philosophy which was profound and original." কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক বার্ট বলছেন—"We thought of him also as one of the most promising philosophers, not just in India, but in the world."

দেশের এই সুসন্তান ডক্টর প্রবাসজীবনের বিশাল সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে সুখলাল কর্ণানী হাসপাতালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে। প্রবাসজীবনের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই। আশা হয় শ্রীভগবান প্রবাসজীবনের বৃদ্ধ পিতামাতা, পত্নী ও চারটি নাবালক সন্তানকে এই শোক সহ্য করিবার শক্তি দিবেন।

পাঞ্চেন-লামা গ্রেপ্তার—

তিব্বতে কম্যুনিষ্ট চীন হাঙ্গামা আরম্ভ করিলে অন্যতর ধর্ম-নেতা পাঞ্চেন লামা চীনের পক্ষে যাইয়া ধর্ম-নেতা দালাই লামার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। তাহার চেষ্টা সফল না হওয়ায় দালাই লামা ভারতে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। সম্প্রতি পাঞ্চেন লামা কমুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করায় তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পিকিংয়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তথায় তাহার বিচার হইবে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু—

গত ২৫শে মে ভারতের সর্বত্র বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মদিন পালিত হইয়াছে। ১৮৮৬ সালের ২৫শে মে জন্ম-গ্রহণ করিয়া (হুগলী জেলার বিঘাটি গ্রাম) ১৯১৫ সালের ১৫ই জুলাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দূতরূপে গোপনে জাপানে চলিয়া যান ও জাপানে থাকিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহারই সাহায্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষে আই-এন-এ দলগঠন সম্ভব হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তিনি জাপানেই দেহরক্ষা করেন। দুঃখের কথা ভারতবর্ষে আজও এই বিরাট বিপ্লবী নেতার স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। তিনি সুভাষ-চন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তিনিও সুভাষচন্দ্রের মত বর্তমান সরকারের কাছে অস্পৃশ্য হইয়া আছেন।

দূরযাত্রা

গৌরীশঙ্কর দে

কয়েক পলক মাত্র দূর দেশে যাত্রা তারপর
আমরা ফিরবোনা আর তুমিও না আমিও না, ঘর
খোলা-দরজা পড়ে থাকবে জানালাটা বন্ধ করতে তুমি
হয়তো ভুলে গিয়েছিলে একলা খাটে রূপসী মৌসুমী
শুয়ে থাকবে অন্ধকারে সারারাত খুলে তার চুল
সকালেই সরে যাবে ফেলে রেখে কবরীর ফুল
সব অ-গোছালো রইলো তুমি আমি দুজনেই স্মৃতি
জীবনে নেমেছে আজ নিয়তির মতো পরিমিতি।

উদ্বাস্ত !···

প্রথম পথচারী :—ইস্, এমন চোট-জখম !···গুণ্ডার হাতে, না গাড়ীর ধাক্কায় ?···
বাড়ী-ঘর নেই ?···স্ত্রী নেই ?···

জখমী গৃহবাসী :—সব আছে, মশাই·· সব আছে···

দ্বিতীয় পথচারী :—তাহলে, চলুন—আপনাকে বাড়ী পৌছে দি···সেখানে স্ত্রীর
সেবায় আরামে···

জখমী গৃহবাসী :—ও বাব্বা···বাড়ী !···স্ত্রী !···তাঁর হাতেই এ দশা, মশাই !···
কোনোমতে পথে পালিয়ে এসে দম নিচ্ছি !···

পৃথ্বী দেবশর্ম্মা।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উৎপল বুঝে নিয়েছে সতীশঙ্কর রায়ের জীবনী না লিখে তার আর উপায় নেই। কয়েক মাস ধরে ক্রমাগত আসা যাওয়ায় মিসেস রায়ের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাতে যে দায়িত্ব সে নিয়েছে, তা আর ফিরিয়ে দেওয়ার কথা সে ভাবতে পারে না। তা ছাড়া শুধু প্রীতির সম্পর্কই তো নয় আর্থিক সম্পর্কও রয়েছে। মাসের পর মাস সে মিসেস রায়ের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে, তার বিনিময়ে একখানি বই তাকে লিখে দিতেই হবে। যদি যে কোন একখানা বই লিখে দিলেই হত, তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু আর কিছু লিখলে চলবে না। সতীশঙ্করের জীবন-চরিত লিখতেই সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মিসেস রায় সেই জীবন-চরিতের পরিবর্তে আর কোন কিছু নিতে সম্মত হবেন না। অথচ এতদিন ধরে তার উদ্যোগ-পর্বেরই শেষ হল না। অনুরাধা অবশ্য আর আগের মত তাগিদ দেন না, খোঁজ নিতে আসেন না কোন দিন ক'পৃষ্ঠা লেখা হল, আগ্রহ প্রকাশ করেন না জীবন-চরিতের জন্য কী রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করেছে উৎপল। শুধু মাঝে মাঝে হেসে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার কাজ এগোচ্ছে তো ?'

অপ্রিয় সত্য বলতে সাহস পায়না উৎপল—জবাব দেয় 'একটু একটু এগোচ্ছে।'

অনুরাধা হেসে বলেন, 'এগোলেই হোল।'

একটি পরিচ্ছেদও এ পর্যন্ত লেখেনি উৎপল এই গোপন তথ্য কি তিনি ধরে ফেলেছেন ? লেখার চেষ্টা যে করেনি তা নয়। কিন্তু লিখেছে আর কেটেছে, লিখেছে আর ছিঁড়েছে। যা অবশিষ্ট আছে তা অনুরাধাকে দেখাবার মত নয়, শোনাবার মত নয়,তার পাঠযোগ্যতাই বা কতটুকু। কিছু কিছু তথ্য উৎপল কোন রকমে নোট করে রেখেছে মাত্র। কিন্তু তথ্য তো অনাবৃত কঙ্কাল। তার মূল্য কি ? মেদে-মজ্জায় শোভায় সজ্জায় তাকে রসের রূপ দিতে হবে। অস্থির কাঠামোর মত পুঞ্জীভূত তথ্যের স্তূপকেও গোপন করা চাই। নিজের পছন্দ মত একটি অধ্যায়ও উৎপল লিখতে পারেনি ? তার এই অক্ষমতার কথা কি অনুরাধা টের পেয়েছেন ? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে তিনি উৎপলকে বলে দিচ্ছেন না কেন, 'তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না।' কেন হাসি মুখে সরস সৌজন্যে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। টাকা দিচ্ছেন কিসের বিনিময়ে ?

টাকা দেওয়ার ধরণও বদলে গেছে অনুরাধার। প্রথম মাসে সই করে টাকা নিতে হয়েছে উৎপলকে। তারপর থেকে বিনা সইতেই নিতে হয়। উৎপল ভাউচারের কথা বলায় অনুরাধা হেসে বলেছেন, 'থাক না। আপনার

স্বাক্ষর নিশ্চয়ই মূল্যবান। কিন্তু তা রেভিনিউ স্ট্যাম্পের ওপর বড়ই অস্পষ্ট দেখায়।'

উৎপল বলেছিল, 'কিন্তু হিসেব-টিসেব না রেখে—'

অনুরাধা জবাব দিয়েছিলেন, 'হিসেব আমি রাখছি।' তারপর একটু হেসে বলেছিলেন, 'আপনাদের বে-হিসেবি হলেও চলে। কিন্তু আমরা কি আর হিসেব না করে চলতে পারি?'

কিন্তু সত্যিই কি হিসেব করছেন অনুরাধা? এই যে মাসের পর মাস টাকা দিয়ে যাচ্ছেন—এর বিনিময়ে প্রতিটি শব্দ প্রতিটি অক্ষর কি তিনি হিসেব করে নেবেন? অগ্রিম দাদনের পরিমাণ যত বাড়ছে তত শঙ্কিত হয়ে উঠছে উৎপল। এই ঋণ কি শেষ পর্যন্ত শোধ করতে পারবে? নাকি এই দাদন একদিন দান হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে?

ছিঃ, এমন লজ্জাকর অপমানের কথা উৎপল ভাবল কি করে? লিখে যদি মিসেস রায়ের টাকা সে শোধ দিতে নাই পারে, টাকাটা অন্য ভাবে সংগ্রহ করে ফেরৎ দেওয়া কি তার পক্ষে এতই কঠিন? এই একমাস সে নিজেকেও যাচাই করে দেখবে। এর মধ্যে যদি কিছু সে না লিখতে পারে সামনের মাস থেকে টাকা আর সে নেবে না। যা নিয়েছিল ফেরৎ দিয়ে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নেবে।

অবশ্য মিসেস রায়ের এখনকার ব্যবহার দেখলে মনে হয়না সহজে তিনি তাকে বিদায় দেবেন।

আজকাল প্রায় রোজ বিকেলে উৎপল এখানে আসে। না এলে অনুযোগ শুনতে হয়।

অনুরাধা বলেন, 'কাল কি হয়েছিল আপনার? মন খারাপ, না মাথা ধরা?'

উৎপলের ক্ষুণ্ণ হবার কোন কথাই ওঠে না। অনুরাধার সুর কৈফিয়ৎ তলবের মত নয়, বন্ধুর অদর্শনে অভিমানের মত।

উৎপল যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকে—আলাপ আলোচনায় গল্পে-সল্পে কিছুটা সময় কাটিয়ে যান অনুরাধা। উৎপল লক্ষ্য করেছে অন্য বৈষয়িক কাজের ফাঁকে এই সময়টুকু ব্যয় করে আনন্দ পান অনুরাধা। অন্য কোন আগন্তুক এলে কি কোন এলে তাঁকে উঠে যেতে হয়। কাজ সেরে আবার এসে বসেন। যেন গল্প করবার জন্যে আলাপ করবার জন্যেই উৎপলকে তিনি ডেকে এনেছেন। তার কাছে যেন আর কোন কাজের প্রত্যাশা নেই। লেখার জন্যে আজকাল আর কোন তাগিদ দেন না, তাড়া দেন না অনুরাধা। শুধু মাঝে মাঝে এক এক দিন বলেন, 'লিখুন আপনি। গল্প করে করে আপনার কাজের ক্ষতি করে গেলাম।'

উৎপল জবাব দেয়, 'ক্ষতি তো আপনার কাজেরও হল।'

অনুরাধা স্বীকার করে বললেন, 'তা তো হতেই পারে। দু-জনের কাজ যখন এক।'

উৎপল অবশ্য অনুরাধার অন্য কাজের কথা ভেবেছিল। কিন্তু জীবনী লেখায় তিনি যৌথ-দায়িত্ব স্বীকার করায় উৎপল খুসি হল।

কিন্তু খুসি হওয়াটা স্থায়ী হতে পারে কই। উৎপল যতক্ষণ এই বাড়িতে থাকে অনুরাধার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় সূক্ষ্ম হাসি পরিহাসে সময়টা বেশ ভালোই কাটে—কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নামলেই উৎপল অনুশোচনায় বিদ্ধ হতে থাকে। কিসের এক মোহজালে সে নিজেকে ক্রমেই জড়িয়ে ফেলছে। কয়েক মাস ধরে তার অন্য সব লেখা বন্ধ। অথচ জীবনী লেখার যে ফর-মায়েসী কাজ সে হাতে নিয়েছে তাতেও এগিয়ে যেতে পারছে না। এগোন তো ভালো—সে কাজ···আজও সে আরম্ভ করতেই পারেনি। অথচ দিনের পর দিন এখানে আসছে গল্প করছে, আর মাসের পর মাস আগাম টাকাও নিচ্ছে। এ যদি প্রতারণা হয় আত্ম-প্রতারণা। এতে নিজেরই বেশি ক্ষতি হচ্ছে উৎপলের। সে অন্য কোন লেখায় হাত দিতে পারছে না। এক অকৃতকর্মভার ভূতের বোঝার মত তার ঘাড়ে চেপে রয়েছে। এই ভার না নামাতে পারলে তার মুক্তি নেই।

সে এ বাড়িতে লেখক হিসাবে আসে বটে কিন্তু তার বৃত্তিটা আসলে বয়স্যের। মিসেস রায়কে সান্নিধ্য দেয়, সাহচর্য দেয়, তার মনোরঞ্জন করে। বেতনভুক লেখকের চেয়েও ধিক্কৃত বৃত্তি বেতনভুক বন্ধুর। এ বন্ধন ছিঁড়তে হবে—উৎপল মনে মনে বলল।

'এই যে কেমন আছেন? আপনাকে চা দিয়ে যাব এখন?'

পদ্মা এসে সামনে দাঁড়াল।

কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে কাগজের একটি পাতাকে রেখা-সংকুল করে তুলছিল, নারীকণ্ঠ শুনে মুখ তুলে তাকাল।

পদ্মা বলল, 'মিসেস রায় একটু দরকারী কাজে বেরিয়েছেন। আপনার যখন যা লাগে—'

উৎপল বলল, 'আপনার কাছে চাইবার জন্যে অনুমতি দিয়ে গেছেন এই তো ?'

পদ্মা বলল, 'বাঃ রে, অনুমতি আবার কিসের।'

উৎপল নিজের মনে হাসল! পদ্মা স্বীকার না করলে কি হবে, অনুমতি দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার প্রথম প্রথম ছিল বই কি। পদ্মা উৎপলের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে, বিনা দরকারে কথা বলে—তা অনুরাধা গোড়ার দিকে পছন্দ করতেন না। হয়তো তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল—পদ্মা সতীশঙ্করের জীবন সম্বন্ধে অনেক অবাঞ্ছিত গোপন তথ্য উৎপলকে বলে দিতে পারে। এখন বোধ হয় অনুরাধার সে ভয় নেই। তিনি কি পদ্মাকে সতর্ক করে দিয়েছেন? সত্য-মিথ্যা যাই কিছু জানুক পদ্মা অনুরাধার আশ্রিতা হয়ে তাঁর বিরুদ্ধতা করবার সাহস নিশ্চয়ই তার নেই। অনুরাধা এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছেন। আরো একজনের সম্বন্ধেও বোধ হয় এতদিনে তাঁর সংশয় ঘুচে গেছে। উৎপল উল্টোপাল্টা যত তথ্যই সংগ্রহ করুক, লিখবার সময় সব সোজা করেই লিখবে। একটিও বক্র রেখাপাতের সাধ্য তার নেই। সেই জন্যেই কি এত আলাপ আলোচনা প্রীতি আর সৌহার্দের প্রাচুর্য? আর্থিক আর সামাজিক সিঁড়ির উঁচু ধাপ থেকে সৌজন্যেই কি এই ঔদার্যের অবতরণ? কিন্তু তাই যদি হবে, তার জন্যে এত আয়োজন অনুষ্ঠান করতে হবে কেন অনুরাধাকে? তিনি তো একটি মাত্র কথায় নিজের নির্দেশকে স্পষ্ট করে তুলতে পারেন, 'আমি টাকা ব্যয় করছি, তাই আমি যা বলব তাই আপনাকে লিখতে হবে। যদি না পারে সদর দরজা খোলা আছে।'

একটি অঙ্গুলী সঙ্কেতই যেখানে যথেষ্ট, সেখানে কেন সর্বাঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়েছেন অনুরাধা। আর সে অঙ্গও তো যে সে অঙ্গ নয়। লাবণ্যে মাধুর্যে লালিত্যে প্রতি অঙ্গে যার পূর্ণতার স্বাক্ষর। তবে কি কাজ করতে এসে উৎপল যেমন কাজের কথা ভুলেছে, তিনিও কাজ আদায় করতে এসে কাজের কথা মনে রাখতে পারেন নি?

পদ্মা বলল, 'যাই। আপনি বোধ হয় লেখার কথাই ভাবছেন। আপনাকে ডিস্টার্ব করে গেলাম।'

উৎপল বলল, 'আরে না না বসুন। এখন লেখাটাই আমার পক্ষে একমাত্র ডিস্টার্বিং।'

পদ্মা হেসে বলল, 'আমি কিন্তু তা আগেই বুঝতে পেরেছি। লেখায় আপনার মন বসছে না। শুধু আজ থেকে নয়, গোড়া থেকেই।'

উৎপল বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

পদ্মা বলল, 'বাঃ রে, মানুষের ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় না? আমরা লেখক না হতে পারি, কিন্তু কার কখন লিখবার ইচ্ছে হয় কি না হয় তাও কি একটু আধটু বুঝতে পারিনে?'

উৎপল হেসে বলল, 'শুধু একটু আধটু কেন, আপনি মারাত্মক রকমের বেশি বুঝতে পারেন।'

পদ্মা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন!'

উৎপল প্রতিবাদ করে বলল, 'ঠাট্টা করব কেন, আপনি সত্যিই বুদ্ধিমতী।'

পদ্মা বলল, 'এবার যাই, আপনার চা করে নিয়ে আসি, তাহলে আপনার কাছ থেকে আরো সুখ্যাতি পাব।'

উৎপল বাধা দিয়ে বলল, 'না না, বসুন বসুন। আপনি ভাববেন না, এই সুখ্যাতির মধ্যে কোন রকম স্বার্থের সম্পর্ক আছে। না চাইতেই আপনাকে আমি প্রশংসা করেছি, তেমনি চা না চেয়েও আপনাকে আমি প্রশংসা করে যাব।'

পদ্মা বলল, 'থাক আপনার অমন বানানো প্রশংসা না শুনলেও আমার চলবে।'

একেবারে বানানো অবশ্য নয়। এ বাড়ির এই আশ্রিতা মেয়েটির মধ্যে প্রশংসা করবার অনেক গুণ আছে। রূপ-লাবণ্যে বুদ্ধিমত্তায় ব্যক্তিত্বে অনুরাধার কাছে পদ্মা অবশ্য দাঁড়াতে পারে না—কিন্তু স্নিগ্ধতায়, মাধুর্যে এই তন্বী শ্যামলা মেয়েটি অল্প সময়ের মধ্যে মনকে আকর্ষণ করে অনাত্মীয়কে আত্মীয় করে নেয়।

আরো একটি কারণে অনুরাধার এই পার্শ্বচরী মেয়েটি উৎপলের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। অনুরাধার কাছে ও তো ছায়ার মত, অস্পষ্ট, নেপথ্যচারিণী। কিন্তু যখনই
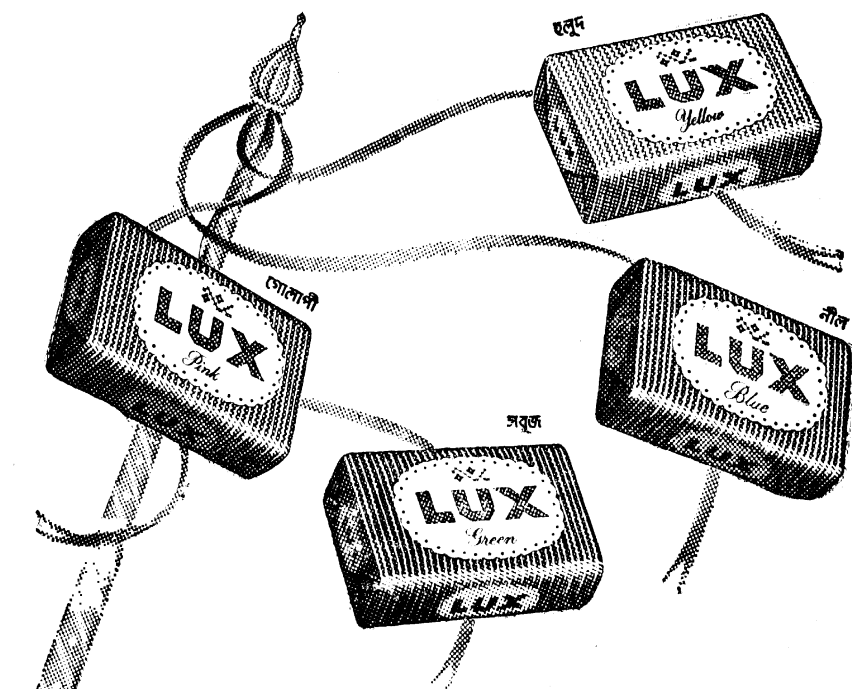
হলুদ
LUX
Yellow
গোলাপী
LUX
Pink
নীল
LUX
Blue
সবুজ
LUX
Green
বিশুদ্ধ, কোমল লাক্স এবার
৪টি রামধনু-রঙে
আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!
দেখুন ! লাক্স এবার চমৎকার কত সব নতুন রঙে ধরা দিয়েছে
টিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার প্রিয় বিশুদ্ধ লাক্স—ত্বকের
যত্ন নিতে যে সাবান আপনি চিরদিনই চেয়েছেন।
মঞ্জুলা ব্যানার্জী বলেন
'আমার প্রিয় লাক্সে যেন
রঙের মেলা লেগেছে,
এ এক অভিনব রচনা!'—
LUX
TOILET SOAP
চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্য-সাবান
LTS. 84-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

ও সামনে আসে—সেবিকার বেশে আসে। আর সে বেশ যে ওর ছদ্মবেশ নয়, তা ওর চাল-চলনে মৃদু-ভাষায় নম্র-ভঙ্গিতে চোখে পড়ে।

উৎপলের মাঝে মাঝে ভেবে অবাক লাগে পদ্মা কেন এ বাড়িতে আটকে রয়েছে। ও অনাথা হতে পারে কিন্তু অশিক্ষিতা তো নয়। নিজের খরচ নিজে চালিয়ে নেওয়ার মত টাকা ও রোজগারও করে। তবু কেন স্বাধীনভাবে থাকে না পদ্মা? কলকাতায় ভদ্র মেয়েদের থাকবার মত হোস্টেল বোর্ডিং-হাউসের তো অভাব নেই। হয়তো অভ্যাস—দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। কারো আশ্রয় আর অভি-ভাবকত্বের বাইরে নিজেকে মনে মনে মানিয়ে নিতে পারে না। একক নিরবলম্বভাবে দাঁড়াতে ভয় পায়। হয়তো ভাবে অস্থায়ী বোর্ডিং হস্টেলে গিয়ে কী হবে? একেবারে স্থায়ী ঘর সংসারের ব্যবস্থা করেই চলে যাবে পদ্মা। ও কি কাউকে ভালোবাসে? তেমন কোন পুরুষ কি ওর জীবনে এসেছে? যার অনুরাগের রঙে ওর মন রঞ্জিত হয়েছে? কিছুই জানবার জো নেই। পদ্মা নিজের সম্বন্ধে বড় চাপা। মনে হয় সোনার ঝাঁপির মুখ সে বন্ধ করে রেখেছে। কিছুতেই সে তা খুলবে না। হয়তো কেউ আসেনি। বেশির ভাগ মেয়ের জীবনেই বিয়ের আগে কোন পুরুষ আসে না, তেমন আলাপ-পরিচয় মেলামেশার সুযোগ হয় না। ভালোবাসা তো গায়ে পড়ে হবার জো নেই। তার জন্যে বাইরে অনুকূল ঘটনার সমাবেশ চাই, মনে এক বিশেষ ধরণের আগ্রহ আর প্রবণতা থাকা চাই। সতীশঙ্করের মত এক দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ববান পুরুষ ছাড়া সহজ সুস্থ স্বাভাবিক সাধারণ কোন ছেলেকে কি পদ্মার চোখে পড়েনি?

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর পদ্মা জিজ্ঞাসা করল, 'কী ভাবছেন বলুন তো?'

উৎপল বলল, 'বললে কি বিশ্বাস করবেন? আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

পদ্মার মুখে লজ্জার আভাস দেখা গেল। শুধু আভাস নয়, আভাও। সহসা পদ্মা কোন জবাব দিতে পারল না।

উৎপল একটু অনুতপ্ত হল। ছি ছি মেয়েটি কী মনে করল তার সম্বন্ধে। নিশ্চয়ই চটুল, পেশাদার নারী-স্তাবক বলে ধরে নিল ওকে। অথচ অন্তত এই মেয়েটিকে স্তুতি করতে সে চায়নি। সত্যি সত্যি যা ভাবছিল তাই বলেছে। কিন্তু মনের যথার্থ ভাবনাকে মুখে প্রকাশ করতে গেলে মাঝে মাঝে তার কী অর্থান্তরই না হয়।

পদ্মা বলল, 'বানিয়ে বানিয়ে লেখার মত বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতেও আপনারা ওস্তাদ। সংসারে কেউ আমার কথা ভাবে না। কেউ ভাবুক, আমি তা চাইওনে।'

উৎপল বলল, 'চান না কেন?'

পদ্মা বলল, 'আমার সম্বন্ধে যে ভাববে তার সম্বন্ধেও আমাকে ভাবতে হয়। কাজ কি অত হাঙ্গামায়, ওসব থাক। আপনার লেখার কথা বলুন। আপনার লেখা কেন এগোচ্ছে না বলুন তো? কোথায় অসুবিধে হচ্ছে আপনার?'

উৎপল বিস্মিত হয়ে পদ্মার দিকে তাকাল। মনে হল তার অসুবিধার কথা এমন আন্তরিকতার সঙ্গে অনুরাধা নিজেও যেন কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন নি।

কী জবাব দেবে কিছু ভেবে না পেয়ে উৎপল বলল, 'অসুবিধে আর কী এমন—'

পদ্মা বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন না। নিজের কথা আপনি সব সময় গোপন করে যান, আর বলেন আমি নাকি সব চেয়ে চাপা। আসলে চাপা কিন্তু আপনি নিজে।'

উৎপল স্মিত মুখে চুপ করে রইল।

পদ্মা বলল, 'আমার কি মনে হয় জানেন? সতীশঙ্করদা চান না, তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা হোক।'

পদ্মার এই অদ্ভুত কথায় উৎপল বিস্মিতও হল, একটু কৌতুকও বোধ করল। একটু হেসে বলল, 'যিনি আর এ জগতে নেই তাঁর চাওয়া না চাওয়াই বা কী করে থাকে? আপনি কী ভাবে টের পান? আপনি কি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন?'

পদ্মা বলল, 'ওভাবে বলবেন না। ও শব্দগুলি শুনতে বড় বিশ্রী লাগে। বিশ্বাস ঠিক করিনে। তবে মাঝে মাঝে তাঁর কথা একা একা ভাবতে বড় ভালো লাগে।'

উৎপল বিস্মিত হয়ে বলল, 'ভালো লাগে?'

পদ্মা বলল, 'বাঃ, লাগবে না? তিনি শুধু আমাকে আশ্রয় দেন নি, তিনি—তিনি—তাঁর স্নেহও তো আমি পেয়েছিলাম।'

উৎপলের মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। স্নেহ! কী ধরণের স্নেহ? সেই স্নেহ কি অবিমিশ্র ছিল? পদ্মা কি জানে না অমন স্নেহ তিনি হয়তো তার মতো আরো অনেককে করেছেন? তবু কোন কৃতজ্ঞতায় যা একান্তভাবে ভুলে যাওয়া উচিত, তাই এই মেয়েটি তার গোপন মণি-কোঠায় সঞ্চয় করে রেখেছে? নাকি মৃত্যুপূত হলে আর কোন দোষ থাকে না, রক্তস্নানে সব মালিন্য ধুয়ে যায়?

কি উৎপল হয়তো নিজেই ভুল করছে। সহজ স্নেহ-প্রীতি কৃতজ্ঞতার সম্পর্ককে বক্র-দৃষ্টিতে দেখতে চাইছে।

উৎপল সহজ সুরে বলল, 'যখন একা একা তাঁর কথা ভাবেন—কী মনে হয় আপনার?'

পদ্মা বলল, 'কী আবার মনে হবে! বললে আপনি হাসবেন। মনে হয় তিনি যেন এ বাড়ির মায়া ছেড়ে চলে যেতে পারেন নি। অদৃশ্য এক ছায়ার মত এই বাড়ি-ঘর লোকজন জিনিষ-পত্রকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। ঠিক আগেও যেমন রাখতেন।'

উৎপল বলল, 'আশ্চর্য তো। এসব কথা আপনার মনে হয়?'

পদ্মা বলল, 'সবই অবশ্য বানানো। আপনারা যেমন বানিয়ে বানিয়ে বই লেখেন এও তেমনি। যারা লেখক নয় তাদেরও তো মাঝে মাঝে বানাতে ইচ্ছে করে; বানাতে ভালো লাগে।'

উৎপল বলল, 'তা লাগতে পারে বই কি। কিন্তু সতীশঙ্করবাবুকে নিয়ে একা একা এসব কল্পনা করতে আপনার ভয় করে না?'

পদ্মা বলল, 'না ভয় কিসের? প্রথম প্রথম আমি তাঁকে স্বপ্ন দেখতাম। নানা অবস্থায় নানা বেশে তাঁকে দেখতাম। তখনো তো ভয় করত না।'

উৎপল বলল, 'আশ্চর্য আপনার সাহস।'

পদ্মা জবাব দিল, 'আমার চেয়ে অনেক বেশি সাহস অবশ্য অনুরাধাদির। এই বাড়িতে কত কী কাণ্ড হয়ে গেল। তবু তো তিনি এখানে নির্ভয়ে বাস করছেন। তাঁর সাহসের তুলনা হয় না। তিনি তাঁর স্বামীর মতই অসাধারণ। সেই জন্যেই তো দুজনের মধ্যে অমন লাগত!'

উৎপল বলল, 'লাগত? বনিবনাও হত না বুঝি?'

পদ্মা এবার একটু ভয় পেয়ে বলল, 'দোহাই আপনার, আপনি যেন এসব কথা অনুরাধাদিকে বলবেন না।'

উৎপল পদ্মাকে ভরসা দিয়ে বলল, 'আরে না না, আপনি কি ক্ষেপেছেন? একজনের কথা আর একজনের কাছে বলা আমার মোটেই অভ্যাস নয়। ঝগড়াটা কার দোষে লাগত?'

পদ্মা বলল, 'দোষের কথা বলতে গেলে দোষ অবশ্য সতীশঙ্করদারই বেশি ছিল। কিন্তু জানেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্যে আমার মায়া হয়।'

উৎপল হেসে বলল, 'এ কথা শুনে আমারও দোষী হতে লোভ হচ্ছে।'

তার কথার ধরণে পদ্মাও হেসে ফেলল, 'আপনি কি কারো চেয়ে কম দুষ্টু নাকি?'

উৎপল জবাবে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। দোরের কাছে এক দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ এসে দাঁড়াল। কালো, হতচ্ছাড়া চেহারা। বয়স বছর চল্লিশেক হবে। ছিটের একটা জামা পরণে। কাঁধের কাছে ছেঁড়া। শক্ত চোয়াল-লাগা মুখ—চোখ দুটি রক্তাভ। উৎপল এক নিমেষেই বুঝতে পারল লোকটি তাদের সমাজের কেউ নয়। সে উৎপল আর পদ্মার দিকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়েছিল; সে দৃষ্টিতে বিদ্রূপ আছে, ঈর্ষা আছে, স্বাচ্ছন্দ্য মোটেই নেই। উৎপল চোখ ফিরিয়ে নিল।

লোকটিকে দেখে পদ্মাও বিরক্ত আর বিব্রত হয়েছিল। অপ্রসন্নভাবে বলল, 'কি নিশিকান্ত, তুমি যে এখানে?'

নিশিকান্ত তার ময়লা দাঁতগুলি বের করে একটু হাসল, 'দরকার পড়লেই আসি। তোমাদের দরকার ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু আমার তো আর ফুরোয়নি। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।'

পদ্মা গম্ভীরভাবে বলল, 'কাজ-কর্ম করবে না, সে জ্বালা মিটবে কি করে? আজ তুমি এসো, দিদিমণি বাড়ি নেই।'

নিশিকান্ত বলল, 'দারোয়ানও তাই বলছিল। আমি তাকে থাবড়া মারবার ভয় দেখিয়ে ভিতরে চলে এসেছি। সত্যি বাড়ি নেই?'

পদ্মা বলল, 'সত্যি না কি মিথ্যে? আজ যাও।

গোলমাল কোরো না। আজ আমরা দরকারী কাজে ব্যস্ত আছি।'

নিশিকান্ত হাসল, 'কাজ যে কত দেখতেই পাচ্ছি। আমারও জরুরী কাজ আছে আজ। দিদিমণির সঙ্গে দেখা না করে আজ আমি যেতে পারব না।'

পদ্মা বলল, 'কিন্তু ওঁর ফিরতে দেরি হবে। অপেক্ষা যদি করতেই হয় বাইরে গিয়ে বোসো। এখানে আমরা কাজে আছি।'
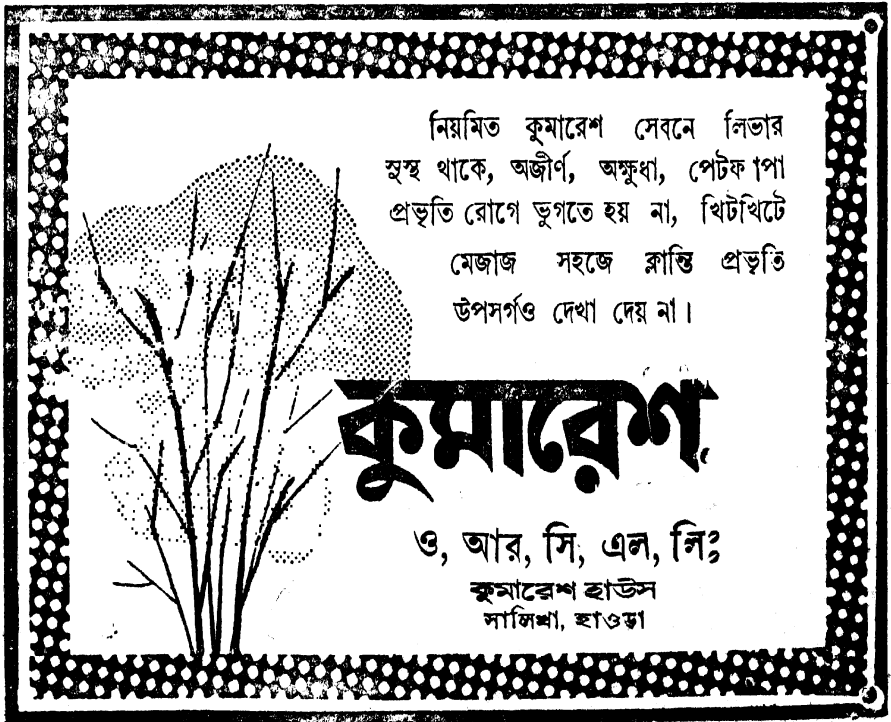
নিশিকান্ত উৎপলের দিকে আর একবার বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর পদ্মার দিকে চেয়ে বলল, 'বেশ তো তোমাদের যত কথা থাকে বলবে। কিন্তু আমার একটা কথাও তোমাকে শুনতে হবে। 'না' বললে কিছুতেই চলবে না।'

পদ্মা পরম অনিচ্ছার সঙ্গে ঘর থেকে বারান্দায় নামল; তারপর নিশিকান্তকে আড়ালে ডেকে নিয়ে তার কথা শুনতে গেল।

উৎপল অবাক হয়ে ভাবতে লাগল নিশিকান্তের মত লোকের এত জোর এ বাড়িতে কিসের জন্যে? কোন রহস্য আছে এই শক্তির মূলে?

[ক্রমশঃ

❋ মেয়েদের কথা ❋

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী

স্নুবর্ণা ভট্টাচার্য

সেদিন রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলুম স্থানীয় এক সভায়। সেখানে কয়টি মেয়ের চাল-চলন, মাথায় ঘোড়ার লেজের বাহার দেখে মনে হচ্ছিল—"হায় কবিগুরু, আজকে তোমার পূজারিণীরা মেতে উঠেছে তোমার মূর্তিপূজায়। তাদের মনে নেই তোমার দর্শিত পথের বিন্দুমাত্র ধারণা, তোমার আদর্শের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা।" বড় দুঃখ হচ্ছিল মনে। কবি যে এত বিদ্রূপের কশাঘাত করে গেলেন তথাকথিত প্রগতি-শালিনীদের নিষ্ঠুর ভাষায়, তার কি ফল হ'ল? শেষের কবিতায় কেতকীর যে বর্ণনা করেছেন কবি তা কি স্পর্শ করতে পারে নি এই অতি-আধুনিকাদের মনকে? উদ্ধৃত করছি সকলের স্মরণের উদ্দেশ্যে—

'কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কায়দা-কারখানার বকযন্ত্র পরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা—বিলিতি কৌলিন্যের ঝাঁজালো এসেন্স। সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘ কেশ-গৌরবের প্রতি গর্ব সহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মত বিলুপ্ত হয়ে অনুকরণের উল্লম্ফনশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা-বর্ণ প্রলেপের দ্বারা এনামেল করা। জীবনের আদ্য লীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ। এখন মনে হয় সে যেন যাকে তাকে দেখতেই পায় না। যদি বা দেখে তো লক্ষ্যই করে না। যদি বা লক্ষ্য করে তাতে যেন আধখোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম বয়সে ঠোঁট দুটিতে সরল মাধুর্য ছিল। এখন বার বার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনাড়ি, তার পরিভাষা জানি নে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাতলা পাতলা সাপের খোলসের মত ফুর-ফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানি অনাবৃত, আর অনাবৃত বাহু দুটিকে কখনো টেবিলে, কখনো চৌকির হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গিতে আলগোছে রাখবার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর যখন সুমার্জিত-নখর রমণীয় দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলংকরণের অঙ্গরূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশ্যে নয়। সবচেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে সেটা ওর সমুচ্চ খুরওয়ালা জুতোজোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায়, যেন ছাগল-জাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টি-কর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দত্ত পদোন্নতির কিম্ভূত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়।"

কবি কি তবে প্রাচীনাদের পক্ষপাতী? মোটেই নয়। শিক্ষাদীক্ষা-বিবর্জিতা, শুধু ঘর-কন্না, আর শাড়ী-গয়নাগতপ্রাণা নারীদের কি নির্মমভাবেই তিনি আঘাত দিয়েছেন! মণিহারা গল্পে তাঁর নিদারুণ বিদ্রূপ মূর্তি-মান্ হয়ে উঠেছে অলংকারভারাক্রান্ত কংকালে।

কবি নারীর সুমহান আদর্শ এঁকেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্র যোগাযোগের কুমু, গোরার আনন্দময়ী ও সুচরিতায়। সেবার আদর্শে ছোট্ট মেয়ে পোষ্টমাষ্টারের রতন অতুলনীয়া। চিত্রাঙ্গদা স্বাধীনা নারীর উজ্জ্বল আলেখ্য। যোগাযোগের কুমু কোমল কিন্তু তেজস্বিনী। জীবের দুঃখে তাঁর অন্তর আর্দ্র হয়। কিন্তু ঔদ্ধত্যের কাছে কখনও মাথা নত করে নি।

গোরার আনন্দময়ী মাতৃত্বের উজ্জ্বল আদর্শ।—"ঘর দুয়ার মাজিয়া ঘসিয়া, ধুইয়া মুছিয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া সেলাই করিয়া গুন্তি করিয়া, হিসাব করিয়া, ঝাড়িয়া, রৌদ্রে দিয়া আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীর খবর লইয়া, তবু তাঁহার সময় যেন ফুরাইতে চাহে না।" তাঁর মাতৃহৃদয় গোরার প্রসঙ্গে উদ্বেল হয়ে বলছে, "তোকে কোলে নিয়েই আমি আমায় ভাসিয়ে দিয়েছি তা জানিস?···ছোট ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায়, জাত নিয়ে কেউ জন্মায় না। তুই আমার কোল ভরে ঘর আলো করে থাক; আমি পৃথিবীর সকল জাতের হাতেই জল খাব।"

তারপর কি মনোরম গোরার সুচরিতার চিত্র! "সুচরিতা তাঁহার শিষ্যা, তাঁহার কন্যা, তাঁহার সুহৃদ্। সে তাঁহার জীবনের এমন কি ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। যে-দিন সে নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার উপাসনার সহিত যোগ দিত, সে দিন তাঁহার উপাসনা যেন পূর্ণতা লাভ করিত।···সুচরিতা যেমন ভক্তি, যেমন একান্ত নম্রতার সহিত তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন করিয়া আর কেহ তাঁহার কাছে আসে নাই। ফুল যেমন করিয়া আকাশের দিকে তাকায়, সে তেমনি করিয়া তাঁহার দিকে তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে উন্মুখ এবং উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। এমন একাগ্রভাবে কেহ কাছে আসিলে মানুষের দান করিবার শক্তি আপনি বাড়িয়া যায়। অন্তঃকরণ জলভারনম্র মেঘের মত পরিপূর্ণতার দ্বারা নত হইয়া পড়ে। নিজের যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, তাহা যেন অনুকূল চিত্তের নিকট প্রতিদিন দান করিবার সুযোগের মত; এমন শুভযোগ মানুষের কাছে আর কিছু হইতেই পারে না; সেই দুর্লভ সুযোগ সুচরিতা পরেশকে দিয়াছিল।"

কিন্তু ইহাই রবীন্দ্রনাথের নারী আদর্শের শেষ কথা নহে। নারীকে তিনি শুধু পুরুষের লীলাসঙ্গিনী বা সেবা-সঙ্গিনী দেখতে চান নি। কর্তব্যে নারীকে তিনি পুরুষের পাশে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চিত্রাঙ্গদায় নারীর সে কণ্ঠ বেজে উঠেছে—

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেত আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নই। যদি পার্শ্বে রাখো
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারীর আদর্শ এই কয়টি দৃষ্টান্তেই স্পষ্ট বুঝা যেতে পারে। এমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারা যেত। কিন্তু তার দিকে নজর দেবার মত চোখ কোথায়? আজকালকার বাগাড়ম্বর ও হাস্য-লাস্যের কোলাহলে নারীদের সে সকল আদর্শের কথা ভাববার অবসর আছে কি?

—

রমণী রত্ন

ভদ্রাবতীর বিয়ে

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

কমলাপুরের রাজকুমারী ভদ্রাবতীর মনটা যেন বিষাদে ভ'রে গেছে। বসন্তের সায়াহ্নে তিনি তাই রাজপ্রাসাদের ভিতরে একটি উদ্যানে পায়চারি ক'রতে ক'রতে ভাবছেন-"কেন মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম।"

প্রায় আটশ বৎসর আগেকার কথা। মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের তরবারির আঘাতে শোণিতাক্ত হয়েছে নদীয়া। মহারাজ লক্ষ্মণ-সেনের মৃত্যুর ফলে চূর্ণ হ'য়েছে সেনরাজবংশের গৌরব। পাঠান সেনার আক্রমণের ফলে বিস্তৃত গৌড় সাম্রাজ্যের অতীত গরিমা বিলুপ্ত হয়ে কয়েকটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। সেই সময়, সেই সকল খণ্ড রাজ্যের মধ্যে একটির অধিপতি অচ্যুত সেন তখন উত্তর-বাংলার এক দুর্গনিকেতনে রাজধানী স্থাপন ক'রে সেনবংশের পূর্ব্ব-গৌরব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা ক'রছেন।

রাজ্যের নাম কমলাপুর। করতোয়ার শ্যামল তীরে সে রাজ্য—আয়তনে ছোট; কিন্তু ধনের, মানের ও বিদ্যার গৌরবে গরীয়ান। সে রাজ্যের অশ্বারোহী কত, পদাতিক কত। রণতরীই বা কত।

সকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর তোরণে কামান ডাকে, আদেশমাত্র সেজেগুজে সেনা দাঁড়ায়। বাংলার মেয়েরা তখনও অতি সুকোমল হ'য়ে পড়েন নি ; তাঁদের কোমল বাহুতে তখনও তরবারি ধারণ ক'রবার ক্ষমতা ছিল, মনে ছিল দুর্দ্দমনীয় সাহস।

অচ্যুত সেনের পাঁচ বছরের মেয়ে—ভদ্রা, দোলপূর্ণিমার দিন সোনার একটা পিচ্‌কারী নিয়ে সেনাপতির আট বছরের ছেলে বিজয়বাহুর সঙ্গে হোলী খেলছিল। ফাগের রংএ তাদের মুখ রাঙা, আতরমাখা আবিরের গন্ধে চারিদিকের আকাশ বাতাস মেতে উঠেছে। সেই সময় পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাদের খেলা দেখে হেসে অচ্যুত সেন ব'ল্‌লেন—

"ওকে বিয়ে ক'রবি ভদ্রা ?"

মেয়ের মনে হ'লো, বিয়ে বুঝি একটা নূতন খেলা। সে তার টানা-টানা চোখ দুটি ঘুরিয়ে ব'ল্‌লো—"হাঁ ক'রবো।"

চারিদিকের সব লোক হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো। খেল্‌তে খেল্‌তে বিজয়ের গায়ে আবির ছুঁড়ে দিয়ে ভদ্রা গেল পালিয়ে—তার হাসিটুকু ঘরের ভিতর ঢেউ তুল্‌তে লাগ্‌ল।

এমনি করেই দিন যায়। কখন পূর্ণ উৎসাহে গাছে উঠা, জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতার কাটা, বাগান কাঁপিয়ে হাসি, ছুটাছুটি, দাপাদাপি চলে। দুইজনে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে কীর্ত্তনের আসর সাজায়, অনেক সময় আবার রাম-রাবণের অভিনয় করে। আবার কখনও দীঘির পারে বকুল গাছের তলায় বসে' গল্প চলে,—শুধু গল্পই নয়, কত সব জল্পনা-কল্পনা, মান-অভিমান, জেদাজেদি ; এমন কি ছাড়াছাড়ি পর্য্যন্ত। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু আবার সব ঠিক হয়ে যায়—দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে প্রাসাদে ফিরে' আসে।

দিন যায়, মাস যায়—বছরের পর বছর যায়। রাজকুমারী ভদ্রার বয়স প্রায় আঠার বৎসর। ফুটন্ত-যৌবন, লীলায়িত রূপ। লোকে বলে ভদ্রাবতী যখন তাঁর রূপের ডালি নিয়ে করতোয়ার তীরে এসে দাঁড়ান, তখন প্রজাপতিদেরও মন ব্যাকুল হয়। ছুটে আসে রাজকুমারীর মুখের দিকে। তবুও কিসের জন্য তাঁর মন এত বিষাদে ভ'রে গেছে তা জিজ্ঞাসা ক'রলে বল্‌তে হয় তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর রূপই তার একমাত্র কারণ।

এখন অবশ্য আর আগেকার মত ছুটাছুটি দাপাদাপি ক'রতে পারেন না। তবে ছোট বেলা থেকে এক সঙ্গে বড় হয়েছেন তিনি বিজয়বাহুর সাথে। রাজা অচ্যুত সেনের মেয়ে ভদ্রাবতী আর সেনাপতির ছেলে বিজয়বাহু একই গুরুর কাছে একই পাঠশালায় লেখাপড়া শিখ্‌তেন। এক সঙ্গে ছোট থেকে বড় হবার ফলে ভদ্রা কখনও কল্পনাও ক'রতে পারেন নি যে তাঁর সুন্দর মুখের লজ্জারাগ ধীরে ধীরে বিজয়বাহুর মনে কিসের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলছে !

একদিন পাঠশালা থেকে প্রাসাদে ফিরে' যাবার সময় পথের এক বকুল গাছের ছায়ায় এসে চম্‌কে উঠ্‌লেন দশ বছরের মেয়ে ভদ্রাবতী। গাছের পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠ্‌লো—"রাজকুমারি !"

ভদ্রাবতী দেখ্‌লেন—বকুলের ছায়ায় ব'সে বিজয়বাহু। জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"কেন ?"

বিজয়বাহু বল্লেন—"কথা দাও আমার অনুরোধ রাখ্‌বে।"

"কি অনুরোধ ?"

"সেটা পরে ব'ল্‌বো। আগে কথা দাও আমার অনুরোধ রাখ্‌বে।"

ভদ্রাবতী ব'ল্‌লেন—"দিলাম কথা। কি চাও আমার কাছে ?"

বিজয়বাহু ব'ল্‌লেন—"তোমার নাম ধ'রে ডাক্‌বার সম্পূর্ণ অধিকার।"

ভদ্রাবতী হেসে উঠ্‌লেন—"নাম ধরেই ত ডাক। আবার নূতন ক'রে অধিকার দেব কি ?"

বিজয়বাহু এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভদ্রাকে বলেন—"নাম ত জানিই ; তবুও চাই একান্ত নিজের ক'রে নিয়ে ডাকবার অধিকার।"

ভদ্রাবতীর চক্ষু অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে। শৈশবের সাথীর কাতর অনুরোধে তাঁর বুকে দোলা লাগে। মৃদু হেসে বলেন—"দিলাম অধিকার। কে নিষেধ ক'রছে নাম ধরে ডাকতে ?"

রাজকন্যা হয়ে সেনাপতির ছেলেকে সেদিন অবহেলায় যে অধিকার দিয়েছিলেন ভদ্রাবতী, তার পরিণাম সেদিন তিনি কল্পনাও ক'রতে পারেন নি।

দিন যায়, রাত্রি ফুরায় ; মাসের পর মাস অতীত হয়ে বৎসরও অতীত হয় এবং একদিন সূর্য্য ডুবে যাবার আগে যখন করতোয়ার জল রঙীণ হ'য়ে ওঠে তখন বিজয়বাহু বলে ফেল্লেন—"তোমায় ভালবাসি রাজকুমারী।"

ভদ্রাবতীর চক্ষু নত হ'য়ে আসে। নাম ধ'রে ডাকবার সম্পূর্ণ অধিকার চাওয়ার অর্থ যেন এবার তিনি বুঝ্‌তে পারেন। বকুলের সুরভিত ছায়ায় দাঁড়িয়ে নত চক্ষে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। বুঝ্‌তে পারেন না—কি উত্তর দিবেন তিনি।

বিজয়বাহু বলেন—"তুমি ত তোমায় নাম ধ'রে ডাক্‌বার অধিকার আমাকে দিয়েছ। আরও অধিকার দাও—আমাকে বিয়ে কর।"

বিব্রত ও বিচলিত ভদ্রাবতীর মুখে কোন কথা আসে না। শুধু তাঁর মনের ভিতর তোলপাড় করতে থাকে বিজয়বাহুর মুখের কথা—"ভালবাসি ! ভালবাসি !"

মাথা নীচু ক'রে ভাবেন তাঁর নিজের মনেও জেগেছে কি ঐ একই কামনা ? ভয় পান ভদ্রাবতী। কল্পনা করেন শৈশব ও কৈশোরের সাথী যদি আবার ভালবাসার আহ্বান জানায়, তবে কি ক'রবেন তিনি ?

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেন ভদ্রাবতী এবং দেখেই চম্‌কে ওঠেন, তাঁর আবাল্যের সাথী বিজয়বাহু তাঁর মুখের দিকে তৃষ্ণাতুর চক্ষে তাকিয়ে আছেন। এই কি প্রেম ? ঐ চোখে কি আর কোন স্বপ্ন নাই ? রাজ্যগ্রাসী ক্ষুধা যার প্রলুব্ধ দুই চোখের দৃষ্টিতে, সে কি সত্যই ভালবাসে ?

ভদ্রাবতী বিস্মিত বেদনায় বিজয়বাহুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন,—সে দৃষ্টিতে বোধ হয় নীরব একটি ধিক্কারও মিশে থাকে। মৃদু কম্পিত-কণ্ঠে বলেন—"না।"

বিজয়বাহু চম্‌কে ওঠেন। লুব্ধ দুই চোখের স্বপ্ন যেন হঠাৎ এক কঠিন আঘাতে চম্‌কে উঠেছে!

বিজয়বাহু বল্লেন—"কেন?"

ভদ্রা উত্তর দেন—"বিয়ে দেবার অধিকার আমার পিতার—স্বেচ্ছাচারিণী আমি নই। তাছাড়া দেশ যখন পাঠানের আক্রমণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন, তখন প্রেমের স্বপ্ন দেখা যেন রাজকুমারীর পক্ষে শোভা পায় না। আমায় তুমি ক্ষমা ক'রো।"

বিজয়বাহু অস্থির হ'য়ে ওঠেন; বুঝ্‌তে পারেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিতা নারীর স্বপ্নলোকের সঙ্গে তাঁর মনের কামনার কত তফাত। কল্পনা ক'রতেন তিনি, বোধ হয় তাঁরই মনের কামনার মত ভদ্রার মনও তাঁর জন্য পাগল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু একি কঠোর ভাষা ভদ্রার মুখে!

বিজয়বাহুর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়—ব্যর্থতার কালিমা ধীরে নেমে আসে তাঁর মুখে এবং দুই ওষ্ঠ যেন এক দুঃসহ বেদনায় কাঁপ্‌তে থাকে।

কথায় বলে রাজার হাজার কান; কান মানে গুপ্তচর। গুপ্তচরের মুখে শুনলেন অচ্যুত সেন—বিজয়বাহুর প্রেম নিবেদনের কাহিনী আর ভদ্রার উত্তর।

অচ্যুত সেন সতর্ক হন। একদিন রাজসভায় ব'সে সমাগত সভাসদ আর সামন্তদের মুখের দিকে তাকিয়ে হতাশার মৃদুস্বরে আবেদন করেন—"পাঠানের গর্ব্বোন্নত-তরবারির আঘাত থেকে দেশকে রক্ষা ক'রবার জন্য তৈরী হ'তে হবে। আর যে সময় নেই!"

রাজার আবেদন শুনে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সভাসদ আর সামন্তেরা। কিন্তু যাকে উপলক্ষ ক'রে কথা বলা, তার আচরণে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। বিজয়বাহু যেন রাজা অচ্যুত সেনের এই কথা শুন্‌তেই পান নি। সেনাপতির পুত্র এবং নৌসেনার অন্যতম নায়ক বিজয়বাহুর মন তখন আর এক কল্পনার ফন্দী আঁটছিল।

পাঠান সুলতান ফিরোজশাহের পদধ্বনি এগিয়ে আস্‌ছে গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম ক'রে। রাজধানী গৌড় নগরীকে পিছনে ফেলে রেখে তিনি এসে ছাউনি ক'রেছেন দেবকোটে। তাঁর অসির ঘায়ে উত্তর বাংলার পল্লীতে পল্লীতে আর্ত্তনাদ জেগে উঠ্‌লো। গ্রাম পুড়ছে, লুণ্ঠিত হচ্ছে কৃষকের শস্য ও তৈজস, বিগ্রহ জলে নিক্ষেপ করে মন্দিরের দ্বার বন্ধ ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে পূজারী ব্রাহ্মণ।

একদিন চুপিসাড়ে পাঠান শিবিরে এসে সুলতানের সঙ্গে দেখা করলেন বিজয়বাহু। বল্লেন—"সুলতান, সেনা দিন কমলাপুর রাজ্য ভেঙ্গে চূর্ণ ক'রব—রাজা অচ্যুত সেনকে শিকল দিয়ে বেঁধে আনব।"

ফিরোজশাহ ভাবলেন—মিথ্যা কথা। বিজয় নিজেই যে কমলাপুর রাজ্যের একজন সেনাপতি—সে রাজ্যের সেনাপতির ছেলে! তার-পর দেখ্‌লেন বিজয়ের চোখে হিংসার আগুন জ্বলছে! তিনি আর অবিশ্বাস ক'রলেন না। ভাবলেন, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যাবে।

আজ্ঞা দিলেন ফিরোজশাহ; পাঠান সেনাকে পথ দেখিয়ে কমলাপুর রাজ্য ধ্বংস ক'রবার জন্য এগিয়ে চল্‌লেন বিজয়বাহু।

সুলতানকে বল্‌লেন বিজয়বাহু তাঁর প্রয়োজনের কথা; ধনরত্ন কিছুতেই তাঁর প্রয়োজন নাই। তিনি চান বন্দিনী রাজকন্যাকে—আর কিছুই না।

সুলতান হাসেন, বলেন—"তাই হবে।"

শুনতে পেলেন অচ্যুত সেন, তাঁরই সেনাপতির ছেলে বিজয়বাহু পাঠান সেনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আস্‌ছে। কর্কশকণ্ঠে তিনি ডাক্‌লেন—"সেনাপতি!"

নিতান্ত অপরাধীর মত দুই চক্ষু নত ক'রে নীরবে বিষণ্ণ বদনে দাঁড়িয়ে থাকেন সেনাপতি...দুঃসহ বেদনায় তাঁর মুখ ম্লান। চক্ষুতে কালিমা। তারপর এক সময় তাঁর কণ্ঠে ভাষা ফুটে ওঠে; বলেন—"শুনেছি মহারাজ। হাঁ—আমি তাকে অভ্যর্থনাই ক'রব; কিন্তু আশীষ দিয়ে নয়, জয়মাল্য দিয়েও নয়—মুক্ত অসি নিয়ে। জগতের লোক দেখ্‌বে দেশের জন্য বাঙ্গালী কেমন ক'রে তার ছেলের শিরেও অসি হানে।"

সংবাদ যখন রাজপ্রাসাদের অন্দর মহলে প্রবেশ করলো—তখন রাজকুমারী ভদ্রা কেঁদে উঠ্‌লেন—"হায়, কেন মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম!"

বুঝ্‌তে দেরী হয়নি ভদ্রাবতীর। পাঠান সেনার সহায়তায় কমলাপুরের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করে দিয়েও তাকেই যে অধিকার ক'রতে চায় বিজয়বাহু, একথা বুঝতে কোন অসুবিধাই তার হয়নি।

জ্বলে ওঠে রাজকুমারী ভদ্রার কাজল-টানা চোখের তারা। সহজ পথে এগিয়ে চল্‌লে একদিন যাকে সব কিছুই দিতে বাধত না রাজকুমারীর, এখন তারই ধৃষ্টতার উত্তর দেবার এক কঠোর সঙ্কল্প জেগে ওঠে তার মনে। লজ্জা ত্যাগ ক'রে বিজয়বাহুর আচরণের কথা পিতা অচ্যুত সেনকে জানাতে ছুটে চলেন। বিস্মিত ও বিভ্রান্ত ভদ্রাবতী উত্তর পান। সব সংবাদই অচ্যুত সেন রাখেন এবং তার প্রতিকারের পথও তিনি ঠিক করেছেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই পাঠানের জয়ধ্বনিতে ভরে উঠলো কমলাপুর রাজ্যের চারিদিক। মুক্ত তরবারি নিয়ে অচ্যুত সেন আর তাঁর সৈন্যদল কমলাপুরের চারিদিক ঘিরে দাঁড়ালেন—বলদর্পী পাঠান সেনার গতিরোধ করবার জন্য।

একদিকে চল্‌তে লাগ্‌লো অস্ত্রে অস্ত্রে ঝন্‌ ঝন্‌ ঠন্‌ঠন্। অন্যদিকে চল্‌তে লাগ্‌লো বিয়ের আয়োজন।

কমলাপুরের রাজপ্রাসাদ ছবির মত সেজে উঠলো। কোথাও ফুলে ফলে লতায় পাতায় সাজানো তোরণে সোনালী ফুলকাটা রঙিণ রেশমের ঝালর ঝুলছে—কোথাও বা নানা রঙের নিশান উড়্‌ছে—লাল, নীল, হলুদ, সাদা। সম্মুখের সুসজ্জিত নহবৎখানায় ব'সে বাজনদারেরা সানাইয়ে পোঁ ধ'রেছে, বাজনা বাজাচ্ছে।
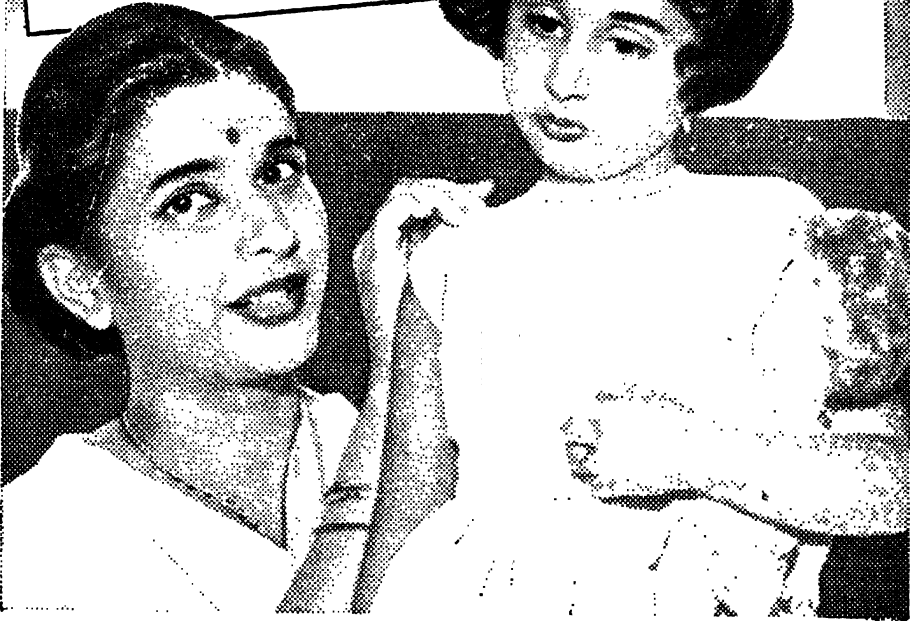
নিষ্পলক চক্ষে উৎসব দেখ্‌ছেন ভদ্রাবতী। চোখ দুইটি জবাফুলের মত লাল, চোখের কোলে কালি পড়েছে, উৎসবের আনন্দ, যুদ্ধে পরাজয়ের আশঙ্কা ও পরিণামের তীব্রোৎকণ্ঠার দ্বন্দ্বে তাঁর অনুপম রূপ যেন ছিঁড়ে ভেঙ্গে একাকার হ'য়ে গেছে। প্রাসাদের উদ্যানে পায়চারি ক'রতে ক'রতে তিনি ভাবছেন—"কেন মর্‌তে মেয়ে হ'য়ে জন্মেছিলাম ?"

সখী পত্রলেখা বাগানে এসে ভদ্রাকে দেখে অবাক হয়ে গেল—"সখি, তুমি এখানে ?"

ভদ্রা ম্লান মুখে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। শেষে আত্ম-সম্বরণ ক'রতে না পেরে' ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লেন, "লেখা, আমার কপালে কি আছে জানি না। হয়তো আজই আমার শেষ দিন। তোর কাছে যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি ক্ষমা করিস।"

পত্রলেখা রাজকুমারীকে জড়িয়ে ধ'রে অনেকক্ষণ তাঁর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌ল—"ছি সখি, ওকথা মনেও আনতে নেই। চল প্রাসাদে চল। কাজললতা যে প'ড়ে রইল হাতে নাও। চুলের কাঁটাও যে খসেছে দেখছি; আচ্ছা, আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। তোমার ভাগ্যদেবতা তোমাকে নিয়ে পরিহাস করছেন, সেজন্য কাতর হ'লে কি চলে ?"

ভদ্রা মৃদুস্বরে বলেন—"পরিহাসই বটে !"

মাথায় সোনার টোপর আর গলায় ফুলের মালা পরে' বর এসেছেন। শুভ মুহূর্ত্তে বরকনের হাত এক ক'রে পুরোহিত মন্ত্র ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ফুলের ডোরে বেঁধে দিলেন। চারিদিকে হুলুধ্বনি উঠলো—মঙ্গল শঙ্খ বাজলো। এমন সময় দুর্গদ্বারে ভেরী বেজে উঠলো—ধু—ধু—ধু। দূত এসে খবর দিল—পাঠান সেনা করতোয়ার ওপারে এসে গেছে।

অচ্যুত সেন কন্যা-সম্প্রদান ক'রছিলেন—চম্‌কে উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়লেন। চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে অসিহাতে দুর্গদ্বারের দিকে এগিয়ে চল্‌লেন। আসনে বর বসেছিলেন—তীরের মত উঠে দাঁড়ালেন। ফুলের মালা ছিঁড়ে তাঁর পায়ের তলায় গড়াতে লাগলো। তিনি ভদ্রার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন। বল্‌লেন—"ভদ্রা, বিদায় দাও, শত্রু নিপাত ক'রে আসি।"

রাজকুমারী ভদ্রাবতী লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। দৃষ্টি বিনিময় হ'ল।

অসি হাতে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণ কন্দর্প। অপূর্ব্ব সুন্দর তাঁর দেহের বর্ণ। পেশল পেশীবদ্ধ দেহ—মুখে পৌরুষ ও লাবণ্যের অপূর্ব্ব মেশামেশি। গলায় ভদ্রারই দেওয়া ফুলের মালা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভদ্রার চোখ দুটি আবেগে নত হ'য়ে এল; এ যে অপরূপ !

উচ্ছ্বসিত আবেগে ভদ্রাবতী স্বামীর বুকে লুটিয়ে পড়লেন; বল্‌লেন—"একটু দাঁড়াও, আমিও সঙ্গে আসি। হয়ত আজ একই দিনে আমার বাসর আর ফুলশয্যা দুই-ই।"

ধীরে ভদ্রার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কুমার বল্‌লেন—"এত বিচলিত কেন ? আর সত্যই যদি শেষের দিন এসেই থাকে, তবে দুঃখই বা কি ? একদিন ত সকলকেই যেতে হবে।" তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ভদ্রা দুই হাতে চোখ মেজে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌লেন। একি স্বপ্ন না সত্য ? সত্যই কি আজ তাঁর বিয়ের বাসর ? তাঁর চোখ দু'টি জলে ভ'রে এলো।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে তিনি বল্লেন—"সাজাও আমার ঘোড়া।"

সখীরা জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন ? কেন ?"

ভদ্রা বল্‌লেন—"জান না, আমার স্বামী যুদ্ধে গেছেন দেশের শত্রু বধ করতে ? বিজয়ী বীর যখন যুদ্ধ থেকে ফিরবেন তখন কে তাঁর গলায় বৈজয়ন্তী মালা পরিয়ে দেবে ? আমি ভিন্ন সে সময়ে কে ক'রবে তাঁর সেবা ! আনো আমার ঘোড়া।"

বিয়ের উৎসবে ফুলের মালায় সাজানো তোরণের ভিতর দিয়ে নগর থেকে রাজকুমারী বাইরে এলেন,—সঙ্গে মৌন একদল সেনা, আর দু'চার জন সখী। ভদ্রা সকলের আগে আগে চ'লছেন। তখনো তাঁর গলায় ফুলের মালা, অঙ্গে ফুলের ভূষণ—শুকায়নি, ঝরে নি। মাত্র একটা সিন্দুরের টিপ তখনো তাঁর কপালে শুকতারার মত জ্বলছিল।

ভদ্রাবতী যখন করতোয়ার তীরে এসে পৌঁছলেন, তখন পূর্ণিমার চাঁদ ম্লান হ'য়ে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। এমন সময় তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন বিজয়বাহু—হাতে তাঁর মুক্ত তরবারি। চকিতে, মাত্র একবার বিজয়বাহুর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ভদ্রাবতী। তার-পরই অবিচলিত স্বরে সঙ্গী সেনাদলকে আদেশ করেন—"এগিয়ে চলো।"

বিজয়বাহু বল্‌লেন—"তোমার পিতা মারা গেছেন ভদ্রা,—এ হ'ল শুধু তোমারই জন্য।"

জ্বলে উঠ্‌লো ভদ্রাবতীর চোখের তারা। যেন তপ্ত সীসার মত ঐ কথা কয়টির উত্তর দেবার এক কঠিন প্রতিজ্ঞা জেগে উঠেছে তাঁর চোখের দৃষ্টিতে।

সঙ্গীদের আদেশ দিলেন,—এগিয়ে চলো—দাঁড়াবার সময় নেই।

তীব্র প্রতিহিংসায় বিজয়বাহুর মুখ কালো হ'য়ে উঠ্‌লো,—কুটিল নয়নে চেয়ে তি[illegible]'লে উঠ্‌লেন—"আরও শুন্‌তে চাও ? রাজ-জামাতাও আর বেঁচে নেই—পাঠান সেনার খরতরবারি তাঁর রক্তপান ক'রে তৃপ্ত হ'য়েছে। তোমার কপালে প্রেমের স্বপ্ন দেখা আর ঘটল না।"

যে ফুলের মালায় স্বামীর হাতের সঙ্গে তাঁর হাত বাঁধা ছিল, ভদ্রা চম্‌কে উঠে সেই শুষ্ক ফুলের ছেঁড়া মালা বুকের উপর চেপে ধরলেন, বাঁ হাতের নোয়াখানা একবার কপালে ছোঁয়ালেন। পরক্ষণেই যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

গুড়ুম্‌। গুড়ুম্‌। গুম্‌! যুদ্ধ জয় ক'রে পাঠানসেনা রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছিল—থম্‌কে দাঁড়াল। পাঠান সেনাপতির কাছে খবর গেল—"রাজকুমারী ভদ্রাবতী পাঠানসেনা আক্রমণ ক'রেছেন। তিনি লড়্‌তে লড়্‌তে মরবেন, তবুও বেঁচে থাক্‌তে কমলাপুর জয় করতে দিবেন না।"

বন্দুকের ধোঁয়ায় ভোরের আলো ম্লান হ'য়ে এলো। সওয়ারে সওয়ারে পদাতিকে পদাতিকে মরণযুদ্ধ বেধে গেল। সে যুদ্ধের পণ ছিল রমণীর মানরক্ষা!

শ্রান্তরবি দিনের শেষে যখন অস্ত যায়, তখন ভদ্রাবতীর সৈন্যদল চমকে উঠ্‌লো। তারা শুনলো—রাজকুমারী তাঁর স্বামীর মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছেন, তাই তিনি সহমরণে যাবেন। তারা কেঁদে উঠ্‌লো—"আমাদের ফেলে কোথায় যাবি মা।"

ভদ্রার চোখ ছল ছল ক'রে উঠ্‌লো। মনের আবেগ দমন ক'রে বল্লেন—"আমাকে যে যেতে হবে যেখানে আমার স্বামী গেছেন;—আজ যে আমার ফুলশয্যা!"

সন্ধ্যা পার হ'য়ে গিয়ে রাতের আঁধার ছেয়ে গেছে। আকাশ-ভরা তারার মেলা। করতোয়ার তীরে জ্বলে উঠ্‌লো একটি চিতার প্রবল শিখা। চিতা জ্বল্‌ল—দাউ—দাউ—দাউ; আগুনের জিভ্‌গুলো লক্‌লক্‌ ক'রে উঠ্‌লো। পরমস্নেহে স্বামীর দেহখানি বুকে জড়িয়ে ধ'রে ভদ্রাবতী চিতায় উঠে বস্‌লেন। চিতার কাঠগুলি ধীরে—অতি ধীরে একবার ন'ড়ে উঠল—তারপর সব স্থির!

আজ আর কেউ ব'ল্‌তে পারে না বিজয়বাহুর শেষ পরিণাম কি হয়েছিল। তিনি কি মুসলমান হ'য়ে কমলাপুরের অধীশ্বর হ'য়েছিলেন, না দেশদ্রোহীর যে শাস্তি মৃত্যু, তাই ফিরোজশাহের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তা-ও কেউ ব'ল্‌তে পারে না। আজ শুধু দেখা যায় পাবনা জেলার নিমগাছী গ্রামে জঙ্গল-ঢাকা অচ্যুত সেনের প্রাসাদ ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। আর তারই অদূরে আছে করতোয়া তীরে 'সতীঘাট'। আজও শত শত নরনারী 'সতীঘাটে' নৈবেদ্য রেখে পূজা দেয়, পূজিতা দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করে সকলে।

এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে, বুনোগাছের গা বেয়ে যে সকল লতাপাতা আজও গজিয়ে ওঠে, তাতে বেশী ক'রে ফুল ধরে প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে, আর জ্যোৎস্নার স্পর্শে জেগে ওঠে এক বীরবালার অপূর্ব্ব বিবাহের কাহিনী।

ঘরোয়া সেলাইয়ের কাজ

সুলতা মুখোপাধ্যায়

সেমিজ-পেটিকোট

এবারে মেয়েদের পরিধান-উপযোগী প্রয়োজনীয় বিশেষ এক ধরণের 'আণ্ডারওয়ার' (Underwear) বা শাড়ী-ব্লাউশ বা ফ্রকের নীচে পরবার পোষাকের কথা বলছি। এ পোষাকের নাম—'সেমিজ-পেটিকোট' বা 'প্রিন্সেস-পেটিকোট' এবং এটি সচরাচর ব্যবহৃত হয় মেয়েদের শাড়ী-ব্লাউশ বা ফ্রকের ভিতরে পরিধেয় সায়া-সেমিজের মতো 'অন্তর্বস্ত্র' বা 'Underwear' হিসাবে। অনেকের মতে, সায়া ও সেমিজের বিচিত্র সমন্বয়ে রচিত এ ধরণের 'সেমিজ-পেটিকোট' বা 'প্রিন্সেস-পেটিকোট' 'অন্তর্বস্ত্রটি' মেয়েদের দৈনন্দিন ব্যবহারের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক ও আরামপ্রদ—বিশেষ করে আমাদের দেশের মতো
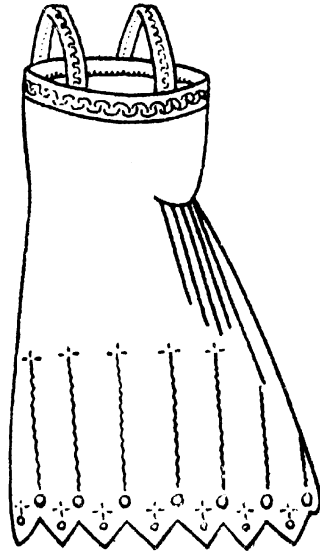
গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে গরমের দিনে! উপরের ছবিতে, এ-ধরণের পোষাকের নমুনা দেওয়া হলো—সেটি দেখলেই 'প্রিন্সেস-পেটিকোট' বা 'সেমিজ-পেটিকোট' পরিচ্ছদের সুস্পষ্ট আভাস পাবেন। তাছাড়া এ ধরণের পোষাক তৈরী করা এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন বা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়...সীবন-শিল্পের সাধারণ শিক্ষার্থীরাও সামান্য আয়াসে অবসর-সময়ে ঘরে বসে নিজেরাই এ সব পোষাকের ছাঁট-কাট-সেলাই করতে পারবেন।

আপাততঃ, এ ধরণের 'সেমিজ-পেটিকোট' বা 'প্রিন্সেস পেটিকোট' বানাতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার ও বিধি-নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন—গোড়াতেই

তার মোটামুটি আভাস জানিয়ে রাখি। ধরুন, উপরের ছবিতে এই পোষাকের যে নমুনাটি দেখানো হয়েছে—সেটির মাপ হলো—

ঝুল—৪৫″ ইঞ্চি

ছাতি—৩২″ ইঞ্চি

কোমর—২৮″ ইঞ্চি

সেন্ত—১৫″ ইঞ্চি

এই মাপ অনুসারে 'সেমিজ-পেটিকোট' তৈরী করতে হলে, লম্বা ঝুলের ৩৬″ বা ৩৭″ ইঞ্চি বহরের লংক্লথ, মার্কিন, কিম্বা চিকণদার কাপড় প্রয়োজন। যদি চিকণদার কাপড় ব্যবহার করেন, তাহলে পোষাকের 'ঘেরের' মাপ-অনুপাতে কাপড় নেবেন। লংক্লথ বা মার্কিন কাপড় হলে—২গজ ৬″ ইঞ্চি কাপড় নেবেন। সচরাচর এ পোষাক লংক্লথ বা মার্কিন কাপড়েই বানানো হয়ে থাকে, তবে সৌখীন ও মোলায়েম ধরণের 'প্রিন্সেস-পেটিকোটের' জন্য, সুন্দর ও অপেক্ষাকৃত দামী চিকণদার-কাপড় ব্যবহার করাই রীতি। বলা বাহুল্য, বাড়ীতে সচরাচর ব্যবহারের জন্য অনেকেই থাপি অথচ মোলায়েম-ধরণের লংক্লথ বা মার্কিন কাপড়ের 'সেমিজ-পেটিকোট' বানান এবং বাইরে-বেরুনোর পোষাক-হিসাবে সৌখীন এবং দামী নক্সাদার মিহি-চিকণদার-কাপড় ব্যবহার করে থাকেন।

পছন্দমতো কাপড় বাছাই করে নেবার পর, সে কাপড়টিকে প্রয়োজনানুসারে ছাঁটাই ও সেলাইয়ের কাজ।

প্রথমে বলি 'প্রিন্সেস-পেটিকোট' বানানোর জন্য কাপড়টিকে মাপমতো ছাঁট-কাট করার পদ্ধতির কথা। এ ধরণের পেটিকোট ছাঁটাইয়ের সময় ছাতির মাপ যেখান থেকে নিতে হবে, সে জায়গার ১″ ইঞ্চি উপর থেকে মাপ ধরে নিয়ে কাপড়টিকে সুষ্ঠুভাবে কাটতে হবে। এ নিয়ম, শুধু লংক্লথ আর মার্কিন জাতীয় কাপড় ব্যবহারের সময়…চিকণদার-কাপড় হলে উপরোক্ত বাড়তি-মাপের কাপড়টুকুর প্রয়োজন নেই। লংক্লথ বা মার্কিন কাপড় হলে, লম্বা বা ঝুলের ৭″ ইঞ্চি কাপড় বাদ দিয়ে, ৩″ ইঞ্চি কাপড় অতিরিক্ত নিয়ে, আড়াআড়িভাবে এবং লম্বালম্বি ভাবে দু'দিকের কাপড়ই 'দু'পাট' বা 'ডবল-ভাঁজ' দিয়ে নিতে হবে। তবে চিকণদার-কাপড় ছাঁটাইয়ের কাজে—ছাতির মাপের ¼ অর্থাৎ ৮″ ইঞ্চি—১″ ইঞ্চি—৭″ ইঞ্চি অংশে, নীচের ২ নং ছবিতে যেমন দেখানো
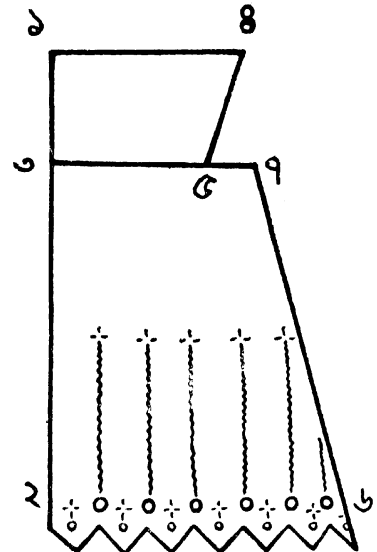
রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে পোষাকের 'ঝুল' বা 'লম্বা' ৪৫″ ইঞ্চি থেকে ৭″ ইঞ্চি বাদ দিয়ে মোট ৩৮″ ইঞ্চি জায়গা (৪৫″ ইঞ্চি—৭″ ইঞ্চি=৩৮″ ইঞ্চি) অর্থাৎ '১' চিহ্নিত অংশ থেকে '২'চিহ্নিত অংশ অবধি বরাবর লম্বা মাপ নিতে হবে। বলা বাহুল্য, ছাঁটাইয়ের সময়, কাপড়ের বিভিন্ন অংশের মাপগুলি যথারীতি রঙীন পেন্সিল বা সেলাইয়ের-কাজের খড়ি (Tailor's Marking-Chalk) দিয়ে সুষ্ঠুভাবে পাকাপাকি চিহ্নিত করে নেওয়াই বিধেয়—তাহলে ছাঁটকাটের সুবিধা হয় এবং মাপের গলদ ঘটবার সম্ভাবনাও কম থাকে। যাই হোক, পেটিকোটের 'ঝুল' মাপমতো চিহ্নিত করে নেবার পর, উপরের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনিভাবে '৩' চিহ্নিত অংশ অর্থাৎ জামার 'সেন্ত'—১৫″ইঞ্চি থেকে ৭″ ইঞ্চি বাদ দিয়ে (১৫″ ইঞ্চি-৭″ ইঞ্চি=৮″ইঞ্চি মাপের জায়গাতে) পূর্ব-প্রথানুসারে রঙীণ পেন্সিল বা খড়ির দাগ এঁকে নিন। তারপর ঐ ২নং ছবির ছাঁদে, '১' চিহ্নিত অংশ থেকে '৪' চিহ্নিত অংশটুকু অর্থাৎ পোষাকের ছাতির মাপের ¼ ইঞ্চি বা ৮″ ইঞ্চি+২″ ইঞ্চি=১০″ ইঞ্চি জায়গাটিতে রঙীণ খড়ি বা পেন্সিলের রেখা টেনে দিন। এবারে উপরের ঐ ২নং নক্সার ছাঁদেই রেখা টেনে চিহ্নিত করে নিন—

পোষাকের [কোমরের ¼ অংশ ৭″ ইঞ্চি+২″ ইঞ্চি=৯″ ইঞ্চি অর্থাৎ 'চ' চিহ্নিত স্থানটি। 'চ' চিহ্নটি এঁকে নেবার '৪' এবং '৫' চিহ্নিত অংশটুকু লাইন টেনে সংযোজিত করে, উপরোক্ত ২নং নক্সানুসারে '৫' থেকে '৭' অংশ অর্থাৎ ৩″ ইঞ্চি মাপের কুচি-দেবার কাপড় বজায় রেখে, '২' থেকে '৬' পর্য্যন্ত অংশ অর্থাৎ পোষাকের ছাতির মাপের অর্দ্ধেক বা ১৬″ ইঞ্চি জায়গাতে রঙীণ খড়ি বা পেন্সিলের দাগ আঁকুন। অতঃপর, উপরের ২নং নক্সানুসারে '৭' থেকে '৬' চিহ্নিত অংশ খড়ি বা পেন্সিলের রেখা টেনে সংযোজিত করুন। চিকণদার-কাপড় ব্যবহার করলে, '৬' চিহ্নিত অংশে ১″ ইঞ্চি উপরে দাগ দিতে হবে না···তবে, লংক্লথ বা মাকিন জাতীয় কাপড় হলে, '৬' চিহ্নিত অংশে ১″ ইঞ্চি উপরে রেখা-নির্দ্দেশ এঁকে নিতে হবে। নীচের অংশ ২½″ ইঞ্চি কাপড় মুড়ে দেওয়া প্রয়োজন।

'প্রিন্সেস-পেটিকোট' তৈরী করতে হলে, মাকিন, লংক্লথ কিম্বা চিকণদার কাপড় ছাঁটাইয়ের এই হলো মোটামুটি নিয়ম।

আগামী সংখ্যায় 'প্রিন্সেস-পেটিকোট' বা 'সেমিজ-পেটিকোট' সেলাইয়ের পদ্ধতির বিষয়ে মোটামুটি আভাস দেবো।

—

সুধীরা হালদার

সর্ব্বতোভাবে সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, স্বামী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়-পরিজনদের সেবা-পরিচর্য্যা, বাড়ী-ঘর গোছালো-পরিচ্ছন্ন, নিরাময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ রাখা, অতিথি-অভ্যাগতের যত্ন ও সন্তুষ্টিবিধান, অবসর-সময়ে সঙ্গীত-শিল্পচর্চ্চা ও বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানাহরণ করে আত্মোৎকর্ষলাভের মতোই, রন্ধনপটুতার দিকে নজর রাখাও প্রত্যেক সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য। রন্ধননৈপুণ্যে শুধু যে নানা ধরণের বিচিত্র ও আটপৌরে দেশী ও বিদেশী ভোজ্য এবং পানীয় পরিবেশন করে স্বামী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-বন্ধু ও অতিথি-অভ্যাগতজনকে পরিতৃপ্তিদান সম্ভব হয় তাই নয়, তাঁদের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনও করা যায় বহুরকম উপায়ে। সেই উদ্দেশ্যেই, এবার থেকে এ-আসরে নিয়মিতভাবে দেশী ও বিদেশী ধরণের বিবিধ খাদ্য ও পানীয় রন্ধন-প্রণালীর মোটামুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। আপাততঃ, যে দুটি বিচিত্র রন্ধন-প্রণালীর হদিশ দিচ্ছি—সে দুটির মধ্যে প্রথমটি হলো দেশী এবং দ্বিতীয়টি হলো বিদেশী ধরণের রান্না।

কাঁকড়ার কালিয়া ঃ

আমাদের দেশী-ধরণের রান্নার তালিকায় এটি বেশ বিচিত্র-অভিনব সুস্বাদু আমিষ-জাতীয় খাদ্য। ছুটির দিনে কিম্বা বাড়ীতে আত্মীয়-বন্ধুদের সমাগমে এ ধরণের খাদ্য-পরিবেশন প্রচুর সমাদর লাভ করবে। তবে অন্যান্য খাবারের তুলনায় এটি হলো—অপেক্ষাকৃত গুরুপাক খাদ্য—খুব ছোট ছেলেমেয়েদের না দেওয়াই ভালো।

'কাঁকড়ার কালিয়া' রাঁধতে হলে যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি। এ রান্নার জন্য চাই—কাঁকড়া, আলু, টোম্যাটো, আদা-বাটা, পেঁয়াজ-বাটা, লঙ্কা-বাটা, হলুদ-বাটা, টক-দই, নুন, চিনি, ঘি, সরষের তেল, জিরে আর তেজপাতা। এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর রন্ধনের পালা!

প্রথমেই গুঁড়ো-সোডা মেশানো ফুটন্ত গরমজলে কাঁকড়াগুলির দাড়া এবং গা খুব ভালো করে ঘষে আগাগোড়া পরিষ্কারভাবে ধুয়ে নিতে হবে—অর্থাৎ কাঁকড়ার গায়ে বা দাড়ায় যেন কোনো রকম ময়লা-কাদা না থাকে। তারপর পরিপাটিভাবে ধোয়া কাঁকড়ার দাড়াগুলিকে বেশ করে থেঁতো করে নিতে হবে এবং কাঁকড়াগুলির পিঠের খোলা ছাড়িয়ে প্রত্যেকটি কাঁকড়ার শাঁসালো দেহাংশ চার টুকরো করে কেটে নেবেন। এবারে উনানের আগুনের আঁচে লোহার কড়াতে সরষের তেল দিয়ে আলাদাভাবে আলু ও কাঁকড়ার টুকরোগুলি ভেজে নিয়ে অন্য কোনো পরিষ্কার পাত্রে

নামিয়ে রাখুন। তারপর কড়ার ঐ তেলে আন্দাজমতো ঘি ঢেলে, তাইতে জিরে ও তেজপাতার ফোড়ন সহযোগে প্রয়োজনমতো আদা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, হলুদ-বাটা, পেঁয়াজ-বাটা, নুন, চিনি, টক-দই, টোম্যাটো আর অল্প একটু জল দিয়ে মশলাগুলি ভালো করে ভেজে নিন। এভাবে ভাজার সময়, মশলা থেকে সুগন্ধ বেরুলেই, সেই কড়াতে আলাদা-পাত্রে রাখা আলু আর কাঁকড়ার টুকরোগুলি ছেড়ে, কিছুক্ষণ হাতা বা খুন্তির সাহায্যে সেগুলি উপরোক্ত মশলার সঙ্গে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে আন্দাজ-মতো পরিমাণে জল ঢেলে দেবেন। এইভাবে মশলাদি সহযোগে আগুনের আঁচে জলে ফুটে আলু আর কাঁকড়ার টুকরোগুলি সুসিদ্ধ হয়ে গেলে, অল্প-অল্প ঘন-পাতলা ধরণের ঝোল থাকতে থাকতে কড়াটিকে উনান থেকে নামিয়ে নেবেন। অতঃপর সেই কাই-কাই ধরণের গরম ঝোলে আন্দাজমতো গরম মশলা ছেড়ে কিছুক্ষণ খুন্তি দিয়ে নাড়া-চাড়া করে, বড় একটি পরিষ্কার পাত্রে সদ্য রান্না-করা 'কাঁকড়ার কালিয়া' সযত্নে নামিয়ে রাখবেন। এই হলো অভিনব এই দেশী খাবারের মোটামুটি রন্ধন-প্রণালী।

চিকেন স্যালাড ঃ

এবারে জানাই বিচিত্র এক ধরণের বিদেশী খাবার—'চিকেন স্যালাড' রন্ধনের প্রণালী। এটি শজী এবং আমিষ সহযোগে তৈরী অভিনব ধরণের একটি সুস্বাদু অথচ সহজ-পাচ্য বিলাতী খাদ্য। বাড়ীর লোকজন এবং বাইরের অতিথি-অভ্যাগতদের সমাদরের পক্ষে এটিও পরম উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাবার ;

'চিকেন-স্যালাড' রান্না করতে হলে, উপকরণ চাই—মুরগীর মাংস, বীট, গাজর, আলু, পেঁয়াজ, নুন, গোল-মরিচের গুঁড়ো, রাই-সরষের গুঁড়ো (Mustard) এবং 'স্যালাড-অয়েল' (Salad Oil)। উপকরণগুলি সংগৃহীত হবার পর, রান্নার সময়, গোড়াতেই জ্বলন্ত উনানের উপর ডেকচি বা হাঁড়িতে জল দিয়ে বীট, গাজর, আলু আর মুরগীর মাংস সিদ্ধ করে নেবেন। উনানে এগুলি সিদ্ধ হবার অবসরে, টোম্যাটো ও পেঁয়াজগুলিকে চাকা-চাকা ভাবে পাতলা করে কেটে সযত্নে পরিষ্কার একটি রেকাবীতে জড়ো করে রাখবেন। ইতিমধ্যে বীট, গাজর, আলু জলে ফুটে সুসিদ্ধ হবার পর, সেগুলি ডেকচি থেকে নামিয়ে ধারালো বড় ছুরীর সাহায্যে গোল-ছাঁদে পাতলা টুকরো করে কেটে, ইতিপূর্ব্বে কেটে-রাখা ঐ টোম্যাটো আর পেঁয়াজের সঙ্গে একত্রে মিশিয়ে দেবেন। তারপর অনুরূপ ধরণে জলে ফুটে সুসিদ্ধ মুরগীর মাংস ছোট-ছোট পাতলা 'স্লাইসে' (Slice) টুকরো করে কেটে, পূর্ব্বোক্ত ঐ বীট-গাজর-আলু ও পেঁয়াজের টুকরোগুলির সঙ্গে একত্রে মিশিয়ে নেবেন। এইভাবে মেশানোর পর, আন্দাজ মতো নুন, রাই-সরষে (Mustard) আর গোল-মরিচের গুঁড়ো নিয়ে সিদ্ধ মাংস এবং শজীর সঙ্গে একত্রে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। তারপর সেগুলির উপর অল্প খানিকটা 'স্যালাড-অয়েল' ঢেলে দিয়ে পুনরায় সমস্ত সিদ্ধ জিনিষগুলিকে একত্রে মেখে নিয়ে—পরিবেশনের জন্য সুন্দরভাবে পরিপাটি একটি 'পরিবেশন-পাত্রের' (Serving Plate বা Bowl) উপর সাজিয়ে রাখুন। এই হলো বিচিত্র বিলাতী খাদ্য—'চিকেন-স্যালাড' রান্নার মোটামুটি প্রণালী।

বারান্তরে, আরো কয়েকটি বিচিত্র-উপাদেয় দেশী ও বিদেশী রন্ধন-প্রণালীর কথা আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

জ্যোতিষের আলোচনা

উপাধ্যায়

কোষ্ঠী বিচারের প্রাক্‌কালে জন্মকুণ্ডলীতে লগ্নাধিপতির অবস্থা ও লাবল প্রথম দেখা দরকার। উত্তম ভাবে গ্রহটী উচ্চস্থ এবং শুভগ্রহের ারা দৃষ্ট কিনা তাও লক্ষ্য কর্‌বার বিষয়। লগ্নাধিপতি বলবান হোলে াতক জীবনে যে উন্নতি কর্‌বে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। লগ্নাধি- াতির বলাবলের ওপর জীবনের দুঃখ সুখ বা আনন্দ অনেকটা নির্ভরশীল। াগ্নাধিপতি অস্তমিত পরাজিত বা দুর্ব্বল হোলে কিম্বা ষষ্ঠ, অষ্টম অথবা াদশ ভাবে অশুভ গ্রহের দৃষ্টি বা সহাবস্থান বর্জ্জিত হোলে জাতকের ীবন উন্নতিশীল হবে না, জাতক পার্থিব সুখ সম্পদ ভোগ কর্‌তে পারবে া। দশমে মঙ্গল থাক্‌লে মানুষের বিক্রম, প্রভুত্ব ও মর্য্যাদা লাভ হয়। 'শমে মঙ্গল উচ্চস্থ থাক্‌লে জাতক মন্ত্রী, রাজ্যপাল, নগরপাল প্রভৃতি হাতে পারে। এই মঙ্গল দশমে থাক্‌লেও যদি লগ্নাধিপতি নীচস্থ বা ্র্ব্বল হয়ে ষষ্ঠস্থানে পাপগ্রহ দৃষ্টি-বর্জ্জিত অবস্থায় থাকে, তাহোলে জাতক াভর্ণমেণ্ট অফিসে পিওন হয়। জন্মকুণ্ডলীকে সবল কর্‌তে হোলে ষষ্ঠ, ষ্টম এবং দ্বাদশ স্থানের অধিপতিগণের দুর্ব্বল বা নীচস্থ হওয়া দরকার। ষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশস্থান দুঃস্থান। এই সব দুঃস্থানের অধিপতিরা যদি সবল । উচ্চস্থ হয়, আর শুভগ্রহের সহিত দৃষ্টি বা সহাবস্থানের দ্বারা সম্বন্ধ ্ত্রে আবদ্ধ হয় তাহোলে অশুভফলগুলি বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়। াদাহরণস্বরূপ ধরা যাক মীনলগ্নের ষষ্ঠাধিপতি রবিকে। দ্বিতীয় স্থানে াবি উচ্চস্থ হয়ে মেষে অবস্থিত থাক্‌লে আর্থিক অবস্থা আদৌ শুভ হয় না। াাতক ঋণ জালে জড়িত হয়ে কষ্টভোগ করে, শেষ পর্য্যন্ত মামলা মোক- দ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হয়, এমনকি তাকে কারাগার বরণ করে নিতে হয়। ঃস্থানগুলিতে যত দূর সম্ভব অশুভ গ্রহ থাকা আবশ্যক এবং ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশে শুভগ্রহ থাকা অনুচিত। যদি এসব স্থানে শুভ গ্রহ থাকে, তাহোলে, অশুভ গ্রহের দৃষ্টি বা সহাবস্থান আবশ্যক যাতে স্থানগুলির অশুভত্ব খণ্ডন হয়। বৃহস্পতি, শুক্র অথবা শুভ চন্দ্রের লগ্নে অবস্থান অথবা এদের যে কোনটীর দৃষ্টি লগ্নে থাকলে শুভ ফলপ্রদ হয়। লগ্ন থেকে নবমস্থানে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি ভাগ্যোন্নতি কারক এবং পিতৃধন বৃদ্ধির সহায়ক। দ্বাদশে অশুভ গ্রহের দৃষ্টি-বর্জ্জিত শুক্রের অবস্থান অত্যন্ত শুভপ্রদ। এর দ্বারা বুঝা যায় যে জাতক সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করে জীবন আনন্দে অতিবাহিত কর্‌তে পার্‌বে। দ্বাদশাধিপতির সঙ্গে শুক্রের দ্বাদশে অবস্থান বা যোগাযোগ জাতকের জীবনের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এক্ষেত্রে পার্থিব সুখ সম্পদ ও ধনৈশ্বর্য্যলাভ অবশ্যম্ভাবী। অন্য কোন গ্রহের সহাবস্থান বা দৃষ্টি সম্বন্ধ বর্জ্জিত চন্দ্র ও বৃহস্পতির যে কোন ভাবে অবস্থিতি বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ। চতুর্থস্থানে এরূপ যোগ হোলে মায়ের দীর্ঘজীবন সূচিত হয়, সপ্তমস্থানে এরূপ যোগ হোলে স্ত্রী দীর্ঘজীবী হয়, ষষ্ঠস্থানে হোলে মাতুল দীর্ঘজীবী হয়, নবমস্থানে হোলে দীর্ঘজীবী হয় পিতা। এর আরও বৈশিষ্ট্য আছে। ঐসব স্বজনের মৃত্যুর পর সৌভাগ্যোন্নতি ঘটবে। জীবনের প্রারম্ভে প্রথম বিংশোত্তরী দশা শুভগ্রহের হোলে, জাতক জীবনের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট অতিক্রম কর্‌তে পার্‌বে এবং তার শেষ জীবনটী অতিসুন্দর ভাবে অতিবাহিত হবে। আর্থিক সংক্রান্ত ব্যাপারে সমগ্র জন্মকুণ্ডলীর বলাবল প্রাথমিক বিচার্য্য। দ্বিতীয়, নবম ও একাদশ স্থান বিশেষ ভাবে বিচার আবশ্যক, তাছাড়া উল্লেখযোগ্য শুভ যোগ হয়েছে কিনা, তাও দেখা দরকার। ষষ্ঠ অষ্টম এবং দ্বাদশাধিপতির অশুভ যোগ বা দৃষ্টি ঐ সব স্থানে আছে কিনা তাও পরীক্ষা করা আবশ্যক। লগ্নাধিপতি ও দ্বিতীয়াধিপতির যোগাযোগ বা সম্বন্ধ, প্রথম ও পঞ্চম, দ্বিতীয় ও একাদশ প্রথম ও একাদশ, চতুর্থ ও পঞ্চম, নবম ও একাদশ, সপ্তম ও নবম গৃহগুলির অবস্থা আর এদের অধিপতিগণের অবস্থিতি বা দৃষ্টি সম্বন্ধ লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয়। নবম ও দশম স্থান এবং এদের অধিপতির বলাবলের উপর ভাগ্য বহুসাংশে নির্ভরশীল। দ্বিতীয়াধিপতি বৃহস্পতি থেকে ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থানে থাক্‌লে শুভফল দেয় না। এরূপ অবস্থা হোলে জাতককে বিত্তশালী হোলেও শেষে ক্রমে ক্রমে বিত্ত হ্রাস হয়ে দারিদ্র্য কষ্ট পাবার ও সম্ভাবনা থাকে। চন্দ্র মানুষের জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই গ্রহ মন ও মাতৃ কারক। চন্দ্র থেকে বুঝা যায় জাতকের শরীরের অভ্যন্তরে ধমনীর ভিতর রক্ত চলাচল হচ্ছে। কর্কট রাশিতে চন্দ্র থাক্‌লে

জাতক তার অবেষ্টনীর প্রভাবের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়। উত্তম দশাতেও চন্দ্র বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পারসিক জ্যোতিষে উল্লিখিত আছে রাশিচক্রে এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে চন্দ্রের সঞ্চার সময়ের নবাংশ ধরে বিচার করলে দেখা যাবে নব নব ফল। চন্দ্র উদর-ঘটিত পীড়ার কারক। সঞ্চার কালে অশুভ নবাংশে থাকলে পেটের গোলযোগ হবে। যে তারিখে চন্দ্র শরীরের সে অংশ কারক রাশিতে থাকে সে অংশের শস্ত্রোপচার সে তারিখে বিপজ্জনক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে তারিখে চন্দ্র কন্যায় থাকবে, সে তারিখে উদরা-ভ্যন্তরে শস্ত্রোপচার করা অনুচিত। কার্ডন বলেন রবির ১৭ ডিগ্রির মধ্যে চন্দ্র থাকলে আর মঙ্গলের বিপরীত স্থানে এর অবস্থিতি হোলে শস্ত্রোপচার বিপজ্জনক। ঐ সময়টী অতিক্রান্ত হোলে তারপর শস্ত্রোপচার চলতে পারে। জন্ম সময় থেকে শনি চতুর্থ, মঙ্গল পঞ্চম, বৃহস্পতি ষষ্ঠ এবং রাহু সপ্তম দশা হোলে এদের দশাকালীন সময়ে অত্যন্ত অশুভ ফল দেয়। কোন বিকল বা নীচস্থ বা ষষ্ঠস্থ স্থূল দশা থেকে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম অন্তর্দ্দশা অশুভ, মারক সূচিত হয়। দশমাধিপতি ও আয়াধি-পতির যোগ অশুভ ফল প্রদ। যদি কোন উচ্চস্থ গ্রহ বক্রী হয়, তাহোলে নীচস্থ ফল দান করে। নীচস্থ গ্রহ বক্রী হোলে উচ্চস্থ ফল দান করে। রাজযোগে হোলেও দেখতে হবে লগ্নাধিপতির অবস্থা ; লগ্নাধিপতি দুর্ব্বল হোলে রাজযোগের ফল সম্যক ভাবে পাওয়া যায় না, উদাহরণ স্বরূপ ধনুলগ্নের কথা এখানে বলা যেতে পারে। ধনুলগ্নের পক্ষে রবি ও বুধ রাজযোগ কারক। এক্ষেত্রে রবি ও বুধ থেকে লগ্নাধিপতি বৃহস্পতি যদি কেন্দ্রে, কোণে, দ্বিতীয়ে ও একাদশে থাকে তবে রাজযোগের পূর্ণ ফল পাওয়া যায়, অন্যথা ফলের হ্রাস হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে দ্বিতীয় ও সপ্ত-মাধিপতি দৃষ্ট অথবা এদের সহাবস্থান সম্বন্ধ বিশিষ্ট নবাংশাধিপতি ষষ্ঠে অষ্টমে অথবা দ্বাদশে থাকলে রাজযোগ ভঙ্গ হয়। পাত্র ও পাত্রীর যদি এক দশা বিবাহকালীন সময়ে দেখা যায় তা হোলে অশুভ সূচক। এর ফল দুঃখ কষ্ট, দারিদ্র্য, দাম্পত্য কলহ, এমন কি বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ঘটে। লগ্ন পৃথ্বী রাশিতে, রবি অগ্নি রাশিতে এবং চন্দ্র বায়ু রাশিতে অবস্থান অত্যন্ত শুভপ্রদ—শনি ও বৃহস্পতির ক্ষেত্র-বিনিময়ে যদি বৃহস্পতি নীচস্থ হয় তাহোলে ফল শুভ হয় না, তবে বৃহস্পতির শুভ ভাবাধিপতি হোলে অশুভ দোষ খণ্ডন হয়ে যায়। চতুর্থ স্থানে শনি অশুভপ্রদ কিন্তু কুম্ভ চতুর্থস্থান হোলে আর সেখানে শনি অবস্থান করলে পঞ্চমহাপুরুষ যোগ হয়। এ যোগকে শশযোগও বলে। এরূপ যোগে শনির অশুভত্ব খণ্ডন হয়।

রবি ও চন্দ্র লগ্নে থাকলে চোখে আব হয়। রবি পঞ্চম নবম অথবা পাপ গ্রহ সংযুক্ত হোলে চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে যায়। ষষ্ঠ স্থানে লগ্নাধিপতি ও অষ্টমাধিপতি একত্র থাকলে দক্ষিণ চক্ষুর হানি হয়—রবি দক্ষিণ চক্ষু এবং চন্দ্র বাম চক্ষুর কারক। শুক্র চক্ষু দৃষ্টি দাতা। রাহু—ছানি কারক। মঙ্গল চক্ষু ক্ষত কারক। শনি অন্ধত্ব প্রদান করে। মঙ্গল দ্বাদশে থাকলে দক্ষিণ চক্ষু আক্রমণ করে, শনি থাকলে বাম চক্ষু আক্রান্ত হয়। পিত্তপ্রকোপবশতঃ অন্ধত্ব ঘটে, যদি চন্দ্র ও মঙ্গল ষষ্ঠ বা অষ্টমে থাকে। চন্দ্র ও শনি অষ্টম বা দ্বাদশে থাকলে বায়ু বা শ্লেষ্মা প্রকোপ বশতঃ অন্ধত্ব ঘটে। লগ্নে রবি পাপগ্রহ পীড়িত হোলেচ ক্ষু পীড়া হয়। পঞ্চমাধিপতির সঙ্গে শুক্রের সহাবস্থান ঘটলে চক্ষু আক্রান্ত হয়।

দ্বাত্মক রাশি লগ্ন হোলে আর লগ্নাধিপতি শনি যুক্ত হোলে অথবা শনি গৃহে থাকলে জাতক জাতি ভ্রষ্ট হয়। লগ্নে ক্রুর গ্রহ, দ্বাদশে বা ধন স্থানে ক্রুর গ্রহ, কিম্বা লগ্নাধিপতি ক্রুর গ্রহসংযুক্ত হোলে জাতক ম্লেচ্ছ হয়। ধনস্থানে শনি, সিংহরাশিতে মঙ্গল, পঞ্চমস্থানে বৃহস্পতি এবং অষ্টমে রবি চন্দ্র থাকলে ব্রাহ্মণ সন্তানও মদ্যপায়ী আর বেশ্যাসক্ত হয়, আর কুড়ি বছর বয়সে ম্লেচ্ছ হয়। রবি শনি এক রাশিস্থ হোলে জাতক চৌর্য্য পরায়ণ, বিত্তশালী, জননিন্দুক, ক্রোধী, দুঃখী ও রোগী হয়।

শনি রাহু যুক্ত হোলে জাত ব্যক্তি কপট, অজীর্ণ রোগী, ব্রণযুক্ত কুবিদ্যা সেবী, পর সেবারত ও অতিশয় দুঃখী হয়। তার স্ত্রী হয় ভাগ্যহীনা, আর তার সব কাজই নিস্ফল হয়। বৃহস্পতি পঞ্চমে আর লগ্নের পঞ্চমে পাপ-গ্রহ থাকলে ২৬।৩৩।৪০ বর্ষে সন্তানহানি হয়। কুম্ভ ও কর্কটে বৃহস্পতি পঞ্চমস্থ হোলে সন্তান হয়না। লগ্নপতি মঙ্গল উচ্চস্থ আর শনি যুক্ত রবি অষ্টমস্থ হোলে বিলম্বে সন্তান লাভ হয়।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফল

মেষ রাশি

ভরণী নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম, অশ্বিনী ও কৃত্তিকার পক্ষে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ফল। শেষার্দ্ধটি পূর্ব্বার্দ্ধ অপেক্ষা ভালো। অধিকাংশ সময়েই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে দিনগুলি কেটে যাবে স্বজনবিরোধ, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, ক্ষতি, গুরুজনবর্গের জন্য মানসিক অশান্তি, উদ্বিগ্নতা, শারীরিক অসুস্থতা প্রথম দিকে দেখা দেবে শেষের দিকে কিছুটা সাফল্য, সৌভাগ্য, উত্তম অবস্থা ও পদমর্য্যাদা শত্রু জয়, সৎসংসর্গ প্রভৃতি সূচিত হয়। স্বাস্থ্যহানি যোগ। হজম শক্তি অভাবজনিত পীড়া, রক্তের হ্রাস, যারা পুরাতন ব্যাধিগ্রস্ত তাদের সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। পারিবারিক কলহ ও ঐক্যের অভাব, আর্থিক ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নয়। আর্থিক দুশ্চিন্তা, বন্ধুদের প্রতারণা, অর্থ অনাদায়ী হেতু কষ্ট ঘটবে। শেষের দিকে অনেকটা ভালো। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেসখেলায় পরাজয় ও অর্থনাশ, ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম নয়। গৃহাদি নির্ম্মাণ বা ভূম্যাদি ক্রয়ে হস্তক্ষেপ না করাই ভালো। অপ্রত্যাশিত ক্ষতি। চাকুরিজীবী পক্ষে প্রথম দিকটা প্রতিকূল। কিছু কিছু বেকার ব্যক্তি চাকুরি পেতে পারে। উপরওয়ালার মনস্তুষ্টি সাধন না করে চললে এমাসে চাকুরি জীবীর বহু দুর্গতি ভোগ হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অনেকটা ভালো সময়। বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে চললেও তবু শেষ পর্য্যন্ত

কিছুটা আশার আলো দেখতে পাওয়া যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে নানা প্রকার কষ্টভোগ আছে। অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত নারীরই বিশেষ দুর্ভোগ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মহিলারা কোনপ্রকার সুখ-সুবিধা পাবেনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটি হতাশা-ব্যঞ্জক।

বৃষ রাশি

মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে উত্তম। কৃত্তিকা ও রোহিণীজাতগণের পক্ষে মধ্যম। প্রথমার্দ্ধে উত্তম স্বাস্থ্য, সাফল্য, সুখ, বিলাস ব্যসন, লাভ, কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি সূচিত হয়। কিন্তু শত্রুদের জন্য নানাপ্রকার উপদ্রব ভোগ, কষ্টকর ভ্রমণ, ক্ষতি, দুঃখ, স্বজন বিচ্ছেদ, কলহ বিবাদ, দুর্নাম প্রভৃতি হোতে মুক্ত হওয়া যাবে না। শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। রক্তের চাপ বৃদ্ধি। উদরঘটিত পীড়া, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি দেখা দেবে। পথ্যের সতর্কতা ও গৃহে বিশ্রাম আবশ্যক। পারিবারিক অশান্তির জন্যে মন মেজাজ খুব খারাপ হবে। আত্মীয় স্বজন কেবলই কষ্ট দিতে থাকবে। আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা ঘটবে না। রেসে লাভ হবে, মাসের শেষার্দ্ধে সুযোগবাদীদের প্রতারণা হেতু বিশেষ অর্থ ক্ষতি। স্পেকুলেশনে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি একেবারেই ভালো নয়। টাকার লগ্নী ব্যাপারও ক্ষতিকর। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী খারাপ। নানাপ্রকার অপবাদ ও লাঞ্ছনা ভোগ ঘটবে। মহিলাদের পক্ষে মাসটী অশুভ। নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা, প্রণয়ভঙ্গ, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রু-বৃদ্ধি, পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি ঘটবে। অবৈধ প্রণয়ে লিপ্তা নারীর পক্ষে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটী মধ্যম।

মিথুন রাশি

মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে উত্তম, আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ফল। মাসটী মোটের উপর ভালো বলা যায় না। দুঃখকষ্ট, উদ্বিগ্নতা, স্বাস্থ্যহানি, বন্ধুবিচ্ছেদ, স্বজনবিরোধ, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, নানা প্রচেষ্টায় বাধা, প্রতারণা হেতু ক্ষতি, শত্রুবৃদ্ধি, নীচ সংসর্গ, অসম্মান প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছুটা ভালো বলা যায়। লাভ, সুখস্বচ্ছন্দতা, কর্ম্মে সাফল্য, বন্ধুদের সাহায্য, লাভ, মানসিক ও পারিবারিক সুখ, বিলাস ব্যসন ইত্যাদি আশা আছে। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্য হানি, বায়ু ও পিত্তপ্রকোপজনিত কষ্টভোগ। রক্তের চাপ রোগে আক্রান্ত পুরাতন রোগীদের পক্ষে বিশেষ কষ্ট-ভোগ। উদর ও শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের ক্রিয়ার উপর ব্যাধির প্রকোপ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে এসব ব্যাধির উপশম হবে। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের দ্বারা নিগ্রহ ভোগ হোলেও পারিবারিক শান্তি ও ঐক্যের সম্ভাবনা আছে। আর্থিক যোগাযোগ ঘটলেও ব্যয়াধিক্য ও অর্থ ক্ষতির প্রাবল্য হেতু সমস্যার সম্মুখীন হবার যোগ দেখা যায়। প্রতারণা, দলীয় চক্রান্ত, এবং সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টায় অসাফল্য হেতু মানসিক অশান্তি। মূলধনের পরিমাণ কিছু হ্রাস হোতে পারে। মামলা মোকর্দ্দমায় আশঙ্কা আছে। তার জন্যে বহু ব্যয়, স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেস খেলায় কিঞ্চিৎ লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি ভালো। উৎপন্ন দ্রব্য ও বাড়ীভাড়ার ব্যাপারে অনেকটা সন্তোষজনক। উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা দানের আনুকুল্যে কিছু কিছু ব্যক্তির সৌভাগ্য লাভ সূচিত হয়। টাকা লগ্নী ব্যাপারে লাভজনক পরিস্থিতি। এতদ্ সত্ত্বেও ভাড়াটিয়ার সহিত মনোমালিন্য, এজেন্ট ও অংশীদারের সঙ্গে মতানৈক্য ও বিবাদ সংঘটিত হোতে পারে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম বলা যায়না। উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার আশঙ্কা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে লাভ ও ক্ষতি দুই-ই চল্‌বে, ফলে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু লাভ ঘটবেনা। স্ত্রীলোকেরা গ্রহবৈগুণ্যের প্রভাব হোতে নিষ্কৃতি পাবে না। পুরুষের সহিত তাদের সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দুঃখদায়ক হয়ে উঠবে। এজন্য বহিক্ষেত্রের সহিত যোগাযোগ থেকে বিরত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সামাজিক পসার প্রতিপত্তি ও প্রভাব হ্রাস পাবে। অবৈধ প্রণয়ে আসক্তা নারীর অদৃষ্টে বহু লাঞ্ছনা ভোগ। গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই ভালো। বাহিরের সঙ্গে বিশেষতঃ পরপুরুষের সহিত নিজের যোগাযোগ না করলে অনেকটা শান্তির আশা আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়।

কর্কট রাশি

কর্কট রাশির তিনটী নক্ষত্রগত ব্যক্তিদের একই প্রকার ফলভোগ হবে। সময়টী কারো পক্ষে ভালো নয়। কিছু কিছু শুভফলের আশা থাকলেও অশুভ ঘটনার চাপে সেগুলি ম্লান হয়ে যাবে। নানাপ্রকার অশান্তি ও উদ্বিগ্নতা, কলহ বিবাদ, ক্ষতি, চুরি, দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য-হানি, ব্যয়াধিক্য, শত্রুবৃদ্ধি, মামলায় প্রতিকূল গতি, অবাঞ্ছনীয় পরিবর্ত্তন প্রভৃতি মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ হবে। প্রথমার্দ্ধটী কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যদাতা হোতে পারে। সুখ ও সাফল্য এবং গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রথমার্দ্ধে সম্ভব। সামান্য পরিমাণে স্বাস্থ্যভঙ্গ যোগ। রক্ত-দুষ্টি, পিত্তপ্রকোপ, শারীরিক উত্তাপজনিত পীড়াদি কষ্ট। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বায়ু ও বাত ব্যাধিজনিত শয্যাশায়ী হওয়ারও ভয় আছে। পারিবারিক কলহ, স্বজন বিরোধ ও ঘরে বাইরে মনোমালিন্য হেতু অশান্তি। কিন্তু এসব অপ্রিয় ঘটনার স্থিতি স্থাপকতা কম। আর্থিক সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথমার্দ্ধ অনেকটা ভালো। দ্বিতীয়ার্দ্ধ নৈরাশ্যজনক, ক্ষতির আধিক্য আছে। এজন্য আর্থিক ব্যাপারে পূর্ব্ব থেকেই সতর্ক হওয়া সমীচীন। সন্দেহজনক কর্ম্মপ্রচেষ্টা বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষি-জীবীর পক্ষে মাসটী মিশ্রফলদাতা। কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে লাভজনক পরিস্থিতি। গৃহাদি নির্ম্মাণ, ভূম্যাদি ক্রয়, খনি সংক্রান্ত কাজ প্রভৃতিতে অর্থনিয়োগ ক্ষতিকর হবে। ভূমি সংক্রান্ত কোন পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ অন্ততঃ এমাসে চলবে না। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়। প্রথমার্দ্ধ কিছু ভালো হোতে পারে। চাকুরিজীবীরা নানা কষ্টভোগ করতে পারে। ভৃত্য বা অধস্তন কর্ম্মচারীরা কষ্ট দেবে। যাদের সম্মান বা পুরস্কার পাবার যোগ্য আছে তাদের অনেকেরই এমাসে সাফল্য হবে। স্ত্রীলোকদের পক্ষে মাসটী সুবিধাজনক নয়। প্রণয়ভঙ্গ যোগ,

অবৈধ প্রণয়ে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। পারিবারিক, সামাজিক, প্রণয়, শারীরিক ও মানসিক ক্ষেত্রে কোনপ্রকার শুভ লক্ষণ দেখা যায়না, বরং বারম্বার পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতা হেতু চিত্তের সমতা রক্ষা সুসাধ্য হবে না। এজন্যে বহির্ভাগে বেশী মেলামেশা না করাই উচিত। দৈনন্দিন গার্হস্থ্যানী কর্মে ব্যাপৃত হওয়া উচিত। পরপুরুষের সহিত মেলামেশার ফলে অপ্রীতিকর পরিণতি ঘটবার আশঙ্কা করা যায়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী মোটেই অনুকূল নয়। রেসে লাভ।

সিংহ রাশি

পূর্বফল্গুনীজাতগণের পক্ষে উত্তম, মঘা বা উত্তরফল্গুনী জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। সিংহ রাশির পক্ষে মাসটী শুভপ্রদ। আশা আকাঙ্খার পরিপূর্ণতা, উত্তরোত্তর সাফল্য, লাভ, বিলাস ব্যসন, কর্ম্ম প্রচেষ্টায় সিদ্ধি লাভ। প্রভুত্বশালী বন্ধুলাভ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি, যশ ও খ্যাতি লাভ, শত্রুজয় প্রভৃতি শুভ ফল গুলি দেখা যায়। তবে মধ্যে মধ্যে ব্যয়বৃদ্ধি ক্ষতি, কলহ বিবাদ স্বজন বিরোধ, স্বাস্থ্যের অবনতি ইত্যাদি ও সম্ভব। স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালোই যাবে। পিত্ত প্রকোপের সম্ভাবনা। চক্ষু পীড়া হোতে পারে। পারিবারিক ঐক্য ও শৃঙ্খলতা বজায় থাকবে। পরিবারের বহির্ভূত আত্মীয়স্বজনের দ্বারা কিছু কষ্ট ভোগ। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বা গৃহে সন্তানের আবির্ভাব। বিলাস ব্যসন। আর্থিক অবস্থার পক্ষে উত্তম। লাভ, আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য। বাহিরের সাহায্য লাভ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। কারো জন্যে জামিন হোলে বিপত্তির কারণ হবে। আকস্মিক ভাবে সৌভাগ্য বৃদ্ধি। রেসে লাভ। ভূম্যধিকারী বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম, কিন্তু ভূম্যধিকারীর কিছু কিছু ভূমির অধিকার চ্যুতি ঘট্‌তে পারে। প্রতারণার সম্ভাবনা। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। নূতন পদমর্য্যাদা লাভ, পদোন্নতি প্রভৃতি যোগ আছে। বেকার ব্যক্তির চাকুরি লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে মাসটি শুভ। মহিলাগণের পক্ষে সাফল্য গৌরব, অবৈধ প্রণয়ে লিপ্তা নারীর নানা সুযোগ ঘট্‌বে। ভিতরে বাহিরে অনুকূল পরিস্থিতি। বাইরের মজলিসে, গানের আসরে, পিকনিকে, কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে কৃতিত্ব প্রদর্শন প্রভৃতি যোগ আছে, তা ছাড়া আছে জনপ্রিয়তা। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও ব্যাধির সম্ভাবনা আছে।

কন্যা রাশি

চিত্রাজাতগণের পক্ষে উত্তম, উত্তর ফল্গুনী বা হস্তার পক্ষে মধ্যম। কন্যারাশির পক্ষে মাসটী বিশেষ শুভ। সাফল্য, লাভ, বিলাস ব্যসন, আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ, শত্রুজয় সৌভাগ্যবৃদ্ধি, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের অনুগ্রহ ও বন্ধুত্ব লাভ। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান নূতন বিষয়বস্তু অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ প্রভৃতি যোগ আছে। ব্যয়বৃদ্ধি মামলা মোকর্দ্দমা, ক্ষতি, অসম্মান, কলহ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি গ্রহ বৈগুণ্য হেতু ঘট্‌তে পারে। উত্তম স্বাস্থ্য। চক্ষু পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। পিত্ত প্রকোপ। সন্তানাদির স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি নেওয়া আবশ্যক। পারিবারিক ক্ষেত্রে উত্তম পরিস্থিতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, শুভ ঘটনা, স্বজনপ্রীতি। পারিবারিক ঐক্য শান্তি শৃঙ্খলা। বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি ক্রয়। আর্থিক ব্যাপার উত্তম। এতদ্ সত্ত্বেও ব্যয় বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার দিকে মনঃ সংযোগ আবশ্যক। উত্তরাধিকার, চরমপত্র বা দানের আনুকূল্যে লাভের সম্ভাবনা। অপ্রত্যাশিত ভাবে অর্থ প্রাপ্তি। স্পেকুলেসনে লাভ ক্ষতি দুই ই ঘট্‌বে। রেসে জয়লাভ। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটী উত্তম। ফসলের অবস্থা সন্তোষ জনক, অনাদায়ী ভাড়াও হাতে এসে যাবে। গৃহ নির্ম্মাণ, সংস্কার বা গৃহাদি বৃদ্ধি বিস্তার হওয়ার যোগ আছে। । চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা বহুল পরিমাণে-লাভবান হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষেও মাসটি শুভ। শুভ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। আনন্দপ্রদ ভ্রমণ, পিকনিক, পার্টি প্রভৃতিতে আশাতীত সাফল্য। অবৈধ প্রণয়ের পক্ষে মাসটী অত্যন্ত অনুকূল এবং নানা প্রকারে সুযোগ সুবিধা ও লাভ ঘট্‌বে। যে সব নারী অধ্যয়নরতা বা চাকুরিজীবী তাদের উন্নতি হবে। প্রণয়ের আনুকূল্যে সহপাঠী বা সহকর্ম্মীর সঙ্গে বিবাহ হয়ে যেতে পারে। অধ্যাত্ম সাধনায় রতা নারীর নানা প্রকার দৈবী শক্তি লাভ ও দর্শন ঘট্‌বে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অতীব উত্তম ফল লাভ ও কৃতিত্ব অর্জ্জন।

তুলা রাশি

চিত্রাজাতগণের পক্ষে উত্তম, স্বাতী ও বিশাখাজাতগণের ফল চিত্রা জাতগণের অপেক্ষা ন্যূন। তুলা রাশির পক্ষে মাসটী আদৌ ভালো নয়। দিনগুলি বহু কষ্টে অতিক্রান্ত হবে। স্বাস্থ্যের অবনতি, স্বজন বিরোধ, বন্ধু বিচ্ছেদ, শত্রুবৃদ্ধি, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, পদমর্য্যাদাহানি, সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টায় বাধাবিপত্তি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, ক্ষতি, মিথ্যা অপবাদ নারীর নিকট নিগ্রহ ভোগ, দুঃসংবাদ প্রাপ্তি প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। রক্তের চাপ বৃদ্ধি, স্ত্রীপুত্রাদির পীড়া ও তজ্জনিত উদ্বিগ্নতা, পারিবারিক মতানৈক্য ও অশান্তি। আর্থিক অবস্থার অবনতি হবে না, তবে অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে শত্রুদের অপপ্রচেষ্টা রোধ কর্‌বার জন্যে অর্থব্যয় ঘট্‌বে ক্ষতি ও হবে। এমাসে কারো জন্য জামিন হওয়া উচিত নয়। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভপ্রদ নয়। মামলা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হবে। চাকুরিজীবীর পক্ষেও মাসটী নৈরাশ্যজনক, উপরওয়ালার সহিত অপ্রীতিকর মনোমালিন্য. পদোন্নতির বাধা প্রাপ্তি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ নয়, উপার্জ্জনে ব্যাঘাত। স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ। পুরুষের প্ররোচনায় বিপত্তি। অপযশ ও অপমান। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে নানা প্রকার অশান্তিপ্রদ অভিজ্ঞতা লাভ। ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত হয়ে বন্ধুরা পর্য্যন্ত শত্রু হয়ে উঠে ক্ষতি কর্‌বার চেষ্টা করবে। সুন্দরী নারীর সতর্কতা আবশ্যক। বাহিরে চলাফেরা-কর্‌বার

সময় নিজের লোক ছাড়া একাকী যাওয়া অনুচিত। তুলারাশির নারীর পক্ষে এমাসে অধিকাংশ সময়ে গৃহে থাকা বাঞ্ছনীয় ও পর পুরুষের সংস্রবে আসা যুক্তি-যুক্ত নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ সময়।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত জাতগণের পক্ষে একই প্রকার ফল। মাসটী আশাপ্রদ নয়। মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, নৈরাশ্য, বহুবিধ ব্যাপারে উদ্বিগ্নতা, কলহ বিবাদ, স্বাস্থ্যের অবনতি, অপরিমিত ব্যয়, ক্ষতি, প্রচেষ্টায় অসাফল্য, শত্রু বৃদ্ধি, পদমর্য্যাদা হানি, মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতি অশুভফল। লাভ, সাফল্য, গৃহে মাঙ্গলিক ঘটনা, শত্রু দমন, উত্তম মর্য্যাদা এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগও আশা করা যায়। মিশ্রফল। উদর ও গুহ্যদেশে পীড়া, অজীর্ণতা, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি পীড়া। জীবনী শক্তির হ্রাসও শারীরিক দুর্ব্বলতা। ধারালো স্পর্শে আঘাত প্রাপ্তি এবং ক্ষত সৃষ্টি। পারিবারিক শৃঙ্খলতা ক্ষুণ্ণ হবে না। আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভালো বলা যায় না। নিজের চেষ্টায় কিছুটা লাভ হোতে পারে। রেসে লাভ। ভূম্যধিকারী কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে নানা প্রকার অসুবিধা ও দুঃখকষ্ট ভোগ। চাকুরি ক্ষেত্রে ভালো নয়। বহু প্রকার অসুবিধা, অসন্তোষ ও মর্য্যাদা হানি। পদোন্নতির আশা নেই। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অশুভ মাস, কাজ ভালোভাবে চলবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে ভালো মন্দ দু প্রকার ঘটনাই ঘটবে। অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত নারীর পক্ষেই কিঞ্চিৎ ভালো। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ, মধ্যে কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তি যোগ আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়াজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। মূলা ও উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভালো অল্প বিস্তর অসুবিধা বাধাবিপত্তি ও কষ্টভোগ সত্বেও মোটের উপর মাসটি মন্দ যাবে না। মিশ্র ফল শত্রু দমন। উত্তম স্বাস্থ্য, কর্ম্ম সাফল্য, সুখ, আর্থিক উন্নতি। বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। সন্তান জন্ম। নূতন পদ মর্য্যাদা লাভ প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া আছে ক্লান্তি কর ভ্রমণ, মানসিক উদ্বেগ। কলহ বিবাদ, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। মোটের উপর স্বাস্থ্য ভালো হোলেও উদর শূল, আমাশয় জ্বর প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। রক্ত হীনতা, ক্ষত বৃদ্ধি, পক্ষাঘাত। সামান্যই পারিবারিক বিরোধ। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে মিশ্র ফল। রেসে লাভ। কৃষিজীবী, ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মিশ্র ফল। বাড়ী ও জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে বেচা কেনায় লাভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধটা শুভ, শেষার্দ্ধটা অশুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে লাভক্ষতি কিছুই হবে না। একভাবে চলবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ও মাসটি মিশ্র ফলদাতা। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি, পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়।

মকর রাশি

ধনিষ্ঠাজাত গণের পক্ষে উত্তম। উত্তরাষাঢ়া বা শ্রবণার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মধ্যম সময়, প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধ শুভ। প্রথমার্দ্ধে শত্রুদের দ্বারা নির্য্যাতন ভোগ, দুর্ঘটনা, বহু প্রকার অশান্তি, ভগ্ন স্বাস্থ্য, বন্ধু স্বজন বিরোধ। অপমান, ক্ষতি ইত্যাদি সূচিত হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে সুসংবাদ বন্ধু লাভ মিলন, আমোদ প্রমোদ, সুখকর ভ্রমণ, জনপ্রিয়তা, খ্যাতি প্রভৃতি দেখা যায়। চক্ষু পীড়া, উদরের গোলযোগ প্রভৃতি প্রথমার্দ্ধে পরিলক্ষিত হয়। শেষার্দ্ধে শরীর ভালোই যাবে। দেহ অপেক্ষা মনের অবস্থা খারাপ হবে। পারিবারিক অশান্তির যোগ আছে। বন্ধুগণের সহিত কলহ। বিশেষ অন্তরঙ্গ স্বজন ব্যক্তির পীড়া উদ্বিগ্নতার কারণ হবে। দুঃসংবাদ প্রাপ্তির জন্য কষ্ট ভোগ। আঘাত অথবা ক্ষতজনিত দূষিত অবস্থা চিন্তার কারণ ঘটাবে, রক্তের হ্রাস হবে। আর্থিক অনাটন, সহজে কার্য্যে সিদ্ধি হবে না। অংশীদারদের সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু কষ্ট ভোগ। শেষার্দ্ধে লাভজনিত চিত্তপ্রসন্নতা। ভূম্যধিকারী বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে অতীব শুভ। সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি ও শস্য সমৃদ্ধি। উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ সম্পত্তি লাভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। অধস্তন কর্ম্মচারীরাই বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মোটামুটি ভাবে সময়টি যাবে। স্ত্রীলোকেদের পক্ষে মাসটি মিশ্র ফল দাতা। প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্যলাভ। পারিবারিক অস্বাচ্ছন্দ্যতা, পর পুরুষের আনুকুল্য লাভ ও প্রলোভনে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। উত্তম বসন ভূষণ প্রাপ্তি। সামাজিক ক্ষেত্রে অপবাদ, দাম্পত্য কলহ মধ্যে কর্ম্মে বাধা বিপত্তি, রেসে লাভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম।

কুম্ভ রাশি

শতভিষা অথবা পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতগণের অপেক্ষা ধনিষ্ঠা জাতগণের সময় ভালো। কুম্ভরাশির ফল এমাসে শুভ নয়, নানাপ্রকার বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হোতে হবে। মানসিক অশান্তি ও ভয়, স্বজন বন্ধু বিরোধ, সকল কর্ম্মে বাধা, শত্রুদের অপপ্রচেষ্টা হেতু কষ্টভোগ, দুঃখ, স্বাস্থ্যহানি, দুর্ঘটনা কর্ম্মে অসাফল্য প্রভৃতি যোগ আছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই সব ফলের প্রাবল্য। কিছু আনন্দ, লাভ, প্রতিযোগীর উপর জয়লাভ, উত্তম বন্ধুলাভ, বিলাসিতা প্রভৃতি এমাসে দেখা দেবে। মাসের মধ্যে প্রায়ই উদরের গোলযোগ। পুরাতন চক্ষু রোগীর বিশেষ কষ্ট ভোগ। স্ত্রী পুত্রাদির সহিত কলহ হেতু পারিবারিক অশান্তি। অপ্রিয় সংবাদপ্রাপ্তি হেতু দুঃখও আশঙ্কার কারণ ঘটবে। অর্থকৃচ্ছ্রতা। প্রথমার্দ্ধে কিছু লাভ। মাসটী দুঃখকষ্টে অতিবাহিত হবে। স্পেকুলেশনে কোন লাভ হবে না। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভপ্রদ নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভপ্রদ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা এমাসে বহু অসুবিধা ভোগ করবে। স্ত্রীলোকের পক্ষেও দুঃখময়। নানা বাধাবিপত্তি,

আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, প্রণয়ে ভঙ্গ, অবৈধ প্রণয়ে বিপন্নতা—কোর্টসিপ ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ। ব্যয় বৃদ্ধি। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতা। রেসে পরাজয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

মীন রাশি

রাশিচক্রে তিনটী নক্ষত্রেই যারা জন্মেছে তাদের সকলেরই একই রকম ফল। মাসটী মিশ্রফল দাতা। উত্তম স্বাস্থ্য, লাভ, সম্বন্ধ, শত্রু জয়, বিশেষ মর্য্যাদা ও অনুগ্রহলাভ, বিলাসব্যসন, সুখ স্বচ্ছন্দতা, কর্ম্ম প্রচেষ্টায় সাফল্য, আয় বৃদ্ধি, সৌভাগ্যলাভ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উপঢৌকন লাভ, খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রভৃতি যোগ আছে। সামান্য বাধাবিপত্তি, উদ্বেগ, অশান্তি, স্বজন বন্ধুর সঙ্গে কলহ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে সন্তানগণের শারীরিক অবস্থা খারাপ হবে। পুরাতন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অনেকটা সুস্থবোধ করবে, জীবনীশক্তির বৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যাধিকারীও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। গৃহ নির্ম্মাণ বা বৃদ্ধির যোগ। চাকুরিজীবীদের উত্তম সময়। উপরওয়ালার অনুগ্রহলাভ। বেকারব্যক্তিগণ চাকুরি পাবে। প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় সাফল্য ও কর্ম্মপ্রাপ্তি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষেও উত্তম সময়। মহিলারা আশাতীত সুযোগ সুবিধা পাবে। সৌভাগ্যলাভ। অবৈধ প্রণয়ে অত্যন্ত সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ ও মূল্যবান উপঢৌকন লাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য। রেসে লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের সাফল্য এবং উন্নতি ঘটবে।

ব্যক্তিগত দ্বাদশলগ্নের ফল

মেষ লগ্ন

বায়ুঘটিত পীড়া, শারীরিক বেদনা, পাকযন্ত্রের বিশৃঙ্খলতা, বিত্তলাভে অন্তরায়, পত্নীর জরায়ুঘটিত পীড়া, ভাগ্যোদয়ে বাধা। কর্ম্মস্থলে অশান্তি, মাতার স্বাস্থ্যহানি, পিতার স্বাস্থ্য উত্তম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়, অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য।

বৃষলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, আর্থিক প্রতিকূলতা, সহোদরের ফল শুভ নয়, বিত্তোন্নতি যোগ, ভাগ্যোন্নতি, অবিবাহিত ও অবিবাহিতার বিবাহ, স্ত্রীর সহিত মতানৈক্য, স্ত্রীর উল্লেখযোগ্য পীড়া, চাকুরিতে উন্নতি, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়।

মিথুনলগ্ন

পীড়াদি কষ্ট, নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ, কর্ম্মোন্নতি, বন্ধু লাভ, পারিবারিক পরিস্থিতি প্রতিকূল, পাকযন্ত্রের পীড়া, ধনোপার্জ্জন যোগ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মধ্যম, স্ত্রীলোকের প্রণয়ভঙ্গ যোগ।

কর্কটলগ্ন

বেদনাঘটিত পীড়া, স্বাস্থ্যহানি, কন্যা সন্তানের বিবাহ সম্ভাবনা, চাকুরির ফল শুভজনক, নানারকম ব্যয়বাহুল্য, সন্তানের বিদ্যার্জ্জনে কিছু কিছু বাধা, লাভের আশা আছে, স্ত্রীলোকের পক্ষে মানসিক কষ্ট, উদ্বেগ ও অশান্তি, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে আশাপ্রদ ফল।

সিংহলগ্ন

ব্যয় বাহুল্য, ঋণগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা, সম্বন্ধ লাভ, পড়াশুনায় অমনোযোগিতা, দেহপীড়া, ভাগ্যোদয়, কর্ম্মস্থলে ক্ষতির আশঙ্কা, মাতার দৈহিক অবস্থা ভালো নয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে ফল উত্তম নয়।

কন্যা লগ্ন

পাকাশয়ের দোষ, দাঁতের যন্ত্রণা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধনাগম যোগ, শত্রুবৃদ্ধি যোগ, ভাগ্যোন্নতি, সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা, দাম্পত্য প্রেম, পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

তুলা লগ্ন

ভূমি গৃহাদি সংক্রান্ত গোলযোগ, গুরুজন বিয়োগের সম্ভাবনা, মিত্রলাভ, স্ত্রীর স্বাস্থ্যোন্নতি, বিজ্ঞান শাস্ত্রে অধিকতর উন্নতি, বিদ্যার্জ্জন উত্তম, সহোদর ভাব অশুভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃশ্চিকলগ্ন

দৈহিক অবস্থা ভালো, ভাগ্যোন্নতির পথে বাধা, চুরি ও প্রতারণা, নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ বা সংস্কার, কন্যা সন্তানের বিবাহের সম্ভাবনা বা আলোচনা। কর্ম্মস্থানে দায়িত্ব ও মর্য্যাদা লাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ, বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা।

ধনুলগ্ন

অনুকূল পরিস্থিতি, শারীরিক অসুস্থতা, আকস্মিক আঘাত বা রক্তপাতাদির সম্ভাবনা, ধনাগমযোগ, ব্যয়বৃদ্ধি, বৈষয়িক ব্যাপারে ভ্রাতার সহিত মতানৈক্য, মিত্র লাভ, পড়াশুনার কৃতিত্ব, কর্ম্মস্থান শুভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, অবিবাহিতা নারীর বিবাহের যোগ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মকরলগ্ন

ধনভাব মধ্যবিধ। শারীরিক অশান্তি। সহোদরের সহিত অসদ্ভাব। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আশাপ্রদ না হোলেও বিফল মনোরথ হওয়ার যোগ আছে। সন্তানের বিবাহ বা বিবাহের আলোচনা। ভাগ্যোন্নতি, তীর্থ পর্য্যটনে অর্থব্যয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর সাফল্য লাভ।

কুম্ভলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা, চাকুরি বা পদোন্নতি লাভের আশা পত্নীর শারীরিক অশান্তি, ভাগ্য বা ধর্ম্মভাবের উন্নতির আশা কম, সন্তানের স্বাস্থ্যহানি, বিদ্যার্থীকে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হোতে হবে, সময়ে সময়ে দমকা খরচ, গুরুজনের সহিত মনোমালিন্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে দুঃসময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর অসাফল্য ও বাধা।

মীনলগ্ন

উত্তম দেহভাব, বন্ধুর সহিত মতানৈক্য, অধ্যাপনায় সুনাম, বিদেশ ভ্রমণ, বিবাহার্থীর পত্নীলাভ, ব্যয়াধিক্য, আর্থিক পরিস্থিতি বিশেষ অনুকূল, সম্পত্তি বা নূতন গৃহাদি যোগ, বিদ্যাভাব শুভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এ জীবনে এত ভাবনা আসবে, কোনোদিন ভাবে নি অভয়। নিজে সে যত ব্যস্ত হল, তত চিন্তা বাড়ল, জটিল হল পরিবেশ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ল দুঃখ।

আজ তার সবচেয়ে দুঃসময়ে সুরীন কাকা, ভামিনী খুড়ি নিজেদের সংসারে ফিরে গেল। অথচ, তাকে কেউ ছেড়ে যাবে কিংবা তার কাছে কেউ আসবে, এটা কোনো সমস্যা ছিল না জীবনে। তার জীবনটা ছিল, কারুর ধরা এবং ছাড়ার বাইরে।

তারপর এসেছিল ধরা এবং ছাড়ার পালা। শূন্য আর ফাঁকি মনে হয়েছিল আগের জীবনটা। আজ এল এমন দুঃসময়, যা চোখে দেখা যায় না। যে দুঃসময় তার ভিতরে ছায়া ফেলেছে। আক্রমণ করেছে মনের চারদিক ঘিরে। যখন তার আদর্শের সীমানা ও বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে গেল, নিমিহীন সংসারে যখন সে পুনর্বাসন খুঁজছে, সংসারকে নিমিময় করার একটা মহৎ আবেগের দৈন্য যখন রক্তের মধ্যে চাপা পড়া গুপ্ত রোগ চামড়ায় ফুটে ওঠার মতো আচমকা জেগে উঠেছে সুবালার সান্নিধ্যের রূপ ধরে, তখন সুরীন ভামিনী গেল। তাদের এ যাওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু যাওয়ার রকমটা ততো স্বাভাবিক হয় নি। সিদ্ধান্ত মাত্রেই কাজে পরিণত করেছে। তার ভিতরে যে একটা খচ্ খচানি ছিল, সেটা প্রত্যক্ষ প্রকাশ পেল না। কিন্তু খচখচানিটুকু আন্দাজ করল অভয়। তবু সে মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করল না। জিজ্ঞেস করল নিজেকে। সেখানে কিছু খুঁজে পেল না।

তাই অভিমান অভয়ের। একটা যন্ত্রণার স্তব্ধতাকে সে প্রত্যহের কলরোলে মুখরিত করে তুলতে পারল না। তার মনে হল, এক একে সবাই তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। এই ছেড়ে যাওয়াটাই, তার দুঃসময়কে প্রমাণ করছে। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে, তাকে নিয়ে কেউ খেলছে। অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে টানছে।

একথা ভাবতে ভয় হয়। আশৈশব দুঃখ তার কাছাকাছি জিনিষ, প্রায় ছায়ার মতো। তাই ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় হিসেবে, দৈনন্দিনতাকে অব্যাহত রাখতে চাইল।

না পাওয়াটা এক কথা। পেয়ে হারানোটা আর এক কথা। পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা-ই বেশী। অভয়ের মনে হল, সে পেয়ে হারাচ্ছে। এর জন্যে কোথায় যে আপোষের প্রয়োজন, কোথায় হাত বাড়ানো উচিত ছিল, তা সে খুঁজে পেল না। এ সব কিছুকে সে মেনে নিয়ে চলতে চাইল।

আসন্ন সম্মেলনের মহড়া ঠিক চলতে লাগল মুচীপাড়ায়। সন্ধ্যাবেলায় সুরীন দোকানে যেমন বসছিল, তেমনি বসতে লাগল। নিমেকে ছেড়ে ভামিনীর দিন কাটে না। ভামিনী এসে নিয়ে যায়। নয় তো গিনি দিয়ে আসে। তা' ছাড়া ভামিনীর নামে মাত্রই বাড়ি যাওয়া। তার অধিকাংশ সময় কাটে গিনির কাছেই। বিশেষ রাত্রের দিকে। কারণ গিনির পক্ষে একেবারে একলা অনেক রাত্রি অবধি থাকা একটু ভয়ের। যদিও গিনির কাছে আদৌ তা সমস্যা নয়।

আর অন্য কথাটিও উঠল খুব স্বাভাবিকভাবেই, কেবল অভয়কে বাঁচিয়ে। কথা উঠেই ছিল যে, ভামিনী গিনিকে নিমির জায়গায় বসাতে চায়। ভামিনী চলে যাবার পর, ব্যাপারটা অনেকে পাকাপাকি মনে করল। তাই কথাটা

আর একবার উঠল। মালীপাড়ার অন্য কোনো লোকের বিষয় হলে, এ বিষয়ে একটা খোলাখুলি রসালোচনার আসর বসত। কিন্তু শৈলর জামাইয়ের বেলায়, অনেকে একটু সঙ্কোচের আড়ষ্টতায় থমকে রইল। আলোচনা অভয়ের আড়ালে আবডালেই চলতে লাগল। শোনানো চলল কখনো ভামিনীকে। কখনো গিনিকে। এ বিষয়ে ভামিনী যদিও মুখের ওপর ঝগড়া করতে কসুর করল না, গিনি একেবারে নীরব। ভামিনী তাতে অবাক হল। গিনি যে চোপা করতে জানে না, তা তো নয়।

সেদিন যখন পাড়ার জল-কল থেকে কলসী কাঁখে গিনি ফিরল, ভামিনী তখন নিমেকে নিয়ে উঠোনে। দেখল গিনির চোখে জল।

ভামিনী বলল, কী হল?

গিনি কলসী নিয়ে রান্না ঘরে যেতে যেতে জবাব দিল, যা হয়। কলসীটা ভরবার উপায় নেই। তার মধ্যেই কত কথা শুনতে হয়।

ভামিনী বলে উঠল, তা তুই বা এত চুপচাপ কেন? মুখের মতন জবাব দিতে পারিস না? কাঁদছিস তুই?

রান্নাঘরে কলসী রেখে চোখ মুছল গিনি। ওখান থেকেই ভেজা গলায় বলল, কী জবাব দেব?

ভামিনী রুষ্ট হল। বলল, কী জবাব দিবি জানিস না? যা সত্যি, তাই বলবি আঁটকুড়ি মাগীদের মুখের ওপর।

গিনি বাইরে এল আর একটা শূন্য কলসী নিয়ে। বলল, সত্যি বলব কাদের কাছে মামী? সত্যি কথার ধার ধারছে কেউ?

—কেউ না ধারুক, তুই তো ধারবি।

আপাত একটা যুক্তি থাকলেও, গিনি ঠিক ভাবে নিতে পারল না। এ বিষয় নিয়ে বাইরে কথা বলতে যে তার কোথায় বাধছে,তা সে ব্যাখ্যা করতে পারল না ভামিনীকে। কিন্তু বাধছে। বাইরের ওসব আলোচনা সে কেবলি এড়িয়ে যেতে চায়। যেন পালিয়ে আসে। এরকমটা ঠিক গিনির মতো নয়। সে যে ঠিক তেজ ও দর্পের সঙ্গে, নীরব অবহেলায় সবাইকে এড়িয়ে যাচ্ছে, তা নয়। কেমন একটা ভয়ের ছায়া তার মুখে।

গিনি প্রতিবাদ করল না ভামিনীর কথার। কলসী নিয়ে আবার বাইরে চলে গেল। ভামিনা ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে। মনের মধ্যে একটা সুদূর সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু ভামিনীর অভিজ্ঞ চোখ ও মন সে সন্দেহকে ঘেঁষতে দিতে চাইল না। তবু একটা কাঁটা যেন খচ্ খচ্ করতে লাগল কোথায়। তার সন্দেহ সত্যি হোক, এককালে সে তাই চেয়েছিল। আজও চায়। মিথ্যে দুর্নাম সে অভয়ের নামে সইবে কেমন করে।

অভয় এ সবের কিছুই জানল না। গিনির সম্পর্কে সে বিশেষ করে কোনোদিনই কিছু ভাবে নি। ভাবে নি, তার কারণ গিনিকে সে সংসারের একটি স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবে জেনেছে। গিনি শুধু গিনি-ই। ভামিনী আর সুরীন চলে যাবার পর, প্রত্যহের সাংসারিক কথাবার্তা কিছু বেড়েছে। গিনি যে তার সংসারে আছে, অভয়কে দেখলে সেটা বোঝা যায় না। সে-ই যেন গিনির সংসারে আছে। সুতরাং গিনি যেমন আছে, ঠিক তেমনি করেই গিনিকে মেনে নিয়েছে সে। মুচীপাড়া থেকে ফেরার পর গঙ্গাজলের ছিটার মতোই, অনেক নিয়ম, সংসার চালানোর বিধি এবং ছেলে মানুষ করার ব্যবস্থা, সবই মেনে নিয়েছে।

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করে দেখল না, গিনি গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কথার জবাব কম দিচ্ছে। অভয় বেশী কাছে এলে, গিনি চোরা চোখে বাইরে তাকাচ্ছে। সরে সরে যাচ্ছে।

কখনো যদি একটু বিশেষভাবে অভয়ের কিছু চোখে পড়ে, তবে হয় তো বলে, গিনি ঠাকরুনকে যে একটু ভার ভার দেখছি! কী হল?

গিনি বলে, কই, কিছু না তো।

অভয় নিশ্চিন্ত গলায় বলে, তাই বল। আমি ভাবি কী জানি, তোমার আবার কিছু হল নাকি।

বলে সে নিমেকে নিয়ে মাতে এবং সম্প্রতি এক উপসর্গ হয়েছে, অভয় রাত করে এসে ঘুমন্ত নিমেকে জাগিয়ে দেয়। একেবারে ঘুম কাটিয়ে দেয় ছেলেটার। ছেলেও তেমনি, ঘুমটুকু কাটতে যা দেরী। আরম্ভ করবে হুড়যুদ্ধ, দাপাদাপি, হাসাহাসি, তা থৈ তা থৈ নাচ। বাপ ব্যাটা সমান।

ঠিক ছুদিন গিনি হেসে হেসে দেখল।

অভয় বলে, হাঁরে নিমে, কুরুক্ষেত্তরের লড়াইটা হয়ে কি হল বল দিকিনি।

নিমে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, হিঁ।

হিঁ কি রে ব্যাটা?

নিমে এক মুহূর্ত বাপের দিকে তাকিয়ে, নতুন দাঁত দিয়ে মাড়ি চিবোয়। তারপরে বলে ওঠে, বাত্তা।

অর্থাৎ ব্যাটা। অভয় বলে, দুর ব্যাটা, তুই কিছু জানিস না। হল না কিছুই। কিন্তু কলকাতায় যে লোকশিল্প না কি হবে, দেখিস, সেখানে কবি-ওয়ালা ঠিক ওই মহাভারত গাইবে। ও আর আমার ভাল লাগে না।

নিমে অমনি খিল্‌খিল করে হেসে ওঠে।

হাসছিস কি রে?

নিমে বলে হাত তুলে, গিঁঈ।

নিমের অঙ্গুলি সংকেত লক্ষ্য করে। অন্ধকারে ছায়ার মতো গিনিকে দেখতে পায় অভয়। কিন্তু মনোযোগ দেয় না। গান ধরে দেয়,

হুকুমে নৌকো চলে ডাঙ্গায়,
দেখি নতুন ভারতে।
বাজারে মাল বিকোয় দামে
মানুষ পচে আড়তে।
নতুন ব্যাসদেব লিখে যাবেন
নতুন মহাভারতে।

গাইতে গাইতে অভয় নাচে। নিমেও তার অশক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে নাচবার চেষ্টা করে। আর খ্যাল্‌খ্যাল্ করে হাসে।

গিনি হাসি চাপতে পারে না। বলে বাঃ বাঃ! বাপ ব্যাটা সমান।

অভয় বলে, গিনি তুমিও নেমে পড় আদরে।

গিনি বলে, তা হলেই যোল কলা পূর্ণ হয়।

অনেকক্ষণ ধরে এই নাচ গানের পালা চলতে থাকে। এও অভয়ের এক রকম নতুন গানেরই মহড়া। তারপর বাবার সঙ্গে নিমের আর এক প্রস্থ খাওয়ার পালা। গিনির তাতে আপত্তি। এরকম অনিয়মে নাকি অসুখ করে। কথাটা গম্ভীরভাবে গিনি বললে, অভয়কে ছেলের হয়ে একটু খোশামোদ করতে হয় গিনিকে।

কিন্তু তৃতীয় দিন গিনি প্রস্তুত হয়ে রইল। নিমেকে এসে জাগাবার আগেই সে বাধা দিল। গঙ্গা জলের ছিটা দিয়ে বলল, থাক, ওকে আর জাগিও না অভয়দা। রোজ রোজ রাত ছুপুর পর্যন্ত, লোকে কি বলবে? আর ছেলেটার শরীর খারাপ হবে না?

অভয় বলল, অ।

ঠিক রাগ নয়, বিরক্তিও নয়, অভয় যেন শূন্য মন নিয়ে বসে রইল। গিনির কথাগুলি তাকে মেনে নিতে হল। সে জিজ্ঞেস করল, খুড়ি চলে গেছে?

দুর অন্ধকার থেকে প্রায় অস্ফুট জবাব এল, হ্যাঁ।

—রান্না হয়ে গেছে?

জবাব এল না। অভয়ও আর জিজ্ঞেস করল না। তাকিয়ে দেখল না, গিনি কোথায় আছে। গিনি আছে কোথাও তার নিজের কাজে, এই তার ধারণা। সে চুপ করে বসে রইল দাওয়ায়। সে চুপ করে বসে রইল, কিন্তু তার ভিতরটা চুপ করে নেই। এ অন্ধকার নিস্তব্ধতা যেন তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তাকে অস্থির করছে। তার দেহ ও মন, কিছু একটা করবার জন্যে যেন তাকে ধাক্কা দিচ্ছে। এই নিঃশব্দ রাত্রি ও সম্পূর্ণ আকাশ তাকে গ্রাস করে একটা শান্তির পারে নিয়ে যেতে পারছে না। একটা ঘর, একটি অস্বাভাবিক কান্না, মত্ত হাসি ও গান, বাঁধভাঙ্গা উচ্ছৃঙ্খল একটি দেহ তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

সহসা যেন অনেক দূর থেকে ভয়ার্ত গলার চীৎকারের মতো, নীচু কিন্তু তীব্র গলায় অভয় গেয়ে উঠল,

আমি প্রেম-নৌকা ভাসায়েছি প্রেমের সাগরে
নীল জলে দেখি ঝিলিক মারে কাম-হাঙরে।
ও মাঝি ভাই, হায় হায়—
সময় বুঝে উঠল ঝড় দক্ষিণা বাতাসে
উথলে পাথালে জলে নৌকা কাঁপে তরাসে।
ও মাঝি ভাইরে···

তারপর নিজের গলা শুনে নিজেই সে হঠাৎ চুপ করে গেল।

কেমন একটা সঙ্কোচে তাড়াতাড়ি তাকিয়ে দেখল চার-দিকে। ডেকে উঠল, গিনি, ও গিনি।

সাড়া পেল না। অভয় উঠোনে এসে দাঁড়াল। রান্না-ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাকল, ও গিনি, গিনি!

ডাকতে ডাকতে অভয় বাড়ির সীমানা চিতে বেড়ার কাছে চলে গেল। আগল বন্ধ দেখে, ফিরে, আবার ডাকবার উপক্রম করতেই, গিনির ভারী ও চাপা গলা শোনা গেল, চেঁচিও না। কী বলছ!

অভয় বলল, বলব আর কি। চুপচাপ বসে আছি। ভাবলাম কোথায় গেলে আবার।

সে গিনির কাছে এসে দাঁড়াল। গিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে, ঘরের দিকে এক পা এগিয়ে বলল, নিমেকে তুলে দেব?

—কেন? থাক না। এই তো বললে, পাড়ার লোকে ভাববে, ছেলেটার শরীর খারাপ করবে।

অভয় গিনির কাছে এগিয়ে গেল। বলল, তার চেয়ে বস, তোমার সঙ্গেই কথা বলি। হ্যাঁ, দেখ, দোকানে ধারের কারবার বড্ড বেশী চলছে দেখছি। কী করা যায় বল তো।

এবার গিনি ফিরে তাকাল। তার গলাও এবার হাল্কা হয়ে এসেছে। বলল, হাত মুখ ধুয়ে এস। অনেক রাত হয়েছে। খেতে খেতে কথা হবে।

এবারে গিনির গাম্ভীর্য ধরা পড়ল অভয়ের কাছে। বলল, তোমার বড় কষ্ট হয় গিনি।

গিনির বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে উঠল। বলল, মোটেই না। চুপচাপ বসে থাকতে আমার ভালই লাগে।

—অ। আমার আবার দম বন্ধ হয়ে আসে।

বলতে বলতে সে গামছা নিয়ে পুকুর ঘাটে চলে গেল। ফিরে এসে রান্নাঘরের লম্ফর আলোয় খেতে বসে, হঠাৎ বলল, শুনলাম, রাজুমাসীর বাড়ির ওই মেয়েটা, কী যেন নাম—?

গিনি বলল, সুবালা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ সুবালা। মেয়েলোকটি নাকি পাগল হয়ে গেছে।

গিনি চোখ নামিয়ে বলল, শুনেছি।

অভয় বলল, মানুষ যে কী চায়, তা সে নিজেই জানে না।

গিনি নিশ্চুপ। কিন্তু অভয়ের চোখ সরল না গিনির ওপর থেকে। বসে থাকা দায় হল গিনির। তার বুকের মধ্যে কেমন করছে।

অভয় হঠাৎ বলল, গিনি, তোমাকে আর ছোট মেয়েটি মনে হয় না। বেশ বড়-সড় লাগছে।

গিনি হাসবার চেষ্টা করে, গোছানো আঁচল আরো গোছাল।

অভয় মুখে ভাত তুলে বলল, এবার তোমার একটা বে-র দরকার, খুড়িকে আমি বলব।

গিনি তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। অভয় বলল, কী হল?

বাইরে থেকে জবাব এল, আসছি।

অভয় অবাক হল। তারপর ভাবল, গিনি লজ্জা পেয়েছে।

পরদিনই, ভামিনীর খচখচানি ও গিনির দুর্বোধ ভয়ের মুখে একটা প্রচণ্ড আঘাত করে ফিরল অভয়।

মুচীপাড়া থেকে রাত্রে বাড়ি ফিরছিল সে। পথেই পড়ে মালীপাড়ার যাত্রার আখড়া ঘর। প্রায়ই সেখানে জটলা চলে। পথ চলতি অভয়ের ডাক পড়ে প্রায়ই। দাঁড়িয়ে দু'চার কথা বলে।

এই দিনও দাঁড়িয়ে দু'এক কথা বলে তাড়াতাড়ি ফিরছিল অভয়। বিশু কোনোদিনই তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না। নিমিকে বিয়ে করা নাকি তার অপরাধ হয়েছিল। বিশুর বিশ্বাস, নিমির ওপরে অধিকার নাকি ওরই ছিল। শুনেছে, নিমির সঙ্গে নাকি আইবুড়ো বেলায় ওর ভাব ভালবাসা ছিল। মনে করতে বুকের মধ্যে টাটায়। তাই ও-জায়গাটা পারতপক্ষে অভয় কোনোদিন ঘাঁটায় নি।

বিশু হঠাৎ বলে উঠল, আর তর সয় না দেখছি।

অভয় বলল, হ্যাঁ, আর দেরী করব না।

অন্ধকারে বিশুর জলন্ত চোখ, নেকড়ের মতো ঝলকানো দাঁতের হাসি দেখতে পেল না সে। বিশু বলল, তা তো করবেই না। ঘরে অমন একখানি ডাঁসা ফল থাকলে—

অভয় দাঁড়িয়ে পড়ল।—কী বললে ?

কে একজন বলে উঠল,এই বিশে, কাকে কী বলছিস ? মাথা খারাপ নাকি ?

কিন্তু বিশু নিজেকে সামলাতে পারল না। বলল, আমি ওসব মান-জ্ঞান বুঝি না বাপু। যা সত্যি, তাই বলছি।

অভয় দু'পা এগিয়ে বলল, সত্যিটা কী, তা তো বুঝলাম না।

যদিও বুঝতে সত্যি বাকী ছিল না এবং বুকের আগুন এক মুহূর্তেই লেলিহান হয়ে মাথায় উঠেছে।

বিশু বলল, তোমার কপালটার কথা বলছিলুম। বেড়ে আছ। লোকে মিছে চেঁচিয়ে মরছে। তোমার কানে তুলো, পিঠে কুলো। দিব্যি লুটছ।

বিশু হেসে উঠল। কে যেন কী বলে বিশুকে বাধা দিতে চাইল। অভয়ের গলার স্বর ছুরির ফলার মতো বিঁধল, কী লুটছি ?

বিশুর হিংস্রতা আর হাসির আবরণ রাখতে পারল না। ফুঁসে উঠল, কী আবার! বেওয়ারিশ আইবুড়ো ছুঁড়ি।

কথাটা শেষ হবার আগেই, অভয়ের প্রকাণ্ড থাবাটা সাপটে গিয়ে পড়ল বিশুর গালে। বিশু গোটা মালীপাড়া জাগিয়ে চীৎকার করে উঠল, ওরে শালা, আবার গায়ে হাত! পাড়ায় বসে তুই আইবুড়ো ছুঁড়ি নিয়ে ঘর করবি, আবার—

বিশু কথা শেষ করবার আগেই আক্রমণে উদ্যত হল। কিছু বিদ্রূপ করে, টিটকারি দিয়ে বহুকাল থেকে সে অভয়ের ধৈর্যের পরীক্ষা করেছিল এবং সার্থক হয়েছিল। অভয়কে যাত্রার আখড়া থেকে সরে পড়তে হয়েছিল। দৈহিক শক্তির পরীক্ষায় অগ্রসর হয়ে সে ভুল করল। যে হাত সে বাড়িয়েছিল, সেই হাতই মুচড়ে ধরে, অভয় অন্ধের মতো আঘাত করতে লাগল। চাপা গলায় গর্জে উঠল, অনেক দিন তোমার ওই মেয়ে-ন্যাকড়া ন্যাকা-ন্যাকা ইয়ার্কি শুনেছি। মনে করেছ, চিরদিন পার পেয়ে যাবে। লোচ্চা, তোর জিভ্ উপড়ে ফেলব আজ।

বলে সে সত্যি সত্যি সাঁড়াশীর মতো হাত দিয়ে বিশুর গাল চেপে ধরল। প্রথমটা সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। এবার এক যোগে সকলেই চীৎকার করে উঠল, জামাই, ছেড়ে দাও জামাই, ছেড়ে দাও।

কয়েকজন তাকে ধরে ফেলল। ইতিমধ্যে হাতে হাতে বাতি নিয়ে, মেয়েরাও বেরিয়ে এল। কিন্তু তখনো সমানে চেঁচিয়ে চলেছে, কেন বলব না ? যা সত্যি, তাই বলছি। আরো বলব। তোকে বলতে হবে, গিনির সঙ্গে তোর কিসের সম্পর্ক ? কে কবে এমনটা দেখেছে। আমি এখুনি পুলিশে যাব। তোমরা সবাই সাক্ষী, ও আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।

কথা উচ্চারণ হচ্ছে না বিশুর। প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থা তার। ঠোঁটের কষ রক্তে ভেসে গেছে।

অভয় বলল, তাই যা, পুলিশের কাছেই যা। বলিস, তোকে খুন করে ফাঁসী গেলেও ক্ষতি নেই। তবু মালীপাড়ার একটা পাঁঠা বলি যাবে।

মেয়েরা হাঁকডাক শুরু করেছিল। জল আন, ন্যাকড়া আন্। কিন্তু বিশুর বউয়ের নিঃশব্দ কান্নাটা হঠাৎ চোখে পড়ে অভয় থতিয়ে গেল। নিমির সে বন্ধু ছিল। অভয়ের সঙ্গে তার বড় ভাব।

বাকী মেয়েরা সবাই যেন যম দেখার মতো দেখছিল অভয়কে। তারা সর্বনাশ সর্বনাশ করে চীৎকার করছিল, কিন্তু অভয়কে কিছু বলতে পারছিল না। পুরুষদের মধ্যে কয়েকজন অভয়কে ঠেলে দিল।—যাও যাও, জামাই তুমি বাড়ী যাও। ফয়সালা যা হয়, পরে হবে।

অভয় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কাল কেন, আজই হোক না। যদি অপরাধ করে থাকি, দশজনে মিলে আমাকে জুতো মার। ওর কথা যদি সত্যি বলে মানো, দশজনে মিলে আমাকে মার। দশ জনের চেয়ে বেশী জোর নেই তো আমার।

কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। সত্যের একটা শক্তি যেন কোথায় আছে। একজন বলল, তুমি বাড়ি যাও জামাই। তোমাকে কি আমরা চিনি না ? তবে, বিশের মারটা একটু বেশী হয়ে গেছে।

অভয়ের আবার চোখ পড়ল বিশুর ওপর। বিশুর বউ আঁচল দিয়ে কষের রক্ত মোছাতে যাচ্ছিল। বিশু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল হাত। আবার চীৎকার করে উঠল, কিন্তু আমি তোকে ছাড়ব না।

একজন বলে উঠল, এই বিশে, থাম্।

অভয়ের মনটা হঠাৎ যেন কেমন অবশ হয়ে এল। সে বাড়ির পথ ধরল। তখনো অনেকে আসছে ঘটনাস্থলে। সে অদূরেই দেখতে পেল, দুজন দুটি বাতি হাতে ফিরে যাচ্ছে। আর একজন তাদের সঙ্গে। সুরীন ভামিনী আর গিনি। চিনতে পারল অভয়। বাড়ি ঢুকতে তার ইচ্ছে করছিল না। তবু, বাড়ি ফিরেই এল।

বাড়ি যেমন নিস্তব্ধ থাকে, তেমনি আছে। সুরীন আর ভামিনী উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপচাপ। দাওয়ার ওপরে বাতি। নিমে নিদ্রিত। গিনি এই দৃশ্যপটের কোথাও নেই।

ভামিনী বলল, বড্ড বেশী মেরেছ নাকি?

অভয় দাওয়ায় বসে বলল, ওর আবার মার। মারে কিছু হয় না ওর। দেখগে, এখনো তড়পাচ্ছে।

সুরীন বলল, আবার একটা পুলিশ টুলিশের হাঙ্গামা—

ভামিনী বাধা দিয়ে বলে উঠল, তুমি রাখ দিকিনি। হাঙ্গামা হয় হবে। ওদের অত বাড়াবাড়িই বা কিসের? কী বাড়ানোটাই বাড়িয়েছে কিছুদিন ধরে।

বোঝা গেল, ভামিনী খুশি হয়েছে। সে চাইছিল এমনি একটা কিছু। শোধ না নিলে তার শান্তি হচ্ছিল না।

সুরীন বলল, এই দেখ, মেয়েমানুষের বুদ্ধি দেখ। এখন একটা গোলমাল যে চলবে—

—চলুক। গোলমাল কি চলছিল না?

অভয় বলল, আর এখন ভেবে কি হবে খুড়ো। সামলাতে যখন পারি নিকো, তখন যা হয় তা হবে।

—তা বটে। তবে—

শান্তিপ্রিয় মানুষ সুরীনের অস্বস্তি গেল না। বলল, আচ্ছা, নাও, খেয়ে দেয়ে এখন শুয়ে পড়। কাল দেখা যাবে, কী হয়।

ভামিনী বলল, হবে ছাই। অত যদি ওদের চুলবুলোনি। রাতে এসে আড়ি পেতে দেখে গেলেই পারে? মুরোদ বড় মান।

বলে সে হ্যারিকেন তুলে নিল। বলল, কই লো গিনি, নে ভাত টাত দে অভয়কে। চল যাই।

সুরীনকে নিয়ে সে চলে গেল। অভয় বসে রইল তবু। কেমন একটা চিন্তাশূন্য অবশ অবস্থা তার। মাঝে মাঝে খালি মনে পড়ছে পরশু—তার কলকাতায় লোকশিল্প সম্মেলনে যেতে হবে, কিন্তু গানগুলি তার মনে পড়ছে না।

[ক্রমশঃ

প্যাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ ঝিন্দের বন্দী ॥

Anthony Hope-এর "The Prisoner of Zenda" য়্যাডভেঞ্চার সাহিত্যে একটি অনবদ্য সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে এই উপন্যাসেরই সার্থক রূপ দিয়েছেন কথাশিল্পী শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "ঝিন্দের বন্দী" উপন্যাসে। এই 'ঝিন্দের বন্দী' উপন্যাসটি "The Prisoner of Zenda"-র আক্ষরিক অনুবাদ তো নয়ই, ভাবানুবাদও নয়—এটি একটি প্রায় স্বতন্ত্র সৃষ্টি। 'প্রিস্‌নার অফ জেণ্ডা'-র প্রধান থিম্‌টিকে উপজীব্য করে শরদিন্দুবাবু সম্পূর্ণ ভারতীয় পটভূমিকায় ও ভারতীয় ভাবে এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন, আর লিখেছিলেনই শুধু নয়—বাংলা য়্যাডভেঞ্চার বা রোমাঞ্চ সাহিত্যে একটি সার্থক সৃষ্টি করেছিলেন বললেও অত্যুক্তি করা হবে না নিশ্চয়। এই বহুজনপঠিত উপন্যাসের দশম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যাবার পর বাংলা চিত্র-নির্ম্মাতাদের এই বইটির ওপর নজর পড়ে এবং অধুনা বাংলা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে "ঝিন্দের বন্দী" দর্শক সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে আত্মপ্রকাশ করে উপন্যাসটির সমতুল্য হতে পেরেছে একথা বোধ হয় বলা চলে না। "ঝিন্দের বন্দী" একটি সুন্দর য়্যাডভেঞ্চার চিত্রের উপযোগী বই। উপন্যাসটিতে উপকরণ যা আছে তা দিয়ে একটি অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষক চিত্র নির্ম্মাণ করা যায়।

"প্রিস্‌নার অফ্ জেণ্ডা" শ্রেষ্ঠ তারকাদের দ্বারা অভিনীত হয়ে হলিউডে বার দু'য়েক চিত্রায়িত হয়েছে এবং সাফল্য লাভও করেছে। কিন্তু এই প্রসিদ্ধ বইটির উপযুক্ত ভারতীয় সংস্করণ বাংলা সাহিত্যে থাকলেও এদেশীয় প্রযোজকদের দৃষ্টি এই বইটির ওপর যে কেন এতদিন পড়েনি সেটাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত "ঝিন্দের বন্দী" চলচ্চিত্রে রূপায়িত হল। কিন্তু আগেই বলেছি, চিত্রায়িত হয়ে উপন্যাসটির সমকক্ষ হতে পারে নি। "ঝিন্দের বন্দী" কথাচিত্র আর শরদিন্দু বাবুর "ঝিন্দের বন্দী" উপন্যাসের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানিই রয়ে গেছে—যদিও একমাত্র শেষটি ছাড়া গল্পটির বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন চিত্রটিতে করা হয় নি। যে সমস্ত দর্শকের উপন্যাসটি পড়া আছে তাঁরা বৃথাই খুঁজে মরবেন চিত্রগৃহে বসে রূপালী পর্দ্দার ওপর তেজদৃপ্ত কুশলীনায়ক গৌরীশঙ্করকে, বেপরোয়া ময়ূরবাহনকে, নির্ভীক রুদ্ররূপকে, কুচক্রী উদিত সিংকে, আর সবার ওপর অজন্তা-চিত্রবৎ রূপসী কস্তুরী বাঈকে ও লাস্যময়ী ললনা কৃষ্ণাকে। এর ওপর কোথায় সেই নদী 'কিস্তা'? যার দুপারে দাঁড়িয়ে আছে ঝিন্দ ও ঝড়োয়ার দুই রাজপ্রাসাদ—যার একটিতে বাস
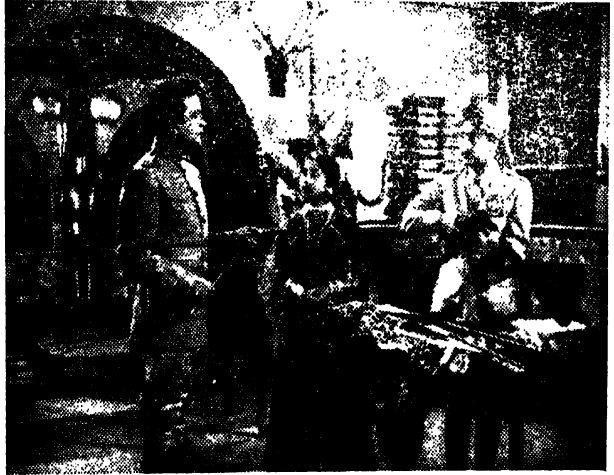
ভোলানাথ রায় প্রযোজিত ও তপন সিংহ পরিচালিত "ঝিন্দের বন্দী" চিত্রের একটি দৃশ্যে—উত্তমকুমার, সন্ধ্যা রায় ও দিলীপ রায়কে দেখা যাচ্ছে।

করেন অবিবাহিত মহারাজ শঙ্করসিং ও অন্তটিতে থাকেন মহারাণী কুমারী কস্তুরী বাঈ, আর যে কিস্তার জলে পড়ে সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে গৌরীর প্রথম সাক্ষাৎ হল কস্তুরীর সঙ্গে, যে কিস্তার জল পেরিয়ে গৌরী আঁধার রাতে রোমাঞ্চকর অভিযান করে যায় শক্তিগড় দুর্গ থেকে শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করতে—সেই কিস্তাকেই দর্শক খুঁজে পাবেন না এই চলচ্চিত্রে।

রহস্য-রোমান্সের রমণীয় রূপে রূপায়িত কিস্তার জলধারা উপন্যাস পাঠকের মনে যে রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে চিত্রটিতে সেই কিস্তার অদর্শন দর্শক মনে আনে এক শুষ্ক অনুভূতি। নায়কের পক্ষে সন্তরণ অসম্ভব বলেই কি কিস্তা বাদ গেল? তা হলে এরকম নায়কে দরকার কি? তাছাড়া camera tricks-এর সাহায্যে অন্য লোককে সাঁতার কাটিয়ে দেখানোওতো চলত। নায়কের ড্রেসিং গাউন্ পরা অবস্থায় দোলনা চেয়ারে বসে স্নানের দৃশ্য দেখানর চেয়ে সন্তরণ দৃশ্য দেখালে তা অধিকতর উপযোগী হত না কি? য়্যাড্‌ভেঞ্চার-প্রধান গল্পে য়্যাড্‌ভেঞ্চারকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত এবং সেই অনুযায়ী নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রগুলির নির্ব্বাচনও করা উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে পারদর্শিতার দিকে লক্ষ্য না রেখে শুধু দর্শক আকর্ষণের জন্য নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নেওয়া হয়েছে, তাতে হয়ত বক্স-অফিসের দিক থেকে ছবিটি সাফল্য লাভ করবে, কিন্তু চরিত্রগুলি যে ঠিকমত ফোটেনি তা দর্শক চক্ষে ধরা পড়বে, আর সেদিক থেকে বলা চলে ছবিটি দর্শক মনে ছাপ ফেলতেও পারবে না—এইখানেই এর ব্যর্থতা।

নায়ক গৌরীশঙ্করের ভূমিকায় উত্তমকুমার তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ আড়ষ্ট অভিনয়ের দ্বারা চরিত্রটির রূপায়নে যে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন একথা বলা চলে না। তবে অনেক উত্তম-প্রিয় দর্শকের কাছে তাঁর অভিনয় ভাল লাগতে পারে। অবশ্য বন্দী শঙ্করসিং-এর ভূমিকায় তিনি কিছুটা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। নায়িকা কস্তুরীবাঈ চরিত্রে শ্রীমতী অরুন্ধতী একেবারেই বেমানান। অভিনয় তাঁর হয়ত খারাপ হয় নি, আর অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগও এই চরিত্রে বিশেষ নেই। কিন্তু উপন্যাসে বর্ণিত বিংশতি-বর্ষীয়া অজন্তা-চিত্রবৎ তন্বী রূপসীর দেহশ্রী কি ফুটেছে? না লাঞ্ছনম্রা তরুণীর ব্রীড়াবনত ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে? ময়ূর-বাহন চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চেহারার দিক দিয়ে মানানসই হলেও ময়ূরবাহনের বেপরোয়া নির্ভীক ভাবটিকে যথাযথরূপে ফোটাতে পারেন নি। অবশ্য অন্য ভূমিকা-গুলির তুলনায় তাঁর অভিনয়ে কিছুটা 'স্মার্টনেস্' বা স্বাচ্ছন্দ্য চলা ফেরার—যা এই ভূমিকাটিতে একান্ত দরকার—পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁর হাসিটি বড়ই কাষ্ঠ, আর গালা-গালি সূচক কয়েকটি উক্তি যেন কষ্টোচ্চারিত—স্বাভাবিক হয়নি কোনটিই। অথচ এই ভূমিকাটিতে নায়ক চরিত্র-কেও অতিক্রম করে যাবার সুযোগ স্থানে স্থানে আছে, কিন্তু সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হয় নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করি হলিউডের রঙিণ চিত্র 'The Prisoner of Zenda'-তে James Masson-এর অভিনয়, যা নায়ক Stuart Granger-কেও ছাড়িয়ে গেছে বহু স্থানে। 'ঝিন্দের বন্দী' চিত্রের অন্য ভূমিকাগুলিও আশানুরূপ হয় নি। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় সর্দ্দার ধনঞ্জয় চরিত্রটি। এই ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্য্যের চরিত্রো-পযোগী অভিনয় চিত্রটির প্রাণকেন্দ্ররূপে ছবিটিকে ধরে রেখেছে। এই ভূমিকাটিতে তাঁর নির্ব্বাচন উপযুক্ত হয়েছে।

ভূমিকাগুলি ছাড়াও পরিচালনার ত্রুটিও চিত্রটিতে কম নয়। আগেই উল্লেখ করেছি 'কিস্তা'র বিলোপ সাধন ও নায়কের সন্তরণের বদলে পোষাকসুদ্ধ ফোয়ারায় স্নান! এ ছাড়া শঙ্কর সিং-এর প্রথম দর্শন পাওয়া যায় গায়করূপে। উপরি উপরি তিনটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (ছোট হলেও) গাইলেন সুরাপানে বেসামাল শঙ্কর সিং। গানই যদি শোনাবার দরকার হয় তাহলে মহারাজ শঙ্কর সিং-এর দরবারে গানের আসর বা জলসা দেখিয়ে সেখানে ওস্তাদের দ্বারা গান শোনালেই তো হত এবং একটি গানই যথেষ্ট হত।

কাহিনীর বিন্যাসেও ত্রুটি রয়ে গেছে। মূল কাহিনীর কয়েকটি বিশেষ ঘটনা বাদ পড়েছে—বিশেষ করে উপন্যাসে শেষটি যেভাবে হয়েছিল চিত্রে ঠিক সেভাবে হয় নি, কিন্তু গল্প অনুযায়ী হলেই বোধহয় ভাল হত। রক্ত সম্পর্কে গৌরীশঙ্কর যে শঙ্কর সিং-এর ভাই এবং ঝিন্দের সিংহাসনে গৌরীর দাবী যে শঙ্কর সিং-এর চেয়ে

কম নয়—এ ইঙ্গিত সর্দ্দার ধনঞ্জয় উপন্যাসে একাধিকবার দিয়েছেন এবং এই কথার তাৎপর্য্য হিসাবে শেষে দেখা গেছে আসল রাজা শঙ্কর সিং নিহত হয়েছেন এবং গৌরী-শঙ্করই ঝিন্দের সিংহাসনে পাকাপাকিভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ লেখক শেষ পর্য্যন্ত গৌরীকে রাজা করে পাঠককে সন্তুষ্ট করে যেমন মধুরেণ সমাপয়েৎ করেছেন, তেমনি পাঠকের সন্তোষ বিধানও করেছেন এই যুক্তি দিয়ে যে গৌরী অনিচ্ছাতে উড়ে এসে জুড়ে বসলেও সে অনধিকারী নয়—ঝিন্দের সিংহাসনে তার অধিকার আছে এবং কুমারী কস্তুরী বাঈকেও সে বিবাহের যোগ্য। কিন্তু, কথা হচ্ছে চিত্রটিতেও ধনঞ্জয়ের মুখ দিয়ে একাধিকবার ঐ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এবং গৌরীশঙ্করের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান কালীশঙ্করের পূর্ব্ব ইতিহাস এবং শঙ্কর সিং ও গৌরীর উভয়েরই যে তিনি পূর্ব্বপুরুষ ও ঝিন্দ রাজ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং তাঁর নিহত হবার কারণ ইত্যাদিও ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক গৌরীকে জানান হয়েছে। কিন্তু এই কথাগুলির যা উদ্দেশ্য তা সিদ্ধ হয়নি চিত্রের শেষে। শেষটিতে "The Prisoner of Zenda" চিত্রের মতন শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করে গৌরী নিজের দেশে ফিরে চলল, এই দেখান হয়েছে। তাতে এই কথাটাই মনে হয় যে তাহলে ধনঞ্জয়ের মুখ দিয়ে অত কথা বলাবার কি দরকার ছিল যদি না সে কথার কোনও উদ্দেশ্য থাকে। তা ছাড়া গল্পটির শেষ উপন্যাস অনুযায়ী করলেই ভাল হত—তাতে অন্ততঃ দর্শক মনে কিছুটা সোয়াস্তি আসত, কারণ শেষটি মোটেই জমেনি—নায়কের বিদায় দৃশ্যটিও মনে কোনও ছাপ ফেলতে পারে না, যেন কোনও রকমে ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা ও শেষ! এর মধ্যে চিত্রের আরম্ভটি ভাল হয়েছে বলা চলে। রেলের কামরার মধ্যের দৃশ্যটি ভালভাবেই গৃহীত হয়েছে, আর ফ্ল্যাশ্-ব্যাক্ পদ্ধতিতে পূর্ব্বকাহিনী দেখান সুন্দর হয়েছে। কিন্তু আরম্ভটি সম্বন্ধে এখানে আরও কিছু অভিমত দিলে বোধহয় অবান্তর হবে না। চিত্রটিকে যদি য়্যাড্-ভেঞ্চার-প্রধান চিত্ররূপে ধরে নেওয়া হয় এবং তাই বলেই বিজ্ঞাপিতও করা হয়েছে, তাহলে বলব যে রোমাঞ্চচিত্রের উপযোগী আরম্ভ করবার সুযোগ উপন্যাসটীতে পুরামাত্রায় থাকলেও পরিচালক তার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি, খুব সম্ভব কল্পনা শক্তির অভাবে। দেওয়ান কালীশঙ্করের সঙ্গে একটী রহস্য জড়িয়ে আছে এবং তাঁর হত্যাও হয়েছে রহস্যজনকভাবে, আর সেটিই হচ্ছে একরকম গল্পের গোড়া। এই গোড়াটীকে ধরে রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে যদি প্রথমেই দেখান হত ঃ—দেড়শত বৎসর আগের কলিকাতায় এক অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন পথ ধরে একটী পাল্কি এগিয়ে আসছে, সঙ্গের দু'জন মশালচির হাতের জ্বলন্ত মশাল আঁধারের মাঝে সৃষ্টি করছে এক ভৌতিক রহস্যময়তা এবং তারই মাঝে হঠাৎ অস্ত্রধারী আক্রমণকারীদের আগমন, মশাল ফেলে মশালচি ও বেহারাদের পলায়ন, আততায়ীগণ কর্ত্তৃক পাল্কীর দরজা উন্মোচন, আর কালীশঙ্করের বিস্মিত ভয়ার্ত্ত চিৎকার! পরে লোকজন ছুটে এসে দেখল কালীশঙ্করের বুকের মধ্যে আমূল প্রোথিত একটি সোনার বাঁটওয়ালা ছুরিকা, তার সোনার মুঠটি খালি জেগে রয়েছে মৃত কালীশঙ্করের বুকের ওপর—আলোক সম্পাতে মুঠটি ঝলসে উঠল ঝক্ ঝক্ করে, প্রতিফলিত হল কালীশঙ্করের স্থির বিস্ফারিত স্বচ্ছ চক্ষে। তারপর ক্লোশ্-আপ্ করে ছুরিকার সোনার মুঠটি বড় করে দেখিয়ে তার ওপর বড় অক্ষরে "ঝিন্দের বন্দী" টাইটল্ দিয়ে অন্যান্য ভূমিকালিপি ইত্যাদি দেখান হল এবং কিছুটা ভূমিকা-লিপি দেখিয়ে ট্রেনের কামরায় সর্দ্দার ধনঞ্জয় ও গৌরীশঙ্করকে এবং ফ্ল্যাস্-ব্যাকে পূর্ব্ব কাহিনী দেখিয়ে আবার ট্রেনের মধ্যে এসে বাকি ভূমিকালিপি দেখান চলত। এই ভাবে চিত্রটির আরম্ভ হলে এবং প্রথমেই চমক থাকলে রোমঞ্চ চিত্রের উদ্দেশ্যও সফল হত। আর, চিত্রের সমাপ্তিটিও যদি উপন্যাস-বর্ণিত ভাবেই হত তাহলে দেখান চলত—মুমূর্ষু ময়ুরবাহন শঙ্কর সিং-এর বক্ষে ঐ ছুরিটি, যা গৌরীই তাকে মেরেছিল, আমূল প্রোথিত করে দিল—জেগে রইল শুধু সোনার মুঠটুকু। সর্দ্দার ধনঞ্জয় ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করতে গেল আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিহত হয়েছে কিনা এবং সে কোন শঙ্কর সিং, আসল না নকল, তখন সর্দ্দারের হস্তধৃত আলোকে ঐ সোনার মুঠটি ঝক্ ঝক্ করে ঝলসে উঠে প্রতিফলিত হল নিহত শঙ্কর সিং-এর স্থির বিস্ফারিত স্বচ্ছ চক্ষে। এই ভাবে দেখালে গোড়ায় ও শেষে ছুরিটির সাহায্যে রোমাঞ্চের চমক সৃষ্টিই শুধু হত না, ঝিন্দ রাজবংশের যে ছুরি কালীশঙ্করের রক্ত পান করতে বাংলায় ছুটে গেছিল তা যেন মহারাজ শঙ্কর সিং-এর রক্তে প্রায়শ্চিত্ত করে দেড় শত বৎসর পরে আবার ফিরে এল ঝিন্দ রাজগৃহে—এই রকম একটা উদ্দেশ্যমূলক

উপসংহারও করা চলত। আর, রোমাঞ্চ রস—যা এই ছবির অপরিহার্য্য অঙ্গ অথচ এই চিত্রে যার অভাব ঘটেছে—আরও কিছু যুক্ত হয়ে ছবিটিকে য়্যাড্‌ভেঞ্চারধর্ম্মী করে তুলত।

যাই হোক, এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি ছাড়া "ঝিন্দের বন্দী" চিত্রটির আকর্ষণও বেশ কিছু আছে। ওস্তাদ আলি আকবর খাঁয়ের সঙ্গীত পরিচালনা এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবহসঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীতের সুর অপূর্ব্ব হয়েছে বলা চলে। তবে মাঝে মাঝে পরিমিতি বোধের অভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—স্থানে স্থানে প্রয়োজনের মাত্রা অতিক্রম করেছে বলে। "ঝিন্দের বন্দী" চিত্রটির আর একটি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এর বহির্দৃশ্য ও অভ্যন্তর দৃশ্যের চিত্র-গ্রহণ। রাজকীয় জাঁকজমক,প্রাসাদ, অলিন্দ, কারাগার, দুর্গ, পার্ব্বত্য পথ-ঘাট প্রভৃতি সুন্দর ভাবে দেখান হয়েছে এবং এই সকল দৃশ্যের সাহায্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান্‌ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এজন্য তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

আশা হয় অধুনা বাংলা চিত্রে বহির্দৃশ্য গ্রহনের যে চেষ্টা চলছে তা বাংলা কথাচিত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অনেক দূর, অবশ্য যদি ঠিক ভাবে দৃশ্যগুলি গ্রহন করা হয়।

এই দিক থেকে "ঝিন্দের বন্দী" একটি বিশেষ আকর্ষণই শুধু নয় একটি যুগ-স্রষ্টিকারী চিত্রও বলা চলে।

***

খবরাখবর :

পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর "তিন কন্যার" পর কি করবেন, অর্থাৎ তাঁর পরবর্ত্তী ছবি কি হবে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হয়ে গেছে। যত দূর জানা গেছে তাতে মনে হয় আজিকার মহানগরী কলিকাতাকে নিয়ে একটি চিত্র নির্ম্মাণের কাজে তিনি শীঘ্রই হাত দেবেন। চিত্রটির নাম হবে "মহানগর" এবং কলিকাতার সর্ব্বভারতীয় পটভূমিকাকে ভিত্তি করেই চিত্রটির বিষয়বস্তু রচিত হবে। এছাড়া মহাভারত-কে চিত্রে রূপায়িত করবার বাসনাও তাঁর রয়েছে। বিরাট মহাভারতকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করে চিত্রায়িত করতে চান। প্রথম ভাগে পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাস পর্য্যন্ত থাকবে, আর দ্বিতীয়ভাগে থাকবে কুরুক্ষেত্র মহাসমর। এই বিরাট চিত্রটির মধ্যে শ্রীরায়ের ইচ্ছা পৃথিবীর সেরা অভিনেতাদের সমাবেশ করা। যুধিষ্ঠির চরিত্রে রুশ শিল্পী চেরকাসভ্‌কে ভাল মানাবে বলে তিনি মনে করেন। আর, আকর্ষণীয় দৃশ্য অপেক্ষা মনস্তত্বই ছবিটিতে প্রাধান্য পাবে। আরও জানা গেছে যে শ্রীরায়ের "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রামাণিক চিত্রটির অভাবনীয় সাফল্য ও দেশে বিদেশের সুধীগণের প্রশংসা ভারত সরকারকে প্রভাবিত করেছে মহাত্মা গান্ধীর একটি জীবনীচিত্র নির্ম্মাণে এবং এই চিত্রটির ভারও সত্যজিৎ রায়ের উপরই দেবার ইচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকারের। এ সব ছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতি প্রভৃতি নিয়েও একটি চিত্র নির্ম্মাণের ইচ্ছা শ্রীরায়ের আছে।

* * *

পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় "অনুরাধা"-র পর তাঁর নূতন চিত্র ফিল্মক্র্যাফ্‌টস-এর 'বেনারসী'-কেও সমাপ্ত করে তাঁর পরবর্ত্তী চিত্র মাদ্রাজের এ, ভি, এম-এর "ছায়া"-র চিত্র গ্রহণও শেষ করে ফেলেছেন। আরও জানা গেছে পরিচালক মুখার্জির কলিকাতায় থেকে একটি বাংলা চিত্র নির্ম্মাণের ইচ্ছাও আছে। এই চিত্রটীর মধ্য দিয়ে আন্ত-প্রাদেশিক সম্বন্ধকে আরও ঘনিষ্ঠ করে দেখান হবে। নায়কের ভূমিকায় বিখ্যাত নট রাজ কাপুরকে নির্ব্বাচিত করা হয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে নায়িকার ভূমিকায় নেওয়া হবে কোনও নামকরা বাঙ্গালী অভিনেত্রীকে। হিন্দীতে একটী পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের শিশু-চিত্রও শ্রীমুখোপাধ্যায় নির্ম্মাণ করবেন বলে জানিয়েছেন।

* * *

'আরোরা' চিত্র-প্রতিষ্ঠান তাঁদের "ভগিনী নিবেদিতা" চিত্রের জন্য দলবল সহ এখন ইংলণ্ডে অবস্থান করছেন। পরিচালক বিজয় বসু ও অরুণ বসু খুবই কর্ম্মব্যস্ত রয়েছেন। বিখ্যাত 'ডেন্‌হাম্‌ ষ্টুডিও'-র সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীরবীন সরকারও 'অরোরা'-কে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করছেন। নামকরা বৃটিশ ক্যামেরাম্যান্‌ রবার্ট টেলর 'অরোরা'-র পক্ষে ওখানে কাজ করছেন এবং লণ্ডনের ডক্‌ অঞ্চল ও নিবেদিতার জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানের চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে। লণ্ডন রামকৃষ্ণ মিশন থেকে স্বামীজী ও

নিবেদিতা সম্বন্ধীয় কিছু দুষ্প্রাপ্য চিঠিপত্র পাবার ও সেগুলি এই চিত্রের অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনা আছে।

* * *

বিশ্বের-বিস্ময় তাজমহলকে নিয়ে চিত্র নির্ম্মাণের ইচ্ছা দেশে ও বিদেশের বহু প্রযোজকই অনেকবার প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে কার্য্যক্ষেত্রে কেহই বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। ইংলণ্ড ও আমেরিকার চিত্র প্রযোজকরা ছাড়াও ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম মেহ্‌বুবখান্ সাহজাহানের ভূমিকায় রাজেন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি চিত্র নির্ম্মাণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা ফলবতী হয় নি। তারপর 'মুঘল-ই-আজম্'-এর সাফল্যের পর কে, আসিফ্‌ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সাহজাহানের ভূমিকায় দিলীপকুমারকে নির্ব্বাচিত করে তাজমহলকে নিয়ে একটি চিত্র নির্ম্মাণে, কিন্তু সে চেষ্টাও পরিত্যক্ত হয়েছিল। এবার প্রযোজক নাদিয়াদওয়ালা অগ্রসর হয়েছেন এরূপ একটি চিত্রনির্ম্মাণে। 'আনারকলি'-খ্যাত নায়ক-নায়িকা প্রদীপকুমার ও বীণা রাইকে সাহজাহান ও মমতাজের ভূমিকায় নির্ব্বাচিত করা হয়েছে এবং 'আনারকলি' যিনি পরিচালনা করেছিলেন সেই নন্দলাল যশোয়ান্ত লালই এই চিত্রটি পরিচালনা করবেন বলে জানা গেছে।

* * *

সেন্সারের কড়াকড়ি হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় চলচ্চিত্র নির্ম্মাতারা বিশেষ ভাবিত হয়ে পড়েছেন। ভারতীয় ফিল্ম ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীজগৎনারায়ণ সহ বিভিন্ন প্রদেশের চিত্র প্রযোজকগণ তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডাঃ বি, ভি, কেশকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন। 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সর'-এর অস্থায়ী চেয়ারম্যান্ শ্রীদিলীপ কোঠারীও এই সাক্ষাতের সময় সম্ভবতঃ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে দক্ষিণ ভারতীয় 'ফিল্ম চেম্বার অফ্ কমার্স'-এর প্রযোজকগণ নিজেরাই চিত্র সেন্সর করবার মনস্থ করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বারজন সভ্যকে নিয়ে একটি সেল্ফ সেন্সরসিপ্ কমিটি গঠনেও উদ্যোগী হয়েছেন। এরূপ

প্রেস্ ডিস্ট্রিবিউটার্স পরিবেশিত 'ওয়াণ্টেড্' চিত্রে বিজয় কুমার ও সঈদা খান।

করবার কারণ হচ্ছে গত দু'মাসের চিত্রগুলিকে সেন্সরের কাঁচি এমন নির্দ্দয়ভাবে কেটেছে যে চিত্র নির্ম্মাতাদের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তাই তাঁরা নিজেরাই আগে থেকে সেন্সর করে অযথা ফিল্ম নষ্ট হওয়ার হাত থেকে প্রযোজকদের রেহাই দিতে চান।

* * * *

'বেঙ্গল মোশান্ পিক্‌চার্স এসোসিয়েসন্' নাম বদল করে "মোশান্ পিক্‌চার্স এসোসিয়েসন্ অফ্ ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া" (MPAEI) এই নাম রাখবার সিদ্ধান্ত করেছেন। এরূপ করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এসোসিয়েসনের কার্য্যসীমা আরও বর্দ্ধিত করে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানকে এর অন্তর্ভুক্ত করা।

* * * *

'এস, মুখার্জ্জি ফিল্ম সিণ্ডিকেট' এখন ইষ্টম্যান্ রঙের একটী রঙিণ চিত্র নির্ম্মাণে ব্যস্ত রয়েছেন। চিত্রটীতে রঙের প্রাচুর্য্য ছাড়াও দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালার অভিনয়ের আকর্ষণও থাকবে। পরিচালনা করছেন রাম মুখোপাধ্যায় এবং নৌসাদ দিচ্ছেন সঙ্গীত।

* * *

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "আহ্বান"-এর কয়েকটি বহির্দৃশ্য গঙ্গা, চুর্ণি ও হিজলী নদীর তীরে গ্রহণ করে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ফিরেছেন। নায়ক-

নায়িকার ভূমিকায় আছেন বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। সঙ্গীতের ভার নিয়েছেন শ্রীপঙ্কজ মল্লিক।

* * *

পদ্মিনীর প্রেম! বা 'ডক্টর ইন্ লাভ'!—দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ নৃত্যপটীয়সী ট্রাভাঙ্কোর ভগিনীত্রয়ের মধ্যমা, বিখ্যাত ছায়াচিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী পদ্মিনী সম্প্রতি ডাক্তার রামচন্দ্রন-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

পদ্মিনী

শীঘ্রই তাঁরা লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং সেখানে দু'বৎসর থেকে রামচন্দ্রনের উচ্চশিক্ষা সমাপ্তির পর বাঙ্গালোরে এসে স্থায়ী ভাবে বাস করবেন বলে জানা গেছে। ডাঃ রামচন্দ্রন যেমন লাভ করলেন স্ত্রীরত্ন, ভারতীয় চিত্র ও নৃত্য-জগৎ তেমনি হারাল একটি তারকা-রত্ন!

* * * *

"মিষ্টার ও মিসেস চৌধুরী"-র পর সুলতা পিকচার্স-এর পরবর্তী চিত্র হবে "চৌধুরী বাড়ী"। ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের এই গল্পটীর চিত্র-নাট্য ও সংলাপ লিখবেন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

***

পরিচালক কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় জরাসন্ধের একটি স্ত্রী-কয়েদির গল্প "অপর্ণা"-কে অবলম্বন করে একটি চিত্র তুলছেন।

***

জনপ্রিয় জুটি উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেনকে নিয়ে 'চিত্র প্রযোজক' নামের একটী নবগঠিত সংস্থা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প অবলম্বনে "বিপাশা" নামে একটী চিত্র নির্ম্মাণ করছেন।

***

পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের "দুই ভাই" চিত্রের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অভিনয়াংশে আছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, সুলতা চৌধুরী প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

***

'ফিল্ম এজ' নামের আর একটী নবগঠিত সংস্থা শক্তিপদ রাজগুরুর একটী কাহিনী অবলম্বনে "কুমারী মন" নামে একটি ছবি তুলছেন। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ঋত্বিক ঘটক। ভূমিকায় আছেন কণিকা মজুমদার, সন্ধ্যা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায় প্রভৃতি।

***

শিল্পীর কথা

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে…

কুমারেশ ভট্টাচার্য

বিশ বছর আগের কথা। মা-বাবার অতি আদরের একটি হাসি-খুসী মেয়ে। বয়স তখন সাত-আট বছর। অসংখ্য তার আবদার—অসীম চাঞ্চল্য। তার হাসি-উচ্ছল আনন্দ, দুষ্টুমী ও প্রাণ-চাঞ্চল্যে বাড়ীখানা সরগরম। কিন্তু তার মা অবসরসময়ে বাড়ীতে যখন এস্রাজ বাজাতে এবং গান করতে বসতেন তখন এই দুরন্ত মেয়েটি অতি শান্ত হয়ে সাগ্রহে শুনত মায়ের গান-বাজনা। অনুকরণ করত গানের, বৃথা চেষ্টা করত এস্রাজ বাজাতে। গান-বাজনার দিকে ছোট্ট মেয়েটির এই স্বভাবজাত আগ্রহ ও অনুরাগ কিন্তু মা-বাবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁরা উভয়েই তাকে উৎসাহ দেন। মা নিজেই শেখাতে আরম্ভ করেন গান।

সেদিনকার সেই ছোট্ট মেয়েটিই আজ বাঙলার সংগীত-জগতে পরিচয় দিয়েছেন তাঁর সংগীত-প্রতিভার—লাভ করেছেন সুনাম। ইনি হচ্ছেন শ্রীসুমিত্রা সেন।

১৯৩৪ সালে এই কোলকাতা শহরেই জন্মগ্রহণ করেন সুমিত্রা। তাঁর পিতা শ্রীঅতুল চন্দ্র দাসগুপ্ত ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক এবং বিদ্যাসাগর কলেজ হোষ্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তাঁর আদি নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার কার্তিকপুরে। উত্তর কোলকাতায় একটা বাসাবাড়ীতে তিনি বাস করতেন বহু বছর ধ'রে। তারপর বালীগঞ্জ অঞ্চলে বাড়ী করে সেখানেই

সুমিত্রা সেন

বাস করছেন। তাঁর তিনটি সন্তান। প্রথম পুত্র, পরে দুটি কন্যা সন্তানের মধ্যে সুমিত্রাই বড়। ঋষিকল্প, আত্মভোলা দার্শনিক পিতৃদেব সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ না হোলেও সন্তানদের প্রকৃত শিক্ষা দেবার দিকে তাঁর ছিল সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

১৯৪১ সালে বোমার ভয়ে অতুলবাবু বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ) বাসা ঠিক করে বাড়ীর সবাইকে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে থাকবার সময় রাজা রায় মশাইয়ের কাছে সুমিত্রা কিছুদিন শিক্ষা করেন সেতার বাজনা।

১৯৪৩ সালে তাঁরা সবাই কোলকাতা ফিরে এলেন। এখানে এসে বালীগঞ্জে বেংগল মিউজিক কলেজে ভর্তি হয়ে সুমিত্রা সেতার বাজনাই ভালভাবে শিখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর গান শুনে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই বিস্মিত হন। তিনি অতুলবাবুকে অনুরোধ করে বলেন, সুমিত্রার এমন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, একে উচ্চাংগ সংগীত শেখবার সুযোগ দিন। ননীবাবুর ইচ্ছামতই ঐ কলেজে সুমিত্রা চার বছর ধরে উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা করেন। ঐ সময়ে বেংগল মিউজিক কলেজে শ্রীমুকুন্দ মজুমদার ও ফণীভূষণ দাসের প্রচেষ্টায় এমন একটি বিভাগ খোলা হয় যেখানে সূচিশিল্প, অংকন-বিদ্যা, চর্মশিল্প প্রভৃতি নানাবিধ কাজ শেখান শুরু হয়। সুমিত্রা এই বিভাগেও যোগদান করেন এবং এ সমস্ত নানাবিধ শিল্পকাজে অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। তাঁর স্বহস্তে নির্মিত চামড়ার ব্যাগ, মাটীর পুতুল, কার্পেটের উপর নানাবিধ সূচি শিল্পের কাজ দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

১৯৪৬ সালে মুরলীধর গার্লস্‌ স্কুল থেকে সুমিত্রা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি আই, এ, পড়তে আরম্ভ করেন মুরলীধর গার্লস্‌ কলেজে। এ সময় তিনি পল্লীসংগীত, আধুনিক, ভাটিয়ালী, কীর্তন, রাম প্রসাদী প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের গান শিখতে শুরু করেন। তাঁর রয়েছে জন্মগত সংগীত-প্রতিভা আর অতি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর।

১৯৪৭ সালে কোলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে সুমিত্রা তাঁর গান গাইবার প্রথম সুযোগ লাভ করেন এবং ভাটিয়ালী গান গেয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন।

১৯৪৮ সালে মুরলীধর গার্লস কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করে ঐ কলেজেই তিনি বি, এ পড়তে শুরু করেন। ঐ বৎসরেই তিনি 'বৈতানিক' সংগীত শিক্ষা সংস্থায় ভর্তি হয়ে নিয়মিত ভাবে সংগীত চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪৯ সালে আন্তঃকলেজ সংগীত প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন সুমিত্রা। মানব মুখোপাধ্যায়, সনৎ সিংহ প্রভৃতি বর্তমানের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পীরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন উক্ত প্রতিযোগিতায়। উচ্চাংগ সংগীত ব্যতীত আধুনিক, ভাটিয়ালী পল্লীসংগীত, রবীন্দ্র সংগীত প্রভৃতি সংগীতের বিভিন্ন শাখায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন সুমিত্রা।

এবং তিনি সমস্ত গ্রুপের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পরিচয় দেন তাঁর অসামান্য সংগীত প্রতিভার।

১৯৫০ সালে পুনরায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃকলেজ সংগীত প্রতিযোগিতা। এবার সুমিত্রা সংগীত প্রতিযোগিতায় সর্ববিষয়ে প্রথমস্থান অধিকার করে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেন আবার ঐ বৎসরেই তিনি বি এ, পাশ করেন এবং ইউনিভার্সিটিতে এম, এ, ক্লাসে ভর্তি হন।

১৯৪৮ সাল থেকে ,৫০ সাল পর্যন্ত এই তিন বৎসর সুমিত্রা 'বৈতানিকে' সংগীত শিক্ষা করেন এবং বিভিন্ন ধরণের সংগীতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন।

১৯৫০ সালে হিজ মাষ্টার্স ভয়েস কোম্পানীতে প্রথম দুখানা নজরুলগীতি রেকর্ড করেন সুমিত্রা। গান দুখানা 'গোঠের রাখাল বলে' ও 'বেদনার বেদীতলে'। সুর দিয়েছিলেন প্রখ্যাত সুরকার শ্রীদুর্গা সেন। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত সুমিত্রার বহু গান রেকর্ড করা হয়েছে এবং তাঁর গানগুলি জনাদৃতও হয়েছে।

১৯৫৩ সালে শ্রীঅনিল সেনের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন সুমিত্রা। বিয়ের পর তাঁর সংগীত সাধনা এতটুকুও হয় নি ব্যাহত বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে।

১৯৫৬ সালে তিনি 'গীতবিতানে' ভর্তি হলেন। এই সংগীত শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে তিনি বহুস্থানে বহুবার গান গাইবার সুযোগ লাভ করেন। এর ফলে, জন সাধারণের মধ্যে তাঁর নাম ও যশ পড়ে ছড়িয়ে। ১৯৫৮ সালে সুমিত্রা লাভ করেন 'গীতভারতী' উপাধি।

প্রখ্যাত সুরকার শ্রীঅনাদি দস্তিদার মশাইয়ের কাছে সুমিত্রা রবীন্দ্র সংগীত, সুরেন চক্রবর্ত্তী মশাইয়ের কাছে পল্লী সংগীত, প্রসাদ সেনের কাছে আধুনিক গান শিক্ষা করেন। এ ভিন্ন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় তাঁর এই ছাত্রীটিকে সযত্নে কীর্তন গান শিক্ষা দেন এবং প্রখ্যাত সুরকার শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এঁকে শিক্ষা দেন ভজন ও রাগপ্রধান গান।

বিখ্যাত চিত্রপরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদারের পরিচালিত 'মর্মবাণী' কথাচিত্রে সুমিত্রা সর্বপ্রথম সুযোগ লাভ করেন গানে প্লেব্যাক করবার। তারপর থেকে 'কোমলগান্ধার' ও 'শুনবরনারী' কথাচিত্রেও তিনি কয়েকখানা গানের 'প্লেব্যাক' করেছেন। বিখ্যাত সুরকার শ্রীঅভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরসংযোজনায় সুমিত্রা অনেকগুলি গান রেকর্ড করেছেন। 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' 'ঘরেতে ভ্রমর এল' (রবীন্দ্র সংগীত) প্রভৃতি সুমিত্রার গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'ওগো সাওতালী ছেলে' ও 'দিনের পরে দিন যে গেল' এ দুখানা রবীন্দ্র সংগীত সুমিত্রা রেকর্ড করেছেন হিজ মাষ্টার্স ভয়েস কোম্পানীতে।

রবীন্দ্র সংগীতে সুমিত্রা বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও আধুনিক, ভজন, কীর্তন, রামপ্রসাদী, পল্লীগীতি প্রভৃতি সংগীতেও তাঁর দক্ষতা কিছুমাত্র কম নয়। কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন ধরণের গান তিনি পরিবেশন করেন নিয়মিতভাবে।

এই কয়েক বছরের মধ্যে সুমিত্রা যেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন, তাতে আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্পীর নাম-যশ সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়বে।

অত্যন্ত মধুর তাঁর ব্যবহার। সারল্য ও মাধুর্যে অন্তর তাঁর ভরপুর। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়। পারিবারিক দিক দিয়েও তিনি অত্যন্ত সুখী। তাঁর বর্তমান বয়স আঠাশ বছর।

আমরা আশা করি তিনি অদূর ভবিষ্যতে সংগীত-জগতে আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যে আরও উজ্বল হয়ে দীপ্তি পাবেন।

ভগবানের কাছে কামনা করি সুমিত্রার শান্তিময় সংসার, সুস্থ দেহ-মন আর সুদীর্ঘ জীবন।

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল খেলার দু'চার কথা

শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায়

> শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায় তাঁর সময়ে একজন নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁরই অধিনায়কত্বে মোহনবাগান দল সর্ব্বপ্রথম লীগ বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। ১৯৩৮-৩৯ সালে অষ্ট্রেলিয়া সফরে তিনি ভারতীয় ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ফুটবল খেলা প্রায় সব দেশেই প্রচলিত এবং এই খেলাটি প্রায় সব দেশেরই জনপ্রিয় খেলা। নূতন নূতন যাঁরা ফুটবল খেলা শুরু করেছেন তাঁদের ফুটবলের কয়েকটি প্রাথমিক ও সাধারণ নিয়ম জানা দরকার। বলা বাহুল্য যে, ১১জন খেলোয়াড়কে নিয়ে একটি দল গঠন হয়, অর্থাৎ, ১জন গোলকিপার, ২জন ব্যাক, ১জন ষ্টপার, ২জন হাফব্যাক ও ৫জন ফরওয়ার্ড। প্রত্যেক দলের উদ্দেশ্য থাকে যে অপর পক্ষকে পরাজিত করা, সুতরাং একপক্ষকে এমন-ভাবে বল আদান প্রদান করে অগ্রসর হতে হবে যাতে অপর পক্ষের খেলোয়াড়দের পক্ষে গতি বন্ধ করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। ফুটবল খেলোয়াড় হতে হলে প্রথমেই দৈহিক পটুতার (Fitness of the body) একান্ত দরকার সুতরাং স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবে, অর্থাৎ দৈহিক পটুতা বজায় রাখতে হলে গুটিকতক ব্যায়ামের দরকার—যেমন স্কিপিং, দৌড় এবং যে কোনরকম তৎপরতা বর্দ্ধক ব্যায়ামের চর্চ্চা রাখার প্রয়োজন। ভাল ফুটবল খেলোয়াড় হতে হলে খেলোয়াড়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দৃষ্টি এবং ক্ষিপ্রগতি রাখা প্রয়োজন, অর্থাৎ অপর পক্ষকে ধাপ্পা দিয়ে বল নিয়ে যাওয়া ও বল এমন ভাবে নিজেদের খেলোয়াড়কে যোগানো যাতে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের পক্ষে বল ধরা বিশেষ অসুবিধা হয়ে পড়ে এই মতলব সদা সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার। সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় যে অনেক খেলোয়াড়ই প্রথমে বল receive করবার বা ধরবার সময় বল ঠিকমত নিজের আয়ত্বের মধ্যে নিতে পারে না যার ফলে অপর পক্ষের খেলোয়াড়ের বল নিয়ে নেওয়া সুবিধা হয়ে পড়ে। সুতরাং বল receive করবার কৌশল আয়ত্ব করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বল ধরবার সময় বিশেষ ভাবে নজর রাখতে হবে যাতে বল ধরেই নিজেদের খেলোয়াড়কে দিয়ে দেওয়া ও নিজে অগ্রসর হওয়া সুবিধা জনক হয়ে উঠে। তারপর দরকার হয় খেলোয়াড়ের স্ব স্ব স্থান বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা, কারণ খেলোয়াড়েরা নিজেদের যায়গা ছেড়ে গেলে অপর পক্ষের বিশেষ সুবিধা হয়ে থাকে এবং বিপক্ষ দলকে গোল দেবার সুযোগ দেওয়া

হয়। সুতরাং প্রত্যেক খেলোয়াড়ের স্থান এবং বাধা প্রদান সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ, অপর পক্ষীয় খেলোয়াড়গণ যখন বল আদান প্রদান করে অগ্রসর হতে থাকে তখন কি ভাবে বা কেমন ভাবে নিজেদের জায়গায় থাকতে হবে এবং কেমন ভাবে তাদের বাধা দিতে হবে সেটা প্রত্যেক খেলোয়াড়ের বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের অনুপ্রাণিত হওয়া দরকার team spirit দ্বারা, কারণ এই বস্তুটি না থাকলে দলের পক্ষে সাফল্য লাভ করা বিশেষ অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। যদি কোন স্বার্থপর খেলোয়াড় নিজের খেলার উপরই বিশেষ দৃষ্টি রাখে অর্থাৎ, নিজের খেলা দেখাবার দিকে নজর রাখে তাহা হলে দলের খেলা অনেকটা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সেইজন্য দলের খেলা ভালভাবে হয়ে উঠে না, সুতরাং প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই নিজের নিজের দলের খেলা যাতে ভাল হয় সেইদিকে লক্ষ্য রথো উচিত এবং সেটাই হচ্ছে প্রকৃত teem spirit। তারপরই হচ্ছে প্রত্যেক খোলোয়াড়কে খেলোয়াড়-মনবৃত্তি পোষণ করতে হবে তাতে জেতা বা হারার কোন প্রশ্ন থাকবে না এবং এইটিই প্রত্যেক খেলোয়াড়ের থাকা একান্ত প্রয়োজন। ফুটবল খেলা কেহ কাহাকেও শেখাতে পারে না যতক্ষণ না খেলোয়াড়ের ফুটবল খেলার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে এবং এই জ্ঞান সকলের মধ্যে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। যাদের এই জ্ঞান থাকে তাদের খেলা উন্নত থেকে উন্নততর করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ পারদর্শী খেলোয়াড়দের তত্ত্বাবধানে থেকে ট্রেনিং নেওয়াটা একান্তই বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ যে সব খেলোয়াড়ের ফুটবল জ্ঞান থাকে তারা যদি খেলার উন্নতি করবার ঐকান্তিক ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁদের উচ্চাঙ্গ খেলোয়াড়দের নির্দ্দেশমত খেলা বা নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে যাতে খেলার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটে। সকল সূক্ষবিদ্যার মতনই ফুটবল খেলার দক্ষতা অনেকটা জন্মগত ব্যাপার। শিক্ষা ও অনুশীলন শুধু এর উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। চলতি কথার "গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয় না" উক্তি ফুটবল খেলার সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য। এই কটি কথা বলেই আমি আমার সীমিত বক্তব্য শেষ করছি।

পরলোকে এ্যান্থনি এস্, ডি'মেলো

ভারতের ক্রীড়া জগতের শুভ্রস্ব রূপ, ভারতীয় ক্রিকেট কণ্টোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি এ্যান্থ ন এস্, ডি'মেলো গত ২৪শে মে, অল্ ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস হাঁসপাতালে পরলোক গমন করেছেন। তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। গত আগষ্ট মাসে রোম্ অলিম্পিকে যাবার পথে জুরিখ বিমান বন্দরে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তারপর থেকে তাঁর দেহে চারবার অস্ত্রপচার করা হয়। তিনি ১৯০০ সালে করাচীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানে তাঁর পড়াশুনা শেষ করে উচ্চশিক্ষার্থে কেম্ব্রিজে গমন করেন।

১৯২৮ সালে এ, এস, ডি'মেলো এবং গ্র্যাণ্ড গোভেনের চেষ্টায় ভারতীয় ক্রিকেট কণ্টোল বোর্ড

প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সম্পাদক এবং শ্রীগোভেন সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। এরপর ১৯৪৭সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত তিনি সহ-সভাপতি এবং শেষে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বোম্বাইয়ের সি, সি, আই এবং ব্র্যাবোর্ণ ষ্টেডিয়াম তাঁহারই কীর্তি। বোম্বাই ও দিল্লীর ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাব প্রতিষ্ঠার মূলেও তিনি ছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর দান সর্ব্বাধিক হলেও খেলাধূলার অন্যান্য বিভাগেও তাঁর দান অল্প নয়। তাঁরই চেষ্টায় ১৯৫১ সালে দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমসের অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়। এর পরবৎসরই তিনি বোম্বাইতে বিশ্ব টেবল্ টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তিনি ভারতীয় টেবল্ টেনিস ফেডারেসনের এবং এশিয় টেব্‌ল টেনিস ফেডারেসনে সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক টেব্‌ল টেনিস ফেডারেসনের সহ-সভাপতি ছিলেন। গত বৎসর তাঁর লেখা প্রথম পুস্তক "এ পোট্রেট অফ্ ইণ্ডিয়ান স্পোর্টস" প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এম, সি, সি-র সদস্য ছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মৃতদেহ এম, সি, সি-র 'কলার' দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়।

এ, এস, ডি'মেলোর মৃত্যুতে ভারত একজন অভিজ্ঞ এবং বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক হারালো, যাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় বিশ্ব ক্রীড়া জগতে ভারত তার যোগ্যস্থান সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যাণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল ঃ

ইংল্যাণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল এ পর্য্যন্ত (২৯শে এপ্রিল থেকে ১৬ই জুন পর্য্যন্ত) ১১টি খেলায় যোগদান করেছে। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ঃ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয় ৪ এবং খেলা ড্র ৭। সফরের প্রথম তিনটি খেলা বৃষ্টির জন্যে ভণ্ডুল হয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে। এরপর অস্ট্রেলিয়া ল্যাঙ্কাসায়ারকে ৪ উইকেটে, সারে দলকে ১০ উইকেটে এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে ৯ উইকেটে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি তিনটি খেলায় জয়ী হয়। কিন্তু গ্লামর্গান এবং গ্লস্টার দলের সঙ্গে সফরের ৭ম এবং ৮ম খেলা ড্র করে। শক্তিশালী এম. সি. সি দলের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া ৬৩ রানে জয়লাভ করার পর উর্যুপরি দুটি খেলা—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাসেক্সের সঙ্গে খেলা ড্র করেছে। এই ১১টি খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে ১২টি সেঞ্চুরী হয়েছে; অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরী হয়েছে মাত্র ২টি। অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে সেঞ্চুরী রান করেছেন—নর্ম্মান ও'নীল ৩, বিল লরী ৩, নীল হার্ভে ২, পিটার বার্জ ২, কলিন ম্যাকডোনাল্ড ২, ব্রেণ বুথ ১, কেন ম্যাকে ১ এবং বব সিম্পসন ১। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরী করেছেন মাত্র ২জন—গ্লামর্গান দলের জন প্রেসডি এবং এম. সি. দলের এম. সি. কাউড্রে।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেঞ্চুরী

রান	খেলোয়াড়	বিপক্ষে
১০০*	নর্ম্মান ও'নীল	ইয়র্কসায়ার
১২০	নীল হার্ভে	ল্যাঙ্কাসায়ার
১০১*	পিটার বার্জ	ঐ
১৬৫	বিল লরী	সারে
১০০	কলিন ম্যাকডোনাল্ড	কেম্ব্রিজ
১০০	বিল লরী	ঐ
১১৩	ব্রেন বুথ	ঐ
১০৮*	কেন ম্যাকে	ঐ
১১৭	নীল হার্ভে	গ্লামর্গান
১২৪	নর্মান ও'নীল	ঐ
১০৪	বিল লরী	এম. সি. সি
১২২	নর্ম্মান ও'নীল	ঐ
১৪৮	বব সিম্পসন	অক্সফোর্ড
১৫৮	পিটার বার্জ	সাসেক্স
১১৬	কলিন ম্যাকডোনাল্ড	সাসেক্স

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরী

রান সংখ্যা	খেলোয়াড়	পক্ষে
১১৮	জন প্রেসডি	গ্লামর্গান
১১৫	এম, সি কাউড্রে	এম.সি.সি

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দ্বৈপায়ন হ্রদ-তীরে দুর্যোধন

শিল্পী : অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী

শ্রাবণ—১৩৬৮

প্রথম খণ্ড | ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

জপ

শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

"স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতা সম্প্রয়োগ"—পাতঞ্জল। অর্থাৎ মন্ত্রজপের দ্বারা ইষ্ট দর্শন হয়।

"জপাৎ সিদ্ধি"—জপ হতে সিদ্ধি।

স্মরণাতীত কাল হইতে মন্ত্রজপ সাধন প্রণালী এই জগতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ মন্ত্রের শক্তি অসীম, ইহার অসাধ্য কিছু এ জগতে বা অন্য জগতে নাই। ইষ্ট লাভ বা সিদ্ধি লাভের পক্ষে ইহার চেয়ে সহজ, সরল, দ্রুত ও অব্যর্থ পথ আর নাই। ইহাতে সংসার ত্যাগ করিয়া কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনেরও প্রয়োজন নাই, আসন প্রাণায়ামাদি বা ধ্যান ধারণারও প্রয়োজন নাই। সর্ব্বকালে সকল অবস্থায় মন্ত্র জপ করা যায়। সিদ্ধ মহাপুরুষগণ এই সকল মন্ত্র সাধনার দ্বারা প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তার ফলে যে কোন ব্যক্তি এই সিদ্ধমন্ত্র জপ করিয়া অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, এমন কি এর জন্য গুরু বা গুরু কৃপারও প্রয়োজন নাই।

এ পথ এত সহজ ও সরল যে, যে কোন ব্যক্তি, পাপী, সংসারী বা সন্ন্যাসী হোক, এর পূর্ণ ফল লাভ বা পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। জপের সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন মাত্র সত্যকার সরলতা ও বিশ্বাস। ধৈর্য্য সহ যে অভ্যাস করে তার সিদ্ধি অনিবার্য্য। সে সিদ্ধি যে কোনদিন আসিতে পারে, সঠিক কাল নির্ণয় করা কঠিন।

কারণ সিদ্ধি নির্ভর করে ব্যক্তিগত সাধনা ও আন্তরিকতার উপর।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে, স্বরূপতঃ আমরা সকলেই ভগবানের অংশ, সুতরাং মানুষের মধ্যে অসম্ভব বলিয়া কিছু থাকা উচিত নয়। ভগবানের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত; তিনি পক্ষপাতশূন্য, পাপী-পুণ্যবান সব তার কাছে সমান। তিনি মাত্র চান সত্যকার ভাল, প্রেম ও আত্মদান। তিনি কোন নিয়মে বদ্ধ নন, অলীক কিছু করারও মালিক তিনি, তাঁর শক্তি অসীম ও অনন্ত।

আত্ম-সমর্পণের পথ বড় কঠিন, এরূপ আধার কদাচিৎ মেলে—কিন্তু মন্ত্র জপের পথ অতি সহজ ও সরল—সর্ব্বত্র এ করা যায়। সকলের ডাক একপ্রকার নয়, আধারও বিভিন্ন প্রকার। সিদ্ধি নির্ভর করে শুধু আধারের উপর। এই জন্য সিদ্ধি লাভ কারো হয় শীঘ্র—কারো হয় বিলম্বে, এইমাত্র তফাৎ। সিদ্ধি এ জন্মেই সম্ভব এবং তাহাই হওয়া উচিত। হয় না, তার কারণ আমরা ঠিকমত ধৈর্য্য সহ বিশ্বাস রাখিয়া লাগিয়া থাকিতে পারি না।

এবার গুরুবাদ সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। সদ্‌গুরু লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, আর ভাগ্যগুণে ঘটিলেও সকল সদ্‌গুরু মন্ত্র দেন না, আর যদি বা দেন তার পূর্ণফল লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়, কদাচিৎ ২।১ জন তাহা পারে কিনা সন্দেহ। তবে সদ্‌গুরু যে বীজ বা মন্ত্র দেন তা একেবারে নষ্ট হয় না, তা কাল-সাপেক্ষ—এ জন্মে না হয় পরজন্মে তার ফল লাভ হয়। শিষ্য যদি গুরুর বিধান পালন করে তার সিদ্ধি অবশ্য ঐ জন্মেই ঘটে, তবে এরূপ শিষ্য খুব কমই মেলে। "গুরু মেলে লাখ লাখ, শিষ্য মিলে না এক।" কথাটা মিথ্যা নয়, শিষ্যের যেমন সদগুরু লাভ সৌভাগ্যের লক্ষণ:সদ্‌গুরুরও সেইরূপ সৎ-শিষ্য লাভ সৌভাগ্যসূচক। সদ্‌গুরু কারো ক্ষতি করেন না, জগতের মঙ্গল তাঁর কাম্য। কোন কোন মহাপুরুষ দুঃখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে শিষ্যকে দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের উপলব্ধি বুঝিবার বা শুনিবার মত লোক তাঁরা পাননি।

"শৈইয়-নৃপ গুরু তিয় অনল মধ্যভাগ জপমাহিঁ,
হৈ বিনাশ অতি নিকটেতেঁ, দুর হই ফল নহিঁ।"

রাজা, গুরু, স্ত্রী ও অনল এদের মধ্যবিধ সেবা করাই প্রশস্ত, অতি দূরে থাকিলে কোন ফল লাভ হয় না, আবার অধিক কাছে গেলে সর্ব্বনাশ।

সাধারণ গুরু, যিনি আত্মজ্ঞানী নন, যার বৃত্তি বা ব্যবসা মন্ত্র দিয়া শিষ্য বৃদ্ধি করা বা অর্থ লাভ করা, যিনি নিজে অন্ধ হইয়া অপর অন্ধকে পথ দেখান, তার ফল হয় ভয়াবহ। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম হয় না এমন নয়। এই সব অন্ধ গুরুদের ভাগ্যগুণে ২।১ জন সৎ-শিষ্য যে না মেলে এমনও নয়, কিন্তু তা হয় কদাচিৎ, সেরূপ শিষ্য ভাগ্যবানের হয়। এরূপ গুরু করিয়া নিজের ক্ষতি করার চেয়ে মনোমত মন্ত্র নিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করা নিরাপদ। সবচেয়ে বেশী নিরাপদ আশ্রয় ভগবান—এ যে স্বীকার করে তার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

বহুকাল পূর্ব্বে এক শব-সাধকের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—তাঁর গুরু নিজ অহমিকার জন্য তাঁর সমস্ত জীবনটাই নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এ জীবনে তাঁর সিদ্ধির আর কোন আশা নাই, কারণ শব-সিদ্ধির সুযোগ জীবনে একবার মাত্র আসে; তার গুরু ছিলেন বৃদ্ধ ও ভীরু, ইনি ছিলেন ঠিক তার উল্টা, তাঁর গুরু তাঁর নিষেধ মানেন নাই, ফলে শিষ্যের কৃপায় তাঁর জীবন রক্ষা হয়। অধ্যাত্ম পথে দম্ভ ও অহমিকা সর্ব্বনাশা, যাঁরা কিছু শক্তি লাভ করিয়াছেন এগুলি তাঁদেরও শিষ্যের পক্ষে মারাত্মক। কথায় কথায় অভিশাপ দিয়া শিষ্যদের ক্ষতি করেন এঁরা।

আমরা প্রত্যেকে ভগবানের অংশ এবং সে অংশ যাকে জীবাত্মা বলে, যিনি আমাদের অন্তরের গহন তলে বাস করেন, তিনিই আমাদের পরম গুরু, তিনি সদামুক্ত, বুদ্ধ ও নিত্য, তাকে ডাকিলে বা তার কৃপা লাভ করিলে আমরা শীঘ্র ভগবানকে লাভ করিতে পারি, বাহিরে আর ছোটা-ছুটি করিয়া মরিতে হয় না, অনর্থক খুঁজিয়া মরিতে হয় না। কিন্তু এ পথ অতি কঠিন, তবে একবার দেখা মিলিলে আমরা চিরমুক্ত হইয়া যাই। অধ্যাত্মপথ সুখের পথ নয়, বহু বাধাবিঘ্ন উত্থানপতনের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে হয় এবং সিদ্ধিরও কোন নিশ্চয়তা নাই।

এর চেয়ে মন্ত্র জপ সহজ ও সরল, মন্ত্র জপের একটু বৈশিষ্ট্য এই, কিছু কাল মন্ত্র জপ করার পর অন্তরে যখ

-...শ কিছুটা শক্তি সে সঞ্চয় করে তখন ঐ চেতনা শক্তি বা ইচ্ছা শক্তি ইষ্টের কাছে চলিয়া যায় এবং ইষ্টকে নামাইয়া আনে। অবশ্য ইহাতে ইষ্টের সম্মতি থাকে। মন্ত্রজপের সঙ্গে অবশ্য ব্যক্তিগত ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়।

মন্ত্রের মধ্যে আবার কোন কোন মন্ত্র আছে যাহা শীঘ্র ফলপ্রদ, কোন কোন দেব-দেবী আছেন যাঁরা কৃপা করেন খুব শীঘ্র, যাঁদের করুণা, দয়া, শক্তি অসীম, যেমন মহাকালী—(কালী আর মহাকালী এক নন, মহাকালীর মন্দির বা মূর্ত্তি কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই, মহাকালীর আলো সোনালী, অধি-মানস জগতের আদ্যাশক্তি, দু-হাত ...ক্তি, রং কালো নয়)। কয়েকজনকে জানি ব্যক্তিগতভাবে খুব শীঘ্র অত্যাশ্চর্য্য ফল তাঁরা পাইয়াছেন। ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতাও আমার আছে। আবার বহু এমন দেখিয়াছি যাঁরা সিদ্ধ মন্ত্র জপ করিয়া কোন প্রকার বিশেষ ফল দীর্ঘকাল মধ্যেও পাননি, কারণ মনে হয় ঠিক মত অন্তর দিয়া তাঁরা ডাকেন নি।

মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনা আমার এক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, ইনি আত্মজ্ঞানী, সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য। তাঁর মাতা স্বপ্নে মা কালীর মন্ত্র পান, একবার তাঁর পিতা অসুখে মরণাপন্ন হন, তাঁর মাতা যতক্ষণ সঙ্কটকাল ছিল অবিশ্রান্ত মন্ত্র জপ করিয়া তাঁর পিতার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। যেখানে মন্ত্র জপ কালে বিঘ্নাদি ঘটিয়াছে সেখানে ফল লাভ হয় নাই।

এবার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা বলিতে চাই, এগুলি বলিবার উদ্দেশ্য, যদি কেউ উপকৃত হন সেই জন্য। মহাকালীর অবতরণ (হৃদয়ে), মহাকালীর জগৎ, শান্তি··· গুলি আমি দুই বৎসর মধ্যে পাই, অবশ্য স্বপ্নে। এক বৎসর মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মে শুধু সমাধি যোগে পৌঁছান নয়, নিজের হৃদয়ে স্থায়ী-ভাবে নামাইয়া আনিয়াছিলাম, খুশীমত সমাধিস্থ অবস্থায় অসীম অনন্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে, পূর্ণ ...ণ্ড চেতনার মধ্যে থাকিতাম—যাকে নির্ব্বাণ বা মোক্ষ ...ল। আমাকে কেহ মন্ত্র দেয় নাই বা সাহায্যও করে-...ই। সুতরাং এইটুকু জোর করিয়া বলিতে পারি যে, কোন ব্যক্তি, আমার মত অতি-সাধারণ ব্যক্তিও সত্য...র ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে ফল লাভ করিতে পারেন অতি সহজেই, এর মধ্যে মিথ্যা নাই একটুকুও।

মন্ত্র জপ করার আগে যদি অল্প কয়েক মাস, ২।৩ মাস অন্ততঃ, অল্প ত্রাটক অভ্যাস করেন তাহা হইলে ফল নিশ্চিত ও দ্রুত হইবে। আমি অবশ্য এই দুটি মন্ত্রের বিষয় মাত্র জানি, অন্য মন্ত্রের অভিজ্ঞতা আমার নাই। ত্রাটক একাগ্রতা বৃদ্ধি করে ও মানহীন করে। ত্রাটকের অভ্যাস যাঁরা সত্যকার করিয়াছেন, আশা করি তাঁরা এটা স্বীকার করিবেন। স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দেখা ত্রাটকের আর একটা ফল। সুতরাং ত্রাটকের নাম শুনিয়া ভয় পাইবার কিছু নাই। কোন উজ্জ্বল আলোকের প্রতি স্থির দৃষ্টি দ্বারা একাগ্রতা অভ্যাসের নাম ত্রাটক। নক্ষত্র, প্রদীপ, রাস্তার আলো প্রভৃতি আমাদের মধ্যে যোগের নামে বা এইগুলির নামে (ত্রাটক প্রভৃতি) সাধারণের মধ্যে একটা আতঙ্ক বা আতিশয্য বা অসম্ভব এরূপ কিছু ধারণা আছে, কিন্তু বস্তুতঃ ঐরূপ ভয় পাইবার মত কিছু সত্যকার যোগ নাই।

মানুষ যখন অধ্যাত্মপথ গ্রহণ করে বা মন্ত্র জপ অভ্যাস করে, তার অদৃষ্ট তখন সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়, সে আর নিম্ন প্রকৃতির হাতের মুঠায় থাকে না বা তার দ্বারা অন্ধ ভাবে, অসহায় অবস্থায় চালিত হয় না, তার চালক হয় তার ইষ্ট, এদের বাধা বিঘ্ন থাকিলেও, বহুগুণ কমিয়া যায় ইষ্ট কৃপায়।

যিনি মন্ত্র জপ করিয়া কিছু ফল পান নাই, তিনি এগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ২।৩ মাসে ত্রাটকের ফল অবশ্য পাইবেন, যদি ঠিক মত অভ্যাস করেন, সে অভ্যাসও সরল। এর পর ইষ্টমন্ত্র জপ অভ্যাস করিলে শীঘ্র ফল লাভ করা উচিত, এর জন্য অবশ্য একটু খাটিতে হইবে, বিনা আয়াসে সম্ভব নয়। ইষ্ট যদি কাছে নাও আসে মন্ত্রশক্তি ঐ কার্য্য করিবে। সংসারী লোকের পক্ষে এগুলি সময়সাপেক্ষ, কারণ তাদের মন নানা চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে—কিন্তু অবিবাহিত বা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীদের পক্ষে আশু হওয়া উচিত।

* "বিনা ক্লেশে অভীষ্ট সিদ্ধিই মন্ত্র সিদ্ধির উত্তম লক্ষণ।"

* ঠিক সাধনা যে হইতেছে, সিদ্ধিই তা জানিয়ে দেয়।" অর্থাৎ ঠিক মত সাধনা করিলে তার সিদ্ধি অনিবার্য্য।

নাম মনে নাই উক্ত মহাপুরুষদের।

আগে আমাদের দেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, অন্ততঃ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেন। সকলের অবশ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইত না সম্ভবতঃ, সুতরাং ভগবান লাভ করা বা ইষ্ট লাভ করা অসাধ্য এরূপ মনে করিবার কোন যুক্তি বা কারণ নাই। ভগবান মুষ্টিমেয় লোকের জন্য, তা লাভ করা কষ্টকর, এরূপ যুক্তিও অর্থহীন —বরং এটাই ঠিক তাঁর দুয়ার সকলের জন্য খোলা, আমরা চাইনা তাই পাই না।

মোক্ষ বা নির্ব্বাণ সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে, নির্ব্বাণ অর্থাৎ দীপ নিভিয়া যাওয়া বা ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া বা ঐরূপ কিছু। ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারেন কেহ ইচ্ছা করিলে—কিন্তু সম্ভবতঃ কেহ তাহা করে না। কারণ তাদের জন্য এজগৎ ছাড়া আরো সুন্দর অপরূপ বহু জগৎ আছে, তাঁরা সেখানে থাকিতে পারেন, লয়ের আর দরকার হয় না। নির্ব্বাণ বা মোক্ষ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, যারা মোক্ষ বা নির্ব্বাণ চান, তারা নির্গুণ ব্রহ্মে সম্ভবতঃ থাকেন স্বরাট হয়ে, তাঁরাও ব্রহ্ম হয়ে যান, অবশ্য তাঁদের ব্যক্তিগত সত্তা থাকে, ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মবোধ বা ব্রহ্মের বিশ্ব-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়, এখানে দ্বৈত বলিয়া কিছু নাই। তাঁরা আর জন্ম নিতে চান না, ইচ্ছা করিলে তাঁরা জন্মগ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া মনে হয়, সঠিক বলিতে পারি না। ভগবান বুদ্ধদেব এখনও আছেন বলিয়া শুনিয়াছি।

পরিশেষে শ্রীঅরবিন্দের কিছু উক্তি দিয়া শেষ করি, কারণ এরূপ আশার কথা আর কারো কাছে শুনি নাই।

"He who choses The Divine has been chosen by the Divine. The Divine holds him tight and will not let him go."

"যিনি ভগবানকে বরণ করেন ভগবানও তাঁকে বরণ করেন। ভগবান তাঁকে শক্ত করে ধরেন, আর ছাড়েন না।"

যুগান্তের প্রশ্ন

'গোরা'

তবে কেন বলেছিলে ?
'যুগে যুগে এসে—
তোমাদের দুঃখ-দৈন্যে, ক্লেশে,
তোমাদের অশ্রুর প্লাবনে
কাণ্ডারীর মত এসে পার করে যাবো।
শুনে যাবো তোমাদের অভিযোগ যত,
রিক্ত করে যাবো নিজ প্রাণের ভাণ্ডার,
যুগে যুগে এসে বারবার।'
যুগান্তের চঞ্চল হংসদূত
করে না কি প্রদক্ষিণ
পৃথিবীরে আজ বারবার ?
সীমার বাহিরে গিয়ে
বলে নি কি সে তোমায়—
হেথা রাত্রি-দিন, চলেছে কি ষড়যন্ত্র,
চক্রান্ত কুটিল ;
ভেদ করে যাবো মোরা নীলিমার নীল—
নক্ষত্রে নক্ষত্রে যাবো,
গ্রহে উপগ্রহে।
পরম আগ্রহে—
তুমি কি বাড়াবে হাত, আমাদের
অবিশ্বাসী হাত নেবে তুলে বুকে ?
আমরা উত্তীর্ণ হ'ব যুগ থেকে যুগে।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এক সময়ে ঝিঝির ডাক তীব্র হয়ে উঠল। কোন্ একটা গাছে, পাখা ঝাপটা দিল পাখি। মুক্ত আগলটা বাতাসে কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ করে উঠল।

অভয়ের সংবিত ফিরল। চারদিক স্তব্ধ। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে উঠে গিয়ে অর্গল বন্ধ করল। ফিরে এসে ঘুমন্ত নিমের দিকে তাকাল। তারপর বাতি নিয়ে ঘরে গেল। ঘর শূন্য। উঠোনের চারদিক দেখে, রান্নাঘরে উঁকি দিল। গিনিকে চোখে পড়ল না, রান্নাঘরের পিছনে গেল। পুকুরধারে খুঁজল। গিনি নেই কোনোখানে!

অভয় এবার না ডেকে পারল না, গিনি।

কোথা থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ এল, উ?

—কোথায়?

জবাব নেই। আবার ডাকল, গিনি।

—উ।

অভয় রান্নাঘরে গেল। গিনি রান্নাঘরেই ছিল। অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়েছিল জড়োসড়ো হয়ে। ময়লা আঁচল মাটিতে লুটানো। কোনো কারণেই গিনির চুলবাঁধা বন্ধ থাকে না। আজ ওর সেই পরিপাটি খোঁপা অবিন্যস্ত। লক্ষ্য করলে অভয় দেখত, কিছুদিন ধরেই এমনি যাচ্ছে। বিস্রস্ত জামাটার জন্য, তার ঘাড় ও পিঠের অনেকখানি মুক্ত।

অভয় বলল, এখানে কী করছ?

ভেজা গলায় বলল গিনি, এই যাচ্ছি।

সে আঁচল তুলে, মুখ মুছতে লাগল।

অভয় বলল, এসব ঘোলানি বুঝি অনেকদিন থেকেই চলছে?

মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল গিনি, ওই বিশু আমাকে দু' বেলা বলে।

—এতদিন আমাকে বলনি কেন?

গিনি চুপচাপ।

—কেন বলনি?

গিনি ওর ভেজা লাল ভীরু চোখ দুটি তুলল। এই ভয় ও করেছিল। সেই দুর্বোধ ভয়। বলল, ভয়ে।

অভয় জিজ্ঞেস করল, কিসের ভয়?

—তুমি জানবে। তাই সকলের সব কথায় চুপ করে থেকেছি।

—আমি জানলে কী হবে?

সংশয়াতুর চোখে অভয়কে দেখল গিনি। তার চোখে জল এসে পড়ল। বলল, তোমার মিথ্যে দুর্নাম। এবার তুমি কী করবে?

কী করবে অভয়? সে হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না।

গিনি রুদ্ধ গলায় বলল, আমাকে বিদায় করে দেবে, না?

করুণ আর অসহায় মেয়েটার কথা শুনে অভয়ের বুকের মধ্যে মোচড় লাগল। তার মনে পড়ল বিশুর কথা, তোকে বলতে হবে গিনির সঙ্গে তোর কিসের সম্পর্ক। সে বলল, গিনি, লোকে লোকের সঙ্গে একটা সম্পর্ক না দেখলে খুশি হয় না। তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?

প্রশ্ন শুনে গিনির শেষ আশাটুকু যেন চূর্ণ হয়ে গেল। কষ্টে কান্না দমন করে বলল, আমি একটা দুঃখী মেয়ে তোমার আশ্রয়ে আছি। সম্পর্কের কথা তো আমি কিছু জানি না।

অভয় সহসা কথা বলতে পারল না। তার বিশাল বুকের মধ্যে সব কথা একটা ব্যথায় থম্‌কে রইল। খানিকক্ষণ তার নিশ্বাস পর্যন্ত পড়ল না। আজ তার বিস্ময়েরও অবধি রইল না। গিনি এ সংসারের অঙ্গ হিসেবে রাঁধে বাড়ে খেতে দেয়। চোপা করে, শাসন করে এবং তার মধ্যে কোনো জটিলতা কিংবা কীটের কামড় ছিল না। ওর বয়সের সঙ্গে সেটা একরকমের উপভোগ্য ব্যাপার বলেই মনে হত। কিন্তু আজকের গিনি ও তার কথা আর এক দিগন্ত মেলে ধরল।

যেন অনেক ভিতর থেকে আস্তে আস্তে বলল অভয়, এর ওপরে তো আর কোনো কথা নেই গিনি। তুমি দুঃখী, সুখী কে জানি না। তবু আমার এই নুন আনতে পান্তা ফুরোয় আশ্রয়টা যদি তোমাকে রক্ষা করে, সেটাই আমাদের সম্পর্ক।

গিনি সহসা, হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নির্ভয়! নির্ভয় সে! সে যে তার সব থেকে বড় আশ্রয়ের, সবার বড় অভয়-বাণী শুনল।

অভয় গিনির মাথায় হাত দিল। পিঠে হাত রাখল। —কী হল গিনি।

কান্নায় কথা শোনা গেল না। গিনি শুধু মাথা নাড়তে লাগল। কিছু নয়।

অভয় বলল, কেঁদ না গিনি।

বলে গিনিকে টেনে তুলে দাঁড় করাল। আর সহসা হাত সরিয়ে নিয়ে, অভয় গম্ভীর হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই বাইরে যেতে যেতে বলল, আজ আর খাব না গিনি। ত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ব

গিনি কান্নার মধ্যেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বলল, কেন, খাবে না কেন?

—ভাল লাগছে না। বিশুকে বড় মেরেছি। বিশুর বউ কাঁদছিল। আমার কিছু ভাল লাগছে না। তুমি খাও। আমি নিমেকে নিয়ে শুচ্ছি।

গিনি জোর করতে পারল না। কিন্তু বিশুর ব্যাপারে অভয়ের মন খারাপ ছিল ঠিকই। তবু তার মনের অন্ধকার ঝাঁপিতে যেন কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখে সে ভয় পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ লোকশিল্প সম্মেলনের চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠান। কবি-গানের আসর আজ। মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভয়ের বুকের মধ্য থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হল। কলকাতা শহরের হাজার হাজার নরনারী এসেছেন কবি-গান শুনতে। তাও কি হয়!

তাই হয়েছে। চারদিকে নানান আলোকমালার মধ্যে শহরের চকচকে ঝকমকে বিশাল জনতা। এই এক বিস্ময়। আর এক বিস্ময় বিজয়হরি পাল। সারা বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি-গায়ক। তিনি এসেছেন আজ গাইতে। জন্মের পর থেকে বিজয়হরি পালের নাম শুনেছে অভয়। বৃদ্ধ, সৌম্য, শাদা শাদা দাড়িতে ঢাকা মুখ। যেন কোন সাধক। এই মানুষের ছবিও দেখেছে অভয়। বিজয়হরির গানের ছাপা বই আছে।

আলাপ হওয়া মাত্র পায়ে পড়ে প্রণাম করল অভয়। বিজয়হরি বুকে জড়িয়ে ধরলেন। নাম জিজ্ঞেস করলেন। দূর রাঢ়ের ভাষায় বললেন, আই গ বাবা, আসা মাত্তর তোমার নাম শুনেছি। শুনলাম, খুব নাম করেছ।

অভয় বলল, না না।

—না ক্যানে, হঁ বল। বড় খুশি হলাম বাবা। আজ তো তোমার আমার গান।

সেই এক দুশ্চিন্তা অভয়ের। শুধু গান নয়, সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মনোগত ইচ্ছে যেন, লড়াইয়ের ভঙ্গিতে গান হয়। তেমন সাহস কোথায় অভয়ের যে, বিজয়হরি পালের সঙ্গে কথার লড়াই করবে।

তবুও অভয়ের বুকের তালে, ডুম্‌ডুম্ করে বেজে উঠল ঢোলের কাঁসী। গলা শুকিয়ে উঠল অভয়ের। যদিও আগে বিজয়হরিরই পালা।

নির্ভয় কেবল হারু বায়েন। তার কোনো ভয় ডর নেই। মনে হল, কেটে কেটে যেন তবলা বাজাচ্ছে। বিজয়হরির বায়েনের গলায় গাদাখানেক মেডেল দেখে তার মেজাজ একটু খারাপ হয়েছে। তাই প্রথম চোটের প্রতিযোগিতার উত্তেজনাটা ওর মুখে লেগেছে। বাজাচ্ছে, আবার অভয়কে ভ্রূ নাচিয়ে নাচিয়ে ইশারা করছে।

অভয়ের লজ্জা করল। বিজয়হরি বললেন, বাঃ হাতখানা বড় ভাল দেখছি।

হারু তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে একবার নমস্কার করে নিল।

ঘোষণা এর আগেও হয়েছে। তা' ছাড়া ছাপানো ঘোষণাপত্রও ছিল। আবার শেষবার ঘোষিত হল গায়কদের নাম।

বিজয়হরি পাল উঠে দেবদেবী এবং গুরুবন্দনা করলেন তারপরে গাইলেন।

পশ্চিমবঙ্গ লোকশিল্প সম্মেলন
আমারে করেছেন আনয়ন
সম্মেলনে বিজয়হরির ইহা চতুর্থ অয়ন
জানি না করিতে পারি কিনা মনোরঞ্জন।

তারপরে দেশ এবং পরিবারের দুর্দশার কথা গাইলেন একটু। বান বন্যা অভাব, সংসারে মৃত্যুশোক, নিজের জরার শোক। তার ওপরে,

বিনয়ে বিগলিত, রূপেতে কৃষ্ণকান্ত
নয়া কবি শ্রীমান অভয়
বিনয়ে যত ভক্তি, দেখি তত শক্তি
তাহার কাছে মাগি নির্ভয়।

অভয় জোড় হস্তে মাথা নীচু করে বলল, ছি ছি ছি, আমি আপনার পায়ের ধূলোর যোগ্য নই।

কিন্তু যা ভেবেছিল অভয়, তাই হল। বিজয়হরি মহাভারত থেকে গাইলেন। অনেকের জন্মবৃত্তান্তই ওঁর জিজ্ঞাস্য। শেষবারে বললেন, এক কথায় মহাভারতের বাণী কী হবে?

অভয় দেবদেবী বন্দনা করল না। গুরু বন্দনা করল। বিজয়হরিকে বন্দনা করল। ভণিতা করল, কিছুই জানি না। জীবনে এত বড় পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হবে ভাবিনি। কিন্তু,

যার বুক ভরা দুঃখ, পেট ভরা ক্ষুধা
তার কি কোনো ভয় থাকে?
হারিয়ে যে সব হারা, শৃঙ্খল ছাড়া,
সাহসে বুক বাঁধতে হবে তাকে।

অতএব বিজয়হরি তাকে নির্ভয় দিন। সে জবাব দিচ্ছে। একে একে বিজয়হরির সব কথারই জবাব দিল সে। শেষ কথায় এসে গাইল, মহাভারতের একমাত্র বাণী, সত্যমেব জয়তে।

বিজয়হরি হাত তুলে সমর্থন করে বললেন, একেবারে যথার্থ গেয়েছ।

কিন্তু অভয় থামল না। সে গেয়ে চলল, সত্যের জয় হল। কিন্তু সেই আমাদের প্রথম জ্ঞাতি-বিবাদ মারামারির শুরু। চেয়ে দেখুন, শত বিধবা থান কাপড় পরে কাতারে দাঁড়িয়ে। ধৃতরাষ্ট্র বলছেন, হে ব্রাহ্মণ, হে রাজন, এই শত বিধবাকে আপনারা ক্ষমা করুন। যুদ্ধ এদের সব নিয়েছে।

মহাভারতের শেষ লগ্নের শোক সন্তাপ ফুটে উঠল যেন অভয়ের গলায়। শ্রোতারা নিঃশব্দ। কলকাতাকেও নিশ্চুপ মনে হল। বোঝা গেল রাত হয়েছে। অভয় নিজে প্রশ্ন আরম্ভ করল। পৃথিবীতে এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা কোন্ ধর্মযুদ্ধ? শুনি ভীমরূপী জনতা অনেক দুঃশাসনের রক্ত পান করেছিল। কিন্তু আজ কী তার পরিণতি! কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে এর তফাৎ কী? কেন উৎপত্তি। এর একমাত্র বাণী কী?

অনেকগুলি ক্যামেরা ফ্লাস্ পর পর চমকে দিচ্ছিল অভয়কে। চারদিকে একটা চাপা গুলতানি। অভয়ের প্রতি সমর্থন সূচক উচ্ছ্বাস সেটা।

এবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম। বিজয়হরি গায়ে হাত দিয়ে

প্রশংসা করলেন। বললেন, যথার্থ বলেছ। বড় ভাল ধরেছে।

ইতিমধ্যে এক প্রস্থ চা-বিস্কুট পরিবেশিত হল। মঞ্চের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেকে আলাপ করল অভয়ের সঙ্গে। কয়েকজন পর পর এসে, তার নাম ঠিকানা জন্মসাল ও স্থান, জীবিকা, তার গোটা জীবনটার কথা জেনে নিতে লাগল। টুকে নিল কাগজে।

অভয়ের মনে হল, তার জ্বর এসেছে। তার সর্বাঙ্গ, কান ঠোঁট পর্যন্ত দপ্‌ দপ্‌ করছে। তার কেমন যেন একটা ঘোর লাগছে। কলকাতার সে কিছু বোঝে না। চেনে না। কিন্তু কলকাতা তাকে একটা উত্তপ্ত অন্তরঙ্গ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সে বুঝতে পারছে।

আর একজন এলেন। সঙ্গে তাঁর আরো কয়েকজন। ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারল অভয়। উনি একজন নেতা। শ্রমিক নেতা। অনেকবার গিয়েছেন অভয়দের শহরে। বক্তৃতা দিয়েছেন চটকল শ্রমিকদের সামনে। অনাথখুড়ো, গণেশবাবুরা যাকে দেবতার মতো দেখে, উনি সেই দিব্যেন্দু মিত্র। এসে হাত বাড়িয়ে অভয়ের হাত ধরলেন। বললেন, খুব ভাল করেছেন। সমস্ত জিনিষটার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আর সেটা এমন পথে ঘুরিয়েছেন, দেশের লোকে যেটা ভাবছে।

তাঁর সঙ্গী কে একজন বলে উঠল, আপনার বক্তব্য শান্তি আন্দোলনের পথ বলে দিচ্ছে।

শান্তি আন্দোলন? কথাটা তার জানা। কিন্তু গানের সময় সে কথা তার মনে পড়ে নি।

দিব্যেন্দু আবার জিজ্ঞেস করলেন, অনাথ, গণেশদের খবর ভাল?

অভয় বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, খবর ভালই।

দিব্যেন্দু বললেন, আপনার মতো কবি আছে ওদের হাতে, ওদের তো কোনো ভাবনাই নেই। ওখান থেকে শ্রমিকরা কলকাতায় এলেই আপনার কথা বলে।

অভয় বুঝল, উনি জানেন না, গণেশবাবুরা তাকে ত্যাগ করেছে। এমন কি অনাথ-খুড়োও। সাধারণ শ্রমিকরা তার নাম করে, কারণ তারা গান ভালবাসে। দলের বিচার করে না।

অথচ এখনো আসল পরীক্ষা বাকী। বিজয়হরি জবাব দেবেন, প্রশ্ন করবেন। শুরু হয়েছে। শেষরক্ষা বাকী। কিন্তু হারু বায়েন আর তার ভাই সম্মেলনের লোকদের অবাক করে দিয়ে, অনবরত চা সিগারেট খেয়ে চলেছে। ধমক দেবে, তেমন উপায় নেই অভয়ের।

আবার ঢোলক বাজল। কিন্তু আশ্চর্য ঘোর লেগেছে অভয়ের। সে নিজেকে, বলছে থাম্‌ অভয়, থাম্‌! ভেতরটাকে চুপ করা। তোর আসল কথা ভাব, তোকে আজ অনেক কথা বলতে হবে। ঠিক মতো বলতে হবে।

রাত তিনটেয় কবি গানের আসর ভাঙল এবং জয়মাল্য শেষ পর্যন্ত অভয়ের গলায় এল। কিন্তু বিজয়হরির মুখের দিকে তাকিয়ে তার বুকে কোথাও ছায়ার সঞ্চার হল না। কারণ শেষ জয়টা তাঁর-ই ছিল। আসর শেষ করলেন তিনি। হেসে হেসে নেচে নেচে, অভয়ের প্রশস্তি গাইলেন কেবল। তাঁর নিজের গলার রূপোর মেডেলের হার পরিয়ে দিলেন অভয়ের গলায়।

সব যুদ্ধেরই কারণ এক। লোভ এবং মাৎসর্য। ব্যক্তির সুখের লালসা-ই যুদ্ধ টেনে আনে। কুরুক্ষেত্র থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত, পৃথিবীর সকল যুদ্ধ মানুষকে একই জায়গায় উপস্থিত করে। সুখকে মানুষ 'নিরন্তর' করতে চেয়েছে, তাই বাসনা তাকে অসম্ভবের পথে ঠেলে দিয়ে উন্মত্ত করেছে। দুঃখ যে তার জীবনের আর এক সঙ্গী, এই সহজ সত্য-কে ভয়ে সরিয়ে দিতে চেয়েছে। তার সঙ্গে সহজ ভাবে, হাত মিলিয়ে, তাকে স্বীকার করতে পারে নি। সুখ দুঃখ মিলিয়ে যে মানুষের সহজ প্রসন্নতা, তার সাধনা চাই। প্রেমানন্দ চাই। অশান্ত প্রাণ শান্ত হোক, শান্ত হোক। লোভ হোক নিঃশেষ। লালসা লোলুপতা হোক নিশ্চিহ্ন।

মোটামুটি এই ভাবেই ব্যাখ্যা করেছিল অভয়।

বিজয়হরি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধারাবাহিক নৃশংস কিছু চিত্রোপহার দিয়েছিলেন দর্শককে। অভয়ের বয়সী কবিয়াল যে শুধু সুখ দুঃখের কথা দিয়ে, এত বড় যুদ্ধটাকে ব্যাখ্যা করবে, ভাবেন নি। বয়সের তুলনায় গভীর মনে হল তাঁর অভয়কে।

হারু বায়েন বলল, কিন্তু, অ জামাই, তুমি তো বাপু আমাদের বাড়িতে আজকের গানগুলান গাওনি এত দিন ?

সত্যি তাই। এতদিন সে অন্য সব গান ভেবে রেখেছিল। বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সব বদল বদল হয়ে গেল। বিজয়হরির কুরুক্ষেত্র ও সত্যমেব জয়তে গানের মোড় দিয়েছিল ঘুরিয়ে। মহাভারত শুনলেই বর্তমান কালকে টেনে আনার পথ খোঁজে অভয়।

একটা আশ্চর্য ঘোর লেগেছে অভয়ের। এটা কিসের ঘোর সে জানে না। তার ভিতরে যেন একটা আগুনের শিখা দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে এবং তারই সঙ্গে একটা শূন্যতা, একটা ব্যথা কোথায় চেপে বসছে। একবার মনে হল, নিমেটাকে নিয়ে এলে হত। একবারটি তাকে বুকে নিয়ে বসতাম।

উদ্যোক্তারা তাদের খাবার ব্যবস্থা করল। শোবার ব্যবস্থা করল এবং তার পরদিনও বিশেষ নিমন্ত্রণ করল সম্মেলনে থাকবার জন্যে। পরদিন বাউল আর কীর্তন গানের আসর হবে।

অভয়ের আগে, হারু বায়েন বলে উঠল—তা থাকব না কেন। আপনারা নেমন্তন্ন করছেন। সারাদিন কলকেতাটিও একটু ঘুরে ফিরে দেখা হবে, কী বল জামাই।

কথাটা মন্দ বলে নি হারু। তবে, কেমন যেন লোভীর মতো বলছে।

উদ্যোক্তারা বললে, বেশ তো, আমরাই চেষ্টা করব, আপনাদের কলকাতাটা ঘুরিয়ে দেখাতে। হারু একেবারে আহ্লাদে আটখানা।

বিজয়হরি পাশে নিয়ে শুলেন অভয়কে। শুনলেন তার জীবনবৃত্তান্ত। নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর দেশ ইলামবাজারে, অনেক আলোচনার পর বললেন, তুমি অনেক লেখাপড়া করেছ বাবা।

অভয় একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। বলল, বিশ্বাস করুন, লেখাপড়া কিছুই জানি না। পড়তে ইচ্ছা করে। সব বুঝি না।

—কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হয়, লেখাপড়া করেছ। যদি না করে থাক, তা হলে বলব, চেষ্টা করবে। তোমার দরকার। এখন লেখাপড়া না শিখলে আর কিছু হবে না। রোজ খবরের কাগজ পড়বে। বড় বড় মানুষদের বই পড়বে।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। কলকাতার গাড়ি ঘোড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই। অভয়ের মনে হল, সে দৈববাণী শুনছে। বলল, পড়ব—নিশ্চয় পড়ব। এমন করে আর কেউ আমাকে বলে নি।

পরদিন সত্যিসত্যি উদ্যোক্তারা একটি বড় গাড়ির ব্যবস্থা করল। বিজয়হরি এবং অভয় উভয়ের দলকেই তারা কলকাতার অনেক জায়গা ঘুরিয়ে দেখাল। দুর্গ, বিধানসভা, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ন্যাশনাল লাইব্রেরী।

হারু বায়েন একটা তেজী বাছুরের মতো লাফালাফি করল সারাটা দিন। একবার সামলাতে না পেরে, অভয়ের কানে কানে বলেছিল—গাড়ি চড়া, কলকেতা দেখা সবই হল, দু ভাঁড় মাল হলেই ষোল কলা পূর্ণ হত, কী বল জামাই, অ্যাঁ ?

জামাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে আর কথাটার পুনরুক্তি সম্ভব হয়নি হারুর। রাত্রে দর্শকদের আসনে বসে বাউল আর কীর্তন গান শুনল অভয়রা। তার যে একটা বিশেষ ঘোর লেগেছিল, বাউল আর কীর্তন গান তাকে আরো বাড়িয়ে দিল। কীর্তনের অনুরাগগীতি আর বাউলদের আনন্দদায়ক উদাসীনতা তার ভিতরে যেন একটা রহস্যময়তার সৃষ্টি করল। এক দুর্বোধ মন্ত্রের গুণে সে যেন আচ্ছন্ন।

পরদিন সকালবেলা, উদ্যোক্তারা অভয়ের হাতে এনে দিল খবরের কাগজ। সেদিন শুক্রবার। প্রায় সমস্ত পত্রিকাতেই, বিশেষ একটি পাতায়, অভয়ের ছবি বেরিয়েছে। অভয় নাচছে হাত তুলে, গান করছে। কেউ লিখেছে, 'কবি-গায়ক অভয়দাসের যুদ্ধ ও শান্তির পালা।' 'সমাজ-সচেতন কবিগায়ক অভয়দাস।' ইংরেজী কাগজগুলি সে পড়তে পারল না।

উদ্যোক্তারা আজও তাকে নিমন্ত্রণ করল। আজ রাঢ়ের ঝুমুর-পূর্ববঙ্গের জারী ও সারী। অভয় রাজী হল।

তবে, হাওড়া থেকে রাত্রের লাস্ট ট্রেনটা ধরতে হবে! সেইরকমই ব্যবস্থা হল।

হারু বায়েন চুপি চুপি বলল, জামাই তোমার কল্যাণে মাইরি অনেক কিছু দেখা হল। দাও, খবরের কাগজ-গুলান দাওদিকিনি, ঝোলায় ভরি। বাড়িতে বেড়ায় এঁটে রাখব।

এবার অভয়ের একলা হবার প্রয়োজন হল। হারু বায়েন, লোকজন, সকলের কাছ থেকে আলাদা হতে ইচ্ছে করল তার। কেন তার এ ইচ্ছা হল, সে জানে না। যেন মনে হল, সে একটু একলা থাকতে চায়।

এক সময়ে সে একলা পথে বেরিয়ে পড়ল। কলকাতার বিশাল জনতার মাঝখানে, তার একাকীত্বে কোনো বাধা পড়ল না। প্রথমেই মনে পড়ল—তার নিমির কথা। আজ নিমি থাকলে কী অভয় সকলের আগে তার কাছে যেত? তাকে বুকে নিত? সত্যি যে বুকের মধ্যে একটা ঢেউ দুলছে। তাকে শান্ত করতে পারছে না অভয়। তার শূন্যতা যে ঘুচছে না। একজন অন্তরঙ্গ যে কাউকে চাই। সকলের কাছ থেকে পাওয়া সব প্রাপ্য নিয়ে একজনের কাছে সঁপে না দিলে যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে। সে যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থান থান হতে চাইছে।

কে আছে? কার কাছে যাবে অভয়?

এ মীমাংসা তার জীবনে বোধহয় আর সম্ভব নয়। কারণ সঁপে দেবার কথা ভাবলেই, তার ভিতর থেকে আর একটা বোধ তাকে ভয়ের বেশে তাড়া করে আসে। তাকে দুর্বল করে তোলে।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে সে সম্মেলনের তাঁবুতে ফিরে এল।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় হাওড়া স্টেশনে উদ্যোক্তারা তাদের পৌঁছে দিয়ে গেল। বিদায় নিল গাড়িতে তুলে দিয়ে। সারাটা পথ অভয় গুন্‌গুন্ করতে লাগল। হারু বায়েনের অনেক কথার জবাব দিল। অনেক কথার দিল না। হাসতে লাগল। হারু বায়েন তার জন্য কোনো কৈফিয়ৎ চাইল না। জামাই একজন সাধক মানুষ। সে যে কখন কী ভাবছে, তা কি বোঝা যায়? সে কেন হাসছে, তা কি হারু বায়েনের বুঝবার ক্ষমতা আছে?

আসলে, অভয়ের বুকের ভিতর ঢেউ উপচে পড়ছে। চল্‌কে চল্‌কে পড়ছে। সে এখন আর নিজেকে বিচার করছে না। সে বলছে, এই তো আমার পাওয়া না। আমি তো সঁপেই দিয়েছি নিজেকে। সকলের কাছে দিয়েছি।

প্রায় মধ্যরাত্রে যখন তারা তাদের স্টেশনে নামল, তখন শহরের চোখে ঘুম নামছে। চারিদিক স্তব্ধ। সাইকেল রিকসা দু চারখানি আছে। তার দরকার নেই। হেঁটে যাওয়াই সাব্যস্ত।

হারুর নজর প্রথমেই, শুঁড়িখানার দিকে। ঝাঁপ বন্ধ দোকানের। এ সময়ে খোলা থাকার কথা নয়। তবু বলল, পাঁচু দাদার বাড়িটা একটু ঘুরে যাই।

অর্থাৎ বে-আইনি চোলাইয়ের সন্ধানে। অভয় কিন্তু আপত্তি করল না। খালি বলল, তাড়াতাড়ি এস, আমি আস্তে আস্তে হাঁটি। দেখ, কোনো গোলমাল বাধিয়ে বস না।

—সে কি, তুমি খাবে না?

—না, ইচ্ছে করছে না হারুদা। তুমি খেয়ে এস।

—এক যাত্রায় পেরথক্ ফল? বেশ, আমি একটু না খেলে পারব না বাপু।

ভাইকে বলল, তুই?

ভাই পা বাড়িয়েছিল, বলল, চল।

দু' ভাই চলে গেল। অভয় একলা ফিরে চলল। কাঁধে ব্যাগের মধ্যে পারিশ্রমিকের টাকা, বিজয়হরির দেওয়া মেডেলের হার। ইচ্ছে ছিল, নিমে আর গিনির জন্যে কিছু কিনে নিয়ে আসে। কিন্তু কেনা হয়নি। কাল কিনে দেবে এখান থেকে।

শীত এখনো আছে। দক্ষিণা বাতাস তার পুরো আসর পায়নি। রাস্তা একেবারে নিঝুম। বিজলী বাতি-গুলি নিষ্প্রভ। শহর এখন ঝিঁঝিঁর ডাকের তলায় আশ্রয় নিয়েছে।

বাজারের কাছে, মালীপাড়া প্রবেশের মুখে কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করে উঠল। পিছু নিল। তারপরে আপনা থেকেই চুপচাপ ফিরে গেল আবার।

বেড়ার আগল বাঁধা। বাড়ি অন্ধকার, নিশ্চুপ। গিনি নিশ্চয় নিমেকে নিয়ে ঘুমোচ্ছে। আগলের বাঁধন খুলল

অভয়। ঢুকে আবার বাঁধল। দাওয়ার এককোণে আস্তে আস্তে হ্যারিকেনের ঘুমন্ত শিখা, একটু একটু করে জেগে উঠল। একটা সাপের ফণার মতো। আলোয় জেগে উঠল গিনির মূর্তি। আড়ষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করল, অভয়দা ?

অভয় বলল, হ্যাঁ। ঘুমোওনি।

গিনি কোনো জবাব দিল না। বাতি নিয়ে ঘরে চলে গেল।

অভয় দাওয়ায় উঠে একেবারে গিনির কাছে এল। গিনির মাথা নত দেখে, জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে গিনি ?

গিনি চোখ তুলল। চোখ ছলছল করছে। বলল, কাল সারা রাত বসেছিলাম। বলে যাওনি তো যে আসবে না।

—কেন, খুড়ি থাকে নি ?

—পরশু রাতে ছিল। আর এখন বসে বসে ভাবছিলাম—

গিনির গলার স্বর বন্ধ হল। মাথা নীচু করল। অভয় তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখ তুলে ধরে বলল, কী ভাবছিলে ?

গিনি বলল, আজও বোধহয় আসবে না।

—না এলে ?

—ভয় করে।

কিন্তু এখন আর ভয় নেই গিনির। অভয়কে দেখা-মাত্র, এক মুহূর্তের জন্য অভিমান স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল। কাছে আসা মাত্র তা অন্তর্হিত হয়েছে। বলল, মাসী থাকতে চেয়েছিল। আমি পাঠিয়ে দিলাম। মেশোর সারারাত ঘুম হয় না। বুড়ো মানুষ।

পরমুহূর্তেই অপরূপ হাসিতে ভরে উঠল গিনির মুখ। বলল, সবাই বলছে, কলকাতায় তোমার খুব নাম হয়েছে। খবরের কাগজে তোমার নাম বেরিয়েছে।

গিনির উল্লসিত হাসি মুখখানি অভয়ের দৃষ্টি ধরে রাখল। তার বুকের ঢেউ বাড়তে লাগল। বলল, কে বললে ?

গিনি বলল, সবাই।

—আর তুমি ?

—আমি ?

গিনি যেন উপছে পড়তে লাগল। বলল, আমার খুব অহঙ্কার হল।

খুশির এমন প্রকাশ ও ভাষা কখনো শোনেনি অভয়। বলল, অহঙ্কার ?

—হ্যাঁ। বলে না, অহঙ্কারে মাটিতে পা' পড়ে না। আমার যেন সেরকম হল।

নিষ্পাপ পবিত্র উল্লাস ও লজ্জা—কথার মুন্সীয়ানা জানে না। অভয় দেখল, গিনির চোখে কাজল আজ। পায়ে আলতা। কাচা কাপড়, ধোয়া জামা পরণে। লজ্জায় এবং আনন্দে নতমুখী গিনি আবার বলল, সারা পাড়াটা আজ ঘুরেছি, নিমেকে কোলে নিয়ে। তুমি একটা রূপোর মেডেলের মালা পেয়েছ, না ?

—হ্যাঁ। দেখবে ?

—দেখি।

ব্যাগটা খুলে দিল অভয়। গিনি নিজেই হাত ঢুকিয়ে বার করল। সত্যি সত্যি রূপোর। বেশ ভারী, ঝকঝকে, লাল ফিতেয় গাঁথা মেডেলগুলি। গিনি একবার দেখল অভয়ের দিকে। সাহস করে বলল, পরিয়ে দিই ?

—দাও।

কিন্তু অভয়ের বুকের ঢেউ প্রবল হল। প্লাবন এল, ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে। গিনি মেডেলের হার পরিয়ে দিল। যেন এক প্রখর মন্ত্রের আচ্ছন্ন উত্তেজনায়, অভয় গিনির দুটি হাত নিজের হাতে তুলে নিল। তার বুকের অশেষ শূন্যতার মধ্যে জোরে চেপে ধরল।

গিনির বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করতে লাগল। সে আর তাকাতে পারল না। চোখ নামিয়ে নিল। অভয়ের নিঃশ্বাস দ্রুত হল। কিন্তু গলার স্বর তলায় চাপা পড়ে গেল। বলল, গিনি আমি বড় একলা। আমার কষ্ট হয়।

গিনি আবার চোখ তুলতে চাইল। কিন্তু জলে ভেসে গেল চোখ। ফিস্‌ফিস্ করে বলে, জানি।

—জান ?

অভয়ের বুকের সমস্ত শূন্যতা যেন অস্থির আবেগে ও পিপাসায়, দু'হাত দিয়ে গিনিকে টেনে নিল বুকের মধ্যে। বহু যুগ ধরে রুদ্ধ চুম্বনের সব আকাঙ্ক্ষা যেন গিনির ওষ্ঠ-পুটে নিরলস ধারায় এল নেমে।

গিনি কেঁপে কেঁপে উঠল। দু হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রইল অভয়কে। যেন ভয় পেয়েছে। অভয়ের সমস্ত দ্বন্দ্বের যন্ত্রণাকে বুকের ঢেউ তার প্রবল বেগে

সরিয়ে, কোনো এক অতীতের থেকে তার সহসা সমস্ত ঋণমুক্তির দুর্জয় বেগ, রাশি রাশি তরঙ্গের মতো একটি নবযুবতীর নিটুট অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শিত হল। যে-নারীর নাম সে ভুলে গেল এবং সমস্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে ডাকতে গিয়ে থমকে গেল সে। তার ওষ্ঠাগ্রে এল প্রথম নাম, নিমি! কিন্তু ডাকা হল না। মুহূর্তের মধ্যে এই বিস্মৃত মেয়েটির মুখ সে দেখতে চাইল এবং সে আবার ডাক দিতে গেল। তার ঠোঁটের দুয়ারে ছুটে এল আর একটা নাম, সুবালা! আর সেই মুহূর্তে তার সমস্ত স্মৃতি, অশ্রু-ভাসানো চোখ-বোজা একটি মুখের ওপর নিঃশব্দে চীৎকার করে উঠল, গিনি! গিনি!

সেই মুহূর্তে তার বুকের ঢেউ স্তব্ধ হল। প্লাবন সরে গেল। রুক্ষ এবং শুষ্ক বালিয়াড়ির ওপরে যেন খর জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র আগুনের মত গলে গলে পড়তে লাগল। সরে গেল অভয়। তার চোখে পড়ল, নিমে নিদ্রিত। সারা ঘরটা যেন গ্রাস করতে এল অভয়কে। সে ত্রাস-ভরা গলায় ডাকল, গিনি।

বুকের আলিঙ্গন থেকে নিরাশ্রিতা গিনি বিস্ময়ে, ব্যথায় নির্বাক। তার আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা জাগছে। বলল, কী?

অভয় বলল, গিনি! এ কি করলাম? আমি এ কি করলাম? বলতে বলতে শরবিদ্ধ এক বিশালকায় পশুর মতো টলতে টলতে সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। গিনি ডাকতে চাইল। তার গলায় শব্দ ফুটল না। উঠতে চাইল। কিন্তু বুকের ভিতর একটা অসহ্য কষ্ট ও যন্ত্রণা তাকে অবশ করে রাখল।

অভয় এই গভীর রাত্রিতেও লোকভয়ে বাইরে যেতে পারল না। ঘরের পিছনে, পুকুর পাড়ের অন্ধকারে, দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। —এই কি আমি? সম্মেলনের মঞ্চের, পরশু রাত্রের সেই অভয় দাস কি আমি? যুদ্ধ ও শান্তির পালাদার, সমাজ-সচেতন কবি-গায়ক, বিজয়হরির মালার সম্মান গলায় দোলানো—সেই আমি কি এই আমি?

গলা থেকে মালাটি টান দিয়ে খুলে নিল অভয়। এই কি আমার সেই বুকের ঢেউ? এই কি আমার সেই ব্যথা! তবে আমি কেন বিশুকে মেরেছিলাম। কে আছে এই বিশাল অন্ধকারে। কার পায়ে ধরে আমি ক্ষমা চাইব। কার, কার! কে সে, এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলছে আমাকে নিয়ে। কেন শান্তি নেই আমার। আমি জানি, আমার বুকের মধ্যে এক অশান্ত শক্তি বাসা বেঁধেছে। কেন তাকে আমি তাড়াতে পারছি না। কেন স্থির হতে পারছি না?

ভোর রাত্রের প্রথম বাঁশী বেজে উঠল চটকলগুলিতে। অভয় একই ভাবে বসে আছে। চোখের তারা তেমনি উদ্দীপ্ত। সারা মুখে তেমনি ব্যাকুলতা।

গিনি এসে দাঁড়াল দূরে। ডাকল, অভয়দা।

ফিরে তাকাতে গিয়ে, মুখ নামিয়ে নিল অভয়। বলল, বল।

গিনি বলল, পুকুরঘাটে এখন লোকেরা আসবে। ঘরে এস!

স্বভাব এবং নিয়মের সত্যগুলো কখনো ভুল হয় না ওদের। তাই বোধহয় মেয়েরা প্রকৃতির অনেক কাছা-কাছি। অভয় উঠল। গিনির পিছনে পিছনে ঘরে এল। গিনি ফিরে দাঁড়াল মুখোমুখি। ওর চুল খোলা। রাত্রি জাগরণ ও চিন্তাক্লিষ্টতার ছাপ। কিন্তু অনেক স্বাভাবিক।

অভয় বলল, গিনি, তুমি আমার আশ্রয় চেয়েছিলে।

—তাই তো।

গিনির গলায় কোনো আবেগের বাষ্প নেই।

—কিন্তু আমি তাকে নোংরা করলাম।

—কোথায় নোংরা করলে?

—করিনি?

—আমি তো জানি না।

—আমার ওপর তোমার ঘেন্না হয়নি? রাগ হয়নি?

—না।

—দুঃখ?

—তুমি যে জন্যে ভাবছ সে জন্য নয়।

—তবে?

—তুমি কষ্ট পাচ্ছ, তাই। কিন্তু—

—কী?

—আমি বলছিলাম, তুমি একটু শোও, ঘুমোও।

অভয় আপন মনে বলতে লাগল, কিন্তু আমি তো এসব ভাবিনি, আমি তো ভাবিনি। মানুষের মনের ভেতরটা কী সাংঘাতিক অন্ধকার। কিছু সে দেখতে পায় না। তবে কেন আমি বিশুকে মারলাম, কেন ?

গিনি চুপ করে, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। বলল, সেটা ঠিক করেছিলে।

—আর এটা ?

—তোমার মন জানে অভয়দা।

স্পষ্ট আর সাবলীল শোনাল গিনির গলা।

আমার মন ! আমার মন ! রাস্তার ধারে নিরাশ্রিত ভিক্ষুকের মতো, প্রকাণ্ড দেহটাকে জড়োসড়ো করে, কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল অভয়।

ঘুম তার অনেকক্ষণ আসেনি। সুরীন আর ভামিনীর গলা শুনতে পেয়েছে। নিমের কান্না এসেছে কানে। দোকান বন্ধ থাকবে আজও, সেই কথা সুরীনকাকা বলে গেল। ভামিনীকে বলতে শোনা গেল, তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন গিনি ? চোখের কোল বসা, সাত সকালে চুল খোলা। গিনি কী বলেছে শুনতে পায় নি অভয়। নিমে মা মা করে ভামিনীকে জড়িয়ে ধরেছে শুনতে পেয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে যখন তার চোখে ঘুম জড়িয়ে এল, সেই সময়েই শুনতে পেল রিক্শার হর্ন। ডাক শোনা গেল, কই, অভয় কোথায় ?

জীবনচৌধুরী মশায়। তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে অভয়। ছুটে গিয়ে দেখা করল, আসুন, আসুন—বলে আজ পায়ের ধুলো নিল। আবার বলল, আপনি কেন এলেন এই শরীর নিয়ে। আমিই তো যেতাম আর একটু বেলায়।

জীবন চৌধুরী অভয়ের কাঁধে হাত রেখে, ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। হাঁপাচ্ছেন, শরীরও কাঁপছে যেন। বললেন, কাল গেলে না দেখে—আর তর্ সইল না অভয়।

অভয় বলল, আমি যে কাল রাতের শেষ গাড়িতে এসেছি।

—অ ! তাই ! ভাবলাম, অভয় একবারটি না এসে কখনো পারে ?

বলে, খাটো লেন্সের ভিতর দিয়ে অভয়ের মুখের দিকে তাকালেন। হাত তার মুখে বুলিয়ে দিলেন। বললেন, বড় আনন্দ পেয়েছি বাবা। হয় তো বাংলাদেশ থেকে কবিগান তর্জা সব উঠে যাবে একেবারে। কিন্তু সত্য তুই যেখানে দাঁড়িয়ে বলবি, তাকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

এই প্রথম চৌধুরীমশায় অভয়কে 'তুই' বললেন। কিন্তু তার বুকের ভিতরটায় ছুরি চলতে লাগল। চৌধুরী-মশায় তো অভয়ের ভিতরের অন্ধকারটাকে চেনেন না। অভয় বলল, আসুন বসবেন।

—না, আজ আর বসতে বলিস না। দেরী হলে এখুনি বাড়ির লোকেরা ছুটে আসবে। তুই যাস।

—তবে এখন আমি সঙ্গে যাই ?

—কী দরকার। চেহারাটা তো দেখছি খারাপ, ঘুম-টুম হয়নি। এখন আমি একলাই যেতে পারব।

বলে অভয়কে ধরে রিকসায় উঠে বললেন, গণেশদের দলের কাগজ কী লিখেছে দেখেছিস তো ?

—না।

—লিখেছে, তোদের মতো লোকেরাই দেশকে জাগ্রত করতে পারে।

চলে গেলেন জীবন চৌধুরী। নিমে টলতে টলতে এসে জড়িয়ে ধরল। তাকে বুকে তুলে নিল অভয়। না তাকিয়েও সে বুঝতে পারল, গিনি আশেপাশেই ঘোরা-ফেরা করে কাজ করছে।

অভয় দাওয়ায় বসামাত্র গিনির গলার স্বর শোনা গেল —মুখটা ধুয়ে এস, একটু চা দিই। তারপর একেবারে স্নান করে, খেয়ে শুয়ে পড়ো।

নিমে তার বাবার স্তব্ধতা ভাঙাতে অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু শুষ্ক হাসি ছাড়া কিছু পেল না। মুখ ধুয়ে এল সে। গিনি চা আর মুড়ি দিল—দিয়েও দাঁড়িয়ে রইল। অভয়ের চোখের ওপর তার-বাসি আলতা-পরা পা।

গিনি বলল, কাল সুবালাদি এসেছিল সকালে।

অভয় মাথা তুলতে গিয়েও পারল না। গিনি বলে গেল, তোমার দেখা না পেয়ে মন খারাপ করে চলে গেছে। বললে, 'তখনি জানি, দেখা হবার ভাগ্যি করিনি। এ সময়ে রোজ গঙ্গায় চান করি, মাথাটা একটু ভাল থাকে, তাই এসেছিলাম। তবে, লোকটা আমাদের সকলের মাপের বাইরে। যেতে বলতে ঘেন্না করে।

তবু বলিস্ গিনি, এসেছিলাম। ওষে, আমাদের চেনা, এ আমরাও ভাল করে জানি না।'

বলে গিনি সরে গেল। অভয় চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। নিমে বক্‌বক্ করে মুড়িগুলি নিজেই সাবাড় করল। তারপর অভয়ের গাল টেনে ধরে বলল, তা, তা।

অর্থাৎ চা। অভয় তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা চা এক নিমেষে খেয়ে, অবশিষ্ট নিমেকে দিল। দিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল।

রাস্তায় এসে, একেবারে বিশুর বাড়িতে গিয়ে উঠল। আশেপাশে যারা ছিল, তারা অবাক হয়ে গেল। অভয় উঠোনে ঢুকে ডাকল, বিশুদা আছ নাকি?

বিশুর বউ বেরিয়ে, অবাক হয়ে বলল, না তো। ও তো কাজে বেরিয়ে গেছে। কেন?

বিশুর বউয়ের চোখে সন্দেহ ঘনিয়ে উঠল।

অভয় বলল, তাও তো বটে, মনে ছিল না। তবে এখন যাই বউদি।

বিশুর বউ বলল, কী দরকার—বলই না।

অভয় বলল, অন্যায় করেছি, তাই মাপ চাইতে এসেছিলাম। মানুষের গায়ে হাত তুলব, এত বড় সাহস যেন আর কোনদিন না করি, এই বলতে এসেছিলাম।

বিশুর বউ তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল, তা' চলে যাচ্ছ কেন? দাদা নেই বলে বসতে নেই বুঝি? সেই জেল থেকে এসে তো এ বাড়িতে একদিনও পা দাওনি। বস একটু।

তাড়াতাড়ি দাওয়ায় আসন পেতে দিল বিশুর বউ। কিন্তু অভয় পরিষ্কার বাতাবীলেবুতলায় বসে পড়ল।

—আহা মাটিতে কেন?

—মাটিই ভাল বউদি।

—তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন জামাই?

রাতভর ঘুম হয়নি। কিন্তু যে কথা বলতে এসেছিলাম, বউদি,তুমিও আমাকে মাপ করে দিও। রাগলে মানুষ পশু।

—ছি ছি, ও কি কথা। আমি তো তোমার ওপর রাগ করিনি। ঘরের মানুষকে তো আমি জানি। তবু, স্বামীর জন্য কার না অপমান হয়? দশজনের সামনে তখন খারাপ লেগেছিল।

বউদির চোখ ছলছলিয়ে উঠল।—কিন্তু আমার এখন আর কিছু মনেতে নেই। তুমি নিজে এসেছ বলতে, সেই তো অনেক।

—না না, তা নয় বউদি।

—তাই জামাই। আর তোমার সম্পর্কে ওসব বললেই হল? তোমাকে কে না চেনে?

অভয়ের চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করল। বউদি আবার বলল, আমাদের মেয়েমানুষের চোখ জামাই। গিনিকে কি আমরা দেখে কিছু বুঝি না? কিছু ঘটলে আমরা আগেই বুঝতাম।

—মানুষের কখন কী হয়, বলা যায় না। যদি ঘটেই থাকে।

—ও তুমি গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও মানব না। আর যদি ঘটে, তবে তো ভালই। ভামিনীদি তো তাই চেয়েছিল। আমরাও মনে মনে চেয়েছি। কিন্তু গিনির সে কপাল কই?

কী অগাধ বিশ্বাস মানুষের। এই বিশ্বাসকে আঘাত করার প্রবৃত্তি তার কোন্ গুহায় লুকিয়েছিল? সে বলে উঠল, কিন্তু বউদি, হাত দুটো ছেঁচে ফেলতে ইচ্ছে করে। কেন আমি অমন কাজ করলাম।

কিন্তু বউদি অবিচল। বলল, সে কি তুমি করেছ। তখন তুমি সইতে পারনি। বস জামাই, একটু চা খেয়ে যাও।

আপত্তি করল না অভয়। ভাল লাগছে তার এখানে বসে থাকতে।

চা আসতে আসতেই এল মালীপাড়ার এক প্রৌঢ়া বিধবা। বলল, ও বাবা জামাই, এই দেখ, মুন্সপালটি লুটিশ দিয়েছে। এক মাসের মধ্যে খাজনা না দিলে, আমার ঘর নীলেম হয়ে যাবে।

নোটিশখানি হাতে নিয়ে, অভয় পড়ল। বলল, মাসী, তোমার যে দু'বছরের খাজনা বাকী।

—তা বাকী আছে বাবা। তোমার মেসো যে এতদিন ব্যামোয় পড়েছিল। এখন আমি কী করব?

অভয় একটু ভেবে বলল, এখন দিতে পারবে?

—সব তো এক সঙ্গে পারব না।

—মাসে মাসে, কিস্তিতে কিস্তিতে।

—তা পারব।

—বেশ, আমি দরখাস্ত একখানি লিখে দিচ্ছি। তুমি দিয়ে এস।

[ক্রমশঃ

পদাবলী সাহিত্যে বর্ষাভিসার

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী

আকাশ অন্ধকার। বর্ষা সমাগত। পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন মেঘ। বিদ্যুৎ-শোভা। গতি চঞ্চল। ধারাপাত শুরু হইল। পবন নিঃস্বন। ঝঙ্ক-ঝঙ্কার-মুখরিত গগন পবন। শ্রীরাধা-হৃদয় উৎকণ্ঠা পূর্ণ। সঙ্কেতকুঞ্জ গৃহ হইতে দূরে। মিলন পিয়াসী নাগর হয়তো কুঞ্জে অপেক্ষা করিতে-ছেন। আমি যে গুরুজনের দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছি। কি করা যায়। উপায় দেখিনা। পথে বিঘ্নও অনেক। রায়শেখর কবির কথায়—

গগনে অবঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ-পতন শবদ ঝনঝন পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি সংকেত কুঞ্জহি গেল॥

এমন বর্ষায় কিভাবে বাহির হইব? অথচ না গেলেও যে নয়। আমাকে তো যাইতেই হইবে। একাকী শ্যাম-নাগর উৎকণ্ঠায় অবশ অঙ্গ হইয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। এ কথা সহজেই অনুমেয়। আমাকে স্মরণ করিয়াই সে যে বিহ্বল হয়। স্থির থাকিতে পারেনা। বাতাস জোরে চলিয়াছে, যেন লাফ দিয়া যাইতেছে। আমারও মন বাতাসের আগে যাইতে প্রস্তুত।

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম-নাগর একাল কৈছনে পন্থ হেরই মোর॥
সোঙরি মঝুতনু অবশ ভেলজনু অথির থর থর কাঁপ।
মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥

গৃহে গুরুজন সতত সতর্কদৃষ্টি। ঘোর অন্ধকার এখন তাহাদের সেই দারুণ দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন আর অন্য বিচারে প্রয়োজন নাই। শীঘ্র চল। আমার প্রাণ আগেই ছুটিয়া গিয়াছে। রায় শেখর বলেন—বিঘ্ন যতই থাকুক না কেন অভিসার কর।

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ জীবন মঝু আগুসার॥
রায়শেখর বচনে অভিসর কিয়ে যে বিঘিনি বিথার॥

শ্রীরাধার অভিসার উৎকণ্ঠা আরও অধিকতর প্রকাশিত শেখর-কবির নিম্নের পদটিতে। এখানে বর্ষার ধারা ও দশদিকে ঘন অন্ধকার বাধা সৃষ্টি না করে এই আকুতি। তিনি বলেন—

ঝর ঝর বরিখে সঘনে জল ধারা।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা॥
এ সখি কিয়ে করব পরকার।
অব জনি বাধয়ে হরি অভিসার॥
অন্তরে শ্যাম চন্দ্র পরকাশ।
মনহিঁ মনোভব লেই নিজ পাশ॥

আমার অন্তর পথে অন্ধকার নাই। সেখানে শ্যামচন্দ্র উদয় হইয়া পথ আলোকিত করিয়া দিয়াছেন। মনোরথ-সারথি কামদেব রথের রজ্জু হাতে লইয়া রথ চালাইতে প্রস্তুত। কিভাবে কানু সঙ্কেত কুঞ্জে কাল কাটায় তাহা ভাবিতে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িল। দামিনী অগ্নিবর্ষণের ন্যায় ঝলক দিতেছে। বজ্রপাত ধ্বনি কর্ণবিদারক। অথচ ঘরেও থাকা যায় না। এ সকল বিঘ্ন থাকিলেই বা কি হইবে। মনের রথে চড়িয়া কামদেবকে সারথি করিয়া অনতিবিলম্বে নাগরের সমীপে মিলিত হইব। মনই আমার এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কবি বলেন—অভিসার কর।

কৈছনে সঙ্কেতে বঞ্চয়ে কান।
সোঙরিতে জর জর অথির পরাণ॥
ঝলকই দামিনী দহন সমান।
ঝন ঝন শবদ কুলিশ ঝনঝান॥
ঘরমা হার হইতে রহই না পার।
কি করব এ সব বিঘিনি বিথার॥
চড়ব মনোরথ সারথি কাম।
তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম॥
মনমাহা সাখী দেয়ত পুনবার।
কহ শেখর ধনি কর অভিসার॥

বর্ষার অন্ধকার যে অত্যন্ত গভীর তাহা আরও একটি পদে বর্ণিত আছে। পদটি গোবিন্দদাসের। নববর্ষাসমাগমে এরূপ অন্ধকার হইয়াছে যে নিজের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়না। অপরকে দেখার কথা তো দূরে থাকুক। বাহিরে অন্ধকার সত্ত্বেও শ্রীরাধার অন্তরে শ্যামবর্ণ চন্দ্র উদয় হইল। মনোভব সিন্ধু এই চন্দ্রের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এখন আর অন্য কথা বিচারে প্রয়োজন নাই। নববর্ষা সমাগত—অতএব শুভক্ষণে প্রথম অভিসার হউক।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ
বাহিরে তিমির না হেরি নিজদেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভব সিন্ধু।
অবজনি সজনি করহ বিচার।
শুভখনে ভেল পহিল অভিসার॥

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া যাইতে হইবে। অতএব সেইভাবে বেশ ধারণ করা প্রয়োজন। চম্পকবর্ণ অঙ্গের কান্তি আবরণ করিতে মৃগমদ কস্তুরীর কালি ভিন্ন আর উপায় কি? নীল শাড়ী পরিধান করিতে

হইবে। বক্ষাবরণ কাঁচলির ভার বহন করিবার প্রয়োজন নাই। সতিনীর মত মুক্তার মালা দূর করিয়া দাও। ওলো সখি তুই একবার দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া তাখ, দেখি গুরুজন সকলে ঘুমাইয়া পড়িল, অথবা এখনও জাগিয়া আছে। পথে চলিতে যেন দিকভ্রান্তি না হয়। গোবিন্দদাস পদকর্ত্তা কবি গোপনে গোপনে অভিসারিণীর সঙ্গে যাইতে প্রার্থনা করে।

মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তঁহি পহিরায়হ নীল-নিচোল॥
কী ফল উচকুচ-কঞ্চুক ভার।
দূরে কর সোতিনী মোতিম হার॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি॥
চলইতে দীগ্ ভরম জানি হোই।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোই॥

ব্যবস্থা হইল কিন্তু বড়ই সন্দেহ। সখী ভাবেন—কেমন করিয়া রাধার রূপ আবরণ করা সম্ভব? তাই তিনি শ্রীরাধাকে তাহার উপদেশ শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীহরির সঙ্কেতে অভিসার করিবে, কিন্তু আমার কথামত চলিতে হইবে। তোমার নীলশাড়ীতে মুখমণ্ডল আবৃত করিতে হইবে। তোমার হাসির সঙ্গে শরৎ কালের বিমল চন্দ্রের শোভালোক ছড়াইয়া পড়ে। মুক্তার হার খুলিয়া রাখ। কিঙ্কিনী বন্ধন মুক্ত কর। নুপুরকে নিঃশব্দ করাও। পদনখ শ্রেণীকে আবরণ কর। ধীর পদে কেলিকুঞ্জের পথে চলিবে। পথে চলিতে কঙ্কন কিঙ্কিনী বাজিয়া না উঠে। পুরবাসী কোনো শব্দমাত্রে চমকিত হইয়া উঠিবে। পথের অনুসরণে অন্ধকারে সন্দেহ হইতে পারে, গোবিন্দদাসকে সঙ্গে করিয়া চল, পথ দেখাইয়া দিবে।

কি করব মৃগমদ-লেপন তোর।
কী ফল পহিরণ নীল নিচোল॥
শারদ চাঁদনি তুয়া মুখ হাস।
বিঘটন তিমির হোয়ব পরকাশ।
এ ধনি ধরবি হামারি উপদেশ।
অব অভিসার হরিক সন্দেশ॥
আঁচরে ঝাঁপব আনন-চন্দ।
দূরে কর মোতিম কিঙ্কিণি বন্ধ॥
নুপুর মুখভরি ও নখপুঞ্জ।
মন্থর গতি চল কেলি নিকুঞ্জ॥
চলইতে চঙকি নগর পুরমাঝ।
জনি মণি-কঙ্কণ কিঙ্কিনী বাজ॥
তিমিরে পন্থ যব হোত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস সঙ্গে করি লেহ॥

অভিসার সুযোগ সুবিধা মত দিবা অথবা রাত্রি যে কোনো সময়ে হইতে পারে। বর্ষায় দিনে দিবা-অভিসারেও সুযোগ মন্দ নয়। দিবাভাগেও যখন ঘন মেঘে সূর্য্য ঢাকা পড়িয়া যায়, তখন কোনোদিন এমনও হয়—যে দিন বা রাত্রির ভেদ ঘুচিয়া গেল। কাছের মানুষকেও তখন লক্ষ্য করা যায় না। প্রতিটি গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ। সেই অবসরেও অভিসার বর্ণনা করেন গোবিন্দদাস।

গগনহিঁ নিমগন দিনমণি কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥
ঐছন জলদ কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হিঁ কোই-লখই নাহি পার।
চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
চৌদিশে অথির পবন ভরু দোল।
জগ ভরি শীকর-নিকর হিলোল॥
চলইতে গোরী নগর পুরবাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥
যব্ ধনী কুঞ্জে মিলহ হরি পাশ।
দূরহি দূরে রহু গোবিন্দ দাস॥

কবি বর্ষাভিসার উপলক্ষে শ্রীরাধা ও সখীর উক্তি প্রত্যুক্তি অতি নিপুণভাবে বলেন। পথে কাদা ইহাই শুধু রাধার বাধা নয়। বাধা অনেক আছে। প্রথমতঃ গৃহের সদর দরজা। সেটা অতিক্রম করা কঠিন। দ্বারটিও কঠিন। পথে চলিতে শঙ্কা। কোথায় পা পড়ে স্থিরতা নাই। কর্দমাক্ত পথ দুর্লক্ষ্য। বর্ষাও এমন যে কোনো দিকে আর ফাঁক নাই। মুষলধারে জলবর্ষণ। জলকে বাধা দেওয়ার মত ছত্রাদির অভাব। মানস-গঙ্গার তীরে যেখানে নাগর-চূড়ামণি রহিয়াছেন উহা নিকটবর্ত্তী স্থান নয়। শব্দ সহ ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। কানে তালা লাগিবার উপক্রম। বিদ্যুতের প্রভা চারিদিকে। চক্ষু ঝলসিয়া যায়। এই সব বাধা না মানিয়া ঘরের বাহির হওয়ার অর্থ নিজের দেহকে উপেক্ষা করা। প্রেম কি দেহ রক্ষার চাইতেও বড় হইল? শঙ্কার উত্তর কবি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তিনি বলেন—ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার। সম্পূর্ণ পদটি এই—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহি অতি দুরতর বাদলদোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥

ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহে ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

জল কাদায় অন্ধকারে পথে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুতি চলিয়াছে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীবাক্যে সেই সংবাদ পাওয়া যায়। শ্রীরাধা কণ্টকাকীর্ণ পিচ্ছিল পথে কেমন করিয়া দ্রুত গতিতে চলিয়া যাইবেন তাহার অভ্যাস করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কণ্টক ফেলিয়া কলসী করিয়া জল ঢালিয়া কর্দ্দমাক্ত পথে অঙ্গুলে ভর করিয়া কোমল কমল চরণে শ্রীরাধা চলিয়াছেন। হে সুন্দর শ্যাম, অন্ধকারে অনায়াসে চলিবার জন্য কখনো কখনো চক্ষু বুজিয়া আবার নিজে হা'তে চক্ষু চাপিয়া রাত্রি কালে অপর সকলে যখন নিদ্রিত সেই সময় অভ্যাস করিয়াছেন। অঙ্গের কোনো অলঙ্কারের ধ্বনি না হয় সে জন্যও সাবধানতা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি সাপের ওঝাদের নিজের হাতের কঙ্কন প্রদান করিয়া সাপগুলি বশীভূত করিবার মন্ত্রতন্ত্রও শিখিয়া লইয়াছেন। যে যাহাই বলুক না কেন গুরুজন পরিজনের কথায় কান দেন না, এমন কি তাহাদের কথা শুনিয়া যেন কিছুই বুঝিতেছেন না এমন ভঙ্গী করিয়া অবোধের মত শুধু হাসেন। গোবিন্দদাসের বাণী—

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি
গাগরী বারি ঢারি করু পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি॥
কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কন পণ ফণিমুখ বন্ধন শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

শ্রীরাধা কি ভাবে ভয়কে জয় করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। সখী বলেন, এই রাধা একদিন একটি সাপ দেখিলে ভীতচিত্তে চমকিত হইয়া কম্পিত হইত। এখন অন্ধকারে নিজের অঙ্গ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া চলে, সাপের মাথার মণি ঝিকমিক্ করিয়া উঠিলে নির্ভয়ে সেই মণির দীপ্তি বন্ধ করিবার জন্য রাধা সাপের মাথায় হস্তার্পণ করেন। অনুরাগে রাধাকে অবশ করিয়াছে। সে যে বাঁচিয়া আছে ইহাই ভাগ্য বলিতে হইবে। স্থল কমল হইতেও অধিকতর সুকোমল শ্রীরাধার চরণতল, উহা ভূমি স্পর্শে চমকিত হইয়া উঠে, আর এখন কণ্টকময় সঙ্কটাকুল পথেও সেই রাধা নির্ভয়ে গমনাগমন করে। নিজের গৃহ হইতে কখনও যে বাহিরে যাইত না, সন্ধ্যা হইলে দ্বারটিকে দূর পথ বলিয়া মনে করিত, এখন অন্ধকার অমাবস্যা রজনীতেও একাকিনী সে পথে চলিয়া যায়।

ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনী চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই করদেই ফণি-মণি ঝাঁপ॥
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে আপ নব নাগরী জীবই বহু পুণভাগ।
যো পদতল থলকমল সুকোমল ধরণী পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি আওত যাওত নিশঙ্ক॥
মন্দির মাঝ সাজ নাহি তেজত দেহলি মানয়ে দূর।
অব কুহু যামিনী চলয়ে একাকিনী গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

পথের বাধা কোনো ক্ষেত্রেই শ্রীরাধাকে আরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। নিঃশঙ্ক হৃদয়ে রাধা সখীর বাক্যের উত্তরে যাহা বলেন গোবিন্দ দাস তাহার প্রতিধ্বনি করেন। নিম্নের পদটি আস্বাদন করুন—

কুলবতী কঠিন কপাট উদঘাটলু তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঞে পঙরেলু তাহে কি তটিনি অগাধা॥
সজনি, মঝু পরীখণ কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটী কুসুমশর বরিখয়ে যছুপর তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয়ে সহ তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে হাম জীবন সোঁপলু তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর সহচরী পাওল বোধ॥

সখী মন্দিরের বাহিরে কঠিন কপাটের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহারই উত্তরে রাধা বলেন, কুলবতী নারীর কুলমর্য্যাদার সঙ্গে তুলনা করিলে কাঠের কপাটের বাধা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। মর্য্যাদার বাধা যখন অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিয়াছি, কাঠের কপাট আর আমাকে আরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না সখী। আত্মমর্য্যাদা সাগরের মত অপার, সেই অপার সমুদ্র পার হইয়াছি, সাধারণ নদী আমাকে বাধা দিবে কেমন করিয়া বলতো? আমার আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। আমার মন কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। শুধু আমি ভাবি—কেমন হৃদয় লইয়া কৃষ্ণ আকুলভাবে পথের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছে। আমার উপর কোটি কুসুমশর বর্ষিত হইতেছে, কাজেই মেঘের জল বর্ষণ আমার মোটেই বাধক নয়। আমার হৃদয়ে যে সতত প্রেমের আগুন তাপ সঞ্চার করিতেছে, বজ্রের অগ্নিতাপ আমার কি করিবে? আমি যে সুন্দর শ্যামের চরণতলে আমার জীবনটাই সমর্পণ করিয়াছি, আমার দেহ থাকুক বা না থাকুক উহা আমার সমীপে অতি তুচ্ছ কথা। সখী বুঝিলেন রাধাকে বাধা দেওয়া যাইবে না। গোবিন্দদাস বলেন—রাধে, তুমি যথেচ্ছ অভিসার কর।

চলু গজ গামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
পঙ্ক পিছল পথ গুরুয়া নিতম্ব।
পড়ু কত বেরি নাহি অবলম্ব॥
বিজুরি জ্যোতি দরশায়লি দেহ।
উঠইতে চাহে জল-ধারক এহ॥

ঐছন মিলল নাগর পাশ।
গোবিন্দ দাস কহে পূরল আশ॥

অন্যত্র এই অবস্থাটির বর্ণনা, যথা—

যব ধনি ঘর সঞে ভেল বাহার।
ঝর ঝর বরিখে জলদ অনিবার॥

ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতে অধিক পরিমাণে জল বর্ষণ হইতে লাগিল। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। উহা কি আর হাত দিয়া ঠেলিয়া দূর করা সম্ভব? পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল মদন নিজেই, পাছে দিগ্‌ভ্রম হয় এই নিমিত্ত।

কর ঠৈলন নহে ঘন আঁধিয়ার।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার॥

গোবিন্দ দাস কবি সখীমুখে বলেন—

কি কহব মাধব পুণ ফল তোরি।
এতহু দূর তরি তোহে মিলু গোরী॥
ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক।
চলইতে খলয়ে সঘন মহীপঙ্ক॥

পথের কাদায় চরণ স্খলিত হইলে দাঁড়াইতে যাইয়া উদ্ধত-ফণ সর্পকে মণির কিরণে স্বর্ণদণ্ড ভ্রম করিয়া উহাই ধরিতে যান। প্রাণের কোনো ভয় নাই। এই ভাবে শ্রীরাধা অভিসার করেন।

উচইতে ফণি মণি উজোর হেরি।
কনক দণ্ড বলি ধরু কত বেরি॥
ঐছন সোপলু তোহে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুলেহ॥
এতদিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দ দাস ভরম দূরে গেল॥

ভগবদ্‌গীতা প্রসঙ্গ

ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এম এ

অখিল শ্রুতিসার, পরিভবন্ন, শ্রবণমঙ্গল ভগবদ্‌গীতা শাস্ত্র নিখিল বিশ্বের একমাত্র অধ্যাত্ম প্রদীপ—যাহার অম্লান, অবিকল্প, শাশ্বত ধ্রুব-জ্যোতি দেবীমায়া-মুগ্ধ বিশ্ববাসীকে মৃত্যুসংসার সাগরের পরপারে অবস্থিত জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যের সন্ধান দিতেছে।

বর্ণাঢ্য, রূপাঢ্য, অনুপম বাক্যবিন্যাসে রচিত এই অপূর্ব গ্রন্থের প্রত্যেকটি শব্দ সারগর্ভ ও গভীর ভাবোদ্দীপক—যে গ্রন্থের একটি শ্লোকের গূঢ়তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে শান্তিপুরের মহাপণ্ডিত অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু দিনের পর দিন উপবাস করিয়া থাকিতেন।

আজ হইতে বহুবর্ষ পূর্বে দ্বাপরযুগের শেষভাগে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ-পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে মঘানক্ষত্রে কুরুপাণ্ডবের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যদল পরস্পর পরস্পরের নিধন সংকল্পে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে সমবেত হয়েছিল। ভয়াবহ যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, মহামৃত্যুর আসন্ন বিভী-ষিকা স্মরণ করিয়া বাসব-বিজয়ী অর্জুনের বীর হৃদয় বিকম্পিত—বিষাদ-গ্রস্ত। তাঁহার শরীরে বেপথু, গাত্রত্বকে তীব্রদহন—সব্যসাচীর হস্ত হইতে গাণ্ডীবধনু স্খলিত হইয়া পড়িল। এইখানে গীতার আরম্ভ। তারপর শ্রীকৃষ্ণের অগ্নিগর্ভ বাক্য—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,…ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ'—জীবন দর্শনের বিচিত্র রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন এবং পরে স্বীয় বিভূতি বর্ণনা; ইহাতে অর্জুনের মোহ দূর হইল বটে কিন্তু তখনও তিনি যেন প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাই অবশেষে কৃষ্ণের ঐশ্বররূপ দর্শন করিয়া তাঁহার সর্বসংশয় বিদূরিত হইল—তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন দেবদত্ত শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। অমনি চারিদিকে শত শত রণ-শঙ্খের তুমুল ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পার্থসারথী শ্বেতহয়যুক্ত কপিধ্বজরথ চালনা করিতে উদ্যত হইলেন। এইখানে গীতার পরিসমাপ্তি।

অতএব,

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত।
যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্॥

এই শ্লোক গীতার সূচনা।

এবং

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ প্রাসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

এই শ্লোক গীতার উপসংহার।

প্রচলিত গীতাগ্রন্থ ১৮ অধ্যায়ে বিভক্ত—মোট শ্লোক সংখ্যা—৭০০।

সূচনা বিষয়বস্তুর বিবৃতি ও বিশ্লেষণ এবং উপসংহার—এই তিনটি বিভাগের সুসমঞ্জস বিন্যাসই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত করে।

কৃষ্ণই "সর্বস্তধাতা", "বিশ্বস্য পরংনিধানং" এই সত্য বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জ্জুন মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। এখন তিনি মোহমুক্ত। এখনি সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত। এখন কি আর অর্জ্জুন ধীর অবিচলিত চিত্তে 'ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ', 'গুণত্রয় বিভাগ', "দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ", 'শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ'—এই সব অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর কথা শ্রবণ করিতে পারেন!

অর্জুন এখন বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান লাভ করেছেন—যাহা জানিলে অন্য-কোন জ্ঞাতব্য বিষয় অবশিষ্ট থাকে না,—'যদ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যঅবশিষ্যতে'—৭২। অতএব তাহার কাছে এখন নূতনকরিয়া ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ ইত্যাদি নীরস কাহিনী প্রচার করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। গীতার ১৩ হইতে ১৮ এই শেষ ৬ অধ্যায়ে যে সব অনাবশ্যক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক, অসঙ্গত ও অশোভন। ঐ শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্তীকালে গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই সংযোজনের ফলে ১২ অধ্যায়ের গীতা ১৮ অধ্যায় যুক্ত গ্রন্থ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই অনাবশ্যক গ্রন্থ স্ফীতির জন্য দায়ী সেই সব পণ্ডিতবর্গ—যাঁহারা সহজ সাধ্য ছন্দে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া মহাভারতের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শেষ ৬ অধ্যায়ের অনেক শ্লোক পূর্ববর্তী অধ্যায় হইতে নকল করা হইয়াছে ;—যথা

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ঠাশ্মকাঞ্চনঃ ৭।৮
শ্রেয়ান্‌ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ
স্বনুষ্ঠিতাৎ ৩।৩৫
যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ৫।৫
মন্মনাভবমদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজীমাংনমস্কুরু ৯।৩৪
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ১২।১৭
স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন ঃ ১৪।২৪
শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মোবিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ১৮।৪৭
যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ১৩।২৭
মন্মনা ভবমদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাংনমস্কুরু ১৮।৬৫
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ১৮।৫৪

ভাষার দৈন্য, অর্থের অসঙ্গতি, সামঞ্জস্যের অভাব, সুষ্ঠু শব্দচয়নে অক্ষমতা, দ্বিরুক্তি দোষ প্রভৃতি গুরুতর বোঝাবহ ত্রুটি বিচ্যুতি কিরূপে উপেক্ষা করা যাইতে পারে? অল্পপরিসর একই গ্রন্থে এইরূপ পুনরুক্তি-এ হেন নির্লজ্জ plagiarism নিতান্ত অসহ্য। শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি কত মহাপণ্ডিত গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন এবং পরবর্তীকালে বহু মনীষী গীতার আলোচনা করেছেন ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য কেহই প্রক্ষিপ্ত শ্লোক এবং প্রক্ষিপ্ত অধ্যায় সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করা আবশ্যক বোধকরেন নাই। গীতার শেষ ছয় অধ্যায়ের সর্বাঙ্গীণ দীনতা সুপরিস্ফুট—অতএব ১৩ হইতে ১৮ এই ছয় অধ্যায় গীতার অংশ নয়—উহা যেন একটা Cysticumour, অস্ত্রোপচার দ্বারা ঐ অনাবশ্যক মাংসপিণ্ড গীতা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

গীতা ১২ অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থ। প্রচলিত গ্রন্থে ১২ অধ্যায়ে বর্ণিত ভক্তিযোগ ৯ অধ্যায়েরই logical sequence, এই কারণে ৯ অধ্যায়ের পরই ইহার সংযোজন যুক্তি সঙ্গত। অতএব ১২ অধ্যায়ের ভক্তিযোগ ১০ম অধ্যায় রূপে পরিগণিত হইবে এবং ১০ম অধ্যায় ১১শ অধ্যায় ও ১১শ অধ্যায় ১২শ অধ্যায় রূপে নির্দিষ্ট থাকিবে।

গীতাপ্রোক্ত কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ বক্তা আর অর্জুন প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা, এখানে তৃতীয় কোন ব্যক্তির স্থান নাই।

বেদব্যাসের ঔরসজাত পুত্র অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র (Symbol of Imperialism) হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে সমাসীন এবং তাঁহারই নিকটে উপবিষ্ট সঞ্জয়—যিনি ব্যাসদেবের বরে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া অন্ধ নৃপতিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া শুনাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন—দূরদৃষ্টি ও দূরশ্রবণ এই দুই শক্তির প্রভাবে তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা প্রতিভাত হইতেছিল। অতএব সঞ্জয় Radio-Cum Television যন্ত্রমাত্র, অন্য কোন ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন না।

'পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে' ইত্যাদি বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কুরুক্ষেত্রে যাহা ঘটিতেছিল তাহা সেই মুহূর্ত্তে সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইয়া দিতেছেন। যুদ্ধের দৈনিক Bulletin ছয়মাস পরে জ্ঞাপন করাইলে দিব্যদৃষ্টি প্রদানের কোন সার্থকতাই থাকে না। তাহা হইলে 'মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়' একথা রাজা বলেন কি করিয়া? অতীতকালের লঙ্‌ এর পদ না দিয়া লট্‌ এর পদ ব্যবহার করা উচিত ছিল, কারণ উহা তৎকালীন ঘটনা। 'শঙ্খাং দধ্মৌ' এখানেও লিটের পদ অপপ্রয়োগ। বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া ব্যবহার করাই যুক্তি সঙ্গত। কৃষ্ণার্জুনের বাক্যে সব স্থানেই লটের পদ ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও লঙ্‌ ও লিটের পদ নাই।

অনেক বক্ত্র নয়নমনেকাদ্ভুত দর্শনং।
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং।
সর্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখং॥
দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্‌ যুগপদুত্থিতা।
যদিভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥
১১।১০, ১১, ১২

সঞ্জয়ের এই উক্তি নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক।

'দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ'—১১।৫২
'এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরু প্রবীর'
১১।৪৮

অর্জুনের পূর্বে কেহই কখনো বিশ্বরূপ দেখিতে পান নাই, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবতাবৃন্দেরও বিশ্বরূপ দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই, তাঁহারা সকলে বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য লালায়িত। তাহা হইলে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্বে সঞ্জয় বিশ্বরূপ দেখিয়া 'দিব্যমাল্যাম্বরধরং', 'দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্‌ যুগপদুত্থিতা' ইত্যাদি শ্রুতিমধুর বচন রাজাকে শুনাইতে আরম্ভ করিলেন কিরূপে? অতএব নিঃসংশয়ে বলিতে হইবে সঞ্জয়ের ঐ সব উক্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব, অলীক ও কল্পনাপ্রসূত। কেবল কতকগুলি অবান্তর কথার জাল বুনিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করার কোনই সদর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশ্বরূপদ্রষ্টা অর্জুন সহস্র সূর্যের যুগপৎ উদয়ের কথা কোথাও বলেন নাই। তাহা হইলে সঞ্জয়ের মুখ হইতে ঐ কথা উচ্চারিত হইল কিরূপে? সুতরাং ঐ সব উক্তি সঞ্জয়ের নিছক কল্পনা বিলাস। শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত দিব্য দৃষ্টি

লাভ না করিলে স্বয়ং অর্জুনও বিশ্বরূপ দেখিতে পাইতেন না, সঞ্জয়ের পক্ষে বিশ্বরূপ দর্শন করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। উগ্র তপস্যা প্রভাবেও বিশ্বরূপ দেখা যায় না, ঐ দর্শন কৃপা-সাপেক্ষ—সাধন-লভ্য নয়।

অতএব ঐ সব শ্লোক ১১।১০, ১১, ১২ গীতায় প্রক্ষিপ্ত। সঞ্জয় কখনই স্বচক্ষে বিশ্বরূপ দেখেন নাই, অর্জুনের মুখে শুনেছেন মাত্র। স্বচক্ষে দৃষ্ট বস্তুই স্মৃতিতে অঙ্কিত থাকে এবং ঐ স্মৃতি হইতে হর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু অপরের মুখে বর্ণনা শুনিয়া 'সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ' (১৮।৭৭) ইহা সঞ্জয়ের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেন চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ১১।৪৬

এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, কারণ চতুর্ভুজ বিশ্বরূপ দর্শনের আগ্রহ অর্জুনের কখনই থাকিতে পারে না। বামহস্তে ধৃত অশ্ববল্গা ও দক্ষিণ হস্তে কষা—দ্বিভুজ কৃষ্ণই তাঁহার রথের সারথী। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দর্শনের ইচ্ছা অর্জুনের মনে কখনই উদিত হইতে পারে না। ঐ প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। উক্ত শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত পরবর্ত্তী 'দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন' (১১।৫১) এই শ্লোকাংশ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

গীতায় প্রথম ছয় অধ্যায়ে জীব স্বরূপকে প্রধান ভাবে লক্ষ্য করিয়া আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভগবৎ স্বরূপকে প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে। বাসুদেব তত্ত্বই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। আর ঐ বাসুদেবকে লাভ করাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত সারে বাসুদেবের প্রতি তীব্র বেগে ধাবিত হইতেছে। "নাগেনে নিখিল পড়ে আছে পথে যার দরশন লাগি, যুগ যুগ ধরি যাহার আশায় মহাকাল আছে জাগি।"

'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।' ১১।৩৩

এ কথার অর্থ প্রথমে অর্জুন বুঝিতে পারেন নাই। এই সত্য উপলব্ধি করিলেন কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরে। তাই বলিতে হয় শ্রীমদ্ভাগবতের সন্ধানী আলোকের সাহায্যে মহাভারত তথা গীতার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইবে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য প্রভৃতি মহারথিগণ বিপক্ষে থাকিতে অর্জুনের দ্বারা কুরুক্ষেত্রে জয়লাভ করা সম্ভবপর হইত না। কৃষ্ণই দৃষ্টির দ্বারা ঐ সকল মহাবীরের বীর্য্য, শক্তি, সামর্থ্য হরণ করিয়া ছিলেন।

যো ভীষ্ম কর্ণ গুরু শল্য চমূষ্বদভ্র রাজন্য বর্য্য রথ মণ্ডল মণ্ডিতাসু।
অগ্রেচ রোমমবিভো রথ যূথ পানাং আয়ুর্মনাংসিচ দৃশা স ওজ
আচ্ছ'ৎ॥

ভা—১।১৫।১৫

অর্জুন এখন বুঝিতেছে, তাঁহার নিজস্ব শক্তি কিছুই নাই, মায়ামনুষ্য কৃষ্ণই সকল শক্তির একমাত্র অফুরন্ত উৎস।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্ত—তার পর যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের অন্তর্ধান। দ্বাপর যুগের মহাবীর অর্জুন স্বীয় গাণ্ডীব ধনুর সাহায্যেও কতক গুলি অসৎ গোপের হস্ত হইতে কৃষ্ণমহিষীদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার অলোকসামান্য শৌর্য্য, তাঁহার অমিত বিক্রম অস্তমিত। সেই বীরচূড়ামণি অর্জুন, সেই ভুবনবিজয়ী গাণ্ডীব সবই বর্তমান, কিন্তু আজ তিনি অবলা রমণীর ন্যায় পরাজিত হইলেন। অদৃষ্টের একি ক্রূর পরিহাস! মর্ম্মন্তুদ বিষাদে অর্জুনের মন ভারাক্রান্ত। কৃষ্ণ বিরহে তাঁহার হৃদয় টন্ টন্ করিতেছে। তাই তিনি দ্বারকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—

তত্রৈবমে বিহরতো ভুজদণ্ডযুগ্মং
গাণ্ডীব লক্ষণমরাতি বধা দেবাঃ।
সেন্দ্রাঃ শ্রিতা যদনু ভাবিতমাজমীঢ়
তেনাহমদ্য মুষিতঃ পুরুষেণ ভূম্না॥

ভা—১।১৫।১০

সোহহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন
সখ্যা প্রিয়েন সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ।
অধ্বন্যুরুক্রম পরিগ্রহমঙ্গরক্ষন
গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোস্মি॥

ভা—১।১৫।২০

ইউরোপে সংস্কৃত চর্চা

নরেন ভট্টাচার্য্য
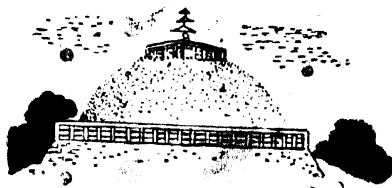
॥ ১ ॥

বিখ্যাত ইংরাজ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ম্যাকডোনেল তাঁর একটি পুস্তকে মন্তব্য করেছিলেন—"Since the Renaissance there has been no event of world wide significance in the history of culture as the discovery of Sanskrit literature in the latter part of the eighteenth century।" সত্যকথা বলতে কি অষ্টাদশ শতকের পূর্ব পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত নামক কোন ভাষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন না, এমন কি সংস্কৃত ভাষা আবিষ্কৃত হবার পরেও অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এতে বিশেষ আমল দেননি। এমনকি ডুগাল্ড্ স্টিউয়ার্ট নামে জনৈক দার্শনিক গোটা সংস্কৃত সাহিত্যকে ধাপ্পা বলে উড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি,অধিকন্তু তিনি বলেছিলেন যে সংস্কৃতভাষা হচ্ছে একটা জালিয়াতি, যে জালিয়াতি ব্রাহ্মণরা করেছিল গ্রীক ভাষার অনুকরণে। ১৮৩৮ সালে, যখন ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলে সংস্কৃতচর্চা রীতিমত শুরু হয়ে গেছে, তখনো এরকম ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ডাব্লিনে একজন অধ্যাপক এ নিয়ে দারুণ হৈ চৈ করেছিলেন।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সঙ্গে ইউরোপের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ একটি ঐতিহাসিক সত্য। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কিছুকাল আগে থেকেই গ্রীকরা যে ভারত সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ ভারতের উল্লেখ করেছেন; ক্রেসিয়াস্ ভারত সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর ডায়োডোরাস, প্লুটার্ক, স্ট্রাবো, কুরসিয়াস্, জাস্টিনাস্ প্রভৃতি বৈদেশিকগণ ভারত নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থান করে ভারত সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। পরবর্ত্তী কালে প্লিনিও ভারত সম্বন্ধে বিবরণ দিয়েছেন। আলেকজাণ্ডার ফিরে যাবার পর ভারতের উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক রাজত্ব স্থাপিত হয়েছে। কোন কোন গ্রীক রাজা ভারতের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। ভারতীয়দের হাতে পড়ে গ্রীকরাজ ডিমিট্রিয়াস্ দত্তামিত্র হয়েছেন। গ্রীকরাজ মীনাণ্ডার বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মিলিন্দ পঞ্হোর নায়ক হয়েছেন। গ্রীক রাজদূত হেলিওডোরাস্ বাসুদেব ভক্ত হয়ে গরুড়ধ্বজ স্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। অপর দিকে গ্রীক শিল্পরীতি ভারতীয় শিল্পরীতির সঙ্গে মিশে জন্ম দিয়েছে গান্ধারশিল্পের। গ্রীক জ্যোতিষ প্রতিফলিত হয়েছে বরাহমিহিরে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্য্যন্ত রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য অবাধে চলেছে। কিন্তু তারপর ইউরোপের সঙ্গে ভারতের সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। গোটা মধ্যযুগ জুড়ে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মুখ দেখাদেখি ছিল না। যদি ভারত সম্বন্ধে কোন সামান্য পরিচয় এ সময়ে ইউরোপ পেয়ে থাকে, তা তারা পেয়েছে আরবদের কাছ থেকে। কিন্তু ভারতের চর্চা, মনীষা, ভাষা, ধর্ম কোন কিছু সম্বন্ধেই ইউরোপ কোন ধারণাই করতে পারেনি।

সংস্কৃত ভাষাকে ইউরোপে প্রথম পরিচিত করার কৃতিত্ব ওলন্দাজদের। এ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন আব্রাহাম রজার নামে একজন ধর্মযাজক। তিনি মাদ্রাজের পুলিয়াকট্ (আধুনিক পুলিঘট) নামক স্থানে বাস করতেন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি ডাচ ভাষায় লেখেন Open Deure Tot Het Verborgen Heydendom যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় "গুপ্ত বিধর্মীতন্ত্রের দ্বারোন্মোচন।" বইটি ১৯১৫ সালে শ্রীযুক্ত কালাণ্ড কর্তৃক নতুনভাবে সম্পাদিত হয়। বইটির জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৬৬৩ সালে নুরেনবার্গ সহরে। বইটিতে ভর্তৃহরির কিছু কিছু শ্লোকের অনুবাদ আছে। অংশগুলি সোজাসুজি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করা হয়নি। রজার সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত ছিলেন না। একজন স্থানীয় ব্রাহ্মণ তাঁর জন্য ভর্তৃহরির কিছু শ্লোক পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করে দেন। তা থেকে রজার আবার ডাচ্ ভাষায় অনুবাদ করেন। সংস্কৃতকে ইউরোপে প্রথম পরিচিত করার দায়িত্ব একজন ওলন্দাজের হলেও প্রথম যে ইউরোপীয় ভাষায় সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি অনুবাদ হয় তা হচ্ছে পর্তুগীজ। অবশ্য তার আগেও অভারতীয় ভাষায় সংস্কৃতের কিছু কিছু চর্চা হয়েছে। যেমন আল্‌বিরুনী কিছু করেছেন, আবুল ফজল কিছু করেছেন; মুঘল রাজকুমার দারা শিকোহ্‌র উপনিষদের অনুবাদ তো বিখ্যাত। আরবজাতির জাগরণের প্রথম পর্য্যায়ে যে সব প্রখর প্রতিভাশালী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেমন, আবু মিনা, ইবন্ ইসাক, ইবন রস্বদ, আল তবারি, ইবন্ খলদুন—তাঁরা সংস্কৃতভাষা এবং ভারতীয় চিন্তাধারার কোন খবরই যে রাখতেন না তা নয়; পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশের আখ্যানগুলিও বহুপূর্বে আরবী ও পার্শী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল; এও অসম্ভব নয় যে কিছু কিছু ভারতীয় চিন্তা প্রাকরেনেসাঁ যুগে আরবদের মারফত ইউরোপে গিয়েছিল। সে যাই হোক না কেন, আধুনিক ইউরোপে—অর্থাৎ রেনেসাঁ পরবর্ত্তী ইউরোপে—সংস্কৃত ভাষাকে পরিচিত করাবার একমাত্র কৃতিত্ব আব্রাহাম রজারের।

অতঃপর যাঁর নাম একান্ত উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন জোহান্ আর্ণস্ট্ হ্যাংকস্‌লেডেন্। ইনি একজন জেসুইট ধর্মযাজক ছিলেন। ইনি মালাবার মিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং মালাবার অঞ্চলেই তিরিশ বছরেরও

অধিক কাজ করেছিলেন। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ লেখেন। বইটির নাম Grammatica Granthamia Sen Samscrdumica. এই বইটি হচ্ছে প্রথম ইউরোপীয় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। বইটি অবশ্য ছাপা হয়নি। তবে বইটি তাঁদের যথেষ্ট কাজ দিয়েছে যাঁরা ইউরোপে সংস্কৃত চর্চার আদিপর্বে গবেষণা করেছেন। বইটি থেকে সবচেয়ে উপকৃত হয়েছেন ফ্রা পাওলিনো।

এই ফ্রা পাওলিনো সংস্কৃত চর্চার জনৈক অগ্রদূত ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল জে, এফ, ওয়েসডেন্। ইনিও একজন ধর্মযাজক ছিলেন এবং মালাবার উপকূলে কাজ করেছিলেন ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এঁর জীবন সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তা থেকে এটুকু খবর পাওয়া যায় যে তিনি ১৮০৫ সালে রোমে দেহত্যাগ করেন। সংস্কৃত ভাষায় এঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি দুখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থ Systema Brahmanicum রোম শহর থেকে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থটি জে, আর, ফরষ্টার জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদিত সংস্করণটি ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর গ্রন্থগুলিতে ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। এ সত্ত্বেও এটুকু বলা চলে যে তাঁর বইগুলিতে যে সকল তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলি পর্যাপ্ত নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার চর্চার প্রাথমিক স্তরে পাদ্রীদের অবদান অত্যন্ত বেশী। রজার, হ্যাংকস্লেডেন, পাওলিনো প্রভৃতি মিশনারীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই ইউরোপ সংস্কৃতভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট এবং বিপুল রত্নভাণ্ডারের অতি সামান্যই এঁরা আহরণ করতে পেরেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের অবদান সর্বদাই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণীয়।

॥ ২ ॥

ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের পর শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে ইংরাজদের সংস্কৃতভাষার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করার প্রয়োজন অনুভূত হল। ভারতে বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরাচরিত স্থানীয় রীতি সমূহকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের নির্দেশে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দিয়ে বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থ হতে একখানি আইনগ্রন্থ সংকলিত হয়। গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছিল বিবাদার্ণবসেতু। এই গ্রন্থটিকে সরাসরি সংস্কৃত হতে ইংরাজীতে অনুবাদ করবার মত লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। অগত্যা গ্রন্থটিকে প্রথম পার্শীভাষায় অনুবাদ করা হয়। পার্শী থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেড। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বইটি প্রকাশ করা হয়। নাম দেওয়া হয় A Code of Gentoo। Gentoo কথাটি পর্তুগীজ Gentio থেকে নেওয়া হয়েছে যার বাংলা অর্থ হচ্ছে বিধর্মী। বইটির জার্মান অনুবাদ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হামবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রথম ইংরাজ যিনি যত্ন করে সংস্কৃত শেখেন তিনি হচ্ছেন চার্লস উইলকিন্স। ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুপ্রেরণায় তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। প্রধানতঃ কাশীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছ থেকেই তিনি সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই প্রথম সংস্কৃতভাষা থেকে ইংরাজীভাষায় সরাসরি অনুবাদ। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হিতোপদেশের অনুবাদ করেন এবং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মহাভারতের শকুন্তলা আখ্যানটির। ১৮০৮ সালে তাঁর রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ সংস্কৃত হরফেই ইউরোপে প্রকাশিত হয়। উইলকিন্স শুধু সংস্কৃত থেকে ইংরাজীতেই অনুবাদ করেন নি, অধিকন্তু কয়েকটি শিলালিপি ও তাম্রশাসনেরও পাঠোদ্ধার অনুবাদ করেন। এ কাজে ইনিই প্রথম।

অতঃপর যাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪)। ফোর্ট উইলিয়ম বিচারালয়ের বিচারপতি হয়ে তিনি এদেশে আসেন। তাঁর আগমনের তারিখ ছিল ১৭৮৩ সাল। ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যার এই মহান অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপনের মূলে তাঁর অবদান অনেকখানি। এই এশিয়াটিক সোসাইটিতেই এক চাঞ্চল্যকর বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন, লিথুয়ানিয়ান, কেল্টিক প্রভৃতি ভাষার শব্দগত সাদৃশ্য দেখে এটুকু অনুমান করা চলতে পারে যে এই সব ভাষাগুলি একটি মূল ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং আরও অনুমান করা যেতে পারে যে এই মূল ভাষা, যার পরে নামকরণ করা হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় বলে, সেই জায়গারই ভাষা ছিল যেখান থেকে আর্য্যজাতির প্রথম উদ্ভব হয়। উইলিয়ম জোন্স ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি জর্জ ফরস্টার কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি কালিদাসের ঋতুসংহার অনুবাদ করেন। তাঁর শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে গ্যয়টে এবং হার্ডার অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি কালিদাসের ঋতুসংহার অনুবাদ করার পর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মনুসংহিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। মনুসংহিতার জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে। তুলনামূলক পুরাণতত্ত্বের তিনি অন্যতম জন্মদাতা।

এরপর যাঁর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি হচ্ছেন হেনরী টমাস কোলব্রুক। এঁকে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের প্রথম স্থাপয়িতা বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি কলকাতায় আসেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। A Digest of Hindu Law on Contract and Succession এই শিরোনামায় তিনি চারখণ্ডে স্মৃতিগ্রন্থগুলির অনুবাদ করেন। ভারতীয় আইন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতির উপর তিনি অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক On The Vedas প্রকাশিত হয়। তিনি অমরকোষ, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, হিতোপদেশ, কিরাতার্জুনীয় প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। এ ভিন্ন তিনি একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। তা ছাড়া তিনি

বহু শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন। প্রায় দশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের পাণ্ডুলিপি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলি এখনো ইণ্ডিয়া অফিসে আছে।

এর পর নাম করতে হয় আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের। ১৮০২ থেকে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি ফ্রান্সে বাস করেন। সেই সময় নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলতে থাকায় তিনি ফ্রান্স থেকে যেতে বাধ্য হন। ফ্রান্সে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত জার্মাণ পণ্ডিত ফ্রিডেরিখ শ্লেগেলের পরিচয় হয়। শ্লেগেল তাঁর কাছে সংস্কৃত শেখেন। এটা ১৮০৩-০৪ সালের কথা।

সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের অবদান নেহাত অল্প নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের খানিকটা উল্লেখযোগ্য অংশই ইংরাজ পণ্ডিতগণ কর্তৃক ইউরোপে উদ্ঘাটিত হয়। ১৮০৫ সালে কোলব্রুকই প্রথম বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় ঘটান। উপনিষদ গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে তখনো কোন ধারণা ইউরোপে প্রবেশ করেনি। দারাশিকোহ্ পারসিক ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন একথা আগেই বলা হয়েছে। সেই অনুবাদ আঁক্যুতি দু পেরঁ নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত ওপনেখ্‌ৎ নাম দিয়ে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদের অনুবাদে যথেষ্ট বিকৃতি থাকলেও তা সেলিং, সোপেনহাওয়ার প্রমুখ জার্মান দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। রামমোহন রায়ও কয়েকটি উপনিষদের ইংরাজী তর্জমা করেছিলেন।

॥ ৩ ॥

বিশ্ববিখ্যাত জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উইন্টারনিৎস মন্তব্য করেছিলেন—In the field of Indian philology and in the research of Indian literature the Germans have been the leaders and pioneers. এর মধ্যে অত্যুক্তি কিছুই নেই। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে জার্মানী বরাবরই কৌতুহলী ছিল। রজার, পাওলিনো কেউই জার্মানীতে অপরিচিত ছিলেন না। একথা আগেই বলা হয়েছে যে গ্যয়টে ও হার্ডার জোন্সের অনুবাদ পড়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যে সব গ্রন্থের জার্মান তর্জমা হয়েছিল তার তালিকা আগেই দেওয়া হয়েছে। মোট কথা ইউরোপের মধ্যে যে সকল দেশ সংস্কৃতচর্চায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে তার মধ্যে জার্মানীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

জার্মানীতে সংস্কৃতজ্ঞ হিসাবে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়। বড় ভাই ফ্রিড্‌রিখ শ্লেগেল বিখ্যাত ইংরাজ সংস্কৃতজ্ঞ আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের কাছ থেকে সংস্কৃত শেখেন। ১৮০৮ সালে তাঁর রচিত গ্রন্থ Ueber Die Sprache Und Weisheit Der Indier প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে রামায়ণ, মনুসংহিতা এবং ভগবদগীতার কিছু কিছু অংশ এবং মহাভারতের শকুন্তলা উপাখ্যান অনুদিত হয়। এইগুলি হচ্ছে সংস্কৃত থেকে জার্মানীতে প্রথম সরাসরি অনুবাদ। তাঁর ভাই অগাষ্ট উইলহেল্‌ম্ ভন শ্লেগেল ছিলেন জার্মানীর প্রথম সংস্কৃতের অধ্যাপক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত বন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। তাঁর শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এ, এল, চেজী। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি Indische Bibliothek নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। ঐ বছরেই তিনি গীতার একটি ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮২৯ সালে তাঁর অসমাপ্ত রামায়ণের প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হয়। শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয় শখ করেই সংস্কৃত ভাষাকে নিজেদের গবেষণার বিষয় বস্তু করেছিলেন। গ্যয়টেকে লিখিত একটি পত্রে ফ্রিড্‌রিখ শ্লেগেল জানিয়েছিলেন—In this manner I had to a certain extent exhausted the European literature and turned to Asia in order to seek a new adventure.

এর পর যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন তুলনামূলক ভাষা-তত্ত্বের জনক ফ্রান্‌য বপ। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে। ১৮১২ সালে তিনি প্যারিস যাত্রা করেন এবং উইলহেল্‌ম্ ভন শ্লেগেলের সঙ্গে চেজীর নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ধাতুরূপ তত্ত্বের উপর একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের কিছু কিছু শ্লোকের ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে অনুবাদ করেন। অতঃপর তিনি মহাভারতের নলদময়ন্তী উপাখ্যানের একটি সটীক সংস্করণ এবং তার ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। (Nalus, Carmen Sanskritume Mahabharato—লণ্ডন ১৮১৯)। এ ছাড়া তিনি মহাভারতের বহু উপাখ্যান জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি কয়েকটি সংস্কৃত ব্যাকরণ লেখেন যেগুলি যথাক্রমে ১৮২৭, ১৮৩২ এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত Glossarium Sanscritum সংস্কৃত সাহিত্যের অতি উত্তম সূচীপত্র।

এর পর উইলহেল্‌ম্ ভন হামবোল্‌ড্‌ট এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ছিলেন শ্লেগেলের বিশিষ্ট বন্ধু। গীতার উপর তাঁর আলোচনা বিখ্যাত। সংস্কৃত থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ফ্রিডেরিখ রুকার্ট। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল কাব্য। তাঁর অনুবাদিত কবিতাবলী ভন গ্লাসেনাপ কর্তৃক ১৯২১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই বৈদিক সাহিত্যের উপর বিশেষ আলোকপাত হতে থাকে। ১৮৩৮ সালে লণ্ডন থেকে ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক ফ্রিডেরিখ্ রোজেন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বৈদিক সাহিত্যকে ইউরোপে প্রথম পরিচিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ ইউজিন বার্ণফ্। তাঁর শিষ্য রুড্‌লফ্ রোট ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে Zur Litteratur Und Ge schichte Des Weda গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। বার্ণফের অপর শিষ্য জগদ্বিখ্যাত ম্যাক্সমুলার সায়নের ভাষ্যসহ সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ প্রকাশ করেন। ম্যাক্সমুলার প্রকাশিত

বেদ ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় আলোচনা ১৮৪৯ থেকে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চার জন্য যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত আজ অবধি আদৃত হন তাঁদের মধ্যে ম্যাক্সমুলারের নাম সর্বাগ্রে। থিয়োডর আফ্রেখট ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঋগ্বেদের একটি সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করেন। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বন থেকে প্রকাশিত হয়।

উইলহেল্ম্ ভন শ্লেগেলের শিষ্য খৃষ্টিয়ান লাসেনের Indische Alterthumskunde নামক চারখণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট গ্রন্থ ১৮৪৩ থেকে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সমকালীন সংস্কৃতচর্চার সম্পূর্ণ বিবরণ বর্তমান। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় আলব্রেচ ওয়েবারের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস Akademische Vorbsungen Uber Indische Literaturgeschichte। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে অটো বোটলিংক এবং রুডলফ্ রোট কর্তৃক সাত খণ্ডে পরিকল্পিত পর্বতপ্রমাণ সংস্কৃত-জার্মান অভিধান Sanskrit Worterbuck এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। আরও একজনকার নাম এ প্রসংগে একান্ত উল্লেখযোগ্য। তিনি হচ্ছেন পণ্ডিতপ্রবর গোল্ডস্টুকর। ইনি মূলত ঐতিহাসিক হলেও সংস্কৃত সাহিত্যে এঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসীম। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর তারিখ নির্ণয় ব্যাপারে এঁর দান অতুলনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গোল্ডস্টুকরের মতামতের যথেষ্ট মূল্য ছিল; আর ম্যাক্সমুলার, ল্যাসেন এবং ওয়েবারের উপর রোটের ছিল রীতিমত বিরাগ। (দ্রঃ—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য) গোল্ডস্টুকর সম্বন্ধে সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি উৎকৃষ্ট আলোচনা করেছেন।

॥ ৪ ॥

সংস্কৃতচর্চায় ফরাসীদেশও ঘুমিয়ে ছিলনা। প্যারিস লাইব্রেরীতে প্রায় দুশোর উপর ভারতীয় পুঁথি ছিল। এই পুঁথিগুলির তালিকা ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন প্যারিসে প্রকাশিত করেন। তাঁকে একাজে সাহায্য করেছিলেন ফরাসী পণ্ডিত এল্ লাঙ্গলে। প্রথম ফরাসী পণ্ডিত যিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন তিনি হচ্ছেন এ, এল, চেজী। ইনি কলেজ-দে-ফ্রাঁসের প্রথম সংস্কৃতভাষার অধ্যাপক ছিলেন এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ করেছিলেন। দুজন দিকপাল জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ ভন শ্লেগেল এবং ফ্রান্জ বপ তাঁর ছাত্র।

এরপর যাঁর নাম উল্লেখ করা সবচেয়ে প্রয়োজন তিনি হচ্ছেন ইউজিন বার্ণফ। ইনিও কলেজ-দে-ফ্রাঁসের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। বৈদিক সাহিত্য আবিষ্কার ও প্রচারে তাঁর দান অতুলনীয়। তাঁর শিষ্যগণ প্রত্যেকেই সংস্কৃতচর্চায় দিকপাল বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, যাঁদের মধ্যে রুডলফ রোট এবং ম্যাক্সমুলারের নাম উল্লেখযোগ্য। বার্ণফ শুধু সংস্কৃতজ্ঞই ছিলেন না, পালি ভাষা উদ্ধারে এবং পালি সাহিত্য প্রচারেও তাঁর অবদান যথেষ্ট। তিনি লাসেনের সহায়তায় লেখেন Essal Sur Le Pali। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে। এ ভিন্ন তাঁর Introduction A Lhistoire Du Bouddhisme Indien পুস্তকখানিও বিখ্যাত। ফরাসী পণ্ডিতদের সংস্কৃতচর্চা পরিমাণের দিক থেকে কম হলেও গুণের দিক থেকে কারুর চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়।

এইভাবে বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে একটি ভারতীয় সাহিত্যকোষ রচনার প্রয়োজন ইউরোপে অনুভূত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বোত্তম পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম জর্জ বুলার এই পরিকল্পনা করেন। ফলে Grundriss Der Indo-Arishchen Philolugie And Altertums Kunde (Encyclopaedia of Indo-Aryan Philology and Archaeology) নামক মহাগ্রন্থের সম্পাদনা শুরু হয়। জার্মানী, অষ্ট্রীয়া, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, ভারত ও আমেরিকার তিরিশজন পণ্ডিত এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে সম্পাদক হন বুলার, তারপর কীলহর্ণ এবং তারপর লুডার্স এবং ওয়াকারনাগেল।

॥ ৫ ॥

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে প্রথম নাম করতে হয় ডঃ বুলারের। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হ্যানোভার প্রদেশের বারস্টেল সহরে তাঁর জন্ম। তাঁরা ছিলেন লুথারীয় মতে দীক্ষিত, তাঁর পিতা ছিলেন ধর্মযাজক। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয় গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। অতঃপর তিনি অধ্যাপক বেনফির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিন বৎসর তিনি প্যারিস, লণ্ডন ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তলিখিত বহু পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি উইণ্ডসর কাসেলে রাজকীয় পাঠাগারে একটি কর্ম গ্রহণ করেন। এইখানে ম্যাক্সমুলারের সংগে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং ম্যাক্সমুলারের 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের' নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাইয়ে আসেন এবং এলফিনস্টোন কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশ্মীর ভ্রমণ করেন এবং কল্হন্ বিরচিত কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীর বিভিন্ন অংশ সংগ্রহে ও সম্পাদনে ব্যস্ত থাকেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভিয়েনায় সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনা শুরু করেন। ভারতীয় ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বের উপর তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অশোক লিপির উপর তিনি লেখেন Erklarung Der Asoka-Inschriften, ইন্দো-গ্রীক মুদ্রার উপর লেখেন Kharosthi Inscriptions on indo-Grecian Coins। জৈন ধর্মের উপর তাঁর গ্রন্থ Uber Die indische Secte Der Jainas বিখ্যাত। বইটির ইংরাজী অনুবাদ জে, বার্জেস কর্তৃক The Indian Sect of the Jainas নামে প্রকাশিত হয়। এ ভিন্ন তিনি হিন্দু আইন-বিধির সংক্ষিপ্তসার, ভূমিকাসহ মনু, আপস্তম্ব ইত্যাদির অনুবাদ করেন। ভিয়েনা ওরিয়েণ্টাল জার্ণাল, ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী, ইণ্ডিয়ান

স্টাডিজ প্রভৃতি পত্রিকাগুলির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সুইজারল্যাণ্ডে কনস্টাণ্ট হ্রদে নৌকাডুবিতে আকস্মিকভাবে এই মহাপণ্ডিতের মৃত্যু হয়।

অতঃপর উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন লুডার্স। ইনি একজন প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। জার্মান ভাষায় ইনি কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Philologie, Geschichte and Archaeologie in inden; Die Ausgrabungen Von Mohenjodaro প্রভৃতি। লুডার্স সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মুজতবা আলী মহাশয় একটি মজার বর্ণনা দিয়েছেন যেটা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা গেল না। "কিম্বা দেখতুম (বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে) কাঁচাপাকা চুল, একচোখ কানা সংস্কৃতের অধ্যাপক লুডার্স। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য বেদে। মোন-জো-দরো সভ্যতা আর্য্য, অনার্য্য না প্রাক-আর্য্য—তাই নিয়ে যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতরা খুনখারাপি করার মত অবস্থায় এসে পড়েছেন তখন সবাই বললেন...একথা ঠাহর করার মত এলেম মার্শালের পেটে নেই। সেখানে পাঠাও লুডার্সকে। চতুর্বেদ আর সে সময়কার আহার বিহার, খেতখামার, হাতিয়ার তলোয়ার সর্ববিষয় তাঁর নখদর্পণে। মোন-জো-দরো সভ্যতার গোপনতম কোণেও যদি বৈদিক সভ্যতার কণামাত্র প্রভাব লুকিয়ে থাকে, তবু সে লুডার্সকে ফাঁকি দিতে পারবে না...করাচী বন্দরে নেমেই লুডার্স তার গন্ধ পাবেন, ওই একটি চোখ নিয়েই তাকে খুঁজে নেবেন, আর কাঁক করে ধরে নিয়ে বিশ্বজনকে দেখিয়ে দেবেন—বেদের ইন্দ্রদেব কোন ময়ূরের প্যাখম পরে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে আছেন।"

এর পর সার অরেল স্টাইন। ইনি ছিলেন মূলতঃ প্রত্নতাত্ত্বিক। মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের লুপ্ত কীর্ত্তি উদ্ধারে তাঁর অবদান অসামান্য। কাশ্মীরের ইতিহাসের ইনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। এঁর অসামান্য উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে কল্হন্ বিরচিত রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদ। বৃহদায়তন দুই খণ্ডে ইনি রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থখানি উদ্ধারের কাহিনী, এ বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরীদের অবদান, কল্হনের জীবনী, রাজতরঙ্গিণীর সমালোচনামূলক ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত কাশ্মীরের ইতিহাস, মূল রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদ, ভাষ্য এবং টীকা রচনা করেন। তাঁর অপরাপর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে—Notes on the monetary system of ancient Kashmir, An archaeological tour in Waziristan and Northern Beluchistan, Archaeological reconnaissances in N. W. India and S. E. Iran, An archaeological tour in Gedrosia, The Indo-Iranian borderlands ইত্যাদি।

। ৬ ।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যাঁরা প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই ইংরেজ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ম্যাক্‌ডোনেলের নাম উল্লেখ করা উচিত। সমগ্র বৈদিক সাহিত্য ছিল তাঁর নখদর্পণে। এখনো বৈদিক ভাষা শিখতে গেলে তাঁর রচনার দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন উপায় নেই। তাঁর রচিত Vedic Mythology ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্ট্রাসবুর্গ শহর থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় History of Sanskrit Literature লণ্ডন শহর থেকে। ছাত্রদের বৈদিক সাহিত্য পাঠের উপযোগী করে তিনি Vedic Selection নামে একটি সংকলন সম্পাদন করেন। তাঁর রচিত Vedic Grammar একটি বিখ্যাত পুস্তক। তাঁর ছাত্র শ্রীযুক্ত কীথের সহযোগিতায় তিনি Vedic Index নামে দুই খণ্ডে বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত সমস্ত ব্যক্তি, স্থান এবং বিষয়ের সূচীপত্র প্রস্তুত করেন। বৈদিক সাহিত্যে প্রবেশার্থীদের নিকট এত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক আর দ্বিতীয় নেই।

'গুরু মিলে লাখ তো চেলা মিলে এক' এ কথা সত্য হয়েছে ম্যাকডোনেলের শিষ্য কীথের ক্ষেত্রে। সংস্কৃত ভাষা ও বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে কীথের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ঐতিহাসিক হিসাবেও তাঁর অবদান যথেষ্ট। সিন্ধু সভ্যতার উপর তিনি দুখানি বই লেখেন The Aryans And The Indus Valley Civilization এবং The Ancient Mesopotemia of India। বৈদিক ধর্মের উপর তাঁর পৃথিবীবিখ্যাত বই হচ্ছে Religion and Philosophy of the Vedas and the Upanishads। বইখানি দুই খণ্ডে রচিত; বৈদিক ধর্মের উপর এত বিশদ আলোচনা আর কোন পুস্তকে নেই বললেই চলে। এ ভিন্ন তাঁর History of Sanskrit Literature একটি অনবদ্য গ্রন্থ। তাঁর গুরু ম্যাকডোনেল যেখানে শেষ করেছেন কীথ সেখান থেকে শুরু করেছেন। এ ভিন্ন কীথের Problems of Sanskrit Literature একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। সাংখ্যায়ন আরণ্যক, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদও তিনি করেন।

এর পর আরও একজন জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞের নাম করা যেতে পারে। তিনি হচ্ছেন ওলডেনবার্গ। Sacred Books of the East নামক সংকলনে তিনি সাংখ্যায়ন, আশ্বলায়ন, পারস্কর খাদির, গোভিল, হিরণ্যকেশী এবং আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রগুলির অনুবাদ করেন। এ ভিন্ন তিনি Ancient India নামে প্রাচীন ভারতের একটি ইতিহাস লেখেন। বইটি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে চিকাগো থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস Die Literatur Des Alten Inden ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর Rigveda Forchung প্রকাশিত হয়। এটিরও প্রকাশ স্থল বার্লিন। এ ভিন্ন ঋগ্বেদের ধর্মের উপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Die Religion Des Veda বার্লিন থেকে ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, ওলডেনবার্গ পালি ভাষাতেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত Buddha জগদ্বিখ্যাত।

এর পরে অধ্যাপক ব্লুমফীল্ডের কথায় আসতে হয়। Sacred

Books of the East সংকলনে তিনি অথর্ববেদের উল্লেখযোগ্য অংশ অনুবাদ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্টাসবুর্গ থেকে অথর্ববেদের উপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক থেকে তাঁর রচিত The Religion of the Veda প্রকাশিত হয়। এ ভিন্ন The Vedic Concordance নামে তিনি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় জ্ঞাপক একটি বিশ্বকোষ ধরণের গ্রন্থ রচনা করেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে গ্রিফিথ্ এবং মুইরের নাম বিখ্যাত। গ্রিফিথের ঋগ্বেদের অংশ বিশেষের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। মুইরের Original Sans-Krit Rext বিখ্যাত গ্রন্থ।

অতঃপর পণ্ডিতপ্রবর হিলেব্রাণ্ড্ট্ এর নাম করা প্রয়োজন। তিনি বেদ ও অবেস্তায় রীতিমত দক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত Vedische Mythologie এবং Ritual Litteratur যথাক্রমে স্টাসবুর্গ ও ব্রেসল থেকে ১৮৯১ এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ ভিন্ন তিনি সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রের সম্পাদনা করেন। বৈদিক দর্শন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন পল ডয়সেন। তাঁর রচিত The System of the Vedanta ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চিকাগো থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ সালে তিনি Philosophie Des Veda রচনা করেন। ১৮৯৯ সালে তাঁর রচিত Die Philosophie Der Upanishads লিপজিক থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ইংরাজী অনুবাদ এডিনবরা থেকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে The Plilosophy of the Upanishads নামে এ, এস জেডেন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ডয়সেন সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। একদা একজন ইংরাজ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত জার্মানীতে ডয়সেনের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। প্রথম দর্শনেই ডয়সেন তাঁর সঙ্গে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে আলাপ শুরু করলেন। আমাদের ভদ্রলোকটি আমতা আমতা করে বললেন —দেখুন, সংস্কৃতে আমি কথা বলতে পারিনা; বোঝেন তো, সংস্কৃত একটা মৃত ভাষা। ডয়সেন মৃদু হেসে বললেন—কিন্তু ওরই কাছে আমরা আলোর খোঁজে ঘোরাঘুরি করছি।

সংস্কৃতজ্ঞ ঐতিহাসিক হিসাবে অধ্যাপক র‍্যাপসনের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের উপরও তাঁর অসামান্য দখল ছিল। বিখ্যাত কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রী অফ ইণ্ডিয়ার প্রথম খণ্ডের সম্পাদনার ভার তাঁরই উপর ন্যস্ত ছিল।

॥ ৭ ॥

বৈদিক সাহিত্য নিয়ে এত বেশী পণ্ডিত আলোচনা করেছেন যে প্রত্যেককার বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত ই, ভি আর্ণল্ড্ Vedic Metre নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থটি কেম্ব্রিজ থেকে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত এ ফুরুর্ এর রচিত Der Sprachgebrauch Der Alteren Upanishads স্বনামধন্য বুলার শিক্ষাস্থল গটিন্জেন থেকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ওয়াল্টার ওয়াস্টের Stilgeschtchte Und Chronologie Des Rigveda ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে লিপজিক থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বার্থের The Religions of India লণ্ডন থেকে এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বেরুগেইন্যে বিরচিত La Religion Vedique প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মনিয়ের উইলিয়ম্‌সের Religious Thought and Life in India লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। মনিয়ের উইলিয়মস্ সংস্কৃত শিখেছিলেন অক্সফোর্ডের অধ্যাপক এবং ভারতের প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার কা[ছ] থেকে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জে জলির Rechte Und Sitt[e] স্টাসবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয়। বইটির ইংরাজী অনুবাদ করেন ড: বটকৃষ্ণ ঘোষ Hindu Law and Custom নাম দিয়ে। ঐ একই বছরে সেনার্তের বিখ্যাত গ্রন্থ Les Castes Dans L'jnde প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়।

মূল বৈদিক গ্রন্থ যাঁরা সম্পাদনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সম্পাদক অফ্রেক্ট, আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রের সম্পাদক গার্বে, আর্ষেয় ব্রাহ্মণের সম্পাদক বার্ণেল, অথর্ববেদের রোট্ এবং হুইট্নি, বোধায়ন ধর্ম শাস্ত্রের হাল্চ্, বোধায়ন শ্রৌতসূত্রের কালাণ্ড, কাঠক সংহিতার শ্রডার, কৌশিতকী ব্রাহ্মণের কওয়েল্, সামবেদের বেণফি, বহু ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সম্পাদক বার্ণেল এবং বহু ধর্মশাস্ত্রের সম্পাদক ফুরারের নাম উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর আমাদের অতিপ্রিয় উইণ্টারনিৎসের কথা। শ্রীযুক্ত উইণ্টারনিৎস বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হয়ে এদেশে আসেন। তাঁর তিনখণ্ডে রচিত History of Indian Literature অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বইটি প্রকাশিত হয় এবং বইটিকে জার্মান থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন শ্রীমতী কেটকার, যিনি জন্মে জার্মান, শিক্ষায় ইংরেজ এবং পরিণয়সূত্রে ভারতীয়। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থটির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। পুনায় যখন শ্রীউইণ্টারনিৎস বেড়াতে গিয়েছিলেন: সেখানে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত এস, ভি, কেটকারের গৃহে তিনি তাঁর গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ দেখতে পান। শ্রীমতী কেটকার তাঁর স্বামীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যই গ্রন্থটি অনুবাদ করেছিলেন। ওই অনুবাদটিকেই সংশোধন করেই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। উইণ্টারনিৎস গ্রন্থখানি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। এ প্রসংগে আরও একজন সংস্কৃতজ্ঞের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু, ভারতবাসীর একান্ত আপন সিলভাঁ লেভী।

মহাকাব্য ও পুরাণ নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের অনেকেরই পরিচয় আগে দেওয়া হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত পণ্ডিতগণ ভিন্ন যাঁরা মহাকাব্য নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে সোরেনসেন, গ্রীয়ারসন, হোলজম্যান, লেভী, জ্যাকোবি, এলিয়ট, হপকিন্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ওলডেন্‌বার্গের Das Mahabharata একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। জ্যাকোবির নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। ঋগ্বেদ রচনার কালনির্ণয়ের উপর তাঁর মতামত বহু বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। মহাকাব্যের উপর হপকিন্সের অবদান অসামান্য। তাঁর Great Epic of India এবং Epic Mythology বিখ্যাত গ্রন্থ। এ ভিন্ন হপকিন্স এর Religions of India বইটিও জনপ্রিয়। পুরাণ-গবেষণার একচ্ছত্র সম্রাট হচ্ছেন এফ, ই, পার্জিটার। তাঁর Dynasties of Kali Age ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এবং Ancient Indian Historical Tradition ১৯২২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

ইউরোপে সংস্কৃত চর্চার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া একটি প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। বর্তমান প্রবন্ধে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতেও হয়ত অনেকেই বাদ পড়ে গেছেন। তাই কেউ কিছু বলার আগেই নিজেই সলজ্জে স্বীকার করে নিচ্ছি যে ইউরোপে সংস্কৃত চর্চার অতি সামান্য অংশই এখানে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি মাত্র।

তমসা

দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়

অনুপম রূপ ছিল অনুপমার।

তাই যখন কোনোদিন অলস মধ্যাহ্নে গ্রামের মেঠো পথ ধ'রে পাড়া বেড়াতে যেত ও, তখন চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডার মুখরতাটুকু নিমিষের জন্য মূক হ'য়ে যেত। সকলেরই চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠত উদ্দীপ্ত।

এই অপরূপ অনুপমার অন্তরের নিভৃত কোণে সংগোপনে লুকানো ছিল একটা রিক্ততার বিলাপী সুর। একান্তে ব'সে যখন ও নিজের মনের সাথে চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মিলাত, তখন ওর মনের মাঝে চাপা-দেওয়া সেই করুণ সুরটুকুই সোহাগ পেয়ে উছলে উঠত সবেগে। তখন নিরালায় ব'সে চোখের দু'টি কোণ থেকে সংগোপনে দু'টি অশ্রু-বিন্দু মুছে ফেলত অনুপমা।

মাঝে-মাঝে শয্যায় এসে হয়ত কোনোদিন মনে হত, যদি ওদের দু'জনার শোয়ার মাঝে থাকত একটা ছোট্ট কোমল শিশুর একটা ছোট্ট শয্যা, তাহলে যেন খুব—খুব ভাল হত।

কিন্তু এই ঢাকা-দেওয়া তুষের আগুনকে খুঁচিয়ে আরো বেশি জ্বলন্ত ক'রে তোলার লোকের অভাব ছিল না রূপারুণপুরে। তাই একদিন শলাকার মত একটা কথা ছিটকে এসে কানে ঢুকতে ভুলল না অনুপমার। পরশ্রীকাতরা বৌদের দল আড়ালে-আবডালে রঙ্গ করে নিজেদের মধ্যে: 'যার কোলে ছেলে নেই তার আবার রূপের দেমাগ কেন?'

আবার এ-কথাটাও হাওয়ায় ভেসে কানে প'শেছিল আরেকদিন:

'যার কোল খালি, তার রূপকে গালি।'

ওদের রঙ্গ-রসে ভেজানো নোনতা কথাগুলো তীব্র জ্বালা ধরাল ওর গোপন ক্ষতে। তাই যেটুকু হাসিও অম্লান ছিল অনুপমার মুখশ্রীতে—সেটুকুও নিভে গেল একদিন।

কাজ-শেষে রাত্রির শয্যায় ও যখন এসে আশ্রয় নেয়, তখন অনুপমার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যটুকু বিস্মিত ক'রে তোলে দেবেনকে। এর কারণ জিগ্যেস ক'রে-ক'রে হয়রাণ হ'য়ে গেছে দেবেন। কোনো জবাবই দেয়নি অনুপমা।

লক্ষ্মণের মত দেবর শোভন ও অবাক হ'য়ে যায় ওর বৌদির এই পরিবর্তন দেখে; যে স্নেহময়ী বৌদি মুখর-ছন্দে ভরপুর ছিল একদিন, সেই বৌদি আজ-কাল হঠাৎ বাণী-হারা হলেন কেমন ক'রে!

একদিন হঠাৎ আঙিনায় দাঁড়িয়ে একটা খুঁটি ধ'রে থর-থর ক'রে বৌদিকে কাঁপতে দেখতে পেল শোভন। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ব্যাকুল স্বরে জিগ্যেস করল: কী হল বৌদি?

মুখে রা' নেই অনুপমার। তখনো কাঁপ লেগেই আছে। যেন বাতাস ধরেছে বাঁশের পাতায়। সঙ্গে-সঙ্গে ওকে ধ'রে নিয়ে যেয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল শোভন। তাড়াতাড়ি ডাকল দাদাকে। দাদা আবার ডাকলেন কবিরাজকে! কবিরাজ পরীক্ষা ক'রে বললেন: এখন তো বোঝা যাচ্ছে না কিছু; আরো দিনকয়েক দেখ; এমনি হলেই আমায় খবর দিও।

দিনকয়েক আর দেখতে হল না। সেদিন রাতে আস্তে-আস্তে ঘরে এসে ঢুকতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল অনুপমা। গ্রামের ও-প্রান্ত থেকে যেন ভেসে আসছে কোন শিশুর কান্না। তেমনি আবার কাঁপুনি সুরু হল

ওর। ভাসা-ভাসা হ'য়ে উঠল চোখ দুটো। নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘন-ঘন! বিছানা ছেড়ে ত্বরিতে উঠে এল দেবেন। ওকে ধ'রে আকুল হ'য়ে উঠল: বৌ, বৌ, অনু—কী হল তোমার?

উত্তর নেই মুখে। ঝিম্ ধরেছে যেন ওর সারাদেহে। আস্তে-আস্তে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিতেই চোখ কপালে তুলে গোঁ-গোঁ করতে লাগল অনুপমা। মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগল বুদ্বুদ কেটে! মুখের ভেতর হাত দিয়ে দেখল দেবেন, দাঁতে দাঁতে চাপা। দাঁত লেগে গেছে একেবারে। সঙ্গে-সঙ্গে আকুল কণ্ঠে চীৎকার ক'রে শোভনকে ডাক দিল দেবেন। কবিরাজকে ডেকে আনতে ব'লে মাথায় জল ঢেলে হাওয়া করতে লাগল তাড়াতাড়ি।

কবিরাজ এসে পরীক্ষা করলেন। তখন দাঁত আর হাতের মুঠো ছেড়ে গেছে অনুপমার। পরীক্ষা ক'রে গভীর শ্বাস ফেলে আস্তে-আস্তে উঠলেন কবিরাজ। পেছনে পেছনে এল দেবেন। আমতা-আমতা ক'রে উঠল: রোগটা কী……?

: হ্যাঁ, বাবা রোগটা মৃগী, এ-রোগের ওষুধ নেই কোনো…তবে সন্তান লাভের পর অনেকেরই এ-রোগ ভাল হ'য়ে যায়!

সেদিন থেকে ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাসে ভ'রে উঠতে লাগল ঘরটা। শান্তি-হিম-ঝরা বাতাসের মরমে-মরমে মিশে গেল দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত অণু।

অনুপমার ম্লান মুখের পানে চেয়ে চোখ ফেটে জল বেরোতে চায় শোভনের। কী রূপ দেখেছিল বৌদির, আর আজ এই ক'দিনে কী হল!

: হঠাৎ তোমার এমন কেন হল বৌদি?

ম্লান মুখে মধুর হাসি আনতে চেষ্টা করে অনুপমা। জবাব দেয়: কী জানি ঠাকুরপো, আমি কী ক'রে বলব?

কিন্তু ওই কথাগুলোতে যে দুঃখ নির্ঝর ঝরে সেটা শোভনের কান এড়িয়ে যায় না।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রামের শিব মন্দিরে এবার থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে আসতে লাগল অনুপমা। এই দীপ জ্বেলে অন্তরের বাসনাটাকে হয়ত দেবতার কাছে উজ্জ্বল ক'রে দেখাতে চায়। দেবেন বুঝেছে সব, কিন্তু করার নেই কিছুই। সেদিন রাত্রে অনুপমা বলল: চল না গো—নারাণপুরের ঠাকুরের কাছে একদিন পূজো দিয়ে আসি।

দেবেন বলল: বেশ ভাল কথা। শোভনের সাথে কালকেই গরুগাড়ী ক'রে চ'লে যাও!

সকালেই গরুগাড়ী প্রস্তুত হ'য়ে গেল। অনুপমা স্নান সেরে শুভ্র-শুচি বসন প'রে উঠল গাড়ীতে। সঙ্গে চলল শোভন। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে ওরা যখন মন্দিরে এসে পৌছাল, তখন অণু-অণু তপ্তকিরণ ছড়াচ্ছে প্রায়াহ্নের প্রখর সূর্য। বিটপী তলে গাড়ী থামালে নামল অনুপমা।

ওকে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে গেল শোভন। মন্দিরের ভেতরের ধূমায়িত ধূপাধার তখনো ছড়াচ্ছে ধূপের অগুরু সুরভি। গলায় আঁচল দিয়ে শ্বেত মর্মরের শিবলিঙ্গকে প্রণাম জানাল অনুপমা। আঁখিকোণ থেকে অশ্রু অর্ঘ্য দিয়ে জানাল মনের কথা। বৌদির এই ব্যথা-ভরা অর্চনা আপ্লুত ক'রে তুলল শোভনের সুকুমার অন্তরখানি।

সকালের পূজো সেরে পূজারী চলে গেছে গ্রামে। আসবে আবার সেই সন্ধ্যেয়।

মন্দিরের ও-পাশে ব'হে চলেছে ছোট্ট একটা নদী। বাঁধানো অবতরণিকা রয়েছে ও-পাশ থেকে। শুকনো কত অশোক-মঞ্জরী ঝরে পড়েছে সেই অবতরণিকার ওপরে। ধীরে ধীরে অবতরণিকা বেয়ে নামতে লাগল অনুপমা। পেছনে পেছনে শোভন। নদীর স্বচ্ছ-তুহিন জল আঁজলা ভ'রে কানে-মুখে দিয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে নিল অনুপমা।

সন্ধ্যা নামল ধীরে ধীরে। কনক-কুঙ্কুম রঙ ছড়িয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বিদায় নিল শেষ বিকেলের সূর্য। পূজারী এলেন গ্রাম থেকে। মন উজাড় ক'রে পূজো দিল অনুপমা। পুরোহিত বললেন: দীপ জাগাও মা; আজ সারা রাত দেবের কাছে দীপ জাগাও; তিনি তোমার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

তাই হল। গ্রাম থেকে তক্ষুণি শোভন নিয়ে এল ঘি আর তুলো। সারারাত উপবাস ক'রে ঘি ঢেলে-ঢেলে দেবের কাছে দীপ জ্বালাল অনুপমা। মন্দির-দ্বারে ঠাঃ

জেগে বসে রইল শোভন। * * * নবারুণের রক্তিম আভাস দেখা দিল পূবের সীমায়। শুচি স্নাত হ'য়ে পুরোহিত এলেন মন্দিরে। সস্মিত মুখে বললেন : যাও মা, এবার স্নান সেরে এসে চরণামৃত পান ক'রে কিছু মুখে দাও; সারারাত জেগে ব'সে।

ভক্তির একটা পবিত্র আমেজ নিয়ে অনুপমা গেল স্নান করতে। স্নান সেরে এসে আবার পূজো দিয়ে প্রসাদ খেয়ে পারণ করল অনুপমা।

এরপর কয়েকদিন একটু সাবলীলতা এল অনুপমার মাঝে। দেবেনকে একদিন বলল : শোভনের বিয়ে দাও, আমার আর ভাল লাগে না। শোভনকেও বলল : এবারে বিয়ে কর ঠাকুরপো।

ওর মনের শান্তির জন্য সম্মত হল শোভন। দিকে দিকে ঘটক গেল; পাত্রীর খোঁজও আনল অগুণতি। শেষে হলুদপুরে সব ঠিক হল।

সাহানা রাগিণীর সুর তুলল শানাই। বিয়ে ক'রে হাসি মুখে ফিরল শোভন। নতুন বৌকে বরণ করল অনুপমা।

এরপর ওই আনন্দের আমেজে বেশ ক'টা দিন কেটে গেল। কিন্তু আবার অনুপমার রোগ দেখা দিল একদিন। ওর হাত থেকে প্রায় সব কাজগুলোই নিজের হাতে তুলে নিল নতুন বৌ বিজয়া। আশে পাশের সব নামকরা কবিরাজ দিয়ে চিকিৎসা করাল দেবেন। সাতরাজ্যির কবজ আর মাদুলী ঝুলল অনুপমার কণ্ঠে আর বাহুতে!

কিন্তু হঠাৎ বুঝি ভগবানের কানে পশল অনুপমার এই ব্যথাভরা সুর। ও-পাড়ার সর্বজনীন পিসীমা একদিন এসে চিবুক নেড়ে ফিসফিস ক'রে বলল :ক'মাস হল ?

লাজে রক্ত-রাঙা হ'য়ে উঠল অনুপমা। তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে যেতে বলল : কী জানি, জানি না।

: তাই কী হয়, ছেলে তোর পেটে আর তুই খবর জানিস্ না ?

শরম-রাঙানো মুখখানা আবার অলক্তরাগে রাঙিয়ে ছোট্ট করে বলল অনুপমা : পাঁচ মাস।

অন্তঃসত্বা অনুপমা! এ যেন এক নতুন সুর জাগল সকলের মনের পরতে-পরতে।

সাধ-অন্ন খাওয়ানো হল ধুমধাম ক'রে। আবার ফিরে এল অনুপমার মুখে সেই হারিয়ে যাওয়া মাধুরিমা। ললাটে জাগল ডাগর সিন্দুর বিন্দু। দীঘল আঁখির পলকে আবার দেখা দিল বিজলী রেখা।

বহুদিন পরে রূপারুণপুরের বার বাড়িতে আবার যেদিন জাগল নবাগত শিশুর তমসা-মুক্তির ক্রন্দন, সেদিন অসুস্থ হ'য়েও বার-বার ওই কান্নার সুরটাকে বুভুক্ষুর মত দু'কানে গ্রহণ করতে লাগল অনুপমা। যেন স্বাতী নক্ষত্রের বারি পড়ল সমুদ্রের শুক্তির মুখে।

কিন্তু এই পাওয়ার মৌতাতে বেশি দিন অনুপমাকে মেতে থাকতে দিল না ভাঙা-গড়ার মালিক। প্রথম থেকেই রুগ্ন ছিল ছেলেটা। ছ'মাস পরে একদিন আরো বেশি জ্বালা দিয়ে অনুপমার স্নেহ-কোল থেকে বিদায় নিল অনুপমার আঁখির মণি।

নিষ্ঠুর ভগবানের এই মমত্বহীন আঘাতে একেবারে ভেঙে পড়ল অনুপমা।

শোভন একদিন বলল দেবেনকে : বৌদিকে নিয়ে তুমি দিনকয়েক পুরী-টুরী ঘুরে এস দাদা; তীর্থ দর্শন হলে অনেকটা শান্তি পাবে মনে।

এ-কথাটা মনে ধরল দেবেনের। দিন কয়েকের মধ্যে প্রস্তুত হ'য়ে অনুপমাকে নিয়ে গেল পুরী। কিন্তু ওখান থেকে ফিরে এসে সেই যে শয্যা নিল দেবেন, আর সেই রোগ-শয্যা ছেড়ে উঠল না।

এরপর কেটে গেছে অনেকগুলো মাস। কংকালসার অনুপমা সংসারের সব কিছু পরশ থেকে আল্‌গা রেখেছে নিজেকে। জৈবিক ধর্মগুলো পালন করা ছাড়া সব সময় নিঝুম হ'য়ে পড়ে থাকে নিজের ঘরে।

হঠাৎ একদিন ঘটল আবার এক মরমিয়া ঘটনা।

গভীর মৌন রাতের বুকে ঘুমুচ্ছিল সারাটা গ্রাম। সাতরাজ্যির ঘুম এসে জুটেছিল অনুপমার ম্লান আঁখির পাতে। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। দূরে, গ্রামের শেষপ্রান্ত থেকে যেন রাত্রির হিমেল হাওয়ায় ভেসে আসছে ওর ক্ষয়ে যাওয়া খোকার আকুল ক্রন্দন। ঘুমন্ত অনুপমার বুকের ভেতরটা আকুলি-বিকুলি করে উঠল যেন। আস্তে আস্তে ঘরের দোর খুলে এসে দাঁড়াল আঙিনায়; তারপর বাইরের দোর খুলে একেবারে যেয়ে নামল পথে। ওর চেতন-মনে কোনো সাড়া নেই।

বাইরের হিম-বাতাসও চেতনা জাগাতে পারল না ওর মনে। কান্নার সুর অনুসরণ ক'রেই চলতে লাগল ও। গ্রামের শেষে ডাইনী মাঠে এসে পৌছাতেই কান্নার সুরটা যেন ফিরে গেল উল্টো দিকে। কোনো হুঁস নেই ওর। ওই কান্নার সুরটাকে অনুসরণ ক'রেই হেঁটে চলেছে ও। শেষে আবার এসে হাজির হল ঘরের দোরে। কান্নার সুরটাও বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। এবারে চেতনা হল অনুপমার। এই এত রাতে হঠাৎ নিজেকে খোলা দোরের সামনে আবিষ্কার ক'রে ভীষণ অবাক হ'য়ে গেল অনুপমা। ভয়ে কেঁপে উঠল থর-থর ক'রে। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে নিজের ঘরে এসে হাঁপাতে লাগল ও। সারারাত আর ঘুম নামল না ওর ভয়-ভাবনা জাগা দু'টি চোখে। পরদিন প্রাতে নিজের পায়ের দিকে নজর পড়তে আরো বিস্ময়ে ছেয়ে গেল ওর মন। শুভ্র দুটি পেলব পায়ে রাত্রের মধ্যে কাদার প্রলেপ লাগল কী ক'রে ?

কয়েকদিন পর আবার গভীর রাতে ঘটল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এরপর প্রায় রাত্রে অনুপমা নিজেকে আবিষ্কার করে সদর দরজার গোড়ায়। তক্ষুণি অজানা এক ভয়-শিহরণ শির-শির ক'রে কাঁপিয়ে দেয় ওর সর্বাঙ্গ। ত্বরিতে দোর বন্ধ ক'রে ছুটে চলে আসে নিজের ঘরে। বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেনা এই ঘটনাটিকে। শোভনকে বলব বলব ক'রে বলেই উঠতে পারেনি এ-কথা।

* * *

সেদিন দুপুরবেলায় বিজয়ার কাছে এল সেই সর্বজনীন পিসী। কানের কাছে ফিস ফিস ক'রে বলল: গ্রামে কী কথা উঠছে ছোটবৌ !

: কী কথা গো ?

: অনুবৌকে অনেকেই নাকি মাঝ রাতে ডাইনী মাঠের পানে যেতে দেখেছে !

শিউরে চমকে উঠল বিজয়া: সে কী গো ?

: হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, মাঝরাতে ধুম-ধুম ক'রে হাতে ঝাঁটা নিয়ে ও যায় ডাইনী মাঠে !

শুধু সেদিন সর্বজনীন পিসীই কেন, গ্রামের সবাই এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে জানাল এক-ই কথা। শেষ পর্যন্ত কথাটাকে আরো বিকৃত ক'রে তুলতেও ভুলল না তারা। একদিন তো দুপুরের আড্ডায় এই রোমাঞ্চকর প্রসঙ্গে ও পাড়ার প্রৌঢ়া বধূ ব'লেই ফেলল: নিশ্চয়-ই অনু ডাইনী বিদ্যা শিখেছে।

তার প্রমাণও দেখাল অনেকেই: যারা ডাইনী হবে তারা আগে খাবে ছেলে, পরে খাবে স্বামী !

অনু নাকি খেয়েছেও তাই! আবার কেউ কেউ জমাট ক'রে তুলল কথাটাকে: দেখলেই তো বিয়ে হবার একবছর পরেই শাশুড়ী গেল !

সবাই মিলে ভয়ের বীজ ছড়িয়ে দিল বিজয়ার মনে। অনুপমার সামনে বেরোতে ভয় পায় ও। কী জানি পেটের ছেলেটাকে যদি নষ্ট ক'রে দেয় ওর ডাইনী নজর দিয়ে !

একদিন একটু দ্বিধা ক'রে সব কথা খুলে বলল শোভনের কাছে। শুনে শোভন রেগে উঠল: যতো সব আজে-বাজে কথা—তোমার থেকে গ্রামের লোকের থেকে বৌদিকে আমি ভাল ক'রে চিনি।

ক্ষীণ প্রতিবাদ ক'রে উঠল বিজয়া: কিন্তু রাতে কোথায় যায় বৌদি ?

: কেন, রাতে বাইরে যাওয়ার দরকার থাকতে পারে না বুঝি ? যতো সব তোমাদের ইয়ে……

ওর ধমকানি খেয়ে দিনকয়েক চুপ ক'রে রইল বিজয়া। কিন্তু তবু ভয় ভাঙল না অনুপমার সামনে বেরোতে।

গ্রামের লোকের কাছেও একদিন ওই কথা শুনতে পেল শোভন। কিন্তু ওর অনুপম বৌদি অনুপমাকে ডাইনী ব'লে মনে ধরাতে পারল না ও। বিজয়াও কাঁদা কাটা করতে লাগল বাপের বাড়ি চলে যাবার জন্য। ওর আবার সাধঅন্ন রয়েছে।

দৃঢ় মনটা মাঝে-মাঝে চঞ্চল হ'য়ে উঠতে লাগল শোভনের। সেদিন রাত্রে সত্যি-সত্যি জেগে বসে রইল ও।

ঠিক সেই নির্দিষ্ট সময়ে ঘরের দোর খুলে বেরোল অনুপমা। ক্ষণেক পরে ওকে অনুসরণ করবার জন্য নিজের দোর খুলে বেরোল শোভন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বিজয়ার। শয্যা শূন্য। একাকিনী ও ছাড়া শোভন নেই। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বিষাক্ত সন্দেহ ওর মনকে দোদুল ক'রে তুলল। ত্বরিতে বেরিয়ে এল ও বাইরে। ওকে দেখতে পেয়ে ফিস ফিস করে উঠল শোভন: চুপ।

কাছে এগিয়ে এল বিজয়া। মৃদুস্বরে শোভন বলল : তুমি ভেতরে যাও, আমি একটু বৌদির পিছু-পিছু যেয়ে দেখে আসি।

সভয়ে ওর হাতটা চেপে ধরল বিজয়া। ভীতাকুল গলায় বলল : না, না, ওঁর পিছু-পিছু যেও না ; ওদের পিছু-দৃষ্টি যে বড় ভয়ঙ্কর হয় গো—তে-রাত্তির পেরোতে হবে না তাহলে !

রাগে ঝট ক'রে হাতটা ছাড়িয়ে নিল শোভন : যাও, ভেতরে যাও। বিজয়া তবু অনড়। স্বামীকে নিবৃত্ত করা যাবে না দেখে সদৃঢ় কণ্ঠে বলল : যেও না, নইলে চীৎকার করে লোক জড় করব এক্ষুনি।

বাধ্য হ'য়ে ফিরে আসতে হল শোভনকে। কিন্তু রাগে রি রি করতে লাগল সর্বশরীর।

* * *

পরদিন বিজয়াকে বাপের বাড়ি রেখে দিয়ে এল শোভন। ফিরে আসার সময় আমতা-আমতা ক'রে শোভনকে বলল বিজয়া : ও-বাড়িতে তোমাকে একা ফিরে যেতে দিতে মন সরছে না গো।

ও-কথার কোনো আমল না দিয়ে রূপারূপপুরে ফিরে এল শোভন।

কিছুদিন পরেই পেল ছেলে হওয়ার সংবাদ। অনুপমা সাধ ক'রে বলল : চল ঠাকুরপো, বিজয়ার ছেলেকে দেখে আসি।

একটু আমতা-আমতা করল শোভন : অতদূর কেন মিছিমিছি কষ্ট ক'রে যাবে বৌদি, আর মাসটেক পরেই তো নিয়ে আসব।

মাসটেক পরে ও যখন আনতে গেল, তখন ওর শাশুড়ী একটু দ্বিধা করল : মেয়েকে পাঠাতে সাহস হ'চ্ছে না বাবা ; সঙ্গে কচি ছেলে—ঘরে যা তোমার......!

কথাটা তপ্ত শলাকার মত সর্বাঙ্গে বিঁধল শোভনের। রাগে তাপিত হ'য়ে বলল : আপনার মেয়েকে কোনোদিনই পাঠাতে হবে না—আমি চল্লাম।

পর মুহূর্ত্তে বিজয়ার শতকাকুতি পায়ে দলে হলুদপুর ত্যাগ করল শোভন।

আরো একমাস পরে একদিন বিজয়ার বাবা এসে দিয়ে গেলেন বিজয়াকে। অনুপমা ছুটে এল ছেলে দেখতে। আঁচলের আড়ালে শিশুর বুকে 'রাম রাম' ব'লে থুথু ছিটিয়ে দোদুল বুকে ছেলে দেখাল বিজয়া। মনটা কিন্তু সঙ্কুচিত হ'য়ে রইল ভয়ে। সেদিন থেকেই ছেলেটাকে অনুপমার নজর থেকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রাণান্ত হ'য়ে উঠল ও। কিন্তু যেদিন থেকে ছেলে নিয়ে ফিরে এসেছে বিজয়া, সেদিন থেকে আর গভীর রাতে অনুপমাকে বাইরে যেতে দেখেনি ও। এই ব্যতিক্রম অনেকখানি আশ্চর্যান্বিত ক'রে তুলেছে বিজয়াকে!

সেদিন গুমোট-রাত্রে ঘুম নামেনি বিজয়ার চোখে। ছটফট করতে করতে যখন ঘুম এল তখন মাঝ রাত। হঠাৎ কেঁদে উঠল ছেলেটা। একঘেঁয়ে ভাবে কেঁদেই চলতে লাগল তবু ঘুম ভাঙ্গল না বিজয়ার বা শোভনের। ওঘর থেকে উঠে এল অনুপমা। ছেলেটাকে সযত্নে বুকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় পায়চারি ক'রে ঘুম পাড়াতে লাগল ছেলেটাকে। হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে সুপ্তোত্থিতা বিজয়া চীৎকার করে উঠল আকুল স্বরে : খোকা—আমার খোকা কৈ···!

ধড়মড় ক'রে উঠে বসল শোভন। বাইরে থেকে ছুটে এল অনুপমা : এই যে, এই যে ছোটবৌ, খোকা আমার কোলে ; ঘুম ভেঙ্গে কাঁদছিল যে—!

: খোকা—খোকা তোমার কোলে !! আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল বিজয়া।

উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল ছেলেটাকে। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল থর-থর ক'রে!

হতভম্ব অনুপমারও কাঁপ লেগে গেছে সারা দেহে। কম্পিত দেহেই আস্তে আস্তে ফিরে এল নিজের ঘরে।

এ ঘটনার পর কেটে গেছে অনেকগুলো দিন। আরো ক্ষীণ হয়ে গেছে অনুপমা। আজো পর্যন্ত ভাল ভাবে বুঝে উঠতে পারেনি সেদিনের বিজয়ার সেই আতঙ্ক পাওয়ার রহস্য। শুধু এটুকু মনে মনে বুঝেছে—ও অপয়া, তাই হয়ত ওর কোলে ছেলে দিতে চায় না বিজয়া। আর কোনো কিছু অমঙ্গল ঘটবার ভয়ে বিজয়ার ছেলেকে কোলে নিতেও মন সরে না অনুপমার।

একদিন রাণী-সায়রে স্নান সেরে সিক্ত বসনে ফিরছিল অনুপমা। হঠাৎ ওকে দেখে ঘোষদের আঙিনায় খেলারত ছেলেটাকে বুকে তুলে ছুটে ঘরে ঢুকল ঘোষবৌ। অবাক্

হ'য়ে গেল অনুপমা। মনে প'ড়ে গেল, সেদিন ওকে দেখতে পেয়ে 'ডাইনীবুড়ি' ব'লে ছুটে ঘরে ঢুকেছিল একটা ছোট্ট ছেলে। আজ খানিকটা স্পষ্ট হ'য়ে এল বিজয়ার সেই আতঙ্কিত হওয়ার রহস্য।

বিজয়ার ছেলেটার জ্বর হয়েছে ক'দিন ধ'রে। অনুপমাকে জানায়নি এ-কথা। সেদিন সন্ধ্যেয় গা ধুয়ে ফিরছিল অনুপমা, হঠাৎ চোখ পড়ল বিজয়ার ঘরের পানে। শয্যার'পর একাকী ছেলেটা ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে কাঁপছে থর-থর ক'রে! ঘরে নেই কেউ। ছুটে এসে ছেলেটাকে বুকে তুলে ধরল অনুপমা। আকুল স্বরে ডেকে উঠল: ছোট বৌ—ছোট বৌ—খোকা কেমন করছে!

ঝড়ের মত ছুটে এল বিজয়া আর শোভন। ওর কোল থেকে খোকাকে ছিনিয়ে নিয়ে ভয়ে কেঁদে উঠল বিজয়া: তুমি আমার এ-কী করলে গো…এ-কী করলে!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে ছিল শোভন। হঠাৎ তারও যেন কী হল। পাগলের মত ব'লে উঠল: বৌদি—বৌদি তুমি আমার খোকাকে ফিরিয়ে দাও বৌদি!

ভীষণ ভাবে চমকে ওর পানে তাকাল অনুপমা। কী বলবে ও? কী জবাব দেবে শোভনের এই প্রলাপের?

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়েই ঝপ ক'রে বসে পড়ল ছেলেটার সমুখে। ঘটির জল মুখে-চোখে ছিটা দিয়ে এক নতুন দৃঢ় স্বরে বলল: ঠাকুর পো, শিগ্‌গিরী কবিরাজ মশাইকে ডেকে নিয়ে এস; আর ছোটবৌ তাড়াতাড়ি বাতাস কর ছেলের মাথায়!

কবিরাজ আসার সঙ্গে সঙ্গে এ-ঘর ছেড়ে চলে গেল অনুপমা। কবিরাজ ছেলে দেখে বললেন: ভয় নেই কিছু মা—তড়কা হয়েছিল, ছেলেদের এ-রোগ হয়।

শিলা-ভার নেমে গেল শোভনের বুক থেকে। কিন্তু বিবেকের দংশনে ছটফট করতে লাগল ও। ওর মাতৃতুল্য বৌদিকে কী বলেছে তখন!

* * *

কাক-আঁধারির অস্বচ্ছ আবরণ কেটে যায়নি তখনো। প্রভাতী কাকলী সুরু হয়েছে সবে। এমন সময় চৌকিদার এসে দাঁড়াল শোভনের ঘরে। ডাক দিল: ছোট রায়বাবু—রায়বাবু!

নিদ্রাবশ হাতে দোর খুলে বাইরে বেরোল শোভন।

: শিগ্‌গিরী আমার সাথে আসুন—বিপদ ঘটেছে!!

: কী—কী হয়েছে রে? অজানা ভয়ে আঁৎকে উঠল শোভন।

: আমার সাথে আসুন শিগ্‌গিরী!

চৌকিদারের পেছনে রাণী সায়রে ছুটে এল শোভন। এই এত ভোরেও লোক জমেছে জন কয়েক। ওকে ছুটে আসতে দেখে একটু সরে দাঁড়াল ওরা। পাড়ের ওপর সিক্ত বসনে ঢাকা পড়ে রয়েছে অনুপমার তিল তিল ক'রে ক্ষয়ে যাওয়া দেহটা। এ দৃশ্য দেখে ক্ষণেকের জন্য বোবা হ'য়ে গেল শোভন। তারপর হঠাৎ মৃত বৌদির গায়ে নাড়া দিয়ে ছোট্ট ছেলের মত কেঁদে উঠল শোভন: বৌদি, বৌদি, জীবন ভোর আঘাত সয়ে-সয়ে কালকের আঘাতটুকু সইতে পারলেনা বৌদি!

প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীপ্রমোদনাথ সেন

পূর্বপ্রকাশিতের পর

রবীন্দ্রনাথের শুধু সাহিত্যচর্চার প্রোৎসাহক ছিলেন না—প্রিয়নাথ সেন, সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারাদিসমূহেও প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ও প্রধান সহায় সম্বল ছিলেন। বন্ধুর দুঃখে প্রিয়নাথ কাঁদিতেন—সুখে হাসিতেন। A friend in need—ছিলেন প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথের। দুঃখেদৈন্যে সুদিনেদুর্দিনে—আধিব্যাধি সর্ববিষয়ে সর্বসময়ে প্রিয়নাথকেই রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিতেন—একান্তভাবে চাহিতেন। প্রিয়নাথই তাঁর আশাভরসা ছিল। সোদরপ্রতিম প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথের সুখদুঃখের অংশভাগী ছিলেন। বিষম অর্থসঙ্কটাদিব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বারবার বিপর্য্যস্ত হইয়া প্রিয়নাথকে আহ্বান করিয়াছেন—প্রিয়নাথ উদ্বেলিত হৃদয়ে বন্ধুর পাশে আসিয়া বন্ধুকৃত্য করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া দিয়েছেন ! এ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের ২।৪ খানি পত্রের অংশ উদ্ধৃত হইল—

"ভাই,

আজ হঠাৎ অ্যাটর্নি অমরনাথ ঘোষের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেছি—নিম্নে কপি করে পাঠাই :—

"The document in favour of my client Babu Moti chand Nakhat—requires registration as three months have expired, the document must at once be registered or a fresh one executed so that you will have 4 months within which the 2nd document may be registered. An early reply will oblige. এর অর্থ কি ? কি কর্তব্য—কি জবাব দেওয়া যাবে ? এরা যেরকম party দেখছি তাতে আমাকে হঠাৎ বিপদে ফেলবার চেষ্টা করা অসম্ভব নয়। এক বৎসর কড়ার আছে। তারপর বেঁকে দাঁড়ালে একদম মুস্কিলে পড়ব। কি উপায়ে এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার হওয়া যায় আমায় শীঘ্র লিখে পাঠিয়ো। মনটা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়েছে। ইতি ২রা অগ্রহায়ণ (১৮৯৯),

"ভাই,

তোমার চিঠিমত অমরনাথ ঘোষকে লিখে দিলুম। যদি রেজেষ্ট্রি করতেই হয় তাহোলেও আর কারো কাছ থেকে টাকা এই লোকটাকে শোধ করে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। এ রকম লোকের কাছে বদ্ধ হয়ে থাকা অসহ্য। চকম কি আয়ত্তাতীত ?

"ভাই,

তোমার আজকের চিঠি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। আমি কদিন চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলুম। এবার তুমি যাহোক একটা সদ্গতি করে দিও, যাতে ভবিষ্যতে হঠাৎ নাড়া খেয়ে নাড়ী চমকে না ওঠে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গেলে পাছে সেটা শুষ্ক মৌলিকতার শূন্যগর্ভ

প্রিয়নাথ সেন ও প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

কথার মত শোনায়, সেই জন্য নীরব আছি। কিন্তু এটুকু বলতে দোষ নেই যে তুমি আমার আয়ুবৃদ্ধি করে দিয়েছ—কিছুকাল থেকে অহরহ চিন্তায় অলুনিতে আমার তেল ফুরিয়ে আসছিল।"

ভাই,

একটা কাজের ভার দেব। আমার বাড়ী তৈরী বাবদ লোকেদের কাছে আমি ৫০০০ টাকা ঋণী, ঐ সম্বন্ধে খুচরা ঋণ আরো কিছু

আছে। আমার গ্রন্থাবলী এবং ক্ষণিকা পর্য্যন্ত সমস্ত কাব্যের Copy right কোন ব্যক্তিকে ৬০০০ টাকায় কেনাতে পার?

ভাই,

আমার Copy right বিক্রি করার কথাটা চিন্তা কোরো এবং পারত চেষ্টাও কোরো।

ভাই,

তোমার সঙ্গে কাজের কথা না কয়ে থাকবার যো নেই, অতএব সে কথা সেরে রাখাই ভাল। ২০০০০ যদি ৮ পার্সেণ্ট এবং অন্ততঃ বছর তিনেক মেয়াদে এবং অত্যধিক খরচ ব্যতিরেকে পাওয়া যায় তাহোলে মাড়োয়ারীকে শুধে ভার লাঘব করা যায়, কি বল? যদি সুবিধা থাকেত কিংকর্ত্তব্য লিখো। লোকেনের দেনা শুধতে যদি দেনা করি তাহোলে লোকেন নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে, সেই জন্যে কপি-রাইট বেচতে প্রস্তুত হয়েছি। নিজের বই এবং নিজের দেহটা ছাড়া সম্প্রতি আর কিছু বিক্রয় পদার্থ আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই—বই কেনার মহাজন পাওয়া দুর্লভ এবং নিজেকে বিক্রী করতে গেলেও খরিদ্দার পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। কোন ছাপাখানা-মহাজন যদি গ্রন্থাবলী কেনে, ঠকবে না—এটা নিশ্চয়।

ভাই,

ভাবিয়াছিলাম বৈষয়িক চিঠি লিখবো না। কানে ধরিয়া লেখাইল। আজ আমলার সাহাবাবুরা তাহাদের টাকাটা তুলিয়া লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল। ১২০০০ টাকা দশ টাকা হারে সুদ। ওদিকে সুরেন এখন বায়ুপরিবর্ত্তনে কটকে গেছে—মহাজন টাকাটা ৯।১০ দিনের মধ্যেই চায়। আপাততঃ আপনা আপনি কারো কাছে হইতে (যথা চন্দ্র ব্রাদার্স) যোগাড় করিয়া দিতে পার? লেখাপড়ার হাঙ্গামা করিতে গেলে সুরেনকে পাইব না-আমার পক্ষেও বিষম অসুবিধা। তোমার নিজের দায় যথেষ্ট আছে, তাঁহার উপর পরের ঝঞ্ঝাটও তোমারি ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। যদি সুযোগ ঘটাইতে পার--ধন্যবাদ দাবী করিতে পারিবে না, পারিলেও কৃতজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

৪ঠা ফাল্গুন
শিলাইদহ

ভাই,

বাঁচাগেল। আমার টাকার দরকার বারোহাজার, কিন্তু শুনচি মহাজন ৬০০০ হাজারেই খান্ত থাকবে-সেটা জনশ্রুতি মাত্র। যদি ১২০০০ বা ১০০০০ পার যোগাড় কোরো—নইলে ৬০০০ হাজার। কিন্তু তুমি এতদিন আমার বিধি মতে পরীক্ষা করে দেখলে, তবু কি করে জানলে যে, প্রমিসারী নোট কি ভাষায় লিখিতে হয় তা আমার মনে আছে। একটা খসড়া লিখে পাঠালেইত ভাল করতে।"

জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার বিবাহ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছিল—মহা সমস্যার পড়িতে হইয়াছিল।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত বেলার বিবাহের যোগাযোগ সাধন করিবার জন্য প্রিয়নাথের কি আপ্রাণ চেষ্টা! অনতিক্রমনীয় বাধাবিঘ্নাদির উৎপত্তিতে রবীন্দ্রনাথ নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিতেছেন—বন্ধুকেও আশা ত্যাগ করিতে বলিতেছেন—অনর্থক কর্ম্মভোগ করিতে নিষেধ করিতেছেন—কিন্তু প্রিয়নাথ দমিতেছেন না—তাঁর চিত্ত বজ্রাদপি অখণ্ডিতম—অকম্পন। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে, বংশগৌরবে বন্ধুকন্যার এ হেন সুপাত্র হাতছাড়া হইবার চিন্তা প্রিয়নাথকে নিশিদিন দগ্ধ করিয়াছে। দীর্ঘকাল সর্ব্বপ্রকার কষ্ট—হীনতা দীনতা স্বীকার করিয়া অতীব অভিলষিত সেই মঙ্গল মিলন সংঘটিত করাইতে সক্ষম হইয়া প্রিয়নাথ অপার আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। এই বিবাহ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের পত্রসমূহের কয়েকখানির অংশ উদ্ধৃত হইল:—

"ভাই

চলে এস-আর নয়। বৃথা চেষ্টা নিয়ে, বৃথা কষ্টভোগ করবার দরকার কি? এক কাজ কর-একদম সোজা অবিনাশের কাছে গিয়ে পরিষ্কার প্রস্তাবটা করে ফেল—যদি হয়ত হবে, না হয়ত চুকে যাক। না হবার দিকেই যখন সাড়ে পনেরো আনা সম্ভাবনা, তখন ভয় কিসের—দুপয়সা সম্ভাবনার জন্যে এত কসাকসি করতে পারা যায় না।

"তোমার নম্বর দুই পাত্রটির কথা শোনাচ্চে মন্দ নয়-বয়স ঠিক উপযুক্ত—শিক্ষার অভাব নাই—সম্পত্তিও যথেষ্ট-কিন্তু ভাবে বোধ হচ্চে তুমি গোত্র সম্বন্ধে কোন সম্বাদ নেও নি। যদি শাণ্ডিল্য না হয় তার মার মতটা সম্বন্ধে কি রকম বিবেচনা কর। একটা কথা বোধ হয় জাননা, পাত্রটিকে বিবাহের পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়-তাতে প্রতিজ্ঞা করতে হয়—পরব্রহ্ম জ্ঞানে কোন সৃষ্টপদার্থের উপাসনা করব না।"

"যেমন ওষ্ঠ এবং পাত্রের মধ্যে অনেকগুলি ব্যাঘাত থাকে—তেমনি পাত্র ও পাত্রীর মধ্যেও। সেই জন্য খুব বেশী আশা করিয়া থাকা ভাল নয়। প্রজাপতির পথও never runs smooth".

"মার কাছ থেকে তার ছেলেটিকে দরবার করিয়া লইবার উপযুক্ত উকীল কে? সে কাজ ছেলে নিজে করিতে পারিতেন—অভাবে অবিনাশ ছাড়া ত লোক দেখি না।

কিন্তু বুদ্ধি সম্বন্ধে আমার কাছে বেশী সাহায্য পাইবে না। অতএব তোমাকে একক লড়িতে হইবে।

কিন্তু তুমি দমিয়া আছ কেন? যদি ঘটকালি সম্বন্ধে আশু কোন উপায় না দেখিতে পাও বা কর্ত্তব্য কিছু না থাকে, তবে চট করিয়া এখেনে চলিয়া আইস আমি তোমার ভূত ঝাড়াইয়া দিব"।

"শরতের চিঠি কি আশাপ্রদ? অবিনাশের ভাবটা কি রকম? শরৎ নিজে যদি নির্ব্বন্ধ প্রকাশ না করে তাহলে কি তার মা সহজে সম্মত হবেন? কিন্তু শরতই বা বেলার কোন প্রকার পরিচয় না পেয়ে কিসের জোরে মার কাছে প্রবল ইচ্ছা জ্ঞাপন করবে? এই সমস্ত নানা কারণে বিশেষ আশা করবার কোন হেতু দেখা যায় না"।

২৬ শ্রাবণ ১৩০৭

"ভাই,

যা হোক তুমি আর যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন কর, ঘটকের কাজে শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। অতএব বৃথা চেষ্টায় নিজেকে ক্ষুব্ধ কোরো না—নদী-যেমন চল্‌তে চল্‌তে এক সময়ে সাগরে গিয়ে

পড়েই—সেই রকম "বেলা" যথাসময়ে তার স্বামীর কুলে গিয়ে উপনীত হবে"।

১ ভাদ্র ১৩০৭

"ভাই,

শরতের আশা তুমি এখনো ছাড়নি, আমিত সে অনেক দিন উৎপাটিত করে ফেলেছি।

তোমার দ্বিতীয় পাত্রটির সংবাদ আমার মন্দ লাগচে না। তার খবরটা বোধ হয় কাল পর্শু পাওয়া যাবে। কি বল?

"সাধু! সাধু! তুমি যে আমার বুদ্ধির উপর নির্ভর না করে নিজের বুদ্ধি চালনা করেছ সেজন্য তোমাকে ধন্য। এখন তারপর? এইবার কথাটাকে তার শুভ পরিণামের দিকে সত্বর অগ্রসর করিয়ে দাও। এজন্য আমার কি কলকাতায় যাওয়া আবশ্যক হবে? শরত কবে কলকাতায় আসবেন জান কি?

বৈশাখ ১৩০৮

"ভাই,

"শরতকে চিঠি লিখে আমি সুবুদ্ধির পরিচয় দিইনি। কিন্ত

একটা 'শেষ কথা আসল লোকের কাছে না পেলে মনের আশাকে সম্পূর্ণ খতম করে দেওয়া যায় না। আমার একটা কেবল আশঙ্কা হচ্ছে যে, যে দশহাজার টাকা দেওয়া হবে, সেটা হয়ত সম্পূর্ণ শরতের ভোগে আসবে না। যাহোক সে নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা।

"আজ শরতের এক পত্র পাইয়াছি। পত্রখানি সুন্দর কিন্তু strictly private বলিয়া তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। শরৎ ভাইদের মতের বিরুদ্ধে কিছু করিতে চায় না এবং বাবা মহাশয়ও বিবাহের পূর্ব্বে যৌতুক দিবেন না স্থিরপ্রতিজ্ঞ, অতএব তুমি এই সঙ্কটের যদি কোন সুপথ থাকে অবলম্বন করিয়ো—আমাদের পক্ষ হইতে আমি ত কোন সুযোগ ভাবিয়া পাই না"।

২রা বৈশাখ ১৩০৮

ভাই,

টাকা দেওয়া সম্বন্ধে কাল তোমাকে যে প্রশ্ন করেছি তার উত্তর দিয়ো। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ হওয়া অসম্ভব, অন্য কোন তারিখে হতে পারে—তুমি সেটা পাঁজিপুঁথি মিলিয়ে আমাকে ঠিক করে লিখে দাও না। আষাঢ়ে বোধহয় কোন লগ্ন নেই। শ্রাবণের ১০—ইকি বল? শুক্লা দশমী? সে সময়ে টাকাও হাতে আসবে।"

১লা আষাঢ় ১৩০৮ শনিবার ৮ ঘটিকায় বেলার বিবাহ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীরই সহিত হইয়াছিল।

প্রিয়নাথ সেনের গদ্য-পদ্য রচনাসমূহে তাঁর বিচিত্র প্রতিভা সুপরিস্ফুট। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ১৭ বৎসর পরে ১৩৩০ সালে তাঁহার কতকগুলি গদ্য রচনা "প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি" নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। প্রিয়পুষ্পাঞ্জলির 'মুখবন্ধ' লেখেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। স্মৃতিপটে চিরাঙ্কিত অভিন্ন-হৃদয় কবি-বন্ধু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের কথা ও ব্যথা কতক যাহা উক্ত মুখবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন, উদ্ধৃত হইল:—

"প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ছিল। নিজের কাছ থেকে দূরে বাহিরে স্থাপন করে তাঁর কথা সমালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলা সাহিত্যে যখন আমি তরুণ লেখক, আমার লেখনী নূতন নূতন কাব্যরূপের সন্ধানে আপন পথ রচনায় প্রবৃত্ত, তখন তীব্র এবং নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। সেই সময়ে প্রিয়নাথ সেন অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক অধ্যবসায়কে নিতাই অভিনন্দিত করেছেন। তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার, নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্যরস-সম্ভোগ প্রতিদিনই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হতো। সেদিন আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর সেই ঔৎসুক্য, আমার কাছে যে কত মূল্যবান ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। বহুকালের বহু দেশের জ্ঞান ও ভাবের ভাণ্ডারে প্রিয়নাথ সেনের চিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, তবু তিনি যে-কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এখনকার পাঠকদের কাছে দূরবর্ত্তী সেই কালকে বঙ্কিমের যুগ বলা যেতে পারে। সেই বঙ্কিমের যুগ এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগারম্ভকালীন বৈদগ্ধ্যের আদর্শ এই বই থেকে পাওয়া যাবে এই আমার বিশ্বাস।"

প্রিয়নাথের বহু পদ্য রচনা 'ভারতী', 'কল্পনা', 'সাহিত্য', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী', মানসী, 'ব্রহ্মবিদ্যা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার অনেক বাংলা ও ইংরেজী কবিতা এবং গদ্যরচনা অপ্রকাশিত। কাব্য-প্লাবিত বাংলা দেশে প্রিয়নাথের কবিতা এক অমূল্য সম্পদ। প্রিয়নাথের একটি অপ্রকাশিত গদ্যরচনা, হাস্যরসের রসিক কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্বন্ধে লিখিত "শ্মশান" ও "মানসী" নামক তাঁর দুটি বাংলা কবিতা এবং "At The Year's End" নামক তাঁহার একটি ইংরাজী কবিতা মুদ্রিত হইল:

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

যদিও বঙ্গ সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্থান নিরূপণ করিবার এ সময় নয় তিনি বাঙ্গালার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রিয় লেখক এবং জীবদ্দশায় ভূয়সী প্রতিষ্ঠা এবং প্রভূত আদর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তিনি গীতি-কবি, নাট্যকার, হাস্য-রসিক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার রচিত নাটকসকল রঙ্গালয়ে এবং অন্যত্র বিশেষ গৌরব লাভ করিয়াছিল। সেই সঙ্গে তাঁহার স্বদেশী গান এবং কবিতাগুলি লোকপ্রিয় হইয়াছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহার হাসির গানের জন্যই তিনি বঙ্গের গৃহে গৃহে পরিচিত হইয়াছিলেন। সমজদার সকলেই। প্রকৃত হাসির গানের ধর্ম্মই এই। শুনিয়া বা পড়িবামাত্র তাহা লোককে হাসাইবে। বিশ্লেষণ বা টীকার মারফৎ যে হাসির গান উপভোগ্য, তাহা হাসির গান নয়। কিন্তু তাঁহার হাসির গানের ভিতর অনেক সময়েই যে মর্ম্মবিগলিত অশ্রুনিহিত এ কথা কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। সম্প্রতি মাননীয় রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় সেদিনকার শোকসভায় মৃত কবি সম্বন্ধে যে সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কথারই উল্লেখ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। উক্ত প্রবন্ধটি সাহিত্যের নানা তথ্য-পরিপূর্ণ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের বিচিত্র প্রতিভার এবং আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিপাটি সমালোচনা। ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে একজন শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ বলিয়া ঘোষ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার প্রবীণতাও প্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালা সাহিত্যেও প্রবীণ, উক্ত প্রবন্ধটি অনেকের কাছে তাহার এই নূতন পরিচয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রবন্ধটি সাহিত্যিক তথ্যে পরিপূর্ণ—তাহার সমালোচনায় উদার এবং বিস্তারিত সাহিত্য জ্ঞানের এবং মৌলিক চিন্তার নিদর্শনে অমূল্য। এই প্রবন্ধ পাঠে কোন বাঙ্গালীর মনে একথা উদয় না হয় যে রাসবিহারীবাবু যদি বঙ্গীয় সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার হাতে বাঙ্গলা সাহিত্যে আরো কত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিত। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য-কবিতা সম্বন্ধে রাসবিহারীবাবুর উপরের কথিত কথা গুলি এই—"তাঁহার রচিত হাসির গান শুনিয়া হাসিতে হয় বটে, আমরা অনেকেই অনেকবার সে গান শুনিয়া হোহো হাসিয়াছিও বটে,

পরন্তু সেগুলি কি সত্যই হাসির গান ? সে যে জাতির চরিত্রের মুকুর। শিথিল শ্লথ সমাজের প্রতিচ্ছবি ! যখন হাসিয়াছি, তখন আমরা কেহ ভাবিনাই, এ মুকুরে আমাদের প্রত্যেকের মুখ ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। যখন সে ভাবনা আসিয়াছে, তখন গোপনে চোখের জলে অনেকের বুক ভাসিয়া গিয়াছে—" ঠিক এ কথাই আমি ১৯০৬ সালে আমার রচিত নিম্নলিখিত সনেটে বলিয়াছিলাম। এ বৎসর আমি দ্বিজেন্দ্রবাবুর অতিথি হইয়াছিলাম। সে সময়ে তিনি গয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাঁহার পুত্রকন্যা লইয়া কয়েকজন আত্মীয় স্বজনের সহিত গয়ায় বাস করিতেছিলেন। আমি তাঁহার পরিবারভুক্ত ছিলাম। সকলের সহিত তাঁহার উদার অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার পুত্র এবং কন্যাটির লালন পালন পদ্ধতি আমাকে বড়ই অভিনব, মধুর এবং উদারতা-প্রসূত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যতক্ষণ তিনি বাড়ীতে থাকিতেন ততক্ষণ তাহারা তাঁহার সাথের সাথী—তাহাদের সমক্ষে সকল কথাই হইত সকলই তাহারা শুনিত এবং অনেক কথাতেই যোগ দিত। কিন্তু কখনও অনধিকার চর্চ্চা বা জেঠামী দেখি নাই। পিতার স্নেহের শাসন ছাড়া অন্য শাসন ছিল না। কখনও তাঁহাকে চোখ রাঙ্গাইতে দেখি নাই—না ঠিক কথা বলা হইল না—তাঁহাকে কখন চোখ রাঙ্গাইতে হয় নাই। ভাই বোনে দুটি যেন পরস্পরের ছায়া—তিল মাত্র বিচ্ছেদ নাই। সেই অল্প বয়সেই 'মণ্টু্য' সংগীত বিদ্যায় অভিজ্ঞতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। শুনিবামাত্র গানের স্বরলিপি ঠিক করিতে পারিত এবং হারমোনিয়মের সঙ্গত দিতে পারিত। আশীর্ব্বাদ করি, পুত্র কন্যা দুটি যেন বাপের প্রতিভা লাভ করে।

মৎরচিত সনেট্ :—

কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সুহৃদ্বরেষু

তোমার আতিথ্য সখা, ভুলিবার নয়,
ভুলিবার নয় তব পুত্র কন্যা দু'টি
মণ্টু আর মায়া মাতা— সরল নির্ভয়
শিশু জীবনের দুষ্টামীর নাহি ত্রুটি।
পরস্পর স্নেহ বিনা অপর শাসন
নাহি—পিতৃ-সঙ্গ আর। শুধু কণ্ঠ সনে
নহে, মর্ম্মে মর্ম্ম করিয়া মিলন
তোমার প্রতিভা-লক্ষ্মী গড়িছে দু'জনে।
সে প্রতিভা হাস্যে শুধু ? বঙ্গ-কবি-কুলে
জাগাইতে হাস্য-রস তুমি একা, শুনি
কিন্তু কান আছে যার, কাঁদে ফুলে ফুলে
শুনিয়া বীণার তব প্রচ্ছন্ন কাঁদুনি!
অশ্রু জলে আর্দ্র হাসি—অশ্রু হাস্যোজ্জ্বল
মেঘ রৌদ্রে ধরা যথা শরতে বিহ্বল।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

শ্মশান

গ্রামের সুদূর প্রান্তে—ভগ্ন দেবালয়
তাহার চরণে লগ্ন—বিস্তীর্ণ শ্মশান
নীরব নির্জন। যেন আপনারে লয়
করিয়াছে প্রেতভূমি সমর্পিয়া প্রাণ
শিয়রের দেবী-পদে—ধ্যান নিমগনা
উর্দ্ধে দেখে শুধু সেই এক নভঃ—আর
মন্দিরের মহাভয়—লেলিহ রসনা—
মরণের ক্ষুদ্র ভয়ে করিছে সংহার।
আমার জীবন হোক শ্মশান প্রখর
দাঁড়াও পাবনী তাহে একা—একেশ্বরী
পুড়ুক নিয়ত তাহে যা কিছু নশ্বর
পাপ যাহা—মৃত্যু যাহা—যাহা মৃত্যুকরী
তোমাতে নিমগ্ন-লুপ্ত—তুমি প্রাণময়
বিশ্বের সে চিরচিতা ধরিবে হৃদয়।

"মানসী"

ধরা যে তোমায় পাব কেমনে—কোথায় ?—
লেলিহান দীর্ঘ তৃষা মিটাই কেমনে ?
কোনরূপে বহুরূপী হৃদয়—বেলায়—
তোমারে করিয়া বন্দী নিবাই চরণে
অশেষ বাসনা—উর্দ্মি সংক্ষুব্ধ জীবনে ?
ধ্যান বল, প্রেম বল নিষ্ফল প্রয়াস।
পাইলেও পাই নাই মিটেনা তিয়াস।
চিরউপভোগ নেশা চির অন্বেষণে।
জড় রূপে দেখা দিলে,— সদা কাঁদে প্রাণ
চেতনার সাড়া পেতে অমূর্ত্ত যখন,—
দরশ—পরশ—আশে হৃদি ম্রিয়মান ;—
দেহ প্রাণ ধরি এলে,— কোথা সে মিলন
তব অঙ্গে প্রতি অঙ্গ পাবে পরিত্রাণ,
প্রাণ পাবে তব প্রাণে নিশ্চিন্ত নির্বাণ।

AT THE YEAR'S END

The year has found its goal,
Hope knows not where begin,
Life yawns—a barren waste,
When—when will death close in !
What a hedge of sturdy thorn
For one short-lived ose !
For the gleam of a distant dawn
What a night of storm and snows !
A wisp's frail light in front,
Behind—the heavens dome
Glares red a beacon fire
Fed by my burning home.

কাব্যরসের বিশেষজ্ঞ প্রবীণ সমালোচক Edmund Gosse প্রিয়নাথকে লিখিয়াছিলেন :

Your verses remind me of the English poetry

of Goethe, which had similar peculiarities. I am sure you will not mind being compared with so eminent a man.

Believe me, with many thanks for your letter,

Yours sincerely

(Sd,) Edmund Goss."

প্রিয়নাথের মৃত্যুতে তাঁহার প্রতি ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৺প্রমথ চৌধুরী, ৺যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতি বহু কবি, সাহিত্যিক ও মনীষীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়।

নাটোরের মহারাজা ৺জগদিন্দ্রনাথ রায় কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন :—

"যতীন,

আজ একটি দুঃসংবাদ দিতে বাধ্য হইতেছি। তোমার বন্ধু, আমার বন্ধু, বঙ্গ সাহিত্যের বন্ধু, কৃতী লেখক, বোদ্ধা ও সমালোচক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন আজ কদিন যাবৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দেহমনে কিছুদিন হইতে যেরূপ অসুস্থ ও অসুখী ছিলেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে মৃত্যু নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় হয়ত বা ছিল না। * * * * প্রিয়বাবু গিয়াছেন তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বান্ধব-সমাজ এবং বঙ্গদেশ ও সাহিত্য যে গুণী গুণগ্রাহী রসজ্ঞজনকে আজ হারাইল, কবে কে সে স্থান পূরণ করিবে বিধাতাই জানেন।

সন্তোষের জমিদার সুকবি প্রমথ নাথ রায়চৌধুরী প্রতি বৎসরারম্ভে প্রিয়নাথের উদ্দেশে একটি করিয়া কবিতা লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথের একাধিকপত্রে প্রমথবাবুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৩০৮ সালে প্রিয়নাথ সেনের উদ্দেশে প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক লিখিত "উপহার" নামক কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধটির সমাপ্তি করিলাম। করিতাটি "প্রদীপ" মাসিক পত্রে (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮) প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রিয়নাথ ও প্রমথনাথ এই যুগল কবির একখানি চিত্রও প্রদীপে প্রকাশিত হয়।

উপহার

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন সুহৃদ্বরেষু

বাণীর চরণ তলে বসে আছ কুতূহলে
সাধক সুন্দর !
ভাবে ভরা ভোলা প্রাণ নাহি ভাণ অভিমান
উদার অন্তর।
অমিয় সাগরে নামি, তৃপ্তিহীন দিবাযামী
কি করিছ পান ?
গীতিময় বক্ষ পুটে ভূমানন্দে বাজি উঠে,
কাব্য জয় গান।
থাক বা না থাক মধু, নহে এ মাননী বধূ
নহে প্রেমভীতা ;
খোল হৃদি কুঞ্জদ্বার, ধর ধর উপহার
আমার কবিতা।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

---

* ৺প্রিয়নাথ সেন আমার পূজনীয় পিতৃদেব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও আমার পিতৃতুল্য—পূজনীয়।

পিতৃদেবের মৃত্যুকালে আমার বয়স ২৩।২৪ বৎসর, সুতরাং তাঁর শৈশব বা যৌবনের কথা বা উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ অবগত হইবার বিশেষ সুযোগ সুবিধা আমার ঘটে নাই। তবে আমার শিশুকালের কোন কোন স্মৃতি আমার মনের মধ্যে ছবির মত আঁকা হইয়া আছে। একটির উল্লেখ করি—পিতার বৈঠকখানা ছিল ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ এবং চারিদিকে পুস্তকের রাশি। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত পুস্তক রাজির মধ্যস্থলে পিতৃদেব বসিতেন এবং আশপাশে যে স্বল্প স্থান থাকিত তথায় তাঁহার বন্ধু বান্ধবাদি আসিয়া বসিতেন ; স্থানাভাবে কেহ কেহ দাঁড়াইয়া থাকিতেন—কেহ বা ফটকের দুইপাশে যে বসিবার স্থান ছিল তথায় বসিতেন। বহু লোকেরই সমাগম দেখিতাম—একজন দীর্ঘকায় উজ্জ্বল গৌর বর্ণ—চোখে চস্‌মা সুন্দর কেশবিন্যস্ত সুপুরুষ প্রায়ই আসিতেন। এক দিনের কথা মনে পড়ে—বাবা স্নান করছিলেন—এমন সময় তিনি আসিলেন—বৈঠকখানা বন্ধ ছিল—বড় দাদা (৺মন্মথনাথ সেন উদীয়মান কবি ও সাহিত্যিক) তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া দিলেন—আমিও বড় দাদার সঙ্গে গিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইলাম—তিনি আমায় স্নেহবাক্যে কাছে ডাকিয়া কত কি কথা বলিলেন স্মরণ নাই। ইনিই বিশ্ববিদিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—যাঁহাকে ছেলেবেলায় প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিতে দেখিতাম।

পিতৃদেবের মৃত্যুর ৮।১০ বৎসর পূর্ব্ব হ'তে এবং আমার অতি অল্প বয়স হ'তেই পিতৃদেবের সহিত অধিকাংশ সময় থাকিবার এবং তাঁহার আদেশাদি পালন করিবার সৌভাগ্য আমার হয় ; সুতরাং তাঁর শেষ জীবনের অনেক কথাই আমার জানিবার সুযোগ ঘটে। পিতৃদেব স্মৃতিকথা সম্ভবতঃ কিছু লিখিয়া যান নাই—তবে তাঁর সহিত থাকাকালীন, তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁর জীবনের যে সব কথা বিবৃত করিতেন তাহা আমার স্মৃতিপটে সদাই বিরাজমান এবং বড় বড় লোকদের ছবি সম পিতৃদেবেরও গৌরবময় উজ্জ্বল ছবি আমার মানসপটে সদাই অঙ্কিত।

পিতৃদেবের সম্বন্ধে কিছু বলিবার বা লিখিবার আমার বিশেষ আগ্রহ ও অভিলাষ, কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সেই অসাধারণ বিদ্বান মনীষীর সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। রবীন্দ্র-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কবিগুরুর সোদরপ্রতিম অভিন্নহৃদয় বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে বিস্মৃত হইয়া থাকা অবাঞ্ছনীয় এবং বেদনাদায়ক ! জানিনা পিতৃদের সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনা করিবেন কিনা, কিন্তু রবীন্দ্র-শত-বর্ষ-পূর্তি এই চিরস্মরণীয় মহোৎসবে পিতৃদেব সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রবল বাসনা আমায় এই নিবন্ধ লিখিতে প্রণোদিত করিয়াছে। এই নিবন্ধের প্রধান এবং বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু হ'চ্ছে পিতৃদেবকে লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমূল্য পত্রসমূহের কয়েকখানির উদ্ধৃত অংশ। রবীন্দ্রনাথ জীবন স্মৃতিতে লিখিয়াছেন—"প্রিয়নাথ সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক, তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভ কালেই যে কত উপকার করিয়াছে বলিয়া শেষ করা যায় না।"

প্রিয়নাথকে বুঝিবার জন্য—বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায় এবং তিনি উপযুক্ত স্থান পাইয়াছেন কিনা তাহা নিরূপণার্থে—এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রিয়নাথ সেন যে কি অমূল্য সম্পদ ছিল তাহা দেখাইবার জন্য এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আমার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না আশা করি।

উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন—অনিচ্ছা সত্বেও ইহাতে পরম পূজনীয় পিতৃদেবকে—"প্রিয়নাথ" এবং পিতৃতুল্য গুরুদেবকে—"রবীন্দ্রনাথ" বলিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছি—পুনঃপুনঃ "পিতৃদেব" বা "প্রিয়নাথ সেন মহাশয়" এবং "গুরুদেব" বা "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়" শ্রুতিমধুর হইবে না এবং পাঠকবর্গের হয়ত রুচিকরও হইবে না। যদিও পিতাকে এবং পিতৃতুল্য ব্যক্তিকে এরূপে সম্বোধন পুত্রের অন্যায় ও অশোভনীয়।

স্বদেশ-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

নরেন্দ্র দেব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ইং ১৯১৮ সাল। এই বৎসর এপ্রিলমাসে পাঞ্জাবে জালীনওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল ডায়ার ভারতবাসী জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ এ দুঃসংবাদে অস্থির হয়ে ওঠেন। এই পাশবিক বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি 'স্যর্' উপাধি বা 'নাইটহুড' পরিত্যাগ করে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে একখানি ঐতিহাসিক পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রের এক অংশে এই কথাগুলি ছিল—

"The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised Governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote... And these are the reasons, which have painfully compelled me to ask your Excellency with due deference and regret, to release me of my title of Knighthood," স্বদেশ প্রেমের এমন অভূতপূর্ব পরিচয় পৃথিবীর আর কোনও দেশের আর কোনও কবি কখনো দিতে পেরেছিলেন কিনা জানা নেই।

ইং ১৯২০ সালে কবি পুনরায় য়ুরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁর ভারতব্যাপী বিশাল অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা নিয়ে শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলেন। কিন্তু, দেখা পাননি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কবি দেশে ফিরে এলেন। তখন এখানে অহিংস প্রতিরোধ ও নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলেছে। পণ্ডিত জহরলাল ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ ভারতের ও বাংলার নেতৃবৃন্দ সকলেই তখন গান্ধিজীর স্বরাজ আন্দোলনের অনুবর্তী। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা এসে ধরলেন এই আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য। কিন্তু, কবি তাঁদের কর্মপন্থা সমস্ত মনোযোগ দিয়ে শুনে বলেছিলেন—এ পথে স্বরাজলাভ সম্ভব নয়। এ যেন নিজের নাসিকা কর্তন করে পরের যাত্রা ভাঙ্গার চেষ্টা। উত্তেজনায় অবসাদ আসার সঙ্গে সঙ্গে এ আন্দোলন ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

তিনি সেদিন অসম-সাহসিকতার সঙ্গে 'শিক্ষার-মিলন' ও 'সত্যের আহ্বান' প্রভৃতি পর পর কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখে 'অসহযোগ আন্দোলনে' প্রমত্ত দেশবাসীকে ডেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে এ অসহযোগের ফলে দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বন্ধ হবে, তার ফলে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। ছেলেমেয়েদের জন্য জাতীয় শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা না-ক'রে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের বাইরে টেনে আনাটা শেষ পর্যন্ত দেশের পক্ষে একান্ত অশুভ ও অকল্যাণকরই হয়ে উঠবে। তাই শিক্ষার ব্যাপারে 'অসহযোগ আন্দোলন' যে কতদিক দিয়ে নিষ্ফল হ'তে বাধ্য, নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তার বিশদ আলোচনা করে আপন সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

এই বছরই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর পূর্ব-পরিকল্পিত 'বিশ্বভারতী' শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সিলভাঁ লেভী, প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ জার্মান পণ্ডিত ভিণ্টার্নিজ প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতগণ 'বিশ্বভারতী'র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে একমত হয়ে সানন্দে এখানে এসে অধ্যাপনার কাজে যো দিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত এল্মহার্ষ্ট আসেন বিলেত থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য নিয়ে শুরুলে কৃষি ক্ষেত্র ও 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করতে। কবির বহুদিনের স্বপ্ন ও কল্পনা 'বিশ্বভারতী' ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে ওঠে জগতের নানা জ্ঞানী গুণীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমাবেশে।

হিন্দু মুসলমানের একতা ছাড়া এবং উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত চেষ্টা ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা যে সম্ভব নয় এটা দেশবাসীকে বুঝিয়ে তিনি আর একবার এদের মধ্যে একটা মিলনের চেষ্টা করেন—কি ভাবে ও কি উপায়ে এ মিলন সম্ভব হতে পারে তারই ব্যাখ্যাকরে "একতার উপায়" শীর্ষক একটি চিন্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখে তিনি সে পথও নির্দেশ করেন।

ইং ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ চায়না ও জাপান ভ্রমণ কালে পাশ্চাত্য 'রাজনীতি ও সম্রাজ্যবাদের' কঠোর নিন্দা করেন। চায়না ও জাপানকে অনুরোধ করেন যে তারা যেন তাদের মহান দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য ভুলে পশ্চিম দেশের অনুকরণে মেতে না ওঠেন। বিশেষ ভাবে জাপানকে কঠোর তিরস্কার করে বলেন—তোমরা একি করেছো?—শান্তিপ্রিয় এশিয়াতে শক্তিমদমত্ত সাম্রাজ্যবাদ ও হীনধনতন্ত্রবাদকে প্রবেশ করতে দিওনা। তাহলে তোমাদেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে।

জাপান থেকে ফিরে আসবার পর বাংলার তদানিন্তন গভর্ণর লর্ড লিটন ঢাকার এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাংলার মেয়েদের সম্বন্ধে অমর্যাদা সূচক একটি মন্তব্য করায় কবি ক্রুদ্ধ হ'য়ে লর্ড লিটনকে তাঁর কথা প্রমাণ করবার জন্য প্রকাশ্য ভাবে আহ্বান করেন। এরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন অসত্য উক্তির জন্য লাট সাহেবকে তিরস্কার ক'রে তাঁকে এই আপত্তিজনক মিথ্যা ভাষণ পত্রপাঠ প্রত্যাহার করতে বলেন। দেশবাসীর অপমানে এই দেশপ্রেমিক কবি মর্মাহত হ'তেন। বিদেশীর মুখে স্বজাতির নিন্দা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকার্ত হয়ে তিনি এই ত্যাগবীর দেশনায়কের উদ্দেশে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥"

দেশের সর্ব সাধারণ এই শ্রদ্ধার বাণী কণ্ঠস্থ করে রেখেছে।

চরকার ব্যাপারে কবির নিষ্ক্রিয়তার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রেছিলেন, কবি তখন 'স্বরাজ-সাধন' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে সে অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় একথা বলেছিলেন যে ঘরে ঘরে চরখা ঘোরালে হয়ত' প্রচুর সুতা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু 'স্বরাজ' পাওয়া যাবে না।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় যান এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ত্রিপুরা প্রভৃতি পূর্ব বঙ্গের নানা জেলায় পরিভ্রমণ করেন। অভয় আশ্রম, খাদি প্রতিষ্ঠান' পরিদর্শন করেন। নমঃশূদ্রদের একটি সম্মেলনে যাবার ডাক পেয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং জাতিভেদের অভিশাপ সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসেই তিনি মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ইটালি যান। তিনি 'ফ্যাসিস্ট' আন্দোলনের নিন্দা করেন। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা, মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করা, একট জাতিকে সে দেশের রাজশক্তির যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করবার জন্য তাকে একই কলকব্জার ছাঁচে গড়ে তোলার বিরুদ্ধে তিনি কঠোর মন্তব্য করেন। ইটালি থেকে বেরিয়ে পুনর্বার য়ুরোপ ঘুরে গ্রীস ও তুরস্কদেশ হ'য়ে তিনি মিশরে আসেন এবং সেখান থেকে ভারতে ফেরেন।

ভারতে এসে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে কবি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। এরূপ হত্যা যে কাপুরুষোচিত একথা বলতে তিনি কুণ্ঠিত হননি, কিন্তু এই দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে দেশে যাতে একটা সাম্প্রদায়িক বিরোধ না জেগে ওঠে এ সম্বন্ধে দেশবাসীকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ছেলেমেয়েদের বিনাবিচারে আটক করা ও রাষ্ট্রনেতাদের অন্তরীণে আবদ্ধ রাখার বিরুদ্ধে কবি প্রবল প্রতিবাদ করেন। একে আদিম অসভ্য জাতির বর্বর শাসন প্রথা বলে তীব্র তিরস্কার করেন। এই বছরেই তিনি বিশালভারত, অর্থাৎ যবদ্বীপ, বালি, সুমাত্রা, মালয় ও শ্যামদেশ ভ্রমণ করে আসেন। বিশাল ভারতের অতীত যুগের বিস্মৃত গৌরবের বহু চিহ্ন এসব অঞ্চলে এখনো বিদ্যমান রয়েছে দেখে দেশপ্রেমিক কবির মন আনন্দাতিশয্যে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তাঁর 'সাগরিকা' 'বিজয়লক্ষ্মী' প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা এই বালি ও যবদ্বীপের উদ্দেশেই রচিত।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন একাদশবার ভূপর্যটনে বেরিয়ে প্যারিস হয়ে লণ্ডনে অবস্থান করছিলেন, ভারতবর্ষে সেই সময় মহাত্মার তুমুল সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলেছিল।

রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী : অসিতরঞ্জন বসু

'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে'...

ফটো : রণেন্দ্রশেখর ঘোষ
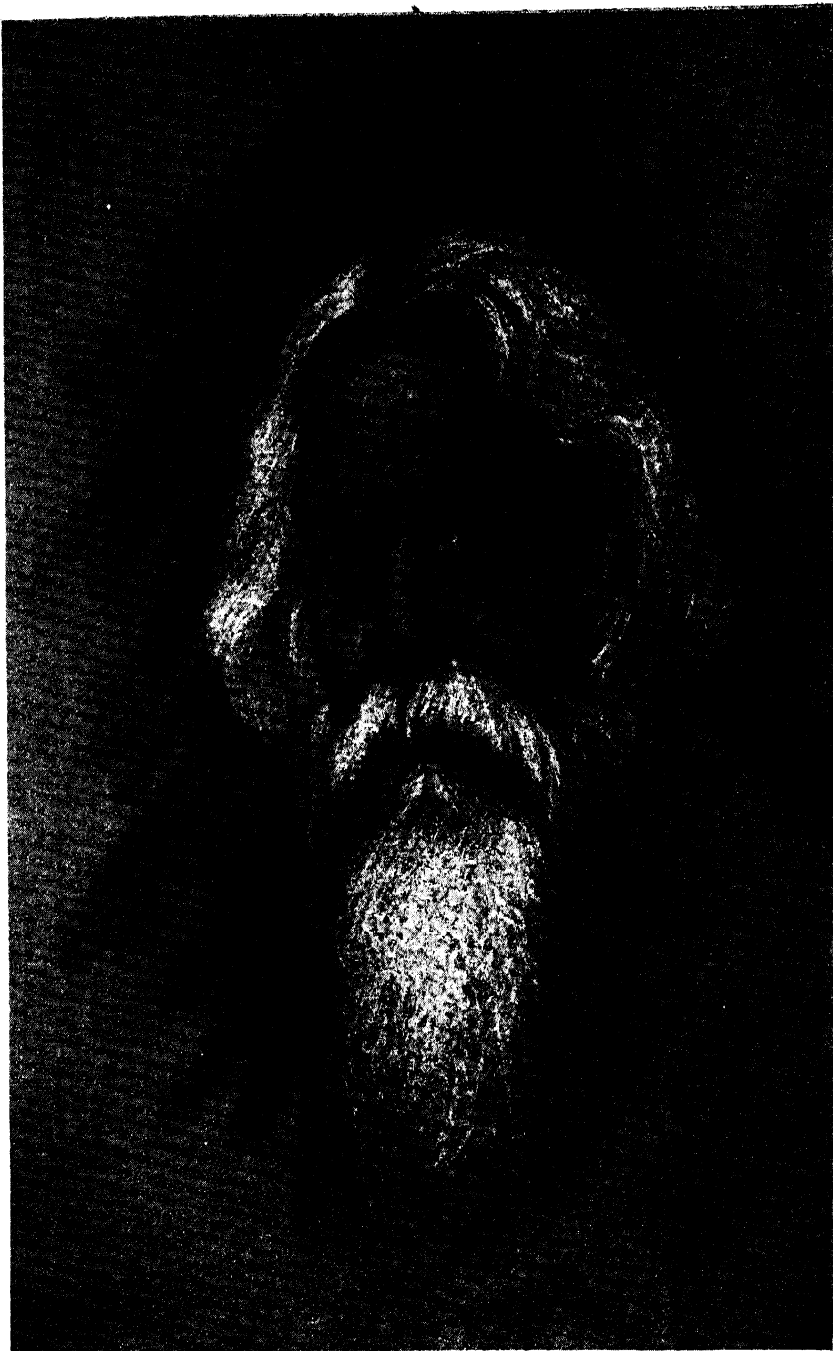
গান্ধিজীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'ডাণ্ডী মার্চ' 'লবণ সত্যাগ্রহ', মাদকদ্রব্য সেবন নিরোধে তালগাছ কেটে তাড়ি প্রস্তুত বন্ধ করা, গান্ধিজীকে বন্দী করে অন্তরীণে আবদ্ধ করা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, শোলাপুরে বিদ্রোহ ও সামরিক আইনজারি, কংগ্রেসকে 'বে-আইনী প্রতিষ্ঠান' বলে ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্ডিনান্সে ঘোষণা, ঢাকায় বিদেশীর চক্রান্তে হিন্দু মুসলমানের ভীষণ দাঙ্গা, এই সব উত্তেজনাপূর্ণ খবর সংবাদপত্র মারফৎ তাঁর কাছে পৌচচ্ছিল। তিনি লণ্ডনে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডেনের প্রতিনিধির কাছে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, ঢাকার এই শোচনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে আছে বিদেশী কুচক্রীদের কুমন্ত্রণা ও অভিসন্ধিমূলক প্ররোচনা। বাইরে থেকে ভাড়াটে গুণ্ডা আমদানী করে নিরীহ লোকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের দায়িত্বহীন দুঃশাসনে, ভেদনীতির কূট পরিচালনায় নিষ্ঠুর ও অন্যায় অবিচার সেখানে চলেছে আজ—শান্তিরক্ষার নামে! দেশহিতৈষণা অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে। নির্দোষীদের ধরে কারাগারে আবদ্ধ করা হচ্ছে। শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে সেখানে অমানুষিক অত্যাচার চলেছে। এর ফলে ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিদিনই অভিশাপগ্রস্ত হচ্ছে।

লণ্ডনে 'কোয়েকার সমিতির' বার্ষিক অধিবেশনে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত হ'য়ে তিনি যখন কিছু বলবার জন্য অনুরুদ্ধ হ'লেন, তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ভারতে রাজশক্তির অপব্যবহার ও ব্রিটিশ শাসনের বর্বরোচিত ব্যভিচার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। শ্রোতারা অনেকেই এতে অপমান বোধ করে প্রতিবাদ স্বরূপ সভায় গোলমাল করে ওঠে, তখন আহত সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠে তাদের তীব্র ভর্ৎসনার কণ্ঠে কবি বলেন—তোমরা যদি আজ আমাদের অবস্থায় পড়তে তাহলে এই পরাধীনতার কী যে জ্বালা তা বুঝতে। অনেকদিন আগে রোম্যানরা, নর্মানরা তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে গেছে, তাই ভুলে গেছ তোমাদের দাসত্বের বেদনা। স্মরণ কর মুক্তিপ্রয়াসী আমেরিকার সেদিনের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা। সেদিন তোমাদেরই ভাই বন্ধু আত্মীয়—তারাও তোমাদের অধীনতা পাশ ছিন্ন করে স্বাধীন হবার জন্য অকাতরে নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। পা দিয়ে মাড়িয়ে ধরলে ক্ষুদ্র পিপীলিকাও কামড়াতে ইতস্ততঃ করেনা। লণ্ডনের 'স্পেক্টেটার' কাগজে একখানি পত্র লিখে তিনি গান্ধিজীর নিরস্ত্র ও অহিংস উপায়ে ভারতের কুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার এই পন্থাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

বিলেতে যখন রাউণ্ডটেবল কনফারেন্স বসে, কবি তখন সুদূর আমেরিকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন শুনলেন যে গান্ধিজী গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত হ'তে অস্বীকার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে সত্বর একখানি পত্র দিলেন যে গোলটেবিলে না এসে গান্ধিজী মস্ত একটা ভুল করলেন। কবির এ পত্র লণ্ডনের 'স্পেক্টেটর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে গোলটেবিলে আসল কাজ কিছু হোক বা না হোক, এই উপলক্ষে জগতের সমুখে ভারতের প্রকৃত অবস্থা উদ্ঘাটিত করে দেখাবার একটা দুর্লভ সুযোগ পাওয়া যেত।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণ করে এসে 'রাশিয়ার চিঠি' নাম দিয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কবির জন্মোৎসবের দিন বইখানি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং ভারতের পক্ষেও এই উপায় অবলম্বন ছাড়া শিক্ষা প্রসারের আর কোনও উপায় নেই এইরূপ অভিমত দিয়েছিলেন। এই বৎসরই জাতিভেদ প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি 'শাপমোচন' ও পর বৎসর 'চণ্ডালিকা' রচনা করেন। ভগবান বুদ্ধের শাসনে যে জাতিভেদ বলে কিছু ছিলনা, সকল মানুষই যে সমান ভাবেই তাঁর প্রেম ও কৃপার পাত্র—এইটেই তিনি এ গ্রন্থ দুখানিতে অতি হৃদয়গ্রাহী করে দেখিয়েছিলেন। উত্তর-বঙ্গের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের সাহায্যের আবেদন জানিয়ে এবং হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নিবারণের জন্য আর একবার উপদেশ দিয়ে কবি এই সময় প্রবাসী পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। শুধু প্রবন্ধ লিখেই তিনি নিশ্চিন্ত হননি, শান্তি নিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে উত্তরবঙ্গের আর্তদের সাহায্যকল্পে 'শিশু-তীর্থ' শীর্ষক একখানি অভিনব গীতিনাট্য রচনা করে অভিনয় করেন।

এই বৎসরই পূজারপূর্বে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কবি যখন দার্জিলিঙে যাবার উদ্যোগ করেন ঠিক সেই

সময়েই হিজলী বন্দী নিবাসে এক শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ঘটে। কারারক্ষীরা দুজন রাজনৈতিক অপরাধে বন্দী যুবককে গুলি করে হত্যা করে এবং বহুবন্দীকে আহত করে। কবি এই নৃশংস অমানুষিক অত্যাচারের সংবাদে মর্মাহত হয়ে তাঁর দার্জ্জিলিং যাত্রা বন্ধ রেখে এই বর্বরোচিত লোমহর্ষণ নরহত্যার প্রতিবাদে টাউনহলে যে বিরাট সভা হয় তার পৌরোহিত্যের ভার নিয়েছিলেন। টাউন হল লোকারণ্যে পরিণত হওয়ায় প্রতিবাদ সভা সেখানে না হয়ে গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের তলায় অনুষ্ঠিত হয়। কবি টাউনহল থেকে ময়দানে চলে এসে সেই বিরাট জনতাকে সম্বোধন করে বলেন আত্মরক্ষায় অক্ষম নিরস্ত্র বন্দী যারা, যারা ভাগ্যবিড়ম্বনায় বিদেশী শাসকের সংশয় ও সন্দেহ বশে অনির্দিষ্ট কালের জন্য এক বর্বর শাসন প্রথার অধীনে বন্দীদশায় দুঃসহ দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করছে, রাত্রের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সেই অসহায়দের উপর এই নৃশংস নিষ্ঠুর মারাত্মক আক্রমণ কাপুরুষতা ও অমানুষিকতার চরম নিদর্শন। এ দেশের ইংরেজ পরিচালিত একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রে সরকারের এই জঘন্য অন্যায় কার্যকে সমর্থনের চেষ্টা করা হয়েছে দেখে কবি ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় উক্ত সংবাদপত্রে একখানি তীব্র তিরস্কারপূর্ণ পত্র লিখে সংবাদপত্রের এই ঘৃণিত আচরণের কঠোর নিন্দা করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই সময় বাঙালীকে পরিধেয় বস্ত্রের জন্য বোম্বাই আমেদাবাদের মিলগুলির মুখাপেক্ষী না হ'য়ে থেকে নিজেদের অভাব নিজেদের চেষ্টায় পূরণ করবার অনুরোধ জানিয়ে যে আন্দোলন উপস্থিত করেন রবীন্দ্রনাথ এ আন্দোলন সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে আচার্য-দেবের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং "বাংলার তাঁত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে দেশবাসীকে তাঁতের কাপড় ব্যবহার করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। দেশের টাকা বিদেশে চলে যাওয়া বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে স্বদেশী শিল্প-সামগ্রীর প্রসার ও প্রচারের জন্য কবি আজীবনই চেষ্টা করেছিলেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে গান্ধিজীকে পুনরায় বন্দী করায় কবি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর নিকট পত্র লিখে ভারতের শাসনকর্তাদের অন্যায় অত্যাচারের ইতিহাস তাঁর গোচর করে বলেন—এইভাবে নির্বিচারে ভারতবাসীদের উপর সুদীর্ঘকাল অত্যাচার চলার ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসীদের মধ্যে চিরকালের জন্য যে এক দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠছে, তার পরিণাম হবে বড় ভয়াবহ।

এই ১৯৩২ খৃষ্টাব্দেই ২৬শে জানুয়ারী কংগ্রেস কর্তৃক স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়। এই উপলক্ষে দেশ-প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশবাসীদের কাছে যে তেজঃদৃপ্ত মুক্তির বাণী প্রেরণ করেছিলেন, বিদেশী শাসক-দের 'সেন্সার' তাঁর কণ্ঠ চেপে ধরে সে বাণীর অনেকখানিই প্রকাশ করতে দেয়নি। এরপর কবি পারশ্য ও ইরাকের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে 'মিডল-ইস্ট' বা মধ্য এশিয়ায় চলে যান। সেখান থেকে ভারতে ফিরে এসে লণ্ডনের গোল-টেবিল বৈঠকের পরিশিষ্ট রূপ ভারতের স্কন্ধে 'সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার' সর্বনাশা বিধান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখে দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তিনি ব্যাকুলভাবে দেশবাসীর কাছে প্রার্থনা করেন তাঁরা যেন এমন ভাবে এই রাষ্ট্রীয় পৃথক ব্যবস্থা মেনে না নেন। ভারতের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই আজ এক হয়ে একমত ও এক পথ বেছে নিতে হবে, নতুবা বিদেশী শাসকদের মস্তিষ্ক-উদ্ভূত এই বিভেদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা যাবে না। ভারতের জাতীয় একতা ও সংহত শক্তির মূলে এই সর্বনাশা 'সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা' চিরদিনের মতো অতি নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত করবে এবং ভবিষ্যতে এই বিষে হিন্দু মুসলমান উভয়েই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন শুনিনি কথা—মহাত্মা গান্ধির এ দূরদর্শিতা ছিল না। তিনি 'না বর্জন না গ্রহণ' রূপে একে মেনে নিয়েছিলেন। তার ফলেই আজ ভারত খণ্ডিত হয়েছে এবং পাকিস্তানের উদ্ভবও সম্ভব হয়েছে।

পুণা যারবেদা জেলে বন্দী অবস্থায় গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ প্রায়োপবেশনের সংকল্প নিয়ে উপবাস শুরু করেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহাত্মা গান্ধি কবির ইঙ্গিতে সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন এই সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারায় কি বিষময় কুফল হ'তে পারে। মুসলমানদের বেলা ধর্মের পার্থক্যে

অজুহাতে যে বাঁটোয়ারা ভুল করে মেনে নেওয়া হয়েছিল, হরিজনদের বেলা তা আর মেনে নেওয়া চলে না। হরিজনরা অস্পৃশ্য হলেও তারা হিন্দু! হিন্দুদের ভিতর আবার একটা অন্তর্বিভেদের সৃষ্টি করা চতুর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শয়তানী কূটনীতি। মহাত্মা বললেন—আমার জীবিত অবস্থায় দেশের এতবড় সর্বনাশ আমি কিছুতেই হ'তে দেবনা। উপবাসক্লিষ্ট গান্ধিজীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়তে লাগলো। রবীন্দ্রনাথ অস্থির হয়ে সেই বৃদ্ধ বয়সেই ছুটেছিলেন যারবেদা জেলে—এই মৃতপ্রায় ভারতাত্মাকে স্বেচ্ছামৃত্যু থেকে রক্ষা করবার জন্য। যাবার আগে কবি তদানীন্তন ব্রিটীশ প্রাইমমিনিস্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে তারযোগে অনুরোধ জানিয়ে যান যে ভারতের এ সর্বনাশ আপনি আর করবেন না। ইতিপূর্বে যা' করেছেন তা 'ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর। দোহাই আপনাদের, দয়া করে থামুন এইখানে —আর না।

ভারতের বিরুদ্ধে বহির্জগতে যে জঘন্য মিথ্যা প্রচার করা হয় ভারতেরই অর্থে আর বিদেশীদের স্বার্থে—বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত ভি, জে প্যাটেল তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সৃষ্টি করবার আয়োজন করেন দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের মিথ্যা নিন্দা ও কুৎসা রোধ করবার জন্য এ আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে জানান। রাজনৈতিক বন্দীদের দীর্ঘকাল বিনা বিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সেদিন দেশের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত করেন রবীন্দ্রনাথ তাতেও সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়েছিলেন। অনির্দিষ্ট কাল কারাগারে বন্দী ও আন্দামানে নির্বাসিত দেশবাসীদের উপর যে পুলিশী অত্যাচার চলতো তার বিরুদ্ধে বন্দীরা 'অনাহার ধর্মঘট' ঘোষণা করাতে রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হ'য়ে তাদেরও খাদ্যগ্রহণ করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তোমরা আত্মহত্যা করে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দিওনা।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কারাগারে বন্দী অবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যু হওয়ায় কবি অতি গভীর শোকাভিভূত হ'য়ে পড়েন। 'ক্ষতি তব ক্ষতি নয়' বলে আপন মনকে ও দেশবাসীকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বিহার ভূমিকম্পের ব্যাপারে গান্ধিজী যখন বলেন যে দেশবাসীর পাপের ফলেই দেবতার অভিসম্পাতে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে—রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ মহাত্মাজীর কাছে তাঁর এই দায়িত্ববোধহীন, অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক ও নির্বোধ উক্তির জন্য দৃঢ় প্রতিবাদ করে পাঠান।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কবি বাংলার বিপ্লবী-দলের গুপ্ত হত্যার ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে 'চার অধ্যায়' উপন্যাস রচনা করেন। এই গ্রন্থে গল্পচ্ছলে কবি বলতে চেয়েছেন—এ পথে মুক্তি আসবে না। এপথ জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে শুভ ও কল্যাণকর নয়। এর ফলে কবিকে উগ্রপন্থীদের তীক্ষ্ণ সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার তদানীন্তন জবরদস্ত গভর্ণর স্যার জন এণ্ডার্সন শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে যখন বোলপুর আসেন, সাধারণ পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের দল লাট সাহেবের নিরাপত্তার জন্য এমন সব আপত্তিকর ও অসম্মানজনক ব্যবস্থা করতে হবে বলে দাবী করেন যে কবি বিরক্ত হ'য়ে সেদিন শান্তি নিকেতনের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও পরিচালকবর্গকে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে সেদিনটা শুরুলের শ্রীনিকেতনে গিয়ে কাটিয়ে আসতে বলেন। স্যার জন এণ্ডার্সন এসে জনহীন পরিত্যক্ত শান্তিনিকেতন দেখে যেতে বাধ্য হন। কবি লাটসাহেবকে জানিয়ে দেন যে এজন্য তোমার কর্তব্যে অতি-উৎসাহী পুলিশ ফোর্সই দায়ী।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে এই সময় টাউন হলে যে বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়, কবি তার সভাপতিরূপে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে কবিকে প্রধান বক্তারূপে কিছু বলবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। কবি এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে এই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অভিভাষণ দেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "মানব ধর্ম"। তিনি বিলেতে হিবার্ট লেকচারেও এই মানবধর্ম সম্বন্ধে বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ যে বাংলা ভাষায় পরীক্ষার প্রচলন হয়েছে, স্যার

আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদের পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের অক্লান্ত প্রচেষ্টা তার অনেকখানি কৃতিত্বই দাবি করতে পারে।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে কবির স্মরণীয় বক্তৃতা প্রত্যেক বাঙালীর অন্তরে নববল ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বীরভূম সিউড়িতে কবি বাংলার কৃষি শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং বাঁকুড়ায় মাতৃ মঙ্গল ও শিশু কল্যাণ আশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর ভবন উদ্বোধন করেন। জাতির উন্নতিকর যে কোনও গ্রামা-প্রচেষ্টায় কবির সহানুভূতি ছিল গভীর ও অকৃত্রিম। দেশের কাজে তাঁর কোনও দিনই ক্লান্তি দেখা যায় নি!

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কবির একাশিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে কবি দেশবাসীর কাছে "সভ্যতার সংকট" নামে যে তাঁর শেষ বাণী দিয়ে যান তাতে দেশের ভবিষ্যৎ ও ইংরাজ শাসকদের পরিণাম তিনি যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়ে সকলের নিকট প্রকাশ করে বলেছিলেন। এরই কিছু-দিন পরে ব্রিটীশ পার্লিয়ামেন্টের মহিলা সদস্যা মিস্ র‍্যাথবোন ভারতবাসীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ না-দেওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করে সংবাদপত্রে এক খোলা চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেন ব্রিটেন ভারতের যে প্রভূত উপকার করেছে তারপর যুদ্ধে যোগ না-দেওয়া বা সাহায্য না-করাটা ভারতবাসীর পক্ষে কৃতঘ্নতা ও অকৃতজ্ঞতা। রোগ-শয্যা থেকে রবীন্দ্রনাথ জাতির মুখ-পাত্র স্বরূপ অতি কঠোর ভাষায় এই উদ্ধত মহিলার অপরিমেয় ধৃষ্টতার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। স্বদেশের প্রতি তাঁর এই শেষ কর্তব্য পালন করে কবি চিরদিনের মতো অনন্তনিদ্রার কোলে শান্তিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন।

উপসংহারে এই কথাটি শুধু নিবেদন করবো যে রবীন্দ্র-নাথ কেবলমাত্র ভারত-প্রেমিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক। নিখিল মানব জাতির প্রতি ছিল তাঁর অসীম সহানুভূতি ও প্রীতি। তিনি এই মাটির জগৎকে ভালবেসেছিলেন। এর প্রভাত, এর সন্ধ্যা, এর আকাশ-বাতাস, নদনদী, বন, এর পর্বত শিখর, গিরি, নির্ঝরিণী, এর ফুল ফল তরু তৃণ সব কিছুকেই কবি প্রাণ দিয়ে ভাল-বেসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

পৃথিবীর দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি বলেছেন—

"শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে
সমস্ত প্রাণ কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখি জলে!
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা
লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা
সুন্দর ধরাতলে!"

কবি বলেছিলেন "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
"অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।"

এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমায় অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়।

তিনি বার বার এই জগতেই ফিরে এসে জন্মগ্রহণ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—

…ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান রবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন!

পদ্মার তীরে বসে কবি বলেছেন'

"—কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে

*　　*　　*

জন্মান্তরে শতবার যে নির্জন তীরে
গোপনে হৃদয় মম আসিত বাহিরে
আরবার সেই তীরে সে সন্ধ্যা বেলায়
হবে না কি দেখা-শুনা তোমায় আমায়?"

ভগবানের উদ্দেশ্যে তিনি শেষ নিবেদন জানিয়েছেন—

"সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে
সেই ঘরে রব—সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রেখে দিয়ো তার একটি দুয়ার খুলিয়া।"

শেষ

বহুবাজার শিশুহত্যা মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এর পর সহকারী অফিসারকে যথাযথ উপদেশ দিয়ে আমি ডাক্তার প্যাটেলকে নিয়ে তাঁর বাড়ী এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ঐ বাড়ীর দ্বিতলে গিয়ে ঐ নিহতমনা শিশুর মাতার নিকট উপস্থিত হতে সাহসী হইনি। এই দিন ঐ হতভাগিনী শোকাতুরা মাতাকে শোনাবার মত কোনও সান্ত্বনার বাণী ছিল না। অকারণে তাঁকে ত্যক্ত না করে আমি আসামীর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হলাম। এই পাড়ায় একে ওকে জিজ্ঞাসা করার পর আসামীর দু'জন যুবক বন্ধুকেও আমি খুঁজে বার করতে পেরেছিলাম। এদের একজন আসামীকে চেনে বলে অস্বীকার করলেও—অপরজন এতোখানি মিথ্যা বলতে সাহসী হয় নি। সে বরং উভয়কেই তার বন্ধু ব'লে স্বীকার করেছিল। এরপর আসামীর এই বন্ধু দুইটিকে পরস্পরের সহিত পরস্পরের মুকাবালা করালে উভয়েই বেকায়দায় পড়ে সত্য কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল। এই সম্পর্কে তাদের বিবৃতির সারাংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"এইখানেই ঐ আসামীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। এই আলাপ পরবর্তীকালে অন্তরঙ্গ বন্ধুতায় পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। হাঁ, আমরা স্বীকার করছি যে মধ্যে মধ্যে তার মনটা খারাপ হলে সে আমাদের সঙ্গে এখানে ওখানে গিয়েছে। সেইসব অস্থানে ও কুস্থানে আমরা তার পয়সায় আনন্দ করেছি, কিন্তু সে নিজে এইসব বিষয়ে নির্লিপ্ত থেকেছে। আজ্ঞে, না, আমরা নিজেরা মন্দ হলেও তার সম্বন্ধে এমন মন্দ কথা আমরা বলবো না। আজ্ঞে হাঁ, তাকে নিয়ে আমরা পাঁচ ছয়জন রূপজীবিনীর কক্ষে গিয়েছিলাম। সে তাদের সঙ্গে আলাপ করলেও কোনও অসৎ কার্য কোনও দিনই করে নি। তার এই চরিত্রের দৃঢ়তায় আমাদের ন্যায় ঐ সকল রূপ-জীবিনীরাও কতবার বিরক্তি প্রকাশ করেছে। আজ্ঞে হাঁ, আমরা আপনাকে ঐ সকল স্ত্রীলোকদের বাড়ীগুলি এখুনি দেখিয়ে দিতে পারবো।"

এদের এই বিবৃতিটির সূত্র ধরে ঐ সকল রূপজীবিনীর বাটীগুলি আমি একবার তল্লাস করে দেখবো ঠিক করলাম। আহত অবস্থায় ঐ শিশুটিকে ঐরূপ এক পরিচিতা রূপজীবিনীর বাটীতে আসামীর পক্ষে লুকিয়ে রাখাও অসম্ভব ছিল না। আমি তৎক্ষণাৎ এই যুবকদের সঙ্গে করে ঐ সকল নারীর ডেরাগু'লিতে হানা দিলাম, কিন্তু সেখান হতে এই খুন বা অপহরণ সম্বন্ধে কোনও সুখবর পাওয়া গেলো না। আমি নানাভাবে জেরা করে জানলাম—যে আসামী তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বহুবার ঐ সকল নটীর কক্ষে এসেছে। কিন্তু প্রতিবারেই কুভাবে কখনও সে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে নি। তার বন্ধুবান্ধবরা তাদের সঙ্গে অসৎ আচরণ করলেও সে সব সময়েই তাদের 'বহিন' বলে সম্বোধন করে দূরে দূরে থেকেছে। বন্ধুবান্ধবরা ঐ সকল কুলটা নারীদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে নিরত থাকার সময় আসামী (অভিযুক্ত ব্যক্তি) সম্মুখের বারান্দায় কিংবা নীচের রাজপথে পায়চারি করেছে। তাদের এই-সব হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে সে কখনও যোগ দেয় নি। আমি আরও জানতে পারি যে এইসব স্ফূর্তিবাজ ছোকরারা আসামীর রোজগারের পয়সাতেই এইখানে নবাবী করতে আসতো।

আসামীর চরিত্রের এই বিশেষ দিকটা সম্বন্ধে আমার বৈজ্ঞানিক মন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়েছিল। পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করার পূর্বে (এম, এস-সি, পাশ করার পর) আমি বিশ্ববিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিত ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর এ্যবনরম্যাল সাইকোলজি সম্পর্কে কিছুকাল গবেষণা করেছিলাম। এই সময় অধ্যাপক ডাঃ বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান অধিকর্তা ছিলেন। এই জন্য সুবিধা মত ইতিপূর্বেও এমনি

অদ্ভুতমনা কয়েকটি অপরাধীকে তাঁর ল্যাবরেটারিতে এনে আমি পরীক্ষা করিয়েছি। এই সময় পুলিশের মধ্যে একমাত্র আমিই এই ধরণের অপরাধীদের সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলাম। কিন্তু এই বিষয়টি এমনই জটিলতর এবং বিশেষজ্ঞগ্রাহ্য ছিল যে [তৎকালীন পুলিশী প্রচলিত জ্ঞান গরিমার পরিপ্রেক্ষিতে] আমি এই অপরাধীকে একজন অপরাধ-রোগী রূপে বুঝেও এই সম্বন্ধে উর্দ্ধতন অফিসারদের বোঝাতে সাহসী হচ্ছিলাম না। তবুও আমি যতটা পারি নিজেই অপরের অলক্ষ্যে এই সম্বন্ধে সাধ্যমত সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহার্থে সচেষ্ট হলাম। এই জন্য আমি এই সকল রূপজীবিনী নারীর নিকট হতে আরও বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলাম। আমি এখানকার মেয়েদের এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা প্রায় সকলেই হেসে ফেটে পড়ে অনিমা নামে একটি মেয়েকে আসামীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে বললো। তাদের সকলেরই মতে এই অনিমার সঙ্গেই নাকি আসামীর খুব ভাব ছিল। এদের মতে আসামীর সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ শুধু এই অনিমারই ছিল। এইজন্য আমার মনে হলো এই মেয়েটিকে একটু পীড়াপীড়ি করলে সুফল ফলবে। এদের মধ্যে এই অনিমা ছিলেন একটি সুচতুরা ও সুন্দরী নারী। তাঁর সঙ্গে আসামীর নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে একটু মাত্রও উল্লেখ না করে তাঁকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করি এবং তিনি এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তরও দিয়েছিলেন। এইসব প্রশ্নোত্তরগুলি নিয়ে আমি উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—আচ্ছা, বলুন তো সে কি বারে বারে বা প্রত্যহই আপনাদের ডেরাতে আনাগোনা করেছে, না কেবলমাত্র কদাচিৎ সে আপনাদের নিকট এসেছে, বসেছে ও কথা বলেছে। তা'ছাড়া বন্ধুবান্ধবদের না নিয়ে মাত্র একাকী সে কখনও আপনাদের কারুর ঘরে এসেছে কিনা—তাও আপনাকে একটু চেষ্টা করে মনে করে আমাকে জানাতে হবে।

উঃ—আজ্ঞে সে এখানে এলে আমার সঙ্গে দেখা না করে কখনও আমাদের বাড়ী ত্যাগ করেনি। আমার ঘরে এসে আমার খোঁজ খবর না করে এখানকার অন্য কোনও নারীর সঙ্গে সে কথোপকথনও করেনি। এমন কি আমার ঘরে অন্য কোনও অতিথি থাকলে সে বন্ধুবান্ধবদের এখানে রেখে তাদের মানা সত্ত্বেও এ বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে। এই জন্য একমাত্র আমিই তার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে সমাচার আপনাকে জানাতে পারবো। আমাদের এই বাড়ীটিতে দুতলায় বারোটি ঘরে আমরা বারোজন মেয়ে পেশা করি। অনেকের মতে এদের মধ্যে আমি লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি এবং আমাদের এই অর্থকরী পেশার সহিত সম্পর্ক-রহিতভাবে ভদ্র-সন্তানদের সঙ্গে মেলামেশা ও সংলাপ প্রভৃতি করে থাকি। অন্য মেয়েদের মত প্রতিটি ব্যাপারে আমি কখনও কেনা-বেচা বা লেন-দেনের প্রশ্ন তুলি নি। সেই জন্য আপনাদের এই আসামীটিকে আমার ভালো করে বুঝবার ও জানবার সুযোগ হয়েছিল। বহুবার সে আমার ঘরে এসে আমাকে 'বহিন' বলে সম্বোধন করে আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। এই রকম ভাইবোনের সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা স্বভাবতই অভ্যস্ত নই। এতে আমাদের স্বাভাবিক পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে এতে আমরা প্রশ্রয়ও দিই না। আমাদের মধ্যে এমন মেয়েও আছে—যারা ওই সকল সম্বোধন এইখানে শুনলে ওটাকে ঠাট্টা মনে করে। কেহ কেহ আবার এতে নিজেদের অপমানিত মনে করে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। পেশাজনোচিত কামনার উন্মাদনা পুরুষঅতিথিদের মনে উদ্রেক করতে না পারা আমাদের অকৃতিত্বের পরিচায়ক বলে এখানে বিবেচিত হয়। এইরূপ এক অক্ষমতার গ্লানি আমাদের বরং উত্যক্ত করে তুলে। এই কারণে অন্য নারীদের ঐ যুবক 'বহিন' বলে সম্বোধন করা মাত্রই তারা হেসে গড়িয়ে পড়েছে, কিংবা দূর দূর করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঐরূপ কদর্য ব্যবহার তার সঙ্গে আমি কোনও দিনই করি নি।

প্রঃ—ঐখানকার অপর নারীদের ন্যায় আপনিও তো একজন রূপজীবিনী নারী। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে বা টিকে থাকতে হলে তাদের মত আপনাকেও পয়সা রোজগার করতে হবে। আপনিও তো ওদের মত রোজ আনেন ও রোজ খান। একদিন উপায় করতে না পারলে তাদের মত আপনাকেও তো সেইদিন অনাহারে থাকতে হবে। তবে কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে

আপনি বিনা স্বার্থে এই একটা লোককে আস্কারা দিয়ে (উদ্দেশ্যহীনভাবে) নিজের ভাতভিত্তি সম্পর্কিত ব্যবসা অকারণে নষ্ট করতেন ?

উঃ—আপনি মশাই মাত্র একটা বিষয়ে ভাবছেন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমাদের পেশার বাইরেও একটা পৃথক সত্তা আছে। এইজন্য এখানকার মেয়েরা কাউকে কাউকে ভালোবেসেও ফেলে। এইক্ষেত্রে এরা শুধু তাদের ভরণপোষণ করে না, তাদের অকথ্য অত্যাচারও তারা সহ্য করে থাকে। একজন পুরাতন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার হিসেবে এই অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আপনার আছে। কিন্তু মনের এই যৌনজ ভালোবাসা বা প্রেম ছাড়া আরও বহু ভালোমন্দ বৃত্তি বা গুণাগুণও আমাদের মধ্যে কি থাকতে পারেনা ? চেয়ে দেখুন আপনি আমার দিকে ভালো করে। আমি এখন কোনও রঙিণ শাড়ী পরে আপনার সঙ্গে কথা কইছি না। এতক্ষণ নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্য করেন নি যে আমার পরণে শুধু একটা তসরের কাপড়। একটু আগে আমি আমার গৃহ দেবতারূপ আরাধ্য বিগ্রহের পূজা করছিলাম। আপনার ডাকে এই ঘরে এসেছি। আমাদের অতিথিরা [পোষকরা] ঈশ্বরকে ভুললেও আমরা তাঁকে আজও ভুলিনি। তাঁর কাছে আমরা অনেকেই প্রার্থনা করে থাকি যে তিনি যেন পরজন্মে আর আমাদের এই পাঁকের মধ্যে ও আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ না করেন। এইজন্য আজও আমাদের পাড়ার অলিতে গলিতে আমরা চাঁদা করে বারোয়ারী পূজাআচ্ছার ব্যবস্থা করে থাকি।

এতক্ষণে আমি মুগ্ধ নয়নে সদ্যস্নাতা কাষায়-বস্ত্র-পরিহিতা এই মহিমময়ী নারী মূর্তির দিকে চেয়ে দেখলাম। তিনি যে একজন সামান্যা বারবণিতা—আমার মন যেন তা এখন বিশ্বাস করতে চায় না। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে আমার আজন্ম সংস্কারসম্ভূত চিত্ত-প্রস্তুতি তাঁর চরিত্রের এই মহৎ দিকটি উপলব্ধি করার ব্যাপারে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক হয়েছিল। এরপর আমি সশ্রদ্ধভাবে তাঁকে এই সম্পর্কে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি প্রদান করেছিলেন :—

"আমি কতোদিন অবাক হয়ে ভেবেছি যে এই লোকটি কতো বদ্ ও চরিত্রহীন বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের বাড়ী এসে আমাদের সকলকেই 'বহিন' বলে সম্বোধন করে কেন ? তার মুখে এই 'বহিন' শব্দ শুনে এখানকার মেয়েরা অপমান করে তাকে ঘর হতে বার করে দিয়েছে। আমি কিন্তু সব সময়েই তাকে ভাইরূপে গ্রহণ করে তার বোনের-সাধ মিটিয়েছি। এইজন্য ও এখানে এলে অন্য মেয়েদের মতন আমি ওদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড়ে যোগ দিতে পারি নি। ভাই-এর সামনে কি বোনেরা এইসব অকায কুকায করতে পারে ? তাই অন্য মেয়েরা ওর চরিত্রহীন বন্ধুদের সঙ্গে পাশের ঘরে দাপাদাপি শুরু করা মাত্র আমরা দুই ভাইবোন ওখান থেকে আমার ঘরে চলে এসে নিজেদের সুখদুঃখের গল্প করেছি। আমার বিশ্বাস ওর কোথায় যেন একটা বিরাট ক্ষোভ কিংবা ব্যথা আছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রায়ই সে অন্যমনস্ক হয়ে যেতো। আমি প্রায়ই তাকে বিমর্ষ ও চিন্তারত থাকতে দেখেছি। আমি লক্ষ্য করেছি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তার মুখে চোখে ফুটে উঠছে। সে প্রায়ই আমাকে বলতো যে সে বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে। অসহায়ভাবে কি যেন সে আমাকে বলতে চাইতো, কিন্তু বলি বলি করেও তা সে বলতে পারতো না। আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করা মাত্র সে অপেক্ষা না করে আমাদের বাটী থেকে বার হয়ে গিয়েছে। এখানকার মেয়েদের ধারণা আমাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মেছে। আমার ব্যবসার ক্ষতি করে তার সঙ্গে অসময়ে গল্প করার জন্যে তারা এইরূপ ভেবে থাকবে। কিন্তু আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, বড়বাবু! আমাদের মধ্যে ঐরূপ কোনও ভালবাসা আদপেই নেই। ওর জন্যে আমার দয়া ও মায়া হতো মাত্র। অসময়ে এসে আমাদের সঙ্গে গাল-গল্প করলে আমাদের পেশার ক্ষতি হয়। কিন্তু এই সহজ সত্যটুকু সে বুঝেও বুঝতে পারতো না। একে আমার ঘরে দেখে আমার কতো বাবু ফিরে গেছে। এজন্য মধ্যে মধ্যে আমি এর উপর বিরক্তও হয়েছি। কিন্তু এজন্য তাকে আমি কখনও অপমান করি নি।"

এই রূপজীবিনী নারীর এই বিবৃতি বিশ্বাস করবো কিংবা করবো না, এই সময় তা আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এমন সময় আমি লক্ষ্য করলাম তার

মাথার সিঁথিতে লাল টকটকে সিঁদুর। এজন্য আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তাঁই যদি সত্য হয় তো আপনার মাথায় নিষেধের লাল নিশান কেন? আপনি কি আগে থেকেই বিবাহিতা ছিলেন, না সম্প্রতি কাউকে আপনি বিয়েই করে ফেলেছেন?'

এই রূপজীবিনী মেয়েটি আমার এই প্রশ্ন শুনে একটু হাসলেন মাত্র। কিন্তু এই হাসির মধ্যে ভয় বা লজ্জা ছিল না, ছিল শুধু তাতে বিস্ময়। সমাজ-বিজ্ঞানে আমার মত অভিজ্ঞ অফিসারের এই অজ্ঞতা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। আরও একটু সলজ্জ হাসি হেসে নিয়ে তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন—এইসব লাইনের ভিতরের খবর তো আপনাদের জানবার দরকার হয় না। আসলে যে দিন যে লোক আমাদের ঘরে আসে, তার কল্যাণের জন্য তার নাম করে সেইদিন আমরা সিঁথিতে সিঁদুর দিই। আজকে সন্ধ্যায় আমার ঘরে একজন অতিথি আসবার কথা আছে। আপনাদের চেনা বড় ঘরের একজন মানী লোক। দয়া করে তাঁর নাম আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। এখুনি তিনি এখানে এসে পড়তে পারেন। এসে আপনাকে দেখলে তিনি বড্ড লজ্জা পাবেন। আপনি দয়া করে এখন আমাকে রেহাই দিলে খুব কৃতজ্ঞ থাকবো।'

এই রূপজীবিনী মেয়েটির এই বিবৃতিটুকু লিপিবদ্ধ করে অবাক হয়ে আমি ভেবেছিলাম—হায় রে! এরা প্রতিদিন এদের ওই সব ক্ষণস্থায়ী দৈনিক বন্ধুদের কল্যাণের কথা ভেবে তাদের মঙ্গল কামনা করে সিঁথিতে সিঁদুর পরে। কিন্তু তাদের এই সব ধনী, শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সাময়িক স্বামীরা কি কোনও দিন তাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেছে? পরবর্তী কালে আমি এইসব লোকেদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী নাগরিক রূপে দেখেছি। এঁদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের বহু দায়িত্বপূর্ণ পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের এই সব অমূল্য সামাজিক অভিজ্ঞতা দেশের কল্যাণ কামনায় নিযুক্ত হলো না কেন? ঘটনাচক্রে এখন তাঁরা কি ভালো ও সৎ হয়ে গিয়েছেন? তাঁদের বিগত দিনের চরিত্রহীনতার জন্য এঁরা কি এখন অনুতপ্ত? আজ কি তাঁরা এইসব নারীদের অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন? তাই সমাজের কল্যাণের জন্য এদের উদ্ধার করতে তাঁরা এখন নিশ্চেষ্ট। কিন্তু একদিন তো এরা তাঁদের একটুকুও আনন্দদান করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এজন্য তাঁদের কৃতজ্ঞতা নেই কেন? এই 'কেন'র উত্তর তাদের কাছে আজও আমি পাই নি। যা হোক এদের নিকট আমার যেটুকু জানবার তা জানা হয়ে গিয়েছে। এখন অকারণে তাঁদের পেশার কোনও ক্ষতি করার আমার ইচ্ছে ছিল না। তবে ভবিষ্যতে এই মেয়েটি এই খুনের তদন্তে আমাদের সাহায্য করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস হলো। এই মেয়েটি যে আসামীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। তাকে প্রয়োজন মত এই ব্যাপারে কাজে লাগাবার ইচ্ছে মনে মনে পোষণ করে আমি প্রফুল্ল মনে থানায় ফিরে এলাম।

থানায় ফিরে এসে ডাঃ প্যাটেলকে ডাকিয়ে জেরা করে প্রকৃত তথ্য জানতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাঁর নিকট হতে নূতন কোনও তথ্য আর সংগ্রহ করা গেলো না। অগত্যা পরদিন তাঁর বাড়ীতে তদন্ত করবো ব'লে তাঁকে বিদায় দিয়ে অপরাধীকে নিয়ে পড়লাম। কিন্তু এদিকে অপরাধীও আর আমাদের কোনও নূতন কাহিনী শুনাতে চায় না। এমন কি সে তার স্বীকৃতিমূলক বিবৃতিতে উল্লেখিত রিক্সা-চালক, ট্যাক্সিওয়ালা, মনোহারী দোকানী প্রভৃতিকে দেখিয়ে দিতেও সে এখন নারাজ। মনে মনে প্রমাদ গুণে ভাবলাম যে লোহা গরম থাকতে থাকতেই তাতে ঘা মারা উচিত ছিল। প্রথম দিনে যখন সে আমাদের বারাকপুরের মাঠে নিয়ে যায় সেইদিন বা তার পরদিনই এই সকল কার্য শেষ করে ফেললে আমাদের এমন বিপাকে পড়তে হতো না। অবশ্য আমাদের পক্ষে ঐ সকল সাক্ষীকে চেষ্টা করে খুঁজে বার করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সেইরূপ ক্ষেত্রে আসামীকে তার অনুরূপ আকৃতির ও পরিচ্ছদের কয়জন ব্যক্তির সহিত মিশিয়ে—মিছিল-সনাক্তি করণের ব্যবস্থা করতে হোত। এই ব্যবস্থায় একজন হাকিমের সম্মুখে সাক্ষীদের দ্বারা আসামীকে আইনানুযায়ী সনাক্তিকৃত করাতে হয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে করে আসামী এই সকল সাক্ষীকে খুঁজে বার করে তাদের পর পর আমাদের দেখিয়ে দিলে এই সব মিছিল-সনাক্তি করণের ঝক্কি আমাদের পোয়াতে হতো না। এই জন্য আমরা শেষোক্ত সহজ

পন্থারই পক্ষপাতী ছিলাম। যাইহোক পরবর্তী এক দুর্বল মুহূর্তে আসামীর মন ঘুরে যাওয়া বা তাকে ঘুরিয়ে আনা অসম্ভব হবে না। এইরূপ সাত পাঁচ ভেবে মনকে আর ভারাক্রান্ত না করে আমি আসামীকে তার জন্য নির্দিষ্ট হাজত ঘরে পুরে দিয়ে ঘুমাবার জন্য উপরের কোআর্টারে উঠে গেলাম।

পরদিন প্রত্যূষে থানায় নেমে অফিসের চেয়ারে এসে বসা মাত্র প্রথমেই মনে পড়ে গেল—ডাঃ প্যাটেলের সেই বালিকা-বধূ তথা নিহতমন্য শিশুটির মাতাকে। ঐ বালিকা মাতার হৃদয়ভেদী আর্তনাদ যেন থেকে থেকে আমার কানের পর্দায় বেজে উঠছে। পূর্বদিন সে আমাদের দেখে ঘরের মেঝের উপর আছড়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তাই তাকে ঐ দিন এই মামলা সম্পর্কে কোনও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয় নি। আজকে ডাঃ প্যাটেলের বাটী গিয়ে তার বিবৃতিটুকু আমার লিপিবদ্ধ করে নেবার কথা ছিল। কিন্তু গত রাত্রে তার উদ্বেলিত মাতৃ-হৃদয় কি তাকে ঘুমাতে দিতে পেরেছে? সারারাত না ঘুমিয়ে এতক্ষণে বোধ হয় সে ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে। তাদের বাড়ীতে ঐ নিহতমন্য শিশুর মাত্র একটাই এন্‌লার্জড্ ফটো ছিল। ঐ ফটোটা পর্যন্ত তো আমার সহকারী তদন্তের সুবিধের জন্য তাদের বাড়ী থেকে থানায় এনেছে। ঐ ছবিটা বাড়ীতে থাকলে হয়তো তা দেখে সে সান্ত্বনা পেতো, না তার মাতৃ-হৃদয় শোকে পূর্ণ হয়ে উঠতো? একবার মনে হলো, ফটোটা ওদের বাড়ী থেকে সরিয়ে এনে আমি ভালোই করেছি। কিন্তু তার মাতৃ-হৃদয়ে যে ফটোটি অঙ্কিত হয়ে রয়েছে তা কি কেউ কোনও দিনই সরিয়ে নিতে পারবে? না না না, কেন সে এই প্রথম সন্তানকে ভুলতে পারবে না? নিশ্চয়ই একদিন সে এই বিরাট ধ্বংসের বার্তা ভুলে নূতনতর সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠবে। তার মন তখন অতীত ভুলে বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত হবে। সে তখন পিছনে না তাকিয়ে সামনের দিকে শুধু এগুতে চাইবে। পরবর্তী কালে আর একটি সন্তানের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সে হয়তো ভাববে যে তার হারানো নিধিই এতদিন পরে তার কোলে আবার ফিরে এসেছে। সেই একই প্রকার 'মা মা' ডাক শুনে সে তার সকল অতীত নিঃশেষে একদিন ভুলে যাবে। কিন্তু প্রথম প্রেমের মত প্রথম সন্তানের স্মৃতি কি ভুলা সম্ভব? আরে, একি? একি পাপ চিন্তা আমার মনে আসলো। না না, ঐ নিষ্ঠুর আসামীকে মিসেস প্যাটেল কোনওদিনই ভালোবাসেনি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! পুলিশের কাজ করে করে আমার মন নিম্নগামী হয়ে গিয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস হলো যে আসামী ঐ সতী-সাধ্বী মহিমময়ী নারীর বিরুদ্ধে যত সব মিথ্যে কথাই বলেছে। ঘুমের আমেজ ও গত রাত্রের দুঃখময় স্মৃতি তখনও পর্যন্ত আমার মন হতে বিদায় নেয়নি। চোখ রগড়াতে রগড়াতে চিন্তার রাজ্য হতে ফিরে এসে আমি লক্ষ্য করলাম—আমার সহকারী সুরেনবাবু সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন করে বলছেন—'গুড্ মর্নিং স্যার।'

এই সব আজে বাজে চিন্তাকে এতক্ষণ ধরে মনের মধ্যে অকারণে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে লজ্জিত হয়ে উঠে সহকারীকে অভিবাদন করে আমি বলে উঠলাম, 'আরে তুমি? গুড্ মর্নিং—এসো, বসো। এই খুনের মামলাটা সম্বন্ধে পরামর্শ করা দরকার।'

সহকারী সুরেনবাবু আমার উপদেশ মত সম্মুখের একটি চেয়ারে বসে পড়লেন। তিনি এই খুন সম্বন্ধে অন্য একটা কি বিষয় অবতারণা করতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর একটি প্রয়োজনীয় সংবাদ মনে পড়ে গেল। আপন বক্তব্য আর না পেশ করে তিনি আমাকে জানালেন 'স্যার! একটা জরুরী খবর আপনাকে দিতে ভুলে গিয়েছি। কাল আপনি এই তদন্তে বার হয়ে যাবার পর সন্ধ্যার দিকে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে ইনেস্‌পেক্‌টার রায় সাহেব সত্যেন মুখার্জি [ইনি পরে রায় বাহাদুর ও ডেপুটি কমিশনার হয়েছিলেন] এসেছিলেন। কলিকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ্ ডিপার্টমেণ্টের তরফ থেকে তিনি আমাদের এই অদ্ভুত খুনের তদন্তে সাহায্য করবেন। তিনি বলে গেলেন যে তিনি আজ সকাল আটটায় আবার আসবেন। আপনাকে এই সময় থানায় উপস্থিত থাকবার জন্যে তিনি অনুরোধ করে গেছেন।'

সাধারণত সাংঘাতিক মামলার তদন্তে গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞরূপে বিবেচিত হয়ে থাকেন। কিন্তু এই বিষয়ে আমি কোনদিনই একমত হতে পারিনি। আমার মতে এই বিড়ালই [গৃহস্থ বাড়ীর]

বনে গিয়ে বনবিড়াল হয়ে উঠে। এদের উভয়ের মধ্যে কোনও তফাৎ না থাকবারই কথা। থানা হতে অফিসাররা বদলী হয়ে গোয়েন্দা বিভাগে বহাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক্সপার্ট হন। আবার গোয়েন্দা বিভাগ হতে বদলী হয়ে থানায় এলে তাঁর এক্সপার্টত্ব ঘুচে যায়। কিন্তু রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জির সম্বন্ধে এ' কথা বলা চলে না। এরূপ একজন সুদক্ষ পুলিশ অফিসার আজও পর্যন্ত কল্পনা করাও যায়না। [মাত্র দুই বৎসর পূর্বে ১৯৫৯ সালে ভারতীয় পুলিশের প্রতিটি খেতাব, ডেকরেশন ও পদমর্যাদাসহ ইনি বিদায় গ্রহণ করেন।] সৌভাগ্যক্রমে এঁর কাছেই আমি পুলিশী কার্য প্রথম শিক্ষা করি। এঁকে এই খুনের তদন্তে কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করেছেন শুনে বরং আমি আশান্বিত হয়ে উঠলাম। ভদ্রলোক পুলিশী কার্যকে শুধু চাকুরী হিসাবে গ্রহণ করেননি। পুলিশী কার্যকে একটি প্রোফেশন বা পেশারূপেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্য তাঁর মধ্যে বহু সহজাত বুদ্ধি [instinct] বা প্রেরণা উদ্ভুত হতে আমি দেখেছি। প্রত্যেক প্রফেশন বা পেশার ব্যক্তিরা এরূপ বহু পেশাগত বা প্রফেশন্যাল ইনিষ্টিংট অর্জন করে থাকেন। দক্ষ উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি লোকেদের অনেকে তাঁদের স্ব স্ব প্রফেশন বা পেশার ক্ষেত্রে এইরূপ সহজাত প্রেরণা লাভ করেছেন। এমন অনেক ডাক্তার আছেন যাঁরা দূর হতে রোগীর চেহারা দেখে বলে দিতে পারেন যে তার রোগ কি? পরে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরীক্ষার পর তাঁর ঐ অভিমত সত্যরূপে প্রমাণিত হয়েছে। আমি জনৈক ফুল-বিক্রেতাকে জানি যিনি ক্রেতাকে দেখে সে ফুল কিনবে কি না এবং কিনলেও তার জন্য কত দাম দেবে তা পূর্বাহ্নেই বলে দিতে পেরেছেন। রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি ছিলেন এইরূপ এক সহজাত প্রেরণার অধিকারী। দশ বারো জন সন্দেহমান গৃহ-ভৃত্যকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করলে তিনি অনায়াসে বলে দিয়েছেন যে ওদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ বাড়ীতে ঐ দিন চুরি করেছে। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি মাত্র এই বলেছেন যে তাঁর মন বলছে তাই। পরে তাঁর এই মতামত সত্য রূপে আমি প্রমাণিত হতে দেখেছি। খুব সম্ভবত মানুষের মনের চিন্তা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে তাদের মুখের চেহারায় ধরা পড়ে। এইসব পরিবর্তন এতো সূক্ষ্ম যে তা ডেস্‌ক্রাইব করা যায় না। এই পরিবর্তন তার সূক্ষ্মতার কারণে কেবল মাত্র অনুভব করা যায়। এই জন্য লোকের মুখে প্রস্ফুটিত এই মূক ভাষা কেবল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বুঝতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি ছিলেন একজন জাত-পুলিশ বা স্বভাব পুলিশ। দুই পুরুষ যাবৎ তাঁরা কলকাতা শহরে নাম করা পুলিশ অফিসার। এঁর পিতা রায়সাহেব বৈদ্যনাথ মুখার্জিও কলিকাতা পুলিশের একজন প্রাক্তন অ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার ছিলেন। আমি অধীর আগ্রহে অফিস ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে আটটা প্রায় বাজে বাজে। হঠাৎ শুনলাম থানার ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজতে শুরু করেছে। শেষ ঘণ্টাটি বাজার সঙ্গে সঙ্গে রায়বাহাদুর সত্যেনবাবু অফিস ঘরে ঢুকে পড়লেন। [ক্রমশঃ)

একটি ট্রিওলেট কবিতা

সনতকুমার মিত্র

সমুদ্রের ঢেউ অন্তহীন, দিন, রাত, তারাও, এবং
উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যু, জীব-জীবাণুর সীমাহীন সাধ,
ইচ্ছা-আশা-কল্পনার পরে, সাত নয়, সংখ্যাহীন রং
নিয়ত ওঠে ও পড়ে; তাই পৃথিবীতে নিয়ত বিবাদ।
সমুদ্রের ঢেউ অন্তহীন, দিন, রাত, তারাও, এবং
উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যু, জীব-জীবাণুর সীমাহীন সাধ,
তাই মৃত্যু যতবার মোছে, ততবার জীবনের রং
জয়ী হয়; পৃথিবীতে তাই জীবনেই অমৃতের স্বাদ।
সমুদ্রের ঢেউ অন্তহীন, দিন, রাত, তারাও, এবং
উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যু, জীব-জীবাণুর সীমাহীন সাধ,
সব ছবি মুছে যায়, থাকে, একমাত্র কৌতুকের রং;
কি বিস্ময় সীমাহীন তৃষ্ণা বাদ দিলে সব যায় বাদ!

এভিয়ান বৈঠক : আলজেরিয়ার ভবিষ্যৎ

অনাদিনাথ পাল

রাতারাতি নামডাক। বিলাতের এক কবি-কাহিনীর মতো। এমনি ভাগ্য হালের এভিয়ানের। বাইরের জগতে কেন, খোদ ফ্রান্সের গুটিকয় স্বাস্থ্যান্বেষী ছাড়া খুব কম লোকই এর নামধাম জানে। ভূগোলের কোন্ বিন্দুতে এর স্থিতি, ধরা কঠিন; ইতিহাসের কোন মোড় এখানে নিয়েছে কিনা, তা' গবেষণার বিষয়। তবে এখানে যে-নতুন ইতিহাস রচনা হতে যাচ্ছে, তা' হয়ত জোর গলায় (ভবিষ্যৎ বলা নিরাপদ না হ'লেও) বলা যেতে পারবে। যেহেতু এখানে নয়া আলজেরিয়ার পত্তন হয়ত হবে। তাই বহু প্রতীক্ষার পর বহু প্রত্যাশা করে এখানে ফরাসী ও আলজেরীয় বিপ্লবী সংস্থার প্রতিনিধিরা মিলিত হয়েছেন। তারিখটা এর ২০শে মে। কাজেই বিশ্বময় গিয়েছে এর নাম ছড়িয়ে।

* * *

ভালোয় ভালোয় যদি বৈঠক শেষ হয় তবে তা'র পরিণামফল হবে দূরপ্রসারী। ফ্রান্সের পক্ষে তা' শুভ, আলজেরিয়ারও। কেননা, গত সাত বছর ধরে আলজেরিয়ার যে-একটানা হিংস্র অসম লড়াই ও রক্তস্নান চলছে, তা'র অবসান পৃথিবীতে একটা মহত্তম ঘটনার সূচকচিহ্ন হবে। একদিকে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্ষাত্রশক্তি, আণবিক শক্তির অধিকারী পরাক্রান্ত ফ্রান্স, অন্যদিকে একটা নিঃসম্বল অসহায় দাস জাতি। পাথেয় শুধু তা'র অজেয় মনোবল, আর যেকোন মূল্যের বিনিময়ে মুক্তির স্পর্ধা। আর ভরসা ইতিহাসের শিক্ষা—এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন কতগুলো দেশের দৃষ্টান্ত ও নৈতিক সমর্থন।

* * *

উপনিবেশবাদী আর দু'দশটি দেশের মতো ফ্রান্সেরও আশা ছিল, একটা নিরস্ত্র গরীব গোবেচারা ও অনুন্নত জাতকে হুমকি আর পিটুনীতে বশে রাখা যাবে। কিন্তু

অস্থায়ী আলজেরীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী ফারহাত আব্বাস

অস্থায়ী আলজেরীয় সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী বেন বেলা; বর্তমানে ফরাসী কারাগারে বন্দী।

ইতিহাসের অনিবার্য গতিপথে অবস্থান্তর ঘটেছে। আলজেরিয়ার আরব বার্বার অধিবাসীরা কাতারে কাতারে প্রাণ দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী। তারা পৃথিবীর নৈতিক তো বটেই, ভিন্নতর বৈষয়িক সাহায্যও আজ পাচ্ছে। তার নির্বাসিত প্রতিনিধিরা 'দেশত্যাগী সরকার' গড়েছে মিশরের রাজধানী কায়রোতে—নেতা ফারহাত আব্বাস। আজ তাঁর চালিত সরকারের সঙ্গেই ফরাসী সরকার মিটমাট-প্রয়াসী। বিদ্রোহীদের অন্যতম নায়ক বেলকাসেম করিমের নেতৃত্বে আলজেরীয় প্রতিনিধিদল এভিয়ানে উপস্থিত। একদা ফরাসী সরকার করিমের অনুপস্থিতিতে তাঁকে দু'-দুবার প্রাণদণ্ড দিয়েছে। কিন্তু ধরা পড়েননি তিনি একবারও, তাই ফাঁসির রশি গলায় তাঁকে পরতে হয়নি। বলা বাহুল্য, '৪৭ সাল থেকেই তিনি বিদ্রোহী; ফরাসীদের জাতিবৈষম্য, অত্যাচার ও অনাচারের বিরোধী। জন্ম ১৯২১ সালে বার্বার এলাকায়; এক নিরক্ষর চাষীর ঘরের ছেলে; সামান্য লেখাপড়া জানার সৌভাগ্য হয়েছিল। গত মহাযুদ্ধে ফরাসী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, ফরাসীদের হয়ে ঢের লড়েছিলেন। কিন্তু শৌর্যের পুরস্কার পেলেন কর্পোরাল পর্যন্ত ধাপে উঠে। আর জাতিগত পক্ষপাতিত্বের দরুণ এটাই হলো সেনাবাহিনীতে তাঁর পদোন্নতির শেষ ধাপ। ফরাসী সেনাদলের সঙ্গে শেষ সম্পর্কও তাঁর এখানেই। কাজেই তাঁকে ফরাসী দুঃশাসন অবসানের লড়াই-এ যোগ দিতে হয়। এভাবেই তাঁর জাতীয়তাবাদে দীক্ষা। আর উগ্র জাতীয়তায় তিনি বিশ্বাসী। এটা তাঁর আবাল্য শিক্ষা ও সেনাদলে চরিত্র-অনুশীলনের ফল। তাই আলজেরিয়ার জাতীয় আন্দোলনে মত ও পথভেদ যখন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়, 'আন্দোলনের জনক' বলে অভিহিত মেসালীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় আসন্ন—তখন তিনি দুঃখ বরণের পথই বেছে নেন। যে নয়জন দেশপ্রেমী শস্ত্রসহায়ে দেশোদ্ধারে ব্রতী হলেন, উগ্রপন্থী জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের প্রবর্তন করলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। করিম ছাড়া সে-দলের কেউ আজ জীবিত বা বাইরে নেই। ফরাসী গুলী বা ফাঁসিকাঠে বন্দিশালায় তাঁদের জীবনদীপ নিভেছে বা নিভূনিভু। কিন্তু তাঁদের শেষশিখা আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদের প্রতিভূ, সারা দেশের সাধারণ মানুষ ও চাষী মজুরের প্রতিনিধি করিম সেবা ও ত্যাগের বলেই আজ ফরাসী সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একই টেবিলে মুখোমুখি। পদমর্যাদায় এখন তিনি জাতীয় সরকারের ('৫৮ সাল থেকে) ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ও সশস্ত্র সেনা দপ্তরের মন্ত্রী; '৬০ সাল থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমর চালনার অন্যতম নায়ক। কাজেই তাঁর উদ্দেশ্য: আলজেরীয় সমস্যার সমাধান। লক্ষ্য: আলজেরিয়ার সার্বভৌম স্বাধীনতা। একেই বলে ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন।

* * *

বলা বাহুল্য, বাৎসল্যরসে ডগমগ নয় ফরাসী জাতটা; জাত নেশাখোর হলেও সাম্রাজ্যিক দান-খয়রাতের সুনাম নেই তাদের। দৃষ্টান্ত ইন্দোচীন ও ভারতের প্রাক্তন এলাকা, দৃষ্টান্ত আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত গোটা চৌদ্দ কাফ্রী দেশ। তা' ছাড়া, স্বভাব-চরিত্রে শিথিল হলে হবে কি, হিসাব-নিকাশে এরা পাকাপোক্ত; কড়ায়গণ্ডায় পাওনা আদায়ে সিদ্ধহস্ত; ঘোর বিষয়ী বা মজ্জায় মজ্জায় তাদের বস্তুনিষ্ঠা। কাজেই এতদিনের তিলে তিলে গড়েতোলা সুখের নীড়, 'সোনার খনি' ছেড়ে আসা দূরের কথা, সে-চিন্তাও তাদের কাছে দুঃসহ। কিন্তু অবস্থা বিপাক। দুনিয়ার রাজনৈতিক হালচাল ভালো নয়। 'নাটো'ও যখনতখন সর্বময় ত্রাণকর্তা নয়। অভিভাবক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু…বহু দূর। ব্রিটেন নিজ সমস্যায় বিব্রত; জার্মানী নিজ ঘর গুছিয়ে এখনো উঠতে পারেনি। কাজেই বেমক্কা এতদিন যত কিছু খুনখারাবি চালান গেলেও বা আণবিক অস্ত্রের অধিকারী হলেও এখন বেশি জবরদস্তি করা সম্ভব নয়। তা' ছাড়া, আলজেরিয়ার ব্যাপারটা এখন আর একতরফা নয়। আলজেরিয়ার স্বদেশপ্রেমীরা মরছে যেমন, মারছেও তেমন। অর্থাৎ পাল্টাপাল্টি। ছেড়ে কথা কয় না; দশটা ঘুষির বদলেও একটা কিল লাগায়। ট্রেন উড়ায়, লাইন ভাঙ্গে, সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে, যখনতখন ১০ লক্ষ ফরাসী উপনিবেশকারীর প্রাণ সংশয় করে তোলে। আর আলজেরিয়ার বৈষয়িক জীবন করে বিপর্যস্ত, রাজনৈতিক ও সামজিক জীবন অনিশ্চিত। এর উপর গোদের ওপর বিষফোঁড়া। সাহারায় লব্ধ প্রাণসম্পদ তৈলকে নিরাপদে সযত্নে য়ুরোপের বাজারে পৌছে দেবার দায়িত্ব ফরাসীদের। এখানে বাণিজ্যিক ও তৈল উত্তোলনের লাভের অংকটা

মহম্মদ এজিদ : বিদ্রোহী সরকারের মুখপাত্র ও তথ্য সরবরাহ মন্ত্রী।

আমেদ বৌমেন্দজেল : গত বছরে মেলুন বৈঠকে বিপ্লবী প্রতিনিধি দলের নেতা।

আবদুল হামিদ বৌস্থফ (৩৪) ; কনিষ্ঠতম বিপ্লবী নেতা।

ফরাসীদের দিকে সিংহভাগ পড়লেও য়ুরোপায় ও মার্কিন বণিককুলের হিস্যাও মন্দ নয়। তা ছাড়া, আরব, ইরাক, কুয়ায়েৎ ও পারস্যের একচেটিয়া তৈল ব্যবসায়ের ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী সাহারার অজস্র তৈল। কাজেই আলজেরিয়ায় ফরাসীদের অবস্থিতি য়ুরোপায় শ্বেতাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থেই প্রয়োজন। এখানে বৈষয়িক, রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। আবার সত্যিকারের বিপদও এখানে। পুরাণো উপনিবেশবাদের রূপান্তর যেমন নয়া তৈলশিল্পের পত্তনে সূচিত হয়েছে, তেমনি বৃহৎ শক্তির খেলাও এখানে অবধারিত। অর্থাৎ কেনেডী-দ্যগল গলাগলি (৩১শে মে কেনেডী প্যারিস আসেন) বা ফ্রাঙ্কো-হিউম ঢলাঢলি (লিসবনে ২৫ বছরে এই প্রথমবার উচ্চ পর্যায়ে ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ বৈঠক ; ফ্রাঙ্কো নাকি আফ্রিকার পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন) সত্ত্বেও একটি 'কিন্তু' থেকে যায়। সেটি রুশভীতি। অর্থাৎ ফের শক্তিমত্ততা ও তা'র আনুষঙ্গিক ছলাকলা।

*　　　*　　　*

অবস্থা ভালো নয় কোন মতে। যেকোন সময় আন্তর্জাতিক সংঘাত বেধে উঠা বিচিত্র নয়। ফরাসীদের ভয় এটা শুধু নয়। ১০ লক্ষ ফরাসী অধিপ্রবাসীর স্বার্থ রক্ষা, নবাবিষ্কৃত সাহারার তৈলের পাওনাগণ্ডা বজায় রাখা ও বাড়ানো, তৈল শিল্পটিকে নিজ কুক্ষীগত রাখা, আর সম্ভব হলে সাহারাকে একটা পৃথক এলাকায় (আলজেরিয়া থেকে) পরিণত করার দুশ্চিন্তা তাদের বেশ কিছু দিনের। এভিয়ান বৈঠকে এ-ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা তাদের মৎলব। বিপ্লবীরাও এ অভিসন্ধি জানেন। করিম তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছেন—Self-determination which applies to a whole people must also necessarily be exercised over the whole national territory. To limit the application of self-determination to only a portion of this territory is to seek to divide Algeria and to deny even the principle of self-determination" কাজেই উভয় পক্ষই উভয়ের মন জানে। অথচ সমস্যা বেশ জটিল ও ঘোরালো। এর জট ছাড়ানো সোজা কাজ নয়। তবে একটা ফয়সালা উভয় পক্ষেরই কাম্য। তাই গেল বছর যখন আলোচনার আমন্ত্রণ (মেলুন বৈঠকের আগে) এলো তখন জাতীয় মুক্তি-ফ্রন্টের নেতারা সাগ্রহে তাতে সাড়া দেন।

*　　　*　　　*

কিন্তু প্রথম দিকে ফরাসী শাসক-গোষ্ঠীর আন্তরিকতা দেখা যায় নি এ-ব্যাপারে। কারসাজি তারা সূচনাতেই করে। তারা চেয়েছিলো বিপ্লবীদের আত্মসমর্পণ। তাঁদের শর্তে নয়,—ফরাসীদের শর্তে

তাঁদের সায় দিতে বলা হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, জাতীয় সরকারের সহকারী প্রধান মন্ত্রী বেন বেলা ও তাঁর আর দু'জন বিশিষ্ট সঙ্গীকে মরক্কো থেকে ফেরার পথে আটক করা হয়। তাঁরা এখনও ফরাসী কারাগারে বন্দী।

* * *

আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের এক মাস মেয়াদী যুদ্ধবিরতি ঘোষণাকে বলা হয়েছে—'ধাপ্পাবাজি,' নিছক 'প্রচার-কৌশল' বা 'বেইজ্জতি' (blackmail)। আলজেরীয় জাতীয়তাবাদীদের (এফ এল এন) দৃঢ় মত অন্তত এ-ই। সদিচ্ছা প্রকাশ ও উত্তম আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যে নাকি ফরাসীরা বন্দি-মুক্তির কথা ঘোষণা করে। কিন্তু বিপ্লবীরা তাদের ভালোমানুষীও ভালো চোখে দেখতে পারেনি, ভালো মনে তো নয়ই। যেহেতু বিগত সাত বছরের তেতো অভিজ্ঞতায় তাদের বুঝতে ভুল হয়নি যে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে যতক্ষণ না শক্তি-সাম্য ঘটবে, ততক্ষণ কোন মর্যাদাই বিজিত পায় না। কাজেই আগে যতবার তারা এগিয়ে গিয়েছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে, অথবা ফরাসীদের সন্ধি প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে—ততবার তারা ধমক ও মার খেয়েছে, আবার তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু যখন ফরাসী শাসকরা স্পষ্ট বুঝলো যে উচ্চশ্রেণীর সুবিধাভোগী কিছু লোক হাতে থাকলেও সাধারণের মধ্যে শাসকের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থাও নেই, তখনই নয়া শাসকদের প্রতিভূ দ্য' গল গলতে শুরু করেন—গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রথমে আলজেরিয়ায় ও পরে খোদ ফ্রান্সে 'ম্যাকি'দের নিয়ে তিনি জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন। এখন তিনি ফ্রান্সের সর্বময় কর্তা, ভাগ্য নিয়ন্তা। এ সত্ত্বেও দেওয়ালের লিখন পড়া তাঁর মতো ব্যক্তির পক্ষে, একটু দেরীতে হলেও অসুবিধে হয় নি। এমন কি যেসামরিক ও বুর্জোয়া শাসক শ্রেণী আলজেরিয়ায় সেনাবিদ্রোহ ঘটিয়ে দ্য গলের রাজনৈতিক অজ্ঞাত-বাস শেষ হবার হেতু হয়েছিল, তাদের ও আলজেরিয়ার অধিপ্রবাসী ফরাসীদের ('colons') হালের (এপ্রিলের) ক্ষণস্থায়ী বিরোধিতায়ও (যা' গৃহ-যুদ্ধে পরিণত হতে পারতো) তিনি হাল ছাড়েন নি। আর প্রয়োজন হলে বিদ্রোহ দমনে আণবিক বোমা ব্যবহারের হুমকিও দেয়া হয়েছিল। অথচ প্রথম দিকে এবং এই অল্প কিছুকাল আগেও তাঁর ধারণা ছিল: আল-জেরিয়ার সমস্যাটি মূলত অরাজনৈতিক। ছিটেফোঁটা দান-খয়রাৎ (কনস্ট্যান্টিন প্রকল্প অনুযায়ী) আর উচ্চশ্রেণীর কিছু সুবিধাভোগীর কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখলেই যথেষ্ট। তাই একদিকে দমননীতি, সাধারণের ফরাসী-বিরোধিতার সঙ্কল্পে ভাঙ্গন ধরানো, অন্যদিকে শান্তির ললিত বাণী শোনানো, সন্ধির ভাঁওতা দেওয়া। উদ্দেশ্য: বিপ্লবীদের শৃঙ্খল-মুক্তির সংগ্রাম ও দুঃখবরণকে অবাস্তব প্রমাণ করে উপহাসের বস্তু করে তোলা—সাধারণের সহানুভূতি নষ্ট করা, আর তাদের হয়রান করে পরিণামে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। তাদের শকুনী লক্ষ্য বরাবর এদিকেই ছিল। অথচ বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য: জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার ঝুঁকি নিয়েও আল-জেরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অনিচ্ছুক হাত থেকে কেড়ে নেয়া এবং প্রয়োজন হলে সমমর্যাদার ভিত্তিতে আপসেও তারা রাজি। তাই বছর দুই আগে তাঁরা যখন ফরাসী যুদ্ধ বন্দীদের ছেড়ে দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করেন, তখন একে দুর্বলতা মনে করে ফরাসীরা বিনাশর্তে আত্ম-সমর্পণ করতে বলে; কিন্তু ব'লে আহাম্মুক বনে যায়। আবার গেল বছর এদের নমনীয়তার সুযোগ নিয়ে মেলুনে যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কে আপস আলোচনার ধোঁকা ফরাসীরা দেয়; কিন্তু চরম কূটনৈতিক অশিষ্টতার পরিচয় দিয়ে মরক্কো থেকে ফেরার পথে বিপ্লবী নেতা বেন বেলা (অস্থায়ী সরকারের উপপ্রধান মন্ত্রী) ও তাঁর দু'জন বিশিষ্ট সঙ্গীকে আটক করে। তাঁরা এখনও ফরাসী কারাগারে বন্দী এবং এভিয়ান বৈঠকের নাম করেও একেবারে ছেড়ে দেয়া হয়নি তাঁদের। অথবা আর যে সব বন্দী বা অন্তরীণকে (মোট হাজার পঁচিশ) ছেড়ে দেবার কথা হয়েছিল, (সদিচ্ছার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য) তা কাজে পরিণত করা হয়েছে কিনা জানা যায়নি। এমনকি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এভিয়ান বৈঠক হবার কথা হতেই ফরাসীরা আর একবার চালাকি করেছিল, একই বৈঠকে বেসুরা বাজাবার ফন্দি এঁটেছিল—(এফ এল এন) জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের বিরোধী আলজেরীয়

এম এন এ-র বয়োজ্যেষ্ঠ নায়ক মেসালী আলজেরিয়ায় বামপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদের জনক।

জাতীয় (এম এন এ) আন্দোলনের নেতাদেরও বৈঠকে যোগ দিতে দেওয়া হবে বলে ফরাসী সরকার ঠিক করেছিল। তাই আলোচনার ফাঁদে না জড়িয়ে বিপ্লবীরা পিছিয়ে যান—চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী কায়দা divide et impera—ভেদ সৃষ্টির অপকৌশল ধরে ফেলে দৃঢ় হন। তখন প্রচার করা হয় যে অস্থায়ী সরকারের নেতা ফারহাত আব্বাস মস্কো গিয়ে মতবদল করেছেন। তবে যাঁরা একাধিকবার কূট-কৌশলে ফরাসীদের কাছে হেরেছেন, তাঁরা যে আগেভাগেই সতর্ক হবেন, তা' সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়। কাজেই আটঘাট বেঁধেই বিপ্লবীরা তৈরী। কাজ ছাড়া ফরাসীদের কোন কথাকেই সদিচ্ছার প্রমাণ বলে ধরে নিতে তাঁরা নারাজ। তাঁদের অনমনীয় সংকল্পের ফলেই মূল আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন এম এন এ নেতারা এভিয়ান বৈঠকে যোগ দিতে পারেন নি। আর বৈঠকও এহেতু এবং সামরিক বিদ্রোহের দরুণ ২০শে মে পিছিয়ে যায়। স্বভাবতই ক্ষুব্ধ দ্যগল মর্ম পীড়ায় ফেটে বলে বসলেন যে ফ্রান্সের সঙ্গে থাকলে যাবতীয় সাহায্য পাবে—নইলে না। নইলে আলজেরিয়ায় লক্ষ্মী বন্ধ হবে; ফ্রান্সে কর্মরত ৪।৫ লাখ আলজেরীয় মুসলমান বেকার হবে, তাদের দেশে ফেরৎ পাঠানো হবে। অর্থাৎ একই মুখে নরম গরম। কিন্তু এতেও অভীষ্ট ফল হয়নি। দ্য-গল আগে দেখে যতটা শিখেছিলেন, এবার ঠেকে শিখলেন ঢের বেশি। কাজেই এক্ষেত্রে মর্যাদার লড়াই-এ আলজেরীয় জাতীয়তাবাদের জয়-জয়কার বই কি। এভিয়ান বৈঠকের ডিঙ্গি যেকোন স্বার্থের চড়ায় আটকে হয়ত যেতে পারে। কিন্তু মর্যাদার প্রশ্ন বিবেচনায় এর গুরুত্ব কদাচ কমবার নয়। সোজা ভাষায় বিপ্লবীদের দাবি: আলজেরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধিকার। আর ফরাসীরা মোটামুটি চায় (১) আলজেরিয়ায় বসতকারী লাখ দশ ফরাসী অধিপ্রবাসীর ধন-প্রাণ ও স্বার্থরক্ষা আর (২) পৃথক এলাকারূপে সাহারার প্রতিষ্ঠা। এর রূপ কিছুটা আলাদা মনে হলেও আসলে কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনীয়। বিপ্লবীরা ভাবী বিপদ সম্পর্কে তাই এত বেশি সতর্ক। সাধারণ আলজেরিয়াবাসী গরীব; বছরে মাথাপিছু আয় ছ'শ টাকা মাত্র। অথচ ফরাসী শ্বেতাঙ্গদের সে তুলনায় গড় আয় সাড়ে তিন হাজার টাকা। এখানকার কলকারখানার ৯০ শতাংশ ব্যবসায়, চাষযোগ্য জমির এক তৃতীয়াংশ ও যাবতীয় দামী-ফসলী জমির (আঙুর ইত্যাদি) মালিক ফরাসীরা। তা ছাড়া তাদের বড়ো জমিদারীর সাকুল্য সংখ্যা তিন শ'। কাজেই যুদ্ধ আরো বেশিদিন চললে লোক ও অর্থনাশ শুধু নয়, ফরাসী বাসিন্দাদেরও সমূহ বৈষয়িক সর্বনাশ অনিবার্য।

ফ্রান্সের আয়তন কত?

হলোই বা দেশটা উত্তর আফ্রিকায়। তবে ভূমধ্যসাগরের এপার-ওপার। সমুদ্রপথে দূরত্ব ৫।৬ শ মাইল মাত্র, কিন্তু আলজেরিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্ক আজকের নয়।

বেল কাসেম করিম: এভিয়ান বৈঠকে বিপ্লবী প্রতিনিধি দলের নেতা।

প্রায় ১৩৮ বছর আগের কথা। তৃতীয় নেপোলিয়ন দেশটা দখল করেন। অনুন্নত অসভ্য (?) ও জনবিরল এক বিস্তীর্ণ উষর এলাকার (৮ লক্ষ ৬০ হাজার ন'শ বর্গ মাইল) অধিপতি ফ্রান্স—পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মরুভূমি—এখানে—রুক্ষ কর্কশ, নিষ্করুণ জনমানবহীন প্রান্তর সাহারা—এর বুক চিরে শুধু বিক্ষিপ্ত মরুদ্যান—'ওয়েসিস', এখানকার উটবিহারী মরুপথিকের মরুমায়ায় বন্দী হওয়াটা ছিল আবহমান স্বাভাবিক ব্যাপার। মরুভূমি পেরুতে গিয়ে কিছুকাল আগেও অগুনতি প্রাণ দিয়েছে নানা দেশের লোক। সেই দুরধিগম্য ও দুরতিক্রম্য মরুপথের রহস্য দুয়ার এখন খোলা। আজ মানুষের সাধনা ও বিজ্ঞান বুদ্ধির জয়জয়কার। তা-ই প্রাণ-হরণের মরীচিকা প্রাণধারণের উৎসে পরিণত। কেউ কি জানত, বালুস্তূপের সহস্র যোজন স্তর ভেদ করে তৈলধারার অপরিমেয় ভাণ্ডার মানুষের ভোগে লাগবে? আজ আলজেরিয়ার বোন বন্দরের ভেতর দিয়ে য়ুরোপের বাজারে চলেছে সাহারায় তৈল রপ্তানী—যার ভূগর্ভাধারে 'গলিত সোনার' পরিমাণ লেখাজোখা নেই। তবে এখানে আছে ৪৫০ কোটি টন কয়লা; লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও স্বাভাবিক গ্যাসের তো কথাই নেই। কাজেই যদি আলজেরিয়া ছেড়ে আসা ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব, সাহারা কদাচ নয়।

* * *

আলজেরিয়ার সমস্যার সঙ্গে ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামরিক ও বৈষয়িক স্বার্থের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। তা'র সাথে বৃহত্তর বিশ্ব রাজনীতিরও। তাই আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ফরাসী এলাকা থেকে বিতাড়িত বা অনিচ্ছায় ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ফ্রান্স আলজেরিয়ায় তার শেষ সাম্রাজ্যিক ঘাঁটি আগলাবার চেষ্টা করছে এবং অবশ্যই তা পশ্চিমী 'নাটো' এলাকাভুক্ত করে। আলজেরিয়ায় মার্স-এল-কেবির বন্দরকে তাই সার্বভৌম ফরাসী সামরিক ঘাঁটিতে রূপান্তর চেষ্টা আর তৈলসম্পদভরা সাহারাকে আলাদা ফরাসী রাজ্যরূপে গঠনের ছলচাতুরী।

* * *

আলজেরিয়ায় যুদ্ধাবসানের তাড়া এত বেশি কেন? যেহেতু ফ্রান্সের সমাজদেহ রক্তশূন্য। ৪ লক্ষ ফরাসী ও যুদ্ধচালনার উপযোগী উপকরণ ও যন্ত্রপাতি আলজেরিয়ায় নিয়োজিত। রোজ এর জন্যে খরচ হয় ৩০ লক্ষ ডলার করে অর্থাৎ বছরে খরচের পরিমাণ ৫৪০ কোটি টাকা। ক'বছরে যত টাকা খরচ হয়েছে, তা' দিয়ে সারা আলজেরিয়ায় শিল্পায়ন করা যেতো, তা'তে শিক্ষায়তন ও দাতব্য সংস্থা স্থাপন করা চলতো। তা' ছাড়া হতাহতের সংখ্যাও উভয় পক্ষে বিপুল। ২ লাখ বিদ্রোহী আর ১৯ হাজার ফরাসী সৈন্য ও ১৫ হাজার অসামরিক ফরাসী নিহত হয়েছে। তা' ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ ও প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থার ফলে ১০ লাখ আরব গৃহহারা; তাদের পুনর্বাসন আশু দরকার। আবার য়ুরোপে কম্যুনিষ্টবিরোধী সংগ্রামে 'নাটো'কে বলহান করার কিছুটা পরোক্ষ হেতুও ফ্রান্স। তা-ই দুকূল রাখার চেষ্টা তার।

* * *

আলজেরিয়ায় গম জন্মে প্রচুর। তা' থেকে সরকারী অর্থ সাহায্যে ফ্রান্সের জন্য নির্দিষ্ট দরে মদও তৈরী হয়। অথচ কোনটাই আলজেরীয়দের ভোগে লাগে না। এদিকে ২৩লাখ কর্মক্ষম আরবের ভেতর চার লাখ চিরদিন বেকার, আর সাড়ে চার লাখ মরশুমী কাজ করে থাকে মাত্র। অথচ দক্ষিণ আলজেরিয়ায় বা জনশূন্য সাহারা মরুভূমিতে যে তৈল সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার পরিমাণ সারা পশ্চিম এশিয়ার সাকুল্য পরিমাণের চেয়েও নাকি ঢের বেশি। যে 'তরল সোনার' দৌলতে আরব ভূমি ও ইরাকের চেহারা বদল হয়ে চলেছে, (অবশ্য ওপরওলা বিত্তভোগী হোমরা-চোমরাদের) সেই সম্পদের সুষ্ঠু ভাগ-বাঁটোয়ারা যদি হয়, তাহলে আলজেরিয়ার বৈষয়িক পরিবর্তন হ'তে খুব বেশি দিন নিশ্চয়ই লাগবে না। তা' না হলে অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও প্রথম দফায় ফ্রান্স সাহারার তৈল নিষ্কাষণে ২৫ কোটি পাউণ্ড লগ্নী করতো না। '৫৭ সাল থেকে চলছে তেল আহরণ; এক বছরেরও আগে থেকে পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ চলছে; এমনকি বোন বন্দরের ভেতর দিয়ে চলেছে য়ুরোপে তেল চালান।

* * *

কাজেই এভিয়ানের বৈঠক বানচাল হলে ফ্রান্সেরই সমূহ ক্ষতি। দ গলের এতদিন বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে ক্রমবর্ধমান আরব জাতীয়তাবাদ বা আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোর দাবি (আলজেরিয়ার স্বাধিকার ঘোষণার) ঠেকানো অসম্ভব। কম্যুনিষ্ট দেশগুলো, বিশেষে চীন তো

কায়রো মারফৎ ফারহাত আব্বাস সরকারকে সাহায্য দেবার কথা গোপন রাখেনি ; রাশিয়াও তেমন ধারা সাহায্য দেবে বলে ঘোষণা করেছে। তিউনিসিয়া, মরক্কো, গিনি, ঘানা, মালি ইত্যাদি আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র এর স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মিশরের নাসের তো বিপ্লবীদের অন্যতম বড়ো পৃষ্ঠপোষক, আর মিশরেই নির্বাসিত আলজেরীয় সরকারের সদর দপ্তর। কাজেই যুদ্ধের চেয়ে শান্তি ফ্রান্সের বেশি কাম্য। এভিয়ান বৈঠকে ফ্রান্সের পক্ষে তিনটি পথ খোলা। (১) সন্ধি করে আলজেরীয়দের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার, (২) আপসে আলজেরিয়ায় ফরাসী বাসিন্দা ও ফরাসী বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষা ও শিল্পায়নে সুবিধালাভ আর (৩) ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ধাঁচে আলজেরিয়ার ফরাসী রাষ্ট্রগোষ্ঠী ভুক্তি। (যাতে আফ্রিকার কিছু রাষ্ট্র সহযোগী)।

* * *

আলজেরিয়ার ফরাসী অধি-প্রবাসীরা দেশের সবচেয়ে ভালো জমির মালিক। দেশের চাষযোগ্য সাকুল্য জমির এক তৃতীয়াংশ (৫০ লক্ষ একর) তারা চাষাবাদ করে থাকে। আর তাদের বৈষয়িক স্বার্থও যথেষ্ট। তাদের ধারণা : বিপ্লবীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিকিয়ে দেবার ব্যবস্থা পাকা করা হবে। এদিকে রক্ষণশীল কায়েমী মহল মনে করলো যে আলজেরিয়া হাত-ছাড়া হ'লে সেখানকার সম্ভাব্য সম্পদরাশির মালিকানা চিরতরে বেহাত হবে। এক শ্রেণীর শাসক মনে করলো : আফ্রিকার সমস্ত উপনিবেশ হারিয়ে একেই ফ্রান্স যথেষ্ট দুর্বল, তার উপর আলজেরিয়াহীন হ'লে সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তার অবস্থা অসহনীয় হবে। কাজেই ত্রি-বজ্র সম্মেলনে যে চক্রীদল গড়ে উঠে, তারই ফলশ্রুতি জানুয়ারী ও গত এপ্রিলের সেনাবিদ্রোহ—যা' ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধের রূপ নিতে পারতো। তবে জানা ভালো, এটা ১৯৫৮ সালের মে মাসে দ্য গলের (৭০) ক্ষমতা লাভের প্রাক্কালীন সেনা বিদ্রোহেরই রকমফের—জেঃ সালাঁ ও ফ্যাসিস্তপন্থী আলজেরিয়ার রেসিডেণ্ট জেনারেল সুস্তেলের নেতৃত্বে Coup de etat ও Coup de main-এর পূর্ণাহুতি। সেবারও বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করার প্রশ্নে (যা' ফরাসী সংসদে অনুমোদিত হয়) চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের (Fourth Republic) পতন ঘটে—দ্য গলের ক্ষমতা লাভের পথ হয় সুগম।

* * *

১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে গণভোটে আলজেরিয়ার ভবিষ্যৎ স্থির হবে বলে দ্য গল ঘোষণা করেন। Algeric Algeriene অথবা Algeric Pracanaise-এর প্রশ্নেই গণভোট নেওয়া হয় এবং তা' বহু ভোটাধিক্যে অনুমোদিতও হয়। তখন থেকেই শুরু কায়েমী ও রক্ষণশীল শাসক গোষ্ঠীর দ্য-গল-বিরোধিতা। কিন্তু যখন সাম্রাজ্যিক বিলোপের অপরিহার্য পরিণতির সম্ভাবনা ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক কারণে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে থাকে, তখনই দ্য-গল ফ্রান্সকে নতুন করে গড়ে তুলতে, দুর্নীতি ও নোংরামি মুক্ত করতে উদ্যোগী হন। অবশ্য কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ-রূপে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রথম দিকে বাঁধাধরা পথ ও গোঁড়ামি বর্জন তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। পূর্ববর্তী শাসক-শ্রেণীর মতো আলজেরিয়াকে সামরিক বলে তাঁবে রাখার নীতি তাঁরও ছিল। তবে যেটুকু পরিবর্তন চোখে পড়ে তা' হলো নতুন শ্রেণীস্বার্থের বাধ্য-বাধকতা—"* * * the class interests of the oil industrialists * * compel them to draw up plans for a partial industrialisation of Algeria. They find it profitable to build factories, oil pipe lines, highways, railways and train a relatively skilled labour force drawn from the local population. The economic and social programme announced by De Gaulle in Constantine pursues not only the propagandist aim. It expresses the interests of the big bourgeoisie who placed him in power. One should not be surprised if De Gaulle is forced to pursue a policy differing in some respects from that proclaimed by Colonists and that he may, should the circumstances call for it, even oppose their policy..." (L' Humanite, 8th Nov. 1958). প্রকৃতপক্ষে এ ভবিষ্যৎবাণী সফলও হয় পরে। তবে গোড়ায় আলজেরিয়ার সংগ্রামের জাতীয়

রূপ মেনে না নিলেও কতকগুলো আকস্মিক ঘটনায় দেব্‌র-ত্যগলদের চোখ খুলে যায়। গত বছর ডিসেম্বরে আরবরা বড় বড় শহরে এফ এল এন-এর পতাকা নিয়ে রাজপথে বিক্ষোভ জানায়; কিন্তু ফরাসী বিরোধিতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় হাজার হাজার প্রাণের বিনিময়ে। পরে মার্চ মাসে ফ্রান্সের পার্লামেণ্টে নির্বাচিত ৭২ জন আরব প্রতিনিধি (ফ্রান্সের হাতের পুতুল) নিজেদের প্রকাশ্যে বিপ্লবী দল-ভুক্ত বলে ঘোষণা করার দুঃসাহস দেখায়। দ্য গলের পক্ষে এ-ও কম বিস্ময়ের হেতু হয়নি। তবে যতটুকু ঘোর তাঁর চোখে ছিল, তার শেষ রেশও এতে কেটে যায়। অবশ্য আন্তর্জাতিক চাপ সর্বক্ষণ যেমন ছিল, অহরহ ঘরোয়া সমস্যার ঘনীভূত সঙ্কটও তাঁকে কম বিচলিত করেনি। কাজেই সামরিক দিক দিয়ে নয়—রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই ঔপনিবেশিক প্রশ্নের বিচার করা তিনি অপরিহার্য বোধ করেন। অবশ্য যা' '৫৯ সালেই তাঁর চেতনা ও কাজে ধরা পড়ে, তারই চূড়ান্ত পরিণতি জানুয়ারীর ('৬১) গণভোট গ্রহণে।

*   *   *   *

দ্যগল গত এক বছর ধরে সীমিত ক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতির চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু সেনাদলের একাংশের বিরোধিতায় তিনি সফল হননি। এর আগে রাজনৈতিক দিক থেকে সমস্যা নিষ্পত্তির প্রয়োজন বুঝে তিনি '৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে আলজেরিয়ার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য মেনে নিতে রাজি হন। কিন্তু তা' সম্পূর্ণ ফরাসী শর্তে। এমনকি এর পর '৬০ সালের জুন মাসে যখন কোন পূর্বশর্ত আরোপ না করে ফরাসী যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দিয়ে অস্থায়ী আলজেরীয় সরকারের প্রতিনিধিরা মেলুন বৈঠকে ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপস আলোচনায় মিলিত হন, তখনও ফরাসীরা অবমাননাকর আত্মসমর্পণের দাবি জানায়। ফলে জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নে আলোচনা ফেঁসে যায়। এমনকি মরক্কো থেকে বিপ্লবী প্রতিনিধি দল যে বিমানে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছিলেন, তার ফরাসী চালকের কারসাজিতে বেন-বেলা ও তাঁর দু'জন বিশিষ্ট সহযোগীকে ফরাসীরা বন্দী করে। কূট-নৈতিক শিষ্টতার পর্যন্ত তারা ধার ধারে না। কিন্তু শেষ কথা বলা তখনও শেষ হয়নি। একদিকে চলে বিপ্লবীদের মরণপণ হামলা ও পাল্টা প্রতিশোধ, অন্য দিকে শুরু হয় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া। এরও বেশ কিছু আগে থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও য়ুরোপের কিছু রাষ্ট্র অস্থায়ী আলজেরীয় সরকারকে ('৫৮ সালে আব্বাসের নেতৃত্বে কায়রোতে গঠনের পর) স্বীকৃতি দেয়; আর রাষ্ট্রপুঞ্জেও এশীয়-আফ্রিকা গোষ্ঠীর উদ্যোগে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। বিশ্ব-মতের ওপর এর প্রভাব তখন সুস্পষ্ট। কেননা, ১৯৫৯ সালের মার্চে যখন রাষ্ট্রপুঞ্জে এ বিষয়ে ভোট নেয়া হয় তখন ৩৫টি পক্ষে ও ১৮টি বিপক্ষে ভোট হয়। আর ২৮টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। এমনকি আমেরিকাও ভোটাভুটিতে যোগ দেয় না। এটি কূটনীতিক দিক থেকে ফ্রান্সের মর্যাদার ওপর নিদারুণ আঘাত। ফলত এ ব্যাপারে বিশ্ব জনমতের রায় তা'র বিপক্ষেই যায়, পাশ্চাত্যের শক্তি গোষ্ঠী থেকেও বাহ্যত সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আবার '৬০ সালের নভেম্বরে সাধারণ পরিষদের বৈঠক যখন আরম্ভ হয় তখন আগেভাগেই দ্য গল আলজেরিয়ায় গণ-ভোট গ্রহণের কথা সরবে জানান। উদ্দেশ্য: যাতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকূল সিদ্ধান্ত করা না হয়। কিন্তু পরিষদের পঞ্চদশ বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে আলজেরিয়াবাসীদের নিজ ভাগ্য স্থির করার অধিকার স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ ফলত প্রস্তাবটি ফ্রান্স-বিরোধী। কাজেই ঘরে ও বাইরের চাপে আলজেরীয় বিরোধকে আর হতাদরে দূরে সরিয়ে রাখা বা রাজ-নৈতিক সমস্যা বিবেচনা না করা ফরাসী শাসকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিতে গত জানুয়ারীতে গণ-ভোট গ্রহণ। এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, '৫৮ সালের গোড়ায় ক্ষমতা লাভের সময় কলুষমুক্ত ফরাসী প্রশাসন ও আলজেরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ভরসা দিয়ে ছিলেন দ্য গল। এভিয়ানের বৈঠক—তাঁ'র মনোমত না হলেও—হয়ত তারই প্রতিশ্রুতিবাহী।

*   *   *

এখানে এভিয়ান বৈঠকের পটভূমি রচনায় তিউ-নিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট বরগুইবার ভূমিকা উল্লেখ্য। তিনি বেশ কিছুকাল ফরাসী ও বিপ্লবী—উভয় পক্ষের মনের কথা

জানেন। উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করার সুবিধা ও যোগ্যতা তাঁর আছে। আব্বাসও তিউনিসে এখন নিজস্ব বাড়ীতে থাকেন। কাজেই জানুয়ারীতে গণভোটের ফলাফল জানার পর পূর্ব ব্যবস্থামত বরগুইবা প্যারিসে দ্য-গলের সঙ্গে গোপনে দেখা করে আলোচনার পথ তৈয়ার করেন। আর মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে অস্থায়ী সরকারের নেতা ফারহাত আব্বাস ঘোষণা করেন যে সুইজারল্যাণ্ডের কোন স্থানে ফরাসী প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুখোমুখী আপস আলোচনা হবে শুরু। অর্থাৎ বরগুইবা এ ব্যাপারে উভয় পক্ষের সম্মেলনে উপলক্ষ হলেও বা যন্ত্রীরূপে কাজ করলেও ঘটনাপরম্পরাই উভয়কে নিকটতর করে এবং তা'ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে। শুধু তা-ই নয়, একদা যাঁরা বিনা শর্তে ও অসম্মানে যুদ্ধবিরতি ও আপস-আলোচনা চেয়েছিলেন, তাঁ'রা আজ মনোবলে অজেয়, অনমনীয়, এমনকি খোদ ফ্রান্স ও প্যারিসে সন্ত্রাস ও বিভীষিকা (৫ই জুন) ছড়াতেও কুণ্ঠিত নয়।

*　　*　　*

'৫৪ সাল থেকেই ফ্রান্সে ঘনঘন মন্ত্রি-সংকট। উপর্যুপরি গোটাকয়েক মন্ত্রিসভার পতন হলেও সকলেরই এক রা'—এফ এল এন থেকে সাধারণকে সরিয়ে রাখো; একে চরম আঘাত হানো, নিশ্চিহ্ন করো। তা-ই ঐ বছর ('৫৪) ১লা নভেম্বর বিপ্লবীদের মধ্যে আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে ফরাসী সেনা তা'র মৃত্যুশেল নিয়ে সারা আলজেরিয়াকে ছেঁকে ধরে; পাহাড় পর্বত কন্দর বনজঙ্গল চষে ফেলে। তার হাড়গোড় ভাঙ্গে, কিন্তু মনোবল আদৌ নয়। তাই রক্তের সুতোয় একতার মালা গাঁথা। আর শোণিতের হোমশিখায় সারা আলজেরিয়া শুদ্ধপূত হয়। তবে রক্তেইরক্তবীজের জন্ম। আজ আলজেরিয়ার আরব মাত্রই বিদ্রোহী, ফরাসী শাসনের বিরোধী। এর দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। ফরাসী সংসদে ১৯১৮ সালে সেনাদলের তদারকীতে সাহারা ও মূল আলজেরিয়া থেকে যে ৭২জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদের ভেতর ২৫জনই গত মার্চে পদত্যাগ করে নিজেদের প্রকাশ্যে এফ এল এন দলভুক্ত ঘোষণা করেন। ফরাসী সরকারের ধারণা ছিল: এঁরা নরমপন্থী এবং এঁদের দিয়ে জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করান চলবে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে যাঁদের কার্যোদ্ধারের যন্ত্র করা হয়েছিল, তাঁরাই ঘোর ফরাসীবিদ্বেষী! তাঁরা পশ্চিম জার্মানীর কোন স্থানে বিপ্লবীদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে আব্বাসের যাবতীয় দাবি সমর্থন করেন।

*　　*　　*

আগে কনস্ট্যাণ্টিন প্রকল্পের উল্লেখ করা হয়েছে। এর আসল উদ্দেশ্য ফরাসী সরকারের সহযোগীরূপে আলজেরিয়ায় সুবিধাভোগী আরব শ্রেণী গড়ে তোলা ও তাদের জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে লেলান। বলা বাহুল্য আলজেরিয়ার কনস্ট্যাণ্টিন বিভাগেই যত সব চাষযোগ্য দামী জমি। এখানকার অধিকাংশ জমির মালিক ঔপনিবেশিক ফরাসীরা। কিন্তু বিপ্লবীদের ভয়ে তাদের অনেকেরই চাষাবাদ ও গোলাবাড়ির তদারকীর কাজ বন্ধ। ওগুলো থাকে পতিত। ফরাসী সরকার সেসবের একটা বিলিবন্দোবস্ত না করলে তারা সদলে দাসদাসী ও চাষের উপকরণ নিয়ে শহরে চলে আসার হুমকিও অনবরত দিতে থাকে। কাজেই সেগুলো কিনে নিয়েছিলো ফরাসী সরকার—চাষীদের ভেতর ভাগবাঁটোয়ারা করবে বলে; অবশ্যই সদাব্রত উদ্দেশ্য নয়। চাষীদের ভেতর (যেহেতু বেশির ভাগ বিপ্লবীই চাষাভুষো, সাধারণ গেরস্থ ঘরের ছেলে) ফরাসী-বিরোধী মনোভাব মিইয়ে দেয়াও 'রাজনৈতিক শূন্যতা' পূরণের উৎকট চেষ্টা এখানে প্রকট। কিন্তু সামগ্রিক ফল বিচারে ফরাসী প্রশাসন এ ব্যাপারেও বিফল। এদিকে সারা উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধের দাবানল ছড়াবার উপক্রম; মরক্কো ও তিউনিসিয়ার ভেতরও বিপ্লবীদের তাড়া করে বহুবার বিনা উস্কানীতেই চলেছে গুলীগোলাবর্ষণ। কাজেই ভূমধ্যসাগরের অববাহিকা অঞ্চল ও উত্তর আফ্রিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম শর্ত আলজেরিয়ার শান্তি।

*　　*　　*

আলজেরিয়ায় মুক্তি আন্দোলন মূলত জাতীয়তাবাদী। এর নায়ক মুখ্যত দু'জন যথা (১) ফারহাত আব্বাস (৬২), (২) মেসালী হজ। প্রথম ব্যক্তি Democratic Union of the Algerian Manifesto বা সংক্ষেপে U.D.M.A.র, শেষোক্ত ব্যক্তি Movement for the Triumph of Democratic Liberties বা সংক্ষেপে MLTD.-র নেতা। চরিত্রের দিক দিয়ে কিন্তু দুজনে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মানুষ। একদা আব্বাস ফ্রান্সের সঙ্গে আল-

জেরিয়ার মিলনে ছিলেন বিশ্বাসী ; এমনকি ফরাসীদের সঙ্গে সম-অধিকার লাভের আশা না থাকলেও তিনি ফ্রান্সের সহযোগিতায় আপসে স্বায়ত্তশাসন লাভের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু নির্বাচনী শাঠ্য ও আইনগত বাধায় তিনি হতাশ শুধু নয়, ফরাসীদের সদিচ্ছায় তাঁর বিশ্বাসের রেশটুকুও লোপ পায়। '৫৫ সালে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে একমাত্র বিপ্লবের পথেই আলজেরিয়ায় মুক্তি সম্ভব। তাতেই ফরাসীরা টলবে। কাজেই '৫৬ সালে তিনি কায়রোতে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট বা National Liberation Front বা সংক্ষেপে (এফ এল এন) বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেন এবং '৫৮ সালে অস্থায়ী সরকারের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন। এখন বিপ্লব ও তাঁর নাম সমার্থবাচক। গত ডিসেম্বরে ('৬০) আলজিয়ার্সে আরব বিক্ষোভকারীরা তাঁর নামেই ধ্বনি দেয়।

জাতীয়তাবাদী দ্বিতীয় দলের নায়ক মেসালী হজ। মেজাজ ও স্বভাবে তিনি একরোখা ও প্রভুত্বকামী। এহেতু তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে মনান্তর ও অবশেষে পথান্তর। তাঁর দলের দু'টো শাখা ছিল। একটা বৈধ, অন্যটা গোপন অর্থাৎ জঙ্গী দল, যা'র বাছাইকরা লোক নিয়ে গঠিত নিরাপত্তা সংস্থা বা O. S। যখন আত্মদ্রোহে দল বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন ও এস-এর ঝানু ২২ জন সশস্ত্র বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁদের ভেতরে রয়েছেন নয়জন 'ইতিহাস-খ্যাত নেতা'; এঁরাই '৫৪ সালের সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রবর্তক। আবার এঁদের মধ্যে তিনজন এখন মৃত, ৫ জন ফরাসী কারাগারে বন্দী ; অবশিষ্ট ব্যক্তির নাম বেলকাশেম করিম (৩৯)। এভিয়ান বৈঠকে বিপ্লবী দলের নায়ক। মেসালীর দলের হালের নাম আলজেরীয় জাতীয় আন্দোলন, সংক্ষেপে এম-এন-এ। তিনি এফ-এল-এন-এর ঘোর শত্রু। সাকুল্য বছর কুড়ি জেল ভোগ করেছেন। এখন কার্যত তিনি ফ্রান্সে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। এভিয়ান বৈঠকে তাঁকেও যোগ দেবার সুযোগ ফরাসী সরকার দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু বিরোধী পক্ষের দৃঢ়তায় তাদের ভেদ-নীতি বিফল হয়ে যায়।

বর্তমানে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের নেতৃস্থানীয়দের ভেতর UDMA-এর আমেদ ফ্রান্সিস (চিকিৎসক, আব্বাসের ভায়রা ভাই, অস্থায়ী সরকারের অর্থ মন্ত্রী), আর আমেদ বৌমেন্দজেল (আইন-ব্যবসায়ী, গত বছরের মেলুন বৈঠকে বিপ্লবী প্রতিনিধিদলের নেতা). লাখদার বেন তোব্বল (অস্থায়ী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), আব্দুল হাফিজ বৌসুফ (৩৪. কনিষ্ঠতম নেতা), সৈয়দ মোহাম্মেদী (রাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমর পরিচালক) মহম্মদ এজিদ, (তথ্যমন্ত্রী ও সরকারী মুখ-পাত্র), আব্দুল হামিদ মেহরী (সমাজ ও সংস্কৃতি মন্ত্রী), মহম্মদ বেন ইয়াহিয়ার (সরকারের সেক্রেটারী জেনারেল ও মেলুন বৈঠকে অন্যতম প্রতিনিধি) নাম বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁদের ছাড়া, সহ-প্রধান মন্ত্রী বেন বেলা, মহম্মদ বৌদিয়াফ, মহম্মদ খিদের, হোসেন আমেদ ও রাজ বিতাত ফরাসীদের কৌশলে বন্দী।

* * *

যুদ্ধ শেষ হয়নি, শান্তি স্থাপনও হয়নি—যুদ্ধ এখন আল-জেরিয়া থেকে প্যারিসে। কিন্তু বেশ কিছুকাল ধরে সাহারার সম্পদ আহরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও আরব দেশ-গুলোর ভেতর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। ফ্রান্সের পরিকল্পনা : সাহারা স্বতন্ত্র হবে ; আলজেরিয়া সহ ফ্রান্স, মরক্কো, তিউনিসিয়া ও নিগ্রো দেশগুলোর সহযোগিতায় তৈল আহরণ করা হবে। গরীব আফ্রিকার দেশগুলো পাবে বাণিজ্যিক মুনাফা, ফ্রান্স পাবে কারিগরী ও যন্ত্রপাতি তদারকীর ভার ও তৈল আহরণের সুযোগ। কিন্তু এফ এল এন্-বলেন : দেশটা অবিভাজ্য, সে সব মুনাফাই নেবে, তবে ফ্রান্স করবে তৈল বিক্রী। এদিকে তিউনিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট বরগুইবা এফ এল এন-এর পরিকল্পনা বরবাদ করে দিতে দ্য গলকে অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে ফ্রান্সের পরিকল্পনার সঙ্গে আর একটি ধারা যোগ করতে হবে। সেটি হলো : বহুজাতিক ব্যবস্থা হবে মার্কিনী 'গ্যারাণ্টি'-নির্ভর। অর্থাৎ প্রকারান্তরে আমেরিকা হবে সাহারার রাজনৈতিক প্রভু। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়া তর্জনী তুলে শাসনের ভঙ্গিতে প্যারিস, তিউনিস ও এফ এল এনকে জানিয়ে দিয়েছে যে উত্তর আফ্রিকায় কোন রাজনৈতিক সুবিধাই যেন আমেরিকা না পায়।

* * *

এদিকে ফরাসী সরকার আলজেরিয়ার তৈল ও স্বাভাবিক গ্যাস সম্পদ তুলে দিয়েছে নিউ জার্সির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোং-এর প্রাধান্যযুক্ত আন্ত-

র্জাতিক বাণিজ্যিক সমবায়ের (cartel) হাতে। শর্তানুযায়ী এর মুনাফার আধা-বখরা ফ্রান্সের লভ্য। ফ্রান্স তার হিস্যার টাকা আলজেরিয়ার সামরিক পেষণযন্ত্র চালু রাখার কাজে লাগায়; বাকিটা যায় তৈল কোম্পানিগুলির জঠরে। শুধু মজুরীর ছিটেফোঁটা যা' কিছু জোটে আলজেরিয়ার সস্তা মজুরের। কাজেই শিল্প ও ব্যবসার সঙ্গে সমরনীতি ও রাজনীতি একাকার। শিয়ালের পিছু ফেউ-এর মতো স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোং-এর প্রেতাত্মা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এখানে উপস্থিত। বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে দেখা দিতে কতক্ষণ। অবশ্য তার চরিত্র ও রূপ যুগভেদে ভিন্ন—প্রভাব এলাকা নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াই যা'র পরিণতি। আফ্রিকার শেষ দাস জাতি—ফ্রান্সেরও শেষ আশা-ভরসা—আলজেরিয়ায় কিন্তু ইতিহাসের বিধান অমোঘ। মাত্র বছর পাঁচ আগেও আফ্রিকার এক তৃতীয়াংশ ছিল ফ্রান্সের শাসনাধীন। অথচ ১৯৬০ সালে আফ্রিকার যে ১৭টি দেশ স্বাধীনতা পায়, তার ভেতর ১৪টিই হলো হয় ফরাসী উপনিবেশ, নয় অছি এলাকা, যথা মালি (ফরাসী সুদান), সেনেগল, দাহোমি, নাইজার, উত্তর ভোল্টা, আইভরি কোস্ট, চাদ, সেণ্ট্রাল আফ্রিকান রিপাব্লিক (উবাঙ্গি-শারী), কঙ্গো, গেবন, মৌরিতানিয়া, মালাগাছি (মাদাগাস্কার), ক্যামেরুন্স ও টোগোল্যাণ্ড (অছি এলাকা)। তা ছাড়া '৬১ সালের জানুয়ারীতে আফ্রিকার মোট ২৭টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্বও—যার মোট জনসংখ্যা ১৮ কোটি ও মহাদেশের তিন চতুর্থাংশ—আলজেরিয়ার মুক্তি ত্বরিৎ করার অনুকূল। এহেন অবস্থায় আফ্রিকা মহাদেশে আলজেরিয়ায় "রইলো বাকি এক" হলেও ফরাসীদের পক্ষে এর ভরসাও কিছু নেই। এখন খালি সময়ের প্রশ্ন। দু'দিন আগে পরে, আলজেরিয়ার চূড়ান্ত ভাগ্যনিয়ন্তা আলজেরিয়াবাসীরাই হবে। ফ্রান্সের নিয়ন্তা হ'লেও দ্য-গল এক্ষেত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের যন্ত্র মাত্র—ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন যেমন হয়েছিলেন ভারতের বেলায়। তবে অবস্থা দৃষ্টে নবীন রাষ্ট্রের দশাও ভারত বা মালি ফেডারেশনের (মালি ও সেনেগালে বিভক্ত) মতোই হবার সম্ভাবনা বেশি। অন্যথা অপরিমেয় রক্তক্ষয় ও দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ অপরিহার্য।

* * *

ফ্রান্স চায় আলজেরিয়াবাসী ফরাসীদের স্বার্থরক্ষা করতে। এ-ইচ্ছা ন্যায়সম্মত, স্বাভাবিক। বিপ্লবীরা বলেন: তথাস্তু। দেশের সাধারণ নাগরিক হিসাবে সব সুযোগসুবিধা ও অধিকার আলবৎ তা'রা পাবে—যেমন পাবে ফ্রান্সে বসবাসকারী আলজেরীয়রা। তবে ফরাসীরা চায় ফরাসীদের জন্যে বেশি কিছু সুবিধা। এরা বলে 'না'; ফরাসীদের আব্দার: তবে উপকূল বরাবর ফরাসী সংখ্যাগুরু এলাকা আলাদা করা হ'ক। আলাদা প্রশাসন চালু হ'ক। ওদের সাফ জবাব, 'হবে না; দেশটা অবিভাজ্য ও অখণ্ড। ফরাসীরা কর্তৃত্ব চায় জনশূন্য অথচ সম্পদভরা সাহারায়; দেশের যাবতীয় শিল্পায়নে। ওঁদের ওই এক কথা। সব কিছু করতে পাবে; দেশের সাধারণ আইনে তোমাদের সব স্বার্থরক্ষা করা হবে; কিন্তু প্রশাসনিক হর্তাকর্তা বিধাতা আমরা; দেশের মালিকও আমরা। কিন্তু ফরাসীরা এতে নারাজ। গোঁসা করে দ্য-গল হুঙ্কার ছেড়েছেন—ভাল কথায় রাজি না হ'লে তোমাদের ছাড়াই অন্যকে দেশ শাসনের ভার দেওয়া হবে। দেশ ভাগ হবে। আলজেরিয়ায় হবে দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। নয়া পাকিস্তান! বিপ্লবীরা বলেন—কুছ পরোয়া নেই। করে দেখ। রক্তের আখরেই অটল সংকল্পের স্বাক্ষর রেখেছি আমরা। জান দোব, জবান নয়। আপসে হয় ভাল, নইলে রক্ত গঙ্গা। নিশ্চিহ্ন হবো—তবু জাতের মর্যাদা খোয়াব না।

* * *

প্রায় ২৪ দিন আলোচনা চলেছে এভিয়ানে। দরকষাকষি চলেছে, যুক্তিতর্কের ঝড় বয়েছে ঢের। কিন্তু মীমাংসার সূত্র উদ্ভাবন হয়নি। হবার কথাও নয়। যেহেতু গোলে হরিবোল; মূলে গলদ; মূল নীতিতে মতভেদ। ১৫ই জুন নিউইয়র্কে অস্থায়ী আলজেরীয় সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে—সাহারার ওপর ফরাসী কর্তৃত্বের দাবি উঠেছে; আলজেরিয়া বিভাগের হুমকি দেওয়া হয়েছে। তবে ১২ই জুন (২০শে মে থেকে বৈঠক শুরু) আলোচনা ১০ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত রাখার অনুরোধ আসে ফরাসীদের দিক থেকে। এর বিরোধিতা করেছিলেন বিপ্লবীরা। ফল হয়নি। কিন্তু কবে আবার

আলোচনা শুরু হবে, তা'র কোন ঠিক ঠিকানা নেই। অতএব অচল অবস্থা।

* * *

১৩৬ বছর আগে (১৮২৫) তৃতীয় নেপোলিয়ন আলজেরিয়া জয় করেন। কিন্তু ফ্রান্সের যে স্যাভয় প্রদেশে এভিয়ানের অবস্থিতি, তা' ফ্রান্সের দখলে আসে ঠিক ১০১ বছর আগে (১৮৬০ সাল) এবং তা সমজাতি ও স্বার্থগত হেতুতে। ফরাসী দেশও ভবিষ্যতে হয়ত থাকবে। কিন্তু আলজেরিয়া? সম্ভবত নয়। তবু ভরসা জেগেছিল: এখানে হয়ত আলজেরিয়ার ভবিষ্যৎ চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে যাবে।

২।৭।৬১

দূরদ্রষ্টা প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীনদীয়াবিহারী অধিকারী

আচার্য রায়ের দূরদৃষ্টির পরিচয় এখনও সম্যক্‌ভাবে আলোচনা করা হয়নি। 'বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার' ও অন্যান্য নিবন্ধে সমগ্রভাবে জাতীয় উন্নতি তিনি কামনা করেছেন। চাকুরীর মোহ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, ব্যবসাবৃত্তি চাকুরীর থেকে ভাল এবং ডিগ্রি না পেয়েও মানুষ নিজের চেষ্টায় এত বেশী উন্নতি করতে পারে যা যে কোন উচ্চ ডিগ্রিধারীরও ঈর্ষার বিষয় হতে পারে। ডিগ্রির অসারতা সম্বন্ধে নানা আলোচনা করলেও দেখা যায় তিনি দেশের ছাত্রদিগকে বিজ্ঞানানুরাগী করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন। ভাল ভাল ছাত্র যাতে 'সিভিল সার্ভিস' অথবা 'বার' এ যোগ না দিয়ে বিজ্ঞান তথা রসায়ন অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণা করেন তার জন্য একটি সুষ্ঠু কার্য্যক্রম নিজের জীবনে পালন করেছেন। সাধারণভাবে ছাত্রদেরও তাদের অভিভাবকদের সামনে রসায়ন ও আধুনিককালে মানুষের জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা, এর বিস্ময়কর গুণাবলী এবং বহু সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দুরা কিভাবে রসায়নে গবেষণা করে তৎকালীন পৃথিবীর জাতি সমূহের অগ্রগামী হয়েছিলেন—ঐ সকলই তাঁর বক্তৃতার বিষয় হ'ত, এর ফলে বহু ছাত্র ও অভিভাবক রসায়ন পড়বার এবং পড়াবার জন্য মনস্থির করতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াবার সময়ও তিনি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের পড়ানোর ভার নিজে থেকেই নিতেন; ঐ সময়ে 'সিনিয়র প্রফেসর'রা সাধারণত প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতেন না এবং যতদূর জানি এখনও ঐ ধারাই বর্তমান। ছাত্রদের মনের মধ্যে রসায়নে গবেষণা করার ইচ্ছা একবার প্রবিষ্ট করালে তারপর বেশীরভাগ ছাত্রই তখন নিজের চেষ্টায়ই অগ্রসর হয়ে যেতে থাকে। পথ-প্রদর্শকের কাজটাই হ'ল সুদূর-প্রসারী দৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক। তিনি শতাব্দীর প্রারম্ভে যা আরম্ভ করেছিলেন, এখন অন্যান্য অগ্রগামী দেশের দিকে তাকালে তার তাৎপর্য আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়।

গত মহাযুদ্ধের পরে আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশকে শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বল্পতা উপলব্ধি ক'রে তাদের নিজ নিজ দেশের সমস্যা-সমাধানে চেষ্টিত দেখতে পাই। আমেরিকা রাষ্ট্র ও শিল্পগতভাবে বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা এবং মাল প্রস্তুতের উপযুক্ত শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তি তৈরী ও সংগ্রহের জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য। রসায়ন শিল্পে এই দেশ বর্তমানকালে অন্যান্য দেশ থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে। এই শিল্পের বিভিন্ন শাখায় বহু বৃহৎ শিল্পসংস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যা সত্যিই চমকপ্রদ। রসায়ন শিল্পকে কেন্দ্র করেও এই দেশে কয়েকটি সুবৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এরা একক কিম্বা সম্মিলিতভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক বিজ্ঞান-শিক্ষাবস্থা থেকেই নানাপ্রকার সহজ শিক্ষণীয় পদ্ধতিতে রসায়ন বিজ্ঞান ও শিল্পকে তাদের নিকট পরিবেশন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এতে প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা হয়েছে এবং যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা কিশোর অবস্থা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মন রসায়ন বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হতে সাহায্য করে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষাকালে রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যয়নে উৎসাহিত করে। শিল্পগোষ্ঠী এবং উচ্চবিজ্ঞান শিক্ষা-কেন্দ্রের পরিচালকগণের সমবেত প্রচেষ্টায় শিল্প-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা ও মাল প্রস্তুতের কাজে ছাত্রছাত্রীদের শিল্প সংস্থায় হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এভাবে ছাত্রাবস্থা থেকেই রসায়ন বিজ্ঞান ও শিল্পের কাজে তাদের উপযুক্ত করে তোলা হয়। উক্তরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই

শিল্পের বিভিন্ন কাজের উপযোগী মানসিক প্রবণতা সৃষ্টিরও সাহায্য হয়। পরবর্তী জীবনে শিল্পকার্যে কিম্বা গবেষণায় নিযুক্ত থাকাকালে তাদের নিজ নিজ কাজ যথেষ্ট প্রাণবন্ত হয়। শিল্প-সংস্থাসমূহের সমিতিও এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য করছে। ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্ এসোসিয়েসন, নিউইয়র্ক—"Career Ahead in the chemical Industry"; "Guide to Education Aids Available from Chemical Industry" প্রভৃতি পুস্তিকা ছাত্রছাত্রীদের নিকট বিলির ব্যবস্থা করেছেন। এইসকল পুস্তিকায় রসায়ন বিজ্ঞান ও শিল্পের বিশদ বিবরণ, বিভিন্ন কাজের টিকাসহ তালিকা, বিভিন্ন কাজের উপযোগী 'Career' কিভাবে তৈরী করতে হবে ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পদার্থ বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শিল্প সংস্থাসমূহও অনুরূপভাবে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার ব্যবস্থা করেছেন।

ব্রিটেনও রাষ্ট্র ও শিল্পগত ভাবে তাদের দেশের সুযোগ সুবিধা মত এই বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কয়েকটি বৃহত শিল্পসংস্থা উচ্চ-বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ যোগ্যতা বিচার করে বিভিন্ন শিল্প বিজ্ঞানের কাজের জন্য বাছাই করার ব্যবস্থা করেছেন। অবসর সময়ে শিল্প সংস্থায় হাতে কলমে শিক্ষাদান, মাল তৈরীর কাজ শেখার সুযোগ, আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি নানা ভাবে তাদের সাহায্য করার ব্যবস্থা হয়েছে। রাষ্ট্রগতভাবে এই দেশের শিক্ষামন্ত্রী Sir David Eccles বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টে "Better Opportunities in Technical Education" নামে একটি 'White Paper উত্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"It is essential today that the boy or girl in a secondary school should see ahead a straight road carrying on to their careers, At present the end of the school life is for many of the students the end of the road or at least a sharp bend which they cannot see round. In future, we intend the last years of school and first years in work to be, and to be seen to be a continuous period of education." ব্রিটেনের "Sandwich Course" অর্থাৎ ছয় মাস কলেজে পড়া এবং ছয় মাস শিল্প সংস্থায় কাজ করা, এইরূপ দুই হ'তে তিন বৎসর পঠন-প্রণালী বর্তমানে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে; এতে ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী যোগ দিচ্ছে।

সোভিয়েট রাশিয়া বর্তমানে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও শিল্পকার্যে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধির কাজে অতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমানে এই দেশ অন্যান্য দেশ থেকে অগ্রসর বলা যায়। অবশ্য এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বহুলাংশে তাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং শিল্প সংস্থা সমূহও রাষ্ট্রায়ত্ব থাকায় তাদের উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তি তৈরী ও নিয়োগের সমস্যা ও তার সমাধানের পথ ভিন্নরূপ।

বর্তমানে আমাদের দেশেও বেসরকারী ও সরকারী পর্যায়ে এই ধরণের কিছু কিছু প্রচেষ্টা চলেছে। সম্প্রতি আচার্য জগদীশ বসু জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি Jagadish Bose National Science Talent Search (J B-NSTS) নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের কার্যকরী সাহায্য দ্বারা 'I. Sc.' দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর এবং 'Three Years Degree Course' প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের ভিতর থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিশেষ কার্যোপযোগী প্রতিভার বাছাই। প্রথমে এই প্রচেষ্টা পশ্চিম-বঙ্গ প্রদেশের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং ক্রমে সর্বভারতীয় পর্যায়ে ব্যাপ্ত করা হবে। তিন বৎসরের জন্য প্রতিমাসে ৭৫.০০ টাকা করিয়া দশটি বৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছে; বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই সন্তোষজনক উন্নতি দেখাতে হবে। 'Higher Secondary Examination,' 'School Final Examination' অথবা 'Senior Cambridge Examination' পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ে কম পক্ষে শতকরা ৬০ নম্বর উক্ত বৃত্তি পরীক্ষায় যোগদানের নিম্নতম মান হিসাবে ধার্য করা হয়েছে। ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদের ভিতর থেকে উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীকে আরও পড়াশুনার জন্য মাসিক ১৫০,০০ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হবে। সরকারী পর্যায়ে 'The Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs' এর 'The Council of Scientific & Industrial Research' দ্বারা 'National Register of Scientific & Technical Personnel' প্রস্তুতের কাজ; স্বদেশে ও বিদেশে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও শিল্প কার্যে দক্ষতা সঞ্চয়ের জন্য কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতি নগণ্য।

একদা আচার্য রায় এককভাবে তাঁর শক্তি, সামর্থ্য ও অর্জিত অর্থ দিয়ে যে মহান প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেছিলেন আজকের দিনে তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার উদ্যোগ দেখতে পাই। বর্তমানে সম্মিলিতভাবে যে সকল সংস্থা এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়েছেন তাঁদের আচার্য রায়ের আরব্ধ কাজের উত্তর সাধক বললে অত্যুক্তি হবে না মনে করি।

মাধুকরী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আমার এ প্রেম-মদিরা-আবেশে
গিয়েছ কি সখি, ভুলে—
মধুকর— সে যে সঞ্চরি' ফিরে
কুঞ্জের ফুলে ফুলে ?
চম্পার বুকে তোলে গুঞ্জন,
করে মাধবীর মধু ভুঞ্জন ;—
রজনীর স্মৃতি ভুলে যায় এসে
প্রভাতের উপকূলে !
ঐ মতো আমি করি মাধুকরী
তোমার দুয়ারে আসি,'
অনেক জ্বলেছি,—তাইতো কেবল
জ্বালাতেই ভালবাসি !
হায়গো ক্ষণিক প্রেমবিহ্বলা,
হেরি' অকারণ তব ছলাকলা—
আমার মর্ম-মুকুরে হাজার
চাঁদমুখ উঠে ভাসি ।'
কতো ছলছল নয়নের জল,
কতো অপলক চাওয়া,
ক্ষণিকের কতো বাহু-বন্ধনে
আপন-করিয়া-পাওয়া ;
কতো মীনকেতুশরজর্জর
উতল মায়াবী যামিনীজাগর,
'আসি' ব'লে কতো জীবনের মতো
চিরতরে-চলে-যাওয়া,—
চিত্তে আমার চপলার মতো
রহি' রহি' উঠে ঝলি' !—
আমি যে তোমারি,—এ মহামিথ্যা
কেমনে তোমারে বলি !
যাই তবে—যাই—উড়ে চলে যাই
নব নিকুঞ্জে নবগীতি গাই ;—
বৃথা অভিযোগ,—স্বভাব-ধরমে
বহুবল্লভ অলি !

মনে পড়ে আজ কত চেনা মুখ

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

ঝিরি-ঝিরি ঝরে শ্রাবণের ধারা সারাটি দিন,
সুর নেই, শুধু নীরবতা-ভরা হৃদয়-বীণ্ !
ডাকে না বেহগ তরু-শাখে আজ,
যে যাহার ঘরে—ফুরায়েছে কাজ,
পল্লীর পথ, ঘুমাইছে যেন—পথিকহীন,
একটানা ঝরে বাদলের ধারা সারাটি দিন ।

থেকে থেকে বয় পূবালি সমীর আপন মনে,
কথা ক'য়ে যায় উতলা বিহ্বল যূথীর বনে ।
কদম, কামিনী অনুরাগে কা'র
ছড়ায় সুরভি প্রীতি-মমতার,
আকাশে, বাতাসে তাহারি বারতা আসিছে ঠিক
চির-চেনা সেই অনাদি যুগের আসে পথিক ।

চেয়ে চেয়ে দেখি আকাশের বুকে মেঘের ভার,
কালো ছায়া পড়ে তৃণ-প্রান্তরে শ্যামলতার ।
উড়িছে চাতক আকাশের গায়,
মিলাইয়া যায় জলদের ছায়,
সঙ্গি-বিহীন কোন সে বলাকা আকাশ-পথে,
সুদূর-পিয়াসী যায় বুঝি সে মানস-রথে !

আজিকে প্রকৃতি বিবশা কেন যে কাহারে স্মরি',
কোন সে দয়িত জাগিয়াছে—তা'র হৃদয় ভরি' ।
স্মৃতির কুসুম করে সে চয়ন,
তাই বুঝি ঝরে অঝোর নয়ন,
দূর দিগন্তে তাই বুঝি চাহি সারাটি দিন,
বাতায়নে বসি' গণে বুঝি ক্ষণ পলকহীন !

মনে পড়ে আজ কত চেনা মুখ হারানো গান,
ভুলে যাওয়া স্মৃতি, কত পরিচিতি প্রীতির দান !
আনে চিঠি কত এই বরষায়
কত না প্রভাতে, কত সন্ধ্যায়,
চেনা-অচেনার মায়া-জালে ভরা শ্রাবণ-দিন,
ঝিরিঝিরি শুধু স্মৃতি-বরিষণ মনে গহীন্ ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চার

সেই সুরটি এখনও তন্দ্রাহীন নয়নে পাহারা দিচ্ছে আমাকে। যথানিয়মে যথাসময়ে একটি করে রাত্রি এখনও ঠিক আসছে আর পালিয়ে যাচ্ছে। পালিয়ে যাওয়া রাত্রিরা অনাগতা রাত্রিদের থেকে অনেক বেশী দলে ভারী হোয়ে উঠেছে। যারা পালিয়ে গেছে তাদের একটিকেও ধরে রাখতে পারিনি, যারা আসছে তাদের কাউকেও ধরে রাখতে পারব না। পারব কেমন করে! রাত্রি মাত্রেই যে অসতী। যারা ধরা দিতে আসে পালিয়ে যাবার জন্যে, তাদের বেঁধে রাখার চেষ্টা করাটা যে বেকুবের বেহায়াপনা। অসতীকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করব, এমন আহাম্মক আমি নই নিশ্চয়। আহাম্মক নই বলেই নিজে ধরা পড়ে গেছি। বাঁধা পড়ে গেছি সুরের জালে, একজন অসতী রাত্রি সেই সুর শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে পালিয়েছে। সে গেছে, কিন্তু সুরটা কিছুতে যাচ্ছে না। কিছুতে পরিত্রাণ পাচ্ছি না সেই সুরের খপ্পর থেকে। উদ্ধার পেতাম, যদি এ জীবনে আর একটিও রাত্রির সঙ্গে দেখা না হোত।

ঠিক সময়ে এখনও একটি করে রাত্রি সমুপস্থিত হয়। এদের ছলা কলা সুর ছন্দ সবই ভিন্ন জাতের। তবু শিউরে উঠি। যে কোনও রাত্রির সঙ্গে দেখাদেখি হোলেই চমকে উঠি। সঙ্গে সঙ্গে আমার শিরা-উপশিরায় রক্তের সঙ্গে বেজে ওঠে সেই সুর। সেই অনেকদিন আগে যে সুর শুনিয়ে সেই বিশেষ রাত্রিটি আমায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল, সেই সুরে বেহুঁশ হোয়ে ঢলে পড়ি। সেই সুরটি আমার ওপর তন্দ্রাহীন নয়নে সদাসর্ব্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছে! সেই সুর কিছুতেই আমার সঙ্গে নিমক-হারামি করে না।

সে হোল এক বিশেষ জাতের মল্লার রাগিণী। ঝিমঝিমে বরষায় অন্ধকার আকাশের বুকে কান পেতে শুনলে সেই রাগিণী শোনা যায়। শোনা যায়, যদি কোনও রাত্রি তার আঁধার অন্তঃকরণের দুয়ার খুলে তার অন্তরের অন্ত-স্থলে একটিবার উঁকি দিতে দেয়। তারপর, সেই বিশেষ জাতের মল্লার রাগিণীর সঙ্গে একটিবার পরিচয় হবার পরে সর্ব্বনাশ হোয়ে যায়। নির্মম নিঃসঙ্গতার বিষে বিষিয়ে ওঠে জীবন। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হোয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টি দিয়ে দুনিয়াখানাকে যেভাবে যেরূপে দেখা যায়, তার ছিটেফোঁটাও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

ফলে দুনিয়াখানাও আজ একরত্তি বিশ্বাস করে না আমাকে। করবে কেন! দুনিয়া সুদ্দু সবাই যে সবকিছু বড্ড বেশী করে জেনে ফেলেছে। এখন দুনিয়াখানা চলছে সাইকো-অ্যানালিসিস্, পার্‌ভার্‌সন আর ফ্রিজিডিটি সম্বল করে। রহস্য বলতে কোনও পদার্থ দুনিয়ার বুকে এখন বেঁচে নেই। রোমাঞ্চিত হবার মত ব্যাপার এ দুনিয়ায় আর একটিও ঘটছে না। দুই আর দুই যোগ দিলে যোগফল কাঁটায় কাঁটায় চার হোতে বাধ্য। এই বাধ্য-বাধকতা-সম্বল দুনিয়ার কোন গরজ পড়েছে রাত্রির অন্তঃ-করণ নিয়ে মাথা ঘামাবার! সে ফুরসতই বা কোথায়!

ফুরসত-বিহীন জীবন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এখন সবাই।

তাই সবাই মহাসৌভাগ্যবান। কোনও কারণেই এ দুনিয়ার কোনও কিছু কারও কাছে বিমিয়ে ওঠার ফুরসত পায় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত জিভের ডগায় যে কোনও পদার্থ ঠেকে, তৎক্ষণাৎ সেটিকে নির্বিচারে চুষতে লেগে যায়। ঠকবে কেন কেউ, জীবনটাকে চুষে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলতে না পারলে ঠকে যাবে যে। শুধু শুধু কেউ ঠকতে যাবে কেন!

ঠকিনি আমিও। সত্যিকথা অকপটে স্বীকার করাই ভাল। আমি ঠকিনি। অতবড় সুযোগটা হাতে পেয়ে ফসকে যেতে দিয়েছি, একথা বললে ফলটা ভাল হবে না। সেরকম ফাজলামি করার স্পর্দ্ধাই বা হোতে যাবে কেন আমার! ঝিমঝিমে বৃষ্টি পড়া সেই রাত্রিতে একান্তে একখানি নির্জন ঘরে দেড়হাত চওড়া শয্যায় শ্রীবিপিন-বিহারীবাবুর পরিবারটিকে পাশে নিয়ে শুতে পেয়ে এখন যদি ধাপ্পা দিয়ে পাশ কাটাতে চাই, তাতে দুনিয়াসুদ্ধুর মুখে মুখটেপা হাসি ফুটে উঠবে। গা টেপাটিপি আর চোখের ইশারায় এমন সব মারাত্মক মর্মকথা প্রকাশ পাবে, যা কল্পনা করতে গিয়েই আঁতকে উঠছি। তার চেয়ে খোলা-খুলি সব স্বীকার করাই ভাল। আমি যে ঠকিনি, এটা এখানে স্পষ্টাস্পষ্টি কবুল করে যাই।

তবে শ্লীলতা শালীনতা এই দুটি অবলা প্রাণীকে রক্ষা করা চাই। ওদের দু'জনকে বাঁচিয়ে যতটা বলা সম্ভব বলে ফেলি। তারপর আর ধাপ্পাবাজ গালাগালিটা শোনার ভয় থাকবে না।

কবুল করছি, কি যেন কি এক অদ্ভুত নেশায় বুঁদ মেরে গিয়েছিলাম আমি। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক, রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ, এই দশটা যন্ত্রই সম্বল আমাদের। এদের নাগালের বাইরে পৌঁছে গিয়েছিলাম হঠাৎ। নিষ্কলঙ্ক নিরবয়ব নিঃসঙ্গতার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হোয়ে গিয়েছিল। সে এক ভয়ানক জগৎ, সেখানে শ্লীলতা অশ্লীলতা প্রেম কাম লালসা ভালবাসা পৌঁছতে পারে না। সেখানে নারী নেই পুরুষ নেই, নারী নরের দেহ শরীর মন বুদ্ধি কিচ্ছু নেই। একমাত্র নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সেখানে ধরা ছোঁয়ার উপায় নেই।

সেই হোল রাত্রির নিজস্ব ঘরকন্না। নিরম্বু একলা সেখানে বাস করে রাত্রি। অদৃশ্য হোয়ে থাকে নিজের কাছে নিজে, তলিয়ে থাকে নিজের অন্তঃকরণের অতল তলে। রাত্রি আমাকে তার নিজস্ব আস্তানায় নিয়ে গিয়েছিল।

কি দেখলাম! সেখানে!

তাও বলতে পারব না। আমার যে আমিটি প্রেম কাম ভালবাসা ইত্যাদি গালভরা বাক্যগুলির নেশায় লকলকে জিভ বার করে ঘুরে বেড়ায়, সেই আমিটি তখন আমার সঙ্গে ছিল না। সুতরাং দেখব কি!

দেখিনি কিছুই, দেখবার বোঝবার মত অবলম্বন যেখানে থাকে, সেখানটা নিষ্কলঙ্ক নিরবয়ব নিঃসঙ্গ স্থান নয়। রাত্রি সেখানে বাস করতে পারে না। রাত্রি হোল চরম ক্ষুধা আর পরমা তৃপ্তির সন্তান, রাত্রির বাপ মায়ের পরিচয় কোনও রতিশাস্ত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অসতী রাত্রি তার বুকের আবরণ সামলে ফেললে। পালাবার লগ্ন সমুপস্থিত হোল তার। অন্তরের মধ্যে তলিয়ে থাকার মেয়াদ শেষ হোল। রক্তমাংসের দেহে পুনর্বার ফিরে আসতে বাধ্য হোলাম। আর একটা রক্ত-মাংসের দেহ তখনও—দু'হাতের বন্ধনে বাঁধা রয়েছে। স্পর্শ আর ত্বক—সর্বপ্রথম সজাগ হোয়ে উঠল। তারপর কর্ণ আর শব্দ কাজ শুরু করে দিলে। প্রথম যা গ্রহণ করলে তারা, তা' হোল একটি সকরুণ হাহাকার। ফুরিয়ে গেছে, সুযোগের মত সুযোগ একটা ফসকে গেছে। হঠাৎ কানে গেল—'রাত পুয়িয়ে এসেছে।'

সোজা হোয়ে উঠে বসলাম। হাতের বাঁধন খসে পড়ল। রূপ রস গন্ধ, চক্ষু নাসিকা জিহ্বা বোবা ভাষায় গালাগালি জুড়ে দিলে। ওদের আক্ষেপের সীমা পরিসীমা নেই। অসতী রাত্রি সত্যিই পালিয়ে যাচ্ছে। উৎকট চেষ্টা করে একটা অবাধ্য নিঃশ্বাসকে শাসন করে ফেললাম। আঁচলখানি বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শ্রীবিপিনবিহারী-বাবুর শ্রীমতী আচম্বিতে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলেন "এখন বল, তোমার আসল নাম কি ছিল। বল—বলতেই হবে।"

"নাম!" দস্তুরমত—হাঁ হোয়ে রইলাম।

"হ্যাঁ হ্যাঁ—নাম। জন্মেই ত' আর এত বড় একটা

সাঁইবাবা হোয়ে ওঠনি। আঃ—বলনা শিগ্‌গির—" উৎকট উত্তেজনায় কাঁপছে। একখানা হাত ধরে ফেললে আমার। ধরে—প্রবল বিক্রমে ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

"বল—বল শিগ্‌গির নামটা। আঃ—দেরি করছ কেন?"

একটা ঢোক গিলে বললাম—"দাঁড়াও, আগে মনে করে নি—"

"না না, মনে করতে হবে না। আসল নামটি বলে ফেল। মনগড়া নাম শুনতে চাই না। বল আমার কানে কানে। কেউ কখনও আমার মুখ থেকে সে নাম শুনতে পাবে না।" কানসুদ্ধ মুণ্ডটা আমার মুখের ইঞ্চিখানেক তফাতে এগিয়ে দিলে।

কানে কানেই বললাম। শুনে একেবারে নিভে গেল। কানের ভেতর ফুঁ দিয়ে ওর ভেতরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম যেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে খুব লম্বা একটা শ্বাস ছাড়লে। সেই শ্বাসের সঙ্গে খুব আলগোছে বেরিয়ে এল সামান্য একটু শব্দ। আলগোছে শব্দটুকু ধরে ফেললাম আমি। বললে—"যা—মিলল না।"

যা মিলল না, তা' শত চেষ্টা করলেও মিলবে না। তবু—দেঁতো হাসি হেসে ফেললাম। বললাম—"কেমন! ঠকলে ত'! অত তাড়াতাড়ি করলে ঠকতে হয়।"

"তার মানে!" চোখে মুখে রক্তের ছোপ ফুটে উঠল। নিতাই দাসীর নিজস্ব চাউনি চকচক করতে লাগল দু' চোখের কোণে, সেই রকম অদ্ভুত ঢঙে তেরছা হোয়ে গেল মুখখানা। একদম জাত সাপ, ফণা তুলেছে। সাপের মত হিসহিসিয়ে বললে—"যা মুখে এল বলে ফেললে বুঝি?"

নেহাত ভালমানুষের মত মুখ চুষিয়ে বললাম—"কি করব বল। হঠাৎ অমন তাড়া লাগালে, সব যে কেমন ঘুলিয়ে গেল। আগে থাকতে ত' আর মনে করে রাখিনি। কতকাল আগে ছেড়ে এসেছি নামটাকে, টপ্‌ করে মনে পড়বে কেন।"

একেবারে গালে হাত। চোখ দুটো যেন উপ্‌চে পড়তে চায়। টেনে টেনে বললে—"ও মা! নিজের নামটাকে পর্য্যন্ত ভুলে মেরে দিয়েছ! বেঁচে যে আছ, এটাও বোধ হয় সব সময় মনে করতে পার না?"

চোখ মুখের পানে তাকিয়ে জোর করে একটা ঢোঁক গিলে ফেললাম আবার। জেগে উঠেছে তখন রক্তমাংসে গড়া সর্ব্বশরীর, খা খা করছে। আর একটি বার সুযোগ পেতে চায়। কি আপসোস! অসতী রাত্রি তখন পালিয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পরে হাত নামল গালের গা থেকে। চোখের চাউনিও পালটে গেল। জলজ্যান্ত বিস্ময় জলজল করছিল যে চোখ দুটিতে—সকরুণ হতাশায় সেই চোখ ছল-ছলিয়ে উঠল। এলিয়ে গেল কেমন কথা বলার ধরণ। উদাসভাবে বলতে লাগল—"কোথায় না নামতে পারে পুরুষ মানুষে! মেয়েরাও ঘর বাড়ী ছাড়ে, আত্মীয় স্বজনকে ভুলে যায়। কোথায় জন্মেছিল, বাপ মায়ের পরিচয় কি, এ সব মুখে আনতে হোলে জিভ খসে পড়ে তাদের। কিন্তু মন থেকে ত' তাদের কিছুই মুছে যায় না। নিজের নামটা পর্য্যন্ত ভুলে মেরে দিয়েছে, এতখানি রসাতলে নামতে কোনও মেয়েকে দেখিনি। অনেক হতভাগীর সঙ্গে মিশেছি। আগের জীবন মন প্রাণ খুলে বলেছে আমার কাছে অনেকে। বলে নিজেদের বুক হালকা করেছে। মেয়েদের ভেতর এত বড় বেহায়া কখনও দেখিনি, যে নিজের নামটাও ঠিক করে বলতে পারে না। কি জানি, হয়ত তুমি মস্করা করে বসলে আমার সঙ্গে, ইচ্ছে করে মিথ্যে নাম একটা বললে। হয়ত বা সত্যিকারের নামটাই বলেছ। যাই করে থাক না কেন, শেষকালে ঐ দেঁতো হাসি হেসে যে বললে, নিজের নামটাও ঘুলিয়ে গেছে—, ঐ কথাটা বলতে মুখে আটকালো না তোমার! আশ্চর্য্য! মানুষ এতখানি বেহায়া হোতে পারে!

উচ্চস্তরের হাসি মুখে ফুটিয়ে বললাম—"ত্যাগ করেছি কি না। এ সমস্ত ত্যাগ তপস্যার আইন খুব কড়া। আগের জীবনের নাম টাম কিছু মনে করতে নেই।"

কয়েক মুহূর্ত্ত মুখ টিপে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তারপরই হাসি, অতিরিক্ত ফাজিল একটা ফচকে কন্যের হাসি। হাসির বন্যায় ভেসে গেল চোখ মুখের পাকা ছাপ। বেরিয়ে এল আসল সেই কন্যেটি, যার বয়েস কিছুতে কোনও কালে বয়েসের জাতে উঠবে না। হাসিটাকে থামাবার জন্যেই বোধ করি উপুড় হোয়ে পড়ল

আমার কোলের ওপর। মুখ লুকিয়ে ফেললে। ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল পিঠ ঘাড় চুল। বাক্‌রোধ হোয়ে গেল আমার। হাসির ঝাপটায় চোখের সামনে থেকে কালো পর্দা একখানা সরে গেল। ত্যাগ, তপস্যা, আগের জীবনের নামটা পর্য্যন্ত ভুলে যাওয়া, কার সামনে আওড়ালাম ঐ বাঁধা গৎ! কি জানে না ও! আমার ত্যাগ—আমার বৈরাগ্যের দৌড় কতখানি, তা' জানতে ঐ ফাজিল কন্তের এতটুকু বাকী নেই। ওর কাছে কি নিয়ে বড়াই করে মলাম!

বাইরেটা ধোঁয়াটে গোছের হোয়ে উঠেছে তখন। বৃষ্টি বন্ধ হোয়েছে, আকাশ কিন্তু মেঘমেদুর। বাইরের দিকে তাকিয়ে মনটা ভয়ানক কাঁদা-কাঁদা হোয়ে উঠল। বেরতে ইচ্ছে করে কখনও ঘরের তলা থেকে অমন আকাশমুখী দিনে! দূর ছাই—পথ ছাড়া যার গতি নেই, সে কেন মরতে এই সুদুর্লভ নেশার বস্তু সঙ্গে নিয়ে ফেরে! গাছ তলায় বসে তাড়ি গেলা চলে, শ্যাম্পেনের বোতল খুলতে হয় বহু দামী হোটেলের নাচ-ঘরের এক কোণায়। আড়াল চাই, এমন জাতের আড়াল চাই যা কারও নজর এড়িয়ে যাবে না।

পিঠের ওপর হাত রেখে মিনমিনিয়ে বললাম—"নাও, ওঠ। চল, আবার রাস্তায় নামি গে। ঝড় জল যাই হোক, এই ঘর কামড়ে পড়ে থাকলে খিটকেলের কিছু বাকী থাকবে না।"

কোলের ভেতর মুখ চেপেই বলে উঠল—"বয়ে গেছে আমার। করুক খিটকেল যে যত পারে। যতক্ষণ না আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে, এ ঘর ছেড়ে এক পা নড়ছি না।"

নড়লও না।

না নড়বার বন্দোবস্তটি যে কতখানি পাকা হোয়ে গেছে ইতিমধ্যে, তা' তখন জানতে পারলাম। জেনে তৎক্ষণাৎ সেই ঘর বাড়ী ছেড়ে দৌড়ে পালাবার প্রবল বাসনা হোল। আবার ঝঞ্ঝাট। শ্মশানে পড়েছিলাম ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে শান্তিতে বেঁচে থাকবার আশায়। শ্মশান ছেড়ে বেরবার ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলতে শুরু করল যে! সাধে কি আর জ্যান্ত মানুষের ত্রিসীমানা মাড়াতে ইচ্ছে করে না। জ্যান্তদের সঙ্গে ওঠা বসা করতে গেলেই দুনিয়ার যত জলজ্যান্ত ঝঞ্ঝাট দুমদাম করে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে।

চোখ গরম করে বললাম—"চল, এখুনি পালাই চল। আর এক মুহূর্ত্ত থাকছি না এখানে। ওরা কেউ জাগবার আগেই সরে পড়তে হবে। এই সব বাজে ঝামেলায় নাক গলাতে আছে!" লাফিয়ে নেমে পড়লাম চৌকি থেকে। লাগালাম আর এক তাড়া—"ওঠ, নেমে পড় শিগ্‌গির। বিছানাটা জড়িয়েনি।"

উঠল না, এক চুল নড়ল না, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দরজার বাইরে। হঠাৎ যেন কাঠ হোয়ে গেল ওর দেহটা, চোয়াল চিবুক নাক সব কেমন ধারালো হোয়ে উঠল। দুটো তিনটে কোঁচ দেখা দিল দুই ভুরুর মাঝখানে। ঠোঁট দু'খানা একটু ফাঁক হোল। অন্য-মনস্ক ভাবে উচ্চারণ করলে—"বাজে ঝামেলা!"

বললাম—"তা' নয়ত কি? কোন গরজ পড়েছে আমাদের এদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার? পথ চলতে চলতে যদি এই ভাবে সকলের সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়, তা'হলে এ জীবনে আর পথ চলার শেষ হবে না। যত সব—"

কথাটা শেষ করতে দিলে না। এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে কি যেন বলে ফেললে। দু'চোখ দিয়ে আগুনের হলকা ছুটছে তখন। খুব চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলে—"পথ চলার শেষ হোলে কোথায় পৌছব আমরা গোঁসাই? কোন ঠিকানায় পৌছবার জন্যে ছুটেছ আমায় নিয়ে?"

যা মুখে এল বলে ফেললাম—"আরে—পৌছব ত কোথাও না কোথাও। সারাটা জীবন দু'জনে পথে পথে ঘুরে মরব নাকি? এই ভাবে বাক্স বিছানা বইতে বইতে চিরকাল বেঁচে থাকা যায়?

কয়েক মুহূর্ত্ত এক ভাবে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ নিচু করে নেমে এল চৌকি থেকে। মুখ নিচু করেই বললে—"চল গোঁসাই, তোমাকে সেই শ্মশানে আবার রেখে আসি। ভুল হোয়ে গেছে আমার। জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে চলে ফিরে বেড়ানো যায়। নিজের নামটা পর্য্যন্ত যে ভুলে গেছে, সে ত' মড়া। মড়ারা

নির্ঝঞ্ঝাটে শ্মশানে পড়ে থাকবে। তোমায় সঙ্গে নিয়ে পথে বেরনো মস্ত ভুল হোয়ে গেছে।"

ঠোঁটের ডগায় এসে গেল নির্ভেজাল সত্যি কথাটি। আর একটু হোলেই বলে ফেলেছিলাম—"এত দিনে বুঝলে?" খুব সামলে নিলাম। তার বদলে প্রকৃত বেঁচে থাকা মানুষের মত এক লাফে উঠে পড়লাম আবার চৌকির ওপর। লম্বা হোয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানা জুড়ে। দরাজ গলায় আসল স্বামীর মত নকল পরিবারকে হুকুম করলাম—"যাও, এখন আর জ্বালিও না। ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে। খানিকটা চা জোটাতে পার কি না দেখ। গরম চা পেটে না প পর্য্যন্ত কিছুতে আর চোখ মেলছি না।"

ফল ফলল।

গেরস্ত ঘরের একটি ভদ্র সন্তান এবং ভদ্র সন্তানের একটি ভদ্র পরিবার ভদ্রতার পাঁক না ঘেঁটে আলগোছে থাকতে পারে না। ভদ্রতার ভেক ধারণ করার ফল ফলতে খুব বেশী দিন সবুর করতে হোল না। ভদ্র সমাজের মার প্যাঁচের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। শ্রীমান তারকনাথের জন্মদাতা শ্রীযুক্ত আগুনাথ উপাধ্যায় কার প্যাঁচে পড়ে কোথায় ঘাপ্‌টি মেরে আছেন, তাই জানতে হবে। খুবই নামজাদা এক ধর্ম্মস্থানের এক ধর্ম্মগুরু চান না, আগুনাথ উপাধ্যায়ের মুখ থেকে ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বিশেষ জাতের গূঢ় রহস্য প্রকাশ পায়। তাই ঐ ব্যবস্থা। যতকাল ধর্ম্ম-গুরুটি জীবিত থাকবেন, ততকাল আগুনাথকে গায়েব হোয়ে থাকতে হবে। তারকনাথ জানবে, তার বাবা সন্ন্যাসী হোয়ে গিয়ে হিমালয়ে বসে তপস্যা করছেন। আর তারকনাথের মা কাউকে কখনও মুখ না দেখিয়ে বাঙলা দেশের বাহিরে বিহারের এক তেপান্তরের মাঠে ভুতের বাড়ীতে জীবন কাটাবেন। অন্যায়, সবটাই আগাগোড়া অন্যায় আর অবিচার। অন্যায় এবং অবিচারের প্রতিবিধান করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হোল।

কারণ! কিসের গরজে ঐ ভুতের ব্যাগার খাটতে যাওয়া?

আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, জবাবটি একদম জলের মত সোজা। কারণটি হচ্ছে, পরিবারটি বাক্য দিয়ে ফেলেছেন। বলে ফেলেছেন, তাঁর স্বামীর বুদ্ধিটা এমনই চোখা যে সেই রহস্যময় ধর্ম্মস্থানের ধর্ম্মগুরুটির মর্ম্মভেদ করতে পারবেই। অতএব পরিবারের বাক্যদানের মর্য্যাদা রক্ষা করতেই হবে। নয়ত ভদ্রতার ভেক ধারণ করাটা যে একদম ভেস্তে যায়।

শেষ পর্য্যন্ত পরিবারের বাক্যদান ব্যাপারটি কতদূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল, সে কাহিনী পরে বলছি। তার আগে নিজের ধাঁধাটার একটা সদুত্তর চাই যে। সেই বিশেষ রাত্রিটি যখন পালিয়ে গেল তখন থেকে একটি বিশেষ সমস্যার জবাব খুঁজে পাচ্ছি না। সমস্যাটি হোল, নারী কি চায়! কিসের লোভে নারী একটা পুরুষের কাছে তার জীবন যৌবন ধর্ম্ম অধর্ম্ম সমস্ত উৎসর্গ করে? বিশেষ একটা পুরুষের জন্যে সর্ব্বস্ব পণ করে বেঁচে থাকাটাই কেন নারীর কাছে সার্থকভাবে বেঁচে থাকা?

মনে হয়, এ সমস্যায় অনেকেই ভুগছেন। এর আগেও ভুগেছেন অনেকে। নারীচরিত্র বিশ্লেষণ করার দুরূহ চেষ্টার ফলে বহু দামী কথা জন্মলাভ করেছে। শাস্ত্রও কিছু কম কথা বলেনি। সমস্ত উলটে-পালটে দেখে আরও ঘাবড়ে গেছি। দরদ, শুধু দরদ, যার নাম বুকভরা দরদ, উপছে পড়া দরদী দল নিয়ে এক দল বিজ্ঞ মানুষ নারীকে দেখেছেন জ্যান্ত দেবী হিসেবে। আর একদল দরদের চেয়ে অনেক দামী উপযুক্ত দক্ষিণা দাখিল করতে পারলেই নারীত্বের সব থেকে উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হোল মনে করেন। তারপর আছে ঐ সাইকো-অ্যানালিসিসের কেরামতি। মোটের ওপর নারীকে যথেষ্ট মর্য্যাদা প্রদর্শন করতে কোনও দিক থেকে কেউ এক তিল কসুর করছেন না।

নারী কিন্তু আজও সেই হেঁয়ালি হোয়েই রইল। নারী হেঁশেলেই থাকুক বা হাইস্কুলের হেডমাস্টারের চেয়ারেই বসুক, সে তার নারীত্বকে এমনই এক দুর্জ্ঞেয় পদার্থ দিয়ে ঢেকে রাখে, যা ভেদ করা ত' দূরের কথা, সেই আবরণের কাছাকাছি পৌছনই দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেই আবরণ ভেদ করে কোনও কালে কেউ নারীত্বের গায়ে আঘাত হানতে পারেনি। নারীর দেহ নিয়ে অনেক রকমের বেচা-কেনা ছেঁড়াছিঁড়ি হোয়েছে—হচ্ছে, ভবিষ্য-

তেও নিশ্চয়ই হবে। তা' হোক নারীর তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। নারী জানে, খুব ভাল করে জানে, তার দেহের সঙ্গে তার নারীত্বের কোনও সম্বন্ধ নেই। দেহটা হোল তার হাতের অস্ত্র। ঐ অস্ত্রের সাহায্যে সে সর্ব্বত্র আত্মরক্ষা করতে পারে। এবং হ্যাঁ—জয়লাভও করতে পারে বৈকি।

অস্ত্রটা যখন পুরনো হোয়ে যায়, তখন আর তার ধার থাকে না। আর তৎক্ষণাৎ নারীর মৃত্যু ঘটে। তারপর নারী দেহের মধ্যে যে বেঁচে থাকে সে আর নারী থাকে না। হয় দেবী—নয় দানবীতে পরিণত হয়।

তাই সব থেকে বুদ্ধিমানের কাজ হোল নারীর ঐ হাতের অস্ত্রখানিকে যথেষ্ট খাতির করা। যথেষ্ট ধার আছে তার অস্ত্রে—এইটুকু মেনে নিলেই হোল। নারীর অস্ত্রের সামনে গর্দান বাড়িয়ে দেবার একদম প্রয়োজন করেনা। নারী কখনও তার অস্ত্রের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে হন্যে হোয়ে ওঠে না।

হন্যে হোয়ে ওঠা হোল পুরুষের ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম নিয়ে জন্মে পুরুষ যখন বিচার বিশ্লেষণ করতে বসে নারীকে তখন নানা জাতের উপদ্রব এসে জোটে। উদ্ভট দরদ, উৎকট ভক্তি, নয়ত উদম হ্যাংলাপনা—এর যে কোনও একটার সাহায্য না নিলে পুরুষ মোটে নারীকে বুঝতেই পারে না। এ ব্যামোর দাওয়াই নেই।

বুদ্ধিমানের মতো অস্ত্রখানিকে উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদর্শন করলাম। বললাম—"কথা যখন দিয়ে ফেলেছ তখন উপায় একটা করতেই হবে। ভাল করে জেনে নাও সব, তারপর চল পৌঁছই গিয়ে সেই ধর্ম্মস্থানে। একদম গোড়ায় পৌঁছেই কাজ আরম্ভ করা যাক।"

পরিবারের চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল। কি জানি, খুব সম্ভব আমার প্রতি কৃতজ্ঞতায়। কিংবা হয়ত তারকনাথের জননীর ওপর সহানুভূতিতে। যাই হোক, আসল ভদ্র সন্তানের উপযুক্ত একটা ব্যবহার করলাম। দামী শাড়ি গয়নাও ত' চেয়ে বসতে পারত। তার বদলে অন্য রকম কিছু চেয়ে বসেছে। উদ্দেশ্য ঐ একই। অস্ত্রখানির ধার ঠিক আছে কিনা দেখতে চায়। দেখে নিশ্চিন্ত হোয়ে চলে গেল। পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজলাম।

ক্রমশঃ

জেনে যাও

হাসিরাশি দেবী

রাত যদি শেষ হ'লো—কোন স্বপ্ন নিয়ে—
বেদনা-হলুদ-চাঁদ, চ'লে যেতে যেতে—
এখনও মাটির দিকে রয়েছ তাকিয়ে—
এখনও কি চাও খুঁজে পেতে—
হারানো সন্ধ্যার স্মৃতি—সকালের অস্পষ্ট আলোয়,
শিশিরের বিন্দুতে বিন্দুতে!

এ বিন্দু যে এতটুকু! তোমার আকাশ—
অনেক—অনেক বড়, ধরা যায় নাকো—
তবু যদি ছায়া পড়ে—আলোর আভাষ
একবারও যদি দেখে থাকো—
হয়তো সে দেখা শুধু তোমারই একার ভাবনার—
যা কেবল মনে মনে রাখো।

রাত যদি শেষ হ'লো, চ'লে যাও তবে—
কোন কথা—ব'লোনাক' শুনিওনা গান,
তার চেয়ে তোমার এ বিদায় উৎসবে—
আজ এই প্রত্যাশার কর অবসান
তোমার দৃষ্টির। তার চেয়ে যাও, চলে যাও,—
চেওনা—চেওনা প্রতিদান
তার কাছে—যে মাটি সবুজে—
একদিন সেজেছিল—সে আজ বিস্ময়ে চোখ বুজে।

আখাড়পুরের কুটীর শিল্প

শ্রীশচীপতি রায়

ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকেই পুরোদমে সব কিছুতেই এগিয়ে চলেছে—শিল্প কৃষি বাণিজ্যে ভারতের অগ্রগতি সত্যই আজ অপরাপর দেশগুলিকে পর্যন্ত প্রলুব্ধ করেছে। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যাতে সাফল্য লাভ করতে পারে তার জন্য ভারতের বন্ধুভাবাপন্ন অপরাপর দেশগুলি আজ সমবেতভাবে এগিয়ে এসেছে। আনন্দের কথা যে সম্প্রতি রয়টার ওয়াশিংটন থেকে জানিয়েছে যে ছয়টি রাষ্ট্র এবং বিশ্বব্যাঙ্কের যৌথ উদ্যমে "ভারতের জন্য সাহায্যদানের ক্লাব" নামে একটি সংস্থা ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে। এই সংস্থা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য দু'শো সাড়ে আটাশ কোটি ডলার সাহায্য দিতে রাজী হয়েছে। ছয়টি বন্ধু ভাবাপন্ন রাষ্ট্র—কানাডা, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক ভারতের ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুসম্পন্ন করবার জন্য এই সাহায্য দিচ্ছেন। এর মধ্যে আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য ক্ষমতা দান সাপেক্ষ-সাহায্য ধার্য্য হয়েছেন—এই সাহায্যের পরিমাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—১ শত সাড়ে ৪ কোটি ডলার, বৃটেন ২৫ কোটি ডলার, কানাডা ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, জাপান ৮ কোটি ডলার, বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি ৪০ কোটি ডলার দিতে সম্মত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারত আজ আর একক নেই। অনেকেরই সাহায্য ও সহযোগিতা ভারতকে ক্রমশঃ শক্তিশালী দেশে পরিণত করে তুলছে। আজকের যুগে বাঁচতে হলো সব চেয়ে যা প্রয়োজন—তা হল কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন। কৃষি ও শিল্পে যদিও ভারত সত্যই প্রভূত উন্নতি করেছে—তবুও আজ এমন অনেক ছোট জায়গা লুকিয়ে আছে, যার খবর হয়ত অনেকেরই।পক্ষে রাখা সম্ভব পর নয়। তাই সরকারের সাথে সাধারণ যদি এই বিষয়ে সক্রিয় সহযোগিতা করতে পারে তবে সরকারও এগিয়ে যেতে পারবে তার বিরাট সম্ভাবনাময় মুহূর্ত্তকে নিয়ে।

ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে আজ জমিদারী প্রথা অবলুপ্ত হয়েছে। কৃষি বিষয়ে যাতে চাষীরা সাহায্য পায় তার জন্য সরকারের সমবায় দপ্তর কৃষি সমবায় আন্দোলন করে চলেছেন। সমবায়ের সাহায্যে কৃষিজীবীদের আজ তাই অনেকেই উপকৃত হয়েছে। শিল্পেও সরকার সমবায় দপ্তরকে অগ্রণী করেছে—ছোট্ট ছোট্ট কুটীর শিল্প "শিল্প দপ্তর" থেকে যেমন সাহায্য পেয়ে আসছে, তেমনি সমবায় দপ্তরের মাধ্যমেও প্রকৃত কর্মীদের সমবায় সংস্থার দ্বারা আর্থিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চলছে।

প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক শিল্পের কথা হয়ত এই প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়, কিন্তু এরকম উল্লেখযোগ্য একটি কুটীর শিল্পের কথাই আলোচনা করছি। সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি পেলে এই ধরণের শিল্পগুলি সত্যই অত্যন্ত লাভজনক হয়ে উঠতে পারে।

সম্প্রতি আখাড়পুরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ইচ্ছামতী নদীর

একটি কারখানায় শ্রমিকরা কাজ করছেন

ফোটো—বিশ্বপতি রায়

ওপারেই আখাড়পুর গ্রাম—ইটিণ্ডা পোষ্ট অফিসের এলাকার মধ্যেই এই গ্রামটি পড়ে।

এই জায়গাটিতে বহু দরিদ্র কর্মকারের উপজীবিকা—কর্মকার শ্রেণী লোকের বাস এই স্থানটিতে। বাংলাভাষায় আমরা "কামারশালা" কথা পেয়েছি। এই কর্মকার শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই কামারশালায় কাজ করে থাকে। এদের দৈনন্দিন অবস্থা স্বচক্ষে দেখলে বাস্তবিকই মনটা ঠিক রাখা যায় না। এই ব্যবসাটিতেও সেই 'মিড্‌লম্যান' জাতীয় লোকের উপদ্রব রয়ে গেছে। এরাই ছুরি, কাঁচি, জাঁতী, বঁটি, খন্তি, কাটারী ও কাস্তে তৈরী করে থাকে। এদের তৈরী শিল্পজাত দ্রব্যগুলি বাজারে অসম্ভব চাহিদা রাখে। বর্দ্ধমানের কাঞ্চনপুর এই ছুরি কাঁচির জন্যই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। সরকারের সমবায় দপ্তরের প্রচেষ্টায় আজ ওখানকার কর্মকারদের একটি নিজস্ব সংস্থা গড়ে উঠেছে এবং তারা আর্থিক দিক হতেও প্রচুর সাহায্য পেয়ে আসছে। পুরুলিয়া সহরেও এরকম কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারের সাহায্যে আজ সুন্দর ভাবে

পরিচালিত হচ্ছে। বাংলা দেশের এ কোণে সে কোণে এধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান আরো হয়ত লুকিয়ে রয়েছে। সব দিক হতেই সুদূর পল্লীগ্রামের ভেতর "আখাড়পুরের" শিল্প দ্রব্য তাই তেমন করে সরকারীভাবে সমর্থন লাভ করতে পারে নি। কারণ ঐ কর্মকারশ্রেণীর লোকেরা সারা দিন হাতুড়ি পিঠে আর আগুনের হাপর টেনেই ক্লান্ত হায় পড়ে। "মিডলম্যান" ওত পেতে বসে থাকে তৈরী দ্রব্যগুলি কেনার আশায়। নামমাত্র মূল্যে ওরা কিনে নেয়—তারপর শহরের শিল্পাঞ্চল এবং অন্যান্য জায়গায় ঐ সব সামগ্রী ডীলারদের সহায়তায় বিক্রী করে দেয়—মুনাফার সবই পায় এই মধ্যবর্ত্তী লোকেরা। শ্রমিকরা কেবলমাত্র পারিশ্রমিক টুকু ছাড়া আর কিছুই পায় না। এদের মোটামুটি কাজের একটা ধারণা দিচ্ছি—

কাঁচামাল হিসাবে এরা কলকাতার কালোয়ার পট্টি হতে অর্থাৎ মানিকতলা, কলেজ ষ্ট্রিট এবং হাওড়ায় লোহার ছাঁট (Scraped iron) ২০৲ টাকা হতে ২৫৲ টাকা মণ দরে কিনে থাকে। মাইল্ড ষ্টিল ও কার্বন ষ্টিল এই দুই রকমের লোহাই দরকার হয় এই কাজে। সরকারী মূল্য অবশ্য খুবই কম। তবে সে সুযোগ নেওয়ার অবস্থা এদের নেই। সুদূর পল্লীগ্রামে ওরা কেবল মাল তৈরী করেই নিশ্চিন্ত—বেশ ভালো লোহা কিনতে ৫০৲ টাকা হতে ৬০৲ টাকা মণ প্রতি দের পড়ে। সাধারণত এরা ১ মণ লোহা থেকে চুল কাটার কাঁচি ২৫ ডজন তৈরী করে—অবশ্য সাইজের তারতম্য অনুযায়ী এই পরিমাণের কম বেশী নির্ভর করে। মজুরী হিসাবে ওরা ৭″ ইঞ্চি সাইজের কাঁচিতে ৩৲ টাকা নেয় দৈনিক। একটি লোক গড়ে ৬ পিস কাঁচি তৈরী করতে পারে—অবশ্য ঐ কারিগরের সাথে আরো দুটি লোকের দরকার হয়। এরা যথাক্রমে দৈনিক ৪৲ টাকা ও ২৲ টাকা (পেটা ও শানের জন্য) নিয়ে থাকে। সুতরাং মজুরী হিবাবে মোট ৬ পিস কাঁচি ৭″ র জন্য—৯৲ টাকা খরচ পড়ে। কাঁচা মাল ১ সের লোহা প্রয়োজন হয় এই ৬ পিস কাঁচিতে—এর মূল্য ১।০ আনা লাগে (প্রায় ½ সের লোহা বাদ যায় ছাঁট হিসাবে)। কয়লা এর সাথে সের তিনেক লাগে—সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রায় ১১৲ টাকা খরচা হয় ৬ পিস কাঁচিতে—। এবারে বিক্রী হবে ঐ কাঁচী গুলি ১৫৲ টাকাতে। প্রায় ৪৲ টাকার মত লাভ থাকতে পারে একটি কারিগরের—যদি বিক্রীর সুযোগ কারিগরেরা নিজেরাই পায়।

কিন্তু মহাজনদের টাকায় এই সব মাল তৈরী করে হাতে আর এমন টাকা থাকে না যাতে করে ওরা বাইরের এই সব দায়িত্ব নিতে পারে। সম্প্রতি এদের এই সব অবস্থা দেখে শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দে ও শ্রীবটকৃষ্ণ দে এঁরা ওদের সকলকে নিয়ে একটি সমবায় সমিতি স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। "আখারপুর কাটলারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড" নাম দিয়ে সরকারের কাছে এঁরা যোগাযোগ করেছেন। এঁদের এই প্রচেষ্টা যদি সরকার মেনে নিতে পারেন তবে অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবিকই দেশের ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি যেমন নিশ্চিত, তেমনি এই সব দরিদ্র কারিগরের আর্থিক বনিয়াদের চেহারাটাও হয়ত বদলে যেতে পারে। ওদের মুখে যেদিন আনন্দের হাসি দেখা যাবে সেদিনই সত্যকার ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর সার্থকতা লাভ করবে। আমরা সেদিনের আশাই করি।

কন্যাকুমারী

অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য

একদিন এখানে এসো ভাবুক মনকে সাথে নিয়ে।
এখানে পাথর কাঁদে, নোনা জলে হৃদয় ভাসিয়ে
কুমারী কন্যার বিরহে। ঢেউয়ের গর্জন বলে
ভুল কোর না'ক।

ভেবে দেখো,
কতো যুগ কেটে গেছে এক অনাগত রাতের প্রতীক্ষায়
কন্যাকুমারীর। কতো কান্নার ছোঁয়া লেগেছে হাওয়ায়—

সে অতীত ভুলে যেও যার মূল্য কানাকড়ি নয়।
কিন্তু, যা'তে লেখা আছে জীবনের শেষ পরাজয়—
যা'র কাছে মনে হয় ভাবীকাল অন্ধ, মূল্যহীন—
তা'কে কি ভুলতে পারো? তাই ভাসে রাতদিন
পাথুরে কান্নার সাথে এক হয়ে যাওয়া তিন সাগরের
হা-হুতাশ;
অর্থহীন মনে হয় উদয়াস্ত, সাগর, আকাশ।

সহানুভূতি রেখে যেও না: নিয়ে যেও,
কোন দরকার নেই;
কী দেবে সেখানে, যেখানে সকলি শূন্য, শুধু কান্না—
'নেই, নেই, নেই।'

ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়

উপানন্দ

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী সংবাদপত্র পাঠ করে ব্রিটিশরা, কিন্তু সোভিয়েট অধিবাসীদের ইচ্ছা-বিনিয়োগ-অধিকারে আছে সবচেয়ে বেশী বড় বড় পাঠাগার। অষ্ট্রিয়ার অধিবাসীদের মত এরা কদাচিত সিনেমায় যায় না। পূর্ণাকারের ছায়াছবি প্রতিবছরে একমাত্র জাপানেই সবচেয়ে বেশী তৈরী হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। সোভিয়েট রাশিয়াতে আছে সবচেয়ে বেশী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেলে-মেয়ে। মার্কিন মুলুকে প্রতিহাজারে ওনোপাটিজনের রেডিও নেই। কানাডার উপকূল দূরবর্তী সেন্টপেয়ারি আর মিকুয়েলো নামক দুটি ফরাসী দ্বীপে প্রতি বারোজন ছেলেমেয়ের জন্যে একজন শিক্ষক। দুঃখের বিষয় এই যে, এখানে স্কুলে পড়ার বয়সী ছাত্রছাত্রী শতকরা ষোল, সতেরো বা পঁচিশ। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় ন্যূন বলতেই হবে। শতকরা যে ষোল, সতেরো বা পঁচিশজন ঠিক বয়সে স্কুলে পড়বার সুযোগ পায় এখানে, তারাই উত্তমভাবে জ্ঞানার্জন করে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এদের সংখ্যা ৩,২৩৬,৪১৪, সোভিয়েট রাষ্ট্রে এদের সংখ্যা ২,২৬০,০০০। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া মার্কিন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৮৭,১৬৪, সোভিয়েট রাষ্ট্রে ৭৬৫,০০০ ছাত্রছাত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। এরপরই ৮৩৩৫৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর জাপান আছে ৬৩৬,২৩২ সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছাত্রছাত্রী নিয়ে।

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ফ্রান্স ইউরোপে ২২৬,১৭৩ সংখ্যক বিদ্যার্থীদের নিয়ে আধিপত্য করছে। ইটালী ও জার্মানীর গণতান্ত্রিক সন্ধিবদ্ধ রাষ্ট্রদ্বয়ের যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬৪,০১৫ আর ১৬৩,৯৪৫ প্রতি বৎসরে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গ্রাজুয়েট হয়ে বেরোয় যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে, সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে আসে ২৯০,৭০০ সংখ্যক স্নাতক।

বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল বিষয়ে প্রতি বৎসরে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে গ্রাজুয়েট হ'য়ে বেরোয় ১১৪,৬০০ ছাত্রছাত্রী, আর আমেরিকাতে দেখা যায় উপরোক্ত বিষয়ে ৯৬,৫০৯ গ্রাজুয়েট।

অন্যান্য দেশের সংখ্যানুপাতে ন্যূনাধিক ৪৭,২৮৫ সংখ্যক বৈদেশিক-ছাত্রছাত্রী যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়নরত। এরপরই স্থান অধিকার করে আছে ফ্রান্স। এখানে বৈদেশিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৭,৪৩৬, জার্মানীর ফেডারেশন রিপাব্‌লিক রাষ্ট্রে এদের সংখ্যা ১৫,১১৫।

পৃথিবীতে সবচেয়ে শিক্ষা বাবদে কম খরচ করেছে ১৯৫৮ সালে পুয়েটোরিকো। এখানে জাতীয় আয়ের শতকরা ৬'৯ ভাগ ব্যয় হয়েছে মাত্র, এরপরই আছে ফিন্‌ল্যাণ্ড। এখানে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৬'৫ ভাগ।

সোভিয়েট সাধারণ পাঠাগার গ্রন্থ সংখ্যা ৭৫২,৬০৪,০০০ যুক্তরাষ্ট্রে ২০০,০০০,০০৬, যুক্তরাজ্যে ৭১,০০০,০০০। এরা দুটি যেন প্রতিযোগিতামূলক শেষ খেলায় পরাজিত রাণার্স আপ্‌। প্রতিবৎসরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে যাদুঘর দেখ্‌তে যায় ৩৯,৯০০, ০০০ সংখ্যক লোক। যুক্তরাজ্যে প্রতি বৎসর যাদুঘর দেখে ১০, ৯৯৮, ০০০ আর জাপানে দেখে ১০, ৪৩৯, ০০০

গ্রেটব্রিটেন সংবাদপত্রপাঠ মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অত্যধিক। প্রতি হাজারে ৫৭৩ জন পাঠক পাঠিকা, সুইডেনে ৪৬৪, লাক্‌সেমবুর্গে ৪২৯ আর ফিন্‌ল্যাণ্ডে ৪২০। যুক্তরাষ্ট্রে দৈনিক কাগজের সংখ্যা ১,৭৪৫, এত বেশী দৈনিক কাগজ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। প্রতি হাজার মার্কিণের মধ্যে ৩২৭ জন এই সব দৈনিক ক্রয় করে। অপর পক্ষে প্রতি হাজারের মধ্যে ৪৭৫ জন মার্কিন সাধারণ

প্রয়োজনে পত্রপত্রিকা পড়ে। এত বেশী পৃথিবীর আর কোন দেশের লোক পড়ে না।

কোন মার্কিন যখন একখানি সংবাদপত্র ক্রয় করে, তখন সে একখানি চিত্তাকর্ষক পৃষ্ঠার সমষ্টি পায়, এজন্যে এই বাবদে ব্যয় যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয় হয় ৩৩৬ কিলোগ্রাম (এক কিলোগ্রাম ২'২ পাউণ্ডের সমান)। পৃথিবীতে এরূপ ব্যয় আর কোথাও হয় না। এর পর অস্ট্রেলিয়া, এখানে ব্যয় হয় ২৭'২ কিলোগ্রাম, তার পরই নিউজিল্যাণ্ড—এখানে ব্যয় হয় ২৫'৫ কিলোগ্রাম।

চিত্র জগতে টেক্কা দিয়েছে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জাপান। ১৯৫৮ সালে জাপানের ৫১৬ পূর্ণ আকারের দীর্ঘ ছবি প্রথম প্রদর্শিত হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে ২৮৮, হংকঙে ২৪০; ফ্রান্সে ১২৬ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১২১।

টেলিভিসনে মোনাকো পৃথিবীর মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। মোনাকোর অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি হাজারে ৫২৪ জনের টেলিভিসন যন্ত্র আছে, যুক্তরাষ্ট্রে ২৯০ জনের, কানাডায় ১৯৬ জনের, যুক্তরাজ্যে ১৯৫ জনের আর বারমুডায় ১৮২ জনের।

প্রতি বর্ষে সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে ৬৯,০৭২ নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়। পৃথিবীর মধ্যে এক বছরের মধ্যে এত গ্রন্থ কোন স্থান থেকে বাহির হয় না। এর নীচেই জাপান। এখানে প্রতিবর্ষে নতুন বই বেরোয় ২৪,১৫২, যুক্তরাজ্য থেকে বেরোয় ২০,৬৯০, জার্মানীর সংযুক্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে বেরোয় ১৬,৫৩২, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরোয় ১৪,৮৭৬ আর ফ্রান্স থেকে বেরোয় ১২,০৩২। ১৯৫৮ সালে সব চেয়ে বেশী অনুবাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন সোভিয়েট ইউনিয়ন। ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪,৪৫৭। জার্মানীর অনুদিত গ্রন্থের সংখ্যা ২,৫১২ চেকোশ্লোভাকিয়ার ইংরাজীতে অনুদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১,৪৬২।

পৃথিবীতে যে পাঁচ জনের গ্রন্থ সবচেয়ে বেশী অনুদিত হয়েছে, ১৯৫৮ সালে দেখা গেছে তাদের পাঠকপাঠিকাই বেশী। এই পাঁচজন হচ্ছেন লেনিন, সেক্‌সপিয়র, জুলে ভার্ণে, টলষ্টয় আর ডষ্টয়ে ভস্কী।

শেষ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে গোর্কি ও সাইমেনন যেন রার্ণাম আপ। পৃথিবীতে বাইবেলের মত কোন গ্রন্থ সব ভাষায় আজও পর্য্যন্ত অনুদিত হয় নি।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগমন পর্য্যবেক্ষণ করে তোমরা নিশ্চয়ই বিস্মিত হ'বে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আমাদের অগ্রগমন হচ্ছে না, পশ্চাৎ অপসরণ হচ্ছে হাহাকারে। তার কারণ 'ঘর জ্বালানো পর ভুলানো' ব্যক্তিত্বের আধিপত্যই এর মূলীভূত কারণ। যে দেশে বানরের পিঠা ভাগ নিয়ে দু'বেলা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, সে দেশে কলার চাষ করতে গিয়ে কচু ফলছে এইটেই বেশী অনুতাপের বিষয়। তোমরা মানুষ হ'য়ে ওঠো যাতে আমরা সবার উপরে সব বিষয়ে টেক্কা দিতে পারি। অতীতের সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে বর্ত্তমানের কর্ম্ম পদ্ধতির প্রানিকর ব্যবস্থা ও অপ প্রচেষ্টা দেখে। আজ যাদের সম্বন্ধে ফলাও করে লেখা হয় তারা কতদূর নীচে নেমে গেছে লক্ষ্য করেছ কি?

বর্ষা মেয়ে

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

ঝুমকা ঝুমুর ঝুমকা ঝুমুর
বর্ষা মেয়ের পায়ের নূপুর
বাজেরে ঐ বাজে,—
তাই পুলকে চাতক পাখী
মধুর সুরে কেবল ডাকি
ছোটে বনের মাঝে॥
ব্যাঙের গানের বিরাম তো নাই,
শঙ্খচিলের ডাক শুনে ভাই
জাগছে শিহরণ,—
বিজলীলতা আকাশ গায়
ঝিলিক দিয়ে যায় রে যায়—
তাই কি দোলে মন?
ডাকছে রে বাজ ক্ষণে ক্ষণে,
দুষ্ট খোকা-খুকুরও মনে
জাগছে ভীষণ ভয়;
বাউল বাতাস বইছে বেগে—
ঘুমের থেকে উঠ্‌লো জেগে
কোমল কিশলয়॥
নাচছে ময়ূর পেখম তুলে—
বক বসেছে নদীর কূলে,—
মাছরাঙা গান গায়:
দিনরাত্তির ঝুমকা ঝুমুর
বর্ষা মেয়ের পায়ের নূপুর
শুধুই বেজে যায়॥

নাথানিয়েল্ হথর্ণ রচিত

হার্কুলিসের দ্বাদশ অভিযান

(সার-মর্ম্ম)

সৌম গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ছয়ের ফরমাশ—গ্রীস-রাজ্যের প্রান্তে বিচিত্র একজাতের বিরাট পাখী নর-মাংসভোজী···তারা বহু প্রজাক্ষয় করছে··· সে-পাখীর বংশ উচ্ছেদ করা চাই! রাজা ইউরিসথিয়াসের আদেশে বীর হার্কুলিস্ এ দুঃসাধ্য কাজও সুসম্পন্ন করলেন।

সাতের ফরমাশে—হার্কুলিস্ প্রচণ্ড সংগ্রামে বধ করলেন গ্রীসের এক দুর্দ্দান্ত বলদকে।

এ ঘটনার পর, হার্কুলিসের উপর রাজা ইউরিস-থিয়াসের অষ্টম আদেশ হলো—গ্রীসের প্রতিবেশী-রাজ্যের দুর্দ্দান্ত-দুর্বিনয়ী এক রাজা ডায়োমেডিস্—যাঁর নির্ম্মম পীড়ন-অত্যাচারে রাজ্যের প্রজারা ধনেপ্রাণে বিনষ্ট হচ্ছে এবং বিদেশী-মানুষ সে-রাজ্যে প্রবেশ করলেই তাকে বন্দী করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার ব্যবস্থা চলেছে! অর্থাৎ, বাইরে থেকে কোনো বিদেশী সে-রাজ্যে এলেই রাজা ডায়োমেডিসের আদেশে নির্দ্দয়-রাজরক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে বন্দী করে রাজার বিচিত্র-ভয়ঙ্কর এক আস্তাবলে নিক্ষেপ করে···সে আস্তাবলে থাকে রাজার একরাশ অদ্ভুত ঘোড়া—তারা মানুষ খায়! এই সব বন্দী-বিদেশীরা হয় নর-খাদক সেই সব ভয়ঙ্কর ঘোড়াদের খাদ্য! রাজা ইউরিস্থিয়াস্ ফরমাশ করলেন—দুর্ব্বৃত্ত এই ডায়ো-মেডিস্কে শায়েস্তা করতে হবে!

প্রভুর আদেশে হার্কুলিস্ এলেন নির্ম্মম-অত্যাচারী ডায়োমেডিসের রাজপ্রাসাদে···এসেই রাজা ডায়োমেডিস্কে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। দুজনের দারুণ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হলো এবং সে যুদ্ধে পরাক্রান্ত-বীর হার্কুলিসের হাতে দুর্দ্দান্ত রাজা ডায়োমেডিস্ বেঘোরে প্রাণ হারালেন। হার্কুলিস্ তখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডায়োমেডিসের প্রাণহীন দেহ তুলে এনে নিক্ষেপ করলেন রাজার মারাত্মক আস্তাবলে—সেই নর-খাদক ঘোড়াদের মুখে···তাদের পরম উপাদেয় খাদ্য হবে। তারপর সেই ভয়ঙ্কর ঘোড়াগুলিকে সুকৌশলে শৃঙ্খলিত করে হার্কুলিস তাদের রাজধানীর বাইরে দূরের পাহাড় পার করিয়ে চিরদিনের মতো সে-রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দিলেন—এ সব মারাত্মক-জীব যাতে আর কোনোদিন লোকালয়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না পারে! দেশে আবার ফিরে এলো শান্তি-শৃঙ্খলা··· প্রজারা বীর হার্কুলিসের জয়গানে পঞ্চমুখ!

এ অভিযানের পর, রাজা ইউরিস্থিয়াসের সভায় ফিরে আসতেই হার্কুলিসের উপর নবম ফরমাশ জারি হলো—দুর্দ্দমনীয় নারী-বাহিনী আমাজন-জাতিকে শায়েস্তা করতে হবে। আমাজন-জাতির মেয়েরা যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি দুর্দ্ধর্ষ-সাহসী যোদ্ধা···কোনো পুরুষ-বাহিনী তাদের সঙ্গে যুদ্ধে পাল্লা দিতে পারে না। হার্কুলিসের উপর রাজার আদেশ—এই অজেয় আমাজন-নারীবাহিনীকে পরাজিত করে, বিজয়নিদর্শনস্বরূপ আমাজনদের রাণীর সোনার কোমরবন্ধ আর মণিহার সংগ্রহ করে আনতে হবে।

এ আদেশ পেয়ে হার্কুলিস্ তখন সারা গ্রীস-রাজ্যে ঘোষণা জানালেন—তিনি যাবেন আমাজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে···কে চাও তাঁর সঙ্গে সে-যুদ্ধে যোগদান করতে? ··

এ ঘোষণার ফলে, দলে-দলে বহু সাহসী বীর যোদ্ধা-যুবক এলো হার্কুলিসের সঙ্গে যোগদান করতে।

কিন্তু লোকবল যতই হোক, এ যুদ্ধে মস্ত অসুবিধা ঘটলো এই যে, আমাজনরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে—আর গ্রীকরা হলো পদাতিক! তবু এ অসুবিধা সত্ত্বেও আমাজন-যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত হার্কুলিস্ হলেন বিজয়ী এবং তিনি আমাজনদের রাণীর সোনার কোমরবন্ধ আর মণিহার এনে রাজা ইউরিস্থিয়াসের হাতে দিলেন উপহার।

তারপর দশম অভিযান···রাজা ইউরিস্থিয়াএবারেস্

হার্কুলিসকে ফরমাশ করলেন—গেরিয়ান্ নামে তিন-মাথাওয়ালা বিকট এক দানব আছে—তাকে বধ করতে হবে। একে সে দানব ভয়ঙ্কর, তার উপর সারাক্ষণ তার পাশে রক্ষী থাকে একদল বীভৎস-বিরাট কুকুর···কুকুরগুলিও নির্ম্মম···নর-মাংস খায়! দানব গেরিয়ানের সঙ্গে ভয়ঙ্কর এই কুকুরগুলিকেও বধ করা চাই!

এ দুঃসাধ্য-কাজে নামবার পূর্ব্বে হার্কুলিস্ সারা ভূমধ্যসাগর-তীরবর্ত্তী প্রদেশগুলিতে এবং জিব্রাল্টার অন্তরীপ ঘুরে দেখলেন···তারপর তিনি এলেন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে। এখান থেকে সুদীর্ঘ ক'মাসের পথ মাড়িয়ে তিনি এলেন যেখানে দানব গেরিয়ান্ বাস করে, সেই প্রদেশে। দানব গেরিয়ানের আস্তানায় পৌছুতে হার্কুলিস্কে বহু নদী, বহু পর্ব্বত পার হতে হলো! হার্কুলিস্ শেষে সন্ধান পেলেন—দানব গেরিয়ান্ থাকে এক দুর্গম গিরিগুহায়···সে গুহার মুখে সব সময় পাহারায় মোতায়েন আছে ভয়ঙ্কর কুকুর! গিরি-গুহার সামনে এসে হার্কুলিস্ তাঁর ধনুকে তীরযোজনা করবার আগেই, দানবের প্রহরী-কুকুর এলো তেড়ে···কুকুরের সঙ্গে বাধলো হার্কুলিসের তুমুল সংগ্রাম! গোলমাল শুনে দানব গেরিয়ান্ও এসে হাজির হলো সেখানে···তার সঙ্গে হার্কুলিসের বাধলো প্রচণ্ড লড়াই···সে লড়াইয়ে দুর্দ্ধর্ষ-বীর হার্কুলিসের হাতে দানব গেরিয়ান্ আর তার রক্ষী-কুকুরের হলো মৃত্যু···বাকী ভয়ঙ্কর কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে হার্কুলিস্ রাজ্যের বার করে দিয়ে এলেন।

দুর্গম পথে তিনি ফিরলেন গ্রীসে···ফিরতে না ফিরতেই রাজা ইউরিস্থিয়াসের দশম আদেশ—হেস্পেরাইডিসের বাগান থেকে এখনি সোনার আপেল নিয়ে এসো!

হেস্পেরাইডিস্ হলো—তিনটি সুন্দরী কুমারী-কন্যা···স্বর্গরাজ্যের রাণীকে স্বর্গরাজ্যের রাজা জুপিটার দিয়েছেন ক'টি আপেল গাছ··সে সব গাছে সোনার আপেল ফলে···এ তিনটি কন্যা সে আপেল-গাছগুলিকে পাহারা দেয়···এদের পাহারাদারীর কাজে সহায় আছে এক দানব···সে দানবের একশোটি মাথা।

কাজেই এ কাজে খুবই বিপদ···তাছাড়া সেই সোনার আপেল-গাছের বাগানটি গ্রীস থেকে বহু দূরে—সুদূর আফ্রিকায়! আফ্রিকা থেকে হার্কুলিস্ সদ্য ফিরেছেন···কিন্তু উপায় কি? যাই হোক, হার্কুলিস্ একদিনও বিশ্রাম করলেন না···রাজার আদেশে তখনি বেরুলেন অভিযানে।

আফ্রিকা বিরাট মহাদেশ···তার কোথায় কোন প্রান্তে এ বাগান···সে সম্বন্ধে হার্কুলিসের কোনো ধারণা নেই! কিন্তু সুবিধা হলো—নিরিয়াস্ নামে ছোটখাট এক দেবতা হার্কুলিস্কে সে-বাগানের সন্ধান দিলেন। কি উপায়ে সোনার আপেল সংগ্রহ করা যাবে—সে সম্বন্ধেও দেবতা নিরিয়াস্ দিলেন উপদেশ। নিরিয়াস্ হার্কুলিস্কে জানালেন—প্রথমে ঐ একশো-মাথাওয়ালা দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে···সে যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ঐ তিন কুমারী-কন্যা, অর্থাৎ হেস্পেরাইডিস্—তারাও খুব সাহসী বীর···তাদের অঙ্গে আজ পর্য্যন্ত কোনো যোদ্ধাই অস্ত্রক্ষেপ করতে সমর্থ হয়নি···তাদের তিন জনের চোখে ধূলো দিয়ে সোনার আপেল সংগ্রহ করতে হবে!

নিরিয়াসের উপদেশমতো হার্কুলিস্ এলেন হেস্পেরাইডিসের বাগানের সামনে ··বাগানের বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, এখন কিভাবে সোনার আপেল সংগ্রহ করবেন, এমন সময় একচক্ষু-দানব আট্লাসের সঙ্গে দেখা। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে দানব আট্লাস্ একদা শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিল বলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে···আট্লাস্কে তাই সর্ব্বক্ষণ সারা ত্রিভুবন কাঁধে করে রাখতে হয়।

হার্কুলিস্ তাকে শুধোলেন—কি করে সোনার আপেল পাই, বলো তো আট্লাস্?

আট্লাস্ বললে—তোমার সাধ্য হবে না···সে আপেল পাবে! তবে, আমার ঘাড়ের এই বোঝা যদি তুমি কাঁধে বইতে পারো, খানিকক্ষণ তাহলে আমি গিয়ে এনে দিতে পারি সোনার আপেল!

হার্কুলিস তখনি রাজী। দানব আট্লাস্ কিন্তু খুব ধূর্ত্ত···এতকাল ধরে একটানা ত্রিভুবনের ভারী বোঝা সে আর বইতে পারে না···অসহ্য ঠেকে তার! হার্কুলিসের কাঁধে ত্রিভুবনের বোঝা চাপিয়ে সে হাসতে হাসতে গমনোদ্যত হলো!

হার্কুলিস্ বুঝলেন তার মতলব···বললেন—একটু সবুর করো, আট্লাস্···বোঝা আমি বইবো···কিন্তু এটা ভালো

করে আমার কাঁধে চাপিয়ে দাও—যাতে বোঝা না হেলে পড়ে!

এ কথার মর্ম্ম ঠিকমতো বুঝতে না পেরে হার্কুলিসের কাঁধ থেকে আট্‌লাস্ দু'হাতে তুলে নিলো ত্রিভুবনের বোঝা ···যেমন তোলা, বোঝার ভার বহন থেকে মুক্তি পেয়ে হার্কুলিস্ চট করে সরে গেলেন দূরে! আট্‌লাস্ রেগে চীৎকার করতে লাগলো···হার্কুলিস্ বললেন—তোমার ফন্দী ফাঁশলো, আট্‌লাস্! তুমি এমন, তা আমি জানতুম না!

আট্‌লাসের ঘাড়ে আবার সেই ত্রিভুবনের ভারী বোঝা ···হার্কুলিস্ তখন আট্‌লাসের নির্দ্দেশমতো কাজ করে সোনার আপেল নিয়ে রাজা ইউরিস্‌থিয়াসের সভায় ফিরলেন।

একাদশ অভিযান শেষ হলো···তারপর দ্বাদশ অভিযান! হার্কুলিসের উপর আদেশ হলো—পৃথিবীর অতল-তলে পাতাল-গর্ভে নেমে সেখান থেকে তে-মাথা কুকুর সার্বেরাস্‌কে এনে দিতে হবে! এ কুকুর—আকারে হাতীর মতো প্রকাণ্ড···গায়ের এক-একটা লোম হলো, এক-একটি সাপ···কুকুর ডাকলে ভূমিকম্প হয়!

রাজার আদেশে হার্কুলিস্ গেলেন পাতালে···পাতাল-রাজ বললেন—অস্ত্রাঘাত চলবে না···গায়ের জোরে ও কুকুরকে কাবু করতে হবে!

কাজেই সেই ভয়ঙ্কর কুকুরের সঙ্গে সুদীর্ঘ সাতদিন ধরে চললো হার্কুলিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ···সে যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত কুকুরের হলো পরাজয়! তখন সেই ভয়ঙ্কর-কুকুরকে জীবন্ত বন্দী করে হার্কুলিস্ তাকে এনে রাজা ইউরিস্‌থিয়াসের হাতে সমর্পণ করলেন!

বারোটি অভিযানে এমন সাফল্য···স্বর্গের দেবতারা হার্কুলিস্‌কে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—যতকাল পৃথিবী থাকবে, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বীর বলে তোমার নাম কীর্ত্তিত হবে···তাছাড়া স্বর্গ-রাজ্যে তুমি পাবে দেবতার আসন··· স্বর্গে তোমাকে সকলে দেবতা বলে গণ্য করবেন!

—

রথ—রথ

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

বাজিবাজে খুশীর নেশায়
দে ছেড়ে আজ পথ রে,
ঐ আসে ঐ দেখনা চেয়ে
ঐ আসে আজ রথ রে।
রথের মেলা পথ জুড়ে
বইছে হাওয়া ফুরফুরে!
এই মিষ্টি দেখবি আয়
জগন্নাথের রথটি যায়;
হাজার জনে টানছে রথ—
হেঁইই ছেলেরা ছাড়রে পথ।
রথের রশি টান রে—
ধররে খুশীর গান রে;
এই মিষ্টি দেখবি আয়,
জগন্নাথের রথটি যায়!
রথের মেলা পথ জুড়ে,
বইছে হাওয়া ফুরফুরে!
আনন্দে আজ মাতলো সবাই
ঐ আসে আজ রথ রে;
বাজিবাজে, আকাশ-হাওয়ায়,
দে ছেড়ে আজ পথ রে॥

ছুটির ঘন্টায়

চিত্রগুপ্ত

ইতিপূর্ব্বে হাঁসের কিম্বা মুর্গীর ডিম নিয়ে যে সব মজার-মজার খেলা দেখানো যায়, সে রকম কয়েকটি খেলার হদিশ তোমাদের জানিয়েছি। এবারে যে বিচিত্র-অভিনব মজার খেলাটির কথা বলবো—সেটিও ডিমের

খেলা; তবে একটু আলাদা-ধরণের। ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়ে এ খেলাটি ঠিকমতো দেখাতে পারলে অনায়াসেই তোমরা আর-পাঁচজনকে রীতিমত অবাক করে দিতে পারবে। এ খেলাটির নাম—'ডিমের কেরামতী'।... এখন বলি শোনো—ডিমের এই মজার খেলাটির কায়দা-কানুনের কথা।

ডিমের কেরামতী ঃ

তোমরা সকলেই জানো—কোনো সমতল টেবিল কিম্বা মেঝের উপর হাঁসের বা মুর্গার ডিমকে কখনো খাড়া সিধা রাখা যায় না...যতই চেষ্টা করো—ডিম হেলে গড়িয়ে পড়বেই! কিন্তু এমন কৌশল আছে, যার দৌলতে ডিমকে যেমন খুশী খাড়া বসিয়ে রাখতে পারবে—এমন কি, ঢালু-জায়গার উপরেও! সেই কৌশলের কথা বলি ...তবে সে-কথা বলবার আগে ডিমের বিচিত্র এই কেরামতী দেখাতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন গোড়াতেই তার ফর্দ্দ দিই। এ খেলার জন্ম চাই—হাঁস কিম্বা মুর্গীর দুটি ডিম, খানিকটা শুকনো বালি, সামান্য একটু গঁদ বা শিরীষের আঠা (Glue) কিম্বা 'ডুরোফিক্স' (Durofix), 'প্লায়োবণ্ড' (Pliobond) জাতীয় জিনিষ-পত্র জোড়বার বস্তু। এ সব জিনিষ জোগাড় করা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

খেলার সাজ-সরঞ্জামগুলি জোগাড় হবার পর, খেলাটি দেখানোর জন্ম যে সব ব্যবস্থাদি করবে, এবারে সে সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ জানাচ্ছি।

প্রথমেই একটি কাঁচা ডিম (অর্থাৎ, সিদ্ধ করা নয়) নিয়ে তার একপ্রান্তে ছোট ফুটো করে, সেই ফুটো দিয়ে ডিমের ভিতরকার 'কুসুম' বা 'Yolk' পদার্থ নিঃশেষে ঝরিয়ে বার করে দাও। তারপর সেই ডিমটিকে খানিক-ক্ষণ রোদে রেখে ভালো করে শুকিয়ে নাও। ডিমের খোলাটি শুকিয়ে নেবার পর, পূর্ব্বোক্ত ঐ ফুটোটি দিয়ে ডিমের ভিতরে খানিকটা শুকনো বালি ভরে দাও...তবে ডিমটিতে পুরোপুরি বালি ভরবে না—মুখের কাছে খানিকটা যেন খালি থাকে। তারপর গঁদ বা শিরীষের আঠা কিম্বা 'Glue'—জাতীয় 'ডুরোফিক্স' (Durofix), 'প্লায়োবণ্ড' (Pliobond) অথবা ঐ ধরণের কোনো জোড়বার-বস্তু দিয়ে ডিমের প্রান্তভাগের ঐ ফুটোটিকে বেমালুম বুজিয়ে দাও। এ সব কাজ কিন্তু খেলাটি সকলের সামনে দেখানোর আগেই নেপথ্যে সেরে রাখতে হবে—না হলে মজা মাটি...দর্শকরা পূর্ব্বাহ্নেই তোমাদের কেরামতীর কৌশল জানতে পারবেন—কাজেই খেলা দেখিয়ে তাঁদের আর তাক্ লাগানো সম্ভব হবে না! সুতরাং এ সব ব্যবস্থা চুপিচুপি আগে থাকতেই সেরে রেখো তোমরা—কেউ না ঘুণাক্ষরেও আভাস পায় এ-কৌশলের!

যাই হোক, এ সব কাজ সেরে নেবার পর, প্রকাশ্য-ভাবে সকলের সামনে ডিমের এই কেরামতীর খেলাটি দেখানোর পালা!

দর্শকদের সামনে এ খেলাটি দেখানোর সময়, সঙ্গে দুটি ডিম রাখবে—একটি, আগেই যেমন বলেছি তেমনি ভাবে বালি-ভরে-রাখা ডিম এবং আরেকটি, সদ্য বাজার থেকে কিনে আনা টাট্‌কা কাঁচা-ডিম। প্রথমে সুকৌশলে অর্থাৎ দর্শকরা কেউ না জানতে পারে, এমন ভাবে কায়দা করে, ঐ বালি-ভরা ডিমটিকে হাতের কাছেই কোথাও লুকিয়ে রাখবে। তারপর সদ্য-কিনে-আনা টাট্‌কা কাঁচা-ডিমটি দর্শকদের কারো হাতে দিয়ে, তাঁকে বলবে, সেই ডিমটি খাড়া-সিধাভাবে সামনের সমতল টেবিল অথবা মেঝের নিমকদানী বা ঐ ধরণের কোনো জিনিষের উপর বসিয়ে দিবে। নীচের
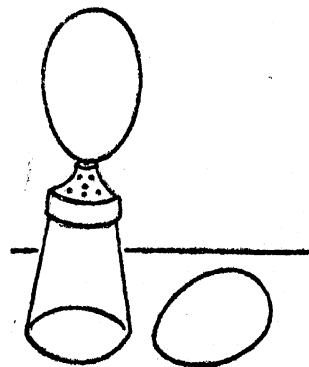
ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে! বারবার চেষ্টা করেও দর্শকদের মধ্যে কেউ যখন ঐ সদ্য-কিনে-আনা কাঁচা-ডিমটিকে নিমকদানীর উপরে খাড়া-সিধা বসিয়ে রাখতে পারবেন না, তখন তোমরা সুকৌশলে পাকা ম্যাজিসি-

য়ানের মতো সুষ্ঠুভাবে হাত-সাফাই করে, ঐ সদ্য-কিনে-আনা কাঁচা-ডিমটিকে সকলের অগোচরে চটপট হাতের কাছাকাছি কোনো জায়গায় লুকিয়ে রেখে তার পরিবর্ত্তে সেই বালি-ভরা ডিমটিকে গুপ্ত-জায়গা থেকে বার করে এনে সাড়ম্বরে নিমকদানীর মাথায় বসিয়ে দেবে! দর্শক-রাও অবাক-বিস্ময়ে দেখবেন যে, ডিমটি আর হেলে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে না···নিমকদানীর মাথায় দিব্যি খাড়া বসানো রয়েছে!

দর্শকদের আরো বেশী তাক্ লাগানোর জন্য, তোমরা আরো একটি কায়দা দেখাতে পারো! এতক্ষণ ঐ বালি-ভরা ডিমটিকে লম্বালম্বিভাবে (Vertical) খাড়া বসিয়ে রেখেছিলে নিমকদানীর মাথায়, এবারে সেটিকে আড়া-আড়িভাবে (Horizontal Position) নিমকদানীর মাথায় বসিয়ে রেখে আরো একটু কেরামতীর পরিচয় দাও। এভাবে বসানোর আগে, পাকা ম্যাজিসিয়ানের ভঙ্গীতে কথাবার্ত্তায় দর্শকদের মোহিত করে রেখে, তারই ফাঁকে সুকৌশলে হাতের ঐ বালি-ভরা ডিমটিকে বার করেক আড়াআড়িভাবে নেড়ে নাও। এমনি আড়াআড়িভাবে নাড়া দেবার ফলে, ডিমের উপরদিককার বালি নীচে পড়ে নীচের দিকটা ভারী হবে এবং উপরের দিক হবে হাল্কা···তখন ঐ ভারীদিকটি নিমকদানীর মাথায় রাখো··· দর্শকরা সবিস্ময়ে দেখবেন—আড়াআড়িভাবেও ডিমটি দিব্যি অবিচল বসে রয়েছে নিমকদানীর মাথার উপর! এমনিভাবে সমতল টেবিলের বদলে, ঈষৎ-ঢালু জায়গাতেও এই ডিমের কেরামতীর' খেলাটি দেখানো সম্ভব। সে-কায়দাটি তোমরা নিজেরাই হাতে-কলমে পরখ করো। এই হলো 'ডিমের কেরামতী' খেলাটির মোটামুটি রহস্য! আপাততঃ এই পর্য্যন্ত···পরের বারে আরো কয়েকটি এমনি ধরণের বিচিত্র মজার খেলার কথা বলবো।

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র
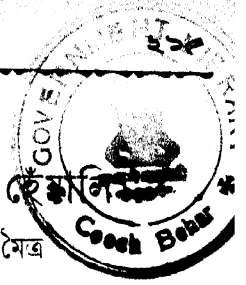
১। চতুষ্কোণের হেঁয়ালি ঃ

নীচের ছবিতে যে 'স্বস্তিকার' নক্সাটি দেখতে পাচ্ছো, কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে হুবহু এমনি-ছাঁদের একটি
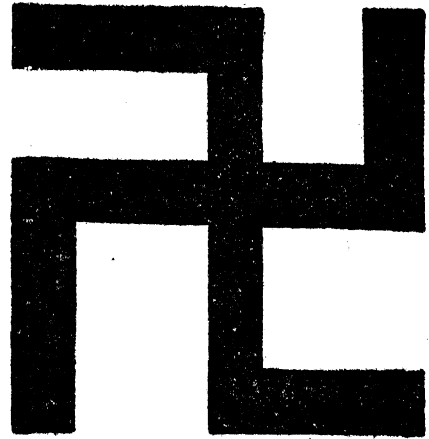
'স্বস্তিকা' আঁকো। তারপর কাঁচি দিয়ে সে নক্সা-আঁকাই কাগজটি কেটে অবিকল ঐ উপরের ছবির ভঙ্গীতে একটি 'স্বস্তিকা' তৈরী করো। এবারে বুদ্ধি খাটিয়ে এই 'স্বস্তিকা-টিকে' পুনরায় কাঁচি দিয়ে কায়দা করে কেটে চারটি টুকরোতে ভাগ করো। টুকরোগুলি সমান-মাপের না হলেও চলবে···তবে মনে রেখো—কাগজ-কাটা 'স্বস্তিকার' টুকরোগুলি সংখ্যায় যেন চারের বেশী বা কম না হয়। এখন ছাখো দিকিন্, 'স্বস্তিকার' ঐ চারটি টুকরো সুকৌশলে সাজিয়ে পরিপাটি একটি 'চতুষ্কোণ' রচনা করতে পারো কি না! যদি পারো, তাহলে বুঝবো—তোমাদের বুদ্ধি খুবই প্রখর!

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

১০	২৬	১৬	৫	২১	১২
১০	২৩	৫	২৬	১৭	১১
৩০	২৩	২২	৩	১৩	৩৩
১০	২৮	১৯	৩	২০	১১
৩০	২১	১৭	২০	১৪	১৩
১০	৯	২	২৭	৩৮	২

উপরের ছকটিতে ছত্রিশটি অঙ্ক এলোমেলোভাবে সাজানো আছে। এই সংখ্যাগুলিকে পাশাপাশি, উপরে ও নীচে একনভাবে সুকৌশলে সাজিয়ে বসাতে হবে, যাতে যোগফল সব সময়েই ১০০ হয়···অর্থাৎ সারি-দিয়ে-সাজানো সংখ্যাগুলিকে আড়াআড়িভাবে (Horizontally)। যোগ দিলেও যোগফল হবে—১০০ এবং লম্বালম্বিভাবে (Vertically) যোগ করলেও যোগফল দাঁড়াবে—১০০। এখন চেষ্টা করে ছাখো তো—উপরের ছকের ঐ এলোমেলোভাবে সাজানো ছত্রিশটি সংখ্যাকে ঠিকমতো সাজিয়ে বসাতে পারো কিনা!

সুব্রতকুমার পাকড়াশী
(কানপুর)

আষাঢ় মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' সঠিক উত্তর ঃ

১। 'কাটকুটের হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

নীচের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনিভাবে
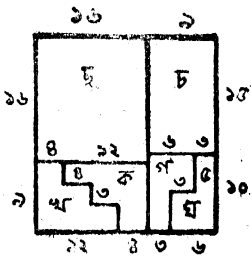
কায়দা করে, ১২" ইঞ্চি × ১২" ; ১৫" ইঞ্চি × ১৫" ইঞ্চি ; এবং ১৬" ইঞ্চি × ১৬" ইঞ্চি—বিভিন্ন মাপের তিনখানি কাঠকে, 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'চ' আর 'ছ'—এই ছয়টি টুকরোর—ছাঁদে কাটকুট করে, সেই টুকরোগুলিকে উপরের নক্সার ধরণে সাজিয়ে জোড়া দিলেই দেখবে, দিব্যি চমৎকার ২৫" ইঞ্চি × ২৫" ইঞ্চি মাপের চতুষ্কোণ একটি টেবিলের মাথা বা Top তৈরী হয়ে যাবে।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধার উত্তর ঃ

জানালা

আষাঢ় মাসের 'হেঁয়ালির' উত্তর দিয়েছে ঃ

১। মাত্র এঁরা ক'জন ছাড়া গতমাসে প্রকাশিত 'কাঠের কাটকুটের হেঁয়ালির' সঠিক-উত্তর কেউই বিশেষ দিতে পারেন নি।

১। আলো, শীলা ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কাশীপুর)

আষাঢ় মাসের 'ধাঁধার' সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

১। অমিতা, সঞ্চিতা, গীতা, রীতা, দেবীদাস ও ভবানীপ্রসাদ বসু (শিবপুর)
২। অপূর্ব্বকুমার সরকার ও অমিতকুমার বসু (কলিকাতা)
৩। অরিন্দম ও সুপ্রিয়া দাস (কৃষ্ণনগর)
৪। সুরঞ্জিত, অমিত, কাবেরী ও সৌমিত্র ঘটক (বাঁশধানি)
৫। মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় (খড়দহ)
৭। সুমন্ত, সুকান্ত ও বনানী সিংহ (গয়া)
৮। সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর)
৯। জয়প্রকাশ ও মমতা চক্রবর্ত্তী (ধুবড়ী)
১০। সুময়কুমার বিশ্বাস (কলিকাতা)
১১। বাপি, বুতাম, ও পিণ্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)
১২। দেবাশীষ, রাত্রি, স্বপন, তপন, মিনতি ও ইরা (পূর্ণিয়া)
১৩। নব সেনগুপ্ত (গণেশপুর কোলিয়ারী, ধানবাদ)
১৪। বেণু ও রুণু চক্রবর্ত্তী (জগদলপুর)
১৫। সুবাবু, সাধন, নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায়, সু মুখোপাধ্যায় ও মেহন (বাঁকুড়া)
১৬। রবীন্দ্রনাথ দিন্দা, হেমন্তকুমার জানা ও কুমারী চিত্রলেখা চৌধুরী (মেদিনীপুর)
১৭। বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (কলিকাতা)
১৮। বাচ্চু ও মাষ্টার (হরিওকা)
১৯। ভবানা, সন্ধ্যা, বরুণ, কেকা নীলা, ও শীলা খাঁ (কলিকাতা)
২০। বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত (যাদবপুর)
২১। কমলেশ মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মালতী ও সন্ধ্যা দত্ত (সারতা, মেদিনীপুর)
২২। মনীন্দ্রনাথ ও রেবা মুখোপাধ্যায় (গিরিডি)
২৩। কৃষ্ণা ও সুতপা মুখোপাধ্যায় (কামারহাটি)
২৪। নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত (জলপাইগুড়ি)

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

পোর্তুগীজ-মানোয়ারী সামুদ্রিক জীব : চেহারা দেখলে মনে হয় যেন একটি বিরাট ফুল জলের স্রোতে ভেসে চলেছে, আসলে এটি হলো বিচিত্র এক ধরণের সামুদ্রিক জীব... গভীর সাগরে থাকে। এদের দেহের নীচে অজস্র বটগাছের ঝুরির মতো যে লতাগুলি ঝুলছে দেখছো, ওগুলি লতা নয় – এই জীবের পা – অনেকটা খর্কোপাশের শুঁড়ো-পায়ের মতো। এই পায়ে ভর করে এরা সাগরের তলদেশে বিচরণ করে। এই শুঁড়ো-পায়ের অসংখ্য শুঁয়োর সাহায্যে এরা মৎস্যাদি জলজীব শিকার করে জীবনধারণ করে। এটি একটি জীব নয় – বহু জীবের সমষ্টি

লাল প্রবাল : গাছের গুঁড়ির মতো দেখতে বিচিত্র এই সামুদ্রিক-জীবের বাস সাগরের অতল-তলে – ভূমধ্যসাগরেই সচরাচর সন্ধান মেলে। এদের দেহে থাকে গাছের মতো বহু শাখা-প্রশাখা। দেহ এদের ঢাকা থাকে ছোট-ছোট ফুলের মতো বিচিত্র অলঙ্কারে। এরা হলো মাছের মতো এক ধরণের সামুদ্রিক-কীট – আকারে খুবই ছোট – এদের গায়ের রঙ টুকটুকে লাল, তাই এদের নাম 'লাল-প্রবাল' বা RED CORAL। শুধু গাছের আকারই নয়, এ ধরণের অসংখ্য ছোট-ছোট লাল-প্রবাল একত্রে মিলে সাগরের বুকে ছোট-বড় বহু দ্বীপ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করে। লোকে এই প্রবাল বা পলা দিয়ে মালা, আংটি প্রভৃতি রচনা করে।

'সাগরের ফুল' বা SEA-ANEMONE : দেখতে ফুলের মতো বটে, আসলে এগুলি হলো বিচিত্র এক ধরণের সামুদ্রিক কীট। ফুলের মতো রঙীন সুন্দর বিচিত্র এই সামুদ্রিক 'এ্যানিমোন' জলজীব দেখতে পাওয়া যায় সাগরের অতল-গর্ভে... এদের দেহে ফুলের পাপড়ীর মতো ঐ যে সব দল – ও দলগুলিতে আছে ধারালো-কাঁটার মতো অসংখ্য শোঁয়া – ডাঙার শুঁয়োপোকার সর্বাঙ্গে যেমন থাকে। এই সব পাপড়ীর-শুঁয়োকাঁটার সাহায্যে 'সামুদ্রিক-এ্যানিমোন' প্রাণীরা, মৎস্যাদি জলজীব নাগালের মধ্যে এলেই, তাদের দল মেলে কাঁটার হুল ফুটিয়ে দেয়... হুলের দংশনে মৎস্যাদি শিকার পঙ্গু ও কাবু হলেই, এরা পরমানন্দে সেগুলি ভক্ষণ করে।

এমন দুপুরে—

মায়া বসু

ঘুম কেড়ে নে'য়া এমন দুপুরে মন কি চায় ?
অবচেতনার মানস আকাশে মেঘ ছড়ায়
সেই ছেঁড়া মেঘ এলো-মেলো হয়ে মন ঢাকে,
এমন দুপুরে মন কী যে চায় ! চায় কাকে ?
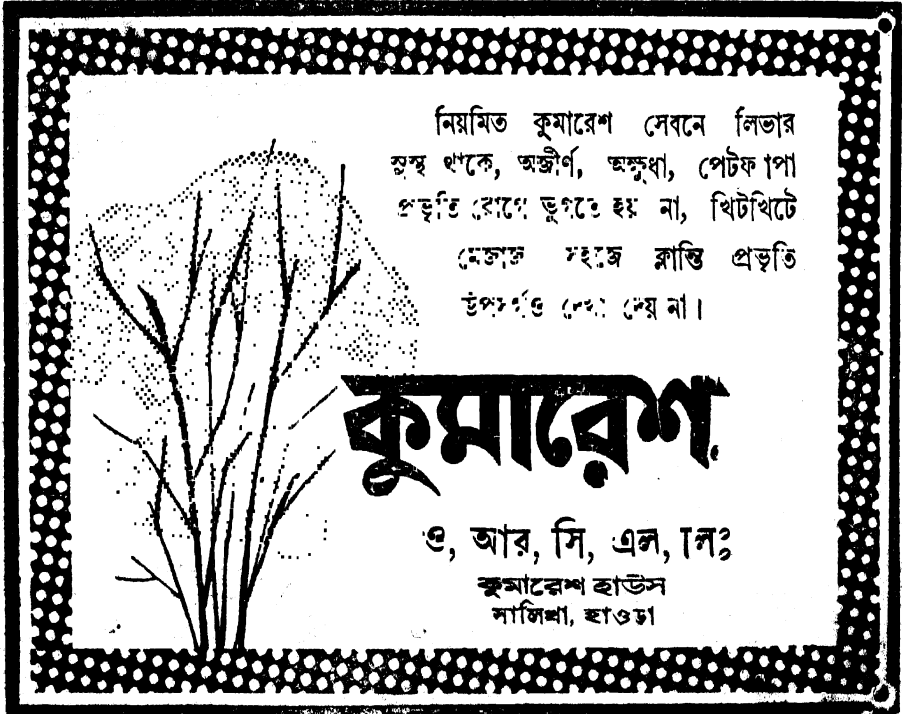
কার্ণিশে দুটো কাক কা কা করে সারা দুপুর
হাওয়ায় বাজায় রুদ্র বীণায় দীপক সুর ।
জল নেই—জ্বালা-ভরা দিন শুধু মন জ্বালায়
কী যে চায় মন ! কেন চঞ্চল ! কী ভাবনায় ?

অ্যাসফল্টের ঘামে ভেজা-পথ মূর্চ্ছা হত—
এঁকে-বেঁকে জ্বলে পুড়ে ধোঁকে যেন সাপের মত ।
কেউ কোথা নেই এই পৃথিবীর সব নিঝুম
তপ্ত দুপুর মুছে নিয়ে গেছে চোখের ঘুম ।

বাইরে সূর্য মুঠো মুঠো খর রোদ ছড়ায়,
বিরহ বিধুর কপোতীর চোখে ঘুম জড়ায়
নির্জন নীল আকাশে কোথায় মেঘ মিছিল
উর্দ্ধ গগনে ডানা মেলে ওড়ে শঙ্খ চিল ।

তৃষ্ণা কাতর চাতকী হৃদয় মেঘকে চায়—
মনের তৃষ্ণা জলে কি কখনো মেটানো যায় ?

৮০তম জন্মদিবস—

গত ১লা জুলাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশবরেণ্য নেতা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ৮০তম জন্ম-দিবস কলিকাতায় ও বাংলার বহু স্থানে পালিত হইয়াছে। বিধানচন্দ্র ঐ দিন উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁহার ভাষণের মধ্য দিয়া দেশবাসীকে সর্বদা কাজে নিযুক্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। কি উপায়ের দ্বারা তিনি পরিণত বয়সে কর্মময় জীবন যাপন করেন, তিনি সে সকল কথাও দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন। এই ৮০ বৎসর বয়সে তিনি সারাদিন কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহা চিন্তা করিলে আজিকার অলস মানুষ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়। তিনি তাঁহার জন্মদিনেই রাত্রিতে উড়োজাহাজে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন এবং ৫ সপ্তাহকাল ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সে সকল দেশ হইতে শুধু ভারতের উন্নয়নের জন্য অর্থ ও অন্যান্য উপায় সংগ্রহ করিয়া আনিবেন না, ব্যক্তিগত জীবনে বহু নূতন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আনিয়া তাহা দেশবাসীর কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত করিবেন। মুখ্যমন্ত্রী হইয়া তিনি তাঁহার স্বদেশ পশ্চিম-বাংলাকে সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের সকল অসুবিধা ও কষ্ট দূর করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন এবং প্রায় একক চেষ্টাতেই দেশের সকল প্রকার উন্নয়নের প্রচেষ্টা করিতেছেন। তিনি শুধু শ্রমদান করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই—ঐ দিন তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে (১) তাঁহার ৩৬ নির্মলচন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ ৪ লক্ষ টাকা দামের বসতবাটী তিনি জনকল্যাণ কার্য্যে—রোগীদের চিকিৎসা কেন্দ্ররূপে ব্যবহারের জন্য, দান করিয়াছেন ও (২) পাটনাস্থ তাঁহাদের পারিবারিক বাসগৃহও তিনি শিশু-কল্যাণ কেন্দ্ররূপে ব্যবহারের জন্য দান করিয়াছেন। সুদীর্ঘ কর্মবহুল জীবনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কত

লোকের কত উপকার করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। গত প্রায় ১৪ বৎসর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরূপে তিনি যে কাজ করিয়া যাইতেছেন, তাহা জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। চিকিৎসাব্যবসায়ীরূপে তিনি এই ১৪ বৎসরকালও প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সকালে ১ ঘণ্টাকাল বিনা পারিশ্রমিকে রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কলিকাতার বা পশ্চিম বাংলার কত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিতও পরিচালিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহার ইতিহাস লেখার সময় এখনও আসে নাই। তাঁহার অকুণ্ঠ সাহায্য ও সেবা ব্যতীত কলিকাতার (১) আর-জি-কর কলেজ ও হাসপাতাল (২) কে-এস-রায় টি·বি হাসপাতাল (৩) চিত্তরঞ্জন-সেবাসদন (৪) চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল প্রভৃতি বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলি সুপরিচালিত হইত না। ঐ দিন রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে এক সভায় বিধানচন্দ্রকে এক স্মারক গ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছে। তিনি দীর্ঘজীবন লাভের পথ হিসাবে তিনটি উপায়ের কথা বলিয়াছেন—(ক) নিমন্ত্রণ খাওয়া একেবারেই বাদ দিতে হবে (খ) যথাসম্ভব কম খেতে হবে ও (গ) নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করতে হবে। আমরা এই শুভদিনে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সুদীর্ঘ শান্তিময় ও কর্মময় জীবন কামনা করি এবং প্রার্থনা করি, তাঁহার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হউক।

আচার্য্য জন্মশতবার্ষিক—

আগামী ২রা আগষ্ট আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মশতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্মের কয়েক দিন পরেই আচার্য্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন যাপন করিয়া তিনি মাত্র কয় বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-কথা আজ কয়েকটি বিশেষ কারণে স্মরণ-যোগ্য। তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া যে আদর্শ কর্মময় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ কর্মবিমুখ, অলসতাপ্রিয় বাঙ্গালী তরুণদের বিশেষভাবে চিন্তার বিষয়। যৌবনে বিলাতী ডিগ্রী লইয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন—কিন্তু অধ্যাপনার সঙ্গে তিনি যে গবেষণা আরম্ভ করেন, তদ্বারা দেশবাসীর উপকার সাধনের প্রবল আকাঙ্খাই তাঁহাকে বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠার প্রেরণা দান করে। চাকরীর অবসরে তিনি কারখানায় কাজ করিয়া কারখানাটিকে এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তদ্বারা শুধু বিদেশী ঔষধের আমদানী বন্ধ হয় নাই, বহু বেকার বাঙ্গালী কর্মলাভ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক হন এবং তথায় প্রায় ২০ বৎসর কাল গবেষণা কার্য্যের সহিত অসাধারণ সমাজ সেবার কাজ করিয়া আচার্য্যদেব বাঙ্গলা দেশে এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে তিনি বাঙ্গালা দেশে বহু নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও কারখানা স্থাপন করেন এবং তাঁহার বহু ছাত্র, সহকর্মী ও বন্ধুকে এই কাজে উৎসাহ দান করেন। সারা জীবন ধরিয়া তিনি তাঁহার উপার্জ্জিত বিপুল অর্থ দেশের দরিদ্র ছাত্রগণের কল্যাণ কার্য্যে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। সর্বোপরি তিনি ত্যাগনিষ্ঠ আদর্শ জীবন অতিবাহিত করিতেন। ভোগবিলাসে তিনি কখনও অর্থব্যয় করেন নাই এবং নিজের আহার ও পরিধেয়ের জন্য অতি সামান্য মাত্র অর্থ ব্যয় করিতেন। গান্ধীজি কর্তৃক কটিবস্ত্র পরিধানের বহু পূর্ব হইতে আচার্য্যদেব মাত্র ৬আনা দামের লুঙ্গি ও অতি সাধারণ ছিটের হাফসার্ট ব্যবহার করিতেন। জীবনের শেষ প্রায় ৩০ বৎসর কাল তিনি বিজ্ঞান কলেজ ভবনের দ্বিতলে দক্ষিণের বারান্দায় একটি অতি-সাধারণ খাটিয়ায় শয়ন করিতেন এবং বিছানাও তাঁহার সেইরূপ পারিপাট্যহীন ছিল। তিনি অল্পাহারী ছিলেন এবং সাধারণ ভাত তরকারীই তাঁহার খাদ্য ছিল। আহারের জন্য তিনি কখনও অধিক অর্থব্যয় করেন নাই এবং বিলাত ভ্রমণ বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ভ্রমণের সময়ও তিনি যে পোষাক ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিলে তাঁহাকে সাধারণ ভৃত্য বলিয়া মনে হইত। নিজে প্রভূত অর্থের মালিক হইয়া—তাহা পরের মঙ্গলের জন্য বিতরণের উদ্দেশ্যে—নিজে এরূপ কৃচ্ছ সাধন করা—সত্যই অতি অল্প লোকের জীবনে দেখা যায়। আজ দেশে জনগণের

মধ্যে বিলাসবহুল জীবন যাপন দেখিয়া আচার্য্য রায়ের সেই অনাড়ম্বর, অতি সহজ, সরল ও ব্যয়বাহুল্যবর্জিত জীবন যাত্রার কথা বার বার আমাদের মনে হয়। আমরা জীবনে প্রায় ৩০ বৎসর কাল বহু সময়ে তাঁহার সান্নিধ্য লাভের ও তাঁহার সহিত একত্র বসবাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, সে জন্য তাঁহার আচরণের কথাই সর্বদা স্মরণ পথে উদিত হয়। তিনি প্রাচীন ভারতের ঋষি জীবনের উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং সারা জীবন কখনও অল্প সময়ও অলসভাবে যাপন করেন নাই। যৌবনে তিনি প্রভূত অধ্যয়নের ফলে হিন্দু-রসায়ন-বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহার পর সারা জীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল প্রবন্ধাদির মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন এবং এমন কি বৃদ্ধ বয়সে ভাল করিয়া পুনরায় সেক্সপীয়ার পড়িয়া সে বিষয়ে বিরাট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। সারা জীবন তিনি দেশবাসী জনগণকে কর্তব্যপরায়ণ করার জন্য শিক্ষা, দেশ-প্রেম, সমাজ-সেবা প্রভৃতি সম্বন্ধে কত প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। আমরা তাঁহার জন্মশতবার্ষিক উৎসবে সকলকে তাঁহার জীবন, কার্য্য ও গুণাবলীর কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি এবং আশা করি তাহার প্রচারের দ্বারা তরুণ দেশবাসী-দিগের মনে আমরা সেই আদর্শবাদ জাগ্রত করিতে সমর্থ হইব। আমরা এই শুভদিনে তাঁহার উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়া নিজেরা কৃতার্থ হইব।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা—

ভারতবর্ষের সকল রাষ্ট্রের একদল মনীষী স্বীকার করেন, ভারতে কোন ভাষার যদি সর্বভারতীয় ভাষারূপে গণ্য হইবার অধিকার থাকে, তবে তাহা সংস্কৃত ভাষার। ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু, শ্রীরাজাগোপালাচারী প্রমুখ বহু লোকই এ জন্য আন্দোলন করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতায় গত ২রা ও ৩রা জুলাই মহাজাতি সদনে নিখিল ভারত সংস্কৃত সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আচার্য্যগণ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দী ভাষার চাপে সংস্কৃত ভাষা ক্রমশঃ বিতাড়িত হইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় ভারতের জীবন-বেদ লিখিত—তাহা পাঠ না করিলে কোন ভারতীয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হয় না। ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত একমত হইয়া সেদিন সভায় ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার উমেশ মিশ্র, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবলবন্ত নাগেশ দাতার, পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ডাঃ নরহরি বিষ্ণু গ্যাডগিল প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ সম্মিলনে নিম্নলিখিত ৪টি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—(১) ভারতের সমস্ত প্রদেশে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় সংস্কৃতকে সকল কোর্সে অবশ্য-পাঠ্য করিতে হইবে। (২) প্রাদেশিকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জাতীয়তার প্রতিষ্ঠার্থে একমাত্র সর্বভারতীয় স্বদেশী ভাষা সংস্কৃতকে রাষ্ট্র-ভাষায় পরিণত করিতে হইবে। (৩) বিদ্যালয় ও মহা-বিদ্যালয়ে সংস্কৃত উপাধিধারীদেরও সমান সুযোগ ও সমান আর্থিক মর্য্যাদা দান করিতে হইবে। (৪) প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি করিয়া বিশেষ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

প্রথম দিন ৩রা জুলাই রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্মিলনের উদ্বোধন করেন এবং তথায় লোকসভার স্পীকার শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে ৫ জন পণ্ডিতকে রাষ্ট্রপতি 'বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধি দান করেন—তাঁহাদের নাম (১) পণ্ডিত পি-শাস্ত্রী (২) তারানাথ তর্ক-তীর্থ (পশ্চিমবঙ্গ) (৩) শশিনাথ ঝা (বিহার) (৪) দত্তাত্রেয় শাস্ত্রী (মহারাষ্ট্র) ও (৫) বিশ্বনাথ জগন্নাথ (অন্ধ্র)। রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতার শেরিফ শ্রীকে-কে-বিড়লা তথায় অভিনয় মহোৎসবের উদ্বোধন করেন। এই সম্মিলনের ফলে দেশে সংস্কৃতি শিক্ষার প্রচার বাড়িলে দেশ উপকৃত হইবে।

নূতন মেডিকেল কলেজ—

গত ১লা জুলাই সকালে কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডে সুখলাল কার্নানি হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মেডিসিনের (মৌলচিকিৎসাবিজ্ঞান বিভাগ) ভিত্তি স্থাপন করিতে যাইয়া ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বলেন—আমরা পুরানো ডাক্তার, বাঁধা ধরা নিয়মে চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছি। ভাল বুঝিতে পারিলে আরও ভালভাবে চিকিৎসা করিতে পারিতাম। উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব কষ্ট দেয়। ঐ দিন তাহার পর ডাক্তার

রায় বেহালা রোডে দে'জ পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপটোমাইসিন প্লান্টের উদ্বোধন করেন। ৮০তম জন্মদিনেও সারা দিন তাঁহাকে কর্মব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। ভোর হইতে সেদিন তাঁহার গৃহে শত শত বন্ধু বান্ধব জন্মদিনে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতে সমবেত হইয়াছিলেন। সকলেই সে দিন তাঁহার কল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যাদি দান করিয়াছিলেন।

খ্যাতনামা সাহিত্যিকের মৃত্যু—

আমেরিকার খ্যাতনামা সাহিত্যিক হেমিংওয়ে গত ৩রা জুলাই নিজের বন্দুক পরিষ্কার করার সময় বন্দুকের গুলীতে মারা গিয়াছেন। তিনি বড় শিকারী ছিলেন—তাঁহার পিতাও ১৯২৮ সালে নিজের বন্দুকের গুলীতে মারা যান। ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯২৯ সালে প্রথম বই প্রকাশ করিয়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন ও পর পর বহু গ্রন্থ লিখিয়া ১৯৫৪ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হন। তাঁহার মত একজন কৃতী সাহিত্যিক অকালে এই ভাবে পরলোকগমন করায় সারা পৃথিবীর লোক শোক প্রকাশ করিতেছে।

বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়

গত ৩রা জুলাই সোমবার রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতা হাইকোর্টের বার এসোসিয়েসন হলে প্রাক্তন বিচারপতি (১৯১৯-১৯১৭) স্বর্গত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। দিগম্বরবাবু ১৮৫৭ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৮৮২ সালে হাইকোর্টের উকিল হন ও ১৯৪১ সালে মারা গিয়াছেন। শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার বক্তৃতায় সে যুগের মানুষদের আদর্শ নিষ্ঠার কথা বিবৃত করেন।

নূতন ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতবর্ষে ১৯৫০-৫১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৭টি। ১৮৫৫-৫৬ সালে তাহা ৩২টি এবং ১৯৬০-৬১ সালে ৪৭টি হইয়াছে। বর্তমান তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও নূতন ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা আছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ছাত্রগণকে বৃত্তিকরী ও কারিগরী শিক্ষার দিকে ফিরাইবার জন্য অধিকতর সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইবে। শিক্ষা বিভাগে বর্তমানে বহু সমস্যা বর্তমান, সে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত ও কার্যে পরিণত করা না হইলে ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা কোন ফল লাভ হইবে না।

কলিকাতা বন্দরের উন্নয়ন

কলিকাতা বন্দর উন্নয়নের জন্য ঋণ এবং সড়ক পরিকল্পনার জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার ঋণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী শ্রী জি বেঙ্কটেশ্বর আয়ার ওয়াশিংটন গিয়াছিলেন। তিনি ৩রা জুলাই দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—কলিকাতা বন্দরের উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক প্রায় ১০ কোটি টাকা ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন। হুগলী নদীর জল সংক্রান্ত পরীক্ষা কার্য্য, বিভিন্ন ধরণের ড্রেজার ক্রয়, পুরোধা জাহাজ, খিদিরপুর ডকে জল সঞ্চালনের জন্য পাম্প করিবার যন্ত্র স্থাপন, কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি, কিং জর্জ ডকের একাংশের সম্প্রসারণ ও সাজ সরঞ্জাম বাবদ এই ঋণ ব্যয় করা হইবে। কলিকাতা বন্দরকে সোজাসুজি ঐ টাকা দেওয়া হইবে এবং ভারত সরকার ঐ ঋণের জন্য জামীন থাকিবেন। ইহার ফলে কলিকাতা ও সহরতলীর উন্নতি হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন বৈদ্যুতিক ট্রেন

আগামী ১৯৬৩ সালের মার্চ মাস নাগাদ শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট ও বনগাঁ পর্যান্ত বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল সুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়। শিয়ালদহ শাখার দক্ষিণ ভাগে এবং কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর অঞ্চলে ১৯৬৫ সাল নাগাদ ইলেকট্রিক ট্রেন চলিবে। এই বিদ্যুৎকরণ কার্যের জন্য বর্তমান যাত্রীদিগকে কিছুকাল নানারূপ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। ইহার জন্য কি ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়?

দক্ষিণ ভারতে বন্যা

এবার জুন মাসের শেষ ভাগ হইতে দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে বন্যার ফলে বহু শত লোক মারা গিয়াছে ও বহু সহস্র মানুষ গৃহহীন হইয়াছে। কেরল রাজ্যে বন্যার প্রকোপ খুব বেশী হয় এবং মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহীশূর প্রভৃতি স্থানেও তাহা ছড়াইয়া পড়ে। প্রতি বৎসর দেশের কোন না কোন স্থানে বন্যা হইয়া লোক বিপন্ন হইয়া থাকে। উন্নয়ন কার্যের জন্য প্রকৃতির সহিত মানুষের সংগ্রামের ফলই কি ইহার কারণ?

উড়িষ্যায় নূতন মন্ত্রিসভা

উড়িষ্যা রাজ্যে ৪ মাস রাষ্ট্রপতির শাসন চলার পর গত ২৩শে জুন কংগ্রেস-নেতা শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়কের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। গত সাধারণ নির্বাচনে উড়িষ্যায় কংগ্রেস দল একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মন্ত্রী হইয়াছেন—বিজয়ানন্দ পট্টনায়ক মুখ্যমন্ত্রী, বীরেন মিত্র, সদাশিব ত্রিপাঠি, নীলমণি রাউতরায়, পবিত্রমোহন প্রধান, সি-ডি-জগন্নাথ রাও এবং খাণ্ডাপাড়ার রাজা হরিহরি সি মর্দরাজ ভ্রমরেশ্বর রায়। ঐ দিন বিকালে ৭ জনকে লইয়া গঠিত মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন বিভাগের কাজ ভাগ করা হইয়াছে।

কলিকাতা বাগজোলায় গুলীবর্ষণ

গত ২৬শে জুন সোমবার বিকালে কলিকাতার উত্তরপূর্ব দিকে ২৪ পরগণা জেলার বাগুইআটির নিকট বাগজোলা উদ্বাস্তু শিবিরে পুলিসের গুলীতে ৪ জন উদ্বাস্তু নিহত ও বহু উদ্বাস্তু আহত হওয়ায় সাধারণ মানুষ স্তব্ধ হইয়াছে। উদ্বাস্তরা দণ্ডকারণ্যে যাইতে অসম্মত হওয়ায় তাহাদের ডোল বন্ধ হয় ও প্রতিবাদে তাহারা অনশন আরম্ভ করেন। কয়েকজনের অবস্থা শঙ্কাজনক হওয়ায় পুলিশ তাঁহাদের হাসপাতালে লইয়া যাইতে চায়; পুলিস তথায় যাওয়ায় উদ্বাস্তরা পুলিসকে ইট পাটকেল মারিয়া আহত করে ও শেষে পুলিস গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। একজন বামপন্থী নেতার প্ররোচনায় উদ্বাস্তরা অনাচারে প্রবৃত্ত হইলে পুলিস আহত হইয়া গুলী চালাইয়াছে—ঘটনাটি মর্মন্তুদ সন্দেহ নাই। কাজেই এ বিষয়ে তদন্ত হইয়া অপরাধীর শাস্তি বিধান বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ ঘটনা না ঘটে, সেজন্য কর্তৃপক্ষকে সতর্কতার সহিত কাজ করিতে হইবে। যে কয়জন উদ্বাস্তু নিহত হইয়াছে, তাহাদের জীবনের মূল্য কে দিবে?

পার্বত্য জাতিদের সেবাকার্য্য—

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ডেরাডুনের রাজপুর পল্লীতে সাধন-শান্তিকুটীর নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে জনসেবার কাজ করিতেছেন। সম্প্রতি

ডেরাডুনে উৎসবের চিত্র

কলিকাতার ধনী ব্যবসায়ী শ্রীকার্তিকচরণ সাহা ও ব্যারিষ্টার শ্রীনমালী দাসের অর্থ সাহায্যে ঐ আশ্রমে শিব প্রতিষ্ঠা ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে এরূপ কার্য্য প্রশংসনীয়।

শব্দের-গতিজয়ী জঙ্গী বিমান—

বাঙ্গালোরের ২৪শে জুনের সংবাদে প্রকাশ—ভারতে নির্মিত শব্দের-গতি জয়ী প্রথম জঙ্গী বিমানের সাফল্যজনক পরীক্ষা করিয়া ভারত পৃথিবীর মধ্যে অন্যান্য ৫টি দেশ—রুসিয়া, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও সুইডেনের সমান গৌরব অর্জন করিল। শব্দের গতিজয়ী এই জঙ্গী বিমানকে এচ—এফ—২৪ নাম দেওয়া হইয়াছে। ভারত এসিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম এই গৌরবের অধিকারী হইল। ইহা নির্মাণ করিতে ৫ বৎসর সময় লাগিয়াছে। ৪১ বৎসর বয়স্ক উইং কম্যাণ্ডার পুরঞ্জন দাশ উহা লইয়া আকাশে ২০ মিনিট ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

॥ ফ্যামিলি-গ্রুপ ॥
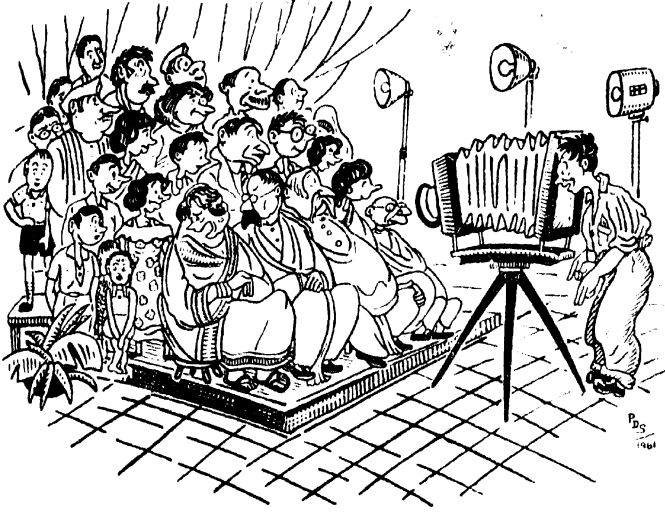
ফটোগ্রাফার :—হ্যাঁ, আর নড়বেন না কেউ···বেশ হাসি-হাসি মুখ···আমি এবারে ছবি তুলবো !

কর্ত্তা (শশব্যস্তে) :—আহাহা···না, না···সবুর করুন···এখনো ক'জন বাকী !···

ফটোগ্রাফার :—বলেন কি ?···এর উপর আরো ক'জন !···এতেই আমার ক্যামেরার লেন্সে থৈ পাচ্ছি না···

কর্ত্তা :—উপায় কি ! আমার পিসতুতো ভাই, তার বৌ—মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী নিয়ে আসছে !···'ফ্যামিলি-গ্রুপ' কিনা !···

ফটোগ্রাফার :—তাহলে অপেক্ষা করুন মশাই ! ষ্টুডিয়োর এই পিছনের দেওয়ালটা না ভাঙলে চলবে না···কারণ, ক্যামেরা নিয়ে আমাকে অনেকখানি পিছু-হটতে হবে—না হলে আপনাদের পুরো 'ফ্যামিলি-গ্রুপটিকে' ছবির লেন্সে আঁটতে পারবো না !···

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

২৯

❀ মেয়েদের কথা ❀

নারী তুমি মহীয়সী

নমিতা গঙ্গোপাধ্যায়

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেহ নাহি দিবে অধিকার" এ কথা লিখে গেছেন কবি অনেক দিন আগে, যখন নারীর ভাগ্য ছিল চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। বাহির-বিশ্বে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে নারী ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেদিন পুরুষ আপন স্বার্থে নারীকে আটকে রেখেছিল সীমিত গণ্ডীর মধ্যে। যখন স্ত্রী শিক্ষার বহুল প্রচলন হয়নি সেদিন শিক্ষিত মহিলা ছিল মুষ্টিমেয়, আর নারীর কর্মজীবন সীমিত ছিল বিদুর ভাষায় "রাঁধার পরে খাওয়া, আর খাওয়ার পরে রাঁধায়"। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। সে যুগকে পেছনে ফেলে নারী আজ এগিয়ে এসেছে অনেক আগে। পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে সে আজ উঠছে পাহাড়ের চূড়ায়। এরোপ্লেনের পাইলট হয়ে উড়ছে আকাশের বুকে। সাঁতার কেটে পার হচ্ছে দুস্তর সমুদ্র, আর সাথে সাথে ছুটে চলেছে কর্মস্থলে।

নারী শুধু আজ পুরুষের সহধর্মিণীই নয় পুরুষের কর্মসঙ্গিনীও। নারীর গতি আজ আর শুধু চার দেয়ালে আবদ্ধ নয়। তবু কেন আজ সংবাদপত্রের পাতায় পড়তে হয়—অত্যাচারে জর্জরিত ললিতার আত্মহত্যার কাহিনী ? শুধু কাহিনী নয়, এর পেছনে আছে এক মর্মন্তুদ ইতিবৃত্ত। ললিতা আত্মহত্যা করেছে। স্বামী আর শাশুড়ীর অত্যাচারে জর্জরিতা ললিতা। অভিমানিনী বাংলার মেয়ে কারও প্রতি কোন অভিযোগ না রেখে আগুনে পুড়ে মারা গেছে। জীবনের প্রতি মানুষের মমতা অসীম, তবে কেন ললিতা আগুন জ্বালালো নিজের সর্ব শরীরে ? হয়তো সে আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলছিল ললিতা, তার চেয়ে পুড়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। ললিতার পুড়ে মরার পেছনের ইতিহাস যদি উদ্ঘাটিত হয় তো দেখা যাবে সেই পুরোন দেনাপাওনার ইতিহাস। "দেনা-পাওনা"র নিরুপমা সে কারণে তিলে তিলে মারা গেছে, ডাক্তার আসেনি আর হতভাগ্য পিতাও শেষ দেখা দেখতে পারেনি মেয়েকে। এখানেও ললিতা মারা গেছে ছেঁড়া কাপড় পরে তেলহীন কেশে। ললিতার আগে আরও দুটি মৃত্যু-কাহিনী বেরিয়ে গেছে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়—আর সেই আত্মহত্যার কারণগুলো অনুধাবন কোরলে একই সরল রেখায় পৌছনো যায়। অতি-লোভী পাত্রপক্ষ ঈপ্সিত যৌতুক না পেয়ে হয়ে ওঠেন হিংস্র আর নিষ্ঠুর। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে শুরু হয় বধূর ওপর নির্য্যাতন। গালাগালে পিতামাতাও বাদ যান না। ললিতা আর শ্রীমতী চ্যাটার্জি ছাড়া কিছু দিন আগে আর যে মেয়েটি বিষ খেয়ে হাসপাতালে আসে, সে মারা যাবার পূর্ব্ব মুহূর্তে বলে যায় তার বক্তব্য। বলে যায় যে তার বিয়ের যৌতুক স্বরূপ আলমারী পাওনা ছিল, আর সেটা দেওয়া হয়নি দেখেই স্বামী আর শাশুড়ীর সম্মিলিত অত্যাচার শুরু হয় তার ওপর, যার ফলে আত্মহত্যা কোরতে বাধ্য হয়েছে মেয়েটি। কথা হচ্ছে এই যে নিষ্ঠুর উৎপীড়নে উৎপীড়িতা মাত্র তিনটি নারীর মৃত্যু সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে এমনি আরো কত নারী আছে যাদের কথা সংবাদপত্র জানে না। যে সভ্য দেশে আজও নারীকে পণ্য সামগ্রীর মত নারীর মূল্য যাচাই কোরছে সে দেশের পরিণতি কী ? পণপ্রথা নিয়ে অনেক লেখালিখি হয়েছে, এ নিবন্ধে নতুন করে তার সূচনার প্রয়োজন নেই। যদিও আজও সেই পণ নিয়ে যৌতুকের দানসামগ্রী নিয়ে চলছে নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা। যারা প্রাচীন-পন্থী তাদের কথা নাহয় বাদই দিলাম, কিন্তু নবীন-পন্থীরা এত অনুদার কেন ? স্ত্রী যখন মায়ের হাতে লাঞ্ছিতা হচ্ছে

তখন কি একটা ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদের ভাষাও স্বামীর মুখে যোগায় না? হয়তো এর পেছনে আছে তাদের সুস্পষ্ট সমর্থন। যে নারীকে পিতামাতার স্নেহনীড় থেকে নিয়ে আসা হয় অগ্নি আর ধর্ম সাক্ষ্য করে, প্রতিজ্ঞা কোরতে হয় সকল সুখে দুখে স্ত্রীর অংশীদার হওয়ার, সেই মেয়েকেই তারা কেমন করে একটু একটু করে আঘাতের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে? কিছুই কি মনে পড়ে না তখন যখন নববধূ কাঁদতে কাঁদতে বলে, "আর আমি পারছিনা—এমন করে তোমরা আমায় বোল না?" টাকা আর আলমারী, বালা আর হার কী বিবাহিতা পত্নীর সজল চোখের চেয়েও মূল্যবান? হায় পুরুষ! অসহায়ের প্রতি কি তোমার এতটুকু সমবেদনা নেই?

আজ আমাদের দেশেও পাশ্চাত্যের মত বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ হয়ে গেছে। অত্যাচারিতা নারী আজ ইচ্ছে কোরলেই এই বিশেষ আইনের সহায়তায় বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হতে পারে পুরুষের হাত থেকে। যদিও এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বলতে হয়। প্রথমতঃ বাঙ্গালী ললনার দেহ-মন এমন উপাদানে তৈরী যে বিচ্ছেদের নামে তারা ম্লান হাসি হাসবে। বলবে—যে দেশে মেয়েদের একবার বিয়ে দিতেই বাপ মায়ের রক্ত জল হয়ে যায়, সেখানে বিচ্ছেদের পর আবার পুনর্বিবাহের চেষ্টা? আবার নতুন করে পিতা কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে গলবস্ত্র হয়ে হন্যে হয়ে ঘুরুক পাত্রের দ্বারে দ্বারে। তার পর? দ্বিতীয় পতি গ্রহণের সুযোগ পেয়ে পাত্রপক্ষ দর হাঁকুক নীলামে, তখন মেয়ের বাবা আবার সেই পরিণতিই দেখতে পান দিব্য দৃষ্টিতে। কাজেই এদেশে "বিবাহ-বিচ্ছেদ" আইনটা সার্থক প্রচেষ্টা নয়—হাস্যকর প্রচেষ্টা।

এই প্রসঙ্গে স্বতস্ফূর্ত ভাবে আর একটা কথাও এসে পড়ে—যেটা হচ্ছে পাত্র নির্ব্বাচনের প্রশ্ন। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় চোখ বুলোলেই অনেক শিক্ষিত রুচিবান পাত্রের আবেদনই চোখে পড়ে। বক্তব্যের শেষে যাদের ছোট করে দুটি শব্দ দেওয়া থাকে "দাবী নেই"। সততই তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় অন্তর আপনিই নুয়ে পড়ে। কিন্তু যদি এই বিষয়টিকে নিয়ে একটু পরিষ্কার আলোচনা করা যায় তবে দেখা যাবে পরিকল্পনাটি কত সুন্দর, কত কল্পনাপ্রসূত। এই "দাবী নেই" কথাটিকে ভুল করে দুটি পরিবার নিদারুণ ভাবে ঠকে গিয়েছিল কটি বছর আগে। পাত্র পক্ষ ভেবেছিল "দাবী নেই" বলে কী কিছুই দেবে না? নগদ টাকা না দিক পিতা যখন "অফিসার" তখন গয়নাগুলো ভারীই হবে। আর কন্যাপক্ষ ভাবলেন দাবীই যখন নেই তখন আর দেনার বিড়ম্বনা কেন? যাহোক সামান্য দিয়ে সেরে দিই। বিয়ের রাত কেটে গেল কিন্তু গোলমাল কাটলো না। বউ ভাতের দিন কন্যাপক্ষর দেওয়া যাবতীয় দানসামগ্রী ফিরে গেল নিমন্ত্রিত হয়ে আসা কন্যাপক্ষের হাতেই। তাই বলছিলাম এক কথায় এর যবনিকা টানা যায় না।

কাগজের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

আজকের দুনিয়াতে কাগজের প্রয়োজনীয়তা যে মানুষের দৈনন্দিন-জীবনে কতখানি ব্যাপক-প্রসারতা লাভ করেছে, সে কথা কারো অজানা নেই। কাগজে কত কাজ হয় এ যুগে···বই-ছাপা, সংবাদপত্র-মুদ্রন, দলিল-দস্তাবেজ রচনা, বৈজ্ঞানিক কলকব্জার নক্সাঙ্কন, লেখাপড়ার কাজ, দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীদের বিবিধ তৈজস-সামগ্রী আর পণ্য-পরিবহনের উপকরণ বাক্স-কৌটা-পুলিন্দা প্রভৃতি বহু বিভিন্ন ধরণের ব্যাপারেই শুধু যে কাগজের চাহিদা ও ব্যবহার আজ বেড়েছে তাই নয়, একালের সৌখিন কারু-শিল্পীদের কাছেও এটি হলো অপরিহার্য্য একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রী। কাগজের বুকে রঙ তুলির বিচিত্র রেখা টেনে কুশলী চিত্রশিল্পী যেমন অনায়াসেই মনোরম পট-চিত্র রচনা করে তোলেন, ঠিক তেমনিভাবেই রঙিণ কাগজ আর সামান্য কয়েকটি উপকরণের সাহায্যে নিপুণ

কারু-শিল্পী অল্প-আয়াসেই গড়ে তুলতে পারেন নানান্ অভিনব-অপরূপ বিচিত্র সৌখিন শিল্প-সামগ্রী! শুধু রঙিণ কাগজ আর অল্প কয়েকটি সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে এমনি ধরণের বিচিত্র-অভিনব কারু-শিল্পের সৌখিন সামগ্রী তৈরী করা খুবই সহজসাধ্য এবং এমন কিছু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপারও নয়। কাজকর্ম্মের অবসরে ঘরে বসেই যে কেউ সামান্য কয়েকটি উপকরণের সাহায্যে অনায়াসেই এ সব কারুশিল্প-কাজ করতে পারবেন। তাছাড়া এ সব শিল্প-কারুর সামগ্রী রচনা করে শুধু যে নিজে আনন্দ পাবেন তাই নয়, সংসারে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকেও স্বহস্তে-রচিত বিচিত্র অভিনব নানান্ সৌখিন জিনিষ উপহার দিয়ে, তাঁদেরও আনন্দদান করবেন প্রচুর। এমন কি যাঁরা অবসর-সময়ে কোনো কিছু বাড়তি-কাজকর্ম্ম করে সংসারের সাশ্রয়-সাধনের জন্য অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ খুঁজছেন, তাঁদের পক্ষেও এ ধরণের সামান্য মূলধনে নানা রকমের সৌখিন কারু-শিল্পের সামগ্রী রচনার ব্যবসাটি অনেকখানি সুবিধা-জনক হবে। আপাততঃ, কাগজ দিয়ে যে সব অভিনব-অপরূপ সৌখিন কারুশিল্প-সামগ্রী রচনা করা যাবে, সেগুলির বিষয়ে মোটামুটি কিছু আভাস দিচ্ছি।

প্রথমেই বলছি—রঙিণ কাগজ দিয়ে বিচিত্র-ছাঁদের 'ল্যাম্পশেড্' (Lampshade) বা 'বিজলী-বাতির আবরণী' রচনার কথা। নীচের ছবিতেই আমাদের আলোচ্য
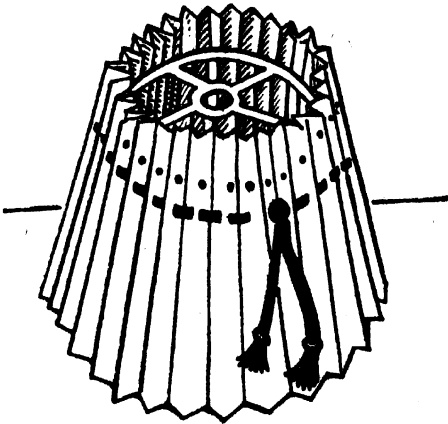
'ল্যাম্পশেড্' (Lampshed) বা 'বিজলী-বাতির আবরণী'র যে নমুনা দেখতে পাচ্ছেন, সেটি তৈরি করতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিই। এই কারু-শিল্প সামগ্রীটি তৈরি করতে হলে চাই—একটি পেন্সিল, একটি কাঁচি, একটি 'রুলার' (Ruler), একশিশি আঠা এবং ৯″ ইঞ্চি × ১২″ ইঞ্চি সাইজের দু'খানি পাৎলা কার্ডবোর্ড-জাতীয় বইয়ের মলাটের মতো কাগজ কিম্বা ঈষৎ মোটা-ধরণের 'ড্রইং-পেপার' (Drawing Paper)। ল্যাম্পশেডে'র কাগজ খুব বেশি পাৎলা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়—কারণ, খুব বেশী পাৎলা-কাগজের তৈরি 'ল্যাম্পশেড' তেমন মজবুত ও টঁ্যাকসই হয় না। অথচ খুব বেশি মোটা-ধরণের কাগজেও আবার ভালো 'ল্যাম্পশেড্' বানানোর অসুবিধা ঘটে। কাজেই 'ল্যাম্পশেডে'র কাগজটি যেমন বলেছি, তেমনি হওয়া চাই—অর্থাৎ, খুব বেশি মোটাও হবে না এবং খুব বেশি পাৎলাও যেন না হয়। 'ল্যাম্পশেডে'র কাগজ রঙিণ হলেই ভালো হয়...সাদা কাগজেও 'ল্যাম্পশেড' তৈরী করা চলে, তবে সাদা কাগজের তৈরী 'ল্যাম্পশেডে' রঙিণ কাগজের মতো তেমন বাহার খুলবে না। সেজন্য রঙিণ কাগজ ব্যবহার করাই ভালো। বাজারে কাগজের দোকানে সহজেই এ ধরণের রঙীণ কাগজ মিলবে এবং সে সব কাগজের দামও এমন কিছু বেশি নয়।

কাগজ সংগ্রহ হবার পর, 'ল্যাম্পশেডে'র জন্য ৯″ ইঞ্চি ১×২″ ইঞ্চি মাপের দু'খানি রঙিণ কাগজকে, দুইপ্রান্তে জুড়ে (End to End) নিয়ে সমতল টেবিল বা মেঝের উপর সে দুটিকে সমানভাবে বিছিয়ে পেতে রাখুন—যেমন পাশের ১নং ছবিতে দেখানো হয়েছে। এবারে
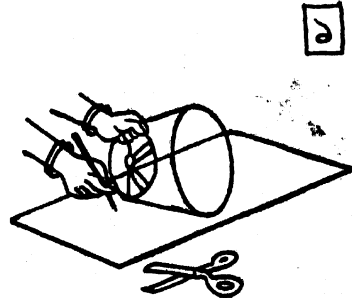
বাড়ীতে যদি পুরোনো 'ল্যাম্পশেড' থাকে, তাহলে সেই 'শেডের' 'তারের ফ্রেম' (Wire-Frame) কিম্বা বাড়িতে যদি তেমন 'ফ্রেম' না থাকে, তাহলে প্রয়োজনের অনুরূপ নতুন একটি 'তারের ফ্রেম' বাজার থেকে কিনে এনে, সে

'ফ্রেমটি' ঐ বিছানো-কাগজের উপর রেখে (যেমন ১নং ছবিতে দেখছেন) 'ফ্রেমের' উপরদিকে এবং নীচের দিকে কাগজে ½" ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে পেন্সিলের দাগ টেনে চিহ্নিত করে নিন। তারপর ঐ পেন্সিলের দাগে-দাগে কাঁচি চালিয়ে কাগজের উপরে-নীচে ঐ দাগের বাইরের বাড়তি অংশটুকু কেটে বাদ দিন।

কাগজের বাড়তি-অংশটুকু কেটে-ছেঁটে নেবার পর, কাগজটিকে পাশের ২নং ছবির ধরণে, আগাগোড়া ½" ইঞ্চি
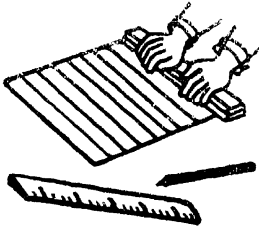
অন্তরে থাকে-থাকে পরিপাটিভাবে ভাঁজ করে নিন।

এবারে ঐ থাকে-থাকে ভাঁজ করা কাগজখানিকে পাশের ৩নং ছবির ভঙ্গীতে, বেশ শক্ত করে চেপে ধরে,
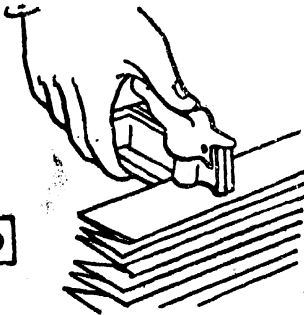
'পাঞ্চিং-মেশিন' (Paper-Punch) বা মোটা গুণ-ছুঁচ ঢুকিয়ে একটি 'রন্ধ্র' (Hole) বা 'ফুটো' করে নিন…এই 'রন্ধ্রটি' করতে হবে, কাগজের মাথার দিকে ½" ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে। তারপর, ঠিক এমনিভাবেই, কাগজের মাথার দিকে ১" ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দিয়ে (অর্থাৎ, ঐ আগের 'রন্ধ্রের' ½" নীচে) পুনরায় ঐ থাকে-থাকে ভাঁজকরা কাগজখানির প্রায় মাঝামাঝি-অংশে পূর্ব্বোক্ত-ধরণে 'পাঞ্চিং-মেশিন' বা গুণ-ছুঁচ দিয়ে আরেকটি 'রন্ধ্র' (Hole) বা 'ফুটো' রচনা করুন…উপরের ৩নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে। এভাবে 'রন্ধ্র'-রচনার ফলে, থাকে-থাকে ভাঁজকরা কাগজখানি মেলে প্রসারিত করলেই দেখবেন—উপরের 'রন্ধ্রগুলি' দুটি লাইনে সারি দিয়ে ছোট-ছোট বিন্দুর মতো ফুটে উঠেছে—ঐ থাকে-থাকে ভাঁজকরা কাগজের মাথার কাছে।

এবারে 'ল্যাম্পসেডের' ভাঁজকরা কাগজের প্রান্তভাগ আগাগোড়া আঠা দিয়ে পাকাপাকিভাবে জুড়ে নিন, কিম্বা বরাবর 'ষ্টেপলার'-(Stapler-machine) যন্ত্রের সাহায্যে 'পিন' (Pin) দিয়ে জুড়ে নিন। তারপর ঐ 'তারের ফ্রেমের' উপরে কাগজের এই 'শেডটিকে' ভাঁজ খুলে প্রসারিত করে পরিপাটিভাবে পরিয়ে দিন…এভাবে পরানোর সময় নজর রাখবেন যে—'ফ্রেমের' মাথার দিকের গোলাকৃতি তারের সঙ্গে, 'ল্যাম্পশেডের' মাথার দিকের বৃত্তাকারে সাজানো 'রন্ধ্রগুলি' যেন আগাগোড়া 'খাঁজে-খাঁজে মিলে গিয়ে বসে যায়! এবারে পাশের ৪নং ছবিতে
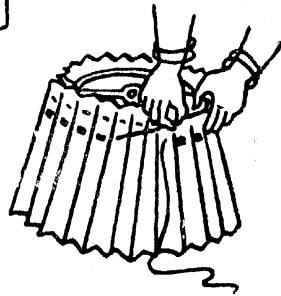
যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ধরণে সুদৃশ্য একটি বাহারী রেশমের 'কর্ড' (Chord) বা 'ফিতা' নিয়ে, সেটিকে পরিপাটিভাবে 'ল্যাম্পশেডের' মাঝামাঝি যে বৃত্তাকারে সাজানো 'রন্ধ্রগুলি' রয়েছে, সেগুলির ভিতর দিয়ে পরিয়ে দিন। ফিতাটিকে পরানোর পর, সেটিকে বেশ মজবুত করে টেনে, ফিতার প্রান্তভাগ দুটি মিলিয়ে একত্র করে পরিপাটি-ছাঁদে 'গ্রন্থি' বেঁধে দিন—প্রবন্ধের গোড়ায় উপরের ল্যাম্পশেডের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে।

বারান্তরে, কাগজের কারু-শিল্পের আরো কয়েকটী বিচিত্র সামগ্রী রচনার কথা আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

ঘরোয়া সেলাইয়ের কাজ

সুলতা মুখোপাধ্যায়

সেমিজ-পেটিকোট

গতবারে 'প্রিন্সেস-পেটিকোট' বা 'সেমিজ-পেটিকোট' বানাতে হলে কিভাবে মার্কিন, লংক্লথ কিম্বা চিকণদার কাপড়ের কাট-ছাঁট করা প্রয়োজন, তার মোটামুটি আভাস দিয়েছি, এবার বলবো—মেয়েদের বিশেষ-প্রয়োজনীয় এই 'অন্তর্ব্বস্ত্র' বা 'Underwear' পরিচ্ছদটি সেলাইয়ের কথা।
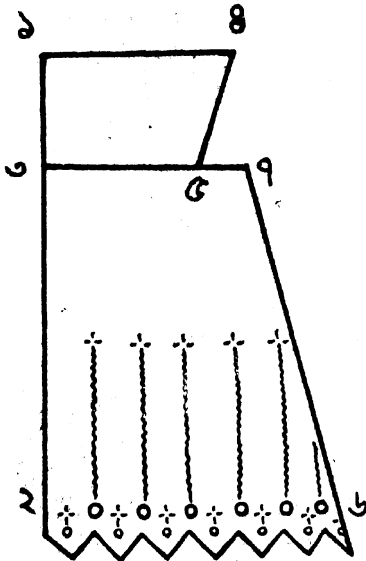
উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি-ছাঁদে কাপড়টিকে সুষ্ঠুভাবে মাপ-মতো আকারে ছাঁটাই করে নেবার পর সেলাইয়ের পালা। আপাততঃ সেই সেলাইয়ের পদ্ধতির কথা বলি।

'প্রিন্সের-পেটিকোট' সেলাইয়ের সময়, গোড়াতেই 'ছাতির লাইন' অর্থাৎ উপরের নক্সানুসারে '১' চিহ্নিত অংশ থেকে '৪' চিহ্নিত অংশটিতে আড়া আড়িভাবে সোজা লাইনে কাপড়ের 'পটি' বা ফিতা অর্থাৎ, 'ইন্সেসন্' বসিয়ে '৪' এবং '৫' চিহ্নিত অংশ সংযুক্ত করে সেলাই দিতে হবে। তারপর উপরের নক্সার ছাঁদে, '৫' চিহ্নিত অংশে ১½" ইঞ্চি কাপড় কেটে, '৭' চিহ্নিত অংশের সঙ্গে '৬' চিহ্নিত অংশটিকে জোড়া দিয়ে সেলাই করবেন। এবারে পূর্ব্বোক্ত ঐ ১½" ইঞ্চি কাটা-কাপড়ের জায়গায়, '৫' এবং '৭' চিহ্নিত অংশে ৩" ইঞ্চি মাপের যে বাড়তি কাপড়টুকু রাখা হয়েছে, সেটিকে সুষ্ঠুভাবে কুঁচি দিয়ে, '৫' চিহ্নিত অংশে যে ১½" ইঞ্চি কাপড় ছাঁটাই করা হয়েছে, সেই জায়গায় জুড়ে সেলাই করে নেবেন।

অতঃপর, উপরের যে ৭" ইঞ্চি কাপড় 'বাড়তি' হিসাবে বাদ রাখা হয়েছে, সেটিতে ১৫" ইঞ্চি মাপের দুটি 'ইনসেসান-টেপ' বা 'কাপড়ের সরু পটি বা ফিতা' বানিয়ে, 'সেমিজ-পেটিকোটের' বুকের উপরকার অংশে ৫" ইঞ্চি জায়গা ব্যবধানে সেই দুটি 'ইনসেসানটেপ' বা 'কাপড়ের ফিতা-পটির' একটিকে সামনের এবং আরেক-টিকে পিছনের অংশে বসিয়ে সেলাই করে জোড়া দিতে হবে। তবে পরিচ্ছদের কাপড়টি যদি দামী ও সৌখিন চিকণদার সামগ্রী না হয়ে, সাধাসিধা মার্কিন বা লংক্লথ জাতীয় হয়, তাহলে ঐ 'ইনসেসান-টেপ' বা 'কাপড়ের ফিতা-পটির' ৭" ইঞ্চি মাপ-সমেত পুরো ৪৫" ইঞ্চি অর্থাৎ 'ঝুল' বা 'লম্বা' ঠিকমত বজায় রেখে, কাপড়ের বাকী যে টুকরোটুকু রয়েছে, সেটিকে ভিতরের অংশে সেলাই করে জুড়ে নিতে হবে। সৌখিন চিকণদার-কাপড়ের 'সেমিজ-পেটিকোট' বানাতে হলে, সেলাইয়ের কাপড়ের নীচের অংশ যথাযথ রেখে, উপরের অংশে 'ইনসেসান-টেপ' বা ফিতা-পটি' জোড়া দেবার সময়, পরিচ্ছদের পুরো 'ঝুল' (লম্বা) অর্থাৎ ৪৫" ইঞ্চি মাপ বজায় রেখে বাকী কাপড়-টুকু পিছনের অংশে সেলাই করে জুড়ে নিতে হবে।

এই হলো মেয়েদের অন্তর্ব্বস্ত্র 'প্রিন্সেস-পেটিকোট' সেলাইয়ের মোটামুটি নিয়ম।

বারান্তরে, আরো কয়েকটি ঘরোয়া পোষাক-পরিচ্ছদের ছাঁট-কাট ও সেলাইয়ের প্রসঙ্গ আলোচনা করার বাসনা রইলো।
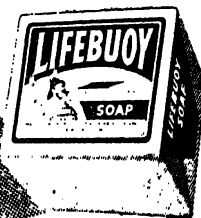
লাইফবয় যেখানে, স্বাস্থ্যও সেখানে!

স্নানের আনন্দ লাইফবয়ে! লাইফবয় সাবান মেখে স্নান করলে শরীরটা কত ঝরঝরে লাগে, মনেও এক সজীবতা আনে! ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা আপনার লাগবেই। লাইফবয়ের প্রচুর কার্য্যকারী ফেনা ধুলো ময়লার রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয়। পরিবারে সবার স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে লাইফবয় মাখুন।

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

L. 23-X52 BG

স্থধীরা হালদার

গত মাসের মতো এবারেও কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব দেশী ও বিদেশী খাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা আলোচনা করছি। অল্প-আয়াসে এবং সল্প-ব্যয়ে এ সব উপাদেয়-ভোজ্য পরিবেশন করে বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন আর বাইরের বন্ধু-বান্ধব, অতিথি-অভ্যাগতদের প্রচুর পরিতৃপ্তিসাধন করা যেতে পারে।

বর্ষার দিনে ইলিশমাছ দিয়ে নানা রকমের সুস্বাদু ও উপাদেয় খাগুাদি রন্ধন—বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য! প্রথমেই বলি—বিদেশী-প্রথায় ইলিশমাছ দিয়ে বিচিত্র-মুখ-রোচক যে অভিনব আমিষ-খাগু রান্না করা যায়, তারই কথা। এটি সহজসাধ্য অথচ রসনাতৃপ্তিদায়ক বিশেষ এক ধরণের 'মাছের রোষ্ট' (Roast) বা 'ঝল্‌সানো-মাছের খাবার'!

ইলিশমাছের রোষ্ট ঃ

বিলাতী-প্রথায় 'ইলিশমাছের রোষ্ট' বানাতে হলে যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার ফর্দ্দ দিই। বিচিত্র এই আমিষ-জাতীয় খাগুটির জন্ত উপকরণ চাই—ইলিশমাছ, ভিনিগার (Vinegar), ঘি, নুন, গরম-মশলা, আদা-বাটা আর পেঁয়াজ-বাটা। উপকরণগুলি সংগ্রহ করে রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, ইলিশমাছটিকে বেশ পরিষ্কার-ভাবে আঁশ ছাড়িয়ে, পেট থেকে তেল, পিত্ত, কান্‌কো প্রভৃতি বার করে, 'ল্যাজা' এবং 'মুড়ো' বাদ দিয়ে কেটে নেবেন। 'রোষ্টের' জন্ত ইলিশমাছের শুধু 'গাদা' এবং 'পেটি' নেবেন—'ল্যাজা' আর 'মুড়োর' প্রয়োজন নেই। এ কাজের পর, কাটা-মাছটিকে বেশ ভালো করে পরিষ্কার-জলে ধুয়ে নেবেন—যেন কোথাও এতটুকু ময়লা না থাকে। কাটা-মাছটিকে ধুয়ে নেবার পর, মাছের মাঝের অংশ অর্থাৎ 'গাদা' ও 'পেটির' টুকরো পরিচ্ছন্ন একটি বড় থালার উপর রেখে মাছের দেহটিকে আগাগোড়া ধারালো ছুরি বা বঁটির সাহায্যে কিছুদূর অন্তর-অন্তর দাগ দিয়ে ফালি-ফালি করে চিরে নেবেন। এমনিভাবে মাছের-দেহাংশটিকে চিরে নেবার পর, জ্বলন্ত উনানের আঁচে ডেক্‌চি বা কড়া চাপিয়ে, সেই কড়া বা ডেক্‌চিতে প্রয়োজন-মতো ভিনিগার ও আস্ত গরম-মশলা দিয়ে ঐ চেরাই-করা মাছটি সিদ্ধ করে নিতে হবে। উনানের আঁচে সু-সিদ্ধ হবার পর, মাছ ও মাছ-সিদ্ধ জলটুকু, ডেক্‌চি বা কড়া থেকে নামিয়ে সযত্নে আলাদা-আলাদা ছুটি পরিষ্কার-পাত্রে ঢেলে রাখবেন। তারপর, পুনরায় ঐ উনানের-আঁচে ডেক্‌চি বা কড়া চাপিয়ে, সেটিকে আন্দাজ-মতো ঘি এবং তার সঙ্গে খানিকটা আদা-বাটা, পেঁয়াজ-বাটা আর নুন মিশিয়ে রান্নার মশলা ভেজে নেওয়া প্রয়োজন। রান্নার মশলা ভাজা হয়ে গেলে, ইতিপূর্ব্বে আলাদা-আলাদা ছুটি পাত্রে যে সিদ্ধ-মাছ এবং মাছ-সিদ্ধ জলটুকু সযত্নে সঞ্চিত রেখেছিলেন, এবারে সেগুলি ঐ কড়া বা ডেক্‌চিতে ঢেলে দিয়ে একটি বড় হাতা বা খুন্তির সাহায্যে ঐ রান্নার মশলার সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দিন। সুসিদ্ধ-মাছ এবং মাছ-সিদ্ধ জলটুকু এমনিভাবে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নেবার পর উনানে বসানো কড়া বা ডেক্‌চির মুখে বড় একটি থালা বা ডেক্‌চির ঢাকা চাপা দিয়ে পাত্রটির মুখ ঢেকে খানিকক্ষণ অল্প-আঁচে রেখে মাছটিকে সু-সিদ্ধ করে নিন। কিছুক্ষণ মৃত্-আঁচে সুসিদ্ধ হবার ফলে, ক্রমশঃ মাছ-সিদ্ধ জলটুকু শুকিয়ে গিয়ে ঘি আর মশলায় মাখামাখি হয়ে মাছটি যখন বেশ কাই-কাই ধরণের দেখাবে, তখন উনানের আঁচ থেকে ঐ কড়া বা ডেক্‌চি নামিয়ে রাখবেন—তাহলেই রান্নার পালা শেষ। এই হলো—'ইলিশমাছের রোষ্ট' রাঁধবার মোটামুটি নিয়ম।

এ ছাড়া আরো একটি সহজ উপায়ে 'ইলিশমাছের রোষ্ট' রান্না করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে, সে রন্ধন-প্রণালীরও মোটামুটি একটু হদিশ জানিয়ে রাখি এখানে। 'ইলিশ-মাছ-রোষ্ট' করার এ প্রণালীটিও সহজসাধ্য—ইতিপূর্ব্বে যেমন বলেছি, অনেকটা তারই অনুরূপ…তবে, এ-ধরণের

রান্নাতে উপকরণ লাগে একটু আলাদা এবং রাঁধবার কায়দাটিও কিঞ্চিৎ বিভিন্ন।

গোড়াতেই এ-ধরণের পদ্ধতিতে 'ইলিশমাছের রোষ্ট' রান্না করতে হলে, যে সব উপকরণ প্রয়োজন, সেগুলির ফর্দ্দ দিই। এ রান্নার জন্য চাই—ইলিশমাছ, পাতি-লেবু, ঘি, নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং খানিকটা পেঁয়াজ-কুচো।

উপকরণগুলি সংগৃহীত হবার পর, পূর্ব্বে যেমন বলেছি, সেই ধরণে ইলিশ মাছের আঁশ ছাড়িয়ে, মাছের পেট থেকে তেল-পিত্ত, কানের ফুল্‌কো প্রভৃতি সযত্নে বার করে, মাছটিকে আগাগোড়া পরিষ্কার-জলে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে—যাতে এতটুকু ময়লা না থাকে কোথাও। মাছটিকে ধুয়ে সাফ করে নেবার পর, ইতিপূর্ব্বে অন্য পদ্ধতির প্রসঙ্গে যেমন বলেছি, তেমনিভাবে মাছের দেহটিকে কিছুদূর অন্তর-অন্তর ধারালো ছুরি বা বঁটির সাহায্যে আগাগোড়া ফালি-ফালি করে চিরে নিতে হবে। এভাবে চিরে নেবার পর, মাছের সর্ব্বাঙ্গে বেশ করে নুন আর গোল-মরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে নেবেন।

এবারে জ্বলন্ত-উনানের মৃদু-আঁচে পরিষ্কার একটি কড়া বা ডেক্‌চি চাপিয়ে, তাইতে আন্দাজমতো ঘি ঢেলে, সেই ঘিয়ে পেঁয়াজের কুচো ভেজে নিতে হবে। ঘি দিয়ে ভাজার সময়, পেঁয়াজ-কুচোর রঙ বেশ বাদামী ধরণের হলে, সেগুলি কড়া বা ডেকচি থেকে তুলে নিয়ে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে নামিয়ে রাখবেন। তারপর ঐ ঘি-সমেত কড়া বা ডেকচিতে, নুন আর গোল-মরিচের গুঁড়ো মাখানো মাছটিকে ছেড়ে, রন্ধন-পাত্রের মুখটি বড় একটি থালা বা ডেক্‌চি-ঢাকা চাপিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিয়ে খানিকক্ষণ উনানের অল্প-আঁচে বসিয়ে সু-সিদ্ধ করে নেবেন। এমনিভাবে সু-সিদ্ধ করবার সময়, একটি হাতা বা খুন্তির সাহায্যে, কড়া বা ডেক্‌চির ভিতরের মাছটিকে মাঝে মাঝে উলটে-পালটে নেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। এইভাবে কিছুক্ষণ উনানের অল্প-আঁচে সু-সিদ্ধ হবার ফলে, মাছের রঙ বেশ বাদামী ধরণের হলে, সেটিকে কড়া বা ডেকচি থেকে নামিয়ে, পরিষ্কার একটি 'পরিবেশন-পাত্রে' (Serving Dish বা Bowl) তুলে রেখে, 'রোষ্ট-করা মাছের' উপর ভাজা পেঁয়াজ-কুচো ছড়িয়ে সন্ত-রাঁধা খাবারটিকে সযত্নে সাজিয়ে দেবেন। তাহলেই রান্নার পালা শেষ···

এবারে পরিবেশন! পরিবেশনের সময়, ভাজা-পেঁয়াজের-কুচো ছড়ানো মাছের উপর পাতিলেবু নিঙড়ে একটু রস ছিটিয়ে দেবেন—তাহলে এই 'ইলিশ মাছের রোষ্ট' খাবারটি খেতে আরো বেশী সুস্বাদু এবং মুখরোচক হবে।

এই হলো বিদেশী-ধরণে ইলিশমাছ রান্নার বিশেষ আরেকটি প্রণালী। এবারে জানাই পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিরই অনুরূপ দেশী-প্রথায় বিশেষ এক-ধরণের ইলিশমাছ রান্নার কথা। এটিও পরম উপাদেয় এবং বিচিত্র মুখরোচক ভোজ্য—বিশেষভাবে আমাদের এই বাঙলাদেশে।

ইলিশমাছের রসা:

দেশী-প্রথায় 'ইলিশমাছের রসা' রান্না করতে হলে যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার ফর্দ্দ দিই, উপাদেয় এই আমিষ-খাদ্যটি রান্নার জন্য চাই—ইলিশমাছ, ঝিঙা, ডাঁটা, কাঁঠালবিচি, কাঁচা লঙ্কা, ময়দা, নুন, সরষের তেল, পাঁচফোড়ন, হলুদ-বাটা এবং ধনে-বাটা।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ করে, প্রথমেই ইলিশমাছটিকে আঁশ ছাড়িয়ে, মাছের পেটের তেল-পিত্ত, কানের ফুল্‌কো প্রভৃতি বার করে নিয়ে সাধারণতঃ যেমনভাবে মাছ কোটেন, তেমনিভাবে মুড়ো, ল্যাজা, গাদা ও পেটি বিভিন্ন টুকরোতে কুটে নেবেন। কুটে নেবার পর, মাছের টুকরোগুলি পরিষ্কার-জলে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে, সেগুলিতে নুন আর হলুদ-বাটা মাখিয়ে রেখে দেবেন। এবারে কাঁঠালবিচিগুলি ছাড়িয়ে দু'টুকরো করে কেটে, উনানের আঁচে ডেক্‌চি বা কড়া চাপিয়ে সু-সিদ্ধ করে, সেগুলিকে জল ঝরিয়ে অন্য একটি পাত্রে নামিয়ে রাখবেন। কাঁঠালবিচি যখন সিদ্ধ-হতে থাকবে, সেই ফাঁকে, বঁটিতে ডাঁটা ও ঝিঙার খোশা ছাড়িয়ে সেগুলিকে লম্বা-লম্বা আকারে কুটে নিয়ে, জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে দেবেন। তারপর কাঁঠালবিচি সু-সিদ্ধ হয়ে যাবার পর, উনানের আঁচে কড়া চাপিয়ে সেই কড়াতে প্রয়োজনমতো সরষের তেল, পাঁচফোড়ন, কাঁচা লঙ্কা ফালি করে চিরে তার সঙ্গে ঐ ডাঁটা ও ঝিঙার টুকরোগুলি ছেড়ে দেবেন এবং কড়ার মধ্যে খুন্তি দিয়ে এগুলিকে খানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে নেবেন। খুন্তি দিয়ে খানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে নেবার পর, কড়ায় অল্প একটু জল দিয়ে

প্রয়োজনমতো হলুদ-বাটা, ধনে-বাটা, নুন ও সিদ্ধ-কাঁঠালবিচির টুকরোগুলি ছেড়ে দেবেন। তপ্ত-কড়ায় এই মশলা ঘেঁটে-মিশে তরকারীর গায়ে বেশ মাখা-মাখি হয়ে গেলে, নুন আর হলুদ-বাটা মাখানো ইলিশমাছের টুকরোগুলিকে রন্ধন-পাত্রে ছেড়ে সযত্নে খুন্তি দিয়ে নাড়বেন। কিছুক্ষণ এভাবে নাড়াচাড়া করার ফলে, মশলা ভাজা হয়ে গেলে, কড়াতে পুনরায় অল্প একটু জল ঢেলে কড়ার মুখটি বড় একটি থালা চাপা দিয়ে ঢেকে দেবেন। ঢাকা-চাপা দেওয়া কড়াটিকে খানিকক্ষণ এইভাবে উনানের আঁচে বসিয়ে রাখার দরুণ মাছ আর তরকারী একত্রে সু-সিদ্ধ হয়ে যাবার পর, একটি বাটিতে অল্প জলে সামান্য একটু ময়দা গুলে, ময়দার রসটুকু ঐ কড়াতে ঢেলে দেবেন। কিছুক্ষণ পরে কড়ার রসটুকু ফুটতে আরম্ভ করলেই, পাত্রটি উনানের উপর থেকে নামিয়ে রাখবেন। এই হলো—'ইলিশমাছের রসা' রান্নার মোটামুটি নিয়ম।

পরের সংখ্যায় আরো কয়েকটি বিচিত্র উপাদেয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা জানাবার চেষ্টা করবো।

আমার দেখা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ রায়

আচার্য্য-দেব ছিলেন আদর্শ দরদী গুরু। তাঁহার শিক্ষাব্রত শিক্ষাগারের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত বাঙ্গালী যুবক কিসে প্রতিষ্ঠিত হইবে, পরিণত বয়সেও এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যায় বিপন্ন দেশবাসিগণকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, অন্ন ও আশ্রয় দেওয়ার জন্য, ভিক্ষার ঝুলি লইয়া নগরের দ্বারে দ্বারে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। দেশও তাঁহার ডাকে আশ্চর্য্যভাবে সাড়া দিয়াছে। সমাজের সকল স্তরের নর-নারী তাঁহার কাজে আগাইয়া আসিয়াছেন। উত্তরবঙ্গের বন্যা কিম্বা খুলনার সাইক্লোনে, তিনি জাতির নিকটে যে ডাক দিয়াছিলেন, তাহাতে আশাতিরিক্ত সাড়া ও উন্মাদনা পড়িয়াছিল। এই অপূর্ব উন্মাদনার উৎস কোথায় ছিল? ক্ষীণদেহী এই মহাত্মার জীবন-বেদ তাই বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার "আপনি আচরি ধর্ম্ম" নীতি সকল যুগের সকল আদর্শবাদীর আশা-প্রদীপ। এই ত্যাগব্রতী মহাপুরুষ, জাতির সকল মানুষের সুখদুঃখের মধ্যে আপন সুখদুঃখকে নিঃশেষে মিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন, এই পরার্থপর যোগসাধন ছিল তাঁহার মানব-হিতৈষণার উৎস। মন্দির, মসজিদ, এবং দেউলের চৌহদ্দীর বাহিরে, বৈচিত্র্যময় বিশাল পৃথিবী ছিল তাঁহার মন্দির এবং ইহার আর্ত্ত ও পীড়িত নর-নারীকে লইয়াই ছিল তাঁহার কর্মকেন্দ্র, সাধন ও সমন্বয় ক্ষেত্র। ধর্মের গোঁড়ামি ও মনের নোংরামি, তাঁহার নিকট একই বস্তু ছিল। তিনি বলিতেন, স্বাস্থ্যপূর্ণ মানুষের দেহই তাহার মন্দির এবং জীবন্ত মনই সেই মন্দিরের শ্রেষ্ঠ পূজারী। ইহাকেই তিনি মানব জীবনের "ষ্টোরেজ ব্যাটারী" বলিতেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহিত ধর্ম-জীবনের সম্বন্ধে তিনি বলিতেন সত্যানুসন্ধান উভয়েরই মূলসূত্র। ফাঁকি দিয়া কোনও কিছুই লাভ করা যায় না। ডগ্‌ম্যাটিক, Creed bound কিম্বা লোহার ছাঁচে হাত-পা-বাঁধা কোনও ধর্মকে তিনি জীবনে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ধর্ম তাঁহার নিকটে "ever wakeful, and ever progressing and ever expanding." শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভাবের ঘরে লুকোচুরি করিতে দেখিয়া তিনি মাঝে মাঝে হতাশ হইতেন। বলিতেন, মনের অগোচরে পাপের ক্ষমা নাই; যাহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সত্যের নিকটে মস্তক অবনত করিতেছে, অথচ বাহিরের লোক সমাজে বলিবার সাহস রাখে না, তাহাদের দ্বারা জাতি গঠিত হইবে কেমন করিয়া। বারো সেপাহীর তের হাঁড়ি লইয়া তিনি বহু চীৎকার করিয়া গিয়াছেন। স্নেহলতার আত্মহত্যা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল, তাই তিনি শিক্ষিত ও উপযুক্ত ছেলেদের পালটি ঘর ও পণ লইতে দেখিলে ব্যথা পাইতেন। প্রিয়ছাত্রদের কাহারও জীবনে এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাইলে, তাহার মুখ দর্শন করিতেন না। সর্ব সমক্ষে তাহার উল্লেখ করিয়া ধিকার দিতেন। জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও নর-নারীর সামাজিক অধিকারের তারতম্য লইয়া বহু কথা তিনি বলিয়া গিয়াছেন। জাপানের সামুরাই শ্রেণীর বিশেষ অধিকার ত্যাগ, সমগ্র জাপানী জাতির সামগ্রিক উন্নতির জন্য আত্ম বিলোপন, প্রায়ই উল্লেখ করিতেন। বলিতেন,

হে মোর জননী,
সাতকোটি বাঙ্গালীরে
রেখেছো বাঙ্গালী করে,
মানুষ করোনি।

মানুষ হিসাবে দৈনন্দিন জীবনে আচার্য্য দেবকে যেমনটি দেখিয়াছি, তাহার উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যতই দিন যাইতেছে, তাঁহাকে ব্যক্তিগত জীবনে দেখিয়াছেন, সেবা করিয়াছেন, তেমন লোকের সংখ্যা স্বাভাবিক কারণে হ্রাস পাইতেছে। তবু ভয় হয়, হয়তো ঠিক ঠিক বলা হইবে না, অতিশয়োক্তি কিম্বা চিত্র-চিত্রণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

বহু সহস্র ভাগ্যবান দেশবাসীর ন্যায়, এই ক্ষুদ্র লেখক হঠাৎ তাঁহার লোক-লোচনে পড়ে এবং আজীবন তাঁহার কৃপায় কৃতার্থ হয়। ছাত্রাবস্থায় আমাদের একটি ক্ষুদ্র পাঠাগারের ও নৈশবিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করিতে তিনি ১৯২০ সালে উত্তর বঙ্গের নওগাঁ সহরে আসেন। অতি সামান্য ঘটনায়, তিনি এই সমিতির প্রাণস্বরূপ তৎকালীন ছাত্র নেতা সাজাহান কবীরএর পত্রে সম্মতি দেন, এবং সাগ্রহেই যোগদান করেন এবং সমিতির উন্নতির জন্য নগদ ২০০৲ টাকা দান স্বরূপ দেন। সাজাহান কবীর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবিরের অগ্রজ। সহপাঠী ছাত্রদের লইয়া তিনি গৌড়নগরী দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁহার লিখিত একটি বর্ণনা সংবাদ পত্রে বাহির হয়। আচার্য্যদেব সংবাদপত্রে উক্ত বর্ণনা দেখিয়া উৎসাহব্যঞ্জক "সাবাস সাজাহান বাদশা" লিখিয়া একটি পোষ্টকার্ড দেন। পরিচয়ের সূত্র এইখানে। ঘটনাটি উল্লেখের কারণ, কত সামান্য ব্যাপারে এই ছাত্র-দরদী জননেতা ও আচার্য্যের কোমল হৃদয় জয় করা যায়। যত দূর মনে পড়ে, এই সময় পর্য্যন্ত তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। আজও স্পষ্ট স্মরণে আসে, তিনি জনসভায় বলিয়াছিলেন যে "পাই-রেক্স" ঔষধ বিলাতী শিশির বদলে বাঁশের চোঙ্গায় দিলে, তাহা কি কেহ গ্রহণ করিবে? সমাগত মহিলাদের দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, সরু ও খাপির উপরে পাড়ের বাহার না খুলিলে, মা-লক্ষ্মীদের পছন্দ হইবে কি? বিলাতী রং ও বিলাতী সূতা ব্যতীত মিহি, খাপি ও রঙ্গীণ সাড়ী তখন অসম্ভব ছিল। লম্বা কোটের পকেট হইতে 'হ্যামলেট্' পুস্তক বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন এই পুস্তকের সহিত অসহযোগিতার অর্থ, বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার ও রসের সহিত অসহযোগিতা। তখনও তিনি চরকা আন্দোলনে বিশ্বাসী হ'ন নাই। কিন্তু অকুতোভয়ে তিনি তাঁহার বিশ্বাস অনুযায়ী কথা বলিয়া ছিলেন। পরে হয়তো মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মতের পরিবর্তন হয় এবং প্রতিদিন তিনি কিছু সময় চরকায় সূতা কাটিতেন ও খদ্দর পরিধান করিতেন, একথা দেশবাসী সকলেই জানেন। হয়তো উত্তরবংগের বন্যা, দেশবাসীর অবর্ণনীয় দুঃখ, কৃষককুলের বৎসরের অর্দ্ধেক সময় বেকারী, তাঁহাকে চরকায় বিশ্বাসী করিয়াছিল। বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগে বোম্বাই ও আহমেদাবাদএ নবস্থাপিত কটন মিল, মোটাধুতি বেশীদামে বাঙ্গলাদেশে বিক্রয় করিয়া দেশবাসীর স্বদেশী প্রীতির উপরে ব্যবসায়িক সুযোগ লওয়া, তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। আত্মভোলা বাঙ্গালী কেবল ত্যাগব্রতে ও উন্মাদনায় মত্ত হয়। তিনি বলিতেন ব্যবহারিক সুযোগ লইতে তাহারা অক্ষম। কিন্তু পশ্চিম ভারত, বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের বলে ধনাঢ্য হইয়া উঠে। এই সময়ে বঙ্গলক্ষ্মী কটন্ মিলের বিপর্য্যয় তাঁহাকে চিন্তিত ও ব্যথিত করিয়াছিল। উত্তরকালে, তাঁহার প্রেরণায় নূতন কটন মিল স্থাপন ইহারই পরিণতি।

বেঙ্গল কেমিক্যালের পাণিহাটি কারখানায় প্রায়ই তিনি কিছুকাল ধরিয়া বাস করিতেন। তাঁহার বাসের জন্য একটি বাংলোঘর—কোম্পানী তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। এখানে আসিলে, তিনি কোম্পানীর কাজ কর্ম ব্যতীত, কর্মীদের সহিত মিশিতেন, তাহাদের বাসগৃহে যাইতেন, এবং পরিবার পরিজনদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিতেন। প্রত্যাবর্তনের সময় কর্মীদের পরিজনদের, ব্যক্তিগত তহবিল হইতে সাবান কিম্বা সুগন্ধি দ্রব্য উপহার দিতেন। কর্মীদের সন্তানদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইতেন ও উপহার দিতেন। ভিড় পছন্দ না করিলেও, কর্মীদের কোনও অনুষ্ঠানের সংবাদ পাইলেই, তিনি উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ দিতেন। সমাগত বাহিরের কোনও বক্তা কিম্বা গায়ক আসিলে, তাঁহাদের আশীর্বাদে আপ্যায়ন করিতেন। মনে আছে, একবার নজরুল ইস্‌লামের আবৃত্তি শুনিয়া, তাঁহাকে "বিদ্রোহী কবি" বলিয়া অভিনন্দন দিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে কারখানায় গিয়া কাজের খোঁজ লইতেন এবং প্রত্যেক বিভাগের কর্মীদের সহিত কাজের সম্বন্ধে কথা বলিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন "চরৈবেতি চরৈবেতি।" আজ যতটুকু কাজ হইল, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আগামী দিন আরও কিছু বেশী কাজ করিতে এগিয়ে যাওয়াই জীবন, পেছনে পড়াই মৃত্যু। তাঁহার উপস্থিতি কর্মীদের যে কিরূপ উৎসাহিত করিত, তাহা যাঁহাদের চোখে দেখিবার সুযোগ হইয়াছে তাঁহারাই জানেন। শীতের সময় বলিতেন—এখনই ত' কাজ করিবার সময়, আলস্য আসে না। আবার গ্রীষ্মের সময় বলিতেন—১৪ ঘণ্টা দিন, এখনই ত' খাটিবার সময়। কত উদাহরণ সামনে ধরিতেন, সত্যই জীবনে যেন জোয়ার আসিত। হঠাৎ একদিন আমাদের ল্যাবরেটরী ঘরে টিফিনের সময়ে আসিয়া হাজির। টিফিনের সময় আমরা তখন কাজ ছাড়িয়া টিফিন লইতেছিলাম। তিনিও আসিয়া আমাদের মধ্যে বসিলেন। আমরা কি টিফিন খাই—খোঁজ লইলেন। সেদিন ছিল "মুড়ি।" আমরা ইতস্ততঃ করিতেছি, কিন্তু তিনি নির্বিকার। বলিলেন—"বেশ টাটকা মুড়িত!" এক গাল মুখে দিয়া বলিলেন—"মুড়ি খাইতে কিযে ভাল লাগে জানিস্?" এই ঘটনার পরে, যখনই তিনি পাণিহাটি আসিতেন, একশিশি গব্যঘৃত ও এক শিশি খেজুরের গুড় কিম্বা মধুমুড়ি সংযোগে খাওয়ার জন্য আনিতেন।

আজ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণে আসে যে, বড় বড় কাজের মধ্যেও সামান্য কর্মীদের মুড়ি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু করিবার উপাদান আনিতে কখনও ভুল হয় নাই।

আমরা তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে, সময়জ্ঞান ও কর্মনিষ্ঠা যেরূপ দেখিয়াছি তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি প্রতিদিন খুব ভোরে সাড়ে চারটায় উঠিতেন, প্রাতঃকালীন ভ্রমণান্তে, সামান্য প্রাতরাশ করিয়া

পড়িতে আসিতেন। সকাল ৮॥টা পর্য্যন্ত সাহিত্য ও সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। তাহার পরে লোকজনের সঙ্গে দেখা করিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া বেলা একটা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতেন। তিনি অত্যন্ত স্বল্পাহারী ছিলেন। অনেক সময় চোখে কাপড় বাঁধিয়া শুইয়া থাকিতেন। তার পরে কিছু সময় চরকায় সূতা কাটার পরে আবার পড়াশুনা। শেষের দিকে প্রায়ই দেখা যাইত সেকসপীয়র-এর আলোচনা। অনেক সময় কোনো ছাত্র কিম্বা কর্মী তাঁহার পাঠ্য বিষয় তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেন। বৈকাল চারটার পর কিছুক্ষণ কথাবার্তা, তার পরে হয় নৌকায় পুকুরে ভ্রমণ নয় ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে বসিয়া থাকা। পুকুরে নৌকায় উঠিয়া অনেক সময় তিনি নিজেও দাঁড় টানিতেন। অদ্ভুত তাঁহার সময়জ্ঞান ছিল। সন্ধ্যার পরেই, নৌকায় সময় জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা আন্দাজে যাহা বলিতাম, তাহাতে বেশীর ভাগ সময় তিনি একমত হইতেন না। পাড়ে নামিয়া আলোতে দেখিয়াছি, তাঁহার বলা সময়ের সহিত ঘড়ির কাঁটায় হয়তো ২।৩ মিনিট তফাৎ হইয়াছে। সভাসমিতিতে তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতেন। আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে, বহু পরে দেশনেতৃগণ সভায় উপস্থিত হন এবং অবান্তর কৈফিয়ৎ দিয়া, মূল্যবান কর্তব্যজ্ঞানএর পরিচয় দেন। কিন্তু আচার্য্যদেবের ক্ষেত্রে অদ্ভুত নিয়মানুবর্ত্তিতা লক্ষ্য করিয়াছি। একদিন তাঁহার পানিহাটি হইতে কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজে কোনো সভায় যাওয়ার জন্য গাড়ী আসিবার কথা ছিল। কোনো কারণে গাড়ী না আসায় তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এদিকে কোনো গাড়ী জোগাড় না হওয়ায়, লরীতে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঐ দুর্বল শরীরে, লরীতে যাইবেন, আমাদের কিন্তু পছন্দ হইল না। কিন্তু তিনি ব্যস্ত হওয়ায় বাধ্য হইয়া লরী আনা হইল। তাঁহার বয়স ও স্বাস্থ্য বিবেচনায়, এই লেখক তাঁহার সাথী হইলেন। সমস্ত রাস্তা তিনি সময়জ্ঞানের ও সময় রক্ষার উপদেশ দিলেন। চিরকেলে অসুস্থ তিনি, একমাত্র সময় রক্ষার জন্য এত পড়াশুনা ও কাজ করিতে পারিয়াছেন বলিলেন এবং আমাদের মত "বাবু"দের হাতে তাঁহার প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির সম্ভাবনায় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পুরস্কার স্বরূপ যাহা পাইলাম তাহা যেমন করুণ তেমনই আনন্দপূর্ণ। স্মৃতির পরশে এই কষ্টার্জিত পাওনা, আজ পবিত্রতম পাথেয় হইয়া উঠিয়াছে।

সময়নিষ্ঠা ও সময়ানুবর্ত্তিতার আর একটি ঘটনা উল্লিখিত হইল। আচার্য্যদেব কোম্পানীর কাজে লাহোর গিয়াছিলেন। সেই সময়, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অধিনায়ক লালা হরকিষেণ লাল, তাঁহাকে এক পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেন। আচার্য্যদেব যথাসময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান এবং নিমন্ত্রণকর্তাকে অনুপস্থিত দেখিয়া সহকারীকে জানাইয়া চলিয়া আসেন। তাঁহার চলিয়া আসিবার পরেই লালাজী ও অনেকে তাঁহার নিকটে আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া পুনরায় যাইবার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি নিমন্ত্রণ যথাসময়ে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন।

তাঁহার স্বল্পকালীন বাসগৃহে, কত রকমের লোককে দেখা করিতে আসিতে দেখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। শিল্পপতি হইতে বেকার সকলকেই তিনি সমান ভাবে দেখিতেন। বরং স্বার্থপর শিল্পপতি ও ভণ্ড দেশসেবকদের সহিত দেখা করিতে শুধু বিরক্তই হইতেন না, হঠাৎ এই বৃদ্ধ মানুষকে রাগিয়া উঠিয়া হাত পা ছুঁড়িতে দেখিয়াছি। নূতন সমাজ ব্যবস্থায় আজ তাঁহাদের অনেকেই বিখ্যাত। যে সকল শিল্পপতিকে কম লাভ লইবার জন্য কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব্ রুলস্ বদল করিয়া, রিসার্চ ও সামগ্রিক উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, অনেকেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। অনেকে প্রক্সি ভোটের জোরে তাঁহাকেই এক ঘরে করিয়াছেন। কিন্তু আজ দেখা যায়, তাঁহাদের অনেকেই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে কালের অমোঘ আদেশ পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন। বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার সম্পর্কে প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী তাহাতে আকৃষ্ট হয় নাই। ফলে আজ বাঙ্গালী তাহার নিজের দেশেই কেবল প্রবাসী নহে, সারা ভারতে নিন্দিত ও নিগৃহীত।

পোষ্টাফিসের মাধ্যমে, বাৎসরিক কত টাকা বাঙ্গলার বাহিরে যায়, তাহার একটি হিসাব তিনি লইয়াছিলেন। আজ যদি ঐ হিসাব পুনরায় লওয়া হয় তবে দেখা যাইবে সেই হিসাব কত কম ও নগণ্য ছিল। এক মাত্র কলিকাতার সরকারী পরিবহন বৎসরে কোটি টাকার উপর বাংলার চৌথ হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আজকাল অনেকের মুখেই, আচার্য্য দেবের চিন্তাধারা প্রাদেশিক-ভাবাপন্ন বলিয়া কটাক্ষ করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর উত্তর তিনিই দিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক রাজ্যের অধিবাসীদের আলাদা সমস্যা আছে। প্রত্যেক প্রদেশ যদি আপন পায়ে শক্ত করিয়া না দাঁড়ায়, তবে ভারত মহারাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িবে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঐ দুর্বল অঙ্গ হইতে ক্যানসার রোগের ন্যায় সমস্ত দেহে ধ্বংস আনয়ন করিবে। বিভিন্ন প্রদেশকে বঞ্চিত করিয়া বাংলা বাঁচুক, এই ইচ্ছা কখনও তিনি প্রকাশ করেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, আচার্য্যদেবের কথা বলিতে মন উদ্বেলিত হইয়া পড়ে। ভয় হয়, চিত্রণ ঠিক ভাবে করা হইল কিনা? এই মাত্র বলা যায় যে বাংলা দেশ বড়ই ভাগ্যবান, এই রকম বাঙ্গালীকে তাহারা পাইয়াছিল। চৈতন্যদেব, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বিবেকানন্দ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বাংলায়, আচার্য্যদেবও আসিয়াছিলেন। সহস্র বৎসরের অধীনতা শৃঙ্খল মোচন করিবার কৌশল তাঁহারা দিয়া গিয়াছেন। শতবার্ষিকী জন্মোৎসবের কর্মীদের কর্তব্য হইল, ঘরে ঘরে সেই সুসমাচার পৌঁছাইয়া দেওয়া। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, পাঠশালায়, বাণীমণ্ডপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, বাজারে, বন্দরে, পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে, বাঙ্গালীকেই বাংলার এই মৃতসঞ্জীবনী বাণী লইয়া যাইতে হইবে। উচ্চৈঃস্বরে সকলে আজ বলুন, বাংলাদেশে ঐ রকম বাঙ্গালী বহুবার আসিয়া ছিলেন। আমাদের জাগ্রত চেষ্টা সত্য হইলে, তাঁহারা পুনরায় আসিবেন, তখন দেশের এই অমানিশার অবসান হইবে। তাঁহারই কথায় বলি, বাঙ্গালী ওঠো, জাগো, আপনার প্রাপ্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অর্জন কর।

ভারতীয় মন্দিরশিল্পের গোড়ার কথা

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় মনীষীরা যুগ যুগ ধরে যে কঠোর সাধনা করে গেছেন তা হল ভারতের বিরাট ও গভীর ঐক্য অন্তরে উপলব্ধি করবার সাধনা। বস্তুতঃ, বিশাল বিচিত্র এই ভারতভূমি নানা ভাষা, নানা জাতির লীলাভূমি হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতই একটি অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বিধৃত হয়ে রয়েছে। ভারতের এই গভীর ঐক্যের প্রাণরস এসেছে কোথা থেকে? বিশ্বে যতদিন প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ হয়েছে ভারতীয় সভ্যতা তার অন্যতম। ভারতীয় সভ্যতা ঐক্যমূলক ও মিলনমূলক সভ্যতা। ভারত পর বলে তো কাউকে কখনও দূরে ঠেলে দেয়নি। সে সকলকেই আপন বুকে টেনে নিয়েছে অসঙ্কোচে, সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে অন্তর দিয়ে। কিন্তু বাইরের বহু বিচিত্র বস্তুকে আপন সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সত্তা প্রকাশ করতে হলে এক বিশেষ শৃঙ্খলা ও ঐক্যের প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারি: "যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে, সকলের স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহজ।" ভারতের এই শৃঙ্খলা ও ঐক্য আছে বলেই সে সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যকে অখণ্ড ঐক্যসূত্রে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—এই হল ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্মকথা।

এই মিলনমূলক ও ঐক্যমূলক সভ্যতারই দান ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পবস্তুগুলি। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যে অজস্র প্রাচীন নিদর্শন ছড়িয়ে আছে আসমুদ্রহিমাচল ভারতের বনে-প্রান্তরে, পর্বতে-গুহায়, মঠে-মন্দিরে, চৈত্যবিহারে, সেদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেই ভারতীয় ঐক্যের প্রাণরসের উৎসমূলে উপনীত হওয়া যায়। বৈচিত্র্যময়ী রূপৈশ্বর্যময়ী ভারতের এক ঐশ্বর্যের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সমন্বিত নিদর্শন এই অসংখ্য মন্দিরগুলি। মন্দিরগুলির মধ্যে যেন দেহরূপ লাভ করেছে ভারতের মর্মবাণী—যে বাণী শান্তি ও ঐক্যের বাণী। ভারতের এই মহৎ বাণী যুগ থেকে যুগান্তরে বহন করে নিয়ে এসেছে এই সমস্ত মন্দির। ভারতীয় জীবনতত্ত্বের রূপময় ও রসময় প্রকাশ এই মন্দিরগুলি, তাই এগুলি মহৎ সৃষ্টি। এই বিস্ময়কর মন্দিরশিল্পের সামনে এসে মানুষেরসমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ স্তব্ধ, সমস্ত বিরোধ-বিক্ষোভ এখানে শান্ত।
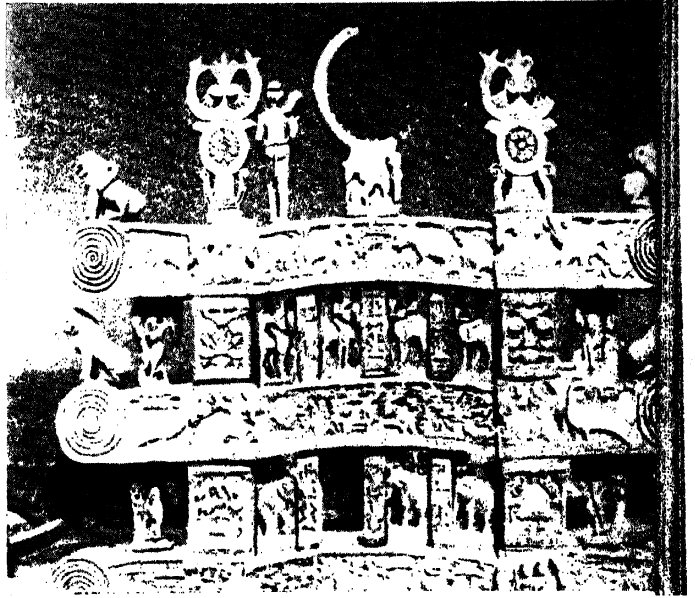
সাঁচী স্তূপের প্রবেশদ্বারে কারুকার্য — ফটো—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যা

বৈচিত্র্যময় এই মন্দিরগুলি নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের মনে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি জাগায়—তা হ'ল এক অখণ্ড ঐক্যের অনুভূতি। সেই ঐক্য এক অখণ্ড আনন্দসত্তার প্রকাশ। অবশ্য যে কোন প্রকৃত রসসৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে অনুভূতি আর ঐক্যবোধ। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় ও ভাবে রূপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "সৌন্দর্যের রস আছে, কিন্তু একথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্যরসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে ঐখানে, যেখানে সে আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার ক'রে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে। রস-

"সাঁচী স্তূপ"　　ফটো — সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়
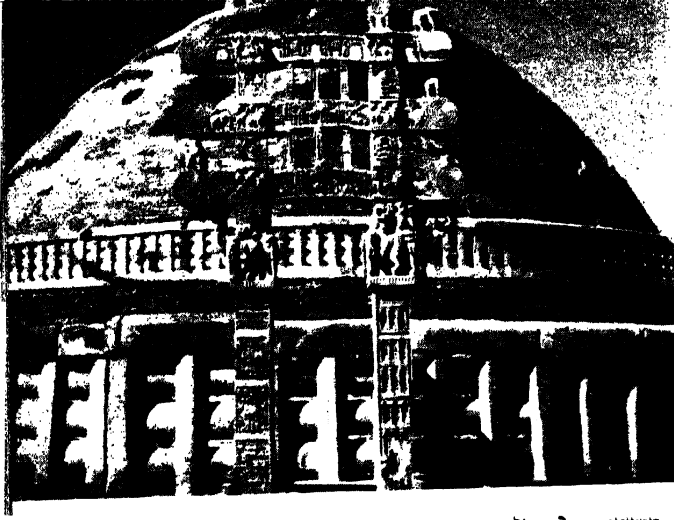
আবেগ উদ্রিক্ত করছে তা নয়, অনিন্দ্য-সুন্দর শিল্পসুষমার নিদর্শন এই মন্দির-গুলি ভারতের তথা সারা বিশ্বের নর-নারীর শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণতা দান করছে। বস্তুতঃ ভারতে শিল্প-স্থাপত্য ধর্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে ধর্মকে অবলম্বন করেই ভারতে শিল্প-স্থাপত্যের স্ফুরণ হয়েছে। মহান ঐশ্বর্যময় এই মন্দিরগুলি সারা ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতে ধর্মের ক্রম-বিকাশের যে ধারাটি গড়ে উঠেছে, এই মন্দিরগুলির মধ্যে তার একটা ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

পদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হোতে বিলম্ব হয় না।"

ভারতের মন্দিরশিল্প নানান দেশের নানান জাতির মানুষকে আকৃষ্ট করে নিয়ে এসেছে "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"। মন্দিরময় ভারতের এই বিচিত্রসুন্দর মন্দিরগুলি শুধু যে ভারতীয় ঐক্যের মর্মমূলের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে তা নয়, আধুনিক কালে এই সংঘাতজর্জর, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে এক বিশ্ব ঐক্যের সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বারও উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা পাষাণের বুকে সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব ও সামঞ্জস্যের যে অনুপম স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাতে তাঁদের শিল্পপ্রতিভা ও শিল্পদক্ষতা আমাদের বিস্ময়বিমুগ্ধ করে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। শিল্পচেতনা কতখানি উচ্চস্তরে পৌঁছুলে যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভব হয় তা চিন্তা করে গৌরবে মন ভরে ওঠে, আনন্দ বিস্ময়ে কণ্ঠ নীরব হয়ে যায়। কবিগুরুর কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছা হয়, মানুষের ভাষা এখানে পাষাণের ভাষার কাছে সত্যিই বুঝি হার মেনে গেছে।

ভারতীয় ঐতিহ্যের গৌরব এই মন্দিরগুলির উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এগুলি নির্মাণের ভিত্তি হল সমসাময়িক কালের ধর্মবিশ্বাস ও পূজার্চনাপদ্ধতি। কিন্তু কালক্রমে মানুষের কাছে এগুলির অন্তরের রূপ গেছে বদলে। এগুলি এখন আর শুধুমাত্র ধর্মের পীঠভূমি হয়েই বিরাজ করছে না, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন অনুপম স্মৃতিমন্দিররূপেই প্রধানতঃ এগুলি এখন মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। ধর্ম ও শিল্প এখানে একই সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে। অন্তরের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করতে যাঁরা সমবেত হচ্ছেন, এই মন্দির-

প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে মন্দিরে উপাসনার প্রচলন কেমন করে হল এখানে তা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এদেশে মন্দিরে পূজার্চনার ইতিহাস গড়ে উঠেছে বিগত দু'হাজার বছর ধরে। তবে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকে ভারতের মন্দির গুলি ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া, মিশর ও গ্রীসের প্রাসাদোপম মন্দির সমূহের উত্তর সাধক বলা যায়। এই বিকাশ ধারার একটা উল্লেখযোগ্য যোগসূত্র পাওয়া যায় ভারত ও প্রতীচ্যের প্রাচীন সভ্যতার সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মধ্যে। ৩২৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীক-সম্রাট আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে ভারতে পদার্পণ করে পাঞ্জাবের অধিকাংশ জয় করলে এবং পরবর্তীকালে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকদের অভিযানের ফলে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক যে সকল প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে অনুমান করা হয় যে, গ্রীকেরা যে সময় ভারত আক্রমণ করেছিল তখন ভারতের ধর্ম ব্যবস্থায় মন্দিরোপাসনার বিশেষ কোন স্থান ছিল না। বেদোক্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই তখন আধিপত্য ছিল উত্তর ভারতে। মুক্তাকাশতলে যাগযজ্ঞের মধ্য দিয়েই তখন ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ত। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভারতের ইতিহাসকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল সত্য, কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও একথা অনায়াসেই বলা চলে যে, এটি আর্য বংশোদ্ভূত এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই ধর্ম ছিল।

খৃষ্টজন্মের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে আর্যদের ভারতে আগমনের ফলে ভারতে বসবাসকারী দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত অগণিত মানুষ এদিক থেকে আদৌ প্রভাবিত হয় নি। তারা আদিম দেবপূজা পদ্ধতিই

মনে চলত। মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ কোন দেব-দেবীর পূজার্চনায় তার বিশ্বাসী ছিল না, পরন্তু তারা মৃত পূর্বপুরুষদের, ভূত ও পরীদের পূজা নিবেদন করত। এ ছাড়া নদী, গাছ, পাহাড়, জীবজন্তু ও সর্প পূজাও প্রচলিত ছিল তাদের মধ্যে।

এই ধরণের পূজাপদ্ধতির জন্য পথে-ঘাটে দু'একটা মন্দির-জাতীয় কোন কিছু হয়ত গড়ে উঠে থাকতে পারে, তবে ভারতে পূর্ণাঙ্গ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সম্ভবতঃ গ্রীকেরাই করেছিল। স্বয়ং আলেকজাণ্ডারই যে ভারতের মৃত্তিকার ওপর বেদী নির্মাণ করে গ্রীক দেব-দেবীর পূজা করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই তিনি নিশ্চয়ই অনেক মন্দিরও নির্মাণ করে থাকতে পারেন। তক্ষশিলায় খননকার্যের পর এ তথ্য নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রায় ৬০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ কুশান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরও উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক সভ্যতার জের চলেছিল। তক্ষশিলায় প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত একটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে, যা গ্রীক রীতির একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত।

খৃষ্টীয় যুগ সুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে গ্রীকেরা ভারতে পদার্পণ করার পর পাঞ্জাবে বসবাস করতে সুরু করে। তক্ষশিলার খননকার্যে তাই গ্রীক প্রভাবের প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতীয়রা মূর্তিনির্মাণ ও মূর্তিপূজা যে গ্রীকদের কাছ থেকে শিক্ষা করেছিল একথা অবশ্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আজকাল স্বীকার করেন না। তবে এই সব পণ্ডিতদের অভিমত মেনে নিলেও একথা বলতে কোন সঙ্কোচের কারণ নেই যে, গ্রীকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলেই প্রাচীন ভারতীয়রা দেবমূর্তি নির্মাণের কাজে নতুন উদ্দীপনা লাভ করেছিল। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, কিছু কিছু প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা ও শীল মোহরে যে সকল দেবমূর্তি পাওয়া গেছে তার সঙ্গে প্রাচীন যুগে গ্রীকেদের মুদ্রায় ক্ষোদিত দেবমূর্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। তক্ষশিলার মন্দিরের কথা তো পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতে গ্রীক আধিপত্যের ফলে প্রাচীন বৌদ্ধদের ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও ধর্মনীতির মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। রাজা অশোক খৃষ্ট জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধধর্মকে রাজ্যের প্রধান ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন, পূজার্চনার জন্য স্তুপ পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন।

প্রেম, তিতিক্ষা ও ত্যাগের ভিত্তিতে বুদ্ধদেব এক নতুন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, কামনাকে জয় করতে পারলে তবেই মানুষের মুক্তি। ব্রাহ্মণদের কঠোর আচারানুষ্ঠান ও জটিল পূজা পদ্ধতি বৌদ্ধদের মতে নিরর্থক। অবশ্য রাজা অশোকের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম জনগণের কাছে পরিপূর্ণ আবেদন নিয়ে উপস্থিত হতে পারে নি।

রাজা অশোক ভারতের সর্বত্র বহু সংখ্যক স্তুপ নির্মাণ করেছিলেন। স্তুপ হল একটি গোলাকার ভিতের ওপর ইঁট বা পাথরে তৈর একটি নিরেট গম্বুজ বিশেষ। কখনও কখনও এই গোলাকৃতি

মন্দির গাত্রে খোদিত প্রস্তর মূর্তি

(খাজুরাহো)

ফটো—হরেন ঘোষ

গম্বুজের চারিদিকে কারুকার্যময় পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকে এবং এই প্রাচীরে একাধিক প্রবেশদ্বারও থাকে। এই প্রবেশদ্বার

গুলি সাধারণতঃ স্থাপত্য শিল্পের প্রকৃত নিদর্শন হয়ে থাকে। কথিত আছে রাজা অশোক নাকি সারা ভারতে ও আফগানিস্থানে এই রকম ৮৪,০০০ স্তুপ নির্মাণ করেছিলেন, তবে তার প্রায় সবগুলিই কালকবলিত হয়েছে। এদের মধ্যে যে কয়টির অস্তিত্ব এখনও বজায় রয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতনামা হল ভূপালের সাঁচীতে অবস্থিত স্তূপটি। সাঁচী স্তূপের ব্যাস হল ১২১½ ফুট, উচ্চতা প্রায় ৭৭½ফুট। পাথরের যে প্রাচীরটি এর চারিদিক ঘিরে রয়েছে তা উচ্চতায় ১১ফুট। অবশ্য স্যার জন মার্শালের মতে অশোক নির্মিত মূল স্তূপটি ছিল ইঁটের তৈরী এবং তার আয়তন সম্ভবতঃ এর অর্ধেক ছিল। পরবর্তীকালে এর ওপর প্রস্তরের আবরণ লাগান হয়েছে। অশোকের অন্যান্য স্তূপও এই ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সাঁচী স্তূপের শীর্ষদেশে বৌদ্ধদের প্রতীক ছাতা লক্ষ্য করা যায়। এই স্তূপের প্রাচীরে চারটি প্রবেশদ্বার আছে। এগুলির কারুকার্য ভুবনবিখ্যাত।

যাই হোক, রাজা আশোক এই সকল স্তুপে বুদ্ধের পূতাস্থি বিতরণ করে এমন এক ধর্ম আন্দোলন সৃষ্টি করলেন, যা অচিরেই পূতাস্থি পূজার মধ্যে রূপলাভ করল এবং পরবর্তীকালে স্বয়ং বুদ্ধই দেবতায় পরিণত হলেন।

প্রাচীনতম বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে কতকগুলি প্রতীকের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধের উপস্থিতিকে অনুভব করার চেষ্টা করা হ'ত। এই প্রতীকগুলি হল স্তূপ সিংহাসন, ছাতা বা অন্য কোন প্রতীক। বুদ্ধের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা আরও পরবর্তী কালের। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সাঁচীতে আর পশ্চিম ভারতের অজন্তা, নাসিক প্রভৃতি গুহামন্দিরে। এগুলি সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম ও দ্বিতীয় খৃষ্টপূর্বাব্দে। ক্রমে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রসার হল ভারতে, বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির ছড়িয়ে পড়ল ভারতের সর্বত্র, এবং দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দ থেকে সপ্তম খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ভারতের জাতীয় ধর্মের রূপ গ্রহণ করল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন পাওয়া যায় তক্ষশিলায়। এখান থেকেই শিল্পকলা ও ধর্মের প্রসার হয়েছিল তুর্কীস্থানে, চীনে জাপানে এবং তিব্বত, জাভা, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে।

অবশ্য খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক নাগাদ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমে হ্রাস পেতে লাগল। ক্রমে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হল এবং এরই স্বাভাবিক ফলস্বরূপ ভারতের সর্বত্র অজস্র নয়নমনোহর মন্দিরের সৃষ্টি হল।

যে সকল কারণে প্রাচীন যুগে ভারতে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়েছিল ও মন্দির নির্মাণে জোয়ার এসেছিল তার অন্যতম হল সে যুগে ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের অসামান্য জনপ্রিয়তা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে এই সকল মহাকাব্য নতুন করে লিখিত ও সম্পাদিত হল, যার ফলে কৃষ্ণ ও রাম হয়ত মূলতঃ ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও বিষ্ণুর অবতার বলে বর্ণিত হয়েছেন এবং তাঁদের পূজাও প্রচলিত হয়েছে।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে পুরাণ সাহিত্য লিখিত হতে থাকে। পুরাণে এক একজন কল্পিত শক্তিমান দেবতার গৌরব-মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ এই যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েও সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ নিজের জীবনে উপলব্ধি করবার জন্য নিজেকে সাধারণের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছিলেন। তাই বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের কথা বিবেচনা করে হিন্দুর দেবতাদেরও আর দেবলোকে মানুষের কাছ থেকে দূরে দেবাসনে বসিয়ে রাখা যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয় নি। তাঁদেরও নামিয়ে আনা হয়েছিল এই ধূলার ধরণীতে। তাঁদের কথা নিয়েই লেখা হল পুরাণ। এমনি করেই হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকতার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পৌরাণিক যুগেই।

চতুর্থ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ভারতে মন্দির পূজা সুপ্রতিষ্ঠিত আসন লাভ করল। পুরাণোল্লিখিত অসংখ্য দেব দেবীর বাসগৃহ গড়ে উঠল ভারতের সর্বত্র মন্দিরের রূপ নিয়ে। এই সমস্ত মন্দিরের দেয়ালগাত্রে সুনিপুণ ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে দেবকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ক্রমে এই সকল দেবমন্দিরকে ঘিরে নানা উৎসবের সূচনা হয়েছে এবং যে সকল স্থানে এই দেবমন্দিরগুলি গড়ে উঠেছে সেগুলি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

ভারতে মন্দির নির্মাণশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রেরণা লাভ করে গুপ্তযুগে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্য গুপ্ত রাজাদের আধিপত্য ছিল পঞ্চম শতকের শেষ দশক পর্যন্ত। তবে তাঁরা শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যে নতুন রীতির প্রচলন করেছিলেন তা অব্যাহত ছিল ষষ্ঠ শতাব্দী, এমন কি সপ্তম শতাব্দীরও মাঝামাঝি পর্যন্ত। তাই শিল্পক্ষেত্রে গুপ্তযুগ বলতে ষষ্ঠ শতাব্দীরও পর পর্যন্ত বুঝতে হবে। গুপ্তযুগে ষষ্ঠশতাব্দী পর্যন্ত নির্মিত চৈত্য বা পূজাকক্ষগুলিই পরবর্তীকালে মন্দিরের রূপ গ্রহণ করেছিল। গুন্টুরে এরকম একটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। চৈত্যগুলি নির্মিত হয়েছিল অতি প্রাচীন কালে। প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত এই রকম একটি মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গেছে তক্ষশিলায়। অনুরূপ আর একটি মন্দির পাওয়া গেছে সাঁচীতে। এটি অত্যন্ত প্রাচীন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। গুন্টুরের মন্দিরটি আগাগোড়া ইঁট দিয়ে তৈরী এবং গঠনের মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। খিলানাকৃতি অর্ধবৃত্তাকার ছাদটিই এর বৈশিষ্ট্য। গুপ্তযুগে দেওয়াল পরিবেষ্টিত মণ্ডপ নির্মাণেরও প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় রীতিতে নির্মিত দেবালয়ের ক্ষেত্রেই যথেষ্ট প্রচলিত হয়েছিল।

সাঁচীতে বৌদ্ধরীতিতে গঠিত ক্ষুদ্র কক্ষ ও স্তম্ভ যুক্ত মণ্ডপসমন্বিত মন্দির পরবর্তীকালে ভারতে মন্দির নির্মাণের আদর্শস্বরূপ হয়েছিল। গুপ্তযুগে মন্দির স্থাপত্যের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল মন্দিরের সমতল ছাদ। পরবর্তীকালে শিখরের উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

গুপ্তযুগের অবসানের পর ছয়শত বৎসর পর্যন্ত স্থাপত্যশিল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ যুগ। এই সময়ের মধ্যেই স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রীতির উদ্ভব হয়েছিল' এবং আজ আমরা সারা ভারতে নয়নবিমোহন যে সকল মন্দির দেখতে পাচ্ছি সেগুলির নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল এরই ফলে।

মোটামুটি ভাবে বলা যায়, এ সময়ে স্থাপত্য শিল্পের দু'টি প্রধান

রীতি গড়ে উঠেছিল—একটি ভারতীয় আর্য বা উত্তর-ভারতীয় রীতি অপরটি দ্রাবিড়ীয় বা দক্ষিণ-ভারতীয় রীতি। এদের মধ্যে পার্থক্য প্রধানতঃ মন্দির শিখরের গঠনভঙ্গীতে। উত্তর ভারতীয় মন্দিরগুলির শিখর খানিকটা গোলাকৃতি, মাঝখানটা স্থূল ও শীর্ষদেশ তীক্ষ্ণ, দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে নির্মিত শিখর পিরামিডের আকৃতিবিশিষ্ট এবং তা ক্রমেই ধাপে ধাপে স্তরে স্তরে সরু হয়ে গিয়েছে।

উভয়ের মধ্যে আর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরগুলিতে স্তম্ভ একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে, কিন্তু উত্তর ভারতীয় রীতিতে নির্মিত মন্দিরগুলিতে এগুলি প্রায় অনুপস্থিতবলা চলে।

দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাদের গোপুরমগুলি। মূল দেউলের চারপাশে থাকে চারটি বা পাঁচটি গোপুরম বা প্রবেশদ্বার। গোপুরমগুলির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য লক্ষ্য করবার মত। উত্তর ভারতীয় মন্দিরগুলিতে গোপুরম নেই।

ঐতিহাসিক দিক থেকে বিবেচনা করলে গুপ্ত যুগের অবসানের পর সপ্তম শতক থেকে বিভিন্ন রাজাদের শাসনকালে হিন্দু স্থাপত্যের বা ভারতীয় আর্য স্থাপত্যের উৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল। পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে চালুক্য রাজবংশের হাতে শাসন ক্ষমতা ছিল অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। এদিকে দক্ষিণপূর্ব ভারতে সপ্তম শতক সম্পূর্ণ ও অষ্টম শতকে প্রথমার্ধ পর্যন্ত দেড়শ বছর পল্লব রাজারা রাজত্ব করেন। এই সকল স্থানে হিন্দু রাজাদের শাসন বজায় থাকায় ও শিল্পের প্রতি তাঁদের প্রবল অনুরাগের জন্য হিন্দু স্থাপত্যের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়েছিল। একমাত্র গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে পাল ও সেন রাজবংশের আমলে বৌদ্ধ শিল্প সঞ্জীবনীশক্তি লাভ করেছিল।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান আক্রমণের বলি হয়েছিল উত্তর ভারতের বহু প্রাচীন দেবদেউল। এই সমস্ত মন্দির ধ্বংস করেই গড়ে উঠেছিল মসজিদ, নতুন দুর্গ। বারানসী, মথুরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রগুলিতে বর্তমানে যে সকল মন্দির রয়েছে সেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সৃষ্টি। দিল্লী, আজমীঢ় ও জৌনপুরে হিন্দু স্থাপত্য যে কতখানি উচ্চস্তরে পৌঁচেছিল হিন্দু মন্দিরগুলির থিলান ও স্তম্ভগুলির মধ্যে তার পরিচয় রয়েছে। পরবর্তীকালে মুসলমান স্থাপত্যরীতির ওপরও এর প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এই সকল স্থানে মুসলমানদের তৈরি গৃহাদির মধ্যেও এই রীতি অনুসৃত হয়েছে।

ভারতীয় আর্য বা উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায় রাজস্থানের উদয়পুরে ও চিতোরে, মধ্যভারতের গোয়ালিয়রে, মথুরা-বৃন্দাবনে ও খাজুরাহোতে, পশ্চিম ভারতের গুজরাটে ও কাথিয়াবাড়ে, আর পূর্ব-ভারতের উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোনারকের মন্দিরগুলিতে। সবশেষে বাংলা দেশের নাম না করলে ভারতীয় আর্য স্থাপত্য-রীতির দৃষ্টান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অনেকগুলি সভ্যতার ঢেউ বাংলা দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। তবে এই সব সভ্যতার দান মন্দিরগুলি এখন খুব স্বাভাবিক কারণেই কোথাও সম্পূর্ণ লুপ্ত, কোথাও বা অর্ধলুপ্ত। কিন্তু তবুও বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পর্যালোচনা করলেই ভারতীয় আর্য রীতির স্থাপত্য আন্দোলনের সঙ্গে এর একটা স্পষ্ট যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের স্থাপত্যরীতির সঙ্গে বাঁকুড়া-বর্ধমানের মন্দির-স্থাপত্যের একাত্মতা লক্ষ্যণীয়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দিরশিল্পের এক-একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে সন্দেহ নেই। এই বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল স্থানীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে। তবে এই সমস্ত মন্দিরের গঠনরীতি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে পরিকল্পনার ঐক্য, স্থাপত্যরীতি ও দেহরূপের দিক থেকে সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন অঞ্চলের এই সমস্ত মন্দির যে একই ব্যাপক স্থাপত্য আন্দোলনেরই ফল সে বিষয়েও সন্দেহের কোন অবকাশই থাকে না।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

খানিকবাদে পদ্মা ফিরে এসে তার চেয়ারটিতে বসল। মুখখানা বেশ অপ্রসন্ন। নিশিকান্ত তাকে খুব খানিকটা বিরক্ত করে গেছে—একথা অনুমান করতে উৎপলের বিশেষ কল্পনার আশ্রয় নিতে হল না।

জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে কিনা ভাবতে ভাবতে উৎপল বলেই ফেলল, 'কী হল?'

পদ্মা বলল, 'কী আবার হবে, দুটো টাকা আদায় করে নিয়ে তবে ছাড়ল। শুনলে অনুরাধাদি অবশ্য রাগ করবেন।'

উৎপল বলল, 'তাহলে দিলেন কেন?'

পদ্মা বলল, 'না দিয়েই বা কী করি বলুন। প্রথমে তো খুব চোটপাট হম্বিতম্বি। তারপর হাতে-পায়ে ধরা। দিদিমণি, বউ ছেলে না খেয়ে শুকিয়ে মরুক তাই কি চান?'

উৎপল বলল, 'কোন কাজ-কর্ম করে না কেন?'

পদ্মা বলল, 'অল্প বয়স থেকেই অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। অকাজ-কুকাজ দেন করতে পারবে, কিন্তু কাজের কথা বললেই ওদের হাতে ব্যথা ধরে।'

উৎপল বলল, 'অকাজ কুকাজ তো সংসারে কম নেই। তার কিছু কিছু করলেই তো পারে।'

পদ্মা হেসে বলল, 'আপনার পরামর্শের জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে কিনা। সুবিধে পেলে কুকাজ কি আর করছে না? মাঝে মাঝে জেল-টেলও খাটছে। বেরিয়ে এসে আবার যে সেই। চুরি ডাকাতি রাহাজানি আর শেষে নিরুপায় হয়ে ভিক্ষা—রোজগারের এই ক'টি পথ ছাড়া ওদের আর কোন পথ নেই।'

উৎপল বলল, 'ক'টি পথ! আমাদের রোজগারের পথ তো মাত্র একটি কি দুটি। সে হিসেবে ওদের পথ তো অসংখ্য। সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান যারা পেয়েছে আজকালকার দিনে তাদেরই তো জয়জয়কার। মিসেস রায়ের এমন বহুপন্থী পোষ্যপুত্র আর ক'জন আছে?'

পদ্মা হেসে বলল, 'এখন আর বেশি নেই। তবে আগে, সতীদা থাকতে ওদের সংখ্যা কম ছিল না।'

উৎপল বলল, 'মানে তিনি ওদের প্রশ্রয় দিতেন?'

পদ্মা যেন একটু সাবধান হয়ে গেল, একটু থেমে বলল, 'ঠিক প্রশ্রয় দেওয়া নয়। কেউ এসে সাহায্য চাইলে সাধ্য থাকলে তিনি তা না দিয়ে পারতেন না। লোকজন সম্বন্ধে তাঁর এই ধরণের নানারকম দুর্বলতা ছিল। ফলে অনেক বদনামও তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে।'

উৎপল বলল, 'কিসের বদনাম?'

পদ্মা বলল, 'এই অমনিই বুঝি আপনি নোট নেওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছেন? আমি আর বলব না।'

উৎপল বলল, 'ভয় নেই, আপনার বক্তৃতা থেকে এক লাইন নোটও আমি নেব না। শুধু মিসেস রায়ের ভাষণ থেকেই আমার নোট নেওয়ার অধিকার আছে।'

পদ্মা উৎপলের দিকে তাকাল, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'নিজের অধিকারের সীমানাকে এত ছোট করতে আপনি রাজী হয়েছেন তাহলে?'

পদ্মার কথার মধ্যে একটু কি ঈর্ষার উত্তাপ ফুটে উঠল? উৎপল ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু কোথায় গৃহকর্ত্রী বিত্ত-সম্পত্তির অধিকারিণী অনুরাধা রায়—আর কোথায় তাঁর এই আশ্রিতা পদ্মা, যে এখানে প্রায় পরিচারিকার কাজই করে থাকে—এঁদের মধ্যে কি ঈর্ষা আর অসূয়ার সম্পর্ক সম্ভব? কিন্তু ঈর্ষার মত মনের অনেক বৃত্তিই কি সম্ভব-অসম্ভব সীমানা ডিঙিয়ে যায় না? ওর যৌবনকে, ওর স্বাস্থ্যকে অনুরাধা হয়তো ঈর্ষা করতে পারেন। আর পদ্মা মনে করলেও করতে পারে তার পক্ষে অনুরাধা হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল না।

নিজের মনকে শাসন করল উৎপল। কী যত সব আজগুবি কল্পনা। জীবনী লিখতে এসেছে সে। কিন্তু তার ঝোঁক উপন্যাসের দিকে। এই দুটি নিঃসম্পর্কীয়া নারী একটি মৃত পুরুষের অবশিষ্ট বিত্ত প্রতিপত্তিকে আশ্রয় করে কেন আছে, কোন রহস্যজনক সম্পর্কের ডোরে এরা বাঁধা পড়ে রয়েছে—মাঝে মাঝে তা জানবার কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে উৎপলের। নিবৃত্তির কোন সহজ পথ না পেয়ে, কি কোন সহজ সরল পথ-রেখা মনঃপূত হয়না বলে, ওর কল্পনা নানা অলিগলিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে ঘোরাঘুরি করে। একাধিক নারীতে সতীশঙ্করের আসক্তি ছিল এই জনশ্রুতি উৎপলের কানে গেছে। পদ্মাও কি সেই অনুগ্রহ-ভাগিনীদের একজন? তাই যদি হবে পদ্মাকে তিনি এখানে থাকতে দেবেন কেন, অমন অপরাধ কি কেউ ক্ষমা করে? মৃত্যুর পরেও কি তা মন থেকে মুছে ফেলে দেয়? এসব অনুমানের অবশ্য কোন প্রমাণ নেই। শুধু মাঝে মাঝে পদ্মার দু'একটি কথায় একটু আধটু যা সন্দেহ হয়। কিন্তু এমনো হতে পারে সে সংশয় একেবারেই অমূল তরু। সত্যের মধ্যে তার কোন শিকড় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পদ্মা উঠে পড়েছিল, উৎপল বলল, 'ওকি, আপনি চললেন যে।'

'কী করব। আপনি বসে বসে লেখার কথা ভাববেন, আর আমি আপনার সামনে চুপ করে বসে থাকব—আপনি কি তাই ভেবেছেন নাকি?'

উৎপল বলল, 'তা কেন ভাবতে যাব? আপনি আমার টেবিলের পেপার ওয়েটও নয়, কলমদানিও নয়। আপনার প্রাণ আছে, মন আছে, আর সেই মনভরা প্রচণ্ড রাগ আছে—।'

পদ্মা প্রতিবাদ করে বলল, 'রাগ? রাগ আবার কোথায় দেখলেন? আপনি এত বানিয়ে বানিয়ে কথা বলেন? আচ্ছা মানুষ যা হোক।'

উৎপল বলল, 'সত্যি করে বলুন তো সবটাই আমার বানানো? রাগ করেননি আপনি? এক ফোঁটাও না?'

রাগ যে করেনি সে কথা প্রমাণ করবার জন্যেই যেন পদ্মা ফের চেয়ারখানায় বসে পড়ল। হেসে বলল, 'রাগের কথা এতে আসে কোত্থেকে। আপনি বললেন অনুরাধাদি যা আপনাকে বলবেন আপনি তা ছাড়া কিছুই লিখতে পারবেন না। আমি তার জবাবে বললাম—তাহলে তো আপনার কাজ খুব সোজা হয়ে গেছে। কেন যে আপনি এতদিন ধরে এত গড়িমসি করছেন, এত চিন্তা-ভাবনা জল্পনা-কল্পনা করছেন আমি তো তার কারণ খুঁজে পাইনে। উনি যা ডিক্টেট করবেন আপনি তাই লিখে যাবেন। শুধু ভাষাটা আপনার হবে। এ কাজ তো খুব কঠিন নয়।'

উৎপল বলল, 'আপনি জানেন না যে কাজ অনেকের পক্ষে সোজা সেই কাজই কারো কারো পক্ষে দারুণ কঠিন। তা ছাড়া আমি তো আপনাকে বলিনি একজনের ডিকটেশন অনুযায়ী আমি লিখব।'

পদ্মা বলল, 'মাফ করবেন। আমি যতটা শুনেছি সেই শর্তেই আপনি এখানে কলম ধরেছেন। হয়তো শর্তটা পরে আর তেমন মনঃপূত হচ্ছে না তাই কলমও শক্ত করে ধরতে পারছেন না।'

উৎপল বলল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

পদ্মা বলল, 'জানব আর কী করে। রোজ যাতায়াতের পথে আপনাকে দেখছি—আর ভাবছি আপনি এমন করে আর কতকাল কাটাবেন।'

উৎপল একটু চমকে উঠে বলল, 'কেন, এই নিয়ে কি আপনাদের মধ্যে কথা উঠেছে না কি? মিসেস রায় কি আপনাকে কিছু বলেছেন?'

পদ্মা বলল, 'আপনার ধারণা মিসেস রায় তাঁর মনের সব কথা আমাকে বলেন?'

উৎপল হেসে বলল, 'তেমন ধারণা অবশ্য আমি করিনে। আপনাকে আমাকে কেন, মিসেস রায় তাঁর স্বামীকেও মনের সব কথা বলতেন না। কেউ তা বলতে পারে না। স্বামী স্ত্রীকে পারে না, স্ত্রী স্বামীকে পারে না, ভাই ভাইকে পারে না, বন্ধু বন্ধুকে পারে না। একজন কিছুটা বলে, আর একজন অনেকখানি আন্দাজ করে নেয়। আপনি কি এ ব্যাপারে মিসেস রায়ের মনের কথা আন্দাজ করে নিয়েছেন?'

পদ্মা বলল, 'আমি তা কেন বলতে যাব? আন্দাজ করবার ক্ষমতা কি আপনার কারো চেয়ে কম?'

হয়তো কম নয়। কিন্তু প্রথম আলাপে যাকে একদিন লাজনম্রা, মুখচোরা মিসেস রায়ের সহচরী পার্শ্বচরী বলে মনে হয়েছিল উৎপলের, সেও যে সুযোগ সুবিধে পেলে

উৎপলের মত একজন অনাত্মীয় যুবকের সামনে বসে এত সহজ ভাবে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে বক্রোক্তি মিশিয়ে কথা বলতে পারে তা উৎপল অনুমান করতে পারেনি। একি মিসেস রায়েরই সদ্গুণ? না কি যৌবনের স্বাভাবিক প্রাচুর্য, উচ্ছলতা, অনায়াস এমন কি অবচেতন-পটুত্ব? যখন সতীশঙ্কর বেঁচেছিলেন তখন থেকেই কি এই ধরণের যোগ্যতা দক্ষতার অধিকারিণী হয়েছে? না কি এসব বিশিষ্টতা আরও পরে পদ্মার আয়ত্বে এসেছে?

উৎপল বলল, 'দেখুন, আরও পাঁচজনের মত আন্দাজ করবার শক্তি অল্প-স্বল্প আমারও আছে। কিন্তু তাই বলে সবাইর মনের কথাই যে বুঝতে পারি এমন অহংকার আমার নেই।'

পদ্মার মুখখানা একটু যেন আরক্ত হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সবাইর মনের কথা বুঝবার চেষ্টা করে আপনার দরকারই বা কি। আপনি যাঁর মনের কথা বুঝবার জন্যে এখানে এসেছেন তাঁর মনের কথা বুঝে নিয়ে তাঁর মনের মত কাজ করে যেতে পারলেই তো আপনার সব দিক বজায় থাকে।'

উৎপল হেসে বলল, 'না, মনে হচ্ছে, তাতেও সব দিক বজায় থাকে না।'

'আপনার কাজ আপনি নিজে বুঝবেন, আমি চলি।'

পদ্মা ফের উঠে দাঁড়াল।

উৎপল হাত দিয়ে বাধা দিল না, কিন্তু কাতর চোখে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'না না, চলে যাবেন না। সত্যি বলছি, আমার কাজের জন্যেই আপনার কাছে আমি সাহায্য চাইছি। কার্যোদ্ধার হয়ে গেলে আপনার কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকব। বইয়ের ভূমিকায় সে কথা স্বীকার করব।'

উৎপলের কথায় কতখানি গুরুত্ব আছে, কতখানিই বা কৌতুকরস—তা ঠিক করবার জন্যেই যেন পদ্মা উৎপলের মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল, তারপর মৃদু হেসে বলল,—'খবরদার খবরদার আমার নাম গন্ধ যেন কোথাও না থাকে। না ভূমিকায় না বইয়ের ভিতরে।'

উৎপল বলল, 'কেন, আপনার নামের গন্ধ এমন কি খারাপ যাতে নাকে রুমাল চাপা দিতে হবে? পদ্মগন্ধ কেনা পছন্দ করে বলুন?'

পদ্মা একটু কাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কাতর আর্তস্বরে বলল, 'না না, উৎপলবাবু, আমাকে মাফ করবেন। আপনাকে আমি কোন সাহায্যই করতে পারবনা, আমার কোন ক্ষমতাই নেই।'

কোন কথা উৎপলকে আর বলবার সুযোগ না দিয়ে পদ্মা এবার সত্যই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উৎপল মুহূর্তকাল অবাক হয়ে রইল। পদ্মার এই অক্ষমতা জ্ঞাপনের ভঙ্গি, তার অমন দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার ভিতর দিয়ে অনেক অব্যক্ত কথা যেন বলা হয়ে গেল। সবাইর বলবার ধরণ তো এক রকম নয়। কেউ বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিয়ে ব্যাখ্যা করে, উপদেশ নির্দেশ দিয়ে বলে, কেউ বা 'আমার বলবার ক্ষমতা নেই, বলবার মত কথা নেই' এই কথা বলতে বলতেই অনেক কথা বলে যায়। পদ্মার আজের এই আচরণটুকু মনে মনে নোট করে রাখতে পারে উৎপল। যদিও এখন বলা শক্ত, এই নোট তার কোন কাজে লাগবে কিনা। এক ফোঁটা অস্পষ্ট আভাসকে সে কোনদিন ফুটিয়ে তুলতে পারবে কিনা? ফুটিয়ে তুলবার দরকার হবে কিনা তা সে জানে না। বাস্তব জীবনের এমন কত গল্পের ইশারা ইঙ্গিত আর সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যায়, হয় তা নিয়ে লেখা যায় না, না হয় তা নিয়ে লেখা হয় না। এমন কত কুঁড়ি অকালে শুকোয়, অকালে ঝরে, ফুটি ফুটি করেও ফোটে না, কে তার হিসেব রাখে।

লেখাটা আজও কিছু মাত্র এগোল না। নিজের ওপরই বিরক্তি ধরে গেছে উৎপলের। কাগজ পত্র গুছিয়ে তুলে রেখে এবার সেও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। মিসেস রায় এখনো এলেন না। কিন্তু অনুরাধা এই মুহূর্তে না এসে পড়লেই যেন ভালো। দেখা হয়ে গেলেই একটি অনুচ্চারিত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, 'কতখানি লেখা হল?' জবাব আশাপ্রদ হবেনা। তাই আজ আর দেখাসাক্ষাৎ তার কাম্য নয়।

গেটের সামনে দারোয়ান সেলাম জানালে, 'তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যা বাবুজী?'

উৎপল বলল, 'হ্যাঁ, তুমি ভালো আছ তো চৌবেজী!'

চৌবে বলল, 'ভালোই আছি, বাবুজী। আপনার

কিতাব লেখা ভালো হচ্ছে ?' চওড়া কালো গোঁফের আড়ালে দারোয়ানের হাসির মধ্যে বেশ একটু কৌতুক। উৎপল তার কথার জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল। সে যে এখানে বই লিখতে আসে তা এই দারোয়ানও জানে। তার এই কাজটাকে কী চোখে দেখে দারোয়ান! নিশ্চয়ই কিছু অনুকম্পার ভাবই থাকে তার দৃষ্টিতে। সতীশঙ্করের কর্মব্যস্ত ঘটনাবহুল জীবনকে চৌবে যে শ্রদ্ধা আর সমীহর চোখে দেখেছে, উৎপলের বৃত্তি তার কাছে নিশ্চয়ই তেমন মূল্য পায় না। লেখাটা নিশ্চয়ই তার কাছে খেলার সামিল। আর স্বামীর জীবনী সম্বন্ধে মিসেস রায়ের এই আগ্রহ আর অর্থব্যয়কেও দারোয়ান নিশ্চয়ই একটা বাতিকের চেয়ে বেশি মূল্য দেয়না। সাহিত্যশিল্প সম্বন্ধে শুধু বাইরের দারোয়ান কেন—যারা গৃহী, যারা অভ্যন্তরবাসী তাঁদের বেশিরভাগ লোকেরই তো ধারণা এই রকম। কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায়না। দারোয়ানের কাছে তার মর্যাদা যতই কম হোক, ওকে তার সাহিত্যের সামগ্রী করতে উৎপলের বাধা নেই। মনের এই ঔদার্যে উৎপল বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। অজ্ঞ বলে উৎপলকে যে অবজ্ঞা করে তাকেও সে তার লেখার মধ্যে যথাযোগ্য মর্যাদার আসন দিতে পারে। উৎপল ওর কাছে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তাই বলে দারোয়ান উৎপলের কাছে অতখানি তুচ্ছ নয়। ভিতরের বাসিন্দাদের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের এই রক্ষীটিকেও যদি তার যথাযোগ্য ভূমিকায় জীবন্ত করে তুলতে পারে উৎপল সে কৃতিত্বের কিঞ্চিৎ ভাগী হবে। কে জানে এই দারোয়ানও হয়তো সতীশঙ্করের অনেক খবর রাখে। হয়তো তাঁর অনেক সৎকর্মের দুষ্কর্মের সাক্ষী এই চৌবেজী। দিনে রাত্রে কত নারী পুরুষ, প্রার্থী গ্রহীতা শত্রু মিত্রকে এই প্রতিহারী যেতে দেখেছে, আসতে দেখেছে, যাঁরা ওকে চিনতে চাননি. গ্রাহ্য করেননি, তাঁদেরও কত জনকে ও চিনে রেখেছে। এই প্রশস্ত দরজার ভিতর দিয়ে সে কত উৎসব উল্লাসের শোভাযাত্রা দেখেছে, আবার শোক দুঃখে, পরাজয়ে দীর্ণ বিধ্বস্ত মহূর্তগুলিকেও সে প্রত্যক্ষ করেছে। শেষে দেখেছে সতীশঙ্করের অন্তিমযাত্রা। যে যাত্রার কথা সতীশঙ্কর আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বইতে লিখে রাখতে পারেননি। যে যাত্রা একান্তভাবে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত, পরবর্তী অনেক জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্টকে যা বাতিল করে দিয়ে গেছে। সে যাত্রাও দেখেছে চৌবে। দেখে নিশ্চয়ই চোখের জল ফেলেছে। আবার চোখ মুছে তারপরের ছবিগুলিও দেখে যাচ্ছে। দেখে যাচ্ছে সতীশঙ্করের স্ত্রীকে, পুত্রকে, জীবনের নতুন অঙ্কুরকে। তাদের উৎসাহ উদ্যম, জীবন চাঞ্চল্যে আবার এই মৃত শুষ্ক অসাড় পুরীতে সাড়া জাগছে, আলো জ্বলছে। সেই আগেকার মত উজ্জ্বল দীপ্তি হয়তো নেই, কিন্তু দুটি একটি কোণে বাসনা কামনা নিয়ে প্রদীপের শিখা আবার জ্বলে উঠেছে। এই প্রতিহারীর চোখ দিয়ে একটি প্রাসাদের ইতিহাস লিখলে মন্দ হয়না। উৎপলের মনে নতুন ফর্মের চিন্তা নতুন আনন্দ দিল। নিজের ড্রাইভারের চোখে সতীশঙ্কর, নিজের দারোয়ানের চোখে সতীশঙ্কর যা ছিলেন তাঁর স্ত্রীর পদ্মপলাশ লোচনে নিশ্চয়ই সে রূপ ধরা পড়েনি। তাঁর রূপ যেমন বহু, শত্রু মিত্র আত্মীয় পর একেকজনের কাছে তিনি যেমন একেক রকম ছিলেন, আবার যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের চোখও নিশ্চয়ই একরকম ছিলনা। ভিন্ন ভিন্ন রুচি বুদ্ধি, প্রীতি প্রেম ঈর্ষা দ্বেষ, স্বার্থবোধ কি আদর্শবাদে তাঁদের দৃষ্টিও অভিন্ন নয়। এমন কি একই চোখ বিভিন্ন দৃষ্টির অধিকারী। সে দিনে একরকম দেখে, রাত্রে আর একরকম দেখে, জ্যোৎস্নায় একরকম দেখে, অন্ধকারে কিছুই দেখেনা। সুখে একরকম দেখে, দুঃখে আর একরকম, প্রসাদে একরকম, বিষাদে আর একরকম, তার সমবেদনার মমতার দৃষ্টি, আর নির্মম দৃষ্টিতে অনেক প্রভেদ। এই যে মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাওয়া অসংখ্য রূপ আর অসংখ্য চোখ এর কোনটির কথা লিখবে উৎপল? এই সংখ্যাহীন সামঞ্জস্যহীন মুহূর্তের টুকরোগুলির মধ্যে কি কোন ঐক্য বন্ধনই নেই? তাহলে এই সংসার চলছে কী করে? অন্তত ন্যূনতম একটি সংক্ষিপ্তসার ছাড়া কি কাজ চালানো সম্ভব? অনিত্যতার মাঝখানে এক নিত্যতার ধারণা, সদাচঞ্চল, গতিশীল ধাবমান এই জীবনধারায় এক অবিচল স্থিরতার ধারণা ছাড়া মানুষ কী করে এগোতে পারে? কী করে তার পদক্ষেপ সম্ভব যদি পা রাখবার এক পাদভূমিও সে না পায়?

ছায়া-ঘেরা আধো-অন্ধকার এই গলির ভিতর দিয়ে উৎপল নিতান্ত অভ্যস্ত পায়ে বড়রাস্তার দিকে এগোতে লাগল। রাস্তার দুদিকে বাড়িঘর দোকানপাট লোকজন কিছুরই যেন কোন সত্যিকারের অস্তিত্ব নেই। এরা শুধু অস্পষ্ট আবছা দৃশ্যপট। সত্য শুধু উৎপল নিজে, আর তার উদ্দাম আপাতসঙ্গতিহীন যা ঝরণার মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে কখনো বা খরস্রোতে ভাসিয়ে নেয়, ডুবিয়ে দেয়, আশ্রয়চ্যুত করে আবার এক অর্থে আশ্রয় দেয়—এই মুহূর্তে সত্য শুধু তার অসংলগ্ন চিন্তাধারা।

'কাজ হয়ে গেল? চললেন বুঝি বাবু?'

উৎপল চমকে উঠল। সামনে এক বিপুলাকার বিসদৃশ ছায়ামূর্তি। উৎপলের চিন্তার গতি তো রুদ্ধ হলই, তার পায়ের গতিও থেমে গেল। শুধু হৃৎপিণ্ডের তাল দ্রুততর হল।

উৎপল ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'কে? কে আপনি?'

কালো ছায়ামূর্তি তার পানের ছোপ লাগা ময়লা দাঁতগুলি বার করে হাসল, 'ঘাবড়াচ্ছেন কেন বাবু। ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমাকে একটু আগেই তো আপনি ওবাড়িতে দেখলেন। আমার নাম নিশিকান্ত দাস।'

এতক্ষণে উৎপল আশ্বস্ত হল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'ও!'

মনে মনে ভাবল তখনকার সেই ভিক্ষুক হঠাৎ এখানে এই গলির মোড়ে এমন দস্যুমূর্তি ধরল কী করে।

উৎপল বলল, 'কী চান আপনি।'

নিশিকান্ত হেসে বলল, 'কিচ্ছু না বাবু, কিচ্ছু না। এই আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই, একটু গল্প করতে চাই। আপনি বুঝি সতীশঙ্কর রায়কে নিয়ে বই লিখছেন?'

উৎপল বলল, 'সে কথা আপনাকে কে বলল?'

নিশিকান্ত হেসে বলল, 'কে আবার বলবে? সবাই কি মুখ ফুটে আমাদের সব কথা বলে? আমরা কি তেমন যুগ্যি লোক? আমরা নিজেরাই দেখে শুনে নিই। আপনি কবে থেকে ও বাড়িতে আসছেন, কী করছেন না করছেন সব জানি। শুধু আমি কেন পাড়ার অনেকেই ও বাড়ির খবর রাখে।'

উৎপল বলল, 'ভালোই তো।'

নিশিকান্ত বলল, 'আপনার সঙ্গে যখন আলাপ হয়ে গেল, চলুন না স্যার গরীবের আস্তানায়। একটু পায়ের ধুলো দিয়ে আসবেন।'

উৎপল দুপা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'না না, আজ আমার সময় হবে না। ওসব আর একদিন হবে।'

নিশিকান্ত বলল, 'আর একদিন কেন স্যার, আজই চলুন না। এই তো কাছেই। ওই যে বস্তী দেখছেন—ওখানে। আপনি যাঁর কথা লিখছেন সেই সতীশঙ্করদাও ওখানে অনেকবার পায়ের ধুলো দিয়েছেন। এমন দিন গেছে এই নিশিকান্তই ছিল তাঁর ডান হাত। আমাকে ছাড়া তাঁর কোন কাজ চলত না। আজ আর সেদিন নেই, আজ আর আমাকে কেউ চেনেনা। চলুন সব বলব আপনাকে। শুনবেন তখনকার দিনের কাণ্ডকারখানা। চলুন, ভয় নেই আপনার। আমরা সত্যিই ডাকাতও নই, গুণ্ডাবদমাসও নই। তাছাড়া আপনার সঙ্গে তো আমার কোন শত্রুতা নেই। কিসের ভয় আপনার।'

বার বার ভয়ের কথা তোলায় উৎপলের পৌরুষে ঘা লাগছিল। এতক্ষণে প্রাথমিক অস্বস্তি তার কেটে গেছে। তার পরিবর্তে খানিকটা কৌতূহল বোধ করছে উৎপল। কী আর হবে। সঙ্গে থাকার মধ্যে ঘড়ি আর কলম। তা নিশ্চয়ই কেড়ে নেওয়ার সাহস পাবে না। বড়জোর দু-একটা টাকা ধার চাইবে। তারপর নিয়ে আর শোধ দেবে না। এর চেয়ে বেশি লোকসানের আশঙ্কা নেই উৎপলের। কিন্তু সতীশঙ্করের সঙ্গে এই সম্পূর্ণ ভিন্নস্তরের মানুষটির কী সম্পর্ক ছিল জানতে পারলে—বলা যায় না উৎপলের হয়তো তা খানিকটা কাজে লাগলেও লাগতে পারে।

উৎপল লোকটির সঙ্গে সঙ্গে বস্তির দিকে এগোতে লাগল।

[ক্রমশঃ

অপরাজিত

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২রা জুলাই, ১৯৬১ সাল। সান্ ভ্যালির এক রৌদ্র-করোজ্জ্বল শান্ত সকালে একটি সুদৃশ্য ভিলার নীচের ঘরে হঠাৎ গর্জ্জে উঠল একটি বন্দুক! বন্দুকের গম্ভীর গর্জ্জনে সচকিত হয়ে উঠল ভিলার বাসিন্দারা—ছুটে এল গৃহকর্ত্রী শোবার ঘর থেকে, নীচের ঘরে গিয়ে সবাই দেখল গৃহ-কর্ত্তার হাতে বন্দুক, দেহ প্রাণহীন! নিজের বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েছেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ে!—রোমাঞ্চপ্রিয় লেখকের রোমাঞ্চকর মৃত্যু!

হেমিংওয়ের বাড়ীর লোকেরা বলেছেন মৃত্যুর আগের দিন শিকারে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি, কিন্তু শিকারের মরশুম ইতিপূর্ব্বেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। হেমিংওয়ের চতুর্থ স্ত্রী শ্রীমতী মেরী জানিয়েছেন যে তাঁর স্বামী বন্দুক পরিষ্কার করবার সময় অকস্মাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন,—এটি একটি মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনা। কিন্তু দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা?—এ প্রশ্নও অনেকের মনে জেগেছে, কারণ হেমিংওয়ের পিতা মারা গেছলেন আত্মহত্যা করেই। পুত্রও কি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন? কিন্তু এ প্রশ্ন এখানে অবান্তর। হেমিংওয়ে মারা গেছেন—বিশ্ব-সাহিত্য-জগতে হয়েছে ইন্দ্রপাত—এটাই মহা অঘটন, তা যে ভাবেই ঘটে থাক। মাত্র এক সপ্তাহ পূর্ব্বে হেমিংওয়ে 'মেয়ো ক্লিনিক্' হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার পর ফিরে এসে-ছিলেন। সেখানে তাঁর রক্তচাপাধিক্যের চিকিৎসা করা হয় এবং তিনি বেশ সুস্থ হয়েই ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যদেবতা বোধ হয় তাঁর এই দুরন্ত সন্তানকে শান্ত-বোধের মতন শয্যাশ্রয়ী হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাই একদা সৈনিক ও দুঃসাহসিকতার প্রেমিক, অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় হেমিংওয়ে মৃত্যুবরণ করলেন রহস্য-রোমাঞ্চের মধ্যে। জীবনে, মরণে, কর্ম্মে ও সাধনায় তিনি হয়ে রইলেন স্বধর্ম্মাশ্রয়ী।

১৮৯৯ সালের ২১শে জুলাই, শিকাগো শহরের ইলি-নয়েস-এ আর্ণেষ্ট মিলার হেমিংওয়ের জন্ম। পিতা ছিলেন ডাক্তার, আর মা ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণা ও সঙ্গীতানুরাগিণী। স্থানীয় স্কুলে হেমিংওয়ের পঠদ্দশা আরম্ভ হয়। শান্ত-

আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ে

শিষ্ট তিনি কোনও দিনই ছিলেন না। ছোট বেলাতেই তিনি নানারূপ খেলাধূলায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। মুষ্টিযুদ্ধ লড়তে গিয়ে একটি চোখও তাঁর চিরকালের মতন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, বাড়ী থেকেও বার দু'য়েক পালিয়ে-ছিলেন। এই সময় থেকেই তাঁর লেখাতেও হাতে-খড়ি হয়। তিনি স্কুলের সংবাদপত্র সম্পাদনা করতে আরম্ভ করেন এবং ষোল বছর বয়স থেকেই গল্প লেখা-তেও হাত দেন। পরে ১৯১৭ সালে হাই-স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট্ হয়েই তিনি Kansas City-তে চলে যান এবং Kansas City Star নামের একটি নাম-করা কাগজে রিপোর্টারের চাকরি নেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চল্‌ছে। তাঁর অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মন তাঁকে এক জায়গায় থেকে সুস্থির ভাবে কাজ করতে দিল না—টেনে নিয়ে গেল ইতালীর রণক্ষেত্রে 'রেড্-ক্রস' বাহিনীর লেফ্‌টানেণ্ট রূপে। সেখানেই তিনি ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে আহত হন ও মিলানে আসেন চিকিৎসার জন্য এবং ইতালীয়ান্ সরকার

কর্ত্তৃক সম্মানে ভূষিত হয়ে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ইতালীয়ান বাহিনীতেই থাকেন।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মর্ম্মন্তুদ মৃত্যুকে হেমিংওয়ে শুধুই চোখে দেখেননি—মনে-প্রাণে সে ভয়ঙ্করকে উপলব্ধিও করেছিলেন, আর তারই ছাপ—সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুর ছায়া তাঁর সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ছড়িয়ে আছে। এই বিশ্ব-যুদ্ধের পঠভূমিকাতেই কয়েক বৎসর পরে হেমিংওয়ে সৃষ্টি করেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "A Farewell to Arms," যা অনেক সমালোচকের মতে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা-প্রসূত যত সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মানব মনোবৃত্তির যে পরিচয় তিনি পেয়েছেন সেই অভিজ্ঞতাই তিনি তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে তাঁর এই বই-টিতে। 'এ ফেয়ারওয়েল্ টু আর্মস' লিখে বিখ্যাত হবার আগেই তিনি আরও কতকগুলি বই লিখেছিলেন প্যারী শহরে বসে। সেগুলি হচ্ছে—'In Our Time','Torents of Spring', 'The Sun Also Rises,' প্রভৃতি এবং এই শেষোক্ত গল্পটিতেই হেমিংওয়ে বিশেষ করে সুনাম অর্জ্জন করেন। যুদ্ধশেষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে তাঁর মন না টেকায় তিনি প্যারিসে চলে আসেন। ইতি-মধ্যে তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রী হাড্‌লী রিচার্ডাসন্-কে বিবাহ করেছেন। প্যারিসে এসে তিনি মার্কিন লেখিকা Miss Gertrude Stein-এর সঙ্গে পরিচিত হন, আর তাঁরই পরামর্শে ও উৎসাহে তাঁর নিজস্ব লিখন-শৈলীর প্রবর্ত্তন করে "দি সান্ অলসো রাইসেস্" উপন্যাসটি লেখেন। উপন্যাস রচনায় কথ্য ভাষার তখন কদর ছিল না। হেমিংওয়ে এই অপাংক্তেয় কথ্য-ভাষাকেই বিচিত্র রম্যতা দিয়ে তাঁর নিজস্ব সাবলীল ভঙ্গিমায় এই বইটি লিখে মার্কিন তথা বিশ্ব-সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করলেন। সমালোচকরা করলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা, আর লেখকরা করতে লাগলেন অনুকরণ! নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ফরাসী ঔপন্যাসিক Francois Mauriac বলেছেন—"No novelist in the world produced such a direct effect on other people's writing. এরপর হেমিংওয়ে একটির পর একটি গল্প লিখে গেছেন। তার মধ্যে 'The Killers', 'The Green Hills of Africa,' 'Death in the Afternoon', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত বইটি স্পেনের ষণ্ড-যুদ্ধ নিয়ে লেখা এবং অনেকের মতে বুল্-ফাইট্ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ১৯৩৭ সালে স্পেনে গৃহ-যুদ্ধ বাঁধল, আর স্পেনের প্রতি হেমিংওয়ের টান তাঁকে টেনে নিয়ে গেল সেই রণক্ষেত্রে একটি উত্তর আমেরিকান্ সংবাদপত্রের সংবাদদাতারূপে। ১৯৪০ সালে স্পেনের এই গৃহ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হল হেমিংওয়ের চলচ্চিত্রে রূপায়িত ও বহু পঠিত বিশ্বখ্যাত পুস্তক "For Whom The Bell Tolls", হেমিংওয়ের এই সব পুস্তক-গুলি মার্কিন তথা বিশ্ব-সাহিত্যে নতুন জীবনদর্শন ও প্রাণবস্তু চাঞ্চল্য আনয়ন করল। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিণ কবি Carl Sandburg হেমিংওয়ে সম্বন্ধে বলেছেন—"...having profound influence on a style of fiction." আর একজন সমালোচক বলেছেন—"Greatest Stylist of his generation."

এরপর কিছুদিন হেমিংওয়ের লেখায় ভাঁটা পড়ে। তারপর এল বিধ্বংসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। হেমিংওয়ের দুরন্ত মন আবার নেচে উঠল বিপদের নেশায়, ছুটে গেলেন তিনি ফ্রান্সের সমরাঙ্গণে যুদ্ধ-সংবাদদাতারূপে। সংবাদদাতারূপে গেলেন বটে কিন্তু নিরীহ সংবাদদাতার ভূমিকায় তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না—অস্ত্র হস্তে যোগ দিলেন সক্রিয় যুদ্ধে। Sein নদীর তীরে একটি যুদ্ধে হেমিংওয়ের বীরত্বে পেশাদার সৈনিকরা পর্য্যন্ত মুগ্ধ হলেন।

১৯৫২ সালে প্রকাশ পেল হেমিংওয়ের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পুস্তক "The Old Man and the Sea". একদা কর্মঠ ও কুশলী মৎস্য-শিকারী এক বৃদ্ধ মৎস্যজীবীর মৎস্য শিকারে ব্যর্থতা ও তার লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ধৈর্য্যে দূর সমুদ্র বক্ষ: থেকে এক প্রকাণ্ড মৎস্য শিকার, বিরাট মৃত মৎস্যটি নিয়ে আসবার সময় হাঙরের ঝাঁকের অবিশ্রান্ত আক্রমণ এবং অনিদ্রা-ক্লান্ত, অনাহার-ক্লিষ্ট বৃদ্ধ শিকারীর মহান ক্লেশের পুরস্কার ঐ বিরাট মৎস্য রক্ষার্থে নিশীথ সাগর বক্ষে অমিত-বিক্রমে একক সংগ্রাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার পরাজয়, —বৃদ্ধ শিকারী ফিরে এল শুধু বিরাট মাছের কঙ্কালটি নিয়ে। এই ঘটনাগুলি হেমিংওয়ে তাঁর নিজস্ব অনবদ্য

লিখন-ভঙ্গির মধ্য দিয়ে আশ্চর্য্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন এই পুস্তকটিতে। শুধু তাই নয়, এই বইটিতেই হেমিংওয়ের কাব্য-দর্শনের সারমর্ম নিহিত আছে। বৃদ্ধ মৎস্যজীবীর মুখ দিয়ে তিনি বলেছেন—"Man is not made for defeat". "A man can be destroyed, but not defeated." মানুষকে ধ্বংস করা যেতে পারে কিন্তু তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে, তার সত্তাকে পরাজিত করা যায় না, মানুষ অপরাজেয়। এই হচ্ছে হেমিংওয়ের জীবন-দর্শন। ১৯৫৩ সালে "The Old Man and the Sea" পুলিৎজার পুরস্কার (Pulitzer Prize) লাভ করল এবং পর বৎসরই নোবেল পুরস্কারে এই বইটিকে সম্মানিত করা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব কয়টি আধুনিক ভাষাতেই এই বইটির অনুবাদ করা হয়েছে।

১৯৫৯ সালে হেমিংওয়ে আবার তাঁর প্রিয় দেশ স্পেনে যান এবং সেখানকার দু'জন নামকরা ষণ্ড-যোদ্ধার (bull-fighters) পরস্পরের বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতার ব্যাপার নিয়ে একটি বই লিখতে আরম্ভ করেন। বইটির নাম "The Danger of Summer". বইটির কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে এবং তার থেকে দেখা যায় হেমিংওয়ে তাঁর নিজস্ব ধারায় সেই মৃত্যু, বীভৎসতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পরাজিত মানুষের অদম্য আত্মার তেজ, বীর্য্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বইটি যদি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে থাকে তাহলে বোধহয় শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে হেমিংওয়ের শেষকীর্ত্তিরূপে বিশ্ব-সাহিত্যে বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করবে।

হেমিংওয়ে ছিলেন ভবঘুরে প্রকৃতির—ঘুরে বেড়িয়েছেন বহুদেশে। ফ্রান্সকে তাঁর ভাল লেগেছে, স্পেনকে তিনি ভালবেসেছেন, আর কিউবাতে তিনি ঘর বেঁধেছেন। ডিমোক্রেসিকেই তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, আর ছিলেন সম্পূর্ণরূপে আমেরিকান্। একজন সমালোচক লিখেছেন—"Living this life with its twisting turns and sudden reverses and apparently so remote from our own manners and shores Hemingway must be seen as a typical figure the underlying causes of his art are I believe, particularly American." মার্কিন জনসাধারণের আবেগ ও মনোভাবের ওপর হেমিংওয়ের লেখার প্রভাব পড়েছে অপরিসীম। বিখ্যাত ইতালীয় ঔপন্যাসিক Alberto Moravia হেমিংওয়েকে অভিহিত করেছেন, "The best American writer" বলে।

হেমিংওয়ের লেখার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর অদ্ভুত ট্র্যাজিক্ দৃষ্টিভঙ্গী। মৃত্যু, যুদ্ধ, অধঃপতন, দুঃসহ যন্ত্রণা, নিষ্ঠুর পরাজয়, প্রভৃতি ভয়াবহ দুর্বিপাকের আলোড়নের মধ্য দিয়ে তাঁর ট্র্যাজিডি অদ্ভুত নৈপুণ্যে ফুটে উঠেছে। Maxwell Geismar হেমিংওয়ের লেখার সম্বন্ধে বলেছেন—"A variety of short stories, 'The Revolutionist', 'In Another Country', 'A Simple Enquiry', 'Now I Lay Me', 'A Way You Will Never Be'—affirm the various phases of Hemingway's thesis : the sufferings of war, the resistenses and defenses of his people, their ways of ignoring the scene around them which apparently they cannot control, in fact, has brought us so many vivid studies of the war's impact on the defenceless human temperament ; the almost unbearable episode which closes 'A Natural History of the Dead' —is typical of these."

লেখকদের সম্বন্ধে হেমিংওয়ে বলে গেছেন—"For a true writer each book should be a new beginning," এবং তিনি নিজের লেখার মধ্য দিয়েও এই কথাই প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর লেখা যেমন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ, তিনিও তেমনি ছিলেন বিচিত্র চরিত্রের। দুঃসাহসিকতার তিনি ছিলেন পূজারী,য়্যাড্‌ভেঞ্চার ছিল তাঁর প্রিয় নেশা। ইতালী, স্পেন্ ও ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে, স্পেনের ষণ্ড-যুদ্ধঅঙ্গনে, অরণ্য-ভয়ঙ্কর আফ্রিকার দুর্গম প্রদেশে, কিউবার উত্তুঙ্গ সমুদ্রবক্ষায় [illegible] য়্যাডভেঞ্চারের নেশায় বিচরণ করেছেন, তাঁর অনবদ্য [illegible] সৃষ্টির উপকরণ সঞ্চয় করেছেন, মানব মনের বিচিত্রগতিকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন, নিজের জীবনকেও সর্ব্বদিকে সম্প্রসারণ করে উপভোগ করেছেন। আর, তাঁর জীবন-দর্শন, তাঁর কষ্টলব্ধ অভিজ্ঞতা—তাঁর সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর

অনবদ্য উপন্যাসাবলীর ছত্রে ছত্রে, তুলে ধরেছেন বিশ্ব-পাঠকের বিমুগ্ধ চক্ষের সম্মুখে। পৃথিবীর আর কোনও লেখক ঠিক এভাবে নিজের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাকে পাঠক চক্ষে তুলে ধরেছেন বলে জানা যায় না—এইখানেই তিনি অনন্য, এইখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য, এইখানেই তাঁর সার্থকতা।

মৃত্যুকে তিনি তাঁর ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনে সম্মুখে দেখেছেন অনেকবার, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে জিতেছেনও প্রতিবার। ইতালীর রণক্ষেত্রে, স্পেনের খণ্ড-যুদ্ধে, ফ্রান্সের সমরাঙ্গনে, আফ্রিকার গহন অরণ্যে, উপর্য্যুপরি বিমান দুর্ঘটনায়—মৃত্যুর দূত এসে দাঁড়িয়েছে সামনে কিন্তু নিতে পারেনি তাঁকে, অপরাজিত হেমিংওয়ে সদর্পে ফিরে এসেছেন জীবনের মাঝে। তাঁর জীবনালেখ্যের দিকে চেয়ে বিশ্ব-কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে—

"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহান,
তাই তব জীবনের রথ—
পশ্চাতে ফেলিয়া যায়
কীর্ত্তিরে তোমার
বারংবার।"

মানুষ অমর নয় তাই মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করেছে, ছিনিয়ে নিয়ে গেছে জীবনের মাঝ থেকে, কিন্তু সে মৃত্যুও হেমিংওয়ে নিজ হাতেই এনেছেন—মৃত্যুকে যেন দান করে গেছেন তাঁর এই নশ্বর দেহ! অপরাজেয় কথা-শিল্পীর দৈহিক মৃত্যু ঘটছে—কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর সাধনা, তাঁর সাহিত্য, তাঁর সৃষ্টি একই সূত্রে গাঁথা তাঁর জীবনের সঙ্গে। সে জীবন চলে গেলেও তাঁর সাধনা বিফল হবার নয়, তাঁর সৃষ্টি বিনষ্ট হবার নয়, তাঁর সাহিত্য মুছে যাবার নয়। এইখানেই হেমিংওয়ের জয়—এইখানেই তিনি দিয়েছেন মৃত্যুকেও টেক্কা। 'A Farewell to Arms'-এর লেখক arms হাতে নিয়েই বিশ্বকে বিদায় জানিয়ে গেছেন। জীবনে, মরণে, সৃষ্টিতে, সাধনায় তিনি নিজ ধর্ম্মই আচরণ করে গেলেন, হয়ে রইলেন স্বধর্ম্মাশ্রয়ী। তাঁর জীবনই যেন তাঁর বাণী হয়ে বিরাজ করছে, আর চিরকালই করবে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে। মানুষকে ধ্বংস করা যায়, তার নশ্বর দেহকে বিনষ্ট করা যায়, দুঃখ-যন্ত্রণায় তাকে নিষ্পেষিত করা যায়, বারে বারে প্রতিকূল অবস্থার চাপে সে নুয়ে পড়ে, কিন্তু তার চিরন্তন সত্তাকে, তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে পরাস্ত করা যায় না, মানুষ অপরাজেয়—হেমিংওয়ের এই জীবন-দর্শনই সত্য হয়ে উঠেছে তাঁর নিজের জীবনেও,—তাই হেমিংওয়ে আজও অপরাজিত!

আচার্য প্রফুল্ল বন্দনা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বাগচী

জ্ঞানেরি সাধনে তোমারি জীবনে এনেছো আলোক জানি
এনেছো যে দান সে তব মহান এনেছে করম বাণী।
ছিলে যে তাপস আপন হারা
তোমারি জ্ঞানের আলোক ধারা
জগতের চিতে জাগাল সাড়া
তোমারি জ্ঞানের বাণী।

বঙ্গের তুমি বিশ্বের তুমি তোমারি সাধনাখানি
সাধকজনের অভয় মনের ত্যাগের প্রেরণা জানি।
আজিও যাতনা দহন হানে,
তোমারি করুণা চাহি যে প্রাণে,
তুমি তা' দিয়েছো তোমারি দানে—
সে তব অভয় বাণী।

বিবিধযোগের আলোচনা

উপাধ্যায়

অন্ততঃ দুইটী গ্রহ ভিন্ন এক একটি যোগ গঠিত হয় না। যোগকারক ভাবাধিপতি শুভ কি অশুভ তা প্রথমে বিচার্য্য। ভাবাধিপতি শুভগ্রহ হোলে একভাগ শক্তিলাভ করে, পাপগ্রহ হোলে একভাগ শক্তি হ্রাস হয়। যোগকারক গ্রহ দ্বয়ের সহাবস্থান বা দৃষ্টি সম্বন্ধ হয়েছে কিনা তা, তৎপরে নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। যোগকারক ভাবাধিপতি নিজে শুভ-গ্রহ হোলে আর শুভ ভাবাধিপতির সঙ্গে সহাবস্থান বা দৃষ্টি সম্বন্ধ করলে আর যোগকারক গ্রহ উচ্চস্থ বা মিত্র ক্ষেত্রে যোগ শক্তি সুদৃঢ় হোলে পূর্ণ উত্তম ফলদাতা হয়, অন্যথায় ফলের অপূর্ণতা প্রকাশ পায়। যোগ কারক গ্রহরা নিজেদের দশা ও অন্তর্দ্দশায় ফলদান করে।

কেন্দ্রপতি আর ত্রিকোণ পতির পরস্পর সম্বন্ধে রাজযোগ হয় কিন্তু তাদের কারও সঙ্গে তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম বা একাদশ পতির সম্বন্ধ হোলে রাজযোগ হবে না। সম্বন্ধ চারি প্রকার। প্রথম ক্ষেত্র বিনিময় সম্বন্ধ। যেমন রবির ক্ষেত্র সিংহ রাশিতে মঙ্গল, আর মঙ্গলের ক্ষেত্র মেষ বা বৃশ্চিকে রবি আছে। এতে রবি ও মঙ্গলের পরস্পর ক্ষেত্র বিনিময় সম্বন্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় পরস্পর দৃষ্টি সম্বন্ধ। যেমন মেষ বা তুলার একরাশিতে রবি, আর অপর রাশিতে মঙ্গল থাকলে এদের মধ্যে পরস্পর দৃষ্টি সম্বন্ধ হয়েছে বলে বুঝতে হবে। দৃষ্টি ক্ষেত্রে পূর্ণ দৃষ্টিই গ্রাহ্য। তৃতীয় অন্যতর দৃষ্টি সম্বন্ধ। এক গ্রহ অপরের ক্ষেত্রস্থ কিন্তু অপর গ্রহ, সেই গ্রহের ক্ষেত্রস্থ না হয়ে তার ওপর পূর্ণ দৃষ্টি দিলে এরূপ সম্বন্ধকে অন্যতর দৃষ্টি সম্বন্ধ বলে। সূর্যের ক্ষেত্র সিংহে মঙ্গল থেকে যদি মীন রাশিস্থ সূর্য্যকে পূর্ণ দৃষ্টি করে, তাহোলে বুঝতে হবে রবি ও মঙ্গলের অন্যতর দৃষ্টি সম্বন্ধ ঘটেছে। চতুর্থ সহাবস্থান সম্বন্ধ। যে কোন দুটি গ্রহ একত্র থাকলে এই যোগাযোগকে তাদের সহাবস্থান বলা হয়। যেমন রবি ও মঙ্গল উভয়ে মেষ রাশিতে আছে, সুতরাং এক্ষেত্রে এই দুটি গ্রহ সহাবস্থান রূপ সম্বন্ধ করেছে।

এই চারি প্রকার সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। দ্বিতীয় সম্বন্ধ প্রথমাপেক্ষা দুর্ব্বল। তৃতীয় সম্বন্ধ প্রথম ও দ্বিতীয়াপেক্ষা দুর্ব্বল। চতুর্থ সম্বন্ধ প্রথম ও দ্বিতীয়াপেক্ষা দুর্ব্বল। চতুর্থ সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। পঞ্চম ও নবম এই দুইটি লক্ষ্মীস্থান, আর চতুর্থ ও দশম সুখস্থান। এদের যোগে ভাগ্যযোগ হয়ে থাকে। চতুর্থ ও দশম স্থান দ্বারাই রাজযোগের প্রাবল্য ঘটে। যে রাশিতে চন্দ্র অবস্থিত সেই রাশির অধিপতি মারক। তা ছাড়া ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানের অধিপতি, রাহু, কেতু, দ্বিতীয়াধিপতি—আর লগ্ন থেকে দ্বাবিংশদ্রেক্কাণ পতি (অষ্টমস্থানের প্রধান দ্রেক্কাণ) বধ, বিপৎ, প্রত্যরি তারায় অন্তর্ভুক্ত নক্ষত্রে যে যে গ্রহের দশা হয় তারা, একাদশ ও দ্বাদশপতি মারক মধ্যে গণ্য এরা দশা কালে ফলদান করে। নবম ও দশম পতির যোগ বিশেষ বলবান।

নবম ও দশম স্থানের অধিপতি (স্বয়ংদোষযুক্ত হয়েও) পরস্পরের ক্ষেত্র বিনিময় করে বা উভয়ে একত্র ধর্ম্মস্থান বা কর্ম্মস্থানে অবস্থান করে অথবা উভয়ের মধ্যে একটিও নিজভাবে অর্থাৎ নবম পতি নবমে কিম্বা দশম পতি দশমে অবস্থান করে তাহোলে ঐগ্রহদ্বয় রাজযোগকারক হবে।

ভাগ্যপতি শুক্র পাপযুক্ত হয়ে ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকলে ও ভাগ্য বৃদ্ধি হয়। নিশার্দ্ধ ও দিনার্দ্ধের পর আড়াই দণ্ডকাল শুভকর। এই সময়ে জাতকব্যক্তি রাজা, রাজতুল্য বা ধনবান হবে। মেষলগ্নে চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি থাকলে জাতক রাজ-রাজেশ্বর হয়। একটি কেন্দ্র-পতির সঙ্গে একটি ত্রিকোণপতির সম্বন্ধ হোলেই রাজযোগ। যদি এদের সঙ্গে অপর কোণপতিরও সম্বন্ধ হয় তা সর্ব্বোত্তম রাজযোগ হবে। একটি গ্রহ কেন্দ্র ও কোণপতি হোলে সেই গ্রহ রাজযোগ-কারক হবে। যদি এর সঙ্গে অন্য কোণত্রিকোণপতি গ্রহের সম্বন্ধ হয় তাহোলে সর্ব্বোত্তম রাজযোগ হবে। বৃষলগ্নে শনি নবম ও দশম পতি হওয়াতে রাজযোগকারক। এর সঙ্গে পঞ্চমপতি বুধের সম্বন্ধ হোলে শ্রেষ্ঠ রাজযোগ হবে। কর্কট লগ্নে পঞ্চম ও দশম পতি মঙ্গল, রাজযোগকারক। এর সঙ্গে নবমপতি বৃহস্পতির সম্বন্ধ হোলে প্রবল রাজযোগ। প্রবল রাজযোগ হেতু বৃহস্পতির ষষ্ঠপতিত্ব হেতু দোষ রাজযোগ

হানিকর হবে না। সিংহ লগ্নে চতুর্থ ও নবম স্থানপতি মঙ্গল রাজযোগ কারক। এই মঙ্গলের সঙ্গে পঞ্চমাধিপতি বৃহস্পতির সম্বন্ধ হোলে প্রবল রাজযোগ হবে, এজন্যে বৃহস্পতির অষ্টমাধিপত্য দোষ যোগনাশক হবেনা। তুলা লগ্নে শনি চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানের অধিপতি হেতু রাজ যোগ কারক। এর সঙ্গে নবম পতি বুধের যোগ শ্রেষ্ঠ রাজযোগকারক। মকর লগ্নে শুক্র পঞ্চম ও দশম স্থানাধিপতি হেতু রাজযোগকারক। এর সঙ্গে নবমপতি বুধের সম্বন্ধ হোলে প্রবল রাজযোগ হবে। এই প্রবল রাজযোগের জন্য রাজযোগকারক-এর সঙ্গে পঞ্চমপতি বুধের সম্বন্ধ হোলে শ্রেষ্ঠ রাজযোগ হবে। এতে বুধের অষ্টমপতিত্ব দোষ বাধা দায়ক হবে না।

রাহুকেতু যখন যে গৃহে থাকে সেই গৃহই তখন তাদের গৃহ। কেন্দ্র ও কোণপতির সম্বন্ধে রাজ যোগ হয়। রাহু বা কেতু কেন্দ্রে থাকলে তারা কেন্দ্রপতি, তখন তারা কোণ পতির সঙ্গে সম্বন্ধ করলে রাজযোগ কারক হবে। নবমপতি অষ্টমপতি হোলে (যেমন হয় মিথুন লগ্নে) কিম্বা অষ্টমপতির সঙ্গে সম্বন্ধ করলে বা দশমপতি একাদশ পতি হোলে (যেমন মেষ লগ্নে শনি) কিম্বা একাদশ পতির সঙ্গে সম্বন্ধ করলে রাজ-যোগ কারক হয়না। যে রাশির নবাংশে চন্দ্র অবস্থিত সেই রাশিপতি কোন মারক গ্রহের সঙ্গে যুক্ত বা মারক স্থানে অবস্থিত হোলে জাতক ধনহীন হয়। লগ্নাধিপতি যে নবাংশে অবস্থিত সেই নবাংশপতি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থেকে মারক গ্রহ কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হোলে জাতক নির্ধন হবে। ধনস্থানে চন্দ্র ও মঙ্গল একত্র থাকলে ধন নাশ হয়। ধন স্থানে রবি শনির দ্বারা দৃষ্ট হোলে জাতক ধন হীন হয়। কিন্তু শনি দ্বারা দৃষ্ট না হোলে মহাধনী ও বিখ্যাত হয়। ধনস্থানে শনি বুধের দ্বারা দৃষ্ট হোলে জাতক বহুবিত্তবান হয়। ধনস্থানে বুধ চন্দ্রের দ্বারা দৃষ্ট হোলে জাতকের সর্ব্বস্ব নাশ হয়। ধনপতি পাপযুক্ত ও অস্তগত হোয়ে ধনস্থানে শুভ গ্রহ থাকলেও জাতক ধনহীন হয়।

চতুর্থস্থানে পাপগ্রহ চতুর্থাধিপতির সঙ্গে সহাবস্থান করলে অথবা পাপ দৃষ্ট হোলে কপট যোগ হয়। চতুর্থস্থানে শনি, মঙ্গল, রাহু আর দশমাধিপতি অবস্থিত হয়ে পাপগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হোলে এই যোগ হয়। এই যোগে মানুষ ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হয়। সপ্তমাধিপতি এবং শুক্র চতুর্থস্থানে একত্র থাক্‌লে আর পাপ গ্রহ সংযুক্ত বা দৃষ্ট হোলে বা ক্রুর ষষ্ঠাংশে থাক্‌লে সহোদরা সঙ্গম যোগ হয়। এই যোগে জাতক ভগ্নীর সহিত সহবাস করে পাপসঞ্চয় করবে। চতুর্থাধিপতি দ্বাদশে থেকে পাপদৃষ্ট হোলে গৃহ নাশ যোগ। চতুর্থাধিপতি কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে শুভগ্রহের সঙ্গে থাক্‌লে উত্তম গৃহ যোগ। চতুর্থ ও দশমাধিপতি শনি ও মঙ্গলের সঙ্গে একত্র থাক্‌লে বিচিত্র সৌধপ্রাকার যোগ হয়। লগ্নাধিপতি বুধ পাপগ্রহ সংযুক্ত বা পাপ দৃষ্ট হোলে মাতৃশত্রুত্ব যোগ হয়। এরূপ যোগ একমাত্র মিথুন লগ্নজাত ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য। এই যোগে জাতক মাতাকে ঘৃণা করবে ও মায়ের সঙ্গে শত্রুতা করবে। বৃহস্পতি, লগ্ন, সপ্তম এবং পঞ্চমাধিপতি দুর্ব্বল হোলে অনপত্যযোগ। শনি ব্যতীত অন্য কোন গ্রহের নবাংশে অথবা পঞ্চমে রাহু থাক্‌লে বহু পুত্রযোগ। পঞ্চমাধিপতি দুঃস্থান গত হোলে অপুত্রযোগ হয়। পঞ্চমাধিপতি শুভ হয়ে শুভ রাশিতে কিম্বা শুভগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট বা শুভগ্রহের সঙ্গে একত্র থাক্‌লে বুদ্ধি চাতুর্য্য যোগ হয়। এ যোগে জাতক অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন চরিত্রবান আদর্শ ব্যক্তি হয়। দ্বিতীয়াধিপতি, সপ্তমাধিপতি এবং দশমাধিপতি দশমস্থানে সহাবস্থান করলে জারজযোগ হয়। এ যোগে জাতক অত্যন্ত লম্পট হয় এবং বহুরমণী সম্ভোগ করে। মঙ্গল বা শুক্র সপ্তমাধিপতি হয়ে দশমে এরূপ যোগকারক হোলে ফলটী পূর্ণ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। দশম স্থানে রবি ও শনি অশুভ নবাংশে থাক্‌লে অথবা পাপ গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হোলে অপকীর্ত্তি যোগ হয়। চন্দ্রের সঙ্গে রাহু লগ্নে থাক্‌লে আর অশুভ গ্রহ ত্রিকোণে থাক্‌লে পিশাচগ্রস্ত যোগ হয়, এ যোগে জাত ব্যক্তি ভৌতিক উপদ্রবে আক্রান্ত হয় এবং পিশাচের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে জীবনে বহু কষ্টভোগ করে। রবি শুক্র পঞ্চম, সপ্তম বা নবমে থাক্‌লে বিকলাঙ্গপত্নী যোগ হয়। এ যোগে জাতক ব্যক্তির স্ত্রীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈকল্য দোষ ঘটে। অবশ্য রবি ও শুক্র পীড়িত হওয়া চাই, অন্যথা কেবল অবস্থান হেতু এ ফল ফল্‌বে না।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফল

মেষ রাশি

কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম। ভরণী জাতগণের পক্ষে মধ্যম। অশ্বিনীজাতগণের পক্ষে অধম। মাসটী মিশ্রফলদাতা। প্রথমার্দ্ধটী অপেক্ষাকৃত ভালো, শেষার্দ্ধটী নানাপ্রকারে কষ্টদায়ক। বন্ধুস্বজন বর্গের সহিত মনোমালিন্য ও কলহ, কর্ম্মে বিঘ্ন আস্থা, দুঃখবোধ, অশান্তি, আশঙ্কা, ক্ষতি, নানাদিকেই অসুবিধা ও বিপত্তি, মর্য্যাদাহানি, অপ্রীতিকর পরিবর্তন প্রভৃতি অশুভ ঘটনা দ্বিতীয়ার্দ্ধে দেখা যায়। অপরপক্ষে কোন কর্ম্ম হস্তক্ষেপে কিছুটা সাফল্য, সৌভাগ্যোদয়, সুখ স্বচ্ছন্দতা, শুভ ঘটনা ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাসব্যসন, শত্রুজয় প্রভৃতি। কিছুটা স্বাস্থ্যহানি। উল্লেখযোগ্য পীড়া না হোলেও শারীরিক দুর্ব্বলতা, জীবনী শক্তির হ্রাস ও তজ্জনিত উদ্বিগ্নতার সম্ভাবনা। স্বজন বা বন্ধু বিয়োগের দুঃসংবাদ প্রাপ্তিযোগ আছে। পরিবারবর্গের সহিত কলহ এবং তজ্জনিত বারম্বার মানসিক আঘাত দুঃসহ হয়ে উঠবে। প্রথমার্দ্ধে উত্তম বন্ধুলাভ, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা, সুখ ও শত্রুজয়। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক উন্নতি, শেষার্দ্ধে অর্থক্ষতি ও ব্যয়জনিত কষ্টভোগ। কোন সময়েই অর্থ আসার পথ বন্ধ হবে না। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। সম্পত্তি-সংক্রান্ত গোলযোগ, মামলা মোকর্দ্দমা ও শত্রুতার জন্য দুশ্চিন্তা। নব-প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা পরিত্যাজ্য, মোটেই সুবিধা হবে না। ভূসম্পত্তি বা বাড়ী ক্রয়, বিক্রয় ও বিনিময় ক্ষতিকারক হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধটী

মোটের উপর ভালো, ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে আলোক সম্পাত করবে। উপরওয়ালার সুনজরে আমার সম্ভাবনা আছে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটী সুবিধা জনক নয়। যে পরিমাণে উৎসাহ ও সময় ব্যয়িত হবে, সে পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন হবে না। রেসখেলায় জয়লাভের আশা আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটি মন্দ নহে। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। সৌভাগ্যজনক পরিস্থিতি। অপরের সদিচ্ছা ও অনুগ্রহলাভ। অবৈধ প্রণয়ে অসাধারণ সাফল্য—প্রণয়ীর কাছ থেকে অর্থ, উপহার ও ভালোবাসা বিশেষ ভাবে পাবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার সুখসুবিধা থাকলেও বিলাসব্যসন, অবৈধ প্রণয় সম্ভোগের জন্য পরপুরুষের আকর্ষণের উদ্দেশ্যে বসন-ভূষণের জন্য ব্যয়বাহুল্য, তা ছাড়া, বন্ধুবান্ধবের জন্য এবং সামাজিকতা রক্ষার জন্য অর্থের অপচয় হবে। এবিষয়ে সতর্ক নাহোলে অভাব-অনাটনের সম্মুখীন হয়ে কষ্টপেতে হবে। অবৈধ-প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘরের বাইরে গেলেই ভালো হয়। তা'তে সাফল্য ও তৃপ্তি অবশ্যম্ভাবী ;

বৃষ রাশি

কৃত্তিকা ও মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম। রোহিনীর পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। অশুভ ঘটনাগুলির প্রাধান্য প্রথমার্দ্ধে, দ্বিতীয়ার্দ্ধটী অনেকটা ভালো বলা যায়। শত্রুনিগ্রহ, কষ্টকর ভ্রমণ, প্রচেষ্টায় অসাফল্য, ক্ষতি, অপমান ও উদ্বিগ্নতা, কুসংসর্গের প্রভাবে বুদ্ধিভ্রংশ অবস্থা, শারীরিক কষ্ট প্রভৃতি সূচিত হয়। শেষার্দ্ধে স্বাস্থ্যোন্নতি, সুখস্বচ্ছন্দতা ও কর্ম্মে সাফল্য, উত্তম বন্ধুত্ব লাভ, লাভজনক প্রচেষ্টা, আয়বৃদ্ধি, বিলাসব্যসন, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্যলাভ, শুভঘটনা। উদরাময়, আমাশয়, রক্তস্রাব, হজমের গোলমাল প্রভৃতি ঘটতে পারে। যে কোন প্রকার পুরাতন জ্বরে আক্রান্তরোগীর পক্ষে চিন্তার কারণ আছে। পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মত দ্বৈধ হেতু অশান্তি, পরিবারের বর্হিভূক্ত স্বজনগণের সহিত কলহ বিবাদ হেতু মনোকষ্ট ভোগ। এমাসে গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যোগ আছে। আর্থিক অভাব অনটন বা দুর্গতি বিশেষ ভাবে হবে না, আর্থিক উন্নতি ও খুব আশা করা যায় না। দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রচেষ্টার আনুকুল্যে কিছু লাভ ও সাফল্য সম্ভব। আয়ের পথগুলি নিঃসন্দেহে বিস্তৃত হবে, মাসের শেষে হবে উল্লেখযোগ্য। স্পেকুলেশন ও রেস খেলায় অর্থাগম। জমিজমাসংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু দুর্ভোগ আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মোটেই সন্তোষজনক নয়। বিষয় সম্পত্তি কেনা বেচা বা বিনিময় বর্জ্জনীয়। স্বজনগণের সঙ্গে টাকাকড়ি লেনদেন ব্যাপারে সতর্কতা অবশ্যক। চাকুরিজীবীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধটী কিছুটা ভালো কিন্তু শেষের দিকে পদোন্নতি বা মর্য্যাদা লাভ, উপরওয়ালার অনুগ্রহে উন্নতির বহু সুযোগ ঘটবে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়। স্ত্রী লোকের পক্ষে মাসটী মোট.-মুটি মন্দ যাবে না। তরুণ তরুনীদের মধ্যে মেলামেশা সম্পর্কে সতর্কতা আবশ্যক। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তির সম্ভাবনা আছে। এমাসে স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের সঙ্গে অবাধ ও অবৈধ ভাবে মেলামেশার বহু প্রকার সুযোগ ও প্রলোভন আসবে। সংযত পদ্ধতি অবলম্বন না করলে নৈতিক শৃঙ্খলা ব্যাহত হোতে পারে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সর্ব্ব ব্যাপারেই বিশেষভাবে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থী পক্ষে উত্তম সময়।

মিথুন রাশি

মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম, আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে কিছুটা অশুভ যোগ আছে। মাসটী কষ্টপ্রদ। কর্ম্মে বাধা বিপত্তি, কষ্টকর ভ্রমণ, শারীরিক অসুস্থতা। প্রতিদ্বন্দ্ব ও শত্রু বৃদ্ধি যোগ। স্বজন বিয়োগ, ক্ষতি, সুযোগ বাদীদের অপপ্রচেষ্টা, অসম্মান, মামলা মোকর্দ্দমা, নীচ সংসর্গ, নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট ও অশান্তি। এতদসত্ত্বেও কিছু ভালো আশাকরা যায়, মধ্যে মধ্যে প্রচেষ্টায় সাফল্য সুখ ও আনন্দ লাভ। শারীরিক অবস্থার অবনতি। হৃদয়ও বক্ষস্থলে যাদের অসুখ অথবা যাদের রক্তেরচাপ বৃদ্ধি রোগ, তারা সতর্ক না হোলে বিশেষ কষ্টভোগ করবে। উদরের গোল মাল। পারিবারিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রীতিপ্রদ পরিবেশ সৃষ্টি না থোলে ও মনোমালিন্য বা কলহ বিবাদ সত্ত্বেও মাসটী কোন ঘটনার সম্মুখীন হবে। কোষ্টির ফলাফল বিচারে যাদের এসময়ে দশান্তর্দ্দশা খারাপ যাচ্ছে, তারাই বিচ্ছেদের জন্য কষ্ট অনুভব করবে। আর্থিক বিস্তৃতি, নব প্রচেষ্টায় সফলতা, যৌথ কারবারে মিত্রতা এবং চালু ব্যবসায়ে লাভ যেমন একদিকে দেখা যায়, অপর দিকে তেমনই অপ্রত্যাশিত বাধা, মূল ধনের অভাব হেতু ব্যবসায়ের কাজে অসুবিধা অথবা অংশীদারের বিপক্ষতা ও দুর্ব্যবহার। কাজ চললেও লাভ হবে অল্প। নানা ব্যাপারে ব্যয়াধিক্য, বিলাস ব্যসন ও আমোদ প্রমোদের জন্য ব্যয় বাহুল্য ইত্যাদি যোগ থাকায় অর্থ সঞ্চয়ের পক্ষে বাধা। স্পেকুলেশনে বা রেসখেলায় লাভের আশা নেই। বাড়ীওয়ালা,ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়, নানা প্রকার গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার জন্য কষ্ট ভোগ। অতএব কোন প্রকার পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি আদৌ ভাল নয়, বহু দুঃখ কষ্ট ও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হোতে হবে। ব্যবসায়ী এবং বৃত্তি জীবীর পক্ষেও অনুরূপ অবস্থা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। পরিবেশ ও আবেষ্টনী অনুকূল না হওয়ায় চিত্ত-চাঞ্চল্য। পরিবর্ত্তন, রোমান্স, স্পেকুলেশন, অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ প্রভৃতির জন্য ব্যাকুলতা। অবৈধ প্রণয় সম্ভোগ প্রচেষ্টার কষ্ট ভোগ। কোষ্ঠীতে দশা ও অন্তর্দ্দশা অশুভ হোলে, স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ, প্রণয় ভঙ্গ, বিবাহ বিচ্ছেদ, দুঃখ ও নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হোতে হবে। পুরুষের প্রলোভন ও চক্রান্ত হেতু বিপদেরও কারণ আছে। অতএব পর পুরুষের সংস্রবে আসা, পার্টিতে যোগদান বা অবাধ মেলামেশা বর্জ্জনীয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী অশুভ।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু পুষ্যা ও অশ্লেষা জাত ব্যক্তিগণের ফল একই প্রকার। মাসটী মিশ্রফল দাতা। অশুভ ফলগুলি কিছুটা বেশী প্রত্যক্ষ হবে।

উদ্বেগ, দুঃখ, ক্ষতি, বন্ধুর সহিত কলহ, নব প্রচেষ্টায় বাধা, কষ্টকর ভ্রমণ, স্বাস্থ্যের অবনতি, অপমান, শত্রুর উৎপীড়ন, অকারণ মনোমালিন্য বা ভুল বোঝার দরুণ অশান্তির উৎপত্তি, অপ্রিয় পরিবর্ত্তন প্রভৃতি অশুভ ব্যাপার ঘট্‌তে পারে। শুভ ফলও কিছু কিছু পাওয়া যাবে যেমন বন্ধুলাভ, বিলাস ব্যসন ভোগ, লাভ, ভাগ্যোন্নতি, আমোদ-প্রমোদ, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন আর গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। শেষার্দ্ধে শারীরিক অবনতি। উদরের গোলযোগ, বায়ু পিত্ত প্রকোপ, হাঁপানির প্রবণতা, রক্তের চাপবৃদ্ধি আর বুকের বেদনা। পারিবারিক অশান্তি ও কলহ বিবাদ। আর্থিক উন্নতি যোগ নেই। অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হবে না। ব্যয়াধিক্য। স্পেকুলেশন অনুকূল বলে প্রতীয়মান হোলেও কার্য্যতঃ তা প্রকাশ পাবে না। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না। ভূসম্পত্তি, গৃহাদি নির্ম্মাণ বা সংস্কার কল্পে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। কেননা প্রতারণার সম্ভব। চাকুরির ক্ষেত্রে মোটেই সুবিধাজনক নয়। পদোন্নতিতে বাধা। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন অশুভ ঘটনার সমাবেশ হ'বে না, বরং পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য লাভ। অবৈধ প্রণয়ে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা ও উপঢৌকন প্রাপ্তি। বন্ধুদের সাহায্যে আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার যোগ আছে। পর পুরুষের সান্নিধ্যলাভ ব্যঞ্জক ও আনন্দপ্রদ হ'বে। অবিবাহিতাদের বিবাহ যোগ। প্রণয়ের মাধ্যমেও অনেকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হবে। চাকুরিজীবী নারীর পক্ষে উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ। যারা শিল্পকলা ও উচ্চ শিক্ষার দিকে আগ্রহান্বিতা তাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। রেশ খেলায় জয়লাভ।

সিংহ রাশি

উত্তরফল্গুনীজাতগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম, পূর্ব্বফল্গুনীজাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং মঘা জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মাসটী মিশ্র ফল দাতা। প্রথমার্দ্ধটীতে শুভ ফল। লাভ, সাফল্য ও সৌভাগ্য, শ্রীবৃদ্ধি, উত্তম সঙ্গ ও বন্ধুত্বলাভ, বিলাস-ব্যসন, সুখ সম্মান, গৃহে মাঙ্গলিক উৎসব শত্রু জয় প্রভৃতি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কলহ বিবাদ, শত্রুদের নিকট পরাজয়, স্বজন বিরোধ, প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা, ব্যয়বৃদ্ধি, শারীরিক কষ্ট, দুঃখ ও উদ্বেগ। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই যাবে। গুরুতর পীড়াদি ঘট্‌বে না। পিত্ত প্রকোপ উত্তাপ বৃদ্ধি, রক্তদুষ্টি, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক শান্তি অব্যাহত থাকবে। পরিবারের বহির্ভূত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য। আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভালো হবে। অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেও তার সঙ্গে টাকা কড়ির লেনদেন ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। ঘটনাচক্রে এসব বন্ধু কথার ঠিক রাখ্‌তে পারবে না, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হোতে হবে। কোন বন্ধুকে টাকা ধার দেওয়া বর্জ্জনীয়। কারো জন্যে জামিন হওয়া বিপজ্জনক। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে অর্থাগম। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভাশুভ ঘটনাপূর্ণ। চাকুরির ক্ষেত্রেও অনুরূপ দেখা যায়। প্রথমার্দ্ধে অবস্থার উন্নতি, সম্মান ও পদমর্য্যাদা লাভ আশা করা যায়, কিন্তু পদোন্নতির জন্যে উপরওয়ালার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ তদ্বির বা চাটুকারিতা কোনরূপ অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবে না, বরং উপরওয়ালা আশাভরসা দিয়ে কিছুটা ক্ষতি করে দেবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী উত্তম। যে সব বিষয়ে রমণী আগ্রহশীলা, সে সব বিষয়ে তার সুবিধা সুযোগ ঘটবে। অবৈধ প্রণয়ে অনুরক্তা নারীর আশাতীত সাফল্য ও আনন্দ লাভ, নানা প্রকার উপহার ও অর্থলাভ এবং পরপুরুষের প্রণয়াসক্তির আতিশয্যে চিত্তের প্রসন্নতা। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে যশ, প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদালাভ। বস্ত্রালঙ্কার ও আসবাবপত্রাদি লাভ যোগ। শিল্প কলাদি চর্চ্চার দ্বারা যারা অর্থোপার্জ্জন করে তারা নানা ভাবে সাফল্য মণ্ডিত হবে। চাকুরিজীবী নারীর উপরওয়ালার অনুগ্রহ প্রাপ্তি যোগ। ব্যয়াধিক্যের প্রবণতা থাকায় বিশেষ সংযত হওয়া আবশ্যক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী মধ্যম।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী জাত ব্যক্তির পক্ষে অতীব উত্তম। চিত্রার পক্ষে মধ্যম। হস্তানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে অধম ফল। শুভ ফলের আতিশয্য, অশুভ ফল কিছু কিছু এমাসে ঘট্‌বে যেমন উদ্বেগ, চিত্তপীড়া মামলা মোকর্দ্দমা, চুরির জন্য ক্ষতি, শত্রু উৎপীড়ন, কলহ এবং ব্যয়াধিক্য। দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধটী শুভ। উদ্দেশ্য সিদ্ধি, লাভ, বিলাস ব্যসন, উচ্চ পদ মর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সহিত বন্ধুত্ব ও সঙ্গ লাভ, সৌভাগ্য সুখ, নূতন পদ মর্য্যাদা ও সম্মান, নবপরিকল্পনা বা প্রচেষ্টায় সাফল্য, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বন্ধুসমাগম বৃদ্ধি, নূতন বিষয় বস্তু সম্পর্কে অধ্যয়ন ও অনুশীলনে জ্ঞানবৃদ্ধি। স্বাস্থ্যোন্নতি যোগ আছে। পিত্ত প্রকোপ ও চক্ষু পীড়া। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও শান্তিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান হবে। ঘরে বাইরে আত্মীয় স্বজন অনুচর পরিচর ও বন্ধু বান্ধবের কাছে সমাদর লাভ। বিলাস ব্যসনের উদ্দেশ্যে কিছু ব্যয় করে আনন্দ লাভ—স্বর্ণালঙ্কার, রত্নাদি, রেডিও, রিফ্রিজেটার দামী মোটর প্রভৃতি সখের জিনিষ ক্রয়ের সম্ভাবনা। অর্থ যোগ। টাকাকড়ি লেনদেন ও লগ্নী ব্যাপারে অর্থাগম। বন্ধুদের সাহচর্য্যে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। অপ্রত্যাশিত লাভ ও ব্যয়—দুই ই আছে। মাসটী ভালো যাবে কিন্তু এ আনন্দে বৃহৎ পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করা চল্‌বেনা। রেসে অর্থলাভ। স্পেকুলেশনে ও অর্থবৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিবর্ত্তন ও উন্নতির সুযোগ সুবিধা ঘট্‌বে। চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ শুভ, আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য ও অন্তরের কামনা পূর্ণ হবে। বহু আকাঙ্ক্ষিত পদ লাভ, উর্দ্ধতন পদে অধিষ্ঠান বা অভীপ্সিত উচ্চপদে অধিষ্ঠানের জন্য স্থানান্তরিত হওয়া প্রভৃতি কল্যাণকর পরিবর্ত্তনের যোগ আছে। পদ-নিয়োগ কর্ত্তারা বিশ্বস্ত আজ্ঞাবাহী কর্ম্মী লাভ করবেন, ফলে তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র সুন্দর ভাবে চালু হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিরা উপার্জ্জনের আধিক্য হেতু প্রচুর আনন্দ লাভ করবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে এমাসটী

সর্ব্বপ্রকারে শুভ ও অনুকূল। অবৈধ প্রণয়ের দিকে যাদের ঝোঁক বা প্রচেষ্টা ও রোমান্স ব্যাপারে প্রীতিলাভ করে তাদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। যেসব পুরুষের প্রতি অন্তরের টান আছে সে সব পুরুষ সহজ লভ্য হবে। প্রেমাস্পদ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য প্রচুর আনন্দ ও লাভের কারণ হবে। স্বামীর বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গেও অনেকে গুপ্ত প্রণয়ে আসক্ত হবে। সামাজিক, পারিবারিক প্রণয় ও জনকল্যাণ কর কর্ম্ম ক্ষেত্রে সম্মান প্রতিপত্তি, মর্য্যাদা, অধিকার ও অর্থপ্রাপ্তি যোগ ঘট্‌বে। সাহিত্য শিল্পকলা অভিনয় সঙ্গীত প্রভৃতি চর্চ্চায় আশাতীত সাফল্য। তা ছাড়া পার্টি, ভ্রমণ ও পিকনিকে চিত্তের প্রসন্নতা। উচ্চ শিক্ষার সাফল্যলাভ। উন্নত ধরণের সাহিত্যচর্চ্চাও বক্তৃতাদিতে প্রশংসা অর্জ্জন। কোর্টসিপ ও পূর্ব্বরাগে উদ্দেশ্য সিদ্ধি। অবিবাহিতাদের বিবাহযোগ সৌভাগ্যোদয়, সদিচ্ছালাভ, বহু উপঢৌকন-প্রাপ্তি। অধ্যাত্ম সাধনায় আসক্তা নারীরও ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে অগ্রগমন, ধ্যান ধারণায় মন সংযোগের শক্তি লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ শুভ।

তুলা রাশি

চিত্রানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম। স্বাতী ও বিশাখাজাতগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নয়। মাসটী এই রাশির পক্ষে আদৌ শুভ নয়। নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হবার যোগ আছে। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, ধনক্ষয় ও মর্য্যাদাহানিজনিত গ্লানিকর পরিবেশ। প্রথমদিকটা মোটেই ভালো নয়, শেষের দিকে কিছু ভালো বলা যায়। মিথ্যা অপবাদ, গুপ্ত ষড়যন্ত্র, অর্থনাশ, চুরি, মামলা মোকর্দ্দমা, ভ্রমণকালে দুর্ঘটনা, দাম্পত্যকলহ প্রভৃতি অশুভফলগুলি নানা ঘটনার সমাবেশে প্রত্যক্ষ হবে। শেষের দিকে কিছুটা সাফল্য, লাভ, প্রতিপত্তিশালী বন্ধু, নূতন বিষয় অধ্যয়নে জ্ঞানার্জ্জন, কিছু খ্যাতি আশা করা যায়। স্বাস্থ্য মোটামুট মন্দ নয় কিন্তু পৌন-পুনিক মানসিক আঘাতে শরীর ও মন ভেঙে পড়বে। দুর্ঘটনা বা শরীরে আঘাতপ্রাপ্তির আশঙ্কা আছে। পারিবারিক অশান্তি প্রবল হয়ে উঠবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে না, তবে অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু প্রাপ্তিযোগ পরিলক্ষিত হয় যদিও এ যোগের প্রাবল্য নেই। টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক, লেনদেন একেবারে বর্জ্জনীয় কেন না শত্রুতা, কলহ ও বিপত্তির কারণ ঘটতে পারে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে পরাজয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি আদৌ সুবিধাজনক নয়। মামলা মোকর্দ্দমার যোগ আছে। চাকুরির ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। অধীনস্থ লোকেরা নানাপ্রকারে বিপন্ন করে তুলবে এমন কি গৃহে চাকর চাকরানীর ব্যবহারও হয়ে উঠবে অপ্রীতিকর ও অবাধ্যতামূলক। বন্ধু-বান্ধবদের ষড়যন্ত্র চাকুরির ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা টেনে আনতে পারে, ফলে পদমর্য্যাদা হানি ও অসম্মান বৃদ্ধি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসের শেষার্দ্ধটি অনেকটা ভালো। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি ঘটনা সঙ্কুল। অবৈধ প্রণয়িনীর অপবাদ ও বিপত্তি। যে সব পতিতা মনোবৃত্তি সম্পন্না নারী গৃহাভ্যন্তরে নেপথ্যে অর্থোপার্জ্জন করে, তাদের সতর্কতা আবশ্যক। গৃহস্থবধূদের নির্য্যাতন ভোগ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীর গহনা বন্ধক পড়তে পারে আর্থিক সঙ্কট ও অসুখ-বিসুখের জন্য। পরপুরুষের সঙ্গে এমন কি স্বামী বা পরিবারবর্গের বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক। পার্টি, পিকনিক, ভ্রমণ বা আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে স্বজনবর্গের সঙ্গে যাওয়া বিধেয়। বেশীর ভাগ সময় সংসারের কাজ নিয়ে ঘরে থাকাই যুক্তি-যুক্ত। চাকুরিজীবীদেরও সতর্ক হয়ে চলা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আদৌ ভালো নয়।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠাজাতগণের পক্ষে একই প্রকার ফল। মাসটী মোটামুটিভাবে যাবে। খুব ভালো কিছু আশা করা যায়না। তবে কিছু কিছু সুযোগ ও কর্ম্মসিদ্ধি, লাভ, সুখসমৃদ্ধি, পসার-প্রতিপত্তি, শত্রুজয় সম্ভব হবে, তাছাড়া স্ত্রীলোকের জন্য বা তার সংসর্গে এসে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, অপ্রত্যাশিত অপ্রীতিকর পরিবর্ত্তন, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ, পদমর্য্যাদা হানি, দুষ্ট সংসর্গ, বন্ধুবিচ্ছেদ ও শারীরিক অসুস্থতা এই রাশির ব্যক্তিদের অন্তরে তীব্র আঘাত এনে দেবে! সহজে কোন কাজেই যোগাযোগ হওয়া বা সিদ্ধি লাভ কোন রকমেই হবে না। যেখানেই যোগাযোগ হবে, সেখানেই পরিচিত ব্যক্তির নেপথ্য অপ-কৌশল ও শত্রুতা প্রবল হয়ে উঠবে। সমগ্র পরিবারই স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য কষ্টভোগ করবে, বাড়ীতে অসুখ লেগেই থাক্‌বে, চিকিৎসা সঙ্কট ও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। রক্তের চাপবৃদ্ধিজনিত নিজের যেমন কষ্টভোগ, স্ত্রী-পুত্র পরিবারের ভগ্নস্বাস্থ্যজনিত তেমনই দুশ্চিন্তা। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকবে। বাইরের আত্মীয় স্বজনের উৎপাড়ন ও কলহ। আর্থিক দুর্গতি ঘটবে না, বরং শেষার্দ্ধে আর্থিক অবস্থার উন্নতি। বড় বড় ব্যাপারে হাত দিলে বহু অর্থ বেরিয়ে যাবে, পরে অনুতাপ করতে হবে। টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে কলহ ও শত্রুতার সম্মুখীন হোতে হবে। স্পেকুলেশনে সাংঘাতিক ক্ষতি, রেসেও দারুণ পরাজয়। কৃষিজীবির পক্ষে এমাসে চাষবাস সংক্রান্ত ব্যাপারে নূতন কোন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা সমীচিন হবে না, যন্ত্রপাতির জন্য অর্থনিয়োগও সুবিধাজনক বলা যায় না। বাড়ী-ওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায়না, চাকুরির ক্ষেত্রেও প্রতিকূল আবহাওয়া। উপরওয়ালার কড়া নজরও বিরাগভাজন হওয়ার জন্য কাজ করা কষ্টকর হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতের উন্নতির পথরোধ করতেও উপরওয়ালা কুণ্ঠাবোধ করবে না। বর্ত্তমান কর্ম্মস্থান থেকে অন্য বিভাগ বা কর্ম্মস্থানে প্রেরিত হবে, ফলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। বেতার-কর্ম্মীদের ভাগ্যে নিগ্রহভোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অবস্থা একইপ্রকার। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভাশুভ

মিশ্রিত। জনসাধারণের কার্য্যে শিল্পী বা সমাজসেবায় রতা নারীই কেবল-মাত্র সাফল্য, খ্যাতি, প্রভাব প্রতিপত্তি মর্য্যাদা লাভ করবে। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য লাভ। দাম্পত্য প্রণয়যোগ আছে। কোর্টসিপে অনুকূল পরিস্থিতি। ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মসাধনায় যে সব নারী আত্মসমাহিতা তাদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। নানাপ্রকার অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা লাভ, কুলকুণ্ডলিনী শক্তির উর্দ্ধগতি হেতু অপূর্ব্ব অব্যক্ত আনন্দানুভূতি, আজ্ঞাচক্র থেকে জ্যোতিস্ফুরণ প্রভৃতি যোগ আছে। ভৈরবী নারীর মধ্যে মহাশক্তির অধিষ্ঠান হেতু অলৌকিকতার অভিব্যক্তি! ভক্তিমার্গের নারীর ইষ্টদর্শন। যে সব পরিবারে এ সব নারী আছে, সে সব পরিবারে বিশেষ কোন অকল্যাণ হবে না। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম, মূলার পক্ষে নিকৃষ্ট। মাসটী মোটের উপর মন্দ যাবেনা। নবপ্রচেষ্টায় সাফল্য সুযোগ, সুখ স্বচ্ছন্দতা, শত্রুজয়, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা যায়। আঘাত প্রাপ্তি, ভ্রমণে কষ্ট, উদ্বেগ, মনোমালিন্য, মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতি গ্রহবৈগুণ্যজনিত অশুভ ফল আশঙ্কা করা যায়। উদর ও গুহ্যপ্রদেশে পীড়া, অজীর্ণ আমাশয়, প্রস্রাবের দোষ বা কষ্ট ইত্যাদি জনিত শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা। স্ত্রীপুত্রপরিবারের সঙ্গে অল্পবিস্তর কলহ ও মনোমালিন্য ঘটবে, ফলে কিছু কিছু পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আর্থিকোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। নানাদিক দিয়ে অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত হবে। এতদ্‌সত্বেও ব্যয়াধিক্য ও সামান্য ক্ষতি, জিনিষপত্রের চুরি হবে। উন্নতির বহু সুযোগ এমাসে দেখা দেবে কিন্তু অধিকাংশ সুযোগ ধরে নেওয়া সম্ভব হবে না। শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আশানুরূপ নয়, বাড়ীভাড়া আদায় সংক্রান্ত ব্যাপারে বিপত্তি, ফলে কলহ বিবাদ। চাকুরির ক্ষেত্র মন্দ নয়। বিশেষ কোন উন্নতি বা সুযোগসুবিধার যোগ নেই! যাদের পদোন্নতি অপেক্ষা করছে তারাই লাভবান হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভপ্রদ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ মাসটী মন্দ যাবে না। গার্হস্থালী ও বিলাস-ব্যসনের দ্রব্যাদি ক্রয়ের দিকে অত্যন্ত আগ্রহ। ফ্রিজিডেয়ার, রেডিও আসবাবপত্র, অলঙ্কার, বস্ত্র প্রভৃতি খরিদ করে আনন্দ লাভ। ধারে জিনিষ কেনা বাঞ্ছনীয় নয়। চাকুরিজীবী নারীর পক্ষে উত্তম সময়। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। অবৈধ প্রণয়িনীর বহু সুযোগ সুবিধা, উপহার ও অর্থপ্রাপ্তি। দাম্পত্য প্রণয়। অবিবাহিতাদের বিবাহ সম্ভাবনা। রেসে অর্থপ্রাপ্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ সময়।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিতগণের উত্তম সময়, ধনিষ্ঠার পক্ষেও অনুরূপ কিন্তু শ্রবণাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। মাসটী মিশ্রফলদাতা। প্রথমার্দ্ধটি শেষার্দ্ধ অপেক্ষা ভালো। উত্তম স্বাস্থ্য শত্রুজয়, মানসিক শান্তি, প্রচেষ্টায় সাফল্য, জনপ্রিয়তা লাভ, খ্যাতি, সুখস্বচ্ছন্দতা, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, কুটুম্বের সমাবেশ, বন্ধুদের সাহায্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি যোগ আছে মাসের প্রথমার্দ্ধে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভ্রমণে ক্লান্তি ও অবসাদ, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা ও উদ্বেগ, ক্ষতি, স্বজনবন্ধুবর্গের সহিত কলহ, সর্ব্ববিষয়ে বাধা ও বিলম্ব। স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ নয়। প্রথমদিকে ছোটখাটো দুর্ঘটনা, যেমন কেটে গিয়ে রক্তপাত প্রভৃতি হোতে পারে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে হজমের ব্যাঘাত, উদরাময়, আমাশয়, প্রস্রাবের কষ্ট, জ্বর প্রভৃতি সূচিত হয়। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হবে না। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা আছে। এতদ্‌সত্বেও ক্ষতি ও ঋণ যোগ। অর্থ এসেও দাঁড়াবে না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় হয়ে যাবে। মাসের প্রথমদিকে স্পেকুলেশন চলতে পারে। কোন বৃহৎ পরিকল্পনায় অর্থনিয়োগ অনুচিত। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মন্দ নয়। কিন্তু বাড়ী বা ভূম্যাদি ক্রয় বা বিনিময় মোটেই অনুকূল নয়। সম্পত্তিনাশ যোগ আছে। চাকুরীজীবীর পক্ষে অতীব শুভ সময়। পদোন্নতি ও জনপ্রিয়তা। উপরওয়ালার আনুকূল্য লাভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্পূর্ণ শুভ। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সম্মান, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদালাভ। কোর্টসিপে সাফল্য। সর্ব্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদ, ভ্রমণ, পিকনিক প্রভৃতিতে আনন্দ লাভ। শিল্পকলা সঙ্গীত সাহিত্য, অভিনয় বিশেষতঃ চলচ্চিত্রে অভিনয়ে অসাধারণ সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন। অবিবাহিতাদের বিবাহযোগ। প্রথমার্দ্ধে বিবাহের সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠা জাত গণের পক্ষে উত্তম, শতভিষা ও পূর্ব্ব ভাদ্র জাত গণের পক্ষে মধ্যম। মাসটী মিশ্রফল দাতা। অশুভ ফলগুলি প্রাধান্য বিস্তার করবে। শেষার্দ্ধটি অনেকটা ভালো বলা যায়। দুঃখ কষ্ট, আত্মীয়, স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য, কুটুম্বাদির সঙ্গে কলহ বিবাদ, ব্যর্থ প্রচেষ্টা, অপমান প্রভৃতি যোগ আছে। শত্রুজয়, মানসিক শান্তি, লাভ ও সুখ, পসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, প্রমোদজনক ভ্রমণ, শুভ সংবাদ প্রাপ্তি, প্রভৃতি শুভ সম্ভাবনা। উদর ও গুহ্য প্রদেশে পীড়া, চক্ষু পীড়া, সন্তানদের ভগ্ন স্বাস্থ্য, ঘরে বাইরে আত্মীয় স্বজনের জন্য কষ্ট ভোগ। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক কষ্ট বৃদ্ধি, এমন কি ঋণ যোগ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থ কৃচ্ছ্রতা থেকে কিছুটা মুক্তি লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষি জীবির পক্ষে শুভ সময়। চাকুরির ক্ষেত্রে মিশ্রফল। নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটবে। হাসপাতাল, রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান সেবা সদন প্রভৃতি স্থানের কর্ম্মীদের পক্ষে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ সময়। প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পারিবারিক কর্ম্ম নিয়ে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ। অবৈধ প্রণয়িনীর ভাগ্যে নিগ্রহ ভোগ। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। পর পুরুষের সংস্পর্শে আশা বিপত্তি জনক। রেসে অর্থক্ষতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি উত্তম নয়।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ উত্তর ভাদ্রপদ ও রেবতী জাতগণের পক্ষে একই প্রকার ফল। মীন রাশির পক্ষে অতীব শুভ সময়। সৌভাগ্য ও সম্মান বৃদ্ধি লাভ নব নব প্রচেষ্টায় বিশেষ সাফল্য, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি ভোগ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, পসার প্রতিপত্তি লাভ। উত্তম বন্ধু, শত্রু জয়, প্রমোদ জনক ভ্রমণ, উত্তম সংবাদ প্রাপ্তি, সম্পত্তি লাভ প্রভৃতি যোগ আছে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মনোমালিন্য, শত্রুদের অপ প্রচেষ্টা প্রভৃতি সূচিত হয়। উত্তম স্বাস্থ্য, বিশেষ কোন পীড়া ভোগ হবে না। শারীরিক দুর্ব্বলতা সময়ে সময়ে সামান্যই অনুভূত হবে। গৃহে সন্তান জন্মলাভের যোগ আছে। বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকবে। আর্থিক অবস্থা বিশেষ উন্নত হবে। আত্মীয়স্বজনের সম্প্রীতি ও সাহায্য প্রাপ্তি। অধস্তন কর্ম্মচারীরা আনুগত্য স্বীকার করবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে অর্থ প্রাপ্তি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষি জীবির পক্ষে উত্তম সময়। গৃহ সম্পত্তি প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ গৃহাদি নির্ম্মাণ বা সংস্কার যোগ আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে বা দানের আনুকূল্যে গৃহ সম্পত্তি লাভ। চাকুরি জীবির পক্ষে অতীব শুভ সময়, পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি, অনুকূল আবহাওয়া, উপর ওয়ালার অনুগ্রহ লাভ প্রভৃতি সূচিত হয়। প্রতিযোগিতা, পরীক্ষা ও সাক্ষাতের ফল উত্তম। বেকার ব্যক্তির পদ প্রাপ্তি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবী আশাতীত অর্থোপার্জ্জন করবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব শুভ সময়। প্রণয় পিপাসু ও অবৈধ প্রণয়াসক্তা নারী নানাভাবে সুযোগ সুবিধা, সুখ স্বচ্ছন্দতা, উত্তম যোগাযোগ ও প্রণয়ীদের অর্থ শোষণে সাফল্য লাভ করবে। উত্তম অলঙ্কার, যান বাহনাদি ভোগ ও উপঢৌকন প্রাপ্তি। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য। দাম্পত্য প্রণয় অটুট থাকবে। পর পুরুষের সান্নিধ্যে প্রফুল্লতা। সর্ব্ব প্রকার প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ। প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। দেশ ভ্রমণের যোগ আছে। কারুশিল্পকলা, সাহিত্য, নৃত্য সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতির দিকে যে সব নারীর নেশা বা পেশা তাদের পক্ষে উত্তম সময়। কোর্ট সিপে সিদ্ধি লাভ। অবিবাহিতার বিবাহ যোগ। এমাসে তরুণীদের রোমান্স ও প্রণয়ের দিকে মনোবৃত্তি বিশেষ ভাবে দেখা যায় এবং এজন্য পরপুরুষের সান্নিধ্য লাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্রতা প্রকাশ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম সময়।

ব্যক্তিগত দ্বাদশলগ্নের ফলাফল

মেষ লগ্ন

পাক যন্ত্রের পীড়া, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, বিলাস ব্যসনাদি উপভোগ, ব্যয় বাহুল্য, অযথা ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি, ভ্রমণ, স্থান পরিবর্ত্তন, স্ত্রীর জন্য দুর্ভাবনা, সন্তান লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

বৃষলগ্ন

আত্মীয়ের জন্য অর্থ নাস ও অপবাদ, সামাজিক ব্যাপারে দুঃখ, কর্ম্মক্ষেত্র অনুকূল। নানা প্রকার ঝঞ্ঝাট, অর্থাগম। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয় ভঙ্গ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

মিথুনলগ্ন

স্বাস্থ্যোন্নতি। মাতার পীড়া ভোগ। কর্ম্মক্ষেত্রে সুযোগের অভাব। বিদেশে লেখা পড়ার ব্যাপারে, বাধা। মানসিক অবনতি। ব্যবসাদির জন্য ভ্রমণ। রোমান্টিক মনোভাব, অর্থ সম্বন্ধে চিন্তা, ব্যয় বাহুল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে পারিবারিক অশান্তি ও আশা ভঙ্গ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নিকৃষ্ট ফল।

কর্কটলগ্ন

পত্নীর দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ। কর্ম্মক্ষেত্র সুপ্রশস্ত। অকস্মাৎ অর্থ প্রাপ্তির যোগ। দাঁতের পীড়া পারি বারিক পরিস্থিতির জন্য বিব্রত হওয়ার যোগ। ভ্রমণের ইচ্ছা। আমোদ প্রমোদের জন্য কর্ত্তব্যে অবহেলা। অনিশ্চিত আয়। প্রবল সৌষ্ঠন আকর্ষণ। বিদেশে সাফল্য ও উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম ফল।

সিংহলগ্ন

ধনোপার্জ্জন যোগ। হঠকারিতা, আকস্মিক ভাবে আঘাত প্রাপ্তি। আহার বিহারে অত্যাচারের জন্য স্বাস্থ্য হানি। যকৃত দোষ, অন্ত্রগত পীড়া বা অস্ত্রোপচার যোগ্য কোন পীড়ার আশঙ্কা। সহোদর হানি বা পীড়া। ব্যবসায়ে লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ ফলের হানি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়।

কন্যা লগ্ন

পুত্রের উন্নতি বা সন্তান নিমিত্ত সুখ ও আনন্দ প্রাপ্তি। যশ ও সম্মানের যোগ। আয়ভাব উত্তম। রক্তসম্বন্ধীয় পীড়া ভোগ। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা। শত্রুবৃদ্ধির যোগ। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহযোগ। সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা। অভাব ও উপবাসে স্বাস্থ্য হানি। কর্ম্মোন্নতি বা উচ্চপদ প্রাপ্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে দাম্পত্য-কলহ, পারিবারিক অশান্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম সময়।

তুলা লগ্ন

ধনাগম যোগ। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে আশাপ্রদ পরিস্থিতি। স্ত্রীর স্বাস্থ্যোন্নতি, বাসগৃহ ও বাসভূমির মধ্যে স্বচ্ছন্দতার অভাব। সৌভাগ্য বৃদ্ধি। স্ত্রীজনিত কোন গুপ্ত মনোকষ্ট। মূত্রাশয়ের পীড়া। মামলা মোকর্দ্দমায় দুশ্চিন্তা। বন্ধু ও অনুচরের দ্বারা চুরি ও প্রতারণা। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মধ্যম।

বৃশ্চিকলগ্ন

নানা প্রকারে ব্যয় বাহুল্য। সম্বন্ধ লাভ। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু শুভ। দাম্পত্যপ্রেম বৃদ্ধি। গৃহসংস্কার। ভ্রাতার জন্য অশান্তি। বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বিদেশযাত্রা। কর্ম্মোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম সময়।

ধনুলগ্ন

ধনাগম যোগ। ব্যয় বৃদ্ধি। মিত্রলাভ। পড়াশুনায় কৃতিত্ব অর্জ্জন। অব্যবস্থিত চিত্ত হেতু মানসিক অবসাদ। অসঙ্গত উচ্চাভিলাষ। স্ত্রীর জন্য মনোকষ্ট। নীচব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় বিপদগ্রস্ত অংশার দ্বারা ক্ষতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও শত্রুবৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম সময়।

মকরলগ্ন

শারীরিক কষ্ট। ধনাভাবের ফল মধ্যবিধ। সাফল্যে বাধা। আমোদ-প্রমোদে সময়ের অপব্যবহার। স্পেকুলেশনে বা রেসে লাভ। কর্ম্মোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে সাফল্য, প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদালাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ সময়।

কুম্ভলগ্ন

চাকুরি ও পদোন্নতি লাভের আশা। ব্যবসায়ে উন্নতি। ধনাগম, সম্বন্ধ লাভ। ভাগ্যোন্নতির সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মধ্যবিধ সময়।

মীনলগ্ন

দেহভাবের ফল উত্তম। কোন শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান। বন্ধুলাভ; ভাগ্যোন্নতি, আর্থিক উন্নতি। সন্তান স্থানের ফল শুভ। নূতন গৃহাদির যোগ। স্ত্রীলোকের প্রণয়লাভ। বিদেশ ভ্রমণ যোগ। বিবাহার্থীর পত্নীলাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম।

ছন্দ পতন

সমরাদিত্য ঘোষ

যখন আসবে ঘুম চোখের পাতায়
আঁধার নিবিড় হবে কাঁথাটির কোলে
জোনাকিরা এলো মেলো হবে কুয়াশায়
জ্যোছনা পড়বে ঝরে ঘাসে আঁচলে,
তখন স্বপন আনে সেই হাসি মুখ
চারি চোখে মিলনের নিবিড় উত্তাপ
দ্রুত-তাল স্পন্দনের এক খানি বুক
যুগল শয্যার রাতে অস্ফুট প্রলাপ।
সহসা শিশুর কান্না, স্বপ্ন ছিঁড়ে যায়
মা তারে ভোলাতে চায় দুগ্ধহীন স্তনে,
অবুঝ শিশুর ক্ষেদ শিহরে হাওয়ায়
বুভুক্ষিতা মা শাসায় তারে প্রাণপণে।
আমার কাঁথার নীচে বরফের বাসা
আমার চোখের কোণে অশ্রু ভরে যায়
আমার সুখের চিন্তা, হায়রে দুরাশা—
ঘুম নেই কেরাণীর চোখের পাতায়।

মিথ্যেই

অসীমকুমার বসু

বৃথা তারে খুঁজে খুঁজে ফেরা,
যে মন হারিয়ে গেছে,
যে মন আঁধার দিয়ে ঘেরা।

যে মন দূরের হ'লো আজ তারে
বারে বারে ডেকে,
অলস কল্পনা আর রঙীন স্বপন দিয়ে
কারুময় আল্পনা এঁকে
অস্ফুট বিস্ময়ের মতো কোন এক
অপূর্ণ সংলাপে,
জীর্ণ সে মন খোঁজা বৃথা।
যে মন মরচে ধরা সময়ের খাপে
থেকে থেকে অচেনা হয়েছে আরও, মিথ্যেই
তারে আজ ডাকা।
সে মন হারিয়ে গেছে।
সে মন আজকের নেই।

শ্রী'শ'—

॥ কাঞ্চন মূল্য ॥

আর, ডি, বনশাল্ পরিবেশিত ও রূপভারতী ফিল্মস্ প্রযোজিত বহু-বিজ্ঞাপিত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শরৎস্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত 'কাঞ্চন মূল্য' গল্পের চিত্ররূপ মুক্তিলাভ করেছে। বিভূতিবাবুর এই ছোট গল্পটি তাঁর নিজস্ব কমিক্ ভঙ্গিতে লেখা একটি মনোরম সুখপাঠ্য 'কমেডি'। এটি শুধু হাসির গল্পই নয়, এর মধ্যে তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের পটভূমিকায় বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের হাস্যকর পরিণতি, তরুণ সমাজ-সংস্কারকদের মতি-গতি, গ্রাম্য আচার-ব্যবহার, প্রভৃতিরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বিগত শতাব্দীর প্রগতিশীল বঙ্গ সমাজের সেই যুগ-সন্ধিক্ষণের ঘটনাবলীর বিবরণ কাল্পনিক হলেও শক্তিশালী লেখকের কলমে যখন জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে, বিশেষ করে যখন তা আবার কমেডির রসে সিঞ্চিত হয়ে সুখপাঠ্য গল্পে পরিণত হয়, তখন তা আবালবৃদ্ধবনিতার মনোরঞ্জনে যে সমর্থ হবে তা বলাই বাহুল্য। বিভূতিবাবুর গল্পটিও তাই, কিন্তু যাঁরা মূল্য দিয়ে প্রেক্ষাগৃহে "কাঞ্চন মূল্য" চিত্রটি দেখতে যাবেন তাদের মূল্য অনুপাতে চিত্রটি মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে কি না তা বলা শক্ত; অন্তত: চিত্ররসিকদের যে চিত্রটি বিশেষ ভাল লাগবে তা মনে হয় না। তবে এক শ্রেণীর দর্শকদের চিত্রটি ভাল লাগতে পারে; কারণ এতে হাসির খোরাক অনেক কিছুই আছে, আবার চোখের জল ফেলবার ইচ্ছা হলেও (বিশেষ করে মহিলা দর্শকদের) তা করা চলবে—সেরকম দৃশ্যও কয়েকটি রয়েছে বলে। 'রক্‌ফেলার'-দের উপযোগী গঞ্জিকা সেবনের কয়েকটি দৃশ্যের অতি প্রাধান্য থাকায় তাঁদেরও চিত্রটি আকর্ষণ করবে। আবার, যাত্রার জুড়িগানের মতন মাঝে মাঝে বাউলের গানের অবতারণা থাকায় চিত্রটি 'ছবি দেখা মানেই গান শোনা' মনোভাবের দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনেও সমর্থ হবে। আর, হাসি আনবার জন্য অতি-নাটুকে দৃশ্যাবলীর অভাব না থাকায় যাঁরা শুধু হাসতেই চান, অর্থাৎ সব সময় হেসেই আছেন, তাঁদের অবশ্যই ছবিটি ভাল লাগবে। কিন্তু ঐ যে আগেই বলেছি সত্যকার চিত্র-রসিক এক শ্রেণীর দর্শক আছেন—তাঁদের নিয়েই হয়েছে মুস্কিল! আর দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করবার উপযোগী বিশেষ কিছুই এই চিত্রটিতে নেই।

এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে পরিচালনায় কাঁচা হাতের কাজ। চিত্রটির পরিচালনা হয়ে পড়েছে মঞ্চ-ঘেঁষা। তার ওপর সংলাপ-বাহুল্যে চিত্রটির গতি হয়েছে মন্থর, আর এই মন্থরতাকে মাঝে মাঝে দ্রুততালে আনবার অক্ষম প্রচেষ্টা হাস্যোদ্রেকই করে না বিরক্তি উৎপাদনও করে। মাঝে মাঝে খামকা বাউলের গান ঢোকানর আবশ্যকতা বোধগম্য হয় না—বোধহয় ভাবকে আরও ঘন করবার চেষ্টা, কিন্তু এ টেকনিক্ তো মান্ধাতা আমলের! আগেকার কালে মঞ্চে এর কদর ছিল বটে, কিন্তু এখন—এই সিনেমাস্কোপ্, সিনেরামার যুগে, এই 'জেট্' গতির কালেও এই টেক্‌নিক চলবে? এর ওপর দিন রাতের প্রভেদ, সময়ের পরিধি অর্থাৎ কতটা সময় কাটল—এক দিন না দশ দিন, ইত্যাদি চলচ্চিত্র কলাকৌশলের এই মামুলী টেকনিক্‌গুলিও যথোপযুক্ত রূপে প্রয়োগ করা হয় নি। একই

'কাঞ্চন মূল্য' চিত্রে বিকাশ, গৌতম, রাজলক্ষ্মী ও বাসবী নন্দী।

দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি চক্ষু পীড়া দায়ক—আর তাই ঘটেছে এই চিত্রে পুনঃ পুনঃ। নায়িকা নেত্য কর্তৃক বালক ভৃত্য স্বরূপকে পুনঃ পুনঃ টাকা আনতে পাঠান, ব্রেজ ঠাকরুণের তাকে বার বার পাকড়াও করে চিঠি নেওয়া ও টাকা দেওয়া; মুখরা, পোড়া, বিরাট বপু শুলিকা ব্রেজর ভয়ে চোরের মতন লুক্কায়িত অনাদি ঠাকুরের মাঝে মাঝে আবির্ভাব ও স্বরূপকে অর্থ প্রদান (কে কাকে যে কত টাকা দিল তার হিসাব করতে গেলে মাথা গুলিয়ে যাবে), তার ওপর বাউলের গানের বাহুল্য, আর ছিরু ঘোষাল ও তার সাকরেদদের গাঁজার আড্ডায় অতিনাটুকেপনার সাহায্যে হাসাবার চেষ্টা প্রভৃতির পৌনঃপুনিকতা দোষে চিত্রটি ভারাক্রান্ত।

একে তো কাহিনীটাই কিছুটা অসংবদ্ধ বলে একে চলচ্চিত্রে একক সংবদ্ধভাবে রূপায়িত করা এখানকার পরিচালকদের পক্ষে খুবই শক্ত—আর তা এক্ষেত্রে হয়ওনি। তার ওপর পটভূমিকার অতিবিস্তারের ফলে কাহিনীর ভারসাম্যও রক্ষিত হয়নি। বিধবা বিবাহের পটভূমিকায় স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিধবা-পার্টির ও সধবা-পার্টির দ্বন্দ্বই গল্পটির মূল ভাব, কিন্তু চিত্রটিতে অনাদি ঘোষালের পারিবারিক ব্যাপারই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় প্রধান,—তাই কোনটিই প্রাধান্য পায়নি। অভিনয়ের দিক দিয়েও গাঁজাখোর ছিরু ঘোষালের ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সাকরেদরা—অনুপকুমার প্রভৃতি, অতি-অভিনয় করে ফেলেছেন। স্থানে স্থানে স্বাভাবিক অভিনয়ের অভাব প্রায় সব কয়টি চরিত্রেই ঘটেছে। তবু অভিনাংশই এই ছবির একমাত্র উপভোগ্য বস্তু। অবশ্য সঙ্গীতাংশও প্রশংসনীয় হয়েছে, তবে বাউলের গানের বাহুল্য কম হলে আরও ভাল হত।

অভিনয়াংশে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শ্রীমান গৌতমের নাম। রাখাল বালক স্বরূপের ভূমিকায় গৌতমের অভিনয় শুধু চরিত্রোপযোগীই হয়নি—স্বাভাবিকতায় ও সাবলীল ভঙ্গিমায় মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছে। ভানু বন্দোপাধ্যায়ের পুত্র এই বালক শিল্পীর অভিনয়ের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল বলে মনে হয়। উপযুক্ত শিক্ষণ পেলে গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় কালে যশস্বী শিল্পী হয়ে উঠবে। এরপরই নামকরা চলে নায়িকা নেত্য চরিত্রে বাসবী নন্দী ও রাজীব ঘোষাল চরিত্রে বিকাশ রায়ের নাম। বাসবীর চরিত্রোপযোগী অভিনয় নিখুঁত হয়েছে, আর বিকাশ রায় মেক্-আপে ও অভিনয়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয় আবার একবার প্রদান করলেন। ব্রজ ঠাকুরাণী চরিত্রে শ্রীমতী রাজলক্ষ্মীর অভিনয় এক কথায় বলা চলে অপূর্ব্ব হয়েছে। ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও প্রশংসাযোগ্য হয়েছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলিরও প্রশংসা করা চলে। আর একজনের নাম এখানে উল্লেখ না করলে রচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। তিনি হচ্ছেন প্রবীণ অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী। জমিদার বাড়ীর আসরে তাঁর তর্জ্জা গান ও ভঙ্গিমা সত্যকার হাসির খোরাক জুগিয়েছে, আর মনে রাখবার মতন একটি দৃশ্যও হয়ে উঠেছে।

***

খবরাখবর ঃ

'বিমল ঘোষ প্রডাক্‌সন্স'-এর প্রথম চিত্র "বধূ"-র কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে। চিত্রনাট্য লিখেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। অভিনয় করছেন—ছবি বিশ্বাস, বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বজিৎ, বিকাশ রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত শোনাবেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

*   *   *

'বিভা পিক্‌চার্স' তাঁদের প্রথম চিত্র "এবার ফিরাও মোরে"-র শুভ-সূচনা করেছেন ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে। অভিনয়াংশে আছেন—সুচিত্রা সেন, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, কমল মিত্র প্রভৃতি। আর সুর-সংযোজনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

*   *   *

'মুভি টকী'ও নিউ-থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে তাঁদের প্রথম চিত্র "শিউলি-বাড়ী"-র চিত্র গ্রহণ আরম্ভ করেছেন। সুবোধ ঘোষের 'নাগলতা' উপন্যাস অবলম্বনে 'শিউলি-বাড়ী'-র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন তপন সিংহ। প্রধান চরিত্রগুলিতে আছেন—উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপ রায়। সঙ্গীত পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

*   *   *

'বেনারসী' চিত্রে রুমা গুহঠাকুরতা (গঙ্গোপাধ্যায়)

তপন সিংহর পরিচালনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"-র চিত্র গ্রহণ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। অভিনয় করবেন—কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, প্রভৃতি। সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কণ্ঠসঙ্গীত দেবেন দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে। সঙ্গীতগুলি রচনা করেছেন কাহিনীকার শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় নিজে।

* * *

'জনতা পিক্চার্স' তাঁদের 'স্বরলিপি'-র পর "বাসর" নামের একটি চিত্র নির্ম্মাণের আয়োজন করছেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়।

* * *

'রাজীব পিক্চার্স'-এর "হাই হিল" চিত্রটির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য রচনা করেছেন চিত্রনাট্য, আর অভিনয় করছেন—অনুপকুমার, তরুণকুমার, কমল মিত্র, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, প্রভৃতি।

* * *

হিমালয়ের একটি দূর শৈল-শহরের পটভূমিকায় 'চিত্র-যুগ'-এর প্রথম চিত্র "কাঁচের স্বর্গ"-র চিত্র-গ্রহণের কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। চিত্রটি পরিচালনা করছেন যাত্রিক, আর অভিনয়াংশে আছেন—দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায় ছায়া দেবী, অমর মল্লিক, প্রভৃতি বহু নাম করা শিল্পীবৃন্দ।

* * *

মনোজ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় 'দেবী প্রোডাক্সন্স'-এর "ডাইনী"-র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, গীতা দে, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, প্রভৃতি। কালোবরণ রচনা করেছেন সঙ্গীত।

* * *

'সুশীল মজুমদার প্রডাক্সন্স'-এর "কঠিন মায়া" চিত্রটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। সুশীল মজুমদার পরিচালিত এই চিত্রটির নায়ক-নায়িকা চরিত্র দু'টিতে অভিনয় করেছেন—বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়।

* * *

বোম্বের খ্যাতনামা প্রযোজক-পরিচালক ও অভিনেতা রাজকাপুর তাঁর "জিস্ দেশ মে গঙ্গা বইতি হ্যায়"-এর সাফল্যের পর তাঁর পরবর্ত্তি চিত্রের কথা জানিয়েছেন। চিত্রটির নাম হবে "সঙ্গম" এবং প্রধান চরিত্রে রাজকাপুর ও অন্য দুইটি চরিত্রে বৈজয়ন্তীমালা ও রাজেন্দ্রকুমার অভিনয় করবেন। ছবিটি রঙিন হবে এবং কাশ্মীরের দৃশ্যাবলীর মধ্যেই এর চিত্র-গ্রহণ করা হবে। ক্যামেরার কাজ করবেন রাধু কর্ম্মকার।

* * *

আচার্য্য বিনোবা ভাবের আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে অভিনেতা সুনীল দত্ত এবার প্রযোজকরূপে ডাকাতদল ও তাদের সংস্কার—এই তথ্য অবলম্বনে "মুঝে যানে দো" নামে একটি চিত্র নির্ম্মাণে ব্রতী হয়েছেন। নায়ক সুনীল দত্তর বিপরীতে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন ওয়াহিদা রহমান।

***

দেশে-বিদেশে ঃ

জনপ্রিয় দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতা শিবাজী গণেশনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। শ্রীগণেশন এই বৎসরের শেষের দিকেই যাত্রা করবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র শিল্পী ও কর্ম্মীবৃন্দের সহিত চলচ্চিত্র সংক্রান্ত নানারূপ আলোচনায় যোগদান করবেন।

* * *

বাংলার খ্যাতনাম্নী চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী মঞ্জু দে যখন লণ্ডনে গেছলেন তখন 'বি, বি, সি'-র বাংলা অনুষ্ঠান 'বিচিত্রা'-তে শ্রীউমেশ মল্লিক ও 'বিচিত্রার'-র প্রযোজক শ্রীএস, এল, সিন্হার সঙ্গে 'বৃটেনের চলচ্চিত্র শিল্প' এই পর্য্যায়ের একটি আলোচনায় যোগদান করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীউমেশ মল্লিকই হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় যিনি একটি বৃটিশ চলচ্চিত্র সংস্থার পক্ষে তাঁর নিজের লেখা গল্পের ইংরাজী চিত্রনাট্য থেকে প্রযোজকরূপে একটি ইংরাজী চিত্র নির্ম্মাণ করেছেন।

এখানে শ্রীমতী দে কে, শ্রীসিন্হা ও শ্রীমল্লিকের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

বার্লিন্ ফিল্ম্ ফেষ্টিভ্যাল্ থেকে ফিরে এসে তথ্য ও বেতার দপ্তরের সেক্রেটারী জানিয়েছেন যে বার্লিনে "অনুরাধা" এবং আন্দামান্ ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে তোলা একটি ডকুমেণ্টারী চিত্র—এই দু'টি পাঠান হয়েছিল। কিন্তু ভেনিস্ চলচ্চিত্র উৎসবে কোনও ভারতীয় চিত্র পাঠান হচ্ছে না। ভারত সরকারের ইচ্ছা ছিল সত্যজিৎ রায়ের "তিন কন্যা"-কে পাঠাবার কিন্তু শ্রীরায় নাকি রাজী হন নি।

* * *

বার্লিন্ আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের পাঠান "অনুরাধা" চিত্রটি সমালোচকদের প্রশংসা অর্জ্জনে সক্ষম হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে বার্লিনে উপস্থিত 'অনুরাধা'-র নায়িকা লীলা নাইডুও বিশেষ প্রশংসা পেয়েছেন।

বার্লিনের পর "অনুরাধা"-কে লণ্ডনে দেখাবারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

* * *

অষ্ট্রেলিয়া একটি মহাদেশ, কিন্তু এখানে ভারতীয় চলচ্চিত্রের কদর তো নেইই, চাহিদাও নেই, আর তাই ভারতীয় চিত্র এখানে দেখানও হয় না। কিন্তু কিছুকাল আগে সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার" চিত্রটি মেলবোর্ণ-এর কার্জন্ থিয়েটারে প্রদর্শিত হয়ে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। মেলবোর্ণের চিত্র-সমালোচকরা চিত্রটীর বিশেষ প্রশংসা করেছেন এবং মনে হয় অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় চিত্রের বাজার পাবার এটি একটি শুভ সূচনা। এর থেকে এ আশাও হয় যে ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়ান ফিল্ম পরিবেশকগণেরও মনের পরিবর্ত্তন হবে এবং ভারতীয় চিত্র আমদানীতে তাঁরা উদ্যোগী হবেন।

* * *

বিদেশী খবর ঃ

মস্কোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। ৫১টি দেশের প্রতিনিধি এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন। তাছাড়া নানা দেশের বহু চলচ্চিত্র অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও সমাবেশ হয়েছিল। ভারতীয় প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন এবং এইদলের নেতৃত্ব করেন শ্রীগুরু দত্ত। এই উৎসবে চিত্র-তারকাদের একটি প্যারেড্ও অনুষ্ঠিত হয়।

* * *

ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক ইতালীয় যুবক Cuilio Rinaldi, "Last Days of Sodom and Gomorrah" নামের একটি ইতালীয় চিত্রে অভিনয় শেষ করেই নিউ-ইয়র্কে উপস্থিত হন Madison Square Gardens-এ Archie Moore-এর সঙ্গে বিশ্ব-লাইট্-হেভিওয়েট্ মুষ্টিযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য।

* * *

আর ডি, বি, পরিবেশিত মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'বাগদাদ' চিত্রে এম, জি আর ও বৈজয়ন্তীমালা।

স্বনামখ্যাতা ইতালীয়ান্ চিত্র তারকা Gina Lollobrigida, যাঁকে তাঁর অনুরাগীরা 'La Lolla' বলে ডেকে থাকেন, তাঁদের কানাডার Toronto শহরের বাড়ী ছেড়ে দিয়েছেন। Lollobrigida-র রোমে এবং কালিফোর্ণিয়াতেও বাড়ী আছে। তাঁর স্বামী Dr. Milko Skofie, যিনি পূর্ব্বে 'ষ্টেট্‌লেস্' ছিলেন, তাঁকে গত বছর কানাডার নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁদের তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রও কানাডীয় নাগরিক। কিন্তু 'La Lolla' বলেছেন যে তিনি সম্পূর্ণরূপে ইতালীয়ান্ এবং আমৃত্যু নিজেকে সেই ভাবেই ভাববেন। তিনি বলেছেন তাঁর কাজের জন্য তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে কানাডীয় নাগরিক হওয়া সম্ভব নয়, তাই কানাডার বাস তুলে দিয়েছেন।

মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'ওয়াণ্টেড' চিত্রে সঈদা খান ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

১ম টেষ্ট—এজবাস্টন

ইংলণ্ড ঃ ১৯৫ (সুব্বারাও ৫৯। ম্যাকে ৫৭ রানে ৪ এবং বেনো ১৫ রানে ৩) ও ৪০১ (৪ উইকেটে। সুব্বা রাও ১১২, টেড ডেক্সটার ১৮০, ব্যারিংটন নট আউট ৪৮)।

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৫১৬ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। নীল হার্ভে ১১৪, ও'নীল ৮২। সিম্পসন ৭৬। ম্যাকে ৬৪, লরী ৫৭। স্টেথাম ১৪৭ রানে ৩, এ্যালেন ৮৮ রানে ২)

এজবাস্টন মাঠে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড-অস্টেলিয়ার ১ম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসে সুব্বারাও এবং ডেক্সটার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে পরাজয়ের হাত থেকে ইংলণ্ডকে রক্ষা করেন। খেলার মধ্যে বৃষ্টিপাতের দরুণ বেশ কয়েক ঘণ্টা খেলার সময় নষ্ট হয়।

দ্বিতীয় টেষ্ট—লর্ডস

ইংলণ্ড ঃ ২০৬ (সুব্বা রাও ৪৮। ডেভিডসন ৪২ রানে ৫, মিশন ৪৮ রানে ২ এবং ম্যাকে ৩৪ রানে ২ উইকেট) ও ২০২ (পুলার ৪২, ব্যারিংটন ৬৬। ম্যাকেঞ্জি ৩৭ রানে ৫, ডিভিডসন ৫০ রানে ২, মিশন ৬৬ রানে ২ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩৪০ (উইলিয়াম লরী ১৩০, ম্যাকে ৫৪, বার্জ ৪৬। ট্রুম্যান ১১৮ রানে ৪, ডেক্সটার ৫৬ রানে ৩, ষ্টেথাম ৮৯ রানে ২ উইকেট) ও ৭১ (৫ উইকেটে। বার্জ নট আউট ৩৭। স্টেথাম ৩১ রানে ৩, ট্রুম্যান ৪০ রানে ২।

লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ২য় টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে জয়ী হয়েছে। এজবাস্টনের ১ম টেষ্ট খেলা ড্র যায়। অষ্ট্রেলিয়ার এই জয়লাভের ফলে ইংলণ্ড বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে অনুষ্ঠিত ১৮টি টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় যে একটানা অপরাজেয় রেকর্ড সৃষ্টি ক'রে চলেছিল তার যবনিকাপাত হয়। দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড টসে জয়ী হ'লে তারা উপর্যুপরি ১২টি টেস্ট খেলার টসে জয়লাভের সৌভাগ্য লাভ করে।

১ম ইনিংসের খেলার ফলাফলে অষ্ট্রেলিয়া ১৩৪ রানে ইংল্যাণ্ডের থেকে এগিয়ে যায়। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে লরী উভয় দলের দিক থেকে দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় একমাত্র সেঞ্চুরী রান (১৩০) করেন। তাঁর টেষ্ট খেলোয়াড়-জীবনের এই প্রথম সেঞ্চুরী। শেষের দিকে খেলতে নেমে অষ্ট্রেলিয়ার তিন খেলোয়াড়—ম্যাকে, ম্যাকেঞ্জি এবং মিশন ৯ম এবং ১০ম উইকেটের জুটিতে ১০২ রান তুলে দেন। ম্যাকে ও ম্যাকেঞ্জির ৯ম উইকেটের জুটিতে ৫৩ রান এবং ম্যাকে-মিশনের ১০ম উইকেটের জুটিতে

দলের ৪৯ রান ওঠে। মিশন ২৫ রান করে শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থাকেন। ৩য়দিনের ৮৫ মিনিটের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার বাকি ২টো উইকেট পড়ে ১ম ইনিংস ৩৪০ রানে শেষ হয়; ২য়দিনে ৮ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ার ২৮৬ রান ছিল। ৩য় দিনে ইংলণ্ডের ৬টা উইকেট পড়ে ১৭৮ রান ওঠে—ফলে তখন তারা মাত্র ৪৪ রানের ব্যবধানে এগিয়ে থাকে। ৪র্থ দিনের খেলার শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড টিকে থাকতে পারেনি—২০২ রানে ২য় ইনিংস খতম হয়ে যায়। তখন জয়লাভের প্রয়োজনে ৬৯ রান তুলতে অষ্ট্রেলিয়াকে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করতে হয়। হাতে পুরো একদিন সময়—জয়লাভের জন্যে মাত্র ৬৯ রান দরকার। কিন্তু এই জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলতে গিয়ে ৫টা উইকেট পড়ে গেল। দলের মাত্র ১৯ রানে ৪টে উইকেট পড়ে। ষ্টেথাম ও ট্রুম্যান অষ্ট্রেলিয়ার জয় ঠেকাতে না পারলেও, মরণ-কামড় দিলেন। ৫ম উইকেট পড়লো ৫৮ রানে। তারপর অষ্ট্রেলিয়া ধাতস্থ হ'ল—৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে বার্জ এবং এ্যালেন ডেভিডসন। দলের রান ৬৭। বার্জের রান ৩৩ এবং ডেভিডসন তখনও কোন বউনি করেননি। আর মাত্র দু'রান করলেই দলের জয়। ষ্টেথামের বল বাউণ্ডারী পাঠিয়ে বার্জ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দু'রান তুলে দিলেন। ৫ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ার জয় হ'ল। পাঁচদিনের টেষ্ট খেলা ৪র্থ দিনেই শেষ।

২য় টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো অসুস্থতার দরুণ খেলায় যোগদান করেননি। নীল হার্ভে দল পরিচালনা করেন। ইংলণ্ডের পক্ষে অধিনায়কত্ব করেন কলিন কাউড্রে, যদিও পিটার মে দলে খেলেছিলেন। লর্ডস মাঠে অনুষ্ঠিত দুই দেশের টেষ্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে: মোট খেলা ২০, অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৮, ইংলণ্ডের জয় ৫, এবং খেলা ড্র ৭।

তৃতীয় টেষ্ট—লিডস

অষ্ট্রেলিয়া: ২৩৭ (কলিন ম্যাকডোনাল্ড ৫৪, নীল হার্ভে ৭৩। ট্রুম্যান ৫৮ রানে ৫, জ্যাকসন ৫৭ রানে ২, লক ৬৮ রানে ২ উইকেট) ও ১২০ (হার্ভে ৫৩। ট্রুম্যান ৩০ রানে ৬, জ্যাকসন ২৬ রানে ২, এ্যালেন ৩০ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড: ২৯৯ (পুলার ৫৩, কাউড্রে ৯৩। ডেভিডসন ৬৩ রানে ৫, ম্যাকেঞ্জি ৬৪ রানে ৩ উইকেট) ও ৬২ (২ উইকেটে। ডেভিডসন ১৭ রানে ১ উইকেট)।

লিডস মাঠের তৃতীয় টেষ্টে ইংলণ্ড ৮ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে খেলার ফলাফল সমান ১—১ করেছে। এখনও ২টো টেস্ট খেলা বাকি—৪র্থ ও ৫ম।

লিডস মাঠে ইংলণ্ডের ৩য় টেষ্ট খেলায় জয়লাভ—১৯৫৬ সালের প্রথম তিনটি টেষ্ট খেলার ফলাফলেরই পুনরাবৃত্তি। ১৯৫৬সালের টেস্ট সিরিজের ১ম টেষ্ট খেলা ড্র যায়, লর্ডস মাঠের ২য় টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া এবং লিডস মাঠের ৩য় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড জয়ী হয়। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে বাকি দুটি টেষ্ট খেলাও যদি ১৯৫৬ সালের মত শেষ হয় তাহলে 'Histroy repeats itself'—এই প্রবাদ বাক্যের পুনরায় সমর্থন পাওয়া যাবে।

লিডস মাঠের ৩য় টেষ্টে ইংলণ্ড টসের বাজিতে হেরে যায়। ইংলণ্ড দলে পিটার মে এবং অস্ট্রেলিয়া দলে রিচি বেনো অধিনায়কত্ব করেন। কাউড্রের কাঁধ থেকে গুরু-দায়িত্বের বোঝা সরিয়ে নেওয়াতে তিনি তাঁর স্বাভাবিক খেলা দেখাতে পেরেছেন। খেলার ২য়দিনে ইংলণ্ড ৪ উইকেটে ২৩৮ রান তুলে অস্ট্রেলিয়ার থেকে ১ রানে এগিয়ে যায়।

খেলার ৩য়দিনে উভয় দলের মিলিয়ে ১৮টা উইকেট পড়লো—ইংলণ্ডের ১ম ইনিংসের বাকি ৬টা এবং ২য় ইনিংসের ২টো আর ওদিকে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের ১০টা। পাঁচদিনের টেস্ট খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ৩য় দিনেই হয়ে গেল।

৩য় দিনে ইংলণ্ড তার বাকি ৬টা উইকেটে ৬১ রাণ তুলে। ১ম ইনিংস ২৯৯ রানে শেষ হয়। ইংলণ্ড ৬২ রাণে এগিয়ে যায়। অষ্ট্রেলিয়ার ডেভিডসন এই দিন মাত্র ৯ রাণে ৩টে উইকেট পান—আগের দিন ২ টো ৫৪ রাণে; মোট ৬৩ রাণে ৫টা উইকেট।

অষ্ট্রেলিয়ার ২য় ইংনিসের খেলায় ফ্রেডী ট্রুম্যান ২৪টা বলে কোন রাণ না দিয়েই ৫টা উইকেট পেলেন; অষ্ট্রেলিয়ার ডেভিডসনের বোলিং সাফল্যের সমুচিত উত্তর দেওয়া হল। ট্রুম্যান ২য় ইনিংসের খেলায় ৩০ রাণে ৬টা উইকেট পান। জ্যাকসন এবং লক দুটো ক'রে

উইকেট পান। প্রধানতঃ ট্রুম্যানের মারাত্মক বোলিংয়ের দরুণই অষ্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস ১২০ রাণে শেষ হয়। দুটো উইকেট পড়ে যেখানে ৯৯ রাণ উঠেছিল—ইনিংসই শেষ হ'ল ১২০ রাণে। ইংলণ্ড জয় লাভের প্রয়োজনীয় ৫৯ রাণ তুলতে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং ৭০ মিনিটের খেলায় ২টো উইকেট হারিয়ে ৬২ রাণ তুলে দিয়ে ৮ উইকেটে জয়ী হয়।

উইম্বলেডন লন টেনিস ঃ

১৯৬১ সালের উইম্বলেডন লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় অষ্ট্রেলিয়ার সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৬০ সালের পুরুষদের সিঙ্গলস বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার নীল ফ্রেজার এ বছরের প্রতিযোগিতায় এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় হিসাবে সম্মান পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ৪র্থ রাউণ্ডে অবাছাই খেলোয়াড় বৃটেনের ববি উইলসনের কাছে পরাজিত হন। গত দু'বছরের (১৯৫৯ ও ১৯৬০ সাল) মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়িনী মেরিয়া বুইনো (ব্রেজিল) প্রতিযোগিতা আরম্ভের কয়েকদিন আগে কঠিন পীড়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ; ফলে তাঁকে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করতে হয়।

আমেরিকার মিস ডালিন হার্ড শেষ সময়ে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করেন। মিস হার্ড ১৯৫৯ সালের সিঙ্গলস ফাইনালে বুইনোর কাছে পরাজিত হ'ন এবং ১৯৬০ সালে বুইনোর জুটিতে ডাবলস খেতাব লাভ করেন। সুতরাং বুইনোর অনুপস্থিতিতে এ বছর তাঁর সিঙ্গলস খেতাব লাভের খুবই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি রোগ শয্যাশায়ী বুনোর মুখ চেয়ে খেতাব লাভের সম্মানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রোগ শয্যার পাশে তিনি খেলার সঙ্গিনী বুইনোর পরিচর্য্যার ভার নিয়েছিলেন। মিস হার্ড নিঃসন্দেহে মনুষত্বের শ্রেষ্ঠ খেতাব লাভ করেছেন। ১৯৬১ সালের খেলোয়াড় জীবন তাঁর ব্যর্থ হয়নি।

মেরিয়া বুইনো এবং ডার্লিন হার্ডের অনুপস্থিতিতে গতবারের সিঙ্গলসের রাণার্স-আপ দক্ষিণ আফ্রিকার সাণ্ড্রা রেনোল্ডস মহিলাদের সিঙ্গলসের নামের বাছাই তালিকায় প্রথমস্থান দখল করেন। কিন্তু সেমি-

১৯৬১ সালের উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়িনী এঞ্জেলা মর্টিমার (ইংলণ্ড)

ফাইনালে ৭নং বাছাই খেলোয়াড় এ্যাঞ্জেলা মর্টিমার (বৃটেন) তাঁকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে ২নং বাছাই খেলোয়াড় রড লেভার (অষ্ট্রেলিয়া) ৭নং বাছাই খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণানকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন। অপর এক সেমি-ফাইনালে ৮নং বাছাই খেলোয়াড় ম্যাকিনলে (আমেরিকা) অবাছাই খেলোয়াড় স্ট্যাংষ্টারকে (বৃটেন) পরাজিত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ২৩ বছর পর বৃটেনের খেলোয়াড় পুরুষদের সেমি-ফাইনালে খেলার কৃতিত্ব লাভ করলো। যুদ্ধ-পরবর্ত্তীকালের খেলায় বৃটেনের কোন খেলোয়াড়ই কোয়ার্টার ফাইনাল পর্য্যন্ত উঠতে পারেনি।

মহিলাদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে চারজনের মধ্যে ইংলণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার দু'জন ক'রে খেলোয়াড় উঠেছিল। ফাইনালে উঠেছিলেন ইংলণ্ডেরই দু'জন, ক্রিষ্টিন ট্রুম্যান এবং এ্যাঞ্জেলা মর্টিমার। ক্রিষ্টিন ট্রুম্যানের জুটি ১৯৫৯ সালে ডাবলসের ফাইনালে পরাজিত হয়েছিলেন।

ফ্রেডী ট্রুম্যান—ইংলণ্ডের ত্রাণকর্তা
ইংলণ্ড—অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের পক্ষে
১১টি উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে সাফল্যলাভ করেন।

এ্যাঞ্জেলা মর্টিমার ১৯৫৮ সালে সিঙ্গলস ফাইনালে পরাজিত হন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : রড লেভার (অষ্ট্রেলিয়া) ৬—৩, ৬—১, ৬—৪ গেমে 'চাক' ম্যাকিনলেকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন। লেভার এ বছরে ছিলেন ২নং বাছাই খেলোয়াড় এবং ম্যাকিনলে ৮নং। লেভার উপর্যুপরি ৩বার ফাইনালে খেলে তৃতীয়বারে সিঙ্গলস খেতাব পেলেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : ১৯৫৮ সালের রানার্স-আপ এঞ্জেলা মর্টিমার ৪—৬, ৬—৪, ৭—৫ গেমে ক্রিষ্টিন ট্রুম্যানকে পরাজিত করেন। মর্টিমার ছিলেন ৭নং এবং ট্রুম্যান ছিলেন ৬নং বাছাই খেলোয়াড়।

পুরুষদের ডাবলস : রয় এমার্সন এবং নীল ফ্রেজার (অষ্ট্রেলিয়া) ৬—৪, ৬—৮, ৬—৪, ৬—৮, ৮—৬ গেমে বব হেউইট এবং ফ্রেড স্টোলিকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : ক্যারেন হাণ্টজ এবং বিলি জিন মেফিট (আমেরিকা) ৬—৩, ৬—৪ গেমে ৩নং বাছাই জুটি লেহানে এবং মার্গারেট স্মিথকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন। হাণ্টজ এবং মেফিট বাছাই তালিকায় কোন স্থানই পাননি।

মিক্সড ডাবলস : ১নং বাছাই জুটি ফ্রেড ষ্টোলি এবং মিস লেসলি টার্ণার (অষ্ট্রেলিয়া) ১১—৯, ৬—২ গেমে ৪নং জুটি বব হাউই (অষ্ট্রেলিয়া) এবং এডা বুডিংকে (জার্ম্মানী) পরাজিত করেন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৬১ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় কোন্ দল চ্যাম্পিয়ানসীপ পাবে—সে প্রশ্নের উত্তর আজ অনেক সহজ হয়ে এসেছে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পাওয়ার পথে এখন আর কোন বড় বাধা নেই। তাদের ২৩ টা খেলায় ৪১ পয়েন্ট উঠেছে; আর মাত্র ৫টা খেলা বাকি। এই ৫টা খেলায় ৬ পয়েন্ট তুলতে পারলেই তারা নিশ্চিতভাবে লীগ চ্যাম্পিয়ান হবে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান তাদের বাকি ৫টা খেলায় এবং বি এন আর তাদের বাকি ৯টা খেলায় যদি কোন পয়েন্ট নষ্ট না করেও।

গত বছরের লীগ-চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ২৩টা খেলায় ৩৬ পয়েন্ট পেয়ে লীগের তালিকায় বর্ত্তমানে ২য় স্থানে আছে; ইস্টবেঙ্গল দলের থেকে তারা ৫ পয়েন্টের পিছনে আছে। ৩য় স্থানে আছে বি এন আর—১৯ টা খেলায় ২৮ পয়েন্ট পেয়ে। ৪র্থ স্থানে আছে গত বছরের রানার্স-আপ মহমেডান স্পোর্টিং এবং এরিয়ান্স—দুই দলেরই ২০টা খেলায় ২৪ পয়েন্ট। ১৬।৭।৬১

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর…

শিল্পী—পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
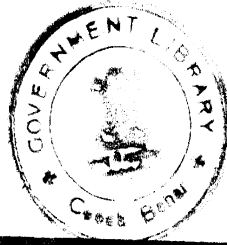
ভাদ্র—১৩৬৮

প্রথম খণ্ড | ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

সংস্কৃত ও বাংলায় প্রাগ্‌-আর্য ও উত্তর-আর্য উপাদান

শ্রীকৃষ্ণপদ গোস্বামী

ইন্দো-ঈরাণীয় জাতির যে শাখা ঈরাণ হইতে ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হল সেই জাতিই ভারতীয়-আর্য (Indo-Aryan) বলিয়া কথিত। ইন্দো-ঈরাণীয় জাতি নিজেদের "অর্য্য" (Airya) বা "আর্য" বলিয়া গৌরব বোধ করিতেন। সেই জন্য এই জাতির নাম হইল আর্য। "আর্য্য" শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীর বহুবচন যুক্ত হইয়া ঈরাণ নামের উৎপত্তি হয়। প্রাচীন ঈরাণীয় ও আর্যগণ যে একই শাখা-ভুক্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ মিলে তাঁহাদের ভাষা, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে। আবেস্তার সঙ্গে সংস্কৃতের এইরূপ গভীর মিল রহিয়াছে যে সামান্য একটু ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমেই এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হইতে পারে। নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিচার করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে।

সংস্কৃত	আবেস্তীয়	সংস্কৃত	আবেস্তীয়
সূর্য—	সুরিয়ম্	হোতর—	জওতর
		মিত্র—	মিথ্‌র
অগ্নি—	অগ্‌নাস	যম্—	যিম
বরুণ—	বরুণাস্	সেনা—	হএনা।
দেব—	দএব	আহুতি—	আজুতি
যজ্ঞ—	যস্ন	শতম্—	শতম্
সোম—	হওম	অস্তি—	অস্তি

ইত্যাদি।

উপনয়ন প্রথা কিংবা অগ্নি সাক্ষ্য রাখিয়া বিবাহের রীতি উভয় জাতির মধ্যেই বিগুমান ছিল।

ভারতে আর্যদের আগমন কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে বা উপদলে বিভক্ত হইয়া তাঁহারা ভারতে আসিয়াছিলেন। প্রত্যেক দলের গোত্রপতি পৃথক থাকায় গোত্র, দেবতা ও মন্ত্র পৃথক। মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে খৃষ্ট-পূর্ব ১৫০০ অব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে ভারতীয় আর্য শাখার প্রথম দল সর্ব প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (পূর্ব-আফগানিস্থান সমেত) ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন।

আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতে প্রাগ-আর্য (Pre-Aryan) জাতিগুলির মধ্যে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষগণ বাস করিত। সময়ের দিক হইতে সাধারণত মনে করা হয় যে অষ্ট্রিক শাখার অন্তর্গত অষ্ট্রো-এশিয়াটিক (Austro-Asiatic) জাতিই ভারতের আদিম অধিবাসী। উত্তর ও পূর্ব-ভারতে এক সময়ে ইহাদের প্রাধান্য ছিল। এই জাতির কোন উন্নত ধরণের সভ্যতা ও রাজনৈতিক চেতনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তীকালে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষগণ ভারতে আসে এবং অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতিকে উত্তর ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া সেখানে বসতি স্থাপন করে। দ্রাবিড়দের পরে আর্যেরা ভারতে আসেন।

আর্যেরা ছিলেন যাযাবর। পশুপালন ও কৃষিই ছিল তাঁহাদের প্রধান উপজীবিকা। সিন্ধু উপত্যকায় মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় যে উচ্চস্তরের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা সুপ্রাচীন কালের বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা। যদি এই সভ্যতা প্রাগ্-আর্য বা দ্রাবিড় সভ্যতা হইয়া থাকে তবে এই কথা স্বীকার করিতে বাধা নাই যে আর্য সভ্যতা অপেক্ষা প্রাগ্-আর্য সভ্যতা উন্নত ধরণের ছিল। বেলুচিস্থানে ব্রাহুই অঞ্চলে প্রচলিত "ব্রাহুই" (Brahui) ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড়ীয় ভাষার সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং ইহা খুবই সম্ভব যে দ্রাবিড়গণ আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বাস করিত এবং সিন্ধুসভ্যতার পত্তন করিয়াছিল।

অষ্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জাতি ছাড়া আর কোন অন্-আর্য জাতি আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতে বাস করিত কিনা জানা যায় না। তবে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে রাক্ষস, দানব, দৈত্য, অসুর, কিন্নর, নাগ, গন্ধর্ব প্রভৃতি অনেকগুলি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব জাতি অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড় শাখা ভুক্ত ছিল, না অন্য কোন গোষ্ঠীভুক্ত ছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। এমনও হইতে পারে যে কালক্রমে ইহারা অন্য জাতির সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে মিশিয়া গিয়াছিল।

আর্যদের প্রধান সম্পদ ছিল তাঁহাদের দেবস্তুতি মূলক শক্তিশালী বৈদিক ভাষা। "বেদ" শব্দ বিদ্ ধাতু হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ হইল জ্ঞান। আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০ হইতে ১০০০ অব্দের মধ্যে ঋক্ বেদের অধিকাংশ সূক্তগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। আর্যেরা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। প্রাকৃতিক শক্তির (সূর্য, দ্যৌঃ, মরুৎ-বরুণ প্রভৃতি) স্তুতি গানই বেদের বিষয় বস্তু। ধর্মের ব্যাপারে প্রাচীন গ্রীকদের সঙ্গে আর্য জাতির মিল রহিয়াছে। গ্রীক সাহিত্যে এ্যাপোলো (Apollo) সূর্য দেবতা, জিউস (Zeus) আকাশ দেবতা। আর্য ঋষিগণ বংশ পরম্পরায় বেদ সম্পূর্ণরূপে কণ্ঠস্থ রাখিয়া এক অদ্ভুত মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ভারতীয় আর্যগণ ব্যতীত ইন্দো-য়ুরোপীয় (Indo-European) গোষ্ঠীর অন্য কোন জাতিই এইরূপ মানসিক উৎকর্ষ দেখাইতে পারেন নাই। সেই জন্য বেদের অপর নাম শ্রুতি। বৈদিক ভাষাই হইল ইন্দো-য়ুরোপীয় জাতির সর্ব প্রাচীন নিদর্শন। ঋক্-বেদের ১০০৮ সূক্তের মধ্যে কিছু সংখ্যক স্তোত্র ভারতের বাহিরে লেখা হওয়া সম্ভব। "হিট্টাইট" (Hittite) ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ঈরাণীয় ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। মেসোপটেমিয়ায় অবস্থিত বোঘাজকোই নামক স্থানে খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর এক প্রস্তরলিপিতে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া যায়।

হিট্টাইট ও মিটানি রাজবংশের মধ্যে পুত্রকন্যার বিবাহের চুক্তিপত্রে পঞ্চ আর্য দেবতার নাম উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—ইন্দর=ইন্দ্র; মি-ইৎ-র=মিত্র; উরুয়ন=বরুণ। সেইজন্য তুর্কীস্থানকেই অনেকে আর্যদের আদি নিবাস বলিয়া মনে করেন।

আর্যগণ সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক জাতি পর্যুদস্ত হয় এবং অনেকেই ক্রমে ক্রমে আর্যভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। অষ্ট্রিক বা কোল গোষ্ঠীর কোন কোন শাখা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুরের পাহাড় পর্বত, বন জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্তমানে প্রটো-অষ্ট্রিক জাতির বংশধর হইতেছে সাঁওতালী, ওরাঁও, হো, শবর, কুরথ, গর্দব প্রভৃতি জাতি। দ্রাবিড় গোষ্ঠীরও বহুসংখ্যক অধিবাসী আর্য প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তাহারা আর্য সভ্যতা ও ধর্ম গ্রহণ করিলেও আর্যভাষা গ্রহণ করে নাই। তবে কালক্রমে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বাহক ভাষা বলিয়া সংস্কৃত হইতে উচ্চশ্রেণীর শব্দসমূহ দ্রাবিড়ীয় ভাষা সমূহে প্রবেশ করে। প্রটো দ্রাবিড় জাতির বংশধরগণ বর্তমানে তামিল, তেলুগু, কানাড়ীয়, মালয়ালাম্ প্রভৃতি ভাষা-ভাষী।

আর্যদের আগমনের বহু পরে ভোট-চীনীয় (Tibeto-Chinese) ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভোট-বর্মী (Tibeto-Burman) শাখার গারো, টিপ্‌রা, হাজঙ, মেইতেই, লুসাই, বোড়ো (Bodo) প্রভৃতি জাতি ভারতের পূর্ব সীমান্তে (আসাম, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ) আসিয়া বসতি স্থাপন করে। ভোট-বর্মী শাখার ভারতে আগমনের পূর্বে আসামের পার্বত্য অঞ্চলে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক শাখাভুক্ত খাসিয়া, মোন্-খমের (Mon-Khmer) প্রভৃতি জাতি বাস করিত। খাসিয়া ভাষা এখনও আসামে রক্ষিত আছে। সুতরাং ভোট-বর্মী শাখার অধিবাসিগণই হইল উত্তর-আর্য (Post-Aryan) জাতি। অনেকে মনে করেন কিরাত, কিন্নর প্রভৃতি জাতি এই শাখাভুক্ত।

আর্য ও প্রাগ-আর্য জাতিসমূহের মিশ্রণের ফলে ভারতে নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে। প্রাগ্‌-আর্য জাতি একদিকে যেমন আর্যভাষা ও ধর্ম গ্রহণ করিল, অপর পক্ষে বিজেতা আর্যগণও সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাগ্‌-আর্য জাতি সমূহের সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, এবং তাহাদের ভাষাগুলি হইতে বহু শব্দ, উচ্চারণ পদ্ধতি ও বাক্যগঠন রীতি গ্রহণ করিলেন।

বিভিন্ন জাতির ভাষা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া যেমন একটি ভাষা শক্তিশালী হয়, তেমনি বিভিন্ন জাতির রক্তের সংমিশ্রণের ফলে জাতির প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং বুদ্ধিবৃত্তিও প্রদীপ্ত হয়। আর্য ও প্রাগ্‌-আর্য জাতির সংমিশ্রণের ফলেই বলিষ্ঠ হিন্দু সভ্যতার পত্তন হইয়াছিল। আর্যদের মধ্যে মাতৃ-পূজা, শিব পূজা ও মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। সিন্ধু সভ্যতায় মাতৃকাপূজা ও লিঙ্গপূজার বিধি ছিল বলিয়া মনে হয়। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে সুমারীয় ও সেমিটিক সভ্যতার কিছু কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন দ্রাবিড়গণ মাতৃপূজার ধারণা এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান সুমারীয় কিংবা সেমিটিক জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, আর্যগণ কালক্রমে অন্-আর্যদিগের দেবদেবী, পূজা পদ্ধতি, ধর্মীয় আচার ব্যবহার অল্প বিস্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা অন্-আর্য দেবদেবীকে নূতনভাবে রূপদান করিয়া আর্যায়িত করিয়াছিলেন।

আর্য ও প্রাগ্‌-আর্য সভ্যতার মিশ্রণের ফলে কোন পক্ষের কতটুকু দান ছিল তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। অথর্ববেদে উপদেবতা, অপদেবতার পূজার মন্ত্রাদি, মারণ ও বশীকরণের মন্ত্র রহিয়াছে। কোল জাতির মধ্যে অদ্যাবধি ভূত প্রেত প্রভৃতির পূজা প্রচলিত আছে। সুতরাং অথর্ববেদে এই সমস্ত মন্ত্রাদির পশ্চাতে প্রাগ্‌-আর্য প্রভাব আছে বলিয়া মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না। পূজা পার্বণে নৃত্য-গীত বাদ্য প্রভৃতি কলা বিদ্যার প্রচলন, গন্ধ-দ্রব্যের ব্যবহার, নারিকেল, সিন্দুর, পান ইত্যাদি ব্যবহারের রীতি প্রাগ্‌-আর্য জাতির নিকট আর্যেরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি অশৌচ পালন, শ্রাদ্ধক্রিয়া, মৃতদেহ দাহ করিয়া অস্থি নদীতে বিসর্জন এবং গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান ইত্যাদি প্রথার মূল প্রাগ্‌-আর্য অবদান থাকিতে পারে। তর্পণের মন্ত্রে যক্ষ, নাগ, অসুর প্রভৃতি দানবের নাম রহিয়াছে। দোল উৎসবের সময় যে মন্ত্র পাঠ করিয়া নারায়ণ এবং রাধাগোবিন্দকে আবীর দেওয়া হয়, সেই মন্ত্রের মধ্যে যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগের উল্লেখ আছে।

এখন আর্যভাষার উপর অন্-আর্য প্রভাব কতটুকু পড়িয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখা হউক। ভারতীয় আর্য ভাষাকে তিনটি সুস্পষ্ট স্তরে ভাগ করা হইয়া থাকে। (১) আদ্য ভারতীয় আর্য (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দ);

(২) মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্য (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০—১০০০ খ্রীষ্টাব্দ); (৩) নব্য ভারতীয়-আর্য (১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে)। আদ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার নমুনা আমরা বৈদিক-সংস্কৃত, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও সংস্কৃতে পাই।

নানা কারণে ভাষার পরিবর্তন ঘটে। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, নূতন পরিবেশ ও জাতির সংমিশ্রণের ফলে ভাষার পরিবর্তন হয়। তবে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের ফলে ভাষার পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। প্রাগ্-আর্যেরা যখন আর্যদের ভাষা গ্রহণ করিল তখন হইতেই বৈদিক ভাষার পরিবর্তন হইতে থাকে।

যদিও বৈদিক সংস্কৃতের মূল শব্দগুলি ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা হইতে গৃহীত, তথাপি ঋক্‌বেদের মধ্যে আমরা এমন কতকগুলি শব্দ পাই যাহাদের মূল আর্য ভাষায় পাওয়া যায় না। যেমন, কুণ্ড, দণ্ড, পিণ্ড, বিল, ময়ূর, অণু, অরণি, কুট. কাল, রাত্রি, রূপ প্রভৃতি।

অথর্ববেদে পাই বিল্ব, শূর্প, তূণ প্রভৃতি শব্দ।

ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়—পণ্ডিত, অলস, শব, অর্ক, অটবী, খড়্গ, তণ্ডুল, মর্কট, বল্লী প্রভৃতি শব্দ।

বৈদিক যুগের পর হইতেই পাণিনি, পতঞ্জলি, রামায়ণ-মহাভারতের যুগে সংস্কৃত ভাষায় বহু প্রাগ্-আর্য শব্দ প্রবেশ করিতে থাকে। প্রাগ্-আর্য শব্দগুলির বেশীর ভাগই দ্রাবিড় ভাষাগুলি হইতে আসে। এক সময়ে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী যে উত্তরাপথে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ কুরুখ ও মাল্তো (মালদহ জিলায়) উপভাষাগুলি পাই। টি, বারো তাঁহার সংস্কৃত ভাষার ইতিহাসে সংস্কৃতে ব্যবহৃত অনেকগুলি শব্দ অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। [The Sanskrit Language PP 378—386].

কিন্তু এই শব্দগুলির সবকয়টাই দ্রাবিড় ও কোল শাখার ভাষাগুলি হইতে গৃহীত হইয়াছে কিনা তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। নিম্নলিখিত শব্দগুলি কোন ভাষার অন্তর্গত, যথা—অলাবু, নীর, কদলী, তাম্বুল, কার্পাস, লাঙ্গল, লিঙ্গ, মরিচ, ফল, সর্ষপ প্রভৃতি।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা হইতেই বেশী পরিমাণে শব্দ সংস্কৃত ভাষায় আসিয়াছে। যথা—অনল, অলস, অগুরু, কানন, কটু, কাক, কুট, কুটিল, কুটি, চতুর, চন্দন, পল্লী, বিল্ব, মুকুট, হেরম্ব প্রভৃতি।

আবার খিট্ট, খট্ট, গুণ্ড প্রভৃতি ধাতুর মধ্যেও অন্-আর্য উপাদান লুক্কায়িত আছে। প্রাণীবাচক শব্দগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে একটি সংস্কৃত এবং অন্যটি প্রাগ্-আর্য ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

যেমন—	সংস্কৃত	প্রাগ-আর্য
	ঋক্ষ—	ভল্লুক
	অশ্ব—	ঘোটক
	শ্বন্—	কুক্কুর
	মার্জার—	বিড়াল
	শার্দূল—	ব্যাঘ্র

হস্তী (হাত বিশিষ্ট প্রাণী), মাতঙ্গ [তুলনীয়—মোল্-খেমর শব্দ মোতৈঙ্গ—হাত বিশিষ্ট যে প্রাণী] সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডারে এইগুলি হইল প্রাগ্-আর্য ভাষার শব্দ।

ধ্বনিতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে সংস্কৃত মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক ভাষা হইতে আসিয়াছে। মূল ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষায় মূর্ধন্য বর্ণগুলি ছিলনা। এমন কি সংস্কৃতের ভগিনী-স্থানীয়া গাথা আবেস্তায়ও মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি পাওয়া যায় না। ভারতে আর্যদের আগমনের পর মৌলিকভাবেই তাহাদের ভাষার মধ্যে মূর্ধন্য ধ্বনিগুলির উদ্ভব হইয়াছিল এই ছিল গোড়াতে কয়েকজন ভাষা তাত্ত্বিকের ধারণা। যেমন ঋ, র, ষ প্রভৃতি বর্ণগুলি পূর্বে থাকিলে সংস্কৃত শব্দে দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্য বর্ণে পরিণত হয়। যথা—পঠতি—বৈদিক পৃথতি, প্রথয়তি; মুণ্ড—বৈদিক মৃদ্; কট—কৃত; নট—নৃত্; পটুঃ (গ্রীক Platus)। কিন্তু অনেকগুলি শব্দে দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্যবর্ণ হয় নাই। যথা—কর্তামি (লিথুয়ানিয়ান—Kertu); মর্দামি (লিথুআনিয়ান—mardeo)।

আসলে সংস্কৃত ঋ, র, ষ প্রভৃতি বর্ণের পরে দন্ত্যবর্ণ যে মূর্ধন্য বর্ণে রূপান্তরিত হয় তাহা প্রাকৃত ভাষার প্রভাবের ফল। প্রাকৃতেও অনুরূপ অবস্থায় দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্য বর্ণ হয়। যথা: বিকট—বিকৃত; অট্ঠ—অর্থ; বুড্ঢ—বৃদ্ধ; বড্ডিথ—বর্দ্ধিত প্রভৃতি।

সংস্কৃতে "ন" এর স্থানে "ণ" হওয়ার রীতির মূলেও প্রাকৃত প্রভাব (Prakritism in Sanskrit) রহিয়াছে।

যথা—পুণ্য, বর্ণ, নিপুণ, কুণার, স্থাণু প্রভৃতি। তাহা হইলে মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে সংস্কৃতে এই ধ্বনিগুলির স্বাভাবিক বিকাশ হয় নাই; দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক ভাষা হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

ল্যবর্থ অসমাপিকার (Gerund or Conjunctive Participle) প্রয়োগ একমাত্র সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষায় পাওয়া যায় না। দ্রাবিড়ীয় ভাষা-গুলিতে ল্যবর্থ অসমাপিকার প্রয়োগ যথেষ্ট মিলে। সুতরাং এইরূপ অসমাপিকার প্রয়োগের মূলে দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব আছে বলিয়া মনে করিলে অযৌক্তিক হইবে না।

সংস্কৃতে কৃ ধাতুর সহযোগে যৌগিক ক্রিয়ার (Compound verb) প্রচলন আছে। যথা—গমনং করোতি= গচ্ছতি; শয়নং করোতি=স্বপিতি। অনুরূপভাবে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার দ্রাবিড় ভাষাগুলিতেও দৃষ্ট হয়। সুতরাং এইক্ষেত্রেও দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়।

তারপরে স্বরাঘাত (Accent) সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বৈদিক সংস্কৃত সুর বা স্বরাঘাত (Pitch accent) প্রধান ভাষা ছিল। স্বরের উত্থান পতনের উপর শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটিত। যেমন—রাজপুত্র; এখানে প্রথম স্বরধ্বনি উদাত্ত হওয়ায় বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। আবার রাজপুত্রশব্দে অন্ত্য স্বরধ্বনি উদাত্ত হওয়ায় ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। কিন্তু অন্ত্য বৈদিক যুগ হইতেই স্বর ঘাতের স্থানে শ্বাস ঘাত বা বল (stress accent) দেখা দিল। শ্বাস-ঘাতের ফলে শব্দ-মধ্যস্থিত স্বরের লুপ্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত সংস্কৃতে কিছু কিছু পাওয়া যায়—যেমন—সুবর্ণ—স্বর্ণ; অনু-বর্তিষ্যে—অন্—বর্তিষ্যে ইত্যাদি।

স্বরাঘাতের স্থানে কেমন করিয়া শ্বাসাঘাত আসিল তাহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। হোমারিক গ্রীকও স্বরাঘাত-প্রধান ভাষা ছিল। পরবর্তীকালে গ্রীক ভাষায়ও শ্বাসাঘাত আসে। অন্ত্য বৈদিক যুগে যে শ্বাসাঘাত দেখা দিল তাহা খুব সম্ভব দ্রাবিড় প্রভাবেই হইয়া ছিল। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতেও প্রবল শ্বাসাঘাত লক্ষণীয়। মোটামুটি এইগুলি হইল সংস্কৃতের উপর প্রাগ্-আর্য ভাষাগুলির প্রভাব।

ভারতীয়-আর্য ভাষা যখন মধ্যযুগীয় স্তরে আসিয়া পৌছিল তখন সেই যুগের ভাষার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের জটিলতা পরিত্যাগ করিয়া অনেক সহজ সরল রূপ প্রাপ্ত হইল। বহু অন্-আর্য শব্দ (প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা যে গুলিকে "দেশী" আখ্যা দিয়াছেন) প্রাকৃত ভাষাগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। ধ্বনিগত, রূপগত ও বাক্যগঠন রীতিতে একটা অমূল পরিবর্তন আসে। পশ্চিম অঞ্চল অপেক্ষা পূর্ব অঞ্চলের ভাষাগুলিতেই এই পরিবর্তন বেশী করিয়া হইয়াছিল। কেননা, আর্যগণ গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী বিধৌত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই জন্য ঐ অঞ্চলের নাম হয় আর্যাবর্ত। বাংলা ও মগধ বহুদিন অন্-আর্য অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। ঐতেরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও মগধকে পক্ষী অর্থাৎ পক্ষীর ন্যায় দুর্বোধ্য ভাষাভাষী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে ঐ অঞ্চলে আগত আর্যগণকে "ব্রাত্য" অর্থাৎ পতিত বলিয়া অভিহিত করা হইত। সুতরাং জাতিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় খুব কম সংখ্যক আর্যই পূর্ব দেশে গিয়াছিলেন।

প্রাকৃত যুগেই তালব্য বর্ণগুলি ঘৃষ্ট বর্ণে (Affricate) পরিণত হয়; অর্থাৎ চ-কারের উচ্চারণের সময় যুগপৎ চ+শ এই দুই যুক্ত ধ্বনির উচ্চারণ হইত। চ-কারের এইরূপ উচ্চারণ দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে দেখা যায়। এই যুগেই মহাপ্রাণ বর্ণগুলি "হ"তে রূপান্তরিত হয়। যথা—মুখ—মুহ; রুধির—রুহির ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্তন সংস্কৃতেও দেখা গিয়াছিল। যেমন—বৈদিক সংস্কৃত গৃভ্নাতি—সংস্কৃত গৃহ্নাতি। মহাপ্রাণ বর্ণগুলির এইরূপ পরিবর্তন উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় উপ-ভাষা গুলিতে দৃষ্ট হয়। যথা: এখন—এহন; পানি—ফানি—হানি ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্তনের মূলে নিঃসন্দেহে অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড় প্রভাব আছে। যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে স্বরধ্বনি আনয়নের রীতি এই যুগেই দেখা যায়। যথা—রত্ন—রতন; হর্ষ—হরিষ; স্নেহ—সিনেহ; অর্হ—অরিহ প্রভৃতি। অনুরূপ ভাবে দ্রাবিড়

ভাষাগুলিতেও যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে স্বরধ্বনির আগম হয়। যেমন ব্রাহ্মণ—বরামণ; শ্রী—তিরু। এই যুগের ভাষাগুলিতে শ্বাসাঘাত পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পালিতে পাওয়া যায়: ধীতা—দুহিতা; দক—উদক; দানীম্—ইদানীম্। প্রাকৃতে—পাই লাউ—অলাবু; কত্ত—কলত্র ইত্যাদি।

পূর্ব-মগধীয় ভাষাগুলির অন্যতম হইল বাংলা। আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে মাগধী প্রাকৃত তথা মাগধী অপভ্রংশ হইতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। বাংলা দেশে আর্য ভাষা ও ধর্ম অনেক পরে বিস্তৃত হয়। খুব মুষ্টিমেয় আর্য বাংলায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া যান। সুতরাং এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে পূর্ব অঞ্চলের প্রায় সমগ্র অধিবাসীই পূর্বে অন্-আর্য ছিল। মাগধী প্রাকৃতে যে অন্-আর্য উপাদান পাওয়া যায়, শৌরসেনী প্রাকৃতে তাহা দৃষ্ট হয় না। মধ্যদেশই হইল লৌকিক সংস্কৃতের পীঠভূমি। সেইখানেই শৌরসেনী প্রাকৃতের উদ্ভব হয়। সেই জন্য শৌরসেনী প্রাকৃত অনেকটা সংস্কৃত ঘেঁষা। সংস্কৃত নাটকেও দেখা যায় যে অতি নিম্নস্তরের অধিবাসীরা মাগধী প্রাকৃতে কথাবার্তা বলে।

বাংলায় আর্য ভাষা ও সভ্যতা বিস্তৃত হওয়ার পূর্বে কি ধরণের ভাষা প্রচলিত ছিল সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন আমাদের হাতে নাই। তবে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, উচ্চারণ রীতি ও গ্রামের নামগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে দ্রাবিড়, কোল, মোন-খেমর প্রভৃতি জাতির অধিবাসীরা রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করিত। পরবর্তী কালে ভোট-বর্মী শাখার লোকেরা কামরূপ এবং বাংলার পূর্ব ও উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে থাকে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় প্রাপ্ত অনুশাসনগুলিতে এমন কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যে গুলির মূল আর্য ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যথা—পিণ্ডারবীটিজোটিকা, বাল্লহিট্টা, মোডাললন্দী, আউহাগড্ডী প্রভৃতি। গ্রামের নামের শেষে প্রাপ্ত জোল, জোলী, শোল, গুলি, ঝরা, ঝরি, ঝোর (নদী, জল, খাল অর্থে), গুড়া, গুড়ি (নদীর তীর অর্থে), ভিটা, ভিটি (বাড়ী অর্থে); পোল, ভোল (মাঠ অর্থে) প্রভৃতি শব্দগুলি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা হইতে আসিয়াছে।* আবার আম্রেড়িত বা দ্বিত্ব (Reduplicated names), ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দ বোধক (Onomatopoetic and echo words) গ্রামের নামগুলি পরীক্ষা করিলে অষ্ট্রিক বা কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রাবিড় উপাদান লক্ষ্য করা যাইবে। যথা—দমদম, বজবজ, কোল-কোল, লটপটিয়া, ঘোড়দৌড়, দুধেবুধে, হুথাকুথা, হিলিমিলি প্রভৃতি।

গ্রামের নামের শেষে প্রাপ্ত দহ, দা, কোব, কোলা (নদী, জল অর্থে), বাড় (বাহির অর্থে), বির, বু (বন অর্থে) প্রভৃতি শব্দগুলি অষ্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত। গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত চক (বসতি অর্থে), চু, চো, অঙ, অঙা, অঙ্গি (জল, নদী অর্থে) প্রভৃতি শব্দগুলি ভোট-বর্মী ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে বাংলা দেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক ও ভোট-বর্মী জাতির অধিবাসিগণ বাস করিত।

বাংলা ভাষায় নিম্নলিখিত প্রাগ্-আর্য ও উত্তর-আর্য উপাদান লক্ষ্য করা যায়।

(১) বাংলায় অ-কারের উচ্চারণ অর্ধ-বিবৃত (Half-open); কিন্তু সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দীর “অ” সংবৃত (closed)।

সংস্কৃতের আ-কার অ-কারের দীর্ঘরূপ। কিন্তু বাংলার “আ” অ-কারের দীর্ঘরূপ নহে। আমরা পড়ি, স্বরে-অ, স্বরে-আ। বাংলায় অ-কারের এইরূপ উচ্চারণ উড়িয়া ও অসমিয়া ভাষায়ও দেখা যায়। অ-কারের এইরূপ বিবৃত উচ্চারণের মূলে খুব সম্ভবতঃ অষ্ট্রিক বা ভোট-বর্মী প্রভাব আছে।

(২) পূর্ববঙ্গে এ-কারের উচ্চারণ (অ্যা) অর্ধ-বিবৃত। উহা নিঃসন্দেহে ভোট-বর্মী ভাষার প্রভাবের ফল।

(৩) সংস্কৃতের তালব্য বর্ণগুলির উচ্চারণের ধারা প্রাকৃত যুগ হইতেই পরিবর্তিত হইতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের চলিত ভাষায় “চ”এর উচ্চারণ চ+শ এই দুই বর্ণের মিলিত উচ্চারণ (Palatal affricate)। “চ”এর এইরূপ উচ্চারণ

[* মৎলিখিত “বাঙলার গ্রামের নামে অনার্য ও দেশী উপাদান” প্রবন্ধ—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য]

দ্রাবিড় ভাষার বৈশিষ্ট্য। আবার পূর্ববঙ্গে "চ"এর উচ্চারণ ত+শ এই দুই ধ্বনির মিলিত উচ্চারণের (Dental affricate)। "চ"এর এইরূপ উচ্চারণ ভোট-বর্মী ভাষায় লক্ষ্য করা যায়।

(৪) মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক ভাষা হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

(৫) পূর্ববঙ্গের উপ-ভাষাগুলিতে ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণগুলি কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণরূপে (Glottal stops) উচ্চারিত হয়। মারাঠী ও গুজরাটী ভাষাগুলিতেও কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণের সন্ধান মিলে। আবার সিন্ধী ভাষায় অঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণগুলি কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। মহাপ্রাণ বর্ণগুলির এইরূপ উচ্চারণ রীতি ভারতের অন্য কোন অঞ্চলের আর্য ভাষায় পাওয়া যায় না। "জার্মান" ও "আরবী" ভাষায় কণ্ঠনালীয় স্পর্শ বর্ণ আছে। আদি আর্য ভাষার কোন স্তরে এইরূপ উচ্চারণ রীতি ছিল কিনা তাহা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। হোর্নলে সাহেবের মত হইল এই যে—আর্য জাতির দুইটি প্রধান দল ভারতে আসিয়াছিলেন। প্রথম দলে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা মধ্যদেশে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় দল আসিয়া পূর্ববর্তীদলকে তাহাদের স্বদেশ-ভূমি হইতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বিতাড়িত করেন এবং তাঁহারা সেই অঞ্চলে স্থিতি করেন। ইহারাই অন্তরঙ্গ আর্য (Inter Aryan) বলিয়া কথিত। প্রথম দলের আর্যেরা সিন্ধু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলসমূহে ছড়াইয়া পড়েন। পরে তাঁহারা মগধ, বাংলা প্রভৃতি দেশে গমন করেন। ইহাদের বহিরঙ্গ আর্য (Outer Aryan) বলা যায়।

অন্তরঙ্গ আর্যেরাই বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। অপর পক্ষে বহিরঙ্গ আর্যেরা অবৈদিক ছিলেন। গ্রীয়র্সন (Grierson) সাহেব হোর্নলেকে অনুসরণ করিয়া ভাষাতাত্ত্বিক ভিত্তিতে নব্যভারতীয় আর্য ভাষাগুলিকে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ এই দুই ভাগে ভাগ করেন। বাংলা, উড়িয়া, অসমিয়া, সিন্ধী, কাশ্মীরী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাগুলি হইল বহিরঙ্গ এবং পশ্চিমা হিন্দী ও পাঞ্জাবী হইল অন্তরঙ্গ আর্য। আর্য ভাষাগুলির এই দুই প্রকার বিভাগ আচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার করেন নাই। কারণ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া বহিরঙ্গ আর্য ভাষাগুলির মধ্যে বিশেষ মিল নাই। আবার ঐ ভাষাগুচ্ছের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হিন্দীতেও পাওয়া যায়। তবে কণ্ঠনালীয় স্পর্শ বর্ণের ব্যাপারে বাংলা, গুজরাটী, মারাঠী, সিন্ধী প্রভৃতি ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহাতে বৈদিক যুগে কোন বিশেষ অঞ্চলের আর্যদের কথ্য ভাষার মধ্যে সম্ভবতঃ এই বর্ণগুলির অস্তিত্ব ছিল। আবার অষ্ট্রিক ও ভোট-বর্মী ভাষার মধ্যেও কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণগুলি থাকা সম্ভব। যেমন কোন ভাষায় পাওয়া যায় দা'ক (জল অর্থে)। সুতরাং পূর্ব বাংলায় মহাপ্রাণ বর্ণগুলির কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণরূপে উচ্চারণের মূলে অন্-আর্য প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

(৬) বাংলায় কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যেখানে নাসিক্য ধ্বনির সংস্পর্শ ব্যতীত স্বরধ্বনিগুলি আপনা-আপনিই অনুনাসিক হয়। যেমন কাঁকড়া—কর্কট; নিঁদ—নিদ্রা প্রভৃতি। প্রাকৃত ভাষারও যুক্তব্যঞ্জনসমূহে নাসিক্য ধ্বনির যোগের দিকে ঝোঁক ছিল। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির মধ্যেও নাসিক্যধ্বনি দেখা যায়। যেমন চেঁচান, টেঁক-টেক। এইরূপ স্বতোনাসিক্যভবনের পশ্চাতে অন্-আর্য প্রভাব আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

(৭) অনেক সময় ঋ, র, ষ প্রভৃতি বর্ণের সাহচর্য ব্যতীত দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্য বর্ণে রূপান্তরিত হয়। যেমন ফড়িং—পতঙ্গ; ডাহিন—দক্ষিণ। এইরূপ স্বতোমূর্ধন্যীভবনের মূলে রহিয়াছে দ্রাবিড় কিংবা অষ্ট্রিক প্রভাব।

(৮) বাংলার উপভাষাগুলির মধ্যে দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের উপভাষা (নোয়াখালি-চট্টগ্রাম) একটু স্বতন্ত্র। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মত চট্টগ্রামের উপভাষায় শব্দ মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি প্রায়ই লুপ্ত হয়। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য উপভাষায় যেখানে নাসিক্য ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয় না, এই অঞ্চলের উপভাষায় নাসিক্যধ্বনির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। আবার স্বতোনাসিকীভবন ও উষ্মধ্বনিরও আধিক্য দেখা যায়। যেমন আকাশ—আঁশ, কুকুর—কুঁর; পূজা—ফুজা; পত—ফত ইত্যাদি।

এইরূপ ধ্বনিগত বিশেষত্বের মূলে নিঃসন্দেহে ভোট-বর্মী প্রভাব রহিয়াছে।

(৯) পূর্ববঙ্গে ও অসমিয়া ভাষায় শ, ষ, স অনেক স্থলেই "হ" হয়। প্রাকৃতেও কোন কোন সময় স—"হ"

হয়। যেমন—দিবস—দিঅহ; আবার স্বরমধ্যস্থিত স-কার গ্রীক ও আবেস্তায় অনেক সময় হ-কারে পরিবর্তিত হইয়াছে। যেমন, সংস্কৃত—অসুর—আবেস্তা—অহুর; সংস্কৃত সনস্—গ্রীক হেনেস্। কি কারণে বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় এই শিস্ ধ্বনিগুলি হ-কারে পরিণত হয় তাহা নির্ধারণ করা একটা ধ্বনিতত্ত্বগত সমস্যা। তবে ইহার পশ্চাতে ভোট বর্মী বা অষ্ট্রিক প্রভাব থাকা খুবই সম্ভব।

(১০) পূর্ববঙ্গের উপভাষায় হ-কার কণ্ঠনালীয় স্পর্শ বর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। যথা: হয়—অয়। এইরূপ উচ্চারণের মূলেও অন্-আর্য প্রভাব রহিয়াছে।

(১১) বাংলায় প্রতিধ্বনি বা অনুকার শব্দ (echo-words) ব্যবহারের রীতি আছে। যেমন, ঘোড়া-টোড়া, জলটল, দুধটুদ্, বইটই প্রভৃতি। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতেও অনুরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

(১২) বাংলায় ধ্বন্যাত্মক বা জোড়া জোড়া শব্দ ব্যবহারের রীতির মূলে অষ্ট্রিক উপাদান আছে। গ্রামের নামগুলিতে জোড়া জোড়া শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আবার কুড়ি সংখ্যা (কুড়ি শব্দটি কোন ভাষার অন্তর্গত?) বা গণ্ডা দ্বারা গণনার রীতি কোন ভাষা গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(১৩) পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় শব্দের আদি অক্ষরে যে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে তাহার মূলে দ্রাবিড় প্রভাব আছে। অবশ্য ভোট-বর্মী শাখার অন্তর্গত বোডো ভাষায়ও প্রবল শ্বাসাঘাত লক্ষণীয়। পূর্ববঙ্গের ভাষায় দ্রাবিড় উপাদান কম বলিয়া সেখানকার ভাষায় শ্বাসাঘাত এত প্রবল নহে। আবার কখনও কখনও অন্যান্য শ্বাসাঘাতও দেখা যায়। যেমন পূর্ববঙ্গে মার্থা, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মাঁতা (=মাথা)। উত্তর-পূর্ববঙ্গের ভাষায় সময় সময় সুর ও (Intonation) লক্ষ্য করা যায়।

(১৪) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে প্রত্যেক বাক্য বা চরণকে কয়েকটি পর্বে (Sense group অথবা Breath group) ভাগ করা হয় এবং এক একটি পর্বে এক বা ততোধিক শব্দ থাকে। প্রত্যেক পর্বের প্রথম শব্দের আদি অক্ষরে যে শ্বাসাঘাত পড়ে তাহার মূলেও রহিয়াছে দ্রাবিড় প্রভাব।

(১৫) বাংলায় বহু বচনের পদ বুঝাইবার জন্য গণ, গুলা, সব প্রভৃতি বহুবাচক বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। দিয়া, থাকিয়া, হইতে প্রভৃতি অনুসর্গের সহায্যে কারকের অর্থ জ্ঞাপিত হয়। এই ব্যাপারে দ্রাবিড় ভাষাগুলির সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

(১৬) প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে স্ত্রী প্রত্যয় পাওয়া গেলেও আধুনিক বাংলায় এইগুলি লুপ্ত হয়। ভোট-বর্মী বা অষ্ট্রিক ভাষায় লিঙ্গভেদ নাই। সুতরাং বাংলায় লিঙ্গভেদের পার্থক্য দুরীভূত হওয়ার মূলে ভোট-বর্মী বা অষ্ট্রিক প্রভাব থাকিতে পারে।

(১৭) বিশেষণের স্তর বুঝাইবার জন্য বাংলায় সংস্কৃতের তর, তম, ঈয়স্, ইষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। সবার চেয়ে ভাল, এর মধ্যে ভাল, এইরূপ প্রয়োগের মূলে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব আছে।

(১৮) বাংলায় কর্তৃকারকের বিভক্তি "এ"এর সহিত করণের বিভক্তি—"এ"এর মিশ্রণকে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক ভোট-বর্মী ভাষার প্রভাবের ফল বলিয়া মনে করেন। ভোট-বর্মী ভাষায় এইরূপ বিভক্তির মিশ্রণ ঘটে।

(১৯) করণ, অপাদান ও অধিকরণের বিভক্তির মিশ্রণ কিংবা এক কারকের অর্থে অন্য কারকের বিভক্তির প্রয়োগের মূলে দ্রাবিড় প্রভাব আছে।

(২০) বাংলা এবং অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় ল্যবর্থ অসমাপিকার (Conjunctive or Gerund) ব্যবহার খুব বেশি। এই ব্যাপারেও দ্রাবিড় প্রভাব অনস্বীকার্য।

(২১) বাংলা এবং অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলিতে যৌগিক ক্রিয়ার প্রচলন আছে। দ্রাবিড় ভাষা হইতেই এই রীতি আর্য ভাষায় গৃহীত হইয়াছে।

(২২) বাংলায় বাক্যে অনেক সময় ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় না। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতেও এই রীতি দেখা যায়।

মোটামুটি এইগুলি হইল বাংলা ভাষার উপর প্রাগ-আর্য ও উত্তর-আর্য উপাদান। উপরের এই আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর অধিবাসীরা রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গে বাস করিত। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলিতে দ্রাবিড় উপাদান কম; অষ্ট্রিক ও ভোট-বর্মী ভাষার উপাদান বেশী। আবার দক্ষিণ-

পূর্ববঙ্গ ও কামরূপের ভাষায় ভোট-বর্মী ভাষার প্রভাব বেশী, অষ্ট্রিক উপাদান অল্পস্বল্প আছে। দ্রাবিড় উপাদান খুবই কম।

বাংলার শব্দভাণ্ডারে প্রচুর শব্দ পাওয়া যায়—যেগুলিকে "দেশী" বা "দেশজ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যেমন, ঝাড়, ঝোঁপ, ঝিঙ্গা, আড্ডা, খড়, গোড়, ঢাক, ঢেঙ্গা, ঢেঁকুর, ঢেড়স, ঢোল, হুড়কা, হাঙ্গর প্রভৃতি শব্দ। গ্রামের নামগুলিতে বহু দেশী শব্দের সন্ধান মিলে। যথা, ছল, ঝিকর, টিটা, টেঁক, টিকর, ডাঙ্গা, হোগল ইত্যাদি। ইহাদের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। কিন্তু এই শব্দগুলি কোথা হইতে আসিল? এইগুলি নিশ্চয়ই ভারতের আদিম অধিবাসীদের ভাষাগুলি হইতে আসিয়াছে। দ্রাবিড়, কোল, ভোট-বর্মী কিংবা মোন-খেমর ভাষাগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিলে এই জাতীয় অনেকগুলি শব্দের মূল জানা যাইবে। আবার ভারতে আর্যদের আগমনের পর কোন কোন অন্-আর্য জাতি এবং সম্ভবতঃ তাহাদের ভাষার অবলুপ্তি ঘটিয়া থাকিবে। সেই সমস্ত অবলুপ্ত ভাষা হইতে যদি কিছুসংখ্যক শব্দ প্রাকৃত কিংবা আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে আসিয়া থাকে তাহা হইলে সেই সব শব্দের মূলনির্ণয় করা কঠিন হইবে। ভারতে ফিন্নো-উগ্রীয় বা ককেশীয় গোষ্ঠীর কোন জাতি বাস করিত কিনা এবং তাহাদের ভাষা হইতে কিছু শব্দ ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলিতে আসিয়াছে কিনা তাহাও বিশেষভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বুরু-সস্‌দি (Buru-Shaski) ভাষা পাওয়া যায়। অনেকের মতে এই ভাষা ককেশীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

ভারতের ভাষাগুলির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমায়িত। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রচিত পুস্তকগুলিই আমাদের প্রধান উপজীব্য। আমাদের দেশে সংস্কৃতের অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে পরিচিত নহেন। তাঁহারা মনে করেন বেদ মানুষের রচনা নহে। উহা নিত্য ও অপৌরুষেয়। ভারতই আর্যদের আদি বাসভূমি। তাঁহারা অন্য কোন দেশ হইতে ভারতে আসেন নাই।

গ্রীয়র্সনের রচিত "Linguistic Survey of India" নামক বিরাট গ্রন্থেরও সংস্কারের প্রয়োজন আছে। কোল বা ভোট-বর্মী ভাষা-গোষ্ঠীর এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কোন অনুশীলন সম্ভব হয় নাই। আবার মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পায় খনন কার্যের ফলে যদি প্রাচীন কোন ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর্য ভাষার ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদের অনেক পরিবর্তনও পরিবর্ধন হইতে পারে। যেমন, "হিট্টাইট" ভাষা আবিষ্কৃত হওয়ার পর আর্যদের মূল ভাষাকে ইন্দো-য়ুরোপীয় না বলিয়া ইন্দো-হিট্টাইট বলিলে (Indo-Hittite) বলিলে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হয়। কেননা হিট্টাইট প্রত্নলেখে এমন কয়েকটি প্রাচীন শব্দের সন্ধান পাও যায় যেগুলি সংস্কৃতে বা ঈরাণীয় ভাষায় পাওয়া যায় না। ভারতের প্রাগ-আর্য ও উত্তর-আর্য ভাষাগুলির সম্বন্ধে যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গবেষণা করা হয় এবং ইহাদের তুলনা-মূলক ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত ভাষার সঙ্গে আর্য ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের পথ সহজ ও সুগম হইবে। অধিকন্তু প্রাচীন ভারতের সমাজিক, রাজনীতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোকপতি করা সম্ভব হইবে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জীবনটা আবার একটা নতুন লয়ে, নতুন করে শুরু হল যেন।

নতুন করে ডাক আসতে লাগল গান গাইবার জন্যে। আরো দূর দূরান্তের ডাক। দোকান ঘরটা হয়ে উঠল দরখাস্ত লিখার অফিস ঘর। যদিও বাংলা দরখাস্তই সব। পাড়া-বেপাড়ার অনেকেরই ভিড়। দরখাস্ত অধিকাংশই পৌরসভার। তা ছাড়া জমিদারি উচ্ছেদের পর, বি. ডি, ও-র অফিসের দরখাস্ত। জমিদারের খাজনা এখন সরকারের প্রাপ্য। সেখানেও নানান গোলমাল।

কাজের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব কিছু ছিল না। কিন্তু জীবনের নানান দিকে সে যেন বেড়া দিয়ে রেখেছে। জোর করে ধরে রেখেছে। লাগাম দিয়ে বেঁধে রাখার মতো।

অথচ গিনি স্বাভাবিক আছে। যেন কিছুই হয় নি। যেমন ছিল তেমনি, সংসার করছে। স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে। কিন্তু অভয় পারছে না। নিজেকে তার খাটো লাগছে। কথনো কথনো গিনির স্বাভাবিকতা স্পর্ধা বলে মনে হচ্ছে। যেন অভয়কে অশ্রদ্ধা করছে। মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে অভয়ের। তাতে গিনির অবস্থা দেখে আবার বিমর্ষ হয়ে ওঠে।

কদিন ধরে বারেবারেই সুবালার কথা মনে পড়তে লাগল। আবার নিজেকে ভয়ও করতে লাগল। তারপর একদিন বিকেল বেলায় গিয়ে উপস্থিত হল। প্রথমেই রাজুবালার সঙ্গে দেখা। উঠোনে বসেছিল রাজু। একটি মেয়ে পা টিপে দিচ্ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে বসল, এসেছ? বাব্বা! রোজ সুবালা তোমার নাম করে। আজও দুকুরে বলেছে, 'দেখলে তো মাসী, আর সে এখন এখানে আসবে না। এখন তার কত নাম ডাক। দয়া করে সেই কবে একদিন নাকি রাত্রে এসেছিল, তা আমার খেয়ালও নেই। আর সে দয়া হবে না।'

অভয় বলল, রাজুমাসী, অত সাহস আমার নেই যে, দয়া করব। কোথায় সুবালা? রাজুবালা বলল, দেখ তো, একটু আগে বোধহয় ঘুম থেকে উঠেছে। ঘরেই আছে।

কিন্তু আবার সেই বুকের ঢেউ। গিনি যেন অনেকটা আকস্মিক। কিন্তু সুবালা যেন বহুদিন ধরে, বহুদূর থেকে একটি সুতোর সঙ্গে বাঁধা। সরে গেলে, ভুলে গেলেও, ওই বন্ধন শেষ হয়ে যায় না। তাই ভয় হয় সুবালার কাছে আসতে। অথচ, নিমির মৃত্যুর জন্যে এক রকমের দায়ী করে, সুবালাকে সে ঘৃণা করতে চেয়েছিল। সেটা যে জোর করে, আজ তা বুঝতে বাকী নেই।

ঘরের সামনে এসে দেখল দরজা খোলা। সুবালা মেঝেয় বসে আছে পা ছড়িয়ে। বোতল সামনেই। গেলাস নিয়ে সবে মুখে তুলতে যাচ্ছে। অভয়কে দেখে থমকে গেল। গেলাস রেখে উঠে দাঁড়াল। বলল, তুমি।

অভয় বলল, অসুবিধে করলাম নাকি?

—একটুও না। আশা করিনি তো যে আসবে। এই সবে মুখে তুলতে যাচ্ছিলাম। ভালই হয়েছে।

বলে বোতল গেলাস তাকে তুলে রাখল। ফিরে বলল, বস।

অভয় মেঝেতেই বসল। সুবালা বললে, প্রথম দিন

এসেও মেঝেতেই বসেছিলে। ইচ্ছে না থাকলে, বিছানায় বসতে বলব না।

অভয় দেখল, মুখ ফোলা সুবালার। বয়সেরও অকাল ছাপ পড়েছে যেন। চোখের কোল থলের মতো দেখাচ্ছে। শরীরের বাঁধুনি কোথাও শিথিল হয়নি। বলল, সেদিন আর থাকতে পারিনি, তোমার বাড়ী চলে গেছলাম।

—শুনেছি। কিন্তু থাকতে না পারার মতন—

—তা বলতে পার। কী জানি! তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল।

বলেই একটা লম্বা হাই তুলে চোখ সরিয়ে নিল সুবালা। একটু ঝিম্‌ঝিম্ হাসি হেসে বলল, এ সময়ে একটু না খেলে, চোখ মেলতে পারিনা।

অভয় বলল, তবে খাও একটু।

—বলছ?

—হ্যাঁ। অসুবিধে করে লাভ কি?

চোখে চোখে তাকিয়ে, সুবালা বলল, হ্যাঁ, একটু খাই, নইলে কথা বলতে পারব না।

বলে, গেলাসের মদটুকু চুমুক দিয়ে একবারেই খেয়ে ফেলল। কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে চুপ করে রইল। চোখ যখন মেলল, তখন লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু আবার খানিকটা ঢেলে নিল।

অভয় বলল, বড্ড খাচ্ছ আজকাল।

—হ্যাঁ। নইলে পারি না।

—কিন্তু শরীরটা—

—শরীর!

কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিল সুবালা। অভয় আবার বলল, গান গাওয়া তো ছেড়ে দিয়েছ।

—ভাল লাগে না।

—কেন? কেন এরকম হল তোমার?

—কী জানি। খালি রাগ হয়, ঘেন্না হয়।

—কাকে?

—সবকিছুকে, সবাইকে।

চোখ ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, তোমাকে নয়।

—ঠাট্টা করছ?

—জ্ঞানে কোনদিন তো করিনি।

বলে সুবালা গেলাসের মদটুকু একচুমুকে খেয়ে নিল। সরিয়ে রাখল গেলাস।

অভয় বলল, কেন রাগ কিসের? কী চাও?

—তা জানিনে বলেই তো রাগ হয়। কেবলি মনে হয়, কী করলাম! কী করলাম জীবনে।

সুবালার মুখ একটু একটু করে লাল হচ্ছে। চোখে ঈষৎ মত্ততার আভাস। হঠাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে দু' হাতের ওপর চিবুক রাখল। তার মাথা অভয়ের পায়ের কাছে এসে পড়ল। বলল, আমার মাথায় একটু হাতটা দাওনা।

অভয়ের বুকের স্পন্দন বাড়ছে। কিন্তু সুবালার গলার স্বর শুনে সে আপত্তি করতে পারল না। সে সুবালার মাথায় হাত রাখল। যেন জ্বলন্ত কয়লা, এত গরম মাথাটি।

সুবালা বলতে লাগল, অথচ দেখ, সংসারের কতগুলি আজে বাজে দুঃখে পড়ে, বড় সুখের আশায় বেরিয়ে এসেছিলাম। সে সুখও পেলাম না। এখন ছাই, পাল্টা দুঃখ যে কি তাও বুঝতে পারি না। গান-বাজনা রান্না-বান্না শিখেছিলাম। নভেলটভেল পড়ার মতন বিদ্যে বুদ্ধিও ছিল। একটু বোধহয় বেশী ছিল, তাই কোথাও কোনো কাজে লাগল না।

চুপ করল। অভয় তার নিজের অজ্ঞান্তেই সুবালার মাথা তার পায়ের ওপর টেনে নিল। তার কষ্ট হচ্ছে সুবালার জন্যে।

সুবালা আবার বলল, কেউ যদি নিয়ে গিয়ে আমাকে আটকে রাখত, খাটাতো, কথা না শুনলে মারধোর করত, তা হলেও বোধহয় বেঁচে যেতাম।

বলে মুখ ফিরিয়ে অভয়ের দিকে তাকাল। অভয় দেখল, সুবালার মত্ত চোখে জল। কিন্তু হাসছে সে। অভয় সুবালার গালে হাত দিল।

সুবালা বলল, তুমি নেবে আমাকে?

অভয় প্রায় অস্ফুট গলায় বলল, তুমি যাবে?

সুবালা হাসল। বলল, দোহাই তা বলে যেন বলে বস না, সত্যি নিয়ে যাবে। তবে, একটা সত্যি কথা বলব?

—বল।

—এ ঘরে অনেক বড় মানুষ এসেছে। বাইরেও অনেক মানুষ দেখেছি। তোমার মতন এমন সরল আর তেজী মানুষ দেখিনি।

—এমন বলো না সুবালা।

—সত্যি যে! বিদ্যায় অর্থে নয়, আর কিছু, যা সংসারে সকলের থাকে না।

— এসব কথা থাক সুবালা।

—তবে থাক্।

থাক্, কিন্তু বেদনার রূপ ধরে, এক বিচিত্র প্লাবন আবার ভাসিয়ে নিতে লাগল অভয়কে। সে সহসা নীচু হয়ে বলল, সুবালা, আমি তোমাকে ভালবাসি।

সুবালা স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। অভয় সুবালাকে টেনে নিজের দেহের ওপরে তুলে আনল। ডাকল, সুবালা!

সুবালা যেন হঠাৎ মাতালের মত অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ল। বলল, উঁ? অভয় নীচু রুদ্ধশ্বাস গলায় আবার বলল, সুবালা, তোমার কাছে আসবার কথা রোজ ভাবি।

সুবালা আচ্ছন্নের মতো জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, আমি জানি, সেই প্রথম দিন আসা আর এক রাতে ফিরে যাওয়াটা তোমার মধ্যে যুলোচ্ছে।

—সুবালা!

প্রতিবাদে ও যন্ত্রণায় তীক্ষ্ণ শোনাল অভয়ের গলা। সরিয়ে বসিয়ে দিল সুবালাকে। সুবালা চমকে তাকাল। চকিতে হাত বাড়িয়ে অভয়ের হাত ধরল। বলল, বিশ্বাস কর, অন্যকিছু ভেবে বলি নি। আমি যে ওই দিনগুলি ভুলতে পারি নি, তাই বলেছি।

অভয় যেন মন্ত্রাচ্ছন্নের মতো বিড়বিড় করে বলতে লাগল, সত্যি, সে যে সত্যিই, সত্যি বলেছ। সুবালা, তবু আমি লোকের কাছে ভাল সেজে থাকি।

সুবালা বলল, অভয়, তোমার কি ভগবান হবার পণ?

—না না না। কিন্তু ওকথা বলে নিজেকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না সুবালা।

সুবালা বলল, চাপা দিয়ে রাখবে কেন।

বলতে বলতে সুবালা কাছে এল আরো। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার পর অন্ধকার নেমে এসেছে ঘরে। দু'হাতে সুবালা জড়িয়ে ধরল অভয়কে। বলল, তোমাকে তো আমি চিনি। তুমি তো অন্ধ লোক নও, রক্ত খেয়ে বেড়ানো তোমার স্বভাব নয়, বাঁচা মরা নয়। এই নাও, আমাকে নাও, আজ ফিরে যেও না। নিজেকে ফিরে পাবে তুমি।

—না সুবালা, না। এ আমার এক হঠাৎ কল, হঠাৎ বিকল অবস্থা। ছেড়ে দাও আমাকে।

নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সে বেরিয়ে এল। সুবালা ডাকল, অভয়, শোন অভয়।

অভয় সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল তরতর করে। কোনোদিকে না তাকিয়ে একেবারে রাস্তায় এসে পড়ল। —আঃ! কে আমাকে এমন বিড়ম্বিত করছে। কে এই নিষ্ঠুর উপহাসের খেলা খেলছে আমার ভিতরে বসে।

আবার কলকাতায় ডাক পড়ল গানের। সবাই তাকে ডাকল, সব ডাকে সে সাড়া দিল। কিন্তু তার ভিতরটা কোথায় বরফের মত কঠিন ভাবে জমাট হয়ে রইল।

কেবল তাকে অবাক করল গিনি। ওর কি কোথাও কোনো পরিবর্তন হতে নেই। মাঝে কিছুদিন জ্বরে ভুগেছিল। তাও ভামিনীর কাছে প্রথম জানতে পারা গেছল, গিনি জ্বরে ভুগছে। আর পরিবর্তন শুধু চেহারায়। স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছিল।

অনাথ খুড়ো আবার আসতে আরম্ভ করেছে। গণেশবাবুও দেখা হলে, ডেকে কথা বলেন। কিন্তু কোনো পক্ষেরই আগের সেই উচ্ছ্বাস আর নেই।

জীবনচৌধুরীমশাই একেবারে শয্যা নিয়েছেন।

এদিকে দোকানটা উঠে যাবার অবস্থায় এসে পৌঁচেছে।

এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন রেডিও প্রোগ্রামে কবি গান গেয়ে এসে শুনল, সুবালাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। রাজুবালার কাছ থেকে সব শুনল অভয়।

আজ বিকেলে সুবালা বড় রাস্তার দিকে তার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। কালীতারা বাড়িউলীর বাড়িতে সম্প্রতি একটি নতুন মেয়ে এসেছে, নাম মালতী। দেখতে সুন্দর। তাকে সবাই বলে লাল মালতী। কারণ সে সব সময়েই লাল পাতলা শাড়ি, আর হাত কাটা লাল ব্লাউজ পরে থাকে। সুবালা রাস্তা দিয়ে মালতীকে হেঁটে যেতে দেখে

ডেকেছে। মালতী শোনে নি। কারণ সে মালতী নয়। সে পিছন ফিরে ছিল।

সুবালা বলেছে, ওলো ও লাল মালতী। তোর যে কানে কথাই যায় না।

তখন রাস্তার সেই মেয়ে ফিরে তাকিয়েছে। চোখে তার আগুন। বলেছে, বড় বেশী বেড়ে উঠেছ না? রাস্তা দিয়ে তোমরা ছাড়া আর কেউ চলে না?

সুবালা বলেছে, চলে, অত বুঝতে পারি নি।

সেই মেয়ে বলেছে, কিন্তু বুঝতে হবে, সেটা মনে রেখ। না বুঝলে, ডাকবে না।

কিন্তু সুবালা কেমন মেয়ে, সকলেরই জানা। সে বলে উঠেছে, পোশাক দেখলে তো সব টের পাওয়া যায় না।

সেই মেয়ে বলেছে, তাই নাকি? আচ্ছা।

বলে, সঙ্গে সঙ্গে রিকশা ডেকে ফিরে গেছে। কে জানত, সেই মেয়ে আবার এ শহরের নতুন বড় দারোগার মেয়ে। একটু পরেই পুলিশ বোঝাই গাড়ি নিয়ে, একেবারে সেই মেয়ে এসে উপস্থিত। কালবিলম্ব না করে, একেবারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে, সবাই দোতলায় ছুটে গেছে। যেন একদল খ্যাপা নেকড়ের মত ঢুকেছে গিয়ে সুবালার ঘরে। একজন এস-আই সঙ্গে ছিল। সে মেয়ে পুলিশের হাত থেকে লাঠি নিয়ে বলেছে, পোশাক দেখে চিনতে পার না, তাই চেনাতে এলাম।

বলে লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি মেরেছে।

সুবালা চিৎকার করে বলেছে, দারোগার মেয়ে বলে আপনি মগের মুলুক পেয়েছেন? কেন মারবেন আপনি আমাকে?

সেই সুবালা! তার অসহায় অবস্থা কল্পনা করে অভয়ের বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল।

তারপর পুলিশেরা তার চুলের মুঠি ধরে, আছড়ে মেঝেয় ফেলে মেরেছে। বলেছে, আবার বড় বড় কথা?

বলে রক্তাক্ত অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় চুল ধরে টেনে নিয়ে গেছে থানায়।

অভয় দেখল, সমস্ত পাড়াটা থম্‌থম্‌ করছে। কেউ দরজায় দাঁড়ায়নি। লোক জন নেই একটিও। অভয় সোজা থানায় গেল। স্বয়ং ও, সি বসেছিলেন। অভয় নমস্কার করল। মাথা নেড়ে বললেন, কী চাই?

অভয় বলল, আমি সুবালার জন্য এসেছি।

—সুবালা কে? সেই বেশ্যাটা?

—হ্যাঁ।

—তুমি কে? তোমার রক্ষিতা?

—না। আমি প্রতিবেশী।

—মানে দালাল, অ্যাঁ?

—না।

ও, সি চিৎকার করে ধমকে উঠলেন, না মানে কী? নিশ্চয়ই তাই। তা নইলে এসেছ কেন তুমি?

অভয়ের চোখে রক্ত উঠে এসেছিল। সে বলল, সেটা আপনি বুঝতে পারছেন না বলেই, তখন থেকে আমাকে তুমি তুমি করে যা খুশি তাই বলছেন।

—বটে?

অভয়ের আপাদ মস্তক দেখলেন ও, সি। ডাকলেন, নিরঞ্জনবাবু, দেখুন তো একে চেনেন নাকি?

পাশের ঘর থেকে এস, আই বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোক এ শহরের পুরনো মানুষ। বললেন, হ্যাঁ, চিনি বৈকি। একজন নাম-করা কবি-গায়ক।

ও, সি বলে উঠলেন, ও, সেই অভয় পদ দাস। জুট স্ট্রাইকে একবার জেল হয়েছিল, না?

নিরঞ্জনবাবু বললেন, হ্যাঁ স্যার।

ও, সি—কিন্তু ওই বেশ্যাটার জন্যে এ কেন? এতে যে নিজেরই সম্মান যাবে।

অভয় নিজেই বলে উঠল, সে সম্মান থাকলে তো আসতামই না। ও তো আপনার আমার মতোই এ দেশের আইনত অধিবাসী আর ভোটার। মেয়েটিকে বেল দিতে পারার মতো কেস্‌ কি না, সেটা আমাকে বলুন।

ও, সি তাঁর কাগজ থেকে মুখ তুলে একবার দেখলেন অভয়কে। বললেন, আজ সে সব কিছুই বলতে পারব না। বেল দেবার কোনো প্রশ্নই নেই। শহরকে স্যুয়েল করা আর ভদ্রলোকের মেয়েকে বেশ্যাবাড়িতে ডেকে নিয়ে যাবার কী সাজা হয়, তা আমি দেখাব।

অভিযোগের বিবরণ দিয়েই দিলেন ও, সি। অর্থাৎ, তার মেয়েকে সুবালা বেশ্যাবৃত্তিতে প্রলুব্ধ করার জন্যে ডেকেছিল।

অভয় বলল, ওর সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে ?

ও, সি বললেন, না।

তবু অভয় দাঁড়িয়ে রইল।

—কী হল ?

অভয় বেরিয়ে এল আস্তে আস্তে। হাজতঘর অফিসের পিছনে, সে জানে। অফিস না ডিঙিয়ে সেখানে যাবার উপায় নেই। কিন্তু কেমন আছে সুবালা! সেই সুবালা! যে দেশে সমাজের ভদ্রলোকদের জীবনেরই কোনো দাম নেই, সেখানে সুবালার মতো একজন দেহোপজীবিনীর প্রাণের কী মূল্য আছে। কিন্তু কার কাছে যাবে এখন অভয়। একমাত্র জীবন চৌধুরীর কথা মনে পড়ছে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। শুনলে পরেও না জানি কী ভাববেন। গণেশবাবু আছেন। সেটা আরো খারাপ হবে। এমনিতেই তিনি চান, অভয় যেন মালীপাড়া ছেড়ে একটা অন্য পাড়ায় বাসা নেয়।

তবে কী হবে সুবালার। কেমন আছে সে, কে জানে।

বাড়ী ফিরে এল অভয়। এসে চুপ করে বসে রইল দাওয়ায়। গিনি তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল, কেমন দেখে এলে সুবালাদিকে ?

—দেখতে দেয় নি।

—কেন ?

—পুলিশের ইচ্ছে।

গিনি চুপ করে রইল। দূর অন্ধকারে সরে রইল।

অভয় পায়চারি করতে লাগল।

রাত গভীর হয়ে এল। এই নিশীথের সুপ্তিমগ্নতার মধ্যে, সুবালার জন্যে কোথাও একটু দাগ পড়েনি। সুবালার জীবনটা সব দিক থেকেই যেন কেমন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছিল। সব কিছুকে সে ঘৃণা করেছিল।

সহসা কে যেন বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল। ডাকল, জামাই।

অভয় তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।—কে ?

—আমি। রাজুমাসী পাঠালে। ওরা সুবালাকে দিয়ে গেছে। তুমি এস।

মেয়েটি সুবালাদেরই সঙ্গিনী। অভয় বেরুতে গিয়ে একবার পিছন ফিরল। পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছিল গিনি। সে বলল, ঘুরে এস তুমি।

অভয় বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু মেয়েটিকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস করল না। রাজুবালার বাড়িতে এসে যখন পৌঁছুল, তখন তার ভয়ই সত্যি হয়ে দেখা দিল। সুবালার অবস্থা খারাপ। উঠোনের ওপরে, একটা মাদুরে সে শোয়ানো। ডাক্তার দেখানোর কোনো চিহ্ন নেই। সর্বাঙ্গে আঘাতের দাগ। মাথায় মুখে রক্ত।

অভয় কাছে এসে বসল। সুবালা তাকিয়েছিল। আঙুলের ইশারায় কাছে ডাকল। অভয় ঝুঁকে পড়ল। সুবালার হাত ধরল। হিম ঠাণ্ডা হাত।

অভয় বলল, রাজুমাসী, একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।

মাথা নড়ে উঠল সুবালার। অভয় ফিরে তাকাল। ঠোঁট নড়ল সুবালার। স্বর নেই। প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, মরে যাচ্ছি।

মেয়েরা সব ঘিরে দাঁড়িয়েছে। রাজুবালা কেবল বলল, আশ্চয্যি, এই সুবালারও বাবা ছিল এক দারোগা।

অভয় অবাক হয়ে তাকাল রাজুবালার দিকে। রাজুবালা আপন মনে বলে গেল, ভদ্রলোকের মেয়ে, গুণী মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল একটা ছাগলের সঙ্গে।…

সুবালা হঠাৎ বলল, প্রায় চুপি চুপি, না, মানুষই ছিল মাসী।

সুবালার মুখটা একেবারে শাদা দেখাচ্ছে। রক্ত কালো হয়ে এসেছে। ডাকল, অভয়।

—বল।

—হাতটা দাও।

সুবালার ঠাণ্ডা হাতে হাত দিল অভয়। সুবালা বলল, এ নিয়ে যেন কোন হৈ হুজ্জোৎ কর না আর। এই মার খেয়ে মরা আমার ভাল হল।

হঠাৎ শুব্ধ হয়ে গেল সুবালা। সবাই ঝুঁকে পড়ল। অভয় ডাকল, সুবালা।

চোখ বোজা অবস্থায়, সুবালা যেন হাসল। ডাকল, অভয়।

—বল।

—আমি নিমির কাছে যাচ্ছি না।

অভয়ের বুকের মধ্যে কথা আটকে গেল।

সুবালা আবার বলল, সে ছিল এক, আমি আর এক। নইলে তোমার কথা ওকে বলতাম! অভয়!

—বল।

—তুমি খুব বড় মানুষ।

—সুবালা, তুমি এবার চুপ কর।

সুবালা বলল, করব। কিন্তু অভয়, তুমি ভেবেছ, বড়-মানুষ দশজনের মতন হয় না।

—কেন সুবালা।

—তুমি কাউকে একটু প্রাণ ধরে বুকে নিতে পারনা। ওসব মিথ্যে। অভয়!

—বল।

সুবালার চোখ ভেসে জল এল। ডাকল, অভয়।

অভয় বলল, বল সুবালা।

সুবালা আবার ডাকল, অভয়।

অভয় আরো জোরে বলল, কী বলছ সুবালা।

সুবালার ঠোঁট নড়তে লাগল, অভয়···অভয়···।

রাজুবালা বলল, অভয়, সুবালাকে জড়িয়ে ধরে রাখ। ও ভয় পাচ্ছে।

অভয় সুবালাকে জড়িয়ে ধরল। অভয়ের আলিঙ্গনের মধ্যে সুবালা মারা গেল।

এর পরে অনেকদিন অভয় কোথাও যায়নি। দোকানে মালপত্র প্রায় শূন্য। খুলে বসেনি সেখানে। গানের আমন্ত্রণ নেয়নি। সংসারের সঙ্গে গিনির সম্পর্ক, গিনিই জানে। আর গিনির জানার মধ্যে একমাত্র স্বরীন ভামিনী।

কিন্তু অনাথ ছাড়ল না। সে অনেক বদলেছে। এখন নাকি গণেশবাবুই দলত্যাগে উদ্যত। অনাথ প্রায় রোজ আসে। টানাটানি করে বাইরে। তারপর জোর করেই অনাথ শহরের সদর পার্কের এক অনুষ্ঠানে, কবি-গানের আসর ডেকে বসল এবং জোর করেই ধরে নিয়ে গেল অভয়কে।

হারু বায়েনের ঢোলক শুনে রক্তে একটা ধ্বনি বাজল। কিন্তু চোখের সামনে ভাসতে লাগল সুবালার মুখ।

শেষ পর্যন্ত আসরে দাঁড়াল অভয়। সুবালার কাহিনী গাইল সে। সমস্ত কাহিনী, যেমনটি যা হয়েছিল। সুবালার মৃত্যু পর্যন্ত এবং শেষ পর্যন্ত অভয় গাইল, গোটা দেশটা সুবালারই মত অসহায়। ক্ষমতার দম্ভের কাছে, সকলেই বলির পশু।

সমস্ত শ্রোতা নতুন করে জানল সুবালার মৃত্যু কাহিনী। আসরের সবাই চিৎকার করে ধিক্কার দিল।

রাত্রে গান শেষ করে বাড়ি ফিরে অভয় আজ নাম ধরে ডাকল, গিনি।

দাওয়া থেকে সাড়া দিল গিনি। হ্যারিকেনের শিখাটা আস্তে আস্তে জেগে উঠল। গিনির মূর্তি জেগে উঠল আলোয়।

অভয় যেন চিনতে পারল না গিনিকে। শীর্ণ, ধূলিচ্ছিন্ন কাপড়। যেন অসুস্থ।

অভয় বলল, ঘুমোওনি।

—না।

গিনির গলা সহজ। কিন্তু অনেকদিন বাদে সেও সহজ গলা শুনছে অভয়ের। তাই তার অসহজ হয়ে পড়ার ভয়।

অভয় কাছে এসে গিনির কাপড়টা হাতে তুলে দেখল। বলল, নেই বুঝি আর?

গিনি বলল, হাত-মুখ ধুয়ে এস।

—ধোব, একটু বস গিনি।

গিনি বসল। অভয় গিনির হাত টেনে নিল। নিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল তার নত মুখের দিকে। তারপর হাত দিয়ে টেনে নিয়ে এল একেবারে বুকের কাছে।

গিনি তাকাল আবার। বলল, খেতে দেব না?

অভয় সহজভাবে আবেগে বলল, না। আমার কাছে একটু বস গিনি।

বলে অভয় স্থির অকম্পিত স্বাভাবিক ভাবে গিনির কপালে চোখে ঠোঁট চেপে ধরল। একটা চাপা আর্তনাদ উত্থিত হল গিনির বুকের তলা থেকে। অভয় বাধা দিল না। শব্দটা বাড়তে বাড়তে, অভয়ের কোলে চেপে ধরল মুখ দিয়ে। গিনির সারা শরীর কাঁপতে লাগল।

অভয় তাকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু কিছু বলল না। আর একটা হাত দিয়ে সে পাশেই নিদ্রিত নিমের গা স্পর্শ করল।

নিমের একটা বড় নিশ্বাস পড়ল। নিমে আরো বড় হয়েছে। জীবন এমনি ছিন্নবাধা।

সমাপ্ত

"ভক্তি ভক্ত সাধু"

যোগেন্দ্র [illegible] শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ২৬।১০।৬৭
গঙ্গাসাগর ২৬ মাঘ ১৩৬৭

শ্রীদিলীপকুমার রায়
প্রেমভাজনেষু

বাবা প্রেমানন্দ, কেমন আছ? ভক্তিমা (ইন্দিরা) ও অন্যান্য বাবারা মায়েরা কেমন আছেন? ঠাকুরের আশীর্বাদ জানাবে। তুমি ঠাকুরের আশীর্বাদ ও সীতারামের ভালোবাসা জানবে।

তোমার উপহৃত ভাগবতী কথা, শ্রুতাঞ্জলি, প্রেমাঞ্জলি, সুধাঞ্জলি ও দীপাঞ্জলি পড়লাম। ভাগবতী কথা এর আগেই পড়েছিলাম। "মোহন বেণু" ব'লে একটি পুস্তক সংকলন করছি, তাতে বাঁশির গান দেব ব'লে শ্রুতাঞ্জলি ও প্রেমাঞ্জলি বোধহয় দু-তিন বৎসর আগে এনে পড়েছিলাম। প্রেমাঞ্জলি প'ড়ে দেখি—সব গানেই বাঁশির কথা আছে, সংকলন করতে হ'লে সমস্ত প্রেমাঞ্জলিই সংকলন করতে হয় দেখে আর সংকলন করিনি। আগে তোমার রচিত একটি গান সংকলন করেছি। এবার প্রেমাঞ্জলি প'ড়ে আবার বাঁশির গান সংকলনের ইচ্ছা হ'ল।

ভক্তি মা-র উপরে মীরা মা-র অপূর্ব লীলা চলছে। এরূপ অভূতপূর্ব লীলার কথা প্রায় শোনা যায় না। মনে হয় মীরা মা-র কৃষ্ণগীতি গেয়ে তৃপ্তি হয় নি, তাই নতুন ক'রে ইন্দিরা মাকে মাঝে রেখে তিনি প্রেমগীতি গাচ্ছেন। অপূর্ব এ-গানগুলি—ভাব ভাষার তুলনা হয় না।

সীতারাম হিন্দি বিশেষ জানে না। তথাপি মীরা মা-র গানগুলি বুঝতে পারলাম—প্রাণ ভ'রে গেল। প্রকৃত ভক্ত না হ'লে এমন ভাব ভাষা ফোটে না। নিত্য নূতন ভাষা ভাব ছন্দের খেলা চলছে, সবই মধুর হ'তে সুমধুর। সার্থক জন্ম ইন্দিরা মা-র, মীরা মার প্রকাশ এতদিন হয় নি এরূপ আধারের অভাবে। ইন্দিরা মা দীর্ঘ জীবন লাভ ক'রে এরূপ সুধা সঙ্গীতে ভক্তগণের মনপ্রাণ ভরিয়ে রাখুন। ভবিষ্যতে ভক্তগণের প্রেমগীতি আস্বাদনের সুযোগ তুমিই উপস্থিত করলে। ঠাকুরই তোমাকে উপলক্ষ ক'রে করালেন, করাবেন। তোমার "ভাগবতী কথা"-র উপমা নাই। মধুর হ'তে মধুর তোমার ভাব ভাষা ছন্দ।

তোমার "অঘটন আজো ঘটে"-তে শ্যামঠাকুর গল্পে (৪১ পৃষ্ঠায়) আনন্দগিরি শ্যামঠাকুরের মেয়ের বিয়ের সময়ে এসে হাজির হ'য়ে বলছেন হেসে: 'কী রে শ্যামলাল? এ বিয়ের কর্মকর্তা বলবি কাকে?" শ্যামঠাকুর গুরুদেবের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন: 'গুরুদেব! কত পাই, তবু ভুলে যাই কেন?'

পড়তে পড়তে চোখে জল এল। স্থান বিশেষে এর আগে মাঝে মাঝে হুংকার বেরুচ্ছিল! ভাই, তোমার "অঘটন আজো ঘটে" কি পুস্তক, না ভক্ত হৃদয়ের অনুপম মধুর শাশ্বত পরমানন্দের আনন্দ উৎস—চোখের জলে, রোমাঞ্চে ওঁ গুরু ও মেঘনাদে শরীর জমাট বাঁধা প্রাণ আনন্দে পূর্ণ! লক্ষ্মী ভাইটি আমার! পরিবেশন ক'রে চলো এমন অমরার অফুরন্ত প্রেমানন্দ—আরো যা জানো।

শাস্ত্র প'ড়েও নিজের সাধারণ দৃষ্টিতে একটা সংস্কার ছিল, কিন্তু তোমার "অঘটন আজো ঘটে-'র সতী চরিত্র প'ড়ে সে-সংশয়ের অবসান হ'ল! অঘটন যে আজো ঘটে "সতী" তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

তোমার বা ইন্দিরা মা-র কোনো বিবরণ জানি না, তবে তোমাকে অনেক দিন থেকে ভালোবাসি—কেন বাসি, তাও জানি না। আজ অসিত ও তপতীর মধ্যে তোমার ও ইন্দিরা মা-র ছন্ম রূপ দেখতে পেলাম। ভালোবাসা জেনো—জানিও।

মীরা মা-র হিন্দি গানের অনুবাদ করেছ—মূল ভালো কি অনুবাদ ভালো বুঝি না।

কী বলব? তুমি পরম ভক্ত, ভগবানের কৃপায় দীর্ঘজীবী হ'য়ে তাপিত জগৎকে ভক্তি সুধাধারায় স্নিগ্ধ করো। সেদিনের তোমার গান ও ইন্দিরা মা-র অশ্রুবিগলিত নেত্রে

"হরিবোল হরিবোল হরিবোল" যারা শুনেছে তারা জীবনে ভুলতে পারবে না।

তোমার
সীতারাম

ওঁ

হরিকৃষ্ণ আশ্রম ২৪.২.৬১.
ইন্দিরা নিলয়
পুণা—৫

শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথ
শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার আশীর্বাদী পত্র পেয়ে শুধু পুলকিত নয়, ধন্য হয়েছি। কয়েকমাস আগে আমাদের মন্দিরে যখন আপনাকে প্রণাম করেছিলাম তখন মনপ্রাণ নির্মল হয়ে গিয়েছিল। না হবে কেন? ভাগবতে স্বয়ং কৃষ্ণ ভক্ত অক্রূরকে বলেন নি কি—

ন হ্যম্মযানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥
তীর্থসলিল, দেবতা, প্রতিমা—করে না-জীবেরে
অমল পলে,
বহু সাধনায় বহু স্নানে তবে শুদ্ধি।
সাধু শুধু দরশনে পরশনে নির্মল তারে করে ভূতলে,
যুগবন্ধন খ'সে পড়ে—লভি মুক্তি।

মনে পড়ে প্রথম আপনাকে দেখেছিলাম কাশীতে—বাইরে থেকে দেখতে মনে হয়—হঠাৎ! কিন্তু গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনেছি জগতে কিছুই হঠাৎ ঘটে না, সাবিত্রীকে তিনি লিখেছেন:

A blind God is not our destiny's architect:
A conscious power has drawn the plan of life.

জীবের নিয়ন্তা নয় অন্ধ ভগবান্। এক চির
সচেতন দিব্যশক্তি ধারয়িত্রী মর্ত্য জীবনের।

আপনাকে দেখেছিলাম গঙ্গার কাছেই। আপনি শিষ্যদের সঙ্গে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" নামগান করতে করতে মোটরে চ'ড়ে বললেন—যেতে হবে দূরে। আমি আপনার সৌম্য দিব্যকান্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে আমাদের শিষ্য শ্রীকান্তকে বললাম আপনাকে জানাতে। আপনি শুনবামাত্র অধীর হ'য়ে মোটর থেকে নেমে এসে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন—বার বার। বললেন ইন্দিরাকে, "মা, তোমার গান আমি বার বার পড়েছি।" আমি বললাম: "ঠাকুর কতদিনের সাধ আজ মিটল, পুণ্যাত্মা আপনাকে দেখলাম পুণ্য কাশীধামে। আর কী চাই?" আপনি হেসে বললেন: "আমিও কি বহুদিন থেকে তোমাকে দেখতে চাইনি ভাই?" যে সত্যি বড়, সে কত সহজে ছোট হয়!

পরমহংসদেব বলতেন—ব্যাকুলতা থাকলে যোগাযোগ হ'য়ে যায়ই যায়। আমাদেরও হ'ল: আমার অসুখের সময়ে আপনি পুণায় আমাদের মন্দিরে পদার্পণ করলেন। সে আনন্দ কি ভুলবার? কত কথা বললেন—ভক্তের, শাস্ত্রের, শাস্ত্রীর, ঠাকুরের। এসব কিছুই অকস্মাৎ ঘটে নি—ঠাকুর চেয়েছিলেন আমরা আপনার আশীর্ব্বাদ পাব—তাই পেয়েছি।

আপনি নামকীর্তন প্রচার করছেন অক্লান্ত প্রেমে। আপনার প্রতি ভঙ্গি থেকে প্রেম শান্তি পবিত্রতা ঝরে। আপনার প্রতি সরল উপদেশ আলো বিলায়। আপনার বালশুভ্র হাসিতে মনের তাপ দূর হয়। সাধু যখন খাঁটি সাধু হ'য়ে ঠাকুরের পাঞ্জা পান তখন তাঁর কথায় সুধা ক্ষরে, তাঁর আদেশে পাহাড় ট'লে যায়। কারণ কী? না, উর্ধ্বমুখী সাধুর মধ্যে দিয়ে ঠাকুরের শক্তি সহজেই নিজের আলো বিতরণ করে—বাধা পায় না নিম্নমুখী মনের হাজারো সংশয়ের, অভিমানের, গ্লানির, নিরানন্দের। আপনাকে দেখে তাই তো মনে হয়েছিল পরমানন্দের কথা। আনন্দময়ের সান্নিধ্যে যাঁর নিত্য অবস্থান তাঁর সামনে নিরানন্দ টি'কবে কেমন ক'রে? আপনার মতন সাধুপুরুষ ভারতের গৌরব। ভারত আজো বেঁচে আছে প্রাতঃস্মরণীয় সাধু সন্তের তপস্যার বলেই তো। মহাভারতে পড়েছিলাম কালকেয় দৈত্যেরা যখন জগৎকে ছারখার করতে চেয়েছিল তখন তারা এই রেজলুশন পাশ করেছিল সবাই মিলে:

যে সন্তি কেচিচ্চ বসুন্ধরায়াং
তপস্বিনো ধর্মবিদশ্চ তজ্জ্ঞাঃ।

তেষাং বধঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রমেব
তেষু প্রণষ্টেষু জগৎ প্রণষ্টম্ ॥

ধরাতলে আছে যারা ধার্মিক জ্ঞানী তপস্বী—তাদের বধ করো আগে—হ'লে তাদের নিধন, ধ্বংস হবে এ-মর জগৎ।

কেন ধ্বংস হবে?

কারণ দৈত্যরা ধরেছিল ঠিকই—"লোকা হি সর্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে"—জগৎ সাধুসন্তদের তপস্যায়ই বিধৃত। "তস্মাৎ তরধ্বং তপসঃ ক্ষয়ায়"—কাজেই আগে তপস্যাকে নির্মূল করো—তপস্বীদের উৎসাদন করো। বটেই তো। নৌকা মাঝদরিয়ায় খরস্রোতে চলেছে—সমস্ত নৌকাটা খণ্ড খণ্ড করতে সময় লাগে, তার চেয়ে হালটিকে দাও না ভেঙ্গে, নৌকা মুহূর্তে হবে বানচাল। দৈত্যরা আর যাই হোক অবোদ্ধা ছিল না—শয়তান জানে দেবতার প্রতিষ্ঠা হয় কার মধ্যে দিয়ে। তাই না আমাদের শাস্ত্রে এত বেশি গুণগান করা হয়েছে সাধুসন্তের, জ্ঞানী ধ্যানীর, এমন কি এমন কথাও বলা হয়েছে যে ঠাকুরের যারা ভক্ত তারা সত্যি তাঁর ভক্ত নয়, যারা ঠাকুরের ভক্তের ভক্ত তারাই ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ভক্ত:

যে মে ভক্ত জনাঃ পার্থ, ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্ত তে নরাঃ ॥

তাই সেদিন সকালে আপনি যখন বলছিলেন যে, কে এক কালাপাহাড় দেবগুরুভক্তদের নিন্দা করেছে, তখন আমার মনে হয়েছিল—কী যায় আসে? ভবাদৃশ সাধুরা যতদিন আছেন ভয় নেই—রবীন্দ্রনাথও বলেন নি কি—

"হালের কাছে মাঝি আছে করবে রে সে পার"?

আপনি শতায়ু হোন—ঠাকুরের নামামৃত বিলিয়ে চলুন আর আমাদের আশীর্বাদ করুন—যেন আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে একান্তী হ'তে পারি, পূর্ণ পবিত্র হ'তে পারি, ঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে বলতে পারি:

যৎ করোমি যদশ্নামি যজ্জুহোমি দদামি যৎ।
যৎ তপস্যামি গোবিন্দ! তৎ করোমি ত্বদর্পণম্

যাহা কিছু করি—ভোগ দান হোম যাগ তপস্যা—যেন সকলি তোমার চরণে ওগো জীবনেশ, অর্পিতে নিতি উঠি উছলি।

ইতি স্নেহধন্য
দিলীপ

কবি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের কয়েকটি কথা

সুনীলময় ঘোষ

কোন এক রসজ্ঞ সমালোচক ব'লেছেন..."সুধীন্দ্রনাথের কবিতা প্রধানতঃ নাটকীয়, রঙ্গমঞ্চের, একটু দূরের, একটু সাজান। অবশ্য সব কবিতাই তাই, তবে অনেক কবিতাই রঙ্গমঞ্চ থেকে নেমে আসে; সুধীন্দ্রনাথের কবিতা নামে না"—বর্তমান কালে এমন যথাযথ রসজ্ঞ চিন্তা সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আর কেউ করেছেন কিনা জানা নেই।

কবিতা পাঠ যাঁরা করেন তাঁরা কবির অতি-ঘনিষ্ঠ সহ-অনুভূতির রসানন্দ লাভ করতে চান। বাঙলা কাব্যের ঐতিহ্যময় ধারায় এ অন্তরঙ্গতা সকল সময় সর্ব অবস্থায় পাঠক লাভ ক'রেছেন, তৃপ্তি পেয়েছেন। সেই ধারার বিরাটতম প্রবাহ রবীন্দ্র-কাব্যে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠে তেমন ঘনিষ্ঠ সহ-অনুভূতির আনন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু কেন? একটা বিশেষ চিন্তার তাঁর কাব্য-জিজ্ঞাসা তাঁরই সীমার মধ্যে কখনো প্রতিবাদে তীব্র, দুর্বার—আবার কখনো তা বিশ্বাসের গভীরতায়, নব নব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের রহস্যালোকের সন্ধান ক'রছে। একটা স্বতন্ত্র অথচ সংযমী-রসানন্দের ধ্যানে সর্বসাধারণের হাততালির বহু দূরে নিঃসঙ্গ একক।

হাল্‌কা ভাবের কাছে, সহজিয়া পথে সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-চেতনা আত্মসমর্পণ করেনি। উচ্ছ্বাসের অবান্তর আবর্জনা বর্জন ক'রে কবি কাব্যকে সুসংবদ্ধ, ঘন, ঋজু গদ্যের রূপ দিতে চেয়েছেন। অকারণ আবেগের ভারে কাব্যকে দুর্বল করার আপত্তি তাঁর সকল সময় তীব্র ছিল। চিন্তা-নির্ভর, সংহত রূপই তাঁর আদর্শ। তাই তাঁর মতে, কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"শব্দ অবান্তর নয়, বক্তব্যের তাগিদে উৎপন্ন; কিন্তু কবিতা বিশেষের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিষয়-গৌরবের ধার ধারে না, শব্দ গঠনের নিজস্ব তার নির্ভর।

...র মন উঁচু. তিনিই হয়তো উচ্চাঙ্গ শব্দের আবিষ্কর্তা; কিন্তু তাঁর কবি-প্রতিভা বিচার্য উচিত শব্দের নিকষে।...—এদিক হ'তে সুধীন্দ্রনাথ প্রায় অনেক জায়গায় মাইকেলের শব্দ-ব্যবহারের প্রভাব সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ ক'রেছেন। যে কালে তাঁর জন্ম, সেকালে শব্দ ব্যবহারে একটা স্বাধীনতা সর্বত্র। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ সেই সহজ আথেরীভাষা, রাস্তা-ঘাটের গপ-প্রেমের ভাষা ব্যবহার না ক'রে গদ্যের পৌরুষকে কাব্যে দান ক'রলেন। এ কাজ দুঃসাহসিক!

উত্তীর্ণ পঞ্চাশ: বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে
অতঃপর অনিবারণীয়: এবং বিজ্ঞান বলে
পশ্চিম যদিও আয়ুর সামান্য সীমা বাড়িয়েছে
ইদানীং, তবু সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের
প্রভু, বার্ধক্যের আত্মাপহারক।

আবেগ আছে; তবে চিন্তা ও শব্দের সংযত পরিমিতিতে জীবন জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসায় একটা দৃঢ়তা-সচেতন বিশ্বাস বর্তমান। সুধীন্দ্রনাথ সহজ সাধনার পথে তাঁর কাব্য-প্রেরণাকে নিরুদ্দেশের দিকে নিয়ে যাননি। তাঁর কাব্যে স্বপ্নের মোহ এবং দৈবের অজানিত নিরুদ্দেশ-যাত্রা নেই। তাঁর বিশ্বাস..."শব্দ স্বয়ম্ভর নয়"। কবির সচেতন সৃষ্টিই কবিতা, তা কোন দৈববাণী নয়। অর্থাৎ সচেতন রূপশরের রূপাঞ্জলী। তার জন্য রূপকারকে প্রেরণার আশ্রয় হয়তো কিছুটা নিতে হয় কিন্তু তাতে সমর্পণ নয়। কবির মতে, স্রষ্টা হবেন আত্মনির্ভরশীল। তাই অনেক জায়গায় যখন কবির অজ্ঞানতে কোন শব্দের মিল প্রেরণার বাহন হ'য়ে এসেছে সুধীন্দ্রনাথ তাকে বর্জন করেছেন গভীর অনুশীলন ও পরিশীলনের মধ্য দিয়ে।

এমন কি উপস্থিত হানি
সম্ভবত অবাস্তব সুললিত সে পদ্যের মতো
যাতে রেণু, বেণু, কদাচ ধেনুও, মিলে ক্রমাগত
অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখে।

কবির কাছে বিষয়বস্তু অর্থাৎ বক্তব্য এবং রূপকৌশলের কোন পার্থক্য নেই। তিনি 'অর্কেস্ট্রা' ভূমিকায় বলেছেন, "কখনো যদি লেখবার মতো কথা মানসে জমে, তবে তার উচ্চারণ পদ্ধতিও আপনি যোগাবে।"

ভাবের তন্ময়তার বন্ধ্যা কবির কাছে অলীক। "যযাতি" কাব্যে মানবের নিরুদ্দেশ যাত্রার অতীত, বর্তমান সব দিকই দেখিয়েছেন। কিন্তু হতাশার কথা তিনি মোটেই সমর্থন করেন না। মানব সভ্যতার মূলে যে দীনতা, যে অত্যাচার—সেখানে কবি দিশাহারা শূন্যতার মধ্যে যাত্রীদের ফেলে দিতে চান নি।

হিংস্র অরি
বন্দরে বন্দরে, অবিশ্রান্ত অনুচর, অবহেলা
চরমে নিশ্চিত জেনেই বেরিয়েছিল তারা—

কিন্তু এখন কি সম্বল? কবির মতে, "প্রাণ পাত পৌরুষ এবং রুদ্র কৌতূহল।" অর্থাৎ নিজের চিন্তায়, বিবেচনায় নির্মোহ সত্যে অবিচলিত কর্মের পথই একমাত্র অবলম্বন। জাতির কাছে যেমন এ পথ, কবির কাছেও সেই একই পথ। ব্যক্তিগত সত্যে জাতির ভাবনাকে রূপায়িত ক'রতে হলে জাতির চৈতন্য-বোধকে নিজের জীবনে প্রতীক করে নিতে হবে তবেই কবি জীবনের সার্থকতা।

বিশ্বযুদ্ধের হিংস্রতা কবির চিত্তে গভীর ভাবে আলোড়ন আনে। সেই কবি বললেন,

চরাচরে নেতির বিস্তার
নির্বিকার হয়তো বা নিরাকার ব্রহ্মের সমাধি
অদ্ভুত এ পরিবেশে মানুষের প্রার্থনা সমূহ
জাতিস্মর অভিমন্যু।

'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে বলছেন, "...এত দিন ধরে স্থানে-অস্থানে তার অতিমানুষিকতার যে ঘোষণা শোনা গেছে, সে দাবির প্রথম প্রমাণ এইবার হয়তো মিলল। কারণ চিরকালের স্তম্ভগুলোকে ভেঙ্গে চুরে সভ্যতার স্টীম্ রোলার আজ যখন তার অভিমুখে ধাবমান, তখনও দুঃসাহসে ভর ক'রে কবি আছেন সৌন্দর্যের দরজা আগলে। তার মনে আশা নেই। সে জানে তার পরাজয় নিশ্চিত। সে বোঝে সে একা; যাদের জন্য তার বিদ্রোহ, তাদের কাছে এই আসুরিক স্পর্ধা যেহেতু পাগলামিরই নামান্তর, তাই তার পরিচিত বিশ্বকে দৈব ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না। তবু তার চেষ্টার ক্রটি নেই, বিরাম নেই তার গানে। সোপান হয়তো আনন্দের গান।"

একটা সহজ স্বীকৃতি নেই বটে, কিন্তু জীবন প্রত্যয়ে সেই "দৈব"কে বিশ্বাস করেছেন। চরাচর বিশ্বের আনন্দরূপের অনুভবে কবির সংশয় আছে, কিন্তু "জীবনের স্বাদ" বিকৃত হয় নি।

এই নিষ্ঠুর অপচয়,
এর পাছে আছে অভিপ্রায়,
আছে কি আকৃতি?
হেথা যারা পরাজিত বৈকুণ্ঠে তাদের হবে জয়?...
হায় ক্ষেমঙ্কর,
অভগ্র মঙ্গল তব পারিবে কি করিতে সুন্দর
অবরুদ্ধ যৌবনের জীবন্ত মৃত্যুরে?

'মঙ্গল'কে কবি বিশ্বাস করেছেন। 'আনন্দবাদ' সুধীন্দ্রনাথ-এর কাব্যকে জীবন জিজ্ঞাসার ক্রম বিবর্তনের পথে আঁতান্ত সজাগ করেছে। তাই কবির প্রেম-যৌবন যখন পারিপার্শ্বিকতার দীনতায় বিচ্ছিন্ন, রিক্ত, কামুক—তখন সেই প্রেমে একটা 'বিশুদ্ধ চৈতন্য', নিরহংকার সঙ্কল্পের সাধনাকে স্বীকার করেছেন। 'মানুষের অনহায়তা'য় কবির কথা—

তন্ময় আমার চিত্ত, প্রীত বুদ্ধি, তদ্গত শরীর,
তথাগত অন্তর্যামী আত্ম-পর সবারে ক্ষমেছে,
ব্যক্তিতার অবরোধ মুহূর্তেকে চূর্ণ হ'য়ে গেছে,
সার্বভৌম যৌবরাজ্যে প্রত্যাগত যযাতি স্থবির।'

কঠিন সাধন-পথের নিঃসঙ্গ পথিক সুধীন্দ্রনাথ।

'সংবর্ত' কাব্যে কবি আধুনিক জড়-শক্তির তথা সভ্যতার অবক্ষ-

ম্ভাবী মহাপ্রলয়ের কথা বলেছেন। সংশয়, নিরাশা মেশা ভবিষ্যতের আশায় জীবন ও জগতের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রলয় একদিন আসবেই। এ সত্য শুধু মাত্র ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তিনি লাভ করেননি। দার্শনিক সুগভীর চেতনায় মন-প্রাণ তথা আত্মার নিবিড়তম জিজ্ঞাসায় কবির কাব্যে তা প্রকাশ লাভ করেছে।

প্রলয়ে পট-পরিবর্তন, এ বিশ্বাস সুধীন্দ্রনাথের স্থির সত্য এবং তাতে জীবনের নবীন সম্ভাবনা—সর্বত্র।

তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে
বসেছি বিজনে, নব নীপবনে
পুষ্পিত তৃণদলে।
মুগ্ধ নয়নে পেতে আছি কান
গান বিরচিব বলে।

সভ্যতার অনুদার ভণ্ডামিকে কবি সকল সময় ধিক্কার দিয়েছেন। যুদ্ধ কবির কাছে একটা হিংস্র দুর্যোগ। এ দুর্যোগে হিংসা অহিংসার পরীক্ষা। কবির কাছে সত্য হলো স্থির—

স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে শুদ্ধির তাণ্ডবে।

স্বাবলম্বী মন সকল সময় জীবনের বিচিত্র জিজ্ঞাসায় পথ খুঁজে পেয়ে জাতিকে জানিয়েছেন

'সংবর্তে' নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের ইংগিত আছে, কিন্তু হাহাকার নেই। একটা গভীর নির্লিপ্ত মন, সব কিছুর মধ্যে থেকে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি-ভংগী দিয়ে বিশ্ববাসীর চিন্তাকে অবশ্যম্ভাবী কল্পান্তের ঘনঘোর দুর্যোগের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে, একটা সৎ বিবেকী মনের পরিচয় দিয়েছেন।

যুদ্ধের বিভ্রান্তি জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছে। সেই "মেদিনীমুখর একনায়কের স্তবে" সকলেই ব্যস্ত। কিন্তু কবির জিজ্ঞাসা :—

এই আয়োজন অর্ধশতক ধ'রে,
দু-দুটো যুদ্ধে, একাধিক বিপ্লবে ;
কোটী কোটী সব পচে অগভীর গোরে...
... ...
নির্বাণ লভে গৃধ্র রাহুর গ্রাস।

জীবন ধর্মে নিষ্ঠাবান কবি মানবিক সত্যের গতিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও অটল, স্থির। চারিদিক হ'তে জীবনের প্রতি কঠোর অবহেলায় কবির মন চঞ্চল।

"—'নিরর্থক'
পূষার একর্ষি নাম, অসূর্যের পুরাণ ঝলক
হিরণ্ময় পাত্র ঠেলে ফেলে,
দেয় মেলে
অন্ধতম অতিপ্রজ বল্মীকে বল্মীকে
বিমানের ব্যূহ চতুর্দিকে
মাতরিশ্বা পরিভূ কবির কণ্ঠশ্বাস।"

কিন্তু কবি তাতেই আত্মসমর্পণ করেননি।

কারণ তাঁর কথা,..."বিংশ শতাব্দীর মূল মন্ত্র অবৈকল্য আর অকপটতা।"

এই যে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে, ভাসিয়ে না দিয়ে একক সত্যের গভীর-চেতনায় বিশ্বাসী, সমগ্র সাহিত্য-জীবনে তার পরিচয় রয়েছে।

'যযাতি' কবিতায় কবি মানুষকে তার মহৎ ভাবের বিশ্বাসের জন্য সাময়িকভাবে সমালোচনা করেছেন। কারণ অভিভাবকে তিনি অকৃত্রিম বলে মনে করেন।

প্রৌঢ়মনের একটা সহজ ছবি এই কবিতায় দেখা যায়। মৃত্যু আজ হিংসার রূপ ধারণ করে রাষ্ট্রে, সমাজে, মানুষের মনে মনে আচ্ছন্ন। কিন্তু হাহাকারের উন্মাদনায় তার দেখা শেষ হয়নি ; একটা অন্তরতম আকাংখা বিশ্বাসের গভীরতাকে বহন ক'রে ব'লছেন,

অনাত্মীয়ের মুখ চেয়ে আছি
সে দিন থেকে
উঞ্ছ কুড়িয়ে অগত্যা বাঁচি
নিরুপার্জন নির্বিবেকে।
দৃষ্টির সীমা মাপে হিমগিরি
পর্ণকুটীরে দুর্যোগে ফিরি
সৈকতে এসে বসি কদাচিৎ
আমার উপক্রমে ;
মহার্ণবের সামসঙ্গীত
হয়তো বা শুনি শুক্তির মাধ্যমে॥

সেই "স্বধর্মে" ধ্যানস্থ থেকে জীবনের সেই "সামসঙ্গীত" শুনতে চেয়েছেন।

অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই,
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই ;
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
অনুমানে শুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে
জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে
তথাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি ?

এই "আপনার দেখা"ই নিজেকে আবিষ্কারের শ্রম। এই 'আবিষ্কারের' আনন্দবোধ সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে যথেষ্ট রয়েছে। শুধু মাত্র তত্ত্ব আর নিরাশার শুষ্ক জড়ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। জীবনের কাছে অতীত—বর্তমান—ভবিষ্যৎ গভীর বুদ্ধিও বিশুদ্ধ চৈতন্যে দেখতে হবে।

সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে বিভ্রান্ত সমসাময়িক পথকে গ্রহণ করেন নি। তাই তাঁর প্রথমদিককার রচনায় 'চৈতন্য' কথাটির ব্যবহার অনেক আছে। পরবর্তী সময়ে 'জগৎ' তাঁর কাছে নিঃস্ব বোধ হ'য়েছে সত্য, কিন্তু 'চৈতন্যে'র জ্যোতিঃরূপ তাঁকে জীবন ও চিন্তার দিকে একটা গভীর সত্যের সন্ধান দিয়েছে। সে সত্য নির্লিপ্ত অহংকার শূন্যতা।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সহজ নয়, অবসর-বিনোদনের সুরে গাঁথা গান ও নয়। মন, বুদ্ধি এবং মুক্ত বোধে তাঁর ছন্দ, শব্দ এবং বিষয়-বস্তু অনুধারণের একান্ত প্রয়োজন। শ্রম না দিলে তাঁর কাব্য সহজ হবে না। কারণ তাঁর কাব্য পরীক্ষার ফল; শ্রমের রূপাঞ্জলী। বহির্জগতের বিচিত্র চিন্তার মধ্যে তিনি কাব্যের উপাদান খুঁজেছেন কিন্তু তার জন্য তিনি তথাকথিত "গণসাধারণের" দ্বারস্থ হননি। একান্তভাবে ব্যক্তিগত আন্তরিক শক্তির পরিচয়ের অভিজ্ঞতায় সুধীন্দ্রনাথ এক-মন-এক-চিন্তা।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে দুরূহতা আছে সত্য, কিন্তু তা অস্বচ্ছ দুর্বোধ নয়। একটা কঠিন স্পষ্টতা, যুক্তিযুক্ত শুদ্ধ ভাবনা।

কাব্যের দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন,···এখনকার কবিতা দুর্বোধ্য। কিন্তু দুরূহতার দুটো দিক আছে, একটা পাঠকের দিকে, অন্যটা লেখকের। যে-দুরূহতার জন্য পাঠকের আলস্যে, তার জন্যে কবির উপরে দোষারোপ অন্যায়। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত বাদ দিলেও কলার অন্যান্য বিভাগে প্রবেশাধিকার যে আগ্রহ, অভিনিবেশ ও অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে, কবি যদি তার বিভাগ থেকে সেই পরিমাণের শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা চায়, তাহলে তার দাবি নিশ্চয়ই সঙ্গত। কিন্তু যে দুরূহতার উৎপত্তি অনুকম্পার অভাবে, যার মূলে কবির নিজের দ্বিধা নিহিত, তার কতকটা যুগসন্ধির ফলাফল বটে, তবু অধিকাংশের জন্যে কবিই দায়ী"—
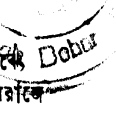
সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সকলের জন্য নেমে আসে না সহজ আন্তরিকতার হৃদয়াবেগে। একটু বিশেষ দিকে, সকলের অন্তরালে নিজস্ব শ্রমের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। সে দীপ্তিতে ছন্দই একমাত্রসম্বল, ভাব খুবই খাটো। তাই তাঁর কবিতা তখনই জীবন্ত বলে মনে হ'বে যখন আমরা তার ছন্দের নির্মোহ স্বতঃপ্রবৃত্তের প্রতি আকৃষ্টহবো। তাঁর মতে··· "জীবন্ত কবিতার ছন্দ সর্বত্রই অহংজ্ঞানশূন্য, সর্বত্রই স্বতঃপ্রবৃত্ত।"

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭

শ্রীঅরুণেন্দু নন্দী

আজি এই ভারতের মুক্তি দিবসে
কে তুমি নয়ন-পদ্ম ভরিলে হে বিশ্বপ্রেমরসে?
অন্তরের স্বপ্ন তব হল কি সফল এতদিনে?
ওগো মহাপ্রাণ, আজি পুণ্যময় তব জন্মদিনে
ঘরে ঘরে উঠে হুলুধ্বনি,
বাজে ঘণ্টা শঙ্খ মাঙ্গলিক,
ঊর্দ্ধে ঘোষে বিজয়-কেতন
মুক্তির বারতা আকস্মিক!
এ জগৎ বিস্ময়ে নির্ব্বাক!
কে জানিত দাসত্বের সুকঠিন বন্ধনের পাক
যাবে খসি অকস্মাৎ কোন মায়াবলে,
অলৌকিক সংগ্রামের
অপূর্ব্ব কৌশলে।
নির্ম্মম প্রতীচী-মেঘনাদ,
তারি বাণে সারাদেশ ভুলেছিল মুক্তির আস্বাদ
সর্পের বাঁধনে জরজর
নির্যাতনে লাঞ্ছিত অন্তর
তুমি হে শ্রীরামচন্দ্র বসি ধ্যানাসনে
মাগিলে যে বন্ধন মোচন।
আংশিকরূপে পাশ করিল হরণ
স্বাধীনতা-বৈনতেয় আসি'।
পূর্ণরূপে উঠিলনা আনন উদ্ভাসি'
আনন্দের রবিরশ্মিধারা,
তবু তাহা হেরিবে যে সেই হবে হারা
অপার্থিব উপলব্ধি-গভীরতা মাঝে
যেথা কেহ নহে পর, উচ্চ-নিচ অভেদে বিরাজে
এক ও অখণ্ড আত্মার ঐক্যমাল্য গলে,
জ্যোতির্ময় সে-দেশের আমরা সকলে
অধিকারী মর্ত্ত্যবাসী—হবে অনুভব,
শান্ত হবে হৃদয়ের ক্ষুব্ধ কলরব।
চাহ নাই স্বার্থপর জগতের মত
অহঙ্কার বিজড়িত কর্ম্মে হতে রত
আপনার লাগি',
তুমি যে দিয়েছ বলি স্বার্থ অহঙ্কার
বিশ্বমাতৃপদে;
তুমি আজ জাগি'
অন্তহীন সুকঠোর মহাসাধনার
ক্ষুরধার পথে;
পেয়েছ আপন পরিচয়
পেয়েছ সে-ধন যার ক্ষয় নাহি হয়।
তাই এত শান্তি তব হেমকলেবরে
এত করুণার ধারা তব নেত্রে ঝরে।
হে প্রেমিক, যুব-অবতার
হে ভাস্কর, কর দূর সর্ব্ব অন্ধকার।

কান্না

শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

এতদিনে মুক্তি পেল অতসী। বাপ-মাকে হারিয়ে কাকা-কাকীর সংসারে নিত্য লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা সহ্য করে জীবনের বাইশটা বছর কেটেছে—একটা গলগ্রহের সামিল সে। কাকারও খুব অভাবের সংসার, ছাপোষা মানুষ। যেখানে দু'মুঠো খাওয়া আর পরার স্বাচ্ছন্দ্য নেই—সেখানে বিবাহের প্রশ্ন অবান্তর ছাড়া কি। অতসীও মুখ বুজে নির্য্যাতন সহ্য করেই ছিল—উপায় কি? শুধু তার যুবতী মনটা ভিতরে গুমরে গুমরে কেঁদেছে। সে কান্নার শব্দ কাকা বা কাকীর কারোরি কানে যায়নি—যাবার কথাও নয়। কেবল অতসীই জানে। এ সংসারে তার দুঃখ কেউ বুঝবে না। দেহে সতেজ যৌবন, অথচ সকল সময়ে কেমন একটা মন-মরা ভাব অতসীর। কারো সামনে নিজেকে প্রকাশ করবার এতটুকু স্পৃহা জাগে না—কেমন একটা লাজ, সঙ্কোচ, জড়তা তাকে সব সময়ে ঘিরে রাখে। নিজেকে গোপনে লুকিয়ে রাখতে চায়। এই কলকোলাহলের মধ্যে সে একটু নিরালা নিরিবিলি জায়গা খোঁজে, যেখানে নিজের মনটাকে একটু মেলে দিতে পারবে, একটু স্বপ্ন দেখবার অবসর পাবে। কিন্তু, তা আর হয়ে ওঠে না—এই দুখানা খুপরি আধো অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে স্বপ্ন দেখবার ইচ্ছাটুকু আপনিই মরে যায়। নিজের সত্তাকে বোধহয় হারিয়ে ফেলেছে অতসী, কেমন একটা যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। কাকার সংসারে সমস্ত কাজ নির্ভুলভাবে করাটাই তার একমাত্র চিন্তার বিষয়, আর কিছু নয়।

বিকেলে অতসী যখন বাসন মাজার কাজ শেষ করে গা ধুতে যাবে, কাকীমা বললেন: উহুনে আজ একটু তাড়াতাড়ি আঁচ দিস অতসী, আর আমার বাক্স থেকে একখানা পরিষ্কার কাপড় নিয়ে পরিস।

প্রথম কথাটা না হয় কাকীমা প্রতিদিনই প্রায় বলেন, বিকেলে তাঁ'র চা খাওয়ার অভ্যাস—কিন্তু দ্বিতীয় কথাটা তো একেবারেই নতুন। হঠাৎ নিজের বাক্সের পরিষ্কার কাপড় পরাবার সখ হোল কেন অতসীকে? খানিকটা বিস্মিত না হয়ে সে পারে না। তবে কি এ সংসারের সদয় দৃষ্টি তার উপর পড়ল—নাকি, কাকীমা আজ হঠাৎ তার প্রতি অকারণে একটু অতি মাত্রায় করুণা প্রকাশ করে ফেলেছেন! হাসি পেল অতসীর।

: কিরে, যেতে যেতে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? প্রণতি আর অরুণ যে এখুনি এসে পড়বে। দেখিস্, তাদের কোনো অযত্ন যেন না হয়। কাকীমা আবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন।

দ্রুত পায়ে কুয়োতলার দিকে এগিয়ে গেল অতসী।

কাকীমার নববিবাহিতা ছোট বোন প্রণতি আর ভগ্নীপতি অরুণ বিকেলের দিকে এল। ছাদের উপর থেকে অতসী লুকিয়ে দেখল, বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একখানি ঝকঝকে মোটর গাড়ী, আর তারভিতর থেকে নেমে এলো নতুন দম্পতি দুটি তরুণ-তরুণী। দরজার সামনে এগিয়ে এসে বিনয়ের ভঙ্গিতে কাকা-কাকীমা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাদের।

বড়লোক কুটুম, কোনো ক্রটিই চলবে না। এতক্ষণে আজকের কাকীমার হঠাৎ করুণা প্রকাশের কারণটা খুঁজে পেল অতসী। তারপরেই শোনা গেল—কাকা ও কাকীমার মিলিত হাকডাক।

নিচে নেমে এলো অতসী। রান্নাঘরে গিয়ে দেখলো, কাকীমা এক ঝুড়ি খাবার নিয়ে দু'খানি রেকাবীতে সাজাতে ব্যস্ত। অতসীকে দেখে বললেন: নে-নে, তাড়া-

তাড়ি কেটলীটা উনুনে চাপিয়ে দে। শীগ্রি চা'টা করে ফেল। অতসীও কাকামার সমান তালে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কাকাবাবু পাশের ঘরে বসে নতুন ভায়রাভায়ের সঙ্গে হাসি গল্পে মেতে উঠেছেন। এতক্ষণ প্রণতি সেই ঘরেই ছিল, এবার এসে দাঁড়ালো দিদির রান্নাঘরে।

: ওরে বাবাঃ, এ যে ভীষণ আয়োজন করেছো দিদি —কী দরকার ছিল এত খাবারের? আমরা পেট ভরে খেয়ে তবে বেরিয়েছি। মিছিমিছি ব্যস্ত হওয়া।

: এ আর কি এমন আয়োজন ভাই, খুবই সামান্য। গরীব দিদির বাড়ীতে এই প্রথম এলি, একটু খাওয়াবার আয়োজন না করে পারি? তোদের আদর আপ্যায়ন করবো দিদির সে সামর্থ্য কোথা? কথাগুলি খুবই নরম সুরে বললেন কাকীমা।

প্রণতি এসে অতসীর কাছে দাঁড়ালো: এ মেয়েটি কে দিদি?

: আমার ভাসুরঝি, অতসী।

: বেশ সুন্দর দেখতে তো!

: ঐ রূপটুকুই আছে, আর কিছু নেই।

: মেয়েদের ঐটিই তো বড় মূলধন, দিদি।

: বকিস্নি বাবু, একটা পাত্র তো জোটে না যে রূপটুকু দেখে ঘরে নিয়ে যাবে।

অতসী লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, তার সামনে একি বিশ্রী কথা বলছেন কাকীমা! নয় সে তাঁদের কাছেই গলগ্রহ, সে কথাটি কি অপরের কাছেও এমনি জঘন্য ভাবে ব্যক্ত করতে হবে? সেখান থেকে উঠে যেতে ইচ্ছা করছিল তার, কিন্তু উপায় নেই। খাবারের রেকাবীটা এগিয়ে দিয়ে কাকীমা বললেন: যা, ওঘরে চা-খাবারটা দিয়ে আয় অরুণকে।

কাপড়টা ঠিক করে গুছিয়ে নিয়ে চা আর খাবারের রেকাবীটা হাতে করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল অতসী। কুমারীর ভীরু লজ্জা আর এ বাড়ীর হীনতার গ্লানি দুটি মিশে কেমন একটা বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করছিল অতসী অরুণের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে।

ঘাড়টি নীচু করে চা আর খাবারের রেকাবীটা অরুণের সামনে নামিয়ে রাখলো অতসী।

কাকাবাবু অরুণের পানে তাকিয়ে বললেন: আমার ভাইঝি, অতসী।

: ও। অরুণ তাকাল অতসীর পানে। অতসী সরে দাঁড়িয়েছে তক্তাপোষের এক পাশে। জানলার কোল ঘেঁসে। তখন বেলা গড়িয়েছে, জানলা দিয়ে তির্য্যকভাবে ঘরে পড়েছে বিদায়ী সূর্য্যের একটুকরো আলো। সেই আবীররাঙা আলোর আভা অতসীর মুখে আর চুলের উপর ছড়িয়ে পড়ে কেমন যেন রহস্যময়ী করে তুলেছে। অরুণ অপলক দৃষ্টিতে দেখছে চেয়ে চেয়ে। চমক লাগানো রূপসী বটে মেয়েটা, গোরা গোরা বর্ণ, টানা দুটি আয়ত চোখ, উছল দুই বুক। অঙ্গের দুটি কূল ছাপাছাপি করে বান ডেকেছে। নারী নয়, ভাদ্রের নদী।

ঘরে এলো প্রণতি। অতসী ঘরের বাহিরে যাবার জন্য এগিয়ে যেতে তার একখানি হাত চেপে ধরলো প্রণতি: এসো না ভাই, বসে তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাক। বড় ভাল লেগেছে তোমাকে!

কাকাবাবুর কি একটা কাজ মনে পড়ে যাওয়ায়, তিনি উঠে ঘরের বাহিরে গেলেন।

অতসীকে এনে প্রণতি তক্তাপোষের উপর বসলো। অরুণেরই প্রায় কাছ ঘেঁসে। লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল অতসী। তবু যেন তার এই প্রণতি মেয়েটিকে বড় ভাল লেগেছিল। বহুদিন অনাদরের পর কেমন স্নেহের স্পর্শ দিয়ে তাকে কাছে টেনে নিতে চাইছে। পরম আপন জনের মত। প্রণতিও অতসীর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলো: আচ্ছা ভাই, তুমি দিদির কাছে কতদিন আছো?

: পাঁচ বছর বয়সে বাবা, মা মারা যাবার পর থেকেই কাকীমার কাছে আছি।

: ও, তোমার আর ভাই-বোন নেই?

: না।

দুটি বোনের প্রকৃতি আশ্চর্য্য রকম ভিন্ন। কাকীমা যে অনুপাতে রূঢ় এবং কর্কশ, প্রণতি সেই অনুপাতে কোমল এবং মধুর। রূপের দিকেও সে পার্থক্য যথেষ্ট। পৈতৃক অবস্থা তাদের মোটেই স্বচ্ছল নয়। তবু, রূপের জোরে প্রণতি ধনীর ঘরের কুলবধূ হয়েছে। অরুণ নিজের পছন্দে বিবাহ করেছে প্রণতিকে। অল্পদিন বিবাহ হলেও সে নিজের গুণে শ্বশুর বাড়ীর প্রতিটি ব্যক্তিকেই মুগ্ধ করতে

পেরেছে। তাই সেখানে তার প্রভাব এবং সুনাম যথেষ্ট। দিদির সংসারে অবহেলিতা অতসীর যে মর্মকথা—সে ব্যথা প্রণতির কোমল মনকে আশ্চর্য্য রকম স্পর্শ করেছে। মেয়েটার অত রূপ—দিদি বলে কিনা পাত্র জুটছে না!

হয়তো জুটতো—বাংলা দেশের মেয়েদের অর্থকৌলিন্য যাদের না থাকে তাদের রূপ নিয়েও পাত্র পক্ষের মন জয় করা সম্ভব হয় না। রূপের চেয়ে রূপার লোভ বেশী। কিন্তু পৃথিবীতে ব্যতিক্রমও ঘটে—তা না-হলে গরীবের মেয়ে হয়ে প্রণতি ধনীর ঘরে ঠাঁই পেল কি করে? তেমনি একটা ব্যতিক্রম অতসীর জীবনে আনতে পারে না প্রণতি সামান্য একটু চেষ্টা করে?

: তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ভাই, আমাদের বাড়ী বেড়াতে? প্রণতি বললো।

বিস্ময়ে চমকে উঠলো অতসী! এমন প্রস্তাব ধনীর কুলবধূ প্রণতি তাকে করতে পারে? কাকীমার সংসারে যার কোন মূল্য নেই, সবার অবহেলিতা হয়ে যাকে দিন গুজরান করতে হয়—তাঁর বোন হয়ে প্রণতি একি প্রস্তাব করছে? অতসী নীরবে তাকিয়ে রইল প্রণতির পানে।

অরুণ উৎসাহিত হয়ে বললো: বেশ তো ভাল কথা, চলুন বেড়িয়ে আসবেন।

এমন অযাচিত সৌভাগ্যে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে ঘাড়টি নীচু করে বসে রইলো অতসী। কাকীমার সংসারের গণ্ডির বাইরে কোনদিন বেরুবার সুযোগ হয়নি তার—এই ঘর দু'খানির বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই। এই বাইশটা বছর তার কেটেছে সংসার-কারায় বন্দিনীর মত। প্রতি বছরই বসন্ত এসে পৃথিবীকে নতুনরূপে সাজিয়েছে, আকাশের রং বদলেছে—কিন্তু অতসীর রুদ্ধ-কারায় সে সংবাদ কেউ পৌঁছে দেয়নি। সেখানে বসে বসে সে শুধু উপভোগ করেছে চিৎকার, গঞ্জনা আর গ্লানি। আজ বুঝি তাকে নতুন পৃথিবী হাতছানি দিয়ে ডাকছে—যেখানে মানুষের জন্য আছে শুধু হাসি, আনন্দ আর গান। দুঃখ, গ্লানি যার নাগাল পায়না। এমন লোভ সামলাতে পারছে না অতসী—খুব রাজী, একশোবার রাজী। সে বাঁচতে চায়, জীবনের অপরিসীম আনন্দের উৎস খুঁজে পেতে চায়।

: দিদিকে বলি গিয়ে, তুমি ভাই তৈরী হয়ে নাও। উঠে দাঁড়ালো প্রণতি। তারপর, অতসীর হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে ঘরের বাহিরে বেরিয়ে গেল।

কাকী এবং কাকা রাজী হলেন।

কাকীমা নিজের বাক্স থেকে ভাল শাড়ী, ব্লাউস বার করে দিলেন, যা আজ এই বাইশ বছরের মধ্যে একটি দিনও পরবার সুযোগ পায়নি অতসী। আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন: খুব সাবধানে থাকবি, বুঝে-সুঝে কথা বলবি—বড়লোক কুটুম অসন্তুষ্ট না হয়।

নীরবে ঘাড় নেড়েছিল অতসী। বাইশ বছরে ওটুকু বোঝবার শক্তি অতসীর নিশ্চয় হয়েছে।

প্রণতি নিজের হাতে ভাল করে সাজালো অতসীকে। ছোট হাত-আয়নাটা মুখের কাছে ধরে অতসী নার্সিসাসের মত নিজের রূপ নিজে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখবার অবসর কাজের ফাঁকে কোনদিন বড় একটা ঘটেই ওঠে না। এমনিতে কাকীমার রূঢ় আচরণের শেষ নেই, সর্বদাই খিটমিটি করেন—তার উপর আয়না হাতে নিয়ে বসতে দেখলে তো আর রক্ষে থাকবে না! কাজেই অতসী রূপচর্চাকে বর্জনই করেছে। প্রণতিকে আড়াল করে এই সুযোগে বার কয়েক আয়নাটা মুখের কাছে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। প্রণতি আড়চোখে দেখে একবার মুচকি হাসলো।

: এমন পদ্মিনীর রূপ কোথায় পেলি ভাই?—ভগবান বড় একচোখো, যত কার্পণ্য করলো কেবল আমাদের বেলায়। দু'চোখে কৌতুক নিয়ে মিটিমিটি হাসছিল প্রণতি।

লজ্জা পেল অতসী, আয়না নামিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়ালো।

সন্ধ্যার পূর্বেই সকলে মোটরে করে চলে গেল।

অতসী চলে যাবার পর কাকা এবং কাকীমা বসলেন তক্তাপোষের উপর জল্পনা-কল্পনা করতে। একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা যেন আজ ঘটে গেল তাঁদের চোখের সামনে! অতসীর সম্পর্কে তাঁরা চিরকালই উদাসীন ছিলেন। বাড়ীর আর পাঁচটা অপ্রয়োজনীয় জিনিষের মত অতসীর অস্তিত্ব তাঁরা গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু আজ একি হোল?

কাকাবাবু বললেন: ব্যাপার কি বলতো, সকলে থাকতে হঠাৎ অতসীর উপরই বা চোখ পড়লো কেন প্রণতির?

কাকীমা বললেন : বুঝতে পারছিনা, হয়তো সমবয়সী বলে।

কাকাবাবু হা···হা করে খানিকটা বিজ্ঞের হাসি হাসলেন। তারপর হাতের বিড়িটাতে একটা জোর টান দিয়ে বললেন : আসল জায়গাটাই বুঝতে পারোনি গিন্নি, স্রেফ বড়লোকী চাল শিখেছে ছুঁড়িটা—এক সময়ে পেট পুরে খেতে পেতো না, এখন পাচ্ছে, তাই আমাদের কাউকে ডেকে না দেখালে শান্তি পাচ্ছেনা।

কথাটার মধ্যে কাকীমার পিতৃগৃহের অবস্থার খোঁচা ছিল বলে তিনি মনে মনে ভীষণ রকম রুষ্ট হয়ে উঠলেন। রুক্ষকণ্ঠে বললেন : তোমার যত বাজে কথা, নিজের নেই—তাই পরেরটাও সহ্য করতে পারো না।

কথার মোড় ঘুরে যাচ্ছে দেখে কাকাবাবু আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়লেন। এরপর আর কোনদিন মুখোমুখী দু'জনে বসবার প্রয়োজন বোধ করেননি।

অতসী কয়েক দিনের জন্য রয়ে গেল প্রণতির শ্বশুর বাড়ী, তাঁরা কেউ তাকে ছাড়তে চাইলেন না। কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে মেয়েটার উপর সবারই।

প্রণতির সংসারে আত্মীয় স্বজন বলতে বিধবা শাশুড়ী, স্বামী অরুণ এবং একটি দেবর বরুণ। এ ছাড়া ঝি, চাকর। একদিন নিরালা অবসরে প্রণতি তার মনের ইচ্ছাটি অরুণের কাছে ব্যক্ত করে ফেললো : ঠাকুরপোর সঙ্গে অতসীর বিয়ে দিলে কেমন হয়, বলতো? অরুণ ইতিপূর্বেই কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিল যে প্রণতি এমন প্রস্তাব করতে পারে। হলে মন্দ হয়না। সত্যিই রূপ আছে মেয়েটার। দুটিতে মানাবে ভাল। বরুণের দিক থেকেও কোন আপত্তি ওঠবার সম্ভাবনা নেই, কারণ সে লুকিয়ে তার বৌদির কাছে অতসী সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে বহু জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। প্রথম দিনে অতসীর সঙ্গে আলাপও করে নিয়েছে। আর মায়ের মতও যে হাঁ-এর দিকে এটাও অনুমানে বুঝেছে। তবে, তারই বা আপত্তির কি থাকতে পারে? অরুণ বললো : বেশতো, পুরুত মশায়কে খবর দাও—সামনের মাসেই কাজটা সেরে ফেলা যাক।

লোক মারফৎ সংবাদটি যখন কাকার সংসারে পৌছাল, অতসীর সৌভাগ্যে তাঁরা আশ্চর্য্য হলেন, কেননা তার সম্বন্ধে তাঁরা কিছুমাত্র সচেতন ছিলেন না—তার একি অভাবিত সৌভাগ্য! একটা চাপা ঈর্ষা যে ছা-পোষা স্বামী-স্ত্রীর মনে জাগেনি এমন কথা বলা যায় না। তাঁদের রূপহীনা কন্যা অনু, মিনুর কথা চিন্তা করে একটা অসহ্য জ্বালা অনুভব করলেন মনে মনে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহ কার্য্য সমাধা হোল। অতসীর জীবনে যেন একটা রূপান্তর ঘটলো। এতদিন যে জীবনকে ধিৎকার দিয়েছে, ঘৃণা করেছে—আজ তাকে ভালবাসতে শিখলো। এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে পৃথিবীতে সে একান্তই অবাঞ্ছিত নয়—তারও একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গা আছে এখানে, বাঁচবার অধিকার আছে, আর পাঁচটা মেয়ের মত হাসবার, আনন্দ করবার, জীবনকে উপভোগ করবার সুযোগ আছে।···

আরো কয়েকটি বছর পরের কথা।

যে অশ্রু এতদিন অতসীর চোখে শুকিয়ে গিয়েছিল আজ আবার তাতে বান ডেকেছে। কাঁদছে অতসী। প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও যেন তার সুখ নেই। কিসের একটা অভাব তাকে সর্বদা পীড়িত করে তুলেছে···প্রণতি ইতিমধ্যে তিনটি সন্তানের মা হয়েছে। শিশুর কলকোলাহলে তার ঘর সর্বদাই মুখরিত। তার সারা দেহ-মনে মাতৃত্বের পূর্ণ প্রকাশ। মা হয়েছে প্রণতি—নারী জীবনের যা সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু অতসী? চার বছরের মধ্যে একটি সন্তানেরও মা হতে সে পারেনি। নারীর এ লজ্জা সে রাখবে কোথায়? সর্বদা এ চিন্তা অতসীকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। যে দিন দারিদ্র্য আর অভাবের সংসার থেকে এই ঐশ্বর্য্যের সংসারে এসে সে দাঁড়িয়েছিল—সেদিন সে ভেবেছিল সত্যি সে সুখী হয়েছে। কিন্তু, আজ বুঝতে পারছে—এ সুখ তাকে সত্যিকারের সুখী হতে দেয়নি। তার জীবনে বিধাতার পরিহাস! প্রণতির ছেলেরা যখন অতসীর আঁচল ধরে কাকীমা, কাকীমা বলে ডাকে—সহ্য করতে পারে না অতসী। অসহ্য জ্বালায় তার বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে। নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদে।

অতসী ভাবে, সুখী হয়েছে প্রণতি আর তার কাকীমা। কাকীমা নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের জ্বালার মধ্যেও ছেলেমেয়েদের নিয়ে হয়তো সুখই পান—তাই বাহিরের দারিদ্র্য ভিতরের সুখকে গ্রাস করতে পারেনি। কিন্তু অতসীর সে সুখ কোথায়? মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে কোলের কাছে হাতড়ায়—খোঁজে একটা কচি শিশুর কোমল স্পর্শ। ব্যর্থ ব্যর্থ, সব ব্যর্থ হয়ে গেছে তার জীবনে। পাশে শুয়ে থাকা বরুণের বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে অতসী আকুল কান্না কাঁদে।

কৃষ্ণলীলা-মানসকথা

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

"যেদিন কৃষ্ণ জন্মনিলেন দেবকী-উদরে, মথুরায় দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।"

পণ্ডিতদের হিসেবে সে আজ কম্‌সে কম্‌ পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। এখন সে দেশও নেই, সে কালও নেই, সে পাত্রও নেই। "তবে আজ কিসের উৎসব? কেন মিছে সহকার-শাখা? কেন মিছে মঙ্গল কলস?" এই "কেনর" সত্যি সত্যিই কোন উত্তর আছে কি? যদি না থাকে, তবে বলতেই হবে আজকের সব আয়োজনই বৃথা, অনর্থক কোলাহল মাত্র। উত্তরে বলেন ভক্তরা—"আছে, অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরারায়; কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।" বলেন তাঁরা—নিত্যকৃষ্ণ, নিত্যভক্ত, নিত্যবৃন্দাবন। তাঁদের কথায়—ভক্তিই সেই সেতু যাতে ক'রে স্থান—কাল—পাত্রের সকল গণ্ডি পার হ'য়ে এখনও সেই নিত্যকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করা যায়—নিত্যবৃন্দাবনের লীলারস আস্বাদিত হয়। আবার যাঁরা জ্ঞান মার্গের লোক তাঁরা বলেন—"জীবমাত্রেই অব্যক্ত, ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই [সকল দেশে, সর্ব্বকালে] মানবজীবনের উদ্দেশ্য।" তাঁদের ভাষায়—জীব ও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই, মাত্র প্রকাশের তারতম্যেই এই ভেদভাব। এও আর একদিক দিয়ে এই কেনরই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা। এখন সমস্যা এই, কি করে এই ভক্তিলাভ হ'বে? কি করে অব্যক্ত ব্যক্ত হয়ে উঠবে? বীজ কি ক'রে বৃক্ষে, ফুলের কুঁড়ি কি ক'রে ফোটাফুলে পরিণত হবে? "পাশবদ্ধ জীব" কি করে "পাশমুক্ত শিবত্ব" লাভ করবে? একদিক দিয়ে বলা যায়,—বীজ যেমন তার অন্তর্নিহিত প্রেরণাতেই বৃক্ষে পরিণত হয়, ফুলের কুঁড়ি তা'র আন্তরিক প্রস্ফুটনের প্রচেষ্টার ফলেই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, মানবাত্মাও তেমনি তার অন্তর্নিহিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষাতেই একদিন মুক্ত অথবা ব্যক্ত হ'য়ে থাকে। কথাটি তত্ত্বতঃ সত্য হ'লেও, যেমন বীজের পক্ষে বৃক্ষে পরিণত হওয়ার জন্য যথেষ্ট অনুকূল আবহাওয়ার প্রয়োজন, ফুলের কুঁড়িটিকে প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠতে প্রয়োজনানুরূপ সূর্য্যালোক ও বাতাসের আবশ্যক, তেমনি জীবাত্মার ক্ষেত্রেও বদ্ধত্বের সুদৃঢ় সংস্কার অথবা মোহের আবরণ কাটিয়ে উঠ্‌তে অনেক কিছুরই সাহায্য বা সাহচর্য্যের দরকার হয়। এই খানেই বস্তুতঃ "কেনর" প্রকৃত উত্তর; আর, আমাদের সকল প্রচেষ্টা, সকল সাধনার মূলতত্ত্ব এই-ই।

পুরাণের কৃষ্ণ ভক্তের কাছে, সাধকের কাছে, নেহাৎ পুরাণ কথা নয়, হাজার হাজার বছরের ব্যবধান ছেদ করে, পুরাণের ঘন-কুহেলিকার আবরণ ভেদ ক'রে আজও মানুষ তাঁর আকর্ষণ অনুভব করে; তাঁর আকর্ষণে আজও বুঝিবা তেমনি ক'রেই মানুষের হৃদয়-যমুনা উজান ব'য়ে যায়। চুম্বক তখনও যেমন, এখনও তেমনিই লোহাকে আকর্ষণ করতে ক্ষান্ত হয়নি; লোহা যদি মাটি মেখে থেকে সে আকর্ষণ অনুভব করতে না পারে, সে কথা ভিন্ন। দেখা যায়, হৃদয়ের এই অব্যক্ত অস্ফুট আকর্ষণেই মানুষ তার নিত্য-অশান্ত জীবনে একটি দিন বেছে নেয়, যেদিন সে চোখের জলে মনের মালিন্য, হৃদয়ের গ্লানি ধু'য়ে ফেলতে চেষ্টা করে, —কৃষ্ণচুম্বকের আকর্ষণে আকর্ষিত হ'য়ে লৌহজন্ম সার্থক করার সৌভাগ্য খোঁজে। এদিনটি তা'র মুক্তির দিন—বিশ্রামের দিন—শান্তির দিন। এদিনটি যুগে যুগে ব'য়ে আনে শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের কাছে অনন্তের আভাস—অমৃতের বার্ত্তা—কৃষ্ণের আকর্ষণ, বলে তা'র কানে কানে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—ওঠো, জাগো, অবিরাম চল্‌তে থাক ততক্ষণ, যতক্ষণ না সেই পরমগতি চরমস্থিতি লাভ করে ধন্য হ'তে পারছ। এই দিনে, এই নব জাগরণের মুহূর্ত্তে, গোকুলের কৃষ্ণ শুধু নন্দ-নন্দন নন—আমাদেরও হৃদয়ানন্দ, আমাদেরও সখা, আমাদেরও প্রিয়তম হ'য়ে ধরা দেন। মোহন বাঁশী বাজিয়ে বৃন্দাবনের কালশশী আমাদেরও মন হরণ করেন। কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথী পাঞ্চজন্যরবে আমাদিগকেও উৎসাহিত করেন। সুদর্শনের বিদ্যুচ্ছটায় আমাদেরও মোহের আঁধার চকিতে চমকিত হ'য়ে ওঠে। আমাদের সকল আয়োজন সার্থক হয়, সকল উৎসব সফল হয়। সেদিন উৎসবের দীপালোকে ক্ষণকালের জন্য যেন আমরা আমাদের স্ব-স্বরূপের "ঝলক দর্শন" পাই। উৎসবের পুষ্পগন্ধে কৃষ্ণগন্ধের মদিরা এনে দেয়। উৎসবের বাদ্যে আমাদের হৃদয়-বীণা আপনা হতেই ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে। তখন শুধু যুক্তিতে নয়,—ভক্তিতে—অন্তরের অন্তরে আমরা "কেনর" উত্তর খুঁজে পাই, অথবা এ প্রশ্নই ভুল হয়ে যায়।

[২]

যা'হোক, যে কথা আমরা সুরু করেছি—বৃন্দাবন-চন্দ্রের সেই বাল্য-লীলাকথাই এখন অনুসরণ করা যা'ক। কই গো মা নন্দরাণী! কোথায় তোমার নীলমণি? তা'ইত! কই বাছা, কোথায় গেল? খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ! ওমা! এই এতটুকু দুধের ছেলের কাণ্ডটা ত্যাখ! দই দুধ সব লণ্ডভণ্ড—ভাঁড়গুলো ভেঙ্গে চুরে একাকার করে দিয়ে দস্যিছেলে গাড়ীটার নীচে শুয়ে শুয়ে কেমন মিটমিট করে তাকাচ্ছে। ভাগ্যি গাড়ী চাপা পড়েনি! গাড়ী? ওকি গাড়ী? ও যে শকটাসুর! কংসের অনুচর বাছাকে চেপে মেরে ফেল্‌তে এসেছিল। আহা! বাছা আমার দেবতার কৃপায় এ যাত্রা রক্ষে পেয়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অতটুকু ছেলের পায়ের চোটে এতবড় একখানি গাড়ী একেবারে চুরমার! দুধ দই সব মাটিতে লোটাচ্ছে। একেই কি বলে—"কীর্ত্তনে নর্ত্তনে নর কি নারীর ভাঙ্গিল সংসার-স্বপন?" দুধ দই গোপ-গোপীদের একমাত্র উপজীবিকা—সংসার চালাবার উপায়; শকটাসুর নিধন ছলে এসব নষ্ট ক'রে দিয়ে শিশুকৃষ্ণ ব্রজবাসী তথা জগৎবাসীকে কি তাই প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছেন—"যে আমায় করে আশ, তার করি

সর্ব্বনাশ।" তাই বুঝি এখন থেকেই—এখন থেকেই বা বলি কেন—ধরাধামে শুভাগমনের দিন থেকেই, সেই সর্ব্বনাশেরই সূত্রপাত? আর, কার্য্য কারণেরও বালাই নেই! যদি মানুষ হিসেবে ধরি, এমন কি বৈশিষ্ট্য ছিল বসুদেব-দেবকীর—যা'তে ক'রে তাঁদের ঘরে একটা কেষ্ট-বিষ্টু জন্মাতে পারে? তাই, দেখে শুনে মনে হয়—শাস্ত্রকার যেন ইঙ্গিতে এই কথাই বলতে চাইছেন—বসুদেবের ঘরে অর্থাৎ কিনা জন্ম-মরণশীল এই বসুন্ধরার বক্ষে, দেবকীর গর্ভে অর্থাৎ দৈবাৎ—ত্বচিৎ—কখনও আমাদের ভালমন্দ, যুক্তিবিচারের অপেক্ষা না রেখেই তাঁর জন্ম। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলেই শাস্ত্রকার ক্ষান্ত হচ্ছেন না; আবার যেন বলতে চাইছেন—তবে কি জান? তিনি গুণাতীত, আবার গুণময়। সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনগুণেরই পার হ'লেও সত্ত্বেই তাঁর বেশী প্রকাশ। যেমন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—"ভক্তের হৃদয়ই তাঁর বৈঠকখানা।" তাই-ই কি দেখা যায়—ক্ষীণ প্রভাব ক্ষণিক আলোকে সেদিন মথুরার মেঘাচ্ছন্ন নৈশ-আকাশ ক্ষণেকের জন্য আলোকিত হ'য়ে উঠলেও পরক্ষণে আবার যে অন্ধকার সেই অন্ধকার? নবজাত শিশুর দিব্য আবির্ভাবে মুহূর্ত্তের জন্যে বসুদেব-দেবকীর কোল উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলেও দুঃখের রজনী অবসান হবার আগেই দেবশিশুর মথুরা ত্যাগ? একই সঙ্গে যেন আবাহন ও বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠল! আনন্দাশ্রু শুকোতে না শুকোতেই বিয়োগাশ্রু-বর্ষণ সুরু হ'ল! কংসভয়-ভীত বসুদেব-দেবকীর সাধ্যে কুলা'ল না সে অহেতুক-কৃপার দানকে ধ'রে রাখতে—মায়ার সংসারের শতবন্ধনে হৃদয়-কারায় চিররুদ্ধ ক'রে রাখতে।

(৩)

পুত্রকোলে বসুদেব যখন মথুরা ছেড়ে গোকুলে এসে উপস্থিত, গোকুলের গোপগোপীরা নন্দ-যশোদা, তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হ'তে বোধহয় বেশী দেরী ছিল না। তাই কাল বিলম্ব—না—ক'রে ঘুমন্ত নন্দরাণীর পাশে নবজাত কুমারকে রেখে দিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে তাঁদের সদ্যজাত কন্যাটিকে বুকে তুলে নিয়ে বসুদেব এবার মথুরাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত। হাত দু'খানি তখনও কাঁপছে, বুক থর্ থর্ করছে; চোখের কোন্ থেকে হঠাৎ এক ফোঁটা জল গড়িয়ে মাটিতে পড়ল। একি! কাঁদছ বসুদেব? কাঁদছ? আজ এভাবে শিশু পুত্রকে ত্যাগ ক'রে যেতে হচ্ছে তাই কাঁদছ? না কি, পাষাণে বুক বেঁধে, আপন পুত্রের প্রাণরক্ষার্থে অপরের সন্তানকে কংসের মারণযজ্ঞে আহুতি দিতে নিয়ে চলেছ, তাই কাঁদছ? কাঁদ বসুদেব! লোকচক্ষুর অন্তরালে তোমার নয়ন জলেই আজ শিশুকৃষ্ণের জন্মতিথি—অভিষেক সুরু হোক! কিন্তু, তোমারই বা ষোল আনা দোষ কি বসুদেব? এর আগে তোমার ঘরে কংসের কারাগারে, এমনি করে যখন সাতবারে সাত-সাতটা সন্তান জন্মেছিল, কই তখন ত তোমার মনে এ বুদ্ধি জাগেনি—এবারের মত এমনি ক'রে হাতপায়ের লোহার শিকল আগে ত কখনও আপনা হতে খসে পড়েনি—এমনি ক'রে চিররুদ্ধ কংস-কারাগারের দ্বার আপনা হতে ত কখনও খুলে যায়নি—কংসের বিনিদ্র প্রহরীকুল কই কখনও ত এমন ক'রে ঘুম ঘোরে অচেতন হ'য়ে পড়েনি। যন্ত্র স্বরূপ তুমি, তোমার আবার দোষগুণ কি? উত্তরে কিন্তু শাস্ত্রকার বলছেন,—আছেও বটে, নেইও বটে। আজ এখানে, কৃষ্ণলীলার সূচনায়, বসুদেব হয়ত যে কথা মুখ ফুটে বলতে পারেন নি, কৃষ্ণলীলার পরিণতিতে শাস্ত্রকারকে সেই কথাটিই, আর কারও নয়—কুরুকুলগ্লানি সকল অনর্থের মূল স্বয়ং দুর্য্যোধনের মুখ দিয়েই বলতে শোনা যায়—

"যন্ত্রস্থ গুণ দোষৌ হি ক্ষম্যতাং মধুসূদন।
অহং যন্ত্রং ভবান যন্ত্রী মম দোষে ন বিদ্যতে॥

শেষের একথা আগে বলা যায় না,—আগে বোঝা যায় না। খেলার শেষেই একথা বোঝা যায়, অথবা একথা বুঝলেই খেলা শেষ হ'য়ে যায়। তাই কি দেখতে পাওয়া যায় রামায়ণের শেষ বরাবর বনবাস—প্রত্যাগত রামচন্দ্রকে দেখে কৈকেয়ী খেদ করে বলছেন—

"বনে গেলে দেবতার কার্যসিদ্ধি লাগি,
আমারে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী?"

একথা যদি কৈকেয়ী আগে থেকে বলতে পারতেন, আগে থেকে বুঝতে পারতেন, তাহলে রামলীলা কতদূর অগ্রসর হ'তে পারত কে জানে?

বসুদেবও বুঝি তাই আজ একথা বুঝেও বুঝলেন না—বলিবলি করেও বলতে পারলেন না। এই দেখা-না-দেখা, বোঝা-না-বোঝার আলো-অন্ধকারের পথ ধরেই অতঃপর আমাদেরও পরম-রহস্যময় কৃষ্ণলীলার অনুসরণ করে চলতে হবে।

যা'হোক, কন্যাটিকে বুকে নিয়ে যতক্ষণে বসুদেব মথুরায় কংস-কারাগারে এসে পৌঁছলেন, ততক্ষণে নন্দ-যশোদার ঘুম ভেঙ্গেছে, গোপগোপীরা শয্যাত্যাগ করেছে—গোকুলের ঘাটে, মাঠে, বাটে জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। গোকুলের গোপ গোপিনীরা রোজই যেমন করে জেগে ওঠে, সেদিনও বোধহয় তেমনি ক'রেই জেগে উঠেছিল। সেদিনের সেদিনটি যে তা'দের জীবনের একটি বিশেষ দিন, সেদিন কি তারা তা' বুঝতে পেরেছিল? বোধহয়—না। এ দিনটির—এ জন্মাষ্টমীর মাহাত্ম্য বুঝেছিল তারা সেদিন, যেদিন পেয়েছিল তারা নব জাতককে বাল্যের বালগোপালরূপে—কৈশোরের সঙ্গীরূপে—যৌবনের সখারূপে—বিপদের বন্ধুরূপে—ইহকাল-পরকালের সর্ব্বস্বরূপে; যেদিন সেই পাওয়ার চেয়ে বড় কোন পাওয়ার কল্পনা ছিল না তা'দের মনে—রূপ ছিল না তাদের চোখে। কিন্তু একদিনে এ রূপ ফুটে ওঠেনি, এ অবস্থা লাভ হয়নি। কি ক'রে দিনের পর দিন একখানির উপর আর একখানি ইষ্টক স্থাপিত হ'য়ে হ'য়ে এই বিরাট প্রেমের প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল উহাই কৃষ্ণলীলা কাহিনী—আর, এর বর্ণনা করবার চেষ্টায় অমৃত-ফলই ভাগবৎগ্রন্থ।

৪

ইতঃপূর্ব্বে শকটভঞ্জনের কথা বলা হয়েছে। তা'রও আগেকার কথা। কংসের আজ্ঞায় গোপনে গোপনে অনেক শিশুর প্রাণনাশ করে, এসেছে এবার পুতনা গোকুলে নন্দালয়ে। মুখে মিষ্টি হাসি, বুকে বিষ নিয়ে এসেছে সে অঙ্কুরেই নন্দ-নন্দনের বিনাশ-সাধন করতে। "মা"

সে নয়, "উপ-মা", কিন্তু সেজে এসেছে অবিকল "মা"। কাউকে কোন সন্দেহের অবকাশ না দিয়ে, একেবারে সোজা অন্তঃপুরে এসে হাজির—যেখানে প্রাণগোপাল আনন্দে ক্রীড়ারত। মাতৃত্বের ভাণ করে, কপটস্নেহে তুলে ধরল সে বিষময় স্তনযুগল শিশুকৃষ্ণের মুখে। কিন্তু, একি! এই সেদিনের শিশু, কিন্তু কী ভীষণ তার আকর্ষণ! যা'র ফলে বেরিয়ে এল—শুধু স্তনের বিষ নয়, বুকের দুধ নয়, একেবারে হৃদয়ের তাজা খুন। মর্ম্মস্থলে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল রাক্ষসী পুতনা, খসে পড়ল তার কপটতার আবরণ বাইরের মুখোস। বাহিক লাবণ্যের কলাকুশলতার আবরণে লুকান রাক্ষসীমূর্তি দেখে ভীত স্তম্ভিত হ'ল গোকুলের নরনারী।

মনে হয়, কৃষ্ণলীলার প্রারম্ভেই এ হেন পুতনাবধের অবতারণা করে এই কথাই যেন বলা হয়েছে—কপটতাই এ পথের প্রথম অন্তরায়। অভীষ্টপূরণের পথে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে অগ্রসর হ'তে হয় সত্য, কিন্তু অকপট না হ'লে কিছুই কিছু নয়। কপটমনে ভক্তের মাল্য লাভ হ'তে পারে বটে, কিন্তু ভক্তির সম্ভোগ হয় না। পুতনার দেহের দগ্ধাবশেষ হ'তে চন্দনগন্ধ নির্গমন, মাতৃসমাগতি প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কথা কি এরূপক্ষেত্রে কৃষ্ণসংস্পর্শজনিত বাঞ্ছ-ফল লাভেরই ইঙ্গিত করেছে? কে জানে? বস্তুতঃ, দেখতে পাওয়া যায়, শ্রীরামচন্দ্রের পিতামাতা—দশরথ-কৌশল্যা, কৃষ্ণের জনক-জননী বসুদেব-দেবকী, পালক পিতামাতা—নন্দ-যশোদা, বুদ্ধের পিতামাতা—শুদ্ধোদন ও তাঁর পত্নী, খৃষ্টের পিতামাতা—জোসেফ ও মেরী, শ্রীচৈতন্যের পিতা—জগন্নাথ মিশ্র, মাতা—শচীদেবী, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পিতামাতা—ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণি এঁরা প্রত্যেকেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। সারল্যের সরসভূমি ভিন্ন কোথাও ভক্তিবীজের অঙ্কুরোদ্গম হ'তেই দেখা যায়না, "প্রেম-রতন-ফল" ত বহুদূরের কথা।

৫

এরপর তৃণাবর্ত্ত। শিবকোপানলে ভস্ম হ'বার আগে কামদেব ছিলেন যখন দেহধারী—দূর থেকে বাণ মেরে মানুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটান ছিল যখন তাঁর কাজ তখন হয়ত বা তাঁর চোখ এড়িয়ে কখনও-সখনও মানুষ একটু স্থির থাকতে পারত। কিন্তু, যেদিন থেকে তিনি বিদেহ হ'য়ে মানুষের মনেই বাসা বাঁধলেন, সেদিন বানরকে যেন ভীমরুলে কামড়াল! চঞ্চল মন আরও চঞ্চল হ'য়ে উঠল। শত্রু যখন বাইরে এসে রূপ ধরে দাঁড়ায় তখন তার সাথে যুদ্ধ করা বরং সোজা, কিন্তু সে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে তা'তেই যদি ভূত ঢুকে বসে থাকে, তবে বিপদ আরও গুরুতর হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই দেখা যায় নারীদেহধারিণী পুতনা, জড়দেহধারী শকটাসুর যা পারেনি, তৃণাবর্ত্ত এসে দেখতে না দেখতে তা' ঘটিয়ে ফেলল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে ব্রজবাসিদের চোখে ধূলো দিয়ে তাদের নব-অনুরাগের নরম বাঁধন ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে শিশুকৃষ্ণকে একেবারে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে গেল। শূন্য-হৃদয় ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণবিহনে হাহাকার করে উঠল। উপায় কি? হাওয়ার সাথে তো আর ঢাল-তরোয়াল নিয়ে লড়াই করা চলেনা। কিন্তু, "যেইজন কৃষ্ণভজে সে বড় চতুর।" তাই সুচতুর গোপগোপীরা বুঝ্‌তে পেরেছিল—এ হেন সঙ্কটে কৃষ্ণছাড়া আর উপায় নেই—হাওয়ার মত চঞ্চল মন বিনাকারণেই এটা ওটা ভাবছে, খড়-কুটোর মত হাল্‌কা মন বিনা প্রয়োজনেই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে—কৃষ্ণের আকর্ষণ ছাড়া এ মনের হাত থেকে কা'রও নিষ্কৃতি নেই। আর বোধহয় তাই কেঁদে কেঁদে বলেছিল—"কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!! কৃষ্ণ!!! আমরা সাধনহীন, ভজনহীন, জ্ঞানহীন,—কৃপা করে তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে রতি মতি দাও।" যা' হোক ঝড় থামতে দেখা গেল, বালকৃষ্ণ নিজেই কণ্ঠরোধ করে তৃণাবর্ত্তের প্রাণসংহার করেছে। এইরূপে তৃণাবর্ত্ত নিহত হবার পরে, প্রাণে প্রাণে কৃষ্ণের গুরুত্ব কৃষ্ণের আকর্ষণ অনুভব ক'রে ব্রজবাসীদের মন এবারে কৃষ্ণভক্তির দ্বিতীয়স্তরে উপনীত হ'ল।

৬

সংশয়-সন্দেহের কুজ্ঝটিকা থেমে গেছে। ব্রজবাসিগণের বিশেষ ক'রে যশোদাপ্রমুখ সহজ-সরল গোপিনীদের মানস-সরোবরের জল এখন স্থির, শান্তভাব ধারণ করেছে। সেই স্থির জলে এবারে জগৎ-রহস্য প্রতিভাত হচ্ছে। তাই বুঝি এখন যশোদার দিব্যদর্শন—কৃষ্ণের মুখ গহ্বরে ব্রহ্মাণ্ডদর্শন; অলৌকিক পুত্রের সংস্পর্শে যশোদার মাতৃস্নেহ-পূর্ণ হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে এক অলৌকিক দিব্যভাব ফুটে উঠছে। নানা-ভাবে শিশুকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে পেয়ে তাকে আর সামান্য মানবশিশু বলা চলছে না। কিন্তু, এ দিব্যভাব সর্ব্বক্ষণ মনে স্থায়ী হচ্ছে না, ঘুরে ফিরে আবার লৌকিকভাব—মায়িকভাব এসেই পড়ছে। মনে হচ্ছে, দৈবকৃপাতেই অসহায় শিশু বারে বারে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। তাই দেখতে পাওয়া যায় পুত্ররূপী কৃষ্ণের মঙ্গল-কামনায় এত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, এত পূজার্চ্চনা, এত মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান। এরপরেই মহামুনি গর্গের ব্রজপুরীতে শুভাগমন, জাতকের নামকরণ ও নন্দ-যশোদার নিকটে কৃষ্ণমাহাত্ম্য-বর্ণন। "কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া"।

কিছুদিন আর কংসানুচর অসুরদের উৎপাত তেমন একটা নেই। গোপালকে নিয়ে সকলেরই এখন আনন্দে দিন কাটছে। মাঝে মাঝে আদুরে ছেলের আবদার-অত্যাচার, ফলে মায়ের কাছে ভৎ'সনা, আর তা'তে ক'রে বাৎসল্যরসের পরিপুষ্টি। এমন সময়ে একদিন খেলতে খেলতে মুখে একরাশ মাটি পুরে দিয়েছে গোপাল। "দেখি, মুখ দেখি, মুখে তোর ওসব কি?" বলতে বলতে জোরকরে হাঁ করিয়ে মাটি খুঁজতে গিয়ে দ্বিতীয়বার দেখলেন মা যশোদা—গোপালের মুখে শুধু মাটি নয়, মাটি থেকে, পঞ্চভূতের বিকারে যা' কিছু জন্মায় সব-কিছু; আর সেই সাথে পূর্ব্বের ন্যায় দেখলেন—অনুভব করলেন, লৌকিক অলৌকিক সকল তত্ত্বের প্রকাশ। অধিকন্তু এবারের এই দর্শনে আপন আপন বাসভূমি—ব্রজভূমি ও সেই সাথে আপনাকেও

এখন (ভাগবতকার যেমন বলেছেন) "সেই ক্ষুদ্রবালকের মুখ-গহ্বরে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্মিতের ন্যায় নানাপ্রকার শঙ্কা করিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি অথবা ইহা কোন দেবতার মায়া অথবা আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। পরক্ষণে গর্গাচার্য্যের বাক্য স্মরণ করিয়া বুঝিলেন—এ সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছায় হইয়াছে। এইরূপে সাময়িকভাবে কৃষ্ণের প্রতি ভগবৎ বুদ্ধির উদয় ও ঈশ্বরই সার আর সব অসার—এই জ্ঞানের সাময়িক স্ফুরণ হওয়ায় বারে বারে কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন।" এর পরেই বলা হয়েছে—পরমুহূর্ত্তে কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ অবলুপ্ত হ'ল, কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে যশোদা আবার পুত্রস্নেহে আবিষ্ট হ'য়ে পড়লেন।

যদিও উপরোক্ত—"পরক্ষণে গর্গাচার্য্যের বাক্য স্মরণ করিয়া বুঝিলেন," "সাময়িকভাবে কৃষ্ণের প্রতি ভগবৎ বুদ্ধির উদয়" ইত্যাদি কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যশোদার এই দ্বিতীয় অলৌকিক দর্শনকেও ভাগবতকার শাস্ত্রোক্ত অপরোক্ষদর্শন অথবা অপরোক্ষ অনুভূতি ব'লে স্বীকার করেননি এবং পরবর্ত্তী বাক্যে—"যশোদা আবার পুত্রস্নেহে আবিষ্ট হ'য়ে পড়লেন" এরূপ ব'লে যশোদার মন থেকে জাগতিক ভেদজ্ঞান তখনও যে সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়নি এরূপই ইঙ্গিত করেছেন, তবুও একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, "এবারের এই দর্শন পূর্ব্বেকার দর্শনের চেয়ে অধিকতর সুস্পষ্ট ও গভীরতর অর্থব্যঞ্জক। প্রথম দর্শনে—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান যেন সুস্পষ্টরূপে পৃথক, পৃথক, বহুজ্ঞানের ভিত্তিতে কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য বা শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন। অপরপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাবাত্মক পরবর্তী এই দর্শনে—ঈশ্বর স্বয়ংই জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন, "এমন কি দর্শক নিজেও যে সেই একই অপরিচ্ছন্ন সত্বার অন্তর্গত এরূপ ভাবের প্রকাশ সুপরিস্ফুট। কিন্তু, জাগতিক মায়া অতিক্রম করতে না পারলে সাংসারিক ভেদবুদ্ধির পারে যেতে না পারলে, এভাবে স্থিতিলাভ করা যায় না। মন সম্পূর্ণ নির্ম্মল না হ'লে চিত্তপটে এ ভাব চিরমুদ্রিত থাকে না। তাই বুঝি—অন্যে কা কথা—যশোদার মনেও এ দর্শন—এ জ্ঞান চিরস্থায়ী হ'ল না। কিন্তু—

"ভুলায়েছ যা'রে তব প্রলোভনে, সে কি ক্ষান্ত রবে তব অন্বেষণে ?
যতই না পাবে, তত পেতে চাবে, কভু না ফুরাবে অন্বেষণ তা'র।"

তাই বুঝি আবার নতুন খেলার অবতারণা !

৭

কৃষ্ণের দৌরাত্ম্য বেজায় বেড়ে উঠেছে। দুষ্টু ছেলের জ্বালায় পাড়ার লোকের একটুকুও স্থির হ'য়ে থাকবার যো নেই। কোথায় কে ঘরে একটু সর-ননী লুকিয়ে রেখেছে,খুঁজে খুঁজে তে বে'র করা—নিজে খাওয়া সঙ্গীদের দেওয়া, আর বাকী যা থাকে দেওয়া হয় বানরদের। শিকেয় ঝুলিয়ে রেখেও নিস্তার নেই। নেহাৎ নাগালের বাইরে হ'লে, তলা থেকে হাঁড়ি ফুটো করে যা পারে খায়, বাকী সব ফেলা যায়। অতিষ্ঠ হয়ে নালিশ করল একদিন গোপিনীরা মা-যশোদার কাছে। কি আর করেন যশোদা। এমন দস্যি ছেলেকে না বেঁধে রেখে উপায় কি ? কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! ঘরে যত দড়ি-বেড়ি ছিল তা'তেও কুলিয়ে উঠছে না যে ! গোপালকে বাঁধতে গিয়ে মহা ফাঁফরে পড়লেন মা-যশোদা। একে ত মোটা মানুষ, তারপরে ছুটোছুটি করে হাঁপিয়ে উঠেছেন—গা দিয়ে দর্ দর্ করে ঘাম ঝরছে। মায়ের অবস্থা দেখে বোধহয় একটু দয়া হ'ল ! মৃদুহেসে অবশেষে বন্ধন স্বীকার করল গোপাল। মায়ের হাতে আষ্টেপৃষ্ঠে উদুখলে বাঁধা পড়ল। কিন্তু—কিন্তু, এই বন্ধনই যে অন্যের মুক্তির কারণ ! অন্যের মুক্তির জন্য, কেন কিভাবে অবতার পুরুষগণ রোগ-শোক-জরা-মরণের বন্ধন স্বীকার করে যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সাধারণ মানুষ—শুধু সাধারণ মানুষ কেন, যাদের ঘরে তাঁদের জন্ম তারাও, তা' বুঝে উঠতে অক্ষম। এমন কি, যে দেহমন আশ্রয় করে এই নরলীলার অভিব্যক্তি উহাও সব সময়ে ইহা ধ'রতে বা বুঝতে সক্ষম হয় না। কাজেই যশোদার পক্ষে আজ এ তত্ত্ব বুঝতে বা ধারণা করতে না পারায় আর আশ্চর্য্য কি ?

গোপালকে বেঁধে রেখে অতঃপর যশোদা গৃহকার্য্যে মন দিলেন। এদিকে দুরন্ত ছেলে টানাটানি ক'রে উদুখল উপড়ে নিয়ে পালাতেই কোমরে বাঁধা উদুখল প্রাঙ্গণের দু'টি যমজ অর্জ্জুন গাছের মাঝে আটকে গিয়ে তার গতি রোধ করল। তার পর উদুখলটি ছাড়িয়ে নিতে যেমন দড়ি ধরে টান দিয়েছে, অমনি কি আশ্চর্য্য। অতটুকু ছেলের সেই টানেই প্রকাণ্ড অর্জ্জুনবৃক্ষদুটি প্রচণ্ড শব্দ করে উপড়ে পড়ল মাটিতে। আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন দু'টি তাপস-মূর্ত্তি। এসেই এরা শিশু কৃষ্ণকে দেখে নানা স্তব স্তুতি আরম্ভ করলেন। আসলে এঁরা ছিলেন স্বর্গের দুটি দেবতা। নারদ মুনির অভিশাপে স্বর্গচ্যুত হ'বার পরে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়েও এঁদের অন্তশ্চেতনা লোপ পায়নি। ভাগবতকার যেমন বলেছেন, নারদ মুনি কৃপাপরবশ হ'য়েই উৎকট ভোগমত্ত এই দেবতাদ্বয়কে তাঁদের কল্যাণের নিমিত্তই এরূপ অভিশাপ দিয়েছিলেন ; ফল দেখে বিচার করতে গেলেও এই রূপই বলতে হয়। শাস্ত্রোক্ত অনুরূপ ঘটনার সাথে তুলনা করলে এক্ষেত্রে বেশ একটু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইতঃপূর্ব্বে ত্রেতাযুগে তপস্বিনী অহল্যার নিজ স্বামী গৌতম মুনির অভিশাপে পাষাণত্ব প্রাপ্তি ও পরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে মুক্তিলাভ—রামায়ণের এক বিখ্যাত কাহিনী। অহল্যা ছিলেন অনিন্দ্যসুন্দরী দেবকন্যা ; সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার আদেশে তপঃক্লিষ্ট গৌতম মুনিকে স্বামীত্বে বরণ করে তাঁর সেবায় দিন কাটাচ্ছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎএকদিন অহল্যার অতৃপ্ত-কামনা-বাসনা বাত্যাবিক্ষুব্ধ জীবন নদী-স্রোত বিপথগামী হ'বার মুখে মুনির অভিশাপে রুদ্ধগতি হ'য়ে দাঁড়াল—যৌবন-জল-তরঙ্গ মুনির মর্ম্মান্তিক অভিশাপের মৃত্যু শীতল স্পর্শে স্তব্ধ হ'য়ে কঠিন তুষার স্তূপে পরিণত হ'ল। জীবনের সর্ব্ব অনুভূতি সর্ব্ব বহিঃপ্রকাশের দ্বার অবরুদ্ধ হ'য়ে, দেবী-অহল্যা—মানবী অহল্যা—পাষাণী-অহল্যায় পরিণত হ'লেন। প্রসঙ্গ ক্রমে লক্ষ্য করবার বিষয়—শাস্ত্রে যে পঞ্চকন্যার

স্মরণে মহাপাতক নাশ হয় ব'লে বলা হয়েছে, অহল্যা তাঁদেরই মধ্যে একজন। এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কোন-না কোন কারণে আদর্শ সতীধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, কিন্তু তার ফলে একমাত্র অহল্যাকেই পাষাণত্ব প্রাপ্ত হ'তে হয়েছিল। এরূপ হ'বার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় দ্রৌপদী প্রভৃতি অপর চারিকন্যা তাঁদের যা কিছু দুষ্কৃতি সত্বেও প্রত্যেকেই অবতার খ্যাত শ্রীরামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসবার বা তাঁদের লীলাসহচরী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তবুও, অথবা বুঝি সেই কারণেই, তাঁদের প্রত্যেকেরই লৌকিক-জীবনে দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা পরিসীমা ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—অবতার পুরুষের সঙ্গের ফলে তাঁদের দশ জন্মের ভোগ এক জন্মেই কেটে গিয়েছিল। অপর পক্ষে, অহল্যার ক্ষেত্রে এরূপ কোন যোগ বা ভোগ দেখতে পাওয়া যায় না। তাই কি তাঁর পাষাণত্ব অথবা জড়ত্ব প্রাপ্তি? অহল্যা শাপগ্রস্তা হ'য়ে পাষাণী হ'বার বহুদিন পরে, শ্রীরামচন্দ্র দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বালক বয়সে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সাথে গৌতম মুনির আশ্রম দেখতে যান। সেখানে অহল্যার পাষাণ মূর্ত্তি দেখতে পেয়ে পদদ্বারা স্পর্শ করে তিনি তা'কে চেতনা দান করেন। মুনির অভিশাপের গুরুভারে অবনত-মস্তক পাষাণ প্রতিমা অহল্যা এমনি করে পাষাণের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করলেন—তাঁর দেহমন জড়ত্ব পরিত্যাগ করে পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হল—রুদ্ধগতি জীবন নদী-স্রোত গতিলাভ ক'রে আবার সংসার খাদে প্রবাহিত হ'তে চল্‌ল। মুক্তিলাভ করে অহল্যা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম প্রদক্ষিণ ও বন্দনাদি করে গৃহত্যাগী স্বামীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পাষাণী-অহল্যা পুনরায় মানবী হলেন—সংসারী হ'লেন। শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে এইরূপে পাষাণী অহল্যার পাষাণত্ব মোচনের কাহিনী সর্ব্বজন বিদিত। কিন্তু, কবে—জীবনের কোন সন্ধ্যায় সেই পাদস্পর্শের ফলে মানবী অহল্যার মনে সংসার-বৈরাগ্যের অনল প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছিল, রামায়ণের কোথায়ও তার উল্লেখ আছে ব'লে মনে হয় না।

আবার শ্রীরামকৃষ্ণের কথা এসে পড়ে। বাজীকর বাজী দেখাচ্ছে; হঠাৎ তালুতে জিভ্‌ আট্‌কে গিয়ে আপনা হতেই কুম্ভক হ'য়ে গেল। হাজার বছর এভাবে কেটে যাওয়ার পরে যখন সে অবস্থাটা চ'লে গেল, শুনতে পাওয়া গেল বাজীকর আগের মতই চিৎকার ক'রে বল্‌ছে—লাগ্‌ ভেল্কি লাগ্‌, রাজা টাকা দাও, পয়সা দাও। হাজার বছর আগে যেখানে ছেদ পড়েছিল, আবার সেখান থেকেই আরম্ভ। দেখা যায় কেবল মাত্র সময়ের ব্যবধানেই মন বদলায় না—বিষয়ের সংস্কার ঘোচেনা। আর,—"ভোগান্ত না হ'লে বৈরাগ্য হয় না।" অহল্যা ও অপর চারি কন্যার অবস্থা ভেদের এ'ও কি অন্যতম কারণ?

কথায় কথায় যমলার্জ্জুন প্রসঙ্গ ছেড়ে আমরা অনেকদূর এসে পড়েছি; আবার এখন সেই প্রসঙ্গেই ফিরে যাওয়া যাক। মনে হয়, অহল্যার ক্ষেত্রে যেন রজোগুণ থেকে তমোগুণে পতন, আবার রজোগুণে প্রত্যাবর্তন। নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে পাষাণের বুকে নবজীবনের সঞ্চার অবচেতন মনে চেতনার পুনরুন্মেষ। অপরপক্ষে, যমলার্জ্জুন বৃক্ষোদ্ভূত তাপস যুগলের ক্ষেত্রে যেন রজোগুণক্ষয় জনিত সত্বগুণের উদয়। অভিশাপকালীন এদের উক্তি, দেবর্ষি নারদের অভিশাপচ্ছলে আশীর্ব্বাদ এদের আসন্ন ভোগান্তেরই সূচনা করে। তাই অভিশপ্ত জীবনে এদের তপশ্চর্য্যা, আর এর ফলে বালকৃষ্ণ যখন যমলার্জ্জুনরূপ আবরণ উন্মোচন ক'রে জগতের সমক্ষে এদের প্রকাশ করলেন, তখন দেখতে পাওয়া গেল ভোগলম্পট দেবতাযুগলের স্থলে দু'টি তাপসমূর্ত্তি, যাঁদের রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে ভাগবতকার মানবীয় ভাষায় যোগ্যতর শব্দ খুঁজে না পেয়েই বোধহয় "জলন্তপাবকসম" বলে উল্লেখ করেছেন।

বৃক্ষাভ্যন্তর থেকে মুক্তিলাভ করেই তাপসদ্বয় সারগর্ভ ভাষায় কৃষ্ণের স্তবস্তুতি করতে লাগলেন আর তা'র উত্তরে কৃষ্ণকে বলতে শোনা যায়—"হে কুবেরনন্দন! আমাতে তোমাদের অতি-অনুপম সংসার-মোচক ভাবের উদয় হয়েছে, এখন আমাতে চিত্ত-সমর্পণ করে স্বস্থানে গমন কর।" অতঃপর—

> "ইত্যুক্তৌ তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
> বদ্ধোদূখলমামন্ত্র্য জগ্মতু দিশ মুত্তরাং॥"

ঋষিদ্বয় উদূখলবদ্ধ কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ, বারবার প্রণাম ও অভিবাদন করে উত্তরদিকে যাত্রা করলেন। দেখা যায়, ভাগবতকার শুধু শাস্ত্রকারই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মরমী কবি—দরদী বন্ধু! তাই ভাগবত কেবল মাত্র একখানি অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ নয়, একখানি অতুল্য কাব্যগ্রন্থও বটে। এখানে বালকৃষ্ণকে অন্য বিশেষণে বিশিষ্ট না করে, "বদ্ধোদূখল" অর্থাৎ উদূখল বদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ করার তাৎপর্য্য এই মনে হয়—শ্রীভগবান নানা যুগে নানারূপে লীলা করছেন এ তত্ত্ব তাঁদের কাছে সম্যক প্রকটিত হ'য়ে থাকলেও, যে উদূখলবদ্ধ বালগোপাল মূর্ত্তিতে আজ তিনি তাঁদের অভিশাপ মোচন করলেন—পরামুক্তি বিধান করলেন, সেই উদূখলবদ্ধ রূপটিই তাপসদ্বয়ের কাছে সমধিক প্রিয় ব'লে বোধ হয়েছিল। ইষ্টনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্বরূপে, শ্রীরামচরিতকারকেও শ্রীহনুমানের মুখ দিয়ে অনুরূপ ভাবে বল্‌তে শোনা যায়—

> শ্রীনাথে জানকিনাথে অভেদ পরমাত্মনি।
> তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।

এই প্রসঙ্গে এরূপ প্রশ্নও জাগে—তবে কি বালকবেশী কৃষ্ণ যিনি আপন শক্তিতে উদূখল উৎপাটন করলেন, বিরাট যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়কে অবলীলা-ক্রমে ভূপতিত করলেন, তিনি এই সামান্য উদূখল-বন্ধন-রজ্জু থেকে আপনাকে মুক্ত করতে সত্য সত্যই অপারগ হয়েছিলেন, অথবা তাঁকে এই স্বেচ্ছাস্বীকৃত প্রেমবন্ধন থেকে মুক্তি দিতে কাতর ভাগবতকার এই উপলক্ষে এই কথাই প্রচার করতে চেয়েছেন যে—এমনি করেই যুগে যুগে দেহাভিমানশূন্য পরম পুরুষেরা ইচ্ছামাত্রই দেহের বন্ধন ছিন্ন করতে সমর্থ হ'লেও জীবের প্রতি অহৈতুক কৃপায় লোক-কল্যাণার্থে অশেষ দৈহিক ক্লেশ সহ্য করেও নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত দেহের বন্ধন স্বীকার করে

জগতে অবস্থান করেন। এই উদুখল বন্ধন কি এইরূপে স্বেচ্ছাস্বীকৃত দেহবন্ধনেরই প্রতীক ?

এরপর, "জগ্মতু দিশমুত্তরাং"—অর্থাৎ তাঁরা উত্তরদিকে গমন করলেন। মনে পড়ে, ছেলেবেলার যখন মা, ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনতাম, বা "ঠাকুরমার" অথবা "দাদামশাই-এর ঝুলির" গল্প পড়তাম, তখন গল্পের শেষে প্রায়ই থাকৃত—"তারপর তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করতে লাগ্‌ল।" বাস্তবিকই যে ব্রতের যে কথা তা'ইত বল্‌তে হবে। তা'ই বোধহয় আজন্ম ব্রহ্মচারী শুকদেব—"অতঃপর কুবের নন্দনদ্বয় স্বর্গে ফিরে গিয়ে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর স্বর্গসুখ ভোগ করতে লাগলেন" একথা আর না ব'লে তা'দিগকে (যেমন মনে হয়) সাধককুলের বহু অভিলষিত হিমালয় প্রদেশে পুনরায় তপস্যার্থে প্রেরণ করলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—'কেরাণী জেল থেকে বেরিয়ে এসে কি ধেই ধেই করে নাচবে—না, আবার কেরাণী গিরিই করবে ?"

আশ্চর্য্যের বিষয়, এত যে সব ঘটে গেল—গোপগোপীরা সে সকলের কিছুই দেখেও দেখতে পেলেন না, বুঝেও বুঝতে পারলেন না। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যায় ভাগবতকার গোপগোপীগণের ভক্তিভাব ও সৌভাগ্যের অকুণ্ঠিত প্রশংসা করলেও, তাঁদের তৎকালীন মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং ভাবোচ্ছ্বাসবশতঃ অবস্থাগতভিন্ন কোন উচ্চতর ভাব কখনও কারও চরিত্রে আরোপ করবার চেষ্টা করেন নি। যা'হোক এই ঘটনার পরে, যদিও ভগবানের অনুগ্রহে কৃষ্ণ-বলরাম এ যাবত সকল অনর্থের হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে আসছে, তবুও তাদের নিয়ে আর বেশীদিন এরূপ বিপদসঙ্কুল স্থানে বাস করা উচিত নয় মনে করে, নন্দ-যশোদা-প্রমুখ গোপগোপীগণ জন্মভূমি গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনের বনে নির্জ্জনবাসই স্থির করলেন। শাস্ত্রানুযায়ী, যে অষ্টপাশ মানুষকে আজীবন বদ্ধকরে রেখেছে দেশ তা'দের অন্যতম। কৃষ্ণভক্ত গোপগোপীরা কৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় এইরূপে দেশত্যাগ করে এ পাশ থেকে মুক্ত হলেন—ভাগবতকার গোকুল ত্যাগের কথায় কি এই আভাসই দিচ্ছেন ? কে জানে ?

(৮)

পিতৃপুরুষের ভিটের মায়া ছেড়ে গোপগোপীগণ বৃন্দাবন-বনবাসী হলেন বটে, কিন্তু বনে এসেও অসুরের হাত থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেলেন না। দেখতে পাওয়া যায়, স্থূলভাবে বিষয় ছাড়লেও বিষয়ের সংস্কার সহজে যেতে চায় না। তাই কি আবার বৃন্দাবনেও অসুরের প্রাদুর্ভাব ? এবার কিন্তু অসুরের চেহারার ঢং বদলেছে; তাই নিত্য পরিচিত গোবৎসের রূপে অসুরকে দেখে গোপবালকেরা আদপেই তাকে চিনতে পারল না। তার দ্বারা তা'দের যে কোন অনিষ্ট হ'তে পারে এমন কথা তাদের কা'রও মনেই এলনা। গোবৎসের প্রতি তা'দের যে স্বাভাবিক প্রীতি, সেই প্রীতির চোখেই তারা নবাগত বৎসটিকে দেখল, নিতান্ত আপনার বলেই গ্রহণ করল। আমাদের চির-আদরের মনগড়া ধর্ম্মের সংস্কার যে কখন কখন আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির হন্তারক হ'তে পারে এ কথা বুঝে উঠা কঠিন। সাধনপথে বেশ কিছুদূর অগ্রসর না হলে মনের এ ফাঁকি ধরা পড়ে না, একে পরিত্যাগ করবার চেষ্টাও আসে না। তাই বুঝি এত দেরীতে বৎসাসুরের আগমন! যাহোক রাখাল বালকেরা বুঝতে না পারলেও, চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণের চোখে বৎসাসুরের চাতুরি ধরা পড়্‌তে মোটেই দেরী হ'ল না; অন্যান্য অসুরগণের মত, একেও খেলাচ্ছলে বধ করে তিনি শরণাগত গোপবালকদিগকে ভবিষ্যৎ-বিপদ থেকে রক্ষা করলেন।

বৎসাসুরের পরে বকাসুর। এসম্বন্ধে ভাগবতগ্রন্থে টীকাকার যেরূপ আভাস দিয়েছেন, বকাসুরের আবির্ভাব ও বিনাশের মর্ম্মার্থ হিসাবে সেই কথারই উল্লেখ করলে যথেষ্ট হবে।—"জীবহৃদয়ে ঈশ্বর প্রেমের কণামাত্র উদয় হইলে জীব যদি ভক্তিবারি সিঞ্চনে সেই ভাবের পোষণ করে তাহা হইলে কংসরূপী মহামোহই যে কেবল নিরাকৃত হয় তাহা নহে, তৎসঙ্গে উহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার প্রতারণাদি কুপ্রবৃত্তিসমূহও আপনা হইতে বিলীন হইয়া যায়।" কথাও আছে—হাসপাতালে নাম লেখালে রোগের শেষ থাক্‌তে ছেড়ে দেয় না।

৯

বকাসুর বধের পরে দেখা যায় কৃষ্ণকে নিয়ে রাখাল বালকেরা বনে বনে কখনও বা যমুনা পুলিনে নির্ভয়ে বালকসুলভ ক্রীড়াকৌতুকে মগ্ন। এই ক্রীড়া বর্ণনায় ভাগবতকার মুখর হয়ে উঠেছেন, ব্রজবালকগণ, তথা সমুদয় ব্রজবাসিগণের সৌভাগ্যের সাথে তুলনা করবার মত অপর কা'রও ভাগ্যের সন্ধান পাচ্ছেন না। কিন্তু তখনও বুঝি রোগের শেষ হয়নি। শত্রুর শেষ হয়নি! তাই আবার অঘাসুর। বলা হয়েছে—"অঘাসুর পর্ব্বতের ন্যায় স্থূল এবং যোজন পরিমাণ দীর্ঘ একটি সুবৃহৎ অদ্ভুত সর্পকলেবর ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ ও রাখালগণকে গ্রাস করবার মানসে গিরিকন্দরের ন্যায় মুখব্যাদান করতঃ পথিমধ্যে শয়ান রহিল।" অঘ অর্থে পাপ অথবা বিষয়ের সংস্কার—যা' থেকে সকল পাপচিন্তা, সকল পাপ কার্য্য, সকল ভয়ের উৎপত্তি। আমাদের চিত্তস্থিত বিষয় সংস্কারের সাথে অজগরের তুলনার একটি হেতু এই মনে হয়, অজগর যেমন বিনা আহারেও সুদীর্ঘ দিন জীবিত থাকতে পারে, আমাদের ভালমন্দের সংস্কারগুলিও তেমনি বিষয়ের ইন্ধন বিনাও দীর্ঘকাল সুপ্ত অথবা নিক্রিয়ভাবে থেকে আবার বিষয় সংস্পর্শমাত্রই চঞ্চল অথবা সক্রিয় হ'য়ে ওঠে।

বালকগণ, বিশেষতঃ ব্রজবালকেরা স্বভাবতই নির্ম্মলচিত্ত। তারপর কৃষ্ণের সঙ্গের ফলে, আর এই সেদিন তাঁকে চোখের সামনে বকাসুরের মত অতবড় একটা প্রকাণ্ড অসুরকে হেলায় মেরে ফেলতে দেখে—তা'রা এখন অকুতোভয় হ'য়ে উঠেছে। তাই দেখতে পাওয়া যায়, ভয় পাওয়া ত দূরের কথা, কৃষ্ণের বলে বলীয়ান হ'য়ে আজ তারা "উদ্ধসন্তঃ করতাড়নৈঃ"—উচ্চহাস্য ক'রে হাততালি দিতে দিতে অবলীলাক্রমে কালসর্পের মুখে প্রবেশ করছে। যা'হক বালকেরা এরূপ অসমসাহসিকতা দেখালেও অঘাসুরের বিক্রম কৃষ্ণের বিলক্ষণ জানা

থাকায় তিনিও বালকদের পিছু পিছু অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবেশ করলেন ও নিজদেহ বিস্তার করতে করতে তালুদেশ বিদীর্ণ ক'রে সর্পাসুরকে বিনাশ করলেন। মায়ার রজ্জু যতই দীর্ঘ হোক না কেন, তা' কখনও মায়াধীশকে বাঁধতে সমর্থ নয়! The whole is always greater than the part.

বিষয়ের সংস্কার যতই ক্ষীণ হ'তে থাকে অনর্থনিবৃত্তি ততই সহজসাধ্য হ'তে থাকে আর অভীষ্টপূরণের পথও ততই সুগম হ'য়ে ওঠে। তাই-ই বোধহয় দেখতে পাওয়া যায়, অঘাসুর-বধের পরে বৃন্দাবনে অসুরের দৌরাত্ম্য একেবারে লোপ না পেলেও অনেকটাই কমে গেল আর তারপর থেকে ব্রজবাসিগণ শান্তভাবে ধীরে ধীরে অভীষ্টপূরণের পথে এগিয়ে চলেছেন।

অঘাসুর বধের ব্যাপারে ভাগবতে একটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ বলা হয়েছে—"অঘাসুর বিনষ্ট হ'বার পর তা'র দেহ থেকে এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নির্গত হ'য়ে, কৃষ্ণ অঘাসুরের দেহ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'বা মাত্র সমস্ত দেবগণের সামনেই উহা কৃষ্ণশরীরে প্রবেশ করল।" একদেহ হ'তে নির্গত জ্যোতিঃ অপরদেহে প্রবেশের এরূপ অলৌকিক কাহিনী পৌরাণিক যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তও শুনতে পাওয়া যায়। একের অস্তিত্ব বা চৈতন্যসত্তা যা' জ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হচ্ছে, উহার অন্যদেহে প্রবেশের দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মী বলে বোধ হ'লেও উভয়ই মূলতঃ এক অদ্বয় সত্তারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। দ্বৈত ভাবাত্মক ভক্তি শাস্ত্রে এরূপ অদ্বৈত জ্ঞানের আভাস দেখে মনে হয়,—স্থান কাল ও অধিকারী বিশেষে ভক্তিযোগের প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও, ভক্তির পূর্ণতা ও অদ্বৈতজ্ঞান যে একই, শাস্ত্রকারের উহা অবিদিত ছিল না। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, কেবল মাত্র ব্রহ্মাদি দেবগণই এই দিব্য দর্শনের অধিকারী হয়েছিলেন। যে ব্রজবালকগণকে উপলক্ষ ক'রে অঘাসুর-বধ, তাদের কারও এই জ্যোতিঃ নির্গমন লক্ষ্যের মধ্যে আসেনি। পূর্ব্বেও তা'রা যেমন স্থূল ভাবে দেখেছিল—পুতনা নিধন, শকট ভঞ্জন, তৃণাবর্ত বধ, অকস্মাৎ যমলার্জ্জুন বৃক্ষ দুটির পতন, বৎসাসুর-বকাসুর বধ, আজও তেমনি তারা স্থূলচক্ষে দেখল—সখা কৃষ্ণ বিরাট একটি অজগরকে মেরে ফেলে তাদের রক্ষা করল আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে। সেদিনও যেমন যমলার্জ্জুন ভঙ্গরূপ স্থূল ঘটনা ভেদ ক'রে তাদের চক্ষু "পাবকোপম" ঋষিদ্বয়ের দিব্য আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়নি, আজও তেমনি অঘাসুর বধের পশ্চাতে যে এক বা অদ্বৈততত্ত্বের প্রকাশ উপস্থিত হ'ল তা' অন্ততঃ এখনকার মত, তাদের মনের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল। মনে হয়, এখানে ভাগবতকারের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এই যে কেবলমাত্র ভক্তির চরম অবস্থাতেই অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হয়, তৎপূর্ব্বে নয়।

১০

এরপর যমুনাপুলিনে বন ভোজনের পালা;—কৃষ্ণকে নিয়ে বালকদের যদৃচ্ছা ভোজন, অঞ্জলি করে যমুনার জল পান, নানা রঙ্গরস। ইতোমধ্যে, গাভী-বৎসগণ সকলের অলক্ষিতে চরতে চরতে দৃষ্টি পথের বাইরে চলে যেত, হতবুদ্ধি বালকগণকে প্রবোধ দিয়ে অর্দ্ধভুক্ত-অন্ন-হস্তে চললেন কৃষ্ণ একাই তাদের খোঁজে। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! এ বন সে বন করে, এ গুহা সে গুহা তন্ন তন্ন ক'রে, একটিও গাভী বা বৎসের সন্ধান পাওয়া গেল না। এদিকে কৃষ্ণ ক্ষুণ্ণমনে যমুনাতীরে ফিরে আসতে দেখা গেল সেখান থেকে রাখালেরাও অদৃশ্য হয়েছে। রাখালরাজ এবার মহা ফাঁফরে পড়লেন। এর আগে যে সব লড়াই, তা' হয়েছিল স্থূল দেহধারী অসুরদের সাথে, কেবল মাত্র এক তৃণাবর্ত্তের বেলাতেই লড়তে হয়েছিল হাওয়ার সাথে। এবার কিন্তু শত্রু একেবারে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বাইরে। আগে ছিল অসুরী মায়া, এবারে দেবী মায়ার ব্যাপার। যা'হোক চালাক ছেলে একটু ভাবতেই বুঝে নিলেন এ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারই কাজ। আসলে হয়েছিলও তাই-ই। অঘাসুরের দেহ নির্গত জ্যোতিঃ কৃষ্ণশরীরে প্রবেশ করতে দেখে ব্রহ্মার দৃষ্টি কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর কৃষ্ণের শক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁর দ্বারাই আজ এই গাভীবৎস ও রাখালগণের হরণ।

এখানে কথা উঠতে পারে—এরূপ অলৌকিক দর্শনের পরেও ব্রহ্মার কৃষ্ণকে পরীক্ষা করবার ইচ্ছা হ'ল কেন? সকল পরীক্ষার মূলেই থাকে কিছু-না-কিছু সন্দেহ, কিছু-না-কিছু অজ্ঞান,—পূর্ণ বিশ্বাসের অভাব। কাজেই বলতে হয়—এরূপ দর্শন সত্ত্বেও ব্রহ্মার তখনও পরাভক্তি চরম এবং পরম জ্ঞান লাভ হয়নি; সকল সন্দেহের নিরসন হয়নি,—যে দর্শন ও বিশ্বাস অভেদ, সে দর্শন অথবা বিশ্বাস তখনও লাভ হয়নি। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেছিলেন—ভাই! যতক্ষণ জ্ঞান, ততক্ষণ অজ্ঞান; তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পারে চলে যাও। শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানীর পরে বিজ্ঞানীর অবস্থার কথা বলতেন। যে দর্শনের ফলে হৃদয়ের সকল গ্রন্থি ভেদ হয়ে যায়—সকল সংশয়ের নাশ হয়—সকল মায়িক কর্ম্মের অবসান হয়, উহাকেই মাত্র শাস্ত্র ঈশ্বরদর্শন বলে স্বীকার করেছেন। যা হোক ব্রহ্মার তপানুষ্ঠান, দিব্যদর্শন ও আত্মানুভূতি কেমন ক'রে তাঁকে চরমে পূর্ণজ্ঞান-ভক্তির অধিকারী করেছিল, গোধন ও বালকগণ হরণের ব্যাপারকে অবলম্বন করে ভাগবতে অতঃপর তারই বর্ণনা করা হয়েছে। মনে হয়, ভাগবতকার গোপ-গোপীগণের চরিত্র অবলম্বনে দেখিয়েছেন কেমন করে পূর্ণ ভক্তির উদয়ে পূর্ণজ্ঞান অযাচিত হ'লেও অবশ্যম্ভাবীরূপেই উপস্থিত হ'য়ে থাকে। অপর পক্ষে ব্রহ্মার ন্যায় যাঁরা জ্ঞান মার্গের সাধক তাঁরাও যে জ্ঞানের চরম পরিণতিতে পূর্ণ ভক্তির অধিকারী হ'ন এও ভাগবতের অন্যতম বক্তব্য বিষয়।

অতঃপর হৃত-গাভীবৎস ও রাখালদের আর বৃথা খোঁজাখুঁজি না ক'রে কৃষ্ণ নিজশক্তি দ্বারা অনুরূপ বৎস রাখালগণকে সৃষ্টি করলেন।

"ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্ত্তুং তন্মাতৄণাঞ্চ কস্য চ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বর॥"

"তারপর বিশ্বস্রষ্টা ভগবান কৃষ্ণবালকগণের জননী অর্থাৎ ব্রজগোপী-

গণের এবং বৎসগণের প্রভৃতি গাভী সকলের এবং ব্রহ্মারও যাহাতে আনন্দ হয় সেই উদ্দেশ্যে "উভয়ায়িতম্ আত্মানং" অর্থাৎ নিজেকে বৎস ও বালকগণ এই উভয় রূপেই রূপায়িত করলেন। অপূর্ব্বকৌশলীর সৃষ্টি কৌশলে আসল নকল এক হয়ে গেল। যা'রা সৃষ্ট হ'ল তা'রা নিজেরা, এমন কি তা'দের পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনেরাও কেউই কোন তফাৎ বুঝতে পারল না। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—এই ভগবন্মায়ায় মোহিত হয়নি এরূপ ব্যক্তিমাত্রই তখন কেহ ছিল না। বলতে গেলে বলতে হয়, শুধু তখন কেন, এখনও, আর কেবল এখন-তখনই বা কেন, যুগে যুগেই,—ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে আত্ম-স্বরূপ বিস্মৃত হয়নি এমন মানুষের সন্ধান কমই মিলে ! কৃষ্ণ কিন্তু সব জেনেশুনেও এমন নির্ব্বিকার হ'য়ে রইলেন যে তাঁর হাবভাবে, ভাষায় ব্যবহারে কারও মনে কোন সন্দেহের উদয় হ'বার অবকাশই ঘটল না।

১১

দেখতে দেখতে প্রায় এক বছর কেটে গেল। এই একবছর ধরে, রাখালেরা পূর্ব্বেও যেমন ধেনুবৎস নিয়ে রোজ রোজ গোচারণে যেত আবার সন্ধ্যা হ'লে ব্রজে ফিরে আসত, তেমনিই চলে এসেছে। তফাতের মধ্যে, বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখলে দেখা যেত, গোপীগণ ও গাভীগণ নতুন বালক ও বৎসগণের প্রতি আগের চেয়ে যেন কিছু বেশী স্নেহ-পরায়ণা হ'য়ে পড়েছে। জানতে অজান্তে বিষ খেলেই বিষের ক্রিয়া হয়—তাইত বিষ, বিষ ! অন্যের চোখে এ পার্থক্য ধরা না পড়লেও, বলরামের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য্য ঠেকেছিল। একদিন গভীরভাবে কথাটা ভাবতে ভাবতে সহসা তাঁর জ্ঞানদৃষ্টি খুলে গেল। এই প্রসঙ্গে ভাগবতকার বলছেন—"তখন বলরাম স্বীয় প্রতিভাবলে যাবতীয় বৎস ও বয়স্যগণকে কৃষ্ণরূপে অবলোকন ক'রে কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলতে লাগলেন, 'হে বাসুদেব ! পূর্ব্বে আমি জানতাম ঋষিগণই বৎসরূপে এবং দেববৃন্দই বালকরূপে জন্মপরিগ্রহ ক'রে আপনার সাথে ক্রীড়া করতে এসেছেন, কিন্তু এখন বিভিন্ন বৎস ও পালকরূপে এক আপনাকেই অবলোকন করছি।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের সেই বিখ্যাত শ্লোকটির কথাই এসে পড়ে—

> বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে।
> বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।

এদিকে ব্রহ্মাও এক বৎসর পূর্ণ হ'বার মুখে গোষ্ঠে এসে দেখেন, আগেকার মতই বৎস ও বালকদের নিয়ে কৃষ্ণ সেখানে খেলাধুলা ক'র-ছেন। তা' দেখে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগলেন—গোকুলের সকল গোবৎস ও বালকেরাই ত আমার মায়ানিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছে, তবে এরা সব আবার কে ? দেখতে দেখতে ব্রহ্মার চোখের সামনেই কৃষ্ণ ও সেই সঙ্গে বৎস ও বালকগণ, এমনকি তাদের যষ্টি ও সিঙ্গাগুলি পর্য্যন্ত সকল দৃশ্যমান পদার্থই নবঘন পীতাম্বর চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হ'ল। এরূপ "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" দর্শনের ফলে ব্রহ্মার মনে যে অদ্ভুতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়েছিল এবং আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে কৃষ্ণের উদ্দেশে তিনি তখন যে সব স্তবস্তুতি করেছিলেন তা' একাধারে জ্ঞানভক্তির চরমোৎকর্ষতার পরিচায়করূপে নিত্যকালের মত শ্রীমদ্ভাগবতের অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'য়ে রয়েছে। প্রায় বৎসরেক পূর্ব্বে, ব্রহ্মা একদিন ব্রজের গোপগোপীগণের এমন কি কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী রাখাল বালকগণেরও অগোচরে, অঘাসুরের দেহনিষ্ক্রান্ত বিমল জ্যোতিঃর বিদ্যুচ্ছটায় কৃষ্ণের চিন্ময়রূপের আভাস পেয়েছিলেন ও ক্ষণকালের জন্য অদ্বৈতজ্ঞানের প্রকাশে স্তম্ভিত হয়েছিলেন, আজ তাঁর হৃদয় সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণ প্রভার স্থলে স্থিরা সৌদামিনীর কনক কিরণে সমুদ্ভাসিত। সেদিনের সেই অস্ফুট দর্শন—চকিতদর্শন আজ সুপরিস্ফুট,—প্রত্যক্ষানুভূতিতে পরিণত। এতদিন নিজেকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব'লে মনে মনে যে অভিমান ছিল, কৃষ্ণের কৃপায় কৃষ্ণের লীলা-কৌশলে আজ তা' দূর হয়েছে। বোধহয় নিজ জীবনকথা—নিজ সাধনকথা স্মরণ ক'রেই এখন তা'ই ব্রহ্মাকে বলতে শোনা যায় কৃষ্ণকে সম্বোধন করে—"অনেকে প্রথমতঃ ভক্তিব্যতীত অন্যউপায় অব-লম্বনে উদ্দেশ্যলাভে অসমর্থ হ'য়ে পরে আপনাতে চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক নিজ বর্ণাশ্রমোচিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে ও ভবদীয় লীলাকথা শ্রবণে ভক্তিপূত হয়ে হে অচ্যুত ! বিশ্বব্যাপক পরমাত্মজ্ঞানের উদ্বোধনে আপনার পরমতত্ত্ব লাভ ক'রে থাকেন।" এইরূপে ঈশ্বরলাভের উপায় স্বরূপ জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধায়ক বহু স্তবস্তুতির পরে কৃষ্ণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে ব্রহ্মা স্বধাম সত্যলোকে গমন করলেন। প্রসঙ্গক্রমে এই অধ্যায়ের একটি শ্লোক এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যা'তে ভাগবত-কার ব্রহ্মার মুখ দিয়ে, মানুষ কিরূপ অবস্থাসম্পন্ন হ'লে তবেই ভবসাগর পার হ'তে সমর্থ হয় তারই বর্ণনা করেছেন—

> এবম্বিধং ত্বাংসকলাত্মনামপি স্বাত্মানংআত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
> গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎ—সুচক্ষুষা যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধি॥

অর্থাৎ "গুরুরূপ দিবাকরের সন্নিধানে উপনিষৎরূপ জ্ঞানলাভে যাঁদের অন্তর্নেত্র উন্মীলিত হয়েছে তাঁরাই কেবল সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ আপনাকে এই প্রকার স্বীয় আত্মরূপে দর্শন ক'রে ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ হন।"

(১২)

পট-পরিবর্ত্তন হ'ল। ফিরে এল, এক-বৎসর আগে যে সকল ক্রীড়ারত বালক ও বৎসগণ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছিল। কৃষ্ণকে দেখে তারা সকলে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল ও আবার আগের মতই তাঁকে নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে উঠল। মাঝে যা'সব ঘটে গেছে তা'র বিন্দু-বিসর্গও তা'রা জানতে বা বুঝতে পারেনি। মনে পড়ে, জন্মাষ্টমীর রাত্রিতে বসুদেব ক্রোড়ে কৃষ্ণ যখন গোকুলে আগমন করেন, তখন গোকুলে সকলেই নিদ্রামগ্ন। যদি সেদিনের সেই নিদ্রাকে মোহনিদ্রা বলি, এবারের এই আত্ম-বিস্মৃতিকে বলতে ইচ্ছা হয় মায়ানিদ্রা। একরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার জীবসৃষ্টির কৌশলে সকলেই নিদ্রিত অন্যরূপে কৃষ্ণের সখা—লীলাসহচর হ'য়ে ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন। কিন্তু এ লীলা-খেলাও যেন স্বপ্নচালিতের ন্যায় মায়ানিদ্রার ঘোরেই চলছে। লীলার

নায়ক সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ রাখালরাজ কৃষ্ণ দ্রষ্টারূপে লীলাবিলাস করছেন, কিন্তু যা'দের নিয়ে এই লীলা তা'রা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন। এই ব্যাপারের অবতারণা ক'রে ভাগবতকার কি জগতে নিত্যকাল যা' ঘটে আসছে তা'রই আভাস দিচ্ছেন? তা'ই বুঝি সকল প্রার্থনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা—"পিতানোহসি পিতা ন বোধি।" সকল আশীর্ব্বাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ—তোমাদের চৈতন্ত হো'ক!

(১৩)

অতঃপর বাল্যলীলা কাহিনী শেষে পৌগণ্ডলীলাকথা আরম্ভ। এই অবকাশে, পূর্ব্ববর্ণিত বাল্যলীলা ও পরবর্ত্তী লীলা কাহিনী সকল একত্রে অনুধ্যান ক'রে যখন আমরা দেখতে পাই,—যিনি একদিন গোপালবেশে ব্রজের ঘরে ঘরে ননী চুরি ক'রে খেয়েছিলেন, তিনিই আবার একদিন দিগ্মণ্ডল কম্পিত ক'রে ভীষণ দর্শন সুদর্শন সঞ্চালিত করেছিলেন; একদা যিনি বাল্যলীলাচ্ছলে মুগ্ধাজননীর মাতৃত্বের সকল লৌকিক বন্ধন স্বীকার ক'রে নিয়ে সামান্ত মানবশিশুর ন্যায় আচরণ করেছিলেন, সেই তিনিই লীলাবসানের প্রাক্কালে সকল বন্ধনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে পরমনির্ব্বিকার-চিত্তে স্বীয়কুল—যদুকুল-নিধনযজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করছেন;—যাকে একদিন আত্মভোলা রাখালবেশে বাঁশী বাজিয়ে ব্রজের বনে বনে ধেনু চরাতে দেখেছিলাম, তিনিই আবার ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে আচার্য্যরূপে শততর্কযুক্তির তীক্ষ্ণশরজাল বিস্তার ক'রে জ্ঞানখড়্গে ত্রিভুবনবিজয়ী অর্জ্জুনের মোহপাশ ছিন্ন করছেন; তখন,—তখন আর না বলে উপায় থাকেনা—আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে জ্ঞান ও ভক্তির মাঝে কৃত্রিম সীমারেখা টেনে এহেন কৃষ্ণলীলাকে আমরা খণ্ডিতভাবে দেখছি মাত্র;—আমরা ভুলে গেছি, সরলা ব্রজবালা-হৃদয়-নিকুঞ্জকাননচারী শ্যামসুন্দর আর প্রলয়ঙ্কর ভারতযুদ্ধের সর্ব্বাধিনায়ক অঘ-বক-কংসারী কৃষ্ণচন্দ্র এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি!

ভাস্কর

অসীম সেন

নিপুণ ভাস্কর নই পিকাসোর মতো,
লিখিনা কবিতা আমি এলিয়টী ঢঙে,
তবুও মুখের রেখা এখন অক্ষত
অবিকল আঁকা আছে কল্পনার রঙে;
খোঁপার ও ফুলগন্ধ মৃগনাভী শ্বাসে
পূর্ণাঙ্গীন প্রতিকৃতি শিল্পীর ছোঁয়াতে,
পরম আবেগে দেখি সযত্ন প্রয়াসে,
মধ্যাহ্নের অবসরে, রাত্রির তন্দ্রাতে।
যাদুকরী নও তবু তোমার অধরে,
আশ্চর্য্য সম্মোহ আছে, তাই বারে বারে
শুধুই ভাস্কর সাজি বসন্তের ভোরে
সুরের নির্ঝর আনি স্মৃতির সেতারে।
আমার ভাস্কর্য্য তাই সবার আড়ালে,
আমৃত্যু নেপথ্যচারী, আমার খেলাতে
খেলে যাবে, রবেনা তো কাল থেকে কালে
রবে শুধু রজনীর রজনীগন্ধাতে॥

বৃথাই

মনোজকুমার ঘোষ

বারে বারে হেরে বাবার দুঃখটাকে বয়ে
(সোনার স্মৃতি মিথ্যে সুখের খাদ মেশানো নয় তো?)
মিথ্যে আশার সান্ত্বনা আর নাইবা এলে নিয়ে
অলকেরও মনের তারে স্থির বেদনা বাজ তো।
আমি বরং হারিয়ে যাবো তোমায় দেখার জন্যে
(মিষ্টি হাসি ধূর্ত হয়ে হয় না যেন তিক্ত)
গন্ধলি আর চীনাংশুকে তোমায় দেখুক অন্যে
আমার দুচোখ মনের কাছে হয় না যেন রিক্ত।
অবহেলায় রিক্ত দিনে তোমার ও সুখ মিথ্যে
(তৃপ্তির মোহে অন্ধ যে আজ বন্ধ দুয়ারগুলি)
নিখুঁত মুখের নিখুঁত হাসি কুণ্ঠিত অসত্যে
পিয়াসী মনের বেদনা যে এই প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি।
তোমার রূপের নিঃশ্বাসে যায় বিশ্রামটুকু টুটে:
(মাছটা যেমন টোপ খেয়ে তার ভাগ্যটাকে মারে)
সেই হাসিটি ফুটিয়ো বরং তোমার আঙুর ঠোঁটে—
আমি তখন ব্যর্থ খেয়ায় জীবন-সাগর পারে!

বহুবাজার শিশুহত্যা মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রায়বাহাদুর সত্যেনবাবুকে অফিস ঘরে ঢুকতে দেখে আমরা সকলেই একত্রে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললাম, 'আসুন স্যার, আসুন। আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। আসামীকে এখানে নিয়ে আসবো কি, স্যার? এই মামলার ডায়েরিও লেখা হয়ে গিয়েছে। আগে কি ডায়েরিটা পড়ে দেখবেন? এই যে এখানে এই মামলার ডায়েরি রয়েছে।'

'না না, ডায়েরি পড়ে সময় নষ্ট করতে চাই না।' আসন গ্রহণ করে ইনেসপেকটার মুখার্জি বললেন, 'তার চেয়ে মুখে মুখে ঘটনাটা আমাকে বলো। কাল ডেপুটি কমিশনার, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের মারফৎ এই খুন সম্বন্ধে স্পেশাল রিপোর্টটা পেলাম। রক্ত-পরীক্ষকের রিপোর্টটা না পড়ে আমি এই ব্যাপারে কোনও এক স্থির সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারছি না। তবে আমার মন বলছে যে খুন আদপেই হয় নি। এটা একটা কোনও খুনের মামলা নয়। যদি কিছু হয়েও থাকে তো এটা অপহরণের মামলাই হবে। আচ্ছা! ডাকো দেখি এখানে তোমার আসামীকে।'

ইনেসপেকটার মুখার্জির এই শেষ অভিমত শুনে আমি ও সহকারী সুরেনবাবু একবার পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। তারপর খুন সম্পর্কীয় ঘটনাটা আদ্যোপান্ত মুখার্জি সাহেবের নিকট বিবৃত করে দরজার সিপাহীর উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে হুকুম করলাম, 'এই যাও তো ভাই। আসামী অমুককো হাজতসে বহার লে আও।'

আমাদের আদেশ মত দরজার সিপাহী হাজতঘরের দরজা খুলে আসামীকে আমাদের সম্মুখে দাঁড় করালে ইনেসপেকটার সত্যেন মুখার্জি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর আসামীকে একটা বেঞ্চে বসতে বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুম! আসামী তার নাম ও বাপের নাম কি বলেছে? ওর জাতি বর্ণ নির্ণয় প্রথমেই আপনাদের করা উচিত ছিল।' ইনেসপেকটার সত্যেন মুখার্জির এবংবিধ প্রশ্নে হতভম্ব হয়ে গিয়ে আমরা ভাবলাম, আরে। কি থেকে কি? এরপর আসামীর জাতি বর্ণ সম্বন্ধে তাঁকে আমরা অবহিত করা মাত্র তিনি খেঁকরে উঠে বললেন, 'তোমরা বাপু, কিছুই বুঝতে পারো নি। লোকটা আগাগোড়া সব তোমাদের মিথ্যে কথা বলেছে। ও কিছুতেই হিন্দু হতে পারে না। ও হচ্ছে একজন মুসলমান। বিশ্বাস না হয় নিভৃতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখো। ওর যৌন দেশে নিশ্চয়ই সুন্নত করা আছে।'

ইনেসপেকটার সত্যেন মুখার্জির এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে প্রথমটায় আমরা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। সত্যকথা বলতে কি, এতক্ষণ এইরূপ কোনও এক প্রশ্নই আমাদের মনে উদয় হয় নি। রায় সাহেব সত্যেন মুখার্জির উপদেশ মত সহকারী সুরেন বাবু আসামীকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে জমাদার সেখ মহীউদ্দীনের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখলেন যে সে সত্য সত্যই একজন গুজরাটী মুসলমান। সে কোনও দিনই গুজরাটী হিন্দু ছিল না। এ সম্বন্ধে আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে এজন্য একটুমাত্রও লজ্জিত হয় নি। এই সম্পর্কে আমরা তাকে যা যা জিজ্ঞেসে করেছিলাম এবং সে ঐ সব প্রশ্নের যা যা উত্তর দিয়েছিল তা যথাযথ ভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—এঁ্যা। তুমি তা হলে এতোক্ষণ আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলে এসেছো। লজ্জা করলো না তোমার এতো সব মিথ্যে কথা বলতে। তুমি নিজের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তো এত মিথ্যে কথা বললে। এখন এই খুন সম্বন্ধে তুমি যে সত্য কথা বলছো তারই বা নিশ্চয়তা কি?

উঃ—আজ্ঞে! আমি একটুকুও মিথ্যে বলি নি। ধর্মে আমি মুসলমান হলেও জাতিতে আমি হিন্দু। আমার প্র-পিতামহ আপনাদের মতই হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। আমি

পুরুষানুক্রমে একজন এই দেশেরই মানুষ। এতে আপনাদের আপত্তির কারণ কি তাতো বুঝলাম না। আমি কোন ধর্মাবলম্বী তাতো আপনারা জিজ্ঞাসাও করেন নি।

এর পর খুনের কথা আর না বলে আসামী উত্তেজিত ভাবে সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করতে সচেষ্ট হয়ে উঠলো। বেশ বুঝা গেল যে এই ব্যাপারে সে মনে বেশ একটু যেন আঘাত পেয়েছে। ডায়েরির পাতায় লিপিবদ্ধ না করলেও এই সম্পর্কে তার বক্তব্যটুকু আজও আমার মনে আছে। আসামীর ঐদিনকার বক্তৃতার সারাংশটুকু নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। এ হতে আসামী যে কিরূপ ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রস্থ ছিল তা প্রমাণিত হবে। বলা বাহুল্য যে অপরাধ-রোগীদের স্বভাব-চরিত্র এই প্রকারেরই হয়ে থাকে।

"আপনারা সুশিক্ষিত ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি হয়ে এই সব প্রশ্ন তুলেন কেন? সাতশ বৎসর পূর্বে পাঠনরা যখন ভারত আক্রমণ করে তখন আমাদের উভয়েরই হিন্দুধর্মীয় পূর্বপুরুষরা কি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেন নি? কে বলতে পারে যে ডাঃ প্যাটেল ও আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ সহোদর ভ্রাতা ছিলেন না? সেই দিনকার সেই যুদ্ধ ছিল এক জাতির সঙ্গে অপর এক জাতির যুদ্ধ। এক ধর্মীয় মানুষের সহিত অন্য ধর্মীয় কোনও মানুষের যুদ্ধ ছিল না। আমরা ধর্মে মুসলমান হলেও জাতিতে আমরা সকলেই হিন্দু। তবে আমি মোসলেম হওয়ার জন্য গর্ব অনুভব করি। কারণ মোসলেম ধর্ম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করেছে। ঠিক যেমন বৌদ্ধধর্ম সমৃদ্ধ করেছে চীন দেশকে। এই মহান ধর্ম দ্বারা হিন্দুমুসলমান সমভাবেই লাভবান হয়েছে। বিদেশীয় আক্রমণকারীদের সত্য-মিথ্যা দুষ্কৃতির বোঝা যারা মোসলেম ধর্মীদের উপর চাপায় তারা ক্ষমারও অযোগ্য।'

আসামীকে একজন অপরাধ-রোগী তথা বিকৃতমনা মানুষরূপে বুঝতে পারায় তাকে এই সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করা আমি উচিত মনে করি নি। তাকে তার স্বপ্নরাজ্য হতে নির্মম আঘাতে ফিরিয়ে এনে ফল হলো বিপরীত। এক্ষণে তার কাছ হতে অপহৃত বা নিহত শিশুটির সম্বন্ধে কোনও সংবাদ সংগ্রহ করা সুদূরপরাহত হয়ে উঠলো। কিন্তু আমার পুলিশী গুরু রায়বাহাদুর সত্যেন মুখার্জি আসামীর এই সব উক্তি স্থাকামী বা বজ্জাতির নামান্তর মনে করলেন। তিনি নীরোগ-অপরাধী কর্তৃক অপরাধ সম্বন্ধে তদন্তে সিদ্ধহস্ত হলেও এইসব বিকৃতমনা অপরাধ-রোগী কৃত অপরাধের তদন্তের রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। এমন কি পৃথিবীতে এই সকল অপরাধ-রোগীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি সন্দিহান ছিলেন। রায়বাহাদুর তাঁহার স্বভাব সুলভ উচ্চনাদে তাকে নাস্তানাবুদ করতে সচেষ্ট হলেন। নানাভাবে নানা কায়দায় ভালোমন্দ কথায় তার নিকট হতে প্রকৃত তথ্য জানবার তিনি প্রয়াস পেলেন। অপরাধ-নিরোধ এবং অপরাধ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রায়বাহাদুরের অসীম হাতযশ ছিল। এ সব ব্যাপারে তিনি ছিলেন যেন একটি রূপকথার বাঘ। কিন্তু আজ যেন তিনিও বোধহয় এর কাছে পরাজিত হলেন। এদিকে আসামীর সেই ভদ্রলোকের এক কথা। আপনারা আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করলেও আমি মরবো না। আমার দেহ ও মন—এই দুইয়ে প্রকৃত তফাৎ আছে জানবেন। তবুও রায়বাহাদুর মুখার্জি দমবার পাত্র ছিলেন না। রাত্র আটটা পর্যন্ত নিজস্ব কায়দায় আসামীর নিকট হতে কথা বার করবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে তিনি আমাদের বললেন, 'আচ্ছা। ঠিক আছে। কুছপরোয়া নেই। নাই বা পাওয়া গেল লাস। আসামী যেটুকু বিবৃতি দিয়েছে, অপরাধ প্রমাণের জন্য তাই যথেষ্ট। আমি এর উপর হয়তো একটু বেশি রুক্ষ ব্যবহার করেছি'—আসামীকে হাজতে প্রেরণ করে রায়বাহাদুর মুখার্জি বললেন, 'তাই তোমাদের এখন এর উপর একটু নরম ব্যবহার করা উচিত হবে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে কাবলেওয়ালারা কি করে লোকের নিকট হতে টাকা আদায় করে। এরা টাকা আদায়ের জন্য নিজেদের মধ্যে সলা করে জোড়ে জোড়ে বার হয়ে পড়ে। এদের একজন লাঠি উচিয়ে মারমুখী হয়ে লোকেদের তাদের ঋণ পরিশোধ করতে বলে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে এদের অপরজন তার বন্ধুকে নিরস্ত করে মিষ্টি কথায় তাকে বলে উঠে, 'এই, ঝুট মুট মাৎ উনকো মারো। কুছ রুপেয়া উ আভি দে দেগা।' এখন যেহেতু আমি একবার এর উপর রুক্ষ হয়েছি, সেই হেতু এখন নরম আর আমি হতে চাই না। আমি চলে গেলে ওকে লক্-আপ হতে বার করে এনে

তোমরা ওকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কথা বার করবার জন্ম আর একবার চেষ্টা করো। লোকটাকে যেন সত্যই কি রকম পাগল পাগল মনে হয়। ওর চোখের চাহনীটাও ভালো নয়। ওকে বেশী পীড়াপীড়ি করলে ওর পাগলামী বাড়তে পারে। অন্যথায় ও রীতিমত পাগল হয়ে উঠে তোমাদের আক্রমণ করলেও করতে পারে। একটু সাবধানে দূরত্ব বজায় রেখে ওর সঙ্গে তোমরা কথাবার্তা কয়ো। তবে এ সব ওর নিছক বজ্জাতি হলেও হতে পারে। আমি কাল বিকালে আবার এখানে আসবো।'

আমার মনে হলো যে রায়বাহাদুরের সহজাত প্রেরণা যেন এইবার কথা বলতে শুরু করেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ভুল করলেও তার সহজাত প্রেরণা কমক্ষেত্রেই ভুল করেছে। তাই রায়বাহাদুর এমন কথা বলে গেলেন যা তিনি নিজেই বিশ্বাস করেন না। রায়বাহাদুর সত্যেন মুখার্জি এই খুনের তদন্ত সম্পর্কে আমাদের আরও কয়েকটি উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। এদিকে রায়বাহাদুর কতকটা আমার মতে মত দেওয়ায় আমি খুশি হয়ে উঠেছিলাম। তাই আমি খুশি মনে সহকারী সুরেনবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'কি হে! শুনলে তো সব? রায়বাহাদুরের ইনটেলিজেন্স অন্য কথা বললেও তাঁর ইনষ্টিংট্ আমার মতেই মত দিল।'

'সে কথা স্যার, হয়তো ঠিক' আমার সুযোগ্য সহকারী সুরেনবাবু প্রত্যুত্তরে আমাকে বললেন, 'এখন দেখতে হবে যে এই সব ইনষ্টিংট্ পরিচালিত নির্দেশের শতকরা কতগুলি সত্য হয় এবং এর শতকরা কতগুলিই বা মিথ্যা হয়।'

এই ইনষ্টিংট বা সহজাত প্রেরণা সম্বন্ধে আমি সহকারীদের সঙ্গে ইতিপূর্বে বহুবার আলোচনা করেছি। আমি নিজেও এর সবটুকু যে বিশ্বাস করি তাও নয়। তবুও অদ্ভুত ভাবে বিভিন্ন মতাবলম্বী হয়েও আমাদের দুজনার এই মতের মিল আমাকে কথঞ্চিৎ চমৎকৃত করে দিয়েছিল। বহুক্ষণ একটি মাত্র বিষয়ে মাথা ঘামাবার জন্যে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা দুজনাই মনে করছিলাম যে এইবার বিশ্রামের জন্ম উপরের কোয়াটারে উঠে যাবো। ঠিক এই সময়—পাশের অফিস ঘর হতে মুন্সী বিমলবাবু একটা জরুরী লেফাপা বন্ধ পত্র নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। তাড়াতাড়ি লেফাপাটি হতে পত্রখানি বার করে দেখলাম উহা বারাকপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক লিখিত হয়েছে। ঐ পত্রখানির সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আপনাদের নির্দেশমত ঐ নিহতমস্ত শিশুটির দেহ খুঁজে বার করবার জন্ম এই কয়দিন আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। বারাকপুরের ময়দানের সব কয়টি পুকুরেই আমরা জাল ফেলবার ব্যবস্থা করি। এর ফলে একটি বালকের মস্তকের খুলি একটি পুকুর হতে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উহা কত বয়স্ক বালকের মাথার খুলি তা জানবার জন্ম উহা পোস্টমর্টেম পরীক্ষার জন্ম সহকারী ডাক্তারের নিকট পাঠালাম। ঐ পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া মাত্র উহা আপনাদের নিকট প্রেরিত হবে।"

এই রিপোর্টটি পাঠ করে আমাদের দুজনার মনটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাহ'লে সত্য সত্যই কি ঐ অপহৃত শিশুটি নিহত হয়েছে? এই দিনকার মত বিশ্রামের জন্ম উপরের কোয়াটার্সে উঠবার সিঁড়ির কাছে এসে আমি একবার থমকে দাঁড়ালাম। তারপর আমি ফিরে এসে হাজত ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আসামীকে ডেকে এই মস্তক প্রাপ্তির সংবাদ দিলাম। আসামী ধীর ভাবে আমার দেওয়া এই খবরটি শুনে মাথা নেড়ে বলে উঠলো, 'নেহি নেহি, এ হোনে সেকথা নেহি।' কিন্তু কেন সে এমন কথা বললো তা সে আমাকে বলে নি। এই নিয়ে আসামীর সঙ্গে বৃথা বকাবকি করার আমার স্পৃহাও ছিল না। আমি ক্লান্তপদে বিশ্রামের লালসায় এই দিনকার মত উপরের কোয়ার্টারে এসে আশ্রয় নিলাম।

এর পর আরও কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। আসামী প্রায় সাত দিন হলো পুলিশ হেপাজতে আছে। আর বেশি দিন তাকে এই ভাবে থানায় আটকে রাখা সম্ভব হবে না। এরপর হাকিমবাহাদুর হয়তো আসামীকে জেল হাজতে পাঠাবার নির্দেশ দেবেন। ইতিমধ্যে বারাকপুরের শবব্যবচ্ছেদক ডাক্তারের নিকট হতে পোস্টমর্টেম রিপোর্টও এসে গিয়েছে। উহাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ঐ মস্তকের খুলিটি ছিল একটি দশ বৎসর বয়স্ক বালকের। এদিকে ঐ নিহতমস্ত শিশুটির বয়স ছিল মাত্র তিন বা চার। কিছুতেই আমরা আলোকের সন্ধান আর পাচ্ছি

না। এমন সময় শেষ চেষ্টা স্বরূপ আমি আসামীকে নিয়ে একবার ডাঃ প্যাটেলের বাটী যাওয়া মনস্থ করলাম। ইতিমধ্যে রায়বাহাদুর সত্যেন মুখার্জিও থানায় এসে আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়ে গেলেন। তাঁরও মনে হলো এই যে আসামীকে ঐ শিশুর মাতার নিকট নিয়ে গেলে তার হৃদয় দ্রবীভূত হতে পারে। অফিসে বসে আমি ভাবছিলাম যে এই মামলার ফরিয়াদী ডাঃ প্যাটেলকে একবার ডেকে পাঠাবো কি না? ঠিক এই সময় সহকারী স্থরেনবাবু রক্ত-পরীক্ষকের রিপোর্টটি আমার সামনে মেলে ধরে বলে উঠলেন, 'এই দেখুন স্যার, ব্লড এক্সামিনারের রিপোর্ট। এই মাত্র এটা মেডিকেল কলেজ থেকে পাওয়া গেল।' সহকারীর কথার কোনও উত্তর না করে ব্যস্ত হয়ে আমি ঐ রিপোর্ট পড়তে আরম্ভ করলাম। ঐ রিপোর্টের বিষয়বস্তু আমাকে স্তম্ভিত করে তুলেছিল। ঐ বৈজ্ঞানিক রিপোর্টের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি অমুক থানা হতে প্রেরিত ক, খ, গ, এবং ঙ মার্কা বস্ত্রগুলির রঞ্জিত অংশগুলির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছি যে উহাতে মনুষ্য রক্তের সহিত ছাগ বা অন্য কোনও রুমিনেন্ট জীবের রক্ত মিশ্রিত আছে। ঐ সকল বস্ত্রাদির প্রতিটি রঞ্জিত স্থানে এই উভয়-বিধ রক্তই দেখা গিয়াছে।"

এই রক্ত পরীক্ষকের রিপোর্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করে আমার মনে হলো হয়তো বা শিশুটিকে আদপেই খুন করা হয় নি। আসামী নিশ্চয়ই পুলিশকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ঐখানে ঐ শিশুর রক্তের সহিত ছাগরক্ত মিশ্রিত করেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার আমার মনে হলো যে তাই যদি হয় তাহলে আসামী নিজেই থানায় এসে আত্ম-সমর্পণই বা করবে কেন? সাত পাঁচ ভেবে আমি আসামী সহ ডাঃ প্যাটেলের বাড়ী যাওয়া এই দিনের মত স্থগিত রেখে এই তদন্ত সম্পর্কে করণীয় বাকী কাযগুলি প্রথমে শেষ করে নিতে মনস্থ করলাম।

এর পর আমি আসামীকে ডাকিয়ে এনে আদর করে কাছে বসিয়ে মিষ্টি কথায় নানা বিষয়ে সংলাপ শুরু করে দিলাম। তদন্তের জন্য সরাসরি মূল মামলা সম্বন্ধে আরও সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করার আমার ইচ্ছা ছিল না। এর কারণ এতক্ষণে আমি নিশ্চিতরূপে তাকে একজন অপরাধ-রোগীরূপে বুঝতে পেরেছিলাম। তবে সে যে কোন শ্রেণীর অপরাধ-রোগী তা তখনও পর্যন্ত আমি বুঝতে পারি নি। অপরাধীদের জিজ্ঞাসাবাদের (interrogation) জন্য প্রথমে তাদের শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করে নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এর কারণ এক এক শ্রেণীর ও উপশ্রেণীর অপরাধীদের উপর এক এক প্রকারের বাক্-প্রয়োগ (suggestion) কার্যকরী হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে একটুমাত্র ভুল করলে তাদের নিকট হতে কোনও প্রয়োজনীয় সংবাদ বার করা সম্ভব হয় না। এই জন্য আমি তাকে আপাতত মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভুলিয়ে তার কাছ হতে সংবাদ সংগ্রহে মনোনিবেশ করি। এই সম্পর্কে নিম্নের প্রশ্নোত্তরগুলি বিশেষরূপে প্রণিধান-যোগ্য।

প্রঃ—দেখ বাপু! তুমি যে সত্য কথা বলেছ তা তো আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু মুস্কিল বাঁধাচ্ছে আমার ওপর-ওয়ালারা। যে কোনও কারণেই হোক তাদের ধারণা যে তুমি মিথ্যা কথা বলেছো। তাঁদের মতে তুমি নাকি এক-জন শঠ, প্রবঞ্চক, ধাপ্পাবাজ ও বদমায়েস। তুমি খুন-টুনও কিছুই করো নি। তোমাকে ওরা একেবারে শেষ করেই দিতে চাইছে। তবে দেশের আইনে এসব মানা আছে এই যা—

উঃ—কি? আপনাদের সেই রায় সাহেব অমুক তো? ওঃ আমাকে নাকি উনি কাঁচা খেয়ে ফেলবেন। আমি মিথ্যা কথা বলেছি? ওরা ভেবেছে কি? ওরা যদি মনে করে যে আমাকে ঠেঙিয়ে কথা বার করবে, তাদের বলে দেবেন যে, সে আশা তাদের দুরাশা। আমার বক্ষের মধ্যে আমূল ছুরি বসিয়ে দিয়ে সেই গর্তের পথে আঙুল ঢুকিয়ে আমার হৃৎপিণ্ডটা মুচ্‌ড়ে ছিঁড়ে বার করে তাদের সেটা কচকচিয়ে চিবুতে বলুন। এতে বরং আমার মনটা শান্ত হবে কিন্তু তাদের তাতে এক তিলও আশা মিটবে না।

প্রঃ—আরে! ওঁদের কথা তুমি ছেড়ে দাও। ওঁরা যাই বলুন না কেন, আমি তো তোমাকে বিশ্বাস করি। তবে মুস্কিল এই ওঁদের আমি বোঝাইতেই পারছি না। সুস্পষ্ট প্রমাণ না পেলে ওঁরা কোনও কিছুই বিশ্বাস করতে

চান না। তুমি এ বিষয়ে একটু সাহায্য করলে আমার মুখ রক্ষা হতো।

উঃ—সত্যি, আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে। এ কয়দিন মনে আমার কম অশান্তি নেই। আমার মাথার মধ্যে কি যেন কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। দেহটা যেন কারা কুরে কুরে খেতে চায়। আমার এই দুর্দিনে এক-মাত্র আপনিই আমাকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন। এই নিদারুণ অবস্থায় আপনি না থাকলে আমার মনের যন্ত্রণা আরও অসহনীয় হয়ে উঠতো। এই জন্য যাতে আপনার উপকার হয় তার জন্য যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করবো। এ ছাড়া পৃথিবীর লোকের কাছে আমিই বা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবো কেন? আমি নিজে যা করেছি তা আমিই জগতকে নিজেই শুনিয়ে দেবো।

প্রঃ—তুমি তো ভালো করেই জানো যে আজিকার মানুষ প্রমাণ না পেলে কোনও কিছুই বিশ্বাস করে না। তুমি মুখে যতো কিছুই বলো না কেন তা তারা কোনও দিনই বিশ্বাস করবে না। তারা প্রারম্ভে প্রত্যেক মানুষকে মিথ্যাবাদীরূপে ধরে নিয়ে সে যে সত্যবাদী তা প্রমাণ করবার জন্যে সদম্ভে তাদের আহ্বান করে থাকে। এখন তুমি আমাকে বলো কি কি উপায়ে তোমার খুন সম্পর্কে এই বিবৃতিটি আমি উর্ধ্বতন অফিসারদের নিকট প্রমাণ করতে পারবো। তোমার সাহায্য না পেলে এই সব বিষয় প্রমাণ করা অসম্ভব। এমন কি খবরের কাগজগুলো এ পর্যন্ত তোমার কথা একটুকুও বিশ্বাস করছে না।

উঃ—আচ্ছা! এতো দিন নিশ্চয়ই আপনি ঐ নিহত খোকার রক্তমাখা জামা ক'টা রক্ত পরীক্ষক ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঐ সকল রক্তমাখা জামা পরীক্ষা করলে রক্তপরীক্ষক দেখতে পাবেন যে মনুষ্য রক্তের সঙ্গে ওতে ছাগরক্ত মিশ্রিত আছে। আমি নৈহাটি রেল-স্টেশনের নিকটে এক স্থানের একটা জঙ্গলে একটা ছাগ আহত করে ঐ ছাগরক্ত সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। আগেই বলেছি যে আমি একজন পাশ করা কম্পাউণ্ডার। সুতরাং দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার অল্প বিস্তর জ্ঞান আছে। ঐ জামাগুলোতে যে মনুষ্য রক্ত আছে তা আমি আমার দেহ হতে সিরিঞ্জের সাহায্যে তুলে নিয়েছি। এর পর ঐ ছাগ-রক্তের সহিত আমার নিজের রক্ত মিশ্রিত করে ঐ শিশুটির জামাগুলোয় তা আমি মাখিয়ে রাখি। এখন আপনাদের সরকারী রক্তপরীক্ষক যদি ঐ জামায় প্রাপ্ত রক্তের সঙ্গে আমার দেহ হতে পরবর্তীকালে গৃহীত রক্তের বৈজ্ঞানিক তুলনা করেন তা হলে দেখতে পাবেন যে এই দুইটি রক্তই একই গ্রুপের রক্ত। এক এক দল মানুষের রক্ত এক এক গ্রুপের অন্তর্গত হয়ে থাকে। সাধারণত পিতা বা মাতার রক্ত এবং তাদের সন্তানের রক্ত একই গ্রুপের অন্তর্গত হয়েছে। এই জন্য ঐ শিশুটির মাতা ও পিতার রক্ত এবং আমার রক্ত—এই কয়টি রক্তের ফিলিম আপনি আপনাদের সহকারী ডাক্তারের কাছে এক্ষুনি পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিন। এ বিষয়ে আমি আপনাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত। এতে জগতের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞানকে সাহায্য করাও হবে এবং সেই সঙ্গে এই অদ্ভুত মামলার একটা কিনারা করাও সম্ভব হবে। আমি স্বেচ্ছায় আমার দেহ থেকে একটু রক্ত ক্ষরণ করে নিতে আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি। এ কাযটা খুবই সহজ কায। আমার আঙুলের ডগাটা অন্য এক আঙুলের ডগা দিয়ে টিপে ধরলে ওটা রক্তাভ হয়ে উঠবে। এই সময় একটা নিড্‌লের সূচাগ্র মুখের ঠোকর ওর উপর দিলে ওখানে জমা রক্ত হতে এক ফোঁটা রক্ত তখুনি উপরে উঠে আসবে। এর পর একটা চৌকা পাতলা কাঁচের সাহায্যে ঐ রক্তটুকু তুলে নিয়ে অপর একটি মোটা রেকট্যাঙ্গুলার কাঁচের উপর আমার রক্তের একটা ফিলিম তুলে নিয়ে তা আপনি রক্ত-পরীক্ষক ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিন।

এই নির্মম অপরাধী তার কোন দুর্বল মুহূর্তে এই অভিনব তথ্যটি আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল তা জানি না। কিন্তু এই খুনী আসামীর এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অপপ্রয়োগ স্বভাবতই আমাকে মুগ্ধ করতে পারে নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে ইতিমধ্যে পাওয়া রক্ত-পরীক্ষকের রিপোর্ট তাকে না দেখানো সত্বেও সে ঐ রিপোর্টে উল্লেখিত তথ্য আমাদের বলে দিতে পেরেছে। আমি এই সময় অবাক হয়ে ভাবলাম তাহলে কি ঐ আসামী ঐ হতভাগ্য মাতা-পিতার একমাত্র দুলারী শিশু পুত্রটিকে আদপেই হত্যা করে নি? কিন্তু তখুনি তাকে সরাসরি এই সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করে তার খুস মেজাজ ও 'মনের আমেজ' সহ তৎ-কালীন মানসিক অবস্থাটিকে (condition) অপসারিত করা

আমি উচিত মনে করলাম না। আমি তাকে অযাচিত ভাবে ইচ্ছামত কথা বলতে দিলাম। তার পরে সাবধানে তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে প্রকৃত তথ্যটি অবগত হতে সচেষ্ট হলাম। নিম্নের প্রশ্নোত্তরগুলি এই সম্পর্কে বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

প্রঃ—যাক তাহলে বুঝা গেলো যে তুমি সত্য কথাই বলছো। তুমি তা'হলে ঐ নিহতমন্য শিশুটিকে নিহত না করে তাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছো। তবে তুমি তো এখুনি তাকে বের করে দেবে না সে কথাও ঠিক। ওর পিতামাতাকে তুমি আরও একটু শাস্তি দিতে চাও, এই তো?

উঃ—আজ্ঞে, আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানে তাদের মনোবেদনা দেওয়ার প্রশ্ন আদপেই উঠে না। ও ছেলে তো, আমি আমার নিজেরই মনে করি। এই জন্য এখানে ওকে খুন করার কোনও প্রশ্ন উঠে না।

প্রঃ—আচ্ছ', আর একটা মাত্র প্রশ্ন তোমাকে আমি করবো। একদিন তুমি কতকগুলো 'মিসেস প্যাটেল' নামাঙ্কিত জার্মান সিলভারের বাসন ডাক্তার প্যাটেলের বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছিলে। কিন্তু কেন তুমি এ কায করেছিলে তা আমাদের বলতে পারো?

উঃ—আমাকে আপনি আর লজ্জা দেবেন না। আসলে ও বাক্সো হচ্ছে আমার। এ সব ব্যক্তিগত ব্যাপার জানবার আপনাদের দরকারই বা কি? এ সব গুহ্যতত্ত্ব আপনাদের আমি বলবোই বা কেন? না না, না মশাই। আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। যান যান মশাই। আমি এই খুনের ব্যাপারে কিছুই বলবো না।

এই আসামী একজন অপরাধ-রোগী হলেও সে ঐ অপরাধ-রোগীর অন্তর্গত কোন্ শ্রেণী বা উপশ্রেণীর রোগী তা বুঝতে না পারায় শেষের দিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্বষ্ট আমার বাক্যবিন্যাস ঠিক সময়োপযোগী হয় নি। এই জন্য শেষের দিকে এইরূপ এক ভুল করায় আসামী আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু পরে সাধ্য-সাধনা করে তাকে পুনরায় তাঁবে এনে আমি তার মাত্র নিম্নোক্ত বিবৃতিটুকু লিপিবদ্ধ করে নিতে পেরেছিলাম।

"আমার পূর্বের বিবৃতিটুকু সত্য না হলেও উহা অর্ধ সত্য। আমি ঐ শিশুটিকে আদপেই নিহত করি নি। শিশুটির পিতার সহিত আমার অবৈধ সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এক্ষণে তিনি আর আমার প্রতি পূর্বের ন্যায় আগ্রহান্বিত নন। এই জন্য তাঁর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি তাঁর একমাত্র শিশু পুত্রটিকে অপহরণ করে তাকে এক অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে রেখেছি। এর পর আমি ঐ শিশুর জামাগুলোয় মনুষ্য রক্তের সহিত ছাগরক্ত মিশিয়ে বারাক-পুরের মাঠে রেখে আসি। তবে ঐ দিন শিশুটিকে একবার ঐ পথে আমি ঘুরিয়েও নিয়ে এসেছি। আপনাদের বিভ্রান্ত করবার জন্যে আমার এই প্রচেষ্টা ছিল। এক্ষণে ঐ শিশুটি সিংহলে আমার ভগিনী রুক্মিণীর কাছে নিরাপদে আছে। তবে তাদের ঠিকানা আমি এখন কিছুতেই আপনাদের বলবো না।"

আসামী ক্ষেপে ক্ষেপে এইরূপ বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমরা পূর্ব হতে বিরক্ত ছিলাম। এক্ষণে এক একদিন এক একপ্রকার বিবৃতি দেওয়াতে আমরা তার উপর সবিশেষ ক্রুদ্ধও হয়ে উঠি। এর উপর আবার ঐ নিহতমন্য শিশুটির পিতার বিরুদ্ধে এই জঘন্য মিথ্যা উক্তি। এজন্য তার উপর আমাদের মনে এক বিজাতীয় ঘৃণা জেগে উঠে। কিন্তু আমরা এই ব্যাপারে ঘৃণা বা রাগ কার উপরই বা করবো। একজন মানসিক রোগী বা অপরাধ-রোগী সমভাবেই আমাদের কৃপারই যোগ্য। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে প্রকৃত পক্ষে পাগল না হলে মানুষকে কেহ পাগল মনে করে না, বরং তাকে অধিকতর বজ্জাত মনে করে তার প্রতি অধিকতর শাস্তি প্রয়োগের চিন্তা করে। এই জন্য মানসিক রোগীর ন্যায় অপরাধ-রোগীরও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। এর ফলে এদের রোগ আরও বেড়ে গিয়ে সামাজের সমস্যা আরও জটিল করে তুলেছে। কিন্তু এই সব কথা আমার সহকর্মীদের বুঝাবার তখনও পর্যন্ত অনুকূল সময় আসে নি। এই ব্যাপারে উপহাসাস্পদ হবার ইচ্ছাও আমার ছিল না।

যাই হোক, এর শেষ সমাধানের বিষয় আপাতত মুলতুবী রেখে এই মামলার জন্যে আইনগত প্রমাণ সংগ্রহে মনো-নিবেশ করা এইবার আমি উচিত মনে করলাম। এক্ষণে ঐ আসামীর প্রথম বিবৃতিটি সত্য রূপে মেনে ঐ বিবৃতি অনুসারে ঐ ট্যাক্সি ও রিক্সাচালক, বারকপুরের ও শ্যাম-নগরের দুধ বিক্রেতা, টিকিট ক্রয়কারী কুলি এবং কাঁচড়া-

গাড়ার মনোহারী দোকানের ছুরি বিক্রেতাকে খুঁজে বার করে তাদের প্রত্যেকের বিবৃতি নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন এই আসামী এই ব্যাপারে আমাদের আর সাহায্য করতে রাজী নয়। তাই বলে সব সময় আসামীর সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকা বাঞ্ছনীয়ও নয়। আমি এইবার নিজের শক্তি সামর্থ্য ও বুদ্ধি-বৃত্তির উপর নির্ভরশীল হতে মনস্থ করলাম।

এই দিন এই তদন্ত সম্পর্কে আর অধিক কিছু আমাদের করবার ছিল না। আমরা ঠিক করলাম যে খুনের দিন যে সময় এই আসামী ঐ নিহতমন্দ শিশুটিকে নিয়ে অজানার পথে যাত্রা শুরু করেছিল, আগামীকল্য ঠিক ঐ একই সময় আমরাও ঐ নিহতমন্দ শিশুর ফটো চিত্র এবং তার নিধনকারী ঐ বিকৃতমনা আসামী সহ তদন্তে বার হব। এই সময়টি বেছে নেওয়ার একটি বিশেষ কারণও ছিল। প্রায়শ ক্ষেত্রে মেহনতি মানুষ মাত্রেরই তাদের দুঃখধান্ধা ও রুজী-রোজগারের জন্য পথে বার হবার একটি প্রাত্যহিক সময় আছে। এইজন্য প্রতিদিনই তারা বিশেষ বিশেষ সময়ে একই পথ ধরে চলতে শুরু করে বা ঐ পথের কোনও একস্থানে অপেক্ষা করে। এক্ষণে ঐ আসামীর বিবৃতি অনুযায়ী ওদের বহনকারী রিক্সা ও ট্যাক্সিচালক, বারাকপুরের দুধ-বিক্রেতা, শ্যামনগরের কুলি, কাঁচড়াপাড়ার মনোহারী দোকানের ছুরি-বিক্রেতাকে খুঁজে বার করতে হলে আসামীর বিবৃতিতে উল্লেখিত সময়ে ঐ সব স্থানে যেতে হবে। অন্য সময় ঐ সকল স্থানে গেলে সেখানে তারা উপস্থিত না থাকলেও থাকতে পারে। এই উদ্দেশ্যে পর দিন ঠিক সকাল আটটায় আমি আমার দুইজন সহকারী ও জনৈক জমাদার রামসিং সমভিব্যাহারে এই আসামী ও ঐ শিশুটির ফটো সহ একটি ভাড়া-করে-আনা ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। এই সময় কলিকাতা পুলিশে এতো বেশি যানবাহন মজুত ছিল না। যে কয়টি ছিল প্রয়োজনমত তা আমরা কোনও দিনই পাই নি। এই ট্যাক্সিট আমাদের ভাড়া করে আনতে হয়েছিল। এই ট্যাক্সি করে প্রথমে আমরা এলাম বিডন ষ্ট্রিটের মোড়ে। এর পর আসামী যে পথ ধরে এখানে এসেছিল সেই পথ দিয়েই আমরা চলতে শুরু করলাম। পথের এখানে ওখানে যেখানেই একটি রিক্সা দেখি তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করি। সৌভাগ্যক্রমে একজন রিক্সাচালক এই আসামীকে চিনতে পেরে বললে যে সে তাকে ও একটি শিশুকে বিডন ষ্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত একদিন পৌছিয়ে দিয়েছিল। সে ঐ শিশুর ফটো চিত্র হতে ঐ শিশুটিকেও সনাক্ত করতে পেরেছিল। এই রিক্সাচালকের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

'আমার নাম বুধন রাম। পিতার নাম হারু রাম। আমার বর্তমান নিবাস সিংহী বাগান ২নং বস্তী, আমার আদিনিবাস—গ্রাম ও পোঃ সিদ্ধি, জিলা মতিহারী। আমি এই রিক্সার মালিক সীতানাথ তেওয়ারীর অধীন এক-জন বেতন ভোগী রিক্সাচালক। নির্দিষ্ট মাসিক বেতন ছাড়াও আমি প্রতি দশ টাকায় সামান্য কমিশনও পাই। আমরা মাত্র দশজন রিক্সাচালক এই অঞ্চলে কার্যরত আছি। অন্য কোনও রিক্সা-মালিক বা সর্দারের গাড়ী এখানে চলাচল করে না। আমরা প্রায় সকলেই এই আসামীকে ভালো রূপে চিনি। ইনি ও এঁর বন্ধুবান্ধবরা এক সঙ্গে প্রায়ই আমাদের চার পাঁচটা রিক্সা করে একত্রে রামবাগান, সোনাগাছি ও সিমলা ষ্ট্রীটের বেশ্যা পল্লী অঞ্চলে সন্ধ্যার দিকেও যাতায়াত করেছেন। এই ফটো চিত্রে যে শিশুটিকে আমি দেখতে পাচ্ছি ঐ শিশুটিকেই সঙ্গে করে ঐ দিন ইনি আমার এই রিক্সায় উঠেছিলেন। আমি ঐ দিন তাঁদের সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের একটা বাড়ীর নিকট হতে তুলে এঁর নির্দেশ মত এঁদের বিডন ষ্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছিলাম।"

এই সময় আমি ঐ পেশাদারী রিক্সাচালক বুধন রামকে কয়েকটি প্রশ্ন করে আরও কয়েকটি তথ্য অবগত হই। এই সময় তাকে আমি যে প্রশ্ন করেছিলাম এবং সে ঐ প্রশ্নের যা উত্তর দিয়েছিল প্রয়োজনীয় বিধায় তা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—তুমি ওদের শুধু রামবাগান, সোনাগাছি ও সিমলা ষ্ট্রীটের বেশ্যাপল্লীগুলিতে পৌছিয়ে দিতে, না এই শহর ও পার্শ্ববর্তী শহরের অন্যান্য বেশ্যাপল্লীগুলিতেও মাঝে মাঝে নিয়ে গিয়েছিলে?

উঃ—আজ্ঞে এই সব জায়গাতেই তাঁরা মাত্র যেতেন। একবার আমি উঁদের হাওড়ার ঘোলাডাঙ্গার বেশ্যাপল্লীতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তবে এই আসামী একা একা বেনীর

ভাগ সময়েই সোনাগাছি অঞ্চলের একটি দ্বিতল বেশ্যা-বাড়ীতে যেতেন।

প্রঃ—তুমি ওকে কখনও কলিকাতার ধুকুড়ি বাগান, কচুরী গলি, চিৎপুর ও মানিকতলা অঞ্চলের কোনও বস্তী বা বাড়ীতে নিয়ে যাও নি? একটু মনে করে করে তুমি আমাকে এইসব প্রশ্নের উত্তর দাও।

উঃ—আজ্ঞে, এঁরা শুধু উঁচুদরের বেশ্যালয়েই যাতায়াত করেছেন। ধুকুড়িবাগান, কচুরীগলি ও মানিকতলার নীচু (নিকৃষ্ট) শ্রেণীর বেশ্যবাড়ীতে এঁরা কখনও যাননি। একদিন মাত্র ওঁর বন্ধুরা আমাদের রিক্সাতে ধুকুড়িবাগানের একটা বাড়ীতে ওঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু উনি ও বাড়ীতে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে তৎক্ষণাৎ আমার রিক্সাতে চড়েই ওঁদের সেই নয়া রাস্তার (সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ) বাড়ীটাতে ফিরে আসেন। এরপর আর কোনও দিনই ওঁকে ঐ সব আজেবাজে জায়গায় আমি যেতে দেখিনি। আজ্ঞে—ওঁদের ঐ নয়া রাস্তার বাড়ীটা ও দাওয়াইখানা আমি দেখিয়ে দিতে পারবো। ঐ বাড়ীর নীচের তলায় একটা দাওয়াইখানা আছে। এই জন্য আমি ঐ বাড়ীটা অনায়াসে আপনাদের দেখিয়ে দিতে পারবো।

এই সাক্ষী রিক্সাওয়ালার কথোপকথন হতে আমি অন্তত এইটুকু বুঝতে পারলাম যে আসামীর মন তার বিপথ-গামী বন্ধু-বান্ধবদের মত অতো নিম্নগামী ছিল না এবং তার আচার ব্যবহারে সে একজন কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিল। আসামী একজন অপরাধ-রোগী বিধায় চিকিৎসার জন্য তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল। এর কারণ এই যে আমি নিশ্চিতরূপে বুঝেছিলাম যে আসামীর নিকট হতে এই শিশুটিকে [যদি সে জীবিত থাকে] বার করতে হলে তার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করার বিশেষ প্রয়োজন। আমি আসামীর জীবনে সংঘটিত কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে বিবিধমুখী পারিবারিক স্নেহ-প্রীতির একটি অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে জোর করে চেপে রাখতে গিয়ে সে তার অবচেতন মনে একটা দারুণ বিপর্যয় এনে নিজেকে এক প্রকারের পাগল করে তুলেছে। তবে এই সব আকাঙ্ক্ষা সহজ অবস্থায় আর পাঁচজনের ন্যায় সেও সহজেই দমন করতে পারতো। কিন্তু তার মধ্যে হঠাৎ-আসা স্নায়বিক ক্ষয় ক্ষতি এই ব্যাপারে তার যা কিছু প্রতিরোধ শক্তি তা বিনষ্ট করে দিয়েছে। তবে এই একটি বিষয়ে পাগল হলেও অন্যান্য বিষয়ে সে একজন সহজ মানুষ। এইজন্য তার এই সব এলোমেলো উগ্র স্পৃহাকে সে সহজেই রূপ দিতে পেরেছে। এসব কথা এখানে অবান্তর হলেও এই প্রকার অপরাধ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত তদন্তরীতির ব্যাপারে এই সব জ্ঞান অপরিহার্য ছিল। এই জন্য এই সব তথ্য আমি আইনানুযায়ী পুলিশী তদন্তের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে সংগ্রহ করে রাখছিলাম।

এর পর আমরা বিডন ষ্ট্রীটের মোড় ও ওর আশে-পাশে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডগুলিতে অনুসন্ধান শুরু করে দিলাম। আমাদের ভাগ্য এইখানেও সুপ্রসন্ন ছিল। ঐ দিনকার সেই ট্যাক্সি-চালককেও আমাদের খুঁজে বার করতে একটুও দেরি হয় নি। এই ট্যাক্সি-চালকের বিবৃতিটি প্রয়োজনীয় বিধায় উহার উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমার নাম সুখেন রাম—বাপকো নাম মতিহারী রাম। হাল সাং—নং হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাত্তা। হাম গাজীপুর জিলাকো আদমী হ্যায়। হাম এই আসামীকে আচ্ছি তরফসে পছন্‌নে শেখতা। এই আদমী এহি মোড়সে হামার ট্যাক্সি পকড়কে বোলা 'বারিকপুর মোড়মে চলো, সিধা—'। উনকো সাথ তিন বরষ উমেরকো এক লেড়কা থে। হাঁ হাঁ, এই তসবীরমে যো লেড়কা দেখা যাতি—উহি লেড়কাই উসরোজ উনকো গদিমে থে। এহি লেড়কা সারা রাস্তা রোতি রোতি যাতি থে। এহিবাস্তে উনকো পর মোর থোড়ি সুবা ভি হোতা থি। উসরোজ উনলোককো বারিকপুর স্টেশনমে পৌছাকে মিটার মাফিক ভাড়া লেকে হাম কলকাত্তা লোট আয়ে থে।"

এরপর আমি ঐ ট্যাক্সি-চালককে আরও বহু জেরা করতে থাকি। এর কারণ আমার মন বলছিল যে সে নাগরিক-সুলভ কোনও কর্তব্য করে নি। তবে এই সময় এদের নাগরিক জ্ঞান ও বাধ্য-বাধকতার সম্বন্ধে ধারণাও ছিল যৎসামান্য। পুলিশের কায ও নিজেদের কায এখন আলাদা করে দেখতে শিখছে। এদের মধ্যে সামাজিক

চেতনা উদ্বোধন করতে কেহ কখনও সাহায্যও করে নি। এইজন্য এই সব ব্যাপারে এদের খুব বেশি দোষ দেওয়াও যায় না। যে সব রাষ্ট্র পুলিশের মধ্যেই মাত্র ক্ষমতা একীভূত রেখে উহা জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বা উহাকে বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে ভয় পায়, সেই সব রাষ্ট্রে স্বভাবতই যে নাগরিক জ্ঞানের অভাব ঘটবে তাতে আর বিচিত্র কি ? এই একটি মাত্র কারণে তারা আজও পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীন জাতির অংশ বিশেষ বলে ভাবতেও শিখেনি। এই সময় এই অর্ধ-শিক্ষিত মোটর চালককে আমি যে সব প্রশ্ন করেছিলাম এবং সে ঐ সব প্রশ্নের যা উত্তর দিয়েছিল তার বাংলা তর্জমা প্রয়োজনীয় বিধায় নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্র—তুমি যখন দেখলে যে ছেলেটা ত্রাহিস্বরে ভীত ত্রস্ত হয়ে ক্রমাগতই কাঁদতে লেগেছে, তখন তুমি তাদের আটকে রেখে একেবারে থানায় নিয়ে গেলে না কেন? তোমারও তো বাপু ছেলে-পুলে বৌ ঘরে আছে। এই বিষয়ে তুমি একটু অবহিত হলে এই বাচ্চাটার এমনভাবে জীবন সংশয় হয়ে উঠতো না।

উঃ—আজ্ঞে, এই আসামী যে এই ছেলেটাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে,এইরূপ এক সন্দেহ যে আমার মনে আসে নি তাও নয়। কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে সে তার ছোট ছোট হাত দুটো দিয়ে 'মামা-মামা' বলে পরম নির্ভরতার সহিত তার গলা জড়িয়ে ধরছিল। সেইজন্য আমি একটু ইতি-কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। তারপর এদের পুলিশ ও থানায় নিয়ে গেলে হয়তো এই আসামীরই অভিযোগে পুলিশ আমাকেই হাজত-বন্ধ করে আমার নাকালের এক-শেষ করে ছাড়তো।

প্রঃ—পুলিশ এই সব ভালো কাযের জন্য তোমাদের গ্রেপ্তার করবে কেন? তা ছাড়া সত্য মিথ্যা তদন্ত করে দেখবে তো? কেউ যদি মিছিমিছি অভিযোগ করে তা হলে তদন্ত করে দেখে তবে তো তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। এর জন্য যদি একটা ঘণ্টা সময় নষ্ট হয় তো সাধারণের উপকারার্থে তো সে ক্ষতি ক্ষতিই নয়।

উঃ—কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে, এ দেশে তদন্ত করে পুলিশ নাগরিককে গ্রেপ্তার করে না। তুচ্ছ বা বড় ছোট অভিযোগে সমভাবেই তারা মানুষকে প্রথমে গ্রেপ্তার করে, তারপর তদন্ত শুরু করে। এর পর এই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তাকে হাজতে থাকতে হয়। অবশেষে হয়তো তারা পুলিশ বা আদালত থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু এত দিনে তার মান-সম্মান, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য,ব্যবসা-বাণিজ্য ও রুজি-রোজগার যা কিছু তা একেবারে গয়া। এ ছাড়া এদেশের লোকেদের মান-সম্ভ্রম নির্ভর করে শিক্ষা, অর্থ ও বংশ মর্যাদানুযায়ী। এজন্য একজন ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করে একজন ট্যাক্সি-চালককে নিগ্রহ করতে বাধা কোথায়? এখান-কার পুলিশরা শুধু আইনের ওআর্ডিঙই দেখে, তার উদ্দেশ্য দেখে কৈ ?

আমি এই অর্ধ শিক্ষিত মেহনতি মানুষটির সহিত বন্ধুত্ব করে তার অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করায় বোধ হয় তার মনের আগোড় খুলে গিয়েছিল। তার এই তত্ত্বজ্ঞ বক্তৃতায় আমি অবাক হয়ে এই মেহনতি মানুষটির দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম যে, সে লাল, নীল না হলদে। কিন্তু তার মধ্যে একজন সাধারণ ভারতবাসী ছাড়া আর কাউকেই খুঁজে পেলাম না। সত্যই তো এদেশে খুব প্রতিষ্ঠাবান লোক না হলে গ্রেপ্তার না করে তদন্ত শুরু কম ক্ষেত্রেই হয়েছে। এমন কি যে সকল নাগরিক বাড়ি-ঘরের মালিক ও স্ত্রী-পুত্রসহ বসবাস করে, যাদের পালাবার কোনও সম্ভাবনা নেই তাদের ক্ষেত্রেও নয়। অভিযোগ আসা মাত্র তাদের গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে, তবে ক্ষেত্র-বিশেষে অবশ্য জামিনগ্রাহ্য অপরাধ হলে জামিন দেওয়া হয়েছে। এই সব মামলার শতকরা অনেকগুলিতেই তদন্তের পর আখেরে প্রমাণের অভাবে তাদের মুক্তিই দেওয়া হয়ে থাকে। তাই এদেশের আদালতসমূহে প্রায়ই দেখা যায় যে হাকিমগণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখে যাচ্ছেন—'সিন্ দি পুলিশ রিপোর্ট। একিউসড্ ডিস্‌চার্জড্।' শুনেছি যে ব্রিটিশ আইনের নিয়ম হচ্ছে শত শত আসামী খালাস পাক ক্ষতি নেই, কিন্তু একজন আসামীরও যেন বিনা দোষে শাস্তি না হয়। তাই যদি হয় তাহলে এও মেনে নেওয়া উচিত যে শত শত দোষী লোকের যা হয় হোক, কিন্তু এক-জন নির্দোষ লোকও যেন কোনওক্রমে দুর্ভোগ ভোগ না করে। এছাড়া প্রায়ই দেখা গেছে যে আদালতে জরিমানা

হয় হয়তো ১০৲ টাকা, কিন্তু উকিল মুহুরি খরচে ব্যয় তার হয় হাজারের উপর। মামলাসমূহে মুক্তি পেলেও উকিল বাবদ খরচ-খরচা হাজারের উপর উঠে। বিনা দোষে নির্দোষ নাগরিকের এর চেয়ে বড় জরিমানা বা শাস্তি আর কি হতে পারে? সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে এমন দেশও আছে যেখানে মানুষের স্বাধীনতা একটুক্ষণের জন্যও হরণ না করে তদন্তের পর সরাসরি আদালতে বিচারের জন্য হাজির হবার জন্যে মাত্র নোটিশ দেওয়া হয়েছে। জানি না বর্তমান অবস্থায় এই ব্যবস্থার অনুসরণ করা সম্ভব কিনা। কিন্তু তা সম্ভব হলে একটা স্বাধীন জাতির প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশও সম্ভব হতো। সামান্য কারণে মানুষের আত্ম-সম্মান বিনাশ আত্ম-বিনাশেরই নামান্তর মাত্র। এই ভাবে কত জাতি যে বিদেশী শাসনে বংশপরম্পরায় এইরূপ দুর্ভোগ ভোগ করে ক্লীব জাতিতে পরিণত হয়েছে তার একটা হিসাব জীব-বিজ্ঞানবিদ্, নৃতত্ত্ববিদ্ এবং ঐতিহাসিকরা রাখেন কিনা জানি না। এই মান্ধাতা আমলের বিদেশী আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে আমাদের পূর্বতন নিজস্ব পঞ্চায়েত রাজত্বের বিচারে আজ ফিরে যাওয়া সম্ভব কিনা তাও জানি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হলো এই যে, এ দেশের মানুষরা নিরক্ষর হলেও শিক্ষিত। এই শিক্ষা-দীক্ষা তারা বংশপরম্পরায় গ্রাম্য কথকতা ও লোক-শিক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে গেলে এই ট্যাক্সি চালকের এবংবিধ নিবেদনের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল, কিন্তু তার এই উক্তির যথাযথ বিচার করবার আমাদের যথেষ্ট সময় ছিল না। তাই তৎক্ষণাৎ তাকে আমাকে জোর হুকুম দিতে হলো—'আউর যাস্তি বাত হাম নেহি শুননে মাংতা। আভি চলো সিধা বারাকপুর স্টেশন পর।'

উদ্দাম গতিতে আবার এই ট্যাক্সিখানা বারাকপুর রোড ধরে ছুটে চললো। একজন দুর্বৃত্তের সঙ্গে যে আমরা ট্যাক্সিতে বসে ছুটে চলেছি, তা যেন কিছুক্ষণের জন্য আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। এই প্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে কতো মাতা ও পিতা তাদের শিশু সন্তানদের কোলে করে পথে চলছে, কিংবা যে যার শান্তি-নীড়ের আশেপাশে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমন কি ছোট ছোট ছাগ শিশু-গুলি পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে তাদের মায়েদের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চর্বিত চর্বণ করছে। এদিকে আমরা ঐরূপ একটি শিশুকে তার মা-বাপের কোলে ফিরিয়ে দেবার জন্যে এক অজানা স্থানের সন্ধানে ছুটে চলেছি। এই সব সুন্দর সুন্দর দৃশ্যগুলিকে অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে দূরে সরিয়ে ট্যাক্সিখানি এবার শহরের মধ্য দিয়ে গিয়ে বারাকপুর স্টেশনের সামনে ক্যাঁক করে আওয়াজ করে থেমে পড়লো। [ক্রমশঃ

নীলকান্তম্

শ্রীচারুলতা রায়চৌধুরী

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

চৌধুরী মশাই জাতিতে বাঙ্গালী, কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র হল দাক্ষিণাত্যের প্রধান সহর মাদ্রাজ। বাংলাকে তিনি ভালবাসলেও তার মোহ তাঁকে পেয়ে বসেনি। কাজে মনোসংযোগ কোরলে আর সব কিছুই তিনি ভুলে থাকতে পারতেন। মুস্কিল বাধল তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রীর। না জানেন তিনি দেশীয় ভাষা, না আছে কোন স্থানীয় বাঙ্গালীর সঙ্গে পরিচয়। সঙ্কল্প কোরলেন দেশের ভাষা শিখতে হবে। কিন্তু সেখানেও মস্ত গোল। ভাষা কি একটা? তামিল, তেলেগু, মালেয়ালাম, কুমকিনি, ক্যানারিজ,—কোনটা ফেলে কোনটা শেখেন। অনেক গবেষণা কোরে সিদ্ধান্তে এলেন—তামিল শিখবেন কারণ মাদ্রাজ তামিল-প্রধান দেশ, সহরে ঐ ভাষারই চলন বেশী।

নতুন ভাষা শেখার কথায় গৃহিণীর বেশ উৎসাহ হল। কিন্তু শিখতে গিয়ে দেখেন একি বিপদ, এ যে প্রায় দাঁত

বর্ষণ শেষে

ফটো : বিজয় মুখোপাধ্যায়

অবতরণ

ফটো : এস. এন, দত্ত
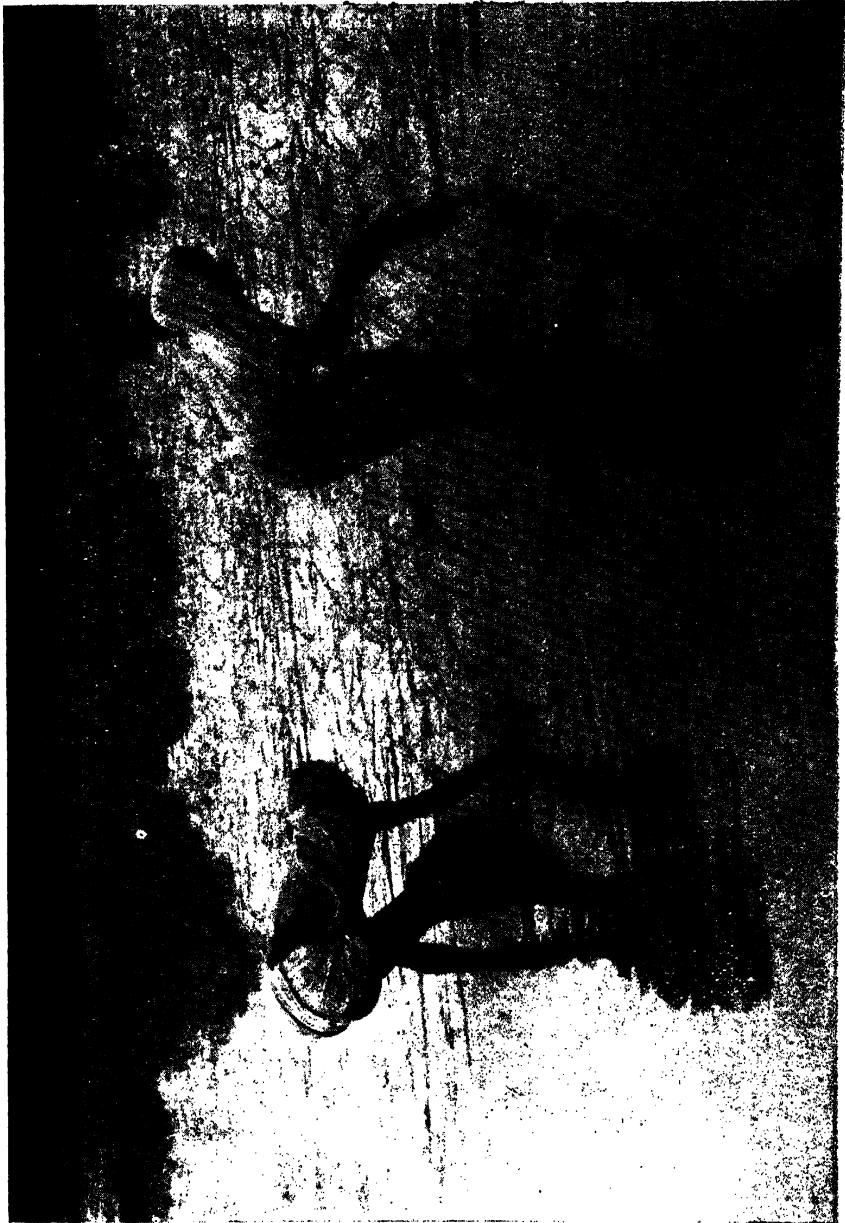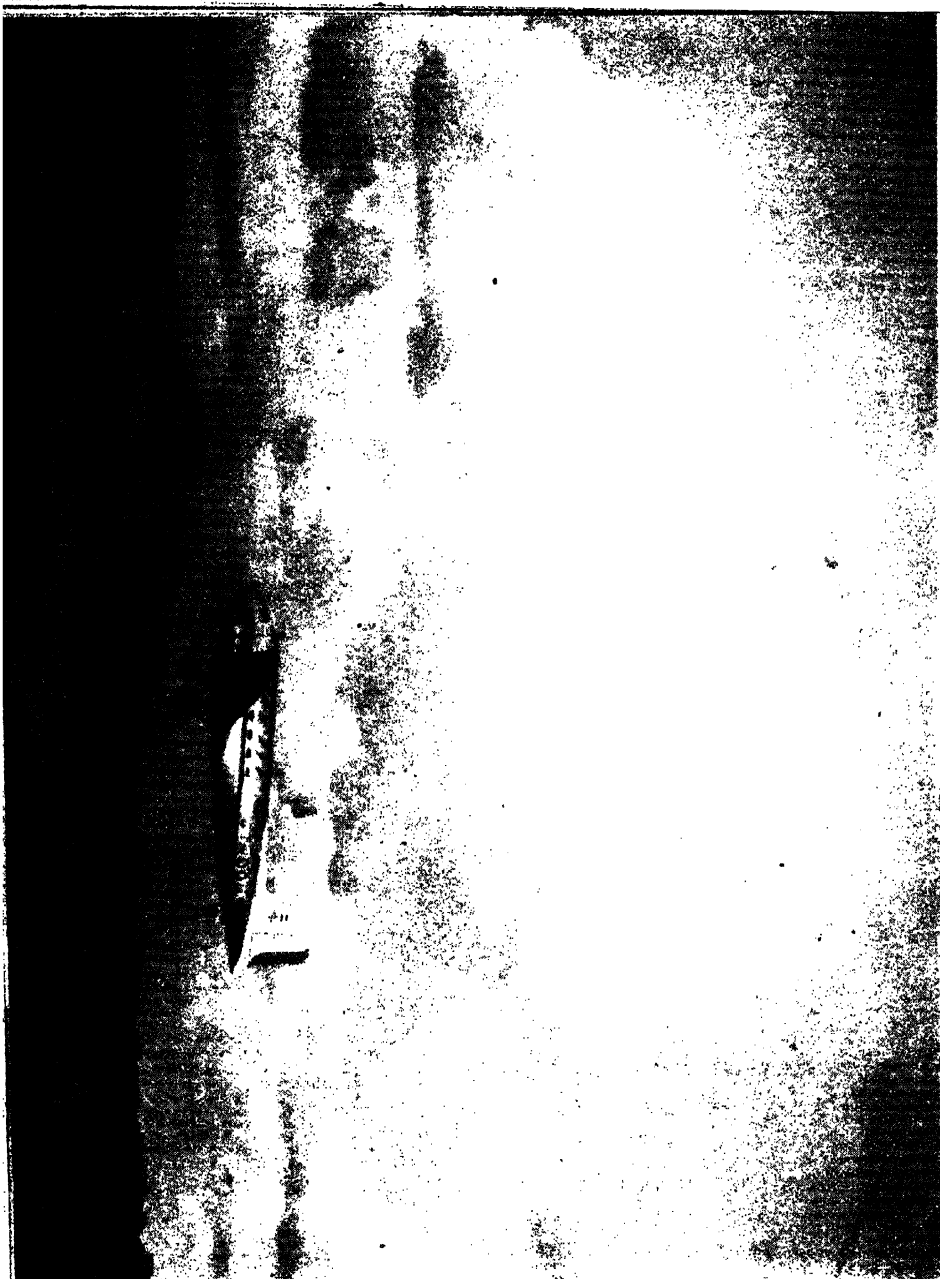
কিড়িমিড়ি ব্যায়রাম হবার অবস্থা! ভাষার কোথাও এত-টুকু মিষ্টত্ব নেই, সব যেন কড়মড়, কড়মড় কোরছে। সংসার চালাবার জন্য নিতান্ত যেটুকু না হ'লে নয় সেইটুকু শিখে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। তার বেশী প্রয়োজনও ছিল না বিশেষ, কারণ ইংরাজি ভাষার চলন ও দেশের সর্ব্বত্র। এমন কি চাকর-দাসীর মধ্যেও অনেকে ইংরাজি বুঝতে তো পারেই, এমন কি বোলতেও পারে। ভাষা বিভ্রাট তো ঘুচল কিন্তু মনের ক্ষুধা যে মেটে না।

যে দেশে বাস কোরতে হয়, কোন না কোন উপলক্ষে সে দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হ'বার সুযোগ ঘটেই। চৌধুরী পরিবারের সঙ্গেও অল্পকাল মধ্যে কয়েকটি স্থানীয় বাসিন্দার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জমে গেল। তারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'লেন শ্রীযুক্ত তাম্বুস্বামী। বাড়ীর কাছেই থাকতেন। ভারতবর্ষ তখনও ইংরাজের অধীনে, তাই দেশে সাদা ও কাল আই, সি, এস, (I. C. S.) এর ছড়াছড়ি। যাঁরা ছিলেন সরকারী অফিসের শীর্ষ-স্থানীয়, তাম্বুস্বামী হ'লেন তাঁদেরই গোষ্ঠীভুক্ত একজন। কৃষ্ণবর্ণের লম্বা ছিপছিপে মানুষটি। বুদ্ধিব্যঞ্জক মুখশ্রী। ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জারম্যান ইত্যাদি অনেকগুলি বিদেশী ভাষায় দখল ছিল প্রচুর। তৎসত্ত্বেও তামিল যে তাঁর মাতৃ-ভাষা একথা বোলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি কোনদিন। চৌধুরীমশাইরা ঐ মানুষটির মধ্যে এমন কিছু পেলেন—যা সাধারণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁদের সন্ধ্যার কর্ম্মহীন বেলা তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই তাম্বুস্বামীর সঙ্গ সুখে অতিবাহিত হ'ত।

কোন এক সন্ধ্যায় চৌধুরী দম্পতী তাম্বুস্বামীর বসবার ঘরে প্রবেশ কোরে দেখলেন অতি পরিপাটি রূপে ক্ষৌর-কার্য্য করা ছোট একটি মানুষ জড়সড়ভাবে সোফার ওপর বসে আছেন। কালো রং-এর আড়াল থেকে উজ্জ্বল দুটি চোখ চঞ্চলভাবে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলকেই যেন সে সন্দেহের চক্ষে দেখছে। শ্রীযুক্ত তাম্বুস্বামী চৌধুরীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বোললেন, "এঁর নাম নীলকান্তম্, বহুদিন আগে টিনেভেলিতে এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়।" অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর নীলকান্তম যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি চলে গেলে তাম্বুস্বামী বোললেন, "আমার কর্ম্মজীবনে সবার চেয়ে বড় পুরস্কার আজ পেলাম। যে লোকটিকে আপনারা একটু আগে দেখলেন তিনি হ'লেন বাংলার ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের একজন বড়দরের আসামী। আমি যখন টিনেভেলির কালেক্টর, তখন তাঁকে বন্দী অবস্থায় আমার কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। সামান্য সদ্ব্যবহার পাওয়ার ফলে আজ সাত বৎসর পরে জেল থেকে খালাস পাবামাত্র চিঠি লিখে আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।"

এরপর আর কয়েকবার তাম্বুস্বামী মহাশয়ের গৃহে নীলকান্তমের সঙ্গে চৌধুরীদের দেখা হয়। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয় কথা বোলে তাঁরা বুঝলেন—তাম্বুস্বামী ভুল বিচার করেননি, নীলকান্তম্ সাধারণ আসামী ছিলেন না। বুদ্ধি ছিল তাঁর প্রখর এবং জ্ঞানও আহরণ কোরেছিলেন যথেষ্ট। এই অদ্ভুত মানুষটির পূর্ব্ব ইতিহাস জানবার কৌতূহল হ'ল তাঁদের খুব বেশী। কিন্তু সে সুযোগ আসবার আগে হঠাৎ তিনি কোথায় যে অন্তর্ধান কোরলেন আর তাঁর পাত্তা পাওয়া গেল না।

বেশ কয়েক বৎসর পরে তাম্বুস্বামীর গৃহে আবার তাঁরা একটি নতুন ধরণের মানুষের সাক্ষাৎ পেলেন। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, গুম্ফশ্মশ্রু দ্বারা মুখটি ঢাকা, কপালের মাঝ-খানে প্রকাণ্ড একটি কুমকুমের টিপ, হাতে মোটা একখানি লাঠি। পরিধানে মাদ্রাজি ধুতি এবং উপরাঙ্গে একটি চাদর দ্বারা আবৃত। বেশ সহজভাবে তাম্বুস্বামীর সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা কোরে চলেছেন। নতুন অভ্যাগতদের দেখে কিছুমাত্র অপ্রতিভ ভাব নেই।

কথা শেষ হ'লে তাম্বুস্বামী পরিচয় করিয়ে বোললেন, "ইনি হলেন সাধু ওমকার। এঁকে আগে কোথাও দেখেছো বোলে মনে হয় কি?"

চৌধুরীরা উভয়েই এ অদ্ভুত প্রশ্নে বিস্মিত হ'লেন। যাঁর সঙ্গে সবেমাত্র পরিচয় হ'ল তাঁকে পূর্ব্বে দেখার কথা আসে কি কোরে?

তাম্বুস্বামী হেসে বোললেন—"আমার প্রশ্ন আপনাদের অবাক কোরে দিচ্ছে, না? আপনাদের স্থানে থাকলে আমারও সম্ভবতঃ ঐ অবস্থা হত। বহুদিন পূর্ব্বে নীলকান্তম নামে একটি মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম মনে পড়ে কি? সেই নীলকান্তমই আজকের এই সাধু ওমকার। মহিশূরের (Mysore) অন্তর্গত নন্দীপাহাড়ে

বৎসর কয়েক ধরে ওঁ মন্ত্র জপ করার পর তিনি যা খুঁজছিলেন তার কিছুটা পেয়েছেন।

ওমকার বোললেন—"আমি সাধক—তাই সাধু সন্ন্যাসী বোলতে যা বোঝায় তা কিন্তু আমি নই। সেদিনকার নীলকান্তমের সঙ্গে তুলনা কোরে আজকের আমাকে দেখে আপনাদের বিস্মিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর বেশী আশ্চর্য্য হবেন শুনলে যে আমার এই পরিবর্ত্তনের সূচনা হয় জেলখানার মধ্যে থেকে।

নীলকান্তমের সঙ্গে সাধু ওমকারের যে প্রভেদ কতখানি, দুটি মানুষকে যারা না দেখেছে তাদের পক্ষে সেটি অনুমান করা কঠিন। সে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি আর নেই। সদাপ্রফুল্ল বদন, শান্ত সমাহিতভাব। তাঁর সহজ, সরল ব্যবহার চৌধুরীদের ভাল লেগে গেল। সাধুজিও নিশ্চয় তাঁদের সঙ্গে আলাপে আনন্দ পেয়েছিলেন—কারণ এরপর থেকে তিনি মাদ্রাজে এলে চৌধুরীরা তাঁর সঙ্গলাভ থেকে বঞ্চিত হতেন না। তাঁর আগমনে চৌধুরী গৃহে যে আসরটি বসত সেটি ছিল ভারি উপভোগ্য। অনেক সময় তাঁদের আলোচনা তর্কের কোঠায় গিয়ে উঠত। চৌধুরী মহাশয় হারবার পাত্র ছিলেন না। তাঁর যুক্তি খরখড়্গ সম, অন্যের যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করার জন্য সদাই প্রস্তুত। সাধুজির একটি মহৎ ক্ষমতা ছিল, তর্কের শেষে আংশিক ভাবে নিজের হারকে মেনে নিতে পারতেন। অতি শান্তভাবেই বোলতেন—"ঠিক বোলেছ বন্ধু, তুমি যে দিক দিয়ে দেখছ সেদিক দিয়েও ধরা যেতে পারে বৈকি," এবং তারপর তর্কের ঐখানেই নিষ্পত্তি হত।

একদিন চৌধুরী গৃহিণী সাধুজিকে বোললেন, "আপনার কথা শুনে আপনার পূর্ব ইতিহাস জানতে আগ্রহ হয়, বোল্‌তে বাধা না থাকলে শুনতে পারি কি?"

তিনি বোললেন,—"বেশ কথা (Very well), আমি বোলব।" এই বোলে তিনি তাঁর কাহিনী সুরু কোরলেন:

"আমার জন্ম হয়েছিল এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। ছেলেবেলা থেকেই আমার ঝোঁক ছিল যুগ পরিবর্ত্তনের দিকে। আমি ছিলাম যাকে বলে খাঁটি রেভোলিউসনিষ্ট (revolutionist)। দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা কি রকম গোঁড়া সেকথা নিশ্চয় শুনে থাকবেন। এখন তাঁদের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বোলছি তখন দক্ষিণীর কাছে মাথার চুল ছোট কোরে কাটা অর্থাৎ মধ্যস্থলে নারী সুলভ কেশগুচ্ছ না রাখা মস্ত একটা অপরাধ বোলে গণ্য হ'ত। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত হ'লে তো কথাই নেই। আমি যখন বিনা দ্বিধায় সেই শিখার উচ্ছেদ সাধন কোরলাম সকলে এক বাক্যে বোললে, 'তুমি জাতিভ্রষ্ট, তুমি অব্রাহ্মণ।' এমন কি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব যাঁরা নন তাঁরাও আমার প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরলেন।

আমার বয়স যখন একুশ, তখন বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন মানুষ এলেন দাক্ষিণাত্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রচার কার্য্যে এবং সেই সঙ্গে দলের জন্য লোক সংগ্রহ কোরতে। অনেকেই পিছিয়ে গেল। একদল বোলল,—আমরা সংসারী লোক এসব আমরা বুঝি না। কোন একজন বোললেন—আমি সরকারী চাকরি করি, আমার এ পেশা নয়, পোষাবেও না। আমার মন উঠ্‌ল নেচে। আমি যেন এই রকমই একটা কিছু খুঁজছিলাম। বাড়ীতে কাউকে কিছু না বোলে, ফলাফলের কথা না ভেবে, দিলাম নিজেকে বিপ্লবীদের কাজে সমর্পণ কোরে। কিছুদিন বাদে কোন এক ইংরাজ বড় অফিসার এই বিপ্লবীদের গুলিতে মারা পড়েন। তৎক্ষণাৎ অন্য কয়েকজনের সঙ্গে আমার নামে পরোয়ানা বার হ'ল। আমার পরিচিতি হ'ল খর্ব্বাকারের কৃষ্ণবর্ণের মানুষ, সদাই ধূমপানে রত (Chain Smoker)। খবর শুনে আমি বাহিরে সিগারেট খাওয়া বন্ধ কোরে দিলাম এবং বাঙ্গালীর বেশে কলকাতা সহরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে অনেক বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। সকল বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ করা আমাদের নিষেধ ছিল, কারণ সেটা নাকি আসল উদ্দেশ্যের পক্ষে হানিকর। অনেক তল্লাসের পর তিনমাস বাদে আমি ধরা পড়লাম এবং আমার হাতে হাতকড়ি পড়ল। সাব্যস্ত হল আমার বিচার হবে মাদ্রাজ প্রদেশের কোন একটি আদালতে এবং কাল বিলম্ব না কোরে যাত্রার জন্য আমাকে প্রস্তুত করা হ'ল।

শুনলে আপনারা নিশ্চয় হাসবেন যে আমার মত একটি ক্ষীণজীবী প্রাণীকে নিয়ে যাবার জন্য পুলিশবাহিনী দিয়ে আমাকে বেরোয়া করা হ'ল। ডাহিনে পুলিশ, বামে পুলিশ, সামনে পুলিশ, পশ্চাতে পুলিশ! আসল লোকটি তারই মধ্যে গেল হারিয়ে। মাদ্রাজ পৌছান মাত্র আমাকে

টিনেভেলিতে চালান দেওয়া হ'ল। সেখানে কালেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর পদব্রজে আমাকে সদর আদালতে যেতে হবে এই রকম বন্দোবস্ত ছিল। কালেক্টরের বাংলোয় পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে যখন পৌছলাম তখন আমি ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। সারাপথ স্নান, আহার বা নিদ্রা কোনটাই হয় নি। আমার আকৃতি দেখে শ্রীযুক্ত তাম্বুস্বামী আমার তখনকার অবস্থা কিছুটা অনুমান কোরে থাকবেন। তিনি আমার সঙ্গে অল্প কয়েকটি কথা কইলেন। তারপর আমাকে টঙ্গা কোরে আদালতে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়ে বোললেন—আসামী দু-রাত্রি, দুদিন ট্রেনে এসেছে, এখন স্নান পর্য্যন্ত হয়নি, তোমরা ওঁকে টঙ্গা কোরে নিয়ে যাও, হাঁটিয়ে নিয়ে যেওনা এবং উপস্থিত কিছুক্ষণের জন্য হাতকড়ি খুলে দাও।

আমার সঙ্গে আর কয়েকজন আসামীকে তাম্বুস্বামীর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাম্বুস্বামী তাঁর রিপোর্টে (report) লিখলেন—"আসামীদের মধ্যে একটি মাত্র মানুষ আছে যে নিজের শক্তিতে চলে। যার বুদ্ধি আছে এবং তার ব্যবহার সে জানে। ঐ মানুষটি হ'ল নীলকান্তম্। বাকি সকলে নগণ্য। নিজস্ব ক্ষমতা বোলে কিছু নেই, চালালে চলে, এই পর্য্যন্ত।" এই রিপোর্টের ফলাফল সহজেই অনুমেয়। বিচারে আমি একজন ভয়ঙ্কর বিপদ-জনক জীব বোলে সাব্যস্ত হলাম্ এবং সাত বৎসরের জন্য আমার সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল।

জেলখানায় আমি শান্তশিষ্ট হয়ে ছিলাম না। নানা রকম উৎপাত সুরু কোরে দিলাম্। কর্তৃপক্ষ আমাকে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়লেন। এক জেল থেকে আর এক জেলে আমাকে বদলি করা হতে লাগল। তাতেও কোন ফল হচ্ছে না দেখে তাঁরা আমায় সোজাসুজি জিজ্ঞাসা কোরলেন, তুমি কি চাও? কি হ'লে তুমি ভালভাবে থাকতে পার?

জেলে আমাদের ভাত দেওয়া হ'ত না। লপ্সি বা কাঞ্জি (এক জাতীয় মাড়ে ভাতে) দেওয়া হ'ত। আমি জানালাম, এসব খাওয়ায় আমি অভ্যস্ত নই, আমাকে ভাত দেওয়া হ'ক। তা ছাড়া এখানে আমাকে যে সব কাজ দেওয়া হচ্ছে (গাছ কাটা ইত্যাদি) সে রকম কাজও আমি কখন করিনি।

কর্তৃপক্ষ আমাকে ভাত দেবার অনুমতি দিলেন এবং আমার সশ্রম কারাদণ্ডকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে পরিণত করা হ'ল। এ ভিন্ন সময় কাটাবার জন্য নানা রকম পুস্তকও আমাকে সরবরাহ করা হ'ত। এর পর থেকে আমি আর কোন রকম উপদ্রব না করায় আমার সাত বৎসরের মেয়াদকে কমিয়ে চার বৎসর কোরে দেওয়া হ'ল। আমার যখন কারা জীবনের আর মাত্র আঠের (১৮) মাস বাকি তখন কি খেয়াল হ'ল জানিনা, মনে মনে সঙ্কল্প কোরলাম, এই বন্দী অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত কোরতে হবে। মনে চিন্তা আসা মাত্র কালবিলম্ব না কোরে কাজ সুরু কোরে দিলাম। একদিন সুবিধা পেয়ে আমার কামরার (cell) চাবির একটি ছাঁচ নিলাম। জেলের একজন "আচারির" (মিস্ত্রী) সঙ্গে আগেই ভাব জমিয়েছিলাম। তাকে দিয়ে একটি নকল চাবি প্রস্তুত করালাম। তখনকার দিনে জেলঘরের দরজা এখনকার মত ছিল না। হাত গলিয়ে তালা ছোঁয়া যেত। এক নিশুতি রাত্রে সব যখন নিস্তব্ধ আমি ধীরে শয্যা ত্যাগ কোরে আমার চাদরটিকে এমন ভাবে সাজালাম যাতে বাইরে থেকে মনে হয় একটি মানুষ সেখানে নিদ্রিত। তারপর সন্তর্পণে তালাটি খুলে বাহিরে এসে নিঃশব্দে আবার সেটিকে বন্ধ কোরে পলায়নের জন্য প্রস্তুত হ'লাম্, বুকের মধ্যে তখন হৃৎপিণ্ড তাণ্ডব নৃত্য কোরছে। এক পা, দু পা কোরে কোরে খানিক অগ্রসর হই, আবার থামি। ছায়া দেখলে ভয় হয় এই বুঝি আমার সন্ধানে কেউ এল। একটু শব্দ হয় আর চমকে উঠি, মনে ভাবি এইবার সব শেষ। অবশেষে নীচু ছাদ পেয়ে তারই ওপর উঠে চলা সুরু করলাম্। ছাদকে মাটির অপেক্ষা নিরাপদ মনে হ'ল। এক ছাদ থেকে আর এক ছাদে—এইভাবে চলে প্রায় যখন শেষ সীমানায় এসে পৌছেছি অকস্মাৎ মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। আওয়াজ আমার কাছে এসে থামল না দেখে কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সেটি সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়ালাম এবং ছোট পাঁচিলকে আশ্রয় কোরে একেবারে জেল-খানার বাইরে এসে পৌছলাম। তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে সুতরাং আমার অন্য উপায় ছিল না। দিনের আলো ফোটার আগেই আমাকে গা ঢাকা

দিতে হবে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আমি আমার পথ ক্ষোরে চললাম।

এদিকে পরদিন প্রত্যুষে জেলের ভিতর হুলুস্থুল কাণ্ড। শূন্য বিছানা আবিষ্কৃত হবার পর আসামী পালিয়েছে এই সংবাদ যখন প্রকাশ হয়ে গেল তখন চতুর্দ্দিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। মুক্তির তৃতীয় দিনে একটি গ্রাম্য ষ্টেশনের (station) নিকট দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় দেখি আমার জেলের আর একটি পলাতক আসামী পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে ঐ পথে চলেছে। জেলে থাকাকালীন ঐ লোকটির সঙ্গে আমার কোন রকম সম্বন্ধ ছিল না। তবু কি উদ্দেশ্যে জানি না সে আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ কোরে বোললে —ঐ লোকটি পরশু দিন জেলখানা থেকে পালিয়েছে। বলা বাহুল্য আমি পুনর্ব্বার ধৃত হলাম। পূর্ব্বেই বোলেছি, আমার বন্দী অবস্থার সমাপ্তি হতে আর মাত্র কয়েকটি মাস বাকি ছিল। পলায়নের চেষ্টা করায় সাত বৎসর তো ফিরে এলই, উপরন্তু আর ছ'টি মাসের বাড়তি শাস্তি হ'ল।

এরপর আমি আমার অদৃষ্টকে মেনে নিলাম এবং জেলে বসেই লেখাপড়ার চর্চ্চা সুরু কোরে দিলাম। নানা রকম চিন্তা আমার মধ্যে তোলপাড় সুরু কোরে দিলে। আমার কেমন যেন মনে হ'ল, এই যে স্বদেশী আন্দোলন, এই যে প্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি—এ সবই বাহ্য, সমস্তই মিথ্যা। সব কিছুর মধ্যে আনন্দ পাওয়া এবং সত্য ও সুন্দরকে উপলব্ধি করা, এই হ'ল জীবনের চরম সার্থকতা। তাই জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েই আরো বড় মুক্তির খোঁজে আমি নন্দী পাহাড়ে চলে গেলাম। উপরে যে ছোট মন্দিরটি আছে সেইখানে আমি থাকি। কাছেই একটি জলাশয় আছে, ভোর চারটেতে উঠে সেইখানে স্নান কোরে আমি আমার তপস্যা সুরু করি। বেলা দশটার সময় একটি লোক আমার ডাকের চিঠি ও ফলমূল ইত্যাদি আবশ্যক জিনিস নিয়ে নীচের গ্রাম থেকে আসে। চিঠির জবাব দেবার থাকলে লিখে তার হাতে দিয়ে দি। সন্ধ্যার সময় খবরের কাগজ নিয়ে আসে আর একটি লোক। কাগজ পড়া শেষ হ'লে নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হই। নানাজাতীয় বই এবং লেখবার সরঞ্জাম থাকে আমার কাছে। সাধনার বাইরে যে সময়টুকু পাই সেটি জ্ঞানচর্চ্চায় অতিবাহিত করি।"

চৌধুরী গৃহিণী বোললেন—"আপনার চাহিদা খুব কম জানি কিন্তু জীবন ধারণের জন্য যে সব জিনিস অত্যাবশ্যক সেগুলি আসে কোথা থেকে? আপনার কথা শুনে যা বুঝলাম তাতে মনে হয় আপনার তো কোন আয় নেই বা সঞ্চয় নেই।"

সাধুজি হেসে উত্তর কোরলেন—"যার ঘর নেই সব-খানেই তার ঠাঁই। যার স্বজন নেই সবাই তার আপন। না চাইতেই কয়েকটি বন্ধু বা শিষ্য আমি পেয়েছি। তাঁরা সর্ব্বদা আমার খোঁজ-খবর রাখেন এবং কোন কিছুর অভাব বোধ করবার আগেই তাঁদের দ্বারা সেটি পূরণ হয়ে যায়। নিজের জন্য যার ভাবনা নেই তার চিন্তার ভার অপরে গ্রহণ করে, অন্ততঃ আমার জীবনে আমি তো তাই দেখছি। বৎসরে একবার কোরে পাহাড় থেকে আমি নামি। এটা শিষ্যদের অনুরোধ। আপনাদের মত কয়েকজন লোক আমার দেখা পেলে খুশী হন এবং আমিও তাঁদের সঙ্গ-লাভে আনন্দ পাই। আনন্দই হ'ল ব্রহ্ম। আমি আনন্দের পূজারী।"

ঘড়িতে ঢং ঢং কোরে ন'টার ঘণ্টা বাজল। সাধুজি. বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বোললেন—ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ক্ষুদ্রের ক্ষমতা

যতই ভাবি ক্ষুদ্র তা'রে
ক্ষুদ্র ও সে নয়,
উড়ে এসে পড়লে চোখে
তখন মনে হয়।

—সাধন চৌধুরী

অস্তি মগধ দেশে…

শ্রীসুধীর ব্রহ্ম

"মগধ দেশ হয় কাঞ্চন পুরী
দেশ ভাল পাই ভক্ষ বুড়ি"

উপরি উক্ত প্রবাদটি প্রমাণ করে সোনার দেশ মগধ, কিন্তু ভাল নয় ভাষা। প্রাচীন মগধ বলতে পাটনা ও গয়ার পূর্ব্ব অংশকে বোঝায়। ভাষাবিদ গ্রীয়ারসনের মতে সমগ্র মগধের ইতিহাস উক্ত প্রবচনের মধ্যে নিহিত। তুলসীদাস মগধকে কাশীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এবং তাঁর রামায়ণে কৈকেয়ীর সংলাপ পর্য্যালোচনা করলে গয়ার চলতি ভাষা বলেই মনে হবে। ঋক্ সংহিতায় মগধকে 'কীকট' নামে অভিহিত করলেও ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে মগধকে 'বগধ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাটলী অর্থাৎ ফুল হতে 'পাটলিপুত্র' নামটি এসেছে। পাটনা যে পাটলি পুত্রের অংশ বিশেষ এ বিষয়ে এখন আর কোন মতবিরোধ নেই। গ্রীকরাজ সিলিকউসের দূত মেগাস্থিনিস পাটনাকে পালিহোত্র বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি এই স্থানে অনেকদিন বাস করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা চন্দ্রগুপ্তের ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিংশ সহস্র অশ্বারোহী, পঞ্চদশ সহস্র গজ সৈন্যের মধ্যে কখন চুরির অভিযোগ শোনা যায়নি। চারিদিকে গভীর পরিখা ও অত্যুচ্চ প্রাচীর পাটনাকে একরূপ দুর্ভেদ্য করে রেখেছিল। প্রাচীরে ছিল ৫৭০টি উচ্চ স্তম্ভ এবং ৬৪টি তোরণ। কাষ্ঠ নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ শোভা সম্পদে পারস্যের রাজপ্রাসাদকে অতিক্রম করেছিল। সেই রাজপ্রাসাদের পরিবর্ত্তে মহারাজ অশোক প্রস্তর-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছিলেন। কলিঙ্গ জয়ের সময় বহু লোকের প্রাণ হানি হল; অশোকের মনে এল বৈরাগ্য, গ্রহণ করলেন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অহিংসার বাণী। মগধবাসী সকলেই তাঁর সাম্রাজ্যে ভোগ করল বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধুর ফল। বৌদ্ধ যুগে পাটনার নাম ছিল পাটলিগ্রাম, কিন্তু নন্দবংশের সময় মগধের রাজধানী পাটলিপুত্ত বা পাটলিপুত্র নামেই অধিক পরিচিত ছিল। এখানে পর্ব্বত গাত্রে বিহার বা চৈত্যের প্রাচুর্য হেতু দেশটিই ধীরে ধীরে এক সময় বিহার নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রাচীন পাটলিপুত্রের সহিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। বৌদ্ধ যুগে যখন রেল ষ্টীমার কিছুই ছিল না তখন ভারতের বাইরে থেকেও অগণিত শিক্ষার্থী এখানে সমবেত হত। রাজধানী তখন ছিল দৈর্ঘ্যে নয় মাইল ও প্রস্থে দুই মাইল। ভারতের চির গৌরব নালন্দায় একদা দশ হাজার শিক্ষার্থীর এক সঙ্গে অবস্থান এবং অধ্যয়নের সুব্যবস্থা ছিল। গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমে গড়ে উঠল এক বাণিজ্য-শ্রী-সম্পন্ন নগর। নগরটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠার মূল উৎস ছিল শরযূ আর উজানে গণ্ডকী নদী। এই মহা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে নানা দেশ বিদেশ থেকে এখানে প্রতিবৎসর সমবেত হত হাজার হাজার জ্ঞানলিপ্সু বিদ্যার্থীর

বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি।

দল। সেই পাটলিপুত্র এখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন। পাঁচ ছয় মাইল চওড়া গঙ্গার মধ্যে বিরাট এক চড়া। গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থল এখন ১২ মাইল পশ্চিমে সরে গেছে গঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে পাটনা ও বাঁকিপুর সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৮৫ ফুট উচ্চে অবস্থিত। সেই পাটনা এখন বিহার প্রদেশের রাজধানী। কলকাতা থেকে উত্তর পূর্ব্বে এর দূরত্ব হল ১৭০ ক্রোশ।

তদানীন্তন বিহারের জননেতা কনষ্টিটুয়েণ্ট আসেম্বলীর চেয়ারম্যান ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাটনারই অধিবাসী। ১৯১১ সালে বঙ্গ-বিভাগ রহিতের সঙ্গে সঙ্গে বিহার একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ রূপে গঠিত হয়। পাটনা হল সেই প্রদেশের রাজধানী। প্রাচীন মগধের ভগ্নস্তূপ ও নালন্দা এখন রয়েছে পাটনা সহর থেকে দূরে। O'Malleyর বিবরণ হল:—

"Pataliputra which now lies buried beneath the modern city of Patna and the adjoining civil station of Bankipore, was founded in the fifth century B. C. and became the great metropolis of India in the time of Chandra Gupta (321-297 B. C.)…In 1877 village of a long brick wall and of a wooden palisade were found, and the mere recent researches of Col. Waddell in 1892, 1896 and 1899 have brought to light many more remains which are sufficient to show

নালন্দার বিহার গাত্রের বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি সমূহ।

what a wealth of material awaits complete exploration."

এখন পাটনা বলতে কার্য্যতঃ তিনটি সহরকে বোঝায়; প্রথম পাটনা, দ্বিতীয় গুলজারিবাগ এবং তৃতীয় বাঁকিপুর। হাওড়া থেকে পাটনা জংসন ৩৩১ মাইল। পুরাতন বাঁকিপুরের পাকা রাস্তা দিয়ে একটি সাইকেল রিক্সা আমাকে নিয়ে চলেছে 'গোবিন্দ মিত্র রোডের' দিকে। পথে পড়ল সরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল কলেজ, আদালত ভবনগুলি। বাঙ্গালী বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারগুলির মধ্যে 'মিত্র বংশের নাম বিহার প্রদেশে এখনও বহুখ্যাত। লালরংয়ের সেই গোবিন্দ-নিবাস এখন উত্তরাধিকার সূত্রে বিভক্ত। ৺গোবিন্দবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনীহারচন্দ্র মিত্রের নিকট কয়েকদিন থেকে গেলাম ঐতিহাসিক পাটনাকে স্বচক্ষে দেখার জন্য।

সম্প্রতি পাটনায় অনেকগুলি সুন্দর প্রাসাদ তৈরী করা হয়েছে। পথে মোটর বাস চললেও, ড্রেনের অভাবে রাস্তার ধারে ধারে অগভীর নালা বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। পথ ঘাট সংস্কার করার কাজে সরকারী বহু অর্থ বরাদ্দ থাকলেও, পাটনাকে বিহারের রাজধানী যোগ্য করতে সময় সাপেক্ষ। নগরের পশ্চিম প্রান্তে কোন এক ব্যক্তির রুচি সঙ্গত বসত বাড়ী পাটনা কলেজের ভবনরূপে উপস্থিত ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৮৫৭ সনে সরকার ঐ গৃহটি ক্রয় করে প্রথমে আদালত গৃহ রূপে ব্যবহার করতেন কিন্তু ১৮৬২ সনে গৃহটি পাটনা কলেজের জন্য নির্দ্দিষ্ট হল। গৃহটির মধ্যে উপস্থিত রাসায়নিক বিভাগ, আইন বিভাগ ও কলেজিয়েট স্কুল রয়েছে। নিকটে টেম্পল মেডিকেল স্কুল ও পাটনা হাসপাতাল। হাসপাতাল ভবনটি ১৯০৩ সনে এক লক্ষ টাকা খরচে নির্ম্মিত। ১৮৭৬ সনে প্রিন্স অফ ওয়েলস বিহার পরিদর্শনে এসেছিলেন। তাঁর সম্মানার্থে যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল, সেই টাকায় বিহার ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল গৃহটি নির্ম্মিত। সাধারণের জন্য ১৯০০ সনে সেই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। খান বাহাদুর খুদাবক্স কর্তৃক স্থাপিত পাটনা ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীটি এখানে উল্লেখ-যোগ্য। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও ইজিপ্ট হতে সংগৃহীত পুঁথি, ক্যিটবিত্ত, ইউরোপে মুদ্রিত চার হাজার পারসিয়ান ও আরেবিক পুস্তক, মুসলমান সম্প্রদায়ের মহামান্য 'উলমার' হস্তাক্ষর ও সীল, নানা দুষ্প্রাপ্য পুস্তক প্রভৃতি এই গ্রন্থাগারে এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। আধুনিক পাটনায় প্রাচীনতম মসজিদ শেরশাহ কর্তৃক শিকারপুরে প্রতিষ্ঠিত। ইটের তৈরী মসজিদটির মাঝ খানে প্রকাণ্ড গম্বুজ ও চারকোণে অপেক্ষাকৃত ছোট চারটি গম্বুজ। মসজিদের বাইরে আসরফ আলি খানের কবর। সুলতানগঞ্জে পাথরের মসজিদটি জাহাঙ্গীরের পুত্র পরেজ শাহ কর্তৃক ১৬২৬-২৭ সনে নির্ম্মিত। গঙ্গার ধারে সইফ খান কর্তৃক ১৬২৬ খৃঃ যে মসজিদটি তৈরী করা হয়েছিল, সেটি সত্যই ছবির মত সুন্দর। মাদ্রাসার নিকটেই এই মসজিদটি স্থাপিত হওয়ায় 'মাদ্রাসা মসজিদ' বা 'চমনিঘাট' মসজিদ বলা হয়। প্রকাণ্ড সেই মাদ্রাসা বর্ত্তমানে একটি ছোট উর্দ্দু মকতবে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাঁকিপুর ময়দানের কাছেই গ্রেনারী বা গোলা ঘর। ১০৮ ফুট উঁচু গোলাঘরের চূড়ায় উঠবার জন্য পাকা সিঁড়ি। ভিতরের সামান্য শব্দটিও বার বার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। পাথরের স্মৃতি-ফলকে খোদিত আছে:—"মন্ত্রী পরিবেষ্টিত গভর্ণর জেনারেল এই সব প্রদেশে চিরকালের জন্য দুর্ভিক্ষ নিবারণ করবার অভিপ্রায়ে যে উপায় উদ্ভাবন করেন তাহার অঙ্গ স্বরূপ এই শস্যাগার কাপ্তেন জন গার্ষ্টিন কর্তৃক ২০ এ জুলাই ১৭৮৬ খৃঃ সম্পূর্ণ করা হইল। প্রথমবার শস্যে পূর্ণ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে দ্বার বন্ধ করিবার তারিখ।"—আজ পর্য্যন্ত গোলাঘরে এক দানা চাল বা গম পড়ে নি। শস্যে পূর্ণ করা এখনও ঘটে উঠল না, তাই তারিখের স্থান আজও অপূর্ণ রয়েছে। সাহেবদের মতে গোলাঘরটি গার্ষ্টিনের নির্ব্বুদ্ধিতার সাক্ষ্য দেয়। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত Buchanan Mss. এ গোলাঘর সম্বন্ধে লিখিত আছে:—"For the sake of great-man by whose orders this building was erected, the inscriptions should be removed, were they not a beacon to warn governor, of the necessity of studying political economy and were it not of use to mankind to know even the weakness of Mr. Hastings."

গোলাঘরের নিকটেই পাটনা চক। লালরংয়ের সরকারী বাসে চেপে মহারাজগঞ্জে পৌছালাম। অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে বাস চলেছে পুরাণো পাটনা সহরের দিকে। বাস টারমিনাস থেকে হেঁটে খানিকটা এগিয়ে গেলে তৎকালীন গঙ্গা ও শোনের সঙ্গম স্থল পাওয়া যায়। ১৯০ খৃঃ নির্ম্মিত মোগল আমলের রামনারায়ণ দুর্গটি গঙ্গা তীরে অবস্থিত। ফটকের দুপাশে দুটি সিংহ মূর্ত্তি। দুর্গ অভ্যন্তরে দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহশালা আছে। বর্ত্তমানে এক ধনী মাড়োয়ারী দুর্গটিকে ক্রয় করে নিয়েছেন। প্রবেশ-অনুমতি নেবার জন্য ফোন করলাম নিকটের এক গোশালা থেকে ; কিন্তু অনুমতি মিলল না। ফিরে গেলাম দুটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির দেখতে। ১৮১১ খৃঃ নির্ম্মিত বড় পাটন দেবীর মন্দিরে যে বিগ্রহটি দেখলাম সেটিকে নাকি মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছল। ছোট পাটন দেবীর মন্দির 'হর মন্দির' লেনের নিকটেই রয়েছে। কিছু দূর এগিয়ে গেলে একটি কুয়া পেলাম। কথিত আছে দেবীর কাপড় বা 'পাট' ঐখানে পড়েছিল ; আর শিব নাকি দেবীর নশ্বর দেহ সেখান থেকে বহন করে নিয়েছিলেন। এখন দেখি মন্দিরের সামনে এক অগ্নিকুণ্ডে যাত্রীরা খুবই ভক্তিভরে হোমাগ্নি দিয়ে চলেছে। মাতৃমূর্ত্তির মুখ কিন্তু কালীঠাকুরের মত নয়। হর মন্দির লেনে আধুনিক পাটনার অন্যতম গৌরব শিখ গুরুদোয়ারা। শিখদের দশম গুরু মহাতেজা গুরু গোবিন্দ সিংহ এইখানে জন্মেছিলেন।

সেদিন ছিল গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মদিন। যে মহাপুরুষ সমগ্র শিখ জাতিকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক পরাক্রান্ত সিংহের জাতিতে পরিণত করেছিলেন, যিনি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সারা জীবন ধরে যুদ্ধ করেছিলেন, যিনি স্বীয় চরিত্রবলে মিত্রের পূজা ও শত্রুর সম্ভ্রম অর্জ্জন করেছিলেন, আজ তাঁর সম্মানার্থে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কত না লোকের সমাগম হয়েছে। মন্দিরটি এখনও প্রস্তুতির পথে। প্রবেশ পথে সশস্ত্র প্রহরী ; পকেট থেকে রুমাল বার করে মস্তক আবৃত করলাম। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম জুতা জামা রাখবার জায়গায়। সঙ্গে চামড়ার তৈরী কোন জিনিষ বা দিয়াশলাই, সিগারেট আছে কিনা, প্রহরী জিজ্ঞাসা করে নিল। এসব জিনিষ নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটি সুউচ্চ শাল কাঠে এক পতাকা শোভিত। নেপালের জঙ্গ বাহাদুর এই পতাকাটি দান করেছিলেন। একটি শ্বেত প্রস্তরের জলাশয়ে পা দুটি ধুয়ে মন্দিরের ভিতরে এলাম। পাঞ্জাব থেকে আগত বহু শিখ এক সঙ্গে উপাসনা করছে। গুরু নানকের প্রতিকৃতি আজ ধূপ ধূনা পুষ্পমাল্যে সাদরে অর্চ্চিত হচ্ছে। শিখদের পবিত্র 'গ্রন্থ সাহেব' পুস্তকে স্বহস্তে লিখিত গুরু গোবিন্দ সিংহের নাম আজও দেখা যায়। প্রাঙ্গণের এক অংশে ত্রিপলের ছাউনি ; সেখানে চলেছে রান্না করার এক বিরাট আয়োজন। হর মন্দির সম্বন্ধে Monier William ১৮৮৩ খৃঃএ "Religious Thought and Life in India" নামক পুস্তকে লিখেছিলেন :—

"The temple dedicated to the tenth Guru Govind, at Patna, was built by Ranjit Singh about forty years ago. I found it, after some trouble, in a side street, hidden from view and approached by a gateway, over which were the images of the first nine Gurus, with Nanak in the Centre. The shrine is open on one side. Its guardian had a high-peaked turban encircled by steel rings used as weapons…on one side, in a small recess supposed to be the actual room in which Govind was born more than two centuries before—were some of his garments and weapons, and what was once his bed, with other relics, all in a state of decay. On the other side was a kind of low altar on which were lying under a canopy a beautifully embroidered copy of the Adi-Granth and of the Granth of Govind. In the centre on a raised platform, were a number of sacred swords, which appeared to be as much objects of worship as the sacred books."

পাটনার দ্রষ্টব্যস্থল যথা পাটনা মিউজিয়ম, সুলতান আহমেদের

নালন্দার চৈত্য গাত্রের আবক্ষ মূর্ত্তি।

প্রস্তর নির্ম্মিত সর্প দেবতার মূর্ত্তি।

প্রাসাদ, রবীন্দ্রভবন, হরিসভা ও বিরলাভবন, হাইকোর্ট, গভর্ণরের প্রাসাদ ইত্যাদি পরিদর্শন করে চলে এলাম বোরিঙ্গ রোডে। সদর রাস্তার ধারে ধারে নবনির্ম্মিত বিচিত্র ধরণের ঘর বাড়ী। রাস্তার মোড়ে বাঙ্গালী এক ভদ্র মহিলা ছাতা মাথায় ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে রাজমিস্ত্রীদের কাজ করাচ্ছেন। পরিচয় সূত্রে জানলাম তিনি নাকি পাটনার পুলিশ কমিশনরের স্ত্রী। খুবই আগ্রহ করে তিনি নিয়ে এলেন আমাকে ঘরের মধ্যে, দেখালেন কত সুন্দর ভাবে প্রতি ঘর তাঁরই রুচি অনুযায়ী তৈরী হতে চলেছে। ছাদের উপর উঠলেই গঙ্গার বিস্তৃত রূপ মনে করিয়ে দিল বিবেকানন্দের সেই বাণীখণ্ডটি। সংযুক্ত বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা প্রদেশ আজ বিভক্ত কিন্তু প্রকৃতি দেবী তবু তাঁর অফুরন্ত প্রাচুর্য্য ও শ্যামল সৌন্দর্য্যে এই বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় ভূখণ্ডটিকে একটি সুগভীর ঐক্যে বিধৃত করে রেখেছে। বিবেকানন্দ তাই লিখেছিলেন :—

"সেই নীল, নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝাপ তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলচে, তার নীচে ফিকে, ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ী ঢালা আম, নীচু, জাম কাঁঠাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল-পালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলচে দুলচে, আর সকলের নীচে…যার কাছে ইয়ার কান্দী ইরানি তুর্কিস্থানি গালচে কোথায় হার মেনে যায়; সেই ঘাস যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক কোরে রেখেছে; জলের কিনারা পর্য্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদু মন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্ছে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গা জল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্য্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙ্গের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ?"

দুপুর রোদে গঙ্গার ধার দিয়ে চলেছি রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সদাকৎ' আশ্রমটি দেখতে। দিয়াশলাই, সাবান তৈরী থেকে আরম্ভ করে কুটীর শিল্পের নানা বিষয় এইখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। বহু ছাত্র আজ এই আশ্রম থেকে তৈরী হয়ে নিজেদের জীবিকা সংগ্রহের পথ খুঁজে নেয়। ভারতের রাষ্ট্রপতির এই প্রচেষ্টা আজ কতটা সাফল্য লাভ করতে চলেছে, সেটা এখানে না এলে উপলব্ধি করা যায় না।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পাঁচ

চক্ষু দুটো উন্মীলিত বা নিমীলিত যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ওদের কর্ম্ম ওরা করবেই। চোখ বুজে থাকার চেয়ে প্যাটপেটিয়ে তাকিয়ে থাকা ঢের ভাল। তাকিয়ে থাকলে চোখের নাগালের ভেতর যা পড়ে, তাই নিয়ে সময় কাটানো যায়। কিন্তু চোখ বুজলেই একটু একটু করে তলিয়ে যেতে হয় অথই জলে। নজরের নাগাল তখন অনেক তলায় পৌঁছে আঁতিপাতি করে খুঁজতে থাকে। কি যে খুঁজে মরে, তা কিন্তু নজর নিজেই জানে না।

তারপর সেই বোজা চোখের দরুণ ভয়ানক চক্ষুলজ্জায় পড়ে যেতে হয়। অনেক তলায় তলিয়ে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকলে এমন অনেক চোখের সঙ্গে চোকোচোকি হোয়ে পড়ে যে ভারী অপ্রস্তুত হোয়ে পড়তে হয় তখন। মেলা চোখের চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। মেলা চোখে চোখের পর্দা থাকে না। পর্দাবিহীন চাউনি দিয়ে যা দেখা যায়, তা' একেবারে বেপর্দা বেআবরু দৃশ্য। বেআবরু দৃশ্য দেখলে চক্ষুলজ্জায় পড়তে হবে কেন!

যা বেআবরু হবার ভয়ে লুকিয়ে থাকে অন্তরের নিভৃত কোণে, তা' যদি দেখতে চাও, তা'হলে আগে নিজের চক্ষু দুটির ওপর পর্দা টেনে দাও। পর্দা টেনে দিয়ে নিজের পানে তাকিয়ে দেখ। দেখবে, নিজেকে দেখেই নিজে লজ্জায় মুখ তুলতে পারছ না।

চক্ষু বুজে পড়ে থেকে নিজেকে নিজে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। যা দেখলাম, তা' আর ব্যাখ্যা করে বলে কাজ নেই। আজন্মকাল যে কুৎসিত কুলাঙ্গার আমিটিকে দূর ছাই করে মরেছি, তার পানে তাকিয়ে সত্যিই মুখ তুলতে পারলাম না। আহা বেচারা, বলে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হোল।

তাই নাকি হয়। ঐ যাকে ভাল ভাল মানুষরা প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি ভাল ভাল নাম দিয়েছে, সে ব্যাপারটার ধর্ম্মই নাকি ঐ রকমের। আকছার আর কে নিজের পানে নিজে তাকিয়ে থাকতে যাচ্ছে। কিন্তু যদি কখনও অপরের দু'টি চক্ষুতে শ্রাবণ আকাশের মেঘ ঘনিয়ে ওঠে আমার পানে তাকিয়ে, সেই মেঘের অন্তরে ঝিকিমিকি করে আশ্বিন আকাশের ফিরোজা রোশনাই, তাহ'লে নিরিবিলিতে নিজের গলা জড়িয়ে ধরে চক্ষু বুজে শুয়ে থাকার বাসনা হয়। আর সেই আকাশে নিজের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা বেশ মিষ্টি নেশায় বুঁদ হোয়ে পড়ে জ্ঞান-বুদ্ধি। ঘেন্না বিতৃষ্ণা বিদকুটে বেহায়াপনা কিছুই তখন ধারে কাছে ঘেঁষতে পায় না। নিজেকে এবং নিজের তৈরী দুনিয়াটাকে তখন খুবই নিরুপম নিকটতম বলে মনে হয়।

কিন্তু নিরুপম দুনিয়ায় চক্ষু বুজে পড়ে থাকা যায় কতক্ষণ! অতি বড় বিশ্বনিন্দুকেও এ কথা মানতে বাধ্য যে বিশ্বখানার আর যত দোষই থাকুক না কেন, বিশ্বখানা কিন্তু আদিখ্যেতা করার জায়গা নয়।

শ্রীমান তারকনাথ এমন মানুষ যার কাছে আদিখ্যেতা

বলতে কোনও বালাই ঘেঁষতেই পারে না। এগার বছর বিশ্বে বাস করে ও বেচারা বিশ্বটাকে মোটে চেনেই না। পেটের খিদে কি ব্যাপার তা' পর্য্যন্ত মালুম হয়নি ছেলেটার। হবে কেমন করে, ও জানে সকাল হোলেই মা ভাত ডাল রেঁধে ফেলবে। মিঠুরাম কোথা থেকে খানিকটা দুধ এনে দেবে। তারপর মা-বেটা দু'জনে চুপ-চাপ খেয়ে নেবে। সন্ধ্যার পরে আর একবার খাবে রুটি দুধ, এক ডেলা ভেলীও থাকবে দুধের মধ্যে ফেলা। হাঙ্গামা চুকে গেল। খিদে পাবার ফুরসত মিলছে কখন যে খিদের সঙ্গে পরিচয় হবে ওর।

এগারটা বছর ছেলেটা ঐ ভাবে বেঁচে আছে। জন্মে দেখেছে মাকে, মাকেই দেখছে এগার বছর ধরে। মা ছাড়া আর কাউকে দেখেনি, কাউকে চেনে না। একটা খেলার সাথীও কখনও জোটেনি ওর। মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে আর একটু বড় একটা পেটের মধ্যে বাড়ছে এত দিন। সে পেটটাও ওর মায়ের পেট। ওর মা ওকে তাঁর মনগড়া পেটের মধ্যে পুরে রেখেছেন। তারকনাথের কাছে কিছুই আদিখ্যেতা নয়। কিছুই যে জানে না, সে না জানার ভাণ করে ন্যাকামি করবে কেমন করে।

তাই ও থেমে থাকতে পারে নিঃশব্দে, গাছ পাথরের মত অপেক্ষা করতে পারে।

চোখ বুজে শুয়ে থাকলেও টের পেলাম কে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল। দাঁড়াল ত' দাঁড়িয়েই রইল। অনেকক্ষণ সবুর করে রইলাম, একটু কিছু সাড়াশব্দ পেলে চোখ মেলে উঠে পড়ব বলে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। কোথায় কি, যে ঘরে ঢুকল, সে যেন হাওয়ার সঙ্গে মিশে রইল। শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই হার মানতে হোল। আস্তে আস্তে দু'পায়ের পাতা দু'খানা নাড়াতে শুরু করলাম। কোনও ফল ফলল না। অগত্যা চোখ মেলতে হোল।

ও কি! কি ব্যাপার!

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসতে গেলাম। চাপা গলায় ধমক দিয়ে উঠল তারকনাথ—"উঠবেন না, উঠবেন না। একটুও নড়বেন না যেন। আর একটু সময় ঐ ভাবে শুয়ে থাকুন। উঠলেই সব গোলমাল হোয়ে যাবে।"

উঠলাম না, নড়লামও না। মাথা হেঁট করে তারকনাথ তার খাতায় পেন্সিল চালাতে লাগল। এক এক বার মুখ তুলে কপাল কুঁচকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার পানে, তারপর আবার মুখ নিচু করে খাতার পাতায় দাগ টানতে লাগল। স্তম্ভিত হোয়ে ওর মুখখানির পানে আমি তাকিয়ে রইলাম।

এগার বছরের কচি মুখ, সেই মুখে আচম্বিতে আবির্ভূত হোয়েছে স্বয়ম্ভু শিল্পীর স্বভাবসিদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক নিপুণতা, আত্মপ্রকাশের অসীম উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে একটা স্নিগ্ধ জ্যোতি সৃষ্টিকর্ত্তার ছায়ার ভেতর থেকে, শাশ্বতী শক্তি নতুন সৃষ্টির আনন্দে সাকার রূপ পরিগ্রহণ করছে, এত বড় একটা শুদ্ধ শান্ত অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার জন্যে সত্যিই প্রস্তুত ছিলাম না। পূজা ধ্যান তপস্যা করতে বহু স্থানে বহু সাধককে দেখেছি, দেখে ভক্তি সম্ভ্রমে মন বুদ্ধি সন্ত্রস্ত হোয়ে সঙ্কুচিত হোয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই এগার বছরের সাধকটির সাধনা আমার চিত্তেও একটা অনিরুদ্ধ আবেগের আলোড়ন তুললে। মনে হোল, ইচ্ছে করলে আমিও একটা কিছু নিয়ে ঐ ভাবে আত্মস্থ হোয়ে থাকতে পারি। ঐ রকম আত্মস্থ হোতে পারলে কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

ছেলেটা আরও কিছুক্ষণ তার খাতার পাতায় ডুবে রইল। দরজার ডান পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে, বাঁ পায়ের হাঁটু মুড়ে পায়ের তলা দেওয়ালের গায়ে চেপে ধরেছে, বাঁ হাতের কনুই মুড়ে খাতাখানা ধরেছে বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে, খাতাখানার তলায় শক্ত এক-খানি পাতলা কাঠ, ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে ছোট্ট একটু পেন্সিল। মুখখানি নুয়ে পড়েছে বুকের ওপর, গোছা গোছা কোঁকড়ানো চুল ঝুলে পড়েছে সামনে, প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না মুখের, শুধু টিকলো নাকের ডগাটি চিকচিক করছে। ওর পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমিও মনে মনে আমার মনের খাতায় আঁক কাটা শুরু করে দিলাম। হুবহু ছাপ উঠে গেল, আজ এতদিন পরেও আমার মনের খাতার পাতা খুলে সেই খুদে শিল্পীর ধ্যানস্থ মূর্ত্তিটি আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

হোয়ে গেল আঁকা, মুখ তুলে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে

চুলগুলোকে চোখের ওপর থেকে সরিয়ে তারকনাথ বললে—"ব্যাস, উঠুন এবার, হোয়ে গেছে ছবি।"

উঠলাম, হাত বাড়িয়ে বললাম—"দাও, কেমন আঁকলে দেখি।"

"এখন কি বুঝবেন এ ছবির! দাঁড়ান, আগে সব ঠিক করি। এখন ত' শুধু ছকে নিলাম। এর ওপর অনেক কাজ করতে হবে।"—ঝানু চিত্রকরের মত খাতার ওপর নজর রেখে তারকনাথ তার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করলে।

তৎক্ষণাৎ ওর মতে মত দিলাম। বললাম—"তা ত' হবেই। তুমি যে ছবি আঁকতে শিখছ, তা' ত' কাল বলনি! ছবি আঁকা শিখছ কার কাছে?"

এগিয়ে এল কাছে। চৌকির ধারে বসে পড়ল পা ঝুলিয়ে। বললে—"শিখছি না ত'। ছবি আঁকা আবার শিখতে হয় নাকি! এমনি আঁকি, যা দেখি খাতায় তুলে ফেলি। পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে দিতে ছবি হোয়ে যায়।"

খুবই সাবধান হোয়ে গেলাম। না শিখলেও ছবি আঁকা যায়, এটা যত বড়ই আশ্চর্য্য কাণ্ড হোক, ওর সামনে সেটা প্রকাশ না করাই ভাল। পেন্সিলের আঁচড় কাটতে কাটতেই ছবি হয়, কথাটা খাঁটী সত্যি। কি লাভ হবে, আঁচড় কাটলে হিজিবিজি অর্থহীন পাগলের পাগলামোও হোতে পারে, এই তত্ত্বটা ওর মাথায় ঢুকিয়ে কি লাভ হবে! শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া কর্ম্মটি কটা মানুষে কোমর বেঁধে শিখতে বসে! জন্মেই জীবে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া শুরু করে, বেঁচে থাকার শেষ মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মটি করে চলে, শেখবার কথাটা ত' কই কারও মগজে উদয় হয় না। ছবি আঁকাটাও যদি কারও কাছে ঐ শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার মত সহজ কর্ম্ম হয়, তা'হলে তাকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে লাভ কি! মেনে নিলেই হোল যে ছবি আঁকা গান গাওয়া ইত্যাদি শক্তিগুলো অনেকে সঙ্গে নিয়েই জন্মায়। এক-জনকে চেষ্টা যত্ন অনুশীলন করে যা আয়ত্ত করতে হয়, আর এক জনের কাছে সেটা একটা স্বাভাবিক গুণ। এটা মেনে নিতে আপত্তি কোথায়!

খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে তারকনাথ অন্য মনস্ক হোয়ে বলতে লাগল—"প্রথম ছবি আঁকি আমার বাবার। মার কাছ থেকে বাবার কথা শুনতে শুনতে একদিন করেছি কি, খাতা খুলে বসে নিজের মনে দাগ টানছি। দাগ টানছি ত দাগ টানছিই। অনেকক্ষণ পরে মা এসে পেছনে দাঁড়িয়ে বলে উঠল,—'চুপচাপ বসে বসে কি করছিস তারক? খাতার পাতাগুলো কেন নষ্ট করছিস মিছিমিছি?' ভয়ানক চমকে উঠলাম। খাতাখানা হাত থেকে টেনে নিয়ে মা একেবারে আঁতকে উঠল—'এ কি! কি এঁকেছিস তুই!' তখন আমিও দেখলাম। দেখলাম, একজন মানুষ ফুটে উঠেছে খাতার পাতায়। আমিও খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কি করে হোল মানুষটা! তখন কিছুই বলতে পারলে না মা, গলাটা আটকে গিয়েছিল কেমন। অনেকক্ষণ পরে মার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। মা বললে—'এ ছবি কোথায় দেখলি খোকা তুই! এ যে ঠিক তোর বাবার মত হোয়েছে।' বাবাকে কিন্তু আমি এখন পর্য্যন্ত দেখিনি। অথচ ঠিক বাবার ছবি আঁকা হোয়ে গেল।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"সেই ছবি কোথায়?"

"মা তুলে রেখেছে ট্রাঙ্কে। মার কাছে চাইবেন, মা দেখাবে।" বলতে বলতে তারকনাথ আবার তার খাতার মধ্যে মগ্ন হোয়ে গেল।

চুপ করে বসে রইলাম ওর পাশটিতে। কখনও যাকে দেখেনি, তার ছবি কি করে আঁকলে ছেলেটা, ভাবতে লাগলাম। অসম্ভব—অবিশ্বাস্য—অযৌক্তিক ইত্যাদি অ-সংযুক্ত অব্যর্থ বাক্যগুলো কপালের পেছনে গুঁতোগুঁতি করে মরতে লাগল, ওদের দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে রইলাম। বার বার মনে মনে বললাম, মানছি—তোমাদের চোখ রাঙানি মর্ম্মে মর্ম্মে মানছি, কিন্তু এই একটি বারের জন্যে তোমরা আমায় ক্ষমা কর। জ্ঞান বুদ্ধি বিচার বিবেচনা সামান্য একটু সময়ের জন্যে থাক না শিকেয় তোলা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডখানা তদ্দরুণ এক্ষুনি উলটে যাচ্ছে না।

বয়স গুণে বুড়ো হইনি বটে তখনও, কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটিয়সী আমার ভাগ্য দেবীটির তাড়নায় ঠকর খেতে খেতে আর ঠকতে ঠকতে এত রকমের তাজ্জব ব্যাপার দেখা হোয়ে গিয়েছিল যে তাজ্জব বনে যাওয়াটাকে নেহাতই ন্যাকাপনা করা হবে বলে সাবধান হোতে শিখেছিলাম। উদ্ধারণপুরের ঘাট আর কিছু দিক না দিক

শ্মশান ভস্ম খানিকটা দরাজ হাতে দান করেছিল। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বহু ভস্ম চলে গিয়েছে ফুসফুসের ভেতরে, সেখানে রক্তের সঙ্গে মিশে মস্তিষ্কে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। শ্মশান ভস্মে নাকি বৈরাগ্যের বীজ মেশানো থাকে। দিক্‌ধাউড়ী ধাপ্পা। বৈরাগ্যের বীজ অত সস্তা হোলে কবে শ্মশান ভস্ম বোতলে পুরে দেশ বিদেশে চালান দেবার কারবার ফাঁদা হোত। বৈরাগ্য রসে মজে থাকবার সখ কি কম মানুষের আছে!

আসল কথাটা হোল, ও সব বৈরাগ্য বৈজাত্য ইত্যাদি কোনও বৈগুণ্যই নেই শ্মশান ভস্মে, আছে শুধু নির্ম্মম নিরপেক্ষতা। বৈয়াঘ্র বৈশম্পায়নের মত আস্ত মহাভারত-খানা জেনে ফেলেছি, সুতরাং আমার আর জানতে বাকী আছে কি, এই বেআন্দাজী বোকামির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় খানিকটা শ্মশান ভস্ম মগজে সেঁধুলে। জানা এবং না জানার দৌড় ঐ শ্মশান ভস্ম পর্য্যন্ত কি না, কাজেই জানার সঙ্গে না জানাটার বিশেষ ফারাক আছে বলে মনে হয় না। সবুর করতে পারলে আজকের জানাটা কালকে না জানা হোয়ে যায়,—এ শিক্ষা শ্মশান ভস্মই দিতে পারে। আর কিছুই দিতে পারে না।

তাই সবুর করে রইলাম। তারকনাথ খাতার পাতা ওলটাতে লাগল।

বাইরে বেশ রোদ উঠে পড়েছে। কাছাকাছি কোথায় কে কাঠ ফাঁড়তে শুরু করেছে। গাছের গুঁড়ির ওপর কুড়ুলের চোট পড়বার আওয়াজ হচ্ছে এক তালে। দরজার বাইরে দাওয়ার ওপর একটা পায়রা নামল। নেমেই ঘাড় ফুলিয়ে মহা মুরুব্বীর মত হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। পাঁচিলের ওধারে একটা ঘোড়া কি জানি কি ভেবে চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ বলে বারকতক সাড়া দিলে। ঘরের ভেতর আমাদের মাথার অনেক ওপরে পেল্লায় মাপের কড়ির আড়াল থেকে একটা তক্ষক ভয়ানক মোটা গলায় ঘোড়াটাকে জানিয়ে দিলে—ঠিক আছি, ঠিক আছি, ঠিক ঠিক ঠিকঠাক বসে আছি। তারপর আবার সব নিঝুম হোয়ে পড়ল।

ও বাড়ীতে দিনের আলোতে আলগোছে লুকিয়ে আছে রাত্রি। ও বাড়ীর ইঁট কাঠ চুণবালির চাপড়ায় বোবা অতীতের বুক চাপা হতাশা মিশে আছে। বাড়ী-খানা যেন চোখ বুজে ঘাড় মুখ গুজে বসে আছে থুথুড়ে বুড়োর মত। কে এল কে গেল, মোটে টেরই পায় না।

ঐ বুড়ো বাড়ীর আশ্রয় থেকেই মাত্র এগার বছর বয়েসে বুড়িয়ে গেছে ছেলেটা। ওর চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে কোথাও ছিটে ফোঁটা উত্তাপ উত্তেজনা নেই। বেঁচে আছে, কেন বেঁচে আছে তার কোনও হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। বেঁচে না থেকে করবে কি! বেঁচে থাকা ছাড়া উপায়ান্তর নেই বলেই বেঁচে আছে।

বেঁচে থাকা ছাড়া আর কি করতে পারে তারকনাথ, তাই ঠাওরাতে লাগলাম। ঠাওরাতে গিয়ে খুব জোরে একটি থাপ্পড় খেলাম গালে। হঠাৎ তারকনাথ খাতা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি ছবি আঁকতে পারেন?"

থতমত খেয়ে বলে ফেললাম—"না।"

"গান গাইতে পারেন?" চোখের ওপর তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে ছেলেটা।

তার উত্তরও দিতে হোল ঐ এক কথা—"না।"

"মাঠুরামের মত দুধ দোয়াতে পারেন?"

"না।"

"আমার বাবা খুব বন্দুক ছুঁড়তে পারত। খুব বড় বড় বাঘ মেরেছিল বন্দুক ছুঁড়ে। আপনি বন্দুক ছুঁড়তে পারেন?"

"উঁ হুঁ।"

"তা'হলে আপনি কি করতে পারেন!" কপাল কুঁচকে আমার কপালের পানে তাকিয়ে ঠাওরাবার চেষ্টা করতে লাগল তারকনাথ, আমি কি পারি। স্থির হোয়ে বসে থাপ্পড়ের জ্বলুনিটা সহ্য করতে লাগলাম। নিজের বেঁচে থাকার হেতুটা কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারলাম না। এ বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কেমন করে!

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোল না, সশরীরে সটান ঘরের ভেতর আবির্ভূত হোলেন হেতুরা। বিপিনবিহারী-বাবুর পরিবারটি মক্কেল সহ সমুপস্থিত হোলেন। এক বাণ্ডিল চিঠি পত্র রয়েছে মক্কেলের হাতে, অর্থাৎ মকদ্দমাটা এবার বুঝে নিতে হবে।

চাঙ্গা হোয়ে উঠলাম। সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করে

ফেললাম—"আসুন আসুন। চমৎকার ছেলেটি আপনার, ছবি আঁকা গান গাওয়া সব জানে।"

ছেলের মা আমার অভ্যর্থনাটাকে অগ্রাহ্য করে ছেলেকে হুকুম করলেন—"তুমি এবার ঐ সামনের ঘরে গিয়ে বসত বাবা, আমি একটু দরকারি কথা বলেনি।"

তারকনাথ তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল। মায়ের আদেশ পালন করবার জন্তে উঠে পড়ল এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বলে মনেই হোল না। কেমন যেন অবজ্ঞার ভাব, অর্বাচীন অপদার্থগুলো অবান্তর বক বক করে মরবে, কে সেখানে বসে থাকতে যায়। ওর চলে যাওয়ার ধরণটা আর একবার আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে ছবি-আঁকা গান-গাওয়া বন্দুক-ছোঁড়া যে জানে না, তার মূল্য কানাকড়িও নয়।

পরিবার কিন্তু প্রমাণ করে ছাড়বেনই যে বিপিন-বিহারীর মূল্য সোনা দানা দিয়ে পরিশোধ করা যায় না। বললেন—"নাও, ঐ চিঠিপত্রগুলো দেখে শুনে নাও। গুম হবার পরেও তারকের বাবা মাঝে মাঝে চিঠি দিতেন। পাঁচ ছ' বছর দু' তিন মাস অন্তর চিঠিপত্র এসেছে। তার-পর সব বন্ধ। ঐ চিঠিপত্রগুলো দেখলে বোধ হয় বুঝতে পারবে, কোথা থেকে ওগুলো পাঠান হোয়েছিল।"

তারকনাথের মা বললেন—"না, সে উপায় নেই। সব চিঠি প্রথমে গিয়েছে তাঁর গুরুদেবের কাছে। তারপর সেখান থেকে অন্ত খামের ভেতর আমার কাছে এসেছে।"

বললাম—"গুরুদেবকে গিয়ে আপনি ধরুন না। তিনি ত' জানেন তাঁর শিষ্য কোথায় আছে।" তারকনাথ-জননীর মুখের ওপর হঠাৎ একটা ফিকে গোছের চুনের ছোপ পড়ল যেন, চোখ দুটোও খুব ফ্যাকাশে হোয়ে উঠল। ভয়ানক অসহায় দৃষ্টিতে তিনি একবার আমার—একবার নিতায়ের পানে তাকালেন।

বুঝলাম। গলার আওয়াজ পালটে বললাম, "থাকগে। কোথাও আপনাকে যেতে হবে না। এখন বলুন, আপনার বাবার নাম। আপনার মা বাবা আত্মীয় স্বজন, এঁরা সব কোথায় আছেন? আশুনাথবাবুর বাবার নামও বলুন। ওঁদের দেশ বাড়ী কোথায়? আপনাদের বিয়ে হোয়েছিল কোথায়? সব বলুন আস্তে আস্তে।"

নিতাই বললে—"সে সব আমি শুনেছি। আর এক-বার ওঁকে কষ্ট দিয়ে কাজ নেই। চিঠিপত্রগুলো দেখতে চাও ত' দেখে নাও। তারপর চল এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। এখানে আর দেরি করে লাভ কি?"

হাত বাড়িয়ে বললাম—"দিন। আর আশুনাথবাবুর ছবি একখানা দিন। তাঁর চেহারাটা ভাল করে চিনে নিতে হবে।"

ভদ্রমহিলা নিদারুণ হতাশায় ভেঙে পড়লেন একেবারে। কোনও রকমে তাঁর ঠোঁট দু'খানি একটু নড়ে উঠল। একটা বুক ভাঙা নিশ্বাসের সঙ্গে মাত্র দুটি শব্দ বেরিয়ে এল —"তাও নেই।"

বললাম—"নিশ্চয়ই আছে। আপনার ছেলে এঁকেছে। সেই ছবিখানা দেখতে চাই।"

এতক্ষণ পরে তারকনাথের মায়ের মুখ-চোখে রক্তের ছোপ ফুটে উঠল। প্রায় দম আটকানো সুরে বললেন—"সেই ছবি দেখলেই হবে! সে ত' শুধু পেন্সিলের দাগ—"

"হোক। কিন্তু তাই দেখেই আপনার চোখে জল এসে গিয়েছিল।" দরাজ গলায় ধমক দেবার মত করে বললাম—"খালি কাঁদতেই জানেন। আপনার ছেলের ক্ষমতা আপনার চেয়ে ঢের বেশী। সে আপনার কান্নাকে পেন্সিল দিয়ে রূপ দিয়েছে। আমি সেই রূপটাই দেখতে চাই। যান, ছবিটা নিয়ে আসুন গে।"

মানুষ সব চেয়ে ফ্যাসাদে পড়ল সেই দিন, যেদিন সে নিজেকে পরিচয়ের ফাঁদে জড়িয়ে ফেললে। বাঘ সিঙ্গি হাতি ঘোড়া এরা কেউ পরিচয় ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়ায় না। জীবনভোর আউরে-ওঠা পরিচয়ের ফোড়া একটা, ধাক্কা-ধুক্কি ঠোকাঠুকি থেকে বাঁচিয়ে চলাফেরা করতে হয় শুধু মানুষকে, মানুষ ছাড়া অন্য জীবেরা ঐ বেয়াড়া ফোড়াটার হাত থেকে বেঁচে গেছে। বাঘ সিঙ্গি হাতি ঘোড়ারা সভা করতে পারে না, প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে না, সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করে সবাই মিলে সেটাকে বানচাল করে দেবার জন্তে মতলব ভাঁজতে পারে না। এটাও যেমন সত্যি কথা, তেমনি আর একটা সত্যি কথা হোল মনগড়া নাম গোত্র উপাধি বাঁচাবার জন্তে হানাহানি খেয়োখেয়ি করে মরতে হয়না ওদের। ওরা যখন একে অপরের ঘাড়

ভাঙে, তখন সেটা সোজাসুজি ঘাড় ভাঙবার জন্যেই ভাঙা হয়। আমি যেহেতু বাঘ, আর তুমি যেহেতু গরু, সেহেতু তোমার ঘাড় ভাঙতেই হবে আমাকে, নচেৎ আমার ব্যাঘ্র পরিচয়টা গোল্লায় যাবে। এই জাতের একটা কৌলিন্য গর্বে অনুপ্রাণিত হোয়ে বাঘ গরুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে না। সহজ সরল স্বাভাবিক একটি কারণে ঐ ঘাড়-ভাঙা কর্ম্মটি সম্পাদন করে। সেই কারণটি আর কিছুই নয়, স্রেফ উষ্ণ তাজা রক্তপানের তৃষ্ণা।

ঐ তৃষ্ণা মানুষের মনেও জাগে। মনে জাগে বলে আবার ভুল করলাম। মনে জাগে না বলে বলা উচিত —মানুষের শরীরের মধ্যেও জাগে। জাগলেই মানুষ তখুনই সেটাকে একটা পরিচয়ের পরিচ্ছদ পরাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। ফলে এ কূল ও-কূল দু-কূলই যায় ভেস্তে। তৃষ্ণাও মেটে না, পরিচয়ও পিছনে পালায়। মানুষের মত অভাগা জীব আর কে আছে!

কথাটা বেশ ফলাও করে বুঝিয়ে বলছিলাম সইকে।

গাড়ী তখন ছেড়ে দিয়েছে। সব থেকে টিকিয়ে টিকিয়ে চলবে—এমন গাড়ীতে উঠে বসেছি। গাড়ীখানা রাত তিনটেয় বর্দ্ধমান পৌছবে। বর্দ্ধমানে নেমে আর এক গাড়ীতে উঠে প্রায় ভোরবেলা কামারকুণ্ডু পৌছব। তারপর আবার গাড়ী বদল করতে হবে। অনেক হিসেব-পত্র করে বার করলাম ঐ টিকিয়ে টিকিয়ে যাওয়া গাড়ীটিকে। গুঁতোগুঁতি করতে হবে না, শুয়ে বসে রাত কাটানো যাবে। ভোরবেলা কামারকুণ্ডুতে নেমে যথাস্থানে পৌছবার গাড়ীটিও পাওয়া যাবে। অত রকমের সুবিধে কে ছাড়ে, অতএব বিকেল বেলা বিদেয় নিলাম।

জুত করে বসলাম একখানা বেঞ্চি জুড়ে, তারপর কথাটা উঠে পড়ল। সই একটি নিশ্বাস ফেলে বললে—"ফ্যাসাদ দেখ। একটা অন্যায়কে ঢাকবার জন্যে মানুষ কতগুলো অন্যায়ই না করে মরে। তারপর যখন সামলাতে পারে না, তখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"অন্যায়টা আবার দেখলে কোথায়? প্রেম ভালবাসা এই সব ব্যাপারগুলো তা'হলে অন্যায় বলতে চাও?"

সই বললে—"ও সব প্রেম-ফ্রেম আমি বুঝিনা বাপু। আমি বুঝি, সোজা ব্যাপারটাকে শুধু শুধু ঘুলিয়ে ফেলাটা অন্যায়। আদ্যনাথ প্রেমে পড়েছিলেন, বেশ করেছিলেন। তা' প্রেমে পড়ে তাঁর গুরুদেবটির কাছে পরামর্শ নেবার জন্যে ছুটলেন কেন? সোজাসুজি ঐ তারকনাথের মাকে নিয়ে কোথাও উধাও হোয়ে গেলে ত পারতেন। সেই উধাও হোতে হোল, মাঝখান থেকে প্রেমও গেল গোল্লায়। যার প্রেমে পড়লেন, তার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচে গেল চিরকালের জন্যে। এটা কি ভাল হোল?"

"ভাল হোল না, মানছি। কিন্তু সেটা ঐ প্রেমে পড়ে অন্যায় করেছিলেন বলে নয়। ওর অন্য কারণ আছে।" বলে একটি বিড়ি ধরালাম। তারপর সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতে বসলাম। আদ্যনাথের অন্যায়টা কোথায় হোয়েছিল।

বললাম "অন্যায়টা ঘটল কোথায় জান সই, অন্যায়টা ঘটল ঐ স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিতে গিয়ে। ঐ লোভটুকু যদি আদ্যনাথ আর ঐ তারকনাথের মা সামলাতে পারত, তা'হলে গুরুদেবের কাছে ছুটে গিয়ে প্রেমটাকে পবিত্র করার জন্যে হন্যে হোয়ে উঠত না। ওদের মনে এ ধারণাটা ছিল যে প্রেমকে বিয়ের মন্ত্র দিয়ে কষতে না পারলে ফস করে প্রেম পালিয়ে যেতে পারে। হয়ত তার চেয়ে বড় অন্য রকম ভয় ছিল। বিয়ে-করা প্রেম না হলে অনন্ত নরক বাসের ভয় হোতে পারে বা অবিবাহিত প্রেমের পরিচয় ঘাড়ে করে মানুষের মধ্যে বাস করতে হোলে যে চোখে দেখবে মানুষে—তা' ওরা আন্দাজ করতে পেরেছিল। আসল কথা হচ্ছে, ওদের প্রেম ওদের বেপরোয়া করতে পারেনি। স্বামী স্ত্রী পরিচয় দেবার লোভটা ওদের প্রেমের ঘাড়ে চেপে প্রেমকে পিষে মেরে দিয়েছে।"

চোখের কোণ দিয়ে আমার পানে তাকিয়ে সই জিজ্ঞাসা করলে—"তা' হলে কি করা উচিত ছিল ওদের শুনি? শ্মশানে মশানে বসে থাকত একজন, আর একজন ভিক্ষে করে বেড়াত, এই করলেই বুঝি খুব ভাল হোত?"

কষে একটা টান দিয়ে বিড়িটা জানলার বাইরে ফেলে বললাম—"তার চেয়েআরও ভাল হোত, স্বামী স্ত্রী নই—এই পরিচয়টা স্পষ্ট ভাষায় কবুল করে দু'জনে মিলে কোথাও ঘর সংসার পাতা। যাক্ গে—এই নিয়ে আর তোমার আমার মধ্যে চুলোচুলিটা না হয় নাই হোল। তুমি এখন

বিপিনবিহারীবাবুর বিয়ে-করা পরিবার, আর আমি স্বয়ং বিপিনবিহারী। দেখাই যাক, কতক্ষণ এই ধাপ্পাটা টেকে। ভুল হোয়ে যাচ্ছে বোধ হয় সই, এমন অনেক লোক আছে যারা নিজের জাতটাকে এমন ঘেন্না করে যে বড় জাতের পরিচয় দিতে পারলে বর্ত্তে যায়। আমরাও তাই করছি। ঐ শাঁখা দুগাছা আর ঐ সিঁদুরটুকুর লোভ যদি তুমি সামলাতে পারতে, তা'হলে হয়ত ভবিষ্যতে পস্তাতে হোত না।" চুপ করে মুখ বুজে বসে রইল নিতাই অনেকক্ষণ। চোখ নত করে তাকিয়ে রইল নিজের হাত দু'খানির দিকে। হাত দু'খানি আলতো ভাবে পড়ে আছে কোলের ওপর। দু' গাছা সাদা শাঁখা দু' হাতের কবজিতে দাঁত বার করে হাসছে।

অনেকক্ষণ পরে বিড়বিড় করে বললে—"আবার এই শাঁখা খুলে ফেলব! তারপর কি হবে!"

আরও খাটো গলায় বললাম—"যা হোয়েছে একবার তাই হবে। একবার শাঁখা খুলে নিতাই বোষ্টমী হোয়েছিলে। আবার খুলে ফেলে দাও, আর একটা কিছু মাথা ঘামিয়ে বার করলেই হবে। সব চেয়ে সোজা পরিচয়, তুমি আমার সই। এ পরিচয়টা মন্দ কিসের?"

চোখ বুজে ফেলেছে তখন সই, মাথাটা প্রায় হেলে পড়েছে আমার কাঁধের ওপর। ফিস ফিসিয়ে বলতে লাগল—"সই, সই, সই—কোথায় শিখলে ঐ ডাকটি? ইচ্ছে করে, ঐ রকম কিছু একটা বলে আমিও তোমায় ডাকি। আমায় একটা ঐ রকম নাম শিখিয়ে দাও না গো—"

ভাবতে শুরু করে দিলাম। সই আর সখা—সখা বলে ডাকতে বলব নাকি! দূর দূর—সখা আবার একটা ডাক। সই বলে যত সহজে ডাকা যায়, সই ডাকটি ডাকতে পারলে যা ফল হয়, সখাতে কি তা' হবে কখনও! সখা বলে ডাকতে শুরু করলে যাত্রাওয়ালাদের মনে পড়ে যাবে। তা' হলে সই ডাকটির বদলে কি চলতে পারে!

ভাবতে শুরু করে দিলাম। গাড়ীটা ঘট্ ঘটাং ঘট্ ঘট ঘটাং ঘট্ আওয়াজ তুলে একটা পোল পেরতে লাগল। [ক্রমশঃ

খনিকের পরিচয়

জসীম উদ্‌দীন

কত জনমের মমতা মাখান শান্ত শ্যামল মুখে,
কাজল মেঘের শীতল পরশ মাখাইয়া গেল বুকে।
নতুন ধানের পাতার বাতাস বুলাইল যেন গায়,
দুপুরের রোদে পরাণ জুড়াল তমাল তরুর ছায়।

আর দেখা হবে? হয়ত হবে না, নিমেষের পরিচয়,
সকল জীবন করে দিল তাই লতা বন্ধন-ময়।
সে লতায় আমি ফুল ফুটাইব, হাওয়ার পাখায় করে,
সুবাস তাহার ছড়াইয়া দেব সবাকার ঘরে ঘরে।

স্নেহ মায়া ভরা সে মুখ লবানি বৃথা না হইতে দেব,
তোমার শ্যামল বরণ, চোখেতে কাজল করিয়া নেব।

পুরু দু'টি ভুরু ধনুকে বাঁকায়ে আঁকায়ে দুই ধার,
টানিয়া আনিয়া ধরিয়া রাখিব আঁখির দীঘির পাড়
দিব এ স্নেহের মমতা কুসুম ভাসায়ে তাহার জলে,
আকাশের নীল ছায়াটি সেথায় ধরিয়া দেখিব ছলে।

আর কোনদিন দেখা ত হবে না, খনেকের পরিচিতি,
দূর বহুদূর অনাগত কালে নিয়ে যাব এই প্রীতি।
শুভ হোক তব ভাইবোন আর শুভ হোক কোল মার,
আম-কাঁঠালের ছায়াঘেরা হোক পথ তব চলিবার।

পদ্মা নদীর সুশীতল বারি ভরে দেব তব ঘটে,
আকাশ হইতে নীলিমা কাড়িয়া মেখে দেব মুখ পটে।

দূর্বা শিষের শিশিরে করিয়া আশীষ আনিব ভরে,
মোর আদরের চন্দন ফোঁটা ছড়াব তোমারে স্মরে।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম, এ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৫২৫ সালের ঘটনাবলী

১৫২৫ সালের শফর মাসের ১লা তারিখ শুক্রবারে যখন রবি ছিলেন ধনুরাশিতে—আমি হিন্দুস্থান আক্রমণের অভিযানে বেরিয়ে পড়ি। সম্ভ্রান্ত বা সাধারণ, ভাল বা মন্দ, ভৃত্য অথবা ভৃত্য নয়—এমন লোক দিয়ে তৈরী বাহিনীর লোক সংখ্যা বারো হাজার।

বাগ-ই-ভাফাতে এসে আমরা থামি। এখানে হুমায়ুন ও তার সৈন্য বাহিনীর জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করতে বাধ্য হই। আমি বারংবার এই স্থানটির সীমা, বিস্তৃতি, এর সৌন্দর্য্য ও মহিমার কথা আমার স্মৃতি-কথাতে বলেছি। যে কেউ এই জায়গা দেখবে তার এই স্থানের রমণীয়-তার কথা স্বীকার না করে উপায় নাই। যে কয়দিন আমরা এখানে অপেক্ষা করেছি ততদিন প্রত্যেক বৈঠকেই প্রচুর পরিমাণে সুরাপান করেছি—প্রতিদিন ভোরের পেয়ালাও বাদ দিই নি। যখন সুরাপান চলতো না, তখন ভাং খাওয়ার বৈঠক বসতো।

ধার্য্য সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও হুমায়ুন না আসায় তাকে কটু ভাষায় চিঠি লিখি। কর্ত্তব্য চ্যুতির জন্য তার কৈফিয়ৎ তলব করি এবং তাকে গাল মন্দ দিতে থাকি। অবশেষে হুমায়ুন এসে পৌঁছায়। তার এই দীর্ঘ বিলম্বের জন্য তাকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে ভৎ'সনা করি।—বুধবারে সেখান থেকে আবার যাত্রা সুরু হয়। আমি একটি ভেলায় চড়ে নদীর ভাটিতে এগিয়ে যাই। সর্ব্বক্ষণেই সুরাপান চালিয়ে আমরা কোস্-গুমবেজে পৌঁছাই। সেখানে ভূমিতে অবতরণ করে শিবিরে যাই।

দুই একদিন পর যখন আমরা বেক্রামে থেমেছিলাম, সেই সময় আমি জ্বরে আক্রান্ত হই। সঙ্গে প্রবল কাসি। যখন কেসেছি গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। আমার এই অসুস্থতার কারণ কি তা জানতাম। এটা যে আমার কোনও পাপের শাস্তি তাও বুঝতে পেরেছিলাম।

এর আগে আমার মাথায় ভাল বা মন্দ, আমোদ বা ঠাট্টার যে ভাবই এসেছে—সেই ভাবটাই খুব হালকা স্ফূর্ত্তির জন্য কবিতায় রূপ দিয়েছি। সেই কবিতা কদর্য বা ঘৃণ্য ভাবের হলেও আমি লিখতে কোনও লজ্জা বোধ করিনি।—বর্ত্তমান মনের অবস্থায় যখন আমি কবিতার কয়েকটি পদ লিখে ফেলেছি আমার মনে তখন এই চিন্তার উদয় হলো এবং আমার অন্তর এমন অনুশোচনায় ভরে উঠলো যে মানুষের যে রসনা মহিমা ও গরিমার বিষয় বস্তু বার বার আবৃত্তি করে যেতে পারে, সে কেন এই রকম বিকৃত রুচির কবিতা আবৃত্তি করবে। আমি মন-মরা হয়ে ভাবতে লাগলাম যে যার অন্তর মহান ভাব ধারায় পূর্ণ হয়ে উচ্চস্তরে উঠে যায় সে আবার কি করে নীচ এবং কদর্য্য চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে মহৎ চিন্তাগুলোকে দূরে সরিয়ে দেয়। সেই সময় থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করি যে শ্লেষাত্মক কিংবা কুরুচি পূর্ণ কবিতা আর লিখবো না। আগে যখন আমি কবিতা লিখে আবৃত্তি করেছি তখন কিন্তু আমি কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিনি এবং এ কথাও তখন মনে আসেনি যে এই ভাবের কবিতা লেখা কতটা নিন্দনীয়।

'নিজ প্রতিশ্রুতির কথা,
যে জন অনায়াসে যায় ভুলে।
সেই প্রতিশ্রুতি মূর্ত্ত হয়ে তাহারই জীবনে,
প্রতিশোধ লবে তুলে।—
যে লোক সত্যের আশ্রয়ী,
অঙ্গীকার রক্ষা করে সেই জন।
ভগবান তার দিকে মুখ তুলে চান,
অসীম করুণা তাঁর করেন বর্ষণ।—
কবিতার ভাষা মোর!
কিবা করি বল দেখি
তোমায় নিয়ে।
শোণিতে দিয়েছ তুমি
বিষ মিশিয়ে।
ব্যঙ্গের ধুয়া ধরি
কবিতা রচনা করি'
কতদিন পাইবে আমোদ?
এতো শুধু মিছে বলা,
অপবিত্র ভাবে চলা,
এতো নহে বিশুদ্ধ প্রমোদ।—
যদি তুমি বুঝে থাক
এ পাপ থেকে দূরে রাখ।
বল্‌গা তোমার টেনে ধর,
এ জমিন্ ছেড়ে দূরে সর।
'আত্মার পরে করেছি অত্যাচার।
যদি তুমি নাহি কর বিভু, মোরে ক্ষমা!
অভিশপ্তের সংখ্যা বাড়িবে শুধু
দুঃখের মোর নাহিকো রহিবে সীমা।'

অনুতপ্ত হয়ে এখন থেকে আমি আত্মসংযম করি। প্রতিজ্ঞা

করলাম—কোনও রকম অলস চিন্তার আমি প্রশ্রয় দেব না। কোনও কদর্য্য বিষয় নিয়ে আমোদ করবো না, তা যদি করি তাহলে আমার কলম ভেঙ্গে ফেলবো। বিদ্রোহী—নফরের ওপর সর্ব্বশক্তিমান আল্লার সিংহাসন থেকে এইরূপ অন্তর-শুদ্ধির আদেশ তাঁর অদ্ভুত করুণারই ফল। ভগবানের যে ভৃত্য তাঁর নির্দ্দেশ এবং শাস্তির উপকারিতা অনুভব করে সেই জানে—সেটা শাস্তি নয়, তাঁর অসীম কৃপা।—

কোস্ গুমবেজ থেকে সৈন্য চালনা করে আলি মসজিদে এসে থামি। এখানে শিবির স্থাপনের জায়গা সঙ্কীর্ণ হওয়ায় আমি কাছাকাছি একটা উঁচু টিলার ওপর আমার থাকবার তাঁবু খাটাই। সৈন্যরা সমতল ভূমিতেই তাদের শিবির ফেলে। যে পাহাড়ের ওপর আমার শিবির খাটানো হয় সেখান থেকে চার পাশের দৃশ্য বেশ ভাল ভাবে দেখা যায়। নীচের শিবিরগুলিতে যে আগুন জ্বালানো হয়েছে তার আভা খুবই উজ্জল আর সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই রকম দৃশ্য দেখার জন্য যখনই আমি এই-খানে থেমেছি—তখনই মনের উল্লাসে আমি প্রচুর সুরাপান করেছি।

সূর্য্য ওঠার আগেই ভাং খাই, তারপর আবার যাত্রাশুরু করি। সেদিন আমি উপবাস করেছিলাম। বেকরামের কাছাকাছি না আসা পর্য্যন্ত আমরা চলতে থাকি। সেখানে পৌছিয়েই গণ্ডার শিকার করতে বেরিয়ে যাই। সিয়া-আব নদী পেরিয়ে ভাটির দিকে একটা জায়গা শিকারের জন্য ঘিরে ফেলা হয়। আমরা কিছুদূর এগুতেই একজন লোক এসে জানালো যে একটা গণ্ডার ছোট্টো বনে ঢুকেছে। বনটাকে লোকেরা ঘিরে ফেলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা সেই বনের দিকে গেলাম এবং চারিদিকে ঘিরে ফেল্লাম। হল্লা সুরু করতেই গণ্ডারটা বন থেকে ছুটে বেরিয়ে সমতল ভূমিতে এসে দৌড়ে পালালো। হুমায়ুন আর তার সঙ্গীরা আগে কখনও গণ্ডার না দেখায় খুবই আমোদ অনুভব করলো। তারা গণ্ডারকে অনুসরণ করে অনেকগুলি তীর নিক্ষেপ করে শেষটায় তাকে ধরাশায়ী করলো। গণ্ডারটা কিন্তু কোনও মানুষ বা ঘোড়াকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেনি। হুমায়ুন আর তার দল আর একটা গণ্ডারও শিকার করে।

আমি অনেক সময় ভাবতে চেষ্টা করেছি যে হাতী আর গণ্ডারকে যদি মুখোমুখি আনা যায় তাহলে তারা পরস্পর কেমন ব্যবহার করে দেখতে হবে। হাতীর মাহুতরা হাতীদের নিয়ে আসতেই একটা হাতী গণ্ডারের সামনা সামনি পড়ে গেল। মাহুতরা হাতী তার সামনা সামনি নিয়ে আসতেই গণ্ডারটা ভয় পেয়ে অন্যদিকে ছুটে পালালো।

মোটামুটি এই সংবাদ পাওয়া গেল যে গাজি খাঁ যুদ্ধের জন্য ত্রিশ চল্লিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেছে। আর বৃদ্ধ দৌলত খাঁ কোমরের দুই ধারে দুই খানি তলোয়ার ঝুলিয়ে অপেক্ষা করছে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে। আমার একটা চলতি কথা মনে পড়ে গেল। সেটা হচ্ছে এই—নয় জন বন্ধুর চেয়ে দশ জন বন্ধু ভাল। কোনও সুবিধাজনক অবস্থাকেই হাত ছাড়া করতে নেই। আমি বিবেচনা করে দেখলাম যে যুদ্ধে নেমে পড়ার আগে আমার সৈন্য বাহিনীর যে অংশ লাহোরে আছে তার সঙ্গে সংযোগ সাধন করাই আমাদের পক্ষে উচিত হবে। সেই জন্য দূত মারফৎ আমার উপদেশ সেখানকার আমিরদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তার পর দ্বিতীয়বার যাত্রা সুরু করে চেনাব নদীর তীরে পৌঁছিয়ে সেখানে শিবির সন্নিবেশ করলাম।

অশ্ব পৃষ্ঠে আমি বেলালপুর রাজ্যের দিকেই এগিয়ে গেলাম এবং তার চারিদিক বেশ ভাল ভাবেই পর্য্যবেক্ষণ করলাম। চেনাব নদীর তীরে এই রাজ্যের দুর্গ অবস্থিত। আমার জায়গাটা খুব পছন্দ হয়ে গেল। ঠিক করলাম যে শিয়ালকোটের জনসাধারণকে আমি এই খানে নিয়ে আসবো। আল্লার ইচ্ছা হলে যখনই আমি সুবিধা পাব আমার এই মতলব হাসিল করবো। আমি একটা নৌকা করে বেলালপুর থেকে শিবিরে ফিরে আসি। নৌকাতেই একটা আমোদ-বৈঠক বসে। কেউ সুরাসার, কেউ সুরা, আবার কেউ কেউ খেলো ভাং। রাতের নমাজের সময় নৌকা থেকে ডাঙ্গায় নামি। আমার শিবিরেও সে রাত্রে কিছু কিছু সুরাপান চলে। একদিন ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সেই নদীর তীরেই থেকে যাই।

রবিয়ল মাসের ১৪ই তারিখ শুক্রবার আমরা শিয়ালকোটে পৌঁছে যাই। যত বারই আমরা হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছি তত বারই অগণিত জাট আর গুর্জ্জর দলে দলে পাহাড় আর বন থেকে নেমে আসে ষাঁড় আর মোষ লুঠ করার জন্য। এই সব সয়তানরা এ দেশের জনসাধারণের অনেক দুঃখ কষ্টের কারণ। তারা এদের উপর অত্যাচার করার অপরাধে অপরাধী। এই দেশগুলো আগে বরাবর বিদ্রোহ করে এসেছে এবং অল্প রাজস্বই তারা আদায় দিয়েছে। বর্ত্তমানে যখন আমি এই দেশ অধিকার করে নিয়েছি তখনও তারা সেই সাবেক চালেই চলতে আরম্ভ করলো। আমার দরিদ্র প্রজারা যখন শিয়াল-কোট থেকে যাত্রা করে অর্দ্ধনগ্ন ও ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় নানা দুঃখকষ্ট সহ্য করে আমার শিবিরের দিকে আসতে থাকে তখন তারা চলতি পথেই আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। আমি অত্যাচারীদের খুঁজে বের করি ও তাদের মধ্যে দুই তিন জনকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে হুকুম দিই।

পরদিন সকালে আবার যাত্রা সুরু করে পরে সার-উরে গিয়ে থামি। এই খানে মহম্মদ আলি ও আরও কয়েক জন এসে আমাকে সম্মান জানায়। লাহোরের দিকে রাবি নদীর তীরে শত্রু পক্ষ শিবির স্থাপন করেছে। সেখানকার সংবাদ আনবার জন্য আমি একদল লোককে পাঠাই। রাতের তৃতীয় প্রহরের শেষে তারা ফিরে এসে সংবাদ দেয় যে তাদের আগমনের সংবাদ পাওয়া মাত্রেই শত্রু পক্ষের লোক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যে যার মত ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

দৌলত খাঁ একজন লোক পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দেয় যে গাজি খাঁ পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। যদি আমি দৌলত খাঁর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাকে অভয় দান করি, তাহলে সে আমার ক্রীতদাস হয়ে তার রাজ্য আমার হাতে তুলে দেবে। এই কথা শুনে আমি মির মিরাণকে তার ঠিক কি মনোভাব জানবার

জন্ম পাঠিয়ে দিই ও তাকে আমার কাছে আনবার জন্ম বলে দিই। তার পুত্র আলি খাঁও তার সঙ্গে যায়। আমি এই বৃদ্ধ লোকটির অসৎ ব্যবহার এবং বোকামির ব্যাপারটা লোক-সমাজে প্রকাশ করে দেওয়ার জন্ম মিরাণকে এই আদেশ দিই যে দৌলত খাঁ যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তা হলে যে দুইখানি তরবারি সে কোমরের দুই ধারে ঝুলিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে স্থির করেছিল—সেই তরবারি গলায় ঝুলিয়ে তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। যখন ব্যাপারটা এতদূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে, তখনও দৌলত খাঁ নানা ছল চাতুরির আশ্রয় নিয়ে আমার সামনে আসতে বিলম্ব করেছে। যাহোক অবশেষে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসা হলো। তার গলায় ঝুলানো তরবারি দুই খানা সরিয়ে নিতে বললাম। আমাকে সম্মান দেখানোর জন্ম নতজানু হতে সে বিলম্ব করছে দেখে আমার লোকদের তার পায়ে ধাক্কা দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে আমাকে সম্মান দেখাতে আদেশ করলাম। এই ভাবে সম্মান দেখানো হয়ে গেলে তাকে আমার সম্মুখে আসন গ্রহণ করার জন্ম বলি। আমি, যে কথাগুলো বলছি সে গুলো তাকে হিন্দুস্থানী ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে তর্জ্জমা করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্ম হিন্দুস্থানী ভাষা জানে এমন একজন দোভাষী নিযুক্ত করি। তাকে বলেছিলাম—'আমি তোমাকে পিতৃ-স্থানীয় বলে সম্বোধন করেছি। তুমি আমার কাছে যে সম্মান বা শ্রদ্ধা আশা করতে পার তার চেয়েও তোমাকে বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছি। বেলুচিদের অত্যাচার ও অসম্মানের হাত থেকে তোমাকে এবং তোমার ছেলেদের আমি বাঁচিয়েছি। তোমার পরিবারবর্গ ও স্ত্রীলোকদের ইব্রাহিমের দাসত্ব থেকে আমি মুক্ত করেছি। তাতার খাঁ যে দেশগুলো অধিকার করে সাত লক্ষের ওপর রাজস্ব আদায় করতো সে দেশগুলোর অধিকার তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। তোমার আমি এমন কি অনিষ্ট করেছি, যাতে তুমি এই ভাবে কোমরে দুইখানি তলোয়ার ঝুলিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধে নামবার ইচ্ছা করে তোমার সৈন্যদের নিয়ে আমার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছো?

আমার কথা শুনে লোকটা হতভম্ব হয়ে কয়েকটা কথা উচ্চারণ করার চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু তার কিছুই বোঝা গেল না। সত্যি কথা বলতে গেলে আমার এই নির্জলা সত্য কথাগুলোর উত্তরে তার কিই বা বলার ছিল। যাহোক, অবশেষে এই স্থির হলো যে সে এবং তার পরিবারবর্গ তার নিজ উপজাতিদের ওপর কর্তৃত্ব করবে এবং তাদের গ্রামগুলো তার অধিকারে থাকবে। কিন্তু অবশিষ্ট ভূসম্পত্তি থেকে সে বঞ্চিত হবে। আর মির মিরাণের শিবিরের কাছাকাছি তাদের থাকতে হবে।

প্রথম রবিয়ল মাসের ২২শে তারিখ শনিবার দৌলত খাঁর দল যখন তাদের আত্মীয় পরিজন এবং আশ্রিতদের দুর্গের বাহিরে নিয়ে আসছিল, তখন তাদের ওপর কোনও খারাপ ব্যবহার না হয় সেটা দেখবার জন্ম মিলওয়াৎ দুর্গফটকের উল্টোদিকে একটা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। কয়েকজন বেগ যারা আমার কাছে ছিল তাদের দুর্গে প্রবেশ করে ওদের সমস্ত ধন সম্পত্তির দখল নিতে এবং সেগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে নির্দ্দেশ দিই। যদিও শোনা গিয়েছিল যে গাজি খাঁ এই স্থান থেকে পালিয়েছে—কিন্তু কেউ কেউ আবার বলতে লাগলো তাকে দুর্গের ভিতর দেখা গেছে। এই জন্ম আমি কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং ভৃত্যকে ফটকের সামনে মোতায়েন করে এই নির্দ্দেশ দিই যে কিছুমাত্র সন্দেহ হলেই তারা কোনও ব্যক্তিই হোক কিংবা কোনও জিনিষপত্রই হোক ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখবে যাতে কোনও ছল চাতুরি করে গাজি খাঁ না পালাতে পারে। কারণ, আমার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল তাকে বন্দী করা। তাদের আরও নির্দ্দেশ দিই যে কোনও ধনরত্ন কিংবা মূল্যবান পাথর গোপনে নগরের বাহিরে পাচার করার চেষ্টা হলে তৎক্ষণাৎ সেগুলো আটক করা। দুর্গের ফটকের সামনে কতকগুলো সৈন্য দাঙ্গা আরম্ভ করতেই তাদের দমন করার জন্ম কতকগুলি তীর নিক্ষেপ করি। হঠাৎ একটা তীর হুমায়ুনের শিক্ষককে বিদ্ধ করে। সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

দুই রাত্রি পাহাড়ের ওপর কাটিয়ে সোমবারে আমি দুর্গে প্রবেশ করে পর্য্যবেক্ষণ সুরু করি। গাজি খাঁর গ্রন্থশালা পরীক্ষা করে দেখতে পাই সেখানে অনেক মূল্যবান পুস্তক আছে। সেই পুস্তকের কতকগুলো হুমায়ুনকে দিই এবং কতকগুলো কামারণের কাছে পাঠিয়ে দিই। কতকগুলো ধর্মসংক্রান্ত বইও সেখানে ছিল। কিন্তু প্রথম দেখে যতটা মূল্যবান মনে হয়েছিল ভাল করে দেখ্‌বার পর আর ততটা ভাল মনে হলো না।

দুর্গে আমি সারারাত ছিলাম। পরদিন সকালে শিবিরে ফিরে আসি। আমাদের এ ধারণাটা ভুল যে গাজি খাঁ দুর্গের মধ্যেই আছে। সেই ভীরু বিশ্বাসঘাতক পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। সঙ্গে নিয়েছে তার অল্প কয়েক জন অনুচর। তার বাবা, বড় ও ছোটভাইদের, তার মাকে, তার বড় ও ছোট বোনদের সে মিলওয়াতেই ফেলে গিয়েছে।—

'অবিশ্বাসী লোকটিরে
চিনে রাখ ভাল করে,
কখনও কি দেখিবে ও
সৌভাগ্যের মুখ?
স্ত্রীপুত্র কন্যা ত্যাগী জন
আত্মসুখে রহে সে মগন,
ঈশ্বর তাহার প্রতি,
রহেন বিমুখ।'

খাজা কিলান কতকগুলো উটের পিঠে মদের পাত্র বোঝাই করে গজনির মদ শিবিরে নিয়ে আসে। তার বাসস্থান ছিল দুর্গ ও শিবিরের মুখোমুখি একটা উঁচু টিলার ওপর। সেখানে আমাদের একটা ফুর্ত্তির বৈঠক বসে। বৈঠকে কেউ বা খেল সুরা, কেউবা খেল সুরা সার। এ রকম সুন্দর আড্ডা খুব কমই হয়।

সেখান থেকে যাত্রা করে মিলওয়াতের পাশ দিয়ে আরকেন্দের ছোট ছোট পাহাড় অতিক্রম করে আমরা 'দুনে' পৌঁছে যাই। হিন্দুস্থানী ভাষায়

উপত্যকাকে 'দূন' বলে। সবচেয়ে মনোরম প্রবাহিনী এই উপত্যকার ভেতর দিয়ে গিয়েছে। এই উপত্যকাটি অতি সুন্দর। এর নদীর দুই-পাশে শস্য ক্ষেত্র। কোনও কোনও জমিতে এখানকার লোকেরা ধান বোনে। উপত্যকার মধ্য দিয়ে যে নদী বয়ে যাচ্ছে তার স্রোতের বেগ এমন যে তিন চারটা জাঁতাকল চালানো যায়। উপত্যকাটি তিন মাইল এমন কি কোনও কোনও জায়গায় পাঁচ মাইল প্রশস্ত। এখানকার পাহাড়গুলো খুব ছোট। গ্রামগুলি পাহাড়ের ধারে ধারে অবস্থিত। যেখানে কোন গ্রাম নাই, সেখানে ময়ূর আর বাঁদরের বাস। এখানে মোরগ জাতীয় অনেক পাখীও দেখা যায় যেগুলো দেখতে গৃহপালিত মোরগের মত। তারা আকারেও ঐ রকম তবে সাধারণতঃ এক রংয়ের।

গাজি খাঁয়ের কোনও সংবাদ না পাওয়ায় আমি এই আদেশ সকলের কাছে পাঠাই যে তার যেখানে থাকা সম্ভব সেখানেই তার সন্ধান করে এবং যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তাকে বন্দী করে আনতে হবে। ছোট ছোট পাহাড়খচিত এই উপত্যকায় কতকগুলি সুদৃঢ় দুর্গ আছে। উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটি দুর্গ—নাম 'কোটিলা'। দুর্গটি পাহাড়ে—ঘেরাযার খাড়াই দেড়শ ফুট। এই দুর্গের প্রধান ফটকে ষোলো ফুট পরিসর একটা জায়গা আছে যেটা টানা-সেতুর কাজে ব্যবহার করা হয়। এই সেতুটা দুইখানি লম্বা তক্তা দিয়ে তৈরী করা—যার উপর দিয়ে ওদের ঘোড়া ও সৈন্য পারাপার করে। পার্ব্বত্য প্রদেশের দুর্গগুলির মধ্যে এই একটি—যেটাকে গাজি খাঁ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত ও সৈন্য সমাবেশ করে। আমার যে সৈন্য দল আক্রমণ চালানোর জন্য এদিকে এসেছিল তারা প্রবলভাবে আক্রমণ চালিয়ে প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করে এবং দুর্গটি প্রায় দখল করে ফেলে। কিন্তু তখন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। দুর্গরক্ষী সৈন্যগণ এই সুযোগে দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। কাছাকাছি আর একটা দুর্গ আছে—যার আশে পাশে সমস্ত জায়গাই পাহাড়ে ঘেরা। কিন্তু এটা আগেকার বর্ণিত দুর্গের মত অতটা সুদৃঢ় নয়। আলিম খাঁ পালিয়ে এসে এই দুর্গেই আশ্রয় নেয় সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

একদল সৈন্যকে গাজি খাঁকে অনুসরণ করে বন্দী করবার জন্য পাঠিয়ে আমি স্থির প্রতিজ্ঞারূপ রেকাবে পা দিয়ে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস রূপ বল্‌গায় হাত দিয়ে লোদি আফগান বংশের সুলতান বেলালের পৌত্র এবং সুলতান ইস্কান্দারের পুত্র সুলতান ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। এই সময়ে হিন্দুস্থান সাম্রাজ্য ও দিল্লীর সিংহাসন সুলতান ইব্রাহিমের দখলে ছিল। তাঁর অধীনে একলক্ষ সৈন্য এবং তাঁর ও তাঁর আমিরদের মোট একহাজার হাতি ছিল। মিলওয়াৎ দুর্গ থেকে যে স্বর্ণ এবং মূল্যবান জিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছিল তার অধিকাংশই বাল্‌খ ও কাবুলে আমার স্বার্থরক্ষার জন্য আমার আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, পুত্র-কন্যা এবং আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের কাছে উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিই।

এইখানে আমরা জানতে পারি যে সুলতান ইব্রাহিম দিল্লীর এক-দিক থেকে অগ্রসর হয়ে আসছে, আর এক দিক থেকে আসছে হিসার ফিরোজের শিকদার সেখানকার এবং পার্শ্ববর্ত্তী দেশের সৈন্যদের নিয়ে। হিসার ফিরোজের সৈন্যরা আমাদের দিকে প্রায় ত্রিশ মাইল এগিয়ে এসেছে। ইব্রাহিমের শিবিরের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য আমি কিত্তে বেগকে পাঠাই। আর মোমিন আত্তেকে হিসার ফিরোজের সৈন্যদল কতদূর এগিয়ে এলো সেই সংবাদ জানার জন্য যেতে বলি।

জেমাদি মাসের উনিশ তারিখ সোমবার আম্বালা থেকে যাত্রা করে এগিয়ে গিয়ে একটা পুকুর পাড়ে শিবির ফেলা হয়। সৈন্যব্যূহের দক্ষিণ বাহুর অধিনায়ক হিসাবে হুমায়ুনকে নিযুক্ত করি। এই জায়গায় বিবান এসে আমার বশ্যতা স্বীকার করে। এইসব আফগানদের ব্যবহার বিরক্তি-উদ্রেককারী এবং এরা অশিষ্ট ও মূর্খ। যদিও দিলওয়ার খাঁ সৈন্যসংখ্যার দিক দিয়েই হোক, বা পদগৌরবেই হোক—তার চেয়ে অনেক উঁচু তবুও সে আমার সম্মুখে বসার সম্মান এখনও পায়নি এবং যদিও আলিম খাঁর পুত্ররা যারা সত্যই রাজকুমার তারাও আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে—কিন্তু এসব দেখেশুনেও বিবান খাঁ আমার সামনে বসবার জন্য আবদার জানায় এবং বৃথাই আশা করে যে আমি তাকে অনুমতি দেব।

পরদিন সকালে হুমায়ুন তার হালকা বাহিনী নিয়ে হামিদ খাঁকে হঠাৎ আক্রমণ করার জন্য বেরিয়ে পড়ে। অগ্রগামী প্রহরী হিসাবে হুমায়ুন একশো কি দেড়শো জন বাছাই করা সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। এই দলটি শত্রুসৈন্যের কাছাকাছি এসে তাদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়। যতক্ষণ না হুমায়ুনের পশ্চাৎবর্ত্তী সৈন্যরা এগিয়ে এসে রণক্ষেত্রে দেখা দেয়, ততক্ষণ তারা সঙ্ঘর্ষ চালিয়ে যায়। হুমায়ুনের সৈন্যদের দেখামাত্র শত্রুপক্ষ ভীত হয়ে পালাতে থাকে। আমাদের সৈন্যরা শত্রুপক্ষের একশো কি দুশো সৈন্যকে বন্দী করে। তাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের শিরশ্ছেদ করা হয়। বেগ মিরাক মোগল হুমায়ুনের এই বিজয়বার্ত্তা আমার শিবিরে নিয়ে আসে। এই জায়গাতেই আমি এক সেট পুরা সম্মানের পোষাক, আমার নিজের আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া এবং কিছু নগদ অর্থ তাকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়ার আদেশ দিই।

হুমায়ুন একশ' বন্দী এবং সাত আটটি হাতী নিয়ে আমার শিবিরে পৌছিয়ে আমাকে সম্মান জানায়। একটা দৃষ্টান্ত দেখানোর জন্য আমি বন্দুকধারী সৈন্যদের এই বন্দীদের গুলি করে হত্যার আদেশ দিই। হুমায়ুনের এইটাই প্রথম যুদ্ধযাত্রা। যুদ্ধ ব্যাপারটা সে এই প্রথম দেখলো। এটা খুব শুভ লক্ষণ। হুমায়ুনের হালকা বাহিনীর কয়েক-জন—যারা পলায়নপর শত্রুর পেছন পেছন ধাওয়া করেছিল তারা হিসার ফিরোজে পৌছানো মাত্র সে দেশ দখল করে নেয় এবং লুঠতরাজ করে সেখান থেকে ফিরে আসে। হিসার ফিরোজ এবং তার অধীনস্থ জেলা-গুলি যার রাজস্বের পরিমাণ দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার—তার অধিকার আমি হুমায়ুনকে দিই এবং উপহার স্বরূপ আরও দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা তাকে নগদ দিই।

ঐ জায়গা থেকে রওনা হয়ে আমরা সাহাবাদে পৌছি। আমি কয়েক-জন উপযুক্ত লোককে সুলতান ইব্রাহিমের শিবিরের সংবাদ আনবার

জন্য পাঠিয়ে এই জায়গায় কয়েকদিন অপেক্ষা করি। এখান থেকে বিজয়বার্ত্তা জানিয়ে কয়েকখানা চিঠি রহমত পেয়াদার মারফৎ কাবুলে পাঠিয়ে দিই।

হুমায়ুনের মন্তব্য

[এই জায়গায় এবং এই দিনেই আমার দাড়িতে প্রথম ক্ষুর কিংবা কাঁচি ব্যবহার করি। আমার মহামান্য পিতা তাঁর এই আত্মচরিতে তিনি কবে প্রথম ক্ষুর ব্যবহার করেছিলেন তা নিবদ্ধ করেছেন। তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমি বিনীত ভাবে নিজের সম্বন্ধে অনুরূপ ঘটনা লিখে রাখছি। এখন আমার বয়স ছেচল্লিশ। আমি মহম্মদ হুমায়ুন পরলোকগত সম্রাটের নিজের হাতে লেখা আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপি থেকে একটা অনুলিপি করে রাখছি।]

এই স্থানে থাকবার সময় সূর্য্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করেন। আমরা পুনঃ পুনঃ এই সংবাদ পাচ্ছিলাম যে সুলতান ইব্রাহিম ধীরে ধীরে দুই এক মাইল অগ্রসর হয়ে সেই জায়গায় দুই তিন দিন বিশ্রাম করছেন। আমরাও সেই ভাবেই অগ্রসর হচ্ছি তাঁর সম্মুখীন হওয়ার জন্য এবং যমুনার তীরে শিবির ফেলছি।

হায়দার কুলিকে খবর সংগ্রহ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। যমুনা নদীর যে জায়গায় জল কম সেই খানে পার হয়ে নদীর ওপারে এলাম। সিরসাতে একটা সুন্দর প্রস্রবণ দেখা গেল। সেই প্রস্রবণ একটি নদীর সৃষ্টি করেছে। জায়গাটা খুব মনোরম। তারদি বেগ খুব প্রশংসা করতে লাগলো জায়গাটার।

আমি বল্লাম—জায়গাটা তোমারই হোক।

তার প্রশংসার ফলে আমি সত্যই এ জায়গাটা তাকেই দিলাম। একটা নৌকার ওপর চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে পাল ভরে নদীর বুকে চলতে লাগলাম—আবার কখনও বা নদীর ছোট ছোট খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে নৌকা চালাতে লাগলাম।

ভাটির দিকে নদীর তীরে তীরে দুইবার সৈন্য চালনা করে এগোতে থাকি। এই সময়ে হায়দার আলি—যাকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল সে—ফিরে এসে জানায় যে নদীর অপর পারে দাউদ খাঁ ও হাতিম খাঁ ছয়সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সুলতান ইব্রাহিমের ঘাঁটি থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে চলে এসেছে। তারা রাস্তা ধরে আমাদের দিকেই এগুচ্ছে। আমি আমার সৈন্যব্যূহের বাম বাহু এবং ইউনিস আলির অধীনে ব্যূহের মধ্যবর্ত্তী সৈন্যদলের কতকাংশকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে শত্রু সৈন্যের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আদেশ দিই।

মধ্যাহ্ন নমাজের সময় আমার সৈন্যরা আমাদের শিবিরের সামনে দিয়েই নদী পেরিয়ে ওপারে গেল। অপরাহ্ন ও সান্ধ্য নমাজের মাঝামাঝি সময়ে তারা ওপারের তীর ধরে অগ্রসর হয়ে চললো। পরদিন সকালে নমাজের সময় তারা শত্রুসৈন্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। শত্রুপক্ষ তাদের সৈন্যদলের শৃঙ্খলা কিছুটা রক্ষা করে আমার সৈন্যদের সম্মুখীন হতে যাত্রা করে। কিন্তু আমার সৈন্যরা এগিয়ে আসতেই তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়, তারা পালাতে সুরু করে। আমার সৈন্যরা পশ্চাদ্ধাবন করে, শত্রুসৈন্য বধ করতে করতে ইব্রাহিমের শিবিরের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তারা শত্রুপক্ষের একজন সেনাপতি এবং আরও সত্তর আশি জন সৈন্যকে বন্দী করে। বন্দীদের এবং সেই সঙ্গে সাত আটটা হাতী নিয়ে তারা আমাদের শিবিরে ফিরে আসে। শত্রুপক্ষের ভীতি সঞ্চারের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকজন বন্দীকে হত্যা করা হয়। ক্রমশঃ

মানসী

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমারে খুঁজেছি আমি নিষ্কলঙ্ক পর্বত শিখরে
পার্বতী পার্বতী যথা হর-লাগি প্রহর গণিত—
মৃগ-শিশু করভেরা স্নানরত নির্মল শিকরে,
সুমধুর ক্রীড়ানন্দে বনরাজি গুনিত ধ্বনিত।
তোমারে খুঁজেছি আমি বিদর্ভের বিরাট প্রাসাদে
যেথানে সুন্দরীবৃন্দ দর্ভ-কাটি শুক্তির দসনে

প্রাচীন বিস্মৃত যুগে অর্বাচীন পথিকের সাথে
রঙ্গলাস্যে হত লিপ্ত অঙ্গ রাখি মুক্ত বাতায়নে
বসন্তে বমন-মুক্ত নভোদেশ চন্দ্রিকা-সম্পাতে
সাকার চন্দ্রমারূপে বিরাজিত কজ্জলালিম্পনে।
শিখর প্রাসাদ শূন্য, কোথা সেই শিখর প্রাসাদ ?
সেখানে নিষ্ফল খোঁজা ভ্রান্ত মন করেছে প্রমাদ।

গ্রাম্য কুঞ্জবন হতে নাসারন্ধ্রে আসে পরিমল—
হর্ষিত মানসে হেরি পার্শ্বে ফুটে বাঞ্ছিত কমল।

আধুনিক ইংরাজী কবিতা

উপানন্দ

তোমাদের সকলকেই ইংরাজী ভাষা শিখতে হয়, পড়তেও হয় ইংরাজী সাহিত্য। সাহিত্যের অঙ্গ হচ্ছে কাব্য, এজন্যে ইংরাজী কবিতার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ঘটে থাকে। তোমাদের পাঠ্য পুস্তকে যে সব কবিতা পড়েছ, সেগুলি বোধগম্য হয়। কিন্তু আধুনিক ইংরাজী কবিতা যদি তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায়, তাহোলে তোমাদের শিক্ষকরাও যেমন পড়াতে গিয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হয়ে পড়বেন, তোমরাও কবিতার বিন্দু বিসর্গ বুঝতে না পেরে বিরক্ত হয়ে উঠবে। তার কারণ আধুনিক ইংরাজী কবিতা-লেখকরা অদ্ভুত রকমের ভাব ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত হয়েছেন, তাতে কবিতাগুলি দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়েছে, ঠিক বুঝানো যায় না, বুঝাও যায় না। এরূপ অদ্ভুত জটিল অবস্থা সাহিত্যের আর কোন ক্ষেত্রে উদ্ভূত হয় নি। তোমরা যারা কীটস, ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রণ শেলী প্রভৃতির ইংরাজী কবিতা পড়ে আসছে, আধুনিক ইংরাজী কবিতা প্রথম পড়েই কিছু বুঝতে পারবে না, বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে এর অসঙ্গতি দোষ দুষ্ট গোলমেলে ভাব, ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের নিদর্শন দেখে। এত কাল জেনে এসেছ কবিতা হৃদয়ের বস্তু। এখন তোমাদের কাছে আধুনিক ইংরাজী কবিতাগুলি প্রমাণ করছে—হৃদয়ের বস্তু নয়, মস্তিষ্কের বস্তুই কবিতা।

আধুনিক ইংরাজী কবিতার রচনা বিন্যাস দেখে অনেকেই বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে হয়তো দু এক জনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে এর ভাবার্থ বুঝে। খুব সম্ভবতঃ তাঁরা অনন্যসাধারণ। বুঝতে পারলেও বুঝোতে গিয়ে বেশ বে-কায়দায় পড়েন, তা ও লক্ষ্য করা গেছে। পাঠক পাঠিকা মহলের অনেকে তর্ক করে প্রমাণ করতে গেছেন আসলে এগুলো কবিতাই নয়। এতকাল ধরে এই মতবাদ সুদৃঢ় হয়েছিল। বহু বাক্ বিতণ্ডাও হয়ে গেছে। আজ অভিজাত ইংরাজী সাহিত্যের দরবারে আধুনিক উদ্ভট কবিদের স্থান হয়েছে। এখন অনেকের মুখে বলতে শোনা যাচ্ছে যে কবিদের বক্তব্যগুলো তাৎপর্য্যপূর্ণ, অর্থ বোধক আর নিছক প্রলাপোক্তি নয়। হট্টগোলের ভেতরও যদি হারানো মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়, অর্থ বিভ্রাটের ভেতর ও লুকিয়ে-থাকা অর্থ খুজে পাওয়া যাবে না কেন? রুচি বৈষম্য অবশ্য এখনও আছে। অনেকের মুখে শোনা যায় আজকের দিনে মানুষের সময়ের মূল্য আছে। একটা দশলাইনের কবিতার অর্থ বুঝতে যদি বেলা পড়ে আসে তা হোলে আর সব কাজ হবে কখন! কথাটা ভেবে দেখবার মত। ইংলণ্ডে শ্রমশিল্প বিপ্লবের চাপে ভেঙে পড়লো পূর্ব্বের কৃষ্টি বা সংস্কৃতি, সামন্ত যুগের হোলো অবসান, এলো বৈশ্য প্রাধান্য, পুঁজি বাদিদের মদ মত্ততা। ফলে কুঠারাঘাত হোলো নৈতিক আদর্শ, শালীনতাবোধ আর ধর্ম্ম প্রবণতার মূলে। যে ক্লাসিক মর্য্যাদা ইংরাজী সাহিত্য পেয়ে এসেছে, সে মর্য্যাদা ক্রমে ক্ষুণ্ণ হয়ে আসতে লাগলো। পর পর দুটি বিশ্ব যুদ্ধের আওতায় পড়ে চিন্তা ধারার গতি দুর্ব্বল হয়ে অবস্থা-সঙ্কট এনেছে, এ যেন মরুপথে নদীর হারিয়ে যাওয়া অবস্থা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবি দেখিয়েছেন সভ্যতার উত্থান পতনের বিভিন্ন রূপ। তাঁর মতে যখন জাতির সভ্যতার পতন শুরু হয় তখন তার প্রতিরোধ করা যায় না। বর্ত্তমানের ভাব ভাষা ও চিন্তাধারার দিকে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ও সংস্কৃতি বা কৃষ্টির এসেছে অধঃপতনের দিন। যন্ত্রের আর অর্থের ধ্যান করতে করতে মানুষ হয়ে গেছে যান্ত্রিক আর অর্থ পিশাচ। আধুনিক কাব্য সাহিত্যে তাই দেখা যায় তার প্রতিফলন। নিরাশার তীরে দাঁড়িয়ে এ যেন দূর পানে চেয়ে থাকা। যতই বিশ্বভ্রাতৃত্ব আর বিশ্বপ্রেমের ধুয়ো ধরা হচ্ছে, ততই প্রকাশ পাচ্ছে বর্ব্বরতা. এই মনোবৃত্তি মহামারীর চেয়ে সাংঘাতিক, মৃত্যুর মত ভয়াবহ, হত্যার মত দুর্ব্বার এরাই আসন্ন তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণ সম্ভার গোপনে প্রস্তুত করছে, সে

বিভীষিকাচ্ছন্ন দিন আগত প্রায়। তা না হোলে বিষ্ঠাকে চন্দন মনে করে, চন্দনের গন্ধে নাকে কাপড় দেওয়ার দিনই বা আস্‌বে কেন?

আধুনিক বিদ্যা শিক্ষা পদ্ধতি মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। এ শিক্ষা জড় বিজ্ঞান ঘেষা, তাতে মানুষের মন জড়তায় ভারাক্রান্ত। একদা ধর্ম্ম মূলক শিক্ষা, উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় বস্তু মূলক শিক্ষা, উন্নত নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ মূলক শিক্ষা বিদ্যালয়ে দেওয়া হোতো। তুলে ধরা হোতে শিক্ষার্থীদের সাম্‌নে আদর্শের বলিষ্ঠতা পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে। এখন এগুলিকে অন্তরালে টেনে ফেলে দিয়ে এদের ওপর অজস্র বই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এ যেন হাসপাতালের মর্গের ভেতর মড়ার মত। সদাচার ও সৎচিন্তা অবলুপ্ত। তোমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখ্‌তে পাবে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি মানুষকে মনুষ্যত্বের দিকে নিয়ে যায় না, বরং এগিয়ে দেয় আত্মকেন্দ্রিকতা ও মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ সৃষ্টির দিকে, এগিয়ে দেয় রাজনীতির পাশা খেলায়। সভ্যতা জননীর বস্ত্র হরণের জন্তে।

শ্রম শিল্প বিপ্লব আর নবনব যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে এসেছে অপ্রকৃতিস্থ জটিলতা আর অকাল বিভ্রান্তি। এরাই আধুনিক ইংরাজী কবিতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, উদ্ভট কল্পনার চূড়ান্ত নিদর্শন সম্ভব হয়েছে এদের চাপে। এজ্‌রা পাউণ্ড, টি, এস, এলিয়ট প্রভৃতির কবিতায় দেখা যায় ভাঙন নদীর ধারে সৌধ নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা। এলিয়ট ও পাউণ্ডের পরবর্ত্তী তরুণ কবিরা সংস্কৃতি ও রাজনীতির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ সম্পর্কে অনেকটা সজাগ। এতদ্‌সত্ত্বেও এঁরা অডেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলেছেন কবিতার উদ্দেশ্য নয় লোককে বাণী দেওয়া, ভালো মন্দ জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়ে তুলে ধরা দরকার, যাতে পাঠক সমাজ বুঝ্‌তে পারে—কোন্‌টা বেশী তাৎপর্য্যপূর্ণ আর প্রয়োজনীয়।

আধুনিক ইংরাজী কবিতার মধ্যে আছে অত্যন্ত সঙ্কোচ আর প্রাথর্য্য। নেই প্রাঞ্জলতা। কবিকে কি বল্‌তে চান তা অনায়াস বোধ্য নয়, অনেকটা বৌদ্ধ দোঁহার মত হেঁয়ালিভরা। অর্থ বিভ্রাটে পড়্‌তে হয়, ভেবে ভেবে বুদ্ধি বৃত্তির সাহায্যে কবির তৎকালীন মেজাজ ধর্‌তে অনেক সময় লাগে। কবির অপরিচিত ব্যাপারের ওপর কল্পনার রঙ চড়ানো আর চিন্তার প্রকাশ এতই আত্মকেন্দ্রিক যে বুঝ্‌তে পারা তো দূরের কথা, ধরা ছোঁয়ার নাগালের বাইরে এসে কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয়। অপ্রচলিত রূপক অলঙ্কার (মেটাফর) আর ইচ্ছাকৃত আজগুবি শব্দ প্রয়োগ আর ও আমাদের মনে বিরক্তি উৎপাদন করে। ইচ্ছে হয় না আর কবিতা পড়্‌তে।

আধুনিক ইংরাজ কবিরা নতুন নতুন ছন্দ আর নতুন নতুন কল্পনার প্রতিমূর্ত্তি বা ইমেজ প্রয়োগ করে কবিতার ওপর দিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। এঁদের রচনা আবেগময়, আত্মিক আর ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি পূর্ণ। সময়ে সময়ে বর্ণনামূলক বা উপদেশপ্রদ কবিতাও এঁদের হাত দিয়ে বেরোয়। ধ্বনি মাধুর্য্য বা সুরেলা শব্দ বিন্যাস পাওয়া যায় না কবিতাগুলিতে। যায় কেবল আবেগের আতিশয্য। অধিকাংশ যুদ্ধোন্মাদনার বিষয় বস্তুতে ভারাক্রান্ত আর সেগুলি বর্ণিত হয়েছে ব্যাজচ্ছলে।

আধুনিক ইংরাজী কবিতার আবেদন সীমিত। নতুন ধরণের আঙ্গিকে লেখা কবিতায় আছে নতুন ধরণের চিন্তার ঢং। চিন্তার নূতনত্বে, নমুনায়, অপ্রচলিত পরোক্ষে উল্লেখ আর ছন্দ শাস্ত্রের রীতি বিরুদ্ধ রচনাভঙ্গীতে আধুনিক ইংরাজী কবিতাগুলি যুদ্ধ পরবর্ত্তী খাম খেয়ালী মেজাজের নিদর্শন। সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে ইংরাজী কাব্যে এসেছে চরম বৈপ্লবিক চেতনা, ফলে হচ্ছে খাণ্ডব দাহন।

আধুনিক ইংরাজী কবিতার প্রবর্ত্তক জি, এম, হপ্‌কিন্‌স। ইনি ইংরাজী কাব্যের পূর্ব্বরীতি পদ্ধতি ভেঙে চুরে ফেল্‌লেন আর এঁর সমসাময়িক ইংরাজ কবিদের দল থেকে নিজেকে তফাৎ রেখে পৃথকভাবে কবিতার রচনার ঢং বদ্‌লালেন। ছন্দ প্রয়োগে, ব্যঞ্জনায়, কল্পনার রূপায়ণে, ভাবভাবনায়, অনুভূতি ও আবেগে একেবারে অন্যধরণের চেহারা করে তুল্‌লেন তাঁর কবিতাগুলির কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গিমায় দেখা গেল না অসংলগ্নতার তীক্ষ্ণ পরিবেশ।

বাইরে সামাজিক দ্বন্দ সংঘর্ষের সূত্র ধরে তাঁর কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য নৈতিক বিরোধিতার বহিঃপ্রকাশ হয়ে উঠেছে। নিজের মধ্যে তিনি যে সব চাপা উত্তেজনা বোধ করেছেন, বিশৃঙ্খলতার ভেতর কেন্দ্রীভূত করেছেন নিজেকে, সেইগুলিকে রূপ দিয়েছেন তাঁর কবিতায় নিজস্ব লিখন শৈলীর মাধ্যমে। তাঁর কবিতায় আছে আধ্যাত্মিক চাপা বেদনা, আছে ব্যর্থতার উক্তি। তীব্র ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি আর বলিষ্ঠ বুদ্ধির সমন্বয়ে কবিতাগুলি এনেছে নব শিল্পরূপ। গঠন কৌশলের দুঃসাহসিক অভিনবত্ব হয়েছে প্রতিভাত। ঈশ্বর আর নিজস্ব আত্মা, ঈশ্বর আর অপরাপর আত্মা, ঈশ্বর ও প্রকৃতি, এরাই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছুটা স্থান অধিকার করেছে।

ইংরাজী কবিতার চেহারা বদ্‌লে দিয়ে সব চেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন টি, এস, এলিয়ট। আমাদের মধ্যে যাঁরা রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত বলে প্রচারে পসারে রাষ্ট্রানুগ্রহে ও পারিতোষিকের আনুকূল্যে নিজেদের বহুবিঘোষিত কর্‌ছেন, তাঁরা শুধু টি, এস, এলিয়টের অনুকারক নন, এলিয়েটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণও বটে। এঁদের অনেককেই দেখা গেছে এই ইংরাজ কবির বহু মাল মসলা আত্মসাৎ করে স্বয়ম্ভু হোতে। এঁরা যেন কাকের বাসায় কোকিলের মত।

ফরাসী প্রতীকীদের ভাব ধারায় অবগাহন স্নান করেছেন টি, এস, এলিয়ট। ছন্দোবদ্ধ ধ্বনি মাধুর্য্য বিশিষ্ট মানসিক ভাবের সঙ্গীতধর্ম্মী পরিবেশের মধ্যে ফরাসী কবিদের কবিতা যেমন অস্পষ্ট, তেমনই বোধগম্য হওয়ার পক্ষে দুরূহ। ফলে লেখক ও পাঠকের ভাব বিনিময় বা আত্মিক যোগাযোগ সমস্যা সঙ্কুল হয়ে ওঠে। ফরাসী কবিদের সুর, ধরণ ধারণ, মেজাজ, ছন্দ, অলঙ্কার প্রয়োগ, শব্দবিন্যাস, রূপায়ন, বিষয় বস্তু আর মানস পুতুল গুলো টি, এস, এলিয়টকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ড' আর অন্যান্য সাধারণ দার্শনিক তাঁর চিন্তাধারার অনেকখানি দখল করে বসে আছেন। তাঁর মতে জগৎটাকে সুন্দর দেখ্‌লেই চল্‌বে না, সৌন্দর্য্য আর কদর্য্যতা উভয়ের সঙ্গে পরিচিত হোতে হবে, যা গৌরবের সূচনা করে,

তা নিয়ে আত্ম প্রসাদ লাভ করলে হবে না, যা কুৎসিৎ বিরক্তিব্যঞ্জক, গ্লানিকর, ভীতিপ্রদ আর বিভীষিকা প্রদর্শক তাও লক্ষ্য বস্তু হওয়া দরকার। আমাদের সভ্যতার অধ্যাত্ম স্তরের সংবেদন শীল সমালোচনাই হচ্ছে তাঁর কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়। চলেছি আমরা ভাতি বিহ্বল প্রকৃত উদ্দেশ্য হীন আবেগ প্রধান বন্ধ্যাযুগের মধ্য দিয়ে, তাই ফসলের আশা বৃথা, এইটাই তিনি ভেবে দেখেছেন। নেতিবাদ ভিন্ন গত্যন্তর নেই আর পার্থিব জগতে পরিপূর্ণতা লাভও অসম্ভব, এসব কথাই ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবিতায়। ডব্ল্ এইচ অডেন, ডেলিউইস, ষ্টীফেন স্পেনডার, লুই ম্যাকলিস প্রভৃতি কবিরা উত্তরাধিকার সূত্রে টি এস এলিয়টের চিন্তারাজ্যের বা ভাব ধারার কিছু কিছু অংশ পেয়েছেন কিন্তু তাঁরা ও তাঁর চিন্তাধারার বিপরীত অভিমুখে ছুটেছেন কিসের সন্ধানে তা কে জানে! এঁদের মধ্যে রয়েছে কাব্যিক ধর্ম্মমতের বৈপ্লবিক গতিময় চেতনা। এঁরা কবিতার ধ্বনি ও রূপ কল্পের সঙ্গে কোন শৃঙ্খলিত ন্যায় যুক্তি সঙ্গত অর্থের প্রয়োজন বোধ করেন না। এঁদের মতে এসব চং অচল, ষষা পয়সা চালিয়ে লাভ কি? এতে নাকি বিশুদ্ধ আবেগ বহন করবার স্বাচ্ছন্দ্য থাকে না—হবেও বা কিন্তু আমরা তো এঁদের বিশুদ্ধ আবেগের স্ফুরণ প্রত্যক্ষ করিনে। যাহোক এঁরা নতুন ভাবে ভাষায় ছন্দে কবিতা রচনায় হাত দিয়েছেন। এঁদের কল্পনার চিত্রাবলী আধুনিক জীবনের ওপর আঁকা, এঁদের শব্দকোষ অন্যধরণের, সাধারণ ভাষার ওপর হয়েছে নতুন শব্দের রঙ্ ফলানো, এঁদের ছন্দ চল্তি কথার অবলম্বনে গড়া। এঁরা এঁদের কবিতাকে পাঠকদের আবেগের অপেক্ষা বুদ্ধি বৃত্তির দিকে পৌঁছে দিতে উদ্যত। সর্ব্বপ্রকার আধুনিক জ্ঞান দের যদৃচ্ছা বিনিয়োগ করবার অধিকার ভুক্ত হয়েছে কবিতার ক্ষেত্রে। কিভাবে পৃথিবীর সুস্থতা আসবে আর ব্যাধি দূর হবে, এগুলি নিয়েই চলেছে এ দের মনন ধারা। ডেলিউইস শৌর্য্যশক্তি প্রিয়। তিনি সাধারণ বিদ্যালয়ের বহুকালের প্রথা, সংবাদ পত্র, গির্জ্জা আর রাজনীতি বিশারদের ওপর তীব্র সমালোচনা করেছেন। ষ্টীফেন স্পেনডরের মতে জীবনের মূল্য দেহেতে যেমন আছে, তেমনই আছে আগ্নের আত্মার ভিতর। যন্ত্রযুগের অনেককিছুই তাঁর কাছে সৌন্দর্য্যের প্রেরণা এনেছে। লুইস ম্যাক্লিসও, তাঁর দলীয় বন্ধুদের মত, সামাজিক রুগ্নতা আর সময়ের আগামী বিপদের সঙ্কেত দেখে সচেতন হয়ে উঠেছেন। কোনদিনই অনুভব করেননি একজনের কল্যাণের পথ রচনা করতে পারবেন আর অপরকে প্রকাশ্য ভাবে বাধা দিয়ে পৃথিবীকে সুস্থ সবল করে তুলবেন। তিনি আশা করে আছেন মানুষের অভাব অনটন দূর হয়ে সুন্দর ভাবে স্বতঃ স্ফূর্ত্ত জীবিকার্জ্জন হবে। সমাজ সংসারের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খা নৈরাশ্য আর বিষন্নতা কবিতায় স্থান পেয়েছে, সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব ও অভিব্যক্ত হয়েছে।

ষ্টিফেন স্পেনডারের মত হচ্ছে কবিতা প্রচারের কাজে নিযুক্ত হবে না। কবি মৌলিক বিষয় বস্তুগুলির সঙ্গে সংস্রব রাখবেন আর প্রত্যেকটী বস্তু পর্যবেক্ষণ করবেন নব দৃষ্টি ভঙ্গিমা দিয়ে। কবি তাঁর নিজের সত্ত্বা দিয়ে, নিজের ভাবধারা দিয়ে অনুপ্রাণিত করে তুলবেন মানুষকে উন্নত অবস্থায় আনতে যাতে দুঃখ দৈন্য দূর হয় আর যন্ত্রযুগের পশ্বাচার ও জড়বাদ থেকে ব্যষ্টি মুক্তি পায়। আধুনিক কবিদের মধ্যে ডাইলান টমাসের স্থান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবিতা উঁচু ধরণের—অত্যন্ত, আবেগ প্রধান। মোদ্দা কথা ইংরাজী সাহিত্যে ভিকেটারিয়া ভাব ধারা, আঙ্গিকতা, ব্যঞ্জনা লিখনশৈলী ও সামীপ্য থেকে দূরে এসে আধুনিক ইংরাজী কবিরা কবিতার রূপ পরিবর্ত্তন করেছেন। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ব্যর্থতার উপকরণের দ্বারা এঁদের রচনা ভারাক্রান্ত করে নিজেদের বিশিষ্ট ভঙ্গীকে বড় করে তুলছেন—এর চরিতার্থতা তর্কসাপেক্ষ।—এদের কবিতায় আছে অস্বস্তির স্বীকৃতি। তোমরা এই সব ইংরাজী কবিতা পড়লে বুঝতে পারবে কি অদ্ভুতভাবেই না এদের প্রভাব আমাদের আধুনিক বাংলা কবিতার মধ্যে প্রবেশ করেছে ফলে আমাদের সংস্কৃতিও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে। কাব্য জগত আঁধার হয়ে আসছে একথা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের কবি-সূর্য রাহুগ্রস্ত। এ রাহু ও বিজাতীয় পদলেহনকারী। তোমরা আধুনিক ইংরাজী কবিতা পড়বার সময় আধুনিক বংলা কবিতা তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে ধরতে পারবে এই রাহুজাতীয় উপগ্রহের স্বরূপটা।

বন্ধু বিচার

আভা পাকড়াশী

সমৃদ্ধিশালী শ্রাবস্তী নগরে বহুকাল আগে ব্রহ্মদত্ত নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। প্রচুর ধন রত্নের অধিকারী ছিলেন তিনি। তবে তাঁর খ্যাতি ছিল, বিত্ত বৈভবের জন্য নয়, আসলে তিনি ছিলেন খুব গুণী আর জ্ঞানী। একমাত্র পুত্র রত্নদত্ত গুরু গৃহের পাঠ সমাপ্ত করে ফিরে এসেছে। তিনি ইচ্ছা করেন তাঁর পুত্রও তাঁরই মত বন্ধু বৎসল ও নির্লোভ হোক ও ভদ্র পরিবেশে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করুক। এই সব ভেবে তিনি চাইলেন ওকে কিঞ্চিৎ পরীক্ষা করতে। বললেন দেখ বৎস, এই জগতে বিত্ত বৈভব মানুষের একমাত্র কাম্য বস্তু হলেও আশা করি তুমি তার জন্য লালায়িত নও; কারণ ও বস্তু তোমার প্রভুর আছে। সুতরাং আমি ইচ্ছা করি কয়েকটি সৎবান্ধব থাক তোমার, যারা তোমাকে বিপদে সাহায্য করবে ও সৎ পরামর্শ দিয়ে সত্য পথের সন্ধান দেবে তোমায়। বলং বলং বন্ধু বলং' এই শ্লোকের মাহাত্ম্য গুরু গৃহে পাঠ করেছ নিশ্চয়। উপস্থিত তোমার কয়জন এমন বন্ধু আছে যারা

সত্যই তোমার আপদে বিপদে বুক দিয়ে সাহায্য করবে? পুত্র নত মুখে সম্ভ্রমের সঙ্গে উত্তর দেয়, যে তার অন্ততঃ কম পক্ষে দশজন এমন বন্ধু আছে যারা তার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে।

বিস্মিত হয়ে শ্রেষ্ঠী ব্রহ্মদত্ত সন্দেহের সুরে বলেন, তুমি কি সতই এবিষয়ে নিঃসন্দেহ? তবে আমি তোমাকে এই টুকু বলতে পারি যে আমার এই পরিণত বয়সেও ঐ রকম প্রাণপ্রতিম মিত্রের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তুমি তোমার বন্ধুদের সামান্য একটু পরীক্ষা করলেই চিনতে পারবে কে তোমার সত্যই শুভাকামী মিত্র। এই আমার তরবারি নাও; এতে একটু ছাগ রক্ত মাখিয়ে নাও আর একটি মনুষ্য মস্তকাকৃতি কুষ্মাণ্ড থলিতে রাখ কাপড়ে জড়িয়ে। ঐ ছাগরক্ত বাড়ীর রসুই ঘরে গেলেই সংগ্রহ করতে পারবে অনায়াসে। যূপকার এখনি হয়ত তাজা মাংস ক্রয় কোরে এনেছে! রন্ধনের জন্য এবার চতুর অভিনেতার মত কাতর ভাবে তোমার প্রিয় বান্ধবের গৃহে গিয়ে বল, "ভাই আমাকে রক্ষা কর, আমি কোপ বশতঃ প্রধান অমাত্য অশ্বদত্ত মহাশয়কে বধ করে ফেলেছি। একটি অত্যন্ত জরুরী কাজে খুব শীঘ্র গমন করছিলাম, এমন সময়ে তিনি সম্মুখে উপস্থিত হলেন, আমি দ্রুততা বশতঃ এরাজ্যের নিয়মানুযায়ী তাঁকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ কোরে কুর্নিস না করেই চলে যাচ্ছিলাম। তাতে তিনি রুষ্ট হয়ে তাঁর পরিষদদের আদেশ দিলেন আমাকে বেত্রাঘাত করতে। পথের ওপর এভাবে আমাকে অপমান করায় আমি তাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করি, এবং পরে প্রথা ভঙ্গ করে আমি তাঁকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করি। আমাদের এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধের সাক্ষী কেউ ছিলনা। তাই অনায়াসে আমি তাঁর মাথাটি কেটে এনেছি, সহজে সনাক্ত হবে না এই মনে করে। আম্র কাননে পড়ে আছে তাঁর শরীরটা। সেখানেই আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। রাজ রোষে আমার গর্দ্দান যাবে ভাই। কিছু উপায় করো। দেখ এর কি প্রতিক্রিয়া হয়, ফলাফল আমাকে জানিও।"

আজ্ঞা বৎসল পুত্র পিতৃ আজ্ঞা পালনে দেরী করলনা। রক্তরঞ্জিত তরবারি আর কুষ্মাণ্ড পূর্ণ ঝোলাটি নিয়ে তার সব চেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু বলে যাকে মনে করে প্রথমে তার বাড়ীতেই গেল। পিতার শেখান ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করল করুণ সুরে। ঐ রত্ন দত্ত মহাশয়ের রূঢ় ব্যবহারের সঙ্গে অল্প বিস্তর সকলেরই পরিচয় ছিল। তাই ওর কথা অবিশ্বাস করল না বন্ধু। কিন্তু প্রথমে ওর বন্ধু আতঙ্কিত হলেও পরে রাগত স্বরে বললো, শীঘ্র আমার বাড়ী থেকে চলে যাও নরহন্তা পাপী কোথাকার। তুমি আমার বন্ধু একথা মনে করলেও ঘৃণা বোধ হচ্ছে আমার। দ্বিতীয় বন্ধু ও বললো, দোষ যখন করেছ সাজা তো পেতেই হবে, মাঝ খান থেকে আমাকে জড়িত করছ কেন? যাও সত্বর আমার গৃহ ত্যাগ কর, আর আমি যে তোমার বন্ধু একথা কাউকে যেন ভুলে ভ্রমক্রমেও বোলো না। তৃতীয় বন্ধু এমনি ভান করল যেন সে ওকে চেনেই না। চতুর্থ বন্ধুর কাছে গিয়ে শেষ চেষ্টা করল রত্ন দত্ত, খুবই করুণ সুরে নিজের ব্যথা ব্যক্ত করল, বলল, আমার এই দুর্দ্দিনে একটু সাহায্য কর ভাই, না হলে রাজ রোষে আমার প্রাণ যাবে। হঠাৎ রাগের বশে আমি প্রধান অমাত্যকে মেরে ফেলেছি, তুমি তরবারি আর এই মাথাটি তোমার কাছে লুকিয়ে রাখ। সন্ত্রাসে বলে বন্ধু, না, না, সে হয় না, নরহত্যাকারী পাপিষ্ঠ আমি তোমার বন্ধু নই, এই মুহূর্ত্তে চলে যাও এখান থেকে না হলে আমিই এক্ষুনি যাচ্ছি নগর রক্ষকের কাছে।

এবার আর কোথাও না গিয়ে বিফল মনোরথ রত্নদত্ত ভগ্ন মনে ফিরে গেল পিতার কাছে। দুঃখিত মনে সব ঘটনা বিবৃত করল তাঁর কাছে। স্বীকার করল, তার একটিও সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্র নেই।

শ্রেষ্ঠী তখন অনুতপ্ত পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন এত অল্পেই ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন বৎস? জীবনের পথ চলতে কত আঘাত পেতে হবে। তবে এবার তোমার যা শিক্ষা হোল তাতে ভবিষ্যতে সহজেই তুমি তোমার সত্যি-কারের পরম সুহৃদকে চিনে নিতে পারবে বলেই মনে হয়। যাইহোক্ এবার আমার দুজন বন্ধু, যাদের আমি কায়মনো-বাক্যে একান্ত পরম মিত্র বলে জানি, তাদের পরীক্ষা করে এসো। দেখ কি ফলাফল হয়।

এবার প্রথম পিতৃবন্ধু গৃহে নিজের বিপদের বার্ত্তা জানায় রত্নদত্ত। আকুল হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর। তিনি বলেন, ওঃ হো এতো বড়োই গর্হিত কর্ম করেছ তুমি। পুণ্যবান শ্রেষ্ঠী ব্রহ্মদত্তের পুত্র হয়ে শেষে কিনা নরহত্যা

করলে তুমি? এত বড় মহাপাপ আর হয়না, ছিঃ ছিঃ। এই সব বলে তিরস্কার কোরে বললেন, যাই হোক ব্রহ্মদত্ত আমার বন্ধু শুধু এই কারণেই তোমাকে সাহায্য করছি, যাও আমার আঙ্গিনায় একটি গর্ত্ত খুঁড়ে ঐ ঘৃণ্য জিনিষগুলো পুঁতে দাও।

গৃহে এসে পিতাকে সব ঘটনা বলতেই তিনি নিজের ভৃত্যকে প্রেরণ করলেন শহর কোতোয়ালের গৃহে, এই বার্ত্তা দিয়ে যে, শ্রেষ্ঠী বসুদত্ত তাঁর উঠানে একটি মানুষের মস্তক ও রক্তাক্ত তরবারি পুঁতে রেখেছে। ঐ মস্তক যে প্রধান অমাত্যের এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। খুব বিশ্বস্ত সূত্রে এই খবর পেয়ে গোপনে তিনি তাঁকে জানাচ্ছেন। সত্বর বসুদত্তের গৃহে গিয়ে আঙ্গিনা খুঁড়লেই ওগুলি পাবেন। বহুদিন হয় প্রধান অমাত্য মহাশয় শ্রাবস্তি নগর পরিত্যাগ কোরে রাজকার্য্যে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যে গেছেন। সুতরাং ফেরবার পথে কোন অঘটন ঘটে থাকবে এই মনে করে নগর রক্ষক কোতোয়াল মহাশয় সপরিষদ বীরদর্পে রওনা হলেন। তিনি ভীম বিক্রমে বসুদত্ত গৃহে প্রবেশ করতেই ভীত শ্রেষ্ঠী সব দোষ রত্নদত্তের ওপর অর্পণ কোরে বলল আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। ঐ ব্রহ্মদত্তের পুত্রই প্রধান অমাত্যের হন্তারক। মহাপাপী সে, চিরকালের প্রথা লঙ্ঘন করেছে, সে অভিবাদন না কোরে আবার মেরেও ফেলেছে তাকে, আর আমার অজ্ঞাতে ঐ সব এখানে পুঁতে দিয়ে গেছে।

সত্বর এই সংবাদ পিতাকে জানায় রত্নদত্ত। এবার তাকে দ্বিতীয় বন্ধুর কাছে প্রেরণ করেন পিতা। সেখানে গিয়ে ক্ষোভের স্বরে রত্নদত্ত বলে, আমি মহাপাপী, রাগের বশে প্রধান অমাত্যকে মেরে ফেলি। তারপর তাঁর মস্তক ও সেই তরবারি পিতৃ-বন্ধু বসুদত্ত মহাশয়ের আজ্ঞায় তাঁরই উঠানে প্রোথিত করি, কিন্তু মহাসঙ্কট উপস্থিত, কোতোয়াল আসায় তিনি আমাকে সনাক্ত করে দিয়েছেন। আমার গর্দ্দান যায়, আপনি একটা উপায় করুন দয়া কোরে। সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে রমাপতি সওদাগর নিজের পুত্রকে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে কোতোয়ালকে বলেন, এই আমার পুত্রই প্রকৃত হত্যাকারী। রত্নদত্ত নয়। শ্রেষ্ঠী বসুদত্ত ভুল বলেছেন। যদি শাস্তি দিতে হয় একেই দিন।

এই বার্ত্তা ছুটে গিয়ে ব্রহ্মদত্তকে জানায় রত্নদত্ত। এবার পিতাপুত্র দুজনেই ঘটনা স্থলে উপস্থিত হল। ব্রহ্মদত্ত কোতোয়ালকে বলেন, খুনী কে? সাব্যস্ত করার আগে ঐ প্রোথিত জিনিষগুলি তুলে আগে পরীক্ষা করুন এই আমার অনুরোধ। কোতোয়াল মহাশয়ও এই দুই হত্যাকারীর মধ্যে কে প্রকৃত খুনী এই ভেবে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি বোধ করছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মদত্তের প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা কোরে আগে তাঁর অনুরোধই পালন করতে প্রবৃত্ত হলেন।

এমন সময় যাঁর হত্যাকারীকে নিয়ে বিবাদ সেই প্রধান অমাত্য অম্বাদত্ত মহাশয় স্বশরীরে মহা আশ্চর্য্যভাবে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন। সহর কোতোয়াল ও আরও সকলেই হতভম্ব। শুধু শ্রেষ্ঠী ব্রহ্মদত্ত মৃদু হাস্যে, আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করেন, সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত অমাত্যকে। শহরে নিজের এই অদ্ভুত মৃত্যু সংবাদ রচনার কারণ জানতে চান তিনি। সমস্ত ব্যাপার অকপটে সকলের সমক্ষে সবিস্তারে খুলে বলেন ব্রহ্মদত্ত, ও তাঁর একমাত্র পরম সুহৃদ রমাপতি সওদাগরকে আলিঙ্গন কোরে সাদরে গৃহে নিয়ে যান। একমাত্র তিনিই বন্ধুপুত্রকে রক্ষা করতে নিজের পুত্রকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। সকলেই সাধু সাধু করে তাঁকে।

শহর কোতোয়াল ঝোলা উপুড় করতেই কুষ্মাণ্ডটি বসুদত্ত মহাশয়ের আঙ্গিনায় গড়াগড়ি যায়। তরবারিটি ভোঁতা। তা দিয়ে ঐ কুমড়োটি কাটাই সম্ভব।

আলোকমালায় সজ্জিত শ্রেষ্ঠী গৃহে রাজা অমাত্য ও আরও অনেকেই নিমন্ত্রিত। ব্রহ্মদত্ত ও সওদাগর রমাপতি একাসনে উপবিষ্ট। ব্রহ্মদত্ত বলেন রত্নদত্তকে এবার প্রকৃত বন্ধুত্বের স্বরূপ বলে আশা করি কেন বুঝতে পেরেছ তুমি বৎস? এমনি বন্ধুভাগ্য তোমারও হোক এই আশীর্ব্বাদ করি তোমায়। মিথ্যা করে মৃত্যু সংবাদ রটনা করেছিলেন বলে আজ রাজ অমাত্য অম্বাদত্ত মহাশয়কে পান ভোজনে আপ্যায়িত করছেন শ্রেষ্ঠী ব্রহ্মদত্ত।

জলে থাকে কেন

গৌর আদক

তোমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই একবার না একবার চিড়িয়াখানায় গেছ, যাওনি এ রকম তোমাদের মধ্যে খুব কম আছে। না গেলেও একদিন তোমাদের ভাগ্যে যাওয়ার সুযোগ এসে যাবে। ওখানেই দেখতে পাবে আমাদের গণ্ডার ভায়াকে। চিড়িয়াখানা ছাড়া এদের দেখা মেলা ভার, তা না হলে আর কোথায় দেখবে বল, এত আর রাস্তার কুকুর, বেড়াল নয় যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, আর এরা সে রকম প্রাণীই নয় যে কাদা জল ছেড়ে চারি দিকে ঘুরে বেড়াবে। দৈবাৎ হয়তো কখন একটু আরাম করার জন্য কাদা জল ছেড়ে ডাঙ্গায় এসে বসে, আবার কিছুক্ষণ বাদে চলে যায় ঐ জলের মধ্যে। চিড়িয়াখানায় তো তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো যে কাদা জলের মধ্যে ওরা কিরম ভাবে ডুবে আছে।

আচ্ছা বলতো কেন ওরা ওরকম ভাবে কাদা জলের মধ্যে ডুবে থাকে? তোমরা বলবে ওটা ওদের স্বভাব; অথবা ওদের গায়ের চামড়াটা ভীষণ মোটা বলে ওদের গরম হয়, গরম ওরা সহ্য করতে পারে না বলে তাই ওরা এই উপায় অবলম্বন করেছে। না, তা নয়, এটা সম্পূর্ণ ভুল।

তবে বলি শোন। গণ্ডার যখন দেখেছ তখন নিশ্চয়ই তার গায়ের চামড়াটাও লক্ষ্য করেছ, কি রকম একটা বেশ ভাঁজ করা করা মতন নয়? ঐ চামড়ার ভাঁজটাই হোল ওদের কাল। যার জন্য ওরা এই উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। চামড়ার ঐ ভাঁজটা হচ্ছে পোকা মাকড়ের বাসা, যত রাজ্যের পোকা মাকড় এসে বাসা বাঁধবে গণ্ডার ভায়ার ঐ চামড়ার ভাঁজের মধ্যে। বাসা বেঁধেই ওরা ক্ষান্ত নয়, তার পর তারা কটুস্ কটুস্ কামড় লাগিয়ে ভায়াকে বড়ই অস্থির করে তোলে। ঐ সময় ভায়া যে একটু গা ঘসে আরাম করবে তারও কোন উপায় নেই, কারণ পোকা গুলোতো সব ঐ ভাঁজের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। ভায়াতো বড় চিন্তায় পড়েছে যে কি করা যায়! এবং কি করলে এই কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এই নিয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তার মাথায় এসে গেল এক বুদ্ধি,—যদি একটু কাদা জলে গড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে চামড়ার ভাঁজ গুলো কাদায় বন্ধ হয়ে যাবে এবং এই কষ্টের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। তাই গণ্ডার ভায়া এই কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পাকা পাকী ভাবে কাদা জলেই গিয়ে বাসা বেঁধেছে।

সত্যি তার এই বুদ্ধি প্রশংসনীয় এবং তার এই বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সমস্ত কিছু কষ্টের হাত থেকে সম্পূর্ণ ভাবে রেহাই পেয়ে, বেশ সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করে চলেছে।
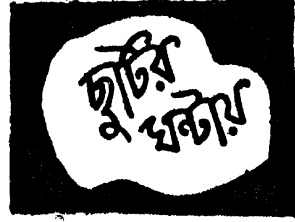
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের বিদ্যুৎ-শক্তির বিচিত্র কয়েকটি মজার খেলার কথা বলি। ঠিকমতো রপ্ত করে নিয়ে, এ সব খেলা দেখাতে পারলে, তোমরা নিজেরাই যে শুধু আনন্দ পাবে তাই নয়, আর পাঁচজনকেও রীতিমত অবাক করে দিতে পারবে। শোনো তাহলে, বিদ্যুৎ-শক্তির মজার খেলার বিচিত্র সব কায়দা-কানুনের কথা।

বিদ্যুৎ-শক্তিতে কাগজের পুতুলের আজব নৃত্যলীলা

তোমরা অনেকেই দেখেছো, মাথার চুলে চিরুণী ঘষবার পর, সেই চিরুণীখানির দাড়ার সামনে তখনি যদি ছোট ছোট ক'টুকরো খুব পাৎলা কাগজ রেখে দেওয়া হয়, তাহলে চুম্বক (Magnet) যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনিভাবেই সদ্য-মাথার-চুলে-ঘষা ঐ চিরুণীখানিও কাগজের টুকরোগুলিকে নিমেষে নিজের দিকে টেনে নেবে। মাথার চুলে চিরুণী ব্যবহার ছাড়াও, একখণ্ড মসৃণ কাঁচের গায়ে খানিকক্ষণ রেশমী কিম্বা পশমী কাপড়ের টুকরো ঘষে নেবার পর, সেই কাঁচটিকে যদি ঐ পাৎলা-কাগজের টুকরোগুলির উপর ধরো, তাহলে দেখবে যে সেগুলি সব বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে এসে সেঁটে থাকবে কাঁচের প্রান্তে। এমন আজব ব্যাপার ঘটবার কারণ—মাথার চুলে চিরুণী এবং কাঁচের গায়ে রেশমী কিম্বা পশমী কাপড়ের টুকরো ঘষবার ফলে, সৃষ্টি হয় বিচিত্র বিদ্যুৎ-শক্তি...এবং সেই বিদ্যুৎ-শক্তির আকর্ষণেই কাগজের টুকরোগুলি ছুটে আসে ঐ চিরুণী আর কাঁচের গায়ে।

ঠিক এমনি উপায়েই, লম্বা-ছাঁদের একখানা সমতল কাঁচের উপর খানিকক্ষণ একটি রেশমী রুমাল কিম্বা পশমী-কাগড়ের টুকরো ঘষে বিচিত্র বিদ্যুৎ-শক্তি সৃষ্টি করে, তোমরা অনায়াসেই 'কাগজের-পুতুলের আজব-নৃত্যলীলার' মজাদার খেলাটি দেখাতে পারো। এ খেলাটি দেখাতে হলে, প্রথমেই খুব পাৎলা কাগজের টুকরো থেকে কাঁচি দিয়ে সুষ্টুভাবে কেটে নাও—নৃত্যছন্দের লীলায়িত-ভঙ্গীতে আঁকা নানান্ ছাঁদের কয়েকটি পুতুলের চেহারা—পাশের ছবির 'ক' চিহ্নিত অংশে যেমন নমুনা দেখানো রয়েছে,
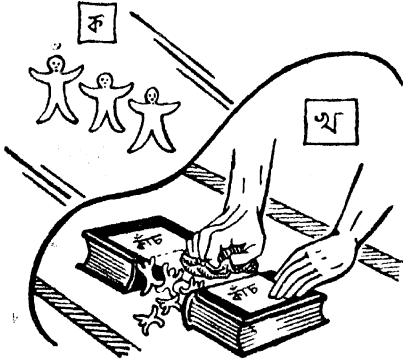
অনেকটা ঠিক তেমনি ছাঁদে। কাগজ কেটে পুতুলগুলি রচনার পর, উপরের ছবির 'খ' চিহ্নিত অংশে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে ঘরের সমতল মেঝে কিম্বা টেবিলের উপর পাশাপাশি এক লাইনে দু'খানি মোটা-ধরণের বাঁধানো বই সাজিয়ে রাখো…এ দু'খানি বইয়ের মাঝখানে যেন বেশ একটু জায়গা ফাঁক থাকে। এবারে 'খ' চিহ্নিত নক্সার ভঙ্গীতে, ঐ বই দু'খানির উপর পেতে দাও—লম্বা-ছাঁদের সমতল একখানা কাঁচ (Flat sheet of Glass) তারপর ঐ কাঁচের নীচে টেবিল বা মেঝের উপরে রাখা বাঁধানো বই দুটির মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটুকু রয়েছে, সেখানে কাগজের পুতুলগুলিকে। শায়িত-অবস্থায় সাজিয়ে রাখো এবারে একটি রেশমী রুমাল কিম্বা পশমী কাপড়ের টুকরো নিয়ে ঐ কাঁচখানির উপরে খানিকক্ষণ ঘষলেই দেখবে, বিচিত্র বিদ্যুৎ-শক্তি সৃষ্টির ফলে, মেঝে অথবা টেবিলের ফাঁকা জায়গাটিতে শায়িত কাগজের পুতুল-গুলি সব একে-একে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে বাঁধানো-বই দুখানির নীচে কাঁচের দিকে এগিয়ে চলেছে। এমনটি হবার কারণ হলো—কাঁচের উপরে রেশমী রুমাল কিম্বা পশমী কাপড়ের টুকরোটি ঘষার ফলে, কাঁচটির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিদ্যুতের বিচিত্র আকর্ষণ-শক্তি…সেই শক্তির আকর্ষণেই টেবিল বা মেঝের উপরে শায়িত-রাখা কাগজের পুতুলগুলি সোজা উঠে এগিয়ে চলেছে বিদ্যুতময় ঐ কাঁচখানির দিকে। এই হলো 'বিদ্যুৎ-শক্তিতে কাগজের পুতুলের আজব-নৃত্যলীলা' খেলাটির বিচিত্র রহস্য।

এবারে তোমরা নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে দেখো অভিনব মজার বিদ্যুৎ-শক্তির এই বিচিত্র খেলাটি।

—

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। কলিকাতা থেকে বৃন্দাবন যাত্রার হেঁয়ালি ঃ
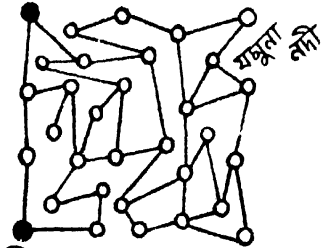
পাশে যে বিচিত্র নক্সাটি দেওয়া হলো, তাতে দেখছো কতকগুলি 'রেখা'…এই 'সব রেখার' বাঁ-দিকে নক্সার উর্দ্ধ-কোণে পুণ্যতীর্থ বৃন্দাবন, এবং বৃন্দাবনের ডানদিকে উর্দ্ধকোণে পুণ্যস্রোতা যমুনা নদী। নক্সার বাঁ-দিকে নিম্নকোণে সহর কলিকাতা। কলিকাতা থেকে তীর্থ-যাত্রীদের যেতে হবে বৃন্দাবনে। উপরের রেখাগুলির মাঝে মাঝে ছোট-ছোট যে সব 'বৃত্তগুলি' রয়েছে, সেগুলি হলো পথের ধারে ধারে অবস্থিত বিভিন্ন সব তীর্থ। বৃন্দাবনে

যেতে হলে পথে, জোড়-সংখ্যক অর্থাৎ ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, এ সব তীর্থ ঘুরে যেতে হবে···বিজোড়-সংখ্যক অর্থাৎ ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ তীর্থ ঘুরলে চলবে না···কিন্তু যত তীর্থেই যাও, ডানদিকের উর্দ্ধকোণে যে যমুনা নদী···ঐ যমুনা নদীতে স্নান করে তবে বৃন্দাবনে যেতে পাবে। সব তীর্থে যেতে হবে না অবশ্য। এখন বলো দিকিনি—কটি তীর্থ ঘুরে যমুনা নদীতে স্নান করে তীর্থযাত্রীরা বৃন্দাবনে পৌছুবে ?

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

তিন অক্ষরে নাম তার
সর্ব্ব ঘরেই রয়,
প্রথম অক্ষর দিলে কেটে
পুষ্টি খাদ্য হয়।
শেষের অক্ষর দিলে কেটে
ভয় পাই যারে,
বলতে পারো তোমরা সবে,
কিবা বলে তায় ?

গীতা চক্রবর্ত্তী (ময়ূরাক্ষী বাঁধ)

৩। তিন অক্ষরে নাম তার, বড় উপাদেয়,
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে হয় অতি হেয় ;
মাঝের অক্ষর না থাকিলে চতুষ্পদ হয়,
তৃতীয়টি কেড়ে নিলে মাটিতে লুকায়।

বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (কলিকাতা)

১। গত মাসের হেঁয়ালির" উত্তর ঃ
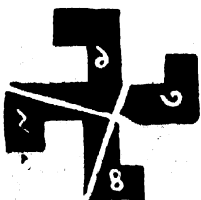
পাশের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ছাঁদে স্বস্তিকা-চিহ্নটিকে চার-টুকরো করে কেটে, টুকরোগুলি গায়ে-গায়ে জুড়ে সাজিয়ে, দিব্য একটি চতুষ্কোণ রচনা করতে পারবে।

২। গত মাসের 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধার উত্তর ঃ

২৬	১৭	১০	১৩	১১	২৩	১০০
২১	২২	১৯	৩	২	৩৩	১০০
৯	২৮	৩	২০	৩০	১০	১০০
২৩	২	২০	১৪	৩০	১১	১০০
১৬	৫	২১	৩৮	১০	১০	১০০
৫	২৬	২৭	১২	১৭	১৩	১০০

৩। ১৪২৮৫৭

শ্রাবণ মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' সঠিক উত্তর ঃ

স্থ বাবু, সাধন, নির্ম্মল চট্টোঃ, অজিত, মনোজ এবং স্থ মুখোপাধ্যায় (বাঁকুড়া)

নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত (জলপাইগুড়ি)

প্রমীতা ও যশোজিৎ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

১। ললিতমোহন, সঞ্চিতা ও অমিতা বসু (শিবপুর)
২। প্রমীতা ও যশোজিৎ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
৩। বাপি, বুতাম ও পিণ্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

ভাদ্র মাসের "ধাঁধা ও হেঁয়ালির" উত্তর আগামী ১৫ই ভাদ্রের ভিতরেই পৌঁছানো প্রয়োজন, না হলে 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের নাম-প্রকাশ করা ঠিকমত সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। কাজেই এ বিষয়ে আসরের সভ্য-সভ্যারা যেন বিশেষ নজর রাখেন—এই আমাদের একান্ত অনুরোধ। ইতি

পরিচালক

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

বৈষ্ণব পদাবলী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

অন্য কয়েকটী সভ্য দেশের মতন ভারতবর্ষেও ধারাবাহিক-ভাবে যে সাহিত্য অধুনা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে মানুষের মন ও আত্মার পরিপোষক কাব্য, নাট্য রচনা, দার্শনিক বিচার প্রভৃতি প্রতিভার বিকাশ-ক্ষেত্র প্রচুর-পরিমাণে বিদ্যমান। বিশেষ করিয়া আধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে আমরা ভারতের যে কৃতিত্ব দেখিতে পাই, তাহার তুলনা অতি অল্প দেশেই পাওয়া যায়।

চীনের বিরাট সাহিত্য আছে। কিন্তু সেই সাহিত্যে গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশক কবিতা ও কাব্যের একান্ত অভাব। চীন দেশের প্রাচীনতম লোক-কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক হইতেছে Shih King "শ্যিঃ কিঙ"—এই গ্রন্থে মাত্র তিনশত পাঁচটী নানা বিষয়ক কবিতা আছে এবং ইহা চীনের প্রাচীন ঋষিকল্প মনীষী খুঙ্-ফু-ৎসের কর্তৃক সংগৃহীত। কিন্তু ইহাতে আধ্যাত্মিক বিষয়ক পদ সংখ্যায় নগণ্য। পরবর্ত্তীকালে চীনা কাব্য-সাহিত্যে—বিশেষতঃ বর্ণনা ও অনুভূতিমূলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় বহু-সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর রচনা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কবিগণ রাখিয়া গিয়াছেন। সুঙ্-রাজবংশের অন্তকাল খ্রীষ্টীয় তের শতক পর্য্যন্ত যে প্রাচীন চীনা সাহিত্যের ধারা চলিয়া আসিতেছে, সেই সাহিত্যে এইরূপ কয়েক সহস্র কবিতা পাওয়া যাইবে। নানা সংগ্রহপুস্তকে এই সকল কবিতা রক্ষিত হইয়া আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক আবেষ্টনী মানুষের মনকে কি করিয়া আকুল করে, সেই বিষয় এবং সুখ-দুঃখময় মানুষের জীবন, প্রেম, রাজসেবা, রাজনীতি, পাণ্ডিত্য. প্রভৃতি বিষয় লইয়া চীনা কবিতা সাহিত্যের কারবার। কচিৎ তাও ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের গভীরতর আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বিচার ও অনুভূতির কথাও ইহাতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক ইহার সীমার মধ্যে চীনের মানস-সংস্কৃতির উদ্যানে এই কবিতাবলী এক জাতীয় অতি মনোহর সুরভি পুষ্প। বিশ্ব মানবের কাছে—অবশ্য অনুবাদের সাহায্যে ইহার আবেদন পৌঁছিয়াছে।

পারস্য দেশে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে যখন সুফী মতবাদের উদ্ভব হইল, তখন এই মতবাদকে এবং ইহার অন্তর্নিহিত রহস্যবাদ, আধ্যাত্মিকতা, অনুভূতি ও উপলব্ধিকে আশ্রয় করিয়া ফারসী ভাষায় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে এখনো পর্য্যন্ত যে কবিতার পরম্পরা প্রবাহ বহিয়া আসিয়াছে, কেবল তাহারই সহিত আংশিক ভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক কবিতার তুলনা হইতে পারে। ফরীদুদ্দীন অত্তার, ওমর খয়্যাম, জালালুদ্দীন রূমী, নূরুদ্দীন জামী, সাদী, হাফিজ, খাকানী প্রভৃতি বহু কবি গজল, কসিদা, রুবাই, ও বয়েৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কবিতা রচনা করিয়া ফারসী ভাষায় সুফী আধ্যাত্মিকতার এক মহিমাময় ও সুষমাময় সম্পদ-সম্ভার উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। আমাদের ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবের পদের সহিত এই ফারসী সুফী পদের অনেক সাদৃশ্য আছে।

এইরূপ অন্য নানা সাহিত্যেও নানা ভাবের কবিতা পাই। কিন্তু এই শ্রেণীর কবিতার ভারতের মত এমন বিরাট প্রকাশ আর কোথাও পাই না। মধ্যযুগে ইয়োরোপের বিভিন্ন ভাষায় প্রেমের কবিতা ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে অবলম্বন পূর্ব্বক রচিত আধ্যাত্মিক সাধনার কবিতা কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু ভারত ও পারস্যের মত এত ব্যাপকভাবে নহে।

কম পক্ষে তিন হাজার বৎসর কালের ভারতীয় সভ্যতার অব্যাহত বিকাশের ইতিহাস আমাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই তিনহাজার বৎসরের মধ্যে বৈদিক-সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন মধ্যযুগের ও আধুনিক আর্য্য, দ্রাবিড়, এবং কোল—নানা ভাষায় সহস্র সহস্র কবিতা রচিত হইয়াছে এবং সেই সব কবিতায় বহু প্রাচীন ও

অর্ব্বাচীন সংগ্রহগ্রন্থও আছে। ভারতবর্ষের সভ্যতার ও সাহিত্যের সূত্রপাত বৈদিক যুগে। ঋক, যজুঃ, সাম, ও অথর্ব্ব এই চারি বেদে ভারত-ইতিহাসের প্রথম যুগের যে সমস্ত "সূক্ত" বা কবিতা ধার্ম্মিক ও সামাজিক জীবনকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছিল, তাহার সংগ্রহ রহিয়াছে। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস, ঋষি অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা আর্য্যজাতীয় কবিদের রচিত ও যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত পুরোহিতগণের মুখে মুখে রক্ষিত ও প্রচারিত—ভাসিয়া বেড়াইতে ছিল এই ধরণের কবিতা সংগ্রহপূর্ব্বক চারিটী গ্রন্থে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই চারিটী গ্রন্থ অর্থাৎ বেদ ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎস ও প্রেরণা। চারি বেদে সংগৃহীত এইরূপ সূক্ত বা কবিতার সংখ্যা দুই হাজারের অধিক হইবে।

এই যে দেবতা, ধর্ম্ম ও অনুভূতিমূলক কবিতা লইয়া ভারতের সাহিত্যের আরম্ভ হইল এবং মহর্ষি ব্যাস এইরূপ কবিতা-সংগ্রহের যে পথ প্রদর্শন করিলেন, ভারতে যুগে যুগে তাহাই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনা কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ, নানা পথে প্রবাহিত হইয়া যেমন প্রকাশের ক্ষেত্র পাইতে লাগিল, তেমনই ভারতীয় মানবের আত্মার প্রকাশস্বরূপ ধার্ম্মিক ও অন্যবিধ কবিতা এই সমস্ত পথকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইতে লাগিল। কিছু পরে পরে তাহার সংগ্রাহকও দেখা দিলেন এবং বহু সংগ্রহগ্রন্থও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করিল। প্রথম যুগে সাধনার পথ নির্ণয়, নানাবিধ রচনায় পথের প্রকাশ ও পরিচয়; দ্বিতীয় যুগে সেই নব-উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সাহিত্যের বিশেষত কাব্য ও কবিতার সংগ্রহ ও আলোচনা।

বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিকাশের পর বৌদ্ধ ধর্ম্ম দেখা দিল। ত্রিপিটকের অন্তর্গত পালি সুত্তনিপাত ও অন্যান্য গ্রন্থে আদিম বৌদ্ধ জগতের সাধনাকে আশ্রয় করিয়া রচিত এইরূপ পদ বা কবিতার সংগ্রহ রহিয়াছে। জৈনদের মধ্যে পদ বা কবিতা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ও উপাখ্যানের দ্বারাই বহুল পরিমাণে ধর্ম্ম, শিক্ষা ও ধর্ম্মানুভূতি প্রকটিত হইত। সেই জন্য জৈন-সাহিত্য ধার্ম্মিক-অনুভূতিমূলক কবিতায় তেমন সমৃদ্ধ নহে।

দক্ষিণ ভারতে পল্লববংশীয় রাজাদের সময় হইতে—খৃষ্টাব্দ পাঁচ শতকের পর হইতে শিব ও বিষ্ণুর প্রতীকে যে অপূর্ব্ব ভক্তিবাদ দেখা দিল, এবং যে ভক্তিবাদ প্রথম দিকে দ্রাবিড় দেশে প্রকটিত হওয়ার কথা—"উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তি" এই মন্তব্যের দ্বারা ভারতের পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ মানিয়া লইলেন, সেই ভক্তিবাদকে অবলম্বন করিয়া পাঁচ ছয় শত বৎসর মধ্যে সেই দেশে—কতকগুলি দিব্যোন্মাদ-যুক্ত সর্ব্বজন-নমস্য সাধক ও ভক্ত কবি দেখা দিলেন। ইঁহাদের রচিত পদ প্রাচীন তামিল সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের মর্য্যাদা দিয়াছে, এবং ভারতীয় সাহিত্যেরও মহিমা বাড়াইয়াছে। "নয়ন মার" নামে পরিচিত কতক-গুলি শৈব ভক্তের রচিত পদ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে "দেবা-রম" নামে এক গ্রন্থে সংগৃহীত হয়। এই গ্রন্থ দ্রাবিড় দেশে শিব-ভক্তগণের নিকট বেদের মতই মূল্যবান গ্রন্থ। তদ্রূপ ঐ যুগেই "অল্ বার" নামে পরিচিত বিষ্ণুভক্তগণ যে সমস্ত পদ রচনা করেন, সেগুলিও ঐ একাদশ শতকেই "নাল-আয়ির-প্রবন্ধম" নামক বিখ্যাত সংকলন গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের "শ্রী সম্প্রদায়ের" বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থকে বেদের সমপর্য্যায়ে—এমন কি বেদের অপেক্ষাও উর্দ্ধে অবস্থিত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সম্মান করেন।

প্রাকৃত ভাষায় রচিত নর-নারীর প্রেম বিষয়ক যে সমস্ত শ্লোক জনসমাজে লোকের মুখে মুখে ফিরিত, সেগুলির মধ্য হইতে সাত শত শ্লোক বাছিয়া সঙ্কলিত "গাথা সপ্তশতী" নামে একটী গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই শ্লোকগুলি মহাকবি হাল কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে। এই কবি হালের বয়স হইবে অন্ধ্র রাজাদের সম-সাময়িক—খ্রীষ্ট জন্মের কিছু পরে। কিন্তু ভাষা বিচার করিলে ও কবিতাগুলির বিষয়-বস্তু প্রভৃতি আলোচনা করিলে অনুমান হয় ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের বা তাহার আরো পরের একখানি প্রাকৃত কবিতার সংগ্রহ মাত্র।

ধর্ম্ম-বিষয়ক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তামিল শৈব ও বৈষ্ণব পদসংগ্রহদ্বয়ের পরেই নাম করিতে হয় শিখ-গণের "আদি গ্রন্থ" বা "গ্রন্থ সাহেব" নামক বিরাট সংগ্রহ গ্রন্থের। পঞ্চম শিখগুরু গুরু-অর্জ্জুন খ্রীষ্টাব্দের ষোল শত পাঁচ সালে প্রথম গুরু শ্রীনানক হইতে আরম্ভ করিয়া নিজেকে ধরিয়া অর্থাৎ পঞ্চম গুরু পর্য্যন্ত শিখ

গুরুগণের রচিত ভগবদ্ বিষয়ক পদ (শ্লোক, শব্দ প্রভৃতি) একত্রে গ্রথিত করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সময়ে পাঞ্জাবে ভক্ত ও সাধুদের রচিত যে সমস্ত পদ লোকের মুখে মুখে, সাধু সন্ন্যাসীগণের ও গৃহস্থ ভক্তগণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, সে গুলিও যথাসম্ভব ইহার মধ্যে আনিয়া ধরেন। এই পদগুলি প্রাচীন হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষায় ও কচিৎ অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। পদগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাগ ও রচয়িতা গুরুগণের নামে সাজানো। ইহাতে উত্তর ভারতের প্রচলিত গুরু অর্জ্জুনের পূর্ব্বকালের ও সমকালের সাধুগণের রচিত কবিতাও আছে। যেমন জয়দেব, নামানন্দ, মহারাষ্ট্রের নামদেব এবং উত্তর ভারতের কবির প্রভৃতি কবিতাকারগণ ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। গুরু অর্জ্জুনের পরে দশমগুরু গুরু গোবিন্দসিংহ পর্য্যন্ত গুরুদের রচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয়। গুরু গোবিন্দ শিখদের মধ্যে গুরুপদ লোপ করিয়া দেন। এই জন্য গুরু গোবিন্দের পর আর কাহারো কোন পদ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয় নাই। এই মহাগ্রন্থকে মধ্যযুগের পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের ভগবদ্ বিষয়ক পদের এক অভিনব সংহিতা বলা যাইতে পারে।

আমাদের বাঙ্গলা দেশে, গৌড় বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী ধারা সুপ্রাচীন কাল হইতে নিরবচ্ছিন্ন রূপে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এই ধারা রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা এই উভয়কেই আশ্রয় করিয়াই বিদ্যমান। কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত এমন কতকগুলি পদ গৌড়বঙ্গে প্রথম হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। ইহার মধ্যে কতকগুলি কাহিনী আবার অতি অর্ব্বাচীন কালেই প্রথম দেখা দেয়। সে যাহা হউক অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক হইতে বাঙ্গালা দেশের লোকভাষায় শ্রীরাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া রচিত বৈষ্ণব সাধনাত্মক পদ পাওয়া যাইতেছে। খ্রীষ্টীয় দশ শত ষাট সালের দিকে মহারাষ্ট্র দেশে সঙ্কলিত বৃহৎ সংস্কৃত বিশ্বকোষ গ্রন্থ "মানসোল্লাস" বা "অভিলাষার্থ চিন্তামণি"র অন্তর্গত সঙ্গীত বিষয়ক অংশে সংরক্ষিত কতকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পদের অংশ হইতে এবং খ্রীষ্টীয় চৌদ্দ শতকের দিকে সঙ্কলিত প্রাকৃত ছন্দোবিষয়ক গ্রন্থ প্রাকৃত পৈঙ্গলে উদ্ধৃত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকটী পদ হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। বাঙ্গালা দেশে যে সমস্ত কবি সংস্কৃতে বিবিধ ছন্দে শ্লোক রচনা করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই শ্রীরাধা কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে সুন্দর সুন্দর শ্লোক লিখিতেন। সে গুলিতে যেন পরবর্ত্তী কালের বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদের পূর্ব্বাভাস আমরা পাই। এই সমস্ত কবিদের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক রচনা আমরা খ্রীষ্টীয় বারশত পাঁচ সালে সঙ্কলিত "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে এবং পরবর্ত্তীকালে সঙ্কলিত অপর সুভাষিতসংগ্রহে ও শ্রীচৈতন্যোত্তর কালে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী গ্রথিত পদ্যাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে পাইয়াছি। বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন কতকগুলি শিলালেখ ও তাম্রপট্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও এইরূপ রচনা পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালী শ্রীজয়দেব কবিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদসাহিত্যে একটী আকর গ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে। এই মধুর কাব্য কালিদাসের মেঘদূতের মতই সমগ্র ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে সংস্কৃতজ্ঞ রসিক জনের মন হরণ করিয়া চলিতেছে। ইহাতে আমরা প্রাচীন সংস্কৃত রচনার ও মধ্যযুগের ভাষা কবিতা রচনার গঙ্গা যমুনার সঙ্গম দেখিতেছি। এই গ্রন্থে দ্বাদশটী সর্গে চব্বিশটী গান বা পদ আছে। কবি জয়দেব তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন যে ইহা একাধারে মধুর কোমলকান্ত পদের সংগ্রহ এবং উজ্জ্বল অর্থাৎ প্রেম ভক্তির গীতিময় মঙ্গল কাব্য। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের দুইটী বিভিন্ন প্রকাশ, "পদ" অর্থাৎ প্রেম ও প্রকৃতি প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রকাশক গীতি কবিতা ও মঙ্গল অর্থাৎ চরিত্র বর্ণনাত্মক মহাকাব্য এই উভয়ের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমও আমরা ইহার মধ্যে পাইতেছি। বাঙ্গলা দেশে শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের কৃষ্ণপ্রেমাশ্রয়ী বৈষ্ণব সাধনা শ্রীচৈতন্য পূর্ব্ববর্ত্তী কবি,—সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবি বড়ু চণ্ডীদাসের পদে ও পদাত্মক কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে দেখিতে পাই।

ইহার পরে আসিল শ্রীচৈতন্যের যুগ। রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা দেশে ভক্তি ও ভাবের বন্যা ছুটিল। শ্রীচৈতন্য দেবকে এক উড়িয়া ভক্ত-কবি "হরি নাম মূর্ত্তি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য দিকে বাঙ্গালী সাধক
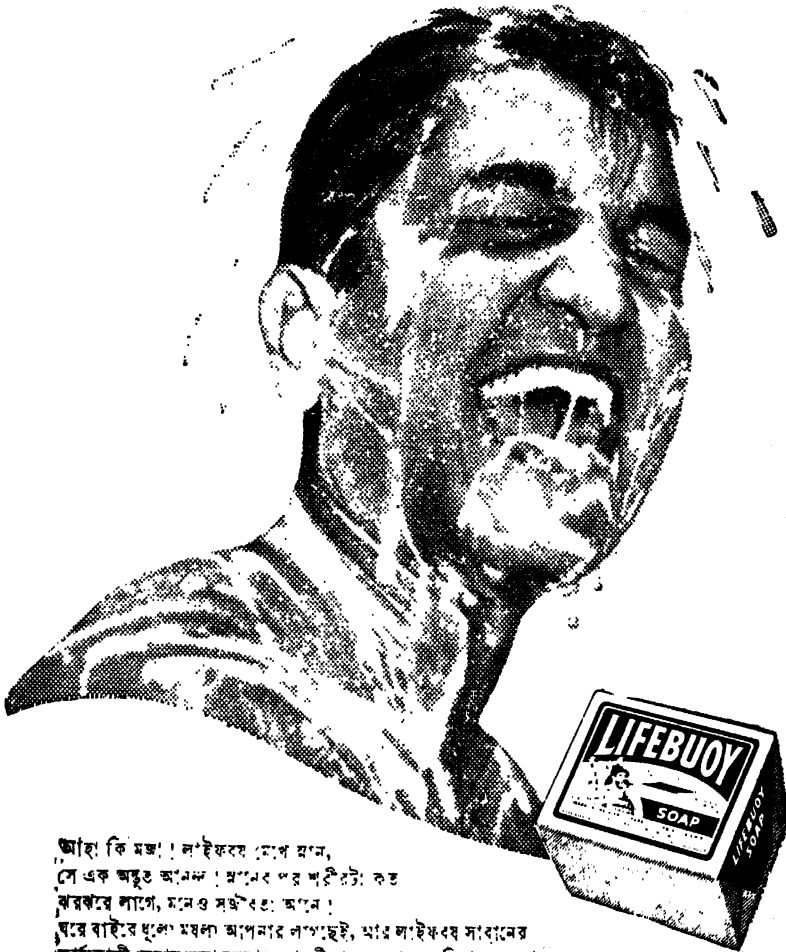
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP

তাঁহাকে রাধা প্রেমের বিগ্রহ বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য দেবের জীবন ছিল দিব্যোন্মাদ দ্বারা আবিষ্ট সাধু জীবন। যাহা শাশ্বত সত্তায় আত্মসমর্পিত হইয়াও মানব জীবনের দুঃখ, কষ্ট, শোক তাপ, পাপ ও অন্যায়কে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর আত্মার কাব্যময় প্রকাশে শ্রীচৈতন্য দেবের অমূল্য অবদান ছিল। তাঁহার পদার্পণে বঙ্গভাণ্ডার মূহ্যমান সাহিত্যোদ্যান পুনরায় নব মঞ্জরিত পুষ্প-সম্ভার-সমৃদ্ধ তরু লতায় পূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীচৈতন্য দেবের দিব্য জীবনের উজ্জ্বল চিত্র সম্মুখে রাখিয়া বাঙ্গালার কবিরা নবীন উদ্যমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলাময় উজ্জ্বল রসের পদ রচনায় মাতিয়া উঠিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য গগনে নানা তালে বিভিন্ন মধুর স্বরে সুগীত অপূর্ব্ব বিহঙ্গ-কাকলি শ্রুত হইতে লাগিল। যে সময় পদ রচনা চলিতেছিল —মুখ্যতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের দেহরক্ষার পরে একশত বৎসর ধরিয়া এই অভিনব পদ সাহিত্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার অপরিহার্য্য প্রভাব তো ছিলই, উপরন্তু অনুমিত হয় যে ফারসী সুফী গজল ও অন্য কবিতার ছায়াও তাহাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আসিয়া গিয়াছিল। কারণ এ কথা আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে যে সেকালে বাঙ্গালীরা ফারসী পড়িত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রমাণ অনুসারে জানা যায় শ্রীচৈতন্যদেব ও মুসলমান ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের দার্শনিক বিচারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; এবং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের ফারসী ভাষায় বিশেষ রূপ দখল ছিল। এই রূপে এই বৈষ্ণব পদ রচনার নূতন প্রবাহ আপন উজ্জীবনী শক্তিতে প্রাণবন্ত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে ইদানীন্তন কালে প্রায় রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছিল। এক দিকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব, অন্য দিকে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি রবীন্দ্রনাথ। কম করিয়া সাড়ে সাতশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৈষ্ণব পদ রচনার পরম্পরা জাহ্নবী প্রবাহের মত বাঙ্গালীর প্রাণ মন আত্মা ও দেহকে সরস ও পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। জয়দেবের গীত-গোবিন্দের পদ কয়েকটি শব্দে ও ব্যাকরণে সংস্কৃত হইলেও ছন্দে ভাবে ও অন্ত্যানুপ্রাসে প্রাকৃত বা প্রাচীন বাঙ্গালার সমগোত্রীয়। আবার এ দিকে বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা অনুবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালার ব্রজবুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করিয়াছেন তাহাও পদাবলী সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

বাঙ্গালা দেশের এই বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে যেমন সংস্কৃত প্রাকৃত ও অনুমিত ফারসী প্রভাব ছিল, তেমনই ইহাতে বিদ্যাপতি প্রমুখ মৈথিলী কবির প্রভাবও আসিয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত গোস্বামীগণের মাধ্যমে আবার ব্রজ-ভাষা হিন্দীর প্রভাবও আসিয়া পড়ে। মনে রাখা দরকার যে ব্রজভাষা হিন্দীতে রচিত নাভাজী কৃত বৈষ্ণব-ভক্ত-চরিত গ্রন্থ ভক্তমাল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালাতে অনূদিত হইয়াছিল। মৈথিলীর প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল হইতেছে— বাঙ্গালার পদাবলী সাহিত্যে ব্যবহৃত ব্রজবুলি নামক অতি মধুর এক কৃত্রিম ভাষা। এই ভাষা মুখ্যতঃ বাঙ্গালীর হাতে পরিবর্ত্তিত মৈথিলী। বাঙ্গালা দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি যেমন গোবিন্দদাস প্রভৃতি এই ভাষায় অপূর্ব্ব সুন্দর পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

সাড়ে সাতশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় যে পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূল্য সম্বন্ধে বাঙ্গালী প্রথম হইতেই অবহিত ছিল। গীতগোবিন্দের পদের অনুকরণ ও শুদ্ধ বাঙ্গালায় তাহার অনুবাদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচনাতেই আমরা পাইতেছি। চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার শিষ্যেরা বাঙ্গালার চণ্ডীদাস ও মিথিলার বিদ্যাপতির পদ গান ও আলোচনা করিতেন। সুতরাং এই সাহিত্যের মর্য্যাদা সম্বন্ধে বৈষ্ণব দার্শনিক ও ভাবুকগণ চৈতন্যদেবের সমকাল হইতেই সচেতন হইয়াছিলেন। এই পদ-সাহিত্যের রচয়িতাগণকে বৈষ্ণব সমাজ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে মহাজন বা বৈষ্ণব মহাজন এই সম্মানের আখ্যা প্রদান করিতে লাগিলেন।

পদাবলী সাহিত্য প্রচুরভাবে রচিত হইবার পর তাহার রক্ষণ ও বিচারের জন্য সংগ্রহগ্রন্থের আবশ্যকতা অনুভূত হইল। এদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে উজ্জ্বল রস বা কৃষ্ণ-প্রেম সম্বন্ধে চিন্তা বিচার ও সিদ্ধান্তের প্রকাশমূলক গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল। বৈষ্ণব পদাবলী আধ্যাত্মিক জীবনের অবলম্বনরূপে নির্দ্দিষ্ট ও বর্গীকৃত হইল। মোটের উপর বিরাট এক রসশাস্ত্র গড়িয়া উঠিল এবং রাধাকৃষ্ণ প্রেমের কবিতা এই রস-শাস্ত্রের বিধানে পূর্ব্বরাগাদি পর্য্যায়ে বিভক্ত হইল। বৈষ্ণবপদের সংগ্রহকারগণ এই সমস্ত পর্য্যায়

ধরিয়া তাঁহাদের সংগ্রহ সাজাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে টীকাকারও দেখা দিলেন।

বাঙ্গালা দেশে জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতক পর্য্যন্ত প্রায় তিনশত পদকার বাঙ্গলা ভাষাকে পদসাহিত্যে অলঙ্কৃত করেন। ইহাদের মধ্যে কেহ ভাল, কেহ মন্দ, কেহ বা ভাল মন্দ উভয়াত্মক পদ রচনা করিয়াছেন। কেহ বা কয়েকটী, কেহবা একটী, কেহ দুইটী বা চারিটী উৎকৃষ্ট পদমাত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ এই সব কবির এই এই সংখ্যক পদমাত্রই পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছেন, বৈদ্য ও কায়স্থ আছেন, তথাকথিত নিম্নজাতীয় কবি, এমন কি সহৃদয় মুসলমান সমাজের কবিও আছেন। ইঁহাদের পদ লইয়া বঙ্গদেশে মুদ্রিত ও হস্ত লিখিত যে কয়খানি সংগ্রহ-গ্রন্থ পাওয়া যায় সমালোচিত গ্রন্থের ভূমিকায় তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রহিয়াছে।

প্রাচীন সংগ্রহগুলির মধ্যে বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাতে তিন হাজার একশত আন্দাজ পদ আছে। আধুনিক সংকলনগ্রন্থ পদামৃতমাধুরীতে বোধ হয় তিন হাজারেরও কিছু বেশী পদ ছিল। সম্প্রতি বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদসাহিত্যের যে নবীনতম সংগ্রহ পুস্তক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন, সরস্বতী প্রেস হইতে মুদ্রিত সাহিত্যসংসদ প্রকাশিত সেই "বৈষ্ণব পদাবলী" বাঙ্গালার বৃহত্তম সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহাতে দুইশতজন পদকর্ত্তার তিন হাজার সাত শত ছাপান্নটী পদ আছে। সংকলন কর্ত্তা কবির নাম অনুসারে কালক্রমবিচারে রস-শাস্ত্রের পর্য্যায় ধরিয়া পদগুলি সাজাইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব পদকর্ত্তার সংখ্যা প্রায় তিনশত, এমন কি তাহার বেশীও হইতে পারে। ইহাদের রচিত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পদের সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার দাঁড়াইবে। এতগুলি পদের "Corpus" অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলন কঠিন কাজ, আর তাহার সাহিত্যিক তাগিদও নাই। আবার ইহার মধ্যে বহু নীরেস পদও থাকিবার কথা। এই জন্যই আমি এই নূতন সঙ্কলন গ্রন্থটীকে স্বাগত জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ঘুণ বলিলেও চলে। পদাবলী সাহিত্য তাহার মত এতটা নখদর্পণে আর কাহারো আছে বলিয়া আমি জানি না। সাহিত্যিক নিষ্ঠার সহিত তাহার ভাবয়িত্রী প্রতিভার নিকষে তিনি যতগুলি পদকে সাহিত্য রসের প্রকাশক বলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন, প্রায় সেই সমস্ত পদকেই নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ইহাতেই পদের সংখ্যা কিছু কম প্রায় চারি হাজার দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের মর্য্যাদা ও মূল্য কত অধিক, ইহা হইতেই আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি। স্থানাভাব হেতু এই গ্রন্থে তিনি অনেক পদ ধরিতে পারেন নাই। এতদ্ভিন্ন তাঁহারও আলোচনার বাহিরে বহু উৎকৃষ্ট পদ থাকা অসম্ভব নহে।

যাহা হউক এই নব-প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা বাঙ্গালী পাঠকগণ আমাদের সাহিত্যের যথাসম্ভব একটী সম্পূর্ণ সংগ্রহগ্রন্থ পাইলাম। সম্পাদনা কার্য্যে সুপণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রথম কথা তিনি বহু পদের পাঠ বিভ্রাটের ব্যাসকূটের সমাধান করিয়া যথাসম্ভব শুদ্ধ পাঠ ধরিয়া দিয়াছেন। প্রচলিত পদাবলীসংগ্রহগুলির সঙ্গে মিলাইয়া এই গ্রন্থখানি পড়িলেই তাহা জানা যাইবে। সাধারণ ভাবে এই হেতু পদের কদর্থ করিবার সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পদের পাঠ বিভ্রাট না থাকিলেও সঙ্গত অর্থ বাহির করা একটু কঠিন হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেগুলিও এড়াইয়া যান নাই। বরং অতিশয় যত্ন সহকারে ঐ সমস্ত জটিল দুর্ব্বোধ্য পদের অর্থ করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তিনি অনেক পদের ব্যঞ্জনাবেদ্য গূঢ় অর্থও নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রন্থে বহু নূতন কবির অনেক নূতন পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। পদাবলী সাহিত্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রসজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার প্রবণতা এতই সুবিদিত যে এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন! গ্রন্থে একটী সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আছে। সম্পাদকের স্বভাব-স্নিগ্ধ রচনা-শৈলীতে ভাব-সম্বদ্ধ সুন্দর ভাষায় তাহা সমুজ্জ্বল। ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় কিছু নূতন কথা বলিয়াছেন, এবং পদাবলী সাহিত্যের প্রকাশ ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার নিকট সুবিস্তৃত ভূমিকায় বৈষ্ণব কবিগণের জীবন-

কথা ও কবিতার তুলনামূলক আলোচনা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।

প্রায় বারশত পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থখানির বাহ্য সৌষ্ঠব অনবদ্য। পাতলা মসৃণ কাগজে সুন্দর ছাপা বইখানি আরামের সঙ্গে পড়া যায়। সাহিত্য সংসদ বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্লাসিকের বা প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থের সুন্দর সুন্দর সংস্করণ আমাদের দিয়াছেন। যেমন দুইখণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী; এক খণ্ডে রমেশচন্দ্রের সমস্ত বাঙ্গালা রচনা এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণের অপর একটি চমৎকার চিত্র সম্বলিত প্রামাণ্য শোভন সংস্করণ। সংসদের সত্বাধিকারী ও সঞ্চালকগণ—বিশেষ করিয়া শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই জন্য বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদার্হ। তিনি সাবধানে গ্রন্থের পদসূচী ও অপ্রচলিত বহু শব্দের অর্থ সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থখানির উপযোগিতা বাড়াইয়া দিয়াছেন। একণে পদাবলী সাহিত্যের সম্পূর্ণ সম্পুট স্বরূপ এই বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থখানি সাহিত্য-প্রেমী ও সংস্কৃতিকামী বাঙ্গালী ও বঙ্গভাষার অনুরাগী সজ্জনগণের গৃহে গৃহে বিরাজ করুক এই কামনা করি।

* ৩২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড হইতে সাহিত্য-সংসদ প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলী। মূল্য ২৫৲ পঁচিশ টাকা।

প্রতীক্ষা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

দিদিমা মোদের যেতেন 'গঙ্গা নাইতে',
গরুর-গাড়ীর পথ চেয়ে থাকি মোরা,
সে পথ-চাওয়া যে মিষ্ট সবার চাইতে—
প্রাপ্যের চেয়ে আনন্দ বুকজোড়া।

২

দূরে বহু দূরে যেত থর শিশু দৃষ্টি,
সকল গাড়ীকে মনে হত সেই গাড়ী,
'বলদে'র রঙ, বদলাতো অনাসৃষ্টি।
'টপ্পর'গুলা ভ্রম লাগাইত ভারি॥

৩

ছুটিয়া যেতাম দূর থেকে গাড়ী দেখে,
গাড়ী নয়—মহারাণীর সে ভাণ্ডার!
সকল জিনিষই আসিত আদর মেখে,
'বাঁশী' টুমটুমি' 'লাট্টু' কত কি আর।

৪

দিদিমার হাসি ঢল ঢল স্নেহ রসে—
সে দৃষ্টি শুধু সোহাগ, মমতা মাখা,
প্রাণ ঢের শোনে—কানে ক'টা কথা পশে?
মোরা মৌমাছি—দিদিমা আঙুর পাকা।

৫

সে পথ-চাওয়ায়—শুধু আনন্দ, আশা,
ছিলনাক দ্বিধা শঙ্কা কি সঙ্কোচ,
কানায় কানায় পূর্ণ সে ভালবাসা—
মেনকার গৃহে যেন অমৃতের ভোজ।

৬

তারপর কত বছর চলিয়া গেছে—
জীবন কাটিল কেবলি প্রতীক্ষায়।
আনন্দের সে স্মৃতিটুকু মনে আছে
আবীরের গুঁড়ি উৎসব আঙিনায়।

মার জন্যে

অনুবাদ—অমল হালদার

মার অসুখ, মা বিছানা নিয়েছেন। বাতের যন্ত্রণায় মার অস্থিরতা দেখছি আর মনে পড়ে যাচ্ছে আমার যখন অসুখ হয়েছিল, মা তখন আমাকে ভালো করবার জন্য কি রকম ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। অষুধ খাইয়ে আমাকে চুমু দিয়ে, মা আমাকে সুস্থ করে তোলবার জন্যে সব সময়ে আমার বিছানার পাশে বসে থাকতেন। তা সে যে রকম অসুখই আমার হোক না কেন, মায়ের এই ব্যাকুলতা একটুও কম হয় না। স্কেটিং করতে গিয়ে হাতের কনুইটা একবার সামান্য মুচকে গিয়েছিল, আর আমার সেই এক-টুকু যন্ত্রণাতেই মা কাতর হয়ে পড়েছিলেন। আমার সেই মায়ের এখন অসুখ, আমাকে একলা একলা বিছানায় ঘুমতে যেতে হবে ভাবতেই বিশ্রী লাগে, মনে হল, মাকে সেবা করার দরকার। মা যেমন আমার অসুখের সময় সেবা শুশ্রূষা করেন তেমনি করে। বায়না ধরলাম স্কুলে যাব না আমি। তার বদলে বাইরে বারান্দায় বসে পড়া তৈরী করব।

আর মার শুশ্রূষা করা? পড়ার ফাঁকে ফাঁকে এখন তখন রান্নাঘরে গিয়ে মার জন্য গরম গরম চা তৈরী করে দিচ্ছি! কখনও বা মার ক্লান্ত মাথার তলায় বালিশ-গুলো ঠিকঠাক করে দিচ্ছি। কখনও বা মাকে গল্প শোনাচ্ছি। অদ্ভুত সব বীরত্বের গল্প, আর নিঃসন্দেহে সে সব গল্পের বীর নায়ক আমিই।

মায়ের বাতের অসুখের জন্যে দুঃখও যেমন আমার হয়েছে, তেমনি আনন্দ হয়েছে এই কথা ভেবে, আমি বড় হয়ে উঠেছি, মার কাজে আসতে পারছি। তাই মাঝে-মাঝে ঘুঁষি পাকিয়ে নিজের মনে-মনে নিজেকে শোনাই 'এ পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই, যা আমি আমার ভালো করার জন্যে করতে ভয় পাব। আমি এখন বড় হয়েছি।'

—'বাপি' মা ঘর থেকে দুর্বল গলায় আমায় ডাকতেই আমার ছোট বুকটা কেমন করে উঠল। 'একটা কাজ করবি রে?' 'নিশ্চয়, মা-মণি তুমি যা বলবে তাই করব।'

'তোর পক্ষে কাজটা করা শক্ত হবে। খুব ছোট। ও তুই হয়তো—তোর লজ্জা হবে।' 'উ লজ্জা, আমি ছোট আছি নাকি, এখন কত বড় হয়ে গেছি না। তাছাড়া তুমি আবার ভাল হয়ে উঠবে, গান গাইবে, হাসবে, আমার জন্যে পিঠে তৈরী করবে। তোমার যা ইচ্ছে তাই বল মা-মণি আমি করব।'

মা হাসলেন, তারপর আমাকে কাছে টেনে এনে অতিকষ্টে অস্ফুট গলায় বললেন, 'আমার নাইট গাউন-গুলো সব মলম লেগে বিশ্রী নোংরা হয়ে গেছে; আমার কি মনে হচ্ছে জানিস, যদি এখন নতুন একটা পরিষ্কার গাউন পরি তাহলে হয়ত অনেকটা ভাল বোধ করব।'

মা কি আনতে বলেছেন শুনে ইতিমধ্যে আমার মুখ-চোখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে। 'কি-রে-যাবি? মেয়েদের ষ্টোরটাও চিনিস, সেখানে গিয়ে তোর পছন্দমত কিনে আনবি একটা। বাবার নাম করে আনবি, ওরা তোর বাবাকে বিল পাঠিয়ে দেবেখন।'

মায়ের কাছ থেকে পিছিয়ে এসে বসে পড়লাম। মায়ের প্রস্তাবে আমি মুষড়ে পড়েছি। চুপচাপ আমি। অনেকক্ষণ পরে বললাম, 'মা-মণি, মেয়েদের দোকানে গিয়ে তোমরা জন্যে নাইট গাউন কিনতে আমার লজ্জা হবে যে, যদি

স্কুলের কোন ছেলে দেখে ফেলে, না মা-মণি, তুমি আর যা বলবে তাই করব, এ কাজটা করতে বলো না আমাকে, লক্ষীটি।'

মা নিঃশ্বাস ফেলে বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বুজলেন। তারপর শুধু বললেন, 'আচ্ছা।'

বারান্দায় ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে পড়বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পড়াটা অসম্ভব হয়ে উঠল। নিজেকে খুব অসুখী মনে হল, নিজের অলসতায় নিজের জন্যে লজ্জা হচ্ছে আমার। সিঁড়ির উঁচু জানালাটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। জানলায় লাগানো নানা রঙের কাঁচগুলোর দিকে চাইলাম। প্রথমে নীল কাঁচ—তারপর গোলাপী কাঁচের মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। ভাবলাম, যদি তুমি কাপুরুষ ভীতু হও তাহলে তুমি নীল কাঁচের মধ্য দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখবে, আর যদি তুমি সাহসী হও তাহলে দেখবে এই গোলাপী কাঁচটা দিয়ে। কিন্তু তুমি যে কাঁচের মধ্য দিয়েই দেখ, পৃথিবীটা একই রকম থাকবে। এখন তুমি কি করবে তাই ভাব।

ছোট আমি, ছোট এই দার্শনিকতা। আমায় ভাবিয়ে তুলল। মা তোমার অসুস্থ, তুমি না মাকে বলেছ তুমি কত সাহসী! এখন ত দেখছি তুমি একেবারে ভীতু। নিজের মনে কথাগুলো নাড়াচাড়া করে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। তারপর টুপিটা নিয়ে মার ঘরে আবার ঢুকলাম। মা তখনও চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন। মাকে শুনিয়ে বললাম, 'খেলতে যাচ্ছি মা-মণি, এখনই ফিরব।'

মেয়েদের বড় ষ্টোরটার পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে-যেতে র‍্যাকে সাজানো অদ্ভুত রহস্যময় গোলাপী আর সাদা রঙের অঙ্গরাগগুলোর দিকে উঁকি মেরে দেখলাম। তারপর সিরিয়াল ডিটেকটিভ ফিল্মের অপরাধীর মত রাস্তাটার এপাশ ওপাশ ভালভাবে চোখ বুলিয়ে দিয়ে ষ্টোরের ভেতরে ঢুকে গেলাম। আমার চারধারে মেয়েদের বহু বিচিত্র বেশবাস সাজানো। এসব জিনিস আমি এর আগে কোনদিন দেখিনি।

কাউণ্টার থেকে একটি সুন্দর দেখতে মেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি চাই তোমার খোকা?' ফিস্-ফিস্ করে কোন রকমে বললাম, 'আমার চাই মানে আমার মার খুব অসুখ কিনা···আর ইচ্ছা ছোট ছোট হাত দুটো দিয়ে আমি কাউণ্টারটা আঁকড়ে ধরে মার কথা ভেবে আমার মনে তবু কিছুটা সাহস হল।

তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে বোঝাতে লাগলাম, আমার একটা নাইট গাউন চাই। আমার মার জন্যে—মার বাত হয়েছে কিনা, নষ্ট হয়ে গেছে, মার গাউন, নতুন সুন্দর একটা নাইট গাউন চাই।

ষ্টোরের মেয়েটি একটা বড় বাক্স থেকে একটা গাউন বার করে খুলে ফেলে আবার চোখের সামনে নাচায়। ইস্ এত বড় নাইট গাউন মা কি করবে?

চোখ মুখ আমার লাল হয়ে উঠল, করিডরের দিকে চোখ রাখতে গিয়ে চমকে উঠলাম। মিসেস ফ্রেমিংহাম তার ছোট ছেলেটাকে নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। মিসেস ফ্রেমিংহাম আমাকে চেনে যে! তাড়াতাড়ি কাউণ্টারের ভেতর ঢুকে গিয়ে ব্যস্তভাবে মেয়েটির পাশে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়াই, মিসেস ফ্রেমিংহাম ছেলেটাকে নিয়ে বাইরে চলে গেলে, তবে কাউণ্টারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম। কাউণ্টারের মেয়েটি খুব হাসছে। 'কি হল তোমার খোকা?' 'কিছু না' তাড়াতাড়ি বললাম আমি। 'তাহলে এই গাউনটা তোমার পছন্দ ত?'

'—পছন্দ? হাঁ, উহু না, আমি ঠিক জানি না।' মেয়েটি আমার কথা শুনে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে আর একটা বাক্স বার করে। একটা নীল রঙের গাউন, সুন্দর লেস দেওয়া।

তোমার মার কি রকম চেহারা, আমার মত?

মেয়েটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। আমার যে একটু আগে লজ্জা করছিল তা ভুলে গেছি।

আমার অবস্থা দেখে মেয়েটা হাসে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার মা খুব সুন্দর, না? কি রকম গাউন তোমার মার পছন্দ, খুব সাদাসিধে, না লেস দেওয়া কাজ করা?'

এবার আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'মা, মা আমার খুব সুন্দর। বাবা বলে মা রাণীর মত।'

রাণী! তাহলে ঠিক জিনিষই বার করছে মেয়েটা হেসে। এবার বাক্স থেকে একটা কালো রঙের নাইট গাউন বার করে। অপূর্ব সূক্ষ্ম কারুকার্য-করা গাউনটা দেখে মুগ্ধ হলাম আমি। পোষাকটা এত পাতলা যে পোষাকটার মধ্যে দিয়ে আমি মেয়েটার মুখ দেখতে পাচ্ছি।

আনন্দে তাই বললাম, 'বাঃ এই ত আমি চাইছি। নিজে বড় হয়েছি এই উপলব্ধিটা এই মুহূর্ত্তে মনে হল আবার। তাই মেয়েটিকে গম্ভীর গলায় বললাম, পোষাকটার জন্যে আমার বাবাকে বিল করবেন। বাবার নামটা জানালাম মেয়েটিকে। মেয়েটি গাউনটা বাক্সয় পুরে দেয়। বড় বাক্সটা নিয়ে আমি ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে এলাম। বিশ্রী গরম হচ্ছে, খুব ক্লান্ত লাগছে, তবু মনে হল আমি আজ বিজয়ী। যে কাজ করতে আমি ভয় পাব ভেবেছিলাম, তাই আমি মার জন্যে করতে পেরেছি।

মা আমার হাত থেকে নিয়ে আস্তে আস্তে বাক্সটা খুলে ফেলেন; আনন্দ আর বিস্ময়ে মার চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করে উঠল। কি সুন্দর! তুই নিজে পছন্দ করে এনেছিস বাপি? হুঁ—বিনয়ের অবতার আমি। কি করে এটাই পছন্দ করলি? এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলাম, তারপর বোকার মত হাসলাম। বাঃ তুমি ত রাণী, বাবা বলে না, আর এই নাইট গাউন ত রাণীদের জন্যে। রূপ-কথার বইয়ে কত ও রকম রাণীর পোষাক দেখেছি আমি এমনি সুন্দর। মা আমাকে অনেকক্ষণ ধরে আঁকড়ে ধরে রইলেন, মনে হল মার গাল বয়ে একটা চোখের জলের ছোট ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল আমার গায়ে।

তোমার বাতের জন্যে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে না মা মণি? নারে বাপি, আমার এখন কোন কষ্টই নেই—আমি আনন্দে কাঁদছি।

পরের দিন মা অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছেন, রাণীর মত নাইট গাউনটা পরে বিছানায় বসে রয়েছেন। বাবা আমার কীর্ত্তি-কলাপ শুনে পরিহাস করে মাকে বললেন, জানো, আমি ভাবছি এবার দরজীকে দিয়ে আমিও রাজার মত পোষাক তৈরী করব। আর কিনব চারটে শাদা ঘোড়ার একটা গাড়ী খুব শীঘ্র।

মা হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বেশ ত, এখানে আমাদের হবে সুন্দর শান্ত এক রাজপ্রাসাদ, কেমন!'

---

* মার্কিন লেখক রবার্ট ফন্টেইন এর "A Night Gown For The Queen" এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

আচার্য্য-স্মরণে

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

রসায়ন-গুরু তুমি; শতাব্দীর ছিলে বৈজ্ঞানিক,
নব নব সৃষ্টি-যজ্ঞে ছিলে তুমি হে মহাঋত্বিক
অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত। অতীতের পুণ্যব্রত
আর্য্যতাপস
ছিলে তুমি জননীর; আলোকিত অন্তর-মানস
প্রজ্ঞার হোমালোকে। তুমি ছিলে
বিবাগী সন্ন্যাসী,
মুক্ত হৃদয় বিস্তারি'
মানবের রচেছ কল্যাণ।
দিয়েছ সন্ধান
নীরোগ ভবিষ্যের। বিজ্ঞানের রচেছ কৃষ্টি—
আর করেছ সৃষ্টি
সন্ধানী বিজ্ঞানী সেবকের। ন্যূনতম দীনতম সাজে
ধরণীর মাঝে
দরদী বন্ধুর বেশে হারালে জীবন।
তা'র লাগি' এ পৃথিবী করিবে স্মরণ
অম্লান স্মৃতিখানি তব
অপরূপ অভিনব।
অন্তরের মণিকক্ষে তুমি রাজো চিরদীপ্যমান,
প্রণমি তোমারে দেব বরণীয় মহামহীয়ান।
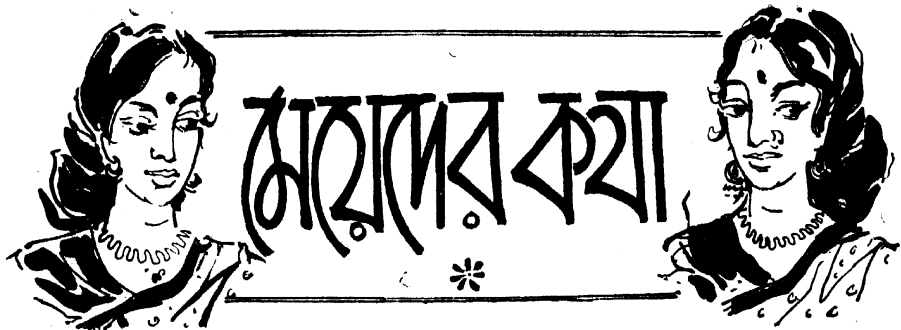
সামাজিকতা

শ্রীমতী বেলা দেবী

বার বছরের মেয়ে মিতালী এক মাথা ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে নাচতে নাচতে ছুটে এলো—ওমা, কি মজা! কি মজা!

রন্ধন নিরতা অপর্ণা কড়ার মাছগুলো খুন্তির সাহায্যে উল্টে দিচ্ছিল, মেয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল—কিরে মিতু, কি হয়েছে?

মিতালীর চোখেমুখে কণ্ঠস্বরে খুশি যেন উপচে পড়েছে, অপর্ণার চোখের সামনে একটা গোলাপী রংএর খামের চিঠি বার দুই নেড়ে দিয়ে বললে—মা দেখ, আর একটা বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠি। কি মজা! এ মাসে আমাদের পাঁচটা বিয়ে বাড়ীতে নেমন্তন্ন, না মা, এ নিয়ে পাঁচটা হলো না? আঃ, কত নেমন্তন্ন খাব।

আট বছরের হাবলু বলল—বিয়ে বাড়ীতে কত কি খেতে দেয়, লুচি, সন্দেশ, দই, লেডি-কেনি আরও কত কি! নারে দিদি—বলতে বলতে হাবলুর জিভ ভিজে এলো। চোখ দুটো চকচক করে উঠল খুশিতে।

অপর্ণা মেয়ের হাত থেকে শুভবিবাহ লেখা, শঙ্খ প্রজাপতি আঁকা খামখানি টেনে নিলে। খুলে একবার চোখ বুলিয়ে পাশে রেখে দিলে।

মায়ের কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে মিতালীর ফুলে-ওঠা উৎসাহের ফানুসটা যেন চুপ্‌সে মিইয়ে এল, মা'টা যেন কি! বিয়ে বাড়ীতে নেমন্তন্ন কি মজার ব্যাপার! শুধুই কি রসনা লোভন খাবার দাবার! কত আলো কত ফুল, কত লোকজন, কত সমবয়সী সঙ্গীসাথী, ছুটোছুটি লুটোপুটি, বর কনে, শাড়ি গয়না। দেখবার কত জিনিস, মিতালী তো যেদিকে তাকায় আর চোখ ফেরাতে পারে না। ইচ্ছে হয় তাকিয়েই থাকে, এমন মজার ব্যাপারেও কিনা মার মুখ কালো। ধুৎ, মার মোটে বুদ্ধি নেই।

এ দিকে অপর্ণার চোখের সামনে অন্ধকার। মনের তলায় গভীর চিন্তা, পাঁচ খানা বিয়ের চিঠি এসেছে, আত্মীয়তাসূত্রে কেউ দূর নয়। চিঠির মধ্যে যদিও লেখা আছে লৌকিকতার পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়, তবু শুধু হাতে তো আশীর্ব্বাদ করা যায় না। সামাজিকতার ঠাট বজায় রাখতেই হয়। এতে আর পাঁচটা দিক বজায় থাক আর না থাক্।

অপর্ণাদের মধ্যবিত্ত পরিবার। পরিবারে উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি মাত্র একজন। স্বামী প্রভাত, তাদের একটি মেয়ে দু'টি ছেলে, বিধবা শাশুড়ি ও অপর্ণা নিজে—সংসারে এই ছয় জন পুষ্যি। স্বামীর মাসিক বেতন সর্বসাকুল্যে তিনশটি টাকা। এর মধ্যে ছয়টি প্রাণীর খোরাক পোষাক, বাড়ীভাড়া, ইলেকট্রিক বিল, ছেলেমেয়ের পড়াশুনো, প্রাইভেট টিউটর, আত্মীয় কুটুম্ব, লোক-লৌকিকতা। মানে ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। মাসের শেষ পড়লে যেন সমস্যা। তার উপর যদি পাঁচ পাঁচটা বিয়ের চিঠি আসে এক মাসের মধ্যে—তবে টাল সামলানোই যে মুস্কিল।

সামনে পড়ছে চত্তির মাস। তাই এই ফাল্গুনে বিয়ের বেজায় ধূম। যাদের হাতে দু পয়সা আছে আর জুতসই সম্বন্ধও একটা জুটে গেছে, তারা বোশেখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নয়। কোন মতে চার হাত এক করে দিতে পারলেই নিশ্চিন্দি। কিন্তু যত মুস্কিল যে সমাজের মধ্যবিত্তদের। না আছে সামাজিকতার দায়গুলো বহন করবার ক্ষমতা, না আছে সমাজের বাঁধা নিয়মগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার সাহস। অপর্ণার নিজের কথাই ধরা যাক্। তিনশটি টাকা নেড়ে চেড়ে অনেক হিসেব করে মাসের ত্রিশটি দিন কাটাতে হয়। এর উপর পাঁচটি বিয়ের নেমন্তন্ন তো তাকে রক্ষা করতে হবে। সমাজে বাস করে সামাজিক নিয়মগুলো না মেনে তো উপায় নেই। নিজের ভাইঝির বিয়ে। বড় দাদার প্রথম মেয়ে, সেখানে যেমন তেমন কিছু দেওয়া চলে না। তাই পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একজোড়া কানের ফুল করাতে হলো, এর কমে মান থাকে না। সে তো মেয়ের একজন পিসী। পনর টাকা করে দুখানা শাড়ি কেনা হয়েছে পিসতুত ননদ আর বাড়িওয়ালার ছেলের বৌকে দেবার জন্য, আপন পিস-শাশুড়ির দিকের ননদ—আত্মীয়তায় এমন কিছু ফ্যালনা নয়, আর বাড়ীওয়ালা বাড়ীর গায়েই থাকে, দু বাড়ীতে খুব মাথামাখি, কাজেই এর কমে মুখরক্ষা হয় না। স্বামীর অফিসের ম্যানেজারের মেয়ের বিয়ে, চেপে ধরেছে অপর্ণাকে শুদ্ধ নিয়ে যাবার জন্য। অন্ততঃ টাকা কুড়ি দামের একখানা শাড়ী না হলে তো অপর্ণা সেখানে যেতেই পারে না! লজ্জা! তার উপর—আজ আবার চিঠি এসেছে—স্বামীর বন্ধু অবনীবাবুর মেয়ের বিয়ে, সেখানে কিছু না হোক দশটা টাকা তো চাই। তাহলে সর্ব্বসাকুল্যে কত বেরিয়ে গেল লৌকিকতার দৌলতে। এই টাকাটা চলে গেলে অবশিষ্ট যা থাকবে তা দিয়ে কি করে অপর্ণা সংসার চালাবে, বাড়ীওয়ালা ভাড়া চাইবে, ইলেকট্রিক বিল আসবে, ছেলেমেয়ে স্কুলের বেতন চাইবে, টিউটর মাইনে চাইবে। শাশুড়ির কাপড় ছিঁড়েছে, একজোড়া থান এ মাসে না আনলেই নয়, তারপর কয়লা গয়লা মুদি—উঃ, অপর্ণা আর ভাবতে পারে না। মাসের শেষে এবার হয়ত অপর্ণার একখানা গয়নাই বাঁধা পড়বে।

আচ্ছা, এ দশা তো শুধু অপর্ণারই নয়, সমাজের কিছু-সংখ্যক অবস্থাপন্ন ছাড়া প্রায় সকলেরই, তবে সবাই কেন অন্ধভাবে এই পীড়াদায়ক নিয়মকানুনগুলো মেনে নিচ্ছে। যে নিয়ম শান্তি দিতে পারে না, সমস্যার সমাধান আনতে পারে না বরং সমস্যা বাড়িয়েই তোলে সে নিয়ম কি চির-দিন সমাজের বুকে চেপে বসে থাকবে? সংস্কারের ভিতটা কোনদিনও টলবে না? অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কতগুলো নিয়মের নাগপাশে বন্দী হয়ে সমাজের মার খাবে অপর্ণার মত প্রতিটি মধ্যবিত্ত পরিবার? এর কি কোন প্রতিকার নেই?

—

রমণী রত্ন

যুগ-পরিক্রমা

শকুন্তলা

কালের প্রবাহে ঝঞ্ঝামুক্ত গতিপথ রচনা করে যায় ঘটনা সম্ভারে ভরা কত সুন্দর সুন্দর পরিবেশ। ফলে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে যাত্রার ইতিহাস ও কাহিনী। আর এই ইতিহাস ও কাহিনীর বুকের উপর দিয়ে কত বর্ষা কত শীত ও বসন্ত চলে গেছে। কারও জীবনে এসেছে যৌবন ভরা বসন্ত, এসেছে লাঞ্ছিত জীবনের হতাশ, এসেছে বর্ষার বেদনা, তবু তারা এসেছে ও গিয়েছে।

বিচিত্র এই গতিপথ।

একটি বজরা এগিয়ে চলেছে। নবদ্বীপ থেকে চলেছে অগ্রদ্বীপ। অগ্রদ্বীপ হয়ে কোলকাতা আসার পথে চন্দননগরের কাছে বজরায় একদল দস্যু পড়ল। বজরার পাইকরা তাদের হটাবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করল। ফলে উভয় পক্ষেই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার সুরু হয়ে গেল। বজরার ভিতর থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এলো: এরা কি চায়?

—দস্যুদের একজন জবাবে বলল: আমরা কিছু পেলেই চলে যাব। কারুর জীবনহানি ঘটাতে চাইনে।

—নারীকণ্ঠ: তোমরা দলে কজন আছ?

—মোট বারো জন।

—আমার কাছে এখন বেশী কিছু নেই, তোমরা যদি কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পার তো, আমি তোমাদের জন্য বার হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবো। আর যদি অবিশ্বাস হয়, আমার গলায় আছে সোনার হার, আর—

—আপনাকে আমরা চিনি, আপনাকে অবিশ্বাস করবো না। আপনার প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট।

বলা বাহুল্য, যথা সময়েই দস্যু দল চলে গেল, পরদিন যথানির্দ্দিষ্ট স্থানেই তারা প্রতিশ্রুত অর্থ পেয়েছিল।

কে দিয়েছিল এই প্রতিশ্রুতি! কে রক্ষা করেছিল সে প্রতিশ্রুতি! অরণ্য কানপেতে শুনেছিল। চুপি চুপি বলেছিল: তুমি রাণী, তুমি রাণী। তুমি রাজার কন্যে নও, আর রাজার রাণীও নও। তবু তুমি রাণী। বাংলার দুঃখ বেদনার মর্মবাণী তুমি উপলব্ধি করেছ, দুর্যোগ আবর্ত্তের মাঝে তুমি আলোক বর্ত্তিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছো!

চব্বিশ পরগণা জেলায়, হালিসহরের কাছে কোন গ্রাম। একেবারে গঙ্গার ধারে। তাই সেখানকার অধিবাসীরা গঙ্গাতেই স্নান করে। একটি বালিকা ও তার পিসিমা গঙ্গায় স্নান করতে আসে, সঙ্গে আসে এক প্রতিবেশিনী। বালিকা অপূর্ব্ব সুন্দরী। তাকালে চোখ যেন ঝলসে যায়। মন যেন কিসের অনুভূতিতে ভরে ওঠে। বালিকার সরল চোখের এমন জিজ্ঞাসা যা নূতন কিছুর সন্ধান যায়।

—আচ্ছা পিসিমা, গরীবদের বুঝি দেখবার কেউ নেই?

—এক ভগবান ছাড়া কে আছে বল্, হঠাৎ তার মাথায় হাত রেখে বলে ওঠে পিসিমা: তুই যখন রাজরাণী হবি,—তখন তাদের দেখিস।

প্রতিবেশিনীর কানে কথাটা ভালোলাগেনি, তাই একটু তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, কে রাজরাণী হচ্ছে গো!

—কেন, আমাদের রাস্।

—হুঁ, কালে কালে কত শুনব, হরেকেষ্টর বেটী হবে রাজরাণী!

—হবে, হবে। পিসিমার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। বলেন, এ আমার বড় সুলক্ষণা, যদি বেঁচে থাকি, তুমিও দেখবে সোনাদি।

আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ উড়ে চলছিল। দে ফটিকজল—তৃষ্ণায় বুক ফাটা পাখীর আর্ত্তনাদ। দে ফটিক জল!

ঠিক সেই সময় গঙ্গার তীর ঘেঁসে ত্রিবেণীর পথে একটা বজরা চলেছিল। তীরের দিকে তাকাতে রাজচন্দ্রের চোখ যেন ঝলসে গেল। তিনি বন্ধুদের ডেকে বললেন, খবর নাও তো ঐ মেয়েটির, কে? কি তার পরিচয়, কোথায় বা তার বাস।

একটু সরে গিয়ে বজরা থামলো। বন্ধুরা নেমে এলো নীচে। খবর নিয়ে আবার ফিরে গেল। তারা বললে তোমার স্বজাতীয়, রাজা।

রাজচন্দ্র বললেন: ওর বাবাকে যদি রাজী করাতে পার, তা হলে ওকে বিয়ে করে আমি পিতৃ আজ্ঞা রক্ষা করতে পারি।

বজরা ছেড়ে দেয়।

গ্রামের নাম' কোণা। কোণাগ্রামে আসে বসন্ত। পাখীর কলরব, উজ্জ্বল আনন্দময় জীবন।

রাসপ্রিয়া আদর করে মেয়ের নাম দিয়েছিলেন—রাণী।

রাণীর ডাগর চোখের চাওয়ায় যেন কত-না-পাওয়া জীবনের স্বপ্ন ভীড় করে থাকে। বার বার তার মনে পড়ে মার কথা, আজ কোথায় তিনি। তার যখন সাত বছর বয়স সেই সময় হঠাৎ মা মারা যান্।

সেদিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল রাণী, মা কোথায় গেলেন? এর কোন উত্তর সে পায়নি। আজ শুধু বোঝে, তার মা যেখানে গেছেন, সেখান থেকে তার কেউ ফিরে আসে না।

রাসপ্রিয়া ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা। কোন অনাথ অভুক্ত অবস্থায় তাঁর কাছ থেকে ফিরে যেতো না। হরেকৃষ্ণ দাস ছিলেন গরীব। সামান্য ধান জমি আর কিছু ঘরামীর কাজ করে দিন চালাতো। এই জমিও ঘরামীর কাজ করে যা আয় হ'ত, তাই দিয়ে তাঁর জীবিকা কায় ক্লেশে নির্ব্বাহ হ'ত। সাধু প্রকৃতির এই মানুষটিকে দেখলে যে কোন মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ত। সন্ধ্যের তিনি পটে বসে তামাক টানতেন।

—প্রতিবেশী এলে বলতেন, এসোহে, এখনও একটু তামাক আছে। ভাল তামাক। ভাল তামাকে মেজাজ যেন নতুন আমেজে ভরে ওঠে।

একজন প্রতিবেশী বলে, রাস্‌তো ডাগর হয়েছে, এই বার ঘর দেখ।

একটু মিষ্টি হাসি হেসে বলেন হরেকেষ্ট, আরে আর দুটো দিন যেতে দাও, মা-হারা মেয়ে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন: ও চলে গেলে আমাদেরই বা দিন কাটবে কেমন করে? একটু হেসে আবার বলেন: আর আমার কিছু করার নেই। যা কিছু করবে ওর পিসিমা ক্ষেমঙ্করী। আহা ক্ষেমঙ্করী ছিল, তাই না সংসারটা চলছে।

হরেকেষ্ট দাসের দুই পুত্র, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ। ১২০০ সালের ১১ই আশ্বিন রাণীর জন্মদিন। দিনে দিনে বড় হয় রাণী। গঙ্গার শীতল বাতাস, গাছের ছায়া—ধূ ধূ মাঠ তার মন পরম অনুভূতির গর্ব্বে ডুবে যায়। মায়ের মৃত্যুর পর পিসিমা ক্ষেমঙ্করীর স্নেহ তার মনকে ভরিয়ে দিতো।

বাবার কাছে বাংলা লেখাপড়া শিখত রাণী। আর শুনতো হিন্দু-শাস্ত্রের কত ভাল ভাল কথা ও কাহিনী। রামায়ণ ও মহাভারত পড়ে শোনাত তার পিসিমাকে। নিজেও চোখের জলে ভাসতো—কিন্তু কার দুঃখে, সে কথা প্রকাশ পেতো না।

পিসিমার মুখে শুধু এক কথা: রাস্ আমার রাজরাণী হবে। তারপরে রাণীকে সাবধান করে দিয়ে চুপিচুপি বলতেন: দেখিস্‌রে রাজরাণী হয়ে তুই যেন আমাদের ভুলিসনে, গরীব দুঃখীদের ভুলিস্‌নে, রাণী পিসির কোলে মুখ লুকায়। সে প্রকাশ করতে চায়—আমি কি ভুলতে পারি পিসি—আমার চোখে অশ্রুর ধারা বয়।

কটা দিন কেটে যায়।

সূর্য্যের আলোকে ঝলমল করছে কোণা গ্রাম। আকাশে সাদা সাদা মেঘ উড়ে চলেছে। রাজহাঁসের দল পাখার ঝাপটায় উড়ে চলেছে—উত্তর হতে দক্ষিণে। বসন্তের ডাক্ এসেছে। নতুন জীবনের ছোঁয়া লেগেছে গ্রামে। নতুন পত্র পুষ্পে ভরে উঠেছে তরু রাজি।

হরেকৃষ্ণ দাসের বাড়ীর সামনে এসে কজন ভদ্রলোক থামলেন। একজন ডাক্ দিলেন: হরেকৃষ্ণবাবু বাড়ী আছেন?

—কে, যাই। উত্তর এলো ভেতর থেকে।

হুঁকো হাতে বেরিয়ে এলেন হরেকৃষ্ণ দাস। গণ্যমান্য ধরণের কয়েকজন ভদ্রলোককে দেখে চমকে গেলেন। একটু ভেবে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন: আজ্ঞে, আমারই নাম, কিন্তু আপনাদের কি প্রয়োজন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ প্রয়োজন আছে, আর প্রয়োজন আছে বলেই না এসেছি।

—আসুন, ভেতরে আসুন, আমার দাওয়ায় যদি একটু বসেন—মাদুর বিছিয়ে দেয় দাওয়ায়। সকলে বসলে—হরেকৃষ্ণ বলেন, একটু তামাক—

—থাক্ থাক্, একজন বলেন: আসল কথাটি আগে পেড়ে নিই।

—কি কথা, হরেকৃষ্ণ হকচকিয়ে যান্।

—আপনার মেয়েটিকে নিতে হবে। নাম হয়তো শুনেছেন—আপনাদেরই মাহিষ্য সমাজের, কোলকাতার জানবাজারের প্রীতিরাম দাস—তাঁর ছেলে রাজচন্দ্রের জন্য পাত্রীর সন্ধানে আপনার দ্বারে এসেছি। আপনার যদি অমত না থাকে—

—অমত, কি বলছেন আপনারা! কিন্তু দেখুন, আমি বড় গরীব।

আপনার মেয়েকে আমরা দেখেছি, রাজচন্দ্র নিজে দেখেছে। আর তারই নির্দ্দেশমত এসেছি।

এমন সৌভাগ্যের কাহিনী ভাবতে গিয়ে হরেকৃষ্ণের দুচোখ বেয়ে জল নেমে আসে। এ পরীক্ষা নয় তো ঠাকুর? তারপর কার উদ্দেশ্যে যেন প্রণতি জানান তিনি।

একটু ম্লান হেসে বলেন, আমার মা-মরা মেয়ে, রূপেগুণে লক্ষ্মী। আমাদের কোন অমত নেই। ওর পিসি আছে—

পিসি একটু দূর থেকে জানিয়ে দেয় তাঁরও মত আছে। বিয়ের দিন স্থির হয়ে যায়।

তাঁরা বিদায় নেন।

ক্ষেমঙ্করী শুধু সকলকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন: কি আমি বলেছিলাম না—রাণ্ আমাদের রাজরাণী হবে। কেমন দেখল তো! কি গো সোনাদি, সেদিন তোমার গায়ে খুব ঝাল লেগেছিল—এখন এসো সব, ওকে তোমরা আশীর্ব্বাদ করো। সেটাই ওর সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে।

১২১১ সালের ৮ই বৈশাখ। ভোর থেকেই সানাই বাজছিল। কি মিষ্টি তার সুর। দূরের পথে চলতে চলতে পথিক ক্ষণিক থমকে দাঁড়ায়। মনে পড়ে যায় তার ফেলে আসা দিনগুলি। তার পোড়ো ভিটে, তার কত আত্মীয় পরিজন।

তারা আজ কোথায়, কেমন আছে…আজকের এ জীবনের সঙ্গে যেন সেদিনের কোন মিল নেই।

তবু সানাইয়ের সুর তার বেদনা বিধুর মনকে বহুদূরে টেনে নিয়ে যায়।

রাজচন্দ্রের সঙ্গে রাসমণির বিয়ে হয়ে গেল।

সানাইয়ের সুর থেমে যায়। কোলাহল শুরু হয়। কনে চলে তার শ্বশুরবাড়ীর ঘর করতে। কোণা গ্রাম তাকে ছেড়ে যেতে হবে। ফেলে যেতে হবে সব সাথীদের। রইলো পিসিমা, বাবা ভাইরা, তার হাতে পোঁতা কত গাছ। সে শুধু দৃষ্টি তোলে অসীম মহাশূন্যে। তার মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। এতদিন এখানে ছিল—সে যেন সর্ব্বদাই মায়ের ছোঁওয়া পেত। তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু বইতে থাকে।

সোণা পিসি বলে: ছিঃ, কাঁদে না রাণী, আজ চোখের জল ফেলতে নেই। আবার আসবি এখানে—দুঃখ কেন?

পিসি এগিয়ে এসে বলে: কাঁদে নারে, আজ যে তুই রাজরাণী হলি। গরীব দুঃখীদের দেখবি, আতুরকে আশ্রয় দিবি, তাঁরও কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। চোখ ফেটে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

রাণীর খেলার সাথী এসে বলে: আমাদের যেন ভুলে যাস না।

রাণী অতি কষ্টে মাথা নাড়ে। সে যেন বলতে চায়, সে কি ভুলতে পারে—তার মন যে এখানকার মাটীর সঙ্গে মিশে আছে। আমি তো চলে যাচ্ছি, তোরাই এখানে রইলি—তোরা যেন আমাকে ভুলে যাস্ না।

ভাবী কাল সাক্ষী। তারা কেউ কাউকে ভোলেনি। তাই তো এ শুধু কাহিনী নয়—বাঙালী ও বাংলার জীবনেতিহাসের এক অখণ্ড অধ্যায়।

জানবাজারে এসে রাণী শ্বশুরশাশুড়ীর নিষেধ সত্ত্বেও কাজ করে যেতেন। সংসারে সকলকে ভালবেসে—সকলের ভালবাসা জয় করে সংসারে আনন্দের স্রোত এনে দিল। দাসদাসীর প্রতিও রাণীর আদর যত্নের অন্ত ছিল না।

তাই তো রাণী—মা।

সকলের যা কিছু অভিযোগ, যা কিছু আবদার সবই তাঁরই কাছে পেশ হ'ত।

রাণী শ্বশুর বাড়ীতে আসার পর প্রীতিরামদাসের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জমিদারীর আয় বহু গুণে বেড়ে যায়। তাই তো তার আদরের সীমা ছিল না।

প্রীতিরামদাস এক দিনে ধনী হন্‌নি। এই জমিদারী গড়ে তুলতে তাঁকে যথেষ্ট শ্রম করতে হয়েছিল।

হাওড়া জেলার খোসালপুর গ্রাম। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন গরীব পরিবারের সন্তান প্রীতিরামদাস। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন এই নিরাশ্রয় বালক একদিন গড়-গোবিন্দপুরের মাহিষ্য জমিদার 'মান্না' পরিবারে এসে আশ্রয় নেয়।

এখন গড়ের মাঠে যেখানে দুর্গ আছে, ঐ জায়গায় নাম ছিল গড়-গোবিন্দপুর। এই এলাকার জমিদার মান্না পরিবারে যুগোল কিশোর মান্না এবং অক্রূর চন্দ্র মান্না, দুই ভাই জমিদারী দেখা শুনা করতেন। প্রীতিরামদাস যেদিন এসে দাঁড়ান, সেদিন শুধু সে আশ্রয় পায় নি, সে এই মান্না বাড়ীরই একজন হয়ে গিয়েছিল। প্রীতিরাম এ বাড়ীর ছেলে মেয়ের মতোই লেখাপড়া শিখতে থাকে। বাংলা ছাড়া পারসী

ইংরেজী লেখাপড়া শিখলো সে। পরবর্ত্তী সময়ে এই শিক্ষা তাঁর ভবিষ্যৎ চলার পথে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিলো।

অক্রূর মান্না সেই সময় 'ডান্‌কিন' সাহেবের অফিসে একটা বড় চাক্‌রী করতেন। বেলেঘাটায় সাহেবের একটা নুনের কারবার ছিল। অক্রূর চন্দ্রের চেষ্টায় প্রীতিরাম এখানে একটা সামান্য মাইনের চাকরী পেয়ে গেল। প্রীতিরাম ছিল সৎ, বলিষ্ঠ এবং উদার। তাঁর নির্লোভ স্বভাব সাহেবের দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি সন্তুষ্ট হলেন। তাই বিক্রির উপর বাটা পাওয়ার ব্যবস্থা করে ছিলেন তিনি। প্রীতিরামের উৎসাহ বেড়ে গেল। বেশী মাল যাতে বিক্রী হয়, সেজন্য সচেষ্ট হলেন। এতে উভয় তরফের আয় বাড়লো। এইভাবে কটা বছর অতিক্রান্ত হ'ল। সাহেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কারবার বন্ধ হয়ে গেল। একবার প্রীতিরাম তার এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে বেলেঘাটাতে এক বাঁশের আড়ৎ করেন। বাঁশের কারবার করেছিলেন বলে—তাঁর এক উপাধি হয়েছিল 'মাড়'। এরই সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর একটা ব্যবসা সুরু করলেন, নিলামী জিনিষের কেনা-বেচার কারবার। টালা থেকে তিনি অনেক শৌখিন জিনিষ কিনতেন। সেগুলি নিয়ে সাহেবদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় দানা বেঁধে উঠলো। তাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনা বিভাগে রসদ সরবরাহের বন্দোবস্ত পেলেন।

যথেষ্ট পয়সা আয় করলেও প্রীতিরাম তাঁর আশ্রয়দাতার আশ্রয় ত্যাগ করেননি। প্রীতিরামের ব্যবসায় আবার ভাটা পড়ল। সব দিকেই বড় মন্দা যাচ্ছিল। কিন্তু ভাগ্য যাকে টেনে নিয়ে চলেছে জয় যাত্রার পথে—সেখানে কোন কিছুই তার গতিরোধ করতে পারে না।

এই সময়ে যশোরের জেলাশাসক যুগোলকিশোরের এক বাড়ী ভাড়া নিলেন। অক্রূর চন্দ্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাও হ'ল। তার অনুরোধে সাহেব প্রীতিরামকে তাঁর সেরেস্তায় চাক্‌রী দিলেন।

প্রীতিরাম যশোরেই কাজ করতে থাকেন। সাহেব বদলী হয়ে ঢাকায় যাবার সময় প্রীতিরামকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। নাটোরের রাজা রামকান্ত রায়ের সঙ্গে প্রীতিরামের পরিচয় হয়। তাঁর সমস্ত সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়ে রাজা তাঁকে তাঁর বিশাল জমিদারীর দেওয়ান করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু সে সময় সাহেব প্রীতিরামকে ছাড়েননি। অবশ্য সাহেবের অবসরগ্রহণের পর প্রীতিরাম কিছুদিন নাটোরের দেওয়ানী করেছিলেন।

রাজা রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর তিনি কোলকাতা চলে আসেন। নাটোর থেকে ফিরবার পর তাঁর বিয়ে হয়। যুগোল কিশোর প্রীতিরামের হাতে তাঁর কন্যাকে তুলে দিয়ে শুধু আশীর্ব্বাদ করলেন: ধনে মানে তুমি বড় হও প্রীতি। বিয়ের যৌতুক হিসাবে যুগোলকিশোর প্রীতিরামকে কোলকাতায় ষোল বিঘা জমি দিয়েছিলেন।

প্রীতিরাম এইবার জমিদারী করার দিকে মন দিলেন। এই সময় তিনি উনিশ হাজার টাকা দিয়ে মকিমপুর তালুক কেনেন। প্রথমদিকে এই তালুকে বানের জল ঢুকতো। তাই এখানে আয় তেমন হ'ত না। তিনি নতুন করে বাঁধবন্দীর দিকে নজর দিলেন। বন্যার জল রোধ হওয়ার পর, বন্যার পলীর জন্য প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতে লাগলো। তাঁর মন গভীর আনন্দে উঠলো ভরে। তিনি আবার ব্যবসা সুরু করলেন। বাঁশের কারবার—আর মকিমপুর থেকে আনা সকল দ্রব্যাদি বিক্রী করতেন।

যৌতুক পাওয়া জমিতে তিনি বাড়ী করলেন। সুন্দর সাজানো বাড়ী। প্রীতিরামের আনন্দে মনটা ভরে গেল। তিনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন: জানো কিভাবে এসব হ'ল—সে যেন চিন্তার অতীত। সে যেন শুধু স্বপ্ন। চোখের সামনে ভেসে উঠলো তাঁর অতীত জীবন। সে জীবনে ছিল না কোন স্পন্দন। মাতৃপিতৃহীন অবোধ নির্লোভ একটি ছন্নছাড়া বালক। আজ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার গ্রাম। গ্রামের জীবনের পোড়ো ভিটে। সে এক কঠিন নির্ম্মম অধ্যায়। অবজ্ঞাই ছিল তাঁর পাওনা। আর আজ—

আজ তিনি জানেন হরচন্দ্র আর রাজচন্দ্রকে নতুন করে সংগ্রাম করতে হবে না। তাদের পথ প্রস্তুত হয়েছে। এপথ সেদিনের মত রক্তক্ষরিত নয়। এপথ চলে গেছে বিপুল সম্ভাবনার ডাক্ দিয়ে—

সেদিন অদৃষ্ট দেবতা তাকে বলেছিল: তুমি কোথায় চলেছ? তেঁতুল গাছের নীচ দিয়ে বোসবাবুদের আমবাগানের পাশ দিয়ে—বাঁশবনকে পেছনে ফেলে খাল বিল পেরিয়ে, চেনা পরিচয়কে দূরে সরিয়ে দিয়ে কোন অজ্ঞাত জীবনকে আহ্বান করবার জন্য এগিয়ে চলেছ। অদৃষ্টদেবতা সেদিন তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াননি। সকল বাধাকে দূর করে দিয়ে তার পথকে সুগম করেছিলেন—তিনি অদৃষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন।

কয়েক বছর সুখে কেটে যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই অকাল বিয়োগে প্রীতিরাম শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। এই শোক ভুলবার জন্য তিনি রাজচন্দ্রের বিয়ে দিলেন। সেই বছরেই রাজের স্ত্রী মারা গেল। তিনি আবার তাঁর বিয়ে দিলেন কিন্তু এও সইলো না। কোন সন্তান সন্ততি না রেখে রাজের দ্বিতীয় স্ত্রীও মারা গেল। এত সম্পদ ও এত বৈভব কে ভোগ করবে? রাজচন্দ্র বাবাকে বললেন: আমার আর সংসার করার সাধ নেই বাবা। বোধ হয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। বংশরক্ষার প্রশ্ন চিন্তা করে প্রীতিরাম আবার ছেলেকে বোঝালেন।

অদৃষ্ট দেবতা হাসেন। তিনি যেন চুপি চুপি বলেন: এই মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল রাজ। এতো আমারই খেলা।

রাজচন্দ্র বাবাকে সম্মতি দিয়ে বললেন: যদি কোন সুলক্ষণা পাত্রী পান, তিনি বিয়ে করবেন।

এহোল অতীত অধ্যায়।

কয়েক বছর কেটে যায়।

অসুস্থ প্রীতিরাম একদিন রাণীকে ডেকে বলেন: মা, তুমি কি চাও আমাকে খুলে বলবে। বলো, মনে কোন দ্বিধা রেখোনা। আমার যা কিছু সবই তোমার। তোমার মনের তৃপ্তির জন্য আমি সব করবো মা।

—বাবা, আমি চাই—আমার অঙ্গনে এসে কোন গরীব দুঃখী যেন নিঃশ্বাস ফেলে না যায়।

রাণীর মুখে এই কথা শুনে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন

শ্রীতিরাম দাস। রাণীর মর্মবেদনা উপলব্ধি করতে তাঁর দেরী হয় না। তাঁর অতীত জীবনেতিহাস চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মন বেদনায় টন টন করতে থাকে, আজ সবই আছে। অথচ তাঁর সেদিনের আত্মীয় পরিজন চেনা ও জানা কেউ নেই। অতীত যেন বৈশাখী ঝড়ের হাহুতাস। হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন: আমি ভুলিনি। একটু হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলতে থাকেন—বড় কঠিন সে পথ, নির্মম সে পথচলা। হঠাৎ রাণীর মাথায় হাত রেখে বলেন: অদৃষ্ট দেবতাই আমাকে চালিয়েছেন। তিনিই সব, তিনিই সব। তাঁরই নির্দ্দেশমত কাজ করবে। সে নির্দ্দেশ আসবে। আবার তিনি চুপ করে থাকেন। কিযেন ভাবতে থাকেন। তাঁর সে অবস্থা দেখে রাণী একটু ভয় পেয়ে যায়। একটু পরে ডাকে: বাবা!

—হাঁ মা, আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার দ্বার থেকে কেউ যেন কোন-দিন ফিরে না যায়। আমি দেখতে পেয়েছি—তুমি গৃহবধূ নও, তুমি কারোর একার নও—তুমি সকলের। মা, তুমি বাংলার। আমি আজ দেখতে পাচ্ছি। নতুন যুগ আসছে, নতুন পুরুষ আসছেন, দিব্যপুরুষ। সেই মহাপুরুষ আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে প্রস্তুত হও। ঘরে ঘরে দীপ জ্বালো।

শ্রীতিরাম অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েন।

এর কিছু দিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এর পরে রাণী রাসমণির জীবনের আর এক অধ্যায় সুরু হয়। রাজচন্দ্র আজ সংসারের সর্বময় কর্ত্তা। মা ও বাবা আজ জীবিত নেই। ও নিষ্ঠুর পরিণতির পথ বেয়ে চলতে হবে। সে পথ চলে গেছে দূর দূরান্তরে—সে পথের শেষ নেই।

এখন তিনি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্ত কাজ করেন।

সংসার কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। এগিয়ে চলে—পদ্মমণি, কুমারী, করুণা ও জগদম্বা নতুন মায়াজাল বিস্তার করেছে সংসারে। রাণী মাঝে মাঝে ফিরে তাকান ফেলে আসা দিনগুলির দিকে। মনে পড়ে যায় অতীতের সঙ্গীদের, পিসিমা-সোনাপিসি বাপ ভাইদের। মনে পড়ে যায় পিসির ভবিষ্যৎ বাণী—রাস্ আমার রাজরাণী হবে। সত্যিই আজ সে রাজরাণী। কিন্তু কোথা গ্রাম, গ্রামের মানুষ তার মাটি। ঠিক এমনি এক সময়ে বাবার মৃত্যু সংবাদ এলো, বাবার মৃত্যু সংবাদে শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন রাণী। কত কথা মনে পড়ে যায় তাঁর। 'বাবা গো'—কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন রাণী।

—ছিঃ, কাঁদে না, শোক তাপ থাকবেই, তাঁর ওপারের ডাক্ এসেছিলো—তিনি চলে গেছেন। অদৃষ্ট দেবতা যেন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। তিনি যেন বলেন, সামনে তাকাতে।

চতুর্থী করার জন্যে রাণী অদূরে গঙ্গার তীরে যান। ভাঙ্গা ঘাটের শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি খুবই দুঃখ পেলেন। বাড়ী এসে তিনি স্বামীকে নালিশের সুরে বললেন: ঐ ঘাটে কত লোক স্নান করে, তাদের যে কি দুর্গতি—তা যদি চোখে দেখতে, মানুষের এই দুর্ভোগ কি কোন মানুষের চোখে লাগে না।

এ নালিশ বৃথা যায়নি, নতুন ঘাট হ'ল, নতুন পথ হ'ল। আজও সেই ঘাট সেই পথ আছে। রাজচন্দ্র বাবুর ঘাট—বাবুঘাট নামে চলে আসছে। এইখানেই শেষ হয়নি, রাজচন্দ্র স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে আরও কতগুলো কাজ করেন। আহিরীটোলায় গঙ্গার ধারে ঘাট, নিমতলায় গঙ্গাযাত্রীর থাকার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তাছাড়া তাঁর জমিদারীর মধ্যে চাষবাসের সুবিধার জন্য দীঘি ও পুকুর কাটিয়ে দেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। কোলকাতার হিন্দু কলেজ স্থাপনের সময় তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেছিলেন। দুস্থছাত্রদের পড়াশুনা করার জন্য বিনা বেতনে স্কুল করে দেন।

[ক্রমশঃ

কাগজের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

গতবারে রঙিন কাগজ দিয়ে 'ল্যাম্প-শেড' (Lamp-Shade) বা 'বিজলী-বাতির আবরণী' রচনার কথা বলেছি। এবারে বলবো, রঙিন কাগজের সাহায্যে আর এক ধরণের বিচিত্র কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কথা।

উপরের ছবিতে রঙিন কাগজের তৈরী বিচিত্র-ছাঁদের যে ফানুশ-আকারের লণ্ঠনটির নমুনা দেখছো, সেটি বাড়ীতে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে গৃহসজ্জার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অথচ কাগজের এই 'ফানুশ-লণ্ঠন' রচনা করা এমন কিছু ব্যয়-সাপেক্ষ বা দুরূহ-পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার নয়। কাজ-কর্ম্মের অবসরে যে কেউ অনায়াসেই সামান্য কয়েকটি উপকরণের সাহায্যে নিজেরাই বাড়ীতে বসে কাগজের এ সব সৌখিন-সুন্দর কারুশিল্প-সামগ্রী বানাতে পারবেন।

উপরের ছবির নমুনার ছাঁদে 'কাগজের ফানুশ-লণ্ঠন' রচনা করতে হলে যেসব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি। বিচিত্র এই কারুশিল্প-সামগ্রীটি তৈরী করতে হলে চাই—একটি পেন্সিল, একটি কাঁচি, একটি ছুরি, একটি 'রুলার' (Ruler), এক শিশি আঠা এবং বেশ মজবুত ও পুরু-ধরণের অর্থাৎ বইয়ের মলাটের মতো মোটা কয়েকখানি বড় সাইজের রঙিন বা নক্সাদার কাগজ। এ কাগজের নানা রকম রঙের প্যাকেট বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে…দামও এমন কিছু বেশী নয়। তবে খুব বেশী মোটা-ধরণের কাগজ কিম্বা কার্ডবোর্ড ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়…কারণ, সেগুলি দিয়ে 'ফানুশ-লণ্ঠন' তৈরী করলে তেমন সুশ্রী-সুন্দর দেখাবে না এবং কাজের সময়ও প্রচুর অসুবিধা ঘটবে।

সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ হবার পর, কাগজের 'ফানুশ-লণ্ঠন তৈরী করার পালা। প্রথমেই রঙিন কাগজখানিকে লম্বালম্বিভাবে দু'ভাঁজ (fold) করে সমতল টেবিল কিম্বা পরিষ্কার মেঝের উপর সমান ভাবে পেতে রেখে,
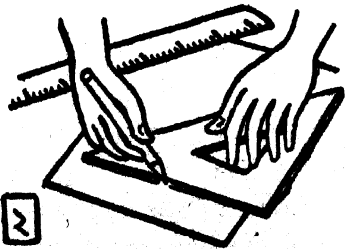
উপরের ২নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে 'রুলারের' সাহায্যে পেন্সিলের রেখা টেনে, 'ফানুষ-লণ্ঠনের' বিভিন্ন অংশের ছক এঁকে নিতে হবে। এভাবে ছক এঁকে নেবার সময় দু'ভাজ করা কাগজ খানির যে-দিকের প্রান্ত খোলা রয়েছে, সেদিকটা থাকবে উপরের দিকে এবং অন্য দিক থাকবে নীচের দিকে। 'ফানুশ-লণ্ঠনটি' যে-মাপের তৈরী হবে, কাগজখানি যেন তার চেয়ে ½" ইঞ্চি বড় আকারের হয়—এদিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন, না হলে কাজের অসুবিধা এবং মাপ-জোপের গণ্ডগোল ঘটবে সবিশেষ। অর্থাৎ 'ফানুশ-লণ্ঠনের' সাইজ যা হবে, কাগজখানির চারিদিকেই যেন তার চেয়ে ½" ইঞ্চি জায়গা বেশী বা বাড়তি রাখা হয়—সেদিকে সজাগ দৃষ্টিদান করা দরকার।
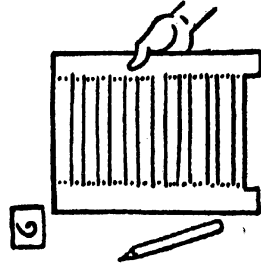
এবারে ভাঁজ-করা কাগজখানির ভাঁজে-ভাঁজে উপরের ৩নং চিত্রের ভঙ্গীতে ½" ইঞ্চি অন্তর-অন্তর পেন্সিল দিয়ে রেখা-চিহ্ন এঁকে নিতে হবে এবং কাগজের চারদিকের কিনারার চার-প্রান্তে অর্থাৎ মাথার দিকে পূর্ব্বোক্ত রীতি-অনুসারে ½" ইঞ্চি মাপের জায়গা ছেড়ে রাখতে হবে। এ কাজ সারা হলে, কাগজখানির বুকে ঐ ½" ইঞ্চি অন্তর-অন্তর রেখা-চিহ্নিত দাগের উপর ছুরি চালিয়ে লম্বালম্বি-ভাবে কয়েকটি 'ফোকর' বা 'গর্ত্ত' (Slit-holes) চিরে নিতে হবে—উপরের ৩নং চিত্রে দেখানো নমুনার ছাঁদে।

কাগজের বুকে 'ফোকরগুলি' চিরে নেবার পর, নীচের ৪নং চিত্রের ভঙ্গীতে, কাগজটিকে ভাঁজ খুলে পুনরায়
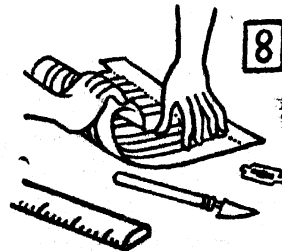
সমতল টেবিল বা মেঝের উপর সোজাসুজিভাবে বিছিয়ে,

ঘটির মতো আকারে চেরাই-করা কাগজখানিকে সুডৌল-গোলভাবে গুটিয়ে (Roll) নিতে হবে। গুটোবার সময় নজর রাখবেন—চেরাই-করা-ফোকরগুলি, যেন লম্বালম্বিভাবে কাগজের উপর থেকে নীচের দিকে সারি দিয়ে সাজানো থাকে—আড়াআড়িভাবে নয়। প্রসঙ্গ ক্রমে, জানিয়ে রাখি—উপরের ১নং চিত্রে দেখানো 'ফানুশ-লণ্ঠনের' গায়ে লম্বালম্বি-ছাঁদের কালো-কালো যে রেখাগুলি চিহ্নিত রয়েছে, সেগুলিই হলো উপরোক্ত কাগজের বুকে চেরাই-করা 'ফোকর' বা 'গর্ত্ত' (Slit-holes)।

ঘটির মতো আকারে চেরাই-করা কাগজখানিকে আগাগোড়া গুটোনোর পর, 'ফানুশ-লণ্ঠনের' অর্থাৎ কাগজের উপরের, নীচের আর পাশের লম্বালম্বি প্রান্তগুলি নিখুঁতভাবে আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে হবে—নীচের ৫নং
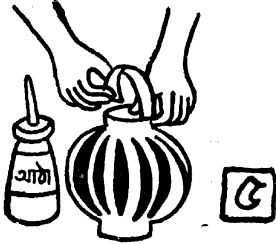
চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ছাঁদে। 'লণ্ঠনের' কাগজটি আগাগোড়া আঠা দিয়ে জুড়ে দেবার পর, 'লণ্ঠনের' মাথার দিকের 'হাতলটির' (Handle) আকারে লম্বা-মাপের এক টুকরো কাগজ কেটে নিতে হবে এবং সেই লম্বা কাগজটিকে উপরের ৫নং চিত্রে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনিভাবে 'ফানুশ-লণ্ঠনের' মাথার দুই প্রান্তে আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেই কাগজের 'ফানুশ-লণ্ঠন' তৈরী হয়ে যাবে। তারপর যদি এই কারু-সামগ্রীটিকে আরো বেশী শিল্পশ্রী-মণ্ডিত করে তুলতে চান, তাহলে জল-রঙ (Water-colours) আর তুলির সাহায্যে ফুল-পাতা প্রভৃতির বিচিত্র নক্সা এঁকে দিলেই হলো···'ফানুশ-লণ্ঠনটি' যে তার ফলে আরো অধিক মনোরম ও অপরূপ হয়ে উঠবে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

তবে,এ লণ্ঠন অবশ্য গৃহ-সজ্জার জন্য···এতে বাতি বসিয়ে, সে বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করলে আরো কয়েকটি কৌশল জেনে রাখা প্রয়োজন—সে কথা আর এক সময় বলবো।

সুধীরা হালদার

এখন ইলিশ মাছের সময়···কাজেই গতবারের মতো এবারেও ইলিশ মাছের আরো দু' একটি বিশেষ ধরণের রান্নার কথা বলি।

ইলিশ মাছের দই-কোর্ম্মা

বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন এবং অতিথি-আপ্যায়নের ব্যাপারে এটি পরম উপাদেয় এবং অভিনব-ধরণের রান্না। এ রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি। ইলিশ মাছের দই-কোর্ম্মার জন্য চাই—ইলিশ মাছ, টক-দই, কাঁচা লঙ্কার কুচো, নুন, সরষে-বাটা এবং সরষের তেল। এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, রান্নার পালা।

রান্নার কাজ সুরু করবার আগেই, ইলিশ মাছটিকে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে, ল্যাজা আর মুড়ো বাদ দিয়ে মাছটিকে বঁটিতে কুটে প্রয়োজনমতো টুকরো করে নিতে হবে। দই-কোর্ম্মা রান্নার জন্য, ইলিশ মাছের মুড়ো আর ল্যাজা বাদ দিয়ে, শুধু পেটি আর গাদার অংশ টুকরো করে কুটে নেওয়া প্রয়োজন। মাছের মুড়ো আর ল্যাজা একেবারে বাতিল করে দেবেন না, বরং সেগুলি ব্যবহার করবেন অম্বল, ঝাল, ছ্যাঁচড়া কিম্বা ঐ ধরণের অন্য কোনো রান্নার উপকরণ হিসাবে। এর ফলে, শুধু যে খাদ্য-তালিকার খাবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে তাই নয়, সংসারেরও আর্থিক সাশ্রয় হবে অনেকখানি।

যাই হোক, মাছ-কোটা হয়ে যাবার পর, মাছের গাদা ও পেটির টুকরোগুলিকে পুনরায় জলে ধুয়ে সাফ্ করে নিয়ে, সেগুলিকে খানিকক্ষণ নুন মাখিয়ে রেখে দেবেন। তারপর

বড় একটি কাঁচের, বা চীনামাটির পাত্রে কিম্বা চটা-না-ওঠা এনামেলের গামলায়, টক-দই ঢেলে, দইটিকে বেশ ভালোভাবে ফেটিয়ে নেবেন। টক-দইটুকু ফেটিয়ে নেবার পর, ঐ দইয়ের সঙ্গে আন্দাজ-মতো কাঁচা লঙ্কার কুচো, নুন, সরষে-বাটা আর সামান্য একটু সরষের তেল মিশিয়ে, সদ্য-মিশ্রিত বিচিত্র এই 'দই-মশলাটিকে', পাত্রের মুখে ঢাকা চাপা দিয়ে সযত্নে রান্নাঘরের এক পাশে পরিচ্ছন্ন জায়গায় আলাদা সরিয়ে রেখে দেবেন। এবারে উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে নুন-মাখানো ইলিশ মাছের গাদা ও পেটির টুকরোগুলিকে ছেড়ে, খানিকক্ষণ গরম ভাপে সিদ্ধ করে নিতে হবে। আগুনের ভাপে মাছের টুকরোগুলি সু-সিদ্ধ হয়ে যাবার পর, ইতিপূর্ব্বে অন্য পাত্রে বিচিত্র যে 'দই-মশলা' বানিয়ে রেখেছেন, সেই পাত্রে 'ভাপে-বসানো' মাছের ঐ সু-সিদ্ধ টুকরোগুলিকে সযত্নে 'দই-মশলার' মধ্যে সাজিয়ে, পাত্রের মুখটি ঢাকা চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিন। এমনি ভাবে তিন-চার ঘণ্টা 'দই-মশলার' সঙ্গে মাছের গাদা ও পেটির সু-সিদ্ধ টুকরোগুলিকে একত্রে মিশিয়ে রাখার পর, 'ইলিশ মাছের 'দই-কোর্ম্মা' রান্নাটি পাতে পরিবেষণের উপযোগী হবে। এই হলো এ রান্নার মোটামুটি নিয়ম।

ইলিশ মাছের রসা

এটিও পরম সুস্বাদু অভিনব দেশী-ধরণের ইলিশ মাছের রান্না। এ রান্নার জন্য উপকরণ প্রয়োজন—ইলিশ মাছ, কাঁঠালবিচি, ডাঁটা, ঝিঙা, কাঁচা লঙ্কা, ময়দা, নুন, সরষের তেল, হলুদ-বাটা, ধনে-বাটা, আর পাঁচফোড়ন। উপকরণগুলি সংগৃহীত হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, ইলিশ মাছটিকে যথারীতি গায়ের আঁশ ছাড়িয়ে, ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে মুড়ো, ল্যাজা, গাদা ও পেটি হিসাবে টুকরো করে কুটে, মাছের টুকরোগুলিতে আগাগোড়া নুন আর হলুদ-বাটা মাখিয়ে রাখতে হবে। তারপর কাঁঠালবিচিগুলিকে ছাড়িয়ে, দু'টুকরো করে কেটে গরম জলে সিদ্ধ করতে হবে; এবং সু-সিদ্ধ হবার পর, সেগুলিকে আগাগোড়া জল ঝরিয়ে নিয়ে পরিষ্কার একটি পাত্রে সযত্নে আলাদা সরিয়ে রাখতে হবে। ইতিমধ্যে রান্নার জন্য ঝিঙা এবং ডাঁটাগুলিকেও খোসা ছাড়িয়ে লম্বা-লম্বা আকারে কুটে ধুয়ে নিতে হবে।

এবারে উনানের আঁচে কড়াই চাপিয়ে সেই কড়াইতে আন্দাজমতো সরষের তেল ঢেলে তাইতে কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা চিরে ছেড়ে দেবেন এবং সেই সঙ্গে খানিকটা পাঁচ-ফোড়ন সমেত সদ্য-কুটে-রাখা ঐ ঝিঙা আর ডাঁটার টুকরোগুলিকে কড়াইয়ের তেলে ঢেলে দিয়ে খুন্তির সাহায্যে সেগুলিকে খানিকক্ষণ নেড়ে-চেড়ে নেবেন। খানিকক্ষণ এভাবে খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়ার পর কড়াইতে সামান্য জল আর আন্দাজমতো নুন, হলুদ-বাটা, ধনে-বাটা এবং সিদ্ধ কাঁঠালবিচিগুলি ছেড়ে দেবেন। একটু পরে, তরকারীর সঙ্গে রান্নার মশলাগুলি বেশ মাখামাখিভাবে মিলে গেলেই, ইতিপূর্ব্বে কুটে-রাখা নুন আর হলুদ-বাটা মাখানো ইলিশ মাছের টুকরোগুলিকে কড়াইয়ের মধ্যে ছেড়ে খুন্তি দিয়ে সযত্নে সেগুলি নেড়েচেড়ে নেবেন। এমনিভাবে রান্নার মশলা ভেজে নেবার পর, আন্দাজমতো অল্প একটু জল ঢেলে উনানের আঁচে বসানো কড়াইয়ের মুখে বড় একটি থালা চাপা দিয়ে রাখবেন। কিছুক্ষণ এভাবে রাখার ফলে, রান্নার মাছ ও তরকারী আগাগোড়া সু-সিদ্ধ হয়ে গেলে অল্প জলে সামান্য একটু ময়দা গুলে সেই ময়দা-গোলা জলটুকু কড়াইয়ের রান্নায় ঢেলে দিতে হবে। তারপর কড়াইয়ের মধ্যে মাছ ও তরকারীর সঙ্গে মিশে সে-জলে দু'চারবার ফুট ধরলেই, উনানের উপর থেকে সাবধানে কড়াইটিকে নামিয়ে, অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে সযত্নে রান্নাটিকে তুলে রাখবেন—খাবার সময় পরিবেষণের জন্য। এই হলো বিচিত্র উপাদেয় 'ইলিশ মাছের রসা' রান্নার মোটামুটি নিয়ম।

বারান্তরে, আরো কয়েকটি অভিনব-ধরণের দেশী ও বিলাতী রান্নার বিষয় আলোচনা করার বাসনা রইলো।

পকেট-হত্যার আসামী

শ্রীবিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ট্রাম থেকে কোনও রকমে ধাক্কাধাক্কি খেয়ে, এর পা মাড়িয়ে, ওর ধুতির কোঁচা লট্‌কে নিয়ে, দেড়'শ লোকের গালাগালি সহ্য করে যখন ফুটপাথের ওপরে লাফিয়ে পড়লাম, তখন সহসা একটা সত্য আবিষ্কার করলাম, 'আমার মনিব্যাগটা খোয়া গেছে (বা আমি 'পকেট মৃত' হয়েছি')।

এক মুহূর্ত্তে দার্শনিক হ'য়ে গেলাম এবং তার ফল হোলো এই যে, রাস্তায় সোয়া আঠারোবার হোঁচট খেয়ে বাড়ীতে ফিরেই খাতা নিয়ে লিখতে বস্‌লাম, 'পকেটমারের ইতিকথা।'

মানুষ কেন পকেট মারে ? 'বেলবিনো'র ভাষায় বলা যায়—প্রথমে মানুষ অভাবে পড়ে চুরি করে, পরে সেটা তার স্বভাব হ'য়ে দাঁড়ায়. 'পকেট মারার' পেছনেও এমনি একটা কারণ থাকা খুবই সম্ভব, কিন্তু অভাবে পড়লে, পকেট মারায় বিশেষ কিছু সুবিধে হয় কি ? কারণ 'সেকেণ্ড ক্লাশ' ট্রামের (ফার্স্ট ক্লাসেরও) যাত্রীরা, যাদের পকেট, পকেটমারদের হাত মকস করার তীর্থস্থান, তাদের পকেটে কি থাকে। মাসের একটা দিন ছাড়া, তাদের পকেটে যা থাকে, তার চেয়ে বেশী পয়সা পকেটমাররাও 'ভিখিরী'কে ভিক্ষে দিতে পারে (মাইনের দিনের কথা ছেড়ে দিলাম)। তবে তাতে নিশ্চয় তাদের অভাব মেটে না ; তাহ'লে ?

তাহ'লে এর ব্যাখ্যা হ'তে পারে, যে তারা নেহাৎই হাত মক্‌স করার জন্যেই পকেট মারে। আমার সঙ্গে একজন পকেটমারের আলাপ আছে ; সে লোকের পকেট দেখলেই বুঝতে পারে, পকেটের টেম্পারেচার কত, এবং যত কমই থাক, এমন কি কিছু না থাক্‌লেও সে ট্রামের টিকিটটা পর্য্যন্ত হাতিয়ে নিতে দ্বিধা করে না ; আর নেমে যাবার সময়…তার পকেটেই আবার তা গুঁজে দিয়ে যায়, তাকে জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিল, "বাবু, অনেক দিন পকেটমারা ছেড়ে দিয়েছিলুম, আবার শুরু করতে হচ্ছে, তাই হাত পাকাচ্ছি।"

আবার আমি এমন লোককেও জানি—যারা অভাবও নয় বা 'হাত পাকানোও' নয়, শুধু স্বভাবের বসেই পকেট মারে। আমার এক বন্ধুর বাবা, তাঁর পয়সারও অভাব নেই বা হাত মকস করারও দরকার নেই, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তাঁর কি এক অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছিল যে 'পকেট' দেখলে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। যদি কোনও দিন বাইরে বেরুতে না পারতেন, তাহ'লে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেরই পকেট সাফাই করতেন।

এতো গেলো পকেটমারদের স্বভাব বা অভ্যাসের কথা, এখন তাদের আকৃতি বা কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। ধরুন, বাসে উঠেছেন আপনি (বলা বাহুল্য আপনার পকেট একেবারেই শূন্য নয়), এমন সময় একজন স্মার্ট ও সুদর্শন ভদ্রলোক এসে আপনার পাশে বসলেন, হাতে তাঁর সুদৃশ্য ও দামী রিষ্টওয়াচ পকেটে গোল্ডক্যাপ পেন, মোটা (সেটা আপনি আন্দাজেই বুঝলেন) মানিব্যাগটা অনেককেই লুব্ধ করে (আপনাকে অবশ্য নাও করতে পারে)। মোটমাট সব মিলিয়ে এমন একটা লোক, যাঁকে দেখলেই মনে হয়, "ড্রাইভারগুলো দেশে যাওয়ায়" বা "মোটরগুলো বিগড়ে যাওয়ায়" তাঁকে বাধ্য হ'য়ে বাসে উঠতে হ'য়েছে। আপনি তো প্রথমটা তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করলেন, চেষ্টা করলেন একটু অন্তরঙ্গ হ'তে ; কিন্তু তিনি আপনাকে গ্রাহ্যই করলেন না। মনে মনে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হ'য়েই আপনি জানলার বাইরে মুখ করে রইলেন, কিন্তু তিনি নেমে যাবার পর আপনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি আপনার কত অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন এবং কি রঙ্গ তিনি আপনাকে দেখিয়ে গেছেন।

বা ধরুন, আপনি ট্রামের একদম সামনের সীটে বসে

আছেন, এমন সময় একটা মিষ্টি কণ্ঠ কানে এলো—"বস্‌তে পারি ?" আপনি তড়িতাহত হ'য়ে পেছনে ফিরে দেখলেন, এক সুবেশা তরুণী, কৃত্রিম রঙে রঙীন, নাইলন শাড়ীর আবরণ তাঁকে যেন নিরাবরণ করতে বদ্ধপরিকর। আপনার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। (বরফের মতো) বিগলিত হ'য়ে বললেন—"নিশ্চয়, নিশ্চয়" এবং নিজেকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত ক'রে নিলেন, তারপর কারণে অকারণেই আপনার ঘাড় স্বয়ংক্রিয় টেবিল ফ্যানের মতো ঘুরতে লাগলো, ডান হাতটা অকারণেই পাশের দিকে সরতে লাগলো, অন্য তরফ থেকেও কোনও আপত্তি না আসায়, আপনি খুসীতে একেবারে ডগমগ, কিন্তু পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে তিনি নেমে যাবার পর, ইলিয়ট রোডের মোড়ে আপনার হাতটা যখন বুক পকেটের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠলো, তরুণীটি তখন ১০ নম্বর বাসে, আপনারই মতো আর একজনের পাশে, আর বাসের মধ্যে আপনি তাঁকে কিছু বলতে যান, মশাই, বলবো কি, আপনাকে পকেটমার বানিয়ে দেবে, সত্যিকথা মশাই—মিথ্যে নয়, এ রকম অভিজ্ঞতা আমার আছে।

এই সেই দিনই তো, এক ভদ্রলোকের পকেটমারা যাওয়ায় তিনি পাশের তরুণীটিকে 'চ্যালেঞ্জ' করেন, ফলে বাসের লোকেরা তাঁকে মারতে বাকী রাখে ; কিন্তু আমি জানি ভদ্রলোক মিথ্যে সন্দেহ করেন নি, তবু তাঁর পরিণতি দেখে আমি বুদ্ধিমানের মতো মৌনী বুদ্ধদেব হ'য়ে গেলাম।

এ রকম কত কথা যে পকেটমার সম্বন্ধে লেখা যায়, কিন্তু 'বেয়ারিং লেটার' হবার ভয়ে সংক্ষেপে সারলুম।

লেখার শেষে 'পকেটমার নিবারণ' কল্পে সরকারের কর্তব্য সম্বন্ধে একটা 'লেক্‌চার' দিয়ে, লেখাটা খামে পুরে যখন ঠিকানা লিখছি, তখন 'চৈতন্য', হাতে ক'রে আমার খোয়া-যাওয়া 'মানিব্যাগ'টা নিয়ে, ঘরে ঢুকলো। বিস্মিত হ'য়ে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই তাকে বলতে শুনলাম, "ব্যাগটা ঘর রাখি কাঁই গইছিলা, বাবু ?"

আচার্য্য জন্ম শত জয়ন্তী—

গত ২রা আগষ্ট দেশের সর্বত্র আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম শত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিন সকালে কলেজ স্কোয়ারে আচার্য্য দেবের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়—দ্বিপ্রহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতিতে অনুষ্ঠান হয় এবং বিকালে মহাজাতি সদন, ভারত সভা, ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট প্রভৃতিতে সভা করা হয়। ৩১শে জুলাই বিকালে অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে বেঙ্গল কেমিকেলের পানিহাটী কারখানায় একটি প্রদর্শনী খুলিয়া ৭ দিন ধরিয়া তথায় আচার্য্যের জীবনী ও বাণী দেখানো হইয়াছিল। আচার্য্য রায় বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে কি স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা আজ বাঙ্গলার তরুণদিগকে বিশেষ ভাবে বুঝাইবার জন্য বাংলার প্রতি স্কুল ও কলেজে আচার্য্য জন্মশতজয়ন্তী অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। তিনি যে কর্মময় আদর্শ দেশবাসীর সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে আজিকার নানা ভাবে বিপর্য্যস্ত বাঙ্গালীর জীবন উপকৃত হইবে। সারা জীবন তিনি কি ভাবে জনসেবা ও দেশ সেবা করিয়া গিয়াছেন,তাহা শুনিলে ও পাঠ করিলে যদি বাঙ্গালীর কর্ম-বিমুখতা কমিয়া জাতি নূতন উদ্যমে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তবেই জাতি মরণের মুখ হইতে রক্ষা পাইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ যদি আচার্য্য দেবের একখানি জীবন কথা প্রকাশ করিয়া সুলভে ছাত্র ও তরুণগণের মধ্যে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করে, তবেই জন্মশতজয়ন্তী সম্পাদন করা সার্থক হইবে! আমরা আচার্য্যদেবের কর্ম-শক্তি, সহৃদয়তা, দেশপ্রেম, সময় নিষ্ঠা, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ, ভারতীয় আদর্শ নিজ জীবনে রক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি গুণের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে কোটি কোটি প্রণাম জানাই এবং প্রার্থনা করি, তাঁহার আদর্শ হইতে যেন আমরা ভ্রষ্ট না হই।

বড় রকমের যুদ্ধের আশঙ্কা—

গত ২৬শে জুলাই হাপুরে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে এবং আগামী ৫।৬ মাসের মধ্যে পৃথিবীতে একটি বড় রকমের যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে। ভারতবর্ষ কোন যুদ্ধে যোগদান করিতে না চাহিলেও তাহার পক্ষে সতর্ক ও সজাগ থাকা প্রয়োজন। জরুরী অবস্থা আসিলে ভারতবর্ষকে যাহাতে কোনও প্রকারে কাহারও উপর নির্ভরশীল হইতে না হয় সে জন্য ভারতের পক্ষে নিজেকে শক্তিশালী করিয়া তোলা প্রয়োজন। হাপুর দিল্লী হইতে মাত্র ৪০ মাইল দূরে—তথায় জনসভায় শ্রীনেহরু ৪৫ মিনিট বক্তৃতা করেন। চীন কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলকে মুক্ত করার জন্য শ্রীনেহরু তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা সভায় ঘোষণা করেন। কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীকে আবেদন জানান। ভারতকে একই সঙ্গে চীন ও পাকিস্থানের আক্রমণে বাধা দিতে হইবে—তাহা খুবই কঠিন কার্য্য।

খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি—

গত আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যমূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তাহা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রায় নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। চাউলের দাম বাড়িয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তৈল, লবণ, মসলা, তরিতরকারী প্রভৃতি সকল জিনিষের দাম বাড়িয়াছিল। আলুর দাম সরকার ১০।১২ টাকা মণের মধ্যে রাখিতে পারেন নাই—অথচ আলুর উৎপাদন কম হয় নাই ও আলু রাখার জন্য ঠাণ্ডা-গুদামও বহু সংখ্যায় নির্মিত হইয়াছে। সাধারণ তরকারী—বেগুন, ঢেঁড়শ, উচ্ছে প্রভৃতির দাম কেন

যে এক টাকা সের হয়, এ বিষয়ে কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। একটু চেষ্টা করিলে দেশে প্রচুর তরিতরকারী বা শাকসজী উৎপন্ন করা যায়—এ বিষয়ে জনগণের আগ্রহ নাই বা সরকারী চেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব। কি করিলে উভয়পক্ষ অধিকতর মনোযোগী হন, সে বিষয়ে চিন্তা ও কার্য্য করিতে আমরা সকলকে অনুরোধ করি।

মৎস্যাভাব—

কলিকাতা অঞ্চলে, শুধু তাহা কেন, সারা বাংলা দেশে মাছের দর বাড়িয়া ৪টাকা সেরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে—কখনও কখনও একটু ভাল মাছ ৫ বা ৬ টাকা সেরেও লোককে কিনিতে হয়। দেশে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও কেন বাড়ে নাই, জানি না। বহু সেচের খাল কাটা হইয়াছে, সে সকল খালে কি মাছ হয় না? পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার বাবদ গত কয় বৎসরে বহু পরিমাণ সরকারী টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, বহু লোককে ঋণ দেওয়া হইয়াছে—কিন্তু তাহার ফল কি হইল? মাছের সের ৮ আনা হইতে বাড়িয়া ৪ টাকায় দাঁড়াইল। সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া আনার জন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইল—কিন্তু মাছ ধরা গেল না। এত নূতন পথ নির্মিত হইয়াছে, মেদিনীপুর বা ২৪পরগণার সমুদ্র উপকূল হইতে মাছ আনা গেল না কেন? মৎস্য বিভাগে সরকারী কর্মীর সংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়া গেল, কিন্তু সে তুলনায় মাছ পাওয়া গেল না। বাঙ্গালী মাছ-ভাত খায়—চাউলের মণ ২৫টাকা. আর মাছের মণ ১৬০ টাকা। যে যত পারে খাউক।

কলিকাতায় যান-বাহন সমস্যা—

কলিকাতায় ট্রামগাড়ী চলে, সরকারী চেষ্টায় ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট হইয়া প্রায় ৭ শত বাস কলিকাতার পথে যাতায়াত করে—কিন্তু তৎসত্বেও সাধারণ মানুষের যাতায়াতের কষ্টের সীমা নাই। বহু বৎসর পূর্বে শুনা গিয়াছিল যে অফিসে যাতায়াতের সময় এমনভাবে পরিবর্তন করা হইবে—যাহাতে সকালে ৯টা ১০টার সময় ও বিকালে ৫টা ৬টার সময় ট্রাম বাসে অত্যধিক ভিড় না হয়। সে বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই। বহু সময়ে সেজন্য বহু লোককে নানাপ্রকার কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। এমন কি মোটরগাড়ীর মালিকদিগকেও পথে অযথা আটক থাকিয়া হায়রাণ হইতে হয়। ঐ সময়ে সকলে ট্যাক্সি চড়িতে চায়, কাজেই সে জন্যও লোককে পথে আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। সরকারী বিবৃতি এ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে আশার কথা প্রচার করে বটে, কিন্তু কাজের সময় আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। সাধারণ মানুষের কথা সরকারী কর্তৃপক্ষ কবে সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন?

বিমলকুমার ঘোষ—

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক, এম-পি বিমলকুমার ঘোষ গত ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে সুখলাল কার্ণানি হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। মস্তিষ্কে টিউমার হওয়ায় তাঁহার মাথায় অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল—কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ঢাকার খ্যাতনামা উকীল শশাঙ্কুমার ঘোষের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাশ করিয়া লণ্ডন হইতে অর্থশাস্ত্রে বি-এস্-সি হন। তিনি কিছুকাল লণ্ডনে সাংবাদিকতাও শিক্ষা করিয়াছিলেন ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগে অধ্যাপক হইয়া ছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ—

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় গত ২৫শে জুলাই উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ রাষ্ট্রপতির কার্য্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করিবেন না—সংবিধান মতে তিনিই এখন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিবে। আমরা ডাঃ সর্বপল্লীর এই সম্মানে তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী—

কলিকাতার বাংলা দৈনিক যুগান্তরের সহকারী সম্পাদক ও 'নেপথ্যদর্শন' এর লেখক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী তাঁহার সাংবাদিকতার নৈপুণ্যের জন্য মানিলা সরকার কর্তৃক ম্যাগসেসে পুরস্কার ১০ হাজার ডলার (৫০ হাজার টাকা) লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী ছিল মৈমনসিংহ নেত্রকোণায়—১৯২৮ সালে জন্ম। তাঁহার ৪ মাস বয়সে তাঁহার

পিতা শিশিরকুমার চৌধুরী মারা যান—১৯৪৮ সালে বি-এ পাশ করিয়া তিনি যুগান্তরের রিপোর্টার হন ও ১৯৫২ সালে বাংলায় এম-এ পাশ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি নেপথ্য-দর্শন লিখিতে আরম্ভ করেন ও পরে সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন। তিনি সরকারী অনাচারের ২৫০টি ঘটনা প্রকাশ করেন ও তাহার ফলে প্রায় ৫০জন সরকারী কর্ম্মচারী অপরাধী প্রমাণিত হন। তাঁহার সাহসিকতা ও প্রকাশ-নৈপুণ্য অসাধারণ। আমরা তাঁহাকে এই পুরস্কার লাভে অভিনন্দিত করি ও তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

সোভিয়েট ২০শালা পরিকল্পনা—

গত ২৯শে জুলাই মস্কো হইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে ১৯৮০ সালের মধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দেশবাসী সকলকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইবে ও জনগণের কোন কোন অংশকে বিনামূল্যে খাদ্য প্রদান সম্ভব হইবে। কর-প্রথা লোপ পাইবে, খুচরা দাম কমিয়া যাইবে। দেশবাসী সকলে বিনা ব্যয়ে শিক্ষা, চিকিৎসা, শিশুপালন ও পেনসনের সুবিধা পাইবে। বাড়ী ভাড়া ও সরকারী পরিবহনের ভাড়া লোপ পাইবে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাওয়ার পোষাক ও স্কুলে খাদ্য বিনামূল্যে পাইবে। যুদ্ধের বিলুপ্তিই সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির প্রধান লক্ষ্য হইবে। সোভিয়েট নীতি সাফল্যমণ্ডিত হইলে পৃথিবীর সকল দেশই সেই নীতি অবশ্যই অনুসরণ করিবে।

পশ্চিমবঙ্গ বেতন-কমিটি—

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কর্মীদের বেতন সম্বন্ধে তদন্ত ও নির্দ্দেশ করিবার জন্য ১৯৫৯ সালের ১৭ই নভেম্বর সরকার ৪জন সদস্য লইয়া এক কমিটি করেন—সভাপতি—অর্থ দপ্তরের সচিব শ্রীবিনয় দাশগুপ্ত—সম্পাদক ঐ বিভাগের ডেপুটি সচিব শ্রীপুলিন বন্দ্যোপাধ্যায়—সদস্যদ্বয়—অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত ও অধ্যাপক ডি ঘোষ। গত ৫ই আগষ্ট কমিটি তাঁহাদের সুদীর্ঘ রিপোর্ট সরকারে দাখিল করিয়াছেন। প্রশ্ন ছিল—(১) মূল বেতন বৃদ্ধি (২) মাগ্গী ভাতার ব্যবস্থা (৩) কাহারা উপকৃত হইবেন (৪) বাড়ী ভাড়া, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধার পরিবর্তন। (৫) ডিরেক্টরেট ও সেক্রেটারীয়েট কর্মীদের বেতনের হার-বৈষম্যের দূরীকরণ (৬) দীর্ঘকালের অস্থায়ী কর্মীদের ভবিষ্যৎ। প্রকাশ, কমিটি সকল বিষয়েই সুবিবেচনা করিয়া কর্মীদের দুঃখ দূর করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে ৩ ও ৪নং শ্রেণীর কর্মীদের প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। কমিটির নির্দ্দেশ—সকল বেতন বৃদ্ধির কার্য্যকাল ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইবে। পুত্রকন্যার শিক্ষা ব্যয়, চিকিৎসা খরচ প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হইয়াছে। সকলে ঐ রিপোর্ট প্রকাশের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিবে।

জলাভাব—

এ বৎসর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে আদৌ বৃষ্টি না হওয়ায় আউস ধান ও পাটের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং আমন ধান্যের চারা যথাসময়ে বসানো যায় নাই; ডি-ভি-সি হইতে যে সব সেচের খাল হইয়াছে, সেগুলিও যথাসময়ে মেরামত ও কার্য্যকরী না হওয়ায় বা বিলম্বে কার্য্যকরী হওয়ায় যথাসময়ে তাহাতে জল আসে নাই। তাহার পর ১৫ই শ্রাবণের পর বর্ষা নামিয়াছে ও তৎপরে ডি-ভি-সি খালে জল আসিয়াছে। বহু অর্থ ব্যয়ে খাল কাটা ও জলাধারে জল রাখার ব্যবস্থা হইলেও পশ্চিমবঙ্গের একাংশ তাহার দ্বারা ঠিক সময়ে উপকৃত হয় না। আবার বেশী বর্ষা হইলে জলাধার হইতে অধিক জল ছাড়ার ফলে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক হয়। সেচ বিভাগ এ বিষয়ে কি করেন, তাহা জানা যায় না। স্বাধীনতা লাভের পর ১৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেও এখন পর্য্যন্ত খাদ্যাভাব দূর হইল না। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যোৎপাদন বিভাগ কবে দেশকে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রচুর পরিমাণে ও সুলভে দিতে পারিবেন কে জানে?

চশমার কাঁচে ভেজাল—

সম্প্রতি কলিকাতা সহরে চশমা কিনিবার সময় ক্রেতাকে সাবধান হইতে হইবে। কারণ চশমার কাঁচ এখন আর খাঁটি নাই—বহু নকল কাঁচ বাজারে বিক্রীত হইতেছে। কলিকাতা সহরে প্রত্যহ ২ হাজার হইতে আড়াই হাজার চশমা বিক্রীত হয়। শুধু কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রত্যহ ৬ শত চক্ষু রোগী আসে ও তাহার মধ্যে ৪ শত রোগীকে চশমা পরিতে বলা হয়। দাম সুলভ বলিয়া ছোট দোকানে চশমা কিনিতে যাইয়া বহু লোক প্রতারিত হইতেছেন—চশমায় লেন্স না দিয়া সাধারণ কাঁচ দিয়া ক্রেতাকে প্রতারিত করা হইয়া থাকে। পুলিশ কি এ বিষয়ে কিছু করিতে পারেন না?

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—

সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৬৭তম বার্ষিক সভায় ৬৮শ বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্যনির্বাহক নির্বাচিত হইয়াছেন—সভাপতি—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি—নির্মলকুমার বসু, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, বিমানবিহারী মজুমদার, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুশীলকুমার দে। সম্পাদক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ। সহকারী সম্পাদক—কুমারেশ ঘোষ ও লীলামোহন সিংহ রায়। কোষাধ্যক্ষ—সজনীকান্ত দাস। পুঁথিশালাধ্যক্ষ—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী! পত্রিকাধ্যক্ষ—দিলীপকুমার বিশ্বাস। চিত্রশালাধ্যক্ষ—পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গ্রন্থশালাধ্যক্ষ—ত্রিদিবনাথ রায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্য অধিকতর ব্যাপক করিতে হইলে যে চেষ্টার প্রয়োজন, বর্ত্তমানকালে তাহার অভাব দেখিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেন। আমাদের বিশ্বাস তরুণ সম্পাদক ও সহকারীরা এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দান করিয়া পরিষদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান হইবেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ—

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ হঠাৎ রক্তবমি করিয়া অসুস্থ হইয়াছিলেন—তাঁহাকে তখনই চিকিৎসার জন্য দিল্লীর ডাক্তার সেনের নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় ১১ দিন বাস করিয়া ও অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া তিনি গত ১লা আগষ্ট রাষ্ট্রপতি ভবনে ফিরিয়া গিয়াছেন। এখনও কিছুকাল তাঁহাকে চিকিৎসাধীন থাকিতে হইবে। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন না।

মণিপুরে ২৭৮টি গ্রাম—

মণিপুরের চিফ-কমিশনার জেলার সদর সার্কেলের ২৩৪টি ও টাউসেম সার্কেলের ৪৪টি গ্রাম সংরক্ষিত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। নাগা বিদ্রোহীদের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণের জন্য ঐ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে বিদ্রোহীদের কার্য্য বাড়িয়া যাওয়ার ফলে তথায় শান্তি বিনষ্ট হইয়াছিল।

কেনেডি ও ক্রুশ্চেভ—

পশ্চিম জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষা লইয়া রুশ নেতা ক্রুশ্চেভের সহিত মার্কিণ নেতা কেনেডির যে বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া সমগ্র পৃথিবীর লোক ভয়ে অভিভূত হইয়াছে। পর পর ২টি বিশ্ব-যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা লোক এখনও ভুলে নাই—সে জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিলেই লোক চঞ্চল হইয়া উঠে। ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকা বর্তমানে রুশের আক্রমণ হইতে পশ্চিম জার্মানী রক্ষা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। রুশও এখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেশ—সেও তাহার শক্তি পরীক্ষার জন্য উৎসুক। কে এই মহাসমরের সম্ভাবনা হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবে? কেনেডি না ক্রুশ্চেভ—ইহাই আজ সকলের প্রশ্ন।

কলিকাতার বহুমুখী উন্নয়ন—

কলিকাতা মহানগরীর জন্য একটি বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করিতে নিউইয়র্কের ফোর্ড ফাউণ্ডেসন মোট ১৪ লক্ষ ডলার (৭০ লক্ষ টাকা) দান করিবেন বলিয়া ২৯শে জুলাই ঘোষণা করিয়াছেন। কলিকাতার সমস্যা পৃথিবীর জটিলতম নগরসমস্যাগুলির অন্যতম। ১৯৮০ সালের মধ্যে কলিকাতার লোক সংখ্যা বাড়িয়া ১ কোটি ২০ লক্ষ হইবে বলিয়া মনে হয়। ভূমি পরিকল্পনা, পল্লীগঠন, নকসা ও গৃহ সংস্থান, পরিবহন, এঞ্জিনিয়ারিং ও খাদ্য রক্ষা ব্যবস্থা, বৈষয়িক ও সামাজিক গবেষণা, রাজস্ব পরিকল্পনা ও প্রশাসন প্রভৃতি বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শদাতা দিয়া আমেরিকা সাহায্য করিবে। কলিকাতার সমস্যা যত সত্বর সমাধান হইবে, ততই দেশ উন্নত হইবে।

ভেজাল চা ধৃত—

হাওড়ার পুলিশ গত ২৬শে জুলাই রামেশ্বর মালী লেনের একটি বাড়ী হইতে ২৫ হাজার টাকা দামের ৮০ মণ ভেজাল চা বাহির করিয়াছেন। ঐ বাড়ীর আর একটি স্থানে ১০ হাজার টাকার বেআইনীভাবে সংগৃহীত লোহা ধরা পড়িয়াছে! খাদ্যে এরূপ ভেজাল সর্বত্র চলিতেছে—সরিষার তৈল, ঘৃত, ডালদা প্রভৃতি ত বিশুদ্ধ পাওয়া যায় না। চিনির সঙ্গে পাথরের গুঁড়া—চায়ের সঙ্গে কাঠের গুঁড়া—মানুষ কোথায় যাইবে। জিনিষের দাম দিন দিন বাড়িতেছে—কাজেই গরীব লোক সস্তায় জিনিষ কিনিতে যাইয়া ভেজাল কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কবে এ ব্যবস্থার প্রতীকার হইবে?

আনন্দীলাল পোদ্দার—

কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি আনন্দীলাল পোদ্দার গত ৩০শে জুলাই রবিবার রাত্রিতে মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে তাঁহার আলিপুর ২নং অশোক রোডস্থ বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ২৫ বৎসর বয়সে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করেন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর শিষ্য হন। ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র ও মেয়র নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৪২ সালে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন। তদবধি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বিধান সভার সদস্য ছিলেন। তিনি মোটর নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা দ্বারা যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন, তেমনই ঐ শিল্পের বিবিধ উন্নতি সাধন করেন। তিনি কলিকাতা ট্রাম কোম্পানার প্রথম ভারতীয় ডিরেকটার ছিলেন। অকালে তাঁহার মৃত্যুতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

॥ অর্থম্ অনর্থম্ ॥

গিন্নী :—সংসারের দরকারে যখনি যা চাইবো, তুমি বলবে,—পয়সা নেই, পয়সা নেই! কিন্তু এই যে এত পয়সার তাগাড় জমাচ্ছো, একি আমার শ্রাদ্ধে খরচ হবে!···

কর্ত্তা : - বোঝো না, বোঝো না···ইনকাম—ট্যাক্স!···খেতে না পাও, পরতে না পাও···ইনকাম-টক্স ঝক্কিটি কিআগে মেটাতেই হবে!

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

নেপোলিয়নের ভবিষ্যদ্বাণী

উপাধ্যায়

নেপোলিয়নের কাছে একখানি জ্যোতিষের গ্রন্থ ছিল। সেটি ছিল তাঁর নিত্য সহচর। এর নাম 'বুক অব ফেট এণ্ড অরেকিউলাম'। মহাবীর নেপোলিয়ান তাঁর প্রতিদিনের শুভাশুভ, ভালোমন্দ ফলাফল এই গ্রন্থের সাহায্যে গণনা করে সেই ভাবে চলতেন। এতদ্সত্বেও ভূতের হাতে যেমন রোজা মরে, তাঁর ভাগ্যেও গ্রহের কোপে পড়ে সেণ্টহেলেনায় নির্বাসন দণ্ডভোগ করে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল। ঐ গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু অংশ জ্যোতিষানুরাগী পাঠকপাঠিকদের চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করা গেল। গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য।

প্রত্যেক স্ত্রীলোকের ৩১ বর্ষটী ঘটনা বহুল ও তাৎপর্য্য পূর্ণ। এবয়সে কিছুনা কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটবেই। তা ভালোই হোক্ আর মন্দই হোক্। এসময়ে স্ত্রীলোকের পক্ষে যৌন উদ্দীপনা ও প্রলোভনে পড়ে বিপথ-হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। অবিবাহিতা বা বিধবার এই বছরে বিবাহ ঘটে। বিবাহিতার সন্তানহানি বা বৈধব্য যোগ দেখা দেয়। এসময়ে নারী হয় ধনৈশ্বর্য্যশালিনী অথবা বিদেশ ভ্রমণ করে। দারিদ্র্যলাঞ্ছিতার পক্ষে কিছু সময় ভালো হয় মাত্র, দুবেলা দুমুঠো ভাত ভালো ভাবে জোটে, এই পর্য্যন্ত। যাই হোক্ এই উল্লেখযোগ্য ৩১ বর্ষ বয়সে যে ঘটনা চক্রের পরিবেশ সৃষ্ট হয় তারই ওপর নির্ভর করে তার ভবিষ্যতের ভাগ্য, অস্তিত্ব আর জীবনযাত্রার পথ নির্দ্দেশ।

৪২ বর্ষটী প্রত্যেক পুরুষের ঘটনা-জটিল পরিস্থিতির স্রষ্টা। বহু ব্যাপার ঘটে যায় এই উল্লেখ যোগ্য বর্ষে, তা ভালোই হোক্ আর মন্দই হোক্। পুরুষের জীবনের যুগ্ম বর্ষগুলি মন্দ নয়, বিজোড় বর্ষগুলি খারাপ।

রবিবারে নতুন পোষাক পরিচ্ছদের জন্তে মাপ দিয়ে দর্জ্জির কাছে কাপড় দিলে, শোকাচ্ছন্ন ও ক্রন্দনরত হতে হয়। সোমবারে দিলে খাদ্যের প্রাচুর্য লাভ, মঙ্গলবারে দিলে জামা কাপড়গুলি পুড়ে যাবে। বুধবারে দিলে সুখশান্তি ভোগ। বৃহস্পতিবারে দিলে খুব ভালো ও শুভ হয়। শুক্রবারে দিলে বন্ধন যোগ। শনিবারে দিলে অসংখ্য কষ্ট ও দুর্ভাগ্য সূচিত হয়।

রবিবারে নব বস্ত্র পরিধানে সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ, সোমবারে পরিধান করলে কাপড় চোপড় ছিঁড়ে যাবে, বেশীদিন টিঁকবেনা। মঙ্গলবারে পরলে, জলে দাঁড়িয়ে থাকলেও কাপড় চোপড়ে আগুন ধরবে। বুধবারে নববস্ত্র-পরিধান করলে শীঘ্রই আবার নূতন পোষাক পরিচ্ছদ লাভ হবে। বৃহস্পতিবারে পরলে পোষাক পরিচ্ছদ সুন্দর ভাবে থাকবে। শুক্রবারে পরলে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যলাভ হবে যতদিন কাপড় চোপড় থাকবে নতুন। শনিবারে নব বস্ত্র পরিধান করলে অসুখ হবে।

সকালে নতুন কাপড় চোপড় পরা সৌভাগ্যব্যঞ্জক, দুপুরে পরা মার্জ্জিত ও রুচি সম্পন্ন নিদর্শনের অভিব্যক্তি, আর সকলের কাছে প্রশংসা লাভ। সূর্য্যাস্তের সময় পরা দুর্ভাগ্য সূচক, সন্ধ্যাতে পরা পীড়াদায়ক।

জানুয়ারী মাসের ১লা, ২রা, ১৫ই, ২৩শে, ২৭শে আর ২৮শে তারিখ শুভপ্রদ, আর ৩রা, ৪ঠা, ৩ই, ১৩ই, ১৪ই, ২০শে ও ২১শে তারিখ অশুভপ্রদ।

ফেব্রুয়ারী মাসের ১১ই, ২১শে, ২৫শে, ও ২৬শে তারিখ শুভপ্রদ আর ৩রা, ৭ই, ৯ই, ১২ই, ১৩ই, ১৭ই এবং ২৩শে তারিখ অশুভ প্রদ।

মার্চ্চমাসের ১০ই ও ২৫শে তারিখ শুভপ্রদ আর ১লা, ২রা, ৫ই, ৮ই, ১২ই, ১৬ই, ২৮শে ও ২৯শে তারিখ অশুভ প্রদ।

এপ্রিলমাসের ৩ই, ১৫ই, ১৬ই, ২০শে তারিখ শুভপ্রদ, আর ২৪শে ও ২৫শে তারিখ অশুভপ্রদ।

মে মাসের ৩রা, ১৮ই ও ৩১শে তারিখ শুভপ্রদ, আর ১৭ই, ২০শে ২৭শে, ২৯শে, ও ৩০শে অশুভপ্রদ।

জুন মাসের ১০ই, ১১ই, ১৫ই, ২২শে ও ২৫শে শুভপ্রদ, আর ১লা, ৫ই, ৬ই, ৯ই, ১২ই ১৩ই, ১৮ই ও ২৪শে অশুভ প্রদ।

জুলাই মাসের ৯ই, ১৫ই ও ২৮শে শুভপ্রদ, আর ৩রা, ১০ই, ১৭ই ও ১৮ই অশুভপ্রদ।

আগষ্ট মাসের ৬ই, ৭ই, ১০ই, ১১ই, ১৯শে ও ২৫শে ও শুভপ্রদ—আর ১৫ই ও ২০শে অশুভপ্রদ।

সেপ্টেম্বর মাসের ৪ঠা, ৮ই, ১৭ই, ১৮ই ও ২৩শে শুভপ্রদ—আর ৯ই ও ১৬ই অশুভপ্রদ।

অক্টোবর মাসের ৩রা, ৭ই, ১৬ই,২১শে ও ২২শে শুভপ্রদ—আর ৪ঠা, ৯ই, ১১ই, ১৭ই, ২৭শে ও ৩১শে অশুভ প্রদ।

নবেম্বর মাসের ৫ই, ১৪ই ও ২০শে, শুভপ্রদ—আর ৩রা ৯ই, ১০ই ও ২১শে অশুভপ্রদ। ডিসেম্বর মাসের ১৫ই, ১৯শে, ২০শে, ২২শে ২৩শে ও ২৫শে শুভপ্রদ—আর ১৪ই ও ২১শে অশুভপ্রদ।

শুক্লপক্ষের প্রথম তিন দিন ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ, বিবাহের পক্ষে শুভ ৭, ৯ ও ১২অ—ার শুক্লপক্ষের প্রথম দিন থেকে গণনায় ১৪, ১৫ ও ১৭ তারিখ অনুগ্রহ প্রার্থনার পক্ষে শুভ ফলপ্রদ। কিন্তু ১৬ ও ২১ তারিখ সাংঘাতিক। নূতনগৃহ নির্ম্মাণ সুরু করতে হোলে মার্চ্চ মাসই সব চেয়ে শুভ। সন্তান রবিবারে জন্মালে ধনী ও দীর্ঘায়ু হবে। সোমবারে জন্মালে দুর্ব্বল, স্ত্রৈণ ও স্ত্রীলোক ঘেঁষা হবে। তার ফলে বিশেষ সম্মান পাবে না। মঙ্গলবারে জন্মালে খুব খারাপ, প্রচণ্ড আঘাতে মৃত্যু। বুধবারে জন্মালে বিদ্যাচর্চ্চার দ্বারা লাভবান হবে। বৃহস্পতিবারে জন্মালে খুব সম্মান ও পদমর্য্যাদা লাভ। শুক্রবারে জন্মালে সুগঠিত ও চিত্তাকর্ষক শরীর কিন্তু অত্যন্ত প্রেমের দিকে ঝোঁক। শনিবারে জন্মালে খারাপ। এদিনে যারা জন্মায় তাদের অধিকাংশই হাঁদা বোকা, অলস ও একগুঁয়ে হয়। এদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয় না।

নেপোলিয়নের গ্রন্থে স্বপ্ন তত্ত্ব

বিদেশ বাস—উত্তম স্বপ্ন।

কলহ বিবাদ—স্বপ্ন দ্রষ্টা যদি দেখে কেউ তাকে অপমান করছে,, তা হোল বুঝতে হবে তার সঙ্গে কারো ঝগড়া বাধ্‌বে।

অতল স্পর্শ গভীরতা—যদি স্বপ্নে দেখা যায় অতল গর্ত্তে গিয়ে পড়া গেছে', তাহোলে সেটি বিপদের পূর্ব্বাভাস।

পরিচয়—যার পিঠ হচ্ছে পরিচিত লোকের সঙ্গে এরূপ স্বপ্নে চিত্ত-বিক্ষেপ ও পীড়া সূচিত হয়। প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে কলহ দ্বন্দ্ব হোলে বুঝতে হবে প্রণয়ী বা প্রণয়িনী অবিশ্বস্ত—ব্যবসায়ে সাংঘাতিক ক্ষতি হবে।

কুমীর—স্বপ্নে কুমীর বা অন্য কোন সরীসৃপ দেখ্‌লে বন্ধু বা কপট প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর সঙ্গে কলহ।

ভিক্ষা—স্বপ্নে কেউ ভিক্ষা চাইলে আর স্বপ্ন দ্রষ্টা দিতে অস্বীকার করলে তার অভাব ও দুঃখ কষ্ট ভোগ হবে। আর যদি স্বপ্ন দ্রষ্টা মুক্ত হস্তে কাঙালিকে দিচ্ছে এরূপ হয়, তা হোলে তার আনন্দের পরিপূর্ণতা ও দীর্ঘ জীবন ঘট্‌বে।

বেদী—স্বপ্নে বেদী দেখ্‌লে প্রকৃত আনন্দ ভোগ আর অচিরে বিবাহ।

নোঙর—স্বপ্নে নোঙর দেখ্‌লে উত্তম আশা ও নিশ্চয়তা লাভ।

দেবদূত—স্বপ্নে দেবদূত দেখ্‌লে কোন প্রিয়জনের মৃত্যু ঘট্‌বে।

ক্রোধ—স্বপ্নে ক্রোধ প্রকাশ পেলে বুঝ্‌তে হবে বহুশক্তিসম্পন্ন শত্রু আছে।

বানর—স্বপ্নে বানর দেখ্‌লে বুঝ্‌তে হবে সাংঘাতিক রকমের হিংসুক গুপ্ত শত্রুর আধিক্য।

পোষাক পরিচ্ছদ—বিচিত্র রকমের পোষাক পরিচ্ছদ পরেছে স্বপ্ন-দ্রষ্টা এরূপ দেখ্‌লে, বিপদ, দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনাভোগ হবে, পীড়িত ব্যক্তি দেখ্‌লে তার মৃত্যু হবে। ছিন্নবস্ত্র পরা হোলে বুঝ্‌তে হবে কার্য্যে বাধা ও আঘাত প্রাপ্তি।

ভূতপ্রেত—স্বপ্নে ভূত প্রেত দেখ্‌লে, প্রতারণা ও পাপে প্রলুব্ধ হওয়া বুঝোয়।

ভস্ম—স্বপ্নে ছাই দেখ্‌লে বুঝ্‌তে হবে দুর্ভাগ্য আসন্ন।

গর্দ্দভ—অশুভ, নানা বাধাবিপত্তি।

জাগরণ—স্বপ্ন দ্রষ্টা যদি ঘুমিয়ে দেখে জেগে উঠেছে, তাহোলে বুঝ্‌তে হবে যার সঙ্গে সে ভালোবাসায় পড়্‌তে চায় তাকে ভালোবাসায় জড়িত করে ফেল্‌বে, প্রেমে অনুপ্রাণিত কর্‌বে। অপরকে জাগাচ্ছে এরূপ স্বপ্ন দেখ্‌লে তার সকল দুঃখের অবসান হবে, তার শেষ পরিণতি হবে সুখের।

প্রভুত্ব—ধনী ব্যক্তি প্রভুত্ব করছে স্বপ্নে দেখলে তার খুব ভালো হয়।

ভোজ—স্বপ্নে ভোজের সমারোহ দেখা খুব শুভ ও সৌভাগ্য প্রদ।

কুকুরের ডাক—ধ্বংস ও অপমান।

স্নান—স্বচ্ছ জলে স্নান আনন্দ, ময়লা জলে স্নান নৈরাশ্য।

ভালুক—ভালুক দেখলে বুঝ্‌তে হবে ধনী নিষ্ঠুর ও দুর্দ্দান্ত শত্রুর দ্বারা পীড়িত হবে।

দাড়ি—স্বপ্নে দাড়ি দেখ্‌লে প্রণয়ে উত্তম সৌভাগ্য।

সুন্দর মুখ—সম্মান লাভ।

আঘাত বা কাটা—

কিছু দর্শন—দূর্ভাগ্যের লক্ষণ।

মৃত্যু—স্বপ্নে মৃত্যু দর্শন বিবাহব্যঞ্জক। পীড়িত ব্যক্তি নিজের বিবাহ বা অপরের বিবাহোৎসব করছে দেখ্‌লে, তার মৃত্যু ঘট্‌বে, আর আত্মীয় স্বজনবর্গের সঙ্গে হবে বিচ্ছেদ।

মৃত ব্যক্তি দর্শন—স্বপ্নে মৃত ব্যক্তি দর্শন করলে, সে ব্যক্তি যদি পরিচিত হয় তাহোলে তার জীবদ্দশায় যেরূপ ভাগ্য ও ভাবাবেগ ছিল, অনুরূপ হবে স্বপ্ন দ্রষ্টার।

পূজার্চ্চনা—স্বজনের মৃত্যু।

শয্যাপার্শ্ব—কোন কুমারীর শয্যাপার্শ্ব দেখা বা তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা বিবাহ নির্দ্দেশক।

পাখী দর্শন—স্বপ্নে পাখী উড়ে যেতে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে হবে দূর দেশে যেতে হবে অথবা হঠাৎ কোন সংবাদ প্রাপ্তি হবে। কালো পাখী দেখা কষ্টের পরিচায়ক।

পাখীর নীড়—পাখীর নীড় দেখা খুব সৌভাগ্যপ্রদ।

নৌকা—নদীতে নৌকাভ্রমণ স্বপ্নে দেখা কর্ম্মে সাফল্য আনন্দ ও সৌভাগ্য ব্যঞ্জক।

ষাঁড়—স্বপ্নে ষাঁড় দেখা লাভের পরিচায়ক। কালো ষাঁড় দেখা অশুভ—প্রতারিত হবার যোগ।

শবসৎকার—শবসৎকার দেখ্‌লে বুঝ্‌তে হবে স্বজনের মৃত্যু, নিজের পরিবারের কেউ বা নিজে বা নিজের অন্তরঙ্গ থাক্‌লে সেই লোকটি বা নিজে মারা যাবে।

আহার—স্বপ্নে আহার করছ এরূপ দেখ্‌লে বুঝ্‌বে অশুভ লক্ষণ—অপরকে আহার করতে দেখ্‌লে বুঝ্‌বে বর্ত্তমান প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করবে।

গ্রহণ—স্বপ্নে সূর্য্য গ্রহণ দেখ্‌লে পিতার আর চন্দ্র গ্রহণ দেখ্‌লে মাতার মৃত্যু হবে। এঁদের দুজনের কেউ বেঁচে না থাকলে পরবর্ত্তী গুরু স্থানীয় ব্যক্তির মৃত্যু।

জল নিমজ্জন—নিজে ডুবে যাচ্ছ জলে এরূপ স্বপ্ন দেখ্‌লে বুঝবে তুমি তোমার ভাগ্য ফিরিয়ে ফেল্‌বে। অপরকে ডুবতে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে হবে দুঃখের দিন শেষ হয়েছে।

হস্তী—হস্তী দর্শন করলে বুঝ্‌তে হবে ধনৈশ্বর্য্য লাভ।

তোষামোদ—কেউ তোষামোদ করছে স্বপ্নে দেখা অশুভ।

মেলা—স্বপ্নে মেলা দেখ্‌লে বুঝ্‌তে হবে গাঁট কাটায় টাকা পয়সা মেরে নেবে।

ক্ষেত্র—স্বপ্নে বিস্তৃত ক্ষেত্র রম্য ভূমি দর্শন করলে বুঝতে হবে সুন্দরী স্ত্রী ও সুন্দর সন্তানাদি লাভ।

পতাকা—স্বপ্নে পতাকা দেখলে অগ্নি কাণ্ডে ক্ষতি হবে।

মৎস্য—স্বপ্নে বড় মাছ দেখা বা ধরা লাভ ব্যঞ্জক।

খনন—স্বপ্নে খনন দেখা খুব শুভ কিন্তু যদি দেখা যায় কোদাল বা খননের যন্ত্র পাতি, হারিয়ে গেছে খুঁড়্‌তে খুঁড়তে তা হোলে বুঝ্‌তে হবে মজুরের ক্ষতি, শস্য হানি আর শস্য জন্মানোর প্রতিকূল আবহাওয়া।

আবর্জ্জনা—স্বপ্নে আবর্জ্জনা দেখা অশুভ। এতে পীড়া আর অসম্মান বুঝায়। কোন ব্যক্তি প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষতি করবে।

মিষ্টান্ন দোকান—শুভ। আনন্দ ও লাভ।

ভূমিকম্প—স্বপ্নে ভূমিকম্প দেখ্‌লে বুঝতে হবে সব কাজেরই পরিবর্ত্তন ঘটার সময় আসন্ন।

৮৩৩ বছর আগে যা বলা হয়েছে

মুসলমান সাধু যা-নিয়ামৎ উল্লা ওয়ালির কোয়া সিদার' মধ্যে উল্লিখিত আছে,—স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হবে। পর্দ্দা বর্জ্জন করবে। সতীত্বের কোন মূল্য থাক্‌বে না। আগামী আসন্ন তৃতীয় মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে সাধু বলেছেন—তৃতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা সংগ্রামকারীদের অন্যতম হবে। পরাজিত জার্ম্মানী ও রুষিয়া একত্র হয়ে ধ্বংসাত্মক নারকীয় অস্ত্র প্রয়োগ করবে। এরা এমন অস্ত্র প্রয়োগ করবে যা থেকে আগ্নেয়গিরির মত অগ্ন্যুদ্‌গীরণ হোতে থাক্‌বে। বৃটিশদের সমূহ ক্ষতি হবে। পৃথিবী থেকে ব্রিটিশ তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে এই তৃতীয় মহাযুদ্ধের ভেতর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর কখন ব্রিটিশ ও তার সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় হবে না। এই সাধুর জন্মস্থান বোখারা। তিনি ৫৪৭ হিজরী বৎসরে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করে পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন, প্রত্যেকটি এযাবৎ মিলেছে আর পৃথিবীতে ঘটেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা, তাদের ফলাফল, ভারতের স্বাধীনতা লাভ, ভারত বিভাগের শোচনীয় পরিণতি, ভারতবর্ষ ত্যাগের সময় ব্রিটিশ যে সব অপকৌশল প্রয়োগ করেছে আর বিষবৃক্ষের বীজ ছড়িয়ে গেছে, ভারতীয় নেতাদের চক্রান্ত—সে সবই তিনি ৮৩৩ বৎসর পূর্ব্বে লিখে গেছেন। এই মহাত্মা জ্যোতিষ ও সংখ্যা গণনার দ্বারা বিশ্বের ভূত ভবিষ্যতের ঘটনা সম্বলিত অনেকগুলি গ্রন্থ লিখে গেছেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চ্চা করবার উদ্দেশ্যে মুলতান ও কাশ্মীরে অনেক-বার এসেছিলেন।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফল

মেষ রাশি

অশ্বিনী ও কৃত্তিকা নক্ষত্র জাত গণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। ভরণীর পক্ষে অনেকটা শুভ বলা যায়। মাসটী মিশ্রফল দাতা। প্রথম দিকটা কিছু ভালো, শেষার্দ্ধটী অশুভ ব্যঞ্জক। প্রথমার্দ্ধে প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ, বিলাস ব্যসন দ্রব্য প্রাপ্তি; শত্রু জয়, লাভ, সুখকর ভ্রমণ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতা, কিছু সৌভাগ্য, প্রচেষ্টায় সাফল্য প্রভৃতি যোগ আছে। অশান্তি, ভগ্নস্বাস্থ্য, সব কাজে বাধা, দুঃখ, স্বজনবন্ধুবিরোধ, পদ মর্য্যাদা হানি, অসম্মান, অপ্রত্যাশিত ভাবে অপ্রীতিকর পরিবর্ত্তন, অর্থ ক্ষতি অপবাদ প্রভৃতি শেষার্দ্ধে ঘটবে। বিশেষ কোন পীড়ার আশঙ্কা নেই। শারীরিক দুর্ব্বলতা মাত্র। সন্তানদের স্বাস্থ্য হানি কিছুটা সম্ভব। শেষার্দ্ধে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। সমগ্র মাসটা যাবে স্বজন বন্ধুর সঙ্গে কলহ বিবাদে লিপ্ত হয়ে। পারিবারিক অশান্তি ও কলহ থাক্‌বেই কিন্তু কোন রূপে সাংঘাতিক ভাব ধারণ করবে না। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে মিশ্র ফল দাতা। প্রথমার্দ্ধটী অর্থাগমের পক্ষে অনুকূল। শেষার্দ্ধে সতর্ক হওয়া সত্বে ও অর্থ ক্ষতি হবে। স্পেকুলেশনে, রেসে ও ফাট্‌কায় পরাজয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে দুঃসময়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতি, উপরওয়ালাদের বিরাগ ভাজন হবার যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবীর পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালোই যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মধ্যম। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশি গণের সঙ্গে অসদ্ভাব ঘট্‌বে না, তাদের কাছ থেকে নানা ভাবে সাহায্য পাবে। শিল্পকলা, সঙ্গীত,

অভিনয়, মঞ্চ ও চিত্র জগতের তারা তাদের বহু আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হবে। সুখকর ভ্রমণ, রোমান্স প্রভৃতিতে সাফল্য লাভ। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সফলতা। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে নানাভাবে লাভ জনক পরিস্থিতি ঘট্‌বে। যে টুকু নৈরাশ্য বা বাধা ঘট্‌বে সেটুকু এমন কিছু উল্লেখ যোগ্য নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মধ্যম সময়।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকা জাত গণের পক্ষে মাসটী আদৌ ভালো নয়। মৃগশিরা নক্ষত্রের পক্ষে উত্তম, রোহিণীর পক্ষে মধ্যম। উত্তম পদ মর্য্যাদা, শত্রু জয়, উত্তম বন্ধু লাভ, সুখ, লাভ, প্রচেষ্টায় সাফল্য, আয় বৃদ্ধি, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে খ্যাতি, মাঙ্গলিক উৎসব, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি লাভ প্রভৃতি শুভ ফল আশা করা যায় আর শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়ন ক্ষতি, ব্যর্থ প্রচেষ্টা দুঃখ অশান্তি, স্বজন বন্ধু বিরোধ প্রভৃতি অশুভ ফল আশঙ্কা করা যায়। স্বাস্থ্য হানি ঘট্‌বে, জ্বর, অজীর্ণতা, হজমের গোলমাল, গুহ্য দেশে পীড়া, আমাশয়, শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি দেখা যাবে। ঘরে বাইরে কলহ বিবাদ। মন সর্ব্বদাই বিরক্ত ও উত্তেজিত অবস্থায় থাকবে। মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা আছে। আর্থিক অবস্থা উত্তম হবে। প্রচুর লাভ, আয় বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ঘট্‌বে। স্পেকুলেশনে বিশেষ সাফল্য লাভ। রেস খেলায় জয় লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালোই বলা যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী শুভ জনক নয় বিশেষতঃ দ্বিতীয়ার্দ্ধে নানা রকম বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হোতো পারে। স্বাস্থ্য হানির জন্য কর্ম্মে অক্ষমতা প্রভৃত নানা রকম অশান্তিকর পরিস্থিতি কর্ম্ম ক্ষেত্রে ঘট্‌বে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটী উত্তম বলা যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি উত্তম। অপরের সাহায্য ও সদিচ্ছা লাভ। অবৈধ প্রণয়ে উত্তম সাফল্য ও উপঢৌকন লাভ। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তম অবস্থা। অলঙ্কার ও মূল্যবান বস্ত্রাদি লাভ। মাসের প্রথমার্দ্ধে ভ্রমণ, পিক্‌নিক সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান প্রভৃতি দেখা যায়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম সময়।

মিথুন রাশি

মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়। পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে মধ্যম সময়। আর্দ্রাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। মাসটী সম্পূর্ণভাবে ভালো আশা করা যায়না, অধিকাংশ সময়ে অশুভ ফলাধিক্য। শেষার্দ্ধ অনেকটা ভালো। সৌভাগ্য, উত্তম স্বাস্থ্য, সুখ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, লাভ, কিছু সাফল্য, উত্তম বন্ধুত্ব প্রভৃতি শেষার্দ্ধে পরিলক্ষিত হয়। বন্ধু-বিরোধ, স্বজন বিচ্ছেদ, কর্ম্মে অসাফল্য, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, অসুস্থতা, অপমান, অপবাদ, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, মামলা মোকর্দ্দমা, নীচ সংসর্গ প্রভৃতি অশুভ ফলগুলি ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে। অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, জ্বর প্রভৃতি পীড়া। পথ্য সম্বন্ধে একটু সতর্ক হোলে এগুলির কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে। স্বজনবিরোধ বা বন্ধুর সহিত কলহের প্রতিরোধ করা যাবে না। আত্মীয় স্বজন ও পরিবারবর্গের জন্য কিছু দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবে। আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ নয়। স্বজনও বন্ধুদের প্রতারণায় জন্য ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। এমাসে অপরের জন্য জামিন হওয়া বিপজ্জনক। বড় বড় পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ না করাই ভালো, কারণ তাতে ক্ষতি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। সাধারণ আয়ের পথ-গুলি এমাসে রুদ্ধ হোতে পারে। অপরিমিত ব্যয়ের জন্য অর্থকৃচ্ছ্রতা দেখা দেবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারীও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী আদৌ ভাল নয়। জমির স্বত্ব নিয়ে গোলমাল বাধতে পারে, বাড়ী ভাড়া নিয়ে সমস্যা, আর প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য কৃষিক্ষেত্রের দুর্দ্দশা ঘটবে। চাকুরিজীবিরাও সুসময় থেকে বঞ্চিত হবে, প্রথমার্দ্ধ অপ্রীতিকর ঘটনায় মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হবে, শেষার্দ্ধ কিছুটা আশাপ্রদ হোতে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে দুঃসময় নয় তবে অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন ও আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি যোগ। রেসে পরাজয়। স্ত্রীলোকদের পক্ষে কোন প্রকার অমঙ্গলজনক ব্যাপার ঘটবে না। বরং অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। অবিবাহিতাদের বিবাহ, কোর্টসিপে সাফল্য, পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় লাভ, ভ্রমণে আনন্দ প্রভৃতি সূচিত হয়। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে পসার প্রতিপত্তি। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটী খারাপ নয়।

কর্কট রাশি

পুষ্যাজাত ব্যক্তিদের ভাগ্যে এ মাসে সবচেয়ে দুর্ভোগ আছে, ভালো ফলগুলি থেকে এরা বঞ্চিত হবে। পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষাজাতগণের গায়ে আঁচ লাগবে না, উত্তম ফললাভ দেখা যায়। উত্তম স্বাস্থ্য লাভ, প্রচেষ্টায় সাফল্য, সুখ স্বচ্ছন্দতা, বিলাস ব্যসন, নূতন বিষয় অধ্যয়নে আনন্দ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, শিক্ষাক্ষেত্রে জয়লাভ প্রভৃতি শুভ সূচিত হয়। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, নানাপ্রকার উদ্বিগ্নতা, আত্মীয় স্বজন ও ভৃত্যাদির কাছ থেকে কষ্টভোগ, অর্থহানি, সম্পত্তিনাশ, প্রভৃতি অশুভ ফলের আশঙ্কা আছে। শরীরের যে কোন যন্ত্র আক্রান্ত হোতে পারে। যারা পেটের পীড়ায়, চক্ষুরোগে, ফুসফুস ও হৃদরোগে ভুগছেন, তাঁদের বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। মাসের মধ্যে বেশীরভাগ সময়েই এইসব রোগের উপসর্গ ক্লেশদায়ক হয়ে উঠবে। পারিবারিক অশান্তির কোন সম্ভাবনা নেই, আত্মীয় স্বগনের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হোলেও কোনপ্রকার মনোমালিন্য হবে না। আর্থিক অবস্থা খারাপ হবে না, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তি প্রচুর লাভবান হবে। এমাসের মধ্যে ভাগ্যের উত্থান পতন ও তজ্জনিত নানা পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করা যায়। বন্ধুবান্ধব সভাসংসদ রাষ্ট্রশাসন বিভাগ অথবা ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপারে অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। আবিষ্কারাদি ক্ষেত্রে অনুকূল আবহাওয়া। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। চাষবাসে বা গৃহাদি নির্ম্মাণে এমাসে অর্থবিয়োগ বিশেষ

ভাবে না করাই যুক্তিযুক্ত। চাকুরির ক্ষেত্রে ভালোমন্দ কোন ঘটনাই ঘটবেনা। অধীনস্থ লোকদের সঙ্গে কিছু বচসা হোতে পারে মাত্র। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী ভালোই যাবে। রেসে জয়লাভ, রোমান্সের দিকে স্ত্রীলোকের ঝোঁক এমাসে প্রবল হবে, সুবিধা সুযোগ পেয়ে এদিকে অগ্রসর হয়েও কোন লাভজনক পরিস্থিতির আশা নেই। পরপুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা বর্জ্জনীয়। সিনেমা থিয়েটার বা জনসঙ্কুল স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা না করাই ভালো। গৃহস্থালী কাজে ব্যাপৃত হয়ে থাকা বিধেয়, কর্ম্মী নারীদের পক্ষে অফিসে বা কর্ম্ম-স্থানে সতর্ক হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটী উত্তম।

সিংহ রাশি

মঘা অথবা উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রজাতগণ অপেক্ষা পূর্ব্বফল্গুনী জাতগণ শুভ ফলগুলি বিশেষভাবে ভোগ করবে। মাসটী মিশ্রফলদাতা। সাংঘাতিক কোন ঘটনা ঘটবে না। উদ্বেগ, আশঙ্কা, মর্য্যাদাহানি, প্রচেষ্টায় বাধা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, শত্রু পীড়া, ক্ষতি, স্বজনের সঙ্গে মতানৈক্য, নীচ সংসর্গ প্রভৃতির যোগ আছে। বন্ধু লাভ, বিলাসিতা, সুখস্বচ্ছন্দতা, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, শত্রুজয়, ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি। অর্থপ্রাচুর্য্য যোগ আছে কিন্তু ব্যয়াধিক্যহেতু সঞ্চয় সেরূপ হবে না। স্ত্রীর আনু-কুল্যে বিবাহাদি সূত্রে বা দানপত্র বা উইলের মাধ্যমে অর্থলাভ যোগ আছে। স্পেকুলেশনে ও রেসে অর্থলাভ। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্রে উপরওয়ালার সঙ্গে মতভেদ বা মনোমালিন্য হোতে পারে, এজন্য সতর্কতা আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটী উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি উত্তম। জনপ্রিয়তা ও সামাজিক মর্য্যাদা লাভ। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য। অবিবাহিতাদের বিবাহ। আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন। উপঢৌকন ও মূল্যবান উপহারাদি লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

কন্যা রাশি

চিত্রানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে সমগ্র মাসটী উত্তম। হস্তাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। উত্তরফল্গুনী জাতগণের পক্ষে অধম। শেষার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধটি উল্লেখ যোগ্য শুভ। প্রচেষ্টায় সাফল্য, সৌভাগ্য, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্মান, বন্ধুদের সাহায্য লাভ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাস ব্যসন, জ্ঞান বৃদ্ধি প্রভৃতি মাসের প্রথমার্দ্ধে সূচিত হয়। ক্ষতি, মামলা মোকর্দ্দমা, কলহ বিবাদ ও পরাজয়, উদ্বেগ, ব্যয়াধিক্য, কর্ম্মেবাধা, ক্লান্তি ও স্বাস্থ্যহানি ইত্যাদি ফলগুলি মাসের শেষার্দ্ধে আশঙ্কা করা যায়। শেষার্দ্ধে স্বাস্থ্যের অবনতি, জ্বর, চক্ষু, পীড়া, পিত্তপ্রকোপ, শ্বাসনালীর কষ্ট প্রভৃতি সম্ভব। ঘরে বাইরে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বর্গের সহিত মনো-মালিন্য ও কলহ বিবাদের সম্ভাবনা। অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষ জনক। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ বলা যায় না। অধিকার, স্বত্বস্বামিত্ব নিয়ে গোলমাল বাধ্‌তে পারে, মামলা হওয়াও অসম্ভব নয়। ভাড়া আদায় ফসল ও খাজনা সংক্রান্ত ব্যাপারেও বিশৃঙ্খলা-ঘটবে। রেসে পরাজয়। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, প্রথমার্দ্ধ চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। কল্যাণ জনক পরিবর্ত্তন, পদোন্নতি প্রভৃতি যোগ আছে। উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হবার যোগ। মধ্য সময়ে হঠাৎ পরিবর্ত্তন, গুপ্ত শত্রু বা ষড়যন্ত্রকারীদের অপপ্রচেষ্টায় অপবাদ ও উপওয়ালা বিরক্তি সূচিত হয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির প্রথমার্দ্ধেই উন্নতি ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি, শেষের দিকে অর্থাগমে মন্দাভাব। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অনুকূল। যে সব স্ত্রীলোক শিল্প সঙ্গীতাদির মাধ্যমে জীবিকা উপার্জ্জন করে তাদের বিশেষ সাফল্য ও উন্নতি। অবৈধ প্রণয়ের দিকে যাদের ঝোঁক তারা ও সাফল্য লাভ করবে। চাকুরি জীবিনীও উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ করবে আর তার কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় পেয়ে উপরওয়ালা বিশেষ সুনজরে দেখবে। এমাসে গার্হস্থালী দ্রব্য, বিলাস ব্যসন দ্রব্য প্রভৃতি ক্রয়ের দ্বারা আত্ম সন্তোষ ঘট্‌বে। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যলাভ—অলঙ্কার, উপঢৌকন প্রভৃতি পাবার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী উত্তম।

তুলা রাশি

চিত্রাজাতগণের পক্ষে মাসটী উত্তম, বিশাখার পক্ষে মধ্যম আর স্বাতীজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা, লাভ, বিলাসব্যসন, উত্তম বন্ধুলাভ, শত্রুজয়, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, নূতন বিষয় অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন, নাম, যশ ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি শুভ ফল সূচিত হয়। অপরিমিত ব্যয়, দুশ্চিন্তা, মতলব বাজ লোকের চক্রান্তে পড়ে বিপন্নতা ও কষ্টভোগ, কলহ বিবাদ, মনোমালিন্য, নীচ সংসর্গ, ক্লান্তি কর ভ্রমণ প্রভৃতি অশুভ ফলও লক্ষ্য করা যায়। শরীর ভেঙে পড়বে যদি ও সাংঘাতিক কিছু হবে না। পিত্তপ্রকোপ প্রায়ই বৃদ্ধি পাবে। চক্ষুপীড়া। ভ্রমণ কালে ছোটখাটো দুর্ঘটনা। সামান্য ব্যপার নিয়ে পারি-বারিক কলহ ঘটবে আর তা থেকে পরিণতি অপ্রীতিকর হয়ে উঠ্‌বে। অসহিষ্ণু না হোলে ব্যাপারটা বেশীদূর পর্য্যন্ত গড়াবেনা। শেষার্দ্ধেই এই সব ঘটনা দেখা দেবে। অর্থোপার্জ্জন ভালোই হবে। মাঝে মাঝে একটু আধটু বাধা ঘটবে, এসব বাধা অতিক্রান্ত হবে। অর্থ উত্তম ভাবে এলেও জমানো সম্ভব হবে না ধনাধিপতি ব্যয়স্থ হওয়ায়। রেসে জয় লাভ। পরের পরামর্শ না শোনাই ভালো। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মিশ্রফল দাতা ও ঘটনা বহুল। চাকুরিজীবির পক্ষে উত্তম কিন্তু ঝঞ্ঝাট ঝামেলা থাক্‌বেই। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। রেসে জয়লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী সকল বিষয়েই ভালো। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সুযোগ, সাফল্য ও নানা মূল্যবান দ্রব্য লাভ। অবিবাহিতার বিবাহ প্রসঙ্গ। অধ্যাত্ম সাধিকার ইষ্ট দর্শন বা ইষ্টানুগ্রহলাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ, নানা লোকের সংস্রবে আসার সুযোগ ঘটবে। খ্যাতনামা শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, ও উচ্চ পদ মর্য্যাদা বিশিষ্ট

ব্যক্তির আনুকূল্য লাভ, পিক্‌নিক, কোর্টসিপ, ভ্রমণ প্রভৃতি যোগ আছে। বহুবিধ পরপুরুষের আনুগত্য ও প্রশংসা লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষেই মাসটি উত্তম। গায়ে বিশেষ আঁচ লাগবে না। কিন্তু অনুরাধা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির ভাগ্যে বহু দুর্ভোগ। শুভ ফলগুলি পাওয়া সম্ভব হবে না। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধই উত্তম। সাফল্য, লাভ, বিলাসব্যসন, মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান, সুখস্বচ্ছন্দতা, শত্রুজয়, সৌভাগ্য, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বর্গের সমাবেশ, নূতন বিষয়বস্তু অধ্যয়নে জ্ঞানলাভ, বিশেষ যশ সম্মান প্রতিপত্তি, খ্যাতির বিস্তৃতি প্রভৃতি শেষার্দ্ধে দেখা যায়। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, অপ্রত্যাশিত অপ্রীতিকর পরিবর্ত্তন, বাধা ও শত্রুবৃদ্ধি যোগ আছে। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে না। ভ্রমণে বিশেষ ক্লান্তি। মাসের প্রথমার্দ্ধে সামান্য কলহ বিবাদাদি ঘটবে, শেষার্দ্ধে পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা অটুট দেখা যাবে। শেষার্দ্ধে অর্থাগম উল্লেখযোগ্য। প্রথমার্দ্ধে টাকা কড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে ও অমাটনের জন্য পারিবারিক অশান্তি বলবৎ হবে। অপরিমিত ব্যয় ও কারো জন্যে জামিন হওয়া অনুচিত। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে অর্থপ্রাপ্তি, ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী শুভ। শেষার্দ্ধেই চাকুরি জীবির পক্ষে উত্তম, গোড়ার দিকে নানা বাধা বিপত্তি। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বন্ধুর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে অতীব উত্তম সময়, সৌভাগ্য বৃদ্ধি অবশ্যই ঘটবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভাবে চলে যাবে শান্তিও আনন্দের মধ্য দিয়ে। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য। যারা শিল্পকলা সঙ্গীতের চর্চ্চা করছে তাদের আশাতীত উন্নতির সম্ভাবনা। মঞ্চচিত্র অথবা মাইকের সম্মুখে যে সব স্ত্রীলোক উপস্থিত হয়ে কলাবিদ্যার পরিচয় দেবে, তারা পাবে প্রশংসা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অর্থ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ। সমাজকল্যাণকর কার্য্যেও সাফল্য। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র জাত গণের পক্ষে উত্তম। মূলা ও উত্তরাষাঢ়া জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। প্রভাব প্রতিপত্তি, সাফল্য, শত্রু জয়, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, নতুন পদমর্য্যাদা, আমোদ প্রমোদ উপভোগ। অল্প বিস্তর বাধা বিপত্তি আসবে। শরীরে উত্তাপ বৃদ্ধি। প্রথমার্দ্ধে রক্তের চাপ বৃদ্ধি। স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্য হানি। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বিবাহ প্রসঙ্গ বা পাকা দেখা। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে মিশ্র ফল। অর্থোপার্জ্জনের বিবিধ সুযোগ লাভ,—স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। ধনাগম ও সৌভাগ্য লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষি জীবির পক্ষে উত্তম। চাকুরি জীবির পক্ষে মাসটি উত্তম। পদোন্নতির যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবির পক্ষে শুভ। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। অবৈধ প্রণয়েও সাফল্য। পিকনিক, ভ্রমণ, পার্টি প্রভৃতিতে আনন্দ লাভ। কোর্টসিপে সাফল্য। পর পুরুষের সহিত অবাধ বিহারের যোগাযোগ। এতদ্ সত্ত্বেও শেষের দিকে প্রণয়ভেদ জনিত দুঃখ ভোগ। রেসে অর্থাগম। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ ফল প্রাপ্তি ঘটবে না।

মকর রাশি

ধনিষ্ঠা জাত গণের পক্ষে উত্তম সময়। শ্রবণার পক্ষে মধ্যম এবং উত্তরাষাঢ়া জাত গণের পক্ষে নিকৃষ্ট। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, শারীরিক কষ্ট, কলহ বিবাদ, উদ্বেগ, প্রচেষ্টার অসাফল্য, শত্রু বৃদ্ধি, ক্ষতি, মামলা মোকর্দ্দমা, নারীর দ্বারা নানা প্রকার ক্ষতির প্রচেষ্টা হেতু কষ্টভোগ। শেষার্দ্ধে সাফল্য, সুখ ও লাভ। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। শারীরিক দুর্ব্বলতা থাকবেই। উদর ও গুহ্য দেশে পীড়া প্রথমার্দ্ধে, আর শেষার্দ্ধে রক্তের চাপ বৃদ্ধি। ধারালো অস্ত্রাঘাতে রক্তপাত। স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য ও কলহ বিবাদ, বন্ধু বান্ধব ও স্বজন বর্গের সহিত বিরোধ। পারিবারিক সংক্রান্ত ব্যাপারে স্ত্রীর সহিত মতানৈক্য হেতু বিশৃঙ্খলার উদ্ভব। রেসে পরাজয়। স্পেকুলেশনে ভীষণ ক্ষতি। ধনাগম যোগ আছে। বড় বড় পরিকল্পনায় হাত না দিলে অর্থ কষ্ট ভোগের কারণ ঘটবেনা। এতদ্‌সত্ত্বেও ব্যয়াধিক্য ও বিশেষ ক্ষতি যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ নয়, নানা প্রকার ঘটনা বহুল। চাকুরির ক্ষেত্রে কর্ম্ম কর্ত্তা ও কর্ম্মী উভয়ের পক্ষে অশুভ। অধঃস্তন ব্যক্তিদের সহিত মনোমালিন্য, অধীনস্থ ব্যক্তির সহিত কলহ বিবাদ ও শেষ পর্য্যন্ত মামলা মোকর্দ্দমার আশঙ্কা। ভৃত্যাদির সহিতও অসদ্ভাব ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরাও বহু অসুবিধা ভোগ করবে। পদে পদে বাধা বিপত্তি। স্ত্রীলোকের ব্যাধি প্রকোপ, শারীরিক যন্ত্রণায় কষ্ট ভোগ। পুরুষের প্রতারণা ও বিশ্বাস ঘাতকতা, অবৈধ প্রণয়িণীর জীবন সংশয় অবস্থা। পুরুষের সহিত কলহ বিবাদ ও দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ জনিত চিত্তের বিক্ষিপ্ততা। সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে নৈরাশ্য ও দুঃখজনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ সময়।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠা জাত গণের পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বভাদ্রপদ জাত গণের পক্ষে মধ্যম ও শতভিষার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। প্রথমার্দ্ধ উত্তম, শেষার্দ্ধ কিঞ্চিৎ অশুভ। ক্লান্তি কর ভ্রমণ, মানসিক অসুস্থতা, নৈরাশ্য, উদ্বেগ-বৈচিত্র শারীরিক কষ্ট, স্বজন বন্ধু বিরোধ, দুর্ঘটনার আশঙ্কা, প্রচেষ্টার অসাফল্য ক্ষতি, অপমান ও অসম্মান শেষার্দ্ধে আশঙ্কা করা যায়। প্রথমার্দ্ধে উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রুজয়, সুখ, জন প্রিয়তা, খ্যাতি, লাভ, প্রিয় জনের সমাগম ও আনন্দ উপভোগ। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও শেষার্দ্ধে হৃদয়ের গোলমাল রক্ত দুষ্টি, চক্ষু পীড়া প্রভৃতি ঘটবে
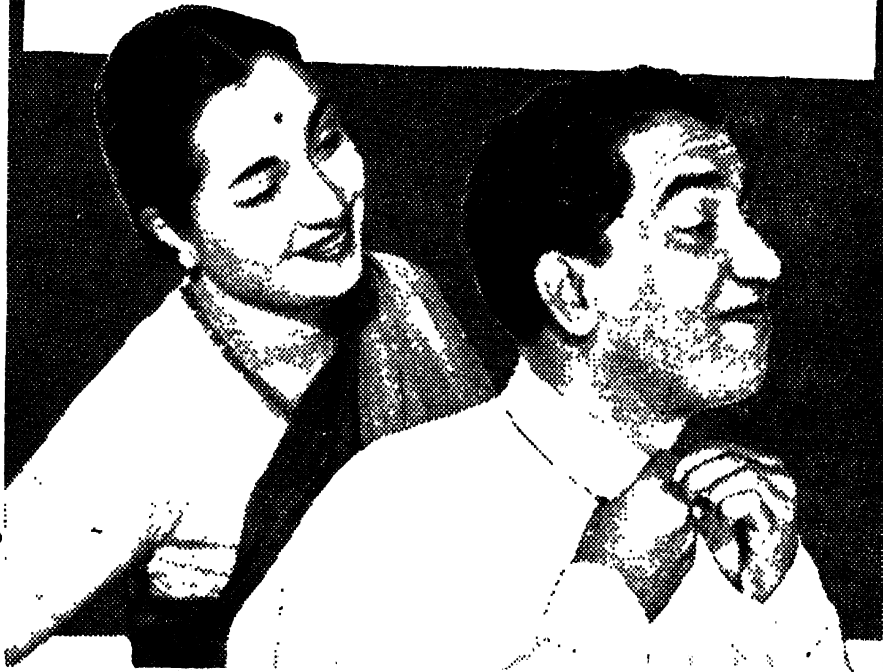
শরীরে রক্ত হ্রাস ও ক্ষত, আর সেই ক্ষত বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে। শেষার্দ্ধে ঘরে বাইরে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কলহ বিবাদ ও মনোমালিন্য। প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক শান্তি ঘটলে ও শেষের দিক অশান্তিপ্রদ। প্রথমার্দ্ধে অর্থাগম বিশেষ ভাবে হবে, শেষার্দ্ধে অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হোতে পারে। প্রথম দিকে সাফল্য, লাভ, নূতন উপার্জ্জন ও ধন বৃদ্ধি। শেষের দিকে অপরিমিত ব্যয়। কারো জন্য জামিন হওয়া কোন ক্রমেই চলবে না। প্রথম দিকে রেস খেলায় জয় লাভ হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে অশুভ হবে না। চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথম দিকে সম্মান, উপর ওয়ালার সুনজর ও কর্ম্মে খ্যাতি, শেষ দিকে নানা প্রকার জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হোতে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবিদের পক্ষে উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। অবৈধ প্রণয়ে অসাধারণ সাফল্য, পর পুরুষের সান্নিধ্যে এসে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ। সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে উত্তম অবস্থা। আমোদ প্রমোদে দিন গুলি অতিবাহিত হবে কিন্তু অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণতা ও আমোদ প্রমোদের আতিশয্য হেতু শেষের দিকে শরীর ভেঙ্গে পড়বে, এমন কি অসুখের ও সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি মন্দ নয়।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতীনক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম সময় কিন্তু উত্তরভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে কিছু নিকৃষ্ট ফলভোগ। মাসটী সুন্দর ভাবে অতিবাহিত হবে, প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধ বিশেষ শুভ। উত্তম স্বাস্থ্য, মানসিক স্বচ্ছন্দতা, প্রচেষ্টায় সাফল্য, শত্রুজয়, লাভ, জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাসব্যসন দ্রব্য ক্রয়, আনন্দপ্রদ ভ্রমণ, শুভ সংবাদ প্রাপ্তি, হিতৈষী স্বজনবন্ধুর সমাগম হবে। কিছু কলহ বিবাদ, কর্ম্মে বাধা, শারীরিক অবস্থা ভালো গেলেও হজমের গোলমাল, অজীর্ণতা চক্ষুপীড়ার সম্ভাবনা। কিছু অশুভ সংবাদ, স্ত্রী ও পরিবার-বর্গের সঙ্গে মতানৈক্য হেতু মনোমালিন্য মাসের প্রথমদিকে লক্ষ্য করা যায়। শেষার্দ্ধে পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা পরিলক্ষিত হয়। আর্থিক ক্ষেত্রে অতীব শুভ, নানাভাবে অর্থাগম, ব্যবসায়ে ধনের প্রাচুর্য্য, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির আনুকূল্যে কিছু আকস্মিক অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। স্পেকুলেশনে লাভ, রেসে জয়। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারীও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম সময়। চাকুরিজীবিদের অতীব শুভ সময়, পদোন্নতির সম্ভাবনা, বেকার ব্যক্তির চাকুরি লাভ। চাকুরি ক্ষেত্রে পসার প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে বিশেষ শুভ সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শুভ সময়। অবৈধ প্রণয়ের উত্তম সুযোগ, উপহার ও অলঙ্কার প্রাপ্তি। অর্থ লাভ। নানাপ্রকার আসবাবপত্রে গৃহ সুসজ্জিত রাখার জন্য অদম্য উৎসাহ। পিকনিক ও পার্টিতে কর্ত্তৃত্ব করবার সুযোগ। ভ্রমণে আনন্দ লাভ। বহুপুরুষের স্তাবকতা লাভ করে আনন্দ উপভোগ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে অতীব উত্তম পরিস্থিতি এবং তজ্জন্য নিজের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ ঘটবে। পরীক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীদের উত্তম সময়।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নের ফলাফল

মেষ লগ্ন

পাকযন্ত্রের পীড়া, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, আর্থিক পরিস্থিতির আনুকূল্য লাভ। পুত্রের উন্নতি, স্ত্রীর জন্য দুশ্চিন্তা। ব্যয় বাহুল্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম।

বৃষলগ্ন

অর্থাগমের পন্থা সুগম, কর্ম্মশক্তির প্রাচুর্য্য, লোকপ্রিয়তা, অসম্ভাবিত কর্ম্মে ঝঞ্ঝাট, পারিবারিক অশান্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয় লাভ।

মিথুনলগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা, মাতৃকষ্ট, দুশ্চিন্তা, কর্ম্মে বাধা বিপত্তি, বিদেশ গমন, ব্যয় বাহুল্য, স্ত্রীলোকের পক্ষে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাভঙ্গ ও বাধা।

কর্কটলগ্ন

আর্থিক উন্নতি। ভ্রমণ। দাঁতের পীড়া, বিদেশ গমন, কর্ম্মে খ্যাতি লাভ, আমোদ প্রমোদের ব্যাপারে ক্ষতি। স্ত্রীলোকের দ্বারা অপবাদ প্রচার। অপরের সংস্রবে সৌভাগ্য, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

সিংহলগ্ন

জীবনীশক্তির হ্রাস, যকৃত দোষজনিত পীড়া, নিয়ম ও শৃঙ্খলার অভাব, সৌভাগ্য বৃদ্ধি অর্থাগম, ব্যবসায়ে লাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

কন্যা লগ্ন

দাঁতের যন্ত্রণা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া ভোগ, সন্তানের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতার লক্ষণ দেখা যায়, মিত্রলাভ, অর্থাগম, অপরিমিত ব্যয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলা লগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা, ধনাগম যোগ, সহোদরভাব শুভ, শিক্ষা সংক্রান্ত ফল আশাপ্রদ। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, প্রতারণা ভোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নিকৃষ্ট ফল।

বৃশ্চিকলগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক স্বচ্ছন্দভাবের দরুণ ম্রিয়মান অবস্থা। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা, সহোদর পীড়া, স্ত্রীর পীড়া ও শোক প্রাপ্তি, স্বজন বিয়োগ, ব্যয় বাহুল্য, কর্ম্মে সুযোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়ে সাফল্য, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আংশিক ক্ষতি।

ধনুলগ্ন

ধনাগম, কর্ম্মোন্নতি, শত্রুজয়, ব্যয়াধিক্য, ব্যবসায়ীর পক্ষে উল্লেখযোগ্য

সময়, অব্যবস্থিত চিত্ততা, সাময়িক ঝঞ্ঝাট, স্বজন বিরোধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

মকরলগ্ন

বহু ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বিব্রত অনুভব, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা, ভ্রাতার দিক থেকে অশান্তি, পত্নীস্থান দুর্বল, সন্তান স্থান শুভ বলা যায় না। বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রা, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্য সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মিশ্রফলদাতা।

কুম্ভলগ্ন

উদরঘটিত পীড়া, বায়ুপ্রকোপ, সুযোগ সুবিধা লাভ, কর্ম্মোন্নতি, অর্থ-ভাণ্ডার উন্নতি হোলেও ব্যয়াধিক্য হেতু সঞ্চয়ের আশা কম। মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, উদ্বেগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ, বিচ্ছেদ ও দুঃসময়, প্রণয়ভঙ্গ যোগ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

মীনলগ্ন

আয়বৃদ্ধি, মানসিক বিচিত্র পরিস্থিতি। সন্তোষ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা, কর্ম্মে বহুবিধ সুযোগ, উন্নতি, গৃহাদি নির্ম্মাণের পরিকল্পনা, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

'কেমন সে—কে রবীন্দ্রনাথ ?'

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি

আজি হতে আরো এক শত বর্ষ পরে,
কোন এক বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত রৌপ্য নীলাম্বরে
অকস্মাৎ পুঞ্জমেঘে দেখা যদি দেয় ঘনঘটা,
বিসর্পিত বিদ্যুতের ছটা
সহসা ঝলসি ওঠে : সেই কাল-বৈশাখীর ঝড়ে
বজ্ররবে চমকিয়া যাবে মনে পড়ে,
মরদেহে জ্যোতির্ম্ময় অমর আত্মারে,
যে এসেছে একদিন শুনাইতে অপার্থিব আনন্দের গান
জাগাইতে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভীত-ত্রস্ত মানবের প্রাণ :
গানে গানে, সুরে সুরে, পৃথিবীর গগন প্লাবিয়া
সুন্দরের তীর্থ পথে নিজেরে যে গেছে বিলাইয়া।
আজি হতে মাত্র এক শতাব্দীর আগে
মহা ভাবে, মহা অনুরাগে :
কিন্নরের প্রায় কণ্ঠ, রূপে সূর্যসম
অচিন্ত্য, অপূর্ব্ব, অনুপম,
যে যুগ-মানব এল এ সঙ্কীর্ণ মানব সংসারে,
মন্ত্রমুগ্ধ আমরা তাহারে
সার্থক নয়ন মেলি দেখেছি বিস্ময়ে
আশার অতীত রূপে। আমাদের প্রাণের সঞ্চয়ে
জমায়ে রেখেছি তার সুদুর্লভ পরশনখানি
প্রাণময়, অগ্নিময়, দ্যুতিময় বাণী।
তবু জানি, হায়,
এত কাছে দেখিয়াও এতটুকু চিনি নাই তায়।
নৈকট্যের ব্যবধান রচিয়াছে কেবলি আড়াল
নিজ অন্তরের মায়াজাল
তাহারে চিনিতে দেয় নাই :
যুগ-যুগান্তের বাধা—সাধ্য কি যে তাহারে এড়াই !
প্রত্যহের ধূলিম্লান মানস-দর্পণে
মূর্তি তার মুছে মুছে গেছে ক্ষণে ক্ষণে।
ভাবি যাহা—সে ভাবনা তার,
যে ভাষা বাহন নিত্য আমার আনন্দ বেদনার,
একান্ত অজ্ঞাতসারে সেও তার দান ;
তবু মোর প্রাণ
অবগাহি তাহারি অন্তরে,
সীমাহীন সে অনন্তে দিকে দিকে কূল খুঁজে মরে।
সূর্যেরে ধরিতে পারে যে নিরাবরণ
শূন্যময়—মহাকাশ, কোথা পাবে মোর ক্ষুদ্র মন ?
আজি হতে আরো একশত বর্ষ পরে—
হে প্রেমিক, হে মানব, সুধাই তোমারে,
চোখে যারে দেখ নাই,
শোন নাই যার কণ্ঠস্বর,
তোমার মর্মের চোখে ফুটেছে কি সে সুরসুন্দর ?
শতাব্দীর ব্যবধানে ঘুচেছে কি দৃষ্টির ম্লানিমা,
আমরা যা পাই নাই, তোমরা পেয়েছ সেই সীমা ?
দেখেছো কি তমিস্রার পারে—
হিরণ্ময় পাত্রে ঢাকা ভাস্বর আত্মারে ?
কালস্রোত করি অতিক্রম—
তোমাদের টুটেছে কি আমাদের দৃষ্টির বিভ্রম ?
পাথরে মাটীতে গড়া মূর্তি মোরা পূজা করি যার
তোমাদের অনুভবে পেয়েছো কি বাণীরূপ তার ?
তোমরা কি জানিয়াছ, যারে কভু দেখনি সাক্ষাৎ
কেমন সে—কে রবীন্দ্রনাথ ?

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সরু গলির ভিতর দিয়ে নিশিকান্ত উৎপলকে একটি ছোট টাইপের বাড়ির সামনে এনে দাঁড় করাল। এই ধরনের এক সারি বাড়ি দক্ষিণ দিকে আরো খানিক দূর এগিয়ে গেছে। বাড়ি তো নয় এক একটি সিন্দুক। একটু দূরে একটি টিউবওয়েলের সামনে কয়েকজন স্ত্রীলোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কারো হাতে পিতলের কলসী, কারো হাতে বালথি, কারো হাতে মাটির ঘড়া। সেখানে গোলমাল চেঁচামেচি শুরু হয়েছে।

সদর দরজা বন্ধ ছিল, কড়া নাড়তে একটি মেয়ে এসে দোর খুলে দিল, উৎপলের মনে হল মেয়েটির বয়স বছর দশ এগারো হবে। রোগা কালো, কিন্তু মুখের লম্বাটে গড়নটুকু মন্দ নয়। পরণে একটা ছেঁড়া ময়লা ফ্রক।

মেয়েটি বলল : 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে বাবা। আসছি বলে সেই যে বেরিয়েছ। মা খুব রেগে গেছে।'

মেয়েটি আরও কী বলতে যাচ্ছিল, নিশিকান্ত বাধা দিয়ে বলল, 'চুপ চুপ।'

তারপর পকেট থেকে একটা টাকা বের করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'যা তো মা লক্ষ্মী মোড়ের দোকান থেকে একসের চাল আর একপো ডাল নিয়ে আয়।'

লক্ষ্মী বলল, 'বা: রে এক টাকায় কী হবে। কেষ্টকাকা তো আমাদের কাছে অনেক টাকা পায়। গেলেই খপ করে ধরে বসবে।'

নিশিকান্ত ধমক দিয়ে বলল, 'যা যা আর পাকামি করতে হবে না। যা বলছি শোন।'

মেয়েটি বেরিয়ে এসে রাস্তার দিকে চলে গেল। যেতে যেতে উৎপলের দিকে একবার কৌতূহলী হয়ে তাকিয়েও নিল। হয়তো ভাবল পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা বাবার এই নতুন সঙ্গীটি কে।

ভিতরে ছোট একটি উঠান আছে। সেই উঠানটুকু পার হয়ে নিশিকান্ত দক্ষিণের ঘরখানার দিকে এগিয়ে গেল। সামনে ছোট একটু বারান্দা। নিশিকান্ত বলল, 'আমি বসবার যায়গা নিয়ে আসি। আপনি একটু দাঁড়ান।'

ঘরে ঢুকতেই নিশিকান্ত যে অভ্যর্থনা পেল তা উৎপলের কানে যেতে বাকি রইল না। রূঢ় নির্মম স্ত্রী-কণ্ঠ ভিতর থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'কোন চুলোয় গিয়েছিলে শুনি। সারা গুষ্টী উপোস করে মরছে আর তুমি—'

নিশিকান্ত বলল, 'চুপ চুপ।'

তারপর মিনিটখানেক বাদে একখানা হাতলহীন চেয়ার নিয়ে এসে বারান্দায় পেতে দিয়ে বলল, 'বসুন।'

উৎপল বলল, 'আপনি কেন এত কষ্ট করছেন।'

নিশিকান্ত হেসে বলল, 'কষ্ট আবার কিসের। আমার সৌভাগ্য আপনার মত আমার বাড়িতে পায়ের ধূলো দিয়েছেন—'

উৎপল বলল, 'আমাকে মোটেই তেমন কেষ্ট-বিষ্টু—একজন বলে ভাববেন না। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে।'

নিশিকান্ত আবার ঘরের ভিতর গেল। তারপর একটা মোড়া এনে উৎপলের সামনে পেতে বসল।

পেতে নিতে নিতে বলল, 'আমরা ঘরে গিয়েও বসতে পারতাম। কিন্তু ঘরে বড্ড গরম হবে। এখানে হাওয়া-টুকু পাবেন।'

উৎপল বলল, 'না না, ঘরে গিয়ে কি হবে। এই ভালো।'

পিছন থেকে একটা নিমগাছ নিশিকান্তের ঘরের ওপরে যেন ঝুঁকে পড়েছে। তার ফলে বস্তিবাসীরা নিমের হাওয়া-টুকু পায়। কয়েকটি নিম ফল আর পাতা উঠানে ছড়িয়ে পড়েছে। কে যেন তোলা উনুনে আঁচ দিয়ে উনুন উঠানে

নামিয়ে রেখে গেছে। তার ধোঁয়া ভেসে আসছে। উৎপল চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে বসল। তাতে ধোঁয়াটা এড়ানো গেল। আবার যে সব বউ-ঝি কাজ করছিল তারাও পিঠের আড়ালে রইল।

একটু বাদে উৎপল বলল, 'সতীশঙ্করবাবু এ বাড়িতে এসেছেন?'

নিশিকান্ত বলল, 'এসেছেন বই কি। দরকার পড়লে তিনি সব যায়গায় যেতে পারতেন। সব কাজ করতে পারতেন।'

উৎপল হেসে বলল, 'এই সব লোকই তো বিশ্বকর্মা হন। আপনার সঙ্গে ওঁর আলাপ কী করে হল?'

নিশিকান্ত উৎপলের দিকে তাকিয়ে কী যেন একটু বুঝে নিতে চাইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আলাপ হয়ে গেল আর কি। দলে আমরা অনেকেই ছিলাম। কিন্তু সবাইর চেয়ে আমাকে উনি বেশি বিশ্বাস করতেন। আমার ওপর নির্ভরও করতেন খুব।'

উৎপল বলল, 'দল বেঁধে কী করতেন আপনারা?'

নিশিকান্ত সোজাসুজি উৎপলের দিকে তাকাল। উৎপল গোয়েন্দা পুলিশের লোক কিনা যেন বুঝে নিতে চাইছে। তারপর নিশিকান্ত একটু হেসে বলল, 'আমরা আর কী করতাম। হুকুমের চাকর হুকুম তামিল করতাম আমরা।'

উৎপল বলল, 'সব রকমের হুকুমই তামিল করতেন? ধরুন সতীশঙ্করবাবু যদি কারো মাথা কাটতে কি মাথা ভাঙতে হুকুম দিতেন তাহলে তাও করে আসতেন নাকি?'

গম্ভীর হয়ে গেল নিশিকান্ত। উৎপলের মনে হল আরও একটু সতর্ক হয়ে গেল লোকটি। পরিহাস করতে গিয়ে উৎপল ব্যাপারটা মাটি করে ফেলেছে। এখন সব সত্য কথা নিশিকান্তের মুখ থেকে বের করতে পারলে হয়।

নিশিকান্ত যেন খুব সাবধানে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। আস্তে আস্তে বলল, 'অমন অন্যায় হুকুম তিনি দিতেন না। মাথা কাটবার হুকুম দেবেন এতো আর মগের মুলুক নয়। তাঁরও তো থানা পুলিশের ভয় ছিল। সুনাম দুর্নামের পরোয়া করে তাঁকেও তো চলতে হত। লোকে অবশ্য নানা কথা বলে, এই পাড়ার লোকেও বলে। আপনি বোধহয় তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু রটনা কথা শুনেছেন।'

উৎপল বলল, 'না না। আপনি মোটেই তা মনে করবেন না। এ পাড়ার কারো সঙ্গেই আমার আলাপ পরিচয় নেই। আপনার সঙ্গেই যা এই আলাপ হল।'

নিশিকান্ত খুসি হয়ে বলল, 'যার তার সঙ্গে আলাপ করতে যাবেন না মশাই। আপনাকে বারণ করে দিচ্ছি। মাখামাখি করতে গেলে বিপদে পড়ে যাবেন। লোকজন ভালো নয় এদিককার। এই বস্তির মধ্যে তো নানারকমের চোর ছ্যাচ্চোড় নানা জাতের মানুষ আছেই। অভাবে অনটনে কেউ কেউ ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঘুরে বেড়ায়, আবার কারো কারো স্বভাবই খারাপ। আমাদের বস্তির কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু রাস্তার দুধারে পাকা বাড়িতে যে সব ধোপ দুরস্ত ভদ্রলোক বাস করেন তাঁদের মধ্যেও চীজ যা একেক খানা আছে তা আর এই নিশিকান্ত দাসের জানতে বাকি নেই।'

উৎপল নিশিকান্তের খেই ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'সতীশঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে কী বলে এখানকার লোকে?'

নিশিকান্ত বলল, 'আমাদের সামনে কি আর কেউ কিছু বলতে সাহস পায়? তেমন বুকের পাটা এপাড়ায় কারোরই নেই। এক চড়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবনা? গুণ্ডাই হোক আর যাই হোক নিশিকান্ত দাস বেইমান নয়। সে এক ছিটে নিমক যার খায় তার কথা চিরকাল মনে রাখে। তার অপমান বদনাম সহ্য করে না।'

হঠাৎ ভিতর থেকে ডাক পড়ল, 'শুনে যাও।' নিশিকান্ত তাড়াতাড়ি উঠে গেল। ঘরের ভিতরে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কী নিয়ে যেন খানিকক্ষণ ফিসফিস চলল। তারপর নিশিকান্ত একটা কাঁচের গ্লাস হাতে বেরিয়ে এসে বলল, 'আপনি বসুন, আমি আসছি।'

উৎপল কিছু বলবার কোন সুযোগ পেলনা। নিশিকান্ত সরু গলি-পথ দিয়ে বাইরে চলে গেল।

উৎপল অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তার সেই দ্রুত চলার ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। বস্তির আর কোথাও ইলেকট্রিক লাইটের ব্যবস্থা আছে কিনা উৎপল জানে না কিন্তু এবাড়ির পাঁচ ছয়খানি ঘরের কোন ঘর

থেকেই কোন বিদ্যুৎরশ্মি সে দেখতে পেলনা। কোন কোন ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। কিন্তু সেই আলোয় উঠোনের অন্ধকার দূর হয়নি। সমস্ত বাড়িটা যেন একগলা তরল অন্ধকারের মধ্যে ডুব দিয়ে রয়েছে। পূব দিকে অনেক দূরে দুটি ন্যাড়া তালগাছের মাথা খাড়া হয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে কিসের একটা রিক্ততা, শূন্যতা যেন সমস্ত পরিবেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হঠাৎ উৎপলের সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল। কেন এখানে সে এসেছে, কিসের জন্যেই বা বসে রয়েছে সব যেন অর্থহীন হয়ে গেছে। সতীশঙ্কর রায়ের জীবনের নানা ঘটনা, তাঁর কীর্তি অকীর্তি সম্বন্ধে উৎপলের যেন কোন মানে হয়না। সেই একটি মানুষের অতীত জীবনের চেয়ে অনেক বেশী অর্থ আর তাৎপর্য বহন করে অন্ধকারে আচ্ছন্ন বস্তির এই সব অচেনা মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্না—যাদের অস্তিত্ব উৎপলের কাছে ছায়ার মত হলেও যারা ঠিক ছায়া নয়। দূরে কোথায় হল্লা আর চীৎকার চলছে, তারই মধ্যে কোথায় যেন গ্রামোফোন রেকর্ডে হিন্দুস্থানী সিনেমা সঙ্গীত বেজে উঠল। এই বিচিত্র পঙ্কপালের মধ্যে এই অর্থহীন অস্বস্তিকর পরিবেশে উদ্দেশ্যহীন ভাবে অন্ধকারে একা একা বসে থাকতে থাকতে উৎপলের মন যখন এক অসহায় বিষণ্ণতায় ভরে উঠছিল, নিশিকান্ত এসে সামনে দাঁড়াল, 'এই যে আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। তাই বলে অন্ধকারে কেন এঁ্যা! একটা আলোও দিতে পারোনি তোমরা? কী আক্কেল তোমাদের! এই লক্ষ্মী, এই শামু, তোরা একটা আলো টালো দিসনি কেনরে?'

ঘরের ভিতর থেকে লক্ষ্মী জবাব দিল, 'তেল কোথায় বাবা, যে আলো জ্বলবে। কেরোসিনের পয়সা দিলেনা কিছুনা আবার বলছ আলো দিয়ে গেলিনে কেন।

বুঝতে দেরি হয়না মায়ের কথাগুলিই মেয়ের গলার মাইক্রোফোনে শোনা যাচ্ছে। উৎপল বিব্রত হয়ে বলল, 'থাক থাক আলোর আর দরকার নেই। আমি বরং এখন উঠি নিশিকান্ত বাবু, পরে আর একদিন এসে অন্য সব কথা শুনব।'

নিশিকান্ত বলল, 'আরে নানা মশাই তাই কি হয়। আপনার জন্যে চা নিয়ে এলাম যে। অন্ধকারের জন্যে ঘাবড়ে গেলেন নাকি? ভয় নেই আপনার এখুনি আলোর ব্যবস্থা করছি। গ্লাসে করে কি খেতে পারবেন না? দাঁড়ান একটা কাপে করে নিয়ে আসছি।'

চা খাবার মত প্রবৃত্তি ছিলনা উৎপলের। কিন্তু যে মানুষটির ঘরে খাবার নেই, রাত্রে আলো জ্বালবার মত তেল নেই তার এই অতিকষ্টের আতিথ্যটুকু ফিরিয়ে দিতেও তার মন সরল না।

চায়ের কাপটি হাতে তুলে নিল উৎপল। একটি অসৎ অসামাজিক দুর্বৃত্তের ঘরে বসে অন্ধকারে সে চা খাচ্ছে। ভাবতে অদ্ভুত লাগল উৎপলের। কিন্তু এই মুহূর্তে একজন অতিথিপরায়ণ গৃহী ছাড়া আর কোন ভূমিকা কি এই মানুষটির আছে?

একটু বাদে আলোর ব্যবস্থাও করল নিশিকান্ত। ফের বেরিয়ে গিয়ে কোত্থেকে হ্যারিকেনে তেল ভরতি করে নিয়ে এল। আলো জ্বেলে হ্যারিকেনটা পায়ের কাছে রেখে মোড়ার ওপর শক্ত হয়ে বসল। কাঁচের গ্লাসে নিজের জন্যেও খানিকটা চা ঢেলে নিয়েছে।

ঘরের ভিতর থেকে রান্নার গন্ধ আসছে। ডালের সঙ্গে কী যেন একটা তরকারিরও ব্যবস্থা হয়েছে। তাই নিয়ে মা আর মেয়ের মধ্যে আলাপ চলছে। অন্য ঘরগুলি থেকেও এতক্ষণ জীবনের সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। পাশের একটা ঘর থেকে শিশুর কান্না, যুবতী নারীর হাসির শব্দ শুনতে পেল উৎপল।

নিশিকান্ত তার আগের কথার জের টেনে বলতে লাগল, 'সতীশঙ্করদাকে নিয়ে অনেকে অনেক রকম কথাই বলে। কেউ কেউ বলে তিনি ছিলেন আস্ত ডাকাত। পরের ধন লুটে পুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। এসব কিন্তু সত্যি নয়, বেশির ভাগই রটানো কথা। বড় বড় লোকের বিরুদ্ধেই তো বড় বড় সব বাজে কথা রটে। ডাকাতি তিনি করবেন না কেন করেছেন। কিন্তু সব সেই স্বদেশী আমলে। তার জন্যে সাজা পেয়েছেন, জেল খেটেছেন। বেরিয়ে এসে তিনি গায়ের জোরে বোমা পিস্তল ছুঁড়ে পরের জিনিস লুটপাট করেছেন বলে তো আমরা কিছু জানিনে। তবে লোকে তাঁকে ভয় করত। বনের সাপ বাঘকেও বোধহয় মানুষ অত ভয় করে না। লোকে জানত উনি মানুষের ভালোও যেমন করতে পারেন মন্দও তেমনি করতে পারেন। লোকে শনিকে যেমন তোয়াজ

করে সতীশঙ্কর রায়কেও তেমনি ভয়ে ভয়ে শ্রদ্ধা করত। উনি সবার সঙ্গেই হেসে কথা বলতেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে জানতেন কে শত্রু কে বন্ধু। কে দুটো মন-রাখা কথা বলছে, কে ওঁকে সত্যিই ভালোবাসে শ্রদ্ধাভক্তি করে। থানার বড়বাবু ছোটবাবু সবাইর সঙ্গে ওঁর ভাব ছিল। শুধু আমাদের এই থানা কেন, লালবাজারের বড় বড় হোমরা চোমরাদের সঙ্গেও ওঁর জানা শোনা ছিল। বাড়িতে বসে একটি ফোন করে দিতেন বাস। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হাসিল। দোষ ঘাট করলে গাল মন্দ করেছেন, আবার বিপদে আপদে পড়লে রক্ষাও করেছেন। থানা-পুলিশের হাঙ্গামা থেকে ছাড়িয়েও এনেছেন। সে কথা স্বীকার না করলে পাপ হবে।'

নিশিকান্ত গ্লাসটা বসিয়ে রেখে বোধহয় সতীশঙ্করের উদ্দেশ্যে দু হাত তুলে নমস্কার জানাল। তারপর বলল, 'দাঁড়ান দেশলাইটা নিয়ে আসি। আপনার ওসব চলেতো?'

উৎপল হেসে বলল, 'না।'

নিশিকান্তও হাসল 'বলেন কি? কিছু খান না? বিড়ি সিগারেট কিছু না? সতীশঙ্করদার কিন্তু সব চলত। বুঝতে পেরেছেন? সব। প্রসাদ-টসাদ আমরাও মাঝে মাঝে পেয়েছি। অস্বীকার করলে পাপ হবে। এব্যাপারে মানুষটি খুবই দিল-দরিয়া ছিলেন।' আগের কোন সুখস্মৃতি মনে পড়ে গেল বোধ হয় নিশিকান্তের। মুখে হাসি ফুটল। বলল, 'বসুন, আসছি।'

তারপর বোধহয় বিড়ি দেশলাই আনবার জন্যেই ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। [ক্রমশ

বিদায়

সমীরণ চক্রবর্ত্তী

সিনেট-ভবন ওহে! অবলুপ্ত চিহ্ন তব আজ!
দাঁড়াইয়া ছিলে দীর্ঘ শতাব্দীর গৌরবের মাঝ,
বিমর্ষ হইবে তব অন্তর্দ্ধানে সারস্বতজন
যাঁহাদের বহু আশা, বহু ভাষা, কল্পনার ধন
ছিলে তুমি। প্রাচীনকালের যত বিদগ্ধ সমাজ,
গৌরব মুকুট পরায়েছে শিরে; এ বঙ্গের মাঝে
আনিলে কত না জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক সন্ধান,
যাহার পরশে ধন্য সুধীজন করিয়াছে স্নান
জ্ঞানের অমৃত স্রোতে। শতাব্দী-কালের সাধনার
সাক্ষ্য তুমি—তোমার মহিমময় মূর্ত্তি কতবার
দোলায়েছে বঙ্গের অন্তর। জোয়ারের স্নিগ্ধ জলে

কাঁপিয়াছে ছায়া তব: তারি সনে নবীন হিল্লোলে
নাচিয়াছে হৃদয় মোদের—আজি তার সমাপন।
ধ্বনিয়া উঠেছে আজি—"হেথা হ'তে যাও পুরাতন।"

জগতের কীর্ত্তি যত, ছিল যত মহান্ প্রাচীন,
লভেছে বিরাম সবে—অতীতের গর্ভেতে বিলীন
হইছে সতত; তুমিও তাদেরি পথের যাত্রী আজি।
মজুরের কুঠারেতে উঠেছে বিদায় বাদ্য বাজি
আজিকে তোমার তরে। যাও তবে, ওহে পুরাতন!
সকলের দীর্ঘশ্বাস, সকলের অশ্রু-মুক্তাধন
হইবে পাথেয় তব।
কিন্তু যে আসিবে তব স্থলে;
'পারিবে কি বহিতে তোমার অতুল গৌরবভার?'—
এই শঙ্কা জাগে মনস্থলে।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ কঠিন মায়া ॥

চিত্রটির এই 'কঠিন মায়া' নাম থেকে স্বতঃই মনে ভেসে ওঠে একটি ট্র্যাজিক্ গল্পের আলেখ্য। কিন্তু গল্পটি আসলে হাল্কা ধরণের একটি পরিচ্ছন্ন কমেডি। বিবাহ-বিদ্বেষী তরুণ নায়কের বিবাহ-ভয়ে শহর থেকে দূরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালিয়ে বেড়ান ও পরোপকার প্রবৃত্তির ঝোঁকে নানা ঘটন-অঘটনের সৃষ্টি করে, শেষ পর্যন্ত যে মায়াকে সে এড়াতে চেয়েছিল সেই কঠিন মায়াকে কাটাতে অক্ষম হয়ে, একটি পল্লীবালার মায়ার বাঁধনে আত্মসমর্পণ এবং কমার্স গ্র্যাজুয়েট্ নায়কের শহরের থেকে গ্রামকেই ভালবেসে শেষে কৃষিকার্যে আত্ম-নিয়োগ।—এই হল গল্পটির সার। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের এই গল্পটি একটি নির্ভেজাল কমেডি, আর ছবিতে গল্পটি হয়েছে অত্যন্ত হাল্কা ধরণের,—কিন্তু সে জন্য চিত্রটিকে ভাল হয় নি একথাও বলা চলে না। তবে দর্শন-তত্ত্ব, রাজনীতি-তত্ত্ব প্রভৃতি জটিল বিষয়ের সমাবেশের অভাব ছবিটিতে ঘটেছে, আর সেইজন্যেই তত্ত্বান্বেষী, দার্শনিক-মনা অনেক বাঙালী দর্শকের চিত্রটি ভাল না লাগবার কারণও রয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় ঐ সব জটিল বিষয়ের অবতারণা চিত্রটিতে না থাকাই চিত্রটির একটি বিশেষ গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৃত্যু, কান্না প্রভৃতি করুণ রসের অভাবও চিত্রটির সৌষ্ঠব বাড়িয়েছে বই কমাই নি। গান আরও দু'টি বাদ গেলে ভাল হত, আর চিত্রটির দৈর্ঘ্য আরও কম হওয়া উচিত ছিল।

ছবিটির প্রধান গুণ বোধহয় প্রবীণ পরিচালক সুশীল মজুমদারের পরিচালনা। তাঁর পরিচালনা গুণেই যে চিত্রটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তা অনস্বীকার্য। চিত্র-নাট্য বা স্ক্রীপ্ট্ লেখাটি ত্রুটিহীন নয়, কিন্তু সে ত্রুটি-বিচ্যুতিও পরিচালক মজুমদার তাঁর পরিচালনা গুণে অনেকটা সামলে নিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর পরিচালনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়েছে চিত্রটির দ্রুত গতি। এই দ্রুত গতিই চিত্রটির প্রধান গুণ-রূপে দর্শক-মনকে সর্বক্ষণ আটকে রাখে এবং এই গতির জন্যই এই রকম ধরণের চিত্র উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ছবিটি মন্থরগামী হলে বোধহয় দেখবার অযোগ্য হয়ে উঠত। তবে এই গতি বজায় রাখতে গিয়ে পরিচালককে বিদেশী টেক্-নিক্ অনুযায়ী অনেক ছোটখাট আনুষঙ্গিক বিষয় বাদ দিতে হয়েছে বলে ঘটনার পারম্পর্য কিছুটা নষ্ট হওয়ায় সাধারণ দর্শকদের,বিশেষ করে যাঁরা বিদেশী ছবি বেশী দেখেন না—তাঁদের পক্ষে হয়ত মাঝে মাঝে ছবিটির ঘটনা-পরম্পরা অনুসরণ করা ও বোঝা কষ্টকর হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি বলব পরিচালক ঠিকই করেছেন এরূপ টেক্‌নিক্ অনুসরণ করে। খুঁটিনাটি ঘটনা ভারাক্রান্ত মন্থরগামী ছবির যুগ·

উত্তমকুমার প্রযোজিত 'সপ্তপদী' চিত্রের একটি প্রেমমধুর দৃশ্যে সুচিত্রা ও উত্তম।

বি, আর, চোপ্রার 'কানুন' চিত্রে অশোককুমার
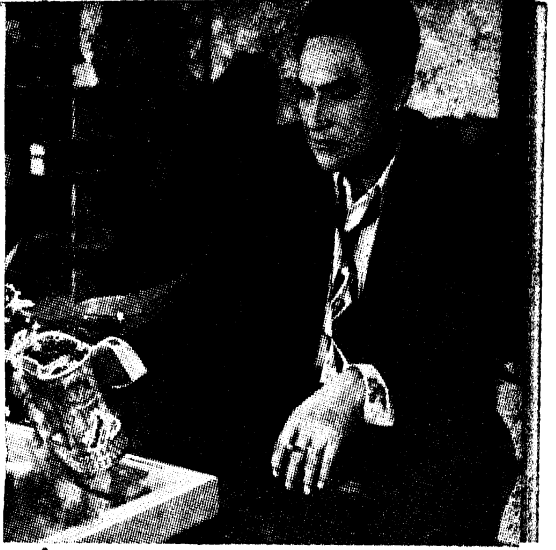
চলে গেছে, এখন দর্শকদেরও উন্নত কলাকৌশলের সাহায্যে চিত্র উপভোগ করবার সময় এসেছে। কলাকৌশলেরও পরিবর্ত্তন হচ্ছে—আজকের টেক্‌নিক্ কালকে হয়ত পুরাণ হয়ে যাবে, নতুন টেক্‌নিকের প্রবর্তন হবে। পরিচালকদেরও সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যেমন তাল রেখে চলতে হবে, দর্শকদেরও মনকে প্রগতিশীল করে তাকে বোঝবার ও তার মারফৎ চিত্ররস উপভোগ করতে হবে—অন্যথা আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাব।

বিদেশী চিত্রের আমদানী বন্ধ করতে বা কমাতে সরকারপক্ষ এবং অনেকেই মাঝে মাঝে বলে থাকেন। কিন্তু বিদেশী চিত্রের আমদানী কমে গেলে পাশ্চাত্য চিত্রের উন্নত টেক্‌নিকের সঙ্গে এদেশীয় পরিচালক ও দর্শকদের পরিচয় ঘটবে কি করে? কোথা থেকে তাঁরা শিখবেন ও বুঝবেন? আমাদের চিত্রের মান বিশ্ব-চলচ্চিত্র মানের সমকক্ষ না হলে কেনই বা আমাদের চিত্র উচ্চস্থান পাবে আন্তর্জাতিক চিত্রোৎসবে? আর কি করেই বা পাবেন আমাদের প্রযোজক, পরিচালকরা যশের মুকুট?—এসব কথা আজ ভাববার সময় এসেছে চিত্র-ব্যবসায়ীদেরই শুধু নয়, সাধারণ দর্শকদেরও।—তাই বলছিলাম, পরিচালক মজুমদারের টেক্‌নিক্ ঠিকই হয়েছে।

''কঠিন মায়া'-র বহির্দৃশ্যের কাজও ভাল হয়েছে, আর আজকালকার কালে বহির্দৃশ্য না থাকলে চিত্রের সৌষ্ঠবও বাড়ে না। গ্রামের পথের, শহরের রাস্তার, ষ্টেসনের সম্মুখে ও ট্রাম্-বাস্-ট্রেনের দৃশ্যগুলি উপভোগ্য হয়েছে। তবে গঙ্গাবক্ষে পাটের নৌকায় নায়কের গানটি বাদ দিয়ে দৃশ্যটি ছোট করলে আরও ভাল লাগত। আর গ্রামের হাটে, যেখানে নায়ক দৈব-ঔষধ বিক্রয় করছিল, সেই দৃশ্যটি বড় করে সত্যকার গ্রাম্য-হাটের দৃশ্য দেখালে আরও উপযোগী হত।

অভিনয়ের দিক দিয়ে বলা চলে, নায়ক বিশ্বজিৎ ও নায়িকা সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় চরিত্রোপযোগী সাবলীল হয়েছে। বিশ্বজিৎ-এর অভিনয়ের প্রধান গুণ তাঁর চলা-ফেরায় বা মুভ্‌মেণ্টে আড়ষ্টতা নেই, যা বাংলা চিত্রের নামকরা অভিনেতাদের অনেকেরই আছে। তবে গানের সময় তাঁর মুখভঙ্গিটি গানের সুর ও কথা অনুযায়ী হওয়া উচিত—নচেৎ প্লে-ব্যাক্‌টা বড্ড ধরা পড়ে, আর গানের সময় অযথা হস্ত-উৎক্ষেপনটাও সংযত করলে দেখাবে ভালই। অন্যান্য চরিত্রগুলির অভিনয়ও যথাযথ হয়েছে বলা চলে। চরিত্রগুলি অনেক, তবে বিশেষ করে চোখে পড়ে নবাগতা গৌরী মজুমদারকে। পার্শ্ব-চরিত্রগুলিতে অনুপকুমার, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী, রবীন মজুমদার প্রভৃতির অভিনয়ও প্রশংসাযোগ্য হয়েছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি আছেই, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে সম্পূর্ণ কমেডি রূপে ছবিটি যে উপভোগ্য হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই এবং এরূপ কমেডিরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে আমাদের শত সমস্যা-জর্জরিত দৈনন্দিন জীবনে।

***

খবরাখবরঃ

প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) "বীণাবাই" নামক গল্পটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। চিত্র-নাট্যরচনা ও পরিচালনা করছেন শ্রীতারাশঙ্কর, আর চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব এই সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছেন সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী।

* * *

অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত 'বেনারসী' চিত্রে সৌমিত্র ও রুমা দেবী।

'কণক প্রডাক্‌সন্স'-এর "আশায় বাঁধিনু ঘর" ছবিটির কাজ শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। পরিচালনা করছেন কণক মুখোপাধ্যায় এবং সুর যোজনা করেছেন ভি, বাল্‌সারা। অভিনয়াংশে আছেন—ছবি বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ প্রভৃতি।

* * *

'দেবী প্রডাক্‌সন্স'-এর "ডাইনী" চিত্রটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। ছবিটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন গীতা দে এবং অন্যান্য ভূমিকায় আছেন—ছবি বিশ্বাস, দিলীপ রায়, নৃপতি, হরিধন প্রভৃতি। সঙ্গীত রচনা করেছেন কালোবরণ।

* * *

'শ্রীমান পিক্‌চার্স'-এর প্রথম বাংলা চিত্র "মধুরেণ"ও শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। চিত্র-নাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং প্রধান চরিত্রে অনেক দিন পরে দেখা যাবে প্রখ্যাতা অভিনেত্রী সন্ধ্যারাণীকে। ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন অন্য ভূমিকাগুলিতে।

* * *

'রাজশ্রী পিক্‌চার্স'-এর সামাজিক চিত্র "আরতি"-র চিত্র-গ্রহণ কমল ষ্টুডিওতে দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে। নায়ক ও নায়িকা চরিত্রে প্রদীপকুমার ও মীনাকুমারী অভিনয় করছেন এবং প্রধান ভূমিকায় আছেন অশোক-কুমার। অন্যান্য ভূমিকাগুলিতে আছেন শশিকলা, রাজেন্দ্র-নাথ, বিজয়া চৌধুরী, জাগিরদার, পিস কানোয়াল প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রোশন্‌।

* * *

একটি নতুন রঙীন চিত্র বোম্বেতে প্রস্তুত হচ্ছে। চিত্রটির নাম "Dharti Maan Rahi". 'বিমল রায় প্রডাক্‌সন্স'-এর সম্পাদক অমিত বসু এই ছবিটি পরিচালনা করছেন। সঙ্গীত-পরিচালক সলীল চৌধুরী ছবিটির চিত্র-নাট্যও রচনা করেছেন। প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করছেন—শাম্মি কাপুর, রাগিণী, রাজেন্দ্রনাথ ও বিজয়া চৌধুরী।

* * *

'স্বস্তিকা ফিল্মস'-এর প্রথম চিত্র "পলাশের রং"-এর কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আরম্ভ হয়ে গেছে। ছবিটির চিত্র-নাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন সুশীল ঘোষ এবং সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ভি, বাল্‌সারা।

* * *

'দে প্রডাক্‌সন্স'-এর দ্বিতীয় নিবেদন নারায়ণ গঙ্গো-পাধ্যায়ের গল্প "সঞ্চারিণী"-র চিত্র গ্রহণ দ্রুতগতিতে নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে অগ্রসর হচ্ছে। পরিচালনা করছেন সুশীল মজুমদার এবং অভিনয় করছেন—বসন্ত চৌধুরী, বিকাশ রায়, কণিকা মজুমদার প্রভৃতি। এঁদের তৃতীয় চিত্র "সংযোগ"-এরও পরিচালনা করবেন সুশীল মজুমদার এবং প্রধান স্ত্রী-চরিত্রে রূপদান করবেন সুচিত্রা সেন।

* * *

দেশে-বিদেশে

Canada Council কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা ও সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ Montreal-এ গেছেন। কানাডার পথে তিনি টোকিওতে নেমে বিদেশে প্রথম ভারতীয় সঙ্গীতপ্রতিষ্ঠান 'Ali Akbar College of Music'-এর উদ্বোধন করে গেছেন। এই সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে জাপানী ছাত্রদের ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল্ সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হবে। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁয়ের বক্তৃতা ভ্রমণ ৩রা আগষ্ট থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে আছেন প্রসিদ্ধ তবলা বাদক পণ্ডিত চতুরলাল। University of Montreal এবং McGill University—এই দুই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Faculties of Music তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই ভ্রমণ ব্যবস্থা করেছেন। এ ছাড়াও ওস্তাদজী 'Jeunesses Musicales du Canada'-তেও সঙ্গীত পরিবেশন করবেন এবং নিউ ইয়র্কের Cornel University কর্তৃক আয়োজিত অষ্টম Congress of the International Musicological Society-র অধিবেশনে যোগদান করবেন। আর একজন নামকরা তবলা বাদক পণ্ডিত মহাপ্রভু মিশ্রও McGill University কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে আলি আকবর খাঁয়ের সঙ্গে গেছেন। তিনিও Voice of America ও নানা সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে তাঁর বাজনা শোনাবেন।

নিয়োগী পিকচার্স পরিবেশিত 'রতনলাল বাঙ্গালী' ছবিতে কমলা মুখার্জী ও অভনু গুহ

* * *

বিখ্যাত সেতার বাদক ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ ও তবলা বাদক পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদও প্রায় চার মাসের একটি ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁরা আফ্রিকা, ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, সুইৎসারল্যাণ্ড, স্কট্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে ও সুইডেন্ প্রভৃতি স্থানে সেতার ও তবলা-বাদ্য পরিবেশন করবেন। এর পর তাঁদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও গমন করার সম্ভাবনা আছে।

* * *

খ্যাতনামা চিত্র-পরিচালক তপন সিংহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছেন। খুব সম্ভব আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি আমেরিকা যাত্রা করবেন। যুক্তরাষ্ট্র সফর কালে শ্রীসিংহ ওখানকার চলচ্চিত্র শিল্পের কর্মপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করবেন এবং কয়েকটি বক্তৃতাও দেবেন। এ ছাড়াও শ্রীসিংহকে আগামী নভেম্বর মাসে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হবে তাতে তিনজন বিচারকের অন্যতম বিচারকরূপে যোগদানের জন্যও ঐ উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। অন্য দু'জন নির্ব্বাচিত বিচারক হচ্ছেন—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র-পরিচালক জোসেফ্ ফন্ ষ্টার্ণবার্গ এবং বিখ্যাত নাট্যকার আর্থার মিলার।

* * *

সুইজারল্যাণ্ডের Locarno-তে জুলাই মাসে যে চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে সত্যজিৎ রায়ের রবীন্দ্রনাথের জীবনী অবলম্বনে নির্ম্মিত ডকুমেণ্টারী চিত্রটিকে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্রগুলির মধ্যে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়

স্থান পেয়েছে সাংহাই-এ নির্মিত চৈনিক চিত্র "Where is Mama."

* * *

গত ৫ই জুলাই থেকে ১২ই জুলাই পর্য্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার Djakarta শহরে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবে নিম্নলিখিত নয়টি চিত্র পাঠান হয়েছিল। চিত্রগুলি হচ্ছে :—'অপুর সংসার' ও 'কাবুলীওয়ালা' (বাংলা); Chhoti Bahen', Naya Daur, ও 'Chaudhvin-Ka-Chand' (হিন্দী); 'Pavamanniup', 'Missiama' ও 'Padikkatha Methai' (তামিল) এবং 'Inti Mahalakshmi' (তেলেগু)। এই উপলক্ষে যে পাঁচজন সিনেমা শিল্পী জাকার্তায় গেছলেন তার মধ্যে বাংলার ছবি বিশ্বাস ও মঞ্জু দে ছিলেন।

* * *

'সিনে ক্লাব অফ্ ক্যাল্‌কাটা' স্থির করেছেন বর্ত্তমান বছরে দু'টি চলচ্চিত্র উৎসব করবেন। একটি পোলিশ চিত্রের এবং অপরটি চেক্ চিত্রের। পরের বছরের আন্তর্জাতিক চিত্রোৎসবটি হবে জার্ম্মান ছবি নিয়ে এবং এর পর থেকে পর পর অনুষ্ঠিত হবে ফরাসী, ইতালীয় ও সুইডিস্ চলচ্চিত্র উৎসব।

* * *

বিদেশী খবর ঃ

বিগত মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে যুক্তভাবে দু'টি চিত্র। একটি হচ্ছে জাপানী ছবি "The Island" এবং অপরটি হচ্ছে সোভিয়েৎ চিত্র "The Clear Sky." শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন বৃটিশ অভিনেতা পিটার ফিন্স ও শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন চীনের ইল-স্যাঙ। ফরাসী চিত্র-পরিচালক আরমণ্ড গাতি শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার লাভ করেছেন। ইতালীয় চিত্র "Every One Goes Home" বিশেষ স্বর্ণ-পদক পেয়েছে এবং কিউবার ছবি "Stories About the Revolution" সোভিয়েৎ লেখক সঙ্ঘের বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছে।

* * *

আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ের বিখ্যাত 'Nick Adams' ছোট গল্পগুলির অন্তর্গত 'Young Man' অবলম্বনে প্রযোজক Jerry Wald একটি ব্যয়বহুল সিনেমাস্কোপ চিত্র নির্ম্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। উদীয়মান তরুণ অভিনেতা Richard Beymerকে প্রধান চরিত্রে মনোনীত করা হয়েছে। একুশ বৎসর বয়স্ক Richard Beymer, "Diary of Anne Frank" ও "High Time" চিত্রে অভিনয় করে ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জ্জন করেছেন। এই 'Young Man' চিত্রের চিত্র-নাট্য লিখেছেন A. E. Hotchner এবং পরিচালনা করবেন Martin Ritt. হলিউডেই চিত্রটি নির্ম্মিত হবে, কিন্তু ইতালীর স্থানীয় দৃশ্যগুলি Rome এবং Verona-তে গৃহীত হবে।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ১৯০ (উইলিয়াম লরী ৭৪, ব্রেন চার্লস বুথ ৪৬। ষ্ট্যাথাম ৫৩ রানে ৫, টেড ডেক্সটার ১৬ রানে ৩ উইকেট) ও ৪৩২ (লরী ১০২, এল্যান কিথ ডেভিডসন নট আউট ৭৭, নর্ম্যান ক্লিফ ও'নীল ৬৭, রোনাল্ড বি সিম্পসন ৫১। ডি, এ্যালেন ৫৮ রানে ৪, ডেক্সটার ৬১ রানে ৩, ফ্ল্যাভেল ৬৫ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড ঃ ৩৬৭ (পিটার মে ৯৫, কেনেথ ব্যারিংটন ৭৮, জিওফ পুলার ৬৩, এ্যালেন ৪২। সিম্পসন ২৩ রানে ৪, ডেভিডসন ৭০ রানে ৩, ম্যাকেঞ্জি ১০৬ রানে ২ উইকেট) ও ২০১ (ডেক্সটার ৭৬, সুব্বারাও ৪৯। বেনো ৭০ রানে ৬ এবং ডেভিডসন ৫০ রানে ২ উইকেট)

১৯৬১ সালের ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজে খেলার ফলাফল ব্যাপারে 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি' হ'ল না। ১৯৫৬ সালের মত ১৯৬১ সালের প্রথম তিনটি খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়; কিন্তু ৪র্থ টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া জয়ী হলে ইংলণ্ডের 'এ্যাসেজ' পুনরুদ্ধারের সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে যায়। ১৯৫৮-৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়া ৪-০ খেলায় জয়ী হয়ে 'এ্যাসেজ' লাভ করে। সুতরাং ১৯৬১ সালের শেষ টেস্ট খেলায় যদি অস্ট্রেলিয়া পরাজয় স্বীকারও করে তাহলেও তাদের 'এ্যাসেজ' হাত ছাড়া করতে হবে না। সে ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের টেস্ট সিরিজে খেলার ফলাফল সমান হবে মাত্র।

ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ৫৪ রানে জয়লাভ রীতিমত নাটকীয় ব্যাপার। কারণ ইংলণ্ড ১ম ইনিংসের খেলায় বোলিং এবং ব্যাটিংয়ে প্রাধান্য লাভ ক'রে অগ্রগামী থেকেও শেষ দিনের খেলায় দল পরিচালনায় এবং ব্যাটিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। হিসাব নিলে দেখা যায়, পাঁচ দিনের মোট ৩০ ঘণ্টার খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য মাত্র ৫ ঘণ্টা, অপরদিকে ইংলণ্ডের ২৫ ঘণ্টা। নাটকীয়ভাবে অস্ট্রেলিয়া খেলার শেষ দিনে প্রাধান্য লাভ ক'রে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করায় টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার এই ৪র্থ টেষ্ট খেলাটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। ক্রিকেট খেলার বৈশিষ্ট্য প্রবল উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা, দলের উত্থান-পতন, নাটকীয়ভাবে খেলার গতি পরিবর্তন, প্রচুর আনন্দ—এই সমস্ত চতুর্থ টেস্ট খেলায় যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ইংলণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়া—উভয় দলের যৌথ নিষ্ঠায় খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত প্রাণ প্রাচুর্য্যে উপভোগ্য হয়েছিল। সুতরাং উভয় দলই সম্মান লাভের যোগ্যপাত্র। এখানে খেলার ফলাফলের মানদণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া নিঃসন্দেহে বেশী সম্মানের দাবী করতে পারে, তবুও বলবো ইংলণ্ডের পরাজয় অগৌরবের হয়নি।

ক্রিকেট দলীয় খেলা। ব্যক্তিগত সাফল্য বহুলাংশে দলের অপর খেলোয়াড়দের খেলার উপর নির্ভর করে। কিন্তু

সময়ে সময়ে দেখা গেছে দলের ভাঙ্গনের মুখে দলের ত্রাণ-কর্তা হিসাবে ব্যক্তিগত সাফল্য দলকে পরাজয় থেকে শুধু রক্ষাই করেনি জয়লাভেও সাহায্য করেছে। এই রকম ব্যক্তিগত সাফল্য দলের অপর খেলোয়াড়দের সহযোগিতার অপেক্ষা রাখে না, এমনিভাবে খেলোয়াড় তখন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে যান। তখন তিনি প্রধান যোদ্ধা হিসাবে সম্মানিত; এমন কি সমস্ত খেলাটি তাঁরই নামে উৎসর্গ করা হয়। ক্রিকেট খেলার সেই চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বিগত চতুর্থ টেস্ট খেলাটিকে অভিহিত করা যায় 'ডেভিডসনের টেস্ট খেলা' হিসাবে। অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে লরী সেঞ্চুরী করেছেন, ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসের খেলায় রিচি বেনো ৭০ রাণে ৬টা উইকেট নিয়ে ইংলণ্ডকে পর্য্যুদস্ত করেছেন; কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের খেলায় দলের দারুণ ভাঙ্গনের মুখে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় খেলেছেন ডেভিডসন, নট আউট ৭৭ রাণ।

শেষ উইকেটে দলের সর্ব্বকনিষ্ঠ ১৯ বছরের খেলোয়াড় গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জিকে পার্টনার ক'রে ১০৫ মিনিটের খেলায় দলের ৯৮ রান তুলে দেন।

শেষ দিনে প্রথম ১৫ মিনিটের খেলার মধ্যে অস্টেলিয়ার ৩টে উইকেট পড়ে, মাত্র ৩ রান যোগ হয়। এই তিনটে উইকেট পান ইংল্যাণ্ডের এ্যালেন, কোন রান না দিয়ে। এ্যালেন তখন অস্টেলিয়ার প্রধান ভয়ের কারণ, 'জুজু'। এই এ্যালেনেরই এক ওভার বলে ডেভিডসন পিটিয়ে খেলে ২০টা রান তুলে দেন—২টো 'ছয়ের' বাড়ি এবং ২টো 'চার'। ডেভিডসনের এই দৃঢ়তায় ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে হতবুদ্ধি হয়ে এ্যালেনকে আর বল করতে দিলেন না। ডেভিডসনের চালে অধিনায়ক মে পরাভূত হন। এ্যালেনকে বসান মে'র পক্ষে মস্ত ভুল হয়। আর এক মারাত্মক ভুল করেন ইংলণ্ডের ক্লোজ। ২য় ইনিংসে দলের ভাঙ্গনের মুখে তিনি মাত্র ৮ রান ক'রে যে ভাবে আউট হয়েছেন তা ক্রিকেট খেলার রীতিনীতির পর্য্যায়ে পড়ে না। তাঁর আউট হওয়া উইকেট দাতব্য করার সামিল। ৪র্থ টেস্ট খেলায় রিচি বেনোর বোলিং সাফল্য অস্টেলিয়ার জয়লাভের পক্ষে অন্যতম সহায়ক ছিল।

জাতীয়তাবোধ অন্যায় নয়। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবোধ খেলার স্বার্থের পরিপন্থি। তখন খেলা খেলার পর্য্যায়ে থাকে না। সর্ব্বদাই জাতীয় আত্মসম্মানবোধের পীড়নে এবং পরাজয়ের আশঙ্কায় খেলোয়াড়রা আত্মরক্ষামূলক খেলায় বেশী জোর দেয়—ফলে খেলা নির্জ্জীব হয়ে পড়ে। ক্রিকেট খেলাকে এই সংক্রামক মানসিক ব্যাধি থেকে রক্ষার জন্যে বেশ কিছুকাল আন্দোলন দেখা দিয়েছে। ১৯৬০ সালের অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের টেষ্ট সিরিজে উভয় দেশই ক্রিকেট খেলাকে উগ্র জাতীয়তা-বোধের উর্দ্ধে রেখে খেলার প্রতিজ্ঞা করেছিল।

উভয় দেশই তাদের মুখের কথা রেখেছিল। ফলে এই দুই দেশের টেস্ট খেলায় ক্রিকেট নবজন্ম লাভ করেছে। আলোচ্য ইংলণ্ড-অস্টেলিয়ার টেস্ট সিরিজেও উভয় দেশ ক্রিকেট খেলার স্বার্থে সঙ্কীর্ণ নীতি পরিহার করতে রাজী হয়েছিলেন। তারই সার্থক পরিণতি ৪র্থ টেষ্ট খেলা। কিন্তু দেশের লোক এবং সংবাদপত্র ছেড়ে কথা বলেনি। ইংলণ্ডের এই পরাজয়ে সারা ইংলণ্ড আজ জাতীয় পরাজয়ের অবমাননায় বিক্ষুব্ধ—দেশের সংবাদপত্রে পিটার মে এবং ইংলণ্ড দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন কমিটিকে কঠোরভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়াও এ ব্যাপারে কম যায় না। ১ম টেষ্ট খেলায় বেনো ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সংবাদপত্র এবং জনসাধারণের কঠোর সমালোচনার পাত্র। বেনোর কাঁধের ব্যথার কথা উল্লেখ ক'রে অস্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা টেস্ট খেলোয়াড় রে লিণ্ডওয়াল মন্তব্য করেছিলেন, হয় বেনো সম্পূর্ণ সুস্থ হ'ন, নয়ত তিনি টেষ্ট খেলা ছেড়ে দিন'। খ্যাতনামা টেষ্ট খেলোয়াড় কিথ মিলার লিখেছিলেন।...বেনো টেষ্ট খেলার উপযুক্ত নন.। তিনি অস্ট্রেলিয়া দলে অযথা একটা স্থান দখল ক'রে আছেন'। ৪র্থ টেষ্টে বেনোর বোলিং সাফল্য এবং জয়লাভে বেনো আজ জাতীয় 'হিরো'। সংবাদ-পত্রগুলি তাঁর জয়গানে পঞ্চমুখ ধারণ করেছে। উগ্র জাতীয়তাবোধের স্বরূপ এই রকমই বিচিত্র গতিতে প্রবাহিত।

এখন মিলার লিখেছেন, 'বেনো যা করেছেন তার তুলনা নেই।' সিডনীর ডেলী টেলিগ্রাফের ক্রিকেট ভাষ্যকার বলেছেন, 'বেনো দেরী ক'রে অবসর গ্রহণ করলে 'এ্যাসেজ' সম্মান অষ্ট্রেলিয়ার হাতে বেশ কিছুদিন

থাকবে।…অস্ট্রেলিয়াকে টেস্ট খেলায় জয় লাভ করতে হলে বেনোকে খুবই দরকার।'

৪র্থ টেস্টে টসে জয়ী হয়ে বেনো প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পান। কিন্তু দলের এ সুযোগের কোন লাভ হয় না। প্রথম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৪টে উইকেট পড়ে ১২৪ রান ওঠে।

২য় দিনে লাঞ্চ পর্য্যন্ত অস্ট্রেলিয়া টিকে থাকতে পারেনি। লাঞ্চের কিছু আগে ১৯০ রাণে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের খেলা শেষ হয়ে যায়। দলের সর্ব্বোচ্চ ৭৪ রাণ করেন উইলিয়াম লরী। স্ট্যাথাম ৫৩ রাণে ৫ এবং ডেক্সটার ১৬ রাণে ৩ উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন। ইংলণ্ডের ১ম ইনিংসের খেলা ভাল হয়নি। দলের ৩ রাণে ১ম, ৪৩ রাণে ২য় এবং ১৫৪ রাণের মাথায় দলের ৩য় উইকেট পড়ে যায়। এই দিন আর কোন উইকেট পড়ে না—রাণ দাঁড়ায় ১৮৭, ৩টে উইকেট পড়ে।

খেলার ৩য় দিনে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংসে ৩৬৭ রাণে শেষ হলে ইংলণ্ড ১ম ইনিংসের রাণের হিসাবে ১৭৭ রাণে এগিয়ে যায়। ৩য় দিনে অষ্ট্রেলিয়া ৮৫ মিনিট খেলার সময় পায়, রাণ করে ৬৩। ৪র্থ দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ৬টা উইকেট পড়ে রাণ ওঠে ৩৩১। প্রথম উইকেট পড়ে দলের ১১৩ রাণে। চা-পানের পরের খেলায় ৩টে উইকেট তাড়াতাড়ি পড়ে যায়। ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে দলের ২৯৬ রাণে। অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের পাওনা ১৭৭ রাণ শোধ দিয়ে ১৫৪ রাণ বেশী করে। হাতে জমা থাকে ৪টে উইকেট—খেলার সময় পড়ে থাকে পুরো একদিন। সুতরাং অষ্ট্রেলিয়ার ফাঁড়া তখনও কাটে নি। আরও শ'খানেক রাণ দরকার। কিন্তু ৫ম দিনে অষ্ট্রেলিয়ার খেলায় দারুণ বিপর্য্যয় দেখা দিল। পূর্ব্ব দিনের ৩৩১ রাণ মাত্র ৩ রাণ বেড়ে ৩৩৪ হয়েছে, এদিকে তিনজন আউট—ম্যাকয়, বেনো এবং গ্রাণ্ট। এ্যালেন কোন রাণ না দিয়েই তিনটে উইকেট পান। ১০ম উইকেটে ডেভিডসনের সঙ্গে শেষ খেলোয়াড় ম্যাকেঞ্জি খেলতে নামলেন। ইংলণ্ডের দিকে খেলাটা ঘুরে গেল। ডেভিডসন-ম্যাকেঞ্জি জুটির একজন আউট হলেই ইংলণ্ড ২য় ইংনিংস খেলবে। ম্যাকেঞ্জি অস্ট্রেলিয়া দলের সর্ব্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়, প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলছেন। বোলার ম্যাকেঞ্জি আর কতক্ষণ! যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ—এ কথাটা যেন শেষ উইকেটের দু'জনকে কানে কানে কেউ বলে গেল। তাই তারা হাল ছাড়লেন না। এক ওভারে এ্যালেনের বলে ডেভিডসন ২০টা রাণ তুলে বুঝিয়ে দিলেন তিনি জুজুর ভয়ে ভীত নন্। অমনি সে কথায় সায় দিয়ে পিটার মে এ্যালেনকে আর বল দিতে দিলেন না। অস্ট্রেলিয়ার রাণ গড়িয়ে চলে ৩৩৪ থেকে ৪৩২ রাণে গিয়ে দাঁড়াল। ম্যাকেঞ্জি এই ৪৩২ রাণের মাথায় নিজস্ব ৩২ রাণ ক'রে বোল্ড আউট হলেন। ডেভিডসন ৭৭ রান করে নট আউট রইলেন। সমস্ত মাঠের দর্শকসাধারণ করতালি এবং হর্ষধ্বনি দিয়ে ডেভিডসনকে বিপুল ভাবে সম্মাণিত করেন।

২৩০ মিনিটের খেলার সময় হাতে নিয়ে ইংলণ্ড ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ইংলণ্ডের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজন ছিল ২৫৬ রান।

চা-পানের জন্তে খেলা ভাঙতে বাকি, নিঃশ্বাস ফেলতে যেটুকু সময় লাগে—দলের রাণ ১৬৩, ৪ উইকেট পড়ে। বেনোর শেষ বলটা মারতে গিয়ে সুব্বা রাও বোল্ড আউট হলেন। ৫ম উইকেট পড়লো ইংলণ্ডের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। ১৬৩ রাণের মাথায়।

লাঞ্চের পর ১৬৩ রানের সঙ্গে ৮ রান যোগ হয়ে ১৭১ রান দাঁড়াল। এই ১৭১ রানের মাথায় ইংলণ্ডের পরপর দুটো উইকেট (৬ষ্ঠ ও ৭ম) পড়লো। দলের ১৮৯ রানে এ্যালেনকে বোল্ড আউট করে বেনো উপর্য্যুপরি ৫টা উইকেট পেলেন। ইংলণ্ডের ১৯৩ রানে ৯ম এবং ২০১ রানে ১০ম উইকেট পড়ে যায়। শেষ দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করে জয়-পরাজয়ের মীমাংসায় ৫৪ রানে জয়ী হয়।

রিচি বেনো ৭০ রানে ৬টা উইকেট পান। এক সময়ে ১৫টা বলে মাত্র ৮ রান দিয়ে তিনি তিনজনকে—ডেক্সটার, মে এবং ক্লোজকে আউট করেন।

ইংলণ্ডের বিপর্য্যয় এবং সেই সঙ্গে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, যেখানে দলের ১৫০ রানের মাথায় ১ম উইকেট পড়ে,

দলের ১৬৩ রানে ৫ম উইকেট পড়ে যায়—দলের অর্দ্ধেক খেলোয়াড় আউট।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার চারটি বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের মীমাংসা হয়ে গেছে।

প্রথম বিভাগে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২৮টা খেলায় ৪৭ পয়েণ্ট পেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। এই খেলার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল দল তাদের সর্ব্বশেষ খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিপক্ষে খেলেনি। না-খেলার দরুণ তাদের ২টো পয়েণ্ট হারাতে হয়েছে। এই নিয়ে ইস্টবেঙ্গল দল ৭ বার প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলো। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় ১৯৪২ সালে। সর্ব্বশেষ লীগ পায় ১৯৫২ সালে। সুদীর্ঘ ৮ বছর পর তারা পুনরায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব লাভ করলো। এ বছরের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, দলের ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৮ জনই বাঙ্গালী খেলোয়াড়।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল ২৮টা খেলায় ৩৯ পয়েণ্ট পেয়ে ৩য় স্থান লাভ করে।

রানার্স-আপ খেতাব লাভ করে বি এন আর ২৮টা খেলায় ৪১ পয়েণ্ট পেয়ে। বি এন আর প্রথম বিভাগের খেলায় প্রথম যোগদান করে ১৯৫০ সালে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় দলগুলির মধ্যে এ পর্য্যন্ত মাত্র চারিটি দল—মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে প্রথম বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। সর্ব্বাধিক ৯বার পেয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং এবং মোহনবাগান; ইষ্টবেঙ্গল পেয়েছে ৭বার এবং ইষ্টার্ণ রেলওয়ে মাত্র ১বার। ভারতীয় দলগুলির মধ্যে প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৩৪ সালে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে উপর্য্যুপরি সর্ব্বাধিকবার লীগ বিজয়ের যে সম্মান লাভ করে তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। মহমেডান স্পোর্টিং দলের এই বিরাট সাফল্যের মূলে ছিল সর্ব্বভারতীয় মুসলীম শক্তি এবং তৎকালীন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা। এই দুই পৃষ্ঠপোষকতা অন্যান্য স্থানীয় ভারতীয় ক্লাবগুলির পক্ষে অর্জ্জন করা সম্ভব হয়নি। মহমেডান স্পোর্টিং দলের মত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খ্যাতনামা খেলোয়াড় সংগ্রহ করা স্থানীয় স্বার্থের পরিপন্থি হিসাবে অন্যান্য ভারতীয় ক্লাবগুলির কর্ত্তৃপক্ষগণ নীতিবিরুদ্ধ কাজ মনে করতেন; কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিং দলের একটানা সাফল্যে জনমতের চাপে পড়ে এই নীতি তাঁরা অনেকটা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হ'ন। তখন মহমেডান স্পোর্টিং দলের একটানা সাফল্যের পথে ভাটা পড়ে বটে, কিন্তু স্থানীয় নামকরা খেলোয়াড়রা বড় বড় দলে খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোট ১৭ বার খেলার মধ্যে বাংলা দেশ ১৪ বার ফাইনালে খেলে ১০ বার সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে। মাত্র ৩ বার (১৯৫৪, ১৯৫৬ ও ১৯৫৭) ফাইনালে উঠতে পারেনি। এই সাফল্য খুবই বিরাট; কিন্তু এই সাফল্যের মূলে বাংলার স্থানীয় খেলোয়াড়দের অবদান কতটুকু? অনেক কম এই কারণে যে, বাংলার দল বেশী সংখ্যায় বহিরাগত খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হয়। তাদের বাদ দিয়ে দল গঠন সম্ভব হয়নি এই কারণে যে, বহিরাগত খেলোয়াড়রা কলকাতার বড় বড় দলের সভ্য। বড় বড় দলগুলিকে উপেক্ষা করা যায় না, তাদের খেলা নিয়েই আই এফ এ-র চ্যারিটি ম্যাচ—প্রতি বছর মোটা টাকা আয়। তাই বলি, জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলার বিরাট সাফল্যের কথা বড়ই ক'রে বলবার উপায় নেই; আত্মসম্মানবোধ যাদের আছে তাঁরা মুখ ঢাকার আচ্ছাদন পান না।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের ২য় বিভাগে বাটা স্পোর্টস ক্লাব, ৩য় বিভাগে ওয়েষ্ট বেঙ্গল পুলিশ এবং ৪র্থ বিভাগে মৌরী স্পোর্টি ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে।

লীগের বিভিন্ন খেলায় 'ওঠা-নামা'র প্রশ্নটির এখনও কোন মীমাংসা হয়নি। বর্ত্তমানে প্রথম বিভাগে ১৫টি দল আছে; আরও ৫টি দল নিয়ে ২০টি দল করার চেষ্টা চলেছে। আই এফ এ কর্ত্তৃপক্ষ লীগ খেলার সূচনায় ঘোষণা করেছিলেন এ বছর থেকে ওঠা-নামা চলবে, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত বানচাল হ'তে বসেছে।

পথের টানে ঃ শ্রীমতী বিভা সরকার।

শ্রীমতী বিভা সরকার একজন কবি। এঁর 'এষণা' ও 'লহ প্রণাম' কাব্য দুখানির সঙ্গে আশা করি কাব্যরসিকদের পরিচয় আছে। একাধিক পত্রপত্রিকায় এঁর ছোটগল্প ও প্রবন্ধও চোখে পড়ে মাঝে মাঝে। 'পথের টানে' এঁর তৃতীয় গ্রন্থ। নামটি মনে করিয়ে দেয় এমন কোনো পথিকের কথা যে পথের টানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। গ্রন্থখানি ভ্রমণ কাহিনী বটে, কিন্তু এর কাহিনী কেবল মাত্র ভ্রমণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কাহিনীটি রম্যরচনাধর্ম্মী। এর মধ্যে ভূ-বৃত্তান্ত আছে, ইতিহাস আছে, পুরাণ আছে, প্রত্নতত্ত্ব আছে, কাব্য আছে গীতি কাব্য আছে এবং পরমার্থতত্ত্বও পথে পথে ছড়ানো আছে প্রচুর। ভারতীয় দর্শনের আমদানিও দেখা যায় নানা উক্তির মধ্যে। তা' সত্ত্বেও, বইখানির সম্বন্ধে বড় কথা হ'চ্ছে এই যে, এত রকম বিক্ষিপ্ত বিষয়ের সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও শ্রীমতী বিভা সরকারের এ রচনা সাহিত্য পর্য্যায়ে পৌঁছতে পেরেছে। ভ্রমণ বিবরণ অবলম্বনে রম্য-রচনা ইতিপূর্বে একাধিক প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছে। 'পথের টানে' তাদেরই পদাংক অনুসরণে সাহিত্য সরস্বতীর কণ্ঠে আরও একটি জয়মাল্য দুলিয়ে দিয়েছে। ভাষার সুকোমল লালিত্যে, প্রকাশ-ভঙ্গীর সুকুমার সৌকর্যে, বর্ণনার বর্ণালী প্রভায় বইখানি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রোজ্জ্বল ও মনোহর। বিশেষ করে এর মধ্যে বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠ শ্রীবৃন্দাবনের 'নূতন রাধা' ও 'ললিতা সখী' দেবযানীর অনুচ্ছেদটি এবং হৃষিকেশ আশ্রমের সেই মাধবী মেয়েটির বিষাদমধুর কাহিনী খুবই চিত্তাকর্ষক। 'পথের টানকে ভুলিয়ে দিয়ে পথিককে টেনে নিয়ে যায় এক স্বপ্নময় কল্পনার রাজ্যে। রোম্যান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসের মাত্রা হয়ত সমালোচকের দৃষ্টিতে অতিরিক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু রসগ্রাহীদের যে এ পরিবেশ মুগ্ধ করবে একথা অনস্বীকার্য। লেখিকার রচনায় প্রসাদগুণে বইখানি আদ্যোপান্ত সুখপাঠ্য হয়েছে। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই, সুরুচি সঙ্গত প্রচ্ছদপট আলোচ্য গ্রন্থের অতিরিক্ত আকর্ষণ। আমরা এই ধরণে রচনা লেখিকার কাছে আরও আশা করি।

[প্রকাশক—এস, সি, সরকার, দাম ৩.৫০ টাকা]

নরেন্দ্র দেব

কোষ্ঠী-দেখা ঃ (৩য় সংস্করণ) জ্যোতি বাচস্পতি।

জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক বই বাজারে বেরিয়েছে, সেগুলি সংস্কৃতে লেখা বইএর অনুবাদ মাত্র। দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোকের সত্যকরে অর্থ অনেক স্থানে বোঝা যায় না, কিম্বা নানারূপ অর্থ করা যায়। জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত কোষ্ঠী-দেখা বইখানা সে সব দোষ বর্জ্জিত। অথচ সহজ, সরল ভাষায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল বস্তুটুকু বিশদ ক'রে বোঝান হয়েছে। এই বইখানা প্রথম শিক্ষার্থী এবং জ্যোতিষানুরাগী ব্যক্তিদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতি প্রয়োজনীয় জ্যোতিষের রাশি এবং গ্রহের কারকতা এমন সুন্দরভাবে লেখা হয়েছে যে সহজেই তা শেখা যায়।

শুধু প্রাচ্য জ্যোতিষ নয়, পাশ্চাত্য জ্যোতিষের বিশেষ বিশেষ জিনিষ গুলিও এর ভিতর সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তার উপর গ্রন্থকারের বহুদিনের অভিজ্ঞতা লব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যটুকু এর মধ্যে পাওয়া যাবে। গ্রন্থকারের নাম বাংলাদেশে সুপরিচিত। বাংলার বাইরেও তাঁর বইএর ভিতর দিয়ে তাঁর নাম অনেকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর অন্যান্য বইএর মত এই কোষ্ঠী-দেখা বইখানাও শিক্ষার্থীদের সত্যকার জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের সহায়তা হবে, এতে সন্দেহ নেই। দাম হিসাবে ভিতরকার বিষয়-বস্তুটুকুর মূল্য অনেক বেশী।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, দাম ৫৲ পাঁচ টাকা।]

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

জীবন স্রোত (নাটক) **ঃ** দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন স্রোত অভিনয়োপযোগী মিলনাত্মক সামাজিক নাটক,-তিনটী অঙ্কে বিভক্ত। বাস্তবতার ভিত্তিতে রচিত আলোচ্য নাটকখানি শক্তি-শালী নাট্যকারের প্রতিভার বিশিষ্ট স্বাক্ষর বলা যায়। চরিত্রগুলিও দুর্ব্বল নয়, জীবন্ত।

স্বামী তেজসানন্দের বরদা আশ্রমের পট ভূমিকার ওপর গড়ে উঠেছে নাটক খানি। এর নায়িকা আশ্রম কন্যা গীতা আর নায়ক অধ্যাপক জিতেন্দ্র গাঙ্গুলী। দেশ বিভাগের ফলে দাঙ্গা বিধ্বস্তা গীতা হত্যার কবল থেকে কোন রকমে মুক্তি পেয়ে গাঁয়ের

মোড়লের সহৃদয় দাক্ষিণ্যে চলে আসে একা পূর্ব্ববঙ্গ থেকে শিয়ালদ'র ষ্টেসনে। নিহত মা বাপ ভাই স্বজনের স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে এসে দাঁড়ায় অসহায়া আর একক। স্বামী তেজসানন্দের আশ্রমে পায় আশ্রয়। অধ্যাত্মক্ষেত্র থেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্থবিরতাকে নির্ব্বাসন দিয়ে সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীনতার অন্তর্নিহিত সত্যাদর্শের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু তাঁর শিষ্য অঘোরানন্দ, অবসর প্রাপ্ত জজ রায় বাহাদুর প্রভৃতি যাঁরা আশ্রমের পরিচালনায় প্রবৃত্ত, তাঁদের কুৎসিত প্রবৃত্তির প্রকাশ আশ্রমের সদুদ্দেশ্যকে ব্যর্থ হবার দিকে টেনে নিয়ে এলো, ফলে সৃষ্টি হোলো এমন নব সভ্যতাগর্হিত পরিবেশ যা সচরাচর বহু ধর্ম্মধ্বজী নারী আশ্রমের মধ্যে ঘটে থাকে। আমরা নাটকখানি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি, রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হোতে দেখ্‌লে সুখী হবো।

[প্রকাশক—পুস্তকালয়, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
মূল্য—২·৫০ নয়া পয়সা]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী : দশম প্রকরণ—শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ লিখিত

খ্যাতিমান কথা-সাহিত্যিক কালিকানন্দ অবধূত এই গ্রন্থের পরিচয় লিখিয়াছেন। তাঁহার মত—"ভগবান জাগ্রত হও—এই মহাবাক্য প্রত্যেকের বুকের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে। শান্তির জন্য নিখিল বিশ্ব ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ১৯৫৯ এসেছে—তারপর আমরা ৬০এর কোঠায় পৌঁছিব। এ সময় নাম-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য শ্রীশ্রীনামামৃতলহরী আত্মপ্রকাশ করছে। এ গ্রন্থের আর যে কোন উদ্দেশ্যই থাকুক, মানুষ জাতটা শান্তি পাক, শান্তির পথে সকলে চলুক, এই উদ্দেশ্যটুকু যে আছে, এ বিষয়ে অন্ততঃ অন্য মত থাকতে পারে না—এই হোল আমার ধারণা।"

সীতারামদাস বিরাট পণ্ডিত ও সুলেখক। সর্বদা পড়াশুনা করা ও লেখা অন্যতম কাজ। কাজেই এই গ্রন্থে শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া নামামৃত উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ২০টি অধ্যায়ে গ্রন্থখানি লেখা—শেষ কথা—

কর নাম নিরন্তর সজনে নির্জনে।
ভোজনে গমনে আর শয়নে স্বপনে ॥
থাকিবি না এক পল ছেড়ে মোর নাম
নাম তোরে লয়ে যাবে মোর সেই ধাম ॥

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ পোঃ, জেলা হুগলী [মূল্য দেড় টাকা।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বড় সাহেব : পরিব্রাজক

কলিকাতার অফিসে অফিসে যে-সব নিষ্ঠুর বড় সাহেব ও নির্যাতিত কেরাণী রয়েছে তাদের করুণ চিত্র অংকিত করেছেন পরিব্রাজক। 'বড় সাহেব' নামে অভিহিত একশ্রেণীর উদ্ভব জীবের নৃশংস আলেখ্য রচনাতেই লেখকের মনোযোগ রয়েছে বেশী। ফলে একটি সুস্থ সবল কেরাণী চরিত্র ফুটে উঠেনি। যে টুকু ফুটেছে তা কেরাণীকুলের হীন মনোবৃত্তি, নীচাসক্তি সেই হীনতার ছবিই লেখক তাঁর করণিক বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

[প্রকাশক—শ্রীঅশোক কুমার ধর। ৯, ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য—দুই টাকা মাত্র]

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রী পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত-কাহিনী" (২য় পর্ব)—৩৲
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ঝিন্দের বন্দী" (১১শ সং)—৪·৫০
অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "বাগ্‌দত্তা" (৫ম সং)—৫৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নবীন সাথী"—৩৲, "যাত্রা হলো শুরু"—৩৲, "তারা ভরা রাত"—৩৲
শ্রীচরণদাস ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "হিন্দুর বউ"—৩৲
পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সুর ও বীণা"—৩৲
শওকত আলি খান প্রণীত "সেনী-গীতিমালা" (৫ম)—৪৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রতীক্ষা

শিল্পী—শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

আশ্বিন—১৩৬৮

প্রথম খণ্ড | ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীমানস

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

প্রাচীন মিশরীয় পুরাণে আছে যে, ফিনিক্স পাখী জরাগ্রস্ত হলে নিজেই চিতা জ্বালিয়ে নিজেকে আহুতি দেয়, আর তার পরে সেই চিতাভস্ম থেকে নব কলেবর নিয়ে বেরিয়ে আসে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের চিতাভস্ম থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের জন্ম হলে সেই পুরাতন গল্পটাই সুপ্রমাণিত হ'ত। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য এমন একটা অনন্ত রূপের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে যে মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালীর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাধনার সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুস্তর ব্যবধান ঘটে গেছে। আমরা যে মন নিয়ে মধুসূদন পড়ি, আমাদের সেই মন কি মুকুন্দরাম—ভারতচন্দ্রে তৃপ্তি পেতে পারে? পলাশীর আম্রকাননের তুচ্ছ ঘটনাটি বাঙলাদেশকে যে বিস্ময়কর তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে, বাঙলার ইতিহাসে সেরকম ঘটনা খুব সুলভ নয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন দেবদেবীর লীলা প্রাধান্য লাভ করেছে, একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করে যাবেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতক থেকে ভারতচন্দ্রের তিরোধান পর্যন্ত প্রায় আটশ' বছর ধ'রে বাঙালী শুধু দেবদেবী বা অবতারকল্প মহামানবের লীলাকথা গান করেছে। বৌদ্ধ সহজিয়ামত, বৈষ্ণব আদর্শ, চৈতন্যজীবনকথা, লোকধর্ম-

কেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্য, শাক্তপদাবলী, বাউলগান, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ বা সারানুবাদ—এর পশ্চাদপটে রয়েছে দৈবচেতনার প্রত্যক্ষ প্রভাব। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও জীবনতত্ত্ব যেদিন বাঙলাদেশে আগন্তুকের মতো প্রবেশ করল, সেদিন থেকে বাঙালীর সমস্ত প্রাক্তন সংস্কারে পরিবর্তন আরম্ভ হল, তা সেদিন বোধহয় অনেকেরই দৃষ্টিগোচর হয়নি। মধ্যযুগীয় বাঙালীর সাহিত্যে দেবতাপ্রধান, উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে বাঙালীর ভৌমজীবনের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা। তাই একে কেউ কেউ 'উনিশ শতকী রেনেশাঁস' বলতে চান। য়ুরোপে মধ্যযুগের অবসানে গ্রাক-রোমক শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের প্রভাবে এবং নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও নূতন দিকদিগন্ত আবিষ্কারের ফলে খ্রীষ্টীয় 'দশ-অনুজ্ঞা'-বন্দী মানুষ বিশ্বমানবতার (*L'uomo Universale*) উদার প্রাঙ্গণে মুক্তি পেল। উনিশ শতকের বাংলাদেশেও অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে ও কালে প্রায় অনুরূপ ব্যাপারই ঘটল। ইংরাজী ভাষার মারফতে পাশ্চাত্ত্য জীবনবাদ, সাহিত্য, শিল্প ও নীতিশাস্ত্রের মানবমুখী ভাবাদর্শের ফলে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বাঙালীর মনে, সমাজ-জীবনে, রাষ্ট্রাদর্শে ও সাহিত্যে সেই মানবচৈতন্যের নির্ব্যূঢ় বাণী বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল—অবশ্য কলকাতা ও শহরতলী ছেড়ে গ্রামবাঙলার প্রাণের গভীরে সে জীবন-অভীপ্সা সঞ্চারিত হতে বিলম্ব হয়েছিল।

উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ইংরাজী সাহিত্যে নর্মান বিজয়ের চেয়েও গভীরতর। কারণ এ্যাংলো-স্যাকশন্‌ ও নর্মান সংস্কৃতির মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও তার মূল য়ুরোপীয় জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত। নানা কারণে এ্যাংলো-স্যাকশন চরিত্রে একটা দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা ঘনিয়ে এলেও নর্মান বিজয়ের পর তার আত্মসঙ্কোচন অনেকটা ঘুচে গেল। তা হলেও এই দুই জীবন-প্রত্যয় এমন কিছু বিসদৃশ ও বিজাতীয় নয়। কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পয়ার লাচাড়ী ছন্দে পাঁচালীর ধীর-মন্থর পদক্ষেপ, আর দেবদেবীদের 'চৌতিশা', নারী-গণের পতিনিন্দা প্রভৃতি তুচ্ছ 'কাব্যকলাকুতূহলা' কোন্‌ দিগন্তে ভেসে গেল—যখন প্রতীচ্য জীবনজলোচ্ছ্বাস বন্যা-বেগে বাঙালীর স্থাবরত্বে প্রচণ্ডভাবে আহত হল। মধ্য-যুগীয় বাংলা সাহিত্য আর উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে মৌলিক প্রভেদ।

কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা চিন্তা করা দরকার। মধ্যযুগীয় দেবপ্রধান বাংলাসাহিত্য পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাস্তবধর্মী, সমাজ-সচেতন ও মানব-মুখী—এককথায় আধুনিক হ'ল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য যদি নিছক দেবকথায় পূর্ণ থাকত,তাহলে পাশ্চাত্ত্য জীবনবাদী সাহিত্য ও সংস্কৃতি এ জাতির কাছে কখনও এত আগ্রহে গ্রাহ্য হ'ত না। ইংরেজের বাণিজ্যের কুঠি বাঙলার বাইরেও স্থাপিত হয়েছিল; কিন্তু ভারতের অন্য কোন প্রদেশে বাঙলাদেশের উনিশ শতকী রেনেশাঁসের মতো কোন নবজাগরণ ঠিক এই রকম সর্বব্যাপী, দার্শনিক ও আত্মিক সংস্কারে ছড়িয়ে পড়েনি কেন?

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দৈবপ্রাধান্য খুব প্রকটভাবে ধরা পড়েছিল। কিন্তু আরও একটু গভীরে অনুপ্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, মধ্য-যুগীয় বাংলাসাহিত্যে দেবতার কথা নানা ছন্দে বিবৃত হলেও তার অন্তস্তলে মানবমুখিতার সুর প্রচ্ছন্নভাবে বয়ে যাচ্ছে; চর্যাগীতিকা থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত প্রবাহিত বাংলা সাহিত্যে এই মানবমহিমা কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও বা পরোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে। পূর্বভারতে শাক্তমন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে বহুকাল থেকে। শাক্তের 'ভুক্তিমুক্তি' তত্ত্বই হোক, বা আদিম অস্ট্রিক সংস্কারই হোক, যে কোন কারণে বাঙলার সাহিত্য, সংস্কার, শীল, চর্যা, কৃত্য-ব্রত প্রভৃতিতে দেহতন্মাত্র মানুষের প্রভাব পড়েছে। সাধনমার্গে যে বারবার 'কায়া-সাধনা'র কথা বলা হয়েছে, বাউল যে দেহ-মূলাধারে সহস্র দলের মর্মমধু পান করেছে, এর মূল তাৎপর্য হচ্ছে মানুষ। "শুন হে মানুষ ভাই; সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—এই সহজিয়া ছত্রটিতে অবশ্য নব্য মানবতন্ত্রের সাক্ষাৎ স্বীকৃতি নেই, বরং এতে গূঢ় রহস্যপূর্ণ 'আরোপ সিদ্ধি'র কথাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দৈবচেতনার উল্টো পিঠে যে মানুষের কথা লেখা আছে, তা একটু অবধান করলেই বোঝা যাবে। সেইজন্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা মানুষের মতো ত্রুটি-বিচ্যুতি দুর্বলতা দিয়ে গড়া, বৈষ্ণব-পদাবলীর 'উজ্জ্বল রস'-এর অন্তরালে তৃষাতপ্ত মানুষের

কথাই প্রচ্ছন্নভাবে ধরা পড়েছে। এই মানবচেতনা—যা অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লবের পথ ধরে এসেছে এবং এদেশে নূতন ভাবাদর্শ সৃষ্টি করেছে, তা পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্য দান হলেও বাঙালীর অন্তর্জীবন ও সাহিত্যে তার আভাষ অনেক পূর্ব থেকেই ছিল ব'লে য়ুরোপীয় শিক্ষাসংস্কৃতি ক্ষণকালের জন্য সুরার মতো উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও—পরে তা-ই প্রাণসঞ্জীবনী সুধা হয়ে উঠল।

২

বাঙালী-মানস ও বাংলা সাহিত্যের পক্ষে উনবিংশ শতাব্দী শুধু একশ বছরের সমাহার নয়, বাঙালীর জীবন ও সাধনার যথার্থ পরিচয়—যা মিশ্র হয়েও মূল ঐক্য থেকে বিচ্যুত হয়নি, তার গঠন-প্রকৃতির ইতিহাস নানা বৈচিত্র্য-পূর্ণ ও বিশেষ কৌতূহলজনক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কথাই ধরা যাক। এর প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে মুঘল রাজমহিমার দীপ নিভে গেলেও ইংরাজ আধিপত্য স্থাপিত ও কার্যকরী হতে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছিল; তার ফলাফল ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা লাভবান হ'তে বাঙালীর আরও কিছু সময় লেগেছিল। ১৮১৪ সালের দিকে রামমোহন যখন কলকাতায় আবির্ভূত হলেন এবং ১৮৬১ সালে যখন মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হ'ল, তখনই বাঙালীর জীবন ও মননে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। রামমোহন নৈয়ায়িক পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-তন্ত্র, যাতেই তাঁর নিষ্ঠা থাক না কেন, মূলতঃ তিনি নব্যন্যায়ের শেষ প্রতিনিধি। তবে নব্যন্যায় একটি মানসিক ব্যায়াম মাত্র, আর রামমোহনের 'ন্যায়'—ন্যায়পরতার সঙ্গে যুক্ত, মানববোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যৌক্তিক পারম্পর্যের সারভূত, প্রত্যভিজ্ঞামূলক বিজ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা পদে পদে নিয়ন্ত্রিত। রামমোহন বাংলাগদ্যকে শাণ দিয়ে তীক্ষ্ণধার আয়ুধে প্রস্তুত করেছিলেন। তাতে বুদ্ধির জড়ত্বকে দ্বিখণ্ডিত করা যায়, কিন্তু বাগদেবীর চরণবন্দনায় তা' যথোপযুক্ত নয়। সে যাই হোক, রামমোহন নির্মোহ জ্ঞানবাদের সাহায্যে মানবচৈতন্যের বস্তুস্বরূপকে বুঝে নিয়েছিলেন, প্রাচ্য অধিমানসকে পাশ্চাত্ত্য অধিভূতের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। এ রকম ক্ষত্রিয়োচিত বীর্য এবং ব্রাহ্মণোচিত সাত্ত্বিকতা ইদানীন্তন কালে দুর্লভ।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়বে। রামমোহন যখন (১৮৩০) বিলাত যাত্রা করেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র দশ বৎসরের বালক মাত্র; সংস্কৃত কলেজে তখন বছরখানেক ধরে তিনি ব্যাকরণ পড়াশুনা করছিলেন। বিদ্যাসাগরকে আমরা দয়ার সাগর, বাংলা গদ্যের জনক, স্ত্রীশিক্ষার প্রচারক, বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, প্রভৃতি সদ্‌গুণে গুণবান ও বিপ্লবী মনোভাবের পুরোধা বলেই জানি। সূর্য গাছকে শ্যামসমারোহে ভরিয়ে তোলে, জীবজগৎকে প্রাণমন্ত্র দান করে, ওষধিকে পরিপক্কতা দেয়—এ সবই সত্য। কিন্তু তারও চেয়ে বড় সত্য—সূর্য দিব্য জ্যোতির্ময় বহ্নিবলয়; অগ্নিজ্বালাই তাকে সৌরমণ্ডলের অধিপতি করেছে, তেজের প্রাণবীজ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই রকম বিদ্যাসাগর মানবপ্রেমী, 'হিউম্যানিস্ট'—যাই হোন না কেন, আসলে তিনি প্রেম ও মননের পারস্পরিক আকর্ষণে-বিকর্ষণে ব্যাকুল। পুরাতন জীবনাদর্শের মধ্যে লালিত হলেও তিনি সেই যুগে এমন সমস্ত অদ্ভুত কথা চিন্তা করলেন যে, তাঁর প্রভাব শুধু বাংলা গদ্যসাহিত্যে নয়, বাঙালীর নবজাগরণকে মানবমুখী করে তুলেছে। দেহদশাধীন মানুষের প্রতি তাঁর যে অন্তহীন স্নেহাধিক্য ছিল, তার প্রেরণা তিনি অন্তর থেকেই পেয়েছেন। প্রাণের দীপশিখাটিকে তিনি উনিশ শতকের বহ্নিকুণ্ড থেকেই জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সম্ভবতঃ পারমার্থিক সত্যে সংশয়বাদী ছিলেন, তাঁর পক্ষে নিরীশ্বরবাদী হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। ব্যারন হল্‌বাথ্‌ *System de la nature* গ্রন্থে বলেছিলেন, "If we go back to the beginning, we shall always find that ignorance and fear have created gods." বিদ্যাসাগর স্বচ্ছন্দে একথা বলতে পারতেন।

অগুস্তে কোঁতের মতো বিদ্যাসাগর মানুষকে নিয়েই চিন্তিত হয়েছিলেন, ব্যাকুল হয়েছিলেন। সেই মানবধর্ম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকট হয়ে পড়ল। মধুসূদন সেই নূতন মন্ত্র ঘোষণা করলেন। যাকে ফরাসী ভাষায় Eclaircissement' অর্থাৎ নবজাগরণের যুগ বলা হয়েছে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বাঙলাদেশে সেই প্রভাস্বর

প্রজ্ঞার যুগ ('The Age of Illumination') সৃষ্টি করেছে। এই নবযুগপ্রেরণা শিক্ষিত বাঙালীর মন ও প্রাণের ধাতুধর্মকে বিচলিত করল, রাজসিক উল্লাসে ব্যাকুল ক'রে তুলল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে চলেছিল তার প্রস্তুতি। রামমোহন—বিদ্যাসাগর সেই মানবযজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করেছিলেন, মধুসূদন তাতে অগ্নিসংকার করলেন।

যে মানবতন্ত্রবাদ মানুষের কবোষ্ণ হৃদপিণ্ডটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে, ক্ষয়ক্ষতি, পাপতাপ সত্ত্বেও মানবযাত্রাকে মহৎ মূল্য দিয়ে অভিনন্দিত করে—মধুসূদন যেন তারই প্রভাবে সমস্ত শতাব্দীর ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও জীবনযৌবনের বাধাহীন মুক্তিকে ত্বরান্বিত করলেন। অথচ মধুসূদন ক'বছরই বা বাংলা সাহিত্যে বিচরণ করেছিলেন? ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৬, এই ক'বছরের মধ্যেই তাঁর সাহিত্য জীবনের সমাপ্তি হয়। মাইকেল শুধু পয়ারের বেড়ী ভাঙেননি, আমাদের দেশের দীর্ঘকালের সংস্কার ও মূল্যবোধকে বিচূর্ণ ক'রে এমন একটা ঝড়ের সঙ্কেত নিয়ে এলেন যে, পূর্বতন জীর্ণ সংস্কার কেঁপে উঠল। অবশ্য সে ঝড়ের সঙ্কেত একটা অদ্ভুত খাপছাড়া কিছু নয়, পাশ্চাত্য জাগ্রত জীবনের জয়োল্লাস আমাদের ভাঙা ভিতের ওপর বার বার যে আঘাত হানছিল, তারই সূক্ষ্ম চৈতন্যরূপী প্রকাশ ঘটল মধুসূদনের মহাকাব্যে। মধুসূদন শুধু কবিমাত্র নন, বা মিল্টনের মতো "justify the ways of God to men" এই মতানুবর্তী হয়েও কাব্য রচনায় ব্রতী হন নি। তাঁর রচনায় সমস্ত সংস্কার নীতিদুর্নীতির প্রাচীর ডিঙিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মানবধর্ম একেবারে অনাবৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করল। মাইকেলের মহাকাব্যে-ব্যাকরণ-অলঙ্কার ঘটিত কিছু কিছু ত্রুটি আছে, দুচার স্থানে সঙ্গতিবোধের অভাবও যে নেই, তা নয়; কিন্তু তবু তারই মধ্য থেকে উনিশ শতকের বাঙালীর প্রাণবেদনা ফুটে উঠেছে।

৩

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ যেমন নানাবিধ সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে উচ্চকিত হয়ে উঠল, তেমনি তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যেও তার ঢেউ লাগল। একদিকে নীল-আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে কৃষক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহযোগিতা, অপর দিকে হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত এবং তারই সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের চেষ্টার ফলে বাঙালীর জড়চিত্তে এল প্রচণ্ড আঘাত। বস্তুতঃ রামমোহন, মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর—তিনজনের চরিত্র ও প্রতিভা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের হলেও বাঙালী-মানসের জড়ত্ব মুক্তির জন্য এঁদের ক্রিয়া-কর্ম যে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনজনেই প্রচলিত লোকসংস্কারের ওপর প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিলেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগর সমাজের বহিরঙ্গে আঘাত দিয়েছিলেন, মধুসূদন তার অন্তর-চেতনায় বজ্রাঘাত করেছিলেন।

উনিশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা আন্দোলন চলছিল এবং এঁদের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদল সংক্রান্ত বিরোধের বীজ জলসিঞ্চিত হচ্ছিল। রাম-মোহন পুরাণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ শুধু পুরাণের বিরোধী ছিলেন না, সমস্ত উপনিষদকেও পুরোপুরি স্বীকৃতি দেন নি, এমন কি জ্ঞানবাদী অক্ষয়-কুমারের প্রভাবে তিনি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকলেও অযৌক্তিক ও অন্যায় দেশাচারকে সর্বথা ঘৃণা করতেন। সুতরাং উনিশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে হিন্দু সমাজের লোকাচার ও পুরাণাশ্রয়ী মতের শোচনীয় অবস্থা ঘনিয়ে এল। অবশ্য মধুসূদনের শিষ্যস্থানীয় নবীনচন্দ্র তাঁর 'রৈবতক—কুরুক্ষেত্র—প্রভাস' এবং অন্যান্য কাব্যে আবার হিন্দুর পুরাণপ্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হলেন। কলকাতায় অবস্থানকালে কিছু দিন কেশবচন্দ্রের কলুটোলার বাড়ীতে যাতায়াত করলেও তিনি মূলতঃ ছিলেন পৌরাণিক ভক্তি-বাদী। অবশ্য সে পুরাণকে তিনি আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার অনুকূলে ব্যাখ্যা করেন এবং প্রাচীন পুরাণ-কথাকে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার শুরু করেন। তাতে তিনি রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের কাছে কিছু নিন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু পুরাণ কথাকে আধুনিকীকরণের পশ্চাদপটে তদানীন্তন যুগমানস-সই জয়ী হয়েছে। 'রৈবতক' (১৮৮৭) যখন প্রকাশিত হ'ল তখন পৌরাণিক সংস্কারের পুনর্জাগরণ শুরু হয়ে গেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রথম যৌবনে ডিরোজিওর শিক্ষায় শিক্ষিত

কালের জন্ম হিউম-পন্থী হলেও পরে ভারতীয় পরাবিদ্যা এবং পাশ্চাত্য অপরাবিদ্যাকে আশ্চর্য উদারতার দ্বারা এক সমন্বয়ের সূত্রে গ্রহণ করলেন। সর্বোপরি তিনি সমাজ ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে একটা সুস্থ যৌক্তিক ক্রম-বিকাশকে লক্ষ্য করেছেন। তিনিও মত ও পথের দিক থেকে বহুলাংশে পুরাণ-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। এই সময়ে নাটকে গিরিশচন্দ্রের চেষ্টায় ভক্তিমূলক পৌরাণিক আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে বেশ প্রচার লাভ করেছিল; অবশ্য গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি সাহিত্যের দিক থেকে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি নয়।

যাঁরা পুরাণকথাকে অস্বীকার ক'রে বেদবেদান্তের ওপর ধর্মমতের ভিত্তি করেছিলেন এবং উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকের মধ্যেই হিন্দুর পৌরাণিক আদর্শ ও বহু-দেববাদকে অযৌক্তিক প্রমাণ ক'রে উপনিষদিক ব্রহ্মবাদকে শরণ্য বলে গ্রহণ করলেন (কিন্তু মায়াবাদকে পরিত্যাগ করলেন), তাঁরা হলেন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র এবং পরে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নব্যব্রাহ্মদের অন্তর্বিরোধের ফলে যখন ব্রাহ্মমত ও আদর্শ ত্রিধা ভাগ হয়ে গেল, তখন বাংলা সাহিত্য ও সমাজে আবার পৌরাণিক মতের নব অভ্যুদয় লক্ষ্য করা গেল। একেই হিন্দু-ধর্মের পুনর্জাগরণ বলা হয়! বঙ্কিমচন্দ্র এই নব আন্দোলনের নেতা, উপদেষ্টা ও মন্ত্রদ্রষ্টা। ইতিপূর্বে পুরাণকথাকে অলীক কথা ব'লে অনেকে পরিত্যাগ করেছিলেন; ব্রাহ্ম সমাজ ও ডিরোজিও-শিষ্যেরাই তার জন্ম প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু বাঙলাদেশে কোন দিনই পৌরাণিক সংস্কৃতি বিনাশ পায়নি। ব্রাহ্ম সমাজের প্রবল আধিপত্যের যুগেও কৃষ্ণকাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সমাজে পুরাণকথা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। নবীনচন্দ্র, শিশিরকুমার ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—এঁরা হিন্দুর পুরাণ ও কৃষ্ণতত্ত্বকে কোথাও সমাজ দর্শন, কোথাও বা ভক্তি দর্শনের সাহায্যে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে সঞ্চারিত করেছিলেন। এমন কি কেশবচন্দ্রও কৃষ্ণের মহামানবত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বাঙলা তন্ত্রের দেশ বটে, কিন্তু কৃষ্ণকথা উনিশ শতকের বাঙালী-মনে যে কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা এখন আমাদের কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশকের দিকে বাঙালীমনের এই দিকটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। ব্রাহ্ম-সমাজ তখন অন্তর্বিরোধের ফলে কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছে। নব্য ব্রাহ্মেরা কেশবচন্দ্রের ভক্তির উচ্ছ্বাস, 'নরদেবপূজা' এবং অন্তঃপ্রেরণা থেকে প্রাপ্ত আপ্তবাক্যে আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। তখন তরুণ সম্প্রদায়ের মনে যুক্তি-বাদী সমাজসংস্কার এবং গ্যারিবল্ডি, মাৎজিনি, কাভুরের রাজনৈতিক আদর্শ ও উপায় প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভকে ধূমায়িত করে তুলছে। সুরেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি নব্য ব্রাহ্মেরা ধর্মীয় মতভেদ ও কলহ থেকে সরে গিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজছেন—প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬)। আই, সি, এস কর্ম থেকে সদ্য-বরখাস্ত সুরেন্দ্রনাথ তখন দেশের যুব-শক্তিকে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার ব্রত নিয়েছেন। য়ুরোপীয় nationalism-এর রক্তচক্ষু এঁদের চোখেও ঘোর সৃষ্টি করেছে। এতদিন ধরে ইংরাজ সরকার ও শাসনের বিরুদ্ধে যে মৃদু প্রতিবাদ জমে উঠছিল, সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তাই বজ্রাগ্নিতে ভেঙে পড়ল। এক দিকে যেমন রাজনীতির ঘটনাবর্ত দেশের যুব শক্তিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল, ঠিক তেমনি প্রায় এই সময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং তাঁর শিষ্যদের সহযোগিতায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজে একটা নব জীবনোল্লাসের প্রবল আলোড়ন এসে পড়ল।

বঙ্কিমচন্দ্র সর্বোপরি ঔপন্যাসিক; বাঙালীর জীবনের বৈচিত্র্যকে তিনি উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কখনও রোমান্সের জ্যোতির্ময় প্রান্তর থেকে, কখনও ধূসর ইতিহাসের বিবর্ণ অলিন্দ থেকে, কখনও বা দুঃখ-দুর্ভর দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর উপন্যাসের শিল্পবিচার বর্তমান প্রসঙ্গ বহির্ভূত; কিন্তু মহৎ ও বৃহৎ জীবনের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে তিনি যে কয়েকটি মানব-মানবীর হাসি-কান্নার ছবি এঁকেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি হয়তো কিছু বিরূপ হবেন। সে যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকে জোলা-মোপাসাঁর মতো কেবলমাত্র জীবধর্মী প্রাকৃত মানুষরূপে ভাবতে পারেন নি। যে নীতি জীবননীতি বা মানবনীতির পরিপন্থী নয়, তিনি সেই বিশেষ রকমের জীবন-নীতির পক্ষ

নিয়েছিলেন বলে ইদানীং পাঠক ও সমালোচকগণ বঙ্কিমচন্দ্রকে পুরোপুরি স্বীকৃতি জানাতে পারছেন না। কিন্তু গোটা মানবজীবনকে যে পরিমাণে এবং যতদূর সম্ভব নানা ভাবের মুকুরে প্রতিফলিত করা সম্ভব, তা তিনি করেছিলেন।

শুধু উপন্যাসই তাঁর প্রতিভা পরিমাপের একমাত্র মাপকাঠি নয়। তৎকালীন হিন্দুসমাজের পুনর্জাগরণকে তিনি পুরাণকেন্দ্রিক শম্বুকবৃত্তি থেকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, তাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাঙালীর চিন্তা, মনন ও কৌতূহলকে শুভ ও স্বাস্থ্যপ্রদ বিকাশের দিকে পরিচালনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বিচারবুদ্ধি, বিজ্ঞানবোধ ও যৌক্তিকতার সাহায্যে হিন্দুর পুরাণ-শাস্ত্র-সংহিতা পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬)-এর কথা মনে পড়বে। মনে পড়বে তাঁর মিল-বেন্থাম-কোঁতে অনুরক্তি এবং ১৮শ-১৯শ শতকী য়ুরোপীয় সাম্যবাদের প্রতি কৌতূহল। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকে মেজে নিয়ে য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা প্রাচীন কথাকে বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় জীবনতত্ত্বের সাক্ষাৎ উত্তর পুরুষ। ব্রাহ্ম সমাজের মতো তিনি স্মৃতি-সংহিতাকে পুরোপুরি ত্যাগ করলেন না; বরং তাকে যুক্তির সাহায্যে বিচার এবং তার পরে গ্রহণে প্রস্তুত হলেন। সেই বিচার সুকঠোর যুক্তি-আশ্রয়ী। প্রয়োজন স্থলে তিনি প্রাচীন সংস্কারকে আধুনিক যুক্তি-বিজ্ঞানের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করতেও কুণ্ঠিত হলেন না। অবশ্য জীবনের উপান্তভূমিতে পৌঁছে তাঁর এই যুক্তিবাদ ও মানবতন্ত্রতা অধ্যাত্ম ও স্মার্ত সংস্কারের দ্বারা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হয়েছিল। তবে তিনি কোন দিনই পুরোপুরি স্মৃতি-সংহিতার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং প্রাচীন মোক্ষ শাস্ত্রকেও আধুনিক আন্বীক্ষিকী বিদ্যার শোধন যন্ত্রে পরিস্রাবণের চেষ্টা করেছিলেন—এই সত্য কথাটা সর্বাগ্রে স্বীকৃত হওয়া কর্তব্য। 'বঙ্গদর্শন' গোষ্ঠীর ওপর তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল বলেই চন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্কচূড়ামণি এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বাঙালী হিন্দু সমাজকে পিছনে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা বহুলাংশে হতবল হয়ে পড়ে। আমাদের তো মনে হয় শিক্ষিত হিন্দু সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রগতিশীল মনের প্রভাব না পড়লে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়াতেও শশধর তর্কচূড়ামণির 'বৈজ্ঞানিক হিন্দু ধর্ম' বাঙালীর মনকে আবিষ্ট করে রাখত। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কিছুকাল তর্কচূড়ামণির 'শশশৃঙ্গবৎ' বৈজ্ঞানিক হিন্দু ধর্মের ভোজবাজিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু পরেই তিনি আত্মস্থ হন এবং লজিকে-ম্যাজিকে আসমান-জমিন ফারাক—তা সহজেই বুঝে নেন।

৪

উনিশ শতকের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হল কবিরূপে। তারও চেয়ে বড় কথা, তদানীন্তন রাজনীতির আবেদন-নিবেদন নিবেদনের দাস্যলীলাকে বিদ্রূপ ক'রে তরুণ রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনের সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং যথার্থ দেশাত্মবোধ কি বস্তু, তা তিনি 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রে ব্যাখ্যা করলেন। এই সময়ে তিনি চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে দ্বৈরথে প্রবৃত্ত হলেন। চন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত হয়েও প্রাচীনকেই সনাতন ব'লে এমন কথা উচ্চারণ করলেন, যা যুগপৎ অনৈতিহাসিক ও কালশৌচিত্যদোষদুষ্ট। হিন্দুধর্ম, সাধনা ও আচার যে নিত্যধর্মের সঙ্গে যুগধর্মের আপোষ করে চলেছে, সময়ে সময়ে বৈতসীবৃত্তি' অবলম্বনেও বাধ্য হয়েছে—এ সব স্বকপোলকল্পিত কথা নয়; প্রাচীন স্মৃতি সংহিতার মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। চন্দ্রনাথ কালানুক্রমিকতাকে অস্বীকার ক'রে ত্রিকালের ভেদরেখা মানতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁর বোধহয় ধারণা হয়েছিল, প্রাগৈতিহাসিককে ইতিহাসের কোঠায় টেনে নামালেই 'পরমা সিদ্ধি'। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত পুরাণ কথার জল্পনাকে আক্রমণ করেছিলেন। তখন তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে বৃত হয়েছেন (১২৯১ সন)। ফলে সেই দায়িত্ববোধের বশে তিনি হিন্দু সমাজের পশ্চাদ্‌গামিতাকে কিছু শাণিত ভাষায় আঘাত দেবার চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছুকাল মনোমালিন্য চলেছিল, তার কারণও এই। সে যাই হোক' উনিশ শতকের নবজাগরণ যুবক রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর ধ্যানশীলতা থেকে টেনে এনেছিল এবং নিষ্ফল কলরবমুখর প্রাঙ্গণে তাঁকে মল্লের বেশে হাজির করেছিল। এর দ্বারা একথাটাই প্রমাণিত হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও

বাঙালী-মানসে নবযুগ-চেতনা প্রবল বিক্ষোভের আকারে ভেঙে পড়ছিল। তাই উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য শুধু একটা সারস্বত নিদর্শনরূপেই গণনীয় নয়। তার মধ্য থেকে এক শতাব্দীর বাঙালী জীবনের ভাঙাগড়ার ইতিহাস, পুরাতন মূল্যমানের অবনয়ন এবং নূতন প্রত্যয়ের আবির্ভাব যে কোন চক্ষুষ্মান পাঠকেরই দৃষ্টিগোচর হবে। বস্তুতঃ বিশ শতকের বাঙালী-মানস ও ঐতিহ্য কার ওপর দাঁড়িয়ে আছে? উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমরা এদেশের মাটিতে যে আশ্চর্য মানুষগুলিকে দেখেছি, তাঁরাই তো একটা জাতির সমগ্র মানসচেতনাকে বিচিত্র প্রাণরসে ভরে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের অর্ধেকটাই তো উনবিংশ শতাব্দীর ফসল।

সম্প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর তাৎপর্য নিয়ে বাদানুবাদ চলেছে। যে মনস্বী লেখক বাঙালীকে 'আত্মবিস্মৃত জাতি' বলেছিলেন, তিনি বাঙালীমনের একটা অতি-সাধারণ সত্যকেই নির্দেশ করেছিলেন। বোধহয় 'আত্ম-বিস্মৃত জাতি' না ব'লে "অতীত-বিস্মৃত জাতি" বলাই অধিকতর সঙ্গত। তা নইলে উনিশ শতকের গৌরবময় কাহিনীকে ঊনার্থবাচক মন্তব্যের দ্বারা মুছে দেবার এমন বিদূষক চেষ্টা তরুণ লেখকদের ভূতাবিষ্ট করবে কেন? এঁরা বলেন, উনিশ শতককে বাঙালী জীবনের রেনেশাঁস বলা যায় না; য়ুরোপের রেনেশাঁস যেমন গোটা য়ুরোপকে মধ্যযুগীয় জড়তা থেকে রক্ষা করেছিল, বাঙালীর উনিশ শতকী রেনেশাঁস কি তার সঙ্গে সমতুল্য? একে বড় জোর *nascens* (nascenecy) বা *revivere* (revival) বলা যেতে পারে। কেন না বঙ্কিমচন্দ্রপ্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা আর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি আবেগবাদীরা নূতন কোন সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেননি, পুরাতন জরাজীর্ণতার ওপর একটু যুগোপযোগী মোড়ক লাগিয়েছেন—এই মাত্র।

এখানে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। উনিশ শতকের বাঙালীর যে সর্বাঙ্গীণ জাগরণের কথা বলা হয়, সাহিত্যে তার যে তরঙ্গ আহত হয়েছে, তাকে কিছুতেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি বলা যায় না। য়ুরোপের রেনেশাঁস যেমন হেলেনীয় সংস্কৃতি থেকে প্রচুর সহায়তা ও উপাদান নিলেও খ্রীষ্টান মধ্যযুগ থেকেও বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছে, তেমনি উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য মূল-ভারতীয় সংস্কার এবং আগন্তুক পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিকে সমন্বিত করতে সমর্থ হয়েছে। য়ুরোপীয় রেনেশাঁসের সঙ্গে বাঙলার উনিশ শতকের শিল্পাদর্শ, জীবন চেতনা ও নীতিবোধের সাদৃশ্য আছে বলেই একে সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে উনিশ শতকী রেনেশাঁস বলা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ঐতিহ্যগত পরিচয় গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য।

ছুটি

শ্রীবার্ণিক

কথায় বলেনা, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা? সুশান্তরও ঠিক তাই হল।

জীবনের ছত্রিশটা বছর একটার পর একটা দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে করে আজ সত্যিই জীবনের ওপরে বীতস্পৃহ হ'য়ে উঠেছে সুশান্ত। একদিন অনেক কিছুই ছিল তার, ছিল অর্থবল, ছিল জনবল। কিন্তু আজ আর কিছু নেই। যখন যৌথ পরিবারের বন্ধনের মধ্যে ছিল, তখন মাথার ওপরে বাবা ছিল—মা, দাদা এরা সবাই-ই ছিল। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনার দায়িত্বগুলো তাদের ওপরে ছেড়ে দিয়ে সে শুধু আনন্দে ঘুরে বেড়াত—মনে থাকত অফুরন্ত সুখের রেশ। কিন্তু আজ সে বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গিয়েছে, বাবা মা মরে গিয়েছে—সুখের দিন গিয়েছে উধাও হ'য়ে। বাইশ বছর বয়েস থেকেই তার জীবনে এসেছে অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন—এসেছে স্ত্রী, এসেছে পুত্র, এসেছে সংসারের দায়িত্ব। সংসারে আজ তাকে দেবার মত আর কেউ নেই—কিন্তু তার কাছ থেকে নেবার মত লোক আছে। স্ত্রী-পুত্রের ভরণ পোষণের ভরসা তো একমাত্র সে-ই। অথচ সেই সুশান্তই আজ যক্ষারোগে শয্যাশায়ী।

একদিন তার স্ত্রী বিভাকে বল্ল সুশান্ত,—আজ ক'মাস হল বাড়ীতে পড়ে আছি। আর তিনটে দিন পার হলেই পাওনা ছুটি সব শেষ হয়ে যাবে। তারপরে···তারপরে কি হবে বিভা?

—কী অবার হবে। আবার ছুটি পাবে। বার বছর ধরে যে কোম্পানিতে চাকরি করলে, সেখানে আর কখন পাঁচটা দিনও ছুটি নিলেনা, সেখানে তোমার অসুখের জন্যে ছুটি পাবেনা তা হ'তে পারে! ছুটির জন্যে দরখাস্ত করো নিশ্চয়ই ছুটি পাবে।

—তা বলেছ ঠিকই। আমি মিছেই দুশ্চিন্তা ভোগ করি। আজই দরখাস্ত লিখে দিচ্ছি, তুমি সময় করে চিঠিটা পোস্ট করে এসো।

—নাও, লেবুর রসটা খেয়ে নাও দেখি। ডাক্তারবাবু না তোমায় বেশী কথা বলতে নিষেধ করেছেন! সুশান্তর পাশে ব'সে লেবুর রসের গ্লাসটা তার মুখের কাছে তুলে ধরতে ধরতে বল্ল বিভা।

হঠাৎ কাশতে কাশতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বল্ল সুশান্ত,—আমার অত কাছে থেকে থেকে শেষ পর্য্যন্ত তোমাকেও না এই রাজ-রোগে ধরে!

—তা, আমায় ধরে যদি তোমায় ছাড়ে—তাতে আমার আপত্তি নেই। বিশেষ আবেগের সঙ্গে বল্ল বিভা।

আজ ক'মাস ধরে রোগে ভুগে ভুগে শীর্ণ কঙ্কালসার চেহারা হ'য়ে গিয়েছে সুশান্তর। অনেকদিন রোগটা গোপন করে রেখেছিল বলে, রোগের আক্রমণ বেড়েই গিয়েছে। দু'দুটো 'লাংসই' আক্রান্ত হয়েছে সুশান্তর। যে দিন গলা দিয়ে প্রথম স্ত্রীর সামনে রক্ত উঠলো, সেদিন ঘাবড়ে গিয়ে সুশান্ত বল্ল বিভাকে,—এর আগেও কয়েকবার পড়েছে। কী জানি কি হল।

বিভা আর কথা বলে সময় নষ্ট না করে, তখুনি তিন মাসের ছেলেকে কোলে নিয়ে স্বামী সহ, বাড়ীর কাছের ডাক্তার ঘোষালবাবুর কাছে ছুটে গেল।

ডাক্তারবাবু সুশান্তকে পরীক্ষা করে বল্লেন,—আরো বড় কাউকে দেখান। রোগটা খারাপই হয়েছে বলে মনে

হচ্ছে। সম্ভবত বুকেরই রোগ। আর ওই শিশুটিকে রোগীর সঙ্গে না আনলেই ভাল করতেন।

উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠলো বিভার চোখে মুখে। আপন অগোচরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিল বিভা,—কি কোরবো ডাক্তারবাবু, আর কেউই নেই যে ছেলেটাকে দু'দণ্ড ত্থাখে। বলতে বলতে ডাক্তারবাবুর হাতে ফিয়ের টাকা দুটো দিয়ে সুশান্তকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল সে।

ডাক্তারবাবুর ওখান থেকে ফিরে এসে সেই দিনই আবার বড় ডাক্তারের কাছে সুশান্তকে নিয়ে গেল বিভা। এবারেও সঙ্গে সেই শিশু। বিভার মনেও খারাপ ডাকই দিয়েছিল। তাই শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যক্ষ্মারোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মুখার্জির ওখানেই গিয়েছিল সে।

বহু রোগীর ভিড়। একের পর এক ডাক পড়ছিল সবারই। অনেকক্ষণ বাদে সুশান্তর ডাক পড়ল। আস্তে আস্তে সুশান্তকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর ঘরে ঢুকলো বিভা।

ডাক্তারবাবু সুশান্তকে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে বল্লেন,—হ্যাঁ, টি-বিই হয়েছে আপনার। তবে ভয় নেই—সেরে যাবে। আজকাল আর এ রোগে বড় একটা কেউ মরে না। বলে প্রেসক্রিপসন করবেন বলে 'লেটার হেড প্যাডটা টেনে নিলেন ডাক্তারবাবু।

সুশান্ত কোন কথা বলতে পারেনি। বিভাই বল্ল,—কতোদিন সময় লাগবে ডাক্তারবাবু?

—একটা বছর তো বটেই! বোথ দী লাংস আর এ্যাফেক্‌টেড।...আচ্ছা, ওঁর বুকের কোন এক্স-রে করিয়েছেন কি? না করে থাকলে ইমিডিয়েট্‌লি একটা প্লেট, আর সেই সঙ্গে ব্লাড ও থুতুটা এক্সামিন করাতে হবে। প্রেসক্রিপসনের কাগজটা বিভার হাতে দিতে দিতে বল্লেন ডাক্তারবাবু।

প্লেট! মনে মনে ভাবল বিভা। দু'বেলা দু'মুঠোই জোগাতে পারিনা—তার আবার প্লেট! কিন্তু মুখে বল্ল,—না, করান হয়নি কিছুই।

—তাহলে তাড়াতাড়ি করিয়ে ফেলুন। আর তেরদিন বাদে ওঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। ইন দি মিন টাইম—ওজনটাও নিয়ে রেকর্ড করে রাখবেন। বলেই আবার বল্লেন ডাক্তারবাবু,—কিছু মনে করবেন না, বাচ্চা শিশুকে এসব জায়গায় না আনাই ভাল।

আবার সেই এক কথা। কিন্তু এবারে কোন জবাব দিলনা বিভা। বিনিময়ে আঁচলের গেরো থেকে ষোলটা টাকা বার করে ডাক্তারবাবুর হাতে দিয়ে বল্ল সে—আপনার পুরো ফি দেবার সাধ্য নেই আমাদের। তাই... তাই অর্দ্ধেকের বেশী দিতে পারলাম না।

ভাল করে কথা বলতে পারছিল না বিভা। না দিতে পারার অসামর্থ্যের লজ্জা যে কী, তা যাঁরা সমর্থ, যাঁরা অর্থবান তাঁরা কোনদিনই বুঝবেন না। ভরাপেটে ক্ষুধার জ্বালা বোঝা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব পকেট-ভরা নোটের তাড়া রেখে সম্বল হীনের দুঃসহ বেদনা বোঝা। কিন্তু বিভা সে দুঃখ বুঝেছিল। অন্তরের প্রতিটি শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে সে সেদিন অনুভব করেছিল অসমর্থের অনুকম্পা নেবার জ্বালা কী। শূন্যতাভরা দৃষ্টি নিয়ে ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল সে জবাবের প্রতীক্ষায়।

জবাব পেয়েছিল বিভা। ডাক্তারবাবুর চোখ-মুখের বিরক্তিসূচক অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই জবাব পেয়েছিল সে। আস্তে আস্তে টাকাগুলো পকেটে রেখে ডাঃ মুখার্জি বল্লেন, আচ্ছা আসুন।

প্রেশক্রিপসনের কাগজটা হাতে নিয়ে অধোবদনে স্বামী-পুত্রসহ বেরিয়ে যাবার প্রাক্‌মুহূর্ত্তে ডাক্তারবাবুর চাপা গলা কানে এলো বিভার,—এভাবে আমি আর কতো স্যাক্রিফাইশ কোরবো! দিস ইজ হরিবল্‌!

বিভা শুধু ম্লান মুখে একবার সুশান্তর মুখের দিকে তাকাল।

যাই হ'ক, শেষ পর্য্যন্ত সুশান্তকে ডাক্তার দেখান হলেও, ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপসন অনুসারে চিকিৎসা করাবার সাধ্য কোথায় তার। মাসিক একশ দশটাকা মাইনে দিয়ে সে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ চালাবে—না নিজের চিকিৎসা করাবে! এক এক ফাইল ওষুধ কিনতে, এক এক কোর্স ইঞ্জেক্‌শন চালাতে যেখানে একসঙ্গে তিরিশ-চল্লিশ টাকা বেরিয়ে যায়, সেখানে সুশান্তর রোগের চিকিৎসা করাবার কথা ভাবা তো বাতুলতা মাত্র। ফলে, কোন কিছুই ঠিকমত হ'য়ে উঠতো না তার। যেখানে কমপক্ষে রোজ দুটো কমলালেবু খাওয়ানোর দরকার, সেখানে মাত্র কয়েক কোয়া খাইয়েই চিকিৎসার

নিয়ম রক্ষা করাত বিভা। এছাড়া মাংস, ডিম, দুধ খাওয়াবার কথা তো ছিলই। কিন্তু সেসব বিভার কাছে 'আকাশ-কুসুমেরই' সামিল ছিল।

সংসারের নানান কথা ভাবতে ভাবতে সময়ে সময়ে চোখে জল এসে যেত বিভার। সুশান্তর আড়ালে চোখের জল আর চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেলত সে।

বস্তি বাড়ীর এক প্রান্তে একখানা ঘর আর একটা বারান্দা নিয়ে সুশান্তর সংসার। একফালি বারান্দার পাঁচ হাত যায়গার মধ্যেই বিভার যা কিছু। স্বামীর অসুখের পর থেকে ঘরখানা তাকেই ছেড়ে দিয়েছিল বিভা। ছেলে নিয়ে সে বারান্দায়ই শুত। সুশান্তর তা মোটেই ভাল লাগত না। তাই একদিন সে বল্ল বিভাকে, তোমরা ঘরে থেকে আমাকে বারান্দায় শোবার ব্যবস্থা করে দাও। কী হবে! দুদিন বাদে তো ওই বারান্দায়ই চাদর ঢাকা দিয়ে বার করবে আমায়।

—যা মুখে আসবে তাই বলবে। আমার কপালে যা আছে তা কি আর আমি রোধ করতে পারবো, তা বলে তুমি ওকথা মুখে উচ্চারণ কোরোনা। বলতে বলতে কান্নার উচ্ছ্বাসে গলা আটকে এলো বিভার।

—কী হবে বেঁচে বিভা! এ অভাব, এ দারিদ্র্য নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল। ছিলাম রাজার হালে, এখন বস্তিতে এসেছি। যাবারও তো একটা সীমা আছে! ছেলেটার দিকে একবার ভাল করে তাকাতেও পারি না। এ পৃথিবীতে সে আমার জন্যেই এসেছে—তাকে জন্ম দিয়েছি বলে তাকে না খাইয়ে রাখার কোন অধিকার নেই আমার। আজ আমি বড় অসহায় বিভা, আজ আমি··· উত্তেজিত হ'য়ে হাঁফাতে থাকল সুশান্ত, সঙ্গে সঙ্গে কাশির বেগও এসে দেখা দিল।

আস্তে আস্তে সুশান্তর পাশে এসে বসে—তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল বিভা—আর কথা বোলোনা। তুমি সেরে ওঠো। তখন আবার সব হবে। আমরা দু'জনে মিলে চাকরি কোরবো—আমাদের অভাব ঘুচোবো। লক্ষ্মীটি এখন চুপ করো। ছল ছল করে উঠলো বিভার চোখ দুটো।

সুশান্ত আর কোন কথা বলল না। কেবল কেমন করে যেন বিভার মুখের দিকে তাকাল।

দেখতে দেখতে সুশান্তর অফিসের ছুটির দিন ফুরিয়ে এলো। আর মাত্র সাত দিন বাকি। সময় থাকতে সুশান্ত আবার দু'মাসের ছুটি প্রার্থনা করে দরখাস্ত করল।

কিন্তু অফিস থেকে জবাব এলো: আপনার আর কোন ছুটি পাওনা নেই, সুতরাং ছুটি এবং মাইনে পাবার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না।

চিঠিটা পড়তে পড়তে হাত-পা সব কাঁপতে থাকল সুশান্তর। যে জিজ্ঞাসা, যে দুর্ভাবনা সদা সর্ব্বদার জন্যে সে মনের মধ্যে বয়ে বেড়িয়েছে—আজ সেটা বাস্তব রূপ ধারণ করাতে দিশেহারা হ'য়ে পড়ল সে। কিছুই যেন আর ভাবতে পারছিল না। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল সুশান্তর। মনের উদ্বেগে আত্মহারা হ'য়ে কেমন করে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠলো সে—বিভা, এবারে কি হবে বিভা?

ছেলেটাকে বোতলে করে তখন দুধ খাওয়াচ্ছিল বিভা। হঠাৎ সুশান্তর আর্ত্তনাদজড়িত কণ্ঠস্বর তার কানে যেতেই চমকে উঠলো সে। একটা অমঙ্গলের ডাক এলো তার মনে। দুধ খাওয়ান মাথায় উঠে গেল বিভার। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সুশান্তর ঘরে ঢুকলে সুশান্ত রাগ করে, তাই ছেলেকে বারান্দায় বসিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি সুশান্তর কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল বিভা, কি, কি হয়েছে গো? অমন করে ডাকলে কেন?

মুখখানা একেবারে সাদা হ'য়ে গিয়েছিল সুশান্তর। মেলে রাখা চিঠিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বিভাকে বলল সুশান্ত—এবার কী হবে বিভা? আর যে ছুটিও পাবনা; মাইনেও পাবনা।

—কেন? কে বললে? বুকটার মধ্যে ধড়াস করে উঠলো বিভার।

—ওই যে চিঠিটা তুমি দিলে—ওটা অফিস থেকেই এসেছে।

—দেখি কি লিখেছে। বলে চিঠিটা পড়তে পড়তে বিভার মুখখানাও ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। রুগ্ন স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে পারল না সে। না, আমার মনে জোর আনতেই হবে। ভাবল বিভা। কোন মতে নিজেকে সামলাল সে। তারপরে সুশান্তকে

বুঝাবার চেষ্টা করে বলল—তুমি অফিসে ভাল করে আবার একটা দরখাস্ত দাও। আমার মনে হয়—এবারে নিশ্চয়ই তোমার ছুটি মঞ্জুর হবে।

—বে-এ-শ, তাই-ই কোরবো। হতাশ হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সুশান্ত।

তার পরের দিনই আবার ছুটিসহ মাইনের জন্য দরখাস্ত লিখে চিঠিটা বিভার হাতে পোস্ট করতে দিয়ে বলল সুশান্ত—দরখাস্ত তো দিলাম। জবাব পাব কি পাব না তা ভগবানই জানেন। এদিকে মাস শেষ হতে তো মাত্র দু'দিন বাকি। তোমারও তো হাত একেবারে শূন্য—তারপর?

—কি তারপর! সে হবেই যা হয়।

—না গো, যার আছে তার দেখবার লোকের অভাব হয় না। ধার তার চাইতে হয় না, তাকে দিতে পারলে মানুষ কৃতার্থ হয়। যার নেই, তার কেউ নেই। সে শুধু কুড়োয় ধিক্কার···শুধু ধিক্কার। বলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুশান্ত।

যেন কত দিনের সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাস; যেন করুণ কাহিনীর নির্ব্বাক প্রকাশ।

অপলকদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইল বিভা। সান্ত্বনা দেবার আর কোন ভাষা খুঁজে পেল না সে।

অনেক দিন বাদেই অফিস থেকে সুশান্তর চিঠির জবাব এলো। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! কোথায় ছুটি, কোথায় মাইনে। পক্ষান্তরে অফিসের মালিক লিখে জানিয়েছেন: আর কোন ছুটি অথবা মাইনে দেওয়া অফিসের পক্ষে সম্ভব নয়। এ জাতীয় ছুটি মঞ্জুর করা মানে অফিসের নিয়ম ভঙ্গ করা, উপরন্তু পরবর্ত্তীকালে অন্যান্যদেরও ছুটিসহ মাইনে দিতে বাধ্য হওয়া। যে পর্য্যন্ত ছুটি আপনার পাওনা ছিল সে পর্য্যন্ত পুরোপুরিই অফিস আপনাকে ছুটি এবং মাইনে দিয়েছে। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের সব টাকাও আপনি তুলে নিয়েছেন, সুতরাং এখন আর এক কপর্দ্দকও অফিসের পক্ষে দেওয়া সম্ভাবপর নয়। আগামী এক মাসের মধ্যে কাজে যোগদান করতে না পারলে আপনাকে রাখা বিবেচনা-সাপেক্ষ হ'য়ে পড়বে। কারণ কোম্পানি লোকসানে চলছে।

স্তম্ভিত হ'য়ে গেল সুশান্ত। জীবনে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বনটুকুও হারিয়ে ফেলল সে। বিভা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে বলল সুশান্ত, তবে কি আমরা সব ভেসে যাব? সবাই-ই কি তবে না খেয়ে মরব? ওই শিশুটা···ওই শিশুটার কি···আর বলতে পারল না সুশান্ত। হুহু করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

শান্ত এবং সংযতভাবে বলল বিভা—কাঁদলে তোমার শরীরের খুবই ক্ষতি হয়। তুমি ভেবনা। আমি তো বাইরে বেরোই-ই, এবারে না হয় তোমার অফিসেও যাব।

—তুমি মেয়েছেলে, তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে!

—কি কোরবো আবার, স্বামীর জন্যে যা করতে হয় তাই কোরবো! কেন, তোমার মালিকের সঙ্গে দেখা কোরবো—তাঁকে বুঝিয়ে বলব সব কথা। তাঁর মত পাল্টাব, ছুটি মঞ্জুর করাব, মাইনে আনবো!

—আর ছুটি! আজ দু'মাস হল ছুটির আশায় দিন কাটালাম। কিন্তু কোথায় ছুটি! ছুটি আমার ভাগ্যে নেই বিভা—ছুটি আমার ভাগ্যে নেই। এসো আমরা সবাই এক সঙ্গে বিষ খেয়ে মরি।

স্বামীর কথা শুনে চোখের জল রাখতে পারছিল না বিভা। তাই তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে নিল।

সুশান্ত আবার বলতে লাগল—মানুষে মানুষে এতো প্রভেদ কেন বলতে পার? জন্মাবার পর সবাই-ই তো এক! সেও শিশু—আমিও শিশু, সেও অসহায়—আমিও অসহায়; সেও মাতৃস্তন পান করেছে—আমিও তাই। তবে আমি কেন মানুষ নই, আর সে মানুষ। বলতে পার বিভা কেন সে সুখের হাসি হাসতে পারে—আর আমি দুখের আগুনে পুড়ে মরি তিল তিল করে। ছেলের মুখে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারি না—কেন? কেন?···ছেঁড়া জামা কাপড় পরে, না খেয়ে তুমি এই অপ্রয়োজনীয় জীবটাকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা কোরছো—এ দুঃখ—এ কষ্ট তুমি তাদের বোঝাতে পারবে না বিভা—বোঝাতে পারবে না। অফিসে গিয়ে কোনও লাভ নেই।

নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল বিভা। আপন মনের অধীরতায় বলতে থাকল সে—না, আমি পারব। আমি বলছি আমি পারব। ওই ছেলেকে নিয়ে আমি যাব সেখানে, আমি যাব···আমি যাব।

চোখ দুটো কোটরে বসে গিয়েছিল সুশান্তর। চোয়াল

ঠেলে হাড়গুলো বেরিয়ে এসেছিল। ওষুধ আর পুষ্টির অভাবে দিন দিনই তার শরীর খারাপের দিকে যাচ্ছিল। সে চেহারা দেখে শুধু বিভার কেন, কারোই মাথা ঠিক থাকা সম্ভবপর নয়। তাই স্বামীর দিকে চেয়ে বিভার মনটা ডুকরে কেঁদে উঠলো। আকোমাখা কণ্ঠস্বরে বল্ল সে,—তুমি শান্ত হও। ছাখোনা, আমি কালই অফিসে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে আসছি।

সুশান্ত তখন একমনে কি যেন সব ভেবে চলেছে।

* * *

মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ লেখাপড়া জানা মেয়ে বিভা। ক্লাশ সেভেন পর্য্যন্তই পড়েছে সে। তাহলেও তার মনে বল আছে যে সব কথা সে সাহেবকে গুছিয়ে বলতে পারবে। অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে ছেলে কোলে অফিসের পথে এগোতে থাকল বিভা। পথের নির্দ্দেশ সুশান্তই তাকে দিয়ে দিয়েছিল। বেলা এগারটা বাজার আগেই অফিসে পৌছে গেল সে।

পৌছুলো বটে, কিন্তু অফিসের সদর দরজার সামনে যেতেই তার বুক শুকিয়ে গেল। বিশাল ফটকের সামনে উর্দ্দি-পরা দ্বার-রক্ষকের প্রশ্ন কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল বিভা।

—কাঁহা যা রহে আপ? কিসকো চাইয়ে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বার-রক্ষকের বিভার দিকে।

জীবনে সে এই প্রথম কলকাতা সহরের বিশাল জনতার ভীড় ঠেলে, কুলবধূর সম্ভ্রম ছেড়ে, একটা কর্ম্মব্যস্ত অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। ছোট্ট সংসারটা বাঁচাবার জন্যে ছুটে এলো অচেনা অজানা পথ বেয়ে স্বামীর মালিকের কাছে আবেদন অনুনয় করতে। পায়ে হেঁটে এতোখানি দীর্ঘপথ সে আর কখনও যায়নি—আর কখনও পথ বার করতে অত মানুষকে জিজ্ঞেস করেনি। তখনও হাঁফাচ্ছিল বিভা। কি জবাব দেবে দারোয়ানকে তাই ভাবছিল সে। সহসা অফিসের চিঠিটা দারোয়ানের সামনে মেলে ধরে আকুতি ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো, আমি এই কোম্পানির মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বার কয়েক ভাল করে বিভার দিকে তাকাল দ্বার-রক্ষক। একে কোলে ছেলে, তার ওপরে পোষাকের বহর বোধহয় তার মনঃপুত হচ্ছিলনা। তবু যেন কি মনে ক'রে বল্ল, ওই সিঁড়ি সে উঠলেই দোতল্লার বাঁদিকে সাহেবের ঘর। যান—চলে যান।

পা চলছিল না বিভার। তবু কোনরকমে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকে কিছুদুর যেতেই আবার বাধা পেল সে।

—কি চাই? কাকে চাই? প্রশ্ন করল একজন বেয়ারা।

—সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আকুতি করে বল্ল বিভা।

—সাহেবের সঙ্গে! মানে?...না না, ওসব হবেনা, সরে পড়ুন এখান থেকে।

ভিখারীর মত করে তাড়িয়ে দিতে চাইলো বিভাকে।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বিভা। কি যে করবে তা ভেবে পাচ্ছিলনা সে।

বেয়ারা আবার ধমক দিল। বল্ল, যান সরে পড়ুন। সাহেব কাউকে ভিক্ষে ছায়না।

ভাগ্য ভাল ছিল বিভার। সেই সময়ে কোম্পানির মালিক রুদ্রেশ্বরবাবু অকস্মাৎ সস্ত্রীক অফিস ঘর থেকে বের হওয়াতে বিভার সঙ্গে একেবারে সামনা-সামনি দেখা হ'য়ে গেল তাঁর। রুদ্রেশ্বরবাবুর স্ত্রী কমলা দেবীও সেদিন কি একটা ব্যাপারে স্বামীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে হঠাৎ এসেছিলেন অফিসে। সে যাই হ'ক, অফিস ঘরের সামনে ছেলে কোলে একটি মেয়ে ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভ্রূকুটি করে বেয়ারার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রুদ্রেশ্বরবাবু, কে রে? কি চায়?

বেয়ারা কিছু বলার আগেই কাঁদ কাঁদ গলায় বলে উঠলো বিভা, আমি বড় সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। বলতে বলতে ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে রুদ্রেশ্বরবাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরে আবার বলে উঠলো সে, দয়া করে একটি বারের জন্যে দেখা করিয়ে দিন।

—পা ছাড়ুন। কি বলবেন বলুন—আমিই মালিক। গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন রুদ্রেশ্বরবাবু।

এবার অফিসের চিঠিটা বার করে, সাহেবের সামনে সেটা মেলে ধরে বলতে থাকল বিভা, আমার স্বামী আজ পাঁচ-ছ মাস যাবৎ যক্ষ্মারোগে শয্যাশায়ী। সংসারে আর কেউ নেই যে আমাদের দ্যাখে। আপনি মাইনের ব্যবস্থা

না করে দিলে আমরা সবাই মারা পড়ব। আপনি মালিক, আপনিই সব—আপনার পায়ে পড়ি আমাদের বাঁচান !

মুখের অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে জবাব দিলেন রুদ্রেশ্বরবাবু, এরকম দুঃখ তো আজ ঘরে ঘরে। তার আমি কি কোরবো। আমি কিছু করতে পারব না। সুশান্তকে বলবেন, রুল ইজ রুল।

—আপনি দয়া না করলে একটা সংসার একেবারে শেষ হ'য়ে যাবে। ভিক্ষে চাই আপনার কাছে, দয়া করুন—বাঁচান! জোড়হাত করে সজল চোখে রুদ্রেশ্বরবাবুর দিকে চেয়ে রইল বিভা।

—না না, আমি কিছুই করতে পারিনা। অফিস-রুল বলে একটা জিনিষ আছে—সেটা কোন ক্ষেত্রেই অমান্য করা চলে না। একজনের জন্যে করতে হলে আর পাঁচ-জনের জন্যেও করতে হয়। না,—তা সম্ভব নয়! রুদ্রেশ্বর-বাবুর কণ্ঠস্বর এবারে যেন আরো কঠোর হ'য়ে উঠলো।

এবারে অসহায়ার মত রুদ্রেশ্বরবাবুর দিকে চেয়ে ছল ছল চোখে বলতে লাগল বিভা, ওই শিশুটা আজ ক'দিন বলতে গেলে একরকম কিছুই খায়নি। আপনি দয়া না করলে ওরা সবাই-ই না খেয়ে মরবে। আমি আপনার দাসী হ'য়ে থাকব—আমার স্বামী-পুত্রকে বাঁচান—দয়া করুন!

বোঝা গেল রুদ্রেশ্বরবাবু খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। বার কয়েক হাতঘড়িটার দিকে বিরক্তিজনিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, বেশ গম্ভীর গলায় বল্লেন, দেখুন, আমাদের সময়ের দাম আছে। বার বার এক কথা বলে কোন লাভ নেই—ডোণ্ট ক্রিয়েট এ সিন হিয়ার। এ ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারবনা।

দেখতে দেখতে বেশ কিছু লোক জমে গিয়েছিল আশে পাশে। রুদ্রেশ্বরবাবুর স্ত্রী কমলা দেবীও এতোক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে সব কিছু শুনছিলেন। ওদিকে বিভার ছেলেটাও তখন 'মা মা' বলে কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছে। বেলা তখন প্রায় দেড়টা বাজে। রুদ্রেশ্বরবাবু আর একবার হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে, স্ত্রীর দিকে তাকাতেই কমলা দেবী আস্তে বলে উঠলেন, নো নো রুদ্র, ডোণ্ট বি সো ক্রুয়েল। আমি তোমায় রিকোয়েস্ট করছি—যদি কিছু করতে পার তো করো।

—তার মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন! চাপা গলায় বলে উঠলেন রুদ্রেশ্বরবাবু।

—আহা, কি যে বলো, ডু সামথিং ফর দেম।

—তা কী করে সম্ভব। ল-মেকার ক্যান্‌ট্ বি ল-ব্রেকার।

—সে সব আমি জানি না। ডোণ্ট ইউ ফিল পিটি! প্লিজ! প্লিজ রুদ্র।

—আর ইউ সিরিয়াস ?…কিন্তু…

—না না, তুমি ওঁর এ্যাপিল মঞ্জুর করো—ইটস্ মাই রিকোয়েস্ট টু ইউ।

বেশ কিছুক্ষণ থ মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন রুদ্রেশ্বরবাবু। ছেলেটা তখনও 'মা মা' করে কেঁদে চলেছে। সমস্ত ঔৎসুক্য নিয়ে বিভা তখনও রুদ্রেশ্বরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে—জবাবের প্রতীক্ষায়।

সহসা বলে উঠলেন রুদ্রেশ্বরবাবু, বলছ? আচ্ছা—দেখছি কি করতে পারি। বলে সেই মুহূর্তেই অফিস ঘরে ঢুকে কাগজে কি সব লিখে এনে বিভার হাতে সেই কাগজটা দিয়ে বল্লেন, যান, দু'মাসের মাইনে আর ছুটির ব্যবস্থা করে দিলুম। ক্যাশ কাউণ্টারে এই কাগজটা দিলেই দু'মাসের মাইনে পেয়ে যাবেন। আর কখনও যেন আমার কাছে না আসেন—দিস ইজ ফার্স্ট এণ্ড লাস্ট।

বিভা বুঝেছিল যে কার জন্যে এই অসাধ্য সাধিত হল। তাই, কমলা দেবীর হাতখানা ধরে মনের আবেগে বলে উঠল, শাঁখা সিঁদুর নিয়ে যেন চিরসুখী হন দিদি।

দেখা গেল বিভা মালিকের স্ত্রীর হাত ধরেছে বলে বেয়ারাটা তার দিকে কটমট করে চেয়ে রয়েছে। ওদিকে রুদ্রেশ্বরবাবুও ততক্ষণে, 'কাম অন ডারলিং' বলে স্ত্রীর হাত ধরে সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছেন।

* * *

বুকে বল, মনে আশা নিয়ে বাড়ীর পথে পা বাড়াল বিভা। এক টাকা নয়, দু'টাকা নয়—একেবারে দুশো কুড়ি টাকা। আজ তার কতো আনন্দ। সে যে মালিকের কাছ থেকে সব কিছু মঞ্জুর করিয়ে আনতে পেরেছে এটাই আজ তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। কেবলই ভাবতে থাকল বিভা, সাফল্যের সংবাদ শুনিয়ে সুশান্তকে কি রকম অবাক করে দেবে।

ফলের দোকান থেকে কয়েক টাকার ফল আর ছেলের জন্যে 'এলিডন' কিনে রিক্সা ভাড়া করে বল্‌ল বিভা—চলো, তাড়াতাড়ি নারকেলডাঙ্গা চলো।

বাড়ী পৌছে কোনমতে রিক্সা ভাড়া মিটিয়ে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করল বিভা। আনন্দের অধীরতায় পা যেন তার আর চলতে চাইছিল না। ছেলেটাকে কোন মতে বারান্দায় বসিয়ে, 'বলিনি আমি তাঁর মত পাণ্টাবই! কেমন—দেখলে তো!' বলতে বলতে স্বামীর ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল বিভা।

—ওকি, কি হয়েছে তোমার? অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? উদ্বিগ্ন হয়ে সুশান্তর কাছে ছুটে গিয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে জিজ্ঞাসা করল বিভা—কি হয়েছে, চুপ করে আছ কেন?

কিন্তু যেমন চুপ করে ছিল, তেমনই চুপ করে থাকল সুশান্ত।

বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো বিভার কপালে। সুশান্তর গালে হাত বুলোতে বুলোতে আবেগের সঙ্গে বলতে থাকল সে—ওগো, এই ভাখো আমি তোমার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে এনেছি। এই ভাখোনা, তোমার মাইনে। চুপ করে আছ কেন, লক্ষ্মীটি একটা কিছু বলো।

কিন্তু কোথায় সুশান্ত! তার যে ছুটি হ'য়ে গিয়েছে। সুশান্ত তখন বহু দূরে—সকলের নাগালের বাইরে।

বিভা যখন বুঝল যে সুশান্ত আর কোন দিনই চেয়ে দেখবে না—তার কথার জবাব দেবে না, তখন সে পাগলের মত হয়ে উঠলো। সুশান্তর বুকে বার বার কান পেতে কিছু শুনতে না পেয়ে, হাউ হাউ করে কেঁদে বলে উঠলো—আমায় শেষে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে! আমি যে তোমার ছুটি করিয়ে এনেছি! বলে সুশান্তর বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

আর মাছিগুলোও তখন উড়ে উড়ে পড়তে থাকল সুশান্তর মুখে।

বারান্দায় ছেলেটা 'মা মা' করে ক্ষিদের তাড়নায় কেঁদে উঠেছে তখন।

ইংরাজী পাঠ্য-সূচী ও পরীক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি, ডি-এস-ই

পাব্‌লিক পরীক্ষার সুত্তি খেলায় অনেক পরীক্ষার্থীকেই বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়; ফলে অর্থ উদ্যম সময় ও সম্ভাবনার বহু অপচয় ঘটে। জাতীয় জীবনে এই ক্ষতিটা উপেক্ষণীয় নয়। পরীক্ষার অকৃত-কার্য্যতা ও আকস্মিকতার জন্য যে সমস্ত বিষয়গুলি স্কুল-ফাইনাল, উচ্চতর মাধ্যমিক, প্রাক্‌বিশ্ববিদ্যালয় ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় সর্ব্বা-পেক্ষা বিভীষিকার সৃষ্টি করে, "ইংরাজী ভাষা" তাদের মধ্যে অন্যতম। পরীক্ষার দুর্ঘটনা জনিত ক্ষয়-ক্ষতিটা ইংরাজীর প্রশ্ন পত্রেই বোধহয় সর্ব্বাধিক। এর কি প্রতিবিধান নেই? আজকের দিনে এইটেই হচ্ছে একটা সার্ব্বজনীন প্রশ্ন।

একটা চরম মতবাদ

কেউ কেউ বলেন এই অপচয় নিবারণের উপায় হচ্ছে পাঠ্য সূচী থেকে ইংরাজীকে একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া। তাঁরা বলেন "আর আমরা ইংরাজের অধীন নেই, শিক্ষার বাহনও আজ ইংরাজী নয়, তবে কেন আর এই ইংরাজী ভাষার বোঝা ছাত্রদের ঘাড়ে চাপান? এ ব্যবস্থা বর্ত্তমানে শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, এটা অসম্মান জনকও বটে, এর মধ্যে যেন একটা দাস-মনোবৃত্তির অনুরণন রয়েছে। দূর করে দাও ইংরাজী ভাষাকে পাঠ্য সূচীর তালিকা থেকে।"

আমাদের মতবাদ

আমাদের মনে হয় ইংরাজীর প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। একদিন এই ভাষার মাধ্যমেই সারা ভারতে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান হয়েছিল, ভাবের বিকীরণ হয়েছিল, জাতীয় সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী দেশের সর্ব্বত্র ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ইংরাজী সেদিন জাতীয় সংগ্রামে জাতীয় ভাষার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের প্রয়োজনে ইংরাজীর ভূমিকা আজ খানিকটা হীনবল হয়ে পড়েছে সত্য এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়ত হিন্দী (বা সংস্কৃত) এই ব্যাপারে ইংরাজীকে স্থান চ্যুত করবে, এটাও সত্য। তা সত্ত্বেও ইংরাজীর প্রয়োজন সেদিনও থাকবে। এই ভাষার নিজস্ব সাহিত্যিক সমৃদ্ধির জন্য, আন্তর্জাতিক ভাব বিনিময়ের

সুবিধার জন্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের অমেয় সম্পদের জন্য, ইংরাজীর প্রয়োজন বহু দিন ধরেই থেকে যাবে। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে রত্নরাজি সঞ্চিত হয়ে আছে, নিছক ভাব-প্রবণতার প্রেরণায় সে সম্পদ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করা আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে ইংরাজীকে পাঠ্য সূচী থেকে বহিষ্কৃত করে পরীক্ষার কৃতিত্বটাকে সহজসাধ্য করে তোলা নয়, ইংরাজী পরীক্ষার দুর্ঘটনা (asualty) ও ক্ষয় ক্ষতিকে হ্রাস করে ইংরাজীর বিভীষিকা দূর করাই হবে বিজ্ঞতর কাজ।

কি ভাবে সেটা সম্ভব হবে ?

একথা অনস্বীকার্য্য যে উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে পরীক্ষার অপচয় খানিকটা নিবারিত হতে পারে। কিন্তু হঠাৎ কি করে সেটা সম্ভব হবে, কোথায় পাওয়া যাবে যোগ্যতর শিক্ষকবৃন্দ ? কোন ভাল জিনিসই লাখে লাখে মেলেনা। ভাল শিক্ষকও খুব বেশী সংখ্যায় পাওয়া যাবে না। আর যারা ইতিমধ্যেই শিক্ষকতা বৃত্তি নিয়ে আছেন, তাঁদের কাছে আরও নিষ্ঠা, আরও নৈপুণ্যের জন্য দাবী করলেও তাঁরা রাতারাতি যোগ্যতর হয়ে উঠবেন না। আমাদের ধরে নিতেই হবে যে তাঁরা যথা-সাধ্য চেষ্টা করছেন ; সে চেষ্টার ফলটা আমাদের মনঃপুত হোক বা নাই হোক, আলোচনায় বা উপদেশে, প্রশস্তি বা নিন্দায় তাঁদের শিক্ষা-পদ্ধতি রাতারাতি সার্থকতর হয়ে উঠবে না, পরীক্ষার অপচয় নিবারিত হবে না।

কাজেই আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে "শিক্ষা-পদ্ধতির আশু পরিবর্ত্তনের দ্বারা পরীক্ষার অপচয় যদি নিবারিত করা সম্ভব না হয়, তাহলে পরীক্ষা-পদ্ধতি অথবা পাঠ্য সূচীর কিছু পরিবর্ত্তন করে সেই অপচয়টা হ্রাস করা সম্ভব হয় না কি ?" আমাদের মনে হয় সেটা খুবই সম্ভব।

স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার পদ্ধতির ক্রটি

পাঠ্য সূচীর পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গ এলো কেন ? বর্ত্তমান পাঠ্য সূচীর মধ্যে কোনও ক্রটি আছে কি ? সেটা কি অত্যন্ত দুর্বহ ? স্কুলফাইনাল পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের আকার দেখলে ইংরাজী পাঠ্য সূচীটাকে খুব গুরুভার বলে মনে হয় না। কিন্তু যে প্রণালীতে ইংরাজীর পরীক্ষা গৃহীত হয়, তার ফলে ইংরাজী পাঠ্য সূচীটা ছাত্রদের কাছে দুর্বহ হয়ে উঠেছে। একটা ক্ষুদ্রায়তন পাঠ্য পুস্তকের প্রস্তুতির জন্য ছাত্রদের মুখস্থ করতে হয় সুবৃহৎ অর্থ পুস্তক। নিজের ইংরাজী লেখবার ক্ষমতা তাদের নেই, তাই তারা সম্ভাব্য প্রশ্নের সন্ধানে বহু শত পৃষ্ঠা ব্যাপী নোট মুখস্থ করে, আর ঠিক নির্ব্বাচিত প্রশ্নগুলি না পড়লেই দিশেহারা হয়ে পড়ে, তাদের প্রস্তুতি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। কাজেই স্কুল-ফাইনাল ছাত্রদের জন্য অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক আকারে ক্ষুদ্র হলেও ইংরাজী পাশের জন্য তাদের পরীক্ষা-বহনীয় বোঝাটি (examination load) কম হয় না।

উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠ্য সূচীর ক্রটি

উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্য সূচীর ক্রটি হচ্ছে অন্য রকম। এখানে পাঠ্য পুস্তক থেকে কোনও প্রশ্নই থাকে না। ইংরাজীটা শেখান হয় সাহিত্যের ভাষা হিসাবে নয়, কাজ কর্ম্মের ভাষা হিসাবে ; অর্থাৎ পরীক্ষার প্রয়োজনের দিক দিয়ে ইংরাজীর প্রস্তুতির জন্য ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাসম্ভারের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিতির প্রয়োজন ততটা নেই, যতটা আছে ইংরাজী লেখবার ক্ষমতার। ইংরাজীটা "Content Subject" নয়, সেটা হচ্ছে "Skill Subject" কাজেই পরীক্ষা পাশের জন্য precis essay letter প্রভৃতি লেখবার কৌশলটুকু আয়ত্ত করলেই হয়ে গেলো, সাহিত্যের রসোপলব্ধি, সমালোচনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতির দরকার নেই। উচ্চতর মাধ্যমিক পর্য্যায়ে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য ৩০খানি পাঠ্য পুস্তকের নাম দেওয়া আছে বটে, তবে কোন স্কুলেই ঐ সব বই পড়ানোর সময় থাকে না, ছাত্ররাও সব বই কেনে না, কারণ ঐ সব বই থেকে কোনও প্রশ্ন আসে না। ইংরাজীটা তাদের কাছে তথ্য বা তত্ত্বের বিষয় নয়, সেটা হচ্ছে নিছক "Skill Subject," শুধু 'প্রেসি' লেখা, চিঠি পত্র লেখা প্রভৃতির Subject.

সাহিত্যের সামগ্রী বনাম ভাষায় ব্যবহারিক দক্ষতা (Content Vs. Skill)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইংরাজীটা যদি "Skill Subject" হিসাবে শেখানো হয়, তাহলে ছাত্ররা সাহিত্য বোধের সুফলগুলি পাবে কি ? সাহিত্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি, রসের চর্ব্বনা, কাব্যের মূল্য বিচার, এগুলির জন্যও একটা অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর ছাত্রদের ইংরাজী (২য় ভাষা হিসাবে) পাঠ্য সূচীতে তার কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে এই পর্য্যায়ের পড়া শেষ করে যে সব ছাত্ররা কলা বিভাগে ইংরাজীতে honours নেবে, তারা হঠাৎ সেক্সপিয়ার ব্রাউনিং শেলি কীট্‌স্ নিয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়বে। শুধু চিঠিপত্র লেখা, 'প্রেসি' লেখা, dialogue লেখা, এই সমস্ত বিদ্যা নিয়ে ইংরাজীর সাহিত্য-রথীদের রচনার সার্থক রস গ্রহণটা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন বলে মনে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্য সূচীর ইংরাজীটাকে (Second language) Skill Subject হিসাবে পড়াবার ব্যবস্থা করে ইংরাজীকে নামিয়ে আনা হল অফিস আদালত দোকান কলকারখানার প্রয়োজনে। ইংরাজী সাহিত্য বধূ এই ব্যবস্থার ফলে কাব্য কুঞ্জের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পদ থেকে স্থানচ্যুত হয়ে সরে এলেন অফিস আদালতের ব্যবহারিক প্রয়োজনের সেবা দাসীর পদে। এই উচ্চতর মাধ্যমিক পর্য্যায়ে ইংরাজী সাহিত্যের সামগ্রীর (Content) জন্য ইংরাজী পড়ানো হয় না, ইংরাজী ভাষার ব্যবহারিক দক্ষতার জন্য সেটার পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

প্রকাশনা বনাম বোধনা (Expression vs. Comprehension)

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ইংরাজীর প্রয়োজন আর বর্ত্তমানের প্রয়োজন এক জাতীয় নয়। প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে ইংরাজ প্রভুদের কাছে মনের

ভাব প্রকাশ করবার মাধ্যম ছিল ইংরাজী। অফিস আদালত ব্যবসা-ক্ষেত্র সর্ব্বত্রই তাই ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম ছিল ইংরাজী। ভাল ইংরাজী লেখা ও ভাল ইংরাজী বলার শক্তিটা ছিল অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত জিনিস, কারণ যারা ভাল ইংরাজী বলতে বা লিখতে পারতো, কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতির দ্বার তাদের কাছে ছিল অবারিত। অফিসের কেরাণী বৃত্তি থেকে উচ্চতম প্রশাসনিক পদের ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত ইংরাজী জ্ঞানটাই ছিল সব চেয়ে প্রয়োজনের জিনিস। শুধু তাই নয়, আন্তঃপ্রাদেশিক মিলনের ক্ষেত্রেও ইংরাজী ভাষাই ছিল ভাব বিনিময়ের বাহন। তাই তখনকার দিনে ইংরাজী বলা বা লেখার শক্তিটার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ এই ইংরাজী ভাষাই তখন সারা ভারতের লোককে একটা অখণ্ড জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এই ভাষার মাধ্যমেই আমরা বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবর্গের বাণীকে গ্রহণ করেছি, এই ভাষার মাধ্যমেই আমরা আমাদের নিজেদের বক্তব্যকে বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করেছি। কাজেই প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে ইংরাজী বলা, ইংরাজী লেখা ও ইংরাজী বোঝা সবগুলিই সমান দরকারী ছিল।

বর্ত্তমানে ইংরাজী বলা ও ইংরাজী লেখার প্রয়োজনটা কমে গেছে। আন্তপ্রাদেশিক মিলনের ক্ষেত্রে ইংরাজীর স্থলে হিন্দী ধীরে ধীরে স্থান দখল করে নিচ্ছে। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহন আর ইংরাজী নেই, রাষ্ট্রের চরম কর্ত্তৃত্ব যাঁদের হাতে, তাঁদের ভাষাও ইংরাজী নয়। কাজেই দেশের সাধারণ ভাষা হিসাবে অথবা শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরাজী ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হচ্ছে। অনতিদূর ভবিষ্যতে এইদিক দিয়ে ইংরাজী একেবারেই ভারতের বাজারে অচল হয়ে যাবে। কিন্তু তখনও ইংরাজীর উপযোগিতা থেকে যাবে অন্য দিক দিয়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার হিসাবে ইংরাজীর গৌরব বহু দিনই থেকে যাবে। বহু দিন ধরে অভ্যাসের ফলে ইংরাজীটা আমাদের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে, কাজেই ইংরাজীর জ্ঞান-ভাণ্ডারের সুগম আকর থেকে আমরা অল্পায়াসেই ধন রত্ন আহরণ করতে পারবো। এই আহরণের জন্য প্রয়োজন হয় ইংরাজী ভাষা বোঝবার ক্ষমতার। একটা ভাষা বোঝা, আর ভাষাতে কথা কওয়া বা শুদ্ধভাবে লেখা, এক জিনিস নয়। বর্ত্তমান ভারতে আমরা যদি বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখতে না পারি, যা বিশুদ্ধ ইংরাজীতে কথা বার্ত্তা বলতে না পারি, তাহলে ততটা ক্ষতি নেই; কিন্তু ইংরাজীতে লেখা মৌলিক গ্রন্থাদি পড়ে সেগুলি থেকে যদি জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্যগুলি আহরণ করতে পারি, তাহলেই আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানে বড় হয়ে উঠতে পারি, সেই জ্ঞানের সমৃদ্ধি দিয়ে স্ব স্ব মাতৃভাষাকে পুষ্ট করে তুলতে পারি। তাই মনে হয় বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইংরাজী শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যাপারে ভাবের প্রকাশ করবার শক্তির (expression) চেয়ে ভাবের বোধের শক্তি (Comprehension)টার প্রয়োজন বেশী হয়ে উঠেছে। প্রাক স্বাধীনতা যুগে প্রকাশনা ও বোধনা এই দুটোই ছিল সমান প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানে সাধারণ ছাত্রদের কাছে প্রকাশনা (expression)র চেয়ে বোধনা (Comprehension) টা বেশী দরকারী হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্র পড়ানো হচ্ছে মাতৃভাষায়। কাজেই ছাত্ররা যদি ইংরাজীতে লেখা "ল্যাডলি মিত্রের" রসায়নের বই থেকে রসায়নের তত্ত্বগুলি বুঝে নিয়ে বাংলায় লেখে, তাতে পরীক্ষার দিক দিয়েও ক্ষতি হয় না, আর রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞানের দিক দিয়েও ক্ষতি হয় না। অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধেও একই যুক্তি খাটে। কাজেই ইংরাজী ভাষাটা আজ জ্ঞান আহরণের ভাষা হিসাবে আমাদের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ভাব প্রকাশের ভাষা হিসাবে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভাষা নয়। সুতরাং ইংরাজী পরীক্ষার ব্যাপারেও ইংরাজী ভাষার প্রকাশ ক্ষমতার (expression) চেয়ে বোধের ক্ষমতার (Comprehension) দিকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

ইংরাজী বোধের পরীক্ষার ত্রুটি

এই বোধের (Comprehension) পরীক্ষার জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক পর্য্যায়ে যে একেবারেই কোনও ব্যবস্থা নেই তা নয়। ২০০ নম্বরের মধ্যে ৩০ নম্বরের একটি প্রশ্ন থাকে "answering question from a passage"। এতে প্রায় ২০০—২৫০ শব্দ যুক্ত একটি উদ্ধৃতি প্রশ্ন পত্রে ছাপান থাকে, আর সেই উদ্ধৃতিটির মধ্য থেকে কতকগুলি প্রশ্ন ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি পাঠ করে ছাত্ররা সেটা বুঝতে পেরেছে কিনা তারই পরীক্ষা করা। কাজেই এই প্রশ্নটিকে সাহিত্য-বোধের প্রশ্ন" (Comprehension test) বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ছাত্রদের কাছে এই জাতীয় প্রশ্নটিও নিছক বোধের পরীক্ষা থাকে না, এটা হয়ে ওঠে "বোধ" (Comprehension) এবং "প্রকাশ শক্তি" (expression)—দুটির সম্বন্ধেই পরীক্ষা। কারণ Comprehension test এর জন্য যে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয় আর তার মধ্য থেকে যে সব প্রশ্নগুচ্ছ দেওয়া থাকে, সেগুলির উত্তর লিখতে হয় ইংরাজী ভাষায়। ফলে যেসব ছাত্র ভাল ইংরাজী লিখতে পারে না, তারা উক্ত passage টি বুঝতে পারলেও সেটা নির্ভুল ইংরাজীতে প্রকাশ করতে পারে না—তারা হয়ত বুঝতে পারে, কিন্তু বোঝাতে পারে না, যে তারা বুঝতে পেরেছে। তাদের বোঝবার কৃতিত্বটা পরীক্ষকের কাছে তারা পেশ করতে পারে না প্রকাশ শক্তির অভাবে। তাদের অবস্থাটা হয়ে পড়ে।

> "ভাষার দৈন্যে মোদের কথাটি মাথা ঠুকে মরে হৃদয় পাড়ে।
> পক্ষ ঝাপটি পক্ষী যেমন বদ্ধ-যাগল্ খাঁচার দ্বারে॥"

প্রতিকারের উপায়

কিন্তু প্রকাশ শক্তির অভাবের জন্য বোধ শক্তির পরীক্ষার ব্যাপারে ছাত্রদের যে ব্যর্থতা আসে, সেটার প্রতিকারের উপায় আছে। একটা ইংরাজী অনুচ্ছেদ পড়ে ছাত্ররা যা বুঝলো সেটা মাতৃভাষায় প্রকাশ করবার জন্য তাকে অধিকার দেওয়া হলে তাদের সুবিধা হয়। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ শক্তির অভাবের জন্য তাকে আর অতিরিক্ত হাঙ্গামে পড়তে হয় না। বর্ত্তমানে Comprehension test এ ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে হয় দুটো ব্যাপারে; একটা হচ্ছে নিছক Comprehen-

-sion এর দিক দিয়ে, আর একটা প্রকাশের (expression) দিক দিয়ে। ইংরাজী অনুচ্ছেদের Comprehension test এর প্রশ্নগুলির উত্তর বাংলা ভাষার মাধ্যমে লেখবার সুযোগ পেলে ছাত্ররা শক্তিগত অসুবিধা থেকে রেহাই পায়। যারা ইংরাজীতে লিখতে চায় তারা লিখুক, তার জন্য তাদের কিছু বেশী নম্বর দেওয়া হোক, কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের জন্য মাতৃভাষায় লেখবার পথটা খোলা রাখলে পাশের হারটা বেড়ে যায়।

ইংরাজীর শিক্ষকবৃন্দ, বিশেষ ভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ যাঁরা Direct method এ বিদেশী ভাষা শেখাতে অভ্যস্ত, তাঁরা এই প্রস্তাবটাকে হাস্যাস্পদ বলে সরাসরি অগ্রাহ্য করবেন। বাস্তবিক ইংরাজী Comprehension test এর প্রশ্নের উত্তরগুলি বাংলা ভাষায় লেখার ব্যবস্থাটা একেবারে নূতন ব্যাপার, তাই এ ব্যবস্থাটাকে প্রথমে হাস্যাস্পদ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যবস্থাটা অযৌক্তিক নয়। এত দিন পর্য্যন্ত ইংরাজী অধ্যাপনার ব্যাপারে আমরা ইংরাজী ভাষার প্রকাশের (expression) দিকটার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছি, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রকাশের চেয়ে ভাষাবোধের (Comprehension) উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রকাশ-ক্ষমতার প্রয়োজন এখনও আছে, তবে বর্ত্তমানে ভাষাবোধের প্রয়োজনটা বেশী হয়ে উঠেছে। ইংরাজপ্রভুদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীর প্রয়োজন এখন নেই, কিন্তু ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির ভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণের প্রয়োজন এখনও আছে, তাই বর্ত্তমানে expression এর চেয়ে comprehensionটা এখন বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আহরণের জন্য, ভারতীয় ভাষাগুলিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলবার জন্য, বিশ্বের প্রগতির চলমান বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করবার জন্য, বহির্ভারতের বৃহত্তর জগতের উন্মুক্ত আকাশ বাতাসের প্রাণদ বায়ুর সঞ্জীবনী প্রভাব অনুভব করবার জন্য, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতির উপলব্ধির জন্য, বিশ্ব সভ্যতাকে ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত করে তোলবার জন্য, ইংরাজী ভাষার বোধশক্তির (Comprehension) প্রয়োজনটা প্রকাশ শক্তির (expression) প্রয়োজনের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

সাধারণ ছাত্রসমাজ রাষ্ট্রদূত হয়ে দেশবিদেশে ইংরাজীর মাধ্যমে ভারতের বাণী প্রচার করবার সুযোগ পাবেনা, ভারতীয় কৃষ্টি কলার দৌত্য নিয়েও তারা সাত সমুদ্রের পরপারে অভিযাত্রী হবে না। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই প্রয়োজন হবে ইংরাজী ভাষার ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের রত্নরাজি আহরণ করবার জন্য। এই আহরণের জন্য আহরণী ক্ষমতার, বোধের ক্ষমতার যতটা প্রয়োজন, প্রকাশের ক্ষমতার প্রয়োজন ততটা নেই। এই ভাষাবোধের পরীক্ষার জন্য (comprehension test) পাবলিক পরীক্ষায় যে সব প্রশ্ন থাকবে, তার উত্তরগুলি মাতৃভাষায় লেখবার অধিকার দিলে ক্ষতি হয় না। যখন সেই সুযোগটুকু পেলে ছাত্রদের পরীক্ষায় সাফল্যের হারটা অনেক বৃদ্ধি পায়।

আমরা জানি কোনও একটা ভাষা বোঝার চেয়ে বোঝানটা শক্ত কাজ। একটা বিদেশী ভাষায় বিশুদ্ধভাবে লেখা বা বিশুদ্ধভাবে বলার চেয়ে সেটা পড়ে বা শুনে মোটামুটি বুঝতে পারার কাজটা অনেক সহজসাধ্য। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লোকেরা যখন এক সঙ্গে বাস করতে থাকে, তখন বিদেশী লোকেরা প্রথমে শিখে নেয় শুধু প্রাতিপদিক (loro stems) গুলির অর্থকে। ব্যাকরণগত বিভক্তি বা প্রত্যয় যোগে ঐ প্রাতিপদিকগুলির কি রকম রূপ ভেদ হয়, সেটা তারা সহজে আয়ত্ত করতে পারে না। তা হলেও ঐটুকু জ্ঞান নিয়ে বিদেশী ভাষাটা বুঝতে পারে এবং কাজকারবার চালিয়ে যায়। সব ভাষা শিখবার ব্যাপারেই এই নিয়ম। ব্যাকরণ বা বাগ্বিধি-(idiom) গত বিশুদ্ধি বজায় রেখে ভাষা লেখা বা বলাটা খুবই কঠিন কাজ, তার জন্য বহু অনুশীলনের দরকার হয়। কিন্তু একটা বিদেশী ভাষা মোটামুটি বোঝার জন্য অত অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। ইংরাজী ভাষার সঙ্গে বর্ত্তমানে আমাদের যা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাতে ইংরাজী ভাষাটা মোটামুটি বোঝবার দিকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, তার রচনার বাগ্বিধি বা ব্যাকরণের নিখুঁত আদর্শ সম্বন্ধে পরীক্ষকদের দাবীটা একটু কম হলেও ক্ষতি নেই। তাই মনে হয় পরীক্ষার ব্যাপারে ইংরাজী সিলেবাসের কিছু পরিবর্ত্তন করা দরকার।

পাঠ্য সূচীর সাম্য

ছাত্রদের পরীক্ষা পাশের সুযোগ দেবার জন্যই যে একথা বলছি তা নয়। ছাত্রদের এক জাতীয় বিদ্যালয় থেকে অন্য জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুবিধার জন্যও স্কুল-ফাইনাল, উচ্চতর-মাধ্যমিক ও প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য ধারার ঐক্যের প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমানে সে ঐক্যটি নেই। ফলে চাকুরীর ট্রান্সফার, বাসস্থানের পরিবর্ত্তন, প্রভৃতি কারণে অভিভাবকদের বাসা বদল যখন অনিবার্য্য হয়ে ওঠে, তখন বাড়ীর ছেলেদের একজাতীয় বিদ্যালয় থেকে অন্যজাতীয় বিদ্যালয়ে ট্রান্সফারটা তাঁদের কাছে সকলের চেয়ে কঠিনতম সমস্যা হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত ছাত্রদের দুই একটা বৎসরের ক্ষতি স্বীকার করেই এই ট্রান্সফারটার ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ দশ শ্রেণী যুক্ত বিদ্যালয়ের নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর সঙ্গে একাদশ শ্রেণী যুক্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর মিল নেই বল্লেই চলে। এই জন্যও বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ইংরাজী পাঠ্যসূচীর পরিবর্ত্তন দরকার। আমাদের পরিকল্পিত পরিবর্ত্তনটি ছাত্রদের পরীক্ষা পাশের রিক্তিকাকেও হ্রাস করবে, আর বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয়ান্তরে ট্রান্সফার প্রভৃতিরও সুবিধা করিয়ে দেবে।

আমরা জানি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ইংরাজীটা পড়ানো হয় "Skill subject" এবং "Content subject" দুই হিসাবেই।

কারণ স্কুলফাইনাল পরীক্ষায় ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর উপরও প্রশ্ন থাকে। কিন্তু উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরাজী পড়ানো হয় নিছক "Skill Subject" হিসাবে; তাতে প্রশ্ন থাকে শুধু প্রেশি লেখা, গল্প লেখা, প্রবন্ধ লেখা প্রভৃতির উপর। নির্দ্দিষ্ট কোনও পাঠ্যপুস্তক থেকে কোনও প্রশ্ন থাকে না। এটা ভাল ব্যবস্থা নয়। একটা ভাষা শিখবো—অথচ সেই ভাষার কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই জানবো না, এটা যেন একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার বলে মনে হয়। আমরা এটা যেন ঠিক চিন্তাও করতে পারি না যে আমাদের ছেলেরা ইংরাজী পড়বে—যখন ইংরাজী সাহিত্যের সেরা সাহিত্যিকদের রচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু জানবে না। স্কুল ফাইনাল বা উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণীর উপযুক্ত বহু ভাষা রচনাই ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে আছে। সেগুলিকে পরীক্ষার বিষয়বস্তু না করলে সেগুলি পাঠ করবার সুযোগ থেকে ছাত্ররা অনেকখানি বঞ্চিত হবে।

সেজন্যই আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষার জন্যই কিছুটা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে সেই সাহিত্য সম্বন্ধে এমন সব প্রশ্ন তৈরী করতে হবে, যাতে ছেলেরা বাজারের অর্থপুস্তকের "রেডিমেড" উত্তর উদ্গীরণ করে কাজ করবার সুযোগ না পায়। এটা খুব শক্ত কাজ নয়। "প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্ব্বক ব্যাখ্যা লিখ" "...সারাংশ লিখ" "রসগ্রাহী সমালোচনা লিখ"—জাতীয় প্রশ্ন না দিয়ে অন্য জাতীয় প্রশ্নের ব্যবস্থা করলেই বাজারের অর্থপুস্তকের মুখস্থ করবার প্রয়োজন লুপ্ত হবে। ঐ জাতীয় প্রশ্ন না দিয়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে বড় বড় উদ্ধৃতি তুলে ধরে তারই উপর একঝাঁক ছোট ছোট প্রশ্ন করে উদ্ধৃতিটা ছেলেরা ঠিক বুঝতে পেরেছে কি না সেটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। এই সব ছোট ছোট প্রশ্নগুলির উত্তর ছেলেরা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে, তাতে ক্ষতি নেই; তবে ইংরাজীতে প্রকাশ করলে তাদের কিছুটা বেশী নম্বর দেওয়া যেতে পারবে।

সাহিত্যিক রচনার অর্থবোধ (Comprehension)-টা হচ্ছে এক মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাপার। একটা উদ্ধৃতি পাঠ করে সেটা ছাত্ররা কতটা বুঝতে পেরেছে, সেটা যদি তাদের মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করে, তাহলে বোধের পরীক্ষাটা (Comprehension test) ব্যর্থ হয় না। ছাত্ররা যেটুকু বুঝেছে, সেটা ইংরাজী ভাষাতেই প্রকাশ করবার জন্য তাদের বাধ্য করলে তাদের ওপর একটা অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়, একটা বিদেশী ভাষার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে তারা আহৃত অর্থকে প্রকাশ করতে পারে না। ফলে Comprehension testটি নিছক Comprehension এর test থাকে না, সেটা Comprehension ও expression উভয়েরই test হয়ে পড়ে।

Comprehension test এর প্রশ্নগুচ্ছগুলির উত্তর লেখবার জন্য বাজারের মানে-বই কাজে লাগবে না। কারণ প্রশ্নকর্তা কোন উদ্ধৃতির জন্য কি ধরণের প্রশ্ন করবেন, তার পারম্পর্য্য কিভাবে হবে, এটা আগে থাকতে ভাবতে পারা যায় না। কাজেই এই জাতীয় প্রশ্নের প্রস্তুতির জন্য ছেলেরা বাধ্য হয়ে আসল বইটি ভাল করে পড়বে ও তার সর্ব্বাঙ্গীন অর্থবোধ করবে। বর্ত্তমানে স্কুল-ফাইনাল বা প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর ছাত্ররা সেভাবে আসল পাঠ্যপুস্তকগুলি পাঠ করেনা। তারা পাঠ্যপুস্তকগুলি পাঠ না করে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি মুখস্থ করে অর্থপুস্তক থেকে; অনেক ক্ষেত্রে অর্থ না বুঝেই মুখস্থ করে; আর ঠিক নির্ব্বাচিত প্রশ্নটি না পড়লে লিখতেও পারেনা।

কাজেই আমরা দেখছি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তার প্রশ্নগুলি এমনভাবে তৈরী করা হয় যে ছেলেরা শুধু অর্থ-পুস্তক পাঠ করেই তাদের কর্ত্তব্য শেষ করে; আর উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকপাঠের কার্যকরী ব্যবস্থা নেই। স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় সাহিত্যিক ভোজের (literary feast) ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অর্থপুস্তকগুলি মাঝে এসে সেই ভোজের বাধার সৃষ্টি করে; আর উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভোজের কোনও ব্যবস্থা নেই; আছে শুধু "কাঁটা চামচের" (knife and fork) বন্দোবস্ত।

এটা বাঞ্ছনীয় নয়; তাই আমরা প্রস্তাব করছি ইংরাজীর পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষাব্যবস্থা উভয়েরই পরিবর্ত্তন করতে হবে। এই পরিবর্ত্তনগুলি এমনিভাবে করতে হবে যাতে

১। পরীক্ষায় ব্যর্থতার হারটা কমে যায়।

২। মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক ও প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ের পাঠ্য সূচীর মধ্যে একটা মিল ও সামঞ্জস্য আসে।

৩। সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতার চেয়ে বোধশক্তির (Comprehension) উপর গুরুত্ব বেশী দেওয়া হয়।

৪। ইংরাজীকে নিছক "Skill subject" হিসাবে না শিখিয়ে "Content Subject" হিসাবেও শিখাতে হবে ("মাধ্যমিক" "উচ্চতম মাধ্যমিক" ও "প্রাক্‌বিশ্ববিদ্যালয়" সব পর্য্যায়েই)।

৫। প্রশ্নপত্রগুলি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে ছাত্ররা আসল পাঠ্যপুস্তকগুলি পড়তে বাধ্য হয়, আর "সম্ভাব্য প্রশ্নের" সন্ধানে অর্থ পুস্তকের গন্ধমাদন বহন করতে প্রলুব্ধ না হয়।

আমরা যে ভাবে পাঠ্য সূচীর ও প্রশ্ন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করতে চাই সেটা মোটামুটি এই রকম হবে, যথা—

প্রথম পত্র—পূর্ণসংখ্যা—১০০

এর জন্য নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণীতে একই পাঠ্য পুস্তক থাকবে।

একাদশ শ্রেণী ও প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ে একই পাঠ্য পুস্তক থাকবে।

প্রশ্নপত্রে নম্বরগুলি এই ভাবে ভাগ করা হবে, যথা—

(ক) একটি বা দুটি উদ্ধৃতি থেকে তার বোধের পরীক্ষার জন্য—প্রশ্ন গুচ্ছ................ ৩০

(খ) পঠিত পুস্তক থেকে দুটি অংশ বিশেষের বঙ্গানুবাদ......১০

(গ) পুস্তকের অংশ বিশেষ থেকে মুখস্থ বা শূন্যস্থান পূর্ণ করা ১০

(ঘ) পাঠ্য পুস্তক নিহিত শব্দ বা বাগ্বিধির (idiom) প্রয়োগ ও ব্যবহার……২০

(ঙ) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (objective test)…… ১০

১০০

দ্বিতীয় পত্র—পূর্ণসংখ্যা—১০০

(ক) প্রেশি (Precis) লেখা—… ২০

(খ) প্রবন্ধ বা পত্র লিখন…… ২০

(গ) গল্প বা কথোপকথন (dialogue) লেখা…… ২০

(ঘ) মাতৃভাষা থেকে অনুবাদ…… ২০

(ঙ) ব্যাকরণ ও সাধারণ রচনা (Composition)…… ২০

১০০

আমাদের মনে হয় পাঠ্য সূচী ও পরীক্ষা ব্যবস্থার এই জাতীয় পরিবর্ত্তনের মাঝে

১। পরীক্ষার অকৃতকার্য্যতার হার কমে যাবে।

২। মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক, প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার পাঠ্য-সূচীর সমতা আসবে, ফলে একজাতীয় বিদ্যালয় থেকে অন্য জাতীয় বিদ্যালয়ে ট্রান্সফার প্রভৃতির সুবিধা হবে।

৩। ইংরাজী ভাষার বোধের (Comprehension) দিকটায় গুরুত্ব আরোপিত হবে, কারণ প্রথম পত্রের ১০০ নম্বরই Comprehension test এর জন্য নির্দ্দিষ্ট হবে।

৪। ছাত্ররা ইংরাজী ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির সঙ্গে কিছু কিছু পরিচিত হবার সুযোগ পাবে। বর্ত্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক পর্য্যায়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজী পরীক্ষার ব্যাপারে সে সুযোগটা পায় না।

এই সুযোগটা পেলে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর থেকে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের স্তরে পদক্ষেপ করাটা কলা বিভাগের ছাত্রদের পক্ষে সহজতর হবে।

"Content subject" হিসাবে ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা পড়ার অন্যতর সুবিধাও আছে। বর্তমানের জীবন হচ্ছে সমস্যা সঙ্কুল, প্রতিযোগিতা কঠোর; তার মধ্যে ভোগের চেয়ে দুর্ভোগের উপাদান-টাই বেশী। সাহিত্য পাঠের আনন্দ এই দুর্ভোগকে অনেকটা কমিয়ে দিতে পারে। Montesquieu বলেছেন "এমন কোনও দুর্ঘটনা বা যন্ত্রণার কথা তাঁর জানা নেই, যেটাকে তিনি ভুলে যেতে বা প্রশমিত করতে না পারেন আট ঘণ্টা মাত্র একখানা ভাল বই পড়ে।" আমাদের ইংরাজী পরীক্ষার পাঠ্যসূচীতে এই সুযোগদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। বর্ত্তমান উচ্চতর মাধ্যমিক পর্য্যায়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজীর পাঠ্য সূচীর মধ্যে এ ব্যবস্থা নেই। এই ত্রুটির সংশোধন করা উচিত।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম, এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করার সময় আমার সমস্ত সৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধ অভিযানের উপযোগী দক্ষিণ, বাম এবং মধ্যবর্ত্তী ব্যূহ রচনা করি। এইভাবে সৈন্য সাজিয়ে 'ভিম' উদ্‌যাপন করা হয়। প্রচলিত রীতি অনুসারে ভিমের অর্থ এই যে যখন সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, অশ্বারোহী সৈন্যরা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেছে, পদাতিকেরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে—তখন সেনাধ্যক্ষকে হাতে ধনুক অথবা চাবুক নিয়ে চলতি নিয়ম অনুসারে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করে বলতে হবে—কতগুলো সৈন্য যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করছে। আমি আন্দাজে যে সংখ্যা নির্ণয় করি কার্য্যতঃ দেখা গেল আসল সৈন্যসংখ্যা তার চেয়ে কিছু কম।

এই জায়গাতেই আমি নির্দ্দেশ দিই যে 'রুমের' রীতি অনুসারে কামানবাহী শকটগুলি একটার সঙ্গে আর একটা ষাঁড়ের চামড়ার পাকানো দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে যেমন লোহার শিকল দিয়ে করা হয়। প্রতি দুইটি কামানবাহী শকটের মধ্যবর্ত্তী জায়গায় থাকবে ছয় সাতটি রক্ষণ-স্তম্ভ। গোলন্দাজ বাহিনী কামান ও রক্ষণ-স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে গোলা ছুঁড়বে। কামান, বন্দুক আদি যুদ্ধাস্ত্র সাজিয়ে ফেলার জন্য আমি পাঁচ ছয় দিন অপেক্ষা করি। সব সুশৃঙ্খল ভাবে সাজানো হয়ে গেলে আমি আমির ও অভিজ্ঞ লোকদের ডেকে এনে সাধারণভাবে সলাপরামর্শ করি। আলোচনায় স্থির হয় যে পাণিপথ একটা বড় শহর। সেই সহরের দালান কোঠা আমার সৈন্য দলের একটা অংশের রক্ষার কাজ করবে। সম্মুখভাগে রক্ষা-আবরণী এবং ঢাকা কামানের ব্যবস্থা রাখতে হবে, তার পেছনে থাকবে গোলন্দাজ সৈন্য ও পদাতিক বাহিনী। এই রকম সঙ্কল্প স্থির করে আমরা অগ্রসর হই এবং দুই বার সৈন্য চালনা করেই পাণিপথে পৌঁছে যাই। আমাদের দক্ষিণে ছিল সহর ও সহরতলী। আমাদের সম্মুখভাগে কামান এবং রক্ষা-স্তম্ভগুলি সাজিয়ে ফেলি যেগুলো আমরা প্রস্তুত করে এনেছি। বাম দিকে এবং আরও নানা জায়গায় পরিখা খনন এবং গাছের ডাল পালা সাজিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলা হয়। তীর ছুঁড়লে যতটা যায় ততটা পরিমাণ জায়গা

মাঝে মাঝে ফাঁক রাখা হয় যেখানে প্রয়োজন মত একশো, দেড়শো সৈন্য ছুটে এসে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

আমার সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু খুব ভীত চকিত হয়ে পড়লো। এ রকম ভয় ও সংকোচ কোনও সময়েই উচিত নয়। সর্ব্বশক্তিমান আল্লা যা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন তা কিছুতেই নড়চড় হয় না। অবশ্য তাঁদের খুব দোষও দেওয়া যায় না। ভয় পাওয়ার তাদের কারণ ছিল। কারণ, তারা নিজেদের দেশ থেকে দুই তিন মাসের রাস্তা পার হয়ে এখানে এসেছে। তাছাড়া তাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত জাতির সঙ্গে লড়াই করতে হবে—যাদের ভাষা আমরা বুঝি না, আর আমাদের ভাষাও যারা বোঝে না।

'বিপদে পড়েছি আমরা সবাই
মাথা মুণ্ডু তাই কারো ঠিক নাই,
ঘিরিয়া মোদের অদ্ভুত জাতি,
জানিনা তাদের কিবা মতি গতি।'

আমাদের মুখোমুখি শত্রু সৈন্য সংখ্যা আন্দাজে মনে হলো এক লাখের মত। সম্রাট ও তাঁর কর্ম্মচারীদের হস্তীর সংখ্যা হাজার খানেক হবে। সম্রাট তাঁর পিতা ও পিতামহের সঞ্চিত ধনরত্নের অধিকারী। তাছাড়া সঞ্চিত নগদ মুদ্রাও যথেষ্ট আছে—যা এখনই ব্যবহার করা চলবে। হিন্দুস্থানের একটা প্রথা এই যে, কেউ এই রকম অবস্থায় পড়লে—যেমন আমার শত্রু পক্ষ এখন পড়েছে—সঞ্চিত অর্থ দিয়ে যে ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করে তার শক্তি বাড়িয়ে থাকে। যদি সম্রাট এই পন্থা অবলম্বন করতেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আরও এক বা দুই লক্ষ অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহ করতে পারতেন। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান আল্লা যা করেন তা ভালই করেন। সম্রাটের নিজের সৈন্যবাহিনীকেই সন্তুষ্ট করার মত উদারতা ছিল না, অর্থ ব্যয় করে ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করাতো অনেক দূরের কথা। তাঁর সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করার কোনও ইচ্ছাই ছিল না। কি করে তাঁর সৈন্যদের সন্তুষ্টি বিধান করবেন? তিনি নিজে ছিলেন পয়লা নম্বরের কৃপণ, ধন সঞ্চয় করাই তাঁর একমাত্র ব্যসন। তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ যুবক। সৈন্য নিয়ে নড়নচড়ন এবং অন্য সব ব্যবস্থাই তাঁর দায়সারা গোছের এবং অবহেলার জিনিষ। কোনও রকম শৃঙ্খলা না রক্ষা করেই তিনি সৈন্য চালনা করেন, যেখানে সেখানে কোনও কিছু সিদ্ধান্ত না করেই থেমে যান। আবার কোনও রূপ দূরদর্শিতার পরিচয় না দিয়েই যুদ্ধে রত হন।

যখন আমার সৈন্যরা পাণিপথে তাদের অবস্থান ভুমি এবং তদ্-সংলগ্ন স্থান কামান বন্দুক, গাছের ডালপালা সাজিয়ে এবং গড়খাই খনন করে সুরক্ষিত করছে, সেই সময় মহম্মদ সরবান্ আমার কাছে এসে বল্লো—আপনি যেভাবে আমাদের জায়গা সুরক্ষিত করছেন তাতে সম্রাট কখনই এখানে এসে যুদ্ধ আরম্ভ করার চিন্তাই করবেন না।

উত্তরে আমি বলি—'উজবেকের সুলতান আর খাঁদের কথা স্মরণ করেই বোধ হয় তুমি এই কথা বলছো। একথা ঠিক—যে বছর আমরা সমরকন্দ ত্যাগ করে হিসারে চলে আসি, সেই সময় উজবেকদের কয়েক জন খাঁ এবং সুলতানরা একত্র হয়ে দরবেন্দ থেকে অভিযান চালিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ সুরু করে। আমি মোগলদের পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তি এবং সৈন্যদের সেই সহরে এবং সহরতলীতে জড়ো করি এবং সেখানে আসবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে অবরোধের মত অবস্থার সৃষ্টি করি। খাঁ এবং সুলতানরা কোন সময়ে আক্রমণ করার সুবিধা এবং কোন সময় পিছিয়ে যেতে হবে তা ধারণা করতে পেরেছিল। যখন তারা দেখলো যে আমরা শেষ রক্ত বিন্দু পাত করে হিসার রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প এবং আমরা আক্রমণ প্রতিরোধ করার সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক করে ফেলেছি, তখন তাদের জয়লাভের কোনও আশা দেখতে না পেয়ে বুন্দাকের দিকে পালিয়ে গেল। কিন্তু যারা তখন আমাদের সঙ্গে লড়তে এসেছিল তাদের সঙ্গে বর্ত্তমান শত্রুদের বিচার করতে যেওনা। এদের এমন কিছু বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা নাই যাতে তারা বুঝতে পারে যে কখন তাদের অগ্রসর হওয়া উচিত—আর কখনই বা পিছিয়ে যাওয়া সঙ্গত।'

আল্লার ইচ্ছায় সবই আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে উঠছিল। আমার ভবিষ্যদ্বাণীই ঠিক ঠিক ফলে গেল। সাত আটদিন আমাদের পাণিপথে থাকার সময় আমার সৈন্যদলের কয়েকজন শত্রুপক্ষের অগণিত শিবিরের কাছাকাছি গিয়ে শর নিক্ষেপ করে এলো। কিন্তু শত্রুপক্ষ কোনও রকমেই শিবির থেকে নড়লো না এবং শিবিরের বাইরে এসে আক্রমণ করার কোনও উদ্যম দেখালো না।

আমাদের পক্ষের কয়েকজন হিন্দুস্থানি আমিরের উপরোধে চার পাঁচ হাজার সৈন্য নৈশ আক্রমণের জন্য পাই। আমার এই সৈন্য-দলটি প্রথমটা শৃঙ্খলার সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে নাই। এলোমেলো ভাবে অভিযান চালনা করে তারা মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। সকাল হয়ে গেলেও তারা শত্রু শিবিরের কাছে কাছেই রয়ে গেল যদিও দিনের আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই সময় শত্রুপক্ষ রণদামামা বাজিয়ে, হস্তী বাহিনীকে প্রস্তুত করে তাদের দিকে ধাওয়া করলো। আমার সৈন্যরা তখন কোনও উল্লেখযোগ্য ফলই দেখাতে পারেনি। তবে, শত্রুপক্ষের অগণিত সৈন্য তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করলেও তারা নিরাপদে পিছিয়ে এলো। একটি লোকেরও প্রাণহানি হয়নি। শুধু মহম্মদ আলি একটি শরাঘাতে আহত হয়েছিল, কিন্তু জখম মারাত্মক নয়। তবু এই আঘাতের জন্য যুদ্ধের দিন, তার নিজের জায়গায় উপস্থিত থেকে যুদ্ধ করতে পারেনি। কি ব্যাপার ঘটেছে জানতে পেরে আমি হুমায়ুনকে তার অধীনস্থ সৈন্য নিয়ে দুইমাইল এগিয়ে যেতে বলি—যাতে আমার পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদের সে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে পারে। আমিও আমার অবশিষ্ট সৈন্য সজ্জিত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। যে সব সৈন্য শত্রুপক্ষকে বিব্রত করার জন্য নৈশ অভিযানে গিয়েছিল তারা পিছিয়ে আসার পথে হুমায়ুনের দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে তারই সঙ্গে নিরাপদে ফিরে আসে। আমাদের

আক্রমণ করার জন্য শত্রুপক্ষের কোনও আয়োজন না দেখে আমি আমার সৈন্যদের সরিয়ে এনে শিবিরে পাঠিয়ে দিই।

রাত্রে একটা মিথ্যা বিপদসূচক সঙ্কেতধ্বনি শোনা গেল। প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে সাজ সাজ রব এবং হৈ হুল্লোড় চল্‌লো। এই রকম বিপদসূচক সঙ্কেত ধ্বনি আমার যে সব নতুন সৈন্যরা শোনেনি বা এইরকম ব্যাপার দেখেনি তারা আতঙ্কিত হয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলো। যা হোক, অল্প সময়ের মধ্যেই এই আতঙ্ক দূরীভূত হলো।

ভোরের নমাজের সময় যখন ঊষার আলো এমন যে কোনও জিনিষকে দেখে চেনা যাচ্ছে অর্থাৎ একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে এমন সময় অগ্রগামী পর্য্যবেক্ষক দলের কাছ থেকে সংবাদ এলো যে শত্রুপক্ষ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে এগিয়ে আসছে। আমরা তৎক্ষণাৎ শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম পরিধান করে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলাম। সেনা বাহিনীর দক্ষিণভাগে হুমায়ুন এবং বামভাগে মহম্মদ সুলতান মির্জ্জা সৈন্য পরিচালনা করছিল। মধ্যবর্ত্তী সেনাবাহিনীর দক্ষিণাংশের পরিচালনার ভার ছিল চিন্ তাইমুর সুলতানের ও বামাংশের ভার ছিল খলিফার উপর। অশ্বশালার অধিনায়ক আব্দুল আজিজের উপর রিজার্ভ সৈন্যদলের ভার ছিল। দক্ষিণ বাহুর সেনাদলের পার্শ্বরক্ষী হিসাবে ওয়ালি কাজিলকে তার মোগল দলবলসহ নিযুক্ত করি। এই পার্শ্বরক্ষীদের এই নির্দ্দেশ দেই যে শত্রুসৈন্য কাছাকাছি এসে পড়লে দুইপাশের পার্শ্বরক্ষী সেনাদল ঘুরে গিয়ে যেন শত্রুসৈন্যের পশ্চাৎভাগে উপস্থিত হয়।

শত্রুসৈন্য দৃষ্টিগোচর হলে তাদের হাবভাব দেখে মনে হলো যে তাদের সমস্ত শক্তি বেশীরভাগ আমার দক্ষিণ বাহুর সৈন্যদলের ওপরই প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। আমি সেজন্য রিজার্ভ সৈন্যের অধিনায়ক আব্দুল আজিজকে তার সৈন্যদলসহ দক্ষিণবাহুর সৈন্যগণের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের দল পুষ্ট করতে নির্দ্দেশ দিই। সুলতান ইব্রাহিমের সৈন্যদের এগিয়ে আসতে দেখে ধারণা হলো যে তারা থামবে না, দ্রুত অগ্রসর হয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা নিকটবর্ত্তী হয়ে আমার সৈন্যদের দৃঢ় অবস্থান দেখে বুঝতে পারে কি সুশৃঙ্খলভাবে আমরা সৈন্যসজ্জা করেছি এবং কিভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিক করেছি। এই সব দেখে তারা কিছুক্ষণের জন্য থেমে যায় এবং যেন ভাবতে থাকে যে এখন থামবে না এগিয়ে আসবে। তাদের অবশ্য থামার উপায় ছিল না কিন্তু তারা আগের মত দ্রুত এগোতেও পারছিল না।

দক্ষিণ ও বাম প্রান্তের পার্শ্ববর্ত্তী সৈন্যদের নির্দ্দেশ পাঠাই যে তারা যেন শত্রুসৈন্যদের চক্রাকারে ডিঙিয়ে অতি দ্রুত তাদের পশ্চাৎভাগে উপস্থিত হয়ে আক্রমণ সুরু করে দেয়। দক্ষিণ ও বামবাহুর সৈন্যদেরও আদেশ দেওয়া হয় যেন তারা তখনই শত্রুসৈন্যের ওপর আক্রমণ সুরু করে। পার্শ্বরক্ষী সৈন্যরা উপদেশ মত শত্রুসৈন্যের পিছনে হাজির হয়ে তাদের ওপর শর নিক্ষেপ করতে থাকে।

দেখি পাশা বাম পার্শ্বের সৈন্যদের পুরোভাগে এগিয়ে যায়। শত্রুপক্ষের একদল লোক একটা হাতী নিয়ে তার দিকে ধাওয়া করে। আমার সৈন্যরা তাদের দিকে তীক্ষ্ণশর ছুঁড়তে থাকে। শত্রুসৈন্যের এই দলটি তখন পিছিয়ে যায়।

আমি আমার প্রধান সৈন্যবাহিনীর নায়েক আহমেদি পারওয়ানচিকে বামবাহুর সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য সেইদিকে পাঠিয়ে দিই। দক্ষিণ দিকের যুদ্ধও তেমনি দুর্দ্দম হয়ে উঠেছিল। আমি মহম্মদ গোকুলতাসকে কেন্দ্রের সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে এগিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বলি। ওস্তাদ আলিও সম্মুখ সারি থেকে অনেকবার কামান দাগে ও তার ফলও ভাল হয়। সেইভাবে গোলন্দাজ মুস্তফা কেন্দ্রের বামদিক থেকে কামানের গোলা ছুঁড়ে বেশ ভাল কাজ দেখায়। দক্ষিণ ও বাম বাহিনী, কেন্দ্র ও পার্শ্বরক্ষী সৈন্যরা এইভাবে শত্রুসৈন্যদের চারদিকে বেরাও করে ফেলে গভীর সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং শত্রুর উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করতে থাকে।

শত্রুপক্ষ আমাদের দক্ষিণ ও বামদিকের সৈন্যদের উপর দুই একবার ব্যর্থ আক্রমণ চালায়। আমার সৈন্যরা ধনুক হাতে নিয়ে শর নিক্ষেপ করে তাদের কাবু করে ফেলে। শত্রুপক্ষের কেন্দ্রের বাম ও দক্ষিণ দিকের সৈন্যরা বিপর্য্যস্ত হয়ে একজায়গায় ভিড় করে জমায়েত হবার চেষ্টা করলে এমন একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যে তারা আর এগোতেও পারে না বা এমন কোনও পথও খুঁজে পায় না যা দিয়ে তারা পালাতে পারে।

পূর্ব্বাকাশে যখন সবেমাত্র সূর্যের উদয় হয়েছে তখন যুদ্ধ সুরু হয়। যুদ্ধ চলে দুপুর পর্য্যন্ত—যখন শত্রুসৈন্য সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত আর আমার সহচররা যুদ্ধে জয়ী হয়ে আনন্দে বিহ্বল। সর্ব্বশক্তিমান আল্লার অসীম করুণা এবং অনুগ্রহে এই দুরূহ কাজ কত সহজ হয়ে গেল, শত্রুপক্ষের এই বিপুল বাহিনী একটা দিনের অর্দ্ধেক সময়ের মধ্যে ধুলায় মিশে গেল।

সুলতান ইব্রাহিমের কাছাকাছি যে সৈন্যরা ছিল তাদের মধ্যে পাঁচ ছয় হাজার সৈন্য মৃত অবস্থায় দেখা গেল। যুদ্ধক্ষেত্রের চার পাশে আরও পনেরো ষোল হাজার মৃত সৈন্যের শব পাওয়া গেল। আগ্রায় পৌঁছাবার পর হিন্দুস্থানবাসীদের বিবরণ শুনে জানা যায় যে যুদ্ধক্ষেত্রে পঞ্চাশ ষাট হাজার সৈন্য নিহত হয়েছে। যাহোক, শত্রুসৈন্য পরাস্ত হওয়ার পর পলায়নপর সৈন্যদের অনুসরণ, হত্যা এবং বন্দী করতে থাকি। আমার যে সব সৈন্যরা এগিয়ে গিয়েছিল তারা আমির ও আফগানদের বন্দী করে নিয়ে আসতে সুরু করে। মাহুতসহ অনেক হাতীও তারা ধরে নিয়ে আসে এবং সেগুলো পেশকোষ কর হিসাবে আমাকে অর্পণ করে।

পলায়নপর শত্রুদের পেছন পেছন কিছুদূর ধাওয়া করবার পর এবং সুলতান ইব্রাহিম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছে ধারণা করে আমার কয়েকজন অতি বিশ্বস্ত অনুচরকে তাঁর সন্ধানের জন্য প্রয়োজন হলে আগ্রা পর্য্যন্ত যাওয়ার জন্য আদেশ দিই। ইব্রাহিমের সৈন্য-শিবির গুলির মধ্য দিয়ে এগিয়ে তাঁর নিজের তাঁবু, আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম পর্য্যবেক্ষণ করে আমরা সেতাব নদীর তীরে শিবির স্থাপন করি।

ঠিক বিকেলের নমাজের সময় খলিফার ছোট ভাই তাহির তাবেরি সুলতান ইব্রাহিমের মৃতদেহ অন্যান্য হতাহতের মধ্যে দেখতে পেয়ে তার মাথা কেটে সেই মাথা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে।

সেইদিনই আমি হুমায়ুন মির্জ্জাকে জিনিষ পত্রের ভারি বোঝা সঙ্গে নিয়ে তখনই যাত্রা করে' যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে আগ্রায় পৌঁছিয়ে সেখানকার কোষাগারগুলি দখল করতে নির্দেশ দিই। সেই সময় মেহেদি খাজাকেও আদেশ দিই যে তার সমস্ত জিনিষপত্র এখানে ফেলে রেখে দ্রুতগতিতে দিল্লী পৌঁছিয়ে দিল্লীদুর্গের কোষাগার যেন সে অবিলম্বে আটক করে।

পরদিন সকালে মার্চ সুরু করে মাইল দুয়েক এগিয়ে যমুনার তীরে থেমে যাই, কারণ ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। পরে তিনবার সৈন্যচালনা করে দিল্লীর কাছাকাছি এসে যমুনা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করি।

দিল্লীর সামরিক সমাহর্ত্তার পদ ওয়ালি কিজিলকে প্রদান করি, আর দোস্তকে দিই দিল্লীর দেওয়ানের পদাধিকার। দিল্লীর সমস্ত কোষাগার অবিলম্বে সিলমোহর করতে আদেশ দিই এবং কোষাগার গুলির ভার ঐ দুইজনের ওপর অর্পণ করি।

মৌলানা মামুদ, মেগ জিন এবং আরও কয়েকজন শুক্রবারের নমাজ পড়তে দিল্লীতে যায়। আমার নামে নমাজ পড়ে' তারা ফকির ও ভিক্ষুকদের কিছু অর্থ বিতরণ করে ফিরে আসে।

কয়েকদিন পর আগ্রার প্রান্তভাগে অবস্থিত সুলেমানের প্রাসাদে আসি। এই জায়গা আগ্রার দুর্গ থেকে অনেকটা দূর হওয়ায় আমি পরের দিন সকালে সেখান থেকে চলে এসে জিলাল খাঁ প্রাসাদে থাকবার ব্যবস্থা করি। আগ্রা দুর্গের লোকজনরা নানা অজুহাত দেখিয়ে হুমায়ুনকে ঠেকিয়ে রেখেছিল যদিও সে আমার আসার অনেক আগেই এখানে পৌঁছেছিল। হুমায়ুন যখন দেখে যে এই সব লোকের ওপর আধিপত্য করার কোনও লোক নাই এবং তারা যাতে ধনরত্ন লুঠ করে পালাতে না পারে—তখন তাদের কিছু না বলে সে এমন সব জায়গায় সৈন্য মোতায়েন করে যাতে দুর্গ থেকে কেউ পালাতে না পারে।

গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিৎ একজন হিন্দু। হিন্দু রাজারা এই রাজ্য একশ বছরের ওপর শাসন করে এসেছে। যে যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম পরাজিত হয় সেই যুদ্ধেই বিক্রমজিৎকে নরকে পাঠানো হয়। বিক্রমজিতের পরিবারবর্গ এবং তার গোষ্ঠীর সর্দ্দাররা তখন আগ্রাতেই ছিল। হুমায়ুন আগ্রায় পৌঁছানোর পরই বিক্রমজিতের লোকজন পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু হুমায়ুন যে সব লোককে সতর্ক নজর রাখার জন্য নিযুক্ত করেছিল তারা তাদের আটক করে। কিন্তু হুমায়ুন তাদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করার আদেশ দেয়নি। তারা স্বেচ্ছায় হুমায়ুনকে সৌহার্দ্দ্যের প্রস্তাব জানিয়ে অনেকগুলি রত্ন ও দামি পাথর উপহার দেয়। এই সব রত্নের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ হীরক ছিল—যার নাম কোহিনুর। সুলতান আলাউদ্দিন এই বহুমূল্য হীরক সংগ্রহ করেছিলেন। এটা এমন মূল্যবান যে একজন হীরার জহুরি এর দাম ঠিক করেছিলেন—পৃথিবীতে দৈনিক যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তার অর্দ্ধেক পরিমাণ অর্থ। এর ওজন প্রায় তিনশ কুড়ি রতি। আমি আগ্রায় পৌঁছালে হুমায়ুন আমাকে সেই হীরক উপঢৌকন দেয় এবং আমিও আবার সেটাকে তাকেই উপহার স্বরূপ প্রত্যর্পণ করি।

দুর্গে যে সমস্ত উচ্চ পদাধিকারী কর্ম্মচারী ছিল তাদের মধ্যে মালেক দাদ কেরানি একজন। সে জালিয়াতির জন্য অভিযুক্ত হয় এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। মালিক দাদ কেরানিকে দোষী সাব্যস্ত করলে তার সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার জন্য অনেক মধ্যস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে অনুরোধ আসতে থাকে। আগু পিছু বিবেচনা করতেই পাঁচ ছয় দিন কেটে যায়। তারপর মধ্যস্থদের অভিপ্রায়ানুসারে আমি তাকে মার্জ্জনা করি। শুধু মার্জ্জনাই নয়—তাকে আমি অনেক অনুগ্রহ প্রদর্শন করি। তার অনুগত ব্যক্তিদেরও তাদের সমস্ত সম্পত্তি দখলে রাখবার অনুমতি দিই। সাত লক্ষ পরিমাণ কর আদায়ী একটি জেলা ইব্রাহিমের মাতার ভরণ-পোষণের জন্য অর্পণ করি। তাঁর আমিরদেরও কয়েকটি জেলার ভার দেওয়া হয়। আগ্রা থেকে মাইল খানেক দূরে তাঁর থাকবার স্থান ঠিক করে দিই। সেখানে তিনি তাঁর সমস্ত আসবাব পত্র নিয়ে চলে যান।

রাজেব মাসের আঠাশে তারিখ বৃহস্পতিবার বৈকালিক নমাজের সময় আমি আগ্রাতে প্রবেশ করি। সুলতান ইব্রাহিমের প্রাসাদেই আমার থাকার ব্যবস্থা হয়। ১৫০৪ সনে যখন আমি কাবুল জয় করি, সেই সময় থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আমি সর্ব্বদাই এই আশা পোষণ করে এসেছি যে হিন্দুস্থান আমি জয় করবোই করবো। কিন্তু কখনও কখনও আমার আমিরদের অসদাচরণ—কারণ আমার ভারত জয়ের অভিলাষ তাদের মনঃপূত ছিলনা—এবং কখনও কখনও আমার ভাইদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও বিরুদ্ধতা আমাকে এই দেশ জয় করার জন্য অভিযান চালানো থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। ফলে হিন্দুস্থানের প্রদেশ গুলি এতদিন আমার আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। অবশেষে এই সব বাধা দূর হলো। এখন ছোট বড়, ধনী নির্ধন, সাধারণ অসাধারণ এমন কেহ নাই যে আমার এই উদ্যমের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করবার সাহস রাখে।

১৫১৯ সালে এক সৈন্যদল গঠন করে ঝড়ের গতিতে বাজুর দখল করি এবং সেখানকার দুর্গ রক্ষীদের তরবারির আঘাতে শিরশ্ছেদ করি। তারপর আমি 'বেহের' দিকে অগ্রসর হই। এখানে আমি লুঠ-তরাজ ও হত্যা নিবারণ করি। এখানে অধিবাসীদের ওপর জিনিষ পত্রে ও নগদ অর্থে চার হাজার টাকার পরিমাণ কর ধার্য্য করি। সেই অর্থ ও জিনিষ পত্র আমার সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে' কাবুলে ফিরে আসি। সেই সময় থেকে ১৫২৬ সাল পর্য্যন্ত সাত আট বৎসর হিন্দুস্থান জয়ের ব্যাপারে আমার সমগ্র ইচ্ছা ও কল্পনা কার্য্যতঃ নিয়োগ করার ব্যাপারে বহুল পরিমাণে অগ্রসর হয়েছি এবং পাঁচ বার আমার সৈন্যদের অধিনায়ক রূপে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছি। পঞ্চম বারে মহান্ আল্লা তাঁর অপার করুণা আমার উপর বর্ষণ করেছেন। তাঁরই ইচ্ছায় ও অনুগ্রহে সুলতান

ইব্রাহিমের মত পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাস্ত করে শক্তিশালী হিন্দুস্থান জয় করে তার অধীশ্বর হবার যোগ্যতা লাভ করেছি।

হিন্দুস্থানের সম্রাট সুলতান ইব্রাহিমের পক্ষে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অর্থ সঙ্গতি দিয়ে ইচ্ছা করলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিযুক্ত করা অসম্ভব ছিলনা। সেই সময় পূর্ব প্রান্তের কয়েকটি আমিরও বিদ্রোহ করেছিল। তাঁর পদাতিক সৈন্য সংখ্যা ছিল আনুমানিক একলক্ষ। তাঁর নিজের ও আমিরদের হাতীর সংখ্যাও ছিল হাজার খানেক। এই রকম অবস্থাতেও। এবং শত্রুপক্ষ এতদুর ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও আমি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেও আমার চির জন্মের শত্রু উজবেকদের —যারা আমার বিরুদ্ধে লক্ষাধিক সৈন্য সমাবেশ করেছিল—পশ্চাতে ফেলে রেখে এগিয়ে এসেছিলাম প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান ইব্রাহিমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে—যিনি ছিলেন অসংখ্য সেনার অধিনায়ক ও একবিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। দৈব অনুগ্রহের ওপর আমার অকুণ্ঠ নির্ভরতার জন্য সর্বশক্তিমান মহান আল্লা আমাকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখেন নি। তাঁরই কৃপায় আমি পরাক্রমশালী শত্রুকে পরাজিত করে এই বিশাল হিন্দুস্থান জয় করার গৌরব লাভ করেছি। এই কৃতকার্য্যতা আমার নিজ শক্তিতে হয়েছে কিংবা আমার এই সৌভাগ্য আমার নিজের চেষ্টায় লাভ করেছি একথা আমি কখনই মনে করি না। এই গৌরব ও সৌভাগ্য লাভ করেছি ভগবানের অপার করুণা ও অনুগ্রহের উৎস থেকে।

ক্রমশঃ

শতাব্দীকে

মদনমোহন কাঁড়ার

তোমাকে যখনি স্মরি'
প্রত্যহের শয়নে স্বপনে,
উৎসবের নৃত্য-গীতে দুর্যোগের নিশি জাগরণে,
তোমার অরূপ মূর্ত্তিখানি
প্রাণে আনে প্রশান্তির বাণী ;
স্মৃতির তরণী চলে উত্তরিতে ধ্যানমগ্ন কোন্ স্বপ্নপুর।
সৌম্য এক ঋষি মূর্ত্তি ভ'রে তুলে পরিপূর্ণ মনের মুকুর ॥

বরণীয় হে শতাব্দী,
আজি শুভ উৎসবের ক্ষণে
ভাবি মনে মনে,
তুমি যা দিয়েছ দেব, তার লাগি কিবা আছে,
কিবা দিব দাম ;
লহ শুধু অতৃপ্ত প্রণাম।
একদিন হে বাণীর প্রিয়,
বিমুগ্ধ নয়নে তব এ ধরণী ছিল রমণীয়।
আজিও তো ঘন বরিষণে
শ্রাবণের ফুল্লনীপবনে—
তোমার গভীর প্রীতি অজস্র ধারায় ঝ'রে পড়ে।
আজো থরে থরে—
হেমন্তের স্বর্ণশীর্ষ শস্যের মঞ্জরী
গানের অমৃতে ভরি'
মহৎ-প্রাণের বার্তা এনে দেয় মানবের মনে।
নবীন বসন্ত দিনে
মহুয়ার কুঞ্জ-বীথিতলে—
তোমার প্রেমের বাণী 'মৌ' হয়ে ঝরে পলে পলে।
নহ শুধু শতাব্দীর কবি,
শত যুগ-যুগান্তের রেখে গেছ বাণীময় ছবি।
অনাদি কালের স্রোতে অনন্তের পানে
জীবনের পতনে-উত্থানে
চলেছে মানব যাত্রী ; তুমি দিলে সঞ্জীবনী সুর।
জীবনের হাসি-অশ্রু তোমার ছন্দের মাঝে হয়েছে মধুর ॥

তবু হায়,
আজো বারে বারে
হৃদয় গুমরি' উঠে বঞ্চিতের ব্যর্থ হাহাকারে।
মানুষের নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা
তোমার অন্তরে কবি, দিয়েছিল যে-তীব্র বেদনা,
সে-দুঃখের আজো শেষ নাই ;
অশ্রু-কণ্ঠে তাই তো শুধাই—
শাসনের সভাতলে শহীদের তাজা রক্ত করে যারা জমা
ন্যায়ের বিধানে তারা কতদিন পাবে আর ক্ষমা ?
মুমূর্ষু পৃথিবী কাঁদে, চারিদিকে নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস ;
'শান্তির ললিত বাণী' আজিও কি শোনাইবে
'ব্যর্থ পরিহাস' !!

বহুবাজার শিশুহত্যা মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আসামীর সঙ্গে আমাদের ঐ ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে স্থানীয় লোকের একটা বড় ভিড় সেখানে জমে গেল। যারা ভিড়ের মধ্যভাগে ঢুকতে পারে নি তারা ভিড়ের ওপার হতে মুখ তুলে ভিতরের ব্যাপার বুঝতে চেষ্টা করছিল। এখানেও দেখলাম আমাদের ভাগ্য বেশ সুপ্রসন্ন। বহু মামলার কিনারা করা সম্ভব হয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষী সাবুতের ক্রমাবির্ভাবের ফলে। আমাদের এক সুদক্ষ স্পষ্টবাদী পুলিশী শিক্ষককে একদা বলতে শুনেছিলাম, 'আরে! ঐ আসামীকে খুঁজে বার করবার কৃতিত্ব আমার কোথায়? বরং আসামী নিজেই নিজেকে ধরিয়ে দিলে।' এই বিশেষ সত্যটি যেন স্পষ্টতর হয়ে উঠল। হঠাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঐ স্টেশনে একজন দুধ-বিক্রেতা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আসামীকে আমাদের হেপাজতিতে দেখে অবাক হয়ে বলে উঠলো, 'এ কেয়া বাত্। ওহি বাবু পাকড় গয়া?' আমার চোখ, কান উর্ধ্বে, নিম্নে এবং চতুর্দিকে খোলাই ছিল। তার এই স্বগতোক্তি কানে যাওয়া মাত্র কাছে ডেকে আমি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম। এই সম্পর্কে তার বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু! এ বাত তো ঠিকই আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হাম ইস্ তসবীর্সে উহি লেড়কাকো ঠিক চিনতে পারছে! এহি আসামী এহি লেড়কাকো গদ্দিমে লেকে হামার দোকানে আসছিল। লেড়কাকো ভুখ্ লাগা থা হোগে। উতো বহুত ভি কানতে লাগছে। হাম আপনা হাতসে উসকো দুধ পিলায়াছে। লেকেন ইসমে বাত কেয়া থে বাবু। উস্ লেড়কা উনকো আপনা লেড়কা নেহি থি? ইস্ লেড়কা কি উনে চুরি করিয়ে আনিয়েছিল? আরে কেয়া বলে বাপরে বাপরে বাপ। এ আদমী এতনা বদমায়েস হ্যায়! আভিতক্ ই আদমী লেড়কাকো নিকালাভি নেহি? উনকো ঠিকসে পিটায়ে হুজুর। তব্ উ সব বাত বলিয়ে দেবে। আউর লেড়কাকো নিকালভি দেবে।"

এদেশের সাধারণ জনসাধারণের কাছে পুলিশ ঘুষ খায় না এবং ছাগল ঘাস খায় না—এ যেন সমভাবেই অবিশ্বাস্য। এ ছাড়া পুলিশ যে কাউকে মারে না তাও তারা বিশ্বাস করতে চায় না। জানি না এই সব মিথ্যা ধারণা কতদিন ধরে তাদের মনের মধ্যে আমরা পুঞ্জীভূত হতে দিয়েছি। অপর দিকে পুলিশের হেপাজতিতে কোনও নির্দোষ ব্যক্তিকে দেখলেও তারা ধরে নেয় যে তারা অপরাধী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এইরূপ পরস্পর-বিরোধী ধারণা জনগণের মধ্যে আসে কেন? এ কি শুধু দেশের পুলিশের প্রতি জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস, না অপরাধী মাত্রের প্রতি তাদের সভ্যজাতি-সুলভ নিদারুণ ঘৃণা, না দেশের পুলিশকে নিজেদের আপনার করে নেবার একটা অপচেষ্টা? এসব কথা কিন্তু আজও পর্যন্ত এদেশের কোনও সমাজ বা মনোবিজ্ঞানী পণ্ডিতদের কেউই ভেবে দেখে নি।

এখানকার তদন্ত থেকে আমরা আবার ট্যাক্সি করে ঐ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়েই ছুটে চললাম। এই বারাকপুর রোডের আর্থিক গুরুত্বের ন্যায় ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। প্রভুচৈতন্যের নিত্যসহচর নিত্যানন্দের লীলাভূমি খড়দার শ্যামসুন্দর মন্দির, বারাকপুরের সিপাহী-বিদ্রোহের প্রথম বলির বধ্য স্থান, এবং তৎসহ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাসস্থান, বিদ্যাসুন্দর প্রণেতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বসত ভিটা [ইনি বর্ধমান হতে বিতাড়িত হয়ে এখানে আশ্রয় নেন], শ্যামনগরের বিখ্যাত কালীবাড়ি, রঘু ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত মাদরালের জয়চণ্ডী মন্দির, ঋষি বঙ্কিম ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পৈতৃক ভবন, ভট্টপল্লীর পণ্ডিত-ভূমি প্রভৃতি এই রাজপথেরই দুই পার্শ্বে অবস্থিত। আরও এগিয়ে গেলে হালিশহরে পড়বে সাধক কবি রামপ্রসাদের

ভিটা—যে রামপ্রসাদ হালিশহরে বসে গান রচনা করলে তার একমাস পরে সেই গান চট্টগ্রামের কৃষক মুখে ধ্বনিত হতো। অথচ সেই যুগে রেল ষ্টীমার প্রভৃতি দ্রুতগামী কোনও যান বাহন বাংলা দেশে ছিল না। এই পথ দিয়ে আরও একটু এগিয়ে গেলেই পাওয়া যায় স্বভাব-কবি ঈশ্বর গুপ্তের বসত বাড়ি। এতোগুলি দ্রষ্টব্য স্থান বিশ-ত্রিশ মাইল ভূখণ্ডের মধ্যে, আশে-পাশে আছে। অথচ সেগুলি দেখে যাবার আমাদের সময় ছিল না। দেখতে দেখতে ট্যাক্সিখানি শ্যামনগরের স্টেশনে এসে থামা মাত্র আমরা তা থেকে আসামীসহ নেমে পড়ে রেল স্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এই স্টেশনে মাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক রেলওয়ে কুলি মোতায়েন আছে। এদের মধ্যে আমাদের মামলার সাক্ষী কুলিটিকে খুঁজে বার করতে আমাদের একটু মাত্রও দেরী হয় নি। সচরাচর এদের দিয়ে কেউ গন্তব্য স্থানের জন্য টিকিট ক্রয় করিয়ে নেয় না। অথচ মাত্র কয়দিন আগে এই আসামী একে একটি বারাকপুর স্টেশনের টিকিট ক্রয় করে দিতে অনুরোধ করেছিল। এই জন্য তাকে মনে রাখা ঐ কুলির পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। এই রেলওয়ে কুলিটি আসামীকে দেখে চিনে ফেলে সেলাম করে বলে উঠলো, 'আরে আপ্ বাবুসাব! আপ ফিন আগয়া। আপকো লেড়কা আচ্ছা হ্যায় তো?' কুলির এই অভিবাদনে আসামী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে বললো, 'ইনেসপেকটার সাব আয়া হ্যায়, উনকো সব বাত সাচ সাচ বাতায় দেও।'

বলা বাহুল্য এই কুলিটিও ঐ নিহতমন্য শিশুটির ফটোচিত্র হতে তাকে সেই শিশুটি বলে সনাক্ত করতে পেরেছিল। এর পর আমরা ঐ ট্যাক্সি যোগেই কাঁচড়াপাড়া স্টেশনের নিকট একটি বাঙ্গালী মনোহারী দোকানে এসে উপস্থিত হই। এই অঞ্চলে ঐরূপ বহু দোকান থাকায় আমরা নিজেরা ঐ দোকানটি খুঁজে বার করতে পারি নি। আমাদের এই ব্যর্থতা দেখে বোধ হয় দয়াপরবশ হয়ে আসামী নিজেই ঐ দোকানটি আমাদের দেখিয়ে দিলে। সৌভাগ্যক্রমে এখানকার এই বাঙ্গালী দোকানীও আসামীকে ও ফটোচিত্র হতে ঐ নিহতমন্য শিশুটিকে সন্দেহাতীতভাবে সনাক্ত করতে পেরেছিল। দোকানী যে তাকে ঐ দিন একটা পেনসিলকাটা ছুরি বিক্রয় করেছিল, তা সে স্বীকার করেছিল। এমন কি সে তার সেইদিনকার হিসাবের খাতা থেকে এবং দোকানের রসিদ বই থেকে ঐ দিন যে জনৈক ব্যক্তিকে একটি ঐরূপ ছুরি বিক্রয় করা হয়েছে তাও প্রমাণ করতে পেরেছিল।

বস্তুত পক্ষে এই সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ আমরা আসামীর স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি অনুযায়ীই খুঁজে বার করতে পেরেছি। তা না হলে তাদের অবস্থান আমাদের পক্ষে জানবার কথাই নয়। এই জন্য এই সব সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতে বিশ্বাসযোগ্য রূপে বিবেচিত হয়। এদের এই সাক্ষ্যসমূহ এই অপরাধীর অপরাধ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আমরা খুশি মনে এদের বিবৃতিসমূহ লিপিবদ্ধ করে নথিভুক্ত বিবৃতিগুলিসহ কলকাতায় ফিরে আসছিলাম। এমন সময় আসামী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে দিল। এই সময় হঠাৎ আসামী বলে উঠলো, 'আরে মশাই! এতই যখন করতে পারলেন, তখন আর একটা বিষয় বাকি রেখে যান কেন?' 'হাঁ! বেশ তো!' আমি তার এই কথায় সন্তুষ্ট ও আশান্বিত হয়ে বলে উঠলাম, 'খোকাটাকে কোথায় রেখেছো তা বলে ফেল এবার।' 'আজ্ঞে না' আমার কথায় একটু ম্লান হাসি হেসে আসামী জবাব দিলো, 'খোকাকে এখুনি আমি আপনাদের এনে দিতে পারছি না। আপনাদের বরং আমি যে স্থান থেকে ঐ ছাগলটা চুরি করেছিলাম সেই স্থানটি দেখিয়ে দেবো। ঐ ছাগলের মালিক বলবে যে সত্য সত্যই ওখান হতে ঐ দিন একটা ছাগল চুরি করে কে বা কাহারা তাকে আহৃত করেছিল। এরপর যদি আপনারা স্থানীয় কোনও একটা থানায় ঐ সম্পর্কে একটা এজাহার বার করতে পারেন, তাহলে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের ব্যাপারে আপনাদের মনস্কামনা সম্পূর্ণ হবে।'

আসামীকে আমরা ডাক্তারী বিজ্ঞানেই শুধু অভিজ্ঞ বলে জেনেছিলাম। এখন দেখলাম পুলিশী তদন্তের ব্যাপারেও সে অভিজ্ঞ। আমরা বুঝতে পারলাম যে অতীতে সে বহু ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসও পাঠ করেছে। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ এক সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলে সরকারী রক্তপরীক্ষক ডাক্তারের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে উহা আদালতে আসামীর বিরুদ্ধে একটা অকাট্য পরিবেশিক

প্রমাণ রূপেই বিবেচিত হবে। এরপর আমি সানন্দে আসামীকে সেইছাগল চুরির স্থানটি দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করলাম। আসামীও এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে কাঁচড়াপাড়া থেকে মাঠের পথে আমাদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিলে।

কখনও রেল লাইন ধরে, কখনও বা উহা হতে বহু দূরে আমরা হেঁটেই চলেছি। আমাদের সারা দেহ ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের হাঁটার যেন শেষ নেই। অপরাধী এক এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় এমন ভাব দেখিয়ে—যেন জায়গাটা সে চিনি চিনি করেও চিনতে পারছে না। এর পরক্ষণেই সে বলে উঠে, 'না না, এ জায়গাটাতো নয়! আরও একটু বোধ হয় এগিয়ে যেতে হবে।' এমনি ভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমারই স্বগ্রামের নিকট সে আমাদের এনে ফেললে। দূরে মাঠের শেষ প্রান্তের বনানীর ওপারে আমাদের পৈতৃক বাটীর বার মহলের চিলের ছাদটির একটা চূড়া সেখান হতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সেখানটা একটু ঘুরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিকটেই একটা মেটে বাড়ি থেকে আমাদেরই একজন প্রজা এসে আমাকে চিনতে পেরে প্রণাম জানালো। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে জানালো যে—এ অঞ্চলে কারুর ছাগল চুরি গেলে গ্রামের মোড়ল হিসাবে তার তা অজানা থাকতো না। এই সময় হিসাব করে আমরা দেখলাম যে একটি কাল্পনিক (?) ছাগলের খোঁজে আমরা কাঁচড়াপাড়া হতে হালিশহর ও জাগুলিয়া হয়ে নৈহাটির শেষ সীমা পর্যন্ত ঘুর পথে প্রায় ১১ মাইল হেঁটে এসেছি। আমাদের ট্যাক্সি-খানাকে আমরা নৈহাটি রেল স্টেশনের নিকট আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। এইটুকু হেঁটে ঐ স্থানে যেতেও যেন এতক্ষণে আমাদের পা টন টন করে উঠছে। এখানকার মাটি যেন এইবার আমাদের নীচের দিকে টেনে নুইয়ে দিতে চায়। আমার একজন প্রবীণ সহকারী তো ক্ষেপে উঠে চেঁচিয়ে উঠলেন—'ওকেও আমি এবার খুন করবো। আমাদেরও স্যার ছেলে-পুলে আছে। তিনটি সন্তানের পিতা আমি। ছেলে কি জিনিস তা আমি বুঝি। ওকে মেরে এই জঙ্গলের মধ্যে পুতে ফেলবো স্যার।' আমি সহকারীকে শান্ত করে তাঁকে পথিপার্শ্বে একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে বললাম। এর কিছুক্ষণ পরে আমরা চলতে চলতে এসে পৌছলাম ঋষি বঙ্কিমের বাড়ীর সম্মুখে। ঋষি বঙ্কিম আমাদের বংশেরই দৌহিত্র সন্তান হতে উদ্ভূত বলে এই জায়গাটি আমাদেরও মনে শ্রদ্ধা আনে। তদুপরি আমাদেরই পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ ঠাকুরের মন্দিরও এখানে। আমি দূর হতে ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে মুখ ফেরাতেই দেখলাম—ঋষি বঙ্কিমের বৈঠকখানার সিঁড়ির উপর বসে রয়েছেন সুসাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস এবং ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের কাছে শুনলাম যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তরফ হতে ঋষি বঙ্কিমের এই বৈঠকখানাটির ভার নেবার ব্যাপারে তাঁরা এখানে এসেছেন। অন্য দিকে আমাকেও এখানে এই আসামী সমভিব্যাহারে আসার কারণ সম্পর্কীয় গল্পটি তাঁদের শুনাতে হলো। সব কথা শুনে এঁরাও আসামীকে ঐ অপহৃত ছেলেটিকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ জানালেন। আসামী তাঁদের এই সব কথা ধীরভাবে শুনে সজনীবাবুকে শুধু এইটুকু জানালো যে সে বাংলা জানে এবং 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাটাও পড়ে। এর পর এদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে আমরা স্খলিত পদে রেল লাইন পার হয়ে নৈহাটিতে এসে আমাদের ট্যাক্সিখানাতে উঠে বসলাম। এর এক ঘণ্টা পর আমরা কোলকাতায় পৌছে আসামীকে হাজতে পুরে বিশ্রামের জন্য যে যার কোয়ার্টারে উঠে এলাম। এই খুনের তদন্তের জন্য আর কিছু করা এই দিন আমাদের সাধ্যাতীত ছিল। এমন কি থানার অন্যান্য মামলার প্রতি দৃষ্টিনিবেশ করারও ক্ষমতা এই সময় আমাদের ছিল না। অন্যান্য অফিসাররা এই দিন কি করেছিলেন তা জানি'না, আমি কিন্তু রাত্রির আহার গ্রহণ না করেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পর দিন ভোর না হওয়া পর্যন্ত কেহ এইদিন আমাকে জাগিয়ে দিতে পারে নি।

পর দিন প্রত্যুষে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসেই আমার মনে পড়লো যে কালকে রাত্রির খাবার খেতে আমি ভুলে গেছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে—আমি এই সময় একটুকুও ক্ষুধা অনুভব করছিলাম না। ঘুম থেকে জেগে উঠামাত্র আমার প্রথমমনে পড়লো এই নির্মম আসামী ও ঐ নিহতমক শিশুটিরই কথা। আমার মনে হলো যে এই-বার শেষ চেষ্টা স্বরূপ আসামীকে ফরিয়াদীর বাড়িতে এনে

ঐ নিহতমস্ত শিশুটির বালিকা মাতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে দেখা যাক—তাতে আসামীর মনের মধ্যে কোনও ভাবান্তর উপস্থিত হয় কিনা। তাড়াতাড়ি দুটা বিস্কুট ও ক'চুমুক চা গলধঃকরণ করে থানাবাড়ির নীচে অফিসে এসে দেখলাম—আমার পুলিশী গুরু রায়সাহেব সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি ইতিমধ্যেই কখন সেখানে উপস্থিত হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে সেখানে দেখা মাত্র তিনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—'তোমরা দেখছি তদন্তের মধ্যে অনেক ফাঁক রেখে গেছো। শহরের কয়েকটি শিশু-প্রতিষ্ঠানে, হাঁসপাতালে ও শহর, শহরতলীর প্রতিটি থানায় একবার খোঁজ খবর করা উচিত ছিল। আমার মনে হয় এই সব জায়গার কোনও এক জায়গায় ঐ শিশুটি হয়তো জমা হয়েছে। এ ছাড়া পাঁঠা কাটার দোকানে ও শ্লটার হাউসেও একবার তোমাদের খোঁজ খবর করা উচিত হবে। আমার মনে হয় ঐ সব জায়গা থেকে আসামী ছাগরক্ত সংগ্রহ করে থাকবে।' রায়সাহেব সত্যেন মুখার্জির কাছে শুনলাম যে সকালের ডাকে রক্তপরীক্ষক ডাক্তারের রিপোর্ট পাওয়া মাত্র তিনি আরও খবর জানবার জন্যে এই থানায় ছুটে এসেছেন। আমি রায়সাহেব সত্যেন মুখার্জিকে জানালাম যে ইতিমধ্যেই আমার একজন উপযুক্ত সহকারী আমার নির্দেশ মত ঐ সকল স্থানের প্রতিটি স্থানে পৃথক রূপে তদন্ত করছেন, কিন্তু কোথায়ও ঐ শিশুটির অবস্থান সম্পর্কে কোনও সংবাদ বা সূত্র বিশেষ চেষ্টা সত্বেও সংগ্রহ করতে পারেন নি। এই সম্পর্কে যে স্মারকলিপি (diary) তিনি পেশ করেছেন তার একটি অতিরিক্ত কপি তাঁর অবগতির জন্য গোয়েন্দা বিভাগে থানা থেকে অচিরেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তার পর মুখার্জি সাহেব আমাদের পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে বিদায় নেবার পর আমি আমার জনৈক সহকারীর সাহায্যে সাবধানে আসামীকে নিয়ে এই মামলার ফরিয়াদী ডাঃ প্যাটেলের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলাম।

ডাঃ প্যাটেলের বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে দেখলাম যে তিনি নিশ্চল হয়ে উঠানের উপর পা রেখে রোয়াকের উপর বসে ভাবছেন। কতক্ষণ তিনি সেখানে বসে আছেন তা কে জানে? আমার আগমন বার্তা যেন তিনি জানতেই পারেন নি। এই সময় ঐ নিহতমস্ত শিশুটির মাতা বোধ হয় উপরের বারান্দা থেকে আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আহত বাঘিনীর মত ছুটে এসে উঠানের উপর লাফিয়ে পড়ে গুজরাটী ভাষায় বলে উঠলেন—'ইনেসপেকটার সাব! আপনি শুধু আমাকে এইটুকু বলে দিন যে খোকা আমার আর ইহজগতে নেই। আমার খোকা বেঁচে থেকে আর কারুর ঘরে চিরজীবন থাকবে এযে আমি চিন্তাও করতে পারি না।' এর পর সেই সন্তানহারা জননী ছুটে গিয়ে বোধহয় আসামীর টুঁটি টিপে তাকে মেরে ফেলতে চাইছিল। তাকে এইভাবে ছুটতে দেখে ডাঃ প্যাটেল তাড়াতাড়ি উঠে তাঁকে ধরে ফেলা মাত্র তিনি জ্ঞানহারা হয়ে স্বামীর হাতের উপরই লুটিয়ে পড়লেন। আমার কিন্তু ঐ সন্তানহারা মার প্রতি তত দৃষ্টি ছিল না, যত দৃষ্টি এই সময় আমার ছিল ঐ আসামীর প্রতি। আমি অধীর ভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম যে এই সকরুণ দৃশ্যে আসামীর চিত্ত বিগলিত হচ্ছে কি না। এতোক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আসামী পুত্রহারা মাতার এই চিত্ত-বিক্ষোভ পরিলক্ষ্য করছিল। এর পর তাকে আসামীর পায়ের নীচে আছড়ে পড়ে বলতে শুনা গেলো—'ওরে অমুক! তোর আমি কোনও অপকার করি নি। তুই আমার একমাত্র সন্তানকে ফিরিয়ে দে। তুই যদি মা হতিস তো বুঝতিস আমার বুকে কতো ব্যথা।' আমার সহকারী অমুকবাবুর সহনশীলতা ছিল কম। তিনি এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন—'দুধকলা দিয়ে আপনারা এতো-দিন বাড়িতে একটা কাল সাপ পুষেছিলেন।' এদিকে ঐ সন্তানহারা মাতার এই করুণ ক্রন্দনে আসামীর যেন সহানু-ভূতির উদ্রেক হলো। খুব সম্ভবত ঐ নারীর শেষ কথাটি আসামীকে অভিভূত করে ফেলেছিল। আমার মতে তার মুখ নিঃসৃত—'তুই যদি সন্তানের গর্ভধারিণী হতিস' বাক্য কয়টিই তার মধ্যে একটি অনুকূল প্রতিক্রিয়া এনেছিল। হৃদয়ের আবেগে আসামী এই সময় একটি অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসলো। তার ঐ প্রস্তাবের কিয়দংশ চিত্তাকর্ষক বিধায় নিয়ে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"হাঁ বহিন! আমি শিশুটিকে তোমায় ফিরিয়েই দেবো। কিন্তু তা আমি দোবো একটি শর্তের বিনিময়ে। আমি তোমার সঙ্গে একটি রুদ্ধদ্বার অর্গলবদ্ধ কক্ষে নিভৃতে কিছু সময় আলাপ আলোচনা করবো। আমার এই

প্রস্তাবে অমত করলে কিন্তু আমি কিছুকাল ঐ শিশুটিকে ফেরত দেবো না। তবে আমি সকলকে আশ্বাস দিচ্ছি যে বদ্ধ-দুয়ার কক্ষে অবস্থান করলেও আমি তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবো। আমার দ্বারা তোমার সম্মান-হানিকর কোনও কাজ সংঘটিত হবে না। এই সম্বন্ধে কোনও ভয় পাবার কারণ নেই। আমার অভিসন্ধি সম্বন্ধে যেন কোনও সন্দেহের অবকাশ কেউ না রাখেন।"

ঐ খুনী আসামীর এই অদ্ভুত প্রস্তাবে আমাদের ন্যায় ফরিয়াদী ডাঃ প্যাটেল ও তাঁর আত্মীয় স্বজনরাও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এজন্য মিসেস্ প্যাটেলের মনে কোনও আতঙ্কের চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি হারানো নিধির পুনঃ প্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন—'ঠিক হ্যায়। ইস্‌মে কহি বাত নেহি। লেকেন মেরি লেড়কা মিলনে চাহি, তুরন্ত—নেহি তো তুমকো হাম ডাণ্ডাসে গোদ করকে মার ডালেগা।

এই প্রস্তাবে ঐ নিহতমস্ত শিশুর মাতা অগত্যা [মন্দের ভালো হিসাবে] রাজী হলেও তাঁর স্বামী ডাক্তার প্যাটেল এবং তাঁর আত্মীয়রা আসামীর এই প্রস্তাবে রাজী হতে পারলেন না। এইরূপ এক বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করা সমীচীন কিনা আমিও তা ভেবে দেখছিলাম। কে জানে যে এই সুযোগে আসামী ঐ মিসেস্ প্যাটেলকে নিহত করবে না? (অন্যথায় মিসেস প্যাটেল কর্তৃক আসামীর নিহত হওয়াও অসম্ভব ছিল না—ওদের ঘরে কোনও সাংঘাতিও অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা, তাই বা কে জানে?)। তবে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের মত আসামী কর্তৃক ওঁর সম্ভ্রম বা ইজ্জত হানির আশঙ্কা অবশ্য আমার মনে উদয় হয় নি। আমি ভাবছিলাম যে হয়তো এই সুযোগে এদের কেউ হত্যা বা আত্মহত্যা এই দুই-এর কোনও একটি করে বসে আমাদের বিপদে ফেলবে। এছাড়া এই উন্মাদ আসামীকে আর অধিকতর প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো। এই ব্যাপারে একটি অনিশ্চিত পন্থা গ্রহণের ঝুঁকি নিতে আমি রাজী হতে পারলাম না। অথচ এই মামলার কিনারার জন্য প্রয়োজনীয় সূত্রের অভাবে আসামীর বিবৃতির উপর নির্ভরশীল হওয়া ভিন্ন আমাদের অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। এই জন্য আমি এই সম্পর্কে আসামীকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করি। এই বিষয়ে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—যে সব কথা তুমি ওঁকে বদ্ধ ঘরের মধ্যে বলতে পারো তা সর্বসমক্ষে তাঁকে বলতে তোমার বাধা কি আছে? তুমি একান্তে গিয়ে আমাদের অগোচরে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারো। আমরা না হয় একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবো। তাতে তোমাদের কথোপকথনও আমরা শুনতে পাবো না। এতে তোমার অমতের কি কারণ থাকতে পারে?

উঃ—আমাকে আপনারা মিথ্যা সন্দেহ করে আমার বহিনের আরও মনোবেদনার কারণ ঘটাচ্ছেন। আমি ওঁকে নিজের মায়ের পেটের বহিনের মতই মনে করি। আমাকে যদি একান্তরূপে এইটুকুও বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনাদেরই বা আমি বিশ্বাস করে ঐ শিশু পুত্র-টিকে ফিরিয়ে দিই কি করে? এখন তাকে ফিরিয়ে দেওয়া মানে অপহরণের দায়ে দায়ী হওয়া। এ'ছাড়া যার কাছে ছেলে আছে সেও তো বিনাদোষে এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে। তবে এইটুকু আপনারা জেনে রাখুন—খোকা ভালোই আছে এবং তিলে তিলে সে তার স্বস্থানে বেড়েই চলেছে।

এদিকে এই নিহতমস্ত শিশুটির মাতা কাতরভাবে আমাদের এই আসামীর এই অহেতুক প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করতে অনুরোধ করছিল। সে তার স্বামীকে এ বিষয়ে তার সামর্থ্যে বিশ্বাস না করার জন্যে অনুযোগ করতে থাকলো। এই মর্মাহত নারীর সেইদিনকার সেই রণহুঙ্কার 'মেরি লেড়কা নেহি দেঙ্গি?' আজও সুস্পষ্ট ভাবে আমার মনে পড়ে। এই সম্পর্কে ঐ নারী যে অভয়-বাণী আমাদের শুনিয়েছিল তাও আমি আজও পর্যন্ত ভুলি নি। এই বিষয়ে তার সেই দিনকার বক্তব্যটুকুর কিছু অংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

'আমি একজন ভারতীয় নারী। ভারতীয় কৃষ্টির মধ্যে আমি মানুষ হয়েছি। ভারতীয় সংস্কার আমার মজ্জায় মজ্জায় প্রবাহিত হচ্ছে। একজন ভারতীয় নারী বিধায় আমি আমার স্বামী ও পুত্রের জীবন অপেক্ষা ইজ্জতকে ঢের বেশি মূল্যবান মনে করি। এ ছাড়া আমি রাজস্থানের সীমানায় গুর্জর দেশের একজন হিন্দু নারী। আমি

আত্মরক্ষা করতেও জানি। ইজ্জত হারানো অপেক্ষা আমরা আত্মবিসর্জন শ্রেয় মনে করি। আমার মত একজন সতী-নারীর মনোবলের কাছে ও একটি মেষ ছাড়া অপর আর কিছুই নয়। এছাড়া আমি আমার বক্ষবস্ত্রের মধ্যে একটি শাণিত ছুরি লুকিয়ে রেখেছি।'

এই রাজস্থানের অধিবাসিনী মহিলাটির শেষ উক্তি এই-বার আমাকে অধিকতর শঙ্কিত করে তুললো। অবিমৃষ্য-কারিতার এই দিকটা তখনও পর্যন্ত আমি ভেবে দেখি নি। আরে বাপরে বাপরে বাপ! শেষে ইনি আসামীকে একা পেয়ে হত্যা না করে বসেন! পরিশেষে আসামীকে এই ভাবে হারালে নিঃসন্দেহে আরেকটি খুনের মামলা রুজু হবে। এর ফলে ঐ বিক্ষুব্ধ নারী কর্তৃক সমাধিত ঐ হত্যা-কাণ্ডের সাহায্যকারী [aider and abetter] অপরাধী-রূপে আমরাও আসামীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়বো। সকল দিক বিবেচনা করে আমরা সম্মিলিত ভাবে আসামীর এই অদ্ভুত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম।

এরপর যে হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হলো তার তুলনা নেই। ঐ নারীর সেইদিনকার হৃদয়-বিদারক কান্না আজও আমি শুনতে পাই। সে এতক্ষণে বুঝেছিল যে তার আশার শেষ আলোকটুকু নির্বাপিত হতে চলেছে। শোকাতুরা মাতার সন্তান-বিয়োগজনিত হৃদয়-বিদারক কান্না এই নিষ্ঠুর আসামীকে যেন এতক্ষণে সত্য সত্যই বিচলিত করে তুললে। এই ব্যাপারে আসামী তার পূর্বতন মনিবানীকে যে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিল তার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"চুপ রহো বহিন। রো-ও মাৎ! ও লেড়কা মেরি বহিনকো পাশ আচ্ছি তাবিয়েতমে হ্যায়। এক বরষ বাদ হাম উনকো লোটা দেঙ্গে। আগার হামার আভি জামিন উমিন মিলে তো হাম চুপচাপ লেড়কাকে লে আয়েঙ্গে। ইস বাড়ে আভি কুছ পুলিশকে বাতায়ে তো ঘিনকে পাশ উ লেড়কাকো রাখা গয়া উনকোভি বিপদ হোনে শেকথি। ঝুট মুট উনলোককো হাম পুলিশকো ক্রোধপর গিরানে নেহি মাঙতা। হামকো আপ মাপ করিয়ে, বহিন। হাম মাফি মাঙতা।"

আসামীর এই শেষ প্রস্তাবের মধ্যে তার দিক থেকে হয়তো যুক্তি আছে। কিন্তু এই বিষয়ে কাউকে আমরা এইভাবে সাহায্য করতে অপারক ছিলাম। দেশের আইন-বহির্ভূত ব্যক্তিগত কোনও ক্ষমতা আমার থাকলে তাকে আমি জামিনে মুক্তি দিয়ে তার গন্তব্য স্থান পর্যন্ত তাকে আমি অনুসরণ করে প্রয়োজনবোধে পুনরায় তাকে ধরে আনবার জন্য আমি একাধিক গোয়েন্দা নিযুক্ত করতাম। কিন্তু এই আসামী জামিন অগ্রাহ্য হত্যাপরাধী হওয়ায় তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। এর কারণ আমরা দেশের আইনের দাস। আইনমত কার্য করতে সকল সময়েই আমরা বাধ্য। অতএব আসামীর এই শেষ প্রস্তাবটিও আমাদের অগ্রাহ্য করতে হয়েছিল। এর পর এই মামলার কিনারা করবার জন্য আর আসামীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার আমরা কোনও প্রয়োজন মনে করি নি। আমরা প্রতিটি সম্ভাব্য পথে অনুসন্ধান চালিয়ে এই মামলার কিনারা করতে মনস্থ করলাম।

এই দিন থানায় ফিরে এসে দেখলাম গুরুদেব [পুলিশী গুরু] তৎকালীন রায়সাহেব সত্যেন মুখার্জি পুনরায় থানায় এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের নিকট হতে এই খুনের ব্যাপারে সেই দিনকার তদন্ত সম্পর্কে পূর্বাপর সকল তথ্য অবগত হয়ে তিনি আমাদের বললেন, "দেশের আইনে না বাধলে এবং মানবতার প্রতিকূল না হলে আমি একদিনেই আসল কথা তার কাছ হতে বার করতে পারি। আমার ইচ্ছে হয় যে ওকে আমি এখুনি এক্কেবারে কাঁচা খেয়ে ফেলি। যাক, তা যখন হবার নয় তখন তোমাদের একজন আসামীর গুর্জর প্রদেশের স্বগ্রামে চলে যাও। সেখান হতে এমন অনেক সূত্র পাবে যার ফলে এই মামলার সহজেই কিনারা হয়ে যাবে।" কলিকাতা গোয়েন্দা বিভাগের তৎকালীন ইনেসপেকটার রায়সাহেব সত্যেন মুখার্জির এই অভিমত সম্বন্ধে আমরাও ইতিমধ্যে চিন্তা যে না করেছি তা'ও নয়। তবে আসামী যেভাবে মিথ্যার পর মিথ্যা বলে চলেছে, তাতে তার প্রদত্ত দেশের ঠিকানার নির্ভুলতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ ছিল। এদিকে তদন্তের এই সম্ভাব্য পথটি উপেক্ষাও করা চলে না। একবার মনে করলাম এই সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্যে গুর্জর দেশের স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে পত্রযোগে অনুরোধ করি। কিন্তু এই মামলা সম্পর্কীয় প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে তাঁকে পত্রযোগে ওয়াকিবহাল করে

দেওয়া সম্ভব ছিল না। এই জন্যে আসামীর পৈতৃক বাটী তল্লাসী করবার সময় অজ্ঞতার কারণে বহুসূত্র ও প্রামাণ্য দ্রব্য তিনি অপ্রয়োজনীয় মনে করে সংগ্রহ নাও করতে পারেন। এই জন্য আমরা আমাদের একজন অভিজ্ঞ অফিসারকে আসামী প্রদত্ত তার দেশের ঠিকানা-আদিসহ গুর্জর প্রদেশে পাঠানো ঠিক করে ফেললাম।

এরপর এমনি আরও কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে সহকর্মী অমুকবাবুর নিকট হতে গুর্জর হতে প্রেরিত স্মারক-লিপি ও পত্রাদিও পেয়ে থাকি। তিনি আসামীর গুর্জর প্রদেশস্থ পৈতৃক গ্রামে গিয়ে স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত চালিয়ে যে স্মারকলিপি বা মামলা সম্পর্কীয় ডায়েরি পাঠিয়ে ছিলেন তার প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি অমুক তারিখে অমুক সময়ে জেলার শহরে এসে এই জিলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপারইন্‌টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আমাদের কলিকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের অনুরোধ পত্রটি প্রদান করে তাঁর সহিত এই মামলার করণীয় কার্যসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করি। তিনি এই বিষয়ে সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দিয়ে ঐ জিলার সদর হতে একজন ইনেসপেক্‌টারকে আমার সঙ্গে স্থানীয় গ্রাম্য থানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর আমরা ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে আসামীর গ্রামে এসে তার পৈতৃক বাটীতে তদন্তের জন্য উপস্থিত হই।

আসামীর এই পৈতৃক বাড়িটি একটি ছোট খোড়ো বাড়ি মাত্র। আসামীর এক বৃদ্ধা মাতা সেখানে বাস করে। পাড়াপড়শীদের দয়ার উপর নির্ভর করে তিনি বেঁচে আছেন। কচিৎ কখনও মাত্র আসামী তাঁকে সাহায্য পাঠায়। আসামীর এক সম্পর্কীয় ভগ্নী আছে বটে, কিন্তু সে তার স্বামীর সঙ্গে থাকে বর্মায়। এখানে তদন্তে প্রকাশ পায় যে তার লেখা এই আসামীর যাবতীয় কাহিনী কল্পিত। আমরা দুইজন স্থানীয় সাক্ষীর সমক্ষে এদের এই বাড়িটির থানাতল্লাসী করেছি। ঐ বৃদ্ধার বাক্স-পত্র তল্লাসী করে আমরা আসামীর লেখা খানকতক চিঠিপত্র উদ্ধার করেছি। দুখানি চিঠির ইংরাজী তর্জমা নিম্নে দেওয়া গেল।

'মা গো ভালো আছো ত? শুনলে সুখী হবে আমি বিয়ে করেছি। খুব ভালো বউ হয়েছে মা। খুব সুন্দরী বৌ, সত্যি বলছি। সে প্রায়ই তোমার কথা বলে ও তোমাকে দেখতে চায়। কাল আমরা দুজনায় বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিলাম। এর দাদারা খুব ধনী লোক। বিয়েতে আমরা পেয়েছি একটা মোটর গাড়ি, আর চমৎকার একটা বসত বাড়ি। আমি এখানে একটা ব্যবসা ফেঁদেছি। তাতে অনেক টাকা লাভ হয়। শোন মা! তোমার বউ লেখা-পড়াও জানে—তোমার ছেলের চাইতেও বেশী, বুঝলে? আমরা দুজনে শীঘ্র তোমাকে প্রণাম করে আসবো।'

এর পরের চিঠিখানা প্রায় এক বছর পরের লেখা। অন্তত চিঠির তারিখ থেকে তাই বুঝা যায়। দু'খানা চিঠিই কলকাতা থেকে লেখা হলেও এর কোনটিতে সেখানকার ঠিকানা দেওয়া হয়নি। ঐ পত্র দুইটির খামের উপর কলিকাতার সিমলা পোস্ট অফিসের মোহর অঙ্কিত রয়েছে। এক্ষণে ঐ আসামীর প্রেরিত দ্বিতীয় চিঠিটির কিয়দংশ নিম্নে তুলে দেওয়া হলো। মূল পত্র দুইটি কলকাতা ফিরবার সময় আনামত প্রামাণ্য দ্রব্য রূপে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। এই চিঠি দু'খানির বিষয় বস্তু যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা সহজেই অনুমেয়। আসামী প্রেরিত দ্বিতীয় পত্রের বক্তব্য ছিল এইরূপ—

'মা, আমি মাত্র কয়দিন পূর্বে জাপান হতে সস্ত্রীক ফিরেছি। আমার চোখের চিকিৎসার জন্যে আমি সেখানে যাই। কিন্তু আমি ভালো হতে পারি নি। আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছি। তোমার বউই এখন আমার একমাত্র চক্ষু। সে আমাকে খুব যত্ন আত্তি করে, আমার কথা তুমি ভেবো না। মা, আমাদের একটা খোকা হয়েছে। ভারি চমৎকার খোকা, ভারি নরম তার দেহ। তুমি ভালো আছো তো মা? ভগবান আমার চক্ষু নিয়েছেন কিন্তু একটা খোকা দিয়েছেন, আর তিনি তোমাকে দিয়েছেন একজন সেবাপরায়ণ বউ। না মা, আমার কোনও দুঃখ নেই। আমি খুব ভালো আছি।'

এই দুইটি পত্র ছাড়া আসামীর গৃহে অপর আর কোনও প্রামাণ্য দ্রব্য পাওয়া গেল না। আসামীর মাতা ও প্রতিবেশীরা আসামীর বর্তমান কার্যকরণ ও বাসস্থান সম্বন্ধে

কিছুই অবগত নন। আসামী গরীব গৃহস্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেছে। এখানে তাদের জমিদারী ও লোক লস্কর কোনও দিনই ছিল না। এই সম্পর্কে আসামী কলকাতায় যে বিবৃতি দিয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলো। আসামীর সম্পর্কীয় কোন ভগ্নীপতির সিংহলের বা বর্মার ঠিকানা সম্বন্ধে এখানকার কেউ কোনও সংবাদ দিতে পারে নি। এ ব্যাপারে আরও একটু তদন্ত করে আমি যথাশীঘ্র কলিকাতাগামী ট্রেনে কলিকাতায় রওনা হবো। মূল পত্র দুইটি মূল্যবান বিধায় ডাকযোগে এই স্মারকলিপি সহ প্রেরিত হয় নি। তদন্ত সম্পর্কীয় অন্যান্য সমাচার পরবর্তী স্মারক-লিপিতে জানানো হবে।"

এই দিন সকালে অফিসে বসে গুজরাট হতে সহকারী অফিসার প্রেরিত এই খুন সম্পর্কীয় স্মারকলিপি নিবিষ্ট মনে পাঠ করছিলাম। এই তদন্তের ফলাফল সম্পর্কীয় ডায়েরিটি পড়তে পড়তে তার পাতায় পাতায় আপন ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী মন্তব্যও লিখে যাচ্ছি। এমন সময় হাজত ঘরের পাহারাদার সিপাহী এসে জানালো যে ঐ খুনের আসামী আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছে। মাত্র আর একদিনের জন্য হাকিমের হুকুম মত সে পুলিশ হেপাজতীতে আছে। আগামী কাল কানুন মত আসামীকে হাকিমের কাছে হাজির করলে তাকে তিনি আর পুলিশ হেপাজতীতে না দিয়ে হয়তো তাকে জেল-হাজতে পাঠিয়ে দেবেন। যা কিছু করবার তা আজকের মধ্যেই করে নিতে হবে। এই কারণে এই মামলার ব্যাপারে আমার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। আমি তৎক্ষণাৎ আসামীকে হাজত ঘর হতে বার করে আমার সামনে আনিয়ে নিলাম। কিন্তু ইচ্ছা করেই আমি তার দেশের তদন্ত সম্পর্কীয় কোনও সমাচার তাকে জানালাম না। আসামীর সঙ্গে এই সময় আমার যা কথোপকথন হয়েছিল তা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

প্রঃ—কি হে ব্যাপার কি? দয়াময়ের কি দয়া হলো? ছেলেটা এখন কোথায়? আর কতদিন আমাদের জ্বালাবে?

উঃ—আজ্ঞে, আপনাদের আর আমার জ্বালাতন করবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু শুনলাম আপনি নাকি এই মামলার তদন্তের জন্য এই মামলা সহ আমাকেও এই শহরের গোয়েন্দা বিভাগে সঁপে দিচ্ছেন?

প্রঃ—এর মধ্যে এই সব কথা তোমার কাছে পৌঁছিয়ে গিয়েছে? এত বড় সাংঘাতিক আশ্চর্য বিষয়। পুলিশের গোপন খবর হাজতের আসামীর কানে পৌঁছায়! না, না, ওসব যা শুনেছো তা সবই মিথ্যে।

উঃ—আমি হাজত ঘরে বসে কয়েকজন পুরানো চোরের কাছ হতে এই সব খবর শুনে নিয়েছি। তারা পুলিশের সব খবরই তো রাখে দেখলাম। আপনাদের উপর নজর রাখবার জন্য তাদেরও নিজস্ব গোয়েন্দা আছে। তা' ছাড়া এসব পুরানো চোররা অকারণে মিথ্যে বলে না।

প্রঃ—তা, কি আর করবো বলো। আমি তো এই মামলার কোন কিনারা করতে পারলাম না। এই জন্য ওপরওয়ালাদের কাছে বেইজ্জতেরও একশেষ হয়েছি। তাই কাল হতে বোধ হয় আমাদের গোয়েন্দা বিভাগই এই মামলার তদন্তের ভার গ্রহণ করবে। যাও তাহলে এখন সেখানে তুমি। সেখানে রায়সাহেব সত্যেন মুখার্জি আছেন।

উঃ—ওঃ বাবা! সেই শ্রীসত্যেন মুখার্জি! না না, আপনি বেইজ্জত হবেন কেন? এ মামলা আপনি নিজের হাতেই রাখুন। আমি এখন সব কথাই খুলে বলবো। আপনাদের ব্লড গ্রুপিঙ-এর রিপোর্ট এসেছে?

ইতিপূর্বেই এই আসামী স্বেচ্ছায় নিজের রক্ত সরকারী ডাক্তারকে গ্রহণ করতে দিয়েছিল। এই ব্যাপারে আদালতের অনুমতির জন্য তাকে কলিকাতার প্রধান হাকিমের নিকট উপস্থিত করলে সে এই প্রস্তাবে সানন্দেই সায় দিয়েছে। এ ছাড়া তুলনার জন্য আমরা ঐ শিশুর পিতা-মাতার রক্তও সরকারী ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমাদের সরকারী ডাক্তার এই সম্পর্কে যথারীতি একটা মন্তব্য সহ রিপোর্টও আমাদের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ রিপোর্টটি বার করে আসামীকে শুনিয়ে দিলাম। এই রিপোর্টটির সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"ব্লাড গ্রুপিঙের পরীক্ষান্তে জানা গেল যে ঐ শিশুর বস্ত্রাদির মনুষ্য-রক্ত এবং আসামীর দেহের রক্ত একই গ্রুপের রক্ত। অন্যদিকে ঐ শিশুর পিতা-মাতার— উভয়ের রক্তই সম্পূর্ণরূপে একটি ভিন্ন গ্রুপের রক্ত। এইসব

তথ্য বিবেচনা করলে আসামীর বিবৃতির মধ্যে সত্য আছে বলেই মনে হয়।”

এই রিপোর্টটি পাঠ করে আসামীকে শুনানোর পর আসামী নিবিষ্ট মনে বহুক্ষণ পর্যন্ত কিএকটা চিন্তা করে বলে উঠলো—‘তাহলে তো বিচারে আমার ফাঁসি না হোক, দ্বীপান্তর হবে।’ আমিও এই সময় মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আমি ভেঙচে উঠে তাকে ভৎ‍‍‍র্সনার সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তা আইন তো তোমার ভালো রূপেই জানা আছে। এই জন্যই তো আদালতের সন্দেহ উদ্রেক করে খালাস পাবার জন্য ছাগরক্তের কেরামতি দেখিয়েছো। এখন আমি যা বুঝছি তাতে তুমি ঐ শিশুটিকে খুনই করেছো।’

এরপর আরও বহু বাক্‌বিতণ্ডা ও ঝঞ্ঝাটের পর আসামী স্বীকার করলো যে সে সিংহলে তার এক সম্পর্কীয় বহিনের কাছে ঐ শিশুটিকে রেখে দিয়েছে। এ ছাড়া সে তৎক্ষণাৎ একটা কাগজ আমাদের কাছ হতে চেয়ে নিয়ে তার সেই বহিনকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠিও লিখে ফেল্লে। এর পর ঐ পত্রখানি আমার হাতে তুলে দিয়ে সে বললে—‘এখন যান সিংহলের অমুক শহরে। আমার হাতের লেখা এই চিঠিখানি দেখালেই তারা ঐ শিশুটিকে আপনাদের দিয়ে দেবে।’ অনেক ভীতি প্রদর্শন এবং উপরোধ-অনুরোধের পর আসামী গুজরাটী ভাষায় এই চিঠিটি লিখে তা আমার হাতে দেয়। এই পত্রটির প্রয়োজনীয় অংশের বাংলা তর্জমা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

“প্রিয় বহিন! আমি এই ছেলেটির পিতামাতার কাতর নিবেদন ও পুলিশের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে অক্ষম। এদিকে নানাভাবে আমার জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। ক’রাত্রি আমার ঘুম নেই; চিন্তা ও অবসাদে আমি কাতর। আমাদের প্রতিশোধ স্পৃহা আপাতত মুলতুবী থাক। আশা করি খোকা তোমার কাছে ভালোই আছে। অফুরন্ত জীবন আমাদের পড়ে রয়েছে। সময় ও সুবিধার অভাব হবে না। আমার মুখ চেয়ে পুলিশের হাতে ছেলেটিকে তুলে দিও। ভয় নেই, তোমার বা আমার ওতে কোনও ক্ষতি হবে না। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। ডিম্বের বর্ণ থেকে যেমন পক্ষীকে চেনা যায়, আশা করি, তেমনি আমার চিঠির ভাষা থেকে চিঠির প্রকৃত স্বরূপ তুমি বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, আমি ভালোই আছি, ইতি—”

আসামীর এত সহজে হঠাৎ সুমতি হবে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। আমি উৎফুল্ল হয়ে তৎক্ষণাৎ এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে গোয়েন্দা বিভাগে টেলিফোন করে রায়সাহেব সত্যেনবাবুকে তা জানিয়ে দিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে শ্রীসত্যেন মুখার্জি একজন গুজরাটী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সঙ্গে করে থানায় এসে উপস্থিত হলেন। এর পর তিনি চিঠিটি এই দোভাষীর সাহায্যে পাঠোদ্ধার করে বলে উঠলেন, ‘বাজে—বাজে—সব বাজে।’ রায়সাহেব সত্যেন মুখার্জির এই অভিমত পরে সত্যরূপেই প্রমাণিত হয়েছিল। সিংহলে অনুসন্ধান করে তার ঐরূপ কোনও বহিনের হদিস পাওয়া যায় নি। এইবার শেষ চেষ্টা স্বরূপ আমি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এই আসামীকে সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী পণ্ডিত ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসুর নিকট নিয়ে গেলাম। এই সময় রায়বাহাদুর বনবিহারী মুখার্জি আমাদের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এবং রায়বাহাদুর প্রভাতনাথ মুখার্জি আমাদের অ্যাসিস্টেন্ট পুলিশ কমিশনার ছিলেন। এঁর উভয়েই আমাকে আসামীর মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার ব্যাপারে মত দিয়েছিলেন। পুলিশে ঢুকবার আগে আমি ডাঃ বসুর অধীনে কিছুকাল অ্যাব্‌নরম্যাল সাই-কোলজি সম্পর্কে গবেষণাও করেছিলাম। এই জন্য তিনি সানন্দে আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করতে সম্মত হলেন। প্রথমে তিনি আসামীর নাসা কর্ণদন্ত প্রভৃতির বিবিধ দৈহিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আসামীর কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এর পর কয়েকদিন ধরে তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ [psycho-physical analysis] করে ডাক্তার সাহেব তার সম্পর্কে নিম্নোক্ত রূপ এক অভিমত প্রদান করলেন।

“এই আসামীকে সর্বতোভাবে পরীক্ষা করে আমি জেনেছি যে এই আসামী একটি বিশেষ রকমের মানসিক রোগে ভুগছে। সে অনেক কিছু কল্পনা করে এবং তার সেই কল্পনাকে সাহিত্যিকদের ন্যায় সাহিত্য রচনায় আবদ্ধ না রেখে সে তার সেই কল্পনাকে [সত্যকার] রূপ দিতে চায় বাস্তবতার মধ্যে। [বাস্তব জগতে] এই বিশেষ ক্ষেত্রে আসামী নিজেকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করে এবং সে না হতে

চায় এবং এই জন্যই সে লছমী দেবীর [মিসেস্ প্যাটেল] নামাঙ্কিত বাসনগুলি লছমী দেবীর বাক্সের মধ্যে রেখে দেয়, বাক্সটি যেন তারই। আপাতত সে ফরিয়াদীর স্ত্রীরূপে নিজেকে কল্পনা করছে। এইরূপ অবস্থায় লছমী [মিসেস প্যাটেল] দেবীকে সতীন রূপে দেখে তার উপর হিংসুক হয়ে উঠা আসামীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে হয়তো আসামী ফরিয়াদীর এই স্ত্রীকেই হত্যা করতো। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে সে শুধু মা হতে চায়। কিন্তু সে পুরুষ বিধায় মা হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে নিজেকে অন্তঃসত্বা রূপে কল্পনা করে ছেলেটিকে সরিয়ে দিয়েচে। দশ মাস দশ দিন পরে ছেলেটিকে [হয়তো] সে বার করবে অর্থাৎ ছেলেটিকে তখন সে প্রসব করবে। আসামীকে এখন পীড়াপীড়ি করা বৃথা। পীড়াপীড়ির ফলে সে শুধু মিথ্যার পর মিথ্যা বলবে মাত্র। আসামীযে নিজেকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করছে স্ত্রী মাত্রকেই এইরূপ ভগ্নী সম্বোধন, তার এক বিশিষ্ট প্রমাণ। এই জন্যই পুরুষ রূপে সে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে নি। এ'ছাড়া মনিবের স্ত্রীরূপে নিজেকে কল্পনা করে বলে সে 'মিসেস প্যাটেল' নাম-অঙ্কিত বাসন তার মনিবানীর বাক্সে রেখে দিয়েছিল।"

এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতের এই সুচিন্তিত অভিমতটি উর্ধ্বতন অফিসারদের নিকট পেশ করে আমি তাকে বাৎসরাধিক কাল কোনও মানসিক হাঁসপাতালে নিরীক্ষণের জন্য আটকে রাখবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিলাম। এই সম্পর্কে আমি তৎকালীন কলিকাতার অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সি হাকিম শ্রীজে, কে, বিশ্বাসেরও মনোযোগ আকর্ষণ করি। কিন্তু তৎ-কালীন প্রচলিত আইন ও ফৌজদারী রীতিনীতি অনুযায়ী এইরূপ কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় নি। এর কারণ এদেশে প্রকৃত পক্ষে উন্মাদ না হলে কাউকে উন্মাদ বলে গ্রাহ্য করা হয় না। এই অবস্থায় একে কোনও মেনট্যাল হস্‌পিট্যালে পাঠানো হলেও সেখান হতে তার সুস্থ মানুষ হিসেবে ছাড়া পাবারই কথা। অগত্যা এই আসামীকে আমরা খুন এবং খুনের উদ্দেশ্যে অপহরন—ভারতীয় দণ্ড-বিধির এই দুইটি ধারায় অভিযুক্ত করে বিচারের জন্য তাকে আদালতে সোপর্দিকৃত করতে বাধ্য হলাম। নিম্ন আদালত সাক্ষীসাবুত গ্রহণের পর শেষ বিচারের জন্য তাকে এই উভয় অপরাধে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ করেন। এই মামলা-টিও তৎকালীন হাইকোর্টের স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল শ্রীএস, এম, বাসু [পরবর্তীকালে স্যার ও অ্যাডভোকেট জেনারেল] দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। বিচারের সময় সুললিতভাবে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে তিনি হাইকোর্টের স্পেশাল জুরিদের এই মামলাটির অন্তর্নিহিত সত্য অনুধাবন করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই মামলাটি হাইকোর্টের সেসনে জাষ্টিস্ মিস্টার খোন্দকার সাহেব বিচার করে-ছিলেন। উচ্চ আদালতের বিচারে মৃতদেহ না পাওয়া যাওয়ায় হত্যা মামলা প্রমাণিত হয় নি। কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ সন্দেহাতীত ভাবে আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছিল। এই আদালতের বিচারে জুরিদের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে আসামী দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় জষ্টিস্ খোন্দকার সাহেব তাকে দশ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এইভাবে আগামী দশ বৎসরের জন্য আসামী প্রেসিডেন্সি জেলে আশ্রয় লাভ করে আমাদের সকল এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেল। এর পর এক বৎসর প্রায় অতীত হতে চলেছে। এমন সময় আসামী জেল হতে তার সঙ্গে সেখানে আমাকে দেখা করতে অনুরোধ করে পত্র পাঠিয়েছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে জেল সুপারইণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি নিয়ে তার সঙ্গে দেখাও করেছিনাম। এই সময় সে বলে যে তাকে জেল হতে বার করে নিয়ে গেলে সে শিশুটিকে আমাদের ফিরিয়ে দেবে। সে এই সময় আরও বলে যে এই ছেলেটিকে ফিরৎ দিতে না পারার জন্য সে অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্যে আছে। কিন্তু জেল হতে এইরূপ অমীমাংসিত কারণে তাকে বার করে নেওয়া রীতিবিরুদ্ধ হওয়ায় তার এই দিনকার সনির্বন্ধ অনুরোধ আমি রাখতে পারি নি। এরপর আরও কয়েক বছর পর পর পার হয়ে গেল। ১৯৪৬ সালে সভ্যতা বিধ্বংসী সাম্প্রদায়িক মহাদাঙ্গা তথা কলিকাতা নিধনযজ্ঞ তখন পুরা দমে শহরের বুকের উপর সঙ্ঘটিত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই বোধ হয় এই খুনী অপরাধী জেল হ'তে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু সেই মহাদাঙ্গার অবসানের পরে ডাঃ প্যাটেলের পরিবারবর্গ এবং তাঁদের মুক্তিপ্রাপ্ত কমপাউণ্ডারের কোনও হদিশই

আমি আর পাই নি। আমি এখনও পর্যন্ত জানি না তাঁরা তাঁদের ঐ নিহতমন্ত্র অপহৃত শিশুটিকে আদপেই ফিরে পেয়েছেন কি না। তবে কলিকাতা পুলিশের সর্বাপেক্ষা দক্ষ অফিসার রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জির মতে এই শিশুটিকে খুন করাই হয়েছে। আমি কিন্তু এই ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত ভিন্ন মত পোষণ করি।

পর বৎসর মাতৃভূমির স্বাধীনতার মহানন্দে এদের বিষয় আমি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাই। বিগত সাম্প্রদায়িক মহা-দাঙ্গার সময় সঙ্ঘটিত অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলির ন্যায় এই ঘটনাটিও আজ আমার মন যেন বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু তবুও নির্মম সত্য এই যে, এরূপ সব ঘটনা এই পৃথিবীতে ঘটা সম্ভব এবং তা এখানে ঘটেও ছিল।

সমাপ্ত

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বে এদেশে দেশাত্মবোধ বলতে কোন জিনিষ ছিল না। ইংরেজী শিক্ষালাভ করে, ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে এসে, ইংরেজ জাতির অতুল স্বদেশ প্রীতির প্রেরণায় এদেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগে—দেশকে ভালবাসতে শেখে, দেশের মঙ্গলের জন্য—উন্নতির জন্য অগ্রসর হয়। বাঙলা তথা ভারতবর্ষের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম দেশসেবায় অগ্রসর হন তিনি রাজা রামমোহন রায়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গলাদেশের দেশ-বাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি শুধু বাঙলাদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কারণ রাজা রামমোহন রায়ের পর দেহমনপ্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে আর কেউ দেশ সেবায় অগ্রসর হননি। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এদেশের দেশাত্মবোধের জনক—গুরু। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আমরা দেশহিতে-আত্মোৎসর্গকারী সেই হরিশচন্দ্রকে ভুলতে বসেছি। নীলবিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে নীলবিদ্রোহের অন্যতম নেতা স্বদেশপ্রেমিক হরিশচন্দ্রের জীবনকথা আলোচনা করলাম।

হরিশচন্দ্র জন্মেছিলেন ভবানীপুরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে। তাঁর পিতা রামধন মুখোপাধ্যায় কুল-মর্য্যাদায় কুলীনশ্রেষ্ঠ হলেও ধনী ছিলেন না। তৎকালপ্রচলিত নিয়মানুসারে "মহাকুলীন" রূপে তিনি তিনটি বিবাহ করেন। তৃতীয় পত্নী রুক্মিণী দেবীর গর্ভে দুটি সন্তান জন্মায়, জ্যেষ্ঠ হারাণচন্দ্র ও কনিষ্ঠ হরিশচন্দ্র। হরিশচন্দ্রের জন্মের ছয় মাস পরে রামধনের মৃত্যু হয়।

গৃহে প্রাথমিক পাঠ শেষ করে হরিশচন্দ্র স্থানীয় 'ইউনিয়ন স্কুলে' ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি কয়েক বছর অবৈতনিক ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি।

এখানেই হরিশচন্দ্রের কলেজে পড়াশোনা বন্ধ করতে হয়। বন্ধ না করে উপায় ছিল না; কলেজে বেতন জোগাড় করবেন, না সংসার খরচের টাকা। উপার্জ্জনের পথ তো ছিল মাত্র একটি—ইংরেজী-অনভিজ্ঞ লোকদের দরখাস্ত লিখে দেওয়া। এতে তিনি যৎসামান্য পারিশ্রমিক পেতেন; আর তাই দিয়েই কোন রকমে দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান হতো। যেদিন কেউ দরখাস্ত লেখাতে আসত না, সে দিন বাড়ীতে কিছু সঞ্চিত থাকলেই খাওয়া হত, তা না হলে সমগ্র পরিবারবর্গকে অনাহারে কাটাতে হত।

অনেক চেষ্টার পর হরিশচন্দ্র একটি চাকরী জোটালেন,—নিলামদার টালা কোম্পানীর অফিসে। বিল লেখকের চাকুরী; বেতন মাসে দশ টাকা। কিন্তু এখানে ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন আশা নেই দেখে তিনি অন্যত্র চাকুরীর সন্ধান করতে থাকেন। এই সময় মিলিটারী অডিটর-জেনারেল অফিসে একটি কেরাণীর পদ খালি হয়। কর্ত্তৃপক্ষ সেই পদ পূরণের জন্য একটি প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় আহ্বান করেন। হরিশচন্দ্র সেই প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দেন এবং কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে সেই পদলাভ করেন। এই সময় থেকেই কমলা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন; তিনি এই অফিসেই পঁচিশ টাকার কেরাণীর পদ থেকে ক্রমশ চারশো টাকা বেতনের সহকারী অডিটার-জেনারেলের পদে উন্নীত হন।

চাকুরী পাওয়ার পর হরিশচন্দ্র অবসর সময় পুস্তক পাঠে অতিবাহিত করেন। চিরকালই তিনি পাঠানুরাগী ছিলেন। তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে (আগের জাতীয় পাঠাগার) নানা বিষয়ের নানা বই পড়তেন। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি, কিছুই বাদ যেত না। হরিশচন্দ্রের সাহিত্য-শিষ্য রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৪০—১৯২২ বলেছেন, হরিশচন্দ্র ছয় মাসের

মধ্যে ৭৫ খণ্ড "এডিনবরা রিভিউ" আগাগোড়া পাঠ করেন। শুধু গৃহে বসে পুস্তক পাঠ করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর জ্ঞান-তৃষ্ণা ছিল প্রবল। প্রায় তিনি পায়ে হেঁটে রেভারেণ্ড ডফ সাহেবের বক্তৃতা শুনতে আসতেন সেই ভবানীপুর থেকে হেদুয়ার ধারে। বলা বাহুল্য তখন আজকের মত ট্রামবাসের প্রচলন ছিল না। আর অদ্ভুত ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি। একবার যা পড়তেন, একবার যা শুনতেন, জীবনে তা ভুলতেন না। শোনা যায়, তিনি কেন্টের দর্শন আর গিবনের ইতিহাস নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারতেন।

হরিশচন্দ্র তরুণ বয়সেই সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি সুবিখ্যাত কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত Hindu Intelligencer পত্রে লিখতে আরম্ভ করেন। এই পত্রেই তাঁর সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। এছাড়া তিনি তদানীন্তন ইংরেজ সম্পাদিত সাময়িকপত্রের লেখক ছিলেন। তবে "হিন্দু পেটরিয়ট" সম্পাদন করেই অক্ষয় যশ অর্জ্জন করেন।

হিন্দু পেটরিয়ট ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন রায় কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮২৯—৬৯)। গিরিশচন্দ্রের সহিত হরিশচন্দ্রের বন্ধুত্ব থাকায় হরিশচন্দ্র প্রথম থেকেই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নিয়মিত লিখতেন। কিছু দিন পর গিরিশচন্দ্র "হিন্দু পেটরিয়ট"এর সংস্রব ত্যাগ করলে হরিশচন্দ্র স্বয়ং হিন্দু পেটরিয়ট সম্পাদন করতে থাকেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই স্বত্বাধিকারীর ভীষণ আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় তিনি কাগজ তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তখন হরিশচন্দ্র মাথায় হাত দিয়ে বসেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সংবাদপত্র ব্যতীত জাতি গঠন হতে পারে না—দেশের উন্নতিও হতে পারে না। তাই স্বদেশপ্রেমিক হরিশচন্দ্র সাংসারিক অর্থকষ্ট স্বীকার করে বড় ভাই হারাণচন্দ্রের নামে "হিন্দু পেটরিয়ট" এর স্বত্ব ক্রয় করে (জুন ১৮৫৫) নতুন উদ্যমে হিন্দু পেটরিয়ট সম্পাদন করতে থাকেন। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও যুক্তি-পূর্ণ সমালোচনামূলক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য অল্প কালের মধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমগ্র ভারতের জনগণের মুখপত্র রূপে সম্মানিত হয়। সিপাই বিদ্রোহের সময় তিনি এমনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করেন যে মাদ্রাজের ব্যারিষ্টার জন ব্রুস নর্টন তাঁর Rebellion in India নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখেছিলেন, Let the Sceptical study the leading articles in the "Hendoo Patriot" written by a Brahmine with a spirited degree of reflection and acuteness which would do honour to any journalism in the world.

বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ সরকার যখন নির্বিচারে সমগ্র ভারতবাসীর উপর নির্ম্মম অত্যাচার চালাতে থাকে যখন হরিশচন্দ্র যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ প্রবন্ধের দ্বারা ইংরেজ সরকারকে দেশবাসীর উপর অত্যাচার থেকে নিরস্ত হতে উপদেশ দেন। শুধু তাই নয়, যখন একযোগে ইংরেজ-সম্পাদিত সংবাদপত্রগুলি অত্যাচার সমর্থন করে সরকারকে অধিকতর অত্যাচারে উত্তেজিত করে এবং দেশীয় ইংরেজদের নিরাপত্তার জন্য ভারতীয়দের নিরস্ত্রীকরণের জন্য দাবী জানায়, তখন হরিশচন্দ্র একা সমগ্র দেশবাসীর হয়ে প্রতিটি ইংরেজী সংবাদপত্রের এই অসঙ্গত আব্দারের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং সরকারকে এর অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সচেতন করে দেন। হরিশচন্দ্রের অকাট্য যুক্তিপূর্ণ উপদেশ-নির্দেশ তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং অবহেলা করতে পারেন নি। তিনি হরিশচন্দ্রের প্রবন্ধ সমগ্র ভারত-বাসীর মনোভাব বুঝতে পারেন। তিনি হরিশচন্দ্রের উপদেশ-নির্দেশ মত বহুকার্য্য পরিচালনা করতেন, তিনি স্বজাতি ইংরেজ সম্প্রদায়ের অসঙ্গত দাবী শোনেননি। ফলে তিনি সমগ্র ইংরেজ সম্প্রদায়ের বিরাগ-ভাজন হন। ইংরেজ সম্প্রদায় তাঁকে Clemency Canning—দয়াময় ক্যানিং বলে বিদ্রূপ করেন।

এই সময় বাঙলার কৃষকগণের উপর নীলকরদের অত্যাচার চরম সীমায় গিয়ে উঠে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নীলচাষীগণ হরিশচন্দ্র প্রভৃতি জননেতার নেতৃত্বে নীলচাষ করে না বলে বিদ্রোহ করল। নীলচাষীদের অত্যাচার নিবারণের জন্য হরিশচন্দ্র আপ্রাণ চেষ্টা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, হরিশচন্দ্রের যে লেখনী লর্ড ডালহাউসির অযোধ্যাধি-কারের সময় অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছিল, তাহাই মিউটিনির সময়ে ক্যানিংএর পৃষ্ঠপোষক হইয়া শান্তিস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই লেখনী আবার নীলকরদের অত্যাচার নিবারণার্থ সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। নীলকর অত্যাচার নিবারণ হরিশচন্দ্রের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। এই কার্য্যে তিনি দেহ, মন, অর্থ, সামর্থ্য সকলই নিয়োগ করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকাল থেকে নীল এই ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হত। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম নীল উৎপন্নের পূর্ব্বে ভারতবর্ষই পৃথিবীর সর্ব্বত্র নীল রপ্তানী করত। ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানী নীলের আটত্রিশ ভাগ নীল উৎপন্ন হত এই বাঙলাদেশে। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে এত নীল উৎপন্ন হত না। তাই নীলকররা, বাঙলাদেশেই তাদের নীল উৎপাদনের প্রধান ঘাঁটী করে। এদেশে নীল উৎপন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। নীলকররা বাঙলাদেশের নিরীহ গরীব চাষীদের নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে ও নানা কৌশলে নীল চাষ করিয়ে নিত। আর সেই নীল বিদেশে রপ্তানী করে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করত। কিন্তু চাষীদের লাভ হওয়া দূরের কথা সারা বছরের অন্ন থেকে বঞ্চিত হত। সারা বছর নীলচাষ করে ধান চাষ করবার সময় থাকত না—উপযুক্ত জমিও পেত না। আর নীল চাষ করে যা মজুরী তারা পেত, তা দিয়ে দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান হত না। ফলে সারা বছর একরকম অনাহারে থাকতে হত। তাই তারা নীলচাষ করতে চাইত না। এদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাত ছাড়া হচ্ছে দেখে নীলকরেরা চাষীদের উপর নানারকম অত্যাচার করে নীলচাষ করতে বাধ্য করত। চাষীদের উপর নীলকরদের সেই নির্ম্মম অত্যাচারের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে অমর নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'

নাটকে (১৮৬১)। এর কোন প্রতিকার ছিল না, আদালতে নালিশ করলে সুবিচার পাওয়া যেত না, শ্বেতাঙ্গ বিচারপতি স্বজাতি নীলকরদের নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করে চাষী প্রজাদের শাস্তি বিধান দিত। যখন এইরকম অবস্থা তখন চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়ে "গলা কেটে ফেললেও নীলচাষ করব না" বলে প্রতিজ্ঞা করে বিদ্রোহ করল।

নির্ভীক সাংবাদিক হরিশচন্দ্র বিদ্রোহের প্রথম থেকেই দরিদ্র অসহায় নীলচাষীদের পক্ষ নিয়ে অত্যাচারী নীলকরদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের কাহিনী "হিন্দু পেটরিয়ট" পত্রে সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রকাশ করে জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি নানাপ্রবন্ধে নীলকরদের কার্য্যকলাপ ও অত্যাচারের কাহিনী জোরাল ভাষায় প্রতিবাদ করেন এবং তীব্রভাবে নিন্দা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সরকারের কাছে এর প্রতিবিধানের জন্য দাবী জানান। অসহায় চাষীদের নিদারুণ অবস্থার কথা দেশ ও দেশবাসীর চোখের সামনে তুলে ধরেন। সহযোগিতার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেন। অচিরেই হরিশচন্দ্রের সেই আহ্বানের সাড়া পাওয়া গেল। তাঁর জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাঠ করে দেশবাসী উত্তেজিত হয়ে উঠে। তারা হরিশচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দাবী আদায়ের জন্য এক সংঘবদ্ধ আন্দোলন সুরু করে। দেশের সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় এই আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হতে দেরী হলো না। বিলাতের Royal Institute of International Affair এই গণ-আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায়রূপে বর্ণনা করেছেন। এই গণ-আন্দোলনের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করে তদানীন্তন ভারত সরকার বিচলিত হয়ে উঠেন— বিদ্রোহ তদন্তের জন্য এক কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনে সাক্ষ্যদান কালে হরিশচন্দ্র যেমন নীলকরদের নির্ম্মম নির্য্যাতন বর্ণনা করেন, তেমনি নীলচাষীদের নিদারুণ অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। ফলে নীলকরদের অত্যাচার প্রমাণিত হয়। সরকার সেই অত্যাচার দূর করবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করেন। বিষধর নীলকরদের বিষদাঁত উৎপাটিত হয়, দেশ থেকে নীলকরের দৌরাত্ম্য দূর হয়।

হরিশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু "বেঙ্গলী" সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, It is perhaps not generally known that Horish Chandra Mukherjee aided the Indigo ryotes not merely witb pen but also his purse. He did not ouly blame the libel law for the benefit of the ryotes, but he fed and clothed those who personally sought the mercy of the Lieutenant Governor in the Belvedere House. His private resources were heavily taxed for this public purpose and he freely placed them at the service of his suffering countrymen.

হরিশচন্দ্রের বসত বাড়ীতে চাষীপ্রজারা প্রায় আসত। তিনি তাদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। তিনি কখনও তাদের মকর্দ্দমা তদারক করতেন, কখনও তাদের মকর্দ্দমার ফলাফল শুনতেন, কখন উকিলের কাছে যাবার জন্য পরিচয়পত্র লিখে দিতেন। এরই মধ্যে তিনি "হিন্দু পেটরিয়ট" পরিচালনা ও সম্পাদনার কাজ করতেন। এর উপর ছিল অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। তথাপি তিনি নিরস্ত হননি। অফিস থেকে ফিরে এসে রাত জেগে চাষী প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করে প্রবন্ধ রচনা করতেন। দিবারাত্রি দিনের পর দিন এই অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভীষণ ভাবে ভেঙ্গে যায়। তিনি শয্যা গ্রহণ করেন।

এই সময় নীলকররা হরিশচন্দ্রের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। তারা হরিশচন্দ্রের নামে এক মানহানির মামলা রুজু করে এবং মানহানির জন্য দশহাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করে। হরিশচন্দ্র নীলকরদের নির্ম্মম নির্য্যাতনের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে ভুলক্রমে একটি প্রবন্ধে মিষ্টার হিলস্ নামক একজন নীলকরের বিরুদ্ধে হরিমণি নামে একজন নারীর সতীত্বনাশের কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। শেষে তিনি ভুল স্বীকার করলে মামলা-খরচের টাকা দিতে আদিষ্ট হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইতিমধ্যে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

হরিশচন্দ্রের জীবন যে অমূল্য, এ মাইকেল মধুসূদন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতেন। হরিশচন্দ্র যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তিনি আশঙ্কিত চিত্তে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন, They say, poor Harish of the Patriot is dying, This is very painful, of all men now living he had exercised the greatest amount of influence over the educated classes of our country. His death would be a real loss, not to our literature, for he writes Feringishly, but to the progress of independen ce of mind and thought. I hope he will recover,

মধুসূদনের আশা পূর্ণ হয় নি ; এর কিছু দিন পরই (১৪ই জুন ১৮৬১) অকালে ৩৭ বছর বয়সে হরিশচন্দ্রের জীবনদীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হয়।

কবিবর নবকৃষ্ণ ঘোষ হরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে লিখেছেন :—

দেশব্রত হোমানল জ্বালিয়া অন্তরে
রিক্ত হস্তে এলে তুমি মাতৃ যজ্ঞ স্থলে
নৈবেদ্য অভাবে শুধু ভক্তি বিল্বদলে
পূজিয়া প্রসন্ন করি' তুমি ক্ষণ তরে
আনিলে লেখনী অগ্রে মহাশক্তিধরে।
দেশের বিপক্ষ নীতি-প্রচারক দলে
দলিয়া নিমেষে তুমি জয় কোলাহলে,
ডালি দিলে আপনার যজ্ঞ বৈশ্বানরে।
এখনো উড়িছে তব যজ্ঞের বিভূতি
"হিন্দু পেট্রিয়ট" মাখি স্মৃতির চন্দন
বিদ্রোহের পরে তব শান্তি নীতি স্তুতি,
নীলকর উৎপীড়ন অসহ্য বর্ষণ।'
তোমার সে মাতৃযজ্ঞে জীবন আহুতি
যুগে যুগে বঙ্গবাসী করিবে স্মরণ।

উইলিয়ম কেরী ও বাংলা বাইবেল

শৈলেনকুমার দত্ত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং খ্রীষ্টীয় সমাজে উইলিয়ম কেরীর নাম চিরদিন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। নিছক ধর্মপ্রচারের জন্তে এ দেশে এসে তিনি যা উপকার করে গেছেন তার তুলনা বিরল। শোনা যায়, শুধু মাত্র বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদের জন্তে তাঁকে ৪১ বৎসর একাদিক্রমে পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আর সব থেকে পরিশ্রম করতে হয়েছিল বাংলা অনুবাদের জন্তে।

মদনবাটিতে থাকবার সময় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এখানে বাইবেল প্রচার করতে হলে আগে বাংলা ভাষা শিখতে হবে। তাই কেরী এখানে ছ বছর থেকে পণ্ডিত রামরাম বসুর কাছে বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। প্রথম বছরের মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষায় সুন্দরভাবে কথা বলতে পারতেন। এই কুঠীতে বসেই তিনি ওল্ড ও নিউ টেষ্টা-মেণ্টের কয়েকটি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁকে এ প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছিলেন রামরাম বসু ও ফাউনণ্টেন।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ওল্ড ও নিউ টেষ্টামেণ্টের অধিকাংশ অনুবাদ শেষ হয়। কিন্তু তখন সমস্যা দেখা দেয় প্রকাশ করার। তখন কোলকাতায় বাংলা ছাপবার জন্তে মাত্র একটি প্রেস ছিল। কেরী সেখানে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে দশ হাজার নূতন নিয়ম ছাপবার জন্তে ৬০,০০০৲ টাকার (মতান্তরে ৪৩,৭৫০ টাকা) দরকার। কিন্তু তাঁর কাছে এত টাকা ছিল না। তাই তিনি ইংলণ্ড থেকে বাংলা হরফ তৈরী করে আনার মনস্থ করেন। এ প্রসঙ্গে ৬ই জানুয়ারীর একটি পত্রে তিনি লেখেন, I intend soon to send specimens of Bengali letters, for types. A considerable part of this expense I hope to be able to bear myself. ২৭শে জানুয়ারী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে যে পত্র দেন তাতেও ওই একই কথার পুনরুক্তি দেখা যায়: It will be requisite for the society to send a printing press from England, and if our lives are spared, we will repay them.

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর এ মতের পরিবর্তন হয়। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্রে তিনি একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পান। মাত্র চার'শ টাকায় একটা প্রেস বিক্রী হবে। ইউডনী নামে একজন সহৃদয় খ্রীষ্টভক্ত এই প্রেসটি কিনে কেরীকে দান করেন। কিন্তু এ শুধু ছাপাখানা। কোন বাংলা হরফ এখানে ছিল না। কেরী কোলকাতায় এসে সমস্ত হরফ তৈরী করান।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রেসটি মদনবাটি ঘাটে এসে পৌছায়। কিন্তু এখানেও এক বিপদ। তাঁকে সেই মাসেই খিদিরপুরে চলে যেতে হয়। তাঁর সমস্ত জমানো টাকা দিয়ে ইউডনীর কাছ থেকে একটা নীলকুঠি কিনে তাঁর পরিবার এবং ফাউনণ্টেনকে সঙ্গে নিয়ে খিদির-পুরে গেলেন সংসার পাততে। নতুন মুদ্রা যন্ত্রটিও তাঁদের সঙ্গে ছিল।

কিন্তু সরকার পক্ষ তাঁদের কোলকাতায় ঠাঁই দিলেন না। সব শেষে তাই ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে সমস্ত পরিবার এবং মুদ্রা যন্ত্রটি সমেত তিনি ডেনিশ রাজ্য শ্রীরাম-পুরে এসে পৌছালেন। তাঁর এ সময়ের অবস্থাটা S, P, Carey বেশ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—

...with his wife and daughter he moved hither and thither, never in one stay. Now living in a boat, now in a bamboo hut; now in Nadia, now in Beerbhum; now preacher, now sugar-refiner and distiller and now again indigo-venturer; A rolling stone, a warm heart, a wary wad judgement and will!

সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তিনি এবার ছাপার কাজ আরম্ভ করলেন। ১৮০১ সালের মধ্যে নূতন নিয়ম ছাপা শেষ হয়। তারপর বাঙালী খ্রীষ্টীয় সমাজে একটি দিন চিরস্মরণীয় হল—৫ই মার্চ ১৮০১। ঐ দিন বাইবেলের সমগ্র নূতন নিয়ম বাংলায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের বইখানি ছিল ডিমাই আট-পেজী আকারের। এতে কোন পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল না। প্রথম দিন একখানি বই প্রভুর মেঝের ওপর উৎসর্গ করা হয়েছিল। ইংলণ্ডের ও ডেনমার্কের রাজা উভয়েই এক একখানি বাংলা নূতন নিয়ম উপহার স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। নূতন নিয়ম প্রকাশিত হবার পর লর্ড ওয়েলেসলির দৃষ্টি কেরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় জর্জ্জ বাংলা নূতন নিয়ম হাতে পেয়ে বলেছিলেন, "আমার একজন প্রজা এই প্রকার মহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত আছে জানতে পেরে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।" এই নূতন নিয়ম প্রকাশিত হবার পরই ৮ই এপ্রিল তারিখে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক রূপে কেরীকে নিয়োগ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কিন্তু এত কিছুর পরই কেরী নূতন নিয়ম প্রচারের কিছু করতে পারলেন না। গ্রন্থটি ছাপা হবার পর ওয়ার্ড একবার হাওড়ায় যান। প্রচারের সুবিধা না হওয়ায় তিনি এক খণ্ড বই রামকৃষ্ণপুরে রেখে আসেন। বইখানি কৃষ্ণদাস নামে একজন হিন্দুর হাতে পড়ে। পড়া শেষ হলে তিনি বইখানি আর এক জনের হাতে দেন। ফলে সমস্ত গ্রামে একটা নতুন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। জগন্নাথ দাস নামে একজন হিন্দু তাঁর বাড়ী থেকে দেব প্রতিমা ফেলে দেন এবং দুবছর পরে রামকৃষ্ণপুর থেকে অনেক হিন্দু শ্রীরামপুরে এসে দীক্ষা নেন। যশোহরেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে।

এই তো গেল নূতন নিয়মের কথা। ১৮০১ সালে নূতন নিয়ম প্রকাশিত হবার পর—পরপর চার খণ্ড পুরাতন নিয়ম প্রকাশিত হয়। ১৮০২ সালে পঞ্চ গ্রন্থ, ১৮০৩ সালে গীতসংহিতা, ১৮০৭ সালে ভাববাদীদের গ্রন্থাবলী এবং ১৮০৯ সালে ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী।

সমগ্রভাবে প্রকাশিত হবার পর বাইবেলের চাহিদা বাড়তে থাকে। নূতন নিয়মের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৮০৬ সালে, তৃতীয় ১৮১১ সালে এবং চতুর্থ ১৮১৬ সালে। ১৮৩২ সালের আগে এরকম ৭টি সংস্করণ হয়। পুরাতন নিয়মের পঞ্চগ্রন্থ বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৮১৩ সালে।

বাইবেলের এই অনুবাদগুলির প্রতি সংস্করণেই সংশোধন করা হয়। সম্পূর্ণ সংশোধন করতে ১২ বৎসর সময় লাগে। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে কেরী বাংলা বাইবেলের অষ্টম সংস্করণের শেষ পাতার প্রুফ সংশোধন করে বলেছিলেন—"আমার কাজ শেষ হয়েছে। প্রভুর আগমনের অপেক্ষা করা ব্যতীত আমার আর কিছুই করবার নেই।"

বিন্দু চেয়ে সিন্ধু পাই

সনতকুমার মিত্র

অনেক পাথর ছুঁয়ে এসেছি এখানে, দেখি পিছে
পাথর অক্ষত আছে, শেওলা জমেনি কারো গায়ে;
(আমার ছোটাই সার? ব্যর্থ তবে এত কলগান?
ছোট বড় সকলেই জানিয়েছে নিছক সম্মান?)
আমার স্মৃতিকে কেউ রাখলোনা হৃদয়ের ছায়ে—
যা কিছু প্রবাহ পথে রাখলেম সব তবে মিছে!

ওগো, আমি এ চাইনি, হৃদয়ের ছিল শুধু সাধ,
এক বিন্দু প্রেম পাব, নীড় পাব, স্নেহের উত্তাপে
বিন্দুতে সিন্ধুকে পাব; সে আনন্দে পথ ছুটে এসে
অবশেষে কি পেলাম? ব্যঙ্গ ক'রে এই দেখ মেশে
জীবন প্রবাহ আজ চোখের জলের অভিশাপে।
বিন্দু চেয়ে সিন্ধু পাই, লবণাক্ত সিন্ধুর আস্বাদ॥

ব্যাধি

শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়

প্রথমে একটা সাইকেলের দোকান, তার পাশেই একটা ময়রার দোকান, তার পরেই সিং দরজা। এখনো অবশ্য লোকে বলে সিং দরজা, কিন্তু নামটা না বোললে ওখানে যে এককালে দরজা ছিল তা কেউ বুঝ্‌তে পারবে না। পাচীল এবং দরজা সবটাই ভেঙ্গে পড়েছে, কিন্তু একটা সিংহ মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও একটু চেষ্টা কোর্‌লে ভগ্নস্তূপের মধ্যে পাওয়া যায়।

এইখান দিয়েও বাড়িটার মধ্যে ঢোকা যায়, কিন্তু এখানটার পথ দুর্গম। লোকে আজকাল এটা ব্যবহার করে না। একই বাড়ির মধ্যে এখন্ অনেকগুলি বাড়ি হোয়েছে এবং বাড়ির মধ্যে যাতায়াতের জন্যে বিভিন্ন সদরও হোয়েছে। তবে এককালে এই সমস্ত বাড়ি মিলিয়ে একটা বাড়িই ছিল। চৌধুরী বাড়ি।

সিংদরজার ভেতর দিয়ে সরু পথ দিয়ে এগিয়ে গেলে প্রথমেই চোখে পড়বে পূজোর দালান। অনেকগুলো, বেশ অনেকগুলো সিঁড়ি পার হোয়ে তবে পূজোমণ্ডপে উঠ্‌তে পারা যায়। পূজোদালানের সামনেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, আর তার তিনপাশ ঘিরে তিনটে দালান। এক একটা দালানে অনেকগুলো ঘর। ঘরগুলো সবকটাই বিধ্বস্ত, অনেকগুলো একেবারেই পড়ে গেছে। কিন্তু পূজামণ্ডপটি এখনও অটুট, সংস্কারের চিহ্ন এর গায়ে বর্ত্তমান। চৌধুরীরা এখনও এটা ভেঙ্গে পড়তে দেন নি। এককালে এখানে মোষবলি হোত, এখন আখবলিতে এসে ঠেকেছে।

পূজোবাড়ি পার হোলে অবাক্ হোয়ে যেতে হয়। পুরোনো বাড়িকে সংস্কার করে, অদলবদল কোরে নতুন হাল্‌ফ্যাসানের যে বাড়িখানা বর্ত্তমান, তার মালিক বৃদ্ধ অয়স্কান্ত বাবু। অয়স্কান্ত চৌধুরী। চৌধুরী এঁদের উপাধি, নবাবী আমলের পাওয়া। বৃদ্ধ অয়স্কান্ত চৌধুরী এই চৌধুরী বংশের শেষ জমিদারের প্রতীক। আর সব বাবুরা বহুদিন আগেই স্থানত্যাগ কোরে কোলকাতায় চলে এসেছেন, তাঁদের নামের সংগে তাঁদের ধামও এখানের মাটিতে মুছে যেতে বসেছে। কেবল যাননি অয়স্কান্ত চৌধুরী। লোকে বলে, অয়স্কান্ত চৌধুরীর বাড়িতে নাকি সোনার ইঁট আছে, বুড়ো যেতে পারে নি তারই মায়ায়। তা না হোলে, তাঁর একমাত্র পুত্র ইন্দ্রকান্ত মারা গেলে তিনি এখানে পড়ে আছেন কিসের মায়ায়?

ইন্দ্রকান্তকে অয়স্কান্ত চৌধুরী চেয়েছিলেন পুরোপুরি জমিদার করে গড়ে তুলতে। ছোটো বেলা থেকেই তিনি ছেলেকে চেয়েছিলেন পাকা জমিদার করে গড়তে। ওস্তাদ রেখে যেমন লাঠি, সড়কি, বন্দুক ছোড়া শিখিয়েছিলেন, তেমনই শিখিয়েছিলেন সঙ্গীতবিদ্যা। ছেলে কিন্তু জমিদার হোলো না, হোলো হাকিম। হুকুম ছেড়ে হাকিম, অসি ছেড়ে মসী। অয়স্কান্তবাবু ছেলের হাকিম হওয়ার সংবাদে গুম হোয়ে বসেছিলেন, পুরো দুদিন কারুর সংগে কোনো কথা বলেন নি। কেবল ঘরে বোতলের পর বোতল জড়ো হয়েছিল। তারপর ছেলের আর খবরই তিনি রাখেননি।

ছেলের খবর নিয়েছিলেন, ছেলে মারা যাবার পর; ছেলের জন্যে নয়, ছেলের বৌ-এর জন্যে। ছেলে মারা গেলেও, তাঁর পুত্রবধূ যে বাপের বাড়িতে থাকবে তা হতে পারে না, এ বংশে তা' হয়নি। সোজা কোলকাতা গিয়ে পুত্রবধূকে সংগে নিয়ে এসেছিলেন। এ বাড়ির বৌয়েরা বিয়ে হবার পর কেউ কোনোদিন বাপের বাড়িতে গিয়ে তিনরাত একসংগে কাটান নি, সে রকম নিয়ম চৌধুরী বংশে ছিল না। ছেলের সংগে অয়স্কান্ত চৌধুরীর বিবাদ থাকতে পারে, কিন্তু বাড়ির বংশ মর্য্যাদার ওপর কোনো কথা চলতে পারে না, চলেনিও।

প্রথমে সুমিতা, তাঁর পুত্রবধূ আপত্তি জানিয়েছিল। সে লরেটোতে পড়া মেয়ে, স্বাধীনভাবে চিরকাল মানুষ। যে শ্বশুরবাড়িতে সে কোনোদিন যায়নি, এমন কি, যে শ্বশুরকে আগে সে কোনোদিন দেখেই নি, তাঁর সংগে কোন্ সুদূরে, এক আধা-শহর আধা-গ্রামে যেতে তার মন সরছিল না। কিন্তু মেয়ে আপত্তি কোর্‌লেও, মেয়ের বাবা আপত্তি কোর্‌তে পারলেন না। বুড়ো আর কদিনের জন্যেই বা আছে, কিন্তু সম্পত্তি? সে সম্পত্তির আয়ব্যয়ের হিসেবের ওপর চোখ বুলোলে—

অতএব সুমিতা শ্বশুরবাড়িতে এলো, কিন্তু সেই যে এলো, আর বাপের বাড়িতে যাওয়া আর তার হোলো না। প্রায় সব বিষয়েই অয়স্কান্তবাবু সুমিতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠলেন, যেন ইচ্ছে করেই তিনি তার হাতে নিজের সব ভার আস্তে আস্তে তুলে দিলেন। রণক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করার সময় অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ যে কৌশল অবলম্বন করেন, প্রায় সেই কৌশলে। জড়িয়ে গেল সুমিতা জমিদারীর ঊর্ণনাভে।

প্রথম প্রথম সুমিতার মন এখানে বসে নি। সুমিতার বাবা রমেনবাবু চেষ্টাও করেছিলেন প্রথম প্রথম, কিন্তু সফল হন নি। বাগানের ভেতর একটা বিলিতি ফলের গাছ দেখিয়ে অয়স্কান্ত চৌধুরী বলেছিলেন,—'জানেন বেহাই মশাই, যখন এই গাছটা বিলেত থেকে আনি তখন সবাই বলেছিল, এ বাঁচবে না। যে ফার্ম থেকে গাছটা আনিয়েছিলাম, তারাও সন্দেহ জানিয়েছিল। কিন্তু এ মাটিতে আমিই ওকে বাঁচিয়েছি।' একটু চুপ কোরে থেকে রমেনবাবু বলেছিলেন,—'কিন্তু ফল দিয়েছে কি কোনোদিন গাছটা?'

সূর্য্যের শেষ আলো যেমন ডুববার আগে সমস্ত আকাশে ছড়ায়, তেমনি একটু মৃদু হাসি, একটু বিষণ্ণ হাসি ছড়ালো অয়স্কান্ত চৌধুরীর মুখে। বোল্‌লেন—'ফলের চেষ্টাতেই তো গাছ পোঁতা। ফল দেবেই এমন কোনো স্থিরতা নেই, তবে চেষ্টা তো কোর্‌তে হবে।'

রমেনবাবু আর কোনো কথা বোললেন না, বুঝলেন, এখানে যুক্তিতর্ক বৃথা। তিনি নিজে সিভিলিয়ান, জীবনে বহু চরিত্রের লোক তিনি দেখেছেন, এক নজরেই লোক চেনেন।

অয়স্কান্তবাবু পুত্রবধূর জন্যে আবার নোতুন উদ্যমে লাগলেন। লেখাপড়া সুমিতা ভালোই জানতো, কিন্তু সেই শিক্ষার সংগে বিষয়বুদ্ধির যোগ ঘটালেন অয়স্কান্তবাবু। জমিদারের সেরেস্তার চেক্ কাটা থেকে আরম্ভ কোরে মোটামুটি আইনজ্ঞান পর্য্যন্ত তিনি নিজে বোসে শিখোলেন সুমিতাকে। তার জন্যে বাড়ি ভেঙে নোতুন কোরে গড়লেন, এমন কি একটা পিয়ানো পর্য্যন্ত ওর জন্যে আনালেন। বনেদিয়ানার সংগে আধুনিকতার একটা বিচিত্র সংযোগ তিনি ঘটাতে চাইলেন। শুধু মুক্ত বিহঙ্গীকে তিনি যে শিকলটি পরালেন, সেটা সোনার। সুমিতা পর্দ্দানশীনই রইল।

অয়স্কান্তবাবু যে মহলটায় থাক্‌তেন তারই পাশের অংশটা অনেকদিন খালি পড়ে ছিল। এই অংশটাও সুবৃহৎ। শুধু ওপরেই ১০ খানা ঘর, নীচে আরও বেশী। কিন্তু সব ঘরগুলো বসবাসযোগ্য করে কোনোদিনই সারান হয় নি। ওপরের তিনখানি ও নীচের পাঁচখানি ঘর মোটামুটি সারান ছিল। কালেভদ্রে এই অংশের শরিকরা আসতেন। একদিন দেখা গেলো এই বসবাসযোগ্য ঘরগুলি মেরামত করা হোচ্ছে। অয়স্কান্তবাবু খোঁজ নিয়ে জানলেন কে একজন ডাক্তার এই অংশটাতে আসবেন। পরে খোঁজ পেলেন মধু ডাক্তার এখানে থাক্‌বেন। অয়স্কান্তবাবুর এটা পছন্দ হোলো না। চৌধুরীবাড়ীতে ভাড়া বসান তিনি ভাল চোখে দেখলেন না। কিন্তু এখানে তাঁর কথা চল্‌বে না। কারণ পাশের অংশটা বিপিনকৃষ্ণ চৌধুরীর, তাঁরা কোলকাতায় ব্যবসা কোরে ফেঁপে উঠেছেন। ভেবেছেন যদি এই মফঃস্বলের বাড়ি থেকে কিছু আয় হয় মন্দ কি! তাতে অন্ততঃ বাড়িটা সারানও তো চল্‌বে।

অবশ্য ইচ্ছে কোর্‌লে অয়স্কান্তবাবু মধু ডাক্তারকে এখান থেকে উঠিয়ে ছাড়তে পারতেন, সে ক্ষমতা তাঁর আছে, এমন কি, বর্ত্তমান থানাপুলিশের রাজত্বেও। কিন্তু মধু ডাক্তার এখানের ২৫।৩০ মাইলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ডাক্তার, লোকও ভালো। অয়স্কান্তবাবু ভাবলেন পাশেই যদি এমন একজন ডাক্তার থাকেন তো সেটা সুবিধেরই হবে। কোলকাতা থেকে ৫০ মাইল দূরে সচরাচর এরকম ভালো ডাক্তার পাওয়া যায় না।

মধু ডাক্তার ভদ্রলোক। তিনি এসে অয়স্কান্তবাবুর

কাছে গিয়ে বোললেন—'আমি পাশে আছি বলে কি আপনার কোনো অসুবিধে হবে ?'

'বিলক্ষণ, কি যে বলো, বরং এতো ভালোই' অয়স্কান্তবাবু বোললেন। অয়স্কান্তবাবু আগেই মধু-ডাক্তারকে চিনতেন, সেই সুবাদে এবং বয়সে অনেক ছোট বলে অয়স্কান্তবাবু মধু ডাক্তারকে তুমিই বোললেন। তাছাড়া সচরাচর অয়স্কান্তবাবু কাউকে আপনি বলেন না।

'না, বলছিলাম আপনারা মানী লোক, মানী বংশ। আপনাদের সংগে সমানভাবে ওঠাবসা করা আমাদের সাজে না। কিন্তু পাকিস্তান হোয়ে গেলো, ওপারে তো থাকবার কোনো উপায় নেই, তাই বাধ্য হোয়ে এই ব্যবস্থা কোর্‌তে হোলো।' প্রায় নগদ দেড় দুই লক্ষটাকার মালিক মধু ডাক্তারের গলার স্বরে বিনয় উথলে উঠলো। সূর্য্যকে আড়াল কোরে লঘু যে মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল, আস্তে আস্তে তা' কেটে গেলো, অয়স্কান্তবাবু হাস্‌লেন।

মধু ডাক্তার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নিজের ব্যবসা চালাতে গেলে কোন্‌খানে কতখানি করা দরকার মধু ডাক্তার জানতেন। ডাক্তারী ছাড়াও তাঁর এখানে স্বনামে-বেনামে অনেকগুলো কারবার আছে। একটা ধানকলেরও মালিক তিনি। ইচ্ছে কোর্‌লে অয়স্কান্ত-বাবুর বাড়ির মত তিনি যে একটা বাড়ি তৈরী কোর্‌তে পার্‌তেন না তা নয়, কিন্তু তিনি তা করেন নি। এদেশে তিনি এসেছেন আজ অনেক বছর, কিন্তু এদেশের তিনি একজন হয়ে উঠতে পারেন নি। এদেশের লোককে তিনি নিজের বলে ভাবতে পারেন নি আজও পর্য্যন্ত। এখন দুহাতে তিনি পয়সা জমিয়ে যাচ্ছেন, প্রস্তুত হোচ্ছেন, একদিন এইস্থান ছেড়ে যাবেন বলে। ছেলেদেরও তিনি মানুষ কোর্‌ছেন কোলকাতায়, মামারবাড়িতে। প্রথম জীবনে বহুকষ্টের ভেতর দিয়ে মানুষ হোয়েছেন মধু ডাক্তার, বিয়েও তিনি কোরেছিলেন এক কুরূপা মেয়েকে—শুধুমাত্র পয়সা ও প্রতিষ্ঠার জন্যে। তখনকার দিনে নগদই তিনি নিয়েছিলেন আট হাজার টাকা। তা না হোলে ডিস্‌পেন্‌সারী তিনি কোর্‌তে পার্‌তেন না, ডাক্তারীতে কতখানি প্রতিষ্ঠালাভ কোরতে পার্‌বেন তাও ছিল তখন অনিশ্চিত।

মধু ডাক্তারের স্ত্রীর বাপের উচিত ছিল অয়স্কান্ত চৌধুরীর বাড়ি। কিন্তু মধু ডাক্তার তা' পছন্দ কোর্‌তেন না। আজ পর্য্যন্ত মধু ডাক্তারের স্ত্রী এদেশে কারুর বাড়ি যাননি, কোনো নিমন্ত্রণেও না। এ বিষয়ে অয়স্কান্তবাবুর সংগে মধু ডাক্তারের আশ্চর্য্য মিল। অয়স্কান্তবাবুর পুত্রবধূকেও কেউ কোনো-দিন বেরুতে দেখেনি। সুতরাং পাশাপাশি দুই প্রতিবেশী রইল, কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা হয়ে।

সেদিন রাত্তিরে মধু ডাক্তার একটা কল্ থেকে ফিরছেন —এমন সময় দেখেন অয়স্কান্তবাবুর ম্যানেজার তাঁর বাড়ির দরজার সামনে পায়চারি কোর্‌ছেন। সাইকেল থেকে নেমে পড়ে মধু ডাক্তার বোল্‌লেন,—'কি খবর সুধাবিন্দুবাবু ?'

'আপনার জন্যে অপেক্ষা কোরছিলাম, এখনই একবার যেতে হবে।'

'কি ব্যাপার, কারুর অসুখ না কি ?'

'হ্যাঁ—কর্ত্তা হঠাৎ পড়ে গেছেন, তারপর থেকে জ্ঞান হয় নি। অন্য ডাক্তারও আছেন, কিন্তু বৌ-রাণী বোল্‌লেন আপনাকে ডেকে আন্‌তে।'

মধু ডাক্তার বাড়ির ভেতর না-ঢুকেই সুধাবিন্দুর সংগে চোল্‌লেন। অয়স্কান্ত চৌধুরীর বাড়িতে এসে ওপরে উঠে অনেকগুলো ঘরের ভেতর দিয়ে শেষে যে ঘরে এসে পৌছলেন সেটা অন্দরমহল। পাশাপাশি দু'খানা ঘর, একটি অয়স্কান্তবাবুর, পাশেরটি বৌ-রাণীর। মধু ডাক্তার এ মহলে এই প্রথম এলেন।

রোগীকে পরীক্ষা কোরে মধু ডাক্তার অন্যান্য ডাক্তারদের সংগে আলোচনা করলেন। তারপর বোললেন, ভয়ের কারণ আছে, কিন্তু উতলা হবেন না। রোগীকে এখন নাড়াচাড়া করাও চলবে না।

অন্যান্য ডাক্তাররা বিদায় নিলেন, যেখানে মধু ডাক্তার এসে রোগীর ভার নিয়েছে, সেখানে তাঁদের থাকাটা কেবলমাত্র অস্তিত্বমূলক, এটা তাঁরা জান্‌তেন।

মধু ডাক্তার কেবল রাত্তিরে একবার খেতে গেলেন বাড়িতে। তারপর ব্যাগ ভর্ত্তি করে নিয়ে এলেন আরও ওষুধ। জেগে থাক্‌লেন রোগীর পাশে। অপেক্ষা কোরতে লাগলেন ওষুধের ক্রিয়া কি রকম হয় দেখার জন্যে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চোল্‌ল, বারটা, একটা, দুটো পার হোয়ে। বাইরের ঘরে সুধাবিন্দুবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন, চাকর

চাকরাণীরাও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সমস্ত বাড়িতে প্রাণের সমস্ত লক্ষণই যেন মুছে গেছে। শুধু জেগে আছেন মধু ডাক্তার একা। না, আর একজন জেগে আছে, সেটা মধু ডাক্তার জানেন না। এই পাশের ঘরেই পর্দ্দাঢাকা ঘরের ওপাশেই একজন জেগে আছে। সেও মধুডাক্তারের মত তন্দ্রাহীন। সে বৌরাণী।

ডুটোর পর নিজে হাতে যে চা কোরে নিয়ে মধু ডাক্তারের সামনে এলো, তাকে দেখে মধু ডাক্তার অবাক্ হোয়ে গেলেন। অনেক প্রশ্ন অনেক উত্তর নিজের মনে ভেঙ্গে গড়ে বৌরাণী এসেছে, তার শিক্ষা তার সহজতাটুকুর সংগে তার অভিজাত্য তার নিষেধের আজ্ঞাকে তুলনা কোরে, ওজন কোরে অবশেষে বৌরাণী এসেছে, অয়স্কান্ত-বাবুর পর্দ্দানশীন পুত্রবধূ। মধু ডাক্তার প্রথমে অবাক্ হোয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথমে বুঝে উঠতে পার্‌লেন না, তার জন্যে কোনো কথা বলা প্রয়োজন কি না, বা কোনো কথা বলা চলে কি না। মধু ডাক্তার নিঃশব্দে শুধু কাপটা টেনে নিলেন, কোনো কথা বোললেন না।

বৌরাণীও কোনো কথা বোলল না, সেও শুধু একবার দেখে চলে গেলো। সমস্ত রাত্রিতেও মধু ডাক্তার একবারও জান্‌তে পার্‌লেন না—সে জেগে আছে না ঘুমচ্ছে।

শেষ রাত্তিরে অয়স্কান্তবাবুর জ্ঞান ফির্‌লো—কিন্তু তখন দিন না রাত্রি ঠিক্ কোরে উঠ্‌তে পার্‌লেন না অয়স্কান্ত চৌধুরী। মধু ডাক্তার যা ভয় কোরেছিলেন তাই হোলো, অয়স্কান্তবাবুর চোখ বোধ হয় জীবনের মতনই গেলো। প্রাণে বাঁচলেন অয়স্কান্তবাবু, কিন্তু তার জন্যে তাঁকে দাম দিতে হোলো ডুচোখের দৃষ্টি।

মধু ডাক্তার পরদিনও এলেন, তার পরেও আরও অনেক দিন। শুধু অয়স্কান্ত চৌধুরীর জন্য নয়, কিসের জন্যে মধু ডাক্তার তা' বুঝেও যেন বুঝ্‌তে চাইলেন না। আর একবার আর একখানা মুখ তিনি এ বাড়িতে খোঁজেন। কিন্তু দেখা পান না কোনোদিনই। একমাত্র অর্থ ছাড়া যে মধু ডাক্তারের সংসারের দ্বিতীয় কোনো আকর্ষণ ছিল না—না, তাঁর নিজের স্ত্রীও না, সেই মধু ডাক্তারের মনে হোলো, অয়স্কান্তবাবুর বাড়িতে বসে তাঁকে পরীক্ষা কোর্‌তে কোর্‌তেই, এ সংসারে তিনিই সব থেকে রিক্ত, সব থেকে তিনিই যেন ঠকেছেন জীবনে। অনেক পাওয়ার চেয়ে জীবনে একটা পাওয়াই যেন সব থেকে বড়ো পাওয়া।

সুমিতাকে মধু ডাক্তার জানতেন। জানতেন বোললে ভুল করা হবে। একদিন চেয়েছিলেনও বা জীবনে, কিন্তু মুখ ফুটে বোলবার সাহস হয়নি তাঁর। সিভিলিয়ান রমেন মিত্তিরের মেয়ে সুমিতা, যাদের বাড়িতে এককালে মধু ডাক্তার ট্যুইশানি কোর্‌তেন। ডাক্তারীতে ভালো ছাত্রই ছিলেন মধু ডাক্তার, কিন্তু পড়ার খরচ না লাগলেও, গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা মধু ডাক্তারকে নিজের পরিশ্রমেই এককালে কোর্‌তে হোতো। সেই সূত্রে সুমিতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। মধু ডাক্তার সুপুরুষ। সুপুরুষ বোললে যথেষ্ট বলা হয় না, একটা পুরুষকারের যোগ ছিল সেই সৌন্দর্য্যের সংগে। তাই সেদিন সুমিতার সংগে তাঁর যেন কী একটা গোপন বোঝাপড়াও চলছিল। কিন্তু সেদিন মধু ডাক্তার ছিলেন নিজের অবস্থার জন্যে কুণ্ঠিত। মুখ ফুটে কিছু বোল্‌তে পারেননি সেদিন। তারপর জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য কোলকাতা ছেড়ে তাঁকে আস্‌তে হয়। সুমিতার আর কোনো খবরই তিনি পাননি।

সেই সুমিতা রাত্রে চা হাতে নিয়ে তাঁর সামনে এলো সেদিন—যেটা এতোদিন তাঁর মনের মধ্যে চাপা পড়ে ছিলো, যেটা এতোদিন তিনি ভুলেই ছিলেন, সেটা হঠাৎ যেন ভূতের মত এক বিরাট্ আকার নিয়ে উঠলো সেই মনের কবর থেকে। সেই ভূত চেপে রইলো তাঁর কাঁধে।

তাই বারবার মধু ডাক্তার সুযোগ খোঁজেন—কবে আবার তার সংগে দেখা হবে, সেই সুমিতার সংগে। কিন্তু সে যেন বিদ্যুতের মতো একবার দেখা দিয়েই অন্ধকারের বুকে মিলিয়ে গেলো।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। মধু ডাক্তার আর কোনো খবর পাননি সুমিতার। অয়স্কান্তবাবু সেরে উঠেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধ হোয়ে।

সেদিন হঠাৎ অয়স্কান্তবাবুর বাড়ি থেকে মধু ডাক্তারকে ডেকে পাঠান হোল। এবার অসুস্থ যে, সে সুমিতা। সুমিতার বুক ধড়ফড় কোর্চ্ছে, এখনই একবার মধু ডাক্তারের যাওয়ার প্রয়োজন। মধু ডাক্তার যে ঘরে গেলেন সেটা সুমিতার ঘর। অয়স্কান্তবাবু একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন, পায়ের শব্দে চিনলেন ডাক্তারকে। কিন্তু

আশ্চর্য্য, মধু ডাক্তার রোগিণীকে পরীক্ষা কোরে রোগ ধরতে পারলেন না। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল সুমিতার চোখের ওপর। একদৃষ্টে সুমিতা তাকিয়ে আছে মধু ডাক্তারের দিকে। মধু ডাক্তার সে চোখে দেখলেন আগেকার, অনেকদিন আগেকার এক দৃষ্টি। মধু ডাক্তার চোখ নামালেন। কিন্তু আর একবার না-তাকিয়ে পারলেন না। এবার সুমিতার চোখের দৃষ্টির অর্থ পরিষ্কার হয়ে উঠলো তাঁর কাছে। অয়স্কান্তবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না, বোধ হয় তিনি ঘুমিয়েই পড়েছেন। ঘরে কোনো সাড়াশব্দ নেই—একটা অস্বস্তিকর নীরবতা যেন ঘনিয়ে উঠেছে সেই ঘরটাতে। একটা কথা বলা যে প্রয়োজন মধু ডাক্তার বুঝলেন, কিন্তু কাকেই বা বোল্‌বেন, আর কী কথাই বা বোল্‌বেন। তবু অয়স্কান্ত-বাবুকেই মধু ডাক্তার বোললেন—'ও কিছু নয়, ভাববার কিছু নেই, ওষুধ আমি দিয়ে দিচ্ছি।'

কিন্তু যেখানে অসুখ ডাক্তারের নিজের, সেখানে রোগিণীকে কী ওষুধ তিনি দেবেন? অমন যে অভিজ্ঞ ডাক্তার মধু ডাক্তার—তিনিও নিজের রোগের হদিস্ খুঁজে পান না। মনের জ্বালার কি কোনো ওষুধ আছে না কি, কী হোতে পারতো আর কি হয়নি এই অহরহ চিন্তার? সুমিতার তবু একটা রোগ আছে, সে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় বুক ধড়ফড়ানিতে; মুখ চোখ চাপা আগুনের উত্তাপে রাঙা হয়ে ওঠে, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত থেকে হয়ে ওঠে দ্রুততর। মধু ডাক্তার ওষুধ দিক্ আর নাই দিক, অনেক কথা বা একটি কথাও না বোলে প্রকাশ করুক আর নাই করুক, তবু মধু ডাক্তার একবার এলেই, সে রোগ অনেক কমে। অয়স্কান্তবাবু এই রোগ-রোগ খেলার ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবু মধু ডাক্তার সাবধানতার ত্রুটি করেন না, অদ্ভুত একটা উভয় সংকটের মধ্যে মধু ডাক্তারের অবস্থা সুমিতার চেয়েও হয়ে ওঠে অসহনীয়। যদি রোগিণীকে পরীক্ষা কোরতে কোরতে মধু ডাক্তারের আঙুল সুমিতার আঙুল ছুঁয়েই ফেলে—তবে অয়স্কান্ত-বাবুর চোখকে তা' এড়িয়ে গেলেও তাতে রোগের প্রশমন হওয়া তো দূরে থাক্, রোগ তাতে বাড়তেই থাকে।

অনেক ভেবে চিন্তে, লোকসানের খাতে অনেক অংক ধরে মধু ডাক্তার অবশেষে কি ঠিক করেন তা' মধু ডাক্তারই জানেন। হয়তো সুমিতাও জানতো।

কিন্তু অয়স্কান্তবাবু জানতেন আরও বেশী, ওদের দুজনের চেয়েও অনেক বেশী। সেদিন সুমিতাকেই ঘুম থেকে জাগালেন অয়স্কান্তবাবু। অন্ধকারের ঘোর তখনও কাটে নি। সুমিতাকে বোললেন স্নান কোরে নিতে। সুমিতা অবাক্ হোলো, কিন্তু অবাধ্য হোলো না। তারপর গরদের কাপড় পরে উভয়ে এলেন ঠাকুরঘরে। তখনও কেউ কোথাও ওঠেনি। দু একটা পাখি গাছের বাসায় সবে দু একবার পাখা ঝট্‌কিয়েছে মাত্র। ঠাকুরঘরে ঢুকে সুমিতাকে বোললেন অয়স্কান্তবাবু, 'আজ তোমায় দীক্ষা নিতে হবে মা।' সুমিতা চম্‌কে উঠ্‌লো, মুখ হয়ে উঠলো পাংশু। অয়স্কান্তবাবু বোললেন, 'নামেই সব মা, নামেই শান্তি, নামেই প্রাপ্তি। নামই পুণ্য, নামই অমৃত।' সুমিতার কানে তিনি যে ইষ্টমন্ত্র দিলেন, সে নাম কোনো ঈশ্বরের নাম নয়, পিতামাতার নামও নয়, সে নাম সুমিতার স্বামীর, অয়স্কান্ত চৌধুরীর পুত্রের। অনেকক্ষণ কাঁদল সুমিতা, কাঁদল অয়স্কান্তবাবুর সামনে, কাঁদল উপুড় হোয়ে। অয়স্কান্ত চৌধুরী বাধা দিলেন না, শুধু ধীরে ধীরে পুত্রবধূর মাথায় হাত বুলোলেন, আস্তে আস্তে শান্ত হোলো সুমিতা। যেন একটা পরম শান্তি এই কান্নার ভেতর দিয়ে নেমে এলো। যখন মাথা তুলল সুমিতা তখন আকাশ বাতাস তার নোতুন মনে হতে লাগল, সেই সূর্য্য ওঠাকেও মনে হোলো নোতুন সূর্য্য ওঠা, নোতুন লাগল অয়স্কান্ত চৌধুরীকে। মনে হোলো, যেন ওই অন্ধ চোখ দিয়ে অয়স্কান্ত অনেক কিছু দেখতে পান, অনেক কিছু দেখতে পেয়েছেন। সেই চোখকেই এতদিন সুমিতা ভুল বুঝেছিল। তারপর অয়স্কান্তবাবু বিগ্রহ সরিয়ে তার তলা থেকে একটা কাঠের বাক্‌স বার কোরলেন, কাঠের বাক্‌স থেকে বেরুল একখানা ইঁট, সোনার নয়, মাটির। সেটি পুত্রবধূর হাতে দিয়ে বোললেন, 'আমি আর কদিন মা, কিন্তু এই ইঁট চৌধুরীবাড়ির প্রথম ইঁট। এই বংশের গৌরব রক্ষার ভার তোমার। লোকে বলে, আমার বাড়িতে সোনার ইঁট আছে, এই সেই সোনার ইঁট, আমার কাছে সোনা। এর ভার আজ থেকে তুমি গ্রহণ করো।'

সেদিন রাত্তিরেই রাত দুটোর পর মধু ডাক্তার অনেকক্ষণ অপেক্ষা কোর্‌লেন পুজোদালানের সিঁড়ির তলায়। সুমিতার আসার কথা ছিল বোধ হয়, কিন্তু সুমিতা এলো না। মধু ডাক্তার সেদিন তাঁর সমস্ত খ্যাতিকে, সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে ফেলে আর এক আকাঙ্ক্ষাকে বড়ো কোর্‌তে চেয়েছিলেন। ঘাটে নৌকো তৈরীই ছিল। অনেকদিন সময় লেগেছে মধু ডাক্তারের এই পরিণতির জন্যে প্রস্তুত হোতে, অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক ঘাত প্রতিঘাতের, অনেক প্রশ্নের মীমাংসা কোর্‌তে হয়েছে তার জন্যে। অবশেষে এইটেই মধু ডাক্তার স্থির কোরেছিলেন। তাঁর বাসা প্রায় তিনি তুলিয়েই দিয়েছিলেন, টাকাকড়ি ব্যবসারও ব্যবস্থা কোরেছিলেন। সকলের বিনিময়ে তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন এই একটি মুহূর্তের জন্যে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা কোরবার পরও সুমিতা যখন এলোনা তখন মধু ডাক্তার অধীর হয়ে উঠলেন। আস্তে আস্তে সিঁড়ি পার হোয়ে সুমিতার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এটা বাড়ির পিছন দিক্‌কার সিঁড়ি। এ অংশের সংগে মধু ডাক্তারের বাড়ির অংশের যোগ আছে অনেকগুলো সাপ খোপ—আর অন্ধকার গলির পথ দিয়ে। তবু মধু ডাক্তার এসে সুমিতার ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। অমাবস্যার রাত্রি, চৈত্রমাস। একটু একটু করে হাওয়া বাড়ছিল। পশ্চিম আকাশে গাঢ় কালিবর্ণের একটা মেঘ যে কখন ঘনিয়েছিল, মধু ডাক্তার টের পান নি। সুমিতার তবু কোনো সাড়া নেই। দাঁতে দাঁত চেপে মধু ডাক্তার একবার কী ভাবলেন, পকেটে গুলিভরা পিস্তলটা একবার হাতের মুঠোয় চেপে ধর্‌লেন। তারপর একটু থেমে থেকে তরতর কোরে সেই অন্ধকার সিঁড়ি দিয়েই নেমে গেলেন।

ঘাটে যখন মধু ডাক্তার একা পৌছলেন, তখন অনেক টাকা-কবুলকরা জনাই মাঝি বোলল—'ঝড় যে এসে পড়্‌ল বাবু।'

মধু ডাক্তার জুয়োয় সব হেরে যাওয়া লোকের মত যেন শেষ কড়িটি এবার বাজি ধর্‌লেন,—'তা হোক্ জনাই চল, নৌকো ডোবে ক্ষতি নেই, কিন্তু পৌছতে পার্‌লে তোমায় আরও পঞ্চাশ টাকা দেব।'

আকাশে একটা তারারও আলো না থাকায় মধু ডাক্তারের মুখটা দেখা গেলো না।

'নবজাতকে'র কয়েকটি কবিতা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার

'নবজাতক' রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে লিখিত কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রকাব্য ধারার 'নবজাতক' অন্যতম স্মরণীয় কাব্য। নব নব সৃষ্টির যে ইন্দ্রজাল রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, 'নবজাতক' প্রতিভার সেই ইন্দ্রধনু স্পর্শ ও গাঢ় বর্ণ সম্ভার হইতে বঞ্চিত নয়। নানা বৈশিষ্ট্যের জন্য 'নবজাতক' যেমন রসিকজনের আস্বাদ্য, সন্ধানী সমালোচকেরও তেমনি আলোচ্য গ্রন্থ।

'নবজাতক' কাব্যের বিষয় বস্তুকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি ঘৃণা ও নবযুগের আবির্ভাব প্রত্যাশা—'প্রায়শ্চিত্ত,' 'নবজাতক' প্রভৃতি কবিতায় এই ভাব অভিব্যক্ত ; (২) যান্ত্রিক উপকরণকে কবিতায় ব্যবহার—'পক্ষী-মানব,' 'সাড়ে নটা,' 'ইস্টেশন' প্রভৃতি কবিতা ; (৩) বিশ্বরহস্য জিজ্ঞাসা—'কেন,' 'প্রশ্ন', 'রাতের গাড়ী' প্রভৃতি ; (৪) কবিজীবন সংক্রান্ত ঘটনা—'শেষ দৃষ্টি', ভাগ্যরাজ্য' 'জন্মদিন', 'রোম্যান্টিক' 'অবর্জিত,' 'শেষ হিসাব,' 'অস্পধ্বনি,' 'শেষকথা' প্রভৃতি কবিতা এবং (৫) স্মৃতিমূলক কবিতা—'মৌলানা জিয়া উদ্দীন' ও 'মংপুপাহাড়ে'।

'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে প্রতাপশালী ও দলিত-অত্যাচারিতদের সংগ্রামে পৃথিবী আজ কলুষিত। পৃথিবীতে ধ্বংসযজ্ঞের অবসানে আসিবে শান্তি। কবি বলিতেছেন—

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি
ছিন্ন করিছে নাড়ী।

* * *

সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুল বীর্যে শান্তি উঠিবে জেগে।

* * *

ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।

কবির আশা, এই অকল্যাণ-অশান্তির অবসান ঘটাইবে নূতন মানুষ। এই নবযুগের নবাদর্শবাহী মানুষের দিকে কবি সাগ্রহে চাহিয়া আছেন। তাই কবি এ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

নবীন আগন্তুক
নবযুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক। (নবজাতক)

রবীন্দ্রনাথের নবজাতক কাব্যে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যেগুলি রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্র-প্রতিভাকে বুঝিবার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কবির 'রূপ-বিরূপ,' 'রোম্যান্টিক,' 'জয়ধ্বনি,' 'ভাগ্যরাজ্য' প্রভৃতি কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে দ্রুত ধাবমান রেলগাড়ীর উপমাকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্তিগত প্রাণের অন্ধযাত্রার কল্পনা প্রসারিত হইয়াছে কবির 'রাতের গাড়ী' কবিতায়। কবি বলিয়াছেন—

এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি,
কামরায় গাড়িভরা ঘুম
রজনী নিঝুম। (রাতের গাড়ি)

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিজের কতিপয় রচনা সম্বন্ধে একদা যে ধারণা ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহার সুন্দর পরিচয় রহিয়াছে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। এই প্রসঙ্গে কবি মৈত্রেয়ী দেবীকে বলিয়াছিলেন, "আমার রচনার মধ্যেও অনেক কিছু আছে যা সাময়িক, সে সব ছাঁট পড়ে যাবে, বাদ পড়ে যাবে, তারপর বাকি যদি কিছু থাকে তবে মহাকাল তা গ্রহণ করবেন—বোঝা তো অনেক জমেছে, এত বোঝা কি পার হবে? তার মধ্যে আবার আজকাল এক উৎপাত জুটেছে, আমার কর্তাদের মাথায় ঢুকেছে ইতিহাস রক্ষা—কোথা থেকে সব কবর খুঁড়ে এনে হাজির করে, বলে আমার রচনা, সে দেখলে লজ্জায় মরে যাই; বলতে ইচ্ছে করে—সে তোমার লেখা, কিন্তু তা হবার নয়—ছাপার অক্ষরে একবার কালী পড়লে সে কলঙ্ক আর ঘুচবে না—*** কাঁচা বয়সে সুরু করেছি লেখা, কত কাঁচা দুর্বল রচনা স্তূপ হয়ে আছে, যা আবর্জনা—তা বাদ দিতে চাই। ইচ্ছে মত ছাঁটাই কাটাই করে গড়ে তুলতে চাই মূর্তিটি—মুছতে দেবে না?"
[পৃঃ ২৬৩—৬৪]

ঠিক এই কথাগুলিই কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে 'নবজাতকে'র 'অবর্জিত' কবিতায়। কবি সেখানে বলিয়াছেন—

লিখিতে লিখিতে কেবলই গিয়েছি ছেপে,
সময় রাখিনি ওজন দেখিতে মেপে
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।

*   *   *

বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা—
আবর্জনারে বর্জন করি যদি
চারিদিক হতে গর্জন করি উঠে
"ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে
যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি।

*   *   *   *

বর্তমানের ভরি অর্ঘ্যের ডালি
অদেয় যা দিনু মাথায়ে ছাপার কালি
তাহারই লাগিয়া মার্জনা আমি চাহি।

'নবজাতক' কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এই কাব্যে কবি আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান ও সভ্যতা-লক্ষ্মীর গর্বের বস্তু বেতারযন্ত্র ও বিমানকে লইয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। পাখীদের মত মানুষ গগনচারী হইয়া স্পর্ধাভরে আকাশের অটল শান্তিকে বিঘ্নিত করিতেছে, কবি তাই মানুষের এই গগনবিজয়কে প্রসন্নচক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

আজি একি হল, অর্থ কে তার জানে
স্পর্ধা পতাকা মেলিয়াছে পাখা
শক্তির অভিমানে।
ঈর্ধা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা। (পক্ষীমানব)

একদিকে কবি যেমন মানুষের স্পর্ধাকে নিন্দা করিয়াছেন—'শ্যামবন বীথি ও পাখীদের গীতি'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই বিশ্বরহস্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। 'কেন', 'প্রশ্ন' প্রভৃতি কবিতায় এই আকর্ষণের—মহা-অজানার প্রতি কবির একটা অনির্দেশ্য অনুরাগের পরিচয় রহিয়াছে। 'কেন' কবিতায় কবি বলিতেছেন—

কল্পনায় দেখেছিনু, প্রতিধ্বনি মণ্ডল বিরাজে
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর-কন্দর মাঝে।
সেথা বাঁধে বাসা
চতুর্দিক হতে আসি জগতের পাখা মেলা ভাষা।

*   *   *

অনুভব করেছি তখনি

বহু যুগ যুগান্তের কোন এক বাণী ধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।

* * *

প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার—
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?

কবিমানস ও কবিজীবন-সংক্রান্ত কয়েকটি কবিতা আছে 'নবজাতক' কাব্যে। 'জন্মদিন' কবিতায় লক্ষ্য করা যায় কবির সত্যভাষণ এবং নিজের সম্বন্ধে অপূর্ব নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী। ইহার পরে কবি 'জন্মদিন' সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছেন—তাহার সবগুলিতে প্রায় একপ্রকার মনোভাব প্রকাশিত। 'নবজাতক' ব্যতীত সেঁজুতি, 'শেষ সপ্তক' ও 'পরিশেষ' কাব্যে জন্মদিন সম্বন্ধে কবিতা আছে।

'রোম্যান্টিক' কবিতাটি কবি-মানসের প্রকৃতি পরিচয় হিসাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র-মানস একান্তভাবে রোম্যান্টিক। 'রোম্যান্টিক' কবিতাটি নিজের কবিমানস সম্বন্ধে কবির স্বীকারোক্তি। 'রোম্যান্টিক' কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রঙ লাগায়েছি প্রিয়ে।

'জরধ্বনি' কবিতাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এই কবিতায় কবি অকুণ্ঠভাবে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন। সংসারের বহু সমস্যা কবিকে চিন্তাকুল করিয়াছে, কিন্তু ভাবমত্ত কবি তাহার প্রতিকার করিতে ধাবিত হন নাই, তাই "চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার"। কবির ভাষায়—

মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটিনি করিতে প্রতিকার,
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।

কবি অপূর্ণতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও 'চিরন্তন মানবের মহিমা'কে উপহাস করেন নাই, ইহাই রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'শেষ কথা' কবিতাটি কবি-জীবনের আসন্ন সমাপ্তির ইঙ্গিতবাহী। এই করুণ রসপূর্ণ কবিতায় কবি বলিতেছেন—

এ ঘরে ফুরাল খেলা
এল দ্বার রুধিবার বেলা।

'মৌলানা জিয়াউদ্দীন'ও 'মংপু পাহাড়ে'—ইহাদের দুইটিকেই স্মৃতিমূলক কবিতা বলা যাইতে পারে। দুই কবিতার মধ্যে পার্থক্য আছে—একটি ব্যক্তি, একটি স্থানের স্মৃতি। 'মৌলানা জিয়াউদ্দীন' কবিতায় আছে জিয়াউদ্দীনের বেদনা-মধুর স্মৃতি। কবির 'স্মরণ' কাব্য তাঁহার স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর স্মৃতি এবং পূরবীর 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি লইয়া রচিত।

'মংপু পাহাড়ে' কবিতা কবির মংপুবাসকালে লিখিত। এই কবিতা রচনার চিত্তাকর্ষক বিবরণ রহিয়াছে মৈত্রেয়ী দেবী রচিত 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। কুজ্ঝটি জালমুক্ত মংপুর ছবি কবির তুলিকায় এই ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে—

কুজ্ঝটি জাল যেই
সরে গেল মংপুর
নীল শৈলের গায়ে
দেখা দিল রঙপুর।

'রূপ-বিরূপ' কবিতায় কবি তাঁহার সুবিশাল সাহিত্যে অসুন্দর ও পরুষ ভাবকে বাণীরূপ দিতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

'নবজাতক' কাব্যে অনেকগুলি কবিতা আছে। তাহাদের প্রায় সবগুলিরই বৈশিষ্ট্য আছে। 'নবজাতক' সার্থক নামা কাব্য। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে লিখিত এই কাব্যে কবিশক্তি ও কবি প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে, বরং রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠকের নিকট এই কাব্য নূতন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তাই 'নবজাতক' কাব্য পাঠ ও আলোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

রূপচাঁদ পক্ষী

(নক্সা)

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ থেকে ৪০৷৫০ বছর পূর্বে কলকাতায় যা দেখা যেত সেই সব অনেক জিনিষ আজ আর বড় একটা চোখে পড়ে না। তখনকার মত রাস্তার ধারে রকে কিম্বা বৈঠকখানায় বসে গল্প করা আজ প্রায় বন্ধ হতেই বসেছে। এ জিনিষ ভাল কি মন্দ এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে চাই না, শুধু এ কথাটাই বলবো আজকের দিনে বেশীর ভাগ লোকই কাহারও সাথে কোন সম্পর্ক রাখতেই চান না—যে যার বাড়ীর দরজা বন্ধ করে বসে থাকতেই পছন্দ করেন। কিন্তু সেকালে এসব ছিল না। তা' ছাড়া মানুষের ছিল প্রচুর অবসর। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তখন মানুষ কথা বলতো না। সেই কারণেই সে সময় মানুষ সময়ের হিসাব না করে গল্প করতে পারতো। সেকালে অনেক বৃদ্ধদের মুখেও অন্যান্য আলোচনার মধ্যে প্রাচীন কলকাতা প্রসঙ্গে অনেক গল্প শোনা যেত। যে সব গল্প তাঁরা তাঁহাদের পিতা-পিতামহের কাছ থেকে শুনেছিলেন সেই সব গল্পও আলোচনা করতেন। অন্যান্য কথার মধ্যে রূপচাঁদ পক্ষীর কথাও তাঁরা বলতেন। কোথায় বাস করতেন রূপচাঁদ পক্ষী, তিনি দাঁড়ে বসে গান ধরতেন—ইত্যাদি বহু কথাই সেকালের কলকাতার বৃদ্ধদের মুখে শোনা যেত।

বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁহার "কেরী সাহেবের মুন্সী" উপন্যাসের ২২৮ পৃষ্ঠায় রূপচাঁদ পক্ষীর কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করলাম—

"পরদিন সকালে পটলডাঙায় রূপচাঁদ পক্ষীর আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত হল রাম বসু।

রূপচাঁদ পক্ষীর পিতৃদত্ত নাম সনাতন চক্রবর্ত্তী বা ঐ রকম একটা কিছু। মহাপুরুষগণের জীবনে প্রায়ই দেখা যায় যে, স্বোপার্জিত পরিচয়ের তলে কৌলিক পরিচয় চাপা পড়ে যায়—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বোপার্জিত রূপচাঁদ পক্ষী পৈতৃক সনাতন চক্রবর্ত্তীকে চাপা দিয়ে লুপ্ত করে দিয়েছে।

সেকালে যে সব মহাপুরুষ একাসনে বসে একশ আট ছিলিম গাঁজা খেতে পারত তারা একখানা করে ইঁট পেত। এই ভাবে উপার্জিত ইঁটে বাসভবন নির্মাণ করতে পারলে পক্ষী পদবী পাওয়া যেত। তখনকার কলকাতায় দেড়জন পক্ষী ছিল। পটলডাঙায় রূপচাঁদ পক্ষী, আর বাগবাজারে নিতাই হাফ-পক্ষী। হাফপক্ষীর অর্থ এই যে, বাড়ির চার দেয়াল গড়বার পরে হঠাৎ সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করে নিতাই, তাই লোকে তাকে হাফপক্ষী বলত। বস্তুত রূপচাঁদই একমাত্র পক্ষী।"

"কেরী সাহেবের মুন্সী" গ্রন্থে রূপচাঁদ পক্ষীর গাঁজা খাওয়া ছাড়া আর একটি কথা জানা যায়, সেটা হলো তুক-তাক মন্ত্রতন্ত্র তাবিজ-কবচ, ঝাড়ফুঁক এবং তান্ত্রিক ক্রিয়া-কর্মে রূপচাঁদ পক্ষীর অভিজ্ঞতার কথা।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা (তৃতীয় সংস্করণ) সন ১২৮৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় পক্ষীর দলের কথা উল্লেখ আছে। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করলাম—

"রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজাবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্ত্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দেখাদেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাতলেন। বাগবাজারের পক্ষীর দল এই সময় জন্মগ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্ত্তা) নবকৃষ্ণর একজন ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়···বাগ-বাজারেদের উড়তে শেখান। সুতরাং কিছুদিন বাগ-

বাজারেরা সহরের টেক্কা হয়ে পড়েন। তাঁদের একখানি পাবলিক আটচালা ছিলো, সেইখানে এসে পাখি হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়তেন—এ সময় বোসপাড়ার ভেতরেও দু-চার গাঁজার আড্ডা ছিল।"

সেকালের ইতিহাস পাঠ করলে আমরা জানতে পারি যে, রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে বহু পণ্ডিতের যাতায়াত ছিল, যেমন পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, শ্রীকণ্ঠ, কমলাকান্ত, বলরাম, শঙ্কর,চতুর্ভূজ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে যেতেন। তাহা ছাড়া বহু গায়ক ও কবির দলও সেখানে যেতেন।আখড়াই গানের জন্য প্রসিদ্ধ রামনিধি গুপ্ত (নিধিবাবু) হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (হরু ঠাকুর) নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালা তাঁহার সভায় প্রতিপালিত হতেন। "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" গ্রন্থে রাজা নবকৃষ্ণের কবি পোষণের কথা উল্লেখ পেয়েছে। কিন্তু "কেরী সাহেবের মুন্সী" গ্রন্থে রূপচাঁদ পক্ষীর পিতৃদত্ত নাম সনাতন চক্রবর্ত্তী বা ঐ রকম একটা কিছু বলে শ্রীযুত বিশী মহাশয় উল্লেখ করেছেন এবং "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" গ্রন্থে আছে শিবচন্দ্র ঠাকুর বা শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্ত্তা)।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ" গ্রন্থে পক্ষীর দলের কথা (পৃঃ ৫৬) উল্লেখ আছে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন যে, সে সময় কলকাতা সহরে গাঁজা খাওয়াটা বেশী বেড়েছিল। সহরের বিভিন্ন স্থানে গাঁজার আড্ডা ছিল। বৌবাজারের দলকে পক্ষীর দল বলা হতো।

নিম্নে শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখার কিয়দংশ উদ্ধৃত করলাম—

"সহরের ভদ্র গৃহের নিষ্কর্ম্মা সন্তানগণের অনেকে পক্ষীর দলের সভ্য হইয়াছিল। দলে ভর্তি হইবার সময়ে এক একজন এক একটি পক্ষীর নাম পাইত এবং গাঁজাতে উন্নতিলাভ সহকারে উচ্চতর পক্ষীর শ্রেণীতে উন্নীত হইত। এ বিষয়ে সহরে অনেক হাস্যোদ্দীপক গল্প প্রচলিত আছে। একবার এক ভদ্র-সন্তান পক্ষীর দলে প্রবেশ করিয়া কাঠঠোক্‌রার পদ পাইল। কয়েক দিন পরে তাহার পিতা তাহার অনুসন্ধানে আড্ডাতে উপস্থিত হইয়া যাহাকে নিজ সন্তানের বিষয় প্রশ্ন করেন, সেই পক্ষীর বুলি বলে, মানুষের ভাষা কেহ বলে না! অবশেষে নিজ সন্তানকে এক কোণে দেখিতে পাইয়া যখন গিয়া তাহাকে ধরিলেন, অমনি সে "কড়ড়্‌ ঠক্" করিয়া তাঁহার হস্তে ঠুক্‌রাইয়া দিল!"

রূপচাঁদ পক্ষীর গাঁজা খাওয়া ছাড়াও অন্যান্য গুণ ছিল। সে গুণ হ'লো—সংগীতে অনুরাগ। গান রচনায় সুনিপুণ ছিলেন, তাহা ছাড়াও তিনি ছিলেন আমোদপ্রিয় ও রসিক পুরুষ। পক্ষী উপাধিধারী বলে তাঁহার গাড়ীখানি ছিল কতকটা খাঁচার আকারের মত। তিনি বিস্তর গান রচনা করে গেছেন। কোন হুজুক উঠলেই তিনি তা' নিয়ে গান রচনা করতেন। রেল, গঙ্গার পোল, বিধবা-বিবাহ, কন্যাদায় প্রভৃতি বিষয় তিনি গান রচনা করেছেন। বিশেষতঃ বিদ্রুপাত্মক গান রচনায় তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার রচিত প্রায় সব গানে পক্ষী বা খগরাজ ভনিতা দেখা যায়। তাঁহার রচিত কতকগুলি গানে ইংরাজী শব্দেরও ব্যবহার আছে। রূপচাঁদ পক্ষী বা রূপচাঁদ দাস ১২২১ সালের মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। রূপচাঁদ পক্ষীর পূর্ব-পুরুষগণের আদি নিবাস উড়িষ্যা প্রদেশের চিল্‌কা হ্রদের কাছে। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশে কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, গৌড়েশ্বর যড়ঙ্গদেব সেই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রূপচাঁদের পিতামহ হরেকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র সেই গৌড়েশ্বর যড়ঙ্গদেবের বংশধর। হরেকৃষ্ণ দাসের পুত্র গৌরহরি দাস মহাপাত্র। গৌরহরি রাজা হরিহরভক্তের আমমোক্তারী চাকরী করতেন এবং সেই কারণে তাঁহাকে কলকাতায় বাস করতে হয়েছিল। গৌরহরি দাসই রূপচাঁদের পিতা। বৌবাজার অঞ্চলের হিদারাম ব্যানার্জি লেনের বৃদ্ধদের কাছে শোনা যায় যে রূপচাঁদ পক্ষীর বাড়ী উক্ত গলির নিকটে ছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ" গ্রন্থে উল্লেখ আছে—বৌবাজারের দলকে পক্ষীর দল বলা হতো। হিদারাম ব্যানার্জি লেনও বৌবাজার অঞ্চলে, তাহা ছাড়াও জেলেপাড়ার সংয়ের গোড়ার দিকে যাঁহারা গান ও পালা রচনা করতেন তাঁহাদের মধ্যে রূপচাঁদ পক্ষীও ছিলেন। জেলেপাড়ার সং বৌবাজার অঞ্চল হতেই বার হতো। রূপচাঁদ পক্ষীর বাড়ী

প্রয়াস

ফটো : তুষার রায়চৌধুরী

প্রাপ্তি

ফটো : রমেন বাগচী

ছিল সেই পাড়ার কাছেই। অর্থাৎ নেবুতলা বাজারের সামনে দিয়ে হিদারাম ব্যানার্জি লেনের মধ্যে ঢুকে কিছুদূর গেলেই দক্ষিণ দিকে যাবার একটি গলি আছে, গলিটির বর্তমান নাম রামকানাই অধিকারী লেন। উক্ত গলির একটি বাড়ীতে বাস করতেন রূপচাঁদ পক্ষী। এবারে রূপচাঁদ পক্ষীর কয়েকটি গান উদ্ধৃত করে রচনা সমাপ্ত করছি :—

সোহনী-বাহার—একতালা

সারদে বরদে বাণী, এমা বিশ্বরূপিণী।
অনাদ্যা আদ্যা, তুমি মহাবিদ্যা, বিদ্যাদায়িনী।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা,
সরোজবাসিনী বাসুদেব-দারা,
সপ্তস্বর উদারা মুদারা,
তারা উচ্চস্বর ব্রহ্মস্বরূপিণী।
বাক্‌বাদিনী পুরাণেতে কয়,
তব কৃপায় মূকে স্পষ্ট কথা কয়,
বর্ণহীন জন কবিতা রচয়,
জড় মূঢ়জন নিস্তারকারিণী॥
ধ্রুপদ খেয়াল, টপ্পা গজল আদি,
রেক্তা পাঁচালি কবিতার বাদি,
তাল লয় আদি সব তব বিধি,
রাগ উপরাগ ছত্রিশ রাগিণী।
দীন খগ কয় মাতা পদ্মাসনা,
ক'রে বহু শিক্ষা কামনা পুরেনা,
রাগে স্বরে আছে তালেতে মেলে না,
মুদ্রা-দোষ বেহুঁস কোন কোন গুণী॥

ঝিঝিট খাম্বাজ—পোস্তা

লেট মি গো ও দ্বারি,
আই ভিজিট টু বংশীধারী।
এসেছি ব্রজ হ'তে, আমি ব্রজের ব্রজ নারী॥
বেগ ইউ ডোরকিপার লেট মি গেট
আই ওয়াণ্ট সি ব্লক হেড,
কার হুম আউয়ার রাধে ডেড,
আমি তারে সার্চ্চ করি।
শ্রীমতী রাধার কেনা সারভেণ্ট,
এই দেখ আছে দাসখত এগ্রীমেণ্ট,
এখনি করব প্রেজেণ্ট, ব্রজপুরে লব ধরি॥
(দাসখত দেখে ঘুচবে জারি)
মর‍্যাল ক্যারেক্টার শুন ওর,
বটরথিব ননীচোর, ব্ল্যাগার্ড রাখাল পুওর,
চোর মথুরার দণ্ডধারী॥
(রাখাল ভূপাল কপাল ভরি)
কহে আর, সি, ডি, বার্ড
কিং বেলাক লান্‌সেন্স ভেরি কনিং
ফ্লুটেতে ক'রে সিং
মজায়েছে রাই কিশোরী॥
(কুলনাশা, বাঁশী করে করি)॥

সিন্ধু কাফি—একতালা

গুলি হাড় কালি, মা কালীর মত রং।
টান্‌লে ছিটে বেচায় ভিটে,
বানায় যেন চুঁচড়োর সং॥
থেলো হুকো কল্‌কে ভাঙ্গা,
পাঁচপো লম্বা বাঁশের চোঙ্গা,
কলসীর কানায় হুকোর সেঙ্গা,
মরি কি বৈঠকের ঢং॥
হাত পা সরু পেট্‌টা ফোলে,
কালি পড়ে ঠোঁটের তলে,
ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পথে চলে,
বাতবলে জবড় জং।
মুখে মারে মালশাট, অর্থাভাবে মুড়ীর চাট,
নানা ভঙ্গি ঠমক্ ঠাট, কথায় কথায় রেগে টং॥
এই নেশাটী সর্ব্বনেশে, ছিল ইহা চীন দেশে,
চণ্ডু গুলির বড় পিসে, জন্মস্থান এদের হংকং॥
খগবরেতে বর্ণয়ে, নেশায় আত্ম বিস্মরিয়ে
স্বপ্ন দেখেন চেটায় শুয়ে
সাজাদার সোনার পালং॥

কবি বিজয়চন্দ্র

শ্রীসুনীলময় ঘোষ

সর্বজনীন মহৎ ভাবনায় ১৮৬১ সাল, বাঙলা তথা ভারতের ভাগ্যাকাশে মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদ-পুতঃ। চিন্তায়, কর্মে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিক্ষায় যে কয়জন বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই প্রায় একই বৎসরে আবির্ভাব হয়েচেন।

বাঙলা দেশের পক্ষে সেই ১৮৬১ সাল বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। মেঘনাদ-বধ কাব্যের রচনা কাল; রবীন্দ্রনাথ-প্রফুল্লচন্দ্র-ব্রহ্মানন্দ-বিজয়চন্দ্র-নীলরতন-অক্ষয় মৈত্র—এই কয় জনের আবির্ভাব বৎসর। এমন ধারা খুব কমই একটি জাতির ভাগ্যে হয়।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার আচার্য। তাঁর মত আদর্শ শিক্ষক, নির্লিপ্ত তেজস্বী পুরুষ, স্নেহকাতর দরদী, সত্যনিষ্ঠ স্পষ্টবাদী, অতিথি বৎসল বন্ধু খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না। শিশুর হাসি, বালকের কৌতুহল-সঞ্জাত কোলাহল, যৌবনের সতেজ প্রাণশক্তির সঞ্জীবতা এবং প্রৌঢ়ত্বের প্রশান্ত ধ্যানস্থ রূপ বিজয়চন্দ্রের প্রতিভাময় জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মানুষের প্রতি বিশ্বাস এবং ইহবাদে জীবনের সকল সামর্থ্যের সমর্পণ, সংসারের অতি নিকট সম্পর্কের মধ্যে থেকেও নিরাসক্ত ভাবে সব জ্ঞান চিন্তা উজাড় করে দিয়ে তিনি মাঝে মাঝে একান্তভাবে পরম কল্যাণময় সেই অনির্বাণ শিখায় অতন্দ্র। সে ধ্যান করুণায় বিগলিত, পরম আনন্দের জ্যোতি ধারায় অবগাহিত। সেখানে এতটুকু বেদনা নেই, নেই কোন অভিমান, নেই কোন জিজ্ঞাসা। একটা দুঃখজয়ী সংযমের দীপ্যমান তেজে সবল, নবীন।

পূর্ণ উদ্যমের প্রবাহের মুখে বিজয়চন্দ্র চোখ দুটি হারালেন। সব অন্ধকার, হারিয়ে গেল সকল বিচার, তলিয়ে গেল জ্ঞানের অহমিকা, একাকার হলো আলো-আঁধারের অভাবনীয় আনন্দ। জীবনে চোখ হারিয়ে তিনি কোনদিন নিজেকে অসহায় বা অক্ষম বলে মনে করেননি। চিরকালের অন্ধতার কাছে বিজয়চন্দ্র নিজেকে সমর্পন করেচেন তাঁর ঐকান্তিক আত্মবিশ্বাসের আর পরম দেবতার কল্যাণ বোধের গভীর অনুভূতিতে। একদিনের জন্যও তিনি তাঁর অন্ধকারের দেবতার কাছ হ'তে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন নি। অন্ধকার বিজয়চন্দ্রকে পরাজিত ক'রতে পারেনি—বরং গভীর মর্মলোকে সত্যের উজ্জ্বল দীপশিখায় জীবনের নব-পরিচয়ের অভিজ্ঞতার রস-সঞ্জাত রূপের পরিচয় লাভ ক'রে ধন্য হয়েছেন। দুঃখজয়ী অবিচলিত ধৈর্য্য, অমলিন প্রফুল্লতা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপরিসীম দরদ—তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ।

বিজয়চন্দ্রের অতি প্রিয় গান 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ'; 'একলা চলরে।' এ দুটি গান কবি বিজয়চন্দ্রের মন্ত্র।

উনবিংশ শতক বাঙলা কাব্য সাহিত্যের রূপান্তরের যুগ। এ রূপান্তর নব নব চিন্তায় ও ভাবনায় রসময়। জাতীয় জীবনের নব-জাগরণের পথে বিচিত্র অসম মন ও চিন্তার স্রোত কখনো জটিল, কখনো সংঘাতপূর্ণ। ইংরেজী শিক্ষা ও ভাবধারার বন্যা এসেচে সর্বত্র, কিন্তু জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা ও ভাবপ্রবণতা থাকার জন্য নব-উন্মেষের পথে বাংলা সাহিত্য বাধাবন্ধনহীন হয়নি। মানসিক ঐতিহ্যপ্রীতি; ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা; কল্পনা ও বাস্তবের অভাবনীয় অনমনীয় ব্যবধান সেই যুগ ধারায় বর্তমান। কিন্তু তাই বলে জগৎকে নোতুন রঙে রাঙিয়ে দেখার প্রবণতা হারিয়ে যায়নি। সে দেখার পটভূমিকায় সর্বজন চিন্তায় জাতির, দেশের ও সাহিত্যের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এবং তার জন্য প্রাচীন চিন্তা ধারায় যেসব ভাব-ভাবনা সৃষ্টিধর্মী সংস্কারহীন, তার প্রতি গভীর বিশ্বাস সর্বত্র।

জাতীয় জীবনে সর্বদিক হ'তে সংগঠন চ'লেচে। বাহ্যিক পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে মানসিক দিক হ'তেও চলেছে নব নব পরীক্ষা, গ্রহণ বর্জ্জনের সংগ্রাম। মহাকাব্যের 'মহৎ ভাবনা ও বিস্তৃতির মধ্যে দেশের চিন্তা ধারা রস-স্নাত। সেখানে একান্ত আপনতর কথা, গীতিরস-প্রধান কবিতা ততটা আনন্দঘন হয়ে উঠেনি।

কিন্তু বিহারীলালের পর বাঙলা কাব্য-জগতে গীতিময় ভাব-রস কবিতার আদর ও জয় আরম্ভ হয়েছিল। আন্তরিকতার মানদণ্ডে গীতিকবিতার পথ যুগ পেরিয়ে যাত্রা সুরু হলো। ভাষার সংযম, ভাবের স্নিগ্ধতা, সর্বোপরি একটা "লোকোত্তর চমৎকারিত্ব" গীতি কবিতার বিশিষ্টতা।

এ ধারায় রবীন্দ্রনাথ সর্ব-সিদ্ধ। তাঁর প্রভাব সর্বত্র। সেই প্রবাহের ধারায় আরও একজনের নাম যাঁর চিন্তা ও চেতনা তৎকালীন বহু কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিলো, তিনি শব্দার্থবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল। তৎকালীন কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব এবং রবীন্দ্র-মনে ধ্যান বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

সমসাময়িক কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্র প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রতিভায় বর্ষীয়ান বিজয়চন্দ্র মজুমদার। সবচেয়ে বড় পরিচয় বিজয়চন্দ্র আচার্য। কিন্তু আচার্যের অন্তর-প্রকাশ হয়েছিলো তাঁর কাব্যে—বিচিত্র ঘটনার অনুভব-প্রকাশে তা রস-উজ্জ্বল। আজ সে রসে ঘাটতি পড়েছে। ভারতবর্ষ আজ পর-শাসন মুক্ত। কিন্তু কালের প্রাচীর ভেদ করে এমন কয়েকজন কবি বা সাহিত্যিক চিরকালের বাণী বহন করে নীরবে, সকল প্রলোভনের বাইরে থেকে সকল ভয়-ভাবনাকে অতিক্রম করে অপেক্ষা করেন, বিজয়চন্দ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একটা শ্রদ্ধা,

মমত্ব, সর্বোপরি গভীর সমবেদনাবোধ না থাকলে তাঁর কাব্য আমাদের চেতনায় স্থান পাবে না। সহৃদয় হৃদয়-আকুলতার সংবাদই তাঁর কাব্যের মূল কথা।

বিভিন্ন সময়ে অনেক কাব্য বিজয়চন্দ্র রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে ফুলশর (১৯০৪) যজ্ঞভস্ম (১৯০৪) হেঁয়ালী (সংকলন) (১৯১৫) অন্যতম। অনুবাদও করেছেন কয়েকটি। অশ্বঘোষ প্রণীত "বুদ্ধচরিতে"র প্রথম পাঁচটি সর্গ বাঙলায় অনুবাদ করার পর তিনি অন্ধ হয়ে যান। অন্ধ অবস্থায় "কবিতাষ্টকম" (১৯১৪-১৫) রচনা করেন। তাহাতে ঈশস্তুতি; উদ্‌বোধন গাথা; ধ্যানম্‌ প্রভাতগীতি; দেবীস্তোত্রম্‌; ভারতীস্তোত্রম ও জিজ্ঞাসা। প্রত্যেকটির মধ্যে কবি-মনের একটা মৌলিক আবেদন আছে যা ছন্দ ও ভাব ঐশ্বর্যে বাঙলা কাব্যের চিরকালের সম্পদ।

'ফুলশর' কাব্য প্রকাশের পর তার সমালোচনায় কিছু দোষ দেখানো হয়েছিলো; বিজয়চন্দ্র তা স্বীকার করেছেন; কিন্তু পুনরায় তা প্রকাশ না করেই "হেঁয়ালীতে" সেই সংশোধন ক'রেছেন।

বিজয়চন্দ্রের সার্থক সৃষ্টি "যজ্ঞভস্ম"। সে যুগে এ কাব্য বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। এ কাব্যে বিজয়চন্দ্রের চিন্তার রূপ সুচারুরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

নামাকরণেই তার ইঙ্গিত—যজ্ঞভস্ম।

দেব পুণ্য যজ্ঞ বহ্নি জগৎমঙ্গল
নির্বাপিত আজি।··· ··· ···

ভারতীয় সভ্যতার প্রথম প্রকাশের প্রথম দিনের উৎস হ'তে যে কল্যাণ-বাণীর মঙ্গল চিন্তার আহুতি প্রতি দিনের যজ্ঞে দেওয়া হয়েছে—আজ সে যজ্ঞ নিবে গেছে—ভারত তথা পৃথিবী আজ সুসভ্য। কিন্তু আজকার এই সভ্য জগৎ হঠাৎ আসেনি। ভূমিকায় কবি বল'চেন, ······ "মানব সমাজ একদিনে সভ্যতা পদবীতে অধিরোহণ করে নাই। বীজ একদিনেই অঙ্কুরিত হইয়া ফুলফল শোভিত বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না······" তার জন্য বহু যুগের বহু শতকের তপাগ্নির সাধনা বর্তমান। সে সাধনার কিছু পরিবেশন 'যজ্ঞভস্ম'। যজ্ঞ নির্বাপিত; কিন্তু ভস্ম রয়েছে যা,

"······তবু পুণ্য গন্ধ ভরা
আছে স্নিগ্ধ-ভস্ম তার শোক—তাপ—হরা"

সে ভস্ম শুধু ভস্ম নয়,

"ঋসি মন্ত্রপুত ভস্ম, দেব আশীর্ব্বাদ।"

কবি সেই দেব আশীর্ব্বাদ ভস্মের কিছু গন্ধ দান করেছেন।

তিনি 'যজ্ঞভস্মে' কতকগুলি ভাগ ক'রেছেন। প্রথমে পাই "প্রার্থনা।" সর্ব যজ্ঞের অধীশ্বর সেই পরম বৈরাগী লোকদেবতার কাছে কবি স্বার্থহীন, জ্ঞানযুক্ত, পুষ্পের করুণ কোমলতা প্রার্থনা করেছেন—তাঁর এগিয়ে যাবার পথের একমাত্র অবলম্বনের জন্যে।

তারপর "তীর্থমঙ্গল।" ভারত সাধনার দেশ; এর পথ ঘাট, ঐতিহাসিক স্থান মাহাত্ম্য, পুরাণ কথিত পুণ্যাত্মাদের বীরবত্তা ও আধ্যাত্মিক চেতনার সাধনার বর্ণনা। যা বর্ণনা করতে, ভাব্‌তে, অনুধাবনে সর্বজনীন মঙ্গল। এই ভাগে রয়েছে—উদ্‌বোধন, আরতি; ব্রহ্মাবর্তে; দণ্ডকারণ্যে; বিশ্বামিত্র, সুজাতা, অজবিলাপ, অর্জুন-সাধনা, অর্জুন (প্রতিজ্ঞা), দ্রৌপদী; খণ্ডগিরি; "উদয়াদিত্য; জ্বালামুখী।" প্রত্যেকটি বর্ণনায় কবি বিজয়চন্দ্রের মৌলিক চিন্তা ধারার সাথে পুরাণ—ইতিহাসের অভাবনীয় সমন্বয় হয়েছে। বিশেষ ক'রে "বিশ্বামিত্র" কবিতায়। আমরা একটু পরে তা আলোচনা করবো।

এর পর পাই "যুগপূজা।" অর্থাৎ মানবসভ্যতার ক্রম বিকাশের মধ্যে ধর্মভাব। এই ধর্মভাব সম্পর্কে নানাজনের নানা মত। কেহ কেহ বলেন, মানবসমাজের আদিতে কোন ধর্মভাব বা ঈশ্বর প্রত্যয় ছিলো না। তাঁরা বলেন, অসভ্য বর্বরতা তথা ঈশ্বরপ্রত্যয় হীনতাই বেশী প্রদর্শন হ'য়েছিল।

কিন্তু বিজয়চন্দ্র তা মেনে নেননি। তিনি বলেন, "ধর্মভাব মনুষ্য হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম ভাব; সুতরাং উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে এ ভাবেরও সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা মানিয়া লইলে কাহারও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই"; কিন্তু কিভাবে এই ধর্মভাবের প্রকাশ লাভ হ'য়েছে তার বিশেষ কোন পথ বা মত কবি দিতে চান না, শুধু মাত্র কবির অন্তর দৃষ্টিতে যতটুকু মনে হ'য়েছে তাই বলতে চেয়েছেন।

বর্বরযুগের প্রেতপূজা হ'তে কোমতের সমাজপূজা পর্যন্ত একটা ভাগ। 'পূজা' করবার প্রকৃতি মানুষের মনে স্বাভাবিক ভাব। প্রকৃতি পূজা হইত অদ্বৈত পূজা। তবে এ ভাবটি সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের চিন্তার উপর কেবল নির্ভর নয়। ভারতবর্ষে প্রেতপূজা, প্রাণীপূজা খুব একটা ছিল না। তারপর নরহরিপূজা, অর্থাৎ অবতারবাদ, সেখান হ'তে অদ্বৈতবাদ।

বিজয়চন্দ্র এসব চিন্তাধারায় দার্শনিক হর্বট স্পেন্সারের পদানুসরণ করেচেন। কিন্তু "অজ্ঞেয়তাবাদের পর হইতে আমি স্পেন্সারের সঙ্গ পরিত্যাগ করি।"

'যুগপূজায় প্রথমে আরম্ভ হয় শৈশবযুগ। এ যুগেই প্রেতপূজা।

বড় লোভী, বড় ধূর্ত্ত—বধে কত প্রাণী
সেই অন্ধকারে,
এড়াইয়ে শত্রুহাত ফিরে আসে জানি
আবার আগারে।

কিন্তু তাতেও মুক্তি নেই। কারণ,

"লুকান মানুষ আছে মানুষের মাঝে সদা অচেতন।"

তারপর আরম্ভ হয় 'পূজা'। মৃত দলপতির যত্নরক্ষিত দেহের পূজা।

"উঠ, জাগ, কথা কও এই ধনুর্বাণ লও
দলপতি ঘুমায়োনা আর।
··· ··· ···
আগুনের তাত দিয়া ধীরে ধীরে চিবাইয়া
খেতে ভালবাস মাংস যায়।"

কিন্তু মরা যে জাগে না। কত ভাবে কত প্রলাপে কত অনুরাগে তাদের কাতরতা ; তবুও মরা মরাই। দলপতির মৃত্যুতে এবার সবাই দুর্বল।

দুর্বল হয়েছি সবে, না জানি গো কিবা হবে
শত্রুহাতে মরিব এবার ॥

প্রেতাত্মার প্রাণীদেহে অবতরণ। এ কল্পনায় প্রেতগণের 'প্রাণিপূজা।'

দেখ রে ফুলের গায়, ফুল সম শোভা পায়
কত প্রজাপতি
ছুঁয়ো না ধরো না তায়, মরিবে নখের ঘায়
সুকুমার অতি।

মানবসভ্যতার বাল্যযুগ। এ যুগে প্রকৃতি পূজা ; এ ভাগে ঋগ্বেদের ঋক্ বিশেষের অনুবাদ। তারপর একে একে প্রয়োজনীয় পদার্থের বন্দনা। যেমন অগ্নিপূজা, সূর্যপূজা, উষাপূজা (সৌন্দর্যপূজা)। বায়ুপূজা, (জীবনধারণের অতি প্রয়োজন এবং শক্তিস্থাপনে ভীতি উৎপাদক) বরুণ পূজা (ভীতি উৎপাদক এবং সর্বজনীন উপকার ও মননমুখী সৌন্দর্যের আকুলতা) এবং আকাশ পূজা (অনন্ত অসীমের মধ্যে পদার্থ নিরপেক্ষভাব)। সর্বশেষে পুরাণ কথিত বহু দেবতার পূজা।

বাল্যযুগের পর কৈশোরযুগ। এ যুগ জীবনের চিন্তা ও সংস্কৃতির ভাবনাজড়িত 'নরহরি' পূজা। এই 'নরহরি' পূজার পরই অদ্বৈত পূজা, তাতে জীবনের সেই 'তত্ত্বমসি' ও 'শিবোহং' 'শিবোহং' চিন্তা।

যৌবনপূজা মানবসভ্যতার স্থিতির ও গতির সমন্বয় পূজা। নরপূজা, সমাজ পূজা—তার সঙ্গে অজ্ঞেয় শক্তির পূজা।

প্রবীণ যুগ, ব্রহ্মপূজার অর্থাৎ উৎসে মিলনের আত্ম-সমর্পণের সঙ্গীত। এ সঙ্গীতে একদিকে পূজা—প্রদীপ, আবাহন, সত্য, জ্যোতি, অমৃত, স্বপ্রকাশ রুদ্র, অনন্ত, জননী, কামনা, প্রবাসে ও স্তোত্র এর সমন্বিত ভাবনায় অপর দিকে মানব জীবনের চিরকালের অজ্ঞেয় সেই প্রকৃতি—আকাঙ্ক্ষা, প্রলয়, আহ্বান, কেন এ জীবন, মৃত্যু ও জীবন, যা হোক বিধান, ইত্যাদির আয়োজন।

সর্বশেষ ভাগে বিজয়চন্দ্র মানবসভ্যতার সবচেয়ে সার্থকতায় যে বোধ সেই প্রীতি—চন্দনা, স্তুতি, মন্দিরের প্রতিমা, রমণী, মিলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শেষ করেছেন।

প্রত্যেক ভাগে কবির অফুরন্ত ভাবনা যার ঐশ্বর্য্য সত্যই আনন্দ রস সঞ্জাত মানসিক উদ্‌বোধনের কেন্দ্রস্থলে আন্দোলিত।

'যজ্ঞভস্মে'র তীর্থমঙ্গল ভাগে 'বিশ্বামিত্র' কবিতাটি সম্পূর্ণ মৌলিক ধারায় সুন্দর। কবি নিজেই বলেছেন……

"রামায়ণে ও পুরাণে আছে, যে প্রথমে মেনকা ও পরে রম্ভা আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে আমার আদর্শ অনুসারে রম্ভাকে প্রথমে ও মেনকাকে শেষে আনিয়াছি।"

বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব চান ; তাই তপস্যায় বসেছেন। কিন্তু এদিকে ইন্দ্রের ভয় হলো—রম্ভাকে বিশ্বামিত্র বশ করতে আদেশ দিলেন।

গেল রম্ভা, বিশ্বামিত্র মগ্ন যথা যোগে—
স্থাণু-সম অচঞ্চল, স্পৃহাহীন ভোগে
সযত্নে অযত্ন সৃজি ; আধেক আবরি
অঙ্গখানি, এলাইয়া মোহন কবরী,
দুলাইয়া বক্ষতটে কৌষিক অঞ্চল,
দাঁড়াইল পুরোভাগে"—

কিন্তু বিশ্বামিত্র অচঞ্চল। কিন্তু রম্ভা দমিবার নয়।

"…………আবার বিলাসে
বাঁধিতে তপস্বী-চিত্ত লাস্য—রসাভাসে,
কুড়ায়ে অঞ্চল ধীরে বদন ছাদিল,
বিলম্বিত মাল্যদানে কবরী বাঁধিল।"

বিশ্বামিত্র নেত্র খুললেন, বললেন,

"……হা নিষ্ঠুর, এসেছে আমায়
ভুলাতে কৃত্রিম প্রেমে অকরুণ প্রাণে ?"

এ বলে বিশ্বামিত্র রম্ভাকে অভিশাপ দিলেন,

"রহিবে পাষাণী হয়ে এই তীর্থ-কূলে,
জড় সমা জড় প্রাণে স্বর্গ সুখ ভুলে।"

এরপর এলেন ব্রহ্মা নিজে। বললেন, তোমার সকল সাধনা সার্থক হয়েছে ; সংসারে যাও, তুমি রাজর্ষি হলে ; কিন্তু বিশ্বামিত্র বললেন,

"এ সিদ্ধি লভিতে দেব, মোর ব্রত নহে।"

দেব চলে গেলেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য সংযত চিত্তে ধ্যানে বসলেন। ইন্দ্র আবার চিন্তান্বিত। এলেন মেনকা ; কিন্তু মেনকা বিশ্বামিত্রকে দেখেই মুগ্ধা।

"এমন অনিন্দ্যরূপ ! ভাবে সুরনারী
ছলনায় কভু এঁকে ছলিতে কি পারি ?
এত যে সুন্দর ধরা জানিনিত আগে
হেথাকার সুখ দুঃখ বড় ভাল লাগে
দুঃখ শূন্য উপভোগে কেবা সুখ পায় ?"

মেনকা মানবীর রূপ ধারণ করে—

"পুষ্করে কলসী কক্ষে নিত্য আসে যায়
অনুরাগে ব্রীড়া ভরে দেখি তপস্বীরে
ফিরে ফিরে চেয়ে দেখে, ঘরে আসে ফিরে।"

এমনি করে একদিন,

……"যুবতীর লাজমাখা অনুরাগ দিঠি" বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ করলো।

"মেনকার রূপমুগ্ধ তাপসের মন"

তারপর মধুমাস। কন্যারত্ন লাভ। তখন বিশ্বামিত্রের ভ্রম দূর হলো

"………………হায় !
কোথা মোর ব্রাহ্মণত্ব, তপস্যা কোথায় ?"

সব পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু স্নেহের সেই কন্যারত্নকে তিনি ভুলতে পারলেন না।

"কভু বা কান্দিয়া কহে, "ব্রহ্ম সনাতন
একবার দেখিব সে দুহিতা রতন"

"পাইলে পরের শিশু, ঋষি লয়ে তায়
চুমিতেন কোলে তুলি ভুলিয়া মায়ায়।"

সংকল্প ভুলে গেলেন. মায়ায় আবদ্ধ হ'লেন বিশ্বামিত্র।

"আসিত পুষ্কর তীরে অনাথিনী যত,
তাদেরই সেবায় ঋষি রহিতেন রত।
আর বার ব্রহ্মা আসি দিয়ে দরশন
কহিলেন,—বিশ্বামিত্র, সফল সাধন
হইল তোমার আজি, যাও গো সংসারে,
ব্রাহ্মণত্ব আমি দিলাম তোমারে।"

কিন্তু বিশ্বামিত্র রাজী নন। তিনি বলেন,

"নহি উপযুক্ত আমি দেব দয়াময়
লভিতে এ ব্রাহ্মণত্ব; আমার হৃদয়
স্নেহ, প্রেম, মায়া, মোহ, ফেলিয়াছে গ্রাসি।"

ব্রহ্মা বললেন,

"স্নেহহীন নির্মমতা ব্রাহ্মণত্ব নহে
জানি, যে সন্তাপে—সদা তব চিত্ত দহে
সে সন্তাপ নাহি যার, ব্রাহ্মণ সে নয়;
মগ্ন হও লোকহিতে, আমি প্রেমময়।"

সম্পূর্ণ কবিতায় আছে সংযম ও মৌলিকতার বিস্ময়। এমন চিন্তা বোধ হয় বিজয়চন্দ্রেরই প্রথম যা উনিশ শতকের গীতিকবিদের মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রেছিল।

দুই

তৎ-কালের কবিদের কাছে প্রেম ও দেশপ্রেম একক মনে অনুরণিত। বিজয়চন্দ্রের দেশপ্রেমের কবিতায় ভারতীয় চিন্তাধারার যে ঐতিহ্যবোধ তাকেই বিশেষভাবে বুদ্ধি ও রসের উজ্জ্বলতায়, উদ্দীপনায় জাতিকে আহ্বান করেছেন।

মহৎ ভাবনায় আদর্শায়িত আত্মত্যাগে জীবনের গৌরব, সেখানেই মর-জগতের অমরত্ব। মৃত্যু সকলের কাছেই অনিবার্য। কিন্তু সে মৃত্যুতে যদি বীরত্বের প্রকাশ না থাকে তবে মানব-জীবন ব্যর্থ।

মরার মতন না লভি মরণ, সাধকের মত মরিবি কে?
আর আজি আর মরিবি কে?

অসুর-নিধনে কিসের তরাস? পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস? অমর-জীবনলাভ ক'রতে হ'লে "চরণের তলে দলি রিপুগণ," তাই আহ্বান। "তূর্ণ ত্রিদিব পুণ্য" লাভ হিন্দু-ধর্মের পরম আকাঙ্ক্ষা। কবি সে আকাঙ্ক্ষা পূরণে মানুষকে আহ্বান করচেন। 'ভারত'কে সর্ব সম্মান দানে "অকথিত মহিমা" গানে "অশেষ গরিমা" গর্বে জাতিকে "রোদন উৎসব" করতে বলচেন। সেটাই কবির কাছে বহুযুগ বিধৃত ভারত-মাতার উদ্বোধনের "নব গাথা।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃবন্দনায় যে "ভক্তি" দেশপ্রেমের অনির্বাণ শিখায় বাণীময় তাকেই বিজয়চন্দ্র তাঁর কাব্যে একটা সহজ মহৎ মমত্বের অনুরাগে জীবনকে প্রসারিত করতে চেয়েছেন। কোন পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করেই, কেবলমাত্র জীবনের অমরত্বকে একমাত্র লক্ষ্য করে বেদনার আর্তিতে নব গান রচনা করেছেন।

'প্রেমের' কবিতায় বিজয়চন্দ্র পুরাতনপন্থী। পুরাণ কথিত চরিত্রের ভাব-রসময় আলাপ তাঁর প্রেমের বিষয়বস্তুকে একটা গোপনীয় তন্ময়তায় সুন্দর করেচে। প্রেমে নবীনতার প্রলেপ সুখময়। পুরাণের বহু পরিচিত বিচিত্র রূপচিন্তায় কবির মন ভরে না; তাই তো কবি বলেন,

বিচিত্রতা নাহি যদি প্রেমের সম্ভোগে
সে কি সুখময়?
নিত্য যদি নবোৎসবে মন্দির নাহিক শোভে,
আঁধার আলয়।"

প্রিয়া গৃহিণী নয়। সৌন্দর্যের সম্পর্কহীন একটা সহজ কান্তি। এ কান্তি যেমন একদিকে মোহমুগ্ধ, অপরদিকে বহু আকাঙ্ক্ষার সুতীব্র ব্যাকুলতায় চঞ্চল।

"নিত্য যদি নব ঋতু না সাজাত তনু
ধরণী তোমার
মোহিনী বলিয়া তোরে কে দেখিত আঁখি ভোরে
কহ অনিবার?"

এ "মোহিনী" কল্পনায় সৌন্দর্যের অফুরন্ত আনন্দের রসে রসময়। বাস্তব-জীবনে তাকে যখন "বিবাহ বন্ধনে" পেতে যাই, তখনই আসে বিষাদ। নারীর বাধনহীন সৌন্দর্যের প্রকাশে পুরুষের বিবাহবিধি যখন একান্ত হয় তখনই "দহিতে রমণীগণে শত যাতনায়।"

"সীতা" কবিতায় কবি রামসীতার প্রণয়-মধুরকে অক্ষয় অমলিন করে চিরকালের শুচিতায় সুন্দর করেচেন। প্রেম শুধু মিলনের আনন্দেই সুন্দর নয়, বিরহের দুঃখে তার মাধুর্য সর্বকালের সর্বজনের মঙ্গলে প্রাণময়। সীতার ও রামের উভয়ের চিত্তে তখন প্রেমের ধ্যান; বিরহানন্দের পরিপূর্ণতা।

"প্রাণে প্রাণ আছে গাঁথা,　　ভিন্ন নহে রামসীতা,
প্রজার রঞ্জনে দুঃখ কেন না সহিব
আত্ম-সুখ-অন্বেষণে　　না তুষি সন্ততিগণে,
অকলঙ্ক রাম নামে কলঙ্ক আনিব?"

"অজ-বিলাপ," "মোহিনী," "আমায় ভালবাসি" প্রভৃতি কবিতায় প্রেমে ধ্যান, প্রেমে ত্যাগ, প্রেমে সর্বময় একাত্মতা সর্বত্র প্রেমময় এ চিন্তা বিজয়চন্দ্রের প্রেমমূলক কবিতায় বিশেষ দেখা যায়। এ দিক হতে বিজয়চন্দ্র আবেগ বর্জিত, কল্পনার স্রোতের বেগ তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেনি। জীবনের সুখে দুঃখে, শোকে আনন্দে কবির প্রেমময় সর্বজনীন চিন্তা, সে চিন্তা নিজের জন্য, আপন প্রশান্তির ভাব ব্যাকুলতায় সর্ব দেহ মনের সর্ব আকাঙ্ক্ষা সমর্পিত।

বিষাদ যখন ঘনিয়ে এসে বিশ্ব ফেলে গ্রাসি,
তখন তুমি ওগো বঁধু!

চুম্বনেতে ঢাল মধু ;
সেই অমৃতে বিষের, জ্বালা নিঃশেষিয়ে নাশি।
তোমায় ভালবাসিনেক, আমায় ভালবাসি।

কবির জীবনে আনন্দ প্রেমময়। কিন্তু দুঃখকেও বিজয়চন্দ্র সৃষ্টির অনিবার্য দান হিসেবে গ্রহণ করেচেন। "হেঁয়ালি" কাব্যে দুঃখ গভীর হয়ে মাঝে মাঝে কবির কাছে দেখা দিয়েচে। আনন্দস্রোতের বেগে দুঃখ যেন হঠাৎ সব চলা থামিয়ে দেয়।

"রোদন ব্যথা-ভীতির
নহে আর্তনাদে অধীর।
দূরে কর্ণ দুটি বধির
দৃঢ় পাষাণ সম বধির।"

চিৎকার নয় ; বেদনার মধ্যে একটা গভীরতাও আছে। ব্যক্তি বেদনা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেখার প্রবণতা বিজয়চন্দ্রের কাব্যে আত্ম-ভাব ময়।

"আমার দুঃখে গাইল পাখী, বাতাস খানিক শ্বসেছিল
জানত তারা আগে মোরে কত ভাল বেসেছিল।"

দুঃখকে গলিয়ে গলিয়ে বিচিত্র রসে রসস্নাত করে কবি দুঃখের মধ্যেই সর্বানুভূতির যোগসূত্র রচনা করেচেন।

প্রকৃতি প্রেম কবি মাত্রই প্রকাশ-কাতর।, প্রকৃতির উদার-সৌন্দর্যের প্রত্যেকটি বাণী তন্ন তন্ন করে আপন অন্তর স্নিগ্ধতায় রস-স্নাত করে প্রকৃতি ধ্যান কবি-কল্পের একটা বিশেষ দিক।

উনিশ শতকের প্রায় সব কবির প্রকৃতির রূপ চিন্তা পাশ্চাত্য কাব্য পরিচয়জাত। বৈষ্ণব কবিদের প্রকৃতি বর্ণনায় সর্বজনীন রস তত্ত্বের দিব্যলীলায় উদ্ভাসিত। সেখানে প্রকৃতির খুব একটা বিশিষ্ট চরিত্ররূপ প্রকাশ পায়নি।

উক্ত শতকের কবিদের কাছে প্রকৃতি একটা বিস্ময়-মুগ্ধতায় কখনো অস্পষ্ট বা স্পষ্ট আবার অসীম সৌন্দর্যের রহস্যঘন রূপালোকের আবিষ্কারের নিরন্তর প্রয়াস। তারই সঙ্গে নারীর রূপ-চ্ছটা প্রকৃতির সৌন্দর্যের তীব্রতর আকর্ষণ ব্যাকুলিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাই অনেকের প্রকৃতি বর্ণনায় প্রেম-সাধন হয়েছে।

বিজয়চন্দ্রের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় একটা সহজ রূপ এবং সাধারণ মুগ্ধতার সাথে জীবনের অসম্পূর্ণতার আর্তি জড়ানো আছে। প্রকৃতির মধ্যে চিত্তের উত্থান পতন অনুভব করেছেন। শুধু মাত্র রূপ বর্ণনায় তার শেষ নয়। একটা শিক্ষা একটা আকাঙ্ক্ষা তার সাথে কার্যকরী। সেখানেই আত্ম-মনন প্রিয়তা প্রকৃতি বর্ণনায় সহ-মর্মিতার পরিচয় লাভ করেছে।

'মধ্যাহ্নে' কবিতায় মধ্যাহ্নের একটা শুদ্ধতার সাথে প্রকাশ জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছেন।

"পাখা দিয়ে বিশ্ব জুড়ে, বসে আছে শৈল-চূড়ে
অতিকায় প্রশান্ততা ; শুদ্ধ চরাচর।
* * * *
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ, আশা, বাসনার ভালবাসা,
ঝরে যাক্, মরে যাক্, আত্ম-বেদনায়।
চরণে বন্ধন নাই, পরাণে স্পন্দন নাই ;
নির্বাণে জাগিয়া থাকি স্থির চেতনায়॥

শীতের আগমনে 'শারদ শ্যামলতা শুষ্ক হয়ে ঝরে যায়। 'প্রকৃতির প্রফুল্লতা,' 'সুখগাথা, শীতের ক্লিষ্ট নিস্তব্ধ নির্জনতায় 'জরা' জীর্ণ। সেখানে প্রফুল্লতার জন্য কবির প্রাণে প্রার্থনা জেগেছে। সে প্রার্থনা অনন্ত সুখ-আনন্দের জন্য শীতের জরাকে মেনে নেওয়া॥

"কোরো না উন্মাদ তুমি ক্ষিপ্রস্বরে বিশ্বের পরাণ :
বিলাস-লালসা নহে সুখ।"

শীতের প্রবাহে ক্ষুদ্রতা মুছে যায়। চঞ্চল বাসনা তৃণলতার মত সব ঝরে যায়। "ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ উড়ে" যায়। তারপরই আসে—

"নবজন্ম লভি' প্রীতি,—স্বার্থের মরণে—
বক্ষ আর বিশ্ব জুড়ে থাক্।"

কবি বিজয়চন্দ্রের 'শারদ' চেতনা খুবই প্রিয়। নানা কবিতায় শারদের মেঘমুক্ত, দুঃখ-ভেদী রূপটির ব্যঞ্জনা আছে। "পঙ্কমালা" কাব্যে 'শারদ প্রভাতে' খুব চমৎকার বর্ণনা।

বঙ্গদেশে ঝর্ণা নেই। শারদের রূপ বর্ণনায় কবি সেই নির্জন ঝর্ণার অভাব বোধ করেছেন। তবুও কবির দুঃখ নেই; প্রেম দিয়ে তার আবাহন করেছেন।

নাহিক বঙ্গে নিবিড় বিজন
বিশাল বনের গরিমা ;
তবু প্রেমভরে করি গো পূজন
সে সুখ-শারদ-প্রতিমা।

'বর্ষাশেষে' কবিতায় পাহাড় ; বনস্থলী ; নীলিমা ; নদী ; ফুলবন ; ভোরের বাতাস ; ইত্যাদির চমৎকার বর্ণনা আছে। একটা বিরাট তছ্‌নছে্‌র মধ্যে নব-জীবনের যাদুর চাতুরী কবির কাছে বিস্ময়।

বিজয়চন্দ্রের "হিমাচলে" কবিতা প্রকৃতি বর্ণনায় সবচেয়ে বেশী মুগ্ধরসে পূর্ণ। হিমালয়কে মহাদেবের তপস্যার ধেয়ান-মগ্ন রূপটির কথা বলেচেন। অলঙ্কারে, ছন্দে অনুপম। 'হেঁয়ালির' অধিকাংশ কবিতাই এমন। ব্যক্তি জীবনে বিজয়চন্দ্র শিবভক্ত। শিবের চিন্তাধারায় একটা সর্বজনীন মঙ্গল ও কল্যাণের রূপ সাধনার অনুভব কবিকে মুগ্ধ করেচে। শিব সন্ন্যাসী। তিনিই বিধাতা, তাঁরই চরণ প্রান্তে আলোর ঝর্ণা। সেই ঝর্ণায় প্রাণের বিশ্বাস, মনের তৃপ্তি ; সকল অসাম্যের সমাধান।

দ্বিজেন্দ্রলালের পরই বিজয়চন্দ্রের হাস্যরসাত্মক কবিতা বিশেষ উপভোগ্য। ছন্দ খুবই হাল্কা কিন্তু একটা চটুল বিন্যাস খুবই মর্মস্পর্শী।

"শারদপ্রেমে" কবির কৌতুক—

নামটি শুনেই শাশুড়ী হলেন হতভম্বা,
শ্বশুর বলেন মন্দ কি, তবে একটু লম্বা।

কথাটা এই বাগচী-পাড়ার পরাণ বাগচী বড় লোক,
লোমে ভরা বুকের পাটা, কটা কটা দুটো চোখ।

রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপকতর অনম-অসঙ্গতি তৎকালে খুব প্রবল। তা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপও হয়েচে অনেক। "বাঙালার পলিটিকস" কবিতায় বিজয়চন্দ্র বাঙ্গালীর বাকসর্বস্ব আর্তনাদকে ব্যঙ্গ করেচেন।

আরাম চেয়ারে শুয়ে ভেবে কূল পাইনে,
কিম্বিধ শাসন-নীতি হবে ফিলিপাইনে।

'যজ্ঞভস্ম' কাব্যে 'বেড়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়ে' কবিতাটি তৎকালীন ছেলে-মেয়ের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে পরিহাস ও বিদ্রূপরস।

রোদন বেদন জানাই কিছু আপীসে আর বালিসে,
জানেন কিছু ডাক্তার পাঁচু, পৃষ্ঠদেশের মালিশে!
(কেননা) দাম্পত্য-প্রেমের পথ্যে সকল রোগ তো সারে না?
(অহো) বেড়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়ে ধন-দৌলত বাড়ে না।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে অবলম্বন ক'রে কবির কৌতুক 'বঙ্গমঙ্গল' কবিতায় ধরা পড়েছে।

'যজ্ঞভস্ম' কাব্যের পরিহাস অংশে 'পঞ্চদেবস্তুতি,' 'গণেশবন্দনা' প্রভৃতি হাস্যরসের ব্যঞ্জনা।

বিজয়চন্দ্রই প্রথম হাস্যরসে সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার করেচেন। সংস্কৃত ছন্দ বাঙলা কাব্যে সার্থক হয়ে উঠেছে। তাঁর ছন্দ চেতনা ও ব্যবহার সংযম ও উপযুক্ততা সত্যই চমৎকার। তিনি ছন্দ সম্পর্কে এমন সচেতন ছিলেন, যার জন্যে তাঁর কাব্যে ছন্দের পরিপাটী একটা মার্জিত রূপ ধারণ করেছে।

কবিদের সম্পর্কে একটা অভিযোগ এই যে, হৃদয়াবেগের কাল্পনিক উচ্ছ্বাসের মোহ বিস্তারে নানা শব্দের মিল ঘটিয়ে কাব্য রচনা করেন। এ অভিযোগ সবটা মিথ্যা নয়। এমন অনেক কবি আছেন, যাঁদের কাব্য পাঠ করলে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া বলে মনে হয়, হৃদয় মনে কোন চিন্তা জাগায় না।

বিজয়চন্দ্রের কাব্য সেদিক হ'তে সর্বদোষমুক্ত। শুধু হৃদয় ব্যাকুলতাই তাঁর কাব্যে স্থান পায়নি, বিষয়জ্ঞান যা ভাব হ'তে ভাবান্তরে, চিত্ত হ'তে চেতনায় চিন্তার গভীরতায় বিচিত্র জ্ঞানানুশীলনের অনুভব আনন্দ দান করে। তিনি ছিলেন পণ্ডিত; রসজ্ঞ দার্শনিক এবং সর্বোপরি জীবন রস-স্নাত দরদী আচার্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব'লেছেন, "বিজয়বাবুর চমৎকার ছন্দজ্ঞান। তিনি যে একজন গ্রন্থকীট, তাহা তাঁহার লেখা কবিতা পড়িলেই বুঝা যায়।"

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হাঁ, তীর্থ বটে !

দ্বিতীয় বার গাড়ী বদল করার সময় হাড়ে হাড়ে টের পেলাম, কি জাতের তীর্থে চলেছি। গাড়ীতে স্থান গ্রহণ করবার জন্যে তুমুল সংগ্রাম করতে হোল। সংগ্রামান্তে যতটুকু স্থানে যে ভাবে নশ্বর দেহটিকে স্থাপন করতে পারলাম, তাতে দেহাতীত চৈতন্যটুকু ছাড়া বাহ্যিক হুঁশ জ্ঞান এতটুকু অবশিষ্ট রইল না। তীর্থগামী গাড়ীতে পা দিয়েই তীর্থের ফল ষোল আনা হাতে হাতে পেয়ে গেলাম। শ্রীভগবান শ্রীশ্রীগীতায় বলেছেন—'শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু সমঃ'। আহা—ঐটুকুই হোল আসল তত্ত্ব। ঐ অবস্থাটুকু প্রাপ্তির জন্যেই যাবতীয় দান ধ্যান তীর্থদর্শন। তীর্থ তখনও আধ ঘণ্টার দৌড়, মাইল তেরো চোদ্দ তফাতে থাকতেই প্রবল পরাক্রান্ত তীর্থফলের নিষ্পেষণে ঐ "শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু সমঃ" দশায় পৌঁছে গেলাম। এমন হাতে হাতে ফলদাতা তীর্থ এ যুগে দ্বিতীয় একটি আর কোথায় আছে !

ঐ গাড়ীখানি হোল প্রথম গাড়ী, নিত্য সকাল ছ'টায় মহানগরী কলকাতা থেকে রওয়ানা হোয়ে পৌনে আটটায় মহাতীর্থে পৌঁছে যায়। মাত্র ত্রিশ মাইল ভুঁই পার হোতে গিয়ে আঠার বার থামে। রওয়ানা হবার সময়েই মহানগরীর ভক্তিমান ভক্তিমতীদের দ্বারা এমন ভাবে পরিপূর্ণ হয় যে তখনই অগুণতি মানুষ বসবার ঠাঁই না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আঠার বার থামার অর্থ হোল, আঠার বার আরও যাত্রী নেওয়া। যেখানেই গাড়ী থামে, সেখানেই মানুষ ওঠে, এক জনও নামে না। নামবে কেন, সবাই সেই তীর্থ দর্শনে চলেছে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, এক ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে ঐ তীর্থ যাত্রা, সীমাহীন যন্ত্রণা আর লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করছে কোটি কোটি নরনারী। রেল চালাবার মুনাফা ওপর দিকে উঠতে উঠতে আকাশ স্পর্শ করতে চলেছে। তা' চলুক, কিন্তু গাড়ী একখানি বাড়ানো চলবে না। রেল চালাবার ব্যবস্থা যাঁদের হাতে, তাঁরা হচ্ছেন যম রাজার সাক্ষাৎ অনুচর। পাপী-তাপীদের নরক যন্ত্রণা দেবার জন্যে তাঁরা আকাশ-ফাটা মাইনে পান, মর্জি হোলেই সপরিবারে ইস্পিশাল কামরায় চড়ে একদল বিনা মাশুলে দেশ ভ্রমণ করে আসেন। তাঁদের কোন গরজ পড়েছে মানুষের যন্ত্রণা ভোগ নিয়ে মাথা ঘামাবার ! যম রাজার আদেশ তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। প্রভু যম তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছেন 'খবরদার, সকাল ছ'টার আগে কিছুতেই আর একখানি গাড়ী দিও না। তাহলে লোকগুলোর নরক যন্ত্রণা ভোগটা কমে যাবে। ষোল দু'গুণে বত্রিশ আনা নরককে শাস্তি না ভুগে কেউ যদি পৌঁছয় বাবার কাছে, তা' হলে তোমাদের আস্ত রাখব না।"

ঐ বাবা, বাবার কাছে ছুটছে যারা বাবার গাড়ীতে চেপে, তারা বাবার কৃপায়—কোনও কিছুরই পরোয়া করে না। রেল আফিসের নরকে বসে নরকরাজের চাকর-বাকররা বাবার ভক্তদের যন্ত্রণা ভোগ দেখে দাঁত ছিরকুটে হাসুক না যত পারে, তাতে বাবার ভক্তদের কি গেল এল !

"ব্যোম ব্যোম, হর হর মহাদেও, বাবা তারকনাথের

চরণের সেবা লাগে”—নানা রকমের বুক-ফাটা চিৎকারে সম্বিত ফিরে পেলাম। গাড়ী থেমেছে। চোখ মেলবার আগেই বুঝতে পারলাম, দেহযন্ত্রটি চাপের চোটে একটু একটু করে এক দিকে সরে যাচ্ছে। সরতে সরতে হঠাৎ পায়ের তলায় আর কিছুই রইল না। পড়লাম সহযাত্রীদের সঙ্গে ডেলা পাকিয়ে দরজার বাইরে। পড়েও যথাবিধি পায়ের ওপরেই খাড়া রইলাম। বাবার ইষ্টিশানে বাবার প্লাটফরমে আস্ত একটা মানুষ তখন পা দু'খানা ঠেকাবার ঠাঁইটুকু ছাড়া একটু বেশী ঠাঁই পাবে না। গাড়ী থেকে যারা নামছে, তার অন্ততঃ দুগুণ মানুষ সেই গাড়ীতেই চড়বার জন্যে গাড়ীর গায়ে আছড়ে পড়েছে। মানুষে মানুষে চাপড়া বেঁধে গেছে, অত মানুষ এককাট্টা হোলে কারও পক্ষেই পতিত হওয়া সম্ভব হয় না।

চোখ দুটো মেলে ফেলেছি তখন, বা মেলতে বাধ্য হোয়েছি। কয়েক হাজার মানুষের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে অদ্ভুত একটা মিষ্টি আওয়াজ কানে যাওয়ার দরুণ চোখ দুটো নিজে থেকেই মেলে গেছে। মেলবার সঙ্গে সঙ্গে যা নজরে পড়ল, তা ভাষা দিয়ে বোঝান সম্ভব নয়। চতুর্দিকে—অজস্র গাঁদা ফুল ফুটে উঠেছে। সমস্ত প্লাটফরম জুড়ে প্রকাণ্ড একটা নরমাংসের চাপড়া, সেই চাপড়ার সর্ব্বত্র কোন এক জাদুকরের কারসাজিতে—হঠাৎ ফুটে উঠেছে অগুণতি গাঁদা ফুল। সোনালী হলুদ আর কমলা রঙের ছড়াছড়ি। গাঁদা ফুলগুলো সজীব, নড়ছে চড়ছে, ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি চিৎকার, মহাহুজ্জত বাঁধিয়ে বসেছে। যাকে বলে দামাল বেপরোয়া দুর্নিবার। সজীব গাঁদা ফুলগুলোর গতিরোধ করে তখন, কার সাধ্য।

দেখতে দেখতে তারা গাড়ীতে উঠে পড়ল। ঝুন ঝুন টিং টুং আওয়াজটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল। বাণ্ডিল বাঁধা অজস্র বাঁক স্থান লাভ করল গাড়ীতে, প্রত্যেকটি বাঁকে গণ্ডা গণ্ডা ঘণ্টা আর ঝুমুর বাঁধা রয়েছে। ছোট ছোট তামার ঘট পেতলের কলসী কত যে উঠল গাড়ীতে—তা' গুণে শেষ করা যায় না। সেই সঙ্গে উঠল গলায়-দড়ি-বাঁধা মুখে-শালপাতা-ঢাকা ছোট ছোট মাটির ঘট, বাবার চরণামৃত চলেছে। বাবার মাথায় গঙ্গা জল চড়ল শত সহস্র ঘট, প্রত্যহ চড়ে। গঙ্গা থেকে দশ বার ক্রোশ দূরে বসে গঙ্গাধর প্রত্যহ গঙ্গাজলে ডুবে থাকেন। ওটা ওঁর সখ, টাকা কড়ি সোনা-দানা কোনও কিছুতেই ভোলেন না ভোলানাথ। স্রেফ খানিক গঙ্গাজল আর এক মুঠো বেলপাতাতেই তুষ্ট হন।

তাই ওরা আসে। দশ বার ক্রোশ পথ বাঁক কাঁধে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে। উপায় কি! বাবার সখ যে বড় বেয়াড়া।

নতুন কাপড় নতুন গামছা ছুপিয়ে নেয় কমলা রঙে বা শুধু হলুদে। বাঁশ চিরে সরু সরু সৌখিন বাঁক বানায়। বাঁকের গায়ে লটকে দেয় ছোট ছোট পেতলের ঘন্টি বা ঝুমুর। গঙ্গাস্নান করে নতুন কাপড় পরে নেয়, নতুন গামছা কোমরে বাঁধে। তারপর ঘট দুটিতে গঙ্গা জল ভরে নিয়ে লাগায় ছুট। যাত্রা শুরু হয় বিকেল বেলা, সারা রাত হেঁটে ভোরের আগে বাবার কাছে পৌঁছে যায়। লক্ষ ভক্তের ব্যাকুল ডাকাডাকিতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের অনেক আগে বাবার ঘুম ভেঙে যায়। ভক্তরা কাঁধের বাঁক মাটিতে নামাতে পারে না, যে জল বাবার মাথায় চড়বে তা' কি কোথাও নামানো যায়! বাঁক কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সবাই। ঘুম ভাঙবার পরে বাবার নিত্যসেবা, নিত্য সেবার ত্রুটি হবার জো আছে! নিত্য সেবাটুকু হোয়ে গেলেই বাবা ভক্তদের আনা গঙ্গাজল মাথা পেতে নিতে থাকেন। জলটুকু বাবার মাথায় ঢালতে পারলেই ছুটি, বাঁক আর শূন্য ঘট দুটো নিয়ে ছোটে তখন সবাই ষ্টেশন পানে, তাড়াতাড়ি সবাই ঘরে ফিরতে চায়। উপোস, হাঁটুনি, রাত-জাগা, তার ওপর ভিড়ের চাপ, কিছুতেই ওরা কাবু হয় না। শরীরের দিকে তখন কারও মনই থাকে না। মন তখন পরম পরি-তুষ্টিতে—টইটুম্বুর, গঙ্গা তখন মনের মধ্যে বইছে। কে কার পরোয়া করে!

টইটুম্বুর মন নিয়ে ওরা সবাই চলে গেল।

“বাবা তারকনাথের চরণের সেবা লাগে, হর হর মহাদেও, ব্যোম ব্যোম ভোলেনাথ গঙ্গাধর জটাধারী” আকাশ বাতাস চিরে সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি মহাব্যোমে গিয়ে পৌঁছে গেল। ছেড়ে গেল গাড়ীখানা, প্লাটফরম ফাঁকা। যাদের সঙ্গে এসে পৌঁছলাম, তারা এগিয়ে চলে গেছে। যাদের এসে দেখলাম, তারা পিছনে পালিয়ে গেল। শূন্য প্লাটফরমে তখনও চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছি।

সতরঞ্চি জড়ানো শয্যা রয়েছে বগলে, পদ্মফুল আঁকা সুটকেশ ঝুলছে হাতে, অস্থাবর সম্পত্তিগুলি তখনও হাতছাড়া হয়নি। হঠাৎ মহাবীর কর্ণের কথা স্মরণে উদয় হোল। তিনি নাকি সহজাত কবচ-কুণ্ডল-ধারী ছিলেন। সহজাত কবচ কুণ্ডল ব্যাপারটা ঠিক ধারণায় আসত না কখনও। সেদিন তারকেশ্বর প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে বগলের বিছানাটি আর হাতের সুটকেশটির দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার হোয়ে গেল। এই রকমই কিছু হবে, এক আনা চৈতন্যটুকু সম্বল করে যেভাবে ভ্রমণ করলাম, কামারকুণ্ডু থেকে তারকেশ্বরধাম, তাতে অস্থাবর সম্পত্তি দুটির-সঙ্গে আসাটা সম্ভব হোল কি করে! হাত দু'খানা পা দু'টো যেমন ভাবে এসেছে, ও দুটিও ঠিক সেইভাবে এসে পৌছল। অর্থাৎ ওরা একদম সহজাত হোয়ে পড়েছে। চমৎকার হোয়েছে।

তাড়াতাড়ি সম্পত্তি দুটিকে সেইখানেই নামিয়ে রাখলাম। রেখে একটি বিড়ি বার করে ধরালাম। অনেকক্ষণ পরে ধোঁয়ামুখ, ধোঁয়াটুকু ভারী মিষ্টি লাগল। ধোঁয়ামুখ করার দরুণ মনটি বেশ চাঙা হোয়ে উঠল। এবার কাজে লেগে যাওয়া প্রয়োজন। কাজের মধ্যে প্রথম কাজ হোল শ্রীমান বিপিনবিহারীর শ্রীমতীকে খুঁজে বার করা। এসে পৌচেছেন নিশ্চয়ই, নারী হোয়ে জন্মেছেন বলে মহিলাদের কামরায় দিব্যি উঠে পড়েছিলেন। নারী মাত্রেই মহিলা, মহিলাদের জন্যে সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত কামরায় যে কোনও নারী উঠে পড়তে পারে। অথচ মহোদয়দের জন্যে সংরক্ষিত সব শ্রেণীতে যে কোনও পুরুষ চড়তে পারে না। ন্যায্য মূল্যে টিকিট কিনে চড়লেও মহোদয়গণের চক্ষু গরম হোয়ে ওঠে—যদি সাজপোশাকে তাঁদের সমতুল্য না হওয়া যায়। অর্থাৎ নারী মাত্রেই মহিলা, কিন্তু পুরুষ মাত্রেই মহোদয় নন।

নর ও নারীর গুণ বিচার করতে করতে বিড়িটি শেষ হোয়ে এল। শেষটুকু ফেলে দিয়ে সহজাত বাক্স বিছানার জন্যে নিচু হোয়েই চক্ষুস্থির হোয়ে গেল। কি সর্ব্বনাশ! গেল কোথায় তারা!

সোজা হোয়ে দাঁড়াবার আগেই কানে গেল—"চলুন বাবু, এই এধার দিয়ে আসুন।"

ঝট্ করে পেছন ফিরলাম, মিসমিসে কালো মাগুর মাছের মত লম্বা এক মিনসে আমার অস্থাবর সম্পত্তি দুটিকে দু'হাতে ঝুলিয়ে রওয়ানা হোয়েছে। চলল কোথায় জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, নজর পড়ল প্লাটফরম থেকে বেরবার ফটকের ওপর। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, বুদ্ধিমতী পরিবারটি সেখানে দাঁড়িয়ে কড়া নজর রাখছেন মালের ওপর। পয়মাল হবার উপায় আছে! একটিবার যা ওঁর মালে পরিণত হোয়েছে, তা' কি আর সহজে পয়মাল হোতে পারে!

পা চালিয়ে কাছাকাছি পৌছলাম। পরিবার বললেন—"চল, ঘর পাওয়া গেছে। ঐ ওঁর ঘর, পছন্দ হোলে নোব। নয়ত অন্য ঘরও অনেক আছে। রোজ চার আনা আট আনা এক টাকা ভাড়া। যে কদিন থাকব, সে কদিনের ভাড়া দিলেই চলবে।"

যাঁর ঘর, তাঁর হাতেই বাক্স বিছানা চলে গেছে। পাশ থেকে তিনি তাড়া লাগালেন—"চলুন চলুন, জল আছে কল আছে, সব রকম সুবিধে আছে। দেখবেন কোনও কষ্ট হবে না।"

নিমেষের মধ্যে কাণ্ডটা মগজে প্রবেশ করল। রেলিং-এর ওপারে আরও কয়েকটি ঐ মাগুর শ্রেণীর জীবকে দেখতে পেয়েছি তখন। একই রকমের আকৃতি, একই রকমের পোশাক সকলের। আধ-ময়লা ধুতি পরনে, শুধু গা, খালি পা। ধুতির খুঁট গলায় জড়ানো, এক গোছা করে পৈতে খুব ভালভাবে প্রদর্শন করা হচ্ছে। রেল কোম্পানির বেড়ার গায়ে বুক পেট মুখ ঠেসে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রত্যেকের চোখে একই জাতের দৃষ্টি, শিকারটিকে একজন বাগিয়ে নিয়ে চলল দেখে প্রত্যেকের চাউনিতেই হতাশা ফুটে উঠেছে। সবাই ওত পেতে রয়েছেন, প্লাটফরম থেকে বাইরে পা দিলেই একচোট 'চান্স' নেবেন। 'চান্স' কথাটির বাঙলা হ'চ্ছে চট করে একটু চেষ্টা করা। চলেই গেছে একজনের খপ্পরে, তবু একবার একটু চেষ্টা করতে আপত্তি কি! সুযোগ নেওয়া বললে যা বোঝায় 'চান্স' নেওয়া বললে ঠিক তাই বোঝায় কি! এই জন্যেই ইচ্ছে করে আমি 'চান্স নেবেন' বললাম।

মুহূর্ত্ত মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করে হাত বাড়িয়ে বাক্স

বিছানা ধরে ফেললাম। খুব ভারী গলায় বললাম—"ছাড়ুন, ছাড়ুন শিগগির।"

ঘাবড়ে গিয়ে ছেড়ে দিলেন তিনি, বু বু করে কি যেন বলতে চাইলেন। তেরছা চোখে তাঁর চোখের পানে তাকিয়ে বললাম—"ছিঃ, ব্রাহ্মণের ছেলে গলায় পৈতে রয়েছে, এগুলো হাতে তুলতে আপনার লজ্জা করল না!"

ওপার থেকে সমবেত কণ্ঠে আমাকে সমর্থন জানানো গেল। টিকিট দু'খানি ফট্‌কে সাহেবের হাতে অর্পণ করে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

পরিবার মহোদয়াটিও খুব চুপসে গেলেন। অতিরিক্ত উৎসাহ প্রদর্শন করতে গেলে উলটো উৎপাত ঘটতে পারে, এটা তাঁর জানা ছিল। গাড়ীর ধকল, নতুন জায়গায় পৌছবার উত্তেজনা, একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই মেলবার আনন্দ, ইত্যাদি নানা কারণে খানিকটা বেসামাল হোয়ে পড়েছিলেন তিনি। ওটা কিছু দোষের নয়। হাজর হোলেও মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ কতক্ষণ মাথার ঠিক রাখতে পারে! মাথাটা যাতে ঠিকঠাক থাকে, সেজন্যে ওরা লম্বা চুল রেখে সেই চুলের বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনভোর ঘুরে বেড়ায়। বোঝার চাপে মাথাটা চট করে স্থানচ্যুত হয় না, হোলেও তৎক্ষণাৎ ঐ চুলের টানে সঠিক স্থানে আটকে যায়।

অপর পক্ষের উৎসাহেও ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। প্লাটফরমের বাইরে পদার্পণ করার পরেও ওঁরা কেউ এগিয়ে এলেন না। রেলের এলাকা ছাড়িয়ে নির্বিঘ্নে পথে নেমে দাঁড়ালাম। সামনেই এক চায়ের দোকান। পেছন ফিরে পরিবারকে বললাম—"চল, আগে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।" "চা!" চোখ দুটোকে বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন পরিবার, যেন চা শব্দটা আগে কখনও শোনেন নি।

আর একবার ভাল করে বুঝিয়ে বললাম—"হাঁ—চা গরম চা, ঐ দেখ কাপে ঢালছে। চল ঐ দোকানের ভেতর শান্তিতে বসে দু'জনে দু' কাপ চা খেয়েনি আগে। সেই কাল সন্ধ্যে বেলা কোন ষ্টেশনে যেন চা খেয়েছিলাম একটু, সে কি আর পেটে আছে। গরম চা পেটে না পড়লে বুদ্ধিটা ঠিক তাতছে না।"

এইবার পরিবার এতক্ষণে হেসে ফেললেন। ফিসফিস করে বললেন—"বর্দ্ধমানে ভোরবেলাতে দু তিন ভাঁড় যে গলায় ঢাললে, সেটা গেল কোথায়? না বাপু, এখন আর কিছু খেয়ে কাজ নেই। এতবড় একটা স্থানে এসে আগে দর্শন, বাবার স্থানে এসে বাবাকে দর্শন না করে আগেই খাওয়া। তোমার কি এতটুকু ভয়ডরও নেই!"

তৎক্ষণাৎ বাক্স বিছানা নামিয়ে দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকালাম। পরম ভক্তিভরে বললাম—"দোহাই বাবা, একটু চা খাব শুধু, এক ভাঁড় গরম চা পেটে পড়লে নিশ্চয়ই তুমি খেপে উঠবে না। ওটুকু তরল পদার্থ পেটের ভেতর এক কোণে পড়ে থাকবে, স্নানটান করে ভাল করে মুখ ধুয়ে তবে তোমার দর্শন করব। কিছুতেই এঁটো মুখে তোমার সামনে যাব না। অপরাধ নিও না বাবা, দোহাই—"

পাছে অন্য কারও কানে যায়, এ জন্যে চাপা গলায় ধমকে উঠলেন পরিবার। বললেন—"ঢের হোয়েছে। চল, তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নাও। মন্দিরের কাছে এখনও পৌছতেই পারলাম না আমরা। যারা সেই গাড়ীতে এল, তাদের এতক্ষণে দর্শনটর্শন সব হোয়ে গেল।"

আবার বাক্স বিছানা তুলে নিলাম। বললাম—"না, সাহস হচ্ছে না। চল, আগে দর্শনটি সেরে ফেলা যাক। লাগিয়ে দিলে খটকা, খটকা সুদ্ধ চা গলা দিয়ে উলবে না। বিষম খেয়ে মরতে হবে।"

বাবার আবার খাবার সময় হোয়ে এসেছে। যাত্রীদের বার করে দিয়ে মন্দির খালি করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। লেগেছে বিষম হুড়োহুড়ি তখন, আমরা দু'জন মন্দিরের কাছে পৌছলাম।

মানুষ মানুষ আর মানুষ। যত মেয়ে তত পুরুষ, ছেলে-পুলে কচিকাচা যে কত এসেছে বাবাকে দর্শন করতে তা আন্দাজ করাও দুঃসাধ্য। সরু সরু পথ, পথের দু'পাশে দোকান।

তীর্থস্থান মানেই বাজার, বাজারবিহীন তীর্থ আর ঘৃত-ছাড়া হবিষ্যি এক কথা। তীর্থে গিয়ে ঝাড়ু গাড়ু ধুচনী সুজনী গয়না সয়না সব কিছু কিনতে পাওয়া চাই।

তীর্থস্থানে যারা কারবার করতে বসেছে, তারা নিশ্চয়ই ঠকাবে না। ঠকবার ভয় নেই ভেবে গাঁয়ের মানুষে তীর্থে গিয়ে কেনাকাটা করে। খুব গরীব যে, সেও দু'চার পয়সা খরচা করে একখানি পট বা ছোট মেয়েটার জন্যে দু'গাছা কাঁচের চুড়ি বা ছেলেটার জন্যে একটা টিনের বাঁশী কিনে ফেলে। তীর্থস্থানের দোকানদার কাউকে কখনও ঠকায় না, স্রেফ অদৃশ্যহস্তে নির্বিকারচিত্তে চাকু চালিয়ে খদ্দের বেচারার ট্যাঁক খালি করে ছেড়ে দেয়।

পুণ্যতীর্থের পুণ্যবান দোকানদার মশায়রা তীর্থস্থানের আইন মাফিক সরু সরু রাস্তার প্রায় সবটুকুই দখল করে বসেছেন তাঁদের পণ্যদ্রব্যের ডালাগুলোকে দু পাশ থেকে এগিয়ে আনতে আনতে। তার ওপর আছে খোঁচা, প্রত্যেকটি দোকানের ঝাঁপ ওপর দিকে তুলে রাখবার জন্যে দু'টি করে খোঁচার প্রয়োজন হোয়েছে। তার মানে রাস্তার মাঝখানে সারি সারি সরু সরু বংশদণ্ড সকল মাথায় ঝাঁপ নিয়ে নিবিকারচিত্তে অবস্থান করছে। ফলে সমস্ত পথগুলি আচ্ছাদিতপ্রায়, আলো হাওয়া প্রবেশ করতে পারে না। উৎকট গন্ধ, ভেপসা গরম, আর নিদারুণ ঠেলাঠেলির মধ্যে জোরসে চলেছে বেচা কেনা। তার ভেতর দিয়ে পথ করে এগতে এগতে অনেকটা সময় নষ্ট হোয়ে গেল। বাজার শেষ হোয়েছে নাট-মন্দিরের গায়ে পৌছে, আমরাও পৌছে গেলাম। পৌছে শুনলাম, মহন্ত মহারাজের পূজার সময় হোয়েছে। তাই ঘণ্টাখানেকের মত দর্শন বন্ধ।

ব্যাপারটা কি হচ্ছে, তা' দেখবার সৌভাগ্য হোল না। আর এগয় কার সাধ্য। নাটমন্দির, নাটমন্দিরের চারিদিকে যতটুকু স্থান আছে, খালি মানুষের মাথা। একটা বারান্দার সিঁড়িতে উঠে পড়েছিলাম দু'জনে, তাই চারিদিকের অবস্থাটা দেখবার সুবিধে হোল। দেখব কি, মাথা আর মুণ্ডু ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। সকালের গাড়ীতে যারা এসেছে, তাদের প্রায় সকলেই তখনও অপেক্ষা করছে। স্নান করে তৈরী হোতে হোতেই বন্ধ হোয়ে গেল দর্শন। মন্দির ধোওয়া হবে, ফুল বেলপাতা ভাঁড় খুরি সব বার করে ফেলা হবে, মন্ত্র পাঠ করে শাস্ত্রসম্মত ভাবে বাবার স্নান হবে অভিষেক হবে। প্রচুর পরিমাণে ঘৃত দুগ্ধ মধু ঢালা হবে বাবার ঊর্ধ্ব মুখে, পঁচিশ টাকার ফল মেওয়াও ঢেলে দেওয়া হবে সেই সঙ্গে। স্বয়ং মহন্ত মহারাজ মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন। সর্ব্ব-কর্ম্ম সমাপ্ত হবে তাঁর চোখের সামনে। কোনও দিকে এতটুকু ত্রুটি তঞ্চকতা হবার উপায় নেই। পূজা ভোগ আরতি হোয়ে গেলে মহন্ত মহারাজ চলে যাবেন, পূজার সরঞ্জাম বেরিয়ে যাবে মন্দির থেকে। তারপর আবার দর্শন শুরু হবে।

যে বারান্দার সিঁড়িতে আমরা উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই বারান্দায় একখানি তক্তাপোশ পাতা ছিল। তক্তাপোশের কিনারায় বসে হৃষ্টপুষ্ট এক ছোকরা একদল যাত্রীকে মন্দিরের বিধি ব্যবস্থা বোঝাচ্ছিলেন। যাত্রীদের সঙ্গে আমরাও শুনে নিলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখে নিলাম বক্তাকে, দেখে ভারী ভাল লাগল। বয়েস বেশী নয়, বিশ বাইশের মধ্যেই হবে। পরে আছেন ফিকে রক্তবর্ণের গরদ, একখানি পাট-করা গরদের চাদর কাঁধে চাপিয়েছেন। গলায় ঝুলছে বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, ডান হাতের কনুইতে স্ফটিকের মালা জড়িয়েছেন। তিন চারটে পাথর বসানো আংটি পরেছেন দু' হাতের আঙুলে, খুব ফর্সা পৈতেটি দেখা যাচ্ছে গরদের চাদরের ফাঁকে। প্রশান্ত মুখ, মোটা একজোড়া ভুরুর নিচে ভাসা ভাসা দুটি চক্ষু। চাউনিতে হাঁকুপাঁকু ভাবটা একদম নেই। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞান না থাকলেও মানিয়েছে বড় চমৎকার। অমন নামজাদা দেবস্থানে কদর্য-দর্শন পাণ্ডা-পুরুত থাকলে চলবে কেন। যাকে দেখলেই মেজাজ বিগড়ে যায়, তাকে দিয়ে পূজা করালে তৃপ্তি হয় কখনও। তীর্থের ব্রাহ্মণ তীর্থের মতই মর্যাদাসম্পন্ন হবে, তবেই না মজা।

বামুন ঠাকুর তাঁর যাত্রীদের আরও কত কি বোঝাতে লাগলেন, সেদিকে আর কান দিতে পারলাম না। বিকট আওয়াজ করে ঢাক বেজে উঠল, সেই সঙ্গে ছোট বড় অনেকগুলো ঘণ্টা বাজতে লাগল। হুড়মুড় করে বহু মানুষ উঠে পড়ল বারান্দার ওপর। রূপা-বাঁধানো আসাসোঁটা উঁচিয়ে পাগড়ি-বাঁধা সান্ত্রী কয়েকজন বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল আগে আগে। তারপর লাল ভেলভেটের ছাতা দেখা গেল, ছাতার চারিদিকে স্বর্ণখচিত ঝালর ঝুলছে। সেই ছাতার তলায় মাথা বাঁচিয়ে মহন্ত মহারাজ বাবার পূজা দেখতে চললেন। ছাতার পেছনে আর একদল আসাসোঁটাধারী সান্ত্রী, তাদের পাগড়ি গোঁফ পেল্লায়-পেট আর

পেটের ওপর ইয়া বড় বড় রূপার তকমা দেখতে দেখতে—মহন্ত মহারাজ পৃষ্ঠরক্ষা করে চলল। ভয়ে ভক্তিতে না সম্ভ্রমে, কিসের দরুণ বলতে পারব না, বেশ খানিকটা স্তম্ভিত হোয়ে গেলাম। বাবাকে তখনও দেখতে পাইনি, বাবার বাবাকে দেখে নিলাম। তাও তাঁর শ্রীবদনখানি দেখার সৌভাগ্য হোল না, বদন ছাতার আড়ালে লুকনো ছিল। তা' হোক, বদন না দেখতে পেলেও এতটুকু আক্ষেপ রইল না। বাবাকে যিনি খাইয়ে দাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তিনি হোলেন বাবার বাবা। বাবার বাবা তিন হাত সামনে দিয়ে চলে গেলেন। উঃ, কি ভয়ানক কথা।

[ক্রমশঃ

লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন ও হিসাব কমিটির সুপারিশ

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

বিগত ১৭ই এপ্রিল তারিখে দিল্লী থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, হিসাব কমিটি লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের লগ্নীযোগ্য তহবিলে সবটাই সরকারের হাতে ছেড়ে দিবার পক্ষপাতী। বর্তমানে যেভাবে লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের কাজ চল্‌ছে তাতে কমিটি সন্তুষ্ট নন। যদি সরকার কর্পোরেশনের সমস্ত লগ্নীযোগ্য তহবিল গ্রহণ করেন তাহলে কর্পোরেশনের কাজের উন্নতি হবে বলে কমিটি আশা করেছেন। কমিটির অভিমত হল, যদি দেশ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার স্বার্থ রক্ষা করতে হয় তাহলে সরকারের পক্ষে নিজের হাতে লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের লগ্নীযোগ্য তহবিলের সবটা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। বিশেষ করে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে কমিটি এই মর্মে মন্তব্য করেছেন যে, সরকার যদি কর্পোরেশনের লগ্নীযোগ্য তহবিল নিজের হাতে গ্রহণ করেন তাহলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে আনুমানিক তিনশত পনের কোটি টাকা সমেত আরো প্রায় একশত পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা সরকারের হাতে এসে পড়বে। অর্থাৎ সরকার পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য মোট চারশত পঞ্চাশ কোটি টাকা পাবেন। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সরকারের হাতে যদি লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের সমস্ত উদ্বৃত্ত তহবিল চলে আসে, তাহলে বে-সরকারী কারবারগুলো কর্পোরেশনের তহবিল লগ্নীর কোন সুযোগ পাবেননা। কাজেই স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠছে, বে-সরকারী কারবারগুলোর পক্ষে মূলধন এবং ঋণসংগ্রহ করা খুব অসুবিধাজনক হবে কিনা। হিসাব কমিটি বলছেন, হবেনা। এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, যেহেতু লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের উদ্বৃত্ত তহবিলটি অতিরিক্ত সংগৃহীত হবার দরুণ সরকারের চাহিদা টাকার বাজার থেকে হারাহারিমতে কমে যাবে, সেহেতু সম-অনুপাতে টাকার বাজার থেকে বে-সরকারী—কারবারগুলোর পক্ষে মূলধন এবং কর্জ্জ পাওয়া কষ্টকর হবেনা। কর্পোরেশনের উদ্বৃত্ত তহবিলের সবটা যদি বে-মেয়াদী ঋণ হিসাবে সরকারকে দেওয়া হয় তাহলে অতিরিক্ত একশত পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা সরকারী রাজকোষে জমা পড়বে। অবশ্য একথা আমরা আগেই বলেছি। তবে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত কথাটির উল্লেখ করছি এজন্য যে, তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের তহবিল থেকে তিনশত পনের কোটি টাকা সরকারের মেয়াদী ঋণপত্রে লগ্নী হবে বলে জানা গেছে।

এযাবৎ আমরা দেখেছি, কর্পোরেশনের উদ্বৃত্ত তহবিল নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দেখা গেছে, এই তহবিল থেকে বীমাকারীদের ঋণ দেওয়া হয়। এছাড়া আমানতের একটা বিরাট অংশ কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করা হয়ে থাকে। অবশ্য কোম্পানীর কাগজগুলোর মেয়াদ নির্দিষ্ট। আমানতের শেয়ার ডিবেঞ্চারে লগ্নী করা হয় বলে জানা গেছে। বীমাকারীরা গৃহ তৈরীর জন্য ও কিছু কিছু ঋণ পেয়ে থাকেন। কিছুদিন ধরে বীমাকারী নন এমন লোককেও নাকি গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ঋণ দিবার নীতি অনুসৃত হচ্ছে। হিসাব কমিটি কর্পোরেশনের এই ধরণের লগ্নী নীতি সমর্থন করতে পারেননি এবং এই নীতি পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করেছেন। কলিকাতার দি ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন "In a way, the Committeo seems to be pleading for what is deprecated in the privato sector. 'Concentration of economic power," Already the sharo of the private sector in the Corporation's investment is steadily declining. Itseems that the time has come when the L. I. C. should be permitted to invest a slightly larger proportion of its funds in first class equities to secure what Mr. C. D. Deshmukh emphasized,

"the maximum yield of policyholders." In the United Kingdom, Companies are moving away from fixed interest bonds towards investments with varying yield."

ভারতের জীবন-বীমা ব্যবসা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার সময় ভারত সরকারের অর্থদপ্তরের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বে-সরকারী কারবার এবং শিল্পব্যবসা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে জীবন-বীমা কর্পোরেশনের তহবিলের একটা অংশ লগ্নী করা হবে। কাজেই এখন যদি কর্পো-রেশনের উদ্বৃত্ত তহবিলের সবটাই সরকারী রাজকোষে জমা পড়ে তাহলে বে-সরকারী তরফকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হবে না বলেই মনে হচ্ছে। ফলে একদিকে যে রকম দেশের জনসাধারণ সরকারের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন সে রকম অন্যদিকে বে সরকারী কাজ-কারবারের প্রসার ব্যাহত হবে। এখানে বে-সরকারী কারবারের প্রশ্ন তুলছি এজন্য যে, আমাদের দেশের সরকার এবং জাতীয় নেতারা মিশ্র অর্থনীতির উপর জোর দিচ্ছেন। অর্থাৎ সরকারী এবং বে-সরকারী উভয় ধরণের শিল্প ব্যবসা প্রসারিত হোক—এটাই এঁরা চাইছেন। কাজেই বে-সরকারী শিল্প ব্যবসার পথে বাধা সৃষ্টি করা সরকারী নীতির দিক থেকে বাঞ্ছনীয় নয়।

হিসাব কমিটি এই মর্মে আশা ব্যক্ত করেছেন যে, কর্পোরেশনের লগ্নী-যোগ্য তহবিলের সবটা সরকারের হাতে এলে কর্পোরেশনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিত হবে। কমিটির এই আশার পিছনে তিনটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হল, গ্রুপ ইনস্যুরেন্স জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। বলা হয়েছে, যা'তে গ্রামাঞ্চলে জীবনবীমা প্রসার লাভ করে সেজন্য চেষ্টা করা লাইফ-ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের প্রাথমিক কর্তব্য। অথচ কর্পোরেশন যথাযথভাবে নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য পালন করেননি। তাই হিসাব কমিটি লোকসভায় প্রদত্ত রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন, গ্রামাঞ্চলে জীবনবীমা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনকে আরো সচেষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ এ পর্য্যন্ত যা করা হয়েছে তার চাইতে আরো বেশী কার্য্যকরীভাবে কর্ত'ব্য সম্পন্ন করা দরকার। কর্পোরেশনের কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য হিসাব কমিটি একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছেন। এখন যে হারে প্রিমিয়ম স্থির করা হয়েছে প্রস্তাবিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সেটা পর্য্যালোচনা করবেন। এ ছাড়া অর্দ্ধস্বায়ংশাসিত আঞ্চলিক ইউনিট গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। হিসাব কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যদি এইপ্রকার ইউনিট গঠিত হয় তাহলে বম্বে থেকে লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় অফিস সরিয়ে নিয়ে কোনও একটা অধিকতর কেন্দ্রীয় স্থানে স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে। দি ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা বলছেন—"Spreading insurance, particular in rural areas, depends largely on proper educative publicity (schemes of rural insurance and the small savings campaign need to be carefully co-ordinated)"

দ্বিতীয়তঃ শিল্পায়নে যে আঞ্চলিক তারতম্য চোখে পড়ছে সে তারতম্য দূরীভূত হবার সম্ভাবনা আছে। কোন কোন অর্থনৈতিক ভাষ্যকারের মতানুযায়ী Removing regional imbalances in industrialization is no more the function of the Corporation than stabilizing the stock market. Policyholders interests must remain paramount. লোকসভায় প্রদত্ত হিসাব কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, নির্দ্ধারিত লগ্নীর পদ্ধতি সরকার কর্ত্তৃক পরিবর্তিত হবার পরেও ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালে লগ্নীর ধরণে প্রকৃতপক্ষে কোন পরিবর্তন হয়নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার, ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার এবং ঋণপত্রে বার কোটি টাকা লগ্নী করা হয়েছে। ঐ টাকার মধ্যে বম্বেতে পাঁচ কোটি বাহান্ন লক্ষ টাকা, এবং পশ্চিমবঙ্গে দুকোটি উনসত্তর লক্ষ টাকা লগ্নী করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অর্থনীতিবিদ্‌রা বলছেন, যদি বে-সরকারী প্রয়াসে লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের তহবিল লগ্নী একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে প্রকাশ্য বাজারে সরকারী ঋণের চাহিদা নিঃসন্দেহে কমে যাবে। তবে তাঁদের আশঙ্কা মুষ্টিমেয় ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি টাকার বাজারে উদ্বৃত্ত তহবিল নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দিবেন। শুধু তাই নয়, এঁরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ঐ তহবিল লগ্নী করতে থাকবেন। এমন কি যে সব অঞ্চলে শিল্প ব্যবসা প্রসারের জন্য লগ্নী প্রয়োজনীয়, সে সব অঞ্চলও লগ্নী থেকে বঞ্চিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়; অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, জীবনবীমা কর্পোরেশনও বিভিন্ন এলাকায় যে হারে তহবিল লগ্নী করেন সেটা সামঞ্জস্যমূলক কিনা, এমন কি বম্বে রাজ্যের প্রতি কর্পোরেশন অনেকটা পক্ষপাতিত্ব মূলক মনোভাব প্রদর্শন করেছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিচার করে দেখতে হবে, লগ্নী-নীতির দিক থেকে কর্পোরেশনের কোন ত্রুটি হয়েছে কিনা। আমাদের মনে হচ্ছে, সেদিক থেকে ত্রুটি হয়নি। কর্পোরেশনের পরি-চালনার ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত আসলে তাঁদের সিদ্ধান্ত ত্রুটিমুক্ত ছিলনা। ইচ্ছা করলে তাঁরা অনায়াসে এই ত্রুটি সংশোধন করতে পারতেন।

তৃতীয়তঃ সরকার কর্ত্তৃক কর্পোরেশনের সমস্ত লগ্নীযোগ্য তহবিল গৃহীত হলে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষে জীবনবীমা পত্র গ্রহণ সহজেই বাধ্যতামূলক করা যাবে। জীবনবীমার উদ্দেশ্য অনেকগুলো। তবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বাধ্যতামূলক জীবন-বীমা প্রবর্তন করলে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল কিছুই হবেনা।

লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন কর্ত্তৃক একটা পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন কার্য্যসূচী গৃহীত হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, কর্পোরেশন এই মর্মে আশা প্রকাশ করেছেন যে, আগামী ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দশ হাজার কোটি টাকার নয়া ব্যবসা করা—সম্ভবপর হবে। হিসাব কমিটি লোকসভায় যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন সে রিপোর্টে দেখা যায়, প্রথম তিন বছরের নয়া ব্যবসায়ে কর্পোরেশন তাঁর

লক্ষ্যস্থল অতিক্রম করেছেন বলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। তবে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬০ সালের পাঁচশত পঁচিশ কোটি টাকা লক্ষ্যস্থলে প্রায় অর্ধাংশ কোটি টাকার কম ব্যবসা হয়েছে। এজন্য হিসাব কমিটিও কর্পোরেশনের সমালোচনা করেছেন। জানা গেছে, ১৯৬০ সালেরই ১লা জানুয়ারী তারিখে তিয়াত্তর হাজার বিরাশী জন পলিসি-হোল্ডারের চৌদ্দ কোটি চার লক্ষ টাকা বকেয়া পাওনা কর্পোরেশনে পড়ে আছে। শুধু তাই নয়। এর ভিতর আবার তেত্রিশ হাজার আটশত দশ টাকা এক বছরের বেশী বকেয়া পড়ে রয়েছে। একথা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই যে, দাবীর টাকা মিটিয়ে দিবার ব্যাপারে বিলম্ব করা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। এতে দাবীদাররা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে বাধ্য হ'ন।

শ্রীমোরারজী দেশাই হলেন ভারত সরকারের অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি বিগত ২১শে এপ্রিল তারিখে লোকসভায় বলেছেন, হিসাব কমিটি সরকারের হাতে লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের সমস্ত লগ্নী-যোগ্য তহবিল তুলে দিবার জন্য যে সুপারিশ করেছেন সরকার সে সুপারিশের সমস্ত দিক বিবেচনা করে দেখবেন। শুধু তাই নয়। তিনি এই মর্মে আশ্বাসও দিয়েছেন যে, ঐ সুপারিশ সম্পর্কে যথাসময়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। বুঝা যাচ্ছে, সরকার হিসাব কমিটির সুপারিশের গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারেননি। তবে যতদিন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত না হবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতীয় লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত বর্তমান লগ্নী-নীতি অনুসরণ করা হবে। অর্থদপ্তরের অভিমত হচ্ছে "L. I. C. should be kept on its toes with regard to investments, servicing and everything else. Let it answer fully for everything."

বাংলা সমালোচনার দ্বিতীয় অধ্যায়

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

(১৮৫৯-১৮৭১)

১৮৫৯ সালে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে বলা চলে বাংলা সাহিত্যে পুরাতন যুগের অবসান হল। ১৮৫৯ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত যে সময়টুকু তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যথেষ্ট গৌরবের, এবং সমালোচনার দিক থেকেও নিষ্ফল নয়। এই সময়েই মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী প্রকাশিত হয়, ফলে বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ট্রাজেডি, সনেট, সুখান্ত পাশ্চাত্য আদর্শের মহাকাব্য, এবং সর্বোপরি মানবতার পূজা প্রবর্তিত হয়। দীনবন্ধুর নাটক প্রহসন গুলোও এই সময়েই রচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী প্রকাশিত হয়। হেমচন্দ্র ও নবীন সেনও কাব্য সাধনায় লিপ্ত হন।

অপর দিকে এই সময়টিতে বিধবাবিবাহ আইন পাশ, সিপাহী-বিদ্রোহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি হয়ে যায়। হিন্দু পেট্রিয়ট, ও হিন্দু মেলার ক্রিয়াও চলতে থাকে। সমাজ ও ধর্ম বিপর্যস্ত হওয়ার আশংকা দূর হওয়ায়(১) সঙ্গে সঙ্গে জাতির চিন্তা ও সাহিত্য প্রয়াস ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করে।

পত্রপত্রিকার প্রচারও যথেষ্ট ছিল এই সময়ে। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' উঠে গেলে কয়বছর পরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল রহস্য সন্দর্ভ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'রহস্য সন্দর্ভ,' সর্বার্থ সংগ্রহ, ঢাকার মিত্র প্রকাশ প্রভৃতি সাময়িকীতে বিবিধার্থ সংগ্রহের ধারার অনুবর্তন করেই নূতন পুস্তকাদির পরিচয় ও আলোচনা প্রকাশ হতে থাকে। ইতোমধ্যে ১৮৫৮ সালে 'সোমপ্রকাশ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। এই কাগজে "সুন্দর সরল ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পলিটিক্স আলোচিত হইতে লাগিল।"(২) সাহিত্য সম্পর্কে দ্বারকানাথ ছিলেন পুরাতনপন্থী, তবে পুরাতনের পক্ষাবলম্বন করে নূতনের স্ফূর্তিতে তিনি পরোক্ষভাবে আনুকূল্যই করেছেন।

আলোচ্য সময়ে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা হল কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা। এটি মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬২ সালে। তখন হেমচন্দ্রের বয়স মাত্র চব্বিশ। ভূমিকায় তিনি কাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন, "ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ;—ভয়, ক্রোধ, আহ্লাদ, করুণা, খেদ, ভক্তি, সাহস, শান্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা।" স্পষ্টতঃই এই মত সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র থেকে ধার করা। সংস্কৃতের সঙ্গে হেমচন্দ্রের পরিচয় ছিল নিতান্ত অগভীর, ইংরাজী শিক্ষাই তিনি লাভ করেছেন বাল্যাবধি। তা থেকে এই অনুমান অসঙ্গত হয় না যে উপরের সংজ্ঞাটিতে যে মত প্রকাশ পেয়েছে তা তাৎ-

১ Queen's Declaration' স্মরণীয়।

২ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

কালিক সংস্কার থেকেই এসেছে, এ'টি সমালোচকের স্বাধীন সুচিন্তিত অভিমত নয়।

আলোচ্য কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে গিয়ে সমালোচক লিখলেন, "কৃত্তিবাস কাশীদাস সঙ্কলিত রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাংলা পুস্তকেই নাই।"—যেন রসের পরিমাণ দিয়ে কাব্যের ওজন নির্ধারিত হবে। এই জাতীয় কথায় একদিকে যেমন অলংকার শাস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব সূচিত হয়, তেমনি মনে হয় এর সঙ্গে লেখকের প্রাণ ও মননের কোন যোগ নেই। এই রসসমাবেশের কথা ছেড়ে যখন লেখক স্বাধীনভাবে তাঁর মনে কাব্যটির প্রভাবের কথা বলতে গেলেন তখনই আমরা যথার্থ সমালোচনার সাক্ষাৎ পেলাম। হেমচন্দ্র জানালেন যে প্রথমে মধুসূদনের কাব্য লোকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে না পারলেও অল্পদিনের মধ্যেই তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার কারণ এই কাব্যের অপূর্ব আবেদন, এখানে পুরাতন বিষয়ের অভিনব উপস্থাপন ঘটেছে, প্রতিটি দৃশ্য প্রতিটি ঘটনা অর্থপূর্ণ মূর্তি লাভ করে পাঠকের মানসচক্ষে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত ও রোমাঞ্চিত না হন এদেশে এমন হিন্দুসন্তানও কেহ নাই।......যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় ও ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ একত্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে, যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়; —যাহাতে দেব দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্যশালী, প্রতাপশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্যকলাপ দর্শনে মোহিত ও রোমাঞ্চিত হইতে হয়"—ইত্যাদি। এই উক্তি পরম্পরায় আমরা বিদগ্ধ পাঠকের অনুভূতির অবিমিশ্র প্রকাশ দেখতে পাই। এখানে অনেকখানি যাকে বলে Impressionistic Criticism তাই পাওয়া যাচ্ছে।

আলোচ্য ভূমিকায় আমরা আর একটি জিনিস পাই, সে হচ্ছে তুলনায় বিচার। হেমচন্দ্র রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ছিলেন, এবং সেই-যুগে ভারতচন্দ্র ছিলেন জনপ্রিয় কবি। লেখক দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে ভারতচন্দ্রের গৌরব 'লেখার চমৎকারিত্বে'—আর মধুসূদনের গৌরব 'ভাবের চমৎকারিত্বে'। আর ভাবের গৌরব যে কাব্যে আছে সে কাব্যই শ্রেষ্ঠতর—"যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় শুব্ধ হয়" তাহাই মহৎকাব্য।

সমালোচক মহাকাব্যখানার দোষের দিকেও নজর দিয়েছেন, 'বাক্যের জটিলতা দোষ' ও "অনেকস্থলে অস্পষ্টতা দোষ" লক্ষ্য করেছেন, প্রথাবহির্ভূত ক্রিয়াপদ গঠনও সমর্থন করতে পারেন নি। ছন্দ সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন, কিন্তু দোষ ধরতে গিয়ে নিজেরই অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, কারণ অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূলকথা যে যতি ও ছেদের অসহাবস্থান সেটাই তিনি ধরতে পারেন নি। যা হোক, দোষের তালিকা স্পষ্টভাবেই 'সাহিত্যদর্পণে'র সপ্তম পরিচ্ছেদের কথা (১) মনে করিয়ে দেয়।

শেষটায় লেখক রায় দিলেন—দোষত্রুটির জন্যে গ্রন্থখানি 'সর্বাঙ্গসুন্দর' না হতে পারলেও বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কীর্তি হয়ে থাকবে।

এই ভাবে আমরা দেখতে পাই একদিকে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী সমালোচক রস, ভাব, দোষ ইত্যাদির উল্লেখ করে কাব্যবিচারের চেষ্টা করেছেন, আর একদিকে কাব্যের আস্বাদ যা লাভ করেছেন তার সুন্দর প্রকাশ দিয়েছেন। এই ভূমিকাটিতে প্রাচীন ও নবীন দুই ধারারই মিশ্রণ দেখা গেল। 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' তুলনায় এখানে যেন পুরাতনের দিকে ঝোঁকটা কিঞ্চিৎ বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাংলা সমালোচনা-ধারায় সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বহুবিচিত্র বিষয়ের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছে সেটি হচ্ছে তার রসবাদ। 'রসোত্তীর্ণ ভাবের রসপরিণতি' প্রভৃতি কথা শিক্ষার্থীদের লেখায়ও খুব মেলে।

হেমচন্দ্রের ভূমিকাটির শিরোদেশে কিন্তু ছিল 'লেখক মহোদয় কর্তৃক সংশোধিত'। কিন্তু এর কোথায় যে মধুসূদনের হাত, যদি আদৌ থেকে থাকে তা নির্ণয় করার উপায় নেই, মনে হয় লেখক মহোদয়ের সংশোধনের কথাটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। মধুসূদনের পক্ষে লেখাটির উপর চোখ বুলিয়ে যাওয়ার অতিরিক্ত কিছু করা স্বাভাবিক নয়। সমালোচকের সম্পর্কে কবির ধারণা নেহাৎ খাট ছিলনা। এই ভূমিকার বিষয়ে কবি তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর নিকট লিখেছিলেন, "a real B. A. has written a long critical preface."

আলোচ্য সময়ে সাহিত্যচর্চা যথেষ্ট হয়ে থাকলেও উল্লেখ করার মত সমালোচনা আর নেই।

(১) দোষ নিরূপণঃ।
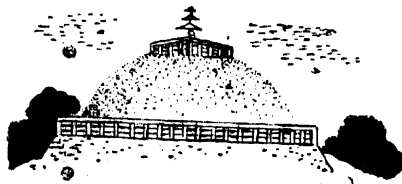
রূপা

শ্রীমতী গৌরীরাণী মুখোপাধ্যায় এম-এ

বসন্তের সমাগমে যেমন আমের ডালে সহসা মুকুল ধরে, বনে বনে রঙ্ লাগে, দিকে দিকে জেগে ওঠে সবুজ শ্যামলিমা, যুবক উদয়ের মনেও তেমনি প্রথম যৌবনের রাঙা-মুকুল ধরতে সুরু ক'রল। যখন সে গরু চরাতে নদীর ওপারে শুক্‌নো মাঠটার মধ্যে যায়, তখন কেমন যেন আনমনা হ'য়ে পড়ে—মন তার কি যে চায়, তা সে নিজেও বোঝে না।

রাশি রাশি পাথরের স্তুপের ফাঁকে ফাঁকে মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে গরুগুলো তাদের সারাদিনের আহার—সবুজ ঘাসের অন্বেষণে মত্ত থাকে; তাদের সামলাতে গিয়ে উদয়ের মাঝে মাঝে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। বিশেষ ক'রে আজকে তার এ কাজে একটুও মন লাগছে না। আজ শিবরাত্রি—আলমপুরের মেলাতে কত উৎসব হবে, কত মেলা বসবে, কত নাচগান হবে—তীর্থযাত্রীর ভীড়ে পথে চলা দায় হবে। তা' ছাড়া বরযাত্রীরাও নাকি এই পথ দিয়েই যাবে। কিন্তু উদয় এমন হতভাগ্য—এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'ল। বাবা তাকে মেলাতে যেতে বারণ করেছেন। বাবার আদেশ উপেক্ষা করার মত দুঃসাহস তার মোটেই নেই। তাই সে ভাবতে লাগল'—যাক্ গে, মেলাতে যেতে না পারি, অন্ততঃ এই পাহাড়ের চূড়োটায় বসে সব লক্ষ্য করতে হবে। উদয় জানে যে গ্রামের সুবেদার অজিন্দর সিংএর মেয়ের বিয়ের বরযাত্রীর পালকীর মধ্যে নিশ্চয়ই তার বোনেরা এবং বান্ধবীরা থাকবে। হয়তো একটুখানি সুযোগ মিলতে পারে—তখন উদয় সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ইশারা-ইঙ্গিতে তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকবে; আর কেই বা জানে তাদের মধ্যে থেকে কোন সুন্দরী মেয়ে একটু মিষ্টি হেসে আপ্যায়িত করবে,—ঐ মিষ্টি হাসিটুকুতেই উদয়ের প্রণয়-তৃষ্ণা চরিতার্থ হবে।

গ্রাম থেকে কত কি আবোল-তাবোল চিন্তা করতে করতে উদয় গরুরপালকে ঘরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চ'লল। মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে বলে—"এ পালগুলো মরেও না, তা' হলে সব কটাকে একসঙ্গে বেঁধে রেখে আরও বেশী ক'রে চারটি ঘাস মুখের মধ্যে গুঁজে দিই।" পাঁচটা বাছুরের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটা উদয়ের হাতের বেত দেখে টাট্টুঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে চারিদিকে ছুটতে আরম্ভ করল।

উদয় বাছুরের পিছু পিছু দৌড় মারল। উদয় মনে মনে ভাবতে লাগল, যখন সে ছোট ছিল তখন তার বাবার মারের ভয়ে সে-ও প্রায়ই এমনি ক'রে ছুটে পালিয়ে বাঁচত। নিজের পূর্বস্মৃতি মনে প'ড়ে যাওয়াতে, সে তখনি হঠাৎ বাছুরগুলোকে মুক্তি দিত।

গরুগুলো পাথরের আনাচে-কানাচে এক সঙ্গে জোট বেঁধে ঘুরে বেড়াত। পাহাড়ে জায়গা, কোথাও সবুজ ঘাসের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।...কোথাও কোথাও নীরস পাথরের বুক চিরে বেরিয়েছে দু'চার গাছা সবুজ ঘাস। বেচারাদের সেই দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! উদয় কেবল লক্ষ্য রাখে, যাতে ওরা পাহাড়ের ওপর থেকে খাদে পড়ে প্রাণটা না হারায়।

উদয় যখন বড় পাথরখানার কাছে এসে পৌছল, তখন রোদ্দুরের তেজ বেশ বেড়ে উঠেছে মনে হচ্ছে। কৈলাসের রাজরাণী—হরপার্ব্বতীর মিলনকে সার্থক ক'রে তুলতে যেন সূর্য্যদেব এমন সুন্দর বিচিত্র রংএর সৃষ্টি করেছেন...বসন্তকে আহ্বান জানিয়েছেন।...

উদয়ের বাবা পৌরাণিক উপাখ্যানে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। এই সেদিন যখন মন্দিরের পুরোহিত ঈশ্বর-

দাস, শিব-পার্ব্বতীর প্রণয়-লীলার বর্ণনা দিচ্ছিলেন—উদয়ের পিতা লজ্জিত হ'য়ে উদয় এবং তার সঙ্গী-সাথাদের অন্য জায়গায় গিয়ে খেলা করতে আদেশ করলেন, পাছে উদয় এবং তার সঙ্গীরা আড়িপেতে এই সব প্রেমকাহিনী শুনে ফেলে। বিশেষ ক'রে সেই জন্যেই তিনি ছেলেকে শিবের গাজনের মেলাতে যেতে বারণ করেছেন। অথচ, নিজের এসব বিষয়ে কৌতূহলের অন্ত নেই। এই নিয়ে প্রায়ই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বচসা ও বাক্‌বিতণ্ডা চলত। সেদিনেও উদয়ের মেলায় যাওয়ার মত সামান্য ব্যাপার নিয়েও দু'জনের মধ্যে বেশ খানিকটা তর্কযুদ্ধ হ'য়ে গেল; কিন্তু ফল কিছু হ'ল না। জেদ, বদমেজাজ এবং দুর্ম্মুখ-এর জন্যে তাঁর আড়ালে আবডালে পাড়াপড়শীরা খুব নিন্দে ক'রে বেড়াত। এই কারণেই নাকি চাক্‌রী জীবনে তিনি বিশেষ পদোন্নতি করতে পারেন নি এবং অসময়ে চাকুরীতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে শোনা যায়।…এখন ঘরে বসে সেই শোধ তুলছেন স্ত্রী-পুত্রের ওপর।…

উদয় ঘরে বসে ভাবছে—"এটা কিন্তু বাবার ভারী অন্যায়—গ্রামের সব ছেলে যে যেখানে ছিল আলমপুরের মেলাতে গেল, আর আমি একা প'ড়ে রইলাম ঘরের কোণে! নাঃ, বাবার এসব চালাকি আর চলবে না।" সে তখনি বাবার পাগড়ীটা তুলে নিয়ে সৈন্য-সামন্তের ঢং-এ মাথায় বেঁধে নানাভাবে বাবাকে নকল করবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর বেরিয়ে পড়ল পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে।…খানিক দূরে এসে একটা পিঁপুল গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় এসে বসে পড়ল। পাগড়ীটা খুলে নিয়ে উত্তপ্ত পাথরখানার এবং নিজের মাঝখানে সামিয়ানার মত ক'রে টাঙ্গিয়ে দিল। বার বার ব্যাকুল হয়ে পথের দিকে ফিরে ফিরে দেখতে লাগল।…

যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কেউ নেই। ক্লান্ত অবসন্ন মন নিয়ে সে তখন পাথরটার ওপর বসে পড়ে বাঁশের বাঁশীখানা তুলে নিয়ে ভৈরবীতে আলাপ শুরু করল। এ বিদ্যে সে শিখে নিয়েছে গ্রামের শিবমন্দিরের পেশাদার বাঁশীওয়ালার কাছে। করুণ সুরের মূর্চ্ছনাতে সে নিজেই মাতাল হ'য়ে উঠল। কতক্ষণ, ক'টা রাগ-রাগিণী বাজিয়ে চলেছে সে খেয়ালও নেই। শেষে চমক ভাঙল যখন তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে এবং কপালে ঘাড়ে বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা ফুটে উঠেছে। তাড়াতাড়ি ধড়ফড় ক'রে উঠে সে পাগড়ীর খুঁট দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে—আরও ঘন গাঢ় ছায়ার সন্ধান করতে গেল। খানিকটা গিয়ে বসে পড়ে ফের বাঁশি শুরু করল।

একটু পরে সে দেখে, পাঁচটা গরুর জায়গায় চারটে আছে—আর একটাকে দেখা যাচ্ছে না—তখনই থমকে দাঁড়িয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে লাগল। খানিক পরে সে দেখে ছোট্ট বাছুরটা শুকনো ঘাস চিবোতে চিবোতে কাঁটা বনের ঝোপে-ঝাড়ে ঢুকে পড়েছে। আশ্বস্ত হ'য়ে সে আবার বসে পড়ল। সময় সময় বড় বিরক্তি ধরে যায় তার। সে মনে মনে দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হ'য়ে শব্দহীন অর্থহীন ভাষায় বিড় বিড় করে বলে—"গরু চরানোর কাজটা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়—চালাকী নয়…বিশেষ ক'রে বন্ধুরা সকলে যখন মেলাতে চলে যায়।" বাঁশির সুরের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণের সমস্ত কাহিনী উদয়ের একে একে মনে পড়তে লাগল। সে ভাবে, রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনীর সবটুকুই বোধ হয় নিছক কাল্পনিক গল্প মাত্র; নইলে, কৈ আমার গরু বাছুরের ত ভৈরবী রাগে মুগ্ধ হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখি না…এ অপার্থিব সৌন্দর্য্যের আস্বাদন-ক্ষমতা এদের আছে বলে মনেও হয় না। আর আমাদের গ্রামের মেয়েরা ত কেউ অমন ক'রে ছেলেদের সঙ্গে মেশে না, কথা বলে না, খেলা করে না। উদয় ঠিক করল—এবার রূপা যখন কলসী কাঁখে নদী থেকে ফিরবে, তখন যেমন ক'রেই হোক তাকে চেপে ধরে আদর করবে, আলিঙ্গন করবে—না হলে তার জীবনটাই বৃথা!…নানা সুখ-স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আছে। এমন সময় সানাই-এর মধুর সুরের মধ্যে তার স্বপ্ন গেল হারিয়ে—কথা গেল মিলিয়ে।…মনে হচ্ছিল সানাই-এর শব্দটা গ্রামের দিক থেকেই আসছে। উদয়ের মনের ভেতর কেমন যেন শিহরণ খেলে গেল। "এবার বোধ হয় বর-কনের পাল্‌কী এই দিকেই আসছে…বরযাত্রীরা নিশ্চয় খুব সেজেগুজে পাল্‌কী ক'রে চলেছে…মেয়েরা বিয়ের গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে।…আর আমি এই ভাবে একা-টি পড়ে আছি।

"বাবার মরণ নেই; বাবা যদি তখন যুদ্ধে মারা যেত তা'হলে আজ আমার এই বন্দীদশা হ'ত না।—মাও মাঝে মাঝে সেই কথা বলে।"…

নদীর এপার থেকে পালকীর নিশান উড়তে দেখা গেল, সানাইওয়ালা এবং বরযাত্রীরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে —যেমনটি উদয় এতক্ষণ কল্পনা করছিল, ঠিক তেমনি ক'রে! সে মনে মনে ফন্দী আঁটে—যদি বরযাত্রীরা পথ ভুলে অন্য কোথাও চলে যায় ত বেশ হবে—কি মজাটাই হবে!…সে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে আশ্রয় নিল। বরযাত্রীর দলে না ভিড়তে পারায় মনে মনে সে বড়ই লজ্জাবোধ করছিল। তা ছাড়া তার বাবা ঐ সঙ্গে রীতিমত সাজসজ্জা ক'রে হুঁকোটি হাতে নিয়ে সুবেদারএর পেছনে পেছনে চলেছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা। বাড়ীর কোনো রকম ভাবনা চিন্তা তাঁর আছে বলে মনেও হয় না। তাই ত মা বলে যে, "উদয় যখন আরও বড় হবে, সুন্দর ক'রে সেজে বিয়ে করতে যাবে—তখন কিন্তু ওর বাবাকে গরু-বাছুরের সমস্ত ভার নিতে হবে—উদয় আর কিছু করবে না।"…

রোদ্দুরের তাপে উদয়ের সমস্ত শরীর যেন পুড়ে যেতে লাগল—কোন রকমে দুটো পা এক করে একটা খুঁটি ধরে সে পাথরের টুকরোটার কিনারায় গিয়ে উঁকি মেরে নীচের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল—বরযাত্রীর দল সেখান দিয়ে চলে যাচ্ছে। সুবেদারের তৃতীয় ও কনিষ্ঠ কন্যা লছমীর দিকে নজর প'ড়ল…উদয় আর চোখ ফেরাতে পারল না। …বার বার মনে হ'ল তার, কি সুন্দর দেখতে, একদিন এই নদীতেই লছমী স্নান করতে এসেছিল—সেদিন তার উদ্ভিন্ন যৌবনশ্রী উদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।…

শোভাযাত্রা বেরিয়ে গেল, ক্রমে সানাই-এর মিঠে সুর ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে মিলিয়ে এল…কিন্তু উদয় তখনও মুখ তুলে চাইতে পারল না।…রাগে দুঃখে অভিমানে তার সমস্ত মনটা বিষাদাচ্ছন্ন হ'য়ে রইলো। বার বার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল…চোখ দুটো তার থাদের নীচে যেন কাকে খুঁজে ফিরতে লাগল।…

একটু পরে সে উঠে গিয়ে বাঁশিখানা নিয়ে করুণ সুরে আলাপ সুরু ক'রল। অনেকক্ষণ বাজানোর পর ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল সে—বাঁশি রেখে এসে খোলা হাওয়ায় খানিকটা বিশ্রাম ক'রে প্রাণ জুড়োল। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে—এবার তার বাড়ী ফেরার পালা। বাবা আজ গ্রামের বাইরে গেছেন। কাজেই সে আজ তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে পারে—ফিরে গিয়ে নিজেদের গ্রামের ছোট্ট শিব-মন্দিরটাতে গিয়ে বসবে—আলমপুরের বড় মেলাতে এবং বরযাত্রীর সঙ্গে যেতে না পারার দুঃখু সেখানেই মেটাবে।

ঘরে ফেরার বন্দোবস্ত ক'রে পাগড়ী বেঁধে দু এক পা এগিয়েছে—এমন সময় হঠাৎ তার নজর পড়ল শুকনো নদীর চর-এ। সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্যকে কে যেন সেখানে এনে উজাড় ক'রে দিয়েছে—সে সৌন্দর্য্য উদয়ের প্রিয়া, প্রণয়িনী রূপা!…রূপার বাবা ভিলায়েৎ-এর যুদ্ধে মারা যান। সেই থেকে তার বিধবা-মা অনেক কষ্ট ক'রে রজকিনী বৃত্তি ক'রে তাকে মানুষ করে তুলেছেন। রূপার অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী, ডালিমের মত গায়ের রং, আর নব-যৌবন গ্রামের ছেলে-ছোকরাদের আকর্ষণ করত, তারাও সুযোগ সুবিধে পেলেই রূপার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা, টিটকিরি-হাতছানি কিছুই বাকী রাখত না। উদয়ও আজ রূপাকে আকৃষ্ট করবার জন্যে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ছড়া কাট্‌তে সুরু ক'রল। পাহাড়ের নীচে দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে, সেখানে গিয়ে রূপা এদিক ওদিক তাকিয়ে এমনভাবে খুঁজতে লাগল যেন সে কি হারিয়ে ফেলেছে। 'নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ সদ্য-প্রস্ফুটিত কুসুমের মত রূপার অপরূপ সৌন্দর্য্য উদয়কে কেবলই মুগ্ধ, আচ্ছন্ন, মোহগ্রস্ত ক'রে তুলতে লাগল'। সে কল্পনায় দেখতে লাগল—পার্ব্বতীও বোধহয় ঠিক এমনি করেই পাহাড়ে পর্ব্বতে, বনে প্রান্তরে তাঁর প্রার্থিতকে খুঁজে ফিরেছেন… শ্রীরাধিকাও বুঝি এমনি ক'রে অভিসারে যাত্রা করেছেন।… নিশ্চয়, নিশ্চয় রূপা আমার পার্ব্বতী।……প্রণয়াবেগ চেপে রাখতে না পেরে প্রবল উৎসাহে একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠে পড়ে সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল—"রূপা!… রূপা!…রূপা!"

নীচের রাস্তা থেকে পাহাড়ের চূড়োটা দেখা যায় না। রূপা কোথাও কোনও মানুষের অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছে না অথচ গলার স্বর কোথা থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বুঝতে না পেরে প্রথমটা বেশ ভয়ে হতভম্ব হ'য়ে গেল, তারপর চীৎকার করে বলল—"কে তুমি? ভূত প্রেত, দৈত্য-দানব না আর কেউ?"…পাহাড়ের নীচে দিয়ে সোজা

চলতে চলতে সে এদিকে ওদিকে মাথা দুলিয়ে আড়-চোখে তাকাতে তাকাতে এমনভাবে চলেছে, যেন চকিত-হরিণী, শিকারীকে আবিষ্কার ক'রে প্রাণভয়ে দিক-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে চলছে।

উদয় আর স্থির থাকতে পারল না। পাথরটার শেষ প্রান্তে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এসে বলল—"রূপা, আমি তোমার উদয়।"

উদয়ের আগ্রহ-আতিশয্যে অবাক্ এবং লজ্জায় রাঙা হ'য়ে রূপা প্রশ্ন ক'রে—"সত্যিই তুমি আমার প্রেমিক উদয়—সত্যিই তুমি আমায় ভালোবাসো?"···সে আবার এগিয়ে চলে!···"না, না, রূপা, তুমি চলে যেও না, শুনে যাও; আমার কথাটা অন্ততঃ একবার শুনে যাও।"

"না, তা' হয় না; তোমার কথা তুমি ফিরিয়ে নাও—, এ অসম্ভব, অসম্ভব।"

"কোথায় যাচ্ছ তুমি"—উদয় প্রশ্ন করে।

তার কথার উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ না ক'রে সে উত্তর দেয়—"আমার সময় নেই, আমি আমার মায়ের কাজে সাহায্য করতে যাচ্ছি—গাধাটা হারিয়ে গেছে কিনা, তাই খুঁজে আনতে যাবো।" তার মনের ভাব বুঝতে পেরে উদয় ঠাট্টা ক'রে বলে—"এই ত, সেটা এখানেই রয়েছে।"—রূপা সরলভাবে জিজ্ঞেস করে—"কোথায়? কোথায়?" "এই ত, তুমিই ত তোমার মায়ের একটি গর্দ্দভী।" তার ঠাট্টার ধরণে বিরক্ত হ'য়ে রাগে গর্‌গর্ করতে করতে রূপা ছুটে চলে যাচ্ছিল। উদয় কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে মিনতির সুরে বলল—"এক মিনিট দাঁড়াও, কথাটা শুনে যাও রূপা···আমি তোমাকে ভালোবাসি··ভালো-বাসি রূপা!" এমন নির্লজ্জভাবে প্রেমনিবেদন ও আবেগ-প্রকাশ করার ভঙ্গী দেখে রূপা মনে মনে গর্ব্বও অনুভব ক'রল, হাসিও পেল। তখন সে উড়নীটা বেশ ভালো ক'রে মাথায় দিয়ে এগিয়ে গেল। রূপা ভাবে—এ যেন আকাশকুসুম স্বপ্ন রচনা।···কোথায় ধনী সৈনিকপুত্র উদয়, আর কোথায় সামান্যা দরিদ্রা রজকিনী-কন্যা রূপা।··· একজন সম্ভ্রান্ত বংশের এবং উঁচুজাতের ছেলে হ'য়ে উদয় কি ক'রে এ ধরণের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়, কি করেই বা এমন সহজ স্বাভাবিকভাবে রূপার কাছে প্রেমনিবেদন করতে পারে? এ ক্ষেত্রে বিয়ের প্রস্তাব উঠতেই পারে না, উঠলেও তা কেউ সমর্থন করতে পারবে না। তা' ছাড়া উদয়ের প্রকৃতিটা-ও কেমন যেন রূপার পছন্দসই নয়, একদিন কুয়োর ধারে সে যা' জোর ক'রে আমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রেছিল। ভারি অসভ্য ছেলে।······

"রূপা, পাগলী আমার, সোনা আমার, শোনো শোনো, লক্ষ্মীটি শুনে যাও।"—উন্মত্তভাবে বলে ওঠে উদয়। তার কথায় একটুও গুরুত্ব না দিয়ে, হালকা হাসিতে ফেটে পড়ল রূপা। উদয়কে নিরস্ত করবার জন্যে সে বলে—"বেশ ত, এতই যদি তোমার অনুরাগের ঘটা, তবে দেখি দিকিনি, তুমি ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আমার কাছে এসে, প্রেমের গভীরতার প্রমাণটা দিয়ে যাও।"

যেমন কথা···অমনি কাজ।···"দেখ, দেখ আমি তোমাকে প্রেমের প্রমাণ দেখাবো, দেখাবো, তোমাকে জয় ক'রব।"···বলে—চাৎকার ক'রে সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রূপার পায়ের কাছটাতে—আর উঠল না। ···সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে···চক্ষের নিমেষে। ধুপ্ ক'রে একটা বিকট আওয়াজ ক'রে উদয়ের দেহটা এসে পড়ল।···যা' ঘটে গেল তা' বর্ণনাতীত।···বিহ্বল, বিস্ময়ে হতবাক্ রূপা, প্রিয়ের রক্তাক্ত দেহ দেখে, মূক-বধিরের মত স্থির হ'য়ে বসে পড়ল। তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে নিশ্বাসের শব্দ শুনতে চেষ্টা ক'রল—কপালে বুকে হাত রেখে বুঝতে পারল এখনও অতি ধীরে টেনে টেনে শ্বাস বইছে তার।

বিভীষিকাময় রক্তের ধারা দেখে ভয়ে রূপার মুখ শুকিয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেল। সে আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে শুধু নিজের কৃতকর্ম্মের কথা ভাবতে লাগল—নিজেকে এক-মাত্র অপরাধিনী মনে হ'তে লাগল। সে যদি জীবন নিয়ে এমনি খেলা না খেলত, তা হ'লে তার এ সর্ব্বনাশ হ'ত না।···তার হাত-পা থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। কম্পিত হাতে সে আস্তে আস্তে উদয়ের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিল, নারীসুলভ সুধা মাথা একাগ্র দৃষ্টি নিয়ে, উদয়ের নির্ব্বোধ হাসিমাথা মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।···আক্ষেপ ক'রে বার বার বলতে লাগল—"এ তুমি কি ক'রলে, কি করলে?"

মাথার আঘাতে কাতর হ'য়ে মাথা ঘুরোতে ঘুরোতে

উদয় বলে—"তুমি যে আমার কাছে ভালবাসার প্রমাণ চেয়েছিলে রূপা!"…এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার জীবন দীপটুকু নিভে গেল।…রূপার প্রতি গভীর অনুরাগ, জীবনের প্রতি অফুরন্ত আসক্তি সব নিমেষে ডুবে গেল মৃত্যুর অতল তলে!…

রূপার কোল থেকে মাথাটা তার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রূপা শরাহত পাখীর মত ডুকরে কেঁদে উঠল—"হায়, হায়—একি হ'ল, এ আমি কি করলাম? আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হবে?"…ভয় ও বিভ্রান্তিতে সে একেবারে শক্ত পাথরের মত মৃতদেহের পাশে বসে করুণ চোখ দুটো মেলে সকলের করুণা এবং সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল।…

মৃত্যুর নৈঃশব্দ চারিদিকে থমথম করছে…শুকনো কঠিন নদীচরের ওপর অস্তমিত সূর্য্যের আলোক রেখা ঝিকমিক্ ক'রে জ্বলছে।…

রূপার নিজেকে বড় অসহায়, বড় দুর্ব্বল মনে হচ্ছে আজ। বার বার করে গভীর সহানুভূতি দিয়ে এই নিষ্পাপ অকলঙ্ক যুবার মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করছে।…সে ভাবতে লাগল—"সত্যিই উদয় আমাকে বিশ্বাস ক'রত, আন্তরিক ভালোবাসত—কৈ আমি ত তাকে তেমন ক'রে বিশ্বাস করিনি—ভালোবাসিনি, হৃদয় দিতেও চাইনি।…কে জানে, কতদিন ধরে উদয় হৃদয়ে এমনি করে কামনা-বাসনার শিখা জ্বালিয়ে রেখে মরুমরীচিকার মায়া নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।…সে যেমন করে প্রেমের বেদীমূলে অর্ঘ্য সাজিয়ে আত্মাহুতি দিয়ে প্রেমের ও ত্যাগের চরম আদর্শ দেখিয়ে গেল—আমি এতদিন যা পারিনি—আজকে তাই দিয়ে প্রেমের চরম মূল্য দেবো—তার প্রতি বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠতম পরিচয় রেখে যাবো। সে আমার জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করে গেছে, আমিও তার যোগ্য উত্তর দেবো।…

উন্মত্ত চিন্তা আর পাগলামী রূপাকে পেয়ে বসল; কতকটা লোকভয়ে কতকটা উদয়ের একনিষ্ঠ প্রেমের কথা চিন্তা ক'রে সে যেন ক্রমেই ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল। তার মাথাটা কোল থেকে আস্তে আস্তে মাটিতে নামিয়ে রেখে রূপা প্রাণপণে ছুটে চলল পাহাড়ের পথে।…

গরুগুলো মাথা নীচু ক'রে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে, প্রভুর শোকে আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে। যে অপরাধ রূপা ক'রেছে নিজের জীবন দিয়ে তাকে ধুয়ে মুছে ফেলে শিবকে সে আজকের দিনে প্রসন্ন করবে, শান্ত করবে। শিবরাত্রির দিন উদয় তার জন্যে জীবন দিয়েছে—তাকেও যে উদয়ের পার্ব্বতী হ'তে হবে, সাধ্বী স্ত্রী হ'তে হবে।…

রূপা আর পিছু তাকালো না, পাছে তার সংকল্পে কোনোরকম বাধা আসে।…সে সেই শিলাখণ্ডটার একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে প'ড়ল, ক্ষণেকের জন্যে পা' দুটো তার কেঁপে উঠল, ঘন ঘন শ্বাস বইতে লাগল। বুকের ভেতরটা তোলপাড় করতে লাগল—। নাঃ, শেষ পর্য্যন্ত সে তার সংকল্পে পৌঁছতে পেরেছে। একবার শুধু সে নিথর মৃতদেহটার দিকে তাকাল…মরণের কথা মনে হতে মুহূর্ত্তের জন্যে তার চোখের পাতা কেঁপে উঠলো…তখনি সে জোর ক'রে চোখ বুঁজে মনে মনে বলল—"কিছু ভেবোনা, আমি তোমার কাছেই যাবো, তোমাকে ছেড়ে কি থাকতে পারি?…জীবনে যে সাধ পূর্ণ হয়নি এখনি তা' পূরণ ক'রে দিচ্ছি।"…কথা বলতে বলতে রূপা ঝাঁপ দিল পাহাড়ের গভীর খাদের নীচে।…

মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাদের প্রেম চিরজয়ী হল। যুগল প্রেমিক-প্রেমিকার দেহ সেইখানে শিবরাত্রির রাত্রে ভস্মীভূত করা হ'ল। সেই থেকে "গোয়ালা টীলা" প্রেমের তীর্থ, প্রেমের স্বর্গ, প্রেমের অমরাবতীতে পরিণত হ'ল। আজও সেখানে কতশত প্রেমিক-প্রেমিকা যায় তাদের জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার একান্ত ইচ্ছায়।*

---

* মুল্ক রাজ আনন্দ-এর "A True-Story" অবলম্বনে।

ভারত-ভাস্করম্

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী

[রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বকবির পুণ্য জীবনী অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত সংস্কৃত নাটকের একটি দৃশ্য। অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী কর্তৃক অনুদিত]

"রবীন্দ্র-নবীনচন্দ্র-সংবাদ-প্রকরণ।"

স্থান—রাণাঘাটের মহকুমা শাসকের গৃহ। কাল-১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। প্রভাত।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন, তাঁর পত্নী লক্ষ্মী দেবী, রবীন্দ্রনাথ (বয়স—৩২)

[নবীনচন্দ্র ও তাঁর পত্নী লক্ষ্মীর প্রবেশ]

নবীনচন্দ্র (সানন্দে)—
পরম সৌভাগ্য মোর আজি
আসিছে রবীন্দ্রনাথ মম নিকেতনে॥
যাঁহার কবিত্বগুণরাজি
উজল করিছে নিত্য নিখিল-ভুবনে॥
সুকৃত দেবেন্দ্রনাথ হোন জয়শীল।
শিল্প কাব্যকুশল যাঁর বংশ নিখিল॥
অপরূপ রূপবিভা চিত্তজয়কারী।
গুণ বিমণ্ডিত কুল অপূর্ব নেহারি॥

[পত্নীর উদ্দেশ্যে]

তুমি ত জানই যে, শিলাইদহ যাবার পথে, রবীন্দ্রনাথকে আমি একদিন এখানে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি রাত্রে এখান থেকে গোয়ালন্দের ষ্টীমার ধরবেন।

লক্ষ্মী—তুমি খুব ভালই করেছ। আমি তাঁর বিষয়ে তোমার কাছ থেকে কত শুনেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁকে চোখে দেখিনি।

নবীনচন্দ্র—সত্যই মহর্ষি-পরিবারের সকলেই সার্থক-জন্মা। তাঁর প্রথম পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ' "স্বপ্ন প্রয়াণ" রচয়িতৃরূপে সাহিত্যিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য—দ্বিজদের মধ্যেও অগ্রগণ্য সুনিশ্চিত। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ কেবল যে সর্ব-প্রথম ভারতীয় 'আই-সি-এস্' তা'ই নয়, সর্বশ্রেষ্ঠও একই সঙ্গে। তাঁর পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথও যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন। বীরেন্দ্রনাথের পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুস্পুত্র বলেন্দ্রনাথও তেইশ বৎসর বয়সেই গদ্য-রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এমন কি, ঠাকুর-পরিবারের মেয়েরাও পেছনে পড়ে নেই। মহর্ষির পঞ্চম কন্যা স্বর্ণকুমারী এবং অন্যান্য সকলেও খ্যাতিলাভ করেছে।

লক্ষ্মী—আহা! কি চমৎকার এবং এটিও বিশেষ গৌরবের বিষয় যে, মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ তোমার সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যুগ্ম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন—বংশ-গৌরবের জন্য নয়, কিন্তু নিজের গুণের জন্যই কেবল।

নবীনচন্দ্র—সত্য কথা।

লক্ষ্মী—লোকসাহিত্য-সংগ্রহ বিষয়ে তাঁর আগ্রহাতিশয্যও আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমাদের লোকসাহিত্যে কতই না অমূল্য ধন রয়েছে। যদি তা'সব সুরক্ষিত হয়, তাহলে অতিশয় আনন্দের বিষয় হবে।

নবীনচন্দ্র—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

[সোদ্বেগে]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কেন বিলম্ব হচ্ছে?
দারোয়ান! দারোয়ান! এখানে এসো।

[দারোয়ানের প্রবেশ]

দারোয়ান—সেলাম। আপনার কি আদেশ?

নবীনচন্দ্র—আমাদের গাড়ী আসছে দেখেছ কি?

দারোয়ান—না, আমি দেখিনি। গেট থেকে আমি পরিষ্কার ভাবে রাস্তা দেখতে পাই। কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পাইনি।

নবীনচন্দ্র—তাহলে, ভাল করে নজর রেখো। কারণ, একজন সম্মানীয় অতিথি আজ এখানে আসছেন।

দারোয়ান—নিশ্চয়।

[প্রস্থান]

লক্ষ্মী—তুমি অত ব্যস্ত হয়োনা। তাঁর আসবার সময় এখনও চলে যায়নি। তুমিত জানই যে, কলিকাতা থেকে ট্রেন এখানে সকাল ১০ টায় পৌঁছবার কথা।

নবীনচন্দ্র—[আশ্বস্ত হয়ে] হ্যাঁ! ঠিক! রবীন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে, তাঁর সময়ানুবর্তিতাও প্রশংসনীয়। সত্যই, ঈশ্বর তাঁকে অসংখ্য-গুণের আধার রূপেই গড়েছেন। তাঁকে আনবার জন্য আমি একজন আত্মীয়কে সঙ্গে দিয়ে ষ্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে ভালই করেছি।

[গাড়ীর শব্দ শুনে]

ঐ ত আমি স্পষ্ট গাড়ীর শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

শকট চক্রশব্দ, আহা, কি মাধুরীময়।

নিমেষে যা' চিন্তাক্লেশ নিঃশেষে করে ক্ষয়॥

আনে বহি নব মৈত্রীবার্তা রসকোমল।

মরুভূমি বক্ষে যেন মরূদ্যান সজল॥

(সানন্দে) ঐ ত রবীন্দ্রনাথ আসছেন।

[নবীনচন্দ্রের একজন আত্মীয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ]

আত্মীয়—[সহাস্যে] শ্রদ্ধেয় আত্মীয়প্রবর! এই রবিকরোজ্জ্বল প্রভাতে আমি আপনার গৃহে উদীয়মান "রবিকে" এনে দিলাম। কিন্তু দেখুন আকাশের রবি কি এই পৃথিবীর রবিকে পরাস্ত করতে পারে?

নবীনচন্দ্র (সহাস্যে)—বৎস! কি মিষ্ট মধুর তোমার বাক্য। তুমি যা বলছ তা সম্পূর্ণ সত্য। তোমাকেই বা কে পরাস্ত করতে পারে?

নবীনচন্দ্র—(অগ্রসর হয়ে)—

সুস্বাগতম্! সুস্বাগতম্! মহর্ষি-কুলতিলক রবীন্দ্রনাথ, সুস্বাগতম্। আপনাকে সম্বর্ধনা করবার জন্য আমার সহধর্মিণী উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করছেন।

রবীন্দ্রনাথ—(উভয়কে নমস্কার করে)

আমি পরম কৃতার্থ হলাম! বধূঠাকুরাণি! আমি আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

লক্ষ্মী—চিরজীবী হোন। আপনার যশ পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করুক। কিন্তু কলিকাতা থেকে দেড় ঘণ্টা ধরে ট্রেণে আসবার পরে, আপনি নিশ্চয় ক্লান্ত বোধ করছেন। সেজন্য, আগে মুখহাত ধুয়ে কিছু জলযোগ করুন।

রবীন্দ্রনাথ—না, না, তার কোনো প্রয়োজন এখন নেই। আপনি সেজন্য ব্যস্ত হবেন না।

আত্মীয়—আচ্ছা, আমি এখন চল্লাম। আপনি আপনার অতিথির জন্য শ্রীসুরেন্দ্র পাল চৌধুরীকে রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁকে নিয়ে আমি আবার আসব।

নবীনচন্দ্র—বেশ, বেশ!

[আত্মীয়ের প্রস্থান]

নবীনচন্দ্র (সস্নেহে)—আপনার ও আমার এই শুভ মিলন আমাকে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শুনুন সেই কবিতাটি :—

"চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি-গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।

বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ডীদাস-গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।

দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল।"

(সহাস্যে)—কিন্তু আমাকে যেন অহঙ্কারী ভাববেন না। আপনার সুন্দর কবিত্বময় আনন দর্শন করে, আমার নিজেকেও যেন সুবিখ্যাত কবি বলেই মনে হচ্ছে।

[সকলের হাস্য]

রবীন্দ্রনাথ—না, না!

দীনহীন আমি রবি প্রতিভাবিহীন।

কবিশক্তি গুণহীন বয়সে নবীন॥

লক্ষ্মী—(সস্নেহে) আহা! অমন করে বলছেন কেন? আপনি ত আমাদের উদীয়মান রবি এবং সর্বদাই তাই থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথ—বধূঠাকুরাণি! আপনার স্নেহের তুলনা নেই। আমি ইতঃপূর্বে মহাকবির সঙ্গে পত্রালাপ করেছি; কিন্তু যে কারণেই হোক, দ্বিতীয়বার তাঁর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হইনি। সেজন্য, আমার খুবই আগ্রহ ছিল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ভগবানের কৃপায় আমার সেই আশা আজ পূর্ণ হয়েছে।

লক্ষ্মী—আপনার কি মিষ্ট কথা! আপনার আগমনে আমরা সকলেই পরমানন্দিত হয়েছি।

নবীনচন্দ্র—নিশ্চয়ই। আমি আপনাকে প্রথম যেদিন দেখি, সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন

আপনি ছিলেন ষোলো বৎসরের বালক মাত্র—এখন আপনি বত্রিশ বৎসরের পুর্ণযুবক। আমি যেন সেদিনের ছবি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেদিন ছিল হিন্দুমেলার একাদশ অধিবেশনের দিন। আপনি এক কোণায় একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজন বল্লেন যে, আপনি আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চান। তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দিলেন। আহা! কি সুন্দর দৃশ্য!

বৃক্ষতলে বিরাজিত স্বর্ণমূর্তি নব।
অমূল্য রতন যেন অতুল বৈভব॥

রবীন্দ্রনাথ—(সলজ্জভাবে) আপনার কি অনুগ্রহ যে আপনি এই কথা মনে রেখেছেন।

নবীনচন্দ্র—আমার আরো মনে আছে যে, আপনি পকেট থেকে একটা 'নোটবুক' বের করে কয়েকটি কবিতা পাঠ করলেন ও কয়েকটি গান গাইলেন। এ সবই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আহা! আপনার সেই মধুর, কোমল গানের ঝঙ্কার এখনও যেন আমার কাণে লেগে রয়েছে।

লক্ষ্মী—কি সুন্দর!

নবীনচন্দ্র—তার দু একদিন পরে বাবু অক্ষয়কুমার সরকারের আমন্ত্রণে আমি যখন তাঁর চুচুঁড়ার বাড়ীতে গিয়েছিলাম, তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আপনার কবিতা ও গান আমার খুবই ভাল লেগেছে এবং আপনি একদিন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও গায়ক হবেন। এই শুনে তিনি সহাস্যে বলেছিলেন: "ও ঠাকুরবাড়ীর কাঁচা-মিঠা আঁব।" এখন আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে। আজ সেই "কাঁচা-মিঠা" আম হয়েছেন পরিপক্ক "ফজলী"—মিষ্ট মধুর ও সুগন্ধযুক্ত, গৌরবে ও সৌরভে তিনি আজ বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যকে মধুময় করেছেন। আজ তিনি নব্যবঙ্গের আদর্শ—আজ তিনি বাংলার শেলী, কীট্‌স্‌, এডগার পো প্রভৃতি কত নামেই না পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথ—(সলজ্জভাবে) আপনার করুণার সীমা পরিসীমা নেই।

নবীনচন্দ্র—(স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে)—

এখন তাঁর দিকে একবার দেখ!

শান্তসৌম্য বুদ্ধিদীপ্ত
উন্নত অবয়ব।
গৌরবর্ণ অঙ্গ শোভা
উজ্জ্বল অভিনব॥
স্ফুটোন্মুখ-পদ্মকলি—
সমতুল আনন।
কৃষ্ণপক্ষ্ম-যুক্ত, দীপ্ত
সুবিশাল নয়ন॥
স্বর্ণোজ্জ্বল, স্নিগ্ধ, দৃপ্ত
উচ্চ ললাট দেশ।
সিঁথি-সজ্জিত, কুঞ্চিত
ভ্রমরকৃষ্ণ-কেশ॥
স্বর্ণ-চশমা-গর্বিত
নাসিকা সমুন্নত।
গাত্রবর্ণ সঙ্গে দ্বন্দ্বে
সুবর্ণ পরাহত॥
গুম্ফ শ্মশ্রু বিমণ্ডিত
বদন-শতদল।
শুভ্র-পট্ট-বস্ত্র, পূত
পাদুকা সুকোমল॥
মুখমণ্ডল অতুল
হৃষ্ট-বিধাতৃ সৃষ্ট।
সুষমায় সমতুল
চিত্রিত যীশুখৃষ্ট॥

এবং এর সঙ্গে যদি যুক্ত কর তাঁর গুণগ্রাম, তাহলে তুমি সত্যই এক অত্যাশ্চর্য বস্তু দেখবে।

লক্ষ্মী—তোমার কথা সম্পূর্ণ ঠিক।

রবীন্দ্রনাথ—(সলজ্জভাবে) আমি সত্যই অভিভূত হয়ে পড়েছি। স্নেহ সত্যই নিম্ন-গামী। আপনারা আপনাদের পুত্র নির্মলের মতই আমাকে স্নেহ করেন। প্রার্থনা করি, আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি।

লক্ষ্মী—[স্বগত] অভিজাত-বংশীয় হয়েও কবি রবীন্দ্র-নাথের কি পরমমধুর ব্যবহার! কি অনায়াসেই না তিনি ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূরূপে গ্রহণ করেছেন।

[প্রকাশ্যে স্বামীর উদ্দেশ্যে]

কেবল আওতি বা কবিত্ব শক্তিতেই নয়, বাগ্‌বিন্যাসেও ত ইনি অতুলনীয়।

নবীনচন্দ্র—আমার স্ত্রী আপনার মধুর কণ্ঠস্বরে বিমুগ্ধ। আপনি আপনার স্ব-রচিত একটি সঙ্গীত তাঁর নিকট করুন এবং তাঁর মাতৃহৃদয়কে চিরদিনের মত বশ করে নিন।

রবীন্দ্রনাথ (সবিনয়ে)—আপনার নিকট আমার কবিত্ব-পরিচয় ?

লক্ষ্মী—না ! না ! আপনার কবিত্ব-প্রতিভা নিশ্চয়ই দুষ্কর তপশ্চর্যার ফল। এর অপেক্ষা অধিক শক্তি আর জগতে কি হতে পারে ? আপনি ত এক অতুলনীয় প্রতিভার উত্তরাধিকারী। সেজন্য, একটি গান করে আমাদের আনন্দ দান করুন। একটি পবিত্র কোমল সঙ্গীত অথবা স্নিগ্ধমধুর কবিতার অপেক্ষা অধিক আনন্দের বস্তু আর কি হতে পারে ?

নবীনচন্দ্র (দেখে)—এই ত নির্মল আসছে।

রবীন্দ্রনাথ—সেই আমাদের জন্য একটা গান করবে।

[নবীনচন্দ্রের পুত্র নির্মলচন্দ্রের প্রবেশ]

নির্মল—প্রণাম। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি, কবি ! আপনি এসেছেন বলে আমরা নিজেদের সম্মানিত মনে করছি।

রবীন্দ্রনাথ—আমি আরো অধিক সম্মানিত হয়েছি। কিন্তু, নির্মল, তোমার মা একটা গান শুনতে চাচ্ছেন। তুমি একটা গান কর।

নবীনচন্দ্র—(সহাস্যে) আপনার ত নিস্তার নেই। আমি আপনার অভ্যর্থনার জন্য একটা গান রচনা করেছি। সেটি সকলে আসলে নির্মল পরে করবে। যাহোক উনি যখন বলছেন, এখন নির্মল, তুমি এখন একটা গান কর।

নির্মল—বেশ, আমি তাঁর রচিত একটি গান করছি।

[রবীন্দ্র সঙ্গীত]

সজনি সজনি রাধিকা লো দেখ অবহুঁ চাহিয়া।

রবীন্দ্রনাথ—চমৎকার ! চমৎকার ! নির্মল ! তোমার গলা কি সুন্দর।

নির্মল—আমার কি আনন্দ হচ্ছে।

নবীনচন্দ্র—আপনি নির্মলকে কত ভালবাসেন। এখন আপনার পালা—একটি গান করুন।

লক্ষ্মী—হ্যাঁ, করুন। সামনেই ত হারমোনিয়ম আছে, আরম্ভ করুন।

রবীন্দ্রনাথ—না, আমি কোনো যন্ত্রের সঙ্গে গান করতে ভালবাসিনা, কারণ তাতে গলার মাধুর্য ঢেকে ফেলে। আমি কেবল একটি মাত্র পর্দা টিপে—প্রারম্ভে সুরটি ঠিক করে নেব।

নবীনচন্দ্র—বেশ। আপনার মিষ্ট মধুর কণ্ঠস্বর শুনে আমার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথা মনে হচ্ছে। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ—আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি এখন আমার একটি নূতন কীর্তন করব।

[পকেট থেকে কাগজ বার করে]

[রবীন্দ্র সঙ্গীত]

"এসো এসো ফিরে এসো বঁধু হে ফিরে এসো।"

নবীনচন্দ্র—(অভিভূতভাবে) আহা ! কি সুন্দর। কি সুন্দর। এত সুন্দর গান আমি অল্পই শুনেছি। সুললিত রচনা, অপূর্ব কবিত্ব, প্রেম—ভক্তির উচ্ছ্বাস, ও অনুপম মধুর কণ্ঠস্বর—সব মিলে এ হয়েছে সত্যই এক অপূর্ব বস্তু। কবি ! কেবল এই গৃহেই নয়, প্রতিগৃহে, আকাশে বাতাসে জলে এই সঙ্গীত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে। শিশুর কোমল, অস্ফুট ধ্বনির মত আপনার গানও আমার অন্তরদেশ কোমল, মধুর ভাবে স্পর্শ করেছে। আর, কি মধুর মুখভঙ্গি ! আপনার ভাব সুর ও ভঙ্গী যেন একতালে নৃত্য করছে। কি চমৎকার।

লক্ষ্মী—আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। আমি যেন এক আনন্দ সাগরে মগ্ন হয়ে গেছি।

রবীন্দ্রনাথ—(কৃতজ্ঞভাবে)—এ আপনাদের স্নেহ।

নির্মল—তার পরে আর কে গান গাইতে সাহস করবে ?

রবীন্দ্রনাথ—(সস্নেহে)—না, বন্ধু, না ! মনে রেখো কার সন্তান তুমি।

নির্মল—(সহাস্তে)—আপনি ত তাহলে আরো বড়-বাবার আরো বড়-ছেলে !

[সকলে হাস্ত]

নবীনচন্দ্র—আপনার আকর্ষণ সার্বজনীন।

ভাগীরথী ধারাসম তব মহাগান।
পবিত্র করে মোরে, আনন্দে ভরি প্রাণ॥

রবীন্দ্রনাথ—আপনি "নবীন" কবি, আমি নবীনতর। আমি আপনার নীচেই ত স্থান চাই।

নবীনচন্দ্র—তা কেন হবে? আমার প্রাণের ইচ্ছা এই যে বাংলার "রবি" যেন পৃথিবীর সর্বত্রই আলোকরশ্মি বিকীরণ করেন। দেখুন—

বাষ্পাকুল নেত্রধারে দেখেছি যে চিত্তচোরে
মম গ্রন্থ "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" মাঝে।
সেই কৃষ্ণ বংশীধারী ত্রিভুবন মনোহারী
নেহারিনু তব গানে আজি নব সাজে॥

আহা! আমার রাধাজীবন, বৃন্দাবন-ভূষণ, বংশী-বিনোদন, যমুনাতটবিহারী কৃষ্ণ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত প্রসাদে তোমাকে যে নিরন্তর দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের জয় হোক! আপনার কৃষ্ণবিষয়ক গানগুলি আমার বড় ভাল লাগে। আচ্ছা আপনার রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কি মত? আপনি আমাকে অসঙ্কোচে তা বলতে পারেন। কারণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন আমার সহপাঠী ছিলেন, তখন আমিও আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনায়াসেই হতে পারি, নয় কি?

রবীন্দ্রনাথ—নিশ্চয়ই! ভক্ত বর! আমার ত আপনার কাছে গোপন করবার কিছুই নেই। আপনার স্নেহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি অনেক সময় ভাবি আমি পৌত্তলিক কিনা। তবে, ভাগবত-পুরাণ সম্বন্ধে অন্যান্য ব্রাহ্মদের থেকে আমার ধারণা বিভিন্ন। আমি এটিকে একটি উচ্চস্তরের রূপক বলেই মনে করি।

নবীনচন্দ্র—আপনি যদি তা রূপক বলে মনে করে তৃপ্তি পান ত, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি যাত্রার কৃষ্ণ দেখলেও অশ্রুসম্বরণ করতে পারিনা। আমার এই কালো পুতুলটিকে ভাঙ্গবেন না। আমার জন্য তা রেখে দিন। [অশ্রুবর্ষণ]

রবীন্দ্রনাথ—[সজল চক্ষে] ভক্তের নয়ন জল দেখে আমার চক্ষুও সজল হয়ে উঠেছে। বিশাল পৃথিবীতে ভক্তের তুল্য আর কে আছেন? এই ভক্তবৃন্দের জন্যই ত ভারত বিশ্বের আদর্শ স্থানীয়।

নবীনচন্দ্র—আপনাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে। নিধুবাবুর গানগুলি চার ছ'লাইনে সম্পূর্ণ হলেও এক একটি যেন ভাবের ফোয়ারা—আপনার গানগুলি বেশ দীর্ঘ—কবিতার মত। কেন?

রবীন্দ্রনাথ—আমার ছোট গানও আছে।

নবীনচন্দ্র—আপনার নূতন কাব্যগ্রন্থ "সোনার তরী" কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রথম কবিতাটি পূর্ববঙ্গের পল্লীদৃশ্যের একটি 'ফটো'। কিন্তু তার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আপনি ব্যাখ্যা করবেন?

রবীন্দ্রনাথ—নিশ্চয়ই।

নবীনচন্দ্র—আচ্ছা, তার আগে স্বরচিত একটি কবিতা পড়ুন না।

রবীন্দ্রনাথ—আচ্ছা, আমি "সোনার তরী" থেকেই পড়ছি—

[পাঠ]

"তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও।"

নবীনচন্দ্র—চমৎকার! আপনি একাধারে কবি ও অভিনেতা। আরো পড়ুন, দয়া করে।

লক্ষ্মী—(বাধা দিয়ে) অবশ্য। এ অতি মধুর। দুই কবির মিলন হলে; কালের গতি রুদ্ধ হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ত তা হয়না। মধ্যাহ্ন-সূর্য শীর্ষদেশে উঠে গেছেন। খাবার সময় যে হল।

নবীনচন্দ্র—(সহাস্তে)—সত্যিই ত আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, ইনি আপনার জন্য বহুবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছেন। এ ত আপনার খেতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথ—(সহাস্তে) নিশ্চয়, নিশ্চয়। তাঁর ত্রিপায় রকমের ব্যঞ্জনাস্ত্র-নিক্ষেপের বিরুদ্ধে ত নিশ্চয় নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে।

[সকলের হাস্ত]

নবীনচন্দ্র—আপনি কোনো ভদ্রতা যেন আমাদের সঙ্গে করবেন না। এটি আপনার দাদা-বৌদির বাড়ী মনে রাখবেন।

রবীন্দ্রনাথ—বধূঠাকুরাণি! আপনার স্নেহেই আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে; আর খাদ্যের স্থান নেই। তা সত্ত্বেও আমি যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান]

দুলো-কাঁচি ইতিকথা

নিখিল সুর

লম্বায় চার হাত আর চওড়ায় হাত দুয়েক জালজেলে পেঁয়াজের বস্তাটা সামনে পাতা। বাঁদিকে দু'লাইনে সাজানো কাঁচা লঙ্কার ভাগ। দু'পয়সা আর এক আনার। ডানদিকে আদা, রসুন, তেঁতুল আর ধনে পাতার আঁটি; একটা ঝুড়িতে পাকা হলদে রংএর আধ-শুকনা গোটা কুড়িক পাতিলেবু। দুলোচাঁদের তরকারী দোকানের দ্রব্য সম্ভার। খুব সকালে, প্রায় আঁধার থাকতে দোকান বসায়। গাঢ় নীল রঙের একটা সস্তা উলের চাদর গায়ে জড়িয়ে, মাথায় দোকান নিয়ে যখন বাজারে আসে তখন একটামাত্র লোককে দেখা যায় বাজারে। সে বাজার-পাহারাদার। সমস্ত রাত জেগে বাজার পাহারা দিয়ে ভোরের দিকটায় একটু ঘুমিয়ে নেয়। চালের গুদামে উঠবার পর পর সিমেন্ট বাঁধানো চওড়া সিঁড়িগুলোর যে কোন একটার ওপর শুয়ে থাকে টান টান হয়ে। এত শীত, তবুও শরীরের একটুকু অংশ কুঁকড়ে থাকে না। গায়ে থাকে খাঁকি রঙের একটা লম্বা কোট। ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি ফেললে একটা জড় বস্তু বলে ভ্রম হয়। দুলোচাঁদ মাথায় ঝুড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকে পাহারাওয়ালার দিকে। মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে ঐ খাঁকি কোটটা। খুব দামী নিশ্চয়ই। নইলে ওইটে গায়ে দিয়ে বাইরে এই হাড়কাঁপানো পাহাড়ী শীতে একটা লোক সারারাত কাটায় বা কি ক'রে! আর ভোর বেলায় এমন মোষের মত নাক ডেকে সুখ নিদ্রা উপভোগ করেই বা কি করে! দুলো নিজের দিকে তাকায়। ন'হাতে ধুতিটা, মুরগীর মত সরু লম্বা ঠাং দুটো ঢাকতে পারে নি, হাঁটু পর্য্যন্ত উঠে এসেছে। আবরণহীন লোম-বিবর্জিত কালো খস্‌খসে খড়ি ওঠা দু'খানা পা আর হাঁ করা ফাঁটা গোড়ালি, ভোতা নখওয়ালা ধুলিধুসরিত দু'খানা শ্রীচরণই সম্বল। মানবের নিকৃষ্ট শ্রেণী দুঃখী, ভাগ্যের কাছে সম্পূর্ণ পরাভূত গরীব। তাই এর দাম অনেক। ব্যবসার মূলধন না হলেও জীবনের মূলধন তো বটেই। এই হতশ্রী পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে না পারলে কোন উপায় নেই। একটা মাত্র উপায় আছে—অনাহার আর মৃত্যু। গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি। তার ওপর চাদর জড়ান। সুতো আর উল মেশান। রঙেই চমকদার। দাম কম, ফাঁকা বুনুনী। ঠাণ্ডাটা জমাট হয়ে সূঁচের মত গায়ে বেঁধে। সির সির করে ওঠে আপাদমস্তক। সারা শরীরটাকে আচমকা ঝাঁকিয়ে দেয়। মাথার এলো-মেলো রুক্ষ চুলগুলো খাড়া হ'য়ে আবার নেতিয়ে পড়ে। ধোঁয়া ধোঁয়া ঘন কুয়াশার মধ্যে হাতড়িয়ে কোনরকমে নিজের রোজকার স্থানটাতে পেঁয়াজের বস্তাটা বিছিয়ে দেয় দুলো। তারপর অতি সন্তর্পণে আগের দিনের বাসি শুকিয়ে যাওয়া অবিক্রীত জিনিষগুলো সাজাতে শুরু করে একটার পর একটা। দোকান সাজানোর বহুক্ষণের মধ্যে খদ্দের আসে না। নোংরা, চোখে পিচুটী-পড়া দু'একটা নেড়ীকুকুর বাজারের এখানে ওখানে যা কিছু পড়ে থাকে শুঁকতে শুঁকতে ঘুরে বেড়ায়। মনমতো খাবার কখনও পায়, কখনও বা পায় না। কিছু গোয়াল-ছাড়া পাঁজরের হাড়-বের-করা গাই, ছাগল আর বহু পুরণো ষাঁড়টা বাজারে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। সময় সময় এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকা পচা টমাটো, শুকনো লাউ ডগা বা হলদে কপির পাতা চিবোয় নিবিষ্ট মনে। দুলোচাঁদ মাঝে মাঝে ওদের মুখ থেকে ছিনিয়ে নেয় দু'একটা ভাল টমাটো বা সবুজ কপির পাতা। এইজন্তেই সকাল সকাল ওর বাজারে আসার উদ্দেশ্য। যখন কেউ থাকে না তখন। সবার সামনে ভিখিরীর মত কুড়োতে সংকোচ হয়। দুলো ভাবে, হ্যাঁ প্রথম থেকেই ভিখিরী হ'লে বোধহয় এর চেয়ে ভাল হত। তাতে কুড়িয়ে নেওয়া তো সামান্ত কথা, হাত পেতে ভিক্ষে চাইতেও লজ্জা

হ'ত না। কিন্তু অতীত তো তা নয়। একদিন এই বাজারের প্রধান পাইকারী তরকারীর দোকানদার ছিল সে। স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে ঠোঁটের এক দিকটা একটু ফাঁক হয়ে এক টুকরো শুকনো হাসি বেরিয়ে আসে ঢুলোর। হ্যাঁ, গেঞ্জি সেদিনও গায়ে থাকতো। কিন্তু শুধু গেঞ্জি নয়। তার ওপর ঢোলা আর্দির পাঞ্জাবী, যার বুক পকেট-টা এক তাড়া নোটে উঁচু হয়ে থাকতো সব সময়। হয়ত দু একটা দশ কি পাঁচ টাকার নোট উঁকি মারতো পকেট ডিঙিয়ে। যে কোন মুহূর্ত্তে হয়ত পড়ে যাবে টুপ করে এই রকম ভাব। কিন্তু ঢুলো বেপরোয়া ভাবে চলতো। পরণে থাকতো মিলের ফিনফিনে দশহাতি ধুতি। কোঁচা লুটতো পায়ের কাছে। ধুলোয় গড়াগড়ি বা কাদায় মাথা-মাখি হ'ত। তবুও কোন ভ্রূক্ষেপ করতো না ঢুলো। পরদিন আবার পাটভেঙ্গে ধোয়া ধুতি পরে আসত। শুধু তাই নয়। অন্যান্য দোকানদারদের ওপরও ছিল তার দারুণ দাপট। সুবর্ণরেখার ওপার থেকে বা শহরের আশেপাশের দেহাতী মানুষেরা ঠেলাগাড়ীর ওপর কচু, কপি, বেগুন, কলা বা পালং শাকের আঁটি চাপিয়ে বাজারে উপস্থিত হলেই ঢুলো গিয়ে দাঁড়াতো সব কিছু আগলে। নতুন সব্জি কিনতো বেছে বেছে। ঢুলো না কেনা পর্যন্ত কেউ তাতে হাত দেওয়ার সাহস পর্য্যন্ত পেত না। 'ও' কেনবার পর অবশিষ্ট যা বাঁচতো, শুকনো মুখে নিয়ে যেত অন্য পাইকারী দোকানদাররা। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার সাহস হ'ত না কারুর।

কিন্তু হয়েছিল বই কি। একজনের সাহস হয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত; শুধু তাই নয় জিতেও ছিল। বড় নিষ্ঠুর-ভাবে হারিয়েছে ঢুলোকে। রিক্ত করেছে সবদিক দিয়ে। স্বাদে-ভরা ঢুলোর জীবনটাকে বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে দিয়েছে। হয়ত তার ভাগ্যের নিষ্ঠুর তামাসা বা সময়ের প্রবঞ্চনা। তবুও ঢুলো যেন নিঃসঙ্কোচে এর সবটা স্বীকার করতে পারে না। ভবিষ্যৎটুকু হাতছাড়া হয়েছে। অতীতের সম্বলটুকু নিঃশেষে হয়ে গেছে ক্ষয়রোগীর জীবনী শক্তির মত। ধীরে ধীরে; নিজের অজ্ঞাতে। সে জিতেছে, ঢুলো ভাবে; এ যেন তার প্রতিহিংসা পূরণের বন্য প্রবৃত্তি। হারিয়ে আশ মেটেনি, দলে পিষে তবে স্বস্তি পেয়েছে ক্ষ্যাপা হাতীর মত। কি করে কি ভাবে যে ওলট পালট হয়ে গেল ঢুলো ভাবতেও পারে না। কটা দিনই বা মাঝে গেছে। চেষ্টা করলে আঙ্গুলে গোণা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে এই! যেন এক মুহূর্ত্তকাল চোখ বোজা আর সামনের পাঁচতলা বিরাট একটা প্রাসাদ ধস্ করে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে যাওয়ার মত ব্যাপার। বুঝবার সুযোগ পায়নি, রক্ষা করার অবসর পায় নি।

—কি রে কালা নাকি তুই ?

দারুণভাবে চমকে ওঠে ঢুলো।

একটা থলি হাতে নিয়ে এক ভদ্রলোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে ঢুলো।

—কি চাই বাবু ?

—লঙ্কা দেখি চার পয়সার।

চার পয়সার ভাগ থেকে একভাগ তুলে নিয়ে ভদ্র-লোকের থলিতে পুরে দিল।

—ইস্। এই কটা চার পয়সার !

—উপায় নেই বাবু, দাম চড়েছে।

হুঁ, তোদের মুখে তো ঐ এক কথা।

ঢুলো চেনে ভদ্রলোককে। পরিচিত খদ্দের। নাম ধাম সব জানা। বছর কয়েক আগে ওর মেয়ের বিয়েতে তরকারী কিনেছিল ঢুলোর কাছ থেকে। এখনও মনে আছে হিসেবটা। সব মিলিয়ে পঁয়তাল্লিশ টাকা কত আনা হয়েছিল যেন। আনাটা অবশ্য ধরেনি ঢুলো। কিন্তু বিয়ের পরদিন এসে চারখানা পাঁচ টাকার নোট হাতে গুঁজে দিয়ে হাতটা চেপে ধরে বলেছিল, ঢুলোবাবু—আপনি মহাজন মানুষ। বাকী কয়টা টাকায় আপনার কিছু যাবে আসবে না। ধীরে ধীরে দিয়ে দেব। লোকটাকে একটু চাপ দিলে বোধহয় কেঁদেই ফেলতো সেদিন। কিন্তু ঢুলো হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলেছিল, তার জন্যে আর কি আছে গোলকবাবু। আপনার মত কত খদ্দেরের কাছে আমার পাওনা বাকী আছে। ঠিক আছে। যখন পারবেন দেবেন।

আর একবার হাসে ঢুলো। রূপোলী চাকতির প্রভাব কি সাংঘাতিক তাই ভেবে। সেদিন অর্থ ছিল—তাই দয়া করার ইচ্ছে ছিল। সম্মান পাবার অধিকার ছিল। আজ অর্থ নেই, তাই কিছুই নেই। দয়া নয়, ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের অধিকারটুকুও নেই। সম্মান তো নাগালের

অনেক বাইরে। একবার মনে হল, কি জানি এরকম ভাবা তার অন্যায়। তার তো চাদর দিয়ে মাথা ঢাকা ছিল। তাই বোধহয় ভদ্রলোক ঠিক চিনতে পারে নি। দুলো মাথার চাদরটা আরও একটু টেনে দিল। বৃহৎ অবগুণ্ঠনে ঢেকে গেল মুখ। এই ভাল। ন্যায্য প্রাপ্যে প্রয়োজন নেই। পূর্ব্ব পরিচয় চটে ঘষে মিলিয়ে যাক্।

—বাঁদা লিয়ে যান বাবুরা। বাঁদা। এমন বাঁদা দেখো লাই। ই বাঁদা লয়। পাথরের ডেলা বটে। শতুরও ঘায়েল হবে। মাথায় মারলে—

আর একবার চমকে ওঠে দুলো। চমকাবার কথা নয়! কারণ এ গলার স্বর শুনে সে অভ্যস্ত। তবুও চমকায়। সারা বাজারের মধ্যে ঐ একটাই দোকানীর গলা। নবাগতা। এ বাজারে ওর বয়েস সবচেয়ে কম। সাধারণ মেয়ে। অসাধারণত্ব কেবল দুলোর চোখেই পড়ে। এতগুলো পাইকারী দোকানদার এতদিনে যা করতে পারেনি ওই মেয়ে তা এই কয়েক বছরে নিংড়ে একেবারে ছোবড়া করে ফেলেছে। সত্যি, দুলোর জীবনে আর কিছুই নেই। ওই ডাইনী সব চুষে নিয়েছে। দুলোর সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে অদৃশ্য হাতে। বলার ভঙ্গি, বিক্রী করার ক্ষিপ্রতা, মায় খদ্দের বাগাবার কায়দাটুকু পর্য্যন্ত। দুলো পাইকারীর জায়গায় আজ ওই বিজয়িনী মেয়ে কাঁচি। কপালে কাঁচ পোকার টিপ, মুখে সস্তা পাউডারের প্রসাধন, পরণে রং-জলা সিল্কের শাড়ী, পানের রসে টুকটুকে রাঙ্গা ঠোঁট। চোখে কাজল, দেহে বিশ বাইশ বছরের আঁট সাঁট যৌবন। আধময়লা রং, স্বাভাবিক নাক চোখ। সব মিলিয়ে সুন্দর। কিন্তু কিছু রুক্ষ্ম, সামান্য উদ্ধত।

এমন আর কি। কয়েকটা বছর মাত্র। সেদিনের কথা মনে করার জন্যে চোখ বুঁজে অন্ধকার খুঁজবার প্রয়োজন হয় না। চোখ মেলেই সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়। সব কিছুই মনে আসে। ওই তো চালের গুদোমের পাশে ঐ পানের দোকানটা এখনও আছে। ওরই সামনে ঠেলায় করে দেহাতীরা সেদিন তাজা, খাঁটি বেগুনী রঙের তেল চকচকে বেগুন আর বাঁধাকপি এনেছিল। বেগুনের কাঁটার তীক্ষ্ণতা বা বাঁধাকপির পাতা থেকে শিশিরের জল তখনও মিলিয়ে যায় নি। রোজকার মত অভ্যস্ত গতিতে এগিয়ে গিয়ে দুলো সব মাল আগলে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে ছিল দুজন কর্ম্মচারী। অন্য দোকানদাররা লোলুপ দৃষ্টি মেলে ঠেলার চার পাশে ঘোরা-ফেরা করছিল মৌমাছির মত। মাঝে মাঝে দু'একটা বেগুন টিপে দেখছিল আর চক্ চক্ করে উঠছিল চোখ দুটো। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যে। পরক্ষণেই মৃত আশার চিতার আগুনের ধোঁয়ায় ম্লান হয়ে যাচ্ছিল তাদের আশাবিহ্বল দৃষ্টি। দড়ির বাঁধন খোলা হল। নামানো হ'ল একে একে সব বেগুনের ঝুড়ি। হঠাৎ ভোজবাজির মত এক কাণ্ড ঘটে গেল। দুলো নিজেও এরকম ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। কোথা থেকে হঠাৎ ঐ মেয়েটা প্রায় উপুড় হয়ে পড়লো একটা বেগুনের ঝুড়ির ওপর। পরক্ষণে তুলে নিল মাথার ওপর। নিদারুণ বিস্ময়ে দুলো হতবাক হয়ে গেল প্রথমটায়। বিস্ময় কেটে যেতেই তাড়াতাড়ি কোঁচা সামলে খপ করে ধরলো এগিয়ে যাওয়া মেয়েটার একটা হাত। একটু জোরেই বোধহয় ধরেছিল। দুলোর মুঠির মধ্যে মট্ করে একটা শব্দ হ'ল। বুঝতে পারল ওর হাতের একটা চুড়ি গুঁড়ো হয়ে গেল। কিন্তু দুলোর তখন তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

—এই তোর নাম কি?

ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা। উদ্ধত যৌবনকে ঘিরে রয়েছে শুধুমাত্র একখানা শাড়ী। দুলো দৃষ্টি ফেললো মেয়েটার মুখে। নিটোল আধময়লা মুখ। কিন্তু দৃষ্টিটা বড় হিংস্র, কুটিল তীব্রতা। দুলোর দৃষ্টির ওপর দৃষ্টি রেখে বললে—কেনে?

—শুনি না।

—কাঁচি।

তা এ বেগুন নিয়ে যাচ্ছিস্ কোথায়?

দুলোর এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল নিজের হাত।

—ভদ্দরলোকের এ কেমন ব্যাভার শুনি? এত লোকের মাঝে আমার হাতটা ধরলে কি মনে করে?

চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো দুলোর। দু'পা পিছনে সরে এল। গলায় যথাসম্ভব জোর এনে বললে—এ বেগুন আমার, তুই—

—নাম লেখা আছে নাকি?

—না। তা কেন থাকবে?

—তবে?

—আমি—

—তুমি কে? বাজারের বড় মাহাজন। তাই না?

চোখে মুখে চরম ঘৃণা এনে মেয়েটা যেন ছুঁড়ে মারল কথাটা। তারপর অন্যান্য দোকানদারদের উদ্দেশ্য করে বললে—তোমরা সব ভেড়ী নাকি গো? ব্যবসা করতে এইসেছ, পয়সা ফেলে মাল কিনবে আর বিকাবে। এই ভাল লোকের চোখ রাঙ্গানিতে ভয় পাবে কেনে শুনি? বলি বাজার কি ওর কেনা? পয়সা ফেলে মাল ওঠাও, দেখি কার বুবে—

আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ অসাড় মানুষগুলো যেন প্রাণ ফিরে পেল। প্রথমে দু'একজন, পরে সবাই ঢুলোর সামনে এসে দাঁড়ালো পিছন ফিরে। কেউ কোন কথা বলল না। নিজের নিজের প্রয়োজন মত মাল ওজন করে নিয়ে গেল। ঢুলো যেন বোবা হয়ে গেছে। কোন প্রতিবাদ মুখ ফুটে বেরুলো না। অন্য দোকানদারদের মুখ-গুলো কঠোর লোহার মত আর দৃষ্টি আগুনের মত হ'য়ে ওর সমস্ত শরীরে অজ্ঞাত ভয়ের সঞ্চার করিয়ে দিল। ঢুলো সব দেখলো একটা দুঃস্বপ্নের মত। চমক্ ভাঙ্গলো একটা খিলখিল হাসির শব্দে। তাকিয়ে দেখে ঠেলায় পড়ে আছে কয়েকটা বাঁধা কপির পাতা, আর বেগুনের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে নির্লজ্জ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কাঁচি।

—কি গো সর্দ্দার, এতদিনে সদ্দারী ঘুচলো—হি-হি-হি—

একদিন নয়। ক্রমাগত কয়েক বছর ধরে কাঁচির নির্দ্দেশে অন্য দোকানদাররা মাল ভাগ করে নেয়। ঢুলো রিক্ত হয়ে যেতে থাকে দিনের পর দিন। ভাল মাল পায় না, খদ্দেরও তাই ওর কাছে ঘেঁসে না। বিপদ কখনো একা আসে না। একদিন দোকান থেকে চুরি হয়ে গেল অনেক মাল। বৌটা পড়ল অসুখে। হু হু করে জলের মত বয়ে গেল সঞ্চিত অর্থ, কিন্তু শ্মশানমুখী বৌকে ধরে রাখতে পারলো না কিছুতেই। একদিন পাকা ভিত আর টালি-দেওয়া দোকান ঘরের ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রইল না। দোকান ঘর ছেড়ে দিয়ে মাটিতে বস্তা বিছিয়ে দোকান সাজিয়ে বসল—আজ যেমন বসেছে। দোকান-দাররা তাকে এক ঘরে করেছে জোট বেঁধে, আর জোট বাঁধিয়েছে ঐ কাঁচি। ঢুলো দেখছে ওকে। মুখ দিয়ে খই ফোটাচ্ছে যেন—আর মেশিনের মত দু'হাতে মাল বেচছে। পয়সা নিচ্ছে গুণে গুণে; আর হাঁপিয়ে পড়ছে।

এক ভদ্রলোক দুটো কপি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, দশটাকার খুচরো হবে?

কাঁচি ঢুলোর দিকে দৃষ্টিটা ছুঁড়ে মারলো। তারপর খদ্দেরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে, ভুরু বেঁকিয়ে বললে—দশটাকার কি গো, শটাকার হবে।

অসহ্য! অসহ্য লাগে ঢুলোর। হৃৎপিণ্ডটা শুকনো পাঁজরে ধাক্কা মারে। ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে নির্মমভাবে ঐ ডাইনীর গলা টিপে ধরে। তাহলে বোধহয় মনটা স্বস্তি পাবে। কিন্তু পরক্ষণেই উত্তেজনা হ্রাস পায় নিজের লিক্‌পিকে শরীরের দিকে তাকিয়ে। ভেঙ্গে পড়ে নিদারুণ হতাশা আর দুশ্চিন্তায়। গাল বেয়ে বোধহয় দু'ফোঁটা জলও গড়িয়ে আসে। ইচ্ছে হয় চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। হঠাৎ খেয়াল হয় ঢুলোর। বাজারে এত লোকের সামনে কাঁদছে সে। কি লজ্জা। দুঃখ মানুষকে পেতেই হবে। কিন্তু এ তো দুঃখ নয়, কষ্টও নয়। পরাজয়ের গ্লানিতে ভেঙ্গে-পড়া বুক নিংড়ানো অশ্রু। কিন্তু হলেই বা। তাই বলে পুরুষ মানুষ হয়ে বাজারের মধ্যে কান্না। এ কান্না ওরা যদি কেউ দেখে তাহলে ওরা আরও বিদ্রূপ করবে, প্রতিশোধ নিতে পারায় খুশীতে ওদের মন বেপরোয়া নৃত্য করবে। ঢুলো তাড়াতাড়ি চাদর দিয়ে চোখ মুছে তাকায়। কেউ দেখে ফেললো নাকি? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যাকে এড়াতে চেয়েছিল সেই দেখছে অপলক দৃষ্টিতে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় ঢুলো। কাঁচি দেখছে তাকে। তার কান্না, তার বেদনা-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। ঢুলোর দৃষ্টির সঙ্গে মিল হতেই আপনা থেকেই যেন তার রুক্ষ শরীরটার ওপর একটা কোমল স্নিগ্ধতা নেমে আসে। চোখে একটা ভাষা ফুটে ওঠে।

ঢুলো এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে নিল। আর মুখ ঘুরিয়েই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে নীলু। তার ন' বছরের মেয়ে।

—কি রে? কি চাই? অস্বাভাবিক রুক্ষ স্বর বেরিয়ে এল গলা থেকে।

—সেই লোকটা এইচে। বলছে জাগা ছেইড়ে দিতে।

বাজারের পশ্চিম দিকটায় একটা দালান আছে অসম্পূর্ণ। শুধু ইঁটের গাঁথুনি দিয়ে খাড়া করা রয়েছে কাঠামোটা। অনেকদিন ধরে অমনিভাবে পড়ে আছে। যে বাড়ী তুলছিলো হঠাৎ অভাবে পড়ায় বোধহয় ঐখানেই থেমে গেছে। তাই ঐখানেই দুলো আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন হ'ল ও বাড়ী কিনে নিয়েছে আর একজন। দোকান দেবে। তাই তাগাদা দিচ্ছে বারবার।

দুলোর মাথাটা হঠাৎ কেন জানি গরম হয়ে উঠলো। মুখখিস্তি করে বললে—যা। রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াগে যা। সরে যা এখান থেকে, নইলে কেইটে সাবাড় করব।

মেয়েটা ভয় পেয়ে চলে গেল। কিন্তু এবার আর দুলো নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠলো। শীর্ণ শরীরটা দুলে উঠতে লাগলো বার বার কান্নার দমকে।

দুপুরে দোকান তুলে নিয়ে গেল নিজের আস্তানায়। না। সব ঠিক আছে। রাস্তায় এসে দাঁড়ায়নি মেয়েটা আর অসুখের বাচ্চাটা। শুনলো, এই মাসটা সময় দিয়ে গেছে। দুলো আশ্চর্য্য হ'ল না। চিন্তাও করল না। বাচ্চাটাকে নিয়ে না হয় গুদোমঘরের বারান্দায় উঠতো। কিন্তু আশ্চর্য্য হলো খেতে বসে। পাতের কোণে অনেকখানি বাঁধাকপির তরকারী। মনটা বড় আনচান করে উঠলো মেয়েটার জন্যে। আহা রে! ওই একরত্তি মেয়ে। তবু বাপের অবস্থাটা বোঝে।

—হ্যাঁরে নীলু বাঁদাকপি পেলি কোথায় রে? ভাত মাখতে মাখতে প্রসন্ন মনে জিজ্ঞেস করে দুলো।

বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে ভরসা পায় নীলু। পাতের কোণে বসে বললে—জান বাবা, বাজারে ওই যে একটা দোকানী আছে, খুব কেনাবেচা যার—সে দিয়ে গেল। বললে—

—আর তুই নিলি হতচ্ছাড়ি!

দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে দুলো এঁটো হাতেই মেয়ের গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ভাতের থালা ঠেলে ফেলে। উঃ অসহ্য! মেয়ে পর্য্যন্ত তাকে অপমান করছে!

হাত ধুয়ে আবার ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে দুলো বেরিয়ে যায় বাজারের দিকে। নীলু ককিয়ে কেঁদে ওঠে, বলে—বাবা গো খেয়ে যাও।

দুটো বেজেছে কিনা সন্দেহ। বিকেলের বাজার চারটের আগে বসে না। তরকারীর বাজার তাই ফাঁকা। এখন আর কেউ তরকারী কিনতে আসবে না। এ কথা দুলো জানে। তবুও সেই ফাঁকা বাজারে দোকান সাজিয়ে বসলো। গমগমে আনাজে ভরা বাজারটা এখন অদ্ভুত লাগছে। দুলোর বুকের ভেতরটার মত খালি, একেবারে শূন্য। শুধু ভোরবেলার মত হলদে, বুড়ো কপিপাতা, পচা বেগুন আর কিছু সব্জি এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে। একটা তাগাড়া গাই সেগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। দুলো আশ্চর্য্য হ'য়ে গাইটাকে দেখে। এমন নধর, সুপুষ্ট গাই বড় একটা চোখে পড়ে না। অনেক দুধ দেয় নিশ্চয়। একটা অসম্ভব কল্পনা মনে এল। এমন একটা গাই যদি কেউ তাকে দিত, অবস্থাটা দু'দিনে ফিরিয়ে আনতে পারত। দুধের ব্যবসাটা মন্দ নয়। গাইটা এদিকে আসছে। সামনের ওই কপিপাতাগুলো খাবে বোধহয়। ওর সাদা মসৃণ গায়ে রোদটা কেমন পিছলে যাচ্ছে। যেন সেই মহাভারতের কামধেনু। আন্দাজটা ঠিকই করেছে। গাইটা কপিপাতায় এসে মুখ দিল। আর ও'দিক থেকে সেই বুড়ো ষাঁড়টাও এগিয়ে এল কপিপাতাগুলোর দিকে। কি ভাবে যেন ষাঁড়টার একটা পা খোঁড়া হয়ে গেছে। খুঁড়িয়ে হাঁটছে। পাঁজরের হাড়গুলো বেরিয়ে গেছে বিশ্রী ভাবে। দুলোর মনটা হঠাৎ কেন জানি ওই নধর গাইটার প্রতিবিতৃষ্ণায় ভরে গেল। স্থির করলো বুড়ো ষাঁড়টাকে যদি বাধা দেয় গাইটা—তাহলে এখান থেকেই বাটখারা ছুঁড়ে মারবে। ষাঁড়টা ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু এক অদ্ভুত ঘটনা দেখলো দুলো। এ যেন কল্পনাতীত। গাইটা ষাঁড়টার দিকে শুধু একবার তাকিয়ে সরে গেল। ষাঁড়টা পাতা খেতে লাগলো। দুলো সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। কি ভেবে সবকিছু ফেলে এগিয়ে গেল কাঁচির ঝুপড়ির দিকে। কিছুদূর গিয়ে আবার একবার ফিরে তাকাল গাইটার দিকে। গাইটা বুড়ো ষাঁড়টার পা চেটে দিচ্ছে আর ষাঁড়টা নিশ্চিন্ত মনে পরম আরামে পাতা খাচ্ছে। দুলো আরও জোরে পা বাড়াল। অনেকটা ছুটে চলল কাঁচির ঝুপড়ির দিকে।

ছাত্রসমাজের প্রতি

উপানন্দ

গোয়েটে বলেছেন, যার অদম্য ইচ্ছাশক্তি আছে সে নিজেই নিজেকে মনের মত ছাঁচে ঢাল্‌তে পারে। চৈনিক ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক কনফিউসের মত হচ্ছে—একজন কৃষকের দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ মনকে হারানো যায় না কিন্তু একটি বিরাট সৈন্যদলের সেনাপতিকে জয় করা যায়। তোমরা জেনো সংগ্রামই জীবন। কবি বলেছেন—'সংসার সমরাঙ্গণে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে—' এ উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তাই অবিরাম চেষ্টা আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাক্‌লে সংসারের সর্ব্বক্ষেত্রে শুধু সাফল্য গৌরব অর্জ্জন করা যায় না, ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে ও শাশ্বত স্বাক্ষর রেখে যাওয়া যায়। প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে তোমাদের সংগ্রাম করে উঠতে হবে, অস্তিত্বও বিপন্ন হোতে পারে, কিন্তু তার জন্যে পিছ্‌পাও হোলে চল্‌বেনা। ভারতের বাণী হচ্ছে—'হতো বা প্রাপস্যসি স্বর্গম্। জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্—' হত হলে স্বর্গে যাবে, জয়লাভ কর্‌লে পৃথিবী ভোগ কর্‌বে। জীবনসংগ্রামে এই বাণীকে বিগ্রহের মত বুকে ধরে সৈনিকের মত চল্‌বার শক্তি অর্জ্জন করা বিশেষ দরকার। কাপুরুষেরাই দৈবের দোহাই দেয়। শক্তি বিনা বেঁচে থাকা যায়না। জীবন-সংগ্রামে টিক্‌তে না পেরে পৃথিবী থেকে বহু অতিকায় প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু মানুষ আজও বেঁচে আছে, তার কারণ একদিকে যেমন বেঁচে থাকবার জন্যে চলেছে তার অদম্য চেষ্টা, অপরদিকে তার উত্তরোত্তর মানসিক শক্তির উৎকর্ষসাধন হচ্ছে, বুদ্ধিবৃত্তির উত্তরোত্তর স্ফুরণ হচ্ছে।

বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু। স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তি অনুধাবন করবার চেষ্টা করতে হবে। মানুষ নিজেই তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা। অপর কেউ তার ভাগ্য গড়ে দেয়না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—'আত্মৈব আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ—' মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, আবার সে নিজেই নিজের শত্রু। এই কথা স্মরণ করে সংসারের সর্ব্ব ক্ষেত্রে অগ্রসর হোতে হবে। তোমরা জানো বর্ত্তমান সভ্যতা শঠতাপূর্ণ, মানুষ আত্মকেন্দ্রিক—শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই গর্ব্বোদ্ধত, এজন্যে যোগ্যতা সব সময় উপযুক্ত সমাদরলাভ করেনা। কিন্তু যখন তার গর্ব্বোদ্ধত শক্তিকে খর্ব্ব করা যায় তখন সে হয়ে ওঠে ত্রস্ত ভীত ও বিপন্ন। তার স্বার্থসর্ব্বস্ব আত্মকেন্দ্রিকতার বিলুপ্তি ঘটে, তার চেতনা জাগে। এই সব, অহংমন্য মানুষেরা সাধারণের জীবন-যাত্রাপথের গতিরোধ করে। তাই ছেলে-বেলা থেকে এরূপ মানসিক ও দৈহিক শক্তি অর্জ্জন করতে হবে, যাতে এরা পথ থেকে সরে দাঁড়ায় তোমাদের কাছে বারম্বার পরাজিত হয়ে। অলসতা, ঔদাসীন্য আর নৈরাশ্য পরিহার না কর্‌লে মানসিক-শক্তির বিকাশ হোতে পারে না। আড্‌ডাবাজ ছেলে-মেয়ে শুধু নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করেনা, সমাজ ও জাতিরও বিশেষ ক্ষতি করে। এদিকে তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। সুপরিকল্পনার সঙ্গে ধীর, স্থির, সংযত ও অনন্য ইচ্ছাশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে ছেলে-বেলা থেকে পথ চল্‌তে হবে, কোনপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়লে মোটেই অধৈর্য্য হবে না। লক্ষ্য স্থির রাখবে। ব্যাসদেব মহাভারতের মধ্যে বলেছেন—'সিংহখেল গতিরঃ শ্রীমান্ মত্তনাগেন্দ্র বিক্রমঃ।' তোমাদের গতি হোক্ সিংহের রাজোচিত গতির মত, তোমাদের দেহে হোক্ মত্ত হস্তীর বিক্রম, তোমরা হও সর্ব্ব সৌভাগ্যযুক্ত।

যার চিত্ত বা মনের ক্রিয়া নেই, লক্ষ্য নেই মহত্তর আদর্শের দিকে, সে কখন উন্নতি কর্‌তে পারে না। অন্তরে যার প্রেরণা নেই, সে সংসারে প্রাধান্য বিস্তার কর্‌তে অক্ষম। শিক্ষা সভ্যতা আর অর্থ ভিন্ন জাগতিক সুখসুবিধা অসম্ভব। তোমরা জানো চারিদিক থেকে সঙ্কট এসে উপস্থিত হয়েছে পশ্চিম বাঙ্গলায়, কোনদিক থেকে পরিত্রাণ পাবার পথ নেই—এই সঙ্কট দুর্য্যোগের মধ্যে অসংখ্য গ্রাসের পেষণে পিষ্ট হয়ে দারিদ্র্যের বীভৎস রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে স্কুলে কলেজে—পেটে ভালো খেতে পাওনা, পরণেও নেই তেমন কাপড়-চোপড়। দৈহিক অবস্থাও আশাপ্রদ নয়।

এই প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়েও তোমাদের গড়ে তুল্‌তে হবে নিজেকে মানসিকশক্তি অর্জ্জন করে। আজকের দিনে যে সব চিত্তঘাতী সমাজ-ঘাতী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, আগামী কালে তোমাদের গতিবেগ-প্রাবল্য উচ্ছৃঙ্খল পদ্ধতিই দূর করবেনা, প্রতিকূলতায় পাষাণ বিদীর্ণ করে বাঙালীর মুখে হাসি ফুটোবে। তোমরা সকলেই ডিজরেলিকে জানো। ডিজরেলি বল্‌তেন—এখন অবশ্য আমাকে বস্‌তে হচ্ছে কিন্তু সময় আসবে যেদিন তোমাদের সবাইকে আমার কথা শুন্‌তে হবে—' একথা তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব হয়েছিল—কেন না ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ইচ্ছা-শক্তিতে বিশ্বাস কর্‌তেন আর এ শক্তি অর্জ্জনের জন্যে সাধনা কর্‌তেন।

ফিসার বল্‌তেন—'যখন আমার মেসের সঙ্গীরা জ্যাম খেতো, আমি অভুক্ত অবস্থায় সরে এসে দাঁড়াতাম। তাদের পেট ভরতি থাকতো যখন, আমার পেট থাক্‌তো তখন খালি। আমি ভালো খেতে পাইনি প্রাণপণ শক্তিতে খেটেছি, সংগ্রাম করেছি, তাই এসেছে আমার সাফল্য—তেরো বছর বয়সে ফিসার নৌ বিভাগে জীবন-যাত্রা সুরু করেন, শেষকালে তিনি উত্তরোত্তর সম্মান ও মর্য্যাদালাভ করে নেতৃত্ব করেছেন। নির্দ্দয়-ভাবে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেও অপকৌশলীরা তাঁকে প্রতিহত করতে পারেনি,—তিনি সংস্কারের পর সংস্কার করে জাতীয় উন্নয়নের পথ রচনা করেছিলেন ; প্রতি সংগ্রামে তিনি হয়েছেন জয়ী, তার কারণ তাঁর মধ্যে ছিল গতিময় অধ্যবসায়শীল ইচ্ছাশক্তি। তোমরা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা হারিয়ে বিভ্রান্ত পথিকের মত ধাবিত হবে না, কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় অটল হ'বে। জার্ম্মান দার্শনিক গোয়েটে বলেছেন—জীবনের পরিচয় কর্ম্মে, চিন্তাহীন কর্ম্মে নয়, মস্তিষ্কহীন কর্ম্মে নয়, সুচিন্তিত কর্ম্মে। যে ধ্যানধারণার ফলে কল্যাণ-প্রদ কর্ম্ম সূচিত হয় না, যে চিন্তা নিছক আষাঢ়ে স্বপ্ন, গোয়েটে তারই নিন্দা বাদ করেছেন। জীবের বিশেষ ক্রিয়াই হচ্ছে জীবন-সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মধ্যে প্রাণোদ্যম চাই। টেনিসন তাঁর ইউলিসিসের মধ্যে বলে গেছেন কর্ম্মই জীবন—আর অকর্ম্মণ্য অবস্থা মানবের মৃত্যু। আশার স্বপ্ন সৌধ নির্ম্মাণ করতে যাওয়া নির্বীর্য্য ব্যক্তির পক্ষে সমীচিন নয়। বাঙালীর অধঃপতনের মূলে রয়েছে ঐক্যচ্যুত আত্মঘাতী ও সমাজঘাতী নীতি। বিগত কয়েকশতাব্দী ধরে এই নীতির কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তাই আজ তার সঙ্কীর্ণ মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে কল্যাণকামী আত্মা নৈরাশ্যের উপকূলে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করছে, আজ আর স্বপ্নের ইন্দ্রধনু দেখে সে আত্মহারা হয় না। আত্ম-কেন্দ্রিকতা কখন দেশকে চিন্‌তে পারে না। দেশপ্রেমের ভাণ দেখিয়ে বহু আত্মকেন্দ্রী ব্যক্তি সমাজের মধ্যে আশ্রয় ও প্রাধান্য লাভ করে শেষে দেশের সর্ব্বনাশ করে থাকে। বাংলার ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যাহোক, এখন তোমাদের পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে—এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের গড়ে তোলা। গড়ে তুল্‌তে হোলে চাই অদম্য মানসিক শক্তি, সুদৃঢ় ইচ্ছা শক্তি, সত্যাশ্রয় ও উন্নত চরিত্র-বল। দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ আর অকল্যাণ সুখৈশ্বর্য্য ও সুখ দুঃখ সবই তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। এজন্যে তোমরা আজকের দিনের দেশের লোকের মত সময়ের দাস ও স্বার্থের উপাসক হবে না। সময়ের জন্যে, স্বার্থের জন্যে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন করবে না। কোন ভাবে প্রলুব্ধ হবে না—সত্যাশ্রয়ী হবে।

ডাঃ হ্যাডক বলেছেন যে, হাতুড়ির শত আঘাতে একটা ছাঁচ চূর্ণ করা যায় কিন্তু তাঁর প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ আঘাতটি প্রকৃত ছাঁচটাকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে? অনুরূপ ভাবে প্রশ্ন হোতে পারে—শত বা শতাধিক কর্ম্মের মাধ্যমে পরিশ্রমের সাফল্য লাভ করা যায় কিন্তু কোন কর্ম্মটি সাফল্য এনে দেয়? এই থেকে তোমরা বুঝতে পারছো ক্রিয়াশক্তির প্রভাব। প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তির প্রতিটি স্তরকে এক করে। সৎচিন্তা, সাৎসাহস, সৎভাব ও আদর্শ ভিন্ন মানসিক শক্তি উদ্ভূত হয় না। শক্তির অভাব হোলে গতির অভাব হয়। যেখানে গতি নেই, সেখানে শক্তির সমাধিক্ষেত্র। অধ্যবসায়ী হোলে তবে শক্তি সক্রিয় হয়। যখন তোমরা প্রাণবন্ত তখনই ক্রিয়াশীল। তাই বলা হয়েছে—'As we act so do we grow'

ইংরাজী সভ্যতার ফলে আমরা চিত্ত অপেক্ষা বিত্তের উপর গুরুত্ব আরোপ করি। ইংরাজ চলে গেছে, কিন্তু এর ওপর স্বদেশের সমাজ বিধ্বংসী স্বার্থান্বেষী মানুষেরা এরূপ গুরুত্ব দিয়েছে যার ফলে দেশের মানুষ অন্তঃসার শূন্য হয়ে ধ্বংসকে বরণ করছে,—এরাই এনেছে মুদ্রা-স্ফীতি, আর দেশজননী দুঃখে বেদনায় সীতার মত পাতাল প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি দেখেছেন সোনাদানা নেই, আছে হাজার হাজার কাগজ?

মানুষ ধারণা করতে পারে না যে সে পরিমিত শক্তির অধিকারী। এজন্য সে শক্তির অপব্যবহার করে নিজের ও পরের সর্ব্বনাশ করে। অত্যন্ত অহঙ্কার করার জন্যে যেখান থেকে তার পরাজয় আসা উচিত নয়, সেখান থেকে তার পরাজয় উপস্থিত হয়। শেষে সে হয়ে পড়ে ভ্রষ্ট মানুষ। সঙ্ঘবদ্ধ দুর্ব্বল মানুষ ও যে দম্ভস্ফীত কাপুরুষ অত্যাচারীকে বিতাড়িত করে নিজেদের মুক্তির পথ নিজেরাই আবিষ্কার করতে পারে, এই জ্ঞান কজনের আছে? তোমরা সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানতা ও নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগ করে নতুনভাবে দেশকে ভেঙে চুরে গড়বে—এর জন্যে চাই যথোপযুক্ত শিক্ষা, মানসিকশক্তি, ভয় বর্জ্জন আর কঠোরতা অবলম্বন করে সত্যরক্ষা। work is worship কাজের অপর নামই পূজা। এ পূজায় ফাঁকি দিতে নেই।

ভগবান তথাগত বলেছেন—অহিংসা, পর দ্রব্য অপহরণ না করা, অপবিত্রতা ত্যাগ, মিথ্যা ভাষণ আর মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরতি—গৃহস্থ এই পাঁচটী উপদেশ অবলম্বন করলে তার শান্তি আসবে। তোমরা এ উপদেশ অনুসরণ করলে অসাধারণ মানসিকশক্তিলাভ করবে। এই শক্তি আজকের দিনে বিশেষ প্রয়োজন। তোমরা লক্ষ্য করেছ জিহ্বার সংযম খুব কম লোকেরই আছে। আত্ম প্রচারও আত্মগৌরব প্রকাশের জন্যে রথী মহারথী থেকে সুরু করে অনেকেই অসত্য ভাষণকে আশ্রয় করে, কিন্ত তারা জানে না তাতে নিজেদের নৈতিক অধঃপতন ও দুর্দশার দ্বার উদ্ঘা-টন করছে দিনে দিনে। এবিষয়ে তোমরা সতর্ক হবে। যে কোন ব্রতীর

...তায় আজকের দিনে কিছু না কিছু মিথ্যা ভাষণ থাকবেই। আশ্চর্য্য এই যে, এরাই জাতির ভাগ্য ভাঁতা ঘুরোচ্ছে।

জ্ঞান জীবন-যাত্রার পাথেয়। এটা কেবল বর্ত্তমানের মধ্যে সীমিত নয়। অতীত একে বিশুদ্ধ করে, আর ভবিষ্যতের দিকে একে চালিত করে। ছাত্র শব্দের ব্যাপক অর্থ জ্ঞান আহরণকারী ব্যক্তি। যে কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তিই ছাত্র। জগতে বিদ্যার অন্ত নেই—জ্ঞানেরও পরিসীমা নেই। যা দ্বারা অর্থ সম্পদ ও কল্যাণ লাভ হবে, এই রকম বিদ্যার অর্জন আরম্ভ করে শেষে বিদ্যাভ্যাসকে সাধনা বলে গ্রহণ করতে হবে। শ্রমানুসারিণী বিদ্যা। যে ব্যক্তি যেরূপ পরিশ্রম করবে সে তদনুরূপ বিদ্যালাভে সমর্থ হবে। তোমাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক শক্তি মনুষ্যত্ব লাভের সাধনায় নিয়োজিত হোক্—যাতে করে আমরা তোমাদের সকলকে একটি অতি-মানব গোষ্ঠীরূপে দেখতে পাই, আর দেখতে পাই বাংলা ও বাঙালীর হৃতশক্তির পুনরুদ্ধার। দেশাত্মবোধ যেখানে সচেতন, সেখানে সামাজিক ঐক্য-সঙ্কট উপস্থিত হয় না। আত্মগৌরব প্রত্যেকের ভাগ্যে ঘটে না, তা সকলের পক্ষে সাধ্য নয় কিন্তু জাতি-গৌরব সহজসাধ্য। জাতি গৌরব আন্‌তে গেলে প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে এদেশে যে পশ্বাচার চলেছে, তার দিকে দৃষ্টি আবৃত করে রাখা যায় না, অসম্ভব রকম খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির পশ্চাতে যে অর্থগৃধ্নু মানুষের চক্রান্ত ও অপকৌশলের জাল ছড়ানো রয়েছে তা যদি ছিন্ন না হয়, তাহোলে এদেশের অস্তিত্ব সঙ্কট ঘটবে, জাতি পঙ্গু হয়ে যাবে, সাধারণ মানুষ কুপ্রবৃত্তির দাস হয়ে উঠবে—এদিকে কেউ ভাবছে না। যারা উপর-তলায় বসে রঙমহলের মজলিসে বিভোর, তারা কেমন করে চিন্তার অবকাশ পাবে! একদিন তারাই ইংরাজ আমলে গামছা কাঁধে করে পায়ে হেঁটে জাতীয় আন্দোলন করেছে, দেশের দুঃখে অশ্রুসংবরণ করতে পারেনি, হাটে বাজারে গ্রামে কুটীরে গিয়ে বক্তৃতা করে জন-জাগরণ এনেছে। যারাই একদিন এনেছে লবণ আন্দোলন, তাদের আমলেই লবণ হয়ে উঠেছে—মহার্ঘ্য—দর বৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তরোত্তর।

এর কারণ কি?—এই সব কার্য্য কারণের অনুসন্ধান করতে হোলে প্রয়োজন আছে উৎকৃষ্টরূপে বিদ্যার্জ্জন, মানসিকশক্তির উৎকর্ষলাভ ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য। এগুলি তোমরা করায়ত্ত করে নিজেদের হাতে পতাকা তুলে ধরে দেশের সকল দুঃখের অবসান ঘটিয়ে এনে দাও সত্যযুগের কল্যাণবার্ত্তা, মানবিকতার দেবালয়ে জীবন দেবতার আরতি করো শক্তির পীঠস্থান এই বাংলায়, নতুবা আজকের পরিস্থিতি জাতির অবস্থিতিকে অচিরে অবলুপ্ত করে দেবে।

মহাভারতের গল্প

(ঋষি বিশ্বামিত্রের শিক্ষা)

শ্রীসুলতা কর

তোমরা বিশ্বামিত্র ঋষির নাম শুনেছ। অহঙ্কার ও দর্পের ফলে তাঁর কেমন পতন হয়েছিল তাই নিয়ে এই গল্প।

বিশ্বামিত্র চিরকালই ঋষি ছিলেন না। প্রথমে তিনি ছিলেন কান্যকুব্জ দেশের রাজা। ধন, ঐশ্বর্য্য, সৈন্যবল কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না। রূপগুণের তাঁর তুলনা ছিল না। কিন্তু অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর একটি বিশেষ দোষ ছিল। ক্ষমতার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তিনি সব লোককে তুচ্ছ করতেন। বিনয় ধৈর্য্য এসব গুণ তাঁর চরিত্রে একেবারে ছিল না। তাঁর আদেশ মেনে সব লোক চলবে এই ছিল তাঁর ধারণা। কেউ যদি তাঁর আদেশ অমান্য করত ত তাকে কঠিন শাস্তি দিতেন।

রাজা বিশ্বামিত্র খুব শিকার করতে ভালবাসতেন। একদিন তিনি সৈন্য সামন্ত দলবল নিয়ে ঘোর বনে শিকার করতে গেলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বন তোলপাড় করে অসংখ্য বাঘ, ভালুক, হাতি, হরিণ মারতে মারতে রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর সৈন্য সামন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁরা রাজধানীতে ফিরে যাবার জোগাড় করতে লাগলেন।

এমন সময় বিশ্বামিত্রের সেনাপতি সভয়ে বললেন—"মহারাজ, আমরা রাজধানীতে ফিরে যাবার পথ হারিয়ে ফেলেছি। ঘোর বনে এসে পড়েছি, এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখন কি করব পরামর্শ দিন।"

রাজা বিশ্বামিত্র বললেন—"আমরা সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খিদেয় তেষ্টায় অস্থির হয়ে উঠেছি। খুঁজে দেখ, যদি কোন ঋষির আশ্রম পাও ত সেখানে চল। ঋষিরা সব সময় অতিথি সৎকার করেন। তারপর রাজধানীতে ফেরবার পথ খুঁজো।

রাজার কথা শুনে সেনাপতি দলবল নিয়ে খুঁজতে বেরোলেন। কিছুক্ষণ খুঁজতেই বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম পেয়ে গেলেন। তখন বিশ্বামিত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

সেকালে ঋষির আশ্রমে অতিথিদের সন্মান দেবতার সন্মানের তুল্য ছিল।

বশিষ্ঠ ঋষি এই সব মাননীয় অতিথিদের দেখে ব্রস্তব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তাঁর শিষ্যেরা সবায়ের পা-ধোয়ার জল, বসবার আসন এনে দিলেন। রাজা বিশ্বামিত্র পথ

হারিয়ে ফেলেছেন শুনে বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—"মহারাজ, রাত গভীর হয়েছে। এখন এই বনের মধ্যে থেকে পথ খুঁজে বার করা কঠিন। আজ রাতের মত আমার আশ্রমে থেকে যান। কাল সকালে আমার শিষ্যেরা আপনাকে রাজধানীর পথ চিনিয়ে দেবে।"

বিশ্বামিত্র ভাবলেন—এই ঋষির আশ্রমে যে খাবার খাব, আর যে বিছানায় শোব, তাতে আমাদের খুবই কষ্ট হবে। রাজকীয় ঐশ্বর্য্যে আমরা অভ্যস্ত, সে সব আর এই গরীব ঋষি কোথায় পাবে!

কিন্তু কি আর করা যায়। উপায় যখন নেই তখন রাজী হতেই হবে। —এই ভেবে বিশ্বামিত্র বললেন—"তাই হবে বশিষ্ঠ ঋষি। আপনার আতিথ্য স্বীকার করলাম। আজ রাত এখানেই কাটাব।" বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রের মুখের ভাব দেখে মনের কথা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন—"মহারাজ, আপনি কিন্তু ভাববেন না। আপনাদের সেবার কোন ত্রুটি হবে না।"

এখন বশিষ্ঠ ঋষি পাতার কুঁড়ে ঘরে থেকে অতি সাধারণ ভাবে গরীবের মত দিন কাটাতেন বটে, কিন্তু তাঁর আশ্রমে একটি মহা মূল্যবান জিনিষ ছিল। এই জিনিষটি হল একটি স্বর্গের গরু—তাকে বলা হত কামধেনু।

ভারী সুন্দর দেখতে এই গরু, তুষারের মত সাদা তার গায়ের রং, কুচকুচে কালো দুটি ডাগর চোখ, কোমল নধর দেহের গড়ন। বশিষ্ঠ ঋষি এই কামধেনুকে দেবতা ব্রহ্মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। একে তিনি নিজের মেয়ের মত স্নেহ করতেন। আদর করে নাম দিয়েছিলেন নন্দিনী। নন্দিনীর একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে বশিষ্ঠ ঋষি তার কাছে যখন যা চাইতেন, তখন তাই পেতেন। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে পাতালে এমন কোন জিনিষ ছিল না, যা নন্দিনী দিতে পারত না। বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করে এসে নন্দিনীকে ডাকলেন। নন্দিনী ছুটতে ছুটতে কাছে এল। বশিষ্ঠ ঋষি তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—"মা নন্দিনী, মহারাজ বিশ্বামিত্র তাঁর দলবল নিয়ে আমার অতিথি হয়েছেন। তুমি তাঁদের সেবার উপযুক্ত আয়োজন এখনি করে দাও।" নন্দিনী ঠিক মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারত। নন্দিনী বলল—"বাবা, কিছুই ভাববেন না। আমি এখনি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" এই বলে সে তিনবার হাম্বারব করে চীৎকার করে উঠল। অমনি এক অদ্ভুত ব্যাপার হল।

প্রথম হাম্বারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে রাজা মহারাজার খাবার উপযুক্ত হাজার হাজার সোণার পাত্রে ভরা রাজভোগ, মিষ্টান্ন, ফল বার হয়ে এল।

দ্বিতীয় হাম্বারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে রাজা মহারাজার শোবার উপযুক্ত হাজার হাজার দামী মখমলের বিছানা বার হয়ে এল।

তৃতীয় হাম্বারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে হাজার হাজার দাস-দাসী রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর সৈন্য সামন্তদের সেবা করবার জন্য বেরিয়ে এল।

তখন বশিষ্ঠ ঋষি রাজা বিশ্বামিত্রকে ও তাঁর সৈন্যসামন্তদের সেই সব রাজভোগ খাবার জন্য ও তারপর মখমলের বিছানায় শুয়ে ক্লান্তি দূর করবার জন্য অনুরোধ করলেন।

এই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার দেখে বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে গেলেন।

শ্রান্ত ক্লান্ত তাঁরা পরম আনন্দে সেই রাজভোগ খেলেন।

পরদিন ভোর হল। রাজা বিশ্বামিত্র ঘুম ভেঙ্গে উঠেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে সাজ-পোষাক পরে আশ্রম ছেড়ে রাজধানীর দিকে চললেন। বশিষ্ঠের শিষ্যেরা পথ দেখিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে চললেন।

যাবার সময় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষিকে বললেন—হে ঋষি, কাল আপনি যেভাবে অতিথি সৎকার করেছেন, যে অমৃতের মত খাবার খাইয়েছেন, যে সুন্দর নরম বিছানায় শুইয়েছেন, তার জন্য কি বলে যে ধন্যবাদ দেব জানি না। এখন যাবার সময় আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। আপনার ওই কামধেনু নন্দিনীকে আমাকে দান করুন। কাল রাতে ওর অদ্ভুত সব ক্ষমতা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। ওর বদলে আপনি যত টাকা চান দেব, আমার অর্দ্ধেক রাজত্ব পর্য্যন্ত দিতে রাজী আছি।"

বিশ্বামিত্রের অনুরোধে বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—"মহারাজ, অতিথি দেবতার মত সম্মানীয়। অতিথি যা চান তাঁকে তাই দেওয়া উচিত, কিন্তু তবুও আপনার এই অনুরোধ রাখতে পারলাম না।

তার কারণ আপনাকে বলছি শুনুন। কামধেনু নন্দিনীকে আমি দেবতা ব্রহ্মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। প্রায়ই আমার আশ্রমে রাজা, মহারাজা এসে অতিথি হন। তাঁদের সেবা করবার জন্য যে রাজভোগ আর যে সব বিলাস দ্রব্য দরকার হয়, সে সব আমি নন্দিনীর কাছ থেকে পাই। এছাড়া আমাকে প্রায়ই বড় বড় যজ্ঞ করতে হয়, তাতে দেবতা, ঋষি, রাজা, মহারাজা ও সাধারণ লোক সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হয়। সে সব জিনিষ নন্দিনী আমাকে দেয়। নন্দিনীকে দান করলে আমার অতিথি সৎকার করা ও যজ্ঞ করা দুইই বন্ধ হয়ে যাবে।

সুতরাং কেন আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না, সেকথা আপনি বুঝবেন এবং আমায় ক্ষমা করবেন। আর ধার্ম্মিক ঋষিরাও কখনও টাকার লোভে ভোলে না একথা আপনি জানেন। সুতরাং আপনার অর্দ্ধেক রাজত্বের লোভে আমি নন্দিনীকে দেব না তা বুঝতেই পারছেন।"

এই বলে বশিষ্ঠ ঋষি চুপ করলেন। বশিষ্ঠ ঋষির কথা শুনে রাজা বিশ্বামিত্র রাগে জ্বলে উঠলেন।

দেশ-বিদেশের রাজারা পর্য্যন্ত তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহস পায় না। আর সামান্য একজন গরীব ঋষি কি না তাঁকে অগ্রাহ্য করছে। বিশ্বামিত্র কঠোর সুরে বললেন—"ওই কামধেনু নন্দিনীকে দিতেই হবে। আমি শেষবার অনুরোধ করছি। যদি ভাল বোঝেন ত দিয়ে দিন। নয়ত আমার সৈন্যরা জোর করে এখনি ওকে ধরে নিয়ে যাবে। আপনি কি আমার সঙ্গে ক্ষমতায় পারবেন?" বশিষ্ঠ

ঋষি বললেন—"আমি গরীব ঋষি, আমার কি আর ক্ষমতা। তবে স্বেচ্ছায় নন্দিনীকে আমি দেব না। ইচ্ছা হয় ত জোর করে কেড়ে নিতে পারেন।"

এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র আরও রেগে উঠলেন। এতবড় স্পর্দ্ধা গরীব ঋষির যে সে তাঁর সৈন্যবল অস্ত্রবলকে ভয় পায় না।

চীৎকার করে বললেন—"সেনাপতি, সৈন্যদের বল নন্দিনীকে মারতে মারতে টেনে নিয়ে যাক। ওর বাছুরকেও মারতে মারতে ধরে নিয়ে যাক।

রাজার আদেশ শুনে সেনাপতি সেনাদের হুকুম দিলেন। সেনারা ছুটে এসে নন্দিনীকে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে, লাঠি দিয়ে মারতে মারতে টানতে লাগল। লাঠির আঘাতে নন্দিনীর শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। কিন্তু তবুও সে এক পাও নড়ল না।

কাতর স্বরে কাঁদতে কাঁদতে নন্দিনী বশিষ্ঠকে বলল—"বিশ্বামিত্রের সৈন্যেরা এভাবে আমায় মারছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ আপনি এদের কিছুই বলছেন না। তবে কি আপনি আমাকে স্নেহ করেন না? আমি কি আপনার মেয়ে নই? এতদিন ধরে মানুষ করেও আপনার কি আমার উপর কোন স্নেহ নাই। আমি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলে যাই, এই কি আপনি চান?"

বশিষ্ঠ ঋষি নন্দিনীর অভিমান-ভরা কথা শুনে বললেন—মা নন্দিনী, তোমাকে আমি নিজের মেয়ের মত স্নেহ করি, সেকথা তুমি ভালভাবেই জান। আমি তোমাকে আশ্রম থেকে যেতে দিতে চাই না। কিন্তু রাজা বিশ্বামিত্র সৈন্য দিয়ে জোর করে তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি গরীব ঋষি, অস্ত্রবল সৈন্যবল নেই। কেমন করে তাদের বাধা দেব বল। কিন্তু তুমি নিজে যদি পার ত বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের বাধা দাও।"

বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—"নন্দিনী ওই দেখ, তোমার বাছুরকে বিশ্বামিত্রের সৈন্যেরা দড়ি বেঁধে টানছে, লাঠি দিয়ে মারছে। সে তোমার মুখের দিকে চেয়ে কাঁদছে। পার ত ওদের অত্যাচার থামাও। ওরা তোমার উপরেও যেরকম অত্যাচার করছে, যেভাবে তোমাকে মারছে, এও দেখতে আমার কত কষ্ট হচ্ছে বুঝছ।

বশিষ্ঠের কথা শেষ হতে না হতে এক অদ্ভুত ব্যাপার আরম্ভ হল। হঠাৎ নন্দিনীর শরীর বাড়তে বাড়তে বিরাট পাহাড়ের মত হল, আর সেই শরীর থেকে প্রচণ্ড আগুনের হল্কা বেরোতে লাগল। তার দুই চোখ প্রকাণ্ড বড় হয়ে দুটো আগুনের গোলার মত হল। সেই চোখ থেকেও ঝলকে ঝলকে আগুন বেরোতে লাগল।

তারপর নন্দিনী ভীষণ শব্দে ডেকে উঠল। বাঘের ডাক সে ডাকের কাছে হার মেনে যায়। সেই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সেজে লক্ষ লক্ষ তেজস্বী সেনা নন্দিনীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। তারা বাইরে এসেই বিশ্বামিত্রের সেনাদের ঘিরে ফেলে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করল, এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বিশ্বামিত্রের সেনারা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তবুও একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

কিন্তু কি সাংঘাতিক বিক্রম নন্দিনীর সেনাদের। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বিশ্বামিত্রের সব সেনাদের হারিয়ে দিল। এমন ভীষণভাবে বিশ্বামিত্রের সেনারা মার খেল যে তারা নন্দিনীকে আর তার বাছুরকে ফেলে রেখে প্রাণের ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাতে আরম্ভ করল। রাজা বিশ্বামিত্র ও ছুটে পালাতে লাগলেন। পিছনে পিছনে নন্দিনীর সেনারা তাড়া করে চলল। খানিকটা ছোটবার পর বিশ্বামিত্র ও তাঁর সেনারা সভয়ে চেয়ে দেখল যে নন্দিনীর সেনারা তাঁদের সবাইকে ঘিরে ফেলেছে, আর পালাবার উপায় নেই। এখন বুঝি প্রাণে মেরে ফেলে।

বিপদে পড়ে রাজা বিশ্বামিত্র বুঝলেন, রাজা হয়ে অহঙ্কার করার ফল, বল ও দর্প দেখানর ফল কি রকম বিষময় হতে পারে।

যে বশিষ্ঠ ঋষি আশ্রয় দিয়ে অতিথি সৎকার করলেন, ক্ষমতার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তাঁর শত্রুতা করার ফল কেমন সাংঘাতিক হল।

কিন্তু এখন আর ভেবে কি ফল। নন্দিনীর সেনারা তাঁদের সবাইকে বন্দী করেছে। প্রাণে মারবার জন্য তীর ধনুক উঁচু করে ধরেছে। আর এক মুহূর্ত্তেই তাঁরা সবাই মারা যাবেন। প্রাণের ভয়ে রাজা বিশ্বামিত্র আর তাঁর সেনারা থরথর করে কাঁপতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন।

রাজা বিশ্বামিত্রকে প্রাণ ভয়ে কাঁদতে দেখে দয়ালু ঋষি বশিষ্ঠ বললেন—"মা নন্দিনী, তোমার সেনাদের বারণ করে দাও। তারা যেন এদের কাকেও প্রাণে না মারে। আমি ঋষি, ক্ষমাই আমার ধর্ম্ম। নন্দিনী সেনাদের বলল—সেনারা, এই রাজাকে আর তাঁর সেনাদের প্রাণে মেরোনা। কিন্তু প্রাণে না মেরেও এমন ভাবে মার যাতে এদের শিক্ষা হয় যে ঋষির আশ্রমে এসে অহঙ্কার ও দর্প দেখান চলে না।

নন্দিনীর কথা শুনে সেনারা ভীষণভাবে বিশ্বামিত্র ও তাঁর সেনাদের মারতে লাগল। তখন বিশ্বামিত্র কাঁদতে কাঁদতে বশিষ্ঠের কাছে ক্ষমা চাইলেন, প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন।

দয়ালু ঋষি বললেন—"নন্দিনী, তোমার সেনাদের চলে যেতে বল।"

নন্দিনী তখন আগের মত আবার ভীষণ শব্দে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সব সেনা তার মুখের মধ্যে ঢুকে মিলিয়ে গেল। নন্দিনীর প্রকাণ্ড আগুন-জ্বলা শরীরও শান্ত হয়ে গেল। সে আগের মত সুন্দর স্বর্গের গরুর রূপ ধরল।

বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রকে বললেন—"মহারাজ, আপনি সৈন্যদের নিয়ে রাজ্যে ফিরে যান। আমার থেকে আপনার কোন অনিষ্ট হবে না। আপনি শরণাগত, তা ছাড়া অতিথি। শুধু অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বল ও দর্প দেখাতে চেয়েছিলেন বলেই এই কষ্ট সইতে হল।

আমি আপনাকে একটি মাত্র উপদেশ দিচ্ছি। যতই বড় রাজা

হন, অহঙ্কার, বল ও দর্পের বশ হবেন না। অহঙ্কারীর যে পতন হয় তা ত দেখতেই পেলেন।

বশিষ্ঠের কথা শুনে লজ্জায় অনুশোচনায় বিশ্বামিত্রের মন ভরে উঠল। বশিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করে তিনি বললেন—"ঋষি আজ থেকে আমি রাজ্য ত্যাগ করলাম। বনে গিয়ে হাজার বছর তপস্যা করে ঋষি হব। আপনার কাছে এসে বুঝলাম ঋষির ক্ষমতার কাছে রাজার সৈন্যবল, ধনবল, তেজ, গর্ব্ব কত মিথ্যা।"

বিশ্বামিত্র সেনাপতিকে বললেন—"সেনাপতি, সৈন্যদের নিয়ে দেশে চলে যাও। প্রজাদের বল—রাজা বিশ্বামিত্র রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন।" এই বলে বিশ্বামিত্র রাজবেশ ছেড়ে সন্ন্যাসীর পোষাক পরলেন।

এমনি ভাবে একদিন বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে গিয়ে রাজা বিশ্বামিত্রের অহঙ্কার ও গর্ব্বের পতন হয়েছিল—আর তিনি রাজ্য ছেড়ে ঈশ্বর-সাধনা করে দৈব বলে ঋষি হয়েছিলেন।

হল্‌দে পাখী

সুধীর কাব্যশ্রী

হল্‌দে পাখী, হল্‌দে পাখী
কোথায় তুমি থাকো ?
রোজ সকালে মিষ্টি সুরে
আমায় কেন ডাকো ?
কাছে আমার আস্‌বে না তো
রইবে দূরে সরে,
আজ্‌কে তোমায় বল্‌ছি শোনো
এসো আমার ঘরে!
আস্‌তে তুমি চাওনা বুঝি
ছোট্ট খুকু ভেবে,
আমার আছে অনেক পুতুল
একটা তুমি নেবে ?
ইচ্ছে হলে বল্‌তে পার
কি কি তোমার চাই,
তোমায় আমি মার্‌ব নাকো
ভয় করো না ভাই।
আমি পড়ি রঙ্‌-বেরঙের
কত মজার বই!
পড়্‌বে তুমি আমার মত
হবে আমার সই ?
হল্‌দে পাখী, হল্‌দে পাখী
এসো আমার কাছে,
বসে আছ এক্‌লা কেন
অত উঁচু গাছে ?
লজেন্স দেব আর যদি চাও
পর্‌তে দেব শাড়ী,
আস্‌বে এসো, নয় তো জেনো
তোমার সাথে আড়ি।

ছোট

শ্রীসুধীরকুমার রায়

ছোট গাছে ছোট পাখী
শিস্‌ দিয়ে গায়,
ছোট ছেলে ছুটে গিয়ে
ডাকে তারে আয়।

মেজাজেতে ছোট খোকা
যেন ছোট লাট,
ওই পাখী চাই তার
গোটা সাত আট।

ছোট-খাটো ব্যাপারেতে
দিওনাকো কান,
ছোটলোক বলে কেন
করো অপমান ?

ছোট মন ভাল নয়
নয় ছোট বাড়ী,
মাপে ছোট জামা গায়
আঁট হয় ভারি।

সকলেই ভালবাসে
মনে তারে রাখে,
হয় হোক্‌ ছোট জাত
গুণ যদি থাকে।

দেবশর্ম্মা

এবারে তোমাদের যে বিচিত্র মজার খেলাটির কথা বলবো—সেটির নাম—"ময়দার বোমা !"

ময়দার বোমা ঃ

কথাটা শুনতে আশ্চর্য্য লাগে—নয় কি ? কিন্তু এটি হলো বিজ্ঞানের একটি অভিনব খেলা—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এ খেলাটির জন্য উপকরণ চাই—উঁচু উঁচু এক চামচ শুকনো ময়দা, একটি ঢাকনিওয়ালা খালি টিনের কৌটা (বার্লির বা কোকো প্রভৃতির খালি টিনের কৌটা ব্যবহার করা চলতে পারে), খানিকটা লম্বা-আকারের রবারের নল, একটি 'ফানেল' (Funnel) আর একটি জ্বলন্ত মোমবাতি।

পাত্রে ময়দা রেখে, তাকে যদি জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ছোঁয়াও, দেখবে ময়দা কিছুতেই জ্বলবে না। অথচ 'ময়দার বোমা' টিনের কৌটার ঢাকনি সশব্দে শূন্যে উড়িয়ে দারুণ তেজে ফেটে বেরুবে ! কি করে এমন ব্যাপার ঘটে, এবারে তোমাদের সেই কথাই বলি।

গোড়াতেই ঐ ঢাকনিওয়ালা খালি টিনের কৌটার তলায় একটি ফুটো করো। তারপর সেই ফুটোর ভিতর দিয়ে ঐ লম্বা রবারের নলের একপ্রান্ত প্রবেশ করিয়ে দাও টিনের কৌটার মধ্যে। ফুটোর মধ্যে রবারের নলের প্রান্তটি এমনভাবে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে যে কোথাও যেন এতটুকু ফাঁক না থাকে। এবারে ঐ খালি টিনের মধ্যে ফুটোর মুখে বসানো রবারের নলের প্রান্তে ভালো করে 'ফানেলটিকে' (Funnel) এঁটে, সেই ফানেলটির ভিতরে উঁচু-উঁচু এক চামচ শুকনো ময়দা ভরে দাও। তারপর ঐ টিনের কৌটায় মুখ ঢাকনি এঁটে বন্ধ করে, সেটিকে নীচের ছবির ভঙ্গীতে সমতল একটি টেবিল বা

টুলের প্রান্তে বসিয়ে রেখে, ঢাকনি-আঁটা টিনের কৌটার তলায় জ্বলন্ত বাতিটি ধরে আগুনের তাপ দাও এবং সেই সঙ্গে রবারের নলের অপর প্রান্তটি মুখে দিয়ে জোরে ফুঁ দিলেই, দেখবে—চকিতের মধ্যে টিনের কৌটার ঢাকনি সশব্দে শূন্যে ছিটকে ছুটে বেরিয়ে যাবে—আর সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার মতো শুকনো ময়দার গুঁড়োতে ভরে যাবে চারিদিক ! তবে সাবধান, রবারের নলে ফুঁ দেবার সময় সর্ব্বদা খেয়াল রেখো—তোমাদের মুখ-হাত বা দেহের কোনো অংশ যেন টিনের কৌটার ঢাকনির কাছাকাছি না থাকে। কারণ রবারের নলে ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই টিনের কৌটার ঢাকনি এবং শূন্যে উৎক্ষিপ্ত শুকনো ময়দার গুঁড়ো ছিটকে উঠে তোমাদের গায়ে বা মুখে লাগতে পারে। তা ছাড়া এ খেলাটি ঘরের মধ্যে না দেখানোই ভালো, কারণ—রবারের নলে ফুঁ দেবামাত্র টিনের কৌটার ঢাকনি সজোরে ছিটকে গিয়ে ঘরের শার্শির কাঁচে বা আলমারি-টেবিলের আয়নায় চোট-জখম না ঘটায় !

এই হলো 'ময়দার বোমা' খেলাটির বিচিত্র রহস্য। এবারে বিচিত্র-মজার এই অভিনব খেলাটির কায়দা-কানুন শিখে পুরোপুরি রপ্ত করে নিয়ে যদি তোমাদের বাড়ীর লোকজন আর বাইরের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে ঠিক মতো উপায়ে দেখাতে পারো, তাহলে তাঁদের যে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিতে পারবে, সে কথা বলাই বাহুল্য !

আজ এই পর্য্যন্ত ! বারান্তরে, এমনি ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব বিজ্ঞানের খেলার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

—

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। বাড়ী সাজানোর হেঁয়ালি ঃ
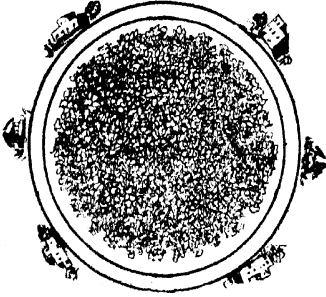
পাশের ছবিতে দেখছো—গোল অর্থাৎ বৃত্তাকার একটি পথ ···পথটি সাতাশ মাইল লম্বা। এই পথের মাঝখানে যে জায়গা, সে জায়গা জলা-জঙ্গলে ভরা···সেখানে লোকের বসতি নেই। এই বৃত্তাকার পথের উপর আছে ছ'খানি বাড়ী···এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীর দূরত্ব—কোথাও এক মাইল, কোথাও দু' মাইল, কোথাও তিন মাইল, কোথাও চার মাইল···এমনিভাবে ছাব্বিশ মাইল পর্য্যন্ত বাড়ীগুলির অবস্থান। এবারে এমনভাবে বাড়ীগুলি সাজাতে পারো, যাতে এক নম্বর বাড়ী বিনোদের···বিনোদের বাড়ী থেকে দু' নম্বরে সতীশের বাড়ীর ব্যবধান এক মাইল; তিন নম্বরে রমেশের বাড়ী থেকে চার নম্বরে যতীশের বাড়ীর দূরত্ব দু' মাইল, পাঁচ নম্বরে যাদবের বাড়ী থেকে ছ' নম্বরে মাধবের বাড়ীর দূরত্ব তিন মাইল—এই ধরণটি বজায় থাকে ··অর্থাৎ এমনি ভাবে ছ'খানি বাড়ীকে ঐ বৃত্তাকার পথের ধারে সাজাতে হবে। এই ছ' বাড়ীর ছ'জন মালিকই অবশ্য পথের এদিকে-ওদিকে যেদিকে খুশী যাতায়াত করতে পারে। তবে খেয়াল রেখো—উপরের ছবিতে বৃত্তাকার পথের ধারে বাড়ীগুলির অবস্থান এমন দূরত্ব হিসাবে অবশ্য সাজানো নেই···অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে যেমন বলেছি, তেমনি দূরত্ব হিসাবে এবারে ঐ ছ'টি বাড়ীকে আলাদা আলাদা সাজানো হলো তোমাদের কেরামতী।

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

২। তিন অক্ষরে নাম—বাড়ী থেকে নড়ে না ;
প্রথম দুই অক্ষরে—কিছুই অজানা থাকে না ;
মাঝের অক্ষর—কখনই 'হ্যাঁ' বলে না ;
এবং মাঝের অক্ষর বাদ দিলে—
তাতে জল ভরে রাখি ;
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে—জল যাতায়াতের
পথ বোঝায় ;
বলো তো এবার সেটি কি ?

অপূর্ব্বকুমার সরকার ও অমিতকুমার বসু
(কলিকাতা)

৩। আমি যখন এলাম, তুমি তখন এলে না। যখন তুমি এলে, সর্ব্বস্ব খেলে। এখন আমায় একা ফেলে তুমি চলে গেলে !

সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর)

৪। তিন অক্ষরে নাম ধরে,
খাবার জিনিষ হয়—
মাঝের অক্ষর কেটে নিলে,
খেতে রাজী নয় !
শেষের অক্ষর বাদ দিলে,
গায়ে দিয়ে তাই—
প্রথম অক্ষর দিয়ে বাদ,
পেতে বসি ভাই !

ছবি ধর

আগামী সংখ্যায় 'ভাদ্র' মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালী'র উত্তর ও সঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।

কিঃ জঃ স

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

আইবিস্‌ঃ এরা সারস, হাড়গিলা, প্রভৃতি পাখীর জাতভাই। এশিয়া, আফ্রিকা, আর আমেরিকায় এদের বাস। এ সব পাখী নানান্‌ রঙের হয়—কারো বা পালখ শাদা, কারো বা কালো, কারো বা বাদামী-লাল, আর কারো বা টুকটুকে লাল—এমনি বিচিত্র এদের বাহার। এরা আকারে প্রায় দু'হাত দীর্ঘ হয়। সারসদের মতো এ সব পাখীরাও স্যাঁতস্যাঁতে জলাভূমিতে বাস করতে ভালবাসে। এরা জলাভূমির আশেপাশে গাছের উঁচু ডালে বাসা বেঁধে থাকে। এরা সাধারণতঃ ইঁদুর, ব্যাঙ, সাপ আর নানা রকম পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে। এ সব পাখী দেশভ্রমণ করে বেড়ায় প্রতি বছরেই। মিশর দেশবাসীরা এদের আগমন উপলক্ষ্যে সৌভাগ্যের উদয় মনে করে ভক্তিভরে আইবিস্‌-পাখীদের পূজা করে।

'র‍্যাটেল' বা 'মধুভুক'ঃ এরা উদ্‌-বিড়াল বংশের বিচিত্র জীব...'গ্লটন'-প্রাণীদের জাতভাই। এরা আকারে—পুচ্ছ-সমেত প্রায় দু'তিন হাত লম্বা হয়। এদের পিঠে আর দেহের দু'পাশে বড় বড় ধূসর-রঙের লোম থাকে এবং পেটে আর পায়ের লোম হয় ছোট ও কালো-রঙের। নিশাচর প্রাণী...মধু খেতে ভালবাসে, তাছাড়া পোকামাকড়, ব্যাঙ, ইঁদুর, কাঁকড় কচ্ছপও খায়। দুর্গন্ধময় দেহ

'জারবোয়া' বা 'লাফানে' ইঁদুরঃ এরা বিচিত্র একজাতের ইঁদুর...এদের পিছনের পা দুটি আর ল্যাজ বেশ লম্বা-ছাঁদের। এই লম্বা ল্যাজ আর পায়ের উপর দেহের ভর রেখে এরা কাঙ্গারুর মতো খাড়া দাঁড়াতে পারে এবং লাফাতে লাফাতে দ্রুতগতিতে চলতে পারে। এরা নিশাচর প্রাণী...ফল, মূল, শস্য খেয়ে জীবনধারণ করে। এ সব জীব সহজেই পোষ মানে... স্বভাবটিও নিরীহ। এদের বাস—মধ্য-এশিয়া, উত্তর-আমেরিকা, আফ্রিকার মিশরদেশ, ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে আর ভারতের নানা স্থানে।

জনস্বাস্থ্য ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

শৈলজানন্দ রায়

স্বাস্থ্যহীন কর্মবিমুখ জাতির পক্ষে বিশ্বের বর্তমান প্রগতিশীল জাতিসমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় নিজের স্থান করে নেওয়ার প্রচেষ্টা আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র। আজকের দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে দেহমনকে পরিচালিত করছেন। সেক্ষেত্রে আমরা বোধ হয় মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা থেকে মুক্তি পাই নাই। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে শরীর রক্ষাকে ধর্মসাধনার অঙ্গ মনে করা হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ধর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য অনুধাবনের চেষ্টা না করে আমরা ধর্মের বহিরঙ্গে মশগুল হয়ে আছি।

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে স্কুলের নীচের ক্লাসে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু অধিকাংশ বাস্তব শিক্ষা বিশেষ কিছু হয় না। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবও তার অন্যতম কারণ। এসম্বন্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহর-লাল নেহরুর বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য। তিনি ১৯শে নভেম্বর (১৯৬০) জয়পুরে রাজস্থান কলেজ ছাত্র পরিষদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ছাত্রদের পাঠ্যতালিকায় কায়িকশ্রম একটি আবশ্যক বিষয় হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত।

আধুনিক সভ্য সমাজে ডিসপেপসিয়া রোগ একটি অভিশাপের মতো। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডিসপেপসিয়া রোগের সংজ্ঞানির্ণয় করা হয়েছে—Consciousness of the activities of the stomach physiological appetite forms an exception.

কায়িকশ্রমের অভাব এবং অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম এই রোগের অন্যতম কারণ। তবে এই যুক্তি অনস্বীকার্য যে, কায়িকশ্রমের জন্য যে পরিমাণ সুসম খাদ্য প্রয়োজন সেই পরিমাণ খাদ্য আমাদের দেশে গড়পড়তা হিসাবে মানুষ পায়না। আমেরিকার কৃষিবিভাগ সম্প্রতি মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রে মাথাপিছু খোরাকির এক গড়পড়তা তালিকা প্রকাশ করেছেন। এই হিসাবে দেখা যায় এই বৎসর (১৯৬০) প্রত্যেক মার্কিনবাসী প্রত্যহ গড়ে নয় ছটাকের অধিক দুগ্ধজাত দ্রব্য (মাখন ও দুধ ব্যতীত), প্রায় সম পরিমাণ ডিম ও প্রায় দুই তোলার মতো, আড়াই ছটাক খাদ্য শস্য, প্রায় আড়াই ছটাক চিনি বা সিরাপ, সম পরিমাণ আলু, দেড় ছটাক মাখন, স্নেহজাতীয় পদার্থ বা তৈল, একছটাক অপেক্ষা কিছু কম পরিমাণে ডিমও প্রায় দুই তোলার মতো কফি, চা বা কোকো পান করেছেন। এর সঙ্গে তরি-তরকারী, দুধ, টাটকা ফল ইত্যাদি আছে। তবে তার পরিমাণ হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই।

একজন সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পন্ন মানুষের জন্য দৈনিক সুসম খাদ্যের পরিমাণ নিম্নলিখিত তালিকা অনুসারে হওয়া উচিত—

চাউল—৮ছটাক (অথবা আটা—৪ ছটাক এবং চাউল—৪ ছটাক)
মাছ বা মাংস—২ ছটাক
ডাল—১½ ছটাক
দুধ—৪ ছটাক
সবজি (রান্নার জন্য)—৩ ছটাক
সবজি (কাঁচা টম্যাটো, লেটুস ইত্যাদি)—½ ছটাক
শাক—১ ছটাক
ঘি—½ ছটাক
আলু—২ ছটাক
তৈল—½ ছটাক
অঙ্কুরিত ছোলা—½ ছটাক
লবণ—½ ছটাক
পাতিলেবু—আধখানা
মশলা ইত্যাদি—আবশ্যক মতো (অল্প পরিমাণে)
চিনি বা গুড় (গুড়ই ভালো)—½ ছটাক

যাঁরা বিশেষ কোনো শারীরিক পরিশ্রম করেন না গ্রীষ্ম প্রধান দেশে তাঁদের খাদ্য পরিমাণে কম লাগে এবং তাঁদের খাদ্যের উত্তাপ মূল্য বাইশ শত ক্যালোরির মতো হলেই চলে। যাঁরা লঘু অথবা সামান্য পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করেন তাঁদের আড়াই হাজার ক্যালোরি মূল্যের খাদ্য হলেই চলে। যতক্ষণ তাঁরা কাজ করবেন ততক্ষণ ঘণ্টা পিছু পঁচাত্তর ক্যালোরি মূল্যের অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োজন। যাঁরা মাঝামাঝি ধরণের কায়িক পরিশ্রম করেন তাঁদের তিন হাজার ক্যালোরি মূল্যের খাদ্য আবশ্যক। কার্যকালের জন্য সওয়া শত উত্তাপ মূল্যের অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োজন। যাঁরা কঠিন পরিশ্রম করেন তাঁদের খাদ্যের উত্তাপ মূল্য অন্ততঃ সাড়ে তিন হাজার ক্যালোরি হওয়া উচিত। কাজের সময় ঘণ্টা পিছু অন্ততঃ দুইশত ক্যালোরির উত্তাপ মূল্যের অধিক খাদ্যের প্রয়োজন যাঁরা অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করেন তাঁদের পক্ষে চার থেকে সাড়ে চার হাজার ক্যালোরি উত্তাপ মূল্যের খাদ্য আবশ্যক। যাঁরা মস্তিষ্ক পরিচালনার কাজ করেন তাঁদের খাদ্যে অপেক্ষাকৃত প্রোটিনের অংশ বেশী হওয়া উচিত এবং শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট) জাতীয় অংশ কম হবে। কিন্তু যাঁরা কায়িক পরিশ্রম বেশী করবেন, তাঁদের খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট বেশী হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় আমাদের দেশে কতজন মানুষ এই সুসম খাদ্য দৈনিক আহার করতে পারেন? সুতরাং তাঁদের কাছে স্বাস্থ্যচর্চা

হিতোপদেশ অরণ্যে রোদন হবে না কি? তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, বিদ্যালয়ে খাদ্যদানের কর্মসূচী ক্রমশঃ সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের মাধ্যমে দরিদ্র মাতা ও বালক-বালিকাদের খাদ্যের পরিপূরক হিসাবে গুড়া দুধ ও ভিটামিন দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক শিশুসংস্থার নিকট হতে মূল্যবান সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে।

বর্তমান ভারতে মৃত্যুহারে এক হাজার ৮½ জন এবং গড়পড়তা মানুষের আয়ু পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে একথা অনস্বীকার্য। মহামারীর প্রাদুর্ভাব ও মহামারীর জন্য মৃত্যুহারও পূর্বাপেক্ষা অনেক কম। ম্যালেরিয়া-জ্বরে মৃত্যুর সংবাদ বর্তমানে পাওয়া যায় না বলা চলে। সরকারী প্রচেষ্টায় ডি-ডি-টির কল্যাণে ম্যালেরিয়া-জ্বর দেশ থেকে প্রায় নির্মূল হয়েছে। তবে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, আমাশয়, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতির আক্রমণ অব্যাহত আছে। এগুলি নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা অপ্রচুর এবং অনেক সময় যথাযথ নয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের সংখ্যা ৮৪ হাজার হতে বর্ধিত হয়ে ১লক্ষ ৩ হাজার হবে। হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারীর সংখ্যা ১২ হাজার ৬শত হতে বর্ধিত হয়ে ১৪ হাজার ৬ শত হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ২ হাজার ৮ শত হতে বর্ধিত হয়ে ৫ হাজার হবে। পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্রের সংখ্যাও ১হাজার ৮শত হতে বর্ধিত হয়ে ৮হাজার ২শত হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় পল্লী অঞ্চলে জল-সরবরাহ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত পল্লী অঞ্চলে জল-সরবরাহ ব্যবস্থা প্রসারের কর্মসূচী তৃতীয় পরিকল্পনাতেও অব্যাহত থাকবে। পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহের অধিকতর বিস্তারিত ধরণের স্কীমগুলি জনস্বাস্থ্য খাতে সীমাবদ্ধ থাকলেও এই কর্মসূচী প্রধানত স্থানীয় উন্নয়ন কার্যাদি, সমষ্টি-উন্নয়ন কর্মসূচী, অনুন্নত শ্রেণীর জনকল্যাণ ব্যবস্থাদির ভিত্তিতে নির্ধারিত। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে গ্রামে কতকগুলি অত্যাবশ্যক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য ৫০কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই সব সুযোগ-সুবিধা স্থানীয় অধিবাসীরা প্রধানত শ্রমদান এবং কিছুটা অর্থদানের মাধ্যমে গড়ে তুলবেন। এই সব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ নিঃসন্দেহে অগ্রাধিকারলাভ করবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শহরাঞ্চলের জল সরবরাহ স্কীম সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আরব্ধ প্রায় ২০০টি স্কীমের জন্য বেশ মোটা রকম ব্যয় নির্বাহ করতে হবে বলে নতুন স্কীম পরীক্ষামূলকভাবে করা হবে এইরূপ বলা হয়েছে। ১৯৬০—৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাজেটে চিকিৎসা খাতে ৬২লক্ষ টাকা, জনস্বাস্থ্যখাতে ১কোটি ২ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছিল।

স্কুল কলেজগুলিতে স্বাস্থ্য চর্চা এবং স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা আরও ব্যাপক ও বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত জনসাধারণকে বক্তৃতা, ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন ও সবাক-চিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত। 'Prevention is better than cure—সুতরাং মহামারীর সূত্রপাতের পূর্বেই বাধ্যতামূলকভাবে সর্বত্র টিকাদানের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। পরিবার পরিকল্পনা, শিশু-পালন ও সুস্থ পারিবারিক জীবনযাপন সম্পর্কে মেয়েদের স্কুল কলেজে প্রকৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থার বাধ্যতামূলক প্রচলন করা উচিত। পরিবার-পরিকল্পনা সম্পর্কে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে—সর্বশেষ হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৬৬ সালে ভারতের প্রকৃত লোকসংখ্যা ৪৮কোটি হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, যে অর্থনীতিতে মাথাপিছু আয়ও পণ্য ব্যবহারের মান খুবই নীচু সেখানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশী হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি স্বভাবতঃই হ্রাস পায়। সেই জন্যই পরিবার-পরিকল্পনা খাতে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৬১ সালের মধ্যেই পরিবার পরিকল্পনায় নিযুক্ত শহরাঞ্চলীয় কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৭৬ এবং পল্লী অঞ্চলে ১১২১। বৃহৎ পরিধিতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর প্রয়োজনীয় সামাজিক পটভূমি সৃষ্টির জন্য ব্যাপক শিক্ষা ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যকলাপের সহিত পরিবার-পরিকল্পনা কার্যাদির সংহতিসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। পরিবার-পরিকল্পনা অভিযানে যতবেশী সম্ভব স্থানীয় স্বেচ্ছানেতৃত্বের ব্যবহার এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে বন্ধ্যা করণের সুবিধা সহ পরিবার পরিকল্পনা কার্যাদির ব্যবস্থা এবং জন্ম নিরোধক দ্রব্যাদির ব্যবহারের দিকে নজর রাখা হবে। মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কর্মসূচীর উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করা হবে।

পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে বিবাহিত মেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধন সম্ভব হবে, কারণ অতিরিক্ত সন্তানধারণ ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে আমাদের দেশের বিবাহিত মেয়েদের স্বাস্থ্য অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এই পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়নের দ্বারা বিবাহিত মেয়েদের স্বাস্থ্য-রক্ষা, জনসংখ্যা-বৃদ্ধি-রোধ ও পারিবারিক আর্থিক সমস্যার আংশিক সমাধান সম্ভব।

সংক্রামক ব্যাধিগুলি দূর করার জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত হয়েছে, (ক) ম্যালেরিয়া নির্মূল করার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৫কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। (খ) ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ফাইলেরিয়া অধ্যুষিত এলাকায় আরও ফাইলেরিয়া ক্লিনিক স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। (গ) যক্ষ্মা সম্বন্ধে তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রধান কাজ হচ্ছে বি-সি-জি কর্মসূচী জোরালো করা, দশ লক্ষ লোকের জন্য একটি করে ক্লিনিক স্থাপন এবং ক্লিনিকের সন্নিহিত অঞ্চলে গৃহ-চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা। যক্ষ্মা সংক্রান্ত শিক্ষণ এবং প্রদর্শন কেন্দ্রস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। (ঘ) বসন্ত রোগ নির্মূলের কর্ম-সূচীতে ব্যাপক টিকাদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে আমাশয় রোগের বিস্তার অত্যধিক দেখা যায়। এই রোগ বিস্তারের অন্যতম কারণ খাদ্যদ্রব্যে প্রোটিনের অভাব। প্রোটীন সম্পর্কে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বলা হয়েছে—"জন্ম হতে আরম্ভ করে যৌবনাবস্থালাভ পর্যন্ত ক্রমশঃ যে দৈহিক বৃদ্ধি হতে থাকে তার জন্য

এবং দৈনন্দিন জীবনে কর্মরত দেহের নানা অংশের যে ক্ষয় হতে থাকে তার সম্যক পরিপূরণের দ্বারা দেহকে সুস্থ ও সবল রাখবার জন্য প্রোটীন জাতীয় খাদ্যের আবশ্যক।"

'মাংসে মাংস বাড়ে, ঘৃতে বাড়ে বল'-একটি প্রসিদ্ধ প্রবচন; অর্থাৎ নিত্য মাংস আহার করলে পেশীগুলি পরিপুষ্ট হয় এবং ঘৃত প্রভৃতি খেলে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। পাঁঠার কিংবা খাসীর মাংস খেলেই তৎক্ষণাৎ ঐ মাংস পেশীগুলিতে গিয়ে তাদের সংগে লেগে গিয়ে পরিপুষ্টি বৃদ্ধি করেনা। পাকস্থলী এবং অন্ত্রগুলির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এমন ভাবে ঐ গৃহীত মাংসের পরিপাক সাধিত হয়, যাতে পরিণামে কতকগুলি অবিভাজ্য অংশ, অর্থাৎ এমাইনো এসিড এ (Amino acid) রূপান্তরিত হয়ে সেই অবস্থায় রক্ত স্রোতে মিশে দেহের বিভিন্ন অংশে তাদের প্রয়োজন মত বার হয় ও সেই সকল অংশে পুনরায় তাদের একত্র সমন্বয়ে আবশ্যক মত পেশী, গ্রন্থি, অন্তঃকরণ প্রভৃতির উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত হয়। দেহ সংগঠনের উদ্দেশ্যে জৈব প্রোটীনসমূহ অর্থাৎ মাংস, মাছ, ছানা, ডিম, পনির, দুধ প্রভৃতি দাল, শিমবীচি, কড়াই শুঁটি, গম, চাল কিংবা অন্যান্য শস্য জাতীয় খাদ্যের প্রোটীন অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। দেহ সংগঠনের জন্য প্রোটীনের কী মূল্য তা খাদ্য প্রোটীনের পরিমাণ অপেক্ষা দেহ গঠনের উদ্দেশ্যে ঐ প্রোটীনের উপকারিতা (Biological value of Proteins) কতটুকু এবং তার সুপাচ্যতার পরিমাণের উপরই অধিকতর নির্ভর করে। ঐ দুইটি অত্যাবশ্যক গুণসমন্বিত বলেই উল্লিখিত জৈব বা প্রাণিজ প্রোটীনগুলি (Animal Protein) খাদ্য হিসেবে উদ্ভিজ্জ প্রোটীন অপেক্ষা অধিকতর কাম্য। দেহ বৃদ্ধিকল্পে দেহক্ষয় পরিপূরণের জন্য যে পরিমাণ প্রোটীন আবশ্যক, তার অতিরিক্ত পরিমাণ প্রোটীন গ্রহণ করলে তা কর্মশক্তিতে পর্যবসিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় খাদ্যে গৃহীত প্রোটীনের এক পঞ্চমাংশের প্রতি গ্রাম প্রোটীন হতে ৪'১ ক্যালোরি উত্তাপ উৎপন্ন হয় এবং তা প্রয়োজন মতো কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।"

এই প্রবন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে আমাদের দেশের জনসাধারণের সুসম খাদ্য গ্রহণ করার মতো জীবনধারণের মান উন্নয়ন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। কারণ আমাদের দেশে জনসাধারণের মাথা-পিছু গড়পড়তা বার্ষিক আয় প্রায় ৩০ টাকারও কম। সেক্ষেত্রে যাদের নুন ভাত জোটানোই সমস্যা, তাদের কাছে সুসম খাদ্যগ্রহণের উপদেশ দেওয়া বাতুলতা বৈকি! সুতরাং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর সুরে সুর মিলিয়ে আমাদের ভবিষ্যত সুখস্বপ্নের বর্ণনায় মশগুল থাকা ছাড়া আর উপায় কী আছে? শ্রীনেহরু ১৯শে মার্চ জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের চতুর্দশ অধিবেশন উদ্বোধন কালে বলেন যে, "তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা কালে জাতীয় আয় বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখাই উদ্দেশ্য হবে। জীবনধারণের মান উন্নয়ন এবং সর্ব সাধারণের বৈষয়িক উন্নয়নই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।" ভবনগর কংগ্রেসেও আমাদের প্রধান মন্ত্রী ভারতের জনসাধারণকে অচলায়তনের বদ্ধ খাঁচা হতে বার হয়ে এসে আধুনিক চিন্তাধারা গ্রহণ করে সর্ব বিষয়েই প্রগতিমূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে জীবনকে বাস্তবমুখী করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

তাই আমরাও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরুতে আশাবাদী মন নিয়ে অগ্রসর হবো। সুফলের কথা প্রথমেই না ভেবে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। সুফল অনেক সময়ে আয়ত্তের মধ্যে নয়। কিন্তু কর্মপ্রবৃত্তি আমাদের নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু তার প্রতিবিধান বোধ হয় শুধুমাত্র অসহযোগ ও সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রথমতঃ আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমরা নিজেরা কতটুকু সর্ব প্রকার দোষ ত্রুটির উর্ধ্বে! যাঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাস করেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, মার্কসবাদ আত্মবিশ্লেষণের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেয়। তাই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় পরিকল্পনার দোষ ত্রুটির সংশোধন সহযোগিতার ভিত্তিতেই করতে হবে। আর সেই জন্যই প্রয়োজন বিশুদ্ধ Logical মন। দুঃখের বিষয় সর্বত্রই সেই Logical মনের অভাব দেখি। বেপরোয়া বিচারবুদ্ধিহীন মনোভাব আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যতশীঘ্র আমরা এই অবক্ষয় থেকে মুক্তি পাই ততই আমাদের মঙ্গল।
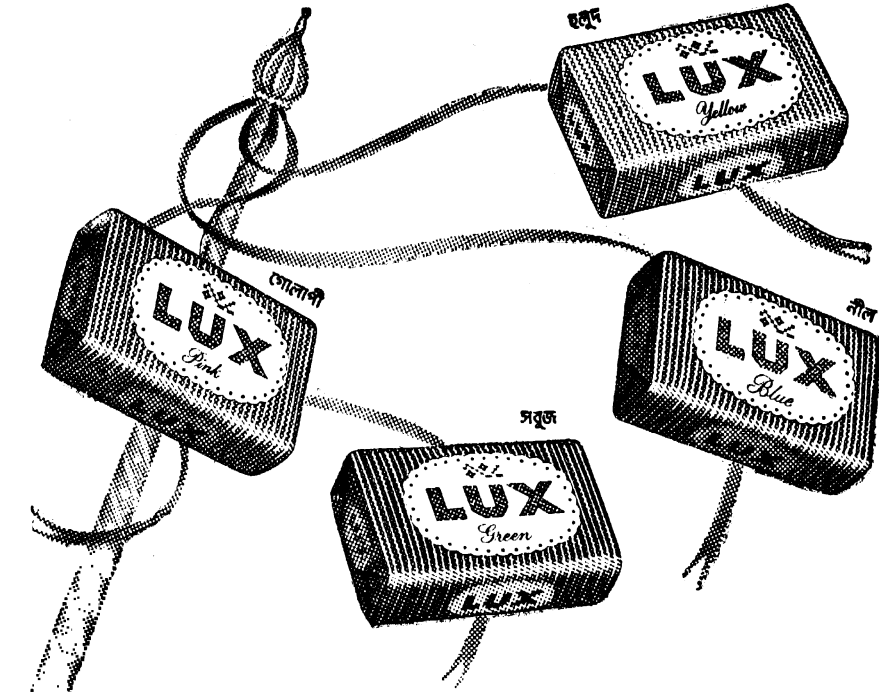
LUX
TOILET SOAP

আমরা ও আমাদের শিশু-সমাজ

শ্রীমতী মীরা দাস

বর্তমানে আমাদের এই বাঙ্গালী-সমাজ নানা জটিল সমস্যায় জর্জরিত। আমাদের দেশের উপর দিয়ে পর পর নানারকম দুর্যোগ ঘটে যাওয়ায় বাংলার সনাতন সমাজ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, তার সঙ্গে আছে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্নীতি, রোগ শোক। এই সবে মানুষের মনোবল পূর্বের মত নাই। আজকের মানুষের মনে একটি চরম প্রশ্ন—কি ভাবে বেঁচে থাকা যায়? চতুর্দিকে এই ভাঙ্গনের মাঝে বাংলার মেয়েদের মনে সব চেয়ে উৎকণ্ঠার বিষয় হল, কিভাবে তাদের শিশু-সমাজকে প্রতিকূল পরিবেশের ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করে তাদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা যায়। কারণ এই শিশু-সমাজই জাতির ভবিষ্যৎ জনক। আবার এঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দায়িত্ব নির্ভর করছে মেয়েদেরই উপর। তাঁরা যদি এই দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে থাকেন তাহলে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের কাছে তাঁদের কি পরিচয় থাকবে?

শিশুর শৈশব, বাল্য, কৈশোর কাটে অভিভাবক বা পিতামাতা এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে এই জন্য চাই তাঁদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও মনের আন্তরিক মমত্ববোধ। চাই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা।

পিতা-মাতার থেকেই শিশু-দেহ ও প্রকৃতিলাভ করে সত্য, কিন্তু তার উপর পরিবারগত প্রভাবও কম নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে শিশুর প্রথম জীবনের শিক্ষা নির্ভর করছে তার পিতা-মাতা বা অভিভাবক, তার পরিবারের পরিবেশ, এবং পরে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর উপর। এঁদের হাতেই সমগ্র শিশু-সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ন্যস্ত।

প্রথমত ধরা যাক্ শিশুর পিতামাতার কথা, ছেলে-মেয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে মা-বাবা উভয়েরই দায়িত্ব আছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মায়ের দায়িত্ব অনেক বেশী; কারণ মা-ই শিশুর বাল্যের সবচেয়ে বড় সাথী, কোনও মনীষী বলেছেন, "শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয় মাতৃ-গর্ভ থেকে।" এই জন্যই মায়ের চিন্তা ও অনুভব হওয়া উচিত সুন্দর, নির্মল এবং মহৎ। আর শিশুকে মহত্তম আদর্শে গড়ে তোলবার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সচেতন ইচ্ছা-শক্তি।

প্রথম হইতেই মা, বাবা যদি তাঁদের শিশুকে ভাল অভ্যাসগুলি করাতে পারেন এবং বাধ্যতা-গুণ আয়ত্ত করাতে পারেন তাহলে তাঁহারাই পরে দেখবেন তাঁহাদের কাজ কত সহজ হয়ে গেছে। মানুষ অভ্যাসের দাস। কাজেই সৎ অভ্যাস, নিয়ম, শৃঙ্খলা ইত্যাদি দ্বারা যদি শিশুর জীবন নিয়ন্ত্রিত করা যায় তবে সে ভবিষ্যৎ জীবনে নানারকম অসুবিধা, বিপত্তি ও দুর্ভোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে।

অবোধ-শিশু যদি কোন অন্যায় কাজ করে ফেলে, তখন মা যদি মিষ্টি কথায় তাহার অপরাধ বুঝিয়ে দেন তা হলে ধীরে ধীরে সে মায়ের বাধ্য হয়ে উঠে এবং নিজের

ভুল বুঝিতে পারে, তার জন্য আলাদা শাসনের প্রয়োজন হয়না। অনেক মায়ের ধারণা বড় হলেই সব দোষ শুধরিয়ে যায়। কাজেই শিশু-সুলভ চপলতা বশতঃ কোন কিছু খারাপ করলে বা বললে তার সংশোধন করার চেষ্টা করেন না। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অবাধ্যতা এত বাড়ে যে তখন শাসনের বাইরে চলে যায়। স্বভাব তো বদলায়-ই না, উপরন্তু তাহা তাহার স্বভাবে দৃঢ়-মূল হয়ে থাকে। কাজেই শিশুর পক্ষে বাধ্যতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

তারপর ধরুন শিশুর পরিবারের পরিবেশ। অনেক বাড়ীতে নানারকম আত্মীয়-স্বজন থাকেন, তাঁদের মধ্যে কতজনের কত-রকমের আচরণ! গালাগালি রাগারাগি, অকথ্য ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি অনেক কিছুই দেখা যায়। ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা নেই এমন সব শিশুর সুমুখে বড়রা অনেক সময় ঘরোয়া নানারকম কথা আলোচনা করেন। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বিষয় সমালোচনা এমন কি নিন্দাবাদও করে থাকেন। এতে ছোটরাও এ রকম-ভাবে ব্যবহার করা শিখে এবং এতে তাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্রমে তাদের মনে নীচতা অঙ্কুরিত হয়। পরিবারের সকলের ইচ্ছা, রুচি এক রকম নয়। পরস্পরের মধ্যে যাহাতে এই সব নিয়ে সংঘাত না লাগে তার জন্য প্রত্যেকেরই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হওয়া কর্তব্য। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ত্যাগ স্বীকার করলে ছেলে-মেয়েরাও ছোট থেকেই পরস্পরের প্রতি স্নিগ্ধ মনোভাব পোষণ করবে। তাদের অন্তর সুন্দর, সুস্থ, উদার হয়ে গড়ে উঠবে এবং পরে পরিবারের সুপুত্র, সুকন্যা হয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। যে পরিবারে সর্ব্বদা অশান্তি দেখা যায় সে পরিবারের ছেলে-মেয়েরা স্বভাবতই উদ্ধত ও বদ-রাগী হয়ে উঠে এবং তাদের ব্যবহারে পরিবারের লোক ও তার সংশ্লিষ্ট সকলেই দুঃখ পান। ছেলে-মেয়ে মানুষের মত মানুষ করতে হলে পরিবারের প্রত্যেকেরই এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

বহু বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর পড়া-শুনায় ত্রুটি দেখলে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ তাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেন, অনেক সময় বা বিদ্রূপাত্মক শব্দ ব্যবহার করেন তাহাতে শিশুর মানসিক গঠনে ব্যাঘাত জন্মায়। সকলের সুমুখে তাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহারে তাহারা মনে মনে খুবই অপমানিত ও অসহায়বোধ করে এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রতিও তাদের মনে বিরুদ্ধভাব জাগতে পারে। প্রহার, ভর্ৎসনা বা ব্যঙ্গ করিয়া শাসন করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। প্রীতি ও যুক্তি দ্বারা বশে আনা উচিত। প্রকৃত পক্ষে মধুর সস্নেহ উপদেশ দ্বারা তাদের ত্রুটি দেখিয়ে দিলে তারা নিজের ভুল বুঝে লজ্জিত হয় এবং আর কখনো সেই ভুল করে না। ছেলে-মেয়েরা যদি বুঝতে পারে তাদের অভিভাবক, শিক্ষকরা তাদের যথার্থই ভালবাসেন, এবং মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করছেন তাহলে কখনও তাঁদের আদেশ লঙ্ঘন করে না এবং তাঁদের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হয়। অসৎ-পথে ছেলে-মেয়েরা চলিলে তার প্রতিবিধান করা অবশ্যই দরকার কিন্তু তা কোন কঠোর-নীতি দ্বারা নয়—স্নেহের দ্বারা, কারণ স্নেহের জয় সর্বত্র।

শিশুরা পৃথিবীতে নবাগত, এদের পবিত্র মন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে, কঠোর বাস্তবের সঙ্গে কোনও পরিচয় নেই, জীবন সম্বন্ধেও কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই এদের নানাদিকে সতর্ক করে, সাবধান করে দেওয়া দরকার। মানুষের মন বিচিত্র। মনের দুইটি অংশ, সচেতন ও অবচেতন। সচেতন মনের অজান্তে অবচেতন মনে অনেক কিছুর ছাপ থেকে যায় যা হয়তো সচেতন মনে কোনরকম রেখাপাতই করে না। এর ফলে মানুষ নানা অঘটনও ঘটিয়ে বসে। বাল্যে ছেলে-মেয়েরা কঠোর শাসনের ফলে ভয়ে কোন প্রতিবাদ করে না, কিন্তু মনে মনে শাসনকারীর ওপর একটা বিরুদ্ধভাব পোষণ করে। ক্রমে ভুলে গেলেও অবচেতন মনে তার তিক্ততা রয়ে যায়, যা পরে বয়সকালে সমাজের অনুশাসনের ওপর প্রতিফলিত হয়। স্বভাবতঃই সব শিশুই চঞ্চল থাকে। তার মধ্যে অতি চঞ্চলতা খিট-খিটে মেজাজ, অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি, অলসতা, অহেতুক লজ্জা প্রভৃতি প্রকাশ পেলে অতি সাবধানে তা সংশোধন করার চেষ্টা করা উচিত। কোন মানুষের মধ্যে অতি মাত্রায় শঠতা, ভীরুতা ইত্যাদি প্রকাশ পেলে উহার জন্য দায়ী তার বাল্য-জীবনের শিক্ষার অবহেলা। এই জন্য বাল্যে যাতে সুন্দর, সুস্থ মানসিক শক্তি, শুভ-বুদ্ধির বিকাশ হয় তার দিকে পিতামাতা অভিভাবক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের

বেশীর ভাগ অভিভাবক বা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীই শিশু-পালনের রীতিনীতি উত্তমরূপে জানেন না বা উদাসীন। এঁদের অজ্ঞতা বা উদাসীনতার জন্য যদি জাতির ভবিষ্যৎ জনক-জননী শৈশবে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয় তাহলে উত্তরকালে সারা-জীবন ধরে তারা নানাভাবে কষ্ট পায় এবং সমাজও তার ফল ভোগ করে। কারণ তারাই একদিন দেশ শাসনের কাজে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায়, আইন সভায়, সর্বত্রই আসন অধিকার করবে। এই সম্বন্ধে কয়জন অভিভাবক বা শিক্ষক ভাবেন? অতি শৈশবে শিশুর কোমল মনে যে অভ্যাস বা ধারণা অঙ্কুরিত হয় তা সৎ হলে যৌবনে প্রকাণ্ড রসাল মহীরুহে পরিণত হয়ে সকলকে ফল দান করে। আবার বিপরীত হলে বিষ-বৃক্ষে পরিণত হয় এবং সমাজে বিষাক্ত বায়ু ছড়ায়। সুতরাং শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই ভাবা উচিত।

শিশু-সামাজিক জীব, সেও সঙ্ঘবদ্ধ হতে ভালবাসে। নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে এদের খেলার ছলে সুশিক্ষা দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। এই শিশুর সঙ্গে শিশু সেজেই এদের মনের সাড়ায় যোগ দিতে হবে। সরল, মিষ্টি ব্যবহারে আদর্শমূলক তথ্য বুঝতে হবে, উর্বর মনটিতে বপন করতে হবে নানা সদ্‌গুণের বীজ। যাতে এরা সাহসী ও নির্ভীক হবার প্রেরণা পায়, এতেই হবে আমাদের শিশু-ভোলানাথের সেবা।

আমাদের আশা, আমাদের দেশের শিশুরা সুন্দর, সুস্থ, মননশীল স্বাবলম্বী হয়ে স্বাধীন ভারতের যোগ্য নাগরিক বলে পরিচয় দেবার অধিকার অর্জ্জন করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলবে এক আদর্শ সমাজ, যার লক্ষ্য হবে সামগ্রিক মানব-কল্যাণ।

রমণী রত্ন

যুগ-পরিক্রমা

শকুন্তলা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)
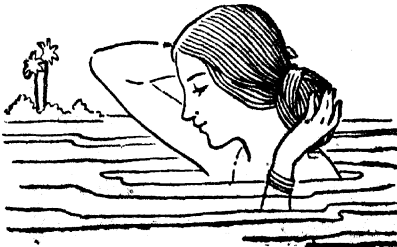
লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে সতীদাহ প্রথা নিবারণ কল্পে যে আন্দোলন চলেছিল, তিনি তাঁর অন্যতম পুরোধা ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে এই ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন, সেদিনের কথা আজও কেউ ভোলেনি।

এতদিন রাজচন্দ্র তাঁর ফ্রি স্কুল ষ্ট্রিটের বাড়ীতেই বাস করছিলেন। এইবার তিনি বাড়ীর সংলগ্ন সাড়ে ছয় বিঘা জমিতে দোতলা এক বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করেন। এই ঐতিহাসিক বাড়ীটি শেষ করিতে আট বছর সময় লেগেছিল। এই বাড়ীর নির্ম্মাণে পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। সেকালের পঁচিশ লক্ষ টাকা—সাত মহলা বাড়ী—পুকুর বাগান সমেত সুন্দর সাজান বাড়ী। নাম—'রাণী রাসমণি কুঠি।' আজও পথিক পথ চলতে চলতে থমকে তাকায় সেই বাড়ীটির দিকে। অবাক বিস্ময়ে কি যেন ভাবে—শুধু কাহিনী, এখন শুধুই কাহিনী।

রাজা রামমোহনের সঙ্গেই শুধু রাজচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর—রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা কম ছিল না। সরকারী মহলেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি রায় বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য করতে এসে রাজ্য-স্থাপন করেছিলেন। সেই কোম্পানীর জনৈক অংশীদার ধনকুবের জনবেব, একবার কোলকাতায় আসেন। তাঁর সঙ্গে রাজচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়েছিল। জনবেব্ ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে তাঁর বন্ধুর কথা ভোলেন নি। বন্ধুত্বের স্থায়ী রূপ দেবার জন্য তিনি একটি ঘড়ি উপহার পাঠিয়ে ছিলেন। আজও সে ঘড়ি বর্ত্তমান বংশধরদের কাছে আছে শোনা যায়।

রাজচন্দ্র তাঁর বাড়ীতে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তার পেছনেও ছিল এক ইতিহাস। বৈশাখের খর রৌদ্রে নগরী যেন পুড়ে যাচ্ছে। লোকজন যার যার কোটরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এক সাধু এসে রাজচন্দ্রের সাক্ষাৎ চাইলেন।

বাবু নিদ্রা যাচ্ছেন, সন্ত্রস্ত কর্মচারিগণ, এদিকে সাধু বাবাজী যদি ফিরে যান। যদি কর্ত্তাবাবুর কানে ওঠে।

না—তা-আর হ'লনা।

সংবাদ দিয়ে রাজচন্দ্র নেমে এলেন। সাধুকে পরম সমাদরে উপরে নিয়ে গেলেন।

সাধু তাঁকে জানালেন তাঁর কাছে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। সেই মূর্ত্তিটি দিতে চান। এই মূর্ত্তি যদি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজচন্দ্রের মন খুশীতে ভরে উঠলো। বিষ্ণু তাঁর বাড়ীতে নিজে এলেন।

এ কি অপূর্ব্ব লীলা! তিনি তাঁর কাছ থেকে সানন্দে মূর্ত্তিটি নিলেন।

আপনি সাধু আপনাকে দেওয়ার মত আমার কিছু নেই, তবু যদি আপনি কিছু গ্রহণ করেন—সাধু হাসলেন, হেসে বলেন: আমি কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে আসিনি। আমি দরিদ্র নিঃস্ব। আর সেইটাই আমার জীবনের বড় সঞ্চয়। তিনি হাসিমুখে চলে গেলেন।

এরপরে মহাধুমধামের মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

গঙ্গা বয়ে চলেছে, কোলকাতা বন্দরে বিদেশী জাহাজের ভীড়। বিদেশী বণিকের শাসন কায়েম হয়েছে ভালো করে। নতুন স্রোত বইতে সুরু করেছে। জীবন চলেছে এগিয়ে। নতুনকে গ্রহণ করতে পারেনি যেন। তাই সারা দেশ গুমরে মরছিল। নতুন শাসনের বিরুদ্ধে আগুন জ্বালবার প্রস্তুতিও চলেছিল।

ঠিক এই সময় ১২৪৩ সালে মাত্র উনপঞ্চাশ বৎসরে রাজচন্দ্র মারা গেলেন। আকস্মিক এই আঘাতে রাণী ভেঙ্গে পড়লেন।

রাজচন্দ্র বিপুল সম্পত্তি, জমিদারী, নগদ প্রায় আটষট্টি লক্ষ টাকা ও কয়েক জনের কাছে আরও কয়েক লক্ষ টাকা পাওনা রেখে যান্। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছে তিনি নগদ দু লক্ষ টাকা পেতেন।

রাজচন্দ্রের দানসাগর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে রাণী যে দান করেছিলেন, তার আর নজীর আছে বলে মনে হয় না। দুদিন দুরাত্রি ধরে এই দানকার্য্য চলে। দরিদ্র অনাথ আতুর কেউ বাদ পড়েনি সেদিন। তৃতীয় দিনে রাণী তুলট্ করছিলেন, সেই তুলটে রাণী রূপার টাকা দিয়ে নিজের দেহের ওজন নিলেন। তারপর সেই টাকা সবই ব্রাহ্মণদের দান করলেন। দানকার্য্য শেষ হয়ে গেল।

রাজচন্দ্রের অবর্ত্তমানে রাণী রাসমণিই সংসারের ও বিষয়-সম্পত্তি দেখা শুনার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। রাণীর ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ, এখানে আর একটি বিষয়ে জানানো দরকার, যখন তাঁর স্বামীর শ্রাদ্ধ শেষ করে উঠেছেন, একজন এসে রাণীকে জানালো, এক সাধু তাঁর দর্শনপ্রার্থী।

—সাধু! কি যেন ভাবলেন রাণী। তারপর নীচে গিয়ে তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করে নিয়ে এলেন।

সাধুর মুখে ম্লান হাসি, বলেন: আপনি আমায় চিনবেন না, বাবু আজ নেই—

—আপনাকে না দেখলেও আপনাকে আমি চিনি।

চমকে ওঠেন সাধুজী, চেনেন?

—নিশ্চয়ই, মনে হয় আপনিই আমার স্বামীকে বিষ্ণুমূর্ত্তি দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ মা, ঠিক। কিন্তু তোমার এই দর্শন ক্ষমতা। অসাধারণ, একটু কি ভাবেন সাধুজী, তারপর বলেন: তোমার স্বামী বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন—আর তুমি যা প্রতিষ্ঠা করে যাবে, তা বাঙালী ভুলবে না কোনদিন। নতুন জীবন—নতুন দর্শন।

কি বলছেন আপনি!

—ঠিক কথা মা, আমি তাহলে আসি, একটু থেমে বলেন: সকলকে এত দান করলেন, আমায় কিছু দেবেন না?

—নিশ্চয়ই দেবো, রাণী বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে সাধুর হাতে তুলে দিলেন একটি লোটা ও কম্বল।

—সাধুজী হেসে বলেন: সকলকে এতো দান দিলেন, আর আমাকে শুধু লোটা কম্বল দিলেন?

রাণী বলেন: ঐতো আপনার পথের সম্বল। আগে যারা নিয়েছে তারা সংসারী—আর আপনি নিরাসক্ত।—সাধুজীর হাত ওপরে ওঠে, বলেন: তোমার জয় হোক মা। তিনি শুধু বিষ্ণুমূর্ত্তিটি দর্শন করে চলে যান্। আর কখনও তিনি আসেন নি।

নতুন অধ্যায় সুরু হ'ল, সিঁথি নিবাসী রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম মেয়ে পদ্মমণির, খুলনা জেলার সোনাবেড়িয়া গ্রামের প্যারীমোহন চৌধুরীর সঙ্গে দ্বিতীয় মেয়ে কুমারীর, চব্বিশ পরগনা জেলার বিথুরী গ্রামের মথুরামোহন বিশ্বাসের সঙ্গে তৃতীয় মেয়ে করুণাময়ীর বিয়ে হয়েছিল। করুণাময়ী একটি পুত্র সন্তান রেখে মারা যাবার পর জগদম্বার সঙ্গে মথুরামোহনের পুনরায় বিয়ে দেন।

রাণীর মেয়ে ও জামাই সকলেই জানবাজারের বাড়ীতে বাস করতেন। সকল জামাতার মধ্যে মথুরামোহনই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধী, মেধাবী ও বুদ্ধিমান। তিনিই ছিলেন দক্ষিণ হস্ত।

স্বামীর মৃত্যুর পর রাণী জমিদারী দেখাশুনা করা ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতেই নিয়েছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছে রাজচন্দ্র টাকা পেতেন। রাণী সেই টাকা চেয়ে পাঠান। দ্বারকানাথ তখন সেই নগদ টাকা দিতে অসমর্থ হওয়ায় তার বিনিময়ে তিনি তাঁর জমিদারীর মধ্যে দিনাজপুর জেলার (বর্ত্তমান পাকিস্থান) অন্তর্গত স্বরূপপুর পরগনা রাণীকে লিখে দেন। রাণীর জমিদারীর মধ্যে একটি তালুক ছিল জগন্নাথপুর। এই তালুকের পাশেই ছিল নড়াইলের রায়েদের জমিদারী। একবার রামরতন রায় জগন্নাথপুরের তালুক গ্রাস করার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি। এরপর তিনি নানা ধরণের অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাতে থাকেন। জগন্নাথপুরের লোকজন এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। রাণীর কানে এলো সংবাদ। তিনি সকলকে ডেকে কঠিন স্বরে বললেন: আমরা কি এতই দুর্ব্বল! এর প্রতিকার করবে কে? আপনারা প্রস্তুত হন। অত্যাচার দমনের জন্য চললো লেঠেল, পাইক বরকন্দাজ ও আরও লোকজন।

উভয়পক্ষে ভীষণ দাঙ্গা হ'ল। রক্তক্ষয়ী হাঙ্গামা। রামরতন রায়ের অনুচরেরা পালিয়ে গেল।

রাসমণির জয় হ'ল। জগন্নাথপুরে আবার শান্তি ফিরে এলো।

রাণী এবার বড় কঠিন। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে প্রস্তুত

নয়। তাঁর এলাকার মধ্যে কোথাও কোনস্থানে কারও উপর কোন অত্যাচার হলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। এমন কি তাঁর লোকজনও যদি কারো ওপর অন্যায় ব্যবহার করতো তিনি তখনই তার প্রতিবিধান করতেন।

'সত্যই জীবন'—এই ব্রতই তাঁর জীবন দর্শন। আর তাঁর প্রত্যেকটি কাজই তার প্রতিফলন।

তাঁর মকিমপুর পরগণাতে নীলকর সাহেবেরা খুব অত্যাচার সুরু করলো। রাণী তাদের কাছে প্রতিবাদ জানালেন, তারা তাতে কান দিল না।

নীলকরেরা জমিজমা কেড়ে নিয়ে চাষীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দিয়ে জোর করে নীলের চাষ করাতো। রাণী জামাতা মথুরামোহনকে ডেকে বললেন: এর ব্যবস্থা কর মথুর। এ অসহ্য। ওরা সাহেব বলে তো মাথা কেটে নিতে পারবে না। একটু ভেবে বলেন: তাই নিজেদের মাথা দেওয়ার আগে ওদের মাথাতেও একটা কোপ পড়ুক।

—তাই হবে মা।

মকিমপুর পরগণায় লোকজন গেল। সেখানকার চাষীরাও সাহেবদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। সাহেবরা বিপদ দেখল। আস্তে আস্তে অত্যাচার বন্ধ হ'ল।

পরে রাণী সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। একজন নীলকর সাহেব গর্জ্জে বলেছিলো: কার দুঃসাহস; কে এই বিদ্রোহিনী নারী।

তার উত্তরে রাণী শুধু বলেছিলেন: এটা আমাদের দেশ—তাদের নয়। এর কিছু দিন পর.........

রাণী মথুরামোহনকে ডেকে বললেন: আমি চাই রথযাত্রা উৎসব হোক্। রূপার রথ তৈরী করতে পারে এমন কারিগরদের তুমি খবর দাও।

মথুরামোহন বলেছিলেন: বিখ্যাত স্বর্ণকার হ্যমিল্টন কোম্পানীকেই তা হলে রথ তৈরী করতে দেওয়া যাক্।

রাণীর মুখ কঠিন হয়ে উঠলো, ধীর কণ্ঠে বললেন: আমরা যে দেশের মাটিতে বাস করি, তা আমার সোনার চেয়ে খাঁটী। আর সে দেশের মানুষ তারা কি—না মথুর, আমার দেশের কারিগরদের দিয়ে কাজ করালে দেশের শিল্পীরা উৎসাহ পাবে। আর তাদের আর্থিক সাহায্য করাও হবে। তুমি তারই ব্যবস্থা করো।

দেশের কারিগররাই তৈরী করেছিল রূপার রথ। স্নানযাত্রার দিন অনেক টাকা ব্যয় করে রাণী এর প্রতিষ্ঠা করলেন। রথযাত্রার মহা ধুমধাম। রাজপথ লোকে লোকারণ্য। এই বিরাট রথ দেখে তারা হতবাক্ হয়ে গেল। দূর দেশান্তর থেকে লোক আসছে জানবাজারের রাণী রাসমণির রথ দেখতে—চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। লোকে ঝাঁকে ঝাঁকে রাণীর রথের মেলা দেখতে আসতো।

বাংলার পাল-পার্ব্বণ কিছুই বাদ যেতো না। দুর্গা পুজার সময় বাড়ীটা মুখর হয়ে উঠতো। কদিন ধরে গান বাজনা, যাত্রা—সব কিছু চলতো—যেমন গান বাজনা চলতো রথযাত্রায়।

এক বছর দুর্গা পুজা নিয়ে এক সাহেবের সঙ্গে তাঁর মামলা পর্য্যন্ত হয়েছিল। সেদিনের সে ঘটনা কোনদিন ভুলবার নয়। ষষ্ঠী পুজোর দিন, অতি প্রত্যুষে ব্রাহ্মণগণ বাজকারদের নিয়ে নব-পত্রিকা স্নান করাবার জন্য গঙ্গায় যাচ্ছিলেন। ঢাকের বাজনার ধ্বনি প্রাণ চঞ্চল করে তুলেছিল। কিছু পথ তারা চলে যাবার পর এক বাড়ী থেকে এক সাহেব নেমে এসে কঠিন কণ্ঠে বলেন: এই ধরণের বাজনা বাজানো চলবে না তোমাদের, এতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

বাজকাররা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চললো। সাহেবের কথায় কান দিল না। তারা জানতো তাদের পেছনে রাণী মা আছেন। তিনি যতক্ষণ আছেন, তাদের কোন ভয় নেই।

ব্রাহ্মণগণ ফিরে এসে রাণীমাকে সাহেবের বক্তব্য বললেন। এই কথা শুনে রাণীর মুখখানি কঠিন হয়ে উঠলো। কি যেন ভাবেন তিনি। আস্তে আস্তে বলেন: দেশ হ'ল আমাদের, পথ হ'ল আমার স্বামীর তৈরী। সে পথ দিয়ে যাবে আমার লোকেরা—কোন এক সাহেবের ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে কি আমাদের সকল ধর্ম-কর্ম বন্ধ করে দিতে হবে! বিদেশীরা এসে না, এ অসহ্য, শুনুন আপনারা, এর উচিত জবাব দিতে হবে। সে জবাব হবে—বাজকারদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন: আসছে কাল আরও অধিক সংখ্যায় তোমরা যাবে।

তারপর দিন।

বাজকরদের মিছিল চলেছিল। সাহেব গেলেন ক্ষেপে, তিনি শান্তি ভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে নালিশ করলেন।

রাণীর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হ'ল।

এত বড় পরাজয়!

রাণী কি করবেন ভেবে ঠিক করতে পারেন না। না, এই পরাজয়ের উত্তর দিতেই হবে। শুধু পন্থা ভাবতে থাকেন তিনি। শেষ অবধি রাণী এক সঙ্কল্প স্থির করলেন, তাঁদের নির্মিত ঐ পথটি তখনও খাসে ছিল। তিনি তাঁর লোকজনদের ডেকে বললেন: এই পথ আমার খাসের জমিতে, পথ আমাদের তৈরী, সেখানে আর কারও হাত নেই। তোমরা ঐ পথে মজবুত করে বেড়া দিয়ে ঘিরে দাও পথে তারের বেড়া পড়ল।

লোকজনদের চলাফেরা, যানবাহন বন্ধ হ'ল।

সরকার প্রথমে রাস্তা খুলে দেবার আদেশ দিলেন। রাণী জানালেন,ও আদেশ মানা যায় না।

এলো অনুরোধ।

রাণী হাসলেন। তিনি জানালেন—সরকার জমির ও পথ নির্মাণের উচিত মূল্য দিলে পথ খোলা হবে। এবার সরকার এলেন আপোশ করতে।

—কিন্তু একটা সর্ত্তে, উত্তর দিলেন রাণী—এবং সে সর্ত এই যে, আমার প্রদত্ত জরিমানার টাকা ফেরৎ দিতে হবে।

সরকার রাজী হলেন।

পথ খুলে দেওয়া হ'ল।

রাণীর মুখে জয়ের হাসি।

এই বিরোধের সূত্র ধরে একটা নিয়ম হ'ল যে, কাউকে শোভা-যাত্রা বার করতে হলে আগে পুলিশ কমিশনারকে জানাতে হবে। তার অনুমতি ছাড়া কোন শোভাযাত্রা যেতে দেওয়া হবে না।

সে নিয়ম আজও চলেছে।

রাণী মা, মা গো—শত শত মানুষের আর্ত্তনাদ রাণী রাসমণি চমকে ওঠেন। কোথায় কি হোল।

—মাগো, আমরা কি ভেসে যাবো মা!

তেজস্বিনীর কানে গিয়ে সে ডাক্ পৌঁছলো, তিনি নীচে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার? আর তোমরা—

—হ্যাঁ রাণীমা, অনেক ভরসা নিয়ে আমরা আপনার কাছে এসেছি। জানি একটা বিহিত হবেই। এদেশের আর কেউ তো আমাদের ভরসা দিতে পারল না। বললো তাদের দলপতি।

—কি ব্যাপার, যদি আমার কিছু করার থাকে তাহলে আমি বসে থাকবো না।

—আজ্ঞে মা, আমরা জেলে, বলে যায় দলপতি:—সরকার হুকুম-জারী করেছেন, গঙ্গায় মাছ ধরলে কর দিতে হবে। কর দিতে হলে, মা, আমরা কেউ খেতে পাবো না।

—তা তোমরা কি ঠিক করেছ?

—ঠিক করেছি কর দেবো না, কিন্তু ভরসা কে দেবে—তাইতো রাণীমা, আপনার কাছে এসেছি।

—কোন ভয় নেই, তোমরা যাও, তোমাদের কর দিতে হবে না।

তারা জয়ধ্বনি করে চলে গেল।

রাণী কর্মচারীদের ডেকে বললেন, গঙ্গায় যতটা জায়গা জুড়ে জেলেরা মাছ ধরে—সমস্তটা সরকারের কাছ থেকে জমা করে নাও।

সরকার আয়ের লোভে ঘুষুরী থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্য্যন্ত গঙ্গা জমা বিলি করে দিলেন। রাণী এবার বললেন: আমাদের জমা নেওয়া জায়গাটা ঘিরে দাও।

আবার নতুন করে জলপথ বন্ধ হ'ল।

জলপথ বন্ধ হওয়াতে জাহাজ ষ্টিমার—বজরা নৌকা সব কিছু চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। কোলকাতা সহরে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হোল।

পথ খুলে দেবার জন্তে সরকার থেকে কঠোর নির্দ্দেশ এলো। তাছাড়া এই ভাবে পথ বন্ধ করবার কারণ দেখাতেও বলা হোল।

রাণী উত্তরে শুধু জানালেন, আমি এ অংশটা খাজনা দিয়ে নিয়েছি, জেলেদের প্রজাবিলি করবো স্থির করেছি। কোলকাতা বন্দরে জাহাজের ঘাঁটি হলে এখানে গঙ্গায় জাহাজের শব্দে কোন মাছ থাকবে না, তাতে আমার প্রজাদের ক্ষতি হবে। আমি আমার এলাকাতে জাহাজ ষ্টিমার ইত্যাদি ঢুকতে দিতে পারি না। সরকার এতে রাজী হলে পথ খুলে দেবো।

সরকার অবস্থার চাপে পড়ে রাণীর সঙ্গে আবার আপোষ করতে এগিয়ে এলেন। রাণী তখন জানালেন, গঙ্গা জমা নেওয়ার ইচ্ছে আমার কোন দিনই ছিলনা, আজও নেই, আমি শুধু গরীব প্রজাদের (জেলেদের) মুখের দিকে তাকিয়ে একাজ করেছি। আমি তাদের বিনা খাজনায় মাছ ধরতে দিলাম। সরকার যদি কর ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেন, তাহলে গঙ্গা জমানেবার প্রয়োজন থাকবে না।

সরকারও রাণীর সর্ত্ত মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কর দিতে হ'ল না জেলেদের। এ এক বিরাট জয়। আজও বিনা করে জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে থাকে—ঘুষুরী থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্য্যন্ত।

রাণী রাসমণির কর্ম-জীবনে এরকম টুকরো ঘটনা অসংখ্য যা নাকি আজ গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সবই সত্য ঘটনা

রাণী আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। জ্যোৎস্না ভরারাত। তারার মিছিল। নারিকেল বনের মাথায় বাঁকা চাঁদ।

রাণী পিছন ফিরে তাকান—অতীত আজ খা-খা করছে। কেউ নেই—কেউ নেই—আমি তোমার কথা ভুলিনি পিসিমা। আমি তোমার কথা, পড়শীদের কথা—কারও কথা ভুলিনি।

এখনও যেন তাঁর পিসিমার কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজে: রাস্, তোর অঙ্গন থেকে কোন দিন যেন কেউ বা কোন অনাথ আতুর ফিরে না যায়।

রাণীর চোখের পাতা ভিজে ওঠে, তিনি আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দেন।

রাণীর ঠোঁটে দেখা দেয় তৃপ্তির হাসি। পরমশান্তি, দুঃস্থ জেলেদের আজ তিনি হাসি মুখে কাছারীর প্রাঙ্গণ থেকে বিদায় দিতে পেরেছেন। অনাথ আতুরের সেবা—এ তাঁর ধর্ম, তাঁর স্বামীর নির্দ্দেশ।

সিপাহী বিদ্রোহের আগুন সবেমাত্র নিভেছে। তার আতঙ্ক কাটেনি। ইংরেজ তখনও সন্ত্রস্ত। আবার কোথাও যদি আগুন জ্বলে ওঠে। সেই অবিস্মরণীয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গোরা-সৈন্য মোতায়েন আছে। তাদের একটা ঘাঁটি ফ্রি স্কুল ষ্ট্রিটে গোরা বর্ব্বর সেনার দল। তার পর দেশী সিপাইরা তাদের হাতে আর একবার মার খেলো। পরাজয়ের এ কলঙ্ক ভারতীয়দের মন থেকে কিছুতেই মুছে যায় না।

কোথায় গেল নানা সাহেব, তাঁতিয়াতোপী! দেশী সেনাদের পরাজয়ে বিজয়ী গোরাদের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের ঘাঁটির সামনে দিয়ে লোক যাবার উপায় ছিল না। কোন লোক দৈবাৎ ভ্রমে গেলে তার আর নিষ্কৃতি থাকতো না। তাদের আস্তানার আশেপাশে রীতিমত লুঠতরাজ চালাত। এমনিভাবে একদিন তারা রাণীর বাড়ী আক্রমণ করলো। 'রাসমণি কুঠির' দারোয়ানরা বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ল। গোরা সৈন্তরা হৈ হৈ করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। রাণীর জামাতারা কেউ বাড়ীতে ছিলেন না।

রাণী কি করেন।

তিনি কোন ক্রমে বাড়ীর মেয়েদের ও শিশুদের পিছনের দরজা দিয়ে

মান্নাবাবুদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে একটি উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে রণরঙ্গিনীর মূর্ত্তিতে রঘুনাথজীউএর মন্দিরের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন।

গোরারা যেন তাঁর জীবিতবস্থায়, তাঁর গৃহদেবতার অঙ্গস্পর্শ করতে না পারে। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে দারোয়ানরা অধিকাংশ আহত ও হত। কোন বাধা নেই। অবাধ লুঠতরাজ চললো। ঠিক এই মুহূর্ত্তে মথুরামোহন বাড়ীতে এই অবস্থা দেখে, কোন বাধা না দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। তিনি গোরাদের সেনাধ্যক্ষের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বললেন। সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে ঘটনাস্থলে এলেন। গোরারা লুঠ বন্ধ করলো মুহূর্ত্তের মধ্যে—সেন্যাধ্যক্ষকে দেখে মাথা নিচু করে চলে গেল। রাণী রঘুনাথজীকে প্রণাম করে তরবারি রেখে নেমে এলেন।

রাণীর খ্যাতি নানাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, কত প্রার্থী এসেছে তাঁর কাছে। কাউকে তিনি কোনদিন নিরাশ করেননি। কত কন্যাদায়গ্রস্ত মাতা পিতা তাঁকে দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে গেছে। তোমার জয় হোক রাণীমা। রাসমণি শুধু দুঃস্থের মা। মা।

কত আশ্রয়হীন তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় পেয়ে গেছে। কত দরিদ্র তাঁর সকল সাহায্য নিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে। রাণীর কথা হ'ল—দরিদ্র, সে ভিখারী নয়, সে নারায়ণ। তিনি জমিদারীতে চাষবাসের সুবিধের জন্তে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করে টোনার খাল কেটে দিলেন। এই খালটা মধুমতী ও নবগঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

হরেকৃষ্ণ দাস শেষ বয়েসে কোণা গ্রাম ত্যাগ করে তিন মাইল দূরে গোলাবাড়ী গ্রামে গিয়ে বাস করেছিলেন। রাণী দীর্ঘদিন পরে একবার আসেন—এখানকার লোকের স্নানের অসুবিধে দেখে তিনি গঙ্গায় একটি ঘাট তৈরী করে দিয়েছিলেন। এর কিছু দিন পরে তাঁর মন জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছে হয়—পুরী যাওয়ার সময় সুবর্ণ রেখা নদী পার হয়ে—সে পথ দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। তা অতি দুর্গম। সে দুর্গম পথ অতিক্রম করা যেন দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি ফিরে এসে সেখানকার পথটি তৈরী করবার জন্ত যথেষ্ট অর্থ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাণীর সদা পরদুঃখ কাতর মন সব সময়ই যেন ব্যস্ত থাকতেন। জনসেবাই তাঁর ধ্যান জ্ঞান।

রাণী তীর্থে তীর্থে ঘুরেছেন—কি যেন পেতে চেয়েছেন কিন্তু পাননি।

সেই পরম পাওয়ার প্রশ্ন তাঁর জীবনকে অস্থির করে তুলেছে। শ্বশুরের কথা মনে পড়ে যায়—মহান্ পুরুষ আসচে, কোথায়—কোন পথে?

তিনি তা জানেন না সে সাধক জন্ম নিয়েছে। গদাধর, গদাধর। রাণী রাসমণি—বাংলাদেশে যেন এক সঙ্গেই মিশে-গেছে।

১২৬২ সালের ১৮ই জ্যেষ্ঠ।

দলে দলে লোক চলেছে দক্ষিণেশ্বরে।

—কোথায় চলেছ তোমরা?

—কেন জানো না তোমরা, রাণী রাসমণি যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন।

দলে দলে চলেছে তারা, দেশ দেশান্তর থেকে আসছে ব্রাহ্মণ। নতুন যুগের পত্তন হ'ল।

সেখানে ছিল একদিন সুপ্রীম কোর্টের এটর্ণী হেষ্টি সাহেবের কুঠি—মুসলমানদের কবর ডাঙ্গা আর গাজী সাহেবের পীরের স্থান।

সেই জমির উপর গড়ে উঠেছে মন্দির গঙ্গার তীরে সারি বদ্ধ বারোটি শিব মন্দির। তৈরী হয়েছে বিষ্ণু মন্দির, কালী মন্দির ও নাট মন্দির। রাণী ঐ জায়গাটা কিনেছিলেন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে, ৬০ বিঘা জমির দাম দেন ৬০ হাজার টাকা শোনা যায়। রাণী মন্দির এর কাজ সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার ধারে বিরাট ঘাট বাঁধবার ব্যবস্থা করেন, ঐ ঘাট নির্ম্মাণের দায়িত্ব নেন—তখনকার দিনের বিখ্যাত কনট্রাকটার মেকিনটস্ কোম্পানী।

শোনা যায় ঘাট তৈরী করতে ব্যয় হয়েছিল প্রায় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা। শিব মন্দির গুলি ঘাটের দুই পাশে ছয়টি করে বারোটি তৈরী করা হয় মন্দির। মন্দিরগুলির সামনে এক বিশাল প্রাঙ্গণ। কালী মন্দিরটি নবরত্ন চূড়া বিশিষ্ট। মন্দিরের উত্তর দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বহু ঘরবিশিষ্ট একতলা দালান তৈরী করে দেওয়া হয়। এই ঘরগুলিতে অতিথি এসে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা ছিল। পূজুরীর দপ্তর খানা ও কর্মচারীদের থাকবার মত ব্যবস্থা ছিল।

মন্দির বাড়ীর দক্ষিণে আস্তবল, পূর্বে পুষ্করিণী আর উত্তরে নহবৎ খানা ও বাগান এর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। মন্দিরের কাজ সুরু হয়েছিলো ১২৫৪ সালে, আর শেষ হয় ১২৬২ সালে। আনুমানিক ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিলো।

কাশী—সে তো অনেক দূরে, এখানে কোথাও শিব শক্তির মন্দির প্রতিষ্ঠা কর। কাশী যাত্রার প্রাক্‌কালে রাণী স্বপ্ন দেখেছিলেন। কাশী যাওয়া বন্ধ করলেন রাণী। বজরা থেকে মালপত্র নামানো হলো। পঁচিশ খানা বজরা আর গঙ্গায় ভাসলো না।

আজ আর কেউ খুজে পাবে না—কোথায় ছিল মুসলমানের কবর ডাঙ্গা, গাজী সাহেবের পীরের স্থান আর হেষ্টি-সাহেবের কুঠি।

রাণী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর বাড়ীতে দ্বাদশ শিব মন্দিরে শিবলিঙ্গ, বিষ্ণু মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ এবং কালী মন্দিরে দেবী ভবতারিণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শৈব, শাক্ত আর বৈষ্ণবের সমন্বয় ঘটালেন তিনি।

সর্ব্ব ধর্ম সমন্বয়।

পঞ্চবটী বনে তমসাচ্ছন্ন রাত্রে একান্ত একাকী সাধনা করেন গদাধর। এই দিব্য জ্যোতি সম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব। এক নব জীবনের উদ্বোধন করলো।

ভবতারিণীর পুজো করতে করতে এক এক সময় তিনি ভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সাধকের মনে এক প্রশ্ন—কে এই আলোকদর্শী পুরুষ।

কে তুমি!

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামের রামকুমার চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় তাঁর একটা ছোট টোল ছিল। এতে সামান্য কিছু আয় হ'ত। তাই কোলকাতার অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে তিনি পুজো করতেন। তিনি একজন মহা পণ্ডিত এবং তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। নিজের কাজে সাহায্য করবার জন্ত ছোট ভাই গদাধরকে নিয়ে এলেন।

গদাধর কোলকাতায় এসে যজমানের বাড়ীতে পুজো করতে লাগলো। তাছাড়া গদাধর দাদার টোলে পড়াশুনাও করতো।

আঠারো বছরের তরুণ গদাধর। মাত্র সাত বছর বয়েসে বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়েছে। সেই থেকে কিসের এক আনমনা ভাব। কি যেন সে ভাবে। সে যেন ভাবনার অন্ত নেই। নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। একান্ত গরীব তারা—একান্ত অসহায়। সে দিন তার মনের কোণে যে দোলা দিয়েছিলো—ভাবীকালে তা সারা দেশকে দোলা দিয়ে গিয়েছে।

টাকা মাটি, মাটি টাকা—

রাণী রাসমণি কালীর পুজক হিসেবে রামকুমারকে মনোনীত করে দিলেন। রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সময় কনিষ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে যান। গদাধর প্রথমে দেবী ভবতারিণীর বেশকারীর কাজ করতেন। পরে বিষ্ণু মন্দিরে রাধাগোবিন্দের পুজোর ভার নেন। এর পর রামকুমার গদাধরকে কালী মন্দিরের পুজার ভার দেন।

তিনি নিজেও আর পারেন না। যেন বয়েসের ভারে নুয়ে পড়েছেন। ওপারের ডাক্ আসতে আর দেরী নেই।

পুজোর শেষে গদাধর রামপ্রসাদ—কমলাকান্ত ও শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে শোনাতেন। নিজের ভাবে তিনি নিজে বিভোর হয়ে যেতেন।

গভীর রাত্রে পঞ্চবটীতে গিয়ে বসতেন। এমনি করে কত তন্ময় মুগ্ধ অমারাত্রি কেটে যেত।

লোকটা পাগল নাকি?

কানাকানি সুরু হ'ল, মাথার গোলমাল হয়েছে নিশ্চয়ই।

গদাধর পুজোয় অনেক গোলমাল করতে থাকেন। কখনও তিনি পুজোর আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে মাকে আদর করতেন। কখনও তিনি আপন মনে বলে যেতেন। কখনও গান গাইতেন। কখনও দেবীকে ভোগ দিতে গিয়ে নিজে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেন। আবার নিজের মনেই বলতেন খা—খা—খা।

—ওর দ্বারা আর পুজো হবে না। রাণী মথুরামোহনকে ডেকে বললেন: যা শুনছি, একি সত্যি? সত্যি কিনা একদিন গোপনে দেখে এসো।

মথুরামোহন গোপনে মন্দিরে আসেন।

গদাধর তখন মাকে প্রেমভক্তি জানাচ্ছেন। দুই নয়নে অশ্রুধারা নেমে আসছে—

স্তম্ভিত মথুরামোহন বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে থাকেন। এ-কি দেখছেন তিনি। এতো সাধারণ নয়—কে এই মহাপুরুষ!

মথুরামোহন দুই হাত যুক্তকরে প্রণাম করেন, তুমি আর যেই হও, তুমি সাধারণ নও—দূর থেকে কোটি প্রণাম গ্রহণ করো ঠাকুর।

মথুরামোহন যেমন গোপনে এসেছিলেন, তেমনি গোপনে চলে গেলেন, কেউ কিছু জানলো না।

মথুরামোহন বাড়ী ফিরে এসে রাণীকে সব কথা বললেন। অবাক্ হয়ে শুনলেন রাণী। তাঁর দুচোখে বয়ে যায় জলের ধারা—তুমি তো সামান্ত নও। প্রীতিরাম দাসের শেষ দিনের কথাগুলো তাঁর মনে পড়ে যায়। তিনি আসছেন, মহাপুরুষ আসছেন। তবে কি এতদিনে—

—মথুরা, বাবা আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা সার্থক হয়েছে। তুমি অন্য পুরোহিতদের বলে দাও। কেউ যেন তাঁর পুজোয় বিঘ্ন সৃষ্টি না করেন। তিনি যেভাবে পারেন পুজো করুন। মথুরামোহনও তাই চাই-ছিলেন। তিনি সেই ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিলেন।

কিন্তু গদাধরের যেন দিনে দিনে বাহ্যিক চেতনা শক্তি লোপ পেয়ে আসছিল। তাঁর পক্ষে পুজো করা কঠিন হয়ে পড়ল। নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে দেবীর ফুল চন্দন নিজের গায়ে দিয়ে বসতেন।

এভাবে আর চলে না। তাই একদিন গদাধরকে পুজোর কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোল।

তাঁর খুড়তুতো ভাই রামতারণ চট্টোপাধ্যায়কে রাণী দেবী পুজোয় নিযুক্ত করলেন। মথুরামোহন রাণীর নির্দ্দেশে গদাধরের অবাধ সাধন-ভজনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সবার মুখে এক কথা, পাগল হয়ে গিয়েছে গদাধর। কামারপুকুরে তাঁর মা চন্দ্রমণি দেবী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর মেজদা রামেশ্বর অত্যন্ত চিন্তিত।

গদাধর বাড়ীতে ফিরে এলো।

পঞ্চবটী যেন শূন্য হয়ে গেলো। রাণীর মনও হাহাকার করে ওঠে। রাণী শুধু তাঁকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসবেন ছোট ঠাকুর। রাণী গদাধরকে ডাকতেন ছোট ঠাকুর।

উন্মনা গদাধর। মাঝে মাঝে মা-মা বলে কাঁদতেন। এমনি ভাবে দিন গড়িয়ে চলে। নদীর বুক দিয়ে স্রোত বয়ে যায়। জল-কল্লোলে শুধু ধ্বনিত হয় কত জীবনের মর্মবাণী।

দিন দিন প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠেন গদাধর। এই সময় তাঁর মা ও দাদা তাঁর বিয়ে দিলেন। শ্রী জয়রাম বাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র মেয়ে শ্রীসারদামণি।

বেশ কিছুদিন কেটে যায়। সংসারে টানাটানি পড়ে। গদাধর আবার কোলকাতায় ফিরে এলেন। গদাধর দক্ষিণেশ্বরে এলে রাণীর মন খুশীতে ভরে উঠলো। মথুরামোহনের আনন্দ আর ধরে না।

পঞ্চবটী মর্মরিত হয়ে উঠলো। রাণী গদাধরকে আবার পুজার

ভার দিলেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই গদাধরের আবার ভাবান্তর দেখা গেল।

দেখা দিল দিব্যভাব। তিনি ভুলে গেলেন—মা, ভাই, স্ত্রী, সংসার—অভাব-অনাটন সবই ভুলে গেলেন তিনি। এ সংবাদ আবার কামারপুকুরে পৌছালো, রাণী শুধু তাঁদের জানালেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, যা ভাল ব্যবস্থা হয় করবো। কত চিকিৎসক এলেন, পরীক্ষা করলেন, একজন শুধু রাণীকে বললেন, এতো শুধু ব্যাধি নয়—এ দেবোন্মাদ অবস্থা।

খবর পেয়ে চন্দ্রমণি দেবী দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন, রাণী তাঁর জন্য অন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন।

দিব্যভাবে বিভোর গদাধর।

মা এসেছেন, মার কাছে আসেন—প্রণাম করেন। এমনিভাবে দিন অতিক্রান্ত হতে থাকে।

এই সময় ভৈরবী যোগেশ্বরী, রামপন্থী জটাধারী এবং সন্ন্যাসী তোতাপুরী ঠাকুরবাড়ীতে আসেন।

এর মধ্যে গদাধর ভৈরবীর কাছে তন্ত্র-সাধনা শিক্ষা করেন। তন্ত্র-সাধনা চলতে থাকে। দিন চলে—সিদ্ধিলাভ করলেন গদাধর। ভৈরবী তাঁর নাম দিলেন: রামকৃষ্ণ। এর পর রামকৃষ্ণ তোতাপুরীর কাছে যোগ ও বেদান্ত শিক্ষা করেন। তিনি সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দেন। তিনি সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দিলেন বলে শিষ্যের নাম দিলেন 'পরমহংস'। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

এর বহুদিন পরে সারদামণি তাঁর বাবার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। আর ফিরে যান্‌নি।

তিনিও পরমহংস দেবের সাধন-জীবনের সঙ্গিণী হলেন। রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেননি। তাঁকে দেখে যেন মনে হয় তিনি এক নির্লিপ্ত সংসারী।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-দর্শন আজ আর কারও অপরিজ্ঞাত নয়। কিন্তু মূল প্রশ্নের উত্তর কি আজও মিলেছে? দিকে দিকে প্রচারিত হ'ল রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অলৌকিক জ্ঞানের মহিমা। পঞ্চবটী হয়ে উঠলো নূতন তীর্থ। এলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত কৃষ্ণদাস পাল, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ—আরও কত।

আর একজন এসেছিলেন ইংরাজী শিক্ষায় সুপণ্ডিত। নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি দীক্ষা নিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বেরুলেন বিশ্বজয়ে। তিনি জয়ী হয়ে ফিরে এলেন। সে আর এক ইতিহাস।

রাণীর দিন আর কাটেনা। ধর্মকর্ম পূজার্চনা নিয়ে থাকেন। বিষয়-সম্পত্তি সবকিছু দেখবার দায়িত্ব একেবারে জামাইদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মনে হয় এখন তাঁর অবকাশ।

অবকাশ—মৃত্যু। মনের মৃত্যু, গতির পথে পূর্ণচ্ছেদ।

দক্ষিণেশ্বরে তিনি অনেক সময় থাকতেন।

রামকৃষ্ণদেব তাঁকে ধর্মকথা ও ধর্ম সঙ্গীত শোনাতেন।

সূর্য উঠেছে। পক্ষীরা দল বেঁধে উড়ে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। আকাশে সাদা সাদা মেঘ লঘু মৃদুচ্ছন্দে উড়ে চলেছে। সেইদিকে তাকিয়ে আজ যেন রাণী কি ভাবেন।

শীতের বাতাস হু হু করে বয়ে যায়। কিছু নাই—সব যেন শূন্য। শুধু তাঁর উদাস দৃষ্টি কিসের সন্ধান করে।

তাঁর উদরাময় রোগ—এ রোগ যেন সারবার নয়। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে তিনি এলেন কালীঘাটের কালীবাড়ীর নিকটে তাঁর বাগানবাড়ীতে। কত ডাক্তার দেখলেন তাঁকে। মৃত্যু কি আসন্ন?

রাণী দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য দিনাজপুর জেলায় যে জমিদারী কিনেছিলেন, সেই সম্পত্তি তিনি দেবোত্তর করে তাঁর দানপত্রে সই করে দিলেন। ১৮৬১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এই কার্য্য শেষ হ'ল। ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাণী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ওপারের ডাক্ এসেছিলো—তাই এপারের দেনা পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

পড়ে রইলো তাঁর সব, তাঁর সাজানো বাগান। সেদিন শুধু তাঁর আত্মীয়রাই কাঁদেনি—সেদিন দেশের মানুষ কাঁদলো। দেশের মানুষ সেদিন সত্যি করে মা হারা হলো। পিছনে রয়ে গেল তাঁর কালজয়ী সব কীর্ত্তি, অবিস্মরণীয় জীবনেতিহাসের অখণ্ড ইতিহাস।

রাণী রাসমণির জীবন একটা সম্পূর্ণ যুগ। সে যুগ পথ কেটে চলেছে আরও সামনের আর এক অনাগত যুগে।

বাঙ্গালীর জীবন সন্ধিক্ষণে—সেই দুর্য্যোগ যাত্রাপথে, তিনি দিয়ে গেছেন অভয় মন্ত্র।

বাংলার জাতির গতিপথে অত্যাচারের বন্যা তাকে বার বার ভেঙেছে। নীলকরদের অত্যাচার—দুর্ভিক্ষ মারী মন্বন্তর কিছুই জাতির গতিপথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। ক্ষণবিরতির পর আবার নতুন করে যাত্রা সুরু হয়েছে। সামনে চলেছে যাত্রী, মরু যাত্রী, সমুদ্র নাবিক।

পরম পথিকৃৎ—পুরুষ ও প্রকৃতি।

—

ঘরোয়া সেলাইয়ের কাজ

সুলতা মুখোপাধ্যায়

'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট'

এবারে ছোট ছেলেদের পরিধান-উপযোগী বিশেষ এক ধরণের পোষাকের কথা বলছি। এ পোষাকের নাম—'রম্পার' (Romper) বা 'সান্-স্যুট' (Sun-Suit)। এ ধরণের পরিচ্ছদ গ্রীষ্মের দিনে ছোট ছেলেদের পক্ষে খুবই আরামপ্রদ ও ব্যবহারোপযোগী। সাধারণতঃ দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের ছোট ছেলেদের এ পোষাকটি ভারী সুন্দর মানায়। তাছাড়া তাদের দৈনন্দিন ব্যবহার আর স্বচ্ছন্দে ছুটোপাটি-দৌড়ঝাঁপের পক্ষেও খুবই সুবিধাজনক—
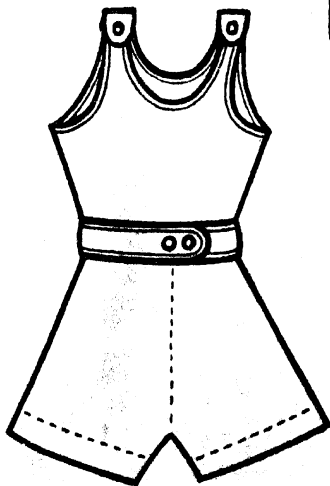
এ ধরণের বিচিত্র পোষাক। উপরের ছবিতে বিচিত্র এই পোষাকটির নমুনা দেওয়া হলো—ছবিটি দেখলেই 'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট' পরিচ্ছদের সুস্পষ্ট আভাস পাবেন। এ ধরণের পোষাক তৈরী করা এমন কিছু দুঃসাধ্য বা ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার নয়···অনায়াসেই ঘরে বসে নিজেরাই এ সব পোষাকের ছাট-কাট ও সেলাই করতে পারবেন।

আপাততঃ ছোট ছেলেদের 'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট' তৈরী করতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার ও ছাট-কাট-সেলাইয়ের বিধি-নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন—তার মোটামুটি আভাস জানিয়ে রাখি। উপরের ছবিতে এই পোষাকের যে নমুনাটি দেখানো হয়েছে, ধরুন, সেটির মাপ হলো—

ছাতি—২২" ইঞ্চি

'সেন্ত' (Body-length) অর্থাৎ কাঁধ থেকে কোমর অবধি দেহের উপরার্দ্ধের 'ঝুল' বা 'লম্বা'—৮½" ইঞ্চি

'প্যাণ্ট' বা পাজামা অর্থাৎ কোমর থেকে হাঁটুর উপর অবধি দেহের নিম্নাংশের 'ঝুল' বা 'লম্বা'—৯½" ইঞ্চি

'হিপ' (Hip) বা পাছা—২৪" ইঞ্চি

এই মাপ অনুসারে 'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট' তৈরী করতে হলে, ৩০" ইঞ্চি থেকে '৩৬" ইঞ্চি বহরের একগজ কাপড় প্রয়োজন। দুই-তিন বছর বয়সের শিশুদের জন্য ৩০" ইঞ্চি বহরের কাপড় নিলেই চলবে, তবে তাদের চেয়ে বড় অর্থাৎ চার-পাঁচ বছর বয়সের ছোট ছেলেদের জন্য এ ধরণের পোষাক বানাতে হলে ৩৬" ইঞ্চি বহরের কাপড় ব্যবহার করা প্রয়োজন। এসব পোষাক তৈরী করবার সময় বিশেষভাবে মনে রাখবেন যে'রম্পার' বা 'সান্-স্যুটের' কাপড়টি যেন মোটা এবং খাপি ধরণের হয়। কারণ, পাতলা কাপড়ে এ ধরণের পোষাক তেমন ভালো হয় না। তাছাড়া, সিল্ক কিংবা রেশমী কাপড়ের চেয়ে সুতীর কাপড়েই এ সব পোষাক তৈরী করা বিধেয়। 'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট' পোষাকের জন্য বিশেষ উপযোগী হবে—'লং-ক্লথ', 'পপ্‌লিন', খদ্দর কিংবা ঐ জাতীয় খাপি-মজবুত এবং মোলায়েম ধরণের সুতীর কোনো কাপড়। বলা বাহুল্য যে এ সব পোষাক ছোট ছেলেদের জন্য, কাজেই শাদা কাপড়ের চেয়ে রঙীন কিম্বা বিচিত্র নক্সাদার ছিটের কাপড়েই 'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট, বানালে, সেগুলি আরো বেশী সুন্দর ও মনোরম হবে। এ প্রসঙ্গে আরো একটি দরকারী কথা বলে রাখি। রঙীন বা নক্সাদার ছিটের কাপড়ে

'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট' রচনার সময় বিশেষভাবে মনে রাখবেন—পোষাকটি যে-রঙের হবে, সেই রঙের সঙ্গে মানানসই দেখায়, এমনি ধরণের আলাদা কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করে 'পাইপিং' (Piping) বা 'কিনারার-পটি' বসানো প্রয়োজন। এই 'পাইপিং' বা 'কিনারার-পটি' বসানোর কাপড়ের টুকরোটিকে আগাগোড়া তেরছাভাবে কাটতে হবে—'পাইপিং'-এর ব্যাপারে কোনো সময়েই সোজাসুজি-ছাঁটাই-করা কাপড় ব্যবহার করা চলবে না। 'পাইপিং' যেন চওড়াতে ⅛" ইঞ্চির কম-বেশী না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। বাজারে নানা রঙের 'তৈরী-পাইপিং' বাণ্ডিল হিসাবে কিনতে পাওয়া যায়। সেগুলি এমন কিছু দুর্মূল্যও নয়। সুতরাং যাঁরা 'পাইপিং' ছাঁটাই ও সেলাইয়ের পরিশ্রম বাঁচাতে চান, তাঁরা বাজার থেকে প্রয়োজনমতো রঙের এই সব 'তৈরী-পাইপিং'-এর বাণ্ডিল কিনেও পোষাক-তৈরীর কাজে ব্যবহার করতে পারেন। সাধারণতঃ বাজারে 'তৈরী-পাইপিং'-এর যে

সামনের অংশ ২

ছাতির ¼ + ১"

ছাতির ¼ + ৩"

ছাতির ¼ + ২½"

পাছার $\frac{১}{১৬}$

বাণ্ডিল কিনতে পাওয়া যায়, সেই রকম এক বাণ্ডিল রঙীন 'কিনারার পটি' বা 'পাইপিং' কিনলে, তাই দিয়ে উপরোক্ত-মাপের দুটি 'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট' তৈরী করার কাজ সারা যাবে।

পছন্দমতো কাপড় ও 'পাইপিং' বাছাই করে নেবার পর, 'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট' পোষাকের কাপড়টিকে প্রয়োজনমতো মাপ-অনুসারে ছাঁটাই ও সেলাইয়ের কাজ।

গোড়াতেই বলি—'রম্পার' বা 'সান্-স্যুটের' কাপড়টিকে উপরের ১নং ছবিতে দেখানো নমুনার মাপমতো ছাঁদে ছাঁট-কাট করার পদ্ধতির কথা। ছাঁটাইয়ের সময়, পোষাকের বিভিন্ন অংশের মাপগুলি যথারীতি রঙীন পেন্সিল বা 'সেলাইয়ের-কাজের খড়ি' (Tailor's Marking chalk) দিয়ে পুরো কাপড়টির উপরে আগাগোড়া পাকাপাকিভাবে রেখা-চিহ্নিত (Drawing) করে নিতে হবে। এইভাবে রেখা-চিহ্নিত করে নেবার সময় পোষাক তৈরীর ঐ একগজ কাপড়টিকে সমতল টেবিল কিম্বা মেঝের উপর আগাগোড়া সমানভাবে (অর্থাৎ, কোনো রকম ভাঁজ না করে) পেতে, প্রথমেই পোষাকের 'নিম্নার্দ্ধ-অংশের' সুমুখদিক বা পাজামার সামনের অংশ দুটিকে পাশের ২নং ছবির ছাঁদে রেখা-চিহ্নিত করে, পরিপাটিভাবে মাপমতো আকারে কেটে নিতে হবে। এ কাজের পর, পোষাকের নিম্নার্দ্ধ-অংশের পশ্চাদ্দিক বা পাজামার পেছনের অংশ দুটিকে পাশের ৩নং ছবির ছাঁদে অনুরূপ

পদ্ধতিতে রেখা-চিহ্নিত করে পুনরায় কাপড়টিকে মাপমতো আকারে সুষ্ঠুভাবে কেটে নিতে হবে। এমনিভাবে

পোষাকের নিম্নার্দ্ধ-অংশ বা পাজামার সামনের ও পেছনের চারটি টুকরো ছাঁটাই করে নেবার পর, বাকী কাপড়টিকে
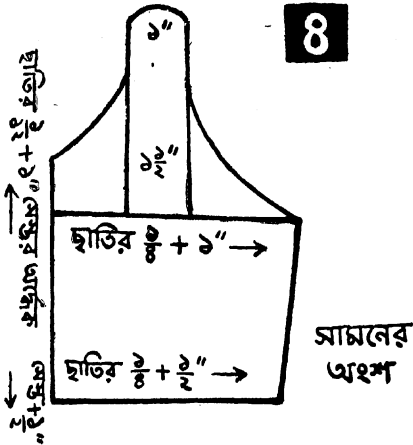
দু'ভাঁজে পাট (Fold) করে পাশের ৪নং ছবির ছাঁদে পোষাকের উপরার্দ্ধ-অংশ বা 'সেন্ড'-এর 'সামনের অংশ'
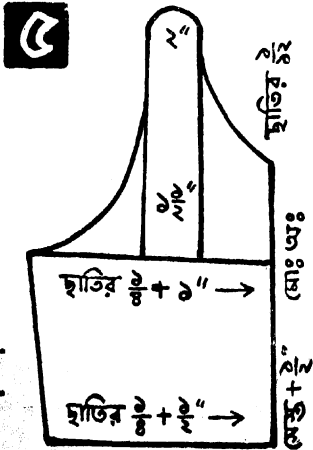
বা 'বুকের দিক' এবং নীচের ৫নং ছবির ছাঁদে পোষাকের উপরার্দ্ধ-অংশের অর্থাৎ 'সেন্ড'-এর 'পেছনের দিক' বা 'পিঠের অংশ', মোট চারটি টুকরোকে মাপমতো আকারে কেটে নিতে হবে। তাহলেই পোষাকের উপরার্দ্ধ ও নিম্নার্দ্ধ অংশের সব ক'টি প্রয়োজনীয় কাপড়ের টুকরো ছাঁট-কাটের পালা চুকলো। এবারে বাকী কাপড়টিকে ভাঁজ খুলে পুনরায় আগাগোড়া সমানভাবে সমতল টেবিল বা মেঝের উপর বিছিয়ে রেখে পোষাকের 'বেল্ট' (Belt) বা 'কোমর-বন্ধনীর' অংশটি যথারীতি রেখা-চিহ্নিত ও ছাঁটাই করে নেবার কাজ সারতে হবে। পোষাকের এই 'বেল্ট' বা 'কোমর-বন্ধনী' রচনার জন্য বাকী কাপড়ের টুকরোটিকে আগাগোড়া সোজাসুজিভাবে ২৫" ইঞ্চি লম্বা এবং ৩" ইঞ্চি চওড়া মাপে কেটে নিতে হবে। উপরের ৬নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি-ছাঁদে পোষাকের 'বেল্ট' বা 'কোমর-বন্ধনী'র কাপড়ের টুকরোটিকে আগাগোড়া দু'ভাঁজে পাট (Fold) করে উপরোল্লিখিত ২৫" লম্বা ও ৩" ইঞ্চি চওড়া মাপ-অনুসারে ছাঁটাই করতে হবে এবং 'বেল্টের' একদিকের প্রান্ত, পরপৃষ্ঠায় ৬নং ছবিতে দেখানো নমুনার ছাঁদে, অর্দ্ধবৃত্তাকারে (Semi-circular shape) কেটে নিতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে, উপরের ১নং ছবিতে দেখানো নমুনা-অনুসারে, 'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট' পোষাকের বিভিন্ন অংশ কিভাবে মাপ নিয়ে কাপড়ের উপর রেখা-চিহ্নিত করতে হবে, সে সম্বন্ধেও মোটামুটি হদিশ জানিয়ে রাখি। অর্থাৎ, ২২" ইঞ্চি ছাতির মাপে 'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট' তৈরী করতেহলে, পোষাকের কাপড়টিকে (এক গজ) নিম্নোল্লিখিত হিসাবে রেখা-চিহ্নিত ও ছাঁটাই করা প্রয়োজন—

'ছাতি'=২২" ইঞ্চি+৪" ইঞ্চি=২৬" ইঞ্চি+৪" ইঞ্চি=৬½" ইঞ্চি ;

'সেন্ড'=৮½" ইঞ্চি+½" ইঞ্চি=৯" ইঞ্চি ('ঝুল' বা 'লম্বা') ;

'পাজামা'=৯½ ইঞ্চি+½" ইঞ্চি=১০" ইঞ্চি+১½" ইঞ্চি (পটি)=১১½" ইঞ্চি ('ঝুল' বা 'লম্বা') ;

'হিপ্' (Hip) বা 'পাছা'=২৪" ইঞ্চি+৩" ইঞ্চি = ৮" ইঞ্চি+½" ইঞ্চি =৮½" ইঞ্চি ,

এই হলো 'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট' পোষাকের কাপড় ছাঁটাইয়ের মোটামুটি পদ্ধতি। তবে পোষাকের কাপড় ছাঁট-কাট করবার সময় সর্ব্বদা খেয়াল রাখা চাই যে প্রয়োজনমতো মাপের চেয়েও যেন অন্ততপক্ষে ½" ইঞ্চি কাপড় বাড়তি বা বেশী (Allowance) থাকে সর্ব্বত্র। কারণ, প্রয়োজনমতো মাপের চেয়ে সর্ব্বত্র সামান্য বেশী বা বাড়তি কাপড় রাখার ফলে, সেলাইয়ের সময় পোষাকের 'ধার-মোড়াই'-এর (Edge-Sewing) কাজের সুবিধা হবে সবিশেষ। অন্যথায়, পোষাকের ডৌলও যেমন

ছাতির সমান + ২½" বা ৬"

সুন্দর-সুশ্রী হবে না, সেলাইয়ের কাজেও তেমনি নানা অন্তরায় ঘটবে। এই কারণেই পোষাকের কাপড় ছাঁট-কাটের সময় এদিকে নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

আগামী সংখ্যায় 'রম্পার' বা 'সান-স্যুট' পোষাকের সেলাইয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

তীর্থ-কামী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

তীর্থ লাগি' চিত্ত মোর অকস্মাৎ উঠিল উছসি,'
দিগন্তের বাণী যেন অদৃশ্য সঙ্কেত দিল তার—
আকাশের আমন্ত্রণে কী যে সুর অন্তর পরশি'
অনির্দ্দেশ অন্বেষণে খুলে দেয় হৃদয়-দুয়ার।
ভুলে যাই পৃথিবীরে, ভুল করি যত সাধা গানে,
জীবনের আকুলতা অতি তুচ্ছ, হেন মনে হয়
মাটির বাঁধন তবু, বুকে তার, মোরে শুধু টানে,
রোমাঞ্চিত চুম্বকের আকর্ষণ করিয়া সঞ্চয়!
পশ্চাতের কোলাহল পড়ে থাক নীরবতা-নীড়ে,
অশ্রুজলে ভুলিব কী অন্তহীন পথের দিশায়?
মিশিতে চাহি না আর অতলান্ত ভাবনার ভীড়ে,
কালের প্রদীপ হাতে বাহিরিব আঁধার নিশায়।
মুক্তির কামনা নয়, যুক্তিরে সম্বল করি তবু—
আমার প্রতিজ্ঞা জাগে দেহরন্ধ্রে অণুতে প্রখর—
সমুদ্ভব-আলোকের দৃষ্টি যদি নেমে আসে কভু,
অমানিশা অবসানে দেখা দিবে রঞ্জিত প্রহর।
অজানার তীর্থালোকে চলিয়াছি আমি সে পথিক,
পথের দু-পাশে যারা হেসে কেঁদে করে সম্ভাষণ,
আশা দেয়, ভালবাসে, যশোগানে ভরে দেয় দিক,—
ভাবের বৈরাগী আমি খুঁজে ফিরি অকূলের ধন।
জানে না তাহারা শুধু, মোর লাগি' নহে জয়গান—
কামনা কৌপীন মোর, রক্তে, মাংসে মেদে ও মজ্জায়
আলোকের তীর্থরেণু ছন্দ-নৃত্যে করে আত্মদান;
উদ্ভাসিত অন্তরের সুকুমার বাসর সজ্জায়!
তীর্থকামী মন মোর স্থির লক্ষ্যে হোক অবারিত,
পলকে ঝলকে যেথা স্বরূপের আলোক-বিহার—
জিজ্ঞাসারে মূলধন করি প্রাণে হউক বিধৃত
ধরণীর লীলাঞ্চলে অ-নির্ব্বাণ-পূত অভিসার।

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে !
আঃ ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম ! আর স্নানের পর শরীরটা কত ঝরঝরে লাগে !
ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্য্যকারী ফেনা সব ধুলো
ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে। আজ থেকে আপনার
পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।
L. 16-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

খ্যাতনামা অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ২৬শে আগষ্ট শনিবার রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিটে ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা গড়পার ৫নং বিপ্রদাস ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ৩ দিন হইতে তাঁহার শরীর ভাল ছিল না—শনিবার

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ফটো: এস বসু

বিকাল ৩টায় হঠাৎ অধিক অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্তিম সময় পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান পূর্ণই ছিল। ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শান্তিনিকেতনে যাইয়া শ্রীনিকেতনের কর্মসচিব হইয়াছিলেন এবং তদবধি বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্র-ভারতীর সহিত যুক্ত ছিলেন। গত ১৬ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। তাঁহার সহধর্মিণী, এক পুত্র ডাক্তার অমল ভট্টাচার্য্য, এক কন্যা ও জামাতা অধ্যাপক গোপাল ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান। ১৮৮০ সালের ২৯শে জুন জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৮৯৯ সালে কলিকাতা মেট্রপলিটান স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। ২৪পরগণা জেলার হরিনাভি গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়—পিতার নাম বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য; গ্রাম্য স্কুলের পড়া শেষ করিয়া ১০ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসেন। খ্যাতনামা নাট্যকার রামনারায়ণ ছিলেন—চারুচন্দ্রের পিতামহের কাকা। ১৯০১ সালে মেট্রপলিটান (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজ হইতে এফ-এ পাশ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়েন—তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও মিষ্টার পার্শিভাল। তিনি ১৯০৪ সালে পদার্থ বিদ্যায় এম-এ পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন ও প্রায় ৩৬ বৎসর কাজ করিয়া অবসরগ্রহণ করেন। তাঁহার বহু ছাত্র কৃতী হইয়াছেন। তিনি বলিতেন—বাংলাদেশের ৫জন এফ-আর-এসের মধ্যে তিনি একজনের ছাত্র (জগদীশচন্দ্র) ও অপর ৪জন তাঁহার ছাত্র—মেঘনাদ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, শিশিরকুমার মিত্র ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। 'ভারতবর্ষের' প্রথমাবধি তাহাতে চারুচন্দ্রের লিখিত বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ আছে—তন্মধ্যে নব্য বিজ্ঞান (১৩২৫), বাঙ্গালীর খাদ্য (১৩২৬), আচার্য্য জগদীশচন্দ্র (১৩৪৫), বিশ্বের উপাদান (১৩৫০), তড়িতের অভ্যুত্থান (১৩৫৫), জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার (১৩৫০), ব্যাধির নিরাময় (১৩৫৬), বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী (১৩৫৬), পদার্থবিদ্যার নবযুগ (১৩৫৯) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সারা জীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত একদিকে যেমন বহু রচনার দ্বারা বাংলার জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তেমনই বহু

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত নিজকে সংযুক্ত রাখিয়া দেশবাসীকে উপকৃত ও চালিত করিয়াছেন। তিনি রামমোহন লাইব্রেরীর সভাপতি, রবীন্দ্র-ভারতীর সহ-সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি, অবনীন্দ্র-পরিষদের সভাপতি, ভারতসভার সহ-সভাপতি প্রভৃতি পদে কাজ করিয়াছেন। গত কয় বৎসর তিনি বসুধারা নামক মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অমায়িক, সহৃদয় ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত—সেজন্য তিনি ছোটবড় সকলের আদর ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বহু-পরিচিত, বন্ধুবৎসল এই অধ্যাপক পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিলেও তাঁহার জন্য সকলেই স্বজনবিয়োগ বেদনা অনুভব করিয়াছে। ভারতবর্ষ কার্য্যালয়ে বহু বৎসর ধরিয়া তিনি সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন বলিয়া ভারতবর্ষের কর্ম্মীবৃন্দ তাঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছে।

ডাক্তার সুবোধ মিত্র—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ও খ্যাতনামা স্ত্রী-রোগ ও ক্যান্সার-রোগ চিকিৎসক ডাক্তার সুবোধ মিত্র গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর সোমবার রাত্রিতে সহসা হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ভিয়েনা সহরে এক হাসপাতালে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী সুষমা মিত্র গত ১৮শে আগষ্ট কলিকাতা হইতে ভিয়েনায় যান—তথায় এক আন্তর্জাতিক চিকিৎসক সম্মিলনে যোগদানের পর ডাক্তার মিত্রের ফ্রান্স ও রুশ-দেশ ঘুরিয়া সেপ্টেম্বরের শেষে কলিকাতায় ফেরার কথা ছিল। ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী ছাড়া একমাত্র কন্যা ডাঃ জয়শ্রী ও জামাতা ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বর্তমান। সুবোধবাবু ১৮৯৬ সালের ১লা ডিসেম্বর যশোহর জেলার নড়াইলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৌবাজার হাইস্কুল ও বঙ্গবাসী কলেজ হইতে পড়িয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি পাশ করেন। পরে বার্লিন হইয়া এম-ডি ও এডিনবরায় এফ-আর-সি-এস পাশ করিয়া কলিকাতা আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হন। স্ত্রী-রোগ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল এবং সে জন্য প্রথম বয়স হইতেই তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়া উহার উন্নতি বিধানে বিশেষ চেষ্টা করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় তথায় স্ত্রী-রোগ সম্বন্ধে
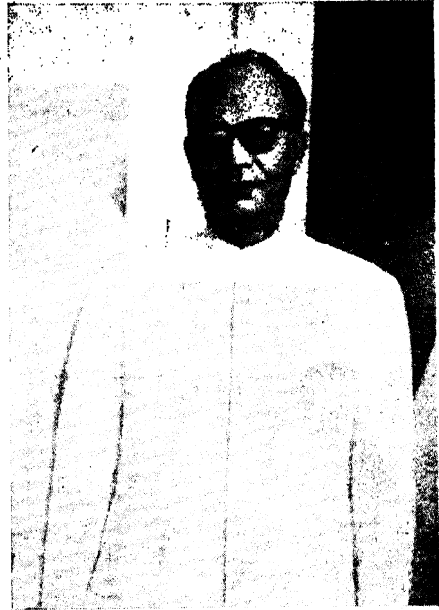
ডাক্তার সুবোধ মিত্র

বিশেষ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। স্ত্রী-লোকদের মধ্যে ক্যান্সার রোগের প্রাবল্য দেখিয়া তিনি ক্যান্সার রোগ চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণা করেন ও পরে চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের পাশে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। তিনি বহু বৎসর উভয় হাসপাতালের পরিচালক থাকিয়া দুইটি হাসপাতালকেই জনকল্যাণ কার্য্যের কেন্দ্রে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি যশোহর ও খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষ নিবারণে বিশেষ কার্য্য করিয়াছিলেন এবং পরে কলিকাতায় আর-ডবলিউ-এ-সি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার মারফত স্থায়ীভাবে জনসেবা করিতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বহু বৎসর সংযুক্ত ছিলেন এবং মেডিসিন ফ্যাকাল্টির ডীন পদও লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৬০ সালে অক্টোবর মাসে তিনি শ্রীনির্মল সিদ্ধান্তের স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং যোগ্যতার সহিত গত প্রায় এক বৎসর কাল সে কাজ

করিতেছিলেন। তিনি সস্ত্রীক বহুবার সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সে ভ্রমণ-কাহিনী তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুষমা মিত্র ধারাবাহিক ভাবে ভারতবর্ষে ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইলেও তাঁহার কর্মশক্তি ও উৎসাহ অসীম ছিল এবং দেশ তাঁহার নিকট হইতে আরও বহুপ্রকার সেবাকার্য্য আশা করিয়াছিল। তাঁহার মত অমায়িক, বন্ধু-বৎসল ও সহৃদয় লোক অতি বিরল। তাঁহার বিদেশে সহসা পরলোকগমনে দেশবাসী শোকে মুহ্যমান হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার শব কলিকাতায় আনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকে তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি, ডাক্তার মিত্রের জীবনাদর্শ তরুণ দেশবাসীকে যেন কর্মে প্রেরণা দান করে।

কবি শ্রীরাধারাণী দেবীর সংবর্ধনা

বিগত ১৮ই আগস্ট ১৯৬১ সালে শুক্রবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী স্বাধীনতা উৎসবের চতুর্থ দিবসে গুণী-সংবর্ধনা উপলক্ষে স্বনামধন্যা কবি রাধারাণী দেবীকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে সম্মান অর্ঘ প্রদত্ত হয়। সুসজ্জিত বিরাট কংগ্রেস মণ্ডপের মধ্যে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। সুবেশা কুমারীগণ তাঁকে মাল্য-চন্দন, ধূপ দীপ ও শঙ্খনাদে বরণ করেন।

প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহোদয় কবি রাধারাণী দেবীকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠানের সভাপতি ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বাংলা দেশের যশস্বিনী কবি রাধারাণী দেবীর কাব্যপ্রতিভার বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিচয় বিবৃত করিয়া বলেন: শ্রীমতী রাধারাণীর কবি-জীবন অতি বিচিত্র। নিজের প্রতিভায় উচ্চমানে উন্নত হয়ে কি ভাবে মহত্তর কবি হওয়া যায় রাধারাণী দেবী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি নিজের ভিতর থেকে শিক্ষার সমস্ত তত্ত্ব গ্রহণ করে তৎসহ আপন অন্তরের কবি-প্রতিভা মিশিয়ে গতানুগতিক সংস্কারকে পরিবর্তিত করতে সাহসী ও সক্ষম হয়েছেন সৃজনীশক্তির দ্বারা।

ডঃ দাশগুপ্ত বলেন, কংগ্রেস আমাদের জাতির প্রতিনিধি। সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের অর্থই হল সমস্ত জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন। আজকের এই সংবর্ধনার মাধ্যমে রাধারাণী দেবী যে স্বীকৃতি পেলেন এর চেয়েও বড় স্বীকৃতি তিনি পূর্বেই পেয়েছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জলধর সেন, রাজশেখর বসু, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি সাহিত্যানুরাগীগণ রাধারাণী দেবী, তথা অপরাজিতা দেবীর কাব্য-প্রতিভার মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

শ্রীরাধারাণী দেবীকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে প্রদেশ-কংগ্রেস সম্মান-অর্ঘ্য অর্পণ করছেন—একখানি কাংস্যপাত্রে গরদের শাড়ী ও গজদন্ত নির্মিত 'অশোকস্তম্ভ' উপহার দিয়ে।

অপরাজিতা দেবী এই ছদ্মনামে লেখা রাধারাণী দেবীর রচনা এককালে বাংলা দেশে বিস্ময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রাধারাণী দেবীর 'লীলাকমল' 'সী থিমৌর' 'বন-

বিহঙ্গী' প্রভৃতি কাব্যগুলি যেমন জনপ্রিয় হয়েছিল, শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর 'বুকের বীণা', 'পুরবাসিনী', 'আঙিনার ফুল' ও 'বিচিত্ররূপিনী' কাব্যগ্রন্থগুলিও ততোধিক সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচনার সংযম, বলিষ্ঠতা ও স্বচ্ছদ্যুতি সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

প্রতিভাষণ দিতে উঠিয়া শ্রীমতী রাধারাণী দেবী বলেন—

স্বাধীনতা উৎসব-সপ্তাহে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমাদের সাহিত্যলক্ষ্মীর বেদীতে স্বীকৃতিঅর্ঘ দান করা হয়। এ' বৎসর এই ডালি বঙ্গবাণীর মন্দিরে বহন করে নিয়ে যাওয়ার ভার আমার উপরে পড়েছে। এ সম্মানের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার নিজের সংশয় ও সংকোচ আছে।

বাংলাসাহিত্যের সৃজন ক্ষেত্রে আমি দীর্ঘকাল অনুপস্থিত। সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আমার সাহিত্যকর্ম যে দেশবাসীর স্মরণ থেকে বিলুপ্ত হয়নি এর আনন্দ সামান্য নয়।

যে-সাহিত্যকর্ম অজস্রতায় স্ফীত নয়, সাম্প্রতকালের সম্মুখে সোচ্চারও নয়, তার প্রতি লক্ষ্য থেকে প্রমাণ হয় বাংলাদেশের সাহিত্য-সন্ধানীদের দৃষ্টি বর্তমানের সীমিত পরিধিতে একান্ত আবদ্ধ নয়।

আমার সাহিত্য সাধনা শুরু হয়েছিলো তিনদশকের ওপারে। একসময়ে বাংলার কাব্যক্ষেত্রে কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছি। শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় সে-পরীক্ষা ও তার ফলাফলের তাৎকালীন আলোড়ন সম্পর্কে আপনাদের বলেছেন।...

সাহিত্যকে আমি অকৃত্রিম ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় ভালোবেসেছি। নিজের জন্য সাহিত্যকে চাইনি, সাহিত্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে চেয়েছি।...আমার রচনা প্রকাশক সম্পাদক বা পাঠকসমাজে অনাদৃত হয়নি। সাহিত্য সমালোচকদের কাছেও যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছে। সেজন্য দেশের সবাইকার কাছেই আমি কৃতজ্ঞতায় বিনম্র। তবুও কেন আমি লেখনী সংবরণ করলাম, বলি।

মানুষের মধ্যে শিল্পীসত্তার চেয়ে সমালোচক-সত্তা প্রবল হয়ে ওঠার মতো মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব হয়তো অল্পই আছে। আমার সমালোচক-সত্তা আমার লেখনীর কণ্ঠরোধ করেছে। লেখকের লেখনীর চলমান আবেগ সংবরণ করা কঠিন। বোধহয় লেখার সাধনার চেয়ে লেখাবদ্ধ করার সাধনা দুঃসাধ্য।...বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে। যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁরা জানেন, কবিতাকে রুদ্ধ করা যায় না। চিন্তা ও উপলব্ধির বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত আবেগ কাগজ কলমে সংহত ও মূর্ত না করা পর্যন্ত অব্যাহতি নেই। হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে চঞ্চল আলোড়নের অবধি থাকে না। আমিও এর থেকে রেহাই পাইনি। কিন্তু আমার আদর্শে ও রচনায় বাধলো সংঘাত। চলমান নতুনকাল পিছনের কালের উচ্চস্বীকৃত যত দামী সামগ্রীই পুনঃসৃষ্টি করে অনাগত কালের মন্দিরে পৌঁছে দিক, তা' ব্যর্থ, এই হোলো আমার বিশ্বাস। যে-রচনায় আপনকালের নিজস্ব মোহর নেই তা' জঞ্জাল বাড়ায় মাত্র।...এই ধারণার পর থেকে আমি সৃষ্টিক্ষেত্রে আত্মসংযম করেছি। প্রকাশক ও সম্পাদকদের প্রবলতম চাহিদার চাপেও বিগলিত হইনি।... নিজের সৃষ্টি, আত্মজ। আত্মজের প্রতি স্নেহ ও মোহ স্বাভাবিক। তাকে বঞ্চিত ও রুদ্ধ রাখা নিজের নির্মম শাস্তি। কিন্তু, সাহিত্যকে যদি আমরা নির্মুক্ত দৃষ্টি ও উন্নতমান নিয়ে মহত্তম শ্রদ্ধায় ভালোবাসি, তা হলে আত্মজেরও প্রতি কঠোর হওয়া কঠিন হয় না।...

আমি বাংলা সাহিত্যকে কতোটুকু কি দিতে পেরেছি জানিনা। কাল তার বিচারক। এই মাত্র জানি বাংলা সাহিত্যকে সারাজীবন মহান্ শ্রদ্ধায় সসম্মানে সাবধানে গ্রহণ করেছি। লঘুভাবে নিজের আনন্দের উপাদান রূপে গ্রহণ করিনি। বাংলা সাহিত্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং উজ্জ্বল অগ্রগতি লক্ষ্য করে আমি আনন্দে-কৃতার্থ।...হয়তো বা সাহিত্যের প্রতি এই অকপট অনুরাগের জন্যই আমি প্রথম হতে আজ অবধি দেশবাসীর কাছে স্নেহ ও সমাদর লাভ করে গেলাম।

আচার্য্য বিজয়চন্দ্র—

১৯৬১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও পণ্ডিত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জন্মের শতবার্ষিক উৎসব। বিজয়চন্দ্র ১৯৪২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণনগর স্কুলে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সহপাঠী ছিলেন—১৮৮৩ সালে বি-এ পাশ করেন ও ১৮৮৯ সালে তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক প্রকাশিত

হয়। ফরিদপুর জেলার খানকুলার জমীদার হরচন্দ্র মজুমদারের তিনি দ্বিতীয় পুত্র। বামড়া ও শোনপুর রাজ্যে কিছুকাল চাকরীর পর তিনি প্রথমে শিক্ষক ও পরে অধ্যাপক হইয়াছিলেন। সম্বলপুর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করার সময় ১৮৯৫ সালে তিনি বি-এল পাশ করেন ও সম্বলপুরেই ওকালতি করিতেন। ১৯১৪ সালে তিনি হঠাৎ অন্ধ হইয়া যান ও কলিকাতায় চলিয়া আসেন। গুণগ্রাহী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৬ সালে তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন এবং ১২ বৎসরকাল অতীব যোগ্যতার সহিত তিনি সে কাজ করিয়াছিলেন। আমাদের তাঁহার পদতলে বসিয়া শিক্ষার সুযোগ হইয়াছিল এবং তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য, স্মৃতিশক্তি ও মেধা তাঁহাকে সকলের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করিয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষের ১ম বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেগুলি সে সময়ে সুধীজনের সমাদর ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। তিনি আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেনের সহিত বঙ্গবাণী নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন ও বহু সাময়িক পত্রে তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্রূপ বিকল্প, ফুলশর, কথা ও বীথি, যজ্ঞভস্ম, উদানম্, হেঁয়ালী, থেরীগাথা, তপস্যার ফল, গীতগোবিন্দ, পঙ্কমালা, কথা নিবন্ধ, কালিদাস, প্রাচীন সভ্যতা, ছিটেফোঁটা, রুচিরা, খেলাধুলা প্রভৃতি বহু বাংলা গ্রন্থ ও কয়েকখানি মূল্যবান ইংরাজি গ্রন্থ লিখিয়া তিনি বিদ্বৎ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার জীবন ও দানের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার জন্ম শতবার্ষিক উৎসবে আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি ও প্রার্থনা করি, তাঁহার আশীর্বাদ আমাদের সুপথে পরিচালিত করুক।

কিশোরী কবির স্মৃতি সভা—

কিশোরী কবি মিনতি নাথের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতি-সভা গত ৩০শে আগষ্ট কলিকাতার কুমার সিং হলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভানেত্রী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত ও প্রধান অতিথি ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ তাঁদের ভাষণে স্বর্গীয়া কবির কবিতাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং অকালে এরূপ প্রতিভার প্রয়াণে দুঃখ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই উপলক্ষে তাঁদের বাণী পাঠাইয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য সঙ্কট—

গত কয়মাস হইতে পশ্চিমবঙ্গে মাছের বাজারে আগুন লাগিয়াছে। মাছের সের ৩ টাকা হইতে উঠিয়া ৬ টাকা হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের লোক বেশী মাছ খায়—অথচ পশ্চিমবঙ্গে বাহিরের মাছ কম আসিতেছে—এ রাজ্যেও আর প্রচুর মাছ উৎপন্ন হয় না—এ সকল কারণ থাকিলেও মাছের বড় বড় ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য মাছের দর বাড়াইয়া দিয়াছিল। এক শ্রেণীর লোকের জন্য বাজারে মাছ অবিক্রীত থাকে না। এ অবস্থায় কয়েকদিন ধরিয়া কলিকাতা ও সহরতলীর বহু বাজারে ক্রেতারা সত্যাগ্রহ করিয়া মাছ বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল—তাহার পর মৎস্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ নানা সভা-সম্মেলন করিয়া মাছের একটা দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফলও সন্তোষজনক হয় নাই। দেশের লোক মাছের চাষ না বাড়াইলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না। পূর্ব-পাকিস্তান তাহাদের খেয়াল-খুশী মত মাছ রপ্তানী করে—উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মধ্যভারত প্রভৃতি হইতে মাছ আনার চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে সমস্যার সমাধান হইবে না। যাহাতে পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশী মাছ উৎপাদনে লোক আগ্রহান্বিত হয়, তাহার ব্যবস্থা না করিলে এ সমস্যা সমাধানের অন্য কোন উপায় নাই।

তরকারীর মূল্য বৃদ্ধি—

গত বৎসর পাটের দাম খুব বেশী ছিল, সে জন্য এ বৎসর চাষীরা তাহাদের জমীতে অন্য চাষ বন্ধ করিয়া দিয়া বেশী পরিমাণে পাট চাষ করায় এবার পশ্চিমবঙ্গে তরকারীর মূল্য খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বেগুন, উচ্ছে, ঢেড়শ, দেশী বা বিলাতী কুমড়া, শাক প্রভৃতি বাজারে দুর্মূল্য। আলুর বাজারে ফাটকাবাজির ফলে ও ঠাণ্ডাঘরগুলিতে আলু রাখার ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য আলুর দামও ২৫ টাকা মণ হইয়াছে। পাহাড় অঞ্চলের বাঁধা কপি, ফুলকপি, বীণ প্রভৃতি উড়োজাহাজে কলিকাতায় আনিয়া বেগুন, পটোল অপেক্ষা সুলভে বিক্রয় করা হয়। কেন যে এ দেশের গৃহস্থগণ নিজ নিজ জমীতে বা গৃহ প্রাঙ্গণে তরিতরকারীর চাষে মনোযোগী হন না—তাহার কারণ বুঝা যায় না।

তরকারীর চাষ বাড়াইলে তরকারী সুলভ হয় ও লোক অধিক পরিমাণ তরকারী খাইয়া অন্য খাদ্যের অভাব পূর্ণ করিতে পারে। কলার চাষের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে—বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে নারিকেলের চাষ বাড়িতেছে না। সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে কোনরূপ উৎসাহ বা চেষ্টা দেখা যায় না। আমরা তরুণ কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুত তরুণ-কান্তি ঘোষকে এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ—

১৯৬১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় ১৮জন ছাত্রী প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে ১১জন কলিকাতা লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রী। দর্শনশাস্ত্রের অনার্সে ৪জন ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণী পাইয়াছেন—তন্মধ্যে ৩জন লেডী ব্রেবোর্ণের ছাত্রী। ভূগোল ও ফার্সী অনার্সে মাত্র ২জন করিয়া প্রথম শ্রেণী পাইয়াছেন—৪ জনই উক্ত কলেজের ছাত্রী। তাহা ছাড়া ৭০জন ছাত্রী উক্ত কলেজ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছেন। বি-এ পাশের হারও শতকরা ৯৭ জন। প্রিন্সিপাল সুপণ্ডিত শ্রীমতী রমা চৌধুরীর পরিচালনায় কলেজটি শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে দেখিয়া সকলেই আনন্দানুভব করিবেন।

নদী-বিশেষজ্ঞের প্রস্তাব—

পশ্চিমবঙ্গের নদী-বিশেষজ্ঞ খ্যাতনামা এঞ্জিনিয়ার শ্রীকপিল ভট্টাচার্য্য গত ৩রা সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন—ফারাক্কায় ব্যারেজ নির্মাণ না করিয়া ভাগীরথী মুখ হইতে হুগলী মুখ পর্য্যন্ত সমগ্র নদীটিকে সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। ভাগীরথীর মুখে পদ্মা নদী হইতে যাহাতে যথেষ্ট জল ভাগীরথীতে স্বাভাবিক গতিতে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা দরকার। শুধু ফারাক্কার নিকট গঙ্গাবাঁধ নির্মাণের ফলে কলিকাতা বন্দর-রক্ষার সমস্যার সমাধান হইবে না। রূপনারায়ণ নদীরও সংস্কার ব্যবস্থার প্রয়োজন। রূপনারায়ণ হইতে স্বাভাবিক জলধারা হুগলী নদীতে প্রবেশ করিলে হুগলী নদীর বহতা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে ও সামগ্রিক ভাবে কলিকাতা বন্দর রক্ষা পাইবে। ভাগীরথীর নদীবক্ষের মাটি কাটিয়া উহার গভীরতা বৃদ্ধি সর্ব-প্রথমে প্রয়োজন। ৫।৬ কোটি টাকা ব্যয় করিলে জলপ্রবাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইবে—ঐ ভাবে মোকামায় রাজেন্দ্র পুল ও পূর্ব-পাকিস্তানে হার্ডিঞ্জ পুলে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। তিনি সরকারী কর্তৃ-পক্ষকে তাঁহার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

শ্রীনেহরু ও পঞ্চনেতা—

বেলগ্রেডে ৫ দিন ব্যাপী ২৪টি নিরপেক্ষ দেশের প্রধান-গণের সম্মিলন আহ্বান করা হইয়াছিল—যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটো ও ৫ জন প্রধান নেতা ছিলেন—ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নাসের, ঘানার প্রেসিডেণ্ট নক্রুমা, ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী উ-নু ও ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ। জগতের দুইটি সর্ববৃহৎ বিবদমান জাতি—মার্কিণ ও রুসের মধ্যে কি উপায়ে আপোষ করিয়া জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াই ২৪টি নিরপেক্ষ দেশের প্রধানগণ এই সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ?—

২রা সেপ্টেম্বর বেলগ্রেড হইতে খবর আসিয়াছে—বর্তমান সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। পরিস্থিতি যেরূপ তাহাতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে। ভারতীয় নেতার অন্তরঙ্গ মহল বলেন যে—বিশ্বপরিস্থিতিতে শ্রীনেহরুর এরূপ নৈরাশ্যপূর্ণ ভাব কখনও দেখা যায় নাই। তিনি তাঁহার সঙ্গের লোকজনের নিকট বলেন—আমরা নিরুপায়, বৃহত্তর রাষ্ট্রসমূহ যদি তাহাদের বিরোধ না মিটাইতে পারেন, আমরা কি করিতে পারি? তাঁহাদের দিক হইতে ঘটনা পরম্পরায় পরিস্থিতি এইরূপ যে সঙ্কটের পর সঙ্কট সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে। এ অবস্থায় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়।

১লা সেপ্টেম্বর হইতে বেলগ্রেডে ২৪টি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শীর্ষক সম্মিলন বসিয়াছিল। প্রথম দিনে যুগোশ্লা-ভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো ৪ হাজার শব্দ সম্পর্কিত এক বক্তৃতা করিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীনেহরু নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের জরুরী কর্তব্য সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বিবৃত করিলে সকল সদস্যকে তাঁহার কথা প্রভাবিত করে। রুশিয়া ও আমেরিকা যাহাতে মিলিত হইয়া শান্তি স্থাপনে অগ্রসর হয়, শ্রীনেহরু সে জন্য চেষ্টা করিতে সকলের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন।

জ্যোতিষের আলোচনা

উপাধ্যায়

যে নারীর লগ্ন কন্যা এবং লগ্নে রবি ও শনি, সপ্তমে বৃহস্পতি এবং দ্বাদশে রাহু অবস্থিত, যে নারী স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হবে। রবি এবং শনি দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদ কারক। কোন স্ত্রীলোকের কোষ্ঠীতে রবি সপ্তমে থাক্‌লে সে স্বামী পরিত্যক্তা হবে, শনির অবস্থিতিও রবির মত ফলদাতা। দ্বিতীয়ে ভৌমদোষস্থ কন্যা মিথুনয়ো বিনা, কন্যা এবং মিথুন রাশিতে লগ্নের দ্বিতীয় স্থান হোলে আর এখানে মঙ্গল থাক্‌লে অশুভ হয় না। পাতালে ভৌম দোষস্থ মেষ বৃশ্চিকয়োর্বিনা। মেষ ও বৃশ্চিক লগ্নের চতুর্থস্থান হোলে ভৌম দোষ হয় না। সপ্তমে ভৌম দোষস্থ নক্র কর্কটয়োর্বিনা। কর্কট এবং মকর লগ্নের সপ্তমস্থান হোলে ভৌম দোষ হয় না। অষ্টমে ভৌম দোষস্তু চাপ মীনোদয়োর্বিনা। ধনু এবং মীন লগ্নের অষ্টমস্থান হোলে ভৌমদোষ হয়না। বৃষ এবং সিংহ লগ্নের দ্বিতীয়স্থান যথাক্রমে মিথুন ও কন্যা। দ্বিতীয় স্থান পারিবারিক স্থান। এখানে মঙ্গলের অবস্থিতি শুভকারক। কেননা নৈসর্গিক পাপ গ্রহ মঙ্গল শুভ হয়েছে কেন্দ্রাধিপত্য হেতু। এজন্যে তার অবস্থান ও দৃষ্টি শুভ প্রদ, সিংহ লগ্নের মঙ্গল যোগকারক কেন্দ্র কোণাধিপতি হেতু। এজন্যে তার অবস্থিতি ও দৃষ্টি যে যে স্থানে আছে সেই সেই স্থান অশুভ হবে না। কর্কট লগ্নের মঙ্গল যোগ কারক। মকর মঙ্গলের উচ্চস্থান কেন্দ্রাধিপত্য হেতু মঙ্গলের অশুভত্ব নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় কর্কট লগ্নে মঙ্গলের অবস্থান শুভ প্রদ হোতে পারে না, মঙ্গল এখানে নীচস্থ হওয়ায় দুর্ব্বল। এটা আলোচনা সাপেক্ষ। বৃষ এবং সিংহ লগ্নের পক্ষে মঙ্গলের কেন্দ্রাধিপত্য হেতু শুভ। কিন্তু সপ্তমাধিপতি মঙ্গল অষ্টমস্থান (অর্থাৎ নিধন স্থান) অধিকার করে থাকলে কেমন করে শুভ হবে এটাও বিচার্য্যের বিষয়। সিংহের নবমাধিপতি মঙ্গল, এজন্য শুভ। মঙ্গল যে গৃহে অবস্থান করে তার অধিপতি যদি লগ্ন বা চন্দ্র থেকে কেন্দ্র বা কোণে অবস্থান করে তাহোলে ভৌম দোষজনিত দাম্পত্য বিচ্ছেদ বা বৈধব্যাদি দোষ ভঙ্গ হয়। মঙ্গল বৃহস্পতির সঙ্গে সহাবস্থান করে ভৌম দোষ উৎপাদক গৃহ গুলিতে থাকলে মঙ্গল দোষ জনিত বৈধব্যাদি দোষ খণ্ডন হয়। ভৌমস্থিতোথদি কেন্দ্র কোণে তদ্দোষনাশং প্রবদন্তি সন্তঃ। গুরু মঙ্গলসংযোগে ভৌম দোষো ন বিদ্যতে।

চন্দ্রের সঙ্গে মঙ্গল সহাবস্থান করলে শশি মঙ্গল যোগ হয়। এযোগে ভৌম দোষ ঘটে না। শনি মঙ্গল সংযোগে ভৌম দোষো ন বিদ্যতে। মঙ্গল বুধের সঙ্গে একত্র থাক্‌লে বা বুধের দ্বারা দৃষ্ট হোলে ভৌম দোষ খণ্ডন হয়। বুধোযুক্তেহথবা নিরীক্ষিতে তদ্দোষ নাশং প্রবদন্তি সন্তঃ। আশ্চর্য্য এই যে, ঘোটক বিচারের সময় এসবগুলি জ্যোতিষীরা লক্ষ্য করে বলেন না, এসব দোষখণ্ডনের সূত্র অনেকের পক্ষে না জানা ও সম্ভব। মঙ্গল তৃতীয়াধিপতি হয়ে দ্বাদশে থাক্‌লে পৃষ্ঠজাত ভ্রাতাদের আয়ু অল্প হয়। তৃতীয় স্থানে রবি ও অনুরূপ ফলদান করে। উচ্চস্থ-শনির দৃষ্টি নীচস্থ অবস্থার দৃষ্টি অপেক্ষা কম অশুভ ফল দেয়। বৃহস্পতির পক্ষেও অনুরূপ ফল। চতুর্থস্থান থেকে উদ্যানের বিচার হয়, বুধ উদ্যানকারক গ্রহ। চতুর্থাধিপতি হয়ে বুধ শুভ ভাবে থাক্‌লে জাতকের উদ্যান তৈয়ারী করা বাতিকে পরিণত হবে। দ্বাদশে বুধ থাক্‌লে জাতক উদ্যান নিয়ে নাড়া চাড়া করবার যথেষ্ট সুযোগ পাবে।

শনি ও চন্দ্র পাপ গ্রহে সঙ্গে মেষ, কর্কট, মকর ও মীনে থাক্‌লে জাতক বা জাতিকা খঞ্জ হয়। ষষ্ঠে রবি, মঙ্গল ও শনি থাক্‌লে খঞ্জযোগ। শনি এবং ষষ্ঠাধিপতি দ্বাদশে থেকে পাপগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হোলে মানুষ খোঁড়া হয়। অষ্টমাধিপতি ও নবমাধিপতি পাপ গ্রহের সঙ্গে চতুর্থে থাকলে অনুরূপ ফল হয়। কর্কটে শনি চন্দ্র থাকলে আর এখানে শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকলে মানুষ খঞ্জ হয়। শনি শুক্র একত্র থাকলে এবং এদের ওপর শুভ গ্রহের দৃষ্ট না থাকলে অথবা শনি সপ্তমাধিপতি হয়ে পাপ গ্রহের সঙ্গে অবস্থান করলে খঞ্জযোগ হয়। রবি অষ্টমে, দ্বিতীয়ে চন্দ্র, আর শনি দ্বাদশে, অথবা চন্দ্র ষষ্ঠ, রবি অষ্টমে, মঙ্গল দ্বাদশে ও শনি দ্বিতীয়, অথবা লগ্ন কিম্বা শুক্র থেকে সপ্তমে রাহু অবস্থান করে ও রবি দৃষ্ট হয়, কিম্বা শনি চতুর্থস্থান থেকে পাপ দৃষ্ট হয়

অথবা লগ্নাধিপতি ও দ্বিতীয়াধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে, সিংহ-লগ্নে রবি চন্দ্র একত্রে অবস্থান করে—শনি মঙ্গলের দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহোলে মানুষ অন্ধ হয়। কর্কট, বৃশ্চিক অথবা মীনে বুধ চন্দ্রের দ্বারা দৃষ্ট হোলে এবং দিবা জন্ম হোলে মানুষ বোবা হয়। বুধ এবং ষষ্ঠাধিপতি লগ্নে থাকলে, বৃহস্পতি এবং ষষ্ঠাধিপতি লগ্নে থাকলে, বৃহস্পতি এবং দ্বিতীয়াধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশে থাকলে মানুষ মূক হয়। মঙ্গল লগ্ন থেকে দ্বাদশে থাকলে এর দশান্তর্দ্দশায় বিস্ফোটক ও নানা প্রকার বাধা বিপত্তি ও ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করে। সপ্তমে শনি বিবাহ-বিচ্ছেদকারক। শনি তুলা, বৃশ্চিক এবং কুম্ভে থাকলে তার দশা অন্তর্দ্দশায় উত্তম ফল দান করে, রাহু মূল ত্রিকোণে, স্বক্ষেত্রে, তুঙ্গ স্থানে থাকলে তার দশান্তর্দ্দশায় উত্তম ফলদান করে। শুক্র এবং চন্দ্রের দশান্তর্দ্দশায় মানুষ কামুক হয়ে ওঠে এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। শুক্র বা চন্দ্র এই দুইটী গ্রহ যখনই দশা বা অন্তর্দশা ভুক্ত হয় তখনই মানুষের যৌন-উদ্দীপনা দেখা দেয় এবং প্রণয়াসক্তি, অবৈধ প্রেম প্রভৃতির দিকে মন টানে। শনি যকৃতের দোষ আনে। ষষ্ঠে চন্দ্র থাকলে স্নায়ুঘটিত দোষহেতু মানুষ কষ্ট পায়, গোচরে শনি আড়াই বছর থাকে, শেষ ছয় মাস মানুষকে খুব কষ্ট দেয়। এসময় শনির দশা থাকলে মারাত্মক হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে শান্তি কর্ম্মাণি সর্ব্বত্র ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা।

রবি, চন্দ্র, লগ্ন, লগ্নাধিপতি এবং নবমস্থান উত্তম না হোলে মানুষের সৌভাগ্য বৃদ্ধি সুন্দর ভাবে হয় না। নৈসর্গিক শুভগ্রহ বৃহস্পতি কেন্দ্রাধিপত্য হেতু অশুভ হোলে নৈসর্গিক পাপগ্রহ শনি, রাহু এবং মঙ্গলের চেয়ে খারাপ ফল দেয়। দ্বিতীয়ে, চতুর্থে, সপ্তমে, অষ্টমে এবং দ্বাদশে মঙ্গল আর শুক্র দুর্ব্বল হোলে পুরুষের দ্বিভার্য্যা যোগ। রবি পঞ্চম স্থানে নীচস্থ হয়ে থাক্‌লে মকর কিম্বা কুম্ভের নবাংশে অথবা পাপ মধ্যস্থ হয়ে থাক্‌লে জাতকের পিতৃশাপে সন্তান হানি হয়। বৃহস্পতি লগ্নে এবং মঙ্গল সপ্তমে থাক্‌লে মতিভ্রংশযোগ হয়। লগ্নে শনি এবং পঞ্চম, সপ্তম, অথবা নবমে মঙ্গল, ক্ষীণ চন্দ্রের সঙ্গে দ্বাদশে শনি, চন্দ্র এবং বুধ অন্য গ্রহের সহিত সহাবস্থানে বা দৃষ্টিতে কেন্দ্রস্থ থাক্‌লে এই যোগ হয়। এই যোগের ফলে মানুষ উন্মাদ হয়। শনি চন্দ্রের সঙ্গে একত্র থাক্‌লে নিষ্ঠুর-ভাষী যোগ হয়। এই যোগের ফলে মানুষ কটু কাটব্য উক্তি করে এবং অপরের মর্ম্মে আঘাত করে তৃপ্তি পায়। এর ওপর মঙ্গল দৃষ্টি দিলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক শব্দ প্রয়োগ কর্‌তেও কুণ্ঠা বোধ করেনা। লগ্নে রাহুও চন্দ্র এবং পাপগ্রহ ত্রিকোণে থাক্‌লে পিশাচ গ্রস্ত যোগ হয়। এই যোগে মানুষকে অপদেবতায় আচ্ছন্ন করে। লগ্নে চন্দ্র, সপ্তমে শুক্র এবং চতুর্থে পাপগ্রহ থাক্‌লে বংশচ্ছেদ যোগ হয়। এই যোগে জন্ম হোলে জাতকের পর বংশ লোপ হ'য়ে যায়। ক্ষীণ চন্দ্র পঞ্চমে, লগ্নে সপ্তমে এবং দ্বাদশে পাপ গ্রহ থাক্‌লে পুত্র কলত্র হীন যোগ হয়। এ যোগে জাতকের স্ত্রী পুত্রাদি কিছুই থাকে না।

দশা বিচার কালে দৃষ্টি, চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ক্ষেত্র বিনিময় প্রভৃতি বিচার্য্য। পাপগ্রহ কেন্দ্রাধিপত্য হেতু শুভ হোলে তার দশায় শুভ গ্রহের অন্তর্দ্দশায় শুভ ফল দান করে। শুক্র এবং শনি শুভ হোলে এরা পরস্পরের দশান্তর্দ্দশায় শুভ ফলপ্রদাতা হয়, অশুভ হোলেও নিজেদের দশান্তর্দ্দশায় ক্ষতিকারক হয় না ; তবে এদের উভয়ের মধ্যে একটি শুভ আর অপরটি পাপ হোলে ক্ষতি করে। গ্রহরা জন্ম-কুণ্ডলীতে উচ্চস্থ কিন্তু নবাংশে নীচস্থ হোলে অশুভ ফল দান করে। নবাংশে উচ্চস্থ এবং জন্মকুণ্ডলীতে নীচস্থ গ্রহ শুভ ফল দাতা। যে কোন গ্রহ নিজের দশান্তর্দ্দশায় ফল না দিয়ে পূর্ব্বের দশান্তর্দ্দশায় ফল দান করে। কেবল রাহু ও কেতু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। পূর্ব্বের দশা যদি ভালো হয় এবং পরবর্ত্তী দশা মন্দ হয় তাহোলে পূর্ব্বের ভালো ফল পরবর্ত্তী দশার অন্তর্দ্দশা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চল্‌তে থাকে। অন্তর্দ্দশাধিপতি স্বাধীন ভাবে কোন ফল দিতে পারে না দশাধিপতির সঙ্গে সম্বন্ধ না করলে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে দশাধি পতি তার অন্তর্দ্দশায় ভালো ফল দিয়ে পরবর্ত্তী অন্তর্দ্দশায় মন্দ দিয়েছে কিন্তু এটা সাধারণতঃ হয় না। দশাধিপতি অশুভ হোলে, তার সঙ্গে সম্বন্ধকারী গ্রহরাও অন্তর্দ্দশায় অশুভ ফল দান করে। সম্বন্ধকারী গ্রহরা শুভ হোলে মোটামুটি ভালো ফল অন্তর্দ্দশায় দিয়ে থাকে। দশা ও অন্তর্দ্দশায় শুক্র ও শনি মন্দ ফল দেয়, বৃষলগ্নের পক্ষে শনি ও শুক্র দশান্তর্দ্দশায় রাজ যোগের ফল দান করে। ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশে অবস্থিত নীচস্থ গ্রহের দশা অশুভ। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, নবম ও একাদশ স্থানে অবস্থিত নীচস্থ গ্রহের দশা সাধারণতঃ শুভ। শুভ গ্রহের দশান্ত র্দ্দশায় বাহন লাভ হয়। দ্বিতীয় ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, একাদশ অথবা দ্বাদশাধিপতির দশায় পঞ্চমাধিপতি বা নবমাধি পতির অন্তর্দ্দশায় পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট হোলে দুঃখ দাতা হয়। শনির দশা চতুর্থ দশা, মঙ্গলের দশা পঞ্চম দশা, বৃহস্পতির দশা ষষ্ঠ দশা আর রবির দশা সপ্তম দশা হোলে সেই দশায় মানুষের মৃত্যু ঘটে।

—

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফল

মেষ রাশি

ভরণী নক্ষত্র জাত ব্যক্তি গণের পক্ষে উত্তম, গোচরের অশুভ প্রভাব গুলি এদের ওপর বিশেষ পড়বে না। অশ্বিনী ও কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে অল্প বিস্তর গোচরের শুভাশুভ ফলগুলির প্রাপ্তি যোগ আছে। অশুভ প্রভাবগুলি প্রাধান্য লাভ করবে। শেষার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধ ভালো বলা যায়। সাফল্য, নিজের পরিচিত মহলে প্রশংসা অর্জ্জন, লাভ, সুখ-স্বচ্ছন্দতা, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি ক্রয় এবং উপভোগ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, ভ্রমণ, শুভ সমাচার, বন্ধুবর্গের সাহায্যপ্রাপ্তি, প্রিয় স্বজন সমাগম প্রভৃতি শুভফলের আশা করা যায়। ক্ষতি, অপ্রিয় পরিবর্ত্তন, অপবাদ, কলহ

মর্য্যাদাহানি, প্রচেষ্টায় বাধা, মনোমালিন্য, দুশ্চিন্তা, শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট লাঞ্ছনাভোগ। শেষের দশদিন এগুলি বিশেষ পরিলক্ষিত হবে। উদর ও চক্ষু পীড়া, প্রথমার্দ্ধে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। স্ত্রী ও সন্তানাদির পীড়া ও স্বাস্থ্যহানি। পারিবারিক ক্ষেত্র সন্তোষজনক যদিও সামান্য কলহ-বিবাদ বা কথা কাটাকাটি হোতে পারে। পরিবারের মধ্যে নবসন্তান সন্ততির জন্ম লাভ। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা কিছুটা প্রকাশ পাবে। নানাদিক থেকে লাভের সম্ভাবনা এবং প্রচেষ্টাগুলিও মোটামুটিভাবে সফল হবে। গৃহ সম্পত্তি ও টাকা লেনদেন বা লগ্নীতে লাভের সুযোগ। চারুকলা, শিল্পসঙ্গীত, ছায়া মঞ্চ প্রভৃতি থেকেও লাভের আশা আছে। গৃহ ভূম্যাদি ক্রয়ে পক্ষে উত্তম সুযোগ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূস্বামীর পক্ষে মাসটি উত্তম। চাকুরিজীবিরাও শুভ ফল লাভ করবে। কর্ম্ম-দক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রকাশের দরুণ উপরওয়ালার সুদৃষ্টির ফলে কর্ম্মোন্নতির সুযোগ আসবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য নির্দ্দেশ করে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিদের পক্ষে মাসটা আশাপ্রদ নয়, পদে পদে বাধা। [illegible] মাসটা মন্দ যাবে না, বিশেষতঃ প্রথমার্দ্ধ তো ভালোই বলা যায়। রেসে প্রাপ্তিযোগ আছে। বহিঃক্ষেত্র অপেক্ষা পারিবারিক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের পক্ষে সন্তোষজনক পরিস্থিতি। ঘর সাজানোর জন্যে কিছু কিছু আসবাবপত্র কিনবারও সম্ভাবনা। অবৈধ প্রণয়, পিকনিক, ভ্রমণ, পরপুরুষের সঙ্গে বেশী মেলামেশা বিপত্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ রাশি

রোহিণীজাতগণের পক্ষে উত্তম, গ্রহবৈগুণ্যদোষ হেতু অশুভ ফলগুলির সম্মুখীন না হওয়াই সম্ভাবনা বেশী। মৃগশিরার পক্ষে মাধ্যমিক অবস্থা। কৃত্তিকাজাতগণেরই কষ্টভোগ বিশেষভাবে হবে আর অশুভ ফলগুলির সঙ্গে বেশী পরিচয় ঘটবে। প্রথমার্দ্ধে অশুভ ঘটনাগুলির সমাবেশ, শেষের দিকে অল্পই সম্ভব। দুঃখ বাধা বিপত্তি, স্বজন বন্ধু বিরোধ, শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য কষ্টভোগ, স্বাস্থ্যহানি ও দুর্ব্বলতা, অকারণ প্রচেষ্টা, মর্য্যাদাহানি, দুঃসংবাদ প্রাপ্তি প্রভৃতি অশুভ ঘটনার সমাবেশ। শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী জয়, প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মানের বৃদ্ধি, লাভ, জনপ্রিয়তা প্রভৃতি শুভফল। এমাসে বিশেষ ভালোমন্দ দেখা যায় না, গতানুগতিকতারই সুস্পষ্টতা দেখা যায়। স্বাস্থ্যের অবনতি বিশেষভাবে হবে না। সাধারণ দুর্ব্বলতা। যাদের রক্তঘটিত পীড়া, তাদের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। পারিবারিক ক্ষেত্র ঘটনাবহুল নয়, সন্তানাদির সঙ্গে কথা কাটাকাটি মাত্র হোতে পারে। পারিবারিক ব্যাপারে ভ্রমণ হোতে পারে। গৃহে কোন শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানের সম্ভাবনা, আর্থিক দিকটা সুবিধাজনক নয়। অর্থকৃচ্ছ্রতা বা অনাটন মাসের প্রথমার্দ্ধে সম্ভব, দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থের প্রাচুর্য্য। সাধারণতঃ আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ হোলেও কোন পরিকল্পনায় হাত না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। কৃষিজীবিদের পক্ষে মাসটী শুভ নয়, নৈসর্গিক দুর্য্যোগে কৃষিকর্ম্ম ব্যাহত হবে এবং সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা। ভূস্বামী ও বাড়ীওয়ালারাও নানা অসুবিধাও কষ্টভোগ করতে পারে। মাসের প্রথম দিকে চাকুরিজীবিদের পক্ষে আশাপ্রদ নয়, যতদিন যাবে ততই ভালোর দিকে অগ্রসর হওয়ার যোগ, শেষের দশদিন উত্তম। কর্ম্মনৈপুণ্য হেতু উপরওয়ালার দৃষ্টিতে আসার দরুণ চাকুরিজীবির পক্ষে উত্তম সুযোগ, ভবিষ্যতের উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মিশ্রফল—লাভ ক্ষতি দুই-ই ঘটবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী উত্তম। চিত্তের প্রফুল্লতা, মনের ঔদার্য্য ও উদার অন্তরের পরিচয় লক্ষ্য করা যাবে। সৌখীন সম্প্রদায়ের শিল্পকলা, এবং যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীতের দিকে উন্নতি করবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না। এরা প্রশংসা ও সমাদর লাভ করবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যয়ের সম্ভাবনা থাকায় সতর্কতা আবশ্যক। অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সমাদর প্রাপ্তি। শেষার্দ্ধে রেসে লাভ হোতে পারে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী উত্তম।

মিথুন রাশি

পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়, গোচরের অশুভ প্রভাবগুলি এদের ওপর পড়বে না। মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে মধ্যম সময়। আর্দ্রা-জাতগণের পক্ষে মধ্যম সময়। মাসটি মিশ্রফলদাতা। প্রথমার্দ্ধটী দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা শুভ। সাফল্য, লাভ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, উত্তম বন্ধু, উত্তম পরিবর্ত্তন, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাসব্যসন, শত্রুজয়, প্রভাব ও প্রতিপত্তি মাসের প্রথমার্দ্ধে পরিলক্ষিত হয়। আত্মীয়-স্বজন ও ভৃত্যদের জন্য কষ্টভোগ ক্ষতি, মামলা মোকর্দ্দমা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, দুঃখ, অসম্মান, কলহ, ক্ষতিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ, শারীরিক অসুস্থতা, উদ্বেগ, অশান্তি প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। এগুলি শেষার্দ্ধে ঘটবে। মাসের প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্য মোটামুট ভালো, পরে স্বাস্থ্য-হানির প্রবণতা। স্নায়ুদৌর্ব্বল্য ও সাধারণ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেলেও সাংঘাতিক রকমের কোন পীড়া ঘট্‌বেনা। পারিবারিক অশান্তির যোগ আছে। ছেলে মেয়ে ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ, ও মনোমালিন্য সূচিত হয়। এজন্যে ধৈর্য্যও সহিষ্ণুতার আবশ্যক। আর্থিক হ্রাস বৃদ্ধি দিনে দিনে প্রকাশ পাবে। অল্পবিস্তর ক্ষতি লেগেই থাকবে, কোন প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়া অনুচিত। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থকৃচ্ছ্রতার সম্ভাবনা। অপরিচিত ব্যক্তি বা প্রতারকদের কোন পরিকল্পনায় কর্ণপাত করে তার পরামর্শে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ বিশেষ ক্ষতিকর হয়ে উঠ্‌বে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। কৃষিজীবী, বাড়ীওয়ালা ও ভূস্বামীর পক্ষে মাসটা ভালো বলা যায় না, তবে শেয়ার, জমিজমা, ভূসম্পত্তি-সংক্রান্ত ব্যাপারে শুভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধটী শুভ, কোন কল্যাণকর পরিবর্ত্তনের আশা করা যায়। মাসটী তবুও নানা অপ্রিয়কর ব্যাপারের মধ্য দিয়ে যাবে, উপরওয়ালার সঙ্গে বনিবনাও হবে না। ব্যবসায়ীও বৃত্তিজীবির পক্ষে প্রথমার্দ্ধটী মন্দ যাবে না। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু কিছু বাধা আস্‌তে পারে, ক্ষতি ও কিঞ্চিৎ আশঙ্কা করা যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী উত্তম। দ্বিতীয়ার্দ্ধটী সম্বন্ধে একটু সতর্কতা অবলম্বন

বাঞ্ছনীয়। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে সমাদর লাভ। সঙ্গীত, শিল্পকলায় খ্যাতি, বিলাস ব্যসন, অলঙ্কার ও বেশভূষার দ্রব্যাদি লাভ, রেসে পরাজয়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী মধ্যম।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষাজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম সময়, পুষ্যাজাতগণের মধ্যে মধ্যম। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধটী উত্তম। স্বাস্থ্যোন্নতি, শত্রুজয়, উত্তম বন্ধুলাভ, সুখস্বচ্ছন্দতা, প্রচেষ্টায় সাফল্য, বিলাসিতা, সৌভাগ্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিদ্যার্জ্জনে উন্নতি ও সাফল্য, সর্ব্বপ্রকার আনন্দ উপভোগ, উপঢৌকনাদি প্রাপ্তি প্রভৃতি শুভ ঘটনাগুলি দ্বিতীয়ার্দ্ধে দেখা যায়, প্রথমার্দ্ধে নানা প্রকার বন্ধু ও স্বজন বিরোধ সম্ভব। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। পারিবারিক শান্তি অক্ষুন্ন থাকবে। কলহ বিবাদের সম্ভাবনা নেই। আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য, শেষার্দ্ধেই বিশেষ সাফল্যলাভ। নিজের চেষ্টায় অর্থোপার্জ্জনের অনেক সুযোগ আসবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে জয়লাভ। ভূম্যধিকারী বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। পদোন্নতি বা উচ্চপদ মর্য্যাদালাভ। কর্ম্মনৈপুণ্যের জন্য প্রশংসা পাওয়ার যোগ, ফলে উপরওয়ালার সুনজর। স্থান পরিবর্ত্তনের আনুকূল্য ও শুভফল প্রাপ্তি। ব্যবসায়ী বৃত্তিজীবির পক্ষে ও সময়টী বেশ ভালো যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী উত্তম। অবৈধপ্রণয়ে অসাধারণ সাফল্য। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে, প্রভাব প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদালাভ। কোন রকম আশা ভঙ্গ, দুশ্চিন্তা বা মানসিক কষ্টের সম্ভাবনা নেই। নানাপ্রকার উপঢৌকন লাভ। চাকুরিজীবী নারীর পক্ষে ও মাসটীতে নানাদিকে সুবর্ণ সুযোগ। অবিবাহিতাদের বিবাহের কথাবার্ত্তা চলবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে উত্তম সময়।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম সময়। মঘা ও উত্তর ফল্গুনীর পক্ষে একই প্রকারে শুভাশুভ ফললাভ। এমাসের মোটামুটি ফল সন্তোষজনক নয়। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধ কিছুটা শুভ। প্রচেষ্টায় বাধা, উদ্দেশ্যহীন ক্লান্তিকর ভ্রমণ, সম্মান হানি, স্বজন বন্ধু বিরোধ, শত্রুর দ্বারা নির্য্যাতন, স্বাস্থ্যহানি, রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষদের বিরাগ ভাজন হওয়া, অকারণ অপবাদ প্রভৃতি যোগ আছে। শেষ দশদিন কিছু সুখ, সাফল্য, বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ প্রভৃতি সম্ভব। প্রথমার্দ্ধে শারীরিক কষ্ট, উদর শূল, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, রক্তের চাপ, পিত্তবায়ু প্রকোপ যোগ আছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে মতদ্বৈধ হেতু কলহ বিবাদ, এজন্য শান্তি শৃঙ্খলার হানি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছুটা হ্রাস পাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্রফল, লাভক্ষতি দুইই ঘটবে। সাধারণতঃ দ্বিতীয়ার্দ্ধ অনেকটা ভালো হবে। কিন্তু অপরিমিত ব্যয়ের ঝোঁক থাকবে, এ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী শুভ নয়। চাকুরিজীবির পক্ষে খানিকটা দুর্ভোগ আছে, উপরওয়ালা ও ভৃত্যাদির সঙ্গে বনিবনাও হবে না। কর্ম্মক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় কোন দায়িত্ব-গ্রহণ কিম্বা কোনরূপ পরিকল্পনা বা প্রস্তাব উপস্থিত করে উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হবার চেষ্টা করলে পরিণতি শুভপ্রদ হবে না। উপর-ওয়ালার সন্দিগ্ধতা ও অবিশ্বাস এক্ষেত্রে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী মন্দ যাবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী অনুকূল নয়। যে কোন ব্যাপারেই হোক অধৈর্য্য হয়ে এগিয়ে গেলে বিপত্তির কারণ ঘটবে। অবৈধ প্রণয়ে আশাভঙ্গ ও নির্য্যাতন ভোগ, পরপুরুষের সান্নিধ্যে না আসাই ভালো, প্রলুব্ধ হয়ে শেষে কষ্ট ভোগ। চিত্রে অভিনয় করবার জন্যে যে সব স্ত্রীলোক ব্যাকুল, তাদের সংযত হওয়া দরকার। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে এ মাসে কোন অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্ট হবে না। সুতরাং শিল্পকলা অধ্যয়ন প্রভৃতির মধ্যে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত রাখাই ভালো। চাকুরিজীবি মহিলারও কর্ম্মক্ষেত্রে খুব সংযত হয়ে চলা আবশ্যক। রেসে পরাজয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

কন্যা রাশি

হস্তা জাত ব্যক্তি গণের পক্ষে মাসটি উত্তম। চিত্রার পক্ষে মধ্যম, উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। মাসটী সন্তোষ জনক বলা চলে না। উদ্বিগ্নতা, দুঃখ ভোগ, বন্ধু বিরোধ, ক্ষতি, স্বাস্থ্যের অবনতি, ব্যর্থ প্রচেষ্টা, অসম্মান, শত্রু নির্য্যাতন, নীচ সংসর্গ, মতলববাজ লোকের পরামর্শে নানা কষ্ট ভোগ প্রভৃতি অশুভ ফলগুলি প্রত্যক্ষ হবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি ক্রয়, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, লাভ, সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব ও তজ্জনিত সুযোগ সুবিধা লাভ, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, সুখসমৃদ্ধি প্রভৃতি শুভফল আশা করা যায়। পিত্ত প্রকোপ, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, উত্তাপ জনিত কষ্ট ইত্যাদি সূচিত হয়। ঘরে বাহিরে স্বজন বিরোধের সম্ভাবনা। কতিপয় আত্মীয় স্বজনের ব্যবহারে মানসিক কষ্ট, চাঞ্চল্য ও বিরক্তিকর পরি স্থিতির উদ্ভব হোতে পারে। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে অনেকটা আর্থিক স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ব্যয়াধিক্য হেতু সঞ্চয়ের পক্ষে বাধা সৃষ্টি হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেস খেলায় জয়। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি মধ্যম। সম্পত্তি সংক্রান্ত গোলযোগ এমন কি মামলা মোকর্দ্দমার ও সূচনা হোতে পারে। চাকুরির ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা ভোগ এবং কাজের চাপ। গভর্ণমেণ্ট বা অফিসের উপর ওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। চাকুরির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুদের অপ প্রচেষ্টা হবে ক্ষতি করবার, কিন্তু তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। জাতকের কর্ম্মকুশলতাই শেষ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবির পক্ষে মাসটি মোটেই আশা প্রদ নয়। স্ত্রী-লোকের পক্ষে সর্ব্ব দিকেই অনুকূল। স্বজন বন্ধু বর্গের নিগূঢ় প্রীতি লাভ, অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য অপরকে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং নানা প্রকারে অর্থ, উপহার ও সুযোগ সুবিধা লাভ। জন প্রিয়তা অর্জ্জন, পুরুষের চিত্ত জয় প্রভৃতি যোগ আছে।

পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য লাভ, সম্মান বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন। খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ ও হবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

তুলা রাশি

বিশাখাজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম, গোচরের অশুভ প্রভাবগুলি হোতে এরা মুক্ত হবে। চিত্রাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। স্বাতীজাতগণের পক্ষে অধম এবং নানা কষ্টভোগ। প্রথমার্দ্ধটীতে কষ্টভোগ কম হবে। স্বজন বন্ধুবর্গের সঙ্গে কলহ, ক্ষতি, অসম্মান, সর্ব্ব বিষয়ে বাধা প্রাপ্তি, মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয়, কষ্টকর ভ্রমণ প্রভৃতি যোগ আছে। শারীরিক কষ্ট বা স্বাস্থ্যের অবনতি সেরূপ হবে না, তবে জ্বর, পিত্তপ্রকোপ, বায়ুনলী প্রদাহ ইত্যাদি হোতে পারে। সামান্য দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। পারিবারিক অশান্তি, কলহ বিবাদ। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। প্রথমার্দ্ধে কিছু ভালো হোতে পারে। ক্ষতি, ব্যয়াধিক্য, অর্থকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি দ্বিতীয়ার্দ্ধে দেখা দেবে। সম্পত্তির আয়ের হ্রাস। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে হার। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে দুঃসময়। চাকুরির ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবর্ত্তন, ভবিষ্যতের আশায় পথ রুদ্ধ হোতে পারে। এজন্য স্থিরভাবে দৈনন্দিন কাজগুলি করে গেলে কোনপ্রকার অমঙ্গল ঘটবার অবকাশ হবেনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটি হ্রাস বৃদ্ধি সম্পন্ন। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মোটের উপর ভালোই যাবে। অবৈধ প্রণয়ে পরপুরুষের সান্নিধ্যে আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ। শিল্পকলা ও সঙ্গীতে বিশেষ সাফল্য ও কৃতিত্ব অর্জ্জন। সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মান লাভও মর্য্যাদা বৃদ্ধি। কুমারীদের বিবাহের কথাবার্ত্তা বা যোগাযোগ। বেকার নারীর চাকুরি লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা এবং জ্যেষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, অনুরাধাজাত গণের পক্ষে অধম সময়। এ মাসটি বিশেষ সন্তোষজনক এবং শুভফল দাতা। মোটামুটি সফলতা, আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ, আসবাবপত্র ও বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি ক্রয়, শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ, সুখ সৌভাগ্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, জ্ঞান, যশ ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি, শত্রুজয় প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। জ্বর, পিত্তপ্রকোপ ইত্যাদি যোগ আছে। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা। সকলের প্রিয়ভাজন হোতে পারে। নানাদিক থেকে অর্থাগম, প্রচেষ্টায় সাফল্য, ফাটকাবাজিতে অর্থলাভ, ভ্রমণ, শেষ দশদিন সতর্ক হওয়া আবশ্যক, চুরি, জুয়াচুরি বা প্রতারণার ফলে ক্ষতি, স্পেকুলেশনে লাভ, বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে অতীব উত্তম সময়। অনাদায়ী টাকা ঘরে আসবে। চাকুরিজীবির পক্ষে বিশেষ শুভ সময়। পদোন্নতি, নূতন পদমর্য্যাদা লাভ, আয় বৃদ্ধি ও সন্তোষজনক পরিস্থিতি। উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ। বেকার ব্যক্তির চাকুরি লাভ। রেসে জয়লাভ। স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যোন্নতি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি। অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য, যৌন তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি ও পুরুষের আনুগত্য লাভ। অলঙ্কার, উপহার ও অর্থ লাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সর্ব্বৈব শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি, যৌনোদ্দীপনা, মন গান বাজনা ও শিল্পকলার দিকে ঝুঁকবে। আসবাবপত্র ও গৃহাদি সুসজ্জিত করবার স্পৃহা। অসবর্ণ বিবাহ, দূরের ব্যক্তির সঙ্গে পরিণয় অথবা অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে প্রণয়ে আবদ্ধ হবার সম্ভাবনা। চাকুরিজীবি স্ত্রীলোকেরাও বহু সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিদেরও অসাধারণ সাফল্য লাভ।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়া জাত ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বোত্তম, কোন প্রকার গোচর বিরুদ্ধ কষ্ট ভোগের আশঙ্কা নেই। মূলা ও উত্তরাষাঢ়া জাত গণের পক্ষে শুভ ফল গুলির অধিকাংশই লাভ হবে না। শক্তি সম্পন্ন মর্য্যাদা বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন, আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ। বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি ক্রয়, প্রচেষ্টায় সাফল্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, শত্রুজয়, নূতন পদমর্য্যাদা, অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি। প্রথমার্দ্ধে মানসিক অবসাদ, অপরের কাছে নতি স্বীকার, শত্রু বৃদ্ধি, কর্ম্মে অসাফল্য ও দুঃসংবাদ প্রাপ্তি প্রভৃতি অশুভ ফল আশঙ্কা করা যায়। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। রক্তের চাপে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ। পুরাতন ব্যাধি গ্রস্ত ব্যক্তির ও আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকবে। ভোগৈশ্বর্য্য লাভ। গৃহে সন্তানাদির জন্ম। কর্ম্মে লাভ ও প্রচেষ্টায় সাফল্য। উপঢৌকন লাভ, নানা প্রকার সুযোগ উপস্থিত হবে কিন্তু সব সুযোগ আয়ত্তে আসবেনা। রেসে পরাজয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষি জীবির পক্ষে উত্তম সময়। চাকুরি জীবীর পক্ষেও উত্তম সময়, দ্বিতীয়ার্দ্ধে আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ, বৈদেশিক কার্য্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে মাসটী বিশেষ অনুকূল, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অতীব শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব শুভ সময়, প্রণয় পিপাসু নারীর আশা পূর্ণ হবে, অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সুযোগ সুবিধা অর্থ ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ, নানা প্রকার উপহার প্রাপ্তি ও অনুগ্রহ লাভ, পদমর্য্যাদা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভের দ্বারা প্রাধান্য বিস্তার। সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন, অবিবাহিতাদের বিবাহের কথাবার্ত্তা বা যোগাযোগ। বিদ্যার্থী পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ সময়।

মকর রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রজাতগণ গ্রহ বৈগুণ্যজনিত অশুভ ফলগুলি পাবে না, এদের পক্ষে শুভ সময়। ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম। শতভিষাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। মানসিক উদ্বেগ ও অবসাদ, কলহ, কষ্টকর ভ্রমণ, স্বাস্থ্যের অবনতি, ব্যয় বৃদ্ধি, দুর্ঘটনা ও আঘাত প্রাপ্তি, প্রচেষ্টায় বাধা, মিথ্যা দোষারোপ, ক্ষতি, মামলা মোকর্দ্দমা, মনোমালিন্য ও

বিচ্ছেদ। প্রথমার্দ্ধটিতে অল্প কষ্টভোগ, কিছুটা সাফল্য, লাভ ও সুখ। নানাভাবে শরীর খারাপ হবে। উদর ও গুহ্যদেশে পীড়া। দ্বিতীয়ার্দ্ধে রক্তের চাপজনিত অসুখ লক্ষ্য করবার বিষয়। দুর্ঘটনার ভয় আছে। পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হবে। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কলহ। আর্থিক অনটন, অপরের জন্যে জামিন হোলে বিপন্নতার সম্ভাবনা। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেসে পরাজয়। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মোটেই মাসটি শুভ বলা যায় না। চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ দুর্ভোগের আশঙ্কা, পদোন্নতির পথ উন্মুক্ত হবে না। উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মোটামুটি একভাবেই যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ মাসে কোনদিকেই সুবিধাজনক পরিস্থিতি নেই। যে কোন কাজে অগ্রসর হোলে সমলোচনা, বাধা, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, কলহ বিবাদ প্রভৃতির জন্য অসুবিধা ও লাঞ্ছনা ভোগ ঘটবে। পুরুষের সঙ্গে মেশামিশি, অবৈধ প্রণয়, কোর্টসিপ প্রভৃতি বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক কেননা এসবের পরিণতি অশুভ ব্যঞ্জক ও ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। উত্তম সঙ্গীর সঙ্গে না থাকলে বহির্ভ্রমণে বিপত্তি ও ঘটতে পারে। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী উত্তম বলা চলে না।

কুম্ভ রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রজাত গণের পক্ষে মাসটী গোচর জনিত অশুভ ফলপ্রদ হবেনা। ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম এবং শতভিষার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মানসিক উদ্বেগ, কলহ, স্বাস্থ্যের অবনতি, ব্যয়াধিক্য, দুর্ঘটনা, প্রচেষ্টায় অসাফল্য, মিথ্যা অপবাদ, ক্ষতি, মামলা মোকর্দ্দমা, বিচ্ছেদ প্রভৃতি অশুভফলের সম্ভাবনা। প্রথমার্দ্ধট অনেকটা ভালো বলা চলে, কিছু সাফল্য লাভ ও সুখস্বচ্ছন্দতা। নানাভাবে এমাসে শারীরিক কষ্ট ভোগ। উদরও গুহ্য প্রদেশে পীড়া—অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি সূচিত হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে রক্তের চাপবৃদ্ধি, দুর্ঘটনা ও আঘাত জনিত দুষ্টক্ষত দেখা দিতে পারে। পারিবারিক শান্তির অভাব। স্বজন বিরোধ। স্ত্রীর পীড়া। আর্থিক উন্নতি ঘট্‌বে না।

ব্যয়াধিক্য, ক্ষতি ও অর্থের প্রয়োজনীয়তা গভীর ভাবে অনুকূল হবে। কারো পক্ষে জামিন হোলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা এবং মামলা মোকর্দ্দমায় লিপ্ত হলে কষ্টভোগ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়—রেসে পরাজয়—বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না, নানা প্রকার ঝঞ্ঝাট দেখা যায়। চাকুরির ক্ষেত্র ভালো না হোলে ও কোন ক্ষতিকর অবস্থা হবেনা চাকুরিজীবীর বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চল্‌বে, শত্রুরা ক্ষতিনা করতে পারলেও উদ্বিগ্নের ও আশঙ্কার কারণ আছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী প্রতিকূল। এজন্যে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক, বিশেষতঃ অবৈধ প্রণয়াদি দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হোলে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ ঘটবে। বিলাস ব্যসন দ্রব্য বা অলঙ্কারাদি ক্রয় অনুচিত। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রাশ্রিত জাত ব্যক্তির পক্ষে অতীব উত্তম সময়। উত্তরভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে পূর্ণভাবে শুভ ফলপ্রদ হবে না। সাধারণতঃ মাসটী সকলের পক্ষে সন্তোষজনক। শেষার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধ বিশেষ শুভ। সাফল্য, শত্রুজয় সুখ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাস ব্যসন, সম্মান প্রাপ্তি, বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তি, যশ ও লাভ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ক্লান্তিকর ভ্রমণ, মানসিক অবসাদ ও উদ্বিগ্নতা, কলহ বিবাদ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। উত্তম স্বাস্থ্য। দ্বিতীয়ার্দ্ধে উদরঘটিতপীড়া, অজীর্ণতা, গুহ্য স্থানে ও উদরে যন্ত্রণা। গৃহে সন্তানের জন্ম। শান্তি, ঐক্য, ও সুখ পারিবারিক ক্ষেত্রে অটুট থাক্‌বে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দতা, লাভ ও প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ। প্রথমার্দ্ধে স্পেকুলেশনে লাভ। রেস খেলায় জয়লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ সময়। ভূম্যাদি ক্রয়, গৃহাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি যোগ আছে। মাসের শেষের দিকে সম্পত্তি নিয়ে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হোলে ও তা অচিরে দূর হয়ে যাবে। চাকুরির ক্ষেত্রে মাসটী বিশেষ শুভ। নূতন পদমর্য্যাদাও সম্মান লাভ, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্য, পদোন্নতি এবং নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি। উৎকোচ গ্রহণকারী কর্ম্মচারীদের সুবর্ণ সুযোগ। বেকার ব্যক্তিরা কর্ম্মলাভ করবে। প্রথমার্দ্ধ এদের পক্ষে বিশেষ শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষেও অতীব উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে ও অতীব উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ উল্লেখযোগ্য ভাবে শুভ হবে, সে অনুপাতে শেষার্দ্ধটী অপেক্ষাকৃত শুভ। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্যলাভ—পুরুষের কাছে সমাদর ও ভালোবাসাপ্রাপ্তি, শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করবে। অর্থ, উপহার ও অলঙ্কার লাভ, ভ্রমণ ও অবাধগতিতে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত বিহার প্রভৃতি যোগ আছে। পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ ও যৌনোদ্দীপনা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। পরপুরুষের সঙ্গ ও সাহচর্য্য চিত্তের প্রসন্নতা লাভ—বিবাহাদির যোগাযোগ বা কথাবার্ত্তা চল্‌তে পারে। অধ্যাত্ম সাধনায় রত নারীর ঈশ্বর অনুভূতি বা নানা অলৌকিক দর্শন ঘটবে। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মহিলারা এমাসে বিশেষ ভাবে শান্তি সুখস্বচ্ছন্দতা কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভের যোগ। চাকুরিজীবী নারীর লাভ হবে, পদোন্নতি ও ঘট্‌তে পারে, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম সময়।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নের ফলাফল

মেষ লগ্ন

পাকযন্ত্রের পীড়া, বিদ্যালাভে অন্তরায়, সন্তানসন্ততির স্বাস্থ্যহানি, কর্ম্মস্থানে বিশৃঙ্খলতা। মাতার স্বাস্থ্যহানি। বিদেশ ভ্রমণ। কোন কলা বা শিল্প থেকে অর্থাগম। স্ত্রীর জন্য মানসিক কষ্ট। গুপ্ত বা অসঙ্গত উপায়ে অর্থাগম। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য উদ্বেগ। সন্তানের জন্য মনোকষ্ট, কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে লাভ। মানসিক ব্যাধি বা ফুস্ ফুসের পীড়ার আশঙ্কা। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অধম সময়।

বৃষলগ্ন

দেহভাব শুভ, মানসিক সুখস্বচ্ছন্দতা। ধনভাব কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল। মাতার শয্যাশায়ী পীড়া। ভাগ্যোন্নতির পক্ষে সামান্য বাধা, পারিবারিক উৎসবে বহু ব্যয়। বাস গৃহ এবং সাজসজ্জার ব্যাপারে কিছু পরিবর্ত্তন। অধিকাংশ সময়েই বিশৃঙ্খল আবেষ্টনের মধ্যে বাস। ভ্রমণের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্নেহ প্রীতি বা যৌন-প্রেমের ব্যাপার নিয়ে বিবাহ বিসংবাদ ও মনোকষ্ট। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

মিথুনলগ্ন

দেহভাব শুভ। ধনোপার্জ্জনের যোগ। সহোদরের সহিত মত-ভেদজনিত অশান্তি। মাতার দীর্ঘকাল ব্যাপী পীড়া ভোগ। পত্নীর জরায়ু পীড়া, পাকযন্ত্রের পীড়া বা রক্তসম্বন্ধীয় পীড়া। কর্ম্মোন্নতির যোগ মধ্যবিধ। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, ভ্রমণে আনন্দ ও আর্থিক লাভ দুইই হোতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কর্কটলগ্ন

বেদনাঘটিত পীড়া। শত্রুবৃদ্ধি যোগ, অর্থোপার্জ্জন হোলেও সফল হবে না। ভ্রাতা এবং আত্মীয়ের পক্ষ থেকে দুঃখ উপস্থিত হবে। স্বজন-বিয়োগ, স্বাস্থ্যহীনতা, পারিবারিক অসুবিধা ভোগ। শ্লেষ্মা পীড়া, পাকস্থলীর বৈকল্য। ভাগ্যভাব শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

সিংহলগ্ন

অত্যধিক ব্যয়বাহুল্য হেতু ঋণগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা। সহোদর-ভাব শুভ, পড়াশুনায় অমনোযোগিতা। সন্তানের দেহপীড়া। কর্ম্মভাব শুভ। পত্নীর স্বাস্থ্যভঙ্গ যোগ। দাম্পত্য প্রণয়ে বাধা। স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য, স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

কন্যা লগ্ন

সন্তানজনিত চিন্তা, রক্ত-সম্বন্ধীয় পীড়া ভোগ। মিত্রলাভ, অপরিমিত ব্যয়ভারে ক্লিষ্ট ও পারিবারিক সুখের অভাব। হৃৎপিণ্ডের পীড়া ও ঋণযোগ। কর্মোন্নতি সামাজিক প্রতিষ্ঠা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা।

তুলা লগ্ন

পাকাশয়ের দোষ; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া ভোগ, আর্থিক স্বচ্ছলতা, কর্ম্মোপলক্ষে ভ্রমণ, দাম্পত্য ব্যাপারে মনোকষ্ট, শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য উদ্বেগ, আত্মীয়স্বজনের সংস্রবে কোন রকম দুঃখ ও অশান্তি ঘটা অসম্ভব নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

বৃশ্চিকলগ্ন

আর্থিক সুযোগ ও আকস্মিক প্রাপ্তি, আত্মীয়ের দ্বারা অপবাদ প্রচার, সন্তানের জন্য উদ্বেগ, স্ত্রীর সাহচর্য্যে পারিবারিক সুখ, বিষাদ খিন্নতা, মাতৃ কষ্ট, দুর্ঘটনার ভয়, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, কর্ম্মোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনুলগ্ন

নিষ্ফল আক্রোশ। অব্যবস্থিতচিত্ততা ও মানসিক অবসাদ। কর্ম্মে কিঞ্চিৎ বাধা বিঘ্ন। ভ্রমণ বা স্থান পরিবর্ত্তন। উপার্জ্জনের বাধা না হোলেও ব্যয় বাহুল্য। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীর দ্বারা অর্থ অপব্যয়। জননেন্দ্রিয় বা মূত্রাশয়ের পীড়া। কন্যার জন্য অশান্তি। মামলা মোকর্দ্দমা ব্যাপারে দুশ্চিন্তা, পিতার জন্য অশান্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয় ভঙ্গযোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সময়টী ভালো নয়।

মকরলগ্ন

অর্থক্ষতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সহোদয়ের পক্ষে অশুভ। মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয় ও মনোকষ্ট, স্ত্রী পুত্রের বিষয়ে অশান্তি। বিশৃঙ্খল পারিপার্শ্বিকতা। অংশীদারের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা, ঋণ-জনিত অশান্তি। ভ্রাতৃহানি বা ভ্রাতার জীবন সংশয় পীড়া। নানা ব্যাপারে আশাভঙ্গ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ সময়। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতি।

কুম্ভলগ্ন

দমকা খরচ। গুরুজনের সহিত দ্বন্দ্বভাব। প্রতি কার্য্যের প্রারম্ভে বাধা। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিকূল আবহাওয়া। মানসিক দুর্ব্বলতা উন্নতিতে বাধা। অতিরিক্ত আমোদপ্রিয়তার জন্য শারীরিক অস্বাস্থ্য, বিবাদ বিসংবাদে সম্মান বৃদ্ধি, স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, স্ত্রীর দ্বারা শত্রুতা, ভাগ্য হানি, কর্ম্মক্ষতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অধম সময়। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে প্রতিকূল পরিস্থিতি।

মীনলগ্ন

অসম্ভাবিত সুযোগ প্রাপ্তিতে উল্লাস। ভূসম্পত্তি ও নূতন গৃহাদির যোগ। আয়বৃদ্ধি। বায়ু প্রকোপ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশান্তি ও ঝঞ্ঝাট। আধ্যাত্মিক উন্নতি। অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্মান, যশ বা প্রতিষ্ঠা লাভ। সৌভাগ্যোদয়, কর্ম্মোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। শিক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে আশাতীত সাফল্য লাভ।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলা-ধুলায় জার্ম্মান মহিলা

শরীর, স্বাস্থ্য ও মন গঠনে খেলা ধূলার প্রভাব সম্বন্ধে কোনরূপ দ্বিমত থাকতে পারে না। সুস্থ-সবল দেহ যে কোন জাতির কাম্য। ছেলেদের সাথে সাথে মেয়েদের খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন দেশের ক্রিড়া সংস্থাগুলি নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁদের খেলোয়াড়গণকে পরিচালিত করেন। সেজন্য বিভিন্ন দেশের ক্রীড়া পরিচালন পদ্ধতিও বিভিন্ন।

পশ্চিম জার্ম্মানীতে মহিলাদের খেলাধুলা সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। খেলার আনন্দে খেলা, এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতাই খেলাধূলার আসল উদ্দেশ্য বলে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। এজন্য কিন্তু তাঁরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের থেকে পিছিয়ে পড়েন নি মোটেই। গত রোম অলিম্পিকে বিভিন্ন বিভাগে জার্ম্মান মহিলাদের সাফল্য তার সাক্ষ্য দিয়েছে। খেলায় জয়লাভ করাকেই এখানে একমাত্র লক্ষ্য বলে ধরা হয় না। এইটেই এখানকার বিশেষত্ব। একটি সামান্য ঘটনার থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। গত মেলবোর্ণ অলিম্পিকে 'কায়াক্' সিঙ্গলস রেসে তখনকার বিশ্ব বিজয়িনী জার্ম্মান মহিলা থেরেস জেনৃজ যখন রাশিয়ার ডেমেনটিয়েভার নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত
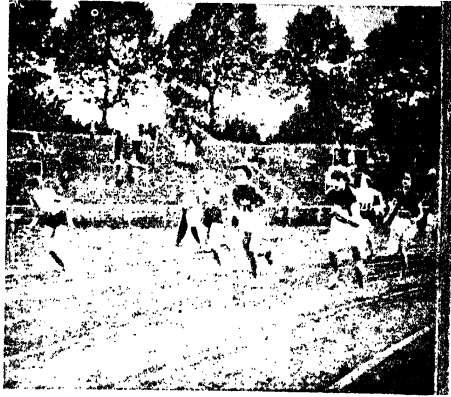
পশ্চিম জার্ম্মানীতে মেয়েদের দৌড়ের একটি সাধারণ দৃশ্য।

হন তখন জার্ম্মান দলে গভীর হতাশা দেখা দেয়। থেরেস জেনৃজ কিন্তু প্রফুল্লই ছিলেন। তিনি হাস্য মুখে তাঁর সমর্থকগণকে বলেন, 'এ ব্যাপারে আপনারা এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন, রৌপ্য পদকের কি কোন মূল্যই নেই ?'

জার্ম্মানীতে মহিলাদের খেলা-ধূলা বহুদিনের ঐতিহ্য মণ্ডিত এবং সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়ে আসছে। পশ্চিম জার্ম্মানীর সমগ্র মহিলাগণের মধ্যে শতকরা ৪০জন সাধারণভাবে খেলা-ধূলার সঙ্গে জড়িত, এবং শতকরা ২০

ক্লাবের মধ্যে জার্ম্মান মহিলারা বল নিয়ে অনুশীলন করছেন।

মহিলাদের ন্যায় উত্তম ফল প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে অস্বাভাবিক দৈহিক শক্তি লাভের চেষ্টা বা দিবা-রাত্র অনুশীলনের সাহায্য তাঁরা গ্রহণ করেন নি। স্বাভাবিক শরীর চর্চ্চার দ্বারা এবং স্বাভাবিক ভাবে অনুশীলনের সাহায্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শনই তাঁদের উদ্দেশ্য। এইজন্য জার্ম্মান মহিলা খেলোয়াড়গণের মধ্যে নারীসুলভ কোমলতার অভাব দেখা যায় খুব কম। যা অন্যান্য অনেক দেশের মহিলা খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রায়ই চোখে পড়ে।

কিন্তু গত রোম অলিম্পিকেই দেখা গেছে যে জার্ম্মান মহিলাদের খেলা-ধূলার মান এজন্য মোটেই নীচু নয়। উল্‌ট্রুড উরশেলমান, হেয়দি স্মিড, প্রভৃতি কৃতি খেলোয়াড়গণ জার্ম্মানীকে অলিম্পিক সম্মানে ভূষিত করেছেন। জার্ম্মান মহিলাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও স্বাভাবিক পটুত্বই এই সাফল্যের কারণ, তার জন্য কোন বিশেষ শিক্ষা এঁরা গ্রহণ করেন নি। তাঁদের অপ্রত্যাশিত সাফল্য বারে বারে সকলকে চমকিত করেছে।

জন মহিলা নিয়মিত ভাবে খেলা-ধূলা করেন। খেলা-ধূলায় পারদর্শীতা প্রদর্শনের জন্য প্রায় ১৫০ জনকে 'ফেডারল রিপাব্‌লিকে'র প্রেসিডেন্ট "সিলভার লরেল লীফ্" প্রদান করেন। এই ১৫০ জনের মধ্যে ৩০ জনেরও বেশী মহিলা এবং বালিকা এই সম্মান লাভ করেন। এ্যাথ্‌লেটিক্স, সাঁতার, স্কেটিং, টেনিস, জিম্‌নাস্টিক এবং "স্কিয়িং" প্রভৃতি খেলাগুলিই মেয়েদের নিকট বিশেষ জনপ্রিয়।

পশ্চিম জার্ম্মানীতে খেলা-ধূলায় কয়েকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে 'স্পোর্টস ব্যাজ' দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পুরুষ বা মহিলা যে কেহ এই পরীক্ষা দিতে পারেন। দেখা গেছে অল্প বয়স্কদের মধ্যে যাঁরা এই 'ব্যাজ' পান তার মধ্যে অর্দ্ধেক হচ্ছে বালিকা। আর অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের মধ্যে শতকরা ২০ জন মহিলা এই 'ব্যাজ' পান।

কিন্তু পশ্চিম জার্ম্মানীতে মেয়েদের খেলাধূলা কোন দিক থেকেই আর্থিক সাহায্য পায় না। জার্ম্মান মহিলাদের এজন্য প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। পশ্চিম জার্ম্মানীর মহিলাগণ যাহা কিছু সাফল্য লাভ করেছেন তা তাঁদের নিজেদের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং তাঁদের নিজেদের ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা। খেলাধূলাকে তাঁরা পেশায় পরিণত করেননি। অন্যান্য অনেক দেশের

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যাণ্ড—৫ম টেষ্ট ঃ

ইংল্যাণ্ড ঃ ২৫৬ রান (পিটার মে ৭১, কেন ব্যারিংটন ৫৩ রান। ডেভিডসন ৮৩ রানে ৪, গণ্ট ৫৩ রানে ৩ এবং ম্যাক্‌কে ৭৫ রানে ২ উইকেট পান) ও ৩৭০ রান (৮ উইকেটে। রমন সুব্বারাও ১৩৭, কেন ব্যারিংটন ৮৩, মারে ৪০, এলেন নট আউট ৪২ রান।

ম্যাককে ১২১ রানে ৫ এবং রিচি বেনো ১১৩ রানে ২ উইকেট)।

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৪৯৪ (পিটার বার্জ ১৮১, নর্মান ও'নীল ১১৭, ব্রেন বুথ ৭১, সিম্পসন ৪০, গ্রাউট নট আউট ৩০। এলেন ১৩৩ রানে ৪, স্ট্যাথাম ৭৫ রানে ৩ এবং ফ্ল্যাভেল ১০৫ রানে ২ উইকেট)।

ওভালে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যাণ্ডের ৫ম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়। ১৯৬১ সালের টেষ্ট সিরিজের মোট পাঁচটা টেষ্ট খেলার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া ২—১ টেষ্ট খেলায় জয়লাভ ক'রে 'এ্যাসেজ' এবং 'রাবার' দুই-ই লাভ করে। ১ম ও ৫ম টেষ্ট খেলা ড্র যায়। ৪র্থ টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার জয়লাভের উপরই 'এ্যাসেজ' লাভের মীমাংসা হয়ে যায়। ৫ম টেস্ট খেলা নিছক কেতা-মাফিক ব্যাপার—বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না। ইংল্যাণ্ড জয়লাভ করলে অষ্ট্রেলিয়ার 'রাবার' পাওয়া হ'ত না এইটুকুই যা। সেক্ষেত্রে খেলার ফলাফল সমান দাঁড়িয়ে 'রাবার' অমীমাংসিত থেকে যেত।

ওভাল মাঠের ৫ম টেষ্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। প্রথমদিনের খেলায় ইংল্যাণ্ড ১ম ইনিংসের ৮টা উইকেট হারিয়ে ২১০ রান করে। ৯ম উইকেটের জুটি এলেন এবং স্ট্যাথাম যথাক্রমে ৭ ও ২ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

খেলার ২য় দিনে ইংল্যাণ্ডের শেষ দিকের তিনজন ব্যাটসম্যান এলেন, স্ট্যাথাম এবং ফ্ল্যাভেল ৪৮ মিনিটের খেলায় দলের ৪৬ রান তুলে দিলে ইংল্যাণ্ডে ১ম ইনিংস ২৫৬ রানে শেষ হয়। শেষের তিনজনই এই দিন পিটিয়ে খেলেছিলেন তবে বোলার ফ্ল্যাভেলের মার-গুলি দর্শকদের হাততালি বেশী পেয়েছিল। ৯ম উই-কেটের জুটিতে এ্যালেন এবং স্ট্যাথাম আধ ঘণ্টায় দলের ২৮ রান তুলেন। ডেভিডসন ৮৩ রানে ৪টে এবং গণ্ট ৫৩ রানে ৩টে উইকেট পান। উইকেট-রক্ষক গ্রাউট খালি হাতে ফিরলেন না—ক্যাচ লুফে ৪জনকে আউট করেন। এলেন ২২ রান ক'রে নটআউট রয়ে যান।

অষ্ট্রেলিয়ারও সূচনা ভাল হয়নি, ইংল্যাণ্ডের মতই অবস্থা দাঁড়ায়। দলের ১৫ রানের মধ্যে লরী এবং হার্ভে আউট। আরও বিপর্য্যয় ঘটলো দলের ৮৮ রানের মাথা সিম্পসন আউট হলেন নিজস্ব ৩০ রান ক'রে। ৪র্থ উইকেটে ও'নীল এবং পিটার বার্জ জুটি বেঁধে দলকে সেই সময়ের বিপর্য্যয় থেকে রক্ষা করলেন। দলের ৪র্থ উইকেট (ও'নীল) পড়ে ২১১ রানে। ও'নীল নিজস্ব ১১৭ রান ক'রে কাউড্রের বদলী খেলোয়াড় মাইক স্টিওয়ার্টের হাতে এলেনের বলে 'ক্যাচ' দেন ; ও'নীলের নিজস্ব ১১৭ রান তুলতে ২০০ মিনিট লেগেছিল—বাউণ্ডারী মেরেছিলেন ১৪টা। সমস্ত মাঠের লোক ও'নীলের অনবদ্য খেলা দেখে আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ও'নীল এবং বার্জ ১২৩ রান তুলে দেন। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ও'নীলের এই সেঞ্চুরিই তাঁর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী। এবং টেষ্ট খেলায় সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে (১৬৮ মিনিটে) সেঞ্চুরী করার জন্য তিনি ৪০০ স্টার্লিং পুরস্কার লাভ করেন। এই নিয়ে ও'নীল ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১০টা টেষ্ট খেললেন, সেঞ্চুরী সংখ্যা ১। মোট ২৩টা টেষ্ট খেলায় তাঁর সেঞ্চুরী দাঁড়িয়েছে ৫টা। এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্ব্বাধিক ব্যক্তিগত রান ১৮১ (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, ব্রিসবেন ১৯৬০-৬১ সাল)। খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল, অষ্ট্রেলিয়ার ৪টা উইকেট পড়ে ২৯০। উইকেটে জিয়ানো বার্জ (৮৬ রান) এবং বুথ (৩৩ রান)।

৩য় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৪৯৪ রানে শেষ হয়। লাঞ্চের সময় রান ছিল ৩৮৬, ৪ উইকেটে। প্রথম দেড় ঘণ্টার খেলায় ৫ম উইকেটের জুটি বার্জ এবং বুথ দলের ৯৬ রান তুলে দেন—দু'জনের জুটিতে তখন ১৭৫ রান দাঁড়ায়। এই সময়ে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডের থেকে ১৫০ রানে এগিয়ে থাকে।

লাঞ্চের পর অস্ট্রেলিয়ার একটা উইকেট পড়লো—দলের ৩৯৬ রানে বুথ নিজস্ব ৭১ রান ক'রে আউট হলেন। ৫ম উইকেটের জুটিতে (বুথ এবং বার্জ) দলের ১৮৫ রান ওঠে। বুথ খেলেছিলেন ৩ঘণ্টা ২২ মিনিট, বাউণ্ডারী মেরেছিলেন ১২টা। চা-পানের বিরতির সময় অস্ট্রেলিয়ার রান গিয়ে দাঁড়ায় ৪৪৭, ৭ উইকেট পড়ে। উইকেটে ছিলেন বার্জ ১৭৪ এবং অধিনায়ক রিচি বেনো ১।

বার্জ নিজস্ব ১৮১ রান করে এলেনের বলে বোল্ড

আউট হ'ন। তিনি তাঁর ৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের খেলায় মোট ২২টা বাউণ্ডারীর বাড়ী মেরে ছিলেন। বার্জের নিজস্ব ২১টা টেস্ট খেলায় এই তাঁর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী এবং ১৯৬০-৬১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে দু'দলের মধ্যে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান।

ইংল্যাণ্ড ৩য় দিনে মাত্র ৫০ মিনিট খেলার সময় পায় এবং এই সময়ে তাদের কোন উইকেট না পড়ে ৩২ রান ওঠে। উইকেটে থাকেন সুব্বারাও (১৯) এবং পুলার (১৩)। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ড ২০৬ রানে অস্ট্রেলিয়ার থেকে পিছিয়ে থাকে; সুতরাং ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যাণ্ডের ২০৬ রান করার প্রয়োজন ছিল। ৪র্থ দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি। বৃষ্টির দরুণ ৩ ঘণ্টা সময় মাঠে মারা যায়। ৪র্থ দিনের সূচনা থেকেই ইংল্যাণ্ডের পতন আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব দিনের ৩২ রানের সঙ্গে মাত্র ১ রান যোগ হয়ে ৩৩ রান দাঁড়ায়—এই ৩৩ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের ২টো উইকেট পড়ে যায়; ৩য় উইকেট ৮৩ রানে এবং ৯৬ রানে পড়ে ৪র্থ উইকেট। দলের ১০০ রান পূর্ণ না হতেই ৪ জন আউট—পুলার (১৩) ডেক্সটার (০), মে (৩৩) এবং কাউড্রে (৩)। ৫ম উইকেটে জুটি বাঁধেন ৫ম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের ত্রাণকর্ত্তা সুব্বা রাও এবং ব্যারিংটন। খেলা ভাঙ্গার সময় ইংল্যাণ্ডের রান ছিল ৪ উইকেট পড়ে ১৫৫। এই দিনে অস্ট্রেলিয়ার কেন ম্যাকে ৫৮ রানে ৪টে উইকেট ফেলেন। উইকেটে অপরাজেয় থাকেন সুব্বারাও ৬৯ রান এবং কেন ব্যারিংটন ৩৫ রান ক'রে। ৫ম দিনে লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের রান গিয়ে দাঁড়ায় ২৪৫, ৪ উইকেটে। সুব্বারাও ১২৭ এবং ব্যারিংটন ৬৪ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

লাঞ্চের পর আরও ১৭ রান বেড়ে মোট রান দাঁড়াল ২৬২। সুব্বারাও নিজস্ব ১৩৭ রান ক'রে দলের ২৬২ রানের মাথায় আউট হ'লেন। বেনোর বলে স্ট্রেট ড্রাইভ মেরে তাঁরই হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে তিনি আউট হ'ন। সুব্বারাও ৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট খেলেছিলেন, ১টা ওভার-বাউণ্ডারী এবং ১২টা বাউণ্ডারী মেরেছিলেন। ৫ম উইকেটের জুটিতে সুব্বারাও এবং ব্যারিংটন দলের ১৭২ রান বাড়িয়ে দেন।

ত্রাণকর্ত্তার ভূমিকায় দৃঢ়তার সঙ্গে খেললেন! চা-পানের সময় ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়াল ৭ উইকেটে ৩৩০। মারে ২৯ এবং এলেন ২৩ রান।

দলের ৩৫৫ রানের মাথায় মারে নিজস্ব ৫০ রান ক'রে আউট হলেন। ৮ম উইকেটের জুটিতে রান উঠেছিলো ৭২। ৯ম উইকেটে জুটি বাঁধলেন এলেন এবং ষ্ট্যাথাম। খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া এ জুটি ভাঙতে পারলো না। দেখা গেল, স্কোর বোর্ডে রান উঠেছে ৩৭০, ৮টা উইকেট পড়ে। খেলা ড্র গেল। ইংল্যাণ্ড হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, পরাজয়ের হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে।

ব্যারিংটন বেশীক্ষণ উইকেটে থাকতে পারলেন না; দলের ২১ রান বেড়ে ২৮৩ রান দাঁড়াল—ব্যারিংটন নিজস্ব ৮৩ রান ক'রে আউট হ'লেন। দলের এই ২৮৩ রানের মাথায় ৭ম উইকেট (লক) পড়লো। আর তিনজন আউট হলেই ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংস শেষ হবে। এই তিনজন আর কতক্ষণ! এই তিনজন আর ক' রানেরই বা খদ্দের—এমনি ভাব সারা মাঠে। ৮ম উইকেটের জুটি উইকেট-কিপার জন মারে এবং বোলার এলেন—এই দু'জনই শেষ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডকে পরাজয় থেকে রক্ষা করলেন। এই দু'জনেই সুব্বারাওয়ের পর ইংল্যাণ্ডের

ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ঃ

১৯৬১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল পাঁচটি টেস্ট খেলা সমেত মোট ৩২টি প্রথম শ্রেণীর খেলায় যোগদান করে।

ফলাফল: অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৩, হার ১ (৩য় টেস্ট) এবং খেলা ড্র ১৮। একদিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স দলের কাছে পরাজিত হয়।

॥ প্রথম শ্রেণীর খেলা ॥

দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক রান: ২০১৯ রান—উইলিয়াম লরী।

দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক উইকেট: ৬৮ উইঃ—এলেন ডেভিডসন।

দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক সেঞ্চুরী: ৯—উইলিয়ম লরী।

সফরের প্রথম শ্রেণীর খেলায় (৩২টি) ১০০০ রান করার কৃতিত্ব লাভ করেছেন: উইলিয়ম লরী (২,০১৯), নর্ম্যান ও'নীল (১,৯৮১), সিম্পসন (১,৯৪৭), নীল হার্ভে (১,৪১২), পিটার বার্জ (১,৩৭৬) এবং ব্রেন বুথ (১,২৭৯)। সফরের প্রথম শ্রেণীর খেলায় ৫০ উইকেট পেয়েছেন: এলেন ডেভিডসন (৬৮), রিচি বেনো (৬১), ক্লাইন (৫৪), ম্যাকেঞ্জি (৫৪), ম্যাক্কে (৫২), মিশন (৫১), সিম্পাসন (৫১) এবং কুইক (৫০)।

ভারত সফরে এম সি সি ঃ

আগামী ২৭শে অক্টোবর মেরী লিবোন ক্রিকেট ক্লাব (সংক্ষিপ্ত নাম এম সি সি) ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রিকেট খেলার উদ্দেশ্যে বোম্বাই সহরে পৌছবে। ১লা অক্টোবর তারিখে এম সি সি দলটি ভারতবর্ষ, পাকিস্তান এবং সিংহল সফরের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করবে। সফর তালিকার তাদের প্রথম খেলা পড়েছে পাকিস্তানে। সেখানে তারা একদফা (৩টে খেলা) খেলে ভারত সফরে আসবে। দলটি ৮০ দিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে

খেলে পুনরায় পাকিস্তান সফরে যাবে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে এম সি সি দল স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করবে এবং ফিরে যাওয়ার পথে সিংহলে খেলবে তিনটে ম্যাচ।

ভারতবর্ষের মাটিতে তারা সফরের প্রথম ম্যাচে খেলবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিপক্ষে ২৮শে অক্টোবর।

এম সি সি দলে নির্ব্বাচিত হয়ে ভারত সফরে আসছেন ১৬ জন খেলোয়াড়। এই ষোলজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ইংলণ্ডের হয়ে ইতিপূর্ব্বে টেষ্ট ম্যাচ খেলেছেন মাত্র সাত জন খেলোয়াড়; তাঁরা হচ্ছেন—টেড ডেক্সটার, মাইক স্মিথ ডেভিড এলেন, কেন ব্যারিংটন, জন মারে, টনি লক এবং জিওফ পুলার। দলের অধিনায়ক এবং সহ অধিনায়ক হয়ে আসছেন যথাক্রমে টেড ডেক্সটার এবং মাইক স্মিথ।

এবারও এম সি সি কর্তৃপক্ষ তাঁদের পূর্ণশক্তি নিয়ে ভারতবর্ষ সফরে দল পাঠালেন না। আমরা পথ চেয়ে বসে ছিলাম যে, কাউড্রে, সুব্বারাও, স্ট্যাথাম এবং ট্রুম্যানের অপেক্ষায়। কিন্তু তাঁরা আমাদের নিরাশ করেছেন। তাঁরা খেলায় ক্লান্ত, সুতরাং বিশ্রাম খুব দরকার। তাছাড়া আপন আপন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঘর সংসারের উপর তাঁদের মন বেশী পড়ে আছে। ভারত সফরে তাই তাঁরা যোগদানের অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছেন।

ভারত সফরকারী এম সি সি দলে নির্ব্বাচিত ষোল জন খেলোয়াড়ের নাম:

টেড ডেক্সটার (সাসেক্স)—অধিনায়ক; মাইক স্মিথ (ওয়ারউইকসায়ার)—সহ-অধিনায়ক; ব্যারী নাইট (এসেক্স), জি, মিলম্যান (নটিংহ্যামসায়ার), মিডলসেক্স কাউন্টি দল থেকে সর্ব্বাধিক তিনজন—জন মারে, পিটার পারফিট এবং এরিক রাসেল, ল্যাঙ্কাসায়ার দল থেকে বব্ বার্বার এবং জিওফ পুলার; কেণ্ট থেকে এলেন ব্রাউন এবং পিটার রিচার্ডসন; গ্লসেস্টারসায়ার থেকে ডেভিড এলেন এবং ডেভিড স্মিথ; সারে থেকে টনি লক্ এবং কেন ব্যারিংটন; ডেভিড হোয়াইট (হ্যামসায়ার) দলের খেলোয়াড়দের গড়পড়তা বয়স ২৮। বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় হলেন টনি লক্ বয়স ৩১ বছর।

সন্তোষ ট্রফি:

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার (সন্তোষ ট্রফি) পূর্ব্বাঞ্চলের প্রথম লীগ খেলায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ৪-০ গোলে বিহার রাজ্য দলকে পরাজিত করেছে।

সাহিত্য সংবাদ

অনর্থ ঃ অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

আমাদের নাট্যশালাকে জাতির দর্পন বলা হয়। ক্রম বর্দ্ধমান দুর্নীতির প্রসার আজ সব চেয়ে বড় সামাজিক সমস্যা। রঙমহলে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত এই নাটকটিতে জাতির এই সমস্যাটি জ্বালাঞ্জন শলাকা রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রচ্ছন্ন প্রচারনা নাটকীয় রসকে কোনখানে বিরস করে নাই, নাটকটির ইহা একটি প্রধান কারুকর্ম। অভাব অনটনে বিপর্যস্ত একটি অধ্যাপকের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কিরূপে দুর্নীতির দাসত্ব বরণ করিল, উহার ভয়াবহ অগ্নি শিখায় কেমন করিয়া আত্মাহুতি দিয়া তিনি তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিপূর্ণ চরিত্র চিত্রণে, শাণিত রঙ্গ ব্যঙ্গ সেই কাহিনীই রূপায়িত হইয়াছে আলোচ্য নাটকটিতে। আদর্শের সংঘাতে আক্রান্ত মধ্যবিত্ত সমাজের দোদুল্যমান সংস্কৃতির উৎকণ্ঠা ও সঙ্কট নাটকটিকে যুগদর্পণের মর্যাদা দিয়াছে। সার্থক এই নাট্যকর্ম সত্য সত্যই অভিনন্দন যোগ্য।

[প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।]

মন্মথ রায়

বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ ঃ বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত

প্রথম সংস্করণ, ১৯৩১ সালে, দ্বিতীয় ১৯৪৯ এবং তৃতীয় ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্রোহী কবি বিজয়লাল রবীন্দ্র নাথের মধ্যে যে বিদ্রোহী মানুষটির পরিচয় পান, তাহার কথাই বলিয়াছেন। ১৯৩১ সালের বহু পূর্বেই তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। বই খানি সম্বন্ধে কবিগুরু ১৯৩১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর বিজয়লালকে লেখেন—"তোমার বইখানি পড়ে খুশী হয়েছি। আমার চিন্তা ও কর্মধারা তুমি ঠিক মতই বিশ্লেষণ করেছ। বন্ধন মোচনের দ্বারা আত্ম প্রকাশের এবং আত্ম প্রকাশের দ্বারা বন্ধন মোচনের চেষ্টাই স্বভাবত আমার জীবনের লক্ষ্য, এ কথা সত্য।" ইহার বেশী পুস্তকের পরিচয়ে অধিক আর কি বলা যায়।

সমস্ত বইখানি পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের 'বলাকার' এই কবিতাটি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—

চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
সে তো নহে সুখ, ওরে সে নহে বিশ্রাম
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা—দ্বারে দ্বারে পাবি মানা
এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ—এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

[আলোচনা—প্রাপ্তিস্থান—বাণী নিকেতন, ২১৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টি তত্ত্ব ঃ অনাদি নাথ সেন

লেখক প্রজ্ঞাবান পুরুষ। হিন্দু দর্শনে ও বিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তিনি এই পুস্তকে এবং বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়গুলিকে সহজ, সরল করে বাঙ্গলা ভাষার মাধ্যমে উপহার দিয়েছেন বাঙ্গালী পাঠককে। বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীসত্যেন বসুও করেছেন তাঁর অজস্র প্রশংসা। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

[লেখক কর্তৃক ৩২, বালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা।]

শ্রীশৈলেন কুমার চট্টোপাধ্যায়

পথের বাঁকে ঃ নির্মলনলিনী ঘোষ

কথা সাহিত্যে লেখিকা নবাগতা হলেও তাঁর রচনায় চমৎকার সরলতা, ও ভাবের গভীরতা রয়েছে। কাহিনী রচনাতেও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। নীলিমার চরিত্র তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। আমরা তাঁর গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পূব পাড়া রোড, বেলঘরিয়া। ২৪ পরগণা। মূল্য ২৲ টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ-বিজ্ঞান" (৬ষ্ঠ খণ্ড—২য় সং)—৫৲
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "সাজাহান" (৩৫শ সং)—২·৫০
গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটক "প্রফুল্ল" (১৪শ সং)—২·৫০
মন্মথ রায় প্রণীত নাট্যগুচ্ছ "কারাগার-মুক্তির ডাক-মহুয়া" (একত্রে ৩য় সং)—৩·৫০
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই "বহুরূপী"—৩৲

বিজ্ঞপ্তি

পরবর্তী কার্তিক সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পূজা বা শারদীয়া সংখ্যারূপে বর্ধিত কলেবরে শীর্ষস্থানীয় লেখক-লেখিকাগণের রচনা ও নয়নাভিরাম চিত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হইবে। প্রতি কপির বিক্রয় মূল্য হইবে ২৲। "ভারতবর্ষ"-এর গ্রাহকগ্রাহিকাগণকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইবে না। বিজ্ঞাপনদাতাগণকে উক্ত সংখ্যার বিজ্ঞাপনের জন্য এখন হইতেই সত্বর হইবার অনুরোধ জানাই। এজেণ্টগণ যাহাতে তাঁহাদের প্রয়োজন মত সংখ্যা সরবরাহ পাইতে পারেন, তজ্জন্য পূর্বাহ্ণেই তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের আবশ্যক সংখ্যার অর্ডার দিয়া রাখিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত—
কর্মাধ্যক্ষ,
ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কার্ত্তিক—১৩৬৮

প্রথম খণ্ড	ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমোনমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ॥
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমোনমঃ।
নৈঋর্ত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ সর্বাণ্যৈ তে নমোনমঃ॥
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ॥

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মানব প্রকৃতির জটিল ও দুর্বোধ্য নানামুখীনতার প্রামাণ্য ও সর্বাঙ্গীণ পরিচয়রূপে উপন্যাসের মর্যাদা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। অবশ্য সমস্ত সাহিত্যেই এই পরিচয় কোন না কোনরূপে বিদ্যমান। কাব্যে, ধর্মশাস্ত্রে, এমন কি অবাস্তব কল্পনাপ্রধান কোন সাহিত্যেও, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবের মনোলোকেরই ছায়া প্রতিবিম্বিত। কাব্যে ও আখ্যায়িকায় আমরা মানুষের যে রূপ দেখি তাহা মুখ্যতঃ সাধারণীকৃত, আবেগপ্রধান, আদর্শনিষ্ঠ। কিন্তু এইরূপ পরিচয়ে মানুষের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য, সূক্ষ্ম মানস-অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রাত্যহিক জীবনের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ে না। কোন সাহিত্যে অলৌকিক কল্পনাও উদ্ভট অতিরঞ্জন-প্রবণতা মানুষের এক হাস্যকর, অসহায় দৈবক্রীড়নকের মত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে। এই সাহিত্যে যাহাদিগকে আমরা লোক বলি তাহারা মানুষের বিশিষ্ট-চিহ্নহীন, মূল প্রবৃত্তিসমূহের অধীনতায় অভিন্ন, ছাঁচে-ঢালা সংস্করণ। মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার মধ্যে, সাংসারিক নানা সম্পর্কের চাপে, বাহিরের ঘটনার সঙ্গে তাহার অন্তর-প্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থাপন প্রয়াসে তাহার সে ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ বটে, উপন্যাস সেই ধীরে ধীরে ফুটিয়া-ওঠা, ক্রমশ-পরিস্ফুট ব্যক্তিস্বরূপ-প্রকাশের সাহিত্যিক বাহন।

রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও উপন্যাসিক। সেই জন্য তাঁহার মানবচরিত্রাঙ্কনে ও জীবনচিত্রণে এই উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীই প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম দুইখানি উপন্যাস—'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৬)—তাঁহার প্রাথমিক যুগের নিম্নলিখিত কাব্য-গুলির—'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২), 'প্রভাত সংগীত' (১৮৮৩), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)—সমকালীন। সুতরাং এই কাব্যগ্রন্থগুলির অস্ফুট উচ্ছ্বাসময়, অর্ধবাস্তব ছায়া কল্পনার কুহেলিকামণ্ডিত কাব্যমনোভাব উপন্যাস দুইটির পরিকল্পনার মূলগত প্রেরণা। জীবন ও মানবিক সম্পর্ক জটিলতাকে বস্তুনিষ্ঠ, অথবা গভীর সত্যোপলব্ধিতে ভাস্বর রূপ দিবার অভিজ্ঞতা কাব্যলোকবাসী ঔপন্যাসিকের সাধ্যাতীত ছিল। জীবনের যে অংশটুকু তাঁহার কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা তরুণ মনের কবিকল্পনানির্দিষ্ট। স্বভাবতঃই কোন গভীর জীবনসত্য এই ঐতিহাসিক রোমান্সের সুদূর জীবনপ্রান্ত সংলগ্ন ও বস্তুবিমুখ ধ্যান কল্পনার অন্তরালবর্তী কাহিনী হইতে নিঃসারিত হয় নাই। 'বউঠাকুরাণীর হাট'-এ কোন কেন্দ্রীয় চরিত্র বা জীবন-রহস্যভেদী দৃষ্টি কাহিনীর গভীর তাৎপর্যটি আমাদের নিকট প্রকাশ করে না। ঘটনাপ্রবাহ যেন স্বপ্ন-সঞ্চারণের ন্যায় মন্থর; চরিত্রগুলি যেন একইরূপ মনোভঙ্গী ও কর্ম-প্রতি-ক্রিয়ার প্রাণচাঞ্চল্যহীন যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি। প্রতাপাদিত্য যেমন একটা অন্ধ, নির্মম, সমস্ত আনন্দ ও সুকুমার বৃত্তির নিষ্পেষণকারী দানবীয়শক্তি, বসন্ত রায়ও তেমনি একটা বিহ্বল, অসহায় আনন্দময়তার ব্যর্থ স্বপ্নকল্পনা। জটিল ঘাত-প্রতিঘাতময় বাস্তব জগতে উভয়েই বে-মানান, সঙ্গতি-হীন। উদয়াদিত্য, সুরমা, বিভা যেন এই নিদারুণ ক্রূর শক্তির নিকট সমস্ত প্রতিরোধের ইচ্ছা পর্যন্ত হারাইয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে—তাহারা অজগরের দ্বারা সম্মোহিত ছাগ-শিশুর ন্যায় একান্তভাবে ত্রস্ত ভীতিবিহ্বল। প্রতাপা-দিত্যের পারিবারিক জীবনে কাহারও ইচ্ছার স্বাধীনতা বা জীবন-স্পন্দন নাই। সকলেই যেন এক আততায়ী দস্যুর লৌহশাসনে শৃঙ্খলিত। প্রতাপ অন্ধ নিয়তির ন্যায় দুর্বোধ্য ও ভাবলেশহীন।

প্রতাপাদিত্যের কাহিনীর সহিত আর একটি কাহিনী

শাখা-আখ্যায়িকারূপে সংযুক্ত—উহা তাহার জামাতা চন্দ্রদ্বীপরাজ রামচন্দ্রের পরিবারসংশ্লিষ্ট। প্রতাপাদিত্যের দিকে যেমন অটল, বজ্র-কঠোর গাম্ভীর্য-বিভীষিকা, রামচন্দ্রের দিকে তেমনি লঘু-তরল আমোদ-প্রমোদ ও হাস্যকর অন্তঃসারশূন্য আত্মশ্লাঘা। একটি যেন অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন; ইহাদের মাঝে কোন তুচ্ছ জীবনযাত্রার চিত্র নাই। প্রতাপাদিত্য মহিষী, মন্ত্রী, রামমোহন—ইহারা স্বাভাবিক হইলেও নগণ্য, কার্যতঃ প্রভাবহীন। রুক্মিণী বা মঙ্গলা এক অতিনাটকীয় নরকাগ্নির একটি অত্যন্ত অকেজো স্ফুলিঙ্গ—অনর্থক অগ্নির পরিবর্তে ধূম সৃষ্টি করে ও নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও দগ্ধ করিতে অক্ষম। লেখকের ইতিহাস-কল্পনাও অতিরঞ্জিত, ঘোরাল জীবন-মরীচিকাবোধ ছাড়া অন্য কোথায়ও এরূপ চরিত্রের অস্তিত্ব নাই। বসন্ত রায়ের হত্যাও এইরূপ একটি অহেতুক, মানসসমর্থনহীন রক্তপাতের প্রক্ষেপ। উপন্যাসের শেষ ফলশ্রুতি একটি করুণ স্মৃতিবিজড়িত কিংবদন্তীর মধ্যে নিহিত। স্বামী-প্রত্যাখ্যাত বিভাই উপন্যাসের জীবন-তাৎপর্যের কেন্দ্র-বিন্দুরূপে শ্রেষ্ঠ নায়িকার পদ অধিকার করিয়াছে। শাখা কাহিনীতেই আখ্যায়িকার স্বাদুতম ফলটি ধরিয়াছে।

'রাজর্ষি'-তে রবীন্দ্রনাথের জীবন-সমীক্ষা পূর্ণতর ও সঙ্গততর রূপ লইয়াছে। লেখকের আদর্শবাদও এখানে বাস্তব জীবনের সহিত অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে। গোবিন্দ মাণিক্য বসন্ত রায়ের আরও পরিণত, জীবন-সংগ্রামের অভিঘাতে সুগঠিত, দৃঢ় ইচ্ছাসম্পন্ন সংস্করণ। তাহার অন্তরের গভীরে একটি বাহ্য উচ্ছ্বাসহীন, কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তি স্থির মহিমায় বিরাজিত; তাহার প্রাণের উৎসমূলে একটি অচঞ্চল জীবনবোধ ও অবিচলিত অধ্যাত্ম প্রত্যয় ক্রিয়াশীল হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র-সংহত করিয়াছে। রঘুপতি প্রতাপাদিত্যের যান্ত্রিক কাঠিন্যকে অন্তর্দ্বন্দ্বে সজীব ও মানবিক কোমলতা ও গতিশীলতায় প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছে। জয়সিংহের চরিত্রে 'সন্ধ্যা সংগীত' ও 'প্রভাত সংগীত'-এর কবি যেন নিজের তরুণ, প্রেমপিপাসু, কর্তব্য-সংকটে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তটিকেই উপন্যাসের সংঘাতময় জগতে পূর্ণতর আত্মবিকাশের সুযোগ দিয়াছেন। অপর্ণা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর বালিকারই একটি অধিকতর সুসংবদ্ধ ও প্রাণক্ষুধায় আলোড়িত প্রকাশ। নবোন্মেষিত প্রেম-চেতনায় চঞ্চল ও অদম্য। গোবিন্দ মাণিক্য-রঘুপতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুধু ব্যক্তিগত বিরোধ নয়, দুই বিপরীত আদর্শের, ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রাহ্মণ্যশক্তির, অনুভূতি-কেন্দ্রিক ধর্মবোধ ও আচারপুষ্ট, চিরাভ্যস্ত সংস্কারের মর্মান্তিক, অন্তরবেদনামথিত সংগ্রাম। নক্ষত্র রায় রামচন্দ্রের আত্মম্ভরিতা ও খামখেয়ালি স্বভাবের একটু রূপান্তরিত মূর্তি। এখানে জীবনতত্ত্ব আরও সুপরিস্ফুট ও সন্দেহাতীতরূপে অভিব্যক্ত। গোবিন্দ মাণিক্যের বহির্জীবনে পরাজয় একটি আন্তর বিজয়ে দীপ্তোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রঘুপতির মূঢ়হস্তে নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ফিরিয়া আসিয়া তাহারই হৃদয়কে ভিন্ন করিয়াছে। উপন্যাসের সমস্ত বস্তুবিন্যাস কিছুটা অপটু হস্তচালিত হইয়াও এক পরম সত্যের অভ্রান্ত নির্দেশ দিয়াছে, সমস্ত বহির্জগতের উপর, অভিমানপুষ্ট, অহঙ্কৃত ধর্মমূঢ়তার উপর আত্মিক শক্তির ও বিশুদ্ধ হৃদয়াবেগের জয় ঘোষণা করিয়াছে। তথাপি এই সিদ্ধান্ত স্বাধীন জীবনবীক্ষণের ফল নয়, ইহা পূর্বসংস্কার-নিয়ন্ত্রিত একটি ধর্ম-সমস্যার কৃত্রিম উপায়লব্ধ, সুলভ সমাধান। ঔপন্যাসিক এখানে প্রায় সম্পূর্ণভাবে কবিদৃষ্টির অধীন।

২

এইবার প্রায় দীর্ঘ ষোল বৎসরের বিরতির পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চোখের বালি' (১৯০৩) লইয়া উপন্যাস-ক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'কণিকা' (১৮৯৯), 'কথা', 'কাহিনী', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা' (১৯০০), ও 'নৈবেদ্য' (১৯০১) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া নিজ কবিত্বশক্তির অস্ফুট সম্ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত করিলেন ও 'ছোটগল্প' (১৮৯৪), 'বিচিত্র গল্প' ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৯৪), 'কথা চতুষ্টয়' (১৮৯৪), 'গল্পদশক' (১৮৯৫) 'গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড' (১৯০০), 'গল্প' (১৯০১) ও 'কর্মফল' (১৯০৩) রচনা করিয়া ছোটগল্পের মাধ্যমে তাঁহার কাব্যানুভূতি ও বাস্তবপর্যবেক্ষণের অপূর্ব সমন্বয় স্থাপন করিলেন। এই সুদীর্ঘ এক যুগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা যেমন সুস্পষ্ট ও জ্যোতির্ময় পরিণতি লাভ করিয়াছে, তেমনি তাঁহার জীবন পর্যবেক্ষণ ও মানবচরিত্রে

অন্তর্দৃষ্টি একটি কাব্যনিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র রসনিবিড়তায় নিটোল হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যে কথা-সাহিত্য এতদিন তাঁহার কাব্যের অধীন উপগ্রহরূপে কল্পনা-বাষ্পে আচ্ছন্ন ও অপ্রকৃত জীবনবোধে প্রহেলিকাময় ছিল, এখন সেই জীবনকাহিনী একটি নিজস্ব রীতি-স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়া আপন প্রকৃতি অনুযায়ী সুসঙ্গত কলারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এখন হইতে লেখক ঔপন্যাসিক প্রয়োজনেই কাব্যানুভূতিকে তাঁহার উপন্যাসে স্থান দিয়াছেন, কাব্যের অপরিমিত উচ্ছ্বাসে উপন্যাসের কলা-রীতিকে বিড়ম্বিত করেন নাই। কল্পনা ও বাস্তবানুকৃতির দুই বিভিন্ন রীতির বিসদৃশ ও যথেচ্ছ মিশ্রণে তাঁহার কথা-সাহিত্যে যে একটি শঙ্কর রূপের উদ্ভব হইয়াছিল, পরিণত কলাবোধের ফলে সেই অবাঞ্ছিত সহাবস্থানের অবসান ঘটিয়া উভয়েই আপন আপন অধিকারে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইল। কাব্য যে পরিমাণে পূর্ণ বিকশিত হইল, ঠিক সেই পরিমাণেই উহা উপন্যাসের উপর অনুচিত অভিভব সংহরণ করিয়া উহার আত্মবিকাশের পথকে বাধামুক্ত করিল।

'চোখের বালি' শুধু পূর্বগামী দুইটি উপন্যাসের সহিত তুলনায় নহে, হৃদয়-দ্বন্দ্বের জটিলতার উন্মোচনে, মানব-প্রকৃতি রহস্যের উপর তীক্ষ্ণ সন্ধানী আলোক-প্রক্ষেপেও নিজ অবলম্বিত রীতির অকুণ্ঠিত আত্মপ্রত্যয়ে অসাধারণ। এই উপন্যাসে যে রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করিলেন তিনি কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছায়ামাত্র নহেন, একটি সম্পূর্ণ নূতন মানস-ভঙ্গীর অধিকারী ও জীবনতত্ত্বব্যাখ্যাতা। কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র পরিবারে, যেখানে মাত্র চারিজন নর-নারী একটি সম্পূর্ণ তৃপ্ত, বিক্ষোভহীন জীবনধারার অনুবর্তন করিতেছিল, সেখানে—মাত্র দুইটি আগন্তুকের আবির্ভাবে একটা গভীর বিপর্যয়ের সূত্রপাত হইয়াছে। এই পরিবারের কেন্দ্রস্থলে ছিল মহেন্দ্র, তাহার সমস্ত খাম-খেয়ালি আবদার, তাহার নিঃসীম আত্মসুখের দাবী ও অসপত্ন অধিকার-বোধ লইয়া। তাহার মা ও কাকীমা এই ক্ষুদে জবাবটির সমস্ত দুরন্ত ইচ্ছা পূরণের যন্ত্রমাত্র; এমন কি তাহার বন্ধু বিহারীও মহেন্দ্রের প্রবল আকাঙ্ক্ষার নিকট নিজ বাগদত্তা বধূর উপর সমস্ত অধিকার প্রত্যাহার করিয়াছে। এই মাহেন্দ্রিক সৌর জগতে প্রবেশ করিয়াছে আশা উহার স্তিমিত নক্ষত্রদীপ্তি ও বালবিধবা বিনোদিনী উহার ধূমকেতুর বহ্নিজ্বালাময় পুচ্ছদাহ লইয়া। এই দুইটি প্রাণী মিলিয়া যে অশ্রান্ত আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা অভিনয় করিয়াছে, যে অহরহ হৃদয় সমুদ্র মন্থনে বিষজ্বালা ছড়াইয়াছে, একটি ছোট পরিবারের চায়ের পেয়ালায় যে তুফান তুলিয়াছে তাহা অভাবনীয় ও শুধু কবিদৃষ্টির অনধিগম্য। কাব্যে মানব প্রকৃতির যে সুকুমার আদর্শ-কল্পনামণ্ডিত পরিচয় মিলে ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রেমের অধিকার-বঞ্চিত, ঈর্ষ্যা-দগ্ধ, মহেন্দ্রকে যে কোন উপায়ে পদানত করিতে দৃঢ়সংকল্প, কুটিল সংক্রান্ত জাল বিস্তারে দক্ষ, অন্তর্দ্বন্দ্বে ও আত্মপীড়নে উদ্ভ্রান্ত বিনোদিনীর যে চিত্র তাহা কাব্য সুষমার সমস্ত বেষ্টনীকে অতিক্রম করিয়া এক নিষ্ঠুর জীবন-সত্যের উদ্ঘাটনে ঝলসিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রেরণা পাইয়াছেন বঙ্কিমের উপন্যাসে, কিন্তু বঙ্কিম-নির্দিষ্ট রুচিগত ও নীতিগত সীমাকে তিনি বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত কবি রবীন্দ্রনাথ আসিয়া ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সমস্যা সমাধান করিয়াছেন, কক্ষচ্যুত তারকার ন্যায় বিনোদিনীর জ্বলন্ত উল্কাপরিক্রমাকে তিনি ধ্যানসমাহিত শান্তি-পারাবারে নির্বাপণের পথ দেখাইয়াছেন।

মহেন্দ্রের অন্ধ আত্মজ্ঞানহীনতা ও নির্লজ্জ আত্মতৃপ্তি সাধনই বিনোদিনীকে উত্তেজিত করিয়া উপন্যাসের সমস্ত জটিলতার প্রেরণা দিয়াছে, আশা, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা তাহাদের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রতিবিধানশক্তির অভাবের জন্যই এই সর্বধ্বংসী প্রবৃত্তি অনলে ইন্ধন যোগাইয়াছে। বিহারী বরাবর মহেন্দ্রের অনুচররূপে কাজ করিয়া হঠাৎ শেষের দিকে স্বাধীন সত্তায় উন্নীত হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের কুশলতায়, ঘটনা-পরম্পরার নিপুণ গ্রন্থনে ও উহার মাধ্যমে সার্থক চরিত্র বিকাশে, তুচ্ছ কারণ হইতে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির প্রবর্তনায়, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর অন্তর্লীনতার ইঙ্গিতে, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সহজ পথে বিস্ফোরক উপাদানের প্রাচুর্য-আবিষ্কারে, এক কথায় মানবজীবনের রহস্যময় দুর্বোধ্যতার উদ্ঘাটনে এবং ব্যক্তিসত্তার নিগূঢ়তা প্রতিপাদনে রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য জীবনসত্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

'নৌকাডুবি'—তে (১৯০৬) রবীন্দ্রনাথ অনেকটা নিম্নতর সুরের জীবন কাহিনী রচনায় অবতরণ করিয়াছেন।

ইহাতে তিনি জীবনের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত নয়, পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যের ফ্রেমে আঁটা। এই উপন্যাসে তিনি যে পরিস্থিতির কল্পনা করিয়াছেন তাহা অনেকটা অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য। কমলা যে রমেশের সদ্যো-পরিণীতা বধূ নয়, তাহা আত্মীয়স্বজনের প্রশ্নে ও পরিচয়-জিজ্ঞাসায় এক রাত্রির মধ্যেই ধরা পড়িবার কথা। বিশেষতঃ রমেশ তাহাকে যে স্কুলে ভর্তি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে তাহারই আলোচনা প্রসঙ্গে এ ভুল সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই অসাধারণ পরিস্থিতির মানস-প্রতিক্রিয়া দেখাইবার জন্যই এই প্রাপ্তিকে কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘস্থায়ী করিয়াছেন। মনে হয় এই অদ্ভুত কাল্পনিক অবস্থা পাত্র-পাত্রীর মনোলোকে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করিবে তাহার প্রতি আকর্ষণবশতঃই তিনি উহাকে ঔপন্যাসিক ঘটনার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। উপন্যাসের অধিকাংশই মনোজ্ঞ ভ্রমণকাহিনীর রূপ লইয়াছে; এই সূত্রে ইহার মধ্যে নানাজাতীয় আগন্তুক পার্শ্বচরিত্রের যাতায়াতের পথটি উন্মুক্ত হইয়াছে। চক্রবর্তী খুড়া এইরূপ রাজ-অতিথির মর্যাদা লইয়া উপন্যাসে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রবর্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য দুই প্রণয়োন্মুখ তরুণ হৃদয়ের মধ্যে একটা সঙ্গত অন্তরাল সৃষ্টি করা। কমলার নিজ প্রকৃত স্বামীর সন্ধান ও অবিষ্কার, নলিনাক্ষের নিকট তাহার মুগ্ধ আত্মনিবেদন উপন্যাসের সহজ পথ ধরিয়া আসে নাই। উহা উপন্যাস মধ্যে পৌরাণিক পাতিব্রত্য—আদর্শের প্রক্ষেপ। কমলার আচরণের মধ্যে যে-টুকু বিশুদ্ধ জীবনসত্য তাহা তাহার বঞ্চিত হৃদয়ের অভিমান ও খাঁটি ও মেকী দাম্পত্য-সম্পর্কের অসঙ্গতির বোধ-বিষয়ক। রমেশ ও হেমনলিনীর হৃদয়সম্পর্কও হেমনলিনীর প্রকাশবিমুখ, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় চরিত্রের একনিষ্ঠতাই উপন্যাসিক বাস্তবতাসমৃদ্ধ অন্তর রহস্য প্রকাশ। কিন্তু এই সত্য খুব গভীরতা দ্যোতক নহে। উপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ যেন 'নৌকাডুবি'তে আবার কবিসুলভ রোমান্স-প্রবণতার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।

'গোরা' (১৯১০) রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস, পটভূমিকার মহাকাব্যোচিত প্রসারে। বৃহৎ জাতীয়জীবন-ব্যাপী—পরিধির মধ্যে ক্ষুদ্র পরিবার-জীবনের ইতিহাস—সন্নিবেশে। মুক্তিসংগ্রামের তীব্র বিক্ষোভ ও ধর্মমত-সংঘর্ষের হিংস্র উত্তেজনার অত্যুগ্র ভূমিকায় ব্যক্তিসত্তার আত্মবিকাশের ক্ষেত্র রচনায় এই উপন্যাসটি সব দিক দিয়াই অসাধারণ। এখানে বহির্ঘটনার প্রতিঘাত-চঞ্চল পরিবেশে অন্তরাত্মার মুগ্ধ সসঙ্কোচ সঞ্চরণ; মতবাদ-সংঘাতের অগ্ন্যুৎপাতেই এখানে ব্যক্তিমনে নব-অনুভূতির স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠে; যুদ্ধোন্মত্ত চিত্তের প্রথমভাবে উত্তেজিত শিরা-স্নায়ুতেই সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ইঙ্গিত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আবির্ভূত হয়। রণক্ষেত্রের তুমুল কোলাহলের মধ্যেই অন্তররহস্যের লীলাস্পন্দন চমকিত বিস্ময়ের সহিত আপনাকে উপলব্ধি করে। এই উপন্যাসে দুইটি পরিবারের কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙলা দেশের রাজনীতি ও ধর্মনীতির দেশব্যাপী আলোড়ন মুখর হইয়া উঠিয়াছে। গোরার ও পরেশবাবুর—উভয় পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতেই ইতিহাসের বিপুল বৈচিত্র্য ও প্রচণ্ড গতিবেগ নিজ অভি-নয়োপযোগী রঙ্গমঞ্চ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

একটা সাধারণ দুর্ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া এই বৈদ্যুতী-শক্তিপূর্ণ পরিবারদ্বয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথটি খুলিয়া গিয়াছে—দুই বিরুদ্ধ আদর্শসম্পন্ন সংসার—খাঁচায় প্রেমের অচিন পাখী আবির্ভাব—অন্তর্ধানের অদৃশ্য পথটি আবিষ্কার করিয়াছে। দুইটি বাড়ীতেই সমধর্মী ব্যক্তির অস্তিত্ব যেন একটি মিলনের সুদূর ইঙ্গিত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছে। আনন্দময়ী—পরেশবাবু, বিনয়—ললিতা ও শেষ পর্যন্ত গোরা—সুচরিতা যেন একে অপরের মধ্যে পরিপূরক সত্তার সন্ধান পাইয়াছে। পরেশবাবুর বাড়ীর পিছনে যেমন ব্রাহ্মসমাজ উহার অতি-সতর্কতার কাঁটাবেড়া ও আক্রমণের উদ্যত খড়্গ লইয়া সর্বদা পাহারায় রত, গোরার বাড়ীতে গোরা নিজেই সমগ্র হিন্দু ধর্মাদর্শের প্রতিনিধিরূপে উগ্র যুদ্ধ-মনোভাব লইয়া দণ্ডায়মান। পরেশবাবুর অবিচল আদর্শ ও হারানবাবুর সদা-সন্দিগ্ধ সঙ্কীর্ণতা যেন গোরার একক সত্তায় মিলিয়াছে। বরদাসুন্দরী ও পানুবাবুর খাঁটি প্রতিযোদ্ধা হইলেন হরিমোহিনী ও কতকটা নির্বি-রোধী, স্থূল স্বার্থসারগঠিত মহিম। হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজ উহাদের সমস্ত মহত্ত্ব ও নীচতা লইয়া, উহাদের ধর্মানুভূতির বিশুদ্ধ আবেগ এবং গোঁড়ামির ও ভণ্ডামির ঔদ্ধত্য ও মিথ্যাচার লইয়া এই দুইটি ছোট পরিবারের ক্ষুদ্র মুকুরে

নিজ নিজ বিরাট প্রতিচ্ছায়া ফেলিয়াছে ও উহাদের উপর একটা সাঙ্কেতিক গৌরব আরোপ করিয়াছে।

গোরার প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয় তাহার ব্যক্তি-পরিচয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সে যেন ব্যক্তি নয়, সমগ্র মুক্তিকামী, আচারনিষ্ঠ, কৃচ্ছ্রসাধনে অহংকৃত ভারতীয় আত্মার মূর্তবিগ্রহ। তাহার সমস্ত আচরণ ও সংলাপ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কার্যকলাপের ন্যায় প্রতিপক্ষের যুক্তি-খণ্ডন ও নিজ মতপ্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্ববোধ নিয়ন্ত্রিত তাহার ব্যক্তিপুরুষের আত্মগত কথা—এই তর্ক কোলাহল ও যুদ্ধজয়ের উত্তেজনা মধ্যে প্রায় শোনা যায় না। বাস্তবিক এই ভারত-প্রতিনিধির কাছে সুস্থ ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই। তাহার আবাল্যবন্ধু বিনয় তাহার মতবাদবিরুদ্ধ কোন কাজ করিলেই তাহাদের হৃদয়-সম্পর্কের অবসান হইতে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব ঘটে না। তাহার মাতা আনন্দময়ী ও তিল-মাত্র আচার-শিথিলতা দেখাইয়া গোরার কাছে কোন প্রশ্রয় পান না। তাহার এই প্রবল ইচ্ছাশক্তিই তাহার দেশ প্রতিনিধিত্বের নিকট তাহার ব্যক্তিসত্তার রাজকর। কাজেই গোরার অধিকাংশ কাজই ইতিহাসের উপাদান, জীবনচরিতের নহে। এই প্রতিনিধিত্বের ছদ্ম-গৌরব উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র—যথা পরেশবাবু, আনন্দময়ী প্রভৃতি-র উপরও কমবেশী সংক্রামিত হইয়াছে। বাহ্য আচরণে ইঁহারা গোরার সম্পূর্ণ বিপরীত, ইঁহাদের বহির্জীবন প্রায় সম্পূর্ণভাবে শান্ত, আত্মসমাহিত অন্ত-র্জীবনের নীরবতায় লীন হইয়াছে। তথাপি ইঁহারাও যেন আপন আপন ধ্যানতন্ময়তার নির্জনতায় আপনাদের বহির্জীবন-প্রতিহত অন্তর্মুখিতার নিঃসঙ্গ সাধনায় যেন হৃদয়-নির্দেশ অপেক্ষা কর্তব্য-নিষ্ঠারই অনুশাসন পালন করিয়া চলিয়াছেন। আনন্দময়ী সমস্ত সংসার হইতে মুখ ফিরাইয়া গোরাকে সন্তানরূপে লাভ করার ফলেই যে সংস্কারহীন ঐতিহ্যস্খলিত মাতৃপ্রকৃতিকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সারা জীবন ধরিয়া অন্তরের সমস্ত নিষ্ঠা ও স্নেহশীলতা দিয়া তাহাকেই লালন করিয়াছেন। কর্তব্যবোধ তাঁহার অন্তরের একটা দিক উন্মোচিত করিয়া বাকী সমস্ত অংশকে শুধু পরের কাছে নয়, নিজের কাছেই রহস্যাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। পরেশ-বাবুর যে অন্তর্জীবন তাহা স্বতঃবিকশিত নয়। শুধু বহি-র্জীবনের অবাঞ্ছিত ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আত্মরক্ষার দুর্ভেদ্য দুর্গ মাত্র—উহাতে পীড়িত চিত্ত বিরাম পায় কিন্তু বিকাশ লাভ করে না। গোরার অতিমুখর, পরেশ ও আনন্দ-ময়ীর অর্ধমূক, বিনয়-ললিতার স্বভাবোচ্ছল ও সুচরিতার আত্মনিরোধের মধ্য দিয়াই আত্মবিকাশের দিকে অগ্রসর—এই কয়টি মানব-প্রকৃতির অধিকারীই উপন্যাসের চরিত্র-পরিচিতির ভূমিকা রচনা করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে গোরা ও সুচরিতাই সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিত্ব-বিকশিত চরিত্র। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ-ভাবের আদান-প্রদান ও পরিচয়ঘনিষ্ঠতাই উভয়ের বিভিন্ন কারণে অবদমিত ব্যক্তিসত্তার উল্লেখ ও পরিণতিবিধান করিয়াছে। তাহাদের পরস্পর-সন্নিকর্ষ তাহাদের মনোভূমিতে যে অদৃশ্য ভূকম্পন জাগাইয়াছে, তাহাই তাহাদিগকে বাহির হইতে অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার প্রেরণা দিয়াছে। গোরার প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় সুচরিতার মনের গভীরে ঘা দিয়া তাহাকে আপনার প্রকৃতি-রহস্যের প্রতি সচেতন করিয়াছে। সুচরিতার নীরব, প্রকাশকুণ্ঠিত আত্মসমীক্ষা গোরাকেও বহির্নিরপেক্ষ স্বকীয় মানস-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। উভয়ের অন্তরলোকের স্বরূপ নির্ণয় আর কাহারও দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হইত না। গোরার বাহিরের ছদ্মগৌরবস্ফীত পরিচয় ধূলিসাৎ হইয়া তাহার অন্তরের ক্ষীণ, প্রতিকূল বায়ুচঞ্চল অনুভূতিশিখাটি আরও প্রোজ্জ্বল ও নিঃসংশয় হইয়াছে। সুচরিতার সংশয়বিদ্ধ, আত্মপরিচয়-হীন প্রেম ধর্মস্মৃতির দ্বন্দ্বমুক্ত হইয়া নিজ পূর্ণ সুরভিত সত্তাটি বিকশিত করিয়াছে। বিনয়-ললিতায় যাহা স্বভাব সৌকুমার্যের উচ্ছলতায় ঘটিয়াছে, গোরা-সুচরিতায় তাহাই দুরূহ অধ্যাত্মসাধনার উত্তাপে ধীরে পাকিয়া উঠা ফল। আর কাহারও চরিত্রে কোন পরিণতি নাই—তাহারা ঘটনা-চক্রে ঘূর্ণ্যমান হইয়া বাহিরের স্রোত তাহাদিগকে যেখানে আনিয়া ফেলিয়াছে সেইখানেই তাহাদের যাত্রা শেষ করিয়াছে।

'গোরা' উপন্যাসে পরিধির বিশালতা, পরিবেশের নানা-মুখী নিখুঁত চিত্রণ, জাতীয়-মানসের উদ্বেল জীবনোচ্ছলতা, তর্কযুদ্ধ ও শক্তিপরীক্ষার সংগ্রামের উত্তেজনা—এককথায় সমকালীন বাঙ্গলার সম্পূর্ণ পটভূমিকা উহাতে ব্যাপ্তির

মহিমা দিয়াছে। ঠিক সেই পরিমাণে গভীর জীবনসত্য হয়ত পরিবেশিত হয় নাই। গোরার নিষ্ঠ, আত্ম-আবিষ্কার-বিমুখ প্রকৃতিতে প্রেমের বিলম্বিত, কিন্তু অনিবার্য আবির্ভাব সমুচ্চ চন্দ্রোদয়ের ন্যায় জীবনের এক রহস্যময় মহিমাব্যঞ্জক। সুচরিতার আত্মনিরোধশীল, মৃদু চরিত্রে প্রেমের কুণ্ঠিত অভ্যুদয় যেন হেমন্তসন্ধ্যার কুহেলি-ঘেরা ম্লান-স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা। এই দুইটি প্রেম-রহস্য কাহিনী ও উহাদের প্রকৃতি-পার্থক্য-বিষয়ে সূক্ষ্ম অনুভূতি উপন্যাস-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দান—বাকী বিবৃতি-বর্ণনা-বিতর্কের উপস্থাপনায় অসাধারণ দক্ষতা মাত্র।

(৩)

'গোরা'র পরে ছয় বৎসর ব্যবধানে 'ঘরে বাইরে'-তে (১৯১৬) রবীন্দ্র-উপন্যাস নূতন রীতি অবলম্বন করিল। জীবন এখন তাঁহার নিকট একটি বিশিষ্ট সমস্যারূপে দেখা দিল। জীবনের সমগ্রতা, উহার নানা রসসমন্বিত বিস্তার, উহার স্বতস্ফূর্ত গতিছন্দ—ইহাদের পরিবর্তে তিনি ইহার সমস্যা ছুরিকাবিদীর্ণ একটু ক্ষুদ্র সভাংশের তীক্ষ্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণকেই নিজ লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মনোভাব কবির ন্যায় আবেগময় ও স্নিগ্ধরসপ্রধান নয়, শ্লেষতীক্ষ্ণ, মননদুর্ভেদ্য ও সূচ্যগ্র বাল্য-পরম্পরা যোগে লক্ষ্য-ভেদতৎপর। তাঁহার আলোচনা সরল অগ্রগতি অপেক্ষা বৃত্তপরিক্রমারই বেশী সাদৃশ্যযুক্ত। চলমান ঘটনাপ্রবাহ অপেক্ষা উদ্দেশ্যের বাঁধে আটকান নিশ্চল ঘটনাংশের প্রতিই তাঁহার মনোযোগ বেশী। প্রত্যক্ষ বর্ণনা অপেক্ষা পরোক্ষ উল্লেখ, যাহা চোখের সামনে ঘটিতেছে তাহার বেগ ও অভাবনীয় বিস্ময় প্রতিফলন অপেক্ষা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার তাৎপর্য নিরূপণই তাঁহার নিকট বেশী রুচিকর মনে হইয়াছে। তিনি জীবন্ত ঘটনাকে শিকার করিবার জন্য তাহার পিছু পিছু রুদ্ধনিঃশ্বাসে ধাওয়া করেন নাই, কিন্তু জন্তুটা যখন শিকার শেষে পাশবদ্ধ অবস্থায় তাঁহার নিকট আনীত হইয়াছে তখন উহাকে চারিদিক হইতে স্থিরমস্তিষ্কে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শেষ পর্যায়ের উপন্যাস-গুলিতে প্রাণের চমক অপেক্ষা বুদ্ধির দীপ্তি, সৃষ্টির রহস্যের অভাবনীয়তা অপেক্ষা উহার মননসম্ভব আশ্চর্য বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যই বেশী প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত যুদ্ধোত্তর জগতে আধুনিক মনোভঙ্গী যে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই নবরূপী প্রক্রিয়া ও প্রেরণা এই উপন্যাসগুলিতে প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়েই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

'ঘরে-বাইরে'-তে সমস্যা দ্বি-কেন্দ্রিক ; প্রথম, বিমলা-নিখিলেশের ক্ষেত্রে দাম্পত্য প্রেম বাহিরের প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইতে পারে কি না ; দ্বিতীয়, নিঃসঙ্কোচ কামনার ছদ্মবেশী ভাবাদর্শমূলক আবেদন ভাবাবেগহীন নির্লিপ্ত ও নিষ্ঠাবান প্রেমের অধিকারকে হঠাইতে সক্ষম কি না। এই দ্বিবিধ সমস্যার তীব্রতা, এই পরীক্ষার অন্তর্নিহিত বিপরীত আকর্ষণ ও মর্মান্তিক বেদনা ফুটাইবার জন্যই উপন্যাসের চরিত্রসমূহ ও পরিস্থিতিপুঞ্জ পরিকল্পিত। নিখিলেশ ও সন্দীপ ঔপন্যাসিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার অদম্য প্রাণশক্তিতে নয়, কিন্তু পূর্বকল্পিত সমস্যা সংঘাতের বাহনরূপে। নিখিলেশ এতটা নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন না হইলেও পারিত। তাহার বংশপ্রভাব ও পূর্ব-জীবনকাহিনী বিমলার স্মৃতিরোমন্থনসূত্রে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ; তাহার চরিত্রের দুর্বোধ্য অংশ ও আদর্শবাদের অবিশ্বাস্য প্রেরণা আমাদের বোধগম্য করিবার জন্য মাষ্টার মশায়ের অবতারণা। নিখিলেশের ব্যক্তিসত্তা যে পরিমাণে ক্ষীণ, সন্দীপের ব্যক্তিত্ব সেই পরিমাণে উদগ্র ও নীতি-সংযমের সম্পূর্ণ অভাববশতঃ অমিতাচারী ও আতিশয্যস্ফীত। অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের বিচারবুদ্ধিহীন ভাবাতিশয্য তাহার এই অসংযত ও নীতিহীন ভোগলিপ্সার একটি সঙ্গত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে ও ইহাকে খানিকটা ভাবমুগ্ধতার অর্ঘ নিবেদন পাত্রের ছদ্ম-গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে। স্বদেশী যুগের উগ্র মদিরা যেমন একদিকে গোরার, তেমনি অপর-দিকে সন্দীপের অস্তিত্বকে সম্ভব্যতা দিয়াছে—তাহারা অন্ততঃ কালচিহ্নিত। কিন্তু নিখিলেশ সর্বকালীন হইতে গিয়া কোন কালেরই হইয়া উঠে নাই, উহার আদর্শগত সার্বভৌমতা কোন নির্দিষ্ট যুগপ্রতিবেশের সীমারেখায় আবদ্ধ হয় নাই। এইখানেই নিখিলেশের দুর্বলতা।

অবশ্য যে বিমলা এই দ্বৈতসংগ্রামের উপলক্ষ ও রণ-ক্ষেত্র সে কোন theory-র সিমেণ্ট বাঁধান মেজেতে ফুটিয়া উঠে নাই ; তাহার উদ্ভব বাস্তব জীবনের সরস মৃত্তিকায়। তাহার সত্তাটি নিছক মানবিক প্রবৃত্তি গঠিত, কোন রাসায়নিক পরীক্ষাগারে সংগৃহীত মিশ্র উপাদানের সংযোগ-ফল সে নহে। যাহার পিছনে ধনী পরিবারের সমস্ত

ঐতিহ্য শাসন ও দুর্ভাগ্যময় ইতিহাস খাড়া আছে, যাহাকে বড়জা মেজজার ঈর্ষ্যা ও শ্লেষশাণিত বাক্যবাণ মুহুর্মুহু হজম করিতে হয়, সে আর যাই হউক স্থির ভাবসত্তায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত চরিত্রমধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোর ও অসহনীয় পরীক্ষা বিমলার উপর দিয়াই গিয়াছে। সন্দীপ রাজোচিত মর্যাদার সহিত যাহা দাবী করিয়াছে ও নিখিলেশ দার্শনিকোচিত নির্লিপ্ততার সহিত যে দাবী প্রতিরোধ হইতে আত্মসংহরণ করিয়াছে, বিমলাকে সেই দাবী মিটাইতে হইয়াছে। তাহাকে হেয় গোপনতার আশ্রয় লইয়া সন্দীপের রাজকোষে কর যোগাইতে হইয়াছে ও সেই চুরি ধরা পড়ার ভয়ে তাহার আদর্শনিষ্ঠার সমস্ত জোর, তাহার সত্যভাষণের সমস্ত সাহস কয়েকটি কম্পমান স্বর্ণমুদ্রার অস্বস্তিতে সঙ্কুচিত হইয়াছে। আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে সে বিচলিত হইয়াছে স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা হইবার আশঙ্কায় নয়, গৃহিণীত্বের পদমর্যাদাচ্যুত হইবার আতঙ্কে। আবার সে শুধু নিখিলেশের স্ত্রী ও সন্দীপের প্রণয়িনী নয়, অমূল্যর দিদি। শেষ পর্যন্ত এই সুস্থ হৃদয়াবেগের সূত্র ধরিয়াই সে নৈতিক ভারসাম্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সবশুদ্ধ ধরিয়া বিচার করিলে বিমলাই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা সজীব চরিত্র। নিখিলেশের সঙ্গে তাহার দাম্পত্য সম্পর্ক আবার সহজ ও স্বাভাবিক হইল কি না, সন্দীপ সম্বন্ধে মোহভঙ্গ তাহার প্রণয়ে নূতন হৃদয়াবেগের তীব্রতর স্পন্দন সঞ্চারিত করিল কি না তাহা উপসংহারে অনিশ্চিতই রহিয়া গিয়াছে। লেখকের জীবনসমালোচনা অপূর্ব মননশীলতায় উদ্ভাসিত ও স্মরণীয়, অর্থপূর্ণ বাক্য-যোজনায় গ্রথিত। কিন্তু এই সমালোচনা সমস্যারাহুগ্রস্ত জীবনাংশের প্রতিই প্রযোজ্য। জীবনের উদার ও সার্বভৌম বিস্তারের উপর ইহার আলোকরেখা সমভাবে বিকীর্ণ হয় নাই।

১৯১৬ খৃঃ অঃ র রচনা 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের সমস্যা-প্রিয়তা ও জীবনের আংশিকতার প্রতি অতি-পক্ষপাতের উৎকটতর নিদর্শন। 'ঘরে-বাইরে'-র সমস্যার মধ্যে সার্বজনীনতার কিছুটা ইঙ্গিত আছে—এই সমস্যার অভিঘাত সাধারণ জীবনেও ঘটিতে পারে। কিন্তু 'চতুরঙ্গ'-এ উৎকেন্দ্রিকতার উদ্ভট সীমারেখার মধ্যেই খেয়ালী-জীবনের সমস্ত অস্থির, অস্বস্তিকর পরিবর্তন-ছন্দ আবর্তিত হইয়াছে। সোজা কথায় কয়েকটি অসাধারণ চরিত্রের প্রায়-অসম্ভব, দ্রুতচ্ছন্দে ঘূর্ণ্যমান জীবন পরিস্থিতিই উপন্যাসের বস্তু-কায়া রচনা করিয়াছে। শচীশের জ্যাঠামশায় হয়ত পূর্বতন যুগের বে-পরোয়া স্বাধীন চিন্তাবাদীদের প্রতিনিধিস্থানীয়; ইঁহারা নিঃসঙ্গ একাকীত্বে তাঁহাদের অ-সামাজিক জীবন-যাত্রা কল্পিত আদর্শের অনুশীলনে কাটাইয়া দেন। কিন্তু এই জ্যাঠা মশায়ের ভূমিকা রচনা ছাড়া উপন্যাসের অন্য কোথায়ও স্থান নাই। ইনি কেবল শচীশকে প্রভাবিত করিবার জন্যই অবতারিত হইয়াছেন। ইঁহার আদর্শ তবু বোঝা যায়; কিন্তু শচীশের খামখেয়ালী জীবননীতি ও আকস্মিক আচরণ-উৎক্ষেপের মধ্যে কোন সুষ্ঠু মনস্তত্ত্ব-কেন্দ্রিকতা আবিষ্কার অত্যন্ত দুরূহ। দামিনী তাহাকে কখনও প্রেমাস্পদ কখনও ভক্তিভাজন গুরুরূপে অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহার উড়ন্ত মনের নাগাল পায় নাই। বায়ুর গতি-নির্ণায়ক যন্ত্রকে (weather cock) কেহ নির্ভরযোগ্য আশ্রয়-স্তম্ভরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে জীবন-তরী বাঁধিতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত আলেয়ার পিছনে ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া সে রক্তমাংসবিশিষ্ট, স্থাবর জীব, স্থূলবুদ্ধি ও মন্থরগতি শ্রীবিলাসকে আশ্রয় করিয়াছে; আকাশের বিদ্যুৎকে ছাড়িয়া ম্লানরশ্মি মৃৎপ্রদীপেই নিজ বঞ্চনা ক্লান্ত, মরীচিকা-বিড়ম্বিত জীবনের সুখ শান্তি ন্যস্ত করিয়াছে। প্রণয়ীরূপে শ্রীবিলাসের বিশেষ যোগ্যতা না থাকিলেও স্বপ্নসঞ্চরণ-শীল, উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণের পায়ে শিকল-পরানো দাসীরূপে সে নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। এখানে লেখক ঠিক দিব্য দৃষ্টি-সম্পন্ন কবিও নহেন, যথার্থ জীবন পর্য্যবেক্ষক উপন্যাসিকও নহেন, খেয়ালী আকাশ অভিযানের একাধারে কল্পনাময় স্রষ্টা ও বিদ্বান কুশলী-দ্রষ্টা। ঝড়ো হাওয়ায় তিনটি অসমান ওজনের বেলুন উড়াইয়া দিলে তাহাদের দ্রুত উঠা-নামার ছন্দ ও পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণের অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য গতিভঙ্গীর ও দিক্‌ পরিবর্তনের যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাহার যেমন একটা আবহ বায়ুঘটিত তত্ত্বব্যাখ্যা, আছে, তেমনি দর্শনীয়তার একটি লীলা বৈচিত্র্যও বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই দ্বিবিধ কৌতূহলই পূর্ণ হইয়াছে। তিনি কখনও কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায়, কখনও সুপ্রযুক্ত রূপক আভাসে, কখনও বিচিত্রমুখী মানস-আবেগের নিখুত মনস্তাত্ত্বিক উপস্থাপনায়—কখনও বা কাহিনীর খণ্ডিত

বিবৃতির ভিতর দিয়া উহার সামগ্রিক তাৎপর্য দ্যোতনার দার্শনিক দৃষ্টিতে এই খেয়ালী ঘূর্ণি বায়ুতে পাক খাইতে খাইতে ছোটা আখ্যানটিকে জীবনের নিগূঢ় নিয়মাধীন রূপে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। চরিত্র ও ঘটনাকে স্বীকার করিয়া লইলে এই ব্যতিক্রমধর্মী কাহিনীতে ইতস্তত বিকীর্ণ জীবন সত্যের হীরকদ্যুতি আবিষ্কার করা যায়।

৪

'চতুরঙ্গ'-এর পর আবার দীর্ঘ তের বৎসর ব্যবধানে ১৯২৯ খৃঃ অঃ 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' প্রায় এক সঙ্গেই প্রকাশিত হয়। তখন কাব্যে 'মহুয়া'র স্মৃতিসম্পদ ভরা, বসন্তের প্রাণ রহস্য চেতনার যুগপৎ তত্ত্বদর্শী ও মদির, প্রেমের বীর্য সাধন-প্রশস্তিতে মন্দ্রিত কবিতা-রচনার পালা চলিতেছে। নাট্য রচনায় 'পরিত্রাণ' ও 'তপতী'র চূড়ান্ত রূপনির্ণয় প্রয়াস লেখককে পূর্ব রচনার সংস্কার ও সম্মার্জনে প্রণোদিত করিয়াছে। এই পরিবর্তন যুগের নব পরীক্ষার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া রবীন্দ্র-উপন্যাসের অন্তিম পর্যায় সুরু হইল। এই পর্যায়ের প্রারম্ভে লেখকের উপন্যাস পরিকল্পনায় কিছুটা নূতন রীতি ও জীবন-কৌতূহল লক্ষিত হয়। 'যোগাযোগ' 'শেষের কবিতা' ঠিক সমস্যা-কেন্দ্রিক নহে। ইহাদের সমস্যা জীবন সমগ্রতার অনুগামী। লেখকের সঙ্কীর্ণ জীবনাংশের প্রতি আকর্ষণও যেন কিছুটা কমিয়াছে। 'যোগাযোগ' এ মধুসূদন-কুমুদিনীর জীবন কাহিনী বিস্তৃতভাবে আলোচিত ও উহাদের বিপরীত জীবনাদর্শের সংঘাতের পূর্ণ চিত্র প্রদর্শিত। মধুসূদনের দুর্দান্ত ইচ্ছাশক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব-বোধের অহঙ্কার খুব বিসদৃশভাবে বিবাহ ও প্রণয়িনীর হৃদয় জয়ের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হইয়াছে। প্রণয়ের দৃশ্য তার সমষ্টিকে রূঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলে যে সঙ্গীতের পরিবর্তে কর্ণপীড়াকর ঝন্‌ঝনানি নির্গত হয় এই সত্য তাহার মদান্ধ দৃষ্টির নিকট উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। তাহার হাঁক-ডাক, মত্ত আস্ফালন, লৌহ কঠিন আদেশের পরোয়ানা, এমন কি অনুগ্রহের দাক্ষিণ্য ও প্রশ্রয়ের খেয়ালী বদান্যতাও যে প্রেমের রুদ্ধদ্বার ও প্রণয়িনীর সূক্ষ্ম, সুকুমার ধ্যানাবিষ্টতার বিমুখতা হইতে প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসিবে এই সম্ভাবনা তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই। সামান্য কিছু চেষ্টার পর যখন নিগ্রহ-অনুগ্রহের পর্যায়ক্রমিক প্রয়োগ কুমুদিনীর হৃদয় জয়ে ব্যর্থ হইল, তখন মধুসূদন তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ প্রণয়সাধনা হইতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে ও শ্যামার প্রতি স্থূল অনায়াসলভ্য লালসায় নিজ আহত আত্মসম্মানের ক্ষত-প্রলেপ খুঁজিয়াছে। কুমুদিনীও নিজ ধ্যানতন্ময়তার জগতে আবদ্ধ থাকিয়া সংসারের স্থূল প্রয়োজন বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ রহিয়া গিয়াছে। মধুসূদন ও কুমুদিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিবাসী; সংসার-বিধান ও দাম্পত্য বন্ধনও ইহাদিগকে একই প্রতিষ্ঠান ভূমিতে মিলিত করিতে সমর্থ হয় নাই; উভয়েই উভয়ের নিকট চিরপ্রহেলিকার মত প্রতীয়মান হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, তাহা মর্মান্তিক হওয়ার পরিবর্তে ভ্রান্ত রণনীতি ও ভুল অস্ত্র প্রয়োগের জন্য কৌতুকের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মধুসূদন বদ্ধ-মুষ্টিতে হাওয়া ধরিতে গিয়া কেবল শূন্যতাই পাইয়াছে; কুমুদিনী তাহার সরল আয়ত দুটি চক্ষুকে অবোধ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া হিংস্র শ্বাপদ-অধ্যুষিত বনভূমির দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। এই বিসদৃশ মিলনের সন্তান অবিনাশ মাতাকে স্বামিগৃহে আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু সে কি পিতা-মাতার অলস জীবনধারাকে এক ছন্দে গ্রথিত করিতে পারিয়াছে? কুমুদিনীর বর্ণনায় লেখকের কাব্য-সুরভিত অনুভূতির অপরূপ প্রকাশ; মধুসূদনের জীবনেতিহাসে পশুপদচিহ্নের স্থূল রেখাচিত্র সু-অঙ্কিত। মোতির মা, নবীন, বিপ্রদাস প্রভৃতি পার্শ্বচরিত্রের জীবন উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণে ক্ষীণ; তাহারা লেখকের বাস্তব পর্যবেক্ষণের পরিচয়বাহী, কিন্তু ঔপন্যাসিক যে তাহাদের সহিত একাত্মভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন এরূপ কোন প্রমাণের অভাব। উপন্যাসে স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় যুক্তিতর্কের প্রাধান্য লেখকের অব্যবস্থিত সংগঠন শক্তির কথাই মনে পড়াইয়া দেয়।

'শেষের কবিতা'-য় কাব্য-প্লাবন উপন্যাসের বাস্তব ভূমিকে ডুবাইয়া দিয়াছে। অমিত রে-র আরম্ভ তীক্ষ্ণ প্রথা-লঙ্ঘী অনন্য সাধারণতায়, তাহার মধ্যান্তরের পরিণতি অস্থির অপরিমিত প্রেমবিহ্বলতায়, প্রেম কুঞ্জনের আত্মমগ্ন কল্পনা-লীলায়, আর উপসংহার প্রেমের স্মৃতি সারসুরভিত গদ্যময় বিবাহিত জীবনের স্বাকৃতিতে। সে প্রেম জীবনের একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত অংকিত করিয়াছে, যাহার আদিতে

প্রেমের পরিহাসমূলক উপেক্ষা, মধ্যে আত্মবিস্মৃত আবেশ-মত্ততা, আর অন্তে সাংসারিকতার সহিত আপোষে বাঁধা বরাদ্দে তৃপ্তি। প্রেমের যে উদ্বোধন সমস্ত মাত্রাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, অতিশয়োক্তির কল্পনালীলা যাহার সহজ প্রকাশ-ছন্দ—তাহা শেষ পর্যন্ত কে, টি, মিত্রের হৃদয়াবেগের পরিমিত ঘড়াজলে সমস্ত স্ফীতিকে সংকুচিত করিয়াছে। লাবণ্য ভিজে কাপড়ের পুঁটুলি—হঠাৎ অমিতের অন্তরের উত্তাপে প্রণয়রাগদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বোবা মুখে কথা ফুটিয়াছে, প্রণয়তড়িৎদীপ্তির অবাধ সঞ্চরণ তাহার সমস্ত অন্তরকে রাঙাইয়াছে। কিন্তু এই প্রণয় মুগ্ধতার বাস্তব-বিস্মৃতির মধ্যে লাবণ্যেরই প্রথম খেয়াল হইয়াছে যে অমিতকে কোন স্থায়ী বন্ধনে বাঁধা অসম্ভব। সে কল্পনার রং-এ প্রেমকে রঞ্জিত করিয়া উহার মুহুর্মুহু নব নব রূপে দৃশ্যমান সত্তার প্রতি অনন্তকাল স্থায়ী অভিসার-যাত্রার জন্যই উন্মুখ; উহার বিবাহিত, স্থাবর রূপ কোনদিনই উহার রুচিকর হইবে না। সুতরাং বিদায়ের অবশ্যম্ভাবিতা প্রথমে লাবণ্য, পরে অমিতও উপলব্ধি করিয়াছে। কিন্তু বিদায়ের পূর্বে উভয়ে উভয়ের উপর স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে। অমিতের উত্তাপে লাবণ্যের বরফ গলিয়াছে; প্রেমে যে প্রকাশ প্রয়োজন তাহা সে বুঝিয়াছে এবং এই নবলব্ধ প্রকাশশক্তির জন্যই সে ইতিহাসের লুপ্ত পথ উদ্ধারকারী শোভনলালের মৌন, একনিষ্ঠ আবেদনে সাড়া দিয়াছে। আবার লাবণ্যের আদর্শ মনে রাখিয়াই অমিত কেটির বাস্তব অনুরাগের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছে। উভয়েই কাব্যচ্ছন্দে পরস্পরের নিকট ঋণস্বীকার করিয়াছে। এ যেন কাব্যের একটি রূপ-রক্তিম কল্পনা-স্বপ্ন উড়িয়া আসিয়া উপন্যাসের নিয়মতান্ত্রিক, কার্য-কারণ-শৃঙ্খলিত রাজ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে—কবির আত্মমগ্ন ভাবোচ্ছলতা যেন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর সত্তা ধার করিয়া তাহাদেরই কণ্ঠে কথা কহিয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসে কোন গভীর জীবনসত্য পাই কি না সে প্রশ্ন আমাদের নিকট অবান্তর হইয়া দাঁড়ায়। তবে নামধামহীন কল্পনাকে যে বাস্তব সত্যের রূপ দেওয়া যায়, নভোচারী প্রেমকে যে মর্ত্য জীবনের বন্ধন স্বীকার করানো সম্ভব, উহার বিচিত্র লীলা-রহস্যকে যে কাব্য ছন্দ হইতে নামাইয়া আনিয়া প্রাত্যহিক কার্য ও সদা-ব্যবহৃত গদ্যের ধ্বনি প্রবাহে স্বচ্ছন্দগতি ও প্রকাশ-সুষমা দান করা যায় উপন্যাসটি হইতে আমরা সেই জ্ঞানই লাভ করি। কবি ঔপন্যাসিক হইলে জীবন যে কাব্য হইয়া উঠে, উহার কঠোর নিয়মবন্ধন যে পুষ্পমাল্যের ন্যায় পেলব ও সুখস্পর্শ হয়, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' তাহারই প্রমাণ। জীবনের বস্তুবহুল, ওজনে ভারি অভিজ্ঞতা এখানে অশরীরী সুরের ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া পাত্র-পাত্রীর মানস আকাশকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে।

আর তিনখানি উপন্যাস, 'দুই বোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসিক জীবনের শেষ অধ্যায় ঘোষণা করে। 'দুই বোন' উপন্যাসটি সম্পূর্ণ theory শাসিত। যেমন শর্মিলা ও ঊর্মিলাকে দুই জাতীয় নারী প্রকৃতির প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ও উহাদের কার্যকলাপ ও চারিত্রিক প্রকাশ তাঁহার পূর্ব নির্দিষ্ট ধারণার দ্বারা নির্মমভাবে নিয়মিত করিয়াছেন। তাহাদের গতিবিধি বাঁধা ছক হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। ঔপন্যাসিক তাহাদের গায়ে যে চরিত্রদ্যোতক লেবেল আঁটিয়া দিয়াছেন তাহারা প্রাণপণে তাহার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। মানবের উত্তাল হৃদয়-সমুদ্র যেন লেখকের হুকুম শুনিয়া তাঁহার নির্দ্ধারিত সীমায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আসল সমুদ্র রাজা ক্যানিউটের আদেশ শুনে নাই; রবীন্দ্রনাথের অতিবাধ্য হৃদয়-সিন্ধু উহার বিপরীত আচরণ করিয়া উহার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-বিক্ষোভকে সম্পূর্ণভাবে সংহরণ করিয়া লইয়াছে। সুতরাং যাহা ঘটিয়াছে তাহা অনেকটা রূপকথার কার্বের ঘোড়ার শিকার করার অনুরূপ। শর্মিলাকে তবু খানিকটা বোঝা যায়, কিন্তু প্রেয়সী নারীর প্রতিনিধি ঊর্মিলা একেবারে ঊর্মিহীন; সে কৃত্রিম ফোয়ারার মত খানিকটা বাঁধাধরা জল উৎক্ষিপ্ত করে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক জীবন-দৃষ্টি যে কতটা ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল, ইহা যে কবির দিব্যানুভূতি হইতেও কতখানি ভ্রষ্ট হইয়াছিল, অশ্বত্থামার ন্যায় পিটুলি গোলা জলকে দুধ বলিয়া চালাইয়া দিতেও পরাঙমুখ হয় নাই, 'দুই বোন' তাহার অস্বস্তিকর প্রমাণ।

'মালঞ্চ'—এর কৃতিত্ব ততটা জীবন-চিত্রণে নয়, যতটা একটি অত্যন্ত সার্থক ও ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাব পরিবেশ রচনায়। পাত্র-পাত্রীগুলি একটি মাত্র ভূমিকার অভিনয়ে কঠোর

ভাবে আবদ্ধ। স্বামী রুগ্না স্ত্রীর সান্নিধ্য যথাসম্ভব বর্জন করিয়া কৈশোর-প্রণয়িনীর সাহচর্যে-উৎসুক; প্রেমাস্পদাও খানিকটা চলচ্চিত্ততার অভিনয় করিয়া পূর্ব প্রণয়ীর আমন্ত্রণ-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ ও তাহার নিঃস্বার্থ কল্যাণকামনার বেষ্টনীমধ্যে নিশ্চল। যাহা কিছু নাটকীয় উৎক্ষেপ, যাহা কিছু অস্থিরমতি পরিবর্তন, যাহা কিছু রুক্ষ মেজাজ, অধৈর্য, অসুস্থ উত্তেজনা ও চিত্তবিকার সমস্তই নীরজার একচেটিয়া। নিঃশব্দ, নীরব ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তশ্চঞ্চল, রোগীর রুদ্ধ কক্ষের ন্যায় বায়ু প্রবাহহীন, আপাতদৃষ্টিতেও শান্ত পরিবার-প্রতিবেশ তাহারই উচ্চকণ্ঠ চীৎকার, তাহারই ক্ষুব্ধ অনুযোগ, তাহারই রুগ্ন চিত্তের কল্পনা-বিকারের দ্বারা বিহ্বল ও তরঙ্গায়িত হইয়াছে। যত্নলালিত পুষ্পোদ্যান ও নীরজার ঈর্ষ্যাকীটদষ্ট পুষ্পপেলব হৃদয় যেন একই সুকুমার ভাবসত্যের দ্বিবিধ বিকাশ। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত মানব-সমস্যাটি সাধারণ ও বৈচিত্র্যহীন; কিন্তু ইহার প্রতীক-কল্পনাটি অন্তঃসঙ্গতিপূর্ণ ও অসাধারণ। এখানেও কবিসুলভ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও প্রতীকী কল্পনা উপন্যাসের বাস্তব সত্যের উপর জয়ী হইয়াছে।

'চার-অধ্যায়' রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস। এখানেও 'ঘরে-বাইরে'-র মত রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হইয়াছেন বাঙলা সন্ত্রাসবাদের একটি চক্রান্তকুটিল, হৃদয়ধর্মের নিষ্পেষণে করুণ, নানা চিত্তের বিক্ষোভ ও আত্মদ্বন্দ্বে মথিত পরিবেশের প্রতি। মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদের অন্তরধর্ম-অনুসন্ধানে সেরূপ কৌতূহলী ছিলেন না। তাঁহার বিপ্লবী সংঘের কর্ম পরিচয় লৌহ মুখোসপরা। অলঙ্ঘনীয় আদেশ-প্রচারে দ্বিধাহীন দলের মানুষদের সহজ জীবনধর্ম-বিরোধী দলপতি স্থানীয় কয়েকটি ব্যক্তির বীরত্বের ও নেতৃত্বের শূন্যগর্ভ আস্ফালন। এই বৈপ্লবিক সংঘের সদস্যেরা ইংরেজের যতটুকু ক্ষতি করিয়াছে তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী ক্ষতি করিয়াছে নিজ দলের লোকদের নির্যাতনে ও মূঢ় যান্ত্রিক জীবন-নিয়ন্ত্রণে। ইহাদের মধ্যে ঈর্ষ্যা, লোভ, দ্বেষ, পরের জীবনে অযথা কৌতূহল ও অন্যায় হস্তক্ষেপ প্রভৃতি প্রাকৃতজনসুলভ মনোবৃত্তির যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। সাধারণ ও সুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সূক্ষ্ম, সুকুমার অনুভূতি বিশিষ্ট, বিশেষত প্রেমের কোমল স্পর্শে সংবেদনশীল নর-নারীর উপর বিপ্লব সাধনার কিরূপ মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া, উহার লৌহ বন্ধনে এই জাতীয় মানুষের শিরা-স্নায়ুতে কিরূপ নিদারুণ বেদনার কম্পন জাগে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসিক দৃষ্টি তাহারই উপর স্থির-নিবদ্ধ। অতীন ও এলা এই পেষণক্রিয়ার বলিস্বরূপ অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাদের নিষ্পেষিত ব্যক্তিত্বের করুণ-ক্রন্দনে, তাহাদের অপমানিত প্রেমের উষ্ণ-প্রখর দীর্ঘশ্বাসে তাহাদের তিলে তিলে আত্মক্ষয়ের শোচনীয় খেদোচ্ছ্বাসে উপন্যাসের আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বিপ্লববাদের যথার্থ চিত্র আঁকেন নাই এরূপ অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছে। ইহা সত্য হইলেও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য বহির্ভূত ছিল। তিনি অজগরের বিরাট কুণ্ডলীকৃত অবয়ব—দৈর্ঘ্য ও ক্রুর জিঘাংসা ফুটাইয়া তোলেন নাই; কিন্তু অজগরের হিমশীতল, বিষাক্ত দৃষ্টি কেমন করিয়া আরণ্যক মৃগমৃগীকে অসাড় করিয়া নিজ কুক্ষীভূত করিবার দিকে আকর্ষণ করে তাহাই বর্ণনীয় বস্তু। এই কাপালিক প্রক্রিয়ার নৃশংসতা প্রকাশ পাইয়াছে শত্রুবধে নয়, দ্বিধাদুর্বল ভাবশিষ্যের উৎকট পীড়নে। রবীন্দ্রনাথের কবিসুলভ মূল্যবোধ সন্ত্রাসবাদের বাহিরের শক্তি অপেক্ষা উহার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকেই প্রধানউপাদান রূপে গ্রহণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট-বিচিত্র সৃষ্টিজীবনে উপন্যাস মুখ্য না হইলেও খানিকটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। খুব মৌলিক প্রতিভাশালী লেখকও তাঁহার রচনার কাঠামো নির্বাচনে যুগধর্মকে অস্বীকার করিতে পারেন না। বঙ্কিমোত্তর যে কোন শ্রেষ্ঠ লেখককে উপন্যাস রচনার দ্বারা নিজ শক্তি পরীক্ষা করিতে, যুগপ্রচলিত প্রধান সাহিত্যধারার প্রতি তাঁহার রাজকর নিবেদন করিতে হইবেই হইবে। ছোট গল্প রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ন্যায়ই সহজাত প্রেরণা; উপন্যাসে তাঁহার আকর্ষণ অনেকটা যুগরুচির অনুবর্তন। খাঁটি ঔপন্যাসিকের অবিমিশ্র জীবন-কৌতূহল রবীন্দ্রনাথের ছিল কি না সন্দেহ। মনে হয় যেন তাঁহার কাব্যের উদ্বৃত্ত শক্তি, তাঁহার কাব্যানুভূতির একটা রূপান্তরিত বিষয়োপযোগী প্রয়োগ তাঁহার উপন্যাস ক্ষেত্রে কম বেশী সার্থকতার সহিত সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম বয়সের উপন্যাস দুইখানি আত্মকেন্দ্রিক, অস্বচ্ছ, গোধূলি রহস্যমাখা জীবনবোধের অনিশ্চিত, অপটু উৎক্ষেপ—ঘটনা ও চরিত্রের অনির্দেশ্যতা কোন স্থির জীবন প্রত্যয়ে সংহত

হয় নাই। 'চোখের বালি' ও 'গোরা' এই দুইটি উপন্যাসই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা—এই দুইটি বই-এই জীবনপথ পরিক্রমায় তাঁহার দৃঢ় পদক্ষেপ শ্রুত হয়। তথাপি উভয়ত্রই কাব্যের বা মননের অনুচিত অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়—'চোখের বালি'-তে বিনোদিনীর ভাববৃন্দাবন প্রবাস ও 'গোরা'য় যুক্তিতর্কের প্রাধান্য দেশপ্রেমের অত্যুচ্ছ্বাস ও পরিবেশের সর্বাত্মক বিস্তার লেখক বিশুদ্ধ ঔপন্যাসিক ধর্মকে কি পরিমাণে লঙ্ঘন করিয়াছেন তাহার নিদর্শনরূপে বর্তমান। 'ঘরেও বাহিরে' সমস্যামূলক হইলেও হৃদয়াবেগের তীব্র প্রকাশে ও চরিত্রের সার্থক ব্যঞ্জনায় উহার মূল প্রেরণার কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করিয়াছে ও জীবনসত্যের জলন্ত পরিচয় উহাতে নিহিত আছে। আর বাকী উপন্যাসগুলির মধ্যে নৌকাডুবি' কৃত্রিম ভ্রান্তি ও মনোচ্চ ভ্রমণকাহিনীর চিত্র সৌন্দর্যে রমণীয়, 'শেষের কবিতা' প্রায় সম্পূর্ণভাবে কাব্যধর্মী, প্রণয়াবেগের উর্দ্ধলোকচারী কাব্য প্রতিরূপ। 'যোগাযোগ'-এ মধুসূদন ও কুমুদিনীর দুই বিপরীতধর্মী চরিত্র একক কল্পনা হিসাবে চমৎকার, কিন্তু উভয়ের এক সূত্রে গ্রহণ গভীর ও করুণরস অপেক্ষা কৌতুককর অসঙ্গতি বোধেরই উদ্দীপক। এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের জীবকে এক জোয়ালে জোড়া যে ঘাত প্রতিঘাতের হেতু হইয়াছে তাহার মধ্যে ট্রাজেডি নাই, আছে প্রহসনের আতিশয্য ও বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। ইহা সুনিশ্চিত যে লেখক এরূপ বিসদৃশ সমাবেশের যোগফলটিকে সত্যদৃষ্টি দ্বারা পরিমাপ করেন নাই। গোঁজামিলের সাহায্যে ইহাকে একটা উদ্ভট পরিণতি দিয়াছেন। অন্যান্য উপন্যাসগুলি হয় খণ্ডিত ও আংশিক, না হয় পূর্বনির্ধারিত গতিপথের অনুবর্তনে প্রত্যক্ষতারসবঞ্চিত, অথবা মুখ্যরসকে এড়াইয়া গৌণ ফল ফলের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপে কেন্দ্রভ্রষ্ট। রবীন্দ্রনাথ কবির স্বচ্ছন্দবিহার-প্রবণতা লইয়া উপন্যাসের জটিল ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি কবিত্ব শক্তির প্রতি অতি-নির্ভরতাবশতঃ কোন বিশেষ পরিস্থিতির স্বরূপতাৎপর্য সম্বন্ধে উদাসীন, নিজ কাব্যরোমন্থন ও মননশীলতার পরিণত ফলটী ভিন্নাভিমুখী ঘটনা-শাখায় প্রলম্বিত করিতে অতিতৎপর। তাঁহার উপন্যাসের জমাট রস অনেক ক্ষেত্রে কাব্যরসমিশ্রণে ফিকে হইয়া উঠিয়াছে, মর্ত্য ও অমর্ত্যের যদৃচ্ছ মিলনে খাঁটি রসও পাকে নাই, কবিকল্পনারসও উপযুক্ত আধারে সঞ্চিত হইবার সুযোগ পায় নাই। সেইজন্যই মনে হয় যে তাঁহার উপন্যাসাবলী উপন্যাসের স্বভাব বিবর্তনের ধারা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। ঔপন্যাসিক প্রণালী তাঁহার একনিষ্ঠ আনুগত্য-বঞ্চিত। তাঁহার উপন্যাস তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিয়া চিরদিনই আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিবে, কিন্তু জীবনপ্রেরণা ও শিল্পসাধনার দিক দিয়া ইহা ভাবী যুগের ঔপন্যাসিকের অনুসরণ-স্পৃহা উদ্দীপ্ত করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।

আজ মনিহারীর আওয়ার নানীকে মনে পড়িতেছে। আজ বিশেষ করিয়া মনে পড়িল, কারণ পাশের বাড়ির দাইটির আজ স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে। এতদিন সে কলাটা মূলোটা চুরি করিত। কাল গহনার বাক্সটি লইয়া সরিয়াছে। নূতন বউয়ের গহনা। থানা পুলিশ করিয়াও বিশেষ সুবিধা হয় নাই। তাহারা কেবল আসিয়া গৃহস্থকে উত্যক্ত করিতেছে, চোরকে ধরিতে পারে নাই। কোথায় গহনা গালানো হইয়াছে এ খবরও নাকি জানা গিয়াছে তবু চুরির সুরাহা হইতেছে না। চোর এবং তাহার সহকারীরা ইংলণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা বা উগান্ডা হইতে

আসে নাই, তাহারা পাশেই রহিয়াছে। দিবালোকে মাথা উঁচু করিয়া রাস্তায় ঘুরিয়াও বেড়াইতেছে। কিন্তু তবু তাহারা ধরা পড়ে না। স্বাধীনতা পাইবার পর চোর-পুলিশের সৌহার্দ্য আরও বাড়িয়াছে। অনেকে বলে—ওটা ঠিক সৌহার্দ্য নয়, ভক্তি। পুলিশদের মনিবরাই নাকি চোরেদের সর্দার। আগে ইংরেজদের আমোলে চুরি যে হইত না তা নয়, কিন্তু পুলিশদের সহিত চোরেদের এতটা মাথামাখি ছিল না। চোরেরাও এতটা হৃদয়হীন ছিল কি? দুর্দ্ধর্ষ নিষ্ঠুর মায়া-মমতা-হীন ডাকাতদের মধ্যেও মহত্বের আকস্মিক প্রকাশ ঘটিয়াছে—এ রকম গল্প আগে অনেক শুনিয়াছি। আজকাল বড় একটা শুনি না। যে দাই সাত আট বৎসর ধরিয়া বাড়িতে আছে, ওই নববধূটি যাহার চোখের সামনেই সেদিন বাড়িতে আসিল, তাহার গহনাগুলি আর যে-ই চুরি করুক, ওই দাই চুরি করিয়াছে তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। অথচ সে যখন সরিয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও সন্দেহ করা যায় না।

আশুয়ার নানীকে আমি শেষ যখন দেখিয়াছিলাম তখন আমার বয়স খুব অল্প। সাত আট বৎসরের বেশী নয়। আশুয়ার নানীর তিন নাতি আমাদের বাড়িতে কাজ করিত। আশুয়া, কয়লা আর মলোয়া। মুসলমান। আশুয়া বেশ লম্বা চওড়া ছিল, পাঠানের মতো চেহারা আর দাড়ি। রং তত ফরসা ছিল না। দাড়ি-চুলও কালো ছিল। চোখের তারাও তাই। কয়লা আর মনোয়ার চোখের তারা কিন্তু কটা ছিল, দাড়ি-চুলেও আভাস ছিল লালের। তাদের মায়ের এবং নানীর চোখও কটা ছিল। আশুয়াই কেবল তাহার বাবার মতো দেখিতে হইয়াছিল। আশুয়ার বাবার নামটা ঠিক মনে নাই। সে মহরমের সময় গদ্‌কা খেলিত। বড় গাছের গুঁড়ির চারিদিকে কাপড় জড়াইয়া দাঁত দিয়া সেটা তুলিয়া ফেলিত। এই সব করিতে গিয়াই মুখে রক্ত উঠিয়া মারা যায় সে। তাহার পুত্র তিনটি আমাদের বাড়িতে মানুষ হইয়াছিল। আশুয়ার মা-ও আমাদের জমিতে মজুর খাটিত। বাবা তাহাদের বেতন এবং প্রচুর সিধা দিতেন, তাহাতেই সকলের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। আশুয়া আমাদের রান্নার কাঠ কাটিত, কয়লা জমিতে লাঙল দিত এবং মলোয়া গরু চরাইত। আশুয়ার নানী দুপুরে তাহাদের খাবার লইয়া আসিত মাথায় করিয়া। মাথার ঝুড়ির ভিতর খাবার আর কোমরে জলের কলসী। পায়ে ঝগড়ু চামারের তৈরি চটি জুতা। আশুয়ার নানী বাড়িতে ঢেঁকি পাড়িত, আটা পিষিত, ইহাদের জন্য রান্না করিত এবং অবসর সময়ে পাড়ার ছোট ছোট শিশুদের জন্য কাঁথাও সেলাই করিয়া দিত। আমাদের জন্য একটি চমৎকার 'সুজনি' করিয়া দিয়াছিল সে। লাল নীল সুতায় নানা রকম কাজ করা। শুধু ফুল নয়, জন্তু জানোয়ারও ছিল তাহাতে, পাখী এবং বকরী। আশুয়ার নানী চশমা পরিত। বাবাই সেটা কিনিয়া দিয়াছিলেন।

বাবা একদিন বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন আশুয়ার নানী উত্তেজিত হইয়া প্রবেশ করিল এবং নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিল, "মালিক চোর পাকড়া হে। সাজা দিজিয়ে—।" চোরও তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহারই নাতি কয়লা।

"কি চুরি করেছে?"

"এক ঝোঁটি মকৈ—"

মকাই পাকিলে সেগুলি গোছা-গোছা করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। দেখা গেল কয়লা সত্যই এক গোছা মকাই চুরি করিয়াছে।

"চুরি করেছিস কেন! চেয়ে নিলেই পারতিস—"

কয়লা কোন জবাব দিল না। মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাবা বলিলেন, "আচ্ছা ও আর করবে না, এবার ওকে ছেড়ে দাও—"

আশুয়ার নানী কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী ছিল না। সে অতগুলি লোকের সামনে অত বড় নাতিকে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড়াইতে লাগিল।

আশুয়ার নানীর আর একটা গল্পও মনে পড়িতেছে। তখন বোধহয় ধান কাটিবার সময়। মনিহারী হইতে কিছু দূরে 'নেস্‌রা' বলিয়া একটা জায়গা আছে, সেখানে প্রচুর ধান হয়। ধান পাকিলে পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রাম হইতে মজুররা সেখানে সমবেত হয় ধান কাটিবার জন্য। ও অঞ্চলে ওটা একটা বার্ষিক মহোৎসবের মতো। শুধু মজুরি নয়, অনেক ধানও পাওয়া যায়। তখন 'লোচনা'

বলিয়া একটা প্রথাও প্রচলিত ছিল। জমির মালিক খানিকক্ষণ মজুরদের লুটিয়া লইবার সুযোগ দিতেন। যে যতটা পারিত ধান লুটিয়া লইত। জানি না এ প্রথা এখনও প্রচলিত আছে কিনা। আর একটা প্রলোভনও ছিল। বহু স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণের ফলে বৈধ অবৈধ নানা রকম প্রণয়-লীলাও হইত। নেসরায় ধান কাটিতে গিয়া অনেক কুমারী মেয়ের স্বামী জুটিয়া যাইত, অনেক বিবাহিতা মেয়ে স্বামী হারাইয়া আসিত। মোট কথা নেসরায় ধান-কাটা একটা পরম প্রলোভনের ব্যাপার ছিল। সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সব চাকরদের ছুটি দিতে হইত। কেহ 'নেসরায় ধান কাটিতে যাইব' বলিলে তাহাকে আর রোখা যাইত না।

বাবাও প্রায় সব চাকরদের নেসরায় যাইবার জন্য ছুটি দিতেন। কিন্তু সেবার একটু মুশকিল হইল। মা তখন আসন্ন-প্রসবা। বাড়িতে সমর্থ আত্মীয় কেহ নাই। আমিই তখন বাড়িতে একমাত্র লোক, কিন্তু আমার বয়স তখন ছয় বৎসর মাত্র। বাবা থাকিলে কোনও ভাবনা ছিল না, কিন্তু বাবা হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পাইলেন যে তাঁহার দিদিমা কঠিন অসুখে শয্যাগত। তাঁহাকে অবিলম্বে সেওড়াফুলি যাইতে হইবে। মাকে ট্রেণের ভিড়ে লইয়া যাওয়া সমীচীন নয়। এমন সময় চাকররাও নেসরায় যাইবার জন্য ছুটি চাহিল। বাবা বলিলেন, "ছুটি দিতে আমার আপত্তি নেই। প্রতিবারেই তো দিই। কিন্তু এবার যে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। মাইজি বাড়িতে একলা থাকবে কি করে? বিশেষত এ অবস্থায়—।" সঙীণ পরিস্থিতি। নেসরায় যাইবার জন্য ছুটি দিতেই হইবে, বাবারও সেওড়াফুলি না গেলে চলিবে না। হঠাৎ আশুয়ার নানী সমস্যার সমাধান করিয়া দিল।

বাবাকে বলিল, "তু যো। হাম্ মাইজিকে পাস দিন রাত রৈবো। জরুরৎ পড়ে তো হরিয়া কা মাইকো ভি বোলাই বো। তু যো। ই সেনি কো ভি ছুটি দে দে। কুছ ডর নেই দে—"(তুই যা। আমি মাইজির কাছে দিন রাত থাকব। দরকার পড়ে তো হরিয়ার মাকেও ডেকে আনব। তুই যা, এদেরও ছুটি দিয়ে দে। কোন ভয় নেই।)

আশ্চর্য্যের বিষয়, বাবা এই স্থবিরা আশুয়ার নানীর বাক্যে আশ্বস্ত হইলেন। চাকরদের নেসরা যাইবার জন্য ছুটি দিয়া সেওড়াফুলি চলিয়া গেলেন।

দিনের বেলা আশুয়ার নানী আমাদের বাড়িতে বসিয়াই আটা পিষিতে লাগিল। আটা পিষিতে পিষিতে সে গান গাহিত। সেদিন সে যে গানটি গাহিয়াছিল তাহার এক কলি এখনও আমার মনে আছে। ওইটাই গানের ধুয়া। বহিন্ গেলৈ শ্বশুরাল্ অব্ কৈসে রৈবো গে। বোন শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে এখন কি করে থাকব। আশুয়ার নানী খুব বুড়ী হইয়া গিয়াছিল। কথা বলিতে গেলে তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া যাইত। কণ্ঠস্বরে মিষ্টতাও ছিল না! কিন্তু গানের মধ্যে যে দরদ ছিল তাহা অপূর্ব্ব। এখনও তাই মনে আছে।

আশুয়ার নানী আসিয়াই মায়ের শাশুড়ীর পদ গ্রহণ করিল। মাকে ছাঁচ তলায় দাঁড়াইতে দিবে না, গাছ হইতে লেবু পাড়িতে দিবে না, উঠানে শুইতে দিবে না। কি জানি কখন কোন 'জিন্' বা 'দানো'র কুদৃষ্টি লাগিয়া যায়। সে পীরবাবার ফকিরের নিকট হইতে একটি মন্ত্রঃপূত লাল সুতা আনিয়া মায়ের হাতে বাঁধিয়া দিল। সমস্ত দিন কোথাও যায় নাই। সন্ধ্যায় একবার বাড়ি গেল। তাহার পর যখন আসিল তখন তাহার অদ্ভুত বেশ। মাথায় পাগড়ি, এক হাতে একটা বড় বাঁশের লাঠি, আর এক হাতে একটা ধূম—কৃষ্ণ লণ্ঠন। লণ্ঠনের কাচ-টা ফাটা, তাহাতে কাগজ জোড়া। তাহার সঙ্গে আসিল কর্পূরা গোয়ালা। সে-ও স্থবির। কথিত আছে বহুকাল পূর্ব্বে আশুয়ার নানী যখন যুবতী এবং কর্পূরা গোয়ালা যখন যুবক ছিল তখন নেসরার ধান কাটিতে গিয়া উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়ে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানে বিবাহ হয় না, তাই তাহাদের বিবাহ হয় নাই। প্রেমটা কিন্তু অটুট আছে। দুই জনেরই আলাদা সংসার। দুইজনেরই ছেলে মেয়ে বউ নাতি। কিন্তু কোনও বিপদে পড়িলে এখনও পরস্পর পরস্পরকে স্মরণ করে। সেবার বানে যখন কর্পূরা গোয়ালার ঘর ডুবিয়া গেল তখন আশুয়ার নানী নিজে গিয়া তাহার বাড়ি হইতে জিনিসপত্র উদ্ধার করিয়াছিল। আশুয়ার যখন নিউমোনিয়া হয় তখন কর্পূরা গোয়ালাও আশুয়ার নানীর সঙ্গে রাত জাগিয়াছিল। আমাদের বাড়ি পাহারা দিবার জন্য তাই সে কর্পূরাকেই ডাকিয়া

আনিয়াছে। বিপদে ওই স্থবির কর্পূরাই তাহার ভরসা। কর্পূরা গোয়ালার রং ফরসা। যদিও বৃদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহার দেহের কাঠামো এখনও খুব মজবুত,বুক চওড়া,হাত-পায়ের হাড় দেখিলে মনে হয় এখনও শক্তি কিছু আছে।

আশুয়ার নানীর পাগড়ির দিকে চাহিয়া আমি হাসিতেছিলাম।

"হাসৈছ কাহে। সিপাহী বনলো ছি!"

"হাসছ কেন? সিপাহী সেজেছি!"

তাহার পর কর্পূরার দিকে চাহিয়া আদেশ করিল—তু বারান্দামে বৈঠ্। নেহি শুতি হেঁ। হাম ভিতর যাইছি মাইজিকে পাস—

সে রাত্রে চোর আসে নাই। কিন্তু হুতোম প্যাঁচা আসিয়াছিল। একটা প্যাঁচা আমাদের বাড়ির চালে বসিয়া ডাকিতেছিল—"হুঁ হুঁ"। আর একটা প্যাঁচা সম্ভবত কুচির অশ্বত্থ গাছটা হইতে উত্তর দিতেছিল—"হুঁ হুঁ"।

চোর বা ডাকাত আসিলে বোধহয় আশুয়ার নানী এতটা উত্তেজিত হইত না। কর্পূরাকে লইয়া সোরগোল তুলিয়া সে বাড়ি মাতাইয়া তুলিল। ঢিল ছুঁড়িয়া, গালাগালি দিয়া, টিন বাজাইয়া প্যাঁচাটাকে আমাদের হাতার বাহির করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল সে। ঘরে পোয়াতি শুইয়া আছে, ঘরের চালে প্যাঁচা ডাকিবে কি!

একটু পরে আর এক কাণ্ড। উঠানে হুড়মুড় করিয়া কি একটা শব্দ হইল। আমি ছেলেবেলায় পায়রা পুষিতাম। উঠানে পায়রার টং ছিল। তাহার উপর বন-বিড়াল উঠিয়াছে। আশুয়ার নানীর সহিত তাহার একটা খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গেল!

এই সব কথাই ভাবিতেছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে একটা ছায়া-মূর্ত্তির মতো দেখা গেল;

"কে—"

"হাম জিতিয়া দি—"

জিতিয়া! পাশের বাড়ির যে ঝিটা গহনা চুরি করিয়া পলাইয়াছে? জিতিয়া আগাইয়া আসিল এবং কাপড়ের তলা হইতে ছোট গহনার বাক্সটি বাহির করিয়া আমার সামনে রাখিল। তাহা পর হিন্দী ভাষায় যাহা বলিল তাহার সারমর্ম—"এটি আপনি পাশের বাড়ির বাবুদের বাড়িতে দিয়া দিবেন। আমার একটা পাজী 'গোত্‌নী' (জা) আসিয়াছিল। সে আমার সঙ্গে বাবুর বাড়ীতেও গিয়াছিল দুই দিন। নতুন বহুমায়ীটির হুঁস একটু কম। সে প্রায়ই আলমারি খোলা রাখিত সেই সুযোগে আমার 'গোত্‌নী' বাক্সটি চুরি করে। চুরি করিয়াই সে তাহাদের গ্রাম হাঁসোয়ারে সরিয়া পড়িয়াছিল। চুরির খবরটা জানাজানি হইতেই আমি বুঝিতে পারিলাম—এ নিশ্চয় আমার 'গোতনী'র কাজ। আমি তাই সঙ্গে সঙ্গে তাহার খোঁজে চলিয়া গিয়াছিলাম। হাঁসোয়ার এখান হইতে দশক্রোশ দূরে। তাই ফিরিতে দুই দিন বিলম্ব হইয়া গেল। ফিরিয়া দেখি তাঁহারা থানা পুলিশ করিয়াছেন। আপনি গহনাগুলো উহাদের ফিরাইয়া দিবেন।

বলিলাম, "শুনেছিলাম গয়না গালানো হয়ে গেছে—"

"ঝুট বাত—"

"তুমিই গিয়ে দিয়ে এস না—"

জিতিয়া বলিল—সে আর ওখানে যাইবে না। তাহার উপর বাবুদের যখন বিশ্বাসই নাই তখন ও বাড়িতে সে আর কাজ করিবে না।

বুঝিলাম আমার মনটা সেকেলে হইয়া গিয়াছিল। সেকালের সব কিছু ভালো এবং একালের সবকিছুই খারাপ এই ধারণা মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। জিতিয়াকে দেখিয়া সে ধারণাটা দূর হইল।
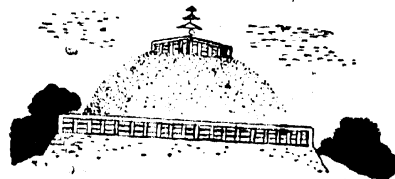
ওঁ তান্ত্রিক ভারতবর্ষ ও শ্রীশ্রীচণ্ডী

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল

শ্রীশ্রীগীতা যেরূপ সকল উপনিষদের সার, তদ্রূপ শ্রীশ্রীচণ্ডী সকল তন্ত্রের সারভূতা। যে সকল ধর্মীয় গ্রন্থ একই সময়ে সমগ্রভাবে পঠিত হয় তন্মধ্যে শ্রীশ্রীচণ্ডী একটি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। ভারতে আজিও অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু বাঁচিয়া আছেন যাহারা প্রতিদিন শ্রীশ্রীচণ্ডী সমগ্র ভাবে পাঠ করেন। দেবীপূজায় শ্রীশ্রীচণ্ডী অবশ্যপাঠ্য। পূর্ব্বে ধনী হিন্দুগণ প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা প্রভৃতি করিতেন, তখন তাহাদের গৃহে মাসাধিক কাল ধরিয়া শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হইত। বর্ত্তমানে বঙ্গে তথা ভারতের বিভিন্ন সহরে এবং অনেক পল্লীগ্রামে সার্ব্বজনীন শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং কালীপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং তদুপলক্ষে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠও হইতেছে। সুতরাং সকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য শ্রীশ্রীচণ্ডী সম্বন্ধে আলোচনা করা। যাহারা জ্ঞানমার্গের পথিক তাহাদের যেরূপ শ্রীশ্রীগীতা আনন্দ-প্রদান করে, তদ্রূপ যাহারা ভক্তিমার্গ ও সাধন মার্গের পথিক তাহাদের শ্রীশ্রীচণ্ডী পরমানন্দ প্রদান করে।

শ্রীশ্রীগীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকা প্রায় একরূপ, কিন্তু প্রশ্ন বিভিন্ন তথাপি সমাধান প্রায় একরূপ।

শ্রীশ্রীগীতার আরম্ভে আমরা দেখি, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ দুইপক্ষ উপস্থিত—একপক্ষে পাণ্ডুপুত্রগণ, অন্যপক্ষে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং উভয় পক্ষে তাহাদের আত্মীয় স্বজনগণ। যুদ্ধারম্ভে তৃতীয়পাণ্ডব অর্জ্জুন তাহার সম্মুখে যুদ্ধার্থ নিজ জ্যেষ্ঠতাতপুত্রগণ এবং আত্মীয়স্বজনগণ দেখিয়া বিষাদ-ক্লিষ্ট হইলেন এবং তাহার সারথ্যেব্রতী শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন—যদিও লোভোপহতচেতঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধে কুলক্ষয়কৃত দোষ এবং মিত্রদ্রোহ নিমিত্ত পাতক দেখিতেছেন না, কিন্তু আমি শাশ্বত সনাতন জাতিধর্ম ও কুলধর্ম্মনাশক এবং বর্ণশঙ্করকারক যুদ্ধের ভয়ানক কুফল অবগত আছি—এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? ক্ষত্রিয় অর্জ্জুন তাঁহার নিকটআত্মীয়গণ হইতে অনাত্মীয় শত্রুবৎ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াও তাহাদের প্রতি নিঃস্নেহ হইতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! সুতরাং তাহার জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরম্ভে অনুরূপ উপাখ্যান। মহারাজ সুরথ নিজ প্রজাগণকে ঔরসপুত্রবৎ ধর্ম্মানুসারে পালন করিতেছিলেন তথাপি কাল-বিধ্বংসী ভূপতিগণ তাহার শত্রু হইয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিল এবং দুষ্ট, দুরাশয়, বলবান অমাত্যগণ তাহার বল এবং ধন সমস্ত আত্মসাৎ করিল। মহারাজ সুরথ তখন মৃগয়াছল করিয়া প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণ সাধনপন্থী শিষ্যোপশোভিত মেধসমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাহার হৃতরাজ্য ও দুষ্টঅমাত্যগণের প্রতি নিঃস্নেহ না হইতে পারিয়া তাহাদের সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় তথায় সমাধি নামক এক ধনী বৈশ্য তাহার অসাধু দুর্বৃত্ত ধনলোভী পুত্র, ভার্যা, স্বজনগণ কর্ত্তৃক রিক্ত, বঞ্চিত সর্ব্বস্বহারা হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার দুরাশয় হীনস্বভাব পত্নীপুত্র স্বজনগণের চিন্তায় ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। রাজা সুরথ তখন স্নেহহীন শত্রুবৎ আত্মীয়স্বজনগণের প্রতি এই অহৈতুকী প্রীতির কারণ কি অনুসন্ধান জন্য মেধসমুনির সমীপে উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুনের ছিল তাহার হৃদয়ের সহিত তাহার কর্ত্তব্যের সংঘাত—এজন্য তাহার জিজ্ঞাসা ছিল—পরমাত্মীয় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ সঙ্গত কিনা এবং উপস্থিত যুদ্ধে তাহার কর্ত্তব্য কি? মহারাজা সুরথের ছিল তাহার হৃদয়ের সহিত তাহার বিবেকের সংঘাত—একারণ তাহার প্রশ্ন ছিল—পরমাত্মীয় শত্রুগণের প্রতি স্নেহপ্রীতির কারণ কি? অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের সমাধান—সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ত্তব্যকরণ—সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। মহারাজা সুরথের জিজ্ঞাসার উত্তরে মেধসমুনির সমাধান—মোহন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে। তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্। আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা। মা মহামায়া জগতের জনগণকে মোহিত করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন—হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর শরণগ্রহণ কর। তিনি সম্যকরূপে আরাধিতা হইলে ভোগ, স্বর্গ ও মোক্ষ দান করেন। এই জগৎসংসার রক্ষার নিমিত্ত মোহের কারণ যিনি—সেই মোহ বিনাশের উপায়ও তিনি। সুতরাং মানবজীবনের কর্ত্তব্য—ভগবানে শরণাগতি। শ্রীশ্রীগীতায় কৃষ্ণতত্ত্ব এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীর পরমেশ্বরীতত্ত্ব—তত্ত্বতঃ এক এবং অভিন্ন।

বেদ ও তন্ত্র

বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য এক। পথ বিভিন্ন কিন্তু গন্তব্য অভিন্ন। যদ্ বেদৈর্গম্যতে স্থানং তৎ তন্ত্রৈরপিগম্যতে। সাধনার চরম লক্ষ্য তত্ত্বসাক্ষাৎকার—বিষয় অনির্ব্বচনীয় কিন্তু অনুভববেদ্য শ্রুতি ও তন্ত্রের মূল উৎস এক। তন্ত্র বেদের ন্যায় প্রমাণ এবং অভ্রান্ত সত্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে আছে—উভাভ্যাম্ বেদতন্ত্রাভ্যাম্ মহ্যং তূভয় সিদ্ধয়ে। বেদের দৃষ্টিতে—সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম। তান্ত্রিকের

দৃষ্টিতে ঐ একই তত্ত্ব। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্‌ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।—দেবী আত্মাশক্তি কূটস্থ চৈতন্যরূপে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে জগতের সমস্ত পদার্থের চৈতন্যরূপিনীশক্তি মা মহামায়ার লীলা প্রকাশ—অচেতন জড় পদার্থ কোথাও নাই।

বেদান্তের ব্রহ্ম এবং তন্ত্রের ব্রহ্মময়ী মা-মহামায়া একই তত্ত্ব। তন্ত্রের আত্মাশক্তি মা-মহামায়া কূটস্থ চৈতন্যরূপে নির্বিকারা নিরাকারা, কিন্তু জগৎরূপে সাকারা। তন্ত্রশাস্ত্র সাধনার শাস্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্র গুহ্যবিদ্যা—ইহা গুরূপদেশে জ্ঞাতব্য। পাণ্ডিত্য ও সাধনা এক বস্তু নহে। এজন্য তান্ত্রিক সাধনায় পাণ্ডিত্যাভিমানীর অধিকার নাই। বন্ধ্যানারীর যেরূপ সন্তানপ্রসব অসম্ভব তদ্রূপ পাণ্ডিত্য-অভিমানীর সাধনা নিষ্ফল—ভস্মে ঘৃত প্রক্ষেপণ দ্বারা অগ্নি উদ্দীপনের আকাঙ্খার মতো পণ্ডশ্রম।

বিজ্ঞান ও তন্ত্র

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শক্তি অন্ধ, প্রাণহীন ও বুদ্ধিহীন। তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে শক্তি চৈতন্যরূপিণী—জাগতিক সমস্ত শক্তিতে পরমা চৈতন্যরূপিণী মা-মহামায়ালীলায়িতা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।" জাগতিক সমস্ত শক্তি মা-মহামায়ার শক্তি—জীবগণ যে শক্তির সাহায্যে আহার করে, দর্শন করে, শ্রবণ করে বাঁচিয়া থাকে সেই শক্তি মা মহামায়ার শক্তি। মা মহামায়া এক এবং অদ্বিতীয়—সত্ত্বগুণপ্রধান দেবগণের মহতী শক্তি এবং রজঃগুণপ্রধান অসুরগণের রুক্ষী শক্তি তাঁহারই শক্তি। তান্ত্রিকসাধকগণের উপলব্ধিতে সেই শক্তি সৎচিৎ আনন্দস্বরূপিণী। তিনি সর্ব্বতত্ত্বরূপিণী—পাপাত্মাদিগের গৃহে 'অলক্ষ্মীরূপিণী সুকৃতিগণের গৃহে শ্রীরূপিণী, নির্ম্মলবুদ্ধি জ্ঞানীগণের হৃদয়ে সাধনবুদ্ধিরূপিণী।

বিজ্ঞানের উন্নতিতে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গীর বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, হইতেছে এবং আরো হইবে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে পরমাণু আর অবিভাজ্য নয়—পরমাণু বিভাজ্য এবং শক্তির কেন্দ্র। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সমস্ত পরমাণু জুড়ে বিরাট শূন্যতা—তন্মধ্যে বিরাট বেগে ঘুরছে ইলেকট্রন বিচিত্র রহস্য। একটি প্রস্তরখণ্ড শুধু একটা শক্তিহীন জড় প্রস্তরখণ্ড মাত্র নয়—উহার অন্তরে অন্তরে বহু ফাঁক। ঐ ফাঁকে ফাঁকে অনুপরমাণুদের অন্তরে অন্তরে ছুটাছুটী ধাক্কাধাক্কী—তাহাদের সংহতি ও সংহার। ঐ আলোড়নের তরঙ্গ ছুটছে দিগদিগন্তে—তার কতকগুলো পড়ছে আমাদের চোখে—আমরা দেখছি ঐ প্রস্তরখণ্ডকে—বাকীগুলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছুটে চলেছে। এই শক্তির লীলা কি অন্ধ, বুদ্ধিহীন, প্রাণহীন? বিজ্ঞানীর চক্ষু ভোগীর চক্ষু—সে শুধু ভাবছে কী করে ঐ শক্তিকে তার ভোগে লাগাবে—কী করে ঐ শক্তির প্রয়োগে তার ভোগাধিকারীগণকে সংহার করবে। কিন্তু তান্ত্রিকের দৃষ্টি—সাধকের দৃষ্টি ত্যাগীর দৃষ্টি—সে জানতে চায়-কোথায় সেই শক্তির মূল উৎস?—কে তিনি?—কোথায় তিনি? তাঁকে কী করে জানা যায়—কী করে পাওয়া যায়। যে শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীব মায়ামোহিত হয়ে বিভ্রান্ত মনে মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের মতো মরীচিকার দিকে ছুটে ছুটে মৃত্যুবরণে মূল্যবান জীবন নষ্ট করছে—সেই শক্তির সঙ্গে কি করে মিলিত হয়ে অমৃতত্ত্ব লাভ করা যায়?

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোটী কোটি নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ সুসংবদ্ধভাবে ঘুরছে—সেই শক্তি কি চৈতন্যময়ী নন—প্রাণময়ী নন? বৈজ্ঞানিক বলেন—ঐ শক্তি অন্ধ, বুদ্ধিহীন, প্রাণহীন। তান্ত্রিকের জিজ্ঞাসা-কেন? বৈজ্ঞানিক বলেন—ঐ শক্তি তো তোমার মতো, আমার মতো, রাম শ্যাম যদুমধুর মতো কোন বুদ্ধি বিবেচনা প্রকাশ করেনা, সুতরাং ঐ শক্তির প্রাণ নেই বুদ্ধিনেই—চেতনা নেই। বৈজ্ঞানিকের এই যে বাহ্যদৃষ্টি—ভোগীর ক্ষুদ্র সীমিত 'আমি'র দৃষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিন্ময়ী রসময়ী ছন্দোময়ী সত্তাকে কি ভাবে অনুসন্ধান করবে? বিজ্ঞান তার সমস্ত শক্তি বুদ্ধি গবেষণা নিয়ে ক্ষুদ্র গুণ্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত। কিন্তু, ঐ শক্তিকে সমগ্র ভাবে মূলগত ভাবে জানিতে ইচ্ছা করে না-পারে না। কারণ সেই জানার সার্থকতা তাহার উপলব্ধিতে নাই। উপনিষদ যাকে বলেন—রসতম—সমস্তরসের উৎস—তন্ত্র যাকে বলেন—আত্মাশক্তি পরমা প্রকৃতি সৎচিৎআনন্দ-স্বরূপা তাহা তো কোন বৈজ্ঞানিকের লেবোরেটারিতে বা পরীক্ষা মন্দিরে বা গবেষণালয়ে পাওয়া সম্ভব নয়; সুতরাং তাহার জন্য কোন বৈজ্ঞানিকের ভাবনা বা মাথাব্যাথা নাই। সেই রসের রস, ছন্দের ছন্দ, প্রাণের প্রাণ জ্যোতির জ্যোতিকে অনুসন্ধান করিতে ভারতে তান্ত্রিক সাধনা।

সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রের সারভূতা
শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ক্রমবিবর্ত্তনবাদ

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে কয়েকটি বিশেষ তত্ত্ব সুপরিস্ফুট। তন্মধ্যে 'ক্রমবিবর্ত্তন' এবং "সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত ধ্বংস তত্ত্বের অর্থাৎ দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত এখানে আলোচনা করিব।

(ক) প্রথম চরিত্র

ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা দুইটি—আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রথম চরিত্রে সৃষ্টির প্রথম অবস্থা বর্ণিত আছে—

যোগানিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবানপ্রভুঃ॥
তদাদ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ॥

কল্পান্তে যখন সমগ্র জগৎ জলময় তখন ভগবান বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় যোগনিদ্রা সম্ভোগ করিতেছিলেন। সেই সময় বিষ্ণুর নাভি কমল-জাত সৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মাকে বধ করিতে বিষ্ণুর কর্ণমল-জাত মধু ও কৈটভ নামক ভীষণ অসুরদ্বয় উৎপাদিত হইয়াছিল। সৃষ্টির প্রথমে সমস্ত জলময়ছিল। ভগবানের সৃজন ইচ্ছায় তাঁহার নাভিকমলে ব্রহ্মার এবং একই সময়ে সেই সৃষ্টির ধ্বংসকারী শক্তি তাঁহার কর্ণমলে উদ্ভূত হইল। এখানে সৃষ্টির সহিত ধ্বংসের সংঘাত।

অসহায় ব্রহ্মা তাহার সৃজন শক্তি অঙ্কুরে বিনাশ প্রাপ্ত হয় দেখিয়া

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী যোগনিদ্রা মহামায়ার স্তব করেন। তখন মা-মহামায়া বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা হইতে মুক্ত করিলে মধুকৈটভের বধ সাধিত হয় এবং তাহাদের মেদ দ্বারা মেদিনীর সৃষ্টি হয়। সুতরাং জাগতিক সৃষ্টির মূলে আদ্যাশক্তি মহামায়া তিনি ধ্বংসের শক্তিকে সৃষ্টির সাহায্যে পরিবর্ত্তিত করেন।

ক্রমবিবর্ত্তনের এই আধিভৌতিক ধারার সহিত আর একটি আধ্যাত্মিক ধারার যোগ আছে। প্রাণী জগতে জীব জন্মের সঙ্গে আহার্য চায়—এজন্য ষড়রিপুর মধ্যে লোভ রিপুর প্রথম উন্মেষ—ইহার বাধায় ক্রোধ এবং তাহার অভিব্যক্তি ক্রন্দন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রথম চরিত্রে বর্ণিত আছে—

> একানবেহহিশয়নাৎ ততঃ সমুদৃশে চ তৌ।
> মধুকৈটভৌ দুরাত্মানামতিবীর্য পরাক্রমৌ।
> ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোত্তমৌ॥

ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রামুক্ত হইয়া দেখিলেন—অতিবীর্য পরাক্রম দুরাত্মা মধুকৈটভ ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখানে মধুকৈটভের জন্মের সঙ্গে লোভ—আহার জন্য। কিন্তু ভগবানের যোগনিদ্রা ভঙ্গে তাহাদের আহারের বাধায় ক্রোধ এবং এই লোভ তাহাদের মৃত্যুর কারণ।

(খ) দ্বিতীয় বা মধ্যম চরিত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দ্বিতীয় চরিত্রে আমরা দেখি দেবগণের সঙ্গে সুসময় জগতে রজোতমোগুণপ্রধান সানুচর মহিষাসুরের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ এবং দেবগণের পরাজয়। এস্থলে দেবগণের সৃষ্টিরক্ষাকারিণী শক্তির সঙ্গে সৃষ্টিধ্বংসকারিণী শক্তির সংঘাত। প্রথম চরিত্রে যেরূপ মহাশক্তির আবির্ভাবে মধু কৈটভের বিনাশে সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছিল তদ্রূপ দ্বিতীয় চরিত্রে দেবগণের স্তবে তাহাদের সম্মিলিত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া মহাশক্তি সানুচর মহিষাসুরকে বিনাশ করায় এই জগতে সৃষ্টির উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। ইহাই আদ্যাশক্তি মা মহামায়ার লীলা বিলাস। লী ধাতু আলিঙ্গণে। একজনে লীলা হয় না এজন্য এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বহু হইয়াছেন। বেদান্তের ব্রহ্ম এবং তন্ত্রশাস্ত্রের আদ্যাশক্তি একই তত্ত্ব। বিরুদ্ধ পক্ষ সমযোদ্ধা না হইলে যেমন ক্রীড়ামাধুর্য উপভোগ হয় না, তদ্রূপ আদ্যাশক্তি মা মহামায়া তাহার প্রতিপক্ষকে তদনুরূপ করিতে ইচ্ছা করেন। প্রথম চরিত্রে কল্পান্তে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উৎপত্তির সঙ্গে সৃষ্টিনাশা অসুরের যেরূপ উৎপত্তি দৃষ্ট হয় দ্বিতীয় চরিত্রে সেইরূপ সৃষ্টিরক্ষাকারী বা সৃষ্টি-উৎকর্ষকারী দেবগণের উৎপত্তির সঙ্গে সৃষ্টি নাশ বা সৃষ্টির অহিতকারী অসুরগণের উদ্ভব হয়। জাগতিক উন্নতি বা ক্রম বিকাশ একটী সহজ সরল উর্দ্ধরেখায় হয় না, দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত এবং সমন্বয়ে স্ক্রুপের প্যাঁচের মতো পেঁচাল রাস্তায় সম্ভব হয়। আমরা যদি একটী মানব জীবন পর্যালোচনা করি, তাহা হইলে এই সত্যের সন্ধান পাই। একটী সদ্যপ্রসূত অল্পায়ুব শিশুর দেহ কোষের ভাঙ্গাগড়া এবং তাহার সমন্বয়ে দেহবর্দ্ধিত হইতে থাকে। শিশু দেহের ধ্বংসের কারণ দেহসৃষ্টির সঙ্গে থাকে—যতদিন সৃষ্টিশক্তি প্রবলা ততদিন ধ্বংসের পরাভব এবং দেহের বৃদ্ধি। যখন সৃষ্টিশক্তি ও ধ্বংসশক্তি সমতুল্য তখন শরীরের বৃদ্ধি হয় না, একটা স্থিতি ভাব বর্ত্তমান থাকে। তারপর ধ্বংসশক্তি প্রবলতরা হইতে থাকিলেই দেহ ধীরে ধীরে অপটু ও অশক্ত হয়, পরিশেষে মৃত্যুবরণে বাধ্য হয়। জগতেও তদ্রূপ দেবশক্তি বা জগৎ কল্যাণ শক্তিও অসুর শক্তি বা জগৎ-অকল্যাণ শক্তির নিত্যসংঘাত এবং মহাশক্তির ইচ্ছায় তাহার সমন্বয়ে জাগতিক উৎকর্ষতা।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মধ্যম চরিত্রে দেবশক্তির বিরুদ্ধ যে শক্তির প্রকাশ আমরা দেখি তাহা পশুবৎ—তন্মধ্যে মহিষাসুর প্রধান এবং অন্যান্য চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, মহাহনু, অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ, প্রভৃতি অসুরগণ—ইহারা সকলেই জাগতিক কল্যাণকামী দেবশক্তির বিরুদ্ধবাদী—ভোগী আত্মম্ভরী। জগতে অসুরগণের অত্যাচারে যখন অমঙ্গল মঙ্গলকে পরাভূত করিল, অকল্যাণ কল্যাণকে নির্জিত করিল—প্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ দ্বারা নির্যাতিত হইল। তখন দেবগণ সকলে সমগ্রভাবে প্রতিকারের চিন্তা করিতেই, তাহাদের একীভূত শক্তির আশ্রয়ে সর্বদেবগণের তেজঃরাশিসম্ভূতা আবির্ভূতা দেবীকে দেখিয়া হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই দেবী সকল দেবগণের দ্বারা সম্মানিতা হইয়া গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন—সেই গর্জ্জনে পৃথিবী ও ভূধরগণ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন মহিষাসুর অসংখ্য অসুরগণ সহ সেই শব্দাভিমুখে ধাবিত হইল। যেরূপ অগ্নি ক্ষণকাল মধ্যেই তৃণকাষ্ঠের সুবৃহৎস্তূপ গ্রাস করে.তদ্রূপ সেই মহাশক্তি-সম্ভূতা দেবী অসুরগণের সেই মহাসৈন্য ক্ষয় করিলেন এবং পরিশেষে মহিষাসুরের ধ্বংস সাধন করিয়া সৃষ্টিরক্ষণকারী এবং উৎকর্ষবিধানকারী জাগতিক কল্যাণকারী দেবশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতের উৎকর্ষ সাধন করিলেন। মধ্যম বা দ্বিতীয় চরিত্রে বর্ণিত অসুরগণের মুখে কোন ভাষা ছিল না—একমাত্র মহিষাসুরের মুখে একটী মাত্র শব্দ আছে তাহা "আংকিম্বু"—ইহা পশুবৎ জীবের ক্রোধের অভিব্যক্তি মাত্র—হিংস্র পশুর গর্জ্জন। যদি ঐ সকল জীবের কোন ভাষা থাকিত তাহা হইলে তাহার বর্ণনা থাকিত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়-মাহাত্ম্যে অসুরগণের সঙ্গে এবং বিশেষভাবে মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা আছে কিন্তু কোন বাক্যালাপমাত্র নাই। সুতরাং মধ্যম চরিত্রে বর্ণিত সময়ে বাক্শক্তিবিশিষ্ট কোন জীবের উৎপত্তি হয় নাই তখন পশুবৎ অসুরগণের অবাধ বিচরণভূমি ছিল। মহিষাসুর এবং তদীয় অনুচরবর্গের বধসাধনে বাক্শক্তিবিশিষ্ট উন্নত শ্রেণীর জীবের উৎপত্তির সম্ভাবনা হইল। প্রথমচরিত্রে আমরা দেখিয়াছি সৃষ্টিকর্ত্তার বিরুদ্ধশক্তি লোভের প্রতিমূর্ত্তি—দ্বিতীয় চরিত্রে আমরা পাইতেছি দেবগণের বিরুদ্ধ-শক্তি সকল ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি। কামাদি অন্যান্য রিপুর কোন বিকাশ নাই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উত্তম চরিত্রে কাম রিপুর বিকাশের বর্ণনা আধ্যাত্মিক ক্রম বিকাশের সূচনা করে। কাম রিপু যৌবনের সম্পদ—কাম জীবজীবনের সর্বনিয়ন্তা। কামের জাগরণ শারীরিক সকল: শক্তি সামর্থ্য সৌন্দর্যকে মূলধন করিয়া।

'(গ) উত্তম চরিত্র।

উত্তম চরিত্রে আমরা দেখি, কশ্যপমুনির ঔরসে দনুর গর্ভজাত শুম্ভ ও নিশুম্ভ দানবদ্বয় জাগতিক কল্যাণকারী দেবশক্তিকে নির্জিত করিয়া অকল্যাণের কারণস্বরূপ হইলে দেবগণ আদ্যাশক্তি মা মহামায়ার শরণাগত হন। আদ্যাশক্তি কালিকারূপে হিমাচলে অবস্থান করিতে থাকিলে শুম্ভ ও নিশুম্ভের ভৃত্যদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়া শুম্ভকে বলিয়াছিল—আপনি জাগতিক যাহা কিছু ভোগপদার্থ তাহা ভোগ করিতেছেন। সুতরাং হিমাচলে অবস্থানকারী অতীব মনোহরা রমণীকে আনিয়া গ্রহণ করুন। কামুক শুম্ভ তখন সুগ্রীব নামক তাহার এক দূতকে দেবীর নিকট প্রেরণ করেন।

প্রথম চরিত্রে প্রকৃতির শিশু অবস্থা—এজন্য লোভ রিপুর উদ্দীপন প্রাকৃতিক নিয়মে সংঘটিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় চরিত্রে প্রকৃতির কৈশোর অবস্থা এজন্য সেই সময় ক্রোধ রিপুর উদ্দীপন স্বাভাবিক ভাবে হইয়াছিল। তৃতীয় বা উত্তম চরিত্রে প্রকৃতির যৌবন অবস্থা এজন্য কামরিপুর উদ্দীপন। ইহা জাগতিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ।

বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানীগণের মতে কামরিপু জীবজীবনের সর্ব্বনিয়ন্তা। তাহাদের মতে কামের অপরিণত অবস্থাই লোভ, কামের বাধায় ক্রোধ, কামপ্রাপ্তির ক্ষমতার অহঙ্কারে মদ, কাম্যবস্তুর প্রাপ্তিতে মোহ, কাম্যবস্তুতে প্রবলতর পক্ষের দর্শনে মাৎসর্য। সুতরাং জীবজীবনে রিপু একমাত্র 'কাম'—অন্য পাঁচটি রিপু কামের বিভিন্ন রূপ মাত্র।

উত্তম চরিত্রে আমরা দেখি—কামের দুইটি প্রতিমূর্ত্তি শুম্ভ ও নিশুম্ভ। কামুকের অহংবোধ প্রবল এজন্য পরম রমণীয়া স্ত্রীমূর্ত্তির সংবাদে স্বয়ং দেবীর নিকট উপস্থিত না হইয়া তাহার সুগ্রীব নামক দূতকে পাঠাইলেন—দেবীকে তাহার নিকট আনয়ন জন্য। কিন্তু, দেবী সুগ্রীবের মাধ্যমে শুম্ভ নিশুম্ভকে জানাইলেন তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা—

> যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
> যো মে প্রতিবল লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥

যিনি আমাকে সংগ্রামে জয় করিবেন, যিনি আমার দর্পনাশ করিবেন, যিনি আমার সমকক্ষ তিনি আমার স্বামী হইতে পারিবেন। সুতরাং যুদ্ধে পরাজিত না হইলে আমি কাহারও নিকট যাইব না।

মহাবল মদমত্ত শুম্ভ দেবীর এই দম্ভ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দৈত্যসৈন্যাধ্যক্ষ ধুম্রলোচনকে পাঠাইলেন দেবীর কেশাকর্ষণ করিয়া আনিবার জন্য। ধুম্রলোচন সসৈন্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধে উন্মত্ত শুম্ভ চণ্ডমুণ্ড নাম দুইজন মহাবল দৈত্যকে সসৈন্যে পাঠাইলেন দেবীকে জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায় আনয়ন নিমিত্ত। তখনও অহংকারী শুম্ভ দেবীকে নিজের সমকক্ষ যোদ্ধা বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই। চণ্ড ও মুণ্ড এবং তাহাদের সহিত প্রেরিত বহু সৈন্য বিনষ্ট হইলে অসুরপতি শুম্ভ তাহার অধীনের সমস্ত অসুরগণকে তাহাদের সকল সৈন্যসহ যুদ্ধার্থ দেবীর নিকট প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। দ্বিতীয় চরিত্রে মহিষাসুর ও তাহার অনুচরগণ একই সময়ে দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছিল—সুতরাং এই যুদ্ধের প্রকৃতিতে পশুভাব সুপরিস্ফুট কিন্তু তৃতীয় চরিত্রে শুম্ভ পরিকল্পিত যুদ্ধ মানবীয়ভাবে সমৃদ্ধ। অসুরগণের সহিত দেবীর যুদ্ধ আসন্ন হইল তখন দেবী, আজকাল যেরূপ ULTIMATUM বা চরমপ্রস্তাব দেওয়ার বিধি আছে সেরূপ, স্বয়ং শিবকে যুদ্ধ নিবৃত্তির জন্য একটি চরম প্রস্তাবসহ দূতরূপে শুম্ভের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন—

> ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
> যূয়ং প্রযাত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥

ইন্দ্র ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ করুন দেবগণ যজ্ঞের আহুতি ভোগ করুন—তোমরা পাতালে যাও যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে।

শুম্ভ প্রভৃতি মহাসুরগণ দেবীর চরম প্রস্তাবে কোপাবিষ্ট হইয়া দেবীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিল। নিশুম্ভসহ সমস্ত অসুরগণ নিহত হইলে শুম্ভ এককভাবে দেবীর সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিল। তখন দেবী এককভাবে যুদ্ধ করিয়া শুম্ভকে নিহত করিলেন। সমস্ত অসুরগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে দিবাকর শোভনকিরণশালী হইলেন, সুখস্পর্শ সুনির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, যজ্ঞীয় অগ্নি নির্ধুম হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। সুতরাং সৃষ্টির উৎকর্ষ সাধিত হইল। জগতের এই ক্রমবিকাশ দুইটি বিরাট শক্তির সংঘাতে এবং তাহাদের অপূর্ব সমন্বয়ে সাধিত হইতেছে, প্রলয়ান্ত পর্য্যন্ত ঐভাবে হইতে থাকিবে। এই সংঘাত কল্যাণ এর সঙ্গে অকল্যাণের—মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলের, শ্রেয় সঙ্গে প্রেয়ের, ত্যাগের সঙ্গে ভোগের, সর্বভূতস্থ ঈশ্বরভাবের সঙ্গে ক্ষুদ্র সীমিত আমি ভাবের। ইহাকে পরমা আদ্যাশক্তির লীলা ভিন্ন তান্ত্রিক সাধকের আর কি বলিবার আছে?

তান্ত্রিক সাধনার স্বরূপ

তান্ত্রিক সাধনা—'গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ং'—গুরুর উপদেশে জানিতে হইবে। ইহা গুহ্যবিদ্যা। কুলার্ণব-তন্ত্রে লিখিত আছে—ইয়ন্তু শাম্ভবীবিদ্যা গুপ্তাকুলবধূরিব। পাণ্ডিত্য ও সাধনা এক বস্তু নয়। সাধক মনে করিবেন—ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত সকলেই গুরু—পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া বালকের স্বভাব গ্রহণ করিতে হইবে এবং উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে। শাস্ত্রমতে দীক্ষাগ্রহণে পৌরুষ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় কিন্তু সাধনা ভিন্ন বুদ্ধিগত অজ্ঞানের নাশ সম্ভব হয় না। প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন প্রকৃতির—প্রাণশক্তি, বুদ্ধি মন আত্মা এই সব নিয়ে মানুষ। তান্ত্রিক সাধনার আরম্ভ যৌবনে—মানুষের যৌবনে তাহার সমস্ত প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়—তার শক্তি ও সামর্থ্য মূলধন করিয়া। শরীর লইয়া সাধনা—সুস্থ শরীর ও সবল মন ভিন্ন তান্ত্রিক সাধনা সম্ভব নহে। চঞ্চল মন নিরানন্দ মন সাধনার পরিপন্থী। মানুষ চায় ভোগ ও জ্ঞান। মানুষের জীবনে যে কিছু কর্ম্ম প্রচেষ্টা তাহার লক্ষ্য ঐ দুইটী

ভোগ ও জ্ঞান। ভোগ দ্বিবিধ—ক্ষুদ্র সীমিত 'আমি'র ভোগ এবং সমগ্র বিশ্বে যে বিরাট এক এবং অদ্বিতীয় 'আমি' লীলায়িত তাহার আস্বাদনে ভোগ। ইহাই "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"। ঐরূপ জ্ঞানেরও দুইটী ধারা—একটীর লক্ষ্য শারীরিক সুখ নিমিত্ত পার্থিব বিষয়ে জ্ঞান, অন্যটির লক্ষ্য 'আমি'কে জানা—আত্মাকে জানা। ইহা ব্রহ্মবিদ্যা। ইহা ভারতের অন্তরের কথা-আত্মানং বিদ্ধি। আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতং। আত্মাকে জান—আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন দ্বারা জানিলে সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। নায়ং আত্মা বলহীনেন লভ্যা—বলহীনের আত্মসাক্ষাৎকার লভ্য নয়। তান্ত্রিক সাধন এই ভোগ ও ত্যাগের আধ্যাত্মিক সংমিলন। লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, ভোগ পথে ইষ্টলাভ সম্ভব। তন্ত্রমতে সাধনা ত্রিবিধ—পশুভাব, দিব্যভাব ও বীরভাব। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া সাধনা পশুভাব—দ্বন্দ্বাতীতভাবে শুদ্ধান্তঃকরণে সাধনা দিব্যভাব। পঞ্চ'ম'কার লইয়া সাধনা বীরভাব। পশুভাব ও দিব্যভাবে সিদ্ধ না হইয়া বীরভাব গ্রহণ শুধু মূঢ়তা নহে-আত্মহত্যা সদৃশ। কলিযুগে তান্ত্রিক সাধনা 'সম্যক ফলপ্রদা। মহা-নির্বাণ-তন্ত্র আছে—সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োতে।

বিনাহ্যগম মার্গেন কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥

ওঁ তৎসৎ ওঁ। ওঁ শুভমস্তু ওঁ।

ভক্তের ভগবান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ভক্ত তোমার যে রূপ দেখেছে—যে রূপ করেছে ধ্যান—
সেই তব রূপ—ভক্তের ভগবান।
ভক্তের চির সত্য দৃষ্টি—অসত্য তাতে নাই,
তিনি যা দেখেন—তুমি তাই, তুমি তাই।
তুমিই সাকার, তুমি নিরাকার, অপরূপ রূপবান
বহু বহু রূপে তোমার অধিষ্ঠান।

২

সুন্দর তুমি, কুৎসিত ও তুমি বরাহ কমঠ মীন—
তুমি লাবণ্যপাথার তুলনাহীন।
ভুবনেশ্বর তুমিই ভুবন—ভাবে রূপে জড়াজড়ি
যাহা আছে নাই—সকলি যে তুমি হরি।
ভক্ত তোমার যে নাম দিয়েছে—তাই তো তোমার নাম
মধুর মধুর সুমধুর অভিরাম।
নামের ভিতর বসতি তোমার—নামে ঝরে সুধাধার—
শব্দ ও রূপ হইয়াছে একাকার।

৩

নামের ডাকেই, রঘুনাথ দাস, সনাতন গোস্বামী—
স্কন্ধেতে ঝুলি নিলো—হে জগৎস্বামী।
গিরির গুহায় নাম জপে যারা—কি সুখ
লভিতে সাধ?
অনাস্বাদিত সে সুখের আস্বাদ।
যুগের যুগের কত পাপী তাপী নিদারুণ ব্যথাতুর—
নামেই শান্তি লভেছে সুপ্রচুর।
নাম জপ করি বাল্মিকী হল—কত যে রত্নাকর
নামে আনন্দ অমৃতের সরোবর।
নাম প্রেম দেয়, করে প্রেমময়,
মানুষে ভাঙিয়া গড়ে
পতিত পাথরে—পরশ-পাথর করে।
তোমার জীবকে কত ভাবে তুমি রাখিয়াছ ভুলাইয়া
ভক্তে ভুলাও শুধু আপনাকে দিয়া।
তুমি খেলাধুলা, অশন-বসন, তুমি তবে মন প্রাণ
সর্ব্বস্ব যে তুমি তার ভগবান্।

শিবশঙ্কর নৌকায় পা দিয়েছেন এমন সময় নায়েব এসে পায়ের ওপর পড়ল। কথা নয়, বার্তা নয়, কেবল ভেউ ভেউ করে কান্না।

অনেকবার বলার পর নায়েবের মুখে কথা ফুটল।

আমাকে বিদায় করে দিন হুজুর। ওসব কথা কানে শুনতে পারব না।

হাঙ্গরমুখো লাঠির ওপর ভর দিয়ে শিবশঙ্কর জিজ্ঞাসা করলেন, কি সব কথা?

নায়েব আবার কেঁদে উঠল, সে কথা মুখ দিয়ে কি করে উচ্চারণ করি হুজুর।

মুখ দিয়েই নায়েব উচ্চারণ করল। তবে আর একটু সাধাসাধি, আর একটু কান্নাকাটির পর।

পাশাপাশি দুই জমিদার। শিবশঙ্কর চৌধুরী আর চুণীলাল হালদার। একেবারে পাশাপাশি জমিদারি হ'লে যা হয়। ঝগড়া বিবাদ, লাঠালাঠি, মামলা-মকৰ্দ্দমা লেগেই আছে। আলের সীমানা নিয়ে, ফল-পাকুড়ের গাছ নিয়ে, প্রজার মালিকানা নিয়ে।

এমনি এক গোলমালের ব্যাপার কোর্ট অবধি গড়াল। ছোট কোর্ট থেকে বড় কোর্ট। রায় বেরোল শিবশঙ্করের বিরুদ্ধে। প্রমাণ হ'ল এক বছর ধরে চুণীলালের একফালি জমির স্বত্ব ভোগ করছিলেন তিনি। কাজেই চুলচেরা হিসাব হ'ল। শিবশঙ্কর নগদ বিয়াল্লিশ টাকা ফেরত দেবেন চুণীলাল হালদারকে।

এ টাকা এতদিন দেওয়া হয়নি। চুণীলালও চান নি। শিবশঙ্করও দেন নি।

আজ বুঝি সুযোগ পেয়ে হালদারদের নায়েব খুব শুনিয়ে দিয়েছে চৌধুরীদের নায়েবকে।

বিয়াল্লিশ টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, নিজেদের জমিদার বলা কেন? ভিতরের অবস্থা যে ফোঁপরা তা তো বেশ বোঝাই যাচ্ছে। বাইরে কোঁচার পত্তন, আর ভিতরে—

কথাটা শেষ না করে ইশারায় নায়েব ছুঁচোর নাচের ভঙ্গীমাটা দেখিয়ে দিয়েছিল।

শিবশঙ্করবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে সব শুনলেন। রাগে মুখ-চোখ আরক্ত হয়ে উঠল। গলার স্বর সামলে নিলেন। খুব মৃদু কণ্ঠে বললেন, হালদারদের নায়েবকে কাল একবার কাছারিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল। সত্যিই টাকাটা অনেক দিন হ'ল পড়ে রয়েছে। শোধ করে দেব।

নায়েব অবাক। শিবশঙ্করকে সে চেনে। খুব চেনে। বয়স কম, তেজ আরবী ঘোড়ার মতন। একটুতে ক্ষেপে ওঠেন। কিন্তু এমন ভিজে বারুদের মতন অবস্থা কি ক'রে হ'ল, ভেবেই উঠতে পারল না। ল্যাজে পা পড়লেও, যে গর্তে মুখ ঢোকায়, সে ঢোঁড়া। নির্বিষ। শিবশঙ্করকে জাত সাপ বলেই কিন্তু নায়েব জানত।

নিরুপায়। মনিবের হুকুম তামিল করতেই হবে। যে গাছ শিং দিয়ে ওপড়াতে চেয়েছিল, সে গাছের গুঁড়িতেই দড়ি বাঁধতে হবে।

পরের দিন দুই নায়েব গিয়ে হাজির। হালদারদের নায়েবের বগলে খাতাপত্র। এতদিনের বাকি উসুল হবে সেজন্য বেশ একটু হাসি হাসি ভাব। শিবশঙ্কর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছিলেন, নায়েবকে দেখে উঠে পড়লেন আসন ছেড়ে। আলবোলার নলটা ছিটকে পড়ল হাত থেকে।

বেতমিজ, বেয়াদব, ছোট মুখে বড় কথা।

আলমারির পিছন থেকে চামড়ার চাবুকটা পেড়ে নিয়ে সপাং সপাং চালাতে লাগলেন। নায়েবের পিঠে, বুকে, মুখে, হাতে।

ব্যাপার দেখে শিবশঙ্করের নায়েব সরে পড়ল। শিবশঙ্কর ক্ষেপলে আর রক্ষা নেই। মানুষটা প্রাণে বাঁচলে হয়।

প্রাণে বাঁচল নায়েব, প্রায় আধমরা হয়ে।

শিবশঙ্কর হুকুম দিলেন পাইকদের, নচ্ছারটার হাত-পা বেঁধে বিলাসপুরের পাট ক্ষেতের মাঝখানে ফেলে রেখে আয়, আর ওই সঙ্গে হালদারদের খবর পাঠিয়ে দে, তাদের নায়েবকে তুলে নিয়ে যাবে।

নায়েবকে চড়া রোদে ক্ষেতের মাঝখানে ফেলে রাখা হল। হালদারদের খবরও গেল।

এতক্ষণ শিবশঙ্কর মেজাজের ওপর ছিলেন। হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। ব্যাপারটা চুকে যাবার পরে চেতনা হ'ল। সমস্ত ঘটনাটা, একতরফা এখানেই শেষ হবে না। হালদারদেরও মান আছে, মর্যাদাবোধ আছে। চৌধুরীদের কাছে মাথা নোয়াবার পাত্র নয়। বিশেষ করে এমন অপমানের পরে। নায়েবকে বেইজ্জত করা তো জমিদারকেই বেইজ্জত করার সামিল।

শিবশঙ্কর ভয় পেলেন। বুঝলেন হালদাররা অল্পে ছাড়বেন না। বিশেষ করে এমন একটা সুযোগ হাতের মধ্যে পেয়ে।

সোজা নিজের কামরায় গিয়ে শিবশঙ্কর দরজায় খিল দিলেন।

এই চরিত্রেরই মানুষ। রাগের সময় জ্ঞান থাকে না। কি থেকে কি হতে পারে সে সম্বন্ধে কোন খেয়াল নয়। তারপরেই ভয়ে কুঁকড়ে যান। একেবারে শিশুর মতন অসহায় হয়ে পড়েন।

বাড়ীতে আপনার লোক বলতে কেউ নেই। মা মারা গেছেন—শিবশঙ্কর পৃথিবীর আলো দেখবার দিন তিনেক পরে। বাবা গেছেন শিবশঙ্কর যখন বারো। একেবারে পরের হাতে মানুষ হয়েছেন। দূর সম্পর্কীয় এক মামা, তিনিই দেখাশোনা, তদ্বিরতদারক সব করেছেন। নির্লোভ, সত্যনিষ্ঠ। ইচ্ছা করলে নাবালক ভাগনেকে ফাঁকি দেওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। একেবারে পথে বসাতে পারতেন তাঁকে। কিন্তু তা করেন নি, বরং বুকের

রক্ত দিয়ে তাঁকে লালন করেছেন। যক্ষের মতন আগলে-ছেন তাঁর জমিদারী।

বয়স হয়েছে মামার, কিন্তু এখনও বেশ কর্মঠ।

শিবশঙ্কর সাবালক হ'তে তিনি নিজের বাড়ীতে ফিরে গেছেন। শিবশঙ্করকে সব বুঝিয়ে শুঝিয়ে দিয়ে।

দরজা ঠেলে ঠেলে কর্মচারীর দল যখন হতাশ হ'ল, তখন নায়েবের মাথায় বুদ্ধি এল। মামাবাবুকে একবার খবর দিতে হবে। তিনি না এলে কেউ এ দরজা খোলাতে পারবে না।

পাইক ছুটল পাশের গাঁয়ে। মামাবাবুর বাড়ী। মামাবাবু সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন।

অনেক দরজা ঠেলাঠেলি, শিবশঙ্করের নাম ধরে ডাকা-ডাকি, কোন উত্তর নেই। তখন মামা ঘুরে জানলার দিকে গেলেন। জানলা বন্ধ ছিল, হাতের লাঠি দিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল;

এদিকটা অন্য সকলেরও জানা ছিল, কিন্তু এত সাহস কারো হয়নি। এর চেয়ে বাঘের খাঁচায় মাথা ঢোকানো বরং তাদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল।

মামা দেখলেন, বালিশে মাথা গুঁজে, দু হাতে পাশ বালিশ আঁকড়ে ধরে শিবশঙ্কর শুয়ে আছেন। ঘুমাচ্ছেন না সেটা বেশ বোঝা গেল।

খুব ছোটবেলায় ঠিক এমনি করেই শিবশঙ্কর ঘুমাতেন। প্রথম দিকে বাপকে আঁকড়ে ধরে, তারপর মামাকে।

শঙ্কর! শঙ্কর! জানলার গরাদের কাছে মুখ দিয়ে মামা গলা বাড়ালেন।

শিবশঙ্কর চুপচাপ—

আমি সব শুনেছি শঙ্কর। বেশ করেছ শাস্তি দিয়েছ ছোটলোক নায়েবটাকে। এ শাস্তি তার পাওনা ছিল। এর জন্য চিন্তাই বা কি, আর ভয়ই বা কি! আমি তো এখনও বেঁচে রয়েছি, না কি? উপায় একটা করতেই হবে। দোরে খিল দিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকলে উপায় হবে? উঠে পড়। বাইরে এস। সব বল আমাকে। দেরী হলে ফৌজদারী কেস খারাপ হয়ে যায়। সময় থাকতে একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কাজ হ'ল। শিবশঙ্কর উঠে বসলেন। মামার দিকে চাইলেন একবার, তারপর দরজার খিল খুলে দিলেন।

সেদিন রাত্রে মামার আর বাড়ী ফেরা হল না। বাড়ীতে খবর গেল। মামা আর ভাগনে পাশাপাশি এক বিছানায় শুলেন।

খুব সকালে উঠে মামা বেরিয়ে পড়লেন।

উকিল মহিম সান্যাল। শিবশঙ্করের এস্টেটের বাঁধা। দায় বিপদে, দেওয়ানী ফৌজদারীতে একমাত্র বুদ্ধিদাতা।

মামা তাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

মহিমবাবু নথিপত্রের উপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে সবে চেয়ারে বসতে যাচ্ছেন, মামাকে দেখেই অবাক হলেন।

কি ব্যাপার? আপনি নিজে এসে উপস্থিত।

এ ছাড়া উপায় ছিল না মহিমবাবু। শঙ্কর আবার ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছে।

মহিমবাবু খুব বিচলিত হলেন না। এমন ফ্যাসাদ দুমাসে একটা শিবশঙ্করবাবু বাঁধান। নিজের পাইককেই এমন মেরে বসেন যে তাল সামলাতে আর সকলের প্রাণ যায়। এ ছাড়া উদ্ধত প্রজার বাড়ীতে আগুন দেওয়া, খাজনা বাকী পড়া প্রজাকে গাছের ডালে পা বেঁধে জলে ডুবিয়ে দেওয়া, এ সব ব্যাপার তো থাকেই।

মহিমবাবুও অনেক বুঝিয়েছেন। দিনকাল খারাপ। মানুষজন এখন বদলে যাচ্ছে। জমিদারকেও আর কেউ দেবতা ভাবে না। এখন সাবধান হও। মেজাজ সামলাও, নয়তো কোনদিন বিপদে পড়ে যাবে।

মহিমবাবু শিবশঙ্করের বাপের আমলের উকিল। এস্টেটের মঙ্গলচিন্তাই করেন।

এবার কি হ'ল? কারুর বাড়ীতে আগুন দেওয়া, না মৌচাকের তলায় প্রজাকে পিছমোড়া করে বেঁধে মৌচাকে আগুন দিয়ে দেওয়া।

চেয়ারে বসে পড়ে মামা বললেন, তার চেয়েও মারাত্মক।

কি রকম? মহিমবাবু খাঁজ ফেললেন দু ভ্রূর মাঝখানে।

মামা বিস্তারিত বললেন। শুনে মহিমবাবুর চোখ কপালে উঠল।

সর্বনাশ, এতো খুব গোলমালের ব্যাপার। হালদাররা এ অপমান মুখ বুজে সইবে এমন মনে হয় না। এতক্ষণে নিশ্চয় থানা পুলিশ শুরু করেই দিয়েছে। এখন উপায়?

উপায় খুঁজতেই তো আপনার কাছেই আসা!

দু হাতে কপাল টিপে মহিমবাবু কিছুক্ষণ বসে রইলেন। মামাই বললেন কথাটা।

আমি একটা কথা ভাবছি মহিমবাবু।

বলুন ?

যদি বলা যায় শঙ্কর মানে শিবশঙ্কর কাল দুপুর দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আপনার কাছে ছিল—জমিদারী সেরেস্তার কাজের ব্যাপারে। সেই রথতলার জল নিকাশের পথ নিয়ে তো গোলমাল একটা চলছেই। সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে এসেছিল। এ কথা বলাতে অসুবিধা আছে।

অসুবিধা আর কি, মহিমবাবু আস্তে আস্তে বললেন, তবে কি জানেন, আমি আপনাদের এস্টেটের বাঁধা উকিল। জমিদারকে বাঁচাবার জন্য এমন একটা কথা বলা তো আমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কোর্ট কতদূর বিশ্বাস করবে কথাটা সেটাই বিচার্য।

তাহলে।

আমি কয়েকটা দিন ভেবে দেখি। আপনি ইতিমধ্যে হালদারদের হালচাল গতিবিধির ওপর নজর রাখুন। ওরা কতদূর এগোল, সে খবরটা আমায় দিয়ে যাবেন।

চুণীলাল হালদার অবশ্য বসেছিলেন না। পাইকের মুখে খবর পেয়ে নিজে গিয়েছিলেন পাল্কি চড়ে। নিজের চোখে নায়েবের অবস্থা দেখেছেন। সর্বাঙ্গে রক্ত জমে কালো কালো হয়ে উঠেছে। দুটো চোখ ফুলো। দড়ির বাঁধনের জন্য হাতে আর গোড়ালীতে মোটা দাগ। দাগের চারপাশে রক্তের চিহ্ন।

বাঁধন খুলে সেই অবস্থায় নায়েবকে পাল্কিতে তুলে নিয়ে চুণীলাল সোজা কুসুমপুরের হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। পরীক্ষা করালেন ডাক্তার ব্রাউনকে দিয়ে। হাসপাতালে ভর্তিও করে দিলেন। অন্তত একুশ দিন রাখা চাই, নইলে কেস শক্ত হবে না।

সেখান থেকে থানায় এজাহার পাঠালেন। তিনশো সাত ধারা। তাতে যদি না আটকায়। উকিলের ফন্দি-ফিকিরে কোন রকমে পিছলে যায়, তো তিনশো ছাব্বিশ ধারা রয়েছে। একেবারে মোক্ষম। হাসপাতালের রিপোর্ট থাকবে। ডাক্তারের সাক্ষ্য। আর নায়েব তো রইলই।

কাজটা আরও পাকা করলেন হালদাররা।

ম্যাজিস্ট্রেট তুলসীচরণ মুখুজ্জে। ধার্মিক লোক। ত্রিসন্ধ্যা জপ, তপ, আহ্নিক। একাদশী অমাবস্যায় ফলাহারী। প্রত্যেক যাগে-যোগে আড়াই ঘণ্টা গঙ্গায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকেন। সব ঠিক। ঘুস নেন না। কিন্তু ভেট নেন। অবশ্য উঁচু দরের। সে খবর হালদারদের জানা ছিল।

তুলসীচরণের আরও একটি দুর্বলতার কথাও তাঁদের জানা ছিল। সন্ধ্যার পরে বিশেষ এক আসরে বসে একটু গান শোনা। বয়স হয়েছে হালকা টুংরি দাদরায় আজকাল মন ভরে না। ভজন শোনেন কিংবা রামপ্রসাদী।

চুণীলাল হালদার বিরাট এক ভেট পাঠালেন। মাছ, মিষ্টি, দই থেকে শাকশব্জী এমন কি তুলসীবাবুর মেয়ের জন্য ঢাকাই বেনারসী পর্য্যন্ত।

আর যায় কোথায়। এবার চৌধুরীরা কাত। শিবশঙ্কর চৌধুরীর জেলদর্শন ঘটবেই।

হালদারের খবর নিয়ে মামা আবার দেখা করলেম মহিমবাবুর সঙ্গে।

মহিমবাবু আইনের বই ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, কিছু খবর আমিও পেয়েছি। হালদাররা আট-ঘাট বেঁধে কাজ করছে। আমাদেরও সব দিক দেখে কাজ করতে হবে। আপনার সেদিনের কথাটা আমার মনে ধরেছে। শিবশঙ্কর দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আমার এখানে ছিল, একথা আমি বলব। কিন্তু আগেই বলেছি, আমার সাক্ষ্য খুব কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না। আপনাকে আর একটা কাজ করতে হবে।

কি বলুন ?

আর একজনের কাছে যেতে হবে। তাকে দিয়ে বলাতে হবে যে শিবশঙ্কর সাড়ে পাঁচটা থেকে নটা অবধি তার কাছে ছিল।

বেশ, বলুন কার কাছে যাব ? ডাক্তার মণীশ বসাকের কাছে যেতে পারি। তাঁকে চেপে ধরলে হয়তো এ কথা বলতে স্বীকার করবেন।

উহুঁ। মণীশ ডাক্তারকে দিয়ে হবে না। তাঁর সাক্ষ্যের দাম আমার সাক্ষ্যের মতনই হবে, তিনি ও তো আপনাদের এস্টেটের ডাক্তার। আপনাদের দিকে

টেনে বলবেনই। ডাক্তারের কাছে বসে থাকার কাহিনী খুব বিশ্বাসযোগ্য হবে না।

তবে কার কাছে যাব বলুন? মামা চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

গহর বাঈয়ের কাছে। মহিম সান্যাল চাপা গলায় বললেন।

মামা চমকে উঠলেন, সেকি গহর বাঈয়ের কাছে? তিনি রাজী হবেন কেন?

রাজী করাতে হবে?

কিন্তু কি করে? টাকা পয়সার প্রশ্ন তো অবান্তর। লাখ টাকাও তিনি পা দিয়ে ছোঁবেন না। তাছাড়া এরকম একটা প্রস্তাব তাঁর কাছে করি কি ক'রে?

দেখুন ভেবে চিন্তে। শিবশঙ্করকে বাঁচাবার এ ছাড়া আর পথ নেই। বিপদে পড়লে মানুষকে অনেক কিছু করতে হয়। আমি তো আর কোন রাস্তা দেখছি না।

মামা উঠলেন বিষণ্ণ-বদনে। রাগ হলো শিবশঙ্করের ওপরে। মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করে বসে, সামলাতে মানুষ প্রাণান্ত। এই বয়সে তিনি আর ঝক্কি সামলাতে পারেন না।

শঙ্করকে একেবারে বাচ্চা রেখে বোনটা গেছে। তাও বিদেশে। শিবশঙ্করের বাপ গৌরীশঙ্কর তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। হরিদ্বার মথুরা হয়ে দ্বারকা পর্যন্ত। স্ত্রী মারা গেলেন হরিদ্বারে। হরিদ্বারেই শিবশঙ্কর জন্মায়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর গৌরীশঙ্কর সোজা দেশে ফেরেননি। হরিদ্বারেই ছিলেন পুরো একটা বছর। এক পাহাড়ী আয়া শিবশঙ্করকে বুকে করে মানুষ করেছিল। যে হাসপাতালে শিবশঙ্করের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন, সেইখানকারই আয়া। তার এত মায়া পড়ে গিয়েছিল শিবশঙ্করের ওপর যে তাকে নিয়ে বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা পর্যন্ত ঘুরেছিল, কিন্তু বাংলায় আসেনি। আবার ফিরে গিয়েছিল হরিদ্বারে।

এ সব মামা শুনেছিলেন গৌরীশঙ্করের চিঠিতে। শিবশঙ্কর বাপের সঙ্গে যখন দেশে ফিরল, তখন তার বয়স বছর দুইয়েক।

গহর বাইকে মামা বার কয়েক চোখে দেখেছিলেন। সামান্য আলাপ পরিচয় ছিল। বেশী থাকার কথাও নয়।

বাঈজী বলতে সচরাচর যে ধরণের স্ত্রীলোক বোঝায়, গহরবাঈ মোটেই সে ধরণের নয়। রোজ ভোরে গঙ্গা স্নানে যায়। বাড়ীতে ছোট একটা মন্দির আছে। বেলা বারোটা পর্যন্ত সেখানে পূজা অর্চনা করে। এক বেলা খায়। রাত্রে শুধু ফল আর দুধ। বাড়ীতে ভিখারী অনাথদের ভীড় লেগেই থাকে।

নাম শুনে মনে হয় জাতে মুসলমানী। সে কথাও কে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল।

হেসে বলেছে, না বাবা, আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে। হিন্দু ঘরের বৌ। সন্ন্যাসীদের যেমন গার্হস্থ্য জীবনের কথা বলতে নেই আমাদেরও তাই। সাধুদের বলতে নেই, কারণ তাঁদের সামাজিক সত্তা নেই। সামাজিক জীব হিসাবে তাঁরা মৃত। আমাদের বলতে নেই কারণ আমরা পিতৃকুল শ্বশুরকুল দুকূলে কালি লেপে বেরিয়ে আসি, তাই।

একটু থেমে আবার বলে, নাড়া বেঁধেছিলাম এক মুসলমান সাধকের কাছে। তিনি নাম দিয়েছেন গহর। গহর বাঈ।

লোকে কিন্তু গহর বাঈ বলত না। বলত গহর-মায়ী।

প্রার্থী কোনদিন তার দরজা থেকে ফিরে যেত না। তার যা সাধ্য, যতটুকু সাধ্য, দিত।

একথাও লোকে জিজ্ঞাসা করেছে।

এত বড় বড় জায়গা থাকতে এখানে কেন মায়ী? বাংলা দেশের পল্লীর প্রান্তে?

গহর বাঈয়ের চোখ ছলছলিয়ে এসেছে। গেরুয়া আঁচল দিয়ে দুটো চোখ মুছতে মুছতে অশ্রুরুদ্ধ-গলায় বলেছে শহরে শান্তি পাই না বাবা। বড্ড শব্দ, বড় ভীড়। নিজেকে যেন হারিয়ে যেতে হয়। এখন, এই বয়সে, নিভৃতে, শান্ত জায়গায় না বসলে নিজের হৃদয়ের শব্দটা যে শোনা যায় না। ঠাকুর তো হৃদয়েই বাস করছেন। তাঁর যা কিছু নির্দেশ, যা কিছু বাণী, পাচ্ছি এই হৃদস্পন্দনের মধ্য দিয়েই। বাইরের কোলাহলে সেটা চাপা পড়ে যায়।

রাত্রে শুধু গানের আসর বসে। আসর ঠিক নয়। গহর বাঈ গান করে ভজন, রামপ্রসাদী কিংবা দেহ-তত্ত্বের কোন গান। বিশিষ্ট দু এক জন শ্রোতা শুধু আসে।

গানের সমঝদার। যারা আসে, তাদের গহরবাঈয়ের অনুমতি নিয়ে আসতে হয়।

শিবশঙ্করের বাপ গৌরীশঙ্কর গহরবাঈকে নিজের চৌহদ্দীর মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন থাকবার ভাল ব্যবস্থা করে দেবেন। আলাদা মন্দিরও তৈরী করে দেবেন।

গহর বাঈ হাত যোড় করেছে, জমিদারী মানেই দম্ভ, ঐশ্বর্য মানেই লালসা। এসব থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। পাপ মনের কথা বলা যায় না। কখন কিসে আসক্তি জন্মায়, কখন নরকে নামায় মানুষকে। তার চেয়ে এই ভাল আছি। একান্তে, ভোগের নাগালের বাইরে। জীবনে কাদা অনেক ঘেঁটেছি, অনেক ডুবেছি বাসনার পঙ্কে, বাকি জীবন বসে সেই সব দাগ তোলার চেষ্টা করি—দেহ থেকে। মন থেকে।

আশ-পাশের পাঁচ-ছ'টি গ্রাম জানত গহরবাঈ পুণ্যবতী মহিলা। দান, ধ্যান ধর্ম কথা নিয়েই আছে। জীবনে কারো অমঙ্গল চিন্তা করে নি, কারো ক্ষতি তো নয়ই।

এ হেন মহিলাকে কি করে গিয়ে বলবেন মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে। মামা চিন্তায় পড়লেন। কিন্তু উপায়ও নেই। শিবশঙ্করের কিছু একটা হয়ে গেলে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না মামার।

অনেক ভেবে-চিন্তে মামা খুব ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লেন। প্রায় ব্রাহ্ম মুহূর্তে। এই সময় গহরবাঈ গঙ্গা-স্নান করতে আসে। ঝড় হোক, জল হোক, এই সময় স্নান করতে আসবেই।

অনেক দূর থেকেই গঙ্গার ঘাটের কাছে মামা একটা সাইকেল রিক্সা দেখতে পেলেন। গহরবাঈয়ের বাঁধা রিক্সা। এইটাতেই যাতায়াত করে।

মামা যখন গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌছলেন, গহর বাঈ তখন আকণ্ঠ জলে। চোখ বন্ধ করে নাম জপ করছে। ঘাটের দু-পাশে ভিখারীর পাল। স্নান সেরে গহর বাঈ ওঠবার সময় পয়সা দিতে দিতে আসে।

ঘাটের একপাশে মামাবাবু দাঁড়ালেন।

পুরো একঘণ্টা ধরে নামজপ চলল, তারপর ভিজা কাপড়ে ঘাটে উঠতেই ভিখারীরা দু' পাশ থেকে ছেঁকে ধরল।

পয়সা বিলোতে বিলোতে মামার সামনে এসেই গহর-বাঈ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, একি আপনি এখানে?

মামা হাতযোড় করলেন, আমিও এদের মত প্রার্থী।

কি ব্যাপার বলুন তো?

যদি অভয় দেন, কথা রাখবেন, তা হ'লে বলব।

কিন্তু না শুনে কথা দেব কি করে? গহরবাঈ বিচলিত হ'ল, গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে, ভিজে কাপড়ে আমি তো সে রকম কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না।

আমি সেই জন্যই গঙ্গার ধারে এসে অপেক্ষা করছি। জানি, এখানে কোন কথা দিলে, আপনি না রেখে পারবেন না।

গহর বাঈ বিরক্ত হ'ল। এগিয়ে যেতে যেতে বলল, আপনি অযথা ভণিতা করছেন। যদি বলবার কিছু থাকে বলুন, নয়তো আমার সময় নষ্ট করবেন না। পূজারী অপেক্ষা করছেন, আমি না গেলে পূজা শুরু হবে না।

মামা কাতরকণ্ঠে নিবেদন করলেন, বিশ্বাস করুন, আমাদের বড় বিপদ। আপনি ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

গহরবাঈ হাসল। শান্ত গলায় বলল, আপনাদের জমিদারির লাঠালাঠির মধ্যে এই বয়সে আমাকে টেনে নাই বা নামালেন। আদালত আছে, আইন আছে, সেখানে প্রতিকার খুঁজুন। এ সব ব্যাপারে আমি কি সাহায্য করব?

গহরবাঈ রিক্সায় এক পা দিয়ে উঠতে যাবে, এমন সময় মামা বললেন, জমিদারির ব্যাপার ঠিক নয়, শঙ্করের বড় বিপদ।

গহরবাঈ চমকে মুখ ফেরাল, কার বিপদ?

শঙ্করের।

কি হয়েছে? গহরবাঈয়ের গলায় উদ্বেগের ছোঁয়াচ।

এখানে দাঁড়িয়ে সব কথা বলা যাবে না। বলতে সময় নেবে।

দু'এক মিনিট গহরবাঈ কি ভাবল, তারপর বলল, আপনি দুপুরের দিকে আমার বাড়ীতে আসুন, সব শুনব।

রিক্সায় উঠে গহরবাঈ চলে গেল। মামা স্নান করার জন্য গঙ্গায় নামলেন।

গহরবাঈ পা মুড়ে বসে সব শুনল। মামার কথা শেষ হতে বলল, তা, আমায় কি করতে হবে?

মামা ঢোঁক গিললেন। অসহায় দৃষ্টি মেলে এদিক-ওদিক দেখলেন। এমন একটা প্রস্তাব কি করে উচ্চারণ করবেন গহরবাঈ-এর সামনে। তারপর আমতা আমতা করে বললেন, আপনাকে বলতে হবে সাড়ে পাঁচটা থেকে নটা পর্যন্ত শঙ্কর আপনার গানের আসরে ছিল।

গহরবাঈ দৃশ্যত একবার শিউরে উঠল। খুব মৃদু গলায় বলল, তার মানে মিথ্যা কথা বলতে হবে?

মামা মুখ তুলে চাইতে পারলেন না গহরবাঈয়ের দিকে। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, শঙ্করকে বাঁচাবার জন্য। এটুকু না হলে শঙ্করের নির্ঘাৎ সাজা হয়ে যাবে। মা-মরা ছেলে—

থাক, থাক, বিকৃত গলায় গহরবাঈ বাধা দিল, আপনি যান। কবে আমাকে কোর্টে যেতে হবে বলে যাবেন।

মামা আর দাঁড়ালেন না। মনে মনে জানা দেবতাদের নাম স্মরণ করে উঠে পড়লেন।

ব্যস; আর ভয় নেই। গহরবাঈ যদি সাক্ষ্য দেয় তবে সব ঠিক হয়ে যাবে। গহরবাঈকে অবিশ্বাস করবে এমন শক্তি আশ-পাশের গাঁয়ের কারো নেই। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটরও নয়।

আবার গিয়ে দাঁড়ালেন মহিম সান্যালের কাছে। সাক্ষীদের ব্যাপার তো হ'ল। আর কি করার আছে?

মহিমবাবু বললেন, এবার সোজা চলে যান কলকাতায়। সব চেয়ে ভাল ব্যারিস্টার ঠিক করে আসুন। যতদূর খবর পেয়েছি হালদাররাও ক'লকাতায় লোক পাঠাচ্ছে। পাবলিক প্রসিকিউটর তো থাকবেই, তা ছাড়াও ওরা আলাদা ব্যারিস্টার দেবে।

কার কাছে যাই বলুন তো? ভাল একজন ব্যারিস্টারের নাম বলে দিন।

মহিমবাবু একটু ভেবে বললেন, ধরতে যদি হয় তো সব চেয়ে বড়কে ধরাই ভাল। এস পি সিংহকে যদি আনতে পারেন, তা হ'লে কেসের চেহারাই ঘুরে যাবে। তবে দক্ষিণা খুবই বেশী।

তাহোক, শঙ্করের মর্যাদার মূল্য আরো বেশী। আমি তো চিন্তায় সারা রাত চোখ বন্ধ করতে পারি না। যদি কিছু একটা হয়ে যায় শঙ্করের, আমাকে এ দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

নায়েবকে নিয়ে রাত্রের ট্রেনেই মামা কলকাতায় চলে এলেন।

এস, পি, সিংহ তখনও লর্ড হন নি। দারুণ প্র্যাকটিশ। প্রায় স্নান আহারের সময় পান না। রাত এগারোটা পর্যন্ত চেম্বার মক্কেলে ঠাস-বোঝাই।

মিস্টার সিংহের মুহুরী বলল, সায়েবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে, কিন্তু তার জন্য তার নিজের ফি লাগবে একশো টাকা।

তাই সই। মামা মুহুরীর হাতে করকরে একশ টাকার নোট দিলেন।

বেলা পাঁচটা থেকে বসে বসে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ মুহুরী মামাকে সিংহ সায়েবের কাছে নিয়ে গেল।

কেসটা তিনি মন দিয়ে শুনলেন। কনুইয়ের ওপর থুতনিটা রেখে। শেষকালে বললেন, বুঝেছি এটা প্রেষ্টিজ ফাইট। রাজায় রাজায় মোলাকাত। আমি যেতে রাজী। ফি রোজ ছ হাজার। এ ছাড়া যাওয়া আসা থাকা খাওয়ার সব খরচ আপনাদের।

মামা রাজী। উপায় নেই। কেউটে বশ করতে হলে ওঝাও সেই রকম দরকার।

জায়গাটা কোথায়? সিংহ সায়েব ডায়েরিতে তারিখটা লিখতে গিয়ে থেমে গেলেন।

মামা জায়গার নাম বললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সিংহ-সায়েব আঁতকে উঠলেন, সর্বনাশ, ও যে ডাকসাইটে ম্যালেরিয়ার জায়গা মশাই। ছ-হাজার কি, দিনে ষাট হাজার টাকা দিলেও ম্যালেরিয়া কিনতে ওখানে যেতে পারব না। মাপ করবেন।

মামা অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু সিংহ সায়েব অটল।

অগত্যা মামা বেরিয়ে এলেন। মুহুরীকে ধারে কাছে দেখা গেল না। টাকাটা ফেরত দেবার ভয়েই বুঝি গা ঢাকা দিয়েছে।

হাইকোর্ট মহলে ঘোরাঘুরি করে মামা খবর যোগাড় করলেন।

ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। আসামী-তারণ। অগতির গতি। আর্গুমেন্টের বন্যায় সরকারী উকিলের যুক্তি-তর্ক কোথায় ভাসিয়ে দেন। সারাক্ষণ খোদ হাকিম তটস্থ হয়ে থাকেন।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে মামা ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর শরণ নিলেন।

চক্রবর্তী সায়েব রাজী। ফি ওই দৈনিক ছ হাজার। রাহা খরচা মক্কেলের।

শুনানীর দিন কোর্টে আর লোক ধরে না। দূর দূর গাঁ থেকে লোক এসেছে। বউ ছেলেপুলে নিয়ে। সবাই এসেছে গহরমায়ীকে দেখতে। এই পুণ্যবতী মহিলার নামই এতদিন তারা শুনেছে, চোখে দেখে ধন্য হবে এই আশায় এতটা পথ হেঁটে এসেছে।

মামা নিজে গিয়েছিলেন গাড়ী নিয়ে গহরবাঈকে আনতে। জমিদার বাড়ীর পুরোনো ব্রুহাম গাড়ী। ঘোড়া অবশ্য অন্য জায়গা থেকে যোগাড় করতে হয়েছিল। কিন্তু সে গাড়ীতে গহরবাঈ এল না। নিজের বাঁধা রিক্সায় আদালতের উঠানে এসে নামল।

কোর্টে ঢুকতেই জনতা চীৎকার করে উঠল, গহরমায়ীকি জয়।

পুলিশ চেঁচিয়ে, ম্যাজিস্ট্রেট হাতুড়ী ঠুকে ঠুকেও অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারল না।

মহিম সান্যালের জবানবন্দীর পর, গহরবাঈয়ের এজাহার শুরু হ'ল।

কোন দিকে চাইল না গহরবাঈ। মাথা নীচু করে নিজের বক্তব্য বলে গেল। হ্যাঁ, তারিখটা মনে আছে। পূর্ণিমার রাত। সারাটা দিন গহরবাঈ উপোস করেছিল। সাড়ে পাঁচটা থেকে ভজন গান শুরু হয়েছিল। কানা তবলচী কানাই ঘোষাল ছিল, আর ছিল চৌধুরী বাড়ীর শিবশঙ্করবাবু। ন'টা পর্যন্ত আসর বসেছিল। তারপর শিবশঙ্করবাবু চলে গিয়েছিলেন।

জেরা করতে উঠলেন মিস্টার কানিংহাম। একে লাল চেহারা, তার ওপর মক্কেলের দৌলতে পানীয়ের ব্যবস্থা ভালই ছিল।

ঠিক সময় নিয়ে নানা প্রশ্ন তুললেন। সাড়ে পাঁচটার পরেও আসতে পারেন শিবশঙ্করবাবু। ধরুন ছ'টা কি সাড়ে ছ'টা নাগাদ।

না, গহরবাঈ ঘাড় নাড়ল, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আরতি শেষ হয়। ভোগ বিলি হয়। ভোগের থালা আর শিবশঙ্করবাবু এক সঙ্গে ওপরে এসেছেন। আজ পঁচিশ বছর ধরে এক নিয়মে পূজা-আরতি চলে আসছে, কোনদিন এর ব্যতিক্রম হয় নি।

দু ঘণ্টার ওপর কানিংহাম সায়েব লড়লেন। গহরবাঈয়ের সাক্ষ্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য, কিন্তু একটু টলাতে পারলেন না গহরবাঈকে। তার অতীত জীবনের ইঙ্গিত করতে যেতেই ম্যাজিস্ট্রেট আপত্তি করলেন। এ কেসের বিষয়-বস্তুর পক্ষে ওসব প্রশ্ন অসম্ভব।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে কানিংহাম বসে পড়লেন।

রায় বেরোল দিন তিনেক পর। শিবশঙ্কর চৌধুরী বেকসুর খালাস। মিথ্যা মকদ্দমায় তাকে অন্যায়ভাবে জড়ানো হয়েছে।

সবাই আশা ক'রেছিল হালদাররা আপীল করবে। এত সহজে ছাড়বে না। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, তারা আর এগোল না। ব্রণ ঘেঁটে কার্বাঙ্কল করার ইচ্ছা তাদের ছিল না।

কথাটা কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তুলসীবাবুই ওঠালেন আর এক গানের আসরে—গহর বাঈয়ের কাছে।

একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

গান শেষ করে গহরবাঈ আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছিল, তুলসীবাবুর দিকে ফিরে বলল, বলুন।

সেদিনের সেই সাক্ষ্যের কথাটা ভাবছি। পূর্ণিমার রাতের আসরে শুধু আমি ছিলাম। আর কেউ ছিল না। শিবশঙ্কর চৌধুরী তো নয়ই। আপনার শরীর খারাপ বলে আপনি একটা ভজন গেয়েই উঠে পড়লেন। অথচ—

খুব মৃদু কণ্ঠে গহরবাঈ উত্তর দিল, আমি মিথ্যা বলেছি তুলসীবাবু।

তা তো জানি, সেই জন্যই সব কিছু কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। আপনার পূজা অর্চনা, দান ধ্যান, সাত্ত্বিক জীবনযাত্রা—এ সবের পটভূমিতে কিছুতেই সে দিনের আচরণটা খাপ খাওয়াতে পারছি না।

একটু চুপ করে রইল গহরবাঈ, তারপর চাপা নিশ্বাসের সঙ্গে অনেকটা আর্তনাদের সুরে বলল, আমার দানধ্যান, পূজা অর্চনা, ইহকাল পরকাল কিছুই আমার ছেলের চেয়ে মূল্যবান নয় তুলসীবাবু। ছেলের জন্য, তার মর্যাদা রক্ষা করতে মা সব পারে। মাকে সব পারতে হয়।

তুলসীবাবুকে অবাক করে দিয়ে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে গহরবাঈ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মানবতার ক্ষেত্রে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত

অন্যান্য ক্ষেত্রে কোথাও মিল, কোথাও অমিল; গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে মানবতার ক্ষেত্রে। দীর্ঘকাল-বহিত জাতীয় জীবনের প্রকাণ্ড এক অভিশাপ দুই বিরাট প্রাণকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল সমভাবে; গভীর সমবেদনা আনে আত্মিক বন্ধন, সেই আত্মিক বন্ধন নিবিড় হইতে নিবিড়তম হইয়া উঠিতেছিল শেষ বয়সে। বর্ণভেদকে অবলম্বন করিয়া অথবা জাতিজন্মের কৃত্রিম ভেদকে অবলম্বন করিয়া মানুষের মধ্যে এমন ঘৃণা-বিদ্বেষ গড়িয়া উঠিবে যে তাহা জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া জাতীয় জীবনকে আক্ষরিকভাবেই বিষাক্ত করিয়া তুলিবে ইহা যথার্থ মহৎপ্রাণের নিকটে সম্পূর্ণই অসহ্য। জাতীয় জীবনের লাভ-ক্ষতি, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা বাদ দিয়া উভয়েই বিষয়টিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন মানবতার ব্যাপকক্ষেত্রে; মানুষে মানুষে কৃত্রিম বৈষম্য মানবতারই অপমান। সেই বৈষম্য যখন এমন তীব্রতা লাভ করে যে মানুষ বনের পশু অপেক্ষা মানুষকে অধিক ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন মানুষ হিসাবে বেদনায় ও লজ্জায় মুখ রাখিবার স্থান থাকেনা। অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার সমগ্র জাতির মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসরণে যে কতখানি প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় ব্যতীত স্বতন্ত্র-ভাবে উভয়েই এ-বিষয়ে তীব্রবেদনায় অবহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই স্মরণ করিতে পারি মনীষী টলস্টয়কেও—যাঁহার অটুট ভগবদ্বিশ্বাস তাঁহাকে প্রথমেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এই বোধে, এক ভগবানের নিকট হইতে আগত কোনো মানুষই মানুষের নিকটে ঘৃণ্য হইতে পারে না, ভগবৎ-সন্তানত্ব সকলকে সম্পূর্ণ সমত্ব দান করিয়াছে। তাঁহার মতে মানুষের প্রতি প্রেমই হইল একমাত্র ভগবৎ-পূজা, মানুষের প্রতি অপ্রেম হইল ভগবানের প্রতিই অপ্রেম। রবীন্দ্রনাথের সমবুদ্ধির ভিত্তিভূমি হইল গভীর ঔপনিষদ-অনুভূতি—যে মানুষ সর্বভূতকে নিজের মধ্যে দর্শন করে—সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করে আপনাকে—তাহাকেও কেহ ঘৃণা করে না—সেও কাহাকে ঘৃণা করে না। মহাত্মা গান্ধী এই সমত্বের বাণী লাভ করিয়াছেন গীতার সারপ্রবচনরূপে। সমদর্শনই শ্রেষ্ঠ দর্শন—তাহাই যথার্থ আত্মদর্শন।

মানুষের প্রতি মানুষের এই ভেদবুদ্ধি ও ঘৃণা-বিদ্বেষ মহাত্মাগান্ধীকে প্রথম ব্যথিত করিয়া তোলে দক্ষিণ আফ্রিকায়; সেখানে কৃষ্ণজাতির প্রতি শ্বেতজাতির ঘৃণা বিদ্বেষের নগ্নরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন। তখন তিনি ভারতীয়দের হইয়াই ইউরোপীয় শ্বেতজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন বটে; কিন্তু ভারতীয়দের স্বার্থ ও ন্যায্য অধিকার তাঁহার অবলম্বন বা উপলক্ষ মাত্র ছিল, লক্ষ্য তাঁহার মানুষের কাছে মানুষের অধিকার—অধিকার না বলিয়া তিনি বরঞ্চ বলিতেন 'সপ্রেম স্বীকৃতি'। ডারবান হইতে প্রিটোরিয়ায় যাইতে গাড়ীর প্রথম শ্রেণীতে উঠিতে গিয়া কৃষ্ণাঙ্গ গান্ধীজীকে শ্বেতাঙ্গযাত্রীদ্বারা কিভাবে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইতে হইয়াছিল,—তখনই গান্ধীজী সেই ব্যাপারে

তাঁহার অহিংস সত্যাগ্রহকে কিভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই বিদিত। ইহা হইল ১৮৯৩ সনের কথা। এই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তখন হইতে বিশ বৎসরের অধিক কাল গান্ধীজী সংগ্রাম করেন, শুধু মানুষ হিসাবে মানুষের সম-অধিকারের নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য।

কিন্তু দেশে ফিরিয়া গান্ধীজী অল্পদিনের মধ্যেই দেখিতে ও বুঝিতে পারিলেন—যে বৈষম্য ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্বজাতীয়গণের পক্ষ হইয়া বিদেশীয়গণের বিরুদ্ধে, সেই বৈষম্য এবং বিদ্বেষের পুঞ্জীভূত অভিশাপ কতখানি বিষাক্ত এবং কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে আমাদের জাতীয় জীবনকে। এই জন্য অস্পৃশ্যতা-বর্জন এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে একটা সমত্ববুদ্ধি ও প্রেমের জাগরণকেই গান্ধীজী তাঁহার সকল গঠনমূলক কাজের মূল লক্ষ্য করিয়া তুলিলেন।

ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার পিছনে যে একটি বর্ণাশ্রমধর্মের নীতি রহিয়াছে গান্ধীজী তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না; বরঞ্চ ইহার ভিতরে যে একটা সমাজশৃঙ্খলার সহজ ব্যবস্থা রহিয়াছে গান্ধীজী তাহা তাঁহার অনেক লেখায় বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও কিন্তু হিন্দুধর্মের ভিতরকার সমাজব্যবস্থার এই বর্ণাশ্রমধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না। অনেক প্রবন্ধে তিনি বর্ণাশ্রমধর্মের আসল সত্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা উভয়েই দৃঢ়ভাবে মনে করিতেন অস্পৃশ্যতা বর্ণাশ্রমধর্মের স্বাভাবিক পরিণতিতে জাত নয়—ইহা বর্ণাশ্রমের সম্পূর্ণ কদর্থজাত। মহাত্মাজী এ-বিষয়ে 'হরিজন' পত্রিকায় (২০।৪।৩) বলিয়াছেন,—

"যে 'ছুঁইও না ছুঁইও না' মনোবৃত্তি আজকারের হিন্দুধর্মকে কলঙ্কিত করিয়াছে তাহা হইল একটা মানসিক অসুস্থতাজাত জিনিষ। ইহা আমাদের মনের একটা কাষ্ঠবৎ ভাবের পরিচায়ক, একটা অন্ধ আত্মাভিমানের সূচক। ইহা ধর্ম ও নীতি উভয়-বিগর্হিত।"

এই অস্পৃশ্যতা বর্জনের সঙ্কল্প এবং ব্রতকে গান্ধীজী যে কি জাতীয় একটা উদার মানবতার দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার 'যারবেদা মন্দির হইতে' গ্রন্থখানির ভিতরকার একটি উক্তির মধ্যেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

"অস্পৃশ্যগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেই অস্পৃশ্যতা-বর্জনের ব্রত পূর্ণ উদ্‌যাপিত হইল না; এ ব্রত পূর্ণ উদ্‌যাপিত হইবে সেই দিন, যেদিন প্রত্যেক প্রাণীকে নিজের মতন করিয়া ভালোবাসা যাইবে। অস্পৃশ্যতা-বর্জনের অর্থ হইল সমস্ত জগতের প্রতি প্রেম—কিন্তু জগতের সেবা; সুতরাং অস্পৃশ্যতা-বর্জন অহিংসাতেই গিয়া পর্যবসিত হয়।"

গান্ধীজীর অহিংসার তাৎপর্য হইল মানুষের অধ্যাত্মসত্যে পূর্ণ বিশ্বাস—আর মানুষ সম্বন্ধে সেই অধ্যাত্ম বিশ্বাসের তাৎপর্য হইল মানবচরিত্রের মূল প্রেম-স্বরূপতায় আস্থা; সেই আস্থা লইয়া মহামৈত্রী-করুণায় নিজেকে পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত করিয়া তোলাই হইল অহিংসার আসল অর্থ। গান্ধীজীর ক্ষেত্রে যে মৈত্রী-করুণায় চিত্তের মহাজাগরণ হইতে অহিংসার উৎসারণ, ঠিক সেইখান হইতেই উৎসারিত অস্পৃশ্যতা-বর্জনের মহাব্রত।

রবীন্দ্রনাথও অস্পৃশ্যতার সমস্যাকে শুধু জাতীয় জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেন নাই। গান্ধীজীর ন্যায় তিনিও অবশ্য একথা বহু স্থলে বলিয়াছেন যে জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য এইপাপ দূরীভূত হইবার আশু প্রয়োজন রহিয়াছে; কিন্তু আশু-প্রয়োজনের তাগিদ কোনো ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের মনে মহৎ-প্রেরণা জাগ্রত করে নাই। বিশ্বমানবতাকে বিশ্বকমলের মত পরিপূর্ণভাবে ফুটাইয়া তোলার দিকেই ছিল তাঁহার মূল লক্ষ্য।

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে প্রকাশিত দুইটি প্রসিদ্ধ কবিতায়, একটি হইল 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান', অপরটি হইল 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে।' মনে রাখিতে হইবে, গান্ধীজী প্রবর্তিত অস্পৃশ্যতা-বর্জন আন্দোলন ভারতবর্ষে ব্যাপক রূপ ধারণ করিয়াছিল প্রায় ইহার দশ বৎসর পরে। রবীন্দ্রনাথ সমস্যাটিকে তৎকালীন জাতীয় জীবনের পটভূমিকায়—তথা মহামানবতার পটভূমিকায় কি ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এবং ইহা লইয়া কি গভীর মর্মবেদনা অনুভব করিয়াছিলেন—এই দুইটি কবিতার মধ্যেই তাহার পরিচয় রহিয়াছে। শ্রেণীবিশেষকে ঘৃণা করিয়া নীচে ফেলিয়া রাখিয়া তাহাদের মধ্যে ও নিজেদের মধ্যে 'ঘোর ব্যবধান রচনার' প্রবৃত্তি ও চেষ্টা জাতীয় জীবনে যে কত বড় অভিশাপ সে সম্বন্ধে

কবির মনোবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে ক্ষুব্ধ ভবিষ্যদ্বাণীর ভঙ্গিতে কবিতাটির শেষ অংশ—

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে যদি না ডাক,
এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

এই বেদনাই প্রকাশিত হইয়াছে 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে' কবিতাতে যেখানে কবি বলিতেছেন—

সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে
দুখের রক্ত শিখা,
হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।

প্রাচীন ভারতের চিত্তের ঔদার্য সম্বন্ধে কবিমনে গভীর শ্রদ্ধা ছিল; সেই চিত্তের ঔদার্য ভারতবর্ষকে একদিন সর্বমানবের সম্মেলনে এবং সকলের সমান চিন্তায় ও কর্মে পুণ্য 'যজ্ঞশালা' করিয়া তুলিয়াছিল; কবির বিশ্বাস, জাতি-পাঁতি লইয়া যে অসাম্য ও ঘৃণা-বিদ্বেষের গ্লানি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহা অনেক পরবর্তী কালের জিনিস। সর্বপ্রকারের গ্লানিমুক্ত ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের যে আদর্শ কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা মানবতার বিরাট ক্ষেত্রে; সেখানে আহ্বান আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান, দেশি-বিদেশী সকলের; সেই মহামানবতার ক্ষেত্রেই কবির আহ্বান—

এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার
এস হে পতিত করো অপনীত
সব অপমান ভার।

এই দুইটি কবিতা রচনার বহুপূর্বেও ১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সেই কবিতাটির একটি ঔপনিষদ পটভূমি থাকিলেও কবিতাটির ভিতর দিয়া কবির ব্যক্তি-প্রবণতা রঞ্জিত হইয়াছে। কবিতাটির শেষে ঋষি গৌতমের মুখে যে-কথাটি দেখিতে পাই—

'অব্রাহ্মণ নহে তুমি তাত।
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।'

ঠিক এই কথা ছান্দোগ্য-উপনিষদে ঋষি গৌতমের মুখে দেখিতে পাই না। তিনি জাবাল সত্যকামকে 'দ্বিজোত্তম' বলেন নাই, বলিয়াছিলেন—"নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি।"

"অব্রাহ্মণ কখনও এইরূপ কথা বলিতে পারে না; হে সৌম্য, তুমি সমিধ আহরণ কর; তোমাকে উপনীত করিব; তুমি সত্য হইতে বিচলিত হও নাই।" ইহার সহিত আবার "দ্বিজোত্তম" কথাটি যোগ করিয়া জাবাল সত্যকামের প্রতি কবি নিজের সশ্রদ্ধ সম্ভাষণই জ্ঞাপন করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি তথ্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটির একটি স্তবকে বলিয়াছেন—

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান,……।

এখানকার রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত এই 'মানুষের নারায়ণ' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে বলি। বলি এই জন্য, এই কথাটি একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথা নহে, এই কথাটা তখনকার বাংলাদেশের বাতাসের মধ্যেই ছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথা অবশ্য স্মরণীয়। বাংলাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে সমস্ত ভারতবর্ষে, এই মনীষী 'মানুষের নারায়ণে'র সত্য জলদগম্ভীরস্বরে প্রচারিত করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্র পূর্বভারত, উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতে স্বামিজী যেমন করিয়া এই 'মানুষের নারায়ণে'র সত্য প্রচার করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে অস্পৃশ্যতার মহাপাপকে নিন্দা করিয়াছেন এমন আর কাহাকেও দেখি না। তিনি এই 'sin of do not touching বা 'ছুঁইও—নার পাপ' কে নিন্দা করিতে কোনও রূপ কঠোর ভাষা ব্যবহারেই কসুর করেন নাই: তিনি ইহাকে অন্ধ কুসংস্কার বলিয়াছেন, মহাপাপ বলিয়াছেন, মহামারি বলিয়াছেন, আত্মঘাতী মহাব্যাধি বলিয়াছেন—কি না বলিয়াছেন: দক্ষিণদেশের 'পেরিয়া' গণের প্রতি

ব্রাহ্মণগণের অমানুষ ব্যবহারের কথা তিনি যেভাবে চোখে অঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন সেই দিনে আর কেহ তেমন করিয়া দেখান নাই। সেইদিনে তাঁহাকেই উদারকণ্ঠে আহ্বান করিতে দেখিয়াছি—'হে ভারত,...ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ;...।" আচার বিচারের বেড়াজাল দিয়া, সমাজে সমান-অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, ঘৃণা-বিদ্বেষের কালিমা লেপন করিয়া, জাত্যাভিমানের রূঢ় আঘাত হানিয়া আমরা যে মানুষের ভিতরকার একটা বৃহদংশকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে দিতেছি না, তাহাদের ভিতরকার 'ব্রহ্ম'কে যে জাগিয়া উঠিতে দিতেছি না এ-কথা প্রায় ধ্রুবসত্যের মতনই স্বামীজীর সকল ভাষণে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দিয়াছে। ১৯০১ সালে স্বামিজী দেহরক্ষা করেন, 'মানুষ নারায়ণে'র সত্যকে ইহার পূর্বেই তিনি তাঁহার জীবনের মূলবাণীরূপে যতটা পারেন প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। যে-কারণেই হোক, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব আমরা রবীন্দ্রনাথের উপরে লক্ষ্য করি না। আমরা শুধু এই কথাটাই বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ যখন 'মানুষের নারায়ণে'র কথা বলিয়াছেন তখন কথাটা বাঙলাদেশের বাতাসের মধ্যেই ছিল এবং বাঙলাদেশের তথা ভারতবর্ষের বাতাসে এই কথাটা ছড়াইয়া দিবার কাজে বিবেকানন্দের কথা অবশ্য স্মরণীয়।

গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথের 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' ও 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে' কবিতা দুইটি প্রকাশিত হয়। ইহার পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, নাটকে, লেখায়, ভাষণে নানাভাবে কৃত্রিম ভেদরচনার দ্বারা মানুষকে ঘৃণা করিবার মনোবৃত্তি ও কর্মচেষ্টাকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন; এ-সকলের সার-সঙ্কলন করিয়া কোনও লাভ নাই।

পরিণত বয়সে রাজনৈতিক মতামত লইয়া রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে নানাভাবে মতানৈক্যের ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে; ইহার কতকগুলি মতানৈক্য মৌলিক অনৈক্য। তথাপি আমরা দেখি, এই ব্যবধান কোনও 'দূর' রচনা করিতে পারে নাই; ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী উভয়ের মানুষের প্রতি গভীর প্রেম, রবীন্দ্রনাথের প্রেম ব্যঞ্জিত তাঁহার ভাব-ভাবনায়, তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির ভিতর দিয়া—গান্ধীজীর প্রেম প্রকাশিত তাঁহার ভাষণে ও দৈনন্দিন কর্মে। এই মানবপ্রেম—বিশেষ করিয়া বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষের জন্য অসীম দরদ—মহাত্মাজী এবং রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ককে যে কতখানি নিবিড় করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৩২ সালে পুণার যারবেদা জেলে মহাত্মা গান্ধীর আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করিবার সময়ে। ব্রিটিশ রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণের চক্রান্তে হিন্দুজাতিকে বর্ণহিন্দু ও তপসিলী হিন্দু এই দুইভাগে চিরকালের জন্য ভাগ করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইল। এ-যেন নিজেদের ভিতরকার ভেদ-ঘৃণা-অপ্রেমকে একটি বাহির হইতে আরোপিত ব্যবস্থা দ্বারা একেবারে চিরস্থায়ী করিয়া তুলিবার চেষ্টা। ইহা গান্ধীর সমস্ত জীবনাদর্শেরই চরম অস্বীকৃতি। এই চক্রান্তকে রোধ করিবার জন্যই গান্ধীজী যারবেদা জেলের মধ্যে আমরণ অনশন আরম্ভ করিলেন। শান্তিনিকেতনে অত্যন্তভাবে বিচলিত হইয়া পড়িলেন রবীন্দ্রনাথ। জেলে মহাত্মাজীর নিকটে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে তার পাঠাইলেন তাহাতেই তিনি জানাইলেন,—

"আমাদের বেদনাকাতর হৃদয় এই মহৎ তপস্যাকে শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত অনুসরণ করিতে থাকিবে।" রবীন্দ্রনাথের এই তার পাইবার পূর্বে অনশন আরম্ভ করিবার পূর্বক্ষণে গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ভিতরকার আত্মিক সম্বন্ধটি ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে এই পত্রখানি অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি। পত্রখানি এই—

"গুরুদেব, এখন মঙ্গলবারের অতি-প্রত্যুষ, তিনটা বাজে দ্বিপ্রহরে আমি অগ্নিময় দ্বারদেশে প্রবেশ করিব। আপনি যদি আমার প্রচেষ্টার জন্য আশীর্বাদ করিতে পারেন তবে আমি সেই আশীর্বাদ চাই। আপনি আমার সত্যকার বন্ধুরূপেই এযাবৎ দেখা দিয়াছেন, কারণ, আপনি অতি সরল বন্ধুরূপেই সর্বদা আপনার মনের কথা উচ্চকণ্ঠেই প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার নিকট হইতে আমি একদিকে হোক, বা অপর দিকে হোক—একটা দৃঢ় অভিমত প্রত্যাশা করিয়াছি। কিন্তু আপনি সমালোচনা করিতে অনিচ্ছা

প্রকাশ করিয়াছেন। আমার এই অনশনের ভিতরেও যদি আপনি আপনার অভিমত প্রকাশ করেন আমি ইহাকে বহুমূল্য মনে করিব; আপনার হৃদয়-মন আমার কার্যের যদি নিন্দা করে তাহাকেও আমি বহুমূল্য দিব। আমি যদি দেখি আমি ভুল করিয়াছি, তবে আমার সেই মারাত্মক ভুল স্বীকার করিতে আমি অত্যন্ত গর্বিত অনুভব করি—সেই স্বীকৃতির জন্য যতখানিই মুল্য দিতে হোক না কেন। আপনার হৃদয়-মন যদি আমার কাজকে সমর্থন করে তবে আমি আপনার আশীর্বাদ চাই। ইহা আমাকে ধারণ করিয়া রাখিবে। আশা করি আমার মনের কথা আমি পরিষ্কার বলিতে পারিয়াছি। আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি গ্রহণ করুন।

এই চিঠিখানি জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাতে দিবার সময়ই গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের তার পাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখিলেন, "আমি যে ঝড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছি তাহার ভিতরে ইহা আমাকে ধারণ করিয়া রাখিবে।"—

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া দেশবাসীর নিকট একটি আবেদন প্রচার করিয়াছিলেন, আবেদনটি এই—

"আমার দেশবাসিগণের প্রতি আমি এই আবেদন জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন ইহা নির্ভুলভাবে প্রমাণ করিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব না করেন যে, তাঁহাদের নিজেদের অঞ্চল হইতে সর্বপ্রকারের অস্পৃশ্যতাকে নির্মূল করিতে তাঁহারা আন্তরিকভাবেই বদ্ধপরিকর। এই আন্দোলন যেন সর্বসাধারণের আন্দোলন হয় এবং এ-আন্দোলন যেন এখনই প্রবর্তিত হয়,—ইহার প্রকাশের মধ্যেও যেন থাকে স্বচ্ছতা ও অদ্বিধা। ভারতবর্ষের যে কোন শ্রেণীর লোক সব প্রকারের অপমান সহ্য করিতেছে, ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে, বীরোচিত কর্ম ও আত্ম-ত্যাগের দ্বারা তৎসমুদয়ই দুরীভূত করিতে হইবে। ভারতবর্ষের যে বিপদ আজ উপস্থিত সেই বিপদে আমাদের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি এই ভীষণ সঙ্কট এড়াইবার জন্য তাহার সর্বশক্তি নিয়োজিত না করিবেন তিনিই আমাদের পক্ষে এবং জগতের পক্ষে একটা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্য দায়ী থাকিবেন।"

এই সব তার প্রেরণ করিয়া এবং দেশবাসীর নিকটে আবেদন প্রচার করিয়াই রবীন্দ্রনাথ সুস্থ থাকিতে পারিলেন না, নিজে যারবেদা জেলে গিয়া মহাত্মাজীর পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, নিজের কণ্ঠে তাঁহাকে গান শুনাইয়া প্রফুল্ল করিলেন; অনশন-ভঙ্গের পূর্বে গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের নিজের কণ্ঠে গান শুনিলেন, 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো।' গানটি চিরদিনই মহাত্মাজীর অতি প্রিয়। পরের দিন বিকালবেলা শিবাজি মন্দির নামক বৃহৎ মুক্ত অঙ্গনে মহাত্মাজীর বার্ষিকী বিরাট উৎসব-সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করিলেন এবং ভাষণ দিলেন। ভাষণ নিজের মুখে খানিকটা বলিলেন, বাকিটা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য পড়িয়া শুনাইলেন।

মহাত্মাজীর অনশন-ব্রত আরম্ভ করিবার দিনে শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসিগণের নিকটে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রার্থনান্তিক ভাষণ দিয়াছিলেন। এই ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন—

"...তাঁর উপবাস,সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটি বাণী, চরম ভাষার বাণী। মৃত্যু তাঁর সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে ঘোষণা করবে, চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য হয়, তবে তা যথোচিতভাবে করতে হবে। তপস্যার সত্যকে তপস্যার দ্বারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

"আজ তিনি কী বলছেন সেটা চিন্তা করে দেখো। পৃথিবীময় মানব ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি, একদল মানুষ আরেক দলকে নিচে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতির প্রচার করে। আপনদলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য দলের দাসত্বের উপরে। মানুষ দীর্ঘকাল ধরে এই কাজ করে এসেছে, কিন্তু তবু বলব এটা অমানুষিক। তাই দাস-নির্ভরতার ভিত্তির উপরে মানুষের ঐশ্বর্য স্থায়ী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাসেদের দুর্গতি হয় তা নয়, প্রভুদেরও এতে বিনাশ ঘটায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি, তারাই আমাদের সম্মুখপথে পদক্ষেপের বাধা। তারা গুরুভারে আমাদের নিচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন মনে করি তারা ক্রমশঃ আমাদের হেয় করে। মানুষ-খেগো সভ্যতা রোগে জীর্ণ হবে, মরবে। মানুষের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মানুষোচিত সম্মান থেকে যাদের

আমরা বঞ্চিত করেছি তাদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েছি।

এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে আহূত পল্লীবাসীদের প্রতিও রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণে গান্ধীজীর 'মহাত্মা' রূপটি তিনি যে-ভাবে পল্লীবাসিগণের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা সত্যই বিশেষভাবে স্মরণীয়।

…"যে মহাপুরুষ ভালবাসা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন, তাঁকে আমাদের ভালোবাসায় আমরা একরকম করে বুঝতে পারি। সেই জন্য ভারতবর্ষে এই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল যে, এবার বুঝেছি। এমনটি সচরাচর ঘটে না। যিনি আমাদের মধ্যে এসেছেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেছি, তাঁকে জেনেছি। সকলে বুঝেছে, তিনি আমার। তাঁর ভালোবাসায় উচ্চনিচের ভেদ নেই, মূর্খ-বিদ্বানের ভেদ নেই, ধনী দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে সমানভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেছেন, সকলের কল্যাণ হোক। যা বলেছেন শুধু কথায় নয়, বলেছেন দুঃখের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েছেন।…

"সবাই জানো—সমস্ত ভারত কী রকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েছে, একটি নাম দিয়েছে—মহাত্মা। আশ্চর্য, কেমন করে চিন্‌লে। মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোনো মানে নেই। কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েছে, তার মানে আছে। যাঁর আত্মা বড়ো তিনিই মহাত্মা। যাদের আত্মা ছোটো বিষয়ে বদ্ধ, টাকাকড়ি ঘরসংসারের চিন্তায় যাদের মন আচ্ছন্ন, তারা দীনাত্মা। মহাত্মা তিনিই, সকলের সুখদুঃখ যিনি আপনার করে নিয়েছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলে জানেন। কেন না, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান।"

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু ভাবের সমর্থন এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং দেশবাসীর নিকটে আবেদন জানাইয়াই কর্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি শান্তিনিকেতনে 'সংস্কার-সমিতি' নামে একটি কর্মসমিতি স্থাপন করেন। বিশ্বভারতীর আচার্যরূপে রবীন্দ্রনাথ এই সমিতির পক্ষ হইতে যে সার্বজনীন নিবেদন জানাইলেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—

"এখন অবিলম্বে আমাদের এই কয়টি ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—

১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না; বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই আমাদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে।

২। সাধারণের মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।

৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভাসমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবে না।

৪। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা সমাজে থাকিতে দিব না।

আমাদের কাজ

হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করা, দুর্গতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, পরস্পর শ্রদ্ধাদ্বারা সর্বশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধকে সত্য করা, জনসাধারণের মধ্যে আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মশক্তি উদ্বোধন করার উদ্দেশে বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন পল্লীসেবার ভিতর দিয়া বহুদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিয়াছে। এখন হইতে ঐ কাজকে আরো ব্যাপক এবং শক্তিশালী করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সভার পরিচালনায় বিশ্বভারতীতে সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইল।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে এই কেন্দ্রীয় সংস্কার সমিতি গঠন করিয়া সমস্ত দেশে আবেদন জানাইলেন—যাহাতে দেশের প্রত্যেক পল্লী-অঞ্চলে এইরূপ সংস্কার সমিতি স্থাপিত হয় এবং পল্লী-সমিতি যেন কেন্দ্রীয় সমিতির সহিত সর্বদা যোগ রক্ষা করিয়া কার্যে অগ্রসর হন। রবীন্দ্রনাথ নিজের স্বাক্ষরিত নিবেদনেই বলিলেন—

"আমরা দেশবাসীদিগকে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য দেশের সর্বত্র এইরূপ স্থায়ী কাজের অনুষ্ঠান গড়িতে আহ্বান করিতেছি। দেশহিতৈষী কর্মীমাত্রেই এই উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইয়া অবিলম্বে কাজে অগ্রসর হইবেন, ইহাই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ। কে কী ভাবে কোথায় কাজ করিতেছেন, ইহা জানিতে পারিলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত ও আনন্দিত হইব। শ্রীযুত কালীমোহন ঘোষ

কেন্দ্রীয় সংস্কার সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীনিকেতন, পোঃ সুরুল, জিঃ বীরভূম—এই ঠিকানায় সকলে পত্রাদি ব্যবহার করিবেন এবং এই কাজে কেহ কিছু অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলে, কর্মসচিব, বিশ্বভারতী, পোঃ শান্তিনিকেতন, জিঃ বীরভূম—এই ঠিকানায় তাহা পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন ইতি ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ সাল।

আমরা একটু ইচ্ছা করিয়াই অনেকখানি অংশ তুলিয়া দিলাম। রবীন্দ্রনাথ এইভাবে শান্তিনিকেতনে কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপন করিলেন, এবং দেশের সর্বত্র ইহার শাখা সমিতি স্থাপন করিয়া সকলকে ইহার সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত হইতে বলিলেন। এমন করিয়া আহ্বান তিনি আর কখনও জানাইয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। এখানকার সকল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম লক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝা যায়, তৎকালে গান্ধীজী গঠনাত্মক কর্মের জন্য দেশবাসী সম্মুখে যে উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তাহা যেন রবীন্দ্রনাথ নিজের মতন করিয়া বাস্তবে রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীনিকেতন স্থাপনের মধ্যে এই-জাতীয় উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের কথা প্রথমাবধিই ছিল বটে, কিন্তু এখানে আসিয়া ইহাকে যেরূপ স্পষ্টরূপ লাভ করিতে দেখিলাম তাহা পূর্বে এমনভাবে দেখা যায় নাই। অস্পৃশ্যতাবর্জন ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর শুধু ভাবসমর্থক থাকিতে চান নাই—সক্রিয় সমর্থক হইয়া উঠিতে চাহিয়াছিলেন।

বন্ধু তোমার প্রথম পরশ

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

বন্ধু তোমার প্রথম পরশ মরুর বুকেতে মেঘের দান,
দখিন সমীরে আঁখি মেলে যেন সহকার-বুকে মঞ্জরী ;
শূন্য কম্বু-কণ্ঠেতে জাগে সহসা উতলা জলধি-গান,
মাধবী প্রভাতে ভ্রমর ফিরিছে বকুলের কানে গুঞ্জরি।

চিনি নাই তোমা দেখি নাই কভু, হে মোর অজানা মিতা,
কালের কক্ষ-পরিক্রমায়, তবু জাগে যেন স্মৃতি ;
সেই সে সাগর সৈকত-ভূমে তুমি যে দীপান্বিতা,
হেরিলে সহসা মুখখানি মোর, ঝরিল নয়নে প্রীতি।

ভুলিল পথিক, মিলালে তুমি যে মহাশূন্যের মাঝে,
খুঁজিল কত যে একাকী বিরহী পৃথিবীর পাতে-পাতে ;
সহসা হেরিল সেই সে ক্ষণিকা গহন হৃদয়ে-রাজে
বর্ষা-বাদলে শরৎ নিশীথে আলো-ছায়া দিনে-রাতে।

আজ আসিয়াছ হে মোর বন্ধু, চোখে স্বপ্নিল মায়া,
নয়নের 'পরে নয়ন রাখিয়া শুধু তুমি মৃদু হাসো ;
আমি ত বুঝি না সে ভাষা তোমার, শুধু যেন ছায়া ছায়া,
তবু মনে হয় বন্ধুরে তব কতখানি ভালোবাসো।

শ্যামা বসুধার মৃত্তিকা-পথে আমরা দু'জনা যাত্রী,
আলোক-আঁধারে বসন্ত-শীতে অবিরাম দিবা-যামী ;
লভিব আশিস্ জীবন লক্ষ্মীর সুস্মিতা বরদাত্রী,
বিরাম লভিব অসীমের বুকে সুদূর তীর্থ-গামী।

ডাঃ নবগোপাল দাস

আড়ি পেতে অন্যের কথাবার্তা শোনা আমার স্বভাব নয়, কিন্তু নাকের ডগার সামনে কেউ যদি অনর্গল বক্‌তে থাকে তাহ'লে কাণে তুলো দিয়ে ত বসে থাক্‌তে পারিনা !

দাদর ষ্টেশন থেকে রোজ সকাল ন'টায় চার্চগেটগামী ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণটা ধরি। ফার্ষ্টক্লাশ কামরা মাত্র দুটো, ছ'দিনের মধ্যে চারদিনই ঢুকে পড়ি সেই কামরায়—যেখানে দুটি বাঙালী মেয়ে গুজুর গুজুর কর্‌ছে। আপনারা হয়ত ভাব্‌বেন, ওদের লক্ষ্য ক'রেই আমি ওদের কামরায় ঢুকি, কিন্তু আসলে তা' নয়। দাদর ষ্টেশনে যাত্রীদের এমন ভিড় যে কামরা পছন্দ কর্‌বার অবসর কারো থাকে না—ফার্ষ্টক্লাশের টিকিটওয়ালাদের ও নয়। দুটো কামরার যেটা কাছে পাওয়া যায়, সেখানেই লাফিয়ে উঠে পড়্‌তে হয়। কিন্তু, ঐ যা বলেছি, অধিকাংশ দিনই ওদের সহযাত্রী হই আমি।

মুস্কিল হচ্ছে, ওরা জানে না যে আমিও বাঙালী। বহুদিন বম্বের জলহাওয়া খেয়ে আমার চেহারা বোধহয় হয়ে গেছে গুজরাটি বা মহারাষ্ট্রীয়দের মত। তাই ওরা নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে গল্প ক'রে যায় ওদের মাতৃভাষায়, এই বিশ্বাসে যে আর কেউ ওদের কথা বুঝ্‌তে পার্‌বেনা।

এক একবার মনে হয়েছে ওদের জানিয়ে দিই যে আমি বাঙালী, ওদের প্রত্যেকটি কথা আমি যে শুধু শুন্‌তে পাচ্ছি তা নয়, সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গমও কর্‌তে পার্‌ছি। কিন্তু বুকে ব্যাজ্‌ এঁটে নিজের পরিচয় ত প্রচার করতে পারি না। কাজেই মৌনী শ্রোতার পার্ট অভিনয় করা ছাড়া গত্যন্তর কি ?

অবশ্য জানিয়ে দিলেও কোন ফল হ'ত কিনা বলা সন্দেহ, কারণ মুখ বন্ধ করা যেন ওদের স্বভাববহির্ভূত। আমি বাঙালী বলে ওরা যদি ইংরেজিতে আলাপন সুরু করে তাহ'লে ট্রেণের সবাই যে ওদের হাঁড়ির খবর পেয়ে যাবে !···তার চেয়ে এই ভাল, ওদের গোপনতম কাহিনীর শ্রোতা মাত্র একজনই থাকুক।

তাছাড়া, একটা ক'রে দিন কাটে, আর আমার সাধু অভিপ্রায়ও শিথিল হয়ে আসে। কথাবার্তার মাধ্যমে ওদের যতটুকু পরিচয় ইতিমধ্যে পেয়েছি, তারও বেশী জান্‌বার ঔৎসুক্য আমাকে পেয়ে বসে। যেদিন দেখি আমার কামরায় ওরা নেই সেদিন সমস্তই কেমন যেন বেসুরো হয়ে যায়।

একটা বিষয়ে আপনারা আমাকে প্রশংসা না ক'রে পার্‌বেন না। আমার কৌতূহল কোনদিনই শালীনতার সীমা অতিক্রম ক'রে যায়নি। ভুলেও চার্চগেট্‌ ষ্টেশনে নেমে ওদের পশ্চাদ্ধাবন করিনি। আমি সোজা হেঁটে গেছি আমার অফিসের দিকে—ফ্লোরা ফাউণ্টেন্‌এর খুব কাছেই আমার অফিস। আর লক্ষ্য করেছি, ওরা বড় ফটক দিয়ে বেরিয়ে মোড় নিয়েছে ডান দিকে, ম্যারিন্‌-ড্রাইভএর অভিমুখে, আমার গন্তব্যস্থানের সম্পূর্ণ উল্‌টো পথে।

প্রায় একবয়সী ওরা দু'জন, কুড়ি-বাইশের বেশী হবে না। কিন্তু বাহ্যিক মিল ঐখানেই শেষ। যার নাম গৌরী তার নাম হওয়া উচিত ছিল শ্যামা, রসিকতা করে বাবা মা গৌরী নাম রেখেছিলেন কি না কে জানে ? তবে একটা কথা স্বীকার কর্‌তেই হবে যে রং কালো হলেও গৌরী সুশ্রী, যে কোন পুরুষ মানুষকে আকর্ষণ কর্‌তে পারে। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। ভয়েলের শাড়ীটা আঁটসাঁটভাবে জড়ানো, যাতে তার অঙ্গ সৌষ্ঠব সহজেই নজরে আসে। বম্বের মেয়েদের নতুনতম ষ্টাইলে খোঁপা বাঁধা, কিন্তু চোলির নীচে কটিদেশ দেখাবার প্রয়াস নেই। বোধহয় গায়ের কালো রংটা প্রয়োজনাতিরিক্ত লোকের সামনে প্রদর্শন করাতে অনিচ্ছা।

আর তার সঙ্গিনী নন্দিতা ধপধপে ফর্সা, বাঙালীদের মধ্যে সচরাচর এরকম উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখা যায় না, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বেঁটে, মোটা, বয়সের তুলনায় অনেক বেশী বুড়ুটে দেখা যায়। সেও জামা কাপড় ষ্টাইল মাফিক পরে, কেশ বিন্যাসে আধুনিকতার অভাব নেই, কিন্তু কোনটাই যেন মানানসই মনে হয় না!

আমার কেবলই মনে হয়েছে, ভগবানের কি অদ্ভুত বিচার! নন্দিতার রংটা গৌরীকে দিলে, আর গৌরীর রংটা নন্দিতার মধ্যে প্রতিফলিত করা সম্ভব হলে, ওরা দুজনেই হয়ে উঠ্‌ত অতুলনীয়া—একজন রূপের সর্ব্বোচ্চ শিখরে, আরেকজন তার নিম্নতম সোপানে!

ওদের কথাবার্তার মাঝখান থেকে জান্‌তে পেরেছিলাম, নন্দিতা কাজ করে একটা বিদেশী এয়ারলাইন্‌স্‌এর অফিসে, রিসেপ্‌শনিষ্ট হিসেবে। আর গৌরীর গন্তব্যস্থান হচ্ছে একটা দিশি কোম্পানি।

ফেরার পথে কোনদিনই ওদের দেখা পাইনি। ওরা নিশ্চয়ই একসঙ্গে ফেরে, কিন্তু আমাকে অফিসে থাকতে হয় সাতটা অবধি। ওদের বোধহয় সাড়ে পাঁচটায় ছুটি।

একটা বিষয় আমার খুবই আশ্চর্য্য লেগেছিল। কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ওদের পরিবারের কথা কখনও জান্‌তে পারিনি। ওদের যেন মা-বাবা ভাই-বোন্ কেউই নেই। বিয়ে যে হয়নি তা অবশ্য আঁচ করে নিয়েছিলাম, এবং তার প্রমাণও পেয়েছিলাম ওদেরই কথোপকথনে।

অবশ্য বম্বেতে এরকম ওয়ার্কিং গার্লস্‌এর অভাব নেই, কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে এর রেয়াজ এখনও কম। তাই অনুসন্ধিৎসা মাঝে মাঝে আমাকে পেয়ে বসত।

কিন্তু ঐ অভীপ্সা পর্যন্তই। ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করবার মত সাহস কোনদিনও সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। সাহসের অভাবের আরেকটা কারণও ছিল। আমি বিবাহিত—শুধু বিবাহিত নই, ছেলের বাবা।

গৃহিণীকে গৌরী-নন্দিতার কাহিনী বলি বলি করেও বলা হয়নি। অবচেতন মনে হয়ত ভয় ছিল। বল্‌লে ট্রেণে চার্চগেট্‌-এ না গিয়ে বাসে যাবার হুকুম হবে। অন্যথায় গৃহিণী হয়ত ইচ্ছে করেই আমার ব্রেকফাষ্টটা পাঁচ দশ মিনিট দেরীতে নিয়ে আসবেন, যাতে কোন প্রলোভনের সম্মুখীন আমাকে হ'তে না হয়।

তিন মাস এইভাবে কেটে গেছে। গৌরী-নন্দিতা আমার জীবনের অপরিহার্য্য একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কামরায় উঠে যেদিনই দেখি ওরা দু'জনে নিৰ্দ্দিষ্ট কোণটিতে বসে রয়েছে, চুম্বকের আকর্ষণে এগিয়ে যাই ওদের কাছে, ওদের অজ্ঞাতে শুন্‌তে চেষ্টা করি ওদের টুক্‌রো টুক্‌রো কথা।

উৎকর্ণ হয়ে উঠ্‌লাম—যখন শুন্‌লাম ওরা কে একজন পরিতোষ ভৌমিক সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌ছে।

আমাদের পরিতোষ ভৌমিক নয় ত?…ঠিক বুঝতে পার্‌লাম না প্রথম দিন।

দিন দুই পরে সন্দেহ রইল না, আমাদেরই পরিতোষ বটে।

কথা বল্‌ছিল নন্দিতা।

—আমি জানি পরিতোষবাবুর তোকেই পছন্দ, গৌরী। তুই কেন যে ভদ্রলোককে মোটেই আমল দিস্‌না বুঝতে পারি না।

একটু হেসে গৌরী জবাব দিল, পরিতোষকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি নন্দিতা। বম্বেতে না হয় নতুন এসেছে, আমি ওকে জানি কলকাতা থেকে। ও আমার টাইপ নয়।

নন্দিতা রাগ করল। বল্‌ল, আসল কথা পরিতোষবাবুর গায়ে-পড়া স্বভাবটা তোর ভাল লাগে না। কিন্তু ভদ্রলোকের উপায় কি? গায়ে এসে না পড়লে তোর নাগাল পাওয়া যে মুস্কিল। আর কতদিন কৃপারাম শেঠএর তাঁবেদারি কর্‌বি? পরিতোষবাবুকে বল—তোর আপত্তি নেই!

—পাগল হয়েছিস্ নাকি, নন্দিতা? বিয়ে কর্‌লে চাকুরীটা খোয়াতে হবে যে! তারপর স্বামী-দেবতা একদিন যখন হাঁপিয়ে উঠ্‌বেন তখন আমাকে চাকুরী কে দেবে?

—ভারী ত চাকুরী!…ঠোঁট উল্‌টিয়ে মন্তব্য কর্‌ল নন্দিতা।…মাত্র আড়াইশ টাকা মাইনে, এ রকম চাকুরী তুই যে কোন দিন জোগাড় কর্‌তে পারবি। তা ছাড়া, চাকুরীর কথা ভাবছিস কেন, পরিতোষবাবু রোজগার ত কম করেন না, একটা স্ত্রী কেন, দু'তিনটে স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

—তুই বুঝবিনা আমার সমস্যা কোথায়। আমি ত তোর মত অনর্গল ইংরেজি বলতে পারি না যে বিলিতি এয়ারলাইনস্ কোম্পানীর বড় সাহেব নেমতন্ন ক'রে পাঁচশ-টাকার চাকুরী দেবেন!

খোঁচাটা গায়ে মাখল না নন্দিতা। বলল, আমি কিন্তু পরিতোষবাবুকে বলব,' সাহস করে প্রস্তাবটা ক'রে ফেলেন। তখন আশা করি তোর সন্দেহ বা ভয় থাকবে না।

—দোহাই তোর, ঘটকালি করিস্ না।···গৌরী বলল।···তোর যদি পরিতোষকে এত পছন্দ, তাহ'লে তুই-ই ওকে বিয়ে কর না!

—কি যে বলিস্ তুই, গৌরী! আমি ত অনেক আগেই বলেছি, বিয়ে আমি কখখনো করব না।

—বিয়ে করবিই একদিন, তবে দিশী লোককে নয়। তোর মন পড়ে আছে সেই ছোকরাটার উপর, জনসন্ না কি নাম বলেছিলি! তা তোদের মানাবে ভাল, ইংরেজিতে প্রেমালাপ করতে পারবি।

এর উত্তরে নন্দিতা কি যেন বলল, আমি শুনতে পেলাম না। ততক্ষণে চার্চগেট ষ্টেশনে গাড়ী এসে থেমেছে।

পরিতোষের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব গভীর নয়, অনেকটা মুখচেনা বলা যেতে পারে। তবে, বম্বেতে যে বাঙালী-গোষ্ঠীর মধ্যে আমি চল-ফেরা করি তারই অন্যতম সদস্য সে। সেও বম্বেতে এসেছে ভাগ্যান্বেষণে। বম্বের পথে-ঘাটে নাকি অগুনতি টাকা ছড়িয়ে রয়েছে। একটু বুদ্ধি খরচ করে কুড়িয়ে নিলেই হয়। পরিতোষ ভৌমিক এই ছ' বছরের মধ্যেই একজন গুজরাটি ব্যবসায়ীর পার্টনার হয়ে মাসে প্রায় হাজারখানেক টাকা রোজগার করছে।

কিন্তু যতদূর জানি, পরিতোষ বিবাহিত, দেশে তার স্ত্রী রয়েছে। কি মতলবে সে গৌরী-নন্দিতার পিছু নিয়েছে? ওদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছে ওরা পরিতোষের পূর্ব ইতিহাস কিছুই জানে না! অথচ উপযাচক হয়ে ওদের জানিয়ে দিইবা কি ক'রে?

জানিয়ে দেবার প্রয়োজন হ'ল না, কারণ এর পরের হপ্তায় গৌরী-নন্দিতার যে কথোপকথন শুনতে পেলাম, তাতে বুঝলাম পরিতোষের ইতিবৃত্ত তারা জানতে পেরেছে।

অনুতপ্ত মুখে নন্দিতা বলছিল, আমাকে মাপ করিস্ ভাই। পরিতোষবাবুর স্ত্রী যে বেঁচে আছেন জানতাম না। জানলে কি আর তোকে এ রকম পীড়াপীড়ি করি?

—আমি কিন্তু জানতাম।···গৌরী বলল।

—তবু আমাকে বলিস্‌নি!···অবাক্ হয়ে গেল নন্দিতা।···ধর, আমিই যদি ওকে বিয়ে ক'রে বসতাম!

—আমি শুধু দেখবার অপেক্ষায় ছিলাম পরিতোষের এই অভিনয় কতদূর গড়ায়। প্রয়োজন হলে শেষ মুহূর্তে ওর কবল থেকে তোকে নিশ্চয়ই রক্ষা করতাম।···কিন্তু পরিতোষের আগের স্ত্রীর কথা তুই কি করে জানলি?

লজ্জিতভাবে নন্দিতা জবাব দিল। এখন তোকে বলতে বাধা নেই। পরিতোষবাবু সত্যি সত্যি আমার পিছু নিয়েছিলেন, আমিও ভাবতে সুরু করেছিলাম। ওকে বিয়ে করলে কেমন হয়, বিশেষ করে যখন দেখলাম তোর দিক থেকে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিস্ যে তোর ক্ষতি করে আমার ভাল আমি কখনও চাইব না।···হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। পরিতোষ-বাবু একদিন আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সিনেমায়, সিনেমার পর নটরাজ হোটেলে ডিনারে।·সেখানে হঠাৎ ভদ্রলোকের এক বন্ধু আমাদের টেবিলে এসে হাজির। আমাকে দেখে বললেন, আরে, মিসেস্ ভৌমিক যে, আপনি কবে বম্বেতে এলেন? বম্বের হাওয়া গায়ে লেগেছে দেখছি। আপনাকে যে চেনাই যায়না!···পরিতোষবাবু ত হতভম্ব। আমি আরও বেশী।···একটু পরেই বুঝতে পারলাম পরিতোষবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আমার খানিকটা সাদৃশ্য নিশ্চয়ই রয়েছে। যার ফলে ভদ্রলোক আমাকে তারসঙ্গে ভুল ক'রে বসেছেন!···পরিতোষবাবু আমতা আমতা ক'রে কি যে বললেন তার কোন মাথামুণ্ডু হয়না। তাঁর বন্ধুটিও লজ্জিত। অপ্রতিভ হয়ে অন্য টেবিলে চলে গেলেন। ···পরিতোষবাবুকে তখন বাধ্য হয়ে স্বীকার করতেই হ'ল যে তাঁর স্ত্রী বর্তমান, তবে বহুদিন তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।···আমি বললাম, আপনি রয়েছেন বম্বেতে, উনি কলকাতায়, সম্পর্ক থাকবে কি ক'রে?

—আশা করি টেবিল ছেড়ে তুই উঠে এসেছিলি?

—এত বোকা আমাকে পাস্‌নি। ডিনারটা খুব আরাম করেই খেলাম। তারপর পরিতোষবাবুকে বল্‌লাম, চার্চগেট ষ্টেশনে আমাকে নামিয়ে দিতে। যথাযথ ধন্যবাদ দিয়ে সোজা ট্রেণে উঠে পড়্‌লাম।

—তারপর ?

—তারপর আর কি? তারপর ইতি পরিতোষ-ভৌমিক-সংবাদ।

—তোর সাহস আছে, নন্দিতা। আমি কিন্তু ঐ অবস্থায় পরিতোষের সঙ্গে বসে ডিনার খেতে পারতাম না।

—বাঃ রে, খিদেয় আমার নাড়ী চুইয়ে যাচ্ছিল, ওয়েটার অর্ডার নিয়ে গেছে। উঠে এলে লাভটা কার হত ?

—বাহাত্তর মেয়ে বটে তুই !···গৌরী বল্‌ল।

—এর মধ্যে বাহাদুরির কি আছে ?···হাস্‌তে হাসতে জবাব দিল নন্দিতা।

মাসখানেক পরের কথা। আমি তিন হপ্তার ছুটি নিয়ে পূজায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। গৌরী নন্দিতাদের সঙ্গলাভ থেকে বঞ্চিত ছিলাম এ কয়দিন।

দাদর ষ্টেশনে যথারীতি ট্রেণ যখন ধরলাম তখন দেখি, নির্দ্দিষ্ট কোনটিতে নন্দিতা বসে রয়েছে, একা।

গৌরীর কি হ'ল ? অসুখ করেনি ত ? অথবা আমার মত সেও কি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বম্বের বাইরে কোথাও গিয়েছে ? নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা মনের মধ্যে ভীড় ক'রে দাঁড়াল, কিন্তু এগিয়ে নন্দিতাকে প্রশ্ন কর্‌বার মত সাহস সঞ্চয় কর্‌তে পার্‌লাম না।

আরও কয়েকদিন এইভাবে কাটল। দেখলাম, নন্দিতা একাই যাতায়াত কর্‌ছে, গৌরীর কোন দেখা নেই !

রহস্যের খানিকটা সমাধান হ'ল খবরের কাগজের বিবাহবিজ্ঞপ্তির স্তম্ভের একটি সংবাদে। দু'দিন আগে মিস্ গৌরী অধিকারীর বিয়ে হয়েছে কে একজন ফ্রাঙ্ক ডি জন্‌সনের সঙ্গে।

জনসন ? জন্‌সন্ ? নামটা যেন পরিচিত মনে হচ্ছে !

চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল গৌরী-নন্দিতার কথোপকথন। গৌরীই না ঠাট্টা করে বলেছিল, নন্দিতার মন পড়ে আছে জনসন নামে কোন একটি বিদেশীর দিকে !··· আর সেই জনসনের বিয়ে হ'ল গৌরীর সঙ্গে !

স্থির কর্‌লাম, নন্দিতার সঙ্গে আলাপ কর্‌ব। হাজার হোক্ আমি বাঙালী, আমার কাছে সব কথা খুলে বল্‌তে নিশ্চয়ই তার আপত্তি হবে না।

কিন্তু আমার অভিলাষ পূর্ণ হবার নয়। নন্দিতারও দেখা নেই। একদিন গেল, দু'দিন গেল, একহপ্তা কাট্‌ল। অবশেষে অফিস কামাই করে মরিয়া হয়ে আমি গেলাম সেই এয়ারলাইনস্ অফিসে যেখানে নন্দিতা রিসেপ্‌সনিষ্ট-এর কাজ করে।

গিয়ে দেখি রিসেপ্‌সনিষ্ট-এর আসনে একজন পার্শী তরুণী বসে রয়েছে। আশেপাশে কোথাও নন্দিতা নেই।

হতাশ হয়ে ফিরে আস্‌ছি, এমন সময় এয়ারলাইনস্-এরই একজন অফিসার এগিয়ে এল আমার দিকে। প্রশ্ন করল, আপনি কি মিস্ চ্যাটার্জির খোঁজে এসেছিলেন ?

অকূলে কূল পেলাম যেন। ঢোঁক গিলে জবাব দিলাম, হ্যাঁ।

—তিনি ত চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন।

—চলে গেছেন ? কোথায় ?

—যতদূর জানি, কল্‌কাতায়।···ওঁর বিয়ে হচ্ছে।

—তাই নাকি ? কার সঙ্গে ?

—কে একজন মিঃ ভৌমিকের সঙ্গে। ওঁর দেশেরই লোক।

সংবাদটা বিশ্বাস কর্‌তে পারছিলাম না। টল্‌তে টল্‌তে বাইরে চলে এলাম। অফিসে এসেই পরিতোষ ভৌমিকের পার্টনারকে টেলিফোন কর্‌লাম, জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, ভৌমিকের খবর তিনি রাখেন কি না।

অপর প্রান্ত থেকে জবাব এল, নিশ্চয়ই রাখি। কল্‌কাতায় আমরা একটা অফিস খুলেছি, মিঃ ভৌমিক সেই অফিসের চার্জ নিতে চলে গেছেন।

—উনি কি বিয়ে কর্‌ছেন ?

—বিয়ে ? তা ত জানি না! তবে, হাঁা, এক বাঙালী মেয়েকে নিয়ে তিনি প্রায়ই সিনেমা-থিয়েটার রেস্তঁরায় যেতেন, ভারী স্মার্ট মেয়ে।···আপনি মিঃ ভৌমিকের কল্‌কাতার ঠিকানাটা চান্ ? বল্‌ছি, লিখে নিন্।

পরিতোষের কল্‌কাতার ঠিকানা লিখে নিয়েছি, কিন্তু ওর কাছে চিঠি লিখবার স্পৃহা আমার নেই। তবু ঠিকানাটা সযত্নে রেখে দিয়েছি, কারণ কল্‌কাতায় যখন যাব নন্দিতার খোঁজ নিশ্চয়ই করব।

আর গৌরী? সে এখন মিসেস্ জন্‌সন্। গায়ের রং কালো হ'লে কি হয়, জিতেছে সেই। জন্‌সনের দেওয়া আংটি পেয়ে তার মনের ক্ষোভ নিশ্চয়ই ঘুচে গিয়েছে।

বৃন্দার দূতিয়ালি

শ্রীকালিদাস রায়

ওগো মহারাজ, কুলশীল লাজ
সকলি ত্যজিল যে হতভাগী
শঠচূড়ামণি, তোমার লাগি,
তার কথা কিছু পড়ে কি মনে?
পড়ে কি হে মনে নব যৌবনে
যে লীলা করিলে তাহার সনে?
সরলা অবলা অখলা বালারে
ভুলাইলে ব্যাধ, বাঁশীর তানে,
বনের মৃগীরে মৃগয়া করিলে বিষের বাণে।
মরেছে সে মৃগী আপদ গিয়াছে তাহাই ভাবি
মনে করিতেছ মিটিয়া গিয়াছে
ব্রজের সকল ঋণের দাবি।
মরেনি সে মৃগী এখনো তাহার জীবন আছে
দশমী দশায় এখনো আশায় আশায় বাঁচে।
যম ভগিনীর ব্রজধাম তীর
বুঝি ইহলোক মানব ভূমি,
পরপার তার বুঝি পরলোক
যেথানে আজিকে এসেছ তুমি।
সব স্মৃতি তব লুপ্ত করেছে খেয়ার-তরী,
তোমার কোমল মানব-হৃদয়
খেয়াঘাটে বুঝি রয়েছে পড়ি?
অথবা তোমার নূতন জন্ম হয়েছে আজ,
পুরা জনমের সব কথা তুমি
ভুলিয়া গিয়াছ মথুরা রাজ।
আজিকে বসেছ সিংহাসনে,
গোয়ালের ঘরে মানুষ হয়েছ বৃন্দাবনে,
চরায়েছ ধেনু পাঁচনি ধরি
লজ্জা কি পাও সে কথা স্মরি?
নব যৌবনে তৃষার তাড়নে পিয়েছ বারি
পর কামিনীর হৃদয় কুম্ভ সবলে কাড়ি।
ব্রজের ননীর গন্ধ এখনো তোমার গায়ে
ব্রজের গোঠের কুশাঙ্কুরের
ক্ষতের চিহ্ন তোমার পায়ে।
কারে দাসখৎ লিখে দিয়েছিলে
'রব চিরদিন তোমার দাসই?'
লিখিলে স্বনাম পায়ে আলতায়
নাপতিনী-বেশে মিলিতে আসি।
লাজে বুঝি আজ নিরীহ সাজিছ
হে মহারাজ,
লজ্জা কি তাতে কে না জানে বলো
তুমি নিলাজ।
কাকুতি-মিনতি করিতে আসিনি
হাতজোড় ক'রে জানাতে ব্যথা।
মানুষ হও তো ভাবিয়া দেখিবে
'অমানুষ হলে পৃথক কথা'।
বলে কেউ কেউ শুনি তুমি বুঝি মানুষ নহ।
মানুষের মত নয় আচরণ,
মানুষের দেহ কেন বা বহ?
কার কাছে আর করিব নালিশ
আসামী হয়েছ বিচারপতি।
তোমার বিচার তুমিই করিবে
সত্যই যদি হয় সুমতি।

উপনিষদে মায়াবাদ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামনীষী শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের সহিত আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত। তাঁর প্রচারিত দর্শনকে আমরা অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ বলে জানি। তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেছে। মায়াবাদ বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে—এ হল সেই দার্শনিক-তত্ত্ব যা প্রচার করে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।'

কিন্তু শঙ্করাচার্য যে মায়াবাদ প্রচার করে গেছেন এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার সঠিক পরিচয় দেয় না। তিনি ঠিক এমন কথা বলেন না যে আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয় বহু বস্তু সমন্বিত বৈচিত্র্যময় যে জগতের পরিচয় এনে দেয় তা মিথ্যা। তিনি বরং বলেন যে তাও সত্য, তাও ব্রহ্মতেই অধিষ্ঠিত। তবে তাকে দেখার ভুলে আমরা বহু ও বিচিত্ররূপে দেখি। জগত মিথ্যা নয়, ব্রহ্ম ও জগত একই, তবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জগত সম্বন্ধে ঠিক পরিচয় আমাদের এনে দেয় না।

কথাটা বোঝা শক্ত হয়ে পড়ছে। অন্যভাবে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। বিশ্ব কি বহু বিশ্লিষ্ট সম্পর্কহীন বস্তুর সমষ্টি, না একই সত্তার প্রকাশ? এটি হল দর্শনের একটি মূল সমস্যা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে—বিশ্ব অসংখ্য বিশ্লিষ্ট বিক্ষিপ্ত বস্তুর সমষ্টি মাত্র। আমাদের দেশে বৈশেষিক দর্শনের স্থাপয়িতা কণাদ তাই বলেছিলেন। তিনি বহু কণার সমষ্টির ভিত্তিতে বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর দর্শনকে কণাবাদ বলা যায়। গ্রীস দেশের দার্শনিক ডিমক্রাইটসও একঅনুরূপ মত পোষণ করিতেন। তাঁর মতে বহু বিশ্লিষ্ট অণুর সমষ্টি নিয়ে বিশ্ব রচিত।

কিন্তু মানুষের জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লক্ষ্য করেছে যে বিশ্বে ঠিক বিশ্লিষ্ট নানা বস্তুর সমাবেশ নাই। যাকে বহু'ও বিচিত্ররূপে আপাতদৃষ্টিতে দেখি তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য শৃঙ্খলা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্যধারা লক্ষ্য করা যায়। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দার্শনিক চিন্তা-ধারা এক নূতন পথে যায়। ফলে একটি নূতন তত্ত্বের জন্ম হয়—যা বলে বিশ্ব বহুকে নিয়ে এক। বিশ্ব সরলভাবে একক বস্তু নয়, তা জটিলভাবে এক। তার মধ্যে বিভাগ আছে কিন্তু সেই বিভাগ-গুলির মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। তাহাদের বহুত্বকে খণ্ডন ক'রে একত্ব প্রকট।

শঙ্কর এই দুটি দার্শনিক মতের কোনটিকেই গ্রহণ করতে পারেন নি। বহুবাদকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ত বটেই, এমন কি বহু বিশিষ্ট জটিল একবাদকেও তিনি স্বীকার করবেন না। তাঁর মতে বিশ্ব একটি অখণ্ড সত্তাস্বরূপ। তার মধ্যে বহুর স্থান নাই। তার মধ্যে বিভাগের অবকাশ নাই। তাকে তিনি ব্রহ্মন্ বা আত্মন্ বলেছেন। তার প্রকৃতি হল চেতনা রূপ। তাই তাকে তিনি 'নির্বিশেষ চিন্মাত্রম্' বলেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, তার প্রকৃতি চিন্ময়, যেমন লবণ খণ্ডের প্রকৃতি লবণের আস্বাদময়।" সাধারণ ক্ষেত্রে চিৎশক্তি-বিশিষ্ট সত্তার চিৎশক্তি প্রকাশ হয় জ্ঞাতা জ্ঞাতের সম্পর্কের ভিত্তিতে। জানবার বস্তু একটা থাকবেই, তবেই ত চিৎশক্তিবিশিষ্ট সত্তার প্রকাশ প্রকট হবে। জানবার বস্তু কিছু না থাকলে আমার মন মানবে কি? কিন্তু তাঁর মতে ব্রহ্ম সম্পর্কে এ কথা খাটে না। জ্ঞেয় বস্তু থাক বা না থাক এই চিৎশক্তি নিত্য বিরাজমান। তিনি বলেন—মহাশূন্যে কিরণ গ্রহণ করবার জন্য বস্তু থাক বা নাই থাক সূর্য যেমন কিরণ বর্ষণকরে, ব্রহ্মের সেই রকম জ্ঞাতৃরূপ নিত্যপ্রকট। তিনি জ্ঞেয় বিহীন জ্ঞাতৃগুণ-বিশিষ্ট সত্তা।

যিনি চিন্ময় ও অবিভাজ্য রূপে একক সত্তা, তাঁকে তবে কেন আমরা বহু, বিভিন্ন ও বিচিত্ররূপে দেখি? তিনি বলেন তার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি খানিক পরিমাণ দায়ী। তারা তাঁর যে পরিচয় আমাদের এনে দেয় তা ভুল পরিচয়। যার বাস্তব কোনো ভিত্তি নাই, যা সম্পূর্ণ অলীক—অথচ যা দেখি তাকে আমরা ভ্রান্তি বলতে পারি। যার বাস্তব ভিত্তি আছে অথচ আমরা যাকে তার প্রকৃত রূপ হতে ভিন্ন আকারে দেখি তাকে আমরা মায়া বা মতিভ্রম বলি। স্বপ্নে যা দেখি তা প্রথমটির উদাহরণ, তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নাই। মরুভূমির তপ্ত বালুস্তরে আমরা জল দেখি। তাকে বলে মরীচিকা—এটি মতিভ্রমের উদাহরণ। তপ্ত বালুস্তরের উপরের বায়ু কাঁপে। তার সেই কম্পনকে আমরা জলের আকারে দেখি। তা ভ্রান্তি নয়, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়, তা হলে তাকে কেবল তপ্ত বালুর উপর না দেখে যেখানে সেখানে দেখতাম। শঙ্করের মতে যা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এক, তাকে যে আমরা বহুরূপে দেখি তা ও মতিভ্রমের মত জিনিষ। তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়, তা মিথ্যা নয়, তা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা তার অপব্যাখ্যা করি। যেমন সব বায়ুস্তরের কম্পনকে আমরা মরীচিকা বলে ভুল করি।

কেন এমন দেখি? তারও তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন

এখানে একটি বিশেষ শক্তি ক্রিয়া করে, তাই নিরবচ্ছিন্নভাবে একরূপী ব্রহ্মকে বহুরূপে বিকৃত বা বিবর্তিত করে। বালুর তাপ যেমন বায়ুস্তরের কম্পনকে বিবর্তিত ক'রে মরীচিকার রূপদেয়, একটা সোজা লাঠির খানিক অংশ জলে ডুবিয়ে রাখলে তাকে বাঁকা দেখাবে। এখানে জলের সূর্য্য-কিরণকে আংশিকভাবে বিকৃত করার শক্তি তার রূপকে বিকৃত করে। জলের বিক্ষিপ্ত করবার শক্তি এখানে আমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটায়। অপ-ব্যাখ্যাই এই প্রাপ্ত উপলব্ধির কারণ। যে শক্তি একক মাত্রাকে বহু-রূপে বিকৃত করে তাকে তিনি মায়া বলেছেন।

শঙ্কর-প্রচারিত এই মায়াবাদ বিশ্বের একটি বিশিষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব। তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি, তাৎপর্য্যপূর্ণ যুক্তিপ্রয়োগ এবং স্বচ্ছ সুস্পষ্ট ভাষা—তাঁর নৈসর্গিকমনীষার পরিচয় দেয়। এমন বিশিষ্ট দার্শনিকের হাতে যার প্রতিষ্ঠা, সেই মায়াবাদ দর্শন কিন্তু সোজা-সুজি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। তাঁর নিজের ধারণা এই যে তার উৎপত্তি তিনি আবিষ্কার করেছেন উপনিষদের বচন হতে। উপনিষদের দর্শনকে একটি সমগ্র রূপ দেবার জন্য মহর্ষি বদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। শঙ্করাচার্য্য এই উপনিষদগুলির এবং তথা ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য লেখেন। এই ভাষ্যগুলির মাধ্যমেই তিনি মায়াবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাজেই পরোক্ষভাবে ভাষ্যের মধ্যে তার জন্ম। উপনিষদে প্রচারিত দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে তাকে তিনি প্রবর্তিত করেন।

এখন প্রাচীন উপনিষদগুলি মায়াবাদ সমর্থন করে কিনা, এ নিয়ে বিশেষ বিতর্ক আছে। অনেক মনীষী স্বীকার করতে প্রস্তুত নন যে সমর্থন করে বাংলার শ্রীচৈতন্যদেব তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে কেমন ক'রে মায়াবাদ সম্পর্কে বিতর্কে তিনি জড়িয়ে পড়েন। একবার এক মায়াবাদে বিশ্বাসী পণ্ডিতের দল তাঁর ভক্তিরসামৃত প্রচারের নিন্দা করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, তা বেদান্তের পরিপন্থী। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে তাঁদের বিতর্ক হয়েছিল। এই বিতর্কের বিষয় ছিল—প্রাচীন উপনিষদগুলি মায়াবাদের সমর্থন করে কিনা। শ্রীচৈতন্যের মতে তা করে না ; তিনি এই সম্পর্কে এই অনুযোগও করেছেন যে শঙ্করাচার্য্য তাঁর ভাষ্যে উপনিষদের ঠিক ব্যাখ্যা করেন নি।

এই অনুযোগের কি সত্যই কোনো ভিত্তি আছে ? বর্ত্তমান প্রবন্ধের সেইটিই অনুসন্ধানের বিষয়। এ সম্পর্কে মায়াবাদের দোষগুণ বিচারের কোনো প্রয়োজন নাই। এখানে প্রশ্নটি একটু স্বতন্ত্র। প্রশ্ন হল প্রাচীন উপনিষদ মায়াবাদকে সমর্থন করে কিনা। আমরা কেবলমাত্র এই প্রশ্নটির জবাব দিতে চেষ্টা করব।

উপনিষদে প্রত্যক্ষভাবে মায়াবাদের সমর্থক কোনো বাণী পাওয়া যায় না। তবে পরোক্ষ ভাবে মায়াবাদের সমর্থক কিছু বাণী পাওয়া যায়। নীচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে নারদ ও সনৎকুমার ঋষির গল্প আছে। নারদ সেখানে তাঁর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার্থী হ'য়ে এসেছেন। সেই প্রসঙ্গে সনৎকুমার এই উক্তিটি করেছেন।

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা অথ যাত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্ বিজানাতি,তদল্পম ॥৭ ২৪।১

যেখানে অন্যে দেখে না অন্যে শ্রবণ করে না অন্যে জানে না, তাই ভূমা, আর যেখানে অন্যে দেখে, অন্যে শ্রবণ করে, অন্যে জানে তাই অল্প।

অনুভূতিকে সম্ভব করতে হলে দুটি বিভিন্নধর্ম্মী সত্তার প্রয়োজন। একটি জানবার ক্ষমতা রাখে এবং অন্যটি তার জ্ঞানের বস্তু হবার ক্ষমতা রাখে। এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্বন্ধের ভিত্তিতেই বহু ও বিচিত্র বস্তুর সৃষ্টি এই বিশ্ব প্রকট হয়। যেখানে এই দ্বৈত বোধ নাই সেখানে এই বিচিত্র বিশ্বের প্রকাশ নাই, দ্বৈতের ভিত্তিতে যা প্রকাশ তার সীমা আছে, কারণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পরের সীমা টেনে দেয়। দ্বৈতের বাহিরে যা প্রকাশ তা সীমাহীন। তাই তা ভূমা। এখানে দ্বৈতের ভিত্তিতে যে প্রকাশ তা যে মিথ্যা, সে কথা বলা হয় নি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে কিন্তু সে কথা বলা হয়েছে। সেখানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে এই কথাগুলিই একটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। তা এইরূপ :

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি ইতর ইতরং পশ্যতি ইতর ইতরং শৃণোতি...যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈ বা ভূৎ তৎ কেন জিঘ্রেৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং শৃণুয়াৎ......বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ॥ ২॥৪॥১৪

যেখানে দ্বৈতের মত হয় সেখানে একজন অপরকে আঘ্রাণ করে, এক জন অপরকে দেখে, একজন অপরকে শোনে, কিন্তু যেখানে আত্মা ভিন্ন আর কিছু যেখানে থাকে না সেখানে কে কাকে আঘ্রাণ করবে, কে কাকে দেখবে, কে কাকে শুনবে, বিজ্ঞাতাকে কে জানবে ?

এখানে দ্বৈতমিব' কথাটির তাৎপর্য্য খুব গভীর। দুয়ের মত হয়, বলতে মনে হয় যেন যাজ্ঞবল্ক্য বলতে চেয়েছেন দ্বৈত ভাবটা ব্রহ্মের প্রকৃত ভাব নয়, তা একটি কৃত্রিম অবস্থার মত। তা যদি হয় তা হলে দ্বৈত বোধের ভিত্তিতে ব্রহ্মের যে বহুধারা খণ্ডিত ও বৈচিত্র্যে বিশেষরূপের পরিচয় আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় তা যেন ব্রহ্মের ঠিক রূপটি প্রকাশ করে না। শুধু তাই নয়, দ্বৈতহীন অবস্থায় ব্রহ্মের যে রূপটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাকে তিনি 'বিজ্ঞাতা' বলে বর্ণনা করেছেন। তা হলে বিশ্লেষণ করলে তাঁর বচনগুলির মধ্যে ব্রহ্মের প্রকৃতরূপের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাই। প্রথম, তিনি অখণ্ডভাবে এক, জ্ঞানও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে বহু ও নানা ধারা খণ্ডিত জাতি তাঁর প্রকৃতি পরিচয় নয়। দ্বিতীয়, তাঁর যা অখণ্ডরূপ তা জ্ঞাতৃরূপী।

এই বাণীগুলির মধ্যেই শঙ্করের মায়াবাদের সহিত অনেকখানি মিল পাওয়া যায়। মায়াবাদের দুটি বৈশিষ্ট্যের এখানে সমর্থন আছে—ব্রহ্মের অখণ্ডতা ও চিন্ময়তা। বাকি যে বৈশিষ্ট্যটুকু রইল ইন্দ্রিয়-গোচর বিশ্বের যে বৈচিত্র্যময় প্রকাশ তার অসারতায় এ যেন পরোক্ষ-ভাবে সমর্থন জুটে যায় আংশিকভাবে 'দ্বৈতমিব' উক্তিটির মধ্যে।

অপর পক্ষে উপনিষদের বচনগুলির মধ্যে এমন একটি ভাবধারা পাওয়া যায় যা ইন্দ্রিয়গোচর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের বিচিত্র জগতকে

ব্রহ্মের প্রকৃত প্রকাশ বলেই গ্রহণ করা হয়েছে। তা যে ব্যাখ্যার ভুল, বা ভ্রান্ত ধারণা বা ব্রহ্মের অপ্রকৃতরূপ, এ ধরণের কোন ইঙ্গিত করা হয় নি। নীচে উদ্ধৃত উপনিষদের বাণীগুলি এই উক্তিকে সমর্থন করবে।

ঈশ উপনিষদের প্রারম্ভেই বহু ও নানা দ্বারা খণ্ডিত জগতকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের প্রকাশ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। "ইশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিং চ জগত্যাং জগত।" বিশ্বে যে কিছু—সসীম বস্তু দেখি সবই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্ম। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি" তা বলে। এই যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মেই তাদের জন্ম, ব্রহ্মেই তাদের স্থিতি ব্রহ্মেই তাদের লয়। বহু ও বিভিন্ন বস্তুর জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুকে জড়িয়ে নিয়ে ব্রহ্মকে পাই। এখানে খণ্ডকে অস্বীকার করা হয় নি, তাকে খণ্ড রূপেই ব্রহ্মের কোলে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

এই বাণীরই প্রতিধ্বনি আর ও একাধিক উপনিষদের বচনের মধ্যে পাওয়া যায়। সেখানে বহুকে বাদ দিয়ে নয়, বহুকে জড়িয়ে সর্ব্বব্যাপী সত্তা রূপেই ব্রহ্মকে দর্শনা করা হয়েছে। 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাই। সব জড়িয়ে, সব কিছু ব্যাপ্ত ক'রে আছেন বলেই ত তিনি ব্রহ্ম। তাদের কয়েকটি বচন এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যই বলেছেন—"ইদং ব্রাহ্মণং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানি ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।" এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই বিভিন্ন লোক, এই দেবতারা, এই বিভিন্ন জীব, এই সব কিছুই সেই আত্মা বা ব্রহ্ম। বহুর মধ্যে বহুকে জড়িয়ে নিয়েই ব্রহ্ম বিরাজমান।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তাঁকে সর্ব্ব বস্তুতে বিরাজমান দেবতা বলে প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে। যো দেবো হগ্নৌ যোহপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈদেবায় নমো নমঃ।" যে দেবতা অগ্নিতে, জলে, ওষধি ও বনস্পতিতে বিরাজমান, যিনি সমগ্র বিশ্বের অভ্যন্তরে বিরাজমান তাঁকে প্রণাম জানাই।

যে তত্ত্ব বলে যে বিশ্ব বহুকে জড়িয়ে একই পরম সত্তার প্রকাশ, একই মহাসত্তা সকল বস্তু, সকল প্রাণী, সকল লোক ব্যাপ্ত ক'রে বিরাজমান তাকে সর্ব্বেশ্বরবাদ বলা হয়। কারণ তা পরম সত্তাকে সকল বস্তুর মধ্যে অপ্রকটরূপে বিরাজমান বলে প্রচার করে। তাঁর অবস্থিতি সৃষ্টির মধ্যে বিশিষ্ট আকারে কোথাও নাই। সর্ব্বত্র ছড়িয়ে তিনি আছেন। উপরের বচনগুলি এই সর্ব্বেশ্বর বাদের সমর্থন করে। তা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি জগতকে পরম সত্তার সহজ প্রকাশ বলেই গ্রহণ করে, তাকে বিবর্তিত রূপ বলে অস্বীকার করে না।

উপনিষদে প্রচারিত এই তত্ত্বটিকে তার মূল ভাবধারা বলে গ্রহণ করবার একাধিক সঙ্গত কারণ দেখা যায়। এবার সেই কারণগুলির উল্লেখ করবার সময় হয়েছে।

উপনিষদের দর্শনের যে পরিবেশে জন্ম, তার ফলে সর্ব্বেশ্বরবাদই তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়। এ কথা সমর্থন যোগ্য কিনা বিচার করতে হলে উপনিষদের দর্শনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উপনিষদগুলিতে আমরা প্রথম যুগের ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার পরিণত রূপটি দেখতে পাই। সে চিন্তাধারার সূত্রপাত হয় বেদের যুগে। বেদের শেষ অংশটি জুড়ে অবস্থিত বলেই সম্ভবত উপনিষদের নাম উপনিষদ। তার বুৎপত্তি-গত অর্থও তাই। বেদের শেষে বেদের অংশ হিসাবে স্থান পেয়ে ছিল বলেই তাকে বেদান্তও বলা হয়। যে দার্শনিক চিন্তাধারা বেদে অঙ্কুরিত হয়ে বেদে বিকাশলাভ করেছিল তাই উত্তর কালে উপনিষদের বক্ষে পরিণত রূপটি পেয়েছিল। বেদে যার উৎপত্তি উপনিষদে তার পূর্ণতালাভ সংঘটিত হয়েছিল।

সেই ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি বড় বিচিত্র। প্রকৃতির বক্ষে যেখানে শক্তির বা সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখাগিয়েছে, সেখানেই বেদের ঋষি দেবতার অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছেন। এইভাবে দেবতার পদে সূর্য অধিষ্ঠিত হয়েছেন, অগ্নি হয়েছেন। এই ভাবে আকাশের দেবতা দ্যৌ এসেছেন, বায়ু এসেছেন। সকালে পূর্ব্বদিকের আকাশ রাঙিয়ে যে সুষমা ছড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে উষা আবিষ্কৃত হয়েছেন। এই ভাবেই বৈদিক যুগে দার্শনিক চিন্তাধারা তথা ধর্ম্মের যুগপৎ বিকাশ সুরু হয়েছে। এই দেবতারা কিন্তু পরস্পর বিশ্লিষ্ট, তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বলবান, কিন্তু কারও মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। এই ভাবে প্রথম দৃষ্টিতে ঋষির নয়নে বিশ্ব বহু বিচ্ছিন্ন শক্তির অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলে প্রতিভাত হয়েছে।

পরের অবস্থায় দেখা যায় এই বিচ্ছিন্ন এবং বিশ্লিষ্ট দেবতাসমষ্টি বেদের ঋষিকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। তাঁর প্রকৃতির বক্ষে শৃঙ্খলার রাজত্ব দেখেছেন। সে উপলব্ধির সঙ্গে এই অবস্থার ত খাপ খায় না। তাই এমন এক বিশেষ দেবতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যিনি বহু বিভিন্ন দেবতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন ক'রে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারেন। তিনি শুধু শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন না, তাঁর অতিরিক্ত কাজ হবে ধর্মের পথে সকলকে পরিচালিত করা। এই বিশেষ দেবতার অনুসন্ধানের চেষ্টার শেষে বরুণের মধ্যে এই প্রয়োজনীয় গুণগুলি আবিষ্কৃত হল। তাঁকে তাই অতি-দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করা হল। তিনি সকল দেবতাকে নিয়মিত করেন। তাই তাঁকে বলা হল 'ধৃতব্রত।' তিনি ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করেন। তাই তাঁর নাম হল 'ধর্মস্য গোপ্তা।' এই ভাবে বহু বিশ্লিষ্ট দেবতা হতে এক অতি-দেবতার শাসনে বিশ্বকে স্থাপিত করা হল। একেশ্বর বাদ জন্মলাভ করল।

বেদের যুগেই উত্তর কালে এই চিন্তাধারা আরও বিকাশ লাভ করেছিল। একেশ্বরবাদের ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি হতে স্বতন্ত্র, সৃষ্টির বাহিরে তাঁর আলাদা প্রকাশ। এই ব্যবস্থা পরবর্ত্তী যুগের ঋষির মনে সন্তোষ

জনক ঠেকেনি। তিনি আরও গভীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত হলেন। তিনি প্রশ্ন তুললেন,

"ইয়ং বিসৃষ্টিঃ কুত আ বভুব।"

এই সৃষ্টি কোথা হতে হল। তাঁর সন্দেহ হল স্বর্গে যিনি ঈশ্বর আছেন তার ভাগ্য নিয়ন্তা রূপে তিনিই হয়ত বা তা জানেন না।

"যোঽস্য ধাতা পরমে ব্যোমন্ যো বায়ং
বেদ যদি বা ন বেদ।"

এই প্রশ্নের ফলে গভীরতর অনুসন্ধান শুরু হল। তার সমাপ্তি হল এক নুতন উপলব্ধিতে যা বলল, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট বস্তু হতে স্বতন্ত্র নয়, তাঁর আলাদা প্রকাশ নাই, বিশ্বই তাঁর প্রকাশ, বিশ্বই তাঁর দেহ। ঋগ্‌বেদের শেষের অংশে বিশেষ করে দশম খণ্ডে এই প্রশ্ন ও তার অনুসন্ধানের পরিণতির কথা লেখা আছে। পরিণতি পরম সত্তা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলেন। তাঁকে নাম দেওয়া হল 'পুরুষ' এবং বলা হল বিশ্বের সব কিছু জড়িয়ে তাঁর প্রকাশ। ঋষি গাইলেন, "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্।"

বৈদিকযুগে যে দার্শনিক চিন্তাধারা অঙ্কুরিত হয়েছিল তা এইভাবে দ্রুত বিকাশলাভ করেছিল। প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির বহু বিশ্লিষ্ট শক্তির মধ্যে বহু দেবতার আবিষ্কার, দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁদের মধ্যে সংযোগ ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে এক দেবতাবাদের জন্ম এবং তৃতীয় অবস্থায় সেই দেবতার সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট বিশ্বের নিগূঢ় সম্বন্ধের ভিত্তিতে সর্ব্বেশ্বরবাদের আবির্ভাব। ঋগ্‌বেদের চিন্তা ধারায় এই ভাবে সর্ব্বেশ্বরবাদের মূল রূপটি ধরা পড়ে গিয়েছিল।

এই পরিবেশের মধ্যেই উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ। অপরিণত রূপে সর্ব্বেশ্বরবাদকে উপনিষদ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে গিয়েছিল। এই সর্ব্বেশ্বরবাদ উপনিষদের আলোচনার মধ্যে আরও বিকাশ লাভ করে পরিণত রূপটি পেয়েছে। ক্রমবিকাশের ধারা অনুসারে সে ক্ষেত্রে এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে সর্ব্বেশ্বর-বাদই উপনিষদের মূল চিন্তা ধারা।

শুধু তাই নয়। উপনিষদের আলোচনার মধ্যেই আমরা আরও দেখি যে, যে অবিমিশ্র এক সত্তা বাদ শঙ্কর প্রচার করেছেন তার সম্ভাবনার কথাও আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনার ফলে উপনিষদের ঋষির মনে এই উপলব্ধি এসেছে যে পরম সত্তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট হেতুই তিনি অবিমিশ্র একত্ব পরিহার করে, দ্বৈতের ভিত্তিতে বহু ও বিচিত্রের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

ঐতরেয় উপনিষদ বলেছেন পরম সত্তার সব থেকে প্রকট রূপটি হল তাঁর আনন্দরূপ। ব্রহ্মকে সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" বলে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে তার সমর্থন পাই। সেখানে পরমসত্তাকে 'রস স্বরূপ' বলা হয়েছে।

"রসো বৈ সঃ। রসং হি এবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" পরম সত্তা রসস্বরূপ, রস উপলব্ধি ক'রে তিনি আনন্দ পান। এখন রস উপলব্ধি হয় কি ক'রে? অবিমিশ্র একত্বের মধ্যে রসের উপলব্ধির অবকাশ নাই। রসের ধারা বইতে হলে চাই দুয়ের প্রয়োজন। দুয়ের জানাজানি, দুয়ের পরিচয়, দুয়ের প্রীতি—এদের অবলম্বন করেই ত রসের ধারা বয়। যেখানে একমাত্র দ্বৈতবিহীন সত্তা বর্ত্তমান—সেখানে রস বয় না, সেখানে আনন্দ উপলব্ধির অবকাশ নাই।

এই উপলব্ধির ভিত্তিতে উপনিষদের ঋষি বললেন, ব্রহ্ম একদা সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ রূপেই এক ছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি রস পেলেন না, সেই জন্যই নিজের প্রকৃতিগত বৃত্তির বিকাশের গরজেই তিনি বহু হলেন। তা না হলে তাঁর আনন্দরূপটি প্রকাশ হয় না যে।

সে কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে প্রথম অবস্থায় ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় রূপেই ছিলেন। 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ।' কিন্তু একা থাকলে যে তাঁর রসোপলব্ধি হয় না, তাঁর আনন্দরূপ প্রকট হয় না। তাই ঋষি বলছেন, 'স নৈব রেমে।' একা একা তাঁর ভাল লাগল না। সেই কারণে তিনি দুয়ের ভিত্তিতে প্রকাশ নিতে চাইলেন। ঋষি বলেছেন, 'স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।' তিনি দ্বিতীয়কে চাইলেন। তখন তিনি নিজেকে দুই করলেন। তখন জ্ঞাতা এল, জ্ঞেয় এল, দ্রষ্টা এল, দৃশ্য এল, শ্রোতা এল, শ্রোতব্য এল, ঘ্রাতা এল, ঘ্রাতব্য এল, এই রূপরস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শে ভরা বিচিত্র বিশ্ব এল।

ব্রহ্মের স্বকীয় তৃপ্তির জন্যই এমন ঘটল। তা না হলে তাঁর আনন্দ রূপটি প্রকাশ হত না যে। তখন বিশ্ব জুড়ে দ্বৈতসঙ্গীতের ধারা ছড়িয়ে পড়ল। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে বিশ্বসত্তা আপন চক্ষে আপনি ধরা পড়লেন। তখন উৎস উৎসারিত হল। বিশ্বের সকলই মধুসিক্ত হল। তাই উপনিষদের ঋষি গাইলেন।

"ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু
অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বানি ভূতানি মধু।"

এই পৃথিবী সকল প্রাণীর নিকট মধুস্বরূপ, সকল প্রাণী পৃথিবীর নিকট মধুস্বরূপ। সেই দ্বৈত সঙ্গীতের সংস্পর্শ এসে সব কিছু মধুময় হয়ে উঠল। উপনিষদের ঋষি গেয়ে উঠলেন,

"মধু বাতা ঋতায়তে।
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মধুনক্তমুতোষসো।
মধু মৎ পার্থিবং রজঃ।"

বাতাস মধু ছড়াচ্ছে, নদীর বক্ষভরে মধুর ধারা চলেছে, রাত্রি ও উষা মধু দিয়ে ভরা, পৃথিবীর মাটি মধু। এই বাতাস, এই নদী, এই রাত্রি, এই উষা, এই পৃথিবীর মাটি—এই সব কিছু জড়িয়ে, সব কিছুকে মধুসিক্ত ক'রে যে সত্তা প্রকাশ হয়েছেন তাঁকে উপনিষদের ঋষি অভিবাদন জানালেন, "আনন্দরূপম মৃতং যদ্বি ভাতি" বলে।

এক কথায় বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট কবিতা হতে উদ্ধৃত নীচের চারটি লাইন যেন পরম সত্তার বিশ্বরূপের যে চিত্র উপনিষদে ক্রমবিকাশলাভ করেছে তার সারমর্ম দেয় :

যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলন ঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা। (স্মরণে)

সুতরাং দ্বৈতের ভিত্তিতে পরম সত্তার যা প্রকাশ—তা তাঁর বিকৃত রূপ নয়, তাঁর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হেতুই তিনি এই পথে বিকাশলাভ করেন। উপনিষদের মূল চিন্তা ধারা যেন সেই কথা বলে।

আমাদের উপরের আলোচনার ফলে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে তা এইবার সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। উপনিষদের এমন কতকগুলি বচন আছে যা শঙ্কর প্রবর্তিত মায়াবাদকে সমর্থন করে। অপর পক্ষে উপনিষদ যে পরিবেশে বিকাশ লাভ করেছে—তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গেলে দেখা যায় যে সেখানে এমন একটি মূল ভাবধারা গড়ে উঠেছে যা বহুকে জড়িয়ে নিয়ে পরম সত্তার একত্ব প্রচার করে। শঙ্করের মায়াবাদ অবিমিশ্র একবাদের পক্ষপাতী। কিন্তু এই মূল ভাবধারাটি সর্বেশ্বর বাদের পক্ষপাতী। সব বিবেচনা করলে মনে হয় এই সিদ্ধান্তই যেন যুক্তিসঙ্গত হবে যে মায়াবাদের বীজ উপনিষদে আছে, কিন্তু উপনিষদ বরমাল্য দিয়েছে সর্বেশ্বরবাদের গলায়।

এ ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের মন্তব্যই যেন সমর্থিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের সপ্তম পরিচ্ছেদে তাঁর সহিত বেদান্তবাদের সমর্থকদের বিতর্কের বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাঁর এই মন্তব্যের সমর্থনে তিনি সংক্ষেপে যা যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন তা সেখানে এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে :—

"উপনিষদ সহিত সূত্র কহে যেন তত্ত্ব।
মুখ্যাবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ব।
গৌণ বৃত্তে যেবা ভস্ম করিলা আচার্য্য"

ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শনের সঙ্কলন গ্রন্থ। তার প্রকৃত ব্যাখ্যা করতে হবে উপনিষদের বচনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে। শুধু তাই নয়, বেদান্ত দর্শনের সঠিক ব্যাখ্যা করতে হলে আরও একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। উপনিষদে যে চিন্তাধারা মুখ্যস্থানীয়, যে ভাব ধারা মূল স্থান অধিকার ক'রে আছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাতেই ব্যাখ্যা সঠিক হবে। তার উৎকর্ষ বাড়বে। অপর পক্ষে যদি গৌণ ভাবধারাই ব্যাখ্যার মূল অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে ব্যাখ্যা সঠিক হবে না। এই হল মোটামুটি শ্রীচৈতন্যের মত। তাই তিনি খেদ ক'রে বলেছেন যে দুর্ভাগ্য ক্রমে শঙ্করাচার্য্য।

"গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া।"

দু'খানি আধুনিক উপন্যাস

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

"ডক্টর জিভাগো" আর "লোলিতা" সাম্প্রতিক কালের দু'খানা নামকরা বই। শুধু নামকরা বললে কম বলা হয়। "লেডী চ্যাটার্লিজ লাভার" ছাড়া সারা দুনিয়ায় এত হট্টগোল আর কোন বইয়ের দরুণ সৃষ্টি হয় নাই। বই দুখানার কাহিনী, রচনা-শৈলী ও সাহিত্য-মূল্যায়ন নিয়ে অভূতপূর্ব বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এই গ্রন্থদুটি এবং তাদের রচয়িতা সম্বন্ধে সাহিত্যরসিক মাত্রেই যে অতিমাত্রায় কৌতুহলী হয়ে উঠবেন তাতে আশ্চর্য কি? দীর্ঘ বন্ধ্যাত্বের অবসানে রুশ দেশীয় লেখকেরা জগতের সাহিত্য ক্ষেত্রে আবার একটা বড় রকমের ফসল ফলাবার গৌরব অর্জন করলেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে হ'লেও ডক্টর জিভাগোর রচয়িতা বোরিস প্যাসটারনাক, এবং লোলিতার লেখক ভ্লাডিমির ন্যাবোকোভ, দুনিয়ার সাহিত্যের বাজারে যে তেজী কারবার চালাচ্ছেন তার তুলনা মেলা ভার। ১৯৫৮ সন থেকে এ দু'জন রুশ লেখক প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসাহিত্যের বাজারে মৌরসী আধিপত্যের অধিকারী হয়ে আছেন।

প্যাসটারনাকের বিশ্বখ্যাত বই 'ডক্টর জিভাগো' রাজনৈতিক কারণে তাঁর নিজদেশে প্রকাশিত হতে পারে নি।

'ডক্টর জিভাগো' ভাষান্তরিত হয়ে ভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানর মত অনূদিত 'ডক্টর জিভাগো' আসলের অভাব পূরণ করতে পুরোপুরি সফল হয় নি। 'ডক্টর জিভাগোর' স্বত্বাধিকারী ইতালি দেশীয় প্রকাশক ফেলট্রিনেল্লী ঘোষণা করেছেন যে ১৯৫৯ অবধি বইখানার ত্রিশলক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে এবং এক আমেরিকাতেই বিক্রি হয়েছে আটলক্ষ কপি। বইখানার এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার পিছনে আছে বোরিস প্যাসটারনাকের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রত্যাখ্যান। আরও একটা কারণ হচ্ছে এই যে, বইখানাকে কেন্দ্র করে লেখকের বিরুদ্ধে মস্কো শহরের সংবাদপত্রে প্রবল বিক্ষোভ। রুশদেশের ক্ষমতাধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্যাসটারনাক 'জনগণের শত্রু' ব'লে ধিকৃত হন। যাধ্য হয়েই তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান

করতে হয়েছিল। স্বল্পস্থায়ী হ'লেও এই বিরুদ্ধ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া পাঠক সমাজকে চঞ্চল ও কৌতূহলী করে তোলে। তারই ফলে বইটার এত কাট্‌তি হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্রেতাই হয়ত ধৈর্য ধরে বইখানা আগাগোড়া পড়েন নি। এই বিরাট কলেবর উপন্যাস-খানা মোট সতের খণ্ডে বিভক্ত, আর প্রতি খণ্ডে বিশ হতে পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ। নায়ক নায়িকা সমেত মোট ষাটটি চরিত্র রূপায়িত হয়েছে এই গ্রন্থে। ১৯১৭ সনের সাম্যবাদী বিপ্লবের পূর্বে ও পরের ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস বিধৃত রয়েছে ডক্‌টর জিভাগোর আখ্যানে। বেশীর ভাগ পাঠকই অনুমান করেছিলেন যে 'ডক্‌টর জিভাগো' নিশ্চয়ই কম্যুনিজমের এবং কম্যুনিষ্ট পরিচালিত শাসনতন্ত্রের এক স্বরূপউদ্‌ঘাটনকারী অকাট্য অভিযোগ। এ-শ্রেণীর পাঠক বর্গ নিশ্চয়ই বহুলাংশে হতাশ হয়েছেন। বইখানা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সনে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বেই ইতালীয় সাহিত্যিক ও সমালোচকগণ পাশ্চাত্য সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি বলে 'ডক্‌টর জিভাগোকে' অভিনন্দিত করেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকাতে ও বইখানা সাদরে গৃহীত হয়—এবং সমসাময়িক সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান ব'লে স্বীকৃত হয়।

সাধারণ পাঠক 'ডক্‌টর জিভাগোকে তুলনা করেন রুশ সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কীর্তি লিও টলষ্টয়ের "ওয়র এণ্ড পীস' উপন্যাসের সহিত। কিন্তু রুশ সাহিত্যের ক্লাশিক 'ওয়র এণ্ড পীস' আর 'ডক্‌টর জিভাগোর' মধ্যে সাদৃশ্য বড়ই সামান্য। তাই এই তুলনামূলক দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে 'ডক্‌টর জিভাগোর' বিচার করতে বসে একটা বড় রকমের ভুল করেন অনেক পাঠক-সমালোচক। নেপোলিয়নের ঐতিহাসিক রুশ-অভিযান 'ওয়র এণ্ড পীসের' কাহিনীর পটভূমি। এই উপন্যাসের পরিকল্পনা ও কাঠামো ঐতিহ্যাশ্রিত বা ট্র্যাডিশনাল। ঘটনাবহুল 'ওয়র এণ্ড পীসের' কাহিনী সুপরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ। নদীধারার মত এই উপন্যাসের কাহিনী পরম্পরা স্বচ্ছন্দ ও মন্থর গামী। সঘনা প্রবাহ নদীজলস্রোতের মতই এক নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ধাবমান। 'ডক্‌টর জিভাগোর' প্ল্যান-ফ্রেম ঐতিহ্যানুমোদিত নয়। কাহিনীর নায়ক বুদ্ধিজীবী য়ুরি জিভাগোর সুখময় বাল্যকাল অতিবাহিত হয় জার-শাসনের সময়ে। যৌবনে বিপ্লবের আবর্তে পড়ে তাকে অনেক দুঃখ নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। সর্বগ্রাসী বিপ্লবের প্রভাব যেন য়ুরি জিভাগোকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। য়ুরি তার আত্মসত্তাকে বিলুপ্ত হতে দেয় নি, প্রাণপণে চেষ্টা করেছে স্বকীয়তাকে বজায় রাখতে, এবং তারই অনিবার্য পরিণাম ঘটেছে তার শোচনীয় মৃত্যুতে। রক্তাক্ত বিপ্লবের হানাহানি খুনোখুনি এবং করাল ভয়াবহতা প্রকট হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসের পাতায় পাতায়। কিন্তু ঘটনার একটানা অখণ্ড ধারাবাহিকতা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। "ডক্‌টর জিভাগো" সুসংবদ্ধ ঘটনা বহুল কাহিনী নয়, আবার মনোবিশ্লেষক উপন্যাস ও নয়। প্যাসটারনাক যেমন সযত্নে পরিহার করেছেন টলস্টয়ের ঐতিহ্যিক ঘটনা-প্রধান উপন্যাস-পদ্ধতি, তেমনি বর্জন করেছেন প্রাউসট এবং জেমস জেমসের মনোবিশ্লেষক রীতি। প্যাসটার-নাক মুখ্যত কবি। একটা কাব্যিক সুষমায় মণ্ডিত রয়েছে প্যাসটারনাকের সাহিত্যকীর্তি "ডক্‌টর জিভাগো।" উপন্যাসের শেষ ভাগে নায়ক য়ুরি রচিত পঁচিশটি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় রুশ ভাষায় রচিত এই অনুপম কবিতাগুলির রসাস্বাদন অনুবাদের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাই বেশীর ভাগ পাঠকই গল্পের কাঠামো নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকেন। কাহিনীর মর্মগত সৌন্দর্যটুকু হতে বঞ্চিত থেকে যান। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি বা তজ্জনিত বিশ্বখ্যাতি লাভের বহু পূর্ব থেকেই বোরিস প্যাসটারনাকের কবি প্রসিদ্ধি। বিপ্লবের সুরে সুর মেলাতে সক্ষম হয় নি বলে বোরিস প্যাসটারনাক রাজনীতিকের বিচারে ছিলেন অপাঙ্‌ক্তেয়। বহু লেখাই তাঁর নিজদেশে প্রকাশের অনুমতি লাভে বঞ্চিত ছিল। দীর্ঘ সাতাশ বৎসর—১৯৩২ সন হতে ১৯৫৯ অবধি প্যাসটারনাকের মুদ্রিত ও প্রকাশিত রচনার পরিমাণ অতি সামান্যই—দু'খানা ক্ষীণকলেবর কাব্যগ্রন্থ মাত্র। তৎপূর্বে প্যাস্‌টারনাক অনুবাদ করেছিলেন সেক্সপীয়র, গোটে এবং ফরাসী মহাকবিগণের কাব্য, আর তাতে দেখিয়েছিলেন অসামান্য কৃতিত্ব। স্বদেশের রাজনীতিক অপবাদ এবং সামাজিক উপেক্ষা সত্ত্বেও প্যাস্‌টারনাকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-বিদেশে। রসজ্ঞ সমালোচকের মতে প্যাসটারনাক রুশ সাহিত্য-শিল্প-কলার প্রধান বৈশিষ্ট্য সত্য ও বিশ্বাসের পূজারী। প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়েও এই বিবেকসম্পন্ন কবি তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিসর্জন দেন নি। প্যাসটারনাকের সাহিত্য-জীবনের এটাই সব চাইতে বড় গৌরব।

জিভাগোর চরিত্র এবং জীবন পরিণতি বহুলাংশে যেন তার স্রষ্টার জীবন বৃত্তান্তেরই প্রতিফলন। সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রধান হোতা লেনিনের দুঃসাহসিক আদর্শকে জিভাগো জানালো অভিনন্দন, কিন্তু যখন সেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের এবং মানবতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হল—হিংসা, হিংস্রতা ও নরহত্যায় তখনই তার মন বিপ্লবের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠল। সর্বগ্রাসী বিপ্লবের গড্ডালিকাপ্রবাহের প্রতিকূলে সাঁতার কাটার চেষ্টায় সে হ'ল বিধ্বস্ত ও পরিণামে বিনাশপ্রাপ্ত। জিভাগো চিকিৎসক,—কিন্তু সেটাই, তার একমাত্র পরিচয় নয়। সে কবি ও দার্শনিক। আলোচ্য গ্রন্থখানা কাব্যধর্মী। এর ছত্রে ছত্রে প্রকটিত হয়েছে শাণিত বুদ্ধির দীপ্তি, আর চিন্তার অভিনব ঝলক। অথচ কাহিনী-প্রধান উপন্যাস হিসাবে "ডক্‌টর জিভাগোর" বিশেষত্ব যৎসামান্যই। উপন্যাসের প্লট বলতে যা বুঝায়—"ডক্‌টর জিভাগো"র ভিতর তেমন কোন জমাট প্লট বড় একটা নাই। শুধু একটি ব্যতি-ক্রম—য়ুরি জিভাগো এবং বিবাহিতা সুন্দরী যুবতী লারার প্রেম কাহিনী। সমকালীন কোন উপন্যাসে এরূপ একটি অপূর্ব প্রেমকাহিনী খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু উক্ত অপেক্ষা অনুক্ত কথার ইঙ্গিতে প্রাধান্য পেয়েছে প্যাসটারনাকের লেখায়। লারার স্বামী কেন লারাকে ত্যাগ করে গেল তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ লেখক প্রদর্শন করেন নি। য়ুরি এবং লারার প্রেমলীলার কোন চিত্র ও আঁকেন

নি তিনি। রসজ্ঞ পাঠকের কল্পনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন 'অমুক্ত জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে নেওয়ার ভার। সঙ্কেতময়তা ও ইঙ্গিত-প্রবণতা অবলম্বনে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন বোরিস প্যাসটারনাক।

লোলিতার লেখক ভ্লাদিমির ন্যাবোকোভ জাতিতে রুশ, কিন্তু ৪০ বৎসরের অধিক কাল দেশ ছাড়া—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ছিলেন ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে এবং সেই সময়ে 'সীরিন' ছদ্মনামে রুশ ভাষায় কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেন। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রসজ্ঞ মহলে এই লেখাগুলির সাহিত্যিক মূল্য স্বীকৃতি লাভ করে। ন্যাবোকোভ সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, তিনি রুশ এবং ইংরাজী উভয় ভাষায় পারঙ্গম এবং রচনায় সিদ্ধকাম। ন্যাবোকোভ প্রথম লেখা শুরু করেন বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক রূপে। গোগোল এবং দস্তয়ভেস্কির উত্তরসূরী ভ্লাদিমির ন্যাবোকোভ ক্রমশঃ এগিয়ে গেলেন বাস্তববাদের পথে, এবং আজ তিনি আধুনিক অধিবাস্তববাদিগণের (Surreahit) অন্যতমরূপে অভিহিত। লোলিতা লিখিত হয় ১৯৫৫ সনে, কিন্তু প্রথমে কোন প্রকাশকই এ-জাতীয় বই ছাপানর ঝুঁকি নিতে রাজী হয়নি। পরে প্যারীর অলিম্পিয়া প্রেস বইখানা ছাপায়, এবং কোন উপায়ে আমেরিকার বইয়ের বাজারে আত্মপ্রকাশ করে তিন বৎসর পরে ১৯৫৮ সনে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'লোলিতা' আমেরিকার বাজারে 'বেস্ট-সেলার' হবার গৌরব অর্জন করে। কিন্তু আমেরিকার বহু পাবলিক লাইব্রেরি 'লোলিতাকে' নিষিদ্ধ পুস্তক বলে ঘোষণা করে, এবং নীতিবাগীশগণ বইখানার বিরুদ্ধে অশ্লীলতা এবং যৌনবিকৃতির অভিযোগ আনয়ন করেন।

'লোলিতার' নায়ক হাম্বার্ট একজন বুদ্ধিজীবী কোন এক অপরিতৃপ্ত, বাল্য-অনুরাগ অপরিণতবয়সী বালিকাদের প্রতি তীব্র যৌন আকর্ষণে পরিণত হয় নায়কের পরবর্তী জীবনে। হাম্বার্ট অর্ধ সুইস অর্ধ ইংরেজ। আমেরিকায় এসে দেখা হল দ্বাদশবর্ষীয়া লোলিতার সঙ্গে। লোলিতা হাম্বার্টের আদর্শ প্রেয়সী। লোলিতার নিবিড় সান্নিধ্য লাভের জন্যই হাম্বার্ট লোলিতার মাতার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হল।

লোলিতার মা এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার পর হাম্বার্ট মুক্ত হলেন আনুষ্ঠানিক বিবাহবন্ধন থেকে, এবং পিতা-কন্যায় আপাতদৃষ্ট পরিচয়ে কিশোরী দয়িতা লোলিতাকে নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণে বের হলেন। ঘটনা পরম্পরায় হাম্বার্টের হাত থেকে লোলিতাকে ছিনিয়ে নেয় একজন দুশ্চরিত্র সাহিত্যিক। প্রতিহিংসায় হাম্বার্ট সেই দুষ্কৃত নারীকে খুন করে বিচারাধীন অবস্থায় কারাগারে বসে আত্মস্বীকৃতি লিখল। এই হচ্ছে মোটামুটি 'লোলিতার' আখ্যানভাগ। এই আত্মস্বীকৃতির প্রকাশক মুখবন্ধে বলছেন যে, এতে প্রকাশ্য মুদ্রণের অযোগ্য একটি কথাও ব্যবহার করা হয় নি। মুখবন্ধই বইখানার সত্যিকারের পরিচিতি। আমেরিকার যান্ত্রিক সভ্যতার যত রকমের ভণ্ডামি, ভুয়া বিজ্ঞানানুরাগ, পরিসংখ্যান প্রীতি শ্লোগ্যান এবং নীতিবাদের এক বলিষ্ঠ ব্যঙ্গ বইখানার ছত্রে ছত্রে প্রকটিত হয়েছে। আখ্যান ভাগের আগাগোড়া একটানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাত। গতানুগতিক নিয়মের গণ্ডীবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা, যান্ত্রিক বিলাস ব্যসন আর মাপজোঁকা হীনকৌতুক এ-সব কিছুর বিরুদ্ধেই ন্যাবোকোভের অভিযোগ। ধরাবাঁধা নিয়মাধীনতার বিরুদ্ধেই তাঁর জেহাদ। মানুষের অবচেতন মনের যে অন্ধ গহনে অ-সামাজিক দানবীয় বৃত্তিগুলি পুষ্টিলাভ করে ঠিক সেই অন্তঃস্থল হতেই উৎসারিত হয় তার সুকুমার শিল্পবোধ। যে লোহায় ঘাতকের ছুরিকা নির্মিত হয় সেই লোহার তারেই উঠে বীণাযন্ত্রের সুললিত নিক্কন। ভ্লাদিমির ন্যাবোকোভের মূলবক্তব্য হচ্ছে এই। ন্যাবোকোভের রচনা শৈলী "লোলিতার" ছত্রে ছত্রে প্রকটিত হয়েছে। তীব্র ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তিতে ন্যাবোকোভ অদ্বিতীয়। মানুষের হীন, ঘৃণ্য প্রবৃত্তিগুলির উপর কঠিন কষাঘাত করেছেন তিনি। কামপ্রবৃত্তি ও যৌন-লিপ্সার উলঙ্গ চিত্রাঙ্কনই তাঁর মূল লক্ষ্য নয়, যদিও সাধারণ নীতি-বাগীশ পাঠকের মতে অশ্লীলতা এবং উদগ্র যৌনতাই "লোলিতার" বিরুদ্ধে প্রধান নালিশ। কাহিনীর অপূর্বতা বা ঘটনা বিন্যাসের অনবদ্যতায় বইখানা স্থায়ী সাহিত্য-কীর্তি না হতেও পারে, কিন্তু সরল বাচনভঙ্গী, সুনিপুণ শব্দসম্ভার, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর স্বচ্ছ সাবলীল রচনা-চাতুর্য লোলিতাকে দিয়েছে এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

প্রবন্ধটি রচনায় International Literary Aurmal গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

নারী-ঘটিত

শ্রীপৃথ্বীশ ভট্টাচার্য

ছয় মাস ক্রিমিনোলজিতে ট্রেনিং নিয়ে আসবার পরেই আমাকে স্থান পরিবর্ত্তন করতে হল। অচিরেই সুদূর একটা ছোট শহরের থানায় গিয়ে কর্ম্মভার ও নিতে হল।

ছোট শহর—দূরে শালবন, উচ্চনীচ রাস্তাঘাট, পাহাড়ী জায়গা। স্বাস্থ্যকর স্থান, তবে অল্প কিছু দিনেই বুঝলাম স্থানটায় দেহের স্বাস্থ্য ভাল হলেও মনের স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার পরিবেশ নেই। প্রথম যে কেস্‌টার তদন্ত ভার পড়ল, সেটা নারীঘটিত কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা—

কোনও একজন চাকুরীজীবীর কন্যা দশম শ্রেণীতে পড়ত, মেয়েটি গান নাচ ভালই জানতো। লেখাপড়ায় অবশ্য তত মেধা ছিল না। নামটা তার চিত্রা—রবীন্দ্রজয়ন্তী বা ঐরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন সঙ্গীত গাইতে তার আহ্বান আসতো প্রায়ই। খ্যাতির মোহে এবং আধুনিকতার ঝোঁকে সে কখনও ভাইএর সঙ্গে কখনও একাকী যেত—বর্ত্তমানে বাবা মা তাতে আপত্তি করতেন না। এই চিত্রা মেয়েটি হঠাৎ উধাও হয়েছে, কয়েকদিন হল ঘরে ফেরেনি—

পুলিশের কর্ত্তব্য জেরা করে সব জেনে নেওয়া। ওদের অনেককে জেরা করা গেল, কিন্তু কার সঙ্গে কোথায় যেতে পারে চিত্রা, তারা বুঝতে পারেন নি এবং অনুমানও কিছু করতে পারেন নি।

এই একই সময়ে শহরের আর একটি লোকও উধাও হয়েছেন খবর এল। ভদ্রলোক শিক্ষক, নাম বনমালী-বাবু। বয়স পঁয়তাল্লিশ, এই শহরে বিগত পনের বৎসর ধরে সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করছেন। চরিত্রবান, পণ্ডিত, মিষ্টভাষী জনপ্রিয় শিক্ষক বলেই তিনি পরিচিত। তার বড় ছেলে বি-এ পড়ে, বড়মেয়েও স্কুলে পড়ে, কিন্তু তিনিও কিছু না বলে গৃহত্যাগ করেছেন। তার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই—বহু মেয়ে তার কাছে পড়ে পাশ করেছে—পিতৃতুল্য শিক্ষকটিকে কেউ কোনদিন এতটুকু সন্দেহ করেন নি—

সন্দেহ একটু হল। কন্যাপক্ষকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, চিত্রা বনমালীবাবুরই ছাত্রী এবং ফ্রকপরা কাল থেকে তাঁর কাছেই চিত্রা পড়ছে। বনমালীবাবুর পক্ষে চিত্রাকে হরণ করা সম্ভব কিনা প্রশ্ন করলে তারা দাঁতে জিবকেটে বললেন—অসম্ভব, দেবতুল্য ব্যক্তি—কত মেয়েকে তিনি পড়িয়ে পাশ করিয়েছেন, আর চিত্রার সৌন্দর্য্যজ্ঞান অসাধারণ। তার পছন্দ শাড়ী পাওয়া ভার, তার পক্ষে একটা বুড়ো মাষ্টারের সঙ্গে চলে যাওয়া সম্ভবই নয়। অন্ততঃ তার রুচিতে বাধবে। যদি কারও সঙ্গে যেয়েই থাকে তবে সে শিল্পী বা কবি হবে বা অমনি কিছু হবে, নইলে কোন গুণ্ডারদল তাকে জোর করে অপহরণ করেছে।

আত্মীয়-স্বজন-বাড়ী, সম্ভাব্য স্থানে খবর নেওয়া হল, কিন্তু এই দুইটি লোকেরই কোন সন্ধান মিলল না। বনমালীবাবুর বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল বাড়ীতে দাম্পত্যকলহ বা অমনি কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। মাষ্টারী জীবনে দারিদ্র্য ছিল চিরন্তন, যে দুঃখ তিনি হাসি মুখেই বহন করেছেন চিরদিন। সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী পড়িয়েও তার ক্লান্তি ছিল না—তবে ইদানীং তিনি যেন বড়ই বিষণ্ণ হ'য়ে পড়েছিলেন। সম্ভবতঃ উদয়াস্ত এই পরিশ্রম ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাব তার দেহে মনে ক্লান্তি এনে দিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী তাঁর চরিত্রের স্খলন পতন যে হতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। আর ছাত্রী অপহরণ তাঁর পক্ষে অসম্ভবের চেয়েও বেশী।

চিত্রার প্রণয়াকাঙ্খী বা পাড়ার ছেলেদের অনেকের পিছনে ঘুরেও দেখা গেল, তারাও বিস্মিত হয়েছে এই ব্যাপারে। তারা চিত্রাকে ছেড়ে, মিত্রাকে নিয়ে আছে, বাড়ী ত দূরের কথা—রকবৈঠকও কেউ ত্যাগ করে নি।

চিত্রার এই বিচিত্র ঘটনাটা তাই অদ্ভুত।

এমন ঘটনা আজকাল হামেশাই ঘটে। পুলিশের আফিস একে খুব গুরুত্ব দেয় না। দু'চার দিন বাদে, বাইরের আনন্দ স্তিমিত হ'য়ে এলে এবং পকেটের অবস্থা স্থিতিহীন হলে আপনিই এরা ফিরে এসে বাপমায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাবামা তাড়াতাড়ি ঘটনাটা চাপা দিয়ে দেন—সমাজ নেই, শাসনও হয় না। তারপরে এক দিন দূরে বিয়ে দিয়ে দেন—মানুষে সব ভুলে যায়।

পুলিশের কাছে তাই এসব কেসের গুরুত্ব খুবই কম। ডাকাতি, খুন, রাহাজানির তদন্ত করতেই সময় নেই, তারপরে এসব ত একটু আধুনিকতার খেসারৎ মাত্র, এর জন্য সময় নষ্ট করা চলে না—

চিত্রা অবশ্য তার গহনার সবই প্রায় নিয়ে গেছে—ভরি চারেক সোনা হবে অর্থাৎ দু'মাসের খরচ। বনমালী-বাবু তেমন কিছু নিয়েযাননি। পঞ্চাশ একশ'রবেশী হবেনা।

অপরাধ-বিজ্ঞান পড়ে এসেছি তাই একটু আগ্রহ ছিল, নইলে এ নিয়ে মোটেই সময় ক্ষেপ করতে যেতাম না। আমার সন্দেহ ছিল—বনমালীবাবুই চিত্রাকে নিয়ে গেছেন,—এতটুকু একটু শহর, এরমাঝে আর কোন দ্বিতীয়-ব্যক্তি আসতে পারে? চিত্রা ঐদিন এমন দূরেও যায়নি, কাছেই কোথায় গিয়েছিল।

নানা দিকে খবর দিয়েছিলাম—বিশেষতঃ ঐদিন রাত্রের গাড়ীতে দুখানা পুরীর টিকিট ইস্যু হ'য়েছে ষ্টেশন থেকে—

হঠাৎ পুরী থেকে খবর এল ঐ ধরণের দুটি ব্যক্তি একটি সস্তা মত হোটেলে কিছুদিন যাবৎ বাস করছে। কালক্ষয় না করে নিজেই পুরী রওনা হলাম এবং সাধারণ বেশে গিয়ে উঠলাম সেই একই হোটেলে—বলা বাহুল্য ওরা হোটেলে নাম ঠিকানা ঠিকঠিক দেন নি।

সাধারণভাবে আমাদের কর্ত্তব্য গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করা। তার পর বয়স নিরূপণান্তর বিচারার্থ চালান দেওয়া। কিন্তু আমি সে পথে যাইনি—চিত্রার মত রুচিসম্পন্না একটা তরুণী কেন এই প্রৌঢ় মাষ্টারের সঙ্গে চলে এল, তার একটা বৈজ্ঞানিক কারণ না-পাওয়া পর্য্যন্ত মনটা শান্ত হচ্ছিল না। অপরাধ বিজ্ঞান পড়ে বুঝেছিলাম, নিঃজ্ঞান মনের অনেক অদ্ভুত ইঙ্গিত মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্য পড়া বিদ্যেটার সত্যতা কতখানি সেইটেই দেখতে চেয়েছিলাম।

চেহারার বর্ণনা প্রভৃতি যা শুনেছিলাম তাতে এরাই যে চিত্রা-বনমালী এবিষয়ে সন্দেহ ছিলনা। এই দেশে এই সময়ে বাঙালীও যথেষ্ট আসে না। তবুও এরা হয়ত নাও হতে পারে—হয়ত কোন পিতা-পুত্রী সমুদ্র দর্শনে এসেছে তাও হতে পারে, অকস্মাৎ কিছু বলা ঠিক নয়। সনাক্ত করণের জন্য হয়ত ওদের খবর দিতে পারতাম কিন্তু তাও দিলাম না—নিজের নবলব্ধ জ্ঞানটাকে যাচাই করব স্থির করলাম—

সকালে চা-খেয়ে ওরা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন আমি ইচ্ছে করেই তাদের সামনে পড়ে প্রশ্ন ক'রলাম—আপনারা বাঙালী?

—হ্যাঁ।

—সমুদ্রের ধারে যাচ্ছেন বোধ হয়।

—আপনি?

—আমি এই প্রথম পুরী এসেছি, রাস্তাঘাট জানিনা। আপনাদের সঙ্গে আসতে পারি?

—আসুন—আপনার নাম?

—নীলকণ্ঠ ঘোষ। বাড়ী আমাদের হাওড়া,—সদাগরী অফিসে চাকুরী করি। কোনদিন সমুদ্র দেখিনি তাই—

—তা বেশ চলুন না।

—আপনি?

—আমার নাম হরিহর রায়—

—এটি বুঝি আপনার কন্যা?

হরিহরবাবু একটু থেমে বললেন,—কন্যা নয়, তবে কন্যাস্থানীয়া। আমার শ্যালিকা কন্যা। মেয়েটি হঠাৎ চোখ-মেলে আমার দিকে চেয়ে দেখলো। প্রশান্ত আয়ত দু'টি চোখ—সকালের সোনালী রোদ মুখের উপর পড়েছে, কমলা রংএর শাড়ীর আভা মুখে চোখে পড়ে—ওকে স্বর্ণবর্ণ করে তুলেছে। চুলের উপর রোদ পড়ে ঠিকরে উঠছে। শ্যামবর্ণা ক্ষীণকটি মেয়েটিকে সুন্দরই দেখাচ্ছে—

তোমার নাম কি মা?

—গীতা।

—সত্যিই, গীতার মতই পবিত্র সুন্দর শুচি তোমার মুখশ্রী।

গীতা চোখদুটি নামিয়ে মাটির দিকে চেয়ে রইল। মনে হল তার ক্ষীণ দেহের মাঝে একটা মৃদু কম্পন দিয়ে গেল।

আমরা চললাম সমুদ্র সৈকতে—

সামনে প্রসারিত বঙ্গোপসাগর—ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বালু বেলায়। সংকীর্ণ স্বার্থময় মন প্রকৃতির এই বিরাটত্বের মধ্যে যেন আপনাকে হারিয়ে ফেলে। তাই দেখাযায় প্রবীণ লোক বালি নিয়ে খেলা করছে শিশুর মত—মানুষ যেন সহসা জীবনের খেঁই হারিয়ে ফেলে—

ওরা চললেন পূর্বদিকে সমুদ্রের ধারে ধারে। আমি গেলামনা অশোভন হবে মনে করে, তবে দৃষ্টির বাইরে তাদের যেতে দিইনি—অনেকক্ষণ।

পুলিশে চাকুরী করলেও যন্ত্র নয়, প্রকৃতির ছোঁয়ায় মনটায় আলোড়ন না এসেছিল এমন নয়। দিগন্তব্যাপ্ত চঞ্চল সমুদ্র, বালুবেলায় তার নিস্ফল গান আমাকে ক্ষণিকের জন্যে বিমনা করে দিয়েছিল। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি ওঁরা হারিয়ে গেছেন—ধারে ধারে এগিয়ে গেলাম।

বালুবেলার একটা খাঁড়ির ধারে বসে রয়েছেন—পায়ের কাছে সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। হরিহরবাবু বসে আছেন নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত, আর গীতা তার পাশে বসে কি যেন বলছে তাকে ব্যাকুলভাবে—দূর থেকে মনে হল গীতা যেন তার সর্পিল দেহের বাসনা বেষ্টনে এই পাথরের মূর্ত্তিটিকে নিষ্পিষ্ট করতে চাইছে—কিন্তু হরিহরবাবু নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মত অচঞ্চল।

এমনটা হয়না, অন্ততঃ স্বাভাবিক নয়; তাই কৌতুহল বেড়েই চলেছিল। ফিরে এলাম, ওদের শান্তি দেওয়ার ইচ্ছেটা মনের মাঝে কিছুতেই শক্ত হ'য়ে উঠছে না, কেবলই মনে হ'চ্চে ওদের যেন বুঝতে পারি, অন্তরের কোন গভীর তলদেশের কোনও গভীর ক্ষত থেকে একটা বেদনা বিচ্ছুরিত হয়েছে ওদের জীবনে—

ওঁরা ফিরে এলেন। একসঙ্গেই হোটেলে ফিরে এলাম, দুপুরে বারান্দায় চেয়ারে বসে অনেক গল্পও হল, পুরীর দ্রষ্টব্য স্থান নিয়ে।

গীতাকে লক্ষ্য করলাম ভাল করে—শাণিত, সর্পিল, শ্যামদেহ। কোঁকড়া চুল বেণীবন্ধনের শাসন মানে না, ক্ষীণকটির ক্ষীণতা উভয় দিকের বিস্তৃতিকে প্রকট ও সুন্দর করে তুলেছে। তীক্ষ্ণনাসা, পাতলা ওষ্ঠ, চোখ দুটি ক্ষুদ্র হলেও উজ্জ্বল, অঙ্গের পৃথক সৌন্দর্য না থাকলেও সামগ্রিক একটা শ্রী ও লালিত্য আছে—কথাবার্ত্তা চালচলনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক আভিজাত্য রয়েছে, যা মানুষকে সহসাই আকর্ষণ করে।

ওঁদের ঘরের একখানা ঘর পরেই আমার ঘর—

রাত্রে চাঁদ উঠেছিল, বারান্দায়, ঘরে জোৎস্না এসে পড়েছে। ঘরের মাঝে একটা আবছা আলোয় মানুষের অবস্থান বোঝা যায়—দক্ষিণের জানালা দিয়ে হু হু করে ঝড়ো হাওয়া বইছে। অপরিসীম কৌতূহল ছিল মনে—ধীরে ধীরে উঠে ওদের জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম শ্বাসবন্ধ করে—ওরা ঘরের মাঝে দুটো ছায়া মূর্ত্তির মত বসেছিল পাশাপাশি—তরঙ্গহীন সমুদ্রের স্তব্ধতা নিয়ে—কাণ পেতে ছিলাম—শুনলাম, একটা চাপা কান্নার শব্দ, পুরুষ না স্ত্রী-কণ্ঠ বুঝলাম না—

যা দেখলাম তার সবখানি না বললেও চলবে, তবে আমার অনুমান বৃথা হয়নি। সর্পিল দেহ, সর্পিনীর মতই ধ্যানমগ্ন পাথরের পুতুলটিকে জড়িয়ে ধরে যেন নিষ্পিষ্ট করতে চায় ওর বাসনা। আপনার দুর্ব্বার শক্তি দিয়ে তাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিতে চায়। এই নাগিনীর নিশ্বাসে যেন একটা প্রতিহিংসার উষ্ণতা, অগ্নির লেলিহান জিহ্বার মত গ্রাস করতে চাইছে তার প্রতিহিংসার পাত্রকে। অভিমানের আগুন যেন হাতের পুতুলকে আছড়ে ফেলে খান খান করে দিচ্ছে—

কেবলই মনে হচ্ছে—এমন ত হয় না, এমনটা ত স্বাভাবিক নয়। কোন একটা অদৃশ্য অমোঘ শক্তি যেন এদের দেহ-মনকে অনিবার্য্য ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে—এদের সমস্ত সজ্ঞান ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে গেছে—

পরদিন ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরী হয়ে গেল—

চা-খেয়ে হরিহরবাবুর খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম,

গীতা সকালেই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে চলে গেছে। উনি একাকীই ঘরে আছেন—

ওকে সাদরে ডেকে নিয়ে এসে, চা দিতে বললাম। হোটেলের চাকর চা-টোষ্ট দিয়ে গেল। আমি বললাম—হঠাৎ বিকেলে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে খুবই খুশী হলাম—এখানে বসে বড়ই একা মনে হচ্ছিল—

হরিহরবাবু নির্ব্বাক। কিছুক্ষণ পরে অশোভন অবস্থাটাকে শোভন করে বললেন—এখানে একা কেউ থাকে না, বাঙালী মাত্রেই আত্মীয়—

—তা সত্যিই, সাগরের বিরাটত্ব মানুষের মনের সংকীর্ণ আত্মাভিমানকে দূর করে দেয়।

—হ্যাঁ—তা কতকটা হয় বটে।

কবি দার্শনিকসুলভ আলোচনা কিছুক্ষণ হল, কিন্তু আমার চাকুরী আছে, কর্ত্তব্যও আছে। অপেক্ষা করা চলে না। আমি বললাম,—দেখুন হরিহরবাবু, আপনার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কয়েকটা কথা বলতে চাই, কিছু মনে করবেন না। নেহাত প্রয়োজনেই আমাকে বলতে হচ্চে—

—বলুন—একটু নড়ে-চড়ে উনি স্থির হয়ে বস্‌লেন।

—আপনি হরিহরবাবু নন, আপনার নাম বনমালীবাবু, আপনার সঙ্গে যে মেয়েটি এসেছে বা আছে ও আপনার ছাত্রী, ওর নাম চিত্রা।

উনি শুষ্ক পাংশু মুখে নিষ্প্রভ চোখ মেলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি ধমক দিয়ে বললুম,—বলুন সত্যি কিনা।

উনি চোখ দুটো নামিয়ে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ—

—আপনি ছাত্রীটিকে অপহরণ করে এনেছেন—

উনি বিস্মিতভাবে চোখ দুটো তুলে ধরে বললেন—অপহরণ?

—হ্যাঁ, লোকে ত তাই বলবে। সাধারণে কি বলবে বলুন?

—হ্যাঁ, তা বলবে—

—দেখুন, আমি পুলিশের লোক। আপনাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এখানে এসেছি। কিন্তু এখনও গ্রেপ্তার করিনি কেন, তাই আপনাকে বলব। আপনি আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না। আমি ইচ্ছে করলে আপনার উপকার বা সাহায্য করতে পারি—কিন্তু সেটা নির্ভর করছে আপনার উপর, আপনি যদি কিছু গোপন না করেন তবে···বলুন ঠিক ঠিক জবাব দেবেন।

বনমালীবাবু একটু ম্লান হেসে বললেন, গোপন করবার কিছু নেই আমার—

—আপনি পণ্ডিত, চরিত্রবান' শিক্ষক বলে আপনার খ্যাতি আমি শুনেছি। চিত্রার মত বহু মেয়ে আপনার ছাত্রী ছিল, কিন্তু এতটুকু স্খলন পতনের কথা কেউ কোন দিন বলেনি। আজ আপনি বৃদ্ধের দলে, আজ হঠাৎ কেন এমন প্রলোভনে পড়লেন, এতবড় কলঙ্ক করলেন। কেমন করে আপনি লোকসমাজে ফিরে যাবেন, কেমন করে পুত্রকন্যা স্ত্রীর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াবেন—কেন এই কন্যা-স্থানীয়া চিত্রাকে আপনি হরণ করলেন?

—কেন?

—হ্যাঁ—

—আমি সত্যিই জানি না, কেন এলাম, কেন চিত্রা এল—

—জানেন না?

—না, সত্যিই জানি না। মনে হয় কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে ঠেলে নিয়ে এসেছে—অনিবার্য্য অদৃষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই—

—এই না-জানার ফল কি তা নিশ্চয়ই জানেন?

বনমালীবাবু আবার একটু হাসলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে প্রসন্ন চোখ দু'টি মেলে বললেন, জানি, আমার ফেরা চলবে না। বেঁচে থাকাও চলবে না। আমি কেমন করে ছেলেমেয়ের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াবো—

—এ জেনেও আপনি এসেছেন চিত্রাকে নিয়ে?

—না, যখন এসেছিলাম, তখন কিছুই ভাবিনি, ভাবতে পারিনি। ওই মেয়েটির সামনে গেলে কেন যেন আমার সমস্ত বুদ্ধি আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়, ওর কথার বাইরে কথা বলতে পারিনে, ভাবতে পারিনে। একটা অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি যেন আমাকে দুর্বার বেগে টানতে থাকে।

—এখানে হঠাৎ এলেন কেন? কি করে এলেন—

—চিত্রা একদিন হঠাৎ বলল, চলুন পুরী চলে যাই, কিছু না ভেবেই চলে এলাম। এই চলে আসার অর্থ

যে কতখানি, কত গুরুতর এর পরিণাম তা ভাবতে পারিনি—ভাবিনি। ও ডাকলো, চলে এলাম—

—কেন! আপনার বয়স হয়েছে'—

—জানি না। সত্যিই জানি না—কণ্ঠে তার পরম বিষাদের সুর।

ধমক দিয়ে বললাম, আপনাদের সম্পর্ক কি তা আমি জানি, জানি না বললে ত চলে না—

বনমালীবাবু উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন, আমাদের সম্পর্ক কি তা আপনার চেয়ে আমি বেশী জানি, তবে কেন আমি হঠাৎ এতবড় একটা অপরাধ ক'রলাম তা সত্যিই আমি জানিনা। আপনার পরিচয় পাওয়ার পরেই সেটা যেন বুঝতে পেরেছি—

আমি চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ। চেয়ে দেখলাম, বনমালীবাবুর মুখে একটা নিরন্ধ্র বিষণ্ণতার ছাপ। চোখের কোণে যেন জল জমা হ'য়েছে'—

—বনমালীবাবু, বাল্যকালের কথা আপনার মনে পড়ে? আপনার মা, বাবা—

আমার মার কথা ঠিক মনে নেই। আমার বয়স যখন বছর পাঁচ ছয়, সেই সময়ে মা মারা যান। বাবা আর বিয়ে করেননি, আমার এক মাসি আমাকে মানুষ করেছেন—

—আপনার মাসি কোথায় থাকেন?

—তিনি বিধবা ছিলেন,—নিরাশ্রয়। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা তাকেই এনে সংসারে রেখেছিলেন। তিনিই রান্নাবান্না ঘরকন্না দেখতেন, আমাকে মানুষ করেছেন—

—বাল্যকালের কথা হয়ত আপনার মনে আছে। এই মাসিমার বয়স তখন কত? আপনার বাবার বয়সই বা কত?

—ঠিক মনে নেই, তবে বাবার চুলে পাক ধরেছিল। বয়স বছর চল্লিশ পয়তাল্লিশ হবে। আর মাসিমাকে আমি চিরদিনই একরকম দেখেছি—প্রথম যে স্মৃতি মনে পড়ে তাতে মনে হয় তখন তাঁর বয়স বছর আঠার উনিশ হবে। প্রায় পয়ত্রিশ বছরে হঠাৎ তিনি মারা যান, তখনও তার বয়স উনিশ কুড়িই মনে হত—এমনি দেহের গঠন ছিল তার—

—ঐ বয়সে আপনি শুতেন কার কাছে? মনে পড়ে?

বনমালীবাবু আবার একটু হেসে বললেন,—কি হবে এসব দিয়ে? আপনার কর্ত্তব্য আপনি করবেন বৈকি?

—কর্ত্তব্য করব বলেই এসব প্রশ্ন করছি, আপনি হয়ত অবান্তর ভাবছেন কিন্তু এসব অবান্তর নয়। আপনি মনে করে দেখুন আপনি কোথায় শুতেন?

বনমালী কিছুক্ষণ ভেবে বললেন—যতদূর মনে হয়, বড় ঘরে দুখানা জোড়া খাট ছিল, সেখানেই বাবা মাসিমা আর আমি শুতাম—পরে পাশের ঘরে শুতাম, তখন আমি অনেকটা বড় হয়েছি—

—আপনার মাসিমার চুলটা বোধ হয় কোঁকড়ান ছিল, কোমরটা খুব সরু, পাতলা ওষ্ঠ, নাকটা টিকলো, সাপল সুন্দর দেহ—তাই না—

বনমালীবাবু অবাক বিস্ময়ে বললেন—হ্যাঁ, ঠিক ওই রকমই—

—মানে, তাঁর দেহের গঠন অনেকটা চিত্রার মতই ছিল না?

—হ্যাঁ—অনেকটা—অনেকটা ওরই মত—আপনি জানলেন কি করে?

—তার দরকার নেই। অন্থের বদলে আপনার শাস্তি হোক্ এ আমি চাইনা। আপনি ফিরে যেতে পারেন, আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করবো না!

—কোথায় যাবো? কেমন করে মুখ দেখাবো ছেলে-মেয়েকে—আমার ফিরে যাওয়া চলে না, বেঁচে থাকাও চলেনা। আমি সহানুভূতির সঙ্গে বললাম, কেন বেঁচে থাকা চলে না। সে ভয় আপনার নেই, শহরের কেউ একথা বলেনি বা বিশ্বাস করেনি যে চিত্রা আপনার সঙ্গে এসেছে। আপনি ফিরে গেলে কেউ প্রশ্ন করবে না।

বনমালীবাবুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। বললেন, বিশ্বাস করে নি?

—না, আপনার প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি এখনও অটুট আছে এবং এই দুইটি আপনাকে রক্ষা করেছে। এমনকি চিত্রার বাবাও একথা বিশ্বাস করেন নি। আমি প্রশ্ন করেছিলাম—তিনি অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

—সত্যি?

—হ্যাঁ, ঘড়ি দেখে বললাম, আধঘণ্টা বাদে একটা গাড়ী আছে আপনি চলে যান। চিত্রা হয়ত এখনই ফিরে

আসবে। আমি তাকে নিয়ে যাবো, যে গল্পটা তৈরী করবো তাও বলে নি, কোন সন্ন্যাসী জবাফুল শুঁকিয়ে ওকে এখানকার আশ্রমে নিয়ে এসেছিল, আমি উদ্ধার করে বাবার কাছে পৌছে দেব। চিত্রাকে আমি সে তালিম দিয়ে নিয়ে যাবো—

জীবনটাকে হঠাৎ ফিরে পেয়েছেন—এমনিভাবে বনমালীবাবু বললেন, তা হ'লে সত্যিই ফিরবো? এত হ'তে পারে—হবে—

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই হবে। চলুন আপনাকে গুছিয়ে নিতে সাহায্য করি।

বনমালীবাবুকে তৈরী করে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে এসে এক কাপ চার অর্ডার দিলাম—

আর দুই একটি মহিলার সঙ্গে চিত্রা ফিরে এল। ঘরে গিয়ে অবাক হল নিশ্চয়ই, তার পরে আমাকে বারান্দায় দেখে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো—উনি কোথায় গেলেন?

—আপনি বসুন চিত্রা দেবী। আপনার সঙ্গে কথা আছে—

—আমি চিত্রা—চিত্রা—

—হ্যাঁ আপনি চিত্রা, আপনার বাবা অসুখ, বাড়ী অমুখ সহরে, বনমালীবাবু আপনার শিক্ষক। আপনি তার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন—এসব আমি জানি—

—চিত্রার মুখখানা মোমের মত সাদা হয়ে গেল। সে কাঁপছিল—বললুম, বসুন চেয়ারে। ভয় নেই। আমি পুলিশ আপনাদের গ্রেপ্তার করতে এসেছি—

—তার মানে? আমার বয়স উনিশ বছর, আমি প্রাপ্তবয়স্ক, আমর উপর আইনের ও সব এক্তিয়ার নেই।

—সেটা প্রমাণ-সাপেক্ষ।

—মাষ্টার মশায় কোথায়?

—তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। চিন্তিত হবেন না, আমাকে কিছু গোপন করবেন না। আমি গ্রেপ্তার করে ভদ্রঘরের এ কেলেঙ্কারীকে প্রকাশ করতে চাইনে। আমি আপনাদের দু'জনকেই রক্ষা করতে চাই, সেটা অবশ্য নির্ভর করছে আপনার উপর। তাঁকে সেই জন্যেই পাঠিয়ে দিয়েছি—আপনাকে আমি আপনাদের বাড়ী পৌছে দেব—

—একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

—নিশ্চয়ই, আমি পুলিশ হলেও মানুষ। আপনি কুমারী, আপনার কলঙ্ক নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে জীবনটাকে নষ্ট করে আমার লাভ নেই। আপনি ফিরে গিয়ে সংসারে স্থান পান, ভবিষ্যতে সুগৃহিণী হয়ে সংসার করেন এই চাই। মানুষের স্খলন পতন হ'তে পারে, হ'য়ে থাকে—তার জন্যে জীবনটাকে নষ্ট করা—'

—আমি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছি, এটা এমন কলঙ্কের কি?

—না, তবে না-বলে এসেছেন, পালিয়ে, থানায় ডায়েরী হ'য়েছে—সাধারণে এটাকে কি গৃহত্যাগ বলে মনে করবেনা?

—মনে করবে?

—করবে নয়, করেছে—শহরে এ নিয়ে আলোচনা ও চলছেই। কিন্তু জানব কেবল আমিই—আপনাকে রক্ষা করতে পারি। সেই জন্যই বনমালীবাবুকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছি—আপনাকে নিয়ে আমি যাবো—বলবো কোন সন্ন্যাসী জবাফুল শুঁকিয়ে আপনাকে আশ্রমে নিয়ে এসেছিল। পুলিশ খুঁজে বের করেছে—এ সবই আমি করতে পারি—কিন্তু তা নির্ভর করছে আপনার উপর—

—আমার উপর?

—হ্যাঁ—সম্পূর্ণ আপনার উপর। আমরা দু'জনে একই কথা বল্লে কেউ অবিশ্বাস করবে না। আপনার কলঙ্কও প্রকাশ পাবে না।

—কিন্তু আমার যা ছিল, সোনার জিনিষ তা ত সবই বিক্রি করেছি—

—না না,—আমি ঘুষ চাই নি—আমাকে ভুল বুঝবেন না। কিন্তু আপনাকে সব কথা বলতে হবে—

চিত্রার মুখে একটু রক্তের লালিমা দেখা গেল, বলল—আমি সবই বলব—

—দেখুন, বনমালীবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি, কেন আপনারা পালিয়েছেন তার সবই আমি জানি। সে সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নেই—সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানতে চাইনে। কিন্তু আপনি তরুণী সুন্দরী। বনমালীবাবু বৃদ্ধের কোঠায়, আপনি তার সঙ্গে পালিয়ে এলেন কেন? যুবকবন্ধু, গুণগ্রাহী আপনার অনেক তা আমি জানি—তাদের সঙ্গে এলে বিস্মিত হবার কিছু ছিল

না—কি প্রলোভনে আপনি এতবড় কলঙ্ক মাথায় নিলেন?

চিত্রা মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ বসে রইল। আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম—কেন? কিছু বলতে পারেন—

—না। কেন? তা ত' জানিনে। চিত্রা ঋজু হয়ে বসে বলল।

—একটু ভেবে দেখুন—এই গৃহত্যাগের গুরুত্ব বুঝবার বয়স আপনার হয়েছে—সত্যি করে বলবেন।

চিত্রা দূরের পানে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপরে বলল, সত্যিই জানি না। তবে এইটুকু জানি—মাষ্টার মশায়ের সামনে গেলে আমার দেহ মন কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে যেত। মনে হত, উনিই একমাত্র লোক যিনি আমার কথা বুঝবেন। পেন্সিল বা কলম দেওয়া-নেওয়ায় ওর হাতের স্পর্শ আমার সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ জাগিয়ে তুলতো—

—কিন্তু উনি ত বুড়ো মানুষ—ওর ছেলে বি-এ পড়ে—

—জানি, কিন্তু কেন এমন হয় জানি না।

—ভাল লাগল বলেই গৃহত্যাগ করলেন, ওকে নিয়ে—ভবিষ্যৎ ভাবলেন না—

—না, কিছু ভাবতে পারিনি, হঠাৎ একদিন মনে হল ওর পায়ে আত্মসমর্পণ না করলে আমার জীবন ব্যর্থ। তাই বললাম, পুরী চলুন, উনি কিছু না ভেবেই হয়ত চলে এলেন। এও জানি আমি যদি ওর সঙ্গে বেড়াতে আসতে অনুমতি চাইতাম—তবে কেউ আপত্তি করতো না, কিন্তু তাও ত করিনি—সে কথা ভাবিনি—

—আপনার মা আছেন?

—না, আমার মা অনেক দিন মারা গেছেন—উনি সৎমা—

—সৎমা কি খুব দুর্ব্যবহার করেন?

—না। তিনি ভালই বাসেন, অন্ততঃ অত্যাচার করেন নি কোন দিন। সে অপবাদ দিতে পারবো না—

—আপনার বাবা কত বছর বয়সে বিয়ে করেন?

—মাষ্টারমশায়ের বয়স হবে—

হঠাৎ আমার চমক লাগলো। মনে মনে অপরাধ-বিজ্ঞান, যৌন-জীবনের যা কিছু পড়েছি তার পৃষ্ঠা ওণ্টাতে লাগলাম মনে মনে। মনে হল চিত্রার যৌন জীবনে হয়ত কোন রকম কন্‌ডিসনিং হ'য়ে থাকবে—অর্থাৎ বিকৃত একটা মনোবৃত্তি গড়ে উঠে থাকবে অজ্ঞান মনে, যা অনিবার্য্যভাবে ওকে টেনে নিয়ে চলেছে, যার জন্যে ও মোটেই দায়ী নয়—

—আপনার বাবা নতুন বিয়ে করে আনলে খুব দুঃখ হয়েছিল মনে, না?

চিত্রা একটু ভেবে নড়ে চড়ে বসল, আমি ওকে ভাবতে—বাল্যের কথা মনে করতে সময় দিলাম। মুখের দিকে লক্ষ্য করতেই দেখি—হঠাৎ এক ঝলক রক্ত উঠে ওর মুখখানাকে আরক্তিম করে তুলল। চোখ দু'টি নীরব বেদনায় ছলছল করে উঠল একবার, ওষ্ঠটা কেঁপে উঠল—

বললাম—দুঃখ পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই—

—কিসে?

—আপনার বাবার পুনর্ব্বিবাহে—

—না, তখন ঠিক এর গুরুত্ব বুঝিনি। তবে রাগ হ'য়েছিল, মনে হত পারলে মা'কে মেরে ফেলি—

আমি একটু হেসে বললুম—কেন?

উত্তেজিত হয়ে চিত্রা বলল, ভয় করতো যে! রাত্রে একা একা বসে কত কেঁদেছি—

—কেন?

—কি করে আপনাকে বলবো। সে দুঃখ…চিত্রা হঠাৎ চোখের জল ছেড়ে দিল। আমি বাধা দিলাম না, সান্ত্বনা দিলাম না। দুঃখের মুহূর্ত্ত ছাড়া সত্যি কথা মানুষ বলে না।

দু'জনেই নীরবে বসে রইলাম। সমুদ্রের হাওয়া ওর কপালের উপর কোঁকড়া চুলের গোছা নিয়ে খেলা করছে। আমি চেয়েছিলাম ওর আনত চোখের দিকে। ও আনমনে আপনার একটা চুল ছিঁড়ে ফেলে দিল দোদুল্যমান কেশগুচ্ছ থেকে। তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ দূরের পানে—

আস্তে আস্তে সজল কণ্ঠে চিত্রা বলল, চিরদিন আমি আর ভাইটি বাবার কাছে শুতাম। নতুন মা আসবার পরে আমাদের বিছানা আলাদা ঘরে হল। ঘরে আলো থাকতো—কিন্তু দুপুর রাতে একঘুম পরে উঠে বড্ড ভয় করতো, ভয়ে কাঁপতাম। বাবা মা বকবে বলে তাদের ডাকতাম না। আলোর ছায়া যেন দৈত্যের মত ঘরের মাঝে ঘুরে বেড়াতো। আমি আস্তে আস্তে উঠে দু'ঘরের

জানালার ফাঁকে বাবার ঘরের দিকে চেয়ে থাকতাম। বাবা মা গল্প করতো—বাবার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হত ভয়টা কমেছে। কাঁপুনিটা কমে যেত—আমি জানলা ধরে দাঁড়িয়েই থাকতাম—

চিত্রার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগলো—

সে একটু সংযত হ'য়ে বল্‌ল—বাবা একবারও ভাবতো না, একবারও দেখতো না, আমরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাত কাটাই—সে দুঃখ ভুলবার নয়, সে দুঃখ যে কি দুঃখ তা কেউ জানে না। এর প্রতিফল তারা পায়নি—আমি প্রতিফল দেব—এ অবিচার, অত্যাচার—

চিত্রা কেঁদে উঠে টেবিলের উপর হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে ফোঁপাতে লাগল। আমি দেখলাম, বারণ করলাম না। আমার চোখও সজল হ'য়ে এল—

বললুম—চিত্রা দেবী, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে এ কলঙ্ক থেকে রক্ষা করবো। পিতৃপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আপনারা দু'জন গৃহত্যাগ করেছিলেন, এ কথা আমি জানি। আপনার ভয় নেই, আপনি শান্ত হোন্—

চিত্রা মাথা তুলে বলল—কি হবে বেঁচে? কি হ'বে ফিরে গিয়ে? এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে—

—আমি আপনার কলঙ্ক স্খলন করে দেব চিত্রা দেবী। আপনি ভাববেন না—

চিত্রার চোখের জলের ধারা এসে নামলো চিবুকে—

পরদিন চিত্রাকে নিয়ে রওনা হলাম। যথাসময়ে ক্লান্ত দেহে পৌছে তার বাবার কাছে, জবাফুল ও সন্ন্যাসীর গল্পটা সবিস্তারে বললাম। পাড়ায় কৌতূহলী জনতা সে গল্প শুনলো, বিশ্বাসও হয়ত করলো—কারণ এটি গল্প নয়—পুলিশের তদন্তের নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট।

বাসায় এসে স্নান সেরে, বিশ্রাম করবো ভাবছি, এমন সময় খবর পেলাম ট্রেনে কাটা একটা লাস এসেছে, পোষ্ট-মর্টেমের জন্য পাঠাতে হ'বে।

বিরক্তির সঙ্গে উঠে আফিসে গেলাম। ট্রেনে কাটা পড়েছে—দেহটা দু' আধখানা হ'য়ে গেছে। লাস আমরা দেখি না, রিপোর্টেই কাজ সেরে ফেলি—সনাক্ত করে অন্য সকলে।

ফিরে আসছিলাম বাসায়, হঠাৎ ফিরে গিয়ে বললুম, খোলো ত দেখি—কে?

কাপড়টা খুলে ফেলতেই আঁৎকে উঠলাম—এ বনমালীবাবু।—অদৃষ্ট অমোঘভাবে ওকে টেনে নিয়ে গেছে রেল লাইনে।

দোসরা অক্‌টোবর

শান্তশীল দাশ

দীপটি আছে অনির্বাণ, পথটি আছে সোজা :
আমরা চলি চক্ষু দুটি বোঁজা।
অন্ধকার, অন্ধকার তাইতো চারিধারে ;
রয়েছে পথ, চক্ষুহীন খুঁজছি বারেবারে।

জীবন আছে, বাণীও আছে—জীবন সাথে বাণী
মিলছে কই, তাইতো হানাহানি।
সভ্যতার অহঙ্কার মিথ্যা হল সব ;
মৃত্যু-কাছে জীবন তাই মেনেছে পরাভব।

হিংসা নয়, চাই যে প্রেম—মুখোশ-পরা নয় :
জীবন দিয়ে জীবন হবে জয়।
বন্ধ কর অস্ত্রাগার ; প্রেমের রঙে মন
রাঙাও সব, নিমেষে হবে অলোর উত্তরণ।

মন্ত্র আছে, পূজারী নাই, দেউলে দীপ জ্বলে,
সেই আলোকে একটি দু'টি মানুষ শুধু চলে।

শিল্প-পীঠ বেলুড় প্রসঙ্গে

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন হ'ল—"So, you are from Calcutta ?"

বললাম—"Yes Sir."

—Much of fishes sold there ?"

—"Yes Sir."

এর পরের প্রশ্ন—"You are eating fishes ?" আপনি মাছ খান ?

উত্তর দিলাম—"Yes, I do eat."—হ্যাঁ খাই।

সিদ্ধান্ত হ'ল—"Then you are a Bengali."—তা' হলে আপনি বাঙালী।

বললাম—"Yes Sir. I have that honour."—হ্যাঁ, আমি সে সম্মানের অধিকারী বটে।

চন্দ্রাপেথ থেকে বেলুড়ের পথে, বাসের পার্শ্বযাত্রীটির সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। * * * *

বেলুড়।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মীয় পীঠস্থানের মতই, ভারতীয় শিল্প ভাস্কর্য্যের উৎকর্ষ-পরিচিতির একটি পীঠস্থান। মহীশূর থেকে রেলপথে হাসান প্রায় ৭৫ মাইল। সেখান থেকে বেলুড় চব্বিশ মাইল। বাস্ বা মোটরে যেতে হয়। বাঙ্গালোর থেকেও যাওয়ার সুবিধা আছে। বাঙ্গালোর হ'তে হাসান বাস চলে।

প্রথম বাস্‌টা খুব সকালে বাঙ্গালোর ছেড়ে বেলা এগারটা নাগাদ চন্দ্রাপেথ পৌছে দিল। ঘণ্টা তিনেকের জন্ম নেমে জৈনদের মহাতীর্থ, গোমতেশ্বরের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র শ্রবণ বেলগোলা দেখা হ'ল। সেখান থেকে ফিরে হাসানের বাস ধরেছি। পাশে বসেছেন উক্ত ভদ্রলোক।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব কাটল।

ভদ্রলোক আবার কথা সুরু করলেন—"আপনি গভর্ণ-মেণ্ট সার্ভিস্ করেন ?"

বললাম—"না।"

ভদ্রলোক—"তবে, এ পথে ?"

উত্তর দিলাম—"একটা কমার্সিয়াল ফার্ম্ম-এ চাকরি করি। তাঁদেরই কাজে বাঙ্গালোর এসেছি।"

প্রশ্ন হ'ল—"আপনি হেড ক্লার্ক ?"

বললাম—"না।"

দক্ষিণ ভারতে এখনও কোনও অফিসের হেড ক্লার্ক বা

মুখ্য প্রবেশ পথ
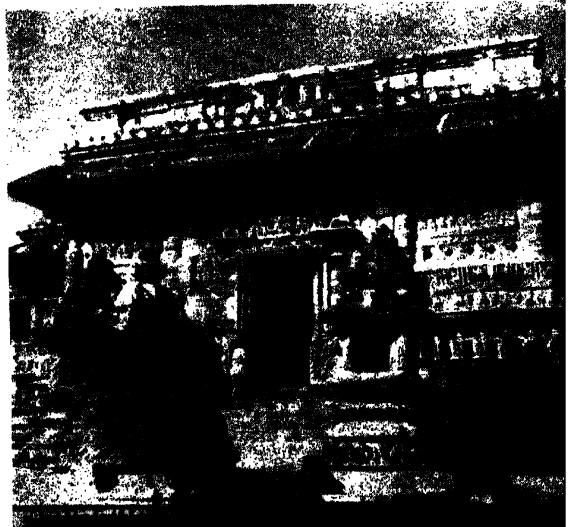
রতি, মন্মথ ও হয়শল রাজগণের অভিজ্ঞান

বড়বাবু হওয়াটা সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিস্ময়কর সম্মানের অধিকার অর্জ্জন।

ভদ্রলোক মিনিট খানেক চুপ করে থেকে, পকেট হ'তে গান্ধী-টুপী বা'র করে মাথায় দিলেন ও আমায় প্রশ্ন করলেন—"আপনি তো কমিউনিস্ট?"

প্রশ্নটা এমন আকস্মিক ও প্রত্যয়ব্যঞ্জক যে, প্রথমে বুঝতে পারলাম না। তিনি প্রশ্ন করলেন—না রায় দিলেন। যাইহোক, বললাম—"না।"

পাল্টা প্রশ্ন হ'ল—"তবে কংগ্রেস?"

বললাম—"না, তাও না।"

জিজ্ঞাসা করলেন—"তবে কোন পার্টিতে?"

উত্তর দিলাম—"কোনও পার্টিতেই নেই। রাজনীতি করবার সময় নেই।"

তিনি এ কথা শুনে বেশ খানিকটা হেসে বললেন—"এও আবার হয় নাকি! আজকের যুগে যে বলে আমি কোনও পার্টিতে নেই সে মিথ্যাবাদী। আমি জানি বেঙ্গলের বেশীর ভাগই কমিউনিস্ট।

...আমি প্রদেশ কংগ্রেসের একজন একজিকিউটিভ

উত্তরপূর্ব্ব অংশের নিকটতর দৃশ্য

প্রসাধন-রতা

মেম্বার। গত বছর পশুমেলার সময় ক্যালকাটা গিয়েছিলাম।"

চুপ করে গেলাম।

বিজয়ওয়াদার দক্ষিণের সাধারণ মানুষদের কাছে, অধুনা বাঙলা দেশের বা বাঙ্গালীর পরিচিতি শুধু মাছ খাওয়ার প্রসঙ্গ আর রাজনৈতিক ছাপের রেফারেন্সেই বুঝি-বা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে! দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাঙলার যে দীপ্তি, যে প্রকাশ ছিল তা' ক্রমেই রাজনীতির মেঘে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

এই দক্ষিণাপথেই শৈব বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব নাকি অতি বিশ্রী ব্যাপার ছিল। সারা ভারতেই ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি ভেদাভেদ অতি নিন্দনীয় ও মূর্খোচিত বিষয় ছিল। আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা যোদ্ধা হয়েছি—মনুষ্য সমাজের ওই সব দ্বন্দ্ব ও বিভেদের প্রায় অবসান ঘটিয়েছি। কিন্তু তার জায়গায় প্রচলন হচ্ছে রাজনৈতিক ব্রাণ্ড, বা ছাপের।

প্রপঞ্চের দাস মানুষ যখন ভাবে সে একটা সমস্যা দূর করছে, তখন অপর একটা সমস্যার সৃষ্টি করে বসে।

বিকাল চারটা নাগাদ হাসান পৌছলাম। ছোট্ট শহর হাসান। তবে জীবনযাত্রার অতি-সাম্প্রতিক সব উপকরণই আছে। রাত্রিবাসের জন্য হোটেলে আশ্রয় হ'ল।...

পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় বেলুড়ে উপস্থিত হওয়া গেল। চেন্নাকেশব মন্দিরের সামনে গিয়ে বাস থামল। বেলুড়ের খ্যাতি, প্রসিদ্ধি, সবই এই চেন্নাকেশব মন্দির।

দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ মন্দিরের মতই এই মন্দিরটিরও প্রবেশপথের শীর্ষদেশ বিশাল 'গোপুরম্' মণ্ডিত। বাইরে থেকে তাই চেন্নাকেশবের ভাস্কর্য্য ও কারুকার্য্যের পার্থক্য বা অনন্যসাধারণ বিশেষত্বের বিশ্রুতির কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রবেশ পথটি পার হ'তেই ভিতরে এক প্রকাণ্ড অঙ্গনের মাঝে দৃষ্টিগোচর হ'ল কেশবের মূল-মন্দির। ১১১৭ খ্রীষ্টাব্দে হয়শল রাজ বিষ্ণু বর্দ্ধন (মতান্তরে রাজা বিট্টিগ) এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। মন্দিরে সরকার অনুমোদিত গাইড্ আছেন। একদল দর্শককে সঙ্গে নিয়ে পুরোহিত শ্রেণীর গাইড্ মহাশয় ঘুরে ঘুরে কানাড়ী ভাষায় বুঝিয়ে চলেছেন। বেশীর ভাগই বোধ হয় মন্দিরের মাহাত্ম্য—যাঁরা এই মন্দির নির্ম্মাণ ও সংস্কার করিয়েছিলেন সেই সব রাজা, মহারাজার কাহিনী আর মন্দিরের গায়ে ক্ষোদিত প্রতিকৃতিগুলির পৌরাণিক উপাখ্যান।

গাইড মহাশয় বেশ চীৎকার করেই দর্শকদের শোনাচ্ছিলেন হয়শল রাজাদের বৃত্তান্ত, আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতি মালিক কাফুরের বেলুড় আক্রমণের উদ্দেশ্যে হালেবিদ্ (বেলুড় থেকে সাত মাইল) পর্য্যন্ত আগমন ও প্রত্যাগমন ইত্যাদি। ব্যাঘ্র-নিধনরত রাজা 'শল'-এর প্রতিকৃতিটা সম্বন্ধে মেয়েদের ঔৎসুক্য বেশী। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ভাষায় অনেক কিছুই বলছিলেন বা মন্তব্য করছিলেন। পুরুষরা নির্ব্বাক দেখছিলেন বিচিত্রভাবে, ভঙ্গীতে উৎকীর্ণ, রমণীয় রমণী মূর্ত্তিগুলি। এঁদের মধ্যেই হয়তো কেউ শুধু ভাবছিলেন যা'রা এই বিশাল ও অপূর্ব্ব মন্দির তৈরী করেছিল তথা মন্দিরের অঙ্গসজ্জায় অসাধারণ কারুকৃৎদের কথা।··· বছরের পর বছর ধরে, নীরস পাথরের বুকে, কঠিন ছেনির আঘাতে, তা'রা কি রসসিঞ্চন করে রেখে গেছে যা'র ধারা পানে কয়েকশত বৎসর পরের মানুষও হতবাক হয়ে যায়! অন্তরের কি মোহনরূপের প্রকাশ তা'রা প্রতিফলিত করে রেখে গেছে, যা' দেখে বহুযুগ পরের মানুষও মোহিত হয়।

অবশ্য ওই বেলুড় মন্দিরের নির্ম্মাণের চেয়ে আরও অনেক কঠিন ও বিরাট কাজই আজকের মানুষ করেছে কিন্তু, সে সবের মধ্যে মানুষের easthetics বা মনোরাজ্যের রূপময় চিন্তাগুলির প্রকাশ ক্ষীণ হয়ে গেছে। মানুষের ভাবরাজ্যের সৃষ্টি বা সৃষ্টির প্রচেষ্টা এখন উপেক্ষিত, অবহেলিত। বস্তু বা অতিস্থূল ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রাহ্য ও তৃপ্তিকারক সামগ্রীর সৃষ্টির পিছনেই মানুষের সমস্ত চিন্তা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শক্তি ও সময় আজ বিশেষ ভাবে নিয়োজিত ও ব্যস্ত। বলা যেতে পারে, জীবন ধারণ তখন এতই সহজ ছিল যে, প্রচুর অবসরকে সেদিনের মানুষ এইরূপ কাজের পিছনে অতিবাহিত করত। আজকের মানুষের সে সময় কোথায়?···সময় আজকের মানুষের নেই, অথচ যন্ত্রের করায়ত্ত করে অনেক কিছুরই সে সময়-সংক্ষেপ করে নিয়েছে। তবুও, তা'র জীবনের অবসর কম।

চেন্না কেশবের মন্দিরটির নির্ম্মাণের পিছনে সেদিনের মানুষ যে কালক্ষেপ করে গেছে তা'র চেয়ে অনেকগুণ বিরাট কাজ আজকের মানুষ অনেক তাড়াতাড়ি করতে
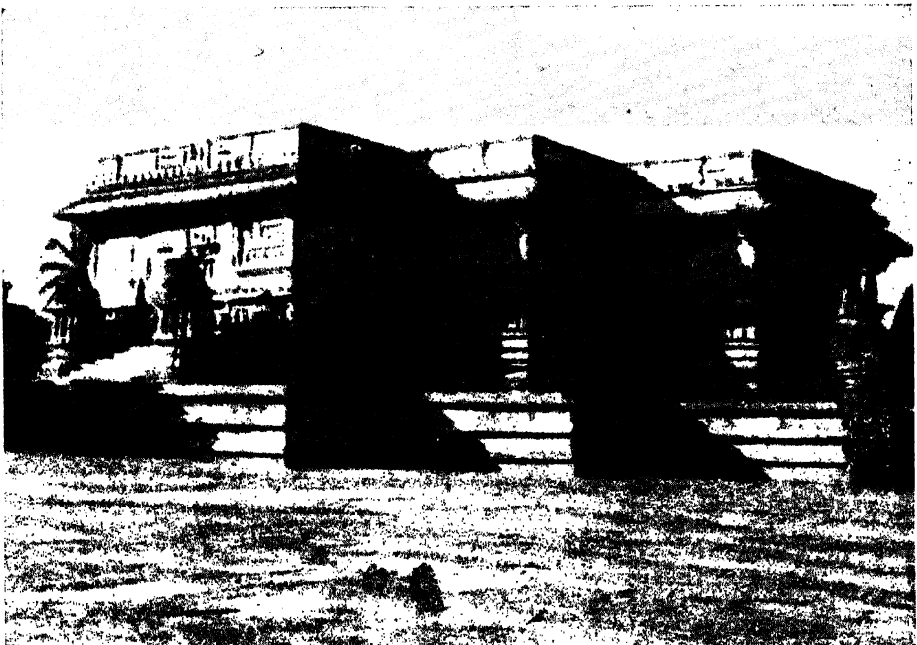
চেন্না-কেশব মন্দিরের কৌণিক দৃশ্য

পারে। কাল-কে বা সময়কে সে কলের সাহায্যে ফাঁকি দিতে পারছে। আজ আর যন্ত্রসৃষ্টি চারুশিল্প-কলাদির সৃষ্টির পিছনে, দিনের পর দিন ধরে, বহু মানুষের অবিরাম আবেগ ও অবিশ্রান্ত নিষ্ঠা স্পন্দিত হাত বহু ক্ষেত্রেই কাজ করেনা। প্রয়োজনও হয় তো নেই। কিন্তু, যন্ত্রের সহযোগিতায় যা কিছু চারুশিল্পের আজ সৃষ্টি হচ্ছে তা' কি উত্তর কালের মানুষের শিল্পী-মন কে কয়েক শত বৎসর পরেও, ওই চেন্নাকেশবের ভাস্কর্য্যের ও কারুকার্য্যের মত করে নাড়া দিতে পারবে? কালের ধোপে তা'র কতটা আকর্ষণ থাকবে? সংশয় জাগে।

বেলুড় মন্দিরে রচনা সৌষ্ঠব সম্বন্ধে বলার চেষ্টানিরর্থক। কারণ, তা' সত্যই অবর্ণনীয়।

ফারগুসন সাহেব বেলুড়ের চেন্নাকেশব মন্দির সম্বন্ধে বলে গেছেন—

"Here combines constructive prosperity with exuberant decoration to an exent, not often surpassed in any part of the world"

ধূলি-সঞ্চয়

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ধূলি দিয়ে গড়ি কল্প-সৌধ
কাল-সাগরের তীরে,
থাকে যদি থাক্—যায় যদি যাক্,—
দুঃখ সে তা'য় কিরে!
তুমি যাবে, আমি যাবো চ'লে ভাই,
পান্থশালার অতিথি সবাই!
পারে কিহে তরু রাখিতে আঁকড়ি'
বুকের কুসুমটিরে?
তাই করি আমি ধূলি-সঞ্চয়
সারাটি জীবন ধ'রে,
একমুঠো ধূলো থাই—রেখে যাই,
কাগজের বুক ভ'রে!
ধূলির পুতুল বসিয়া বানাই—
মরণেরি তরে জনম যে ভাই!—
খেয়ালী ধাতার আমি সগোত্র,—
স্রষ্টা আমি যে ওরে!
দুটি চোখে মোর দেখি যাহা কিছু—
সব একমুঠো ধূলি,
তাই তো পেতলে ভাবি নাকো সোনা,—
জৌলুষে তার ভুলি'!

মরণ-সিন্ধুকূলে বসি' হায়
নাহি থাকি কভু অমৃত-আশায়
ভেঙে যাবে জানি, তবুও কথার
এ তাজমহল তুলি!
আমার কবিতা—এ যেন শিশুর
অকাজের ধূলোখেলা,
ধূলি দিয়ে বসি' গড়ি পিরামিড
অকারণ সারাবেলা।
এ খেয়াল-খেলা কেন—জানি না তা',
সেটা নিয়ে ভাই, না ঘামাই মাথা;
হাজার পাগলে ভরা এ নিখিল,—
এ যে পাগলেরি মেলা!
সব ধূলি ভাই,—একমুঠো ধূলি,—
ধূলিময় সংসার,
সে ধূলায় মিশে যায় যদি যাক্
সঞ্চয় এ আমার!
আমি কবি,—আমি শিল্পী—স্রষ্টা,
আপন লীলার আমি যে দ্রষ্টা;—
ভাঙা ও গড়ার আমি যে সঙ্গী—
সাথীহীন বিধাতার!

রবীন্দ্রকাব্যে আনন্দস্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ধ্যানজগতে একজন অরূপ আছেন এবং এই অরূপকে তিনি খুঁজেছেন অন্তরের গভীরে, বিশ্বপৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে। এই ধ্যানসুন্দর অরূপই কবির কাছে আনন্দস্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে অবশেষে। সুন্দরের ধ্যানে অন্তর তাঁর নিমগ্ন হ'য়ে আছে বলেই দৃষ্টিতে তাঁর প্রতিভাত হয়েছে অরূপ সৌন্দর্যের দিব্যচ্ছটা।

বিভিন্ন ভাবাদর্শের অমৃত উপাদানে গড়ে উঠেছে কবির মানসবৃন্তটি, আর এই বৃন্তটিতে আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি যেন পূর্ণবিকশিত অপরূপ এক পুষ্প। এই পুষ্পের প্রতিটি পাপড়ি কবির ধ্যানের রঙে রাঙানো, জীবনের শান্ত মধুর অনুভবের স্নিগ্ধতায় হৃদয় জড়ানো।

কবি অনন্তের ধ্যানস্বপ্নে নিজের কবি-আত্মাকে ডুবিয়ে রেখে চিরদিন আনন্দস্বরূপকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। জগতের সেই আদিম প্রভাতে যখন এক স্বর্ণোজ্জ্বল আলোক নিখিল পৃথিবীকে বিস্ময়-চকিত ক'রে তুলেছিল, আদি অন্ধকারের রহস্যগর্ভ হ'তে পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকার স্তর ভেদ ক'রে সে-সৃষ্টির হৃদয়াবেগ স্পন্দিত হ'য়ে উঠছিল, অনন্তের ধ্যান করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই দিকেই তাঁর কবিদৃষ্টিকে ফিরিয়েছেন। তাই তিনি তাঁর কবি-জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই একটি অপূর্ব্ব আনন্দ-রূপের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। সেই আনন্দরূপটি একটি অন্তর্লীন সৌন্দর্যবোধের মধ্য থেকেই কবির মনে সর্বপ্রথম জাগ্রত হয় এবং তার প্রথম স্বাক্ষর পড়ে প্রভাত-সঙ্গীতের আলোচনা-প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতির এই কথাগুলিতে—"দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন... আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।...লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল, এবং আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।"

তারপরে তাঁর কবিজীবনের যে অধ্যায়টিকে আমরা লক্ষ্য করি, সে অধ্যায়ে জেগে উঠেছে এক অপরূপ প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ; আর এই বোধের মধ্য দিয়ে আনন্দস্বরূপের উপলব্ধির প্রথম সূচনা। কারণ—রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের মধ্যে একটি অসীমতাবোধের গভীরতা আছে। এর মধ্য দিয়ে পথ ক'রে নিয়েই কবি যেমন পেয়েছেন তাঁর মানসী ও চিত্রাকে, তেমনি পেয়েছেন জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা-আনন্দস্বরূপকে।

কবি তাঁর মানস-নিবেদনের কাব্য 'নৈবেদ্যে' এক স্থানে বলেছেন—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যতদূরে আমি যাই,
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথা বিচ্ছেদ নাই। [নৈবেদ্য—১৪]

কেননা, সেই অসীমের কাছে প্রাণমন নিবেদন ক'রে কবি বুঝতে পেরেছেন যে, সেখানে কোন দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই, বিচ্ছেদও নেই; কারণ অসীমের উপলব্ধিতে হৃদয় মন পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। অসীমের ধ্যান করতে যেয়েই তিনি আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি ক'রে সুগভীর এক প্রশান্তি নিয়ে বলতে পেরেছেন—

হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা অতীত
যেথা হতে অনেন্দর অব্যক্ত সংগীত
ঝরিয়া পড়িছে নামি'—অদৃশ্য অগম
হিমাদ্রি শিখর হ'তে জাহ্নবীর সম। [নৈবেদ্য-৮০]

আনন্দের মধ্যেই অসীমতা, তাই অনন্তের ভাবাদর্শ এসেছে এখানে। সেখানে সেই আনন্দময় অনন্ত স্বরূপ ধারণার অতীত হ'য়ে আছেন, আনন্দের অব্যক্ত সংগীতধারা প্রতিমুহূর্তে যেখান থেকে ঝরে পড়েছে, সেইখানেই নিত্য নূতন রহস্য চিন্তায় ডুব দিয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রকাব্যে যে-সীমা-অসীমের মিলন-রচনার পালা, তার একটি প্রধান পটভূমিকা রচনা করেছে এই অনন্তবোধ। যেখানে অনন্তবোধ, সেখানেই এসে ঠাঁই ক'রে নিয়েছে তাঁর গভীরতম উপলব্ধির এক আনন্দমূর্তি। যখন তিনি অসীমকে সীমার বাঁধন দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন—তখন তিনি বলেছেন।—

আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গ'ড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।

কিন্তু যখন তিনি অসীমের সঙ্গে আনন্দস্বরূপকে বুঝতে পেরেছেন, তখনই উচ্ছ্বাসময় এক ছন্দ-ঝংকারে বলে' উঠেছেন—

যেথা দূর তুমি
যেথা আত্মা হারাইয়া সর্বতটভূমি
তোমার নিঃসীম মাঝে পূর্ণানন্দ ভরে
আপনারে নিঃশেষিয়া সমর্পণ করে।
কাছে তুমি কর্মতট আত্মা-তটিনীর,
দূরে তুমি শান্তি-সিন্ধু অনন্ত গভীর। [নৈবেদ্য—৮৩]

এই সুদূরের অনন্ত গভীর ও পূর্ণানন্দময় শান্তিসিন্ধুর কাছে এই আত্ম-

সমর্পণেই কবির আত্মোপলব্ধির তৃপ্তি, এবং 'অনন্ত' ধারণার নিবিড়তার এক নামহীন বন্ধনবিহীন জ্যোতির্ময় তীর্থযাত্রার পথে নিজ আত্মাকে যেন চালিত করেছেন।

এখন প্রশ্ন জাগে, এই আনন্দস্বরূপ কে? রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্ত-বোধের মধ্যে যে-আনন্দময়কে উপলব্ধি করেছেন তিনি সেই—যাঁকে উপনিষদ বলেছেন—'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্‌বিভাতি' ও 'রস বৈ সঃ'। বিশ্বের অফুরন্ত আনন্দরূপের মধ্যে ও অন্তরের গহন-গভীর রসচেতনার মধ্যেই তাঁর স্থিতি। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই যার বিরাম-বিহীন প্রকাশলীলা, তিনিই কবির আনন্দস্বরূপ। এই আনন্দস্বরূপের প্রকাশের মধ্যেই কবির চিরসুন্দরের প্রকাশ। কবি এই শান্ত স্থির জ্যোতিস্নাত প্রকাশকে লক্ষ্য করেই অপরিসীম আনন্দে বলে' ওঠেন—

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হলো অঙ্গ মম, ধন্য হলো অন্তর।

তিনি আরও বলেন—'একবার চোখ যদি খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের মধ্যে নিমেষের মধ্যেও যদি সেই আনন্দ সপ্তকে সপ্তকে বাজিয়া ওঠে, যে-আনন্দে জগদ্ব্যাপী আনন্দের সমস্ত সুর মিলিয়া যায়, তবে যেখানেই চোখ পড়ে, সেখানে তাঁহাকেই দেখি—'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি। বাধাবন্ধনে দুঃখেদারিদ্র্যে অপকারে অপমানেও তাঁহাকে দেখি—আনন্দ-রূপমমৃতম যদ্বিভাতি। তখন মুহূর্তেই বুঝিতে পারি, প্রকাশ মাত্রই তাঁহারই প্রকাশ—এবং প্রকাশ মাত্রই আনন্দরূপমমৃতম্। তখন বুঝিতে পারি, যে-আনন্দে আকাশে আকাশে আলোক উদ্ভাসিত, আমাতে সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ।' [আনন্দরূপ—ধর্ম] এই আনন্দের প্রকাশ মাধুর্য নিয়েই কবির আত্মোপলব্ধি এবং এ-হচ্ছে কবির কাছে একটি আন্তরিক সাধনা। কবি প্রাসঙ্গিকভাবে একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

আমার জীবনে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধ'রে রাখতে হয়েছে। সে-সাধনা হচ্ছে আবরণ মোচনের সাধনা, নিজেকে দূরে রাখবার সাধনা। আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা।' [পথে ও পথের প্রান্তে]। এই সাধনাই কবিকে নিজ জীবনের প্রাত্যহিকতার আবরণ উন্মোচন ক'রে অনন্ত মধুর আনন্দ স্বরূপের দিকে চলার দীপ-শিখাটিকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। নিভৃত-সাধনার অন্তের প্রশান্তিতে প্রাণের অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে কবি আনন্দ-সরোবরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন, তার বলেছেন—

জীবনে আমার যত আনন্দ
　　পেয়েছি দিবস রাত,
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে
　　স্মরিব জীবননাথ।

রবীন্দ্রনাথের এই আনন্দস্বরূপকে বুঝতে গেলে আমাদের একটু দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হ'বে কবির বহুপোষিত নিজস্ব একটি দুঃখবাদের উপর। কবি জানেন সেই চির আনন্দময়কে জীবনে পেতে হ'লে নির্মম এক দুঃখের সাধনা তাঁর করতে হ'বে। দুঃখের প্রদীপে তাঁর আরতির ব্যাকু-লতা না জানালে সকল কাঁটা ধন্য ক'রে জীবনের বৃন্তে কুসুম হয়ে তিনি ফোটেন না। তাই দুঃখেরবেশে তাঁর দেবতার আবির্ভাব ঘটলেও তিনি ভয় তো পানই না, বরং যেখানে ব্যথা সেখানে তাঁকে নিবিড় করে ধরতে চান। বেদনার মেঘে ছাওয়া হৃদয় আকাশেই তাঁর আগমনের বজ্রবিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে। দুঃখের বিদ্যুৎ দীপ্তিতেই তাঁর প্রচণ্ডরূপের যেমন আহ্বান ভেসে ওঠে, তেমনি তাঁর ভীষণ মধুর আবির্ভাবও হয় দুঃখের দুর্গম-পথে। তিনি যখন আসেন, তখন রাজার বেশেই আসেন; রাজ-সজ্জাই তাঁর উপযুক্ত ভূষণ। কিন্তু তিনি যে আঁধার-ঘরের রাজা। তাঁকে সুখের আলোকে সহজে দেখা যায় না, দুঃখের-শিখায় জীবনের ধূপ না পোড়ালে দুঃখ দেবতার আরাধনা কোন দিক দিয়েই সম্পূর্ণ হয় না। এই আরাধনার যে আনন্দ, তা' দুঃখ সাধনারই এক ঘণীভূতরূপ। তিনি অশান্তিরূপী, কিন্তু সেই অশান্তির উৎস মূল হ'তে শান্তির স্নিগ্ধধারা উৎসারিত হ'য়ে এসে হৃদয়পদ্মকে শতদলরূপে ফুটিয়ে তোলে। তাই সেই চির-আনন্দময় চির-উপাস্য যখন অন্তরের দ্বারে আসেন—তখন আবির্ভাব ঘটে তাঁর রুদ্ররূপে—দুঃখের বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে আভাস ভেসে ওঠে তাঁর প্রচণ্ডরূপের। কবি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চান না, কবি জানেন, দুখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে, তাহা আনন্দ। দুঃখ ও আনন্দরূপমমৃতম্।' [দুঃখ-ধর্ম] রাজা নাটকে কবি ঠাকুর-দাদার মুখ দিয়ে বলেছেন—'আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।' যেই সে বজ্র অঙ্কিত পতাকাবাহী যে-রুদ্র দেবতা, তাঁর অভিনন্দন রচনা করতে যেয়ে আনন্দের এক উচ্ছ্বাসবেগ বুকে বহন ক'রে সাগ্রহে বলে' ওঠেন—

ওরে দুয়ার খুলে দে রে বাজা শঙ্খ-বাজা,
গভীররাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।

[আগমন—খেয়া]

তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শূন্যতলে বেজে ওঠে বজ্র, ঝলকে ওঠে বিদ্যুতের ঝিলিক; ঝঞ্ঝার প্রলয় উল্লাসে সুপ্তিঘেরা মানবাত্মার ঘটে জাগরণ। এই জাগরণের মধ্যে বেদনা থাকলেও রুদ্রের সঙ্গে চকিত পরিচয়ের আনন্দও আছে অপরিমেয়। এই আবির্ভাবে আছে পরমতম নিষ্ঠুরতা—কিন্তু দুঃখ দেখে ভীত হয়ে এই আবির্ভাবকে অস্বীকার করলে চিরসুন্দরের আনন্দরূপকেই অস্বীকার করতে হয়। কবি তাই বলেন—

যে-রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে,
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে।

*　　*　　*

ঝড় যে তোমার জয়ধ্বনি তাই কি জানি? [গীতিমাল্য]

এই দুঃখ দেবতাই কবির সমস্ত অনুভবের মধ্যে তাঁর জয়ধ্বজার রুদ্র-বাণী ছড়িয়ে দিয়ে হন আবির্ভূত; এবং এই আবির্ভাবের মধ্যেই ফুটে ওঠে তাঁর সমস্ত জীবনের আনন্দ-সাধনার শুভ্রপদ্ম।

এই আনন্দস্বরূপ কখনো ব্যক্ত, কখনো অব্যক্ত। যখন ব্যক্ত তখন বিশ্ব পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন; অন্তরে জাগে প্রভাত-সন্ধ্যার রূপময় এক আলোক-আবেশ এবং নিবি-

বিলি ঘরে তাঁর জন্ম করেন বাসর রচনা। এই বাসর রচনার পরেই কবি বর্ষাসন্ধ্যায় বলেন—

আমায় অমনি খুসী করে রাখো
কিছুই না দিয়ে,
শুধু তোমার বাহুর ডোরে
বাহু বাঁধিয়ে। [খেয়া—বর্ষাসন্ধ্যা]

আর যখন অব্যক্ত, তখন বহির্বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের অন্তরালে যে-এককশক্তি আত্মগোপন ক'রে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্তরস্থিত এককে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়ে দিয়ে কবি আনন্দরূপকে অনুভব করেছেন। এই অনুভবের সত্যটিকে উপলব্ধি করেই তিনি বলতে পেরেছেন—'গোলাপ ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মারূপী-এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে, তখন এর আর কোন মূল্যের দরকার হয় না। অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায়বলে' এরই নাম দিই আনন্দরূপ।' [সাহিত্যের পথে।] এই রূপের রসঘনতারই কবির ধ্যান-তন্ময়তা।

যৌবন কালের প্রেম ও সৌন্দর্য বোধের গভীরতায় যে-অসীমরূপী অরূপ সত্তাকে কবি উপলব্ধি করেছিলেন, প্রৌঢ়ত্বের পরিণত চিন্তার শান্ত গাম্ভীর্যের দিনগুলিকে কাটিয়ে দিয়ে কবি বার্ধক্যের পরিপূর্ণ জীবন-অনুভবের তটভূমিতে যখন নেমে এলেন, তখন লীলাসুন্দর ভগবান কবির আত্মিক-চেতনায় ধ্যানের আস্পদ হ'য়ে জেগে উঠেছেন। চেতনার বৃন্তে আনন্দরূপের কুসুমটিকে ফুটিয়ে তুলে' কবি আত্মস্বরূপের বিশ্লেষণের দিকেও মনোনিবেশ করেছেন। যিনি আনন্দস্বরূপ তাঁর যে পূর্ণ অধিষ্ঠান আত্মাতেই। আত্মস্বরূপের উপলব্ধিই ভারতীয় আধ্যাত্ম সাধনার চিরন্তন পথ। উপনিষদের রসবিহারী রবীন্দ্রনাথ তাই আনন্দ স্বরূপের ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে নিজ আত্মার গভীরতম স্তরে দৃষ্টিপাত করেছেন। উপনিষদের ঋষিদৃষ্টি তাই তাঁর এই পর্যায়ের কাব্যসাধনায়। উপনিষদের ঋষি যেমন আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মাকে দেখেছিলেন 'তমসার পারে'—রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন 'আলোকের অতীত আলোকে' ধূলির আসনে বসেই তিনি ভূমাকে দেখেছেন—আর নিজ আত্মার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেছেন—"এষো ম আত্মান্ত হৃদয়ে"—এই ব্রহ্মাই আমার আত্মা এবং এই আত্মার অবস্থিতি হৃদয়ের গভীরে এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ এঁকে 'অণোর-নীয়ান মহতোমহীয়ান' ও বলেছেন। বৃহদারণ্যক বলেন—"এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃত"—ব্রহ্মই যেমন অন্তর্যামী তেমনি অমৃত এবং তিনিই তোমার আত্মা। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে তাই যখনই পরমতম আনন্দোপলব্ধি ঘটেছে, তখনই অন্তরের সেই বিস্মিত অভিজ্ঞতাকে আধ্যাত্মিক নামে অভিহিত করেছেন। তখন বলেছেন—"তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেই জন্যই 'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোন বস্তু নেই, যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখেছি তা' নিয়ে তর্ক কেন? স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে-সত্তা, তার মৃত্যু নেই।" কবির ছন্দে তাই জাগে—'সত্যের আনন্দরূপ এ-ধূলিতে নিয়েছে মূরতি।'

কবি মর্ত্যজীবনের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে একটি কঠিন রোগভোগের পর আসন্ন মৃত্যুর শান্ত গম্ভীর অনুভূতির মধ্যে যে পরমতম সত্যের উপলব্ধি করলেন, তারই দ্বিধাহীন প্রকাশ ঘটলো প্রান্তিক কাব্যে। এই বার্ধক্যের সীমায় দাঁড়িয়ে এই বিশ্বসৃষ্টি ও মানব সত্তার যে-গভীরতম উপলব্ধি কবির জীবনে এসেছিল, তার আরম্ভ হয়েছিল 'শেষ সপ্তক' থেকেই। কিন্তু আত্মস্বরূপের বিশ্লেষণমুখী মন নিয়ে 'সৃষ্টির সীমান্ত জ্যোতির্লোকে'র অসীমতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে নিখিল জ্যোতির জ্যোতি যে-আলোক' তাকে দেখবার যে অত্যুগ্র বাসনা তা' আত্মপ্রকাশ করেছে জীবন গোধূলি বেলার কাব্য 'প্রান্তিক' থেকে। তাই এ জন্মের খ্যাতির ভিক্ষা ঝুলিকে ত্যাগ ক'রে কলরব-মুখরিত প্রাঙ্গণ থেকে ধ্যান শান্ত নিজ পরিবেশের মধ্যে নীরবে স'রে আসতে চান কবি। কারণ কবি এটুকু গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তাঁর 'আমার যাত্রার পথ গেছে চলি' অনন্তের পানে।' সেখানে তিনি আজ একা যাত্রী। কবির একান্ত ইচ্ছা তাই—

মরণের প্রসাদ-বহ্নিতে
কামনার আবর্জনা যত, ক্ষুধিত অহমিকার
উঞ্ছবৃত্তি সঞ্চিত জঞ্জাল রাশি দগ্ধ হ'য়ে গিয়ে
ধন্য হোক আলোকের দানে। (প্রেমিক—২)

এ-আলোক সেই পরম জ্যোতির্ময়ের আলোক। 'সংসারের বিচিত্র প্রলেপে' এবং 'বিবিধের বহু হস্তক্ষেপে' কবির অন্তরের সত্যের মধ্যে দেবতার যে আপন জ্যোতির্ভাস্বর স্বাক্ষরটি ছিল, তা আজ লুপ্ত প্রায়। আদিম সৃষ্টির যুগে প্রকাশের যে-আনন্দ তাঁর আপন সত্তায় রূপ নিয়েছিল, তা' আজ ধূলিমগ্ন, রুগ্ন বুভুক্ষার দীপ ধূমে কলংকিত।' তাকে ফিরে দিয়েই কবি চলেছেন 'মৃত্যুস্নান তীর্থ তটে সেই 'আদি নির্ঝর তলায়।' নিজ আত্মাকে তাই শুভ্র সুন্দর ক'রে নিতে 'প্রদোষের নির্মল তিমির তলে' শেষের অবগাহন কবি সাঙ্গ করতে চান। প্রলয়ংকরের সভা থেকে মৃত্যুদূত কবিকে বিরাট প্রাঙ্গণে নিয়ে যেতে এসেছে—যখন পরিপূর্ণভাবে আবার আসবে—

'তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি' আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্যডালি 'পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ। (প্রান্তিক—১০)

আত্মিক শুভ্রতায় মহৎ সঙ্কল্পকে বুকে বহন ক'রে 'অকৃতার্থ অতীত'কে পিছনে ফেলে আনন্দের পূর্ণতাকে অন্তনিক্তৃপারে এসে কবি অনুভব করেছেন। এখানেই তাঁর আত্মস্বরূপের সঙ্গে সার্থক একটি সাক্ষাৎকার

উঠলো। জীবনের অন্তিম পূরবীতে সুগভীর আত্মপরিচয়ের এ-এক স্নিগ্ধ মধুর রাগিণী!

আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করতে যেয়ে ধরণী ও জীবনকে তিনি সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জানিয়েছেন বারংবার। জীবন যে তাঁর অস্তিত্বের সারথি। এই সারথির কৃপাতেই রূপ-রস-স্পর্শ নিয়ে অনির্বচনীয় এক অপরূপের এক স্পর্শ লাভ ক'রে ধন্য হয়েছেন তিনি। যে-ধরণী তাঁকে চিরসাধনায় শান্ত সুন্দরের সন্ধান দিল, সেই ধরণীকে যারা ক্রূরতা, মত্ততা, শিশু ও নারীহত্যা এবং কুৎসিত বীভৎসতা দিয়ে ক্লেদাক্ত ক'রে তুলছে—মহাকাল-সিংহাসনে সমাসীন বিচারকের কাছে নিত্যকাল ধিক্কার দেওয়ার শক্তি প্রার্থনা করেছেন কবি। মনুষ্যত্ব যেখানে লাঞ্ছিত হচ্ছে, সেখানেই বেজে উঠেছে তাঁর বজ্রবাণী। সেই-জন্যেই তিনি ধরণী থেকে বিদায় নেবার আগে ডাক দিয়ে গিয়েছেন তাদেরকেই—

দানবের সাথে যাঁরা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। (প্রান্তিক—১৮)

আনন্দ স্বরূপের সন্ধানী-কবি-আত্মা মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনাকে কখনো সহ্য করতে পারেন না।

আত্মার পরিমণ্ডলকে ঘিরে এই যে তাঁর গভীরতর উপলব্ধি, রবীন্দ্রনাথের গোধূলিবেলার অন্যতম কাব্য 'সেঁজুতি'তেও তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর স্পষ্ট হ'য়ে আছে। অতীত জীবনের স্মৃতিকে অন্তরের মধ্যে পোষণ ক'রে জগতের বহু আনন্দদায়ী বস্তুর মধ্যে যে অনন্তের স্পর্শ তিনি পেয়েছেন এবং নিজের গভীরতম সত্তার যে পূর্ণ পরিচয়টি তার মধ্য থেকেই লাভ করেছেন, সেই উপলব্ধিরই কাব্যরূপ জীবন-শেষের নিজ হাতে জ্বালানো এই সন্ধ্যাদীপটিতে। বিশ্ব পৃথিবীর কোন জিনিসেই নিত্যতা নেই, কিন্তু এর ভিতরেই নিত্যের আলোক-শিখাটিকে দেখতে পেয়েছেন। কবি যখন চলেছেন, 'নব প্রভাতের উদয় সীমায় অরূপ লোকের দ্বারে'—তখন স্বভাবতঃই এসেছে তাঁর আত্মচিন্তা, এসেছে চির-অজানা বিপুল সমুদ্রপথে পদক্ষেপ করে নানা হিসাব নিকাশের চুলচেরা বিচার। আলো-আঁধারের ধূসর ছায়ায় তাঁর কথাকে ফুটাতে যেয়ে তিনি পেলেন 'দূর নীলিমার ভাষা'—যার মধ্যে ভাব পেয়েছে কিছুটা প্রকাশ-ময়তা, কিছুটা অস্ফুট। ধরণীকে চিরদিন ভালো বেসেছেন কবি, তার মাটির কাছেও যে তিনি ঋণী এ-কথাও বারংবার জানিয়েছেন। কিন্তু তা' হ'লেও এই পৃথিবীকে আঁকড়ে ধ'রে তাঁর পরম আকাঙ্ক্ষা তো চিরদিন মিটতে পারে না। ধরণীর একান্ত কাছে থেকে কবি বলেছেন—

তাহারি বেড়ার প্রান্ত হ'তে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান। যবে আলোতে আলোতে
লীন হ'তো জড় যবনিকা;— (জন্মদিন—সেঁজুতি)

কিন্তু তা হ'লেও অমূর্তের সব অর্থ কবির কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি। সেইজন্যই জীবনের শেষ ধাপটিতে বসে' যে-সন্ধ্যাদীপ কবি জ্বেলেছেন, তারই আলোকে বহুদূরে নিবদ্ধ আছে আজ কবিদৃষ্টি। ধরণীর কাছে কবি চিরকৃতজ্ঞ থাকলেও আত্মস্বরূপের পরমতম অর্থটিকে জানতে চেয়ে—

আজি মর্ত্যের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারই চরম অর্থ খুঁজি।
(জন্মদিন—সেঁজুতি)

এভাবে কবির মুখ ফিরাতেই হ'বে। কারণ চিরযাত্রীরূপী যে-মানবসত্তা, তার অন্তরতম রূপটিকে জানবার জন্য পৃথিবীর মৃৎপাত্রকে দূরে ফেলে দিয়ে যেতেই হবে। তাই কবির একান্ত অনুরোধ—

ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দ স্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হ'য়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে, ভালোবাসিয়াছি।
[জন্মদিন—সেঁজুতি]

বিশ্বপৃথিবীর জীর্ণতার অন্তরালকে ছিন্ন করে না গেলে চিরানন্দময় সে আত্মস্বরূপকে কিছুতেই উপলব্ধি করা যাবে না। নিঃশক্তির প্রদোষ ছায়ায় কবির অন্তরশায়ী আনন্দস্বরূপ অক্ষুণ্ণ সৌন্দর্যের গৌরবে উজ্জ্বল হ'য়ে জেগে উঠেছেন।

সেই অন্তর পুরুষটি প্রতিদিনকার নানাছন্দে কবিকে শুনিয়ে গিয়েছেন ভালোবাসার বাণী এবং সেই ভালোবাসাই মর্ত্যের অধিকারকে ছাড়িয়ে তাঁকে স্বর্গের কাছাকাছি নিয়ে তুলেছে। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির অবশেষে সেই ভালোবাসাটুকু চিরদিন জেগে থাকবে কবির মনে এবং মৃত্যুর পরপারে ও এই অমৃত রূপের অনন্ত জ্যোতি কবিকে সঙ্গদান করবে। রবীন্দ্রনাথ 'সেঁজুতির 'জন্মদিন' কবিতায় যেমন তাঁর জীবনের অতীতকে দেখেছেন, তেমনি বিশ্বপৃথিবীর সমস্ত রূপ সৌন্দর্যের মধ্যে থেকেও একজন কালাতীত আনন্দস্বরূপকে অন্তরের গভীরে প্রত্যক্ষ করেছেন।

'সেঁজুতির 'পত্রোত্তর' কবিতায় 'চির প্রশ্নের বেদীসম্মুখে' দাঁড়িয়ে কবি বিরাট নিরুত্তরের, পরপারের হর্ষকে অন্তরে গ্রহণ করেছেন। তিনি জানেন—

চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখা দেয় সুন্দর,
যায় না তবুও ধরা।

এখানেই তো চিরদিনকাল রহস্য। কবিরও মনে হয়, সেই চিরসুন্দর আনন্দস্বরূপকে কখনো তিনি দেখতে পেয়েছেন, যেমন ক'রে গতিশীল তরঙ্গ দেখতে পায় সাগর বুকের পারাপারহীন বিপুলতাকে। কবি তাই অকুণ্ঠ ভাবেই বলেন—

দেখেছি দেখেছি এই কথা বলিবারে
সুর বেধে যায় কথা না জোগায় মুখে,
ধন্য যে আমি সে-কথা জানাই কারে
পরশাতীতের সুরস বাজে যে বুকে।
[পত্রোত্তর—সেঁজুতি]

'যাবার মুখে, 'অসত্য,' চলতি ছবি', 'প্রতীক্ষা' প্রভৃতি কবিতায় জীবনের ধূলি-ঝঞ্ঝার বহু ক্লান্তিঘন মুহূর্তের মধ্যেও সেই অসীমরূপী পরম একের নৃত্যানুপুরের ধ্বনি শুনেছেন কবি। অপূর্বের অনির্বচনীয় আনন্দ দ্যুতিময় রূপধ্যানে অন্তরকে যেমন ডুবিয়ে দিয়েছেন, তেমনি সেই ধ্যানে মরণকে পার হয়ে সেই আনন্দরসে অন্তর পাত্রকে পূর্ণ ক'রে নিয়েছেন। 'চলতি ছবি কবিতার বলবানতার বহু চিত্ররূপের মধ্য হ'তেও অদৃশ্য কেন্দ্রীয় পুরুষের স্থিতি সত্যকে উপলব্ধি ক'রে মুগ্ধ হ'য়ে আছেন। 'প্রতীক্ষা' কবিতায় সত্যের অপরূপ রসে এবং অভূতপূর্ব স্পর্শে জড়ের আবরণকে খুলে ফেলে মহাকাল যেমন পরম একের আশায় জেগে আছে, কবির অন্তর ও ঠিক তেমনি। আত্মার অতন্দ্র জাগরণকে নিয়েই কবির সমস্ত উপলব্ধি ও অধ্যাত্মসাধনা। এই সাধনাতেই তিনি আবিষ্কার করলেন একটী 'ছুটির মহাদেশ; সেখানে আকাশ শুদ্ধ, কিন্তু পরম সুরের ধারাই অসীম নীরবতার কাণে যে একতারা বাজিয়ে যাচ্ছে, সেই সুরেই কবি আত্মমগ্ন। রবীন্দ্র-কবি-মানস 'সেঁজুতি' কাব্যে সমগ্র কোলাহলের মধ্য থেকে পরম একের ধ্যানে নিমগ্ন হ'য়ে আছে। এই নিমগ্ন অবস্থার মধ্য থেকেই অরূপের সঙ্গে তাঁর শাশ্বত প্রাণের আলাপ।

রবীন্দ্রনাথের পরমতম আনন্দোপলব্ধির মানস অধ্যায়কে বুঝতে গেলে 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষ লেখা' কাব্য চারিটির একটু বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে; কারণ জীবন-বেলাভূমির শেষ ধাপটিতে দাঁড়িয়ে এই কাব্য চারিটিকে যেন কবির মন্ত্রপূত অন্তরাত্মার একটি শান্ত গম্ভীর পূর্ণ জাগরণ ঘটেছে। এখানে কবির আত্মিকবোধ আরো গভীর ও ব্যাপক।

ব্যাধিগ্রস্ততায় বিষণ্ণ ধূসর অবস্থার মধ্যে থেকেও বিশ্বপ্রবাহের বিপুলতায় কবি অনন্ত প্রাণের সীমাহীন মাত্রার সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। 'অনিঃশেষ মরণের স্রোতে' ভাসতে ভাসতে বহু সংকটের মধ্য দিয়ে এই প্রাণ—

নামহীন সমুদ্রের উদ্দেশবিহীন কোন্ তটে
পৌঁছিবারে অবিশ্রাম বাহিতেছে খেয়া,
কোন্ সে অলক্ষ্য পাড়ি-দেয়া
মর্মে বসি দিতেছে আদেশ,
নাহি তার শেষ। [রোগশয্যায়—২]

আর প্রাণের এই ক্লান্তিহীন চলমানতার মধ্যে মাঝে মাঝে দেখতে পান সেই মহনীয় বিরাটকে—

চলমান রূপহীন যে-বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই থাকা,
খোলা আর ঢাকা,
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্ব প্রবাহে—
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে। (ঐ—২)

এই নিরন্তর অস্তিত্ব-প্রবাহের মধ্যে কখনো কোনো মহাক্ষণে সেই রূপহীন বিরাটকে কবি বুঝতে পারেন, কখনো বা কোন্ দূরে হারিয়ে যায়। কিন্তু মানবাত্মার যে-অপরাজেয় শক্তি, সে দেহ দুঃখের হোমানলে জ্যোতিষ্কের তপস্যায় যে-অর্ঘ্য নিবেদন করে, তার কি কোন তুলনা আছে? মানবাত্মা অমর, তাই সে নির্ভীক সহিষ্ণুতায় 'অপরাজিত বীর্যের সম্পদ'কে বুকে বহন ক'রে মরণকে সে-উপেক্ষা দিয়ে জয়যাত্রার পথে চলে, সে তো—

দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে
নামহীন আলোময় কী তীর্থের লাগি—[ঐ—২]

রোগদুঃখময় রজনীর ঘনান্ধকারে যে-আলোক বিন্দুটিকে কবি দেখতে পান, তার নির্দেশের পরম অর্থটিকে বারংবার তিনি না ভেবে পারেন না। জানালার রন্ধ্রপথ দিয়ে পথের পথিক যেমন উৎসব-আলোর একটি খণ্ডিত আভাসকে দেখতে পায়—ঠিক তেমনি যে রশ্মি অন্তরে এসে প্রবেশ করে তাঁর, সেই-ই পরিচয় ঘটিয়ে দেয় 'দেশহীন কালহীন এক 'আদি-জ্যোতি'র সঙ্গে। শুধু তাই নয়, শাশ্বত প্রকাশ পারাবারে সেখানে সূর্য এসে তাঁর সন্ধ্যা স্নান সমাপন করে, অজস্র নক্ষত্র ফুটে ওঠে 'মহাকায় বুদ্‌বুদে'র মতো—সেই 'চৈতন্য সাগর তীর্থপথে' কবি চিরদিনের নিশান্তের যাত্রী। এই যাত্রাই কবিকে মানবাত্মার শাশ্বততত্ত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য পরিচয়ের সূত্রে বেঁধে দিয়েছে,—আর এই পরিচয়ের গভীরতা নিয়েই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা। দেশাতীত কালাতীত সেই আদিজ্যোতির দিকে তাঁর ধ্যানগভীর শান্তদৃষ্টিকে তুলে' ধ'রে সেখানে অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমাকে তিনি বুঝতে পেরেছেন, সেইখানেই তিনি ঋষি। আর নিঃসংকোচে তাই বলতে পারেন—

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ-অমৃত রূপে বিশ্বের প্রকাশ। [ঐ—২৫]

এই আনন্দময় সত্যস্বরূপের উপলব্ধিই দুঃখের বহু তাপদগ্ধ জীবনে কবির মনে বর্ষণ ক'রে গিয়েছে অফুরন্ত শান্তির বারি।

জীবনের প্রথম উষালগ্ন থেকে বিদায় আভায় রাঙানো গোধূলিলগ্ন পর্যন্ত কিনি এই ধরণীকে ভালোবেসেছেন আর এই বিশ্ব পৃথিবী ও নিত্য অম্লান জ্যোতিষ্ক রাজির গভীরে যে অদৃশ্য এক চৈতন্য প্রবাহ নিত্যকাল বয়ে চলেছে, সেই চৈতন্যের সঙ্গে নিজ আত্মিক চেতনাকে মিশিয়ে দিয়ে আত্মোপলব্ধির পূর্ণতাকে আনতে চেয়েছেন। কারণ কবি জানেন—

এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃত রূপে,
আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী উঠিল বাজি মর্মে মর্মে মোর,
এ-বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্যগ্রহ তারা
অস্খলিত ছন্দঃ সূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।

[ঐ—২৮ নং]

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP

বিশ্বসৃষ্টির চেতনার সরোবরে নিজের প্রাণচেতনার পদ্মকে ফুটিয়ে তুলে সূর্যগ্রহ তারার সৃষ্টির উৎসবে চিরন্তন আনন্দানুভূতির অমৃত আস্বাদ পান করতে চান কবি। অন্তর তাঁর ভ'রে উঠেছে প্রত্যয়সিদ্ধ এই গভীর অনুভবে।

তারপর রোগশয্যার ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে কবি নূতন এক দৃষ্টি লাভ করেছেন। সে দৃষ্টিতে কবির কাছে পৃথিবী মধুময় হয়ে দেখা দিয়েছে, জীবনের বাণী চরিতার্থ হ'য়ে উঠেছে। কবি তাই মুগ্ধ হৃদয়ে বলেন—

দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।

তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—

সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে। (আরোগ্য—১নং)

মৃত্যুর কুহেলি-আচ্ছন্ন অন্তরালকে ছিন্ন করে এসে কবির কাছে এই পৃথিবীতেই সত্যের আনন্দরূপ মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। এই অনুভূতিতে যেন কোন তত্ত্ব নেই, অতীন্দ্রিয়তার কোন ভাবাবেশ নেই, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি যেন এই রসের অনুভবের মধুরতা পান করছেন, আর এ জীবনে সে—'সুন্দরের মধুর আশীর্বাদ' পেয়েছেন, মানুষের প্রীতিপাত্রে তাঁর সুধার আস্বাদলাভ করছেন। সেইজন্যও সারা জীবনের সত্যকে পৃথিবীর ধূলিতে কবি প্রত্যক্ষ করেন—

সত্যের আনন্দ রূপ এ-ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ-ধূলায় করিনু প্রণতি। (আরোগ্য—১]

অসীম অরূপ স্পর্শমণির মতো যে-রূপে রূপের মূর্তি রচনা ক'রে চলেছেন, ধরণীর চিরপুরাতন বেদিতলে প্রতিদিন তারই যেন চিরনূতন অভিষেক হচ্ছে। আর যিনি আনন্দস্বরূপ।তিনি তো সকলের মধ্যেই রয়েছেন। এখানেই কবি 'দুঃসহ দুঃখের দিনে অক্ষত অপরাজিত আত্মাকে চিনে নিতে পারেন। কারণ কবি যে ভালো করেই জানেন—

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই,
জানি আমি, তার সাথে আমার আত্মার ভেদ ন্যাই।

[আরোগ্য—৩২ নং]

আনন্দবোধের সঙ্গে আত্মার অভেদতত্ত্বএসে কবিকে এখানেও ঋষির দৃষ্টি দিয়েছে। সেই আদি জ্যোতি-উৎস হ'তে চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে কবির আজ অভিষেক হ'য়েছে, তিনি যে অমৃতের পূর্ণ অধিকারী তা তিনি নিবিড়ভাবেই জানতে পেরেছেন। সেই 'পরম আমি'র সাথে এই বিচিত্র জগতের আনন্দের পথ ধরেই তিনি যুক্ত হ'তে পারেন; এই পরমত-উপলব্ধি তাঁর অন্তরে এসেছে বলেই তিনি বলেন—

এ—আমির আবরণ সহজে স্খলিত হ'য়ে যাক;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ। [আরোগ্য—৩৩ নং]

সত্যের অমৃত রূপের প্রকাশকে দেখতে যেয়েই আজ তাঁর পূর্ণতম আত্মোপলব্ধি। 'চির মানবের আনন্দকিরণ চিত্তে তাঁর বিকীরিত। তাই আজ তিনি ঋষি, আধ্যাত্মিকতার সমুচ্চশিখরে সমাসীন। রোগমুক্তির আলোকোজ্জ্বল এক অন্তর প্রসন্নতা কবিকে বিশ্বব্যাপী আনন্দস্বরূপের একেবারে যেন মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, আর চিরবিদায়ের সময় তাঁর মন শান্ত হোক, শুদ্ধ হোক কবির এখন এই একমাত্র কামনা। ধরণীর শান্তিময় 'রাত্রির নিঃশব্দ আশীর্বাদ' ও 'সপ্তর্ষির জ্যোতির প্রসাদের সঙ্গে কবির জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতে নেমে আসুক—এও কবির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। আনন্দস্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধিতে যাঁর হৃদয় ভ'রে উঠেছে, এই শান্ত গম্ভীর কামনাই তাঁর স্বাভাবিক।

তারপর এলো তাঁর এই ধরণীর বুকে শেষ বছরের জন্মদিন। সেদিন প্রত্যুষের প্রণাম নিয়ে উদয় দিগন্ত পানে তিনি আঁখি মেলে ধরলেন, কিন্তু অন্তরে অনুভব করলেন তাঁর অন্তরসত্তার বহুদূরের পথিক রূপকে অন্তর পুরুষ তো এই জীবনের পথ ধ'রে নীহারিকা জ্যোতির্বাষ্পের মধ্যে নক্ষত্রের মতো এক অজানা রহস্যের সন্ধানে চলেছেন। সত্যের সীমাবন্ধনের মধ্যে চলে জীবনের বাইরের উৎসব, কিন্তু অন্তর পুরুষ যে—'অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অলক্ষ্য তাহার পরিণাম।' কবি তাই এই জীবন-সমুদ্রের নির্জন তটভূমি থেকে জন্মদিনের পুণ্যক্ষণে সেই পুরের পথিকের ধ্বনি শুনতে পেলেন। আর তিনি কেবল অনুভব করেন—

চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে। [জন্মদিনে—২]

অব্যক্তের এই বিরাট প্লাবনের মধ্য দিয়েই কবির ঋষিদৃষ্টি সৃষ্টির সুগভীর মর্মমূলে যেয়ে নিবিষ্ট হয়েছে। বিশ্ব ধরিত্রীর ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে কবির অন্তরতর সত্তা কি ভাবে বহু রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে অঙ্কে অঙ্কে চেতনার প্রকাশের পালায় এসে রূপ ধ'রে দাঁড়িয়েছে, সেই সৃষ্টির রহস্যসূত্রে গাঁথা আশী বৎসরের জীবনকে কবি বিচার ক'রে দেখেছেন। এ-ভাবেই 'জীবনের প্রান্তভাগে অন্তিম রহস্য পথে' সৃষ্টির নূতন রহস্যকে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর সারা জীবনের বাণী সাধনার মধ্যে যে অজানার পরিচয়কে তিনি লাভ করেছেন, খুঁজে পেয়েছেন বাক্যের মধ্যে বাক্যাতীতকে, সেই অজানার দূত তাকে আজ—

নিয়ে যায় দূরে
অকূল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম,
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম। [জন্মদিনে—১২]

চিরআনন্দরূপী সেই অকূল সিন্ধুকে তিনি আজ প্রণাম নিবেদন করতে চলেছেন বলেই বহুদিনকার বাণীর সাধনা তাঁর কাছে আজ অর্থহীন ব'লে মনে হচ্ছে। 'পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে মিশতে যেয়ে পিছনের অনেক কিছুই আবর্জনা বলে মনে হয় তাঁর। প্রচ্ছন্নভাবে নিগূঢ় অন্তরে যে-এক অন্তরতম পুরুষ বিরাজ করছেন, তাকেই একান্তভাবে দেখবার জন্যে কবিপ্রাণ আজ জেগে উঠেছে। কবির ছন্দপুরে তাই শুধু এক কথা বাজে—

নিগূঢ় অন্তরে সেই একা,
চেয়ে আছি যদি পাই দেখা।

সেইজন্যই—

পশ্চাতের কবি
মুদ্রিয়া করিছে ক্ষীণ আপন হাতের আঁকা ছবি।
[জন্মদিনে-১২]

চরম সত্যবোধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কবি প্রণাম জানাচ্ছেন তাঁদের উদ্দেশ্যেও—

যারা জীবনের আলো

ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো। [ঐ-১২]

সৃষ্টিলীলা প্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রভাত আলোকের নির্মল স্বচ্ছতার মধ্যে প্রাচীন ভারতের ঋষিবাক্য জাগে কবির মনে, আর উপনিষদের ঋষির মতো তিনি সূর্যের আলোক-আবরণকে সরিয়ে দিয়ে তার 'অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে' দেখতে পান 'আপনার আত্মার স্বরূপকে'। মর্ত্যের লীলাক্ষেত্রে সুখে দুঃখে অমৃতের স্বাদ তিনি ক্ষণে ক্ষণে লাভ করেছেন, আর সীমার অন্তরালে দেখেছেন অসীমকে,—বুঝতে পেরেছেন, 'এ-জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে।'

অন্তরের শাশ্বত মানুষটিকে তিনি বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে উপলব্ধি করতে চান; সব সময় তা' পারেন নি বলেই তাঁর কাব্যসাধনার অপূর্ণতাকে অকুণ্ঠভাবে বিশ্বের সমক্ষে স্বীকার ক'রে যাচ্ছেন। সমাজ-জীবনের আভিজাত্য নীচতলার লোকের সঙ্গে মিশবার কোনদিনই সুযোগ দেয় নি কবিকে, সেইজন্যেই সকল মানুষের অন্তরতম মানুষটি যিনি, তাঁর সাথে পূর্ণ পরিচয়ের যে- আনন্দ, যে আনন্দ কি সবটুকু তিনি লাভ করতে পেরেছেন? কবি তাই উৎকর্ণ হয়ে আছেন সেই কবির জন্য—

যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে-কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি। [ঐ-১০ নং]

চির অসীমরূপী আনন্দস্বরূপের ধ্যানমগ্নতার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর অতীত আপন আত্মিক উপলব্ধি ঘটেছে বলেই কবি আশা করেন বিশ্বপৃথিবীর মঙ্গলরূপ। হিংস্র সংগ্রামের রক্তমাখা দন্তপংক্তিতে ক্ষতবিক্ষত শত শত নগর গ্রামের বীভৎসরূপ কল্পনা ক'রে কবি গভীরভাবে ব্যথিত হন, এবং ইতিহাসে বিধাতার সংকল্পের যে নিত্য বিপর্যয় ঘটেছে তাও তিনি বোঝেন। কিন্তু এও তিনি আশা করেন—

মানব তপস্বী বেশে
চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে—
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান। (ঐ—২১ নং)

আনন্দস্বরূপের যিনি চিরদিনকার ধ্যানী, মানব মন্ত্রের এই শান্তি-আশ্রয়ী তপস্বীরূপকে তিনি আশা না ক'রে পারেন না; যেমন করেছেন তিনি প্রান্তিকের যুগেও। অতীত ভারতের ঋষির মতো তিনিও সূর্যের দৃপ্ততম রূপের মধ্যে কল্যাণতম রূপকে প্রত্যক্ষ করতে চান। 'হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ করো অপাবৃত।'

'শেষ লেখা'য় কবির ঋষিদৃষ্টি পূর্ণতম প্রকটিত। অসীমের পথে জ্বালানো ধ্রুবতারকার জ্যোতিকে অন্তরে নিয়ে মহা অজানার নির্ভর পরিচয় পাবেন বলে' কবি এখানে মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। 'প্রেমের অসীম মূল্য'কে মৃত্যু যে কোন মতেই নষ্ট ক'রে দিতে পারে না, 'পরম আমি'র সত্যেই সত্য হয় নির্ধারিত, একথা আজ নিশ্চিতভাবে মনে জেনেছেন। বিশ্বলগ্ন সত্য, কবির কাছে এখানে 'পরম আমি'র সত্য এসে মিলিত হয়েছে। রবীন্দ্র জীবনে পূর্বে মৃত্যুকে দেখার যে-দৃষ্টি, সে-দৃষ্টিতে অনুভবের সঙ্গে একটি হৃদয়ের আবেগ ছিল, কিন্তু জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসে সেই মৃত্যুকে সমস্ত আবেগকে দূরে রেখে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে, সত্যোপলব্ধির গভীরতম বিশ্বাসকে বুকে নিয়ে তাকে অসত্য ক'রে দেখছেন।

সব কিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্তনবেগে
সেই তো কালের ধর্ম।
মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে,
এ-বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি। (শেষ লেখা—২)

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিয়েই জীবনের পরিপূর্ণতা, এই বোধ কবির জীবনে চিরদিনই ছিল,—মৃত্যুর ভয়ংকর রূপ কোনদিনই কবিকে ভীত ত্রস্ত করতে পারেনি; পরম শান্ত মনের একাগ্র প্রসন্ন অর্ঘ্যটি চিরদিন মৃত্যু-ভাবনার বেদীমূলে তিনি অর্পণ করেছে। কিন্তু জীবনের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে মৃত্যুর সে-রূপকে কবি দেখেছেন, সে-দেখার মধ্যে যেমন আছে আরো গভীর প্রশান্তি, তেমনি আছে সারা জীবনের বহু তপস্যালব্ধ সত্যের ব্যাপকতা। এ-পর্যায়ে দুঃখের আঁধার, রাত্রির মৃত্যু কেবল তার শিল্প বিকীর্ণ ক'রে যায় অন্ধকারের মধ্যে। অন্ধকারেই তার ছলনার ভূমিকা। তার ভয়ের মুখোসকে বিশ্বাস করলে জীবনের শুধু পরাজয়ই ঘটে, সত্যদীপ্ত বহু বাঞ্ছিত পথের কোনদিনই সন্ধান মিলে না। এই সত্যদৃষ্টিতেই তিনি দেখতে পাবেন, বিশ্বের সমস্ত কর্মের অন্তরালে এক শক্তিরূপিণী ছলনাময়ীর ভূমিকার আত্মগোপন ক'রে আছে, সৃষ্টির পথকে রেখেছে এক বিচিত্রছলনাজালে আচ্ছন্ন ক'রে। এই ছলনাকে উত্তীর্ণ হ'য়ে যেতে পারলেই তার জ্যোতিষ্ক-চিহ্নিত পথের সন্ধান পাওয়া যায়, আলোক-ধৌত অন্তরে আসে 'শান্তির অক্ষয় অধিকার।' চির আনন্দধ্যানের পথ দিয়ে চলতে চলতে রবীন্দ্রনাথের এইখানেই জীবন সত্যের পরমোপলব্ধি ঘটেছে। আত্মস্বরূপের পরম পরিচয় লাভে

নিশ্চিন্ত নির্ভর এবং প্রশান্ত গম্ভীর এক দিব্যচ্ছটায় কবির অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

লক্ষ্য করলে স্পষ্টতঃই দেখা যাবে, 'রোগশয্যায়' থেকেই কাব্যরচনার ক্ষেত্রে শিল্প সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য কবির যেন সজ্ঞান কোন প্রচেষ্টা নেই। জীবনের গভীরতম সত্যরূপ এবং জিজ্ঞাসা তাঁর কবি-মানসকে যেমন আলোড়িত ক'রে তুলেছে, তেমনি তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্তমিলের ধ্বনি গুঞ্জনকে বিসর্জন দিয়ে, ফেনায়িত ভাষার আশ্রয়কে ত্যাগ ক'রে বক্তব্যের এক অপরূপ সংহত সজ্জার মধ্য দিয়ে সমস্ত উপলব্ধি ও অন্তরের কথার কাব্যরূপ দিতে চেয়েছেন। কবির সত্যবোধ অন্তরে এসে পরম একের আনন্দরসকে জাগিয়ে দিয়েছে, আর এইখানেই এই কবিতাগুলির অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য। নিরলংকার মন্ত্রচ্ছন্দের মতো একটি চিরস্থায়ী—সত্যরূপকে ধ'রে রেখেই এক সৌন্দর্য। সারা জীবনের উপলব্ধ সত্যের সুস্পষ্ট প্রকাশের এই পর্বের কবিতাগুলি তাই অসীম নীলিমার অন্তহীন নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল আলোকের ইংগিতবাহী।

স্কেচ ঃ— অলোক দেব

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

॥ পরিমল গোস্বামী ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিনু পেয়ারা গাছে উঠছিল। মিনু নিচে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছিল, "অত উপরে উঠো না, ডাল ভেঙে পড়ে যাবে।"

"উপরে না উঠলে ঐ বড় পেয়ারাটা পাড়ব কি করে?"

"ওটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে।"

"ইস! বললেই হল?"

"না দেবে তো মজাটা টের পাবে।"

বিনু যে ডালটায় উঠতে যাচ্ছিল, তার নিচের দিকে ঝুলে-পড়া আগাটা মিনুর নাগালের মধ্যে এসে যাওয়াতে ওটাকে সে এক লাফে ধরে নিচের দিকে টানতে লাগল।

বিনু চেঁচিয়ে উঠল, "আর টানিস না, ছেড়ে দে, নইলে ডাল ভেঙে পড়ে যাব যে! তুই-ই তো আগে সাবধান করছিলি।"

"আগে বল, ঐ পেয়ারাটা দেবে, তবে ছাড়ব।"

"ওটা কথখনো দেব না।"

"তবে মজাটা দেখ।"

"আ রে! এ যে সত্যিই ডালটা ভাঙছিস।"

আবেদন নিষ্ফল হল। ভাঙা ডাল এবং বিনু এক সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। ভাঙবার মুখে ডালটা কেঁদেছিল, এখন সে চুপ। এখন কাঁদতে লাগল বিনু।

"আহা বিনুদা, তোমার সত্যিই চোট লাগল?'

বিনু কাঁদতে কাঁদতে বলল—"আমার পা ভেঙে দিলি, আমিও এর শোধ তুলব, মনে থাকে যেন।"

কিন্তু বিনু উঠতে গিয়ে পড়ে গেল। তা দেখে মিনুর কি উল্লাস! এমন মজা সে অনেক দিন উপভোগ করেনি।

বিনুর চোখে প্রতিহিংসার আগুন। "আমার পা ভেঙে দিয়ে তুই হাসছিস?"

"সত্যিই পা ভেঙেছে বিনুদা? আমি পা ভেঙে দিয়েছি তোমার? কি মজা তোমার বিনুদা, তোমার পা ভেঙে দেবার লোক আছে, আমার কেউ নেই। আমার পা কেউ ভেঙে দেয় না, আমার কি দুঃখু, বিনুদা!"

বিনয় এ কথায় আরও চটে গেল, কিন্তু মনের ভাব আপাতত গোপন করে কাতরভাবে বলল—"একটুখানি হাত বুলিয়ে দে না আমার পায়ে? দেখছিস না, উঠতে পারছি না?"

বারো বছরের মিনতি এবারে স্নেহময়ী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে কাছে এসে কোমল সুরে বলল, "কৈ, কোথায় চোট লেগেছে দেখি?"

বিনয়ের ফাঁদ খুব সফল ফাঁদ। মিনতি কাছে আসতেই সে এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে মিনতির পিঠে ঢিব ঢিব করে গোটাকত কিল মেরে ছুটে পালিয়ে গেল। কি ঘটল বোঝবার আগেই সব শেষ। মিনতির চোখের সামনেই কয়েকটা সদ্য-ব্যবহারের উপযোগী ঢিল ছিল, কিন্তু এখন আর থেকে লাভ কি? হতাশায় ক্ষুব্ধ মিনতি পেয়ারা গাছের তলায় দুখানা পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে লাগল, আর ঐ সঙ্গে প্রতিশোধ পরিকল্পনার একটি নতুন অঙ্কুরকে চোখের জলে ভেজাতে লাগল।

হঠাৎ চমকে উঠল পিছনে শব্দ শুনে। "কিছু মনে করিস না মিনু, পেয়ারাটা পেড়ে আমি তোকেই দিচ্ছি।"

মিনতি তার অত্যন্ত ব্যক্তিগত নিভৃত চিন্তার মধ্যে বিনয়ের এই আচমকা প্রবেশকে সে ক্ষমা করতে পারল না, সে হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, "আমি চাই না পেয়ারা, চাই না, চাই না।" বলেই দৌড়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিনতির কণ্ঠে মিনতি—"সিনেমার দুখানা টিকিট

অফিস থেকে ফেরবার মুখেই কিনে এনো, নইলে আড়ি।"

"টিকিট আমি কালই কিনেছি, মিনু, তোমাকে জানাইনি।"

মিনতির চোখ খুশিতে উজ্জ্বল।

কিন্তু মিনতির মন ক'দিন খুব ভাল নেই। সিনেমা দেখতে গেলেই তার পাশে আরও একটি ছবি তার মনে ভেসে ওঠে। আলোর পাশে একটি আলোহীন ছবি।… এই তো সে দিনের কথা। ঐ রকমই তো ছিল। এখন নেই কেন? বিনয়কে জিজ্ঞাসা করতে যায়, প্রশ্নটা গলা পর্যন্ত ঠেলে ওঠে, কিন্তু কিছুতেই তার বেশি আর ওঠে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিনেমা দেখা শেষ হয়েছে, খাওয়াদাওয়া শেষ। রাত দশটা।

"কি হল, কথা নেই কেন মিনু? রাগ করেছ?"

"হ্যাঁ, রাগ করেছি।"

"রাগ করলে তোমাকে খুব ভাল দেখায়।"

"এমনিতে তো সুন্দরী নই, সেই কথাটা ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে।"

বিনয় মিনতির গণ্ডদেশ ভীষণ টিপে দিয়ে সামনে একখানা আয়না ধরে বলল, "এই দেখ, তুমি যে কত সুন্দর—আয়নাই তার প্রমাণ। ছবির গায়ে টিপসই দিয়ে আমার অঙ্গীকার এঁকে দিয়েছি।"

আয়না ঠেলে দিয়ে মিনতি বলল, "ওসব সেকেলে ঢং রাখ। আগে তো এমন ছিলে না।"

"ক্রমেই বয়স বাড়ছে বোধ হয়।"

"না, টাকা বাড়ছে। টাকার পিছনে ছুটেছ, তাই অন্য দিকে ফেরবার সময় নেই। আর—"

"আর কি?"

"না, থাক।"

"না, বল।"

"একেবারে গোল্লায় গিয়েছ, বলে লাভ কি?"

"তবু বল।"

"সিনেমা দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।"

"ভালবাসার অভিনয় দেখে?"

"না, ভালবাসা দেখে। আগে তুমিও তো ঐ রকম ভালবাসতে।"

মিনতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

"ঐ রকম ভালবাসি এখনও, কিন্তু ঐ রকম ভাষায় প্রেম করার জন্য এক মাস ছুটি নিয়েছিলাম, প্রিভিলেজ লীভ। ওর একটা কথাও আমার নয়। আমি এক কবিবন্ধুকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে ঐ এক মাস ধরে ঝাড়া মুখস্থ বলেছি তোমার কাছে। যা করেছিলাম সবই অভিনয়, নকল। সিনেমাতেও আসল জীবন দেখা যায় না, সেও নকল।"

"তোমার এই কথাগুলোও নকল, মুখস্থ করা, এর একটাও আমি বিশ্বাস করি না।"

মিনতি উত্তেজিত ভাবে সরে গেল।

বিনয় সিগারেট ধরাল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুহাস আর মিনতি মুখোমুখি বসে। দুজনের বন্ধুত্বে নতুনত্বের স্বাদ। সুহাস গদগদ। কিছুদিন থেকেই তবে আজ কিছু বেশি সাহসী। "মিনতি, তুমি এক আশ্চর্য সৃষ্টি!"

"আমি? কি যে বল সুহাস, তোমার বিনুদা যে বলে ঠিক উল্টো।"

"বিনুদা একেবারে গদ্য। একমাত্র টাকার ঝঙ্কারে যেটুকু কাব্য বাজে তার কানে। শেয়ার মার্কেটে শেয়ারের দাম বোঝে, তোমার এ দুটো চোখের দাম সে বুঝবে কি করে মিনতি।"

সুহাস হঠাৎ সুরে বলতে আরম্ভ করল—"ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখী, নয়নে দেখেছি আমি নূতন আকাশ।"

"থাম সুহাস। আচ্ছা পুরুষেরা বুঝি পরের ভাষায় কথা বলে সুখ পায়?"

"এ তো পরের ভাষা নয়। এ ভাষা কবি আমাদেরই জন্য লিখে গেছেন। এ কথা আমাদের সবার কথা মিনতি। এতে সবার অধিকার। কবি ওর স্বত্ব নিজেই যে সব প্রেমিককে বিলিয়ে গেছেন, তা কি তুমি জান না?"

"জানি, জানি। কিন্তু এতদিন তো কেউ এমন ভাবে আমাকে বলেনি, সুহাস। তুমি কি সুন্দর বলতে পার।"

মিনতির হৃদয়ে সমুদ্রের জোয়ার।

সুহাসের চাঁদের মতো বিগলিত দৃষ্টি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"মা, খেতে দাও, ভীষণ খিদে পেয়েছে।"

"এত দেরি কেন রে বঙ্কল? স্কুল থেকে ফিরতে তো তোর এত দেরি হয় না।"

মিনতির একমাত্র পুত্র বঙ্কল। বিজন ভাল নাম।

"একটু ঘোরা পথে আসতে হল, মা। শুভা বলল, ওর সঙ্গে যেতে। ওর সঙ্গীরা কেউ আসেনি আজ স্কুলে। ভারী ভীতু। আমাদের সঙ্গে ক্লাস সেভেনে পড়ে, অথচ"—

"মেয়েটি খুব ভাল না কি?"

"খুব মা। কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছে। বাবা কোথায়?

"কি জানি, আজকাল তো রোজই ফিরছেন দেরিতে। কি যে হয়েছে কে জানে। আজ শনিবার, অনেক করে বলে দিয়েছিলাম অফিস ছুটি দিয়েই বাড়ি ফিরতে। মরুক গে, তুই খেতে খেতে শুভার কথা বলবি, আমি শুনব।"

কত কথা হল। ঝগড়াতেও পটু। দুজনের মধ্যে আড়ি চলে মাঝে মাঝে। অথচ ওর মতো ভাল মেয়ে হয় না।

মিনতি মনে মনে কৌতুক অনুভব করে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত দশটায় মিনতিকে কিছু উত্তেজিত দেখা গেল। "বলি, তুমি কটা বিয়ে করেছ?"

অপরাধীর ভঙ্গিতে বিনয় বলল, "কেন, বল তো মিনু?"

"লোকের মুখে শুনি তুমি সস্ত্রীক গাড়িতে ঘুরে বেড়াও, এমন স্বামী পাওয়া যে কোনো বৌএর সৌভাগ্য।"

"ও, বুঝেছি। আমাদের অফিসের একটি মেয়ের সেদিন ফিট হয়েছিল, তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম। তাই হয় তো কথাটা রটেছে। তোমাকে চিনলে এমন কথা কেউ বলত না।"

"মানে তোমাকে চিনলে। কারণ তুমি আমাকে নিয়ে বেরুচ্ছ না।"

"কাজের চাপ এত—"

"সত্যি কথা। কিন্তু তুমি যে মেয়েটিকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলে সে দিন।"

"না না, ওটা দৈবাৎ। আমরা আলাদাভাবে গিয়েছিলাম, আগে থেকে যুক্তি করে নয়।"

"কিন্তু সে দিন আমি সিনেমায় উপস্থিত ছিলাম। পাশাপাশি বসেছিলে। দৈবাৎ? তারপর গাড়িতে তাকে তুলে নিয়ে গেলে। দৈবাৎ?"

"সব দৈবাৎ, মিনতি। মানে অ্যাক্সিডেন্ট। সংসারে কত রকম অ্যাক্সিডেন্ট যে ঘটে! আবার লোকে দেখ তোমার সম্বন্ধেও বলে। তুমি কি সে দিন সুহাসের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিলে?"

মিনতি পুরো দুমিনিট স্তব্ধ হয়ে থেকে, গম্ভীরভাবে বলল "হ্যাঁ।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"এ কি সুহাস, তোমার এই ছিরি! এতকাল কোথায় ছিলে? আমাদের দাম্পত্য-শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সেই যে তুমি ডুব মারলে আর কোনো খবর নেই। কি ভয়ানক লোক বাবা তুমি। কুড়ি বছর দেখা নেই!"

"ইউরোপে ছিলাম।"

"তাই অনুমান করেছিলাম। বিয়ে করেছ, না?"

"সে তো কবেকার কথা। একটি ইংরেজ মেয়ে—"

"তাও অনুমান করেছিলাম।"

"ওখানেই স্থায়ীভাবে আছি, বাড়ি করা গেছে একখানা।"

"কিন্তু তুমি যে বুড়ো হয়ে গিয়েছ এরই মধ্যে।"

"তা হয়েছি, কিন্তু তোমার চেহারা আগের মতোই আছে দেখছি। সেই চোখ! মনে আছে ঐ চোখেই নতুন আকাশ দেখেছিলাম।"

"ও তো কালো আকাশ। এখন নীল আকাশ পেয়েছ।"

দুজনেই হাসল!

"কিন্তু আশ্চর্য তোমার কালো চোখ। আর দাঁতগুলো এখনও মুক্তার মতো!"

"চোখে ছানি পড়েছে তোমার। বুঝতে পারছ না, দাঁতগুলো সবই বাঁধানো। ভীষণ পাইওরিয়া হল, দাঁতের ডাক্তার সব তুলে দিয়ে নতুন দাঁত দিয়েছে। আর চোখ কাটাতে হবে কয়েক দিন পরেই, ছানি পড়েছে।"

"বল কি! মাঝখানের এতগুলো বছর খেয়ালই নেই।"

"সুখে থাকলে ঐ রকমই মনে হয়।"

"যাক সে কথা। মনিব কোথায়?"

"শখ হয়েছে তীর্থে যাবেন, তাই টিকিটের বন্দোবস্ত করতে বেরিয়েছেন।"

"কোন তীর্থে?"

"লণ্ডন তীর্থে। সেখানে ছেলে-বৌ এক সঙ্গে পড়তে গেছে। আদর্শ-দম্পতি। অতএব ওঁর এখন লণ্ডনই তীর্থ। কি দুর্বলতা হয়েছে ওদের প্রতি।"

"বল কি! তোমার ছেলে হল, তার বৌ হল। ওদের নাম কি?"

"ছেলে বসুল, পোষাকি নাম বিজন। বৌটির নাম শুভা।"

"তুমিও যাচ্ছ?"

"ইচ্ছে করে নয়। আমি বিলেত যাব ভাবতেই হাসি পায়। ওদের ভাষাটাও ভাল জানি না, আদব-কায়দাও না। অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, সেখানে গেলে ওদের স্বাধীনতার আনন্দ নষ্ট হবে, কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওদের প্রতি এমন টান হয়েছে ওঁর। জান সুহাস ওরা যখন যায় এক গাদা উপদেশ টেপ রেকর্ড করে সঙ্গে দিয়েছেন, আমাকে দিয়েও জোর করে কিছু বলিয়ে নিয়েছেন। বলেন, বাপ-মায়ের কণ্ঠ শুনলে ওদের মনটা ভাল থাকবে।"

সুহাস অবাক হয়ে শুনে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"শুভা, মন খারাপ করো না, ডারলিং।"—বিজনের স্বর কিছু জড়িত।

"বাবা মা বড্ড ব্যথা পেয়ে ফিরে গেলেন। তুমি সব-চেয়ে খারাপ করেছ টেপ রেকর্ডগুলো জাহাজ থেকে জলে ফেলে দিয়ে। তোমাকে নিষেধ করেছিলাম। তুমি বললে রাবিশ!"—শুভার স্বরও সামান্য জড়িত।

"ফেলে দিয়ে ঠিকই করেছি।"

"তুমি যেন কেমন বদলে যাচ্ছ। একটুখানি সেন্টি-মেন্টের দাম দিলে না?"

"যত সব ছিঁচ-কাঁদুনে গাধার দল!"

"ও রকম বলো না, বিজন।"

"তুমি আমাকে কোনো উপদেশ না দিলে খুশি হব, শুভা।"

"তুমি সীমা ছাড়াচ্ছ।"

"রাত বারোটায় বাড়ি ফিরে সীমা রক্ষা করছ তুমি।"

"তুমিও খুব যথানিয়মে ফিরছ না, বিজন।"

"তবে কি এমনই চলবে?"

"আপাতত তো চলছে।"

"তুমি বড্ড রেগেছ, ডারলিং।"

"রাগব না তো কি? তবে আপাতত ঘুম পেয়েছে। বড় ক্লান্ত। রাত একটা। ওন্ট ইউ কিস্ মি গুডনাইট?"

দুজনেরই পা টলছিল।

গুডনাইট পর্বের পর দুজন পাশাপাশি দুটি পৃথক ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

শেষ পরিচ্ছেদ

"লিলিয়ান"—

"কি, সুহাস?"

"বিজনকে ডরোথির কাছে আর আসতে দিও না।"

"কেন?"

"বিজন বিবাহিত, তার স্ত্রীও এইখানেই আছে, নাম শুভা।"

"তুমি জানলে কি করে?"

"বিজনই হচ্ছে মিনতির ছেলে। মিনতির কথা তোমাকে বলেছি—She was my first love—তাকেই আমি প্রথম ভালবেসেছিলাম।

শিশুশিক্ষা শিশুসাহিত্য ও জাতির ভবিষ্যৎ

নরেন্দ্র দেব

আজ যারা শিশু, কালে যে তারাই জাতির ভবিষ্যৎ—একথা সবাই জানেন। কিন্তু জানলেও, জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার আমরা কি ব্যবস্থা করেছি?

এক যুগ হয়ে গেল দেশ স্বাধীন হয়েছে। যে সব কারখানা এতদিন উকিল, মোক্তার, কেরাণী ছাড়া আর কিছু তৈরি করে তোলবার অধিকার পাননি, তাঁরা এবার স্বাধীন ভাবে দেশের শিক্ষা পরিচালনার ভার নিজেদেরই হাতে পেয়েছেন।

অথচ, এই বারো বছরের শিক্ষার আওতায় যে সব বারো বছরের ছেলে আজ চব্বিশ বছরের যুবক হয়ে উঠলো, তাদের দিকে চেয়ে কি মনে হয় দেশ এগিয়ে চলেছে?

পরিসংখ্যান বিভাগ হয়ত আমাদের বলবেন যে এই বারো বছরে দেশে কত স্কুল, কলেজ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে দেখ। আগের চেয়ে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা এখন প্রতিশতকের অনুপাতে কত বৃদ্ধি পেয়েছে! এটা কি অগ্রগতির লক্ষণ নয়?

এর উত্তরে একথা স্বীকার করতে পারা যায় যে, হ্যাঁ, কেতাবী লেখাপড়া শেখা লোক বা অক্ষর পরিচয় যুক্ত মানুষের সংখ্যা শম্বুক গতিতে শতকরা কিছু কিছু বাড়ছে বটে, কিন্তু প্রকৃত মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে পারছি কি আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের?

এ জিজ্ঞাসার উত্তর কি? নতমুখে চুপ করে থাকতে হবে। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত ভদ্র-সন্তানেরা অধিকাংশই আজ বেকার, কেন? কারণ, জীবিকা উপার্জনের উপযোগী শিক্ষা দিয়ে আমরা তাদের গড়ে তুলতে পারিনি।

আমি বলতে চাই, লিখতে পড়তে শিখলেই কোনো ছেলে প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে ওঠেনা। তা যদি হ'ত তাহলে দেশের ছেলেরা আজ এমন সব কাজ কখনই করতে পারতো না—যে জন্য তাদের অভিভাবকদের লজ্জা পেতে হয়। আমি এখানে ছাত্রছাত্রীদের অপরাধের তালিকা হাজির করতে চাইনা। ভুক্তভোগী যাঁরা তাঁদের এটা অজানা নয়।

কিন্তু, এজন্য আমাদের ছেলে মেয়েদের আমরা এতটুকু দায়ী করতে পারবোনা। দোষী আমরা অভিভাবকের দল। আর, দোষী আমাদের অন্তঃসারশূন্য সরকারী ও বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা। পরীক্ষায় ছেলে মেয়ে পাশ করতে পারলে কিনা এই খবরটা জানবার জন্য আমাদের উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। কিন্তু, ছেলেটা মানুষ হয়েছে কি বাঁদর হয়েছে সে খোঁজটা রাখার আমরা কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি। ডিগ্রীর মোহই আমাদের পেয়ে বসেছে।

যখন দেখি ছেলেটা মানুষ হয়ে উঠতে পারলে না, তখন আফ্‌শোস্ করি—স্কুলে, মাষ্টারে, বইকেনায়, মাসে মাসে এত টাকা খরচ করলুম তবুও তো ছেলেটার কিছু হল না! অতঃপর, 'যার কিছু হবার নয়, তার কোনো কিছুতেই কিছু হয়না' বলে মনকে প্রবোধ দিই। কিন্তু পাশ করা ছাড়া ছেলেটার আর কোনো দিকে কিছু হয় কিনা সে চেষ্টা কখনো করিনি।

স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। বইপত্র যা যা দরকার সবই কিনে দিয়েছি। দু'বেলা পড়িয়ে যাবার জন্য একটা মাষ্টারও রেখেছি। আর কি করতে বলেন? তবু যদি কিছু না হয় তো সে ছেলের দোষ, স্কুলের দোষ, মাষ্টারের দোষ—আর আমার দুর্ভাগ্যের দোষ! এই বলে শেষ পর্যন্ত মনকে সান্ত্বনা দিই এবং ছেলেকেও অতঃপর তার ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়েই নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকি। কিন্তু, এ কথাটা কোনোদিন ভাবিনি যে স্কুলে থাকে ছেলেরা মাত্র চার পাঁচ ঘণ্টা! বাকি কুড়ি ঘণ্টা কাটে তাদের বাড়ীতেই অথবা পাড়ায়। পাড়া বা বাড়ীর আবহ কি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিয়ম ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেবার উপযোগী?

প্রাচীন ভারতে স্কুল কলেজ ছিল না। তখনকার দিনে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল গুরুগৃহে। সংস্কৃত ভাষাই তখন শিক্ষার বাহন ছিল। শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল দেখা যায় প্রত্যেকের বাড়ীতেই এবং বাড়ীর আবহাওয়াও ছিল সেকালে তার অনুকূল। যতদূর জানা গেছে বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশই' ছিল সেকালে শিশুশিক্ষার প্রধান পাঠ্য। 'মিত্রলাভ' 'সুহৃদ্ভেদ' 'বিগ্রহ' ও 'সন্ধি' এই চারটি বিষয়কে ভিত্তি করে পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা এই গ্রন্থে গল্পের আকারে যে সব নীতিকথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তা থেকে অনেকেই অনুমান করেন যে তিনি ছিলেন কোনও রাজপরিবারে নিযুক্ত গৃহ-শিক্ষক পণ্ডিত। অথবা নিজেই একজন উচ্চশিক্ষিত নৃপতি, যিনি আপন পুত্রগণের সুশিক্ষার জন্য স্বয়ং ছেলেদের পাঠোপযোগী এই নীতিগ্রন্থ ছদ্মনামে প্রণয়ন করেছিলেন। 'পঞ্চতন্ত্র'ই এই অনুমানের প্রধান কারন। পঞ্চতন্ত্রে তিনি গল্পের মাধ্যমে রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি প্রভৃতি রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারের সন্নিবেশ করেছেন। এসব বিষয়ে শিক্ষালাভ রাজার ছেলের পক্ষে যতটা প্রয়োজন, গৃহস্থ পরিবারের ছেলেদের পক্ষে ততটা নয়।

বাংলা ভাষায় যখন শিশুশিক্ষার উপযোগী শিশুপাঠ্য গ্রন্থের প্রয়োজন উপস্থিত হল তখন বাংলা ভাষায় সেরূপ কোনও পুস্তক না থাকায় বিষ্ণুশর্মার ওই 'হিতোপদেশ' আর 'পঞ্চতন্ত্র'ই বাংলা ভাষায়

অনূদিত হয়ে সেদিন শিশুপাঠ্য গ্রন্থের, এমন কি শিশুসাহিত্যেরও স্থান অধিকার করেছিল।

এর বহু পরে আমরা পাই, বটতলা থেকে প্রকাশিত 'শিশুবোধক'। সেকালে 'শিশুবোধক' নানা বিষয়ে শিক্ষার সঙ্গে শিশুদের মনোরঞ্জনেও সমর্থ হয়েছিল। এর প্রমাণ আমি দিতে পারি, কারণ আমাদের শিশুকালে আমরা ওই বই পড়েই বড় হয়েছি। সেই "বন্দমাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি" মকরবাহিনীর গঙ্গার উডরক করা চিত্রের নিচে দেবী সুরধুনীর এই সুমধুর বন্দনা আমরা আজও ভুলিনি। সেই ষণ্ড-অমর্কের চিত্তাকর্ষক কাহিনী আজও মনে আছে। 'দাতাকর্ণের' উপাখ্যান পড়তে পড়তে বৃষকেতুকে বলি দেবার সময় আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ওপর যে কী রাগ হ'ত তা বলা যায় না! শৈশবে অনেক কিছু ভাল শেখবার মতো গৃহের পরিবেশও ছিল।

এরপরই অবশ্য আমরা ডবল প্রোমোশন নিয়ে একেবারে কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আর কাশীরামদাসের অষ্টাদশপর্ব মহাভারতের পৌরাণিক যুগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেম! শিশুশিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করার পক্ষে আদর্শ বই বলা চলে 'শিশুবোধক'কে। কারণ, ওর মধ্যে ছেলেদের শিক্ষণীয় নানা বিষয়ের সমাবেশ ছিল। যা' পরবর্তীকালের 'শিশুশিক্ষা, 'কথামালা' 'বোধোদয়' বা 'চারুপাঠে' ছিলনা। বর্তমান কালেও নেই। তখন ওই একখানা বই পড়েই আমরা যা শিখতুম এখন দশখানা বই পড়েও তা শিখিনি।

শুষ্ক নীরস পাঠ্যপুস্তকের উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধাদির প্রতি শিশুদের মনোযোগের বড়ই অভাব দেখা যায়, অথচ গল্পচ্ছলে লেখা সরল, সচিত্র নীতিগ্রন্থ তারা আগ্রহের সঙ্গেই পড়ে দেখি। 'বোধোদয়ের'—পদার্থ কয় প্রকার? প্রশ্ন শুনলেই তাদের কচি মুখগুলি দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ হ'য়ে ওঠে! কিন্তু, কথামালায় যখন পড়ে ধূর্ত শৃগালের নিমন্ত্রণে এসে সারস পাখী কি ভাবে ঠকে গিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিল, তাদের মুখে হাসি ফোটে?

শিশু মনস্তত্ত্বের এ পরিচয় অবগত হবার পর থেকেই পাঠ্য পুস্তকের রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। শিশু সাহিত্যেরও প্রায় গোড়াপত্তন হয় এই সময় থেকেই। ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুসি' 'খুকুমণির ছড়া' দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি' অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল, শিশু, রবীন্দ্রনাথের 'শিশু ভোলানাথ' প্রভৃতি বইগুলি এসে, 'শিশুবোধক' শুধু নয়, পণ্ডিত মদন মোহন তর্কলঙ্কারের 'শিশু শিক্ষা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' বোধোদয়' অক্ষয় কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' প্রভৃতি তখন থেকে কেবল মাত্র পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। শিশু সাহিত্যের আসরে তাদের আর আসন মেলেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর নব্য ইংরাজী-শিক্ষিত মনীষীরা ছেলেদের জন্য রচিত ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে বাংলাভাষায় প্রথম শিশু-সাহিত্য সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। 'ভাহুয়কো নামঃ সিংহ' এবং 'পাপবুদ্ধি ও ধর্মবুদ্ধি'র সংসর্গ ছেড়ে 'ঈশপস্ ফেবল্‌স,' 'গ্রীমস্ ফেয়ারী টেলস' ইত্যাদি অবলম্বনে শিশু পাঠ্য পুস্তকগুলি ক্রমেই বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে শুরু করে।

এখনকার ছেলেমেয়েদের সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষা হয়। আমাদের শিশুজগতে উপেন্দ্র কিশোর বা কুলদা রঞ্জন রায় ছিলেন না, সুকুমার রায় বা সুবিমল রায় উদয় হননি। সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র কুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন না। যামিনী সোম বা সুখলতা রাওকে আমরা আমাদের শৈশবে পাইনি। তখন ছন্দ-জাদুকর সুনির্মল বসু আসেননি। মৌমাছির 'আনন্দমেলা' বসেনি, স্বপন বুড়োর 'ছোটদের পাততাড়ি 'পাতা হয়নি।

ছেলেমেয়েদের উপযোগী নানা সচিত্র সাময়িক পত্রপত্রিকার আজ আর কোনও অভাব নেই। আমাদের ছোট বেলায় আমরা পেয়েছিলুম কিছুদিনের জন্য 'সখা', কিছুদিনের জন্য 'সাথী', কিছুদিনের জন্য 'বালক', তারপর 'মুকুল'। তারপর মিলিত 'সখা ও সাথী'। কিন্তু, এরা কেউই দীর্ঘজীবী হ'তে পারেনি। কারণ, আমাদের দেশে সেদিনের অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের জন্য এই সব সাময়িক পত্রপত্রিকা যে কত বেশি প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি।

এরপর শুরু হয়ে যায় এ যুগের সাময়িক পত্র পত্রিকার প্রাঙ্গণে একেবারে রাজসূয় যজ্ঞ! পরপর দেখা দেয় 'সন্দেশ' 'মৌচাক' 'শিশুসাথী' খোকাখুকু, রামধনু, রংমশাল, জলছবি, খেলাঘর, ভাইবোন, কিশলয়, মাসময়লা, পাঠশালা, ধ্রুব, রবিবারের ছুটি, রবিবার, কিশোর এশিয়া, 'শুকতারা', 'আমাদের ছেলে মেয়ে' ইত্যাদি আরও কত কি, এর কোনওটি ছিল মাসিক, কোনওটি পাক্ষিক, কোনওটি বা সাপ্তাহিক। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ছেলেদের জন্য একখানি দৈনিক পত্রিকাও প্রকাশ করে ছিলেন। কিন্তু, এতগুলি শিশু সাময়িকপত্রের মধ্যে 'মৌচাক' 'শিশু সাথী' 'পাঠশালা' 'শুকতারা আর 'রামধনু' ছাড়া আর কেউই দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারেনি।

আজ কাল ছেলেমেয়েদের জন্য বিবিধ 'বার্ষিক পত্রিকা'ও প্রকাশ হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন 'মৌচাক' সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার। ইনিই প্রথম বাংলা দেশে 'রংমশাল' নামে 'পূজা বার্ষিকী' প্রকাশ করে ছেলেদের মুখে উৎসাহের হাসি ফুটিয়েছিলেন। এর পরে আবার, 'নববর্ষ', 'পৌষালী', 'চৈতালী' প্রভৃতি পার্বণেও ছেলে মেয়েদের জন্য বার্ষিক বেরুতে শুরু হয়েছিল। এখন আর হয় না। ছেলে মেয়েদের জন্য এখন কেবল:তিনচার খানি পূজাবার্ষিকীই টিকে আছে। ছোটদের জন্য আজকাল আরও কত রকম সচিত্র রঙীন চিত্তাকর্ষক বই সারা বছর ধরেই বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রকাশকেরা প্রকাশ করছেন। রূপকথা, গল্প, উপন্যাস, গাথা, কবিতা, নাটক, রূপক, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ঐতিহাসিক কাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী, জীবজন্তুর কথা, বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী, সমুদ্র, আকাশ, পাতাল, দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প, এমনকি, চোর ডাকাত, খুন জখম, ইত্যাদি গোয়েন্দা কাহিনী আর ভূত প্রেতের বীভৎস গল্প ছেলেদের জন্য অজস্র ছাপা হচ্ছে এখন। এতে বাংলার শিশু সাহিত্য সমৃদ্ধ হচ্ছে নিশ্চয়।

কিন্তু, ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের আয়োজনে এরা কতটুকু কাজে লাগছে সে চিন্তা ও সে বিচার করবার সময় এসেছে আজ।

শিশুশিক্ষা ও শিশুসাহিত্যের এই সব নিদর্শন আমাদের কাছে এই তথ্যটাই আজ সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত করেছে যে পাঠ্য পুস্তকের উপদেশাত্মক শুষ্ক প্রবন্ধ নিবন্ধ অপেক্ষা সরস ও চিত্তাকর্ষক কাহিনীর অন্তর্নিহিত সহজ শিক্ষাই, তারা সহজে ও সানন্দে গ্রহণ করে। 'কুজ্ঝটিকা' 'পর্যুদস্ত' বানান করতে বললে ছেলে বেলায় আমাদের মুখ শুকিয়ে উঠতো, আজও যে সঠিক লিখতে পারবো সে ভরসা নেই। কিন্তু, প্রথমভাগে পড়া সেই 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' আজও মুখস্থ আছে।

শিশু মনের এই কাব্যপ্রীতির রহস্য অঙ্কশাস্ত্রবিদ শুভঙ্কর জানতেন। জানতেন যে এই নীরস কঠিন সংখ্যাতত্ত্বকে ছন্দোবন্ধনে বেঁধে কবিতার আকারে পরিবেশন করতে না পারলে ছেলেরা এর কাছে ঘেঁষতে ভয় পাবে এবং এর হিসাবটাও সহজে আয়ত্ত করতে পারবেনা। তাই গণিতের বই শুভঙ্করী খানা তিনি আগাগোড়া কবিতায় লিপিবদ্ধ করে নিয়ে এলেন। "কুড়্‌বা কুড়্‌বা কুড়্‌বা লিজ্জে, কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে" শুভঙ্করের ছাত্রেরা তাই আজও কেউ ভোলেনি।

আমাদের মনে আছে যাট পঁয়ষট্টি বছর আগে কি আনন্দেই না দুলে দুলে আমরা সুরকরে পড়তুম 'রাতি পোহাইল উঠ প্রিয়ধন, কাক ডাকিতেছে করয়ে শ্রবণ।" অথবা, স্কুল থেকে বাড়ী ঢুকেই উচ্চকণ্ঠে বলতুম "কি খাব মা! কি খাব মা! বড় ক্ষুধা পেয়েছে?" অনেকে গদগদ কণ্ঠে আওড়াতো "রামেদের বুধিগাই প্রসব হইল, রাম শ্যাম দুই ভাই দেখিতে আসিল!" পণ্ডিত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও মনোমোহন বসুর 'পদ্য মালা' ও 'পদ্য পাঠ' বই দুখানির শিশুমহলে ছিল জয় জয়কার। অতি শৈশব থেকেই মা ঠাকুমাদের মুখে 'ঘুমপাড়ানি গান' 'ছেলে ভুলোনো ছড়া' প্রভৃতি শুনে শুনে স্বভাবতঃই আমরা হ'য়ে উঠেছিলাম ছন্দলোভী ও গদ্যভীরু। ছড়া-ছবির বই তাই সব দেশেই আজও বাচ্ছাদের অত্যন্ত প্রিয়।

শিশু মনস্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বর্তমান জগতে শিশু শিক্ষার নানা নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রচলিত হচ্ছে। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জার্মানী থেকে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। এর উপকারিতা বিশ্বে স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার 'মন্টেসরি' শিক্ষা পদ্ধতির প্রসার ও প্রতিপত্তি সর্বদেশে বিস্তৃত হয়েছে। শিক্ষার নবনব ধারার প্রগতিশীল পদ্ধতি অনুসারে ইউরোপে আধুনিক শিশুসাহিত্যের ও শিশুশিক্ষার গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হ'তে শুরু হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা বয়স ভেদে তাদের পাঠক্রম নির্ধারিত হচ্ছে।

কিন্তু আমাদের দেশের শিশুশিক্ষা ও শিশুসাহিত্যের প্রগতি এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসেও ইউরোপের উনবিংশ শতাব্দির পঠন-পাঠনেরও নাগাল ধরতে পারেনি। তার কারণ, আমাদের দেশের শিশুদের গড়ে তোলবার চেষ্টা সরকারি ভাবে তো কোনও কালেই হয়নি, বেসরকারি ভাবেও কোনদিন এবিষয়ে পুরোপুরি মনোনিবেশ করিনি আমরা। পৌনে দুশো বছরের ইংরাজ শাসনের ফলে এদেশে শিক্ষার প্রসার শতকরা সাত জনের বেশি লোকের মধ্যে যায় নি। কোনও রকমে শুধু লিখতে বা কেবলমাত্র নাম সই করতে ও বানান করে কয়েকটা শব্দ পড়তে পারে—এমন লোকের সংখ্যাও শতকরা পাঁচ সাত জনের বেশি হবেনা। বিদেশী শাসকেরা অধীন দেশের অধিবাসীদের বেশি লেখা-পড়া শেখার সুযোগ দেয়নি এটা তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। যেটুকু করেছিল সে শুধু তাদের রাজ্য রক্ষা ও শাসনকার্য পরিচালনার খাতিরে।

এটা না হয় আমরা বুঝি। কিন্তু, আজ বারো বছরের উপর হল দেশ স্বাধীন হয়েছে। ছেলেদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নতির কী চেষ্টা স্বাধীন ভারত-সরকার বা রাজ্য-সরকার করেছেন? তাঁরা সর্বাগ্রে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে পড়লেন। প্রাথমিক শিক্ষা রইলো অবহেলিত হয়ে একপাশে পড়ে। আজও যে কত দরিদ্র ছেলে মেয়ে, শিক্ষা দূরে থাক, অন্নাভাবে পথে পথে নগ্নগাত্রে ভিক্ষা মেগে ঘুরে বেড়ায়—এ দেখে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র এবং দেশের লক্ষপতি ধনীরা কেউই লজ্জাবোধ করেন না। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার গোড়া ফেলে আগায় জল ঢালতে শুরু করলেন। ভিত রয়ে গেল কাঁচা ও পল্‌কা। তারই উপর একাদশবর্ষীয় মান, সেকেণ্ডারি, ও প্রাক্‌বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার গাঁথনি চাপাতেই ধ্বসে পড়তে লাগলো সে ইমারত। শতকরা পঞ্চাশটা ছেলে মেয়েও এ অপার শিক্ষা-জলধি পার হয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বন্দরে গিয়ে পৌঁছতে পারছে না। পরীক্ষার উত্তর পত্রে পাঁচ থেকে আট নম্বর 'গ্রেস' দিয়েও নয়। গোড়া আলগা রেখে আগায় গিয়ে জল ঢালতে গেলে এই রকম বিপরীত অবস্থাই দাঁড়ায়।

বাচ্ছাদের রসনা পরিতৃপ্তির প্রলোভনের মতই তাদের মনের ক্ষুধা ও জ্ঞানের আকাঙ্খাও অত্যন্ত প্রবল। কেন যে তারা চিড়িয়াখানা ও জাদুঘর দেখতে যাবার বায়না ধরে, সার্কাস ও সিনেমা যাবার আব্দার করে, বাজনা বাদ্যির আওয়াজ কানে এলেই ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে পড়ে বা রাস্তায় নেমে আসে, এ নিয়ে আমরা কেউই মাথা ঘামাইনি। শুধু ভৎর্সনা করে বলি "যা বাড়ীর ভিতর যা! ঘরে ঢুকে পড়তে বোসগে। নইলে মেরে হাড় গুড়ো ক'রে দেব।", আমরা কেউই ছেলে-মেয়েদের চরিত্রের এই বিশেষত্বটা নিয়ে একটুও ভেবে দেখিনি। অথচ এটা দেখা, ভাবা ও জানা শিশুদের মানুষ করে তোলার পক্ষে প্রত্যেক অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য।

পুষ্টিকর খাদ্য যেমন শিশুর দেহের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি শিশুর মনের উপযোগী প্রয়োজনীয় খাদ্যও তাদের সরবরাহ করা অভিভাবকদের অত্যাবশ্যক কর্ম। কেবলমাত্র স্কুলপাঠ্য কেতাবে শিশুরা তাদের মনের উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য খুঁজে পায় না। সে আহার্য তাকে যোগাতে পারে একমাত্র সুসমৃদ্ধ শিশুসাহিত্যের পাঠাগার, প্রখর বুদ্ধির পরিপোষক ও স্বাস্থ্যের অনুকূল খেলাধূলা, আর, মাঝে মাঝে ছুটি-ছাটা উপলক্ষে দেশ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এসব কোনও ব্যবস্থাই

নেই। স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকার দেখি, আজ দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যেও দেশের শিশুদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। দু'চারটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন 'মণিমেলা' 'পাত তাড়ি' 'বালকানজিবাড়ি,' 'ডানপিটের আসর' প্রভৃতি এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গতি খুবই কম। সুতরাং, কতটুকুই বা করতে পারছেন? তাঁদের প্রচেষ্টা অনেকটা যেন সমুদ্রে পাদ্যঅর্ঘ্য।

বিশুদ্ধ আলো, বাতাস, খাদ্য ও পানীয় যেমন শিশুদের সুস্থ, সবল, পুষ্ট ও প্রাণবন্ত করে তোলে, শিশুরঞ্জন সুকুমার সৎসাহিত্যও তেমনি শিশুর সকল প্রকার মানসিক উন্নতি ও কল্যাণ বুদ্ধিকে অগ্রগামী ও জাগ্রত করে তোলার পক্ষে সবিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু কোথায় সে আয়োজন আমাদের দেশে? শিশুদের মানুষ করে তোলার দায়িত্ব নিতান্ত সহজ নয়। শৈশব থেকে বাল্য, বাল্য থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনাবধি তাদের প্রতি সযত্ন ও সতর্ক দৃষ্টি রেখে তাদের সকল দিক থেকে মানুষ করেগড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সর্ববিষয়ে যথাযোগ্য শিক্ষাই শিশুদের ভবিষ্যৎ মানুষ করে গড়ে তোলার প্রধান সহায়।

আবার এই যথাযোগ্য শিক্ষা নির্ভর করে যথার্থ শিক্ষিত ও আদর্শ চরিত্র, স্বজাতিবৎসল এবং দেশপ্রেমিক শিক্ষকদের উপর। সৌজন্য, শিষ্টাচার, সংযম, মনের বলিষ্ঠতা, চরিত্রের দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, ঔদার্য, উচ্চ আদর্শের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, ন্যায়, ধর্ম, ও নীতিবোধ, জীবে দয়া, দুঃস্থের সেবা এবং জন্মভূমির প্রতি প্রেম এ সবই শিশুরা অর্জন ক'রে শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে উঠতে পারে, যদি আশৈশব সুশিক্ষার সুযোগ পায়। কিন্তু, কোথায় আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের সে সুযোগ?

আমাদের দেশের সুকুমারমতি ছেলেমেয়েদের মানুষ করে গড়ে তোলার ও শিক্ষার ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত সেই প্রাথমিক শিক্ষালয়ের শিক্ষকগণ নিজেরাই শিক্ষার সুযোগ পেয়ে মানুষ হয়ে উঠতে পারেন নি! অতি সামান্য বেতনে কেবলমাত্র জীবিকা অর্জনের তাগিদেই তাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে বাধ্য হন! চিরাচরিত গতানুগতিক পথে চলা ছাড়া বর্তমান বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতির কোনও হদিসই জানেন না তাঁরা। আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলতে হয় তাঁদের। নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ও কর্মনিষ্ঠ থাকা সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে। কাজেই, দেশের ছেলেরাও মানুষ হ'য়ে উঠছেনা। সরকারি শিক্ষা বিভাগ অর্থাভাবের অজুহাতে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে আছেন।

কেবল মাত্র স্কুলপাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে রুটিন অনুসারে ক্লাশ চালু রাখতে পারলেই মূলশিক্ষা ও জাতিগঠনের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ছেলে-মেয়েদের একটু স্কুলের চৌহদ্দীর বাইরের পড়াশোনা শেখাবার চেষ্টা করাও দরকার। সুতরাং খেলাধুলা প্রভৃতি ব্যায়ামের উৎসাহ দিতে হবে, পাঠ্য পুস্তকের বাইরের পড়াও তাকে পড়বার সুযোগ দিতে হবে। হাতে কলমে কাজ শেখবার সুযোগ সুবিধাও তাদের থাকা দরকার। এ সব ব্যবস্থা না করতে পারলে কেবল স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়ালেই জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবেনা। ছেলে মেয়েরা কোনও দিনই মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না।

এখনও এমন অভিভাবক অনেক আছেন, যাঁরা ছেলেমেয়েদের পড়ার বই ছাড়া অন্য বই পড়তে দেখলে কঠোর তিরস্কার করেন। অথবা, পড়া ফেলে তারা ছুরি কাঁচি নিয়ে একটা কিছু খেলনা তৈরি করবার চেষ্টা করছে দেখলে তাঁরা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। অভিভাবকদের মধ্যে অধিকাংশেরই এই ভুল ধারণা আছে যে ওসব নাকি বাচ্ছাদের মূল্যবান সময়ের অপব্যয় মাত্র! কিন্তু তা যে একেবারেই নয়, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলুম কিছুদিন আগে ইউরোপের কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখে এসে। তাঁরা সেখানে বাচ্ছাদের মধ্যে যার যেদিকে মনের প্রেরণা—তাকে সেই দিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেন।

আমাদের দেশে এতদিন পরে মাল্‌টি-পারপাস শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান' প্রবর্ত্তিত হচ্ছে। আশার কথা। কিন্তু, আবার বলবো—গোঁড়া কাঁচা থাকলে কিছুই হবে না। প্রাথমিক শিক্ষার দিকেই সর্বাগ্রে নজর দিতে হবে এবং সেখানে উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগও একান্ত প্রয়োজন। মোটা মাইনের রাজকর্মচারীদের নিয়োগ করতে আমরা কাতর নই, কিন্তু, শিক্ষকদের বেলা তাঁরা যাতে দু'বেলা পেটভরে খেয়ে পরে বাঁচতে পারেন তার উপযুক্ত বেতন দিতে কৃপণতা করি। তার ফলে অযোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকার অধীনে দেশের ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রায় অসম্পূর্ণই থেকে যাচ্ছে। ফলে, মাধ্যমিক শিক্ষাতেও তাদের ব্যর্থতার সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় গোড়া মজবুদ করে গড়ে তোলা। ইউরোপের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি দেখে এলুম—অনেক আগে থেকেই এদিকে দৃষ্টি দিয়েছে। সেখানে উকীলের ছেলেকে উকীল করা, আর ডাক্তারের ছেলেকে ডাক্তার করা বা ইঞ্জিনীয়ারের ছেলেকে ইঞ্জিনীয়ারই করে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করা হয় না। ছেলেমেয়েদের নিজ নিজ মনোমত স্বাধীন শিক্ষার প্রবণতাকে সেদেশে যথেষ্ট উৎসাহ ও সুযোগ দেওয়া হয়। সেখানে শিক্ষকেরা সকলেই সুযোগ্য। যদিও বেতন তাঁরাও খুব বেশি পাননা, তবে আমাদের দেশের মতো তাঁদের 'হাতে পাতে' জব্দ হয়ে থাকতে হয়নি। তাঁরা যা পান তাতে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকা চলে, যা এদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের ভাগ্যে কোনওকালেই জোটে না। স্বাধীন সরকারের অধীনে কোনওদিন জুটবে কিনা জানিনা।

শিশুদের শিক্ষার জন্য শিশুপাঠ্য পুস্তক ও শিশুসাহিত্যও এমন ভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন—যা উত্তরকালে তাদের জীবনের আদর্শ নির্ব্বাচনে সাহায্য করতে পারে। তার শিশুচিত্তের অন্তর্নিহিত চিন্তা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে। তার মনন-ক্ষমতাকে বলিষ্ঠ ও ও সম্যক বিকশিত করে তুলতে পারে। তার চরিত্র ও প্রকৃতিকে দৃঢ়, উদার, মহৎ ও সত্যনিষ্ঠ করে গড়ে তুলতে পারে। তার চিত্তে সাহস, মনে বল ও নিজের ওপর একটা অটুট বিশ্বাস এনে দিতে পারে। জাতি গঠনের প্রথম সোপান এই। এই প্রাথমিক কর্ত্তব্যে অবহেলা করে, যে দেশের

জাতীয় সরকার মগডালের প্রসাধন সাধনে তৎপর হয়, তাদের জাতীয় বৃক্ষটি একদিন শুকিয়ে ওঠেই। ছেলেরা মানুষ হয় না।

শিশুদের শিক্ষার সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ না থাকলে শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ছেলেমেয়েদের যে মানুষ করে গড়ে তোলা যায় না, একথা পূর্ব্বেই বলেছি। সুতরাং, পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে শিশু-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনেও শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক মাত্রেরই যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এজন্য সরকারি তাগিদ থাকা যেমন প্রয়োজন, আর্থিক বদান্যতারও ততোধিক প্রয়োজন। কিন্তু, আমাদের সেদিকে দৃষ্টি কই? কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার নিয়ম রক্ষার মতো যেটুকু করছেন সে অনেকটা যেন সেই থুতু দিয়ে ছাতু গুলে খাবার হাস্যকর প্রচেষ্টা! তাই হচ্ছেওনা কিছু?

রূপকথার রাজ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হওয়ায় আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা একটু বেশি কল্পনাবিলাসী ও ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে। পরীক্ষায় ফেল ক'রে বিষ খেয়েছে বা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে—এ ব্যাপার পৃথিবীর আর কোনো দেশের ছেলেমেয়ের ইতিহাসে খুঁজে পাবে না। তাদের শেখানো হয় 'ট্রাই এগেন!' আবার চেষ্টা করো। একবার পারোনি, দুবার পারোনি, লজ্জা কী? তিনবারের বার নিশ্চয়ই পারবে। ছেলেমেয়েদের কোনো কারণেই নিরুৎসাহ করেন না তাঁরা। এমনি করে শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তুলতে না পারলে জাতির ভবিষ্যৎ—মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সাধ্য নয় যে, খাড়া ক'রে তোলেন। ও কেবল মনকে চোখ ঠারা!

কিভাবে ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে তারা সুস্থ সবল সাহসী নিরলস ও অকাতকর্মী হয়ে ওঠে, এবং লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার্জ্জনের পথটি বেছে নিতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিকে ঢেলে সাজতে হবে। দেশের ছেলেমেয়েরা যে পর্যন্ত না আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হয়ে উঠতে পারে ততদিন জাতির ভবিষ্যৎ মেঘাচ্ছন্ন থাকবেই। গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতিও সে অবস্থায় ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। 'এ্যাডল্ট ফ্রানচাইজ' বা সাবালকের দেশশাসনে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার, অনধিকারীদের হাতে পড়ায় দেশ আজ বহু দলে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে। অযোগ্য লোকেরা নির্বাচিত হবার সুযোগ পাওয়ায় শাসন কার্য আজ বিশৃঙ্খল ও দুর্নীতিপ্রবণ হ'য়ে উঠেছে। একে বলে—গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! আমাদের সরকার সেই অবস্থায় পড়ে একেবারে যেন দিশেহারা হয়ে গেছেন। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিবাস ফেলে সর্বাগ্রে সকলে যন্ত্রশিল্প নিয়ে মেতে উঠলো!

এই সমস্ত কিছু অনর্থের মূলে দেশবাসীর শিক্ষার অভাব এবং চরিত্র সংগঠনের ত্রুটিই প্রধান। আমরা সে শিক্ষা আজও আমাদের ছেলেমেয়েদের দিতে পারিনি—যাতে তারা বিপদকে তুচ্ছ করে কঠিন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহসী হয়। অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে ভয় না পায়। নব নব মেরু সুমেরু আবিষ্কারে অজানা দিকে পা বাড়াতে নিঃশঙ্কচিত্ত হ'তেপারে। গৌরীশৃঙ্গ অভিযানে এগিয়ে যেতে পারে যেন। আত্মপ্রত্যয় ও স্বীয়শক্তির উপর অটুট নির্ভরতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তাদের মনে। দৈবকৃপার উপর একান্ত নির্ভর-শীলতা থেকে তাদের পরিত্রাণ করতে হবে। নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে সে যেন সর্ব ব্যাপারেই এগিয়ে চলে। সর্বপ্রকার ভয় থেকেই তাকে মুক্ত করে তুলতে হবে। তারা যেন আর কোনো ব্যাপারে কেবল মাত্র ভাগ্যের প্রসন্নতার উপর ভরসা রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে না থাকে। তারা যে ইচ্ছা করলে স্বাধীন ভাবে অনেক কিছু করতে পারে, ভাগ্যকে জয় করা যে তাদের সকলেরই সাধ্যায়ত্ত—এই নূতন শিক্ষাই দিতে হবে তাদের এখন থেকে। তবেই জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে দৃঢ় ভিত্তির উপর।

ভূতপ্রেতের গল্প ছোটদের একেবারেই শোনানো উচিত নয়। যাতে তারা শিশু কাল থেকেই ভীরু না হয়ে ওঠে এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধি ও শক্তির দিক থেকে মানুষ যে সকলের চেয়ে বড়, কলকব্জা, যন্ত্র পাতি, যান বাহন, জল বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পরমাণবিক শক্তি সব কিছু সে কি ভাবে বিজ্ঞান বলে নিজের করায়ত্ত করতে পেরেছে, আকাশে, ভূগর্ভে, সমুদ্রতলে তার অবাধ গতিবিধির বিজয় বার্তা শিশুদের শোনাতে হবে। তারা যেন কোনোদিন কোনো কারণে নিজেদের অপদার্থ না মনে করে। সোভিয়েৎ দেশের পাইরোনীয়ারদের গল্প শুনিয়ে বল বুদ্ধি ও ভরসা দিতে হবে যে ছেলেরা ফেলনা নয়। তারাও চেষ্টা করলে বড়দের মতো সব কিছু কাজই করতে পারে। তবেই তারা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে।

অনেকের ধারণা শিশুদের উপযোগী সাহিত্য রচনা করা খুবই সহজ। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে প্রকৃত পক্ষে এর চেয়ে বড় দায়িত্ব ও কঠিন কর্ত্তব্য আর কিছু নেই। তাঁদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে ভবিষ্যৎ জাতির চরিত্র দৃঢ় করে গড়ে তোলবার অনেকখানি ভার তাঁদেরই উপর রয়েছে। শিশুদের ছেলেবেলা থেকেই শোনাতে হবে—প্রাচীন ও আধুনিক জগতের ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা, মহাপুরুষদের জীবনী, দেশবিদেশের ভ্রমণ কাহিনীর ভিতর দিয়ে চিত্তাকর্ষক ভৌগলিক পরিচয়, বিবিধ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও শিল্পকলার বিবরণী এই ধরণের শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই শিশুশিক্ষা শিশু সাহিত্য ও জাতির ভবিষ্যৎ সার্থক সুন্দর ও যুগোপযোগী হয়ে উঠবে।

সুলতা বল্লে, আমার তালিকাটা একটু বড় হবেই।
—আমার তালিকাটাই বা ছোট হবে কেন? টিপ্পনী কাটে সুজন।

কথা কাটাকাটি সুরু হয়েছিল—ওদের পঞ্চম বিবাহ-বার্ষিকীতে কাদের কাদের নেমন্তন্ন করা হবে তাই নিয়ে।

প্রতি বছরই ওদের এম্‌নি খুন্‌সুটি দিয়ে নিমন্ত্রিতের ফর্দ্দ তৈরী সুরু হয়।

তিন জাতীয় মানুষ এই উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রথম হচ্ছে সুলতা যাদের সঙ্গে পড়েছে, যাদের সঙ্গে চাকরী করেছে—তাদের একটা দল; সুজনের বন্ধু-বান্ধব হচ্ছে দ্বিতীয় দল, আর সুলতা সুজন উভয়ের পরিচিত দম্পতিরা হচ্ছে তৃতীয় দল। এই তিনদলের হট্টগোলে প্রতিবছর ওদের বিবাহ-বার্ষিকী মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়।

আর হবেই বা না কেন?

সুজন আর সুলতা দুজনেই ভালো চাকরী করে। বিয়ের পর অন্যান্য বাড়ীর মতো বৌ চাকরী ছেড়ে দেয়নি। আর সত্যি কথা বলতে কি—সুলতা বাড়ীর বৌ হবার সুযোগ পেলো কখন? দেবা আর দেবী নিয়ে ওদের দু'জনের সংসার। এখনো সুলতার কোলে কেউ আসে নি। তাই বিবাহ-বার্ষিকীর আয়োজন করে ওরা প্রতি বছর বিয়ের আমেজটাকে বাঁচিয়ে রাখে। ওই একটা দিন সহপাঠিনী, বান্ধবী আর সইয়ের দল এসে সুলতাকে চন্দনে সাজিয়ে দেয়। ফুলের গয়নায় সুন্দরতর করে তোলে ওর সুন্দর তনু। একটু বয়েস হলেও সাজালে পরে সুলতাকে ঠিক বিয়ের কনের মতোই দেখায়। আটো-সাটো বাঁধুনি দেহের, মুখখানি ঢলঢলে, আর চোখ দুটি টানা টানা। বান্ধবীরা যখন ওকে বেনারসী পরিয়ে খাটের ওপর পটের বিবির মতো সাজিয়ে রাখে তখন লজ্জায় সুলতা সাম্‌নের ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে তাকাতে পারে না। সত্যি, ও যে এত সুন্দর—সে কথা একটা দিন সে বুঝতে পারে।

সেই একটা দিনের জন্যে সে সারা বছর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দিন গোনে। ক্যালেণ্ডারের পাতায় লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে রেখে দেয়।

বন্ধু-বান্ধব আর পরিচিতের মহলে সবাই বলে সুজন-সুলতার মতো সুখী দম্পতি এ যুগে চোখে দেখতে পাওয়া যায় না।

সুলতার সখিবৃন্দ

এমন নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট সংসার, এমন মনের মিল, এমন অবিচ্ছিন্ন শান্তি—ওদের জানাশোনা আর কারো বাড়ীতে নাকি খুঁজে পাওয়া যায় না। শুনে শুনে সুলতার মুখ-চোখ হাসিতে ভরে ওঠে!

সুলতার বান্ধবীদের মধ্যে অনেকে ওদের ফ্ল্যাটে বেড়াতে আসে। যাদের বয়েস হয়ে গেছে, অথচ এখনো বিয়ের ফুল ফোটেনি—তারা সুলতাকে আড়ালে ডেকে বলে, বিয়ে যদি করতে হয় ত' এমনি শান্তির নীড়ের লোভেই রাজি হতে পারি। মাথার ওপর শ্বশুরের রাঙা চোখ নেই; নেই শ্বাশুড়ীর শাসন; দিন রাত গঞ্জনা দেবার মতো সংসারে নেই ননদিনী-রায়-বাঘিনী!

আর এক বান্ধবী ওর মুখের কথা টেনে নিয়ে বলে, আর সেই "বিয়ে হলে পুত্র কন্যা, আসে যেন প্রবল-বন্যা…!" চ্যাঁ-ভ্যাঁ-ট্যাঁতে বাড়ী একেবারে ভরপুর! একটু কি দু দণ্ড বসে বই পড়বার যো আছে! লোকে আদিখ্যেতা করে বলে, কোল খালি—! কিন্তু কোল ভর্ত্তি করেই বা লাভ কি শুনি? দিন রাত গ্রামোফোনের চোঙ্ যেন বেজেই আছে! কারো কান্না, কারো হাসি… কারো টায়ফয়েড, কারো আমাশা! দু দণ্ড স্বস্তিতে চোখ বুঁজে ভাবতে পর্য্যন্ত দেয় না। সংসারে থাকে না একটা ভালো কথা, একটা ভালো চিন্তা, একটা ভালো গান, একটা ভালো কবিতা! শুকনো…খটখটে মরুভূমির মতো মনে হয় জীবন…

আর এক সখি টিপ্পনী কেটে বলে, তার চাইতে এই সুজন-সুলতার সংসার! একেবারে যাকে বলে সুখ-নীড়! কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে…বাঁধি নীড় থাকে সুখে?

সত্যি…বিবাহ-বার্ষিকী শুধু তোরাই করতে পারিস! নইলে শুধু বছর বছর লোক-দেখানো ভড়ং করে কোনো লাভ নেই!

সখীদের মুখে শুনে-শুনে সুলতার আর সাধ মেটে না! অতি আনন্দে ওর যেন মরতে ইচ্ছে করে।

অনেক সময় সে নিজের ফ্ল্যাটে বসে চুপচাপ আপন মনে ভাবে।

একটি ছেলে কিম্বা মেয়ে থাকলে কেমন হত? তাকে মনোমত করে সাজাতো, পড়াশোনা করাতো', নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতো। হয়ত ইস্কুলে প্রথম হয়ে সে পুরস্কার নিয়ে হাসি মুখে ঘরে ফিরে আস্‌ত! আনন্দে ওর বুক ভরে যেত!

কিন্তু আবার ঢালের উল্টো দিকও ত' আছে। ছেলেমেয়ে হতে সুরু করলে যদি তার সীমা-সংখ্যা না থাকতো…তা হলে ব্যাপারটার কথা কল্পনা করেই শিউরে উঠত সুলতা! একটি হয়ত রোগা টিং টিঙে হত, একটি হত মাথা মোটা, অপরটি সারা বছরই নিজে ভুগ্‌ত আর সুলতাকে ভুগিয়ে মারত! পেটের অসুখ, জ্বর, হাঁফানি, আমাশা, ডিপথিরিয়া, বসন্ত, কালাজ্বর, হাম, ক্যানসার…রোগগুলো যদি সারবন্দী দিয়ে ওদের বাড়ী একের পর এক আক্রমণ করত—, তাহলে কোথায় থাকৃত সুলতার লাইব্রেরী থেকে বই এনে পড়া, সিনেমা-থিয়েটার দেখা, আর বর্ষণ-মুখরিত সন্ধ্যায় আলসেমী করে ঘরে নীল আলো জ্বালিয়ে দিয়ে রেডিও-র গান শোনা! এর ওপর যদি দজ্জাল-শাশুড়ী, কুঁদুলে-ননদ, মাতাল-ভাসুর আর খরচে-দেবর থাকৃত…তা হলে ত' একেবারে সোনায়-সোহাগা! নাকের-জলে, চোখের-জলে এক হয়ে অন্ধ-কারের কোটরে বাস করতে হত তাকে!

না—না, যা আছে তাই ভালো। ভগবান বড্ড বাঁচিয়েছেন তাকে। বেশী লোভ করতে গিয়ে একেবারে ভরাডুবী হত তার সুখের সংসারের।

আজ যদি তার এক গাদা ছেলে-মেয়ে থাকত তা হলে কি এমনি করে বিয়ের কনেটি সেজে প্রতি বছর বিবাহ-বার্ষিক উৎসব করতে পারত?

"অল্প লইয়া থাকি তাই—
মোর যাহা যায় তাহা যায় !"

অনেক গবেষণা আর আলোচনা করে কিছুতেই নিমন্ত্রিতের পাকা তালিকা আর তৈরী হয় না।

অবশ্য সুজন আর সুলতার ডায়েরীর পেছন-দিককার সাদা পাতাগুলিতে নির্ব্বাচিত নামগুলি টোকা আছে, তবু প্রতি বছরই সেই নামের তালিকা একটু একটু বেড়ে যাচ্ছে।

সেও এক মহা সমস্যার কথা।

আগে ওদের মনে একটা সঙ্কোচ ছিল। তাই স্বভাবতই নিমন্ত্রিতের তালিকা ছিল সীমাবদ্ধ। এখন বন্ধু-বান্ধব পরিচিত মহলে উৎসবের কথাটা সবাই জানতে পেরেছে। ওরাই উৎসাহিত হয়ে সারা বছর ধরে দু'জনকে সচেতন করে রাখে—কিগো, আমরা সবাই কবে যাচ্ছি ?

এই ভাবেই নামের তালিকা বেড়ে যায়। আগে ফ্ল্যাটেই সঙ্কুলান হত। এখন ছাদের ওপর বিরাট প্যাণ্ডেল তৈরী হয়। রঙ-বেরঙের কাপড়, ফুল, মালা দিয়ে মনোমত করে সাজানো হয় সেই প্যাণ্ডেল। নতুন করে যেন বিয়েতে বসে ওরা দুজন। এই জন্য সারা বছর ধরে ওরা টাকা জমায়। দু'জনেই ভালো চাকুরে, অসুবিধে নেই কিছু। নেই ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ, অসুখ-বিসুখের—ডাক্তার অষুধ-পত্র, আর ছোটদের জামা-কাপড়ের বায়নাক্কা। মাসের শেষে অনেক টাকা বাঁচে ওদের, আর সেটা সরাসরি চলে যায় ব্যাঙ্কে।

সুজন বল্লে, এবার নতুন ধরণের খাবারের ব্যবস্থা করো। একেবারে দিশী মতে। পিঠে-পায়েস, নারকেলের নানারকম সাজ, তক্তি, অবাক জলপান, ছানার পায়েস।

সুলতা নাক কুঁচকে উত্তর দিলে, সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। অনেক দিন আগে থেকে তৈরী না করেও উপায় নেই। অথচ সময় মত নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কম পড়তে পারে। তখন দোকানে ছোটা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না! তার চাইতে ফিরপোতে অর্ডার দাও। ছিমছাম ওদের সাজ-পোষাক। পরিবেশনেও পটু। কম পড়বার ভয় নেই। যত দরকার ওরা সাপ্লাই দেবে। আমরা অতিথি-অভ্যাগতদের অভ্যর্থনায় আটকা থাকবো। সব দিকে দৃষ্টি দেবার উপায় থাকবে কি তখন ?

সুজন বুঝলে কথাটা, সত্যি। পিঠে-পায়েস করতে গেলে অনেক হ্যাঙ্গাম। প্রয়োজনীয় দুধ এখানে নাও পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া এ সব তৈরী করতে যত লোকের দরকার—সুলতা একা তা সাম্‌লাতে পারবে কেন? বাড়ীতে ত' আর দ্বিতীয় মেয়েছেলে নেই। নতুনত্বের আমেজ থাকা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে গেল!

সুলতা বল্লে, সেদিন তুমি যে জামা-কাপড় উড়ুনী রোমাল ব্যবহার করবে—তা উপহার দেবো আমি। আর আমি যা পরবো—তা জোগাবে তুমি। কেমন রাজি ?

সুজন হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর দিলে, তুমি খুব চালাক দেখছি। পুরুষ মানুষের আর কতটুকু প্রয়োজন ? শান্তিপুরী ধুতি, নিদেন গরদের পাঞ্জাবী। কিন্তু তোমায় সাজাতে চাই বেনারসী শাড়ী, দামী গয়না, প্রসাধন দ্রব্য, ফুলের মালা, আরো কত কি···স্বামীকে একেবারে ফতুর করে ফেলতে চাও আর কি!

সুলতা শুনে খুব হাস্‌তে লাগলো!

আমন্ত্রিত ঔদরিক

অবশেষে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিন এসে উপস্থিত হল। সানাই বসেছে বাড়ীর সাম্‌নে। এটা সুজনের নিজস্ব পরিকল্পনা।

খুব ভোরবেলা সানাইয়ের তানে ঘুম ভেঙে যাবে—এর চাইতে মধুর আমেজ আর কি হতে পারে?

সন্ধ্যের দিকে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা। সুলতার বান্ধবীরাই এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে সবাই মিলে।

প্রত্যেকের এলো খোঁপায় বেলের গোড়ে জড়ানো। তার মধু-গন্ধে বসন্ত যেন মূর্ত্তিমান হয়ে ধরায় নেমে এসেছে।

অভ্যাগতদের মধ্যে সব শ্রেণীর মানুষই আছেন।
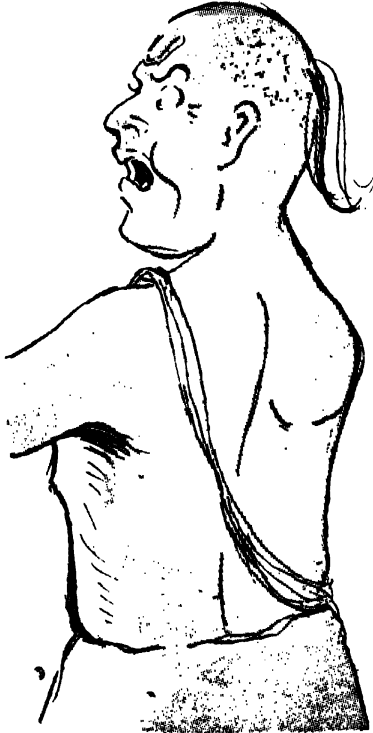
আমন্ত্রিত মারাঠি পণ্ডিত হতবাক—

বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী, গুজরাটি, মারাঠি, মৌলভি, আরো অনেক দলের মানুষ···তাঁরা প্যাণ্ডেলে ঢুকেই একেবারে হকচকিয়ে যাচ্ছেন! কাকে ছেড়ে কার দিকে তাকাবেন?

রবীন্দ্রনাথের অনুজ্ঞা সবাই অস্বীকার করেছে—'অলকে কুসুম না দিও'—কবির এই অনুরোধ কেউ মানে নি!

নিমন্ত্রিত ভাটিয়া বন্ধু

কুসুমে কুসুমে ছেয়ে গেছে এলো-খোঁপা! তার ভুরভুরে গন্ধে মন মেতে উঠেছে সবাইকার। 'কাজলবিহীন সজল নয়ন' মোটেই নয়। কাজলপরা নয়নের কটাক্ষে সবাই বিভ্রান্ত।

হাঁা, বিবাহ-বার্ষিকী যদি করতে হয় ত' এমনি সখি-দলেরই প্রয়োজন।

"মরবো না ভাই নিপুণিকা চতুরিকার শোকে—
তারা সবাই অন্য নামে আছেন মর্ত্ত্যলোকে॥"

নিমন্ত্রিতের দল রূপ-সুধা পান করবে—না, অরেঞ্জ স্কোয়াশের গ্লাসে চুমুক দেবে, ভেবে ঠিক করতে পারে না!

প্রতি বছরই সুজন-সুলতার বিবাহ-বার্ষিকীর পরই নাকি কয়েকটি উদ্বাহ-বন্ধনের শুভ সন্দেশ এই সমাজে ঘোষিত হয়। আন্তঃ-প্রাদেশিক শুভবিবাহও সঙ্ঘটিত হয়ে থাকে।

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—
কোথায় কে ধরা পড়ে কে জানে!
গরব সরম হায়

'সকলি টুটিয়া যায়
সলিল বয়ে যায় দু'নয়নে ॥"

এটা আর কারো কবিতা নয়, স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী প্রসূত ! সুতরাং ফল ফলতে বিলম্ব হয় না !

নিমন্ত্রিত মৌলবী সাহেব

নিমন্ত্রিতেরা সুবেশা সুন্দরীদের কোমল কর থেকে সুগন্ধী মাল্যলাভ করে নিজেদের ধন্যজ্ঞান করেন।

তারপর সুরু হল অনুষ্ঠান।

আজকের উৎসবের সভাপতি প্রেমোৎপল পট্টনায়ক

সভাপতি ও প্রধান অতিথি

এবং প্রধান-অতিথি তাঁর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিদ্যুৎবরণী দেবী। এই দম্পতি একাধিক্রমে ষাট বছর বিবাহিত জীবন যাপন করেছেন। কবে যে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল তা এঁরা নিজেরাই ভুলে গিয়েছেন।

প্রেমোৎপল পট্টনায়ক মশাই উঠে গলাটাকে বেশ সাফ করে বল্লেন, আমরা যে বিবাহিত জীবন কবে থেকে সুরু করেছিলাম তা স্মরণে নেই। আমার গৃহিণী তখন পুতুল খেলতেন। আমি পুতুল ভেঙে ওঁর কাছে সময়ে-অসময়ে মারও খেয়েছি। কিন্তু আমরা আজ যে দম্পতির বিবাহ-বার্ষিকীতে সমবেত হয়েছি—তাঁরা হচ্ছেন আদর্শ দম্পতি। তাঁদের জীবনে কখনো দ্বন্দ্ব-কথান্তর-মতান্তর হয়নি। প্রেম কী করে ঘনীভূত হয় সে পরম রহস্য এঁরা অবগত আছেন। দুধ জ্বাল দিলে যেমন খাঁটি ক্ষীর থেকে একেবারে চাঁছিতে পরিণত হয়, তেমনি তরুণ বয়েসেই এই দম্পতি পরম প্রেমের চাঁছিতে পরিণত হয়েছেন। বয়েসে প্রবীণ হয়েও আমরা এই আদর্শ-দম্পতির কাছ থেকে প্রেমের প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ পাঠ করে আমাদের জীবনে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারি। তাই আমি আজ এই মধুর সন্ধ্যায় শ্রীমান সুজন ও শ্রীমতী সুলতার প্রেম-প্রীতি মুখরিত দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘায়ু কামনা করি। তাঁরা প্রতি বৎসর তাঁদের বিবাহ-বার্ষিকীর আয়োজন করে আমাদের প্রাণের ও রসনার তৃপ্তি বিধান করুন—এই একমাত্র কামনা। ঘন-ঘন করতালি ধ্বনিতে সভাপতির কথা সমর্থিত হল।

প্রধান অতিথিকে বাণী প্রদান করতে সবাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু শ্রীমতী বিদ্যুৎবরণী দেবী অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করে এমনভাবে বসে রইলেন যে, তাঁর কাছ থেকে কোনো ভাষণই শোনা গেল না !

সমবেত নিমন্ত্রিতদের সমস্ত মিনতি, দাবী, অনুরোধ, আবদার একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল !

তখন কুমারী ক্ষণপ্রভা খাশনবীশ একটি আধুনিক গান সুরু করলেন—

তোমার হৃদয়-স্পন্দন শুনে শিখেছি প্রেমের রীতি,
সোনালী সাঁঝেতে তাই ত' সবারে শোনাবো প্রাণের
গীতি ॥

এর পরেই দীপলচরণা দত্তের "মন-দেয়া-নেয়া" নৃত্য শুরু হয়ে গেল। সেই নাচ দেখে অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নাসিকা কুঞ্চন করে রুমালে নয়ন আবৃত করে বসে রইলেন।

নৃত্য শেষ করে সমবেত নর-নারীর সোল্লাস ধ্বনির মধ্যে দীবলচরণা দত্ত আসন গ্রহণ করলেন।

এইবার আরম্ভ হল উপহার প্রদান পর্ব্ব। এই আদর্শ দম্পতিকে মনোমত উপহার দেবার জন্যে সকলেই এসে এই আলো ঝলমল সন্ধ্যায় সমবেত হয়েছেন। তাদের কল-হাসিতে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল।

নবীন কবি গঙ্গোত্রী-উৎস গঙ্গোপাধ্যায় একটি মনোরম কবিতা আবৃত্তি করে বল্লেন, সম্রাট কবি সাজাহান প্রেমের পরাকাষ্ঠা রচনা করেছিলেন 'তাজমহল'। সেই তাজমহলের কবিতা লিখে অমর হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। আর কবি গঙ্গোত্রী-উৎস প্রেমিক-দম্পতি সুজন আর সুলতার অনুরাগকে অক্ষয় করবার জন্যে উপহার এনেছেন "প্রেমের পিরামিড।" সেই প্রেমের পিরামিডের তলায় দু লাইন কবিতা লেখা আছে—

আনিয়াছ সাথে করে মৃত্যুহীন প্রেম,
দান করি গেলে দোঁহে নিখাদ সে হেম॥

উৎসবে উপস্থিত কেউ-কেউ ফিস্‌ফিস্ করে বল্লেন, এতে বিশ্বকবিকে অনুকরণ করা হয়েছে! কিন্তু সে কথায় কেউ কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করলেন না! ঘন-ঘন করতালি ধ্বনিতে কবিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হল। মৃদুহাস্যে ও সলজ্জ ভঙ্গীতে সুলতা এগিয়ে এসে সেই "প্রেমের পিরামিড" সানন্দে গ্রহণ করলে। 'প্রেমের পিরামিড' পিস্‌বোর্ডের তৈরী একটি গাড়ীর মডেল মাত্র। সুতরাং সম্রাট সাজাহানের সম্মানহানির কোনো ভয়ই রইল না!

এরপর এগিয়ে এলেন সমাজের সেরা সুন্দরী সুরূপা সরখেল।

সুরূপা সরখেলের হাতে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পিঞ্জর। এই পিঞ্জরে রয়েছে শুক আর সারি।

শুক-সারি পাখী হচ্ছে প্রেমের প্রতীক। সেই কথা সবাইকে জানিয়ে সুরূপা সরখেল প্রেমগদগদ কণ্ঠে বল্লেন, তাই আমি আজকের এই মধুর সন্ধ্যাকে মধুময় করবার জন্যে সারা ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করে সংগ্রহ করেছি এই শুক-সারী পাখী। প্রেমের এই মূর্ত্ত প্রতীক শুক-সারির মতোই সুজন ও সুলতা এক অখণ্ড প্রেমরাজ্য সংগঠন করে তুলুক—এই আমার আন্তরিক কামনা।

খাঁচার সঙ্গে একটি রূপোলী কার্ড। তাতে দু' লাইন কবিতা লেখা আছে—

শুক-সারি

শুক-সারি সারাদিন সুখ কথা কয়,
সুজন-সুলতা তাই শিখিবে নিশ্চয়॥

সোল্লাস-ধ্বনিতে সমর্থন জানালো উপস্থিত সভ্যবৃন্দ।

এরপর আসতে লাগলো রাশি রাশি ফুলের গয়না, ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, প্রেমের কবিতার বই, অজস্র আধুনিক রম্য-রচনা। মাড়োয়ারী বন্ধুরা কবিতার মর্ম্ম বোঝেন না। তাঁরা অনেকেই সুলতাকে সোনার গয়না উপহার দিলেন।

মুখ দেখে মনে হল, সুলতা দেবী এতেই বেশী খুশী হয়েছেন। কেন ফুল ত' সকালবেলাই বাসি হয়ে যাবে। কিন্তু সোনার গয়না সিন্দুক ভারী করতে সক্ষম। ওজনেও বেশ উল্লেখযোগ্য!

কেউ কেউ সন্দেশের বাক্স নিয়ে এসেছেন। আবার

কোনো কোনো দল হাতে করে এসেছেন—সদ্য-ফোটা রজনীগন্ধার ঝাড় !

সুজন বেচারী আগাগোড়া ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সব উপহারই সুলতার সুকোমল করকমলে গিয়ে পৌঁছুলো। প্রেমিক স্বামীর দিকে কেউ ফিরেও চাইলে না !

অনুষ্ঠান যখন শেষ হল—তখন রাত্রি গভীর।

এত সব উপহার পেয়ে সুলতার মুখখানি আলোতে উজ্জ্বল হয়ে ঝল্‌মল করছে !

আর একটি উপঢৌকনও না পেয়ে সুজন যেন মিয়োনো মুড়ির মতো চুপ্‌সে গেছে ! তার মুখে আর কথাটি নেই !

সুলতা বল্লে, আমার জিনিসপত্রগুলি সব গুছিয়ে ফেল। আজ আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। এক্ষুণি আমি শুয়ে পড়ব—

তপ্ত বালিতে লাফানো খৈয়ের মতো ছটকে পড়ে সুজন টিপ্পনী কাটলে, তা আর ক্ষিদে-তেষ্টা থাকবে কেন ? এত জিনিস-পত্তর পেলে আমিও সাতদিন না খেয়ে থাকতে পারি !

এইবার খিল্ খিল্ করে হেসে গড়িয়ে পড়ে সুলতা।

বলে, সত্যি, বেচারি ! তোমায় কেউ একটা উপহার ত দেয়নি ! আচ্ছা, ওই মালাগুলো সব তোমার গলায় পরিয়ে দেবো'খন। ওগুলো হবে তোমার জয়মাল্য—, কেমন ?

ফোঁস্ করে ওঠে সুজন।

—চাই না আমি ওই সব জয়মাল্য। মোটা মোটা ভারী-ভারী সোনার গয়না সব তোমার সিন্ধুকে গিয়ে ঢুকবে, আর আমার কপালে শুক্‌নো মালা ! তা ছাড়া ক্ষিদেয় আমার পেটের নাড়ি জ্বলে যাচ্ছে !

মিষ্টি মিষ্টি হাস্‌তে লাগ্‌লো সুলতা। বল্লে, যাও না, অনেক ফ্রাই বেঁচে গেছে। স্যালাড দিয়ে খেয়ে ফেল না। মিষ্টিও ত রয়েছে প্যাকেট ভর্ত্তি। খাওয়ার ভাব্‌নাটা কি শুনি ?

সুজন শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌ল। বল্লে, হুঁ ! তোমার পেটে আদৌ খিদে নেই, তা আমি জানি গো জানি। ওই অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিঃ মজুমদার আদর করে তোমার মুখে কি তুলে দিচ্ছিল শুনি ?

সুলতা জবাব দিলে, বা—রে !, ভদ্রলোক সেই গাঙ্গুরাম থেকে স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে সন্দেশ এনেছেন, আমায় বিশেষ করে অনুরোধ করতেই ত'—

—অনুরোধ করলেই ওর হাত থেকে তোমায় খেতে হবে ? এতটুকু শালীনতা বোধ নেই !

মন্তব্য করলে কঠিন স্বরে সুজন।

শুনেই ফোঁস করে উঠল সুলতা !

বল্লে, বটে ! আমি কিছু দেখিনি ভেবেছ ? সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে দীঘলচরণার হাত ধরে কী এত গুজ্‌গুজ ফুস্-ফুস্ হচ্ছিল শুনি ? আমার চোখে কিছুই এড়ায় না। নির্লজ্জ···

—বেহায়া !

—ব্রুট—

—ভাল্‌গার—

—মেয়ে ন্যাক্‌রা—

—ছেলে ধরা !

—নীচ—

—ইতর !

এই মধুর বিশ্লেষণগুলির মাত্রা বোধ করি আরো বেড়ে যেতো, হঠাৎ পাশের বাড়ী থেকে কোন্ রসিক ছোক্‌রা গান গেয়ে উঠ্‌ল—

"আমি তোমার জন্যে কাঁদি
তোমার প্রাণ কি কাঁদে না রে—।"

দুম্ দুম্ করে দুই জন দুই ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলে।

সে রাত্রে আর কারো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না !

শুধু প্রেমের প্রতীক শুক-সারী পাখী সারারাত অভুক্ত থেকে ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দ করতে লাগ্‌লো !
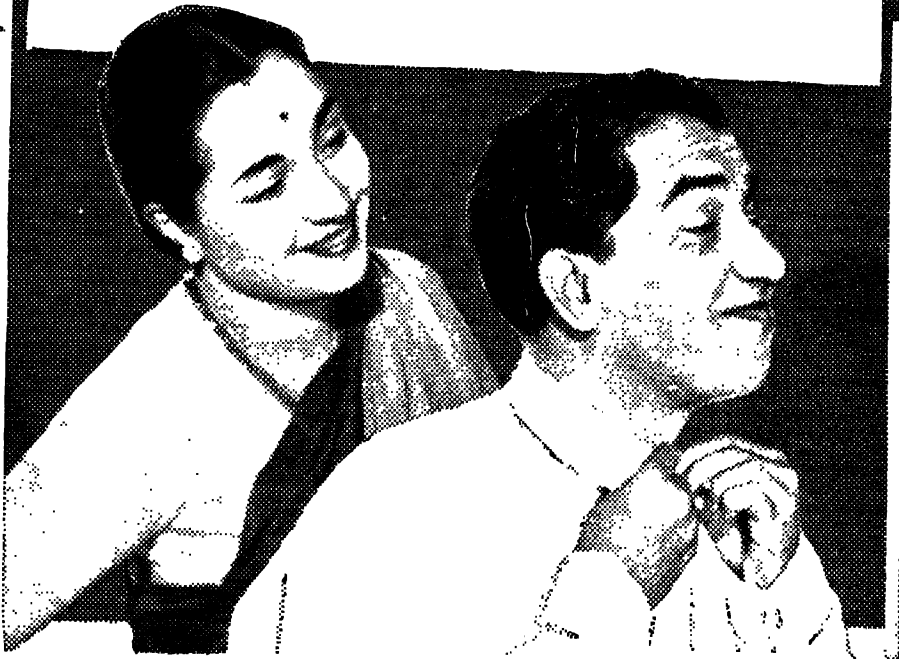
ফিরিওলা

অরূপ ভট্টাচার্য্য

শহরের বুকে ফিরিওলা আমি ফিরি করে শুধু খাই
লেখা পড়া মোটে শিখিনাই আজো চাক্‌রি কোথায় পাই !
পড়েছিনু শুধু বাল্যশিক্ষা আর কিছু ধারাপাত
তারই জোরে আজ ভাগ্যের সাথে মিলিয়ে চলেছি হাত।
আই-এ, বি-এ, এম-এ, পাশ করা যত ডিগ্রীধারীরা সব
প্যান্ট্‌ কোট্‌ পরে অফিসে অফিসে করছে যে কলরব।
কেউ দপ্তরী, কেউ বা কেরাণী কেউ কেউ অফিসার
আমার চেয়েও পণ্ডিত নাকি চাপরাশী ঝাড়ুদার !
রেঁস্তোরা আর ভাতের হোটেল যেদিকেই ফিরে চাই
কল কারখানা কোন খানে দেখি কোন কাজ খালি নাই ॥
কাজ খুঁজে খুঁজে এমনি করেই কেটে যে চলেছে দিন
হঠাৎ দেখি এসেছি যে হ'য়ে প্রায় সম্বলহীন ॥
দিন রাত ভেবে মনে মনে শেষে ঠিক ক'রে ফেলি তাই
যে টুকু রয়েছে পুঁজি পাটা নিয়ে ব্যবসায় নেমে যাই ॥
এ শহরে আছে কত সুধীজন কত রাজ মহারাজ
তাঁদের উপরে ভোগ্যলক্ষ্মী অতি প্রসন্ন আজ ॥
কারো 'পরে মোর নাই কোন দ্বেষ, নাই কোন অভিযোগ
আমি শুধু জানি ভুগিতেছি আমি আমার কর্ম্মভোগ ॥
হরেক রকম মনোহারী চীজ্‌ তুলনা যে তার নাই
মন-পরিমাণ বোঝা ল'য়ে পিঠে ফিরি মজদুর ভাই ॥
পথে পথে ঘুরে রোদ্দুরে পুড়ে হাঁকি জিনিসের নাম
পিচ্‌ ঢালা পথে ঝ'রে যায় মোর ললাটের নোনা ঘাম ॥
কত না কিশোরী তরুণীর সাথে হয় কত পরিচয়
কত বিশ্বাস কাতর মিনতি আর কত বিস্ময় !
প্রসাধন লয়ে যাদের দুয়ারে প্রতিদিন আমি যাই
শুধায়নি তাঁরা কোন দিন মোরে কিবা নাম কোথা ঠাঁই ॥
তরল আলতা কেউ চায় আর, কেউ ফিতা পাউডার
রঙিন, জরীন, সিল্কের কত নমুনা দেব বা তার !
হেজলীন্‌ আর চিরুনী না হয় খোঁপার সূক্ষ্ম জাল
প্ল্যাষ্টিক্‌ দিয়ে তৈরী করা যে কঙ্কন জোড়া লাল
কাঁচের তৈরী চুড়ী, বালা নয় কেমিকেল করা হার
পিন্টির ফুল মোমের পুতুল ব'লব বা কত আর !
অগুরু আতর কেউ চায় আর কেউ চায় লিপ্‌স্টিক
কার যে কখন মরজী কেমন যায় না ত বোঝা ঠিক্‌ !

নেল্‌-পালিশ আর চুলের কাঁটার চাহিদাও কম নয়
কুম্‌কুম্‌ আর কপালের টীপ্‌ তারও প্রয়োজন হয় ॥
হেয়ার-লোশন্‌, অয়েল্‌ পমেড্‌ তাও যে অনেকে চায়
দাম শুনে কেউ হয় যে অবাক্‌ কেউ ভুরু কোচকায়।
কালা গোরা কিবা ছিপ্‌ছিপে যত সতী লক্ষ্মীর দল
সিঁদুর জোগাই আমি যবে তাঁরা সিঁথি করে উজ্জ্বল ॥
তোয়ালে সাবান লেডিজ্‌ রুমাল তাও করি বিক্রয়
বড় ব্যথা পাই যখনই তাঁহারা আজে বাজে দাম কয় !
আমি যদি বলি এই জিনিসের এই হ'ল ঠিক দাম
ওরা বলে মোরে ব'লছ কি হে ! আরে রাম রাম রাম !
এ সব জিনিস্‌ ফুটপাতে ঢেলে কত না বিক্রি হয়
তুমিই বল না ? মিছে কথা সে কি ! মিথ্যে মোটেই নয় !
তবু ভালো তুমি বড়বাজারের নয়ক দোকানদার
তা হ'লে তোমার দোকানের মাল কেনা হোত দেখি ভার !
চোরাবাজারেই চড়া দাম জানি তাকেও মানালে হার
ঘাট্‌ হয়ে গেছে ডেকেছি তোমায় ডাক্‌ব না বাপু আর !
এর চেয়ে ভালো দোকানেই যাওয়া যদিও হয় তা দূর
কেনা যায় তবু সাত পাঁচ দেখে ক'রে দর দস্তুর !
মনে মনে ভাবি ফিরিওলা আমি ফিরি ক'রে শুধু খাই
তোমাদের কাছে তাই বুঝি মোর জিনিসের দাম নাই !
নাইবা রহিল আস্‌বাব ঘেরা সাজানো দোকান ঘর
একই দামের সেই ত জিনিস নিয়েছি পিঠের 'পর !
বড় রাস্তায় ঘর ভাড়া নিয়ে ফাঁদে যারা কারবার
তাঁরা হোলো খাঁটি, আমার বেলায় শুধু এই অবিচার !
হায়গো কিশোরী ললনা নাগরী তোমাদেরই কথা ঠিক্‌
তোমাদেরই কাছে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে হারাই দিগ্বিদিক্‌ !
কত না বধুর চরণ-যুগল রাঙালো আল্‌তা মোর
আমারই দেওয়া ফিতায় বেঁধেছে বেণীবন্ধন-ডোর ॥
অগরু আতর পাউডার মেখে মাতোয়ারা করে প্রাণ
রূপের উপরে দিয়েছে ডাকিয়ে আর এক রূপের বান।
প্রসাধন ল'য়ে তবু এরা দর কষাকষি করে হায়
ফিরিওলা আমি ললাটের ঘাম নোনা হ'য়ে ঝ'রে যায়।
দুয়ারে দুয়ারে দোকান সাজাই পথে পথে হেঁকে যাই
নয় যে দোকানী, উচিত মূল্য কোথাও পাইনা তাই ॥

বন মানুষ

[একাঙ্কিকা]

মন্মথ রায়

রামচন্দ্র ॥ আমাদের ছোট বেলায় মা বলতেন বটে, চাঁদা-মামা সকলেরই মামা। সকলকেই তিনি দেখছেন। তখন আকাশের চাঁদটাকেই সেই মামা বলে জানতাম। কিন্তু সে মামা যে আপনি তা শুনিনি কোনো দিন। মাও বলেন নি কিছু।

চাঁদা-মামা ॥ তোমাদের মা'র বিয়ের আগেই আমি সংসার ছেড়ে চলে যাই কিনা! তাই সকলে ভুলেই গিয়েছিলো আমাকে।

রামচন্দ্র ॥ মা'র বিয়ের খবর পেয়েছিলেন আপনি?

চাঁদা-মামা ॥ তা পেয়েছিলাম বৈকি। তবে কিনা তার জন্মটাই দেখেছিলাম। বিয়েও দেখিনি, মৃত্যুটাও না। তবে আমার এই রাম ভাগ্নেটি যে রেখে গেছে সে, সেটা জেনেছিলাম। তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে বাবা। দেখছি, তোমার লক্ষ্মীর সংসার।

রামচন্দ্র ॥ এই আপনাদের দশজনের আশীর্বাদে কোনো রকমে ক'রে কর্মে খেয়ে প'রে আছি এই যা। নইলে দিন কাল যা পড়েছে এখন—'প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত।'

চাঁদা-মামা ॥ বেশ বাবা বেশ। মানুষের সেরা ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। সাক্ষাৎ ভগবানরূপে পূজা পেয়েছেন তিনি। সেই নামই নিয়েছো তুমি। মানুষের মতো মানুষ হয়েছো। এই একদিনেই সব দেখ্‌ছি তো। কত লোক আসছে যাচ্ছে, মান্যি মাননা করছে। আর বৌমার নামটিও যখন সীতা দেবী, মণি-কাঞ্চন সংযোগই হয়েছে দেখছি।

রামচন্দ্র ॥ দু'দিন আছেন তো?

চাঁদা-মামা ॥ না বাবা। থাকবার জো নেই। রাত পোহালেই যাবো চলে। ঘুরে বেড়ানোই হচ্ছে আমার বাই। এক জায়গায় দু'দিন বসে থাকা ধাতে সয় না বাবা।

রামচন্দ্র ॥ অনেক দেশ দেখেছেন নিশ্চয়। হিমালয়ে-টিমালয়েও ছিলেন বোধ হয়। যখন প্রথম এসে দাঁড়ালেন, মনে হলো সেই সত্য যুগের কোন মুনি ঋষি বুঝি এলেন আমার ঘরে! বলতে এখন লজ্জাই হচ্ছে, মানুষ বলেই মনে হয়নি আপনাকে।

চাঁদা-মামা ॥ (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) বনমানুষ ভাবো নি তো বাবা?

রামচন্দ্র ॥ তবে সত্যি কথাই বলছি চাঁদা-মামা, দেবযানী কিন্তু তাই-ই ভেবেছিলো।

চাঁদা-মামা ॥ দেবযানীটি আবার কে?

রামচন্দ্র ॥ কেন, দেখেছেন তো। আমার মেয়ে।

চাঁদা-মামা ॥ ও হ্যাঁ দেখেছি। আমার এ চুল দাড়ি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলো বোধ হয়। তা' কোথায় সে?

রামচন্দ্র। গেছে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে পিক্‌নিকে।

চাঁদা মামা ॥ সেটা আবার কি হে?

রামচন্দ্র ॥ যাকে আপনারা হয়ত বলতেন বনভোজন। তবে সে বনভোজনের চেহারা পালটে গেছে এখন। বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনটা আজকাল ওখানেই অনেকটা এগিয়ে যায়।

চাঁদা-মামা ॥ ঘটক-টটকের বালাই বুঝি আর এখন নেই?

রামচন্দ্র ॥ এ যুগে ওটা অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে চাঁদা-মামা। সমাজ যে কত পালটে গেছে দু'দিন থাকলে দেখতে পেতেন।

চাঁদা-মামা ॥ হ্যাঁ শুনেছি। বিধবা বিবাহ চালু হয়ে

গেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ ও আইনে হ'চ্ছে। তা হোক। আসল কথাটা হচ্ছে শান্তি। মনের শান্তিটা থাকলেই হোলো। [illegible]বের এই বইটি পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে অবাক হয়ে যাচ্ছি। কত পরিবর্তনই না এসে গেছে সমাজে আর জীবনে। ঐ কে এলেন—তোমরা কথাবার্তা কও। আমি পাশের ঘরে গিয়ে পড়ছি—যাতে বইটা আজ রাতেই শেষ করে যেতে পারি।

চাঁদা-মামা বইটি লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। এ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন বাড়িওয়ালাবাবু।

রামচন্দ্র॥ আরে আরে, বাড়িওয়ালাবাবু যে! হঠাৎ কি মনে ক'রে!

বাড়িওয়ালা॥ একটু বিপদে পড়েই আপনার কাছে এলাম রামবাবু। একটু গোপন কথাবার্তা আছে।

রামচন্দ্র॥ বলুন! বলুন!

বাড়িওয়ালা॥ ঘরে আর কার গলা পাচ্ছিলাম যেন।

রামচন্দ্র॥ আমার চাঁদা-মামা। পাশের ঘরে বই পড়তে গেছেন। কি বলবেন আপনি বলুন। বই হাতে থাকলে আর তিনি এজগতের লোক নন।

বাড়িওয়ালা॥ দেখবেন মশাই, কথাটা দু'কান না হয়। আমার সেই মোকর্দমাটার দিন পড়েছে কাল। উকিল বললেন, আমার কোনো ভাড়াটে দিয়ে সাক্ষী দেওয়াতে হবে যে, হরিশবাবু সেদিন তার সেই তিন মাসের ভাড়া আমার হাতে নগ্‌দা-নগ্‌দি দেন নি।

রামচন্দ্র॥ না না, সে কি, আমার সামনেই তো আপনার হাতে টাকাটা দিলেন তিনি।

বাড়িওয়ালা॥ কিন্তু আপনাকে কোর্টে বলতে হবে, আমি এত করে বলাতেও টাকাটা শেষ পর্যন্ত তিনি দেন নি।

রামচন্দ্র॥ কিন্তু—

বাড়িওয়ালা॥ কিন্তু নয়, এবং। দেন নি এবং মুখের ওপর তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন—কস্মিন কালেও তিনি দেবেন না।

রামচন্দ্র॥ কিন্তু—

বাড়িওয়ালা॥ কিন্তু নয়, উপরন্তু। উপরন্তু শাসিয়ে দিলেন, ফের যদি আমি আবার ঐ টাকা তাঁর কাছে চেয়েছি, আমার ঠাং খোঁড়া করে দেবেন তিনি।

রামচন্দ্র॥ এত বড় একটা জল জ্যান্ত মিথ্যে, কি করে বলা যায় মশাই?

বাড়িওয়ালা॥ কেন, মুখ দিয়েই বলবেন।

রামচন্দ্র॥ পারবো কি! একেবারে পাশের ফ্ল্যাটের লোক। ঘুম থেকে উঠেই মুখ দেখা-দেখি। চক্ষু-লজ্জাও তো একটা আছে!

বাড়িওয়ালা॥ তা'হলে চলি। কিন্তু যাবার আগে মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, বাড়িভাড়ার ডিগ্রীটা জারী দিলে আপনার অস্থাবর মালপত্র যেদিন ক্রোক হবে সে লজ্জাটাও লজ্জা। আপনার চক্ষু লজ্জার চেয়ে বেশি কিনা সেটা আজ রাতে বিছানায় শুয়ে আপনার শয্যা-সঙ্গিনীর সঙ্গে একবার আলোচনা করে দেখবেন।

অন্দরের দরজার আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন রামচন্দ্রের আধুনিকা স্ত্রী সীতা দেবী।

সীতা॥ দাঁড়ান, যাবেন না ত্রিবিক্রমবাবু। আপনার সব কথাই আমি দোরের আড়াল থেকে শুনেছি। সেটা স্বামী স্ত্রীতে শুয়ে শুয়ে ভাববার মতো এমন কিছু গুরুতর কথা নয়। মানুষের মান-মর্যাদাটা সবার আগে। আপনি যে সাক্ষ্য ওঁকে দিতে বলছেন সেটা আমিই দেব, যদি উনি না দেন। হবে না তাতে?

বাড়িওয়ালা॥ হবে না! এর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে? গাড়ি নিয়ে আমি আসবো। কাল দশটায় কোর্টে যাবেন আমার সঙ্গে।

রামচন্দ্র॥ (স্ত্রীকে) না না, আমি থাকতে আবার তুমি কেন? ওতে আমার মাথাই হেঁট হবে। আমিই যাবো মশাই, আপনি আসবেন।

বাড়িওয়ালা॥ হেঃ হেঃ—আমি আপনাদের ভালোই চাই, বুঝলেন? আপনাদের পথে বসানোর কোনো ইচ্ছাই নেই আমার। আর তা ছাড়া, জানবেন এ যুগটাই হলো 'প্যাক্টের' যুগ। আপনি আমাকে দেখবেন, আমি আপনাকে দেখবো। তবেই না টিঁকতে পারবো! আচ্ছা আসি। নমস্কার।

বাড়িওয়ালা চলিয়া গেলেন

রামচন্দ্র ॥ বলে তো গেলেন 'প্যাক্ট'-এর যুগ। কিন্তু দরকার পড়লেই সে 'প্যাক্ট' যায় চুলোয়। দেখেছি তো। বরং বলবো, খাওয়াখায়ির যুগ এটা। যে যাকে পাচ্ছে—খাচ্ছে।

সীতা। খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছো দেখছি। হরিশ-বাবুকে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে এই তো ভাবছো? তা অত ভাববার কি আছে? কাল সাক্ষী দিয়ে এসো। বাড়ীওয়ালা ডিগ্রীটা পেয়ে যাক, তিনমাসের মধ্যে হরিশ-বাবু হবেন উচ্ছেদ। মুখ দেখাদেখির দায়ও যাবে চুকে।

রামচন্দ্র ॥ বাড়িওয়ালার জন্যে তোমার অত দরদ কেন, সেকথা কি আমি বুঝছি না ভেবেছো?

সীতা ॥ কী বুঝেছো?

রামচন্দ্র ॥ বাড়িওয়ালার ঐ সবেধন নীলমণি ছেলেটির পিছে লেলিয়ে দিয়েছো তোমার মেয়েকে। জামাই করবার মতলব তাকে।

সীতা ॥ যাক। এটুকু তবে বুঝতে পেরেছো।

রামচন্দ্র ॥ কিন্তু বুঝছি না—মেয়েটা কি করে এতে সায় দিয়েছে। বাড়িওয়ালার ছেলেটা তো দেখতে একটা ষাঁড়। না শিখেছে লেখাপড়া, না জানে ভদ্রতা। অথচ নাম নিয়েছে কার্ত্তিক চন্দর।

সীতা ॥ রাখো রাখো। লেখাপড়ায় ভদ্রতাতে কার কি হচ্ছে শুনি! ঐ তো তপন—যাকে তুমি জামাই করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছো। মুরোদ কি তার? কলেজের ছেলেদের রাখালী করে ক' টাকা তার রোজগার? আছে বাড়ি না গাড়ি?

রামচন্দ্র: কিন্তু দেবযানী মনে মনে ভালোবাসে ঐ রাখালটিকেই।

সীতা ॥ বাসুক। বাধা দিচ্ছে কে? কার্তিকের সঙ্গে দু'হাত এক না হওয়া পর্যন্ত ঐ তপনটিকে মেঘের আড়ালে রাখতে বলে দিয়েছি আমি। সেটা এমন কিছু বেশি নয়।

রামচন্দ্র ॥ দু'হাত এক হয়ে গেলেই বুঝি মেঘটা যাবে কেটে? তুমি ভেবেছো তপন এতে রাজি হবে? রাজি হবে দেবযানী? আর, কার্ত্তিক?

সীতা ॥ বলি, পরকীয়া প্রেমের যুগটা যে আবার ফিরে এসেছে সে খবর রাখো?

রামচন্দ্র ॥ আঃ, কিন্তু এমন অবাধ মিলনের পরিণামটা কি? সন্তান হলে বাপ বলে ডাকবে কাকে?

সীতা ॥ সন্তান! সন্তান জন্মাবে তবে তো বাপ বলে ডাকবে। কোন যুগে রয়েছো তুমি? সরকারী বিজ্ঞাপন-গুলোও বুঝি চোখে দেখ না। পরিবার নিয়ন্ত্রণ, জন্ম-শাসন—এসব যে সরকারই চাইছেন এখন। রাস্তায় ক্লিনিক বসেছে সব। না দেখে থাকো, শোনোও নি কি এখন পর্যন্ত?

রামচন্দ্র ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। কাগজে পড়েছি বটে। কিন্তু সেটা যে আমার পরিবারেও হানা দেবে এত কোনো দিন ভাবিনি। ওগো, তুমিও কি পরিবার নিয়ন্ত্রণের দলে।

সীতা ॥ সেটা ফলেন পরিচীয়তে। তোমার চাঁদা-মামাকে তো দেখছি না। ...কোথায়?

রামচন্দ্র ॥ পাশের ঘরে বই পড়ছেন।

সীতা ॥ শোনেন নি তো এসব কথা?

রামচন্দ্র। সে সব ভয় নেই। উনি এজগতের লোক নন।

সীতা ॥ যাক বাঁচলাম। ও ঘরে পুঁথি পুস্তকে ডুবে আছেন, তাই যা রক্ষে। নইলে এখন এখানে অনেকের আসবার কথা, দেখলে হয়ত চোখ কপালে উঠতো। ভারি বেমানান তোমার ঐ মামা আমাদের এই পরিবারটিতে।... দেবযানীর গলা পাচ্ছি। বলছিলো, লোকটি কে? মানুষ না বনমানুষ?

[দেবযানীর প্রবেশ]

দেবযানী ॥ হ্যাল্লো মামী! হ্যালো ড্যাড্! আজ-কের পিকনিকটা হয়েছে ওয়াণ্ডারফুল।

সীতা ॥ তুমি একা কেন দেবযানী? কার্তিক কই?

দেবযানী ॥ ও, সে বুঝি জানো না? সে যা কাণ্ড! আমাকে নিয়ে আজ পিকনিকে সে যা একটা 'সীন' হলো—দস্তুরমতো একটা নাটক।

সীতা। বলিস কি? কার্তিককে বুঝি চটিয়ে এসেছিস? পই পই করে তোকে বলি। বেশ একটু 'নাইস' হবি ওর কাছে। তা' না হয়ে 'রুড' হয়েছিলি বুঝি আবার?

দেবযানী ॥ না মা। ওর কাছে আমি বেশ 'নাইস'

হয়েই ছিলাম 'অল আলং'। তাতেই বাধলো গোল। তপনও গিয়েছিলো কিনা!

সীতা॥ তপন গিয়েছিলো কেন? কে তাকে যেতে বলেছিলো? তার তো যাবার কথা নয়।

দেবযানী॥ ও মা, জানো না বুঝি, তক্কে তক্কে থাকে যে। কলেজের কিছু ছেলে নিয়ে, সেও দেখি হাজির বোটানিক্যাল গার্ডেনে।

সীতা॥ তুমি বুঝি এক গাল হেসে তাকে ডেকে নিলে?

দেবযানী॥ ঐটিই আমার ভুল হয়েছিলো মা।

রামচন্দ্র॥ তার পর?

দেবযানী॥ কার্তিক গেল তখন বটে। সুরু হলো কথা কাটা-কাটি। তা থেকেই হাতাহাতি। তা থেকেই মারামারি। আমার এমন গর্ব হচ্ছিলো মা!

রামচন্দ্র॥ গর্ব?

দেবযানী॥ হ্যাঁ বাবা। আমাকে নিয়েই তো ওদের এই লড়াই। মনে হচ্ছিলো আমি যেন সেকালের তিলোত্তমা। আর ওরা যেন সুন্দ-উপসুন্দ। আমার জন্যে জীবনও দিতে পারে ওরা।

রামচন্দ্র॥ (উদ্বিগ্ন হইয়া) কিন্তু জীবন গেছে কি কারো?

দেবযানী॥ না বাবা।

সীতা॥ জখম হয়েছে কেউ?

দেবযানী॥ তা' হয়েছে মা।

সীতা॥ কে, কার্তিক নয় তো?

দেবযানী॥ জখম হয়েছে দু'জনেই। কিন্তু আমার কি আপশোস হচ্ছে জানো তোমরা? কারো জখমই মারাত্মক নয় বলে কালকের খবরের কাগজে না বেরুবে নিউজটা, না বেরুবে আমার ফটো। কাগজের রিপোর্টার এসেছিলো ছুটে। দেখছিলো সব। আমি বললাম, ফটো নেবেন না? তা হেসে বললো, কেউ তো মারা গেল না? এটা কোনো নিউজ-ই নয়। পথে ঘাটে হাটে মাঠে এতো হামেশাই ঘটছে। ভদ্রলোক শুধু আমাকেই হতাশ করলো না, নিজেও নিরাশ হয়ে চলে গেল।

রামচন্দ্র॥ ভদ্রলোক তো চলে গেলেন, কিন্তু তোমার সুন্দ-উপসুন্দ কোথায়?

দেবযানী॥ ও, সে জানো না বুঝি? ট্রাজেডি হতে হতে হয়ে গেল কমেডি।

রামচন্দ্র॥ কমেডি?

দেবযানী॥ হ্যাঁ। কমেডি। ঠিক বাংলা নাটকে যেমনটি দেখি। গায়ের ধুলো ঝেড়ে দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো। রুমাল বের করে দু'জনেই দু'জনের 'উন্ড' বেঁধে দিলো। তার পর কার্তিক, তপন আর আমাকে টেনে নিয়ে গেল তার গাড়িতে। আমার দু'পাশে দু'জনে বসে গাড়ি নিয়ে ছুটলো একটা ডাক্তারখানায়। ড্রেস্ হলো উন্ড। তার পর খাওয়া হলো আইস ক্রীম। তার পর ওরা যা বললো মা, তা শুনে তোমাদের মনে এতটুকু অশান্তি থাকবে না আর।

সীতা॥ কি বললো?

দেবযানী॥ বললো, আজ থেকে আমাদের প্যাক্ট হলো দেবযানী। Peace Pact.

সীতা॥ সেটা আবার কি?

দেবযানী॥ কি আশ্চর্য! সেটাও আমাকে মানে ক'রে বলতে হবে তোমাদের? যাও অতশত বোঝাতে আমি পারবো না।

অন্দরে ছুটিয়া চলিয়া গেল

সীতা॥ (স্বামীকে) বুঝলে না? ঐ সেই ক্লিনিক। তোমাদের সরকারই এসব সুবিধা করে দিয়েছেন। ভালোয় ভালোয় কার্তিকের সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যাক। একুল-ওকুল দু'কুলই বজায় থাকবে। বাঁচা যাবে।

রামচন্দ্র॥ ছিঃ ছিঃ!

সীতা॥ একটা কথা ভুলে যেয়ো না তুমি, সে রামও নেই, সে সীতাও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। তোমার নাম রামচন্দ্র, আর আমার নাম সীতা হলে কি হবে? সে যুগই গেছে পাল্টে। তবে ঘটনাগুলো এখনো ঘটে। সীতাকে নিয়ে রাম রাবণের যুদ্ধ এখনো হয়। তফাৎ এই, এ যুগে রাবণ মরে না, সীতার অগ্নিপরীক্ষাও হয় না। এটা হলো শান্তির যুগ। খবরের কাগজ খুলে দেখ। দেখবে, সকলের মুখে শান্তির বাণী। আপোষ ছাড়া এ যুগে গতি নেই। আপোষ ছাড়া এ যুগে বাঁচা চলে না। ওদের কি দোষ। ওরা যা শিখছে, ওরা যা দেখছে—ওরা তাই করছে।

দেবতাত্মা হিমালয়　　　শিল্পী : ইন্দ্র দুগার
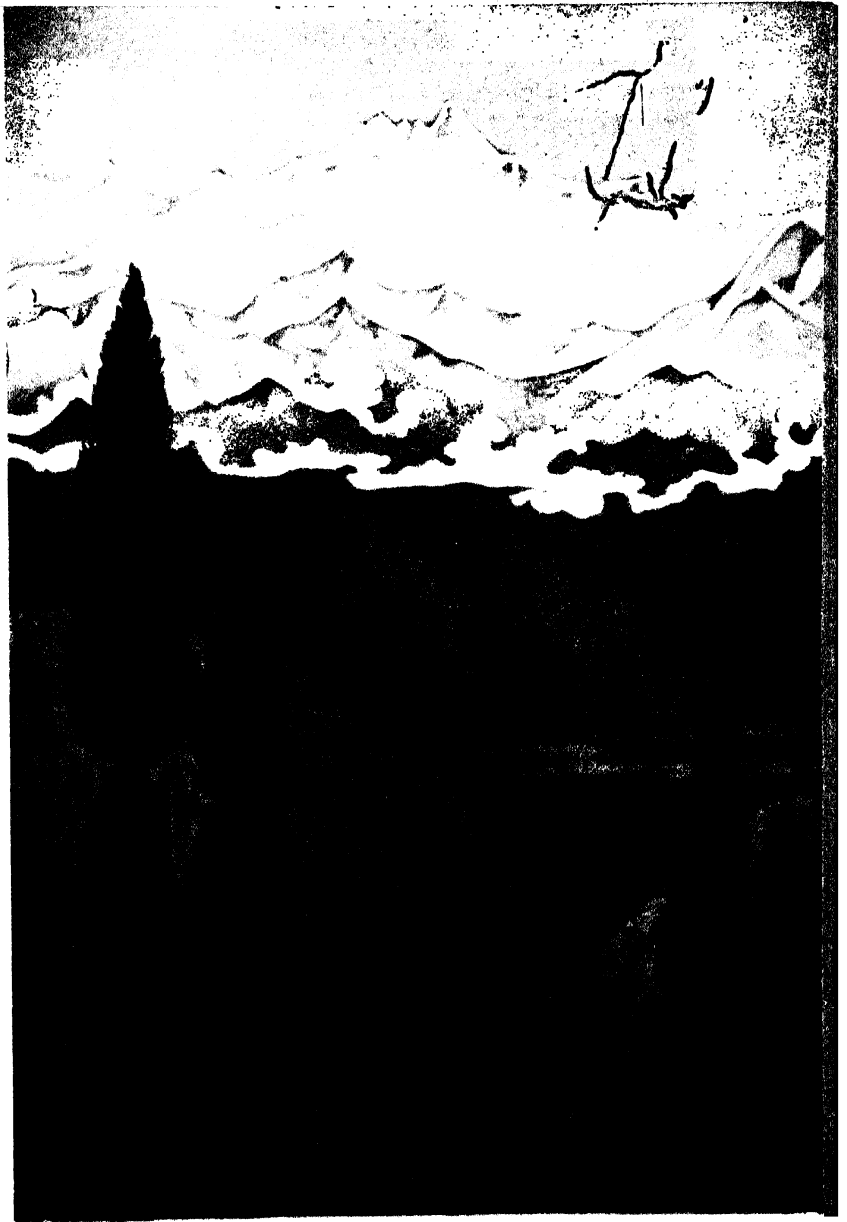
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

রামচন্দ্র ॥ কিন্তু—

সীতা ॥ কিন্তু আবার কি ? তুমি বাড়িওয়ালার সাথে আপোষ করোনি ? না করে উপায় ছিল কোথায় ? দাঁড়াতে পারো তুমি আমাদের নিয়ে গিয়ে পথে ? ইজ্জতের ভয় নেই তোমার ? নাও আর কথা বলো না। এসো, খাবে এসো। আমি খানা দিতে বলছি !

সীতার অন্দরে প্রস্থান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন চাঁদা-মামা

চাঁদা-মামা ॥ বুঝলে বাবা রাম ভাগ্নে, তোমার সমাজ-বিপ্লবের বইটি রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম।

রামচন্দ্র ॥ কেমন লাগলো আপনার চাঁদা-মামা ?

চাঁদা-মামা ॥ আমার যা জ্ঞান, থাকি এজগতের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। অত দূরে থেকে যা দেখতাম, যা শুনতাম ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। বইটি পড়ার পর এখন সব বুঝলাম।

রামচন্দ্র ॥ কি বুঝলেন চাঁদা-মামা ?

চাঁদা-মামা ॥ বুঝলাম, এই যুগে মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে তাকে অমানুষ হতেই হবে।

রামচন্দ্র ॥ কিন্তু আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

চাঁদা-মামা ॥ পালাচ্ছি বনে। আমি মানুষ নই বাবা, বনমানুষ।

চাঁদা-মামা যেন পলাইয়া বাঁচিলেন

রামচন্দ্র ॥ চাঁদা-মামা। চাঁদা-মামা !

কিন্তু চাঁদামামা আর ফিরিলেন না। রামচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন বড় জানালাটির ধারে। শুধু দেখিতে পাইলেন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছে।

॥ যবনিকা ॥

কলাপিনী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ঘুমে-ভেজা রাতে তুমি যেন মোর ভরা ভাদরের নদী
চাঁদ ভেসে আসা নীলনভোতলে স্রোতের দোলায় দুলি।
রস তরঙ্গে ভেসে যেতে কেন সাধ জাগে নিরবধি
তরী খানি আর তীরেতে ফিরাতে আমিযে গিয়েছি ভুলি।
তোমার হৃদয়ে যে চর দেখেছি সে গেছে আজিকে ডুবে,
উপনিবেশের হোলো নাক ঠাঁই আলো ছায়া মেখে মেখে।
কত মেঘঝড় বাদলের ধারা এলো গেলো নানা রূপে,
তোমার চকিত রূপান্তরেতে ছুটে চলে ঢেউ বেগে।

তব কল্লোল সঙ্গীত শুনি, ঘন আবর্ত্ত হেরি,
পাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে দুরন্ত গতি বাধা বন্ধন টুটে।
দূরে ঠেলে দিলে তোমারে বরিতে ছিল যারা তনু ঘেরি
তাদের প্রাণের গভীর বেদনা গুমরি গুমরি উঠে—
রাত্রি-শিবিরে ঢেলেছে অশ্রু, সেকথা জানো কি তুমি ?
কেন গো আমারে বাহু বন্ধন করিলে অধর চুমি !

কতনা ভ্রূকুটি করেছ তাদের ব্যাকুল বাসনা দেখে,
কি জানি কেন গো টেনে নিলে মোরে নৈশ বিহার তরে !
অসঙ্কোচেতে যে কথা কহিলে প্রণয় সুষমা মেখে
তাহারি আবেগে আসিয়াছি লোক-
লোচনের অগোচরে।
আজ কিছু নয়, তোমাতে আমাতে সারাটি রজনী জাগা,
প্রণয়-মন্দির সুখ সমারোহে এক হয়ে শুধু থাকা।

দুধালি বুকের গোলাপী আঙিনা রূপ-মানকে ভরা,
রজত-জ্যোছনা পড়েছে ছড়ায়ে কুসুম গন্ধ ছেয়ে ;
স্তনাগ্রে যেন সূর্য্যোদয়ের আলোক পড়েছে ধরা,
কৌমুদীসম তব নিতম্ব—চাঁদ বুঝি থাকে চেয়ে।
প্রথম মিলন উৎসব ক্ষণে স্খলিত বসনা হয়ে,
পঞ্চ প্রদীপ জ্বালালে কেন গো দেহের আরতি লয়ে ?

পদাবলী সাহিত্যে স্বয়ং-দৌত্য

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

পদাবলী সাহিত্যে স্বয়ং-দৌত্য একটী বিশিষ্ট অধ্যায়। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয়—স্বয়ং-দৌত্য নায়ক ও নায়িকার "সাক্ষাৎ অভিযোগ।" সংস্কৃত সাহিত্যে-স্বয়ং-দৌত্যের অনেক শ্লোক আছে। প্রাকৃত ভাষায়-রচিত প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত গাথা-সপ্তশতী বা হালা-সপ্তশতীর মধ্যেও স্বয়ং-দৌত্যের কবিতা আছে। ভাবটা এইরূপ—বিদেশী পথিক আসিয়া গৃহে আশ্রয় লইয়াছে। বাড়ীর বধূ তাহাকে বলিতেছে—পতি আমার বিদেশে। শ্বশুর বাঁচিয়া নাই। শাশুড়ী বৃদ্ধা এবং চোখে দেখিতে পান না। ননদিনী কালা। নিকটে প্রতিবেশী কেহ নাই। রাত্রি অন্ধকার, অতএব হে পথিক ইত্যাদি।

পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। পদাবলী প্রণেতৃগণ সাবধান করিয়া দিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, শ্রীরাধা তাঁহার স্বরূপ শক্তি, অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তি। কেমন করিয়া সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া সংসারের সর্ব্ব বাধাবন্ধ পায়ে ঠেলিয়া শ্রীভগবানে আত্ম সমর্পণ করিতে হয়, শ্রীরাধাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া ব্রজবধূগণ সেই দৃষ্টান্তই দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিত প্রণেতা মহাকবি কবিরাজ কৃষ্ণদাস তো পরিষ্কার বলিয়াছেন।

> পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
> ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।

সুতরাং শ্রীরাধা-গোবিন্দ লীলাকথা আলোচনা করিতে হইলে প্রাকৃত দৃষ্টি পরিহার করিতে হইবে। পদাবলী সাহিত্যের পটভূমিকায়—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা অনুসরণের পদ্ধতি গ্রহণ না করিলে রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটিবে। নয়নে প্রেমাঞ্জনের প্রলেপ দিয়া পদাবলী সাহিত্য পাঠ কর। বিশেষত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতে সারা বাঙ্গালার শিক্ষিত অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ নরনারী—এই দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়াই পদাবলী সাহিত্য পাঠ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কীর্ত্তন গান শুনিতে গিয়া—শ্রীগৌরাঙ্গের পদরজ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া—দেহ মনকে পবিত্রতায় অনুলিপ্ত করিতে শিখিয়াছে। আধ্যাত্মিক সাধনার ঐতিহ্যমণ্ডিত অধিষ্ঠান ভূমিতে দাঁড়াইবার সঙ্কেত জানিয়া লইয়াছে। এই জন্যই বৈষ্ণব পদাবলী ধর্ম্মমূলক রচনা হইয়াও রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের মর্য্যাদালাভ করিয়াছে।

অভিযোগ পূর্ব্বরাগেও আছে। শ্রীরাধাকে সখী বলিতেছেন—"বেলি অবসান কালে তুই গিয়াছিলি নাকি জলে। তাহারে দেখিয়া মুচুকি হাসিয়া ধরিলি সখার গলে।" ইহা নায়িকার অভিযোগ—নায়কের প্রতি। আবার শ্রীরাধা সখাকে বলিতেছেন—আমাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ—।' না জানিয়ে কোন্ মনোরথে অকুল কিশলয় দলে কর দংশ", ইহাও নায়িকার উদ্দেশে নায়কের অভিযোগ। কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণের এখনো মিলন ঘটে নাই। তজ্জন্য ইহার মধ্যে মাত্র ইঙ্গিতই আছে, আলাপ-অর্থাৎ কথা আসিয়া আসন গ্রহণ করে নাই। স্বয়ং-দৌত্যের মধ্যে পরস্পরের কথার সুযোগ প্রচুর, বাক্যের দ্বারাই নায়িকা ও নায়ক আপন অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির একটী পদ—শ্রীরাধার স্বয়ং-দৌত্য

> পহিল পসার সংসারক সাররন পরহোকি পহিল
> তোহার হে।
> হঠে আঁচর মোর নকরি না হলবে রবে রস ভঙ্গ
> জাএত উঘার হে।
> এ হরি এ হরি আরতি পরিহরি হঠন করিঅ
> পহু বাট হে।
> জেহে বে সাহল সে কি বে সাহব উচিত মনোভব
> হাট হে।
> কাঞ্চনে গঢ়ল পয়োধর সুন্দর নাগর জীবন
> অধার হে।
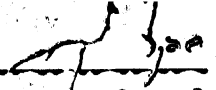
দুইত রতন তুল ন রহ অধিক মূল কিনহিন পার
গমার হে।
ভনই বিদ্যাপতি সুন হে সুচেতনি হরি সঁয় কৈসন
সমান হে।
কপট তেজি কহু ভজহ জে হরি সঞো অন্তকাল
হৌয় ধাম হে।

আমার প্রথম পসরা সংসারের সার রসের। প্রথম বিক্রয় তোমার নিকট, তোমার হাতেই প্রথম বউনি। ভদ্র, বলপূর্ব্বক আমার আঁচল টানিয়া ফেলিয়া দিও না। রস উছলিয়া পড়িবে। ওহে হরি, ওহে হরি, প্রভু, আমার আর্ত্তি উপেক্ষা করিয়া পথে বলপ্রয়োগ করিওনা। মদনের হাটে ইহাই উচিৎ, যে যাহা একবার বিকাইয়াছে, পুনরায় কিরূপে তাহা বিক্রীত হইবে। নাগরগণের জীবনাধার আমার সুন্দর পয়োধর কাঞ্চনে গঠিত। ইহা রত্নের মত, ছুঁইলে ইহার অধিক মূল্য থাকে না। গ্রাম্য লোকে নাগরগণের প্রার্থিত এই বস্তু কিনিতে পারে না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সুচেতনি শোন, হরির সঙ্গে কিরূপে সমান হইবে? কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিকে ভজনা কর। যাহাতে অন্তকালে তাহার পার্শ্বে স্থান হয়।

বয়োজ্যেষ্ঠ কবি গোবিন্দ আচার্যের একটি পদ্যাংশ রসকল্পবল্লীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। আমি তাহার বাকী অংশ পাইয়া বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। এটিও শ্রীরাধার স্বয়ং-দৌত্যের পদ।

ঘন মেঘ বরিষায় বিজুরি চমকে।
তাহা দেখি প্রাণ মোর থরহরি কাঁপে॥
ছোড় ছোড় আঁচর নীলজ মুরারি॥
লাজ নাহিক তোর হাম পর-নারি॥
ঝাঁপল বনতল তিমির আসিয়ে।
একসরি আকুল পথ নাহি পাইয়ে॥
নিবারিয়ে নীর ধার বসন অঞ্চলে।
নিরজনে জানিয়া আইনু তরুতলে॥
বিপতি সময়ে তব এবা কোন ঢঙ্গ।
গোবিন্দ দাস কহে লাগয়ে যজ্ঞ॥

মেঘ হইতে অবিরত বৃষ্টি পড়িতেছে। বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে। তাহা দেখিয়া আমার প্রাণ থরহরি কাঁপিতেছে। নির্লজ্জ মুরারি, আমার আঁচল ছাড়। আমি পরনারী, জানিয়াও তোমার লজ্জা নাই। আঁধার আসিয়া বনতল ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, পথ না পাইয়া একাকিনী আকুল হইয়া উঠিয়াছি। অঞ্চল দিয়া বৃষ্টি নিবারণ করিতেছি। (সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে) নির্জ্জন জানিয়া এই বৃক্ষতলে আসিয়াছি। বিপদের সময় এ আবার তোমার কোন ঢঙ। গোবিন্দদাস বলিতেছেন ভয় লাগিতেছে যে!

নিবিড় বন, আকাশে মেঘ, বৃষ্টি ও বিদ্যুতের বিরাম নাই। বনভূমি আঁধারে ঢাকিয়াছে, এই তরুতলও নির্জ্জন, জনমানবের আসার কথা দূরে থাকুক, একটা পশুপাখিও আশে পাশে নাই। সুতরাং আমাদের মিলনের তো এই সুবর্ণ সুযোগ। বৃষ্টি সিক্ত নীলাম্বরের আবরণ ভেদ করিয়া শ্রীরাধার তনুদেহের গৌর দ্যুতি উছলিয়া উঠিতেছে। শ্রীকৃষ্ণও একেবারে নিকটে আসিয়া শ্রীরাধার অঞ্চল স্পর্শ করিয়াছিল। সকল দিক্ দিয়াই পরিবেশটি মিলনের অনুকূল।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর রচিত পদ—শ্রীরাধার উক্তি।

ন কুরু কদর্থন শরণ্যাং।
মামবলোক্য সতী মনারণ্যাং॥
চঞ্চল মুঞ্চ পটাঞ্চল ভাগং।
করবান্যধুনা ভাস্কর যাগং॥
ন রচয় গোকুলবীর বিলম্বং।
বিদধে বিধুমুখ বিনতিকদম্বং॥
রহসি বিভেমি বিলোল দৃগন্তং।
বীক্ষ সনাতন দেবভবন্তং॥

আমি সতী, এখানে পথে আমাকে অসহায়া দেখিয়া আমার আসার কদর্থ করিও না। অথবা পথে আমার কদর্থন অর্থাৎ লাঞ্ছনা করিও না। চঞ্চল, আমার বসনাঞ্চল পরিত্যাগ কর। আমি এখন ভাস্কর যজ্ঞে (সূর্য পূজায়) যাইতেছি। গোকুলরক্ষক, আমার বিলম্ব করিয়া দিও না। চন্দ্রবদন, আমি পুনঃ পুনঃ আমার প্রণতি জানাইতেছি। সনাতন দেবতা, এই নির্জ্জনে তোমার বিলোল কটাক্ষ আমাকে সন্ত্রস্ত করিয়াছে।

এইবার গোবিন্দ কবিরাজ রচিত শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্যের পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) মদন কিরাত কুসুম শর দারুণ বৃন্দাবন বন মাঝ।
তেঞি আকুল হরি তাহারি শরণ করি পরিহরি
পৌরুষ লাজ॥
সুন্দরি তুয়া দিঠি অথির সন্ধান।
মনমথ মারিতে জোড়ি নয়ন শর হানল হামারি পরাণ॥
দুহু শরে জর জর জীবন অন্তর কিয়ে করব নাহি জান।
নিজ যশ চাই রাই অব দেয়বি অধর সুধারস পান॥
মণিময় হার তরঙ্গিণী তীরহি কুচ কনকাচল ছায়।
ঐছে তপত জনে গোপতে রাখবি তব গোবিন্দ দাস
যশ গায়॥

বৃন্দাবনের বনমধ্যে মদন কিরাতের পুষ্পশর অতি নিদারুণ। এইজন্যই পৌরুষ লজ্জা ত্যাগ করিয়া আকুল হরি তোমার শরণ লইল। সুন্দরি তোমার দৃষ্টির লক্ষ্য স্থির নাই। তাই মদনকে মারিতে যে নয়ন বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলে তাহা আমারই প্রাণকে আহত করিল। দুই পক্ষের বাণে আমার অন্তর এবং জীবন জর্জ্জরিত হইয়াছে, কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। শরণাগতজনকে যাতনা দেওয়া ভাল নয়, এই বলিয়া এখন যদি নিজের যশ কামনা কর, তবে অধর সুধারস পান করিতে দাও। আর তোমার মণিময় হার তরঙ্গিণীর তীরে কুচ-কনক-পর্ব্বতের ছায়ায় আমাকে তাপিতজন জানিয়া গোপনে রক্ষা কর। তাহা হইলেই গোবিন্দদাস তোমার যশ গান করিবে।

(২) কনকলতা কিয়ে বিকশিল পদুমণি কিয়ে মহী
বিজুরি উজোড়।
কুঞ্জকুটীরে কিয়ে উয়ল হিমকর হেরইতে আয়লুঁ
ভোর॥
সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীত।
কাজর গরলহি ভরল নয়ন শর হানলি অন্তর চিতে॥
তব আগয়ানে করলি তুঁহু ঐছন অব সুপুরুষ বধ জান।
উচ কুচ চুম্বক সরস পরশ দেই উদ্‌ঘাটই দিঠি বাণ॥
আশা পাশ হাসি দরশায়নি কতিখণে রাখবি পরাণ।
বিঘটল সময় পলটি নাহি আওত গোবিন্দ দাস
পরমাণ॥

স্বর্ণলতায় কি পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, কিম্বা উজ্জ্বল স্থির বিদ্যুৎ পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে? না কুঞ্জকুটীরে চাঁদ উঠিয়াছে? মুগ্ধ হইয়া তাহাই দেখিতে আসিলাম। সুন্দরি বিপরীত তোমার চরিত্র। তুমি কিনা কাজলের গরল মাখানো নয়ন শরে আমার প্রাণ এবং মনকে বিদ্ধ করিলে? তবে অজ্ঞাতসারে না জানিয়া যদি ঐরূপ করিয়া থাক, তাহা হইলে এখন একজন সুপুরুষ বধ হইতেছে বুঝিয়া তোমার ঐ উচ্চ স্তনরূপ চুম্বকের সরস স্পর্শ দিয়া সেই নয়ন বাণ তুলিয়া লও। হাসিয়া আশার ফান্দ দেখাইতেছ, কিন্তু কতক্ষণে প্রাণ রক্ষা করিবে? সময় চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। গোবিন্দ দাসই তাহার প্রমাণ।

শ্রীরাধা বলিলেন—(গোবিন্দ কবিরাজের পদ)
মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব গাওত কত কত রাগ।
কুলবতি হোই মন্দির ছোড়ি আয়লু সহই না পারি
বিরাগ।
মাধব তোহে কি শিখায়ব গান।
গোরী আলাপি শ্যাম নট সঞ্চরু তব তুহু বিদগধ
জান॥
মুরলী ছোড়ি অছু মধুর আলাপবি তেসর জনে
জনি জান।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি অব সমুঝিয়ে যতিখণে হোয়ত
সুঠান॥
নিজ জন জানি হৃদয়ে অবধারবি ঐছন গুণবতী
ভাস।
গুণী জন লাজ যৈছে নাহি হোয়ত কহতহি
গোবিন্দ দাস॥

নব কিশলয়ের মত অধরে মুরলী মিলাইয়া কত কত (মালবাদি) রাগ (অনুরাগপূর্ণ গান) গাহিতেছ। বিরাগ সহিতে না পারিয়া (রাগ রাগিনীর বিকৃতির আশ-ঙ্কায়—প্রকৃত অর্থে মুরলী গানে অধীর হইয়া) কুলবতী হইয়াও মন্দির ছাড়িয়া আসিয়াছি (গৃহত্যাগ করিয়াছি) মাধব তোমাকে আর কি গান শিখাইব। গৌরী আলাপ পূর্ব্বক শ্যাম ও নট (অথবা নট নারায়ণ) রাগের বিস্তার কর, তবেই তোমাকে কলা-নিপুণ বলিয়া জানিব। (শ্যাম নটবর, গৌরী আমি, আমার সঙ্গে রসালাপ সাকারেই তোমাকে সুরসিক বলিয়া জানিব) মুরলী ছাড়িয়া মধুর আলাপ (রাগালাপ, রসালাপ) করিবে, যেন তৃতীয় ব্যক্তি

কেহ জানিতে না পারে। তাহা হইলেই তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া (তোমার গললগ্ন হইয়া) যতক্ষণ না সুঠাম (সৌষ্ঠব-সম্পন্ন, সর্বাঙ্গসুন্দর) হয় আমি বুঝিয়া লইব। নির্জ্জন জানিয়া আমার মত গুণবতীর কথা—(ভাস-কান্তি) হৃদয়ে ধারণ করিবে, যেন গুণীজন সমক্ষে (সখীগণের নিকট) লজ্জা পাইতে না হয়। গোবিন্দ দাস কহিতেছেন।

গোবিন্দ কবিরাজ এই পদের কোন প্রতি-উত্তর রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। অন্তত এরূপ কোন পদ পাওয়া যায় নাই। কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস আচার্য্যপাদের বংশধর শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর এই পদের একটী উত্তর রচনা করেন। পদটী তুলিয়া দিলাম।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

রাগ তাল দুঁহু হৃদয়ে ধরলি তুহু জানাব বচনক রীতে।
গ্রাম তিনস্বর বহুবিধ পরকার জানসি কত কত নীতে॥
গুণবতি অভয়ে নিবেদিয়েতোয়।
মধুর আলাপ শিখায়বি নিরজনে নিত্য জন জানিয়া মোয়॥
মুরলী ছোড়ি হাম নিষ্টহি বৈঠব শীখব সুমধুর গান।
গৌরী শ্যামনট তব নহ দুরঘট হোয়ব মিলন সন্ধান।
মুখহি মুখহি যব তুঁহু শিখায়বি হৃদয়ে ধরব তব হাম।
ভণ রাধা মোহন বচন রচন পুন ভাল সে জানয়ে শ্যাম॥

তোমার বচন ভঙ্গীতে—কথার কৌশলে জানিলাম—তুমি রাগ (গানের রাগ রাগিনী—অন্য অর্থে অনুরাগ) এবং তাল (গানের তাল, অন্য অর্থে তাল ফলাদপি গুরু স্তন মণ্ডল) হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ। গ্রাম তিন স্বর-(উদারা, মুদারা, তারা, সপ্তস্বর গ্রাম, অন্য পক্ষে সম্ভোগকালে কোকিল-কপোতের মত কূজন কারিণী) ইত্যাদির ভূমি বহু প্রকারের কত নীতি জান। গুণবতি, অতএব তোমাকে নিবেদন করিতেছি নিজ জন জানিয়া নির্জ্জনে আমাকে মধুর আলাপ (রাগআলাপ অন্য অর্থে রসালাপ) শিখাইবে। মুরলী ছাড়িয়া আমি তোমার নিকট বসিব, সুমধুর গান শিখিব। (তোমার গুণ গাহিব) তখন আর গৌরী শ্যাম নটের মিলন দুর্ঘট হইবেনা। (রাগরাগিনীর মিলন অন্য পক্ষে তোমার আমার মিলন) মুখে মুখে (আমার মুখে মুখ রাখিয়া) যখন আমাকে শিখাইবে, আমি তখন সেই সময় (তোমাকে) হৃদয়ে ধারণ করিব। রাধা মোহন বলিতেছেন, কথা বলিতে শ্যাম ভালই জানেন।

প্রাণ-শক্তির প্রতি

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

অয়ি প্রাণৈশ্বর্য্যময়ি মৃত্যু-সখি ভৈরব-সুন্দরি,
নিখিলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিছ দিবস-শর্ব্বরী
দুর্জ্জয় প্রাণের বেগ দুর্নিবার আঘাত-সংঘাতে;
দিয়েছ—দিতেছ ভরি' থরে থরে সন্ধ্যায়-প্রভাতে
তোমার অঙ্গনতল নিত্য নব আনন্দের গানে,
আবেগ-উচ্ছ্বাস-দৃপ্ত সৃষ্টির সে উদাত্ত আহ্বানে
রক্তের বিন্দুজ্বালা ক্ষুধারূপে জাগায়েছ তুমি,
দেহ হ'তে দেহান্তরে বিলয়ের বক্ষ-বহ্নি চুমি!—
তাই তুমি যুগব্যাপি' অনাদ্যন্ত জরতী জিজ্ঞাসা—
হলাহল উগ্ররসে ফেনায়িত অমৃতের আশা
নৃত্যপরা শুষ্ক রসনায়; আশ্চর্য্য সর্ব্বেশ তব
দণ্ড-পলে লীপ্সাভরা ঈপ্সাহীন
সুখে অভিনব,
শূন্য—পরিপূর্ণ, পুষ্ট মৃত্যু-অভিষঙ্গ-আলিঙ্গনে,
যে-মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয়ী সে-প্রসাদে
সুচির-মরণে!

খাওয়া দাওয়াশেষ হয়ে গেছে। তবু রাত দশটা বেজে গেল।

পায়ের দিককার জানালাটা খোলা। চৈত্র শেষের দক্ষিণ হাওয়ায় পর্দাটা কাঁপছে। পয়লা বৈশাখের আর কত দেরী প্রবীর?

আশে পাশের সব কটা বাড়ির আলো নিভে গেছে। সব কোলাহল শান্ত। নিঃশব্দ নিশাথিনী। বুঝি আমার মতই ক্লান্তিজর্জর। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ঘুমোতে চাইছে, কিন্তু কার অভিশাপে ওর দুচোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। আমার মত ভয়ানক এক শাস্তির বোঝা মাথায় নিয়ে ওকেও জেগে থাকতে হচ্ছে। দূর আকাশের তারাগুলো কী ফ্যাকাশে।

যৌবনের সতেজ উচ্ছল উজ্জ্বলতা হারিয়ে ওরা জরার ক্লান্তিতে মুহ্যমান হয়ে প্রতীক্ষা করছে চরম অবলুপ্তির। সূর্যোদয়ের।

বুঝি আমারি মুমূর্ষু জীবনের মত !

এত রাত্রে তোমাকে চিঠি লিখতে বসবার খানিকক্ষণ আগেও কি ভাবতে পেরেছিলাম, সত্যসত্যই তোমার কাছে কোনদিন কোন চিঠি লেখার দরকার হবে আমার? কতদিন তুমি আমায় বলেছ, অনেক কিছুই তুমি আমায় দাওনি। একটা চিঠিও কি তুমি মনখুলে আমায় লিখতে পার না? যার ভিতর দিয়ে তোমাকে নিবিড় করে পেতে পারি?

আমি বলেছি, আমার চিঠি পেয়ে তুমি খুশি হবেনা প্রবীর। তোমার মতো অমন করে আমি লিখতে পারিনা, একথা তো তুমি জানো।

তুমি বলেছিলে, তুমি যা লিখবে, তাই আমার মনের মতন হবে মণি। শুধু আমার অফুরন্ত ভালবাসার প্রতিদানে কিছু যেন থাকে তাতে।

আমি এ কথার উত্তরে হেসেছিলাম।

তুমি অধীর হয়ে বলেছিলে, কেন—কেন আমার এত চিঠি পেয়েও তুমি কখনো উত্তর দাও না? তোমাকে ছেড়ে যখন দূরে চলে যাই, তখন আমার সমস্ত পৃথিবী শূন্য হয়ে যায়। চিঠি লিখে সে অভাব মেটাতে চাই। আমি দূরে গেলে তোমার এ ইচ্ছে হয়না কেন মণি?

কেন? আমি আস্তে আস্তে তোমার ব্যগ্র ব্যাকুল দুই চোখে আমার দুচোখ রেখে উত্তর দিয়েছিলাম; প্রবীর, তুমি আমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, সমস্ত সত্তায় এমন করে জড়িয়ে আছো, তুমি নিজেও জাননা সে কথা। দূরে গেলেও তুমি আমার সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন করে থাকো। আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান। আমার সমস্ত শূন্যতা পূর্ণ করে দিয়েছ। এবার বুঝতে পেরেছ?

আমার কথা তুমি বুঝতে পেরেছিলে। তোমার দুচোখে তারই গভীর উপলব্ধি আমার আত্মাকে স্পর্শ করেছিল।

আগেকার কথা ছেড়ে দিলে তোমার আমার মাত্র তিন বছরের আলাপ পরিচয়। আর এই তিন বছরে তোমার অনেক চিঠির উত্তরে আমার মাত্র এই এক খানা চিঠি লেখার প্রচেষ্টা। এই সুরু। বোধ হয় এই শেষ। কিন্তু প্রবীর, সুরু করা যতটা সহজ ভেবেছিলাম লিখতে বসে দেখছি তত নয়। আর শেষ?

কি জানি শেষ পর্য্যন্ত এ চিঠি শেষ করতে পারব কি না।

এইমাত্র বুড়ী ফুলমতিয়া আমাকে শুইয়ে দিয়ে, আমার নরম স্প্রিং-এর গদিটার চারধারে নেটের মশারি গুঁজে বেশী রাত জাগতে বারণ করে দরজা ভেজিয়ে পাশের ঘরে শুতে চলে গেল। বড় কড়া শাসন ওর। আর সেইজন্যেই মা ওকে আজই পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার সঙ্গেই। তুমি হয়ত ভাবছো—আমার বাপের বাড়ির পুরোনো দাই, যার হাতে শুধু আমি নই, অনেকেই মানুষ হয়েছে, সে এখানে কেন? অথবা বুড়ো জগন্নু বোধহয় নেই এখানে। সুবিনয় টুরে চলে গেলে এতদিন যাকে ভরসা করে এ ফ্ল্যাটে একলাই কাটিয়েছি। কিন্তু না। জগন্নু নীচে ঘুমোচ্ছে। আর ফুলমতিয়ার কথা পরে লিখছি। অবশ্য যদি শেষ পর্য্যন্ত চিঠিটা লিখতে পারি।

প্রবীর! এইটুকু লিখেই হাত কাঁপছে। বেড-সুইচটা টিপে ঘর অন্ধকার করে বালিশে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। ইচ্ছে করছে, অনেক অনেক ইচ্ছার মত এই নিদারুণ চিঠি লেখার ইচ্ছাটারও নিবৃত্তি হোক। কিন্তু, প্রবীর, লিখতে আমাকে হবেই। লিখতে হত না—যদি আঠারো বছর বাদে এক ভয়ঙ্কর কঠিন সত্যের মুখোমুখি আজই আমাকে দাঁড়াতে না হত!

অথচ এই সত্যের স্বরূপটা আর মাত্র দু তিনটে মাস পরে জানতে পারলে এমন কি ক্ষতিটা হত?

এতদিন যা চেয়ে এসেছি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে, তা পাইনি। আর যখন তা পাবো, তখন আমার কাছ থেকে তুমি কতদূরে চলে যাবে প্রবীর?

আমার বিবাহিত জীবনের প্রায় পনেরোটা বছর বাদে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল নতুন করে। একথা তুমি জানো। কিন্তু তুমি কি জানো কী ভাবে কেমন করে তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হবার আগেকার পনেরোটা বছর কেটেছে?

না প্রবীর, তুমি তা জানতে পারবে না। বুঝতেও পারবে না। একটি নয়। যদি সহস্রটা হৃদয়ও তোমার থাকতো তাহলেও আমার সেদিনগুলির মর্মন্তুদ বেদনা আর শূন্যতা তুমি কিছুতেই অনুভব করতে পারতে না।

সেই সেদিনের মন। নিয়ম শৃঙ্খলায় বাঁধা একটা

যান্ত্রিক জীবন। কতকগুলো ছকে-কাটা অভ্যাসের সমষ্টি দিয়ে ঘেরা অর্থহীন বেঁচে থাকা। খাওয়া দাওয়া, বাপের বাড়ি, আত্মীয় বাড়ি যাওয়া, সিনেমা দেখা, স্বামীর সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন। অবসর সময়ে পড়াশোনা। আর বাদ বাকী অন্য সব দায়িত্ব পালন।

প্রবীর আমি যদি সাধারণ মেয়েদের মত হতাম!

একথা বলছি কেন তুমি জানো। আমি সাধারণ নই আর পাঁচটা মেয়ের মত। আমি স্বতন্ত্র। এই মন্ত্র, এই আত্মবিশ্বাস, তুমিই আমায় এনে দিয়েছিলে। অবশ্য স্বীকার করি, রূপটা আমার সাধারণ মেয়েদের চেয়ে খানিকটা বেশীই ছিল।

তোমাকে নতুন করে দেখার আগে আমি কি বেঁচে-ছিলাম? না প্রবীর। মণিমালার নবজন্ম তোমার প্রথম যৌবনের মুগ্ধ দুচোখের দৃষ্টির আলোয়। পনেরো বছরের অভ্যাসের জাল দিয়ে বোনা একঘেয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত জীবনের স্তিমিত বিশীর্ণ মরা নদীতে তুমি আনলে প্রাণের জোয়ার। হিমস্তব্ধ পঞ্চম ঋতুর অবসানে বসন্তের দাক্ষিণ্যে যেমন করে পুষ্পিত মঞ্জরীত হয়ে ওঠে শ্রীহীন বন্ধ্যা পৃথিবী, আলো আর উত্তাপের বন্যায় জড়তা থেকে প্রাণ চৈতন্যের সুনিবিড় পুলক স্পন্দনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি করে তুমি আমার রক্তে রক্তে দুর্বার কামনার নেশা ছড়িয়ে দিলে। জাগিয়ে দিলে নিবিড় উন্মাদনা!

এক জলন্ত আগুনের স্ফুলিঙ্গ জাগিয়ে তুললো আর এক প্রায় নিভন্ত প্রদীপের শিখাকে। ছোট্ট মরা-হাজা একটা পুকুর পার হয়ে আমি দেখলাম অগাধ অতল মহাসাগর।

জীবন সমুদ্র!

সেদিন তুমি আমার যে রূপ আর যে অপরূপ দেহ লাবণ্যে মুগ্ধ হয়েছিলে, তখন সে তো যৌবন সীমান্ত-রেখায়। নিজের সম্বন্ধে এতটুকুও মোহ আর আমার অবশিষ্ট ছিল না। কোনমতে একটা দিন শেষ করে আরেক বিরক্তিকর মন্থর দিনে পদক্ষেপ। মেসিনের মত ঘুরে চলেছি। আর প্রতীক্ষা করেছি কখন থামবো। সুইচটা টিপে কেউ বন্ধ করে দিক—আমার এ যান্ত্রিক জীবনটার একঘেয়েমি।

তুমি এলে। সুইচ টিপলে। থামবার নয়। গতি হীনতার নয়। দুরন্ত আলোড়নের। ঝড়, বন্যা-প্লাবনের।

প্রবীর, আমি জ্বললাম। বেঁচে উঠলাম। সার্থক হলাম। পূর্ণ হলাম।

সুবিনয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা তুমি সবই জানো। তখন তুমি খুবই ছোট। দুপক্ষের অভিভাবকরাই দেখে শুনে সব ঠিক করে দিয়েছিলেন। এমন কি বিয়ের আগে সুবিনয় আমাকে একবার চোখের দেখাও দেখেনি। আর আমার কথা বাদ দাও। মধ্যবিত্ত পাঁচটার ঘরের সেকেলে আবহাওয়ায় আমি মানুষ। এ ইচ্ছে একেবারেই অবান্তর আমার পক্ষে। আঠারো বছর বয়সেই এক অন্তঃপুর থেকে আর এক অন্তঃপুরে বদলি হলাম আমি। বিবাহিত জীবনের আরো সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর।

এই খানেই মস্তবড়ো একটা প্রশ্ন আসতে পারে। কিন্তু সে প্রশ্নও অবান্তর হয়ে উঠলো কয়েকটা বছর কাটবার পর। সুবিনয় আর আমার দৈহিক সম্পর্কের সম্বন্ধ ছাড়িয়ে একটা মস্তোবড় প্রশ্ন সাপের মত বিষের ছোবল তুলে, ফণা উঁচিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালো।

অথচ সব ছিল। সাজানো গোছানো ফার্ণ রোডের ফ্ল্যাট। দরজায় জানালায় বাহারি পর্দা। ঝক ঝকে পেতলের টবে পামের চারা। লতানে যুঁই আর গোলাপের ঝাড়। রান্না ঘরের জন্যে রাঁধুনী, আর অন্য কাজের জন্যে পুরানো লোক জগন্নু। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব। মা-দাদা বৌদিরা, ভাই বোন! সুবিনয়। অফিসের কাজে ওকে মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে যেতে হয়। আবার ফিরে আসে। সেই পুরোনো একঘেয়ে অভ্যাসগুলিকে সঙ্গে করে।

সেদিন ছোট-বৌদির সাধ। প্রথম নয়। বিয়ে হয়েছে অনেক পরে। বড় বৌদি সকালেই চিঠি লিখে পাঠালো; 'মণি ঠাকুরঝি, তুই তো ভাই নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, একটু সকাল সকাল চলে আসিস। অনেক লোক জন আসবে। অনেক কাজ। সুবিনয় রাত্রে এখানে খেয়ে তোকে নিয়ে যাবে অফিস ফেরত।

আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। আর এমন কাজের ডাকও নতুন নয়। শুধু সাধ, অন্নপ্রাশন বলেই নয়, বাপের বাড়ি ভাশুর জা দেওরের বাড়ি বলেই নয়, ডাক আসে আশে-পাশের বন্ধু বান্ধবদের বাড়ি থেকেও।

মণিমালা, কী চমৎকার তোমার সেলাইএর হাত
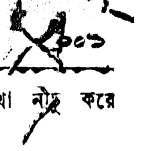
নতুন প্যাটার্নটা একটু তুলে দিওতো। ব্লাউজটার নতুন কাটটাও একটু দেখিয়ে দিও ঐ সঙ্গে। তোমার তো বেশ মজা! ঝাড়াহাতপা! কত সময়।

মণি, তুমি কিন্তু বেশ আলপনা দিতে পারো। সন্ধ্যা-বেলা দিয়ে যেও ভাই লক্ষী মেয়ে। তোমার তো আর ঝামেলা নেই।

রীতাকে দেখতে আসবে। মণি, একটু সকাল সকাল আসতে হবে ভাই। নীতা সাজায় চমৎকার, কিন্তু ও আবার আসতে পারবে না। কোলে একটা, আবার—আর আমাদের? দেখতেই তো পাচ্ছো, কাচ্চা-বাচ্চা সামলে মরবার যদি সময় থাকে।

শুধু এই নয়। আরো অনেক!

প্রথম প্রথম খারাপ লাগত না। নিঃসঙ্গ অবসরগুলো এই কাজেই ভরে তুলতাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সব যেন বিষ হয়ে যেতে লাগলো। বৌদির চিঠিতে আর একটা কিসের ধাক্কা লাগলো। কাঠের মত বসে রইলাম চিঠিখানা হাতে নিয়ে।

সুবিনয় কাছে এলো। চিঠিটা পড়লো। খুসি হল। দিনের পর দিন আমার পরিবর্ত্তন, নিস্তেজ হয়ে আসা ও লক্ষ্য করছিল। আমার বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, সব কিছুর উপর আমার উদাসীনতায় ওর বুঝি ভয় ধরে যাচ্ছিল।

মুখে বললো, চলো তোমাকে এখনি রেখে আসি। হৈ চৈ করে সময়টা কেটে যাবে।

চিঠিটা পড়ার পর থেকেই সমস্ত মনটা বজ্রগর্ভ মেঘের মত থম থম করছিল। ওর কথা কানে যেতেই বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠলাম, আর কতদিন এভাবে ভুলিয়ে রাখবে। লজ্জা করেনা তোমার? পরের বৌ-এর সাধ খেতে—

আমার চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছিল সুবিনয়ের প্রতি চরমতম ঘৃণায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমায় ঠকাচ্ছে ও! দিনের পর দিন আমার সঙ্গে অভিনয় করে চলেছে। আমি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চাই ওর এই প্রবঞ্চনা! ওর দোষ—সব ওর দোষ!

শান্ত স্বরে সুবিনয় বললো, উত্তেজিত হয়োনা। এই তো অসুখ থেকে উঠলে সেদিন। এখনি ফিট হয়ে পড়বে—। আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি।

পরাজিত ভীত ত্রস্ত একটা করুণ মূর্ত্তি মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এতটুকু ও দয়া হলনা আমার। স্বামী আর স্ত্রী! এক পবিত্র মন্ত্রের বাঁধনে বাঁধা। কিন্তু কোথায় সেই আকর্ষণ? সেই ভালবাসা? নেই—নেই। কিছু নেই। ও নিঃস্ব, রিক্ত। ওর রিক্ততা দিয়ে ও আমাকেও শূন্য করে রেখেছে। কোনদিনও আমি পূর্ণ হতে পারবনা। স্ত্রী-রোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের রিপোর্টে জানতে পেরেছি আমার কোন দোষ নেই। একবার নয়, বহুবার পরীক্ষা করিয়েছি। আমি সুস্থ সবল নির্দোষ।

সুবিনয় প্রতারণা করেছে আমার সঙ্গে। ওর মেডিকেল রিপোর্টেও নাকি কোন দোষ নেই—কিন্তু আমি জানি, একথা মিথ্যে। ভয়ানক মিথ্যে।

সন্দেহের বিষে তিলে তিলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগলো আমার দেহ মন।

তোমার সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি আমার অসুস্থ শয্যার পাশে। অসুখটা কি, তাও তোমার অজানা ছিলনা। চার মাস ধরে একটি থরো থরো দুর্লভ বাসনা অঙ্কুরের মত আমার দেহে মনে প্রাণে আমি পালন করছিলাম তখন। ফিরে পেয়েছিলাম নতুন যৌবন। আর বলতে দ্বিধা নেই, সুবিনয়ের সঙ্গে যে তিক্ত সম্পর্ক একটা অদৃশ্য দেয়ালের মত আড়াল করে রেখেছিল দুজনকে, তাতে ফাটল ধরতে সুরু করেছিল এই চার মাস ধরেই।

কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা ভূমিকম্পে সব ধ্বসে গেল। পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু যখন বললেন—ফল্স্ প্রেগ্-ন্যানসি। সন্তানের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে এ ধরণের ভোগ হয়ে থাকে। অন্তঃসত্ত্বার সব কিছু লক্ষণ দেখা দেয়, কিন্তু সেটা আদপে কিছুই নয়। একটা অসুখ মাত্র।

এতবড় আঘাত সহ্য করতে যে মানসিক শক্তির দরকার, ততটা শক্তি সামর্থ্য সে মুহূর্ত্তে আমার ছিল না। হিষ্টিরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর বিকারে অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। সঙ্গে নানান উপসর্গও ছিল।

একটু সুস্থ হলাম। শ্যামবাজার থেকে বড়ো মাকে সঙ্গে করে নিয়ে তুমি আমায় দেখতে এলে ফার্ণ রোডে। এতদূর উনি একলা আসতে পারবেন না, তাই সম্পর্কে ছোট ভাইকে সঙ্গে করে উনি সেদিন এসেছিলেন।

হাসিমুখে বড়দি বললেন, মণি বলো তো ও কে ?

লম্বা চওড়া একটা জোয়ান অপরিচিত পুরুষের মুগ্ধ-দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করে গায়ের চাদরটা টেনে গলা পর্য্যন্ত চাপা দিয়ে আমি শীর্ণ মুখে বললাম, চিনতে পারছি না তো বড়দি ?

চিনতে আর পারবে কি করে ? চিরকালটা তো এলাহাবাদেই কাটালো। জার্মানী থেকে ফিরেছে মাত্র সেদিন। এখন কলকাতায় থাকবে, তাও মাত্র বছর তিনেকের জন্যে। তুমি পারোনি, ও কিন্তু তোমার নাম শুনে, অসুখের কথা শুনে ছুটে এসেছে। তোমার বিয়ের সময় তুমি যখন ঠাকুরপোর সঙ্গে শুভদৃষ্টি করছিলে, তখন ও বারো বছরের ছেলে। তখন ও তার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তোমার দিকে তাকিয়েছিল। আর ছুটে গিয়ে আমাকে কি বলেছিল জানো ? ঠিক তোমার মত সুন্দর বৌ ওর চাই। কি হাসাহাসিই না করতাম তখন ওকে নিয়ে। মনে নেই তোমার ?

মনে পড়লো। সব মনে পড়লো। সেই সুন্দর ছোট ছেলেটার কথা। দিনরাত কাছে কাছে পায়ে পায়ে ঘুরতো। ফাই ফরমাস খাটতো। সে চলে যেতে অনেক দিন পর্য্যন্ত মন-কেমন করেছিল। আজ কত বড় হয়ে গেছে সে! সুদর্শন স্বাস্থ্যবান কান্তিমান আজকার প্রবীরের সঙ্গে সেদিনকার ছোট ছেলেটার কোন মিলই আজ খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রবীর তোমার মুখচোখ লাল হয়ে উঠলো। পুরোনো ছেলে বয়সের কথায় তোমার লজ্জা হচ্ছিল। আমার কিন্তু কিছুই মনে হয়নি। আমাদের সমাজে এমন ঠাট্টা প্রচলিত আছে। তাছাড়া আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোট দেওয়ের প্রতি স্নেহ ছাড়া আর অন্য কিছুই আমার মনে ছিল না।

বড়দি উঠে গেলেন, অগোছালো সংসারটা গুছিয়ে দেবার জন্যে। চা জল-খাবার, আমার পথ্য ইত্যাদি তৈরী করার কাজে। তুমি চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে এলে আমার বিছানার খুব কাছে।

সহজ হবার ভঙ্গে হেসে বললাম, আমার মত সুন্দরী বৌ পেয়েছ ঠাকুরপো ?

তুমি কিন্তু হাসলে না। আমার চোখে চোখ রেখে বললে, সেই বারো বছর বয়স থেকে খুঁজছি। তোমার মত কাউকে দেখিনি। মনেও ধরেনি। তাই এতদিন বিয়ে করিনি মণি-বৌদি।

আমি চমকে উঠলাম। তোমার গলার স্বর গম্ভীর। তোমার চোখের দৃষ্টি সহজ নয়। তুমি চঞ্চল। অন্য-মনস্ক। তোমায় ঠিক চিনতে পারলাম না যেন।

কোন কিছু না বুঝেই না ভেবেই তোমার সান্নিধ্য থেকে একটু দূরে সরে যেতে চেষ্টা করলাম। বালিশটা সরিয়ে ওধারে শুতে চেষ্টা করলাম। তুমি বাধা দিলে। নড়াচড়া কোরোনা। আমি সরে যাচ্ছি। একটা কথার জবাব দাও মণি-বৌদি, তুমি এতদিনে, এত বছরে এতটুকুও বদলাও নি কেন ?

এই সুরু। তার পরের কথা তো তুমি সবজানো। তুমি আবার এলে। আমায় দেখবার নাম করে। বড়দিকে সঙ্গে নিয়ে নয়। একা। অনেক বার।

সুবিনয়কে তখন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ও টুরে চলে গেল বাইরে। আর আমিও যেন মুক্তি পেলাম ভয়াবহ, একাকীত্বের যন্ত্রণার হাত থেকে।

প্রবীর! প্রেম কি প্রত্যেকের জীবনেই আসে ? সবাই কি পায় এই সুধার আস্বাদ ? বিষের দাহ ? বুদ্ধি জ্ঞান চেতনা হারিয়ে প্রবল নেশায় মাতাল হয়ে ওঠে ?

অল্প বয়স তোমার। তোমার হয়েছিল। আর বলতে লজ্জা নেই, তোমার চেয়ে ছ'বছরের বড়, আমিও সেই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। তোমার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করার মত মানসিক শক্তি বা নীতি-বোধ, কোনটাই আমার ছিলনা।

যৌবন দুর্বার। ক্ষয় ক্ষতি কলঙ্কের কাঁটা ভরা চলতি পথে ও পিছন ফিরে তাকায় না। আত্মপ্রত্যয়ে উদ্ধত। বার্ধক্যের স্তিমিত ক্লান্তি বুদ্ধি বিচার বিবেচনা হতাশা তার কোথায় ? সব বাধা সরিয়ে দুহাতে তুমি আমাকে তোমার কাছে টেনে নিলে।

বুঝতে ও পারলাম না, কেমন করে কেটে গেল সেই মাদকতাময় দিনরাত্রিগুলি।

কিন্তু কোথায় যেন একটু ভুল ছিল। একটা অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য কাঁটা। আস্তে আস্তে সেটা খচ খচ করতে লাগলো। দিন দিন তুমি অধীর অস্থির, উগ্র হয়ে উঠতে

লাগলে। আর একটা ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার সংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে আমি স্তম্ভিত অসাড় হয়ে যেতে লাগলাম। অথচ জানাই তো ছিল, একটা সিঁড়ির পর আরেকটা সিঁড়িই তো আসবে? ধাপের পর ধাপ।

হায়রে আমার কপাল! ভালবাসা এমনি করেই সব ভুলিয়ে দেয় বটে! আমি যে তিরিশ পেরিয়ে যৌবনের গণ্ডীর চৌকাঠ করে পেরিয়ে গেছি, আমি যে এতদিন ধরে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সুবিনয়ের সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করে এসেছি, এত বড় কঠিন সত্য আমি ভুললাম কি করে?

আর তুমি? সুদর্শন তরুণ কুমার। সাতাশ বছরের দুরন্ত যৌবন তোমার সর্বাঙ্গে আগুনের মত জ্বলছে। তোমার কামনা বাসনা অতৃপ্তি, ক্ষুধা, আমাকে ঘিরে তোমার তৃষ্ণার দাবদাহ, এ আমি ঠেকাই কি করে?

তোমার বিদ্রোহী যৌবন যে সব কিছু ভেঙ্গে চুরে তচনচ করে দিতে চাইছে। মুখ বন্ধ প্রলয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির মত তুমি যে ফেটে পড়তে চাইছো—

কি করে—কী করে আমি বাধা দেবো?

শুধু আমার ভালবাসাতে তুমি তৃপ্ত নও। তুমি আমাকে চাও পরিপূর্ণভাবে। নিঃশেষে তোমার মধ্যে আমার অখণ্ড সত্তাকে এক করে নিতে। স্পষ্টই বললে, আমি আর পারছিনা। মণি, তুমি চলে এসো আমার ঘরে। আমি তোমার অসম্মান করব না। আইনসম্মতভাবে, দুজনার ভালবাসার পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়ে আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

পর পর যা ঘটে যাচ্ছে, তারপর চমকে ওঠার মত আশ্চর্য কথা তুমি কিছুই বলনি। আমার দ্বিধা-সংশয় তুমি টের পেয়েছিলে। তুমি তোমার জীবন মরণ সব কিছু সব ভার আমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলে। আরো বলেছিলে, এভাবে আমরা ছোট হয়ে যাচ্ছি সুবিনয়বাবুর কাছে। তার চেয়ে উনি জানুন, তুমি কোনদিনও ওর ছিলেনা।

অনেক কষ্টে, অনেক আদর করে তোমায় সামলালুম। সময় চেয়ে নিলাম কিছুদিনের জন্যে। বুঝতে পারলাম, আগুন নিয়ে খেলা করা আর চলবে না। তুমি পাগলের মত হয়েছ আমাকে পাবার জন্যে।

তারপর থেকে রাতের ঘুম আমার চলে গেছে। স্থির লক্ষ্যে পৌঁছেও অস্থির হয়ে উঠেছি। কিন্তু সেদিন যখন তুমি বললে রুড়কীতে বদলি হবার অর্ডার এসে গেছে। এখানকার তিন বছরের সার্ভিস শেষ হয়ে গেছে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে তবে তুমি যাবে; তখন তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি মন থেকেই সম্মতি দিলাম। যাবো, যাবো। প্রবীর তুমি আমাকে নিয়ে চলো, কিছুতেই এখানে ফেলে রেখে যেও না।

তুমি তার উত্তরে কি করেছিলে মনে আছে।

অনেক কষ্টে তোমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিলাম, এতদিন যদি অপেক্ষা করলে, আর মাত্র কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে থাকো প্রবীর। তারপর, আমি সম্পূর্ণভাবেই তোমার।

সেদিন তোমার বাহু বন্ধনের মধ্যে আমার সব বন্ধন, সব সংস্কার গলে গলে পড়ছিল। তার কারণও ঘটেছিল আবার।

শরীরটা আবার খারাপ হয়েছিল। সেই এক রোগ। ব্যর্থ ক্ষোভে জ্বলছি পুড়ছি। সুবিনয়ের প্রতি প্রবল ঘৃণায় আর আকণ্ঠ তিক্ততায় জর্জরিত হৃদয় মুক্তির আকাশে পাখা মেলে দেবার জন্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। যেতেই হবে আমাকে। বার বার বঞ্চনার দারুণ আঘাত আর নয়।

তোমার সঙ্গে যাওয়া স্থির। সুবিনয় বাইরে গেছে। ও টুর থেকে ফিরবার আগেই আমি চলে যাবো এই ঘর সংসার সব ছেড়ে। যাবার আগে ওকে একখানা চিঠিতে সব কিছু খুলে লিখে জানিয়ে দেবো আমার কথা।

প্রবীর, একেই বলে ভাগ্য! সুবিনয়কে চিঠি লেখার বদলে, তোমাকেই লিখতে হচ্ছে। আড়ালে বসে কোন অদৃশ্য যাদুকরের হাতের পুতুল নাচের মত আমরা দিন রাত নেচে চলেছি! নিজস্ব ক্ষমতা কতটুকু আমাদের? যা ভাবি তা হয়না। যা হয় তা ভাবিনা। ভাবতে পারিনা।

শেষবারের মত আজ মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। শরীর এত খারাপ, কিছুই খেতে পারলাম না। বার দুয়েক বমি করে নির্ঝুম হয়ে মায়ের ঘরে চুপচাপ শুয়ে পড়ে রইলাম।

মা স্নান করে তাঁর ঘরের এক ধারে সাজানো ঠাকুর দেবতার সামনে বসে প্রত্যেক দিন ঘণ্টা খানেক ধরে পূজো

করেন। আজও তার ব্যতিক্রম হলনা। পুজো শেষ হতে আমার কাছে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, মণি, তোর দুচোখের তলায় অত কালি পড়েছে কেন? কী হয়েছে তোর?

উত্তর দিলাম না।

মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। আমার যন্ত্রণা তাঁর ও যন্ত্রণা বাড়িয়েছে। তবু আমি চলে গেলে তিনি লজ্জায় হয়ত আমার নামও আর মুখ ফুটে উচ্চারণ করবেন না জানি। কিন্তু তা সত্বেও সব কিছুর পরিসমাপ্তি হোক। আমি যাকে আজ দুঃখ দেবো, একদিন কি আমার সুখে মা সুখী হবেন না? আঠেরোটা বছর ধরে আত্মীয়স্বজন সবাইকে নিয়েও তো বিরাট শূন্যতার সমুদ্রে ডুবে ছিলাম। বাকি জীবনটা কেন প্রবীরকে নিয়ে সুখী হতে পারবনা আমি?

মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে তোর? দুঃখ দিতে কষ্ট হল। বললাম, পুরোনো রোগ।

ক' মাস?

তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম, জানি না।

ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েছিস?

ঘেন্না—ঘেন্না! আবার ডাক্তার! আবার সেই ফলস্ প্রেগন্যান্সির ইতিবৃত্ত? সন্তান আকাঙ্ক্ষার হাস্যকর পরিসমাপ্তি?

চিৎকার করে উঠলাম। মা, তুমি চুপ করো।

মা চুপ করলেন। কিন্তু সরে গেলেন না। চোখ বন্ধ থাকলেও বুঝতে পারলাম, মায়ের দৃষ্টি আমার সর্বাঙ্গে।

হঠাৎ পেটের উপর হাত রাখলেন। বাধা দিলাম না। হয়ত এই তাঁর শেষ স্পর্শ!

ব্লাউজের বোতামে হাত দিতেই বিরক্ত হয়ে সরে গেলাম। আঃ কী করছো মা! একটু ঘুমোতে দাও।

মা শুনলেন না। এক রকম জোর করেই কে জানে কি দেখলেন। তারপর চিৎকার করে ডাকলেন ফুলমতিয়া! ফুলমতিয়া। এদিকে আয়।

ফুলমতিয়া এলো। পেটের, বুকের কাপড় খুললো। কান পাতলো। তারপর মাকে কী বললো।

হঠাৎ দেখলাম মা উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে ঠাকুর-দেবতা পটঘট—সবার সামনে লুটিয়ে পড়েছেন। হে ভগবান, মুখ তুলে তাকাও। দয়া করো।

এদের পাগলামিতে বাধা দিলাম না। শুধু শেষ দিনের মত বলেই।

ফুলমতিয়া আমার গায়ে চাদর চাপা দিয়ে দ্রুত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু চলে যাবার অনেক ক্ষণ পরেও আমার সুস্থ মস্তিষ্কের ক্রিয়া সচল হয়নি। কিন্তু সত্যসত্যই যখন সব কিছু বুঝলাম, লজ্জায় ধিক্কারে আমার মরে যেতে ইচ্ছা হল। এ কী হল। এ কী হল। কেন এমন হল! সুদীর্ঘ জীবনের যৌবনের আঠেরোটা বছর ধরে যা পাইনি, আজ তোমাকে পাওয়ার কয়েক মুহূর্ত আগে, তোমার মিলনের মাঝখানে একটা অচ্ছেদ্য প্রাচীর তুলে ধরলো?

মাত্র কয়েকটা মাসের জন্যে এ কী অঘটন ঘটলো? কেন তোমার নয়—কেন সুবিনয়ের সন্তানেরই মা হতে হল আমাকে এতকাল পরে?

এ যে কী নিদারুণ যন্ত্রণা, অন্তর্বেদনা তোমায় কী করে বোঝাবো প্রবীর? তোমাকে আমি যে সত্যসত্যই ভালবেসেছি। তোমাকে চিরদিনের মত হারিয়ে তারি শাস্তির বোঝা বাকী জীবন ধরে বয়ে বেড়াতে হবে আমাকে।

বাইরে অন্ধকার থম থম করছে। শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় অবশ হয়ে আসছে হাত।

কাল এমন সময় তুমি ট্রেণে। নিঃসঙ্গ। আজকের আমার মত। হয়তো অনেক সমস্যার সমাধান হবে। নীতি সমাজ শৃঙ্খলা সুনাম সব বজায় থাকবে। আমি থাকবো, সুবিনয় ফিরে আসবে টুর থেকে সেও থাকবে একই ফ্ল্যাটে। সংসার ধর্ম সব বজায় থাকবে।

কিন্তু তুমি? তুমি থাকবে না। আমার নিদারুণ নিঃসঙ্গতার সমুদ্রে আবার উত্তাল ঢেউ উঠবে। ডুবতে ডুবতে দুহাত বাড়িয়ে দেবো তোমার জন্যে। কিন্তু পাবনা। কোথাও খুঁজে পাবনা তোমাকে প্রবীর!

সুবিনয়ের সৃষ্টির বীজ তিলে তিলে অঙ্কুরিত হবে আমার দেহে। আর আমার মন?

সেখানে আমার প্রেম এক আশ্চর্য আভায় চিরদিন জ্বলবে তোমার স্মৃতিকে ঘিরে।

তার পর কী হবে প্রবীর? কি হবে? কী হবে? বলতে পারো প্রবীর তার পর কী হবে?

চিঠিখানা প্রবীর যথা সময়েই পেয়েছিল। মণিমালা কিন্তু চিঠি খানা শেষ করতে পারেনি।

বায়রণ ও তাঁর কবিতা

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

বায়রণকে আজ অনেকেই ওয়ার্ড্‌সোয়র্থ, কোল্‌রিজ, শেলি বা কীট্‌সের সমশ্রেণীভুক্ত কবি বলে স্বীকার করতে চাইবেন না। ওই সব কবিদের সঙ্গে তুলনায় বায়রণকে অনেক বেশী পার্থিব মনে হয়। সাংসারিক জগতের উর্দ্ধে যে জ্ঞান ও আনন্দের স্বর্গলোক আছে সেখানে তাঁর প্রবেশ অবারিত ছিল না। কয়েকটা গীতিকবিতা বাদ দিলে, বায়রণের রচনাগুলি সাধারণতঃ পড়া হয় রঙ্গব্যঙ্গের দৃষ্টান্তরূপে। ব্যঙ্গ কবিতা, যত ভালোই হক, ব্যঙ্গ কবিতা। কাব্যমানসের এক অনুজ্জ্বল প্রান্তে তার স্থান। তবে বায়রণের পরিহাসবিজল্পন কাব্যরসসিক্ত হওয়ায় তার একটি বিশেষ সৌন্দর্যও মূল্য আছে এবং সে সৌন্দর্য ও মূল্য অসামান্য।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি লণ্ডন নগরীতে George Gordon Byron এর জন্ম হয়। তাঁর পিতা খামখেয়ালী প্রকৃতির লোক ছিলেন ও বায়রণের যখন তিন বৎসর বয়স তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। বায়রণের মা বড় ঘরের মেয়ে ছিলেন, তিনি শান্তস্বভাবের ছিলেন না। কখনও অতিরিক্ত আদর নিয়ে ও কখনও অতিরিক্ত তিরস্কার করে তিনি বায়রণের স্বভাব চিরদিনের মত নষ্ট করে দেন। ছোটবেলায় দশ বছর বায়রণ মায়ের সঙ্গে অ্যাবারডীনে কাটান। তাঁদের ভাড়া বাড়িতে থাকতে হত, কারণ তাঁর মার সব সম্পত্তি তাঁর বাবা, ফ্রান্সে থাকার সময়, শেষ করে দেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর দাদুর (বাবার কাকা) মৃত্যুর পর বায়রণ 'লর্ড' খেতাবের উত্তরাধিকারী হন।

বায়রণ প্রথমে অ্যাবের্‌ডীনের গ্রামার স্কুলে পড়েছিলেন। পরে তিনি হ্যারোর বিখ্যাত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন (১৮০১-১৮০৫)। এখানে পড়ার সময় তিনি ক্রিকেট খেলায় ও মুষ্টিযুদ্ধে কৃতিত্ব দেখান। সন্তরণেও নৈপুণ্য লাভ করেন। ইটন্ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্যালয়ের ক্রিকেট খেলায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে তাঁর প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত ধরণের—কখনও বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন ও সকলকে এড়িয়ে চলতেন। আবার কখনও খেলাধুলা ও নাচ-গান-হল্লায় যোগ দিয়ে ছাত্রদের নেতৃত্ব করতেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে তাঁর বৃহত্তর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এখানে পড়ার সময় ইতিহাস ও কথাসাহিত্যে তাঁর সব চেয়ে বেশী অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। কেম্‌ব্রিজে তাঁর অন্তরঙ্গতম বন্ধু ছিলেন জন্ ক্যাম্ হব্‌হাউস্। কেম্‌ব্রিজে বায়রণের জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা আরম্ভ হয় ও তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে অবধি বায়রণ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এই বৎসর তিনি এম্-এ ডিগ্রী লাভ করেন।

বায়রণ অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন, কিন্তু তাঁর একটি পায়ের ত্রুটি থাকায় তাঁকে খুঁড়িয়ে চলতে হত। এই ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁর আত্মসচেতনতা স্পর্শকাতর্যে পরিণত হত।

কেম্‌ব্রিজে ছাত্রাবস্থায় বায়রণের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Hours of Idleness' (১৮০৭) প্রকাশিত হয়। তরুণ-কবির প্রথম কবিতায় যে ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি সাধারণত থাকে এই গ্রন্থেও তা ছিল। 'Edinburgh Review' পত্রিকায় গ্রন্থটির তীব্র সমালোচনা করা হয় (১৮০৮)। বায়রণ প্রতিশোধ নেন 'English Bards and Scotch Reviewers' (মার্চ ১৮০৮) লিখে। এই বিদ্রূপাত্মক কাব্যে তিনি সমকালীন প্রায় প্রত্যেক লেখককেই ব্যঙ্গের কশাঘাত করেন। সার্ ওআল্‌টার স্কটও বাদ যান নি। বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখায় যে বায়রণের প্রতিভা আছে তা এই কাব্য থেকে বোঝা যায়।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বায়রণ House of Lords এ আসন লাভ করেন। এই বছর জুলাই মাসে তিনি বিদেশযাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন বন্ধু হব্‌হাউস্। দু বছর ধরে স্পেন, পর্তুগ্যাল প্রভৃতি ইউরোপের নানা দেশে তিনি ভ্রমণ করেন। বেশীর ভাগ সময় তিনি গ্রীস দেশে কাটান। এথেন্স নগরীতে তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনী 'Childe Harold's Pilgrimage' লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন ও কাব্যটির প্রথম দুই সর্গ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গে কবি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, একদিন সকালে ঘুম ভেঙে গেলে তিনি দেখলেন তিনি বিখ্যাত হয়ে গেছেন। (I awoke one morning and found myself famous')। সমস্ত লণ্ডন নগরীতে সাড়া পড়ে গেছল। তরুণ ভাববিলাসী কবিকে রাজধানী ন্যায্যোচিত মর্যাদায় সম্মানিত করল। চার বছর ধরে চলল প্রশংসার স্রোত। বায়রণ এই জনপ্রিয়তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন ও তাঁর নতুন নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হতে লাগল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে "The "Giaour" ও "The Bride of Abydos" প্রকাশিত হয়, ১৮১৪ "The Corsair" ও "Lara", ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে "Hebrew Melodies" এবং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে "The Siege of Corinth" ও "Parisina"। প্রথমটী প্রকাশিত হওয়ার পর বায়রণ রোমান্টিক কাহিনী-কবিতার লেখকরূপে স্কটের স্থান অধিকার করেন, এবং প্রতিটী নূতন কাব্যের প্রকাশে তাঁর খ্যাতি ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে ওঠে। ক্রমশ তিনি সমসাময়িক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পান ও সমগ্র ইউরোপ শ্রেষ্ঠ সমকালীন কবি রূপে গণ্য হন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে বায়রণের সঙ্গে লেডি ক্যারোলাইন্ ল্যাম্-এর ঘনিষ্ঠ

পরিচয় হয়েছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বায়রণ নটিংহামের বিদ্রোহী তন্তুবায়দের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। লর্ড সভার এক স্মরণীয় ভাষণে তিনি তুরস্কের সর্বাধিক অনগ্রসর প্রদেশগুলির জনগণের অবস্থার সঙ্গে তন্তুবায়দের হীন দুর্দ্দশার তুলনা করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ড্রুরি লেন নাট্যশালার পরিচালক সমিতির সদস্য হন ও রঙ্গমঞ্চের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। সামাজিক জীবনের নতুন নতুন দিকে তাঁর প্রতিষ্ঠা হতে থাকে।

এর পর তাঁর ভাগ্যে আকস্মিক পরিবর্তন আসে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি সার্ র‍্যাল্ফ মিল্‌ব্যাঙ্কের একমাত্র কন্যা Anna Isabell-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। এই বিবাহ কিন্তু সুখের হয় নি। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে কন্যা অ্যাডার জন্মের পর, তাঁর স্ত্রী তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। তিনি বললেন, ক্রূরপ্রকৃতি বায়রণের মস্তিষ্কই শুধু বিকৃত নয়, মনও। বায়রণ সমাজের বিরাগভাজন হলেন। জনপ্রিয়তার উচ্চশিখর থেকে লোকনিন্দার অতল গহ্বরে তাঁর পতন হল। সেই বছরই তিনি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে গেলেন। আর কোন দিন ফিরে আসেন নি।

বায়রণ প্রথমে বেল্‌জিয়াম্ ও পরে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে গেলেন। জেনিভার সরোবরের ধারে কয়েক সপ্তাহ তিনি শেলির সঙ্গে বেশ আনন্দে কাটান। এই সময় তিনি 'Childe Harold'এর তৃতীয় সর্গ রচনা করেন ও নভেম্বর মাসে (১৮১৬) সেটি প্রকাশিত হয়। সুইট্‌জারল্যাণ্ড থেকে বায়রণ ভেনিস্ ও রোম নগরীতে যান এবং সেখানে 'Childe Harold' এর চতুর্থ ও শেষ সর্গ রচনা করেন (এপ্রিল, ১৮১৭)। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভেনিসে বায়রণের জীবন ছিল চরম উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন। এখানে তিনি 'Beppo' রচনা করেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বায়রন 'Don Juan' কাব্য লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে Teresa Guiccioli নাম্নী একটী সম্ভ্রান্তবংশীয়া ও মার্জিতরুচি ইতালীয় মহিলার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। ইনি কিছুদিন বায়রনের সঙ্গে ছিলেন, প্রথমে ভেনিসে এবং পরে র‍্যাভেনা ও পিসাতে।

ইতালীয় বিপ্লবীদের বায়রণ প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করেন। পিসাতে শেলির সহযোগিতায় তিনি Liberal নামে একটী পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটী অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই পত্রিকাতেই বায়রণের শ্রেষ্ঠ বিদ্রূপাত্মক রচনা "The Vision of Judgment" প্রকাশিত হয়।

গ্রীসকে বায়রণ গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তাই গ্রীকদের দুঃখ সহজেই তাঁর অন্তর স্পর্শ করে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেন। দশ হাজার পাউণ্ড তিনি গ্রীকদের দান করলেন ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে তাঁদের সাহায্য করবার জন্য যাত্রা করলেন। Missolonghiতে এক সৈন্যদলের নেতৃত্বের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়। বিশেষ কিছু করতে পারার আগেই বায়রণ জ্বরে আক্রান্ত হন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে এপ্রিল Missolonghi তে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দেহ ইংল্যাণ্ডে আনা হয় ও নটিংহামে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে তাঁর শেষ কাব্য 'Don Juan' অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বায়রনের শেষ কথা একটী গ্রীক্ উক্তি—যার অর্থ—"এখন ঘুমের সময় এসেছে।" সুইন্‌বার্ণ—এর সুরে আমরা বলতে পারি, তাঁর আগে পাছে সব কিছু অসমাপ্ত রেখে অনেক ঝঞ্ঝাট ও অনেক জয়লাভের পর বায়রণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। খুব কম লোকেই তাঁর চেয়ে বেশী ক্লান্তি নিয়ে মৃত্যু পথ যাত্রী হয়; তাঁর চেয়ে কম নির্ভীকতা নিয়ে কেউ নয়।

রোমান্টিক্ কবি নিজের চেতনার রঙেই পান্নাকে সবুজ দেখেন; নিজের চেতনার রক্তিমাতেই চুনী তাঁর কাছে রাঙা হয়ে ওঠে। রোমান্টিক্ কবিরা সকলেই অল্পবিস্তর আত্মকেন্দ্রিক। আর তাঁদের কবিতার মাধুর্যের মূলে আত্মসংবেদনার একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। বায়রণের ক্ষেত্রে কিন্তু এই আত্মকেন্দ্রিকতা অনেক বেশী ব্যাপকরূপে প্রকাশ পেয়েছে ও মাঝে মাঝে এত তীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়েছে যে তার ফলে তাঁর কবিতার কাব্য সৌন্দর্যের যথেষ্ট হানি ঘটেছে। উদগ্র আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে সময় সময় একটা রুগ্নতার ছায়া এসে পড়েছে। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'as a seriono writer, he had only one subject, himself।' কীটস তাঁকে আত্মপূজারী (self-worshipper) আখ্যা দিয়েছেন।

নিজের দৈহিক ত্রুটিকে বায়রণ জয় করতে চেয়েছিলেন অন্য দিকে শক্তির পরিচয় দিয়ে। দানবের শক্তি থাকা ভালো, কিন্তু দানবের মত সেই শক্তির অপব্যবহার করা হ'ল আসুরিকতা। বায়রণের চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে আসুরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি নিজে এই ধরণের জীবনযাত্রায় শান্তি পান নি। নিজেকে সব সময় তিনি 'একা' ভেবেছেন, সারা জীবন একাকিত্বের যাতনায় জ্বলেছেন। তাঁর অনেক গুণ ছিল, ছিল বহুমুখী প্রতিভা। মহৎ স্বভাবের অনেক লক্ষণ ছিল তাঁর প্রকৃতিতে। কিন্তু এ সবের সঙ্গে আবার ছিল অনেক সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি। তাঁর 'Manfred' নাট্যকাব্যে Abbot ম্যানফ্রেড সম্বন্ধে বলেছেন—

> This should have been a noble creature: he
> Hath all the energy which should have made
> A goodly frame of glorious elements,
> Had they heen wisely mingled, as it is,
> It is an awful chaos light and darkness
> And mind and dust, and passion and pure
> thoughts
> Mixed and contending without end or order,
> All dormant or destructive…

একথাগুলি বায়রণ সম্বন্ধেও খাটে। বায়রণ যেন এখানে আত্মবিশ্লেষণ করে গেছেন।

তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ 'Manfred' নাটকটি বায়রণের অন্তর্জীবনের আলেখ্য। সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে বায়রণ বারংবার বিদ্রোহ করেছেন।

সেই বিদ্রোহের প্রথম সফল ও সুস্পষ্ট প্রকাশ রূপে 'Manfred' এর মূল্য আছে। নায়ক ম্যান্‌ফ্রেড বায়রণ নিজেই। সব সময় বায়রণ নিজেই তাঁর কাব্য, নাট্যকাব্য ও কাহিনী কবিতার নায়ক। শুধু নায়কই নন, কাব্য ও নাটকগুলির প্রথম কথা বায়রণ, শেষ কথাও বায়রণ। মেকলের ভাষায়—'He was himself the beginning, the middle, and the end, of all his own poetry, the hero of every tale, the Chief object in every landscape'। 'বায়রণীয় নায়ক অবশ্য ফরাসী' লেখক শাতোব্রিয়াঁর নায়কদের দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত হয়েছে, বিশেষ করে René র দ্বারা। শাতোব্রিয়াঁর নায়কেরা ও ভাববিলাসী এবং বিষণ্ণ প্রকৃতির। তারা ও আত্মকেন্দ্রিকতার আবর্তে আলোড়িত।

নিঃসঙ্গ ও স্পর্শকাতর ম্যানফ্রেড্ গভীর হতাশার সম্মুখীন। তবু নিজের ভাগ্য জয় করার অধিকার অর্জন করার জন্য সে সংগ্রাম করে চলেছে। প্রথম অঙ্কে, আল্‌প্‌স্ পর্বতের উপর গথিক দুর্গে চিন্তামগ্ন অবস্থায় ম্যান্‌ফ্রেড্‌কে দেখা যায়। জীবনের তৃষ্ণা তার মিটে গেছে। অশুভ আশঙ্কায় তার হৃদয় তন্দ্রাহীন। তার নয়নের নিমীলন হয় শুধু অন্তরে নিরীক্ষণ করার জন্য। দুঃখের কাছ থেকে অনেক শেখার আছে, দুঃখেই জ্ঞান। জ্ঞানের তরু কোন দিন জীবনের মুকুলে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে না—The tree of Knowledge is not that of Life। বিশ্বের স্বরূপ যাদের মধ্যে রয়েছে সেই আত্মাদের ম্যান্‌ফ্রেড্ আহ্বান জানাল। তাদের কাছে দাবী জানাল বিস্মরণের—আত্মবিস্মৃতিতে সে বিলীন হতে চায়। কিন্তু এ বর প্রদান আত্মাদের সাধ্যাতীত। ম্যানফ্রেড্ তখন চাইল তারা মূর্তি পরিগ্রহ করুক। ম্যান্‌ফ্রেডের ভাগ্যতারকা সপ্তম আত্মাটির এক লাবণ্যময়ী নারীরূপে আবির্ভাব হল। মান্‌ফ্রেড্ তার কাছে যেতে চাইল ; মূর্তি মিলিয়ে গেল, ম্যান্‌ফ্রেড্ জ্ঞান হারাল।

বেঁচে থাকার ম্যান্‌ফ্রেডের কোন স্পৃহা নেই। সে আত্মহত্যা করতে উদ্যত, এমন সময় একজন ব্যাধ এসে তাকে বাধা দিল ও এক পার্বত্য কুটীরে নিয়ে গেল।

দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা ব্যাধকে দেখি ম্যান্‌ফ্রেড্‌কে সান্ত্বনা দিতে। ম্যান্‌ফ্রেডকে অব্যবস্থিতচিত্ত ভেবে সে ম্যান্‌ফ্রেড্‌কে সাধু সঙ্গ করার জন্য পরামর্শ দেবে। ম্যান্‌ফ্রেড্ বলবে কোন মানুষকেই সে নিজের দুর্দশার দ্বারা সংক্রামিত করতে চায় না। এক অশুভ শক্তি তাকে অভিভূত করে রেখেছে, কিন্তু এ শক্তির উৎস তার অন্তর নয়। যারা তাকে ভালোবাসে তাদের বিনাশের মধ্যে এই অশুভের প্রকাশ হয়।

পাহাড়ে ভ্রাম্যমাণ ম্যান্‌ফ্রেডের সঙ্গে আল্‌প্‌স্ পর্বতের ডাকিনীর সাক্ষাৎ হল। সে ম্যান্‌ফ্রেডকে সাহায্য করতে চাইল। ম্যান্‌ফ্রেড্ নিজের দুঃখের কাহিনী তাকে শোনাল—"যৌবনের প্রারম্ভ থেকে, আমার চৈতন্য অন্যান্য মানুষের আত্মার সঙ্গে কোন যোগ রাখেনি, মানুষের চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখেনি। তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার তৃষ্ণা আমার ছিল না। তাদের জীবনের লক্ষ্য আমার ছিল না। আমার আনন্দ, আমার দুঃখ, আমার ভাবাবেগ, আমার শক্তি, আমাকে ভিন্ন করে তুলেছিল। নিজের দেহ রক্তমাংসের হলেও রক্তমাংসের শরীর যাদের, তাদের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি ছিল না।"

ডাকিনী প্রস্তাব করল, ম্যান্‌ফ্রেড্ তার অনুগামী হক। ম্যান্‌ফ্রেড যদি তার বাধ্য হয় তাহলে সে ম্যান্‌ফ্রেডের ইচ্ছা পূর্ণ করবে। ম্যান্‌ফ্রেড অস্বীকার করে বলল, পারিপার্শ্বিকের প্রতি যত ঘৃণাই থাক না কেন, মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। "কাল ও আতঙ্কের হাতে আমরা ক্রীড়নক : দিনের পর দিন আমাদের উপর সন্তর্পণে এসে পড়ছে ও আমাদের কাছ থেকে সন্তর্পণে গ্রাস করছে : তবুও আমরা বেঁচে থাকি, জীবনের জন্য তীব্র ঘৃণা নিয়ে, আর মৃত্যুভয়ে এখনও শঙ্কিত হয়ে।"

রাত্রি আসছে। ম্যানফ্রেড্ তার ভাগ্যদেবতাকে আহ্বান জানাল।

তৃতীয় অঙ্কে ম্যান্‌ফ্রেড্ শান্ত, সমাহিত। নিয়তির বিধানের জন্য সে অপেক্ষা করে রয়েছে। ধর্মযাজক এলো তার আত্মাকে রক্ষা করার জন্য। ম্যান্‌ফ্রেড্ বলল, তার যা কিছু পাপ সে ত' দেবতার কাছে ; ধর্মযাজকের কোন ভূমিকাই নেই। ধর্মযাজক অনেক বোঝাল, কিন্তু যে মানুষ চিরকাল একা থেকেছে সে তার জীবনের ছকের কোন পরিবর্তন করতে পারে ও যে জনগণকে সে চিরকাল ঘৃণা করে এসেছে, তাদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে এ কথা ম্যান্‌ফ্রেড্ কিছুতেই স্বীকার করল না। ধর্মযাজক শেষ পর্যন্ত ম্যান্‌ফ্রেডের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধন করতে পারার আশা ছেড়ে দিল। পরে ম্যান্‌ফ্রেডের আত্মাকে বশে আনার জন্য ধর্মযাজকের সঙ্গে অপ্সরারাও চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ম্যান্‌ফ্রেড্ একাকী দাঁড়িয়ে আছে, অপরাজেয় স্বতন্ত্র মানুষ। তার আত্মা সে শুধু মৃত্যুর হাতেই সমর্পণ করল, স্বর্গ বা নরক এরূপ কোন বিশেষ স্থানের জন্য তা নির্দিষ্ট নয়। মৃত্যুর জন্য সে প্রস্তুত, কিন্তু যে আত্মনিবেদনে তার মন সাড়া দেয় না তার জন্য প্রস্তুত নয়—

Away ! I'll die as I have lived—alone,

ম্যান্‌ফ্রেডের শেষ কথা—

Old man ! 'tis not difficult to die.

যে গীতিকবিতার সুরের রেশ 'Manfred' নাটকে মাঝে মাঝে শোনা যায় তার পূর্ণতা পাওয়া যায় বায়রণের কয়েকটী সুন্দর গীতিকবিতায় যেগুলি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ lyric গুলির মধ্যে স্থান পাবে। যেমন,

She walks in beauty, like the night
of cloudless climes and starry skies.

মেঘহারা নিশি ও নক্ষত্রময় নভোমণ্ডলের নিশীথিনীর মত সে নারী লাবণ্য সঞ্চারিণী। বায়রণও যে গভীর ও নিরুদ্বুদ্বভাবে ভালোবাসতে পারতেন এই চিত্তহারী কবিতা তার সাক্ষ্য হয়ে আছে। কিংবা সেই অপূর্ব কবিতাটী, যেটীতে তিনি তাঁর মানসীকে বলেছেন—'আর কোন রূপ-কন্যার তোমার মত মায়াজাল নেই ; আর তোমার মধুর কণ্ঠস্বর আমার কাছে জলরাশিতে সংগীতের ঝংকারের মত।' আর একটী কবিতায় তিনি দুঃখ করেছেন, জ্যোৎস্না-রাতে তাঁদের বেড়াতে যাওয়ার পালা শেষ হল :

So we'll go no more a-roving
So late into the night.

মাঝে মাঝে এগুলি পড়তে পড়তে শেলির রচনার কথা মনে পড়ে। অবশ্য বায়রণের এই ধরণের গীতিকবিতার সংখ্যা স্বল্প। শেলির রচনা গীতিকাব্য প্রধান, তিনি অজস্র গীতিকবিতা লিখেছেন। বায়রণের রচনা ব্যঙ্গপ্রধান বলা যেতে পারে। অবশ্য শেলির সঙ্গে বায়রণের অন্য অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। এরা দুজনেই বিদ্রোহী কবি, বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছেন বজ্রকণ্ঠে। স্বাধীনতার দৃপ্ত পূজারী এরা, স্বাতন্ত্র্য সূর্যের উদয়দূত। বায়রণের নানা কবিতায় স্বাধীনতার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে—

The mountains look on Marathan
And Marathon looks on the sea;
And musing there an hour alone,
I dreamed that greed might yet be free.

যে 'Don Juan এর অন্তর্গত 'The Isles of Greece' থেকে পঙ্‌ক্তি কয়টী উদ্ধৃত হয়েছে, সেটী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে 'মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়!' রচনার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। অবশ্য শেলির মত, বায়রণ অন্য অর্থেও বিদ্রোহী কবি। সমাজের হৃদয়হীন ব্যবস্থা, অর্থহীন প্রথা ও নিষ্ঠুর অ-শাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা বরাবর বিদ্রোহ করেছেন। যে সমাজে অন্যায় ও ভণ্ডামির প্রতাপ, যে সমাজ মানুষকে মর্যাদা দেয় না, সেই সমাজের বিরুদ্ধে তাঁদের চিরন্তন সংগ্রাম। বায়রণ যদিও শেলির মত ন্যায়, সত্য ও প্রেমকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেন নি, তবু তিনি সমাজ-সংসারের ও মানবচরিত্রের অনেক দীনতা ও হীনতাকে বিদ্রূপের কশাঘাত করিতে দ্বিধা করেন নি।

ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকবিদের মধ্যে বায়রন একজন ও তাঁর অধিকাংশ ব্যঙ্গ রসাত্মক কবিতা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার।পর্যায়ে পড়ে, বিশেষকরে 'The vision of Judgment' ও 'Don Juan'। তাঁর বিদ্রূপের লক্ষ্য শুধু রাজনৈতিক বিষয় নয়, জাতির জীবনের সব কিছু পুঞ্জীভূত ভণ্ডামি, চটক, আড়ম্বর ও অত্যাচার। যে ভাবাবেগ ও তীব্র কৌতুক তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য, তা তাঁর ব্যঙ্গকবিতাকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছে। তাই ব্যঙ্গকবি রূপেই তিনি সর্বোত্তম। তাঁর প্রথম দিকের বিদ্রূপাত্মক রচনায় ড্রাইডেন, পোপ, (যাকে তিনি ইংরাজ কবিকুলের চূড়ামণি মনে করতেন), প্রভৃতি কবিদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর পরিণত রচনা শক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ততার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস ও বিদ্রূপাত্মক রচনার দিকে সাধারণতঃ রোমান্টিক্ কবিদের প্রবণতা দেখা যায় না। বায়রণ রোমান্টিক্ যুগের মানুষ হয়েও এ দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁর বিদ্রূপাত্মক রচনাও রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গ ও কাব্যের সুন্দর সমন্বয় রয়েছে। তাঁর হাস্যরস কল্পনার আলোয় আলোকিত। একাধারে এক দিকে শ্লেষ, অনুপ্রাস, ব্যঞ্জনার ছড়াছড়ি, আর অন্য দিকে অনুভূতির উচ্ছলতা ও করুণ রসের অনুরণন। এই প্রকার রোমান্টিক রঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে দুলর্ভ।

Southey তাঁর 'A vision of Judgment' (১৮২১) এ রাজা তৃতীয় জর্জের প্রশস্তি করেছিলেন ও প্রসঙ্গতঃ বায়রণকে খানিকটা কটাক্ষ করেছিলেন। বায়রণ এর উত্তর দিয়েছেন তাঁর 'The Vision of Judgment' (১৮২১) প্যারডি কবিতায়। এতে তৃতীয় জর্জ ও সাদে ত' বিদ্রূপবাণে জর্জরিত হয়েছেনই, ওয়ার্ডসোয়র্থ, কোল্‌রিজ্ ও একেবারে বাদ যাননি। ব্যক্তিগত ব্যঙ্গকাব্য রূপে 'The Vision of Judgment'এর স্থান সর্বোচ্চ শিখরে।

ব্যঙ্গপ্রধান মহাকাব্য 'Don Juan' এর ষোলটি সর্গ। এটী প্রায় আগাগোড়াই আট পঙ্‌ক্তির ইতালীয় ছন্দ *ootava rima*তে লেখা। সকলকে অগ্রাহ্য করে যা খুশী তাই করার একটা ভাব এই কাব্যে রয়েছে এবং সেটা লেখার ভঙ্গীতে পাওয়া যায়। সামাজিক দুর্নীতি, ইংরাজদের নৈতিক কপটতা ও চারিত্রিক দুর্বলতা, এবং শাসন ও সমরের ব্যাপারে ইউরোপের নেতৃবৃন্দের নির্বোধ ও নির্দয় নীতিকে এই কাব্যে বায়রণ বার বার তীব্র ও তিক্তভাবে উপহাস করেছেন। লালসা এ কাব্যে সহস্র শাখা বিস্তার করে রয়েছে। আয়তনের বিশালতা, পরিধির বিরাটত্ব ও বিবিধ বিষয়ের অবতারণার দিক্ থেকে ব্যঙ্গাত্মক মহাকাব্য 'Don Juan' অতুলনীয়।

'Don Juan' কাব্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সুন্দর বর্ণনা আছে। তীক্ষ্ণ তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি, আর প্রকৃতিকে তিনি যেমন দেখেছেন তেমন বর্ণনা করেছেন। বর্ণনায় বায়রণ সিদ্ধহস্ত। এই প্রসঙ্গে স্বতঃই 'Childe Harolds Pilgrimage' এর কথা মনে পড়ে, বিশেষ করে এই কাব্যের তৃতীয় সর্গের কথা। বায়রণের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে এ কাব্য অন্যতম। এর হতাশ, খামখেয়ালী নায়কের (বায়রণ স্বয়ং ছদ্মবেশে) মোহভঙ্গ হয়েছে। পার্থিব জীবনের প্রতি এসেছে জুগুপ্সা। তার বিষাদের মধ্যে একটা বিলাসের ভাব আছে। পাপে তার কুণ্ঠা নেই, পাপের কালিমায় সে লিপ্ত। নিজের কাছ থেকে সে পালাতে চায়, তাই এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলেছে তার পরিক্রমণ।

বায়রণের জীবনে যেমন, তাঁর কবিতায়ও তেমন, মদোন্মত্ততা, আত্ম-স্তুরিতা, মানব বিদ্বেষ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রাচুর্য। আবার অপরের জন্য সহানুভূতি, অত্যাচারিতের জন্য অনুকম্পা, অন্যের জন্য, মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আত্মত্যাগ, এ সবেরও অভাব নেই। অত্যাচার, শঠতা ও প্রবঞ্চনাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করেছেন ও তাদের বিরুদ্ধে অদম্য সাহস ও শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

অদম্য শক্তি, দুর্বার বেগ বায়রণের কবিতাতে অসাধারণ তীব্রতা এনে দিয়েছে। এত দ্রুতভাবে তিনি কবিতা রচনা করতেন যে তা আশ্চর্যকর (এই জন্য তাঁর কবিতায় অনেক শিল্পগত ত্রুটি থেকে গেছে ও তাঁর ভাষা মাঝে মাঝে ব্যাকরণ-দোষে দুষ্ট)। শুধু অধৈর্যই এর কারণ কারণ নয়। রচনার উদ্দীপনা যখন সবচেয়ে বেশী থাকে তখনই তিনি লিখে ফেলতে চান। তাঁর ভয় ছিল, দেরী করলে কল্পনায় ম্লানিমা এসে পড়তে পারে। তিনি নিজেই বলেছেন, 'If I miss my first spring, I go back to my jungle again'। কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, কাব্য হচ্ছে 'the lava of the imagination, whose eruption prevents earth-quake', এবং তাঁর কল্পলোক থেকে গল্প ও কবিতা বেরিয়ে এসেছে প্রকৃতির প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত।

কালান্তর

শক্তিপদ রাজগুরু

রাত নামে গ্রামে, ফিকে আঁধার দিনের আলোটুকুকে মুছে নিয়ে কালো-মিশকালো হয়ে ওঠে। দু একটা তারা জ্বলে ওঠে আকাশের নিকোন আঙিনায়।

হংসধ্বজ চুপ করে বসে আছেন।

দেউড়িতে আলো জ্বলে না। বড় বাড়ীখানা আঁধারে ডুবে গেছে।

পথটায় জন্মেছে আগাছা—বনতুলসী আর কালকাসিন্দের ঘন জঙ্গল, পরিষ্কার করানো হয়নি। বাড়ীর কোনে কার্ণিশে উঠেছে একটা অশথ গাছ—ওর কঠিন শিকড়গুলো তিন পুরুষের বাড়ীর ছাদে ফাটল ধরিয়েছে।

…চুণ বালি খসে পড়েছে, নোনা লেগেছে দেওয়ালে, কোণে কোণে জমেছে নোনাধরা চুণ বালির খসে পড়া আস্তর।

ঠাঁই ঠাঁই আলোটা একটা কেমন কুশ্রী দীর্ণ ভবিষ্যতের হতাশাময় অন্ধকার ইঙ্গিত রচনা করেছে।

…হংসধ্বজই দেখেছিল এ বাড়ীর কত ঐশ্বর্য!

ওদিকে বিশাল মন্দিরে বাজতো আরতির শঙ্খধ্বনি। কাঁসরের সুর। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলতো।

…দেউড়িতে নিশুতি রাতের প্রহর বাজতো—

সে আজ ক বছর আগের কথা।

তার পর কেমন যেন সব অন্ধকারে হারিয়ে গেল

অতল অন্ধকারে। কাছারিখানায় লাল জীর্ণ খেরো বাঁধানো রোকড় জাবেদা পড়চা স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। জীর্ণ চেয়ার টেবিল তক্তপোষ সব কিছু পুরোনো কাঠের দামে বিক্রী করে দিয়েছে সে নিজেই।

পারেনি কর্তার আবলুস কাঠের কাম-করা বড় কেদারাখানা বেচতে। শূন্য কাছারি ঘরে একা অতীতের কোন সাক্ষীর মত পড়ে আছে সেটা।

আর সচল ধ্বংসস্তূপের মত বাড়ীর ধ্বসে-পড়া ইট কাঠের স্তূপে ঘুরে বেড়ায় হংসধ্বজ।

একটা কিসের শব্দ! খস—খস্—খস্।

হ্যারিকেনের আলোটা তুলে ধরল হংসধ্বজ। চকচকে একটা সচল সরীসৃপ—অন্ধকার ধ্বংসস্তূপে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে, নিশ্চিন্তে বুকে হেঁটে চলেছিল—হঠাৎ আলোর বাধা পেয়ে একবার মাথা তুলে দাঁড়াল।

দীর্ঘ ফণা দুলছে, বাতাসে চাপা হিস্ হিস্ বর্তমান।

আলোটা নামিয়ে নিল হংসধ্বজ।

মাথা নামিয়ে সাপটা সরে গেলেও এ বাড়ীর বর্ত্তমান দখলিস্বত্ব ওদেরই। নেহাৎ অবাঞ্ছিতের মত হংসধ্বজ পড়ে আছে।

শান্ত নিথর গ্রামসীমায় রাত নেমেছে।

পায়চারী করছে হংসধ্বজ—সামান্য একফালি বারান্দায়। কোন রকমে ওই ঠাঁইটুকু জঙ্গলমুক্ত করে রেখেছে বহু চেষ্টায়।

গ্রামের বাইরে লালডাঙ্গার পরই শালবনসীমা, মাঝ দিয়ে পথটা চলে গেছে।

বাতাসে এখন ভেসে আসে ওই দিক থেকে পাঁচটনি ট্রাকের গর্জন।

আগেকার দিনগুলো এখনও যেন ওই আকাশের অসীমে শান্তির মতই মিশে আছে। তাকে নিঃশেষ করে দেবার জন্য চলেছে দিকে দিকে আয়োজন।

দুর্গাপুরের দিকে শান্তির ঢাকা রাতের আঁধার কোথায় মিশিয়ে গেছে,হারিয়ে গেছে। আগুন জ্বলছে—ধূধূ আগুন।

লোহা কারখানায় বিশাল ফার্ণেসগুলো ওই আবছা আলোর মাঝে মূর্তিমান কোন শুদ্ধ আগ্নেয়গিরির মত দুর্বার লাভাপ্রবাহ বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সারা এলাকায় এনেছে পরিবর্তনের স্রোত—দুর্বার প্রবল সেই স্পন্দন, যতকিছু পুরোনো জীর্ণ সবই ওই আগুনের শিখায় ঝলসে গেছে, পুড়ে বিবর্ণ ছাই হয়ে গেছে।

সব গেছে হংসধ্বজেরও।

...জমিদারী কয়েকপুরুষেই যৌত হয়ে গেছে।

এখনও এ মাটিতে ছড়ানো আছে রায়বংশের অনেক কাহিনীই। গালগল্পের মত। বিড়ালের বিয়েতে রসুনচৌকী বসিয়েছিল তার ঠাকুর্দা হরিহর রায়। বাবা হরকিঙ্কর রায়ও কম পয়সা উড়িয়ে যায় নি।

তিনপুরুষের পরও জমিদারী কিছু টিকেছিল হংসধ্বজের আমল পর্যন্ত। কেনারাম—ভোগারাম—ব্যাচারাম—এর পরও বেচেটেচে যা মধ্যস্বত্ব-পত্তনি-দরপত্তনি কিছু জঙ্গল মহাল যা ছিল হংসধ্বজ কোনরকমে তাই থেকে দিনগুজরাণ করেছে। টুং টাং করে ঠাকুরদেবী দোল-রাস-ঝুলনও করেচে।

কিন্তু তার পর সব কেমন যেন হয়ে গেল।

ঝড়! ঝড়ে উড়ছে বনের জীর্ণ ঝরাপাতা।

সেই সঙ্গে উড়ে গেল রোকড়-জাবেদা-খতিয়ান-সাল-তামামীর ওয়াসিল রসিদ।

জমিদারী স্বত্ব নাকচ হয়ে গেল।

বন্ধ হয়ে গেল বাৎসরিক আদায় ওয়াশীল।

—কে?

রাস্তায় আলো দেখা যায়, একফালি আলো পড়েছে ঘাসঢাকা রাস্তায়। সাইকেলের আলো।

—আমি।

—আমি কে? রাতের আঁধারে সেই জমিদার হংসধ্বজের কঠিন কণ্ঠ ভেসে ওঠে, যাত্রীর ওই উদ্ধত পরিচয় দেবার ভঙ্গীতে।

—ফকীর!

চলে গেল ফকীর মণ্ডল—ফকরে সাইকেল চেপেই। হংসধ্বজের মুখের উপর কথাগুলো যেন ছুঁড়ে দিয়ে গেল অবজ্ঞাভরে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে হংসধ্বজ। অপমানে মুখ কালো হয়ে ওঠে।

আজ নির্বিষ ভুজঙ্গের মত মাথা তোলবার সামর্থ্যও

নেই, একটু আগেকার সেই সাপটার কথা মনে পড়ে, বাধা পেয়ে সে তবু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, ভরে তুলেছিল রাতের বাতাস হিংস্র গর্জনে।

হংসধ্বজ আজ নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ হয়ে গেছে।

নইলে তারই কাছারীর ভূতপূর্ব্ব পাইকের ছেলে ফকীর আজ তারই সামনে দিয়ে সাইকেলে চড়ে যায়—জবাব দেবারও প্রয়োজন বোধ করে না।

আগেকার কথা মনে পড়ে।

দেউড়ির সামনে দিয়ে জুতো পরে চলেছিল গদাই বিশ্বাস। হংসধ্বজ পায়চারী করছিল বাগানে। ধানচালের কারবার করে দু'চার পয়সা করেছে গদাই।

—জুতোর শব্দ ওঠে।

—গদাই! গুরুগম্ভীর চালে হাঁক পাড়ে হংসধ্বজ।

গদাই দাঁড়াল। দ্বারোয়ান এগিয়ে গিয়ে ওর হাতটা ধরে।

—চলিয়ে!

গদাই যেন বলির পাঁঠার মত এগিয়ে আসে। কর্তাবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

—প্রাতঃ পেন্নাম।

হংসধ্বজ যেন দেখতেই পায়নি। গম্ভীরকণ্ঠে বলে ওঠে।

—ধানচালের কারবারে বেশ দুপয়সা হচ্ছে তাহলে?

গদাই, হাতজোড় করে জবাব দেয়—আপনার দয়ায়!

বোমফাটার মত ফেটে বলে হংসধ্বজ—সুজনসিং!

—হুজুর!

—ওর জুতো গুলো খুলিয়ে দাঁত দিয়ে তুলে নিয়ে যেতে বল, আমার এলাকা পার হয়ে গিয়ে জুতো পরবে।

গদাই এর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

—সেদিনের কথা আজও ভোলেনি হংসধ্বজ।

আর আজ!

—পূবদিক দুর্গাপুর কারখানায় আগুন জ্বলছে—ধূ ধূ আগুন।

সবপুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ওই আগুন। মান-সম্মান দর্প-অহঙ্কার—বংশ পরিচয় সবকিছুই।

তাদের চিতাভস্মের উপর অন্য কোন মানুষের নোতুন প্রাসাদের বনিয়াদ গড়ে উঠছে।

—রাতের আঁধারে পিচঢালা রাস্তাটা একটা কালো ফিতের মত পড়ে আছে। করুণা ফিরছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ। সারাদিন কারখানায় বিরাট ফারনেসের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে যেন ঝলসে উঠেছে।

চোখের সামনে তখনও ফ্রেমলুকারের পুরু কাঁচ ভেদ করে পনেরোশো টন আকাশ ছোঁয়া ফার্ণেসের অতলে গলিত ধাতুপিণ্ডের তীব্র নীলাভ শিখাটা অসহ্য উত্তাপ দিয়ে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কানে আসে এয়ার চার্জিং এর তীব্র গর্জন।

—করুণা কেতন রায় যেন আর সাইকেলের প্যাডেল ঠেলতে পারে না চড়াই এর মুখে। খাড়া চড়াই এর গা বেয়ে রাস্তাটা শালবনের সবুজে গিয়ে হারিয়ে গেছে—তারই ওপাশে তার গ্রাম।

—রোজ সাতমাইল করে আসা যাওয়ায় চৌদ্দ মাইল চড়াই আর উৎরাই ঠেঙ্গিয়ে ওই লৌহ দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেন পারো না সে।

কিন্তু উপায় কি?

কলেজে কি করে পড়ার খরচ চালিয়াছেন বাবা—তা জানে করুণাকেতন। মায়ের শেষ সম্বল দু চারখান গহনা ও গিয়েছে ফিস্ যোগাতে। বি-এস-সি পাশকরে অন্য উপায় না দেখে কারখানাতেই ঢুকেছিল এপ্রেনটিস হয়ে।

চমকে উঠেছিলেন সেদিন হংসধ্বজ।

—শেষকালে লোহাকাটার কাযে যাবে?

—কেন খারাপ কি?

—নয় কোনখানে? হংসধ্বজ ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন।

ধ্বংসস্তুপের মত বাড়ী। খসে খসে পড়ছে ওর ইট-গাঁথুনি।

ধ্বসে পড়েছে ওর বেড়াপ্রাচীর—সব আব্রু সম্মানটুকু রক্ষার ভার যেন পথের ধূলোয়—পথিকের সৌজন্যতার উপরই অর্পিত হয়েছে।

—সবতো যেতে বসেছে? করুণাকেতন বাবাকে কথাটা না বলে পারেনি সেদিন।

স্তব্ধ হয়ে যান হংসধ্বজ। আর কথা বলেন নি।

শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছেন :ভোর বেলাতেই করুণা-

গ্রামের অন্যান্য সকলের মতই সাইকেলের রডে টিফিন কেরিয়ার ঝুলিয়ে যাত্রা করেছে দুর্গাপুরের দিকে।

ভোঁ বাজে!

—কেঁপে কেঁপে ওঠে শব্দটা। নীল আকাশে সাদা ধোঁয়া বের হয়। ওরা চলেছে দলে দলে।

ফকির ডোম ও মাথার বাবরি চুলগুলো রুমাল দিয়ে বেঁধে—একটা টিফিনকেরিয়ারে পান্তা ভাত বেঁধে চক্কর-বক্কর-কাটা হাওয়াই সার্ট গায়ে দিয়ে চলেছে দুর্গাপুরের দিকে। গান গায়—

মিলকে বিছোড় গঁয়ে রতিয়া
হায় রামা।

এক হয়ে গেছে। করুণা কেতন—রায়বংশের অন্যতম বংশধর আর তার ভূতপূর্ব্ব পাইক কিঙ্কর ডোমের ব্যাটা ফকীর সবই যেন এক আগুনে ঝলসে উঠেছে।

তবু···এ ছাড়া পথ দেখেনি করুণা।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ। হাঁপাচ্ছে চড়াই এর মাথায় উঠে।

তারা জ্বলছে—এদিকে শালবন আর শালবন। রাতের নিস্তব্ধ আঁধারে তারাগুলো দপ্‌ দপ্‌ করছে অসীম নির্জনতায়; পেছনে জ্বলছে ব্লাষ্ট ফার্ণেসের স্লাগ ব্যাঙ্ক এর লালাভ আলো; ওপেন হার্থ ফার্ণেসে লোহা থেকে ষ্টিল তৈরী হচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝল্‌সে ওঠে আলোর নীলাভ শিখাটা।

···ভাসা সাদা মেঘের গায়ে ওই আলোর আভা পড়েছে—জাফরাণী রং করা মেঘগুলো ভেসে চলে অন্ধকারের দিকে আলোকস্নাত হয়ে।

···মণিকার কথা মনে পড়ে।

কেমন যেন একটু অমনি জাফরাণী রংএর স্মৃতি মনের অতল হতাশার পুঞ্জীভূত অন্ধকারে জেগে ওঠে আলোক স্বপ্নেরই মত।

নিউ টাউনের স্কুলের কাছেই ওকে দেখে সাইকেল থেকে নেমেছিল সেদিন। পরণের প্যান্টএর কালি-ঝুলির দাগ। মাথার হেডক্যাপটাও তেমনি কালো—ঘামে বিবর্ণ।

সুগৌর মুখে ঠাঁই ঠাঁই কালির দাগ। ওই সাজ-পোষাকে ওকে দেখে চেনবার কথা নয়। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মণিকা কয়েক মুহূর্ত। চমকে ওঠে—ও তুমি? কি করে চিনবো বল?

হেসে করুণা মাথার ক্যাপটা খুলে বলে ওঠে—তা সত্যি। ছাত্র থেকে কারখানার শ্রমিক।

হেসে মণিকা—পরে তো ফার্ষ্ট ষ্টাফ হবে।

এ ক্লাস এ্যাপ্রেনটিশ, বি-এস-সি পাশ। হয়তো বছর পাঁচেক পর ফার্ষ্ট ষ্টাফ হতে পারে! ছোট্ট বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী—অপেক্ষাকৃত ভালো মাইনে। কি যেন নোতুন স্বপ্ন দেখে করুণা মণিকার ওই হাসির আভায়।

—বাসায় আসবে না?—মণিকা আহ্বান জানায়।

—বাড়ী ফিরতে হবে—জবাব দেয় করুণা।

—বাড়ী ঘর আমার না হয় নেই, বাসা—পাখীর বাসা একটুকু আছে।

মণিকা ও বানে-ভাসা খড়কুটোর মত এঘাট ওঘাটে ঠেকে এইখানেই এসে ভিড়েছে।

—স্কুলের চাকরী নিলাম।

ছোট বাসা মনের মত করে সাজিয়েছে মণিকা। জানলার পর্দা আর টেবিলক্লথ—বেড-কভারগুলো পর্যন্ত মণিকার রং এ রঙীণ।

মণিকার দিকে চেয়ে থাকে করুণাকেতন। এতদিন কলেজে-না হয় ওর মামার আশ্রয়ে দেখেছিল অসহায় মেয়েটিকে, পরানুগ্রহে মানুষ হয়েছে পরগাছার মত। আজ ওর মনের সুপ্ত স্বপ্ন আর সবুজ মিলে মনোরম করে তুলেছে তার শান্তনীড়।

এর তুলনায় করুণার নিজেদের বাড়ীটা মনে হয় ধ্বংসপুরী, ওখানে থাকতে দম বন্ধ হয়ে আসে, বাতাসে কি যেন গুমোট পুরোনো একটা স্যাঁতসেঁতে বদ্‌গন্ধ।

বার বার এতদিন এই কথাটাই ভেবে এসেছে করুণা। মাকে মনে পড়ে না।

কোন ছেলেবেলায় মারা যান মা। মানুষ হয়েছে বাড়ীর পুরোনো ঝি সুখদার কাছেই।

···কেমন ওকে সহ্য করতে পারে না করুণা।

ওই অন্ধকার ধ্বসে-পড়া বাড়ীটার মতই কালো কুশ্রী অন্ধকার একটা দাগের মত রয়ে গেছে সুখদা।

অনেক কথাই কানে আসে—এসেছেও ওর সম্বন্ধে।

নীরব অসহযোগে বাড়ীর বাইরে বাইরে কাটিয়েছে এতদিন করুণা।

আজ যেন সেই মুক্তির দিন এসেছে।

দীর্ঘ সাধনার পর আজ এসেছে তার অন্ধকার ওই ধ্বংসপুরী হতে মুক্তির আহ্বান। আনন্দে মন ভরে ওঠে।

মণিকাকে কথাটা প্রথম জানায় আজ কারখানা হতে বের হয়েই। সেইখানেই দেরী হয়ে গেছে।

আজ নোতুন করে দেখছে মণিকাকে—অধিকার পেয়েছে এগিয়ে যাবার। বাতাসে ওর ঘরময় মিশে রয়েছে রজনীগন্ধার মৃদু সুবাস, হাওয়ায় উড়ছে আকাশী-রংএর পর্দাগুলো মুক্তির আনন্দে।

মণিকার কণ্ঠে আজ সুর ফুটে ওঠে।

—এলি?

কেমন সব সুর প্রাণস্পন্দন এখানে শুব্ধ হ'য়ে গেছে। অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। জমাট অন্ধকারে উড়ছে আগুনের ফুলকির মত জোনাকি পোকার ঝাঁক। ঝিঁঝিঁ ডাকা অন্ধকার।

সাইকেল ঠেলে এগিয়ে যায় বাবার দিকে।

আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ-দেহী অতীতের প্রহরীর মত ওই লোকটি। কালের প্রহরী।

—আজ কোম্পানী আমাকে প্রমোশন দিয়েছে। ফার্ষ্ট ষ্টাফ করেছে আমায়। আটশো টাকা মাইনে—বাংলো।

বাবার দিকে চেয়ে হঠাৎ চুপ করল করুণা।

সাইকেলের আলোটুকু পড়েছে বাবার মুখে। কঠিন শুব্ধ সেই মুখ নীরব—সেই চাহনি। অন্ধকার থমথমে নিশ্চুপরাজ্যে কোন পাষাণ মূর্তির সামনে এতক্ষণ করুণা-কেতন তার আগামী ভবিষ্যতের কথা শোনাচ্ছে।

হংসধ্বজ ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

তার বাবার আমলেই দেখেছে ষ্টেটের ম্যানেজারের মাইনে পোষাতো হাজার টাকায়, নায়েবই উপরি রোজকার করছে অমন কত আটশো টাকা।

আজ!

করুণা-কেতন কঙ্কালের আধুলি পাওয়ার আনন্দে উল্লসিত হয়ে ফেটে পড়েছে।

—কি ঠিক করলে?

হংসধ্বজের কঠিন কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

—নোব ওই চাকরী?

জবাব দিলেন না হংসধ্বজ। অন্ধকারেই এগিয়ে চলে গেলেন বারান্দার জীর্ণ থামগুলোর পাশ দিয়ে।

—বাবা!

এক মুহূর্ত। ওইখানে দাঁড়িয়েই বলে ওঠেন।

হাতমুখ ধোওগে। রাত হয়েছে।

দাঁড়ালেন না হংসধ্বজ রায়, জীর্ণ মখমল আর পুরোনো পর্দা ঘেরা ঢাকা বারান্দায় ওর গম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনি-প্রতি-ধ্বনি তোলে।

কয়েকটা চামচিকে আলোর নিশানায় বিরক্ত হয়ে ফর-ফর শব্দে উড়ে গেল। বদ্ধ বাতাসে বিশ্রী চিম্‌সে একটা গন্ধ।

সবকিছু যেন পচছে—পচছে এ বাড়ীর অস্থি-মজ্জা-মাংস। কোন মৃত গলিত ব্যর্থ হৃত-ঐশ্বর্য্যের শব পচে বিষাক্ত করে তুলেছে এ বাড়ীর বাতাস।

ঘুম আসে না!

কি যেন ভাবছে করুণাকেতন। জীর্ণ জানলাগুলো বাতাসে নড়ছে, ঝুলে পড়েছে কব্জা হুপ খুলে। মেজেতে ঠাঁই ঠাঁই জমেছে খালখন্দ পলেস্তারা উঠে গিয়ে।

হাওয়ায় কাঁপছে বাড়ীটা।

মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামে।

…বেদনাময় এই রাত্রি। এতদিন তিল তিল করে করুণার প্রাণশক্তি কুরে খেয়েছে। বুকের উপর গুরুভারের মত চেপে বসেছে এর জমাট বিরাট অতীতের ঐতিহ্য।

মিথ্যা বোকার মত পিছনে টেনে ফিরেছে রায় বংশের পরিচয়।

বৃষ্টি পড়ছে।

…ফুটো কড়ি বরগা টালির ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়ে বৃষ্টি, হাওয়ার দাপটে—বজ্রের গর্জনে এ বাড়ীর গাঁথুনি কাঁপছে।

কাঁপুক—ধ্বসে পড়ুক এ সব কিছু।

করুণা নোতুন করে জীবন গড়ে তুলবে।

কাল থেকে চলে যাচ্ছে সে ওই আলোকোজ্জ্বল জগতে, কর্মব্যস্ত তার মাঝে। শুধু মৃত অতীতের বোঝা বুকে নিয়ে তিলে তিলে পিষে মরতে সে চায় না আর।

জানালাটা সশব্দে খুলে পড়ল—বৃষ্টি আসছে। আসছে বজ্রের তীব্র আলোকরশ্মি।

জেগে আছে হংসধ্বজ।

জীর্ণ ঘরের কড়িকাঠ দিয়ে জল পড়ছে—ঝাঁঝরা হয়ে ওর সর্বাঙ্গ। ম্লান আলোয় পায়চারী করছে হংসধ্বজ।

ওদিকে একটা বোতল আর কলাইকরা পাত্রে দুচার টুকরো মাংস—সুখদা দাঁড়িয়ে আছে।

লালাভ আলোয় ওই দাঁত-বের-করা ধ্বংসপুরীর মাঝে কেমন প্রেতাত্মার মত লাগে সুখদাকে আজ।

অতীতের সেই যৌবনবতী নারী আজ সব হারিয়ে কুশ্রী কদাকার একটা বুভুক্ষু জানোয়ারে পরিণত হয়েছে।

—খাবেন না?

—না!

এ বাড়ীর পুরোনো আলসে চিলে-ছাদে পায়রার দল বাসা বেঁধেছে। ওরই মাংস। শিকারী বিড়ালের মত ওগুলো ধরেছে সুখদা, বিনাপয়সায় ওই এখন খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ধ্বসেপড়া বাড়ীর জীর্ণ পঞ্চ পুরুষের।

—বেরিয়ে যা!

সুখদা মাঝে মাঝে ওই মানুষটিকে দেখেছে এমনি বদলে যেতে। মনের ব্যর্থতার জ্বালায় জ্বলে উঠে—ফেটে পড়ে হাউয়ের মত নিষ্ফল আক্রোশে ওই হংসধ্বজ।

আজ করুণাকেতন সেই নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এই বাড়ীর শেষ পুরুষ হংসধ্বজ।

করুণাকেতন এখানে থাকবে না, তার পথ বেঁকে গেছে অন্য দিকে, অন্য জগতে।

গলায় ঢালছে তীব্র জ্বালাওয়ালা তরল পানীয়টা, তবু বুকের জ্বালা মেটেনা। সুখদা চেয়ে আছে ওর দিকে।

—আবছা আলোয় ভাঙ্গা ঘরের কুশ্রী কদর্য্যতার মাঝে কি যেন একটা, উন্মাদনা আনে; হংসধ্বজ মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে।

এই তার স্বরূপ, এই তার পরিচয়—ঐতিহ্য। রায় বাড়ীর পঞ্চম পুরুষের ঐতিহ্য।

হাওয়া কাঁপছে—বজ্রের গর্জনে ভরে উঠে রাতের অন্ধকার।

থমকে দাঁড়াল করুণা।

শিউরে উঠেছে দৃশ্যটা দেখে। কুশ্রী কদর্য্য একটা নারী আকাশযোড়া বুভুক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলেছে কোন একটা ধ্বংসপুরীর দৈত্যের পানে।

সারামন ঘৃণায় ভরে ওঠে।

এবাড়ী ধ্বসে পড়ুক—বজ্রাঘাতে চুরমার হয়ে থাক এর ভিত্তি মূল। যত শীঘ্রী যায় ততই যেন মঙ্গল।

করুণা কেতন মুক্তি পাবে—মুক্তি পাবে হংসধ্বজ।

মিথ্যা বংশ-পরিচয়ের কারাগারে বন্দী রায় বংশের অসহায় পঞ্চম পুরুষ।

—কে! কে ওখানে?

বজ্রের নির্ঘোষ ছাপিয়ে ভেসে আসে হংসধ্বজের নিষ্ঠুর নির্মম কণ্ঠস্বর।

সরে আসে চকিতের মধ্যে করুণাকেতন।

দুঃসহ লজ্জায় শিউরে উঠেছে সে। ওই কলঙ্কময় অনুভূতি আঁধারেই ডুবে যাক—মুছে যাক নিঃশেষে।

...কি যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে হংসধ্বজ।

তার একছত্রাধিপত্য এই বাড়ীর নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধানের উপর রাতের অন্ধকারে কোন অশরীরী ছায়ামূর্তি যেন কঠিন নীরব শাসনে ভ্রূকুটি হেনেছে তার নিঃশব্দ উপস্থিতিতে।

—কে?

কোন সাড়া নেই। হংসধ্বজ ওই বৃষ্টির মাঝে—আঁধারে এগিয়ে চলে দীর্ঘ বারান্দা দিয়ে। কণ্ঠে তার শাসনের সুর।

একটা হিম-শীতল স্পর্শ।

মুহূর্তের মধ্যেই যেন চোখের সামনে বজ্রাঘাতের মত অসহ্য দীপ্তির জ্বালা—তার সারা শরীরের উষ্ণ শিহরণ খেলে যায়। মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে।

জ্বলছে সারা শরীরের প্রতিটি অণু পরমাণু। সুখদা আলোটা আনছিল, আর্তনাদ করে ওঠে।

—ছোটবাবু!

আলো দেখে সামনে ফণা মেলে দাঁড়িয়েছে কালো সতেজ সাপটা। কাল কেউটে ফণা মেলে দাঁড়িয়েছে।

বাতাসে মাথা নাড়ছে—দুলছে তার সর্বাঙ্গ। হিংস্র গর্জনে ভরে ওঠে ধ্বংসপুরীর রাতের আঁধার।

করুণাকেতনও ওর চীৎকারে ছুটে আসে। টর্চের আলোয় দেখে সাপটা দরজার ফাঁক দিয়ে কোন বন্ধ ঘরের ভিতরে ওর বহুদিনের বাসায় ফিরে গেল।

—বাবা!

হংসধ্বজ মুখ তুলে চাইলেন। কেমন যেন অসাড়

হয়ে আসছে সারা দেহ, সমস্ত শিরা উপশিরা তন্ত্রীতে ওর তীব্র মৃত্যুনীল বিষ ছড়িয়ে পড়েছে।

আচ্ছন্ন হয়ে আসে চোখের দৃষ্টি।

—কালের দংশন করুণা। করবার কিছুই নেই।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে করুণাকেতন, ধ্বংসপুরীতে রাত্রির অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে আসে।

রায় বংশের শেষ অধ্যায়ের নীরব সাক্ষী রয়ে গেল করুণা কেতন। এই অতীতের হৃত-গৌরব ছেড়ে যেতে চায়নি হংসধ্বজ; আগামী দিনে বাঁচার মন্ত্র সে পায় নি। জনহীন ধ্বংসপুরীর বাতাসে তাই বোধ হয় আজও মিশে আছে তার শেষ নিঃশ্বাস। করুণাকেতন আলো জ্বলা নোতুন জগতের দিকে চেয়ে আছে।

আজি হতে শত বর্ষ আগে

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

আজি হতে শত বর্ষ আগে
কোন রবি রাঙাইল বঙ্গের অঙ্গনতল
অভিনব অরুনিম রাগে
আজি হতে শত বর্ষ আগে?

ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত অমৃতের মন্ত্র গুঞ্জরণ
অরণ্যের মর্মরের প্রেমস্নিগ্ধ মরমের
সত্যদ্রষ্টা হৃদয়ের তরঙ্গের নিত্য আবর্তন
একত্র হইয়া এক শিশুকণ্ঠে জাগে
আজি হতে শত বর্ষ আগে।

ক্রৌঞ্চীকণ্ঠে শোকগীতি করিয়া শ্রবণ
অন্তহীন করুণায় দ্রবীভূত-মন
বাল্মীকির সাথে আসে কমণ্ডলু হাতে—
মহাভারতের কবি ঋষি দ্বৈপায়ন
করিবারে অমৃত বর্ষণ—
এক নব জাতকের আগে
আজি হতে শত বর্ষ আগে।

সুর প্রান্তে ছিল সুপ্ত উপগুপ্ত তথাগতপ্রিয়
বৈশাখী বাতাসে তার তন্দ্রা গেল টুটি
প্রেম-মন্ত্র-পূত-বারি লয়ে আসে ছুটি
সে শিশুর দরশন মাগে
আজি হতে শত বর্ষ আগে।

বিক্রমাদিত্যের রাজধানী
সিপ্রাতটে ছিল উজ্জয়িনী
সেথা হতে সে প্রভাতে—
মেঘদূত বীণা হাতে—
মহাকবি দাঁড়ালেন শিশু-পুরোভাগে
আজি হতে শত বর্ষ আগে।

মত্ত-মুগ্ধ প্রেম গানে
বৃন্দাবন লীলা প্রাণে—
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি-আদি শত শত মহাজন
মন কাড়া মধু-ঝরা করি সংকীর্তন
আসি দেখে দাঁড়াইয়া ভানু-
সিংহ তাহাদের আগে
আজি হতে শত বর্ষ আগে।

বিস্ময় বিমুগ্ধ বসুন্ধরা
রাজপথে আসে এক রাজার কুমার
তারি লাগি খোলে তার সৌন্দর্যের দ্বার
নব সাজ পরে যেন হতে স্বয়ংবরা
বিস্ময়বিমুগ্ধ বসুন্ধরা।

সমুদ্র পর্বত লঙ্ঘি দেশে দেশান্তরে যত প্রাণ
সেই শিশুলাগি তোলে মিলনের মহা ঐক্যতান,
মহা মহীরুহ হতে তুচ্ছ তৃণাঙ্কুর,
এক হয়ে দেয় দেখা নিকট ও দূর।
বিহঙ্গের কলতানে সমুদ্রের তরঙ্গ-নির্ঘোষে
তাহারি ইঙ্গিতে শুধু একই বাণী ঘোষে
মহামানবের স্বপ্ন সত্য হয়ে
দেখা দেয় অন্তরে অন্তরে—
সেদিন হইতে আজি শত বর্ষ পরে।

জাগিতেছে আনন্দের তরঙ্গ কল্লোল
নবতর স্পন্দন হিল্লোল।
প্রতি প্রাণে জাতি নির্বিশেষে আজ তারি
দোলা লাগে
তারে স্মরি, যে আসিল ধরণীতে
আজি হতে শত বর্ষ আগে।

পরম ভাগবত

॥ স্মৃতিচারণ ॥

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীঅরবিন্দ পঁচিশ বৎসর আগে যোগ ও যোগীদের সম্বন্ধে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে একবার একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন আমার অশান্ত মনকে শান্ত করতে। সে-সময়ে আমার মন আকুল হ'য়ে উঠত প্রায়ই—যখনই কোনো যোগী বা সাধুর মধ্যে দেখতাম কোনো ত্রুটি বা অপূর্ণতা। বাংলা লিখতে ব'সে ইংরেজি উদ্ধৃতির বহর বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, তাই গুরুদেবের পত্রটির চুম্বক মাত্র এখানে পেশ ক'রে আমার "স্মৃতিচারণ" সুরু করি। (কেন এ-পত্রের গৌরচন্দ্রিকা পেশ করছি—ক্রমশঃ প্রকাশ্য)।

গুরুদেব আমাকে বুঝিয়ে লিখেছিলেন: "মহাযোগীরাও কেউই নিখুঁৎ ব'লে গণ্য হবার দাবি রাখেন না। কিন্তু তাই ব'লে কি তুমি বলবে যে—তাঁদের তত্ত্বদর্শিতা সবই ভুয়ো, এ-জগতের কোনো কাজেই আসে না? তাছাড়া যোগীও তো কত রকমেরই আছে। কেউ কেউ শুধু অধ্যাত্ম অনুভূতি (Spiritual experience) হ'লেই খুসি; বাইরেও নিখুঁৎ হ'তে চান না তাঁরা—প্রগতির জন্যেও নেই তাঁদের কোনো মাথাব্যথা। কেউ কেউ চান সাধুসন্ত হ'তে, কেউ বা চান বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম (Cosmic consciousness) হবার চৈতন্যে প্রবেশ ক'রে সর্বমৈত্রীর স্বাদ পেয়ে সেই সঙ্গে রকমারি শক্তির ধারয়িতা হ'তে—যেমন পরমহংস সাধু। যোগের যে-আদর্শ আমার মনঃপুত সে-আদর্শ কিছু সব-যোগকেই উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। অধ্যাত্ম জীবন বলতে কি বোঝায় তার কোনো অগুঢ় অচল সূত্র নেই, কোনো সুদৃঢ় মনগড়া নিয়মের দাসও সে নয়। অধ্যাত্ম জীবনের ক্ষেত্র হ'ল একটি বিরাট্ বিবর্তন-এর (evolution) ক্ষেত্র, সে-রাজ্যের প্রসার ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনায় তার নীচের নানা রাজ্যের চেয়ে ঢের বড়—কত দেশ, ধরণ, স্তর, আকার, পথ, অধ্যাত্ম-আদর্শের রকমফের, আত্মিক প্রগতির ক্রম।" লিখে শেষে আমাকে বুঝিয়েছিলেন এই ব'লে যে দু-রকম বিচারভঙ্গি আছে: এক দেখে-শুনে তবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো, আর এক না ভেবেচিন্তেই সরাসরি রায় দেওয়া যে অমুক যোগ বা যোগী, এও তা। কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে না দেখলে অতীতের বা এ-যুগের তত্ত্বদর্শী তথা সাধকের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। আর এ-মূল্যায়ন বিনা ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও স্তরকে বোঝা যায় না—যেসব আদর্শ ও স্তর মানুষের অধ্যাত্ম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

গুরুদেব আমার যেসব প্রশ্নের উত্তরে এ-গভীর চক্ষুরুন্মীলক পত্রটি লিখেছিলেন তার একটি প্রশ্ন ছিল এই যে, সাধুসন্তরা অনেক সময়েই উদ্‌ভ্রান্ত বা ছিটগ্রস্তের (eccentric) মতন আচরণ করেন কেন? আমি লিখেছিলাম গুরুদেবকে যে, কাশীতে লালবাবা নামে একটি মস্ত সাধুর কাছে আমি একদিন গিয়ে দেখি তিনি উলঙ্গ হ'য়ে দোতলায় একটি জানলার খাটে ব'সে রাস্তার দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে। আমি নিচে থেকে চেঁচিয়ে ওঁকে আবেদন জানালাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে ঢুকতে দিলেন না—মানে, তাঁর শিষ্যদের বললেন না একতলার প্রবেশদ্বার খুলতে। আমিও নাছোড়বন্দ, তিনিও তাই। ফলে তর্কাতর্কি চলতেই থাকে। আমি বলছি, তাঁর সঙ্গে

আমার দেখা না করলেই নয়; যোগিপ্রবরও উপরের তলায় খাটে ব'সে বলছেন: "কেন আমার কাছে এসেছ? আমার পড়শীদের কাছে যাও না বাপু, শুনবে আমি কি রকম মন্দ লোক।" শেষে আমি বললাম ঈষৎ উষ্মা দেখিয়ে: "কেন এমন ভাণ করছেন? আপনি যে খাঁটি সাধু আমি জানি যে। তেম্‌নি আপনারও তো জানার কথা যে আমি আপনার কাছে অধ্যাত্মতত্ত্বের খবর নিতেই এসেছি, কোনো ঐহিক কামনাই আমার নেই।" বলতেই তিনি একগাল হেসে আমাকে বললেন: "কাল এসো।" পরদিন যেতে কত যে চমৎকার চমৎকার কথাই বললেন, সে কী বলব? শেষে বললেন: "তুমি পাবে যা খুঁজছ, কিন্তু এখনো সময় হয়নি—কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।" আমি বললাম: "সময় হ'লে আপনার সাহায্য পাবো কি?" তিনি আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "পাবে।" আমি বললাম: "কিন্তু সে-সময়ে আপনার দেখা পাব কোথায়? শুনেছি আপনি যাযাবর।" তিনি হেসে বললেন: "আমার সাহায্য পেতে হ'লে আমার দেখা পাবার দরকার নেই—বরদাবাবু যে আমার সাহায্য পেয়েছিলেন সে কি আমার দেখা পেয়ে? তোমাকে যখন তিনি আমার কাছে এসে ধর্না দিতে বলেন, তখন কি বলেন নি—তোমাকে যে আমি বহু দূর থেকেই তাঁকে সাহায্য করেছিলাম?"

এর পরেও চমৎকৃত না হ'য়ে করি কি? কারণ যোগিপুরুষ বরদাবাবু (বরদাচরণ মজুমদার—যাঁর কথা আমি আমার স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় পর্বে লিখেছি) আমাকে বলেছিলেন যে এই লালবাবা চিরদিন উলঙ্গ; তিব্বতে যোগে সিদ্ধিলাভ ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ান, নানা যোগার্থীকে সাহায্য করেন—অনেক সময়ে তাদের অজান্তে—বরদাবাবুকেও সাহায্য করেছিলেন, যদিও বরদাবাবু তাঁকে কথনো চর্মচক্ষে দেখেন নি। আমি অবাক হয়েছিলাম প্রধানত এই জন্যে যে, বরদাবাবুর সঙ্গে আমার কি কি কথা হয়েছিল লালবাবার তা জানবার কথা নয়। অথচ সিদ্ধ মহাত্মা কেন আমাকে প্রথম দিন ধুলো পায়েই বিদায় দিতে চেয়েছিলেন—জাহির ক'রে যে, তিনি মন্দ লোক? এই ধরণের আরো কয়েকটি দুরবগাহ যোগিমনস্তত্ত্বের তল পেতে চেয়েই আমি গুরুদেবকে লিখি যে সুভাষ আমাকে প্রায়ই বলত: We want Yogis but without their, eccentricities." একথার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন স্বহস্তে—সম্ভবত মনে মনে মৃদু হেসে: "আমার মনে হয় আমাকেও অনেকে এই ভাবে দেখে দুষতে পারেন যে আমি ভদ্র নই উদ্ধত, চিঠিপত্রের জবাব দেই না—আরো কত কী" ("I uppose I myself am accused of rude and arrogant behaviour because I refuse to see people, do not answer letters, and a host of other misdemeanours.") লিখে শেষে জুড়ে দিয়েছিলেন। যে সামাজিক ভদ্রতা বা কেতাদুরস্ত আচরণের সঙ্গে যোগসিদ্ধির কোনোই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই—কেন না যোগ হ'ল আন্তর উপলব্ধির ব্যাপার, সামাজিকতা—বাইরের। এ-প্রতিপাদ্যটিকে নানা যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন ক'রে শেষে গুরুদেব লিখেছিলেন, "আমি একজন বিখ্যাত যোগীর নাম শুনেছি যিনি কেউ এলেই ঢিল ছুড়তেন—নৈলে মক্কেলদের স্রোত ঠেকানো অসম্ভব। কিন্তু তাই ব'লে বলা চলে কি যে, তিনি বড় যোগী ছিলেন না?"...ইত্যাদি!

যোগ ও যোগীদের স্বপক্ষে শ্রীঅরবিন্দের এ-ধরণের ওকালতির মর্মজ্ঞ হ'তে আমার কিছু সময় লেগেছিল। কারণ আমি ছিলাম সে-সময়েও খানিকটা সামাজিক মানুষই বলব, তাই যোগীরা উদ্ভট ব্যবহার করলে অপ্রসন্ন হ'য়ে বলতাম—এঁরা সুভদ্র হ'লে কি বড় যোগী হ'তে পারতেন না? পরে বুঝেছি—কোনো মহাত্মা যোগপথে যখন কোনো গভীর অধ্যাত্ম চেতনার এলাকায় পৌঁছন তখন তাঁর কাছে সে-স্তরের নিম্নলোকবর্তী চেতনার বিধিবিধান অনেক সময়েই অবজ্ঞেয় মনে হয়, লোকে তাঁকে কি ভাববে না ভাববে তা নিয়ে তিনি আদৌ মাথা ঘামান না। কাজেই সুভাষের উক্তিটিকে সামাজিক দিক্‌ দিয়ে সমর্থন করা গেলেও আধ্যাত্মিক দিক্‌ দিয়ে সমর্থন করা অসম্ভব।

কিন্তু তবু একথা মানতেই হবে যে, যদি কোনো যোগী মহাত্মাকে দেখি অধ্যাত্ম চেতনায়ও মহাজন, শালীনতায়ও সুজন—তাহ'লে মনটা যেন হাঁপ ছেড়ে বলে: "বাঁচা গেল, এই তো চাই—এবার এঁর কাছে দরবার করা যাক।" গীতায় বলেছে তত্ত্বদর্শীদের কাছে গিয়ে তাঁদের প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা করলে তবেই তাঁদের তত্ত্বোপদেশের

আলোয় মনের কালি কাটে। ১৯২৮ সালে যখন সর্বপ্রথম সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাজ্ঞানী ও যোগিধর্মী মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গে দেখা হয় তখন মন যেন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছিল দেখে যে এতবড় যোগী তথা জ্ঞানী—এমন উদার স্নেহশীল ও সুভদ্র হ'তে পারেন। আমাকে সাদরে বসিয়ে ধীরভাবে তিনি যেভাবে আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, সে সব উত্তরের প্রতি কথায়ই তাঁর স্বভাবের সারল্য তথা চরিত্রের মাধুর্য ফুটে উঠেছিল। সে-সময়ে এবং তার পরেও বহুবারই মনে হয়েছে আমার যে, মহৎ জ্ঞানী তথা যোগীদের মধ্যে এ-ধরণের মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয় যদি আর একটু ফুটে উঠত তাহ'লে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁদের নানা উদ্‌ভ্রান্তির তরফে একশত ওকালতি করতে হ'ত না, আমাকে বোঝাতেও হ'ত না নানা পত্রে যে, সামাজিক দিক দিয়ে যাঁদেরকে ছিটগ্রস্ত (eccentric) মনে হয় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখতে শিখলে তাঁদের অনেককে অন্তত: জ্ঞানী ব'লে সনাক্ত করা যেতে পারে—ঠিক যেমন ব্যবহারিক (practical) জগতে যাদের আচরণ হসনীয় মনে হয়, তাদের মধ্যে অনেক সময়ে বিরাট প্রতিভার দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

তাঁর পাণ্ডিত্য, আধ্যাত্মিকতা, পুণ্য চরিত্র, নির্লোভতা, বদান্যতা প্রভৃতি নানা গুণের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছিলাম—বিশেষ করে তাঁর অসামান্য বিনয় ও ঔদার্যের নানা কাহিনী। কাজেই আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়েই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তবু কেমন যেন মনের কোনে একটু ভয় মতন উঁকি দিচ্ছিল থেকে থেকে—কি জানি তিনি হয়ত আমার দুচারটে প্রশ্নের দায়-সারা গোচের উত্তর দিয়েই ব'লে বসবেন! "এবার স'রে পড়ো বাপু, আমার বহু কাজ আছে—তোমার মতন স্বভাব-সংশয়ীর সঙ্গ মাদৃশ স্বভাববিশ্বাসীর কাছে তৃপ্তিকর হ'তে পারে না অন্তত এটুকু বুঝে দয়া ক'রে আমাকে অব্যাহতি দাও।" একথা বলছি এই জন্যে যে, আমাদের দেশে যোগীদের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছে যাদের বলা হয় বিরক্ত সন্ন্যাসী, অর্থাৎ যারা মানুষ দেখলে মুখ ফেরায়। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে একটি শ্লোকে উল্লেখ করেছিলেন, এদেরই তখন তিনি করেছিলেন এই (খেদোক্তি শ্রীঅরবিন্দ এই শ্লোকটিরূপ প্রশংসা করেছেন তাঁর Synthesis of Yoga-এ)

প্রায়েন দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠা।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদস্যশরণং ভ্রমতোহনুপশ্যে॥

আমার ভাগবতী কথায় আমি এ শ্লোকটির অনুবাদ করেছি এই ভাবে :

তাপসমুণি যারা দেখেছি প্রায় তারা বিজনচারী—শুধু সাধে আপন
সাধনা—মুক্তির মৌন-ব্রত ধরি', হৃদয়ে নীলমণি করি' গোপন।
পাপী তাপীর পানে চায় না ফিরিয়াও, কে দিবে তাহাদের শরণদান
না দিলে তুমি? ছাড়ি' তাপিতে মোক্ষও চাহিনা আপনার, ওগো মহান্!

আজ আমার মনে এ-বিরক্ত সাধুদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ নেই, কারণ আমি সত্যিই আশ্বাস পেয়েছি যে তাঁরাও জনহিতকর, তাঁদের বিজনপুরীতে মৌন সাধনায়ও পাপী তাপীর কিছু না কিছু কাজে আসেন। এ-সত্যেরও খবর পাই প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের কাছে—পরে রমণ মহর্ষির মুখে—যখন তিনি আমাকে বলেছিলেন খুব জোর ক'রেই যে বিবেকানন্দের কথা সত্য যে, মহৎ চিন্তার মহৎ সাধনার ফল সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েই পড়ে—এমন কি যদি যোগী চিরদিন গুহস্বামী হন তাহ'লেও। ভুলব না কোনোদিন রমণ মহর্ষির করুণাভরা দৃষ্টি ও সৌম্য স্নিগ্ধহাসি—যখন তিনি আমাকে তাঁর আশ্রমে পনেরো যোলো বৎসর আগে বলেছিলেন যে, ভগবানের রাজ্যে বহির্মুখী দৃষ্টি যেখানে দেখে স্বতোবিরোধ, অন্তর্মুখী দৃষ্টি দেখতে পায় এমন সমাধান—যা যুক্তির কাছে অগ্রাহ্য হ'লেও উপলব্ধির কাছে অকাট্য সত্য। ব'লে তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন শঙ্করাচার্যের দক্ষিণা-মূর্তি স্তোত্র থেকে :

চিত্রং বটতরোমূলে বৃদ্ধা শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥
দেখ দেখ অপরূপ দৃশ্য বটতরুমূলে :
আসীন তরুণ গুরু' বৃদ্ধ শিষ্যগণ!

মৌনের মাধ্যমে শুরু করে তত্ত্বব্যাখ্যা—যার
প্রসাদে শিষ্যের হয় সংশয়মোচন।

বহু বর্ষ বাদে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এই শ্লোকটিই উদ্ধৃত করেন পুনায় (১।৮।১৯৬১ তারিখে)—যখন তিনি আমাকে বলেন নানা উদাহরণ দিয়ে যে বুদ্ধির খাস তালুকে যাদের মনে হয় অহি-নকুল (paradox), আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জগতে তাকে মনে হয় শুধু যে গ্রহণীয় তাই নয়, একেবারে স্বতঃসিদ্ধ সত্য—যথা শঙ্করাচার্য ফলিয়ে তুলেছেন চমৎকার ক'রে এই শ্লোকটির মধ্যে। তাঁর মুখের কথা উদ্ধৃত করা আমার পক্ষে অসাধ্য, তবে তাঁকে ভুল বোঝানো হবে না যদি বলি যে তিনি একদিন কথায় কথায় নানা উজ্জ্বল উদাহরণ দিয়ে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে যতক্ষণ আমরা আমাদের বুদ্ধির অভিমানে মুগ্ধ হ'য়ে ভাবি "আমি জানি"—ততক্ষণ যথার্থ জ্ঞানের আলো এসে আমাদের অজ্ঞানের গ্রন্থিমোচন করতে পারে না। আমরা দেখেও দেখতে পাই না যে, আত্মাভিমান দর্প গর্ব এসবই আড়াল করে সেই আলোকে যার অবতরণ বিনা আমাদের মনের আঁধার কাটে না, কাটতে পারে না। এই অবতরণকে কবিরাজ মহাশয় একদিন কেবলমাত্র "ভগবতী কৃপার সাধ্য" ব'লে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, শুধু যে এ কৃপা ছাড়া যথার্থ দিব্যজীবনলাভ অসম্ভব, তাই নয়—প্রতিপদে কৃপা এসে আমাদের নানা অশুদ্ধির মালিন্য মোচন করে ব'লেই আমরা সাধনায় অগ্রসর হ'তে পারি। আমার "অঘটন আজো ঘটে" উপন্যাসটিতে আমিও এই কথা বলতে চেষ্টা করেছি—যতটা সম্ভব আমার নিজের কথা ও ইন্দিরা দেবীর নানা উপলব্ধির এজাহারে। আমার বর্ণিত "অঘটন" সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয় পুনায় ব'সে একটি পত্রে লিখেছিলেন আমাকে (১৩।৬।৬০):

"মানবদেহধারী যোগীও যোগাবস্থাতে অতি-প্রাকৃত ব্যাপারসম্পাদন করিতে পারেন—অঘটন ঘটাইতে পারেন, অবশ্য ইহাও সেই মহাশক্তির কৃপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার ইহাও বিবেচ্য—প্রাকৃত নিয়মের গণ্ডী কোথায় কে বলিবে? আজ যাহা অতি-প্রাকৃত বলিয়া মনে হয় কাল তাহা সকলে প্রাকৃত বলিয়া মনে করিতে পারে। আপনিও স্যর অলিভার লজ—এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন *যে, এই বিশ্বব্যাপারে সম্ভব ও অসম্ভবের সীমারেখা কেহ টানিতে পারে না।"

আমি আমার MIRACLES DO STILL HAPPEN বইটির ভূমিকায় আরো লিখেছি যে, আমার মাথাব্যথা শুধু অদ্ভুত ইন্দ্রজালদের নিয়ে নয়, আমি সবচেয়ে মূল্যবান মনে করি সেই জাতীয় অতি-প্রাকৃত অঘটনদেরকে—যাদের ঘটান দৈবী করুণা আমাদের মানব জীবনকে দিব্য-জীবনে রূপান্তরিত ক'রে, আমাদের চেতনার বিকাশে সহায় হয়ে, আমাদের প্রকৃতির শোধন ক'রে এবং আমাদের দীনতার দীক্ষা দিয়ে। কবিরাজ মহাশয় এ-সম্বন্ধে লিখছেন:

"অঘটন আজো ঘটে' আমার খুব ভালো লাগিয়াছিল, আমার বন্ধুদেরও লাগিয়াছিল। আশা করি আপনার ইংরাজি অনুবাদ সম্বন্ধে ইংরাজি পাঠকদের চিত্তও তেমনি আকর্ষণ করিবে। সত্যের যদি কিছু প্রভাব থাকে তবে বৈজ্ঞানিকদেরও হৃদয় কি টলিবে না?"

এ-চিঠিটির আর একস্থলে কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন, আমার প্রতিপাদ্য সূত্রে সায় দিয়েই: "আমারো মনে হয় প্রকৃত বিরাজ হইতেছে মানুষের জীবনের পরিবর্তন, যে-পরিবর্তন মহা করুণার ফলে কোনো মহামুহূর্তে আকস্মাৎ তাহার সমগ্র সত্তাকে রূপান্তরিত করে। কার্যকারণের শৃঙ্খলাতে উহা ধরা পড়ে না। অহেতুক কৃপার আকস্মিক উল্লাস ব্যতীত উহাকে আর কি বলা যাইতে পারে?"

কবিরাজ মহাশয়ের চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিলাম একটি বিশেষ কারণে। কয়েক বৎসর আগে আমার এক বিজ্ঞ বন্ধু কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে একটু অবিচার করেছিলেন,

---

Let us be as cautious and critical eye and as sceptical as we like, but let us be fair, do not let us start with a preconceived notion of what is possible and what is impossible in this almost unexplored universe, let us be willing to be guided by facts, not by dogmas" (MIND AND MATTER—Sir Oliver Lodge "অঘটন আজো ঘটের" মৎকৃত ইংরাজী অনুবাদ MIRACLES DO STILL HAPPEN বইটির ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত। এ বইটি এখন যন্ত্রস্থ।

এই ব'লে যে তিনি যোগবিভূতিকে যোগের চেয়ে বড় মনে করেন। বন্ধুটি অধ্যাত্ম বিদ্যায় কবিরাজ মহাশয়ের কাছে বালখিল্য প্রমাণ হ'লেও তাঁর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ব'লে তাঁর শ্লেষ আমাকে প্রথমটায় একটু ভাবিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পরে কবিরাজ মহাশয়ের স্নেহভাজন হবার সৌভাগ্য লাভ করার পরে ও তাঁর সঙ্গে পুনায় ও কাশীতে ধর্ম ও যোগ নিয়ে বহু আলোচনা করার পরে আমি মুগ্ধ হয়েছি—শুধু যে তাঁর ভূয়োদর্শনের পরিচয় পেয়ে তাই নয়, এই আনন্দময় আবিষ্কারে যে তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত হ'লেও সব আগে উক্ত। তাই তিনিও একদিন পুনাতে আমাকে অকুতোভয়ে বলেছিলেন যে "অহেতুকী ভক্তির পায়ে প'ড়ে থাকে কোটি কোটি মুক্তি।" ব'লে ব্যাখ্যা করেছিলেন খানিকটা এই ঢঙে—(ভাবাটা আমার, তবে বোধ হয় তাঁর ভাবটুকু ধরতে পেরেছি)—যে মুমুক্ষা বুভুক্ষা এ-দুইই ভক্তির পরিপন্থী। বুভুক্ষা বিনা ঐহিক নানা কামনা যে ভক্তির পথে বাধা, একথা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু মুমুক্ষা মুক্তিকামনাও—ভক্তির পথে সমান বাধা, কেন না ভক্তি চায় আরাধ্য ইষ্টকে, মুক্তি চায় সব বন্ধনের খণ্ডন! কিন্তু ইষ্টের সঙ্গে যে পরম মিলন কামনা করে সে যে একাঙ্গী, চায় শুধু তাকেই। কাজেই মুক্তি নিয়ে সে করবে কী? এর মানে নয় অবশ্য যে ভক্ত মুক্তি পায় না—পায় তো সহজেই ইষ্ট মিলনের সঙ্গে সঙ্গে। না পেয়ে পারে? যিনি রসস্বরূপ, আনন্দের আকর, সর্বসার্থকতার আদিকারণ —তাঁকে যে একবার ভালোবেসেছে, তার সমস্ত সত্তা তাঁর পায়ে নিবেদন করেছে,তাকে বাঁধবে কোন ঐহিক বাসনা? তার প্রেমের এম্‌নিই ঐকান্তিকতা যে সে তাঁকে ভালো-বেসেই চরিতার্থ,তাঁকে পেয়ে পরমানন্দে থাকলেও—এমনকি আনন্দের জন্যেও সে তাঁকে চায় না, চায় তাঁরই জন্যে—'আমার স্বভাব এই তোমা বই জানি না' এই হ'ল তার মন্ত্র।"

এই কথাই বহুদিন আগে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম একবার আমাকে লিখেছিলেন একটু অন্য ভাবে ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে:

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দ সেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

অর্থাৎ কামক্রোধলোভমোহবর্গীয় রিপুদের কবল থেকে মুক্তি লাভ ক'রেও আত্মা তেমন ঝটিতি শান্তি পায় না—যেমন পায় ভক্তি পথে—কৃষ্ণ সেবায়।

পুনায় নানা আলাপে ঘুরে ফিরে কবিরাজ মহাশয় কেবলই এই ধুয়োতে ফিরে আসতেন যে পরা ভক্তির কাছে অদ্বৈতজ্ঞানও তুচ্ছ। কারণ ভক্তি গড়ে যে ভাবতন্ময়কে—সে আস্বাদন করে শুধু তো আনন্দকে নয়, তার উপরে রসকে। আনন্দ ও রস মূলে অভেদ হ'য়েও ঠিক কী ভাবে ভিন্ন, তিনি দুতিন দিন নানা দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করে কী চমৎকার ক'রেই যে বলেছিলেন! কিন্তু মুস্কিল এই যে তিনি এতরকম দিশা যুগপৎ ঝিকমিকিয়ে তোলেন তাঁর নানা ভাষণে ব্যাখ্যায় উপমায় যে একটা ধরতে না ধরতে আর একটা এসে আরো চম্‌কে তোলে, ফলে থেই হারিয়ে যায়। তবু সাধ্যমত তাঁর বিশ্লেষণের সারমর্মটুকু বলবার চেষ্টা করব।

তিনি উদ্ধৃত করলেন প্রথমেই বৃহদারণ্যকের বিখ্যাত সূত্র: "স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে⋯স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।" অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) একাকী আনন্দ পেলেন না, তাই নিজেকে দুভাগ করলেন—পতি ও পত্নীতে। তার পরে জন্মাল মানুষ।

সচ্চিদানন্দ নিজের মধ্যে আনন্দ পেলেন না এ কেমন কথা?—উত্তরে কবিরাজ মহাশয় যা যা বললেন তার মর্ম আমি যা বুঝেছি তা এই:

ব্রহ্মের সৎ-ভূমি হল অস্তির ভূমি, সেখানে আছে আসন। তারপর চিৎ জানে যে সে আছে অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম। চিৎ যখন নিজেকেই এইভাবে দেখল তখনই আনন্দের পদার্পণ। ব'লে কবিরাজ মহাশয় বললেন, যে এধরণের বিশ্লেষণকে ভুল বোঝা খুবই সহজ; কারণ একের পর এক ঘটেনি তো—সচ্চিদানন্দের মধ্যে সমস্তই ছিল, তবে বোঝাবার জন্যে ভাষা ও কালের সহায়তা নিতে হয় আমাদের—তবু খতিয়ে অনির্বচনীয়কে বচনের দ্বারা সামান্য আভাষ মাত্র দেওয়া যায়, তার বেশি নয়। এই অভাষ ইঙ্গিত থেকেই বাক্‌-এর সৃষ্টি। ব'লে কবিরাজ মহাশয় অ আ ই ঈ উ ঊ এসবের প্রতীক তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু বলেই বললেন: "সে যাক্‌। আসল কথা হ'ল রসের উদ্ভব ও লীলা। যখন এক দুই—মিথুন

—হ'লেন তখনই হ'ল লীলার সৃষ্টি—যার মূলে আছে এর সঙ্গে ওর সান্নিধ্য, সান্নিধ্য থেকে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থেকে শেষে মিলন। এই মিলনের অভিসারে নানা ভাব, অনুভাব, বিভাব, উদ্দীপন, আস্বাদনাদির আলো ছায়া, খেলাধুলো। রস আছে ব'লেই এই খেলাধূলো চলে। আমাদের শাস্ত্রে বলে বটে যে রস নয় রকমের। কিন্তু তা নয়, আসলে রস বহু—সূক্ষ্মাণাতিসূক্ষ্মণ নানা খাতে তার প্রবাহ। আমাদের মন যখন প্রকৃতি থেকে খানিকটা নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে পারে তখনই যে পায় দ্রষ্টা পদবী, তখন সে যা-ই দেখে তা থেকে পায় দৃষ্টির আনন্দ—কিনা রস। দেখতে পেলেই রস। রসকে বলা যেতে পারে আনন্দের নির্যাস। আসলে দুইই এক, অথচ একটা সূক্ষ্ম ভেদ আছে। কি রকম ভেদ? একত্বের মধ্যে আনন্দ, বহুর মধ্যে রস। নানার নানাত্ব থেকে যখন এক-এর ভূমিতে উত্তীর্ণ হই তখন পাই জ্ঞান যে, সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। এতে আনন্দ। অথচ এই একমেবাদ্বিতীয়ম্-কেই আবার উপনিষদে বলেছে সর্ব্বগন্ধ, সর্বস্পর্শ, সর্ববর্ণ ইত্যাদি। অর্থাৎ কি না এক যখন বহু হ'লেন তখন বহুর মধ্যে পরস্পরবিহারে রস উপনীত হয়। কিন্তু তার জন্যে চাই দৃষ্টি। যখন আমি প্রকৃতির অধীন তখন আমি ভোক্তা—কখনো সুখানুভূতির, কখনো দুঃখানুভূতির। কিন্তু যখন দ্রষ্টা পদবীতে উন্নীত হই তখন আর প্রকৃতির তাঁবে থাকি না তো—তখন দেখতে পাই যে সুখ দুঃখ—এ দুই প্রবাহেরই তলে অন্তঃশীলা ব'য়ে চলেছে রসধারা—আনন্দের সঙ্গে যে মূলতঃ অভিন্ন হ'লেও আস্বাদনে ভেদ আছে। কেমন? না, জ্ঞানী পায় আনন্দকে—কেন না তার স্থিতি এক-এ, আর রসিক পায় রসকে—কেন না সে সুখ দুঃখ কারুণ্য বেদনা হাসি অশ্রু সব তাতেই আছে—সব তাতেই সে রসাস্বাদনে চরিতার্থ হয় ব'লে। কেমন? না, ধরো তুমি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অভিনয় দেখতে গেছ। অভিনয় অনবদ্য হ'লে সতী ভ্রমরের দুঃখ দেখে তুমি তার সঙ্গে দরদের মাধ্যমে মিলেমিশে যাও ব'লেই তার দুঃখে তোমার চোখে জল আসে। কিন্তু এই যে ভ্রমরের দুঃখে তুমি দুঃখ পাচ্ছ—খতিয়ে এ তো দুঃখ নয়। যদি দুঃখ হ'ত তাহ'লে বারবার ভ্রমর অভিনয় দেখতে আসতে কি? কখনই না, যেহেতু সাধ ক'রে কেউই চায় না দুঃখ পেতে। তাহ'লে তুমি বারবার ভ্রমরের দুঃখ দেখতে যাচ্ছ কেন? না, আসলে তুমি পাচ্ছ আনন্দই বটে; কিন্তু আনন্দই বা আসে কোত্থেকে? তুমি কি তবে পাষণ্ড যে, সতীর দুঃখ দেখে উল্লসিত হচ্ছ? তা তো নয়—কারণ তোমারও যে বুক ফেটে যাচ্ছে ভ্রমরের বুক-ফাটা কান্নায়। তবে? তুমি দুঃখ পাচ্ছ বৈ কি। অথচ এ-দুঃখকেই তুমি মেখে চেখে আস্বাদন করছ রস—কারুণ্যের রস। তাহ'লেই দাঁড়ালো—বেদান্ত ঐ আনন্দের নির্যাস রসে বিধৃত। তাই রসিক বলি তাকেই—যখন সে ব্যথার ব্যথী, সর্ববিধ অনুভূতির অতলে ডুবুরি হ'য়ে স্বাদ পায় অন্তঃলীলা রসধারার—যেখানে দুঃখ সুখ কারুণ্য হাসি ভয় প্রভৃতি ভাব গ'লে রসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ব'য়ে চলেছে। তাই সত্যিকার রসিক হ'লে তাকে সেই সঙ্গে হ'তেই হবে ভাবুক তথা সহৃদয়—কেন না ভাব বা রস সংক্রমিত হয় হৃদয় থেকে হৃদয়ে—কার হৃদয়ে—না যে সহৃদয় তার।" আমি ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করলাম যে ভাগবতের রস নিবেদন করা হচ্ছে রসিক তথা ভাবুককে—"পিঠত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।" তাতে কবিরাজ মহাশয় সায় দিয়ে বললেন: "ঠিক, কেবল ঐ যে বল্লাম—সহৃদয়ও হ'তেই হবে—নৈলে এ-রসের আস্বাদন মিলবে না।" ব'লেই হেসে বললেন: "তাই না রসিক অরসিককে দেখতেই শিরপা ভোলে, বলে 'অশেষ দুঃখ-শতানি বিতরতানি সহে চতুরানন'। যত দুঃখ দাও সইব হে ঠাকুর, কেবল—"অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ"—অরসিকের কাছে রসের তল্পি ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার দুঃখ আমাকে দিও না দিও না।"

এই ধরণের নানা কথা দিনের পর দিন তাঁর মুখে শুনে আমার একটি ভুল ভাঙে। সে-ভুলটি হ'ল এই যে—আমার ধারণা ছিল কবিরাজ মহাশয় মহাজ্ঞানী বিকশিত যোগী, বহুপাঠী, মনীষী—সবই, কেবল রসিক নন—যেহেতু এ হেন গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মানুষ রসিক হ'তে পারে না। কিন্তু এ-জাতীয় মূল্যায়নে আমাদের অনেক সময়েই ভুল হয় এই জন্যে যে—বিধাতার বিচিত্র বিধানে একই মানুষের মধ্যে নানা ভাবধারা যুগপৎ প্রবহমান হ'য়ে থাকে। কাজেই কারুর একটি বা দুটি ভাবের খবর পেলেই সব ভাবের খবর পাওয়া যায় না। পুণাতে কবিরাজ মহাশয় আমাদের অতিথি হ'য়ে

ছিলেন প্রায় একমাস, তাই তাঁর সঙ্গে একটু সহজ ছন্দে মিশতে মিশতে পরম তৃপ্তি পেয়েছিলাম—আবিষ্কার ক'রে যে তিনি স্বধর্মে বহ্মজ্ঞানী হ'লেও স্বভাবে রসিকই বটে—তাই তিনি শুধু গভীর গম্ভীর তত্ত্বদর্শীই নন—সেই সঙ্গে হাল্কা হাসিরও সমঝদার। কী ধরণের হাসিঠাট্টার প্রসঙ্গে তিনি মন খুলে সাড়া দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়তেন তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব।

আমি তাঁকে প্রায়ই নানা মনীষীর নানা রসিকতার নমুনা দিতাম, বলতাম কোন্ মহাজনের সঙ্গে কী ধরণের মজার মজার গল্প গাদা হ'ত—যথা পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ,শরৎচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ—সবশেষে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ। বলতাম—শ্রীঅরবিন্দ হাসির হররায় রীতিমত যোগ দিতেন তাঁর দুই রসরাজ শিষ্যের রসিকতার সঙ্গতে। এঁদের নাম মহামতি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁর বিপ্লবযুগের সতীর্থ তথা শিষ্য।

এরপরে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য হ'য়ে আমি পণ্ডিচেরীতে তাঁর আশ্রমে প্রথম প্রথম বেশ একটু আড়ষ্ট বোধ করতাম, কেন না সে যুগে পণ্ডিচেরি আশ্রমের অধিকাংশ মনীষীই হাসি ঠাট্টাকে vitol (উচ্ছল) ব'লে বলতেন—সাধ্যমত তার ছোঁয়াচ কাটিয়ে। কিন্তু আমি স্বভাবে একটু বেপরোয়া তো, তাই একটু একটু ক'রে স্বয়ং গম্ভীরাত্মাদের গুরু, সাক্ষাৎ যোগিরাজ শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গেও হাসি-ঠাট্টা সুরু করলাম—যার কিছু পরিচয় আমার Sri Aurobindo came to me স্মৃতিচারণে লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু তাতে একটি রসিকতার প্রসঙ্গ দেওয়া হয় নি কেন না ইংরাজি ভাষায় এ-জাতীয় বাংলা রসিকতার রস পরিবেষণ করা দুঃসাধ্য। সে প্রসঙ্গটি দিয়ে এ যাত্রা ইতি করি।

শ্রীঅরবিন্দকে আমরা সবাই বৎসরে তিনবার (পরে চারবার) দর্শন করতে যেতাম। এক এক ক'রে তিন চার শো (পরে হাজার বারশো) দর্শনার্থী তাঁকে পর পর দেখে চ'লে আসত, প্রত্যেকেই এক মিনিট ক'রে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নিষ্ক্রান্ত হ'ত—সরল রেখায় (in a file) শ্রীঅরবিন্দের চোখে চোখ রেখে মনে মনে প্রণাম ক'রে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ চেয়ে থাকতেন গম্ভীর মুখে—নিষ্পলক নেত্রে। ফলে আমার মন খারাপ হ'ত অনেক সময়েই। শেষে মরীয়া হ'য়ে তাঁকে লিখলাম: "গুরুদেব, দর্শনের সময়ে আপনার অমন মেঘ গম্ভীর মুখ দেখে আমার সময়ে সময়ে মনে এমন গুমট হয় যে প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম। তাই কাতর অনুরোধ: আপনি যদি বেচারি দিলীপের অকাল মৃত্যু ঘটাতে না চান, তবে পরের বার দর্শনের সময় যখন আমি আপনার সামনে দাঁড়াব ভয়ে ভয়ে—তখন একটু হাসবেন, লক্ষীটি!"

কিন্তু বৃথা! তাঁর মন গলল না একটুও: পরের বারও দর্শনে তাঁর সামনে দাঁড়াতে—যথাপূর্বং তথা পরং—বুক আমার কেঁপে উঠল সেই গুরুগম্ভীর আনন দেখে।

আমার পিছনে একজন গম্ভীরাত্মা গুরুভাই ছিলেন, তিনি আমার মন খারাপ দেখে সবিস্ময়ে বললেন: "সে কি দিলীপবাবু! শ্রীঅরবিন্দ আপনাকে দেখে তো হেসেছিলেন!" আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: "হেসেছিলেন? কই না তো!—আমি স্পষ্ট দেখলাম সেই সমান গম্ভীর—" তিনি টেবিলে ঘুঁষি মেরে বললেন: "অবশ্য তিনি হেসেছিলেন। আপনি চিনতে পারেন নি।"

অগত্যা অসহায় হ'য়ে আমি গুরুদেবের শরণ নিলাম—তর্কাতর্কির কথা জানিয়ে লিখলাম—বাংলা ছড়ায় (যেমন আমি প্রায়ই লিখতাম ও কখনো কখনো তিনি ইংরাজি ছড়ায় জবাব দিতেন):

"জানি আমি হায়—দিলীপ "মানস"-রাজ্যেরই প্রজা,
পোড়া কপাল!
তাই মানি গুরু; জানে না সে আজো ভবদীয়
"অতিমানস"-কথা।
কিন্তু, যে তার শৈশব হ'তে এসেছে হেসেই চিরটাকাল,
চিনিতে সে হারে 'হাসি' বলে কারে? এ-জুলুমে মনে
উপজে ব্যথা।"

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ মৃদু হেসে লিখলেন (যেমন প্রায়ই লিখতেন স্নেহের প্রশ্রয়ে) "I did smile at you, though it was not the radiant smile of a Tagore or the child-like smile of a Gandhi,"

কবিরাজ মহাশয় শুনতে শুনতে হেসে গড়িয়ে পড়লেন, বললেন: "তারপর?"

আমি বললাম: "তারপর আর কি? গুরুদেবকে আর একটি কাতর লিপি পাঠালাম, লিখলাম:

গুরুদেব

শুনি তুমি দীনদয়াল, আমার তাই এ-মিনতি চরণতলে :
আজ হ'তে হাসি হাসিও এমন—হাসি ব'লে যারে
চিনিতে পারি।
নহিলে হয়ত গম্ভীর তব দর্শনে—ভয়ে নয়নজলে
কোথা যাব ভেসে! তখন কে পার করিবে অপারে
হে কাণ্ডারী!"

লিখে একটু পুনশ্চ দিয়ে লিখেছিলাম "একদা হনুমান দ্বারকায় উপস্থিত হ'য়ে কৃষ্ণের রাজ সভায় বলেছিলেন : 'যদিও

শ্রীনাথ জানকীনাথ যে অভেদ পরমাত্মায়—
জানি হে মনে,
তথাপি হনুর প্রাণাধিপ শুধু রাম সীতা, তাই চরণতলে
এ-মিনতি—আজ রাম সীতা রূপ ধরি' বোসো দোঁহে
সিংহাসনে,
নহিলে এ-সভা ভেঙে চুরে এক লঙ্কাকাণ্ড
করিব পলে।"*

"তাতে নাকি কৃষ্ণ রুক্মিনীরে বলেছিলেন :

'কী করি হে রাণী, পরম ভক্ত হনুর মান তো
রাখিতে হবে
তাই তুমি ধরো সীতার মুরতি, আমি হই
রাম সগৌরবে।'

"একথার উত্তরে অবশ্য আপনি লিখতে পারেন—একশো-বার—'কলির দিলীপ কি দ্বাপরের হনুমানের মতন ভক্ত যে, তার মান রাখতে আমিও ব্যস্ত হব? এ-কথার উত্তরে আমি শুধু বলব : 'তা বটে। কিন্তু একটিবার ভাবুন হনুমান কী চেয়েছিল—কৃষ্ণ রুক্মিনীকে একেবারে ভোল বদলে ফেলতে, আর আমি কী চাইছি—শ্রীমুখের একটু বদান্য হাসি।"

কবিরাজ মহাশয় হেসে কুটি কুটি।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আরো কত কথাই যে তাঁর সঙ্গে হয়েছিল। কিন্তু সেসব কথা পরে লিখব। আজ শুধু সংক্ষেপে বলি তাঁর ভগবৎ নির্ভরের কথা।

তিনি অসুস্থ হয়ে আমাদের আশ্রমে এসেছিলেন নিজের দেহে একটি কঠিন অস্ত্রোপচারে করে। কিন্তু দেহের দুঃখ তাঁর ভক্তি-বিশ্বাসকে যেন চতুর্গুণ উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেছে। কতবারই না তিনি আমাদের বলেছেন যে দুঃখও ভগবানের করুণা, কেন না বেদনার ফলে চেতনার রূপান্তর হয়ই হয়—যদি সত্যি সত্যি বেদনাকে ও ভগবানের করুণার বিধান ব'লে মেনে নিতে শিখি। আমার কাছে উদাহরণ দিয়েছিলেন সেণ্ট ফ্রান্সিস অব আসিসির। সেণ্ট ফ্রান্সিস জীবজন্তু পাখী প্রভৃতি সবাইকে "ভাই" ব'লে সম্বোধন করতেন; Brother tiger, Brother bird, Brother wind ইত্যাদি। শেষ জীবনে মৃত্যুর আগে দেহকে বলেছিলেন : "তাই সেটা ক্ষমা কোরে যে তোমাকে বহু দুঃখ দিয়েছি।"

দেহের দুঃখকে কী ভাবে তিনি নিয়েছেন সত্যিই দেখবার জিনিষ। কিন্তু শুধু দুঃখকেই নয়—গুরুকে, করুণাকে, অতীন্দ্রিয় নানা উপলব্ধিকে—জীবনের প্রতি পদেই তিনি বাহ্য ঘটনাকে দেখেছেন অন্তর আলোর যৌগিক প্রভায়। এই প্রজ্ঞা তার অতি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সাধনায়। তাই তাঁর মধ্যে এসেছে পরম দীনতা (humility) ও গভীর অভীপ্সা (aspiration) এ-দুটী মহাগুণ যেন কবচকুণ্ডলের মতনই তাঁর সহজাত। নৈলে কি তিনি এমন অপরূপ সরল ছন্দে আমাকে লিখতে পারতেন (যে-আমি তাঁর চরণে আশীষপ্রার্থী)

"প্রীতিভাজনেষু,

আপনার সস্নেহ অনুরোধ পাইলাম। আপনি আমাকে আপনাদের মন্দিরে একদিন কিছু বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু অনুরোধ রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি বক্তা নই, উপদেষ্টাও নই—অতি ক্ষুদ্র একজন শুশ্রূষু মাত্র। আমি কোথাও কিছু বলি না—সে অভিমান কোনো দিনই আমার ছিল না, এখনও নাই। শক্তিও নাই। শুনিবার ইচ্ছা চিরদিনই ছিল—অবশ্য যদি শুনিবার মতন কথা হয়—এখনও আছে। তবে এখন সে-ইচ্ছাও অতি ক্ষীণ ভাবধারা করিয়েছে। কি যেন কি একটা মহাক্ষণের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ভাবে বসিয়া আছি—একমাত্র সেইদিকেই সচেতন লক্ষ্য রহিয়াছে। সেই মহাক্ষণ…যে কোনো

* শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃপরমাত্মনি।
তথাপি মমসর্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ॥

সময়ে ফুটিয়ে পারে। সন্ধিক্ষণ অখণ্ড মহাকালের মধ্যে যে কোনো মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে যখন বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের সন্ধি ও সাম্য ফুটিয়া উঠিবে। আশীর্বাদ করুন এবং ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করুন যেন সেই মহাক্ষণের প্রকাশে আমি ধন্য হইয়া যাই। ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষের মহাসন্ধিরূপে সেই মহাক্ষণ পুরুষোত্তমের আকারে আত্ম প্রকাশ করে। গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্। …কালের অতীত সর্বকালময় সেই মহাক্ষণেই যাত্রার অবসান ও একমাত্র বিশ্রাম।

"কিন্তু সে-অবসানও অবসান নয়। সেই অবসানের মধ্যেই অসীম স্পন্দনের অভিনব লীলার প্রারম্ভ—যে-লীলার অবসান নাই। তখন হয়ত বলার সময় আসিবে—বলাও হইবে। এখন 'স্তাবক' থাকিয়া সেই লক্ষ্যের প্রতীক্ষায় পড়িয়া আছি। ক্ষমা করিবেন।

আগামী রবিবার যখন যাব তখন কথা হবে। ভালবাসা লইবেন। ইতি। ৯ই জুন ১৯৬০।

আপনার গোপীনাথ

শেষে শুধু আর একটি কথা বলতে চাই। কবিরাজ মহাশয় মহাপণ্ডিত, কঠোপনিষদের ভাষায় "আশ্চর্য বক্তা" (তিনি "না না" বললে কী হবে?)—ভারতের যোগিবর্গদের মধ্যে একজন প্রধান উচ্চবিকশিত ব্যক্তিরূপ—আরো কত কী। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি—তিনি পরম-ভাগবত—প্রেমময় পুরুষ। তাই ৫ই আগষ্ট যখন তাঁকে ট্রেণে তুলে দিতে গিয়ে প্রণাম ক'রে বললাম: "আপনাকে কী ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব আপনার গভীর স্নেহ, উপদেশ ও আশীর্বাদের জন্যে ?" তাতে তিনি কোমল কণ্ঠে উত্তর দিলেন: "আপনিই ভালোবেসে আমাকে আপন ক'রে নিয়েছেন।" উত্তরে আমি বললাম: "আপনি আগে স্নেহের শুভাশীষ দিয়েছেন তাই না আপন হ'তে পেরেছি।" তিনি দেখে বললেন: "একহার্ত (Eckhart—বিখ্যাত জর্মন যোগী লিখেছেন: 'অহং গেলেই ভগবানের উদয় এবং ভগবান্ এলেই অহম্-এর লুপ্তি'—কোন্‌টা আগে কোনটা পরে কেউ কি বলতে পারে ?"

* কল্যাণ-নিবেদিতা নিবেদিতা

ডক্টর রমা চৌধুরী

আমাদের সর্বজনবরেণ্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একস্থানে অতি সুন্দর-ভাবে বলেছেন :—

"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

(গীতা ৬।৪০)

অর্থাৎ যিনি কল্যাণকারী, তিনি কোনদিন দুর্গতিগ্রস্ত হন না।

এটী শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত একটী মহাবাণী। এই বাণী দ্বারা তিনি এই কথাই পরিস্ফুট করতে চাচ্ছেন যে, দুর্গতি, অথবা বদ্ধাবস্থা থেকে, মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হল এই কল্যাণকরণ, সর্বজীবের সেবার জন্য মঙ্গলব্রতাবলম্বন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হিতার্থে আত্মোৎসর্গ অথবা জীবনদান। যাঁরা এইভাবে প্রকৃত কল্যাণকারী তাঁদের নিকট দেশ জাতি বর্ণ-ধর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি তুচ্ছ ; কারণ তাঁদের ভূমা দৃষ্টিতে সমগ্র জগৎই সেই একই পরমাত্মার মূর্ত প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেজন্য, ভেদাভেদ ভুলে, কায়মনোবাক্যে তাঁরা সেবা ও আরাধনা করছেন বিশ্ব মানবের। এঁদেরই মধ্যে একজন অগ্রগণ্যা ছিলেন "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের" (স্ব-উক্তি) "লোকমাতা" (রবীন্দ্রনাথের উক্তি) "শিখাময়ী" (শ্রীঅরবিন্দের উক্তি) ভগিনী নিবেদিতা।

অত্যাশ্চর্য তাঁর শুচি-শুভ্র, গৌরবোজ্জ্বল জীবন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর সুদূর উত্তর আয়ার্লণ্ডের টাইরণ-অন্তর্গত ডাঙ্গানন শহরে পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল এবং মাতা মেরী ইসাবেলের অতি আদরের প্রথম সন্তানরূপে তাঁর শুভ জন্ম এক পুণ্য, মধুর প্রভাতে। ভবিষ্যতে যে অতুল গুণগরিমার জন্য তাঁর নাম জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে, তার অনেকগুলিই শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে পরিপুট দেখা যায়—সেই অদম্য জ্ঞানপিপাসা, সেই অপূর্ব ধী-শক্তি, সেই জ্বলন্ত কর্মোৎসাহ, সেই মধুর বিশ্বপ্রীতি, সেই গভীর ঈশ্বর বিশ্বাস। সত্যই, জন্মের প্রথম দিনটী থেকেই তিনি ছিলেন ভগবচ্চরণে নিবেদিতা ; কারণ, তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁর ধর্মপ্রাণা মাতা এই পুণ্য—সংকল্পই গ্রহণ করেছিলেন।

এই ভাবে, মার্গারেট এলিজাবেথ সুশিক্ষা লাভ করে, আঠারো বৎসর বয়সে শিক্ষয়িত্রীর পুণ্যকার্য গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পরে উইম্বলডনে একটি শিশু-বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। সেই সময় থেকেই, তাঁর কর্মজীবন প্রসারিত হতে আরম্ভ করে। তিনি তখন একদিকে সাহিত্য ও শিল্পচর্চায় রত হন, অন্যদিকে পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ স্বদেশের উদ্ধারকল্পে বিপ্লবী-আন্দোলনের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট হন। তাঁর স্থির বিচারবুদ্ধি, উদার দৃষ্টিভঙ্গী, অনমনীয় দৃঢ়তা, কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বহু অনবদ্য গুণের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এই সব কার্যকলাপের মধ্যে।

কিন্তু যিনি আজন্ম শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মেই নিবেদিতা, তাঁর জীবন পূর্ণ হবে কি করে কেবল এরূপ পার্থিব কার্যকলাপ দ্বারা? অন্তরকে ত তাঁর পূর্বে বিকশিত করে নিতে হবে ; তবেই না সেই শতদলের সৌরভ বিস্তৃত হবে দিগ-দিগন্তে সাহিত্যে সেবায়, জনসেবায় বিশ্বসেবায়। এই অন্তরকে পূর্ণ করবার মধুই তিনি অন্বেষণ করছিলেন অতৃপ্ত পিপাসায়, এই চিত্তকে প্রস্ফুটিত করবার রবিরশ্মিই তিনি অনুসন্ধান করছিলেন আকুল নয়নে, এই জীবনকে সঞ্জীবিত করবার অমৃতই তিনি আকাঙ্খা করছিলেন অধীর প্রতীক্ষায়। এমন সময়ে, কোন্ মঙ্গলময় বিধাতার অমোঘ বিধানে ঘটল এক পরমশুভ ঘটনা। ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে, তিনি সাক্ষাৎ লাভ করলেন ইংলণ্ডে বক্তৃতারত স্বামী বিবেকানন্দের। তাঁর মহাবাণীর মধু-ধারায় যেন এক মুহূর্তেই তাঁর অন্তরের শূন্য পাত্রটী পূর্ণ হয়ে গেল, তাঁর দীপ্ত জীবনের আলোক প্রবাহে যেন এক মুহূর্তেই তাঁর চিত্তের মুদ্রিত কোরকটী বিকশিত হয়ে উঠল ; তাঁর দৃপ্ত প্রাণের অমৃত সিঞ্চনে যেন এক মুহূর্তেই তাঁর জীবনের খিন্ন স্পন্দনটী দ্রুত হয়ে উঠল—কি সেই পূর্ণতা, কি সেই বিকাশ, কি সেই স্পন্দন!

সমস্ত অন্তর ভরে, সমস্ত চিত্ত প্রসারিত করে, সমস্ত জীবন উন্মেলিত করে, মার্গারেট শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের সেই মহাআহ্বান :—

"আজ জগতে কিসের অভাব জান? জগৎ চায় এমন বিশ জন নরনারী যাঁরা ঐ রাস্তায় সদর্পে দাঁড়িয়ে বলতে পারে: 'আমাদের ঈশ্বর ভিন্ন আপনার বলতে আর কিছুই নেই।' কে যেতে প্রস্তুত? কিসের ভয়?"

পড়লেন স্বামীজীর সেই উদ্দীপ্ত পত্র :—

"আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, তোমার মন সর্বসংস্কারমুক্ত ; তোমার মধ্যে সেই শক্তি নিহিত হয়ে আছে যা' জগৎকে নাড়া দিতে পারে। আর ধীরে ধীরে আরো অনেকে আসবে। আমরা চাই বলিষ্ঠ বাক্য, বলিষ্ঠতর কার্য। হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো! জগৎ

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবেদিতা বক্তৃতামালায় "নিবেদিতার জীবন-দর্শন-" শীর্ষক বক্তৃতার ভূমিকা।

দুঃখ শোকে জ্বলে পুড়ে মরছে, তোমার কি আর নিদ্রা শোভা পায়?" (৭ই জুন, ১৮৯৬)।

পরমপূজ্যপাদ গুরুর এই মহাআহ্বানে বিদেশিনী মার্গারেট নোবলের মহাপ্রাণও জেগে উঠল এক নিমেষেই ভারতের পরমাদরিণী কন্যা "নিবেদিতার" রূপ ধরে। সেজন্য, স্বদেশ ত্যাগ করে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারী কলিকাতায় এসে পৌঁছলেন, এবং সেই সালেরই ২৫ শে মার্চ তিনি স্বামীজী কর্তৃক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিতা হয়ে "নিবেদিতা এই গুরুপ্রদত্ত নাম প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ, এই গুরুপ্রদত্ত এই সার্থকতম, সুন্দরতম, মধুরতম নামটীর মধ্যেই নিহিত হয়ে' রয়েছে তাঁর পরার্থে নিবেদিত, দেবাশীর্বাদপূত, সুধন্য মহাজীবনের মূলমন্ত্রটী। একদিন গুরু তাঁকে এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন :—

"A Benediction

The Mother's heart, the hero's will,
The sweetness of the southern breeze,
The sacred charm and strength that dwell
On Aryan alters, flaming free.—
All these be yours, and many more,
No ancient soul could dream before—
Be thou to India's future son,
The mistress, servant, friend in one."

"আশীর্বাদ"

মাতার মমতা, বীরের দৃঢ়তা,
মলয়-মাধুরী-সার,
আর্যবেদীতলে যে হোমাগ্নি জ্বলে
পূত-দীপ্তি-শক্তি তার,
এ' সব তোমার হোক্ অনিবার
আরো বেশী হোক কত,
অতীত কল্পনে যে শকতিগণে
ভাসেনি, সে গুণ শত।
ভবিষ্য ভারত তোমাতে নিয়ত
পায়রে যেন সন্ধান,
গুরু পুতকায় সেবিকা, সখায়
একাধারে, ভরি' প্রাণ॥"

এই মহাশীর্বাদই যেন রূপ পরিগ্রহ করেছিল ভারত গুরু, ভারত সেবিকা, ভারত-সখা নিবেদিতার প্রজ্ঞা-সমুজ্জ্বল, সেবা-সুকোমল, প্রেম-সুশীতল, অনুপম মাতৃমূর্তিতে।

এরূপে, গুরুর মহামন্ত্রে দীক্ষিতা হয়ে, গুরুর মহাজীবনে সঞ্জীবিতা হয়ে গুরুর মহাদর্শে অনুপ্রাণিতা হয়ে, ব্রতধারিণী নিবেদিতা এলেন বহুনিন্দিত, বহুলাঞ্ছিত ভারতের একপ্রান্তে তাঁর স্নেহাঞ্চলচ্ছায়া বিস্তারে। কি সেই মহামন্ত্র, কি সেই মহাদর্শ, কি সেই মহাব্রত? স্বামীজী নিবেদিতাকে আহ্বান জানিয়ে যে সুবিখ্যাত পত্রটী লিখেছিলেন ১৮৯৬ সালের ৭ই জুন, তাতেই স্বামীজী সেই আদর্শের উল্লেখ করেছেন :—

"আমার আদর্শ ত অতি সংক্ষেপেই বলা যেতে পারে—মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তার বাণী তার কাছে প্রচার করা; এবং তাকে সেই দেবত্ব প্রকাশের উপায় বলে দেওয়া।"

এই ভাবে, স্বামীজী সাধনপথের একটী অপূর্ব সুন্দর বীজমন্ত্র আমাদের দিয়ে গিয়েছেন :—

"প্রথমে, আমরা নিজেরা দেবতা হই; পরে অন্যদের ও দেবতা হতে সাহায্য করি।"

এরূপে, স্বামী বিবেকানন্দের পন্থা—জ্ঞান ভক্তি কর্মের অনুপম পন্থা। শ্রীগুরুর আলোকে আলোকিত নিবেদিতাও এই দুরূহ অথচ শ্রেষ্ঠ পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন—জ্ঞানাহরণ ও জ্ঞান বিতরণের পন্থা, নিষ্কাম কর্ম ও সেবার পন্থা, অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ়া প্রীতির পন্থা।

জ্ঞানাহরণের দিক্ থেকে বলা চলে যে, তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, তা' পরিপূর্ণ আহরণের জন্য যথেষ্ট সাধনা করেন; স্বামীজীর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণাদিতে যান, এবং তাঁরই নির্দেশে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর জীবন-যাপন করেন, ধ্যানধারণায় রত হন, এবং ভারতীয় শাস্ত্রাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।

জ্ঞান বিতরণের দিক থেকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বর্তমানে "রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়" নামে পরিচিত বা বাগবাজারের সেই সুবিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়টী। নিবেদিতা সর্বপ্রথম এর নাম দিয়েছিলেন "শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা—বিদ্যালয়। ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর পরমপূত আশীর্বাদ নিয়ে এই বিদ্যালয়টির প্রারম্ভ।

নিষ্কাম কর্ম ও সেবার দিক থেকেও নিবেদিতার তুলনা নেই। আজীবনই তিনি নিজেকে জনসেবায় নিবেদিত করে রেখেছিলেন। ১৮৯৮ সালের এপ্রিলের শেষভাগে কলিকাতায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিলে তিনি নির্ভয়ে আর্তসেবায় আত্মোৎসর্গ করেন, এমন কি, স্বয়ং কোদালি সম্মার্জনী নিয়ে বাগবাজারের রাস্তাঘাট পরিস্কার করেন। ১৮৯৯ সালের মার্চ মাসেও প্লেগের দ্বিতীয় আক্রমণের সময়ে তিনি সমানভাবে সেবাকার্যে ব্রতী হন। এই ভাবে, তাঁর বহুবিধ সেবার ইয়ত্তা নেই।

ভক্তির দিক থেকে, তিনি ছিলেন সত্যই ভারতের শাশ্বতী, অহৈতুকী ভক্তির পূর্ণ প্রতিমা। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে আধ্যাত্মিকতা, যে ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি, তা'ই তাঁকে আকৃষ্ট করে এনেছিল সুদূর বিদেশ থেকে; এবং সেইজন্যই ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মায়া অনায়াসে ত্যাগ করে তিনি জীবনদান করে গেলেন এক পরাধীন দীনদরিদ্র জাতির উন্নতি কল্পে। শ্রীশ্রীমা সারদামণি ছিলেন তাঁর ধ্যানের দেবী। তাঁকে তিনি সর্বদাই "আমার আদরিণী মা" বলে' সম্বোধন করতেন; এবং নিজেকে বলতেন: "তোমার চিরদিনের নির্বোধ খুকী।" কত না সোহাগ ভরে, কত না স্থির বিশ্বাস সহকারে তিনি শ্রীশ্রীমাকে লিখেছিলেন :—

"আমি কেন বুঝিনি যে তোমার বাঞ্ছিত পদতলে ক্ষুদ্র এক শিশুটীর মত বসে থাকতে পারাটাই ত যথেষ্ট। মাগো! ভালবাসায় পূর্ণ তুমি! আর তাতে নেই জগতের ভালবাসার মত উগ্রতা ও উত্তেজনা। তোমার ভালবাসা যেন একটি সুশীতল শান্তি, যা এনে দেয় প্রত্যেককে এক, কল্যাণ স্পর্শ—এ যেন এক লীলাচঞ্চল সোনালী আভা।...সত্যই, তুমি বিধাতার আশ্চর্যতম সৃষ্টি ; শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যপ্রেমাধারের পাত্র।"

(১৩ই ডিসেম্বর, ১৯১০]।

পরিশেষে প্রীতির দিক্ থেকে বলা চলে যে, নিবেদিতার সুবিশাল জীবনের এইটিইত মূল তত্ত্ব। জ্ঞানও রাখে দূরে ; এমন কি, ভক্তিও কিয়দংশে তাই। কিন্তু প্রীতিতে কোনো দূরত্ব নেই, ভেদ নেই, দ্বিধা নেই', ভয় নেই—সেবার এইটীই ত মূল—ও মূল একাধারে—প্রারম্ভ ও পরিশেষ একাধারে, সাধন ও সিদ্ধি একাধারে। অর্থাৎ প্রীতি থেকে সেবা এবং সেবা থেকে প্রীতি—এই এক অতি সুন্দর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ।

ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর প্রেম ছিল সত্যই অতি শুদ্ধ, অতি গভীর, অতি নিগূঢ়। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষাতেই বলি :—

"শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্দ্ধাশনে, অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া, আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল।...ইহা যে সম্ভব হইয়াছে, এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা যে ভঙ্গ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ ভারতের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না।"

সেজন্যই, তৎকালীন সকল শুভ জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র ছিলেন তিনি।

তিনি ছিলেন সুলেখিকা ও সুবক্তা। তাঁর বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থে তিনি ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, নীতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে সহানুভূতিশীল, অথচ উপকারজনক আলোচনা করেছেন।

একই ভাবে তিনি সাহিত্য বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাংবাদিকতা প্রমুখ সকল ক্ষেত্রেই সকলকে প্রচুর উৎসাহ ও সহায়তা দান করতেন। সত্যই, সেই সময়ে, তাঁর পবিত্র গৃহ প্রাঙ্গণে যে সুধী সমাগম হত, তা' বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দ, যদুনাথ সরকার, নন্দলাল বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, গোখলে, সরোজিনী নাইডু, প্রফুল্লচন্দ্র, শিশিরকুমার ঘোষ, গিরিশচন্দ্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি সে যুগের পুরোধাগণ তাঁর নিকট এসে, কতদিক থেকেই না প্রেরণা লাভ করে যেতেন, তার ইয়ত্তা কোথায় ?

রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও নিবেদিতা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরাধীনতাই যে জাতির ভীষণতম অভিশাপ, সে বিষয়ে তিনি ছিলেন নিঃসন্দিগ্ধ এবং সেজন্য তিনি বিপ্লব আন্দোলনকেও নানাভাবে প্রেরণা দিয়ে সাহায্য করেছেন। প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে, আকুতি নিবেদন করে, আকুল ভাবে তিনি বলছেন :—

"আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড ও অবিনশ্বর। এরূপ এক বাসভূমি, এক আকার, এক প্রীতি থেকেই আবির্ভূত হয় জাতীয় একতা। আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, বেদোপনিষদের বাণীতে, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সংগঠনে, প্রাজ্ঞের বিদ্যায় ও ভক্তের ধ্যানে যে শক্তির প্রকাশ, সেই শক্তিই আজ পুনরায় আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে এবং এরই নাম "জাতীয়তা"। আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, বর্তমান ভারতের মূল নিহিত হয়ে রয়েছে প্রাচীন ভারতে এবং তার সম্মুখে প্রসারিত হয়ে আছে এক গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। হে জাতীয়তা! সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান যে মূর্তিতে ইচ্ছা আমার নিকট দেখা দাও, আমাকে তোমার করে' নাও।" (কর্মযোগিন্ পত্রিকা, ১২ই মার্চ ১৯১০)

একজন বিদেশিনীর পক্ষে এই ভাবে সমগ্র প্রাণমন দিয়ে আরেকটী রিক্ত, রিক্ত', পরাধীন জাতির সঙ্গে নিজেকে একীভূত করা সত্যই জগতের ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ;

এই ভাবে, জ্ঞানে কর্মে, ত্যাগে, তপস্যায়, সেবায়, সাধনায় পরিপূর্ণ মহাজীবন-নদী সবেগে, স্বচ্ছন্দে, সানন্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল নিজের অন্তর্নিহিত গতি-শক্তিতে ; নিঃশেষে নিজের সত্তাকে দান করে, চলেছিল কত না ঊষর প্রান্তর উর্বর করে দিয়ে ; নিজের সমস্ত শীতলতা, কোমলতা, মধুরতা প্রকাশিত করে নিরন্তর। কিন্তু যাঁর কর্ণে অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে মহাসমুদ্রের সেই সাদর সুগম্ভীর আহ্বান-গীতি, তাঁর কি আর অধিকদিন অপেক্ষা করবার উপায় আছে! সেজন্য, স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায়, ভগিনী নিবেদিতাও অল্পদিনই এই মর্ত্য লোকে বিহার করেছিলেন। মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর তাঁর মর—জীবন। কিন্তু কি অতুলনীয় সৌন্দর্য—মাধুর্য—ঐশ্বর্য—বীর্যদীপ্ত তা আদ্যোপান্ত! শ্রীশ্রীমা সারদামণি তাঁর পরমাদরের পাত্রী "স্নেহের খুকী" নিবেদিতাকে জয়রামবাটী থেকে আমেরিকায় একবার লিখেছিলেন—

"তুমি সেই সদানন্দময়ী মা'র প্রতিমূর্তি।"

এর থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, ভগিনী নিবেদিতা কি ভাবে এই জড়-জগতেই, এই মর-পৃথিবীতেই আধ্যাত্মিক উন্নতির শীর্ষদেশে অনায়াসে আরোহণ করতে পেরেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল একটী আকুল আবেদন, একটী আবেগময় আকুতি, একটী উচ্ছসিত আরাধনা তাঁরই "প্রিয়তমের" শ্রীচরণারবিন্দে। জগতের শ্রেষ্ঠ মরমিয়া ভক্তদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কি অপরূপ মধুরিমা বর্ষণ করেই না তিনি বলছেন তাঁর জীবন-দেবতা, পরাণ—বঁধু প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে তাঁর আবেগের সোচ্ছল "প্রিয়তম" ("The beloved") নামক নিবন্ধে—

"পরমেশ্বরের জন্য ব্যাকুলতাতেই জীবনের একমাত্র সার্থকতা। আমার প্রিয়তমই পরমপ্রিয়। কেবল তিনি গবাক্ষ দিয়ে চেয়ে আছেন, কেবল তিনি দ্বারে করাঘাত করছেন। তাঁর অভাব নেই ; তথাপি তিনি অভাবগ্রস্ত মানুষের বেশ ধরে আসেন যাতে আমি তাঁর সেবা করতে পারি। তাঁর ক্ষুধা নেই ; তথাপি তিনি প্রার্থী হয়ে আসেন, যাতে আমি তাঁকে দান করতে পারে। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন, যাতে আমি বক্ষদ্বার উন্মুক্ত করে তাঁকে আশ্রয় দিতে পারি। তিনি

ক্লান্তি প্রকাশ করেন, যাতে আমি তাঁকে বিশ্রাম দিতে পারি। তিনি ভিক্ষুকের রূপে আসেন, যাতে আমি তাঁকে ভিক্ষা দিতে পারি। প্রিয়তম! হে প্রিয়তম! আমার যা কিছু আছে, তা সবই তোমারই। নিশ্চয়, আমি সম্পূর্ণভাবে তোমারই। আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে লুপ্ত করে দিয়ে, তুমিই এসে সেইখানে দাঁড়াও।"

১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে, দার্জিলিং এর তুষার-ধবল, উত্তুঙ্গ শৈলশিখর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অতিক্রম করে, "রায় ভিলার" উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে সত্যই কি এসে দাঁড়ালেন সেই পরম—প্রিয়তম যিনি, উপনিষদের ভাষায়—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ'' (বৃহদারণ্যক ১৪।৮)—

"পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তর, বিত্ত অপেক্ষাও প্রিয়তর, অন্য সকল বস্তু অপেক্ষাও প্রিয়তর।''

আজন্ম তাঁরই রাতুল-চরণে নিবেদিতা, আজন্ম তাঁরই মিলনকামা, ভারতের প্রিয়তমা দুহিতা নিবেদিতা। তখন শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করছেন সেই অমৃত—মন্ত্র :—

"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা-জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।'' (বৃহদারণ্যক ১।৩।২৮)

"আবিরাবীর্ম এধি।"

"অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও ; মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও।''

"হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট জ্যোতির্ময় রূপে প্রকাশিত হও।"

অস্ফুটে শেষ বাণী উচ্চারণ করলেন—

"তরী ডুবছে, কিন্তু আমি পুনরায় সূর্যোদয় দেখব।"

সেই পরমসত্য, পরমালোক, পরমামৃতস্বরূপ পরমদেবতা সত্যই যেন স্বয়ং এসে সাদরে আহ্বান করে, সাগ্রহে প্রত্যুদ্গমন করে নিয়ে গেলেন তাঁরই পরম-প্রিয়তমাকে তাঁরই অনন্ত আনন্দলোকে।

হিমালয়-ক্রোড়স্থিত সেই নির্জন, শান্ত, সমাহিত, পবিত্র শ্মশান ভূমিতে তাঁর কৃতজ্ঞ দেশবাসিগণ তাঁর পরমপ্রিয় বজ্রচিহ্নসহ যে সুন্দর, নিরাড়ম্বর স্মৃতিচিহ্নটী—নির্মাণ করেছেন, তার উপরে প্রোথিত করা আছে একটীমাত্র বাক্য, যাকে আমরা কল্যাণ-নিবেদিতা নিবেদিতার সমগ্র মহাজীবনের শ্রেষ্ঠ পাদটীকা বলেই গ্রহণ করতে পারি :—

"Here repose the ashes of Sister Nivedita (Margaret E. Noble of Ramkrusna—ViveKanande who gave her all to India"

"এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে শয়ান, যিনি ভারতবর্ষকে তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন।"

ভগিনী নিবেদিতার পুণ্য জীবন-দর্শনেরও এই ত মূল কথা—দান, দান, কেবলই দিবারাত্র দান, কেবলই সানন্দে সমর্পণ, কেবলই নিঃশেষে নিবেদন॥

"বিবেকানন্দের'' "বিবেক''—জ্ঞানের আলোকে যিনি প্রদীপ্তা
সেই "আনন্দের" অমৃত-উৎসের ধারায় নিত্যসিক্তা
জীবন-প্রদীপে শতদীপে দীপে দীপে জ্বেলেছেন যিনি আলো
পরাণ কমলে প্রেম-পরিমলে ভুবন করি রসালো।
বন্দ্যা পুণ্যশ্লোকা অজরা অশোকা পরার্থে নিবেদিতা।
আনন্দরূপিনী অমৃতদায়িনী নমি সেই নিবেদিতা॥

অশ্রুময়ী

ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ
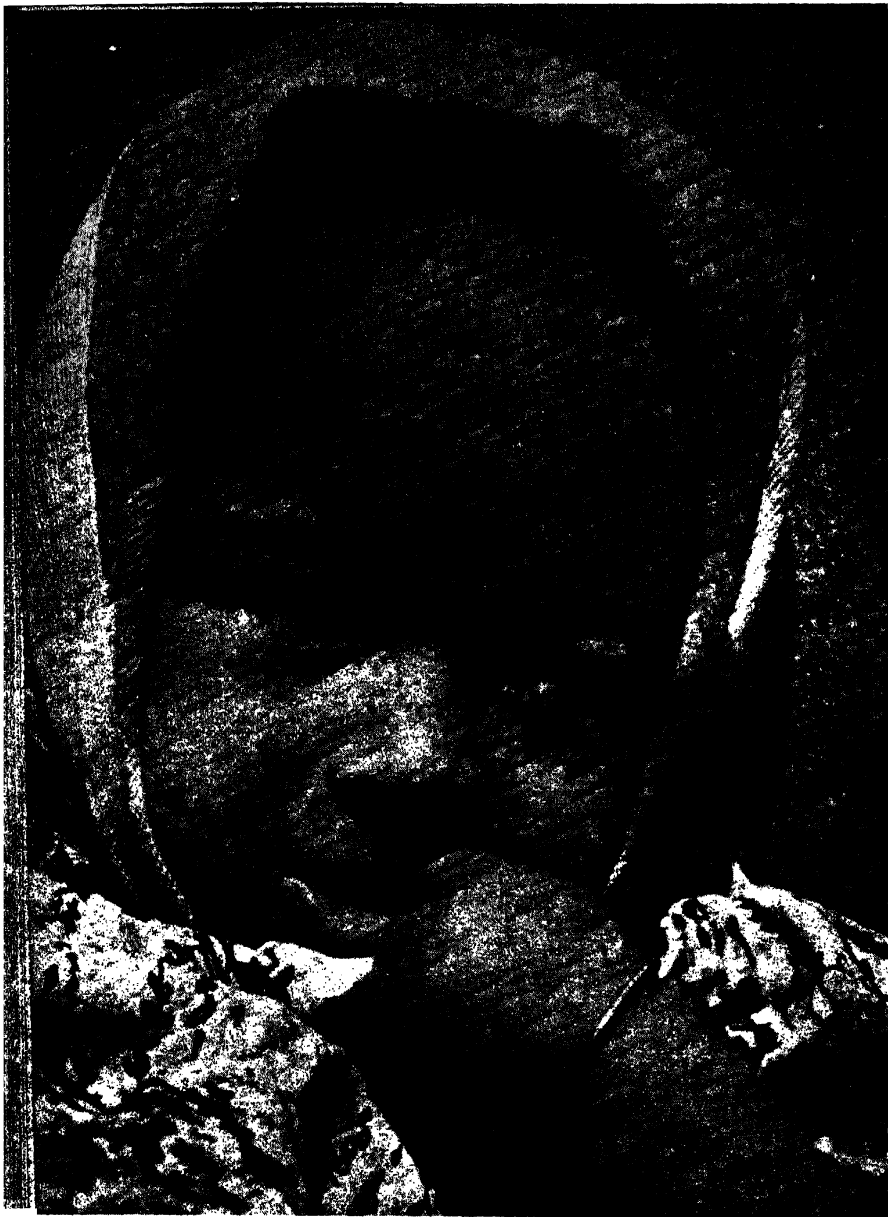
হাস্যময়ী — ফটো : অমল সেনগুপ্ত

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আজকের জাপান

উপানন্দ

জাপান তোমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। এশিয়ার এই দ্বীপময় দেশটি সম্বন্ধে তোমাদের মোটামুটি কিছু জানা দরকার। বিগত যুদ্ধের সময় এরা তোমাদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে কিভেবেই না পাশবিক অত্যাচার করেছে, তা ছাড়া এরা সে সময়ে যে সব দেশ দখল করেছিল, সে সব দেশের ওপর নৃশংসভাবে নির্যাতন করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি; ভগবানের আসন টলে উঠ্‌লো, তা না হোলে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমাই বা নিক্ষিপ্ত হবে কেন? আর ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-মাসে জাপান চতুঃশক্তির পটসডাম চুক্তি স্বীকার করে, আর মিত্র বাহিনীর কাছে বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করে পরপদানত হবে কেন? ঘাতের পর প্রতিঘাত আছেই। মিত্র বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ডগলাস ম্যাকার্থার টোকিওতে এসে এই জাপানের ভাগ্য বিধাতা হয়ে বসার পর থেকে সাত বছর পরাধীন হয়েছিল জাপান। তারপর ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে সানফ্রান্সিসকোতে সম্পাদিত চুক্তির ফলে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে জাপান স্বাধীনতা ফিরে পেলো। এই জাপান যদি গত যুদ্ধে পরাজিত না হোতো, তা হোলে যে সব দেশ দখল করতো, সে সব দেশের পরিস্থিতি শোকাবহ ও ভয়াবহ হয়ে উঠ্‌তো। ভারতবর্ষে প্রবেশ করলে ভারতবাসীর উপরও বর্ব্বরতা প্রকাশ করে জনারণ্যে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতো, পৈশাচিক উল্লাসে তাণ্ডব নৃত্য করতো। এখন এই সব দেশ আমাদের পরম সুহৃদ। যদি কোন রকমে যুদ্ধ বাধে, তাহোলে এরা হয়ে উঠ্‌বে পশুর অধম, জান্তব উল্লাসে বন্য-বর্ব্বরের রূপধারণ করে—হত্যা করবে নিষ্ঠুর হয়ে, আর তখন আমরা হবো ওদের চোখে গরু, ভেড়া ছাগলের মত। তখন কোথাই বা সাংস্কৃতিক বৈঠকে আজকের মত কোলাকুলি হবে! চীনও এই রকম একটা জাতি—দুর্দ্ধর্ষ আর মৃত্যুর মত করাল, ক্রমাগত সুযোগ খুঁজছে ভারতে ঢুক্‌বার—আর তোমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করবার। এরা সবাই বুদ্ধের চরণে প্রণাম করে, কিন্তু যুদ্ধের সময় বুদ্ধের জন্মভূমির লোকদের ওপর অত্যাচারের সময় বুদ্ধের কোন বাণীর মর্য্যাদা এরা দেবে না। এজন্যে তোমরা সামরিক শক্তিতে সুদৃঢ় হও—যাতে এই সব রাষ্ট্র কোন রকমে না তোমাদের ঘরে এসে পড়ে পাঁচিল টপ্‌কে।

জাপান পর্ব্বতময়। পর্ব্বতের সংখ্যা ২৫০। চারিদিক জলে-ঘেরা জাপানদ্বীপপুঞ্জ এশিয়ার পূর্ব্বসীমান্তের অদূরে অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণে এক হাজার চারিশত মাইল দীর্ঘ। এর আয়তন ১,৩৫,০০০ বর্গমাইল। জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতিস্বরূপ হারিয়েছে তার এলাকার শতকরা ৪৫·৫ ভাগ। বর্ত্তমানে ভারতের ১/৮ অংশের সমান এর আয়তন। এই দ্বীপময় দেশটিতে প্রায় ন কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের বাস। পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত জাপানের সর্ব্বত্র শ্যামল পত্রাবরণ। উচ্চ আগ্নেয় পর্ব্বতমালা, স্বচ্ছ হ্রদ, পাহাড়ের উঁচু নীচু গিরি-খাতের মধ্যে প্রবহমানা নদী, ধানের ক্ষেতের পারিপাট্য নয়নানন্দকর। একটি সুন্দর প্রাকৃতিক উদ্যানের রূপ ফুটে উঠেছে জাপানকে ঘিরে। এর স্বনামধন্য ফুজিয়ামা আগ্নেয়গিরির উচ্চতা ১২,৩৭৫ ফুট—এটি উচ্চতম ও সুপ্ত। ১৯২ আগ্নেয় গিরির মধ্যে ৫৮টী সক্রিয়। জাপানের বন ও তৃণভূমির পরিমাণ ৬ কোটি ১০ লক্ষ একর, এগুলির শতকরা ৬১ ভাগ থেকে কাঠ আহরণ করা হয়েছে।

সমুদ্রতীরে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। জাপানের জনসংখ্যার অধিকাংশ লোক এতদঞ্চলে বাস করে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এখানেই।

জাপানে প্রচুর বৃষ্টি হয়, প্রায়ই হয় তুষারপাত।

এটী গণতান্ত্রিক দেশ। রাজধানী টোকিওতে বাস করে জাপানের মোট ৯·২ কোটি জনসংখ্যার প্রায় এক-দশমাংশ।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ থেকে জাপানের অভ্যুদয়। সম্রাটের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলো নিয়মতান্ত্রিক রাজার প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে

জাপান সাদরে গ্রহণ করে ধীরে ধীরে তার জীবনের জন্মান্তর ঘটালো। এইচ, জি, ওয়েলস তাঁর 'দি আউটলাইন অব হিষ্ট্রি.ত' লিখলেন—'শক্তি ও বুদ্ধি নিয়ে তারা তাদের সভ্যতা ও সংগঠন করে তুলেছে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সমতুল্য করে। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে আর কোন জাতি জাপানের মত এত দ্রুত অগ্রসর হয় নি—

চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫) আর রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫), এই দুই যুদ্ধে জাপানের জয় হয়েছিল। সম্রাট তাইয়োর রাজত্বকালে (১৯১২-১৯২৬) প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হোলে, জাপান এ যুদ্ধে যোগদান করে। যুদ্ধাবসানে হয়ে ওঠে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তি। ১৯২৬ সালে সম্রাট তাইয়োর তিরোভাবের পর বর্তমান সম্রাট হিরোহিতা সিংহাসন লাভ করেন। সুরু হোল নতুন যুগ। এর নাম 'শোওয়া।' ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনা যুদ্ধের পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ দেখা দেয়।

বর্তমান সম্রাট হিরোহিতো সামুদ্রিক জীববিদ্যার অনুরাগী ছাত্ররূপে বিখ্যাত। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এ বিষয়ে গবেষণা করে থাকেন। সম্রাট এখন রাষ্ট্রের প্রতীক। সম্রাটের পরিবর্তে সার্বভৌম ক্ষমতা এখন জনসাধারণের হাতে মন্ত্রিসভা ডায়েটের (বা আইনসভা) কাছে দায়ী। ডায়েট দুভাগে বিভক্ত—প্রতিনিধি সভা (৪৬৭ আসন), আর পরামর্শ সভা (২৫০ আসন)। প্রতিনিধি সভা চার বৎসরের জন্যে নির্বাচিত হয়। সমগ্র দেশের নির্ব্বাচকমণ্ডলী ৯০টি ভাগে বিভক্ত, তাদেরই মধ্য থেকে সদস্য নির্ব্বাচন হয়। বর্ত্তমানে এ দেশে তিনটি রাজনৈতিক দল—লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টি, সোসালিষ্ট পার্টি আর ডেমোক্রাটিক সোসালিষ্ট পার্টি।

সকলেরই নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ভোটাধিকার আছে, অংশ্য ভোটাধিকারীর বয়স কুড়ি বা তদূর্ধ এবং জাপানের নাগরিক হওয়া চাই। শাসন কার্য নির্ব্বাহ ক্ষমতা মন্ত্রিসভার ওপর। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের (অনধিক ষোল জনকে) নিয়ে গঠিত মন্ত্রীসভা একযোগে ডায়েটের কাছে দায়ী। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ছাড়া আরো ষোলটি দপ্তর আছে। সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা ৬,৫৫,০০০।

স্থানীয় শাসনের জন্যে জাপান ৪৬টি অংশে বিভক্ত—এই অংশগুলির শহর, নগর ও গ্রামগুলি। স্থানীয় শাসক ও পৌরপ্রধানেরা স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত। স্থানীয় সরকারের কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১৩,৯১,০০০।

বর্ত্তমান বিচার বিভাগ শাসন নির্বাহসভা থেকে স্বতন্ত্র। সমগ্র বিচার বিভাগের ভার সুপ্রীম কোর্ট ও আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ের হাতে। Court of Impeachment এর দ্বারা বিচারকদের অভিযুক্ত করা যেতে পারে। প্রধান বিচারপতি ও অপর চৌদ্দজন বিচারপতির দ্বারা জাপানের সর্ব্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। মন্ত্রীসভার নির্দেশ অনুসারে সম্রাট প্রধানবিচারপতি নিয়োগ করেন। অন্য বিচারপতিরা মন্ত্রীসভার দ্বারা নিযুক্ত হন। তবে গণভোটের দ্বারা মাঝে মাঝে এই নিয়োগ পরীক্ষিত হয়।

১৯৫৯ এর মে মাসে জাপানের আত্মরক্ষা বাহিনীর জনসংখ্যা দেখা যায় ২,৫১,৪৪৩। যদিও জাপান শিল্পপ্রধান দেশ, তথাপি কৃষি আর অর্থনীতিতে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। জাপানের শতকরা ৪৫ ভাগ লোক কৃষিজীবী। চাউলই জাপানের প্রধান খাদ্য। এই দেশের প্রায় ২।৩ অংশ সমভূমি। এদেশে খাদ্যের অভাব অনেকটা মাছের দ্বারা দূর করা হয়। মাছ ধরার কৌশল জাপানে খুব উন্নতি লাভ করেছে। দুভাবে মাছ ধরা হয়—গভীর সমুদ্রে, আর সমুদ্র উপকূলে। জাপানে মোটামুটভাবে বহু প্রকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়।

বিজলীহীন বাড়ীর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে জাপানে সব চেয়ে কম, শতকরা হারে মাত্র দুটি। জাপানের বিশ্ববিখ্যাত পশম শিল্পের অবনতি ঘটেছে। বস্ত্র শিল্পে, ধাতু শিল্পে, যন্ত্র নির্ম্মাণে, জাহাজ তৈয়ারী, মোটর গাড়ী ও রোলিং ষ্টকে জাপান অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর মধ্যে জাহাজ নির্ম্মাণে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে জাপান। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে তৈয়ারী জাহাজগুলোর শতকরা ৮২টি বিদেশে বিক্রী হয়েছে। রসায়ন শিল্পেও জাপান বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

যুদ্ধের ফলে জাপান প্রাকৃতিক সম্পদসমেত মোট আয়তনের ৪৫ শতাংশ জমি হারিয়েছে। বর্তমান ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য জাপানকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আর শিল্পের জন্যে কাঁচামাল আমদানী করতে হয়। প্রাক্‌যুদ্ধকালে এশিয়াই ছিল জাপানী পণ্যের বৃহত্তম বাজার, এখন আর সে অবস্থা নেই। ব্যাঙ্ক অব জাপানই সরকারের আর্থিক প্রতিনিধি। জাপানের যানবাহন ব্যবস্থা অতি উন্নতধরণের। স্থল, জল ও আকাশপথে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত আছে। টোকিও ও অন্যান্য বড় শহরে মাটির তলায় রেলপথ তৈরী হয়েছে। জাপান এয়ার লাইনসের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে। বিগত ৮৫ বছরের মধ্যে জাপানর লোক সংখ্যা ২.৬ গুণ বেড়েছে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে জাপানের আনুমানিক জনসংখ্যা ৯ কোটি ৩৯ লক্ষ। ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ১০ কোটি পেরিয়ে যাবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে জাপানের বেকার সংখ্যা ০, ১½ শ্রমিক আন্দোলনের প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে কর্মব্যবস্থারও উন্নতি দেখা দিয়েছে। সামাজিক রক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে জাপান অনেকখানি এগিয়েছে, সামাজিক সাহায্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্যে জাপান সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে জনকল্যাণ করছেন। এদেশে যেমন স্বার্থ কেন্দ্রিকতা ও অতিলোভের বশবর্ত্তী হয়ে সমাজঘাতী নীতি অবলম্বন করে হাসপাতালে চিকিৎসাকেন্দ্রে এবং সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে সরকারী বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠানে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে সামাজিক সেবামূলক পরিকল্পনাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে, জাপানে সেরূপনীতি অনুসৃত না হওয়ায় এই দেশ স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ হয়েছে। নিরাময় প্রতিষ্ঠানগুলিতে চিকিৎসাও শুশ্রূষার ব্যবস্থা অতিসুন্দর, গৃহ নির্ম্মাণ সংস্থা গৃহ নির্ম্মাণে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। এদেশের সরকার বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান পরের জমি জোর করে দখল করে নিয়ে আর জমির মালিককে না জানিয়ে তার টেনে অপরকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, ওরা সেরূপ করে না।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে গৃহ নির্ম্মাণ হয়েছে ৪,১৩,৩৫৯। পাঁচ বছরের মধ্যে নুতন গৃহ নির্ম্মিত হয়েছে ১৬,৭৮,৫৬৭টি।

জনশিক্ষা চারটি ভাগে বিভক্ত—প্রাথমিক বিদ্যালয় (ছয় বৎসর), নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (তিন বৎসর) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (তিন বৎসর) এবং বিশ্ব বিদ্যালয় (সাধারণতঃ চার বৎসর) জাপানী ছেলে-মেয়েদের ৬ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে স্কুলে পড়াশুনা করতে হয়। এই সময়ে কোন বেতন দিতে হয় না। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে ৭৬০টী সাধারণ গ্রন্থাগারে ১,৩৬,৮৪,০০০ বই ছিল, পাঠক সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ। বর্ত্তমান জাপানে ২২৫টি সংবাদপত্র প্রচলিত। সম্প্রতি জনসাধারণের মধ্যে সংবাদবিস্তারের মাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্র,পত্রিকা,পুস্তক, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ৪০০০ ছাত্র বর্ত্তমানে জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ছে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ২৪,৮৭৭ বই ও ১,৬৫৯ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়।

১৯৫৭ সনের সেপ্টেম্বরে টোকিওতে পি, ই, এন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এ অনুষ্ঠানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লেখকেরা যোগ দিয়েছিলেন। জাপানী সাহিত্য দেশবিদেশে সমাদর লাভ করেছে! সমসাময়িক জাপানী উপন্যাস অনেকগুলিই বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জিরো ও সারাগির 'বাড়ীফেরা' ইউকিও মিশিমার 'ঢেউয়ের শব্দ' ইয়াসুনারি' কাওয়াবাতার 'বরফের দেশ' জুন ইচিরো তানিজাকির 'সাম প্রেফার নেট্‌লস।'

জাপানকে বলা হয় চারুকলার দেশ। চারুকলার ক্ষেত্রে তার সাফল্যময় ঔজ্জ্বল্যময় ইতিহাস বিস্ময়কর। বর্ত্তমানকালে এদেশে দুরকম সঙ্গীত প্রচলিত—প্রাচীন জাপ সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত। নৃত্যশিল্পে জাপানের প্রসিদ্ধি আছে। প্রাচীন ও নাটকলার দিক থেকে জাপান অদ্বিতীয়। ১৯৫৬ সালে জাপানে সিনেমা দর্শকের সংখ্যা ছিল ৯৯ কোটি ৪০ লক্ষ।

জাপানের প্রধান ধর্মমত তিনটি—শিন্তো ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও খৃষ্টানধর্ম্ম। বৌদ্ধ ধর্ম্মানুগামীদের সংখ্যা ৪ কোটি থেকে ৫ কোটির মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শিন্তো ধর্ম্ম ছিল রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম। জাপানী কুস্তি, যুযুৎসু, জাপানী অসিযুদ্ধ খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রচলিত। পশ্চিমী খেলাধূলাও এখানে খুব প্রচলিত। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে জাপানে অষ্টাদশ বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে।

তোমরা লক্ষ্য করছ দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে জাপান দারুণভাবে বিধ্বস্ত ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার পর অল্পদিনের মধ্যে কিরূপ অত্যাশ্চর্য রূপে সর্ব্বপ্রকার মানব সভ্যতার সর্ব্বক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে—আর তোমাদের দেশের লোকেরা আত্মকলহে উন্মত্ত আর আত্মসর্ব্বস্ব নীতি গ্রহণ করে স্বদেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। তোমাদের পেটে নেই ভাত, পরণে নেই কাপড়, ট্যাক খালি—এইতো অবস্থা। তোমরা জাপানের মত সুন্দরভাবে দেশকে গড়ে তোলবার জন্যে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করে শয়তানদের শায়েস্তা করো। এই আমার অনুরোধ।

এলোরে শরৎ

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

কোন ভাবেই বিশ্বাস করা উচিত নহে।
আহা নীল রঙ কে দিলো আকাশ গায়!
উড়ে উড়ে চলে পাখা মেলে শত চিল,
গুঞ্জন তুলে মৌমাছি কোথা ধায়!
পুকুরের জল রোদ্দুরে ঝিলমিল।
শুভ্র কাশের গুচ্ছ তটিনী তীরে
সুবাসমদির সমীরে শুধুই দোলে।
রঙীণ স্বপ্নে উল্লাসে আজ কিরে
দেখছে ফড়িং সবুজ ঘাসের কোলে!
মৌটুসী পাখা ইস্ কী খুসীতে ভাই
হেথায় হোথায় যাচ্ছে কেবলি ছুটে—
এক ফোঁটা দুখ আজকে হৃদয়ে নাই,
শত শতদল ওই তো উঠেছে ফুটে।
দোয়েল পাখীর মধুর কণ্ঠস্বরে
টুং টুং টুং বাজে পিয়ানোর সুর।
ঝর ঝর ঝর শিউলিরা পড়ে ঝরে'
বলাকার প্রাণ আনন্দে ভরপুর।
কুসুমে পূর্ণ আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে
এলোরে শরৎ সোনার হাসিটি নিয়ে।

কাউণ্ট লিও টলষ্টয় রচিত

এলিয়াস্

(সারমর্ম্ম)

সৌম্য গুপ্ত

অনেককাল আগেকার কথা।

রাশিয়ার এক গ্রামে এলিয়াসের বাস। সে ডাগর হলে, বাপ তার বিবাহ দিলে। এ বিবাহের পর বাপ মারা গেল···সংসারে তখন শুধু এলিয়াস্ আর তার বৌ।

এলিয়াসের বাপ ছিল গরীব···টাকাকড়ি রেখে যেতে

পারেনি। সম্পত্তি বলতে ছিল, সাতটি ঘোড়া, দুটি গরু আর কুড়িটি ভেড়া। বাপ মারা যাবার পর এলিয়াস্ হলো এ সম্পত্তির মালিক। এলিয়াস্ আর তার বৌ…দুজনে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা কাজ করে…একনিমেষ বসে না, দাঁড়ায় না—খাটুনির একতিল বিরাম নেই। গাঁয়ের কোনো মানুষ এমন খাটুনি খাটে না…খাটতে পারে না। এই অবিরাম খাটুনি খেটে এলিয়াস্ আর তার বৌ বছরে বেশ টাকা রোজগার করতে লাগলো এবং পঁয়ত্রিশ বছর একাদিক্রমে এমন খাটুনি খেটে তাদের হলো অগাধ টাকা আর সম্পত্তি। এখন তাদের দুশো ঘোড়া, দেড়শো গরু আর বারোশো ভেড়া…ঘরবাড়ী হয়েছে…অনেক লোকজন রেখেছে…আস্তাবলে অসংখ্য সহিস, গোয়ালেও গোয়ালা আর গোয়ালিনী রেখেছে…তারা গরুর সেবা করে…দুধ দোয়…দুধ থেকে ননী-ছানা-পনীর তৈরী করে। এলিয়াস্ এখন গ্রামের মধ্যে খুব ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি।

পাড়ার লোকজন তার পানে তাকায়…তাদের হিংসা হয়…তারা বলে,—ক'বছরে এলিয়াসের কী বাড়ন্তই না হলো! কোনোদিকে কোনো অভাব নেই…বাড়ী নয়, যেন রাজার ভাণ্ডার!

আশপাশের গ্রামের মানীগুণী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা আসেন এলিয়াসের গৃহে, তার সঙ্গে দেখা করতে…সকলকেই এলিয়াস্ সাদরে অভ্যর্থনা করে…অতিথি-সেবায় ভোজ্য-পানীয়ের সমারোহ থাকে…যে যা খেতে চাও, যত খেতে চাও খাও! পাল-পার্ব্বণে বাড়ীতে ভোজের সভায় সকলেরই হয় নিমন্ত্রণ…ভেড়ার মাংস, ঘোড়ার মাংস, উৎকৃষ্ট পানীয়…সকলকে সমানভাবে খাওয়ানো।

এলিয়াসের দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে…ছেলেদের বিবাহ হয়েছে…মেয়েরও বিবাহ হয়েছে। মেয়ে থাকে দূরে…তার স্বামীর গৃহে। ছেলেরা থাকে বাপ-মার কাছে বৌ নিয়ে।

এলিয়াসের যখন অবস্থা ভালো ছিল না, তখন দুই ছেলেও সকলের সঙ্গে সমানে কাজ করতো…তাদেরও খাটুনির বিরাম ছিল না। তারপর বাপের ঐশ্বর্য হলে যখন মাইনে-করা লোকজন কাজ করা সুরু করলো, বড় ছেলে তখন বদখেয়ালীতে মেতে সুরাপানে এমন মশগুল হলো যে সারাক্ষণই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে। শেষে এমনি মদের ঝোঁকে মাতাল-সঙ্গীদের সঙ্গে মারামারি করে সে একদিন বেঘোরে প্রাণ হারালো।

ছোট ছেলের বৌ ছিল দারুণ খাণ্ডারী…সেই খাণ্ডারী-বৌয়ের উস্কানিতে ছোট ছেলে বাপকে মানে না…নিত্য বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে! বাপ শেষে ছোট ছেলে আর ছোট-বৌকে বেশ ভালো রকম সম্পত্তি দিয়ে আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করে দিলে। ছোটছেলে-বৌকে এলিয়াস্ দিলে একখানি বাড়ী কিনে, আর সেই সঙ্গে বহু ঘোড়া, গরু ও ভেড়া। এত দেবার পর, এলিয়াসের ঐশ্বর্যে বেশ ভাঙন ধরলো।

তারপর বিপদের উপর বিপদ…নানা দিকে নানা উপসর্গ! আচমকা এমন মহামারী এলো গ্রামে—যে তার দরুণ ক্ষেত মরুভূমি…ফসল হলো না…ঘাস-খড়ের অভাবে বহু ঘোড়া-গরু-ভেড়া মারা গেল! এলিয়াসের একমাত্র মেয়ের হলো অকাল-মৃত্যু…ছোট ছেলে আর বৌ তাদের সম্পত্তি নিয়ে হলো দেশান্তরী! এমনি একটার পর একটা বিপদ…বিপদের আঘাতে এলিয়াসের আর তার বৌয়ের দেহ-মন গেল ভেঙে…দেহে শক্তি নেই…মনে আশা নেই…এবং সত্তর বছর বয়সে দৈব-দুর্ব্বিপাকে এলিয়াসের বাড়ী-জমি সব গেল দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে…বুড়ো বয়সে সে হলো সম্পূর্ণ নিঃস্ব কপর্দকহীন! পেটে অন্ন জোটে না…পরণে ছেঁড়া-পোষাক…পায়ে জুতো নেই…নিঃস্ব হয়ে শেষে পথ হলো তার আশ্রয়!

পাড়ার একজন ব্যবসায়ী মানুষ—মহম্মদসাহ…তার হলো দয়া! এত বড় ধনী…এমন সাধুসজ্জন মানুষ…তার এ দুর্দ্দশা! সে বললে এলিয়াসকে,—তোমরা দুজনে আমার কাছে থাকতে পারো। গ্রীষ্মকালে তুমি আমার তরমুজের ক্ষেতে কাজ করবে, আর শীতকালে আমার গরু-বাছুর-ভেড়াদের খাওয়াবে…আর তোমার বৌ আমার গরুর দুধ দুইবে,ছানা-ননী-পনীর তৈরী করবে। তাহলে দুজনকে আমি খেতে পরতে দেবো…আমার বাড়ীতেই থাকবে,এছাড়া তোমাদের যখন আর যা প্রয়োজন, চাইলেই আমি দেবো।

কৃতজ্ঞতায় এলিয়াসের চোখে জল এলো…নিঃস্ব-নিরাশ্রয়কে এমন সাহায্য করা! এলিয়াস্ বললে,—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, মহম্মদ! তুমি যা বলবে, আমরা তা করবো।

বৌকে নিয়ে এলিয়াস পেলো মহম্মদের গৃহে আশ্রয়! তাদের কাজের দিকে মনিবকে দেখতে হতো না…নিজেরাই ছিল একদিন বড় কারবারের মালিক…কাজেই তাগবাগ সব জানে—কোথাও অপচয় হবার কোনো আশঙ্কা নেই তাদের হাতে…তার উপর দুজনেই খুব সজ্জন।

মনিব মহম্মদের মনটা সারাক্ষণ হা হা করে…বন্ধু এলিয়াস্…অত বড় মানুষটা…সে আজ তার গৃহে দাস্যবৃত্তি করছে!

একদিন মহম্মদের কজন আত্মীয় এলো মহম্মদের গৃহে…তাদের সঙ্গে একজন মোল্লা। মহম্মদ দিলে এলিয়াস্কে নির্দ্দেশ—বেশ ভালো একটি ভেড়া মারো…খানা তৈরী হবে।

ভোজের খুব সমারোহ…অতিথিরা দিব্যি আরামে গদিতে বসে সকলে খুশী মনে খানা খাচ্ছে…খেতে খেতে নানা খোশগল্প চলেছে…খানা-কামরার দরজা খোলা…সেই খোলা দরজা দিয়ে সকলে দেখলো এলিয়াস্কে…নানা কাজে এলিয়াস্ যাওয়া-আসা করছে! তার দিকে নজর পড়তে মহম্মদ বললে,—দরজার সামনে দিয়ে যে বৃদ্ধ গেল, ওকে দেখেছো?

একজন বললে—হ্যাঁ…কিন্তু হঠাৎ ওর কথা?

মহম্মদ তখন বললে সবাইকে এলিয়াসের জীবনের কাহিনী…বললে—একদিন ঐ এলিয়াস্ ছিল অসাধারণ ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি…ওর নাম শুনেছো নিশ্চয়!

সকলে বললে—নিশ্চয়। ওর খ্যাতি সারা দেশে রাষ্ট্র হয়েছিল…যেমন ঐশ্বর্য, তেমনি সকলের উপর মায়া দয়া…তেমনি

মহম্মদ বললে,—হ্যাঁ, এমন দুরবস্থা যে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই…অন্নবস্ত্রের দারুণ অভাব…আমার এখানে ও করছে দাস্য…আর ওর স্ত্রী আমার গরু বাছুর ভেড়া দেখে!

এলিয়াসের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে অতিথিরা অবাক! মোল্লা বললে,—মানুষের ভাগ্য…চাকার মত ঘুরছে…কখনো উঠছে উর্দ্ধে, কখনো নামছে নীচে! এলিয়াস্ খুবই অসুখী—আর মনঃকষ্ট ভোগ করছে, তাহলে বলো!

মহম্মদ বললে,—তা জানি না…চুপচাপ থাকে…কখনো কোনো অনুযোগ শুনি না ওর মুখে…তাতে মনে হয়, মনে কোনো দুঃখ বোধ করে না!

একজন বললে—ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারি? ওকে দুটি কথা শুধু জিজ্ঞাসা করবো!

মহম্মদ বললে,—বেশ, আমি ওকে ডাকছি!

এলিয়াস্কে মহম্মদ ডেকে পাঠালো…এলিয়াস্ এলো…এসে সকলকে সেলাম করে দাঁড়ালো। তার বৌকেও ডেকে পাঠানো হলো…বৌ এসে দাঁড়ালো দরজার বাইরে পর্দার আড়ালে। এলিয়াস্কে অতিথিরা সাদরে অভ্যর্থনা করে গদিতে বসালো…বসিয়ে তার হাতে দিলে পানীয়।

পাত্র নিঃশেষ হলে একজন অতিথি বললে,—দুটো কথা জিজ্ঞাসা করবো, দাদু…জবাব দেবে? আমাদের সঙ্গে বসতে তোমার মনে বেদনা বোধ করছো—তোমার অতীত দিনের কথা স্মরণ করে? একদিন কি ঐশ্বর্য-সম্পদই না ছিল তোমার…আর আজ তুমি পরের দাস্য করছো!

এলিয়াস্ হাসলো…মৃদু হাসি! হেসে সে বললে,—আপনারা বিশ্বাস করবেন…যদি বলি…কাকে বলে সৌভাগ্য, আর কাকে বলে দুর্ভাগ্য! তার চেয়ে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন…উনি স্ত্রীলোক, সংসারের সুখ-দুঃখ স্ত্রীলোকেই ভালো বোঝে…উনি আপনার কথার জবাব দিতে পারবেন!

পর্দার দিকে চেয়ে অতিথি বললেন,—আচ্ছা দিদিমা, আপনি বলবেন—কাকে বলে সৌভাগ্য, আর কাকে বলে দুর্ভাগ্য?

পর্দার পিছন থেকে বৃদ্ধার কণ্ঠে জবাব ফুটলো,—আমি যা বুঝি, তার মর্ম্ম—আমি ও আমার স্বামী পঞ্চাশ বছর এক সঙ্গে ঘর করছি…সারা জীবন আমরা দুজনে সুখের কামনা করেছি। সুখের সন্ধান করেছি, সুখের জন্য কী পরিশ্রম না করেছি…কিন্তু সুখ পাইনি! আজ দু'বছর এখানে আছি…কোনোদিন এখানে সুখের কামনা করিনি, কিন্তু সুখ এখানে পেয়েছি। আমরা এখানে সত্যিই সুখে আছি…আমাদের কোনো অভাব নেই, নালিশ নেই!

অতিথি বললে,—এতে সুখ কি করে, শুনি?

এলিয়াসের বৌ বললে,—বলি। যতকাল আমাদের অগাধ ঐশ্বর্য ছিল, ততদিন আমাদের দুজনের মনে

ক্ষণেকের জন্যও তিলমাত্র শান্তি ছিল না! দুজনে বসে দু'দণ্ড সুখ-দুঃখের কথা কইবো, তার অবসর ছিল না··· নিজেদের মনের কোনো সন্ধান পেতুম না···ভগবানকে ডাকবো, তারো অবকাশ ছিল না! সব কাজ দেখা ···তারপর নিত্য অতিথি-অভ্যাগতরা আসছেন, তাঁদের পরিচর্যা করা···নিজেদের খ্যাতি, মান আর ইজ্জত রাখবার জন্য সব সময়ে সজাগ দৃষ্টি! তারপর অত ঘোড়া-গরু-ভেড়া···সেগুলো যাতে সুস্থ থাকে···চুরি না যায়, মারা না যায়, নেকড়ে বাঘে না ধরে···রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমোবো কি, তখন চিন্তা···কাল কি কি কাজ আছে··· যদি এদিকে কোনো উপসর্গ ঘটে, ওদিকে কোনো গোল-যোগ ঘটে···কি হবে? এমনি নানা চিন্তায় জর্জরিত থাকতুম। স্বামী-স্ত্রী, দুজনের মধ্যে তর্ক হতো···উনি বললেন, এই করো···আমি বললুম—না, এই রকম করতে হবে! তারপর ছেলেদের নিয়ে জ্বালা···এমনিভাবেই দিন কাটতো···অশান্তির সীমা ছিল না! এত অশান্তির মধ্যে সুখ মেলে কখনো···কোনোদিন সুখী হতে পারিনি!

অতিথি বললে,—এখন তাহলে?

এলিয়াসের বৌ বললে,—এখন! আমরা দুজনে ভোরে ঘুম থেকে উঠি—দুজনের কাজ রুটিনে বাঁধা··· কোনো তর্কাতর্কি হয় না, বিরোধ হয় না···মনিবের ঐশ্বর্য যাতে বজায় থাকে, বাড়ে—সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে এসে তৈরী খাবার পাই—কাজের পর দুজনের অবসর মেলে···দুজনে বসে গল্পস্বল্প করি···পঞ্চাশ বছর ধরে সুখের সন্ধান করে সুখ পাইনি···এখন সুখের সন্ধান করে সুখী আছি দুজনে। ভগবান অত ঐশ্বর্য দিয়ে তা কেড়ে নিয়ে মঙ্গল করেছেন বলে মনে করি।

এলিয়াসের বৌয়ের কথা শেষ হলে মোল্লা বললে, ঠিক কথা মা···তুমি যা বললে—ভগবানের বাণীও তাই···'পুণ্য-গ্রন্থে' Holy Scripture একথা আমার পাই!

অতিথিদের কারো মুখে আর প্রশ্ন নেই···তারা স্তব্ধ হয়ে শুনছে বৃদ্ধ এলিয়াস্ আর তার বৌয়ের সব কথা!

—

শারদ রাঙা

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কদম কেয়া শিউলী ডালে—
ঝরছে হাসি আজ সকালে:
মায়ের পায়ের আলতা লালে,
রাখাল ধরে তান;
হাসি খুশীর আজকে মেলায়
শিশু কিশোর মাত্‌লো খেলায়,
শারদ রাঙা রঙিণ বেলায়
ভুললো অভিমান।
রাখাল ধরে তান॥
নীল আকাশের প্রান্ত সীমায়
সুর ছড়ানো সোনার বীণার
কল কলিছে রেণু বীণায়
মায়ের আসার ভোরে;
শারদ রাঙা হাসছে রবি
আঁকলো সে কোন মোহন ছবি!
উছলে নদী, গাইচে কবি
বাজলো বাঁশী দোরে।
মায়ের আসার ভোরে॥

—

আলেয়া

পার্ব্বতীপ্রসন্ন গুহ

"আলেয়া"কে লোকে সাধারণতঃ "ভূতের আলো" বা "ভূতের মশাল" বলিয়া থাকে। গ্রামের ভাগাড়ে, বিলের প্রান্তে, শ্মশানে-মশানে—প্রভৃতি স্থানেই রাত্রিকালে "আলেয়া" দেখা যায়। বর্ষার সময়, বিশেষ করিয়া শরৎ-কালে আমাদের দেশে "আলেয়ার" প্রাদুর্ভাব ঘটে।

এক প্রকার উজ্জ্বল আলোকের নামই "আলেয়া"। তৈল, কাঠ, খড়-কুটা, অগ্নি প্রভৃতির অভাব সত্ত্বেও এই

ালোক জ্বলিয়া উঠে। এই জন্যই এই আলোক একে-ারে অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। দেখিতে অস্বাভাবিক বলিয়াই ইহা জনসাধারণের মনে সাধারণতঃ য়ের সঞ্চার করিয়া থাকে।

আলেয়া অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির আলোক। ইহা াধারণতঃ মাটি হইতে দুই, তিন হাত উপরে ছুটাছুটি রিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একবার জ্বলিয়া উঠে, াবার নিভিয়া যায়, একবার উপরে উঠে আবার নীচে ামে; কখনও কখনও আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইতেও দখা যায়।

নানা কারণে কুসংস্কারমূলক ধারণা আলেয়াকে কেন্দ্র রিয়া আমাদের মনে "শয়তানের" বাসা বাঁধিয়াছে। এই ন্যই লোকে ইহাকে 'ভূতের মশাল' বলিয়া থাকে। ামরা মনে করি, ভূতগুলি হাতে মশাল লইয়া এদিক দিক ছুটাছুটি করিতেছে।

জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবে এই সব সংস্কারমূলক ধারণা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্বে ইংরেজ াতির মধ্যেও এই সব কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। আলেয়ার ংরেজী "Will-o'-the wisp" অথবা "Jack-o-lan-ern" নামক কথা দুইটি আলেয়া সম্বন্ধে প্রাচীন ইংরেজ-দের ভূতুড়ে বিশ্বাসের কথা সাক্ষ্য দিতেছে।

বৈজ্ঞানিকদের মতে ভূত বলিয়া কোন জীব নাই। ইহা র্বল মানবদের কল্পনার সৃষ্টি। ভয়ই ইহার কারণ। তাই িনে ভূত দেখা যায় না; কিন্তু রাত্রে ভূত আছে বলিয়া নে করে। সুতরাং আলেয়া ভূতের আলো নহে। ালেয়া অস্বাভাবিক আলোও নহে। অগ্নি, কাষ্ঠ প্রভৃতি ্যতীতও আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন ন্তর খণ্ড হইতে আলো উৎপন্ন হয়। খদ্যোতও রাত্রে লে; এক প্রকার কেঁচোর শরীরও রাত্রে আলো দেয়। ুতরাং অগ্নি ব্যতীত আলো জ্বলিলেই অস্বাভাবিক বলিয়া নে করা উচিত নহে।

বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে আলেয়া ক শ্রেণীর গ্যাস। এই গ্যাস 'ফস্ফরাস্' ও 'হাইড্রোজেন' ামক পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

জন্তুর দেহে ও বৃক্ষাদিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। ই জন্য জান্তব দেহ ও বৃক্ষাদি পচিলে তাহা হইতে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহাই "আলেয়া" সৃষ্টির কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

এই গ্যাসের এমনই গুণ যে, ইহা যখন ঠিক পরিমাণ মত বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়, তখন অতি স্বাভাবিক ভাবেই উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ভাগাড়, শ্মশান ও জলা ভূমিতে বর্ষা-বৃষ্টির পর জান্তবদেহ ও বৃক্ষাদি পচিয়া "ফসফরাস্" ও "হাই-ড্রোজেন" মিশ্রিত হইয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই বায়ু সঞ্চরণশীল; সুতরাং আলেয়াও সঞ্চরণশীল।

সুতরাং লোকে বলে যে "আলেয়া" ভূতের কাণ্ড, ইহা কোন ভাবেই বিশ্বাস করা উচিত নহে।

বক্তব্য

প্রভাকর মাঝি

শুনছো হে, বলছিল নরহরি রায়,
ছাঁচি পান খেলে নাকি কবি হওয়া যায়।
আর যদি তার সাথে জর্দাও মেলে
নির্ঘাৎ কবিরাজ হবে সব ফেলে।
দেখে এলো কাল বুঝি হাটে ভোলানাথ
বারো হাত কাঁকুড়ের বীচি তেরো হাত।
ওকি হেসে উঠলে যে? মনে ধরে নাই?
এ রোববারের হাটে চলো তবে যাই।
রক্ত আরাম করে কারা খেতে খেতে
ট্রেনে ট্রামে বাসে যায় বিনা টিকিটেতে?
কাগজে পড়োনি আজ? তারা দলে দলে
জাহাজে বোঝাই হয়ে আমেরিকা চলে।
সিংহের মামা নাকি ভোম্বলদাস
মুস্কিলে পড়লেই খায় কচি ঘাস।
এবং তখন হয় ভাগ্নেই মামা,
প্রাণ ভরে গান গায় সা-রে-রে-সা-গা-মা
শুনছো হে, ধ্যাত্তেরি নাক ডাকে থামা,
তাহোলে তোমার বাপু নেই কোনো আশা।

কোলকাতা হতে জলপাইগুড়ি বদলী হয়ে গিয়ে খুবই মনখারাপ হয়ে গেছিলো। কিন্তু উপায় নেই—যাবার সব ব্যবস্থাই করে ফেলতে হোল। আমাদের রিজার্ভ করা ফার্ষ্টক্লাস কামরা। সন্ধ্যার দিকে দরজার ভেতর হতে বন্ধ কোরে একটা বই নিয়ে শুলুম। টুলু-বুলু ও তাদের মাও শুয়ে। ট্রেণ থামলো—জানি না কি ষ্টেশন। ছাড়বার মুহূর্তে ঘন ঘন কোরে বেশ চড়াসুরেই ইংরাজীতেই বললুম: দেখছেন না, রিজার্ভ কম্পাটমেণ্ট?' দয়া করে আমায় উঠতে দিন—একটু পরেই নেমে যাবো—ইংরাজীতেই জবাব এলো ছোটমেয়ের করুণ মিষ্টি স্বরে। অবাক হয়ে দরজা খুলতেই সে তাড়াতাড়ি একটা ব্যাগ কাঁধে উঠে পড়লো—ট্রেণও ছুটতে আরম্ভ করলো। নয় দশ বছরের একটি সুশ্রী মেয়ে—একমাথা কালো কোঁকড়া চুল—কামরার দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে তখনও হাঁপাচ্ছে, বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আমি স্নেহের সঙ্গে তাকে ইঙ্গিত করলুম বার্থের উপর বসতে, ও বসলো। আমরা সবাই চেয়ে আছি দেখে, ও ওর বিষণ্ণ মুখটি তুলে বললো—: আমার থার্ড ক্লাসের টিকেট—সেখানে একটা গুণ্ডালোক কেবল আমার দিকে দেখছিলো আর নানা কথা জিজ্ঞেস করছিলো। এই ষ্টেশনে সে নেমেছে—আমিও ভয়ে অন্য কামরায় যাবো বলে নেমে উঠতে পারিনি—দয়া কোরে আপনি উঠতে দিলেন! : কোথায় যাচ্ছ—তুমি একা নাকি? গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করি। : হ্যাঁ,...ইয়ে আমি একাই—জলপাইগুড়িতে মিশনারী হোমে যাবো! ও ভড়কে গিয়ে বলে।

ওর ইংরাজী শুনেই বুঝেছিলুম ও ভারতীয় ক্রিশ্চান। আর দু একটি প্রশ্ন কোরেই বুঝলাম ও একা চলেছে একটা মিশনারী হোমের উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়িতে—সে জায়গাটি ও চেনে। আর ওর চোখভরা জল দেখে আর পুলিশের কথা না তুলে বললুম: বেশ, তুমি কিচ্ছু ভয় পেয়ো না—আমরাও জলপাইগুড়ি যাচ্ছি। তোমার নাম কি?

: আলোনা।

বছরখানেক পরের কথা। ইতিমধ্যে আবার কোলকাতা বদলী হয়েছি ও অনেক কষ্টে একটি বাড়ী পেয়েছি দক্ষিণেশ্বরের কাছে। জলপাইগুড়ি যাবার পথে ট্রেণের সঙ্গী ছোট্ট আলোনার গন্তব্যস্থল মিশনারী হোমটি আমাদের বাড়ীর কাছেই ছিল, ও তার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ ও হতো। ভারী চমৎকার মেয়েটি—আমার ছেলেমেয়ে টুলুবুলুর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিলো—কিন্তু তার মনে কি একটা কষ্ট থাকতো—বলতো না। বুঝতে পারতুম। তারপর আবার বদলী হয়ে চলে আসার হিড়িকে আর তার খোঁজ রাখা হয়নি কোলকাতা এসে পর্য্যন্ত।

দক্ষিণেশ্বরে আমার বাড়ীর একটু দূরে খালি মাঠটায় সেদিন দেখি সার্কাসের তাঁবু খাটানো আরম্ভ হোয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই মাইক-লাগানো রিক্সা গলিতে গলিতে ঘুরতে লাগলো ও শোনা যেতে লাগলো ঐ তাঁবুর অর্থাৎ 'ডায়মণ্ড' সার্কাসে'র গুণপনা। প্রত্যেকটি খেলাই হবে দর্শকদের তাক্ লাগানো—তাছাড়া বাঘ সিংহ ভল্লুক তো আছেই। টুলুবুলু এলো আমার কাছে—দুজনের হাতেই দুখানি বিলি করা কাগজ। দুই ভাইবোনের কলকাকলী হোতে স্পষ্টই বুঝলুম—এই সার্কাস ভীষণ রকম ভালো হবে। কালই আরম্ভ, আর কালই টুলুবুলু যাবে দেখতে।

দুচারদিন এগিয়ে গেলেও শেষ পর্য্যন্ত রবিবার ওদের নিয়ে গিয়ে বসলুম সার্কাসে। শীতের রাত—তবু ঐ দ্বিতীয় 'শো' ছাড়া আমার সময় হলো না।

এমন করুণ সার্কাস খুব কম দেখেছি। সেই দ্বিতীয় 'শো'তে গ্যালারীতে গুটি চল্লিশেক দর্শক ছিলো বোধহয়। সামনের চেয়ারে আমরা ক'জনাই মাত্র ছিলুম। আলোগুলি সব টিমটিম করছিলো, আর বাজনাও অতি করুণ ও মৃদু। খেলার শেষে খেলোয়াড়েরা যখন তাদের বিশেষ ঢঙের অভিবাদনটি জানিয়ে চলে যাচ্ছিলো—তখন দর্শকদের মধ্য হ'তে কেউই হাততালি দিচ্ছিলো না—শীতে মুড়ি দিয়ে, চাদরের মধ্যে হাত গুটিয়ে সব বসেছিলো—খেলোয়াড়দের প্রতি তাদের এই সৌজন্য-বোধের অভাব আমায় বড়ই পীড়া দিচ্ছিলো। শুধু আমার ছেলেমেয়ে দুটি উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাততালি দিচ্ছিলো, ও মুগ্ধ মন্তব্য করছিলো প্রতিটি খেলার পরেই। কিন্তু অতবড় সার্কাসমণ্ডপে টুলুবুলুর কচি দুই জোড়া হাতের তালি এমন মৃদু যে তা যেন খেলোয়াড়দের প্রতি ঠাট্টার মতোই লাগছিল। আমি তো অস্বস্তিতে বসে আছি। খেলাগুলিও মামুলী—খেলোয়াড়দের পোষাক-আষাক ধরণধারণও তাই। শেষের খেলাটি কিন্তু আমাকে চমৎকৃত করলো। ছোরার খেলা। খেলোয়াড়ের বেশ বয়েস হয়েছে এবং সে যেন খেলা দেখাতে তেমন যত্ন ও নিল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়েই একের পর এক ছোরা ছুঁড়লো একটি ছোট মেয়েকে লক্ষ্য কোরে বেশ কিছু দূর হতে, আর ছোরাগুলি সব মেয়েটির গায়ের এক ইঞ্চি দূরে গেঁথে গিয়ে তার একটি প্রতিকৃতি এঁকে দিল। খেলার পর কিন্তু প্রত্যেকেই হাততালি দিলো।

সার্কাস শেষ হতে আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসছি এমন সময় একজন আমার সামনে এসে বললেন: আপনি বাচ্চাদের নিয়ে এই শীতে দ্বিতীয় 'শো'তে খেলা দেখতে এসেছেন? চেয়ে দেখি সেই ছোরা খেলোয়াড়। বললুম: হাঁ, বাধ্য হয়ে। আপনার খেলা ভারী চমৎকার লাগলো। খেলোয়াড় আনন্দের সঙ্গে বললেন অশেষ ধন্যবাদ—যদি সময় থাকে আমার আরও দুই একটি খেলা দেখে যান—চলুন ঐ আমার তাঁবু!

আমি ইতস্ততঃ করছিলুম, কিন্তু টুলুবুলু ততোক্ষণে হরিণের গতিতে ছুটেছে সেদিকে—শীতের ভয় অবশ্য নেই কারণ আমরা প্রত্যেকেই গরম ওভারকোট টুপীতে ঢাকা ছিলুম।

খেলোয়াড়ের তাঁবুটি সুন্দর ভাবে সাজানো। আমাদের চেয়ারে বসিয়ে খেলোয়াড় তার ছোরার বাক্স খুলতে খুলতে হেসে বললেন: আজ আমার বহুদিন আগেকার কথা মনে পড়েছে, তখন আমার এ দশা ছিলো না—আমি তখন ছিলুম এক নামকরা বিলিতী সার্কাস পার্টিতে। আমার খেলা সব সাহেব, মেম-সাহেবের দল সামনের সীটে বসে দেখতো। খেলার পরে এসে পিঠে চাপড়ে করমর্দ্দন করে যেতো—কতো পুরস্কার মেডেল পেয়েছি···দীর্ঘশ্বাস পড়লো খেলোয়াড়ের।

: সে কাজ ছাড়লেন কেন?'

আমার সে জীবন-কাহিনী যদি শোনেন স্যার—তবে খেলা দেখা আর হয়ে উঠবে কি?

: আমরা ঐ গল্পটাও শুনবো!—টুলুবুলু সাগ্রহে বলে উঠলো এবং আমার অনুরোধে খেলোয়াড় বললেন: আমার নাম আব্রাহাম। আমি দক্ষিণ ভারতীয় ক্রীশ্চান। ছেলেবেলা হতেই আমি ছোরা খেলায় খুব নিপুণ ছিলুম। প্রথমদিকে এক বিলিতী দল আমায় অনেক মাইনেতে নিয়ে নেয়। সেই সময় আমি বিবাহ কোরেছিলুম ও আমাদের একটি কন্যা হয়। মেয়ের যখন তিন বছর বয়স তখন তার মা মারা যায়। ছোরা খেলায় আমি আগে অন্য ছেলেমেয়েদের খেলোয়াড়ের খেলা দেখাতুম। পরে আমার মেয়ে পাঁচ ছয় বছরের হতে—সেই দাঁড়াতো আর দর্শকরা তাতে

আরও চমৎকৃত হতো। কোম্পানী এ জন্ত আমার মাইনেও কিছু বাড়িয়ে দিলো।

আমার মেয়ের খুব সাহস ছিলো। অনেক সময় ও চোখের বাঁধন নিজেই খুলে ফেলে চোখ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, আর দর্শকদের মধ্যে হাততালি পড়ে যেতো।

জানেন স্তার—মেয়ে আমার প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতো—'বাপি, তুমি আমায় বেশী ভালোবাসো—না তোমার ঐ ছোরা খেলাকে!' আমি জবাব দিতুম—'যদি তোর গায়ে কোন দিন ছোরা লাগিয়ে দিই হাতের ভুলে—তা হলে তো আমার খেলার যশ আর টাকা—দুই যাবে।' আমার এ জবাবে খুশী না হয়ে মেয়ে আবার প্রশ্ন করতো—'বাপি। তুমি আমার দিকে ছোরা ছুঁড়তে ভয় পাও না—তোমার দুঃখ হয় না? আমার গায়েতে ছোরা বিঁধে গেলে তুমি কি করো?'

সেবার শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ইত্যাদি ঘুরে আমাদের দল এলো কোলকাতায়। পার্কসার্কাস ময়দানে খেলা দেখাচ্ছি। সামনের সারের মেম সব গিস্‌গিস কোরছে। মেয়ের চারপাশে ছোরার সার গেঁথে দিয়ে আমি দর্শকদের দিকে মাথা নোয়াতেই হাততালির শব্দে কানে তালা লাগার যোগাড়। ঠিক সমুখের বিশেষ অভ্যাগতাদের সারি হতে এক য়ুরোপীয় সাহেব দম্পতি বললেন —তাঁরা বিলেতে ঐ খেলা চোখ বেঁধে করতে দেখেছেন—আমি সে রকম ছোরার খেলা জানি কিনা। আমি অনেক দিন ধরেই একখানি মানুষের ছবি রেখে ঐ খেলা চোখ বেঁধে অভ্যাস করছিলুম—তবে কখনও মেয়েকে দাঁড় করিয়ে করিনি। ইতিমধ্যে আমাদের সাহেব-ম্যানেজার খুব আগ্রহভরে বললেন—'পারবে আব্রাহাম?'

আমিও রোখের বশে বলে দিলুম—হ্যাঁ পারবো!' মেয়ের চোখ বেঁধে দেওয়ার সময় সে ভীতভাবে বললে—'বাপি যদি লেগে যায়!' না হয় একটু লাগলোই—বা! আমার মানটা রাখবে না?' সে আর কোন কথা বলে নি। আমি চোখ বেঁধে নির্ভুল ভাবে ছোরা ছুঁড়ছিলুম—হঠাৎ মেয়ে হাতটা নড়ানোয় তার হাতে ছোরা গেঁথে গেলো। দর্শকেরা হাঁ হাঁ করে উঠলো—প্রত্যেকেই তার দোষ দিতে লাগলো, কিন্তু আমি মর্মে মর্মে বুঝলুম কি অভিমানে ও হাতটা নাড়িয়েছিলো। রক্তপাতের পর ব্যাণ্ডেজ করা-টরা হলে মেয়ে ঘুমোচ্ছে ভেবে আমিও ঘুমিয়েছিলুম। ভোরে দেখি, মেয়ে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে কোথায় চলে গেছে!···কোথাও খুঁজে পেলুম না স্তার এই তিন বছর ধরে।···এই যে স্তার, তার ছবি! বলে আব্রাহাম ছোরার বাক্স হতে একখানি ফটো বার করে টেবিলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো।

: আলোনা! টুনু-বুলুর ফটোর দিকে উৎসুক ভাবে চেয়ে থাকা দুটি মুখ হ'তে বার হলো উত্তেজনাপূর্ণ উল্লাসের শব্দ। আমিও ঝুঁকে দেখলুম—সত্যই আলোনার ফটো!

সব শুনে আব্রাহাম আমার দুই পা জড়িয়ে ধরে কেবলই বিস্মিত অশ্রুজড়িত স্বরে বলতে লাগলো—ভগবান পাঠিয়েছেন আপনাকে। আপনি বাঁচিয়েছেন—আলোনাকে—আপনি বাঁচালেন আমাকে। চললুম আমার আলোনা মার কাছে—দেখি কেমন কোরে সে তার বাপির ওপর রাগ করে থাকে।

পাগলের মতো এখান ওখান হতে টাকাকড়ি হাতড়ে আব্রাহাম ছুটে বার হয়ে গেলো তাঁবু হতে। গোলমালে সার্কাসের ম্যানেজার এসে ঢুকলেন। বললেন—ভালো হয়েছে! আব্রাহাম লোকটা বড় ভালো। সাধুর মতো। গরীব শিশুদের নানা জিনিষ কিনে বিলোয়—অনেক রাত পর্য্যন্ত ভগবানের উপাসনায় কাটায়। মেয়ের জন্য সে সব ছেড়ে ঘুরছিল—জোর করে ম্যানেজার ওকে টেনে এনেছিলেন তাঁর দলে।

আব্রাহাম ও আলোনার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিলো; ক্রিসমাসের ছুটিতে মাদ্রাজ যাবার পথে দেখা করে গেলো। আব্রাহামও ঐ দলেই আছে কি একটা কাজে—আর আলোনা ক'বছরের মধ্যেই পড়া শেষ করে চাকরী কোরবে। একখানি রূপার ছোরা দিয়ে গেলো আব্রাহাম স্মৃতি স্বরূপ।

আইফেল টাওয়ার ও আলেকজাণ্ডার গুস্তাভ্ আইফেল

জীবনময় দত্ত

নীল আকাশ মাটির মানুষের কাছে চিরকালই একটা প্রবল আকর্ষণ। সেইজন্যই বুঝি মানুষ আকাশের দিকে সগর্বে মাথা তুলতে চায়, চায় আকাশের বুকে ভেসে বেড়াতে। সে যুগে রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তবে এ যুগের মানুষের সে ইচ্ছা যে বহুলাংশে পূরণ হয়েছে তার প্রমাণ আমেরিকার ষ্টেট বিল্ডিং (প্রায় ১৫০০ ফুট), ক্রাইসলার বিল্ডিং (প্রায় ১১০০ ফুট), আইফেল টাওয়ার (প্রায় ১০০০ ফুট)। আইফেল টাওয়ার যদিও উচ্চতায় আমেরিকার আকাশচুম্বী প্রাসাদকুলের নীচে, তবুও অপেক্ষাকৃত উচ্চতার ইতিহাসে তার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। আইফেল টাওয়ারের গর্ব খর্ব করার মতো কোন আকাশভেদী টাওয়ার আজ পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। পৃথিবীর যত দেশে যত টাওয়ার আছে, তার মধ্যে আইফেল টাওয়ারই সবচেয়ে কুলীন। কি উচ্চতায়, কি স্থায়িত্বে, সর্বদিক থেকেই অভিজাত।

তখনও পৃথিবীতে মজবুত ইস্পাতের জন্ম হয়নি। শুধুমাত্র লোহা দিয়ে যিনি এই সুউচ্চ চূড়াটি নির্মাণ করেন তাঁর নাম আলেকজাণ্ডার গুস্তাভ্ আইফেল। স্বনামখ্যাত আইফেল টাওয়ারের নির্মাতা আলেকজাণ্ডার গুস্তাভ বার্গণ্ডির ডিজন নামক স্থানে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি প্যারিসে অবস্থিত সেই সময়কার বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ইকোল সেণ্ট্রালে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে আরম্ভ করেন। ১৮৫৫ সালে সেখানকার পড়াশোনা শেষ করেন। সেই বৎসরই তিনি তাঁর সুদীর্ঘ তিরিশ বৎসরের কর্মময় জীবন শুরু করেন। অশেষ খ্যাতি এবং বহু অতুলনীয় কীর্তির প্রতিষ্ঠাতা আইফেল ১৯২৩ সালে পরলোকগমন করেন।

লোহার পুল তৈরী করে তিনি সারা ইয়োরোপে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। এমন কি ইয়োরোপের বাইরে যেখানে ফরাসী সাম্রাজ্য ছিল সর্বত্র অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। পুল তৈরী করবার সময় পুলের বনেদ ও থাম বসাবার জন্যে তিনি এক অভিনব ও কার্যকরী কৌশল অবলম্বন করেন। রেলপথ নির্মাণে পৃথিবীর অনেক দেশের ইঞ্জিনীয়ারই তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত কীর্তিই আইফেল টাওয়ারের কাছে ম্লান।

এই ৯৮৪ ফুট উচ্চ টাওয়ারটি চারটি পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই চারটি পা বসাবার জন্যে আড়াই একর জমির প্রয়োজন হয়েছে। একটি পা থেকে আর একটি পায়ের দূরত্ব হ'ল ৩৩০ ফুট। টাওয়ারটি সম্পূর্ণ করতে মোট ৭০০০ হাজার টন ওজনের লোহা লেগেছে। ২৫০০০০০ লক্ষ রিভেট, আর মোট ১৫০০ খণ্ড লোহা ব্যবহৃত হয়েছে আইফেল টাওয়ার তৈরী করতে।

টাওয়ারের নক্সা তৈরী করতে প্রায় ৫০০০ হাজার বড় বড় কাগজ লেগেছিল—সিঁড়ির সংখ্যা মোট ১৭১০। ৫০০ ফুট উচ্চতায় বেশ প্রশস্ত একটি চত্বর আছে। সেখানে একবার লিফট পাল্টাতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই মার্কিনরা এখানে একটি বেতারকেন্দ্র ও একটি ক্যান্টিন স্থাপন করেছিলেন। এখনও সেখানে একটি বেতারকেন্দ্র ও টেলিভিশন ষ্টেশন আছে। আবহাওয়া স্থির করার জন্যে একটি কেন্দ্রও এখানে আছে। তাছাড়া এরোপ্লেনকে রাত্রিবেলা আলোর সঙ্কেত দেখানো হয় এখান থেকে।

জোরে হাওয়া বইলে টাওয়ারটি দুলতে থাকে। সময় সময় এর দোলানির পরিমাণ ৩.৪ ফুট পর্যন্ত এদিক ওদিক হয়ে থাকে। আইফেলের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর পরে প্যারিসবাসীরা টাওয়ারের স্থায়িত্বে সন্দেহ প্রকাশ করায় একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়। অবশ্য এ সন্দেহ অমূলক ছিল না। মর্চে পড়ে নাট-বল্টু নষ্ট হবার বহরই তাঁদের সন্দেহের কারণ ছিল। যদিও সারা বৎসর ধরে বহু মিস্ত্রী টাওয়ারের কাজে লেগে থাকে, তবুও ঐ কমিশনের প্রতিকূল রায় সত্ত্বেও আইফেল টাওয়ার আজও প্যারিসের বুকে জগতের কাছে বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অচল অটল। আরও কতকাল থাকবে কে বলতে পারে?

এক যে ছিল রাণী

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দুই দেশে দুই রাজা, বড় রাজা। বড় রাজা মস্ত রাজা। তার রাজত্ব, সৈন্য সামন্ত, হাতী-ঘোড়া, দেশ জোড়া রাজত্ব। ছোট রাজার রাজ্য ছোট হলেও রাজা বড় বীর। তার সৈন্য আছে সামন্ত আছে। লোক আছে লস্কর আছে। রাজায় রাজায় বাধে যুদ্ধ। সে যুদ্ধ তো আর মুখে নয়, সৈন্য সাজে, সামন্ত সাজে, তলোয়ারে শান পড়ে, হাতীশালে ঘোড়াশালে হাতী ঘোড়ায় রব তোলে। লোকজন ঘর তোলে। যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধ বাধে! বড় রাজা বলে ছোট রাজার রাজ্য নেব দখল করে। ছোট রাজা বলে দেব না। বড় রাজা তার সেনাপতিকে পাঠায়।

বড় রাজার নাম বড় জবর, আকবর। ছোট রাজার নাম কেদার রায়, আর বড় রাজার সেনাপতি মানসিংহ।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে। কে হারে আর কে জেতে। হেরে কিন্তু শেষে কেদার রায় গেল। অত বড় রাজা আকবর শা, তার অত সৈন্য; তবে কেদার রায় লড়ায়ে বড় কম নয়। যেমন বীর তেমন সাহস, তেমন কৌশলী। কিন্তু ভাগ্যের দোষ। মানসিংহের কামানের এক জ্বলন্ত গোলা এসে লাগল কেদারের বুকে। অত বড় বীর কেদার ভূমি নিল।

* *

রাজার রাণী বাস করেন রাজ-অন্তঃপুরে। রাণী অন্তঃপুরের দেখা-শোনা করেন। সেদিন বসে আছেন যুদ্ধের খবরের আশায়। দাসী এল ছুটে, চখে বহে জল, ধারা অবিরল। রাণী বলে, দাসী কি সংবাদ বল। দাসী বলে—রাণী কি বলি। আবার কাঁদে, আবার বুক ভাসে। রাণী সব বোঝেন। রাণী কাঁদেনও না, রাণীর বুকও ভাসে না। দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, ভাবলেন অনেক। বলেন দাসীকে—দাসী ডাক দেখি মন্ত্রীকে। আজ্ঞা পেয়ে দাসী ছোটে, তার ভুমে বস্ত্র লোটে।

রাণীর আজ্ঞায় এসে দাঁড়ায় মন্ত্রী রঘুনন্দন, রামরাজা সর্দার। আজ্ঞা করুন রাণী, আমরা রাজার দাস, রাজার তরে জীবন দিতে পারি।

রাণী বলে, কি বলে! রাণী বলে, মন্ত্রী বশ্যতা আমরা স্বীকার করব না। চমকে উঠে মন্ত্রী, চমকে উঠে সেনানী। হাঁ যোগ্য রাজার যোগ্যা রাণী।

* *

আবার বাধে লড়াই। এ দলে মরে ওদলে মরে। কে বা হারে কে বা জেতে। জেতে কিন্তু মানসিংহ।

বীর রাজার বীর রাণী। রাজা গেল, রাণী লড়ল। আর লড়ার মত লড়ল। মুগ্ধ হল মানসিংহ বাঙালী মেয়ের বীরত্বে। এমন মেয়ে তো দেখা যায় না।

মানসিংহ রাণীর হাতেই বিক্রমপুরের শাসনভার দিয়ে গেলেন; মাত্র বার্ষিক কিছু কর গ্রহণে মানসিংহ রাজি হলেন।

রাণী বিক্রমপুরের শাসনভার পরিচালনা করতে লাগলেন।

আর? আর গল্পটি ফুরালো।

শারদীয়া ছড়া

শুভেন্দু পালিত

ড্যাং ড্যাঙা ড্যাং, ড্যাং ড্যাঙা ড্যাং—
ঢাকের বাদ্যি বাজে,
জোড়া ঢাকে প'ড়লো কাঠি
ষষ্ঠীর এই সাঁঝে।
ছেলেমেয়ে আয়রে ছুটে,
আয়-না তাড়াতাড়ি,
বছর পরে দুর্গাঠাকুর
এলো বাপের বাড়ী।
সংগে এলো লক্ষ্মী, মেয়ে,
সরস্বতী আর,
কলাবৌয়ের মুখটি ঢাকা,
লজ্জা ভারী তার!
কার্তিক তার চেহারা খানা
ক'রেছে চেক্‌নাই,
গণেশ দাদা, পেটটি নাদা,
দোলাচ্ছে শুঁড়টাই।
সিংহের কী তেজ দেখেছিস—
মহিষাসুর মারে,
সব মিলিয়ে মায়ের অরূপ
রূপটি দেখে যারে!

বীরবল

বাসুদেব পাল

১৫৫৬ সাল। মহাকবি আকবর দিল্লীর-সিংহাসনে আরূঢ়। ভারতবর্ষের বহু জনপদের অধিকারী হয়েছেন তিনি। মোগলের বিজয়িনী-শক্তি দিগ-দিগন্তে সম্প্রসারিত হচ্ছে ক্রমেই! মোগল-সাম্রাজ্য গৌরবের স্বর্ণ-শিখরে উন্নীত হয়েছে। এমনিই এক পরম-লগ্নে অকস্মাৎ যমুনা-তীরবর্তী কালীনগর থেকে দিল্লীর আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে তুলেছিল জনৈক সঙ্গীতজ্ঞের সুললিত সুর-লহরী।

'কে গায় ও গান?' উন্মনা হ'য়ে ওঠেন মোগল-সম্রাট!

ছড়ারছোঁয়ায়

ফটো : শেখর মণ্ডল
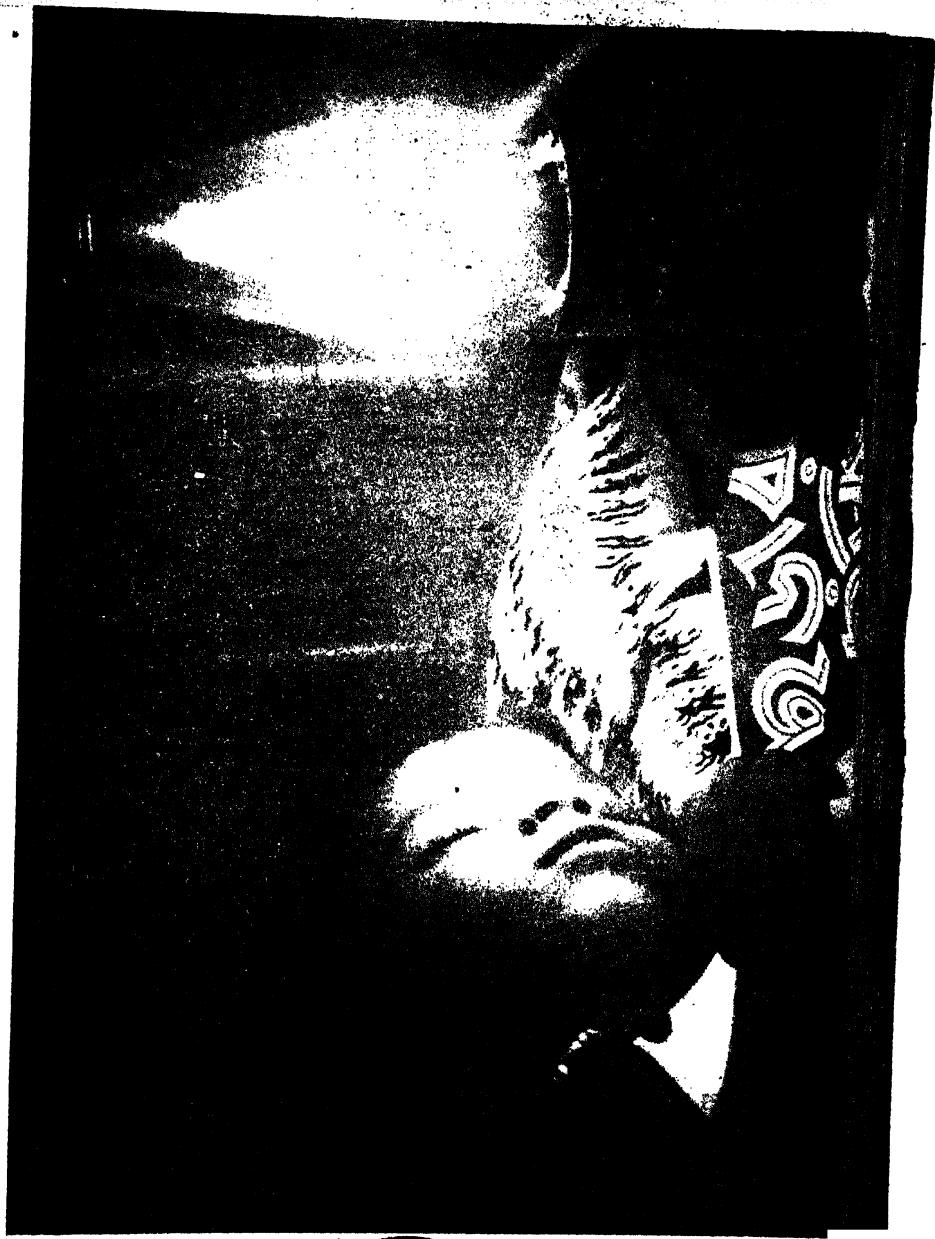
খেলার ছলে

ফটো : মধুসূদন দাস

তলব করেন তিনি উক্ত গায়কের। নতমস্তকে নবীন-সাধক সম্রাট সমীপে সকল পরিচয়ই ব্যক্ত করেন। সুকণ্ঠ ভাটের মনোরম-সঙ্গীতে মুগ্ধ মোগল-সম্রাট 'কবিরায়' উপাধি প্রদানান্তে স্বীয় সভায় স্থান দেন তাঁকে। অতঃপর ক্রমেই দিল্লীবাসীর জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকেন ভাট্। গীতি-কবিতা রচনায় ব্রতী হ'ন তিনি।

১৫৭৩ সাল। আবার এক সৌভাগ্য-সূর্য্য উদয় হয় ভাট-জীবনে! 'রাজা' উপাধিতে সম্রাট তাঁকে আপ্যায়িত করেন পুনরায়। অভিনব রাজা এই অবধি 'বীরবর' বা 'বীরবল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বীরবল জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। বুন্দেলখণ্ডের কোন এক জনপদে নিবাস ছিল তাঁর। পূর্ব্বতন নাম ছিল মহেশ দাস। এই সময় কাঙ্গড়ার অধিপতি জয়চাঁদ—কোন এক গুরুতর অপরাধে দিল্লীতে কারারুদ্ধ ছিলেন। সম্রাট তাঁরই রাজ্য বীরবলকে প্রদান করতে সঙ্কল্প করেন। জয়চন্দ্রের তেজস্বী-পুত্র কিছুতেই মোগল-সম্রাটের কাছে নতি স্বীকার করেন না! পিতৃরাজ্য রক্ষায় অটুট তিনি। এদিকে সম্রাটের আদেশে হুসেনকুলি খাঁ কাঙ্গড়া রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু; বীরবল এই রাজ্য গ্রহণ করেন না শেষ পর্য্যন্ত। কলিঞ্জরের সন্নিকটে এক জায়গীর প্রাপ্ত হ'ন তিনি। মোগল-সম্রাট এই সময়েই তাঁকে সহস্র সৈন্যের অধিপতিরূপে বরণ করেন।

একদা যিনি ছিলেন চারণদলভুক্ত, সঙ্গীত ছিল যাঁর অহোরাত্রের ধ্যান-জ্ঞান, সেই বীরবলই কালক্রমে এক সহস্র সৈন্যের অধিপতিরূপে দুরূহ রাজকার্য্যাদিতে আত্ম-ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন! আকবরের গুজরাট আক্রমণ কালে বীরবল তাঁর সঙ্গীরূপে সমর-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন বীরবল। স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধি তেজস্বিতায় বহু দুর্গম-কার্য্য অকাতরে সম্পন্ন করেন তিনি। ইতিহাস বলে: তাঁরই সুযুক্তির প্রভাবে আকবরের ধর্মমতের পরিবর্ত্তন ঘটে।

১৫৮৩ সালে আফগানেরা আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কাবুলের সেনাপতি জৈন খাঁ আকবরের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হ'লে, বীরবল-ই ঐ সাহায্যকারী সৈন্যদলের প্রধান রূপে কাবুলে গমন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য মোগল-সম্রাটের! পরাজয়ের কালিমা তাঁদের উপরই নিক্ষিপ্ত হয়। বীরবল ও জৈন খাঁ অতিকষ্টে পশ্চাৎ হ'টে, একস্থানে শিবির স্থাপন করেন। আফগানেরা গভীর নিশীথে পুনরায় ঐ শিবিরে হানা দিয়ে, দুর্গম-গিরি সঙ্কটে বহু মোগল সেনাকে নিহত করে। এই সঙ্গে বীরবলেরও জীবনপাত ঘটে!

বীরবলের এ-হেন মৃত্যু-সংবাদে আকবর নিদারুণ শোকাতুর হ'ন। বীরবলের শবদেহের খোঁজ না পাওয়ায় আকবরের এই শোকের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। কিম্বদন্তী আছে, বীরবলের এরূপ মৃত্যু-সংবাদে বাদশাহ যা'তে মুহ্যমান হ'য়ে না পড়েন, সেজন্যে কেউ কেউ বীরবলের মৃত্যু-সংবাদ একবারেই সম্রাট-সমীপে গোপন করে এবং রটনা করে যে, বীরবল কাঙ্গড়ায় সন্ন্যাসী বেশে অবস্থান করছেন। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত 'এই রটনা' অমূলক বলেই প্রতিপন্ন হয়।

বীরবলের পুত্রের নাম ছিল লাল। লাল কিন্তু পিতার গুণাবলীর কোন অংশেরই অধিকারী হননি। পিতার উপার্জ্জিত সমুদয় সম্পত্তিই তিনি নষ্ট ক'য়ে ফেলেন। শেষ জীবনে বৈরাগের সঞ্চার হয় তাঁর মনে। গৃহ-সংসারের সমস্ত আসক্তি ত্যাগ ক'রে, সন্ন্যাসীর-বেশে সুদূর-অজানার পথে পাড়ি দেন তিনি।

আমাজানের বিভীষিকা

ননীগোপাল চক্রবর্তী

তোমরা জান, সবলের হাতে দুর্বল চিরকাল নাস্তেহাল হয়ে থাকে। কিন্তু এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম হতে দেখা গেছে। আমাজান নদীর নাম নিশ্চয় শুনে থাকবে। সেই নদীতে পিরায়া বা কেরাইব নামে একজাতের মাছ আছে। এদের কাছে ছোট-বড় ভেদ নেই; যাকে নাগালের মধ্যে পাবে তাকেই এরা ধারালো দাঁতের আঘাতে চোখের পলকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এদের আস্তানার আশপাশে একমাত্র কঠিন খোলসে ঢাকা প্রাণী ছাড়া আর কোন জলচর জীবের থাকবার উপায় নেই। হয়তো ভাবছ—আকারে না-জানি এরা কত বড়! কিন্তু শুনলে অবাক হবে—দৈর্ঘ্যে বারো থেকে জোর বিশ ইঞ্চি পর্যন্ত এদের

আকার। এরা ভারী রক্তপাগল। একবার একটু রক্তের গন্ধ পেলেই হলো, আর রক্ষে নেই। রক্তের নেশায় ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এসে আহতকে ছেয়ে ফেলবে পিরায়ার দল। তখন এদের ব্যূহ-ভেদ করে বেচারার আর পালিয়ে যাবার উপায়ই থাকে না। তাছাড়া, এসব রক্তপাগলের কাছে আপন-পর ভেদাভেদ নেই। শিকার আক্রমণের সময় দলের কেউ যদি দৈবাৎ আহত হয়, তবে সবাই মিলে তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে খেয়ে ফেলে। এজন্যে জাঁদরেল প্রাণীও এদের ঘাঁটাতে বড় একটা সাহস পায় না। এমন কি হাঙ্গর-কুমীর পর্য্যন্ত এদের বিলক্ষণ ভয় করে থাকে। যতটা সম্ভব এদের এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করে। দৈবাৎ এদের পাল্লায় এসে পড়লে কিংবা আক্রান্ত হলে পাল্টা আক্রমণ না করে ভেগে পড়বারই চেষ্টায় থাকে। অনেক সময় আবার রাগ সামলাতে না পেরে হাঙ্গর বা কুমীর এদের আক্রমণ করে থাকে। প্রথমদিকে অবশ্য হাঙ্গর-কুমীরেরই জয় হতে থাকে ; কারণ দু-চারটে পিরায়াকে ঘায়েল করা এদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু জলে ছড়িয়ে-পড়া রক্তের গন্ধে তাদের জাত-ভাইয়েরা ছুটে আসতে থাকে দলের পর দল। তারপর শুরু হয় আক্রমণ। কী সর্বনাশ! খানিক বাদেই দেখা গেল, জলজ্যান্ত প্রাণীটির দেহ থেকে খাবলা খাবলা মাংস কেটে নিয়ে তাকে বেমালুম সাবাড় করে ফেলেছে! তাই বলে মনে করো না, খিদের চোটেই বোধহয় এরা এরূপ হিংস্র হয়ে থাকে। আসলে এটা এদের মজ্জাগত স্বভাব। এইসব খুদে মাছের আসল শক্তি হলো—দলগত একতা।

রক্তপাগল পিরায়ার দলকে ভয় দেখিয়ে মোটেই ছত্রভঙ্গ করা যায় না। এখন কথা হচ্ছে—কী করে এরা শিকারের সন্ধান পায়? জলের মধ্যে কোন জন্তু চলাফেরা করবার সময় প্রায়ই একটা ঝপঝপ শব্দ হয়ে থাকে। তাছাড়া ডাঙ্গা থেকে কোন জন্তুজানোয়ার নদী পার হবার সময় ঝপাং করে জলে নেমে পড়ে। পিয়ারার পক্ষে এই শব্দটুকুই যথেষ্ট। আশপাশের পিয়ারারা শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে আসে। আর সঙ্গে সঙ্গেই শিকারটিকে করে আক্রমণ। তারপর রক্তপাতের ফলে আরম্ভ হয় কুরুক্ষেত্র। ঝাঁকের পর ঝাঁক এসে ছেয়ে ফেলে শিকারটিকে, আর দেখতে দেখতে তার দফা রফা হয়ে যায়। তাই তো এদের ফাঁকি দেবার জন্যে সেখানকার বাসিন্দারা একটা ভারী মজার কৌশল করে থাকে। মোষ অথবা গরুর পাল নিয়ে নদী পার হবার সময় তারা রোগাপটকা দেখে একটা গরু কিংবা বাছুর আগেই জলে নামিয়ে দেয়। সেটিকে নিয়ে যখন খুদে মাছের দল রক্তের নেশায় পাগল হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সুযোগে তারা গরু-মোষের পাল নিয়ে নদী পেরিয়ে পরপারে চলে যায়।

অন্যান্য মাছের ন্যায় এরাও স্বজাতীয়ের মাংস খেয়ে থাকে। বড়দের অত্যাচারে ছোটদের প্রায়ই লোপাট হয়ে যেতে হয়। তাছাড়া মানুষের মাংসেও কিন্তু এদের অরুচি নেই। না জেনে কেউ জলে নেমেছে কি মরেছে—তাকে আর জ্যান্ত ফিরে আসতে হবে না। মানুষ-খেকো পিরায়ার দল ধারালো দাঁতের সাহায্যে মিনিট কয়েকের মধ্যেই তাকে সাবাড় করে ফেলবে। লক্ষ্য ভেদেও এদের জুড়ি মেলা ভার। কেউ নৌকায় চড়ে যাচ্ছে ; হয়তো অজ্ঞানতে তার হাতখানা নৌকার ধারে রয়েছে। পিরায়ার নজরে পড়লেই হলো, আর যায় কোথায়! জলে থেকে লাফিয়ে ওঠে হাতের একটা আঙুল, নয়তো এক খাবল মাংস কেটে নিয়েই উধাও! ভেবে দেখ দেখি, কী সাংঘাতিক চিজ এরা।

মাছগুলো দেখতে বিদকুটে। চোয়াল দুটি খাটো, আর বেশ শক্ত। তবে উপরের চোয়ালটা খাটো হওয়ার জন্যে মুখটা ভয়ানক দেখায়। দেখতে অনেকটা বুলডগের মুখের মত। উপর ও নীচের চোয়ালে ক্ষুরের মত ধারালো দুপাটি দাঁত আছে। দাঁতগুলো এত ধারালো যে তোমার শরীরের যে কোন অংশ কেটে নিলেও মোটেই টের পাবে না। এদের দেহ কিন্তু বেশ রংচঙে। তলপেট ও লেজের রং লাল, পিঠের দিকটা সাদা ধবধবে আর মাথাটা সোনালী বর্ণের। তোমাদের মধ্যে যারা গোল্ড-ফিস দেখেছ তারা এদের রঙের বাহার অনেকটা আন্দাজ করতে পারবে।

হাঙ্গর-কুমীরে ভরা নদীতে পড়লেও হয়তো বা বাঁচবার আশা থাকে। কিন্তু পিরায়ার কবলে পড়লে কিছুতেই নিস্তার পাবার জো নেই। তবেই বল দেখি, রাক্ষুসে মাছ ছাড়া এদের আর কি বলা যেতে পারে? তবে ভাগ্যিস আমাজান নদী ছাড়া আর কোথাও এদের আস্তানার কথা বড় একটা শোনা যায় না। এরকম চিজ দু-একটা আমাদের চিড়িয়াখানায় থাকলে বেশ মজা হতো, কি বল?

শরীরকে সুস্থ রাখুন

'বিশ্বশ্রী' মনতোষ রায়

শরীরকে সুস্থ সবল রাখা খুব একটা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। একটু চেষ্টা করে আলস্য পরিত্যাগ করলেই আমরা তা করতে পারি। শরীরকে সুস্থ সবল রাখার একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে ব্যায়াম চর্চা। এই ব্যায়াম চর্চা সকলের জন্যই, তবে শারীরিক, মানসিক ও বয়সের অবস্থাভেদে তারতম্য আছে। আপনারা জানেন কি, দারিদ্র্যের অন্য কারণ, আমাদের এই শারীরিক দুর্ব্বলতা? শারীরিক দুর্ব্বলতা আমাদের জীবনে ভয়ঙ্কর এক অভিশাপ। আমরা শরীরকে অবহেলা করি বলেই আমাদের জীবনে নেমে আসে এই জাতীয় অভিশাপ। আপনার আশেপাশে একবার দেখুন, দেখতে পাবেন, এই অবহেলার দরুণ কমবেশী প্রতি সংসারেই একটা না একটা রোগ লেগেই আছে, আর এই রোগের পেছনে সাধ্যানুযায়ী খরচাও হচ্ছে প্রচুর। একটু কষ্ট করে শরীরটাকে ভাল রাখারই ব্যবস্থা করলেই এই খরচা অনায়াসে সেভিংস ব্যাঙ্কে যেতে পারে অথবা ঐ পয়সায় আপনি সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আনতেও পারেন। কাজেই দেখতে পাচ্ছেন, অভাব অনটনকে অদৃষ্টের পরিহাস বলে মেনে নেওয়াটা একটা প্রহসন মাত্র। শরীরের যত্ন আপনি অজ্ঞাতসারে যতটুকু করে থাকেন, জ্ঞাতসারে করলে তার দ্বিগুণ ফল আপনি পাবেন। সবচেয়ে বড় কথা হোল, শরীরকে যত্ন করাই বেঁচে থাকার পরিচয়।

আমরা খাই প্রয়োজনাতিরিক্ত, আর বিনা পরিশ্রমে অপচয় হয় তারচেয়ে বেশী। বিদেশীরা খায় কম, কিন্তু পরিশ্রমের দ্বারা সেটুকু শরীরের যথাযথ পুষ্টিতে লাগায়। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, অতিরিক্ত খেয়ে পরিশ্রম না করলে আলস্য আসে, কাজ না করবার নানান অজুহাত আসে। তারফলে আমরা সবদিক থেকেই ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ি। অতএব আমরা যে যতটুকু ভালমন্দ খাদ্য যাই খাই, সেই খাদ্যটুকু আবালবৃদ্ধবনিতার প্রত্যেকেরই পরিপূর্ণভাবে হজম করানো দরকার। এই হজমের ক্রিয়াটিকে শুদ্ধভাবে সাধিত করার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম ও পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে।

ব্যায়াম করার জন্য বিশেষ কোন স্থানের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি। আবার এও জানি, যে সবার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। যাঁদের পক্ষে সম্ভব তাঁরা কোন আদর্শ ব্যায়াম সমিতিতে গিয়ে শরীরচর্চার নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করুন। আর যাঁদের সে সুযোগ নেই তাঁরা নিজেদের ঘরে বা ছাদে প্রয়োজনমত শরীরচর্চার অনুশীলন করতে পারেন। যাঁরা ঘরে বসে যোগাভ্যাস করবেন, আমার এই প্রবন্ধে তাঁদের সম্পর্কেই কিছু বলব। এই যোগাভ্যাসের ফলে খাদ্য হজম সমস্যার সমাধান করে শরীরকে সুস্থ রাখার শক্তি আপনি লাভ করতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে যোগবস্তুটির অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে অল্প বিস্তর বলা প্রয়োজন মনে করছি, যাতে এই বিষয়টির প্রতি সহজেই আপনাদের শ্রদ্ধা জাগে। এককথায় বলা যেতে পারে—যোগ দেহের সর্ব্ববিধ রোগকে করে বিয়োগ। এর প্রধান কাজ হলো, শরীরের আভ্যন্তরীণ কলকব্জাগুলিকে সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখা। আমাদের দৈনন্দিন কর্ম্মে ধর্ম্মে এবং চিন্তার মাধ্যমে দেহের আভ্যন্তরীণ কলকব্জার চলৎশক্তি প্রতিনিয়তই ব্যাহত হয়ে থাকে। এই ব্যাহত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে দেহের এই আভ্যন্তরীণ কলকব্জার চলৎশক্তি অব্যাহত রাখার একমাত্র পন্থা হচ্ছে যোগব্যায়াম ও পরিমিত পরিশ্রম করা। আপনারা হয়ত দেখে থাকবেন যে বিনাপরিশ্রমী ব্যক্তি অসময়ে অকালে নিজেদের শরীরে একটা অস্বাভাবিকতা বোধ করতে শুরু করেন। এই বোধটা করতেন না—যদি তিনি পরিশ্রম এবং ব্যায়ামের সাথে প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করে আসতেন।

পূর্ব্বেই বলেছি, যোগ শরীরে সর্ব্ববিধ রোগকে করে বিয়োগ। কি করে এটা সম্ভব হয় জানেন কি? যোগাভ্যাসে শরীরে আভ্যন্তরীণ রক্তবহা নালী এবং বিভিন্ন গ্রন্থিরস নিঃসরণের ও গ্রহণের কাজগুলি সর্ব্বদার জন্য সহজ ও সক্রিয় থাকে। তাই যোগাভ্যাসকারীদের শরীরে সহসা কোন ব্যাধি দেখা দেয় না। যোগের প্রধান একটি কারণ হচ্ছে শরীরের অভ্যন্তরস্থ কলকব্জার আংশিক অক্ষমতা বা নিষ্ক্রিয়তা। কাজেই এখন নিশ্চয়ই মেনে নেবেন রক্ত ও গ্রন্থিরস যদি শরীরের বিভিন্ন কলকব্জাকে তাদের চাহিদামত যোগান দিতে পারে তাহলে ঐ সকল

যন্ত্রের অকাল বার্ধক্য আসে না এবং শরীর অকালে রোগজর্জ্জরিত হয় না। কাজেকাজেই অন্ততঃপক্ষে ২০।৩০ মিনিট যোগাভ্যাস করে সুস্থদেহে বেশীদিন বেঁচে থাকার আশায় যদি শরীরটাকে রোগমুক্ত করে আপনি কার্য্যক্ষমতা লাভ করতে পারেন তবে এই অমূল্য বস্তুটিকে কোন অবহেলা করবেন, তার জবাব দিতে পারবেন কি? যদি না পারেন, তাহলে আমার এই প্রবন্ধ পাঠের অব্যবহিত পরই যোগাভ্যাসের সঙ্কল্প গ্রহণ করুন। তাই আমি আপনাদের সবার অভ্যাসোপযোগী কয়েকটি যোগব্যায়ামের নির্দ্দেশ দিচ্ছি—এগুলি নিয়মিতরূপে পালন করবেন! যথা:—

1. Breathing—10times
2, Side Crossing—(6×2) 2 or 3 sets.
3. Hands up Squat—2 sets.
4. উড্ডীয়ান— 10×4
5. সর্ব্বাঙ্গাসন—
6. মৎস্যাসন—
7. অর্দ্ধকূর্ম্মাসন— } ৩ (৪০—৩০) সেঃ
8. ভুজঙ্গাসন—
9. যোগমুদ্রা—
10. শবাসন— ১০ মিঃ

এই ব্যায়ামগুলির পরিচিতির পূর্ব্বে, এইসব ব্যায়ামের সাথে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যে গ্রন্থিগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তাদের গুরুত্ব ও ক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বলে নিচ্ছি যাতে এই ব্যায়ামগুলির অভ্যাস যোগে একটি সুস্থ ধারণা আপনাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

প্রথমেই আসুন থাইরয়েড্ ও প্যারাথাইরেড্ গ্রন্থি প্রসঙ্গে। থাইরয়েড্ গ্রন্থি গলার সামনে নীচের দিকে অবস্থিত—এরা সংখ্যায় দুটি। কিন্তু প্যারাথাইরয়েডের সংখ্যা চারটি—এরা থাইরয়েডের উপরে ও নীচে সংলগ্ন থাকে। আমাদের শরীরে নানাকারণে যে সকল বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলিকে ধ্বংস করা থাইরয়েড গ্রন্থির অন্তর্মুখী রসের প্রধান কাজ। আমাদের দেহের সর্ব্বাঙ্গীণ বৃদ্ধিও থাইরয়েডের সুস্থতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। এই গ্রন্থির দুর্ব্বলতায় কোষ্ঠবদ্ধতা, পরিপাকশক্তি হ্রাস, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, মেদবৃদ্ধি ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। প্যারাথাইরয়েড্ যদিও এতগুলি কাজ করে না, কিন্তু যে কাজটি করে সেটি শরীরের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন খাদ্যের সঙ্গে আমাদের শরীরে যে ক্যালসিয়াম যায় সেই ক্যালসিয়াম কিছুতেই শরীরের কাজে লাগত না—যদি না প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থি এ বিষয়ে সাহায্য করত।

এবার যে ছোট গ্রন্থিটির কথা বলব তার নাম পিটুইটারি। এই গ্রন্থিটি মাথার নীচে করোটির মধ্যে একটি অস্থিগহ্বরের মধ্যে অবস্থিত। এর সামনের অংশকে অ্যান্টিরিয়ার পিটুইটারি এবং পিছনের অংশকে পোষ্টিরিয়ার পিটুইটারি বলা হয়। গ্রন্থিটি দেখতে ছোট হলেও এর কাজ খুব কম নয়। এই গ্রন্থিটি যদি জন্ম থেকেই অকর্ম্মণ্য হয়, তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে দেহের ও মনের পরিবর্ত্তন স্বাভাবিকভাবে হয় না। কোন কারণে যদি গ্রন্থিটি দুর্ব্বল হয়ে যায় তাদের অকালবার্দ্ধক্যকে আপনি আর কোনক্রমেই রোধ করতে পারবেন না।

সংস্কৃতে ক্লোম বলে একটা কথা শুনে থাকবেন, তারই ইংরেজী নাম হোল প্যান্ক্রিয়াস্। এই প্যান্ক্রিয়াস হচ্ছে আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় গ্রন্থিগুলির অন্যতম। এই গ্রন্থিটি পেটের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কটি কশেরুকার (Lumber vertebrate) সামনে অবস্থিত। এই গ্রন্থির বহির্মুখী পাচকরস ডুওডিনামে যে খাদ্যবস্তু আসে তার পরিপাকে সহায়তা করে। কিন্তু এর অন্তরস ইনসুলীন খাদ্যের সারবস্তুকে দেহের শক্তিতে পরিণত করে। এর অভাবে রক্তে শর্করারপরিমাণ বেড়ে যায় এবং বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হয়। কাজেই বুঝতে পারছেন এই গ্রন্থিটিকে সুস্থরাখা আমাদের শরীরের পক্ষে কত দরকারী।

এবার মেয়েদের শরীরের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থি ওভারির কথা বলে গ্রন্থিতত্ত্বের আলোচনা শেষ করব! ওভারি সংখ্যায় দুটি। মেয়েদের তলপেটের ভিতর জরায়ুর দুইপার্শ্বে এই গ্রন্থিদ্বয় অবস্থিত। নারীত্বের বিকাশ সম্পূর্ণরূপেই এই গ্রন্থির উপর নির্ভরশীল। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থির অক্ষমতার ফলে নানারূপ স্ত্রীব্যাধির উৎপত্তি হয়ে থাকে।

এখন বুঝতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, আমাদের শরীরের সুস্থতা ও কর্ম্মক্ষমতা বজায় রাখতে হলে এই গ্রন্থিগুলির কতখানি সহযোগিতা প্রয়োজন কাজেই যদি আপনিও এদের সহযোগিতা পেতে চান, তবে যোগাভ্যাসের মাধ্যমে আপনিও এদের সহযোগিতা করুন। এবার আমি পূর্ব্বোক্ত ব্যায়ামগুলির বিশদ বিবরণ দেবার চেষ্টা করছি। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখুন 'set' মানে বার বা দফে এবং এক এক সেটে নিজের সাধ্যানুযায়ী যতবার আপনি করতে পারেন তাকে বলা হয় Repeatition বা পুনরাবৃত্তি।

1 Breathing—পা জোড়া করে দাঁড়ান। দু'হাত পিছনে ধরুন। এরপর পেট টেনে বুক উচু করতে করতে খুব ধীরে ধীরে নাক ফুলিয়ে দম নিন এবং ধীরে ধীরে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দম ছাড়ুন, পেট ও বুক শিথিল করুন। এইভাবে ১০ বার অভ্যাস করবেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখুন প্রতি ব্যায়াম ও আসনেই নাক দিয়ে দম নেবেন এবং ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দম ছাড়বেন। আমরা সব সময়েই দম ছাড়া নেওয়া করছি। কিন্তু এই বিশেষভাবে দম ছাড়া নেওয়ার উদ্দেশ্য হোল হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুসকে ব্যায়ামে যে পরিশ্রম হবে তার সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া।

2 Side crossing—২।৩ হাত পা ফাঁক করে দাঁড়ান। হাত দুটি কাঁধের সমান্তরালে পাশাপাশি লম্বা করে দিন। প্রথমে দম নিয়ে নিন। এবার দম ছাড়তে ছাড়তে হাঁটু সোজা রেখে ডান হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন এবং বাঁ হাতের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে সোজাসুজি তাকান। এবার দম নিতে নিতে সোজা হয়ে উঠে হাত কাঁধের সমান্তরালে লম্বা রেখে দম ছাড়তে ছাড়তে অপরদিকে ঐ একইভাবে করুন। দু'দিকে দুবার হোল। এভাবে (৬×২=১২ বার) ১ সেট করে একটু বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় অভ্যাস করুন। একটু তাড়াতাড়ি করবেন।

মোট ২ অথবা ৩ সেট করবেন। এই ব্যায়ামে মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বৃদ্ধি হয়, কোমরের চর্ব্বি কমে এবং কিডনী সক্রিয় হয়।

3 Hands up squat—১/২ হাত মত পা ফাঁক করে দাঁড়ান। হাত মুঠো করে দম নিতে নিতে হাত মাথার উপর তুলতে তুলতে বসুন। আবার দম ছাড়তে ছাড়তে হাত নামাতে নামাতে উঠে দাঁড়ান। এইভাবে ২ সেট করুন। তাড়াতাড়ি করবেন। এই ব্যায়ামে হাত ও পায়ের পেশীর শক্তি বৃদ্ধি হয় ও বুকের গঠনকে সুন্দর করে।

4 উড্ডীয়ান—হাঁটু মুড়ে বসে হাত হাঁটুতে রেখে দম নিয়ে দম ছেড়ে দিন। এখন ঐ বদ্ধ অবস্থায় পেটটাকে একটু দ্রুত ভিতরে টানুন ও শিথিল করুন—একসঙ্গে ১০ বার করুন। মোট ৪ দফে করবেন। এই মুদ্রায় প্লীহা, যকৃত ও অন্ত্র সক্রিয় হয়। ফলে পরিপাক ক্রিয়ার উন্নতিসাধনে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণে এই মুদ্রা যথেষ্ঠ সহায়তা করে।

5 সর্ব্বাঙ্গাসন—চিৎ হয়ে শুয়ে কাঁধের উপর শরীরের ভর রেখে কোমরে হাত দিয়ে চিত্রানুযায়ী পা দুটো উপরে তুলুন। এই অবস্থায় ১/২ মিঃ ধীরে ধীরে দম ছাড়া নেওয়া করে, হাঁটু ভেঙ্গে কোমর মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ১/২ মিঃ শবাসনে বিশ্রাম নিন। এইভাবে ৩।৪ বার করুন। এই আসনে থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড ও থাইমাস গ্রন্থি সক্রিয় ও সুস্থ থাকে, টনসিলেরদোষ দূর হয় এবং স্নায়ুর সবলতা বৃদ্ধি হয়।

6 মৎস্যাসন—পদ্মাসনে বসে চিৎহয়ে শুয়ে মাথার তালু মাটিতে রেখে পিঠ মাটি থেকে কিছুটা তুলুন। হাঁটু যেন মাটিতে থাকে। হাত দিয়ে পায়ের আঙ্গুল ধরুন অথবা হাত হাঁটুতে রাখুন। এবার পেটটাকে টেনে বুক উঁচু করে ধীরে ধীরে দম নিন এবং আবার পেট শিথিল করে দিয়ে দম ছাড়ুন। এইভাবে ১/২ মিঃ দম ছাড়া নেওয়ার পর লম্বালম্বি চিৎ হয়ে শুয়ে ১/২ মিঃ শবাসনে বিশ্রাম নিন। এই ভাবে ৩।৪ বার অভ্যাস করবেন। এই আসনে প্যারাথাইরয়েড, থাইরয়েড ও থাইমাস গ্রন্থির কাজও খুব ভাল হয়, বুকের খাঁচার যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি দূর হইয়া ফুসফুসের শক্তি বৃদ্ধি করে।

7 অর্দ্ধকূর্ম্মাসন—হাঁটু মুড়ে বসুন। মাথার উপর হাত তুলে দম নিন, এবার দম ছাড়তে ছাড়তে চিত্রানুযায়ী কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে, হাত লম্বা করে ১/২ মিঃ ধীরে ধীরে দম ছাড়া-নেওয়া করুন। তারপর শুয়ে পড়ে ১/২ মিঃ শবাসনে বিশ্রাম নিন। এইভাবে ৩।৪ বার অভ্যাস করুন। এই আসনে লিভার, প্লীহা ও পরিপাকের অন্যান্য যন্ত্রাদি সুস্থ থাকে। পেটের বায়ু দূর করে।

8 ভুজঙ্গাসন—পা জোড়া করে উপুড় হয়ে পড়ুন। চিত্রানুযায়ী দুই হাত কাঁধের সমান্তরালে মাটিতে রাখুন, কনুই কোমর সংলগ্ন থাকবে। এবার দম নিয়ে তলপেট পর্য্যন্ত মাটিতে রেখে উপরের অংশ (কোমর থেকে মাথা) তুলুন। হাতের উপর বেশী ভর দেবেন না, কোমর ও শিরদাঁড়ার উপর ভর দিন। এই অবস্থায় ১/২ মিঃ দম ছাড়া নেওয়া করে শুয়ে পড়ুন এবং শবাসনে ১/২ মিঃ বিশ্রাম নিন। এই ভাবে ৩।৪ বার করুন। এই আসনে ওভারীর কাজ খুব ভাল হয়, মেরুদণ্ড নমনীয় এবং হৃদপিণ্ড সরল হয়।

9 যোগমুদ্রা—পদ্মাসনে বসুন। চিত্রানুযায়ী হাত দুটি পিছনে ধরুন। এবার দম ছাড়তে ছাড়তে কপাল মাটিতে ঠেকান এবং ঐ অবস্থায় ১/২ মিঃ দম ছাড়া নেওয়া করার পর শবাসনে ১/২ মিঃ বিশ্রাম নিন। এইভাবে ৩,৪ বার করুন। এই মুদ্রায় কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। পেটের বায়ু দূর হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

10 শবাসন—সবশেষে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখবুজে শরীরটাকে শিথিল করে ১০ মিঃ বিশ্রাম নিয়ে নিজেকে জিগ্যেস করুন—কেমন লাগছে? এই সময় শরীরকে সম্পূর্ণভাবে শিথিল করে দেবেন এবং ব্যায়ামগুলির উপকারিতার কথা একমনে চিন্তা করবেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—সে হল শ্বাস প্রশ্বাস। এই শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ যদি ব্যায়াম অভ্যাসের সময় ঠিকমত করতে পারা যায় যোগ ও ব্যায়ামের অন্তর্নিহিত শক্তি নিজ সামর্থ্যের আওতায় আনা খুবই সহজ সাধ্য হয়। অতএব এই শ্বাস প্রশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বলা দরকার মনে কচ্ছি।

আমাদের গলার ভেতর দুটো মুখ আছে। একটা শ্বাসনালী, আর অপরটি খাদ্য নালা। এই দুটো নালা এক সঙ্গে কখনো কাজ করেনা। ভগবানের গঠন প্রণালী কি চমৎকার। খাবার সময় শ্বাসনালীর ভেতর যাতে খাবার ঢুকে না যায় সেজন্য মুখে একটা ঢাকনা থাকে। খাবার সময় নিজে থেকেই তা বন্ধ হয়ে যায়—তবে এলো পাথারী খাবার গিললে কিম্বা অন্যমনস্ক হয়ে—হেসে, বেশী কথা বলে খেতে গেলে অনেক সময় শ্বাস নালীতে—খাবারের টুকরা ঢুকেগিয়ে কাসির সৃষ্টি হয়—তাকেই বলি আমরা 'বিষম' লাগা এবং এই কাসির ধাক্কায় ঐ

খাবারের টুকরোগুলি বেরিয়ে এসে স্বস্তি দেয়। সুতরাং বুঝে দেখুন একটু আধটু কারণে শ্বাস নালী বাধা থেকে কি রকম অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এই শ্বাস নালা ফুসফুস যন্ত্রের সঙ্গে মিশেছে। ফুসফুসের নিজস্ব কোন শ্বাস নেই। শ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাসটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে নালাতে ঢোকে। তার পর ঐ দুটো নালা থেকে আবার অনেক গুলো ছোট ছোট নালীতে ঢুকে যায়। ঐ শ্বাসনালী দিয়েই ফুসফুসে হাওয়া নেওয়া দেওয়ার কাজ দিনরাত সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলছে।

এই ফুসফুসে যখন হাওয়ায় ভরে যায় তখন ডান দিকের ভাগে ৪টি ছোট ছোট কুটুরী এবং বাঁ দিকে দু'টি ছোট্ট কুঠরী দেখতে পাওয়া যায়। এই ছোট্ট ছোট্ট কুঠরী গুলি অসংখ্য বায়ুকোষে ভরা। এই গুলিকে রক্ষা করার জন্য ঘিরে রয়েছে অসংখ্য জাল। বাইরের বায়ু এমনি ভাবেই রক্তের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটায়।

সুতরাং ভুলপ্রথায় শ্বাস নিলে বা ছাড়লে শরীরে রক্ত পরিচালনায় নানা রকম গণ্ডগোল ঘটে। তাই ফুসফুসের সঙ্গে যে সব অসংখ্য বায়ুকোষ এবং রক্তবাহী নালী রয়েছে তারা প্রয়োজন মত রক্ত পায়না বলেই ফুসফুস ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে এবং কোন কারণে বেশী চাপ পড়লে ফুসফুস তার কাজ সঠিক ভাবে করতে পারেনা এবং ধীরে ধীরে ফুসফুসের রোগ দেখা দেয়। এই শ্বাস নেওয়া ছাড়ার ওপর পেটের আভ্যন্তরীণ যন্ত্র গুলিরও কাজের ভাল মন্দ গতি নির্ভর করে। সুতরাং শ্বাস গণ্ডগোল হলে পেটের ও পীড়া দেখা দেবে তাতে কোন আশ্চর্য্য নেই।

সুতরাং ব্যায়াম অভ্যাস কালে যদি প্রথামত শ্বাস নেওয়া ছাড়ার কাজটি করা যায় ফুসফুসে বা পেটের কোন রোগ দেখা দিলেও তা ভাল হয়ে যেতে পারে এমন ক্ষমতা তার আছে।

আমরা যে বায়ু নাক দিয়ে টেনে নিই, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন থাকে বা থাকা উচিৎ। তবেই ভেতরকার দুষিত বায়ু মানে কারবনডায়কসাইডকে টেনে বের করে দেবার কাজ সম্ভব হয়। তাইতো উচিৎ আমাদের মুক্ত স্থানে যোগ ব্যায়াম করা, সকাল সন্ধ্যা মুক্ত স্থানে ভ্রমণ বা প্রাণায়াম করা।

অতএব যখন আপনারা ব্যায়ামকালীন শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ কোরবেন তখন বুক ফুলিয়ে—১ থেকে ৮,১০।১২।১৫ মনে মনে গুনতে গুনতে শ্বাস নেবেন এবং ঐ সংখ্যাই গুনতে গুনতে ছাড়বেন—তাতে ফুসফুসের তো উপকার হবেই—উপরন্তু বুকের খাঁচা বড় হবে—রক্ত বিশুদ্ধ হবে—পেটের যন্ত্রগুলিতে সর্ব্বদার জন্য একটা মালীশের মত কাজ হয়ে মজবুত করবে। শরীরও ধীরে ধীরে সুন্দর সুঠাম হতে থাকবে।

ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল। দরজার বাইরে খবরের কাগজটা উড়ে উড়ে খচ্ খচ শব্দ করছিল।

দরজাটা অনেক বেলা অবধি বন্ধ রইল। তা দেখে অবশ্য কারুর সন্দেহ হয়নি। ছাত্রটির প্রথমে চোখে পড়ল। তার মনে হলো গত তিন বছর ধরে দেখছে, এই সময়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি দরজা খুলে, দরজার কাছে চেয়ারে বসে বসে কাগজ পড়েন। কাগজ পড়তে পড়তে চা খান।

তার ক্লাস ছিল। বেরিয়ে যাবার সময়ে নিচের দোকানে জিজ্ঞাসা করল —ওপরের ঘরে চা দিসনি আজ ?

—বাবু দরজা খুলল না।

—কাল রাতে খাবার দিয়েছিলি ?

—হ্যাঁ।

ছেলেটি আর সে কথা ভাবল না। ভাববার সময় ছিল না। কিন্তু বেলা দেড়টার সময়ে যখন দেখা গেল তখনো দরজা বন্ধ। কাগজটা ভাঁজ খুলে তখনো নিষ্প্রাণ খচ্ খচ শব্দ করছে, হোটেলের চাকরটি যখন জানাল— দুপুরের খাবার দেবার সময়েও বাবু দরজা খোলেনি, তখন তার সন্দেহ হলো।

সে-ই দু'চারজনকে ডাকল। সে-ই প্রেসের লোকটিকে আনল। নাইট ডিউটি সেরে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন।

তারপর ধাক্কাধাক্কি। তারপর স্কাইলাইট গলে হোটেলের ছেলেটাকে নামিয়ে দেওয়া। দরজা খোলানো।

ভদ্রলোক বিছানায় আড় হয়ে পড়েছিলেন। খাবারের থালাটা তেমনি পড়ে আছে। গেলাসটা উল্টে পড়েছে। বোধ হয়, একটা কিছু ধরতে চেয়ে ভদ্রলোক বিছানার চাদরটা খিমচে ধরেছিলেন। একটা মাছি তাঁর ঠোঁটে বসছে আবার একটু ঘুর দিয়ে উড়ে ফিরে আসছে।

ঘরের বাতিটা হলদে মিটমিটে আলো ছড়িয়ে জ্বলছে।

নামটা সবাই জানত মিত্রবাবু বলে। এখন জানা গেল তাঁর নাম সোমেশ মিত্র। কিন্তু স্যুটকেশ হাতড়ে পকেট হাতড়ে কোন হদিশ মিলল না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কারো নাম নয়। শুধু টেবিলে একটা পোস্টকার্ড পড়েছিল। তাতে অপরাজিতা দাশ-এর নিউ আলিপুরের ঠিকানা ছিল।

শেষ অবধি শবদাহের ব্যবস্থা ছেলেটিকে-ই করতে হলো। সৎকার সমিতিতে খবর দেওয়া, ডাক্তারকে জানানো, এই সব করতে রাত গড়িয়ে গেল। ভদ্র-লোককে চিনত না, জানত না, তবু ঘরখানার শূন্যতা ছেলেটিকে একটা ধাক্কা দিল।

মৃত ভদ্রলোকের জিনিস-পত্রের দায়িত্ব নিতে কেউ রাজী হননি। একজন মানুষ এমন নিরাত্মীয়, নির্বান্ধব, একলা ছিলেন, এ কথা গ্রহণ করতে ছেলেটির কষ্ট হচ্ছিল। সে তাই তাঁর কাগজ-পত্র দেখতে থাকল। স্যুটকেশের তলায় কয়েকটি পুরণো ছবি পাওয়া গেল। একটি সুন্দরী মহিলা এবং দুটি ছোট ছেলে-মেয়ের ছবি। ছেলেমেয়ে দুটির পাঁচ বছর থেকে দশ বছর পর্যন্ত নানা ভঙ্গীর ছবি। মহিলাটির বেশী বয়সের ছবি। ঘরের কোণায় পুরণো কাগজে জড়ানো কতকগুলো বই। আর টেবিলের নিচে টুকরিতে ছেঁড়া কাগজ, খাতার স্তূপ।

বইগুলো ধুলো ঝেড়ে দেখল ছেলেটি। বিশ পঁচিশ বছর আগেকার মাসিকপত্র সব। সে সব কাগজের একটি কি দুটি আজও নামে টিঁকে আছে, অন্যগুলির হদিশ নেই। একখানা বিবর্ণ চটি কবিতার বই। নাম অন্তর্লীনা। লেখক সোমেশ মিত্র। বইটির প্রথম পাতায় সবুজ কালিতে লেখা আছে আর্থার সাইমন্‌সের দুটি লাইন—

'Once crowned by you now I abdicate
All other crowns and prefer to be a
begger at your gate.'

সোমেশ মিত্র। ধুলোর জাল সরিয়ে নামটা যেন ছেলেটির মনে উঁকি দিতে চাইল।

মাসিকপত্রগুলোতে তরুণ কবি সোমেশ মিত্র-র কবিতার পাশে লাল পেনসিলের দাগ। বিভিন্ন কাগজে একই সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি প্রেমের কবিতা।

সোমেশ মিত্রর অন্তর্লীনার অজস্র প্রশংসাসহ সমা-লোচনা। আবার, তারপরের কাগজগুলোতে সোমেশ মিত্র কাব্য-জগত থেকে বিদায় নেবার জন্যে অনুযোগ, অভিযোগ।

কবিতাগুলো উলটে-পালটে দেখল ছেলেটি। আধুনিক কাব্য নিয়ে ডক্টরেট নেবার ইচ্ছে রাখে বলেই এই বিস্মৃত কবির নামটি সে মনে করতে পেরেছে।

হ্যাঁ। উনিশশো ছত্রিশ সাঁইত্রিশে সোমেশ মিত্রের নাম শোনা গিয়েছিল বটে। সে দেখতে লাগল। কবিতা-গুলোর মধ্যে সেদিনের আধুনিক কবিদের প্রভাব পাতায় পাতায়। আধুনিক কবিরা যেন সোমেশ মিত্রের আশে-পাশে ভীড় করেছিলেন। 'চিল', 'মৃত নদী' 'শূকরীর আর্তনাদ' এই সব কথার ব্যবহারে জীবনানন্দ দাশকে মনে পড়লো তার। 'চুলের সবুজ ছায়া' 'একবেণী হিয়া'-তে সুধীন দত্ত এবং 'বন্দরের একাকী জাহাজ', 'মৃত প্রেমিকের শব', এই সব এক একটি কথা এক একজনের কাছে ধার করা। ধার করা ভাষা নিয়ে প্রেমের কবিতা। হ্যাঁ! প্রেমেরই, সবই কবির অন্তর্লীনা মেয়েটির উদ্দেশে রচিত।

ছেলেটি মনে করতে পারল একদিন সোমেশ মিত্র তরুণ প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ছেঁড়া কাগজ আর খাতাগুলোও সে দেখল। কবিতা। দুই চার লাইন লিখে লিখে ছিঁড়ে ফেলা। খাতাটিতে দুটি সনেট। দুটিকেই অন্তর্লীনার কবিতার পুনরাবৃত্তি বলে বোধ হলো ছেলেটির। হয়তো সোমেশ মিত্রর-ও তাই মনে হয়েছিল। তাই কি তিনি লেখাগুলো ছিঁড়ে ফেলেছেন?

ছেলেটি শেষ অবধি অপরাজিতা দাশকে ফোন করল।

—কথা বলছি।

ওপার থেকে ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলার জবাব এল। ছেলেটি বললো। ভদ্রমহিলা একটু চুপ করে রইলেন। বললেন—আমায় জানাচ্ছেন কেন?

—কেননা আপনার ঠিকানা ছাড়া অন্য কোন ঠিকানা পাইনি।

—শুনুন, আমি আজ শান্তিনিকেতন যাচ্ছি। পরশু আমার লোক যাবে। তার কাছে জিনিষ-পত্রগুলো, অর্থাৎ কাগজপত্রগুলো দিয়ে দেবেন।

—বিছানা? জামা-কাপড়?

—সে বিষয়ে আপনি যা চান করতে পারেন।

ছেলেটির মনে কেন যেন একটা বিদ্বেষ জমে উঠেছিল। তাই দুদিন বাদে যখন কিংসওয়ে ডজ চালিয়ে লোকটি এল, তার হাতে সে ভাঙা স্যুটকেশ, ময়লা বিছানা, দাড়ি-কামাবার মগ আর কাগজ ফেলবার বাক্স, সবই দিয়ে দিল। বইটা সে দিল না। বইটা তার কাজে লাগতে পারে। এবং সে ভাল করেই বুঝল একদিন—একজনের অন্তর্লীনা মেয়েটির কাছে আজ ঐ বইটির কোন দামই নেই।

ছেলেটি কেরিআর বুঝত। এম-এ পাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে কাগজ-পত্রের অফিসে ঘোরাঘুরি করে আধুনিক বাংলা কবিতার ওপর সে কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপল। সে সব প্রবন্ধে, এক নিরাসক্ত তৃতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার প্রচেষ্টা পাতায় পাতায় বিদ্যমান। ছেলেটি আবেগ এবং ভাবপ্রবণতাকে ভয় পায়। তাই, সে 'অনর্হ', 'অর্লোনা', 'অনঘ', 'ক্রম্যমাণ', 'গূঢ়ৈষা' এই সব শব্দ ব্যবহার করে তার লেখার অন্তরঙ্গ সুরটি ঢাকবার চেষ্টা করল।

এই শতকের তৃতীয় দশকের কয়েকজন কবি, যাঁরা সামান্য দিনের জন্যে লিখেছেন, তারপর আর লেখেননি, তাঁদের নিয়ে সে বিশদ আলোচনা করল। তারপর সামান্য পুঁজি নিয়ে, সমসাময়িক কবিদের প্রভাবের ছায়া ধার করে যাঁরা কবিতা লিখেছিলেন, তাঁদের কবিতাকে টুকরো টুকরো করে ব্যবচ্ছেদ করল। তার মধ্যে সোমেশ মিত্র এবং অন্তর্লীনাও এলেন।

অন্তর্লীনার প্রতিটি সনেট ও কবিতাকে ব্যবচ্ছেদ করতে করতে তাতে বিভিন্ন কবিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়া আর কিছুই রইলনা। সোমেশ মিত্র-র ভাগে আন্তরিকতা, প্রেম ও গভীর ছাড়া আর কিছু দিতে পারল না ছেলেটি। প্রবন্ধগুলো নিয়ে কিছু বাদ প্রতিবাদ হলো।

ছেলেটি তা-ই চেয়েছিল। যেমন করে হোক, তার নামের পরিচিতি এবং মেধাবী ছাত্রের মতো পরীক্ষাতে ভাল ফল করে। এই সব প্রবন্ধকে ভিত্তি করে আর এই জিনিস লিখে সে দুই বছরে এক বে-সরকারী কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে ঢুকতে পারল। সে ব্যবহারের সৌজন্যে, ও স্বভাবের গাম্ভীর্যে জনপ্রিয় হতে পারল। আস্তে আস্তে তার ফ্ল্যাটে সন্ধ্যে বেলা তার অধ্যাপক ও অন্যান্য বন্ধুরা একটি গোষ্ঠি গড়ে তুলল। বুক-শেলফে কাব্য সাহিত্য ও সমালোচনার বই, গল্প উপন্যাসের লক্ষণীয় অনুপস্থিতি, দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের স্কেচ, বাঁকুড়ার সংকীর্ণ, পোড়ামাটির ঘোড়া ইত্যাদি, যা যা তার স্বপ্নে ছিল, সবই হলো।

তার বন্ধু বললো—এখন তোমার প্রেমে পড়া বাকি।

ছেলেটী প্রেমের কথায় গম্ভীর হলো। সে বললো—না। প্রেমে আমি বিশ্বাস করি না। আজকের খণ্ডিত দ্রুতগতি জীবনযাত্রার মধ্যে বিরাট, সর্বব্যাপী প্রেমের কোন স্থান নেই।

—প্রেম ছাড়া-ই বিয়ে করবে তুমি?

—যাকে বিয়ে করব, তার সঙ্গে পরিচয় করতে চাইব। আলাপ করতে চাইব। কি আশ্চর্য, প্রেম যদি আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তা'হলে তাকে আমি জানব কি করে? চিনব কি করে?

—কিন্তু ভাল না বাসলে কোন মেয়ে তোমাকে তার সঙ্গে গভীর ভাবে মিশতে দেবে কেন?

ছেলেটি বন্ধুর কথার যথার্থ্য বুঝতে পেরে চুলে আঙুল চালিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর তাদের আলোচনা মানুষ ছেড়ে সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, ইয়োরোপে চিন্তার দৈন্য ইত্যাদি বহু পথ ঘুরে ফিরে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনে গিয়ে দাঁড়াল। দুজনের একজন-ও সে বিষয়ে কিছু বলবার মতো অভিজ্ঞতা রাখে না। অতএব আলোচনাটা সেখানেই থামল।

এই আলোচনা, চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে, তার ঘরে ভাড়াটে পাখার কর্কশ শব্দ শুনতে শুনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলো ছেলেটির। তার কাছে এর চেয়ে আর কিছুই ভাল লাগছিল না ইদানীং। এরই মধ্যে সে আনন্দ পাচ্ছিল, জীবনের স্বাদ পাচ্ছিল।

এই সময় তাদের আলোচনায় সোমেশ মিত্র আবার পুনরুজ্জীবিত হলেন।

সন্ধেবেলা এই ঘরে চার পাঁচজন অধ্যাপক ছিলেন। ছেলেটির বন্ধুবান্ধব স্থানীয় সকলেই। সকলেই কাঁধে মনিপুরী ব্যাগ ঝুলিয়ে কলেজে যায়। সকলেই পড়াশোনার-ব্যাপারে অত্যন্ত দায়িত্বশীল। সাম্প্রতিক বাংলা পত্রপত্রিকা-র সম্পর্কে সকলেই প্রায় নিরাশ। অতএব তারা একটি সাহিত্য ও সমালোচনা ত্রৈমাসিক প্রকাশ করবার প্রয়াসী।

সত্যিকারের সমালোচনার আজ দেখা মেলেনা এবং সত্যিকারের সমালোচনা ছাড়া এই সাহিত্যকে বাঁচানো যাবে না, সে বিষয়ে এরা সকলেই একমত।

হঠাৎ সাহিত্যিক এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কথা উঠলো। যে প্রিয়দর্শন, অর্থবান, ইংরাজীর অধ্যাপকটি এই গোষ্ঠিতে সবচেয়ে নতুন অতিথি, সে সব চেয়ে মনদিয়ে শুনছিল। গৃহকর্তা বলছিল—

—আমাদের দেশ থেকে সাহিত্যের পাণ্ডাদের এই প্রবেশ নিষেধ না তুলে নিলে উপায় নেই। সাহিত্যের আচার্যদের দেবতা না বানিয়ে আমরা স্বস্তি পাই না। তাঁরা যে মানুষ ছিলেন, সুখ, দুঃখ, লোভ, এই সব মানুষী বৃত্তিতে তাঁরা-ও বাঁধা পড়েছিলেন, সে কথা আমরা ভাবতে চাইনা। অথচ, তাঁদের জীবনকে সম্পূর্ণ উত্তেজিত না করলে আমরা তাঁদের সাহিত্যকে নতুন অন্তরঙ্গ চোখে দেখতে পারব না। একেই তো কালের ব্যবধান তাঁদের সাহিত্যকে-ও খানিকটা সুদূর করেছে। আমরা তাঁদের বিচার করি, আলোচনা করি। আমরা মনে করি তাঁরা কাল-চিহ্নিত হয়েছেন। এখন, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনকে খোলাখুলি ভাবে জানতে দিলে, তাকেই তাঁদের সাহিত্যে আমরা সেই জীবনের প্রতিফলন খুঁজব। বলা যায় না, তাতে হয়তো অনেকে আমাদের মনে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করবেন।

আর একজন বললো—

—সে কথা সত্যি। ইয়োরোপে এই জীবন ব্যবচ্ছেদ এক চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌছিয়েছে। তাই গ্যে-টর অসংখ্য বান্ধবী সম্পর্কে আমরা জেনেছি। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে তাঁদের পেয়েছি। বলতে নেই, অ্যানেট ভ্যালোনকে কবর খুঁড়ে বের না করা পর্যন্ত ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে আগ্রহ বেশ ঝিমিয়ে এসেছিল।

গৃহস্বামী বললো—আমি একজন বিস্মৃত কবিকে জেনেছিলাম। অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পরে। এ কথা-ও বলবো তাঁর কবিতা, সে সময়ে যত প্রশংসা-ই পাক না কেন, নেহাৎই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি। মানুষটিকে আমি জানি না। তবে, কবি হিসাবে তিনি যদি আরো স্মরণীয় হতে চাইতেন, আরো লিখতেন, আমি তাঁর জীবন সম্পর্কে উৎসাহী হতে পারতাম।

—সোমেশ মিত্র?

—হ্যাঁ। তবে কবি হিসেবে যেহেতু তাঁর কোন জায়গাই নেই, সে হেতু তাঁকে নিয়ে টানাটানি করবার উৎসাহ আমার কোনদিনই জোগাল না। তারচেয়ে তাঁর বইয়ে যাঁর কবিতা লেখা ছিল, সেই আর্থার সাইমন্‌দ, এবং তাঁর অ্যামোরিস্ ভিক্টিমা সম্পর্কে আমার বেশী জানতে ইচ্ছে করে। কবি হিসেবে তিনি ও স্বল্পপঠিত।

—আমার একটা কথা মনে হয়। নতুন আগন্তুকটি বললো। তার মুখে একটা স্মিত, প্রায় কৌতুক-ঘেঁষা হাসি খেলছিল। সে বললো—

এমনও হতে পারে হয়তো সোমেশ মিত্রের কাছে জীবনটা তাঁর কবিতার চেয়ে অনেক বড় হয়ে উঠেছিল। মনের আলোকে চিহ্নিত যাকে প্রকাশ করবার জন্যে তিনি কলম ধরেন। এবং তাঁর সেই আবেগ যখন সাড়া পেল, উত্তর পেল, জীবনেই তাকে উপলব্ধি করলেন। তাই আর কবিতা লিখলেন না। তাঁর করিতা যতই প্রভাবিত হোক না কেন, তার আবেগ, তার উত্তপ্ত হৃদয়কে আপনি অস্বীকার করতে পারেন কি?

—আবেগ এবং উত্তপ্ত হৃদয়। উত্তপ্ত হৃদয় এবং আবেগ। আর একজন কথাদুটি উচ্চারণ করে হাতের আঙুলের দিকে চেয়ে রইল।

প্রথম ছেলেটি বললো—সত্যি বলতে কি, ভদ্রলোককে আমি মোটেই জানতাম না। তিনি মারা যাবার আগে পর্যন্ত তাঁর দিকে ভাল করে চেয়েও দেখিনি কোনদিন। তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে—

—হ্যাঁ। অপরাজিতা দাসের কথা আমরা শুনেছি। নতুন ছেলেটি বললো—এক সময় ভদ্র-মহিলার রূপের খ্যাতি ছিল।

—এখন মহিলা কি করেন? খানিকটা বক্তার দিকে, খানিকটা দেওয়ালের দিকে চেয়ে অতিথি অধ্যাপকটি বললো—

অপরাজিতা দাস কি করেন? চা-এর বাগান, পাল ফরেষ্ট রেঞ্জ এইসব-এর থেকে নিউ আলিপুরে বাড়ী করেন, ছেলেটি বাপের জায়গায় অফিসে বসছে। মেয়েটিকে অসাধারণ করে তোলা গেল না। সে একটু আলাদা ধরণের। মা-কে এখন রেসকোর্সে প্রায়ই দেখা যায়।

—ও! বলে সকলেই একযোগে চুপ করলো। যে সব মহিলা আর কিছু করবার খুঁজে না পেয়ে রেস খেলতে যায়, তাঁদের সম্পর্কে এরা কেউই আগ্রহ পোষণ করে না। প্রথম ছেলেটী বললো—

—কিন্তু অপরাজিতা দাসের সঙ্গে আমি অন্তলীনার লেখককে মেলাতে পারছিনা।

—আমি মিলিয়ে দিচ্ছি। ভদ্রমহিলা একদিন বিবাহিত জীবনে ক্লান্ত হয়ে সোমেশ মিত্রর সঙ্গে প্রেম করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রেম করতে চাইলেন এবং সোমেশ মিত্র প্রেমে পড়লেন।

ভদ্রমহিলা-ও বুঝলেন, যে খেলা করতে চেয়ে তিনি ভুল করেছেন। তিনি এক অস্থির হৃদয়াবেগের ঝড়ে কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছেন।

সোমেশ মিত্র-র অন্তর্লীনা সেই সময়েই লেখা। কিন্তু অন্তর্লীনা লেখবার আগে পর্যন্ত দুজনের মন দুজনে জেনেছেন, জানানো হয়নি।

তাই অন্তর্লীনাতে প্রেমের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বিরহের সুরটা এত তীব্র। ঐ লাইনটা যদি আমরা মনে করি।

চৈত্রের হলদে বিকেল। কার্ণিশে পায়রার ঝাঁক।

সবুজ সার্সিতে আলো।

আমার বুকে তোমার মুখ। তোমার দু'হাত কাঁপছে।

তোমার চুলে সবুজ ছায়া।

তোমার চুলের ছায়া সবুজ।

চৈত্র, অর্থাৎ মার্চ মাসে শ্রীযুক্ত দাস বিলেতে যান। তখন তাঁরা দুজনে দুজনের কাছে এসেছিলেন। এমন সময় দাসমশাই হঠাৎ মারা গেলেন। সোমেশ মিত্র যখন অপরাজিতা দাশের জন্যে অস্থির, যখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ব্যাকুল, তখন অপরাজিতা দাশই ছুটে এলেন তাঁর কাছে। বললেন; আজ আমার শুধু তোমাকেই দরকার। আজ আমি অসহায়, বিপন্ন। সোমেশ, তুমি আমার পাশে এসো।

সত্যিই অপরাজিতা দাশ তখন বিপন্ন। দার্জিলিঙ-এর কাছে বিরাট টি এষ্টেট। বিহারে শাল গাছের ফরেষ্ট। আত্মীয়স্বজনকে বিশ্বাস করা চলে না। এমন একজন মানুষ চাই, যে তাঁর সুখকে সুখ বলে মানবে। তাঁর বিপদকে নিজের বিপদ মনে করবে। এমন মানুষ পয়সা দিয়ে পাওয়া যায়না। অপরাজিতা দাশ মানুষ চিনতে ভুল করেন নি।

সোমেশ মিত্র তাঁর কেরি-আর ছাড়লেন। কবিতা লিখে সামান্য পরিচিতি হয়েছিল। বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ওপরতলার কর্মচারী। সোমেশ মিত্র সুদর্শন এবং প্রিয়ভাষী ছিলেন। বেসরকারী কোনো আফিসে, অথবা গ্রান্ট বা ওআল্টার টমসনের প্রচার শিল্পের ফার্মে ঢুকে পড়াটা তাঁর পক্ষে একেবারে আয়ত্তের বাইরে ছিল না।

কিন্তু, সব কিছু ছেড়ে, অপরাজিতা দাশের সঙ্গে রংলিটএর চা-বাগানে চলে গেলেন তিনি। একটা নাম দেওয়া হলো তাঁকে। ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক।

ধনী ঘরের ফ্যাসানদুরস্ত যে কোন মহিলার মতোই অপরাজিতা দাশ তখন বিধ্বস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে শায়েস্তা করবার জন্যে মরফিয়া এবং ঘুমের ওষুধের অভ্যাস করেছেন।

সোমেশ মিত্র তাঁর জীবনটাকে গুছিয়ে আনতে সাহায্য করলেন। প্রয়োজন বোধে তাঁকে কড়া হতে হয়েছে। অপরাজিতা দাশ চেঁচিয়েছেন—হু আর ইউ? এ নো বডি।

আবার পরে সোমেশের কাঁধে মাথা রেখে কেঁদেছেন। বলেছেন—মাপ করো ডার্লিং। আমার মাথার ঠিক ছিল না।

সোমেশ মিত্র-র প্রেমে কোথাও খাদ ছিল না। কিন্তু অপরাজিতা দাশ, রোমান্সের প্রথম আবেগ প্রশমিত হবার পর আর সে উত্তাপ, সে আবেগ খুঁজে পেতেন না। কখনো, কখনো দিনের পরদিন বন্ধুদের সঙ্গে অন্য চা-বাগানে কাটাতেন। সোমেশের কথা ইচ্ছে করেই ভুলে যেতেন।

সোমেশ আহত অভিমানে চুপ করে থাকতেন! সুগত আর স্বাতীকে মায়ের অনুপস্থিতিতে গল্প বলে ভোলাতেন। কিন্তু আবার অপরাজিতা দাশ ছুটে আসতেন। মাঝরাতে ধাক্কা দিতেন।

—সোমেশ, দরজা খোল। স্বাতীর জ্বর হয়েছে। আমার একলা ভয় করছে।

রোগীর সেবার চেয়ে হৈ চৈ করতেন বেশী মিসেস দাশ। সোমেশ রোগীকে মাথায় বাতাস করে ঘুম-

পাড়াতেন। তারপর অপরাজিতাকে বলতেন—বড় ব্যস্ত হয়েছ। চল, এবার ঘুমোবে। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

নিজের অপরূপ সুন্দর মুখখানা সোমেশের কোলে রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন মিসেস দাশ। জানতেন, সোমেশ স্বাতীর পার্শে বসে রাত জাগবে। তাঁর চিন্তা করবার কারণ নেই।

এমনি করে-ই বছরের পর বছর কেটেছে। সোমেশ-কে অনুযোগ করে বন্ধুরা লিখেছে—সোমেশ, চলে এস। একটা মরীচিকার পেছনে ছুটে নিজেকে ক্ষয় করো না। তোমার ছুটবার শক্তি একদিন ফুরিয়ে যাবে। তুমি তপ্ত বালিতে মুখ থুবড়ে পড়বে। আর অপরাজিতা দাশ, তোমার ঐ মরীচিকা, তখনো তোমার থেকে অমনি দুরেই থাকবে। অমনি হাতের বাইরে।

সোমেশ ভেবেছেন। সত্যিই ত! একদিন যদি চলে যেতে হয়? তবে আজই কি সরে যাওয়া ঠিক নয়?

অপরাজিতা সে সব বুঝে, তাঁর ভালোবাসাকে বিচিত্র জাদুকরীর পাখা-র মতো মেলে ধরেছেন। ছেলেমেয়েকে রেখে সোমেশকে নিয়ে গাড়ীতে বেরিয়েছেন। দুর-দুরা-ন্তের পাহাড়ের গায়ে বাংলোতে দুজনে সারাদিন ছেলে-মানুষের মতো আনন্দ করেছেন। সন্ধেবেলা সোমেশের মাথা নিজের কোলে টেনে নিয়ে বলেছেন—সত্যি সোমেশ। তুমি আর লিখলে না। তোমার বন্ধুরা না জানি আমাকে কত গালিই দেয়। সত্যি দুঃখ হয়। মনে হয় তোমার ভবিষ্যৎ আমি স্বার্থপরের মতো নষ্ট করেছি।

সোমেশের তখন মনে হয়েছে। স্বর্গ যখন এখানেই, তখন দুঃখ করব কেন? অপরাজিতার সম্পর্কে সব অমুক্ত অভিযোগ কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। তিনি বলেছেন—তুমি, সুগত আর স্বাতী, তোমরাই আমার কবিতা। তোমাদের দেখেই আমি সার্থক।

তারপর আবার অপরাজিতা দাশ তাকে ভুলে গিয়েছেন ইচ্ছেমতো সুবিধেমতো। আবার তাকে মনে করেছেন।

—এই সম্পর্কের কথা তাঁর ছেলে মেয়ে জানেনি?

—নিশ্চয় জেনেছে। তবে অপরাজিতা দাশের ছেলে-মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই সোমেশকে ভালবাসতে, তাঁর ওপর নির্ভর করতে শিখেছে।

—এই ভাবে কতদিন চলেছে?

—অনেকদিন। অনেকবছর। ততদিনে ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। তারা নতুন স্কুলে গিয়েছে। তাদের জীবনে নতুন বন্ধুবান্ধব এসেছে। নতুন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে জীবনে। তাদের মনে হয়েছে, তাদের নতুন মাষ্টার মশাইরা সোমেশের চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানী। বয়ঃসন্ধির সময়ে তারা ছুটিতে বাড়ী এসে সোমেশের স্নেহ ভালবাসায় বহিঃপ্রকাশ দেখে লজ্জিত হয়েছে। এই অদ্ভুত সময়টা ছেলেমেয়েদের নানারকম মানসিক পরিবর্তন ঘটায়। কখনো তাদের মনে হয়েছে, কে এই মাষ্টারমশাই, তাদের সঙ্গে কি তাঁর সম্পর্ক। তারা কারুকে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। ব্যবহারে সোমেশের প্রতি অযথা রূঢ় হয়েছে। আর, বেদনাহত, অপমানিত সোমেশ হয়তো তখনই বুঝে-ছেন, আসলে এদের উপর তাঁর কোন দাবী খাটে না। তখন যদি সরে আসতে পারেন, তাহ'লে হয়তো তিনি মুক্তি পাবেন। তিনি ইচ্ছে করে অপরাজিতা দাশের চোখের দিকে চাননি।

অপরাজিতা দাশ ও ছেলেমেয়ের কাছে তাঁর প্রয়োজন দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, হয়তো বা ফুরিয়ে-ই গেছে, এই সর্ব-নাশের সংকেত তাঁর নিজেরই বুকে বেজেছে, কিন্তু তিনি উট পাখীর মতো বালিতে মুখ গুঁজে সে সত্যকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে যাঁকে সর্বস্ব দিয়ে এসেছেন, দিতে দিতে রিক্ত হয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে কি নিজেকে সরিয়ে নেওয়া যায়? তাঁর মনে হয়েচে সেই বিচ্ছেদটাই যদি বাস্তব হয়ে ওঠে, তাহ'লে তিনি সে আঘাত সামলাতে পারবেন না।

—তাঁরা কি বিয়ের কথা ভাবেননি?

—সোমেশ মিত্র প্রথম ভেবেছিলেন, বিয়ে তাঁদের হবে। তারপর অপরাজিতা দাশ যখন সে কথা তোলেননি তিনিও চুপ করে থেকেছেন। ততদিন বিয়ের প্রয়োজনের ওপরে চলে এসেছেন সোমেশ। সুগত-র টাকার দরকার হলে তিনি লুকিয়ে টাকা দেন। স্বাতী অসুস্থ হলে দুচিন্তায় ঘুমোতে পারেন না। এই পরিবারের একজন হয়ে এদের স্নেহের বৃত্তে বাস করা তাঁর কাছে স্বর্গ মনে হয়েছে। তবু বিয়ের কথা একদিন উঠল। সুগত-ই প্রস্তাবটা তুলল।

—বোঝাগেল না।

—বয়ঃসন্ধির ভাঙচুর কাটিয়ে সুগত আর স্বাতী যখন মানুষ হয়ে উঠল, তখন তারা নতুন চোখে এদের দেখল। সোমেশের সমস্ত জীবনটা অপরাজিতা দাশ গ্রহণ করেছিলেন একান্ত স্বাভাবিক ভাবে। সোমেশের মধ্যে তিনি কোন মহত্ব দেখতে পাননি.। সুগত নিজে তখন যৌবনের প্রসাদে নিজেকে উদারভাবে প্রসারিত করতে পেরেছে। তার মনে হলো, সোমেশের সমস্ত জীবনটার মধ্যে একটা মহত্ব আছে। তার এ-ও মনে হলো, দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে যদি এই মানুষ দুজনের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠতে পেরে থাকে। তবে তাদের সে সম্পর্ককে আরো শ্রদ্ধার পরিণতিতে আনা উচিত। তার মনে হয়েছে, সে তার নিজের জীবন নিয়ে কোথায় সরে যাবে, স্বাতীর হয়তো বিয়ে হয়ে যাবে। তখন এরা হয়তো দুজনে দুজনকে সুখী করতে পারবে। তাদের দিকে চেয়ে-ই হয়তো এরা সারাজীবন নিজেদের বঞ্চিত করে রেখেছে। খুব high sophistication-ই সুগতর দৃষ্টিকে এমন বৈজ্ঞানিক ও নিরাসক্ত করতে পেরেছে।

—তারপর ?

—তারপর সুগত বলেছে সোমেশকে। সোমেশ বলেছেন অপরাজিতাকে। অপরাজিতা ভেবে দেখবার সময় নিয়েছেন। বন্ধ দরজার আড়ালে তিনি হাতমুঠো করে পায়চারী করেছেন, আর প্রতীক্ষা করতে করতে সোমেশের মনে হয়েছে সময়টা যেন বৃদ্ধ শামুকের মতো গুঁড়ি মেরে একটু একটু করে এগোচ্ছে। তিনি অপেক্ষার যন্ত্রণায় জীর্ণ হয়েছেন। সরে গেছেন। আবার ফিরে এসেছেন। ঘড়িতে ততক্ষণ মাত্র দশমিনিট কেটেছে।

এমনি করে সে রাতটা কেটেছে। আর অপরাজিতা দাশ, ক্ষীণ অনুদেহকে স্থূলতার হাতে সমর্পণ করেছেন যিনি প্রেমকে প্রয়োজনের হাটে বিক্রী করেছেন, তিনি বসে বসে বিরক্ত হয়েছেন। এখন তাঁর কাছে সোমেশের কোন দাম নেই। এখন তিনি কলকাতায় ফিরে যেতে চান। সুগত ও স্বাতীর মাধ্যমে তরুণ ছেলেমেয়েদের ডেকে এনে, তাদের সঙ্গে মিশে নিজেও একটু সজীব তারুণ্য আহরণ করতে চান। এখন তিনি কলকাতার সমাজের একজন হতে চান। কাজ করতে চান। আর্টিষ্ট, লেখক, সমাজসেবী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে মধ্যমণি হয়ে বসতে চান। সোমেশকে বিয়ে করে এই নির্বাসিত জীবনে সমাধিস্থ হতে চান না।

—তারপর ?

—তারপর তিনি সোমেশের কাছে ছুটে গেছেন। বিপন্ন মুখে বলেছেন, সুগত আর স্বাতী তাঁদের এই সম্পর্কটা আর সহ্য করতে পারছে না। যা হয়ে, তাদের তিনি আর আঘাত দিতে চান না। তাই, এখন তাঁদের ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভাল। সোমেশ এই প্রথম আবরণমুক্ত অপরাজিতা দাশের হৃদয়টা দেখতে পেয়েছেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখ পাংশু হয়ে গেছে। তিনি মুখ ঢেকেছেন।

—এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছেন ?

—সঙ্গে সঙ্গে না হোক, কিছু দিন বাদেই। এ কথা একবারও বলেন নি যে আজ তাঁর যাবার জায়গা সত্যিই নেই। আজ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে নতুন করে মানুষকে ভালবাসবার, নতুন কাজ খুঁজবার মন তাঁর নেই। এ কথা বলেন নি, যে অপরাজিতাকে, সুগতকে, স্বাতীকে দেখতে না পেলে তিনি একদিনও বাঁচবেন না। অপরাজিতাকে তিনি অভিযোগ জানাতে পারতেন, তাঁকে বর্বর রূঢ়তায় আঘাত দিতে পারতেন। সে অধিকার তাঁর ছিল। কিছুই না করে সোমেশ মিত্র সরে এসেছেন।

—অপরাজিতা দাশ ?

—অপরাজিতা দাশ যা যা চেয়েছেন সব পেয়েছেন। নিউ আলিপুরে বাড়ী করেছেন। ছেলে বিলেত ঘুরে মেম বিয়ে করে এনেছে। মেয়ে বিয়ের যোগ্য পাত্র খুঁজছে। তিনি তাঁর সমাজের মধ্যমণি হয়েছেন। আর সোমেশ মিত্র আপনার এই মেস বাড়ীতে চারতলার সিঁড়ি গুণে গুণে উঠেছেন। অনুভব করেছেন জীবন থেকে তাঁর মুঠো শিথিল হয়ে আসছে। এখানে কয়েক বছর ধরে প্রতি মুহূর্তে নিঃসঙ্গ নির্বাসনে মৃত্যুর চিন্তার মধ্যে তাঁর দিন কেটেছে। তার পরের কথা আপনিই ভাল জানবেন।

ছেলেটি চুপ করেছে। একজন বলেছে—সোমেশ মিত্র সম্পর্কে এত কথা জানলেন কি করে ?

—তিনি আমার বাবার খুড়তুতো ভাই। তাঁর পরিবারের আর কেউ বেঁচে নেই। তাঁর এবং

অপরাজিতা দাশের কথা আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি।

সোমেশ মিত্রর ট্রাজেডি বাতাসটাকে ভারী করে রাখল। প্রথম ছেলেটি বললো—তাই। ভদ্রলোক যদি কবিতা লিখতেন, তাঁর একটা পরিচয় হতে পারত।

—হয়তো। কিন্তু যেহেতু তিনি আর লেখেননি, সে হেতু তাঁর জীবনটা সম্পর্কে আর কিছু ভাববার নেই। কি বেদনা, কি ট্রাজেডি তাঁকে এমন করে শেষ করে দিল, সে প্রসঙ্গও অবান্তর। আবার সকলে চুপচাপ।

একজন বললো—অপরাজিতা দাশ 'একটি'—!

—সব মেয়ে অপরাজিতা নয়। সব পুরুষও সোমেশ নয়। আবার সবাই চুপচাপ!

এই নীরবতার সুযোগ নিয়ে একটা মাকড়শা বেরিয়ে এল। সে শেল্‌ফের বইগুলো শুঁকে শুঁকে জাল বুনবার জায়গা খুঁজতে লাগল।

হঠাৎ একজন বললো—আচ্ছা আমরা সোমেশ মিত্রকে নিয়ে এত ভাবছি কেন? কবি এবং তাঁর জীবন, এই নিয়েই কথাটা উঠেছিল। কিন্তু সোমেশ মিত্র ত কবি নন। অর্থাৎ কবি হিসেবে খুবই অকিঞ্চিৎকর।

বক্তা এবং শ্রোতারা অজানতেই খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়েছিল, তাই তারা এই আবহাওয়াটা থেকে সোমেশকে সরিয়ে দেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। তবু, 'অন্তলীনার' কবি অনেকক্ষণ ধরে তাদের মনে হাত বাড়িয়ে জায়গা খুঁজেছেন। তাই তাঁর জীবনের রেশ টেনে একজন বললো—

রবীন্দ্রনাথের 'শেষ বসন্ত' কবিতাটায় ঠিক এই প্রেমিকের-ই কথা বলা হয়েছে—

'সহসা তোমার চোখে দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।'

—হ্যাঁ। প্রেমের বিচিত্র অনুভূতিতে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য অধিকার নিয়ে আবার নতুন করে বিস্মিত হবার সময় এসেছে।

ইংরেজীর অধ্যাপকটি বললেন—একজন আসল কবির জীবনে আসা যাক। র‍্যাঁকোর জীবন নিয়ে এই বইখানা বেরিয়েছে। দেখেছেন?

সকলে সেই উদ্ধত, অনন্য চরিত্রটিকে নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত হলো। তাদের আলোচনা র‍্যাঁকো থেকে পুরাকিন এমন কি আর্থার সাইমন্‌স পর্যন্ত চলাফেরা করতে লাগল। তাদের কথার জাল 'অন্তলীনার ওপর বিস্মৃতির আবরণ বুনতে লাগল।

মাকড়শাটা অন্য বইগুলো ছেড়ে 'অন্তলীনায় পৌঁছে তার ভ্যাপ্‌সা, পুরণো গন্ধে খুসী হলো। তার ওপর সে জাল বুনে চললো। আটখানা পায়ের দ্রুত গতি। আট-কোণা ঘন বুনোটের জাল। যার স্তর অত্যন্ত পাতলা, তবুও সেটা খুব তাড়াতাড়ি একটা রূপ নেয়। একটা বাস্তব চোখে দেখার মতো বাস্তব রূপ।

যা মানুষের বিস্মৃতির আর এক নাম।

এবং প্রেমিকার অন্তর থেকে, তার পরিবারের স্মরণ থেকে বিস্মৃত মানুষটি এ যুগের পাঠকের কাছে পাত্তা না পাওয়া লেখকটি, তাঁর নির্বোধ হৃদয়াবেগের একমাত্র স্বাক্ষর ঐ কাব্য গ্রন্থটির সঙ্গে সঙ্গে শেষবার চূড়ান্ত ভাবে বিস্মরণের ওপারে নির্বাসনে যেতে লাগলেন। সে নির্বাসন থেকে আর একবার ফিরে আসবার মতো আর কোন কীর্তি যিনি রচনা করেন নি, সেই সোমেশ মিত্র।

সর্বমানব ও রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায়

বাংলা সাহিত্যের সমস্তটা বাঙালীমাত্রেরই উত্তরাধিকার। এর বেশ কিছু অংশ ভারতীয়মাত্রেরই উত্তরাধিকার। এর অল্প কিছু অংশ মানব মাত্রেরই উত্তরাধিকার। চীন থেকে পেরু, আইসল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া যেখানে যত মানুষ আছে সকলে বলতে পারে যে বাংলাভাষায় লেখা এই কবিতাটি বা এই গল্পটি আমাদেরও সম্পদ। আমরাও একে জন্মসূত্রে বা অন্যসূত্রে পেয়েছি। আমরাও একে ভোগ করব।

বাংলাভাষা সম্পর্কে যা বলা হলো বিশ্বের যে কোন ভাষা সম্পর্কে তা বলা যায়। ইংরাজী ফরাসী রুশ জার্মান ইটালিয়ান ভাষা সম্পর্কেও তা বলা যায়। আরবী ফারসী চীনা জাপানী মালয় ভাষা সম্পর্কেও তা বলা যায়। সমস্তটা যার যার নিজের, কিন্তু কতক আমাদের সকলের। আমাদের ভাষায় রচিত হয়নি বলে একে আমরা পরকীয় ভাবতে পারিনে। এক্ষেত্রে স্বদেশী বিদেশীর প্রশ্ন উঠতেই পারে না। ইংরেজরা বিদেশী, সুতরাং শেক্সপীয়ারও বিদেশী, এটা ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ঠিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভুল। কারণ শেক্সপীয়ার বিদেশী হলেও তাঁর সৃষ্টির একাংশ আমাদেরও উত্তরাধিকার।

এই রকমই বরাবর হয়ে এসেছে। বুদ্ধের বাণী চীন জাপানের আপনার হয়ে গেছে। বুদ্ধকে তারা বিদেশী বলে ভাবতেই পারে না। তেমনি যীশুকেও বিদেশী বলে ভাবতেই পারে না ইউরোপের লোক। তাঁর বাণী তাদের নিজস্ব হয়ে গেছে। ধর্মের মতো বিজ্ঞানের সত্যগুলোও দেশ থেকে দেশান্তরে যায়, সব দেশের আপনার সম্পদ হয়ে যায়। আর্টের বেলা, সাহিত্যের বেলাও এই নিয়ম খাটে। যদিও সাহিত্যে ও সঙ্গীতে ও চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে স্থানিক বর্ণ অত্যধিক বলে এ নিয়ম পুরোপুরি খাটে না। কেউ যদি শেক্সপীয়ারকে ইংরেজের মতো করে পেতে চান, তাঁকে ইংলণ্ডে গিয়ে স্থানিক বর্ণ আয়ত্ত করতে হবে। তেমনি বাংলাদেশে এসে বাঙালীর জীবনে প্রবেশ না করলে রবীন্দ্রনাথকেও বাঙালীর মতো করে পাওয়া যাবে না। সাহিত্যের দাবী বিজ্ঞানের চেয়ে বেশী। এমন কি ধর্মের চেয়েও বেশী। কিন্তু ইংরেজী জেনেও অনুবাদের সাহায্যে "হ্যামলেট" বা "ম্যাকবেথ" বা "রোমিও জুলিয়েট" উপভোগ করতে বাধে না। তেমনি বাংলা না জেনেও "গীতাঞ্জলি।"

বরাবর এই রকম হয়ে এসেছে। আগেকার যুগের মানুষ আমাদেরি মতো বিভিন্ন দেশে বাস করত। রেল স্টিমার এরোপ্লেন না থাকায় আমাদের চেয়ে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু যতটা বিচ্ছিন্ন সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে ততটা নয়। গোরুর গাড়ী ছিল, ঘোড়া ছিল, উট ছিল, পাল-তোলা নৌকা ছিল। কিছু না হোক মানুষের পা ছিল, জেলেদের ডিঙি ছিল। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে যাওয়ার ঐতিহ্য হাজার হাজার বছরের পুরোনো। বাণিজ্যের ছলে, রাজ্য জয়ের ছলে, ধর্ম প্রচারের ছলে মানুষ দেশ ছেড়ে দেশান্তরে গেছে রামায়ণ-মহাভারতের চেয়েও আরো প্রাচীন যুগে। রাজপুত্রের অ্যাডভেঞ্চার মানবাত্মার জগৎজিজ্ঞাসার প্রতীক। মানুষ কোনোদিন এক দেশে সন্তুষ্ট হয়নি। আর একটা দেশ তার চাই। সেটা পেলে আরো একটা দেশ তার চাই। যতক্ষণ না বিশ্বের সব ক'টা দেশ তার আপনার হচ্ছে, ততক্ষণ সে রাজপুত্রের মতো কেবলি চলেছে, কেবলি লড়েছে। এই নিয়ে তার রূপকথা। এই নিয়ে তার ইতিহাস।

সেইজন্যে মানুষে মানুষে একান্ত বিচ্ছিন্নতা কোনো কালেই ছিল না। আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বেও আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল। মানুষ যেমন করেই হোক, যে পথ দিয়েই হোক, সেখানে গিয়ে বসবাস করেছিল, কিংবা সেখান থেকে এখানে এসেছিল। একটা চলাফেরার ঐতিহ্য, আদান প্রদানের ঐতিহ্য স্মরণাতীত কাল থেকেই ছিল। যখনকার ইতিহাস নেই, পুরাণ নেই, রূপকথা নেই তখন থেকেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষের

সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন। সেইজন্যে আমরা দেখতে পাই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীসদেশের লোক যা ভাবছে, চীনদেশের লোকও তাই ভাবছে, ভারতবর্ষের লোকও তাই ভাবছে। কে যে কার কাছ থেকে ধার করল তা জানবার কোনো উপায় নেই। বলা যেতে পারে কেউ কারো কাছ থেকে ধার করেনি। ভাবনাগুলো আকাশে বাতাসে ঘুরছিল। আকাশ বাতাসের মতো সর্বমানবের সম্পত্তি ছিল। সব দেশেই কিছু না কিছু দিয়েছে। সব দেশেই কিছু না কিছু নিয়েছে।

বিচ্ছিন্নতার কথা যখন বলি তখন আপেক্ষিক অর্থেই বলি। ঐকান্তিক অর্থে নয়। এক কালে গ্রীক চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল, আদানপ্রদান ছিল। গ্রীকবংশীয়রা কাবুলে রাজত্ব করত। ভারতের উত্তরপশ্চিমাংশে তাদের প্রভাব ছিল। তেমনি ভারতীয়দেরও আধিপত্য ছিল গান্ধারে ও গান্ধার ছাড়িয়ে মধ্য এশিয়ায়। রুশদেশে এখনো দুটি একটি গ্রাম আছে, যেখানকার অধিবাসীরা হিন্দু—শুনেছি একজন রাশিয়ানের মুখে। রুশভাষায় সঙ্গে সংস্কৃতভাষার মিল দেখিয়ে দিয়েছেন একজন ভারতীয় সুধী। এই যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য যোগসূত্র, এ যে কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল তার একটি নিদর্শন ভারতের সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডের সাদৃশ্য। আইরিশ রূপকথার সঙ্গে বাংলা রূপকথার মিল আগেই লক্ষ্য করেছিলুন। এখন শুনছি আয়ারল্যাণ্ডেও চাতুর্বর্ণ্য ছিল। আমার এক আইরিশ বন্ধু একদিন এসেছিলেন দেখা করতে। বললেন তাঁর পূর্বপুরুষ ফিনিসিয়া থেকে আয়াল্যাণ্ডে যান। সুতরাং তিনি প্রাচ্য। বাস্তবিক কে যে কার বংশধর,তা এক কথায় আইরিশ বা ভারতীয় বা চীনা বলে বোঝানো যায় না। এমন কি বাঙালী বলে বা কায়স্থ বলেও বোঝানো যায় না। পার্শীদের মধ্যেও আমি ব্রাহ্মণ দেখেছি। পাণ্ডে ছিল একজনের পদবী। প্রাচীন ইরানী ও প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য মিল। একজন ইরানী বন্ধু আমাকে বলেন, জোরোআস্টার আসলে জরদ উষ্ট্র। পীতবর্ণ উট।

এমন যে মানব জাতি তার মধ্যে ন্যাশনালিজম নামক তত্ত্ব গত দুই শতকের অর্বাচীন! ভারতে এ জিনিস ছিল না, জার্মানীতে ছিল না, ইটালীতে ছিল না। ভারতে এলো ইংলণ্ডের দাপটে ও ইংরেজের দেখাদেখি। জার্মানীতে ও ইটালীতে এলো নেপোলিয়নের দাপটে ও ফ্রান্সের দেখাদেখি! ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সেও ছিল না রেনেসাসের আগে। যতদুর বোঝা যায় এটির উদ্ভব ভাষাগত ঐক্যবোধ তথা দ্বৈপায়নতা থেকে। তারই উপর পরে আরোপ করা হয়েছে জাতিগত ঐক্যবোধ ও অবিমিশ্রতা। গত শতাব্দীতে জার্মানী ও ইটালী নেশন হয়ে ওঠে, আয়ারল্যাণ্ড ও ভারত নেশন হবার সংকল্প নেয়। বর্তমান শতাব্দীতে আরবরা নিয়েছে সেই সংকল্প। ইহুদীরাও। আফ্রিকাতেও ন্যাশনালিজমের ক্রিয়া চলেছে। সব আফ্রিকান মিলে এক নেশন হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। দেখা তো গেল সব ভারতীয় মিলে এক নেশন হলো না। ধর্ম অনুসারে পাকিস্তানের সৃষ্টি হলো।

ন্যাশনালিজম যদি নিজের সীমায় সন্তুষ্ট হতো তাহলে কী হতো তা এখনো অমীমাংসিত। প্রথম থেকেই দেখা যাচ্ছে যারাই নেশন হয়েছে তারাই যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। গোড়া থেকেই ন্যাশনালিজম একটা অসহিষ্ণু মতবাদ। আমরাই বড়, ওরা বড় নয়। আমরাই ভালো, ওরা ভালো নয়। আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্যের কাছ থেকে আমাদের নেবার কী আছে? নেবার আছে শুধু কাঁচামাল আর সস্তা শ্রম। পরিবর্তে দেবার আছে তৈরি পণ্য আর শাসন-শৃঙ্খলা। এর জন্যে আমরা চক্রান্ত করব, যুদ্ধ করব, রাজ্য-বিস্তার করব। সেইসঙ্গে যদি কিছু শিক্ষাবিস্তার ঘটে, সাহিত্যের প্রসার হয়, ধর্মের প্রচার হয়, তবে সেটা অধিকন্তু ন দোষায়।

এমনি করে ইংরেজ এ দেশে এলো। জাগিয়ে দিল পাল্টা ন্যাশনালিজম। লাগল ঠোকাঠুকি। বিরোধ ক্রমে ক্রমে আচ্ছন্ন করল আর সব। মানুষে মানুষে ভাবনার আদানপ্রদান, সর্বমানবিক সম্পদ, অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র আবহমানকালের আলো বাতাস। ওরা বিদেশী, ওরা শত্রু, সুতরাং ওদের সংস্রব বর্জনীয়। সেইসঙ্গে ওদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। হুঁ, তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ব্যাটারা বর্বর!

যুদ্ধবিগ্রহের দিনে এই মনোভাব সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজরা তাদের জ্ঞাতিভাই জার্মানদের বলতে আরম্ভ করে হুন। তাই বেঠোফেন বাজাবে না, শুনবে না। ও যে "হান মিউজিক!" ইংরেজ উপন্যাসিক ফরস্টার

বেঠোফেন ভালোবাসতেন বলে তাঁকেও মনে করা হয় ঘরের শত্রু বিভীষণ। তখন তাঁর কে এক বন্ধু আবিষ্কার করেন যে বেঠোফেনের পূর্বপুরুষ বাস করতেন বেলজিয়ামে। অমনি বেঠোফেন হলেন মিত্রপক্ষের। এই মানসিকতা থেকে আমাদের দেশে এলো ইংরাজী শিক্ষায় বিরাগ। ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া চলছে, অতএব ইংরাজী পড়া হারামী। পলাশীর পরে মুসলমানদের ছিল এই মানসিকতা। এটা সিপাহী বিদ্রোহ অবধি গড়ায়। তার পরে ওরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে যে ইংরেজ থাকতে এসেছে, বাদশাহী আমল চিরকালের মতো গেছে। তখন কোমর বেঁধে ইংরেজী শিখতে শুরু করে দেয়। হিন্দুরা ততদিন পঞ্চাশ বছর ষ্টার্ট পেয়ে গেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যেই দেখা দিল এই মানসিকতা। এখনো এ মানসিকতা দূর হয়নি। ইংরেজ যদিও দূর হয়েছে।

দেশকে ভালোবাসতে চাও। উত্তম। কিন্তু বিশ্বের একটি বৃহৎ অংশকে বর্জন করতে যাও কেন? সেটাও কি তোমার নিজেরি মানবিক উত্তরাধিকার নয়? মানবিককে বর্জন করলে মানুষ হিসাবে তুমি নিজেই কি দরিদ্র হবে না? দুর্বল হবে না! বিজাতীয় আখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করলে আলো বাতাসকেও বিজাতীয় বলতে হয়। সেটা যখন কেউ করে না, তখন মাটিকেই বা বিজাতীয় বলবে কেন, মাটির ফসলকেই বা কেন বলবে বিজাতীয়? সব কাব্যই মানুষ লিখেছে মানুষের জন্যে, সব শিল্পই মানুষ গড়েছে মানুষের জন্যে, সব দর্শনই মানুষ ভেবেছে মানুষের জন্যে। তোমার দ্বারা যেটা হয়নি তোমার জন্যেও সেটা হয়েছে, যদি আপনার করে নিতে পারো। অমনি করে কত দ্রব্যই না হাত-বদল করছে, কত তত্ত্ব আর কত আইডিয়া! মানুষে মানুষে বিগ্রহ সব দিন হয় না। ওই যে জার্মান আর ইংরেজ তারা অধিকাংশ দিনই সহযোগিতা করে। বিরোধটা সাময়িক, মিশ্রণটা দৈনন্দিন। তেমনি ইংরেজ আর বাঙালী, ইউরোপীয় ও ভারতীয়।

ন্যাশনালিজমের সঙ্গে বর্জনশীল সংকীর্ণতা না থাকলে হিংসাদ্বেষ না থাকলে—ওর উপর রবীন্দ্রনাথের অরুচি ধরে যেত না। ন্যাশনালিজম যেখানে বিশুদ্ধ দেশপ্রেম সেখানে বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে তার স্বতোবিরোধ নেই। একই মানুষ একই কালে সব দেশের প্রেমিক হতে পারে। সে বুকে হাত রেখে বলতে পারে, আমি স্বদেশকে ভালোবাসি বলে বিদেশকে কম ভালোবাসিনে। বিদেশ কেন বলব? সেও আমার স্বদেশ। মানবাত্মা একই মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। একই ক্ষণে সমগ্র বসুধা থেকে বিদায় নেবে। এটা আমার দেশ, ওটা আমার দেশ নয়, এ গণনা মানবাত্মার মুখে মানায় না। এ দেশ আমার দেশ, ও দেশও আমার দেশ। মানুষ মাত্রেরই পক্ষে এই উপলব্ধি স্বাভাবিক! অস্বাভাবিক হচ্ছে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির মতো জাতীয়তাবাদী অন্ধতা। কিন্তু তারও হেতু আছে। এক দেশের লোক যদি অপর দেশের উপর প্রভুত্ব ফলাতে যায়, বিদ্রোহী মানুষ অবশেষে বিদেশীকে বিতাড়ন করতে রুখে দাঁড়ায়, তখন তাকে জোর দেয় বর্জনশীল সংকীর্ণ একটা মতবাদ! সেটাও একপ্রকার হাতিয়ার। কতকগুলো ভয়ানক কাজ আছে মদ খেয়ে বিবেককে ঘুম না পাড়ালে যা করা যায় না। যুদ্ধ বিদ্রোহও সেই রকম কাজ।

রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন মত্ততার ধার ধারেন নি। তাই দেশপ্রেম যেই মত্ততার দিকে মোড় নিল তিনি তার থেকে আপনাকে সরিয়ে নিলেন ও উপহাস সহ্য করলেন। তেমনি দেশপ্রেম যেদিন ইউরোপে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ল সেদিনও তিনি ন্যাশনালিজমের প্রতিবাদ করলেন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিন্দিত হলেন। তেমনি দেশপ্রেম যেদিন অহিংস অসহযোগ ঘোষণা করে বিদেশী বসন দাহ করল ও ইংরেজী শিক্ষা পরিহার করতে গেল—সেদিনও তিনি অসহযোগের সঙ্গে অসহযোগ করলেন ও বহু লোকের আস্থা হারালেন। ইতিমধ্যে নাইট উপাধি ত্যাগ করে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়ে না থাকলে সরাসরি দেশদ্রোহী বলে গণ্য হতেন। সেই সংঘর্ষের দিনে সর্বমানবের সংস্কৃতিমিলনের আদর্শ উচ্চে তুলে ধরা জনপ্রিয়তার পন্থা ছিল না। ছিল ক্ষুরধার পন্থা। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ছিলেন বলেই তিনি জনসাধারণের রোষ থেকে রক্ষা পান। বিশ্বপ্রেমিক বলে যারা তাঁকে ব্যঙ্গ করত, তাদেরকেও গাইতে হতো তাঁরই স্বদেশী গান। নইলে প্রেরণা পাবে কেন?

ইংরেজকে বিদায় করার আয়োজন যখন চলেছে সর্ব-

মানবকে বরণ করে আনার পাল্টা আয়োজনও চলেছে তখনি। এর নেতৃত্ব নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে। সেদিন মনে হয়েছিল এটি একটি সামান্য শক্তি। আজ এই আদর্শ জাতীয়তাবাদকেও অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছে। বিশ্বময় রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উৎসব তারই একপ্রকার স্বীকৃতি!

এই প্রসঙ্গে পরিষ্কার করে বলা দরকার যে গান্ধীজীর উপর যে নেতৃত্ব পড়েছিল সেটা ইংরেজ বিতাড়নের নয়। তাঁর অসহযোগ অন্যায়কারীর সঙ্গে নয়, অন্যায়ের সঙ্গে। তাঁর সত্যাগ্রহ অসত্যাচারীর বিরুদ্ধে নয়, অসত্যের বিরুদ্ধে। মানুষকে তাড়িয়ে দিলে সে আবার একদিন ফিরে আসতে পারে, কিন্তু তার মতি বদলে দিতে পারলে সে আপনি সরে যায়, কিংবা বন্ধুরূপে থাকে। গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল ইংরেজের মনের উপর অহিংসার প্রয়োগ, সেইজন্যে তিনি শুধু অসহযোগ করেননি, করেছিলেন অহিংস অসহযোগ। বিশেষণটি বিশেষ্যের আগে বসেছিল। সেটি অধিকাংশ লোকের নজর এড়িয়ে যায়। তারা অহিংস থাকে না তাঁর মতো কায়মনোবাক্যে। মনে বাক্যে হিংসা পুষে রেখে কায়ায় কতকটা অহিংস হতে চেষ্টা করে ও আপনাকে আপনি ছলনা করে! ইংরেজের চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত। তেমনি রবীন্দ্রনাথও অত সহজে ভোলবার পাত্র নন। গান্ধীজীর কাছে অন্যায়কারীতে ও অন্যায়ে সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণের কাছে তেমন কোনো প্রভেদ না থাকায় আন্দোলন চলে অন্ধ আবেগে। চৌরিচোরার পর রাশ টেনে না ধরলে ঘোড়া আর বাগ মানত না। নির্ঘাত খাদে পড়ত।

তা বলে কি আন্দোলন চিরকালের মতো বন্ধ করতে হবে। গান্ধীজীর সমস্যা হলো এই। তা তিনি কিছুতেই করতেন না, কারণ তাঁর অহিংসা নিভৃত তপোবনের জন্যে নয়। মানুষে মানুষে যেখানে স্বার্থের সংঘাত বা কল্পিত স্বার্থের সংঘাত, মানুষে মানুষে যেখানে মতবাদের সংঘাত সেই জনাকীর্ণ মল্লক্ষেত্রের জন্যে। যেখানেই কুরুক্ষেত্র সেখানেই অহিংসার ধর্মনির্দিষ্ট নীতিনির্দিষ্ট ইতিহাসনির্দিষ্ট ভূমিকায়। গান্ধীজীর কার্যকলাপ এই বিশ্বাস থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকা যা আরব্ধ হয়েছিল ভারতবর্ষের অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন তারই অনুবৃত্তি ও সম্প্রসারণ। গান্ধীজীর দিক থেকে একটি অপরটির পরবর্তী পদক্ষেপ। কিন্তু আর সব নেতাদের দিক থেকে তা নয়। তাঁরা জের টানছিলেন গান্ধীপূর্ব স্বরাজ আন্দোলনের। সে আন্দোলন অহিংসানিরপেক্ষ। অহিংসার জন্যে জীবনের একটি কুলুঙ্গী স্মরণাতীত কাল সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। অহিংসা তার সেই কুলুঙ্গীতেই থাকুক। রাজনীতির আসরে তাকে টেনে আনতে চাওয়া কেন? গান্ধীজীকে না বুঝে অহিংসার প্রয়োজন ও প্রয়োগ না বুঝে তাঁকেই তাঁরা নেতা বরণ করেছিলেন ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণে—অন্য পন্থায় ফল না পেয়ে।

গান্ধীনেতৃত্বও সর্বমানবিক। অহিংসার প্রয়োগ যদি একটি দেশের একটি পরিস্থিতিতে কার্যকর হয় তা হলে অন্য দেশের অন্য একটি পরিস্থিতিতেও হবে। সব মানুষের কাছে তার মূল্য আছে। ভারতীয়রা জিতলে সব মানুষ জিতল। এমন কি ইংরেজরাও জিতল।

এক জাতি আরেক জাতিকে শাসন করবে, শোষণ করবে, এটা অবশ্যই অন্যায়। কিন্তু এক জাতি আরেক জাতিকে পরিপূরণ করবে, তার দ্বারা পরিপূরিত হবে, এর মধ্যে অন্যায় কিছু আছে কি? আমাদের সভ্যতা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, তবু ইউরোপের সভ্যতা এসে তার চোখ ফুটিয়ে না দিলে সে এক অন্ধকার যুগে বদ্ধ থাকত। সে আধুনিক যুগে উপনীত হতো না। বৃহত্তর স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করত না। আমাদের সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করে গতানুগতিকভাবে বিবর্তিত হতো। তার গঙ্গাস্রোতে সমুদ্রের জোয়ার এসে আবর্তন সৃষ্টি করত না। ইউরোপ নিয়ে এলো গতানুগতিকের সঙ্গে ছেদ। ডিস্‌কন্টিনিউইটি। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এলো বহির্বিশ্বের সঙ্গে অন্বয়। কন্‌টিনিউইটি। বাংলা সাহিত্যে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে আরম্ভ করল। আধুনিক কালের আর দশটা সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটল। ছুটতে ছুটতে ধরে ফেলল অগ্রসরদের সারি। অগ্রসরদের সঙ্গে সারিবদ্ধ হলো।

তা হলে বলতে হবে যে এক সভ্যতা আরেক সভ্যতাকে পরিপূরণ করতে এসেছিল। প্রথমে বণিকের মানদণ্ড হাতে। পরে শাসকের রাজদণ্ড হাতে। পরিপূরণ করতে—সে পরিপূরিত হয়েছে কি না অতটা স্পষ্ট নয়। তবু
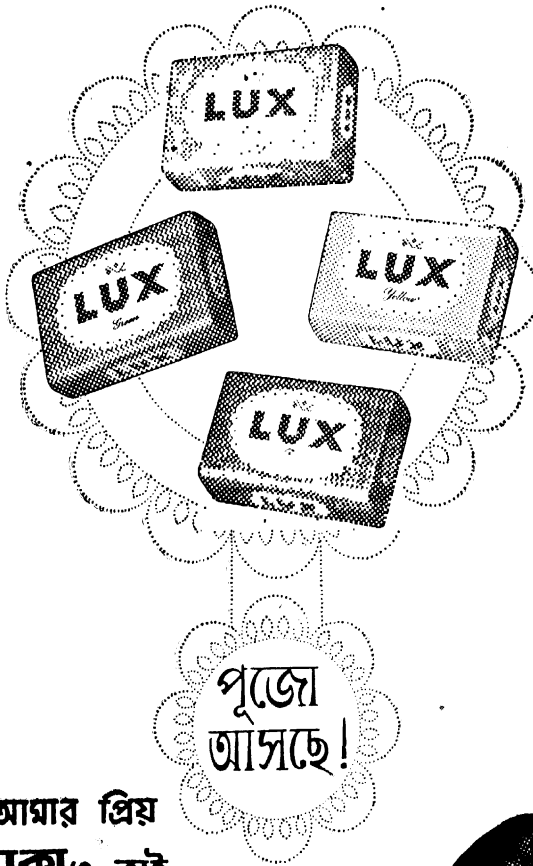
LUX
LUX
LUX
LUX

LUX

ইংরেজদের অনেকে স্বীকার করে যে বাংলার সোনা না গেলে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটত না। ইংরেজ জাতির জীবন রূপান্তরিত হতো না। জীবন রূপান্তরিত না হলে সাহিত্যেরও রূপান্তর ঘটত না। কিন্তু ভারতবর্ষের সান্নিধ্যে এসে ইংলণ্ড কি শুধু পার্থিবভাবে লাভবান হয়েছে? কোনোরকম আত্মিক পরিবর্তন কি তার ঘটেনি? বলা যায় না। তবে বহুদূরে আটলান্টিকের অপর পারে থোরো এমার্সনের উপর উপনিষদের প্রভাব পড়েছে। যাদের সঙ্গে শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ নেই, শোষক-শোষিতের সম্বন্ধ নেই সে সব পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা জাত হয়েছে। একই আর্যজাতির ভারতীয় ও ইউরোপীয় শাখা সম্বন্ধে চেতনা জেগেছে। ভারতকে তারা আত্মীয় বলে জেনেছে। পরাধীন জাতির প্রতিনিধিদেরও সমান মর্যাদা দিয়েছে। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের বেলায় মাথা নত করেছে। তাঁরা যে খৃষ্টান নন, হিন্দু, এতে তাঁদের গৌরব হানি হওয়া দূরে থাক বৃদ্ধিই হয়েছে। তেমনি বিবেকানন্দের বেলায়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিপূরণের দিন এখনো যায় নি। খ্রীষ্টের কাছে সে যা পেয়েছে তারই মহিমা উপলব্ধি করুক জীবন দিয়ে। তার পরে পাবে বুদ্ধের কাছ থেকে, উপনিষদের কাছ থেকে, কালিদাসের কাছ থেকে, অজন্তার কাছ থেকে, গান্ধীর কাছ থেকে, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

সাহিত্যমাত্রেই এক অপরের পরিপূরক। বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু আছে যা পৃথিবীর আর কোনো সাহিত্যে নেই। বাঙালীর জীবনে এমন কিছু আছে যা মানবপরিবারের আর কোনো শাখার জীবনে নেই। বাংলা ভাষার লেখকদের এমন কিছু দেবার আছে যা আর কোনো মানবীয় ভাষার লেখকদের দেবার সাধ্য নেই। আমরাও মানুষ, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরাও বিশিষ্ট। এই বিশিষ্টতা হারাবার নয়, হারাবেও না কোনো দিন। পশ্চিম একে মোটের উপর সাহায্যই করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। পশ্চিম না এলেই বরং ক্ষতি হতো বেশী। পশ্চিম না এলে আমাদেরকেই যেতে হতো তার দ্বারে। যুগের সঙ্গে যোগ রাখার জন্যে। রিয়ালিটির সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্যে। যে অবস্থায় আমরা ছিলুম সে অবস্থায় থাকা চলত না। হিন্দু রাজত্বেও না। হিন্দু রাজত্বে তো মারাঠারা ছিল। কী এমন উন্নতি করেছিল! কী এমন প্রতিরোধশক্তি অর্জন করেছিল। তারাও ছিল এক আনরিয়াল জগতে। যে জগৎ কবে তামাদি হয়ে গেছে পশ্চিম প্রান্তে।

শাসন শোষণের কথা বাদ দিলে ইউরোপ যা করেছে তা সর্বমানবের জন্যেই করেছে। তার সাধনা সর্বমানবিক। সুতরাং তাকে বর্জন করা মানে আপনাকেই বঞ্চিত করা। এটা জাতীয়তাবাদীদের বোঝানো দায়। রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে গিয়ে জনপ্রিয় হননি। কিন্তু দেশের ইনটেলেকচুয়ালরা আপনি বুঝেছেন। তা বলে জাতীয় সংগ্রামের প্রতি উদাসীন থাকেননি। রবীন্দ্রনাথও উদাসীন ছিলেন না। পরে তিনিও স্বীকার করেছিলেন যে গান্ধীজীর মনে একখানি ছবি আছে। সেই ছবিখানি সামনে রেখে গান্ধীজী কাজ করে যাচ্ছেন। সে ছবি শুধুমাত্র বিদেশী শাসন শেষ করেই শেষ নয়। সে ছবি সুদূরপ্রসারী। সে ছবি কিন্তু তুলসীদাসের রামরাজ্য নয়। টলস্টয় রাস্কিন থোরো না জন্মালে সে ছবির সৃষ্টি হতো না। গান্ধীজী যদি ইনটেলেকচুয়াল না হতেন সে ছবির খবর পেতেন না। টলস্টয় রাস্কিন থোরো তিনজনেই পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক হিংস্রতা ও মিথ্যাচার দেখে তার প্রতি বিদ্রোহী হন। সে বিদ্রোহ সর্বমানবের জন্যে। টলস্টয় ও রাস্কিন পাঠ গ্রহণ করেন সাক্ষাৎভাবে যীশুর কাছে। থোরো যত দূর জানা যায় উপনিষদের থেকে প্রেরণা পান।

পূর্ব-পশ্চিমের দেওয়া নেওয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভগবানকে পিতা বলে ভাবা। একই পিতার সন্তান বলে সব মানুষকে ভাই বলে ভাবা। উপনিষদে "পিতা নোহসি" ছিল। কিন্তু পরবর্তী ভারতীয় সাধনায় ভগবানকে পিতা বলার রেওয়াজ ছিল না। এতদিনে আমরা সবাই এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, সেইসঙ্গে সর্বমানবের ভ্রাতৃত্বে। কিন্তু আইডিয়াটা আসে পশ্চিম থেকেই। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যস্থতায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ।

রোমন্থন ক্রিয়াটি বৃদ্ধ বয়সের সাধারণ ধর্ম। কারো কারো বেলায় এটা আবার সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা যোগায়। সারা জীবনে যিনি সরকারী চিঠি এবং সরকারী রিপোর্ট ছাড়া আর কিছু লেখেননি, শেষ বয়সে স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে তারও হঠাৎ লেখক হবার সাধ জাগে।

ভূতপূর্ব পুলিশ-ইনস্‌পেকটর কুঞ্জলাল সাহা একজন কড়া ও কর্মঠ অফিসার বলে উপর-মহলে কিঞ্চিৎ সুনাম এবং নীচের মহলে প্রচুর দুর্নাম লাভ করেছিলেন। সম্প্রতি পেন্‌সন্‌ লাভ করবার পর এই দুটি মূলধন কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন, অর্থাৎ একখণ্ড বৃহৎ স্মৃতিকথা ফেঁদে বসেছেন। মাথার মধ্যে মালমসলার অভাব নেই। সেগুলোকে অবয়ব দিতে গিয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধায় পড়েছেন। জিনিষটা যদি ইংরেজীতে লেখা চলত তাহলে বিশেষ ভাবনা ছিল না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদ্যা না থাকলেও দীর্ঘজীবন অনেক সাহেব-সুবো নিয়ে ঘর করতে হয়েছে

ইংরেজিটা সহজেই আসে, তার মধ্যে না-ই বা রইল ব্যাকরণের বন্ধন, কিংবা ইডিয়মের বালাই। কিন্তু বাংলা ভাষাকে বাগ মানানো রীতিমত কসরতের ব্যাপার। অথচ পাঠক পেতে হলে তাছাড়া আর উপায়ও নেই। ইংরেজের সঙ্গে ইংরেজির মান চলে গেছে। এখন পুলিশসাহেবের জায়গায় এসেছে আরক্ষাধ্যক্ষ। কটমটের জয়জয়কার।

অগত্যা এ. টি. দেবের শরণ নিয়েছেন কুঞ্জবাবু। সেই বৃহদাকার ইংলিস-টু-বেঙ্গলি ডিক্‌শনারী সামনে রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন।

রোজকার মত সকালে চায়ের পাট মিটিয়েই লেখা নিয়ে বসেছিলেন। ভগ্নদূতের মত গৃহিণীর আবির্ভাব। কুঞ্জবাবু চোখ তুলতেই বললেন, বসেই তো আছ; বাজারটা একবার ঘুরে এসো না ?

—কেন, বংশী কোথায় গেল ?

—বংশীর কি আর অন্য কাজ নেই ? ছিষ্টি সংসারের উনকোটি ঝামেলা, আর ঐ একটা তো চাকর। তাছাড়া, (গলা খাটো করলেন গৃহিণী) একেবারে দুহাতে গলা কাটছে আজকাল। ষোল আনার চার আনাই গাপ, কাঁহাতক পারা যায়, বল ?

—একটু কাজ করব ভাবছিলাম, অপ্রসন্ন মুখে আমতা-আমতা করে বললেন কুঞ্জলাল। গৃহিণীর চোখেমুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। বললেন, কাজ মানে তো ঐ ডিকশনারী দেখে দেখে কথার মানে লেখা ? ওটা বরং খোকাকে দিও। তোমার চেয়ে অনেক ভালো পারবে।

সামনেই খোলা রয়েছে এ. টি. দেব। বলবার কিছু নেই। স্ত্রীর খোঁচাটা নিঃশব্দে হজম করে কুঞ্জবাবু উঠে পড়লেন।

পরদিনও ঐ একই সময়ে বাজারের থলে এবং তার সঙ্গে লম্বা ফর্দে-জড়ানো একখানা দশটাকার নোট টেবিলের উপর রেখে গৃহিণী বিনা বাক্যব্যয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন। কুঞ্জলাল বিরক্ত হলেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করবার সুযোগ পেলেন না, তাতে কোনো লাভও হতনা। এ বিপদ থেকে কৌশলে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায় বাজারের পথে সেই কথাই ভাবতে ভাবতে চললেন। পাকা পুলিশী মাথা। বেশীক্ষণ ঘামাতে হল না। দেখতে দেখতে একটি চমৎকার ফন্দি ফুটে গেল।

প্রথমেই পাঁচপো আলু কিনে ওখান থেকে টাকাটা ভাঙিয়ে নিলেন। একখানা পাঁচটাকার নোট, বাকীটা একটাকা আর খুচরো। বড় নোটখানা সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঁকে গুঁজে ফেললেন এবং চারটাকা ক-আনায় যা হয়, তাই কিনে নিয়ে মুখ শুকনো করে বাড়ি ফিরে এলেন।

থলে উজাড় করে গৃহিণী ঝাঁজিয়ে উঠলেন, এ কী করেছ ! মাছ কৈ ? পটল কৈ ? তখন থেকে কড়া চড়িয়ে বসে আছি। খোকার ইস্কুল, মায়ার কলেজ। ওদের ভাত দেবো কী দিয়ে ?

কুঞ্জবাবু মুখখানা আরো কাঁচুমাচু করে বললেন, পাঁচ-টাকার নোটখানা হারিয়ে এলাম।

—ওমা ! সে কি কথা ? চোখ কপালে তুললেন গৃহিণী।

—আলুর দোকান থেকে চেঞ্জ বুঝে নিয়ে পকেটেই রেখেছিলাম, বেশ মনে আছে। মাছ কিনতে গিয়ে দেখি, নেই। কে কখন তুলে নিয়েছে ! যা ভিড় !

গৃহিণী একেবারে থ' মেরে গেলেন। এই বাজারে পাঁচ পাঁচটা টাকা !

কুঞ্জবাবু ঘরে গিয়ে নোটখানা টানায় বন্ধ করতে করতে নিজের উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ না করে পারলেন না। সেই সঙ্গে নিশ্চিন্ত হলেন। এর পরে আর বাজারের দুর্ভোগ নিশ্চয়ই তাঁকে ভুগতে হবে না। সকালবেলাটা এমন করে নষ্ট করলে চলে না। তখনই লেখাটা আসে। মাথা সাফ থাকে। ইন্‌স্‌পিরেশন পাওয়া যায়। কথাগুলো চটচট জুটে যায়। বাধা পড়লেই সারাদিনটাই মাটি।

পরের সকালটা নির্বিঘ্নে কাটল। বেশ কয়েক পাতা এগিয়ে গেল স্মৃতিকথা। পরদিন যথাসময়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে গৃহিণীর প্রবেশ। তার পিছনে দরজার ওপাশে থলে হাতে বংশী। রান্না চাপিয়ে এসেছেন। দাঁড়াবার সময় নেই। তাড়া দিয়ে বললেন, চট করে ওঠো। অনেক জিনিষ বাড়ন্ত। এই নাও ফর্দ। দেখো যেন এটা আবার হারিয়ে না যায়। টাকা বংশীর কাছে রইল। যাকে যা দিতে হবে, বলে দিও। ও-ই দেবে।

বলেই চলে যাচ্ছিলেন। কুঞ্জবাবু মাথার পেছনটা

চুলকোতে চুলকোতে বললেন, বংশীই যখন যাচ্ছে, তখন আবার আমার যাবার কী দরকার?

—আহা, ওকি আর বাজার করতে যাচ্ছে? কী বললাম সেদিন? ওকে সঙ্গে দিলাম টাকা-পয়সাগুলো সাবধান করে রাখবার জন্যে। রোজ রোজ তো আর এক-খানা পাঁচ টাকার নোট গচ্চা দেওয়া যায় না।

সেদিন নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন কুঞ্জলাল। আজ দেখলেন অর্ধাঙ্গিনীর অর্ধেক বুদ্ধিও তাঁর ধড়ে নেই।

কুঞ্জবাবু তার রোজকার রুটিন খানিকটা রদবদল করতে বাধ্য হলেন। সকালে উঠে চা-পর্ব শেষ করে নিজেই গরজ করে বাজারে বেরোন। ফিরে এসে চাকরি জীবনে যা করতেন, দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে ফেলেন। একটু বিশ্রাম করেই লেখা নিয়ে বসেন। এর মধ্যেই দিবানিদ্রার অভ্যাস খানিকটা পেয়ে বসেছিল। তার উপরে ঘা পড়ল। উপায় কি? সংসারে সব দিক বাঁচিয়ে চলা যায় না। একটা ধরতে গেলে আরেকটা ছাড়তে হয়। অ্যাডজাষ্টমেণ্ট অ্যাণ্ড রি-অ্যাডজাষ্টমেণ্ট। এই তো জীবন।

কিন্তু বেকার লোকের কাজের অন্ত নেই। কথাটা শুনতে প্যারাডক্স্—অর্থাৎ স্ববিরোধী উক্তি বলে মনে হলেও আসলে খাঁটি সত্য। কুঞ্জলাল এই ক'দিনেই সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলেন। সপ্তাহে তিনটি দিনও বিনা বাধায় কাটে না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রার্থী-প্রত্যাশী—সব মিলিয়ে পরিচিত মহলটা তো ছোট নয়। কত হরেক রকম দাবি নিয়ে আসে তারা। কারো বন্দুকের লাইসেন্স, কারো পাকিস্তানের পাসপোর্ট, কারো বা বাড়ি তৈরির লোন্ কিংবা ইন্‌কাম্‌ট্যাকসের মামলা। কে ইনক্রিমেণ্ট পায়নি, কার ট্রান্‌স্‌ফার চাই, কে প্রমোশন-প্রার্থী; এ আফিস থেকে সে আফিসের তদ্বির করে বেড়াও। না গিয়ে পারা যায় না। সবার মুখেই এক কথা—'আপনি একটু বলে দিলেই হয়ে যায়,' 'তোমার তো ওখানে বেজায় খাতির হে', 'আপনি না দেখলে কে দেখবে দাদা'—ইত্যাদি।

চাকরি থেকে অবসর নিয়েও অবসর নেই কুঞ্জবাবুর। কাজ না করলেও নানা জনের কাজের ধাঁধাঁয় ঘুরে বেড়ান আফিস পাড়ায়।

গৃহিণী মনে মনে খুশী। যে পুরুষ দুপুরবেলা ঘরে বসে থাকে, প্রতিবেশিনী সমাজে তার স্ত্রীর কোনো মান নেই। 'বাবু কী করেন?' এই প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। এতো শুধু প্রশ্ন নয়, বেকার স্বামীর স্ত্রী বেচারাকে বেকায়দায় ফেলবার ফন্দি। 'উনি লেখেন'—একথা বলে পার পাবার উপায় নেই। তার পরেই দ্বিতীয় প্রশ্ন, তাতো বুঝলাম, কিন্তু করেন কী? চাকরিজীবী পরিবারে দশটা থেকে পাঁচটা একছত্র গৃহিণীরাজ। সে রাজ্যে কর্তাদের অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছিত, নারী সেখানে সাত-ঘণ্টার স্বরাট।

কুঞ্জবাবু যে দুপুর বেলাটা বাইরে বাইরে কাটিয়ে দেন, এও তার একটা কারণ। স্ত্রীর মুখরক্ষা। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। সেখানে নিজের কোনো লাভ নেই, অর্থ-প্রাপ্তির যোগ নেই, কেবল মাত্র পরার্থে পরিশ্রম—কতদিন আর সহ্য হয়? তাছাড়া লেখাটাও এগুচ্ছেনা। সুতরাং বেগার খাটার ঘোরাঘুরি কিছুদিন পরেই বন্ধ করতে হল। কোনো কোনো আত্মীয় অসন্তোষ জানিয়ে গেলেন। কিন্তু কুঞ্জবাবু নিরুপায়।

এই সময়ে একদিন পিসশাশুড়ী এলেন এক নতুন অনুরোধ নিয়ে। তাঁর বড় মেয়েটি ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কোন এক সওদাগরী অফিসে চাকরির দরখাস্ত করেছিল। কর্তৃপক্ষ ইণ্টারভিউ মঞ্জুর করেছেন। সময় দিয়েছেন সোমবার বেলা দুটো। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখাটা করিয়ে আনতে হবে। জামাতাকে চুপ করে থাকতে দেখে বৃদ্ধা অনুনয়ের সুরে যোগ করলেন, আর কাকে বলি বাবা? সবাই কাজের মানুষ। তুমি যদি এই উপকারটুকু না করো—ইত্যাদি।

কুঞ্জবাবু বললেন, কিন্তু সুমিতা তো বেশ চটপটে মেয়ে। তার ওপরে আই-এ পাশ করেছে। একা যেতে পারবে না?

এবার উত্তর দিলেন স্ত্রী—কী যে বল, তার ঠিক নেই। অফিস পাড়ার ভিড়। ছেলেমানুষ; কোথায় যেতে কোথায় চলে যাবে। তাছাড়া সঙ্গে কেউ না থাকলে ঘাবড়ে যাবে না?

এর পরে আর কথা চলে না। কুঞ্জলালকে যেতেই হল।

চাকরি একটি। তার জন্যে পনর ষোলটি মেয়েকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এক এক জনকে মিনিট দশেকের আগে ছাড়ছেনা। সুমিতার পালা যখন এল তখন পাঁচটা বেজে গেছে—ততক্ষণ একটা তিনদিক বন্ধ ছোট্ট ঘরে বিদ্যুতের কড়া আলোর নীচে এক গাদা মানুষের ভিড়ে একনাগাড়ে বসে থেকে থেকে তার মাথা ধরে গিয়েছিল। ম্যানেজারের ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে লিফটের জন্যে অপেক্ষা না করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। ওখানেই একটা বেঞ্চিতে বসেছিলেন কুঞ্জবাবু। কাছে গিয়ে মস্ত বড়—একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, উঃ বাঁচলাম। চলুন, জামাইবাবু।

—হল? উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলেন কুঞ্জবাবু।

—হ্যাঁ; এতক্ষণে—দয়া করে ছাড়লেন কর্তারা।

—কী রকম বুঝলে?

—কী করে বলবো? কাজের কথা একটাও না। কেবল কতগুলো আজে-বাজে প্রশ্ন।

—ওকেই বলে পার্সোন্যালিটি টেষ্ট্।

—টেষ্ট্ না ছাই। লোকগুলো যেন কী রকম! মরুকগে। বাঃ, কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। চলুন না জামাইবাবু। ঐ মাঠে—একটু বেড়াই।

—'বেড়াবে?' বলে চারদিকে একবার তাকালেন কুঞ্জবাবু। ক্ষান্ত বর্ষণ শরতের ছায়া-ঢাকা বিকালটা সত্যিই বেশ মনোরম। অদূরে মাঠের বুকে সবুজ ছাওয়া-মুক্তি। পিঞ্জরাবদ্ধ সহরবাসীর কাছে তার ডাক অলঙ্ঘনীয়। তারই স্বীকৃতি বেরিয়ে এল সুমিতার মুখ থেকে—বাড়ি ফেরা মানেই তো সেই দেড় খানা ঘরের খাঁচা।

'চল।' বলে এগিয়ে চললেন কুঞ্জলাল। কার্জন পার্কের কাছে এসে বললেন, শুধু হাওয়া খেলে তো পেট ভরবেনা। একটু চা'এর জন্যে প্রাণটা টা টা করছে। আগে চল; একটা রেস্তোঁরায় ঢোকা যাক।

সে বিষয়ে সুমিতার নিজের গরজও কম ছিল না। তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ উপাদেয় চব্য বস্তুর প্রয়োজনও বোধ করছিল। ভগ্নীপতির প্রস্তাবে মনে মনে খুশী হল। কিন্তু বাইরে একটা নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে বলল, আপনি আসুন, আমি এখানে বসি।

—কেন?

—ওসব রেস্তোঁরা ফেস্তোরা আমার ভালো লাগে না।

—লক্ষণ তো ভালো নয়। মন্তর টন্তর নিয়েছ নাকি?

সুমিতা হেসে উঠল, হ্যাঁ; ঐটাই বাকী আছে।

—তাহলে আর আপত্তি কী? তোমার মত বয়সে তোমার দিদিকে ঐ পর্দা ঢাকা খোপের মধ্যে একবার ঢোকালে আর বের করে আনা যেত না।

—তার কারণ ছিল।

—কী কারণ?

—আপনারা জানেন। আমি কেমন করে বলবো: আমি কখনো ঢুকেছি নাকি ওখানে?

—সেদিন তো আসছে। তার আগে রিহার্সালটা হয়ে থাক না।

সুমিতার সুগৌর মুখের উপর একটি লজ্জার আভা খেলে গেল। কুঞ্জবাবু শ্যালিকার পিঠের উপর হাত রাখলেন। সেই ভাবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন মোড়ের দিকে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে মাঠে যখন পড়লেন, তার আগেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

পশ্চিম আকাশের দিকে নজর পড়ল কুঞ্জলালের—বললেন, বেশ মেঘ করেছে। ঘুরবে, না বাড়ি যাবে?

—কোথায় মেঘ? আপনি ভারী ভীতু।

—ভীতু কি আর সাধে? তোমার মত রক্তের তেজ তো নেই। বৃষ্টিতে ভিজে নিমুনিয়ায় ধরলে বুকে পুলটিস লাগাবে কে?

—কেন, দিদি? মুখ টিপে হাসল সুমিতা।

হ্যাঁ:, দিদিকে কে দেখে তার ঠিক নেই। কোমরে বাত, হাঁটুতে খচখচ, দাঁতে কনকনানি।

—বেশ; পুলটিসটা না হয় আমি গিয়ে লাগিয়ে দেবো।

—বাঃ, তাহলে আর ভাবনা কি? এরকম নরম নরম মিষ্টি হাতের সেবা পেলে রোজ নিমুনিয়া বাধাতে রাজী আছি।

শ্যালিকার বাঁ হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে যেন নতুন উৎসাহে পা চালালেন কুঞ্জবাবু।

ময়দানের ভিতরে যে রাস্তা গুলো, তাতেও গাড়ি ঘোড়া লোকজনের ভিড়। সে সব এড়িয়ে ওঁরা খোলা মাঠে পড়লেন। কথা বলতে বলতে এগিয়ে চললেন দক্ষিণ দিকে। খানিকক্ষণ হাঁটবার পর কুঞ্জবাবু কিছুটা ক্লান্তি বোধ করে বললেন, এসো, একটু বসি।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। এরই মধ্যে চারদিকটা কখন অন্ধকার হয়ে গেছে গল্পে গল্পে দুজনের কারো খেয়াল নেই। হঠাৎ মেঘের ডাক কানে যেতেই নজর পড়ল! আকাশের দিকে চেয়ে কুঞ্জবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। এতক্ষণ আশে পাশে দুচারটি লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। তাকিয়ে দেখলেন, কেউ নেই। বোধহয় মেঘের তোড়জোড় দেখে সরে পড়েছে। নির্জন ফাঁকা মাঠ। তার উপরে আকাশ ভেঙে আসছে। সুমিতার বুকের ভিতরটাও কেঁপে উঠল। কুঞ্জবাবু তাড়া দিলেন, 'চল, চল, জল আসছে।' কয়েক পা এগোতে না এগোতেই ঝাপিয়ে পড়ল বৃষ্টি।

বাঁ দিকে শ'খানেক গজদূরে গোটা কয়েক বড় গাছ চোখে পড়ল। কাছে ধারে আর কোনো আশ্রয় না দেখে দুজনে সেই দিকেই ছুটলেন। সে পর্যন্ত পৌছবার আগেই একেবারে নেয়ে উঠতে হল। মুষল ধারে বর্ষণ—। গাছ আর কতটুকু ঠেকাতে পারে। একধারে একটা মোটা ডাল খানিকটা নুয়ে পড়েছিল। তারই নীচে ঢুকে গিয়ে গুঁড়ির সঙ্গে মিশে কুঁজো হয়ে যতটা সম্ভব মাথাটা বাঁচাতে চেষ্টা করলেন কুঞ্জবাবু। ওরই মধ্যে একটুখানি সংকীর্ণ আচ্ছাদন। সুমিতা পাশে দাঁড়িয়ে ভিজছিল। হাত ধরে নিজের কাছে টেনে নিলেন। বৃষ্টির বেগ তুমুল হয়ে উঠল।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। জামাইবাবুর গা ঘেঁসে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে সিক্ত এবং ভিতরে অনু-শোচনায় দগ্ধ হতে লাগল সুমিতা। উনি তো গোড়াতেই আপত্তি করেছিলেন। সে জোর করল বলেই অগত্যা রাজী হলেন। এ দুর্ভোগের জন্যে সে-ই সবটুকু দায়ী। বুড়ো মানুষ, যদি কোনো শক্ত অসুখ করে? দিদির কাছে সে মুখ দেখাবে কেমন করে।

কুঞ্জবাবু তখন ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছেন। এদিকে বৃষ্টির বিরাম নেই। সুমিতা কি করবে ভেবে পেলনা। ভিজে আঁচল খানা নিংড়ে ওর পিঠের উপর তুলে দিয়ে নিজের দেহের আড়াল দিয়ে যতখানি সম্ভব ওঁকে বাঁচাতে চেষ্টা করতে লাগল।

গাছের তলায় গাঢ় অন্ধকার। হঠাৎ তার মধ্যে একটা তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল। দুজনেই চমকে উঠলেন এবং নিজের অজ্ঞাতসারেই একটুখানি সরে দাঁড়াল সুমিতা। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই একটা লোক এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। মাথা থেকে হাঁটুর নীচেটা পর্যন্ত বর্ষাতি জড়ানো। পায়ে ভারী বুট। ওদের উপর টর্চ ফেলে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েকবার দেখে নিয়ে একটু হাসল। অর্থপূর্ণ বাঁকা হাসি। তারপর গম্ভীর কর্তৃত্বের সুরে কুঞ্জবাবুকে লক্ষ্য করে বলল, ইনি আপনার কে হন?

কুঞ্জলাল ভিতরে উষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন। রুক্ষ স্বরে বললেন, তা দিয়ে তোমার কী দরকার!

—খুব তেজ দেখাচ্ছেন, দেখছি। তার মানে, ব্যাপারটা গোলমেলে। আপনাদের থানায় যেতে হবে।

—কেন? তেমনি ঝাঁজালো সুরে বললেন কুঞ্জবাবু।

—কেন, তা এখনো বুঝতে পারছেন না? বেশ খানিকটা ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলল লোকটা। 'এর নাম গড়ের মাঠ, মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করবার জায়গা নয়।'

'চোপরাও', গর্জে উঠলেন ভূতপূর্ব পুলিশ ইনস্পেক্টর কুঞ্জলাল সাহা। স্থান কাল পাত্র জ্ঞান রইলনা। তোম্ চুপ রও—সমান তালে দিল ধমক পুলিশের সিপাই। 'চলো।' বলে এগিয়ে এসে কুঞ্জবাবুর হাতটা ধরবার চেষ্টা করতেই সুমিতা বলে উঠল—গায়ে হাত দেবেননা। চলুন, কোথায় যেতে হবে।

মাঠের অন্ধকারে একজন পুলিশের মুখের উপর যা-ই বলুক, ঐ অবস্থায় থানায় পৌছবার পর কড়া আলোয় অতগুলো কৌতূহলী লোকের সামনে সুমিতা কিছুতেই মাথা তুলতে পারছিলনা। নির্দেশমত একটা বেঞ্চির কোণে নতমুখে বসে রইল। কনষ্টেবলটি চুপি চুপি কী বলল তার বন্ধুদের কাছে। নিমিষের মধ্যে সমস্ত ঘরময় একটা চাপা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। সুমিতা মাটির দিকে চেয়েই বুঝতে পারল, চারপাশে একঘর পুরুষের সবগুলো চোখ তীরের ফলার মত তার দিকে উদ্যত হয়ে

আছে এবং তার মধ্যে জলজল করছে কুৎসিত ইঙ্গিতভরা কৌতুক।

ও-সি বা অন্য কোনো অফিসার তখন উপস্থিত ছিলেন না। ওঁদের অপেক্ষা করতে বলা হল। কুঞ্জবাবু একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। সিপাহীদের মধ্যে তার পূর্ব্বতন অনুচর কেউ আছে কিনা, দেখতে পেলেননা। একদিকে নিরাশ যেমন হলেন, আরেকদিকে তেমন স্বস্তিও পেলেন অনেকখানি। পরে যা-ই হোক; আপাততঃ যেন একটা গভীর লজ্জার হাত থেকে বেঁচে গেলেন।

'কুঞ্জদা না?' একটু বাধহয় ঝিম ধরেছিল কুঞ্জবাবুর। চমকে উঠে চোখ তুললেন। সামনে দাঁড়িয়ে সাব ইনস্‌পেক্টর বিনোদ চ্যাটার্জি। কয়েকমাস আগে এক সঙ্গে কাজ করেছেন বড়বাজার থানায়। উনি জবাব দেবার আগেই চ্যাটার্জি বিস্ময়ের সুরে বলল, কী আশ্চর্য্য! আপনি এখানে! উনি কে?'—পাশে বসা সুমিতার দিকে ইঙ্গিত করল।—আর বলোনা, ভাই। কপালের দুর্ভোগ।—'এ ঘরে আসুন।' বলে ও-সি পাশের কামরায় ঢুকল। সুমিতাকে ডেকে নিয়ে কুঞ্জবাবু তার অনুসরণ করলেন।

ওঁদের বসিয়ে চ্যাটার্জি বেরোতে বেরোতে বলল, একটু বসুন দাদা। আমি দুমিনিটের মধ্যে আসছি।

খানিক পরে একজন সিপাই এসে তিন কাপ চা রেখে গেল। কুঞ্জবাবু একটা পেয়ালা সমেত ডিস সুমিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজের কাপটা টেনে নিয়ে বললেন, এসো, একটু গরম হয়ে নেওয়া যাক।

সুমিতা হাত বাড়ালনা। শুধু একবার নিঃশব্দে মাথা নেড়ে যেমন ছিল তেমনি বসে রইল।

পরমুহূর্ত্তেই ফিরে এল চ্যাটার্জি। চায়ের কাপ তুলে নিয়ে নিজের চেয়ারে বসতে গিয়ে সুমিতার দিকে নজর পড়তেই বলল, কই, আপনি চা খেলেন না?

সুমিতা কিছু বলবার আগেই উত্তর দিলেন কুঞ্জবাবু, ও চা খায় না। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। সুমিতা, আমার শালী। আশুতোষ কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে।

—ও, আ-চ্ছা। কী ব্যাপার বলুন তো? ওঁকে নিয়ে এই বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ থানায় যে?

সন্ধ্যার আগে থেকে যা কিছু ঘটেছে কুঞ্জলাল তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন। চ্যাটার্জি হো হো করে হেসে উঠল—শেষকালে আপনিও পুলিশের হাতে পড়লেন, দাদা! তাও এই রকম কেস্‌-এ।

বলে, আড়চোখে একবার তাকাল সুমিতার দিকে। তার মাথাটা যেন আরো নুইয়ে পড়ল। চ্যাটার্জি বলল, তা, যাই বলুন, আমার সিপাইটি কিন্তু বেশ ডিউটিফুল।

—'হ্যাঁ; তবে একটু অতিরিক্ত', মন্তব্য করলেন কুঞ্জলাল। 'বুড়োমানুষ দেখেও—'

—বুড়োমানুষ কি বলছেন? আপনার চেয়ে অনেক বুড়ো অনেক কিছু করে বেড়ান ঐ গড়ের মাঠে। তিনদিন আগেই তো একজনকে ধরে নিয়ে এল। বেশ নামী লোক। মেয়েটা একেবারে কচি।

যাক্ ওঁর সামনে এসব আলোচনা—। আপনারা এবার আসুন। যে রকম ভিজেছেন দুজনে, অসুখে না পড়েন।

কুঞ্জবাবু উঠতে উঠতে বললেন, কেলেঙ্কারিটা যেন আর বেশী দূর না গড়ায়, তাই দেখো।

—গড়ালেই বা মন্দ কি। শালী তো।

বলে, একটু মুখ টিপে হাসল চ্যাটার্জি। তারপর বলল, দাঁড়ান, একটা ট্যাক্সি ডাকতে বলি।

সিঁড়ির ঠিক মাথার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন গৃহিণী। সেখান থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, কোথায় ছিলে তোমরা? একটা খবরও তো দেয় মানুষ। সেই পাঁচটা থেকে ঘরবার করছি।

—খবর দেবো কী! যা বিষ্টি এক কোমর জল দাঁড়িয়ে গেছে আফিসের সামনে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বললেন কুঞ্জলাল।

—সেখানেই ছিলে এতক্ষণ!

—আর কোথায় যাবো? চারঘণ্টা ঠায় বসে সেই দারোয়ানের বেঞ্চির ওপর।

সুমিতা ছিল ঠিক পিছনে। তার বিস্মিত চোখের দিকে চেয়ে একবার চোখ টিপলেন কুঞ্জবাবু। আর একটু উঠতেই গৃহিণী বললেন—ঈস, এ রকম ভিজলে কি করে? বিষ্টিতো সেই কখোন ছেড়ে গেছে।

—শরৎ কালের বিষ্টির ঐ তো মজা। এদিকে খটখটে, ওদিকে বন্যা।

—নাও, আর দাঁড়িওনা। ওগুলো সব ছেড়ে ফেল। আমি কাপড় নিয়ে আসছি। সুমি, তুই ওদিকের কলতলায় চলে যা। আলনায় শাড়ি সায়া ব্লাউজ সব আছে। নিয়ে নিস।

স্ত্রী আড়ালে যেতেই এই সত্য গোপনের কৈফিয়ত-স্বরূপ শালীকে একটা কি বলতে যাচ্ছিলেন কুঞ্জবাবু। চোখের দিকে চেয়ে মনে হল, দরকার নেই। সেখানে এর পূর্ণ সমর্থন।
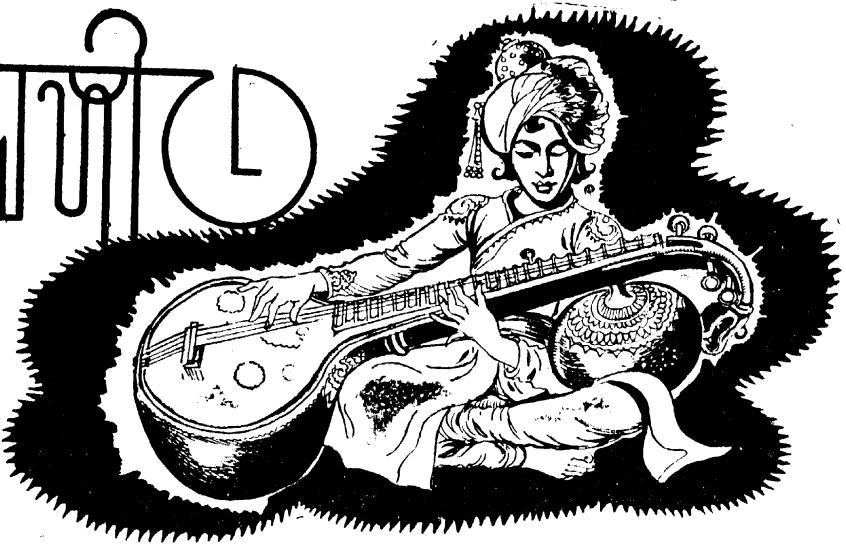
গান

প্রাণের রাধার কোন ঠিকানা—
কোন ভুবনের কোন ভবনে ?
বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে ?
ঘুরে দেশে দেশান্তরে—
এলাম শেষে তেপান্তরে—
পেলাম নাকো রাধার দিশে শুধাইলাম জনে জনে।

হায় কি তারে পাবনাকো হায় বাউলের এ জীবনে ?
মনের চকোর কেঁদে মল (হায়) চাঁদ উঠেছে কোন গগনে ?
প্রাণের কথার লেখনগুলি
লিখে লিখে রাখি তুলি
ডাকঘরে হায় নিলে নাকো
ফিরে দিলে ডাক পিওনে।

কথা ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সুর ঃ নরেন চট্টোপাধ্যায় স্বরলিপি ঃ কুমারী সাগরিকা চট্টোপাধ্যায়

II গ - প | ধ র্স - | র্গ - - | র্ম র্প র্ম | র্গ - - | - র্গ র্র |
প্রা - ণে র রা - ধা - - - - - - - - - - র

র্রর্ম র্গর্গ র্রর্র | র্সর্ন ধ ন | র্স - - | - - - | পগ - প | ধ র্স র্স |
কে - - -ন ঠি- - কা না - - - - - কোন - ভু ব নে র

ন ধ প | ধ নধ প | গ - - | - - - | গ গ প | ধ র্রর্স নর্স |
কো - ন ভ - - ব নে - - - - - ব ল তে পা র- - -

ন ধ প | প পধ র্সণ | ধ প ম | পধপ - র্ম | গ - - | - - - |
কোন স জনী- - - কো - - স - - - জ নে - - - - -

গ - প | ধ র্স - | র্গ - - | র্ম র্প র্ম | র্গ - - | - - - |
প্রা - ণে র রা - ধা - - - - - - - - - - -

- - - | - - - | II Music. র্ধ - র্পর্ম | র্গর্র র্গ - | র্প - র্মর্গর্র |
- - - - - -

র্স - র্র | র্ম - র্গর্র | র্স - ন | প - ণ | ধ প ম | গ - - | - - - |

II ন নর্স নন | ধ প ধ | ধ ন ন | ন নর্র র্স | ন - - | - - - |
ঘু রে- - - দে শে - দে - শা ন্ ত- - রে - - - - -

প ন ন | র্স র্রর্গ র্র | র্স - র্সন | ধ ন - | র্স - - | - - - |
এ লা ম শে ষে- - তে - পা- ন্ ত - রে - - - - -

র্স র্স র্সর্র | র্র র্র র্র | র্র র্র র্র | র্র র্গর্র স | র্স র্স র্গ | র্গর্র র্র র্গ |
পে লা - ম না কো - রা ধা র দি শে- - শু ধা ই লাম - জ

র্গর্র র্স - - | র্স র্স - | II কোন ভুবনের…কোন স্বজনে ? প্রাণের রাধা বলিয়া টানিতে হইবে
নে- - - - জ নে - যথা দ্বিতীয় টানের মত।

Music :—প - - | - প ম | ধ - - | - প ম | প - - | - ম - | গ - - | - - - |

II স সগ | গ গ ম | প প - | ধ ধর্স নর্স | ধন পধ - | - ধন র্রর্র |
হায় - কি তা রে - পা রো - না কো- - - - - - - - - হা- য়

- - প | ধ র্সণ - | ধ ধ প | ম গ - | - - - | - - - |
- - বা উ লের - এ - ন্ধী ব নে - - - - - - -

স সগ | গ গ ম | প প প | ধ ধর্স নর্স | ধন পধ - | - - - |
ম নে র চ কো র কেঁ দে - ম লো- - - -- -- - - - -

র্ম - - | - র্প র্ম | র্গ - - | - - - | গ প প | প প - |
হা - - - - - - - - - - য় চাঁ দ উ ঠে ছে -

ধ - র্স | র্র র্গর্র র্স | র্রর্গ - - | - - - | - - - | - - - |
কো - ন গ - - গ নে- - - - - - - - - - - -

গ গ প | প প প | ধ র্স র্স | র্স র্স র্স | র্র র্গ - | র্র র্স - |
প্রা ণে র ক থা র লে খ ন গু লি - লি খে - লি খে -

র্র র্গ র্গ | র্গ র্পর্ম - | র্গ - - | - র্র র্ম | র্ম র্ম র্ম | র্ম র্ম র্ম |
রা খি তু - তু- - লি - - - - - ডা ক ঘ রে হা য়

র্গ র্মর্গ - | র্র র্গর্র - | র্স র্স - | ন ধ - | ধপম - - | প ধপ ম |
নি লে- - না কো - ফি রে - দি লে - ডাক- - - পি -- ও

গ - - | - - - | II কোন ভুবনের……
নে - - - - -

শিকার

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

রাত দুটো হবে। অসহ্য গরমে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালার পাশেই শুয়েছিলাম, চোখ খুলতেই দেখি, তেঁতুল গাছের গোড়ায় একটি অতিকায় জীব সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মাথার উপর দুটো হাত তুলে দিয়ে কিছু টেনে নামাবার চেষ্টা করছে। দৃষ্টিভ্রম না হলে বলতে হয়,আচরণটি—কতকটা আঁচড়ানর মতন।

কৃষ্ণ পক্ষের ঝিমান চাঁদ, তাও জঙ্গলের ওদিকটায় ঝুঁকে পড়ায় এদিকে গাছের ছায়ায় প্রায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। এত ক্ষীণ আলোয় দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে হলে অনুমানের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। দুইটির সহযোগিতায় যা বার হোলো, তাতে তৎক্ষণাৎ খাটিয়া পরিত্যাগ করার জন্য উঠে বসলাম। তাড়াহুড়ার পুরান পচা দড়ির বাঁধন দুই এক জায়গায় ছিঁড়েগেল। দড়ি ছেঁড়ার সামান্য শব্দ শুনেই জীবটি জানালার দিকে ফিরে

তাকাল, তার পর চার পায়ের উপর ভর দিয়ে সমস্ত দেহটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দিল। যা দেখলাম তাতে চক্ষু স্থির হয়ে গেল। এই সময় চতুষ্পদীর মাথার দিকটা ছায়ার বাইরে এসে পড়েছিল। বড় বাছুরের মত প্রকাণ্ড বাঘ।

হঠাৎ উঠে বসার দরুণ, খাটিয়ার উপর সমস্ত দেহভার এক জায়গায় পড়েছিল, ফলে দুর্ব্বল স্থানের বাঁধনগুলি দুই একটি করে ছিঁড়তে লাগল। বাঘ গোড়াতেই চমকে ছিল। শব্দের ক্রমবৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

জঙ্গলের গোড়াতেই, তেঁতুল, শিমুল ও শাল গাছের ভিড়। ফরেষ্ট বাংলোর সামনে যে টুকু জায়গা পরিষ্কার ছিল, তার ওপাশেই হাত দেড়েক উঁচু আগাছা ও আসসেওয়ার ঝোপ। আশ্চর্য্যের ব্যাপার ঐ টুকুর আড়াল পেতেই অত বড় বাঘ গা ঢাকা দিয়েছিল। কিন্তু লুকোচুরির খেলা মুহূর্ত্তে ভীতিপদ হয়ে উঠল। দেখি জঙ্গলের গোড়া থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে খোলা জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসেছে। কি ভাবে এবং কেমন করে ওখানে এল অনুমান করা শক্ত। ইতিমধ্যে হাঁটু ও কুনুই এর উপর বসে লেজ নাড়ায়, আক্রমণের পূর্ব্ব লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাঘের মুখ জানালার দিকে, খুব সম্ভবতঃ আমাকেই খুঁজছিল। ঘরের ভিতর গাঢ় অন্ধকার হলেও নিশাচরের দৃষ্টিকে অত কাছ থেকে এড়ান সম্ভব নয়। আমাদের মাঝে ব্যবধান তখন বিপদসঙ্কুল কেন্দ্রের ভিতর এসে পড়েছে! জানালায় লোহার গরাদ লাগান থাকলেও নিরাপদ ভাবা চলে না। দীর্ঘকালের অবহেলা এবং মরচের প্রকোপে কোন গরাদের শেষাংশ কতটা উপে গিয়েছে জানা নেই। সন্দিগ্ধ বাঘ যদি কোন প্রকারে ভয় কাটিয়ে ফেলতেপারে—তাহলে এগিয়ে এসে, গাছে আঁচড় কাটার মত সোজা দাঁড়ালে—গরাদে পথ ছেড়ে দিতে পারে, অথবা বাঘের ওজনেই কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

সচরাচর এইরূপটী ঘটে না বলেই জানালার অত কাছে খাটিয়া টেনে এনেছিলাম। খাটিয়ার গায়ে হেলান দিয়ে ভরা বন্দুকও রেখেছিলাম। কিন্তু ঘটনাচক্রের ফলে অস্ত্রটি অত কাছে থেকেও বিপদের সময়ে নাগালের বাইরে রয়ে গেল। একটু হেলে হাত বাড়ালেই বন্দুকে কাছে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐটুকু নড়লেই বাঘকে বেশী করে আকৃষ্ট করার আশঙ্কা থাকায় নিরস্ত হলাম।

বাঘ ঠায় জানালায় দিকে তাকিয়ে, পাথরের মত অটল অবস্থায় বসে রইল। পলে পলে সময় এগিয়ে চলেছে। অনেকক্ষণ আড়ষ্ট অবস্থায় বসে থাকায়, জানু ও গোড়ালী অসাড় হয়ে আসতে লাগল। পায়ে সাংঘাতিক ঝিন্‌ ঝিনি ধরেছে। মাঝে মাঝে ভাবছি—যা থাকে কপালে হবে, পা দুটো নাড়াই। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত বেপরোয়া হয়ে যেতাম। হঠাৎ জন্তুটি উঠে, বাংলোর পিছন দিকে চলে গেল। চলার ভঙ্গীতে বেশ তাড়া ছিল! পিছন দিকের দরজা বন্ধ করেছিলাম বলেই মনে পড়ে। বন্ধ হলেও আশ্বস্ত হবার মত কিছু ছিল না। লোহার গরাদের মতই হয়ত কাঠের শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে।

বাঘ উঠে যেতেই বন্দুক তুলে নিলাম। নলের কাছে হাত আসতে বুঝলাম, টর্চ লাগান হয় নি। উপরি টর্চ বাক্স থেকে বার করতে পারিনি বলে বন্দুকেরটি বালিসের তলায় রেখে দিয়েছিলাম। সব কাজে ব্যবহারের জন্য। বন্দুক থেকে টর্চ পৃথক হওয়ায় একত্রে উভয়ের ব্যবহার সম্ভব নয়। অসুবিধায় পড়ে গেলাম। অন্ধকারে কব্জার সঙ্গে মিল রেখে আলোকে বন্দুক সংলগ্ন করাও অসম্ভব। তবু উভয়কে এক সঙ্গে ব্যবহার করার চেষ্টায় ধাতুর ঠোকাঠুকিতে যে শব্দ হল তাতে জানালার পাশেই বুক কাঁপান হুঙ্কার শুনলাম। বাঘ পিছন দিক থেকে ঘুরে এসে ঐ খানে বসেছিল। শব্দ না হলে হয়ত জানালার উপর এসে দাঁড়াত এবং দেহের খানিকটা ওজনেই গরাদগুলির কি অবস্থা হোতো বলা যায় না। হুঙ্কারের সঙ্গেই বাঘ লাফ মেরেছিল, পরক্ষণে দেখলাম বাঘ উঠানের মাঝখানে। এই সময় জঙ্গলের ভিতর একাধিক ছোট জানোয়ারের ছোটাছুটি সুরু হোলো। ছোটাছুটির শব্দে পালানর সঙ্কেত ছিল না, খেলার ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম। বাঘ ও জঙ্গলের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ করতে লাগল, ঠিক যেভাবে বেড়াল ছানা কাছে থাকলে তাদের মা নিজের উপস্থিতি জানায়। অল্পক্ষণ পরেই জঙ্গলের ভিতর থেকে দুইটি বাঘের বাচ্চা বেরিয়ে এল। দুইটিই প্রায় সাবালক হয়ে উঠেছে। বাচ্চাগুলি মায়ের কাছে আসার আগেই মা নিজে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলো ফেললাম। দুইটি জলন্ত চোখের উপর আলো পড়ল, তারপর আবার ছোটার শব্দ শুনতে পেলাম।

চোখ ও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। থেকে থেকে শুকন পাতা বা কুটো মুচড়ে যাওয়ার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম বটে, কিন্তু নিরাপদ ভাবার অবকাশ ছিল না। পাল্লাহীন জানালায় ঢাকাঢুকির কোন ব্যবস্থা না থাকায় বাকি রাত জেগেই কাটাতে হোলো।

ডবল ফাঁড়া কাটল। বন্দুকে টর্চ লাগান থাকলে উত্তেজনাকে ঠেকিয়ে রাখা যেত না। বাঘিনীর পিছনে ধাওয়া করলে হয় বাচ্চার মা রুখে দাঁড়াত, অথবা বাচ্চাদের বাপ তেড়ে এলে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। বাচ্চা-গুলির চরে খাবার বয়স হয়েছিল। বাঘিনী পুনরায় বিবাহযোগ্যা হওয়ায় নতুন স্বামীর খোঁজে ছিল না এমন কথা বলা যায় না।

সকাল হতে প্রথমেই জানালার পাশে পায়ের দাগ পরীক্ষায় লেগে গেলাম। এইখানেই কাল সন্ধ্যাবেলা

সকাল হতে প্রথমেই জানলার পাশে পায়ের দাগ পরীক্ষায় লেগে গেলাম।

জলেভর্তি বালতি উল্টে ছিল। রোয়াক এখন কাদায় ভরে আছে। স্থানটির কাছে আসতেই বিরাট থাবার ছাপ দেখা গেল। বাঘ শুধু জানালার কাছে আসে নি, এখান থেকে ফিরে স্নানের ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় বাচ্চাদের জঙ্গলের বাইরে দেখে ফিরে যায়।

পিছনটাও দেখে আসব কিনা ভাবছি এমনি সময় ঐ দিকে বাংলোর গায়ে লাগা গাছের উপর থেকে হনুমানের ডাক শুনলাম। ও ডাকের অর্থ জানার জন্য অভিধান দেখতে হয় না। হনুমান আগডালে বসে পাহারা দিচ্ছিল, বাঘ কিম্বা লেপার্ড দেখলে গলা থেকে একরকম আওয়াজ বার করে—যা শুনলে দলভুক্তরা সাবধান হয়ে যায়। দলভুক্ত কেন জঙ্গলের যে কোন জীব আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। সন্দেহ রইল না বাঘ কাছেই ঘুরছে।

সতর্কতার সঙ্কেত শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বিশ্বস্ত অস্ত্র সঙ্গে ছিল, নির্ভয়ে পিছনের দিকে গেলাম। খিড়কির কবাটের কাছে আসতে দেখি, সেটি খোলা। বাঘের আচরণও অদ্ভুত, সে এদিকে কেবল আসেনি—খোলা কবাটের সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। শুকন বালির উপর চলার গতি, দাঁড়ান এবং লেজ নাড়ার বিশেষ সঙ্কেতপূর্ণ ভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়ে আছে। প্রমাণকে অস্বীকার করার উপায় নেই। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম—পোড়ো বাড়ী পেয়ে বাঘ সপরিবারে এইখানেই বসবাস করছিল না তো? পিছনের জঙ্গল একেবারে বাংলোর গায়ে লেগে মাইলের পর মাইল পাহাড় ঘিরে আছে। লক্ষ্য করলাম, একটি মোটা গাছের ডাল ছাদের উপর ভর করায় খোলা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

সামনের দিকে ফিরে এলাম বাংলোর পরিস্থিতি দেখার জন্য। শোবার ঘরের পাশেই স্নান ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। এখন এদিককার দেয়াল পড়ে গিয়ে আবরুর বালাই সরিয়ে ফেলেছে। দুই পাল্লার কবাটে একটির অস্তিত্ব নেই। দেখা করলে এদিক দিয়েও ভিতরে যাবার প্রবেশ। রোদের নেয়া যায়। কবাটের কাছেই দেয়াল ধসে যা ছেড়েছে। স্তূপ ও ধুলার ঢিপি হয়ে গিয়েছিল। ইটের মাঝে ফাটল-গুলিও ভীতিপ্রদ। যে কোনটিকে গোক্ষুর সাপ বাস্তুভিটা বলে দাবী করলে উচ্ছেদের নালিশ আদালত মানবে না। সংক্ষেপে বাংলোটি রাত্রিবাসের পক্ষে একেবারেই নিরাপদ নয়। লোকজন এলেই এখান থেকে পাত্তাড়ী গোটাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম। বিপদ সামনে থাকলে তাকে সামলান যায়, কিন্তু আনাচে কানাচে ওৎ-পাতা বাঘ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার মত বোকামি আর কিছু নেই।

ঘরে ঢুকলাম খিড়কির কবাট বন্ধ করার জন্য। চেষ্টায় মরচে ধরা কবাট যে আওয়াজ করল তাতে হনুমানের সতর্কতার ডাক ফলদায়ী হয়ে গেল। কবাটের একটু

দূরেই বাঘ বসেছিল, বিপরীত দিকে মুখ থাকাই স্বাভাবিক, হয়ত অন্যমনস্কতার যোগও ঘটে থাকবে। এই কারণে আমার উপস্থিতি বুঝতে পারেনি। লোহার সংঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ নড়া সুরু হোলো এবং অদৃশ্য জানোয়ার মন্থর-গতিতে দূরে চলে যেতে লাগল। ঝোপের ভিতর চলার ভঙ্গীতে যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাতে বাঘ ছাড়া অন্য কোন জানোয়ারকে ভাবা চলে না। শব্দের দূরত্ব নিরাপদ হতে কবাট বহুকষ্টে বন্ধ করলাম বটে, তবে অত কষ্ট না করলেও চলত। দুইটি পাল্লারই নীচের দিকটা উইপোকা খেয়ে গিয়েছে। উচ্ছিষ্টের প্রাচুর্য্য যেটুকু পড়ে আছে তা আঙ্গুলের ছোঁয়া লাগলেই ছেঁদা হয়ে যায়। তবু বন্ধ করায় সান্ত্বনা আছে। ঐটুকু লাভ সংগ্রহ হওয়াতে ফিরে এসে খাটিয়ায় বসতে গেলাম। অত সুখ কপালে সইল না। হঠাৎ উঁচু থেকে সমস্ত দেহভার একই জায়গায় পড়তে যে কয়টা বাঁধনের জায়গা ছিঁড়তে বাকি ছিল সেগুলি শেষ কর্ত্তব্য সেরে আমাকে সুদ্ধ মাটিতে বসিয়ে দিল। পিছনটা সামনে পড়ায় পা দুটো উপর দিকে উঠে গেল। ছোট শিশুকে চিৎ করে শুইয়ে দিলে যে ভাবে সে উপর দিকে পা ছোঁড়ে, আমার অবস্থাও দাঁড়াল তদ্রুপ। কপাল জোর, রেডি ট্রিগার-যুক্ত ভরা-বন্দুক হাতে ছিল না। বিশেষ চেষ্টার দ্বারা মানুষ-ধরা ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে একটি শিকারের সরঞ্জাম-[illegible] কাঠের বাক্সের উপর বসতে যাব দেখি, বিশাল জানালায় [illegible] মাছি ধরে আহারের আয়োজন চালিয়েছে। দৃশ্যটি চলে না। [illegible] আক্রমণোদ্যত বাঘের চেয়েও ভয়াবহ। একটা কোন গরাদের [illegible] খুঁজছিলাম ওটাকে মারার জন্য। উপযুক্ত সন্দিগ্ধ বাঘ [illegible], ঝাঁটা, মুড়ো ঝাঁটা এখানে দুর্লভ। খুঁজে পাওয়া গেল না। জুতা পেটাবার সাহস নেই—নিজের হাত মাকড়সার অত্যন্ত কাছে এসে পড়বে, বাইরে গেলাম, বাঁশের কঞ্চি বা ছোট ডাল যাহোক কিছু যোগাড় করতে। একটা পাওয়া গেল, ফিরে এসে দেখি শিকার ধরে মাকড়সা আমার খাটিয়ার তলায় একরাস ছেঁড়া দড়ীর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। পলাতককে ছেড়ে দিলাম, কারণ বন্দুকের তাগ-মারিতে সিদ্ধহস্ত হলেও কঞ্চিকে বিশ্বাস নেই। মার ঠিক জায়গায় না পড়লে এই জাতীয় কীট লাফ মারে। মাকড়সার কামড়ে ঘায়ে জর্জ্জরিত হয়ে মানুষকে মরণাপন্ন হতে দেখেছি। সুতরাং আমার ভীতিকে হাস্যকর ভাবা চলে না। ওদের লাফের বহর না দেখলে বিশ্বাস করার উপায় নেই।

খাটিয়ার তলায় বিষধর কীট চলে যেতে, আর একটা বাক্সের উপর বসে পড়লাম। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, তার উপর উত্তেজনা ঝিমিয়ে যেতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাষ্ঠাসন হলেও দেয়ালের ঠেসান পেতে আরামের খপ্পরে গিয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ তন্দ্রাভূত হয়েছিলাম! আরাম বেশীক্ষণ ভোগ করা গেল না। খাটিয়ার তলায় খট খট শব্দ হতে সজাগ হয়ে বসলাম, আর এক শিকারের দৃশ্য চোখের সামনে উপস্থিত। একটি পাহাড়ী টিকটিকি কোন পোকা ধরে সেটাকে গলাধঃকরণের চেষ্টায় সাংঘাতিক ঝাঁকুনি দিচ্ছে—এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখও শুকন মেজেতে ঠুঁকে যাচ্ছে। যেখানে এসেছি, সেখানে অধিকাংশ জীবেরই খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। ওদিকে নজর দিয়ে লাভ নেই। দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে উঠতে লাগল। এর ভিতর দুজন জঙ্গলীর—ফিরে আসার কথা। আহারের ব্যবস্থার জন্য টাকাও দিয়েছিলাম কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ওদের পাত্তা নেই। সারা রাত আহার না জোটায় ক্ষিধের উৎপাত সুরু হয়ে গিয়েছে। সঞ্চয় যা ছিল তারই উপর নজর দিতে হোলো। শিকারে বার হলে এদিকটার সংস্থান সব সময় কাছে রাখি। শুকন চিঁড়ে, রোদে পোড়া পাঁউরুটি ও কিছু মাখন টিফিন বাসকেটে রাখা ছিল। সেগুলির শরণাপন্ন হতে গিয়ে মনে পড়ল, কাল বিকেলেই সব নিঃশেষিত হয়েছে। বদান্যতায় প্রাচুর্য্যে নিজেকে বঞ্চিত করেছি। ষ্টেসন থেকে আসার পর কুলীরা বললে, সারাদিন ওদের খাওয়া হয় নি। ভোর বেলায় যে ট্রেণ আসার কথা সে গাড়ী বিকেলের দিকে পৌছানয় এইরূপ ঘটেছিল। অভুক্তদের আবেদন মানতে হোলো, যা সঙ্গে ছিল দিলাম। লোকগুলি যে আসল জঙ্গলী তা গোড়ায় বুঝতে পারি নি। খেতে আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না। সত্য কথা বলতে হলে স্বীকার করতে হয়, কেবল করুণা-প্রদর্শনের জন্য দেউলিয়া হবার ব্যবস্থা করিনি, নিজের স্বার্থও ছিল যথেষ্ট। জঙ্গলীরা ভদ্রাচার জানলে আমার জন্য কিছু থেকে যেত।

যাইহোক পাঁচজন কুলীর মিলিত চেষ্টায় আমার এক সপ্তাহের সংস্থান শেষ হয়ে গেল। ওদের মধ্যে যে দুই-

জনের ফিরে আসার কথা ছিল তারা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হওয়ায় সব কিছুই অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। লোকালয় এখান থেকে বহুদূরে। অতগুলি বন্দুক, টোটা এবং লোভনীয় টর্চ ফেলে গ্রামের দিকে যাই কেমন করে? বন্দুকের মত দ্রব্যের উপর আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারীর সর্ত্ত থাকলেও চুরি গেলে পুলিস আমাকেই ধরবে। চুরি তো দূরের কথা, কাহার জিম্মায় রাখতে হলেও রক্ষকের (retainer) নাম লেখাতে হয়। বালতি ভর্ত্তি পানীয় জলও কাল উজাড় হয়ে গিয়েছে। আহারের পর জল যেটুকু খাওয়ার দরকার ছিল তা তো খেলই—অবশিষ্ট অংশ বললে কিনা আচমকা ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছে। ক্ষিদের চেয়ে এখন তেষ্টা বেড়ে উঠেছে। বাংলোর কাছেই রাস্তার ধারে পাতকুয়া দেখে এসেছিলাম। ওখানকার জল খাওয়া চলে না। সাপ থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় কীটের বাসস্থান হয়ে আছে। সাপ হয়ত পাড়ের উপর ব্যাঙ ধরতে এসে পড়ে গিয়েছিল। মাটি থেকে মাত্র হাতখানেক উঁচু পাড়। এইরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

ক্রমান্বয় বেলা বেড়ে উঠতে লাগল। আকাশে আগুন লেগে গিয়েছে। নিস্তব্ধ আবেষ্টনীতে মাঝে মাঝে ঝিল্লির ডাক শুনছি। ওদের উল্লাস থেমে গেলেই ভাবছি জঙ্গলারা আহার এবং জল নিয়ে আসছে। বহুবার এই ভাবে আশা নিস্তব্ধ হাওয়ায় একটা কিছু ব্যবস্থার জন্য স্বাবলম্বী হতে হোলো। ক্ষুধার তাড়না তখন এমন উৎকট হয়ে উঠেছে যে আলোনা কাঁচা মাংস খেতেও কোন আপত্তি নেই।

মাংসের সন্ধানেই বন্দুকে টোটা ভরে প্রস্তত হলাম। বাঘের জঙ্গলে বার হতে হলে রাইফেলের ব্যবহারই প্রশস্ত, অপর দিকে ঘূর্ণিপাক খাওয়া গুলী পাখীর উপর পড়লে মাংসের ছাতু খেতে হয়। সব দিক ভেবে সাধারণ দোনলায় চার নম্বর ও ছয় নম্বরের ছররা পুরে নিলাম। চার নম্বরে তিন ইঞ্চি টোটা নিয়েছিলাম, ময়ূর দূরে থাকলেও কোন অসুবিধা হবে না বলে। এ ছাড়া বুষকোটের পকেটে কয়েকটা উপরি বল্ নিয়ে নিলাম, বলা যায় না স্যামবার জাতীয় বড় হরিণও পেয়ে যেতে পারি। তখন লিথেল বল বিশেষ কাজে আসবে।

রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। জনহীন নিরিবিলি পথ। এদিকে কতদিন আগে মানুষ চলা বন্ধ হয়েছে তার ঠিক নেই। পাখী থেকে আরম্ভ করে হরিণ ময়ূর সব কিছুই এখানে পাওয়া উচিত। আসবার সময় ঘুঘু আর সবুজ পায়রার ঝাঁক দেখেছিলাম। এখন তাদের আশা করা অন্যায়। পাখীর দল দুপুর রোদে নিশ্চয় ঝিমাচ্ছে।

পাখা ঘুমাক, উপস্থিত একটা জলাশয় বার করতে পারলে বাঁচি। গরম এমন প্রচণ্ড যে বুষকোটের সঙ্গত ব্যবহার পোষাল না। সেটা পিঠে ঝুলিয়ে নিলাম। মাথায় সোলার টুপি ছিল। গায়ে হাওয়া লাগায় কিছু আরাম পাওয়া গেল।

বাংলো থেকে খানিকটা আসার পরই কেবল মনে হচ্ছিল, হিসাব করা ব্যবধান রেখে কোন জন্তু আমাকে অনুসরণ করছে। অনুসরণের ভঙ্গী আমার কাছে বিশেষ ভাবে পরিচিত। পিছন থেকে মাথার উপরেই আশঙ্কার কারণকে আর এগুতে দিলে বিপদকে মাথা নত করেই মানতে হবে—সুতরাং এখুনি পরীক্ষা করা উচিত, ব্যাপারটা কি। রাস্তার একদিকে গভীর খাদ, অপর দিকে রাস্তার জন্য কাটা পাহাড়ের উপরটা—অর্থাৎ যেখানে ভয়ের কারণ জড় হয়েছে। ঐ জায়গাটির উপর নজর ফেলতে হলে খাদের দিকে কোন উঁচু গাছে উঠতে হয়। কাছেই সুবিধা পাওয়ায় কাজে লেগে গেলাম। চুনের বোতল, পিঠে ঝোলান বন্দুক আর বুষকোট গাছে চড়ার সহজ গতিকে অসুবিধায় ফেলছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উঁচু ডালে পৌঁছিয়ে গেলাম। এখান থেকে সন্দেহের জায়গাটি চমৎকার দেখা যায়। আগাছা বা বেঁটে ঝোপের বালাই নেই। রোদের তাপে ঘাস পর্য্যন্ত উধাও হয়ে মাটিকে উলঙ্গ করে ছেড়েছে। নজর কড়া করেও, কোথাও সচল জীবের সন্ধান পাওয়া গেল না।

গাছের উপর থেকে কোন জানোয়ারকে দেখতে না পেলেও দূরে ঝরণার সন্ধান পাওয়া গেল। আর একবার সন্দেহের জায়গাটি দেখে নিয়ে যে ডালটিতে দাঁড়িয়েছিলাম সেটি চিহ্নিত করে নেমে এলাম। ফেরার পথে দিগভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকায় গাছে গাছে চিহ্ন রাখা আমার মত পায়ে-হাঁটা শিকারীর পক্ষে মস্ত বড় সহায়।

ঝরণার দিকে অগ্রসর হবার জন্য রাস্তার অপর দিকে উপস্থিত হলাম। মানুষের তৈরী সিঁড়ির ধাপ প্রস্তত না থাকলেও জলে ধুয়ে যাওয়া গাছের শিকড় মইএ চড়ার

মত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। যাবতীয় দোলায়মান বোঝা পিঠের উপর থাকলেও উপরে উঠে আসতে বেগ পেতে হোলো না।

উপরে এসে দেখি, প্রকাণ্ড বাঘ দুইটি বাচ্চাকে নিয়ে বাংলোর দিকে চলেছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে বাঘের দল এত দূরে ছিল যে ছররার পাল্লায় কোন কাজ হোতো না! টোটা বদল করে নিশানা করলেও কোন সুবিধা হোতো না—কারণ পিছনে গুলি লাগলে লেজের খানিকটা জখম হোতো। আমার শিক্ষানবিসীকালে লেজকে Vital part বলে ধরা হোতো না এবং Vital part না পেলে গুলি চালানর নিষেধ থাকায় শিকার দেখতে পেয়েও অস্ত্রকে বেকার রাখতে হোলো। এই সূত্রে একটা সান্ত্বনা পেলাম, জঙ্গলে চলার জন্য তৈরী কাণ আমাকে ঠকায় নি। আরো একটি বিষয় নিশ্চিত হয়ে গেল, বাংলোর ভোগ দখল সত্বে বাঘেদেরই অধিকার বেশী। বাংলোর আসে-পাশের সব জায়গাতেই ওদের মৌরসি-মকররীর দাবী আছে। অনধিকার প্রবেশের জন্য কৈফিয়ত দরকার থাকায় আমার পিছু নিয়েছিল। অনেকটা পথ অনুসরণ করার পর যখন বুঝল আমি গৃহত্যাগ করে চলেছি তখন আমাকে ছাড়ান দিয়ে ঘরমুখো হয়েছিল।

এতক্ষণে ঘটনাটি চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। নিরস্ত্র জঙ্গলীরা আমার অনুপস্থিতিতে ফিরে এলে, ওদের কি অবস্থা হবে। বাঘের দল তো বাংলোর দিকেই গেল এবং ঐ খানেই থাকবে। ভাবলাম, এই খানেই মওড়া আগলে থাকি। এদিকে আসতে দেখলেই সাবধান করে দিতে পারব। ওদের সঙ্গে করে ঝরণার দিকেও নিয়ে যেতে পারি। ঐ খান থেকেই জল আনার ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তার স্থিরতা নেই এবং মোটের উপর ফিরবে কিনা তাও বলা চলে না। ওদের চিন্তার সঙ্গে তৃষ্ণাও বেড়ে উঠছিল, ঝরণার ডাকে জলের দিকে চলা সুরু করে দিলাম। প্রতিটি পদবিক্ষেপে ঝিল্লির ডাক থেমে যাচ্ছে। শব্দ থেমে যাওয়ায় নিস্তব্ধতা যেন আবেষ্টনীকে প্রেত লোকে পরিণত করে দিচ্ছে।

মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তাপে চতুর্দ্দিক নিঝুম মেরে গিয়েছে। শুকন পাতা বা কুটো পায়ের তলায় মুচড়ে গেলে চমকে উঠছি। সতর্কতায় অভ্যস্ত মন সামান্য কারণেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ক্রমান্বয় দুইটি ছোট পাহাড় অতিক্রম করে এলাম। ঝরণার দূরত্ব আর কমতে চায় না। ইতিমধ্যে মাইল খানেক চলে এসেছি। দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে অভুক্ত অবস্থায় চড়াই ও খাদে ওঠা নামা আমার মত সহুরের পক্ষে সহজসাধ্য কাজ নয়। শেষ পর্য্যন্ত যখন জলাশয়ের কাছে এসে পৌছালাম, তখন বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কোট আর বন্দুক একটা পাথরের চাঁই-এর উপর রেখে প্রাণভরে জল খেলাম। যেখানে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণা নিবৃত্তি করছিলাম সেই খান থেকে পাথরের পাড় খাড়াইভাবে ফুট দশেক হয়ে উপরে উঠে গিয়েছে। উপরটা জলের দিকে ঝোঁকা। ঝোঁকা কেন বলি, পাড়ের কিনারা থেকে ওজন-দেয়া সুতো ঝুলিয়ে দিলে হয়ত জলের উপর এসে পড়বে। অর্থাৎ একেবারে উপরের কিনারায় এসে না দাঁড়ালে ঠিক তলায় কিছু দেখা যায় না। ক্লান্তির কিছুটা উপশম হওয়ায় যেখানে বন্দুক আর টোটা-ভরা কোট রেখেছিলাম তারই উপর বসে পড়লাম।

সামনের দিকে তাকিয়েছিলাম। ঝরণার শ্বেতবহায় রৌদ্র ছটা পড়ায় মনে হচ্ছিল রূপোর চাদর, হাওয়ার মৃদু দোলায় দুলছে। শীতল জলের সান্নিধ্যে সবুজ অপূর্ব্ব সাজে সেজেছে। পোড়া মাটির চটাকাটা চেহারা দেখে এসে-ছিলাম তার তুলনায় প্রকৃতির শান্ত রূপ আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল। সুন্দর যে দুঃখ, ভয়, হতাশা ও দৈহিক ক্লেশকে ভোলাতে পারে তার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বেও পেয়েছি, কিন্তু বর্ত্তমানের পরিবেশ ভিন্ন ভাবে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করছিল। নিজের হিংস্র প্রকৃতির কথাই মনে আসছিল, ভাবছিলাম, কোন অধিকারে মহাপরাক্রমশালী বনের রাজাকে হত্যা করার জন্য সাজ গোজ করে এখানে এসেছি। বাঘের প্রকৃতি হিংস্র হলেও তা নিরবচ্ছিন্ন খাঁচার অব-লম্বন। আত্মরক্ষার প্রয়োজন না থাকলে অথবা বিকলাঙ্গ না হলে বাঘ তো কখন মানুষকে আক্রমণ করে না। তবে কি দম্ভকে প্রশ্রয় দেবার জন্যই হত্যার সৌখীনতা? কিম্বা হতেও পারে—আদিম বুনো প্রভাব আজও আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। যে সময় হিংস্র প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিচার করছিলাম, সেই সময় মাথার উপর থেকে একটু দূরে চলন্ত ছায়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ছায়ার মালিক কে, না দেখলেও চেনার কোন অসুবিধা

ছিল না। মুহূর্ত্তে বিচারের চরম নিষ্পত্তি আমার হিংস্র স্বভাবকে সমর্থন করে গেল, বন্দুক তুলে নিলাম। ছায়ার দিকে নল ঠিক করে প্রস্তুত হয়ে রইলাম, কিন্তু ছায়া পাড়ের পিছনে চলে গেল। পরক্ষণেই দুই তিনটি ময়ূর একসঙ্গে ডেকে উঠল, ত্রাসের ডাক, জঙ্গলের রাজার আগমন বার্ত্তা। মাথার উপরেই অনুসন্ধানী বাঘ লাফিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় বন্দুক নিয়ে উঠে পড়লাম।

হঠাৎ আতঙ্ক ঘাড়ে চাপলে আত্মরক্ষার জন্য যে তাড়া আসে তাতেও অনেক কিছু ভুলিয়ে ছাড়ে। উপস্থিত ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। বসার জায়গা থেকে উঠে আসার সময় বুষকোট পাথরের উপর ফেলে এসেছিলাম। উপরি বড় টোটা কোটের পকেটেই রয়ে গেল। ভরা বন্দুক সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ভরসা ছিল না। পাখী-মারা গুলি দিয়ে বাঘ মারা চলে না। দোনলার মধ্যে তাগড়া প্যারাডক্স (Paradox) নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু আসল সাবধানতাই ভুল হয়ে গিয়েছিল একটাতে লিথেল বল ভরে নিলে ভয় পাবার মত কিছু থাকত না। দুটোতেই ছর্‌রা ভরে নেয়ায় বিপদ আমাকে ঘিরে রইল।

বাঘ নিশ্চয় আমাকে দেখেনি এবং দেখলেও বুঝতে হবে নরভুক নয়। তথাপি হঠাৎ সামনাসামনি পড়ে গেলে আত্মরক্ষার জন্যই আক্রমণ করতে পারে। এখন একমাত্র চিন্তা দাঁড়াল, কেমন করে কোটের পকেট থেকে উপযুক্ত টোটা বাহির করে আনা যায়। তখন কোট ও আমার মাঝে ২০—২৫ হাতের ব্যবধান হয়ে গিয়েছে। পাড়ের উপর বাঘ কোথায় আছে জানতে না পারলে ঐটুকু জায়গা অতিক্রম করতে গেলে আত্মঘাতি হবার সুব্যবস্থা হয়ে যাবে। শেষ পর্য্যন্ত বিচার করে দেখলাম—শিকারে এসে ভয়ের কাছে নত হওয়া অপেক্ষা বিপদকে স্বীকার করে বাঁচার চেষ্টা ঢের বেশী ভাল। সিদ্ধান্ত দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল, কোটের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। ময়ূরের ডাক শুনতে পাচ্ছি না। বাঘ যে খোলা জমিতে পাড়ের কাছে নেই সে বিষয় নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। পাথরের কাছে এসে সবে কোট তুলেছি, এমনি সময় দেখি, একটু দূরে ডালপালা আর কয়েকটা বড় পাথরের ওপাশে বাঘ জল খাচ্ছে। ঠিক ঐ জায়গায় খানিকটা জঙ্গলের ফালি এগিয়ে যাওয়ায় আমাকে দেখতে পায় নি।

কিন্তু দেখতে কতক্ষণ। কোট রেখে দিয়ে অতি- সন্তর্পণে যেখানে বসেছিলাম তার বিপরীত দিকে চলে গেলাম এবং পাথরের আড়াল পেতেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। সাবধানতার ত্রুটি ছিল না তথাপি নড়াচড়ায় দুই একটা ছোট নুড়ী ঢালুর দিকে গড়িয়ে গেল। নিস্তব্ধ পাহাড়ে ঢালুর দিকে গড়াতে আরম্ভ করলে চিনেপটকার আওয়াজ করে ছাড়ে। শব্দ শুনে বাঘ জল খাওয়া বন্ধ করে কোটের দিকে তাকাল। জঙ্গলে মানুষহীন কোটও বাঘের কাছে সন্দেহের জিনিস। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও যখন সন্দেহ ভঞ্জন হোলো না, তখন এক পা দু পা করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কয়েক কদম আসে আবার কান খাড়া করে থমকে দাঁড়ায় এবং যখন দাঁড়ায় তখন পরীক্ষার দৃষ্টি আরো প্রখর হয়ে ওঠে। ভাগ্যগুণে হাওয়ার গতি বাঘের দিক থেকে আসছিল, ফলে পরীক্ষার সময় কানের কাজ অকেজো হয়ে গিয়েছিল। বন্দুকের নল ঠিক বাঘের মাথা লক্ষ্য করে ধরাছিল। কিন্তু কতক্ষণ একই ভাবে হাঁটুর উপর কনুই রেখে ভারী বন্দুক ধরে রাখা যায়। হয়ত নলের ডগা সামান্য নড়ে গিয়েছিল ঐটুকুই বাঘের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। হঠাৎ একটা পা তুলে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষণ লেজের দোলা ছিল না এইবার সুরু হোলো। আর এক মুহূর্ত্ত বেশী সময় দিলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। প্রায় চোখ কান বুজেই এক সঙ্গে দুটো ঘোড়া (trigger) টিপে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আহত বাঘ সাংঘাতিক গর্জ্জন কোরে সোজা শূন্যে দশ ফিটের কাছা কাছি লাফিয়ে উঠল, তারপর মাটিতে পড়ে যেতেই ঢালুর দিকে গড়াতে সুরু করল। জলের উপর পড়তে চিৎ অবস্থায় বলীর পাঁঠার মত উপর দিকে পা ছুঁড়তে বুঝলাম আর বেশীক্ষণ নেই। অত কাছ থেকে তিন ইঞ্চি S. S.G. চোখে লাগায় দুটো চোখই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খুলির ভিতর ঘিলুও বোধ হয় ভাল রকম জখম হয়েছিল, তানাহলে বন্দুককেই আক্রমণ করে বসত। এ সুযোগ ছাড়া নয়। যেখানে হাঁটু গেড়ে বসেছিলাম সেই খানথেকেই ধীরে কোট আমার দিকে টেনে নিলাম। আশঙ্কা ছিল কোট নাড়াবার সময় একটা কিছু ঘটতে পারে। সে রকম কোন লক্ষণ না দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। বাঘের উত্থানশক্তি রহিত হয়েছে। হয়ত বা মরেওছে। মরলেও ও মরাকে দুবার মারলে

পাপ বাড়ে না। ২ড়গুলী ভরে নিয়ে বুকের উপর চালিয়ে দিলাম।

তৃতীয় গুলীতে হৃদয়ের স্পন্দনও থেমে গেল। এখন মহাশক্তির প্রতীক কেবল অসাড় মাংসের স্তূপ মাত্র। জল থেকে তুলে শুকন জমির উপর না ফেলতে পারলে মাছের উৎপাতে চামড়ার কিছু থাকবে না। জল থেকে তোলার আগে কয়েকটা নুড়ী ছুঁড়ে মারলাম। মড়ার কাছ থেকে কোন অভিযোগ এল না। কাছে এসে লেজ ধরে টান মারতে গিয়ে দেখি শেষের অংশ অপহৃত হয়েছে। যেখান থেকে লেজ ছিঁড়েছে সেখানে হাড় বেড়িয়ে পড়েছে। উন্মুক্ত হাড়ের উপরে বেজায় ফোলা। হাড় বেরুণার কারণ অনুমান করা চলে, ক্ষত স্থান বাঘ চাটতে চাটতে ঐরূপ অবস্থায় এনেছে,কিন্তু জীবন্ত বাঘের লেজ নিয়ে টানা পোড়েন করতে গেল কে! অদৃশ্য দুঃসাহসীকে নমস্কার করে মড়ার লেজ ধরে টানতে লাগলাম, জলথেকে একচুল নড়াতে পারলাম না। নম্রতার—মাথায় ঘোমটা টেনে বলতে পারি আমার শারীরিক শক্তি অনেক পালোয়ানের পক্ষেও হিংসার বিষয়। তথাপি অসাড়কে নড়ান গেল না। নিশ্চয় জানতাম এই অবস্থায় মাংস পুষ্ট দেহ ফেলে গেলে আকাশ, মাটি ও জল থেকে মাংসভুখের দল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাঘকে সনাক্তের বাইরে নিয়ে ছাড়বে। প্রথমেই আসবে শকুনী, ওদের বভুক্ষু জঠর শান্ত করার পরেও যদি কিছ পড়ে থাকে তাহলে হায়না বা শেয়াল এসে বাকী কাজ শেষ করে দেবে,তার উপর মাছের উৎপাত তো আছেই। আমার জন্যে পড়ে থাকবে কয়েকটা বিক্ষিপ্ত অস্থি। মৃত্যুর সঙ্গে খেলার একমাত্র প্রমাণ হত শার্দুলের চামড়া। দম্ভের এতবড় পুরস্কার ফেলে আসতে আমার মনের অবস্থা কি হয়েছিল তা প্রকাশ করা শক্ত।

বেলা ইতিমধ্যে মধ্যাহ্নের দিকে ঝুঁকেছে। ক্ষুধার তাড়না আবার ফিরে এসেছে। ক্ষুন্নিবৃত্তির কোন উপায় না থাকায় আবার খানিকটা জল খেয়ে ফেললাম। তার পর মরা বাঘকে প্রাণভরে দেখতে লাগলাম! বাস্তবিকই প্রকাণ্ড বাঘ। খুব সম্ভবতঃ স্বয়ম্বরার আসরে পরিচিত বাঘিনীর প্রত্যাশায় এদিকে এসেছিল।

মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। বেলাও পড়ন্তের দিকে,দেখার পালা শেষ করে উঠে পড়লাম। কুলীদের মধ্যে কেহ ফিরে থাকলে আমার অনুপস্থিতি ওরা সহজভাবে নিত না। চিৎকার করে জঙ্গল মাতিয়ে ছাড়ত। যেখানে বাঘের উৎপাত বেশী সেখানে ঘর থেকে মানুষ অন্তর্ধান করলে বাঘে খাওয়ার কথাই আগে মনে আসে। হটাৎ সাপের গায়ে পা পড়লে যা হয় আমার কাছে যেমন সব সরীসৃপই বিষাক্ত, তেমনি চলতি মতে সব বাঘই নরভূক।

কুলীদের ডাক শুনি নি, সুতরাং ফেরেনি। এখন করি কি? উপবাস অসহনীয় হয়ে উঠেছে। জঙ্গলের কোন ফল চিনি না। কোনটা খেতে গিয়ে কি হয়ে যাবে তার ঠিক নেই। একমাত্র নিরাপদ আহার পাখী। গ্রাম থেকে এত দূরে এসে পড়েছি যে এখানে শালিক বা চড়ুই পর্য্যন্ত দেখা যায় না। কাক সামনে পেলে কি করতাম বলতে পারি না।

ক্ষুধার তাড়নায় দম্ভের কথা ভুলেছি। বন্দুকের নল দুটোয় পাখী মারার টোটা প্রাধান্য পেলেও একটিতে তিন ইঞ্চি এল্ জি (L. G, large game slugs) স্থান দিয়েছিলাম। প্যারাডক্সের প্যাচান নলেই বৃহদাকার ছররা পুরলাম। কথায় বলে "নেড়া কয়বার বেলতলায় যায়"। প্রাচীন প্রশ্ন আমাকে গুলী সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল। L G. কাছ থেকে, ঝালে-ঝোলে অম্বলে সবেতেই চলে বড় ছর্‌রা—প্যারাডক্সের নল থেকে বার হলে বাঘকেও কাবু হতে হয়।

বাংলো মুখোই চলতে লাগলাম। হাঁটার জন্য সহজ রাস্তার দরকার হয়ে পড়েছিল। দিগভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। জঙ্গলী প্রথায় দশ বারটি অন্তর গাছে, গোলা চুন ছিটিয়ে এসেছিলাম। শুকন চুণের সাদা, শান্ত সবুজের পরিবেশে বিকট হয়ে উঠেছে। বিকট হলেও পথপ্রদর্শক হিসাবে খুবই কাজে লাগছিল। আমার চিহ্ন দেবার প্রথা অভিনবও ছিল। সাবান রাখার প্লাসটিক বোতলে, গোলা চুণ সঙ্গে এনেছিলাম। প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ গাছের উপর চিহ্ন দিতে হলে বোতল টিপলেই পিচকারির মত খানিকটা সাদা ছিটিয়ে পড়ছিল। কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করতে হয়নি।

চলার পথে নজর কেবল চিহ্নের দিকে আটক ছিল না, ডাল পালা এবং ঝোপগুলিও দেখে নিচ্ছিলাম। ময়ূরের প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশী। বন্দুকের আওয়াজে ঝরণার

কাছ থেকে পালালেও নিজেদের পাড়া ছেড়ে কতদূর আর যাবে। আশাকে আঁকড়ে ধরে এগুতে লাগলাম। অনেকটা পথ চলে এসেছি। সামান্য দূরেই খাদের ধারে চিহ্নিত গাছ নজরে এসে গিয়েছে। রাস্তায় নামতে হলে আবার তল্পি-তল্পা পিঠে ঝোলাতে হবে। বন্দুকের প্রস্তুত-ঘোড়া (ready trigger) অচল (safe) করব কিনা ভাবছি এমন সময় সমস্ত পাহাড় কাঁপিয়ে বন্দুক ছোটার শব্দ সুরু হোলো।

একটার পর একটা গুলী চলেছে, বতকটা পল্টনের কুচকাওয়াজ অভ্যাসের মত। বিস্ময়কর ঘটনা, এমন একটি স্থানে পল্টনের আবির্ভাব হোলো কেন বুঝলাম না। অনুমানকে বহুদিকে ছোটালাম, কোন ফল পেলাম না। গুলী যে ভাবে চলছিল তাতে নির্দিষ্ট নিশানার কিছু থাকলে এতক্ষণে ছোট দুর্গ পর্য্যন্ত ধূলিসাত অথবা লুঠ হয়ে যেত। কৌতূহলে যখন দিশাহারা হবার অবস্থা তখন একটু দূরে, রাস্তার ধারেই অনেকগুলি ঝোপ এক সঙ্গে নড়ে উঠল। বন্দুক বগলে তুলে নিলাম। ঝোপ যে ভাবে নাড়া খেয়েছিল তাতে একাধিক বড় জানোয়ারের আগমন সঙ্কেত পেয়েছিলাম। দুটো ঘোড়াতেই আঙ্গুল ছুঁইয়ে রাখলাম। বধ্য জীবের আকার অনুপাতে যখন যেটি দরকার হবে তখন সেইটি টিপে দেব। ঝোপের নাড়া বেগে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল, হঠাৎ গতি থেমে গেল। ঝোপ ছোট হোলেও উপরে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। নীচের দিকে লক্ষ্য করতেই বাঘের থাবা নজরে পড়ল—সামনের দুটো পা অসাধারণ চওড়া। খুব সম্ভবতঃ গত রাত্রের বাঘিনীই হবে, বাংলোর কাছে তাড়া খেয়ে, জঙ্গলের আড়াল নিয়ে এদিকে এসে পড়েছে। বাচ্চা সমেত তাড়া খাওয়া বাঘের উপর আন্দাজে গুলী চালাবার সাহস পাচ্ছি না। অজায়গায় গুলী লাগলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। জঙ্গলের নড়া যেখানে থেমেছে সেখান থেকে বাঘ এক লাফেই আমার উপর এসে পড়তে পারে। কোন দিক দিয়ে বাঁচার উপায় না থাকায় আমার অনুপাতে বাঘের আকার অনুমান করে বুকের দিকে প্যারাডক্সের নল খালি করে দিলাম। ঝোপ যেটুকু নড়ল তাতে বাঘের গায়ে গুলী লাগল কিনা বুঝতে পারলাম না; কিন্তু পিছনের ঝোপ সাংঘাতিক ভাবে নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের ভিতরেই পলাতক জানোয়ারদের গতি দেখলাম রাস্তার দিকে।

এই সঙ্কট অবস্থায় কি ভাবে সাহস পেলাম বলতে পারি না। মৃত্যুদূত সামনে থাকা সত্ত্বেও খালি নল, বড় টোটা দিয়ে ভরে নিলাম। তারপর অটলভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন গাছের আড়াল নেবার সুবিধা ছিল না। পিছন ফিরলে আক্রমণের সুযোগ আমি নিজেই দিয়ে দেব। বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে যেতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, নয় বাঘ মরেছে, অথবা পালিয়েছে। মরা সম্বন্ধেই নিশ্চিত হলাম। তা না হলে জখমি বাঘ অত কাছ থেকে বন্দুকধারীকে ছেড়ে দিত না। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এগুতে লাগলাম। ঢিল ছুঁড়ে অনুমানকে পরীক্ষার প্রশ্ন অবান্তর—কারণ বেঁচে থাকলে ঢিল ছোঁড়ার পর উপযুক্ত ভাবে বন্দুক ধরারও সময় পাব না, জখমি বাঘ সঙ্গে সঙ্গে লাফ মারবে। নীচু হয়ে মুড়ী কুড়ুতে গেলে একই অবস্থা হবে। দুই এক পা অগ্রসর হবার পরই মনে হোলো কাজটা ঠিক করছি না। বরং পিছু হেঁটে কোন গাছের ছোঁয়া যদি পাই তাহলে উপরে উঠলে ওখানে বাঘ আছে কিনা জানতে পারা যাবে। মুখ সামনের দিকে থাকলে এবং কপাল একান্ত খারাপ না হলে আর একবার গুলী চালাতে পারব।' পরের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে পিছুতে লাগলাম। কপাল গুণে উপযুক্ত-দূরত্বের কাছে পৌঁছাতে একটি গাছের ছোঁয়া পেতেই ওপাশে চলে গেলাম এবং সামনের দিকে মুখ রেখে উপরে ওঠা সুরু করে দিলাম। উপরের দিকে কয়েকটা ডাল পার হতেই ঝোপের অপর দিকে বাঘের পিছন দিককার গোটা পা দেখতে পেলাম। বাঘ শুয়ে পড়েছে। হাতে ঝোলান বন্দুক কোন প্রকারে বগলে বসিয়ে আবার আন্দাজে গুলী চালালাম। বাঘ নড়ল না। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে নেবে এলাম। ঝোপের কাছে এসে হতাশ হতে হোলো। বাঘ মারিনি। ঝোপের তলায় ব্যাঙের ছাতা এবং শুকন ঘাসের জড়ামুড়িতে হুবহু দূর থেকে বাঘের পিছনকার পায়ের মত দেখাচ্ছিল। কল্পনা তেড়ে ওঠায় ঘটনাটি হাস্যকর হয়ে উঠল।

মায়ার বন্ধন না থাকায় বাংলো মুখো হতে হোলো। বেশীদূর যাই নি মোটর গাড়ীর আওয়াজ শোনা গেল। লোকজন রাস্তায় নেই তবু অবিরাম হর্ণ বেজেই চলেছে। গাড়ী বাংলোর দিক থেকেই বেগে ছুটে আসছিল। গাড়ী একটা নয় দুটো জিপ—একরাশ লোক। পিছনের গাড়ীতে

ড্রাইভার ছাড়া সাহেবী ধরণের দুইটি অল্পবয়স্ক যুবক। পিছনের সিটের পাদানীতে বসেছে। বাইরে থেকে কেবল তাদের মাথার খানিকটা দেখা যায়। বন্দুকের নলও আকাশের দিকে। অকস্মাৎ আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার কাছে আসতেই আবার অনবরত গুলী চলতে লাগল। ম্যাগাজীন রিপিটার রাইফেল (Magazine repeater rifle) থেকে গুলী বার হচ্ছিল।

ইতিপূর্ব্বে রাইফেল চালিয়ে কাহাকেও আতস-বাজীছোঁড়ার সাধ মেটাতে দেখিনি। নলের মুখ আকাশের দিকে থাকলেই বা কি হয়। নল আমার দিকে ঘুরে গেলে মাথাটাই উড়ে যেতে পারে। হঠাৎ উবুড় হয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়লাম। উপস্থিত বুদ্ধি প্রাণ বাঁচিয়ে দিল। উবুড় হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছ থেকে হাত দুই দূরে একটি মোটা পাথরের চাঁইতে গুলী লাগায় ফেটে চৌচির হয়ে গেল। মোটরের শব্দ বহুদূরে মিলিয়ে যেতে ওঠার সাহস পেলাম। বন্দুক আর হর্ণের আওয়াজে জঙ্গল তোলপাড় হ'য়ে গিয়েছিল। বাঘিনী কেন, ওর চৌদ্দ-পুরুষ জঙ্গল ছেড়ে সহরে গিয়ে উঠল কিনা কে জানে।

বাঘ তাড়ানর চূড়ান্ত ব্যবস্থা শেষ হতে পরম নির্লিপ্তের মত আস্তানার দিকে চলতে লাগলাম। বাংলোয় ফিরেই বা করব কি। অনাহার ও তৃষ্ণায় পীড়ন তো শিকারে অপরিহার্য্য সাথী আছেই, তার উপর সাফল্যের জন্য যদি নির্লিপ্ততাকে প্রস্তুত রাখতে হয়, পরম বাঞ্ছিতকেও মায়ার দোহাই পেড়ে পরিত্যাগ করতেহয়—তাহলে শিকারের সখও ছাড়তে হয়। কিন্তু আমার কাছে শিকার তো সখ নয়। রোমান্সের নেশা। জঙ্গলী ফুলের গন্ধ, বিশাল বনস্পতির রূপ, আদিম কালের বুড়ো পাথর—তার সঙ্গে নানা ভয়ের সম্ভাবনা আমাকে টেনে আনে জঙ্গলের ভিতর। ইতি-পূর্ব্বে বহু ব্যর্থতা আমাকে হতাশ করেছে। ব্যর্থতার পর সংকল্প দ্বারা নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি আর শিকারে আসব না। বন্দুকগুলো সব আছড়ে ভাঙব। কিন্তু সুযোগ পেলেই বনের আহ্বানে আবার ফিরে এসেছি।

সাফল্য ও ব্যর্থতার চিন্তা নিয়ে বাংলোয় পৌছতেই নজর পড়ল একজোড়া পুষ্ট মুরগীর উপর। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দুর্ভাগ্য পিছু নিয়ে থাকায় মনে হোলো আর একটি ছলনার ব্যবস্থা রয়েছে। মুরগী দুটোর পা-বাঁধা রোয়াকের উপর পড়ে আছে। কোন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি না, ওগুলো এল কেমন করে? প্রশ্নোত্তর পাওয়ার আগেই আর একদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হোলো। সেই তেঁতুল গাছের ডাল থেকে একটি মৃত হরিণের বাচ্চাকে ঝোলান হয়েছে। খানিকটা ছাল ছাড়ান। ব্যাপারটি অনুমান করে বুঝলাম—সাহেবী ধরণের যুবক দুইটি এদিকে শিকারেই এসেছিল।

নতুন শিকারীদের খুব সম্ভবতঃ পাশও নেই। বধ্য পাখী বা জন্তু সম্বন্ধে সরকারী আইন জানা থাকলে হরিণের বাচ্চা মেরে মোটা টাকা জরিমাণা দেবার ব্যবস্থা করত না। বাচ্চা তো দূরের কথা প্রাপ্তবয়স্ক হরিণের সিং মেপে গুলী চালাতে হয়। দৈর্ঘ্যের মাপে সামান্য কমতি পড়লেই আইনের প্যাঁচ মস্তক মুণ্ডিত করে পাপ ক্ষয়েরও ব্যবস্থা করিয়ে ছাড়ে। এই কারণে শোনা যায় নীতিবাদীরা, সঙ্গত আইনকে আরো শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, দূরবিণাক্ষীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে বন্দুক-ধারীর জঙ্গলে প্রবেশ নিষিদ্ধ হোক।

নতুন শিকারীর দল। জনহীন খালি বাংলো দেখে এদিকে এসে পড়েছিল এবং শিকারলব্ধ বাচ্চার ছাল ছাড়ানর আদেশ দিয়ে আশে পাশের জঙ্গলে ঘুরছিল। ইতিমধ্যে বাঘিনীর পরিবার গাছ থেকে ঝোলা ছালছাড়ান মাংসের গন্ধ পেয়ে এদিকে আসে। মাঝপথে হিংস্র জীবটির সঙ্গে নিশ্চয় সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছিল। তারপর কোন দিকে দৃকপাত না করে আকাশ লক্ষ্য করে গুলী চালায় এবং কালক্ষেপ না করে গাড়ীতে চড়ে বসে। সামনের গাড়ীতে বসতে সাহস পায়নি। দেহরক্ষীদের এগিয়ে দিয়ে বিপদকে হাল্কা করে নিয়েছিল।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। প্রবেশ পথে কয়েক জোড়া স্থানীয় চপ্পল (চটি জুতা) নজর পড়ল। কোনটাতে গোটা চামড়া নেই। বহু তাপ্পির আবির্ভাবে সাজান ঘুটি অন্তর্ধান করেছে। বুঝলাম জঙ্গলীরা ফিরে এসেছে। ঘরের ভিতরে ঢুকতে দেখি—তিনজন জড়সড় হয়ে একটি কোণায় বসে আছে। আমাকে দেখে একজন এগিয়ে এসে যা বলল, তাতে আমার অনুমানে বিশেষ কোন গলদ পাওয়া গেল না। ওরা বাংলোর কাছে আসতেই

গুলি চলা সুরু হওয়ায় বাঁধা মুরগী দুটিকে রোয়াকে ফেলেই ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ওদের সঙ্গে সাহেবের লোকদেরও ডেকে নিয়েছিল। বাঘ যদি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে তো ওদের মধ্যেই কাহাকেও আগে নেবে। বিপদে পড়লে সব মানুষের মনই যে চিন্তাশীল হতে পারে, তা জঙ্গলের অভিজ্ঞতা না থাকলে বিশ্বাস করা চলেনা।

শূন্যে গুলি চালিয়ে বাঘ মারার বাহাদুরী দেখে আমার বিশ্বাস জন্মাল—ওরাই নিহত বাঘের মাথায় মারতে গিয়ে লেজের খানিকটা উড়িয়ে দিয়েছে।

জঙ্গলীরা যখন জিজ্ঞাসা করল—মরা হরিণটা সাহেবরা ছেড়ে গিয়েছে, ওটাকে নিয়ে কি করা যায়—তখন আমাকেও চিন্তাশীল হতে হোলো। ভুলক্রমে কোন ফরেষ্ট-অফিসার এদিকে এসে পড়লেই তো চমৎকার মাথা মুড়ানর ব্যবস্থা আমার উপর দিয়েই শেষ করবে। বিপদসঙ্কুল প্রমাণ সামনে রাখার চেয়ে উদরস্থ করে ফেলা ভাল। বলে দিলাম, তাড়াতাড়ি ছাল ছাড়িয়ে ফেল তারপর চারটে পা রান্না কর। শুধু মাংস খেয়ে পেট ভরাতে হলে কিছু পড়ে থাকবে না। বাকি মাংস ডালে ঝুলিয়ে রাখতে বললাম। উদ্দেশ্য ছিল। বাঘিনীর সঙ্গে বোঝাপড়ার লোভ তখন ছাড়তে পারিনি। ঠিক জানতাম, সপরিবারে যখন এইখানেই বসবাস করছে তখন রাত্রে ঠিক এদিকে ফিরে আসবে। সম্ভাবনা জঙ্গলীদের বললে সুবিধা হবে না জেনেই উদ্দেশ্যের কথা তুলি নি।

ইত্যবসরে জানালা কবাট ও স্নান ঘরের ধসা জায়গাটা গাছের ডাল দিয়ে নিরাপদ করা দরকার। দুজন ছালছাড়ানর কাজে লেগে যাওয়ায় উপরি লোকটিকে ডাল কেটে আনতে বললাম। সে কিছুতেই এক পা জঙ্গলের ভিতর যেতে চায় না। অবশেষে আমাকে বন্দুক নিয়ে অনুসরণ করতে হোলো। ডালগুলি সংগ্রহ হওয়ায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলাম।

মেরে-আসা বাঘ সম্বন্ধে পুনরায় আশা এগিয়ে আসতে লাগল। শেষের লোকটিকে কাছে ডেকে কোন কথা বলার আগেই তার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললাম, "আরো দেব, যদি গ্রাম থেকে কতকগুলি জোয়ান লোক নিয়ে আসতে পারো"—প্রকাণ্ড বাঘ মেরেছি। সেটা ঝরণার কাছেই পড়ে আছে। সাহেবরা ঐ বাঘটাকে জখম করে পালিয়েছে। জখমি বাঘের কথা উঠতেই লোকটা জোড়হস্তে অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করল—তারপর নোট আমাকে ফিরত দিয়ে বললে—ও বাঘকে কেউ মারতে পারে না। জঙ্গলের দেওতার উপর গুলী চালিয়ে আমি মহাপাতক করেছি। এর পর বিপদ কোন রূপ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে কেউ বলতে পারে না। অজ্ঞাত বিপদের কথা বলে লোকটা আমাকেও আশঙ্কান্বিত করে তুলল। বাকি লোকদুটি যদি এর সদুপদেশ শুনে আমাকে ফেলে পালায় তাহলে বিপদ বাস্তবিকই ফলপ্রদ হয়ে যাবে। অন্ধ বিশ্বাস চাক্ষুস প্রমাণেও টলবে না। ডবল লোকসান থেকে অব্যাহতি পেতে হলে ফিরতি টাকা নিয়ে নেয়াই ভাল। এ বিষয় অধিক কথা না বলে নোটটি পকেটস্থ করে ফেললাম।

হরিণের মাংসে আহার ভালই হোলো। মুরগী দুটো ঘরে পুরে, আমরা সকলেই ভিতরে আশ্রয় নিলাম। গভীর রাত্রে বাঘিনীর এদিকে আসার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও ঘরের ভিতর আলো জ্বালিয়ে রাখতে হোলো। খাটিয়ার ভোগ বঞ্চিত হওয়ায় মাটিতেই হোল্‌ড-অল পেতে শোয়া ছাড়া গতি ছিল না। মাকড়সার ভয়ে ঘুম আর আসতে চায় না। কীটের উৎপাত না হলে আলো নিবিয়ে বাঘের জন্য অপেক্ষা করতে পারতাম। বাঘের জন্যে জেগে থাকা এক জিনিস, আর ভয়ের তাড়নায় ঘুম না আসা অন্য ব্যাপার। কোন সুতার শেষাংশ গায়ে লাগলেই মনে হচ্ছে ঐ বুঝি এল। সতরঞ্চির কারুকার্য্য একটু বাহারি হওয়ায় কথায় কথায় আতঙ্ক তেড়ে আসতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত আরাম বর্জ্জন করে উঠে বসলাম। কতক্ষণ চুপ চাপ বসে থাকা যায়—একটা সিগারেট ধরালাম। ঘরের বাইরে দৃষ্টির পথ আগেই বন্ধ করে দিয়েছি। গাছের ডাল ও লোহার গরাদ মিলে জানালার উপর চৌকোষ বুনন হয়ে গিয়েছে। যেটুকু জায়গায় বড় ফাঁক টর্চ লাগান বন্দুকের নল বার করার জন্য আছে সেখানে মুখ নিয়ে কিছু দেখার ইচ্ছা ছিল না।

রাত্রি গভীর হয়ে গিয়েছে। জঙ্গলেও জাগরণের সাড়া শুনছি। তিনটে মানুষই ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক ডাকার আওয়াজে শান্ত্রী পাহারার হাঁক জঙ্গলময় ছড়িয়ে পড়ছে। লণ্ঠনের আলো, নাসিকার হুঙ্কার ও বিকালে সামরিক

প্রথায় বন্দুক চলা সত্বেও বাংলোর পিছনেই ফেউএর ডাক শুনতে পেলাম। বিছানার পাশেই তিন ইঞ্চি এল্, জি, (মোটা ছর্‌রা) ভরা দোনলা রাখা ছিল। টর্চ সংযুক্ত বন্দুক তুলে আলো নিবিয়ে দিলাম। তারপর অতি সন্তর্পণে জানালার পাশে বসে বন্দুকের নল বার করে দিলাম। ফেউএর ডাক বাংলোর তিন পাশে ঘুরতে লাগল—কিছুতেই সামনে এল না।

কিছুক্ষণ বাদে ফেউএর ডাকও দূরে মিলিয়ে গেল। প্রথম মারা বাঘ হাতছাড়া হওয়ায় দমে গিয়েছিলাম! আবার যখন সুযোগ পেয়েছি তখন ছেড়ে দিলে লোকে আমাকে টিটকারী দেবে। বাঘ মারার বাহাদুরী কেহই বিশ্বাস করবে না। দম্ভের কষাঘাৎ আমাকে ঘর থেকে বার করিয়ে ছাড়ল। ঝোলান মাংসের সামনে খোলা রোয়াকে বসলে কোন লাভ হবে না। কোন দিক থেকে আমাকে দেখতে পেলে বাঘ মাংসের ত্রিসীমানায় আসবে না। ভাবলাম, পিছন দিক থেকে গাছে চড়ে যদি খোলার ছাদে বসতে পারি তাহলে শিকার মাংসের কাছে গেলে এল্, জি, নিজের কেরামতি দেখিয়ে দেবে। চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করায় দ্বিধার কিছু ছিল না। স্নানের ঘরের পাশেই খিড়কির কবাট। কবাটের সামনেই ডালটি উঠে গিয়েছে ছাদের উপর। স্নানের ঘরের কাছে এসে ডালের দিকে জ্বলন্ত টর্চ ফেলতেই ডালের উপরে গিয়ে আলো পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রোষমিশ্রিত চাপা গর্জ্জন শুনলাম। অমন একটি জায়গা থেকে বাঘের বিরক্তি প্রকাশ হবে আশা করিনি। আলো আরো উপরে ফেলতে দেখি—বাঘ ডালের উপর মাঝ পথে এড়োভাবে নীচু দিকে দেখছে! চোখের উপর আলো পড়ায় আমাকে দেখতে পায় নি। আমার দিকে ঘোরার জন্ত যথেষ্ট জায়গা না থাকায় এইখানে দাঁড়িয়েই লেজ নাড়াছে। প্রথমটা আমার বুক কেঁপে গিয়েছিল, কিন্তু বাঘের বুক তোয়াজ করে এগিয়ে দেয়ায় নিশানা না করেই ঘোড়া টিপে দিলাম। বাঘ থর থর করে কাঁপতে লাগল তারপর মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ার আগেই আর একটা নল খালি করেছিলাম। স্ন্যাপ সটে (snap shot) অভ্যস্ত না থাকলে, অকস্মাৎ টিপ না করে গুলী চালাতে পারতাম না। গল্প লেখার অভ্যাসও সে দিন বাঘ শেষ করে দিত।

ঘটনাগুলি মনে পড়লে ফেলে-আসা যৌবনকে ফিরে পেতে ইচ্ছা করে। ম্যালেরিয়া মাকড়সা সাপ এবং বাগদা চিংড়ীর মত বৃহৎ দাঁড়াযুক্ত কাঁকড়া বিছের সঙ্গে সহবাসের সাহস না থাকলেও জঙ্গলের ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ আজও আমাকে ডাক দেয়। অবসর পেলে বন্দুকগুলো যখন পরিষ্কার করি তখন ঘুমন্ত হিংস্র প্রবৃত্তি সজাগ হয়ে ওঠে। আমার সান্ত্বনা এইটুকু, বলিদানে পূজার্ঘ্য দিয়ে জীব হত্যার পুণ্য সঞ্চয় করি না, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরার আনন্দ পাই। মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারতে পারলে সাহসীর দম্ভ প্রতিষ্ঠায় আরো খুসী হই।

দেখা দাও

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অশ্রুজলে নয়নেরে যমুনা করেছি!
বঁধু গো, তোমার প্রেমে এবার মরেছি!
এতকাল এ সংসার আয়ানের ঘরে
মৃত্যুর শৃঙ্খল পাশে কেটেছে কবরে!
অন্ধকূপে কামনার নিষ্ঠুর সে মার
রক্তাক্ত করেছে হিয়া॥ কখন তোমার
বেণুধ্বনি এলো কানে। সে বাঁশির সুর
অন্ধকারে নিয়ে এলো সোনার রোদ্দুর!
সেই ক্ষণে জানিলাম, অল্পে সুখ নাই;
শান্তির শাশ্বত উৎস—সে শুধু ভূমাই।
তুমি সেই ভূমা। কোথা তোমার তুলনা?
আমার সর্ব্বস্ব! মোরে ভুলোনা, ভুলোনা!
আঁখি কালিন্দীর কূলে হে মুরলিধর
দেখা দাও! দাও, বঁধু, অধরে অধর!

ফটো :
রণেন্দ্রশেখর ঘোষ

শারদ প্রাতে

ফটো : তুষার রায়চৌধুরী

॥ স্বচ্ছ ॥

ফটো : অজয়কুমার দে

চাঁদের আলোয় ঠিক বোঝা যায় না কিন্তু এখন অনেক রাত। শহরের একটা মানুষও জেগে নেই এখন—বুধারু জানে। কুকুরগুলো ঝিমোচ্ছে এখানে-ওখানে। গাছের ওপর পাখিরাও চুপ। আর আজ জলপাইগুড়ির ঘুমন্ত রাস্তায় বুধারুর বুটের আওয়াজও নেই। কেউ তার বল্লমের শব্দ শুনবে না, ঠং ঠং—মাঝ রাত্তিরে শুনবে না কর্কশ গলার স্বর, হল্ট হুকুমদার!

খুব সাবধানে নিশ্বাস ফেলে বুধারু—কাঠ-পিঁপড়ের ঘন ঘন কামড়েও ছটফট করেনা। শুধু জ্বলন্ত আক্রোশে দু হাতের দুটো বর্শা আরও অনেক বেশি শক্ত করে চেপে ধরে আর ঘা খাওয়া বাঘের মতো আক্রমণের এক ভয়ঙ্কর ইচ্ছায় বিকৃত করে নিজের মুখ।

অব্যর্থ লক্ষ তার। পশু পাখি মানুষ—সকলের বেলায় সমান কাজ করে এই বর্শা বুধারুর হাতের ঠেলায়। আজও করবে। আজ দ্বিগুণ বেগে ছুটবে বুধারুর বর্শা—আরও অনেক বেশি হিংস্র হয়ে উঠবে। হঠাৎ সব ভুলে গম্ভীর করে অদ্ভুত এক শব্দ করে বুধারু। তারপরই চমকে এদিক ওদিক তাকায়। না, কেউ কোঁথাও নেই।

তার চোখের সামনে মোটে কয়েক হাত দূরে বাঁশের পোলের খুটিতে বাঁধা ডিঙিটা তিস্তার রুপোলি জলে উঠছে-নামছে। যেন ছাড়া পেলেই বেঁচে যায়—খুশির তীরের মতো মিলিয়ে যায় মাঝ-নদীতে। হ্যাঁ, আসবে একটু পরে ওর বাঁধন খুলে দেয়ার মানুষ মুনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। যেন বুধারুর চোখে ধুলো দেয়া অতই সহজ। বেইমান! ওদের দুজনের জন্যেই দুটো বর্শা ক্ষিপ্ত হয়ে আছে বুধারুর হাতের মুঠোয়।

তিস্তার জলের তলা থেকে শব্দ হয়, গুড়ম! গুড়ম! দূরে পুলিশ লাইনে ঘণ্টা বাজে, ঢং ঢং। রাত দুটো। ঝোপ-ঝাড় ছাওয়া টিলার ওপর বসে বুধারু ডিঙিটার দিকে স্থির লক্ষ্য রাখে ঘাড় বেঁকিয়ে।

ভাটার আগে-আগে ওই ঢালু রাস্তা দিয়ে তর্ তর্ করে ছুটে আসবে রাজু আর মুনিয়া। রামশাই জঙ্গলের

ধারে ঘর বেঁধে থাকার অদম্য ইচ্ছায় পাশাপাশি. বসবে দুজনে। আর তারপরই ডিঙির বাঁধন খুলতে যাবে রাজু।

কাঠ-পিঁপড়ের কামড় খেতে খেতেও হিংস্র হাসিতে বুধারুর ঠোঁট টান টান হয়ে যায়। বাঁধন খুলতে হবে না রাজুকে। তার আগেই বর্শার ঘায়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে তার বুক চিরে। কিন্তু কিছু বোঝবার আগে মুনিয়াও চিৎকার করে উঠবে যন্ত্রণায়।

অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও তাজা লাল রঙের ছোপ লাগুক তিস্তার রুপোলি জলে। তখন গট গট করে টিলার ওপর থেকে নেমে আসবে বুধারু। হেঁচকা টানে তুলবে দুজনের দেহ থেকে দুটো ধারালো বর্শা। আর যদি তখনও না মরে থাকে ওরা তাহলে মারবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। তারপর ও নিজেই বাঁধন খুলে দেবে নৌকোর। আর দাঁত কড়মড় করে একটা লাথি মেরে দুটো লাসের দিকে তাকিয়ে বলবে, যা নিমকহারাম, যা হারামজাদী এখন আশমানে গিয়ে মজা কর।

ডিঙিটা চলে যাক ভাটার টানে ভেসে ভেসে। সেদিকে আর তাকাবে না বুধারু। ধরা পড়ার ভয়ে বুকও কাঁপবে না তার। ধরা পড়ে পড়ুক। একটা খুনের জন্যে হোক কিম্বা দুটোর জন্যে হোক—ফাঁসি তাকে একবারই যেতে হবে। মরতে ভয় পায় নাকি বুধারু।

আশ্চর্য সাহস রাজুর। তার ঘর থেকে মুনিয়াকে টেনে নিয়ে যায়। আর মুনিয়া? জন্মের ঠিক নেই বলে চোরের মতো স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু যাবে কোথায়! বুধারুর হিংস্র অব্যর্থ বর্শা এড়িয়ে কে পালাতে পেরেছে? চোর বাঘ ভাল্লুক বুনো শুয়োর নেকড়ে—কেউ নয়।

তাই সরকারী কাজ করার বয়স হয়ে গেলেও রাতে শহর চৌকি দেবার জন্যে তাকে মোটা মাইনে দিয়ে রেখেছে জলপাইগুড়ির বড় বড় লোক। কে না ভয় করে তাকে! রক্ত দেখার একটা উগ্র নেশা যেন মিশে আছে তার রক্তে। গলার স্বরে সব সময় কড়া ঝাঁজ। কুচকুচে ভাল্লুক-কালো বিরাট শরীর। ছোট ছোট চোখ। থ্যাবড়া মুখ, পুরু পেশী আর সারা গায়ে ঘন লোম। বাচ্চারা ছুটে পালায়। পুলিশ সুপারের বুলডগ যেন ভয়ে ভয়ে তাকায় তার দিকে। আর গাছ পাতা কুকুর ছাগল মানুষ থম থম করে বুধারুর পায়ের শব্দে।

রোজই রাত বারোটা বাজবার আগে আগে তৈরি হয়ে নেয় বুধারু। খাঁকি শার্ট হাফ প্যাণ্ট জুতো মোজা পরে নয়। মৃদু একটা লণ্ঠন জ্বলে একটু দূরে। আর খাটিয়ায় ওপাশ ফিরে মুনিয়া ঘুমোয়। বেরিয়ে যাবার আগে তাকে ঠেলা দিয়ে জাগায় বুধারু। দরজা বন্ধ করতে হবে।

এক ঠেলাতেই জেগে ওঠে মুনিয়া। মুখে যন্ত্রণার ছায়া ফুটিয়ে বলে, উঁহুহু, হাত না লোহা? লাগে না? উঁহুহু—

বুধারুর হাসিটা গর্জনের মতো কাঁপে মুনিয়ার কানে, শরীর নাকি তোর য়্যা? মোটে তো ছুঁলাম তোকে—

বুধারুর দিকে না তাকিয়ে মুনিয়া বলে, ওই ছোঁয়ার চাপেই পরাণটা যায় বুঝি আমার—একটা ভাল্লুক পাও নাই সাদি করবার লিয়ে?

হ হ, বুধারু বল্লমটা টেনে নিয়ে বলে, বাঘিণী বানাতে পারলাম কই তোকে! তবে না মজা হত বেশি। সাহেবের রক্ত আছে না গায়ে? তবে অত ডর কেন প্রাণে? তাকে কাছে টানতে যায় বুধারু। এবার ইচ্ছে করেই যেন তার ছোঁয়া বাঁচায় মুনিয়া, দেরি হয় না কাজের? বার হও এখন—

বাঘ যেমন করে হরিণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বোধ হয় তেমন করেই বুধারু ধরে মুনিয়াকে আর আদরের ঘটায় নিজেই হাসে হি হি করে। তখন বল্লমটা মাটিতে গড়ায়। মুনিয়া ছটফট করে আর বলে, বাঘের হাতে হাড়-গোড় ভাঙে গো আমার—

হি-হি, আমার বউ বটে তো তুই।

জানটা লিবে নাকি তাই?

তোর জান লিবার হিম্মৎ নাই আমার?

বার হও—বার হও। রাত কত খেয়াল নাই?

বল্লমটা তুলে নেয় বুধারু। বাইরে বেরিয়ে আওয়াজ করে, ঠং ঠং! মুখ বাড়িয়ে রোজই আশ্বাস দেয় মুনিয়াকে, কোন ডর নাই। আরামে ঘুম যা বউ। কারো ঘাড়ে দুটা মাথা নাই যে আমার ঘরে সিঁদোয়।

কিন্তু তার কথা শোনবার জন্যে মুনিয়া দাঁড়ায় না দরজার কাছে। ওকে চোখের আড়াল করবার জন্যেই যেন একটু বেশি শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। তারপর অন্ধ কান্নার বেগ বুকে চেপে থর থর করে কাঁপে কিছুক্ষণ। টলতে টলতে এসে লণ্ঠনের শিখা আরও কমিয়ে দেয়। আর খাটিয়ায় গড়াতে গড়াতে অভিশাপ দেয় নিজেকে। তার মাকে। বুধারুকে। রোজই। তখন দূর থেকে বুধারুর বল্লমের ক্ষীণ শব্দ আসে, ঠং ঠং! আর কর্কশ গলার স্বর, হল্ট হুকুমদার!

মুনিয়ার মা বেঁচে থাকলে এখন সে তাকে আঁচড়ে-কামড়ে বুঝিয়ে দিত সে একটা বুড়ো বুনোশুয়োরের সঙ্গে জোর করে ঘর করতে পাঠালে মানুষও পশু হয়ে যায়। আর সে নিজেও পশুর মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে এর মধ্যেই সে কথাটা বোঝাবার জন্যে হয় তো নিজের মাকেই মেরে ফেলত মুনিয়া।

কিন্তু তার মা আর বেঁচে নেই। ঘায়ে ঘায়ে শরীরে পচন ধরেছিল অনেক আগেই। পঙ্গু অক্ষম—বয়স হবার আগেই শুকিয়ে গিয়েছিল পাপের শরীর। আর সব সময় সতর্ক যেন মেয়ের দেহ এমন না হয়ে যায় কখনও। তাই আগলে-আগলে রাখত মুনিয়াকে। লাঠি নিয়ে তাড়া করত সেই সব সুন্দর মানুষদের যারা আসত মুনিয়ার লোভে-লোভে আলাপ জমাতে। আর এক ফাঁকে গাল টিপে আদর করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলত মেয়েকে, পাপে সুখ নাই রে মুন্নি—পাপে সুখ নাই। আমার শরীরের হাল দেখিস? বলি ও ছোঁড়াগুলোরে হাঁকাই সাধে! ওরাও তোরে লাথি মেরে মেরে এমনি হাল করবে—

মার সব কথা শুনত না মুনিয়া। সব ভুলে নিজের ফুটন্ত দেহটা নিজেই দেখত শুধু। আর স্বাধীন হওয়ার এক ভয়ঙ্কর আকাঙ্ক্ষায় যার সঙ্গেই হোক মার কাছ থেকে ছুটে পালাতে চাইত। কিন্তু মা না মরলে কিছুই করবার নেই তার। কবে মরবে মুনিয়ার মা!

হ্যাঁ, তার মা মরল এক হাড় কাঁপানো শীতের রাতে। চোখ কপালে উঠেছিল। ফেনা গড়াচ্ছিল মুখ দিয়ে। কাছাকাছি একটা লোকও নেই। ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল মুনিয়ার দেহ। আর ঠিক তখন রাস্তায় বুধারুর বল্লমের আওয়াজ—ঠং ঠং! মুনিয়াই তাকে ডেকে আনে ঘরের মধ্যে। মানুষ হোক, পশু হোক—একটা কেউ এখন তার চোখের সামনে না থাকলে চলবে কেন।

মরল মুনিয়ার মা। মরবার ঠিক আগে—আগে মেয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল বুধারুকে, এটার গতি কি হবে? কেউ নাই ওর—

চোখ তুলে মুনিয়াকে আর একবার অল্প অল্প অন্ধকারে দেখেছিল বুধারু। আর হঠাৎ একটা চমকে বোধহয় ভুলেই গিয়েছিল যে এই ঘরেই আর একটা মানুষের শ্বাস উঠেছে। বুনো শুয়োরের মতো গরর্ গরর্ করে মুখ দিয়ে দুবার অদ্ভুত শব্দ করে বুধারু। তারপর ভাঙা গলায় ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে আর বলে, আমারও কেউ নাই—

মুনিয়ার মার শেষ কথা, তবে রাখ ওরে—বুজে গেল বুড়ির চোখ চিরকালের জন্যে। কান্নায় ভেঙে পড়ল মুনিয়া। তার মার জন্যে নয়—বাপের বয়সী একটা জানোয়ারের সঙ্গে তাকে ঘর করতে হবে বলে।

জানোয়ার বৈকি বুধারু—একটা হিংস্র জানোয়ার। নরম শরীরটা ভয়ে ভয়ে শুকিয়ে ওঠে মুনিয়ার। আর দিন রাত সে মনে মনে গাল দেয় মাকে। গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে শেষ হয়ে যেতে চায়। একটা ভাল্লুক যেন তাকে রোজ একটু একটু করে কুরে কুরে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে।

ভাল করে ভোর হবার আগেই বল্লম বাজিয়ে ঘরে ফিরে আসে বুধারু। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দেয় আর বলে, এ মুন্নি খোল!

ইচ্ছে করেই দেরি করে মুনিয়া। খাটিয়ায় চুপচাপ পড়ে থাকে কিছুক্ষণ। ও দাঁড়িয়ে থাক বাইরে। ওকে দেখলেই চেহারাটা অন্য রকম হয়ে যায় মুনিয়ার।

এ মুন্নি—মুন্নিরে—

ঘুম চোখে তখন দরজা খোলে মুনিয়া। বুধারুর দিকে না তাকিয়েই ফিরে দাঁড়ায় আবার। তখন জুতোর খটখট শব্দ করে বুধারু চেঁচায়, যাস কোথা? দেখ দেখ, কত বড় হরিণ। মাদী রে মাদী। আহা, কী স্বাদ! ঝপ্ করে মরা হরিণটা কাঁধ থেকে মাটিতে ফেলে বুধারু। আর জিব বের করে চুক চুক শব্দ করে। যেন কাঁচা মাংসই খাবে এখুনি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে মুনিয়া দেখে হরিণটাকে। বুধারুর বর্শার খোঁচার স্পষ্ট দাগ ওর ঝোলা পেটে। তাজা রক্ত। কিন্তু চোখ দুটো খোলা। কালো। করুণ।

কঠিন স্বরে বলে মুনিয়া, চোখ নাই তোমার? পেটটা দেখ নাই ওর?

ফ্যা ফ্যা করে হাসে বুধারু, আরে, পালাতে পারে নাই শালী। তিস্তার জল খেতেই প্রাণটা দিল আমার হাতে রক্ত লাগা বল্লম দিয়ে হরিণটার পেটে আর একটা খোঁচা দেয় সে, বড় স্বাদ! খাবি?

রাক্ষস—রাক্ষস— মুখ ঘুরিয়ে সেখান থেকে ঘরে যেতে চায় মুনিয়া।

কিন্তু বল্লম রেখে তাকে বাধা দেয় বুধারু, রাক্ষস না বাঘ—হি-হি করে দাঁত বের করে সে। আর বাঘের মতোই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মরা হরিণটার দিকে। যেন মুনিয়া না থাকলে সে খাবল-খাবলে কাঁচা মাংসই খেত বসে বসে।

ঝাঁজের একটা তোড় বেরিয়ে আসে মুনিয়ার গলা ঠেলে, ভাল্লুক!

হি-হি-হি, যাবি জঙ্গলে? তখন মুনিয়াকে মনের কথাটা স্পষ্ট করে বলেই ফেলে বুধারু, কাঁচা মাংস চাখবার জন্যে জিব আমার সময়-সময় বড় চক্ চক্ করে রে মুন্নি—

মানুষের মাংস চাখবার ইচ্ছা হয় না?

হয়।

তবে আমারে খাও।

আরে দুর, মুনিয়ার খুব কাছে সরে এসে ভাঙা গলায় বলে বুধারু, তুই তো বউ বটে আমার।

আর কথা বলতে পারে না মুনিয়া। কিন্তু সত্যিই তার মরে যেতে ইচ্ছে করে। তাকেও বল্লমের এক খোঁচায় শেষ করে দিক ওই ভাল্লুকটা। তিল তিল করে জ্যান্ত না চেখে এক বারেই গিলে খাক তার মৃত দেহটা। কি পাপ করলে তাকে মেরে ফেলবে বুধারু এখনও ঠিক বুঝতে পারে না মুনিয়া।

তবে এক-একদিন এক-এক রকম করে বুধারু মুনিয়ার সামনে মেলে ধরে জানোয়ারের মতো হিংস্র রূপ আর রক্তের ওপর তার প্রবল নেশার কথাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়। তখন এ ঘর ভেঙে চুরমার করে চলে যেতে ইচ্ছে করে মুনিয়ার। তার মার মতো পচে-পচে মরতে চায়। বুনো জানোয়ার কি দাম দেবে তার যৌবনের। নিজের দেহটাকে ওই বল্লম দিয়ে নিজেই একদিন টুকরো টুকরো করে ফেলবে মুনিয়া। হরিণটার মতো পুড়িয়ে পুড়িয়ে সাত দিন ধরে তার মাংসও খেয়ে সুখ করুক লোকটা।

বেঁচে থেকে কি সুখ মুনিয়ার!

না, সুখ আছে বটে বেঁচে থাকার। মরতে কে চায়। রাজুর দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে বাঁচবার ব্যাকুল নেশায় ছট ফট করে মুনিয়া। কিন্তু দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওই বুড়ো ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা যেন সারাক্ষণ ওদের মুখ ভেঙায়।

ঢল ঢল রূপ রাজুর। কালো কোঁকড়া চুল। রামশাই জঙ্গলের ধারে নাকি ঘর। বুধারুর নাম শুনে ওর কাছে এসেছে বর্শা ছোড়া শিখতে। তারপর যদি এখানে কাজ জোটে ভাল আর না জুটলে আবার ফিরে যাবে ভিটেয়। দিন চালাবে কোন রকমে।

রাজুর কথা শুনে হাসে বুধারু, বল্লম ধরতে জানলে যে উপোস করে মরে না রে রাজু, এমন একটা লোককে বর্শা ছোড়া শেখাবার কথায় ভারী খুশি হয় সে, কাজ শুরু কর্ কাল থেকে। চাঁদমারির ধারে আসবি ঠিক বেলা তিনটায়।

দূরে দাঁড়ানো মুনিয়ার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে রাজু মাথা নাড়ে, আসব।

এমনি করেই রাজু এল। আস্তে আস্তে নয়, একেবারে প্রথম থেকেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল অন্দরে আর জুড়ে বসল মুনিয়ার মন। কিন্তু ও যেন চোর। কখন ধরা পড়ে যায় আর বুধারু মারে বর্শার মরণ খোঁচা। বুকটাও ঢিপ ঢিপ করে রাজুর। তখন মুনিয়ার মুখ দেখে সাহস পায় আর দেহের শক্তিও যেন বাড়ে তার।

ভয়টা কারে শুনি? মাথা ঝাঁকিয়ে রাজুকে জিজ্ঞেস করে মুনিয়া, জোয়ান বয়স না তোমার?

রসিয়ে-রসিয়ে হাসে রাজু, তোর চোখের ভয়ে পরাণটা যায় আমার—

এসব কথা জীবনে কখনও শোনে নি মুনিয়া। প্রথমটায় ও কেমন বিমূঢ় হয়ে যায়। আগুনের কড়া

আঁচে দেহটা যেন ঝলসে ওঠে ওর। আর রাজুর তাজা বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জুড়িয়ে যেতে চায়।

কাঁপা-কাঁপা স্বরে মুনিয়া বলে, যার সঙ্গে ঘর করি—চোখ দেখার চোখ নাই তার—

দেখার মানুষ আছে না তোর কাছে।

ও মানুষ পালাবে। জীবনটাই আগুন যে আমার। ও মানুষ সাথে নিয়ে যাবে আমারে ?

কালো কোঁকড়া চুলে একবার হাত বুলোয় রাজু। ঝক ঝকে দাঁত বের করে মিষ্টি হাসে। আর সাবধানে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মুনিয়ার খুব কাছে সরে এসে ফিস ফিস করে বলে, বল্লমের ভয় নাই ও চোখের ?

না নাই, মুখ তুলে জোর গলায় বলে মুনিয়া।

ঠিক ?

মিছা কথা নাই এ মুখে।

তবে সবুর কর।

ঝাঁজের হলকা ছোটে মুনিয়ার মুখ দিয়ে তখন। আর অন্ধকারে রাজু ঠিক বুঝতে পারে না ওর চোখ দিয়ে জলও ঝরে টপ টপ। একটা বুড়া জানোয়ার তার সাথে ঘর করতে পারে নাকি মানুষ! মায়া নাই, দয়া নাই, শুধু রক্ত খাওনের সাধ। বাপ রে বাপ!

ওর চোখের জল মুছিয়ে আদর করে রাজু বলে, এই সে মানুষ হাজির। সবুর কর। সবুর কর।

অসহায় ছোট একটা মেয়ের মতো মাথা তুলে থমথমে ভারী স্বরে মুনিয়া জিজ্ঞেস করে, ঠিক ?

তার ভাষাতেই হাসি মুখে রাজু বলে, মিছা কথা নাই এ মুখে।

ঠং ঠং! সারা শহর গভীর রাতে চৌকি দিতে দিতে মাঝে মাঝে পাথুরে রাস্তায় বল্লম ঠুকে বুধারু সকলকে জানান দেয় যে সে তার কাজ করে যাচ্ছে ঠিক। কিন্তু একটা চোর নেই কোথাও। একটা পাগলা শেয়াল কি কুকুরও নেই। কি মারবে বুধারু।

তখন ফাঁকা নিঃঝুম রাস্তায় একা চলতে চলতে শুকনো খটখটে রাস্তার পাথরেই গায়ের জোরে বল্লম ঠুকে বুধারু আওয়াজ করে, ঠং ঠং। আর রাজুর কথা মনে করে একা একাই হাসে।

আজকালকার ছেলেগুলো মেয়ে মানুষেরও অধম। চোখের দৃষ্টি নেই। হাতের জোর নেই। ও ছোকরাকে কি শেখাবে বুধারু। শুধু শুধু তার নিজেরই নাম খারাপ হবে। ছোকরা টিপ করতেই শিখল না এখনও।

আর বুধারু ? সাহেবদের আমলের সেই দিনগুলোর কথা ওর মনে পড়ে যায়। সাহেবের গুলি ফসকেছে কত বার! কিন্তু বুধারুর বর্শা ঠিক বাঘের চোখ কানা করেছে—দাঁত ভেঙেছে বুনো শুয়োরের। চিরকালের মতো পা খোঁড়া করে দিয়েছে দুর্ধর্ষ ডাকাতের—বুক এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিয়েছে।

রাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে হঠাৎ বুধারুর ভয়ঙ্কর গলা বেজে ওঠে, হল্ট হুকুমদার!

কোন সাড়া নেই। বুড়ো বটগাছের পেছনে কে যেন গা ঢাকা দিয়েছে। বিদ্যুৎ-বেগে বুধারু ঘুরে দাঁড়ায়। কাউকে দেখতে পায় না। আর একবার চিৎকার করে। রক্ত দেখার আগ্রহে উন্মাদ হয়ে ওঠে। এখনও বটের কাছে শুধু খস খস শব্দ।

কান খাড়া করে শোনে বুধারু। ঠিক এক মিনিট। নিজের হাতকে ও যেন আর বশে রাখতে পারে না। শব্দ লক্ষ্য করে বর্শা ছোঁড়ে। অব্যর্থ। কেঁই কেঁই কেঁই—আকাশ ফাটিয়ে কুকুরটা কাঁদে। পেটে বেঁধা ভারী বর্শা নিয়ে ছুটে পালাবার ক্ষমতা নেই।

আরে দূর শালার কুত্তা—বর্শা টেনে নিয়ে ঘাসে রক্ত মুছে নেয় বুধারু। তারপর এগিয়ে যায় সামনে। কিন্তু কুকুরটা আর উঠতে পারে না সেখান থেকে। রাস্তার বড় আলোর কাছে এসে বর্শার ফলা চোখের সামনে তুলে ধরে বুধারু। কুকুরের রক্তের দাগ লেগে আছে এখনও। গলা ফাটিয়ে হাসে বুধারু। রক্ত দেখলে চিরদিনই ওর এমন করে হাসতে ইচ্ছে করে।

চাঁদের আলোয় তিস্তার রুপোলি জল ফুলে উঠেছে। আর ঘাটে বাঁধা ডিঙিটা আরও জোরে উঠছে নামছে—তীরের বাঁধন কেটে ছুটে যেতে চাইছে মাঝ-নদীতে। আর লুকিয়ে বসে থাকা বুধারুর রক্তেও আগুন লেগেছে। হাতের তালু ঘেমে ওঠে ওর। উৎকট হিংসায় বুনো বাঘের মতোই চোখ দুটো জ্বলে।

কালভোর রাতেই ও শেষ করে দিতে পারত দুজনকে। বর্শার দুই খোঁচায় গুঁড়িয়ে দিতে পারত বেইমানির ফন্দী। নিজের কানে সব কথা শুনেছে বুধারু। আর থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে জানলার কাছে। ফিস ফিস করে বললেও প্রত্যেকটি কথা ভোর রাতের শুব্ধতায় স্পষ্ট হয়ে বেজেছে তার কানে। আশ্চর্য, এত মশগুল ওরা যে বুধারুর বর্শার আওয়াজ শুনেও সতর্ক হয়নি।

মুনিয়া বলে, যদি ধরতে পারে ?

না না, রাজু সাহস দেয়, অত রাতে সে-ধারে যায় না কেউ। তিস্তার জলে ভাটা নামে রাত-দুপুরে। টিলার কাছে বাঁধা থাকবে ছোট ডিঙি—রাজি ? ঠিক কথা কও ?

মুনিয়া দুবার বলে, রাজি—রাজি।

বুধারুর ইচ্ছে করে এক লাথি মেরে দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে তাজা রক্তের বান ডাকায় সেই মুহূর্তে। কিন্তু না, আরও হিংস্র হয়ে ওঠবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে ঠিক রাখে। ঘরের মধ্যে খুন করে মজা নেই। খেলিয়ে—খেলিয়ে পশুকে যেমন ফাঁদে ফেলে মারা হয় তেমনি ওরা যাক নদীর ধারে—যাক নৌকোয় উঠতে তখন ফাঁকা নির্জন জায়গায় বুধারু শেষ করবে—ওদের।

ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক এসে লাগে বুধারুর গায়ে। অনেক দূরে একটা রাত-জাগা পাখি ডেকে ওঠে। আর আলোয়-আলোয় মনে হয় যেন দিন হয়ে গেছে। স্পষ্ট দেখা যায় চারপাশ। এপাশে শুধু বালি আর বালি। ওপাশে ঘন গাছের সারি। দূর তিস্তায় কি যেন একটা ভেসে চলেছে। আর আকাশের সাদা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ সরে-সরে যাচ্ছে চাঁদের পাশ দিয়ে। বসে বসে ঘুম ধরে যায় বুধারুর। মিঠে নেশার ঝোঁকে ওর মাথাটা ঝিম ঝিম করে। আর ঠিক তখন চোখে মিঠে এক নেশা নিয়েই বুধারু দেখে তার শীকার। বালির ঢালু পথ ভেঙে-ভেঙেই এদিকে এগিয়ে আসছে দুটো মূর্তি—যাদের শেষ করে দেয়ার জন্যে ও এখানে বসে আছে এতক্ষণ।

বুধারু দেখে আর দেখে। নড়তে পারে না। উঠতে পারে না। হাত নেড়ে ধারালো বর্শার শব্দও করতে পারে না, ঠং ঠং। বোধ হয় আশ্চর্য এক নেশায় ঝোঁকেই আকাশ-ভাঙা আলোর জোয়ারে ও দেখে মুনিয়া আর রাজুকে। ও দেখে ওদের রূপ।

আর কেউ কোথাও নেই। দূরে ঘন বনের সবুজ সারি। আর যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বালি আর বালি। আর হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ। এখন একটা কাঠ পিঁপড়েও কামড়ায় না ওকে।

ছুটে ছুটে ডিঙির কাছে আসে রাজু আর মুনিয়া। দ্বিগুণ উল্লাসে নৌকোটা নাচে তখন। খুশির এমন প্রচণ্ড দীপ্তি এক মুহূর্তের জন্যেও মুনিয়ার মুখে দেখতে পায়নি বুধারু। এখন ওকে যেন সে চিনতে পারে না—রাজুকেও নয়।

বুধারু ঠায় বসে থাকে চুপচাপ। বিমূঢ়। মুগ্ধ। আর তার চোখের সামনে দিয়েই নাচতে নাচতে ডিঙিটা হারিয়ে যায় মাঝ তিস্তায়। হাতের মুঠি শিথিল হয়ে আসে বুধারুর। বর্শা দুটো গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। তখন ও দেখে ওর হাত। ওর শরীর। ঘন লোম। ভাল্লুক কালো রঙ। নিজের মুখটা দেখতে পায়না বুধারু—দেখতে চায়ও না।

ও তাকায় তিস্তার দিকে। ও দেখে আকাশ। কান পেতে শোনে হাওয়ার সোঁ সোঁ আওয়াজ। আর অপরূপ দুটো মানুষের শরীর আর দেখতে পাবে না জেনেও ওদেরই খোঁজে ভরা চোখে এদিক-ওদিক।

বৈষ্ণব কবি রসখান

(১৬১৫—১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ)

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

ষোড়শ শতাব্দী ভারতের ইতিহাসে একদিকে যেমন ধর্ম সংঘাতের যুগ, অন্যদিকে তেমনি কৃষ্টি সমন্বয়ের যুগ। দুইটি পরস্পর বিরোধী ভাবধারার সংঘাতে ও সংযোগে হিন্দু মুসলমান ভারতবর্ষে এক নব বিধানের সূচনা করিয়াছিল। রাজশক্তির সুযোগে প্রত্যক্ষ মুসলিম কৃষ্টি হিন্দুদিগকে একদিকে যেমন বিভ্রান্ত করিয়াছিল, অন্যদিকে হিন্দুগণও মুসলমানদিগকে পরোক্ষে তাহাদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সেই ভাবধারায় আপ্লুত হইয়া মুসলিম সুধীজন হিন্দুকৃষ্টিকে বরণ করেন এবং বহুস্থানে বৈষ্ণবসাধনা গ্রহণ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তাঁহাদের মর্মকথা তাঁহারা ভাষার বন্ধনে চিরন্তন করিয়া গিয়াছেন এবং নানাস্থলে কাব্য সঙ্গীত গাঁথা ইত্যাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। যে সমস্ত মুসলিম কবি বৈষ্ণবকাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের একটি অসম্পূর্ণ-তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পন্থা	কবি	অন্যতম রচনা
প্রেমপন্থী	কুতবন শেখ—	মগাবতী
	মালিক মুহম্মদ জায়সী—	পদ্মাবত্
	মনঝন—	মধুমালতী
	ওসমান—	চিত্রাবলী কী কথা
কৃষ্ণপন্থী	রহিম—	দোহা, মদনাষ্টক্
	রসখান—	প্রেমবাটিকা
	রসলীন—	রসপ্রবোধ
	কারেখাঁ ফকির—	স্ফুটপদ
	তানসেন—	সঙ্গীত
	শেখ রঙ্গ রেজীন ও	দোহাসার সংগ্রহ
	আলম—	কৃষ্ণলীলা
	তাজ—	দশাবতার বর্ণন
রামপন্থী	কামাল—	স্ফুটপদ
	রজব—	রজবকী বাণী
	দরিয়া সাহেব—	স্ফুটপদ, সাথী
নিরঞ্জনবাদী	কবীর—	বীজক সংগ্রহ
	ইয়ারা সাহেব—	স্ফুটপদ
	বুলা সাহেব—	"
	দীন দরবেশ—	দীনপ্রকাশ
	মনসুর—	স্ফুটপদ

এই মহাজনদের মধ্যে আমি আজ রসখানের বিষয় অবতারনা করিব। রসখানের বিষয় আমরা "দুল বায়ান্ন বৈষ্ণবোঁকী বার্ত্তামেঁ" উল্লেখ পাই। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণবমহাজনগণ রসখানকে বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহন করিয়াছেন। গোস্বামী বিট্টলনাথজীর প্রিয় শিষ্যরূপে তিনি সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রসখান দিল্লী নগরীর অদূরে এক বিখ্যাত পাঠান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে রসখান কোন কিশোর বণিক বালকের প্রতি আকৃষ্ট হন। সুফীভাষায় কিশোর প্রেমকে "ইমরাদ্ পরস্তী" বলা হয়। মতান্তরে "ইমরাদ-পরস্তী" দোষাবহ নহে, "দু'শ বায়ান্ন বৈষ্ণবোঁকী বার্ত্তামেঁ" রসখান ও বণিক বালকের সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী উল্লিখিত আছে। একদা রসখানকে বণিক বালকের পশ্চাৎগামী দেখিয়া কয়েকজন বৈষ্ণব পরস্পর মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, যদি রসখান তাঁহার কিশোর প্রীতি শ্রীভগবানে অর্পন করিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে ভগবান লাভ করা অসম্ভব হইত না। রসখান শুদ্ধ ও উৎকর্ণ হইয়া বৈষ্ণবদিগের প্রতি জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। বৈষ্ণবগণ তখন রসখানের নিকট বিষ্ণুর অবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বৃন্দাবনলীলা ও প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিতে

লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রসখানের চক্ষুর সন্মুখে বালকবেশী শ্রীশ্রীনাথজীর মুর্ত্তি মুর্ত্ত হইয়া উঠিল। এই ঘটনাই রসখানের জীবনের ছেদচিহ্ন। মনের পরিবর্ত্তন হইল ; কিশোর বণিকের প্রেম এবার কৃষ্ণপ্রেমে পরিণত হইল ; এক রসধারায় রসখানের জীবন আপ্লুত হইল।

একদা রসখান শ্রীনাথজীর মন্দির দ্বারে তাঁহার প্রেমের দেবতার মুর্ত্তি দর্শন করিতে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের অন্যান্য যাত্রীগন মুসলমান রসখানের সন্মুখে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। রসখান বলিলেন, "তোমরা পাথরের মন্দির দ্বার রুদ্ধ করিয়াছ ; কিন্তু আমার মনো-মন্দিরের দ্বাররুদ্ধ করিবে কি করিয়া ? "দেবতা দর্শন অভি-লাষে রসখান মন্দিরের অপর প্রান্তে গোবিন্দকুণ্ডের পার্শ্বে বিনা অন্নজলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত, প্রহর, দিন, সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইল, রসখান ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি, আকুলতা ও আকাঙ্ক্ষার কথা মহাত্মা বিট্টলনাথজীর কর্ণে পোঁছিল। তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া রসখানকে মন্দিরের প্রবেশের অনুমতি দান করিলেন। ভক্তি ও প্রেমের দাবীতে মুসল-মান বৈষ্ণবের পর্য্যায় লাভ করিলেন। হিন্দুদের মধ্যে যদি ধর্ম্মান্তর তথা শুদ্ধিপ্রথা বিশেষ ভাবে, প্রচলিত থাকিত, তবে ষোড়শ শতাব্দীতে পাঠান—মোঘল যুগে বৈষ্ণব, বৈষ্ণব রামপন্থী, বিজ্ঞানবাদী, নিগুর্ন পন্থী মুসলমান ভক্ত হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইতেন।

রসখানের আকুল কৃষ্ণপ্রীতি তাঁহার কবিতা, দোহা ও গানের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রসখানের জীবনের অন্যতম বিশেষত্ব তাঁহার সারল্য। তাঁহার আকুলকৃষ্ণপ্রেম তিনি সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশ ভঙ্গিমা অনবদ্য, অনাড়ম্বর ; ভাষামাধুরী ও ব্রজবুলি যুক্তাক্ষর বিবর্জ্জিত। মধ্যযুগের হিন্দীরচনার ভিতর যে অনাবশ্যক অনুপ্রাস ও অপ্রাসঙ্গিক অলঙ্কারের বাহুল্য রহিয়াছে, তাহার অভাবে রসখানের রচনা সাবলীল গতিতে নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে। অন্তরের সীমাহীন প্রেম অবাধ গতিতে চলিয়াছে সুদূর সেই প্রিয়তমের বার্ত্তা নিয়া :—

মানুষ হোঁ তো কহী রসখনি
বসোঁ ব্রজ গোকুল গাঁবকে গবারনা
জো পশু হোঁ তো কহা বস মেরো
চরোঁ নেতি নন্দকী ধেনু মঝারন ॥
পাহন হোঁ তো বহী গিরিকো
জো ধরয়ৌ কর ছত্র পুরন্দর ধারন
জো খগ হোঁ তো·বসরৌ করৌ মিলি
কালিন্দী কুল কদম্বরী ডারন ॥

অর্থাৎ :—

পরজন্মে যদি মানুষ হই, তবে যেন আমি গোকুলে গোপ বালকের সংগে বাসকরি। যদি পশু হইতে হয়, তবে যেন নন্দ গোষ্ঠে বিচরণ করি। যদি পাথর হই, তবে যেন সেই পাথর হই যাহা কৃষ্ণচন্দ্র পুরন্দরের জন্য নিজ-হস্তে ধারন করিয়াছেন। যদি পক্ষী হই, তবে যেন আমি যমুনার তীরে কদম্বের ডালে নীড় রচনা করি।

কি সুন্দর অনাবিল কৃষ্ণপ্রীতি। হিন্দু পুরাণে কি গভীর জ্ঞান। সমস্ত বৃন্দাবনের পটভূমিকা যেন রসখানের দোহার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে।

যা লকটী অরু কমরিয়া পর
রাজতিহুঁ পুরকোঁ তজি ডরোঁ।
আটহ সিদ্ধি নব নিধিকো সুখ
নন্দকী গাই চরাই বিসারোঁ॥
রসখানি কবোঁ ইন আখিন সো
ব্রজকে বন্‌বাগ তড়াগ নিহারোঁ।
কোটিক হোঁ কল ধৌতকে ধাম
করলীকি কুঞ্জন উপর বারোঁ॥

অর্থাৎ :—

আমি ভোলানাথের কম্বল আর কৃষ্ণের বাঁশরীর জন্য ত্রি-জগতের রাজত্ব ত্যাগ করিতে পারি। নন্দ—গোষ্ঠ ধেনু বিচারণ বিনিময়ে আমি অষ্টসিদ্ধি নবনিধি সুখ ত্যাগ করিতে পারি। রসখান বলিতেছেন—আমি কবে এই আঁখিতে ব্রজধামে বনোপবন ও তড়াগ দর্শন করিব।

শতস্বর্ণখচিত প্রাসাদ ত্যাগ করি যদি বিনিময়ে বৃন্দাবন কুঞ্জের কণ্টাকাকীর্ণ বনে বিচরণ করিতে পারি।

রসখান কৃষ্ণ প্রেমের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগী। ত্যাগের কি অপূর্ব্ব মাধুরী। অষ্টসিদ্ধি, নবনিধি, স্বর্ণপ্রসাদ—ত্রি-জগতের রাজত্ব ত্যাগ করিতে পারেন—শুধু বৃন্দাবনের ধূলিকণার বিনিময়ে।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা যেন রসখান তাঁহার মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছেন :—

শেস্, মহেস্, গণেশ, দিনেশ,
সরেশ্, হু-জাহি-নিরন্তর গাবৈঁ।
জাহি অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড
অচ্ছেদ, অভেদ, সুবেদ বতাবৈঁ॥
নারদ সে শুব ব্যাস রটেঁ
পচিহারে, তজহুনি পার না পাবেঁ॥
তাহা অহীবকী ছোহরিয়া
ছছিয়া পর নাচ—নচাবৈঁ॥

অর্থাৎ :—

যে দেবতার গুণ-শেষ, মহেশ, দিনেশ, সুরেশ কীর্ত্তন করেন; যাঁহাকে বেদ, অনাদি, অনন্ত, অচ্ছেদ, বলিয়া বর্ণনা করেন, নারদ শুকদেব ব্যাসদেব যাঁহার স্তব করেন; সেই শ্রীকৃষ্ণের কি অপরূপ লীলা যে ব্রজবালা সামান্য ঘোলের জন্য তাঁহাকে নৃত্য করাইতেন।
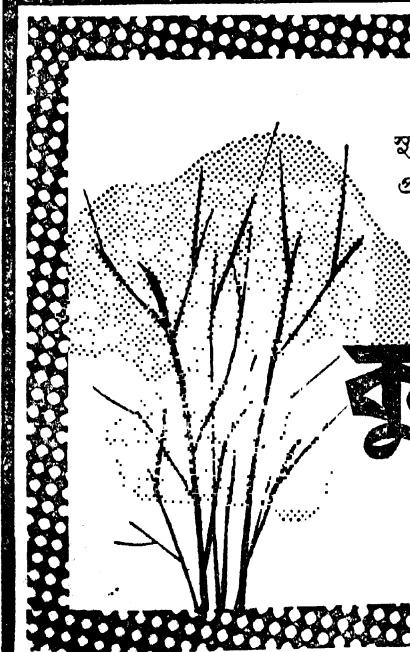
রসখানের কি সুন্দর বালকভাব, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কি সুন্দর অভিব্যক্তি।

রসখানের রচিত "প্রেম বাটিকা" অপরূপ প্রেমরসের আধার। প্রেমে রসখানের জীবন আরম্ভ, প্রেমের রসে রসখানের জীবন রসায়িত। কৃষ্ণ প্রেমে তাঁহার জীবনের পরিণতি, "প্রেমবাটিকা" তাঁহার প্রেমের অর্ঘ্য। মাতবীয় প্রেম যেদিন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে পরিণত হইল—রসখান উপলব্ধি করিলেন :—

প্রেম প্রেম সর্ব্বই কহত
প্রেম না জানত্ কোয়।
জো-জন জানৈ প্রেম তো,
মরৈ জগত্ ক্যায়ো রোয়॥

অর্থাৎ :—

প্রেম প্রেম সবাই বলে। প্রেম তকেহ জানে না। যদি মানুষ প্রেমের বার্ত্তা জানে তবে জগত কেন কেঁদে মরবে?

হঠাৎ কানে গেল আমার অধুনা বিস্মৃত ডাক নামটা। হন্ হন্ করে চলেছিলাম চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে—থমকে দাঁড়াতে হল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম···, আবার সেই ডাক। এবার ভাল করে লক্ষ্য করতে দেখি ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসছে এক সাহেব! আশ্চর্য্য হলাম! আমার ডাকনাম ধরে ডাকছে এক সাহেব! কিন্তু কাছে যেতেই সাহেব পরিষ্কার বাংলায় বলল—'কি রে, চিনতে পারিস?'—থতমত খেয়ে গিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করতে চিনতে পারলাম—আমার একদা সহপাঠী বন্ধু সুকেশ সেন। পরনে প্যাণ্ট, কোট, টাই তো আছেই, মাথাটিও শূন্য নয়—ফেল্ট টুপি শোভিত। আর সুপুরুষ সুকেশকে সাহেবী পোষাকে হটাৎ সাহেব বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। শুনেছিলাম বড় সওদাগরি অফিসে ভাল চাকরি করছে সুকেশ। আমার সঙ্গে দেখা হল বোধহয় একযুগ পরে।

অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় করে আসে মুখে—'আছিস কেমন? এতদিন দেখা করিস নি কেন? বাড়ীর খবর কি রকম? বিয়ে-টিয়ে করেছিস কি? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে সুকেশ বলে—'দেখা তো করতে গেছলাম কিন্তু হবে কোথেকে? এতদিন তো ছিসি বিদেশে। তাছাড়া এখন আর কারও বাড়ী-টাড়ী যেতে ইচ্ছেও করে না। বাড়ীর খবর এখন ভালই। আর বিয়ে? ও ব্যাপারটা আর ঘটাবার ইচ্ছে নেই ভাই।' হেসে বললাম—'কারণটা কি? ব্যর্থ প্রেম না মনোমত পাত্রী জুটল না?' একটু

চুপ করে থেকে ও বলে—'কোনটাই ঠিক নয়, আসলে হচ্ছে আমার এই চেহারায় আর···' কথা কেড়ে নিয়ে বলি—'এই চেহারায় আর···মানে? তোমার চেহারাটা কি খারাপ?' তাড়াতাড়ি বলে ওঠে সুকেশ···'না না, তা ঠিক নয়, মানে আসলে মাথায়, মানে—তুমি তো সব জান না তাই···।' আমতা আমতা করে থেমে যায় সুকেশ। কিন্তু 'মাথায়' কথাটা শুনেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে ওর মাথায় যেখানে শোভা পাচ্ছে 'ফেল্ট' টুপি। টুপিটাকে লক্ষ্য করে এবার বলে ফেল্‌লাম—'অফিসার হয়েছ বলে কোট, টাই হয়ত পরতে হয়, কিন্তু এর ওপর আবার এই গরমে মাথায় টুপি চাপিয়েছ কেন?' কথাটা শুনে এক বিষণ্ণ হাসিতে ভরে যায় সুকেশের মুখ, বলে—'ভাল দেখায় বলে।' ভাল দেখায় বলে? আশ্চর্য হলাম! ভাল দেখায় বলে এই ঘেমো গরমে মাথায় টুপি আঁটতে হবে? আর টুপি পরলেই বা কি এমন ভাল দেখায় তা তো বুঝতে পারছি না। সুকেশের কি তাহলে মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে? এই সব ভেবে ওর দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, সরে পড়ব কিনা তাও ভাবলাম। এমন সময় সুকেশ আমার হাতটা ধরে ফেলল—আমার মনোভাব বুঝেই বোধহয় বলল, 'না হে না, পাগল-টাগল হই নি—তবে হবার মতন হয়েছিলাম বটে।' একটু আশ্বস্ত হয়ে বলি—'যাক, এখন ভাল আছ তো?' হো হো করে হেসে ওঠে সুকেশ, বলে—'আরে না, আমার মাথার ব্যায়রাম কিছু হয় নি, তবে হয়নি যে একেবারে এ কথাই বা বলি কি করে?'

একটু চুপ করে ও। ওর কথাবার্তায় আমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। সুকেশ কিন্তু এবার সহজ হয়ে পড়ে। বলে—'হেঁয়ালীর মতন মনে হচ্ছে, না? আচ্ছা শোন্ তবে সব—সবই তোকে বলব, বলে মনটা একটু হাল্কা করব।' একটু চুপ করে সুকেশ। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে—'আচ্ছা আগে দেখে নে। তাহলে অনেকটা বুঝতে পারবি।' দেখে নে—শুনে অবাক হয়ে ওর দিকে দেখি—হাঁ করে চেয়ে থাকি। তখন সুকেশ দেখাল। একটু এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ সে মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলল। আর···আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। বিস্ফারিত নয়নে, মুখব্যাদন করে সুকেশের মাথার দিকে চেয়ে রইলাম। তখন বিকেল, মনুমেন্টের পাশ থেকে পড়ন্ত সূর্য্যের আলোয় চক্ চক্ করছে চৌরঙ্গীর প্রশস্ত পীচ্ ঢালা রাজপথ, আর তারই আভা যেন ছড়িয়ে পড়ল সুকেশের চুলহীন শুভ্র, বিস্তৃত মস্তকে!—চমকে উঠলাম! একি! এযে বিরাট টাক! কোথায় গেল সুকেশের সেই সযত্ন বিন্যস্ত ঘন কুঞ্চিত কেশদাম?—অন্তরঙ্গরা যার করত মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা,
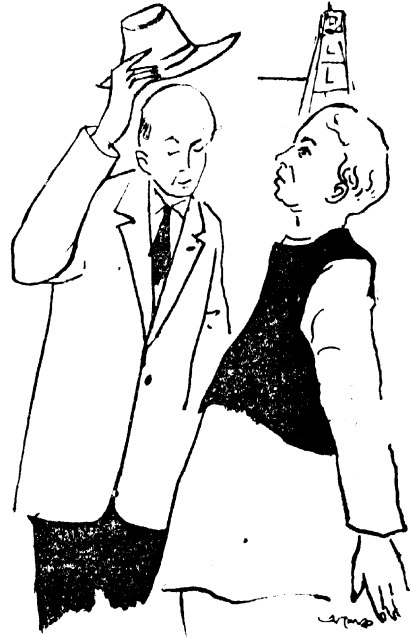
চক্ষু স্থির হয়ে গেল

আর অপরেরা করত অন্তরে অন্তরে হিংসা। কোথায় গেল সুকেশের সেই কেশ? সুকেশ যে আজ কেশহীন! ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলাম অবুঝের মতন। এবার সশব্দে অট্টহাসি হেসে উঠল সুকেশ। টুপিটা মাথায় লাগিয়ে বলল—'দেখলি তো? চল্, হাঁটা যাক।' মোড়টা পেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে ময়দানের দিকে চললাম দু'জনে নিঃশব্দে। কিছুটা এগিয়ে যখন জন-কোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ তখন মুখে ভাষা এল। 'কিন্তু, এমন হল কি করে? কোনও শক্ত অসুখ-টসুখ করেছিল নাকি?' মাথা নেড়ে সুকেশ বলল—'না হে না, ওসব কিছু নয়—এ হচ্ছে পরীক্ষার ফল?' আবার অবাক হলাম। 'কি এমন পরীক্ষা দিলে যে মাথার চুলগুলো সব উঠে গেল? এতো ভীষণ পরীক্ষা

হে!' আমার বিস্মিত মন্তব্য শুনে সুকেশ বলল—'পরীক্ষা কিছু দিইনি, পরীক্ষা করেছি।' 'পরীক্ষা করেছ!' আমার বিস্ময় কাটে না। অনুরোধ করি হেঁয়ালি ছেড়ে সরল ভাবে বলতে এমন কাণ্ড ঘটল কি করে। সুকেশ এবার সহজ হয়ে আসে। বলতে আরম্ভ করে তার কেশ সংহারের করুণ কাহিনী, তার মহাদুঃখের কথা—সে এক ইতিহাস।

'তোর তো মনে আছে কি রকম সুন্দর ছিল আমার চুল।' নিঃশ্বাস ফেলে বলে সুকেশ। ছোটবেলা থেকেই আমার চুলের পারিপাট্য ছিল খুব, তাই সবাই ঠাট্টা করে আমাকে 'সুকেশ' বলে ডাকত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সুকেশ নামটাই বহাল হয়ে গেল, আর ঠাকুর্দ্দাদত্ত সুরেশ নামটা হয়ে গেল বাতিল। ঠাকুর্দ্দাও আর পরলোক থেকে প্রতিবাদের সুযোগ পেলেন না। কলেজে ভর্ত্তি হবার সময় সুকেশ সেনই লিখলাম, তারপর থেকে ঐ নামেই পরিচিত হয়ে আসছি; কিন্তু সেই সুকেশ আজ হয়ে গেছে বি-কেশ, সব চুল তার আজ হয়েছে নিকেশ।'…একটু চুপ করে সুকেশ, আবার ছাড়ে একটা নিশ্বাস—'আমার নাম শুনে আর চুল

মেয়েরাও প্রশংসা করত

দেখে তোরা তো করতিসই, কলেজের মেয়েরাও প্রশংসা করত আমার চুলের। ভাল চুলে মাথা মেয়ে না পেলে বিয়ে করব না—এই রকম একটা প্রতিজ্ঞাও করে ফেলেছিলাম মনে মনে। আমার বিয়ের যখন চেষ্টা হয় তখন অনেক ভাল ও সুন্দরী মেয়েকে রিজেক্ট করেছিলাম শুধু চুল পছন্দ হয় নি বলে। আর আজ…?' সশব্দে বেরিয়ে এল দীর্ঘ-নিশ্বাস আর একটা, আমিও সায় দিলাম একটা—দীর্ঘ না হলেও—ছোট নিশ্বাস ছেড়ে। সুকেশ বলে চলে—'তারপর অফিসে জয়েন্ করে আমার চুলের পারিপাট্য আরও বেড়ে গেল। নানা রকম লোসন্, ক্রীম্ দিয়ে চুলকে আরও সুন্দর করে দেখাতে লাগলাম—টাইপিষ্ট, ষ্টেনোগ্রাফারদের সপ্রশংস দৃষ্টি যেন বিজয়ীর পুরস্কার বলে মনে হতে লাগল। সবাই আমার চুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। কিন্তু…।' আবার চুপ করল সুকেশ। আর একটা বড় নিঃশ্বাস বেরুবে মনে করে ওর নাকের দিকে চাইলাম। না, তা আর বেরুল না। তার বদলে ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে সেই বিষণ্ণ হাসি। 'তারপর', বলে চলে সুকেশ 'হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম আঁচড়াবার সময় ও স্নান করবার সময় চুল যেন বড্ড উঠছে। আগেও একটু আধটু উঠত কিন্তু এখন যেন বড্ড বেশী। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম মাথার বালিশের ওয়াড়ে অনেক চুল আটকে রয়েছে। মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল। অফিসে গিয়ে কারও সঙ্গে আর কথাবার্ত্তা বলতে ইচ্ছা করত না। শেষে এক বন্ধুর পীড়াপীড়িতে তাকে বললাম আমার মনকষ্টের কথা। সে তো শুনে হেসেই অস্থির। বলল, সে নাকি ভেবেছিল আমি বোধ হয় প্রেমে-ট্রেমে পড়েছি, তাই ভাবে বিভোর হয়ে আছি—কথাবার্ত্তা বলছি না যাই হোক, সে একটি বহু প্রচারিত দামী তেল মাখবার উপদেশ দিল। আমার আর তর সইল না। অফিস থেকে ফেরবার সময়ই এক শিশি ঐ তেল কিনে নিয়ে গেলাম, আর বাড়ী পৌছেই খনিকটা মেখে বসে রইলাম। তারপর থেকে দু'বেলা রোজ সেই তেল মাথায় মর্দ্দন সুরু করলাম। কিন্তু চুল আগের মতই উঠতে লাগল—বরঞ্চ বেশি। তবুও সেই তেল চালিয়ে গেলাম কয়েক শিশি। শেষে ধৈর্য্য হারা হয়ে এক কবিরাজকে ধরলাম এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী তাঁরই প্রস্তুত এক আয়ুর্বেদীয় তেল মাখতে লাগলাম। কিন্তু দিন দু'য়েক মাখবার পর আর মাথা তুলতে পারলাম না! মাথায় সর্দ্দি বসে শয্যাশায়ী হলাম! সর্দ্দির হাত

থেকে রক্ষা পেতে আয়ুর্বেদকে ছাড়লাম। তখন বাড়ীতে এবং সর্ব্বত্র আমার এই চুলের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। অনেক ঠাট্টা, সহানুভূতি, উপদেশ বর্ষিত হচ্ছে আমার ওপর। এর মধ্যে এক আত্মীয় পরামর্শ দিলেন মাথায় কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন ঘষতে। তাতে নাকি যেখানে যেখানে চুল উঠে গেছে সেখানে নতুন চুল গজাবে। তাই সই। তখন আমার যা অবস্থা কেউ মাথায় বিষ্ঠা মাখতে বললে তাই মাখতাম। প্রচণ্ড উৎসাহে মাথায় পেঁয়াজ, রসুন ঘষতে লাগলাম, আর গন্ধ যা হত মাথায় চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসত। মনে হত আম্‌জেদিয়া, আমিনিয়ার রন্ধনশালায় যেন সারাক্ষণ বসে আছি। বলব কি ভাই, সিনেমায় গেলে পাশের সিটের ভদ্রলোকেরা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বসে থাকত। একদিন এক ইঙ্গ-ভারতীয় ভদ্রমহিলার সিট্ পড়েছিল আমার পাশে। অনেকক্ষণ রুমাল-টুমাল নেড়ে, নাক মুখ চাপা দিয়ে শেষে হটাৎ উঠে গেলেন। হয়ত বমি-টমি করতে গেলেন ভাবলাম। কিন্তু তিনি আর ফিরলেন না—ছবিটা তাঁর

হঠাৎ উঠে গেলেন···

সবটা দেখাই হল না। আমি কিন্তু অচল-অটল। ঘষে চললুম পেঁয়াজ, রসুন প্রাণপণে। কিন্তু নতুন চুল তো উঠল না, পুরান চুলই খানিকটা উঠে গেল! আত্মীয়টি দেখে শুনে রায় দিলেন আমি নাকি ভুল করেছি যা তা পেঁয়াজ মেখে। এক বিশেষ ধরণের পেঁয়াজই নাকি মাখতে হয়। যাই হোক, তিনি আবার আমাকে সেই পেঁয়াজ মাখতে বললেন। আমার কিন্তু তখন পেঁয়াজে যেন 'অ্যালারজি' হয়েছে। পেঁয়াজের গন্ধ তো দূরের কথা পেঁয়াজের নামেতেই গা গুলিয়ে ওঠে। রান্না থেকে পর্য্যন্ত পেঁয়াজ বাদ গেছে—তখন আমার রান্না হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পেঁয়াজ বাদ দিয়ে। সুতরাং পেঁয়াজ পর্ব ঐখানেই শেষ হল।

এবার এল সরষের তেল। বেশ ঝাঁঝালো। ঘষতে লাগলাম মহা উৎসাহে। কিন্তু কিছুদিন পরেই মাথায় ধরল জ্বালা, আর ফুস্‌কুড়ির মতন কি সব বেরুল মাথাময়! যিনি সরষের তেলের গুণগান করেছিলেন তাঁকে গিয়ে ধরলাম। দেখেশুনে তিনি মত দিলেন যে, তেলে ভেজাল মেশান আছে—আজকাল নাকি লঙ্কা-টঙ্কা কি সব মেশাচ্ছে, খাঁটি তেল পাওয়া দুষ্কর, ও না মাখাই ভাল। যাক্, তেলের বোতল তো রান্নাঘরে ট্রান্সফার্ড হল, কিন্তু মাথার জ্বালা কমতে বেশ কিছুদিন গেল।' 'তাহলে এখানেই ক্ষান্ত দিলে?'—প্রশ্ন করি আমি। 'মোটেই না, অত সহজে ছাড়বার পাত্র আমি নই'—বলল সুকেশ। 'একদিন জোলাপ খেয়ে মর মর হয়েছিলামও তবু কেশ চর্চ্চা ছাড়ি নি।' আশ্চর্য্য হতেই হল—না হয়ে উপায় কি? বলি—'জোলাপ! তা জোলাপই বা খেতে গেলে কেন, আর খেয়ে মর মরই বা হলে কেন? চুলের শোকে কি জোলাপ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গেছিলে? কিন্তু জোলাপ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা, —অভিনব তাতে সন্দেহ নেই।' একটু হেসে সুকেশ বলে— 'আরে শোন আগে তারপর মতামত দিও। আত্মহত্যা আমি করতে যাইনি। সে ইচ্ছে থাকলে তো মনুমেন্টের ওপর থেকে বা নতুন সেক্রেটারিয়েটের ছাদ থেকে এই টেকো মাথাটাকে নীচুর দিকে করে ডাইভ্ করতাম। আর লিখে রেখে যেতাম আমার মৃত্যুর জন্য আর কেহ দায়ী নয়, শুধু দায়ী এই টাক! এটাও খুব অভিনব হত, খবরের কাগজে নাম বেরুত, তোরাও পড়তিস। কিন্তু সে ইচ্ছে আমার ছিল না। আসলে হয়েছিল কি, কে নাকি বলেছিল পেটের গোল-মালে চুল ওঠে, পেট পরিষ্কার রাখলে চুল ওঠা বন্ধ হয়। তাই শুনে পেট পরিষ্কার রাখবার জন্য জোলাপ ব্যবহার

করছিলাম, কিন্তু চুল ওঠা বন্ধ না হওয়ায় একদিন রাত্রে রেগেমেগে খুব বেশি করে জোলাপ খেয়ে দিলাম। জোলাপটা ছিল কড়া, আর খেয়েছিলামও অনেকটা, তাই পরদিন সকাল থেকেই আরম্ভ হল প্রচণ্ড বেগ। বিকালের দিকে একবারে কাৎ, উত্থানশক্তি রহিত। বাড়ীর সবাই ভয় পেয়ে গেল। তারা জানত না যে আমি চুল ওঠা বন্ধ করতে গাদা খানেক জোলাপ খেয়ে বসে আছি। ডাক্তার এলেন। আমি তখন মুহ্যমান, গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। হঠাৎ কানে গেল 'স্যালাইন্' কথাটা।
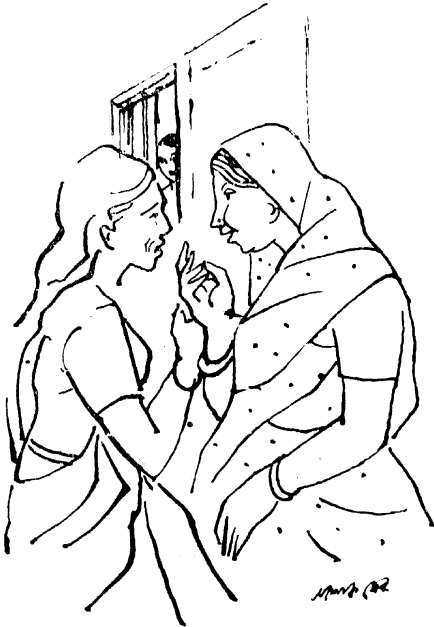
রায়গিন্নী বলছেন…

আর থাকতে পারলাম না, কোনও রকমে চিঁ চিঁ করে বললাম আমি জোলাপ খেয়েছি—এ কলেরা নয়। ডাক্তার চোখ বড় বড় করে জিগ্যেস করলেন কতটা খেয়েছি? ইঙ্গিতে দেখালাম। দেখে তাঁর চোখ আরও বড় হল। কেন এতটা খেয়েছি তার উত্তরে বলতে হল চুল ওঠা বন্ধ হচ্ছিল না বলে! এবার ডাক্তারবাবুর চোখের তারা স্থির হয়ে গেল। অনিমেষ নয়নে আমার মাথার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দিয়ে উঠে গেলেন। পরে শুনেছিলাম বলে গেছলেন আমি সুস্থ হলেই যেন আমার মাথাটা একবার পরীক্ষা করান হয়। চুলের জন্য নয়—মাথার গণ্ডগোল কিছু হয়েছে কি না তাই দেখবার জন্য। অবশ্য মাথা আর পরীক্ষা করতে হয়নি। কিন্তু বাড়ীর সবাই ভুলেও আর চুল সম্বন্ধে আমার সামনে কোনও কথা বলত না পাছে আমি কি শুনে কি করে বসি এই ভয়ে।' হাফ্ ছেড়ে বলি—'যাক্ খুব বেঁচে গেছ। আর কিছু করনি তো এর পর?' 'এর পরও আছে হে'—হেসে বলে সুকেশ। 'কিছুদিন পর হটাৎ একদিন শুনলাম পাশের ঘরে মার সঙ্গে মার বান্ধবী রায়গিন্নীর কথা হচ্ছে। চুলের কথা কানে যেতেই আমার সজাগ মন সক্রিয় হয়ে উঠল। শুনলাম রায়গিন্নী বলছেন—তোমার ছেলেটার কি চুল ছিল আর কি হল ভাই, দেখলে কান্না আসে। তা ওকে কাঁচা ডিমের কুসুম মাখতে বল না। এতে নাকি অনেকে সুফল পেয়েছে। মা উত্তরে বললেন যে, ওকে আর কিছু বলে দরকার নেই ভাই। শুনলেই আবার ঝঞ্ঝাট বাড়াবে। চুলেরভাবনায় না ছেলেটার মাথা খারাপ হয়েযায়! মার শেষ কথা কানে যাবার আগেই কিন্তু আমার মনস্থির হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ বাজারে গিয়ে এক ডজন ডিম কিনে এনে চুপি চুপি ঘরে রেখে দিলাম। রাত্রে শোবার আগে দুটো ডিম ভেঙ্গে বেশ করে মাথায় মেখে নিলাম। সকালে উঠেই আবারএকটা। বাড়ীর লোকে কিন্তু দেখি আর কেউ কাছে ঘেষে না গন্ধের চোটে। মা অবাক হয়ে বললেন—আমি তো তোকে কিছু জানায়নি! কিন্তু আমি শুনেছি যে, সুতরাং মেখেছিও। অফিস যেতে আর সাহস হল না সেদিন। সারাদিন বাড়ী বসে সেই উৎকট গন্ধ সহ্য করলাম। রাত্রে আবার একটা মাখবার পর বমি করে ফেল্লাম। সকালে উঠে আর দেরী করলাম না—বাকি ডিম কটাকে ওম্‌লেট্ বানিয়ে সবাই মিলে খেয়ে দিলাম। ডিম পর্ব এইখানেই শেষ হল। এইবার একটা উপদেশ দেবার লোভ হয় আমার, বলি—'সবাইতো সবকিছু বলেছে, কিন্তু মাথাটা কামিয়ে দেখেছ, একবারও?' একটি সবজান্তা গোছের হাসি ফুটে ওঠে সুকেশের ঠোঁটের কোণে, বলে—'সেটা কি আর বাদ দিয়েছিরে ভাই, তাও করেছি দিন সাতেক ধরে।'—'দিন সাতেক ধরে মানে?'—আমার বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে সুকেশ বলে—'নেড়া হব ঠিক করে অফিস থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে একদিন একটা

নাপিত ডেকে এনে বেশ করে তাকে দিয়ে মাথার ওপর খুর চালালাম। ঠিক করলাম উপরি উপরি কয়েকদিন মাথায় খুর দিলে চুলের গোড়াগুলো শক্ত হবে। তাই নাপিতটাকে ডেকে তারপর দিনও মাথা চাঁচলাম—তারপর দিনও আসতে বললাম; কিন্তু কি জানি কি কারণে, বোধ হয় আমার মাথার গণ্ডগোল আছে মনে করেই সে আর এল না। আমি কিন্তু দমে যাবার পাত্র নয়—নিজেই মাথা কামাতে লাগলাম।'—'নিজেই নিজের মাথা কামাতে!' বিস্ময় বিমূঢ় ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকি। দর্প ভরে সুকেশ বলে,—'হ্যাঁ, তাই করেছি। দাড়ি কামাবার সময় মাথায় সাবান মাখিয়ে সেফ্‌টি রেজর দিয়ে মাথাটাও কামাতাম—মানে সেল্‌ফ-হেল্‌ফ আর কি। বাড়ীতে সবাই হাসাহাসি নিশ্বাস ফেলে চুপ করল সুকেশ। আমিও হাঁফ ছাড়লাম। 'তারপর'-বলে চলে সুকেশ—বিজ্ঞাপন দেখে আর লোকমুখে শুনে এক নাগাড়ে তেল ইত্যাদি মেখে গেছি। সবাই উৎসাহ দিয়েছে এইবার বন্ধ হবে, নতুন চুল উঠবে ইত্যাদি বলে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁদের কথা সত্য হয়েছে—চুল উঠেছে, তবে নতুন নয়, পুরানগুলাই সব উঠে গেছে। আর সে ওঠাও বন্ধ হয়েছে—ওঠবার কিছু আর বাকি নেই বলে।' এবার একটা বিরাট শ্বাস ছেড়ে চুপ করল সুকেশ। জিগ্যেস করি—'সব তেলই তাহলে ট্রাই করে দেখেছ?' 'হাঁ, প্রায় সবই—শুধু কেরোসিন তেল আর মাছের তেলটা বাদ দিয়েছি, কেউ ব্যবস্থা দেয়নি বলে।' চুপ করে থাকি সব শুনে। কি সান্ত্বনা দেব তাই ভাবি। বলি—'এত চেষ্টা, এত অর্থব্যয়, কিছুই ফল হল
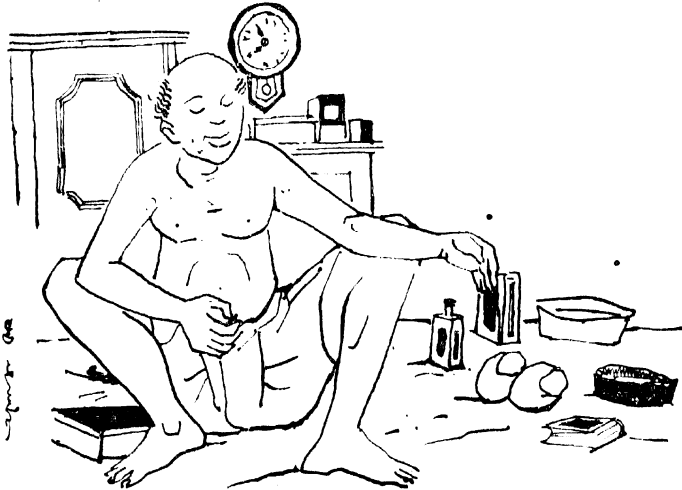
এক নাগাড়ে মেখে গেছি…

করলেও আমি ঠিক চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেফ্‌টি রেজরে হলেও এধার ওধার সারা মাথা ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করে কামানতে মাথা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, আর তেল তো দূরের কথা জল লাগলেও প্রচণ্ড জ্বালা করতে লাগল। জ্বালা সত্ত্বেও কয়েকদিন খুর চালিয়েছিলাম, কিন্তু শেষে সেপ্‌টিক্ মতন হয়ে যাওয়ায় কামান বন্ধ করে ডাক্তারের শরন নিতে হল ও য়্যান্টিসেপ্‌টিক্ মলম ব্যবহার করে ও পেনিসিলিন্ ইন্‌জেক্‌শন্ নিয়ে ঘা সারাতে হল। তারপর থেকে আর মাথা কামানর কথা ভাবি নি।' না? আশ্চর্য্য!' হেসে বলে সুকেশ—'চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে যদি টাক পড়া বন্ধ করা যেত বা টাকে চুল গজান যেত তাহলে কি আর রাজা-রাজড়াদের মাথায় টাক পড়ে? না ফিল্ম-ষ্টারদের চুল পাতলা হয়? ওসব কিছু নয় ভাই আসলে হচ্ছে বরাত। কপালে যদি লেখা থাকে তোমার কপালের বাড় বাড়ন্ত হবে অর্থাৎ বাড়তে বাড়তে বিরাট হয়ে পড়বে বা ব্রহ্মতালু ব্রহ্মাণ্ডের মতন ফাঁকা হতে হতে টাকে পরিণত হবে, তাহলে কোনও তেলের বা ওষুধেরই সাধ্য নেই তাকে রোধ করে।' বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বলি—'তা ঠিক।'

হঠাৎ সুকেশ বলে ওঠে—'হ্যাঁ, ফল কিছু পেয়েছি বৈকি—তেলের গুণ অবশ্যই কিছু আছে।' শুনে একটু হকচকিয়ে গেলাম। 'বল কি, তাহলে এরকম হল কি করে? একটু ফল পেলে তো কিছুটাও থাকত, একেবারে মাঠ হয়ে যেত না নিশ্চয়ই।' আমার কথা শুনে সুকেশ বলল—'কি ফল যে পেয়েছি তা তোমাকে দেখাতে পারি যদি বাড়ী যাও।' আবার অবাক হই—"বাড়ী যেতে হবে কেন?' সুকেশ বলে—'বাড়ী না গেলে জামা খুলব কি করে? এখানে

লোমে হাত বুলিয়ে শোক ভুলি…

তো আর জামা খুলতে পারি না।' আরও আশ্চর্য্য হলাম—'জামা খুলতে হবে কেন? বুঝতে পারছি না।' এ কথার উত্তরে সুকেশ বলল—'ভাই সে দুঃখের কথা আর কি বলব। গোদের ওপর বিষফোড়া বলে একটা কথা আছে না, এ হয়েছে তাই। কোন তেল থেকে কি করে কি হয়েছ বলতে পারি না, কিন্তু জামা খুললে দেখবে আমার সমস্ত গায়ে বুকে, পিঠে হাতে, পায়ে বড় বড় লোম গজিয়েছে—একেবারে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। তেল মাখা হাত গায়ে লেগেই বোধ হয় এই অনর্থ ঘটিয়েছে; কারণ মাথায় কষে তেল মাখবার পর সেই হাত অনেক সময় গায়েও অন্যমনস্ক ভাবে ঘষে দিয়েছি, আর তাতেই বোধ হয় এই বিপত্তি ঘটেছে। লোমের জ্বালায় একবার গা কামিয়েছিলামও; কিন্তু কামান লোম একটু বড় হতেই এমন গা কুটকুট করতে আরম্ভ করল যে অস্থির হয়ে উঠলাম। গায়ে গেঞ্জী বা জামা পরতে পারতাম না কুটকুটুনির চোটে। সেই থেকে আর গা কামাবার কথা মনেও আনি না। এখন মাঝে মাঝে একটু একটু লোমগুলা ছেটে দিই শুধু। তবে খালি গায়ে বড় একটা থাকি না—খুব গরমের সময়ও না। তাই বিয়ে করবার কথাও আর ভাবি না। বৌ হয়ত আঁতকে উঠবে টাকের আর লোমের বহর দেখে—ডিভোর্স ই করে দেবে বনমানুষ বলে! এখন আর টাকের বা লোমের কথাও ভাবি না—ভাবনার সব শেষ হয়ে গেছে। এখন মাঝে মাঝে নির্জন ঘরে বসে লোমে হাত বুলিয়ে টাকের শোক ভোলবার চেষ্টা করি শুধু। তুমি জানতে না তাই বললাম এই ইতিহাস—সুকেশের বি-কেশ হওয়ার কাহিনী!' বিষণ্ণ হেসে চুপ করল সুকেশ।

* * *

এরপর কেটে গেছে বেশ কিছুদিন। বাইরে যেতে হয়েছিল আবার। ফিরে এসে আর সুকেশের কোনও খোঁজ নিতে পারি নি। কিন্তু দেখা হয়ে গেল হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে। ডালহাউসী স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে আছি বাসে উঠব বলে। কিন্তু ভিড়ের জন্য উঠতে পারছি

ফিসফিস্ করে বলল…

না। হঠাৎ নজর পড়ল একটা বাসের জানলায়। চমকে উঠলাম। সুকেশ না? চোখ রগড়ে আবার দেখলাম—হাঁ, সুকেশই তো বটে। কিন্তু মাথায় টুপি তো নেই, তার বদলে—সত্যই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পার'ছি না—সুকেশের মাথা ভর্ত্তি চুল! হাঁ করে সেদিকে চেয়ে রইলাম। চকিতে মনে হল তাহলে এতদিনে সুকেশ আবিষ্কার করেছে সেই জিনিষের যাতে করে টাকে চুল গজায়! আর ধৈর্য্য ধরতে পারলাম না। জানতেই হবে ব্যাপারটা। (আমারও যে চুল উঠতে আরম্ভ করেছে!) আর অপেক্ষা করতে পারলাম না, ঝাঁপিয়ে পড়লাম জন-সমুদ্রে। তারপর মরিয়ার মতন লড়াই করতে করতে কোনও রকমে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় বাসে গিয়ে উঠলাম। বসবার জায়গা অবশ্যই পেলাম না, সুকেশের কাছেও যেতে পারলাম না। যাই হোক, বাস চলতে লাগল আমিও দোদুল্যমান অবস্থায় অপেক্ষা করে রইলাম সুকেশের নামবার সময় তাকে ধরব বলে। ভবাণীপুরে যখন সুকেশের বাড়ীর কাছে বাস এসে গেল তখন সুকেশ উঠে এল এবং আমাকে দেখতে পেল। পাশ দিয়ে যাবার সময় ভিড়ের মাঝেই মাথাটা সাবধানে হাত দিয়ে আড়াল করে একটু দাঁড়াল। আমি সপ্রশ্ন ও প্রশংসামান দৃষ্টিতে তার মাথার দিকে চাইতেই সেই বিষণ্ণ হাসিতে ভরে গেল তার মুখ। আমার কাণের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে শুধু বলল—'নিজের নয়।'

আল্পনা—
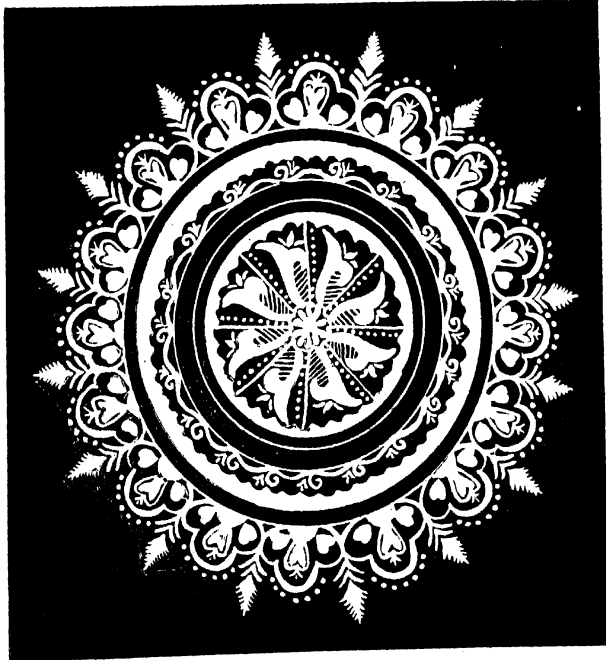
শিল্পী : ইন্দিরা বিশ্বাস

পূজার কাপড়—

শ্রীশ্রীমহাপূজার ২ মাস পূর্ব হইতে কলিকাতার বাজারে কাপড় দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। হাওড়া ষ্টেশনের গুদামে ও কাপড়ের কলসমূহে প্রচুর কাপড় জমা হইয়া আছে—তথায় গুদাম ভাড়া বৃদ্ধি পাইবে জানিয়াও বস্ত্রব্যবসায়ীরা সে কাপড় গ্রহণ করে নাই। শুধু তাঁতের ভাল কাপড়ের দাম বাড়ে নাই নিত্য-ব্যবহার্য্য মিলের সাধারণ কাপড়ের দামও বাড়িয়া ক্রয়ের প্রায় বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেও আসলে প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। মুনাফা-লোভী ব্যবসায়ীর দল এখন অল্প লাভে সন্তুষ্ট হয় না—খুব বেশী লাভ করিতে না পারিলে তাঁহাদের সন্তোষ নাই। তাহার ফলে সাধারণ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত নাই। ইহাই পূজার বাজারের অবস্থা। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় ধনী অধিকতর ধনী হইতেছে, আর দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হইয়া অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছে। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট মুখে সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলে বটে, কিন্তু আসলে ধনিকতন্ত্রকেই সমর্থন করিয়া চলিয়াছে। সারা ভারতবর্ষে মানুষের মন দিন দিন তিক্ত হইয়া উঠিতেছে—ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলের কথা কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন না। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ১৪ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—এখনও এই অবস্থা—কে ইহার জন্য দায়ী এবং কেই বা ইহার পরিবর্ত্তন সাধন করিবে?

বাংলায় অন্য প্রদেশের কাপড়—

পূজার বাজারে কলিকাতার দোকানগুলি বাংলার বাহির হইতে আমদানী করা ধুতি ও শাড়ীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাংলার তাঁতের কাপড় চমকদার নহে, তাহার দামও বেশী। মাদ্রাজ হইতে কোটি কোটি টাকার ধুতি, শাড়ী, জামার কাপড়, ছিট প্রভৃতি কলিকাতার বাজারে আমদানী হইতেছে এবং বাঙ্গালী বিনা বিচারে তাহা ক্রয় করিতেছে। শুধু সুতীবস্ত্রের কথা নহে, বাংলার রেশম-শিল্পের অবস্থাও ঐ একই প্রকার। রেশম কাপড়ের দোকানে বাংলার রেশমের চাহিদা কম, অন্য প্রদেশের রেশমী কাপড় জামা প্রভৃতি দামে ও সস্তা—দেখিতেও ভাল—কাজেই লোক সাগ্রহে তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। এই ত কলিকাতার কাপড়ের বাজারের অবস্থা। বাজারে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী অপেক্ষা অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সংখ্যা অধিক—তাহাদের এ বিষয়টি ভাবিবার প্রয়োজন নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগ এ বিষয়ে কিছু করেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁতশিল্পের কর্ত্তারা শুধু আইন দেখাইয়া কর্ত্তব্য শেষ করেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে মানবিকতা চলিয়া গিয়াছে—কাজেই কে এ বিষয়ে চিন্তা করিবে?

মৎস্য সমস্যা—

গত ১৪ মাস ধরিয়া কলিকাতা তথা পশ্চিম বাংলার বাজারে মৎস্য সমস্যা প্রত্যেক বাঙ্গালী পরিবারকেই বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে। কয়েক দিন হরতাল বয়কট প্রভৃতি চলিয়া বাজার গরম রাখিয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের তরুণ মৎস্য-মন্ত্রী শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ এ বিষয়ে বহু বিবৃতি দিয়া আশ্বাস দিয়াছেন—কিন্তু তাহার কোন ফল আজও দেখা যায় নাই। যে দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে দরে শুধু পচা মাছ পাওয়া যায়—ভাল মাছ পাইতে গেলে অধিক দাম দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। পশ্চিমবঙ্গে অধিক মৎস্য উৎপাদন চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, জাহাজে করিয়া সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া আনার পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করে নাই—চেষ্টা করিয়াও অন্ধ্র, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি স্থান হইতে অধিক পরিমাণে মাছ আমদানী করা যাইতেছে না—সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান হইতেও আর মাছ আসিতেছে না। বাঙ্গালী মাছ ছাড়া ভাত খাইতে পারে না—ইহাই

তাহার অপরাধ। কবে এ সমস্যার সমাধান হইবে কে জানে? পূজার সময় ৪ দিন বাঙ্গালী মাছ-ভাত খাইতেও পাইবে না—অন্য আনন্দের কথা না হয় নাই ধরিলাম। ইহাই আমাদের নিয়তি।

তরিতরকারি উধাও—

এবার এখন পর্য্যন্ত কোথাও ভাল বর্ষা হয় নাই। কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও বন্যা—এইরূপ অসাধারণ অবস্থা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নহে, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, পূর্ব পাকিস্তান—সর্বত্রই চলিয়াছে। ফলে তরিতরকারীর বাজারে আগুন লাগিয়াছে। যে আলু মাঘ-ফাল্গুন মাসে ৬ টাকা মণ দরে পাওয়া যায়, তাহা এবার ৩০ টাকা মণ হইয়াছে। এ বিষয়ে সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি সর্বত্র দেখা দিয়াছে। অধিক খাদ্য-উৎপাদনের জন্য শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষকে সে বিভাগের ভার দিয়া মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইলেও সরকারী লালফিতার দৌলতে তাঁহার কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতেছে না। আলুর সের ৭৫ নয়া পয়সা হওয়ায় বেগুন, পটোল, ঢেঁড়শ, উচ্ছে প্রভৃতি সকল তরকারীর সের এক টাকায় উঠিয়াছে। কি ধনী, কি দরিদ্র, বাজারে যাইয়া সকলের একই অবস্থা—২ টাকার বাজেট ৫ টাকা করিয়াও কূল কিনারা পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে ডাল ও মসলা প্রভৃতির কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। সরিষার তৈল বাঙ্গালী পরিবারের অপরিহার্য্য জিনিষ—তাহার সের তিন টাকা—কারণ আর কিছু নহে, বাজার মুনাফাখোরেরা দখল করিয়া বসিয়া আছে, কোন মন্ত্রীর পক্ষে সে ব্যূহ ভেদ করার শক্তি নাই। অখাদ্য দালদার দামও বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারী ব্যবস্থায় ঘি-দুধের দাম না বাড়িলেও তাহা এমনই দুর্মূল্য যে সাধারণ মানুষ ঘি দুধের কথা চিন্তা করা ছাড়িয়া দিয়াছে। শুধু চায়ের জন্য দুধ—তাও আবার গুঁড়া দুধে কাজ সারা হয়। ঘৃত বলিয়া যে পদার্থ ছিল—তাহা এখন বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ওজন বদলের ফলে ডালের দামও সহসা বাড়িয়া গিয়াছে—ইহার কারণ কেহ জানে না—অনুসন্ধানও করে না। বাঙ্গালী মসলা ছাড়া কিছু রাঁধিতে বা খাইতে পারে না—সেই মসলার দামও দিন দিন বাড়িতেছিল—এখন ক্রমে নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল। শুকনা লঙ্কার সের ৪ টাকা, কাঁচা লঙ্কা দেড় টাকা সের। ১৪ বৎসরেও বাঙ্গালী সুপারি সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই—সের ৬ টাকা বা তাহারও বেশী। বাজারে কোন জিনিষ সুলভ নহে—টাকা নাকি সুলভ—তাই সমস্ত জিনিষের দাম বাড়ে—কিন্তু কই সে জন্য ত খাদ্যের পরিমাণ বা উৎকর্ষতা কেহ বাড়াইতে পারে নাই। এই সব সমস্যা—গৃহস্থের নিত্যকার সমস্যা—সরকার যদি এই সব সমস্যার সমাধান করিতে না পারে, তবে মানুষের মৃত্যুবরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।

রাজনীতিক সমস্যা—

চীন অন্যায়ভাবে ভারতবর্ষের উত্তরাংশের কয়েক হাজার মাইল দখল করিয়া বসিয়া আছে, নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতির মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে ও সর্বদা সর্বত্র গুপ্তচর পাঠাইয়া ভারত সরকারের বহু পরিকল্পনা ধ্বংস করিয়া দিতেছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা প্রায়ই ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুধু সম্পত্তি চুরি করে না, বহু জমী জোর করিয়া দখল করিয়া লইতেছে। পাকিস্তান-ভারত-সীমান্তে ভারতের পক্ষ হইতে কোন উন্নয়ন কার্য্য করিতে গেলে পাকিস্তানীরা তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। পাকিস্তান ভারতের প্রাপ্য অর্থ দেয় না, অধিকন্তু হুমকি দেখাইয়া বহু সুখ সুবিধা গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধের ভয়ে চীন বা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না। এই কারণে ভারতের সীমান্তবাসীরা দীর্ঘকাল ধরিয়া ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইয়া থাকে। এ দিকে আজ পর্য্যন্ত ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শেষ হয় নাই। ভারতবাসী মুসলমানগণ কারণে-অকারণে ভারতের মধ্যে থাকিয়াও পাকিস্তান-প্রীতি প্রকাশ করেন এবং সুবিধা হইলে ও ছোট বড় নানা জাতীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইয়া দিয়া চীৎকার করেন—ভারতে মুসলমানের বাস অসম্ভব হইয়াছে। ভারত যত অধিক সহনশীলতার পরিচয় দেয়, ভারতীয় মুসলমানগণ ততই অধিক পরিমাণে তাহাদের দাবী দাওয়া উপস্থিত করিয়া গণ্ডগোল বাধাইয়া থাকে। আবার ভারতে মুসলেম-লীগ আন্দোলন মাথা তুলিয়াছে এবং ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে—যে সকল কেন্দ্রে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক সেই সকল কেন্দ্রে

মুসলমান-প্রাধান্যকে জয়ী করার জন্য এখন হইতে বিরাট চেষ্টা চলিতেছে। ঐ সকল মুসলমান যে জাতীয়তাবাদী নহে, সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। গত বারের (১৯৫৭) নির্বাচনের পর দেখা গিয়াছে—ঐ সকল মুসলমান নির্বাচিত হইয়া দেশের স্বার্থ অপেক্ষা সম্প্রদায়ের স্বার্থ অধিক পরিমাণে বজায় রাখিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এ সমস্যাও আজ ভারতের একটি বড় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। আসাম রাজ্যকে পাকিস্তানের অন্তর্গত করিবার জন্য তথায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বাড়াইবার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহা এখন সর্বজনস্বীকৃত। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু কঠোরতার সহিত এই সকল জাতীয়তা-বিরোধী আন্দোলন দমন না করিলে ইহার ফলে যে কি হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। চীন-সমস্যা সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা ছাড়া উপায় নাই।

নীলরতন সরকার শতবার্ষিক—

ডাক্তার সার নীলরতন সরকার ১৮৬১ সালে ২৪ পরগণা জেলার একটি গণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার অসাধারণ কর্মশক্তি দ্বারা সারা ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও দেশসেবক রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন—গত ১লা অক্টোবর হইতে দেশের সর্বত্র তাঁহার জন্মশতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বেই দেশবাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য কলিকাতা ক্যাম্বেল কলেজটির নাম পরিবর্তন করিয়া নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ নামকরণ করিয়াছেন। তিনি শুধু চিকিৎসা দ্বারা অর্থার্জন করেন নাই—সেই অর্থে বহু নূতন শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে বিশেষ সাহার্য্য করিয়াছিলেন। তাহার উপর তিনি পরাধীন ভারতের মুক্তি কামনায় অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া কংগ্রেসকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার জীবন কথা সাধারণে অধিক প্রচারিত হইলে তাহা পাঠ করিয়া দেশবাসী সেই আদর্শে অনুপ্রেরণা লাভ করিবে। আমরা তাঁহার জন্মশতবার্ষিক উৎসবে তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং প্রার্থনা করি, তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিয়া তাঁহার দেশবাসী নবজীবন লাভ করুক।

মেঘনাদ বধ কাব্য

[মেঘনাদবধ কাব্যের শতবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে]

শ্রীসুধীর গুপ্ত

রক্ষোরাজ অভ্র-শীর্ষ অশ্বত্থের মত
'মেঘনাদবধ কাব্যে' পেয়েছে মূরতি ;
মর্ম্মের মর্ম্মরে তা'র প্রাক্তনের প্রতি
উদ্ধত আক্রোশ শুধু হয়েছে উদ্যত।
বারম্বার কর্ম্ম-চক্রে হ'য়ে বজ্রাহত
দুঃখ-বহ্নি-দগ্ধ তরু তবু ক্ষয়-ক্ষতি
মানে নাই ;—কালান্তকে করে নাই নতি ;
ভোলে নাই জ্বালা-জীর্ণ মমত্বেরও ব্রত।
শাখা-উপশাখা তা'র শ্যামল পল্লব
দ্রুত অবলুপ্তি পেলো বজ্র-গর্ভ ঝড়ে ;—
বীরবাহু-মেঘনাদ-প্রমীলা-বিভব—
সর্ব্ব-রিক্ত স্বর্ণ-লঙ্কা শ্মশানের 'পরে

জীবন্ত রাবণ-বধ কাব্য-কলরব
শাশ্বত শ্রীমধু-মন্ত্র আহা, হা-হা করে।

সিঁদেল চোরের কাহিনী

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

শহরে রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার বাড়ী আছে। কিন্তু তাদের একটি বাড়ীতে এক রাত্রে চুরি হয়ে গেলো। আমরা ভেবেই পাই না যে এতো বাড়ী থাকতে চোরেরা মাত্র এই বাড়ীটা বেছে নিতে পারলো কি করে? এই থেকে বেশ বুঝা যাবে যে এরা আগে ভাগেই খবরাখবর সব নিয়েই পরিবার বিশেষের উপর দয়া করেছেন। এই সর্ব্বনেশে চুরির কয়েকদিন আগে যদি আপনি লক্ষ্য করে থাকেন তো এই-বার আপনার মনে পড়বে যে ছুতায় নাতায় আজে বাজে কয়েক ব্যক্তিকে আপনার বাড়ীর আশেপাশে ঘুরাঘুরি করতে আপনি দেখেছেন। এদের কাউকে কাউকে যেচে আপনাদের বাড়ীর চাকোর বাকোরদের সেধে আলাপ করতেও দেখে থাকবেন। এমন কি ওরা আপনাদের অজ্ঞাতে আপনার বাড়ীটার পোষা কুকুরটার সঙ্গে পর্য্যন্ত হয়তো আলাপ করে নিয়েছে। এ'ছাড়া যদি আপনার বাড়ীতে কোনও নূতন ঝি এসে থাকলে হয়তো সেই ঝি তার নিজের ভাত বেশী করে বাড়ী নিয়ে গিয়ে খেয়েছে। আপনার বাড়ীর মেয়েরা হয়তো মুচকী হেসে ভেবেছেন যে বোধ হয় তার নিজের খাওয়ার ভাতের সঙ্গে নিজের বাড়ীর মানুষকে খাওয়াবার জন্যও বেশী করে ভাত নিয়ে গেলো। একবার আপনাদের কারুরও মনে হয়নি যে এইভাবে কেউ না কেউ আপনাদের বাড়ীর ভিতরকার সুলুক সন্ধান চুরির উদ্দেশ্যে সন্ধান করছে। এ ছাড়া আপনি এর মধ্যে কোনও উটকো মিস্ত্রি ডেকে নিয়ে বাড়ীতে কাজ করিয়েও থাকবেন। কিন্তু তার আনচান ভাবও তার এধার ওধারে অহেতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ আপনি বোধ হয় দেখেও দেখেননি। এইবার হয়তো আপনি বলবেন এই যে, তা না হয় বুঝলাম মশাই; এরা রীতিমত খবর সংগ্রহ করেই এ বাড়ীতে হানা দিয়েছে। এমন কি হয়তো একেবারে ঘরের ভিতর ঢুকে খবর নেবার জন্যে চোর তার রাখিত স্ত্রীকে বাসনওয়ালীর বেশে এখানে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আমরা যে এতগুলো মানুষ ছেলেপুলে নিয়ে এই বাড়ীর প্রতিটি ঘরে ঠেসাঠেসী করে শুয়ে রইলাম, তা সত্ত্বেও এতোগুলো বিজ্ঞ মানুষের নজর এড়িয়ে এরা বাক্স প্যাঁটরা ভেঙে তছনছ করে টাকা গহনা নিয়ে উধাও হয়ে গেল কি করে? আমি এই প্রবন্ধে আপনাদের সেই সব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চাই।

পৃথিবীর মনীষীরা তাদের স্ব স্ব দেশের সামরিক বাহিনীর জন্য তাদের অমূল্য সময় মেধার যথেষ্ট অপব্যয় করেছেন, কিন্তু তার শতাংশের একাংশও তাদের স্ব স্ব দেশের পুলিশ বা রক্ষীদের জন্য ব্যয় করেন নি। অবশ্য তাদের দেশে চোর ডাকাতদের জন্যও তারা কোনও বৈজ্ঞা-নিক আবিষ্কার করেননি। কিন্তু এজন্য আমাদের দেশের অপরাধীরা নিশ্চেষ্ট হয়ে একেবারেই বসে নেই। তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যতটুকু দরকার ততটুকু জ্ঞান বিজ্ঞান নিজেদের জন্য ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করে নিয়েছে। অথচ এরা দেশের মুর্খ ও নিরক্ষর শ্রেণীর সর্বনিম্ন স্তরের লোক। এই বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা তারা সভ্য মানুষের অজ্ঞাতেই সৃষ্টি করে চলেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সিঁদেল চোরদের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধেই বলবো—

এই সিঁদেল চোরদের দলে সাধারণতঃ পাঁচ বা ছয়জন লোক যুক্ত থাকে এবং এরা সকলেই মাত্র একজন 'পাকা সেয়ানা' নেতার কর্ত্তৃত্বাধীনে কাজ করে। এদের এমনই নিয়মতান্ত্রিক জ্ঞান যে এরা এদের এই নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। তাদের নেতার আদেশ এরা যথা-যথ ভাবে পালন করলে এদের কারুর হদিশ পাওয়া বড় শক্ত। এ ছাড়া এরা দৈবকে বিশ্বাস করলেও দৈবর উপর নির্ভরশীল নয়। শতাংশের একাংশ ভাগও এরা কখনও দৈবর উপর ছেড়ে দেয়নি। এইজন্য কুকর্ম্মের আগে এরা একাধিক সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে। একজন দক্ষ শিকারীর সঙ্গে হিংস্রজন্তু ও মৎস্যাদির যা সম্পর্ক, এদের সঙ্গে গৃহস্থ মানুষের সেই একই রূপ সম্পর্ক। এজন্য ধরা

পড়লে এরা দুঃখিত হলেও কাউর উপর রাগ করেনি। এইবার এদের স্বঅর্জ্জিত বিজ্ঞান সম্মত কার্য্যকরণ সম্বন্ধে বিবৃত করা যাক। এরা চর মারফৎ প্রয়োজনীয় সংবাদাদি সংগ্রহ করার পর প্রথম চুরির জন্য একটা উপযুক্ত সময় নির্ণয় করে। স্বভাবের জন্য আমি দিবা চোরদের বিষয় বাদ দিয়ে শুধু রাত্র চোরদের কথাই বলছি। এই রাত্রের ঠিক কোন সময়টা চুরির প্রকৃষ্ট সময় তা এদের প্রথমে ঠিক করে নিতে হয়। এরা জানে শীতের রাত্রের প্রথম রাত্রে এবং গ্রীষ্মের রাত্রের শেষ রাত্রে মানুষ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর তারা রাত্রে এসে নির্দ্ধারিত বাড়ীর আশে পাশে লুকিয়ে থেকে লক্ষ্য করে যে সাধারণতঃ এই বাড়ীর কক্ষগুলির আলো কোন সময় ঠিক নিবিয়ে দেওয়া হয়, এইসব বিবিধ বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তারা ঠিক করে নেয় সাধারণতঃ এই বাড়ীর মানুষগুলো রাতের কোন সময় ঘুমিয়ে পড়ে। এই ভাবে চুরির স্থান ও সময় নির্ব্বাচন করতে তাদের বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এইটুকু করেই তারা আদপেই নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। এরপর তারা নির্দ্দিষ্ট বাড়ীটির সম্পর্কে একটা মানসিক জরিপ বা সার্ভে করে নিয়ে থাকে। ধরুন আজ রাত্রে আপনার বাড়ীতে একটা সাংঘাতিক চুরি হয়ে গেল। কিন্তু এর সাতদিন পূর্ব্বেই এদের একজন এই বাড়ীটিতে এসে এই মানসিক জরীপের কাজটি সেরে গিয়েছে। এইরকম চুরির প্রায় সাতদিন আগে এরা বাড়ীর প্রাঙ্গণের এক পাঁচিলের উপর বসে রাত্রির অন্ধকারে পকেট থেকে কতকগুলো ছোট ছোট পাথরের বা ইঁটের টুকরো একটি একটি করে বাড়ীর ভিতরের দিকে ছুঁড়তে থাকে। এই সব পাথর বা ইঁটের টুকরো বাড়ীর উঠানে রাখা বাসনের উপর, গ্যারেজের টিনের ছাদে বা জানালার কপাটের উপর টুক টুক করে ফেলে শব্দ করতে থাকে। এই শব্দের মাত্রা ধীরে ধীরে তারা বাড়িয়ে দিতেও থাকে। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে যেন তেন প্রকারেণ বাড়ীর লোকেদের বিরক্তি উৎপাদন করা। এই সব আজে-বাজে কাজ যে তারা বিনা কারণে করে তা মনে করবার কোনও কারণ নেই। এতদ্বারা তারা বাড়ীর লোকেদের মেজাজ, তাদের সংখ্যা, তাদের ঘুম কিরূপ, তারা সজাগ থাকে কিনা, কত দূর পর্য্যন্ত শব্দ তারা অগ্রাহ্য করে বা তা তারা আদপেই করে না। বাড়ীতে ছোট শিশু বা কুকুর আছে কিনা, তা তারা প্রথমেই জেনে নিয়ে থাকে। এই ভাবে বহু পূর্ব্বেই বাড়ীর লোকেদের 'মেজাজী জরীপ বা মেণ্টাল সার্ভে করা সেরে নিয়ে তবে তারা নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্ধারিত বাড়ীটিতে সদলে উপস্থিত হবে। এদের দলের অধিকাংশ লোকেই কিন্তু বাড়ীর আশে পাশে বা পাঁচিলের উপর পাহারায় নিযুক্ত থেকেছে। বাহির থেকে বিপদের আশঙ্কা থাকলে এরা শিস দিয়ে বা সঙ্কেত করে এদের যে ব্যক্তি ভিতরে ঢুকেছে তাকে সাবধান করে দেয়। এদের এমন অনেক দল আছে একটা লম্বা সুতা ও তৎসংলগ্ন একটি বঁড়শীর সহযোগে এই সঙ্কেতের আদান-প্রদান করেছে। এদের যে ব্যক্তি বাড়ীর ভিতর ঢোকে সে এই বঁড়শীটা তার কোমরের কাপড়ে আটকে রেখে অগ্রসর হতে থাকে। ওদিকে যারা বাইরে আছে তারা এই সুতার অপর মুখটা ধরে চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এরা কোনও বিপদ বুঝে এই সুতায় টান মারা মাত্র ভিতরের লোকটি ত্বরিত গতিতে বাইরে এসে দলের অপরাপর লোকেদের সঙ্গে এধার-ওধারে পালিয়ে যায়। কিন্তু সিঁদেল চোরদের পাকাপোক্ত পেশাদারী সেয়ানারা তাদের হাতের পায়ের কায়দার উপরই অধিকতর নির্ভরশীল। এই ধরণের দলের অধিকাংশ লোকই বাইরে পাহারারত থাকে। এদের নেতা বা সর্ব্বাপেক্ষা সেয়ানা যে লোক মাত্র সেই নির্ধারিত বাড়ীর মধ্যে ঢোকে। এই দক্ষ চোর-প্রবর বাড়ীর মধ্যে প্রাঙ্গণে বা আলিন্দয় বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতেই এদের কোনও দল আলিন্দয়, কোনও দল প্রাঙ্গণে, কোনও দল দ্বারদেশে এই বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে। এই বিষ্ঠা তত্ত্ব একটি বিশেষ শাস্ত্র। রক্ষীকুল এই শাস্ত্রটি অপরাধ নির্ণয়ের জন্য বিশেষরূপে অনুধাবন করে থাকেন। অপরাধীদের যারা অপরাধের পর চলে যাবার সময় বিষ্ঠা পরিত্যাগ করে যায়, তারা তা কুসংস্কারের জন্যই করে থাকে। কিন্তু এদের মধ্যে যারা অপরাধের পূর্ব্বে মাত্র বাড়ীতে ঢুকেই সেখানে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে তারা বিশেষ একটি বৈজ্ঞানিক কারণেই করে থাকে। এই রকম এক দুঃসাহসীক কাযে হাত দিলে মানুষ মাত্রেরই একটু না একটু ভয় ভয় [নারর্ভাসনেস] করেই। আমরা জানি যে আয়ুর্বিদ রোগিদের জোলাপ দিলে বিষ্ঠা ত্যাগের পর তাদের

মনের ভয় ভয় ভাব চলে যায়। এরাও এই একই কারণে বিষ্ঠা ত্যাগের পর এদের যা কিছু ভয়-ডরের শেষ ফলটুকু থেকেও এরা মুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে এরা আদিম মানুষ বা জন্তু-জানোয়ারের মত ভয় ডর শূন্য ভাবে কাজ করতে পারে। ঠিক সময় বিষ্ঠা. না ত্যাগ করতে পারলে এদের অনেকে বাড়ী ঢুকেও চুরি না করে চলে গিয়েছে। এর পর এরা অন্ধকার ঘরে ঢুকে এদের ট্যাঁক হতে এক মুঠো সাদা ও এক মুঠো কালো গ্লোবিউল বার করে। এইগুলো হোমিওপ্যাথি গ্লোবিউলের ন্যায় ছোট ছোট গোল দানা হয়ে থাকে। পল্লী অঞ্চলে এরা এই একই উদ্দেশ্যে সাদা আতপ-চাউল ও আলকাতারা মাথানো কালো চাউল ব্যবহার করেছে। ওদের কেউ এ জন্য কালো ও সাদা মোটর দানাও ব্যবহার করেছে। এই শ্রেণীর চোররা অন্ধকারে ঘরে ঢুকে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে প্রথমে এক মুঠো কালো গ্লোবিউল ছড়িয়ে দিয়ে স্থিরভাবে তার পতনের শব্দ শুনে। এই সব মোটর দানার মত কালো কালো গ্লোবিউলের কোনটি বাসন-কোসন, কোনটী মেঝেতে, কোনটি বাক্সে, কোনটি থাটে পড়ে বিভিন্ন প্রকারের অতি সূক্ষ্ম শব্দের সৃষ্টি করে। এই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শব্দ সাধারণ মানুষ শুনতে না পেলেও এরা অভ্যাসের কারণে তা তো শুনতে পাই-ই—এমনি কি এদের বিভিন্ন দ্রব্যের উপর পতন জনিত বিভিন্ন প্রকার [সাধারণের অগোচরে] শব্দের পারস্পরিক প্রভেদও এরা বুঝতে পারে। এই থেকে এরা দ্রব্যাদি অন্ধকারে ভালো করে না দেখে সহজেই বুঝে নেয় যে এখানে কোথায় বাসন-কোশন, কোথায় বাক্সো তোরঙ্গ ও থাট আলমারি ইত্যাদি আছে। এর পর এরা এক মুঠো সাদা গ্লোবিউল ঘরের চারিদিকে উঁচু করে ছড়িয়ে দেয়। গভীর অন্ধকারেও এই সাদা দানাগুলো আলমারী, তোরঙ্গ, বিছানা প্রভৃতির উপরে পড়লেও সাদা রঙের জন্য উহাদের সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই সব সাদা দানা দেখে এরা ঘরের মধ্যে রাখা জিনিষ-পত্রের উচ্চতা ঠিক করে নিতে পারে। এই ভাবে তারা প্রথমে সারা ঘরটা ও উহার মধ্যের দ্রব্যাদি একটা চক্ষুর দ্বারা জরীপ করে নেয়। কিন্তু এতো করার পরও তাদের এই প্রস্তুতির শেষ হয়েছে বলে তারা মনে করে না। এরা ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব রসায়ন শাস্ত্রেরও কিছু উন্নতি সাধন করেছে। এরা কোকেন, ক্যাম্ফার [কর্পূর] অহিফেন ও দেশীয় গাছ-গাছড়ার রস দিয়ে একটা মশলা তৈরি করতে পেরেছে। এই সব মশলা দিয়ে এরা এক প্রকার বিড়ীও তৈরী করে নিয়েছে। এই বিড়ীর বিশেষত্ব এই যে ইহা হতে ধূম নির্গত হলেও উহা হতে আগুন বেরোয় না। এই থেকে আগুন বেরুলে অন্ধকারে তা দেখা যেতো। এই জন্য এই বিড়ীতে এইটেই বড়ো সুবিধে। এথন এই ধোঁয়া নাকে গেলে ঘুম নাকি অস্বাভাবিক রূপে গাঢ় হয়ে যায়। অন্ততঃ এই কথা এই ধরণের অপরাধীরা জিজ্ঞাসিত হলে এইরূপ বলে থাকে। সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে বায়বীয় বিষের অপ্রত্যক্ষ প্রয়োগ কথনও কার্য্যকরী হয় না।

কিন্তু আমি বিশেষ ধরণের যন্ত্রের মধ্যে সাদা ইঁদুর রেখে পরীক্ষা করে দেখেছি যে বায়বীয় বিষের অপ্রত্যক্ষ প্রয়োগ মানুষকে অচৈতন্য না করলেও তাদের গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত করে দিতে পারে। এই সকল অপরাধীরা এইবার ঘরের মধ্যকার নিদ্রিত মানুষগুলোর নিকট উবু হয়ে বসে সাবধানে এই বিড়ি ফুঁকে ধোঁয়া নির্গত করে থাকে। এই ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লে তার আঘ্রাণ ঘুমন্ত অবস্থায় গ্রহণ করে তারা গভীরতম ও দীর্ঘস্থায়ী নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু এইখানে এই সব অপরাধীরা তাদের সকল সাবধানতার শেষ হয়েছে ব'লে মনে করে নি। এদের কেউ কেউ শুধু নিদ্রিতা ভদ্রমহিলার গাত্র হতে স্বর্ণালঙ্কার খুলে নিতে পাকাপোক্ত। এরা সাধারণতঃ কুমারী মেয়েদের গা' অলঙ্কার খুলবার জন্যে কথনও স্পর্শ করে না। এর কারণ স্বরূপ এরা বলে যে প্রথমতঃ কুমারীদের গায়ে অলঙ্কার থাকে যৎসামান্য—উহা কথনও খুব বিশেষ লাভদায়ক হয় নি। এর দ্বিতীয় কারণ স্বরূপ এরা বলে যে বাহিরের স্পর্শে অনভ্যস্ত এই সব কুমারীরা এতই স্পর্শকাতর যে তাদের গায়ে সামান্য স্পর্শ লাগামাত্র তারা তিড়িঙ করে লাফিয়ে উঠেছে, কিন্তু বিবাহিত নারীদের সম্বন্ধে এই সব কথা বলা চলে না। এদের ঘুমন্ত অবস্থায় অবচেতন মন মনে করে যে ও বুঝি তাদের স্বামীরই হাত। এ ছাড়া বিবাহিত মেয়েদের গায়ে প্রচুর দামী অলঙ্কারও থাকে। এইজন্য এরা প্রথমে সিঁদুর দেখে—সিঁদুরের অভাবে শরীরের ঢপ্ দেখে এরা বুঝে নেয় যে শিকারের জন্য মহিলাটি বিবাহিতা কি

না? কিন্তু এখানেও তারা আরও বহুপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে। এরা প্রথমেই মহিলাদের গলায় বা ওখানকার স্বর্ণহারে হাত দেয় না। প্রথমে এরা ঐ হার হতে দূরে ঘাড়ের এখানে ওখানে আলতভাবে স্পর্শ করে। ঘুমের ঘোরে এদের অবচেতন মন মনে করে ওটা বুঝি তাদের স্বামীর হাত। এইভাবে তারা তাদের স্পর্শ সহিয়ে সহিয়ে তারপর এদের গহনাটী খুলে নেয়। এদেশের মেয়েরা অলঙ্কার অতিশয় ভালবাসে। এদের কারুর যদি চারিটী সন্তান থাকে তাহলে এদের একটির বদলেও অলঙ্কারটি ধরে রাখতে সচেষ্ট হয়। এইজন্য বিপথগামী স্বামীরাও চেষ্টা করে ঘুমন্ত স্ত্রীর গাত্র হতে কখনও অলঙ্কার তাদের অগোচরে খুলে নিতে সক্ষম হননি। এরূপ চেষ্টা করে তাদের স্বামীরাও তাদের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছেন। অথচ বাহিরের একজন নিরক্ষর চোর অনায়াসে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের দেহ হতে অলঙ্কার অপহরণ করতে পেরেছে। এর একমাত্র কারণ এঁদের স্বামীরা এইরূপ বিজ্ঞানোচিত ভাবে সাবধানতা অবলম্বন করেননি। এ'ছাড়া এঁরা কুকুর কুকুরীদেরও এক অদ্ভুত মনস্তাত্বিক উপায়ে নিঃস্তব্ধ করে দিয়ে থাকে। সকল সময়েই যে এরা ভাব করে বা কুকুরীর সাহায্যে বা এদের মাংসের টুকরো দিয়ে শুব্ধ করেছে তা নয়। আমরা জানি যে মানুষের স্মৃতিশক্তি দৃষ্টি ও শ্রুতির উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল। কিন্তু কুকুরগণ-দৃষ্টি ও শ্রবণ অপেক্ষা তাদের ঘ্রাণ শক্তির উপরই অধিক নির্ভরশীল। এরা প্রধানতঃ ঘ্রাণের সাহায্যেই মানুষ হতে পশুর এবং এক মানুষ হতে অপর মানুষের প্রভেদ বুঝে নেয়। এরা না নড়লে দূরের জীবকে জীব বলে প্রায়ই বুঝতে পারে নি। এইজন্য এই সকল অপরাধীরা উগ্র গন্ধ মেখে কুকুরের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এই উগ্র স্থূল গন্ধেতে চাপা পড়ে মানুষের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গন্ধ এদের নিকট প্রকট হয়ে উঠতে পারেনি। এই অবস্থায় তাদের নড়তে দেখে কুকুর ডেকে উঠেছে বটে; কিন্তু তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া মাত্র কুকুর চুপ করে গিয়েছে। এই অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক গন্ধ চাপা পড়ে যাওয়ায় এরা মানুষকে মানুষ বলে বুঝতে পারেনি। এইভাবে ধীরে ধীরে থেমে থেমে এরা কুকুরদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করতে পেরেছে।

এই প্রবন্ধ থেকে এও বুঝা যাবে যে, যে সাবধানতা চোরেরা চুরি করার জন্য গ্রহণ করে থাকে, তার শতাংশের একাংশ সাবধানতাও গৃহস্থ তারা ধন রক্ষার জন্য অবলম্বন করেনি। এ জন্য তাকে যদি চোখের জলে মূল্য দিতে হয় তার জন্য চোরের বদলে গৃহস্থকেই আমি দায়ী মনে করি।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

উত্তমকুমার প্রযোজিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগতপ্রায় "সপ্তপদী" চিত্রের একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও ছবি বিশ্বাস
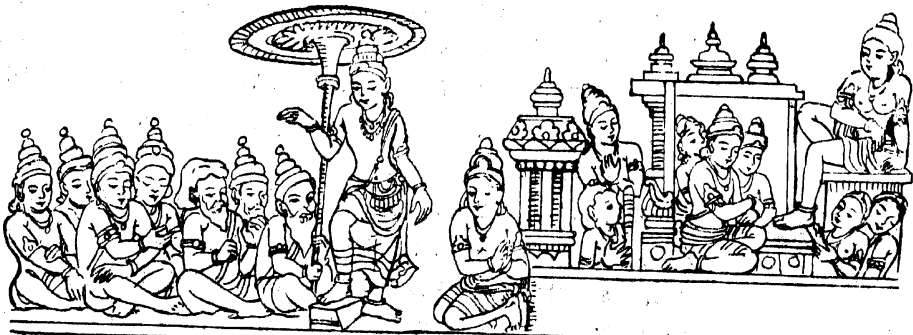
॥ সিনেমা, সমাজ ও সাহিত্য ॥

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের এই অগ্রসরমান অত্যাধুনিক সমাজের জনমানসে চলচ্চিত্র যে আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতাপে বিরাজমান তা অনস্বীকার্য্য। সিনেমার প্রভাবকে, তার প্রবল আকর্ষণকে সভ্য মানুষ আজ আর উপেক্ষা করতে পারে না। জনমনে চলচ্চিত্রের প্রভাব ও আকর্ষণ যে অপরিসীম তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই—এ সত্য স্বীকার করতেই হবে। আর একথাও ঠিক সিনেমার প্রভাব যেমন রয়েছে জনগণের ওপর তার দায়িত্ব ও রয়েছে তেমনি জনমনকে ঠিক পথে পরিচালিত করবার। তার সে দায়িত্ব সে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু যদি এর উল্টাটি হয়—যদি সে অপারগ হয় এই দায়িত্ব পালনে, যদি সে ধরে উল্টো পথ—তাহলেই আসবে বিপদ ঘনিয়ে, সমাজের কাঠামোয় ধরবে ঘুন, ভেঙ্গে পড়বে ন্যায় ও নীতি, বেড়ে যাবে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার। ভেতরে ভেতরে আলগা হয়ে পড়বে সব বাঁধন, সমাজ ব্যবস্থা পড়বে ভেঙ্গে, মানুষের মন হবে নিম্নমুখী। আজকাল, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই দেখা যাচ্ছে শুধু আমাদের দেশেই নয় সারা পৃথিবীতেই একটা যেন বাঁধন না মানার, নিয়ম না মানার একটা উশৃঙ্খল হাওয়া যেন বইছে। পনের কুড়ি বছর আগে যা চিন্তার বাইরে ছিল আজ তা বাস্তবে দেখা যাচ্ছে। মানুষ আজ গ্রহান্তরে যাবার সুদূর কল্পনাকে প্রায় সার্থক করে তুলেছে। বিজ্ঞান আজ নব নব আবিষ্কারে সমৃদ্ধ। কিন্তু মানুষের মন আজ কলুষিত। কেন? এর উত্তর দেওয়া খুবই শক্ত। তবে বিধ্বংসী মহাযুদ্ধের পরোক্ষ ফল যদি একে বলা হয় তাহলে ভুল বলা হবে না নিশ্চয়। ভ্রান্ত রাজনীতির প্রভাবও পড়েছে সমাজ জীবনের সর্বস্তরে। আর সিনেমার প্রভাবও যে কিছুই নেই একথাও বলা চলে না। তাছাড়া আছে সাহিত্য ও তার প্রভাব মানুষের মানসিক গঠনে। সিনেমার সঙ্গে সাহিত্যও বিশেষ করে গল্প-সাহিত্য আবার জড়িত হয়ে আছে। সিনেমাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয়, কিন্তু সাহিত্যকে বাদ দিয়ে সিনেমা হয় না। সুতরাং
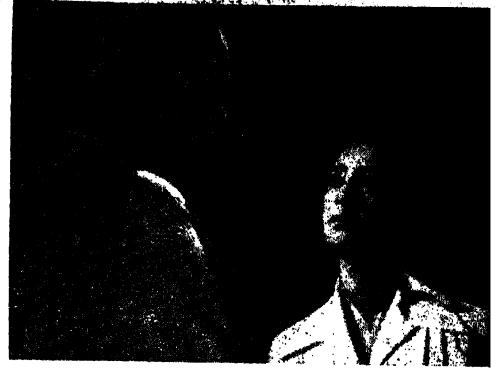
"সপ্তপদী" চিত্রের পাশ্চাত্য নৃত্যের আসরে নায়িকা: সুচিত্রা সেন

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বিভূতিভূষণের 'আহ্বান' চিত্রে সন্ধ্যা রায় ও প্রেমাংশু বসু

সিনেমার সঙ্গে সাহিত্যের প্রভাবও পড়ছে জনমানসে।

সাহিত্য ছাড়া অর্থাৎ গল্প-সাহিত্য ছাড়া সিনেমা বা চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে না। গল্পের ওপরই নির্ভর করতে হবে সিনেমাকে, আর সেই গল্প যদি সিনেমার উপযোগী হয় তবে চলচ্চিত্রটিও সাফল্য লাভ করবার সম্ভাবনা আছে, আর গল্পটি যদি সমাজের পক্ষে জন-সাধারণের পক্ষে উপযোগীই শুধু নয় উপকারীও হয় তাহলে তা সফলই শুধু হবে না—কল্যাণকরও হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি এদেশে কি বিদেশে সিনেমার গল্প সব সময় সমাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্ব্বাচিত হয় না। অনেক সময় এমন সব গল্প সিনেমার মাধ্যমে পরিবেশিত হয় যা দর্শকদের পক্ষে কল্যাণকর তো নয়ই উল্টে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। যৌন আবেদনপূর্ণ, খুন-জখম-রাহাজানির দৃশ্যপূর্ণ ভ্রান্ত রাজনীতির বুলিসম্বলিত নীতি ও শালীনতাবিহীন চিত্র সকল দর্শক মনকে উন্নত তো করেই না—করে কলুষিত। বিশেষ করে কিশোর ও যুবকদের পক্ষে এই ধরণের চিত্র বিশেষ ক্ষতিকর। তাদের অনুকরণশীল মন ঐ সবেরেই অনু-করণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তারা ভুলে যায় তাদের নৈতিক আদর্শ, তাদের সমাজ, তাদের পরিবেশ। এই ভাবেই বিষ ছড়িয়ে পড়ে সমাজের স্তরে স্তরে। অবশ্য এ কথা বলছি না যে সিনেমার সব গল্পই হবে নীতিশাস্ত্রে ঠাসা, নৈতিক আদর্শে পূর্ণ। তা অবশ্যই হওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে সিনেমার প্রাণ নষ্ট হয়ে যাবে। চলচ্চিত্র প্রগতিশীল শিল্প, সাহিত্যও তাই। এই দু'টি শিল্পই করে চলেছে পরীক্ষা, নিরীক্ষা। সুতরাং শুধু নীতি ও পুরাণ আদর্শ আঁকড়ে থাকলে এদের গতি হবে ব্যাহত, যুগের সঙ্গে পারবে না তাল রাখতে, আদর্শ থেকে হবে চ্যুত। তবে প্রগতির নামে যা ইচ্ছা তাই করাও উচিত নয়—একটি সীমা থাকা চাই, তা কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কি সিনেমার ক্ষেত্রে। পরীক্ষা হক, প্রগতি আসুক, কিন্তু আদর্শ থেকে যেন আমরা চ্যুত না হই—ভ্রষ্ট যেন না হই নৈতিক দিক থেকে। বাংলার সাহিত্য প্রগতিশীল, রবীন্দ্রকাব্যে পুষ্ট বাংলার সাহিত্য ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—বিশ্ব-সাহিত্যেও তার স্থান উচ্চে; সুতরাং বাংলার চলচ্চিত্র যে আন্তর্জ্জাতিক সম্মানে ভূষিত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য পরিচালকের ও প্রযোজকের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য্য। আর বাংলার পরি-চালক, প্রযোজকেরাও বিশ্ব-সম্মানের উপযুক্ত যে তাতে সন্দেহ নেই। তবে সস্তা প্রশংসার মোহে আদর্শ চ্যুত যেন তাঁরা কখনও না হন এই আমাদের অনুরোধ। আর গল্প লেখকরাও যেন সিনেমার গল্প লিখতে গিয়ে নীতিভ্রষ্ট না হন এই আমাদের কামনা। বাংলার সিনেমা ও সাহিত্য যদি নৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয় তাহলে বাংলার সিনেমা-শিল্প সমাজের ও সাধারণের যথেষ্ট উপকার যে করবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

ব্রিটিশ চিত্র "No, My Darling Daughter"-এর নায়ক-নায়িকা Juliet Mills ও Rad Fulton.

সিনেমায় অভিনয়

রবীন সরকার

অভিনয় না শিখেও অভিনয় করতে পারা যায়!

তা বলে অভিনয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ না পড়ে যে অন্ধ থাকতে হবে তা আমি বলি না। যাঁরা অভিনেতা হতে চান তাঁদের সব রকম প্রবন্ধ, কাব্য, ইতিহাস, প্রাচীন কালের নির্দ্দেশ জেনে রাখা ভাল বলে মনে করি। জেনে রাখতে দোষ কি? হয়তঃ মনে একদিন প্রেরণা এনে দেবে। আমার এমেরিকা, ইংলণ্ড, ও ভারতবর্ষের শিক্ষা-ধারার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কিছু এখানে জানাছি। যদি মনে ধরে—তবে ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করবেন।

সিনেমার অভিনয় করতে হবে—ডাক পড়লো আমার এজেন্টের কাছ থেকে। আমি সুযোগ ছাড়লাম না। আয় থেকে মাত্র দশ পারসেণ্ট দক্ষিনা দিতে হবে এজেন্টকে। নর্দ্দিষ্ট দিনে হামার ফিল্মের প্রোডিউ মিঃ এণ্টনী হাইণ্ড ও সুপরিচিত পরিচালক মিঃ টেরী ফিসার আমাদের দেখা শোনা করলেন এবং আমাকে "ষ্ট্রেঙ্গলাস' অফ বোম্বে" চিত্রের প্রথম ঠগের অংশে মনোনীত করলেনও হাতে একটি স্ক্রীপ্ট দিয়ে দিলেন পড়বার জন্য। দৈনিক ১৩০৲ টাকা দেবেন আমার অভিনয়ের জন্য। অভিনয় শিক্ষা কৌশল জেনে রেখেছিলাম বলেই অসুবিধা কিছু হল না।

চরিত্রে রূপ দান করা একটু কঠিন ব্যাপার। যে কোন নতুন অভিনেতা এসেই রূপদান করতে পারে না। যার মনে প্রাণে কোন অনুভূতি নেই সে কি ভাবে চরিত্রের ভাব ব্যাখ্যা করে দেখাবে?

ভাব ব্যাখ্যা করা অবশ্যই যায়। প্রত্যেকের ব্যাখ্যা প্রণালী বিভিন্ন। সকলে এক ভাবে কথা বলে না, সকলে একই কথা ভাবে না, সকলে একই ঢংয়ে চলে না—ইত্যাদি। আমরা যা ভাবি তা আবার সব সময় রূপায়িতও করতে পারি না।

অভিনয়ের চরিত্রে রূপদান করতে হলে চিত্র-নাট্য বা 'স্ক্রীপ্ট'খানি বার বার অনুভব দ্বারা পাঠ করতে হবে। যত পাঠ করা হবে ততই নাট্যকারের মনের কথা বুঝতে পারবো। আবার যত মনের কথা বুঝতে

হলিউডের রূপসী তারকা Vera Miles

পারবো ততই নাট্যকারের মনের ভাব দর্শকদের বুঝিয়ে দিতে পারবো—দোভাষীর মত। সেই জন্য অভিনেতাদের বলা যেতে পারে দোভাষী। তারা নাট্যকারের মনের কথা ব্যাখ্যা করবে ও বুঝিয়ে দেবে। এর জন্য যে যত ভাল করে নাটক পাঠ করে সে ততই চরিত্রের মাধুর্যতা মনে ফুটিয়ে নিতে পারে। মনের ভিতর ভাব এলেই ভাব ফুটিয়ে দেখাতে বিশেষ দেরী হয় না।

যখন আমি 'স্ক্রীপ্টখানি পেলাম তখন বার বার পড়ে দেখলাম। ভাবতে লাগলাম কি ভাবে কি করলে আমি আমার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে দেখাতে পারবো। আমায় তখন কয়েকটি বই দেখে নিতে হল। মনো বিজ্ঞান আমার জানা আছে। ১৬ বছর স্কুলে মাষ্টারী করেছি। মনো বিজ্ঞানে আছে মনের খেলার জ্ঞান। তাই কি ভাবে চরিত্রে রূপদান করবো তা ঠিক করে নিলাম ভেবে চিন্তে।

ভাববার সময় ভাবলাম যে চরিত্রের শারীরিক আকার কি হতে পারে। বুঝে দেখলাম যে চরিত্রটি একটি যুবক ঠগী। তখন সে কি ভাবে চলতো—বা দাঁড়াতো, কি ভাবে কথা বলতো—হাব ভাব বা অঙ্গভঙ্গী কি ভাবে করতো—ইত্যাদি বিষয়ের একটি পরিষ্কার ছবি মনের মাঝে ফুটিয়ে নিলাম, যে ভাবে অঙ্কন শিল্পীরা মণের ছবিকে রং তুলি দিয়ে রূপায়িত করতে বদ্ধ পরিকর হয়।

স্পষ্ট ধারণা মনের ভিতর এসে যায় যখন তখন আর বিশেষ কিছু ভাবতে হয় না। নিজের থেকেই চরিত্রানুরূপ ভাব বার হয়ে আসে। এর জন্য কেবল চাই সঠিক অনুভূতি। যে সব বড় বড় ফিল্ম অভিনেতাদের দেখা যায় তারা সঠিক অনুভূতি ছাড়া অভিনয় করতে পারেন না।

তাই আমার অংশটী কি ভাবে অভিনয় করতে হবে তা চোখ বুজে ভেবে দেখলাম। একটা স্পষ্ট ধারণা এসে গেল মনের ভিতর। যে ধারণা একবার মনে স্পষ্ট জেগে ওঠে—তা যদি ঠিক মত ফুটিয়ে তোলা যায় তবে অভিনয় করা সার্থক হয় বলবো।

তবে পরিচালকের কাছে অভিনেতারা কিছুই নয়!

অভিনেতারা মনে করে যে তারা অভিনয় সুন্দর করতে 'পারে। তা তারা ভাবুক—ক্ষতি নেই। কিন্তু ক্যামেরার সামনে তারা বুঝতে পারে না যে তাদের অভিনয় কেমন হচ্ছে। রঙ্গমঞ্চে শ্রোতাদের মুখের

খ্যাতনামা মার্কিন অভিনেতা Tab Hunter

ভাব দেখে বোঝা যায় যে অভিনয় মানানসই হচ্ছে কিনা—কিন্তু ক্যামেরার সামনে সেটা বোঝবার সম্ভবনা নেই। সেখানে পরিচালকই একমাত্র দর্শক প্রতিনিধি হয়ে উপস্থিত থাকেন। পরিচালক যদি সত্যিই অভিনয় বোঝেন তবে লেখবার উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন এবং অভিনেতাদেরও ভুল ধরিয়ে আসল ভাব বার করে নেবেন।

অভিনয় করা মানে মনের মাঝে যে ছবি ফুটে উঠেছে তাকেই প্রকাশ করা। এখন ভাল করে নাটক না পড়লে মনে লেখকের ভাব আসতে পারে না। তাই আগেই বলেছি যে যত পাঠ করা যাবে ততই লেখকের ভাব মনে ফুটে উঠবে। পাঠ করতে করতে চরিত্রের ভিতর এমনভাবে মনকে নিয়ে যেতে হবে যেন মনে হবে সকলকে জীবন্ত রূপে সামনে দেখছেন। তবে কেবল দেখলেই হবে না, তাদের আদেশ মত অভিনয়ও করতে হবে, অর্থাৎ মনের অভিজ্ঞতা থেকেই চলতে হবে, তবেই অভিনয় প্রাণবন্ত হবে বলে আশা করা যায়।

এখন এই মনের ছবি অনুযায়ী অভিনয় করলেই সব সময় যে সঠিক অভিনয় হবে—তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মনের মাঝে ভুল ছবিও ভুল ভাব ফুটে উঠতে পারে। তাই পরিচালক সেই সব ঠিক করে দিয়ে অভিনেতাকে যশের শিখরে তুলে দিয়ে নিজেও ধন্য হন।

অভিনয় চার প্রকার। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে ভাব ব্যাখ্যা করাকে বলে আঙ্গিক অভিনয়। বাক্যের দ্বারা ভাব ফুটিয়ে দেখানোকে বলে বাচিক অভিনয়। সাজ সজ্জার দ্বারা যে ভাব আসে তা আহার্য্য।

আর সাত্ত্বিক অভিনয় তাকে বলে যখন মন ভাবের ভিতর ডুবে যায় সম্পূর্ণ ভাবে।

নাট্য রসাশ্রয়, আর নৃত্য ভাবাশ্রয়। রসাশ্রয় ভাব ছাড়া হয় না। ভাব তখন আসে যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনের দ্বারা হৃদয়গত ভাবের অভিব্যক্তি হয়।

এখন ছায়াচিত্রে যে সব অভিনয় দেখে থাকি সেই সব অভিনয় পর পর এক সঙ্গে হয় না। পৃথক পৃথক ভাবে অভিনয় অংশ আগে তোলা হয়—পরে সম্পাদনার দ্বারা সেই সব একসঙ্গে দেখানো হয়। তাতে ভাব ঠিকমত ফুটিয়ে তোলা যে কত কষ্টকর তা বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। প্রথমে যে ভাব নিয়ে অভিনয় করে চলেছি—হঠাৎ পরিচালক খুশী না হয়ে বলে উঠল—কাট্। সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতাদের মনে যে ভাব জেগে উঠেছিল তাতে বাধা পেল। অভিনয় বন্ধ হল। আবার ভাব বুঝিয়ে দেওয়া হল—তখন আবার অভিনয় করতে হল। ভাল হলে অভিনেতা নিস্তার পেল—না হলে আবার খাটতে হল।

সিনেমার অভিনয় করা একটু কঠিন। নির্দ্দিষ্ট জায়গার মধ্যে অভিনয় করতে হয়। কেন না একটু সরে গেলেই ক্যামেরা ছবি তুলতে পারবে না—আলো ঠিকমত এসে পড়বে না—মাইক ঠিকমত কথা ধরতে পারবে না। সেইজন্য সিনেমায় অভিনয় অতটা সহজ নয়।

এখানে সব কৌশল জানাবার সুযোগ নেই। হয়ত পরে কৌশল গুলি জানাতে পারবো। তবে মনে রাখবেন যে অভিনয় করার একটা উদ্দেশ্য আছে। সেটা হচ্ছে লেখকের মনের কথা দর্শকদের কাছে যোগানীর মত পৌঁছে দিতে হবে। তার জন্য লাগবে দক্ষতা বা কায়দা। এই কায়দাকেই বলে অভিনয়। যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হয়—তখন সব সময় অভিনয় করতে হয়। কি উদ্দেশ্য নিয়ে ক্যামেরার সামনে হাজির হতে হয়েছে তা ভাবতে হবে।

যে কোন একটা উপায় বার করে নিতে হবে যাতে উদ্দেশ্য সফল হয়। অন্য অভিনেতারা কি বলছে তা শুনতে হয়—ও সেই অনুযায়ী ভাব বার করে দেখাতে হয়। যে সব বাণী বার হবে মুখ দিয়ে সেই অনুযায়ী চরিত্রের ভাব ব্যক্ত করতে হবে। চরিত্র অনুযায়ী, ঘটনা অনুযায়ী বাক্যের গতি হবে। তাল, মাত্রা ও গতির দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। ভালভাবে কথা বলতে পারলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। বাণী ও অঙ্গভঙ্গী বিশদভাবে দেখাতে পারলেই অভিনয় মধুর হয় মনে রাখবেন। মুখের ভাব দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারলেই অভিনয় সুন্দর হয়।

॥ নৃত্যম্ ॥

নৃত্যশিক্ষার স্কুল "নৃত্যম"-এর ষষ্ঠ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ছাত্রীবৃন্দের পরিবেশনায় রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় ১৮ই ও ১৯শে সেপ্টেম্বর দুই দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাওড়ার ই-আর-রঙ্গমঞ্চে।

"চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যে মঞ্জুলা ও সুব্রতা হাজরা

শ্রীএস্, সি ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহন করেন এবং প্রধান অতিথিরূপে "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক শ্রীশৈলেন কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষণ দেন।

শ্রীশুকদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা" প্রদর্শিত হয়। ছোট ছোট মেয়েদের দ্বারা অভিনিত এই নৃত্যনাট্যটি খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে ও দর্শকদের প্রশংসা অর্জ্জন করে। উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় কুমারী মঞ্জুলা হাজরা (চিত্রাঙ্গদা), জয়শ্রী মিত্র (কু-রূপা), সুব্রতা হাজরা (অর্জ্জুন) এবং সবিতা ঘোষের নাম করা

"পল্লী উৎসব" নৃত্যনাট্যে রাধাকৃষ্ণ রূপে সাধনা ও সবিতা

"চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যে জয়শ্রী মিত্র ও সুব্রতা হাজরা

যেতে পারে। তাছাড়া দীপ্তি কর, সুলেখা, প্রতিভা, সন্ধ্যা, মৃন্ময়ী, রুমা, মহামায়া, অনীতা ও অজন্তা চলন সই অভিনয় করেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রধান আকর্ষণ ছিল চার হতে সাত বছরের ছোট ছোট মেয়েদের দ্বারা অভিনীত নৃত্যনাট্য "পল্লী উৎসব" এবং বড়দের দ্বারা "ভগবান বুদ্ধ"। "পল্লী উৎসব" নৃত্যনাট্যে রাধাকৃষ্ণের ভূমিকায় সাধনা ও সবিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "ভগবান বুদ্ধ" নৃত্যনাট্যে কুমারী জয়শ্রী মিত্রের কুষ্ঠরোগীর অভিনয় দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে। মঞ্জুলা হাজরা ও সবিতা ঘোষের অভিনয় নৈপুণ্যও সহজেই দর্শকচিত্ত জয় করে। সেতারে নমিতা ঘোষ, রেখা দাস, নীলিমা দাস, ইন্দ্রাণী বিশ্বাস এবং আরতি মুখোপাধ্যায় "জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে..." রবীন্দ্র সঙ্গীতটি বাজিয়ে সুন্দর ভাবে শোনান।

সর্ব্বশ্রী ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী, কমলেন্দু ঘোষ, গোপাল কর এবং রমেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি অক্লান্ত পরিশ্রমে এই দুই দিনের অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সাগর সন্তান—

সম্মুখে সফেন উর্মি, করে খেলা সাগর সন্তান,
জীবন-সাগর কূলে পেয়েছে কি অমৃত সন্ধান!

জাতীয় খেলা-ধূলা সংগঠন

আরবি

ভারতীয় ফুটবল অলিম্পিকে তাজ্জব লাগিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ দল আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনাল উপলক্ষ্যে দুদিনে ১৫৫ মিনিট ছুটোছুটি ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও একটি গোল করতে পারেনি। গোল করাই যে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলার একমাত্র উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে বোধ হয় অবহিত নয় আমাদের দেশের তারকা মার্কা ফুটবলারেরা, এবারের ফাইনাল খেলা দেখেও তাই মনে হয়েছে। আরও সংশয় জেগেছে বিজ্ঞ দর্শকদের মনে, কোন পক্ষেই যাতে গোল না হয় ফুটবল পরিচালনা কর্তৃপক্ষেরও বোধ হয় তাই ছিল তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা যে সার্থক হয়েছে তাতে সক্রিয় কোন পন্থা কার্যকরী করার চেষ্টা হয়েছিল কিনা, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

শীল্ডের আপোষ নিষ্পত্তিতে বিরক্ত হয়ে আমার জনৈক বন্ধু মন্তব্য করেছেন যে ভবিষ্যতে যেন মোহনবাগান ও ইষ্ট-বেঙ্গল ফাইনালে উঠলে কোন খেলা না হয়। আই-এফ-এ সম্পাদকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কোন ফুটবলীয় দায় না থাকা সত্ত্বেও আইনগত সমাপ্তি দিনের তিন দিন আগেই যেভাবে যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করে দেওয়া হল এবার, সেই নজীর মত দু' দলকেই যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হবে—এমন নিয়ম যেন করা হয়। কারণ খেলার আসল উদ্দেশ্য বর্জিত এই উত্তেজনাপূর্ণ ঠোকাঠুকি মাঠে, গ্যালারিতে, র‍্যাম্পার্টে, চায়ের আড্ডায়, গলির মোড়ে, রোয়াকে ও বৈঠকখানায় যে পরিবেশ সৃষ্টি করে, তা অস্বাস্থ্যকর।

হিসেব করে ও তলিয়ে দেখতে গেলে আমাদের সমগ্র খেলাধুলা ব্যবস্থার কোথাও স্বাস্থ্যকর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। অথচ মজা এই অপেশাদারি ছদ্মবেশে আমাদের সম্পাদক চালিত আই-এফ-এ থেকে সুরু করে ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তরের অধীনস্থ অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব স্পোর্টস পর্যন্ত সবাই এই চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার পোষকতা করছে।

ফুটবলের কথাই ভেবে দেখুন। দুটি মাত্র দলের উগ্র-ভক্তদের বাতিকগ্রস্ততাই আজ বাঙলায় ফুটবলপ্রিয়তা বলে চলে যাচ্ছে। অথচ যারা খেলে ও যারা খেলায়, তারা প্রতিযোগিতার সুস্থ মনোভাব বিলোপে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ নয়। এবারকার লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ সিদ্ধান্ত হবার পর যে ভাবে প্রতি খেলায় দুর্বলতর দলটিই অপ্রত্যাশিত ভাবে জয়ী হয়েছে কিংবা ড্র খেলেছে, তাতে দর্শক সাধারণ বিস্মিত ও সংশয়ান্বিতবোধ করলেও, তার জন্য ফুটবল পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ এতটুকু করেনি। একটি বড় টিম লীগ তালিকার একেবারে প্রায় নিচের দিকের একটি টিমের কাছে হেরে গেল। এর জন্য বড় টিমের এক অলিম্পিক খেলোয়াড় স্পষ্ট কৈফিয়ত জানালো ঃ আমরা তো নোকর, ক্লাব যদি জেতার খেলা খেলতে বলে, আমরা তাই খেলি,

হয় তো তাতেও সব সময় জিততে পারি না ; কিন্তু হারার খেলা খেলতে বললে হারতে হয়ই।

এরই নাম অপেশাদার সখের ফুটবল। অথচ কে না জানে যে অন্তত প্রথম বিভাগে ছোট বড় সকল টিমই এক একটি সার্কাসের দল। অখেলোয়াড় সদস্যদের টাকায় কিছু সংখ্যক খেলোয়াড় পুষে তারা সদস্যদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করে উত্তেজনার খোরাক জোগায়। আর জনপ্রিয় দল বলতে যে গুটিকয়েক ক্লাব বোঝায়, তারা মনোরঞ্জন করে হাজার হাজার করিয়া ভক্তদের।

আমাদের প্রধান প্রধান খেলা এই সার্কাস মনোভাব নিয়েই পরিচালিত। জন কয়েক খেলে, আর লক্ষ লক্ষ লোক পাগল হয়ে উচু হারের প্রবেশ মূল্য দিয়ে মাঠে ঢুকে হাততালি দেয়।

খেলা আসলে অন্য জিনিষ, সেখানে দর্শক অবান্তর। যারা খেলে তাদের মনোরঞ্জনই মূল লক্ষ্য। প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন : "দেহ-মনের সকল প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ, কারণ আনন্দ ব্যতীত তার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই" ; খেলার মধ্যে আর্থিক লাভের প্রসঙ্গ ঢুকে গেলে সে খেলা হয়ে দাঁড়ায় জুয়া খেলা।

আজ ব্রিটিশ ঐতিহ্যে চালিত সারা দুনিয়াময় খেলার নামে চলছে হয় খেল্, নয় জুয়াখেলা। অন্তত ঘোড়দৌড় নামে যে খেলাটি যে কোন খবরের কাগজের খেলার পাতার অনেকখানি জুড়ে থাকে, সে খেলা দেখারও মূল লক্ষ্য জুয়া। খেলার পৃষ্ঠাতেই ঘোড়দৌড়ের ফলাফলেরই অংশ হিসেবে থাকে জুয়াড়িদের কি হারে টাকা দেওয়া হয়েছে তার খবর।

মুষ্টিমেয় ভারতে প্রবাসী ইংরেজরা নিজেদের সখের জন্য এ দেশে নানা রকম খেলা প্রবর্তন করেছিল, সেগুলি পরিচালনার জন্য সংগঠন খাড়া করেছিল। তখন পর্যন্ত ভারতীয়দের তা বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়েই দেখতে হত, আর তারিফ করতে হত সাহেবদের অপূর্ব কৌশলের। ক্রমে ভারতীয়রাও অন্দরে প্রবেশ লাভ করলো, সাহেবদের সঙ্গে তাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় দলগুলিকে উৎসাহদানে জাতীয়তা মনোভাব পরিতৃপ্ত ও পুষ্ট হতে লাগলো ভারতীয়দের।

আজ ফুটবল মরশুমের মাস পাঁচ ছয় জুড়ে বাঙালী যুব সমাজ নানা দলের পয়েন্টের হিসাব-নিকাশ নিয়ে যে পরিমাণ ব্যস্ত থাকে, তাদের অন্য কোন কাজ পাওয়া সম্ভব হয় না। ওই সব যৌবন নষ্ট করা ছেলে সমাজের সংসারের নিজেদের কোন কাজে আসবে না কোন দিন। অথচ এরা যখন দাবী করবে আমরা স্পোর্টসম্যান প্রতিবাদ করার উপায় থাকবে না।

আসলে স্পোর্টস সংজ্ঞাটির অর্থ নির্ণয়েই গলদ রয়ে গেছে। সিমেন্ট কংক্রিটের মগজ নিয়ে যারা তথাকথিত জনপ্রিয় খেলায় বীরত্ব দেখায়, তাদের কসরৎ নিয়ে মাতামাতিই আজ স্পোর্টসম্যানশিপ। জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই সেই স্পোর্টস-এর। স্পোর্টস যেখানে হবে জীবনে অংশবিশেষ, সেখানে আজ তা হয় জীবনকে গ্রাস করে বসে আছে নয় তা জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। জীবনের অংশবিশেষ হয়েও তা হবে অলংকরণ, আজ তা কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে।

দেহ, মগজ, মন, জীবনে তিনটিই হল রসের উপকরণ। যারা শিল্পী তারা নিজেকে প্রকাশের জন্যই শিল্প সৃষ্টি করে, তবু দর্শক না থাকলে তা অর্থহীন। কিন্তু খেলার মাঠে দর্শক হল অধিকন্তু, যে খেলে পূর্ণ আনন্দটুকু তারই। অবশ্য স্পেক্টেটার স্পোর্টস বর্তমান যুগের থ্রিল-পিয়াসী জনমনের একটা অপরিহার্য এন্টারটেনমেন্ট। আর সেই স্পেক্টেটার স্পোর্টস, বিশিষ করে এই পেশাদার যুগে সার্কাসেরই প্রকারভেদ মাত্র।

দেহ সঞ্চালনের আনন্দ, স্বাস্থ্যরক্ষা, এবং অবসর বিনোদন এই তিনটিতে জন্মগত অধিকার প্রতিটি মানুষের। এই তত্ত্ব অনুসারে বর্তমান যুগের ওয়েলফেয়ার ষ্টেট খেলা-ধূলায় উৎসাহ দান রাষ্ট্রীয় কর্তব্যগুলির অন্যতম বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তব্য রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সম্বন্ধে। ভারতরাষ্ট্রে সরকারি উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি মুষ্টিমেয় যারা খেলাধুলা দ্বারা জনমনমোহন করে তাদের সম্পর্কে। কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর প্রতিষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব স্পোর্টস-এর সভাপতি শ্রীযাদবেন্দ্র সিং (যিনি ভূতপূর্ব হয়েও পাতিয়ালার মহারাজ বলেই অভিহিত) তো স্পোর্টস বলতে অলিম্পিকে অথবা অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অর্জিত মেডেল ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। তাঁরই নির্দেশে চালিত শিক্ষা দপ্তরের খেলা খাতে

খরচ তাই কেবলমাত্র মেডেলের উদ্দেশ্যেই ব্যয় হয়। এবং সে টাকাটা মুষ্টিমেয় জন কয়েকের সম্পর্কেই শুধু কাজে লাগে। ইতিপূর্বে যখন রাজকুমারী অমৃত কাউর-এর নেতৃত্বে স্বাস্থ্যদপ্তর খেলাধুলা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিল, তখন একজন ভারতীয়কে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান করার জন্য অজস্র অর্থব্যয় হয়েছে, জাতীয় স্বাস্থ্যের প্রয়োজনকে বঞ্চিত করে।

আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় মেডেল পাওয়ার আকাঙ্খাকে আমি অবজ্ঞা করছিনা। তা বলে খেলাধুলার জয় পরাজয়কে জাতীয় সম্মান অসম্মানের সঙ্গে এক করে দেখার ফলে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যবৃদ্ধির বদলে বরং আন্তর্জাতিক বিদ্বেষই বড় হয়ে উঠ্‌ছে ক্রীড়াঙ্গনে। আর তীব্র জাতীয়তাবাদের ওই নবপ্রকাশের ফলে হল জাতীয় শ্লাঘার ঝলক বৃদ্ধি করে সরকার তার অন্য ত্রুটিগুলি ঢাকবার চেষ্টা করে, টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রে যেমন যুদ্ধ উশকানো হয় দেশের মধ্যে শোষণ ও সরকারি অক্ষমতা ঢাকবার জন্য।

ভারত সরকারের তরফ থেকে আন্তর্জাতিক স্পোর্টস মেডেলের স্বপ্নে গুটি কয়েক খেলোয়াড়ের পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সমীচিন কিনা সে প্রশ্নের উত্তরে আমি রাষ্ট্রিয় কর্তব্যে অগ্রাধিকার বিষয়টি বিবেচনা করতে বলবো। যে সরকার আজো অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হিম শিম খেয়ে যাচ্ছে, তার পক্ষে খেলাধুলার ক্ষেত্রে জৌলুশ বাড়াবার প্রচেষ্টায় কতখানি অর্থ ও শক্তি ব্যয় করা সমীচিন? শিক্ষায় ও চরিত্রে, শাণিত বুদ্ধি ও সুগঠিতো স্বাস্থ্যে যাদের যোগ্যতা সুপ্রমাণিত এমন কত তরুণ-তরুণী আজও একটি চাকরির জন্য দেয়ালে মাথা খুঁড়ে ব্যর্থ হচ্ছে। অথচ জনপ্রিয় খেলার প্রতিযোগিতায় রেল দলকে শক্তিশালী করবার জন্য কত মাঝারি ছেলে চাকরি পেয়ে যাচ্ছে স্পোর্টস-পৃষ্ঠপোষকতার নামে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত যদি অনেক অনেক পুরস্কারও জিতে আনে, জীবনে খেলার সুযোগ না পাওয়া আপনার আমার ছেলে কি সান্ত্বনা পাবে তাতে! বিদেশের খাদ্যপ্রদর্শনীতে ভারত প্রথম পুরস্কার জিতে আনলে, উপবাসী লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের পেট ভরে কি?

আর গ্ল্যামার স্পোর্টসেও আমাদের ছেলেমেয়েরা কতটুক উন্নতি করতে পেরেছে? সরকারী খরচ করিয়েছে কিন্তু দেশকে দিয়েছে কি? দোষ আমাদের স্পোর্টসম্যানদের নয়। কারণ যত দলাই মালাই ও তোয়াজ করা হোক, মৌলিক ক্ষমতা অসাধারণ না হল কতটুকু বিকাশ হতে পারে তার!

কথায় কথায় বলে থাকি আমরা, এত বড় দেশে ভালো স্পোর্টসম্যানের সংখ্যা এত কম কেন। তার কারণ জনসংখ্যার এক সামান্যতম ভগ্নাংশও খেলাধুলার কোন সুযোগ পায়না। খেলাধুলার সুযোগ যারা পায় তাদের সংখ্যার হিসেবে ভারততো আসলে খেলনা-রাষ্ট্র মোনাকোর দলে।

অলিম্পিক মেডেল বা উইম্বলডন জেতার উপযুক্ত খেলোয়াড় পেতে হলে খেলোয়াড় সংখ্যা যাতে বাড়ে সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী যদি খেলাধূলা করে, তাদের ভিতর থেকে দু'দশটা মিলখা সিং কেন, আমিন হ্যারিও পাওয়া যেতে পারে। অথচ সে দিকে দৃষ্টি নেই গ্ল্যামার-কাঙাল ভারত সরকারেরও।

পুরাণো দেশ, অগণিত মানুষ, পতিত জমি সব দখল করে চাষ না বাড়ালে যাদের অন্নাভাব ঘুচছেনা, সে দেশে সবার জন্য খেলার ব্যবস্থা করা এত সহজ নয়। কারণ এদেশে এক কথায় খেলা বলতে যে কটি খেলা বোঝায় সেই ফুটবল, হকী, ক্রিকেটে বাইশটি লোকের খেলার জন্য ন্যূনপক্ষে দশকাঠা জমি লাগে এবং সে জমিতে কোন ফসল হতে পারবে না। তাছাড়া একমাঠে অনেক ক্ষেপ খেলাও সম্ভব নয়, কারণ আন্তর্জাতিক নিয়মে খেলার সময় ক্রমশই বাড়ছে, আর খেলাপণ্ডিতদের মধ্যে স্থান কাল পাত্র নির্বিচারে আন্তর্জাতিক নিয়মই সব সময় অনুসরণীয়। অথচ আমাদের দেশে ওই সংকীর্ণ বিকেলটুক ছাড়া খেলার সময় কই। আমাদের সকালটুকুও সংকীর্ণ। দৈনিক কর্ম্মসূচীর শেষে খেলার মাঠে যেতেই তো সন্ধ্যা হয়ে যায়। আমাদের চারটের ফুটবল খেলার ফলে সে খেলা দেখার জন্য বাবুদের আফিস পালানো ও শ্রমিকদের কারখানা পালানোয় কি পরিমাণে কাজে ফাঁকি পড়ছে, সে কথা কেউ কোন দিন ভেবে দেখেনি। কলকাতা ফুটবলের প্রধান শ্রীযুক্ত দত্তরায়কে একথা একবার জানিয়ে ছিলাম, তিনি বলে ছিলেন, আই ডোণ্ট কেয়ার। জাতীয় উৎপাদন ব্যাহত করে, সরকারী কাজের দীর্ঘসূত্রিতা দীর্ঘতর করে যে খেলাধুলার ব্যবস্থা, তা কোনদিন 'জাতীয়' মার্কা পেতে

পারে না, কর্তব্যনিষ্ঠ ও সচেতন সরকারের উচিত জাতির ক্ষতিকর ওই খেলাধূলার পোষকতা না করে, তাকে মেন ও শোধন করা।

এথলেটিকস, বাস্কেটবল, ভলিবল, সাঁতার, কপাটি প্রভৃতি যে সব খেলায় জমির প্রয়োজন কম, সে সব খেলায় ইংরেজ ব্যবসাদার বা রাজ পুরুষদের উৎসাহ ছিলনা বলে ভারতে আজও তার প্রসার কম। টেনিস বায়সাপক্ষে খেলা, অথচ রাজকুমারী অমৃত কাউর নিজে টেনিস খেলিয়ে সমাজভুক্ত ছিলেন বলেই সে খেলার শিক্ষণ ব্যবস্থায় অজস্র অর্থব্যয় করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ লোকের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ফাঁকি দিয়ে। টেনিসের পরেই কোচিং-এর দরাজ হাতে খরচ হয়েছে টেবল টেনিসে। সেখানেও কয়েক লক্ষটাকা শিক্ষণ খাতে খরচের ফল বাঙলা-দেশে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা ভয়াবহ। কলকাতা শহরে যে কটি র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, সারা বাঙলায় র‍্যাঙ্কিং-এর প্রত্যাশায় প্রতিযোগিতা করার মত খেলোয়াড়ের সংখ্যা তার চেয়েও কম।

বাঙলার প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য সর্বভারতীয় প্রতি-যোগিতায় যোগ্যতা অর্জন। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মান নির্ণয়। কিন্তু মান যে নির্ণয় হবে, ছাত্ররা যে খেলাধূলায় এম, এ, পাশ করবে, তার গোড়ায় থাকা চাই অজস্র পাঠশালা। ত্রিশটি ক্রিকেটার নিয়ে অল ইণ্ডিয়া ক্যাম্প করা যায়, কিন্তু সেই ক্যাম্পে যাবার যোগ্যতা অর্জন করবে কে, কোথায় এবং কি ভাবে, তার ব্যবস্থা নিয়ে ক্যাম্প-উৎসাহী এ, আই, সি, এস বা ক্রিকেট বোর্ড কোন দিন মাথা ঘামিয়েছে কি? কলকাতা ফুটবলের বছরের পর বছর নিম্নগামী মানেরও মূল কারণ সেই প্রাথমিক শিক্ষার অভাব, বিশেষ করে বিজাতীয় প্রথায় ফুটবলকে বুটবল করে তুলে মেঠো ফুট-বলের স্বভাব শিক্ষার বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম বিভাগ লীগে যে ২০০।২৫০ খেলোয়াড় না হলেই নয়, তাদের বেছে আনার সময় কোথায়! চাহিদা যেখানে সরবরাহের চেয়ে অনেক বেশি, সেখানে কাঁচা মাল পচা-মাল সবই দরে বিকোবে এবং পাতে উঠবে।

হকির ওলিম্পিক মুকুট খসে পড়ায় মড়া কান্না শুনেছি দেশ ময়। দলগঠন সম্পর্কে মাথা ঘামানো হয়নি। তাও নয়। কিন্তু নিষ্ঠা নিয়ে হকি খেলে যারা, তাদের সংখ্যা ভারতের অন্যতম ক্রীড়া পীঠস্থান কলকাতাতেও মুষ্টিমেয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি কুড়োনই যদি দেশে খেলাধূলায় উৎসাহ দানের একমাত্র প্রেরণা হয় (যদিও আমি তা স্বীকার করছিনা,) তা হলেও দেশের সর্বত্র সবার জন্য খেলাধূলা ছড়িয়ে দিতে হবে। তারজন্য চাই মাঠের সুব্য-বস্থা, সরঞ্জাম তৈরির ব্যবস্থা (কারণ আজ বিদেশ থেকে আমদানির বিদেশীমুদ্রার অভাব খুব বেশি) কর্মসূচীর সঙ্গে ক্রীড়া সূচীর সমন্বয় এবং সবচেয়ে বেশি দরকার খেলাধূলার প্রকৃত গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব। গ্ল্যামারাকাঙ্ক্ষী ও বিদেশ ভ্রমণের লালসা সম্পন্ন প্রচ্ছন্ন পেশাদার নেতৃত্ব দ্বারা সে নেতৃত্ব সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে সেনাবাহিনীর মধ্যে, রেল মহলে, পুলিশ বাহিনীতে এবং সরকারি উচ্চ মহলে খেলাধূলার পৃষ্ঠপোষকতায় যে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তারও মূল প্রেরণা পদস্থ ব্যক্তিদের সেই গ্ল্যামার কামনা ও বিদেশ সফর লালসা। খেলার মাঠ করবার কোন নাম নেই, বড় বড় সহরে খেলা দেখার ব্যবস্থার জন্য অপরিমিত অর্থব্যয়ে স্টেডিয়াম গড়ার পরিকল্পনা চলছে। খেলা করার সুযোগ যাদের নেই, দেখতে না দিলেই বা চলবে কেন তাদের। উদরাময় রোগাক্রান্ত শিশু যখন ভোজনে বঞ্চিত হয়, সে তখন অপরের খাওয়া প্যাটপেটে দৃষ্টি দিয়ে গেলে।

শহরের প্রসঙ্গে কলকাতার কথা ওঠে। ইংরেজ বণিক রাজের এই ভূতপূর্ব হেড কোয়ার্টারটি ছাড়া সারা বাঙলার আর কোথাও উল্লেখযোগ্য, এমন কি কাজ চালা-বার মত সংগঠনও নেই। জীবনের অন্য সবক্ষেত্রেরই মত খেলাধূলার ক্ষেত্রেও কলকাতা সারা বাঙলার প্রাণরস শোষণ করে আপন স্ফীতি রক্ষা করে চলছে।

১৯৫১ সালে প্রথম এশিয়ান গেমস উপলক্ষ্যে আগত চৈনিক পরিদর্শকদলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তাঁরা কবে যোগ দেবেন। উত্তর করেছিলেন সমগ্র চীনের ষাট কোটি অধিবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতার জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমরা মানোন্নয়নের কথা ভাববো। এতদিনে সে দেশে অনেক বিশ্বরেকর্ড

হয়েছে, কিন্তু সেটা আনুষঙ্গিক। তাদের লক্ষ্য ১৯৬৬ সালে ষাট কোটির খেলাধুলার ব্যবস্থা পূর্ণ হবে যেদিন।

আমরা জন্মে থেকেই হকীর বিশ্ব-মুকুট মাথায় পরে তলার দিকে দেখতে ভুলে গেছি। আন্তর্জাতিক প্রতি-যোগিতা ছাড়াও যে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের খেলাধুলা করার নিজস্ব প্রয়োজন আছে, সে কথা ভাবতেও শিখি না। আজও আমাদের ধারণা রেকর্ড মুখস্থ বুকনি আর খেলার মাঠে উগ্র ফড়েমি করা কিংবা ভারতীয় দলের 'ডি' ডিভিশন টেস্টম্যাচের টিকেটের জন্য ক্ষেপে যাওয়ার নামই স্পোর্টসম্যানশিপ।

আসলে গোড়াতেই গলদ। মুষ্টিমেয় ইংরেজ রাজপুরুষ ও বণিক পুরুষদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রবর্তিত সংগঠন-গুলিকে ভারতীয়করণ করেই আমরা তাকে জাতীয় সংস্থা বলে চালাতে চাইছি। স্বাধীন ও বর্দ্ধমান জাতির আধু-নিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্মত প্রয়োজন মেটানো সে কাঠামোর কাজ নয়, তা থেকে ইউনিয়ন জ্যাক সরিয়ে তেরঙ্গায় ঢেকে দিলেও কোন সুরাহা হবে না।

শেয়ালকাঁটায় ছেয়ে আছে আমাদের খেলার মাঠ। সেগুলি সম্পূর্ণ সমূলে উৎপাটন করে আর একবার লাঙ্গল দিয়ে তারপর নতুন বীজ বুনলে তবেই সুফল আশা করা যায়। তার জন্য চাই সুস্থ চেতনা, স্বচ্ছ দৃষ্টি ও দুঃসাহসী কর্মপ্রবণতা। দেশের কোন ক্ষেত্রেই তার সন্ধান পাই না। খেলার মাঠে পাব কেমন করে।

১৯৬১ সালের যুগ্ম শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের অধিনায়কদ্বয়কে আ.ই.এফ-এ শীল্ড গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে

—ফটো ডি, রতন এণ্ড কোং

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৬১ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় মোট ৩৭টি দল যোগদান করে। বাংলার বাইর থেকে এসেছিল ৯টি। ৪র্থ রাউণ্ডের মোট ৮টি দলের মধ্যে ৫টি ছিল স্থানীয় এবং ৩টি ছিল বহিরাগত দল। স্থানীয় দলের মধ্যে ছিল মোহনবাগান, ইণ্টারন্যাশনাল, ইষ্টার্ণ রেল, রাজস্থান এবং ইষ্টবেঙ্গল। মহীশূর, ইণ্ডিয়ান নেভী এবং পাঞ্জাব একাদশ এই ৩টি ছিল বহিরাগত দল।

সেমিফাইনালের খেলায় ৪টি দলের মধ্যে ৩টি ছিল স্থানীয় এবং ১টি বহিরাগত দল (গত বছরের রানার্স-আপ ইণ্ডিয়ান নেভী)।

প্রথম সেমি-ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ২-১ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে গত বছরের

আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ৩য় দিনের খেলায় ২-০ গোলে ইষ্টার্ণ রেল দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যায়। প্রথম দিনের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান-ইষ্টার্ণ রেলদলের খেলাটি দ্বিতীয়ার্দ্ধের আরম্ভের কিছু পরেই বৃষ্টির দরুণ পরিত্যক্ত হয়; এই সময়ের মধ্যে উভয় দলই একটা ক'রে গোল দেয়।

দ্বিতীয় দিনের সেমি-ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। তৃতীয় দিনের খেলায় মোহনবাগান ২-০ গোলে জয়ী হয়।

১৯৬১ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিতোগিতার ফাইনালে উঠেছিল মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল—দুই প্রতিবেশী ক্লাব। দু'দিনের ফাইনাল খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং দ্বিতীয় দিনের অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। দু'দিনেই গোল শূন্য অবস্থায় খেলা শেষ হয়। শেষ পর্য্যন্ত উভয় দলকেই যুগ্মভাবে ১৯৬১ সালের শীল্ড বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। সুদীর্ঘ কালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এ ঘটনা এই প্রথম। টসে জয়ী হয়ে মোহনবাগান ক্লাব প্রথম ৬ মাস শীল্ডটি অধিকারে রাখার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

এবার নিয়ে মোহনবাগান ১৫ বার শীল্ড ফাইনালে উঠে ৭ বার আই এফ এ শীল্ড পেল। এই পনের বারের মধ্যে ১৯৫২ সালের শীল্ড ফাইনাল খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। ফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল রাজস্থান। প্রথম দিনের খেলায় উভয় দল দু'টি করে গোল দেয়। দ্বিতীয় দিনের খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। রাজস্থান পুনরায় খেলতে রাজী না হওয়াতে ১৯৫২ সালের ফাইনাল খেলাটি পরিতক্ত ঘোষণা করা হয়।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব খেলতে রাজী না হওয়াতে ১৯৫৯ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলাটি একেবারেই অনুষ্ঠিত হয় নি। ১৯৫৯ সালে ফাইনালে উঠেছিল মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবও এবার নিয়ে ৭ বার আই এফ এ শীল্ড পেল। ইষ্টবেঙ্গল আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে উঠেছে ১২ বার। ইষ্টবেঙ্গল উপর্যুপরি চারবার শীল্ড বিজয়ী হয়ে আই এফ এ শীল্ডের ইতিহাসে উপর্যুপরি সর্বাধিক বার শীল্ড বিজয়ের রেকর্ড করেছে।

মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল দলের মধ্যে শীল্ড খেলা হয়েছে এবার নিয়ে ৬ বার, যদিও তারা একত্র ৭ বার ফাইনালে উঠেছে। ১৯৬১ সালের ফলাফল বাদে গত ৫ বারের ফাইনাল খেলায় ইষ্টবেঙ্গল জয়ী হয়েছ ৪ বার (১৯৪৫, ১৯৪৯, ১৯৫১ ও ১৯৫৮) এবং মোহনবাগান একবার (১৯৪৭)।

১৯৬১ সালের শীল্ডের প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ৩য় রাউণ্ডে ৯—০ গোলে বার্ণপুর ইউনাইটেডকে, ৪র্থ রাউণ্ডে ৩—০ গোলে ইণ্টারন্যাশনালকে এবং সেমি-ফাইনালে ১—১, ০—০ ও ২—০ গোলে ইষ্টার্ণ রেলওয়েকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি চতুর্থবার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা লাভ করে।

ইষ্টবেঙ্গল অপরদিকে ৩য় রাউণ্ডে ৩—১ গোলে উয়াড়ীকে, ৪র্থ রাউণ্ডে ৩—১ গোলে মহীশূরকে এবং সেমি-ফাইনালে ২—১ গোলে ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গত বছর ৪র্থ রাউণ্ডে ইণ্ডিয়ান নেভী দল ৩—০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করেছিল।

ফাইনাল খেলা

প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। এই দিনের খেলায় মোহনবাগান দল ইষ্টবেঙ্গল দলের থেকে গোল দেওয়ার বেশী সহজ সুযোগ লাভ করে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একটাও গোল দিতে পারে নি।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় প্রাধান্য লাভ করে ইষ্টবেঙ্গল দল; দু'বার গোল পোষ্টে বল বাধা পেলে ইষ্টবেঙ্গল গোল দেওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। মোহনবাগানও গোল দেওয়ার সুযোগ নষ্ট করে; এই দিন চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন মোহনবাগান দলের অরুময়; ইষ্টবেঙ্গল গোলের মুখে গোল থেকে তিন গজ দূরে তিনি বল পান এবং গোলরক্ষককে অসহায় অবস্থায় পেয়েও গোল দিতে পারেননি, গোল রক্ষকের হাতে বল তুলে দেন। এই দিন অতিরিক্ত সময় খেলানো হয়; কিন্তু জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়নি। ফলে উভয় দলকেই যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

আই এফ এ শীল্ডবিজয়ী ভারতীয় দল

মোহনবাগান—৬ বার; ইষ্টবেঙ্গল—৬ বার; মহমেডান স্পোর্টিং—৪ বার (১৯৩৬, ১৯৪১—৪২ ও ১৯৫৭); পুলিশ—১ (১৯৩৯); এরিয়ান্স—১ (১৯৪০); ই বি আর—১ (১৯৪৪); ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ (বোম্বাই) —১ (১৯৫৩) এবং রাজস্থান—১ (১৯৫৫)।

একই বছরে আই এফ এ শীল্ড ও ফুটবল লীগ কাপ

মহমেডান স্পোর্টিং—২ বার (১৯৩৬ ও ১৯৪১)।

ইষ্টবেঙ্গল—৩ বার (১৯৪৫, ১৯৪৯, ১৯৫০ ও ১৯৬১)।*

মোহনবাগান—৩ বার (১৯৫৪, ১৯৫৬ ও ১৯৬০)।

১৯৬১ সালে ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান যুগ্মভাবে শীল্ড বিজয়ী হয়।

ইংলণ্ড সফরে অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ঃ—

১৯৬১ সালের ইংলণ্ড সফর শেষ ক'রে অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেছে। ১৯৬১ সালের ক্রিকেট সফরে অষ্ট্রেলিয়া মোট ৩৭টি ম্যাচ খেলেছিল। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—অষ্ট্রেলিয়ার জয় ১৪, হার ২, এবং খেলা ড্র ২১। ইংলণ্ডের বিপক্ষে ৩য় টেষ্টে ৮ উইকেটে এবং ক্রিকেট কন্ফারেন্স দলের বিপক্ষে এক দিনের খেলায় ৮ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়া হার স্বীকার করে। প্রথম শ্রেণীর খেলার ফলাফল: মোট খেলা ৩২, অষ্ট্রেলিয়ার জয় ১৩, হার ১ (৩য় টেষ্টে) এবং খেলা ড্র ১৮।

প্রথম শ্রেণীর ৩২টি খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৬জন খেলোয়াড় ১০০০ রান অথবা তারও বেশী রান করেছেন। ২০০০ রান করেছেন মাত্র একজন খেলোয়াড়—উইলিয়াম লরী। লরীর মোট রান সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,০১৯ (গড়পড়তা ৬১.১৮)। লরী ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথমস্থান লাভ করেছেন। ২য় স্থান লাভ করেছেন নর্ম্যান ও'নীল—তাঁর মোট রান ১,৯৮১ (গড়পড়তা ৬০.০৩)। আর মাত্র ১৯ রান করতে পারলেই তিনি ২০০০ রান পূর্ণ করার গৌরব লাভ করতেন।

প্রথম শ্রেণীর ৩২টি খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৮জন বোলার ৫০টি অথবা তারও বেশী উইকেট লাভের সম্মান পেয়েছেন।

১০০০ রান বা তার বেশী রান: এই ৬ জন খেলোয়াড় করেছেন—উইলিয়ম লরী (২,০১৯ রান), নর্ম্যান ও'নীল (১,৯৮১), রোনাল্ড সিম্পসন (১,৯৪৭), নীল হার্ভে (১,৪৫২), পিটার বার্জ (১,৩৭৬) এবং ব্রেন বুথ (১,২৭৯)।

৫০টি উইকেট অথবা তার বেশী: এই ৮ জন বোলার পেয়েছেন—এলেন ডেভিডসন ৬৮, রিচি বেনো ৬১, লিণ্ডসে ক্লাইন ৫৪, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ৫৪, কেনেথ ম্যাককে ৫২, ফ্যাঙ্ক মিশন ৫১, রোনাল্ড সিম্পসন ৫১ এবং ইয়ান কুইক ৫৯।

বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন গন্ট (৮৪৫ রানে ৪০টা উইকেট—গড়পড়তা ২১.১২)। এলেন ডেভিডসন সর্ব্বাধিক ৬৮টা উইকেট পেয়েছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেঞ্চুরী: ৩৯টা। উইলিয়ম লরী ৯টা, নর্ম্যান ও'নীল ৭টা, রোনাল্ড সিম্পসন ৬টা, নীল হার্ভে ৫টা, পিটার বার্জ ৪টা, কলিন ম্যাকডোনাল্ড ৪টা, ব্রেন বুথ ২টা এবং কেনেথ ম্যাককে ২টা।

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রান: ১৮১ পিটার বার্জ (৫ম টেষ্ট)। অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রান—১৮০ টেড ডেক্সটার (১ম টেষ্ট)। অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরী সংখ্যা: ১৫টা সর্ব্বাধিক সেঞ্চুরী করেছেন কলিন কাউড্রে—৩টে।

ডেভিস কাপ ঃ

১৯৬১ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলাটি দিল্লীর ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাবের 'গ্রাভাল' কোর্টে অনুষ্ঠিত হয় ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার মধ্যে। পাঁচটি খেলার মধ্যে আমেরিকা ৩-২ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে জোন-ফাইনালে ইটালীর সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। জোন-ফাইনালের বিজয়ী দল চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবে গত দু'-বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। গত বছরের ইণ্টার-জোন ফাইনালে ইটালী ৩-২ খেলায়

চাক ম্যাকিনলে এবং ডোনাণ্ড ডেল ৫-৭, ৬-০, ৬-৩, ৬-২ গেমে রামনাথন কৃষ্ণন এবং প্রেমজিৎ লালকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

হুইটন রীড (আমেরিকা) ৬—২, ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

রামনাথন কৃষ্ণন (ভারতবর্ষ) ৬—৩, ৪—৬, ১—৬, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে চাক ম্যাকিনলেকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন। ম্যাকিনলে এই বছর উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ানীপের সিঙ্গলস ফাইনালে পরাজিত হয়েছিলেন।

রমানাথন কৃষ্ণাণ

আমেরিকাকে পরাজিত ক'রে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠে ১-৪ খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায়।

দিল্লীতে ভারতবর্ষ বনাম আমেরিকার ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে দুই দেশই একটা ক'রে সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হ'লে ফলাফল সমান ১-১ দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় দিনে ডাবলসের খেলায় আমেরিকা জয়লাভ ক'রে ২-১ খেলায় এগিয়ে যায়।

তৃতীয় দিনের প্রথম সিঙ্গলস খেলায় আমেরিকা জয়লাভ করলে ইটালীর সঙ্গে জোন-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় ভারতবর্ষ জয়লাভ করলে ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভের সংখ্যা দাঁড়ায় ২টি খেলা এবং আমেরিকার পক্ষে ৩টি।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

চাক ম্যাকিনলে (আমেরিকা) ৬-৪, ৬-৪ ও ৯-৭ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন। রামানাথন কৃষ্ণন (ভারতবর্ষ) ৬-৪, ৬-১, ও ৭-৫ গেমে হুইটনী রীডকে (আমেরিকা পরাজিত করেন।

সন্তরণে ইংলিশ চ্যানেল ঃ

আর্জেন্টিনার এণ্টোনিও এবারটোণ্ডো একটানা দু'বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ক'রে বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর আগে কোন সাঁতারুই এইভাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেননি। তিনি প্রথমে ইংলণ্ডের ডোভার থেকে ফ্রান্সের কেপ গ্রিজ নেজে সাঁতরে যান। সময় লাগে ১৮ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। নেজে পৌছে তিনি মাত্র ৪ মিনিট সময় সাতার দেওয়া বন্ধ করেন। এই সময়টুকুতে তিনি গায়ে চর্বি মাখেন এবং গরম পানীয় পান করেন। দু'বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে তাঁর সময় লেগেছিল ৪৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট।

গত সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের সাঁতারু ব্রজেন দাস দুটি বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন—(১) সর্বাধিক বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের রেকর্ড এবং (২) সর্বাপেক্ষা কম সময়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের রেকর্ড। ব্রজেন দাস মোট ৬বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছে। এই ৬ষ্ঠ বারে ফ্রান্স থেকে ডোভারে পৌছতে তার ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময় লাগে। সর্বাপেক্ষা কম সময়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের পূর্ব্ব বিশ্ব রেকর্ড ছিল—১০ ঘণ্টা ৫০ মিঃ; এ রেকর্ড করেছিলেন ইজিপ্টের হাসান আবেল রহিম ১৯৫৮ সালে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর-বাহার

শিল্পী : ইন্দ্র দুগার

অগ্রহায়ণ—১৩৬৮

প্রথম খণ্ড | ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

কুমারজীব-কর্তৃক চীনদেশে সংস্কৃত-শিক্ষা ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

মুসলমান ধর্মের তখনো উদ্ভব হয়নি—খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ, ৪০১ সাল—বহির্ভারতে ভারতের যুগ-যুগান্তরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক কুমারজীব বহু শিষ্যপ্রশিষ্যসহ চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করছেন—সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষারও প্রসার ঘটছে—মনশ্চক্ষে কত কি ঘটনা দেখতে পাচ্ছি—কি অপূর্ব সে ইতিহাস।

পরবর্তী সিন রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা ইয়াও-হিঙ্গের (খ্রীষ্টীয় ৩৮৪—৪১৭ সাল) সময়ে কুমারজীব চীনে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। কুমারজীবের পিতা কুমারায়ণ ছিলেন ভারতীয়; তাঁর মা "জীবা" ছিলেন কুচের রাজার ভগিনী। কুমারজীব অল্প বয়সে কাশ্মীরে এবং মধ্য-এশিয়ার বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৌদ্ধকেন্দ্রসমূহে পরিভ্রমণ পূর্বক ৩৫২ সালে কুচে ফিরে আসেন—তখন তাঁর বয়স ২০ বৎসর মাত্র। তারপর সেখানে তিনি আরো ত্রিশ বৎসর অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর কাল পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কুচদেশীয় এই সন্ন্যাসীর মান-প্রতিপত্তির বিষয় মধ্য এসিয়ার মরুভূমি ও বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড অতিক্রম করে চীনদেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বন্ধু তাও-এনের কানে পৌঁছে। তিনি তৎকালীন রাজা ফু-কিনকে (খৃঃ ৩৯৭—৩৮৪) কুমারজীবের সম্বন্ধে বলেন। ইতিমধ্যে ঘটনা পরম্পরার মধ্যে ফু-কিন ইয়াও-চঙ্গের হাতে নিহত হন। ইতোমধ্যে যে সেনাপতি লু-হুয়াং কুমারজীবকে কুচরাজ্য থেকে সেখানকার রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিয়ে আসেন—তিনি তাঁর নব রাজ্য স্থাপন করেন কু—সাংএ। কালক্রমে ৪০১ খৃষ্টাব্দে ইয়াও-চঙ্গ সিংহাসন আরোহণ করেন—তখন তিনি কুমারজীবকে স্বরাজ্যে নিয়ে আসেন। কুমারজীব রাজগুরু: পদে নিযুক্ত হলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ধর্ম প্রচার করেন। ৪১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাজা রাজগুরুকে ধর্মপ্রচারের জন্য সর্ব প্রকারের সুবন্দোবস্ত করে দেন। তিন হাজার শিষ্যকে একসঙ্গে যাতে ধর্মোপদেশ দিতে পারেন, সে প্রকারের একটী প্রশস্ত কক্ষ তাঁর জন্য রাজা নির্মাণ করে দেন।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থের যত অনুবাদ হয়েছে, সেই সব অনুবাদের মধ্যে কুমারজীবের অনুবাদ সম্পূর্ণ একক স্থান লাভ করেছে। এমন অপূর্ব ভাষা চীনদেশীয় মনীষীদেরও ছিল না। ভাষার জন্য কুমারজীব চীনদেশীয় সহায়কের একেবারেই মুখাপেক্ষী ছিলেন না। রাজা ৮০০ আটশত বৌদ্ধ ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ব্যক্তিকে কুমারজীবের অনুবাদ কার্যে সহায়তার জন্য নিযুক্ত করেন।

বাল্যে কুমারজীব হীনযান সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কামগড়ে মহাযান সন্ন্যাসী সুর্যসোমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁর ধর্মমত পরিবর্তিত হয়। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের ত্রিশাস্ত্র—মাধ্যমিক-সূত্র, নাগার্জ্জুনের দ্বাদশ-নিকায় এবং আর্যদেবের শতশাস্ত্র তিনি সুর্যসোমের নিকট গভীর নিষ্ঠা সহকারে পাঠ-করেন।

কুমারজীবের পূর্বে নাগার্জ্জুন ও আর্যদেবের গ্রন্থ চীনে বিদিত ছিল না; অন্যান্য মহাযান গ্রন্থের বিষয় অবশ্য তাঁরা জানতেন। যেমন—অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার প্রচারই হয়েছিল চীনে কুমার-জীবের পূর্বে; লোকক্ষেম ১৭৯—১৮০খৃঃ, চি-চিয়েন আনুমানিক ২২৫ সালে এবং ধর্মপ্রিয় খৃঃ ৩৮২ এ প্রজ্ঞাপারমিতার কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করেন—ইত্যাদি। কনফুসিয়াস্ ও তাওর ধর্মের প্রতি চীনবাসীদের তখন প্রবল আগ্রহ; স্বদেশবাসীর প্রচারিত ধর্মের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক। কিন্তু কুমারজীব আশ্চর্য ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর অনুবাদে কোনও জড়তা বা বিদেশিকৃত অনুবাদের আড়ষ্ট ভাব ছিল না। শ্রেষ্ঠ চীনদেশীয় লেখকদের ভাষার মতই তাঁর ভাষাতেও পার্বত্য নদীর ধারার প্রবল গতি ছিল—কোনও প্রকার বাধার কাছে মস্তক তিনি নত করেননি।

মহাযান বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতা। তন্মধ্যেও আবার নানা কারণে শ্রেষ্ঠ অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থনিকায়ের মধ্যে অষ্টসাহস্রিকা খুব সম্ভবতঃ সর্ব প্রাচীন; কালক্রমে অষ্টসাহস্রিকা দশসাহস্রিকা, পঞ্চবিংশসাহস্রিকা এবং লক্ষসাহস্রিকা পারমিতায় পরিগণিত হয়। সমভাবে তিনি তিনশত সূত্র পরিমিত বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, অত্যল্পসংখ্যক সূত্র পরিমিত প্রজ্ঞাপারমিতা—হৃদয় সূত্র, রাজার উদ্দেশে পত্ররূপে লিখিত "সুহৃল্লেখ" শীর্ষক পারমিতা সূত্রের অনুবাদ রচনা করেন। বজ্র-চ্ছেদিকা চীনদেশে কত প্রবল অনুরাগের সৃষ্টি করেছিল—তার পরিচয় তার অনুবাদের সংখ্যা এবং অনুবাদকের নাম থেকেই পাওয়া যায়; যেমন পরমার্থ—(৫৬২ অব্দ), হুয়েন্থসাং (৬৪৮ অব্দ), ইৎসিং (৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং ধর্মগুপ্ত (৫৮৯-৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ) কৃত অনুবাদ। প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়সূত্রের প্রভাব জাপান দেশেই সর্বাধিক পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপে অদ্যাপি জাপানীগণ এই সূত্রই মন্ত্ররূপে পাঠ করেন।

মহাযান সম্প্রদায়ের দুই বিশিষ্ট সম্প্রদায়—মাধ্যমিক ও যোগাচার। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রখ্যাততম প্রপঞ্চয়িতা নাগার্জ্জুন। প্রসিদ্ধি অনুসারে বিজ্ঞানবাদের প্রবর্তক অশ্বঘোষই যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। বসুবন্ধুই যোগাচার সম্প্রদায়কে বিজ্ঞানবাদের ভিত্তিতে একটী উন্নত সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। ইনি নাগার্জ্জুনের থেকে আড়াই শত বৎসরের পরবর্তী সময়ের লোক এবং কুমারজীব থেকে মাত্র ৫৯ বৎসর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হন।

কুমারজীব নাগার্জ্জুন এবং অশ্বঘোষ—এই উভয়ের সম্পর্কেই সারগর্ভ জীবন-চরিত রচনা করে গেছেন। এতদ্ব্যতীত—কুমারজীব নাগার্জ্জুনের শ্রেষ্ঠ শিষ্য আর্যদেবের জীবনচরিতও রচনা করেন।

নাগার্জ্জুন পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার উপরে যে টীকা রচনা করেন, তার নাম মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্র—কুমারজীব এই গ্রন্থেরও অনুবাদ করেন।

"শূন্যবাদ" প্রচারকল্পে নাগার্জ্জুন কয়েকটী গ্রন্থই রচনা করেন। তন্মধ্যে মাধ্যমিক-কারিকাই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই গ্রন্থে ২৭ অধ্যায়ে ৪০৪টী কারিকা আছে। আর্যদেব এই গ্রন্থের প্রধান টীকাকার; কুমারজীব টীকাসহ মাধ্যমিক-কারিকার চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। কুমারজীব ৪০৪ সালে আর্যদেবের অন্যতম বিশিষ্ট গ্রন্থ "শতশাস্ত্রের" অনুবাদ করেন। মাধ্যমিকবাদের গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটী অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হয় না। এই "শত শাস্ত্র" গ্রন্থটী আস্তিক ও নাস্তিকের মধ্যে বাদানুবাদের আকারে রচিত। নাগার্জুনের মাধ্যমিকবাদের দার্শনিক সৌধ রচনা করেন আর্যদেব এই গ্রন্থের মাধ্যমে; পরে বসুবন্ধু এবং ধর্মপাল বা হুয়েং সাং এই "শত-শাস্ত্রের" টীকা রচনা করেন। এই গ্রন্থে ন্যায়-বৈশেষিকবাদের খণ্ডন আছে। এই গ্রন্থের চীন অনুবাদে ১০টী অধ্যায় আছে।

কুমারজীবের পূর্ববর্তী চিন্তানায়কদের মধ্যে আর একজন ছিলেন হরিবর্মা। তিনি "সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র" রচনা করেন। তাঁর রচিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু চীন দেশে তিনি এত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে এই গ্রন্থের নামেই চীনদেশে একটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। লিয়াঙ্গ (Liang) রাজ বংশের প্রভুত্ব সময়ে এদের পরম অভ্যুন্নতি ঘটে। "সত্যসিদ্ধি শাস্ত্র"—গ্রন্থের কুমারজীব কৃত অনুবাদের ভূমিকা লিখেন তাঁরি শ্রেষ্ঠ শিষ্য—সাং চৌ (San Chhu)। এই ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে সত্যসিদ্ধি গ্রন্থ বুদ্ধদেবের মহাতিরোধানের প্রায় ৮৯০ বৎসর পরে বিরচিত হয় এবং কাশ্মীরীয় হীনযান সম্প্রদায়ের গুরু কুমার লাতের শিষ্য ছিলেন হরিবর্মা। এই মত বিশ্বাস-যোগ্য কিনা, বিশেষ বিবেচ্য, কারণ—হুয়েং সাং লিখে গেছেন যে কুমার লাত—অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন ও আর্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

মহাযান বৌদ্ধ মতে আদর্শ হচ্ছে বোধিসত্ত্বের জীবন। সাধনাক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তি "দশভূমি" অতিক্রম করে বোধিসত্ত্ব হতে পারেন। এই দশভূমির নাম—

১। প্রমুদিতা ২। বিমলা
৩। প্রভাকরী ৪। অরিষ্মতী
৫। সুদুর্জয়া ৬। অভিমুখী
৭। দূরঙ্গমা ৮। অচলা
৯। মধুমতী ১০। ধর্মমেঘা॥

এই "দশভূমি" অবতংসক-গ্রন্থের অংশ বিশেষ। কুমারজীব "বোধিচিত্ত" ও দশভূমি দুইই অনুবাদ করেন।

কুমারজীবের "বিমলকীর্তি নির্দেশ" গ্রন্থের অনুবাদ চীনদেশে এক নব আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থের টীকা করেন কুমারজীবের প্রখ্যাততম শিষ্য স াঁ চৌ। বিমলকীর্তি-নির্দেশের মূল সংস্কৃত রূপ আজ চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে। নাগার্জ্জুনের বহু পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়—কারণ, নাগার্জ্জুন নিজে এই গ্রন্থ থেকে তাঁর প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের টীকায় বহুবার উদ্ধৃত করেছেন।

এই বিমলকী-র্তিনির্দেশের উপরে জাপানীয় যুবরাজ সো টোকু উময়া দো (Shotoku umayado: ৫৭৪—৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) একটী টীকা রচনা করেন। জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের সংপ্রসারণের অন্যতম মূল কারণ এই যুবরাজ সো টোকু উময়া দো।

মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক"। যীশু খৃষ্টের জন্মের কিছু কাল পরবর্তী সময় পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে, তা' এই গ্রন্থে যে প্রকার পাওয়া যায়, অন্য কোনও গ্রন্থ থেকে তা পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে অমিতাভ প্রভৃতি চার জন বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। এই অমিতাভ সম্প্রদায়ের প্রথম গ্রন্থ খুব সম্ভবত, সুখাবতী ব্যূহ। পারস্য দেশীয় সন্ন্যাসী সি কাও এবং তাঁর সমসাময়িক লোকক্ষেম খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনদেশে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার করেন। এই অমিতাভ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ভারতের বাইরেই ঘটে। কুমারজীব অত্রোক্ত "সদ্ধর্ম পুণ্ডরীকে" এবং "সুখাবতী ব্যূহে" রও অনুবাদ করেন।

এতদ্ব্যতীত, "সূত্রালঙ্কার", কুমার লাতের "কল্পনা মণ্ডিতিকা" গ্রন্থের অনুবাদও তিনি করেন। তিনি ব্রহ্মজাল সূত্রেরও অনুবাদ করেছেন। স াঁ চৌ লিখেছেন যে এই সূত্রটী বোধিসত্ত্ব হৃদয় সূত্র নামক গ্রন্থের অংশবিশেষ। দুর্ভাগ্যক্রমে এই অমূল্য গ্রন্থের অর্থাৎ ব্রহ্মজাল সূত্রের অনুবাদাংশ ব্যতীত এই গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ চীন ভাষাতেও আজ আর পাওয়া যায় না।

কুমারজীব নিজেই কেবল প্রখ্যাত অনুবাদক এবং ধর্মপ্রচারক ছিলেন না—তাঁর শিষ্যরাও গুরুর পবিত্রতম জীবনের প্রকৃষ্ট আলোক স্বদেহে সংক্রামিত করে নিয়েছিলেন। তন্মধ্যে স াঁ চৌ এবং সেঙ্গ জুই (Seng jui) র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স াঁ চৌ পূর্বোক্ত "বিমল কীর্তি নির্দেশে"র টীকা ব্যতীত—(১) রত্ন পিটক—শাস্ত্র এবং (২) চাও লুঁ (Chau Lun) নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া স াঁ চৌ কুমারজীবের দুটি এবং বুদ্ধ যশার একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখেন। সেঙ্গ জুইও কুমারজীবের কতিপয় গ্রন্থের ভূমিকা লিখেন। ৪১৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে তিনি দ্বিতীয় ট্সাই রাজবংশের সময়ে রচিত চীন দেশের বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের একটি সূচী রচনা করেন নাম, Er-Tsin-tu এর পিঁ লু।

পরবর্তী সিন্—রাজ বংশের (Later Tsin Dynasty:) চৌত্রিশ বর্ষব্যাপী রাজত্ব সময়ে যে ১৩৮ খানা বিশিষ্ট গ্রন্থ চীন ভাষায় অনূদিত হয়, তন্মধ্যে ১২।১৩ বৎসরের কার্যকাল সময়ে কুমারজীব একাই ১৩৬ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

বিংশ শতাব্দীর ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জন্য এই প্রবন্ধ লিখতে বসে আমরা কেবল ভাবছি—আজ কোথায় আদর্শ ভারতীয় মহাজন সুধী—যিনি সুদূর চীনদেশে রাজগুরুর স্থান অধিকার করে ৮০০ আট শত শিষ্যসহ ভারতীয় ধর্ম প্রচারে দৃঢ়ব্রত হয়ে অমূল্য জীবন যাপন করেছেন? আজ কোথায় ভারতের সেই দৃঢ়ব্রত, ক্ষুরধার প্রতিভা, অতুলনীয় অধ্যবসায়? বিশালকায় মহাযান বৌদ্ধ সংস্কৃত শাস্ত্র। তার সর্বশ্রেষ্ঠ কয়টি মণি মাণিক্যই কুমারজীব চীন ভাষায় অনুবাদ করে গিয়েছেন। আজ এই রত্ন মঞ্জুষার শ্রেষ্ঠ রত্ন সমূহের মৌলিক সংস্কৃত রূপ নষ্ট হয়ে গেছে; কিন্তু তিনি চীন ভাষায় অনুবাদগুলি রেখে গিয়েছিলেন বলে আমরা আজ তার স্বরূপ-সম্বন্ধে জানতে পারছি এবং সত্যই প্রয়োজন হলে তার নূতন সংস্কৃত রূপায়ণও অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়।

হিসেব

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

চিরকালই হিসেব করে চলেছেন রামসদয় বাবু।

নিতান্ত হা-ঘরে জন্মাননি তিনি। বাপ বেশ বনিয়াদী বড় ঘরের ছেলে। দু'হাতে ব্যয় করে গিয়েছেন তিনি। পয়সা রোজগার করেন নি কোন দিনই। রোজগার করার যোগ্যতাও ছিল না বড়ঘরের শেষ বংশ-প্রদীপের। কিন্তু ব্যয় করার দরাজ দু'খানা হাত ছিল তাঁর।

শেষ বয়েসের ছেলে রামসদয়বাবু। তার আগে অনেকগুলি ভাই-বোন জন্মে মরেছে—জন্মাবার আগেও মরেছে। রামসদয়বাবু তাই শিশুকালে আদুরে দুলাল ছিলেন।

অমিতব্যয়ী পিতার শেষ বয়েসের দুর্দশা রামসদয়বাবু চোখে দেখেছেন—কী লাঞ্ছিত ইতিহাস! কী দুর্দশাগ্রস্ত জীবন! রামসদয়বাবুর বাল্যকাল রাজার হাতী চড়ার জীবন; কিন্তু হাতী আর পোষা গেল না। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে শেষ কণাটুকুও নিঃশেষিত হল। বাড়ি গেল, ঘর গেল দেনার দায়ে। নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়রা প্রথমে অনুগ্রহ দেখালেন। পরে দূর দূর করে তাড়ালেন। দূর সম্পর্কের চেনা-জানা বন্ধু-বান্ধব কোথাও আর বাকী নেই। পর্বতপ্রমাণ দেনা। কিশোর কাল থেকে যৌবন কাল পর্যন্ত রামসদয়বাবুর জীবন লাঞ্ছিত।

মা কেবল চোখের জল মুছে বলতেন, 'রাজার দাবা বোড়েতে মাৎ হল। একটু যদি বুঝে চলত, তাহলে কী এই দুঃখ পেতে হয়!'

তখন থেকেই রামসদয়বাবু হিসেব শিখেছেন, হিসেবী হয়েছেন। টাকা আনা পাই এর অঙ্কে দক্ষতা অসামান্য তাঁর। আয়-ব্যয়ে জমার ঘর ভর্তি করার আশ্চর্য মুন্সিয়ানা!

হিসেবী বলেই রামসদয়বাবু আবার দাঁড়িয়েছেন। মামার বাড়ির অনুগ্রহ-আশ্রয় থেকে নিজের পাকা আশ্রয় তৈরী করেছেন। বাপ আগেই মারা গেছেন। গঙ্গার ঘাটে তিল-কাঞ্চনের তিলাঞ্জলির শ্রাদ্ধ হয়েছিল। মায়ের মৃত্যুতে কিন্তু ঘটা করে ষোড়শ করেছিলেন।

মামাদের অনুগ্রহে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে নিজের বুদ্ধিতে জাহাজ কোম্পানির বড় সাহেবকে ধরে কোনরকমে পঁচিশ টাকার টালি ক্লার্ক। তারপর বিবাহ এবং ধাপে ধাপে উন্নতি। শেষকালে জাহাজ কোম্পানি অফিসের বড়বাবু। মাসে তিনশো টাকা মাইনে। হ্যারিশ সাহেবের সঙ্গে ডিনার খেয়েছেন এক সঙ্গে, মদের টেবিলেও বসেছেন, রেসকোর্সের ঘোড়ার নামও সাহেবকে বাৎলে দিয়েছেন, খিদিরপুরের কুখ্যাত গলি থেকেও রাত-বেরাতে মাতাল সাহেবকে তাঁর বাঙলোয় পৌঁছে দিয়েছেন, পুলিশ কেসও তদ্বির করেছেন; কিন্তু নিজে কখনও হিসেবের বাইরে যাননি। আর যাননি বলেই ইংরেজের আমলের পরেও মাড়ওয়ারি জাহাজী ফার্মে সর্বময় কর্তা হয়ে নিরামিষ-ভোজীদেরও সুনজরে থেকেছেন।

উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উঁচু দিকেই উঠেছেন চিরকাল—নামতে শেখেননি। কলকাতা শহরে বাড়ি, গিন্নীর গা-ভরা গয়না। দুটি মেয়েকে দস্তুরমত খরচ করে সৎপাত্রে সমর্পণ, একটি মাত্র ছেলেকে মনের মতন করে মানুষ করা—রামসদয় মিত্তিরের সার্থক জীবন-নামা।

গিন্নী কিন্তু হিসেব জানে না। আর তাই নিয়েই সংসারে খিটির মিটির।

মাস-মাইনে পঁচিশটাকার সংসারে রামসদয়বাবুর স্ত্রী সুধাময়ীর না হয় করণীয় কিছুই ছিল না; কিন্তু পঁচিশ টাকা থেকে তিনশ টাকার বড়বাবুর গৃহিণী—তা বলে এক পয়সা খরচের জন্তে স্বামীর মুখাপেক্ষী হবেন কেন?

হিসেবী রামসদয়বাবু তা ...নে তুলবেন না।

'দশটা টাকা রেখে যেও।'

অফিস বেরুচ্ছিলেন রামসদয়বাবু। সুধাময়ীর কথায় ফিরে তাকালেন, 'কেন? দশটাকা কী হবে?'

'সুনীল আর মলিনা আসবে আজ। খবর পাঠিয়েছে।'

'খবরটা আনলে কে?'

'যমুনা আর পুলিন।'

যমুনা রামসদয়বাবুর প্রথমা কন্যা। পুলিন তার স্বামী। ক'দিন হল বড় মেয়ে আর বড় জামাই আছে—নাতি পুতি ও সেই সঙ্গে। একেই তার জন্যে বাড়তি খরচ—রামসদয় বাবু চটেছিলেন। তার ওপর মেজ জামাই এবং মেজ মেয়ের আসার খবরে একেবারে সপ্তমে উঠলেন, 'তবে যে শুনলাম, পুলিন চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত!'

'হাঁ, বলে কয়ে আমিই কটা দিন আর রাখলাম। আবার তো সেই ধাব-ধাড়া গোবিন্দপুরে যাবে, কতদিন যে আসতে পারবে না তার ঠিক ঠিকানা নেই।'

'তার অফিসের ছুটি তো ফুরিয়ে এসেছে। কাজে জয়েন করবে না?'

'না আরো পনের দিনের ছুটির দরখাস্ত করে তার পাঠিয়েছে।'

'আমায় চরিতার্থ করেছে!' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন রামসদয়বাবু।

'ছি, ছি, ছি! মেয়ে-জামাই না ঘরে রয়েছে। শুনতে পেলে ভাববে কী? তুমি বাপ, না চামার? পয়সাটাই তোমায় জীবনের এত বড় সম্পদ! স্নেহ-মমতা এসব কী কিছুই নেই?' গলার স্বর ভিজে হয়ে এল সুধাময়ীর।

'আহা, তা কেন? তা কেন? বেশি ছুটি নিলে অফিসিয়াল রেকর্ড খারাপ হয়ে যায়। আর তাতে উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না।' রামসদয়বাবু হিসেবী গলায় বললেন।

'রেখে দাও তোমার অফিসের উন্নতির কথা! পঁচিশ টাকা থেকে তিনশ টাকার জীবনে ঢের উন্নতি দেখলাম। একটা পয়সার জন্যে যেখানে ভিখারিণীর মতন হাত পাততে হয়—সেখানে আবার জীবন! এমন হা-ঘরে বাপ-মা কেন যে তুলে দিয়েছিল, কেন যে নুন খাইয়ে আমায় মারেনি'—কান্নায় ভেঙে পড়ল সুধাময়ী।

রামসদয়বাবু প্রমাদ গণলেন। তবুও হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না। দশ টাকা থেকে আট টাকায় রফা করলেন—'আর টাকা এখন আমার কাছে নেই, এইতেই চালিয়ে নিও আজ।'

সারা দিন হয়ত সুস্থ মনে কাজ করতে পারেন নি রামসদয়বাবু। পুলিন, যমুনা—তাদের ছেলেপিলে আরও পনেরদিন থাকবে। সুনীল আর মলিনা কলকাতা শহরে থাকলেও বাপের বাড়ির মায়া তা বলে কী তাদের কম?

শুধু মেয়ে-জামাই নয়, নাতি-নাতনিও নয়, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী সকলের বেলাতেই দরাজ দিল্ সুধাময়ীর।

আগে আঁটতে পারতেন রামসদয়বাবু স্ত্রী সুধাময়ীকে। পঁচিশ টাকা থেকে তিনশ টাকার ধাপে সুধাময়ী ছিল স্বামীর বশে। কিন্তু কী করে না জানি সুধাময়ী টের পেয়েছে অনেক টাকার মালিক রামসদয়। আর জরের চেয়ে যেমন পিলে বড়, তেমনি মাসমাইনের চেয়ে উপরি পাওনা অনেক বেশি। তারপর থেকে সুধাময়ী দু'হাতে খরচ করতে সুরু করেছে।

বড়বাবু থেকে আরো পদোন্নতি। রামসদয়বাবু অফিসার। পাঁচশ টাকা মাইনের সুপারেণ্টেনডেণ্ট। সেকেণ্ডক্লাশ ট্রামে আর অফিস-যাওয়া চলে না। অগত্যা ফার্ষ্টক্লাশ ট্রামেই যেতে-আসতে হয় রামসদয়বাবুকে। তা বলে অপর কোন বাবুয়ানা নেই। কিন্তু সুধাময়ী তা বুঝবার পাত্রী নয়। ট্যাক্সি ছাড়া পথ চলতে আজকাল আত্মসম্মানে বাধে।

কর্তা অফিসে যাবেন। সংসারের কাজ-কর্ম আগে-ভাগেই সেরে রেখেছে সুধাময়ী। ছেলেও আজ তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে কলেজ বেরিয়ে গেছে—কী যেন ফাসন আছে আজ কলেজে। আর তার জন্যে টাকা চাইতে গিয়ে বাপ-ছেলেতে এক প্রস্থ হুলুস্থুল বেঁধে গিয়েছিল।

'কিছু টাকার দরকার বাবা।'

অফিসের খাওয়ার আগে দাড়ি কামাচ্ছিলেন রামসদয়। টাকার কথা শুনেই বিগড়ে গেলেন, 'কেন, আবার টাকা কেন?'

ছেলে পরিতোষ তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে গিলে-করা পাঞ্জাবী আর পায়জামা পরে বাপের সামনে হাজির।

'কলেজে আজ সোশ্যাল, কিছু খরচ আছে। আর চাঁদাও দেওয়া হয়নি।'

'কলেজে গেছ লেখাপড়া শিখতে। নাচ-গান হৈ-হুল্লড়ে বাজে খরচ করবার জন্যে নয়!'

বাপের কথায় পরিতোষ ক্ষুব্ধ হল। সুধাময়ী এসে দাঁড়াল।

'আহা, মুখ ফুটে কখনও চায় না। দিলেই বা ক'টা টাকা!'

'টাকা গাছের ফল নয়।'

'তা বলে দরকারটাও তো মিছে নয়?'

সুধাময়ীর কথায় পরিতোষ সাহস পেল, 'বাবাকে কী করে বোঝাই মা—যে আজকাল কলেজে এসব খরচ করতেই হয়!'

সুধাময়ী আর একধাপ এগিয়ে গেল, 'কী করে বুঝবে বল? নিজে তো আর কলেজের মুখ দেখেনি। চিরকালই টাকা টাকা করে যখ্যির ধন আগলাচ্ছে।'

দুর্বল স্থানে আঘাত করেছে সুধাময়ী। রামসদয় নীরবে পাঁচটাকার একখানা নোট ছুঁড়ে দিলেন।

তারপর স্নানাহার করে অফিস যাওয়ার পালা। সুধাময়ী ও তৈরী। জরির সোনালি পাড়ের চওড়া শান্তিপুরে শাড়ী, গায়ে বডি-টাইট ব্লাউজ, পায়ে দামী মেয়েদের চটি।

সুধাময়ী বললে, 'দাঁড়াও, ট্যাক্সি ডাকতে পাঠিয়েছি।'

'মানে?' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর প্রতি চাইলেন রামসদয়বাবু।

'মলিনার শাশুড়ী, বেয়ান আজ নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন—দুপুরে তাঁর বাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে সাধক রামপ্রসাদ বায়োস্কোপ দেখতে যাওয়ার জন্যে।'

বিস্মিত রামসদয়বাবু বললেন, 'তা, ট্যাক্সি কেন?'

'বারে! অফিসারের বউ, একটা ইজ্জত তো আছে?'

'তা, আমাকে কী করতে হবে?' খিঁচিয়ে উঠলেন রামসদয়বাবু।

'আমাকে পৌঁছে দেবে; আর সেই ট্যাক্সিতেই তুমি অফিস যাবে। কিছু টাকাও দাও। টিকিটের দাম বেয়ান দিচ্ছেন। আমারও তো চক্ষু লজ্জা আছে। কিছু লৌকিকতা করতেই হবে।'

সুধাময়ী কিছুতেই বুঝবে না এখন আর। সারা জীবন ধরেই সঞ্চয়ীর হাতে আত্ম-প্রবঞ্চনাকে কুড়িয়ে এসেছে। এখন পাঁচশ টাকার অফিসারের স্ত্রী। জীবনে ভোগ-বিলাসের সময়।

না পারলে সংসারে অশান্তি। কান্নাকাটি। ছেলে-মেয়েদের সামনে, ঝি-চাকরের উপস্থিতিতে এই নিয়ে কত আর সংগ্রাম করবেন রামসদয়বাবু?

দেহি, দেহি! সংসারে শুধু দেহি দেহি ভাব। পাকা কাঁঠাল পেয়েছে যেন সবাই মিলে রামসদয়বাবুকে। শুধু খরচ আর খরচ। নিজের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী নয়—আত্মীয়-স্বজনের বেলাতেও এমন কী দরিদ্র পাড়া-পড়শীদের অভাব-অভিযোগেও সুধাময়ী সুধাদাত্রী।

রামসদয়বাবু প্রমাদ গণলেন। পাঁচশ টাকার অফিসার—দুর্মূল্যের বাজারে কতটুকু দাম? সঞ্চয়কে আঁকড়ে ধরেছেন তিনি কী সাধে? সুধাময়ী কী জানে না, কী অবস্থার দুর্বিপাক এই সঞ্চয়ীর দৃষ্টিকে খুলে দিয়েছে রামসদয়বাবুকে। পর্বতপ্রমাণ পিতৃঋণ, মায়ের চোখের জল, বন্যার খড়ের ন্যায় এ-দুয়ার, সে-দুয়ারে ভেসে ভেসে কেমন করে রামসদয় আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন!

পঁচিশ টাকা থেকে তিনশ টাকার জীবনে সুধাময়ী তা মেনে নিয়েছিল। পাঁচশ টাকার জীবনে তা আর মানতে সে প্রস্তুত নয়। তারও জীবনে সাধ-আহ্লাদ আছে!

পাঁচশ টাকাতেই রিটায়ার করতে হল রামসদয়বাবুকে। মাড়ওয়ারি জাহাজী কোম্পানি আর হাতী পুষতে চায় না। ব্যবসার মন্দা বাজার।

রামসদয়বাবুর আফশোষ করবার কিছু নেই। প্রচুর দোহন করেছেন। সংসারেও আর কোন ঝকি নেই। দুটি মেয়েই সৎপাত্রে ন্যস্ত।

ছেলে পরিতোষও মানুষ হয়েছে। আর লেখা-পড়া শিখে চাকরিও মন্দ করেনা।

ছেলের বিয়ে দিয়েছেন রামসদয় বেশ ভালো ঘরে। এখন নিশ্চিন্ত অবসর।

কিন্তু আশ্চর্য পরিবর্তন সুধাময়ীর। গুণে গুণে হিসেব করে বাজারের পয়সা দেয় স্বামীকে, 'বুঝে সুঝে খরচ করো। তোমার আবার যা নজর! মাছ পাওয়া যায় না, অত নবাবী করে মাছ আনা কেন?'

'পরির যে মাছ ছাড়া খাওয়া হয় না! আর দু'জন সধবা ঘরে, মাছ না হলে কী চলে?' ভয়ে ভয়ে উত্তর দেন রামসদয়বাবু।

'খুব চলে। যখন যেমন অবস্থা, তখন তেমন ব্যবস্থা। পরির আমার যেমন আয়, তেমনি বুঝে-সুঝে চলতে হবে তো।'

মাসের শেষে ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ আনতে গিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে রামসদয় বাবু। ছেলের একার আয়ে আর চলেনা। দিন দিন বাজারে আগুন লাগছে। কত টাকার কত সুদ তাও সুধাময়ীর হিসেব জানা।
ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে রামসদয় সুদের টাকা গুণে দিলেন স্ত্রীর হাতে। সুধাময়ীই এখন সংসারের কর্ত্রী। আয় ব্যয় তারই হাতে।

'একি! দশ টাকা কম কেন?'

সুধাময়ীর কথায় বিপন্ন বোধ করলেন হিসেবী রামসদয়। আমতা আমতা করে বললেন, 'দশটা টাকা একজন ধার নিলে। অফিসের সহকর্মী। এক সঙ্গেই কাজ করেছি তিরিশ বছর। কেরানিই থেকে গেল সে। আর উঠতে পারলে না। কোম্পানি তাকেও নোটিশ দিয়েছে। আজ দু'মাস চাকরি নেই। বুড়ো বয়সে বড্ড কষ্টে পড়েছে।

'আহা, দাতাকর্ণ আমার! তা দান করতে হয়, নিজের রোজগারে করনা কেন, একটা কথাও বলতে যাব না। আমার পরির এই আয়! দুটো তিনটে কাচ্চা বাচ্চা, তারা নিজেরা দু'জন। তার ওপর আমরা আছি গলগ্রহ হয়ে। লোক-লৌকিকতা আছে, সংসারে এস-জন বস-জন আছে—বাছা কী আমার শেষ কালে পথে দাঁড়াবে?' খিঁচিয়ে উঠল সুধাময়ী।

রামসদয়েরই হিসেবে ভুল হয়েছে। ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা, সঞ্চিত তাঁর সমস্ত অর্থ সম্পত্তি এখন আর তাঁর নিজের কিছুই নয়। যাদের জন্যে তিলে তিলে সঞ্চয় করেছিলেন এখন এ-সমস্ত পাওনা একমাত্র তাদেরি। পাঁচশ টাকা কেন, পঁচিশ টাকা থেকেও এখন আর তিনি জীবন শুরু করতে পারেন না। লেখাপড়া শেখেননি যে দুটো টিউশনি করবেন—আর কোন অফিসের দরজাই আর জাহাজ কোম্পানীর রিটায়ার্ড সুপারিনটেনডেন্টের জন্যে খোলা নেই।

সত্যিই হিসেবে ভুল হয়ে গেছে তাঁর। কৃতজ্ঞ কণ্ঠে ত্রুটি স্বীকার করে নিলেন রামসদয়; 'সত্যিই সুধা, তোমার হিসেবই ঠিক। বুঝে সুঝে চলা উচিত, যে দুর্মূল্যের বাজার, তাতে হিসেবী না হলে গোটা সংসারটাকেই পথে দাঁড়াতে হবে!'

মিলন রাতি

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

হিজলের ডালে মুখোমুখী দু'টি পাখি
স্থির-বিস্ময়ে—চেয়ে রয়, চেয়ে রয়;
রজনীগন্ধা মধুকরে বলে ডাকি—
তোমার আমার এই রাত মধুময়।
চাঁদ হেসে বলে প্রেয়সী কুমুদটিরে
চেয়ে দেখ আমি আবার এসেছি ফিরে,

তুমি আর আমি—আমাদের পরিণয়
মিছে নয় ওগো, কখনোই মিছে নয়।
কবি বলে তার মানসীর কানে কানে,
এই রাত আজ কেটে যাক্ হাসি-গানে;
আর দূরে নয়, সমুখে দাঁড়াও হাসি
হাতে হাত রেখে বলো ওগো ভালবাসি।

মিলনের রাতি বয়ে যায়, বয়ে যায়
মন যেন আজ তোমাকেই কাছে চায়!

তাস-খেলা

শ্রীরমাকান্ত গুপ্ত

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন—আমি বুড়াবয়সে তাস খেলিতে এত ভালবাসি কেন? ইহাদের অধিকাংশই তাস খেলা জানেন না। কয়েকজন খেলার নিয়ম জানেন, ক্বচিৎ কদাচিৎ খেলেনও, কিন্তু ইহাতে বিশেষ আসক্তি নাই। প্রথম শ্রেণীর প্রশ্নকর্ত্তাদিগকে সঠিক জবাব দেওয়া কঠিন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অবগতির জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়র মানুষের জীবনকে রঙ্গমঞ্চের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার একটু বিশ্লেষণ দরকার। কত কটা বয়স পর্য্যন্ত মানুষ থাকে অভিনেতা। তারপর সে হয় দর্শক। বৎসর ও মাসের মাপকাঠিতে এই দুয়ের সীমা-রেখা নির্দ্দেশ করা যায় না। ৭০ বৎসর বয়সে আমাদের প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি বড় বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বার, করুণ ও হাস্যরসের পরিবেশন করিতেছেন—গৌড়জন আনন্দে করিছে পান সুধা (কারণ খাদ্যের অভাব) নিরবধি। ওদিকে ৬০ বৎসর পার না হইতেই অথবা তাহার বহু পূর্ব্বেই অনেকেই অভিনেতার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দর্শকের আসন অধিকার করিয়াছেন। ইহাদিগকেই প্রকৃত 'বুড়া' বলা যায়। প্রাচীন স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাই ইহাদের একমাত্র সম্বল। গরু যেমন রোমন্থন করে ইহারাও তেমনি পরিচিত জিনিষের পুনরাবৃত্তি দেখিয়া মনের খোরাক সংগ্রহ করেন।

এই অবস্থায় তাস খেলার মত এমন সহায় আর নাই। কারণ ইহা মানুষের এবং সংসারের প্রতীক। এমন আর কোন খেলা নাই যাহাতে জীবনের বৈচিত্র্য, দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের ছবি এমন স্পষ্ট আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনেকেই এই পরম তথ্যটি উপলব্ধি করেন না—সুতরাং ইহার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আজকাল তাস খেলা বলিতে আমরা বুঝি কন্‌ট্রাক্ট ব্রিজ (Contract Bridge) সুতরাং তাহার সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক্। এই খেলা খেলিতে হইলে প্রথমেই সঙ্গী নির্ব্বাচনের পালা। ইচ্ছামত সঙ্গী নির্ব্বাচনের উপায় নাই—অদৃশ্য দুইখানি তাস টানার ফলে যে কেহ সঙ্গী নির্ব্বাচিত হইবে, তাহারই সহিত ভাগ্য মিলাইয়া খেলা সুরু করিতে হইবে। পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন—অন্যান্য খেলার তুলনায় তাস খেলার সহিত জীবনের কি নিকট সম্বন্ধ। ফুটবল কি ক্রিকেট খেলায় নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ মত এক দলে যোগ দিয়া খেলা যায়। কিন্তু তাস খেলায় তাহা অদৃষ্টের হাতে ছাড়িয়া দিতে হয়। মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে তখন তাহার অবস্থাও কি ঠিক এই-রূপ নহে? কেহ বা ধনীর একমাত্র পুত্র হইয়া ইহলোকের সকল সুখসম্পদের অধিকার লইয়াই জন্মে। কেহবা দরিদ্রের অষ্টম কন্যার মত অভিশাপের মতই সংসারে প্রবেশ করে। তারপর জীবনের সঙ্গী-নির্ব্বাচনও অনেক স্থলেই তাসখেলার সঙ্গীর মতই। কপালে যে আসিয়া জোটে তাহাকেই গ্রহণ করিয়া সংসারের খেলায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। গৃহিণীর ধনী পিতার সাহায্যে অথবা তাহার গৃহস্থালীর নিপুণতায় যেমন অনেকে সংসারে বাজিমাৎ করে তেমনি তাস খেলারও সঙ্গীর গুণেই বাজী জিতিয়া যায়। দৈনন্দিন সংসার-যাত্রায়ও যেমন গৃহিণীর মেজাজের উপর কর্ত্তার সুখ-দুঃখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে তাস খেলায়ও ঠিক তেমনি। শ্রীযুক্ত ন-বাবু আমার খেলার সঙ্গী হইলেইবুঝি, কপালে আজ অনেক দুঃখ আছে। কারণ তিনি যাহা ভাল মনে করেন তাহাই ভাল খেলা—তাহার অন্যথা হইলেই প্রথমে মুখ-ভঙ্গিতে বিরক্তি, পরে ঈষদুচ্চারিত বাক্যে অসন্তোষ প্রকাশ, সর্ব্বশেষে স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া বকা-বকি ও ঝগড়া—কখনও বা হাতের তাস ফেলিয়া প্রস্থান। এ বিষয়ে সঙ্গী তো দূরের কথা, নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তির মতেরও কোন মূল্য তাঁহার কাছে নাই। বলা বাহুল্য আজ যাহা তিনি খেলার নীতি বলিয়া ঘোষণা করেন দুই দিন বাদে ঠিক তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা-

বোধ করেন না এবং যেহেতু (তাস খেলা ও সংসার যাত্রা উভয় ক্ষেত্রেই) এই দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল মত লিখিয়া রাখা সম্ভব হয় না, সেই হেতু পূর্ব্ব মতের দোহাই দিয়াও কোন সুফল হয় না! এইরূপ তাসের সঙ্গীর সহিত জীবনের সঙ্গীর কি সাদৃশ্য তাহা আর বিশদ করিয়া বলিতে চাই না। কারণ এ বুড়া বয়সেও গৃহিণী বর্ত্তমান—এবং যাহা কিছু বলিব তাহাই আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি এরূপ মনে করিয়া লইলে তাস খেলার শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবার সম্ভাবনা।

সঙ্গী নির্ব্বাচনের পরে তাস কাটিয়া প্রত্যেককে তের খানা করিয়া তাস দেওয়া হয়। কিন্তু সংখ্যায় সমান হইলেও প্রতি খেলোয়াড়ের হাতের তাসের মূল্য বিভিন্ন—অনেক সময় আকাশ পাতাল তফাৎ হইতে পারে। কেহ হয়ত এমন তাস পাইলেন, যাহাতে কোন মতেই দুই পিঠও পাইবার সম্ভাবনা কম—আবার কেহ হয়ত তাসের জোরে একেবারে গ্র্যাণ্ড স্লাম ডাকিয়া তের পিঠই পাইলেন। এবিষয়েও তাস খেলার সহিত অন্য খেলার প্রভেদ। দাবা খেলায় দুই পক্ষই সমান গুটি লইয়া আরম্ভ করেন। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় যতদূর সম্ভব দুই পক্ষ সমান সুবিধা উপভোগ করেন। কিন্তু তাস খেলায় দুই পক্ষ অদৃষ্টক্রমে যে তাস পান, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই খেলা আরম্ভ করিতে হয়। সংসার-যাত্রায়ও কি আমরা ঠিক ইহাই দেখিতে পাই না? কোন দুইজন লোক কি ঠিক এক-প্রকার সুযোগ ও সুবিধা লইয়া জীবন আরম্ভ করে? কেবল যে জন্ম দৈবাধীন তাহা নহে, জীবনের প্রতি পদে এই বিষয়ে বৈষম্য দেখা যায়।—জীবন-যাত্রীর পথ অথবা মূলধন কোন দুই জন মানুষের একরূপ—ইহা সচরাচর বড় দেখা যায় না। এবিষয়ে বিভিন্নতাই সংসারের সাধারণ নীতি এবং ইহা অদৃষ্টের ফল বলিয়াই আমরা মনে করিয়া থাকি। সুতরাং তাস খেলায় যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই জীবনের প্রতীক—সংসারের স্বাভাবিক নিয়মের অনুবর্ত্তী। দাবা, ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার যে নিয়ম তাহা কৃত্রিম—বাস্তব জীবনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

তাস খেলার সাধারণ পদ্ধতির সহিতও বাস্তব জীবনের যে প্রকার নিগূঢ় সম্বন্ধ, অন্য কোন খেলায় তাহা দেখিতে পাই না। তাসগুলি চারি রঙে বিভক্ত—ইস্কাবন, হরতন, রুহিতন, চিড়িতন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত ও বন্ধু সংসারের এই চারিটি প্রধান সম্বলের সহিত ঐ চারি রঙ্গের তুলনা অনায়াসেই মনে আসে। ইহার যে কোন একটি অঙ্গের তুলনায় বেশী থাকিলে যেমন সংসার যাত্রার সুবিধা হয়, তাসের চারি রঙ্গের একটি যদি হাতে বেশী থাকে তবে খেলায় জিতিবার সম্ভাবনা। কিন্তু কেবল সংখ্যায় বেশী থাকিলে চলে না। কারণ প্রত্যেক রঙ্গের মধ্যে শ্রেণী ভেদ আছে। বিদ্যায় যেমন পিএইচ-ডি, এম্-এ, বি-এ, এফ-এ, ম্যাট্রিক প্রভৃতি—তাসেও তেমনি টেক্কা সাহেব বিবি, গোলাম, দশ। তারপর স্কুলের নবম অষ্টম প্রভৃতি শ্রেণীর সহিত তাসের নয় আট সাত হইতে দুই অথবা দুরীর তুলনা হইতে পারে। বুদ্ধি, বিত্ত ও বন্ধু সম্বন্ধেও অনায়াসেই এরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। যেমন মারো-য়াড়ীর ব্যবসায়-বুদ্ধি কলিকাতায় তেতালা বাড়ী অথবা মন্ত্রীবন্ধু ইহারা টেক্কার সামিল। ব্যাঙ্ক ফেল করাইয়া পরের টাকা আত্মসাৎ করার কৌশল, বড় বড় কোম্পানীর শেয়ার অথবা ডেপুটি মন্ত্রী-বন্ধু সাহেবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইহারা অনেক সময় কার্য্যকরী হয়, অনেক সময় হয় না—যেমন যার হাতে সাহেব থাকে তাহার ডান দিকের বিপক্ষের হাতে সেই রঙ্গের টেক্কা থাকিলে সাহেবের পোয়া বারো', কিন্তু বামদিকে টেক্কা থাকিলে সাহেবের মূল্য কাণা কড়িও নহে। গত দুই বৎসরের কলিকাতার ইতিহাস যাহারা বিশেষ ভাবে জানেন, সংসার-যাত্রার 'সাহেবের এরূপ অনেক কাহিনীই তাঁহারা স্মরণ করিতে পারিবেন। বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলে মানহানির মোক-দ্দমায় জড়াইবার সম্ভাবনা আছে। সরকারী সহায়তায় বিরাট প্রদর্শনী প্রভৃতি খুলিয়া তাহার আয়-ব্যয়ের হিসাব বেমালুম চাপিয়া নিজের—ব্যাঙ্কব্যালেন্স বৃদ্ধি করার হাত-সাফাই—বড় বড় সরকারী কন্‌ট্রাক্ট (বিমান ভূমি নির্ম্মাণ হইতে চাউল সরবরাহ প্রভৃতি) এবং মন্ত্রীর আপন-জনের (অধিক ব্যাখ্যায় অশ্লীলতা অপবাদের সম্ভাবনা) সহিত ঘনিষ্টতা—বিবির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রূপ-যৌবন, হাবভাব বিলাস এবং চাটুবাক্য প্রভৃতি নারীজন-সুলভ মনোরঞ্জনের উপকরণ থাকিলে ইহার পূর্ণ সার্থকতা। তাস খেলায় শুধু বিবির বিশেষ কোন মূল্য নাই, কিন্তু সঙ্গে টেক্কা কি সাহেব থাকিলে তাহাকে মারে কে? তেমনি

প্রদর্শনী বা কনট্রাকট প্রভৃতিতে সরকারী সাহায্য বা পোষকতা না থাকিলে তাহাতে বড় একটা সুবিধা হয় না। (তাসে বিবির পরেই গোলামের মূল্য) আজকাল সংসারে গোলাম' যে প্রকার দুর্ল্লভ তাহাতে বিবির পরেই ইহার স্থান দিতে কেহই বোধ হয় কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। বরং এমনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে যে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত গ্রাবু খেলার নিয়ম অনুযায়ী গোলামই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

সংসারে দশজনের মত বা সহায়তার যে মূল্য, তাসের 'দশ'—এর মূল্যও অনেকটা সেই রকম। অর্থাৎ সাধারণতঃ ইহাকে কেহ একটা বড় গ্রাহ্য করে না। কিন্তু টেক্কা-সাহেব-বিবি-গোলাম প্রভৃতি বড় বড় মুরুব্বির অভাব হইলে অনেকেই ইহার দোহাই দেন। তাসের মধ্যে ইহা সর্ব্বকনিষ্ঠ 'অনার কার্ড—বাস্তব জীবনেও তাই। অর্থাৎ আর কোনও সম্মানের দাবী না থাকিলে পাড়ার 'দশজনের' সহানুভূতি অথবা সমর্থনই আত্মগৌরবের উপাদান হয়।

দশের নীচে যে সমুদয় তাস সাধারণত তাহার মূল্য বড় বেশী নহে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে বা সঙ্গগুণে সময় সময় তাহারও দুর্জ্জয় প্রতিপত্তি হয়। যেমন অবস্থাবিশেষে রঙ্গের দুরি দিয়াও বিপক্ষের টেক্কা তুরুপে ঘায়েল করা যায়। সংসারেও ইহার অনুরূপ ঘটে। পাড়ার হাবলা, গ্যাবলা কেবলও জেল খাটার নজিরে বিধান পরিষদের সদস্য পদ লাভ করিয়া একটা কেষ্টবিষ্টু হইয়া পড়ে। তারপর যদি বিধির বিধানে অথবা বিধানের বিধিতে ডেপুটি-মন্ত্রীর পদ পায়, তবে তাহার ঠেলা সামলায় কে? পাড়ার মাতব্বরকেও সে নাজেহাল করিয়া ছাড়িতে পারে। কিন্তু পরের বাজিতে যদি রঙ্ বদলায়, তবে যে দুরি আবার সেই দুরি। দৃষ্টান্ত—গত সাধারণ নির্ব্বাচনে পরাজিত সদস্য ও মন্ত্রীর দল।—একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিলে তাসের সহিত বাস্তব জীবনের এরূপ আরও অসংখ্য মিল দেখান যাইতে পারে। পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে এই খানেই বিরত হইলাম।

তাস বিলি হইবার পর ডাকের পালা। যাহার হাতে যে রংয়ের তাসের জোর—তিনি সেই রঙ্গের এক দুই করিয়া ডাক চড়ান—নীলামের দরের মত ইহা বাড়িয়াই চলে, পরে সর্ব্বোচ্চ দর যিনি হাঁকেন তিনিই সেই বাজী খেলিয়া লাভবান হইবার অধিকার লাভ করেন। একজন ডাকিলেন ইস্কাবন এক, আর একজন ডাকিলেন রুহিতন দুই, আর একজন হাকিলেন চিড়িতন/ তিন—ইত্যাদি। যখন এই রকম ডাক শুনি তখন আমার মনশ্চক্ষে চাকুরীর উমেদারদের চিত্র ভাসিয়া উঠে। কেহ বলিতেছেন—আমি এম্-এ, অথবা পিএইচ-ডি, কেহ পুরাণ অভিজ্ঞতার সাহায্যে নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিতে ব্যগ্র, কেহ পরোক্ষে টাকার থলির ইঙ্গিত দেখাইতেছেন—আবার কেহ বা সাড়ম্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে অমুক মন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রীর সহিত তাহার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যেমন ইস্কাবন বড় হইলেও দুই-ইস্কাবন তিন চিড়িতনের কাছে দাঁড়াইতে পারে না, তেমনি বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত বা বন্ধুর পরপর আপেক্ষিক শ্রেষ্টত্ব স্বীকার করিলেও স্থল বিশেষে অধ্যাপকের পদের জন্যও পিএইচ-ডি কে ফেলিয়া এম-এ পাশ করা মন্ত্রীর শ্যালককে নিযুক্ত করা হয়।

তারপর তাসে যেমন 'নো-ট্রাম্প' সকল রঙ্গের চাইতে বড়, সংসারেও তেমনি যার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত ও বন্ধু সকল দিকেই কিছু জোর থাকে তার দাবী সকলের উপর।

ডাকের পর খেলার আরম্ভ হয়। খেলার আরম্ভেই যাঁর ডাক বজায় থাকে তাঁর সঙ্গীর হাতের তাস খুলিয়া সকলের সম্মুখে রাখিতে হয়। সেই সঙ্গীর নাম 'ডামি'। সেই ব্যক্তি খেলায় তাঁহার কিছুই করিবার অধিকার থাকে না। নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের ন্যায় তিনি চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পান না, কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পান না। 'অবলা' নারীর ন্যায় বদন থাকিতেও কথা বলিতে পারেন না। কেবল সঙ্গী নিতান্ত নীতিবিগর্হিত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলে (অর্থাৎ হাতে কোন রঙ্গের তাস থাকা সত্ত্বেও তাহা দিতে ভুলিলে) মৃদুস্বরে তাহাকে এবিষয়ে সচকিত করিতে পারেন। খেলোয়াড় ও তাঁহার সঙ্গী-ডামির সম্বন্ধ আমাদের গভর্ণর ও প্রধানমন্ত্রীর মত। গভর্ণরের কোন কিছুই গোপন করিবার নাই, তিনি এখন সাধারণের সম্পত্তি। কনভোকেশনের সভাপতিত্ব হইতে পানের দোকান উদ্ঘাটন—সকলই তাঁহার করণীয়। খালি গায়ে খেলো হুঁকা হাতে করিয়া বসিতেও তিনি কোনরূপ সঙ্কোচ করেন না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নির্দ্দেশ ছাড়া তাঁহার কিছু করিবার বা বলিবার সাধ্য নাই।

তিনিও চক্ষু থাকিতে দেখিতে পান না, কর্ণ থাকিতে শুনিতে পান না। প্রধানমন্ত্রী যে তাস খানি দিতে বলিবেন তিনি নির্ব্বিচারে বিনা দ্বিধায় তাহা করিতে বাধ্য। কাউন্সিলের ছয়জন সদস্য মনোনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার নিজের গৃহস্থালীর অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন—সর্ব্বত্রই এই একই নিয়ম চলে।

ডামির হাতের তাস খুলিয়া রাখিবার পরেই রীতিমত খেলা আরম্ভ হইল। এই খেলার সহিত বাস্তব জীবন-যাত্রার যে অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত সাদৃশ্য তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পাঠক যদি আধ-ঘণ্টা কালও ধৈর্য্য ধরিয়া পাশে বসিয়া এই খেলা দেখেন, তবে আমার উক্তির সত্যতা স্বীকার করিতে-বাধ্য হইবেন। সংসারচক্রের নানা আবর্ত্তনে ঘুরিয়া সাত ঘাটের জল খাইয়া মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে আপনার যে অভিজ্ঞতা হইবে এই তাসের আসরে বসিয়াই তাহার সমান অথবা অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। এমন কোন খেলা আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই—যাহাতে মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ এমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে।

মানুষের জীবন সঠিকভাবে পরিচালনা করিবার জন্য যেমন নীতি অথবা ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, তেমনি ব্রিজখেলার কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্যও বহুসংখ্যক বই আছে। কিন্তু সম্প্রদায় ভেদে যেমন কেহ মানেন মনুসংহিতা, কেহ মানেন বাইবেল, আবার কেহ বা কাল মার্কসের ক্যাপিটাল অথবা তাহার আধুনিকতম ষ্ট্যালিন সম্পাদিত রাশিয়ান সংস্করণকেই জীবনের চালক স্বরূপ গ্রহণ করেন, তাস খেলায়ও তেমনি কেহ কালভাসন কেহ লেখকের অনুবর্ত্তন করেন। কাহাকে প্রামাণিক স্বরূপ গ্রহণ করা যাইবে খেলিবার পূর্ব্বেই তাহার সম্বন্ধে একটা বোঝা-পড়া করিয়া লইতে হয়। নচেৎ স্বামী বাইবেল ও স্ত্রী মনুসংহিতার ধারা অবলম্বন করিলে গৃহস্থালীর যে দশা হয় সঙ্গীদের মধ্যে একজন কালভার্স'ন আর একজন প্রণালী মত খেলিলে খেলার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হয়। কিন্তু মুখে যে বইএরই দোহাই দেউক, কয়েকটি বিশেষ সাধারণ নিয়ম ব্যতীত সেই বইএর খুটিনাটি সকল বিধান মানিয়া চলে সংসারে এরকম লোক বড় দেখা যায় না। অবশ্য এমন অর্ব্বাচীনও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে যে বইয়ের পাতার সহিত মিলাইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চায়। কিন্তু সংসারে কেহ তাহার বুদ্ধির তারিপ করে না এবং জীবনে সার্থকতা লাভ তাহার ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে। তাস-খেলায়ও এমন লোক আছে যে রাত জাগিয়া বই মুখস্থ করে এবং তাহার বাঁধা বুলি অনুসারে খেলে। কিন্তু ইহারা খেলায় সুখ্যাতি অথবা জয় কোনটাই অর্জ্জন করিতে পারে না।

মানুষের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি তাহাকে বইয়ের বাঁধা পথে চলিতে দেয় না-অপথে বিপথে চালিত করে। বিশেষতঃ এমন কোন বই নাই, যাহাতে জীবনের সব অবস্থার পথ নির্দ্দেশ আছে। সুতরাং মানুষকে পথ বাছিয়া লইতে হয়। এই খানেই তাহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই সংসারে কোন দুইজন লোক ঠিক একরকম পথ সর্ব্বদা বাছে না। এই বৈচিত্র্য না থাকিলে সংসার শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইত। তাস খেলায়ও মানুষের এই বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অতি আশ্চর্য্যরকমে প্রকট হয়। বস্তুতঃ একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, যে আসরে কালভাসনের নীতিই সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত, সে আসরেও কোন দুই জন লোকের ডাকের বা খেলার প্রণালী একেবারে হুবহু মেলে না। প্রতি খেলোয়াড়েরই এবিষয়ে একটি বৈশিষ্ট্য আছে, এবং একটু অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে তাহার সাংসারিক জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যের সহিত ইহার খুব ঘনিষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। দক্ষিণ কলিকাতার যে পাড়ায় আমি থাকি, সে পাড়ায় শ-বাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যাকালে নিয়মিত তাসের বৈঠক বসে। যাঁহারা খেলেন সকলেই আমার বিশেষ পরিচিত—আমি অবাক হইয়া দেখি, প্রত্যেকের বাস্তব জীবনের ছাপ কেমন তাস খেলার মধ্যে অতি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একজনের কথা বলিব।

অবসরপ্রাপ্ত প-বাবু এই আসরের একজন নিয়মিত সভ্য। বয়স ষাটের উপর কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ। একাসনে আটটি বড় বড় ল্যাংড়া আম উদরস্থ করিয়া দুই পাক লেক ঘুরিয়া তাহা হজম করেন এবং তারপর মোটা লাঠি হাতে তাসের আসরে দেখা দেন। যেমন পুষ্ট দেহ, তেমন স্পষ্ট মন—কোন বিষয়ে কোন দ্বিধা কোন সন্দেহ তাহার মনে কখনও উঁকি মারে না। তিনি যাহা বলেন, যাহা ভাবেন

তাহাই যে একমাত্র সত্য, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই—অপর কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলে তাহার সমূহ বিপদ। সকল বিষয়েই তাঁহার মত অতিশয় দৃঢ় সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট। হিটলার গত যুদ্ধে কেন হারিল, কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের খাদ্য সমস্যার অতি সহজে সমাধান হয়, বিগত নির্ব্বাচনে বাংলার মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার ভূপতিত হইল কেন—ইত্যাদি বিষয়ে তিনি এমন প্রাঞ্জলভাবে মত প্রকাশ করেন যে শ্রোতার মনে গভীর দুঃখ হয়—যে সময় থাকিতে হিটলার, প্রফুল্ল সেন প্রভৃতি প-বাবুর সহিত দেখা করিলে বাংলার ও পৃথিবীর ভাগ্য অন্যরূপ হইত।

এইত গেল প-বাবুর বাস্তব চিত্র। এইবার তাঁহাকে খেলার আসরে দেখুন। প-বাবু ঘরে ঢুকিতেই একজন হয়ত বলিলেন, আজ আপনার পাঁচ মিনিট দেরী। প-বাবু ঈষৎ হাসিয়া কব্জি ঘুরাইয়া হাত ঘড়ীটি দেখালেন। তাঁহার ঘড়ীর সময় নির্দ্দেশ একেবারে অভ্রান্ত—তা সে রেডিওর অথবা জেনারেল পোষ্ট আফিসের ঘড়ীর সহিত মিলুক আর নাই মিলুক। ঘড়িটি দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠিটা সশব্দে ঘরের কোণে রাখিলেন। প-বাবুর মনের ভাব কি বলিতে পারি না—কিন্তু আমরা সকলেই মানিয়া লই যে ঐ ঘড়ীটাই ক্রনোমিটার—কারণ ঘড়ীওয়ালার গায়ে জোর এবং হাতে মোটা লাঠি আছে। খেলিতে বসিয়া কিছু-ক্ষণের মধ্যেই সঙ্গীর সহিত মতান্তর—ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার—তা সে সঙ্গী যেই হউক না কেন। ভুল ডাকিয়া বিপদে পড়িলে দোষটা অনায়াসে সঙ্গীর ঘাড়েই চাপাইয়া দেন। একই রকমের হাত পাইয়া সঙ্গী ডাকিলেও দোষ, না ডাকিলেও দোষ। ঠিক যে রকম ডাকিয়া বা খেলিয়া, সুবিধা হওয়ায় এক সময় সঙ্গী তাঁহার প্রশংসা লাভ করি-য়াছে, অসুবিধা হইলে ঠিক সেই রকম ডাক বা খেলার ফলে সঙ্গীকে হিন্দী ও ইংরেজী বাংলা মিশ্রিত অনেক বকুনি খাইতে হয়। সঙ্গী যদি তর্ক করে, অমনি তিনি বড় বড় বইএর নজির দেখান। কিন্তু সে সব বই কখনও কেহ দেখিতে পায় না। বলা বাহুল্য—তিনি একদিন যে নীতির দোহাই দিয়া সঙ্গীকে গালি পাড়েন আর একদিন ঠিক সেই নীতির অনুসরণ করিয়া সঙ্গী খেলিলেও যদি তাঁহার সুবিধা না হয় তাহা হইলে গালির মাত্রা পূর্ব্ববৎই থাকে। নজিরের বেলায় কিন্তু সেই একই বইএর দোহাই দেন। এইরূপ সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধ নীতির সমাবেশ যে অপূর্ব্ব বইখানিতে আছে তাহা আজ পর্যন্তও কেহ চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পায় নাই। যদি কেহ সেই নামের কোন গ্রন্থ আনিয়া দেখায় তাহা হইলে তিনি কৃপামিশ্রিত হাস্য সহকারে বলেন—এ তো পুরাণ সংস্করণ—১৯৫২ সনের মে মাসের ১৮ই তারিখ যে সংস্করণ ছাপা হয়েছে সেইটি দেখুন। বিশেষ বেকায়দায় পড়িলে পূর্ব্বে যে নীতির দোহাই দিয়াছেন তাহা বেমালুম অস্বীকার করেন। যেহেতু তাঁহার মতামত কেহ তৎক্ষণাৎ লিখিয়া রাখে নাই সেহেতু তাঁহার মতামত কেহ তৎক্ষণাৎ লিখিয়া রাখে নাই সেহেতু তাঁহার কথার খণ্ডন করা দুঃসাধ্য।

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া যদি কেহ প-বাবুর সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করেন, তবে বলিব তিনি নিতান্তই ভুল করিয়াছেন। আমি প-বাবুকে বহুদিন যাবৎ জানি—তিনি বিদ্বান, বুদ্ধি-মান, সহৃদয় ও বন্ধুবৎসল।—তবে ঐ যাহাকে বলে একটু রগ-চটা অর্থাৎ সামান্য কারণে হঠাৎ মেজাজ খারাপ হয় এবং তখন রাগের মাথায় অকথা কুকথা বলিয়া বসেন। কিন্তু পরক্ষণেই মাথা ঠাণ্ডা হইলে আবার পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল হন। তখন তাঁহার সৌজন্যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বেকার অপ্রীতিকর ঘটনা নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের ন্যায় মন হইতে মুছিয়া যায়।—তবে যাহারা তাঁহার স্বরূপ জানেন না তাঁহারা ইঁহার আকস্মিক উত্তেজনায় ও অসংযত বাক্যবাণে ক্ষুব্ধ হন। তাসের আসরেও একাধিকবার তাঁহার বচসার ফলে বন্ধু বিচ্ছেদ হইয়াছে অর্থাৎ কোন কোন খেলোয়াড়—এবং তিনি নিজেও—হাতের তাস ছুঁড়িয়া ফেলিয়া খেলা ছাড়িয়া সবেগে প্রস্থান করিয়াছেন। মনে হইয়াছে এই দুইজন আর কখনও শ-বাবুর গৃহে খেলার আসরে দেখা দেবেন না। গৃহস্বামী সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ় শ-বাবু লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ—তিনি এসব ব্যাপারে বিচলিত হন না—জানেন, সময়ে সব ঠিক হইয়া যাইবে—উপস্থিত ক্ষেত্রে কিছু বলিলে ব্যাপারটা আরও ঘোরাল হইয়া দাঁড়াইবে। পরিণামে হয়ও তাই। দুই চারিদিন পরেই দেখি প-বাবুর প্রতিপক্ষ আবার নিয়মিত আসরে যোগ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে উক্ত অপ্রীতিকর ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্যেই প-বাবুর গৃহে পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল হইয়া খেলিতে থাকেন—এবং অপর পক্ষের বিক্ষুব্ধ অভিমান কয়েকদিন স্থায়ী হইলেও প-বাবুর এক

দিনের তরেও রাগ করিয়া তাসের আসর হইতে অনুপস্থিত থাকেন না। পাঠক যদি এটুকু না বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি এখনও প-বাবুর চরিত্র সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। শ-বাবু এটুকু বোঝেন বলিয়াই প-বাবুকে নিয়া মাথা ঘামান না, কিন্তু অপর পক্ষের রোষ শান্তির মূলে তাহার সর্ব্বজন-বিদিত সৌজন্য অমায়িকতা ও অপক্ষপাত-সহৃদয়তা যে কতদূর কার্য্যকরী, অজানা হইলেও তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। দুইজন বৃদ্ধ ষাটের কোঠা পার হইয়া সামান্য তাস খেলার ব্যাপারে যে এরূপ ভাবে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া সাময়িকভাবেও এরূপ একটি অপ্রীতিকর ও অশোভন দৃশ্য সৃজন করিতে পারেন ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু সংসারে এরূপ দৃশ্য বিরল নহে। বাড়ীর সীমান্তে অবস্থিত একটি আম গাছের অধিকার লইয়া দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে কলহ, প্রাচীর তুলিয়া মুখ দেখাদেখি বন্ধ, অবশেষে আদালতে মোকদ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়া —এরূপ দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নহে। দুর্ভাগ্যের বিষয় শ-বাবুর মত লোক গ্রামদেশে বিরল এবং উভয় পক্ষের উত্তেজনায় ইন্ধন যোগাইতে প্রবৃত্ত আত্মীয় বন্ধু অতিশয় সুলভ। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়ায়। অতএব যাহার অদৃশ্য প্রভাবে আমাদের এই তাসের আসরের ঝঞ্ঝা ঝটিকা উপস্থিত হয় তুফানের মতনই বিশেষ কোন অশুভ না ঘটাইয়াই বিলীন হয় সেই শ-বাবুকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

প-বাবুর সম্বন্ধে আরও অনেক বলিবার আছে। কিন্তু তাঁহার মোটা লাঠির কথা স্মরণ করিয়া এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম। এইবার জ-বাবুর কথা আরম্ভ করি। ইনি একেবারে প-বাবুর বিপরীত। মাথায় টাক, ক্ষীণ দেহ, সদাহাস্যময়। খেলেন ভাল—কিন্তু যত গোল ঐ ডাকের বেলায়। এঁর লক্ষ্য সর্ব্বদাই উচ্চদিকে; গাছের মাথায় লক্ষ্য করার চেয়ে আকাশের দিকে বাণ ছাড়িলে যে লাভের সম্ভাবনা বেশী, বাল্যে পঠিত এই নীতিবাক্য তিনি কখনও ভোলেন না। হাতে নিশ্চিত পাঁচ পিঠ থাকিলেই তিনি সাত পিঠের গ্রাণ্ড স্লাম ডাকিয়া বসেন। সংসারে যেমন একদল লোক আছে, যারা ভালর দিকটাই দেখে—মন্দের দিকটা কখনও ভাবে না। জ-বাবুরও অনেকটা তাই। তাঁহার খেলা দেখিলে অনেকেরই ঘোড়দৌড়ে বাজি খেলার কথা মনে পড়িবে। এক্ষেত্রেও যে তাসের সহিত বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, যদি কেহ শনিবার টালিগঞ্জের ঘোড়দৌড়ের মাঠে যান—তবে টিকিট বিক্রীর ঘরের কাছে জ-বাবুকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। যেদিন ভাগ্যক্রমে হাজার টাকা জিতেন সেদিন সমারোহ করিয়া বন্ধু-বান্ধবদের ভূরি-ভোজন করান। কিন্তু অধিকাংশ দিনই যে হারেন তাহা বেমালুম চাপিয়া যান। তাস খেলায়ও কোন কোন দিন গ্রাণ্ডস্লাম ডাকিয়া তাহা করেন। তখন তাঁহার উল্লাস দেখে কে? কিন্তু অধিকাংশ সময়ই যখন স্লাম ডাকিতে গিয়া হাতের গেম নষ্ট করেন—তখন বাস্তব জীবনের অনুকরণে অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণ দোষ নিক্ষেপ করিয়া অবিচলিতচিত্তে পরের বারের সার্থকতায় নিঃসন্দেহ হইয়া খেলিতে থাকেন।

কিন্তু ওঝারও যে ওঝা আছে এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করিবার জন্য মাঝে মাঝে স-বাবু তাসের আসরে দেখা দেন। তিনি জ-বাবুর মত হিসাব কিতাবের ধার ধারেন না। হাতের তাস তুলিয়া যদি কয়েকটা টেক্কা সাহেবের সমাবেশ দেখেন, অমনি সিংহ গর্জ্জনে ছোট কিংবা বড় স্লাম ডাকিয়া বসেন। তাঁহার খেলার এবং জীবনেরও —মূল নীতি হইল "মারি তো হাতী, লুঠি তো ভাণ্ডার।" একদল লোক ঘোড়দৌড়ে বাজি ধরিবার পূর্ব্বে বহু শ্রম সহকারে ঘোড়ার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেয়—আর একদল কেবলমাত্র কপাল ঠুকিয়াই মোটা নোটের তাড়া বাজি ধরে। জ-বাবু প্রথম শ্রেণীর ও স-বাবু দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। জ-বাবু তাসের হিসাব কিতাব করেন, খেলেন ভাল—কিন্তু স-বাবুর সে সব বালাই নাই। ডাকেনও চটাপট—হাতের তাসও ফেলেন দুপ-দাপ। অনর্থক চিন্তা করিয়া মাথা ঘামান না—দুর্ভাবনাও কিছুমাত্র নাই। পকেটে সদাসর্ব্বদা একশত টাকার নোট লইয়া আসেন। হারিলে টাকা গুণিয়া দিয়া বড় আড্ডার সন্ধানে যান। সেখানে খেলার ষ্টক বেশী, সুতরাং অতিসত্বর হারের টাকাটা ফিরাইয়া পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশী বলিয়াই মনে করেন। পরিণামে কি হয় ভগবান জানেন। হয়ত ভালই হয়—কারণ কথায় বলে যাহারা নিজেদের সাহায্য করিতে অক্ষম, ভগবান তাহাদের সহায় থাকেন। বাস্তব জীবনে

যে এরূপ লোকের অভাব নাই, আশা করি পাঠকবর্গকে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না।

জ-বাবু ও স-বাবুর ঠিক বিপরীত হচ্ছেন অ-বাবু। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আইন-ব্যবসায়ী, গোঁফ-জোড়া দেখিলেই বোঝা যায় ইনি বেশ শিকারী। ধীর ও স্থির, খুব হিসাব করিয়া খেলেন। কঠিন কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে তিনি যখন অর্দ্ধ-স্তিমিত নয়নে ধ্যান করেন তখন মক্কেলের অন্তস্তলের ন্যায় প্রতিপক্ষের হাতের তাসের অপর পিঠ ভেদ করিয়া তাহার সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি প্রধাবিত হয়। তাঁহার চিন্তার গভীরতা দেখিয়া মনে হয় অখিল জগতে তাস খেলা ছাড়া অথবা ইহার বড় আর কিছুই নাই। যখন হাতে ভাল তাস আসে তখন তাঁহার খেলার কৌশলে প্রতিপক্ষকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ছাড়েন। কিন্তু যদি খারাপ তাস আসিতে থাকে তবে অদৃষ্টের কাছে হার মানিয়া সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র তিনি নন। নিজের লোকসান স্বীকার করিয়াও প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দিবার জন্য অডাক কুডাক ডাকেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ইহাতে কেবল প্রতিপক্ষ নহে, তাঁহার নিজের সঙ্গীও বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। তিনি আশা করেন যে তাঁহার কোন ডাকটা সত্যকার, আর কোন ডাকটা বিপক্ষকে ঠকাইবার ছল মাত্র—সঙ্গী তাহা অনায়াসেই বুঝিয়া লইবে। কিন্তু বাস্তব জীবনের ন্যায় তাস খেলার সঙ্গী তাঁহার সমধর্ম্মী না হওয়ায় ক্রমাগতই ভুল বুঝিতে থাকে—ফলে মনোমালিন্যের ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং খেলার কৌশলে তিনি যে লাভ করিতে পারিতেন, কূটনীতি অবলম্বনের ফলে তাহার অধিকাংশই লোকসান হয়। তবে অ-বাবু প-বাবু নহেন। আইন ব্যবসায়ের ফলে লোকব্যবহারে অভিজ্ঞ, সুতরাং সঙ্গীর সহিত মনান্তর ও মতান্তর কখনও কলহ পর্য্যন্ত গড়ায় না।

আর অধিক চরিত্র-চিত্রণ করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। কিন্তু যেটুকু বলা হইয়াছে তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে বাস্তব জীবনের ন্যায় তাস-খেলায় সফলতা লাভ করিতে হইলেও মনুষ্য চরিত্র বিশ্লেষণ করার জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। সঙ্গী অথবা বিপক্ষের চরিত্রের বিশেষত্ব সর্ব্বদা মনে না রাখিলে তাস খেলায় পদে পদে ঠকিতে হয়। জ-বাবু যখন ডাকিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার সঙ্গী হইলে আমি পাঁচের ডাক হাতে থাকিলে তিনের বেশী ডাকি না—বিপক্ষ হইলে দু-এক পিঠ কম হাতে থাকিলেও স্বচ্ছন্দে ডবল দেই। প-বাবু সঙ্গী হইলে নিছক কালভার্টনের পুঁথি মত ডাকি—একচুলও এদিক ওদিক করি না—তা হাতের বিশেষত্ব যতই থাকুক। ফিনিস করিবার সময় অ-বাবু যখন এমন ভাবে তাকান যেন সাহেবটা তাঁহার হাতেই আছে তখন নিশ্চিত ধরিয়া লই যে উহা তাহার হাতে নাই। তারপর গলার স্বর হাত-পা নাড়ার ভঙ্গী প্রভৃতিও লক্ষ্য করিতে হয়। আমার ডাকের সমর্থনে যখন প-বাবু বেশ জোর গলায় সমর্থন করেন, তখন বেশ বুঝি তাঁর তাস খুব ভালই আছে—কিন্তু যখন ঔষধ খাইবার মত মুখ খানা করিয়া মৃদু স্বরে এক রুহিতনের সমর্থনে দুইয়ের ডাক ডাকেন, তখন বুঝিতে বাকী থাকে না যে তাঁহার হাতে দেড় পিঠের বেশী কানাকড়িও নাই। শ-বাবু যখন হাঁটু দোলাইয়া হাতের আঙ্গুল দিয়া তবলার অনুকরণে তাসের বা চৌকির উপর চাঁটি মারিতে থাকেন তখন সকলেই বুঝিতে পারে যে এবার তাঁহার হাতের তাস ভাল।

এই সব এবং আরও অনেক বাহ্যিক লক্ষণ বুঝিবার ক্ষমতা না থাকিলে তাস খেলা চলে না। বলা বাহুল্য বাস্তব জীবনেও অবিকল তাহাই। যাহার নিকট কাজ আদায় করিতে হইবে তাহার হাব ভাব দেখিয়া তৎকালীন মানসিক অবস্থার বিচার করিতে না পারিলে সফলতার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু বাহ্যিক লক্ষণ ছাড়াও বাস্তব জীবনের ন্যায় তাস খেলায়ও সর্ব্বদা হিসাব কিতাব করিতে হয়। যে তাসখানির উপর সমস্ত খেলা নির্ভর করিতেছে তাহা কোন হাতে আছে তাহা জানিতে হইলে অপর খেলোয়াড়দের ডাক, খেলার ধরণধারণ প্রভৃতি বিশেষ অনুধাবন করিতে হয়। অ-বাবু এই এই তাস খেলিয়াছেন—এছাড়াও যদি অমুক তাসটা তাঁহার হাতে থাকিত তবে তাঁহার ডাক এরূপ হইত—খেলার ধরণও অন্যরূপ হইত, জ-বাবু হইলে ত স্লামই ডাকিতেন—অথবা ডবল—রিডাবল করিতেন। প্রয়োজন হইলে অথবা বিশেষ অসুবিধা না থাকিলে সংশয়ের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করিতে হয়। যেমন রুহিতনের ও ইস্কাবনের টেক্কাটা বাইরে আছে। ইস্কাবনের টেক্কাটা কোন হাতে আছে তাহা জানিতে পারিলে তদনুযায়ী ফিনিস করিয়া

খেলা জেতা যায়। এক্ষেত্রে রুহিতনের ফাঁকা সাহেবটা খেলিয়া রুহিতনের টেক্কাটা কোন হাতে দেখিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে বোঝা যাইবে ইস্কাবনের টেক্কাটা অন্য হাতে। কারণ দুই টেক্কা এক হাতে হইলে অবশ্য ডবল দিত। এইরূপ ভাবে বহু গবেষণা করিয়া ও কায়দা করিয়া তবে তাস খেলিতে হয়। বস্তুতঃ খেলার এই অংশই আমাদিগকে মুগ্ধ করে—এবং এই অনিশ্চয়তা ও সমস্যা সমাধানের চমৎকারিত্বে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেমন করিয়া কাটিয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাই না। ইহা জানে না বলিয়াই লোকে তাসের মহিমা ও মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে না। সংসারের জটিল সমস্যার অনুরূপ কত সমস্যা যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং তাহার সমাধানের আনন্দ যে কত—বাস্তব জীবনের আশা ও নৈরাশ্য, সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব, জয়ের উল্লাস ও পরাজয়ের গ্লানিমা এক সন্ধ্যার খেলায় যে পরিমাণ আসে, হয়ত সারা জীবনে তাহার তুলনা মেলা ভার। তফাৎ এই যে খেলা শেষ হইলেই সব শেষ বাস্তব জীবনের ন্যায় মনে কোন দাগ থাকে না। অর্থাৎ বাস্তব জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, নানা বিচিত্র ভাবপ্রবাহের আবর্ত্তন প্রভৃতির রসাস্বাদ করিতে হইলে তাস খেলার মত বৃদ্ধ বয়সে আর কিছুই নাই।—যখন জীবন নাট্যে অভিনয় করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে তখন এই নকল বৃদ্ধাগড়ের কেল্লা ফতে করিয়াই যে সুখ পাওয়া যায় তাহার মূল্য যে বুঝিতে পারে না সে হতভাগ্য। ইহা আমার কথা নহে, একজন খ্যাতনামা ইংরাজী সাহিত্যিক এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তাস খেলার উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে বৃদ্ধ বয়সের অবসাদ অপনোদনে তাস খেলার তুল্য আর কিছুই নাই। পাছে কেহ মনে করেন সে আমি প-বাবুর ন্যায় কাল্পনিক নজিরের দোহাই দিতেছি এই জন্য তাহার উক্তি অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি: "To have learnt to play a good game of bridge is the safest insurance against the tedium of old age!" আশা করি অতঃপর আর কেহ তাসের নিন্দা করিবেন না—এবং আমি যে বৃদ্ধ বয়সে তাস খেলি তাহাতে আমার বুদ্ধির প্রশংসাই করিবেন।

তাস খেলা সম্বন্ধে আরও অনেক বলিবার আছে। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়াছে—পাঠকের ধৈর্য্য চ্যুতির আশঙ্কায় এইখানেই শেষ করিলাম। উপসংহারে যাহার কৃপায় ও আশ্রয়ে আমাদের তাসের আসর প্রতি সন্ধ্যায় শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ-বাবুকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই আসরের সর্ব্ববিধ কোলাহল ও উৎপাত সহ্য করিয়াও যাহারা ধরিত্রীর মত সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন সেই শ-বাবুর পরিজনবর্গকেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্মেছিলেন ১৮৬১ সনের ২রা আগষ্ট। তাই এ বৎসর ঐ দিনে তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রথম বাঙ্গালী রসায়ন অধ্যাপক নন। তার আগে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালী অধ্যাপক ছিলেন। (তবে তাঁরা কেউ তাঁর মত উচ্চ উপাধি-প্রাপ্ত ছিলেন না।) কিন্তু তাঁরা কেউ রসায়নের প্রতি ছাত্র ও অভিভাবক-দের আকৃষ্ট করার জন্য অত সময় ও কৌশল প্রয়োগ করতেন না।

সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র সিটি কলেজের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছি, প্রফুল্লচন্দ্র কতকগুলি শিশিতে করে রাসায়নিক সুগন্ধি নিয়ে তাঁদের স্কুলে আসতেন এবং প্রধান অধ্যাপকের অনুমতি নিয়ে ক্লাসের ছেলেদের এসব দেখাতেন; বলতেন, রসায়ন পড়, এসব সুগন্ধি নিজেরাই বানাতে পারবে।

সারা পৃথিবীতে প্রাচীন কাল হতে রসায়ন শাস্ত্রে যে জ্ঞান ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়েছে, তার ক্রমপরিণতির ইতিহাস বড় বিচিত্র। এর বিবরণ আচার্যদেব ক্রমে জেনেছিলেন; সেই জ্ঞান বিশেষ করে ভারতের প্রাচীন রসায়নের ইতিহাস—তাকে আরও উন্নতির দিকে, বিশেষত হাতে কলমে কাজ করার দিকে টানতো। সেই টানে, আর রসায়ন শাস্ত্রের ব্যবহার দ্বারা লোকের চিত্তে এর ব্যবহারিক ঐতিহ্যের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের সূত্রপাত করলেন, ১৮৯২সনে অধ্যাপকতা সুরু করার ৩ বৎসর মধ্যেই।

১৯০১ সনে বেঙ্গল কেমিক্যাল যখন লিমিটেড কোম্পানী হয় তখন মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র ও অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র এবং কর্মী প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীর একবারে মনের মানুষ হয়েছেন—তাই তাঁর কোম্পানীর মূলধনের অভাব হল না।

এর ৮ বৎসর পর ১৯০৯ সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি আচার্যদেবের স্নেহচ্ছায়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজে মিলিত হয়েছেন বহু জ্যোতিষ্কতুল্য ছাত্রবৃন্দ—জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জি, মাণিকলাল দে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পুলিনবিহারী সরকার, রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি।

এই সব ক্রম পরিণতি এক যোগসূত্রে গ্রথিত—সে গ্রন্থনের মালাকার আমাদের আচার্যদেব—এবং এ দেশের স্বাভাবিক প্রখর তাপে যে সে মালা শুকিয়ে যায়নি—এর শোভা এবং সুগন্ধি যে জগত বহুকাল অম্লান দেখেছে তা তাঁরই স্নেহচ্ছায়ার গুণে।

আচার্যদেবকে সম্মুখে পেয়েছিলেন বলেই তাঁকে পুরোভাগে রেখে ১৯১৬ সনে আশুতোষ বিজ্ঞান কলেজ খুলতে উৎসাহী হয়েছিলেন। তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের বিজ্ঞানের অনুশীলন, জগতে সম্মান ও কর্মনৈপুণ্য দেখেই দাতা পালিত ও ঘোষ মহোদয়রা মুক্ত হস্তে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের দান এঁরা সার্থক করলেন; ১৯২৩ সনে তাঁর ছাত্রেরা ভারতীয় রাসায়নিক সমিতি স্থাপন করলেন। আচার্য রায় প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁর ছাত্রেরা নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্র পড়াতে লাগলেন। এই ভাবে তিনি ভারতে নব্য রসায়নের জনক রূপে সম্মানিত হলেন।

তাঁর জীবনীতে আমি বিস্তৃত করে দেখিয়েছি যে তাঁর দীর্ঘ কর্ম জীবনে ১৮৮৯ সন হতে ১৯৩৬ সন পর্যন্ত—প্রায় ৪৭ বৎসরে তিনি যে বিপুল উপার্জন করেছিলেন তা হতে এই অবিবাহিত পুরুষ নিজের অত্যন্ত মিতব্যয়ী সাধারণ জীবন যাপনের খরচ মাত্র ব্যয় করতেন। দুঃখীদের দৈনন্দিন জীবনের গ্রাসাচ্ছাদনের কথা নিজের জীবন ধারণের মান দ্বারা বুঝবার চেষ্টা করতেন। তাই তাঁর সমস্ত সঞ্চয় তিনি বিলিয়ে দিয়ে গেছেন।

বিলিয়েছেন রসায়নের গবেষণার উৎসাহ দানের জন্য, বিধবাদের দুঃখ মোচনের জন্য, পিতৃহীনদের জীবন গঠনের জন্য, সমাজের যাঁরা উপদ্রুত তাঁদের দুঃখ লাঘবের জন্য।

এই অনুভূতি তাঁর মনে এতখানি বাসা বেঁধেছিল যে তাঁকে আমি নানা ক্ষেত্রে অভিভূত দেখেছি। তাঁর বাইরের দৃষ্টি বা বাক্য তখন অত্যন্ত অচঞ্চল—কিন্তু ভিতরে করুণার অতল বিস্তীর্ণ নিথর সরোবর।

তাঁর ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্র আজ সারা ভারতে ছেয়ে গেছে। ২১১ জন ছাড়া কেউ কি পেরেছেন তাঁর মত একই থান হতে নিজের ও বেয়ারার জামা বানাতে! কেউ কি পারেন তাঁর মত নিজেও সেই আহার্য্য খেতে, যা তাঁর আশ্রিত পোষ্য ছাত্ররা খেতেন। ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। গদিহীন খাটিয়ার শুয়েই তাঁর দীর্ঘকালের অশক্ত অপটু শরীর শেষ হল। কোন আরামদায়ক শয্যা ও আসন তিনি বর্জন করেছিলেন। নিজের জামা কাপড় তোয়ালে লুঙ্গি নিজেই কাচতেন। জুতার কালিও নিজেই দিতেন।

একদিন সকাল বেলায় লেবরেটরিতে কাজ করার সময় এই বুড়ো মানুষটি লুঙ্গি ও খাটো জামা পরে বসেছিলেন। একজন বিদেশী আচার্য-দর্শনার্থী ভদ্রলোক এই অবস্থায় তাঁকে দেখে দপ্তরী মনে করে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ছাত্ররা তাঁকে ধরে এই নিরাভরণ আচার্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তখন আলাপ করে এই নানাগুণালঙ্কৃত মানুষটির পরিচয় পেয়ে ঐ আগন্তুক আচার্যদেবের পরম অনুরক্ত হন।

আজকের দিনে বেশী করে স্মরণীয় আচার্যদেবের এই সাধনার জীবন, এই অনাড়ম্বরের জীবন, এই 'ত্যাগের দ্বারা ভোগের' নীতি। এদেশে বিজ্ঞানের চর্চা দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছে—সে শিক্ষা ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে—হয়তো গবেষণার দিকেও অনেক অগ্রগতি দেখা যায়। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার তেমন প্রসার হয়নি। আজকাল শিল্পক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের ব্যবহার। সেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সে অগ্রগতি দেখা যায়নি যা শিক্ষায়তনে দেখা যাচ্ছে।

যে কারণে এই অবস্থা—তা হচ্ছে, আমরা জীবন ও সংসারে বিজ্ঞানকে তেমন করে খাটাইনি যা স্বাভাবিক ছিল। বিজ্ঞানের ভাষা হচ্ছে অঙ্ক। অঙ্ক হচ্ছে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান। এই যুক্তিপূর্ণ অঙ্কের ফল এক। নানা জনে অঙ্ক কষলেও তার ফল ভিন্ন হয় না। কোন যুক্তি তর্কেও না। কিন্তু আমরা এদেশে যুক্তি তর্কদ্বারা অঙ্কের ফল বদল করতে ভালবাসি বা বদল করার প্রয়োজন বোধ করি।

তাই আয়করের অঙ্ক পৃথক হাতে পৃথক হয়; আইনসভায় বিভিন্ন দিনে সংখ্যা বিজ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত অঙ্কের ফল বিভিন্ন হয়; জাল রাসায়নিক ঔষধেও পুরা ফল আশা করি। অথচ চতুর্দ্দিকে আমরা বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ঘোষণা করে একটা বৃথা আড়ম্বরের সৃষ্টি করে জগত সভায় প্রচার করতে চাই, আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অগ্রসর, আচার্যদেব আমাদের বর দিয়ে গেছেন, আমরা সভ্য হয়েছি।

এই বৃথা আড়ম্বর চলছে বা লোকে সহ্য করছে বলেই এসব দিন দিন বাড়ছে। আচার্য দেবের জীবনের যা মূলমন্ত্র—সাধনা—অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও ত্যাগের দ্বারা ভোগ—তা হতে বিচ্যুত আজিকার মানুষ বুঝি তাঁকে সম্মান দেখাবার দাবী হারিয়েছে।

দাবী হারিয়েছে সম্মানের লোভে নয়। লাভের লোভে। সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ। এই লোভ মানুষকে অপর মানুষের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে; পাশ্চাত্যের জীবনের ছবি এখন এদেশের মানুষের মনে বুঝিবা হয়েছে আদর্শ। মানই যদি বাড়াতে হয়, সমগ্র ভারতীয় জাতিরই জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি হোক। এই কথাটা আচার্যদেবের শেষ জীবনের কথা—৫ বার বিলাতে গিয়েও ইউরোপের নানা দেশে থেকেও তিনি সেদেশের জীবনযাত্রাকে আদর্শ বলে ধরেন নি—তাঁর দেশের দুঃখী মানুষ তাঁর মনের মানুষ ছিল বলেই তিনিও সকলের প্রাণের মানুষ হয়েছিলেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভেঙে গেল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা। গৈরিকের আচ্ছাদন, সোনার ঝালর ঝোলানো মখমলের ছাতা, সোনা রূপা দিয়ে মোড়া আসাসোঁটাধারী পাইক পেয়াদারা সামনে পেছনে পাহারা দিয়ে চলেছে গৈরিকওয়ালাকে, এ দৃশ্য দেখে মনটা খুবই কাঁইকুঁই করে উঠল। গেরুয়া আমিও পরেছিলাম, ঝুলি কাঁধে চিমটে হাতে—সারা দেশটা টো টো করে ঘুরে মরেছি। কিন্তু তাতে লাভ হোয়েছিল কতটুকু! গদি একটা জুটেছিল বটে, শ্মশান ঝেঁটিয়ে কাঁথা ফালি কুড়িয়ে গদিটাকে উঁচুতেও তুলেছিলাম দু'হাত। ত্যাগ-তিতিক্ষা-বৈরাগ্যের আঁচে গরম হোয়ে সেই গদি আঁকড়ে পড়েও-ছিলাম পরিতুষ্ট হোয়ে। ছেঁড়া মাদুরের আচ্ছাদন, আর শেয়াল শকুনের পাহারা ছাড়া কিছুই জোটে নি। তার অর্থ, স্থাননির্বাচনে গড়বড় হোয়ে গিয়েছিল। শ্মশানে পাতা গদির সামনে জ্যান্তরা কেউ গড়াগড়ি খেতে যায় না। ধর্মের হাটে গদির মত গদি দখল করে বসতে পারলে রাজার রাজা হোয়ে একেবারে নাম ভূমিকায় অভিনয় করা যায়। বাড়ি গাড়ি আর ব্যাঙ্কে টাকার কাঁড়ি অনেকের আছে। ও সমস্ত থাকলেও যা, না থাকলেও তাই। এক-জন বাড়ি গাড়ি টাকার কাঁড়িওয়ালার চেয়ে আর একজন বাড়ি গাড়ি ওয়ালা অনেক বড়। বহু বাড়ি বহু গাড়ি বহু টাকার কাঁড়ি যাঁদের আছে, তেমন মানুষরাও যাঁর পায়ের তলায় গড়াগড়ি যান, তিনিই হোলেন রাজার রাজা। এই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বময় কর্ত্তার পদটিতে—আরোহণ করার স্বপ্ন সাদা কাপড় পরে দেখতে চাওয়াও পাগলামো। দূর দূর, রঙচুট কাপড় পরে কি ভুলই করে মরেছি!

পোষাকগুলোর পানে নজর পড়ল। সব ময়লা হোয়ে গেছে। সস্তায় কেনা সার্ট ধুতি স্যাণ্ডেল ময়লা না হোলেও মর্যাদা ফুটিয়ে তোলে না। খেলো জিনিষগুলো অঙ্গে চড়িয়ে—খামকা খানিক খেলোই হোয়ে পড়লাম। শ্রীমান বিপিনবিহারীর কপালে একটা চাকরি জুটলেও জুটতে পারে, চাকরির বেড়ে কুলয় এমন একখানি কুলায় পাওয়াও অসম্ভব নয়। চাকরি করে সেই কুলায়তে ফিরে তক্ত-পোশের ওপর মশারির মধ্যে পরিবারের পাশে শুয়ে দরজায় খিল এঁটে রাত কাটানো বিপিনবিহারীবাবুর জীবনের চরম সার্থকতা। কিন্তু সেই সোনার সংসারে চাঁদপানা মুখ করে তিষ্ঠে থাকাটা কতদিন সম্ভব হবে! স্বপ্ন তখন দেখা কি! বিপিনবিহারীবাবু কি কখনও কোনও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের গদিতে চড়বার স্বপ্ন দেখতে পারবেন! কিছুতেই না, কখনোই নয়। দু' টাকা দিয়ে একখানা লটারির টিকিট কিনে লাখ টাকা পাবার স্বপ্ন দেখতে পারেন বড় জোর। লাখ টাকা পেলে পরিবারটি কতখানি বিপুলা হবেন, তাও আন্দাজ করতে পারেন! সেই বিপুলা পরিবারের সর্ব্বাঙ্গে কতটা পরিমাণ সোনা লটকানো যায়, তার হিসেব কষে মনে মনে পরম সুখ আস্বাদন করতেও পারেন। কিন্তু ঐ গদি, যার মর্যাদা তীর্থ-দেবতার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, ঐ গদির স্বপ্ন দেখাটা বিপিনবিহারীর কপালে কিছুতে সম্ভব হবে না। সার্ট ধুতি স্যাণ্ডেল টান মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করল। ইচ্ছেটিকে কর্মে পরিণত করার পূর্ব্বেই হাতের

সুটকেশটি সম্বন্ধে সচেতন হলাম। বেচারা তখনও হাতেই ঝুলছে। ঝুলন্ত দশা থেকে ওকে একটু রেহাই দিতে পারলে মন্দ হোত না। নামাতে গেলাম বারান্দার কিনারায়। পেছন থেকে দস্তর মত মুরুব্বী চালে কে বলে উঠলেন—"থাক, এখানে আর নামিয়ে কাজ নেই। চলুন, একেবারে ঘরে গিয়েই সব নামাবেন। স্নানটান করে তৈরী হোতে হোতেই বাবার ঘর খুলে যাবে। আসুন তাড়াতাড়ি, আর বেশী দেরি নেই।"

দেরি নেই। কথাটি বেশ লাগ-সই বলে মনে হোল। দেরি যখন নেই তখন আর চিন্তা কি! যত তাড়াতাড়ি বিপিনবিহারীর ভূমিকা শেষ হয় ততই মঙ্গল। তারপর আবার কেঁচে গণ্ডুষ করা যাবে। বাজারে গেরিমাটি এন্তার মেলে, সাদা কাপড়কে জাতে তুলতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। সাদা কাপড়ের দৌলতে সাদা চোখে এই ফাঁকে গদিয়ান হওয়া ব্যাপারটাকে একটু সমঝে নেওয়া হবে। তারপর একটি জুতসই ঠাঁই দেখা আর বসে পড়া, ব্যাস আর কি চাই।

ঘর দখল করে ছুটলাম স্নান করতে। স্নান করে ভিজে কাপড়েই বাবাকে দর্শন করতে হবে। পুকুর বাবার মন্দিরের বিশ হাতের মধ্যে। 'জয় বাবা বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম পুকুরে, তখনকার মত বাবার বাবা হবার বাসনায় ধামা চাপা পড়ল।

বাবার ওপরেও ধামা চাপা পড়েছে। বাবার বদলে ধামা দর্শন করে জীবন সফল করলাম। ক্ষুদে একটু দরজা দিয়ে মন্দিরে সেঁদিয়ে বেশ একটু সময় লাগল অন্ধকারে কি হচ্ছে তা বুঝতে। দরজার ঠিক সামনে বহু মানুষ জড়ামড়ি করছে। সকলেই নিচু হোয়ে বাবাকে স্পর্শ করতে চাচ্ছে। সমবেত কণ্ঠের আর্তনাদ উঠছে—বাবা বাবা বাবাগো। তার মধ্যে ভয়ানক রকম ক্রুদ্ধ স্বরে কারা সংস্কৃত মন্ত্রে ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দিয়েছে। কান পেতে শুনে বুঝতে পারলাম, যাত্রীদের মন্ত্রপাঠ করানো হচ্ছে। প্রত্যেকটি বামুন ঠাকুর নিজের নিজের যাত্রীকে পূজা করাচ্ছেন। সে এক বীভৎস ব্যাপার! একটু পরেই শোনবার মত একদম নাচার হোয়ে পড়ল। ধাক্কা গুঁতো ঠেলায় চোটে সরে গেলাম এক পাশে। সেখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম, বাবার ডাইনে বাঁয়ে বেশ জায়গা আছে। দেয়ালের গায়ে অনেক উঁচুতে একটি বা দু'টি প্রদীপ জ্বলছে। সেই আলোয় মন্দির গর্ভের রহস্য এক'শ গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। করছে . লোকে গুঁতোগুঁতি ঘরের মাঝখানে, বাবার ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সবাই। বাবা সইছেন। ভাগ্যে বাবাদের অঙ্গ পাষাণ দিয়ে গড়া, অন্য কোনও বস্তু দিয়ে তৈরী হোলে বাবারা অতবড় ধকল কতক্ষণ সইতে পারতেন!

খানিক পরে আমাদের ঠাকুর মশায়ের ফুরসত হোল। হাতের যাত্রীদের দরজা পার করে দিয়ে আমাদের নিয়ে পড়লেন। অদ্ভুত কায়দায়—মনুষ্যপিণ্ডের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করবার মত অল্প একটু গর্ত করলেন তিনি। সেই গর্তে মাথা গলাবার পরে আর কিছুই করতে হোল না। পেছনের চাপে একদম বাবার ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম। তখন আর পায় কে! বাবাকে চেপে ধরেছি দু'হাতে, বাবার ওপর দু' হাতের ভর দিয়ে পেছনের চাপ সহ্য করছি। পিঠের ওপর গুরুভার পড়েছে। হুড়হুড় করে জল পড়ছে মাথার ওপর। ফুল বেলপাতা কলা চিনির ডেলা ঝপাঝপ এসে নাকে-মুখে লাগছে। দাঁতে দাঁতে টিপে দম বন্ধ করে দু' হাতে বাবাকে চেপে ধরে আছি। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করলাম। দর্শন করতেই হবে। দর্শন করবার জন্যে অমন তুমুল সংগ্রামে মাথা গলিয়েছি। সুতরাং দর্শন না করে ছাড়ব কেন।

দর্শন হোল। বাবা ধামা চাপা হোয়ে রয়েছেন, এই-টুকুই দর্শন হোল। অর্থাৎ বাবার ওপরে ধামার মত ঢাকনাটা দর্শন হোল। খুব শক্ত কোনও ধাতু দিয়ে তৈরী ধামার মত ঢাকনার তলায় বাবা, ঢাকনাটার ঠিক মাঝখানে একটা ফুটো। সেই ফুটোর ওপরে কাপড় পাতা হোয়েছে। বাবার মাথায় যে জল ঢালা হচ্ছে, তা' কাপড়ে ছাঁকা হোয়ে ঢাকনার মধ্যে সেঁদুচ্ছে। ফুল বেলপাতা ফল মিষ্টি সমস্ত থাকছে সেই কাপড়ের ওপরে। বাবার দু' ধারে দু'জন সুডৌল সুবিপুল সুররিপু সদৃশ সেঙাৎ অনবরত সেই কাপড়ের ওপর হাত চালাচ্ছেন। মানে হাতড়ে দেখছেন, পড়বার মত কিছু পড়ল কিনা।

বেশীক্ষণ সেই অবস্থায় থাকতে হোল না। চাপের

চোটে যেমন করে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থেকেও বাবার ওপর গিয়ে ঠেকেছিলাম, ঠিক তেমনি ভাবে এতটুকু মেহনত না করে আর এক ঝাপটায় বাবার গা থেকে খসে ছিটকে গিয়ে পড়লাম এক ধারে। আমাদের ঠাকুর মশাইটি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন কে জানে। তেড়ে এসে দু' খাবলা ফুল বেলপাতা দু'জনের হাতে দিয়ে প্রচণ্ড ধমকের সুরে হাঁকতে লাগলেন—নমঃ শিবায় শান্তায়—বলুন—অনাদি লিঙ্গ তারকেশ্বর শিবায় নমঃ।

অবশেষে বেরিয়ে আসার সময় সমাগত হোল। যে দরজা দিয়ে ঢোকা সেই দরজা দিয়েই বেরনো। দরজার মুখ পর্যন্ত পৌছতে পারলে বেরিয়ে আসাটা তেমন কিছু নয়। এক মহাবীর—দাঁড়িয়ে আছেন দরজা জুড়ে। এক পাল মেয়ে মদ্দকে মন্দির গর্ভে ঢুকিয়ে দিয়ে—দরজা আটকে রেখেছেন তিনি, আর ঘন ঘন সিংহনাদ ছাড়ছেন—"আও, জলদি কর বাহার আও।" তাঁর নাগালের মধ্যে পৌছলেই খ্যাক করে ধরে ফেলছেন তিনি, তৎক্ষণাৎ এক হেঁচকায় একেবারে দরজার বাইরে পৌছে দিচ্ছেন। তালগোল পাকানো মানুষের ডেলা থেকে এক একটা মানুষকে যে কায়দায় ছিঁড়ে আলাদা করে মন্দিরের দরজার বাইরে নিক্ষেপ করছেন তিনি—তা' তারিফ করার মত ব্যাপার। মহাবীরের সাক্ষাৎ বংশধর, বাবার দ্বাররক্ষক। স্থানটি বাংলা দেশে হোলে হবে কি, বাবার চর অনুচরগণ সবাই খাস মহাবীরের মুল্লুক থেকে আমদানী করা মাল। বাঙলা দেশের মানুষ মনুষ্য নামক জীবকে অমন লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করতে পারে কখনও!

দরজার বাইরে পৌছে নিজের নিজের শক্তি প্রয়োগ করে পথ করে নিতে হবে। বাইরে যারা অপেক্ষা করছে ভেতরে যাবার জন্যে—তারা একচুল নড়বে না। কিন্তু তারা রুখতে পারবে কেন? সদ্য বাবাকে স্পর্শ করতে পেরেছে যারা, তাদের সঙ্গে এঁটে উঠবে কে! আর এক চোট হুলস্থূল কাণ্ডের পরে ভিড়ের বাইরে গিয়ে পৌছলাম যখন, তখন দম ফেলবার আর সামর্থ্য নেই। পুকুরে ডুবে ভিজে কাপড়েই দর্শন করবার জন্যে মন্দিরে ঢোকার সুবিধেটুকু মর্মে মর্মে বুঝতে পারলাম। ভিজে কাপড় না হোলে কি রক্ষে ছিল। হাওয়া নেই, আলো নেই, ঐ দরজাটুকু ছাড়া আর কোনও ছিদ্র নেই। ওর মধ্যে অতগুলো জীবকে এক সঙ্গে ঢোকানো হচ্ছে। ভক্তি-রসের ভয়ঙ্কর নেশায় সবাই বুঁদ, বাবার মহিমায় মন্দিরে সেঁদুলেই সবাই অষ্টপাশ মুক্ত হোয়ে যায়। কিন্তু হাজার হোলেও রক্ত মাংসের তৈরী জীব সব, বাবার মত পাষাণ নয়। ঐ ভিজে কাপড়ের কৃপাতেই কোনও রকমে দমটুকু নিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে। নয়ত যে কি হোত! যা হোত, তাতে বাবার মাহাত্ম্য আরও খানিকটা বাড়ত বই কমত না।

বাবার মাহাত্ম্য কিসে বাড়ে, কেমন ভাবে বাড়ে, তা নজরে পড়ল বাবাকে দর্শন করে মন্দির থেকে পরিত্রাণ পাবার পর মুহূর্তে। ভিড় থেকে আলগা হোয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছিলাম, সেটা হোল বাবার নাটমন্দির। মন্দিরের সামনে একটা লম্বা-চওড়া দালান থাকে, প্রায় সমস্ত মন্দিরের সামনেই থাকে। ঐ দালানটা থাকবার হেতু ভক্তরা ওখানে বসে ধ্যান জপ পূজা পাঠ করবেন। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক তীর্থেই মন্দিরের সামনের দালানে ধ্যান জপ হোম ইত্যাদি হোয়ে থাকে। ঐ বিশেষ স্থানটির নাম নাটমন্দির এই জন্যে যে—একদা দেবতার সামনে নৃত্য গীত বাদ্য অর্থাৎ নাট্য হোত। এখনও দাক্ষিণাত্যের কোনও কোনও নাটমন্দিরে বিশেষ উৎসবের দিনে নৃত্য-গীতাদি হোয়ে থাকে। কিন্তু কেউ কি কখনও কল্পনা করতে পারে যে নাটমন্দিরে হাসপাতাল খোলা হোয়েছে। হাঁ—হাসপাতাল, বাবার হাসপাতাল। বাবার হাসপাতালে বাবা স্বয়ং এক এবং অদ্বিতীয় ডাক্তার। বাবার হাসপাতালে খাট গদি বিছানা ওষুধ পথ্য নার্স মুদ্দাফরাশ কিচ্ছু লাগে না। কোনও হাঙ্গামা নেই, রোগীরা একখানা নতুন কাপড় পরে একখানা নতুন গামছা গায়ে জড়িয়ে নাটমন্দিরে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কেউ উপুড় হোয়ে অনবরত মুখ রগড়াচ্ছে সিমেন্টের মেঝেয়, কেউ পাশ ফিরে শুয়ে আছে হাত-পা গুটিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে। চিত হোয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে কয়েকজন, মুখের ওপর নতুন গামছা চাপা দিয়েছে। গামছার ওপর একপাল মাছি বসেছে, জ্যান্ত না মড়া—কি ভেবে বসেছে মাছিরা তা' ওরাই জানে। মর্মান্তিক দৃশ্য, মাঝে মাঝে অতি ক্ষীণ আওয়াজ উঠছে—'বাবা বাবাগো।' সেই আওয়াজটুকু কানে গেলে বুকের ভেতরে কি রকম যেন মোচড়াতে থাকে, নিঃশ্বাস বন্ধ হোয়ে

আসে। আর একবার বিশেষ ভাবে বুঝতে পারলাম, বাবার দেহ কেন পাষাণ দিয়ে গড়া। পাষাণে গড়া শরীর বাবার, তাই ওই অতি-ভয়ানক যন্ত্রণাভোগ দেখা, ওই অন্তিম আর্তনাদ শোনা পোষায়। পাষাণ না হোয়ে অন্য কোনও ধাতুতে যদি তৈরী হোতেন বাবা, তা'হলে কবে ঐ দৃশ্য দেখতে দেখতে আর ঐ দীর্ঘশ্বাস শুনতে শুনতে গলে ক্ষয়ে একদম নিখোঁজ হোয়ে যেতেন। হাসপাতাল চালিয়ে আর করে খেতে হোত না।

ঐ করেই বাবার চলে। ঐ বিনা খরচার হাসপাতাল চলছে বাবার দরবারে। তাই বাবার দরবার হোল সাচ্চা দরবার। সাচ্চা দরবারে রোগীকেই যে আসতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই! রোগীর মা বউ ভাই যে কোনও আত্মীয়-বন্ধু এসে মরণ পণ করে পড়ে যদি ঐ দরবারে—তা' হলে বাবার দয়ায় ঐ সাচ্চা দরবারের মাহাত্ম্যে রোগ সারবেই। ডাক্তার বদ্যি চিকিৎসা বিজ্ঞান যখন পরাস্ত হয়, তখন খোলা আছে ঐ সাচ্চা দরবার। দরবারের খাতায় নাম ঠিকানা লেখাতে হবে, কার জন্যে কি উদ্দেশ্যে 'হত্যে' দিতে এসেছ তা' উল্লেখ করতে হবে। সঙ্গে একজন জামিনদার থাকা চাই। যে জামিন হবে তাকে থাকতে হবে ঘর ভাড়া করে। যে ব্রাহ্মণ ঘর ভাড়া দেবেন তিনি হবেন আর এক জামিন। সমস্ত দায় দায়িত্ব তাঁর। তাঁর যজমান হত্যা দিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি বাবার কাছ থেকে আসল বস্তুটি অর্থাৎ বাবার কৃপা আদায় করে দেবেন। তিন দিন পাঁচ দিন বা সাত দিন লাগে বড় জোর, নিরম্বু উপবাস করে বাবার দরবারে পড়ে থাকে—বাবার ভক্ত। দিন দু'য়েকে হুঁশ জ্ঞান থাকে, তারপর কেমন যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা হোয়ে যায়। শুধু ঐ মর্মান্তিক স্বরটুকু জেগে থাকে। 'বাবা, বাবাগো'—মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে বাবার নাটমন্দিরের মধ্যে। লক্ষ যাত্রী যায় আসে, হৈ হৈ করে। দিন রাতে বার চার পাঁচ প্রচণ্ড আওয়াজ ওঠে এক জোড়া ঢাকের, ঢাক দু'টোও আছে ঐ নাট মন্দিরের মধ্যে। কাঁসর ঘণ্টা ঢাক ঢোল আর লক্ষ কণ্ঠের চিৎকার হচ্ছে যেখানে, সেখানেই পড়ে আছে ঐ ভাবে বাবার ভক্তরা। কিছুতেই কিছু হয় না ওদের, ওরা বেঁচে যায়—। অপরের অগোচরে বাবা ওষুধ দেন। কি দেন, কেমন ভাবে কখন দেন, তা' কেউ জানে না। বাবার আদেশ পেলেই রোগী বা রোগীর জন্যে যে পড়েছে সে উঠে যায়। বাবার হাসপাতালের—জয়-জয়কার। বদ্যিবাটীর ঘাট থেকে তারকেশ্বরের মন্দির পর্য্যন্ত দশ বার ক্রোশ রাস্তা প্রতি রাতে কাঁপতে থাকে ভক্ত কণ্ঠের—আকুল জয়ধ্বনিতে। গঙ্গা-জলের বাঁক কাঁধে নিয়ে লক্ষপতির ঘরণীও পায়ে পায়ে হাঁটে সারা, পথ মুখে ঐ এক বাণী—ভোলে তারক বোম সাচ্চা দরবার কি জয়।

সাচ্চা দরবার—চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। মন্দিরের মধ্যে দরবারের মালিক ধামার তলায় ঘুমিয়ে আছেন না জেগে আছেন, তাই বা কে বলবে। ক্রমেই তেতে উঠল মেজাজ, ক্রুদ্ধ আক্রোশে বুকখানা ফাটে আর কি। মনে মনে বললাম দরবারের মালিককে—"তোমার শক্তি আছে, মানুষের—রোগ ভোগ তুমি নাশ করতে পার। মানুষের বুদ্ধি বিবেচনায় যেখানে কুলায় না, মানুষ যেখানে হার মানে, সেখানে তোমার কেরামতি তুমি দেখাও—কেন তবে খামকা এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দাও জীবকে! ইচ্ছে করলেই যখন তুমি সবাইকে রোগমুক্ত করতে পার, তখন দিন পাঁচ সাত মরণ পণ করে পড়ে থাকতে হয় কেন ওদের, কি সুখ পাও তুমি এই যাতনা ভোগটা দেখে? এই বীভৎস দৃশ্যটা তোমার দরবারে না থাকলে কি দরবারের মাহাত্ম্য কমে যাবে?"

জবাব তৈরী হোয়েই ছিল—নাটমন্দিরের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে ঘরে পা দিতে না দিতেই সঠিক জবাবটি পেয়ে গেলাম।

ঘর হোল এমন ঘর—যার ভেতর পা দিয়ে দাঁড়ানোই চলে। বসা শোয়া বা গেরস্থালি পাতা কিছুতেই সম্ভব নয়। গেরস্থালি পাতবার জন্যে সে ঘরের সৃষ্টিও হয় নি। যাত্রীরা কয়েক ঘণ্টার জন্যে ভাড়া নেয়, বড় জোর কেউ একটা রাত কাটায়। পাশাপাশি দু'টো মানুষ শুলে ঘরের তিন ভাগ খতম হোয়ে গেল। প্রমাণ মাপের মানুষ হোলে পা মুড়ে শুতে হবে। অতটুকু এক একটা খুপরি বানাবার কারণ হোল, বড় ঘর করলে এক পাল যাত্রী ঢুকে পড়বে। যতগুলো খুবরি, ততগুলো আধুলি উপার্জন হয় প্রতিদিন—যদি প্রত্যেকটি খুপরিতে যাত্রী জোটে। তা' জোটে,

এমন কি দিনে একটা খুপরি চার বারও ভাড়া হয়। এক একটা খুপরি দিন তিন-চার টাকাও কামিয়ে দেয়। খরচা এক পয়সাও নেই, একখানা খেজুর পাতার চাটাই পড়ে আছে ঘরে। তার রূপ আর বর্ণ দেখে উদ্ধারণপুরের কথা স্মরণ হোল। কি নেই তাতে! যাত্রীগণ বাবার মাথায় জল চড়িয়ে ফিরে ঐ চাটায়ের ওপর বসেই জলযোগ সমাধা করেন। মিষ্টির রস, তরকারির ঝোল, বাচ্চা-কাচ্চার "ছ্যা"—সবই আছে। থাকুক যা থাকে, দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্য তখন ফুরিয়েছে। ঘরে ঢুকেই চাটাই খানির ওপর বসে পড়তে যাচ্ছিলাম, পেছন থেকে পরিবার হা হা করে উঠলেন—"ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। ইস্ ছুঁয়ে ফেললে! যাও, আবার পা ধুয়ে এস গে।"

থতমত খেয়ে ফিরে দাঁড়ালাম, মুখ থেকে বেরিয়ে গেল —"কেন! হোল কি!"

"বেরিয়ে এস, শিগ্‌গির বেরিয়ে এস ঘর থেকে।" দু' চোখ রক্তবর্ণ করে চেঁচাতে লাগলেন পরিবার—"এতটুকু আক্কেল নেই গা! স্বচক্ষে দেখলে ঐ ঘেয়ো কুকুরটা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, দেখেও ঐ চাটাই ছুঁতে যাচ্ছ! ঐ দেখ, ঐ—ঐ কোনে শুয়েছিল কুকুরটা, পুঁজ রক্ত লেগে রয়েছে। ঐ এক ঝাঁক মাছি বসেছে ঐখানটায়। এস, বেরিয়ে এস শিগ্‌গির। মা গো মা, আবার নেয়ে মরতে হবে।"

মড়াকান্না যাকে বলে, কিস্তৃতকিমাকার মুখ করে বিকট চিৎকার। যৎপরোনাস্তি মিয়িয়ে গেলাম। ঐ চিৎকার, ঐ নাকেকান্না, ঐ জাতের বেহায়াপনা করে লোক জমাবার চেষ্টা করছে যে মানুষটা—তাকে যেন আমি চিনিই না, কস্মিনকালে যেন দেখিনি তাকে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল খন্তাকে, খন্তার দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কি করত আজ খন্তা! খন্তার দিদি বাজারে দাঁড়িয়ে ন্যাকাপনা জুড়ে দিয়েছে, এ দৃশ্য দেখলে খন্তার সেই দাঁত বার-করা মুখখানার অবস্থা কেমন দাঁড়াত! তেড়ে বেরলাম ঘর থেকে, একটা যা তা' কাণ্ড করে বসতাম হয়ত সেই মুহূর্তে। বাবাই রক্ষা করলেন, পাশের খুপরির দরজা দিয়ে অনেকটা নুয়ে দেড় মানুষ লম্বা একখানি জীবন্ত বংশদণ্ড বেরিয়ে এলেন। বেরিয়েই হাসি, হাসি নয় ঠিক কাসি। অথবা হাসি এবং কাসির মিশ্র পদার্থ যাকে বলে তাই। হাসতে গিয়ে বিষম লেগে গেল, না বিষম লাগা অবস্থায় তিনি হাসতে লাগলেন তা বোঝা গেল না। বোঝাবুঝির আর অবকাশই মিলল না, আচমকা একটা তুল-কালাম কাণ্ড বেধে গেল। অস্বাভাবিক লম্বা দেহযষ্টিখানি সোজাভাবে খাড়া করার উপায় নেই সেই বারান্দায়, খোলার চাল—চালের তলার বাঁশ—বেঁটে মানুষে হাত তুলে ছুঁতে পারে। ফলে ধনুকের মত বেঁকে রইলেন তিনি, অন্তত: এক হাত লম্বা মুখখানি পৌনে হাত লম্বা গলার ডগায় আটকানো রইল। সেই মুখ আবার খোঁচা-খোঁচা চুল দাড়িতে ঢাকা। মুখ থেকে ইঞ্চি ছয়েক এগিয়ে আছে তাঁর নাকের ডগা। মাথার মাঝখানে এক গোছা রুক্ষ চুল খাড়া হোয়ে আছে। সেই মুখ নাক মাথা চুল ঘন ঘন কাঁপছে, কাঁপছে খন্তার দিদির মুখের ঠিক আধ হাত ওপরে। কোথায় গেল ন্যাকাপনা—আর নাকে কান্না, কোথায় গেল সেই অতি-চালাক চক্ষু দুটির চিকচিকে আলো। আচম্বিতে এক রাক্ষস গলা বাড়িয়ে হাঁ করে মাথার ওপর বদনখানি এগিয়ে আনলে কুঁদে ত্যাঁদড়ের তাঁদড়ামিও ঘুচে যায়। খন্তার দিদি পর পর দু'বার আত্মপরিচয় দিয়ে ফেললেন। বেহদ্দ-বেয়াহাপনা করতে তাঁর বাধে না এবং তিনি ভয় পেয়ে আঁতকে উঠতেও জানেন। পরম পরিতুষ্ট হলাম। তৎক্ষণাৎ দু'জনের মাঝখানে ঢুকে আড়াল করে দাঁড়ালাম। বিদকুটে হাসির বদলে সেই বদন থেকে তখন অগ্নিবর্ষণ শুরু হোল।

"নিষ্ঠে—হুঁ হুঁ—বাবা—ঐ নিষ্ঠেটুকু হোল আসল কথা। নিষ্ঠে নেই ভক্তি নেই, মনের ভেতর চর্বাকর পাক। বাবা টের পান, সব টের পান। হাতে পেয়েও হারালি—হুঁ হুঁ—কপাল পুড়ল—ঘেয়ো কুকুর দেখে—মুখ ফিরিয়ে নিল। হায় হায়—নিষ্ঠে কই—"

বক্তৃতার অন্তে খাঁটী যাত্রার ঢঙে গান জুড়ে দিলেন—

ও রে—

ও রে তুই মুখ পোড়ালি—মূল খোয়ালি—ভাল বেসাত করলি বটে।

আর সহ্য হোল না, টপ করে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর চরণ দু-খানির ওপর কপালটা সজোরে চেপে রইলাম। মোক্ষম চাল, গান বক্তৃতা সমস্ত বন্ধ। আধ মিনিট বাদে হেঁচকা মেরে চরণ দু'খানি ছাড়িয়ে নিয়ে আবার সেই খুপরির মধ্যে তিনি অন্তর্ধান করলেন। উদ্ভটভাবে

তোতলাতে-তোতলাতে কি যে বলে গেলেন বোঝা গেল না।

উঠান ভরতি হোয়ে গেছে মানুষে। যার যা খুশি বলতে লাগল। মোদ্দা কথা হচ্ছে, ঘেয়ো কুকুর কেউ কথনও দেখেনি সেখানে। ও তল্লাটে একটাও ঘেয়ো কুকুর নেই। তা'হলে ঘেয়ো কুকুরটার আসল পরিচয় কি!

পরিচয় একদম সকলের জানা। বাবা ছলনা করে গেলেন। ঘেয়ো কুকুরের রূপ ধরে মনস্কামনা পূর্ণ করতে এসেছিলেন। হৈ হৈ দূর ছাই করে তাড়িয়ে না দিলে—আহা—

তাড়িয়ে না দিলে হতভাগীর কপাল ফিরে যেত।

সুতরাং চারিদিক থেকে সহানুভূতির ঝড় উঠল।

হতভাগী তখন মুখ তুলতে পারছে না। সেই গোলমালের ভেতর যতটা সম্ভব কানের কাছে মুখ এগিয়ে বললাম—"কেমন! আর মারবে চালাকি? এত বড় তীর্থে এসেও চ্যাটামি করতে ছাড়বে না। এখন ঢোক ঐ খোপে, তাড়াতাড়ি ঐ ভিজে কাপড় বদলাও। ভিজে কাপড়ে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, ততক্ষণ কেউ নড়বে না।"

এতক্ষণ পরে ভিজে কাপড়ের দিকে খেয়াল গেল। ছুটে গিয়ে ঢুকল ঘরে। চাপা গলায় বলে গেল—কি মুশকিলেই যে পড়লাম! ঐ মড়ার চ্যাকড়াটার দরুণ ঘেয়ো কুকুর আমদানি করে যে এই বিষম ফাঁপরে পড়ব তা' কি জানতাম!"

ক্রমশঃ

প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসেরও ধর্ম ছিল

মলয় রায় চৌধুরী এম-এ

গ্রীস মানেই তো যেখান থেকে ইতিহাসের আরম্ভ, গ্রীসেরও কি প্রাগৈতিহাসিক কাল ছিল নাকি—সন্দেহ হয় অনেকের। যে ইতিহাস গ্রীসের আছে তার পূর্বেও তো কিছু একটা ছিল নিশ্চয়ই! খৃষ্টপূর্ব পাঁচহাজার বছর পূর্বে কি গ্রীসে মানুষ ছিলনা? নিশ্চয়ই ছিল। আর শুনে অবাক হতে হয় যে তাদের ধর্মও ছিল। সেই খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার সনেও পুজো করত গ্রীসের লোকেরা। গ্রীসের ইতিহাস তো আর এক-আধ দিনে তৈরী হয়নি, বহুদিন লেগেছে এবং ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে জমে তা এককালে বিশাল হয়েছিল। ট্রয় আর ইথাকা, মায়সীন আর ল্যাব্রীস্থ তো সেই স্রোতের মাঝপথের একটু অংশ মাত্র। তার আগেও কিছু ছিল এবং তারও আগে কিছু একটা ছিল নিশ্চয়ই। সব ধরে রাখা যায়নি—সময় হারিয়ে দিয়েছে তাকে, আর কোন স্থলে সে নিজেই হারিয়ে দিয়েছে সময়কে। নিওলিথিক যুগের মধ্যে হারিয়ে গেছে বহু তথ্য, বহু ইতিহাস। ম্যাসেডোনীয়া হতে ক্রীট আর লিউকাস হতে সাইপ্রাস্ পর্যন্ত প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসের তথ্য আহরণের যে অভিযান চালান হয়েছিল তাথেকে নিওলিথিক ও ব্রোঞ্জ যুগের গ্রীসের ইতিহাসের বহু অংশ পাওয়া গেছে। জানা গেছে যে খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ১১০০ সন পর্যন্ত গ্রীসে যে ধর্ম ছিল সেই ধর্মই ক্রমবিস্তার লাভ করে পরের যুগে এবং গ্রীকরা বহু দেব-দেবীর পুজো করতে শেখে। গ্রীসের ব্রোঞ্জ যুগটুকু ভাগ করে দেখা হয়ে থাকে সাধারণতঃ প্রথম হল গ্রীকের যাকে বলা হয়ে থাকে মিনোয়ান (খৃঃ পূঃ ৩০০০-১১০০) এবং অপরটি মূল গ্রীসভূমির অর্থাৎ মায়সীনীয়ান (খৃ পূ ১৬০০-১১০০)।

প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসের প্রামাণিক অর্থে ইতিহাস বিরল, তাই সে যুগের ধর্মাচরণের প্রমাণাদি যা সামান্য কিছু পাওয়া গেছে তা হতেই তখনকার ধর্ম সম্বন্ধে একটা ধারণায় আসা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক
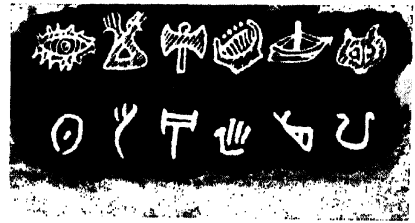
প্রথম সারিতে সুপ্রাচীন মিনোয়ান চিত্রলিপি।
পরের সারিতে অক্ষরের জন্ম।

গ্রীক সমাজে ধর্ম যে ছিল তা বোঝা যায় কয়েকটি রমণীর মূর্তি হতে, যেগুলি প্রায় ছয়-সাত হাজার বছরের পুরোন বলে মনে করা হয়। সে যুগের গ্রীসে গুহার অভ্যন্তরে পুজো করাটাই ছিল রেওয়াজ। মূর্তি পুজো তখনও সম্পূর্ণরূপে আরম্ভ হয়নি। গুহার মধ্যে কোন কিছু একটা স্থাপন করে তাকেই দেবতাজ্ঞা মনে করা হত। যে বিখ্যাত গুহাটি

পাওয়া গেছে তা এমনিসস-এ। এই গুহাটি হতে বোঝা যায় যে সেকালের গ্রীকরা ষ্ট্যালাগমাইট-এর গুহাতেই পুজো করত। পুজো করা যে কোন শক্তির প্রতীক। এমনিসস-এর গুহায় পাওয়া গেছে কিছু পাত্র, যা থেকে মনে করা হয় যে দেবতাকে দুধ, মধু এবং কখনও কখনও মদও উৎসর্গ করা হত। গুহাটিতে কোনরকম মূর্তি পাওয়া না যাওয়ায় মনে করা হয় যে তখনও মানুষ মূর্তিপুজো আরম্ভ করেনি। হোমার-এর কবিতা হতে বোঝা যায় যে এ গুহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন এইলিথিয়া। সেই প্রাগৈতিহাসিক নিওলিথিক যুগ থেকে খৃষ্ট ধর্মের প্রথম যুগ পর্যন্ত গ্রীকরা দেবী এইলিথিয়াকে পুজো করে এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে।

প্রামাণিক তথ্যাদি অন্যান্য গুহাতেও পাওয়া গেছে। সাইকো, আর খালোপোরী, কামারেস ও মাউন্ট ইদা প্রভৃতি গুহায় পাওয়া গেছে তখনকার ধর্মাচরণের ইতিহাস। এ বিষয়ে ক্রীট বিখ্যাত। গুহায় পুজো সেখানেই বেশী হত এবং তার তথ্য প্রমাণাদি কম নয়। গ্রীসের মূল ভূমিতে এখনও এসবের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবুও বিশ্বাস করা যেতে পারে যে সেখানেও গুহার পুজো অনুষ্ঠিত হত। কারণ এ্যাটিকোয় ও ম্যাসেডোনীয়ার দুটি গুহায় নিওলিথিক যুগের পরের কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে।

গুহার পুজো করার কি করে যে উৎপত্তি হল সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। অনেকে মনে করেন যে পুরাকালে গ্রীসে মৃতদেহ গুহায় কবর দেওয়া হত কিংবা হয়ত গুহাতেই তখনও বাস করত মানুষ। গুহার ভেতরের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশটুকু হয়ত ভয়ের উদ্রেক করত এবং ভয় থেকে এল ভক্তি। ক্রমে প্রতিটি গুহাই হয়ে উঠল রহস্যময় এবং পূজ্য। ষ্ট্যালাকটাইট আর ষ্ট্যালাগমাইট এর অদ্ভুত চেহারা বেশ খাপ খেয়ে গেল ভয় আর রহস্যের সঙ্গে। তখন ভাবা অসম্ভব হলনা যে দৈবশক্তিদের অবস্থান সেখানেই।

ক্রমে কয়েক শতক পরে পর্বতের চুড়া ও অন্ধকার বনও পুজোর জন্যে ব্যবহার হওয়া আরম্ভ হল। মিনস-এর প্রাসাদ হতে কিছু দূরে মাউন্ট জুকটাস-এর চুড়ায় একটা পূজার বেদীর প্রমাণ পাওয়া গেছে—আর একটা পাওয়া গেছে পেটসোফাতে। প্রতিটিই দেয়ালে ঘেরা ছিল—যার মধ্যে ছাই কাঠ কয়লা আর কিছু উৎসর্গীকৃত জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। অনেকের মতে তদানীন্তন গ্রীক ধর্মাচারে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করাও পূজানুষ্ঠান সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ক্রীট ও মায়সীন হতে যে সমস্ত সোনা বা দামী পাথরের ওপর আঁকা ছবি ইত্যাদি পাওয়া গেছে তা থেকে মনে করা যেতে পারে যে এগুলি ধার্মিক আচারাদিতে ব্যবহার করা হত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যে পবিত্র স্থানটিকে পুজো করা হত তার ছবি আছে ওই সমস্ত ধাতুর ওপর। অনেক সময়ে গাছকেই পুজো করা হত। অবশ্য সব জায়গায় যে একই বস্তুকে পূজ্য মনে করা হত, তার কোন প্রমাণ নেই। বহু ক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট থামকেই পবিত্র বলে মনে করা হয়েছে। মায়সীন হতে প্রাপ্ত শীলমোহরে দেখা যায়, এক ব্যক্তি হাত তুলে একটা থামকে ভক্তি নিবেদন করছে। সৌণ্টাস হতে প্রাপ্ত দুটি কাঁচের টুকরোয় দেখা যায় যে একটি থামের ওপর কোন তরল পদার্থ ঢালছে। খুব সম্ভব প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসে থামকে আধ্যাত্মিকতার প্রতীক বলে মনে করা হত।

কোন পাহাড়ের চূড়ায় কোনপ্রকার মূর্তি পাওয়া যায়নি এ পর্যান্ত। এ থেকে মনে করা যেতে পারে যে বহুযুগ পর্যন্ত পাহাড়ের চূড়ায় প্রাগৈতিহাসিক গ্রীকরা মূর্তি পূজা করত না বা করতে শেখেনি। তবুও বহুলাংশে গুহার এবং পর্বতের চূড়ার পুজো প্রায় একই ছিল। প্রতি ক্ষেত্রেই ধর্মাচরণের অংশে ছিল ভক্তিভরে হাত ওঠান, কোনপ্রকার তরল পদার্থ পূজ্য বস্তুটির ওপর ঢালা, আগুন জালান এবং দেবতার উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র উৎসর্গ করা।

পর্বতের চূড়া এবং গুহা পুজোর মতই ছিল পবিত্র গাছের পুজো। মিনোয়ান মায়সীনীয়ান লোকেরা মনে করত যে যেখানে বেশী গাছপালা আছে সেখানে দেবতার আবির্ভাব হয়ে থাকে এবং পবিত্র গাছ হল বনস্পতির প্রতীক। সব রকমের গাছই প্রায় পবিত্র ছিল। উৎসর্গীকৃত দ্রব্যাদিতেও আঁকা থাকত গাছের ছবি।

কিন্তু পাহাড়-গুহা-বনানী হতে দূরে নগরে যারা থাকত তারা কেউ বিধর্মী ছিল না। নগরবাসীদেরও ব্যবস্থা ছিল ধর্মাচরণের। প্রতি গৃহেই বা সে যুগের প্রাসাদেই একটি করে পূজার্চনার ঘর থাকত। মন্দির —অর্থাৎ একটি বিশেষ স্থান যেখানে সকলে মিলিত হয়ে ধর্মপালন করতে পারে তা প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসে ছিল না। তবে একটি প্রমাণ গৌরনিয়াতে পাওয়া গেছে। কিন্তু তাকে মন্দির না বলে মঠ বলাই ভাল। মঠটি এখানে গ্রামের সমস্ত অধিবাসীরই ব্যবহারোপযোগী ছিল। গৃহেতে যে সমস্ত পূজার্চনার ঘর থাকত তা আকারে ছোট হত। মিনস-এর প্রাসাদে যে ঘরখানি আছে, মিনোয়ান যুগের শেষ দিকে হলেও তার আয়তন মাত্র দেড় মিটার স্কোয়ার। মধ্য মিনোয়ান যুগের যে ঘরখানি ফায়েসটস-এ পাওয়া গেছে, প্রাপ্ত ঘরগুলির মধ্যে যা সবচেয়ে পুরোণ তার আয়তন মাত্র দৈর্ঘ্যে ৩·৬৫ মিটার ও প্রস্থে ২·৭০ মিটার। কিন্তু

প্রাচীন ক্রীটের একটি শিলালিপি

যে সমস্ত গৃহ বা প্রাসাদে থামকে পূজা করা হয়েছে সেই ঘরগুলির আয়তন বড়। গৃহাভ্যন্তরের এই সমস্ত থাম সাধারণত চৌকাকার। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত থামের ওপর দেখা গেছে দুই-কুঠারের চিহ্ন এবং কখনও কখনও ওই ধরণের কুঠারও পাওয়া গেছে পুজোর ঘরগুলোয়। একটি থাম পাওয়া গেছে যাতে কুঠার রাখার মত সুন্দর একটি স্থান আছে।

মন্দির (যে অর্থে এখানে প্রযোজ্য) এবং পুজোর ঘরের পরই বলতে হয় ছোট-ছোট চৌবাচ্চার আকারের ঘর, মাটি খুঁড়ে যেগুলো তৈরী করা হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলিতে সিঁড়ি তৈরী আছে নীচে নামার জন্য। ধর্মাচরণের কোন অঙ্গ হিসাবে যে এইগুলি ব্যবহার হত সেটাই আশ্চর্যের। কিন্তু পূজার্চনায় ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি সেখানে পাওয়া যাওয়ায় মনে হয় যে স্থানগুলি ধর্মানুষ্ঠানের জন্যেই ছিল।

প্রাগৈতিহাসিক গ্রীকরা দুমুখো কুঠার কেন ব্যবহার করেছে সে বিষয়ে মতভেদ আছে এখনও। কুক-এর মতে দুই কুঠারের অর্থ হল দেব এবং দেবীর একত্র অধিষ্ঠান। আর্থার ইভান্স মনে করেন এটি দৈবদাম্পত্যের চিহ্ন। জর্জ মাইলোনাস মনে করেন যে পুরুষ দেবতার সৃষ্টি প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসে বহু পরে হয়েছে তাই সেই রকম ধারণা করা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব সব ক্ষেত্রেই দুটি করে জিনিসের ব্যবহার করার নিয়ম থাকায় মিনোয়ানরা কুঠারও দুমুখো রাখত।

ছোট-ছোট মূর্তিও পাওয়া গেছে পাঁচটি—এর মধ্যে পক্ষী হস্তে পুরুষ ও একটি রমণীর মূর্তি দেবতার্থে নয়। বাকী তিনটি হল রমণী মূর্তি, যার নীচের দিকটা ঘণ্টার আকারের। এঁরা তিনজন হলেন পূজ্যা। সবচেয়ে বড়টির উচ্চতা বাইশ সেন্টিমিটার এবং তিনিই হলেন মুখ্য দেবী মূর্তি। গৌরনীয়াতেও পাওয়া গেছে এই ধরণের মূর্তি—বা প্রতিমাও বলা চলতে পারে। হাতে সাপ জড়ান। প্রায় প্রতিটি দেবী মূর্তির সঙ্গেই আছে সাপের অবস্থিতি।

মিনোয়ান সর্প দেবীর একটি সুন্দর মূর্তি পাওয়া গেছে মিনস-এর প্রাসাদ হতে, যা মধ্য-মিনোয়ান যুগের বলে ধরা যেতে পারে। দেবীর মাথা হতে নেমে এসেছে একটি সাপ এবং দুটি হাতেও ফণা-বিস্তার-করা দুটি সাপ। দেবীর চোখ দুটিও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় প্রচুর বড়। আর্থার ইভান্স-এর মতে সর্প-দেবী হলেন মৃতের অধিশ্বরী অথবা উর্বরতার দেবী। যে মৃত তাকে মাটির সাথে মিশিয়ে যেতে হয়ে থাকে এবং মাটিতেই জন্মায় বনস্পতি—অতএব সর্প-দেবী দু'য়েরই অধিশ্বরী। অনেকে মনে করেন যে সর্প হল প্রাগৈতিহাসিক গ্রীকদের কাছে প্রহরী ও অভিভাবকের মত।

পাখীরাও ছিল সেকালের পবিত্র বস্তুগুলোর অন্যতম। এর মধ্যে ঘুঘু পাখী প্রধান। এমন পাখীর চিহ্ন প্রায় প্রতি ধর্মানুষ্ঠানের স্থানে পাওয়া গেছে। দাক্ষিয়া ত্রিয়াদাতে যে দুমুখো কুঠারটিকে দেখা গেছে তার প্রতি অঙ্গে পাখীর ছবি। পরের যুগের আকাশচারী দেবদেবীর জন্ম হয়ত এ থেকেই। পাখীর উপস্থিতি খুব সম্ভব কোন অদৃশ্য দেবতার জন্য।

পশুদের বলিদানের প্রথা মিনোয়ান-মায়সীনীয়ান যুগে ছিলনা এবং কোন দেবীকে কিছু প্রাণ উৎসর্গ করা হত কিনা তা জানা যায়নি এখনও। অনেকে মনে করেন যে পশুবলির রেওয়াজ ছিল প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসে। প্রাসাদ চিত্রাবলী হতে এর কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্থার ইভান্স মনে করেন যে দেবতার উদ্দেশ্যে ষাঁড়ের লড়াইও অনুষ্ঠিত হত সেকালে। সঙ্গীতানুষ্ঠান অর্থাৎ তখনকার কিছু স্থূল বাজনা ইত্যাদিও বাজান হত। পূজা-পার্বণে চামড়ার পোষাক পরত নারীপুরুষ নির্বিশেষে।
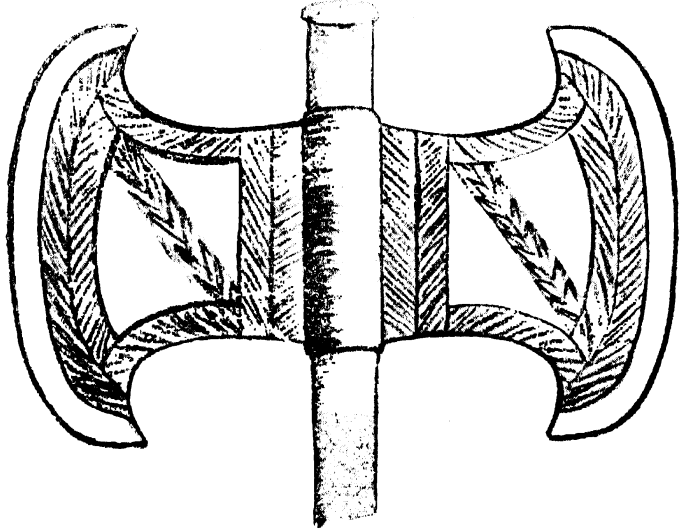
পবিত্র প্রাগৈতিহাসিক কুঠার।

দেখা যাচ্ছে যে প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসে নারী মূর্তির পুজোই বেশী হত। বহু যুগ পরে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভের কিছু পূর্বে একজন পুরুষ মূর্তি পূজ্য বলে মনে করা হয়। দেবীদের মধ্যে প্রধানা হলেন সর্প দেবী অর্থাৎ উর্বরতার দেবী। এঁর পর হলেন—পক্ষী দেবী, শান্তির দেবী, বনস্পতির দেবী, পশুদের দেবী, পর্বতের দেবী, যুদ্ধের দেবী এবং সমুদ্রের দেবী। দেবীদের বিভিন্ন অবতার বলে মনে করা হবে না ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মনে করা হবে—সে বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে। আর এ বিষয়ে তথ্য প্রমাণাদিও পাওয়া যায়নি

তেমন। আর্থার ইভান্স মনে করেন যে ওগুলি একই দেবীর বিভিন্ন রূপ। ডাঃ নীলসন-এর মতে ওরা হলেন ভিন্ন ভিন্ন দেবী, সকলেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে বড়। তখনকার গ্রীস একেশ্বরবাদী হতে পারে কিনা সে বিষয়ে প্রচুর সন্দেহ পোষণ করা চলতে পারে কারণ পরের যুগেও তা হয়নি। যুগ-যুগান্তর কেটে গেছে মানুষের সেই রকম সভ্যতার পর্যায়ে পৌঁছোতে।

তবুও একথা বিশ্বাস করতেই হয় যে প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসেও ধর্ম ছিল। তারাও প্রথমে পবিত্রতাকে ও পরে দেব-দেবীর পূজো করা শিখেছিল। তদানীন্তন মিশরীয় সভ্যতার দ্বারা যে তারা প্রভাবিত হয়নি তার প্রমাণ তাদের ভিন্ন-ভিন্ন দেবী ও ধর্মাচরণ হতেই পাওয়া যায়। এই স্থূল ধর্মানুষ্ঠান হতেই ক্রমে গ্রীসে ধর্ম বিস্তার করে এবং ব্রোঞ্জ যুগের প্রারম্ভে ধার্মিক আচার-ব্যবহার, দেব-দেবী ও পৌরাণিক গল্পে গ্রীকরা তখন সমৃদ্ধ। পরের যুগে গ্রীস এই প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসকে ভিত্তি করেই বেড়ে উঠেছে।

কলিকাতা য়ুনিভারসিটি ইনসটিটিউটে শিশিরকুমারের প্রথম অভিনয়

শ্রীবামাপদ বসু

পুরাণো দিনের পুরানো কথা ভালো লাগে। যিনি শোনান তিনি ফিরে যান তাঁর সেই হারিয়ে যাওয়া সুখ-দুঃখের স্মৃতিঘেরা দিন গুলির ভিতর। আর যিনি শোনেন তাঁর দরদী মন এমন একটা আনন্দরসে সিক্ত হয়ে উঠে যার আস্বাদন ভাষার সাহায্যে অন্যকে বোঝান যায় না—শুধু যার মধুর অনুভূতি হয় অন্তরের মাঝে হৃদয়ের স্পন্দনের সঙ্গে তাল দিয়ে-দিয়ে। তাই পুরাতন-প্রসঙ্গ উভয়েরই কাছেই আদরণীয়।

আমার স্মৃতির এলবাম থেকে কলিকাতা য়ুনিভারসিটি ইনসটিটিউটের কিছু পুরাণো চিত্র দেখাব—আর শোনাব তাদেরই সঙ্গে অভিন্ন হয়ে জড়িয়ে থাকা পুরাণো কাহিনীগুলি। আশাকরি আপনাদের মনোরঞ্জন করবে।

আমি ফিরে যাচ্ছি আজ হতে পঞ্চাশ বছরেরও পূর্বে একটা সময়ের মাঝে-ইংরেজী ১৯০৯ সালে।

বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটের বাঁকের মুখে এখন ইনসটিটিউটের যে গম্ভীর মূর্তি প্রাসাদতুল্য বাড়িখানা রয়েছে সেই প্রায় বিস্মৃত পুরাণো দিনে তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। এরই ঠিক পশ্চিম দিকে রাস্তার অন্য পারে সংস্কৃত কলেজের পূব অংশের একটা একতালা বড়ো ঘর, একটা হল ঘর আর গোলদিঘীর অবারিত বাতাস-বহে-যাওয়া ছোট একটু খানি বাগান সামনে নিয়ে মোটা-মোটা থামওয়ালা একটা দালান—এই ছিল তার গর্ব করবার মতন সর্বস্ব গৃহ-সম্পদ। তখন ঐ রাস্তার নাম ছিল কলেজ স্কোয়ার ঈস্ট। এখন বদল করে বঙ্কিমচন্দ্রের নামাঙ্কিত হয়েছে।

বর্ষার শেষে ফালি জমিটুকুতে মালী লাগাতো গাঁদা ফুলের চারা। শীতকালে তাদের পাতার সবুজ রাশির মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত গুচ্ছ-গুচ্ছ জরদ রঙের আড়ম্বর ঘটা।

দালানটার উপর আমরা জমায়েৎ হতেম জনকয়েক। ইনসটিটিউটের অন্য মেম্বারদের মধ্য থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গড়ে উঠেছিল এই একটি অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী। এখানে বসে এমন সব বিষয়ের আলোচনা করা হতো যার রুদ্ধ ইনসটিটিউটের পাঠগৃহের চারটে দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব ছিল না—সঙ্গতও হতো না। তবে সে-সব আলোচনায় ছিল শুচিতা ভব্যতা—নৈতিক সুস্থতায় ছিল তারা নিটোল স্বাস্থ্যবান। আমাদেরই মধ্যে কে-একজন কবি এই দলটির একটা কাব্যময় নাম দিয়েছিল—Marigold club. পরে ইনসটিটিউটের সকল কার্যক্ষেত্রে এই গোষ্ঠী একটা বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করে রেখেছিল বহু বৎসর ধরে। শিশির কুমার ছিল এই গোষ্ঠীরই একজন।

বড়ো ঘরটাকে পার্টিসন দিয়ে ভাগ করা ছিল—মাঝখানে লাইব্রেরি। একদিকে সেক্রেটারীর ঘর, অন্যদিকে কমিটির মীটিং ঘর। পূর্ব দিকের দরজার সামনের দুটো ধাপ সিঁড়ি নেমে একটা কাঠের ছোটো সাঁকো পার হয়ে যাওয়া যেত হল ঘরের ভিতর। হলের উত্তর প্রান্তে ছিল উঁচু সভামঞ্চ [Dais], তার সামনে বেতের ছাউনি-দেওয়া আরাম ঠেসান-ওয়ালা অনেক গুলো বেঞ্চের সারি। এই বেঞ্চগুলো পুরাণো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে নূতন বাড়িতে এখনও কোনও রকমে টিকে আছে দেখেছি।

ইনসটিটিউটের মেম্বার ছিল দুই শ্রেণীর—সিনিয়র আর জুনিয়র। ছাত্ররা ছিল জুনিয়র মেম্বার। জুনিয়র মেম্বারদের ভিতর থেকে কয়েকজন আণ্ডার-সেক্রেটারী নির্বাচিত হত প্রতি বৎসর। ইনসটিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনায় সাহায্য করবার ভার থাকত তাদের উপর। কোনো ছাত্রী মেম্বার ছিল না। মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রসার আজকালকার মতো তখন এত ব্যাপক হয়নি। সঙ্গীত-চর্চার কোনো ব্যবস্থাই ছিলনা ওখানে। সে-কালে কোনো ছেলে গান গাইলে তার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হয়ে উঠতেন অধিকাংশ অভিভাবকেরা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান রকম শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা, ছোটো খাটো নাট্যাভিনয় কৌতুকাভিনয়, কখনও-বা বিখ্যাত কোন সঙ্গীত বিশারদের আসর প্রায়ই হতো। ছাত্রদের মধ্যে সংস্কৃত ইংরেজী পারসীক ভাষায় আন্তর্কলেজীয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ছিল এখানকার প্রধান বিশেষত্ব। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে মেলা-মেশা করে যাতে সামাজিকতা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠে সেই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে হতো প্রীতি-সম্মেলন। আরও হতো ইনসটিটিউটের প্রতিষ্ঠা দিনে জাহাজ ভাড়া করে গঙ্গায় আনন্দ কোলাহল মুখরিত ষ্টীমার পার্টি। পরে মেম্বারদের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়াতে এটা বন্ধ হয়েছিল। তার পরিবর্তে হতো বাগান-পার্টি। তাতে খেলা-ধূলায় হৈ-হল্লায় আদর আপ্যায়নে ভোজনানন্দে বাগানখানা মুখর হয়ে উঠত। সকলে সন্ধ্যা বেলায় ফিরে আসত একটা আনন্দের পসরা বয়ে নিয়ে। তার মধুময় স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে জেগে থাকত মনের ভিতর কিছু দিন ধরে।

এ-ছাড়া আরও হতো শিক্ষার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গস্বরূপ কোনো একটা ভালো নাটকের পূর্ণাঙ্গ অভিনয়। কলেজী শিক্ষার বাইরে ছাত্রদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার করানই ছিল ইনসটিটিউটের প্রধান লক্ষ্য। সে-সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে, জেনারল এসেমব্লীজ ইনসটিটিউসনে, সেণ্ট জেভিয়াস´ কলেজে, হিন্দু হোস্টেলে—আরও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে নাটকের অভিনয় হতো। জেনারল এসেমব্লীজ ইনসটিটিউসনের নাম বদল করে এখন হয়েছে স্কটিসচার্চ কলেজ। য়ুনিভার্সিটি ইনসটিটিউটে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিনয় পটু ছাত্র মেম্বার পাওয়া যেত। তাদের সমন্বয়ে এখানকার নাট্যাভিনয় তাই উচুদরেরই হতো। রসিক জনগণ মধ্যে তার বেশ একটা সুনাম সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এ-বছরে স্থির হলো হ্যামলেটের অভিনয় হবে। তখন আচার্য বিনয়েন্দ্রনাথ সেন আর আচার্য সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ দুজনে সেক্রেটারী। দুজনেই এখন পরলোকগত। সেই বছরের আণ্ডার সেক্রেটারীদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি হচ্ছেন শৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময়ের কিছু দিন আগে শৈলেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই অসুস্থ অবস্থায় তিনি অনর্গল শেকসপীয়র আবৃত্তি করতেন, বিশেষ করে হ্যামলেট নাটকের হ্যামলেটের উক্তিগুলি। হয়তো এঁরই আগ্রহাতিশয্যে ঐ নাটক খানাই মনোনীত হয়েছিল সে বছর অভিনয়ের জন্যে।

যাঁরা যাঁরা অভিনয় করতে ইচ্ছুক, এমন সব মেম্বারদের একদিন আহ্বান করে এনে বিভিন্ন ভূমিকার পাত্র নির্বাচন করে দিলেন আচার্য মহলানবীশ। যাঁরা যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের সকলের নাম মনে নেই। তবে নিজের স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে কিছু কিছু বলছি—

রাজা ক্লডিয়াস ও প্রেতাত্মা—প্রথমে যিনি নিয়ে ছিলেন তাঁর নাম মনে নেই। পরে তাঁর বদলে দেওয়া হয়েছিল শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে।

হ্যামলেট—শৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পোলোনিয়স ও প্রথম সমাধি খনক—যতীন্দ্রনাথ মিত্র। পরে এঁর বদলে দেওয়া হয়েছিল রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

লেয়ার্টেস—কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হোরেসিও—যতীন্দ্রকুমার মিত্র।

ধর্মযাজক—ভোলানাথ দত্ত।

মারসেলাস—নেপালচন্দ্র রায়।

বার্ণাডো—মুরুশেদ আলি।

ফ্রানসিসকো—কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় কবর খনক—নেপালচন্দ্র রায়।

লর্ডস—

প্রথমে যারা ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের নাম মনে নেই। পরে—বামাপদ বসু [লেখক], গিরীন্দ্রনাথ সেন, শচীন্দ্রনাথ সুর।

রাণী গারট্রুড—নগেন্দ্রনারায়ণ বসু।

ওফেলিয়া—আবদুল হাকিম।

মহলা দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেল। সেণ্ট জেভিয়াস কলেজ থেকে ফাদার পাওয়ার আসতেন শিক্ষা দিতে। অভিনয়ে অংশ নেয়নি এমন অনেকে আসত মহলা-দেওয়া দেখতে। তাদের মধ্যে শিশির কুমার ভাদুড়ীও ছিল একজন। অভিনেতাদের ভাব-ভঙ্গী কী হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে শিশির মাঝে মাঝে মন্তব্য করত। একদিন বলেছিল প্রেতাত্মার মুখে কোনো ভাবের ছায়ামাত্রও থাকবে না। ধীর গম্ভীর পা ফেলে কেবল সে মঞ্চে ঢুকবে। চলা ছাড়া তার অন্য অন্য অঙ্গ-গুলো একেবারে অনড় হয়ে থাকবে। হাত দুখানা দেহের সঙ্গে বেঁধে দেওয়াই উচিত—যাতে কোনো রকমে নাড়তে না পারে।

রাজা ক্লডিয়াস আর প্রেতাত্মার ভূমিকা একই লোক নিয়েছিলেন। তাঁর অভিনয় শিক্ষকের মনোমত হচ্ছিল না। তাই শিশিরকুমারকে ঐ দুটো ভূমিকায় নামতে বলাতে সে রাজী হলো। তখন প্রথম নির্বাচিতের পরিবর্তে শিশিরই হলো রাজা ক্লডিয়াস আর প্রেতাত্মা।

মহলা চলতে লাগল। এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই যা হয়ে থাকে এখানেও তার ব্যতিক্রম হলোনা। উৎসাহের আতিশয্যে যারা অপ্রধান অংশ-গুলি নিয়েছিল তাদের অনেকেই নিয়মিতভাবে অনুপস্থিত হতে লাগল। কোনো অভিনেতার অনুপস্থিতিতে মহলা দেওয়া বন্ধ থাকত না। বিকল্প বিধানে তার জায়গায় যাকে হোক অন্য একজনকে দাঁড় করিয়ে প্রধান অভিনেতারা মহলা দিয়ে যেত। কিছু দিন পরে দেখা গেল এই রকম বেতালা বিশৃঙ্খল শিক্ষা নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে-দর্শকদের কাছে হাস্যাস্পদ হতে হবে। শিক্ষা দেওয়ারও ত্রুটি ছিল। তখন একদিন অস্থির-মতিদের বাতিল করে দিয়ে যারা নিশ্চিন্ত উপস্থিত হতে পারে এমন পাত্রদের নির্বাচিত করা

হলো। আর ভালো করে তালিম দিতে পারে, এমন একজন যোগ্য শিক্ষাদাতাও এলেন। এর নাম Mr. H. W. B. Moreno ছাত্রদের নাট্যরঙ্গ শিক্ষা দেওয়ার কৌশলে এঁর বেশ একটা সুনাম-সুখ্যাতি ছিল। ইনি আসবার পর থেকে নিয়ম-শৃঙ্খলার বাঁধুনিতে অভিনয় শিক্ষার গতি ভালোর দিকেই ফিরে চললো—আমাদের নিরাশার অন্ধকারে আলো দেখা দিল।

মহাকবি বলেছেন—

The course of true love never did run smooth

অন্য অন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তখনকার বাংলাদেশের ছোটোলাট বাহাদুরকেও। এই অনালোচিত অনভ্যাবিত বিপদ আসাতে সকলে যে কী করবেন তা স্থির করে উঠতে পারলেন না।

সেই সময়ে বাগবাজার পল্লীতে একজন ভদ্রলোক থাকতেন তাঁর নাম মিঃ এস, সি মুখার্জি। সভাসমিতিতে, বিদগ্ধজনের মজলিসে তিনি Funniman উপনাম নিয়ে ইংরেজীতে কৌতুকাভিনয় করতেন। তাঁর শেকসপীয়র সোসাইটি বলে একটি শৌখিন নাট্য সম্প্রদায় ছিল। এঁরা মাঝে মাঝে বিশ্বকবির নাটক অভিনয় করে সুধীজনগণের

অভিনেতাদের চিত্র

একথা শুধু প্রণয় সম্বন্ধে নয়—সংসারের অনেক শুভ বিষয়েও যে ঐ-উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য, তার প্রমাণ হয়ে গেল একদিন একখানা চিঠি পেয়ে। যিনি পোলোনিয়াস আর প্রথম কবরখনকের ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি এতদিন ধরে বরাবর নিয়মিত ভাবে মহলা দিয়ে আসছিলেন। এখন তাঁর কাছ থেকে এক পত্র এলো। সে-পত্রের সার মর্ম হচ্ছে যে তিনি অভিনয় করতে পারবেন না। তাঁর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়েছে—অভিনয় করবার দায়িত্ব থেকে তাঁকে যেন নিষ্কৃতি দেওয়া হয়।

নাটক মঞ্চস্থ করবার তখন আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকী আছে। কিছু কিছু নিমন্ত্রণ পত্রও বুঝি তখন পাঠানো হয়ে গেছে। নিমন্ত্রণ হতো

মনোরঞ্জন করতেন। ইনসটিটিউট থেকে গেলেন আরও কে কে গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলো বিপদ সাগর থেকে উদ্ধার পাবার আশায়। সেখান থেকে ত্রাণ-তরণি-রূপে এলেন এক ভদ্রলোক পোলোনিয়াস আর কবর-খনকের রিক্ত ভূমিকা পূর্ণ করবার জন্য। এঁর নাম রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গোলগাল দোহারা চেহারা। উচ্চতার একটু বুঝি হ্রস্ব। এখন মনে হয় সম্প্রতি হ্যামলেটের বিখ্যাত ছায়াচিত্রে যে পোলোনিয়াসের সাক্ষাৎ পাই তার সঙ্গে এঁর যেন দেহগত একটা সৌসাদৃশ্য আছে। বেশ রসগ্রাহী ভদ্রলোক।

ইনি সমস্ত দেখে অবস্থা বুঝে আশ্বাস দিয়ে বললেন—ভাই শেকস-পীয়রের অন্য অন্য কয়েকটা নাটকে নেমেছি বটে, কিন্তু পোলোনিয়াসের

ভূমিকায় কখনও অভিনয় করিনি। যাই হোক সময় অল্প আছে দেখছি, কিন্তু তৈরী করে নিতে পারব বলে আশা হয়। প্রম্পট্ করেন কে? দর্শকগণ-নিন্দিত দৃশ্যপটের অন্তরালবর্তী এই অধন্য কাজটির ভার ছিল লেখকের ওপর। আমাকে বললেন, ভাই তুমি আমার পোলোনিয়স অভিনয়ের সময় বেশ একটু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে প্রম্পট্ কোরো। তাতে ওদিক থেকে যদি কেউ কিছু মন্তব্য করেন সে-কথায় একেবারে কান দিও না। আর যখন Grave-digger হব তখন আমার যা-কিছু বলবার সে-সব একটা কাগজে বড়ো-বড়ো করে লিখে কবরের খাদের মধ্যে ফেলে রাখব। যেমন যেখানে আটকাবে অমনি সেই সময়ে নিচু হয়ে এক কোদাল মাটি কাটব—ব্যস্ সেই অছিলায় দেখে নেব কী বলতে হবে। ভদ্রলোক করেও ছিলেন তাই অভিনয়ের সময়ে।

এঁকে নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করবার বাকী কটা দিন খুব উৎসাহের সঙ্গে মহলা দেওয়া চললো। নির্দিষ্ট তারিখের আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় ড্রেস রিহার্সাল। বক্তৃতা মঞ্চটাকে খানিকটা আগে সরিয়ে এনে তার পিছনে খান তিন চার তক্তা জুড়ে দিয়ে প্রসারিত রঙ্গমঞ্চ তৈরী হয়েছে। এই তক্তাগুলোর দুখানা খুলে ওফেলিয়ার সমাধির খাত তৈরী হবে। সুমুখে প্রোসেনিয়াম্ বাঁধা হয়েছে। ইংরেজ কেশ-প্রসাধক Summerson watts-এর বাড়ি থেকে এসেছে সজ্জাকর আর সাজ-সজ্জার সরঞ্জাম-সম্ভার। হলঘরের পিছনে উত্তরদিকে বারাণ্ডায় গ্রীণ রুম। প্রধান-প্রধান অভিনেতাদের আর 'অভিনেত্রী' দুজনের নেপথ্য-বিধান শেষ করে ড্রেস রিহার্সাল আরম্ভ হয়ে গেল। দর্শকদের বসবার আসনে রয়েছেন Moreno সাহেব, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র আর উৎসাহী কতকগুলি সভ্য। সকলকে এখন মনে পড়ছে না। একটু আধটু দোষ-ত্রুটি যা হচ্ছিল সংশোধন করে দিচ্ছিলেন শিক্ষক দুজন। শেষ অঙ্কেও শেষ দৃশ্যে রাজা আর রাণীর সুমুখে লেয়ার্টেস আর হ্যামলেটের অসি-ক্রীড়া হবে। ক্লডিয়াস-বেশে শিশিরকুমার আর গারট্রুড-বেশে নগেন্দ্রনারায়ণ এসে নিজের নিজের আসনে বসল। খেলার তরবারী-গুলো নিয়ে ঢুকলো ওস্রিক। যুদ্ধ আরম্ভ হবে এমন সময়ে Moreno সাহেব বললেন Well, where are the lords? এই দৃশ্যে রাজার পার্শ্বচর সঙ্গী লর্ডদের থাকবার কথা, কিন্তু অভিনেতা কোনো লর্ডই উপস্থিত নেই। যাঁরা এই ভূমিকায় নাম দিয়েছিলেন তাঁরা একদিনও মহলা দিতে আসেননি। হয়ত তাঁরা ভেবেছিলেন—কথাবার্তা কিছু বলতে হবে না, শুধু পোষাক পরে রং মেখে দাঁড়িয়ে থাকার আর কী রিহার্সাল দেবো! আজকের সন্ধ্যাতেও তাঁরা অনুপস্থিত। কিন্তু Moreno সাহেব বললেন লর্ড-যে চাই-ই। তা না হলে রাজসভা অসম্পূর্ণ। যাঁরা উপস্থিত দর্শক ছিলেন তাঁদের বললেন কেউ এসে এই ভূমিকা নিন না। কিন্তু কারুর কাছে কোনো উৎসাহের লক্ষণ না দেখে আমার দিকে ফিরে বললেন—তুমিই এই ভূমিকাটা নাও-তো। আমি ইতস্তত: করছি। আমার কাছে ছিল গিরিন সেন। সে অভিনয়ের প্রতিটি মহলায় উপস্থিত থাকত। আর তারী ইচ্ছে ছিল মঞ্চে নেমে অভিনয় করে, কিন্তু এগিয়ে এসে কোনো ভূমিকা নেবার সাহস তখনও তার হয়নি। সে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে বললে—আপনি যদি একজন লর্ড সাজেন তাহলে আমিও আর একজন সাজব। আপনি নিন-না এই পার্টটা। তখন গিরীনের সঙ্গে পরিচয় নূতন—'আপনি'র কোঠা পার হয়ে সম্বোধন 'তুমি'তে পরিণত হয়নি। আমাদের ইতস্তত: করা দেখে Moreno সাহেব হাসতে হাসতে বললেন—Gentlemen, don't you like honours thrust upon you? Come and take up the roles. যাও সাজঘরে গিয়ে শুধু জামাটা গায়ে দিয়ে এসো। তাঁর কথাটা আর অমান্য করা গেল না। দুজনে লর্ডের জমকালো জামা গায়ে দিয়ে মাথায় পরচুলো এঁটে রাজা রাণীর পিছনে এসে দাঁড়ালেম। আমাদের দেখে সাহস করে আরও একজন পোষাক পরে এসে দাঁড়াল। এর নাম শচীন্দ্রনাথ সুর।

ড্রেস রিহার্সাল শেষ হলো। একটা নূতন আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেম সে রাত্রে।

পরের দিন সন্ধ্যায় অভিনয়*। হলঘর সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহে পরিণত হয়েছে। মঞ্চের একেবারে সুমুখে কুশন মোড়া চেয়ার সাজানো—বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে। বিকাল থেকেই আমরা উপস্থিত হয়েছি। পূর্ণ উদ্যমে সজ্জাকরণের নেপথ্য-বিধান চলছে। একজন রং মাখাচ্ছে একজন পোষাক-পরিচ্ছদ পরাচ্ছে। অপর একজন মাথায় পরচুলা এঁটে দিয়ে মুখের উপর গুম্ফশ্মশ্রুর বাহার ফুটিয়ে তুলছে। কথা না-কইলে আর চেনবার উপায় থাকছিল না যে আসল কোনজন। যথা সময়ে অভিনয় আরম্ভ হলো—এ-সম্বন্ধে সকলেই বিশেষ সজাগ ছিলেন। দর্শকপূর্ণ হলঘর নিস্তব্ধ। ফ্রানসিসকো বার্ণাডো হোরেসিও মারসেলাসের আলাপ-সংলাপ ছাড়া কোথাও অন্য শব্দ নেই। রঙ্গমঞ্চে ধীর পদবিক্ষেপে শুভ্রাঙ্গ শুভ্রবেশী প্রেতাত্মার প্রবেশ—তেমনই ধীরভাবে বহির্গমন—যেন একটা চলমান মর্মর নির্মিত স্ট্যাচু। অভিনেতাদের ভীতি-বিহ্বল কথোপকথন। প্রেতাত্মার পুন:প্রবেশ। মার্সেলাসবেশী নেপাল রায়ের নিষ্ফল অস্ত্রাঘাত মঞ্চের উপর ঠুকে গেল। অমুদ্বেগ পদক্ষেপে প্রেত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল রঙ্গমঞ্চ হতে। অভিনয় সহজ লয়ে দ্রুতগতিতে চলেছে। শিশিরের অভিনয় ভালোই হচ্ছিল। নবাগত রাধানাথবাবুর আরও ভালো। থেমে থেমে অভিনয় করায় বেশ স্বাভাবিক প্রাণবন্ত হচ্ছিল। তৃতীয় অঙ্কে হ্যামলেট পোলোনিয়সকে হত্যা করেছে। প্রেতাত্মা শিশির অভিনয় করে গেল গম্ভীর কণ্ঠস্বরে।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই ওফেলিয়ার সমাধি-খনন দৃশ্য। রাধানাথবাবু এখন Grave-digger সমাধি খননে ব্যাপৃত। হ্যামলেট আর হোরেসিওর প্রবেশ। খনকের সঙ্গে চটুল আলাপ সংলাপ। রাধানাথবাবুর যেমন যেখানে আটকাচ্ছে অমনি তিনি নিচু হয়ে বিলাতী কোদাল—Spade চালাচ্ছেন আর মাটি কাটার অছিলায় খাদের মধ্যে ফেলে-রাখা লেখা পাট দেখে নিচ্ছেন। দ্বিতীয় খনকের সঙ্গে টাটী-বটকেরা চলছে গান গাইছে। সমাধি ভূমির পারিপার্শ্বিক অবস্থায়

---

* ইংরেজী ১৭ মার্চ ১৯০৯ সাল।

অবিচলিত। অশিক্ষিত মত্তপ মজুরের ঠেকে-যাওয়া অভিনয় বড়ো স্বাভাবিক হচ্ছিল। দূরে শববাহীদের সঙ্গে রাজা রাণী লেয়ার্টেস আসছে। হ্যামলেট হোরেসিওর অন্তরালে অবস্থান। ধর্মযাজকের সঙ্গে তর্কাতর্কির পর শবদেহ সমাধির খাদে নামিয়ে দেওয়া হলো। রাণী গারট্রুড তার উপর Sweets to the sweet : Farewell ! বলে একরাশ সাদা ফুল ছড়িয়ে দিলেন। অধীর হয়ে ভাই লেয়ার্টেস সমাধির খাদের মধ্যে লাফিয়ে নেমে পড়ল—গভীর শোকাবেগে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—

Now pile your dust upon the quick and the dead.

হ্যামলেট এগিয়ে এসে বললে—

What is he whose grief Bears Such an emphasis :······

This is I. Hamlet the Dane.

সেও লাফিয়ে নামল খাদের ভিতর। যেই নামা আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে লেয়ার্টিস—

The devil take thy Soul !

বলে তার গলা টিপে ধরল।

কান্তি ফুটবল খেলত। বেশ ব্যায়ামপুষ্ট ষণ্ডা-গুণ্ডা তার শরীরখানা। শৈলেশ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণদেহী। গলাটিপে ধরাটা বোধহয় অভিনয়ের মাত্রা ছাড়িয়ে বেশী বাস্তবধর্মী হয়েছিল। ধস্তাধস্তিতে শৈলেশের মাথার পরচুলাটা খুলে খাদের ভিতর পড়ে গেল। নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদের সঙ্গে উর্ধ্বাঙ্গের নাটকীয় অসঙ্গতি ঘটায় প্রেক্ষাগৃহের পিছনের আসনগুলো থেকে একটা হাসির শব্দ উঠলো।

হোরেসিও আর রাজঅনুগামীগণ দ্বন্দ্বী দুজনকে পৃথক করে দিলে। হ্যামলেট অপমানে বিক্ষুব্ধ—রাগে গর-গর করছে। বলছে Why I will fight with him upon this theme—এই চরম মুহূর্তে হোরেসিও যতীন্দ্রকুমার পরচুলাটা হাতে তুলে নিয়ে হ্যামলেটের কাছে এগিয়ে ধরে একটু চাপা গলায় বললে—এই এইটে পরো। হ্যামলেট অসম্মতিসূচক মাথা নেড়ে অভিনয় করে চললো। হোরেসিও আবার পরচুলাটা এগিয়ে ধরে পরবার জন্মে অনুরোধ করলে—হ্যামলেট সজোরে মাথা নেড়ে নাঃ পরবো না—নাঃ পরবো না—বলে তার অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগল—পিছনের দর্শকদের মধ্যে হাসির শব্দ পাওয়া গেল। এবার সেটা পূর্বের অপেক্ষা উচ্চতর গ্রামে আর অধিকতর সময়ব্যাপী। এদিকে হ্যামলেট বলে চলেছে—

I lov'd Ophelia : forty thousand brothers could not······

Make up my sum.

কিন্তু অভিনয় একেবারে হৃদয়গ্রাহী হলো না—দর্শকদের মনকে কোনোরূপে স্পর্শ করলে না। করুণ রসের প্রবাহধারার মাঝে হাল্কা হাস্যরসের ঘূর্ণি এসে রসভঙ্গ করে দিয়ে গেল।

এরপর নাটক আর ভালো করে জমল না।

শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য আরম্ভ হলো। শৈলেন ভারী মুষড়িয়ে গিয়েছে। উদ্যমহীন বিরস অভিনয় করে চলেছে সে রাজার প্ররোচনায় উত্তেজিত লেয়ার্টেসের সঙ্গে হ্যামলেটের অসিক্রীড়া। ওফেলিয়ার সমাধির উপর হ্যামলেট তাকে যে অপমান করেছে তারই প্রতিশোধ নিতে হবে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে। তার পিতৃহন্তাকে হত্যা করবে সে খেলার অছিলায়। রাজা গুপ্তমন্ত্রণায় বলেছেন—ক্রীড়া-অসির মুখে সাধারণত যে-রক্ষা বতুল দেওয়া থাকে তার অসিতে চোরাভাবে সেটা খুলে রাখা হবে, আর তীক্ষ্ণ মুখটাও বিষলিপ্ত করা থাকবে।

রাজারাণী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে নিজ নিজ আসনে বসলেন। আমরা তিনজন বোত্রহীন লর্ড তাঁদের অনুগমন করে পিছনে এসে দাঁড়ালেম। সুমুখে টেবিলের উপর স্ফটিক-আধারে ক্লান্তিনিবারক পানীয় সুরা। লেয়ার্টেসের হাতের উপর হ্যামলেটের হাতখানা দিয়ে রাজা খেলা আরম্ভ করবার আজ্ঞা দিলেন।

খেলা আরম্ভ হলো। খেলতে খেলতে হ্যামলেট তরবারী দিয়ে লেয়ার্টেসকে স্পর্শ করতে পারলে। রাজা জয়সূচক কপট উল্লাসের সঙ্গে হ্যামলেটকে বললেন—তোমার সাফল্যের পুরস্কার—বড়ো একটা মুক্তা-ফেলে রাখলেম এই পানীয়ের মধ্যে। এই কথা বলে অন্যের অজ্ঞাতসারে মিশিয়ে দিলেন তাতে একটা উগ্র বিষ।

খেলা চলেছে। রাণী তৃষ্ণার্ত হয়ে আতঙ্কিত রাজার মিনতিপূর্ণ মানা না শুনে নিঃসন্দিগ্ধ মনে পানপাত্র তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন। লেয়ার্টেস বিষলিপ্ত অসি দিয়ে হ্যামলেটকে আহত করলে। নিয়ম-ব্যভিচারী অতর্কিত রক্তপাতে উত্তেজিত হ্যামলেটের হাত হতে আর অকস্মাৎ লেয়ার্টেসেরও হাত হতে হাতিয়ার দুটো পড়ে গেল। তখনই তারা আবার সে দুটোকে তুলে নিয়ে খেলতে লাগল। এবার লেয়ার্টেস আহত। মেঝে থেকে তুলে নেবার সময় অদৃষ্টের পরিহাসে তরবারীর বদল হয়ে গেছে। এখন লেয়ার্টেসের বিষাক্ত অসিখানা হ্যামলেটের হাতে—আর তারই আঘাতে ছিন্ন হয়েছে লেয়ার্টেসের উরুস্থল।

খেলা চলেছে। অকস্মাৎ রাণী ঢলে পড়লেন। কী হলো—কী হলো—একটা গণ্ডগোল হুলস্থূল পড়ে গেল। রাণী জানালেন—পানীয় মধ্যে প্রাণঘাতী বিষ দেওয়া রয়েছে—তাঁর জীবন শেষ। লেয়ার্টেসও বুঝতে পেরেছে যে সেও মরণাহত। রাজার সমস্ত চক্রান্ত ব্যক্ত করে দিয়ে সে বললে—আমার মৃত্যু নিশ্চিত। তুমিও মৃত্যুপথযাত্রী। ক্রীড়া-অসির মুখে প্রাণান্তকর বিষ দেওয়া আছে। রাজা—এই রাজাই এ দুষ্কর্মের জন্য দায়ী। তাই শুনে হ্যামলেট গর্জন করে বলে উঠলো—কী অসিমুখও বিষলিপ্ত !

The point envenomed too !

Then, venom, to thy work.

করুক বিষ তার যথা কার্য—এই বলে রাজার বুকে মরণের অগ্রদূত সেই তরবারী সজোরে বসিয়ে দিলে। আর রাণীর পীতাবশিষ্ট বিষাক্ত পানীয়টা জোর করে রাজার মুখে ঢেলে গিলিয়ে দেওয়ালে।

তুমুল কাণ্ড পড়ে গেল। রাজসভা দানবের নৃত্য সভায় পরিণত হলো। রাজা ক্লডিয়াস বেশী শিশির৹বিকট চিৎকার করতে করতে হুড়-মুড় করে এসে দড়াম করে পড়ল স্টেজের উপর। তার পা দুটো রইল প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের অভিমুখে।

রাজ-অনুমোদন ব্যতীত বিনা আড়ম্বর-অনুষ্ঠানে কেবল মাত্র নাট্যাচার্যের নির্দেশে আমার লর্ড পদবী লাভ হয়েছে গতকাল সন্ধ্যা-বেলায়। কিন্তু লর্ডের ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে কোনো শিক্ষাই আমি পাইনি। আমি দেখলাম চোখের সামনে একজন মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ লোকে এ-ক্ষেত্রে কী করে থাকে? আবার এখানে যিনি খুন হচ্ছেন তিনি যা তা ব্যক্তি নন—তিনি স্বয়ং দেশের রাজা। আমি তাঁর পার্শ্বচর বন্ধু একজন লর্ড। আমার এখন কী করা কর্তব্য? এই কথা যেমন মনে হোল অমনি আমার সামনে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে রাজার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বসলেন। আর তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার মূক অভিনয় করতে লাগলাম। পিছনে হ্যামলেট—লেয়ার্টেস হোরেসিওর উক্তি চলেছে।

এই সময়ে আমাদের দিকে যদি কেউ দৃষ্টি দিয়ে দেখে থাকেন তো তিনি দেখেছিলেন রাজা কী সব বলছেন। সে কী তার মৃত্যু যন্ত্রণার করুণ কাতরোক্তি, না আত্মগ্লানি—অতীত পাপ জীবন-যাপনের স্খালন-স্বরূপ স্বীকারোক্তি? কিন্তু শিশিরের মুখ হতে এর কোনোটাই অভি-নীত হচ্ছিল না। সে যা বলছিল তা হ্যামলেট নাটকের Folio বা quartoতে পাওয়া যাবে না, আর তার ভাষাটাও ইংরেজী নয়।

পিছনে হ্যামলেট বলে চলেছে—

O, I die, Horatio';

The potent poison quite O'er crows my spirit:

এ-দিকে শিশির আমার কোলে মাথা রেখে অতি সাধারণ বাংলা ভাষায় তাকে দুটি অপূর্ব খাদ্য ভক্ষণের পরামর্শ দিচ্ছিল। সে দুটির একটি হচ্ছে—কিছু অগ্নিদগ্ধ কচু আর অন্যটি অনুরূপ অগ্নিপক্ক কদলী—শৈলেশের অভিনয় শিশিরের একেবারে মনোমত হচ্ছিল না।

আমার পেটের ভিতর থেকে একটা হাসির তরঙ্গ ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে উপরে উঠতে চাইছিল। সামনে চেয়ে দেখি মাত্র কয়েক হাত দূরে একেবারে সামনা-সামনি মাননীয় অতিথিগণ বসে রয়েছেন। মৃতকল্প রাজদেহ কোলে নিয়ে আমার হাসিটা শোভন না-হওয়ারই সম্ভাবনা। শিশিরকে বললাম—শিশির চুপ করো। হাসি চেপে রাখতে পারছিনা। কে শোনে সে কথা, পিছনে চলেছে হ্যামলেটের উক্তি…

I connot live to hear the news from England;

আর এ-দিকে শিশিরের সেই উপদেশের বার-বার আবৃত্তি।

আমি অন্য উপায় না দেখে দাঁত দিয়ে আমার জিভটাকে কামড়ে ধরলেম, আর শিশিরকে দিলেম বেশ একটা জোর টিপুনি। তখন রাজা ক্লডিয়াসের মৃত্যু হলো আর অভিনয়েরও শেষ যবনিকা পড়ল।

সাজঘরে গিয়ে আমার সেই আধঘণ্টার আবুহোসেনীর পোষাক ছাড়ছি। আমার পাশে পোলোনিয়স আর কবরখনকের দ্বৈভূমিকার ভরতপুত্র রাধানাথবাবু ভেসেলিন ঘষে মুখের স্বাভাবিক বর্ণটা ফিরিয়ে আনবার পরিশ্রম করছেন। তাঁর পরিধানে সর্টস আর উর্দ্ধ অঙ্গে গেঞ্জী। এমন সময়ে দুজন কর্মী এসে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে চললো বাইরে রঙ্গমঞ্চের দিকে। ব্যাপার কী? শুনলেম ছোটো লাট সাহেব খোঁজ করছেন যিনি পোলোনিয়সের ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি ভারতীয় কী না। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার জন্যে শিষ্টাচার-বিরোধী এই সমাদর। রাধানাথবাবুকে সেই অবস্থাতেই স্টেজের উপর খাড়া করে দিলে কর্মী দুজন। লাটসাহেব তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করে চলে গেলেন। ইনসটিটিউটে শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের পুরস্কার ছিল একটা মেডাল। অন্যের ঈর্ষা আর মনোবেদনা উৎপাদন করে সেটা ঝুলতে লাগল রাধানাথবাবুর কণ্ঠ উদ্দেশে।

য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে শিশিরকুমারের সেই সর্বপ্রথম অভিনয়। সে-অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্তু Aeschy-tusএর কথায় বলতে পারি out of a little seed a great tree might grow—বনস্পতির প্রথম অঙ্কুরোদ্গমে যে কী বিপুল বৃহৎ সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে তা সাধারণ লোকচক্ষুতে প্রতিভাত হয় না। সে-সন্ধ্যায় তার অভিনয় অনাদৃতই ছিল। কিন্তু পরে এই য়ুনিভার্সিটি ইনসটিটিউটে বছর বছর প্রতি অভিনয়ে উৎকর্ষতা লাভ করে পূর্ণতা-গৌরব পেয়েছিল তার অসামান্য নাট্য-প্রতিভা। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় কাবালক্ষ্মী তার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ যশোমালিকা।

এখানে বলা অবান্তর হবে না নাট্যমঞ্চে শিশিরকুমারের অভিনয়-নৈপুণ্য দেখেই সাধারণ দর্শকবৃন্দরা মুগ্ধ হয়ে এসেছিলেন। এঁদের সকলের কাছে শিশির ছিল একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষ-অভিনেতা। কিন্তু মঞ্চের অন্তরালে যাঁরা তার কাছে অভিনয়-কলা শিক্ষা করেছেন একমাত্র তাঁরাই জানেন—সে ছিল একজন কতবড়ো প্রয়োগ শিক্ষণ-কুশলী। নাট্য-অভিনেতা শিশিরকুমার বড়ো কী নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার বড়ো এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে না।

শ্মশান

নারায়ণ মণ্ডল

বুড়ো রামদীনের ফর্সা টকটকে ষোলো বছরের মেয়েটা শুধু শুধু দু'টাকার একটা নোট হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেল।

এর জন্যে মেয়েটি মোটেই অবাক হয়নি। হয়েছিল বাবুটি তাকে ছুঁলো কি করে—এ জন্য।

এই শহরের একজন প্রথম শ্রেণীর বড়লোক সরয়ে-পাড়ানিবাসী সহৃদয় জীবন কৃষ্ণ রায়চৌধুরী এই মাত্র ঘণ্টা তিনেক আগে দেহ রেখেছেন। খবরটা এদিক ওদিক রাষ্ট্র হবার আগেই রামদীন যেন টেলিফোন পেয়ে গেল শ্মশানে বসেই। সংগে সংগে সে ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে জীবনবাবুর সদর দরজায়। সংগে এনেছে তার সমর্থ মেয়েটাকে।

দেখতে দেখতে ভীড় জমতে থাকে সদরে। এদের গমনাগমনের পথে অনেকের দৃষ্টিতেই রামদীন আকৃষ্ট হয়। কেউবা জিজ্ঞেস করে: এই, তোরা এখানে কেন?

রামদীন তাদের করজোড়ে জানায়, আমরা গঙ্গাপুত্তুর বাবু। সকলেই শুনে চলে যায় এদের আবেদন, দু'একজন বুঝতেও পারেনা এই কথার অর্থ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি ছেলে বেরিয়ে আসে সদরে। বেশ উদভ্রান্ত, চুলগুলো তার উসকো খুসকো, চশমাটা যথাস্থানে নেই, জামার বোতামগুলোও আঁটা নেই।

সেই হঠাৎ জিজ্ঞেস করে: এই তোরা কি চাস?

রামদীনের কথাগুলো ভাল করে না শুনেই, ঝাঁ করে একটা দু'টাকার নোট মেয়েটির হাতে গুঁজে দেয়। তারপর বলে, তোরা দাঁড়া, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। বিছানা বালিস এই সব তো—তোদের পাওনা, অন্য আর কিছু নয়তো?

—না বাবু, তবে দ্যাবতা যে খাটটায় লিদ্রা গেলেন সিঠো দিলে গঙ্গাপুত্তুররা ভোগ করবে—আর ওনার জন্য তুলা থাকবে।—আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, তোরা বস ওই রোয়াকটায়। হাঁ, তোরা এই ঘাটেরই লোক তো? ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে জীবনবাবুর ভাগনা দীপক।—হাঁ বাবু, বোড়াইচণ্ডি ঘাটে হামাদের তিন পুরুষ কেটে গেল। রামদীন হাত কচলে উত্তরটা শেষ করবার আগেই দীপক কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

রামদীনের সংগে কথা বলবার সময় বাবুটির যে সব সময়ই দৃষ্টি ছিল কুমরীর ওপর, এটা রামদীনের চোখ এড়ায়নি। কিন্তু এসব দিকে দৃকপাতই করে না রামদীন, সে জানে এটা পুরুষদের স্বভাব। তা ছাড়াও রামদীন জানে তার মেয়েকে দেখবার মতও বটে। কুমরী যে দু'টাকার নোটটা হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছে এতেই বা কত চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে। কালো সাদায় ডুরে কাপড়টা উঠে এসেছে পায়ের গোছের ওপর, আর এমন ভাবে কাপড়টা পরার কৌশল যে কোত্থেকে শিখলে কুমরী—তা রামদীনই ভেবে পায় না। তারপর গায়ের জামাটা, ফেরীঘাটের বাবুর নতুন বৌটি যখন মরে গেল তখন পেয়েছিল এটা। ব্লাউজটি যে অনেক দামী তাতেও কোন সন্দেহ নেই রামদীনের। জামাটা টান টান হয়ে বসেছে ওর বুকে—ফেরীঘাটের বাবুর বৌটির চেয়ে কুমরীর চেহারা অনেক ভাল। কানে কিন্তু দু'টি সনাতন পেতলের মাকড়ী, এদু'টো নাকি ছাপরা থেকেই এনেছিল একদিন। তাছাড়া চুলেও গোটা কয়েক আশ্চর্য ভাবে ভাজ পড়ে গেছে বাঙ্গালী মেয়েদের মতন। কুমরীর মাথাটা ফাঁকাই থাকে; রামদীনের হাজার বার বলা সত্ত্বেও কিছুতে মাথায় কাপড় তুললো না।

রামদীন মেয়েকে আর একবার আগা গোড়া দেখে নেয়। না, চমৎকার গড়নে গড়ে উঠেছে তার মেয়ে।

এর জন্যে মনে মনে সে গর্বিত খুব। নিমতলার ঘাট থেকে পর্যন্ত পাত্র এসেছিল তার কাছে। দর দস্তুরে ঠিক খাপ খায়নি বলে তাদের সবাইকেই ফিরিয়ে দিয়েছে রামদীন।

মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় সে মেয়েকে বলে, এই বসনা রুয়াকটায়, বাবু কখন আসবে তার কি কুছু ঠিক আছে। কুমরী পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে রোয়াকটায়, আর রামদীন হাত দুটো জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে সদরের একপাশে।

কিছুক্ষণ বাদে মেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে: হাঁ বাপ, কান্না কাটি নেই কেন?

রামদীন হাঁসে কিছুটা, তারপর আস্তে আস্তে বলে, বুড্ঢা আদমি ছিল বহুৎ বয়েস। তাই সকলের আনন্দ হইল।

কুমরী ভেবেই পায় না মানুষ মরলে লোক আবার আনন্দ করে নাকি!

প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক একই ভাবে কেটে যাবার পর বারান্দা থেকে চিৎকার করে ওঠে দীপক: এই কোথায় রে তোরা?

—হাঁ বাবু। হাত দুটো জোড় করে রামদীন মাথাটা ওপর দিকে তোলে। কুমরী পাশে এসে দাঁড়ায়, সেও বাপের ভঙ্গিমাটা নকল করে।

বারান্দা থেকে উত্তর আসে: আচ্ছা দাঁড়া আমি নীচে যাচ্ছি। এরা প্রতীক্ষা করতে থাকে সদরের মুখোমুখি।

গোটা চারেক ধবধবে বালিস, একটা তুলতুলে লেপ, একটা শক্ত আর ভারি তোষক, বিছানার চাদর মশারী আর কয়েকটা সদ্য-ব্যবহৃত জামা কাপড় স্তূপাকার করে বারান্দায় নামিয়ে দেয় দীপক। বলে, আর কিছু পাবি না, খাট ফাট দেবে না বললে।

—হাঁ বাবু। আর একবার হাত দু'টো জোড় করে রামদীন। তারপর সেই ধব ধবে বিছনা গুলোর যতগুলো সম্ভব একসঙ্গে বেঁধে মেয়ের সাহায্যে মাথায় তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে ছোটে। কুমরী থাকে বারান্দার মাল গুলোকে পাহারা দিতে।

দীপক ঘোরা ফেরা করছিল বারান্দায়, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—এই তোর নাম কি?

কুমরী বাঙ্গালী ঢঙেই বলবার চেষ্টা করে: কুমরী। দীপক বেশ ব্যস্তভাবেই জানায়: দেখ খাট ফাট দিলেনা বুঝলি, আমার হলেও না হয় ভেবে দেখতুম—কিন্তু এসব আমার মামার জিনিষ বুঝলি না। তবে হাঁ, আরো কিছু পয়সা পেতে পারিস যদি আমাদের পেছনে পেছনে যাস—কুড়ি টাকার ফুটো পয়সা ছড়ানো হবে বুঝলি।

—আচ্ছা। ঘাড় নাড়ে কুমরী।

—তাহলে ঠিক যাস, না হলে অন্য সকলে কুড়িয়ে নেবে। আরো অনেক কিছুই যেন বলার ছিল দীপকের, কিন্তু ওদিক থেকে কে একজন ডাকতে চলে যেতে হলো।

কুমরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। বাবুটির কথাবার্ত্তা-গুলো একটু বেশ আপনার লোকের মত মিষ্টি মিষ্টি।

প্রায় মিনিট কুড়িকের মধ্যেই ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে রামদীন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, ঘরমে কৈ নেই—মগী দারু পিনে নিকল গয়া—জলদী জলদী।

মগী মানে কুমরীর মা। সে মদ খেতে চলে গেছে, তাই ভীষণ রেগে উঠেছে রামদীন। ব্যাপার বুঝে কুমরী তাই বলে, বাপ তুই থাক আমি যাই—বাবুরা বিষ রুপেয়া ছড়াবে তুই কুড়া।

—অ্যাঁ, বিষ রুপেয়া! রামদীন অবাক আশ্চর্য হয়েই রেগে ওঠে হঠাৎ: মগীকা দারু পিনেকা সময় এই হলো—আজ মারতে মারতে জান খতম কর দেগা।

তারপর বাদ বাকী বালিশ বিছনাগুলো বেঁধে তুলে দেয় মেয়ের মাথায়, আদরের ভঙ্গিতে বলে, যা বেটী।

বিছনাগুলো বেশ ভারি। একটু কুঁজো হয়েই ছুটতে হয় কুমরীকে।

রামদীন আবার হেঁকে বলে দেয়: জলদী জলদী তালা লাগাকে চলা আও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কুমরী অদৃশ্য হয়ে যায় রাস্তার মোড়ে। আর ওই পথেই একটা ছোট্ট-খাট কের্ত্তনের দল ডাক ছেড়ে গাইতে গাইতে এদিকে আসে।

কুমরী ফিরে আসবার আরো মিনিট কুড়ি পর মড়া বেরোয়। সূর্য্য তখন বিকেলের সীমান্ত পেরিয়ে গেছে।

শব যাত্রা শোভাযাত্রার আকার নিয়ে যখন শ্মশানে ঢোকে তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। রামদীনরা দাঁড়িয়ে পড়ে

সাঁকোর এ পাশে তাদের ঘরের কাছে। শেষের দিকে আলোটা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়াতে কেউ আর একটাও পয়সা কুড়োতে পারেনি—ঠুং ঠাং শব্দ গুলোর পেছনে ছুটেও ধরতে পারেনি মিলিয়ে গেছে কোথায়। রামদীন তাই আফ্‌শোষ করে বলে, চল, যা বরাৎমে ছিল ওই হলো।

আঁচলের পয়সাগুলো শেষ বারের মত কুমরী আর একবার নেড়ে চেড়ে দেখে ঘরের মধ্যে রেখে আসে, তারপর বাপের সংগে কাঠ বইতে ছুটতে হয়।

কাঠ বওয়া শেষ করে চুলি পরিষ্কার করে চিতা সাজিয়ে দেয় রামদীন। কুমরীও অক্লান্তভাবে সাহায্য করে বাবাকে। এক ফাঁকে তাই সে বলে নিয়েছে: বাপ্‌, এই দু'টাকা আমি নিয়ে নেব।

বাপ মুখে কিছু বলেনি শুধু একটা হুঁ দিয়েছিল। তার পাগড়ী বাঁধা মাথাটা কানের রিং দুটোকে নিয়ে একবার নড়ে উঠেছিল মাত্র।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চিতা জ্বলে ওঠে। চন্দন কাঠের টুকরো আর গাওয়া ঘিয়ের আস্বাদনে সাধারণ চিতার চেয়ে একটু বৈচিত্র্যময় দেখায়।

কুমরী আর রামদীন ফিরে আসে ঘরে।

ঘড়িতে প্রায় ন'টা বেজে গেল। চিতার কাজ অর্দ্ধেকের ওপর গড়িয়ে গেছে; আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই ফিরে গেছে জ্বলন্ত চিতাকে নমস্কার করে। তবু এখনও জন বারো লোক জীবনবাবুর শেষ দৃশ্য দেখার জন্য বেশ আনন্দের সংগেই অপেক্ষা করে চলেছে।

এই বয়োজ্যেষ্ঠের ভীড় থেকে একটু উস্‌খুস করেই দীপক উঠে পড়ে। সিগারেটের নেশাটা প্রবল হয়ে উঠেছে। শ্মশান থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে একটা বাঁধানো ধাপ—নীচে জল ছল ছল করছে। দীপক বসে পড়ে এর ওপর, মৌজসে সিগরেট ধরায় একটা। গঙ্গায় তখন জোয়ার এসেছে, মরা কোটালের জোয়ার, অস্পষ্ট স্রোতের টান চোখেই পড়ে না। উত্তরে বাতাস বইছে ফুর ফুর করে, বকুল গাছটা এইতেই দুলতে আরম্ভ করেছে। বকুল গাছটা বড্ড ঝুঁকে পড়েছে এখানে—ইচ্ছে করলে বসে-বসেই ধরতে পারে দীপক।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শ্মশানের স্তব্ধ রাত্রিকে চৌচির করে দেয়। দীপক চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে—তার মনে হয় এ-কুমরীর গলা।

এবার আসে রামদীনের হুংকার: নিক্‌লো—হাম্‌ খুন কিয়েগা।

দীপক ছুটতে থাকে। মাত্র একমিনিটের পথ, সাঁকো-টার ওপাশেই ওদের ঘর।

খোলা উঠোনের সামনে এসেই দীপককে থমকে যেতে হয়। কুরুক্ষেত্রের মাঠে সকলে যেন জিরুচ্ছে একটু।

বিরাট একটা চ্যালা কাঠ নিয়ে রামদীন দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধত ভঙ্গিতে—এপাশে আহত কুমরী বসে পড়েছে, আর ওপাশের ব্যাড়ার ধারে কুমরীর মা একটা নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে—মুখ দিয়ে বিজ্ঞ বিজ্ঞ করে গালাগাল বেরুচ্ছে তার।

রামদীনের চ্যালা কাঠটা হঠাৎ মাথায় উঠে যায়, চিৎকার করে বলে, ফিন্‌! তারপরই শক্ত করে একটা ঘা বসিয়ে দেয় কুমরীর মায়ের পিঠে। কুমরী হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বাবার ওপর। চ্যালা কাঠটা দিগ্‌নির্ণয় করে নিয়ে আছাড় খায় কুমরীর কোমরে। কুমরী আবার চিৎকার করে হটে আসে, সিংহীর মত হাঁপাতে থাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—দীপককে সে দেখতেই পায় না।

আবার এমনি একটা মুহূর্ত এলো, চ্যালা কাঠটা ঘুরে গিয়ে লাগলো কুমরীর মায়ের পিঠে, কুমরীও ঝাঁপিয়ে পড়তে যচ্ছিল বাবার ওপর, কিন্তু পেছন থেকে সবল দু'টো হাত চেপে ধরলো তাকে।

কুমরী চমকে উঠেই ঘুরে দাঁড়ায়, দেখে তার বুকের কাছে দীপকবাবু। লজ্জায় একশেষ হয়ে গেল কুমরী, কোন রকমে এ বন্ধন ছাড়িয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে সে ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপতে থাকে।

রামদীন চ্যালা কাঠ শুদ্ধু ঘুরে দাঁড়ায়: কোন্‌ হামারা লেড়কীকে ধরলি? চোখ দুটো তার আরো বড় বড় গোল-গোল হয়ে উঠলো। দীপক একপাও পেছলো না।

কুমরী কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না—এমনি এক রক্তাক্ত কাণ্ডের আগের মুহূর্তটিতে। সে ছুটে এসে এদের মাঝখানে দাঁড়ালো—বাপকে একটা ধমক দিয়ে দীপককে ঠেলে বের করে নিয়ে এলো রাস্তায়। প্রাণপণে তাকে বুঝিয়ে দিল: দু'জনেই দারু পিয়েছে বাবু, তুমাদের

পয়সায় বহুৎ পিয়েছে বাবু—কারুর মাথার ঠিক নেই আছে। তুমি চলে যাও বাবু।

কুমরী তাকে সাঁকো পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আবার সেই রণক্ষেত্রের দিকে ফিরে যায়।

দীপকের মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। মামার মৃত্যুর চেয়ে খারাপ। সে এসে আবার ঢিপিটায় বসে পড়ে সিগারেট ধরায় আর একটা।

চিতায় যখন জল দেওয়া হয় রাত তখন বারোটা। মৃদু মৃদু হরিবোল দিয়ে এরা ফিরে চলে শ্মশানকে নির্জন করে।

কুমরীদের উঠানে তখন কে যেন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে।

সকালে উঠে সকলেই দেখে রামদীন হাত দু'টো জোড় করে একাই দাঁড়িয়ে আছে জীবনবাবুর বাড়ীর সদর দরজার ঠিক ডান পাশটিতে। আর যার সংগেই দেখা হয় তাকেই বলে, বাবু, দীপকবাবুকে একটু ডাকি দিন না।

বেলা প্রায় আটটা নাগাদ দীপকবাবুর ঘুম ভাঙে, ঘুম চোখেই সে নেমে আসে সদরে। তার কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই রামদীন তার পা দু'টোকে জড়িয়ে ধরে: বাবু কাল রাত্তিরে আপনাকে কি বুলেছি—আমার অন্যায় হয়েছে।

দীপক কোন রকমে পা'দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, না না, কাল তো তুই মদ খেয়েছিলি; আমি কিছু ভাবিনি যা।

রামদীন চোখ দু'টো মুছে উঠে দাঁড়ায়, হাত দু'টো আবার সনাতন ভঙ্গিতে জোড় হয়ে যায়, মনে হয় সে কঠোর অনুতপ্ত।

দীপক সহানুভূতির সুরে বলে, যা যা শ্রাদ্ধের দিন আসিস—খাবার দাবার নিয়ে যাস।

রামদীন চলে যায় ধীরে ধীরে। দীপক ভাবে এ কুমরী ছাড়া অন্য কেউ পাঠায়নি।

ন'টা দিন তোড়জোড়েই কেটে যায়।

সহৃদয় জীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর শেষ কাজকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়ে তিনছেলে, তার ওপর তো ভাগনা ভাইপোদের জোগান আছেই।

সন্ধ্যে থেকেই লোক যাতায়াত সুরু হয়। অগণন চেনা অচেনা লোকের ভীড়ে সদর জমজমাট হয়ে ওঠে। এদের ভীড়ের একপাশে রামদীন তার মেয়েকে নিয়ে এসে হাত দু'টো জোড় করে দাঁড়ায়। কুমরীর চোখ তন্ন তন্ন করে খুজতে থাকে দীপকবাবুকে, এই বাড়ীর একমাত্র লোক যে তাদের চেনে। কিন্তু এই ভীড়ের মাঝখানে তাকে খুঁজে পাওয়া যে সহজসাধ্য হবে না—এ কথাও বুঝতে বিশেষ দেরী হয় না তার। তাই সে রোয়াকে পা' ঝুলিয়ে বসে পড়ে—রামদীন এক ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে।

এক সময় কুমরী রেগে গিয়ে বাপের হাত দু'টো জোর করে নাবিয়ে দিয়ে বলে, সব সময় হাত জোড়—চল ঘুরে আসি—এখন বহুৎ দেরী।

রামদীন মেয়ের কথা শোনে না, সে আবার হাত দু'টো তুলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে—যেন কারো দিব্যি দেওয়া কর্তব্য পালন করে চলেছে সে। কুমরী রাগ করে রোয়াকটার এক কোনে বসে থাকে।

সময় উৎরে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টায়। সাতটার কাঁটা দশটায় এসেও ঝিমিয়ে পড়ে না। নেমতন্ন বাড়ীর অতিথিরা স্রোতের মত বেরুতে থাকে। ওদিকে কর্তব্যনিষ্ঠ রামদীন এদের সকলকেই যেন অভিনন্দন জানায় তার হাত দু'টো জোড় অবস্থায়—যেন কোন বিলাসী মহারাজার বাগান বাড়ীর মুখে মার্বেল পাথরের প্রতিমূর্তি। নিরুপায় কুমরী মনে মনে জ্বলতে থাকে বাবার ওপর।

এক সময় দীপক বেরিয়ে আসে গোটা একটা পরিবারকে গাড়ীতে তুলে দিতে। রামদীনের আগেই কুমরী দেখতে পেয়ে ডেকে ওঠে: বাবু!

দীপক ফিরে দেখে কুমরী তার বাপের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দীপক হাত নেড়ে বলে, দাঁড়া।

রামদীনের হাত দুটো আরো শক্ত হয়ে জুড়ে যায়।

দীপক ওদের বিদেয় করে দিয়ে এসে দাঁড়ায় এদের কাছে, আত্মীয়ের মত জিজ্ঞেস করে: কতক্ষণ এসেছিস তোরা? উৎসাহে ভেঙ্গে পড়ে কুমরী: অনেকক্ষণ।

রামদীনের কণ্ঠেও এর প্রতিধ্বনি হয়: বহুৎক্ষণ বাবু। —আচ্ছা দাঁড়া। চলে যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়ায় দীপক: আচ্ছা চলে আয় আমার সংগে।

আনন্দে এগিয়ে আসে কুমরী, কিন্তু রামদীন থমকে পড়ে: কোথায় বাবু?

দীপক বলে, আয়না আমার সংগে।

এরা দীপকের পেছু নেয়। দীপক হিসেব করেই ভদ্রলোকের গা বাঁচিয়ে এদের নিয়ে আসে একদম পুকুর ধারে। বাড়ীর পেছনে চমৎকার একটা সান বাঁধানো পুকুর ঘাট, চাতালগুলো পরিষ্কার ও সমতল করেই বাঁধানো—পাশে পাশে রঙ বেরঙের ফুল গাছে ভর্ত্তি।

দীপক এখানে এনে বলে, বস তোরা আমি এক্ষুণি আসছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই দীপক আসে লুচির ঝুড়ি নিয়ে, পেছনে আসে আরো গোটা দুয়েক লোক। তারা এক সংগে এদের পাতা ভর্ত্তি করে খাবার দিয়ে চলে যায়।

দীপক বলে, কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবি তো যায়গা দে। কুমরী বেশ আফসোষের সঙ্গেই জানায়: কুছু নেই তো বাবু! রামদীন কি একটা মুখের মধ্যে পুরে মাথাটা নাড়তে নাড়তে বলে, শাড়ী মে বান্ শাড়ী মে।

—তাহলে পেট ভরে খেয়েই যা' আর নিয়ে যেতে হবে না—কেমন? জিজ্ঞেস করে দীপক।

কুমরী তাড়াতাড়ি বুকের আঁচলটা খুলে মাটিতে পেতে দিয়ে বলে, এইতে দিন বাবু—ঘরমে আমার মাই আছে।

দীপক ব্যস্ত হয়ে বলে, না না, কাপড়টা গায়ে দে, আমি দেখছি কিছু।

দীপক চলে যায়, মনে হয় একটা কিছুর অন্বেষণেই গেল।

খাওয়া দাওয়া মিটে যায় সকলের। রাত প্রায় বারোটা। বহুক্ষণ চলে গেছে কুমরী আর রামদীন। দীপক পুকুরঘাটের চাতালটায় বসে বসে সিগরেট টানে—মনটা তার খুসীতে উজ্জল।

দিন চারেক কেটে যায় নির্বিঘ্নে। দীপক একদিন বেড়াতে আসে বার্ণিং ঘাটের মাঠে। ওখানে বকুলের ছিম ছাম ছায়া, গঙ্গার অঢেল বাতাস—সান বাঁধান রক। তাই অনেকেই শ্মশানকে বাঁয়ে রেখে হাওয়া খেতে বেড়াতে আসে এখানে।

এপথে আসতেই দেখা হয়ে যায় কুমরীর সঙ্গে। রাস্তার পাশে বসে বাপের সঙ্গে একসঙ্গে পেতে বোনার কাঠি চাঁছছিল সে। আর ফাঁকা উঠোনটার মধ্যে তার মা একটা নাচের ভঙ্গিমা নিয়ে মত্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় মদে চুর।

দীপককে দেখেই কুমরী দাঁড়িয়ে ওঠে: বাবু কোথায় যাচ্ছেন?

দীপক দাঁড়ায় একটু: এই এখানে একটু বেড়াতে এলুম—তোদের সংগে দেখা করতে আর কি।

কুমরী তার চোখ দু'টো উজ্জল করে কি একটা বলবার চেষ্টা করেও বসে পড়ে—হাতের ছুরিটা তার ঘন ঘন চলতে থাকে।

দীপক ঘাটে এসে বসে। বকুল গাছটা তখন বেশ ঝড় তুলেছে। সূর্য ডুবে গেছে দিগন্তে।

একটা সিগারেট খাওয়া শেষ হতে না হতেই দু'টো মাটির কলসী নিয়ে কুমরী এসে দাঁড়ায় দীপকের কাছে। ওর মুখে চোখে যেন অনেক বক্তব্য ছটফট করতে থাকে। দীপক বলে, কি রে জল নিতে এলি?

কুমরী কলসী দু'টো নামিয়ে রাখে দীপকের ঝোলানো পা দু'টোর কাছে, তারপর আরো ঘন হয়ে দাঁড়ায়—চোখ দু'টো তার বাঙ্গালী মেয়েদের মত স্থির আর শান্ত।

কুমরী কোন কথা বলতে পারছে না দেখে দীপক পকেট থেকে একটা খাম বের করে, তার ভাঁজ থেকে একটা কাগজ বের করে তার চোখের সামনে মেলে ধরে।

হাত দিতে ভয় হয় কুমরীর, সে বলে, কি এটা?

—টেলিগ্রাম, আমার বাবা বাড়ী যেতে লিখেছে।

কুমরী যেন বিচলিত হয়ে পড়ে: আপনার বাড়ী এখানে নয়?

—না রে, কোলকাতায়।

—কোলকাতায়! কুমরী মনে মনে কি ভাবে, তারপর বলে, কেওড়াতলা কোলকাতায় তো বাবু?

—হাঁ রে। তা কেওড়াতলায় কি হয়েছে?

—না কুছু না। মুখটা তার আরক্ত হয়ে আসে।

দীপক বলে, নিশ্চয় তুই মিথ্যে কথা বলছিস, ঠিক করে বলতো কেওড়াতলায় কি আছে?

—আমার সাদির কথা হচ্ছে। বলেই খিল খিল করে হেঁসে ওঠে কুমরী, দীপকও সে হাসিতে যোগ দেয়। হাসি থামতে দীপক বলে, তবে আর কি রে—আমরা তো দু'-জনেই কোলকাতার মানুষ হয়ে যাব।

কুমরী আবার হাসতে থাকে।

দীপক বলে, তবে হাঁ, আমি মরে গেলে তুই কাঠ বয়ে দিস্ কিন্তু।

—ছিঃ ছিঃ বাবু, আপনি মরবিন কেন, লোক মরলে কি আমাদের আনন্দ হয়।

এক মুহূর্তে নিষ্প্রভ হয়ে যায় কুমরী—যেন বারুদের স্তূপে এক ঘড়া জল ঢেলে দিলে কেউ।

—আরে দেখি দেখি হাতটা—অত ফুল ফল কিসের? দীপক আশ্চর্য হয়েই হাতটা দেখতে চায়।

কুমরী কোনরূপ ইতস্তত না করেই নির্ভয়ে হাতটা দীপকের হাতে তুলে দেয়। এমন একটা সুন্দর বাবুর কাছে কুমরী তার সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারে।

দীপক কুমরীর হাতটা নিয়ে নাড়াচাড়া আরম্ভ করে। হাতের তালুর উলটো পিঠটায় একটা স্তবক লতাপাতা আঁকা। দীপক দেখে আর আশ্চর্য হয়ে বলে, এসব, এসব আবার কি?

কুমরী জানায়, তার বাবা জোর করে আঁকিয়ে দিয়েছে, আমি তখন ছোট্ট ছিলুম। তারপর নিজের হাতটার দিকে একবার দেখে বলে—কি বিচ্ছিরী!

বিচ্ছিরী বলেও হাতটা টেনে নেয় না কুমরী। এ স্পর্শ সুখের শিহরণ—সে জন্ম-জন্মান্তর ধরে পেতে চায়।

কয়েকটা বুড়ো লাঠি হাতে এই পথেই বেড়াতে আসছিল। দীপক তাড়াতাড়ি কুমরীর হাতটা ছেড়ে দেয়, বলে যা, জল নিগে যা।

কুমরী এক ঝলক হেসে নেমে যায় জলে। জল ভরতে ভরতেও দীপকের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে। দীপক ভাবে—জল নিতে আসাই কি এর মুখ্য উদ্দেশ্য?

সন্ধ্যে নামবার আগেই দীপক উঠে পড়ে। তখনও কাঠি চেঁছে চলেছে রামদীন। সে যেন দীপককে দেখেও দেখে না, চিনেও চিনতে পারে না—তার হাত জোড়াটা নমস্কারের ভঙ্গিতে আজ আর হঠাৎ জোড়া হয়ে যায় না।

দু'টো দিন এ পথ আর মাড়ায় না দীপক। কুমরীর অপেক্ষা হয় তো আক্ষেপেই পরিণত হয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে রাস্তাটা ঝাঁট দিতে দিতে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে কুমরী। দীপকবাবু আসছে দূরে, ইট-খোলাটার পাশ দিয়ে বাঁশ ঝাড়টার তলায় তার ফুটফুটে শরীরটা ধবধবে পোষাকে সরল হয়ে ভেসে ওঠে।

কুমরী তাড়াতাড়ি ঝাঁটাটা ফেলে দেয়। তারপর কাপড়টা একটু গুছিয়ে নিয়ে হাতটা ধুয়েই ছুটতে থাকে দীপকের দিকে।

দীপক তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করে: কি রে, এত ছুটলি কেন?

কুমরী লম্বা পায় চলতে চলতে ঘাড়টা একটু তুলে উত্তর দেয়: এমনি। দীপক ভাবে—এত বড় মেয়েটার কোন লজ্জা-সরমই নেই—কি সরল। ছোটার আগের মত এদিক ওদিক আর একবার দেখে নিয়ে, ছোট্ট মেয়ের মত দীপকের বাঁ হাতটার আঙুলগুলোকে দু' হাত দিয়ে ধরে হাতটা দোলাতে থাকে কুমরী। দীপক ভেবে ঠিক করতে পারে না—আজ এর এত খুসীর কি কারণ থাকতে পারে। ওদের বাড়ীর কাছ বরাবর দীপকই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, বলে, হাঁরে—তোদের ঘর-দোর তো একদিনও দেখালি না?

—আসুন না বাবু। খুসীতে উপচে পড়ে কুমরী: বাপ মা কেউ নেই—দু' জনেই সায়েব বাড়ী চিক্ দিতে গেছে।

কথা বলতে বলতে কুমরী এসে ঢোকে ঘরের মধ্যে, দীপক তার অনুসরণ করে এসে দাঁড়ায় তার কাছে।

ঘরটা সুন্দর করেই সাজানো-গোছানো, কুমরীর শিল্পী হাতের নিদর্শন পাওয়া যায়। অধিকাংশই বড়লোকের বাড়ীর আসবাব, বিছানা বালিসগুলো ময়লা হয়ে গিয়ে কেমন যেন আভিজাত্য হারিয়ে ফেলেছে। তবুও দু'দণ্ড বসতে কোন ঘেন্নাই আসে না, তাই কারো বলবার অপেক্ষা না রেখেই দীপক বসে পড়ে। বসে বসে চোখ ঘোরায়, চার পাশের দেওয়ালগুলো রঙ-বেরঙের দেব-দেবীর ছবিতে ভর্ত্তি।

কুমরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে, তারপর বলে, আপনাদের ঘর কেমন?

—কেমন আবার, এই তোদেরই মত।

—ধেৎ, কুমরীর অবিশ্বাস্য মন আরো দৃঢ়তর হয়। দীপক একে বোঝাবার কোন চেষ্টা না করেই জিজ্ঞেস করে: তা বাড়ীর আর লোকজন কোথা—কাঠ বইতে গেছে?

—না, সাহেব বাড়ী। ওই ওপারের তিন নম্বর কলে চিক্ বেচতে গেছে।

—ও, তা তুই যাসনি ?

কুমরী কাছে এসে দাঁড়ায়: না সায়েবগুলো চোখ বড় বড় করে আমার দিকে দেখে—তাই বাপ আর নিয়ে যায় না।

—তা তুই দেখবার মত তাই দেখে।

কুমরী লজ্জা পায়। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলে; বাবু একটা কথা বলবো ?

—বলনা। দীপক ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

—আমি চা' করলে আপনি খাবিন ?

দীপক ভাবনায় পড়ে যায়। কুমরী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে—ওর চোখ দু'টো থেকেই সে যথার্থ উত্তর খুঁজে নিতে চায়। দীপক বলে, এখন আবার চা করবি—তা ছাড়া আমি সব সময় চা খাই না রে।

কুমরী হাসতে থাকে: বলুন আমাদের হাতে খাবিন না।

—না না—খাবো না কেন—আচ্ছা তুই কর।

শেষের কথাগুলো দীপ্ত ঘোষণা করে শোনায় দীপক।

কুমরী আনন্দে ছটফট করতে থাকে, তার ভরা বুকে নতুন করে যেন তুফান ছুটেছে, সে তাকের দিকে ছুটে যায়, একটা ছেঁড়া গোছের কি বই বের করে বলে, বই পড়বিন, বই ?

—কি বই ?

কুমরী তার কোলের ওপর ছেঁড়াগোছের বইটা ফেলে দেয়। দীপক জিজ্ঞেস করে: কে পড়ে ?

—কেউ না, কেউ পড়তে পারে না। ঘাড় দুলিয়ে উত্তর দেয় কুমরী: আচ্ছা আপনি বসুন।

শেষের কথাটা শেষ হবার আগেই সে উঠোন পেরিয়ে ছোট্ট একটা কুঁড়ের মধ্যে ঢুকে যায়।

দীপক বসে বসে হিন্দী বইটার পাতা ওলটাতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাল একটা কাপ ডিসে করে চা' নিয়ে আসে কুমরী। ওর চোখ দু'টো দিয়ে তখনও জল গড়াচ্ছে, ধোঁয়াটে উনুনে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ওর যেন রূপ খুলে গেছে—সুন্দর মেয়েদের কান্নাও সুন্দর।

চা'য়ে একটা চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখে দীপক। কুমরী দাঁড়িয়ে থাকে ওর গা ঘেঁসে। একটা স্বর্গীয় সুখের আনন্দে, আর গর্বে তার বুক ফেটে যেতে চায়, যেন হাজার বছরের সাধনায় তৃতীয় মেরুর কোন নির্জন গহ্বরে সূর্য্য রশ্মি পড়ে গেছে।

হঠাৎ ঝনাৎ করে একটা শব্দ হয়। ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে কে যেন শেকল তুলে দিলে। কুমরী ছুটে এসে দরজাটা টানে—সত্যি বন্ধ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে মুখ বাড়ায় কুমরী, দেখে মাথার পাগড়ীটা খুলে তার বাবা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে, আর উঠনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার মা বুক চাপড়াচ্ছে।

হঠাৎ একটা জলন্ত প্রদীপ দপ করে নিভে যাওয়ার মতই অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে কুমরীর সারা মুখে। দীপকের অপমানের ভয়ে তার সদ্য-ফোলা বুকটা শুকিয়ে যায়—সে হাঁপাতে থাকে।

দীপক দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করে: কি হলো ?

কুমরী কথা বলতে পারে না। ছুটে গিয়ে জানলার গরাদ দু'টো আবার চেপে ধরে চিৎকার করে ডাকতে থাকে: মাই—এ মাই···পরিবর্ত্তে মায়ের মুখ থেকে কয়েকটা অশ্রাব্য গালাগাল ছুটে আসে।

কুমরী ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে: মায়ি—খুলদে মাই—তোর জোড় লাগি—

মা আজ নির্বিকার।

কুমরী দাঁতে দাঁতে চেপেও দীপককে দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই একটা হল্লা পাওয়া যায় ইট-খোলার বাঁশ ঝাড়টার কাছ বরাবর। পেছন দিকের খুপরী-ঘেরা জানলাটা দিয়ে দীপকের চোখে পড়ে একদল ছেলে যেন নাচতে নাচতেই এই দিকে ছুটে আসছে। এরা শুচি অশুচি বাধা নিষেধের প্রশ্ন এড়িয়ে দীনু ডোমের উঠানে এসে দাঁড়ায়।

রামদীন বীর দর্পে শেকল খুলে প্রমাণ করতে এগিয়ে আসে, কে একজন খিঁচিয়ে উঠে বাধা দেয়: এ দাঁড়া, ভক্ করে খুললে যদি পালায়—তখন, তখন কি হবে ?

আর একজন ঘুসি শুদ্ধ হাতটা আকাশের দিকে উচিয়ে চিৎকার করে ওঠে: তুই দাঁড়া—আমরা খুলবো—জন্মের

মত শিক্ষা দিয়ে দোব আজ—এটাকে শালা কোলকাতার এঁদো গলি ঠাওরেছে ?

ঘরের মধ্যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে কুমরী। দীপকের হাত দু'টোকে চেপে ধরে বলে, বাবু, এরা আপনাকে বহুৎ অপ্‌মান করবে—বোধ হয় মারবে।

—মারুক না, তাতে হয়েছে কি? আজ মারলে কাল আর দাগ থাকে না—আমি শুধু ভাবছি—তোর জন্যে!

—আমার জন্যে কোন ভাবনা নেই বাবু, আমরা ছোট লোক আছি, কোন দোষ আমাদের গায়ে লাগে না—এ শুধু আপনারই অপ্‌মান হবে।

হঠাৎ ঝনাৎ করে শেকল খুলে যায়। বাইরে থেকে চিৎকার ওঠে : বের করে নিয়ে আয়—

কুমরী দেখে উঠোন ভর্ত্তি লোক। ছেলে থেকে বুড়োয় যেন মেলা লেগে গেছে।

দীপক বেরিয়ে আসছিল, কুমরী তাকে ঠেলে দেয় বিছানার ওপর, তারপর চৌকির তলা থেকে চ্যাচাড়ো ছোলা একটা কাটারি তুলে নিয়ে চৌকাঠের ওপর দরজা আগ্‌লে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে, যে বাবু গালাগাল শুনবিন ওই দাঁড়ান; আর যে বাবুর জন্মের ঠিক আছে—সে চলে যান। আমরা ছোট লোক আছি হামাদের ব্যাপারে কেউ হাত গলাবিন না।

বাইরে থেকে চিৎকার ওঠে: তোর ওই দীপকবাবুকে বের করে দে—আমরা চলে যাচ্ছি।

—দীপকবাবুকে কি করবিন আপনারা? কুমরী গর্জন করতে থাকে। দীপক চম্‌কে উঠে আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণ। সে আর কিছুতেই চিনতে পাচ্ছেনা কুমরীকে—এই কিছুক্ষণ আগের শান্ত সলজ্জ কুমরী হঠাৎ যেন মশালের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

সামনের কেউ এক পা এগুতে সাহস পেলনা।

কিন্তু চোখ দু'টো যার ভাঁটার মত ঘোরে সেই রামদীন মদ না খেয়ে মাতাল না হয়েই আজ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়ের ওপর।

সকলের চোখগুলো হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে গেল। বাপ মেয়েতে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলেছে বারান্দায়।

দীপক পাংশু মুখে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে: আপনারা কি আমার বিচার করতে এসেছেন?

সামনের একটি ছেলে চিৎকার করে উঠলো: তুমি ভদ্রলোকের মুখে চুন কালি লাগিয়েছ, তোমায় জুতিয়ে লম্বা করে দোব।

—সেটা প্রকাশ্য রাস্তায় হলেই ভাল হয় না—বাইরে চলুন। দীপক ভীড় ঠেলে বাইরে চলে যায়। ভীড় স্বভাবতই দু' ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

বকুল পাতার ফাঁকে ফাঁকে যে অন্ধকার গুলো লুকিয়ে থাকে, সে গুলো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে গঙ্গার তীরে তীরে, কুমরীদের বাড়ীর চার পাশে—এমন কি দীপকের মামার বাড়ির প্রতিটি কক্ষে কক্ষে। কুমরী অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে উঠোনে, আর দীপক বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে। মাঝখানে রাত্রি বাড়তে থাকে! নিস্তব্ধ প্রহর।

ঘড়ির ঘণ্টায় ঘা দিয়ে দিয়ে সহৃদয় জীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর বাড়ীর চার পাশে আবার রাত ভোর হয়। রামদীন হাত দু'টো জোড় করে এসে দাঁড়ায় সদর দরজার ঠিক ডান পাশটিতে।

সতর্ক দরোয়ান লাঠি উঁচিয়ে মারতে আসে: কা মাংতা? ভাগো হিঁয়াছে।

জীবনবাবুর মেজ ছেলে এসে ধমক দেয়: এই, কি চাই তোর এখানে?

রামদীন একটা ঢোক গেলে। তার কান্নাভরা ভরাট গলাটা দিয়ে অদ্ভুত একটা স্বর বেরিয়ে আসে: দীপকবাবু—?

—দীপকবাবু এখানে নেই, কাল রাত্তিরের গাড়িতেই কোলকাতা চলে গেছে।—সত্যিকথাটা অকুণ্ঠ চিত্তে জানিয়ে দিয়েই ওপরে উঠে যায় মেজবাবু।

রামদীন ফিরে আসে শ্মশানে, কুমরীকে খোঁজার আর প্রশ্ন থাকে না তার মনে। কাল মাঝরাত্রে উঠে যখন দেখেছে, কুমরী আর মেঝেতে পড়ে নেই—তখনই তার মনে সন্দেহ হয়েছিল। তবুও সে সারা গঙ্গার তীর তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, শ্মশান ঘাটের খুপরী ঘর গুলোতে ঢুকেই কড়ি কাঠ গুলোর দিকে আগে তাকিয়েছে, যদি তার কুমরী মরতে এসে থাকে। কিন্তু খুঁজে পায় নি।

ঘর পর্যন্ত আর যেতে পারে না রামদীন। ইটের পাঁজার পাশে বাঁশ ঝাড়টার তলায় বসে পড়ে, মাথার চুল গুলোকে দু' হাতের মুঠোয় চেপে নির্জন শ্মশানটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার পঞ্চাশ বছর শ্মশান-বাসের জীবনে এই একটি মাত্র দিন। শ্মশান কে শ্মশান বলে চিনতে পারলো সে।

তৃতীয় অর্থ কমিশন ও পশ্চিম বাংলা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

জানা গেছে, তৃতীয় অর্থ কমিশন ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বক্তব্য শুনে ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির নিকট নিজেদের সুপারিশ পেশ করবেন। তবে নাকি এমন কোন বিধান নেই, যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাধ্যতামূলকভাবে মেনে নিতেই হবে। অবশ্য অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ কমিশনের সুপারিশ মোটামুটিভাবে আগাগোড়াই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডার থেকে পশ্চিমবাংলার জন্য কতটা পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হবে। বর্তমানে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়।

তৃতীয় অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীএ, কে, চন্দ বলেছেন—তিনি কোন অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ পেশ করার পক্ষপাতী নন। যেহেতু তৃতীয়পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুরুতেই তৃতীয় অর্থ কমিশন নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এই পরিকল্পনার গোড়ার দিকেই কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশ দাখিল করা হবে, সেহেতু অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ পেশ করা প্রয়োজনীয় হবে বলে তিনি মনে করেন না। আগেকার অর্থ কমিশন অবশ্য অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ করেছিলেন। এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী কমিশন একটা পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে নিযুক্ত হয়েছিল।

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী অর্থ কমিশনের নিকট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটা স্মারকলিপি পেশ করেছেন। যা'তে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চাহিদা মেটান যেতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত দুশত কোটি টাকা দাবী করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে দেখা যাচ্ছে, এই রাজ্যের রাজস্ব থেকে একশত তেত্রিশ কোটি টাকার বেশী পাওয়া যাবেনা, যদিও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য মোট তিনশত চুয়াল্লিশ কোটি টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। এর উপর যে ৮'৭৫ কোটি টাকা বৈদেশিক এবং ভারতীয় সহযোগিতার দরুণ পাবার সম্ভাবনা আছে তা'তে মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৪৯'৭৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৩৯৫'২৯ কোটি টাকা কম পড়বে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই শূন্যতা পূরণ করার জন্য অর্থ কমিশনকে অনুরোধ জানিয়েছেন। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার জনসংখ্যার ভিত্তিতে অতিরিক্ত দুশত কোটি টাকা দাবী করেছেন। জোর দিয়ে বলা হয়েছে, এটাই হল পশ্চিমবাংলার নিম্নতম দাবী। রাজ্য সরকার বলেছেন, ভূমি রাজস্ব খাতে ১৯৬১-৬২ সালে ব্যয়ের পরিমাণ হল নয় কোটি টাকা, যদিও আয়ের পরিমাণ হচ্ছে আট কোটি টাকা। সুতরাং এইখাতে এক কোটি টাকা লোকসান দেখা যাচ্ছে। আবার নয় কোটি টাকার চার কোটি বিভাগীয় কাজে এবং পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ খরচের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্য সরকার অনুমান করেছেন, আগামী পাঁচ বছরে নয় কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকা রাজস্ব বিভাগের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে। রাজ্য সরকারের দৃঢ় ধারণা হচ্ছে, ভূমি রাজস্বের হার আর বাড়ান যাবেনা।

একথা অনস্বীকার্য্য যে, পশ্চিম বাংলা ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। বসতির দিক থেকে কেরল রাজ্যের পরেই নাকি পশ্চিম বাংলার স্থান। যেক্ষেত্রে কেরলে প্রতি বর্গমাইলে একহাজার একশত পঁচিশজন লোক বসবাস করছে, সেক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় বসবাস করছে একহাজার একত্রিশজন লোক। সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, দুটো রাজ্যের মধ্যে ব্যবধান খুব অল্প। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্মারকলিপিতে দেখান হয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পশ্চিমবাংলারই বেশী। তাছাড়া স্মারকলিপিতে পশ্চিমবাংলার কৃষি অনগ্রসরতার প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এই রাজ্যে মোট জমির তুলনায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ নাকি সব চাইতে বেশী। অর্থাৎ শতকরা ৫৯.১ ভাগ। অন্যদিকে উত্তর প্রদেশে হচ্ছে শতকরা ৫৭.৬ ভাগ এবং কেরলে হল শতকরা ৪৭.১ ভাগ। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, পশ্চিম বাংলার মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা মাত্র চারভাগে চাষ হয়ে থাকে। সোজা কথা হল, পশ্চিম বাংলায় চাষ হয় এই ধরণের জমির পরিমাণ সর্বনিম্ন। তাছাড়া এই রাজ্যে লোহার লাঙ্গল, তৈলচালিত ইঞ্জিনসহ পাম্প, ট্রাক্টর এবং বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প সবচাইতে কম ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবাংলার বেকার সমস্যা খুব তীব্র। ১৯৬০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই রাজ্যে মোট ২,৬৫,৩৮২জন বেকার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নিজেদের নাম রেজিষ্ট্রি করেছেন। এছাড়া পশ্চিমবাংলায় অন্য রাজ্য থেকে যে টাকা মণিঅর্ডারযোগে আসে এবং মণিঅর্ডারযোগে যে টাকা পশ্চিমবাংলা থেকে অন্য রাজ্যে যায় তার মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। পশ্চিমবাংলাকে বছরের পর বছর সীমান্ত-রক্ষী পুলিশ, কলকাতা সহর, উদ্বাস্তু, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, বন্যা, রাস্তা, পুলিশ ইত্যাদির জন্য কিভাবে এবং কতটা পরিমাণ অধিক ব্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় সে সম্পর্কেও স্মারকলিপিতে বিশদ বিবরণ রয়েছে। রাজ্য সরকার বলেছেন, পশ্চিমবাংলায় মাথাপিছু কর সবচাইতে বেশী। অর্থাৎ শতকরা ১৬'৩ ভাগ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পশ্চিম-বঙ্গ শিল্পপ্রধান রাজ্য। দুঃখের বিষয় হল, কেন্দ্রীয় রাজস্ব বাঁটোয়ারা

ব্যাপারে এই রাজ্যের সমস্যার প্রতি আজও তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ গত দুটো অর্থ কমিশনের কাছ থেকে সুবিচার পাইনি। যতই শিল্প প্রসারিত এবং নগরীর সম্প্রসারণ হচ্ছে,ততই রাজ্য সরকারের উপর বিভিন্নপ্রকার দায়িত্ব এসে পড়ছে। অথচ শিল্পের ক্ষেত্র থেকে আদায়ীকৃত ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, কর্পোরেশন ট্যাক্স ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট চলে যায়। যেহেতু জনসংখ্যার মাথাপিছু হিসাবে প্রধানতঃ এইসব ট্যাক্সের বাঁটোয়ারা হয়ে থাকে, সেহেতু পশ্চিমবাংলার হাতে এর সামান্য অংশ ফিরে আসে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এই মর্ম্মে আশা প্রকাশ করেছেন যে তৃতীয় অর্থ কমিশন সমস্ত সমস্যা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবেন। বিশেষ করে যে নীতির ভিত্তিতে রাজ্যগুলোতে কেন্দ্রীয় রাজস্ব বণ্টিত হয়ে থাকে সে নীতি যা'তে নূতন করে পুনর্বিবেচনা করা হয় সেজন্য কমিশনের কাছে দাবী জানান হয়েছে। এই মর্ম্মে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় অর্থকমিশনের রিপোর্টের পর ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্টের যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন হয়েছে সে পরিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় অর্থ কমিশন অতীতে অনুসৃত নীতি থেকে বিচ্যুত হতে দ্বিধা করবেন না। এখানে একটা কথা বলে রাখছি। প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেই কমিশনের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হবে বলে মনে হচ্ছে। ১৫ই জুলাই তারিখে অর্থকমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীএ কে চন্দ চণ্ডিগড়ে পাঞ্জাব সরকারের প্রতিনিধিদের আশ্বাস দিয়েছেন, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যের জন্য সাহায্য বণ্টিত হবার সময় ঐ সব রাজ্য সীমান্তের পুলিশ সম্পর্কে যে খরচ করেছেন সেটা নিশ্চয় বিবেচনা করে দেখা হবে। শ্রীচন্দ বলেছেন, আয়কর এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় করের বিভাজ্য অংশ বণ্টনের ব্যাপারে তৃতীয় অর্থ কমিশন সমস্ত রাজ্যের প্রতিই সমান ব্যবহার করবেন। পাটনা থেকে ১০ই জুন তারিখে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, বিহার সরকার অর্থ কমিশনের কাছে একটা স্মারকলিপি পেশ করেছেন। সে স্মারকলিপিতে নাকি জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় রাজস্বের বণ্টনযোগ্য অর্থ থেকে বিহারকে একশত দশ কোটি টাকা বরাদ্দ করা দরকার। প্রশ্ন হতে পারে, একশত দশকোটি টাকা বরাদ্দের জন্য বিহার সরকার যে দাবী জানিয়েছেন সে দাবীর মূলভিত্তি কি। জানা গেছে, মূলভিত্তি হল লোকসংখ্যা। উক্ত স্মারকলিপিতে এই মর্ম্মে অনুরোধ জানান হয়েছে যে, আয়করের বিভাজ্যের পরিমাণ শতকরা ষাট ভাগ থেকে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ করা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া বিহার সরকার কেন্দ্রীয় আবগারীর বিভাজ্য অর্থের পরিমাণ শতকরা পঁচিশ ভাগ থেকে শতকরা চল্লিশ ভাগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। অর্থ কমিশন যদি বিহার সরকারের প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে সংবিধানের ২৭২ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিহারকে যেন পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হয়, সেজন্য বিহার সরকার কমিশনকে অনুরোধ করেছেন। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিহারের যে বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে সে বরাদ্দের মোট পরিমাণ হচ্ছে তিনশত সাইত্রিশ কোটি টাকা। এর ভিতর দুশত চৌদ্দ কোটি টাকা মূলধন খাতে খরচ করা হবে।

উড়িষ্যা সরকারও অর্থ কমিশনের কাছে প্রায় একশত পঁচিশ কোটি টাকা সাহায্য চেয়ে একটা স্মারকলিপি পেশ করেছেন। এই স্মারকলিপিতে নাকি বলা হয়েছে, তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে রাজস্ব এবং পরিকল্পনা খাতে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে একশত চব্বিশ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ টাকা। আরো দেখান হয়েছে, ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে ১৯৬৫—৬৬ সাল পর্য্যন্ত রাজস্ব খাতে চুয়াত্তর কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়বে এবং পরিকল্পনার জন্য খরচ হবে পঞ্চাশ কোটি তেইশ লক্ষ টাকা। উড়িষ্যা সরকার দাবী করেছেন, কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক এবং ট্রেণভাড়ার উপর করের যে অংশ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করা হবে রাজ্যের পুনর্বিন্যস্ত জনসংখ্যার ভিত্তিতে সে অংশের আশীভাগ বণ্টন করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, স্মারকলিপিতে পুনর্বিন্যস্ত জনসংখ্যা সম্পর্কে দু একটা কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্যের তপশীলী সম্প্রদায় তপশীলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর লোকসংখ্যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার সঙ্গে যোগ করতে হবে। উড়িষ্যা সরকার আশা করেছেন, যদি এই সব সম্প্রদায়ের অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা করা হয় এবং যদি এইসব সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যায় দ্বিতীয়বার যোগ করা হয় তাহলে উড়িষ্যা রাজ্য সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিরকম অসুবিধার সম্মুখীন, সেটা অনায়াসে উপলব্ধি করা যাবে। এটা গেল রাজ্যের পুনর্বিন্যস্ত জনসংখ্যার কথা। এই জনসংখ্যারই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক এবং ট্রেণ ভাড়ার উপর করের বণ্টনযোগ্য অংশের শতকরা আশীভাগ বণ্টন করার জন্য উড়িষ্যা সরকারের দাবীর কথা আমরা আগেই বলেছি। বাকী রইল বিশ ভাগ। উড়িষ্যা সরকার রাজ্যের আয়তনের ভিত্তিতে এটা বণ্টন করার জন্য দাবী জানিয়েছেন। আসল কথা হল, উড়িষ্যার অর্থাভাবজনিত সমস্যা অর্থ কমিশন পুনরায় বিবেচনা করে দেখুক—এটাই রাজ্য সরকারের অভিপ্রায়। এছাড়া উড়িষ্যা রাজ্যের পক্ষে যা'তে অগ্রগতির ন্যূনতম মানে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হতে পারে সেজন্য কেন্দ্রীয় ঋণ বাবদ এবং অন্যভাবে উড়িষ্যাকে যথাযথ সাহায্য দিবার জন্য অর্থ কমিশনকে অনুরোধ জানান হয়েছে।

আসাম সরকার তৃতীয় অর্থ কমিশনের নিকট প্রস্তাব করেছেন, সংগৃহীত আয়করের বণ্টনযোগ্য অংশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকসংখ্যার এবং বাকী পঁচিশভাগ রাজ্যের আয়তনের ভিত্তিতে বণ্টিত হয়ে থাকে। কোম্পানীগুলো যে রাজ্যে গঠিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বণ্টিত হয় অবশিষ্ট দশভাগ। যে রাজ্যে কোম্পানীগুলো রেজিষ্ট্রীকৃত হয়েছে তার ভিত্তিতে আয়করের অংশ বণ্টনের নীতির বিরুদ্ধে আসাম রাজ্য সরকার অভিমত প্রকাশ করেছেন। আসামে যে সব কোম্পানী অর্থ উপার্জ্জন করে সে সব কোম্পানীর বেশীর ভাগই কলকাতায় রেজিষ্ট্রীকৃত—তাই আসাম রাজ্য সরকার মনে করেন, তার ন্যায্য প্রাপ্যের একটা বিরাট অংশ থেকে আসাম বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। এইজন্যই প্রস্তাব

করা হয়েছে, যে স্থানে কোম্পানীগুলোর অর্থ উপস্থিত হয়ে থাকে সেটাকেই উৎস-স্থল হিসাবে গণ্য করতে হবে। অবশ্য উৎস-স্থলের ভিত্তিতে আয়কর বণ্টনের পরিবর্তে আসাম রাজ্য সরকার আয়তনকে অন্যতম ভিত্তিরূপে গ্রহণের বিকল্প প্রস্তাবও করেছেন। এইভাবে দেখা যাবে, প্রত্যেকটি রাজ্য নিজ নিজ সমস্যার প্রতি অর্থ কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছেন।

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর বিভিন্ন সদস্য এবং বিভিন্ন বিভাগের ঊর্দ্ধতন মহলের অফিসাররা নিজ নিজ বিভাগের জন্য অধিকতর পরিমাণে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে অর্থ কমিশনের নিকট তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। শ্রীঈশ্বরদাস জালান হলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি কমিশনকে বলেছেন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে পঞ্চায়েত পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডার থেকে অধিকতর পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দরকার। পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উপর যে অতিরিক্ত আর্থিক চাপ পড়েছে সেটার প্রতি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অনাথবন্ধু রায় অর্থ কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দ্বিতীয় অর্থ কমিশন আয়কর এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় কর বণ্টনের ব্যাপারে পশ্চিম বাংলার প্রতি নীতিবহির্ভূত কাজ করেছেন। যা'তে উদ্বাস্তু সমস্যাজর্জ্জরিত পশ্চিমবাংলার আর্থিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে সেজন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ একান্ত দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় হবে, পরিকল্পনা কমিশন এজন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করতে চাইছিলেন। এমন কি পশ্চিম বাংলার প্রতি অনেকটা অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। কাজেই অর্থ কমিশনের পক্ষে পশ্চিম বাংলার সমস্যাবলী ভালভাবে বিবেচনা করে দেখা খুবই বাঞ্ছনীয়। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং খাদ্যোৎপাদন-মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষও অর্থ কমিশনের নিকট তাঁদের বক্তব্য পেশ করেছেন। যা'তে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সেজন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী কমিশনের নিকট ব্যক্ত করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে জমির খাজনা এবং কর থেকে বছরে ৬.৪২ কোটি টাকা আদায় হয়ে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার কারণ বশতঃ পশ্চিমবঙ্গে জমির খাজনা বহুলাংশে অনাদায় পড়ে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভাবে জমির খাজনা অনাদায় পড়ে থাকার পিছনে সত্য কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা। শোনা যায়, তৃতীয় অর্থকমিশন প্রকারান্তরে যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছেন, যদিও কমিশনের সদস্যদের মুখ থেকে সরাসরি কোন স্বীকারোক্তি শুনতে পাওয়া যায় নি। অর্থ কমিশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে একটা প্রশ্ন ভালভাবে বিবেচনা করে দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রশ্নটী হ'ল জমির খাজনা থেকে আরো আয় বাড়ান যায় কিনা। যদি আয় বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়, তাহলে রাজ্য সরকারের সামগ্রিক আয় নিঃসন্দেহে বেড়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য এবং তাঁর সচিবরা বিভিন্ন প্রকার যুক্তির অবতারণা করে কমিশনকে বুঝাতে চেয়েছেন, ভূমির খাজনা থেকে আর আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না।

শ্রীশ্যামাপদ বর্মণ হলেন পশ্চিম বাংলার আবগারী মন্ত্রী। তিনি অর্থ কমিশনকে বলেছেন, জন সংখ্যার পরিবর্তে ব্যবহারের পরিমাণের ভিত্তিতে আয় বণ্টিত হওয়া উচিত। এছাড়া রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার জন্য পুলিশবাহিনীর পুনর্গঠনের আবশ্যকতা সম্পর্কে পুলিশমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ও কমিশনের সাথে আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।

প্রচারিত খবরে প্রকাশ, তৃতীয় অর্থ কমিশন যে সব সুপারিশ করবেন সে সব সুপারিশ ১৯৬২ সাল থেকে কার্য্যে পরিণত করা হবে। কমিশনের সাধারণ অভিমত হল, যখন কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য আয়োজন চলে তখন পরিকল্পনাটি শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদনক্ষম হবে কিনা সেটা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা খুবই প্রয়োজনীয়। কেন পরিকল্পনার উৎপাদন ক্ষমতার প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অর্থ কমিশনের জনৈক সদস্য বলেছেন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে এমন কতকগুলো পরিকল্পনায় হাত দিয়েছেন যেগুলো প্রচুর অর্থব্যয় সত্ত্বেও বিশেষ লাভজনক হয়নি।

বিগত ২৫শে মে তারিখে কলকাতার বিভিন্ন সভার প্রতিনিধিগণ কলিকাতাস্থ আয়কর কমিশনার এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক-সংগ্রাহক অর্থ কমিশনের সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন বণিকসভার প্রতিনিধিগণ তৃতীয় অর্থ কমিশনের নিকট এই মর্মে অভিযোগ করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার সব আয়কর এবং উৎপাদন শুল্ক আদায় করেন, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সেই আদায়কৃত অর্থ থেকে ন্যায্য অংশ পাচ্ছে না। এক স্মারকলিপিতে বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভা বলেছেন, শুল্ক বণ্টনের ব্যাপারে দ্বিতীয় অর্থ কমিশন লোক সংখ্যার উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বণিক সভার মতানুযায়ী আয়করের যে অংশ বণ্টনযোগ্য, সেটার শতকরা আশীভাগ রাজ্যগুলোর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া উচিত। উক্ত স্মারকলিপিতে জানান হয়েছে, দ্বিতীয় অর্থ কমিশন আয়করের শতকরা আটভাগ রাজ্যগুলোর মধ্যে বণ্টন করার সুপারিশ করেছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের কাজ সমাপ্ত করে উড়িষ্যায় যাবার সময় কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী এ, কে, চন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন—বিগত দুটো অর্থ কমিশন রাজ্য থেকে সংগৃহীত করের পরিমাণের ভিত্তিতে আবগারী শুল্কের বরাদ্দ নির্দ্ধিষ্ট করেছিলেন এবং স্বভাবতঃই তাঁরাও ঐ নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন। তিনি এই মর্ম্মে আশ্বাস দিয়েছেন, চূড়ান্ত সুপারিশের সময় পশ্চিম বাংলার বিশেষ সমস্যাগুলো নিশ্চয় বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ পশ্চিম বাংলা কমিশনের কাছ থেকে সুবিচার আশা করতে পারেন।

সিকিম

রাধানাথ চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম বাংলার উত্তর সীমানায় পাহাড়, উপত্যকা বনাঞ্চল-ঘেরা ছোট্ট দেশ সিকিম। এর তিন দিকে তিন প্রতিবেশী রাষ্ট্র—নেপাল, চীন, ভূটান। সিকিমের রাজধানী গাংটক; গ্যাংটকের উত্তরেও আজকাল চীন সীমানা পর্য্যন্ত রাস্তা হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় কেউ যদি একটু কষ্ট করে কিছু না কালিম্পং পাহাড় থেকে গ্যাংটক পর্যান্ত যেতে পারে তাহলে তার সামনে এক নতুন দেশ চোখে পড়বে।

কালিম্পং পাহাড়ে অনেকেই যায়—ওখান থেকে সোজা গ্যাংটক পর্য্যন্ত বাস যায় এই মাইল পঞ্চাশেক। অনেকদিন কাম্পিংএ থেকে একঘেয়ে লাগছিল, একদিন ওখানকার 'হোমস' এর এক মাষ্টার মশাই বললেন—"যদিও এখনও পাহাড়ে বর্ষা শেষ হয়নি, রাস্তা বিপজ্জনক—কিন্তু আমি বলবো আপনি সময় করে সিকিম পাহাড়ে চলে যান।"

আমি বল্লাম—"আপনি গিয়েছিলেন কি।"

তিনি বল্লেন—"হ্যাঁ এক আমেরিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়েছিলাম। জানেন তিনি কি জন্য গিয়েছিলেন?"

আমি বল্লাম—কেন?

—"প্রজাপতি ধরবার জন্য—গ্যাংটকের পুব-উত্তরে যা বিভিন্ন রঙের প্রজাপতি পাওয়া যায় যদি দেখতেন। তিনি এক কাপড়ের কারখানার হয়ে এসেছিলেন, তাঁরা বোধ হয় ওই সব প্রজাপতির ডিজাইন কাপড়ে বসাবেন।

তাই আমার গ্যাংটক যাওয়া। একদিন সকালে, যখন সবেমাত্র ভোর হচ্ছে, গরম কোটটি মাত্র হাতে নিয়ে কালিম্পং সহর ত্যাগ করলাম। ক্রমে পাহাড়ের চুড়া গোলাপী এবং গোলাপী থেকে লাল হয়ে উঠলো, তীব্র জংলী পোকা মুখরিত নির্জন বনবীথির মধ্য দিয়ে গেলখোলা এলাম এবং অল্পক্ষণ পরেই অন্য একটা রাস্তা দিয়ে আমাদের বাস চললো সিকিম মুখো। বাসটাতে বেশীর ভাগই তিব্বতী। আমাদের বাসটার নাম "সিকিম মেল"—মানে চিঠিপত্র নিয়ে যাচ্ছে আর কি। একটি তিব্বতী ছেলে তারা এখন গ্যাংটকেই বসবাস করছে, বেনারস ইউনিভার্সিটিতে কি পড়ে—বেশ পরিস্কার ইংরাজীতে কথা বলতে বলতে চললো।

কিছুদূর যেতেই পিচের রাস্তা শেষ হয়ে কাঁচা রাস্তা আরম্ভ হোলো—আর সেই মাষ্টার মশাই কেন যে রাস্তা বিপজ্জনক বলেছিলেন বেশ মালুম হতে লাগলো। সেই যে গেলখোলা থেকে তিস্তা নদীকে আমরা অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছি তার আর যেন শেষ নেই। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ইস্পাতের ফলার মতো এঁকে বেঁকে কখনো জঙ্গলে হারিয়ে যায়, কখনো তার এত পাশ দিয়ে চলি যে তার বড় বড় উপলখণ্ডগুলোর ওপর সকালের রোদের আলো স্পষ্ট দেখতে পাই—কখনো বা দেখি অনেক কাছ দিয়ে নদী একটানা শান্ত ভাবে বয়ে চলেছে—আর দেখা যায় না।

ডানদিকে কিন্তু খাড়াই পাহাড়—একটু অন্ধকার, কোথাও ঝরণার জল পড়ছে স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডা। রাস্তায় কুলিরা কাজ করছে, তারা জঙ্গল কাটছে—কাঁচা ডালপালার গন্ধ।

কতক্ষণ গেলাম জানিনা—দেখলাম এক জায়গায় ঘন জঙ্গলের মধ্যে চারটী কাঠের বাড়ী—দু একটা সিগারেটের দোকান। রাস্তায় ঢেলে কাঁচা আখরোট বিক্রী হচ্ছে, বাসটী দাঁড়িয়ে পড়তেই লোক জন সব নেমে যেতেই আমি ভাবছি সেই ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করবো। সে আমাকে নিজে থেকেই বললো 'এই খানে নাকুন পারমিট চেক হবে।'

—এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম। জায়গাটির নাম রংপু, সামনেই তিস্তা নদী তার ওপর দড়ির ঝোলান পুল। দু দিকের গাড়ীই চেক হচ্ছে, তবে বেশী চেক করা হচ্ছে যারা সিকিম থেকে আসছে তাদের। আমাকেও একটা খাতায় নাম, ধাম, সিকিম যাওয়ার উদ্দেশ্য ইত্যাদি লিখতে হোল সবিস্তারে। একটা সাইন বোর্ড ঝুলছে, লেখা আছে "Land customs and Passport office."

সেই তিব্বতী ছেলেটী আমাকে বল্লো—চলুন একটু চা খেয়ে আসি। এখানে গাড়ী অনেকক্ষণ থামবে। এই পাহাড়ী রাস্তায় আর পেট্রলের গন্ধে মাথা ধরে গিয়েছিল তাই চায়ের দোকানে গেলাম। তিব্বতীদেরই দোকান, ফুটবল চাম্পিয়ানদের যে কাপ পুরস্কার দেওয়া হয় সেই রকম কাপ। তিব্বতী ছেলেটী (তার নামটী ভুলে গেছি) দোকানদারকে কি বলে আমার পাশে বসলো।

আমি বল্লাম—তুমি কি বল্লে।

সে হাসল। তারপর বল্লো—তুমি তো মাখন খাও না চায়ের সঙ্গে। তাই চায়ের সঙ্গে মেশাতে বারণ করলাম।

—মাখন কেন খাব।

ইতিমধ্যে দোকানদার-গিন্নী দু'টী ফুটবল খেলার সেই কাপে দু কাপ চা আমাদের সামনে রাখাতে ছেলেটী তারটা আমাকে দেখাল—সত্যি মাখনের মত কি ভাসছে। আমার চা' টা বেশ ভাল।

এর পর একদিন গ্যাংটক সহরে দেখেছিলাম তিব্বতী প্রথায় চা তৈরী করা। মোটা বাঁশের চোঙায় চা তৈরী করে তারা, মাখন দেয় খানিকটা, তারপর প্রাণপণে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করে। আমি কোনও দিন কিন্তু খাই নি।

যাই হোক কিছুক্ষণ বাদে বাস আবার ছাড়লো এবং অনতিবিলম্বে সেই ঝোলানো দড়ির পুল পার হয়ে সিকিম রাজ্যে প্রবেশ করলাম।

ঠাণ্ডা ক্রমেই বাড়ছে, বাঁয়ে তিস্তা ক্রমেই সরু হয়ে আসছে, ডাইনে পাহাড় ক্রমেই উঁচু থেকে উঁচু হয়ে উঠছে। রংপু পার হয়ে আমরা এলাম সিংটম। নিস্তব্ধ পার্ব্বত্য গ্রাম—

পর্বত-সানুদেশে কাঠের বাড়ী, চ্যাপটা মুখ পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা কৌতুহলের চোখে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। ছোট ছোট দোকান পাঠ—এক টুকরো বাজার।

ক্রমে মধ্যাহ্ন শেষ হোল। ইতিমধ্যে একটা উপত্যকা পার হলাম। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড় অরণ্যানী, মাঝে মাঝে এক এক লহমায় ফুলের বাগান নজরে আসে—সে ফুলের বাগান কেউ সখ করে করেনি, অজস্র অকাতর রডোডেনড্রন ফুলের সমারোহ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আবার এরই মাঝে মাঝে হঠাৎ রাস্তার ধারে কোন গাঁ—পাহাড়ের খাঁজ কেটে কেটে ধান চাষ—এক একটা লোমশ দাড়িওয়ালা ছাগল চার পা একত্র করে সার্কাসের কায়দায় উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

অপরাহ্ন হয়েছে শেষ—ঠাণ্ডা পড়েছে। জমজমাট দূরে পাহাড়ের মাথায় ইলেকট্রিক আলো দেখা গেল।

কাঠের ফলকে লেখা আছে—Gangtok—2M.

ছোট্ট সহর—বিরাট পিচের একটা চত্বর—আশে পাশে দোকান পাট। ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। আমার জিনিষ-পত্র কিছু নেই—কোটটী আগেই গায়ে চাপিয়েছি—তিব্বতী ছেলেটি তার জিনিষ-পত্র বাসের ছাদ থেকে নামাচ্ছে। কোথায়ই বা যাই, ভাবলাম বাজারটা আগে ঘুরে দেখি—তারপর আস্তানা ঠিক করা যাবে।

সেই তিব্বতী ছেলেটি আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য জেদ করতে লাগলো, কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী হলাম না দেখে সে আমাকে একটা তিব্বতীদের হোটেলে পৌছে দিয়ে চলে গেল, বলে গেল কাল সকালে সে আবার আসবে। বাজারের মধ্যেই হোটেল—দুতলা কাঠের বাড়ী—দেয়ালে বিলিতী ম্যাগাজিন থেকে কাটা নানা ছবি। মালিক এক তিব্বতী ভদ্রমহিলা। একটু দুধ-বিহীন চা খেয়ে আবার বাজারে বেড়াতে বেরুলাম। আমার কোনও জিনিষ রাখবার ছিল না, কেবল কাঁচা আখরোট সেরখানেক ছিল—তাঁর জিম্মায় দিয়ে দিলাম।

সেদিন সারা সহর জুড়ে কি বোধ হয় পরব ছিল—চারদিকে নাচ গান হচ্ছে। মুখোস পরে একদল নাচছে, অন্ধকার পাহাড়ের দিকে আতস বাজী ছোড়া হচ্ছে—প্রত্যেক বাড়ীর বারান্দায় লাল নীল কাগজের লণ্ঠন ঝুলছে।

বাজারের ওপর একটা বিরাট কাঠের গেট। গেটের ওপর পোষ্ট-অফিস। পিচের রাস্তা ওপরে উঠে গেছে, নিচে নেমে গেছে। দু'একবার দূরে যাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোথায়ই বা যাব, কাল সকালে যা হয় দেখা যাবে ভেবে আবার বাস স্টাণ্ড আর বাজারে ফিরে এলাম। তারপর ঠাণ্ডা যা পড়তে আরম্ভ কোরলো, কাঁপতে কাঁপতে সেই হোটেলেই ফিরে এলাম।

গ্যাংটক রাজধানী হলে কি হয়, ছোট্ট সহর, মোটামুটি ঘুরে আসতে আধঘণ্টা লাগে। পরদিন সকালে সব সহরটা ঘুরে কেন্দ্রস্থল সেই বাজারে যখন ফিরে এলাম—দূর আকাশের গায়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার হিমশিখর প্রকাণ্ড-

সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করছে। আমার নতুন বন্ধু তখন আসাতে মহারাজার প্রাসাদে উঠে দেখলাম—বাড়ীটা একটু উঁচুতে চীনা ধরণের কাঠের বাড়ী, কিন্তু সামনে বিস্তৃত ফুলের বাগান। মহারাজকুমার একটা জিপে চড়ে শিকারে গেলেন; যখন তিনি বাইরের লনে এলেন পরিচারকরা তিব্বতী প্রথায় নমস্কার করলো তাঁকে। এর মধ্যে আমাদের সঙ্গে আর একটি বাঙালী ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—সে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কাজ করে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে উঠতে নামতে উত্তরে—মানে তিব্বত যাবার রাস্তায় এলাম।

অনেকদূর চলে গিয়েছি—পাহাড়ের গায়ে রাস্তা উঠে যাচ্ছে ক্রমে ওপর দিকে, দেখি এক ঘোড়ার ক্যারাভান আসছে। এরা আসছে আঠার দিনের পথ পার হয়ে লাসা থেকে, কত দুর্গম গিরি পার হয়ে আসছে—প্রত্যেকের খোচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা নোংরা জামা কাপড়। ঘোড়ার দুপাশে মালপত্র ঝুলছে। এক নেপালী ভদ্রলোক, তাঁর গায়ে গরম জামা কাপড়ের বহর দেখে আমি অবাক্। লোকটি এই ঠাণ্ডাতেও ঘামছে দেখা গেল, তাই জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল—তিনি লাসা থেকে আসছেন—তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখে লাসা আর তীব্বতী রীতিনীতির অনেক গল্প শুনেছি।

তিব্বত যাবার এই রাস্তা—ভাবলাম অনেকদিন আগে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান হয়তো এই পথেই গিয়েছিলেন। আমরা যখন কেউই এই পৃথিবীতে আসিনি তখনও রাজা রামমোহন রায় হয়তো এই রাস্তাতেই তার দুর্গমপথের যাত্রা সুরু করেছিলেন।

মহারাজারবাড়ী, দেওয়ান মশাই এর বাড়ী, কিং-মেমোরিয়াল হল, জেঠমল ভোজরাজ ব্যাঙ্কার্স ইত্যাদি সহরের ওপর তলায়—সব পাহাড়ী সহরের যা নিয়ম—বড় বড় লোকেরা থাকেন। এইবার চলে গেলাম নীচের তলার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে।

প্রথম যে জিনিষটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে পাহাড়ের নীচের পাড়া সম্বন্ধে—সেটা হচ্ছে এখানের অগণন ঘোড়ার আস্তাবল। কত শত যে আস্তাবল—এই সব ঘোড়ারা তিব্বত থেকে আসে আবার ফিরে যায়, প্রত্যেক বার আঠার দিনের চড়াই উৎরাই পথ। গ্যাংটকে এসে তারা বিশ্রাম নেয়। আর ভারতবর্ষের দিকে যেতে হয় না, কারণ এইখান থেকে লরী-বাস চলে কালিম্পং পর্য্যন্ত।

যাই হোক নীচের তলার অধিবাসী বেশীরভাগই তীব্বতী নেপালী নয়তো ভুটানী। প্রত্যেক বাড়ীতেই শ্বেত পতাকা উড়ছে—এটা স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস—তারা অশরীরী অমঙ্গলের হাত এড়াবার জন্য এরকম পতাকা ওড়ায়।

এখানে আমার কাজ কিছু ছিল না—রোজ সকালে দিগবিদিকের পাহাড় রাঙিয়ে প্রভাত সূর্য উঠতো, আমি পাহাড়ের সানুদেশে ইউক্যালিপ্ট্যাস গাছে হেলান দিয়ে দেখতাম গাছে গাছে অজস্র ফুলের পশরা। আমার পায়ের কাছে এক সাধারণ বনফুল তার কি অপূর্ব বাহার—চারিদিক নির্জন, কেবল ফুলে ফুলে একঘেয়ে ভ্রমর গুঞ্জন করছে—হয়তো যোজন দূরে কোন পাহাড়ের খাদে ঝরণার ধারা নামছে। কখনো কখনো দেখতাম, পাহাড়ের চূড়ো থেকে চূড়োয় দলে দলে ফিঙে জাতীয় পাখী উড়ে চলেছে। সন্ধ্যাবেলা অস্তসূর্য্যের রাঙা আলো অনেকক্ষণ পশ্চিম দিগন্ত আলোকিত থাকতো—হয়তো কিং-মেমোরিয়াল হলে বিলিয়ার্ড খেলা সুরু হয়ে যেতো, বাজারে দোকানে আলো জলে যেতো।

একদিন রবিবার সকালে এখানে হাট বসলো। গ্যাংটকের যা কিছু ঐ বাজার—তাই বাজারের চত্বরের চারিদিক ঘিরে দোকানীরা তাদের পশরা সাজিয়ে বসে গেছে। ওই কালকে সন্ধ্যাবেলা দেখলাম ভোঁ ভাঁ—রাতারাতি এত গ্রাম্য পাহাড়ী আর এত বিচিত্র সম্ভার কোথা থেকে এল খোঁজ করাতে জানা গেল...এরা সব দূর-দূর গিরিকন্দর থেকে এসেছে—সব নীচের তলায় ছিল, আজ ভোর হতে এখানে এসেছে। সন্ধ্যে হলেই আবার নীচে চলে যাবে—কাল সব বাড়ী ফিরবে, আবার পরের রবিবার যথারীতি আসবে।

বাঁশের চোঙার দই বিক্রী হচ্ছে—বিরাট বিরাট লাউ, পেঁপের সাইজের কাঁচা লঙ্কা, ভেড়ার লোম, কাঁচা পশমের হাতে বোনা সোয়েটার দেদার বিক্রী হচ্ছে। ইয়াখ, ছাগলের ইটপাটকেলের মত জমান দুধ, শিলাজিত (কি জিনিষ জানি না), হরেক রকম রং-চঙে পাথরের মালা, ঘাসের ঝাঁটা-কলকাতাতেও দেখেছি বিক্রী হচ্ছে—এই সব

প্রধান সামগ্রী। কাঁচা চামড়ার পুঁটলীর মত ব্যাগের খুব চাহিদা, যারা লাসা যাবে তাদের কাছে মহামূল্য জিনিষ এগুলি। এত বিশ্রী গন্ধ—ওই ব্যাগ যে কিনবে তার সঙ্গে একসঙ্গে চলাফেরা করা মুস্কিল। পচা চামড়া, ভাল করে ট্যান করে না—কিছু না। একটা আস্ত চমরী গাই-এর ব্যাগ বিক্রী হচ্ছে, অনেকটা ভিস্তীর মত দেখতে, তার লেজ দিয়ে হ্যাণ্ডল তৈরী হয়েছে। কিন্তু যাই হোক, মনে হয় খুব মজবুত।

ওরা কিনছে সেফটীপিন, সস্তা টর্চ্চ-লাইট, প্লাষ্টিকের চিরুণী, কেরোসিন তেল, মোমবাতি আর নুন। নুন দশ আনা সের দেখে ভাবলাম, দিন কতক নুন চালানের ব্যবসা করি এখানে, কিন্তু এই গরীব পাহাড়ীদের কষ্টার্জিত পয়সা এভাবে রোজগার করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না ভেবে ক্ষান্ত হলাম।

জুতোর দোকান খোলা হয়েছে, প্রধানতঃ দু ধরণের জুতো বিক্রি হচ্ছে, এক আগাগোড়া পশমের তৈরী, বোনা—মেয়ে পুরুষ সমানে পরে—এগুলো রঙচঙে, মনে হয় খুব সৌখীন। আর বাকী ব্রিচেস-জাতীয় জুতো। শেষের গুলো একটু দামী, কারণ ঘোড়ায় চড়ার জন্য এগুলো খুব দরকারী।

রোজকার বাজার লোকে, মনে হোল এই একদিনেই কিনে রাখে। তা ছাড়াও হাট মুচি আছে, তার কাজ বিশেষ সরল। কেবল বড় বড় পেরেক ঠুকে ঠুকে দেওয়া—কারণ আমার মনে হয় ঐ ব্রিচেস জুতো সেলাই করা একটু শক্ত। ভীষণ ভীড় মুচির কাছে। জুবেয়ানী গরম কাপড় জামাও বিক্রী হচ্ছে।

একদিন দূর পর্বত প্রান্তরে চলে গেলাম। সহর পার হয়ে এক উপত্যকা তারপর আরেকটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ফেলে-আসা প্যাংটক পাহাড়কে লক্ষ্য করে দেখলাম—বাংলোগুলি ছবির মত যেন আঁকা আছে। সবুজের পট-ভূমিকায় লাল-ছাদ বাংলো সব চেয়ে উঁচুতে, মহারাজার চৈনিক স্থাপত্যের প্রাসাদ। সেদিন পরিষ্কার নীল আকাশ ছিল—বর্ষা শেষের লঘু মেঘ পাহাড়ের মাথায় আটকে আছে, কোথা থেকে হু হু করে বাতাস আসছে বরফের মত ঠাণ্ডা—আমি যে পাথরের ওপর বসে আছি তার পিছনের লাউ গাছটার মাথায় একদল পাখী কিচিরমিচির করে মহা-ঝামেলা লাগিয়েছে, দুজন পাহাড়ী মাথায় বোঝা নিয়ে শহরের দিকে চলেছে। এইখানে কিছু কিছু প্রজাপতি পাহাড়ের ঢালু জায়গাটা রঙিণ করে রেখেছে দেখলাম।

এই দিন ফেরবার পথে আমার নতুন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে এক পাহাড়ী ঝরণায় চান করি। এখানকার লোকে বড় একটা চান করে না, সব সময়েই গরম জামা জুতো পরে থাকে, খুব গরম লাগলে উর্দ্ধাঙ্গের জামা কাপড় খুলে কিছুক্ষণের জন্য কোমরে জড়িয়ে রাখে। ঐ দিন অনেক তিব্বতী চান করছিল নির্জন গিরিকন্দরের ঐ হিমশীতল ঝর্ণায়। উঃ সে কি ঠাণ্ডা বোঝান মুস্কিল—আমার দাঁতের বাদ্যি অনেকক্ষণ থামেনি।

আজ সিকিম থেকে চলে এসেছি, মনে হয় কোনওদিন কি সেখানে গিয়েছিলাম। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথায় বলতে হয়—যখন মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত থাকে, ছোট ছোট কথা আর তুচ্ছ দিন সকল যখন গ্লানিকর মনে হবে—তখন যেন মানসনেত্রে উদয় হয় সৌন্দর্য্যভূমি সিকিম। সে পর্ব্বত-সঙ্কুল ভূমিপৃষ্ঠ, উচ্ছল তিস্তা, গিরিকন্দরবহুল পর্ব্বতগাত্র আর তিব্বতীরা যেন আমার স্মৃতিতে অক্ষুন্ন হয়ে থাকে।

ঘাস-ফুল

সনতকুমার মিত্র
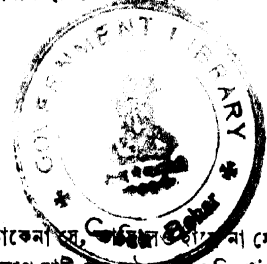
বর্ণ সমারোহ নেই, নেই তার ঘ্রাণের তীব্রতা,
চপল হাসিও নেই, লজ্জাহত হ'য়ে এক পাশে
চেয়ে থাকে; তবু তার সুগভীর স্নিগ্ধ বিনম্রতা
চাঁপা-জবা-গোলাপের আকর্ষণ ছেড়ে অনায়াসে।

চলে গেলে ডাকেনা সে, [illegible] না সে ভুলে,
তবু তার নিরুত্তাপ মাটি গন্ধ [illegible] চুমি;
কিছু নেই, তবু তাকে নিয়েছি আপন করে তুলে
হৃদয়ে অনন্যা করে। (আমার সে ঘাসফুল, তুমি)॥

কাটমুণ্ডুর স্মৃতি

সুধীন্দ্রনাথ সেন

চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা, মাঝখানে নেপালের রাজধানী কাটমুণ্ডু নগরী। প্রকৃতি দেবী যেন তার সমস্ত সৌন্দর্য্য উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন এই পার্ব্বত্য দেশটির ওপর। কাটমুণ্ডু নাম শুনলে মন এক অজানা আতঙ্কে আঁৎকে ওঠে। মনে হয় সুদূর অতীতে ওখানে মানুষের মুণ্ড কাটা হ'ত, সেই জন্য নাম হয়েছে কাটমুণ্ডু। আসলে কিন্তু তা নয়। এর প্রকৃত নাম হচ্ছে কাঠমাণ্ডো। নগরীর অধিকাংশ বাড়িই পূর্ব্বে কাঠের তৈরি ছিল সেই জন্যই এই নাম হয়েছে। ইংরাজরাই এর নাম করেছে কাটমুণ্ডু, যেমন আমাদের কলকাতা হয়েছে ক্যালকাটা।

কাটমুণ্ডুর সঙ্গে আমার পরিচয় সুদীর্ঘ ২০ বৎসরের ওপর। আমার পিতৃদেব যখন মহারাজা চন্দ্রসামসের জঙ্গবাহাদুর রাণার পুত্রদের গৃহশিক্ষকরূপে নেপালে যান, তখন আমার বয়স হবে আট বৎসর। কাজেই বাল্যের অধিকাংশ সময়ই আমার কেটেছে কাটমুণ্ডুতে। তাই কাটমুণ্ডুর পথঘাট, দেব মন্দির ও তুষারমণ্ডিত পাহাড় প্রায়ই আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। এখনও মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে শুনতে পাই ৺পশুপতিনাথ মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি ও স্রোতস্বিনী বাগমতী নদীর কুলু কুলু রব। নেপালে আজ সুদীর্ঘকালের রাণা শাসনের অবসান হয়েছে। কিছুকাল হ'ল নেপালে সাধারণ নির্ব্বাচন বেশ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে এবং জনসাধারণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু নেপালের বর্ত্তমান ইতিহাস রাণাদেরই ইতিহাস এবং নেপালের অগ্রগতিতে রাণাদের অবদানকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাণারা বাঙ্গালীদের খুবই প্রীতির চক্ষে দেখতেন। তাই দেখতে পাই—শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য উচ্চ সরকারী পদে বাঙ্গালীদের নিয়োগ। অনেকেই হয়তো জানেন না। কাটমুণ্ডু নগরীর পরিকল্পনা করেছিলেন একজন বাঙ্গালী নাম ৺রামকৃষ্ণ দাস। নেপালের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিতে বাঙ্গালীর দান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কাটমুণ্ডুতে একটা সরকারী কলেজ ও স্কুল আছে। কলেজের নাম ত্রিভুবনচন্দ্র কলেজ। এখানে আমার পিতৃদেব কিছুকাল ইতিহাসের অধ্যাপনা করেছিলেন। কলেজ ও স্কুলের শিক্ষার ব্যয় সরকারই বহন করেন। শিক্ষা ব্যাপারে নেপাল খুবই পশ্চাতে পড়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্ত্তমানে জনসাধারণের মধ্যে লেখাপড়া শেখবার যে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে তা খুবই আশার কথা। কাটমুণ্ডুতে দেখবার অনেক কিছুই আছে। কাটমুণ্ডুর ত্রিভুবন রাজপথ আমাদের কলকাতার চৌরঙ্গীকেও হার মানায়। রাজাদের বিরাট ও মনোরম রাজপ্রাসাদসমূহ পথিকের মনে বিস্ময় জাগায়। প্রধানমন্ত্রী যেখানে থাকেন তার নাম সিংহ দরবার—আর রাজার বাসস্থানের নাম নারায়ণহট্টি দরবার। এ ছাড়া কত যে দরবার আছে তার ইয়ত্তা নেই। সিংহ দরবারের নিকটেই টুণ্ডিখেল ময়দান, আমাদের কলকাতার গড়ের মাঠের মত। এখানে গুর্খা সৈন্যরা প্রতিদিন কুচকাওয়াজ করে। মনে পড়ে একদিন তন্ময় হয়ে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখছিলাম এমন সময় একটি নেপালী যুবক ব্যঙ্গস্বরে আমাকে বলেছিল—ও তুমি কি বুঝবে। তোমরা ত ইংরাজের গোলাম গোলামের জাত তোমরা। সেদিনের সেই কথাটি আমার মনে খুবই লেগেছিল। জানিনা ইংরাজ-বিদ্বেষ ও দেশকে স্বাধীন করবার কামনা আমার মনে সেই দিন থেকেই সূত্রপাত হয়েছিল কিনা। নেপালে গুর্খা ও নেওয়ার এই দুই জাতের প্রাধান্যই দেখা যায়। নেপাল এক সময় এই নেওয়ার রাজাদের অধীনে ছিল। নেওয়ারদের ভাষা গুর্খাদের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নেওয়াররা খুব নিপুণ শিল্পীর জাত। এদের খচিত অভিনব সুন্দর কারুকার্য্য পথিকের মনে বিস্ময় জাগায়। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে নেপালই একমাত্র স্বাধীন হিন্দু রাজ্য, কাজেই এখানে বারো মাসে হিন্দুদের তের পার্ব্বণ লেগেই আছে। এখানে বহু বিখ্যাত দেব মন্দির আছে। তার মধ্যে ৺পশুপতিনাথ,

গুহ্যেশ্বরী দেবী, স্বয়ম্ভূনাথ, বুড়নীলকণ্ঠ ও বালাজুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিনা পাসপোর্টে কাটমুণ্ডুতে প্রবেশ করবার অধিকার নেই কারো। কেবলমাত্র শিবরাত্রির সময় কাটমুণ্ডুর দ্বার ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে, সেই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী পশুপতিনাথ দর্শনের জন্য সমাগত হন। মন্দিরের সামনেই গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির, কথিত আছে সতীর দেহাংশ এখানে পড়েছিল। তারপরেই উল্লেখ করতে হয় স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির, পাহাড় কেটে সিঁড়ি তৈরী হয়েছে। বেশ কিছুটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে মন্দিরে পৌঁছতে হয়। মন্দিরের বিরাট চূড়াটি সোনা দিয়ে মোড়া। মন্দিরের ভেতর সারাক্ষণ প্রদীপ জ্বলছে ও বৌদ্ধ লামারা মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। প্রবাদ আছে—বুদ্ধদেব এখানে এসে কিছুদিন বাস করেছিলেন। বুড় নীলকণ্ঠ একটি দীঘির ভেতর শায়িত বিষ্ণু মূর্তি। নাগরাজ বাসুকী ফণা দিয়ে বিষ্ণুর মস্তক আচ্ছাদন করে রেখেছে। এই বিষ্ণু মূর্তি নাকি খুব জাগ্রত দেবতা। নেপালের রাজার এই মূর্তি দেখার নিষেধ আছে—কেন না তিনি নাকি বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, কাজেই যদি তিনি এই মূর্তি দর্শন করেন তাহলে নাকি তিনি আর জীবিত থাকবেন না। কাজেই রাজার দর্শন করবার জন্য এই বিষ্ণুরই অনুরূপ মূর্তি তৈরি করা হয়েছে, নাম বালাজু। রাজা এই মূর্তি দর্শন করতে পারেন। জানিনা রাজাকে নারায়ণের অবতার করে রাখবার পেছনে রাণাদের কোন রাজনৈতিক চালবাজি ছিল কিনা। বর্তমানে রাণারা আর নেপালের সর্বময় কর্তা নন, কাজেই বর্তমান রাজা মহেন্দ্র এই প্রথায় বিশ্বাসবান কিনা তা আমার জানা নেই। রাজা সম্বন্ধে রাণাদের আরও একটা প্রথা ছিল, তা হচ্ছে রাজার নেপালের বাইরে যাওয়া চলবেনা—কেননা তিনি নেপালের ভাগ্য-দেবতা, কাজেই ভাগ্যদেবতা নেপাল ছেড়ে গেলে নেপালের ক্ষতি হবে। এই প্রথা প্রথম ভঙ্গ করেন বর্তমান রাজার পিতৃদেব ত্রিভুবন। নেপালে যখন রাণাদের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয় তখন তিনি নেপাল পরিত্যাগ করে ভারতে এসেছিলেন এবং ভারতের বাইরেও গিয়েছিলেন। অবশ্য এর পর তিনি মাত্র দুবৎসর জীবিত ছিলেন। রাণারা হয়তো বলবেন নেপালের বাইরে যাওয়াই হচ্ছে মৃত্যুর মূল কারণ। কিন্তু বর্তমান রাজা মহেন্দ্র হরদম কাটমুণ্ডু-কলকাতা-দিল্লি করছেন।

নেপালের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে কেবল দেখতে পাব রাণাদের ক্ষমতার লড়াই, চক্রান্ত ও চমকপ্রদ ঘটনার কাহিনী। কোথায়ও এতটুকু উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা দেখতে পাবনা গরীব ও মধ্যবিত্তদের। তারা শুধু মুখ বুজে খেটেই চলেছে পেটের ক্ষুধা টুকু মেটানোর জন্য। পেটের ক্ষুধা ছাড়া যে মানুষের জীবনে আরও কিছু আছে এটা ওদের কল্পনার বাইরে। শত অত্যাচার, অবিচার ও অনাহারের জ্বালা মুখ বুজে সহ্য করতে হবে এটা ওরা ভগবানেরই নিয়ম বলে মেনে আসছিল। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখিনি সুদীর্ঘ কাল রাণা শাসনের আমলে। অবশেষে মহারাজা চন্দ্র সামসেরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহন সামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা মহারাজা ও প্রধান মন্ত্রী হলেন। আমার পিতৃদেব জ্ঞানেন্দ্র নাথ সেন মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন এবং তাঁর খুব প্রিয় পাত্র হয়েছিলেন। মোহন সামসের যখন বুঝলেন যে নেপালের জন সাধারণ আর রাণা শাসন বরদাস্ত করবেনা তখন তিনি আর বিলম্ব না করে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিলেন এবং তুলে দিলেন নেপালের জনসাধারণের ওপর নেপালের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার চিরকালের জন্য। নেপালের আকাশ থেকে পুরাতন সূর্য্য আজ বিদায় নিয়েছে। নতুন সূর্য্যের আলোয় ঝলমল্ করছে প্রতিটি জনগণের মুখ। নেপালকে গড়ে তুলতে হবে এক আদর্শ রাজ্যে এই তাঁদের পণ। রাজা মহেন্দ্র ও তরুণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালার নেতৃত্বে নেপাল এগিয়ে চলুক সাধনের দিকে, গড়ে তুলুক এক সুন্দর রাজ্য—যেখানে সকলে থাকবে সুখে ও শান্তিতে। আমরা ভারতবাসী এই কামনাই করবো।

*কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তব জন্ম-মৃত্তিকার পূতরেণু মাখি অঙ্গে পরম শ্রদ্ধায়,
এই পল্লীপথপ্রান্তে স্মরণ তোমারে করি হেমন্ত-সন্ধ্যায়।
দামোদর পার হয়ে সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রে আলিপথ ধরি,
দূর হোতে আসিয়াছি, মোরা তব তীর্থযাত্রী সর্ব্বদুঃখ বরি,
হে কবি! মুকুন্দরাম! প্রাণের প্রণাম রাখি
তোমারি উদ্দেশে।
বহু দীর্ঘ বেদনায় শঠতার হিংসাচ্ছন্ন রূঢ় পরিবেশে,
জীবন মধ্যাহ্নে তব মসীলিপ্ত ভাগ্যাকাশ হেরি ঘন মেঘে,
তৃণ-গুল্ম-তরু-বীথি, স্বদেশের দ্বার হোতে আশঙ্কা উদ্বেগে,
বিদায়ের মালাখানি পরায়েছে কণ্ঠে তব, অশ্রুধারা লয়ে;
দুর্য্যোগের ঝঞ্ঝাবর্ত্তে নীরবে গিয়েছ চলে বাস্তহারা হয়ে।

আজি মোরা সেই গ্রামে এসেছি তোমার
স্মৃতি অর্চ্চনার তরে,
হেথা নাই জনারণ্য, আছে গোষ্ঠ পর্ণগৃহ নির্ব্বাক অন্তরে।
জানি তুমি ভোলো নাই দামুন্যা গ্রামের কথা
রাজসৌধে রহি,
ভোলো নাই ভাঁড়ুদত্ত সম শঠ মানুষেরে—অত্যাচার সহি
যার হয়েছ কাতর, ভাবনার তারে তীরে করি পরিক্রমা;
ছায়া-ঢাকা বীথি পথে অদৃষ্টের লিপিগুলি হয়ে আছে জমা।
যাযাবর সম যাত্রা, মুছে ফেলে নির্য্যাতিত আত্মপরিচয়,
গ্রাম হোতে গ্রামান্তরে বিষণ্ণ দুঃস্বপ্ন সাথে সুদীর্ঘ সময়
চলিয়াছ তুমি, কে জানিত সৌভাগ্যের
সূর্য্যোদয় হবে তব!
উৎকলের দ্বারপ্রান্তে হেরিলাম জীবনের জন্মান্তর নব।

অনুভূতি দিয়ে গড়া তোমার অমর কাব্য গাঁথা অশ্রুজলে,
সমাজের বৃহত্তর জীবনেরে কেন্দ্র করি জাগে ধরাতলে।

তুমি এলে মধ্যযুগে গণ-সমাজের ব্যথা বেদনার মাঝে,
সমবেদনায় চিত্ত তব অসহায় সংসারের চিত্র লয়ে কাছে
কত দিন কত রাত্রি কত না বিজন ক্ষণে অশ্রুভারাতুর,
তুমি বুঝি শুনেছিলে কালকেতু-ফুল্লরার ক্রন্দনের সুর!
মন্ত্রসিদ্ধ হে তপস্বী! সারস্বত সাধনায় মহাশক্তি লভি
স্বর্গ হোতে চণ্ডিকারে দারিদ্র্য লাঞ্ছিত গৃহে এনেছিলে কবি
দীপ্ত রাজটীকা এঁকে নিষাদের ভালে দিতে কল্যাণ লক্ষ্মীরে,
বঙ্গাইতে গুজরাটে আনন্দ হিল্লোল আনি বসন্ত সমীরে।

গণ-সাহিত্যের বার্ত্তাবহ তুমি, শতাব্দীর ভাঙি মৃত্যু ঘুম
ভালে তার পরায়েছ চিরন্তন জীবনের আলোর কুঙ্কুম।
শুধু তুমি সে দিনের সেই সর্ব্বহারা মানুষের কথাগুলি
কহ নাই নব পরিচ্ছেদে, নতুন অধ্যায়ে—তব চিত্ত তুলি
এঁকেছে ধনীর চিত্র, ধনপতি সদাগর খুল্লনা-লহনা
কমলে কামিনী আর শ্রীমন্তের সিংহলের রোমাঞ্চ ঘটনা;
আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব সংঘাতের স্তরে স্তরে বিচিত্র স্মৃতিকে
রূপে-রসে ভাবে অনুভাবে করেছ যে প্রাণবন্ত দিকে দিকে
কাহিনীর নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতে। ইতিহাস-ইতিবৃত্ত
তোমার মঙ্গল কাব্যে রহিয়াছে সমুজ্জ্বল—সে যুগের নিত্য
মানুষের সংসারের সামগ্রিক রূপায়ণ শিল্পায়নে এনে,
রস চেতনারে রেখে গেলে শেষ সারস্বত যতি রেখা টেনে।

চণ্ডীর মহিমা তুমি প্রচার করেছ বিশ্বে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে,
কৈবল্য শক্তি তব মহত্তম আদর্শেরে নিঃশঙ্ক নির্ভয়ে,
করেছে প্রতিষ্ঠা। বঙ্গভারতীর বরপুত্র হে মুকুন্দরাম!
যুগ হোতে যুগান্তর হয়, তবু ভোলেনাকো কেহ তব নাম।
মাণিকদত্তের তুমি উত্তর সাধক! স্নেহ-করুণায় প্রেমে
কেদার বাহিনী ধারা বহায়েছ মরুপথে মর্ত্ত্যালোকে নেমে।

---

* বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠিত মুকুন্দরাম জয়ন্তী উৎসবে দামুন্যা-গ্রামে পঠিত।

বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ

ডঃ দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সন্তানের শিক্ষা-ব্যাপারে একসময় বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। প্রচলিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার ত্রুটি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ছোট-বেলা থেকেই। তিনি মনে করতেন, পুঁথির শিক্ষায় আনন্দের অভাব; মুক্তির আনন্দরস তাতে নেই। 'প্রান্তর যুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ, তারই সঙ্গে মিলিয়ে' ছেলেমেয়েদের তিনি মানুষ করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে-শিক্ষা পেয়েছিলেন 'প্রকৃতির অন্তরলোকে, গাছপালা, আকাশ-আলোর সহযোগে,' সেই ছিল শিক্ষার সত্য পরিচয়। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা এই আনন্দ-উৎস থেকে চিরদিন বিচ্ছিন্ন। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে-শিক্ষক বহুধাশক্তিযোগ্য রূপ রস গন্ধ বর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে সরস বলবান করে তুলেছেন, তার থেকে ছিন্ন করে ইস্কুল-মাষ্টার বেতের ডগায় নিরস শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়'। কি করে শিক্ষার মধ্যে প্রাণরসধারা বইয়ে দেওয়া যায়, তাই হল কবির ভাবনা। প্রাণের ঐশ্বর্য লাভ করতে গেলে প্রকৃতির সৌন্দর্য-ভাণ্ডারের অনুসন্ধান ছাড়া উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে মানুষ জন্মেছে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব সংসারের মধ্যে; সুতরাং ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থায় এই দুইটীকে একত্র সমাবেশ করলেই হবে শিক্ষার পরিপূর্ণতা ও মনুষ্যজীবনের সম্পূর্ণতা; শিক্ষার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সংযোগ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে ছেলেমেয়েদের কাছে তা হবে একান্ত ভার। ভারবাহী প্রাণী যেমন ভারই বহন করে, কিছু গ্রহণ করার ক্ষমতা তার থাকে না, তেমনই প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন শিক্ষায় ছেলেদের মন পূর্ণতা লাভে হয় বঞ্চিত। 'শিক্ষা শুধু সংবাদ বিতরণ নয়, মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায়নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে, তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানব জীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য'। জীবনের পূর্ণতালাভের নিদর্শন আছে সেকালের তপোবনের নির্জন তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে। প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রমই শিক্ষাদান ও শিক্ষা-গ্রহণের একমাত্র আদর্শক্ষেত্র ভেবে রবীন্দ্রনাথ মনে করলেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমই হচ্ছে এ-বিষয়ে উপযুক্ত স্থান। রবীন্দ্রনাথ গেলেন মহর্ষির কাছে তাঁর নিবেদন জানাতে। মহর্ষি সমস্ত শুনে সানন্দে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিলেন। ১৩০৮ সালে ৭ই পৌষ রবীন্দ্রনাথের মনোমত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল শান্তিনিকেতনে। কবি এর নাম দিলেন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'; 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নামটি পরে হয়।

বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হল রবীন্দ্রনাথের দুই পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ এবং অপর চারটি বালক নিয়ে। ক্রমে ক্রমে দু চারটি করে ছেলে আসতে লাগল। পরে রবীন্দ্রনাথের কবি-যশ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নানা গুণিজন, ছাত্র, শিক্ষক দেশ-দেশান্তর থেকে এসে পড়ায় আশ্রম-বিদ্যালয়টি পরিণত হল সার্বজনীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তখন রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়টিকে একটি বিশেষ স্থানের বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন বিশ্ববাসীর সকলের জন্য। এই-ভাবে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার ২০ বৎসর পরে শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়টি 'বিশ্বভারতী' নামে অভিহিত হল ১৩২৮ সালের ৮ই পৌষ। এইদিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মবিদ্যালয়কে সর্বসাধারণের হাতে সমর্পণ করেন। এই হ'ল বিশ্বভারতীর সূচনা।

বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন যে পাশ্চাত্ত্য জাতি পরিপূর্ণ শক্তি লাভ করতে পারেনি—কেবলমাত্র শক্তির একটা অংশ তারা অধিকার করতে পেরেছে। কিন্তু এই আংশিক শক্তিকে সংযম বা সাধনার সঙ্গে যুক্ত না করতে পারলে একদিকে হবে শক্তির অপব্যয়, আর অপরদিকে জাতিগত বিদ্বেষবহ্নি কেবল বাড়তেই থাকবে। বিশ্বের কল্যাণের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়টিতে 'সেই যুগসাধনার প্রবর্তন করতে' ও মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করতে' চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন তাঁর বিদ্যালয়টি হবে সমগ্র জাতির 'মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র'। 'বিশ্বের সঙ্গে ভারতের' যোগসূত্র স্থাপনের পরিকল্পনাও ছিল এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। 'বিশ্বজাতির মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা'র প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি শান্তিনিকেতনকে করে তুললেন 'সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত'। এইভাবে শান্তিনিকেতনে প্রোথিত হল বিশ্বমানবের 'জয়ধ্বজা'।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের মনন-শক্তির দৈন্য লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন এই ভারতবর্ষ 'নিজের শক্তিতে মনন' করে 'মনের ঐক্য' এনেছিল; কিন্তু পরে নানা কারণে সেই মন হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন। বৃক্ষের শাখা-গুলি 'কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করতে' ভুলে গিয়ে যদি বিচ্ছিন্নভাবে বা স্বতন্ত্ররূপে নিজেদের কথাই ভাবে—তবে মূল বৃক্ষের যেমন ভাবী অনিষ্টপাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, ভারতের পক্ষেও সেইরূপ দৈন্যদশা রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন। জাতিগত বিশিষ্ট ভেদবুদ্ধি দেশকে করে তুলেছিল অতিশয় দুর্বল; হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান

ইত্যাদি সকলের মধ্যেই দেখা দেয় মনের একতাভাব ; ফলে, সকলেই নিজের মতো করে দান বা গ্রহণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এই দিকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 'ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত' করতে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ-কাজে অগ্রসর হতে গেলে ভারতের মন নানা ধারায় কিভাবে প্রবাহিত হয়েছিল, তা অবশ্যই জানা প্রয়োজন ; এতে একদিক দিয়ে ভারতের সমগ্রতার উপলব্ধির ও অপরদিকে জ্ঞানক্ষেত্র বিস্তারের সম্ভাবনা আছে, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

সে শিক্ষা শিক্ষাই নয় যদি তাতে বিদ্যার সৃষ্টি না হয়। বিদ্যা দান করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ নয়, বিদ্যা সৃষ্টিও তার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই দান করতে পারে, যার সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে ; পক্ষান্তরে যে কেবল দানই করে আর সৃষ্টি করতে জানে না, তার দানের কড়ি দু-দিনেই যায় ফুরিয়ে। যাঁদের মধ্যে এই সৃজনী শক্তি রয়েছে এবং যাঁরা 'নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার' ইত্যাদি কাজে নিরত আছেন, তাঁদেরই একান্ত প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাক্ষেত্রে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিকল নকল করে গেলে এ সাধনা হবে ব্যর্থ। 'শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ স্থাপনও অবশ্য প্রয়োজন। কতকগুলি উকিল, ডাক্তার, কেরাণি ইত্যাদি তৈরী করে দেওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ নয়। কৃষি, শিল্প, নানাবিধ বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, স্বাস্থ্যবিদ্যা ইত্যাদির সার্থকতা আনতে হবে 'আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিক্‌বর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ' করে। চারদিকের মানুষের সঙ্গে যোগ রেখে শিক্ষক ও ছাত্রকে অগ্রসর হতে হবে। এতে সে-শিক্ষাও থাকা প্রয়োজন, যে-শিক্ষায় হবে উন্নততর প্রণালীতে চাষ-আবাদ, গো-পালন, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি। সমবায় প্রথার কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলে গেছেন। বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত সমবায় প্রথার অনুশীলনী, যাতে ছাত্র ও শিক্ষক চতুর্দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত' হয়। রবীন্দ্রনাথের মনে এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা এসেছিল—যার ফলে হয় বিশ্বভারতীর সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ একবার মহীশূরের নূতন বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, বিদ্যালয়টি একেবারে ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা। এখানে ভারতীয় বোধের একান্ত অভাব দেখে তিনি ক্ষুণ্ণ হন। ভারতবর্ষ যে নিজের সাহস একেবারেই হারাতে বসেছে তার প্রমাণ তিনি পেলেন মহীশূরে। ইউরোপই যেন আদর্শ ; ভারতের যেন কোনো দিন কিছু ছিল না। আমরা অতীব দীন, আমরা সম্মান পাবার অযোগ্য ইত্যাদি বোধ যেন আমাদের মজ্জাগত। কী প্রণালী অবলম্বন করলে উন্নততর শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হয়, তার চিন্তা নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের যেন মনেই আসে না। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, ভারতে 'বিদ্যা-সমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র' গড়তে, যেখানে হবে, বিদ্যার আদান-প্রদান ও বিদ্যার তুলনা নির্ণয় এবং মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে ভারতীয় বিদ্যাকে সংযুক্ত করে বিচার করে নেওয়া। এই বিচারের ক্ষমতা অর্জন করতে গেলে ভারতের সমগ্র বিদ্যা অধিগত করা একান্ত প্রয়োজন। এর ফলেই সম্ভব হতে পারে বিশ্ববিদ্যার সম্বন্ধ নির্ণয়।

নদী যেমন নানা উপনদীর সহায়তায় পরিপুষ্টি লাভ করে, তেমনই ভারতীয় বিদ্যাস্রোতও ইউরোপীয় ও মুসলমান ধারায় পরিপুষ্ট। এর প্রকাশ হচ্ছে আমাদের ভাষা, আচার, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি নানা বিষয়ে। সুতরাং 'আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, পার্সী বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে ইউরোপীয় বিদ্যাকে স্থান' না দিলে ভারতীয় বিদ্যা হবে অসম্পূর্ণ ও অসার্থক। এ-কথা মনে রাখা প্রয়োজন, 'সমস্ত পৃথিবীকে বাদ' দিয়ে একান্তভাবে ভারতকে দেখলে ভারতকে সত্য করে দেখা যাবে না ; আবার ভারতের 'এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা' থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্রভাবে দেখলে ভারতকে জানা সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং ভারতবর্ষকে পূর্ণরূপে দেখতে গেলে সমগ্র পৃথিবীকে ভারতের আপন অঙ্গনে আহ্বান করতে হবে। ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ হওয়া উচিত 'ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, শিখ, পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্য সাধনার যজ্ঞে সমবেত করানো।

স্বার্থ নিয়ে থাকলে কখনই আত্মার মুক্তি ঘটে না ; কাজেই আত্মার মুক্তিতে স্বার্থবিসর্জনের অবশ্য প্রয়োজন। ফলে, সমস্ত বন্ধন হয়ে যায় ছিন্ন। বলা বাহুল্য, এই মুক্তি কিন্তু 'কর্মহীনতা বা শক্তিহীনতার রূপান্তর' নয়। এতে নিরাসক্তি আসলেও মনকে করে অভয় এবং কর্মকে করে পরিশুদ্ধ, আর কামক্রোধাদি রিপু একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই মুক্তিলাভ কী ভাবে হবে তা 'কান দিয়ে শোনা ও সত্য বলে জানার একটি জায়গার' প্রয়োজন।

অভাব হলেই লোকে জীবিকার জন্য ছোটে ; জীবিকার প্রয়োজনই তখন হয় মুখ্য ; কিন্তু জীবনের সার্থকতা তো কেবল তার অভাব মেটানোই নয়, চাই তার পরিপূর্ণতা। জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের চেষ্টায় মনকে করতে হয় শান্ত ; 'নানা প্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার বিশেষ প্রয়োজন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বানই মুখ্য, 'ইস্কুল মাষ্টারের আহ্বান নয়'। পূর্বে এখানে ছাত্রদের কোনো বেতন দিতে হত না। তাদের বিছানাপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য রবীন্দ্রনাথকেই সংগ্রহ করতে হ'ত। এ ব্যবস্থা বরাবরই চলতে পারত, যদি অন্যান্য জায়গায়ও এর আদর্শ রক্ষা করে যেত। কোনো একটা বিষয় যদি স্বতন্ত্র হয়ে চলে, তবে দীর্ঘ দিন তা টিকে থাকতে পারে না ; সুতরাং অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিদ্যালয়কে কিছুটা খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে ; তাতে বিদ্যালয়ের কিছু পরিবর্তন হলেও মূলবিষয়টি অবিকৃতই আছে। 'যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়' এখানকার ছেলে মেয়েরা। আর 'যায় মুক্তির লীলাক্ষেত্র বিশ্বপ্রকৃতি'ও তাঁদের মনে অন্য মুক্তি এনে দেয়]

'ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচনের উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের বরাবর, কিন্তু যে শিক্ষা-প্রণালীর জাল এ দেশকে আপাদমস্তক আবদ্ধ রেখেছে, তার প্রভাব থেকে তাঁর বিদ্যালয়কে তিনি একেবারে মুক্ত করতে পারেন নি। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য ছেলেদের তৈরি করে দেবার চেষ্টাও করতে হত; কিন্তু এর মধ্যেও তিনি যথাশক্তি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন। যার ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশ্রম বিদ্যালয়টিকে শাসনাধীনে আনতে পারেনি। তবুও রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের অন্ত ছিলনা। মনের দাসভাবকে নষ্ট করতে হলে শিক্ষার দাসভাবকে সমূলে উৎপাটিত করা প্রয়োজন। তিনি স্থির জেনেছিলেন যে এই আশ্রমের শিক্ষায় যদি দাসভাবের মুক্তি না আসে, তবে আশ্রম স্থাপনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। তিনি অনুভব করেন স্বাধীনভাবে বিদ্যানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা। ফলে, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ বিদ্বজ্জনকে তিনি স্বাধীনভাবে বিদ্যাচর্চার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন, 'এই রকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। বিশ্বভারতীর প্রথম বীজবপন এই ভাবে হয়।

বীজের মধ্যে প্রাণ থাকলে যেমন তা অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষ জন্মলাভ করে এবং ক্রমে ক্রমে সেই বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে পৃথিবীর হিতসাধনে নিরত হয়, তেমনই সাধনায় সত্য নিহিত থাকলে অর্থাভাব, লোকাভাব, উপকরণাভাব ইত্যাদি অভাব রাশি ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। বিশ্বভারতী পরিকল্পনার মধ্যে প্রথমে নানা অভাব থাকলেও ধীরে ধীরে তার অগ্রগতির পথ সুগম হয়ে এসেছে। আশ্রমে যে সমস্ত অধ্যাপক এসে মিলিত হলেন, কবি তাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত আসন দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন; কেবল তাই-ই নয়, তাঁরা যাতে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণায় যোগ্যতর হয়ে ওঠেন, সে দিকেও রবীন্দ্রনাথের ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তিনি সর্বতোভাবে এ-বিষয়ে ব্যবস্থা ও সাহায্য করেছিলেন। বিশ্বভারতীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর একটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির; ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত; আর আছেন ভীমশাস্ত্রী মহাশয়। ওদিকে এণ্ড্রুজের চারিদিকে ইংরেজি সাহিত্য-পিপাসুরা সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তার সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। দূরদেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জুটছে। তা ছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পার্সি ও উর্দু শিক্ষা দেবেন ও ক্ষিতিমোহনবাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে। শিশু দুর্বল হয়েই পৃথিবীতে দেখা দেয়। সত্য যখন সেই রকম শিশুর বেশে আসে, তখনই তার উপর আস্থা স্থাপন করা যায়। একেবারে দাড়িগোঁফ-সুদ্ধ যদি কেউ জন্মায় তা হলে জানা যায়, সে একটা বিকৃতি। বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোট দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটোর ছদ্মবেশে বড়োর আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ করা যাক—মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠুক। একান্ত মনে এই আশা করা যাক যে, এই শিশু বিধাতার অমৃতভাণ্ডার থেকে অমৃত বহন করে এনেছে; সেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে, বাড়াবে এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে'।

পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ যাঁদের আশ্রমে এনেছিলেন অথবা যাঁরা আশ্রমকে সেবা করবার জন্য এসেছিলেন, তাঁদের যোগ্যতর করার বিষয়ও কবি চিন্তা করতেন। ফলে, কর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে অনেককে তিনি বিদেশে পাঠিয়েছিলেন উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য। এঁদের মধ্যে নাম করা যায়—কালীমোহন ঘোষ, অজিতচন্দ্র চক্রবর্তী, গৌরগোপাল ঘোষ, সন্তোষকুমার মজুমদার, ধীরেন্দ্রমোহন সেন, মুকুল দে প্রভৃতি ছাত্র-শিক্ষকদের। এঁরা বিদেশে থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা-সমাপন করে বিশ্বভারতীতে আত্মনিয়োগ করেছেন।

'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'—এর পরিকল্পনায় বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয় ১৩২৮ সালের ৮ই পৌষ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিনে। ১৩২৬ সালের ১৮ই আষাঢ় কার্যারম্ভ হয় এবং ১৩২৮ সালের ৮ই পৌষ বিশ্বভারতীর জন্য রচিত সংস্থিতি (Constitution) এই সময় গৃহীত হয়। বিশ্বভারতী-পরিষদের প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'কিছুদিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আজ সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ করে দেব। বিশ্বভারতীর যাঁরা হিতৈষীবৃন্দ ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে আছেন, এর ভাবের সঙ্গে যাঁদের মনের মিল আছে, যাঁরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, তাঁদেরই হাতে আজ একে সমর্পণ করে দেব'। পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। এই সভায় সিলভ্যাঁ লেভি, ম্যাডাম লেভি, ডাক্তার মিস ক্রামবিশ, রাজগুরু ধর্মাধার মহাস্থবির, উইলিয়ম পিয়ার্সন, স্যার নীলরতন সরকার, প্রশান্ত মহলানবিশ, স্নেহলতা সেন, হেমলতা দেবী, প্রতিমাদেবী, ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এঁদের সকলকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেন—'যে সকল সুহৃদ আজ এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁরা আমাদের হাত থেকে এর ভার গ্রহণ করুন। এই বিশ্বভারতীকে আমরা কিছুদিন লালন-পালন করলুম, একে বিশ্বের হাতে সমর্পণ করবার সময় এসেছে। একে এঁরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন, এর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ স্থাপন করুন'। পরে রবীন্দ্রনাথ সকলের সম্মতি নিয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে বরণ করে বললেন, তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে কর্ম সম্পন্ন করুন, বিশ্বের প্রতিনিধিরূপে আমাদের হাত থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করুন। তিনি এ বিষয়ে যেমন করে বুঝবেন তেমন আর কেউ পারবেন না। তিনি উদার দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যকে দেখেছেন।......আনন্দের সঙ্গে তাঁর

হাতে একে সমর্পণ করছি। তিনি আমাদের হয়ে সকলের সামনে একে উপস্থিত করুন এবং তাঁর চিত্তে যদি বাধা না থাকে তবে নিজে এতে স্থান গ্রহণ করুন, একে আপনার করে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত' করুন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ' রাখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু 'প্রাণের নিয়মে' গাছের বিস্তার লাভ হলে যেমন তাকে 'বীজের সীমার মধ্যে' ধরে রাখা যায় না, বিশাল আকাশের মধ্যে সে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে, তেমনই তাঁর বিদ্যালয়টিকে বিশ্বের কল্যাণের জন্যই মুক্ত করে দিতে হল। পশ্চিমে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে বেদনা অনুভব করেছিলেন। 'পূর্ব মহাদেশ কী সম্পদ দিতে পারে, তা সকলে জানতে চাচ্ছে এবং মানুষের সাধনা কোন পথে গেলে' তার সমস্ত অভাব পূর্ণ হবে, সেই কথা জানবার জন্য পশ্চিম আগ্রহ প্রকাশ করছে। সেই পথনির্দেশ ও সত্য সন্ধানের সুযোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়টিকে বিশ্ব-জনের হাতে সমর্পণ করেছেন। 'যদি কোনো জাতি স্বজাত্যের ঔদ্ধত্য-বশতঃ আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত বলে মনে করে, তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্যসম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না'—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে বিশ্ববোধই পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ভারতকে বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে, আর 'ক্ষুদ্র অভিপ্রায়কে' দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে 'বড়ো অভিপ্রায়'কে আঁকড়ে ধরতে। তিনি চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষ বিশ্বমানব-গৌরবের অংশীদার হয়ে বিশ্ব-জনীনতা লাভ করুক। এই দিকে লক্ষ্য রেখে কবি সংকল্প করেছিলেন বিশ্বভারতীকে 'সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র' করে দিতে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের দেশে এখানে সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেখানে বাঁধানিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানা ঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার, এঞ্জিনিয়র, উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য, কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি। প্রাচীন কালে ছিল তপোবন সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আত্মার পূর্ণতা বিকাশের জন্য সাধকরা একত্র হয়েছেন। রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে এই সকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্যদেশেই জ্ঞানের তাপসকর্মের ব্রতীদের জন্যে তপোবন রচিত হয়েছে। আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণতঃ মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিলনা। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র, ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা ইত্যাদি বিদ্যার লেশমাত্রও এতে স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয়, কারুকার্য, শিল্পকলা, পল্লীহিত-সাধনোপযোগী শিক্ষা ও চর্চা সমস্তই সংস্কৃতির অন্তর্গত। 'যে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে, তার সবগুলিরই সমবায় হবে' শান্তিনিকেতন-আশ্রমের সাধনায়, এই কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক কাল ধরে চিন্তা করে আসছিলেন।

ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার পক্ষে বিদ্যা ও চরিত্রের সমন্বয় হওয়ার প্রয়োজন। আশ্রমে সকলের মধ্যে এই ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ যত্নবান ছিলেন; কিন্তু তেমন বিদ্যা না থাকলেও শুধু চরিত্রের গুণে যে মানুষ কত মহীয়ান হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে। শান্তিনিকেতনে এক অধ্যাপক এসেছিলেন; তিনি ধনে ও স্বাস্থ্যে ছিলেন বড়ই দুর্বল। একবার এই অধ্যাপক কবিকে অনুরোধ করেছিলেন কিছু কাজ কমিয়ে দিতে যাতে তিনি নিজের পড়াশুনার জন্য সময় পান। কবি তাঁকে বিশেষভাবে জানতেন এবং এটা যে তাঁর সাময়িক মনের অস্বস্তি, তাও তিনি বুঝলেন। তথাপি তিনি অধ্যাপকের অনুকূলে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। অধ্যাপক মশায় হাতখরচা-বাবদ মাত্র ২০৲ টাকা পেতেন; তিনি তার থেকে ১০৲ টাকা করে জমিয়ে যখন ১০০৲ টাকা সঞ্চয় করলেন, তখন সমস্ত টাকাই রবীন্দ্রনাথের হাতে দিলেন এবং অনুরোধ করলেন যে ঐ টাকা যেন আশ্রমের কল্যাণে ব্যয় করা হয়; উপরন্তু তিনি বললেন যে মাসিক ২০৲ টাকার বদলে ১০৲ টাকাতেই তাঁর কুলিয়ে যাবে। এই অধ্যাপকের পরবর্তী জীবন দারুণ অর্থাভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল; কিন্তু একদিন যে তিনি এমন মহানুভবতা দেখিয়েছিলেন, তা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। বড় কাজে এরূপ ত্যাগস্বীকার রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের মধ্যে অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিজেই ত্যাগবীর; সুতরাং তাঁর সংশ্রবে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা কবির পুণ্যস্পর্শে যে মহিমময় হবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। যাকে তিনি সন্তানের মতো লালন করে এসেছিলেন, সেই সাধের আশ্রম-বিদ্যালয়টিকে তিনি বিশ্বজনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। 'নিজেকে দিয়ে ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল'—কবিগুরুর এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই ত্যাগের মহিমায় তিনি শ্রেষ্ঠ ধনেরই অধিকারী হয়েছিলেন।

শক্তির উন্মত্ততায় অথবা পররাজ্যলোলুপতায় পৃথিবীতে পীড়ন চললেও সত্য সাধনার একটি ক্ষেত্র থাকা চাই, তাতে পূর্ব-পশ্চিমের কোনো প্রশ্ন নেই। বুদ্ধদেব যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন, তা তো ভৌগলিক সীমা পার হয়ে সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছিল। 'চিরন্তন সত্যের কাছে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই'। রবীন্দ্রনাথ সেই সত্যসাধনার ক্ষেত্রকেই বিশ্বভারতী নাম দিয়েছিলেন, যেখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যার আদান-প্রদানের সুযোগ থাকবে; আর পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানধারা সেখানে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করবে এক বিশাল জ্ঞানবারিধি। সেই জ্ঞানসাগর মন্থন করে যে সত্যামৃত উত্থিত হবে, তার কাছে ধন হবে অতিতুচ্ছ। ধনপ্রার্থীকেই বলা যায় যে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ীর মতো বলার ক্ষমতা অর্জন করেছে 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্'—যাতে আমি অমৃতত্ব লাভ করলাম না, সে ধনে আমার কী প্রয়োজন?

বিশ্বভারতীতে এইরূপ ধনঞ্জয়-সৃষ্টির পরিকল্পনা ছিল রবীন্দ্রনাথের। এখানে এই স্বীকৃতিও তিনি দান করে গেছেন 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'— এখানে সকল দিক থেকে সকলে আসুক এবং অমৃতত্ব লাভ করে সত্য প্রতিষ্ঠা করুক। বহুদিন ধরে ভারতবর্ষ 'আধ্যাত্মিক ঐক্য সাধনার যে তপস্যা' করে আসছিল, সেই তপস্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন আধুনিক যুগের সঙ্গে ঐক্য রেখে। মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণ গৌরবসাধনের ক্ষেত্ররূপেই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা।

যাঁরা বলতে চান, ভারতবর্ষের সত্যসম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁরা মোহাশ্রিতা সত্যবানের সত্যপ্রকাশ না হয়ে পারেনা। ভারত যে তার সত্যকে হারায়নি, বিশ্বভারতীর সৃষ্টি হয়েছে সেই বিশ্বাস প্রকাশ করবার জন্যই। সমস্ত দেশের নিকট এই সত্য প্রকাশ করতে হবে বিশ্বভারতীকে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে 'বিশ্বভারতীতে ভারতের নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বের কাছে ঘোষিত হোক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সেই সম্পদকে উপলব্ধি করুক যে সম্পদকে সর্বজনের কাছে দান করার দ্বারাই লাভ করা যায়'। তীর্থযাত্রীরা যে-ভক্তি নিয়ে তীর্থস্থানে যায়, তাতেই তীর্থস্থান সত্য হয়ে ওঠে, তেমনই সকলেই যদি বিশ্বভারতীতে এসে আপনার স্থানটি খুঁজে পায়, তবেই আশ্রমের যথার্থ সত্য প্রকাশ হবে। যাঁরা এখানে সত্যকে উপলব্ধি করতে শ্রদ্ধায় প্রত্যাশা করবেন, সেই শ্রদ্ধাও প্রত্যাশা দ্বারা বিশ্বভারতী সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এখানে সেই মন্ত্রের প্রত্যাশা করতে হবে, যে মন্ত্র হচ্ছে 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'।

কবিগুরু আশ্রমকে পাঠশালা করতে চাননি, তিনি একে তীর্থ করে গেছেন ; এই জন্য তিনি বিশ্বভারতীকে বার বার তীর্থ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন যে এখানে লোকে এসে 'যেন বলতে পারে—আঃ বাঁচলাম, আমরা ক্ষুদ্র সংসারের বাইরে এসে বিশ্বের ও বিশ্বদেবতার দর্শনলাভ করলাম—এই উদ্দেশ্যেই কবি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মানুষের মধ্যে মুক্তির পথ সৃষ্টি করাও বিশ্বভারতীর অন্যতম উদ্দেশ্য। 'নিজের ঘরের নিজের দেশের মধ্যে যে মুক্তি, তা হল ছোট কথা ; তাতে করে সত্য খণ্ডিত হয়, আর সে জন্যই জগতে অশান্তির সৃষ্টি। এই সত্যের অপলাপে পৃথিবীতে সৃষ্ট হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ, রেষারেষি, মনকশাকশি ইত্যাদি নানা প্রকার দ্বন্দ্ব। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' এই ঋষিবাক্য ভুললেই সর্বনাশ। মানুষ মানুষকে পীড়া দেয়, এত বড় অন্যায় আচরণ সভ্য জগতের পক্ষে কলঙ্ক স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন, বিশ্বভারতীই এ-বিষয়ে সাহায্য করবে ; বিশ্বের সমস্ত লোকের 'যোগসাধনার সেতু' রচিত হবে বিশ্বভারতীতে ; অতিথিশালার দ্বার মুক্ত হবে, যার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে সকলকে আহ্বান করতে কোনোই কুণ্ঠাবোধ হবে না।

ভারত কী ঐশ্বর্য দিতে পারে—এই প্রশ্ন করেছিলেন কবিকে অনেক বিদেশী। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভারতের ঐশ্বর্য বলতে এই বুঝি, যা-কিছু তার নিজের লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিঃশেষ করবার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার, আতিথ্যের অধিকার পায় ; যার জোরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে নিজের আসন গ্রহণ করতে পারে ; অর্থাৎ যাতে তার অভাবের পরিচয় নয়, তার পূর্ণতারই পরিচয়—তাই সম্পদ। সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণীর প্রকাশ আমাদের বিদ্যালয়টুকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিদ্র ভিক্ষুকের মূর্তি ধরে, কিন্তু একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে সকল ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে'।

রবীন্দ্রনাথ বরাবর বলে এসেছেন, বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শ অপর শিক্ষালয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত নাও থাকতে পারে। তিনি বলেছেন, 'এখানে আমরা কোন বিষয় পড়াচ্ছি, পড়ানো সকলের মনের মতন হচ্ছে কিনা—সাধারণ কলেজের আদর্শে উচ্চশিক্ষাবিভাগ খোলা হয়েছে বা জ্ঞানানুসন্ধান-বিভাগে কিছু কাজ হচ্ছে, এ সমস্তই যেন আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়ের জিনিস বলে না মনে করি। এ সমস্ত আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে। আশঙ্কা হয়, যা ছোট তাই বড়ো হয়ে ওঠে, পাছে একদিন আগাছাই ধানের ক্ষেতকে চাপা দেয়। বনস্পতির শাখায় কোনো বিশেষ পাখি বাসা বাঁধতে পারে কিন্তু সেই বিশেষ পাখির বাসাই বনস্পতির একান্ত বিশেষণ নয়। নিজের মধ্যে বনস্পতির সমস্ত অরণ্যপ্রকৃতির যে সত্য পরিচয় দেয়, সেইটেই তার বড়ো লক্ষণ'।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে 'সংসারের লীলায়' নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে বিশ্বভারতীকে চলতে হবে। তিনি যে-ভাবে বিদ্যালয়টিকে প্রবর্তিত করেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই এর পরিণতি হতে থাকবে, তা তিনি কোনো দিন বলেননি। 'সমাজের সঙ্গে কালের সঙ্গে' যোগ রেখে প্রতিষ্ঠানটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর পরিকল্পনা ; তবে এর মধ্যে সত্য যা আছে, তার জয়যাত্রা যাতে অপ্রতিহত হয়, তাই ছিল কবির কামনা। 'প্রতিমুহূর্তের সত্য চেষ্টা সত্য কর্মের মধ্য দিয়েই' তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি যদি আপন সজীব পরিচয় দেয়, তবেই তার প্রকাশ হবে চিরন্তন জীবনের : 'স্থূল সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে' ইচ্ছে করে যেন তার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি না হয়। তিনি চেয়েছিলেন, 'আদর্শের গভীরতা যেন নিরন্তর সার্থকতায় তাকে আত্মসৃষ্টির পথে চালিত করে। এই সার্থকতার পরিমাপ কালের উপর নির্ভর করেনা, কেননা সত্যের অনন্ত পরিচয় আপন বিশুদ্ধ প্রকাশরূপে'। কালের ধর্ম হচ্ছে নিয়ত পরিবর্তনশীল। 'ভাবী কালের' পথ তৈরী করে দেওয়া যায় ; কিন্তু গম্য স্থানকে নির্দিষ্ট দিনের রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে কখনও একেবারে পাকা করে দেওয়া যায়না। সেই চেষ্টা করতে গেলে তা হয়ে উঠবে—'মৃত সংকল্পের সমাধিস্থান'।

১৩৪১ সালের ৮ই পৌষ বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদ সভার আচার্যের ভাষণে কবিগুরু স্বয়ং বলেছিলেন যে শান্তিনিকেতনের শিশুবিদ্যালয়টির কালের বিবর্তনের সঙ্গে আদর্শ রূপটি পরিবর্তিত হয়েছে ; কিন্তু এ-কথাও অবশ্য স্বীকার্য যে এই পরিবর্তন হলেও 'তার মূল সত্যটি ঠিক আছে'। সেই সত্যটি হচ্ছে—'জীবিকার আদর্শকে স্বীকার করে তাকে সাধনার আদর্শের অনুগত করা'। আশ্রমের পরিধি যখন ছোট ছিল, তখন এই

আদর্শরক্ষা-করা ছিল সুসাধ্যের মধ্যে ; কিন্তু তা হলেও 'সেই শুল্লায়তনের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। উচ্চতর সংগীতে নানা ত্রুটি ঘটতে পারে ; একতারার ভুংচুকের সম্ভাবনা কম, তাই বলে একতারাই শ্রেষ্ঠ, এমন নয়। বরঞ্চ কর্ম যখন বহুবিস্তৃত হয়ে বন্ধুর পথে চলতে থাকে, তখন তার সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে প্রাণ থাকে, তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু-অবস্থার সহজতাকে চিরকাল বেঁধে রাখবার ইচ্ছা ও চেষ্টার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে'। আজ ২৭ বছর পরেও কবিগুরুর উক্তিটি বিশ্বভারতীর পক্ষে সম্পূর্ণই সত্য। ১৩৪১সাল থেকে ১৩৭৮ সালের মধ্যে বিশ্বভারতীর ইতিহাসে বিরাট পরিবর্তন এসেছে ; তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে আশ্রমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিদান ও কেন্দ্রীয় সরকারকর্তৃক আশ্রমের পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণ। রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তনকে কখনও অস্বীকার করেননি ; সুতরাং আজকে আশ্রমের এই পরিবর্তন কারোও ক্ষোভের কারণ হতে পারেনা, যদি দেখা যায় যে তার মূল সত্যটি জাগ্রতই আছে। এখন এখানে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা বিচিত্র ; রবীন্দ্রনাথের সময়ও তাই ছিল। তিনি সকলকে নিয়ে কাজ করতেন, কাউকে বাদ দিতেন না ; নানা ভুলত্রুটিও হত, বিরোধ যে ঘটেনি তা নয় ; কিন্তু তিনি কারও সম্মানহানি করেননি। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 'আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারাযন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতিসরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করিনে'। আশ্রমের প্রতি, আশ্রমের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার অভাব অনেকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন ; কিন্তু তা নিয়ে তিনি নালিশ করতে যাননি। তিনি বলেছেন, 'আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসংগতির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনই তৈরী হয়ে উঠেছে ; আমি যখন থাকব না, তখনও অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্ভাবিত হতে থাকবে, তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায়—প্রাণধর্মের মধ্যে স্বত-বিরোধিতাকে স্বীকার করে নিতে হয়'। নদীর উৎপত্তির মুখে থাকে একটিই ধারা ; কিন্তু যখন সে নানা নদনদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সাগরের কাছে যায়, তখন তার কত রূপান্তর ঘটে। তখন নদীর আদিম স্বচ্ছ ভাব থাকে না, বহু আবিলতা মলিনতা আসে নদীতে। কিন্তু কেউ কি বলে, যে-হেতু নদীটির মালিন্য এসেছে, সেই হেতু তার ফিরে যাওয়া উচিত তার উৎপত্তি স্থানে? 'সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটিই বড়ো—আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই চলেছে, অনেক মানুষের চিত্ত সম্মিলনে আপনি গড়ে উঠেছে'। আশ্রমের মধ্যে নিন্দনীয় বিষয় থাকতে পারে ; কিন্তু সেইটিই বড় নয়, 'তাকে পরাস্ত করে উত্তীর্ণ হয়ে টিকে থাকাতেই প্রাণের প্রমাণ'। যে-কোনো অনুষ্ঠানের মধ্যে ভাল-মন্দর দ্বন্দ্ব থাকবেই, তবে সেটা হচ্ছে তার নিতান্তই গৌণ। আশ্রমের জীবনে যেন 'অখণ্ড পরিপূর্ণতা' প্রতিষ্ঠিত হয়, কবিগুরু তাই কামনা করে গেছেন। আশ্রমের ছাত্রদের উপর ছিল কবির গভীর শ্রদ্ধা। যে-সব ছাত্র এখানে যা পেয়েছেন বা দিয়েছেন, তাঁরাই যদি অন্তরের সঙ্গে একে গ্রহণ করেন, তবেই আশ্রম হয়ে উঠবে প্রাণবান্। আশ্রমটি যাতে অন্যান্য বিদ্যায়তনের মতো কলের জিনিষে পরিণত না হয়, তাই ছিল কবির ঐকান্তিক ইচ্ছা। কিছু যান্ত্রিকতা যে কবির সময়ে আসে নি, তা নয়, তবে 'সবার উপর প্রাণ যেন সত্য হয়' এইটাই কবিগুরু চেয়েছিলেন। সেই সত্যকে রক্ষা করবার জন্য তিনি আহ্বান করেছেন তাঁদেরই যাঁরা একসময় এই আশ্রমের জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং যাঁদের স্মৃতিতে এই আশ্রমের সত্যতা বিরাজিত আছে। চারদিকের প্রবল আবিলতা থাকা সত্ত্বেও সেই পূর্বতনরাই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধায় আশ্রমের সত্য বস্তুটিকে রক্ষা করে চলতে পারবে, এই ছিল আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস।

কবিতার দ্বীপ

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

সমস্ত হৃদয় দিয়ে সে মেয়েকে আমি ভালোবাসি :
সকালের সাতরং দুপুরের নীল নীরবতা
রাত্রির কাজল চোখ আশ্চর্য্য মধুর মনে হয়
কারণ রয়েছে মোর তার তরে তীব্র আকুলতা।

অথচ সে কোনোদিন ছোঁয়া মোরে দিল নাতো হায়
ক্রমাগত দূরে দূরে—আরো দূরে কেবলি পালায়—
অদ্ভুত কৌতুকে চলে নিত্য তার লুকোচুরি খেলা
পরাজয়ে লাল হয় সারা মুখ নিবিড় লজ্জায়।

সে কিন্তু আমায় দিলো পৃথিবীর সেরা উপহার
মনের সাগর নীলে গড়ে দিলো দ্বীপ কবিতার।

হারানো বোন

Dorothy M Johnson এর "Lost Sister" শীর্ষক গল্প থেকে অনূদিত

অনুবাদিকা—ঊষা বিশ্বাস এম-এ, বি-টি

আমাদের বাড়ীটি ছিল শুধু যেন মেয়ে মানুষেই ভরা। তাঁরা আমার চার্লি পিসে মশায়কে দাবিয়ে তো রাখতেনই। তাঁদের হৈচৈ ও বক-বকানিতে সময় সময় আমিও যেন হক-চকিয়ে যেতাম। আমি ও চার্লি পিসে মশায় ছাড়া বাড়ীতে অপর কেউ পুরুষ ছিল না। আমার বয়স যখন বছর নয়েক, তখন বাড়ীতে আর একজন স্ত্রীলোকের আবির্ভাব হল। তিনি হলেন আমার বেসি পিসীমা। এর আগে তিনি নাকি ইণ্ডিয়ানদের কাছেই ছিলেন।

মার কাছে তাঁর সব কথা শুনে প্রথমটা আমি মোটে বিশ্বাসই করতে পারিনি। আমার বাবা ছিলেন এক অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর লেফ্‌টনাণ্ট। বছর দুই আগে অসভ্য বর্বর ইণ্ডিয়ানরা তাঁকে মেরে ফেলে। সেজন্যে ইণ্ডিয়ানদের উপর আমার এক বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। আমি মনে মনে কেবলই ভাবতাম কবে আমি বড়ো হয়ে তাদের একেবারে নির্মূল করে ফেলবো! (কিন্তু আমি যখন সত্যিই বড়ো হ'লাম তখন আর তাদের ভয় করবার কোনও কারণই রইল না।) আমি একদিন খুব জোরের সংগেই প্রশ্ন করেছিলাম—আচ্ছা, বেসি পিসীমা শত্রুদের মধ্যে অতোদিন থাকতেই বা গেলেন কেন?"

মা বললেন—"ছোটতেই ওরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। ওঁর বয়স তখন তোমার বয়সের চেয়েও বছর তিনেক কম ছিল। উনি আবার এখন বাড়ী আসছেন।"

আমি ভাবলাম—ওঁর তো অনেক আগেই বাড়ী ফিরে আসা উচিত ছিল। বললাম—"ওরা যদি আমায় কখনও ধরে নিয়ে যায় তো আমি কক্ষণো ওদের কাছে বেশীদিন থাকবো না।"

মা অমনি আমায় দু হাত জড়িয়ে ধরে বললেন—"ছি! বাবা, ওকথা বলতে নেই। ষাট, বালাই! ওরা তোমায় ধরে নিয়ে যাবে কেন? ওরা কক্ষণো তোমায় ধরে নিয়ে যেতে পারবে না।"

আমিই ছিলাম আমার মায়ের তাঁর স্বামী-গৃহের সংগে একমাত্র সত্যিকারের বন্ধন। আমার পিসীমারা—মার্গারেট, হানা ও সেবিনা—তিনজনেই তাঁর উপর এতো বেশী কর্তৃত্ব চালাতেন যে তিনি সেবাড়ীতে মোটেই সুখী ছিলেন না। তিনি ছিলেন পূর্বাঞ্চলের মেয়ে। কিন্তু সেখানে ফিরে যাওয়াটাও তাঁর তেমন মনঃপুত ছিল না। আমার পিসীমাদের দোকানটি আমার চার্লি পিসে মশায়ই চালাতেন। তাঁকে ঠিক আমাদের পরিবারের লোক বলা চলে না। তিনি ছিলেন আমার মার্গারেট পিসীমার স্বামী। আমার বাবাই ছিলেন এই পরিবারের একমাত্র পুরুষ—আমার পিসীমাদের ছোট ভাই। তারপর আমিই রয়ে গেলাম এই পরিবারের একমাত্র পুরুষ। পিসীমাদের দোকানটি একদিন আমারই হবে। আমার মা আমার পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যেই এখানে রয়ে গেলেন।

আমার এখানকার তিন পিসীমাদের মধ্যে কেউই বেসি পিসীমাকে আগে কখনও দেখেন নি। তাঁরা জন্মাবার আগেই ইণ্ডিয়ানরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। শুধু একমাত্র মেরী পিসীমাই তাঁকে জানতেন। মেরী পিসীমা বেসি

পিসীমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়ো ছিলেন। মেরী পিসীমা এখান থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে এক জায়গায় থাকতেন। তাঁর শরীরও এখন বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না।

যে ছোট্ট মেয়েটি এক নিছক গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছিল বাড়ীতে তার একখানিও ছবি ছিল না। যখন এই পরিবারটি প্রথম এখানে এসে বসবাস শুরু করে তখন ছেলেমেয়েদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে তোলাটাই ছিল এক কঠিন ব্যাপার। সেই সময়ে তাই তাদের ছবি তুলবার কথাটা মোটে ওঠেই নি।

বেসি পিসীমার উদ্ধারের ব্যাপারটি নিয়ে সেনা-বিভাগের কর্মচারীরা অনেকবার আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে বহু চিঠিপত্র লেখালেখিও চলে। এসবের অনেক পরে বেসি পিসীমা এসেছিলেন। মেজর হ্যারিস—যার উপরে শেষ ব্যবস্থাটির ভার পড়েছিল আমার পিসীমাদের আগে থেকেই সাবধান করে দিয়ে বললেন যে বেসি পিসীমাকে নিয়ে তাঁদের কতোগুলি সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, কারণ তিনি হয়তো খুব সহজে তাঁর এই নতুন পারিবারিক জীবনের সংগে নিজেকে ঠিক-মতো খাপ খাইয়ে নিতে নাও পারতে পারেন।

এ যেন মার্গারেট পিসীমাকে দস্তুর মতো চ্যালেঞ্জ করাই হল। তিনি বেশ খুশীমনেই সেটি গ্রহণ করলেন। তিনি সগর্বে বলে উঠলেন—"ওতো আমাদেরই সহোদর, আমাদেরই রক্ত মাংস। ও নিশ্চয়ই আমাদের কাছে ফিরে আসতে চাইবে। আমার কতো আদরের বোন বেচারী বেসি! আজ চল্লিশ বছর হলো সে ঘর ছাড়া।"

মেজর হ্যারিসের যতোই আগ্রহ ও আন্তরিকতা থাকুক না কেন, তাঁর বিচক্ষণতার কিছু অভাব ছিল। তিনি জোর দিয়েই বললেন—"সে আজ এতো বছর ধরে ঐ অসভ্য বর্বরদের মধ্যেই রয়েছে। ওরা যখন তাকে চুরি করে নিয়ে যায় তখন সে তো একটি ছোট মেয়ে। আমি অবশ্য তাকে কখনও দেখিনি। তবে ও যে একজন ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকের মতোই হবে একথা মনে করা মোটেই অসংগত নয়।"

আমার মার্গারেট পিসীমা ছিলেন খুব রাশভারী প্রকৃতির মানুষ। তিনি এবিষয়ে আর বাক্যব্যয় করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"মেজর হ্যারিস, আমি চাই না আমার প্রিয় বোনটিকে কেউ সমালোচনা করে। সে আমাদের বাড়ীতেই থাকবে। যদি এক মাসের মধ্যে সরকারের কাছ থেকে তার আসবার কোনও খবর না পাওয়া যায় তবে আমাকেই এর একটা বিহিত করতে হবে।"

মাস শেষ না হতেই বেসি পিসীমা এসে গেলেন।

আমাদের বাড়ীতে অন্য যে পিসীমারা ছিলেন তাঁরা সাহসের সংগেই মহা উৎসাহে তাঁর অভ্যর্থনার তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। তাঁরা মহাব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। আসবাবপত্র সব কিছু ঝাড়া পোছা ও পালিশ করাও চলতে লাগলো। পিসীমারা আমাকে ঘর থেকে মার ঘরে সরিয়ে দিলেন। মাও তাই চাইছিলেন, কারণ রাত্রে মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে আমি বড়োই কাতর হয়ে পড়তাম। ঘরটিই ওরা বেসি পিসিমার জন্যে ঠিক করে রাখলেন। সেটিতে কয়েকটি আরাম ও বিলাসোপকরণ, যথা পরিষ্কার নতুন নতুন 'ডয়লি', চুলের কাঁটা, মানান-সই একটি জলের কুঁজো, মুখ ধোবার গামলা, সব চেয়ে ভালো তোয়ালে আর দুটি নতুন রাতের পোশাক রাখা হল। কে জানে, তার রাতের পোশাকটি যদি পুরোনোই হয়ে গিয়ে থাকে! (তার কিন্তু রাতের পোশাক মোটে ছিলই না।

হানা পিসীমা বললেন—"আমাদের বোধহয় ওর জন্যে কয়েকটি বাইরে পরবার পোশাকও তৈরী করিয়ে রাখা উচিত ছিল। ওর কি আছে, না আছে তা তো আমাদের জানা নেই।"

মার্গারেট পিসীমা অমনি মনে করিয়ে দিলেন—"ওর মাপটা যে জানা নেই। ও এখানে এসে স্থির-স্থির হয়ে আগে বসুকই—দুদিন বিশ্রাম করুক। তারপর ওর দোকানে যাবার যথেষ্ট সময় থাকবে। ও তখন দোকানে গিয়ে প্রাণভরে কেনাকাটা করতে পারবে।"

যখন এই সব প্রস্তুতি চলছিল, শহরের বিশিষ্ট ভদ্র-মহিলারা প্রায় প্রতিদিন বিকালেই এখানে আসা যাওয়া করতে লাগলেন। মার্গারেট পিসীমা তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন—"বেসির সামনে যে রয়েছে এক মহা-পরীক্ষা। তা থেকে উদ্ধার পেয়ে ও একটু সুস্থির হয়ে বসলেই ওর সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে আপনাদের সকলকে একদিন চায়ে ডাকবো ভাবছি।"

মার্গারেট পিসীমা তাঁর বোনদেরও—যাঁরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন—সাবধান করে দিয়ে বললেন—"গাখো মেয়েরা, তোমরা কিন্তু প্রথমেই ওকে নানা প্রশ্নে বিব্রত করে তুলবে না। ওর খানিকটা বিশ্রাম দরকার। ওর উপর দিয়ে কম ঝড়-ঝাপটা তো যায়নি!" শেষ কথা কটি বলতে বলতে তাঁর গলার স্বরটি যেন বুজে এল। একমাত্র তিনিই যেন শুধু এ কথাটা বুঝতে পেরেছেন।

বাস্তবিকই বেসি পিসীমাকে এক নিদারুণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দুঃখের অভিজ্ঞতাটি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের—তাঁর বোনেরা যে রকমটি অনুমান করেছিলেন ঠিক তা নয়। তিনি যখন এখানে এলেন—মনে হ'ল তাঁকে যেন তাঁর নিতান্ত আপনজনদের ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে কতোগুলি সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোকদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল তখন তিনি বন্ধনমুক্ত তো হনই নি। বরং তাঁকে যেন আবার নতুন করে বন্দী করা হল।

বেসি পিসীমা যখন মেজর হ্যারিসের সংগে এ বাড়াতে এলেন, তখন তাঁদের সংগে একজন আধা-ইণ্ডিয়ান দো-ভাষীও ছিল। তাঁর তেল-জবজবে কালো চুলগুলি কাঁধ অবধি ঝুলে পড়েছে। তাঁর পোশাকটিও আধা-সাগরিক, আধা-আদিম। এঁদের আসতে দেখেই মার্গারেট পিসীমা তক্ষুণি দরজাগুলি খুলে দিলেন। দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছন পিছন তাঁর বোনেরাও ছুটে এলেন। আমি ও মা জানালা দিয়ে দেখতে লাগলাম। মার্গারেট পিসীমার দু-বাহু প্রসারিত। কিন্তু স্ত্রীলোকটির কাছে এসেই যেন তাঁর বাহু দুটি আপনা থেকেই নেমে গেল। তাঁর আনন্দাপ্লুত কণ্ঠস্বরও রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমার বেসি পিসীমা আজ চল্লিশ বছর ধরে ইণ্ডিয়ান হয়েই ছিলেন। তাঁর মধ্যে লেশমাত্র জড়তা বা নম্রতা ছিল না। তিনি চলতে চলতেই দাঁড়িয়ে পড়লেন—অসহায় করুণ দৃষ্টিতে তাঁর অবরোধকারিণীদের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। তাঁর বোনেরা প্রায়ই তাঁকে একটি ছোট্ট মেয়ে বলেই বর্ণনা করতেন। তাঁরা কখনও তাঁকে দেখেন নি। কিন্তু সেই বন্দী শিশুটি এক কল্পিত কাহিনীরই বিষয়-বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা বলতেন—তার নাকি সুন্দর সোনালি রঙের কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল ছিল, আর ছিল বড়ো বড়ো দুটি নীল চোখ। সে যেন একটি পরী শিশু—একটি ছোট্ট দেবদূত, যার চুলগুলি ফ্যাকাশে রঙের, যে নৃত্য-চঞ্চল পায়ে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

যে বেসি ফিরে এল সে একজন বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক। সে 'মোকাসিন' পরে ধীর মন্থর পায়ে চলে। তার গাঢ়-রঙের পোশাকটি তার মোটা শরীরটাকে ঢাকতে পারছে না। তার বাদামী রঙের চুলগুলি ঠিক তার কানের নিচে ঝুলছে। সেগুলি যেন বেড়েই চলেছে। ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে প্রথম যখন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হল, তার মাথার চুলগুলি তখন খুব ছোট ছোট করে ছেঁটে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তার মাথার উকুনগুলি সব পরিষ্কার হয়ে যায়।

মার্গারেট পিসীমা নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি সেই মৌন ধীর স্থির স্ত্রীলোকটিকে আলিংগন করতে চেষ্টা না করে শুধু তার একখানি বাহু থাবড়িয়েই তৃপ্ত হলেন। তাকে সম্বোধন করে বললেন—"বেসি, বেচারী বোনটি আমার, আমি তোমার বোন মার্গারেট। আর এরা দুজন আমাদের বোন—হেনা ও সেবিনা। আশা করি, এতোটা পথ এসে তুমি খুব বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়নি?"

মার্গারেট পিসীমা তার সংগে খুব সদয় ব্যবহারই করলেন, কারণ সে যে তাঁদের পরিবারেরই একজন সে বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না। তাঁর বিশ্বাস—মার্গারেট সব কিছুই বিশ্বাস করতেন—বেসির এখন শুধু দরকার একটুখানি ঘুম ও মুখ ধোওয়া। তারপর সে তাঁদের মতোই অনর্গল বুঝতে শুরু করে দেবে।

আমার অন্য পিসীমারা ছিলেন যেমন চটপটে, তেমনি মুখরা। কিন্তু ইনি? ইনি এমনভাবে চলাফেরা করছেন যেন দারুণ দুঃখ ভারে এঁর কাঁধ দুটি নুয়ে পড়েছে। দো-ভাষীর কথার জবাবে যখন ইনি অতি সংক্ষেপে দু' একটি কথা বললেন, এর একটি কথাও বোঝা গেল না।

মার্গারেট পিসীমা কিন্তু এঁর এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। গত্যন্তর না দেখে তিনি সকলকে, এমন কি দোভাষীকেও, বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। তাকে নিয়ে তিনি মেজরের সংগে ঝগড়া চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তখন তিনি তাঁর হারানো বোনের সংগে কথা বলতেই ব্যস্ত।

মেজর হ্যারিস বললেন—"দোভাষীর সাহায্য ছাড়া আপনি এঁর সংগে কথাই বলতে পারবেন না। আমাদের আইনে অবশ্য কোনও বাধা নেই। কিন্তু ইনি ইংরিজি সব ভুলে গেছেন।

মার্গারেট পিসীমা অমনি ভ্রূ কুঁচকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সেই আধা-ইণ্ডিয়ান দোভাষীর দিকে চাইলেন। তাকে ঘরে ঢুকতে দিতে আর আপত্তি করলেন না। পরে তিনি বেসিকে আদর ও অনুনয়ের সুরে বললেন—"এসো, ভাই বসো।"

দোভাষী মিন-মিন করে কী যেন বললো। আমার ইণ্ডিয়ান পিসীমা ছুঁচের কাজ-করা একখানি চেয়ারের উপরে অতি সন্তর্পণে বসলেন। তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময়েই সকলের সংগে মাটিতে আরাম করে বসে এসেছেন।

ড্রইং-রুমের সেই বৈঠকটি অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হল। এখানে আসবার আগেই বেসিকে কিছু কিছু তালিম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তবুও মেজর হ্যারিস পরিবারের সকলকে খানিক সতর্ক করে দিতে চাইলেন। তিনি পিসীমাদের বুঝিয়ে বললেন—"ধরতে গেলে আপনাদের বোন এখনও বন্দীই আছেন।" মার্গারেট পিসীমার সশংক চমকানি উপেক্ষা করেই তিনি বলতে লাগলেন—"এঁকে আপনাদের জিম্মাতেই রেখে যাচ্ছি। এই ঘেরা উঠোনটির মধ্যে উনি যতো খুশী ঘুরে বেড়াতে পারেন। কিন্তু দেখবেন, সরকারী অনুমতি বিনা উনি যেন কখনও এর বাইরে না যান। মিসেস র‍্যালে, আমার ভয় হয়, আপনাদের উপরে বোধ হয় একটি ভারী বোঝাই চাপানো হল। এঁকে সব কথাই বলা হয়েছে। ইনি আমাদের সব বিধি-নিষেধই মেনে চলতে রাজী হয়েছেন। আমার মনে হয় এঁকে এখানে রাখতে আপনাদের বিশেষ কষ্ট বা অসুবিধা হবে না।' মেজর হ্যারিস যেন একটু ইতস্ততঃ করলেন। তাঁর মনে হ'ল তিনি নিজেও একজন সৈনিক এবং সাহসী পুরুষ। তিনি আরও যোগ করলেন—"যদি মনে করতাম আপনাদের অসুবিধা হবে, তবে এঁকে এখানে আনতামই না।"

এইখানেই একটি খণ্ডপ্রলয় বেধে যেতে পারতো। কিন্তু মার্গারেট পিসীমা সেটা এড়াতে চাইলেন। বেসিকে তিনি যা ভেবেছিলেন সে যে মোটেই তা নয়—এই সত্যটি তিনি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারলেন না।

বেসি নিশ্চয়ই জানতো—এঁরাই তার সেই হারানো শ্বেতাংগ স্বজনবর্গ। কিন্তু মনে হল সে যেন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও উদাসীন। অশেষ বিষাদভরা তার মনটি যেন সব বিষয়েই নিরাসক্ত, নিস্পৃহ। সে শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন করলো—"মেরী?" মার্গারেট পিসীমা অমনি আনন্দে প্রায় কেঁদেই ফেললেন। তিনি তাকে বোঝালেন তাঁদের দিদি-মেরী—এখান থেকে অনেক দূরে থাকেন। তিনি এখন অসুস্থ। একটু সুস্থ হলেই তিনি এখানে আসবেন। কতো আদরের তাঁদের বোন মেরী!

দোভাষী তাঁর কথাগুলি অনুবাদ করে তাকে বুঝিয়ে দিল। বেসি আর কিছু বললো না। আমাদের বাড়ীতে সে এই একটি মাত্র কথাই বলেছিল, যার মানে বোঝা গিয়েছিল। তার বড়ো বোনের নামটিই শুধু তার মনে ছিল।

কলরব করতে করতে পিসীমারা যখন বেসিকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন, তখন তাঁদের মধ্যে থেকে একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার জিনিস-পত্তর সব কোথায়?"

বেসি কিন্তু জিনিস-পত্র কিছুই আনে নি। তার সংগে মাল-পত্র কিছুই ছিল না। যে কাপড়-চোপড় পরে সে সেখানে দাঁড়িয়েছিল তা ছাড়া তার আর কিছুই ছিল না। বোনেরা যখন তাড়াতাড়ি চিরুণী ও অন্যান্য খুঁটিনাটি জিনিস আনতে গেলেন তখন সে সেখানে একটি ক্ষয়ে-পড়া স্তম্ভের মতোই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু নীরবে দেখতে লাগলো। তার মনে হল এটি যেন তার কারাগার। বেশ! এ সবই সে মেনে নেবে—সবই সইবে।

হানা পিসীমা প্রস্তাব করলেন—"আমরা কাল হয় তো ওকে দোকানে নিয়ে যেতে পারবো। দেখি, ও কি পছন্দ করে!"

চিন্তান্বিতভাবে মার্গারেট পিসীমা বলে উঠলেন—"অতো তাড়াতাড়ি দরকার কি?"

তাঁর বোন যে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে এই কথাটাই তিনি তখন ভাবছিলেন। কিন্তু বেসি যে কখনও এর থেকে অন্য রকম হবে না এ আশা মার্গারেট পিসীমা তখনও

যে একেবারে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন তা' আমার মনে হয় না। তাঁর ধারণা বেসি এখন নিতান্ত জেদের বশেই চুপচাপ রয়েছে। তার এই অটুট নীরবতা ভাঙবেই। তখন সে বৈঠকখানায় বসে চা পান করতে করতে সেই অসভ্য বর্বরদের মধ্যে তার যে জীবন এতোকাল কেটেছে তার সমস্ত ঘটনাগুলি বলতে আরম্ভ করবে।

অবশেষে আমার ইণ্ডিয়ান-পিসীমা তাঁর ঘরে চেয়ারে বসতে অভ্যস্ত হলেন। তিনি সেই ঘর থেকে প্রায় বেরুতেনই না। এতে যেন তাঁর বোনেরা খানিক স্বস্তি অনুভবই করলেন। তিনি (বেসি পিসীমা) ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালোবাসতেন। জানালাটি মোটে এক ফুট আন্দাজ খোলা থাকতো। চার্লি পিসে মশায়ের শত চেষ্টাতেও সেটি তার থেকে বেশী খোলাতে পারা গেল না। বেসি পিসীমা সর্বদা পায়ে 'মোকাসিন' পরেই থাকতেন। দোকান থেকে কেনা জুতো জোড়াটি তিনি মোটে পরতে পারলেন না; কিন্তু তিনি সেটি বেশ যত্ন করেই তুলে রেখেছেন বলে মনে হল।

পিসীমারা অবশ্য তাঁকে নিয়ে দোকানে কেনাকাটা করতে বেরুন নি। তাঁরা তাঁর জন্যে দুটি পোশাক তৈরী করিয়ে দিলেন। তাঁরা যখন ইসারায় নানারকমভাবে বুঝিয়ে তাঁকে পোশাক বদলাতে বললেন—তিনি তাও বদলালেন।

আমি যখন দেখলাম বেসি-পিসীমা সামনে সমতল মাঠের ওপারে নীল পাহাড়গুলির দিকে চেয়ে সমস্তক্ষণ জানালার ধারেই দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন তাঁকে দেখবার জন্যেই আমি উঠোনে খেলা করতে আরম্ভ করলাম। আমাকে দেখে তিনি কিন্তু কখনও হাসতেন না, যেমন পিসীমারা হেসে থাকেন। কী যেন ভাবতে ভাবতে কখনও কখনও তিনি আমার দিকে চাইতেন। তিনি যেন আমাকে যাচাই করে দেখতে চান। হাতের উপর দিয়ে হাঁটা ইত্যাদি ব্যায়াম কৌশল দেখিয়ে আমি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইতাম। কোনও বিশেষ কারণে এগুলিকে সে সময়ে আমি যথেষ্ট মূল্যও দিতাম।

তাঁর (বেসি পিসীমার) মুখে কদাচিৎ ভাব বৈলক্ষণ্য দেখা যেতো। দুবার মাত্র আমি তাঁকে গভীর বিরক্তিভরে ভ্রু কুঁচকাতে দেখেছি। একবার যখন আমার এক পিসীমা আমায় পট করে একটা থাপ্পড় মেরেছিলেন তখন। আমি অবশ্য মার খাবার মতোই একটা কাজ করে বসেছিলাম। কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা কখনও নাকি মেরে ছেলেমেয়েদের সাজা দেয় না। তাই বোধ হয় বেসি পিসীমা 'শাদাদের এই কাজে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আর একবার যখন আমি একজনের কথার জবাবে আদুরে দুলালের মতোই উদ্ধতভাবে কথা বলেছিলাম, তখন তিনি বিরক্ত হয়ে ভ্রু কুঁচকে একবার আমার দিকে চেয়েছিলেন।

খ্রীষ্টানদের কর্তব্য হিসাবে পিসীমারা এবং আমার মা-প্রত্যেকে পালাক্রমে আধঘণ্টা ধরে বেসি পিসীমার কাছে থাকতেন। প্রথম দিন খাবার পরেই তিনি আর আমাদের সংগে এক টেবিলে বসে খেতেন না।

মা প্রথমে তাঁর পালা অনুযায়ী বেসি পিসীমার ঘরে যেতে ভীষণ আপত্তি করেছিলেন। এই নিয়ে খানিক তর্কাতর্কি করবার পর বললেন—"আমার খালি ভয় করে, আমি হয় তো ওর সামনে কাঁদতেই শুরু করে দেবো।" কিন্তু মার্গারেট পিসীমা জেদ করতে লাগলেন।

মা ঘরে ঢুকলেন; আমিও অমনি হল ঘরে ওৎ পাতলাম। বেসি পিসীমা কী যেন বললেন। বেশ প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে কথাটি দ্বিতীয় বার বলতেই মা আন্দাজ করলেন তিনি কি চাইছেন। মা আমায় ডাকলেন। আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াতেই তিনি আমায় দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। বেসি-পিসীমা শুধু একটু মাথা নাড়লেন। তারপর মা বললেন—"উনি তোমায় পছন্দ করেন যেমন আমিও করি।" বলে আমায় চুমু খেলেন।

আমি অনুযোগ করলাম—"আমি কিন্তু ওকে একটুও পছন্দ করিনে। কেমন যেন অদ্ভুত।"

মা আমায় বোঝাতে চাইলেন—বললেন—"উনি বুড়ো মানুষ, তায় বড়ো দুঃখিনী। তুমি বোধ হয় জানো না ওর ও একটি ছেলে ছিল!"

"তার কি হয়েছিল?"

"বড়ো হয়ে সে একজন খুব বড়ো যোদ্ধা হয়েছিল। আমার মনে হয় ছেলেকে নিয়ে ওঁর বেশ গর্বও ছিল। সেনা বিভাগ নাকি এঁর ছেলেকে কোথায় বন্দী করে

রেখেছে। সে আধা-ইণ্ডিয়ান। সে ছাড়া থাকলেই নাকি বিপদ।"

সত্যই সে একজন ভয়ংকর লোক। তেমনি অহংকারীও। সে ছিল এক ইণ্ডিয়ান দলপতি। যেন একটি শিকারী পাখী, যার ডানা দুটি সেনাবিভাগ বহু কষ্টে ও বহু চেষ্টায় কেটে দিতে পেরেছে।

যা হোক, আমার মায়ের সংগে আমার ইণ্ডিয়ান-পিসীমার এক বিষয়ে একটি মিল ছিল। তাঁদের দুজনেরই ছেলে ছিল। আমার অন্য পিসীমারা নিঃসন্তান।

বেসি পিসীমার ছবি তোলা নিয়েও খুব খানিক হৈ-চৈ হল। অন্য পিসীমাদের দুর্দান্ত জেদ চাপলো তাঁরা তাঁকে পরিবারের একজন করে তুলবেনই। তাই তাঁরা পরিবারের অ্যালবামের জন্যে তাঁরও একখানি ফোটো তোলাতে চাইলেন। কোনও কারণে গভর্ণমেণ্টও তাঁর একখানি ফোটো চেয়েছিলেন। বোধহয় তাঁদের কারও ধারণা হয়ে থাকবে যে এই বন্দী 'শিশুটিকে অতো বছর পরে পুনরুদ্ধার করে তাঁরা এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কাজই করেছেন।

মেজর হ্যারিস এক তরুণ লেফ্‌টনাণ্টকে ব্যাপারটি ড্রইং রুমে বসে আলোচনা করতে পাঠালেন। তাঁর সংগে ছিল এক তৈলাক্ত-কেশ দোভাষী। মার্গারেট পিসীমা ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শিনী। তিনি চেয়ারের উপর একখানি পরিষ্কার তোয়ালে বিছিয়ে দিলেন এবং দেখলেন দোভাষীটি যেন ঠিক সেই চেয়ারটিতেই বসে। আলোচনার সময় বেসি পিসীমা বিশেষ কিছুই বললেন না। আমরা অবশ্য —ঐ আধা-ইণ্ডিয়ানটি তিনি যা বলেছেন বললেন তাই শুধু বুঝলাম।

না; তিনি ফোটো তোলাতে চান না।

"কিন্তু তোমার ছেলের ও তো ফোটো তোলানো হয়েছিল। তুমি সেই ফোটোটা দেখতে চাও?"

তাঁরা বার বার এই কথা বলেই তাঁকে বিরক্ত করতে লাগলেন। তিনি মাথা নাড়লেন।

"আচ্ছা, আমরা যদি তোমায় তোমার ছেলের ছবিটি দেখতে দি,' তবে তুমি ফোটো তোলাবে?"

বেসি পিসীমা সংশয় ভরে মাথা নাড়লেন। তারপর তাঁকে যা দিতে চাওয়া হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশীই তিনি চেয়ে বসলেন। বললেন—"তাঁর ছবিটা যদি আমায় রাখতে দাও, তবেই আমি আমার ফোটো তুলতে দিতে পারি।"

"না, ফোটোটি শুধু আমরা তোমায় দেখতে দেবো। ঐ ফোটোটি আমাদের কাছেই থাকবে। ওটি আমাদের।"

আমার ইণ্ডিয়ান পিসীমা আরও ঢের বেশী দাঁও মারতে চান। তিনি কাঁধ উঁচিয়ে কথা বললেন। দোভাষীটি বললো—"উনি বলছেন উনি ছবি দেখতে চান না। ছবিটি যদি ওঁকে রাখতে দেওয়া হয় তবেই উনি সেটি দেখবেন। নইলে নয়।"

ব্যাপারটি বুঝতে পেয়ে আমার মা কেঁপে উঠলেন। আমার অন্য পিসীমারা মোটে বুঝতেই পারলেন না যে বেসি চায়—হয় সবটাই, নয় তো কিছুই না।

শেষ পর্যন্ত বেসি পিসীমাই জিতলেন। তাই বোধহয় তাঁরাও চেয়েছিলেন। বেসি পিসীমাকে তাঁর ছেলের ছবিটি রাখতে দেওয়া হল। এই ছবিটি ইতিহাসের বইগুলিতে অনেকবারই বেরিয়েছে—অর্ধশ্বেতকায় নায়ক, অসম সাহসী নেতা—যে ইণ্ডিয়ানদের মুক্তি দেবার উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে পারে নি। তাকে ধরবার পরেই এই ফোটোখানি তোলা হয়েছিল। কিন্তু সে কথা এই ছবিখানি দেখে অনুমান করা কঠিন। উন্নত শির, চোখ দুটি ঘৃণায় নয়—দৃপ্ত তেজে—স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার লম্বা লম্বা চুলগুলিও সযত্ন বিন্যস্ত। তার কালো চুলগুলির একদিকটা বেণীকরে বাঁধা—অপর দিকটা খোলা। যে দিকটা খোলা সেখানকার চুলগুলি একটু কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো। তার হাতে একটি পাইপ। সেটিকে সে যেন রাজদণ্ডের মতোই ধরে রয়েছে—হাতে। এই বন্দী, কিন্তু অজেয় বীরের ছবিখানি আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করলো। তাকে স্মরণ করেই আমি ক্রোধ ও রসনা দুইই সংযত করতে শুরু করলাম। আমার বয়স যতোই বাড়তে লাগলো ততোই আমি বাক্‌-সংযম চেষ্টা করতে লাগলাম। কেউ আমায় বিরক্ত বা আঘাত করলে আমি শুধু তার দিকে ঘৃণায় নয়, সাহস ভরেই চেয়ে থাকতাম। আমি কখনও তাকে দেখিনি। কিন্তু আমার সেই ইণ্ডিয়ান পিসতুতো ভাই এর জন্যে আমি মনে মনে বেশ গর্ব'ই অনুভব করতাম।

বেসি পিসীমা প্রায় সব সময়েই সেই ফোটোখানি হাতে ধরেই থাকতেন। নয় তো সেটি তিনি আলমারীর উপরে রেখে দিতেন। তারপর একদিন সকাল বেলায়—যখন রাস্তায় তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবার মতো বিশেষ লোক চলাচল করছিল না-তিনি একটি শান্ত মৌন শিশুর মতোই মার্গারেট পিসীমার সংগে গাড়ী করে বেরুলেন—ষ্টুডিয়োতে ফোটো তোলাতে। বেসি পিসীমার ফোটোখানিতে অহংকারের ভাব না ফুটে করুণ ভাবটিই যেন ফুটে উঠেছিল। তাঁর চাহনিতে বিশেষ কোনও ভাব-ব্যঞ্জনাও ছিল না। তাতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি কোনও বিশেষ হৃদয়াবেগ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা-স্পৃহা। ফোটোখানি শুধুই এক বর্ষিয়সী মহিলার ছবি। তার মাথার চুলগুলি ছোট ছোট। মুখখানির উপরে যেন অশেষ ধৈর্য ও সহনশীলতারই ছাপ! পিসীমারা সেই ফোটোখানির কপি পরিবারের অন্যান্য ছবির সংগে অ্যালবামের মধ্যে রেখে দিলেন।

কিন্তু ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌছাতে তাঁদের আর বেশী বাকী ছিল না। আমার ইণ্ডিয়ান পিসীমা বাড়ীতে যেন একটি জড়দেহধারী প্রেতের মতোই হয়ে রইলেন। তিনি কোনও কাজকর্ম করতেন না। বাড়ীতে তাঁর করবার মতো কাজও বিশেষ কিছু ছিল না। তার গ্রন্থিল হাত দু'খানি ইণ্ডিয়ান গৃহিনীর যাবতীয় কাজেই সুনিপুণ ছিল। তিনি হয়তো মাংস কাটতে, চামড়া চাঁচতে ও ট্যান করতে, 'টেপী' তৈরী করতে, আনুষ্ঠানিক পোশাকাদিতে পুঁতি বসাতে খুবই পটু ছিলেন। কিন্তু এক সভ্য মার্জিত গৃহে তাঁর এই সব কলাকুশলতার কোনই প্রয়োজন ছিল না। সেখানে এইসব কাজ কেউ চাইতো ও না। আমার মা তাঁকে সেলাই করবার জন্যে কাপড়, ছুঁচ, সুতো ইত্যাদি দিলেও তিনি সেলাই করলেন না। তিনি সেলাই এর জিনিস-গুলি তাঁর ছেলের ছবির পাশেই রেখে দিলেন। তিনি নিজের ঘরেই খেতেন, মেঝের উপর ঘুমোতেন এবং জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখতেন। এ ছাড়া তাঁর আর কোনও কাজ ছিল না। কিন্তু এভাবে তো চিরকাল চলতে পারে না। কিন্তু যতোদিন না আমার মেরী পিসীমা—যিনি অসুস্থ ছিলেন—এখানে আসবার মতো সুস্থ হয়ে উঠলেন ততোদিন এইভাবেই চললো। মেরী পিসীমা ছিলেন বেসি পিসীমার বড়ো বোন। একমাত্র তিনিই এঁকে জানতেন। তাঁরা দুজনেই তখন শিশু ছিলেন।

বেসি পিসীমার বোনেরা কর্তব্যের খাতিরে তাঁকে দেখতে আসা ক্রমেই কমিয়ে দিতে লাগলেন। শেষে দেখতে আসাটাই হল গৌণ, আর কর্তব্যটাই হয়ে উঠলো-মুখ্য। সেটি যেন শেষ পর্যন্ত এক নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাঁড়ালো। মার্গারেট-পিসীমা বেসী-পিসীমাকে কথা বলানোর ভারটি নিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে কথা বলাতে চেয়েছিলেন—কথা শেখাতে নয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর এই একগুঁয়ে হতভাগিনী বোনটির প্রয়োজন শুধু অপর একজন প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উৎসাহমাত্রই। সুতরাং মার্গারেট ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে যেন তিনি একটি শিশুর সংগেই কথা বলছেন—বলতেন—লক্ষ্মী বোনটি আমার, ঠিক ঐখানটায় আমার দিকে চেয়ে দাঁড়াওতো। বাইরে কি দেখবার আছে? পাখী? তুমি বুঝি পাখী দেখছো? তুমি সেলাই করতে চেষ্টা করো না কেন? তুমি ঐ উঠোনটুকুর মধ্যে একটু ঘুরতে ও তো পারো। বেড়াতে চাওনা কেন? একটু বেড়ালে বেশ ভালোই লাগবে, দেখো।"

বেসি-পিসীমা শুনে শুধু চোখ পিটপিট করলেন। যদি একজন ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক সভ্যভাষার কথা বলতে না পারতো, তাহলে হয় তো মার্গারেট-পিসীমা তার মানে বুঝতেন। কিন্তু তাঁর নিজের বোনতো আর ইণ্ডিয়ান হতে পারে না। বেসি শ্বেতাংগী। সুতরাং সে তার বোনদের ভাষাতেই কথা বলবে, যদিও এভাষা সে আশৈশব শোনেই নি।

নিতান্ত দায়ে ঠেকেই হানা-পিসীমা বেসি-পিসীমার সংগে কথা বলতেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনও জবাব বা বাধা না পেলে তিনি বরং খুশীই হতেন। যখন তাঁর বেসি-পিসীমার কাছে বসবার পালা আসতো, তিনি এমব্রয়ডারির উপর ঝুঁকে পড়ে অনবরত নিজের দুঃখের কথাই বলে যেতেন। আর বেসি-পিসীমা সমস্তক্ষণ জানালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

সেবিনা পিসিমার ও দুঃখের অন্ত ছিল না—সেগুলি বেশীর ভাগই মার্গারেট ও হানা পিসীমার সৃষ্ট। সেবিনা ঠিক যেন শহীদের মতোই হাতে একখানা বাইবেল নিয়ে

ঢুকতেন। তিনি তা থেকে জোরে জোরে পড়ে যেতেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত না নির্দিষ্ট সময় শেষ হতো তিনি একটি ছোট ঘড়ি নিয়ে যেতেন, পাছে বিরক্ত হয়ে সংক্ষেপে, অল্প সময়ের মধ্যেই কাজ সেরে তাঁর বোনকে ঠকাবার লোভ তাঁর মনে জাগে।

বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে মেরী পিসীমা এলেন। তাঁর গায়ের রং শাদা—ফ্যাকাশে। তাঁর সমস্ত শরীর সর্বক্ষণই কাঁপছে। রোগে ও দীর্ঘ কষ্টকর ভ্রমণের শ্রান্তিতে তিনি বড়োই ক্লান্ত। বোনেরা দোভাষীকে আনতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। মার্গারেট পিসীমা নিজের এই অক্ষমতার জন্যে বেশ একটু ক্ষুণ্ণই হলেন। মেরী পিসীমা খানিক বিশ্রাম করবার পরে বোনেরা সমস্ত ব্যাপারটি তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, পাছে বেসিকে এই রকম দেখে তিনি মনে বড়ো বেশী আঘাত পান। এঁদের দুজনের মিলনের দৃশ্যটিও আমি দেখলাম। মার্গারেট পিসীমা "ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকটির" দরজার কাছে গিয়ে নানা কথায় তাকে বোঝাতে চাইলেন—কে এসেছেন। ব্যর্থ, সাহসিক তাঁর সেই চেষ্টা! তারপর তিনি সরে গিয়ে একটু তফাতে দাঁড়ালেন। মেরী পিসীমাও সেখানে ছিলেন। তাঁর শাদা, রেখাবহুল মুখখানি খুশীতে ঝলমল, দুবাহু প্রসারিত। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন—"বেসি, বোনটি আমার।"

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে বেসি তাঁর বাহুবন্ধনে ধরা দিল। মেরী পিসীমা তার রোদে পোড়া, অনেক ঝড়-জল সহা, গাল দুটি চুম্বন করলেন। বেসি বলে উঠলো—"মেরী, মেরী।" বলে সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। তার দুই গণ্ড বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে। মুখটিও অল্প অল্প নড়ছে। কতো কথা যে তার বলবার আছে। কতো দুঃখ, ভয়, আনন্দ ও উল্লাস যে তার মনের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে। অবশেষে তার যে বোনের এসব শুনবার প্রকৃত অধিকার আছে—যে সত্যিই এসব বুঝবে—সেই বোনই যে তার আজ এসেছে!

"মেরী" এই একটি মাত্র ইংরিজি শব্দই বেসি পিসীমার মনে ছিল। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ তিনি শিখতেও চান নি। আলমারীর দিকে ফিরে তিনি তাঁর ছেলের ছবিটি তাঁর শ্রমকঠিন হাতে পরম শ্রদ্ধার সংগেই তুলে নিলেন। সেখানি তিনি দেখাবার জন্যে তাঁর বোনের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। তাঁর চোখ দুটিতে ভাষা-হীন মৌন আবেদন।

মেরী পিসীমা তাঁর সেই অর্ধ-ইণ্ডিয়ান ভগিনী-পুত্রের প্রশান্ত উদার, বন্য, অমার্জিত চেহারাখানির দিকে চেয়ে দেখে ঠিক কথাটাই বললেন—"বাঃ। কী সুন্দর দেখতে!" তিনি তাঁর মাথাটি এধার ওধার হেলিয়ে সপ্রশংসভাবে বলে উঠলেন—"ভারি সুন্দর তো তোমার ছেলেটি!" তারপর খানিক থেমে আবার বললেন—"তুমি, ভাই, নিশ্চয়ই এর জন্যে খুব গর্বিত।"

বেসি পিসীমা তাঁর কথাগুলি না বুঝলেও তার সুরটি ঠিকই ধরলেন। সেই সুরটি হচ্ছে—প্রশংসার। তাঁর ছেলেকে তাঁর বোন—যে বোনকেই তিনি শুধু জানেন—তাহলে সাদরে গ্রহণ করেছেন। বেসি পিসীমা ছবিখানির দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন এবং কী যেন বিড় বিড় করে বললেন। তারপর আবার সেটি আলমারীর উপর তুলে রাখলেন।

মেরী পিসীমা বেসিকে কথা বলাতে চেষ্টা করলেন না। তিনি শুধু প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার কাছে বসে থাকতেন। বেসি কথা বলতো—তবে ইংরিজি ভাষায় নয়। পরস্পরের সান্ত্বনার জন্যে তাঁরা শুধু হাত-ধরাধরি করে বসে থাকতেন। সেই বন্দী 'শিশুটি'—যে আজ বুড়ো হয়ে গেছে এবং নাতির ঠাকুরমাও হয়েছে—বলে যেতো তার বিগত চল্লিশ বছরকার জীবনের সব ঘটনাগুলি। মেরী পিসীমা অন্ততঃ বলতেন বেসি পিসীমা তাই বলছেন—যদিও তাঁর একটি কথাও তিনি বুঝতে পারেন নি বা বোঝবার দরকার মনে করেন নি।

মেরী পিসীমা বললেন—"ওর আবার ইংরিজি শিখবার যথেষ্ট সময় আছে। আমার তো মনে হয় ও কথা বলতে না পারলেও অনেক কথাই বোঝে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম ও আমার কাছে গিয়ে থাকবে কিনা। তাতে ও মাথা নাড়লো। ও আমায় যা বলতে চায় এবং যার জন্যে ও আর অপেক্ষা করতে পারছে না—তা হচ্ছে ওর গত জীবনের কথা ও ওর ছেলের কথা।

কর্তব্যের খাতিরে মার্গারেট পিসীমা বললেন—"মেরী, ওকে তোমার কাছে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নেওয়াটা কি

তোমার ঠিক হবে? তোমার কি মনে হয়?" বেসির হাত থেকে উদ্ধার পাবার এই সুযোগটি যদি এসেও ফসকে যায়—মেরী যদি তাঁর মত বদলান—ভয়ে মার্গারেট পিসীমার পা দুটি জুতোর ভেতরেই ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো। পরে তিনি কথাটি শুধরে আবার বললেন—"আমার তো বিশ্বাস ও তোমার কাছেই ঢের বেশী সুখে ও আনন্দে থাকবে। আমরা অবশ্য আমাদের সাধ্যমত সব কিছু করতে ত্রুটি করি নি।"

বেসি অন্য কোথাও গিয়ে থাকলেই মার্গারেট পিসীমা ও তাঁর বোনেরা এখন খুসী হন। পরে যা দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টও এতে কিছু কম খুসী হবেন না।

মেজর হ্যারিস খুঁটিনাটি সব কিছু আলোচনা করবার জন্যে আবার দোভাষীকে সংগে নিয়ে এলেন। তাঁরা বললেন—বেসি যদি চান তো তিনি মেরীর সংগে গিয়ে হাজার মাইল দূরে থাকতেও পারেন। বেসি বেশ ধৈর্য ধরেই সব শুনলো। কিছুমাত্র অনিচ্ছা প্রকাশ তো করলেই না, বরং বেশ খুসীভাবই দেখালো। সে সেদিন দোভাষীর সংগে অনেক কথা বললো—আগে যা কথনও সে বলে নি। দোভাষীও সবিস্তারে তার সব কথাগুলির জবাব দিতে লাগলো। তারপর সে অন্যদের বুঝিয়ে বললো, বেসি জানতে চান কেমন করে তিনি ও মেরী অতো দূর দেশে যাবেন। সে আরও বললো—তাঁরা কতো দূরে যাচ্ছেন তা ধারণা করা ওঁর পক্ষে কঠিন তো।

পরে অবশ্য আমরা জানতে পেরেছিলাম বেসি-পিসীমা ও দোভাষী সেদিন এ ছাড়াও আরও অনেক কথাই বলেছিলেন।

পরদিন সকালে যখন সেবিনা-পিসীমা বেসি-পিসীমার ঘরে তাঁর প্রাতরাশ নিয়ে গেলেন আমরা তাঁর ভয়ার্ত কণ্ঠের চীৎকার শুনলাম। সেবিনা পিসীমা ট্রে হাতে নিয়ে বার বার বলছিলেন—"ও জানালা দিয়ে পালিয়েছে, ও জানালা দিয়ে পালিয়েছে।"

সত্যিই তাই। যে জানালাটি কখনও এক ফুটের বেশী খোলা হয়নি সেটি এখন অনেকখানি খোলা।

দেখা গেল আলমারীর উপর থেকে বেসি-পিসীমার ছেলের ছবিখানিও অন্তর্হিত। ঘরের আর আর সব জিনিস যেমন ছিল তেমনিই আছে। বেসি-পিসীমা কিছুই সংগে নিয়ে যান নি—শুধু আগের দিন যে সুন্দর গাঢ় রঙের পোশাকটি তিনি পড়েছিলেন সেটি ছাড়া।

চার্লি পিসে মশায়ের সেদিন আর প্রাতরাশ খাওয়াই হল না। মার্গারেট পিসীমা এটা সেটা করবার হুকুম দিয়ে অবিরাম চেঁচিয়েই চলেছেন। চার্লি পিসে মশায় একলাকে একটি ঘোড়ার পিঠের উপর চড়ে বসলেন—ছুটলেন টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে।

মেজর হ্যারিস আধ-ডজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এসে পৌছাবার আগেই, 'স্কাউটে'র দল সেই 'পলাতকা মহিলা'র খোঁজে চারদিকে বেরিয়ে পড়লো। তারা সবাই সুদক্ষ চর। একটা উল্টানো পাথর, একটি ভাঙা গাছের ডাল বা একটি থেঁতলানো পাতার মানে বার করাই যেন তাদের কাছে জীবন-মরণ সমস্যা। 'স্কাউট'রা দেখলো বেসি দক্ষিণ দিকেই গিয়েছে। তারা দশ মাইল পর্যন্ত তাকে খুঁজেছিল। তারপর তারা তার পথ চলার আর কোনও চিহ্নই দেখতে পায়নি। বেসির "অশিক্ষিত পটুত্ব" তাদের শিক্ষিত পটুত্বের চেয়ে কিছু কম নয়। এটি যে ছিল তার জীবন-মরণ সমস্যা। হয় তো একটি পাথরের উপরে, একটি গাছের ডালে বা পাতায় তার পায়ের চিহ্ন রেখে না যাওয়ার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করছিল তার জীবনের নিরাপত্তা। প্রথমে সে খুব তাড়াতাড়িই চলেছিল। তারপর সে এমন সতর্কভাবে চলতে লাগলো যাতে তার অনুসরণকারীদের এড়াবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। সে জানতো তাকে খুঁজতে তার পিছন পিছন লোক নিশ্চয়ই আসবে।

পিসীমারা দুঃখে ভেঙে পড়লেন। অন্তত: মেরী পিসীমা খুবই মনে দুঃখ পেলেন। বেসির এই কাজে তাঁর মাথা যেন একেবারে হেঁট হয়ে গেল। জানালার পর্দাগুলি সব টেনে দেওয়া হল। বাড়ীতে সবাই আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে কথা বলছে। ইণ্ডিয়ানরা বেসির শোচনীয় নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে তাকে একটি অসভ্য-বর্বর বানিয়ে তুলতে পেরেছে বলে লোকে আগে আমাদের যেন করুণার চক্ষেই দেখতো। কিন্তু আমরা এখন যেন বিশ্বাসঘাতক বনে গেলাম, কারণ আমরা তাকে ধরে রাখতে পারলাম না।

মেরী-পিসীমা বারবার করুণ সুরে এই কথাই কেবল

বলতে লাগলেন—"ও কি বলে পালিয়ে গেল? আমি তো ভেবেছিলাম ও আমার কাছে বেশ সুখেই থাকবে।" আর সকলে বললেন—"হয় তো এটা ভালোর জন্যেই ঘটলো।"

মার্গারেট পিসিমা বললেন—"ও হয়তো ওর নিজের লোকদের কাছেই ফিরে গেছে।" বাস্তবিক সকলেই, মায় মেজর হ্যারিস পর্যন্ত সেই কথাই বিশ্বাস করলেন।

আমার মা আমায় বললেন—বেসি-পিসীমা কেন চলে গেলেন। তিনি বললেন—"তুমি তো জানো, তাঁর ছেলের —সেই ইণ্ডিয়ান সর্দারটির-ছবি তাঁর কাছে ছিল। সে যে জেলে বন্দী ছিল সেখান থেকে সে পালিয়ে গিয়েছিল। দুর্গের ভিতর কথাটা জানাজানি হয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস সে যেখানে লুকিয়ে আছে বেসি সেখানেই গেছে। সেই-জন্যেই ওরা আগে তাকে খোঁজাখুঁজি করছে। মা আরও বললেন—"তারা ভাবছে তাদের আগেই বেসি তার পালানোর খবরটা জানতে পেরেছিল। তাদের বিশ্বাস সেই দোভাষীটি যখন এখানে এসেছিল, তখন সেই তাকে খবরটা তাকে দিয়ে থাকবে। নইলে একথা জানবার তার আর কোনও উপায়ই ছিল না।"

বেসি ও তার ছেলে "ঈগল হেচ"কে ধরবার জন্যে তারা দক্ষিণের সব পাহাড়গুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত ওদের খুঁজে পায় নি। একবছর পরে উত্তরে অনেক দূরে 'ঈগল হেচ'কে খুঁজে পাওয়া যায়। সেবার তারা ওকে বন্দী করতে পারেনি। ও যুদ্ধ করতে করতেই প্রাণ হারিয়েছিল।

আমি বড়ো হতেই আমাদের পরিবারের সেই দোকানটি চালাবার ভার আমার উপরে এসে পড়লো। যতো দিন যেতে লাগলো, দোকানদারি ততোই যেন আমার অপছন্দ হতে লাগলো, পরে যখন দোকানটি বিক্রী করবার অধিকার পেলাম তখন আমি সেটি বেচেই দিলাম। তারপর আমি পশুপালনের ব্যবসা শুরু করলাম। একদিন যখন কতোগুলি দলভ্রষ্ট বাচ্চা ষাঁড়ের পিছন পিছন আমি একটি গভীর খাদের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলাম তখন আমি বোধহয় আমার বেসি-পিসীমারই দেহাবশেষ দেখেছিলাম। যে রাখাল ছেলেটি আমার কাজ করতো সেও আমার সংগে ছিল। নতুবা কথাটা আমি আর কাউকে জানতেই দিতাম না। একটি ছোট্ট ঝরণার ধারে আমরা কতোগুলি মানুষের হাড় দেখতে পেলাম। সে-গুলির উপর দিয়ে যে কতো রোদ বৃষ্টি ঝড় জল বয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই। গভীর রহস্যে-ভরা সেই হাড়গুলি! সেদিন হঠাৎ যখন অমন করে এক অজানা মানুষের কতো-গুলি হাড়ের কাছে এসে পড়লাম তখন আমার মনে হল 'মরণ বুড়ো'ই বুঝি আমার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার সংগী-অপর অশ্বারোহীটি বললো—কেউ হয় তো এখানে সোনা খুঁজতে এসেছিল। এ হাড়গুলি বোধহয় তারই হবে। প্রথমটা আমারও তাই মনে হয়েছিল। তার-পর দেখলাম একটা মোটা কাঠের নিচে কতোগুলি পচা কাপড়ের টুকরো। সেগুলি সম্ভবতঃ একসময়ে কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলারই গাঢ় রঙের পোষাক ছিল। তাই দিয়ে জড়ানো কা যেন একটা পচা জিনিস। সেটা বোধহয় এক-কালে একটি ছবিই ছিল।

আমার সংগীটি ছিল তরুণ—অল্পবয়স্ক। কিন্তু সেও সেই বন্দী শিশুর গান শুনেছিস। সে আমাকে সেই গল্পটি বলছিল। এতগুলি বছরের মধ্যে সেটির সংগে আরও অনেক কিছু জুড়ে দিয়ে যা দাঁড়িয়েছিল তা শুনে আমি খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তার শোনা সেই গল্পে বেসি-পিসামা হয়ে গিয়েছিলেম এক সুকেশী সুন্দরী, যিনি সদাই অতি মৌন ও বিষণ্ণ হয়ে থাকতেন। বাস্তবিকই তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ ও স্বল্পভাষিণী ছিলেন। আমি সেই পচা কাপড়ের টুকরোগুলি আবার তাড়াতাড়ি কাঠটির নিচে সরিয়ে দিতে গেলাম। কিন্তু আমার সেই সংগীটি তার চেয়েও তাড়াতাড়ি আমায় বাধা দিয়ে বলে উঠলো— "দেখুন, এটি সার্ট নয়—এটি একটি স্ত্রীলোকের পোশাক। এখানে কেউ সোনার সন্ধানে আসেনি, আমি আগে ভেবেছিলাম। এগুলি এক স্ত্রীলোকের দেহাবশেষ।" তারপর একটু থেমে সে আবার ভক্তিমিশ্রিত ভয়ের সংগে বললো—"এ নিশ্চয়ই আপনার সেই ইণ্ডিয়ান-পিসীমা।"

আমি অমনি ভ্রু কুঞ্চিত করে বলে উঠলাম—"যতো সব বাজে কথা। এ তো যে কেউই হতে পারে।"

সে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলো, বললো—"আমার পিসীমা হলে আমি এঁকে নিয়ে গিয়ে আমাদের পরিবারের কবর খানায় গোর দিতাম।"

আমি সজোরে মাথা নেড়ে বললাম-"না।"

সেখানে সেই খাদের মধ্যেই সেই হাড়গুলিকে ফেলে রেখে আমরা সেদিন চলে এলাম। সেই খাদেই ওগুলি চল্লিশ বছরের উপর পড়ে ছিল—যদি সত্যিই ওগুলি বেসি-পিসীমারই হাড় হয়ে থাকে—আর আমারও বিশ্বাস ওগুলি তাঁরই হাড়। আমি আবার তাঁকে বন্দী করতে চাইনি। আমাদের পরিবারের অ্যালবামের মধ্যে তাঁর ছবি আছে। আমাদের পরিবারের কবরখানায় তাঁর থাকবার দরকার নেই।

কেন তিনি আবার আমাদের ছেড়ে গেলেন আমার সেই অনুমান যদি মিথ্যেই হয়ে থাকে তো তা প্রমাণ করবার ও কেউ নেই। তিনি কখনও তাঁর ছেলে যেখানে লুকিয়েছিল সেখানে যেতে চান নি। তিনি উল্টোদিকেই গিয়ে ছিলেন, যাতে কেউ তাকে সেদিকে খুজতে গিয়েও অনুসরণ করতে না পারে।

ঐ খাদে তাঁর কি হয়েছিল তা জানবারও আমার বা অপর কারও দরকার নেই। আমার বেসি-পিসীমা যা করতে বেরিয়েছিলেন তা তিনি করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছে তাঁর নিজের জীবনের কোনও মূল্যই ছিল না—ছিল কেবল তাঁর ছেলের জীবনেরই। তিনি তাঁর নিজ জীবনের মূল্যেই তাকে একবছর আয়ু দিতে পেরে ছিলেন।

স্মরণিকা

ধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রমুখ মহাজনগণের পদাবলীর পর বাংলা ভাষায় প্রথম ক্ষুদ্র কবিতা-সমষ্টি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের "সদ্ভাব-শতক"। উদাহরণ স্বরূপ কবিতার নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

"যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি
আশু গৃহে তা'র জ্বলিবে না আর নিশীতে প্রদীপভাতি"।

বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তির আদিম যুগে চর্য্যা-গীতিগুলি যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু তাহাতে রসমাধুর্য্যের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইত। কারণ এগুলির গর্ভে সাধনমার্গের গোপনতত্ত্ব নিহিত।

হিন্দি সাহিত্যে দোঁহা দুই চরণের ছোট ছোট কবিতা। যেমন তুলসী দাসের দোঁহা :…

"প্রীতি রাম সোঁ নীতি পথ, চলিয় রাম রস জীতি।
তুলসী সংতনকে মতে, ইহৈ ভক্তি কী রীতি॥"

তেমনি বিহারীলালের দোঁহা হিন্দি কাব্যে সমধিক প্রসিদ্ধ।

"মোহনি মূরতি শ্যামকোঅতি অদ্ভুত গতি হোয়।
বসতি সুচিত্ত অন্তর তঊ প্রতিবিংবিত জগ্ হোয়॥"

জাপানী সাহিত্যে 'তান্‌কা' অতি ক্ষুদ্র কবিতা। ইহাকে জাপানী সনেট আখ্যা দেওয়া হয়। এই কবিতা সাধারণতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে পাঁচ পঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ কবিতা। প্রথম ও তৃতীয় চরণে পাঁচটি করিয়া দ্বিতীয় ও চতুর্থ এবং পঞ্চম চরণে সাতটি করিয়া অক্ষর থাকে। যেমন—

ফাগুন রাত
কৌমুদী নক্তে ভরা
নি[illegible]
হসিত বসুন্ধরা।—কিণো
ফাগুন এ ঠিক
গগণে আলো না ধরে
প্রসন্ন দিক
তবু কেন ফুল ঝরে
ভাবি আর আঁখি ভরে। অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ।

ফরাসী ভাষায় 'বয়েৎ', ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। নিম্নোক্ত সাজাহানের 'বয়েৎ'-এর উদাহরণ—

"আগর বে লবয় মজুদদার আয়ি যে শেওয়াজ?
মানন্দ এ লছীম্ এ সয়ে আয়ি থে সওয়াদ
হরচন্দকে বু এ গুণ জে গুণ আয়েজ পেশ
আর গুল তুজে বু পেলতর আয়ি যে সওয়াদ"

পারসীতে রুবাইয়াৎ চার লাইনের ছোট কবিতা, যেমন হাফেজের রুবাইয়াৎ, ওমরের রুবাইয়াৎ, ইত্যাদি।

"নরক অথবা স্বর্গের আমি করিনে ভরসা ভয়
এইটুকু জানি মানব জীবন প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষয়
এইটুকু খাঁটি আর যাহা ব'ল তাহা মিথ্যার জাল
বারেক যে ফুল ফুটিল তাহারে চিরতরে নিল কাল"—ওমর
অনুবাদ—সত্যেন দত্ত।

যদিও অনুবাদটি রুবাইয়াতী ছন্দে অনূদিত হয়নি। রুবাইয়াতী ছন্দ

অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল ও তৃতীয় চরণটি মুক্ত হওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ—

"স্বর্গ-নরক কিছুই বুঝি না, কিছুই করিনা ভয়।
এইটুকু জানি, জন্মেছি যদি মরিব তো নিশ্চয়।
আর বেশী যদি বলিবার থাকে, আমাকে বৃথাই বলা
এ কথাটি জানি, যে ফুল ঝরিল, চিরতরে হ'বে লয়"—ওমর

ফিজারেল্ড সাহেবও ইংরাজিতে একই ছন্দে ওমরের রুবাইয়েতের অনুবাদ করেছিলেন।*

কিন্তু বিরহের বেদনায় হৃদয় যখন আচ্ছন্ন, তখন দীর্ঘ কবিতা রচনার মানসিক স্থৈর্য্য বা অবকাশ কোথায়? গভীর বেদনায় বিষাদাচ্ছন্ন অননুভূতপূর্ব অনুভূতিতে মন অভিভূত তখন মর্ম্মের গভীরতম দেশ হইতে যাহা উৎসারিত হয় তাহা প্রসারে সামান্য হইয়াও ভাবের গভীরতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ও দীপ্তোজ্জ্বল।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মৃত্যু স্মরণের কবিতার সংখ্যা বিরল। শুধু ধনী ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের মৃত্যু উপলক্ষে, শ্রাদ্ধবাসরে অথবা বাৎসরিক জন্ম অথবা মৃত্যু অথবা উভয় সমাবর্ত্তন তিথিতে, অথবা সাহিত্যিক ও কবিবন্ধুদের স্মৃতি সভায় কবিবন্ধু কর্ত্তৃক লিখিত মৃত্যু স্মরণের কবিতা কদাচিৎ লিখিত, পঠিত বা মুদ্রিত হয়। প্রিয়জনের মৃত্যুকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে সামান্য কবিতাও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না। বাংলা ভাষায় এরূপ কবিতা-কণিকারও প্রাচুর্য্য নাই। এমনকি সামান্য সংকলনও নাই। ইউরোপীয়ানদের প্রিয়জনের মৃত্যুতে বা মৃত্যুর সমাবর্ত্তন দিবসে অথবা নিকটবর্ত্তী কোন দিনে কোন-না-কোন বহুলপ্রচারিত সাপ্তাহিক, দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য ক্ষুদ্র স্মরণ কবিতা সন্নিবেশ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারত-বাসী হিন্দু মুসলমানের বেলায় এমন কোন রীতির প্রচলন নাই।

ইউরোপীয়ানদের অনুকরণ করিয়া স্মরণ কবিতা প্রকাশের সার্থকতা কি? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। অনুকরণ মাত্রই মন্দ একথা ভাবার যথেষ্ট কারণ নাই। যাহাদের যে সামগ্রী নাই তাহা অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করা ছাড়াই বা গতি কোথা? তবে অনুকরণীয় বিষয়বস্তুটী ব্যক্তি ও জাতিগতভাবে মঙ্গলফলপ্রাপ্ত ও শুভকর হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। স্মরণ কবিতা প্রচারের অনুকরণে কোন আদর্শ চ্যুতির আশঙ্কা আছে কিনা সেইটীই প্রধান বিচার্য্য। যেহেতু এজাতীয় অনু-করণে কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা বা অবকাশ নাই, তখন তাহা গ্রহণ না করার কোন যুক্তি ও নাই।

উপরন্তু সংবাদপত্রে স্মরণিকা প্রকাশের রীতি বাংলা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশের নূতন এক পথের সন্ধান দিবে—যদিও ইহার অর্থকরী মান যৎসামান্য মাত্র।

বাঙালী এক আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা আসিয়া, হাসিয়া, খেলিয়া' বহুদিন ভালবাসা গ্রহণ করিয়া ও ভালবাসা প্রদান করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আমরা একবারও স্মরণ করিতে ভুলিয়াছি। যদি বৎসরান্তে একবার বিশেষ একটি ঘটনা উপলক্ষে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের স্মরণ করি, তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করি তাহাতে আমাদের আত্মশক্তিকেই উদ্বুদ্ধ করা হইবে। ইহাতে জাতীয় শক্তি বর্দ্ধিত হইবে; জাতির জীবনে আত্ম-বিশ্বাস ও বহু সৎগুণ সঞ্চারিত হইবে। ইহাতে আত্মোন্নতি, আত্ম-চেতনার উদ্বুদ্ধি ও যোগ্য ব্যক্তির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনও করা হইবে। জাতীয় জীবনে ইহার মূল্য অসামান্য, চরিত্র গঠনে ইহা অনিবার্য্য, হৃদয়ের মহৎ বৃত্তি অনুশীলনের এক অপূর্ব সুযোগ।

সাহিত্যের বিভিন্ন পর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ন্যায় ক্ষুদ্র স্মরণ-কবিতা রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। তাঁহার প্রথম স্মরণকবিতাবলী "কণিকায়" লিপিবদ্ধ। 'দেশবন্ধুর তিরোধানে তাহার সেই সূর্য্যকান্ত-মণির মত প্রোজ্জ্বল ও প্রাঞ্জল দুই ছত্র শুধু অনবদ্য সুন্দর নয়, অবিস্মরণীয়।

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান,"

আয়তনে যদিও অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু সামান্য কয়েকটি কথার সন্নিবেশ মনের গভীরতম তন্ত্রীতে আঘাত করে। চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে সেই দুর্জ্জয়লিঙ্গ হইতে আনীত অজস্র পুষ্পমাল্যে সুশোভিত 'দেশ বন্ধুর' বিপুল জনস্রোত বেষ্টিত শবাধার ও তদুপরি উন্মুক্ত চিরপ্রশান্ত বদন মণ্ডল। এই দুই ছত্র কবিতায় চিত্তরঞ্জনের আদর্শের এক উজ্জ্বল চিত্র উন্মোচিত হয়। তেমনি শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ রচিত অনুরূপ স্মরণ কবিতাটিও অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী বাণীর বাহক।

কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের কলিকাতা চৌরঙ্গী রোডে মহাত্মা গান্ধীর ব্রোঞ্জ মূর্ত্তির পাদ পীঠে উৎকীর্ণ বাণীর কাব্যানুবাদটি বাস্তবিকই মনোরম এক স্মরণ কবিতা।

"মৃত্যুর মর্মের মাঝে অধিষ্ঠিত অক্ষয় জীবন
অসত্যের অন্তরালে ধ্রুব সত্য রয় সুগোপন।
তমসার গর্ভগৃহে রহে গূঢ় স্বর্গ জ্যোতিষ্মান;
প্রাণে, সত্যে, আলোকে ও প্রেমে আবির্ভূত ভগবান।"

সাধারণতঃ দুইচারি ছত্রের ক্ষুদ্র স্মরণ-কবিতা যাহাকে "স্মরণিকা" বলা হইয়াছে তাহা বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই হেতু এই ধরণের কবিতার উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি ক্ষুদ্র ইংরাজী কবিতার কোথাও—ভাবগত বা ভাষাগত অনুবাদ করিয়া কয়েকটি "স্মরণিকা" প্রকাশের প্রয়াস পাইলাম।

মূলতঃ 'স্মরণিকা' কবিতাগুলিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, প্রথমতঃ প্রিয়া-প্রিয় বিরহের কবিতা, দ্বিতীয়তঃ পিতামাতা গুরুজন বিয়োগের ভক্তি-শ্রদ্ধাঞ্জলিমূলক কবিতা এবং তৃতীয়তঃ সন্তান সন্ততির অকাল মৃত্যুতে স্নেহ ও করুণা মিশ্রিত কবিতা।

প্রথম পর্য্যায়ে প্রিয়া প্রিয় বিরহে কয়েকটী কবিতার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র কবিতাগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১

ভাবতে পারে লোকে তোমায় গেছি ভুলে

অধর কোণে হেরি,' মধুর মৃদু হাসি।

বুঝবে নাকো তা'র কী যে দারুণ ব্যথা

হাসির তলে আছে হ'য়ে গোপন বাসী॥

২

হারাই নিকো তোমায় চিরতরে

আছ তুমি অলখ তারার মত,

নিত্য তুমি আছ আমার ঘরে,

মৃত্যু কেবল বাধায় বাধা যত॥

৩

হারইয়া, তবু।

ভুলি নাই কভু॥

৪

সে ব্যথা মুছিয়া লইতে পারে না কেহ

যে ব্যথা হৃদয়ে হানে মরণ।

স্মরণ ও প্রীতি রহিয়া যায়

পারে না করিতে তারে হরণ॥

৫

অসীম শূন্যের মাঝে ব্যথিত পরাণ মোর

সন্ধানিয়া ফিরেছে তোমায়,।

ঘন অন্ধকার ভেদি' সুদীর্ঘ বরষ ব্যাপী

হৃদি শুধু তোমারেই চায়॥

মনে পড়ে, আজ অতীতের সেই বেদনা জড়িত স্মরণখানি।

ভালবেসে, পরে যেতে দেওয়া—তীব্র বেদনা হৃদয়ে মানি॥

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে গুরুজন ও সম্মানীয় ব্যক্তির মহাপ্রয়াণে ভক্তিমিশ্রিত বন্দনা যাহা হৃদয়ে উপলব্ধি হয় তাহার কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইল।

১

নয়নের কোণে   হেরিনাকো তবু

জানি তুমি আছ সাথে

বেদনা বিপদে   স্মরণ হইতে

কৃপা তব পাই মাথে।

২

তোমার করুণা কিবা জানি মোরা

তুমি যে করুণাময়।

নিয়ে গেছ তাঁরে অমরা পুরীতে

—তব প্রেম-পরিচয়।

৩

স্বর্গ হ'তে এলো দেবদূত

নিয়ে যেতে শান্তিময় ত্রিদিব আলয়ে

ধরণীর মায়া মোহ কিছু

ধরিতে নারিল ভক্তি, প্রেম, শ্রদ্ধার নিলয়ে।

৪

মর্ত্ত্যেও তুমি কবি নহ আজ

স্বর্গের হও দেবতা

তর্কের তুমি বহুদূরে আজ

শুনাও জ্যোতির বারতা।

৫

মর্ত্ত্যের তুমি মানব নও গো

স্বর্গের নিবাসী

শক্তির তুমি অধীন নও গো

মুক্তির পিয়াসী।

৬

শুধু আজি নয়

চিরদিন ধরি

নীরব নিশীথে

তোমারেই স্মরি।

৭

তোমার প্রীতির স্নিগ্ধচ্ছায়ে

বস্‌তে পা'বো নাকো।

তোমার স্নেহের ভূধর পাশে

আসন হ'বে নাকো।

গেছো তুমি মোদের ছেড়ে

মহাকালের ডাকে।

ধারার মায়া ধূলির কায়া

ফেলে পথের বাঁকে॥

তৃতীয় পর্য্যায়ে স্নেহাস্পদের অকাল মৃত্যুতে স্মরণিকার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত কবিতাগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১

একটি কচি মুখ গেছে মোদের ছেড়ে;

একটি গলার স্বর নীরব চিরতরে,

একটি আসন শুধু শূন্য মোদের ঘরে

জাজিম, বালিস শুধু শূন্য শয্যা পরে।

২

শোক তব বাছা চিরদিন ধ'রি পাব

হৃদয়ের ক্ষত কভু শুকাইবে না।

দিনগুলি তব আছে সযতনে গাঁথা

হৃদয়ের ফাঁক কেহ পুরাইবে না।

৩

ভুলতে পারি তোমায়? তুমি মোদের প্রিয়

হঠাৎ তোমার নামটি ধরে ডাকি

সাড়া দেবার কেউ যে গো নাই, আছে শুধু
ফ্রেমে আঁটা ফটোর ছুটি আঁখি।

৪

দেওয়ালের গায়ে কচি আঙ্গুলের ছাপ
আজো যায় নাই মুছে
হৃদয়ের মাঝে গভীর ক্ষতের দাগ
কখন যাবে না ঘুচে।

৫

নিত্য সেথে রাজে।
আমার হৃদয় মাঝে॥
হ'য়ে ভালবাসার ধন।
তারে যায় কি বিস্মরণ॥

৬

বুক জুড়ানো মাণিক আমার
নাড়ীছেঁড়া ধন।
পূর্ণ হৃদয় শূন্য ক'রে
হঠাৎ বিলোপন।

৭

নয়নের কোনে হেরিব না বলে
ভেবো না তুমি যে নাই।
অসীম আকাশে তারকার মাঝে
লভিয়াছ তুমি ঠাঁই॥

৮

নিকেতনে আজ কোলাহল অবসান
ডাকিবেনা কেহ ক্রন্দন ধ্বনি তুলি'।
এই ভব মনে, ছিল যদি ভগবান
সন্তানে কেন দিয়েছিল বুকেতুলি?

মহাকবি মাইকেল আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতিকে বুঝিতেন। তাই তিনি নিজের মৃত্যু স্মরণের কবিতা অন্যের করুণার উপর রচনার ভার না দিয়া নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন।

—সমাধি লিপি—

"দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তবে
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পরে মহা নিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোহর সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।"

হিতব্রতী রাষ্ট্রের সমস্যা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

ওয়েলফেয়ার স্টেট বা হিতব্রতী রাষ্ট্র স্থাপনা করা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক লক্ষ্য রূপে নির্ধারিত হয়েছে। হিতব্রতী রাষ্ট্র স্থাপন করার পদ্ধতি প্রক্রিয়া ও কর্মপ্রণালী নিয়ে এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতভেদ থাকলেও লক্ষ্য হিসাবে এই আদর্শকে সবাই মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছেন। হিতব্রতী রাষ্ট্রের অর্থ হল—সরকার কর্তৃক জনসাধারণের যাবতীয় হিতসাধনকারী কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা। শিশু মাতৃগর্ভে আসা মাত্রই রাষ্ট্রীয় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র ভবিষ্যৎ মা-এর সেবা যত্ন করার দায়িত্ব নেবে, শিশুর জন্ম হবে রাষ্ট্রীয় প্রসূতি সদনে। এদেশে এখনও সম্ভব না হলেও ইউরোপের কোন কোন দেশে শিশু বড় না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের তরফ থেকে তার জন্য দুধ বরাদ্দ থাকে। তারপর শিশু আর একটু বড় হয়ে যেখানে শিক্ষা গ্রহণ করবে সেই বিদ্যালয়সমূহও সরকারী বা সরকারী সাহায্যপুষ্ট। সরকারই শিশুর যোগ্যতা, মানসিক প্রবণতা ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে স্থির করে দেবে যে ভবিষ্যৎ জীবনে তার কোন্ পেশা গ্রহণ করা উচিত এবং তদনুযায়ী সরকার তাকে গড়ে তুলবে। তারপর সরকার তার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজের ব্যবস্থা করবে। আর সর্বশেষে নাগরিকের মৃত্যু হলে তার মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থাও সরকারের করণীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়বে। এ ছাড়া এর মাঝখানে অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা, দুর্ঘটনা বা অন্যবিধ কারণে অশক্ত হলে অথবা বেকার থাকলে যথাযোগ্য ভাতা দেওয়া ইত্যাদি কাজও হিতব্রতী রাষ্ট্রের আওতায় পড়ে। দেশরক্ষা ইত্যাদি অন্য যে সব দায়িত্ব আজ তাবৎ শ্রেণীর রাষ্ট্র পালন করে থাকে, তার কথা পৃথক ভাবে উল্লেখ করাই বাহুল্য।

এই হল হিতব্রতী রাষ্ট্রের আদর্শ চিত্র। ভারতবর্ষ এর কতটা পারবে এবং পারলেও কত দিনে এই চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হবে—এ সব পৃথক প্রশ্ন। এর সঙ্গে ভারতবর্ষের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা এবং প্রশাসনিক যোগ্যতার কথা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং ঐ সমস্যার কথা বাদ দিয়ে এখানে আমরা একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই—রাষ্ট্রীক লক্ষ্য হিসাবে হিতব্রতী রাষ্ট্রের লক্ষ্য আদৌ কাম্য কি না? হিতব্রতী রাষ্ট্রে নাগরিকদের জন্য যে আপাত আকর্ষণীয় ও সুখকর বিবিধ ব্যবস্থার আয়োজন থাকে, তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্ন ওঠাবার সমীচীন কারণ আছে।

মানুষের সঙ্গে অপরাপর পশুর পার্থক্যের একটি বড় নিদর্শন হল এই যে—মানুষ নিছক ইনস্টিংক্ট বা সহজ বৃত্তির দাস নয়। বহু যুগের অনুশীলনের কারণে মানুষ নিজের ভিতর দয়া, মায়া, প্রেম, করুণা ইত্যাদি বহুবিধ মানবীয় গুণের বিকাশ সাধন করেছে এবং একান্ত অমানুষ না হলে মানুষ নিজের সহজ বৃত্তি সমূহকে অবদমিত করে মানবীয় সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সচেতনভাবে এই সব মানবীয় মূল্যবোধকে কাযে প্রয়োগ করতে পারে। এই জন্য মানুষ দেহধারী হয়েও সাধারণতঃ পারস্পরিক আচার আচরণের ক্ষেত্রে দেহের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। আত্মরক্ষা জীবের স্বধর্ম হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুধার্ত মাতা নিজের মুখের গ্রাস সন্তানকে দিতে কুণ্ঠিত হয়না, গৃহস্থ ক্ষুধার অন্ন অতিথিকে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করে। মানুষ দৈহিক পীড়ন থেকে বাঁচতে চায়—এ কথা সত্য হওয়া সত্ত্বেও মানুষই আবার স্বাধীনতা অর্জন, ধর্ম সংস্থাপন, অন্যায় ও অবিচারের প্রতিরোধ (এবং এমন কি সর্বহারার একনায়কত্ব কায়েম করার মত 'জড়বাদ'সম্মত লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য ও) করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাসিমুখে চরম দৈহিক নিগ্রহ সহ্য করতে এবং প্রয়োজন বিধায় মৃত্যুবরণ করতে দ্বিধা বোধ করে না। যাঁর ভিতর এই সব মানবীয় মূল্যবোধের স্ফুরণ দেখি তাঁকে আমরা মানুষের মত মানুষ বলি, আর আদর্শবাদবর্জিত কেবল নিজ দেহকে রক্ষা করার জন্য যে কোন মূল্যে আপোষ রফা করতে প্রস্তুত মানুষকে আমরা অমানুষ আখ্যা দিয়ে থাকি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দেহোত্তর জড়বাদোত্তর আদর্শবাদে ওতপ্রোত মানবই স্বাভাবিক মানুষ এবং এর ব্যতিক্রম হল মনুষ্যত্বের বিকার।

একথা যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যা এই মনুষ্যত্ব রূপী গুণাবলীর অধিকতর বিকাশের অনুকূল। অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে দয়া মায়া প্রেম করুণা ইত্যাদি সদবৃত্তির যে অমূল্য সম্পদ আমরা পেয়েছি, বাইবেলে কথিত হুসিয়ার পরিচারকের মত কেবল তার রক্ষাই নয়, এর উত্তরোত্তর বিকাশ করাই আমাদের স্বধর্ম। পূর্বোক্ত মানবীয় গুণাবলী যদি কোন সমাজ ব্যবস্থার কারণ ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেই সমাজ ব্যবস্থা প্রগতি পরিপন্থী জ্ঞানে অবশ্য বর্জনীয়।

দয়া মায়া প্রেম করুণা ইত্যাদি কোন ভ্যাকুয়াম বা শূন্যতায় বিকশিত হতে পারে না। মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে না এলে তার জন্য নিজের কোন রকম অসুবিধা না হলে এ সব সদ্‌গুণাবলীর অভিব্যক্তি বা বিকাশ হতে পারে না। শিশুর জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই যদি রাষ্ট্রীয় ক্রেশ, নার্সারী এবং কিণ্ডারগার্ডেন ইত্যাদি ক্রমশঃ তার দায়িত্ব নেয়, মা বাবাকে যদি শিশুপালন করার জন্য দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ কিছু পরিমাণে বর্জন করতে না হয়, তাহলে সন্তানের সঙ্গে মাতাপিতার স্নেহসম্বন্ধ গড়ে ওঠার আধারই নষ্ট হয়ে যায় না কি? আর এইভাবে যে সব শিশু মানুষ হবে। তাদের ভিতর পিতামাতার প্রতি আকর্ষণ কি এতটা জাগার সুযোগ পাবে যাতে তাঁরা বৃদ্ধ হলে নিজ স্বাচ্ছন্দ্যের খানিকটা ক্ষতি স্বীকার করেও তারা তাঁদের সেবা যত্ন করবে? "ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড" উপন্যাসে আলডুস হাক্সলে বিজ্ঞান ও যন্ত্র-কৌশলের আশীর্বাদপুত যে "সব পেয়েছির দেশ"-এর বর্ণনা করেছেন, তার যান্ত্রিক অবস্থার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

আর একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। পথ চলতে আমি কোন আহত মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তাকে উঠিয়ে ঘরে এনে নিজের হাতে তার সেবা শুশ্রূষা করে পুনরায় তাকে কর্মক্ষম করার মাধ্যমে আমার ভিতর যতখানি মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ হবে, তাকে দেখার পর সরকারী হাসপাতাল বা অনাথ আশ্রমে একটা ফোন করে খবর দিয়ে নিজের কর্তব্য সাঙ্গ করলে কি তা-ই হবে? হাসপাতাল বা আশ্রমে যাঁরা জীবিকা হিসাবে আর্তের সেবা করার ভার নিয়েছেন, তাঁদের ভিতর সচরাচর মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ হয়ে থাকে—এ জাতীয় দাবী নিশ্চয়ই কেউ করবেন না। সেবা তাঁরা করেন ঠিকই; কিন্তু তাতে প্রাণ থাকে না।

এ কথা সত্য যে রাষ্ট্রের বিবিধ হিতব্রতী কার্যকলাপের ব্যয় নির্বাহ করে নাগরিকরাই তাদের প্রদেয় কর দ্বারা। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ করের দ্বারা মানব-সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠানের খরচ চালান এবং প্রত্যক্ষভাবে মানুষের সেবা করার মধ্যে গুণ বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে আকাশ-পাতালের ব্যবধান রয়েছে।

(২)

মানবীয় মূল্যবোধের অপহ্নবের আরও একটি দিক আছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর জনসাধারণের প্রত্যক্ষ উদ্যমে জনসেবা করার প্রেরণা তো হ্রাস পেয়েইছে, নিজের প্রয়াসে নিজ অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টাও ক্ষীণবল হয়ে পড়ছে। বন্যা ভূমিকম্প ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষ পূর্বের মত আর নিজের যথাসর্বস্ব উজাড় করে পীড়িতদের জন্য দান করার দরদ অনুভব করেনা বা নিজের সুবিধার কথা বিস্মৃত হয়ে আর্তদের সেবার জন্য ছুটে যায়না। হিতব্রতী রাষ্ট্রের যুগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অথবা সুভাষচন্দ্রের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্নদের পক্ষেও বোধ হয় আর উত্তর বঙ্গের বন্যা বা ১৩৫০-এর মত বিপত্তির কালে সে যুগের মত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত করে সেবাকার্য করা সম্ভব নয়। এ কালের ভারতবাসী ঐ জাতীয় বিপর্যয়ের দিনে সরকারী রিলিফ ব্যবস্থার সত্য বা কাল্পনিক ত্রুটী বিচুতি নিয়ে লিখিত দৈনিক পত্রিকার জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় মন্তব্যের চর্বিত চর্বণ করেই নিজেদের জনহিতা-

কাজ্জার তৃষ্ণা নিবৃত্ত করেন। আমাদের রাষ্ট্র নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবার ফলে সংবেদনশীলতা ইত্যাদি অনুভূতিগুলি স্থূল হয়ে পড়ছে।

কিন্তু এইখানেই বিপদের শেষ নয়। পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রই সব করবে—এই মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাবার ফলে নিজের অবস্থার উন্নতি সাধন করার জন্যও আর দেশবাসী তৎপর নয়। নিজেদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য স্কুল খোলা বা চাঁদা তুলে তার ব্যয় নির্বাহ করা অথবা নিজেদের ক্ষেতে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগী হয়ে সেচ-ব্যবস্থা করা, কিম্বা জল নিকাশের জন্য লেগে পড়ার মনোবৃত্তি আজ আর নেই। এখন আমরা ভাবি যে এ সবই সরকার করে দেবে এবং জনসাধারণের কাজ কেবল তাঁদের কাছে একটি দরখাস্ত করা ও তার জন্য তদ্বির তদারক করা। এই তদ্বির তদারক ও ধরাধরি করার মেহনত নিজেদের প্রচেষ্টায় ঐ কাজ করে নেওয়ার চেয়ে বেশী হলেও ক্ষতি নেই। তবু পরমুখাপেক্ষী থাকাই জনসাধারণ অধিকতর কাম্য মনে করে। এর পরিণাম যা হবার তা-ই হচ্ছে। দেশের বিকাশের গতি অতীব মন্থর।

অবশ্য জনসাধারণকে এই ভাবে পরনির্ভরশীল বানাবার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী দায়ী সরকার ও শাসক দলের নেতৃবৃন্দ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সময় গান্ধীজী প্রমুখ মুষ্টিমেয় গঠনমূলক কাজের নেতা ও কর্মীদের কথা বাদ দিলে সবাই ক্রমাগত এই কথা শুনিয়ে এসেছেন যে একবার কোনক্রমে বিদেশীদের তাড়াতে পারলেই এ দেশে দুধ ঘি-এর বন্যা বইবে। দেশ স্বাধীন হবার পরও তাঁরা বার বার এই কথা বলেছেন যে এবার হিতব্রতী রাষ্ট্র স্থাপিত হল এবং এবার থেকে সরকারই সবার অন্নদাতা মা-বাপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। এর ফলে জনসাধারণের নিশ্চেষ্টতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া দেশের দ্রুত উন্নতি করার মোহে পড়ে তাঁরা ভেবেছেন যে যেহেতু সরকারী কর্মচারীরা সর্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং সর্বাবস্থায় তাঁদের বশম্বদ বটেন, সুতরাং যাবতীয় উন্নয়ন মূলক কার্য্য তাঁদেরই দ্বারা রূপায়িত করাই সমীচীন। জনসাধারণের উদ্যম ও কর্মশক্তিকে গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করার কোন বিধায়ক (Positive) চেষ্টা তো হয়ইনি, পক্ষান্তরে সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে সব করিয়ে নেবার মনোবৃত্তির ফলে স্বাধীনতার পূর্বে গঠনমূলক কর্মীদের প্রচেষ্টায় জনসাধারণের ভিতর যেটুকু অভিক্রম ও উদ্যম সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু শাসক দলের নেতৃবৃন্দ বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে সঙ্গতির অভাব ও অন্যবিধ কারণের জন্য ইচ্ছা থাকলেও আগামী বহু বৎসর এদেশে ইউরোপীয় অর্থে হিতব্রতী রাষ্ট্র কায়েম করা সম্ভব নয়। তাই জনসাধারণকে আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে কোমর বেঁধে পরিশ্রম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে যাদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা, তারাই উদাসীন থাকায় সমস্ত প্রচেষ্টা প্রাণহীন জড়পদার্থে পর্যবসিত। নেহেরুজী তাই সম্প্রতি দেশের উন্নয়ন কার্যে জনসহযোগিতার গুরুত্বের কথা বার বার বলছেন এবং জনসাধারণ আশানুরূপ অনুপ্রাণিত হচ্ছেনা বলে আক্ষেপও করছেন। কিন্তু এখন তাঁরা চাইলেও সহজে জনসাধারণের অভিক্রম জাগ্রত করা যাবেনা। কারণ প্রথমতঃ এই দশ বার বছরের আলস্যে খয়রাতী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের স্বধর্মানুযায়ী জনসাধারণের স্বভাব নষ্ট হয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ বিরোধী দলসমূহও শাসক দলেরই অস্ত্রে তাঁদের বধ করার কাজে লেগে পড়েছেন। যে উন্নয়নমূলক কাজের আদর্শ দেখিয়ে তাঁরা চিরকাল জনসাধারণের আনুগত্য পাবেন ভেবেছিলেন, তার সত্য বা কাল্পনিক স্বল্পতাকে পুঁজি করে বিরোধী দল তাঁদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে নিজেদের জন্য ভোট সংগ্রহের ব্যবস্থা করছেন। তাঁরা ক্ষমতা পেলেও যে অনতিবিলম্বে বর্তমানের মত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এবং জনসাধারণের ভিতর উদ্যমও অভিক্রম সৃষ্টি না করলে যে উন্নয়নের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হওয়া সম্ভব নয়, একথা বিরোধী দলের কর্মীরা বুঝেও বোঝেননা। আপাত লাভের লোভে স্থায়ী কল্যাণকে উপেক্ষা করাই রাজনীতির নিয়ম। সুতরাং সমস্ত দেশ এক ভীষণ দুষ্টচক্রের আবর্তনে পাক খাচ্ছে।

বক্তব্যের আর অধিক বিস্তারনা করেও তাই মন্তব্য করা যায় যে বর্তমান যুগে বৃহৎ যন্ত্রের দ্বারা ভূরি উৎপাদনের ফলে যে কেন্দ্রীভূত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং যেখানে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্র হ্রাস পেতে পেতে মানুষ একটা জড় নৈর্ব্যক্তিক অবস্থায় উপনীত হয়েছে, হিতব্রতী রাষ্ট্রের আদর্শ তাকে আরও ত্বরান্বিত করবে। অর্থাৎ বৃহৎ যন্ত্র ও হিতব্রতী রাষ্ট্র—এ দুয়ের সমাহারে মানুষের উন্নতির জন্য ভোগ্যোপকরণের প্রাচুর্য ও তার জীবনের নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা হবে এবং হয়ত আশাতিরিক্ত ভাবে হবে, কেবল এ ব্যবস্থায় তার মনুষ্যত্বটুকু ও এতদিনের প্রয়োগে অর্জিত তার মানবীয় মূল্য বোধের তিলাঞ্জলি দিতে হবে। এ অবস্থা আমাদের পক্ষে কতটা কাম্য তা প্রতিটি মানবকল্যাণকামীরই গভীর ভাবে বিবেচনা করে দেখার বিষয়।

আর্য্য সঙ্গীতে "রাগভৈরব"

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ বি-এল্
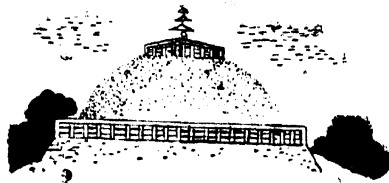
রাগ-ভৈরব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইলে রাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। কারণ তাহা না হইলে এই রাগটী সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না। রাগ শব্দটী রনজ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। রনজ্ ধাতুর অর্থ রং করা বা রঞ্জিত হওয়া। যখন কোন বস্তুর উপর কোন কিছুর প্রলেপ দেওয়া হয় তখন তাহাকে রং করা বলা হয়। আবার যখন কোন বস্তু কালপ্রভাবে নিজের বর্ণ পরিবর্ত্তন করে তখন তাহাকে রঞ্জিত হওয়া বলে। যেমন আম যখন কাঁচা থাকে তখন তাহায় বর্ণ ঘন সবুজ এবং এত কঠিন যে তাহাকে টেপা যায় না এবং তাহাকে নিষ্পীড়ন না করিলে তাহা হইতে রস নির্গত হয় না। কিন্তু যখন কালক্রমে তাহা পক্কতা লাভ করে তখন তাহা তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ধারণ করে এবং যখন আরও অধিক পক্কতা লাভ করে তখন তাহা হইতে রস স্বতঃ নির্গত হয়। এই অবস্থা হইল রঞ্জিত অবস্থা। এই যে এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থায় উদ্ভব ইহার কারণ কি। অর্থাৎ এই অবস্থার বিকার কি করিয়া হয়। সাধারণতঃ লোকে বলিবে প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু প্রকৃতি কি করিয়া ইহা করিল। অগ্নিই বিকারের কারণ। অগ্নি ছাড়া কাহারও বিকার করিবার শক্তি নাই। সেই কারণ সন্ত তুলসী দাস বলিয়াছিলেন—

"কোয়লে কা ময়লা ছোটে
জব আগ কর পরবেশ"।

অর্থাৎ কয়লা যাহা 'শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি' অগ্নি হেতু তাহার মলিনতা বর্জ্জন হয়। সেইরূপ যোগীরা যাহারা সিদ্ধ পুরুষ তাহাদের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনবর্ণের ন্যায় হয়। এই অবস্থায় তাঁহাদের শরীরের উত্তাপ এত বৃদ্ধি পায় যে তাঁহারা তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া উঠে। এই অবস্থা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের হইয়াছিল যাহার দরুণ তাঁহাকে কচি কলাপাতার চন্দন লেপন করিয়া রাখিতে হইত। এই অবস্থা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হইয়াছিল। এই অবস্থা শ্রীরাধার হইয়াছিল। এবং তাঁহাদের বর্ণও তপ্তকাঞ্চনবর্ণ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের আঁখি হইতে আনন্দাশ্রু সদাসর্ব্বদা গড়াইয়া পড়িত। ইহাই মহাভাবের অবস্থা! প্রশ্ন উঠে এই অগ্নি কোথা হইতে আসিল। ইহা বুঝিতে হইলে সৃষ্টি-তত্ত্বর আলোচনা প্রয়োজন।

সৃষ্টি-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে ব্রহ্ম হইতে জীব-জগৎ কি ভাবে আবির্ভূত তাহার জ্ঞান আবশ্যক। অবাঙ্‌মনসো-গোচর ব্রহ্মকে আমাদের এই সীমিত জ্ঞান সহায়ে বাক্য ও মনের দ্বারা বুঝিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি অজানাকে জানিবার ইচ্ছাই হইল মানবের বৈশিষ্ট্য।

পরে ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় তখন তিনি নির্গুণ অর্থাৎ ব্রহ্মের ষাড়গুণ্য যথা জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য এবং তেজ তখন সুপ্ত। এই অবস্থায় তিনি কেবল সৎরূপে আত্মসমাহিত। এই আত্ম-সমাহিত সৎরূপ ইহা তাঁহার সদা-স্বরূপ। সৎরূপ এই জন্য যে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের প্রকাশ অর্থাৎ সম্ভাবনা তখন সুপ্ত অবস্থায় অবস্থিত। অর্থাৎ বলিবার কারণ যে তখন তাহাতে সৃষ্টি প্রপঞ্চরূপ কিছুই নাই। এই কারণে এই অবস্থায় তাঁহাকে বলা হয় তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। তিনি আছেন এই কারণে নিত্য, তাঁহার কোন বিকার হয় নাই এই কারণে শুদ্ধ এবং তিনি জ্ঞান স্বরূপ সেই জন্য বুদ্ধ ও তাঁহার কোন বন্ধন নাই এই হেতু মুক্ত। ইনি যখন নিজেকে দর্শন করেন সেই অবস্থায় ইহার ঈক্ষণ হয়। এই ঈক্ষণ হইতে সৃষ্টির ইচ্ছা। অর্থাৎ 'বহুস্যাম্' এই সঙ্কল্পের উদয়। এই সঙ্কল্পই হইল ঈক্ষণ। ইহাই তাঁহার স্বরূপ দর্শন। ব্রহ্মের শক্তি বা গুণই হইল তাঁহার স্বরূপ। এই যে আপনার মধ্যে প্রথম স্পন্দন ইহাই হইল স্বরূপে সুপ্ত ইচ্ছা জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা শক্তির প্রথম উন্মেষ। এই শক্তিতত্ত্ব সর্ব্বদাই অচিন্ত্য কারণ শক্তিমান ও শক্তির আশ্রয়বস্তু হইতে এই শক্তিকে পৃথক করিয়া দেখা যায় না। ইহাই হইল শিবশক্তি তত্ত্ব। এই কারণ শিব সদাই গৌরীপীঠ চেষ্টিত। ইনিই হইলেন পরম শিব নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কাম। এই শান্ত চিৎরূপ শিবে আত্মদৃষ্টির ইচ্ছার যে প্রথম উন্মেষ তাহাই হইল তাহার স্পন্দরূপ অহন্তা অবস্থা। এই কারনেই বলা হয় অহঙ্কার তত্ত্বের দেবতা শিব এই অবস্থাই হইল "চিদাহ্লাদমাত্রানুভবতল্লয়" অবস্থা। অর্থাৎ তিনি নিজেতেই নিজে বিভোর। অপর কোন কারণকে অবলম্বন করিয়া আনন্দানুভূতি নাই। নিজের চিৎস্বরূপের মধ্যে যে অহ্লাদ স্বরূপতা বর্ত্তমান তাহারই আস্বাদে তিনি নিমগ্ন। এই নিজেকে নিজে দেখা অবস্থা হইতে জাগরণ হয় ইচ্ছা জ্ঞান-ক্রিয়া। এই ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়াত্মিকা যে স্পন্দন তাহাই তাঁহার শক্তি। এই ত্রিশক্তি পরমশিবের পূর্ণাহন্তার ভিতর সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। তিনি নির্ব্বিভাগ এবং চিৎ-পাহ্লাদ পরম অবস্থায় থাকেন। এই অবস্থায় তাঁহার ভিতর কোন ভাগ বা বিভাগ কিছুই থাকে না। অর্থাৎ ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া এই ত্রিশক্তি—তাহা হইতে বিভিন্ন হয় না। এই জন্য ইঁহাদের কখন ছাড়াছাড়ি নাই। নিজের ইচ্ছা মাত্রতাই হইল তাঁহার শক্তি। সুতরাং শিব কখন শক্তি-রহিত নহেন। শক্তির যাহা পৃথক্ সত্তা উহা পরমপুরুষের অবভাসন। তথাপি তাহা যে কিছুই নহে তাহা নহে। প্রতীতিরূপে তাহা বাস্তব।

'আমি বহু হইব' এই আত্মোপলব্ধি হইল তাঁহার সঙ্কল্প এবং এই খানেই তিনি নিজেকে শক্তি হইতে পৃথক করিয়া লইয়া তাহার মধ্য দিয়া নিজেকে অনন্তরূপে সৃষ্টি করেন এবং এই অনন্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়া অনন্তভাবে আত্মোপলব্ধি করেন। অর্থাৎ 'আমি এইরূপ' এই যে জ্ঞান তাহাই তাঁহার বিস্ফুরণ। এই বিস্ফুরণের যাহা কারণরূপ তাহাই হইল শক্তি। এই অবস্থাই হইল তাঁহার ভৈরব রূপ। এই অবস্থায় শক্তিরূপা দর্পণে প্রতিফলিত হয় অব্যক্তশিব মহাবিন্দুরূপে। এই মহাবিন্দু হইল শশীকলায় সপ্তদশীকলা। এই কলা চন্দ্রের ষোড়শ কলায় ঊর্দ্ধে। এই শক্তিই হইল মহামায়া। ইনি আনন্দময়ী এবং মায়ার উপরে। ইহাই হইল শিবের স্বরূপ শক্তি অর্থাৎ সমবায়ী শক্তি। মায়া বা প্রকৃতি এই সমবায়ী শক্তি হইতে উদ্ভূতা।

এই পরমশিবই হইলেন ভৈরব। এই ভৈরব আত্মোপলব্ধির জন্য নিজেকে আপন শক্তিরূপ দর্পণের মধ্যে প্রকাশিত করিয়া রসাস্বাদ করেন। এই প্রকাশ শক্তিই হইল অগ্নি। অগ্নি ভিন্ন আর কাহারও প্রকাশ শক্তি নাই। এই জন্য বলা হয় অগ্নি পরম পুরুষ শিব হইতে জাত; এই শিবই হইল অজ অর্থাৎ জন্ম রহিত। সেই কারণে কালচক্রে প্রথম রাশিই হইল অজরাশি অর্থাৎ মেষ রাশি। ইহা অগ্নি রাশির অধিপতি এবং শিবদ গ্রহ—যিনি অগ্নিভূ এই রাশির অধিপতি। মঙ্গল হইল অগ্নিভূ। অগ্নিই হইল কাল এবং কালই রুদ্র-নামে অভিহিত। যিনি সমাহিত চিত্তে এই অগ্নিতে অবস্থিতি করিতে পারেন তিনিই পরমহংস। এই শিবরূপী অগ্নির প্রতিভাসন হয় শক্তিরূপা দর্পণে। এই দর্পণ হইল কারণ বারি। ইহাই হইল মায়াশক্তি বা প্রকৃতি। ইহা সেই সমবায়ী শক্তি হইতে উদ্ভূত। এই কারণবারিতে অগ্নি হেতু যে তরঙ্গমালার উদ্ভব তাহাই সৃষ্টি। এই অবস্থায় তিনি বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বনাথ। এই

প্রকৃতি নিজেকে অষ্টধা বিভক্ত করা হেতু শিবের অষ্ট মূর্ত্তি কল্পনা। অর্থাৎ শিব নিজেকে এই মায়া প্রকৃতির সাহায্যে অষ্টধা বিভক্ত করেন এবং যখন তিনি ভূতোৎপত্তি করেন তখন ভূতনাথ নামে অভিহিত হয়েন। এই অবস্থায় তিনি পঞ্চানন।

পঞ্চাননের পঞ্চবদন সম্বন্ধে পুরাণ বলে বশিষ্ঠ পুত্র কশ্যপ, প্রাণপুত্র প্রাণ ও অঙ্গিরা পুত্র চ্যবন ও ত্রিসর্ব্বচার তপস্যায় পঞ্চবর্ণ মহাপ্রভাব পঞ্চতেজ উৎপন্ন হয়। ইহারাই হইল পঞ্চাননের পঞ্চ বদন। এই পঞ্চ বদন হইতে পঞ্চভূত ও পঞ্চবর্ণ হইতে পঞ্চরাগ উৎপন্ন হয়।

সঙ্গীতশাস্ত্র বলেন, পঞ্চাননের অঘোর মুখ হইতে রাগ ভৈরব উদ্ভূত। এই অঘোর মূর্ত্তি সম্বন্ধে পুরাণ বলে যে পূর্ব্ব সৃষ্টি নাশ হওয়া হেতু ব্রহ্মা দুঃখিত চিত্ত হইয়া পুনঃ সৃষ্টি কামনায় চিন্তা করিতে করিতেকৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিলেন। তিনি টানে এক মহাতেজঃ দীপ্ত কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত কৃষ্ণ উষ্ণীষধারী,—কৃষ্ণযজ্ঞোপবীতযুক্ত, কৃষ্ণমাল্য শোভিত ও কৃষ্ণানুলেপনসম্পন্ন কৃষ্ণবর্ণ এক কুমার মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিলেন। ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া সংযত চিত্তে পরম ব্রহ্ম মহাদেবকে নিজ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই অঘোর মূর্ত্তির চিন্ত করিতে লাগিলেন। তখন সেই কুমার হাস্য করাতে তদনুরূপ কুমারসকলের আবির্ভাব হইল। তাহারা ব্রহ্মার সৃষ্টি কার্য্যে সহায়তা করিল। ইহাই হইল তামস সৃষ্টি। এই অঘোর মূর্ত্তি হইল অধিকারী শক্তি সম্পন্ন এবং ইনি সর্ব্বভূতে রত হওয়া হেতু ভূতনাথ। ইহার মস্তকে সমুদ্রোত্থিত চন্দ্র অবস্থিত এবং ইনি সকল আশ্রয় স্বরূপ বলিয়া নির্গুণ হইয়াও গুণময়। ইনি সকল চিন্তার অতীত বলিয়া অবাঙমনসোগোচর।'

সঙ্গীত শাস্ত্র বলেন—
ভৈরবে তু রিপৌ হীনৌ স্তো ধৈবতাদি মূর্চ্ছনাঃ।
তত্রোক্তৌ চ গনী তীব্রৌ কোমল ধৈবত স্মৃতঃ॥"
পারিজাত

এই রাগ সম্পূর্ণ জাতীয়। কিন্তু ঋষভ ও পঞ্চম স্বরকে হীন করিতে হইবে। ধৈবতাদি মূর্ছনা ব্যবহার করিতে হইবে ও গান্ধার এবং নিষাদ স্বরকে তীব্র করিতে হইবে এবং ধৈবত স্বরকে কোমল করিতে হইতে।

আর্য সঙ্গীত শ্রুতির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই কারণ এই রাগে শ্রুতির বন্টন লইয়া আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। শাস্ত্রকাররা বলেন, এই রাগে ঋষভ ও পঞ্চম স্বরকে হীন করিতে হইবে। সাধারণতঃ ঋষভ ও পঞ্চম স্বর সপ্তম ও সপ্তদশ শ্রুতিতে অবস্থিত। সপ্তম শ্রুতি হইল রতিকা। যেখানে সাধনার দ্বারা পরাৎপরের সহিত সংযোগ স্থাপনার বাসনা যেখানে রতি কার্য্য হইতে বিরত হওয়া প্রয়োজন। এই কারণে ঋষভ স্বরকে হীন করিয়া ষষ্ঠ শ্রুতিতে স্থাপন করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ শ্রুতি হইল রঞ্জনী। কাল চক্রে ইহাই হইল আদ্রা নক্ষত্র—যাহার দেবতা রুদ্র। পুরাণে ইনিই ভৈরব। বেদে রুদ্রই হইল অগ্নি। এই অগ্নিকেই উত্তোলন করিতে হয়। এই নক্ষত্র শুচি রাশি অর্থাৎ মিথুন রাশিতে অবস্থিত। শিবশক্তিই হইল মিথুন অর্থাৎ অর্দ্ধনারীশ্বর। এই রুদ্রই পীড়া হইতে ত্রাণ করিয়া আনন্দদায়ক ও প্রীতিকারক হইয়া স্ফুত করে। সেই কারণে সাধক যখন মহাভাবে থাকে তখন তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ধারণ করে। তখনই সে রঞ্জিত হইয়া উঠে।

পঞ্চম স্বর সাধারণতঃ আলাপিনী নামক সপ্তদশ শ্রুতিতে অবস্থিত। ইহাকে হীন করিলে এই স্বর ষোড়শ শ্রুতি আশ্রয় করে। অর্থাৎ 'সন্দিপনী নামক শ্রুতিতে অবস্থান করে। পুরাণ বলে শ্রীকৃষ্ণ ভূমণ্ডলে অবতরণ করিয়া উদ্দীপনা লাভ হেতু সন্দিপনী মুনির শিষ্য হয়েন। কালচক্রে ষোড়শ নক্ষত্র হইল রাধা নক্ষত্র, যাহা আসক্তি হেতু উদ্দীপনা ঘটায়। জীবের হৃদয়ে রাধা বিরাজমান হেতু সে আরাধনায় রত হয়। এই পানেই ভাবের উদ্দীপনা। রাধা নক্ষত্র হইল রবি অর্থাৎ রবের জন্ম নক্ষত্র। ভাবের উদ্দীপনা ব্যতীত কোন রবই সঙ্গীতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারে না। এই নক্ষত্রের দেবতা ইন্দ্রাগ্নি। জীব ইন্দ্রাগ্নি সহায়ে বহুত্বের আস্বাদ করিয়া জগৎ ভোগ করে, আবার ইহারই সাহায্যে বহুত্বের নাশ করিয়া একত্বের দিকে অগ্রসর হয়।

গান্ধার স্বর সাধারণতঃ ক্রোধা নামক নবম শ্রুতিতে। ইহাকে তীব্র করিয়া দশম শ্রুতিতে স্থাপিত করা হয়। দশম শ্রুতি হইল বজ্রিকা। দশম নক্ষত্র হইল মঘা। ইহা আত্মরূপ রবির গৃহ সিংহ রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা পিতৃগণ। বেদে ইন্দ্রই হইল পিতা এবং ইন্দ্রের একটী নাম মঘবন। ইন্দ্রের অস্ত্র হইল বজ্র। স্বর্গকে অসুরদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য দধিচীর অস্থি হইতে বজ্র নির্ম্মাণ করেন। অর্থাৎ আসুরী শক্তি হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে বজ্রের প্রয়োজন। সেই কারণে গান্ধার স্বরকে এই শ্রুতিতে স্থাপন করা হয়।

নিষাদ স্বর ক্ষোভিনী নামক দ্বাবিংশ শ্রুতিতে অবস্থিত। ইহাকে তীব্র করিয়া তীব্রা নামক প্রথম শ্রুতিতে স্থাপিত করা হয়। কালচক্রে প্রথম নক্ষত্র হইল অশ্বিনী। ইহা অজ অর্থাৎ মেষরাশিতে অবস্থিত। অশ্বিনী হইল সংজ্ঞা সুত সংজ্ঞা উৎপন্ন না হইলে স্বর শ্রুত হয় না। তীব্র ধাতুর অর্থ হইল স্থূল হওয়া। প্রাণের বিকাশ নিমিত্ত পরা বাক্ স্থূল হইয়া বৈখরী বাকের উৎপত্তি।

ধৈবত বিংশ শ্রুতি রম্যাতে অবস্থিত। ইহাকে কোমল করিয়া রোহিণী নামক উনবিংশ শ্রুতিতে অবস্থান করান হয়। কালচক্রে উনবিংশ নক্ষত্র হইল মূলা যাহার দেবতা নিঋতি। প্রকৃতি শক্তির দ্বারা বন্ধন করিয়া—নিশ্চয়রূপে সত্যকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা যখন আছে তাহাই নিঋতি। প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরগুলির ক্রিয়ায় আরোহণ, অবরোহণ হেতু এই বন্ধন ঘটে। শ্রুতির রোপণ, আরোহণ ও অবরোহণ হেতু এই বন্ধন ঘটে।

বলা হইয়াছে এই রাগেতে ধৈবতাদি মূর্ছনা ব্যবহার্য্য। ধৈবত স্বরের দেবতা শম্ভু এবং ধৈবতাদি মূর্চ্ছনা হইল উত্তরায়তা যাহা সংযমনের উত্তর অর্থাৎ বোধ ও চিত্ত জন্য ওজনকের মত সম্বন্ধে আবদ্ধ। অর্থাৎ যে শক্তি জ্ঞান দেবতারূপ ধীশক্তির সহিত সম্বন্ধ করে। এই কারণে এই মূর্ছনাকে উত্তরায়তা বলা হয়। এই মূর্ছনার দেবতা নারদ যিনি কামচর হেতু সর্ব্বদা যাতায়াত করেন। বায়ু পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করে। স্বর পৃষ্ঠ দেশে ধৃত হওয়া হেতু ধৈবত আখ্যাপ্রাপ্ত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখাযায় যে এই রাগটী অধিকারী শক্তি সম্পন্ন এবং তিনি সর্ব্বভূতে রত ও মস্তকে সমুদ্রোত্থিত চন্দ্র অবস্থিত। তিনি সকল গুণের আশ্রয়স্বদেশ হইয়াও সকল চিন্তার অতীত। এই সকল ভাব থাকা হেতু নিম্নোক্ত ছয় রাগিণীর উদ্ভব।

অধিকারীশক্তি হইতে—	ভৈরবী
চন্দ্র হইতে—	বাঙ্গালী
চন্দ্র হইতে—	সৈন্ধবী
সর্ব্বভূতে রত হেতু—	রামকেলী
গুণীশ্রয় হেতু—	গুণকেলী
সকল চিন্তার অতীত বলিয়া—	গুর্জ্জরী

আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞান সহায়ে জ্ঞান দেবতা শিবের আলোচনা করিয়া কত অপরাধ করিয়াছি জানিনা। তাই আমি সর্ব্বান্তকরণে তাঁহার ক্ষমাভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি—

"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণ ত্রয় হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর॥"
ওঁ শিবায় নমঃ
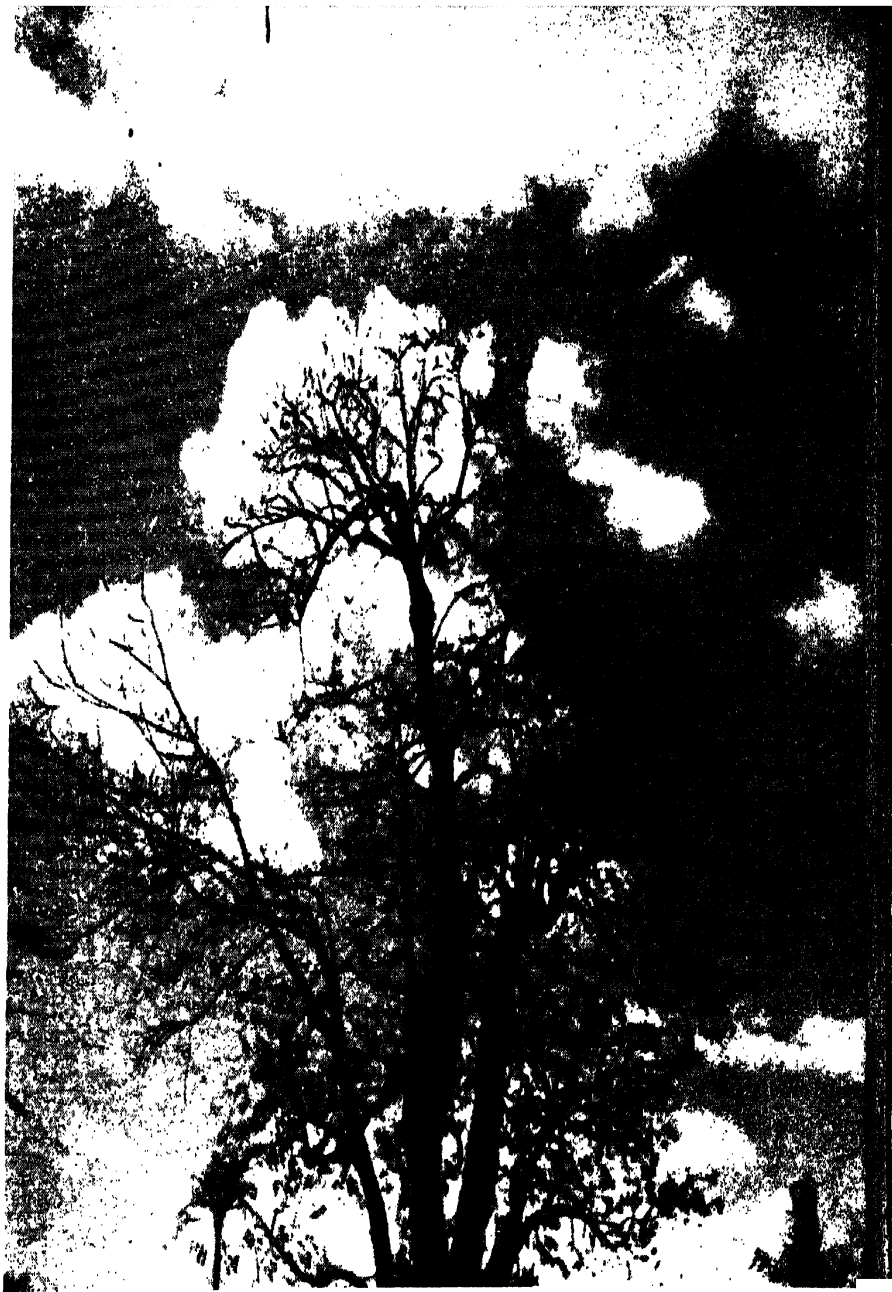
আকাশ পটে

ফটো : রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডা

স্নেহের পরশ

ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

মিশরের প্রাচীন বালুগর্ভে রত্নৈশ্বর্য্য

উপানন্দ

উত্তর আফ্রিকায় মিশর। নীলনদের উপত্যকা ও বদ্বীপ ছাড়া অধিকাংশই মরু-অধ্যুষিত। এর সু-প্রাচীন বালুগর্ভের মধ্যে নিহিত রয়েছে পাঁচ হাজার বৎসরের এবং তারও পূর্ব্বের অতিপ্রাচীন মানব সভ্যতার ও সম্পদের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এর বিস্তীর্ণ বালুকা বক্ষে অবস্থিত ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ অথবা বহুকোণ ভূমির উপরিস্থ.ঘনক্ষেত্র। এইসব ক্ষেত্রই পিরামিড—ফারাওদের অতি বৃহৎ স্মৃতিস্তম্ভ। পিরামিডের মধ্যে রয়েছে মিশরের অধীশ্বরগণের মৃতদেহ। এই সব মৃতদেহে এমন সব রাসায়নিক দ্রব্যের প্রলেপ দেওয়া আছে যাতে সেগুলি নষ্ট না হয়ে যায়। এদের বলা হয় মমি। ফারাওদের সঙ্গে তাঁদের ধনৈশ্বর্য্য ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত সকল বস্তুই কবরের মধ্যে রাখা হয়েছে। অনেক পিরামিডের মধ্য থেকে দস্যুরা ধনরত্নাদি অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তবুও এখনও বহু পিরামিডের ভেতর রয়েছে আত্মগোপন করে ফারাওদের অতুল ঐশ্বর্য্য। পিরামিড ও স্ফিংক্সসমূহ (নারী সিংহী মূর্ত্তি) ধারণ করে আছে মিশরের অতীত কালের ঐতিহ্য আর সাংস্কৃতিক গৌরব। আসোওয়ান, ওয়াদি, হালফা, কর্ণাক প্রভৃতিস্থানে আজও বর্ত্তমান মিশরের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে।

থিব্‌সে সম্রাটদের সমাধি-উপত্যকায় খনন কার্য্য আরম্ভ করে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যেদিন রাজা টুটেন-খামেনের মৃতদেহ (মমি) আর বিরাট ভাণ্ডাগার পিরামিডের ভেতর থেকে আবিষ্কৃত হোলো, সেদিন সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে উঠ্‌লো, হারিয়ে-যাওয়া ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় খুঁজে পাওয়া গেল। বেরিয়ে এলো রূপকথার একটি প্রোজ্জ্বল বাস্তব চিত্র। গীজার বিস্তীর্ণ মরুভূমির ওপর কয়েকটি পিরামিড ও স্ফিংক্স্ মূর্ত্তি প্রাচীন মিশরের ফারাওদের অতীত দিনের নিদর্শনগুলি গর্ভে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাক্ষ্য দিচ্ছে এরা অতীত গৌরবের কথা। এখানকার বৃহৎ পিরামিড উচ্চতায় ৪৮০ ফুট, দ্বিতীয়টি ৪৭১ ফুট আর তৃতীয়টি ২১৮ ফুট, গীজার পিরামিডগুলি প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের অন্যতম।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে গীজার ডিরেক্টর অব ওয়ার্কস কামাল এল্-মাল্লাক ঐ বৃহৎ পিরামিডের নিকটবর্ত্তী রাস্তাটি পরিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে সদলবলে যাত্রা করেন। রাস্তা পরিষ্কার করবার সময় তাঁর অনুচরবর্গ সুরু করলো খুব ভারি চুনা-পাথরের খণ্ডগুলির ওপর শাবলের ঘা দিতে। মনে হলো ভূগর্ভে হয়তো অতীতের কোন ঐশ্বর্য্য আত্মগোপন করে আছে। জনাব এল্-মাল্লাক একটি প্রস্তরখণ্ড টুকরো টুকরো করে ভেঙে গর্ত্ত করলেন। নির্গত হোতে লাগলো ধূপধুনাদি ও কাষ্ঠের সৌরভ। ক্ষীণ আলোকে দেখা গেল—তক্তার সঙ্গে ভূগর্ভ প্রবেশের সুড়ঙ্গ পথ পাশুই বাঁধা। তক্তাগুলি শিথিল। বোধ হলো এরা একটি বৃহৎ তরণীর অংশ। অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো মিশরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের খনি থেকে পাওয়া গেছে একটি বিরল ১০৮ ফুট জাহাজ। এ জাহাজ মিশরের প্রাচীন চতুর্থ রাজবংশের আমলে নির্ম্মিত।

৪৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা খুফুকে এই পিরামিডের মধ্যে যখন সমাহিত করা হয়, তখন এই তরণীতে তাঁকে শুইয়ে আনা হয়েছিল এরূপ মন্তব্য করেছেন এক শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিদ, অপরপক্ষে আরও এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের অভিমত যে, তাঁর 'কা' অর্থাৎ আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে এটি নির্ম্মাণ করা হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে ২৬শে মে বৃহৎ ও ভারী একচল্লিশটি প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করে জাহাজখানি বাহির করা হয়েছে। ৪৫টি শতাব্দী এর বুকের ওপর দিয়ে চলে গেছে—কত ঐতিহাসিক ঘটনার স্তর বিন্যাস করে—তক্তাগুলিও হয়েছে জীর্ণ, এতদ্‌সত্ত্বেও রয়েছে উত্তমভাবে সংরক্ষিত। মিশর সরকার এটীকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

আবিষ্কারের পর কয়েক মাস ধরে কাষ্ঠখণ্ডগুলি নিয়ে চলেছে গবেষণা, বহু পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়েছে স্মারকটিকে কিরূপে রাসায়নিক

পদার্থ প্রয়োগ করে তাজা রাখবার ব্যবস্থা হয়েছিল। শেষে পাঠানো হোলো সরকারী বিভাগের রাসায়নিকগণকে অস্‌লো আর লণ্ডনে। এই সব স্থানে এসে রাসায়নবিদগণ জ্ঞানার্জ্জন করলেন—কি ভাবে প্রাচীন কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে ঠিক রাখা যায়। জাহাজখানি নাইলনদের স্রোতে ভাসমান হোলে, এর গায়ে যে সাদা রঞ্জক লাগানো আছে, তা নিশ্চয়ই ধুয়ে যেতো। ক্যাল্‌সিয়াম সালফেট বা জিপ্‌সাম দিয়ে এর অঙ্গরাগ করা হয়েছে। এগুলি সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়। জাহাজের মধ্যস্থলে পাওয়া গিয়েছে ছোট বড় খুঁটি। এইসব খুঁটি লাগিয়ে পাটাতনের ওপর চাঁদোয়া টাঙানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল—যার ভেতর আশ্রয় নিয়ে স্বর্গযাত্রী রাজার ভবসমুদ্র পার হবার সময় কোন প্রকার কষ্ট না হয়। খুফুর মাতা রাণী হেটেপ হেরেসের শয্যার ওপর এরূপ খুঁটি দিয়ে চাঁদোয়া টাঙানো দেখা যাচ্ছে। তাঁর কবর থেকে বের করে আনা হয়েছে চাঁদোয়ায় আচ্ছাদিত শয্যাটি—এটি এখন কায়রোর যাদুঘরে বর্তমান।

উপরোক্ত জাহাজটি নির্ম্মাণের সময় দেবদারু, বাব্‌লা পাইন নাব্‌ক (বা খ্রীষ্টের কণ্টকবৃক্ষ) প্রভৃতি জাতীয় বৃক্ষের তক্তা মালমসলাও উপাদানরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা অভিমত প্রকাশ করেছেন, এরূপ জাহাজ খুফুর পিরামিডের সন্নিকটে মৃত্তিকাগর্ভে প্রস্তর নির্মিত প্রকোষ্ঠে আরও আছে। প্রায় দু'শো গজ দূরে রাজা খুফুর পুত্র খাফ্রের পিরামিড। এখানেও ওধরণের তরণী থাকা সম্ভব। অনেকে বলেন, ভূগর্ভ হোতে উত্তোলিত জাহাজখানি সূর্যতরণী। প্রাচীন মিসরের অধিবাসীরা খ্রীষ্টজন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বাস করতো যে জাহাজে উঠে সূর্য্য দৈনন্দিন পরিক্রমা করে। প্রাচীন মিসরীরা সূর্য্যোপাসক। তাঁরা ভয় করতো অনন্তকালের অন্ধকারকে। মৃত্যুর পর তাই তারা সূর্য্যকে আশ্রয় করতো। দিঙ্‌মণ্ডলের পশ্চাতে দিবাবসানে সূর্য্যদেবতা যখন পরিভ্রমণ করেন তখন যাতে তারা তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে আলোকের মধ্যে থাকতে পারে এরূপ কামনা করতো। এজন্তে জাহাজগুলি তৈয়ারী হোতো মৃত্যুর পর সূর্য্যের কাছে পৌঁছবার পরিবহন হিসেবে। এদের মনের কথা, এদের অন্তরের কামনা ফুটে উঠেছে, থিব্‌সে রাজাদের কবরের দেওয়াল গাত্রে যে সব চিহ্ন আছে, তাদেরই ওপর। মৃত্যুর পর সূর্য্য-সান্নিধ্য পাওয়াই ছিল রাজাদের একমাত্র কাম্য। জীবনের শেষে দিন রাত ধরে সূর্য্যের সঙ্গে বিহার করা ছিল তাঁদের আকাঙ্ক্ষা।

যাহোক যে উদ্দেশ্যেই জাহাজখানি গীজাতে রাখা হোক না কেন, একথা অস্বীকার করা যায় না যে মিশরীয়া জাহাজ নির্ম্মাণে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিল। আরও দুইটি জাহাজ পিরামিড থেকে তুলে এনে মিসরের যাদুঘরে রাখা হয়েছে এবং অপর একটি আছে পিট্‌সবুর্গে কার্ণেগী ইন্‌ষ্টিটিউটে। স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণে পিতার আরব্ধকার্য্য পুত্রকেই সমাপ্ত করতে হোতো এরূপ প্রথাই ছিল প্রাচীন মিশরে। রাজা খুফুর অসমাপ্ত কার্য্য তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী দেদিফ্রে তাঁর রাজত্বকালের মাত্র চতুর্থবর্ষে শেষ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল আট বছর। গীজাতে প্রাপ্ত জাহাজটি দেখে এইসত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, এর নির্ম্মাণে লেবাননের দেবদারুজাতীয় বৃক্ষের তক্তা ব্যবহৃত হওয়ায় সে সময়ে মিশরের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরবর্ত্তী দেশগুলির বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। আরও জানা গেছে যে খুফুর পিতা রাজা স্নিফ্রু চল্লিশ জাহাজ বোঝাই লেবাননের দেবদারুকাষ্ঠ মিশরে আমদানী করেছিলেন।

ডাশুরে স্নিফ্রুর বক্র পিরামিডের মধ্যে চার হাজার ছয়শত বছরের পুরাতন দেবদারু জাতীয় বৃক্ষের (সিডার) কড়িকাঠ আছে, কতকগুলি কড়ি কাঠের ঘনত্ব একফুট এবং দৈর্ঘ্য কুড়িফুট বা তদূর্দ্ধ। আজকের দিনে এক পুরুষ আগে নির্ম্মাণকল্পে যে সব কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের চেয়েও ঐ সব কড়ি কাঠ শক্ত আর মজবুত। সম্ভবতঃ দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ (সিডার) স্নিফ্রুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে লেবানন থেকে মিসরে আনা হোতো, কেননা অতি প্রাচীন কালেই মিসরীয়েরা অন্যান্য ভূমধ্য সাগরবর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল।

স্নিফ্রুর পুত্ররা অলস রাজা ছিলেন না। এঁরা দেশ শাসনে সুদক্ষ ছিলেন। খুফুর ভ্রাতাগণ আর ভ্রাতুষ্পুত্ররা গীজাতে খুফুর বৃহৎ পিরামিড নির্ম্মাণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হেমিওনু। হেমিওনুর সমাধি খুফুর বৃহৎ পিরামিডের পশ্চিমে অবস্থিত। সর্ব্বসমেত হিসেব করে দেখা গেছে, সত্তরটিরও অধিক পিরামিড নাইল নদীর পার্শ্বে বিদ্যমান। এই সব পিরামিড উত্তরে আবুরা উয়াস থেকে দক্ষিণে মৈদুম পর্য্যন্ত পঞ্চাশ মাইলব্যাপী বিস্তৃত। কয়েকটি পিরামিড ফৈউম প্রদেশে অবস্থিত। অনেকগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কতক গুলির খননকার্য্য বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার প্রচেষ্টা এখনও হয়নি।

তোমরা বোধহয় জানো মহামতি আলেকজাণ্ডার মিশরে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এখানে তাঁর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ অনেক খানি স্থান জুড়ে রয়েছে, সিওয়ার (ওয়াহাৎ সিওয়া) মরুস্থান তাঁর উল্লেখযোগ্য স্মৃতি বহন করছে। এই মরুস্থান জুপিটার আমুন দেবতার দৈববাণীর পীঠস্থান রূপে বিখ্যাত এবং ভূমধ্যসাগর উপকূল থেকে মাটরুর দক্ষিণে প্রায় ১৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। দিগ্বিজয়ী তরুণ বীর আলেকজাণ্ডার এখানে দৈববাণী শুনবার জন্তে মিশরের পশ্চিম মরুভূমির মধ্যদিয়ে নিস্তব্ধভাবে অনেক খানি সময় অতিবাহিত করে দুর্গম পথে এসেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩১ অব্দে পারস্য আক্রমণ কর্‌বার পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার তাঁর ভবিষ্যৎ জান্‌বার জন্তে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। সিওয়ায় দৈববাণী শ্রবণ করে তদনুসারে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করবার উদ্দেশ্যে সম্রাট লিবিয়ান মরুভূমির ওপর দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন। দুটি দাঁড়কাক হয়েছিল তাঁর পথপ্রদর্শক। দেবতা আমুনের দ্বারা তারা প্রেরিত হয়েছিল যাতে সম্রাট পথহারা হয়ে না পড়েন। পুরোহিতের মাধ্যমে তাঁকে যে দৈববাণী জ্ঞাত করা হয়েছিল তা ম্যাসিডনের অধিপতি মহামতি আলেকজাণ্ডার কখন প্রকাশ করেননি।

আলেকজাণ্ডার দার্শনিক পণ্ডিত আরিষ্টটলের শিষ্য এবং তদানীন্তন কালের সর্ব্বোত্তম শিক্ষিত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। প্রাচীন প্রাচ্যের ইতিহাস এবং মিশরের প্রাজ্ঞতা উভয়ই সমভাবে তিনি সমাদর করতেন। তদানীন্তন কালে পৃথিবীর সভ্য মানব সমাজে যে সব দৈববাণী ব্যাপ্ত হয়েছিল তন্মধ্যে আমুনের দৈববাণী বিশেষভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলেই প্রখ্যাত ছিল। বর্ত্তমানে মাটরু থেকে মরুভূমির ওপর নির্ম্মিত পথ ধরে সিওয়াতে আসতে আট ঘণ্টা লাগে আধুনিক পরিবহনের মাধ্যমে ; সহজেই অনুমেয়, আলেকজাণ্ডারের পক্ষে এখানে আসতে কতদিনই না লেগেছিল, অন্ততঃ আট দিন তো বটেই। এখানে রয়েছে প্রাচীন চৌবাচ্চা। গ্রীকরা মিশর জয় করার বহু পূর্ব্বে এই সব চৌবাচ্চা নির্ম্মিত হয়েছিল। এগুলি এখন বেদুইনরা ব্যবহার করে। দেবালয় ও গুপ্ত প্রবেশ পথ আজও দর্শকের চিত্তকে বিস্ময়াপ্লুত করে। এই গুপ্ত প্রবেশপথ পুরোহিতরা ব্যবহার করতেন ; যে সময় তাঁরা দৈববাণী উচ্চারণ করে জানিয়ে দিতেন ভবিষ্যতের ফলাফল আর এই বাণী স্বয়ং দেবতারই উচ্চারিত বলে গ্রহণ করা হোত। মন্দিরটি প্রকাণ্ড প্রাচীরের সঙ্গে নির্ম্মিত, সমান্তরাল ভাবে স্থাপিত হয়েছে একটি আভ্যন্তরীণ কক্ষ। কিন্তু এই দেওয়ালের মধ্যে প্রবেশ-পথের সন্ধান দর্শকদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। তিনটী কুলুঙ্গি, তারপর ছাদের আভ্যন্তরীণ দিকের নিকটে দুটি ছোট প্রবেশ দ্বার গিয়ে পৌঁচেছে মাটির নিম্নস্থ গর্ভগৃহে। মন্দিরের এই মঠ কুলুঙ্গি, ও গর্ভগৃহের মধ্যে যে প্রস্তরটি আছে, সেটি পাতলা। বারান্দায় পুরোহিতরা দাঁড়িয়ে থাকতেন মন্দিরের ভেতর থেকে বাণী শুনবার জন্যে। লুকায়িত পুরোহিত যখন বলতে শুরু করতেন তখন মনে হোতো আওয়াজটি যেন অনেকদূর থেকে ধ্বনিত হচ্ছে এবং অন্যান্য পুরোহিতরা ছাড়া মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ সকলেই নিশ্চয় বিশ্বাস করতো যে এসব কথা দেবতার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে।

আমুনের দৈববাণীপ্রার্থিগণের উত্তর তিন প্রকারের মধ্যে যে কোন এক প্রকারে দেওয়া হতো। প্রথম যখন দেবমূর্ত্তি নৌকার ওপর তুলে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করানো হোতো, সে সময় প্রশ্ন করার নির্দ্দেশ দেওয়া হোতো। নৌকায় ঈষৎ চলন বা আন্দোলনই প্রশ্নোত্তর বলে ঘোষিত হোতো। উত্তরটী চলনের অবস্থানুসারে পুরোহিত বলে দিতেন। দ্বিতীয় প্রকারে বলার রীতি ছিল—সেটী হচ্ছে দৈববাণীপ্রার্থীকে দুটি প্রশ্ন লিখতে হোতো—প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর হাঁ কিম্বা না ছাড়া আর কিছু হোতো না। তৃতীয়—একেবারে মন্দিরের ভেতর থেকে গর্ভগৃহ হোতে বেরিয়ে আসতো দেবতার প্রত্যক্ষ বাণীরূপে। আলেকজাণ্ডার যেখানে দাঁড়িয়ে দৈববাণী শুনেছিলেন, সেস্থানটী এখনও দেখানো হয়। আলেকজাণ্ডার পুরোহিতের মাধ্যমে আমুন দেবতার সঙ্গে গোপনে কথাবার্ত্তা বলেছিলেন। শেষে তাঁর অনুচরবর্গেরা তাঁকে এবিষয়ে বহু প্রশ্ন করেছিলেন। ম্যাসিডনের অধিপতি উত্তরে বলেছিলেন তিনি এমন কিছু শোনেননি যা তাঁর হৃদয় খুসী করতে পারেনা। তিনি কিযে দৈববাণী পেয়েছিলেন তা কোন রকমেই সংবাদটি প্রকাশ করেননি। পরে আলেকজাণ্ডার তাঁর মাতা অলিম্পিয়াসকে লিখেছিলেন যে তিনি দৈববাণীর মাধ্যমে গুপ্ত উপদেশ পেয়েছেন এবং যথাযথভাবে তাঁকে জানাবেন মায়ের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কিন্তু পুত্র পুনরায় তাঁর মাতার দর্শন আর পাননি। আমুনের দৈববাণীর গুপ্তরহস্য দিগ্বিজয়ী বীরের সঙ্গে সমাধির মধ্যে মিশে গেল। সিওয়ার মরুস্থানে একটি চিত্রিত কবর আছে। পশ্চিম মরুভূমিতে এরূপ উত্তম চারুকলার নিদর্শন কোথাও নেই। এই কবরটি জনৈক সিয়ামুনের—১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ডক্টর ফাকরি এর পরীক্ষা শেষ করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কতকগুলি দেওয়াল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যরা বিকৃত করে গেছে।

মিশরের কোন কবরের শিরোনামায় উষ্ট্র সম্বন্ধে উল্লেখ নেই, কেবল বাইবেলে জেনিসিসের (১২ : ১৬) মধ্যে আব্রাহামকে জনৈক ফারাও এই প্রাণী দান করেছিলেন, এরূপ কথা বলা হয়েছে। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে আরবেরা মিশর আক্রমণ করে। এদের আমলেই উষ্ট্র এখানে সাধারণের ভেতর প্রচলিত হয়। উষ্ট্র কিনবার সময় তার খুর আর দাঁত পরীক্ষা করে নেওয়া হয়।

সাক্কারাতে মিশরের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধিকর্ত্তা জনাব জাকারিয়া ঘোনেইয়াম ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে একটি পিরামিড খনন করে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণালঙ্কার শ্বেত প্রস্তরের পাত্র হাতীর দাঁতের ফলক বহুমূল্যের দ্রব্যাদি পেয়েছেন। এই পিরামিড রাজা সেখেম খেতের বলেই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রাচীনকালে মিশরের অধিবাসীরা নাইল নদীর উচ্চঅংশটাকে সুদানে যাবার পথ রূপে ব্যবহার করতো। সুদানে সে সময় হাতীর দাঁত ও স্বর্ণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেতো।

প্রাচীনকালে নাইল নদের বন্যায় আর কৃত্রিম উপায়ে শস্যক্ষেত্রে জল সেচ হোতো। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আসোয়ান নামক স্থানে একটি বাঁধ নির্ম্মিত হয়েছে। আসোয়ান ডাম সৃষ্টি হওয়ার ফলে আবু সিম্বিলের কাছে বিশাল জলরাশি ১৮০ মাইল পথ ধরে নিম্নাভিমুখী হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। লুবিয়া মরুভূমির অজস্র বালুকা এসে নদীর সবুজ তীরে ভিড় করেছে, ফলে সৃষ্টি হয়েছে বালুতট। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে নদী তীরবর্ত্তী বহু গ্রাম আর প্রাচীন মন্দিরগুলি বন্যাবিধ্বস্ত হওয়ায় বহু লোক বিপন্ন হয়েছে। ঐ আসোওয়ান ডামে নীল নদের জল সঞ্চিত থাকে, আর সেখান থেকে খাল দ্বারা বহুদূরের কৃষিক্ষেত্রগুলিতে এই জল নিয়ে যাওয়া হয়। আসোয়ান বাঁধ ছাড়া নাইল নদে আরও অনেক ড্যাম বা বাঁধ আছে। নাইল নদে ষ্টিমার চলে।

মিশর নদীমাতৃক দেশ। সমস্ত দেশটি নীলনদবাহিত মৃত্তিকায় গড়ে উঠেছে আর নাইলের জল প্রবাহে উর্ব্বর। পশ্চিম দিক থেকে বার-এল্-গজল উপনদী এর সঙ্গে মিশে যাবার পর এর নাম হয়েছে হোয়াইট নাইল। নাইলের আর একটি প্রধান উপনদী ব্লু নাইল। এছাড়া আটবারা ও সোবাট এদুটি উপনদীর নামও উল্লেখযোগ্য। মিশরে বৃষ্টিপাত বিশেষ হয় না, নাইল নদীর জলের ওপরেই নির্ভর করছে

মিশরের অন্ন। একজন্যেই মিশরকে বলা হয় 'নাইলনদের দান'। Egypt is the gift of the Nile.

তোমরা সময়ও সুযোগ পেলে এদেশ ঘুরে আসবে। দেখে আসবে প্রাচীন সভ্যতার লীলাস্থল, প্রচুর আনন্দ পাবে আর জ্ঞান সঞ্চয়ও হবে। এদেশের লোকের ব্যবহারও অতি সুন্দর।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাহিনীর সার-মর্ম :

মৃত্যুবাণ

সৌম্য গুপ্ত

[এটি হলো ইতালী দেশের বিশিষ্ট একটি সুপ্রাচীন কাহিনী। তবে দুঃখের বিষয়, এ-কাহিনীর লেখকের নাম অজ্ঞাত। কারণ, সুদীর্ঘ কালের স্রোতে তাঁর নাম আজ বিস্মৃতির অতল-তলে হারিয়ে গেছে।]

এক সাধু তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়ান···ভগবানের ধ্যান-ধারণা করেন···লোকজনের হিতসাধন করেন···ধন-জনের কোনো কামনা নেই···সম্পূর্ণ নির্লোভ এবং ধর্ম্মপরায়ণ।

একদিন তিনি অরণ্য-পথে চলেছেন···মাথার উপর প্রখর সূর্য্য যেন অনল বর্ষণ করছে। শ্রান্ত হয়ে সাধু এক বৃক্ষতলে বসলেন ক্ষণকাল বিশ্রামের জন্য···বসে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন—অদূরে এক গিরি-গুহায় তীব্র ঝলকে যেন আগুন জ্বলছে!

কিসের আগুন?···সাধু উঠে দেখতে চললেন। গিয়ে দেখেন—গিরিগুহায় সোনার বড়-বড় চাঙড়! দেখেই সাধু সেখান থেকে ছুটে পালালেন।

ছুটতে ছুটতে তিনি চলেছেন···মুখে-চোখে রীতিমত আতঙ্কের ভাব! খানিকদূর আসবার পর তিনজন চোরের সঙ্গে দেখা। সাধুকে ভয়ে ছুটে আসতে দেখে চোরেরা বললে,—কি হয়েছে সাধুজী? কিসের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছেন?

সাধু বললেন—সাক্ষাৎ মৃত্যু···মৃত্যুবাণ উঁচিয়ে আছে—তার ভয়ে পালাচ্ছি!

চোরেরা বললে—বটে! কোথায় সে মৃত্যুর বাণ? আমরা তাকে ঢিট্ করে দেবো।

চোরদের কথায় তাদের নিয়ে সাধু এলেন সেই গিরি-গুহার কাছে···এসে সেই সোনার চাঙড় দেখিয়ে বললেন—ঐ···ঐ যে মৃত্যু!

চোরেরা হো-হো করে হেসে উঠলো···তারা সাধুকে বললে,—যাক্ সাধুজী, আপনার কোনো ভয় নেই! আমরা এ মৃত্যুকে এখনি ঢিট করে দেবো।

সাধু চলে গেলেন। তিনি চলে যেতেই চোরেরা বললে,—বরাত জোর! এমন সোনার তাল···তিনজনে লাখপতি হয়ে যাবো···আর চুরি-চামারির হাঙ্গামা থাকবে না। এই সোনার তাল তিনজনে ভাগ করে সকলে সমান-সমান বখরা নেবো।

তিন চোর মহাখুশী। ছোট খানিকটা সোনার তাল কুড়িয়ে নিয়ে তারা ঠিক করলে—একজন যাবে সহরে···সেখানে এ সোনা বেচে ভালো পোষাক-আশাক—আর প্রচুর খাবার কিনে আনবে। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে ভবিষ্যুক্ত পোষাক পরে তিনজনে সোনার চাঙড় নিয়ে বাড়ী ফিরবে। ফিরে বড়মানুষী চালে বাস।

এই ব্যবস্থামতো একজন চোর সোনার একটি তাল নিয়ে সহরে গেল। সেখানে সে সোনা বেচে অনেক টাকা পেলো···সেই টাকায় খুব দামী পোষাক-আশাক কিনে রাখলো···তারপর খাবারের দোকানে বসে ভালো-ভালো সব খাবারদাবার খেতে-খেতে ফন্দীবাজ চোর ভাবলো—ওদের জন্য যে সব খাবার নিয়ে যাবো, তাতে বিষ মিশিয়ে নিয়ে যাই···সে খাবার যেমন খাবে, ওরা অমনি মারা যাবে! তখন সব সোনার তাল হবে আমার! কী মজাই না হবে তাহলে!···

ফন্দীবাজ চোর তাই করলো···সে তখন অন্য দুজন চোরের জন্য ভালো খাবার কিনে, সে-খাবারে বিষ মেশালো—তারপর দামী পোষাক-আশাক নিয়ে ফন্দী-বাজ চোর ফিরলো গিরিগুহায়।

ওদিকে গিরিগুহায় বসে অন্য দুজন চোর ইতিমধ্যে মতলব এঁটেছে—তৃতীয় বন্ধু যেমন সহর থেকে ফিরে আসবে, অমনি কোনো কথা নয়—এরা দুজনে আচম্কা তার বুকে ছোরা বিঁধিয়ে তাকে মেরে ফেলবে···তাহলে একজন ভাগীদার হবে সাফ্···এরা দুই চোর দু'ভাগে এ সোনা নিয়ে ভোগ করবে!

কিছুক্ষণ পরেই সহর থেকে খাবার-দাবার আর পোষাক-আশাক নিয়ে ফন্দীবাজ চোর ফিরলো গিরিগুহায়…এসে বললে—এই নাও পোষাক : আর এই এনেছি খাবার—মনের আনন্দে খাও…কত খাবে !

অন্য দুই চোর কিন্তু কোনো কথা বললে না। তৃতীয় চোর যেমন খাবার আর পোষাক রাখলো গুহার পাশে নামিয়ে, অমনি তারা দুজনে দুদিক থেকে তার বুকে বিঁধিয়ে দিলে ধারালো কিরীচের খোঁচা। তৃতীয় চোর সে খোঁচার আঘাতে তখনি প্রাণ হারালো।

এমনিভাবে ভাগীদার-সঙ্গীকে সাফ্ করে ফেলে, অন্য দুই চোর তখন মহানন্দে সেই খাবার খেতে বসলো। কিন্তু খাবারে ছিল বিষ…যেমন খেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি মরে ঢুলে এদের দুজনের দেহ মাটীতে লুটিয়ে পড়লো।

* * * *

সাধু সাধে ও সোনা দেখে মৃত্যুবাণ বলে ভয়ে পালিয়ে ছিলেন…সোনায় লোভ হবে…তারপর…

লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু…বিধির বিধান ! সোনা নয়, ও সত্যই মৃত্যুবাণ !

—
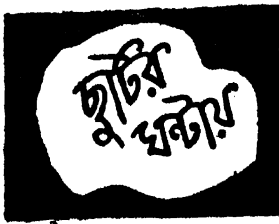
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের যে বিচিত্র মজার খেলাটির কথা বলবো, সেটির নাম—'বিনা রঙ-তুলি-কলম-পেন্সিলে রহস্যময় চিত্র-রচনা' ! এটিও হলো কৃত্রিম-উপায়ে 'বৈদ্যুতিক-চুম্বক' (Electro-Magnet) সৃষ্টির খেলা। ঠিকমতো কায়দা করে মজাদার এ খেলাটি তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে দেখাতে পারলে, তাঁদের তোমরা রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে। এখন বলি শোনো—এ খেলা দেখানোর আসল কায়দা-কানুনের কথা।

বিনা রঙ-তুলি-কলম-পেন্সিলে রহস্যময় চিত্র-রচনা :

বিজ্ঞানের এই বিচিত্র-অভিনব মজার খেলাটি দেখাতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খেলা দেখানোর জন্য দরকার—তিন টুকরো কার্ডবোর্ড, খানিকটা তামার তার (Bell-wire), টর্চ-লাইটের নতুন একটি ব্যাটারি (Battery), আঠা-লাগানো কাগজের ফিতা (Gummed Paper-Tape) এক গজ, এবং খানিকটা মিহি-ধরণের লৌহচূর (Iron-filings)। এ সব সরঞ্জাম
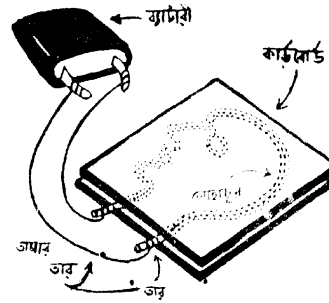
সংগ্রহ হবার পর, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে তেমনি-ধরণে এক টুকরো কার্ডবোর্ডের উপরে মানুষের মুখের বা কোনো ফুল-পাতা কিম্বা অন্য কোনো কিছুর একটি নক্সা এঁকে নাও। তারপর ঐ নক্সার কিনারা বরাবর কাঁচি বা ছুরি চালিয়ে সেই আঁকা-ছবির ছাঁদে কার্ডবোর্ড-টিকে আগাগোড়া ছাঁটাই করে নাও। মানুষের নকসা আঁকলে, চোখের অংশটুকুও ছাঁটাই করতে ভুলো না যেন। এবারে ঐ মানুষের মুখের ছাঁদে ছাঁটাই-করা কার্ডবোর্ডের টুকরো-টিকে, অন্য একটি চতুষ্কোণ-কার্ডবোর্ডের গায়ে পরিপাটি-ভাবে সেঁটে দাও। তারপর ঐ মানুষের মুখের ছাঁদে ছাঁটাই-করা কার্ডবোর্ডের টুকরোটির চারিদিকে তামার তারটিকে আগাগোড়া প্রতিটি রেখার পাশে-পাশে সুষ্ঠুভাবে জড়িয়ে দিয়ে, আঠা-মাখানো কাগজের ফিতার ছোট-ছোট ফালি এঁটে, কার্ডবোর্ডের টুকরো দুটির সঙ্গে তামার তারটিকে

পাকাপাকি-ধরণে জোড়া দিতে হবে—যাতে তারের কোনো অংশই কার্ডবোর্ডের অঙ্গ থেকে এতটুকু খশে না পড়ে!…

এ কাজ সারা হলে, আঠা-মাখানো কাগজের ফিতার ফালির সাহায্যে কার্ডবোর্ডের তৃতীয় টুকরোখানিকে বেশ পাকাপাকিভাবে উপরোক্ত তার-জড়ানো কার্ড-বোর্ডের টুকরো দুখানির সঙ্গে সেঁটে দিতে হবে। এবারে ঐ জোড়া-দেওয়া কার্ডবোর্ড তিনটিকে ঘরের সমতল মেজেয় কিম্বা টেবিলের উপর চিৎ (Flat) করে সাজিয়ে রেখে, কার্ডবোর্ডের উপর লোহাচুর ছড়িয়ে দাও।

কার্ডবোর্ডের উপর লোহাচুর ছড়িয়ে দেবার পর, মানুষের মুখের-ছাঁদে-জড়ানো তামার তারের অতিরিক্ত অংশের লম্বা দুটি মুখ সংযুক্ত করে দাও টর্চের ব্যাটারির প্রান্তে দুটি তামার-পাতের সঙ্গে—উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে। এবারে ধীরে ধীরে আঙুলের টোকা দাও ঐ কার্ডবোর্ডে, তাহলেই দেখবে—টর্চের ব্যাটারি থেকে বৈদ্যুতিক-শক্তি প্রবাহিত হয়ে এসে তামার তার চুম্বকে রূপান্তরিত করবে এবং এই কৃত্রিম-উপায়ে রচিত চুম্বক-শক্তির আকর্ষণে কার্ডবোর্ডের উপরে ইতস্তত-ছড়ানো লোহাচুরের টুকরোগুলি সব ক্রমশঃ নীচেকার গুপ্ত-তারের নক্সার কাছে সরে এসে রচনা করবে মানুষের মুখের ছাঁদে এক রহস্যময় চিত্র!

এই হলো বিজ্ঞানের বিচিত্র মজার এ খেলাটির রহস্য। এবার তোমরা নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে স্থাখো এ খেলার কায়দা-কানুন।

আসছে বারে এমনি ধরণের আরো কয়েকটি মজার মজার বিজ্ঞানের খেলার কথা বলবো তোমাদের।

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। আধুলির হেঁয়ালি ঃ

উপরের ছবিতে দেখছো—পাশাপাশি একই লাইনে চারটি আধুলি রাখা আছে। এই চারটি আধুলিকে সমতল টেবিল বা মেঝের উপর এমনভাবে সাজিয়ে বসাও, যেন এই চারটিতে মিলে একটি চতুষ্কোণ (square) রচনা করে।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি' ঃ
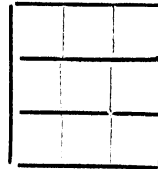
পাশের খোপগুলিতে ১ থেকে ৯ পর্য্যন্ত নয়টি সংখ্যা এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে কোনাকুনি, আড়াআড়ি এবং লম্বালম্বি—সব দিক থেকে তিনটি সংখ্যা যোগ করলে মোট যোগফল হবে ১৫। বলা বাহুল্য যে একটি সংখ্যা একাধিকবার ব্যবহার করা চলবে না।

রচনা : বিশ্বজিৎ, ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়, মানস মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু ও আশীষ (কলিকাতা)

৩। ছয়টি ডিমকে এমনভাবে চার লাইনে সাজিয়ে রাখো যেন, প্রত্যেক লাইনে যেন তিনটি করে ডিম থাকে।

রচনা : রেবা মুখোপাধ্যায় (গিরিডি)

ভাদ্র মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। কলিকাতা থেকে বৃন্দাবন যাত্রার হেঁয়ালির উত্তর ঃ
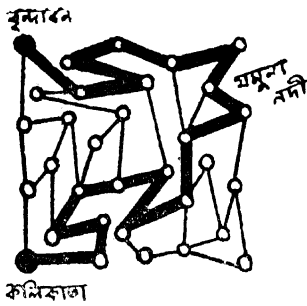
পাশের ছবিতে দেখানো তীর-চিহ্নিত পথে যাত্রা করলে মোট ১৮টি তীর্থ ঘুরে যাত্রীরা যমুনা নদীতে স্নান সেরে বৃন্দাবনে পৌঁছুতে পারবে।

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধার উত্তর ঃ

১। 'কিশোর-জগতের' কোনো সভ্য-সভ্যাই ভাদ্র মাসের প্রথম হেঁয়ালিটির সঠিক উত্তর দিতে পারেনি, তাই কারো নাম প্রকাশিত হলো না।

২। বিছানা

৩। কচুরি

ভাদ্রমাসের বাকী দুইটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

১। নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় (মুর্শিদাবাদ)

২। অরিন্দম, সুপ্রিয়া ও অলকানন্দা দাস (কৃষ্ণনগর)

৩। ছোটন, খোকন, নীনা ও বাচ্চু মাষ্টার (রামপুরহাট)

৪। সন্তু, বুবু, পুপু, হেমু ও মন্টি (গয়া)

৫। সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর)

৬। কমলেশ মুখোপাধ্যায় ও বিমলকৃষ্ণ দত্ত (সারতা)

৭। রামহরি চট্টোপাধ্যায় (নবদ্বীপ)

৮। বিনয় ও মঙ্গলময় মুখোপাধ্যায় (রামপুরহাট)

৯। রাধাগোবিন্দ, কানাই ও মহম্মদপুর দেশপ্রাণ বিদ্যাপীঠের ছাত্র-সংসদের সভ্যবৃন্দ (মেদিনীপুর)

১০। বিশ্বজিৎ, ফাল্গুনী, সানাই, টুনু, সুনীল, নন্দিনী, পুতুল, সচ্চিদানন্দ, পার্থ, তপন, খুচি ও ছোট আপেল (কলিকাতা)

১১। অপূর্বকুমার সরকার ও অমিতকুমার বসু (কলিকাতা)

১২। মণীন্দ্র, রবীন্দ্র ও রেবা মুখোপাধ্যায় (গিরিডি)

১৩। কৃষ্ণা, কাবেরী, সুরজিৎ, সৌমিত্র, অমিতাভ ঘটক (?)

১৪। অর্চনা, অপর্ণা, কৃষ্ণা, টুকুন, ডিলু, মিলু ও প্রদ্যোৎ মিত্র (জয়নগর)

১৫। কল্যাণকুমার গোস্বামী ও গৌরাঙ্গ রায় (কলিকাতা)

১৬। আলো, লীলা ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কলিকাতা)

১৭। বেনু ও রুণু চক্রবর্ত্তী (জগদলপুর)

আশ্বিন মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। বাড়ী সাজানোর হেঁয়ালির উত্তর ঃ

সাতাশ মাইল দীর্ঘ বৃত্তাকার-পথের ধারে ধারে ছয়টি বাড়ী ১, ১, ৪, ৪, ৩ এবং ১৪ মাইল দূরে-দূরে সাজিয়ে রাখলেই এ হেঁয়ালির সমাধান হবে।

২। ধাঁধাঁর উত্তর

২। জানালা

৩। দাঁত

৪। চাপাটি

আশ্বিন মাসের প্রথম হেঁয়ালির সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

১। আলো, লীলা ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কলিকাতা)

'কিশোর-জগতের' সভ্য সভ্যাদের রচিত দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

১। আলো, লীলা ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কলিকাতা)

২। কাবেরী, অমিতাভ, অলকানন্দা ও পঙ্কা (বাসদ্রোনী)

৩। চিণ্ময় ও প্রদ্যোৎ মিত্র (জয়নগর)

৪। বাপ্পা ও পম্পা সেন (কলিকাতা)

আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় ধাঁধার উত্তর দিয়েছে ঃ

১। রবীন্দ্রনাথ দিনদা হেমন্তকুমার জানা, চিত্রলেখা চৌধুরী (সোনালিপুর)

২। সত্যেন্দ্র, পরাগ, সুরাগ, সিপ্রা ও ইলা হাজরা (বড়বড়িয়া)

'কিশোর-জগতের' কোনো সভ্য-সভ্যাই আশ্বিন মাসের তৃতীয় ধাঁধার সঠিক উত্তর দিতে পারেনি, তাই কারো নাম প্রকাশিত হলো না।

পাগ্‌লী

শ্রীঅসিতকুমার ভট্টাচার্য

মেয়েটা আদর পেয়ে পেয়েই যেন
মাথায় উঠে গেছে,
তাই এখন ওকে যায় না ফেলা
মিষ্টি কথার প্যাঁচে
কেবল নিজের খেয়াল মতো
আজগুবি সব বায়না যতো
ধ'রবে, এবং না পেলেই
বিশ্রী বিকট স্বরে
চেঁচিয়ে পাড়া তুলবে মাথায়
কান্নাকাটি করে।

বাবা যখন ব'সবে খেতে,
বল্‌বে তখন হেসে,
"বাবা, তোমার থালার 'পরে
ব'স্‌বো আমি এসে ?"
যেই না বাবা ব'ল্‌বে, "না, না,"
যখুনি মা ক'রবে মানা,
অম্নি ও ঠিক থালার 'পরে
এক পা দেবে তুলে
আর খিল্‌খিলিয়ে হাসবে কেবল,
নাচবে দুলে দুলে!

দাদু ওকে আদর ক'রে
পাগ্‌লী ব'লে ডাকে,
আদর পেয়ে পাগলী চাপড়
মারবে দাদুর টাকে!
দাদু তখন বল্‌বে, "ওরে,
আরেকটু মার জোরে জোরে
তোর চাপড় খেতে সত্যি আমার
বড্ড ভালো লাগে,
মিষ্টি এ যে চিনির মতন
জান্‌তো কে বা আগে ?"

সেদিন দুটো বেড়ালছানা
ঘুমিয়ে ছিলো ছাতে,
ওদের এনে ফেল্‌লো টেনে
দুধের কড়াইটাতে।
বেড়াল দুটো মজা-ই পেয়ে
সবটুকু দুধ ফেল্‌লো খেয়ে,
পাগ্‌লী বলে, "এক্‌লা খেলি ?
তোদের সাথে আড়ি,
তোদের নিয়ে যাবো না আর
আমার মামার বাড়ী!
মামারবাড়ী গেলো না আর,
বছর কয়েক পরে,
পাগলী ক'নে বউটি সেজে
চ'ল্‌লো পরের ঘরে।
মা ব'ললেন, "লক্ষ্মীটি মা
দুষ্টুমি তোর এবার থাম।"—
পাগলী তখন মুখ নামিয়ে
ব'ল্‌লো শুধু—"ছিঃ,
পরের বাড়ী দুষ্টুমি আর
ক'রতে আছে কি ?"

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

তপস্বী কাঁকড়া: এরা হলো বিচিত্র একজাতের কাঁকড়া – সাগর-জলে পাথরের আশেপাশে বাস। অন্য কাঁকড়াদের মতো এদের দেহ, শক্ত-খোলার বর্ম্ম-আবরণে ঢাকা নয়… আবরণের জন্য এ-জাতের কাঁকড়া সামুদ্রিক শামুক, গেঁড়ি-গুগ্‌লীর পরিত্যক্ত-খোলার মধ্যে আশ্রয় নেয়… সে খোলার-খোলোশের ফাঁকে এরা শুধু পা আর পিছন ও সামনের দিকের দাড়া এবং শুঁড়টুকু বার করে বাইরে উঁকি মারে। এদের পিছন দিকে থাকে আংটার মতো দেহাংশ, যেটির সাহায্যে এরা খোলার আবরণে শরীর আটকে রাখে – দেখলে মনে হয় যেন কোন ঋষি – গুহা থেকে উঁকি দিচ্ছেন।

দেসমান: এরা হলো বিচিত্র ধরণের জীব ছুঁচো আর ভোঁদড়ের জাতভাই। এদের চেহারা কিম্ভুত-ছাঁদের – ছুঁচোলো শুঁড়ের মতো নাক, লম্বা ল্যাজ আর হাঁসের মতো চ্যাটাল পায়ের প্যাতা কিন্তু তাতে বড় বড় নখ থাকে, গাটি ছুঁচো আর ভোঁদড়ের মতো লম্বা-নরম লোমাবৃত। এদের বাস জলা-নদীর কিনারে ঝোপঝাপ-জঙ্গলে। বড়-আকারের 'দেসমান' প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় রাশিয়ায় এবং ছোট আকারের এসব জীব মেলে পিরেনিজ অঞ্চলে
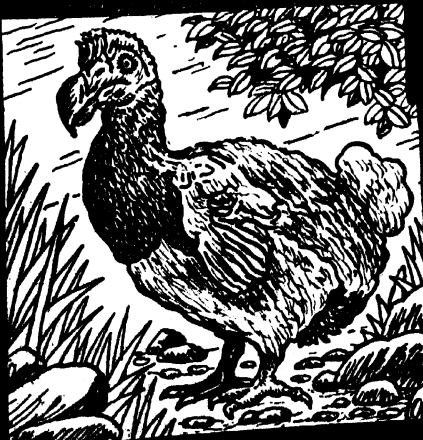
ডোডো: এরা এক বিচিত্র-ধরণের পাখী… পায়রার জাত – তবে আকারে বিরাট – কতকটা 'টার্কী' পাখীর অনুরূপ। এদের বংশ আজ পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুকাল আগেও এসব জীব প্রচুর দেখতে পাওয়া যেতো আফ্রিকার পাশে 'মরিশাস্' দ্বীপে। সে দ্বীপ ওলন্দাজ-কবলে আসার একশো বছরের মধ্যেই এরা ক্রমশঃ মানুষের শীকারের জীব হিসাবে একেবারেই নির্ব্বংশ হয়ে গেছে। এদের মাংস ছিল পরম সুস্বাদু এবং স্বভাব নিতান্ত নিরীহ। কাজেই ছিল সহজ বধ্য

কবি শৌরীন্দ্রনাথ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি শৌরীন্দ্রনাথের সহিত আমার প্রথম পরিচয় পরস্পরের লেখার মধ্য দিয়ে। সে অবস্থায় কেউ কাউকে দেখিনি। পরে কর্ম্ম জীবনে আমি যখন কয়েক বছর মুর্শিদাবাদ জেলায় ছিলাম তখন তাঁর সহিত সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য ঘটে, কারণ তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাসিমবাজারের অধিবাসী। তার ফলে যে সৌহার্দ্দ প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে আমার স্থানান্তর গমন ক্ষুণ্ণ করে নি এবং আমৃত্যু তাঁর স্নেহ ও প্রীতি পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মানুষটি ছিলেন ক্ষীণাঙ্গ ও স্বল্পভাষী। তাঁর রচনার সহিত পরিচিত না থাকলে বোঝা যাবে না যে তাঁর সেই ক্ষীণ দেহে কত তেজ তিনি ধারণ করতেন।

মনে হয় তাঁর নিজের পরিচয় তিনি যেন তাঁর স্বরচিত কবিতার (বৈরাগীর) মধ্যে দিয়ে গেছেন। এই বৈরাগীর কাজ হল—"কৃষ্ণ পরমায় সুধা বিতরণ।" তাঁর ছিল জীবনে সেই কাজই একমাত্র আকর্ষণ। খেতে হবে, পরতে হবে, তার জন্য অর্থ উপার্জ্জন করতে হবে—এ সব বিষয়ে তিনি মনোযোগ দিতেন না। লেখার মধ্য দিয়ে কবির ভাগ্যে আর অর্থাগম কত হয়? কিন্তু তার জন্য তাঁর কোনো ভাবনা ছিল না। উদরে অন্ন না জোটে, মন ত তাঁর উপবাসী থাকত না। কৃষ্ণরস-মধুরী তাঁর আহার নিয়তই জোগাত। শেষ বয়সে ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমান সাহিত্যিক বৃত্তির ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তাঁর অর্থকৃচ্ছতার কিছু লাঘব ক'রে দিয়েছিলেন। সে বৃত্তি না জুটলেও তিনি নিজেকে সম্ভবত দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিবেচনা করতেন না। কারণ, তাঁর "চিত্ত চিদানন্দে দোলে", কৃষ্ণ নামে বক্ষ ভ'রে, তিনি "আত্মভোলা"। তাই

> করছে সে যে নিত্য ফেরী কৃষ্ণ পরমায় সুধা
> নিত্য তারি বিত্ত লাভ তৃপ্ত হল চিত্ত ক্ষুধা।
> অর্থে সে অনর্থ ভাবি সার করেছে ছিন্ন ঝোলা,
> একটি মুঠি ভিক্ষা লাভ আনন্দে সে আত্মভোলা।
>
> (বাংলার বাণী)

তাঁর রচনা পাঠ ক'রে মনে হয় তিনি ছিলেন মনে প্রাণে পরম বৈষ্ণব। কিন্তু তাঁর সেই বৈষ্ণবত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। মন্দিরে পূজা বা উপাসনা ক'রে তিনি তৃপ্তি পেতেন না। তিনি বলেছেন—মন্ত্রের মধ্যে প্রাণ নাই, পূজার মধ্যে ভগবানকে মেলে না, তথাকথিত ধর্ম্মাচরণে কেবল নানা সংস্কারের বোঝা জমা হয়ে ওঠে!

> ফাঁকা সে মন্ত্র নাহি তার প্রাণ,
> পূজার মাঝারে নাহি ভগবান,
> সত্যেরে চাপি সংস্কার শুধু বেড়ে ওঠে
> পলে পলে।
>
> (পদ্মরাগ)

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দুটি রূপ তাঁর মনকে অতিশয় মুগ্ধ করেছিল। প্রথমটি হল—তাঁর "রসিক শেখর" রূপ। বিশ্ব জুড়ে ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা ভিত্তি ক'রে যে অনন্ত রসের ধারা প্রবাহিত তিনি যেন তার কেন্দ্রস্থল। এখানে তিনি বংশীধারী বেশী। তাঁর বাঁশী নিরন্তর বেজে সেই রস ধারাকে প্রবাহিত রাখে, তাঁর বাঁশী হল সেই রস প্রবাহিণীর উৎস:—

> অনন্ত রসের কেন্দ্রে হে কেন্দ্রীয় রসিক শেখর
> এ কী বাঁশী বাজে নিরন্তর?
>
> (পদ্মরাগ)

তাঁর অপর রূপটি হল—কলুষ-হরণ, বিঘ্ন-বিনাশন, পাঞ্চজন্য-শঙ্খধারী পার্থসারথি রূপ। এই রূপেই ভগবান ধর্ম্মের গ্লানি ঘটলে অধর্ম্ম নাশের জন্য অবতীর্ণ হন। তাঁকে কবি "ত্রি যুগের ধ্বংসরাজার ধ্বংসের অবতার" বলে অভিবাদন জানিয়েছেন। বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ যেমন রসের উৎস, পাঞ্চজন্যধারী শ্রীকৃষ্ণ তেমন বিঘ্ন-বিনাশন শক্তির উৎস। তাঁর পাঞ্চজন্যের আহ্বান সুপ্ত মানুষকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে আত্মনিবেদনের আহ্বান, অন্যায় ও অত্যাচারকে প্রতিরোধ এবং ধ্বংস করতে আহ্বান:—

> দাঁড়িয়ে শোণিত-সিক্ত কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন পরে
> পাঞ্চজন্য পরশি অধরে—

করিলে উদাত্ত স্বরে যেই দিন শক্তির বোধন,
সুপ্ত নিদ্রা ভাঙি করে কর্ম্মে আত্ম নিবেদন।

(পদ্মরাগ)

শ্রীকৃষ্ণের এই আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী দুটি ধর্ম্মে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তাঁর জীবনেও মনে হয় এই দুটি বিপরীত ধর্ম্ম বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর প্রথম জীবনে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমময় রূপের কীর্ত্তনই যেন প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। বাংলা দেশের শ্যামল গ্রামের কোলে বসে শ্যামসুন্দরের প্রতি অনির্ব্বচনীয় ভক্তি তাঁর বুকে যে দোলা দিয়েছিল, তাকেই তিনি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় তাঁর কাব্যের মধ্যে স্থায়ী-রূপে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই তা ভাল ক'রে জানতেন। তাই লিখেছিলেন,—

শ্যাম বনের কুঞ্জে গগনে
দুলিছে শ্যামের দোল
সেই দোলে দোলে দুলিতেছে মোর
জীবনের হিন্দোল।
হিন্দোলা তলে দিয়েছি বাঁধিয়া
জীবনের প্রেম ফাঁসি,
শ্যামসুন্দরে ঘিরে ঘিরে মোর
বাজে বাংলার বাঁশী।

(বাংলার বাঁশী)

শুধু "বাংলার বাঁশী" নয়, প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত তাঁর সকল কাব্যগ্রন্থেরই সুর বেজেছে শ্যামসুন্দরকেই ঘিরে ঘিরে। আশ্চর্য্য লাগে ভাবতে যে কেবল উত্তর কালে শেষ বয়সে তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল। দেশের মধ্যে অত্যাচার ও অনাচারের জঘন্য প্লাবন দেখে তিনি এমন রুষ্ট হয়েছিলেন যে নিজেই পাঞ্চজন্যধারী পার্থসারথীর কর্ত্তব্য বহন করবার ভার নিয়েছিলেন। সমাজের চারিপাশে কুসংস্কারের অচলায়তন, ঘুষখোরের কণ্টকবন, হিংসার কংস, দুঃস্থের শোষক, অতিধনদম্ভে স্ফীতি, মুনাফাবাজের গদী, খাদ্যে ভেজালের কারবারী, পুঁজিবাদের দম্ভ দেখে দেখে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছিল। এই অত্যাচার, অনাচার ও পাপস্রোতকে ধ্বংস করবার আহ্বান তিনি দেশের মানুষকে জানিয়ে গেছেন তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে। তার নামও দিয়েছিলেন তিনি "বাঁশীর আগুন"। তাঁর নূতন বাঁশীর সুর মানুষের মনে যে আগুন জ্বালাবে তা ধ্বংস ক'রে দিক—এরা যে পাপবাহিনী রচনা করেছে তাকে—এই ছিল তাঁর কামনা। আশ্চর্য্য লাগে ভাবতে এই ক্ষীণজীবী দেহে ছিল এত তেজ, এত দাহিকা-শক্তি।

এই ব্যতিক্রমের সুর কাব্যরসপিপাসুর মনে সত্যই আনন্দ দেবে। এ কবিতায় বিদ্যুতের দীপ্তি আছে, ঝঞ্ঝার বিনাশ-শক্তি আছে, আর আগুনের মত পুড়িয়ে সমাজকে ক্লেদ মুক্ত করবার শক্তি আছে। এখন তার দুয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

তিনি যে নূতন বাঁশী হাতে নিলেন তা শোনাবে না ভাব-বিলাসের সুর—তা শোনাবে এক নূতন সুর :—

আমার এই নয় তো বাঁশী মিলনের কুঞ্জবনের
অলিদের গুঞ্জরণের গান,
এ বাঁশী ঘুমের বনের মিলনের স্বপন ভাঙ্গ
সকলের দুঃখে পরিত্রাণ।

(বাঁশীর আগুন)

কবি তাই নিজে হলেন বজ্র, আর ঝঞ্ঝাকে নিলেন সাথী ক'রে—উদ্দেশ্য এই দ্বৈত অভিযানে অত্যাচারের, অনাচারের, অন্যায়ের বাহিনীকে পরাভূত করবেন।

আমি ভাই বজ্র তুই সাথী ঝঞ্ঝা,
দুই জনে মিলে চল্ চাহে আজ মন যা —
পৃথিবীটা দলি চল আছে যত সয়তান,
খলদের ঢিপিগুলো ক'রে দিব ময়দান।

(বাঁশীর আগুন)

আজ দেশে ধর্ম্ম অন্তঃসারহীন সংস্কার, অত্যাচার শান্তির মুখোস প'রে আত্মগোপন ক'রে আছে, ভদ্রসমাজে গুণ্ডার অভাব নাই :—

ধর্ম্মের ঘরে আজ মর্ম্মের বাণী নাই
শান্তির নামে সবে হতাশায় ঝুলছে,
ভদ্রের সাথে আজ গুণ্ডার ভেদ নাই
লুণ্ঠনে হত্যাতে সৃষ্টি যে তুলছে।

(বাঁশীর আগুন)

এখন তার প্রতিকার কি ? প্রতিকার ধ্বংস, ক্ষমাহীন হস্তে দুর্নীতির বিনাশ সাধন :—

যেথা দয়া নাই মায়া নাই
সেথা, ক্ষমা নাই ক্ষমা নাই
গুঁড়িয়ে দে চল্ যাই যেথা খুসী মন্ যা,

কড় কড় গুম গুম
ভাঙ তবে ঢুম ঢুম
দুর্নীতি নাশি আজি সৃষ্টিটা রঙ্গা,
আমি ছুটি বজ্র গো তুই সাথী ঝঞ্ঝা।

(বাঁশীর আগুন)

এই হল সংক্ষেপে কবি শৌরীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিচয়। রবীন্দ্র যুগে জন্মগ্রহণ ক'রে ও তাঁর দুর্ব্বার প্রভাব প্রতিরোধ ক'রে নিজস্ব পথে তিনি তাঁর প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছিলেন। অথচ নিজে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত। তাঁর শান্তি-নিকেতনে তিনি কিছুদিন শিক্ষালাভও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিকট ছিলেন শুধু ভারতের ঋষি নয়, 'ভুবনের ঋষি'—আর তাঁর শান্তি-নিকেতন হল শুধু ভারতের নয়, বিশ্বমানবের ধন। তবু তিনি গুরুকে অনুকরণ করেন নাই। নিজস্ব রীতিতে যে ভাবধারা তাঁর হৃদয়ে স্বতস্ফূর্ত হয়ে প্রকাশ নিয়েছে তার সেবাতেই তাঁর কাব্যশক্তি উৎসর্গ করেছিলেন তাই তাঁর কবিতা ছন্দে, ভাব-মাধুর্য্যে এবং স্বকীয়তাগুণে এমন উৎকর্ষলাভ করেছে।

প্রশ্ন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

গোপাল! বলো না সত্য—ছলনা কোরো না, নন্দলাল!
অভাবনীয় এ কী সব রটনা শুনি নিতি, হে গোপাল ?

কেহ বলে : তুমি যোগেন্দ্র, কেহ বলে : তুমি ভগবান!
ধ্যানী বলে : তুমি অন্তিম ধ্যান, জ্ঞানী বলে : তুমি জ্ঞান!
আমি দেখি : তুমি পীতবাস, শিশু অসহায় ব্রজবাল।
গোপাল! বলো না সত্য—ছলনা কোরো না, নন্দলাল।

কেহ বলে : তুমি নারায়ণ, এই জগতের কাণ্ডারী ?
কেহ বলে : তুমি অন্তরযামী, দয়াল দুঃখহারী!
আমি দেখি—তুমি কিছুই জানো না আমার মন, গোপাল
গোপাল! বলো না সত্য—ছলনা কোরো না, নন্দলাল!

লোকে বলে! তুমি রবি শশী তারা পবন ধরা আকাশ
কাল কালাতীত মায়া লীলা—সবি তোমার চরণদাস!
কেন করো তবে নিতি মীরা সাথে আড়ি, হ'য়ে লোকপাল
গোপাল! বলো না সত্য—ছলনা কোরো না নন্দলাল!

মীরা গায় : চাই শুনিতে সত্য কথা, বলো আজ খুলে :
হ'য়ে নিখিলেশ কী দুঃখে এলে চরাতে ধেনু গোকুলে ?
জটিল কথার থাক জল্পনা—বাজাও বাঁশি, গোপাল!
গোপাল। বলো না সত্য—ছলনা কোরো না, নন্দলাল!

ইন্দিরা দেবীর সমাধিপ্রাপ্ত হিন্দী মীরা ভজনের অনুবাদ

অপয়া

রণজিৎ ভট্টাচার্য

পুরাণো বাড়ীটার দোতলায় এই ছায়ান্ধকার ঘরটীকে এত কুৎসিত আর কোন দিন মনে হয়নি।

মহেশ দত্তর জীবনের সঙ্গে এই ঘরখানি দীর্ঘ দিন ধরে জড়িয়ে রয়েছে। তখনও রাধারাণী এ বাড়িতে আসেনি। তার আগে থেকেই মহেশ এ ঘরটিতেই থাকে। তারপর একদিন রাধারাণী এল। কত আলো, কত কলরব, কত হাসি আর গান! আগেই বাড়ি মেরামত হয়েছে। মহেশের ঘরটিতেও কলি ফেরান হল, সাজান হল। সুন্দর শয্যায় বেল আর রজনীগন্ধা ছড়িয়ে দেওয়া হল একটি একটি করে। এই ঘরেই তো ফুলশয্যা ওদের।

আটাশ বৎসর আগেকার দৃশ্য মহেশ দত্তর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

বড় সুন্দর মনে হয়েছিল সেই রাতটিকে।

খাটের শেষ দিকে রাধারাণী দাঁড়িয়েছিল। পরণে একটা বিচিত্র ধরণের শাড়ি। রঙটা মহেশের মনে নেই। তবু কেমন করে যেন তার মনে হয়েছিল ঐ শাড়িটার ভাঁজে ভাঁজে শয্যায় ছড়ানো ফুলগুলির স্নিগ্ধ সুরভি জড়িয়ে রয়েছে।

অনেকটা কাছে এগিয়ে গিয়ে মহেশ বলেছিল—বসবে না?

রাধারাণী তখনই বসেছিল কিনা তাও মনে নেই মহেশের। শুধু মনে আছে, সে চোখ তুলে একবার তাকিয়েছিল মহেশের দিকে। কিসের একটা জ্যোতিতে তারা দুটি বড় উজ্জ্বল। ঠোঁটের কোণায় কোণায় যেন একটা শান্ত হাসির ছটা খেলে বেড়াচ্ছে।

তারপর আটাশটা বর্ষা, বসন্ত পার হয়ে গেছে।

আটাশটা বছরের ব্যবধানে সেই শান্ত হাসি ছুরির মত নিষ্ঠুর ধারালো হয়ে উঠবে—মহেশ দত্ত সেদিন কল্পনা করতে পারেনি।

অভিযোগটা নূতন নয়। আত্মীয়-স্বজন থেকে পথের মানুষ পর্য্যন্ত সবার কাছেই সে বারেবারে আঘাত পেয়েছে। প্রতিবাদ করেনি। মানুষের সংস্কারের কাছে নিঃশব্দে মাথা নত করে এসেছে মহেশ।

কিন্তু আজকের আঘাত বিচলিত করে দিয়েছে তাকে। বুকের ভিতরে হঠাৎ যেন একটা জ্বালাময় ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে মহেশ পদচারণা করতে থাকে; মনে মনে সে এই আটাশ বছরের জীবনটাকে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করতে চাইছে যেন! কিন্তু রাধারাণীকেও তো বাদ দেওয়া যায় না। জীবনটাকে পাকে পাকে ঘিরে আছে একটা উপবাসী মন—যে মনটাকে অমনি করে বিশ্লেষণ করলে রাধারাণীর বুকের অন্তস্থলের একটা অভিশপ্ত দীর্ঘশ্বাসকে খুঁজে পাওয়া যাবে!

মহেশ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামনের কাচ-কাটা বড় আয়নাটায় তার প্রতিবিম্বটা আটকে গেছে। ধীরে ধীরে মহেশ এগিয়ে এল। স্থির হয়ে দাঁড়াল আয়নাটার কাছে। অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। আয়নার ভিতরের মহেশ দত্তকে নূতন করে দেখতে লাগল সে।

না, চমকে ওঠার কিছু নেই। কালও দেখেছে, পরশুও দেখেছে। দেখেছে এর আগেও। নূতন পরিবর্তন কিছু হয়নি। তবু এ কথা তো মিথ্যা নয়, আটাশ বছর আগে একদিন এই ঘরেই রাত্রির প্রথম যামে তরুণী রাধারাণীকে যে মানুষটা গভীর আবেগে তার কাছে বসতে বলেছিল, তার কোন কিছুই আর ওই কাচে ভাসা অবয়বটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না!

স্তব্ধ বেদনায় নিঃশ্বাস ফেলে মহেশ।

রাধারাণীর অভিশপ্ত দীর্ঘশ্বাস এর চেয়েও জোরে, এর চেয়েও সন্তর্পণে বেরিয়ে আসে কিনা জানা নেই তার। তবু সে তার জন্য একটা মমতা অনুভব করে।

বয়সের মোহ রাধারাণীর আর নেই। পঁয়তাল্লিশ বছরের একটা মেদবহুল চেহারার মধ্যে সেদিনকার তরুণী রাধারাণী কোথা দিয়ে বিলীন হয়ে গেল সে কথা চিন্তা করার মত মানসিকতা তার নেই—এই কথাটা বারে বারেই মহেশের কাছে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু মহেশের ওই মুখখানাই কেমন করে আর কত ধীরে ধীরে সহস্র বেদনার বোঝা কুড়িয়ে নিয়ে এল, এ কথা মহেশই শুধু বুঝতে পারেনি কোনদিন।

তবু একদিন জানল সে।

একটা আকস্মিক নির্মমতায় তার বুকটা টন টন করে উঠল।

রোজকার মত সেদিনও সকাল হয়েছে। আকাশ তেমনি পরিষ্কার। মিষ্টি রোদ-ছোঁওয়া গাছের আগাগুলো প্রতিদিনের মতই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

প্রসন্ন মনেই বাড়ি থেকে বার হয় মহেশ। কয়েক-পা এগিয়ে গিয়ে রাস্তার বাঁকেই চ্যাটার্জি ব্রাদার্সের মনোহারী দোকান। হাতটা বাড়িয়ে অভ্যস্ত কণ্ঠেই বলে—কই গো চাটুজ্যেমশাই, একখানা দাও। একবার হেডিংগুলো দেখে নিই।

অর্থাৎ খবরের কাগজ। এ এক অভ্যাস হয়েছে মহেশের। সকাল বেলাতেই কাগজের মোটামুটি খবরগুলো একবার না দেখলেই নয়।

কিন্তু কাগজ এল না।

চাটুজ্যে ছিল না। তার দুর্মুখ বড় ছেলেটি বসেছিল দোকানে। তীক্ষ্ণ হেসে বললে—কাগজ কিনে পড়বেন দত্তমশাই। সকাল বেলাটায় আপনার শ্রীমুখ দর্শন নাই-বা করালেন। কাগজ পড়তে এসে আমাদের সারা দিনটাই মাটি করলেন।

এক মুহূর্তে মহেশের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। শুষ্ককণ্ঠে বললে—তুমি—তুমি কি বলছ চাটুজ্যের পো!

বলছি কি আর সাধ করে দত্তমশাই। আপনার দর্শনে যে কত পয়সে খবর হয়ত রাখেন না। কিন্তু আমাদের না রাখলে যে—মাইরি বলছি দত্তমশাই, বউনির আগে আপনি আর কাগজ পড়তে আসবেন না।

অপমানে বেদনায় মহেশের সারা দেহটা অসাড় হয়ে গেল। টলতে টলতে বাড়িতে ফিরে এল সে। একটা তীব্র জ্বালায় শয্যার উপরে একেবারে ভেঙে পড়ল।

অনেকক্ষণ পরে রাধারাণী শুনল। মহেশ বেদনাতুর-কণ্ঠে সব কথা বলল তাকে। নিঃশব্দে শুনল রাধারাণী। মুখটা কঠিন হয়ে গেল তার। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যই। আস্তে আস্তে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। অস্ফুটকণ্ঠে শুধু বললে—আমি জানতুম।

আর একটা আঘাত পেল মহেশ দত্ত। স্তব্ধ বিস্ময়ে বলে উঠল—তবে বলনি কেন!

বলিনি—

হাঁ। কেন!

তুমি দুঃখ পাবে বলে।

মহেশের চোখ দুটো কোমল হয়ে আসে। আস্তে আস্তে একবার জিজ্ঞাসা করল—তুমি পাওনি!

রাধারাণীর মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—আজ নয়, অনেকদিন আগে থেকেই জানতুম। লোকে কত কি বলে; তোমাকে দেখিয়ে বলে, আমাকেও শুনিয়ে বলে। বলে—

এক মুহূর্ত থামল রাধারাণী। উদগ্র আগ্রহে মহেশ তার দিকে অপলক চেয়ে আছে। একটু ইতস্ততঃ করে বিহ্বল মৃদুকণ্ঠে রাধারাণী বললে—বলে, অমুক দত্ত অপয়া—অযাত্রা।

মহেশ চমকে উঠল। বারেকের জন্য চাটুজ্যের বড় ছেলের কথাগুলো তার কাণের মধ্যে তিক্তস্বরে বেজে উঠল। রাধারাণীর চোখে চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল মহেশ। ভুলে গেল দীর্ঘশ্বাস ফেলতে। গম্ভীর ব্যথাতুর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললে—তুমিও কি তাই বিশ্বাস কর বড় বৌ!

রাধারাণী সহসা উত্তর দিতে পারল না। অন্যমনস্কের মত বড় আয়নাটার দিকে চেয়ে রইল। ফাটা কাচের মধ্যে মহেশের মুখটা বীভৎস বিকৃত হয়ে ফুটে রয়েছে।

বড় বৌ—

রাধারাণী ফিরে মহেশের পানে চাইল। ম্লান হেসে

মহেশ বললে—আমার কথার জবাব তো দিলে না বড়বৌ।

ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে গেল রাধারাণীর। একটা আকস্মিক রুক্ষতায় বলে উঠল—আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি যায় আসে বল। লোকের মুখ তো আর হাত চাপা দিয়ে রাখা যাবে না। তোমার ভাইঝির কপালের কথা তুলে সবাই তো বলে—

মুহূর্তে মহেশের দুচোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। হঠাৎ সরে এসে দৃঢ়মুষ্টিতে রাধারাণীর হাত ধরে উত্তেজিত-কণ্ঠে বললে, কি বলে?

রাধারাণী অবাক হয়ে গেল। মহেশের মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে হাতটি ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, মরণ! লোকে দেখলে বলবে কি! যত বয়স হচ্ছে, তত যেন ধিঙ্গি হচ্ছে!

আর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল মহেশের। সে আর কিছু বলতে পারল না। রাধারাণীর অপস্রিয়মান মূর্তিটির দিকে শুধু অপলক চেয়ে রইল।

মহেশের চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। কাচ-ফাটা আয়নাটার দিকে তাকিয়ে রইল নিঃশব্দে। একটা বীভৎস মুখ। কপালে দীর্ঘ বলিরেখা। কুঞ্চিত চামড়ায় মুখের এখানে-ওখানে ভাঁজ পড়ে গেছে কয়েকটা। বাঁ চোখটা সাদা। দৃষ্টি নেই সে চোখে। তরুণ মহেশ দত্তর জীবনের সমস্ত ছবি কবে আর কত ধীরে ধীরে বিদায় নিয়ে তাকে এমন রিক্তসর্বস্ব করে তুলেছে এ কথা ভেবে মহেশের চোখে বিন্দু বিন্দু জল এসে গেল।

মনে পড়ল আর এক দিনের কথা।

এ ঘটনা তারও পরে।

সেদিনও এমনি কঠিন হাতে রাধারাণীকে ধরে অকম্পিতকণ্ঠে মহেশ জিজ্ঞাসা করেছিল, বল, কি বলতে চাও তুমি। বরং ওই দিকে তাকিয়ে তুমিই বল—কি বলার আছে তোমার!

মহেশের সদ্য-বিধবা ভাইঝির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সে।

মা-বাপ-মরা ভাইঝিটিকে বড় ভালবাসত মহেশ। অনেক খুঁজে সুপাত্রের হাতেই তুলে দিল তাকে। খরচ-পত্রের কোন মায়া করেনি। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। বিধবা হল মেয়েটা!

আঘাতে জর্জরিত হয়ে গেল মহেশ। রাধারাণীও কাঁদতে কাঁদতে তাকে বুকে তুলে নিল।

কিন্তু এর পিছনে যে এত বড় কথা থাকতে পারে রাধারাণী ভাবেনি কোনদিন। সেদিন সে চমকে উঠল; পাড়া-প্রতিবেশী সবাই কানাঘুষা করে বেড়াচ্ছে। শুনে ফেলল সে। কার মুখে হাত চাপা দেবে!

রাধারাণী বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেল। না না, এ যে মিথ্যা! মহেশ দত্তর এত বড় স্নেহের পারাবারকে এই জঘন্য মিথ্যা কি এত সহজে ম্লান করে দেবে!

কিন্তু সত্যিই মহেশের হার হয়ে গেল।

রাধারাণীর মনটা একটু একটু করে সন্দেহের তরঙ্গে দুলে উঠল। হলেই বা তোমার ভাইঝি! লোকের কথা তো তোমার শোনা উচিত! জানি, মেয়েটাকে তুমি বুক দিয়ে ভালবাস। কিন্তু তোমার মুখে ভগবান যখন অমন একটা খারাপ জিনিষ লিখে দিয়েছেন, মেয়ে-জামাই বিদায়ের সময় নাই-বা তুমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে!

কেমন যেন কথাটা বিশ্বাস হতে লাগল রাধারাণীর। পাড়া-প্রতিবেশী কি মিছেই বলে! মহেশের মুখ দেখলে কি সকল শুভকাজই পণ্ড হয়ে যায়!

রাধারাণী ভাবতে থাকে। ফেলে-আসা দিনগুলির দিকে পিছন ফিরে দেখতে চায় সে। না, মনে পড়ে না কিছু। তার জীবনের কোন শুভ কাজ মহেশের মুখদর্শনে মুহূর্তে অশুভ বার্তা বয়ে এনেছিল কিনা—রাধারাণী এতদিন পরে কিছুতেই মনে করে উঠতে পারছে না।

তবু হার হয়ে গেল মহেশের।

জীবনের সবচেয়ে বিশ্বাসের স্থানে কেমন করে ফাটল ধরে গেল, মহেশ কোন রকমেই হিসাব করে উঠতে পারল না। কিন্তু হিসাব মেলাবার ধৈর্যই থাকল না তার। ক্ষিপ্ত হয়ে গেল সে। কঠোর কণ্ঠে ডাক দিল, বড়বৌ!

নিঃশব্দে ভাঙা দালানটার সামনে রাধারাণী এসে দাঁড়াল।

তুমি—তুমি বিশ্বাস কর এ কথা?

আমার কথা কে শোনে! পাড়া-প্রতিবেশী যদি কিছু বলে আমি কি করব। মেয়েটার এমন অবস্থার জন্যে—লোকের কথা একটু মেনে চলা ভাল বৈ কি।

মহেশ একেবারে ফেটে পড়ল। লোকের কথা,

লোকের কথা! আমি কোন লোকের কথা শুনতে চাই না। তোমার কথা বল। আমি তোমার স্বামী; লোকের মত তোমার কাছেও কি আমি 'অযাত্রা' হয়ে থাকব! বল, কি বলতে চাও তুমি!

আকস্মিক উত্তপ্ততায় রাধারাণীর হাতটা শক্ত করে ধরল মহেশ!

রাধারাণীও দপ করে জ্বলে উঠল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, লোকের কথা শুনবে না বলে উড়িয়ে দিলে কি পার পাবে! আমি কি বলব; ওই দিকে তাকিয়ে তুমিই বল কি বলার আছে তোমার!

দূরে কর্মরতা ভাইঝির দিকে মুহূর্তের জন্য মহেশ তাকাল। রুদ্ধ আক্রোশে চাপা স্বরে রাধারাণীকে একটা গালাগালি দিয়ে আচম্বিতে দুহাতে সে তার গলা টিপে ধরল। দম বন্ধ হয়ে গেল তার। প্রাণপণ চেষ্টায় সে মহেশের হাতে সজোরে দাঁত বসিয়ে দিল। শিথিল হয়ে গেল মহেশের হাত। এক ঝাঁকুনীতে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে। দালানের পাশে চুণের গাদায় রাধারাণী ছিটকে পড়ে গেল।

ক্রোধে পাগল হয়ে গেল রাধারাণী। একবার সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর সহসা একমুঠো চুণ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল মহেশের মুখে।

একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল মহেশ। বাঁ চোখটা দু'হাতে টিপে ধরে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সেইখানেই বসে পড়ল সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মহেশ।

সামনের আয়নাটায় তার সমস্ত অবয়বটা একবার নড়েচড়ে উঠল। ঝাপসা চোখে চেয়ে রইল ওই দিকে। একটা কুৎসিত মুখ। বাঁ চোখটায় দৃষ্টি নেই—সাদা। রাধারাণীর বেদনার আগুনে চোখটা পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে।

তবু রাধারাণী কত না করেছে! কেঁদেছে কত! ডাক্তার দেখিয়েছে, সেবা করেছে। মহেশের পায়ে মাথা রেখে অশ্রুর বন্যায় তার পা ধুইয়ে দিয়েছে।

মহেশের বুকটাও হালকা হয়েছে বৈকি! পা থেকে রাধারাণীর অশ্রুসিক্ত মুখখানাকে আকস্মিক আবেগে বুকে তুলে নিয়েছে সে। আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলেছে, তোমার দোষ নয় বড়-বৌ। আমার ভাগ্য! ঈশ্বরের অভিশাপ আছে আমার উপর। তাই—তাই—; তোমার দোষ নয়—

উচ্ছ্বসিত কান্নায় রাধারাণী ভেঙে পড়েছিল: ও গো না, না—এ আমার দোষ, আমার পাপে তুমি আজ—

বলতে পারেনি আর। এমন একটা মুহূর্তে নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারেনি। ওই কুৎসিত অশুভঙ্কর মুখখানার উপরেই নিজের মুখখানিকে সজোরে ঘষতে ঘষতে ফুলে ফুলে কেঁদেছে সে!

সেই রাধারাণী আবার আজ মহেশের হৃদয়টাকে পুড়িয়ে দিয়ে গেল।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস নেমে এল। আয়না থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল মহেশ। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল চারিদিকে। খাট, বিছানা, টেবিল, আলমারি, কাপড়ের আলনা—সর্বত্রই রাধারাণীর হাতের স্পর্শ মাখানো।

ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল মহেশ।

বিতৃষ্ণায় তার মনটা ভরে গেল। তার দোতালার এই প্রিয় ঘরটা হঠাৎ যেন তার চোখে কুৎসিত হয়ে উঠল। বেরিয়ে এল সে। এর চেয়ে ছাদ ভাল। উদার, উন্মুক্ত; ওখানে রাধারাণী নেই—ওই কাচ-ফাটা আয়নাটাও নেই!

রাধারাণীকে কি সইতে পারে না মহেশ!

এ কথার কোন জবাব নেই তার কাছে। শুধু জানে, রাধারাণীর কাছে তার সকল সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেছে। বাইরের মানুষের কাছে আঘাত পেয়ে সে রাধারাণীর কল্যাণ-নীড়ে মাথা গুঁজে আশ্রয় পাবার জন্য বারে বারেই ছুটে এসেছে। কিন্তু পায়নি। রাধারাণীও বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। বেদনার ঝড়ে ভেঙে গেছে তার নীড়।

সে কথা এই সকালে মহেশ স্পষ্ট করেই জানতে পারল।

রাধারাণীকে নিতে এসেছিল ওর ভাই। ভাই-পোর অন্নপ্রাশনে বড় পিসিমার না গেলেই নয়!

হেসেই সম্মতি দিয়েছে মহেশ। যাবে বৈ কি। নিশ্চয় যাবে। বলতে গেলে, তোমাদের আমলে এই প্রথম কাজ। তা—জিজ্ঞাসা কর তোমার দিদিকে, কখন যাবে।

আপনি!

আমি!

মুহূর্তের জন্য মহেশ হারিয়ে ফেলল নিজেকে। তারপর ম্লান হেসে আস্তে আস্তে বললে—আমার তো সময় হবে না ভাই। তোমার দিদিকেই নিয়ে যাও। ও গেলেই—

আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে গেল মহেশ।

ভোরেই মহেশের ঘুম ভেঙে গেল।

শুনছ—

ডাকছে রাধারাণী। মহেশ চোখ মেলে তাকাল। পরমুহূর্তে চোখটা রগড়ে নিল একবার।

ওঠো। আর তো সময় নেই। আমাকে যে বেরুতে হবে।

ধড়মড় করে উঠে বসল মহেশ। রাধারাণীর বেশবাস সম্পূর্ণ। একটা দামী শান্তিপুরী শাড়ি ওর দেহটাকে একটা শান্ত পবিত্রতার মত ঘিরে রয়েছে।

হাত মুখ ধুয়ে মহেশ বললে—সকালেই যাবে আমাকে তো বলনি।

কুণ্ঠিতস্বরে রাধারাণী বললে—আগে ভাবিনি। পরে দেখলুম, ফার্স্ট ট্রেণে না গেলে অসুবিধা হবে।

মহেশ নিরুত্তরে চেয়ে রইল।

তুমি কি রাগ করলে?

মহেশ হাসল। বললে—না।

রাধারাণী আরও কি বলতে যাচ্ছিল। নিচে থেকে ডাক এল—দিদি।

এই যে, যাই—

একটু ইতস্ততঃ করে মহেশ ডাকল—বড়বৌ।

রাধারাণী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

আমিও যদি যাই—

তুমি!—রাধারাণী শিউরে উঠল যেন।

মহেশের মুখটা কুণ্ঠার হাসিতে ভরে গেল। হ্যাঁ। ও ফার্স্ট ট্রেণেই যাক। তুমি আর আমি খেয়ে-দেয়ে দুপুরে—

না না, সে হয় না—আমাকে এখনই যেতে হবে। রাধারাণী যেন আর্তনাদ করে উঠল। তা ছাড়া, কাজ-কর্ম সব ফেলে তুমি—না না, তোমার যেয়ে কাজ নেই—

ত্রস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রাধারাণী।

মহেশ আবার ডাকল—বড়বৌ।

রাধারাণী এক মুহূর্ত দাঁড়াল। মুখ না ঘুরিয়ে কঠিন স্বরে বললে—না। আমার প্রথম ভাইপোর ভাত। সেখানে তোমার—না। তোমার যাওয়া হবে না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল রাধারাণী।

দৃষ্টিহীন চোখটা হাত দিয়ে মহেশ মুছল। ওই সাদা বোবা চোখটার মধ্যেই বেদনার এত অনুভূতি কেন, কে জানে!

খোলা ছাদটায় আস্তে আস্তে সে পদচারণা করতে লাগল। বেলা হয়েছে—অনেকটা রোদ ছড়িয়ে পড়তে কোথাও আর বাকি নেই। মাঠ, ঘাট, বন, প্রান্তর—সর্বত্র রোদের প্রাচুর্যে ঝলমল করছে। মানুষের হৃদয়ে এমন প্রাচুর্যের আবির্ভাবে যুগসঞ্চিত আঁধারপুঞ্জ কোনদিন তিরোহিত হবে কিনা আর কেউ জানলেও মহেশ জানতে চায় না আর।

আস্তে আস্তে মহেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

নিচে নামতে হবে এবার। দু একটি খাতকের আসবার সময় হয়েছে। বন্ধকী জিনিষ ছাড়িয়ে নেবার কথা তাদের।

মহেশ হাসে। একটু জোরেই হেসে ওঠে। ওখানে তার আলাদা সাম্রাজ্য। তার বাঁধানো খেরো খাতা, আর মেহগনী কাঠের শক্ত আলমারি। ওখানে রাধারাণী নেই, পাড়া-প্রতিবেশী নেই।

একটা একটা করে মহেশ সিঁড়িতে পা দেয়। কাজের কথা মনে পড়ে। সোনার জিনিষগুলো খুলে দেখতে হবে। অঙ্ক কষে অতি সাবধানে সুদের হিসাবটাও বার করতে হবে। সামনে টাকার থলি হাতে বসে থাকবে খাতকেরা।

বুকের বোঝাটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে যেন। কাজ—কত কাজ। ওখানে সে কুৎসিত নয়, অযাত্রা নয়। আলমারি থেকে খাতাটা বার করে ওদের সামনে হিসাব করবে সুদের। পেড়াপিড়ি করলে ছেড়ে দেবে খানিকটা। কমিয়ে দেবে সুদ। হ্যাঁ, চাটুজ্যেমশাইকেও। দোকানের জন্য টাকা ধার নেন তিনি। শোধ দিতেও আসেন। কমিয়ে দেবে মহেশ। সুদ ছেড়ে দেবে খানিকটা।

ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে মহেশ।
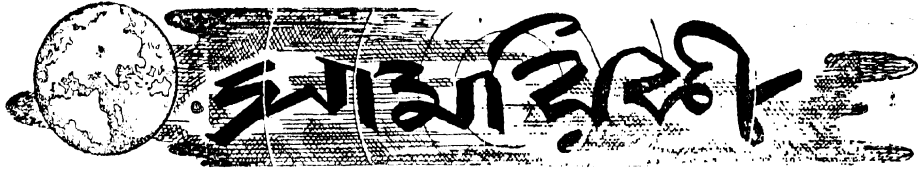
অতুলচন্দ্র ঘোষ

পুরুলিয়ার খ্যাতমান জননেতা, মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক অতুলচন্দ্র ঘোষ গত ১৫ই অক্টোবর ৮০ বৎসর বয়সে পুরুলিয়া লোক-সেবক-সংঘ আশ্রমে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৮১ সালের ২রা মার্চ বর্দ্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রামে পৈতৃক বাস ভবনে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা মাখনলাল ঘোষ প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র—পিতামাতা শৈশবে মারা যান ও তাঁহার মেশো মহাশয় অযোধ্যানাথ ঘোষ তাঁহাকে পালন করেন। অযোধ্যানাথ মানভূম বরাবাজারে বড় উকীল ছিলেন। ১৮৯৯ সালে অতুলচন্দ্র পুরুলিয়া জেলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতা মেট্রপলিটান কলেজ হইতে ১৯০৫ সালে বি-এ পাশ করেন ও ১৯০৮ সালে বি-এল পাশ করেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কারাবরণ করেন—১৯২২ সালে ৩ মাস কারাদণ্ড হয়। ১৯২৫ সালে তাঁহাকে পুরুলিয়ায় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনে নেতৃত্ব করিতে হয়। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহে ১ বৎসর ও ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে ১ বৎসর কারাদণ্ড হয়। ১৯৩২ সালে ২ বৎসর, ১৯৩৪ সালে ৬ মাস, ১৯৪০ সালে ১ বৎসর, ১৯৪২ সালে ২ বৎসর, ১৯৪৫ সালে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি সদলে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া লোকসেবকসংঘ গঠন করেন। ১৯৪৯ সালে গণমুক্তি আন্দোলনে সরকারী গুণ্ডাদের হাতে তাঁহাকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৯৫৩ সালে টুসু সত্যাগ্রহে তাঁহাকে আবার ২ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। ১৯৫৬ সালে ভাষা সত্যাগ্রহ উপলক্ষে তিনি পদব্রজে পুরুলিয়া হইতে সদলে কলিকাতায় আসেন ও আবার কলিকাতায় ২ সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁহার নেতৃত্বে এই আন্দোলনের ফলে মানভূম জেলার একাংশ পশ্চিম বঙ্গে আসে ও তাহা আজ পুরুলিয়া জেলা বলিয়া পরিচিত।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ দেশকর্মী ও কনিষ্ঠ ডাঃ অমল চন্দ্র ঘোষ কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি পিতার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কন্যাদ্বয় শ্রীঊর্মিলা মজুমদার ও শ্রীকমলা সেন পিতার মৃত্যুর সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। অতুলচন্দ্রের মৃত্যুতে বাংলা দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয় বলা চলে। এইরূপ সংগ্রামী জীবন সাধারণত দেখা যায় না। আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র—

খ্যাতমানা শিক্ষাবিদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র গত ১১ই অক্টোবর ৮১ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা বালীগঞ্জ-প্লেসস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ-কাল ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক ও শুভার্থীবন্ধু ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি ও তাঁহার স্বর্গত আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি। ১৮৮০ সালে যশোহর জেলার ধুলিগ্রান গ্রামে তাঁহার জন্ম—১৮৯৮ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরাজি ও দর্শনে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করেন। পর বৎসর তিনি দর্শনে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম-এ পাশ করেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ ও রাজসাহী কলেজে কিছু কাল অধ্যাপনা করার পর দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকরূপে তিনি কলিকাতার সকল সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত হন। বাল্যকালেই তিনি কীর্তন গান শিক্ষা করেন এবং তাঁহার

সুমধুর কণ্ঠের পদাবলী কীর্তন ও অন্যান্য সংগীত তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সুন্দর দেহ, সুমধুর ব্যবহার ও সহৃদয়তা তাঁহাকে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের শ্রদ্ধাভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। কলেজে ইংরাজি ও দর্শন পাঠ করিলেও তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং প্রথম জীবন হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটের একজন প্রধানকর্মী রূপে উহাদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য থাকিয়া তিনি শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করিতেন। কয়েক বৎসর তিনি বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শকের কাজও করিয়াছিলেন। ১৯৩২ হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু অধ্যাপক (বাংলা বিভাগের প্রধান) ছিলেন এবং ১৯৫১ সালে ফেকালটি অফ আর্টসের ডীন হইয়াছিলেন। রবিবাসরের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি রায়বাহাদুর জলধর সেনের পরলোক গমনের পর তিনি রবিবাসরের সভাপতি হন এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সে পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শেষ কয় বৎসর তিনি শারীরিক অসামর্থ্যের জন্য বাড়ীর বাহির হইতে পারিতেন না, কিন্তু প্রায়ই স্বগৃহে রবিবাসরের অধিবেশন আহ্বান করিয়া সদস্যগণের সহিত মিলিতহইতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক রূপে তিনি দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইন সভায় কয়েক বৎসর সদস্য হইয়াছিলেন এবং কেম্ব্রিজে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সহিতও দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার পদামৃত-মাধুরী, কার্ত্তন, নীলাম্বরী, মন্দাক্রান্তা, বিবিবউ, সুখদুঃখ ও অন্যান্য বহু গল্পপুস্তক তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি বাংলায় কত সাময়িকপত্রে কত যে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ও গল্প লিখিয়া গিয়াছেন,তাহার সংখ্যা নাই।

দামুন্যায় কবিকঙ্কণ উৎসব—

২২শে অক্টোবর রবিবার সাহিত্য সম্মিলনের ৬০ জন সদস্য বিকাল তিনটায় মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান দামুন্যা গ্রামে পৌছিলে তাঁহাদের তথায় সাদর অভ্যর্থনা করা হয়। এম-এল-এ ও দামোদর-সম্পাদক শ্রীদাশরথি তার নেতৃত্বে শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক সকলকে প্রথমে মুকুন্দরাম-সেবিত চণ্ডীমন্দিরে লইয়া যান—তথায় সকলকে চা ও জলযোগে তৃপ্ত করা হয়। সেথান হইতে অদূরে মুকুন্দরাম উচ্চ বিদ্যালয় গৃহে সকলের বাসস্থান স্থির ছিল ও স্কুলের মাঠে বিরাট মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া কবিকঙ্কণ উৎসব সম্পাদিত হয়। ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডাঃ অজিত ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরা শঙ্কর সেনশাস্ত্রী, শ্রীসুরেন নিয়োগী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন এবং শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণধন দে প্রভৃতি বহু কবি কবিতা পাঠ করেন। দামুন্যা গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত—দামোদর তীর হইতে প্রায় ২ মাইল। তারকেশ্বর হইতে বাসে গুড়াকালনা হইয়া নদীপথে নৌকায় ও পরে পদব্রজে তথায় যাইতে হইয়াছিল এবং সদস্যগণ ফিরিবার সময় নদীপথে মুণ্ডেশ্বরী দিয়া হরিণঘাটা হইতে বাসে চাঁপাডাঙ্গা ও তারকেশ্বর হইয়া ট্রেণে ফিরিয়া আসেন। ঐ উৎসবে প্রায় দুই সহস্র গ্রামবাসী সমবেত হইয়া ৪ঘণ্টা-কাল ধীরভাবে তাঁহাদের অঞ্চলের কবি মুকুন্দরামের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর আলোচনা শুনিয়াছিলেন। মফঃস্বলে এরূপ সাহিত্য সভা খুব কম দেখা যায়। অভ্যর্থনা সমিতি রাত্রিতে সকলকে ভুরিভোজনে ও পরদিন সকালে বিরাট জলযোগে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। কলিকাতার সাহিত্যিকগণ ছাড়াও রাত্রিতে দূরাগত ৫ শত গ্রামবাসীকে প্রচুর মৎস্য সহযোগে ভাত খাওয়ানো হইয়াছিল। বিদ্যালয় গৃহে বহু স্বেচ্ছাসেবক সারারাত্রি উপস্থিত থাকিয়া সকলের সেবা করিয়াছিলেন,কলিকাতার সুগায়ক ডাক্তার শ্রীইন্দুভূষণ রায় দলের সঙ্গে থাকিয়া শুধু সভায় নহে,সর্বদা সুমধুর সঙ্গীতে সকলকে তৃপ্ত করেন। মুকুন্দরামের গ্রাম দেখিতে এই বোধ হয় এতগুলি সাহিত্যিক সর্বপ্রথম তথায় গমন করিয়াছিলেন। আতিথেয়তা ও আদর আপ্যায়ন সকলকে পথের কষ্ট ভুলাইয়া দিয়াছিল। পরদিন সোমবার সকাল ৮টায় দামুন্যা ত্যাগ করিয়া বিকাল ৫টায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন কর্তৃপক্ষ এইভাবে গ্রামে যাইয়া প্রাচীন কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের

ব্যবস্থা করিলে গ্রামাঞ্চলের লোক সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন।

গঙ্গাটিকুরীতে ইন্দ্রনাথ উৎসব—

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ গঙ্গাটিকুরী গ্রামে সেকালের খ্যাতনামা রস-সাহিত্যিক ও 'বঙ্গবাসী'র লেখক 'পঞ্চানন্দ' ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভূমি। ইন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানে ওকালতী করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন। তাঁহার বংশধরগণের উদ্যোগে আগামী ২,৩ ও ৪ ডিসেম্বর তারিখে তথায় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক অধিবেশন তথা রজত জয়ন্তী উৎসব হইবে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে সভাপতি করিয়া ও বর্দ্ধমান জেলার বহু সাহিত্যিককে লইয়া সে জন্য একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালি উৎসবের উদ্বোধন করিবেন এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য ডক্টর শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ উৎসবে সভাপতিত্ব করিবেন। বাংলা দেশের কয়েকশত সাহিত্যিককে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে এবং অভ্যর্থনা সমিতি ৫শত প্রতিনিধির তথায় আদর আপ্যায়নের জন্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজারও উপযুক্তভাবে আয়োজন করা হইয়াছে। হাওড়া হইতে গঙ্গাটিকুরীর দূরত্ব ১৫৫ কিলোমিটার এবং রেল ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে ইন্দ্রালয়। কলিকাতা হইতে কালনা কাটোয়া হইয়া মোটরেও তথায় যাওয়া যায়।

বঙ্গবাণীর দীপবাণী উৎসব—

নদীয়া জেলার শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগোবিন্দলাল-গোস্বামীর চেষ্টায় বঙ্গবাণী নামক এক সুবৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। নিদয়ার ঘাটের নিকট গঙ্গাতীরে প্রায় একশত বিঘা জমীর উপর তিন শত ছাত্রীর জন্য বাসস্থান, বিদ্যালয়-গৃহ ও বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীমান গোবিন্দলাল পণ্ডিচেরী হইতে ঋষি শ্রীঅরবিন্দের চিতাভস্ম আনিয়া তথায় এক সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে ভস্মাধার রক্ষা করিয়াছেন। তাহা আজ বাঙ্গালীর এক পুণ্য তীর্থক্ষেত্রে পরিণত। গত ৭ই ও ৮ই নভেম্বর বঙ্গবাণীতে দীপবাণী উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়; পতাকা উত্তোলন, প্রদর্শনী, খেলাধূলা, শ্রীমন্দিরে প্রার্থনা, শিশু সমাবেশ, সাহিত্য সভা, সঙ্গীত-সম্মিলন প্রভৃতিতে বহু লোক যোগদান করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুলেখক শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় ২ দিন তথায় থাকিয়া সকল উৎসবে যোগদান করেন। বঙ্গবাণীর পরিচালক শ্রীমতী উত্তরা চৌধুরী, গোবিন্দলালের পুত্র শ্রীদিব্যেন্দু গোস্বামী, প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী রাণী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টা ও আন্তরিক ব্যবস্থাপনায় উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। আমরা বাঙ্গালী মাত্রকেই বাংলার অন্যতম গৌরব বঙ্গবাণীর কার্য্য দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করি।

তারকেশ্বরে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২৯শে অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় তারকেশ্বর হরিসভার মণ্ডপে তারকেশ্বরবাসী সুধী ও সাহিত্যিকগণের উদ্যোগে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীশ্যামাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী সম্মিলনের প্রধান উদ্যোক্তারূপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। দামুন্যা যাইবার পথে কলিকাতা হইতে ৬০ জন সদস্য ৫টায় তারকেশ্বর যাইয়া ঐ সম্মিলনে যোগদান করেন। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং ডাঃ কালীকিঙ্কর সেন-গুপ্ত, অধ্যাপক ডাঃ অজিত ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী প্রমুখ বহু সাহিত্যিক সভায় বক্তৃতা করেন। তারকেশ্বর নিবাসী খ্যাতনামা কথক পণ্ডিত শ্রীরামরতন ভট্টাচার্য্য সম্মিলনে কথকতা করিয়া সকলকে সম্মোহিত করেন। হরিসভা কর্তৃপক্ষ ৬০ জন সাহিত্যিকের রাত্রিতে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরদিন ভোর ৫টায় সকলে বাসযোগে সুড়াকালনা হইয়া দামোদর নদে নৌকাযোগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার দামুন্যা গ্রামে গমন করেন।

পশ্চিমবঙ্গে সৈনিক বিদ্যালয়—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যে দুইটি সৈনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন। একটি বিদ্যালয় হইবে দার্জিলিংয়ে—অপরটি হইবে পাঞ্চেতে। এই বিদ্যালয় দুইটিতে তরুণদের সামরিক শিক্ষার প্রথম পাঠ দেওয়া হইবে। ঐ বিদ্যালয়ে ট্রেনিং লাভের পর ছাত্ররা জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। ঐ বিদ্যালয় দুইটির সহিত পাবলিক স্কুলও থাকিবে। এতদিনে পশ্চিম-

বঙ্গ সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া সকলে আনন্দিত হইবেন। একেবারে না হওয়ার চেয়ে বিলম্বে হওয়া ভাল—এই বাক্য স্মরণ করিয়া আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অভিনন্দিত করি।

রবীন্দ্র পুরস্কার—

নয়া দিল্লীর সাহিত্য একাডেমী বর্তমান বৎসরের ঠাকুর শতবার্ষিক বিশেষ রবীন্দ্র পুরস্কার নিম্নলিখিত ৪জন সাহিত্যিককে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কোন একজন প্রার্থী সর্বাপেক্ষা ভাল বিবেচিত না হওয়ায় স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনেন নেতৃত্বে নির্বাচন কমিটীকে এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। পুরস্কার পাইবেন —(১) পশ্চিমবঙ্গের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও (২) পুলিনবিহারী সেন (৩) উত্তর প্রদেশের হাজারীপ্রসাদ ত্রিবেদী এবং (৪) অন্ধের আকুরতি চলমায়া। ১০ হাজার টাকা ৪ জনকে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। ৪ জনের মধ্যে ২ জনই খ্যাতনামা বাঙ্গালী সাহিত্যিক—আমরা উভয়কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, খ্যাতনামা শ্রমিক নেতা, অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, পূর্বে কংগ্রেস ও পরে পি-এস-পি কর্মী, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে ৭৬ বৎসর বয়সে শেঠ সুখলাল কার্ণানী হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ৫ই অক্টোবর তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘদিন রোগে কাতর ছিলেন। ১৮৮৫ সালে ফরিদপুর জেলার নড়িয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৯০৪ সালে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ১৯০৫ সালে কোচবিহারে তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৪ সালে শান্তি নিকেতনে মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ও ১৯১৭ সালে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চিকিৎসকরূপে সেনা বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯১৯ সালে তিনি সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। ১৯২০ সালে অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি আজীবন তাহার সভাপতি ছিলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া সুরেশচন্দ্র চাঁদপুরে ষ্টীমার ধর্মঘট পরিচালন করিয়াছিলেন। তাহার পর বি-পি-সি-সি'র সদস্যরূপে তিনি পালংয়ে গ্রেপ্তার হন ও কারাগারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত একত্র বাস করেন। ১৯২৪ সালে গান্ধীজির আহ্বানে তিনি সবরমতী আশ্রমে গমন করেন ও ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। ১৯৩২ সালে অভয় আশ্রমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে আটক করিয়া রাখা হয়। তাহার পর তিনি শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করেন এবং প্রথমে সোসালিষ্ট দল ও পরে পি-এস-পি দলের নেতা হন। ১৯৩৫ সালে তিনি বি-পি-টি ইউ-সি'র সভাপতি ও পরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৩৬ সালে দিল্লীতে ও ১৯৩৭ সালে নাগপুরে তিনি নিখিল ভারত শ্রমিক নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে কিছুকাল তাঁহাকে কারাবাস করিতে হয়। ১৯৩৭ সালে ঘোষ-মন্ত্রিসভার সদস্য হন ও ১৯৪৮ সালে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করিয়া ইউরোপ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি আবার এম-এল-এ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সারা জীবন তিনি জন-কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে গঠনমূলক বহু কার্য্যের সহিত নিজেকে যুক্ত রাখিয়া দেশের শিল্পোন্নতির জন্য কাজ করিয়াছেন। তাঁহার মত তেজস্বী, সংগ্রামশীল, স্বাধীনচেতা নেতার পরলোকগমনে দেশ সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বিহারে বন্যা ও ঝড়—

গত অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে বিহারের কয়েকটি জেলায় ভীষণ ঝড় ও প্লাবনের ফলে শত শত অধিবাসী প্রাণ হারাইয়াছে, হাজার হাজার বাসগৃহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে ও কত শত বর্গমাইল পরিমিত স্থানের শস্যহানি হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। বিহার রাজ্যসরকার বন্যার্তদের সেবায় অগ্রসর হইলেও ক্ষতি এত ব্যাপক ও ভীষণ যে সরকারের পক্ষে সকলকে সাহায্যদান সম্ভব হইতেছে না। সেজন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির মত বহু সেবা প্রতিষ্ঠান বিহারে কর্মী ও খাদ্যবস্ত্র অর্থাদি পাঠাইয়া বিভিন্ন জেলায় সরকারী সেবাকার্য্যের সহায়তা করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী বিহারী বন্ধুরাও তাঁহাদের দুর্গত ভাইবোনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া তথায় প্রেরণ করিতেছেন। আমরা

বিহারবাসীদের এই দারুণ দুর্দ্দিনে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করি ও ধনী সম্প্রদায়কে বিহারবাসীদের এই দুর্দ্দিনে মুক্ত হস্তে অর্থদান করিতে আবেদন জানাই।

ইংরাজিই শিক্ষার একমাত্র বাহন—

দিল্লীতে কয়দিন ধরিয়া ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য্যগণের যে সম্মিলন হইতেছিল, গত ২৯শে অক্টোবর তাঁহার শেষদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় স্থির হইয়াছে যে বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করিলে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজিই একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার বাহন হইতে পারে। আন্তর্জাতিক ব্যবহার আছে, এমন একটি ভাষার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। এই শিক্ষার মাধ্যমকে পরিবর্তন করা ভারতের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই মন্তব্য সম্মিলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীনেহরু সম্মিলনে বলেন—উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের প্রশ্নটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং নিছক অর্থ উপার্জনের জন্য কোন একশ্রেণীর লোককে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতে দেওয়া সঙ্গত হইবে না। রাষ্ট্রকেই এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রের লোকেরাই যাহাতে পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিয়া শ্রমের উপযুক্ত ফল লাভ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বর্তমানে ভারতের শিক্ষা সমস্যা সকল বিবেচক লোকের চিন্তার কারণ হইয়াছে। সম্মিলন সে সমস্যার সমাধানে যে মনোযোগী হইয়াছেন, উহাই আনন্দের কথা।

কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত—

বাংলার বিপ্লবী যুগের অন্যতম নায়ক কেদারেশ্বর সেন-গুপ্ত গত ৭ই অক্টোবর শনিবার কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট নেতা ও আজীবন দেশকর্মী ঢাকা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গত রজনী গুপ্ত ছিলেন তাঁহার মাতামহ। মামাদের সহিত বাল্যকালে তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন ও পরে সমিতির 'ব্রেণ' নামে পরিচিত হন। তাঁহার পিতা ছিলেন অতুল-চন্দ্র সেন। ১৯১৫ সালে কাশীতে বি-এস-সি পড়িতে যাইয়া তিনি তথায় বিপ্লব প্রচারে ব্রতী হন। ১৯১৭ সালে বহরমপুরে গ্রেপ্তার হইয়া তাঁহাকে ২ বৎসর হাজারিবাগ জেলে থাকিতে হয়। ১৯৩০ সালে আবার বোম্বাইয়ে ধৃত হইয়া তিনি আটক ছিলেন। ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্তও তাঁহাকে নিরাপত্তা বন্দী করিয়া রাখা হইয়া-ছিল। তাঁহার একান্ত চেষ্টায় কলিকাতা টালীগঞ্জ কুঁদ-ঘাটায় 'অনুশীলন ভবন' নির্মিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি দলাদলির উর্দ্ধে থাকিয়া দেশবাসীর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন।

উত্তর প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—

ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারত হইতে সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্ত হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহর-লাল নেহরু ভারতকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করিলেও ভারতবাসী একদল মুসলমান ভারতে পাকিস্তান বিস্তারের চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মন হইতে সাম্প্রদায়িকতা দূরীভূত হয় নাই। আসাম যাহাতে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়, সে জন্য তথায় ধীরে ধীরে মুসলমান আনা হইতেছে। উত্তর প্রদেশের মুসলমানগণ তথায় তাঁহাদের সংখ্যার কথা ভুলিতে পারে না—গত অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে সে জন্য উত্তর প্রদেশের কয়েকটি জেলায়—বিশেষ করিয়া কয়েকটি জেলা সহরে মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ফলে বহু লোক নিহত ও আহত হইয়াছে। যে সময়ে শ্রীনেহরু দিল্লীতে বৈঠক করিয়া জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় উত্তর প্রদেশের কয়েকটি জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গেল—ইহা যে কত পরিতাপের বিষয়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ভারতরাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা করিলেও তাহাকে এইরূপ উৎপাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। সে জন্য শ্রীনেহরুর সর্ব-প্রকারে চেষ্টিত থাকা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে এখনও কয়েক কোটি মুসলমান বাস করে—তাহারা যেন সর্বদা জাতীয়তার কথা চিন্তা করিয়া বিবাদ হইতে নিজেদের দূরে রাখে।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার মৃত্যুর পর সভাপতির আসন শূন্য ছিল। যথারীতি নির্বাচনের পর গত ৩০শে অক্টোবর পুরুলিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস সম্মিলনে ঘোষণা করা হয়—শ্রীঅতুল্য ঘোষ ঐ পদে নির্বাচিত হইয়াছেন—তিনিই ঐ পদের একমাত্র

প্রার্থী ছিলেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁহার অসাধারণ সংগঠন-শক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা বহু বৎসর পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেসকে সুপরিচালিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন। কাজেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার এই নির্বাচনে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। নিখিল-ভারত-কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীও ঘোষণা করিয়াছেন, অতুল্যবাবুকে একই সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও লোকসভা সদস্যের কাজ করিতে দেওয়া হইবে—এ বিষয়ে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তাঁহার জন্য বিশেষ বিধিদান করিয়াছেন। আমরা আশাকরি, অতুল্যবাবু অচিরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি পদ লাভ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

পুরুলিয়ায় সম্মিলন—

গত ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে অক্টোবর পুরুলিয়া সহরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী সম্মিলনের উদ্বোধন করেন, বিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা সভাপতিত্ব করেন এবং উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়ক প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দান করেন। স্থানীয় নেতা শ্রীসাগর মাহাতো অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। প্রধান বক্তা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তথায় উপস্থিত থাকিয়া ভাষণ দিয়াছিলেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এক সময়ে একই প্রদেশের মধ্যে ছিল। আজ তিনটি পৃথক রাজ্যে বিভক্ত হইলেও তিনটি রাজ্যের সমস্যা একই প্রকারের। শ্রীপট্টনায়ক তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন—আমরা তিন রাজ্যের লোক একই থালায় ভাত খাই—অর্থাৎ আমরা তিন ভাই—এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া তিনটি রাজ্যের লোকের সকল সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়া উচিত। বিহারের সহিত উড়িষ্যার সেরাইকেলা খরসোয়ান লইয়া, বিহারের সহিত বাংলার মানভূম লইয়া বিরোধ যাহাতে আমরা আপোষে মীমাংসা করিতে পারি, সে জন্য তিন ভাই একত্র বসিয়া আলোচনা করিলে সকল বিরোধ অবশ্যই মিটিয়া যাইবে। এই ভাবে রাজ্য কংগ্রেস সম্মিলনে তিনটি পৃথক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মিলন ও তথায় নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতি শ্রীরেড্ডীর উপস্থিতি শুধু অভিনব ঘটনা নহে—তিনটি রাজ্যের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি নির্ণয় সম্বন্ধে ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ও তাঁহার ভাষণে সে কথার উল্লেখ করেন এবং বিহার ও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীকে সকল সমস্যা সমাধানে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া একইপ্রকার কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে আহ্বান জানান। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সভাপতির ভাষণ দান কালে এমন সুন্দর বাংলাভাষায় বক্তৃতা করেন যে তাহা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া যান। শ্রীরেড্ডী দুঃখ করিয়া বলেন যে, যে সকল কর্মী ১০ বৎসরের অধিককাল মন্ত্রীপদে কাজ করিতেছেন, তিনি তাঁহাদের গদী ত্যাগ করিয়া সাধারণ কর্মী হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন—কিন্তু কেহই সে আহ্বানে সাড়া দেয় নাই—তিনি এই গদীর মোহ সকলকে ত্যাগ করিতে বলেন। ৩০শে সোমবার পুরুলিয়ায় অতিবৃষ্টির ফলে সম্মিলনের কার্য্য বন্ধ করিতে হয় এবং বিনা আলোচনায় ৭টি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। নানা কারণে নির্বাচনের প্রাক্কালে পুরুলিয়া সম্মিলন তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং তিন মুখ্যমন্ত্রীর মিলন ও একত্রে নানা সমস্যার আলোচনা তিনটি রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক।

চীন নেপাল সীমানা—

১৩ই অক্টোবর পিকিং হইতে হংকংয়ে খবর আসিয়াছে, নব-বিন্যস্ত চীন-নেপাল সীমারেখা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ—২৯০০২ ফিট উচ্চ মাউণ্ট এভারেষ্টের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী কম্যুনিষ্ট চীন শুধু ভারতের কয়েক হাজার বর্গমাইল স্থান বলপূর্বক দখল করে নাই—নেপালের উত্তরাংশও এই ভাবে দখল করিতেছে। এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ নেপাল রাজ্যে অবস্থিত। তাহার একাংশ চীন আজ জোর করিয়া দাবী করিয়াছে। সমগ্র তিব্বত দেশ আজ চীনের করতলগত হইয়াছে—চীন সরকার পিকিং হইতে লাসার মধ্য দিয়া কাটমুণ্ড পর্য্যন্ত বিরাট রাস্তা নির্মাণ করিতেছে, ঐ পথে সে নেপালের রাজধানীতে আসিয়া ব্যবসা করিবে। তাহার এই সাম্রাজ্য বিস্তারে কে বাধা দিবে? ভারত-কর্তৃপক্ষ এখন পর্য্যন্ত চীনের এই অন্যায় কার্য্যে বাধা প্রদানের কোন ব্যবস্থা করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম, ভুটান, আসামের উত্তরপূর্ব

সীমান্ত এলাকা—সবই ক্রমে চীনের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়িতেছে।

ডঃ প্রমোদ কুমার ঘোষাল—

ডঃ প্রমোদ কুমার ঘোষাল গত ১৪ই অক্টোবর রাত্রিতে মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে হাওড়া হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। ১৯০৫ সালে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারের প্রসিদ্ধ ঘোষালবংশে তাঁহার জন্ম হয় ও ১৯২৬ সালে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে গণিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি-এস-সি পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ছাত্র আন্দোলন সংগঠন করেন ও পরবর্তীকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহকর্মীরূপে দেশের মুক্তি আন্দোলন পরিচালনা করিতেন। ১৯৩০ সালে তিনি 'ইণ্ডিয়া টুমরো' পত্রিকা প্রকাশ করেন ও আজীবন তাহার সম্পাদক রূপে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত কোন না কোন জনকল্যাণকর কার্য্যের সহিত নিজেকে যুক্ত রাখিয়া ছিলেন। কলিকাতার বহু সভাসমিতি ও দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সংযোগ ছিল এবং ব্যক্তিগত ভাবে তিনি পরোপকারী, অমায়িক ও সহৃদয় ছিলেন।

দেশকর্মীদের জীবনাদর্শ—

গত ২রা অক্টোবর সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৩জন দেশ নেতার চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ১৯৫৬ সালে ১৮ খানি চিত্র স্থাপন করা হইয়াছিল। সে দিন নিম্নলিখিত নেতাদের চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, লালালাজপৎ রায়, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, নটগুরু গিরীশচন্দ্র ঘোষ, কিরণশঙ্কর রায় ও আবদুল রসুল। পূর্বে বিধানসভা ভবনে রাজা মহারাজা ও লাট-বেলাটের ছবি রাখা হইত, এখন সে স্থলে ত্যাগী কর্মীদের ছবি প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। তাঁহাদের জীবনাদর্শ বর্তমান যুগের তরুণদের মনে নূতন আদর্শ জাগাইয়া দিবে।

কবি নিরালার মৃত্যু—

বিখ্যাত হিন্দী কবি শ্রীসূর্য্যকান্ত ত্রিপাটি ('ইনি নিরালা' নামেই সাহিত্য জগতে পরিচিত ছিলেন) গত ১৫ই অক্টোবর সকালে ৬৫ বৎসর বয়সে এলাহাবাদে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গত এক বৎসর কাল রোগভোগ করিতেছিলেন। বাংলা দেশে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে তাঁহার জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে তিনি হিন্দী কবিতায় বহু নূতন ছন্দের প্রবর্তন করেন ও হিন্দীতে তিনিই সর্বপ্রথম গদ্য-কবিতা লিখিয়া যশ অর্জন করেন। তিনি ৬০ খানি হিন্দী গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কাব্য ছাড়াও তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিতেন এবং পুস্তকাকারে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু—

গত ১২ই নভেম্বর রবিবারকলিকাতা বালীগঞ্জ হিন্দুস্থান পার্কে কবি শ্রীনরেন্দ্র দেবের গৃহে রবিবাসরের অধিবেশনে রবিবাসরের সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ নিবাচিত হইয়াছেন। সর্বাধ্যক্ষ অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ মিত্রের পরলোক গমনে ঐ পদ শূন্য হইয়াছিল। নরেন্দ্রবাবু প্রথমাবধি রবিবাসরের সদস্য ছিলেন ও প্রথম ৫ বৎসরের পর গত প্রায় ২৫ বৎসর তিনি নিষ্ঠার সহিত সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্তিতে সাহিত্যিকমাত্রই আনন্দিত হইবেন। প্রথম সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন জলধর সেন মহাশয়, নরেন্দ্রবাবু তৃতীয় সর্বাধ্যক্ষ হইলেন। আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়—

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম খ্যাতনামা কম্যুনিষ্ট নেতা, পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার সদস্য বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় গত ২৫ নভেম্বর বুধবার ৬৪ বৎসর বয়সে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগত হইয়াছেন। ১৮৯৭ সালের মে মাসে হাওড়া জেলার বেলুড়ে তাঁহার জন্ম হয়, পিতার নাম যোগেন্দ্র নাথ। শ্যামবাজার এ-ভি-স্কুল, হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞান কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া পরে তিনি কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত হন। ১৯২৬ সালে কম্যুনিষ্ট দলে যোগদান করিয়া তিনি ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন। ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে তিনি পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন—তিনি সুবক্তা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী পূর্বেই পরলোকগত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

বৈদ্যুতিক রেল এঞ্জিন—

গত ১৪ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু চিত্তরঞ্জনে আসিয়া সন্ধ্যা ৬টায় চিত্তরঞ্জন রেল কারখানায় নির্মিত ভারতের প্রথম বৈদ্যুতিক রেল এঞ্জিনের উদ্বোধন করিয়া উহাকে চালু করেন। তিনি বলেন—ভারত আজ বৈদ্যুতিক যুগে প্রবেশ করিতেছে—এই এঞ্জিন তাহার প্রমাণ। ভারতের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করাই স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সংকল্প। কারখানার প্রবীণতম কর্মী শ্রীনেহরুকে স্বাগত জানান। শ্রীনেহরু তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামকে সঙ্গে লইয়া সভাস্থলে গমন করিয়াছিলেন। উৎসবে ১২জন কর্মীকে পুরস্কার দানে উৎসাহিত করা হয় ও ১২ হাজার কর্মীকে মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। শ্রীনেহরু বক্তৃতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ত্যাগ ও সেবার আদর্শের কথা উল্লেখ করেন এবং সকলকে মনে করাইয়া দেন যে তাঁহার নামেই এই রেল-সহরের নাম চিত্তরঞ্জন রাখা হইয়াছে। সকলে যেন সর্বদা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন ও আদর্শের কথা স্মরণে রাখেন।

ট্রেড ইউনিয়ম ও পলিটিক্স

শ্রীসমর দত্ত

সাধারণতঃ শ্রমিকগণের কর্ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ে মালিক গোষ্ঠীর কাছথেকে শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেওয়াই ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের অর্থ নৈতিক, সমাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক নানা সমস্যার সমাধানে অনুসৃত বিভিন্ন সরকারী নীতি সম্বন্ধে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা এবং প্রয়োজন মত ঐ সকল নীতির সমালোচনা করা বিশেষ কর্তব্য। দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির সঙ্গে শ্রমিকস্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। সেইজন্য কোন ট্রেডইউনিয়ন যদি এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ না করে এবং কেবল মাত্র শ্রমিকদের কোন রকমে কিছু টাকাকড়ি পাইয়ে দিয়েই আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাহলে আর যা কিছু হোক্ প্রকৃত শ্রমিক কল্যাণ হয় না।

শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক বহু কষ্টেঅর্জ্জিত বর্দ্ধিত বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কোন বিশেষ সরকারী নীতি অথবা আইনের প্রতিকূলতায় বে-আইনী ব'লে ঘোষিত হয়েছে এরূপ দৃষ্টান্তও ট্রেডইউনিয়নের ইতিহাসে বিরল নয়। এমন ঘটনা শুধু অতীতেই যে ঘটেছে তা নয়, বর্তমানে তাদের পুনরাবৃত্তি যেমনই দেখা যায় তেমনই তাদের সম্ভাবনা রয়েছে ভবিষ্যতের পথে বিশেষ করে সাম্প্রতিক শ্রমনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। এই রকম পরিস্থিতিতে ট্রেডইউনিয়নের কর্তব্য যে এই ধরণের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইনের পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণীর অনুকূলে নতুন আইন প্রণয়ন করা অথবা প্রচলিত আইনটিকে সুবিধামত সংশোধন করার জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট দাবী পেশ করা, সে কথা বলা আজকের এই শ্রমিক আন্দোলনের দিনে অনাবশ্যক। কিন্তু এই ধরণের কাজে অংশগ্রহণ করা যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের রাজনীতিতে লিপ্ত হওয়া, এরূপ সিদ্ধান্ত বোধহয় ভ্রমাত্মক নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র যখন রাজনৈতিক দলের অভাব নেই তখন ট্রেডইউনিয়ন কর্মচারীদের পলিটিক্সে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি? শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন পরিবর্তন, সংশোধন অথবা কোন সরকারী নীতির জন্য শ্রমিক স্বার্থ উপেক্ষিত বিষয়গুলি ট্রেডইউনিয়ন তো অনায়াসে রাজনৈতিক দলের হাতে ছেড়ে দিতে পারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই শ্রমিকদের পলিটিক্সে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ এর ফলে ট্রেডইউনিয়নের উপর কোন না কোন দিন রাজনীতির প্রচণ্ড ধাক্কা এসে লাগবে এবং শ্রমিক সংস্থাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের জানা উচিত যে আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচীর মধ্যে শ্রমিক কল্যাণকর কার্য্য অন্যতম এবং শ্রমিক কল্যাণের জন্য তারা বিশেষ ভাবে সচেষ্ট আবার প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে রাজনৈতিক দল এবং ট্রেডইউনিয়ন উভয়েই যদি শ্রমিক কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হয় তাহলে এই দুই ধরণের প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য কি? যদি দুটি প্রতিষ্ঠানেরই আদর্শগত উদ্দেশ্য এবং কর্মধারা একই প্রকার হয় তাহলে রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক সংঘের পৃথক অবস্থানেরই বা প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন দুটির উত্তরে ট্রেডইউ-নিয়নকর্মীদের কি ধরণের রাজনৈতিক কর্মে অংশ গ্রহণ করা উচিত এবং ট্রেড ইউনিয়ন এলাকায় রাজনৈতিক কর্ম সম্পাদনে কেমনভাবে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত, সেই কথার আলোচনা প্রয়োজনীয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীবৃন্দ কর্তৃক সম্পাদিত রাজনৈতিক কার্য্যের রূপ ও রেখা বিভিন্ন ধরণের। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাজনৈতিক দলের সংগে সংযুক্ত এবং রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কিত যে কোন কাজ (নিজেদের সদস্যগণের স্বার্থে) দলের সাহায্যে সম্পন্ন করে থাকে। আবার এমন অনেক দেশ আছে— যে দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাজনৈতিক দলের প্রভাব থেকে দূরে থাকে। কিন্তু এইসব দেশের ট্রেড ইউনিয়ন জন-সমর্থন লাভের জন্য কাজ করে এবং তাদের সমস্যার দিকে দেশের রাজ-নৈতিক দলগুলিরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা যথা সময়ে তাদের সমস্যার সমাধানে রাজনৈতিক দলের সাহায্য লাভ করে। এমনও অনেক দেশ আছে যেখানে এই পদ্ধতিগুলি ছাড়াও শ্রমিক সংঘ আইন সভার সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যার কথা প্রচার করে এবং বিবদমান বিষয়গুলি তাদের আনুকূল্যে আইন সভায় আলোচিত হবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। অনেক দেশ আছে যে দেশের শ্রমিক সংঘগুলি উপরোক্ত পদ্ধতিগুলিতে সন্তুষ্ট না হয়ে আইন সভায় তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠাবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু যে কোন পদ্ধতিই অবলম্বিত হোক না কেন, ট্রেড ইউনিয়ন এলাকায় কর্মসম্পাদনে রাজনীতির প্রয়োজন হবেই। অনেকে এমন মত পোষণ করেন যে ট্রেড ইউনিয়ন এলাকায় রাজনৈতিক কার্য্যাবলী আইন দ্বারা নিরূপিত হওয়া উচিত। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধীয় রাজ-নৈতিক কার্য্যাবলী আইনের সাহায্যে নিরূপিত হবার পূর্বে যে জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হয় তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন এলাকায় রাজনৈতিক কর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে।

শ্রমিকগণের দৈনন্দিন কাজের অবস্থা তাদের কর্ম-জীবনের এবং কর্ম থেকে অবসরপ্রাপ্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সার্বিক উন্নতি সাধনই যদি ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হয় তাহলে মালিকদের সংগে পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় এই উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব নয়। বেতনের হার অথবা চাকুরীর অবস্থায় আংশিক উন্নতি এই প্রক্রিয়ায় সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু

শ্রমিক শ্রেণীর এইগুলি ব্যতীত আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন। অর্থনীতির দিক থেকে বলা চলে, যদি দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ক্রমশ ঊর্দ্ধগামী হয় এবং অর্থাভাবে যদি ক্রয়ক্ষমতা পতনোন্মুখ হয়—তাহলে সেই অবস্থা শ্রমিক তথা জনকল্যাণের পরিচায়ক তো নয়ই,বরং অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের নির্দ্দেশক। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মালিকপক্ষ হয়তো বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন উত্তম সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারে যেহেতু এই বিষয়ে তাদের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। কিন্তু শ্রমিকগণের ক্রয়-ক্ষমতা অনুসারে দ্রব্যমূল্যনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মালিক পক্ষের সরাসরি কোন দায়িত্ব নেই। তাই যখন ট্রেড ইউনিয়নের তরফ থেকে দাবী করা হয় যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সংগে সংগে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হোক, অথবা ক্রয়ক্ষমতা অনুসারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হোক—তখন এই ধরণের দাবী শ্রমিক মালিকের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় মীমাংসিত হয় না। দাবীটির দিকে সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয় এবং সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত সালিশীর নির্দেশ অনুসারে এই দাবী সাময়িকভাবে মীমাংসিত হয় অথবা অমীমাংসিত থেকে যায় এবং শ্রমিক অসন্তোষ চলতে থাকে। এই অসন্তোষ থেকে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং এই আন্দোলন রাজনৈতিক তাৎপর্য্যপূর্ণ।

বিভিন্ন প্রকারের কর্মে নৈপুণ্য লাভ করবার জন্য শ্রমিকগণ উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ চায়। শুধু তাই নয়, তাদের সন্তান-সন্ততিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা, উপযুক্ত বাসস্থান, চিকিৎসালয়, প্রসূতি-সদন ইত্যাদিও তারা দাবী করে থাকে কিন্তু এই সকল দাবী দাওয়া পূর্ণ করতে হলে সরকারী হস্তক্ষেপ অত্যাবশ্যক, কারণ সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে এই ধরণের দাবী মেটান সম্ভব নয়। দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে মালিক এবং সরকারের বিরুদ্ধে দুমুখী অভিযান চালিয়ে রাজনৈতিক কর্মে অংশ গ্রহণ করতে হয়।

এই দৃষ্টান্তগুলি হ'তে সহজেই বোঝা যায় যে ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পূর্ণ সমধর্মী না হলেও এ দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু আমাদের মৌল সমস্যা হ'ল—ট্রেড ইউনিয়নের চৌহদ্দির মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর কি ধরণের এবং কিভাবে রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত তাই নিয়ে। অনেকের মতে শ্রমিকশ্রেণীর উচিত রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে বৃহৎ শিল্পগুলিকে অধিকার করে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু কোন স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই কৌশল প্রযোজ্য কি না তা বিশেষ চিন্তার বিষয়। জার শাসিত রাশিয়ার মুক্তি আন্দোলনে ঐ দেশের ট্রেডইউনিয়ানগুলির দান যথেষ্ট। বহু দিনের মুক্তি আন্দোলন যা ট্রেডইউনিয়ন এবং অন্যান্য স্তর থেকে রাজনৈতিক স্তরে উপনীত ও কেন্দ্রীভূত হয়ে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল তারই ফল হল নব গঠিত সমাজ তান্ত্রিক সোভিয়েট রাষ্ট্র। প্রয়োজন ছিল যেখানে চাষী মজদুর এবং অন্যান্য আন্দোলনের সক্রিয়তায় নতুবা বহুযুগের সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের জগদ্দল পাথর ঠেলে রাশিয়া মুক্তির আলো দেখতে পেতনা। কিন্তু স্বাধীন গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন বিশেষ শ্রেণীর (সে শ্রেণী পুঁজিবাদী হোক অথবা শ্রমিক হোক) শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলির উপর একাধিপত্য থাকা উচিত নয়। শ্রেণীনির্বিশেষে জনসাধারণের সহযোগিতায় শিল্পগুলি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। শিল্প যদি কোন বিশেষ শ্রেণীর কুক্ষীগত হয় তাহলে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে ট্রেডইউনিয়ন এলাকা থেকে সেই আন্দোলন পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। কোন স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ক্ষমতা লাভের যুদ্ধেও ট্রেডইউনিয়নের মাথা ঘামান উচিত নয়। কারণ এ কাজ রাজনৈতিক দলের। ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে যদি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজন হয় তাহলে সেই আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট থাকা অবাঞ্ছনীয়।

৩

আপন স্বাধীন সত্ত্বা বাঁচিয়ে শ্রমিক-সংঘের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে আপত্তির কোন কারণ নেই যদি অবশ্য সেই রাজনৈতিক দলটি শ্রমিক সংঘের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়। যুক্তরাজ্যে বৃটিশ লেবার পার্টির সংগে নিকট সম্বন্ধ রেখে কাজ চালায়। বৃটেনের অধিকাংশ ট্রেডইউনিয়ন এই বৃটিশ ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের সংগে যুক্ত। যদি কোন ট্রেডইউনিয়ন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক হয় তাহলে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ট্রেডইউনিয়ন এ্যাক্ট (Trade Union Act of 1913) অনুসারে ঐ বিষয়ে ব্যালট ভোটের দ্বারা শ্রমিক সংঘের সদস্যদের মত নিতে হয়। যদি অধিকাংশ সদস্য রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের পক্ষে মত দেয়, তাহলে এ আইনের বিধান অনুসারে কি ধরণের রাজনৈতিক কর্মে শ্রমিকসংঘ অংশ গ্রহণ করবে তারই উল্লেখ সহ একটি তালিকা Chief registrar of friendly societies এর কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। রাষ্ট্রীয় নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয়, পার্লামেন্টের অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়, রাজনৈতিক পত্রিকার প্রকাশন এবং রাজনৈতিক সংবাদ পত্রের রচনা ও প্রকাশের জন্য অর্থ সংগ্রহের বিষয়গুলি ও ঐ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের আইনের অন্তর্ভুক্ত। আইনটির বিভিন্ন ধারায় এমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই যে রাজনৈতিক কর্মে যোগদানেচ্ছু কোন ট্রেডইউনিয়নকে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সংগে যুক্ত হ'তে হবে। সভ্যগণের ইচ্ছানুসারে যে কোন ট্রেডইউনিয়ন যে কোন পার্টিকে সমর্থন করতে পারে অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সংগে সংস্রব না রেখেও কাজ চালিয়ে যেতে পারে। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য বৃটেনের প্রায় সমস্ত ট্রেডইউনিয়ন লেবার পার্টির সংগে সংযুক্ত হওয়ায় ঐ পার্টির মাধ্যমেই ট্রেডইউনিয়ন সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পন্ন হয়।

যদিও ট্রেডইউনিয়নের ভোটেই বৃটেনের লেবার পার্টি নিয়ন্ত্রিত এবং পার্টি কর্ত্তৃক গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ট্রেডইউনিয়নগুলি নাকচ করে দিতে পারে তথাপি এ দেশের (বৃটেনের) ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন এমন ভাবে সংগঠিত যে ইউনিয়নের সাধারণ সভ্যদের রাজনীতিতে প্রবেশ করবার প্রয়োজন হয় না। ট্রেডইউনিয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় নীতি ট্রেডইউনিয়ন কর্মীরাই স্থির করে, অপর পক্ষে জনসাধারনের সংগে সংশ্লিষ্ট সমস্ত রাষ্ট্রীয় নীতি রাজনীতিবিদ গণের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। (অবশ্য

এঁদের সংগে যে টেড্ ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ একেবারে থাকেন না তা নয়)। লেবার পাটির অন্তর্ভুক্ত যে টেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস বৃটেনের প্রায় সকল শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধিত্ব করে, কার্য্যত সেই কংগ্রেস একটি পৃথক প্রতিষ্টান। যদি কোন কারণে টেডইউনিয়ন কংগ্রেস এবং লেবার পার্টির মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দেয় তাহলে তা দূর করবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হয় এবং পরস্পর বিরুদ্ধ মত পোষণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যাতে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতাও অবলম্বিত হয়।

৪

স্কান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের টেডইউনিয়ন গুলির সংগে স্থানীয় সোস্যালিষ্ট পার্টির খুব আঁতাত। এখানে বৃটেনের চেয়েও পার্টি এবং টেড্ইউনি-য়নের মধ্যে ঘনিষ্টতা বেশী। রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক সংঘের মধ্যে মত বিরোধ যে একেবারে হয় না তা নয়; মাঝে মাঝে মত বিরোধ দেখা দেয় তবে তা অধিকাংশ সময়েই কার্য্য সমাধানের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে। আদর্শগত মতান্তরও দেখা দেয় তবে তার গুরুত্ব খুবই কম। আগে স্কান্ডেনেভিয়া অঞ্চলে পার্টি এবং টেড্ইউনিয়নের মধ্যে মোটেই সম্ভাব ছিল না। কিন্তু কালক্রমে নরওয়ে ও সুইডেনের শ্রমিক সংঘগুলি সোস্যালিষ্ট পার্টির সংগে যুক্ত হয় এবং তার ফলে টেডইউনিয়নের সভ্যগণ রাজনৈতিক দলের সভ্য হিসাবে গণ্য হয়। যদিও টেড্ইউনিয়নের কোন সভ্য রাজনৈতিক দলের সভ্যপদ গ্রহণে বাধ্য নয় তথাপি নরওয়ের লেবার পার্টির মোট সদস্য সংখ্যার অর্দ্ধেক এবং সুইডেনের সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির দুই তৃতীয়াংশ এই রকম যুক্ত সদস্য (Collective Membership) ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহীত হয়। ডেনমার্কে অবশ্য এই ধরণের কোন নীতি অনুসৃত হয় না।. কিন্তু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অথবা সোস্যালিষ্ট পার্টির অন্তর্গত অধিকাংশ সভ্যই এখানে টেড্ইউনিয়ন ফ্রন্টে কাজ করে। একমাত্র দেশ সুইডেন, যেখানে শ্রমিক সংঘগুলির উপর সোস্যালিষ্ট পার্টির কর্তৃত্ব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত গড়ে উঠেছে এবং কঠোর সমালোচনাও হয়েছে। এখানে লেবার ফেডারেশনের সঙ্গে সোস্যালিষ্ট পার্টির ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে এমনই অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লেবার ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষ ফেডারেশনের সংবিধান থেকে পার্টির সংগে সহযোগীভাবে কাজকরবার কথা বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। পরে অবশ্য ফেডারেশনের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিই সুইডেনের শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মের পরিচালক। একটি যুক্ত মন্ত্রণা। সভার সাহায্যে পার্টি এবং টেড্ ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ জড়িত বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হবার ব্যবস্থাও হয়। নরওয়েতে পার্টি এবং টেড্ইউনিয়নের যুক্ত সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। ১৯২০ থেকে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দেশে দলগত রাজনীতির ভিত্তিতে টেড্ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে মতদ্বৈধতা দেখা দেয় সেইটাই এর কারণ। বর্তমানে নরওয়ে এবং সুইডেনে পার্টি এবং টেডইউনিয়ন উভয়ের স্বার্থে গৃহীত কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ চালান হচ্ছে। ফলে টেড্ইউনিয়নের মতামত যথা সময়ে পার্টির দৃষ্টি গোচর হয় এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট ও ঠিক সময়ে উপস্থাপিত হয়।

৫

অষ্ট্রিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন একটি নির্দলীয় শ্রমিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এই দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পুনরায় পরিচালিত হবার পর এখানে কোন শ্রমিক সংঘই এখন দলীয় রাজনীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত নয়। কল-কারখানার কর্মচারী সওদাগরী অফিসের কর্মচারী অথবা অন্যান্য শ্রমজীবী (তারা যে কোন প্রকার রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসবান হোক অথবা রাজনৈতিক দলভুক্ত হোক) অতি সহজেই অষ্ট্রিয়ার শ্রমিক সংঘগুলির সভ্য হতে পারে। এই দেশের প্রায় সকল শ্রমিক সংঘই দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে তথাপি প্রয়োজনের তাগিদে অষ্ট্রিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বিষয়ে যখনই প্রয়োজন হয় ফেডারেশন তখন মালিক এবং গভর্ণমেণ্টের সংগে দাবী দাওয়া নিষ্পত্তির বিষয়ে কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়। এমনিভাবে আবশ্যক মত শ্রমিক কল্যানের জন্য ফেডারেশন রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু যাই হোক নিজ কর্মক্ষেত্রে অষ্ট্রীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সম্পূর্ণ স্বাধীন; কোন দলীয় আদেশে অথবা দলগত রাজনীতির প্রভাবে পরিচালিত নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই দেশে যখন দল-নিরপেক্ষ শ্রমিক সংঘের কাজ সুরু হয় তখন তার সার্থকতা সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে বলেছিলেন যে ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে দল নিরপেক্ষ আন্দোলন গণতন্ত্র বিকাশের সহায়ক তো হবেই না বরং নানা দলের সহ অবস্থানে প্রতি নিয়ত মতানৈক্যের এবং বিশৃঙ্খলার কারণ দেখা দেবে। ফলে একতার অভাবে শ্রমিকদের সংগঠনী শক্তি ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়বে। কিন্তু যুগপৎ আর একটি মতবাদ দেখা দেয় এবং সেটি হ'ল দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে সর্ব দলের সমন্বয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনা। এই মতবাদ আধুনিক অষ্ট্রিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বহুলাংশে সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে, যদিও অষ্ট্রীয়ার সোস্যালিষ্ট পার্টি পরিচালিত কয়েকটি শ্রমিক সংঘ ফেডারেশনের বাহিরে আছে।

৬

ফ্রান্সের মত বৃহৎ দেশে রাজনৈতিক দলের অভাব নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী ব্যক্তি বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের সমর্থক। তাই ফ্রান্সের ট্রেড ইউনিয়ন গুলির মধ্যে সোস্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট, র‍্যাডিকাল র‍্যাডিকাল সোস্যালিষ্ট, পপুলার রিপাবলিকান ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সভ্যরূপে দেখা যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত হওয়া সত্বেও এই সকল কর্মীরা পারস্পরিক সহযোগীতা ও সহনশীলতার মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন এলাকায় কাজ করে। তবে ফরাসী টেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে দলীয় রাজনৈতিক কুটচক্রান্ত যে একেবারে চলে না তা নয়। দলাদলির জন্য ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে ট্রেড ইউনিয়ন
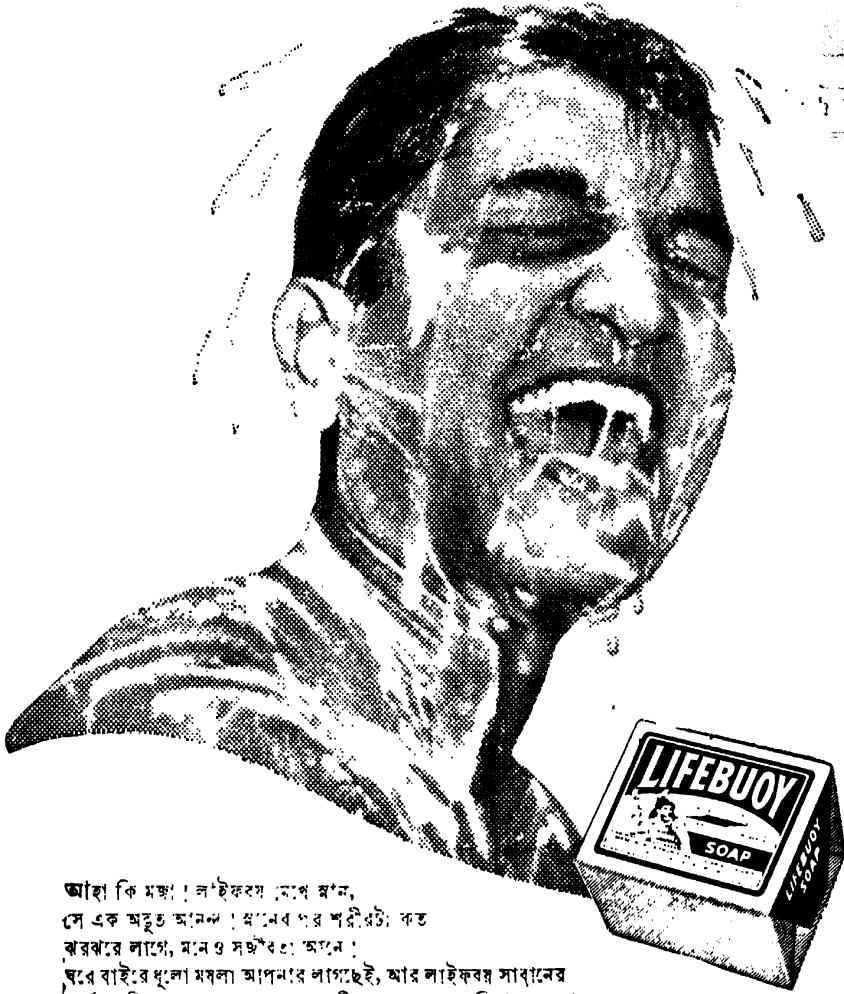
লাইফবয় যেখানে,
স্বাস্থ্যও সেখানে!

L. 26-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

আন্দোলন বিভক্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে Force Ouverie নামক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এর উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক প্রণালীতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনা করা।

(৭)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায় যে কতকগুলি মূল কারণ সংঘবদ্ধ শ্রম আন্দোলন গঠনে বাধাই সৃষ্টি করেছে। এখানকার জন জীবনের স্বাধীনতা এবং জনগণের জৈবিক এবং মানসিক উন্নতির সুযোগই শ্রেণী চেতনা উন্মেষের পথে অন্তরায়। আমেরিকায় বসতি স্থাপনের জন্য বিদেশীদের ক্রমাগত আগমনে শ্রমিক সংখ্যা স্বভাবতই উদ্বৃত্ত থাকতো। এর ফলে প্রকৃত শ্রম সংগঠন এখানে গড়ে তোলা এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তা ছাড়া জাতি, ধর্ম ও ভাষার ভিন্নতা কিছুকালের জন্য বৃহৎ বৃহৎ শিল্প গুলিতেও পারস্পরিক সহযোগীতার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করেছিল। শিল্প পরিচালকগণ বহুদিন ধরে শ্রমিক সংঘ গুলির ভীষণ বিরোধী ছিলেন। এই বিরোধিতা মূলক আচরণ শুধু যে তাঁদের নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের উদ্দেশ্যে করাইত তা নয়, এ ছিল Laissez Faire নীতির ফল। এই নীতির ফলেই শিল্পের এক চেটিয়া, ব্যবস্থা পদ্ধতি অনুসরনের অধিকার তাঁদেরই ছিল, কিন্তু শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার অধিকার ছিল না।

এরূপ পরিস্থিতির জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক আন্দোলন কোন সুসম্বদ্ধ তত্বকে ভিত্তি করে সাম্প্রতিক কালে গড়ে উঠতে পারে নি। শিল্প বিপ্লবের প্রথম পর্য্যায়ে সেখানকার শ্রমিক নেতারা অস্পষ্ট ভাবে এক সমবায়িক সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল শ্রমিকগণ শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদন শিল্প গুলিকে অধিকার ক'রে নেবে। কিন্তু নির্মম বাস্তব অবস্থার সংগে বোঝা পড়ার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। শ্রমিক শ্রেণী তাঁদের সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেনি। নিজেদের জীবনের বিশেষ করে তাদের সন্তান সন্ততি গণের জীবনের সুযোগ সুবিধার দিকে আকৃষ্ট হয়ে গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের প্রতি তাদের বিশেষ আস্থা জন্মায়। গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জীবনের মান উন্নয়ন করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। সেইজন্য মার্কসীয় সমাজ তন্ত্রের মূলনীতি গুলি আমেরিকার শ্রমিক গণের উপর কোন সময়েই প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। বর্তমান কালের অর্থনৈতিক ঘটনাবলীও শ্রমিকদের মধ্যে ভবিষ্যত সম্বন্ধে কোন সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারেনি। মজুরী অর্জনকারী শ্রমিকদের মতামত সংগ্রহ করে জানা গেছে যে তারা যে কেবল যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উন্নতি সম্ভবপর ব'লে মনে করে তা নয় তাদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশের দৃঢ় বিশ্বাস যে আগামী কালের নরনারী তাদের চেয়ে অধিকতর সুখ সুবিধা ভোগে সমর্থ হবে।

এই সকল কারণে এখানে একটি লেবার পার্টি গঠনের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। তবুও এ কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে যে এখানে প্রায় প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা গণতন্ত্রের প্রতি গভীর বিশ্বাসী এবং তাঁদের লক্ষ্য এমনই একটি ক্রমবিবর্তমান সমাজের প্রতি যে সমাজে আমেরিকার জীবন যাত্রার সমস্ত সুযোগ সুবিধা জনসাধারণ যতদূর সম্ভব সমভাবে বণ্টন ক'রে নিতে পারবে।

এখন দেখা যাক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতির এলাকায় ট্রেড ইউনিয়নের কার্য্যাবলী কি ভাবে চলে। প্রকৃত পক্ষে এখানে প্রতি পদক্ষেপেই শ্রমিক সংঘকে রাজনৈতিক কর্মে অংশ গ্রহণ ক'রতে হয়।

A F L (এ, এফ, এল) এবং C. I. O (সি, আই, ও) এই দুইটি ন্যাশানাল ফেডারেশনের (Notional Federation) মাধ্যমে রাজনীতির এলাকায় ট্রেড ইউনিয়নের কাজ চলে। রেলওয়ে পলিটিকাল লীগ [Railway Political League) রেলওয়ে শ্রমিক অংশ গুলির তরফ থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ পরিচালনা করে। A F L C I O এবং অন্যান্য কয়েকটি শ্রমিক সংস্থার ওয়াশিংটনে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠান গুলির কাজ আইন সভার মধ্যে শ্রমিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা। প্রয়োজন অনুসারে এরা সংবিধান কর্তাদের শ্রমিক কল্যাণকর আইন প্রণয়নে নানাভাবে সাহায্য করে।

কিছুদিন আগে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারে কয়েকটি শ্রমিক সংঘ সম্মিলিত ভাবে আন্দোলন চালায়। তাদের দাবী ছিল যে ঘণ্টা পিছু ৭৫ সেণ্টের পরিবর্তে ১ ডলার ২৫ সেণ্ট দিতে হ'বে। রাষ্ট্রপতি সুপারিশ করেছিলেন যে ঘণ্টা পিছু ৯০ সেণ্ট দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু A, F, L এবং C IO এই দুট সংঘই ১ ডলার ২৫ সেণ্ট থেকে দাবী কমাতে রাজী হয়নি। C IO র অন্তর্গত দুটি এবং A, F, L এর অন্তর্গত দুটি অর্থাৎ মোট চারিটি ইউনিয়ন যারা দাবী সম্বন্ধে বিশেষ অগ্রণী ছিল তারা আন্দোলনের পথে এগিয়ে আসে। আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় এবং একটি সুচিন্তিত কার্য্যসূচীও গৃহীত হয়। এই কার্য্যসূচী অনুসারে আন্দোলন কারীদের ট্রেড ইউনিয়ন এলাকায় কি ভাবে রাজনৈতিক কর্মে অংশ নিতে হয়েছিল তারই একটা আভাষ দেওয়া গেল :—

(ক) মজুরী বৃদ্ধির ব্যাপারটি নিয়ে প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্য এবং প্রত্যেক সিনেটর (Senator) নতুন আইন প্রণয়নে কতটা উদ্যোগী সে সম্বন্ধে আন্দোলন কারীদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়েছে।

(খ) যে সকল স্থানের কংগ্রেস সদস্যগণ মজুরী বৃদ্ধির পক্ষে আইন প্রণয়নে ইচ্ছুক ছিলেন না সেই সকল স্থানে প্রচার কার্য্য তীব্রতর ক'রে তুলতে হয়েছে।

(গ) বিলটি নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে কি পরিস্থিতি ঘটছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়েছে।

(ঘ) কংগ্রেস সদস্য এবং সিনেটরদের সঙ্গে সদাসর্বদা চিঠি

পত্রের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখতে হয়েছে।

(ঙ) দাবীটির দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য্য চালাতে হয়েছে।

(চ) শ্রমিক শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য জনসাধারণ যাদের স্বার্থ এই দাবীটির সংগে পরোক্ষভাবে জড়িত তারা কি ভাবে দাবীটির প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জানাচ্ছে সে সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ করতে হয়েছে।

(৮)

ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী পর্ব এবং পরবর্তী পর্ব। প্রথম পর্বে যে আন্দোলন চলে—তার উদ্দেশ্য শুধু শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করা ছিল না, সংগে সংগে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে সংগ্রাম করাও ছিল তার উদ্দেশ্য। ১৮২১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আধুনিক কলকারখানা আর গড়ে ওঠেনি। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বোম্বেতে বোম্বে উইভিং এণ্ড স্পিনিং কোম্পানির উদ্যোগে একটি সুতাকল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এমনিভাবে সেখানে আধুনিক শিল্প বিকাশের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৫২ থেকে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শিল্প বিকাশের যে কাজ সুরু হয় তাকে ধনতন্ত্র বিকাশের প্রথম যুগসূত্র বলা যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পর ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল। এই বিকাশ প্রথম ঘটে বোম্বাই, কলিকাতা এবং মাদ্রাজে। এই তিনটি শহরে শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল বেশী। তাই শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাতও হয়েছিল এই তিনটি শহর থেকে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রমিকদের কাজ করতে হ'ত এক অমানুষিক নিষ্পেষণমূলক ব্যবস্থার মধ্যে। দৈনিক ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ না করে তারা নিষ্কৃতি পেত না। মজুরী ছিল নামমাত্র। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পর বোম্বের শ্রমিক শ্রেণী এই অমানুষিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম ঘোষণা করে। শ্রমিক আন্দোলনের প্রাথমিক যুগে এই আন্দোলন মোটেই ক্ষুদ্র ঘটনা ছিল না। এই যুগে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে এককভাবে এবং সম্পূর্ণ নিজ শক্তির উপর নির্ভর ক'রে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। এই সংগঠন প্রথম দিকে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কোন রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। তা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় জীবনে নিজস্ব ভূমিকা নিয়ে সেই সময়ে এ দেশের শ্রমিক আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বহুদিন থেকে বাঙলাদেশকে বিভক্ত করবার ষড়যন্ত্র করেছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গ-ভঙ্গের ষড়যন্ত্র কার্য্যকরী করা হয়। এর ফলে সারা দেশে যে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয় জাতীয় আন্দোলন সেই সময় থেকে এক নতুন রূপ নেয়। ভারতের শ্রমিক শ্রেণী শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে নিজেদের অর্থনৈতিক আন্দোলন সীমাবদ্ধ না রেখে ভারতের রাজনীতিতেও শ্রেণী হিসাবে নিজস্ব শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের কারখানায় বিরাট ধর্মঘট হয়। এই ১৯০৭ খৃষ্টাব্দেই রাজদ্রোহ আইন পাশ হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লোকমান্য তিলককে বৃটিশ সরকার গ্রেপ্তার ক'রে ছ'বছর কারাদণ্ড দিলে বোম্বাইএর সুতাকল সমিতির উদ্যোগে বিরাট ধর্মঘটের সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেট ক'রে শ্রমিকগণ পুলিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। এমনি করে ভারতের স্বরাজ আন্দোলনের পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এদেশের শ্রমিক সংগঠন সংক্রান্ত আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনে শ্রমিকদের সংগঠন সৃষ্টির অধিকার স্বীকার ক'রে দেওয়া হয়। সংগঠনগুলি ধর্মঘট পরিচালনার জন্য তহবিল রক্ষারও অধিকার পায়। অতঃপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম শিল্পবিরোধ আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনটির পরিবর্তিত আকার ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের শিল্পবিরোধ আইন নামে শ্রমিক সমস্যা সমাধানে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। ইতিমধ্যে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্বে রাজনৈতিক মতবাদের দ্বন্দ্বে জাতীয়তাবাদী নেতারা নরম ও চরম দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নিখিলভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের মধ্যে প্রথম ভাঙন সুরু হয়। ভারতে তৎকালীন শ্রমিক সমস্যা অনুসন্ধানের জন্য বৃটিশ কর্তৃক প্রেরিত হুইটলি কমিশন বয়কট করার প্রশ্নে মতভেদ তীব্রতর হয়। কিছুকালের মধ্যে রেড ট্রেড ইউনিয়ন ও ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন নামে আরো দুটি সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠন দুটি অবশ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীব্যাপী মন্দার প্রতিক্রিয়া ভারতেও দেখা যায়। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি কিছুকালের জন্য ব্যাহত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের পরাধীনতার সংকট ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়ে মতানৈক্য ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের মধ্যে আবার নতুন বিভেদ সৃষ্টি করে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয়তাবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে অপর একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে হিন্দ মজদুর সভা ও ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে আরো দুটি সংগঠনের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর অর্থাৎ ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে আমরা ভারতবর্ষে চারিটি প্রধান সর্ব ভারতীয় শ্রমিক সংগঠন দেখতে পাই। বর্তমানে এই চারিটি সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন কোন না কোন রাজনৈতিক দলের অনুগতরূপে শ্রমিকদের মধ্যে কর্মরত।

৯

বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নের ঐতিহ্যময় কর্মধারা সংক্ষিপ্তভাবে পর্য্যালোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে পৃথিবীর

অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলি যেরূপ নিয়মানুগ ও নিরপেক্ষ ভিত্তিতে শ্রমিক কল্যাণের দিকে সচেতন, রাজনৈতিক জটাজালে আবদ্ধ ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি সেরূপ সচেতন নয়। এখানে রাজনৈতিক দাবা খেলার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে খুঁটি করা হয়েছে এবং সেই ঘুঁটিগুলি দলকেন্দ্রিকতার দ্বারা চালিত হচ্ছে। 'সবার উপরে দল সত্য তাহার উপরে নাই,—এই কথাটাই হচ্ছে সাম্প্রতিক দিনে ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে পদচারণার প্রধান বক্তব্য। দলের প্রয়োজন আছে এ কথা অনস্বীকার্য্য নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারি বিন্দু যখন বিচ্ছিন্ন ও একক তখন তা শক্তিহীন। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ বারিবিন্দুর গতিবেগ পর্বত, জনপদ উপত্যকা প্রভৃতিকে প্লাবিত ক'রে বিশাল সমুদ্রের জন্ম দেয়। এ ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যষ্টি এককভাবে দুর্বল ও অসহায় এবং তার কণ্ঠরোধে শক্তিসম্পন্ন আধিপত্য মাত্রেই উদ্যত। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ তুচ্ছের সংহতি যখন কর্মতৎপর তখন তার গতিবেগ প্রতিহত করা অসম্ভব। কিন্তু আধুনিক ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দলীয় স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এরূপ ব্যবহারের ফলে দলের স্বার্থের চৌহদ্দির সঙ্গে শ্রমিক কল্যাণের পরিধি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হ'য়ে নানাভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। তাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণকর যে সব উদ্দেশ্য অন্যান্য দেশে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে সেই সব উদ্দেশ্য এ দেশে ব্যর্থ হ'তে চলেছে। সেই জন্য রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে অথচ দলীয় রাজনীতির অতল গহ্বরে পা না দিয়ে কিভাবে ট্রেড ইউনিয়নের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করা যায় এবং বলিষ্ঠ কর্মপদ্ধতি অবলম্বনে পরিশ্রমজীবী মানুষের জীবনের সামগ্রিক উন্নতি বিধান সম্ভবপর হয় সে সম্বন্ধে ভেবে দেখবার দি এসেছে।

হে অগ্নি আদিত্য-রাগ

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

হে অগ্নি আদিত্য-রাগ পৃথ্বীর-পরাণ,
অতীতের তমোগর্ভ হ'তে
বহিয়া চ'লেছ সাথে সে-কী ব্যগ্রধারা
দেহে-দেহে প্রাণে-প্রাণে উচ্চকিয়া প্রাগ্রসর-প্রবণ ইশারা
প্রচণ্ড দাহতে,
জোগায়েছ নিত্য অনুভূত তব অবিচ্ছেদ বিরাট বিস্তার
অকুণ্ঠিত দান—
নব নব সম্ভাব্যের পর্য্যাপ্ত সম্ভার!

তোমার প্রধূম্র শিখা ভ্রূকুটি-কুটিল
বিদ্যুতের তনু ঘিরে নাচে
ঝঞ্ঝার ও মাদকের বিভ্রান্তি-স্পন্দিত,
মরীচিকা-হাহাকার—রূপমরু-উর্ব্বরের একান্ত ঈপ্সিত
জপমন্ত্র যাচে—
প্রাত্যহিক পরিবাহে কভু বা-সে প্রজ্বলন্ত বন্য দাবানল
কাঞ্চনাক্ত নীল—
যৌবন-সঙ্কট-পঙ্কে তৃষ্ণা শতদল!

তোমার বিক্ষেপ-ভঙ্গি-ব্যতিরিক্ত ঋণ
ক্ষতোদ্রিক্ত গুঞ্জন-গুমর
আকর্ষিছে অহোরাত্র আরক্ত সংরাগ
হবির গভীরে কোন্ অতীন্দ্রিয় আসঙ্গের আশ্চর্য্য সোহাগ,
দুশ্চর দুর্ম্মর,
প্রণয়ে যে পরিমিত—পরিণয় দুর্ণমিত আগ্নেয় অস্থক,
সমস্যা সঙ্গীণ—
প্রেম অঙ্গে উত্তরী সে লালসা গৈরিক!

আকাশ আসনে জ্বলে নেশা দুর্ব্বিপাক,
অসনাক্ত মৃত্যু-প্রকরণ,
লাঞ্ছিত সংবর্ত্তের চেষ্টা সর্ব্বনাশী—
দহনান্ত তারি তলে ভস্ম শেষ সুকঠিন স্মারক প্রত্যাশী
মর্ম্ম-অসেচন,
দু'হাতে ছড়ায় বীজ রসপুষ্ট ভবিষ্যের বীর্য্য ঋতম্ভর,
নিরুক্ত নির্ব্বাক,
মন্থন নিরুদ্ধ মন্ত্র অমৃত লহর!

হৃদয়ে অমর্ত্ত্য-মধু জিহ্বায় গরল
সিঞ্চন লেহন নিত্যকাল,
উদ্গারিত বুভুক্ষায় লাভার নির্য্যাস!
আকণ্ঠ তৃষার-জ্বালা—অনির্ব্যক্ত অমর্ষের বিশ্রব্ধ বিন্যাস
জ্বালায় মশাল—
মুঠাভরা ছাই শুধু ঐহিকের অনিবার্য্য শেষ অবশেষ,
বিসর্গ নিষ্ফল—
শ্মশান-বৈভব দৃপ্ত অন্তর উন্মেষ!

অনন্ত তোমার স্পর্শ ত্রিকাল দ্যোতক,
প্রসারিত দিক্‌চিহ্নহারা,
বিজ্ঞানের জ্ঞান হ'তে সুদূর অতীত
দাও তার কণামাত্র আমার এ চিত্ততলে, করি উৎসারিত
ধূর্জ্জির ফোয়ারা—
হব লীন বিশ্বকোষে রক্তের অঙ্গারে তব অহরহ মিশে'
সন্ময় হীরক—
মৃত্যু হ'তে মৃত্যুঞ্জয় জীবন দুর্ব্বিষে!

'ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি'

শৈলদেবী চট্টোপাধ্যায়

এই কিছুদিন আগেই প্রতি পূজা মণ্ডপে ঢাক-ঢোল সানাইএর কলকোলাহলের মধ্যে দেবীর পদতলে প্রার্থনার মন্ত্র গুঞ্জরিত হল—"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।" আর তার সঙ্গে সঙ্গে—"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি।" যে ভক্তজন, প্রার্থীজন দেবীর নিকট প্রার্থনা করেছেন, জীবনের সব চেয়ে বড় কাম্য মুক্তি, তাঁর অন্তরের অন্যতম প্রার্থনা "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি।" মনোরমা ভার্যা যে মানুষের জীবনে শান্তি লাভের পথে কতখানি প্রয়োজনীয় তা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ জানতেন। অথবা ঋষিদের মধ্যে কারো কারো ভাগ্যে অ-মনোরমা ভার্য্যার লাঞ্ছনা যে ঘটেনি, তা কে বলতে পারেন। সে যাই হোক, মুক্তির মন্ত্র যেমন ভক্তের নিকট প্রয়োজনীয়, তেমনি মনোরমা ভার্য্যার জন্য প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।

একজন লেখিকা এক জায়গায় লিখেছেন— "সংসারে সবাই চায় স্নেহময়ী প্রেমময়ী একটি নারীকে। কিন্তু যে হতভাগিনীর শেষ রাত থেকে দিন সুরু হয় আর জীবনী শক্তিটুকু ক্ষয় হতে থাকে সংসারের কয়েকটি প্রাণকে শুধুমাত্র টিঁকিয়ে রাখবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায়, দিন শেষে তার ক্লান্ত অবসন্ন মুখে ক্ষীণ হাসিটুকু বাঁচিয়ে রাখারই সাধ্য থাকে না, তার স্নেহ-প্রেমে মহিমময়ী হয়ে ওঠা ত দূরের কথা।" মনোরমা হবার সাধনায় পর্য্যুদস্ত নারীর একটি করুণ চিত্র।

কিন্তু এর থেকে ভিন্ন চিত্রও তো রয়েছে, যেখানে নারীর অর্থানটন নেই, স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী আছে—আছে আর্থিক স্বচ্ছলতাও। সেখানে কেন নারীর উচ্ছৃঙ্খলতা ও অধৈর্য সংসার চুরমার করে দেয়? দারিদ্র্যে, স্বাচ্ছন্দে—সকল অবস্থায় নারী পুরুষের পাশে থেকে জীবন সংগ্রামে সহায়তা করবে তবেই তো তার সার্থকতা।

মনোরমা হতে হবে বলে অনেকে মনে করতে পারেন নারীকে বুঝি শুধু সুন্দরী হতে হবে, চিত্তহারিণী হতে হবে, জীবনসঙ্গিনী হতে হবে, তা' কিন্তু নয়। মনোরমা অর্থে নারীকে হতে হবে সংসারের মনোরমা—স্বামী, শ্বশুরের সংসারকে তার সুন্দর করে তুলতে হবে; স্নেহে দয়ায়-মায়ায় তাকে কল্যাণময়ী হতে হবে। নারী তার মনোরমাত্বের সাধনায় যাতে সিদ্ধিলাভ করতে পারে, তার জন্যে অনেক কিছুই তাকে শিক্ষা করতে হয়। সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের মেয়েরা মা, ঠাকুমা, দিদিমা, মাসিমা প্রভৃতি গুরুজনদের কাছ থেকে অনেক উপদেশ পেয়ে থাকেন—কি ভাবে সংসার চালাতে হবে, কি ভাবে স্বামীগৃহে থাকতে হবে, কি করলে সবাইকে সুখী করা যাবে ইত্যাদি। কিন্তু অতি-আধুনিক ঘরের ইংরাজীশিক্ষিতা মহিলারা এরূপ উপদেশে অনেক সময় কর্ণপাতও করেন না, ব্যাক্‌-ডেটেড্ বলে। তাঁদের জন্য এবং সাধারণের জন্যও Douglas Lurton যে কয়টি বিধিনিষেধ বেঁধে দিয়েছেন—তা উদ্ধৃত করছি—

1. Do'nt nag—(ঘ্যান্‌ঘ্যানে হইও না)

2. Be affectionate—(স্নেহশীলা হও)

3. Don't complain—(অভিযোগ করিও না)

4. Don't interfere with the hobbies of the husband—(স্বামীর শখ ইচ্ছা প্রভৃতিতে বাগড়া দিও না।)

5. Be not quick-tempered—(রাগী বা অধৈর্য্য হইও না।)

6. Don't interfere with the discipline of children—(ছেলেপুলেদের নিয়ম শৃঙ্খলাতে বাধা দিও না।)

7. Be not conceited—(আত্মাভিমানি বা দাম্ভিক হইও না।)

8. Be not insincere—(কপট বা অসরল হইও না।)

9. Dont criticize husband—(স্বামীর সমালোচনা করিও না।)

10. Be not narrow-minded—(সঙ্কীর্ণমনা হইও না।)

11. Don't neglect children—(শিশুদের অবহেলা করিও না।)

12. Keep house properly—(গৃহস্থালী সুনিয়মে রাখ।)

স্বচ্ছল আর অস্বচ্ছল সব সংসারেই নারী এ কয়টি উপদেশ মেনে চললে তার মনোরমাত্ব বাড়বে সন্দেহ নেই।

অনেক ভুক্তভোগী মহিলা বলবেন, নারীর জন্যেই যত বিধিনিষেধ। পুরুষ বুঝি সংসারে অশান্তি আনে না? আনে। তাদের জন্যেও লার্টন বিধান দিয়েছেন—

1. Be not selfish and inconsiderate—(স্বার্থপর ও অবুঝ হইও না।)

2. Try to be successful in business—(কর্ম্মে সাফল্য লাভের চেষ্টা কর।)

3. Be truthful—(সত্যবাদী হইও।)

4. Dont complain—(অভিযোগ করিও না।)

5. Show affection—(স্নেহ, প্রেম প্রদর্শন কর।)

6. Don't be harsh with childern—(শিশুদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করিও না।)

7. Dont be touchy—(স্পর্শ কাতর হইও না।)

8. Have interest in children—(শিশুদের প্রতি মনোযোগী হইও।)

9. Be interested in home—(গৃহের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইও।)

10. Be not rude—(রুক্ষ স্বভাবের হইও না।)

11. Have ambition—(উচ্চাভিলাষী হইও।)

12. Don't be nervous and impatient—(ভীতু ও অধৈর্য্য হইও না।)

13. Dont criticize the little wife—(স্ত্রীর সমালোচনা করিও না।

নারী ও পুরুষের মিলিত প্রচেষ্টায় সংসার সুখের হবে, সকলের মনোরমাত্ব বাড়বে এতে সন্দেহ নেই। সে সম্বন্ধে চেষ্টাও করতে হবে ঐকান্তিকভাবে, আর দেবীর চরণে নারী পুরুষ উভয়েরই প্রার্থনা করলেই শুধু চলবেনা—এইসব বিধিনিষেধও পালন করতে হবে যাতে জীবন সুখময়, মধুময় হয়ে ওঠে।

কাগজের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

ইতিপূর্ব্বে কাগজের কারু-শিল্পের কয়েকটি বিচিত্র সৌখিন-সামগ্রী রচনার কথা বলেছি। এবারে বলবো, কাগজের কারু-শিল্পের কয়েকটি নিত্য-প্রয়োজনীয় ঘরোয়া-সামগ্রী রচনার কথা।

বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখার কাজের জন্য খাম-লেফাকার (Envelope) দরকার সব সময়েই। সাধারণতঃ আমরা

এ প্রয়োজন মেটাই বাজার থেকে ছোট-বড়, লম্বা এবং চৌকানো নানা ধরণের খাম বা লেফাফার প্যাকেট কিনে। তাতে খাম তৈরী-করার মেহনৎ আর সময় বাঁচে অনেকখানি, কিন্তু হিসাব কষে দেখলে বোঝা যায় যে অর্থব্যয় ঘটে বেশ কিছুটা। অথচ, সামান্য একটু মেহনৎ করলে অল্প খরচে কিছু কাগজ আর গঁদের আঠা (Glue) ব্যবহার করে দৈনন্দিন সাংসারিক-কাজকর্ম্মের অবসরে বাড়ীতে বসেই অনায়াসে এ কাজটুকু সেরে ফেলা যায়। তার ফলে শুধু যে খাম আর লেফাফাগুলি পরিপাটি-সুন্দর প্রয়োজন-মতো ছাঁদের এবং মজবুত-গড়নের হয়তাই নয়, গৃহস্থ-সংসারে অর্থের সাশ্রয়ও হয় অনেকখানি। তাছাড়া অভাবের সংসারে এভাবে নিত্যকার সাংসারিক কাজের ফাঁকে অবসর-সময়ে খাম-লেফাফা প্রভৃতি বানিয়েও বাজারের দোকানে সে সব চালান দিয়ে, তার বিনিময়ে কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জনের সম্ভাবনা আছে যথেষ্ঠ—বিশেষ করে ইদানীং কালের এই মাগ্যি-গণ্ডার দিনে। তাই আজ কাগজের কারু শিল্পে এ সব নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী-রচনার বিষয়ে মোটামুটি আভাস জানাচ্ছি।

কাগজের কারু-শিল্পের এই সব প্রয়োজনীয়-সামগ্রী অর্থাৎ খাম-লেফাফা প্রভৃতি রচনা এমন কিছু দুঃসাধ্য পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার নয় এবং এজন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার, সেজন্য খুব বেশী খরচপত্রও লাগে না। এ কাজের জন্য প্রয়োজন শাদা বা বাদামী কিম্বা কোনো হালকা-রঙের কয়েক দিস্তা মিহি বা মোটা ধরণের মজবুত কাগজ, একটি কাগজ-কাটা ছুরি, কাঁচি, একশিশি গঁদের আঠা (Glue), একটি লাইন-টানবার 'স্কেল' বা 'রুলার' (Ruler-Scale) এবং একটি পেন্সিল।

উপরের ফর্দ্দ-অনুসারে সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর, কাজে হাত দেবার পালা। পাশের ১, ২ এবং ৩, ৪ নং ছবিতে দুটি বিভিন্ন-ছাঁদে শাদা বা রঙীণ কাগজের-তৈরী খাম ও লেফাফা (Envelope) বানানোর নমুনা-নক্সা দেখানো হলো। প্রথমটি (১, ২ নং চিত্র) চৌকো-ছাঁদের লেফাফা এবং দ্বিতীয়টি (৩, ৪ নং চিত্র) লম্বা-ধরণের খাম।

শিক্ষার্থীদের পক্ষে, গোড়ার দিকে উপরোক্ত নমুনা-নক্সা দুটির ছাঁদে, কাগজের খাম বা লেফাফা রচনা করাই যুক্তিযুক্ত হবে। কিছুদিন অভ্যাসের ফলে, এ কাজে হাত বেশ রপ্ত এবং কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের পর, তাঁরা নিজেরাই তখন অনায়াসে অন্য আরো নানা বিচিত্র ছাঁদের খাম ও লেফাফা তৈরী করতে পারবেন।

এবারে বলি, উপরোক্ত নমুন-নক্সা দুটির ছাঁদে কাগজের খাম ও লেফাফা রচনার পদ্ধতির কথা।

আগেই বলেছি, খাম বা লেফাফা তৈরীর জন্য কি ধরণের কাগজ ব্যবহার করতে হবে। কাজেই তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। পছন্দমতো কাগজ সংগ্রহ করে, সে কাগজের বুকে, গোড়াতেই উপরের ১ নং কিম্বা ৩ নং ছবির মাপ-অনুসারে, পেন্সিলের রেখা টেনে নক্সার ছাঁদে আগাগোড়া 'ছক' এঁকে নিতে হবে। 'এই, ছকটি' (Sketch) হলো, 'চৌকো' (১ নং চিত্র) কিম্বা 'লম্বা' (৩ নং চিত্র) আকারের খাম বা লেফাফার 'ছাঁচ' বা 'ফর্ম্মা' (Format)। এবারে অবিকল এই 'ছাঁচের' মাপে ও ছাঁদে বাকী কাগজগুলিকে ছাঁটাই করে নিন। তাহলেই 'লম্বা' বা 'চৌকো'—যে ছাঁদের খাম-লেফাফা তৈরী করবেন সঙ্কল্প করেছেন—সেটির ছাঁটাইয়ের কাজ (Cutting) শেষ হলো।
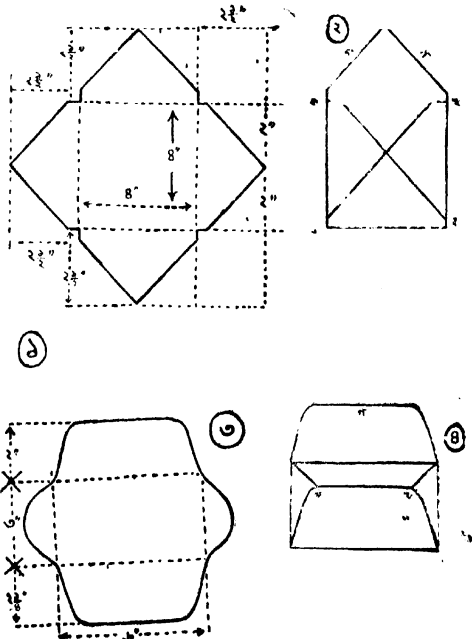
ছাঁটাইয়ের পর, 'খাম' বা লেফাফার কাগজটিকে 'ভাঁজ' (Folding) করার পালা। এ কাজটিও পরিপাটি-ভাবে করতে হবে, নাহলে খাম-লেফাফার গড়ন অসুন্দর ও বে-মজবুত হবার সম্ভাবনা। সুতরাং এদিকে শিক্ষার্থীদের বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। যাই হোক, উপরের ১ নং বা ৩ নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনিভাবে 'সুস্পষ্ট লম্বা-রেখাঙ্কিত' (Area drawn in Bold-Lines) কাগজের মাঝখানে 'ফুট্‌কি-ফুট্‌কি রেখাঙ্কিত' (Area drawn in Dotted-Lines) অংশ সব আগাগোড়া পরিপাটিভাবে ভাঁজ করে ফেলুন। তাহলেই খাম বা লেফাফাটি ২ নং বা ৪ নং ছবিতে যেমন নমুনা দেখানো রয়েছে—সেই ছাঁদের অনুরূপ হবে। এবারে ২ নং ও ৪নং ছবিতে দেখানো নির্দ্দেশ-অনুসারে খামের 'ক' এবং 'খ' চিহ্নিত অংশে সুষ্ঠুভাবে সরু-লাইনে গঁদের আঠার প্রলেপ লাগিয়ে কাগজের নীচের প্রান্তগুলিকে মজবুত করে সেঁটে দিন। তারপর উপরের ২ নং বা ৪ নং ছবির নির্দ্দেশমতো 'গ' চিহ্নিত অংশে অর্থাৎ খাম-লেফাফার উপর-প্রান্তে সরু-লাইনে গঁদের আঠার প্রলেপ লাগিয়ে, কাগজটিকে ছায়া-শীতল স্থানে রেখে বাতাসে শুকিয়ে নিন। গঁদের আঠা ভালোভাবে শুকিয়ে যাবার পর, খাম-লেফাফার উপরের প্রান্তটিকে পরিপাটিভাবে ভাঁজ করে দেবেন। তাহলেই 'খাম' বা 'লেফাফা' রচনার কাজ শেষ হবে।

এই হলো কাগজের খাম বা লেফাফা তৈরীর মোটামুটি পদ্ধতি।

বারান্তরে, কাগজের কারু-শিল্পের আরো কয়েকটি-বিচিত্র সৌখিন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী রচনার কথা আলোচনা করার বাসনা রইলো।

সুধীর হালদার

এবারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি বিশেষ ধরণের রান্নার কথা বলি। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন এবং অতিথি-আপ্যায়নের ব্যাপারে এগুলি পরম উপাদেয় এবং অভিনব ধরণের রান্না।

প্রথমেই বলি, দক্ষিণ-ভারতের জনপ্রিয় কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব রান্নার প্রণালীর বিষয়।

সম্বর

এটি সুদীর্ঘকাল ধরে দক্ষিণ-ভারতের মুখরোচক খাদ্য-তালিকায় বিশিষ্ট একটি স্থান অধিকার করে আসছে। এ রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি। 'সম্বর' রান্নার জন্য চাই—প্রয়োজনমতো অড়হর ডাল, ছাঁচি কুমড়ো, পালং শাক, সজনে ডাঁটা, ঢেঁড়স, ধনেপাতা, হিং, ভাজা-লঙ্কার গুঁড়ো, গোলমরিচ, ধনে এবং তেঁতুল। এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, রান্নার পালা।

রান্নার কাজ সুরু করবার আগেই শব্জীগুলি প্রয়োজন-মতো আকারে কুটে নেবেন এবং একটি পাত্রে আন্দাজ-মতো জল ঢেলে তেঁতুল ভিজিয়ে রাখতে হবে···নজর রাখবেন তেঁতুলের ক্বাথ যেন বেশী করে থাকে। এবারে উনানের উপর অন্য একটি পাত্রে জল দিয়ে,অড়হর ডাল সিদ্ধ করে নিতে হবে···ডাল যেন বেশী পাৎলা ধরণের না হয়—ঘন হওয়া প্রয়োজন। তারপর ঐ তেঁতুলের ক্বাথে পালংশাক, ছাঁচি কুমড়ো,সজনে ডাঁটা,ঢেঁড়স প্রভৃতি কুটে রাখা শব্জী-গুলি ঢেলে দিয়ে পাত্রটিকে উনানের আঁচে বসিয়ে এগুলি একত্রে সুসিদ্ধ করে নিতে হবে। এভাবে তেঁতুলের ক্বাথে

সব্জীর টুকরোগুলি সিদ্ধ করবার সময়, আন্দাজমতো পরিমাণে রান্নার-মশলা অর্থাৎ ভাজা লঙ্কার গুঁড়ো, গোল-মরিচের গুঁড়ো, ধনে এবং অল্প একটু হিং মিশিয়ে দেবেন। তারপর বেশ খানিকক্ষণ উনানের আঁচে ফুটে শব্জীর টুকরোগুলি সুসিদ্ধ হয়ে গেলে, রান্নার পাত্রে মশলা-মেশানো তেঁতুলের ক্কাথে আন্দাজমতো ধনেপাতার সঙ্গে সিদ্ধ-করা অড়হর ডাল ঢেলে দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপর ঐ মশলা-মেশানো তেঁতুলের ক্কাথে সুসিদ্ধ ডাল-সব্জী একটু বেশী-পরিমাণ ঘিয়ে বেশ করে কষে ভেজে নিয়ে, সবটুকু সম্বরা দিয়ে নিলেই রান্নার পালা শেষ। এই হলো দক্ষিণ-ভারতীয় খাদ্য 'সম্বর' রান্নার মোটামুটি নিয়ম।

রসম্

এটিও দক্ষিণ-ভারতের পরম-উপাদেয় এবং জনপ্রিয় আরেকটি বিশেষ ধরণের রান্না। 'রসম্' রান্নার জন্য উপকরণ প্রয়োজন—তেঁতুল, ধনেপাতা, রসুন, সরষে, গোলমরিচের গুঁড়ো, জিরে, নুন আর ঘি।

উপকরণগুলি সংগৃহীত হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগেই, জল-ভরা একটি পাত্রে প্রয়োজনমতো তেঁতুল ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক এমনিভাবে ভিজিয়ে রাখার পর, তেঁতুল বেশ করে গুলে নিতে হবে। এভাবে গুলে নেবার সময় তেঁতুলের ছিবড়ে, খোসা আর বিচিগুলি ফেলে দেবেন। এবারে একটি পরিচ্ছন্ন এ্যালুমিনিয়মের ডেকচিতে এই তেঁতুল-গোলা-জল ঢেলে, পাত্রটি উনানের আঁচে বসিয়ে খানিকক্ষণ ফুটিয়ে নেবেন। এমনিভাবে ফোটানোর সময় উনানের আঁচে বসানো পাত্রের ফুটন্ত তেঁতুল-গোলা জলে আন্দাজমতো পরিমাণে ধনেপাতা, জিরে, গোলমরিচের গুঁড়ো আর নুন মিশিয়ে ডেকচির তরল-পদার্থটিকে আরো বেশ কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেবেন। তারপর উনানের উপর থেকে ডেকচি নামিয়ে রেখে, অন্য একটি পাত্রে এক কোয়া রসুন এবং আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি আর সরষে ফোড়ন দিয়ে, তাইতে ঐ ফুটন্ত মশলা-মেশানো-তেঁতুল-গোলা জলটুকু সব ঢেলে দিতে হবে। এই হলো দক্ষিণ-ভারতীয় খাদ্য 'রসম্' রান্নার মোটামুটি প্রণালী।

বারান্তরে, আরো কয়েকটি বিচিত্র ভারতীয় রন্ধন-প্রণালীর কথা আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফলাফল

উপাধ্যায়

মেষরাশি

ভরণী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে গ্রহ বৈগুণ্য দোষ থেকে কিছুটা মুক্ত হবে, কিন্তু অশ্বিনী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রাশ্রিতগণের গ্রহ কোপ হেতু দুঃখক্লেশ ভোগ আছে। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, স্বাস্থ্যের অবনতি, মানসিক অবসন্নতা এবং উদ্বিগ্নতার বৈচিত্র্য, দ্বন্দ্বকলহ, ক্ষতি কর্ম্মে বাধা, আশঙ্কা-সংশয় মর্য্যাদাহানি, অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন, মামলা মোকর্দ্দমার ভয়, অসৎসংসর্গ, ব্যয়বৃদ্ধি প্রভৃতির সম্ভাবনা, উল্লেখযোগ্য শুভফলের আশা কম। সারা মাস শরীর নিয়ে কষ্টভোগ। দেহের যে কোন অংশ আক্রান্ত হোতে পারে তন্মধ্যে উদর, গুহ্য প্রদেশ, মুত্রাশয় উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ার্দ্ধে রক্তের চাপবৃদ্ধি, জ্বর প্রভৃতি দেখা দিতেপারে। পারিবারিক ব্যাপার গুরুতর হবে। ঘরে বাইরে স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত কলহ। স্ত্রীরসঙ্গে' কলহের মাত্রাধিক্য এবং তজ্জনিত অশান্তিও গুরুতর পরিস্থিতি, আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব। ব্যয়বৃদ্ধি অত্যধিক হবে। এমাসে ঋণ করা অনুচিত, কেননা ঋণপরিশোধ করা সহজসাধ্য হবেনা। কোন প্রকার স্পেকুলেশন বিশেষতঃ ষ্টক এক্সচেঞ্জে 'শোচনীয় পরিণতি এনে দেবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি আদৌ শুভ নয়। চাকুরিজীবীদের দুঃসময়, প্রতি পদক্ষেপে উপরওয়ালার অসদ্ব্যবহার সহ্য করতে হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে সময়টা ভালো বলা যায় না। যে সব নারী অবৈধ-প্রণয়ে লিপ্তা তাদের পক্ষে নানাপ্রকার বিপত্তির সম্ভাবনা আছে। দাম্পত্য প্রণয়ভঙ্গ যোগ। স্ত্রী লোকের পক্ষে কোন প্রকারেই মাসটি শুভ যাবেনা। চাকুরিজীবী নারীর অফিসমহলে বা কর্ম্মক্ষেত্রে নানা বিড়ম্বনাভোগ। প্রণয় পিপাসু নারীর অন্তরে মর্ম্মান্তিক আঘাত। যে কোন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার পরিণতি ভালো হবেনা। প্রতারণার সম্ভাবনা। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে লাঞ্ছনা যোগ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তাছাড়া স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে, স্ত্রী ব্যাধি প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। রেসে পরাজয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটি নৈরাশ্যজনক।

বৃষরাশি

মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে উত্তম, গ্রহকোপে বিপর্য্যস্ত হবে না। রোহিনীর পক্ষে মধ্যম। কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে শুভফলের আশা করা বৃথা। শেষার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধটি শুভ। সাফল্য, মানসিকশান্তি লাভ, শত্রুজয়, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা, নূতন পদমর্য্যাদা, আয়বৃদ্ধি প্রথমার্দ্ধে দেখা যায়। প্রতিপক্ষ ও প্রতিযোগীদের কুচক্রান্ত, কষ্টকর ভ্রমণ, শত্রুতা ভগ্নস্বাস্থ্য অপমান ও উদ্বিগ্নতা, মামলা মোকর্দ্দমা, পরিকল্পনায় বাধা, কলহ বিবাদ, ভুলধারণা প্রভৃতি শেষার্দ্ধে প্রকাশ পাবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে শারীরিক অসুস্থতা, উদর গুহ্য ও মূত্রাশয়ের পীড়া, অজীর্ণতা দোষ, চক্ষুপীড়া এমনকি চক্ষুর অস্ত্রোপচার পারিবারিক অশান্তি, পুত্রগণের সঙ্গে মনোমালিন্য ইত্যাদি দেখা যায়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে আর্থিক অবস্থা সুবিধা-জনক নয়। ব্যয়াধিক্য সমস্যা-সঙ্কুল করে তুলবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে পরাজয় অভাবনীয় ক্লেশজনক অবস্থা হবে বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের। প্রথমার্দ্ধে চাকুরিজীবীদের পক্ষে শুভ, দ্বিতীয়ার্দ্ধেও বিশেষ কিছু খারাপ দেখা যায় না। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। যে সব নারী গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাদের পক্ষে কোন অশুভ ঘটনার সম্ভাবনা নেই। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে আহার বিহার পরিমিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বস্ত্রালঙ্কার ক্রয় অনুচিত। চাকুরিজীবী বিশেষতঃ উপসেবিকার পক্ষে মাসটি অনুকূল। অবৈধ প্রণয়ে লিপ্তা নারীর বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। এমাসে প্রণয়ের দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। পরপুরুষের সহিত ভ্রমণ, কোর্টসিপ, পার্টিতে যোগদান, পিকনিকে অংশগ্রহণ একেবারেই বর্জ্জনীয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়।

মিথুন রাশি

মৃগশিরা ও পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে উত্তম। আর্দ্রাজাতগণের পক্ষে অধম। মাসটি মিশ্রফলদাতা। সাধারণ সাফল্য, শত্রুজয়, লাভ, বিবাহ

বিসম্বাদের নিষ্পত্তি, বিলাস ব্যসন, জনপ্রিয়তা, আয়বৃদ্ধি, সুখ, আমোদজনক ভ্রমণ, শুভ ঘটনা, বন্ধুর সাহায্য লাভ প্রভৃতি মাসের শেষার্দ্ধে প্রত্যক্ষ হবে। প্রথমার্দ্ধে কষ্ট ভোগ, গুরুজনবর্গের অপ্রিয়ভাজন হবার যোগ, দুর্ঘটনা, ব্যর্থ প্রচেষ্টা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, ক্ষতি, স্বজন ও ভৃত্যাদি গণের জন্যে কষ্টভোগ। স্বাস্থ্যের অবনতি হবে না। সন্তানদের শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করা বিশেষ দরকার। প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক কষ্ট, কলহ বিবাদ, শেষ পর্য্যন্ত সন্তানাদির সঙ্গে কলহের মাত্রাধিক্য হোতে পারে। আর্থিক অবস্থা অনুকূল নয়। লাভ ক্ষতি দুই-ই সম্ভব। দ্বিতীয়ার্দ্ধে আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করার যোগ আছে। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ। চাকুরিজীবীদের পক্ষে উত্তম, প্রথমার্দ্ধে কিছু অসন্তোষজনক পরিস্থিতি হোতে পারে। অধীনস্থ লোকেরা কিছু কষ্ট দিতে পারে। দালাল ও আইন ব্যবসায়ীদের পক্ষে উত্তম। অন্যান্য ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী মধ্যম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী উত্তম, বিশেষতঃ এ সম্পর্কে দ্বিতীয়ার্দ্ধটী উল্লেখযোগ্য। সংসার থেকে পৃথক হয়ে স্বামীর সঙ্গে আলাদাভাবে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করার যোগ। সামাজিক সংশ্লিষ্ট ও অবৈধ প্রণয়ে লিপ্তা নারীর পক্ষে উত্তম সময়। অধ্যাত্ম সাধিকার ধ্যান ধারণাও তপজপের প্রাবল্য দেখা যায়। চাকুরিজীবী নারীর পক্ষে উত্তম। রেসে বিশেষ সুবিধা দেখা যায় না। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষাজাতগণের পক্ষে ভালোই, পুষ্যার পক্ষে কিছুটা অশুভ। মাসের শেষার্দ্ধটি সকলের পক্ষেই কিছুটা অশুভ হোতে পারে। আর্থিক স্বাচ্ছল্যের বৃদ্ধি, বিলাসিতা, শত্রুজয়, মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান, ভ্রমণ, সুখস্বচ্ছন্দতা, সুসমাচার প্রাপ্তি, নূতন বিষয়ে অধ্যয়নানুরাগ, উত্তম বন্ধু লাভ প্রভৃতি শুভ ফলের আশা করা যায়। দুঃখবেদনা, অর্থকৃচ্ছ্রতা, স্বজনবন্ধুর সহিত মনোমালিন্য, নানাপ্রকারের উদ্বিগ্নতা প্রভৃতি সম্ভব। গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা নেই। স্ত্রী পুত্র পরিবারের পীড়াদি কষ্ট। শেষার্দ্ধে অল্প বিস্তর আঘাতাদি দুর্ঘটনার ভয়। পরিবার সম্পর্কে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন। পারিবারিক ব্যাপারে ক্লান্তিকর ভ্রমণ। গৃহে শিশুর জন্ম সম্ভাবনা। আর্থিক বিষয়ে নানা পরিবর্ত্তনের যোগ এবং এ সম্পর্কে হ্রাসবৃদ্ধি। সরকারী বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অর্থকৃচ্ছ্রতা অনেকটা লাঘব হোতে পারে। এমাসে কোনপ্রকার টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখা অনুচিত: নূতন পরিকল্পনায় রূপ দিলে সাফল্য লাভ হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেস খেলায় কিঞ্চিৎ লাভ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী সন্তোষজনক। চাকুরীজীবিদের পক্ষে প্রথমার্দ্ধটি শুভ। শেষের দিকে উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হওয়া এবং কাজের কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রভৃতি ঘটতে পারে। বৃত্তিজীবি ও ব্যবসায়ীর পক্ষে এবং রঙ্গমঞ্চ ও সিনেমা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ভালো। স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে শুভ। অবৈধ প্রণয়ে লিপ্তা হোতে যারা ইচ্ছুক, তাদের পক্ষে মাসটি উত্তম। তা ছাড়া সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত অভিনয়, প্রবন্ধরচনা এবং ধর্ম্মসাধনার দিকে যাদের ঝোঁক আছে, তাদের সাফল্য লাভ হবে। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তম। ভ্রমণ ও রম্য চিঠিপত্র আদান প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধিপাবে। গৃহস্থালী কর্ম্মেরত মেয়েরা বিশেষ শান্তি ও সুখ পাবে। আবহাওয়া বিশেষ অনুকূল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

সিংহ রাশি

পূর্ব্ব ফল্গুনী জাতগণের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। মঘার পক্ষে মধ্যম। উত্তর ফল্গুনী জাতগণের পক্ষে অধম। মাসটী মিশ্রফল দাতা। উত্তম বন্ধু, বিলাস ব্যসন, ধনৈশ্বর্য্যলাভ, প্রভাব প্রতিপত্তির বৃদ্ধি, সৌভাগ্য প্রভৃতি যোগ আছে। চিত্তের অপ্রসন্নতা, স্বজন বন্ধু সহ কলহ বিবাদ, লাভশূন্য প্রচেষ্টা, অর্থক্ষতি, গুরুজনবর্গের শাসনজনিত কষ্টভোগ উপরওয়ালার সহিত মনোমালিন্য, শত্রুতা শারীরিক কষ্ট প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। হজম শক্তির গোলমাল, গুহ্যদেশে পীড়া, আমাশয় ইত্যাদির আশঙ্কা আছে। এ ছাড়া আর কোনরূপ কষ্ট ভোগ দেখা যায় না। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু পারিবারিক বিশৃঙ্খলতা ও অশান্তির সম্ভাবনা। এ মাসে গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আশা করা যায়। সন্তোষজনক আয় ও আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। লগ্নী ব্যাপার জনিত আয়বৃদ্ধি। আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য। টাকা লেন দেন ব্যাপারে ক্ষতি ও প্রতারণার যোগ থাকায় পূর্ব্বে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। কোন ব্যক্তির জন্যে জামিন হওয়া চলবেনা। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে জয়লাভ। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবির পক্ষে বহু বাধা বিপত্তি, গোলযোগ মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতির সম্মুখীন হোতে হবে। কিছু সম্পত্তিও ক্ষতিগ্রস্থ হোতে পারে। চাকুরির ক্ষেত্র আদৌ সন্তোষজনক নয়। উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হওয়া, প্রতিদ্বন্দ্বীদের কুচক্রান্ত জনিত কষ্ট উন্নতির পক্ষে বাধা প্রভৃতি দেখা যায়। যে সব বন্ধুকে শুভানুধ্যায়ী বলে মনে কর, তারাও কোন রকম সাহায্যের সম্মুখীন হবে না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। বুদ্ধিজীবী মহিলাদের পক্ষে এই মাসটী উত্তম। অধ্যাপনায় কৃতিত্ব অর্জ্জন, সাহিত্য, শিল্প বিজ্ঞান, সংবাদ ও কাব্য রচনায় সাফল্য লাভ। অবৈধ প্রণয়ে ও পরপুরুষের সঙ্গে মেলা মেশায় অপ্রীতিকর জটিল পরিস্থিতি ঘটতে পারে। এমাসে কোর্টসিপ বা বিবাহের দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

কন্যা রাশি

চিত্রানক্ষত্রজাত গণের পক্ষে উত্তম। হস্তার পক্ষে মধ্যম। উত্তরফল্গুনীজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। মাসটী মিশ্রফল দাতা। দ্বিতীয়ার্দ্ধটী প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শুভ। উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রুজয়, উত্তম বন্ধুলাভ, বিশেষ গুণের প্রকাশ এবং তজ্জনিত সমাদর লাভ, সুখ লাভ, প্রচেষ্টায় সাফল্য, বিলাস ব্যসন, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, নূতন বিষয়

অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞানার্জ্জন, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য লাভ প্রভৃতি মাসের শেষার্দ্ধে পরিস্ফুটিত হবে। প্রথমার্দ্ধে কিছু ক্ষতি, আর্থিক দুশ্চিন্তা, স্বজন বন্ধু কলহ, উদ্বিগ্নতা, কার্য্যে ব্যর্থতা, অহেতুক অপবাদ, কুৎসা রটনাহেতু মানসিক কষ্ট। স্বাস্থ্য হানির আশঙ্কা নেই। সন্তানদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দৃষ্টি নেওয়ার দরকার। পারিবারিক শান্তি অটুট থাকবে। পরিবারের বহির্ভূত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মনোমালিন্য বা কলহ বিবাদ ঘটতে পারে। এমন কি শত্রুতায় পরিণত হওয়াও সম্ভব। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা ব্যাহত হবে না, বরং শেষার্দ্ধে আরও অনুকূল পরিস্থিতি ঘটবে। প্রথম দিকে কিছু আর্থিক ক্ষতি বা ব্যয়ের চাপ পড়তে পারে। এতদ্ সত্বেও আর্থিক অবস্থা এমাসে অতীব সুন্দর। নিজের পরিশ্রম, চেষ্টা, প্রতিভা ও অধ্যবসায় প্রভৃতি আর্থিক অবস্থাকে উন্নত করবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয় রেসে জয়লাভ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষি জীবির পক্ষে মাসটী শুভ। চাকুরির ক্ষেত্রে নূতন পদ মর্য্যাদা, পদোন্নতি, উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ এবং কর্ম্মস্থলে খ্যাতি প্রতিপত্তি যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে। মহিলাদের পক্ষে মাসটী অতীব উত্তম। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ ও উপহার প্রাপ্তি। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে শান্তি, শৃঙ্খলা মর্য্যাদা লাভ ও চিত্তের প্রসন্নতা, প্রভুত্ব বিস্তার প্রভৃতি যোগ। রঙ্গমঞ্চে, সিনেমায়, গান বাজনায় যে সব নারী আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁরা বিশেষভাবে অর্থোপার্জ্জন ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারবেন। ভ্রমণ, পিকনিক, পরপুরুষের সান্নিধ্য সাহচর্য্য ও আনুগত্য লাভ করে আনন্দে আত্মস্ফীত হবার সম্ভাবনা। এ মাসে কোর্টসিপ, বিবাহের কথাবার্ত্তা প্রভৃতি অনুকূল। চাকুরিজীবি নারীর পক্ষেও উত্তম সময়। রেসে জয়লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অতীব উত্তম সময়।

তুলা রাশি

চিত্রা ও বিশাখা নক্ষত্র জাতগণ ব্যক্তির পক্ষে অনেকটা শুভ কিন্তু স্বাতী জাত গণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। শারীরিক কষ্ট, বাধা, কর্ম্ম প্রচেষ্টার বাধা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, ক্ষতি, স্বজন বন্ধুবিরোধ, অপবাদ ও অসম্মান, স্বজন বিয়োগ ও দুঃখ কষ্ট। বিলাস ব্যসন, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য লাভ, কিছু সুখ সমৃদ্ধি, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি শুভ ফলের আশা করা যায়। স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি, রক্তের চাপবৃদ্ধি ও হৃদ্‌ রোগের প্রকোপ, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং অনুরূপ উপসর্গ পীড়াদি আশঙ্কা করা যায়। আহারাদির সামান্য দোষ ঘটলে বায়ুপিত্ত প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। প্রথমার্দ্ধেই এগুলি প্রকাশ পেতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন কলহবিবাদাদি জনিত ঘটনার ভয় নেই। পরিবারের বহির্ভূত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বর্গের সহিত মনোমালিন্য হবে। আর্থিক অবস্থা আদৌ ভালো বলা যায় না। ব্যয়াধিক্য জনিত কষ্টভোগ। নানা প্রকার সমস্যা সঙ্কুল পরিস্থিতি। আর্থিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে পরাজয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষি জীবীর পক্ষে মাসটী অনুকূল নয়। চাকুরির ক্ষেত্র মোটেই শুভপ্রদ নয়। উপর ওয়ালার বিরাগ ভাজন হবার যোগ রয়েছে। নানা প্রকার অভিযোগ ও বিরুদ্ধ মন্তব্যের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবিদের পক্ষে মাসটী আশা প্রদ নয়। এমাসের প্রথমে নারীচিত্ত রোমান্সের দিকে ঘুরবে, অসম সাহসিক কার্য্য করবার জন্যে অভিলাষী হবে, তা ছাড়া অবৈধ প্রণয়ের আবেষ্টনে জড়িয়ে পড়তে পারে। অতএব এ সব বিষয়ে সতর্ক না হোলে ও চিত্ত সংযমের অভাব ঘটলে এই সব কার্য্যের পরিণতি শোচনীয় হয়ে উঠবে। পরপুরুষের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য যতটা সম্ভব বর্জ্জন করা আবশ্যক। দৈনন্দিন রুটিন মাফিক কাজের মধ্যে থাকাই ভালো। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। দাম্পত্য প্রণয় ভঙ্গ যোগ। মঞ্চ ও পর্দ্দার অভিনেত্রীগণের বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত গণের পক্ষে অনেকটা শুভ, অনুরাধা জাত গণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। নানা প্রকার উদ্বিগ্নতা, কলহ, ক্ষতি, দুঃখ, স্বাস্থ্যের অবনতি, প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা ক্লান্তিকর ভ্রমণ, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুদের জন্য কষ্টভোগ বন্ধুহানি, অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছনীয় পরিবর্ত্তন। এতদ্‌সত্বেও বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি লাভ। উপভোগ, বিদ্যার্জ্জনের সাফল্য লাভ, শত্রুজয়, প্রভাব বৃদ্ধি প্রভৃতির যোগ আছে। সারা মাসের মধ্যে শরীর ভালো যাবে না। ক্লান্তিকর ভ্রমণ জনিত কষ্টভোগ রক্তের চাপ বৃদ্ধি, উদর ফুসফুস ও চক্ষুপীড়া। পথ্য সম্পর্কে সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক শান্তির অভাব। কলহ বিবাদ লেগেই থাকবে। পরিবারের বহির্ভূত স্বজন ব্যক্তিও বন্ধুরা কষ্ট দেবে ও কলহের ইন্ধন জোগাবে। আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে না, এবং অর্থের চাপ চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে। অপরের জন্যে জামিন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। স্বজনবর্গেরা অর্থক্ষতি ঘটাবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে পরাজয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী নৈরাশ্য জনক। চাকুরি জীবিরা উপর ওয়ালার বিরাগ ভাজন হবে, কর্ম্মক্ষেত্রে কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ দেখা যায় না। পদমর্য্যাদা হানি ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন কর্ম্মক্ষেত্রে সম্ভব। স্ত্রীলোকেরা তথাকথিত বন্ধু ও স্বজন বর্গের পরামর্শানুসারে এমন সব কাজ করবে যার জন্যে বহু কষ্ট ভোগ, ক্ষতি, অপবাদ ও লাঞ্ছনা প্রাপ্তি ঘটবে। এ জন্যে কারো পরামর্শ অনুসারে এমাসে না চলাই ভালো। পারিবারিক ক্ষেত্রের মধ্যে নিজেদের সীমিত রাখা আবশ্যক। পর পুরুষের সঙ্গে মেলা মেশা বা নিগূঢ় ভাবে আলাপ আলোচনায় সময় অতিবাহিত করা বা বহির্ভ্রমণ একেবারেই বর্জ্জনীয়, তা ছাড়া মেয়ে পুরুষের সংমিশ্রণে গঠিত কোন প্রকার দলে ভিড়ে পিকনিক, ভ্রমণ, বা আমোদ উৎসবে যোগদানের

পরিণতি কলঙ্কপ্রদ হোতে পারে। আত্মসংযমের শৈথিল্য বহু ভাবী ঘটনাকে নিকটবর্ত্তী করতে পারে। সকল কাজেই নৈরাশ্যজনক অবস্থা। এক্ষেত্রে খুব সংযম ও ধৈর্য্য অবলম্বন করে স্ত্রীলোককে সতর্কভাবে মাসটী অতিবাহিত করতে হবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়াজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে মোটামুটিভাবে দিনগুলি অতিবাহিত হবে। মূলাজাতগণের পক্ষে সমগ্রটি ভালো বলা যায়না। সকলের পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা। প্রথমার্দ্ধটী অপেক্ষাকৃত ভালো। উত্তমলাভ, প্রচেষ্টায় সাফল্য ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি, বন্ধুলাভ, গৃহে-মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সন্তানের জন্ম, শত্রুজয়, অংশীদারী ব্যবসায়ে সাফল্য, স্ত্রীলোকের সহিত ভাবের আদান প্রদানে সাফল্য প্রভৃতি প্রথমার্দ্ধে সম্ভব। শেষার্দ্ধে আর্থিকচাপ, স্বজনবিয়োগ, প্রতারণাজনিত ক্ষতি, স্বজন ও বন্ধু বিরোধ, স্ত্রীলোকের কুচক্রান্তজনিত কষ্টভোগ। শারীরিক স্বচ্ছন্দতা এমাসে থাকলেও আহার্য্য সম্পর্কে সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঈষৎ ত্রুটির ফলে পিত্তপ্রকোপজনিত রোগ হবে। এমাসটি ঘরে বাইরে শান্তিপূর্ণ নয়। বন্ধুদের সঙ্গে অসদ্ভাবের কারণ ঘটতে পারে। স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আচার ও আচরণের ভিতর বহু কষ্টভোগ আছে। এজন্য স্ত্রীলোকের কোন ব্যাপারে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। আর্থিক সাফল্য, ধনলাভ, প্রচেষ্টায় সাফল্য ইত্যাদিযোগ আছে, শেষের দিকে কিছু ক্ষতি এবং প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা। চৌর্য্যভয় আছে। কারো জন্যে জামিন হওয়া একেবারেই বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে অত্যন্ত শুভ সময়। গৃহসম্পত্তি কেনা বেচা বা বিনিময়ে লাভ হবে। দালালরাও লাভবান হবে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে প্রথমার্দ্ধটি শুভ, নূতন পদমর্য্যাদা ও সম্মান লাভ, শত্রুজয়, প্রতিযোগিতায় সাফল্য। দ্বিতীয়ার্দ্ধটি কিঞ্চিৎ খারাপ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। জনসাধারণের কাছে সম্মানলাভ। সমগ্র মাসটি স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুকূল। ঘরে বাইরে পসার প্রতিপত্তি, সম্মান ও মর্য্যাদালাভ। অবৈধপ্রণয়ে আশাতীত সাফল্য ও উপঢৌকন লাভ, তা ছাড়া প্রণয়ীর ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে দিনগুলি সুন্দরভাবে অতিবাহিত হবে। পরপুরুষের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য নানপ্রকারে লাভজনক। উচ্চপদমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুগ্রহও দাক্ষিণ্য লাভ। চাকুরিজীবী নারীর সৌভাগ্যবৃদ্ধি। উপরওয়ালার অনুগ্রহ পুষ্টিলাভ। শিল্পকলা, মঞ্চ ও পর্দ্দা নিয়ে যে সব নারী জীবিকা অর্জ্জন করছে তাদের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ।

মকর রাশি

ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। শ্রবণার পক্ষে মধ্যম। উত্তরাষাঢ়াজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। উত্তম ও শক্তিসম্পন্ন বন্ধুলাভ, অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ, বিলাসব্যসন, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, শত্রুজয়, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, নূতন বিষয়ের অধ্যয়ন প্রভৃতি শুভফলের আশাকরা যায়। কলহ মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয়, অপবাদ, ক্লান্তিকর-ভ্রমণ বন্ধুহানি, প্রচেষ্টায় বাধা, শত্রুবৃদ্ধি ও অর্থক্ষতি প্রভৃতি গ্রহবৈগুণ্য হেতু কুফল ফলতে পারে। শারীরিক দুর্ব্বলতা ব্যতীত বিশেষ পীড়াদি যোগ নেই। পরিবারবহির্ভূত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত অসদ্ভাবের কারণ ঘটবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে শান্তি শৃঙ্খলাও ঐক্য ব্যাহত হবে। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। অপরিমিতব্যয়। আর্থিক প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হবে, টাকাকড়ি বিনা চেষ্টায় আসতে থাকবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে উত্তম সময়। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি ভালোই যাবে। পদমর্য্যাদাবৃদ্ধির যোগ আছে। অল্পবিস্তর বাধা এলেও ব্যবসায়ীও বৃত্তিজীবীদের এমাসে নানা ভাবে সাফল্যলাভ ও আয়বৃদ্ধি। রেসে জয়লাভ স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্ব বিষয়ে উত্তম সময়। অবৈধপ্রণয়ে লিপ্ত নারীর আশাতীত সাফল্য ও সুখসমৃদ্ধি। কোর্টসিপ প্রণয়—বিনিময়, পরপুরুষের সহিত ঘনিষ্টসূত্রে আবদ্ধ হওয়া ও বিবাহের প্রস্তাব প্রভৃতি অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করবে। বহু অবিবাহিতার এমাসে বিবাহ হবে। প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্বামীর সান্নিধ্য-লাভ করবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মর্য্যাদা, প্রতি-পত্তি ও প্রভুত্ব লাভ। বেকার নারীর চাকুরী হবে। এমাসে নূতন বিষয় অধ্যয়ন, সাহিত্য, সঙ্গীত, দর্শন ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান চর্চ্চায় বিশেষ সাফল্য লাভ। বৃত্তি শিক্ষাতেও কৃতিত্ব অর্জ্জন দেখা যায়। ভ্রমণ, পিকনিক পার্টি, জনকল্যাণকর কার্য্যাদি, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার কারণ হবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে বিশেষ শুভ। শতভিষা-জাতগণের পক্ষে শুভপ্রদ নয়। মাসের শেষার্দ্ধটী প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা উত্তম, মাসটি মিশ্রফলপ্রদ। সাফল্য, বিলাসব্যসন, লাভ, ধনী ও প্রভাব প্রতিপত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব, শত্রুজয়, সুখসৌভাগ্য, যশ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা, গৃহে বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি শুভ ফলের আশা করা যায়। প্রথমার্দ্ধে কর্ম্মপ্রচেষ্টায় ব্যর্থতা, দুর্ঘটনা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, ব্যয়বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যহানি, কলহবিবাদ প্রভৃতি সম্ভব। স্বাস্থ্যের অবনতি হবে না। শারীরিক দুর্ব্বলতা ঘটতে পারে। ভ্রমণে ক্লান্তি হেতু অস্বচ্ছন্দতা। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা ও ঐক্য অটুট থাকবে। ঘরে বাইরে সকলের সঙ্গে মেলামেশায় বেশ প্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কলহবিবাদের ভয় আছে। আর্থিক ক্ষেত্র সন্তোষজনক বলা যায়না। শেষার্দ্ধে কিছু আর্থিকোন্নতি ঘটবে। প্রথমার্দ্ধে অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু ক্ষতি, ব্যয়বৃদ্ধি, কলহবিবাদ প্রভৃতি সম্ভব। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে পরাজয়। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ সময়। প্রথমার্দ্ধ চাকুরি জীবীদের পক্ষে শুভ নয়, শেষার্দ্ধে বাধা বিপত্তির ভেতর দিয়ে কিছুটা শুভ হবে। ব্যবসায়ী ও, বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়, শেষ দিকে সন্তোষজনক। স্ত্রীলোকের

পক্ষে আশাআকাঙ্ক্ষা খুব বেশী না হোলেও, শেষার্দ্ধটি সর্ব্বতোভাবে উত্তম হবে। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে অনুকূল আবহাওয়া দেখা যাবে। বিত্তার্জ্জনে, সাহিত্য চর্চ্চায়, শিল্প সাধনায়, সামাজিক ও পারিবারিক হিতকর কার্য্যে সন্তোষজনক ফললাভ। অবিবাহিতার বিবাহযোগ। ভ্রমণ, কোর্টসিপ, প্রেমের আদানপ্রদান, পরপুরুষের সান্নিধ্যে সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি এমাসে দেখা দেবে। বস্ত্রালঙ্কার ও অর্থপ্রাপ্তি যোগ আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতীজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়। উত্তরভাদ্রপদজাতব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। মোটামুটিভাবে সফলতা লাভ, সুখ, প্রভাবপ্রতিপত্তি, মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান। বিলাসিতা ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি, প্রভাবপ্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির আনুকূল্য প্রাপ্তি প্রভৃতি শুভযোগ। কর্ম্মে বিলম্ব ও বাধা, মিথ্যা অভিযোগ, ক্লান্তিজনক ভ্রমণ, ক্ষতি, অসম্মান এবং শত্রুতা, ধারালো অস্ত্রের আঘাতপ্রাপ্তি, উদ্বেগ প্রভৃতি অশুভফলের আশঙ্কা আছে। স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হবে না। প্রথমার্দ্ধে রক্তের চাপবৃদ্ধি। ভ্রমণে ক্লান্তি, সামান্য শস্ত্রোপচার ও ঘটতে পারে। পারিবারিক শান্তিশৃঙ্খলা ও ঐক্য অটুট থাকবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বিশেষতঃ আড়ম্বরের সহিত বিবাহাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হোতে পারে। আর্থিক অবস্থা ও অর্থোপার্জ্জনবৃদ্ধি প্রচেষ্টা বিশেষ আশাপ্রদ, ধন বৃদ্ধিযোগ আছে। পদমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহচর্য্য লাভ। গ্রন্থথেকে লাভ, সমুদ্র পরপারের বাণিজ্যে লাভ, বিজ্ঞান সাধনায় লাভ, নূতন পরিকল্পনায় সিদ্ধি। সম্পত্তিলাভের সম্ভাবনা আছে। বাড়ী ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যাপারে দালাল বা বন্ধুর সাহায্য না নিয়ে নিজের হস্তক্ষেপ আবশ্যক, অন্যথা ঠক্‌বার সম্ভাবনা। শেষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আফ্‌শোষ করতে হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। সহকর্ম্মীদের ঐক্য ও সহযোগের অভাব হেতু চাকরির ক্ষেত্রে কিছু কষ্ট ভোগ আছে। এদিকে এমন সুযোগও আস্‌বে—যার ভেতর থেকে নিজের কর্ম্মদক্ষতা প্রকাশের পথ প্রশস্ত হবে এবং ভবিষ্যতে পদোন্নতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী বিশেষ শুভ নয়। ধনী আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের অনুগ্রহলাভ, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তি, অপরের দানগ্রহণ প্রভৃতি সত্বে ও শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছন্দতার অভাব ঘটবে। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তির কারণ আছে। কোর্টসিপ, ভালোবাসার আদানপ্রদান-পরপুরুষের সঙ্গে অবাধ ও অবৈধ মেলা মেশা, পার্টি, পিকনিক ও ভ্রমণে যোগদান বাঞ্ছনীয় নয়। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র মোটেই অনুকূল নয়। এজন্ত গার্হস্থ্য কর্ম্মে নিজেকে সীমিত রাখাই উচিত। শরীর সম্বন্ধে সতর্ক না হোলে দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির কার্য্য ব্যাহত হবে, শূলবেদনা, উদরের বিশৃঙ্খলা, স্ত্রীরোগের উপসর্গ প্রভৃতি সম্ভব হয়ে উঠবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটি ভালো বলা যায়না।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নের ফলাফল

মেষ লগ্ন

দেহভাব অশুভ। নূতন ঋণের সম্ভাবনা। চিত্র ও মঞ্চ ব্যবসায়ী ও শিল্পীর পক্ষে উত্তম। যৌন আকর্ষণ, বেদনাসংযুক্ত পীড়া। পাকযন্ত্রের গোলযোগ। কর্ম্মস্থলে কিছু বাধা। স্ত্রীর জরায়ু ঘটিত ও পাকযন্ত্রের পীড়া। সন্তান ও মাতার স্বাস্থ্যহানি বা পীড়া। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ বলা যায় না।

বৃষলগ্ন

আর্থিক অসুবিধা ভোগ। ভাগ্যোন্নতিতে কিঞ্চিৎ বাধা। বিদ্যোন্নতির পক্ষে ও প্রতিকূল পরিস্থিতি। স্ত্রীর জন্য মানসিক কষ্ট। গৃহস্থালীর ব্যাপারে বিশৃঙ্খল আবেষ্টন। বিদ্যার উন্নতি যোগ। মস্তিষ্ক পীড়া বা মানসিক ব্যাধি। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মিথুনলগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা। ধনোপার্জ্জন যোগ আছে, কিন্তু ব্যয়বাহুল্য হেতু বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের দেহ পীড়া। বিদ্যালাভে বাধা। স্বার্থপর সন্তানের জন্য দুঃখ। স্ত্রীর জন্যে গৃহসুখের হানি। ফুসফুসের পীড়ার আশঙ্কা। কর্ম্মস্থলে প্রতাপশালী ব্যক্তি বা উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সাহায্যলাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ।

কর্কটলগ্ন

কোন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের জন্য পরিশ্রম। দেয় ও প্রাপ্য অর্থের জন্য বিবাদ। ভ্রমণে বিপত্তি বা দুর্ঘটনা। কোন সভা বা সংসদের কর্ম্মে খ্যাতি। গুপ্ত উপায়ে লাভ। গুপ্ত প্রেমের দিকে ঝোঁক। শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্যে ভ্রমণে বাধা। বৃথা ব্যয়ের জন্য অনুশোচনা। শত্রুপীড়ায় স্থান চ্যুতি। চোর বা প্রতারকের দ্বারা ক্ষতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসের শেষার্দ্ধে অসুবিধা ভোগ ও নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতি।

সিংহলগ্ন

আকস্মিক আঘাতপ্রাপ্তি। সহোদরের স্বাস্থ্যহানি। সামান্য কারণে বন্ধুদের সঙ্গে মনোমালিন্য। ভাগ্যোন্নতি, শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা—শ্লেষ্মা, বাত প্রভৃতি রোগের প্রবণতা। মানসিক দুশ্চিন্তা। অংশীর ব্যাপারে দুঃখ ও আশাভঙ্গ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ।

কন্যা লগ্ন

বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হওয়া বা বন্ধুদের ষড়যন্ত্রে কোন রকমে বিপন্ন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। সন্তানদের দেহপীড়া এবং সন্তানের লেখা পড়ার দিকে অমনোযোগিতা। পত্নীর আন্তরিকতা অনুভূত হবে। দাম্পত্য প্রণয় যোগ। কর্ম্মস্থলে নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট ও বিরক্তির কারণ ঘট্‌বে। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলা লগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা। ব্যয়বৃদ্ধি, ধনাগম যোগ, সহোদরের পীড়া বা সম্ভব স্থলে হানি। মাতার দেহ পাড়া। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। মিত্রলাভ, বাসভূমির স্বচ্ছন্দতার অভাব। কর্ম্মোন্নতিতে বাধা, কন্যা সন্তানের বিবাহের আলোচনা বা বিবাহ যোগ। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যে সাফল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ বলা যায় না। শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে আশানুযায়ী ফল লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃশ্চিকলগ্ন

কর্ম্মস্থলে দায়িত্ব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি। কন্যা সন্তানের বিবাহের আলোচনা বা বিবাহ যোগ। গৃহাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কারাদিতে অর্থব্যয়। ভাগ্যোন্নতির পথে অন্তরায়। সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা। পাকযন্ত্রের পীড়া, বাত বেদনাজনিত পীড়া ভোগ। পত্নী সুখ, সব বিষয়ে একটু বাড়া বাড়ি ভাব ও রুক্ষ মেজাজ। কন্যা সন্তানের বিবাহের আলোচনা বা বিবাহ যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

ধনুলগ্ন

ধনাগম যোগ। এতদ্‌সত্ত্বেও অনেক রকমে ব্যয় বৃদ্ধি। পড়াশুনায় কৃতিত্বের পরিচয়। ভাগ্যোন্নতি। আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তি বা রক্ত-পাতাদি পীড়া। দুঃস্বপ্ন দর্শন। ভোগবিলাসের উপকরণ প্রাপ্তি। মিত্র-লাভ যোগ। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহের আলোচনা। সহোদরের সহিত বৈষয়িক ব্যাপারে মতানৈক্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি ভালো বলা যায় না। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

মকরলগ্ন

শারীরিক অশান্তি। ধনভাবের ফল মধ্যবিধ। সম্বন্ধু লাভ। স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতা। শত্রুজয়। সহোদরের সহিত অসদ্ভাব। সন্তানের বিবাহ বা বিবাহের আলোচনা। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আশানুযায়ী না হোলে ও বিফল মনোরথ হোতে হবে না। সরকারের অথবা জনসাধারণের সংস্রবে পদপ্রাপ্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী ভালো নয়, স্বামীর পীড়াদি সূচিত হয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

কুম্ভলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক সুখস্বচ্ছন্দতা। বন্ধুবান্ধবদের একান্ত চেষ্টায় চাকুরী বা পদোন্নতির যোগ প্রবল নয়। ভৃত্যাদির শত্রুতা বা বিশ্বাস ঘাতকতা। অপবাদ প্রাপ্তি। প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবার জন্য অথবা নিজের স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্য প্রতারণা ও কপটাচার। অব্যবস্থিত চিত্ত। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ নয়, উদ্বেগের কারণ আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

মীনলগ্ন

দেহভাবে ক্ষতির আশঙ্কা। বাতবেদনা, দাঁতের পীড়া, আকস্মিক দুর্ঘটনা। মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ যোগ। অধ্যাপনায় সুনাম। বিদেশ ভ্রমণ বিদ্যাচর্চায় অমনোযোগিতা, সন্তানাদির দেহ পীড়া। বন্ধুর সহিত মতানৈক্য। ভাগ্যোন্নতির যোগ। অর্থাগম। বিবাহার্থীর পত্নী লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি শুভপ্রদ নয়।

ভক্ত শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পিতৃকুল, মাতৃকুল, সম সমুজ্জ্বল,
আভিজাত্যপূর্ণ, সিদ্ধ, শুদ্ধ সুপ্রাচীন ;
তুমি তাঁহাদের পুণ্য পুঞ্জ শতদল
প্রতিভার অধিকারী অভিমানহীন।
তুমি যেথা গান কর, সে তো যজ্ঞস্থলী,
কণ্ঠের বৈকুণ্ঠে তব রাজে রাধাশ্যাম,

কার অন্বেষণে কোথা ফের কুতুহলী ?
তুমি হের নিত্য ব্রজ লীলা অভিরাম।
অভাগা ! তবু ও ভাগ্যবানের অগ্রণী
সব সাধ খোয়াইয়া পূর্ণ সব সাধ
পবিত্র তোমার কুল কৃতার্থা জননী
করেছেন তোমারে শ্রীহরি আত্মসাৎ।

এক ছাড়া তুমি আর কিছু চাহ নাই
আনন্দে তোমার পানে বিস্ময়ে তাকাই।

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

এম, সি, সি, দল ও ভারতীয় ক্রিকেট

ভারত পাকিস্থান সফরকারী এম, সি, সি-দল তাঁদের সফর ভালভাবেই শুরু করেছেন। পাকিস্থানের বিরুদ্ধে প্রথম টেষ্টে তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের ফলে সূচনায় এম, সি, সি দলের শক্তি সম্বন্ধে যে সন্দেহের উদয় হয়েছিল তা দূর হয়েছে। ভারত এবং পাকিস্থানের বিরুদ্ধে পিটার মে, কাউড্রে, ট্রুম্যান, ষ্টেথাম প্রমুখ খ্যাতনামা খেলোয়াড় বর্জিত এই দলটিই যে যথেষ্ট, ক্রমশঃ তা প্রমাণিত হচ্ছে।

ভারতে গত কয়েক বৎসরের ক্রিকেট খেলা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় একমাত্র 'ড্র' করতে পারা ছাড়া আর অন্য কোন বিষয়ে উন্নতি হয় নি। শক্তিশালী বা দুর্ব্বল যে কোন দলই আসুক না কেন, ভারতের অতি-বড় সমর্থকও বলতে পারবেন না যে এদের কাছে ভারত জয়লাভ করবে। বিদেশের কাগজে ভারত ইতিমধ্যেই 'ড্র'-বিশারদ আখ্যা লাভ করেছে। কিন্তু ভারতে ক্রিকেট খেলার মানের এই অবনতির কারণ কি? ক্রিকেট খেলার উন্নতির জন্য উপর মহলে জল্পনা-কল্পনার তো অবধি নেই, খরচও হচ্ছে ঠিকই। পুরানো কর্ম্মকর্তাদের বদলে নূতন কর্ম্মকর্তারা আসছেন। কিন্তু ফল সেই একই আছে—থোড়বড়ি খাড়া, খাড়াবড়ি থোড়।

কেন্ ব্যারিংটন এম, সি, সি, দলের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান

ভারতীয় ক্রিকেটের পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেই মহম্মদ নিশার, সুঁটে ব্যানার্জির পর একজনও প্রকৃত ফাষ্ট বোলার খুঁজে পাওয়া গেল না এই বিশাল দেশের মধ্যে। দাত্তু ফাদকারের পর রামচাঁদ ও উমরিগড় প্রভৃতির দ্বারা ভারতীয় দলের বোলিং-এর সূচনা করা যে কোন আন্তর্জাতিক দলের পক্ষে ওপনিং বলের নামে পরিহাস স্বরূপ। অষ্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে সুভ্র দেশাইকে

দেখে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়েছিলো—কিন্তু গত বোম্বাই টেষ্টের পর তাঁর উপর আর ভরসা রাখা সম্ভব নয়। ওপনিং বোলারদের কথা বাদ দিলে এতদিন পর্য্যন্ত ভারত যা নিয়ে গর্ব্ব করতে পারতো তা হচ্ছে তার স্পিন বোলার-গণ। এঁদের কৃতিত্বের জন্য ভারতের ওপনিং বোলারের অভাব এত প্রকট হয়ে ওঠে নি। ফাষ্ট বোলার না থাকলেও ভারত তার স্পিন বোলারদের নিয়ে গৌরব করতে পারতো কিছু দিন আগেও। ভিনু মানকাদ, গোলাম আমেদ, সুভাষ গুপ্তে আর তারও আগে অমর সিং, আমীর এলাহী, সি, এস, নাইডু প্রমুখ বোলারগণ বিশ্বের সুখ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় দলে না আছে ভাল ওপনিং বোলার না আছে ভাল স্পিন বোলার। অথচ আগের তুলনায় ক্রিকেট এখন অনেক বেশী জনপ্রিয় খেলা। নির্ব্বাচকমণ্ডলী ব্যাট্স-ম্যান দিয়ে দল ভরিয়ে কোন রকম করে জোড়াতালি দিয়ে ড্র' করে সম্মান বাঁচাতেই ব্যস্ত। কিন্তু জিততে গেলে শুধু ব্যাট্স-ম্যান হলেই চলবে না, ভাল বোলিং যে অপরিহার্য্য এ বিষয়ে আমাদের নির্ব্বাচক মণ্ডলীর যেন হুঁস নেই। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ

ভারত-পাকিস্থান সফররত এম, সি, সি, দলের অধিনায়ক টেড্ ডেক্সটার

অষ্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে ভারতের ঐতিহাসিক জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল যাশু প্যাটেলের অপ্রত্যাশিত বোলিং সাফল্যের জন্য। ভি, ভি, কুমার সম্বন্ধে অনেকেই আশা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু বোম্বাই টেষ্টে তিনি তাঁদের নিরাশ করেছেন। ফলে পুনরায় সুভাষ গুপ্তেকে দলে স্থান দেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু তাঁর বোলিং-এর যা নমুনা আমরা শেষের দিকে দেখেছি তাতে বিশেষ ভরসা হয় না।

সামনেই ভারতের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর। সে জন্য এম, সি, সি-র এই সফরের গুরুত্ব অনেকখানি। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারত যদি সুফল লাভ করতে চায়, তা হ'লে তাদের বোলিংকে বিশেষ ভাবে শক্তিশালী করতে হবে। সে জন্য এই বিভাগের উন্নতি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জি, এ, আর লক্

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

দলিপ ট্রফি

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম বছরের ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল দল ১০ উইকেটে দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত করে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরেই জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। পশ্চিমাঞ্চল দলে নাম-করা খেলোয়াড় খেলেছিলেন—নরী কণ্ট্রাক্টর, পলি উমরিগড়, হেমু অধিকারী, রামচাঁদ, নাদকার্ণী এবং দেশাই। দক্ষিণাঞ্চল দলে ছিলেন তিনজন নাম-করা খেলোয়াড়—দুই ভাই কৃপাল ও মিলখা সিং এবং জয়সীমা।

টসে জয়ী হয়ে দক্ষিণাঞ্চল দল প্রথম ব্যাট করে। ১৭৫ রাণে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। টসে জয়লাভের সুবিধা তাদের শেষ পর্যন্ত কাজ দেয়নি। খেলার দ্বিতীয় দিনে ২৩৪ রাণের (৯ উইকেটে) মাথায় পশ্চিমাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তৃতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের ২য় ইনিংস আরও কম ১৩৯ রাণে শেষ হয়, চা-পানের ২৫ মিনিট খেলার পর। তখন খেলা ভাঙ্গতে ৫০ মিনিট সময় ছিল। এই সময়ে পশ্চিমাঞ্চল দল কোন উইকেট না হারিয়ে ৬২ রাণ তুলে দেয়। জয়লাভের জন্যে তখনও ১৮ রাণের প্রয়োজন ছিল। খেলার চতুর্থ দিনে ১৯ রাণ তুলে দিয়ে পশ্চিমাঞ্চল দল ১০ উইকেটে জয়ী হয়।

দক্ষিণাঞ্চল দল ঃ ১৭৫ রাণ (কৃপাল সিং ৭৩। উমরিগড় ৫২ রাণে ৬ উইঃ) ও ১৩৯ রাণ (রামচাঁদ ১৮ রাণে ৪ এবং দেসাই ৫১ রাণে ৪ উইঃ)

পশ্চিমাঞ্চল দল ঃ ২৩৪ রাণ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বোরদে ৮২ নট আউট। কৃপাল সিং ৬৬ রাণে ৪ এবং প্রসন্ন ৬৯ রাণে ৩ উইকেটে ও ৮২ রাণ (কোন উইকেট না পড়ে)।

ব্যাডমিণ্টন ঃ হায়দরাবাদে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ছাত্র বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই দল ৩—২ খেলায় দিল্লীকে পরাজিত করে। বোম্বাই দল ৩—০ খেলায় আগ্রা দলকে পরাজিত ক'রে ছাত্রী বিভাগের ফাইনালেও জয়লাভ করে।

ফুটবল ঃ ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল ৩—১ গোলে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত ক'রে পর পর দু'বছর আশুতোষ স্মৃতি শীল্ড লাভ করেছে।

ডি সি এম ফুটবল ঃ

দিল্লীর ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব (গত বছরের রানার্স আপ) ২—১ গোলে মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার দলকে পরাজিত করে।

সেমি-ফাইনাল ঃ মহমেডান স্পোর্টিং (ক'লকাতা) ১, ৫ ঃ হায়দরাবাদ সেণ্ট্রাল পুলিশ লাইন ১, ৩। মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার ৩ ঃ সিটি কলেজ ওল্ড বয়েজ ০।

মহমেডান স্পোর্টিং দলের সাহাবুদ্দিন সেমি-ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে হ্যাট-ট্রিক করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য গত বছরের বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব (ক'লকাতা) এবছরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি।

ডেভিস কাপ ঃ

প্রখ্যাত ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন ফাইনালে ইটালী ৪—১ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করেছে। এই জয়লাভের ফলে ইটালী মূল প্রতিযোগিতার 'চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে' অর্থাৎ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। গতবছর ইণ্টার-জোন ফাইনালেও ইটালী আমেরিকাকে পরাজিত ক'রে 'চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে' অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মিলিত হয় এবং ১—৪ খেলায় পরাজিত হয়। সুদীর্ঘ কালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ইটালী এই নিয়ে দ্বিতীয়বার 'চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে' খেলবার সৌভাগ্য লাভ করলো।

১৯৬১ সালের ইণ্টার জোন ফাইনালে মোট ৫টি খেলার মধ্যে প্রথম সিঙ্গলসে আমেরিকা জয়ী হয়; ইটালী ২টি সিঙ্গলস এবং ডাবলসে জয়ী হয়ে ৩—১ খেলায় অগ্রগামী হয়ে 'চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে' খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ৪র্থ সিঙ্গলস খেলাতেও ইটালী জয়ী হলে

খেলার ফলাফল দাঁড়ায় ইটালীর জয় ৪ এবং আমেরিকার ১।

সুব্রত মুখার্জি কাপ ঃ

ভারতবর্ষের এয়ারমার্শাল পরলোকগত সুব্রত মুখার্জির স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত সুব্রত মুখার্জি কাপ প্রতিযোগিতার প্রথম বছরের ফাইনালে ক'লকাতার রাণী রাসমণি হাইস্কুল ২—০ গোলে দেরাদুনের গুর্খা মিলিটারী স্কুলকে পরাজিত করেছে। এই বাৎসরিক ফুটবল প্রতিযোগিতাটি সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে কেবল স্কুল দলের জন্ম উন্মুক্ত।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা ঃ

সন্তরণ ঃ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণে কলকাতা ৫৮ পয়েণ্ট পেয়ে উপর্য্যুপরি দু' বছর চ্যাম্পিয়ান-সীপ লাভ করেছে। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে বোম্বাই (৪৭ পয়েণ্ট)। ওয়াটার পোলো ফাইনালে বোম্বাই ৭—৩ গোলে গত দু'বছরের বিজয়ী ক'লকাতা দলকে পরাজিত করে।

সুধীর সেন (বাংলা)

গত জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোক (সময় ১ মিঃ ২৭·১ সেঃ) অনুষ্ঠানে নতুন জাতীয় রেকর্ড করেছেন। ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটির সভ্য।

সন্ধ্যা চন্দ্র (বাংলা)

গত জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক (সময় ১ মিঃ ২৮ সেঃ) এবং ২৭০ মিটার ফ্রি স্টাইল (সময় ২মিঃ ৫৮·৩ সেঃ) অনুষ্ঠানে নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যা।

সৌরভ ব্যানার্জি

রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতার জুনিয়ার বিভাগের ১০০ মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোকে প্রথম স্থান লাভ করেন। ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সভ্য।

পাকিস্থান সফরে এম সি সি ঃ

প্রেসিডেন্ট একাদশ : ২০৮ ও ১৯৫ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মুস্তাক মহম্মদ ১০২ নটআউট। লক্ ৫৩ রানে ৫ উইকেট)

এম সি সি : ১৯৭ (জাভেদ আখতার ৫৬ রানে ৭ উইকেট পান) ও ১৫৪ (৭ উইকেটে। রাসেল ৭২)

প্রেসিডেন্ট একাদশ দলের বিপক্ষে পাকিস্থান সফরের প্রথম খেলাটি এম সি সি দল ড্র করে।

পাকিস্থান সফরের দ্বিতীয় খেলায় এম সি সি দল ২৯ রানে গভর্ণর একাদশ দলকে হারিয়ে দেয়।

প্রথম টেষ্ট :

পাকিস্থান ঃ ৩৮৭ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জাভেদ বার্কি ১৩৮, মুস্তাক মহম্মদ ৭৬, সয়িদ আমেদ ৭৪। হোয়াইট ৬৫ রানে ৩, বারবার ১২৪ রানে ৩ এবং এ্যালেন ৬৭ রানে ২ উইকেট পান) ও ২০০ (ব্রাউন ২৫ রানে ৩, এ্যালেন ৫১ রানে ৩ এবং বারবার ৫৪ রানে ৩ উইকেট পান)

ইংল্যাণ্ড ঃ ৩৮০ (কেন ব্যারিংটন ১৩৯, মাইক স্মিথ ৯৯। মহম্মদ মুনাফ ৪২ রানে ৪ উইকেট পান) ও ২০৯ (৫ উইকেটে। ডেক্সটার ৬৬ নটআউট, রিচার্ডসন ৪৮ এবং বারবার ৩৯ নটআউট। ইনতিখার আলম ৩৭ রানে উইকেট পান।)

ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্থানের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৫ উইকেটে জয় লাভ করে। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের খেলা ভাঙতে ৩৫ মিনিট বাকি থাকতে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়।

পাকিস্থান টসে জয়ী হয়ে প্রথম দিনের খেলায় ৩ উইকেট হারিয়ে ২৫৪ রান করে। জাভেদ বার্কি ১০৩ এবং মুস্তাক মহম্মদ ৪৬ রান করে নট আউট থাকেন।

খেলার দ্বিতীয় দিনে পাকিস্থান দল ৩৮৭ রানে (৯ উইকেট) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এইদিন ইংল্যাণ্ড ২টো উইকেট খুইয়ে ১০৯ রান করে। নটআউট থাকেন ব্যারিংটন (৫১) এবং জে কে স্মিথ (৪৫)। খেলার তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড সারাদিন ধরে ব্যাট করে ৩২১ রান করে, ৬টা উইকেটে। রাসেল এবং মারে যথাক্রমে ২২ এবং ৪ রান ক'রে উইকেটে অপরাজেয় থাকেন।

চতুর্থ দিনে ৩৮০ রানে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে লাঞ্চের কয়েক মিনিট আগে। পাকিস্থান মাত্র ৭ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এইদিনে পাকিস্থানের ৯টা উইকেট পড়ে—রান ওঠে ১৪৯।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে পাকিস্থানের দ্বিতীয় ইনিংস ২০০ রানে শেষ হয়। তখন খেলা ভাঙতে ২৫০ মিনিট বাকি। ইংল্যাণ্ড ২০৮ রান তুলতে পারলেই জয়লাভ করবে। প্রয়োজনের থেকে এক রান বেশী (২০৯ রান) ক'রে পাকিস্থানকে ৫ উইকেটে ইংল্যাণ্ড পরাজিত করে।